KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : কলিকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher :
Title : অনুসন্ধান সাপ্তাহিক	Size : 5.5"x 9" 13.97x 22.86 c.m.
Vol. & Number : ৮/১-৪৮	Year of Publication : বৈশাখ-চৈত্র ১৩৬১
	Condition : Brittle Good
Editor : তুষারকান্তি সাহা	Remarks :

C D Roll No : KLMLGK

১১০৮

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণং।

অনুসন্ধান।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সাপ্তাহিক।

অষ্টম বৎসর।

১৩০১

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,
অধ্যক্ষ,
'অনুসন্ধান'—পত্রের কার্য্যালয়, কলিকাতা।

PRINTED BY WOOMA CHURN CHUCKERBUTTY
AT
THE HERALD PRINTING WORKS.
189, BOW BAZAR SREET,
CALCUTTA.

অনুসন্ধান।

অষ্টম বৎসর।

সূচী।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ। ২১এ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। প্রথম সংখ্যা।

প্রাগ-কথা।

আমি কে?

এ সংসার মধ্যে আমি কে? এ গুরুতর প্রশ্ন যাহার মনে একবার উদ্রিত হইয়াছে, তিনি আর উদাসীন থাকিতে পারেন না। অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানপিপাসা তাঁহাকে ক্রমেই বাহ্যজগৎ হইতে অন্তর্জগতে লইয়া যাইবে।

প্রথমেই আমার সম্বন্ধ বাহ্যজগতের সঙ্গে। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই দেখি,—যেন সমস্ত জগৎ আমার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। যে জননী—আমায় জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি আমার ধাত্রী ও দুগ্ধদাত্রী। পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, দাস, দাসী সকলেই যেন আমার সেবার জন্য পূর্ব্বেই প্রেরিত। পৃথিবীর গণ্ডগুলি যেন আমার জন্য অগ্রেই সৃষ্ট। মধুমধুরী ও তুষসারী প্রভৃতি যেন আমাকে প্রমোদিত করিবার জন্য কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে। ধাত্রী হস্বার করিয়া যেন আমায় দুগ্ধপান করাইবার জন্য ডাকিতেছে। তাহার বৎস যেন আমার জন্য উৎসুক হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ যেন সকলেই আমার জন্য আনন্দে প্রমত্ত হইয়া বেড়াইতেছেন। ঢাক-ঢোল ও শঙ্খঘণ্টাদি মাঙ্গল্য বাদ্যসকল বাজিয়া উঠিয়া জগতে আমার অবতারণা উদ্ঘোষিত করিতেছে। সুদ্যঃপ্রসূত কুমারের জন্য এত আনন্দ ও এত উৎসব কেন? আমি কে, যে আমার জন্য এত আনন্দ—এত উৎসব? জড় ও অজড় সকলেই আমার জন্য আনন্দে বিহ্বল কেন?

আমি কি এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের রাজরাজেশ্বর হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিলাম? জননী-জঠরের কারাগার হইতে বাহির করিয়া কে আমায় এই অতুল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসাইলেন? কার আদেশে পবন আমায় ব্যজন, ধরিত্রী আমায় বক্ষে ধারণ, বরুণ আমার রত্নলালামিশ্রিত দেহ প্রক্ষালন, অগ্নি আমায় উত্তাপ প্রদান এবং অনন্তপ্রসারী গগন আমার মস্তকে অতুল ও বিশাল চন্দ্রাতপ ধারণ করিল? সংক্ষেপতঃ কার

শক্তিবলে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ মিলিত হইয়া আমার পূজা আরম্ভ করিল? কাহার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া এই বিশ্বজনীন পূজার পুরোহিত হইলাম? কাহার আদেশে পঞ্চভূত ও তদ্ধিকার জগৎ বিভিন্ন আকারে আমার শরীরে নিরন্তর প্রবিষ্ট হইয়া, প্রতিপদের চন্দ্র যেমন পূর্ণিমায় পূর্ণকলা হয় সেইরূপ আমার শিশুদেহকে পূর্ণত্ব প্রাপ্তিত করিল?

যত দিন তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে, ততদিন মানব ঘোর অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন থাকায় আপনার জনকজননী ও জন্মস্থান চিনিতে পারে না। সেইজন্য আপনাকে পাপী, তাপী ও দীন-হীন কাঙ্গালের সন্তান মনে করিয়া বিড়ম্বিত হয়। যেদিন তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, সেদিন যোগ-চক্ষু খুলিয়া যায়, সেই দিন জানিতে পারে যে, ত্রিভুবনের ঈশ্বর তাহার জনক এবং জগজ্জননী আদ্যাশক্তি তাহার জননী। তখন সামান্য পার্থিব ভোগ্যবস্তু তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। ব্রহ্মাণ্ডপতির পুত্র হইয়া তাহার আর এ পৃথিবীতে থাকিতে ইচ্ছা করে না। জগতের মঙ্গলসাধনের জন্য পিতা আমায় এখানে পাঠাইয়াছেন জানিতে পারিয়াও, পিতামাতা ছাড়িয়া আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা করে না। তখন প্রাণ "মা! মা! মা! কোথায় মা!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠে। পিতৃভক্তিতে প্রাণ এত আপ্লুত হয় যে, পিতার নাম আর মুখে বাহির হয় না। জননী স্নেহের আধার—তাঁহাকে ডাকিতে প্রাণে সঙ্কোচ বোধ হয় না। জননীর গলা ধরিয়া তাঁহার কোলের উপর নৃত্য করিবার জন্য মন উৎসুক হয়। জননীর নিকট পুত্র সকল সময়েই শিশু। সুতরাং সেখানে সঙ্কোচ বা লজ্জা আসিয়া প্রাণের উচ্ছ্বাস নষ্ট করিয়া দেয় না। পিতার চরণযুগ বক্ষে ধারণ করিয়া নীরবে ভক্তিগদগদভাবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। পিতা-পুত্রের নয়নে নয়নে নির্ব্বাক্ প্রেমালিঙ্গন—যে জীবনে কখন অনুভব করে নাই, সে কখন এ চিত্রের সৌন্দর্য্য ও মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। পিতার নয়নযুগল হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া পুত্রের নয়ন-বিনির্গত জ্যোতির সহিত কোলাকুলি করিতে করিতে দুই জ্যোতিঃ মিলিয়া একাকার হইয়া যায়। তখন কে পিতা, কে পুত্র স্থির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়; এবং অবশেষে উভয়ে পরস্পর বিলীন হইয়া একটী অখণ্ড জ্যোতিঃপুঞ্জরূপে পরিণত হয়। জননী আদ্যাশক্তি, পিতাপুত্রের সেই অদ্বৈত মিলনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া স্বয়ং জ্যোতিরূপে সেই জ্যোতিঃপুঞ্জে মিশিয়া যান। তখন সেই প্রকাণ্ড জ্যোতির্গোলকে ত্রিভুবন বিলীন হইয়া যায়।

আমি যদি সেই জগজ্জননীর ও সেই জগৎপিতার পুত্র—তবে আমার এত ভাবনা কিসের? আমার আবার শত্রুমিত্র কেন? আমার শত্রু হইতে লোকের সাহস হয় কেন? আমার নিন্দা করিতে লোকের এত আনন্দ কেন? যে নিরন্তর জগতের মঙ্গলকামনা করে—জগতের মঙ্গলসাধনের জন্যই যাহার জন্ম—তাহার নিন্দা করিতে লোকের প্রবৃত্তিই বা হয় কেন? আর দান করিবার জন্য প্রাণ যাহার নিরন্তর আকুল—তাহার কোষ সদা শূন্য কেন? সকলের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যাহার মন সতত ধাবিত, তাহার বাঞ্ছাকল্পতরু সমে কলঙ্ক হয় কেন? কে ইহার জন্য দায়ী? কাহার দোষে এই সকল বিড়ম্বনা ঘটে?

আমার পিতামাতা অনন্ত শক্তির, অনন্ত

ময়ার ও অনন্ত জ্ঞানের আধার। সুতরাং তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বারিতা-দোষে এই সকল অভাবনীয় ফল সৃষ্টি হইতেছে, একথা বলিবার আমার অধিকার নাই। যাঁহাদের জ্ঞান এত পূর্ণ যে, একটী পরমাণু কোটী কোটী যুগে কখন কি আকার ধারণ করিবে তাহা অগ্রেই জানিয়া তাহাকে জগতে পাঠাইয়াছেন, কোটী কোটী গ্রহনক্ষত্রাদি ও জীবজন্তুর গতি-স্থিতি প্রথম হইতেই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা পুত্রের দুশ্চিন্তা-হরণ, শত্রুনাশ, নিষ্কণ্টক-নিপাত বা অভাব-মোচনাদি করিতে পারিতেন না—একথা কে বলিতে সাহস করিবে?

তাঁহারা নিজের জন্য যাহা বিধান করিয়া থাকেন, পুত্রের জন্যও তাহাই বিধান করিয়াছেন। সৃষ্টি করাই ইচ্ছাময় ও ইচ্ছাময়ীর উদ্দেশ্য। যাঁহারা জগতাধার, জগন্নিদানি—তাঁহাদের আবার ভাবনা কিসের? অথচ তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন বসিয়া থাকা অপেক্ষা জগতের চিন্তাভার ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের স্কন্ধে লইয়াছেন। ত্রিভুবনের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় কার্য্যের ঝঞ্ঝাট স্কন্ধে লইয়া, তাঁহাদের আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। আপনাদের আহার নাই — অথচ তাঁহারা জগতের ক্ষুদ্র পরমাণুর পর্য্যন্ত নিরন্তর আহার-যোগান করিতেছেন— পঞ্চ-ভূতরূপে স্থলর-জলম সকলের প্রাণরক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের চিন্তার বিরাম নাই। পুত্রকেও আপনাদের অনুরূপ করিবার জন্য জগতের চিন্তার ভারও তাহার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। তখন আমি সেই গুরুভার কাতর হই, তখন তাঁহারা আসিয়া আমার তার আপনার মস্তকে গ্রহণ করেন। প্রাণ ভরিয়া ডাকিলেই তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদেরও শত্রুমিত্র আছে—পূর্ণ লীলা বা পূর্ণবিকাশের জন্য শত্রুমিত্র উভয়ই প্রয়োজন। প্রাণপ্রিয়ার বা প্রাণপ্রিয়ের সঙ্গ যেরূপ আনন্দপ্রদ, প্রিয়সহচরী বা প্রিয়-সহচরের মৃত্যুসংবাদও উদ্দীপক। এইজন্যই শিব বিষ্ণুকে এবং বিষ্ণু শিবকে সখিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণাবতারে বিষ্ণু অর্জ্জুনকে সখা করিয়া লইয়াছিলেন, শিব রামাবতারে কৃষ্ণ প্রভৃতি গোপীনাথগুণকে সখা করিয়া লইয়াছিলেন, এবং রামাবতারে বিষ্ণুকে, স্ত্রীকে মিত্রপদে বরণ করিতে হইয়াছিল। আবার শত্রু বিনা শক্তিবিকাশের স্থান নাই। এইজন্য বিষ্ণুর নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপু, রামাবতারে রাবণ ও কৃষ্ণাবতারে কংসাদি শত্রু হইয়াছিল। শিবময় শিবের অন্তর দক্ষ শত্রু এবং যোগেন্দ্র যোগীন্দ্র ও জিতেন্দ্রিয়-শ্রেষ্ঠ শিবের মদন শত্রু হইয়াছিল। শক্তি-প্রয়োগে আধার না থাকিলে শক্তির বিকাশ হইবে কিরূপে? এই নিমিত্ত নিজের ও পুত্রের জন্য শত্রুর সৃষ্টি। যে পিতামাতা আমার জন্য মিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন—তাঁহারাই আবার আমার বিকাশের জন্য শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং শত্রুও আমার মিত্র—কারণ আমার পূর্ণবিকাশের সহায়। অতএব আমি শত্রুকেও মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিব। শত্রুকে বিনাশ করিলেই যে শত্রু আমার পূর্ণবিকাশ হইবে, তাহা নহে। শত্রুকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করায়, তাহার মঙ্গল-কামনা করায়, আমার প্রেম-ভাণ্ডার পূর্ণ হইবে। যে আমাকে ভাল-বাসে, তাহাকে ভালবাসা ত সুতঃসিদ্ধ ও অযত্নসম্ভূত; কিন্তু যে নিরন্তর আমার অনিষ্ট-কামনা ও অনিষ্ট-আচরণ করিতেছে—বিনা কারণে আমার ধ্বংসের আয়োজন করিতেছে, তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া আমি ভাল-বাসার পূর্ণতা ও সার্থকতা সম্পাদন করিব।

আমার পিতামাতাও ইহার অনন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন। কত লোক তাঁহাদের নিয়ম ভঙ্গ করিতেছে — তাঁহাদের অপূর্ব্ব সৃষ্টিকে ছারখার করিয়া ফেলিতেছে—তাঁহাদের নিন্দাবাদে জগৎ ধ্বনিত করিতেছে—তথাপি তাঁহাদের অনন্ত প্রেম তাঁহাদিগ হইতে প্রত্যাহৃত হইতেছে না। আমি এরূপ বিশ্বপ্রেমিক পিতামাতার পুত্র হইয়াও প্রেমের খেলায় কেন হারি মানিব? আমি জগৎময় প্রেম বিলাইয়া নিত্যানন্দ হইব—সজ্ঞানে শত্রুমিত্র-সমদর্শী হইয়া চৈতন্যময় হইব। তবে আর শত্রুর জন্য ভয় কেন? এস ভাই শত্রু! আমি প্রাণ ভরিয়া তোমায় আলিঙ্গন করি—তুমি বক্ষে কি পৃষ্ঠে ছুরি মারিলেও আমি আর তোমায় কিছু বলিব না—কারণ, তোমার মত ওরূ আমার আর কেহই নাই। মিত্রকে ত সকলেই ভালবাসে। যে সুহৃৎ, তাহাকে ভালবাসায় ভালবাসার মাহাত্ম্য কি হইল? কারণ সেখানে পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ-সম্বন্ধ রহিয়াছে। তুমি ভালবাস বলিয়া আমি তোমায় ভালবাসি। ইহা স্বভাবসিদ্ধ—সুতরাং অতিমানুষ নহে। কিন্তু শত্রু নিরন্তর আমার অনিষ্ট করিতেছে। সে স্থলেও যদি আমার প্রেমসাগর শুখাইয়া না যায়, তাহাহইলে বুঝিব আমি প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক। তখন আমি বুঝিব যে, আমি আনন্দময়ী জননী ও সচ্চিদানন্দ জনকের উপযুক্ত সন্তান। এইজন্য বলিতেছি—"হে শত্রো! তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।" কারণ, তুমি নিকটে না থাকিলে আমার নিষ্কাম-প্রেমশিক্ষা হইবে না। অপ্রেমের বিনিময়ে প্রেম-বিতরণ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিব না। তুমি আমার পূর্ণপরিপাকের প্রধান সহচর—সুতরাং তুমি আমায় ছাড়িও না। আর বিশেষতঃ তুমি নিরন্তর আমার পশ্চাতে থাকিলে আমার "আনন্দময়ী মাতা ও সচ্চিদানন্দ পিতাকে আমার সর্ব্বদা স্মরণ হইবে। সুতরাং সর্ব্বদা আমি তাঁহাদের দর্শন পাইব। অতএব তুমি ছায়ার ন্যায় নিয়ত কখন আমার পশ্চাতে ও কখন আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। যখন পশ্চাতে থাকিয়া অদৃশ্যভাবে আমায় ভয় প্রদর্শন করিবে, তখন আমার পিতা বিপদভঞ্জন নিরঞ্জন ও বিপন্নাশিনী ব্রহ্মময়ীকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া মানবজন্ম সার্থক করিব। এবং যখন সম্মুখে আসিয়া বিভীষিকা দেখাইবে, তখন তোমায় প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া নিষ্কাম প্রেমের পূর্ণাধিকারী হইব। যাহা হইতে আমার এত উপকারের আশা, সে শত্রু হইয়াও আমার পরম সুহৃৎ। সুতরাং হে শত্রো! আমি করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমায় পরিত্যাগ করিও না।

নৈদাঘ নিশীথ স্বপ্ন।*

(নাটক)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

সুরেশ্বর	... বৈজয়ন্তী নগরের রাজা।	হেমলতা	... ভাবী রাণী।
অজয়	... প্রমদার পিতা, রাজমাতা।	প্রমদা	... অজয়ের কন্যা, বিনোদাসুরক্ষা।
বিনোদবিহারী, বিপিনবিহারী	প্রমদার প্রথমপ্রার্থী, এবং বালসহচর।	মানদা	... বিপিনের অনুরক্ষা, প্রমদার সখি, অন্য অমাত্য-কন্যা।
ফুলেশ্বর	... প্রিয়বয়স্য।	অনঙ্গ	... পরীদিগের রাজা।
কানাই	... সূত্রধার।	ত্রিতারা	... পরীদিগের রাণী।
বামা	... স্বর্ণকার।	পঞ্চু রা পাঁচু	... পরীদিগের বিদূষক।
পরা	... তন্তুবায়।	বেলফুল, বকফুল, বকুলফুল, বেণ্ডণফুল	...পরীবর্গ।
ছিরে	... কর্ম্মকার।		
তিনু	... কাঁসারী।		
পাঁচু	... দর্জ্জী।		অনুচরবর্গ, ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈজয়ন্তীনগর—রাজবাটী।

(সুরেশ্বর, হেমলতা, ফুলেশ্বর এবং পরিচারকবর্গের প্রবেশ।)

সুরেশ্বর।—দেখ প্রিয়ে হেমলতে! শুভ-বিভাবরী
আসিছে বিজলীবেগে; চারি দিন আর,
উদিবে নবীন-চন্দ্র; চারি দিন আরি,
তবু মনে হয়—স্বর্গ ধীরে-ধীরে যেন
হইতেছে কলাহীন এই শীশ-শশী।
বিলম্বে বাসনা, প্রিয়ে, বাড়িছে কেবল।

হেমলতা।—চারিদিন, প্রিয়তম! নিবিড় সহসা
নিশিকোলে; চারি নিশি পোহাবে স্বপনে
তখন দেখিবে শশী—রজতের ধনু
নব-নত,—আমাদের বিজয়-বিলাসে।

সুরে।—যাও ফুলেশ্বর!
ভাসাও গে রাজধানী আমোদ-সাগরে;
জাগাও গে আনন্দের মৃদুল-লহরী,

* ইহা মহাকবি সেক্সপিয়রের সুপ্রসিদ্ধ আদৃত *Mid-summer Night's Dream* এর অনুবাদ। অনুবাদক বন্ধুর একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি-বনিতা ইহা সাদরে গৃহীত হইল। ইহার কিয়দংশ গ্রান্ড ডুচেসের বালক নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ফিরাদে পাঠাও বনে, অথবা শশীনে;
যেন কালছায়া-তার না দেখি নয়নে।

(ফুলেশ্বরের প্রস্থান।)

হেমলতে, বীরবেশে সুকুমার করে,
লভিয়াছিলাম আমি তোমার প্রণয়,
কিন্তু তব-পরিণয়, বিলাসীর বেশে
লভিব, কুসুম-দামে, অনন্ত-উৎসবে।

(অজয়, প্রমদা, বিনোদ এবং বিপিনের প্রবেশ।)

অজ।—সুকৃতি সুরেশর দীর্ঘজীবী হউন!

সুরে।—মহাত্মা অজয়ের সম্ভাষণে প্রীত হইলাম! নূতন সংবাদ কি?

অজ।—মাথা-মুণ্ড! কালের বিচিত্র গতি! আমার কন্যা প্রমদার বিরুদ্ধে রাজসমক্ষে অভিযোগ করিতে আসিলাম। বিপিন! মহারাজের সম্মুখে দাঁড়াও। মহারাজ! আমি ইহার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিতে চাই। বিনোদ! অগ্রসর হও। মহারাজ! এই দুরাচার আমার কন্যাকে কি মোহিনী করিয়াছে!

দিয়াছে গলায় তার কবিতার মালা;
করিয়াছে বিনিময় প্রেম-নিদর্শন;
সচন্দ্র-নিশীথে মুক্ত গবাক্ষে তাহার
গেয়েছে কৃত্রিম-কণ্ঠে কৃত্রিমতাময়
প্রেমের সঙ্গীত;—হায়! কল্পনা তাহার
করেছে অঙ্কিত চারু সুকেশ-বলয়ে,
কোমল-কুসুম-দামে,—প্রবঞ্চনা-জালে
হরিয়াছে বালিকার কোমল-হৃদয়।

তাহাতে কন্যা আমার অবাধ্য হইয়াছে। মহারাজ! যদি প্রমদা বিপিনের সঙ্গে বিবাহে সম্মত হয়, ভাল; না হয়, রাজ্যের চির-প্রসিদ্ধ প্রথা-অনুসারে কন্যা, বলক্রমে বিপিনকে কিম্বা শমনকে প্রদান করিবার আজ্ঞা হউক।

সুরে।—প্রমদে! তুমি কি বল? তোমার পিতার আদেশ প্রতিপালন করা উচিত; তোমার পক্ষে তোমার পিতা দেবতা এবং তোমার সৌভাগ্যদাতা। ঊর্দ্ধে তাঁহার কাছে একটী য়োমের পুতুলবিশেষ; তিনি তোমাকে গড়িয়াছেন, তিনি তোমাকে ভাঙিতেও পারেন। বিশেষতঃ বিপিন একজন যোগ্যপাত্র।

প্রম।—বিনোদও তেমনি যোগ্যপাত্র।

সুরে।—বিনোদ নিজে যোগ্য-সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন তোমার পিতার অভিমত পাইতে পার নাই, তখন বিপিনকেই যোগ্যতর মনে করিতে হইবে।

প্রম।—পিতা যদি আমার চক্ষে দেখিতেন—

সুরে।—বরং তোমার চক্ষু তাঁহার অভিমত মতে দেখা উচিত।

প্রম।—মহারাজ! ক্ষমা করিবেন। আমি জানি না, আমি কি প্রকারে এত প্রগল্‌ভা হইলাম। আমি জানি না, মহারাজের সমক্ষে আমার মনের ভাব খুলিয়া বলা আমার পক্ষে কতদূর শীলতা-সঙ্গত। কিন্তু আমি মহারাজের কাছে জানিতে চাহি, আমি বিপিনের সঙ্গে বিবাহে অসম্মত হইলে আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অমঙ্গল কি হইতে পারে?

সুরে।—মৃত্যু কিম্বা তৎপরবর্ত্তন। অতএব, প্রমদে! তোমার মন পরীক্ষা করিয়া দেখ। তোমার পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে, তপস্বিনীবেশে আশ্রমের বৃক্ষচ্ছায়ায় শীতল নির্ম্মল চন্দ্রের দিকে চাহিয়া উপাসনা-গীত গাহিয়া গাহিয়া তোমার মরু-পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে।

পায় যারা উপেক্ষিয়া শোণিত-প্রবাহ,
একপে সাজিতে পারে যৌবনে যোগিনী,
কিন্তু ধরাতলে ধন্য সেই সুকুসুম

নির্জ্জনে অনূঢ়া বৃন্তে না ফুটি, না ঝরি,
অগন্ধমোহিত করে মানবের মন।

প্রম।—তেমতি ফুটব আমি, তেমতি ঝরিব,
নরনাথ! শুধু নাহি সমর্পিব আমি,
প্রাণ নাহি চাহে যারে, প্রণয় আমার।

সুরে।—সময়, লও; আগামী অমাবস্যা দিন, যে দিন আমি আমার প্রণয়িনীর সহিত চির-প্রেম-পাশে বদ্ধ হইব, সেই দিন তোমার পিতার আজ্ঞার অবাধ্যতার জন্য হয় ত মরিতে কিম্বা তাঁহার ইচ্ছানুসারে বিপিনকে বিবাহ করিতে অথবা করালিনীর মন্দিরে চির-তপস্যা-ব্রত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিও।

বিপি।—প্রমদে! এখনও ভাবিয়া দেখ। বিনোদ তোমার অমূলক বিবাহ-সাধ পরিত্যাগ কর।

বিনো।—বিপিন, তুমি প্রমদার পিতার ভালবাসা পাইয়াছ, তাহাতেই সুখী হও; প্রমদার ভালবাসা পাইলেই আমার যথেষ্ট।

অজ।—নরাধমশ ঠামী করিতেছ! সত্য বিপিন আমার ভালবাসা পাইয়াছে। অতএব, যাহা আমার, আমার-ভালবাসা তাহাকে অর্পণ করিবে। প্রমদা আমার, অতএব প্রমদাতে আমারই যে অধিকার আছে, আমি তাহাকে প্রদান করিলাম।

বিনো।—অর্থে কি বংশ মর্য্যাদায়, আমি কোন অংশে বিপিনের ন্যূন নহি। আমার প্রণয় অসীম। কিন্তু এ সকল অহঙ্কার তুচ্ছ যখন প্রমদা আমাকে ভালবাসে। তবে আমি কেন তাহার আশা ত্যাগ করিব? আমি বিপিনের মুখের উপর বলিতেছি যে, সে-নন্দের কন্যা নন্দাকে ভালবাসিত এবং তাঁহার মনোহরণ করিয়াছিল। সেই সরলা নন্দা এই কুলুষিত লম্পটকে এখনও দেবতার ন্যায় উপাসনা করে।

সুরে।—একটু বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। প্রমদে! তুমি তোমার কলঙ্কনাকে তোমার পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী করিতে চেষ্টা কর। এই দেশের রাজনীতি-অনুসারে চলিতে আমি এক চুলও অন্যথা করিব না। মরিতে অথবা তপোবনে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হও। অজয় এবং বিপিন, আমাদের সঙ্গে আইস; 'আমাদের শুভবিবাহ-সম্বন্ধে কোন বিঘ্নশূন্য কার্য্যে তোমাদিগকে নিযুক্ত করিব।

অজ।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

(প্রমদা এবং বিনোদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

বিনো।—কেন প্রিয়তমে তব কপোল মলিন—
সুহাসা গোলাপ কেন হইতেছে বিলীন?

প্রম।—সলিল বিহনে বুঝি শুকাইয়ে যায়;—
এখনি করিব সিক্ত নয়ন ধারায়!

বিনো।—একি পরিতাপ! প্রিয়ে, বুঝিতে
না পারি,
ইতিহাসে, উপন্যাসে অথবা জীবনে—
যথা দেখি, যথা শুনি, যথা পড়ি, প্রাণ,
প্রকৃত প্রেমের স্রোত বহে না সমান।
হয় ত বিভিন্ন রক্ত—বংশ প্রতিকূল—

প্রম।—উচ্চে নীচে প্রেম, হায়! বিধাতার ভুল।

বিনো।—হয় ত বয়স-দোষে অপাত্রে পতিত,—

প্রম।—কি ঘৃণা! প্রাচীন প্রেম নবীন সহিত?

বিনো।—কিম্বা প্রেম-নির্ব্বাচক বন্ধুর নয়ন—

প্রম।—নরক? পরের চক্ষে প্রেম-নির্ব্বাচন!

বিনো।—সমানে সমানে কিম্বা প্রেম-বিনিময়
হ'ল যদি; মৃত্যু, পীড়া, বিগ্রহ অকালে
করিবে ছায়ায়, শঙ্কে, স্বপ্নে পরিণত।
মেঘাচ্ছন্ন-অমানিশি-বিদ্যুতের মত,
মুহূর্ত্ত ঝলসি যাহা পৃথিবী গগণ,
না দেখিতে অন্ধকারে লুকায় বদন।

প্রম।—প্রেমের কণ্টক যদি বিধাতার লিপি,

তবে কেন, প্রিয়তমে, হইবে অধীর ?
নিশ্বাস, স্বপন, চিন্তা, অশ্রুর মতন
জানিলাম এ কণ্টক প্রেম-সহচর।

বিনো।—শুন প্রমদা, এক উত্তম উপায় আছে। আমার একজন সম্পত্তিশালিনী, অপুত্রা, বিধবা সখী এখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বাস করেন। তিনি আমাকে আপন সন্তানের মত স্নেহ করিয়া থাকেন। সেই স্থানটী এই রাজ্যের বহির্ভূত। প্রমদা, তুমি যদি সেখানে যাইতে সম্মত হও, তবে আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি। যদি আমার প্রতি আন্তরিক প্রণয় থাকে, তুমি কাল রাত্রে তোমার পিতালয় হইতে গোপনে বাহির হইয়া যাইবে। নগরের অনতিদূরে বনের মধ্যে যেখানে বাসন্তোৎসব-উপলক্ষে একদিন প্রভাতে তোমার এবং মানদার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমি সেখানে তোমার প্রতীক্ষা করিব।

প্রম।—প্রাণের বিনোদ, আমি অনঙ্গ-আয়ুধে
কিম্বা যেই স্বর্ণচূড় তীক্ষ্ণতম বাণে,
কিম্বা যে অনলে জ্বলি অনঙ্গমোহিনী,
পুড়িল অনঙ্গ ঘরে হরনেত্রানলে,
দ্রবিল নয়ন-জলে পাপপ, পাষাণ,—
করিনু প্রতিজ্ঞা—কাল তোমার সহিত
নিশ্চয় সঙ্কেত স্থানে হইব মিলিত।

বিনো।—প্রতিজ্ঞা যেন মনে থাকে, প্রাণ! দেখ মানদা আসছে।

(মানদার প্রবেশ।)

প্রম।—ভাল আছ, মানদা ? কোন্ সৌন্দর্য্যে মোহিত করিয়া আসিলে ?

মান।—সৌন্দর্য্য আমার! কেন কর প্রবঞ্চনা ? তোমার সৌন্দর্য্যে কেন মোহিত বিপিন ? তব নেত্র ধ্রুবতারা ; প্রভাত কাকলি, কৃষকের কাণে কত মধুরতাময়!

তা হতে মধুরতর প্রমদা তোমার
বচন-সঙ্গীত ; বড় সাধ মনে—শিখি
তব সুমধুর স্বর, নয়ন-সন্ধান,
সপ্রেম কটাক্ষ ;—পদ্মিনী সসাগরা ধরা
হইত আমার, আমি রাধিয়া বিপিনে
দিতাম সমস্ত ধরা তোমায়, সুন্দরি!
তোমারি সৌন্দর্য্যে দেহ হলে পরিণত।
শিখাও—কেমনে তুমি চাহ, সুভাগিনি!
শিখাও—কি ইন্দ্রজালে বিপিনের মন
করিয়াছ আজ্ঞাধীন ; শিখাও এখন।

প্রম।—আমি তাহার প্রতি মুখভঙ্গী করি, তথাপি সে আমাকে ভালবাসে।

মান।—আমার হাসিতেও যদি আমি সে মুখভঙ্গীর কৌশল শিখিতে পারিতাম।

প্রম।—আমি তাহাকে তিরস্কার করি, তথাপি সে আমাকে ভালবাসে।

মান।—বিধাতঃ! যদি আমি উপাসনার দ্বারাও তাহার সেই ভালবাসা পাইতে পারিতাম!

প্রম।—আমি তাহাকে যত ঘৃণা করি, সে তত আমার সঙ্গ লয়।

মান।—আমি তাহাকে যত ভালবাসি, সে আমাকে তত ঘৃণা করে।

প্রম।—সে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা ; মানদা, আমার কি দোষ ?

মান।—দোষ ?—তোমার সৌন্দর্য্য। যদি সেই দোষ আমার হইত।

প্রম।—তুমি সুস্থির হও, সে আর আমায় মুখ দেখিতে পাইবে না। আমি এবং বিনোদ কল্য এখান হইতে পলায়ন করিব।

যত দিন বিনোদে না করেছি দর্শন,
ছিল এ নগরী যেন স্বর্গের মতন।
না জানি এ প্রেমে কি যে আছে বিদ্যমান,
করিয়াছে স্বর্গসম নরক সমান!

বিনো।—মানদা, মনের কথা বলিব তোমায়,
কালি নিশাকালে যবে শশাঙ্কসুন্দরী
দেখিবে রজত-মুখ সলিল-দর্পণে,
তরুণ মুকুতাময়-কুরি-কুর্ব্বলদল
পালাবে বাসর ছাড়ি প্রেমিক-যুগল।
প্রম।—কাননে বেধবনে বোন্ মোমায় আমায়
শুইয়াছি কত দিন, কুসুম-শয্যায়,
মধুমাখা মনকথা কহেছি দুজনে,
সেখানে মিলিব আমি বিনোদের সনে।
যথা জন্মভূমি হতে ফিরাব নয়ন
অন্বেষিব নব দেশে নব প্রিয়জন।
বিদায়! আমার তুমি খেলার সঙ্গিনী,
কি বলিব, রেখো মনে আমায় ভগিনি,
ঈশ্বর-কৃপায় হবে বিপিনভামিনী!
বিনোদ, যুগলনেত্র রবে নিরমল,
কালি যতক্ষণে শুনঃ না হবে মিলন

(প্রমদার গমন।)

বিনো।—বিদায়, মাঁমদা ; তুমি বিপিনে যেমন বাস ভাল, সে তোমায় বাসুক তেমন!

(প্রস্থান।)

মান।—পৃথিবীতে সকলে অপেক্ষা কেহ কত সুখী! এই নগরীতে আমাকে সকলেই তাহার সমান সুন্দরী বলিয়া প্রশংসা করে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? বিপিন তেমন মনে করে না যাহা সে ভিন্ন সকলে জানে, যে তাহা জানিবে না! কি আশ্চর্য্য! সে যতই প্রমদার রূপে মোহিত হইয়া ভুল করিতেছে, আমি ততই তাহার গুণে ভ্রমান্ধ হইতেছি। গুণশূন্য নিকৃষ্ট পদার্থকেও প্রেমে শোভা এবং প্রতিভাসম্পন্ন করিয়া তোলে—

প্রণয় নিমুখে মনে, না দেখে নয়নে ;
মনমথ চিত্রিত তাই মুদিত নয়নে।
প্রেমের নাহিক রুচি, নাহিক বিচার ;
পঙ্গু অন্ধ, চক্ষু নাই,—মূরতি তাহার!
তাই বলে—প্রেম যেন বালক, সরল ;
নির্ব্বাচন-শক্তি তার এতই দুর্ব্বল!
দেখিয়াছিল যা যবে নেত্র প্রমদার,
বর্ণন বলিত,—'আমি একান্ত তোমার';—
কতই প্রতিজ্ঞা যেন শিলা-বরিষণ!
প্রমদার রূপপ্রভা লেগেছে এমন,
যে শিলায়, এবে তাহা জলের মতন।

আমি তাহাকে প্রমদার পলায়নের কথা বলিব, তাহা হইলে সে নিশ্চয় কাল রাত্রে তাহার অনুসন্ধানে বনে প্রবেশ করিবে ; আর আমি যদি ইহার জন্য শুধু ধন্যবাদটুকু পাই, তাহাও আমার পক্ষে বহুমূল্য। সে বনে যাইবার ও'র ফিরিয়া আসিবার সময়ে আমি যে তাহাকে দেখিতে পাইব, তাহাই আমার পক্ষে এই পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।

১৮৫৭ অব্দে পঞ্জাব।

বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যখন সিপাহীদিগের প্রবল উত্তেজনা পরিদৃষ্ট হয়, নগরের পর নগরে বর্ব্বর মুরোপীয়দিগের শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত পঞ্চ-সরিৎ-বিধৌত বিস্তৃত খণ্ডের বিষয়ও লর্ড ক্যানিঙের চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া উঠে। আট বৎসরের ঐহিক ফল হইল, সহায়াজ রণজিৎ সিংহের এই বিস্তৃত রাজ্য ব্রিটিশকোম্পানির অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই অধীনতার পরি-

নদের চিরপ্রসিদ্ধ শিখজাতির বীরত্ব ও সাহসের বিলয় হয় নাই। যাহারা এক সময়ে পঞ্জাব-কেশরীর সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়া অসামান্য শূরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, তাহারা এখন নিরস্ত্র হইয়াছিল। পঞ্জাবের অনেক স্থানে এইরূপ নিরস্ত্রীকৃত সৈনিক বাস করিতেছিল। এদিকে বিভিন্ন সৈনিক-নিবাসে যুদ্ধ-সংখ্যক সিপাহীও ছিল। উত্তেজনার সময় ইহাদের সহিত যদি শিখগণ সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে বিপদ অনিবার্য্য হইবার সম্ভাবনা। সপ্তদশ শতাব্দীর য়ুরোপের একজন প্রধান দার্শনিক লিখিয়াছেন,—"প্রাচীর-বেষ্টিত নগর, অস্ত্রশস্ত্রপরিপূর্ণ অস্ত্রাগার, দ্রুতগতিশীল অশ্ব, যুদ্ধরথ, হস্তী, কামান, এওর্বি সিংহ-চর্ম্মাচ্ছাদিত মেষের স্বরূপ; লোকে দৃঢ়তা-সম্পন্ন ও যুদ্ধকুশল না হইলে ঐ সকলের কিছুতেই কিছু হয় না।" শিখগণ দৃঢ়তাসম্পন্ন ও সমরকুশল ছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লর্ড গফ, ভারত-সাম্রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈনিকদল সহ যাহাদের স্বদেশীয়গণের সহিত যুদ্ধে যার-পর-নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, যাহাদের স্বদেশীয়-গণ চিনিয়াবালার প্রান্তরে উৎকৃষ্ট ব্রিটিশ সৈনিকদলকে মেষপালের ন্যায় তাড়িত করিয়াছিল, তাহারা কখনও দুর্ব্বল বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের পর গবর্ণমেণ্টেরও পঞ্জাবী সৈনিক-শ্রেণীতে ২৬ হাজার লোকের বেশী ছিল না। ইহাদের মধ্যে দশ হাজার শিখ, সাত হাজার পঞ্জাবী মুসলমান, চারি হাজার পাহাড়িয়া রাজপুত, চারি হাজার হিন্দুস্থানী, এবং এক হাজার গূর্খা ছিল। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের তেজস্বিতার বিষয় বিস্মৃত হন নাই। যদিও তাহাদিগের দেশ ব্রিটিশ-কোম্পানীর অধীন হইয়াছিল, তাহাদের হৃদয় ব্রিটিশ-পতকা উড্ডীন হইতেছিল, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহারা তেজস্বিতায় বিসর্জ্জন দেয় নাই। পূর্ব্বতন গৌরব-কাহিনী তাহাদের স্মৃতিপটে হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। পূর্ব্বতন স্বাধীনভাবের সুখলালসা তাহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই। পরাধীনতায় আবদ্ধ, পরকীয় শাসনে পরিচালিত ও পরহস্তে নিগৃহীত হইয়াও তাহারা স্বাধীনতার উপাসক ছিল। নুওসেরা ও চিনিয়াবালায় কথা এখনও তাহাদিগকে শূরত্ব-প্রকাশে সমুত্তেজিত করিতেছিল।

উপস্থিত সময়ে এইরূপ দৃঢ়তাসম্পন্ন সাহসী বীরপুরুষেরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য পুনর্ব্বার ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহে অসমর্থ ছিল না। পঞ্জাব পরহস্তগত হওয়াতে তত্রত্য সর্দ্দারদিগের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। তাঁহাদের চিরন্তন দণ্ড বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের গৌরবজনক পদ-মর্য্যাদাও বিলয় হইয়াছিল। তাঁহাদের অধিকৃত সম্পত্তি অনেকাংশে বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা যদ্যপি ব্রিটিশ-শাসনে শান্তভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহাদের স্বজাতি-প্রীতি ও স্বদেশ-ভক্তি তিরোহিত হয় নাই। স্বদেশের জন্য পুনর্ব্বার তাঁহাদের তেজস্বিতার বিকাশ হওয়া অসম্ভব ছিল না। কেবল পঞ্জাবেই এরূপ আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান ছিল না। পঞ্জাবের উত্তরপ্রান্তে আর এক যুদ্ধ-প্রিয় জাতির বসতি ছিল। ইহারা বিদেশীয় রাজার বশীভূত ছিল না। ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে কখনও উৎকোচ দিয়া, কখনও বা ভয় দেখাইয়া শান্তভাবে রাখিয়াছিলেন। বিশৃঙ্খল-প্রকৃতি আফগানেরা শিখদিগের সহিত সম্মিলিত হইলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; তিনি কোম্পানীর নিকট রীতিমত অর্থ পাইতেন। অর্থের পরিবর্ত্তে ইংরাজের বিরাগ উৎপাদন করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। এদিকে পঞ্জাবে কেবল এক জাতি বাস করিত না। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ, এই তিন জাতি প্রধানতঃ পঞ্জাবে বাস করিত। শিখদিগের সহিত দিল্লীর মোগল-ভূপতিগণের কোন সদ্ভাব ছিল না। তাহারা মোগলের অধিকারে সৌভাগ্যসম্পত্তির অধিকারী হয় নাই। মোগলের অনুগ্রহে আপনারা গৌরবান্বিত হয় নাই বা মোগলের সম্মানে আপনাদিগকে সম্মানিত বোধ করে নাই। মোগলের প্রতি তাহাদের সমবেদনার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তাহারা দিল্লীর রুগ্ন মোগল-ভূপতির উদ্ধারে আহ্বানিত হয় নাই বা তাঁহার অবনতিতেও দুঃখপ্রকাশ করে নাই। পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে ৯০ হাজার লোকের বাস ছিল। ইহাদের অধিকাংশ মুসলমান ও শিখ। এই দুই জাতির মধ্যে তাদৃশ সমবেদনা ছিল না। পঞ্চশ্বরে শিখদিগের অনেকেই নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। অনেকে অস্ত্র-সঞ্চালনের পরিবর্ত্তে হলসঞ্চালনরূপ সন্মোনিবেশ করিয়াছিল। অনেকে অবার আগ্নেয়াদির চির-ব্যবহৃত অস্ত্রাদি গোপনীয় স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। পঞ্জাব-কেশরীর দেহত্যাগের পর রাজ্যে যে গোলযোগ ঘটিয়াছিল, তাহাহইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অনেকে ইংরেজ-শাসনে শান্তভাবে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল। কৃষাণ-জনোচিত নিরীহভাবের পরিবর্ত্তে ইহারা সহসা মুসলমানের সহিত উত্তেজনার পরিচয় দিতে ইচ্ছুক ছিল না। পঞ্জাব-কেশরীর পুরুনদ বীরত্বসম্পন্ন জাতির আবাসভূমি হইলেও,

সমবেদনায় ও মৈত্রীসৌহৃদ্যের অভাবপ্রযুক্ত এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় হইতে পৃথক ছিল। এইরূপ পার্থক্য, উপস্থিত সঙ্কট-কালে পঞ্জাবের ন্যায়, বীরপ্রসূনী-ভূমিতে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনুকূল ঘটনাসূচনা করিয়াছিল।

উপস্থিত সময়ে একদল ইয়ুরোপীয় ও একদল সিপাহী সৈন্য লাহোরের দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। লাহোরের ৬ মাইল দূরে মিয়ামীর নামক স্থানে সৈনিকনিবাস ছিল। এই সৈনিকনিবাসে ৩ দল পদাতি, ১ দল অশ্বারোহী সিপাহী এবং ১ দল য়ুরোপীয় পদাতি ও কামান-রক্ষক সৈনিকপুরুষ অবস্থিতি করিত। য়ুরোপীয় সৈনিকের সংখ্যা অধিক ছিল না। মেণ্টামুটি হিসাবে করিলে প্রতি চারিজন সিপাহীর স্থলে একজন করিয়া য়ুরোপীয় সৈনিকপুরুষ ছিল। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর স্যার জন লরেন্স এই সময়ে রাবলপিণ্ডিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুতরাং বিচার-বিভাগের কমিশনর রবার্ট মণ্টগোমারির প্রতি প্রধান কার্য্যভার সমর্পিত ছিল।

১১ই মে মীরাটের ঘটনার সংবাদ লাহোরে উপস্থিত হয়। তৎপর দিন প্রাতঃকালে তাড়িত-বার্ত্তাবহ উহা অপেক্ষাও ভয়াবহ সংবাদ লাহোরস্থিত ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের গোচর করে। রবার্ট মণ্টগোমারি প্রথম দিন সিপাহীদিগের অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিতে না করিতেই দ্বিতীয় দিন দিল্লীর ভয়ঙ্কর ঘটনা জানিয়া স্তম্ভিত হন। মীরাটের য়ুরোপীয়গণের অনেকে নিহত ও অনেকে তাড়িত হইয়াছেন। মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানী উত্তেজিত সিপাহী-দিগের হস্তগত হইয়াছে। তত্রত্য য়ুরোপীয়গণ দলে দলে নিহত বা পলায়িত হইয়াছেন। উত্তেজিত লোকে রুগ্ন মোগল-ভূপতিকে

সমগ্র ভারতের সম্রাট বলিয়া সম্মানিত করিয়াছে। রবার্ট মন্টগোমারি ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এখন অনুশোচনার বা বিস্ময়াভিভূত হওয়ার সময় ছিল না। পঞ্জাবে বহুসংখ্যক সিপাহী অধিষ্ঠিত করিতেছে। পঞ্জাবের শিখ ও মুসলমান আজন্ম বীরব্রতে দীক্ষিত হইয়াছে। পঞ্জাবের অনতিদূরে উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি-জিগীষু আফগানগণ আপনাদের পার্ব্বত্য প্রদেশে শত্রুত্ব-প্রকাশের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। রবার্ট মন্টগোমারি মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব না করিয়া ইহাদের মধ্যে আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হন। লাহোরের এক মাইল দূরে আনারকালী নামক স্থানে সিভিল ষ্টেশন। রবার্ট মন্টগোমারি এই স্থানে সপরিবারে রাজপুরুষদিগের সহিত উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, সিপাহীগণ গুলি, বারুদ ও বন্দুকের ক্যাপ রাখিতে পারিবে না। লাহোরের দুর্গে অতিরিক্ত য়ুরোপীয় সৈন্য রাখা হইবে। এই প্রস্তাব সকলের অনুমোদিত হইল। রবার্ট মন্টগোমারি একজন সৈনিক পুরুষের সহিত মিয়াঁমীরের সৈনিক-নিবাসে ব্রিগেডিয়ার কর্ণেটের নিকট গমন করিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে একটি তত্ত্বাবহ ষড়যন্ত্রে বিশ্বয় তাঁহাদের গোচর হইল।

লাহোরের দুর্গও নগর প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এক দল য়ুরোপীয় সৈনিক পুরুষ, একদল ক্লামান-রক্ষক প্রদাতি এবং মিয়াঁমীরের সৈনিক-নিবাসের ২৬ সংখ্যক সিপাহীদলের ক্ষতিপূর্ণ সৈন্য এই দুর্গে অধিষ্ঠিত করিতেছিল। নগরে শান্তিস্থাপন ও রাজকীয় ধনাগার রক্ষা করা ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ২৬ সংখ্যক দলে যে সকল সিপাহী মে মাসের প্রথমার্দ্ধে দুর্গে পাহারা দিতেছিল, ১৫ই মে তাহাদের পালা শেষ হয় এবং তাহাদের স্থলে মিয়াঁমীরের ৪৯ সংখ্যক সিপাহীরা দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করে। কথিত আছে, ষড়যন্ত্রকারিগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, যখন ৪৯ সংখ্যক দলের সিপাহীরা ২৬ সংখ্যক সিপাহীদিগকে অবসর দিবার জন্য দুর্গে উপস্থিত হইবে, তখন (এই উভয় দলের সমবেত সিপাহীদিগের সংখ্যা প্রায় ১১০০;) ইহারা অবিলম্বে অফিসারদিগকে আক্রমণ ও দুর্গদ্বার অধিকার করিবে। দুর্গস্থিত য়ুরোপীয় সৈনিকদিগের সংখ্যা অল্প হওয়াতে (ইহাদের সংখ্যা ১৫০ জনের অধিক ছিল না) ইহারা অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজিত করিবে। অস্ত্রাগার ও ধনাগার অধিকার করা হইবে। অনন্তর নিকটবর্ত্তী হামপাতালের গ্লালিবাড়ীতে আগুন দেওয়া হইলে। মিয়াঁমীরের সিপাহীরা এই আগুন দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, দুর্গস্থিত সিপাহীরা য়ুরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। সুতরাং তাহারাও অস্ত্রপরিগ্রহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধে উদ্যত হইবে। কারাগারের দুই হাজার কয়েদীকে বিমুক্ত করা হইবে। এইরূপে সকলেই সমবেত হইয়া য়ুরোপীয়দিগকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। কথিত আছে, মে মাসের প্রারম্ভে লাহোরের সিপাহীরা এইরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। লাহোর ব্যতীত ফিরোজপুর, ফিলোর, জলন্ধর এবং অমৃতসরেও এই ষড়যন্ত্রের বিস্তার হইয়াছিল। দুইজন ইংরাজ ঐরূপ ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রথম প্রচার করেন*। কিন্তু মিয়াঁমীরের সৈনিকনিবাসে সমস্ত সিপাহীরাই যে গোপনে উক্তরূপ পরামর্শ করিয়া য়ুরোপীয়দিগের বিনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে রাজপুরুষগণ কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রকাশ করেন নাই। দুই এক

* Martin, Indian Empire, Vol. II, P. 197.

জন অসন্তুষ্ট সিপাহী উক্তরূপ কল্পনা করিতে পারে। ইহা হইতে সর্ব্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের প্রকাশ হওয়া অসম্ভব নয়। কথিত আছে, কাপ্তেন লুরেন্স নামক পুলিস ও ঠগী-বিভাগের কর্ম্মাধ্যক্ষ আপনার প্রধান মুন্সীকে লাহোরের সিপাহীদিগের মনোগত ভাব জানিবার জন্য আদেশ দেন। এই মুন্সী অযোধ্যার একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। বিশ্বস্ত ও কর্ম্মপটু বলিয়া ইনি রাজপুরুষদিগের আদরণীয় ছিলেন। উক্ত মুন্সী অনুসন্ধান করিয়া সিপাহীদিগের মধ্যে গুপ্তচর উত্তেজনার নিদর্শন দেখেন। ইনি এই অনুসন্ধানের ফল সংক্ষেপে আপনার প্রভুর গোচর করেন। সংক্ষেপে রিচার্ড লরেন্সকে কহেন,—"সাহেব! মিয়াঁমীরের সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই রাজদ্রোহিতায় পরিপূর্ণ। সকলেই বিপ্লবতা-সাধনে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে।" এই বিশ্বস্ত মুন্সী এইরূপ সংক্ষিপ্তভাবে স্বীয় গবেষণার ফল প্রকাশ করেন। মিয়াঁমীরের সিপাহীরা কিরূপ একসূত্রে, গ্রথিত হইয়াছিল, কিরূপে সকলে গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাঁহার কথায় কিছুই পরিস্ফুট হয় নাই। বোধ হয়, তিনিও, দুই চারিজন সিপাহীর মনোগত ভাব বুঝিয়া সমগ্র সিপাহীদিগকে মন্দিল, সমুত্তেজিত ও গবর্ণমেণ্টের শত্রুতা-সাধনে কৃতনিশ্চয় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

* Kaye, Sepoy War, Vol. II., P. 427.

আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র।

কাব্য-কাননের কলকণ্ঠ কোকিল উড়িয়া গিয়াছে; বঙ্গীয় সাহিত্য আকাশের ধ্রুবতারা খসিয়া পড়িয়াছে; জননী বঙ্গভাষার কৃতী সন্তান অনন্তধামে, মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। আমাদের বুদ্ধিমচন্দ্র আর নাই! আমরা আর তাহাকে পাইয়া এ শুষ্কস্বরে সংসার পাতিব? বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সুহৃদ্, আমাদের সখা, আমাদের নেতা, আমাদের গুরু, আমাদের পরমাত্মীয়, আমাদের সর্ব্বস্ব! সুতরাং আজি আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমাদের এ ক্ষতি আর পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই; যে জিনিষ আমরা হারাইয়াছি, তাহা আর পাইবার উপায় নাই। চন্দ্রিমা যে স্বর্ণবর্ণ রশ্মিজালে বসুন্ধরা বিশোভিত করিয়া, ধ্যানে, তাহার কোনই অন্যথা ঘটিবে না, মার্ত্তণ্ডদেব যে প্রচণ্ড করজাল দ্বারা অবনীমণ্ডল আলোকিত করিয়া থাকেন, এখনও সেইরূপই করিবেন। শিবার পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিবা যেমন অব্যাহতভাবে সমাগত হয়, এখনও সেইরূপ হইবে। গ্রীষ্ম ও বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত, শীত ও হেমন্ত ঋতুনিচয় সমানভাবে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে। কেবল ফিরিবে না আমাদের সেই বঙ্কিমচন্দ্র। আজিও নভঃপ্রদেশে নক্ষত্রসংবেষ্টিত, শশধর শোভাময় সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতেছেন, আজিও মুকুলন্ত মাধবীহিন্দোলে বৃক্ষবল্লরী ধীরে ধীরে নৃত্য করিতেছে, আজিও ভ্রমরভিসার কুসুম পুঞ্জে সর্ব্বাঙ্গে হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে গুঞ্জরবে হাস্য করিতেছে, আজিও বিহঙ্গমগণ কুঞ্জকাননে প্রত্যূষকাল হইতে সুমধুর প্রাতঃ

তিক মাঙ্গলিক গীতধ্বনিতে বিশ্বসংসার পরিপ্লাবিত করিতেছে—কিন্তু আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র আর নাই। আমাদের সংসার আছে, ধর্ম্ম আছে, কর্ত্তব্য আছে, প্রেম আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, সুখ আছে, তৃষ্ণা আছে—কিন্তু আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র আর নাই। হায় প্রাকৃতিক পদার্থ-পুঞ্জের শোভা! হায় ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য, আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা! তোমরা আর এ ক্ষত বিক্ষত হৃদয়কে শান্ত করিতে পারিবে কি?

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে যে অচ্ছেদ্য গুণ-জালে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে বাঙ্গালী জাতি কখনও নিষ্মুক্ত হইতে পারিবে না। আমাদের অধঃপতিতা, পদাবলম্বিতা, সন্তানগণের অনাদৃতা মাতৃভাষাকে তিনি সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদ-সমাবৃতা করিয়া স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীনা করিয়াছেন। তাঁহার রসময়ী লেখনীর মধুময় ফল-পুষ্প, স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া, সুদূর সমুদ্রপারেও অসমা সুষমা বিকাশ করতঃ, তত্রত্য জ্ঞানগর্ব্বিত ও সাহিত্য-মকরন্দলোলুপ ভৃঙ্গগণকে বিস্ময়াবিষ্ট ও হর্ষোৎফুল্ল করিয়াছে। আমার পরমশ্রদ্ধেয় লেখকশ্রেষ্ঠ সহৃদয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই মর্ম্মবিদারক ঘটনার উপলক্ষে আমাকে লিখিয়াছেন,—"সেই বঙ্কিমচন্দ্র এখন কোথায়? বাঙ্গালা ভাষা, ইংরেজীবিদ্যালার অবজ্ঞায়, ধর্ম্মাধিকরণ ও রাজসভা প্রভৃতি সকলস্থান ছাড়িয়া, দুঃখ-দারিদ্র্যের কুটীরে দিনপাত করিতেছে। আর কে বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিবে?" বাস্তবিকই বাঙ্গালা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল—বঙ্কিম বিহনে, আজি বঙ্গভাষার মুখ উজ্জ্বল করিবার লোক দেখিতে পাইতেছি না।

যে অমানুষী প্রতিভা লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র এ মরজগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে অলৌকিক গুণগ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র বিভূষিত ছিলেন, তাহার সমালোচনা করিতে আমরা আমার সামর্থ্য নাই। তদীয় অসাময়িক বিয়োগে হৃদয়ে যে শোকাবেগ জন্মিয়াছে, তাহাই কথঞ্চিৎ প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে এই মহাপুরুষের সহিত আমি সখ্যসূত্রে সংবদ্ধ ছিলাম; তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহে আমার হৃদয় পরিপ্লুত রহিয়াছে। তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহারগত প্রসঙ্গ ও কৃতিত্বের আলোচনায় ন্যায্য এক্ষণে নিতান্ত অসাময়িক। একাল, অকালে, তাঁহার স্নেহ-ময় সাহচর্য্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করায় আমি যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে।

মরণপ্রবণ দেহ ধারণ করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় দেবতাকেও অপ্রতিবিধেয় নিয়তির অধীন হইতে হয়। প্রাকৃতিক অবশ্যম্ভাবী বিধিবশে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বরণীয় বপুঃ-খানি ভূতে বিলীন হইয়াছে। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন সুগঠিত কলেবর লোকলোচন হইতে অন্তরিত হইলেও অমর বঙ্কিমচন্দ্রের কখনই মৃত্যু হয় নাই—সেই মরণাতীত দেবতা চিরামর। তাঁহার প্রতিভাময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করিবে এবং সেই সুন্দরতর শোভনতর কলেবরে তিনি আমাদের অন্তরে ও বাহ্যে, নিকটে ও দূরে, অবিরত বিরাজমান থাকিবেন। তাঁহার সৃষ্ট আয়েষা, তিলোত্তমা, কপালকুণ্ডলা, মৃণ্ময়ালিনী, গিরিজায়া, শৈবলিনী, সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, ভ্রমর প্রভৃতি সুরসুন্দরীগণ তাঁহার সেই প্রতিভাময়ী প্রতিমূর্ত্তি মাল্যচন্দনে সুসজ্জিত করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে। আর তৎকর্ত্তৃক পরিস্ফুট জগৎসিংহ, ওস্মান, নবকুমার, নগেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, প্রতাপ, গোবিন্দলাল প্রভৃতি বীরগণ কালকে

কখনই সেই মূর্ত্তিসন্নিধানে গমন করিতে দিবে না।

যাও বঙ্কিম, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি যোগধামে গমন কর এবং তথায় যথোপযুক্ত শান্তি সম্ভোগ কর। সেক্ষপীয়র ও কালিদাস, স্কট ও ভবভূতি তোমায় প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন-সহকারে প্রত্যুদ্গমন করিয়া ঐ যে আপনাদের মধ্যবর্ত্তী সমুজ্জ্বল সিংহাসনে বসাইয়াছেন এবং সানন্দে কীর্ত্তিমুকুটে বিভূষিত করিয়া প্রেমভরে তোমার জ্যোতির্ম্ময় বদনমণ্ডল অবলোকন করিতেছেন। এমন বঙ্কিমচন্দ্রেরও কি কখন মরণ হয়? তুমি, আমার নও, তোমার পরিবারবর্গের নও, বাঙ্গালী জাতির নও, ভারতবাসীর নও—সমস্ত বঙ্গীকারীর আদরের ধন। যতদিন স্বর্ত্তা-ধামে বিদ্যার সমাদর থাকিবে, যতদিন ভূম-ণ্ডলে জ্ঞানের মহিমা সঙ্ঘোষিত হইবে, যত দিন স্বগতে প্রতিভার পূজা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন অমর বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর হৃদয়রাজ্যে রাজত্ব বিস্তার করিয়া থাকিবেন। বঙ্কিম! তুমি মরিলেও অমর। জীবনে ও মরণে তুমি, চিরদিনই অদ্বিতীয়। আমার পরমসুহৃদ্ বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্, সি, আই, ই, মহাশয় আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছেন,—"The country now deplores the untimely death of our friend Rai Bunkim Chandra. Among the many great writers of Bengal of this century, Bunkim Chandra and Madhusudan will be remembered as the greatest."

মহাপ্রয়াণ।

(চতুর্দ্দশপদী।)

ধূলায় ধূলার দেহ হয়েছে মিশ্রিত;
মৃণ্ময়দেহমাঝে সেই অন্তরের প্রাণ
সপ্তস্বর্গ মাঝারেতে ঢুকে বিরাজিত;
দেব-আত্মা মুক্ত যার শুনি বেণু-গান।
মৃত্যু আজ মৃত দেব, পরশি তোমায়;
জীবনের স্বপ্ন হ'তে হয়ে জাগরিত,
আলোকিছ দেবরাজ্য আপন প্রভায়।
রোদনের হাহাকারে বঙ্গ ধ্বনিত।
দুর্লভ আনন্দ এক গেল চলি দূর!
হা দুখিনী বঙ্গভূমি! হৃদয়ে তোমার,
পশি শোক পলপল করিছে আতুর;
ভগ্নপ্রাণ মা আমার করে হাহাকার।
চন্দ্র গেছে রেখে গেছে মধুর কিরণ,
যাহে বিভাসিত আজ এ বঙ্গভবন।

সুচিন্তা সুকলপনা দুটী সহোদরা,
বড় ভালবেসেছিল তোমার হৃদয়;
কবিতার কুসুমিত অমর আলয়
সুরপুরী-বিমোহিনী রাগিণীতে ভরা।
তাই তারা দেবলোক করি পরিহার

আসিতি প্রাণের সনে করিবারে কৌল।
আসক্তি-পীযূষে ভরা দুটী আঁখি মেলি
দুটী দেবকন্যা সহ করিতে বিহার।

আজ তারা নীলাকাশে প্রাণের বেদনে,
শুভ জোছনার পাখা করি সঞ্চালন,
বীণাকণ্ঠে মর্ম্মকথা করিছে ঘোষণ।
পাগলিনী সখী দুটী তোমার বিহনে,
প্রাণময়ী প্রতিকৃতি কে সৃজিবে আর!
চলে গেলে রেখে গেলে চির হাহাকার!

কে কোথায় সমরস আছিস্‌রে ভাই,
আয় সবে বঙ্গছাদি কাঁদি উভরায়,
গ্রাসিয়াছে মৃত্যুরাহু স্নিগ্ধ চন্দ্রমায়!
বঙ্কিম, সাহিত্য-শোভা এ জগতে নাই।
পতিত জাতির আশা, হে দেব মহান!
হেম-কল্পনার হারে চিন্তামণিমালা
যতনে বিজড়ি তুমি করেছিলে আলা
যে বঙ্গভাণ্ডার, সেই এবে ভিন্নমাণ!

সুরেশ্বরী হার আহা দূরে নিক্ষেপিয়া
কাঁদে দেবী সূর্য্যমুখী জনকের লাগি,
ছায়াময় স্বপনের পুরীতে বসিয়া
নীরবেতে ফেলে অশ্রু আয়েসা অভাগী।
দারুণ রোদনের ভীম প্রতিধ্বনি
পশিছে হৃদয়মাঝে ভীষণ অশনি।

কোথা তোরা বিলাপ বিষাদ শোকতাপ
শান্তিহীন এবিধের চির মানচ্ছবি?
বারেক দেখারে এসে নিজ নিজ দাগ;
আজি বঙ্গে অস্তমিত মহিমার রবি।
কাঙ্গালিনী বঙ্গভাষা জননী আমার
জ্বেলেছেন চিতানল আপন প্রাঙ্গণে,
করিতেছে গণ্ডগ্রহি উত্তপ্ত আসার,
মলিনতা-ব্যাপিয়াছে শ্যামল বয়ানে।

মন্দার-সুরভিস্নাত সেই দেশে হায়,
যেথা হতে মণিরিঞ্জ দীপ্তিরাশি আসে,
সেথা গেল চলে, গেল লয়ে প্রতিভায়,
অবসাদ-প্লাবনেতে আজি বঙ্গ ভাসে।
দেবতারি ছ'ল বুঝি লীলাসম্বরণ,
মরণ অমর নাম করিল ধারণ।

শতপুটপাকতাপে দগধ অন্তর,
অশ্রুজলে টলমল যুগল নয়ন,
জগতের রোদনের মর্ম্মভেদী স্বর
প্রতি লোমকূপ মাঝে বেঁধে অনুক্ষণ,
হতবিধি কি নিধিরে করিলি হরণ!
দুখিনী মায়ের আজ হৃদয় ভাঙিয়ে!
প্রলয়ের অন্ধকারে আবরি বরন,
মূর্চ্ছিতা জননী যম ধরায় পড়িয়ে।

রে মরণ স্নেহশূন্য নির্ম্মম নির্দ্দয়,
মনীষা যুগল হিয়া নিত্য জ্যোতির্ম্ময়।
এক প্রাণ অমরায় গেছিস লইয়া,
অন্য প্রাণে আলোকিত এমর আলয়,
আশু-প্রতিভায় তাহা বিশ্ব বিমোহিয়া
চিরকাল দেখাইবে দেব-অভিনয়।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য—বাঙ্গালার আদিকাব্য।

বঙ্গসাহিত্যের "ইতিহাসলেখক মাত্রেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবকবি ও গ্রন্থকারদিগের উল্লেখ করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বাঙ্গালা ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ইঁহাদিগকে গীতরচক-কবি বলা যাইতে পারে। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রণীত "চৈতন্য ভাগবতকেই" অনেকে বঙ্গভাষার আদিকাব্য-গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, "অনেকে জীব গোস্বামীর কড়চাকেই বাঙ্গালার আদিগ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। * * জীব গোস্বামীর কড়চার পাই বোধ হয় বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্য-ভাগবত বা চৈতন্যমঙ্গল লিখিত হয়।" বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্যের সম-সাময়িক ছিলেন, অনেকের মতে জীব গোস্বামী চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের পরে জন্মগ্রহণ করেন। যাহা হউক, জীব গোস্বামী যে বৃন্দাবন দাস অপেক্ষা অন্ততঃ ২০।২৫ বৎসর পরসাময়িক, তাহা নিশ্চয়। সুতরাং বৃন্দাবন দাসকেই উক্ত সম্মানে সম্মানিত করা অধিকতর যুক্তি-যুক্ত। কিন্তু আমাদের মতে ইহাঁরা কেহই সে সম্মান লাভের অধিকারী নহেন।

চৈতন্য দেবের জন্মের ১২ বৎসর পূর্ব্বে ১৩৯৫ শকে গুণরাজ খাঁন উপাধিযুক্ত মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে সমাপ্ত করিয়াছিলেন। নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে ১৩৯৫

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥"
শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

হইতে ১৪০১ শকাব্দ মধ্যে বিদ্যাপতি দুর্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী লিখিয়াছিলেন। সুতরাং বিদ্যাপতির সমকালেই শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থকেই নিঃসংশয়ে বাঙ্গালা ভাষার আদিকাব্য বলা যাইতে পারে। মালাধর বসু বিদ্যাপতির সমকালে এই কাব্য রচনা করিলেও, তিনি বিদ্যাপতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন বোধ হয়। মালাধরের পুত্র সত্যরাজ ও তৎপুত্র রামানন্দ বসু উভয়েই শ্রীচৈতন্যের পরিকর ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের শ্রেষ্ঠতা ও প্রামাণিকতার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। চৈতন্য দেব এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। কুলীনগ্রামবাসী বৈষ্ণবগণের প্রশংসাস্থলে তিনি বলিয়াছেন;—

"কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোর লঞা॥ †
গুণরাজ খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহে এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥

† রেশমনির্ম্মিত যে রজ্জু দ্বারা জগন্নাথ বিগ্রহকে বন্ধন করিয়া রথোপরি স্থাপিত করা হয়, তাহার নাম "পট্টডোর"। চৈতন্যদেব লীলাচলে অবস্থান কালে একবার রথযাত্রার সময় এই পট্টডোর ছিঁড়িয়া যাওয়ায়, সত্যরাজ ও রামানন্দ বসুকে চৈতন্য প্রভু বলিয়াছিলেন;—

"কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্য রাজ খাঁন।
তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতি বৎসর আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ।
এত বলি দিল তারে ছিণা পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি॥"
চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য খণ্ড।

'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাহার বংশের হাত॥

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য খণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের আরম্ভ এইরূপ:—

"প্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিধন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যত তাহার কারণ॥
একভাবে বন্দ হরি যোড় করি হাত।
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ॥

* * * *

আকাশের তারা যদি একে একে গণি।
সমুদ্রের জল যদি ঘটে প্রমাণি॥
পৃথিবীর রেণু যদি নারিয়ে গণন।
তবু কি বলিতে পারি কৃষ্ণের কারণ॥
বহ্নিযার বৃষ্টিধারা গণিবারে পারি।
কৃষ্ণের চরিত তবু বলিবারে নারি॥

* * * *

ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে
লৌকিক কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে॥
ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালি রচিয়া॥

ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তে কারণ ভাগবত গীতছন্দে গাই।
কলিকালে পাপচিত্ত হয় সব নর।
পাঁচালীর রসে লোক হইব বিস্তর॥
গাইতে গাইতে লোক পাইব নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার॥

এই কাব্য রচনার উদ্দেশ্য কবি এই কয়েক পংক্তিতে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। "ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে"—এই বাক্যে বোধ হইতেছে, কবি নিজে ভাগবত অধ্যয়ন করেন নাই, পণ্ডিতদিগের মুখে পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাহা পাঁচালী-প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মূল গ্রন্থের সহিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহাতে অনুমান হয় যে তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং মূল ভাগবতও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের বাঙ্গালা অনুবাদস্বরূপ। গ্রন্থখানি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে নিবদ্ধ। ইহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদের উপরিভাগে মেঘমল্লার, সুহার, রামকেলি ইত্যাদি রাগরাগিণীর নাম লিখিত থাকায় অনুমান হয় যে, এই কাব্য চামর মন্দিরা বা অন্য কোন সঙ্গীতযন্ত্রের সাহায্যে রাগ-রাগিণী সহযোগে গীত হইত। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "তে কারণ ভাগবত গীতছন্দে গাই।" সুতরাং আমাদের অনুমান অমূলক নহে।

এই কাব্যখানি এতদিন হস্তলিখিত পুঁথির আকারে জীর্ণাবস্থায় ছিল। "সজ্জনতোষিণী" সম্পাদক বাবু কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের যত্নে ১২৯২ সালে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময়ে এদেশের ভাষা যে হিন্দিসংস্রবশূন্য বাঙ্গালা ভাষা ছিল, এই গ্রন্থপাঠে তাহা জানিতে পারা যায়। "শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের রচনা অতিশয় সরল, এমন কি বঙ্গীয় অর্দ্ধশিক্ষিতা রমণীগণ ও সাধারণ বর্ণজ্ঞানলিপ্ত নিম্নশ্রেণীর পুরুষগণ এই গ্রন্থ অনায়াসে পড়িতে ও বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয়। ইহাঁর পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় নাই। ছোঁদ অক্ষরের পয়ারের অনেক স্থলে ষোল সতর অক্ষর বা ত্রিপদীর অনেক স্থলে দশ অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনেক শব্দই তাৎকালিক ব্যবহৃত শব্দ। সে সকল শব্দের অর্থ নিতান্ত রাঢ়ীয় লোক ব্যতীত বুঝিতে পারে না। ইহাতে যদি দোষ থাকুক, বিলাতী লোকেরা যেরূপ চসারকে মান্য করেন, আমরা কাব্য সম্বন্ধে ইহাকে তদ্রূপ মান্য করি।" (শ্রীকৃষ্ণবিজয়, উপক্রমণিকা, ৶ পৃষ্ঠা)। এই কাব্যের ভাষা নিরূপ প্রাঞ্জল ও তৎকালোচিত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, তাহার নিদর্শনস্বরূপে রাসলীলা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

যথা,—কৌ-রাগ।

'তুলসী মালতী যুতি, অমলক কুন্দ তথি
নবরক চাঁপা নাঁগেশ্বর।
অড়িল বকুল-মালী, মধুকর করে কেলি,
গন্ধ খাটি কেতকি কেশর॥
অশোক বাশক কেয়া, কিংশুক রঙ্গিল চুয়া,
সেফালিকা বৃক্ষের উপর।

নানাবর্ণের বৃক্ষ পাতা, কোথাহ মাধবীলতা,
নানা পুষ্পনাদ মনোহর।
শারি শুক নাদপুরে, ময়ূর পেখম ধরে,
শুনা বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর॥
কাঞ্চন পাকল ফুলে, কুঞ্জ গুঞ্জ শব্দদলে,
কনক চম্পক মনোহর।
পদ্মনীসোংপলদলে, মালুক কুমুদ জলে,
শিয়ালিতে শোভে সরোবর॥"

পুনশ্চ—

যথা—রামকেলি রাগ।

"নানা বর্ণে সম্পূর্ণ সেই বৃন্দাবন।
গোপী লয়ে ক্রীড়া করিবারে হৈল মন॥
শারদ পূর্ণিমা শশী করিল উদয়ে।
সুগন্ধি শীতল বায়ু মনোহর বহে॥
কোকিলের কলরব ভ্রমর ঝঙ্কার।
কুসুমিত দশদিক বসন্ত অবতার॥
নবকিশলয় বৃক্ষ শোভে বৃন্দাবনে।
অধিক বাড়িল দিঠি চন্দ্রের কিরণে॥
কৃষ্ণ অবতার কবিবংশীতে নাদ দিল।
শুনিয়া গোকুল নারী মূর্চ্ছিত হইল॥
জানিল গোবিন্দ বংশী রায় বৃন্দাবনে।
চলিল সকল নারী একচিত্ত মনে॥

এই বর্ণনা যে কবিত্বপূর্ণ ও সুন্দর, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা হিন্দী সম্পর্কশূন্য খাঁটি বাঙ্গালা; বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার সহিত ইহার অধিকতর সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, সে সময়ের দেশপ্রচলিত ভাষা এইরূপই ছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিদিগের রচনার মধ্যে হিন্দী শব্দের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, বিদ্যাপতিকে আদর্শ করিয়া সুব্রজবুলির অনুরোধে বাঙ্গালার গ্রাম্যতা তাঁহারা ব্রজভাষা মিশ্রিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভাষা যে সর্ব্বত্রই এইরূপ পরিষ্কার ও সুন্দর, তাহা নহে। স্থানে স্থানে নিতান্ত গ্রাম্য অপভাষা এবং পদান্ত, বলন্তি, গচ্ছন্তি প্রভৃতি সংস্কৃতানুযায়ী ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা:—

ইহার পর পর হইতে ইহাঁরা কুলীনগ্রাম হইতে পটুডোর প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতেন। প্রায় ৪০০ চারিশত বৎসর অতীত হইতে চলিল, অদ্যাপি রামানন্দ বসু বংশধরেরা চৈতন্য দেবের আদেশ মান্য করিয়া প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে জগন্নাথ ক্ষেত্রে পটুডোর প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। শুনিয়াছি এই ডোর প্রস্তুত করিতে শতাধিক টাকা ব্যয়িত হয়। উক্ত বংশোদ্ভব আমাদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট অবগত হইলাম, ৮।১০ বৎসর হইতে আর পটুডোর প্রেরিত হয় না। এই কয় বৎসর পটুডোর প্রেরিত না হওয়ায়, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য বিগত বর্ষে জগন্নাথের পাণ্ডা কুলীনগ্রামে আসিয়াছিলেন।

"চতুর্দ্দশে নরসিংহ অদ্ভুত-শরীর।
হিরণ্যকশিপু মারি নিবৃত্তি রুধির॥"
"ক্রীড়ায় গোবিন্দ দেব, শয়নে-রাধা মাধবে
গচ্ছন্তি বৈষ্ণব দেবং।
"গোঁসাই বলন্তি শুনঙ্উজ্বল সুমতি।
সবার জীবন দেখ আমার বিচুতি॥
"শুনিয়াত বৎস রাজা চমকিত মনে।
নারদ কহন্তি কথা শুনে নিজ কাণে॥"

ইতিহাস লেখা এদেশের সনাতন প্রথা নহে, এজন্য, প্রাচীনকালে এদেশের সাধারণ হিন্দু-সমাজের আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু বৈষ্ণব লেখকেরা চৈতন্যদেবের জীবনচরিত্র বর্ণন-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে বাঙ্গালা দেশের তাৎকালিক সামাজিক রীতিনীতির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থ হইতে এবিষয়ে বিশেষ কোন সংবাদই জ্ঞাত হওয়া যায় না। এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও এদেশে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। এবং তখন ভক্ত গৃহস্থগণ ভাগবত ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে কবি লিখিয়াছেন যে, পণ্ডিতের মুখে ভাগবত শ্রবণ করা তখন অনেক ব্যয়সাপেক্ষ ছিল, সাধারণের ভাগ্যে তাহা প্রায় ঘটিয়া উঠিত না। এই জন্য তিনি লোক হিতার্থে "ভাগবত অর্থ পয়ায় বান্ধিয়া" 'গীত-ছন্দে' এই শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই সময়ে বাসুলী, সরস্বতী ও গণপতি এবং "ত্রিভুবনেশ্বরী দেবী জগত জননীর" পূজাও (বোধ হয় দেবী দশভুজা দুর্গাপূজা) এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল।

এক্ষণে অনেক বঙ্গভাষার আদিকাব্য-রচয়িতা এই অপরিচিত কবির সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন। ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন, বঙ্গাধিপতি আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সদাচারসম্পন্ন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন; তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে পাঁচজন সাধুসুভাব কায়স্থও বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দশরথ বসু অন্যতম। এই কায্যপ্রণেতা মালাধর বসু উক্ত দশরথ বসুর অধস্তন ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে উৎপন্ন হন। ইনি রাঢ়ীয় কায়স্থকুলসম্ভূত ভগীরথ বসুর পুত্র। বর্দ্ধমান প্রদেশস্থ কুলীনগ্রাম ইহাঁর জন্মভূমি। আধুনিক মেমারী রেলওয়ে ষ্টেসনের ৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে এই কুলীনগ্রাম অবস্থিত। মালাধর বসু প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন। কুলীনগ্রামে অদ্যাপি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গড় ও দেবালয় প্রভৃতির চিহ্ন বিদ্যমান আছে। কুলীনগ্রামে ইহাঁর বংশধরেরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন। গৌড়েশ্বর ইহাঁকে "গুণরাজ খাঁন" উপাধি দিয়াছিলেন, এইজন্য "গুণরাজখান" নামেই ইনি সাধারণতঃ পরিচিত হইয়া থাকেন। ইনি স্বীয় গ্রন্থে এই রূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন:—

"বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুবতী।
যাহার পুণ্যে হইল আমার কৃষ্ণপ্রেমে মতি॥
* * *
ওণ নাই অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খাঁন॥
সত্যরাজ খাঁন, হয় জদয়নন্দন।
তাহৈ আশীর্ব্বাদ কর যত সাধুজন॥
দস্তে তৃণ ধরি বদি সকলের ঠাঞি।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।
কায়স্থকুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু রামাঞি॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে হরি বল সর্ব্বজন॥

শ্রীপুরুষ শিশু সব শুন সাবধানে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় গুণরাজ খাঁন ভনে॥"

মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের উপক্রমণিকায়, প্রকাশক বাবু রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মালাধর বসুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "গুণরাজ খাঁন মহাশয়ের একটী সামাজিক সাহসের পরিচয় পাইয়াছি। বঙ্গালী কৌলীন্য প্রথাকে সারহীন জানিয়া অস্মদীয় পূর্ব্বপুরুষ শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত বংশীয় বালি সমাজের দত্ত মহাশয়-গণ তাহা কখনই স্বীকার করেন নাই। * * মহাত্মা মালাধর বসু তদীয় ধীশক্তি দ্বারা উক্ত প্রথার ভাবী অমঙ্গলজনক ফল লক্ষ্য করিতে পারিয়া আপন আত্মীয় পুরন্দর খাঁনের অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম বংশীয় ত্রয়োদশ পর্য্যায় শ্রীপতি দত্ত মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের উদ্বাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। * * বর্ত্তমান কায়স্থ সমাজের অবস্থা যাঁহারা পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারা বঙ্গীয় ও পৌরন্দরীয় প্রথার উপস্থিত মন্দ ফল দৃষ্টে শ্রীমালাধর বসুর কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।" ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মালাধর বসু একজন যথার্থ মনস্বী ব্যক্তি ছিলেন, সমাজের পদানত অনুদাস ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার অধস্তন বংশপরম্পরার মধ্যে এই মনস্বীতার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না।

"গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খাঁন" এই পয়ারার্দ্ধ পাঠে বোধ হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনার পূর্ব্বে মালাধর বসু গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক "গুণরাজ খাঁন" উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই গৌড়েশ্বরের নাম কি? বিগত মাঘ মাসের নব্যভারতে 'শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরূপ গোস্বামীর জীবনী" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে * শ্রীযুক্ত হারাধন ভক্তিনিধি লিখিয়াছেন যে, মালাধর বসু, গৌড়াধিপতি সৈয়দ হুসেন সাহার মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। আমরা কুলীনগ্রামের বসু মহাশয়দের নিকট অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছি যে, একথার কোন মূল নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গৌড়াধিপতি হুসেন সাহাই মালাধরকে এই উপাধি দিয়াছিলেন। এরূপ অনুমানের কারণ আছে। সৈয়দ হুসেন সাহ মুসলমান রাজগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ রূপ ও সনাতন গোস্বামী পূর্ব্বে ইহাঁর কর্ম্মচারী ছিলেন। হিন্দুদিগের সহিত ইহাঁর বিশেষ সদ্ভাব ছিল; চৈতন্য দেবকেও ইনি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। এই সকল কারণে বোধ হইতে পারে যে, ইনি হিন্দু-কবির গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহা প্রচলিত ইতিহাস বিরুদ্ধ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ১৪০২ শকে অর্থাৎ ১৪৮০ খৃঃ অব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয় লিখিত হইয়াছে এবং কবি তৎপূর্ব্বেই উপাধি পাইয়াছেন। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হুসেন সাহ ইহাঁর নয় বৎসর পরে ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে মজঃফর সাহকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।*

বিগত ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যক "সাহিত্য" পত্রিকায় "কবিকাহিনী" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়া-

* ভক্তিনিধি মহাশয়ের এই প্রবন্ধটী নানারূপ ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ। বিগত ফাল্গুন মাসের "সাধনা" পত্রিকায়, এই প্রবন্ধের একটী সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

* Vide Marshman's History of Bengal

ছেন, গৌড়ের মুসলমান-নবাব হিন্দু মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় শুনিয়া তাঁহাকে গুণরাজখান উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।" এই লেখক মহাশয় মালাধরের গ্রন্থ হইতে তৎকালিক হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু "গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান" এই বাক্যের লক্ষিত গৌড়েশ্বর কে?—তাহা নিরূপণ করিতে কোন চেষ্টাই করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয়ও "ইহাঁর প্রকৃত নাম শ্রীমালাধর বসু, গৌড়ীয় সম্রাট্ দত্ত উপাধি গুণরাজখান" এইমাত্র লিখিয়াই এবিষয়ে অনুসন্ধান শেষ করিয়াছেন। আশা করি, বৈষ্ণবসাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি ইহা মীমাংসা করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন।

রামপাল-দর্শন।

বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২২এ মাঘ, শুক্রবার অপরাহ্ণ সময়ে, আমরা ঢাকা হইতে রামপাল দর্শনোদ্দেশে যাত্রা করি।

রামপাল ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এইস্থানে চন্দ্রবংশোদ্ভব বল্লালসেনের রাজধানী ছিল। তাঁহার ভদ্রাসনবাটী এখন জঙ্গলাকীর্ণ, কোথাও ইষ্টকক্ষেত্রে, কোথাও বা কদলীক্ষেত্রে, কোথায় বা বেত্রবনে পরিপূর্ণ দেখিলে—ভাবিলে, অশ্রুসম্বরণ করা দুঃসাধ্য। জগৎ-বিখ্যাত রামপাল দীঘি দেখিলাম। কথিত আছে, জননীর মনস্তুষ্টির জন্য মহাত্মা বল্লাল-সেন একরাত্রে এই দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। যদিও পূর্ব্বের ন্যায় আর কিছুই নাই, তথাপি যাহা আছে দেখিলাম, তাহাতে পূর্ব্ব-মাহাত্ম্য প্রকাশিত রহিয়াছে।

বল্লালসেন, সম্বন্ধে এখানকার কিম্বদন্তী এইরূপ। ইনি বিজয়সেনের জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভসম্ভূত, ব্রহ্মপুত্র নদের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। ঢাকার নিকটবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে ঢাকেশ্বরী-মন্দির সন্নিহিত কোন স্থানে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবন এই অরণ্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল। রাজা হইয়া তিনি বিশেষ সুযশের সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার শাসনগুণে দেশে আবার যথারীতি যাগযজ্ঞ সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। অনেক সাধুপুরুষ ঢাকেশ্বরী দেবীর মন্দির-সন্নিহিতে বাস করিতেন। কোন সময়ে তাঁহারা যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞান্তে বল্লালসেনকে আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়া দেন। একজন শিষ্য ঐ আশীর্ব্বাদ লইয়া রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুর আদেশ ছিল, ঐ আশীর্ব্বাদ অন্য কাহার হস্তে দিবেন না—স্বয়ং মহারাজের শিরোপরে অর্পণ করিবেন। ঐ ব্রাহ্মণকুমার ন্যায় সমস্ত দিন দ্বারদেশে ঐ আশীর্ব্বাদী পুষ্পাদি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু রাজা দৈবনির্ব্বন্ধে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণকুমার সেই আশীর্ব্বাদী অর্ঘ্য এক গজবন্ধন স্তম্ভে স্থাপন করিয়া ক্রোধ

ভরে প্রস্থানক্ষম রিলেন। ঐ স্তম্ভ ক্রমে বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। ঐ বৃক্ষটিও দেখিলাম। উহা রামপাল দীঘির অদূরে অবস্থিত। বল্লালসেনের ভদ্রাসন, গজবন্ধন ভূমি, রামপাল দীঘি, কোদাল ধোওয়া দীঘি প্রভৃতির অবস্থান সমস্তই স্বচক্ষে দর্শন করিলাম।

রামপাল বল্লালসেনের মাতুল। তিনি পরমভক্ত শৈব ছিলেন। যখন বল্লালসেন তাঁহার জননীর দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইবার জন্য ঐ বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান, সেই সময় প্রথম উহাতে জল উঠে নাই। রামপাল উহার মধ্যস্থলে গমন করিবামাত্র উহার আদেশ ভিন্ন হইয়া জল উঠে। রামপাল ঐ দীর্ঘিকাতেই প্রাণত্যাগ করেন। সেই পর্য্যন্ত উহা রামপাল দীঘি নামে বিখ্যাত। অসংখ্য মজুরে একরাত্রে রামপাল খনন করে। ঐ মজুরেরা প্রাতঃকালে নিকটে আর এক স্থানে প্রত্যেকে এক এক কোদাল মাটী তুলিয়া ছিল; তাহাতেই 'কোদাল ধোওয়া' দীঘির উৎপত্তি হয়। বল্লাল সেনের শাসন-সময়ে এদেশে মুসলমানগণ আসিতে আরম্ভ করিলেও তাহাদের প্রতাপ বদ্ধমূল হয় নাই। তাহারা প্রকাশ্যভাবে গোহত্যা করিতে পারিত না। গোপনে গোহত্যা করিয়াছে জানিতে পারিলেও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইত। এই কারণে মুসলমানেরা তাঁহার উপর কিছু বিরক্ত ছিল। এক সময়ে ঝাবা আদম নামে একজন ফকির তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন; ঐ যুদ্ধ সময়ে বল্লালসেন এক পারাবত সঙ্গে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। কথা ছিল, পারাবত পুরীতে প্রত্যাগমন হইলে পরিজনেরা বল্লাল নিহত হইয়াছে বুঝিয়া অনলে দেহ ত্যাগ করিবেন। সমস্তদিন যুদ্ধের পর বাবা আদম নিহত হইলে যখন বল্লাল পুষ্করিণীতে হাতমুখ প্রক্ষালনার্থে গমন করেন, ঐ সময়ে পারাবত উড্ডীন হইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করে। পারাবত দর্শনে পরিজনেরা বল্লালসেনের মৃত্যু হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া অগ্নিকুণ্ডে দেহ বিসর্জ্জন করেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে হইতে বল্লাল দ্রুত প্রত্যাগত হইয়াও কাহাকে জীবিত পাইলেন না; কেবল এক দাসী মাত্র অবশিষ্ট ছিল। বল্লাল স্বজন-শোকে অনলে প্রাণাহুতি প্রদান করিলে, দাসীও প্রাণত্যাগ করে। ঐ সময়ে যুবরাজ লক্ষ্মণসেন মন্ত্রীকে গৌড়নগরে অবস্থিতি করিতে দিলেন। বল্লালের মৃত্যুর পর তিনি আর রামপালে আসেন নাই। ক্রমে প্রজাগণ দেশ ত্যাগ করায় উহা অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। রামপাল দীঘি প্রায় সাড়ে সাতশত হাত দীর্ঘ ও পাঁচ শত হাত প্রস্থ।

অবতার প্রয়োজন ও বুদ্ধাবতার।

যৎকালে জগৎরক্ষার কোন বিশেষ প্রয়োজন হয়, অথবা যৎকালে দুর্জ্জন দুরাত্মাদিগের দ্বারা পৃথিবী অত্যাক্রান্তা হয়, যৎকালে নির্দ্দয় সবল দুরাত্মারা দুর্ব্বল প্রাণী-সাধারণের প্রতি অতিমাত্র নিষ্ঠুর ব্যবহার আরম্ভ করে, তৎকালেই সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান তৎকালোচিত মূর্ত্তিবিশেষে বা মনুষ্যাদি প্রাণীবিশেষে অবতরণ এবং পৃথিবীর ভারহরণ করেন। ভগবদ্গীতাতে উক্ত আছে, যথা,—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"

অর্থাৎ "যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃজন করি, অর্থাৎ অবতরণ করি।" পুরাণাদি শাস্ত্রে অবতারের অনেক কারণ উল্লিখিত হইয়াছে এবং পূর্ণ ও আংশিক ভেদে নানা অবতারের প্রমাণ ও লক্ষণ লিখিত আছে। দেব, তির্য্যক ও মনুষ্যাদি সকল প্রাণীতেই অবতার হইয়া থাকে। অনেকে জানেন, পুরাণাদি আর্য্যশাস্ত্রে কেবল মৎস্য-কূর্ম্মাদি দশবিধ অবতারেরই উল্লেখ আছে; বাস্তবিক ভগবানের অবতার অসংখ্য; যথা,—

"অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্ব
নিধেদ্বিজা।" ইত্যাদি।

অনাদি ও অনন্তের অবতারও যে অনাদি ও অনন্ত, এ তত্ত্ব ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ ঋষিগণ যেরূপ জানিতেন, এরূপ পৃথিবীর আর কোথাও কোন জাতি জানিতেন না। পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশেও প্রয়োজন-বশতঃ ভগবান অবতরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তত্তৎ দেশবাসিগণের প্রায়ই তাহা অপরিজ্ঞাত আছে। আফ্রিকার মিসর (ইজিপ্ট) দেশে যখন তদ্দেশীয় ফেরাউন নামক রাজা সেই দেশের প্রধান উপনিবেশী ইহুদী-জাতির প্রতি অতিমাত্র নিষ্ঠুর ব্যবহার আরম্ভ করেন, এবং ভাবী বৈরনির্য্যাতন উদ্দেশ্যে পাষণ্ড যখন ইহুদী জাতির সমস্ত নবজাত পুংশিশুদিগের প্রতি নৃসংশ হত্যা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন মুসা নামক মহাত্মাতে ভগবানের অবতার হয়। এইরূপ অবতার সংস্কৃত পুরাণাদি শাস্ত্রে 'আবেশাবতার' নামে অভিহিত হইয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে জানা যায়, মহাত্মা মানবেই ভগবানের আবেশাবতার হইয়া থাকে। আবেশাবতার, যথা,—

"জ্ঞানশক্ত্যাদি কলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহোত্তমাঃ॥"
(ভাগবতামৃত)

আবেশাবতারে বুদ্ধাদি কার্য্য অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বিনাযুদ্ধে সাধারণ মনুষ্যের অসাধ্য কোন কোন বিশেষ কার্য্যসাধন করাই আবেশাবতারের প্রয়োজন। ভারতে মহারাজ পৃথু আবেশাবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। মুসা অসাধারণ শক্তিবলে মিসর দেশের চিরবন্দী ও চিরদাস-ভাবাপন্ন স্বজাতীয় ইহুদীদিগের উদ্ধারসাধন করিয়া যেরূপ পয়গম্বর (ঈশ্বরপ্রেরিত) নামে সাধারণ্যে পরিচিত হয়েন, ভারতে মহারাজ পৃথুও সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতরাজির উৎখাত ও পৃথিবীর অত্যন্ত উচ্চ নীচতাদি নিরসন-পূর্ব্বক কৃষিকার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, এবং আবেশাবতার নামে প্রথিত হয়েন। পৃথিবীর এবম্বিধ অসাধারণ

উন্নতি করাতেই আমাদের অধিষ্ঠানভূতা ত্রৈ অবনী পৃথ্বীর সম্বন্ধে 'পৃথিবী' এই নূতন নামে পরিচিতা হইয়াছেন। কার্য্যসাধ্যতে বা কার্য্যবিশেষে অসাধারণতা অবতারের একটি বিশেষ লক্ষণ। যথা,—

"তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈগুঁ ণৈর্দেহিষমন্বিতঃ।"
(ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ।)

অর্থাৎ—"যে সকল গুণ মনুষ্যাদি অন্য কোন প্রাণীতে অসম্ভব, সেই সকল গুণ যে কোন প্রাণীতে দৃষ্ট হয়, তাহাকেই কোন না কোন অবতার বলিয়া জানিতে হইবে।" পৃথুর ন্যায় ভারতে যেরূপ সনকাদি ঋষি-চতুষ্টয় এবং ধন্বন্তরাম প্রভৃতিও আবেশাবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশেও অর্থাৎ সিরিয়া ও আরব প্রভৃতি দেশেও সেইরূপ অনেক আবেশাবতারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাঁরা সকলেই মহাত্মা মানব ব্যতীত আর কিছুই নহেন। ভারতে, পরশুরাম ও খ্রীষ্টাব্দের মহম্মদ এই দুই আবেশাবতারে পৃথিবী রূপ ভীষণ মানববশোণিতে প্লাবিতা হইয়াছে, অন্য কোনও আবেশাবতারে সেরূপ হয় নাই। অন্যান্য স্থলে বিনারক্তপাতে পৃথিবীতে ধর্ম্মস্থিতি সংস্থাপনই আবেশাবতারের প্রধান প্রয়োজন বোধ হয়। ভারতে জ্ঞান- ও ধর্ম্ম-প্রচার উদ্দেশ্যেই যেরূপ সনকাদি আবেশাবতার, অন্যত্র সেইরূপ যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতিকে জানিতে হইবে।

আমরা যে অবতারের প্রসঙ্গে এতক্ষণ অন্য অবতারের কথা বলিতেছিলাম, তাহাকে আবেশাবতার বলা যায় না। ইহাকে লীলাবতার বা কলাবতার বলা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধাবতার ভগবানের লীলাবতার বা কলাবতার। ভারতবর্ষে অসুর বা দৈত্য-কুলোৎপন্ন ব্যক্তিরা যখন যজ্ঞপরায়ণ হইয়া যজ্ঞব্যাজে অজস্র পশুহনন ও পশুশোণিতে পৃথিবীকে সিক্ত করিতে আরম্ভ করে, ভারতে এইরূপে যখন নিরাশ্রয় পশুবংশ নিঃশেষপ্রায় হয়, পশুবধার্থপূর্ণে যখন প্রতি গৃহই ভীষণ মূর্ত্তিকায় ধারণ করে, সেই সময়ে দয়াময় ভগবান পশুহত্যা-নিবারণ ও জগতে অহিংসা পরমধর্ম্ম প্রচারের জন্য বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হন। অবতীর্ণ হইয়া তিনি সনাতন বেদের যজ্ঞবিধির তীব্র প্রতিবাদ করাতেই, তাৎকালিক যাজ্ঞিক আর্য্যগণের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন ও সেই সঙ্গে কেহ কেহ বৌদ্ধমতকে বেদবহির্ভূত বলিয়া প্রচার করেন। যজ্ঞবিধির প্রতিবাদ থাকাতেই যদি বৌদ্ধধর্ম্ম অবৈদিক হয়, তবে ভারতের হিংসারহিত ধর্ম্মমাত্রকেই অবৈদিক বলা যাইতে পারে। সুবিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মও বেদের হিংসাপ্রধান ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। বেদের সকল প্রকার বিধি সম্পূর্ণ পালন করিতে পারে, ভারতে এরূপ ধর্ম্মসম্প্রদায় নাই বলিলেই হয়। বেদে অধিকার-ভেদে ধর্ম্মের বিধান আছে। সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের তারতম্যানুসারে যাহার যেরূপ অধিকার, তাহার সেইরূপ ধর্ম্মই স্বাভাবিক। সর্ব্বপ্রাণীতে সমদর্শী বা সদয়-হৃদয় মহাত্মাগণ কোনরূপেই বেদের হিংসাপ্রধান যজ্ঞবিধির আনুগত্য করিতে পারেন না। কেন না, বেদে প্রায় এরূপ কোন যজ্ঞের বিধান নাই, যাহা নিদারুণ পশুহনন ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে। প্রাচীন যাজ্ঞিকগণ যে ভাবে পশুহনন করিতেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় অতিমাত্র ব্যথিত ও শরীর কণ্টকিত হয়। সে হত্যা বর্ত্তমান কালের ভীরুকি পশুবলি বা ম্লেচ্ছজাতির 'জবে' নামক পশুহত্যার ন্যায় নহে, তাহা ভীষণ হইতেও ভীষণতর। দুর্ভাগ্য যজ্ঞীয় পশুকে যূপকাষ্ঠে বন্ধনপূর্ব্বক তাহার মুখ বাঁধিয়া অগ্রে নিদারুণ প্রহার, তারপর

গতপ্রাণ হইলে তাহাকে খণ্ডীকৃত করা হইত! কেবলমাত্র সাধারণ পশু নয়, মানবজাতির মাতৃস্থানীয়া গো এবং মনুষ্য পর্য্যন্ত যজ্ঞীয় পশুরূপে ব্যবহৃত হইত! গোমেধ ও নরমেধ যজ্ঞ বাস্তবিকই অথর্ব্বনামা! মহারাজ রন্তিদেব এত গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন যে, তাঁহার যজ্ঞীয় হত গো-কুলের শোণিত ও বসাতে চর্ম্মবতী নাম্নী নদীর উৎপত্তি হইয়াছিল। চর্ম্মবতী অদ্যাপি রন্তিদেবের সেই ভীষণ কার্য্যের কুকীর্ত্তিস্বরূপা হইয়া রহিয়াছে। চর্ম্মবতী ভারতের অন্যান্য দেশ হইতে প্রাচীন পঞ্চালদেশকে পৃথকরূপে পরিচিহ্নিত করিত। পরন্তু নরমেধের কথার উল্লেখ করিতে কেবল যে দারুণ দুঃখ হয় এরূপ নহে, অনির্ব্বচনীয় লজ্জাও আমাদিগকে জড়সড় করে। এ দুঃখ, এ লজ্জা সামান্য নহে। ভারতের ন্যায় ধর্ম্মময় পবিত্র দেশে একসময়ে গোবধ ও নরবধ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল, এ কথা বর্ত্তমান সময়ে গোপনীয় হইলেও, সত্যের অনুরোধে লেখনীমুখে ব্যক্ত করিতে হইল। "ভগবান বুদ্ধদেব এরূপ বেদবিধির প্রতিবাদ করাতে যাহারা তাঁহার পবিত্র মতকে অবৈদিক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা ঋষি হন, আর যেই হন, দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। বৈষ্ণবচূড়ামণি মহাত্মা জয়দেব ভগবান বুদ্ধদেবের অহিংসাধর্ম্মের সম্পূর্ণ অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁহার যে স্তুতি করিয়াছেন, অতিশয় শ্লাঘ্যগ্রাহ্য বলিয়া আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়-হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর,
জয় জগদীশ হরে।"

(গীতগোবিন্দ।)

অর্থাৎ—'হে জগদীশ হরি, হে সদয়-হৃদয়! তুমি বুদ্ধশরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক পশুঘাতবহুল যজ্ঞবিধির নিন্দা করিয়াছ, তুমি জয়যুক্ত হও।' এস্থলে আমরাও স্বদেশীয় মহাত্মা জয়দেবের মতের অভিনন্দন-পূর্ব্বক প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বুদ্ধদেবের জয়কামনা করিতেছি। এস্থলে বলা উচিত যে, ভগবান চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরে ক্রমে ঘোরতর নির্ম্মল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অজ্ঞান-মূর্খজনসাধারণ্যে বিকৃত হইয়া যাইতেছে, বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরে পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্ম ততোধিক বিকৃত হইয়াগিয়াছে। ভারতের মরুদেশ ব্যতীত পৃথিবীর আর কুত্রাপি বুদ্ধদেবের প্রকৃত অহিংসা পরমধর্ম্ম প্রচলিত নাই। পৃথিবীর বহুদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে; চীন, জাপান প্রভৃতি মহাদেশে বুদ্ধদেবের পূজা হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় তত্তৎদেশবাসিগণ অজ্ঞানিতাবশতঃ স্বীয় প্রভুর আজ্ঞার অন্যথা ব্যভিচার করিতেছে। কেন-না, এই সকল দেশবাসীর, জলচর, স্থলচর, উভচর প্রায় সকল প্রাণীই নিয়ত উদরসাৎ হইতেছে। শুনিতে পাওয়া যায়, বিষ্ঠার কৃমি পর্য্যন্ত ইহাদের আহার্য্য পদার্থ! ভর্জ্জিত কৃমি নাকি ইহাদের উপাদেয় খাদ্য! ধন্য মনুষ্যের প্রবৃত্তি!

সে যাহা হউক, আমরা সম্প্রতি ভগবান বুদ্ধদেবের অবতার, কাল ও স্থানের বিষয় যথাশাস্ত্র সংক্ষেপে লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পুরাণাদি আর্য্যশাস্ত্রানুসারে এসম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায়, আমরা তাহাই বিবৃত করিব। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে যথা—

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নামাঞ্জনসুত কীকটেষু ভবিষ্যতি।"

অর্থাৎ—'কলি সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্ত হইলে দেবদ্বেষী অসুরগণের মোহনের নিমিত্ত গয়া প্রদেশে বুদ্ধদেব অঞ্জনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।'

অঞ্জনের অপর নাম জিন। একারণ বুদ্ধদেব জৈন নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। কলিকাল সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলে বুদ্ধাবতার হয়, একথায় এই মাত্র বুঝা যায় যে, কলির কিছুকাল অতীত হইলে বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েন; কিন্তু এতদ্দ্বারা সঠিকরূপ সময় নির্ণয় হইতেছে না। অতএব এস্থলে ভাগবতাদির প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে, যথা,—

"অসৌব্যক্তঃ কলেরন্ধ্র সহস্র দ্বিতয়ে গতে।
মূর্ত্তিঃ পাটলবর্ণায় দ্বিজভা চিকুরোজ্জ্বলা॥
আসীত্তকথামাহ তদাবুদ্ধস্য ভাবিতা।
অনাবৃত্ত এবাযাং ধর্ম্মারণ্যে যদূদ্ভতঃ॥"

অর্থাৎ—'এই বুদ্ধদেব কলির দুই সহস্র বৎসর অতীত হইলে ধর্ম্মারণ্য গ্রামে সমুদ্ভূত হন। ইঁনি দ্বিজভ ও পাটলবর্ণ ছিলেন। মস্তকের কেশকলাপ ঊর্দ্ধে বন্ধন করিতেন।' ইত্যাদি।

গয়া প্রদেশের স্থান-বিশেষেই যে ধর্ম্মারণ্য, এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। পরন্তু বুদ্ধদেব যদি কলির দুই সহস্রবর্ষ গতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তবে তিনি বর্ত্তমান কালের ৪৯১৪ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন, ইহাই জানা যাইতেছে। কেন-না, শাস্ত্রানুসারে সম্প্রতি কলির গতাব্দ ৪৯১৪ বৎসর অবগত হওয়া যায়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খৃঃ জন্মের ১১০০ একাদশত বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

একটী ক্ষুদ্র গল্প।

উপন্যাস নয়, নবন্যাস নয়—একটী ক্ষুদ্র গল্প। এ গল্পের নায়ক নাই, নায়িকাও নাই—আছে কেবল একটী "ক্ষুদ্র" সংসারের একটী ক্ষুদ্র ঘটনার কথা। ঘটনাটী ক্ষুদ্র হইলেও বিষয়জনক বটে। আর একটি কথা—এ ঘটনাটীর বিষয় যতই ভাবিবেন, ততই নূতন নূতন কিম্বা মনোমধ্যে উদয় হইবে। আপনাদিগের সে চিন্তা করিবার সময় থাকুক বা না থাকুক, আমি কিন্তু গল্প আরম্ভ করিয়া বসিলাম।

গোবিন্দলাল নামে এক উদ্ভট যুবা ছিল। তোমরা এ নামে হয়ত তাহাকে চিনিতে পারিবে না। কারণ, সে 'গোঁয়ার গোবিন্দ' নামেই প্রসিদ্ধ। গোবিন্দলাল তাঁহার পিতা মাতার শেষ বয়সের একমাত্র; সন্তান সুতরাং বড় আদরের। এদিকে পিতা হারাধন বসু গোবিন্দলালের বাল্যজীবনের শিক্ষার বিষয়ে কোনরূপ বন্দোবস্ত করেন নাই, কিন্তু ওদিকে তাহার মাতা হরসুন্দরী পুত্রের আহারাদির বিষয়ে রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া লক্ষতি পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং কিশোর বয়সেই পুত্র গোবিন্দলাল 'গোঁয়ার গোবিন্দ' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল। হারাধনের একটা সংস্কার ছিল, সন্তান বাল্যকালে দুষ্ট হইলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড় শিষ্টশান্ত হয়। কিন্তু গোবিন্দলাল সম্বন্ধে তাঁহার এ নিয়ম খাটিল না। গোবিন্দলালের বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দুষ্টমীও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল। এমন দিন নাই, যেদিন গোবিন্দ লালের বিপক্ষে হারাধনের নিকট নালিশ হয় নাই; আর এমন দিনও ছিল না, যেদিন গোবিন্দ লাল সমস্তদ্ধ বালক্‌দিগের সহিত একটা মারামারি না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। ক্রমে ক্রমে গোবিন্দলাল সামান্য মারামারি ছাড়িয়া দিয়া বড় বড় দাঙ্গা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার একটা ছোটখাট দলও জুটিয়া গেল। হারাধন পুত্রের রকমসকম দেখিয়া বিশেষ বিরক্ত হইলেন। প্রথমেই পুত্রকে শাসন করিবার চেষ্টা, কিন্তু পুত্র তখন শাসনের অতীত! তাহার পর রুচির বিচিত্র গতি দেখুন! যে পুত্রমুখ দর্শন লালসায় তিনি এক সময় অধীর হইয়া বেড়াইয়াছিলেন, এখন সেই পুত্রমুখ দর্শন করিতে হইবে—এই কথাটিমাত্র মনে হইলে তৎক্ষণাৎ ভয়ে তাঁহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইত। হারাধন তখন মনের দুঃখে কেবল নিজের মৃত্যু-কামনা করিতেন।

এদিকে হরসুন্দরী পুত্রের বিবাহের জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন। পুত্র ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যায়, সুতরাং আর বিবাহ না দেওয়া কি ভাল দেখায়? এই বিষয় লইয়া স্ত্রী-পুরুষে বিলক্ষণ বিবাদ-বিসম্বাদও চলিতে লাগিল। হারাধন পুত্রের বিবাহের সম্পূর্ণ বিপক্ষ, আর হরসুন্দরী তাহার ঠিক বিপরীত—পুত্রবধূমুখ দেখিবার জন্য পাগলিনী। শেষ গৃহিণীর জেদই বজায় রহিল, গোবিন্দলালের একটী বিবাহ হইয়া গেল। পুত্রের বিবাহের তিনমাস পরে কিন্তু হারাধনের মনস্কামনা সিদ্ধি। হারাধন পুত্রের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন!

পিতৃ-বিয়োগের পর কিন্তু গোবিন্দলালের অত্যাচার ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিল। হারাধন বসু কিছু সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন কি না, আর এখন সে সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী গোবিন্দলাল। তাই তাহার অত্যাচারের এত বৃদ্ধি। অর্থাভাবে এত দিন যে সকল যৌবনসুলভ দোষ গোবিন্দলালের চরিত্র স্পর্শকে করিতে পারে নাই, এখন তাহাদের বিক্রম দেখে কে? সুকল গুলিই পূর্ণমাত্রায় দর্শন দিল। এরূপ অবস্থায় সে সুকল বিষয় সম্পত্তি আর কত দিন টিকিবে? হারাধনের সংসারের লক্ষ্মী ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আর অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দরিদ্রতা কঙ্কাল মূর্ত্তি ধীরে ধীরে আসিয়া দর্শন দিল। তত্রাচ গোবিন্দলালের ভ্রূক্ষেপ নাই। যৌবনের দুর্দ্দমনীয় তেজে গোবিন্দলাল তখন ভীষণবেগে ভাসিয়া চলিয়াছে!। সংসারের বন্ধন, সমাজের বন্ধন, ধর্ম্মের বন্ধন—কোন বন্ধনই তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। গোবিন্দলালের জননী হরসুন্দরী অপমানের ভয়ে কোন কথা তাহাকে বলিতে সাহসী নন; গোবিন্দলালের স্ত্রী এখন নিতান্ত বালিকা না হইলেও প্রাণের ভয়ে কোন কথা বলিতে সাহসী নয়। আর প্রাক্‌বেশিগণও 'গোঁয়ার গোবিন্দ' নাম শুনিলেই ভিয়ে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দেয়; এমন কি পুলিস পর্য্যন্ত 'গোঁয়ার গোবিন্দের' নামে কম্পমান! সুতরাং সে দুর্দ্দমনীয় তেজের সম্মুখে কে দাঁড়াইবে? গোবিন্দলাল অপ্রতিহত প্রভাবে আপন পল্লীতে পৈশাচিক রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। তাহার বিপক্ষে একটী কথা বলে, এমন লোক সে পল্লীতে ছিল না। কারণ সকলেরই প্রাণের মায়া আছে।

কিন্তু নিজের জীবনে যাহার মায়া নাই, সে পরের জীবনের মূল্য কিরূপে বুঝিবে? গোবিন্দলাল কথায় কথায় লোকের মাথা ফাটাইতে আরম্ভ করিল। আবার যে পরিবারের মধ্যে কাহারও মাথা ফাটিত, সে পরিবারের অন্য মাথাগুলি গোবিন্দলালের লাঠির আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গোবিন্দলালের বিপক্ষে নালিস পর্য্যন্তও কেহ করিতে সাহসী হইত না। লাঠির কেমন প্রভাব দেখিলে?

গোবিন্দলালের জননী হরসুন্দরীর অন্তরাত্মার স্ত্রী সুখদার অবস্থা ক্রমে বড় শোচনীয় হইল। একে তো তারা গোবিন্দলালের সুনামের জোরে দুপুরা মুখ দেখাইতে পারিত না, তাহার উপর আবার সাংসারিক দারিদ্র্যযন্ত্রণায় দিন দিন ম্রিয়মাণ! হরসুন্দরী এখন অনেক কষ্টে সংসার চালাইতেন, কিন্তু তাহার উপর পুত্রের অপব্যয়ের অর্থ কোথায় পাইবেন বল? সুতরাং প্রতিদিন পুত্রের নিকট অপমান আর লাঞ্ছনা, আবার মধ্যে মধ্যে প্রহার!

আর সুখদার কথা কি বলিব? লোকে যমকে যত ভয় না করে, সুখদা তাহা অপেক্ষা স্বামীকে অধিক ভয় করিত। হিন্দু-ললনা মাত্রেই স্বামীকে ভয় করিয়া থাকে জানি, কিন্তু তাহাদের সে ভয়ের সহিত যেরূপ ভালবাসা আর ভক্তি মিশ্রিত থাকে, সুখদার ভয়ের সহিত কিন্তু সেরূপ ভালবাসা বা ভক্তি মিশ্রিত ছিল না। এরূপ নরপিশাচ স্বামীর স্ত্রীকে আমি যদি পতিব্রতাধর্ম্মে পূর্ণমাত্রায় ভূষিতা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই স্থানে হইতেই আমার এই গল্প বিলক্ষণ জমিয়া যাইত, আর আমিও পাঠকমহলে 'বাহবা' লইতে পারিতাম, কিন্তু আমার এ গল্প 'আষাঢ়ে গল্প' নয়, বৈশাখের দিবা দ্বিপ্রহরের সময় লিখিত, সুতরাং হিন্দুর সন্তান হইয়া সুখদার স্বামীর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির কথা কিরূপে বর্ণনা করিব?

এই সময় একটি ক্ষুদ্র ঘটনার কথা বলি শুন। ঈশ্বরের লীলা বুঝিতে পারা মনুষ্যের সাধ্য নয়। তাঁর পাখ্য দেখ, যে সংসারে দুইটি প্রাণীর আহার জুটিবার উপায় নাই, সেই সংসারে আর একটি প্রাণীকে তিনি প্রবেশাজ্ঞা দিলেন। যথাসময়ে সুখদা এক পুত্ররত্ন প্রসব করিল। এরূপ একটি উৎসবের দিনেও কিন্তু সেগৃহে কোনরূপ আনন্দ-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় নাই—একটা শঙ্খধ্বনি পর্য্যন্তও নয়! কেবল হরসুন্দরী ঠাকুরাণী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে পৌত্রের অভ্যর্থনা করিল। তোমরা বিশ্বাস করিবে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সুখদা পুত্রমুখ দেখিয়াই স্বামীর অহরহ ছেঁকা-দেওয়া অঙ্গের সমস্ত জ্বালা তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া গেল!! এসংসারে সুখদার কি সুখ ছিল তাহাতে তোমরা সকলে জানই, তত্রাচ সুখদা আজ ভাবিতেছে—তাহার মতন সুখী বুঝি এ পৃথিবীতে আর নাই! এখন হঠাৎ সুখদার তত সুখ—তত মনের শান্তি কোথা হইতে আসিল জান? আবার কোথা হইতে আসিবে? পুত্রমুখ সে যতই দেখে, ততই যেন সে অনন্তসাগরে ভাসমানা! আর একটা বিস্ময়জনক ঘটনার কথা বলি শুন। পুত্রের প্রতি ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের প্রতিও তাহার ভালবাসার সঞ্চার হইয়া গিয়াছে! ওমা, সুখদার আবার ভালবাসার পাত্র কে? একথা মনে করিয়া তোমরাও হয়ত শিহরিয়া উঠিয়াছ। এখন কথাটা বলি শুন, সে ব্যক্তি অন্য কেহ নহে—সেই নরপিশাচ স্বামী গোবিন্দলাল!

শিশুর বয়ঃক্রম যত বাড়িতে লাগিল, সেই পাষণ্ড স্বামীর প্রতি ভালবাসা আর ভক্তিও যেন সুখদার হৃদয়কে ততই পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল।

ক্রমে তাহার সেই অত্যাচার, প্রহার, লাঞ্ছনা, সমস্তই তুলিয়া গিয়া মুখদর্শী সেই পশুর অধম স্বামীর চরণে জীবন, মন সমুস্তই অর্পণ করিল! আর গোবিন্দলালের সে দুর্দ্দমনীয় যৌবন-স্রোতের প্রবল জোয়ারও অমনি ভাটায় পরিণত হইল।

কেবল তাহাই নহে, ইহা অপেক্ষা আরো বিস্ময়জনক ঘটনা আছে। যে গোবিন্দলালের ভয়ে পৃথিবী কম্পবান, যে গোবিন্দলালের নাম শুনিলে বীরের হৃদয়েও ভীতিসঞ্চার হইত, যে গোবিন্দলাল স্বহস্তে শত শত পুলিশকর্ম্মচারীর মস্তকও দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে, পুত্রমুখ-দর্শন অবধি সেই গোবিন্দলালের হৃদয়ে কোথা হইতে সেই প্রভাবশালী 'ভয়' আসিয়া দর্শন দিল। অবাধে লাঠি চালাইতে গোবিন্দলালের সে ক্ষিপ্রহস্ততা আর নাই! অকুতোভয়ে মাথা ফাটাইতে গোবিন্দলালের আর সাহসে কুলায় না! যে মত্তহস্তীকে বন্ধন করিতে মহা প্রতাপশালী সংসার, সমাজ আর ধর্ম্ম পরাজয় মানিয়াছিলেন, সেই মত্তহস্তী আজ অতি দুর্ব্বল শিশুর দ্বারা আবদ্ধ! ইহা অপেক্ষা বিস্ময়জনক ঘটনা আর আছে কি?

ঠাকুর-ঝি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, প্রকৃতি যেন নিদ্রার কোমলক্রোড়ে ধীরে ধীরে অচেতন হইয়া পড়িতেছে। এখন জনমানবের সাড়াশব্দ প্রায় আর শুনিতে পাওয়া যায় না। হীরালাল বহুর অন্তঃপুরের দুইটী স্ত্রীলোক তখনও কিন্তু নিদ্রা যায় নাই। ইহার মধ্যে হীরালাল বাবুর বিধবা ভগিনী অমলা তখন মহাভারত পাঠ করিতেছিল, আর তাঁহার ভার্য্যা শরৎকুমারী সেই মহাভারতের শ্রোতা। শরৎকুমারী কিন্তু মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল, কারণ তখন তাহার মন তাহার নিজের বশীভূত ছিল না, সে মন কাহার অনুসন্ধানে কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ অমলার কথায় বাধা দিয়া শরৎকুমারী বলিল,—"ঠাকুরঝি, এখন রাত্রির কটা বেজেছে?"

অমলা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"আটটা বেজে গেছে, এইবার একটা বাজ্‌বে।"

শরৎকুমারী বিস্মিত হইয়া বলিল—"রাত্তির একটা হলো! তবে বুঝি আর এলো না—"

অমলা।—এখনি আসবেন। ততক্ষণ এস না কেন, আমি এই সাবিত্রীসত্যবানের উপাখ্যানটা পড়ে শেষ করি। এই দ্যাখ বউ দিদি, আর বেশী পাতা নেই।

এই বলিয়া অমলা তাহাকে পুস্তকের পাতা দেখাইল!

শরৎকুমারী কিন্তু উত্তর করিল—"আর তোমার সাবিত্রীসত্যবান আমার ভাল লাগে না। দ্যাখ ঠাকুরঝি, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, সে আজ আর আস্‌বে না।"

অমলা।—কেন বউদিদি মন খারাপ করিস্? সাবিত্রীসত্যবান ভাল না লাগে, আমি একটা ভাল উপাখ্যান তোকে পড়ে শোনাই আয়।

শরৎ।—না বোন তোর মতন আমার ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি নেই। আর আমার জন্যে কেন তুই এত রাত জেগে মরিস্? তুই তোর

ঘরে গিয়ে শুগে যা, আমি দরজা দিয়ে শুই।

অমলা।—শুলেও ত তুমি ঘুমতে পারবে না বউদিদি; কেবল শুয়ে শুয়ে ভাববে কেন? তার চেয়ে মহাভারত শোন না?

শরৎ।—আমার ভাবতে বয়ে গেছে, তিনি মদ খেয়ে কোথায় পড়ে আছেন, আর আমি বুঝি তাঁর জন্যে ভেবে ভেবে আমার নিজের শরীর মাটি কর্‌বো?

অমলা।—ওকি কথা বউ-দিদি! আমার দাদা ভোলানাথ। কেউ হয় ত একটু আদর করেছে, দাদা ঘরসংসার সমস্ত ভুলে গিয়ে সেইখানে হেসে গল্প কর্‌ছেন। কেউ হয়ত কোন বিপদে পড়েছে, দাদা অমনি আমাদের কথা ভুলে গেছেন, না হয়, তাঁর কোন বন্ধুবান্ধবের হয়ত ব্যায়রাম হয়েছে, দাদা তাকে ফেলে ঘরে আস্‌তে পাচ্ছেন না। পরের উপকার কর্‌তে গেলে, দাদা ঘরসংসার ভুলিয়া যান।

শরৎ।—ভোলানাথের গুণের মধ্যে এখন মদ খেতে দেখ্‌তে পাই, তা ছাড়া আর কোন গুণই দেখিনি।

অমলা।—তৎক্ষণাৎ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার দাদার মতন এমন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, পরোপকারী দয়ালু আছে কার আছে?"

শরৎ।—তোমার দাদার মতন মাতাল, লম্পট, আর মিথ্যাবাদী দাদাও আর ভারতে নেই।

শরৎকুমারীর এই কথায় অমলার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। অমলা যাহাকে এ পৃথিবীর আদর্শ দাদা মনে করে, তাহার উপর শরৎকুমারীর এ কি দোষারোপ? শরৎকুমারী আবার অন্য কেহ নহে, সেই দাদারই সহধর্ম্মিনী সুতরাং অমলা বলিল—"বউ দিদি, স্বামী নিন্দা করলে, তাঁকেই নরক দর্শন কর্‌তে হয়।"

শরৎকুমারী তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"মাতালের স্ত্রী আবার কোন কালে স্বর্গে যায় বোন?"

শরৎকুমারী হাসিতে হাসিতে এই কয়েকটী কথা বলিল বটে, কিন্তু বলিতে বলিতে তাহার নয়ন প্রান্তে হঠাৎ দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। অধরপ্রান্তে হাসি, আর নয়নপ্রান্তে অশ্রু জল—শরৎকুমারী একি!

শরৎকুমারী অসাবধানতাপ্রযুক্তকিন্তু সেঅশ্রু গোপন করিতে পারিল না, অমলা সে অশ্রু দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, —"বউ দিদি, তুমি কি কাঁদ্‌ছ?"

শরৎকুমারী এইবার সেই অশ্রুজল গোপন করিয়া বলিল,—"আমার ত কাঁদ্‌বার জন্যে ঘুম হয়নি! তবে যদি একটা বড় দেখে পাকা লঙ্কা এনে দিতে পারিস্, তবে খানিকটা কাঁদ্‌লেও কাঁদ্‌তে পারি।"

"আচ্ছা বউ দিদি!"—এই কথা কয়েকটি বলিয়াই অমলা শরৎকুমারীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া তৎক্ষণাৎ চুপ করিল। শরৎকুমারী কিন্তু ছাড়িল না, বলিল,—"কি বল্‌ছিলি, বল্ না।"

অমলা বলিল,—"থাক্ বউদিদি, সে কথা আর বল্‌বো না।"

শরৎকুমারী বলিল—"বল্ না, তোর ভয় কি? আমার হৃদয় যে পাষাণ, আমি মূর্চ্ছা-টুর্চ্ছা যাই না।"

অমলা তখন অবনতমস্তকে সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে বলিল—"তুমি কি দাদাকে ভালবাস না?"

শরৎকুমারী হাসিয়া বলিল—"এই কথা! দ্যাখ, তোর দাদাকে বলিস্, আমাদের সেই মেনীবেড়ালটীর প্রতি আমার যে ভালবাসা

আছে, তার প্রতি আমার সে ভালবাসাও নেই!"

অমলা স্তম্ভিত হইয়া শরৎকুমারীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল! সরলা অমলা ছতুরার চাতুরী বুঝিবে কিরূপে? অমলা বলিল,—"বউ দিদি—"

কিন্তু আর কোন কথাই অমলা বলিতে পারিল না, কারণ তখন তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অমলার চক্ষের জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। শরৎকুমারী তখন আরম্ভ করিল, —"বলো, তুই কাঁদিস্ কেন? আমি না ভালবাসি, তুইতো তাকে ভালবাসিস্—তা হলেই কি সেটা পুরণ হবে না?"

অমলা তখন ধীরে ধীরে চক্ষু মুছিল, মুখে কিন্তু কোন উত্তর করিতে পারিল না। শরৎকুমারী পুনরায় আরম্ভ করিল,—"দ্যাখ, এমন সময় ছিলো, যে সময় তাকে আমার মাথার মণি করে রেখেছিলুম, কিন্তু সে মণি এখন আঁস্তাকুড়ে টেনে ফেলে দিয়েছি।"

এ কথার অর্থ কিন্তু অমলা বুঝিতে পারিল না; কারণ অমলার বিশ্বাস, মাথার মণিকে কেহ মাথা ছাড়া অন্য স্থানে রাখিতে পারে না। আবার অমলা ভাবিতে লাগিল,—"কেবল কি মাথারই মণি?" কারণ অমলার যেন মনে হইতে লাগিল, সে মণি কেবল মাথার নয়, সে মণি মাথার, হৃদয়ের ও সর্ব্ব স্থানের। অমলা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—অমলা বিধবা, আর শরৎকুমারী সধবা!

সাপ্তাহিক-প্রসঙ্গ।

মিউনিসিপ্যাল আইন।—গত শনিবার ছোট লাটের মন্ত্রীসভায় বৈঠকে মিউনিসিপ্যাল আইন পাস হইয়াছে। ইহাতে কমিশনারদিগের ক্ষমতার অনেক খর্ব্ব করা হইয়াছে। লর্ড রিপনের সাধের স্বায়ত্ব শাসনের আয়ুত্ব এই বার এক-তোপে উড়িয়া গেল।

চৈতন্য লাইব্রেরী।—গত শনিবার ৪৷৷ ঘটিকার সময় ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্রের জন্য শোক-প্রকাশার্থ চৈতন্য লাইব্রেরী কর্ত্তৃক এক সভা আহূত হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন —মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বাবু। পণ্ডিত শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত ও কবি শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর উভয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধীয় দুইটী হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করেন। জানি না, প্রবন্ধ-পাঠই লেক্চর-পরিপাটি কি না?

পামীরে রুষ।—চীনদিগের সহিত রুষিয়ার পামীর-সম্বন্ধে বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে। বিবাদী-স্থলে রুষ আর প্রবেশ করিবেন, না, এরূপ স্বীকার করিয়াছেন। পামীর লইয়া চীনের গোল তো মিটিল; কিন্তু ইংরাজ-সম্বন্ধে কি?

অদ্ভুত ডাকাতি।—ফরিদপুরের বামনদী গ্রামে এক অদ্ভুত ডাকাতি হইয়াছে। ২৫জন লোক পুলিসের ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার ও কনেষ্টেবাল সাজিয়া ঐ গ্রামের কোন হিন্দুমহাজনের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। তাহাদের সঙ্গে একজন হাতপা বাঁধা চোর ছিল। সেই চোর এজাহারে প্রকাশ করে যে, চোরাই মাল সব এই মহাজনের ঘরে আছে। তখন পুলিস কর্ম্মচারিগণ সেই মহাজনকে মালসহ থানায় বাঁধিয়া লইয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এই ডাকাতি রূপের পাঁচজন ডাকাত ধরা পড়িয়াছে। এ নূতন রকম ডাকাতি বটে!

গবর্ণমেণ্টের ধনাগার লুট।—ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা মৃত্তিকুমার ধনাগার লুট হইয়া গিয়াছে। ডাকাতের কোন অনুসন্ধান হয় নাই। সন্দেহ করিয়া ঐ ধনাগারের ৩জন রক্ষক ধৃত হইয়াছে। রাজার নিজের ধনই যখন লুট হইতে চলিল, তখন প্রজার ধনে উপায় কি?

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা-কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ। { ২৮এ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। } দ্বিতীয় সংখ্যা।

অবতার প্রয়োজন ও বুদ্ধাবতার।

(২)

ভাগবতের টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী 'বুদ্ধোন্নায়াঞ্জন সুত' এই সংস্কৃত বাক্যানুসারে ভগবান্ বুদ্ধদেবকে অঞ্জনের পুত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু বৌদ্ধদিগের প্রামাণিক গ্রন্থ 'মহাবংশে' বুদ্ধদেব অঞ্জনের কন্যা মায়ার গর্ভে শুদ্ধোদনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ লিখিত আছে। ব্যাস্তবিক ভাগবতের মূলানুগামী 'আঞ্জন সুত' এরূপ অর্থও করা যায়। তাহা হইলে 'আঞ্জন' শব্দে অঞ্জনের কন্যা অর্থ করা অসঙ্গত হয় না। অতএব বুদ্ধদেবকে অঞ্জনের পুত্র না বলিয়া দৌহিত্রও বলা যাইতে পারে। এরূপে ভাগবতের সহিত মহাবংশের ঐক্যও প্রতীত হয়; কিন্তু এরূপে বিশেষ বক্তব্য যে, বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশ' প্রভৃতির সহিত পুরাণাদি বৈদিক-গ্রন্থের সর্ব্বত্র ঐক্য নাই। বৌদ্ধগ্রন্থের কথা দূরে থাকুক, বৌদ্ধাবতার-সম্বন্ধে সকল বিষয়ে সকল পুরাণেই একমত দৃষ্ট হয় না। এরূপ অনেকের বিশিষ্ট কারণও অনুভূত হয়। বুদ্ধদেব একমাত্র হইলেও তাঁহার তিরোধানের পরে যে তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্য মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধ নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট অনুমিত হয়। আরও এক প্রমাণ এই যে, পুরাণানুসারে জানা যায়, বুদ্ধদেব যৎকালে দাক্ষিণাত্যের নর্ম্মদা-নদীতীরস্থ তপস্যাপরায়ণ দৈত্যদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করেন, তখন স্থলবিশেষে নিজের বেশ ও মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই কারণ বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে তাঁহার নাম ও রূপ ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধদেব যাঁহাদিগকে 'অর্হেথেম মহাধর্ম্মং' অর্থাৎ 'তোমরা মনুজ এই মহাধর্ম্মের যোগ্য হও' এই কথা বলেন, তাঁহারা বুদ্ধদেবকে 'অর্হৎ' নামে নির্দ্দেশ করেন, এবং আপনারা 'আর্হত' অর্থাৎ অর্হতের শিষ্য এই নামে খ্যাত হন। পরন্তু বুদ্ধদেব অন্যান্য যাঁহাদিগকে নানা উপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক "এবং বুধ্যত" অর্থাৎ 'এই প্রকার বোধ কর' এই কথা বলেন, তাঁহারা অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সেই শিষ্যেরা স্বীয় গুরুকে বুদ্ধ নামে অভিহিত করেন। বুদ্ধদেব এই সময়ে বুদ্ধ-

বস্ত্র পরিধান ও নেত্রে অঞ্জন দিয়াছিলেন।" এইরূপে কালসহকারে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম যে বহুপরিমাণে বিকৃত হইয়াছে, চীন, জাপান, ভোট, তিব্বত, প্রভৃতি দেশীয় বৌদ্ধগণই ইহার প্রচুর প্রমাণ।

কাশীখণ্ডে বৌদ্ধাবতার-সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার সহিতও পুরাণান্তরের ঐকমত্য নাই। কাশীরাজ দিবোদাসের বৈদিক ধর্ম্মনিষ্ঠা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত দেবগণের প্রার্থনানুসারে বিষ্ণু বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হন, কাশীখণ্ডে ইহাই লিখিত আছে। দিবোদাস ও তাঁহার প্রজাবর্গ পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। দিবোদাসের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অসাধারণ উন্নতির কথা সুশ্রুতাদি গ্রন্থে লিখিত আছে। এরূপ ব্যক্তিকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত জগৎপালনকর্ত্তা বিষ্ণু বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভগবৎ বাক্যের সহিত এ কথার সম্পূর্ণ বিরোধ দৃষ্ট হয়। যথা,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"
(ভগবদ্গীতা।)

অর্থাৎ 'সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।' এরূপস্থলে দিবোদাসের ন্যায় সাধুসজ্জনের ধর্ম্মনষ্ট করিবার নিমিত্ত ভগবান্ অঞ্জনের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন, এ কিরূপ কথা!! ভগবান বুদ্ধদেব বেদের হিংসাভাগের অনাদর করিতে বহু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ তাঁহার 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' মতের প্রতি নাস্তিক্যাপবাদ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিক বুদ্ধদেব হিংসাপ্রধান যজ্ঞকার্য্য ব্যতীত বেদের অন্য কোন অংশের নিন্দা করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ নাই। বুদ্ধদেব পরকালের অস্তিত্ব ও জীবনের মোক্ষলাভ সম্বন্ধে যে নর্ম্মদা-নদীতীরস্থ দৈত্যদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, পুরাণশাস্ত্র তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বুদ্ধদেবের তিরোধানের পরে বৌদ্ধধর্ম্মের নানা সম্প্রদায়ের যখন সৃষ্টি হয়, তখনই চার্ব্বাকাদি নাস্তিকমতের প্রাদুর্ভাব হয়। নাস্তিক আচার্য্যদিগের মধ্যে বৃহস্পতি প্রধান ছিলেন; এই বৃহস্পতি দেবগুরু বৃহস্পতি নহেন। ইনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যক্তি। বৈষ্ণবধর্ম্মবিদ্বেষী পৌরাণিক পণ্ডিতগণ, কেবল যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিই নাস্তিক্যদোষের আরোপ করিয়াছেন, এরূপ নহে; শিবাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত মায়াবাদের প্রতিও বিলক্ষণ নাস্তিক্যদোষের আরোপ করিয়াছেন, এবং সেস্থলেও বৌদ্ধধর্ম্ম-বিদ্বেষ বিস্মৃত হন নাই। যথা,—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে॥"
ইত্যাদি।

অর্থাৎ 'অসৎ শাস্ত্র মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত বলিয়াই উক্ত হয়।' * বুদ্ধদেব কা কথা, তাঁহার বহুশত বৎসর পরবর্ত্তী শঙ্কশাস্ত্রবিৎ বৌদ্ধপণ্ডিত অমরসিংহও যে তৎকৃত অমরকোষ অভিধানের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে সেবনীয় অক্ষয় পুরুষ ও অমৃত অর্থাৎ মুক্তি পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। অতএব প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মকে কিরূপে নাস্তিকমত-পরিপোষক বলা যাইতে পারে? তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কালসহকারে বৌদ্ধমতের শাখা-বিশেষে নাস্তিক্য প্রবেশ করিয়াছে। এবং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, সেই সময়ে পদ্মপুরাণের উল্লিখিত শ্লোক রচিত হইয়াছে। শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই যেন বোধ হয়। যদি তাহা না হয়, তবে পদ্মপুরাণের আধুনিকত্ব স্বীকার না করিয়া আর উপায় নাই। পরন্তু যে সকল পুরাণে বুদ্ধাবতার-সম্বন্ধে ভূতকালের নির্দ্দেশ আছে, সে সকল পুরাণ যে বুদ্ধাবতারের অল্পবিস্তর পরে রচিত, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু কোন কোন পুরাণে ভবিষ্যৎ কালেরও নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ।)

* আমরা যাহাকে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করি, মায়াবাদ মতে উহা বাস্তবিক নহে, সকলই মায়া-কল্পিত মাত্র। রজ্জুতে যেমন সর্প ও কাচে যেরূপ জলভ্রম হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। পরন্তু জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই মায়াবাদের মূল তত্ত্ব। অদ্বৈতবাদ হইতে মায়াবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ মায়াবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। জীব যাহা, ব্রহ্মও তাহাই—এরূপ মতকে দ্বৈতবাদিগণ নাস্তিকমত মধ্যে পরিগণিত করেন। শতদূষণী গ্রন্থকে মায়াবাদের শতদোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ বেদে উভয় বাদই দেখিতে পাওয়া যায়। আর বিচার-যোগে উভয়েরই সঙ্গতি বোধ হয়। একারণ ভগবান চৈতন্যদেব উভয়েরই সারগ্রহণ পূর্ব্বক অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য সমস্ত গৌড়মাধ্বাচার্য্য অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ-মূলে প্রণীত হইয়াছে। চৈতন্য-সম্প্রদায়ী, বৈষ্ণবগণ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।*

যাঁহারা দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে দুঃসহ দুঃখভোগ করিয়াও শাস্ত্রানুশীলনে যত্নশীল হয়েন, নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়াও স্বাবলম্বনে লোকসমাজে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেন, উদরান্নের জন্য অপরের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়াও শেষে আপনারাই প্রভূত সম্পানের সহিত সম্পত্তি হস্তগত করিয়া অপরের আশ্রয়দাতা ও ভিক্ষাদাতা হইয়া উঠেন, তাঁহাদের অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বনের বারংবার প্রশংসা করিতে হয়। এইরূপ দরিদ্র ভাবের মধ্যে অনেক মনস্বী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। এইরূপ দারিদ্র্যদুঃখের মধ্যেও সর্ব্বদা অবিচলিত থাকিয়া অনেক মনস্বী পুরুষ আপনাদের অসামান্য প্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের দেশেও এক এক সময়ে এইরূপ এক একটি লোক জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। এই অধঃপতন ও অধোনতির কালে—এই দুঃখ ও দুর্গতির শোচনীয় সময়ে আমাদের মধ্যে এইরূপ মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, সেই পূর্ব্বতন স্বর্গীয় ভাব—সেই মহিমান্বিত আর্য্যসমাজের মহত্তর কার্য্যের অবতারণা করিয়াছেন।

এইরূপ নিঃস্ব ও নিরবলম্বদিগের মধ্যে আবার আর এক শ্রেণীর কৃতী পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে ইহাঁদের জন্ম হয় নাই; দৌরতের দারিদ্র্যদুঃখে ইহাঁদের কোনরূপ দুর্দ্দশা ঘটে নাই; দারিদ্র্যসম্ভাপে মর্ম্মাহত হইয়াও ইহাঁরা সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় মলিনবেশে ও সজলনয়নে অপরের দ্বারস্থ হয়েন নাই। সম্পত্তিপন্নের গৃহে ইহাঁরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সম্পত্তিসহকৃত সুখ শান্তির মধ্যে ইহাঁরা প্রতিপালিত হইয়াছেন। সম্পত্তিরসমবায়ে ইহাঁরা বিনাকষ্টে বিদ্যার্জ্জনে

* ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিয়োগে শোকসভার্থ গত ১০ই বৈশাখ ষ্টার থিয়েটারে 'বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কোয়ার লিটারেরি ক্লবের' অধিবেশন হয়। তদুপলক্ষে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

মনঃসংযোগ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু সম্পত্তির মধ্যেও ইহাঁদের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে নাই। বিষয়-বাসনার পঙ্কিল প্রবাহে ইহাঁদের চিত্ত নিরন্তর কলুষিত হয় নাই। আপাতমনোরম সৌখীনভাবে ইহাঁদের কার্য্য নিরন্তর পাপপ্রবৃত্তির পরিচয় দেয় নাই, বা উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতের আবর্ত্তে ইহাঁদের স্বভাব নিরন্তর নিম্নগধামী হইয়া উঠে নাই। ইহাঁরা বিষয়-ভোগের মধ্যেও সংযতভাবে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন করিয়াছেন এবং আপনাদের অমূর্ত্ত প্রতিভার পরিচয় দিয়া, লোকসমাজকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। পরমাত্মনিষ্ঠ সাধক যেমন ন্যূনাপ্রলোভনে পরিবৃত হইয়াও, কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তদ্‌গতচিত্তে বরণীয়দেবতার ধ্যান করেন, ইহাঁরাও সেইরূপ বিবিধ ভোগ্যবস্তুর মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও, একাগ্রচিত্তে সেই অমৃতময়ী সারস্বতী শক্তির উপাসনা করিয়াছেন।

বহুদিনের পর আমাদের দেশে এইরূপ একটি প্রতিভাশালী মনস্বী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। বহুদিনের পর একটি মনস্বী পুরুষ সংযতচিত্তে জ্ঞানানুশীলনপূর্ব্বক মাতৃভাষার পরিষ্কৃতাকৃতি মহত্তর কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এখন সেই মনস্বী পুরুষের মহাপরিচর্য্যার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। সেই মনস্বী পুরুষ এখন চিরদিনের জন্য মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া অনন্তপদে বিলীন হইয়াছেন। আমরা আজ শোকসন্তপ্তচিত্তে তাঁহারই গুণকীর্ত্তনার্থ এইস্থানে সমবেত হইয়াছি। স্বর্গীয় ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাতৃভাষারসেবারূপ চিরপবিত্র ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই ব্রতের মহিমায় তাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই কীর্ত্তি বিভিন্ন জনপদেও প্রসারিত হইয়া, তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের সমক্ষে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। এইস্থলে ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনীয়। তাঁহার জীবনীয় সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি ও উন্নতির বিবরণ এরূপ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে যে, ঐ জীবনীকে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের উৎপত্তি ও উন্নতির ইতিহাস বলিলেও বলা যায়। উপস্থিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই ইতিহাস বিবৃত করা সুসাধ্য নয়, এবং সেই ইতিহাসের সম্যক্ পর্য্যালোচনাও উপস্থিত সময়ের উপযোগী নয়। আশা আছে, যাঁহারা সাহিত্য-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কৃতী পুরুষ সেই ইতিহাসের অনুচিত সম্মানরক্ষা করিবেন।

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বীয় অগ্রজ স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী লিখিয়াছেন। ঐ জীবনীতে তিনি আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের এই পরিচয় দিয়াছেন ঃ "অবসখী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় একশ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামে রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া, কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি 'রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকই কেবল স্থানান্তরবাসী।"

অসামান্য প্রতিভাশালী পুরুষ স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়-প্রসঙ্গে আপনাকে ক্ষুদ্র লেখক বলিয়া বিনয়নম্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। যাঁহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে 'রঘুবংশ' প্রভৃতি প্রসূত হইয়াছে, তিনিও সাধারণের সমক্ষে

আপনাকে ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির আলোকসাধারণ কবিত্ব-শক্তিতে ও অসামান্য প্রতিভাস্ব সমগ্র সভ্য-সমাজ মোহিত রহিয়াছেন। আর যাঁহার রসমধী লেখনীর গুণে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি ক্ষুদ্রলেখক লিখিয়াই আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা কোন বিষয়ে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, এইরূপ সারল্যময় বিনয়ে তাঁহাদের মহত্ত্বের অধিকতর বিকাশ হয়; এবং তাঁহারা লোক-সমাজের অধিকতর বরণীয় হইয়া, শ্রদ্ধালাভ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত কাঁটালপাড়া গ্রামে ১২৪৩ সালের ১৩ আষাঢ় (খ্রীঃ ১৮৩৮ অব্দের ২৬এ জুন) এই বিনয়সম্পন্ন প্রতিভাশালী পুরুষের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গবর্ণর জেনেরাল লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে ডেপুটি কলেক্টরের কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চারি পুত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয়।

শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র সুস্থ ও সবল ছিলেন না। রোগে তাঁহার দেহ নিরতিশয় নিস্তেজ ছিল। কিন্তু এই নিস্তেজ দেহই তেজস্বিনী প্রতিভার আশ্রয়-স্থল হইয়াছিল। বাল্যকালেই সেই প্রতিভার প্রভাব পরিস্ফুট হয়। বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে সমগ্র বাঙ্গালা বর্ণমালা শিক্ষা করেন, সকল বিষয়েই পাঠশালার বালকদিগের প্রথম হইতেন, এবং অসামান্য বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি দেখাইয়া গুরুমহাশয়কে বিস্মিত করিয়া তুলেন। তাঁহার পিতা বিষয়-কার্য্যোপলক্ষে খ্রীঃ ১৮৪৬ অব্দে মেদিনীপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি সেই সময়ে তত্রত্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পাঠশালায় তাঁহার যেমন বুদ্ধি পরিস্ফুট হইয়াছিল, পাঠানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, প্রবীণ প্রতিভার প্রভাবেও ধীরে ধীরে বিকীর্ণ হইতেছিল, মেদিনীপুরের ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-সময়েও সেই সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সেই বলবতী বিদ্যানুশীলন-প্রবৃত্তি, সেই তেজস্বিনী প্রতিভার নিদর্শন লক্ষিত হয়। পঞ্চদশবর্ষীয় শিশুপ্রকৃতি যখন শিশুদিগকে বিলাসে ও ভোগ-বিলাসে পরাঙ্মুখ করিবার জন্য আপনার সমস্ত সম্পত্তি শঙ্কতে নিক্ষেপ করেন, তখন শিষ্যগণ তরুণবয়স্ক গুরুর অপূর্ব্ব আত্মসংযম ও বিষয়-বিরাগ দর্শনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিল। পঞ্চদশবর্ষীয় বালক শিখদিগকে যে কঠোরভাবে দীক্ষিত করেন, সেই কঠোরভাব-শিক্ষায় শিখগণ আজ পর্য্যন্ত সতেজ রহিয়াছে। অষ্টমবর্ষীয় বঙ্কিমচন্দ্র যখন ইংরেজী শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেন, তখন শিক্ষকবর্গ বালকের বুদ্ধি চাতুর্য্যে ও শিক্ষানুরাগে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে বালকের যে প্রতিভার বিকাশ হয়, তাহারই বলে আমাদের জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার রত্নরাশিতে সমৃদ্ধ হইয়াছে, এবং সেই রত্নরাশি চারিদিকে প্রভা বিস্তার করিয়া অপরাপর সভ্যসমাজের সমক্ষে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের যখন জন্ম হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন, তখন অশান্তির অভিঘাতে ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও এই অশান্তিতে নিরতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়, সে সময়ে আফগানিস্তানে পার্ব্বত্যপ্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। আফগানেরা ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া স্বদেশের দুর্গম গিরিসঙ্কট নরশোণিতে রঞ্জিত করিয়াছিল। গবর্ণর জেনেরাল লর্ড অকলাণ্ড আক্রমণকারীদের বহুসৈন্যনাশে ও বহু অর্থব্যয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। অথবার বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়েন, সে সময়ে মমগু পঞ্চনদ ভীষণ মহাযুদ্ধের বিকাশ-ক্ষেত্র হইয়াছিল। পরক্রান্ত শিখেরা কাহারও কথা না শুনিয়া, ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জের ন্যায় রণপণ্ডিত গবর্ণর জেনেরলও ইহাদের অসামান্য সাহস, পরাক্রম ও যুদ্ধকৌশলে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এক একটী মহাযুদ্ধে সৈন্য সমগ্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি বিকম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এইরূপ অশান্তির মধ্যেও প্রতিভাশালী বালকের পাঠের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই। চীনের চিরপ্রসিদ্ধ দরিদ্র পরিব্রাজক স্বদেশের অশান্তি-সময়ে রীতিমত শাস্ত্রানুশীলন করিতে পারেন নাই; এক এক সময়ে তাঁহার অধ্যয়নে অতিশয় বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া নানা শাস্ত্রপাঠে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন। শেষে গরীয়সী জন্মভূমিতে যাইয়া, আপনার অভিজ্ঞতায় স্বদেশের সমাটকে বিস্মিত করিয়া তুলেন। রাজ্যে অশান্তি ঘটিলেও অধ্যয়ন-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ অসুবিধা উপস্থিত হয় নাই। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য এরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে যে, উহার একাংশে আঘাত লাগিলেও অন্যাংশে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ রাজ্যে আবির্ভূত হওয়াতেই তাঁহার বিদ্যানুশীলনের সহিত প্রতিভা-প্রকাশের সুযোগ ঘটিয়াছিল।

১৮৫১ অব্দে যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুর হইতে চব্বিশ পরগণায় বদলি

হয়েন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে হুগলি-কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি এই কলেজে "সিনিয়ার স্কলার্সিপ্" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, বি এ পরীক্ষার নিয়ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার একজন সমপাঠীর সহিত সর্ব্বপ্রথম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। বাঙ্গালার প্রথম লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হালিডে সাহেব তরুণবয়স্ক বঙ্কিমচন্দ্রের গুণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন। অতি তরুণ বয়সেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু শাস্ত্রানুশীলনে বিসর্জ্জন দিলেন না। তিনি যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তখন পুস্তকালয়ে বসিয়া বিবিধ পুস্তক পাঠ করিতেন; তিনি যখন সংসারে প্রবেশ করিলেন, তখনও গ্রন্থানুশীলনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ পাঠানুরাগ কখনও অন্তর্হিত হয় নাই। বাল্যাবধি ইংরেজী বিদ্যালয়ে ইংরেজী প্রথালীতে ইংরেজী পুস্তক পাঠ করিয়াও তিনি সংস্কৃতের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। তিনি যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন কোন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের নিকটে সংস্কৃত শিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন এবং মনোযোগের সহিত, কয়েক খানি কাব্য ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করেন। ইহার পর যখন রাজকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন, এবং ঐ কার্য্যসম্পাদনে গুরুতর পরিশ্রম করিতে থাকেন, তখনও আইন পড়িয়া বি-এল-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন।

সবিশেষ পারদর্শিতার সহিত রাজকীয়

কার্য্য সম্পাদন করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৯১ অব্দে পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যদক্ষতা, নিপিক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের সম্মানরক্ষায় বিমুখ হয়েন নাই। তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রথমে রায় বাহাদুর, পরে C.I.E. উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। শেষে পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনী সভার সভ্য হইয়াছিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনচেতা ছিলেন। চাকরী করিলেও তাঁহার স্বাধীন ভাব তিরোহিত হয় নাই। তিনি পরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পরের মনস্তুষ্টির জন্য আত্মসম্মানে বিসর্জ্জন দেন নাই। তিনি পরের কার্য্য সম্পাদনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরের নিকটে আত্মবিক্রয় করেন নাই। তিনি পরের আদেশ পালনে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু পরের অনুচিত আদেশানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইয়া, আত্মাভিমানের মর্য্যাদা নাশ করেন নাই। তাঁহার হৃদয় এইরূপ অটল ও এইরূপ শক্তি-সম্পন্ন ছিল; তাহার অভিমান এইরূপ উন্নত ও এইরূপ অবিচলিত ছিল। মিবারের রাজপুতেরা অনেকবার অনেক বিষয়ে স্বার্থ-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তথাপি আপনাদের তেজস্বিতা ও অভিমানে জলাঞ্জলি দেন নাই। সহৃদয় টড এই অসামান্য গুণদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, তেজস্বিত্বের বরণীয় প্রাচীন গ্রীকদিগের সহিত মিবারের রাজপুতদিগের তুলনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের জন্য যদি একজন টডের আবির্ভাব হয়, একজন টড যদি বাঙ্গালীর সুকীর্ত্তি বা অপকীর্ত্তির বর্ণনায় ব্যাপৃত হয়েন, তাহা হইলে তিনি এই অধঃপতিত ভূখণ্ডে এই চিরাবনত জাতির মধ্যেও এমন কতিপয় ব্যক্তি দেখিতে পাইবেন, যাঁহাদের অভিমান সহকৃত তেজস্বিতায় তাঁহার অপরিসীম বিস্ময়ের আবির্ভাব হইবে; তিনি মুক্তকণ্ঠে সেই মহাপুরুষদিগের গৌরব ঘোষণা করিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জাতীয় সমাজে এইরূপ একটী অভিমানসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। এই রূপ অভিমানসম্পন্ন পুরুষ পরাধীনতা স্বীকার করিয়াও স্বাধীনভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন।

জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদন স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহার এই পবিত্র ও মহৎ কার্য্যের জন্যই আজ সমগ্র দেশ তদীয় নিয়োগে শোকসন্তপ্ত হইয়াছে। তিনি মাতৃভাষার পরিচর্য্যার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন; বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষার পরিচর্য্যা করিয়াই লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বব্যাপিনী ছিল। একাধারে তিনি কবি, উপন্যাসতত্ত্বজ্ঞ, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিৎ ও ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ ছিলেন। যখন বাঙ্গালা ভাষা দুরূহ্যার্থ সংস্কৃত শব্দে ও দুশ্ছেদ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের আবরণে আচ্ছাদিত ছিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন; তাঁহার অসামান্য ক্ষমতায় ভাষা প্রাঞ্জল, কোমল ও মধুর হইয়া উঠে। তিনি আত্মপ্রাধান্য-স্থাপনের জন্য কোনরূপ আড়ম্বর প্রকাশ করেন নাই, আত্মগৌরব বৃদ্ধির জন্য কোনরূপ কৌশল বিস্তারে অগ্রসর হয়েন নাই, বা আত্মকীর্ত্তি পরিকীর্ত্তনের জন্য কোনরূপ অপকার্য্যের প্রশ্রয় দেন নাই। অনেকে তাঁহার বিরোধী হইয়াছেন, অনেকে তাঁহার রচনার নিন্দাবাদ করিয়াছেন, অনেকে তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহের গতিরোধে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হয়েন নাই। প্রশংসা বা নিন্দাবাদে দৃক্‌পাত

না করিয়া, প্রলোভনের অনুরাগ বা বিরাগে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তিনি যে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই কার্য্যই এখন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি স্বদেশীয়দিগের যেরূপ শিক্ষাদাতা হইয়াছেন, বিদেশীয়দিগকেও আপনাদের ভাষার সম্পত্তি দেখাইয়া, সেইরূপ বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার সমধিক পরিচয় দেওয়া উপস্থিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সংক্ষেপে কেবল ইহাই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, তিনি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাঁহার উপন্যাস সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে; তিনি 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' সাময়িক পত্রের আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; তিনি বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রবন্ধাবলী তদীয় সর্ব্ববিষয়িণী অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে; তিনি সংস্কৃত গ্রন্থাবতারণা করিয়াছেন, তাঁহার রসস্রোত বিশুদ্ধভাবে অবিরলধারায় প্রবাহিত হইয়াছে; তিনি ধর্ম্মতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন, তাঁহার বিচারপদ্ধতিতে তদীয় বুদ্ধিচাতুর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে। এইরূপে তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সকল বিষয়েই অসামান্য ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন।

যাঁহারা সভ্যসমাজে কৃতবিদ্য বলিয়া সম্মানিত হইতে ইচ্ছা করেন, সর্ব্বাগ্রে জাতীয় ভাষায় তাঁহাদের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কেহ ভিন্নদেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়াও যদি জাতীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেন, তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না; এবং তিনি কৃতবিদ্য বলিয়া সম্মানিত হইতে পারেন না। ইংরেজীতে Culture শব্দে যে ভাব পরিস্ফুট হয়, তাহার সহিত জাতীয় ভাষার অনুশীলনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জাতীয় ভাষায় উপেক্ষা করিয়া জ্ঞানানুশীলন করিলে, সে অনুশীলনের কোন সার্থকতা থাকে না, এবং সে অনুশীলন-প্রবৃত্তি দ্বারাও সমাজের কোন উপকার সাধিত হয় না। বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত ভাণ্ডারকে মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য-সম্পাদন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির একটী উদ্দেশ্য। যিনি এই উদ্দেশ্য-সাধনে ঔদাস্য প্রকাশ করেন, তিনি ভিন্নভাষায় অভিজ্ঞ হইলেও সমাজে অকৃতবিদ্য বলিয়াই পরিচিত হইয়া থাকেন। আমাদের সম্মানিত সভাপতি মহোদয় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি চান্সেলরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি-দানের সভায় বক্তৃতা-কালে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা-প্রসঙ্গে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "জাতীয় ভাষায় জ্ঞানবিস্তার না হইলে, আমরা কখনও বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব না।" এই উক্তি অতি যথার্থ। অতীতদর্শী ঐতিহাসিকগণ এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। যে সকল জাতি জ্ঞানগরিমায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহাদের ইতিহাস এই উক্তির সত্যতার পরিচয় দিতেছে। স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইভাবে কৃতবিদ্য সমাজের বরণীয় হইয়া, জাতীয় ভাষায় জ্ঞান-বিস্তার-পূর্ব্বক সল্লাতিক অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি স্বদেশের উপকারের জন্য বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং স্বদেশবাসীকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্যই নানাস্থান হইতে জ্ঞানসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলনে, তাঁহার সংগৃহীত জ্ঞানে, স্বদেশের উপকার সাধিত

হইয়াছে। তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তদীয় শাস্ত্রজ্ঞানে যেরূপ জ্ঞানসম্পন্ন হইতেছে, বহুদর্শীতায় যেরূপ বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে, বিচার-ক্ষমতায় সেইরূপ বিবেকের পথে পরিচালিত হইতেছে। যিনি স্বদেশীয়দিগকে এইরূপে জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া পরস্পর সমবেদনাপর, পরস্পর একতাবদ্ধ, পরস্পর একাত্মভাবে অন্বিত মহাজাতির মহিমান্বিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার স্বদেশভক্তি এবং স্বজাতিপ্রীতি অতুল্য। হিতৈষিগণ জলদ-গম্ভীর-স্বরে আপনাদের হিতৈষিতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে পারেন, সহায়সম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী পুরুষগণ স্বীয় কার্য্যের জন্য আপনাদের গৌরব ঘোষণা করিতে পারেন, বিদ্যাভিমানী আপনাদের অভিমানে স্ফীত হইয়া, সর্ব্বত্র আত্মগরিমার বিস্তারে উদ্যত হইতে পারেন, কিন্তু এইরূপ অসামান্য কীর্ত্তির সমক্ষে ইঁহাদের কোন কার্য্য গৌরবান্বিত হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইরূপ স্বদেশভক্তি ও স্বজাতি-প্রীতির পরিচয় দিয়া অসামান্য কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। এইজন্য তাঁহার এত গৌরব, এইজন্য তাঁহার এত সম্মান, এইজন্য তাঁহার বিয়োগশোকে আজ তদীয় স্বদেশবাসিগণ এত মর্ম্মাহত। তিনি অনেকবার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-লেখককে বলিয়াছেন যে, গ্রন্থলেখা দেশের লোককে বুঝাইবার জন্য, যে লেখা দেশের লোক বুঝিতে না পারে, এবং যে লেখায় দেশের লোকের উপকার না হয়, সে লেখায় কোন ফলোদয় হয় না। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে এইরূপ লোক হিতৈষিতা জাগরূক ছিল। তিনি দেশের লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কখনও গ্রন্থপ্রণয়নে নিরস্ত থাকেন নাই। 'বঙ্গদর্শনের' পর 'প্রচারে' ও 'নবজীবনে' তাঁহার কতিপয় গ্রন্থের সূচনা হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন; ইংরেজী 'রচনায় যথোচিত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন; ইংরেজী ভাষায় তাঁহার রচনা-কৌশল দর্শনে সুপণ্ডিত ইংরেজগণও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন; তথাপি তিনি জাতীয় ভাষায় অনাদর করিয়া কেবল ইংরেজী লেখাতেই ব্যাপৃত থাকেন নাই। তিনি একবার ইংরেজীতে একখানি উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে তাঁহার প্রীতিলাভ হয় নাই। কেবল Rajmoran's Wife এর লেখক বোধ হয় স্বদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইতে পারিতেন না, এবং Rajmohan's wife এর লেখক ডার ওয়াল্টার স্কট বা ডিকেন্স প্রভৃতির পার্শ্বেও আসন-পরিগ্রহে সমর্থ হইতেন না। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতির লেখক সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি কেবল মাতৃভাষার সেবায় যে প্রতিপত্তি-লাভ করিয়াছেন, মহারিপ্রবেও তাহা বিনষ্ট হইবার নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন গদ্যে বাঙ্গালা ভাষা বিবিধ-বিষয়ক সদ্‌গ্রন্থে ভূষিত ও উন্নত ছিল না। এইরূপ অনুন্নত মাতৃভাষার প্রতি তিনি অবজ্ঞা দেখান নাই। দাম্ভে বা চাসর মাতৃভাষার দারিদ্র্য-দর্শনে কখনও তৎপ্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন নাই, বরং এই দারিদ্র্যভাব তাঁহাদিগকে মাতৃভাষার উন্নতি-সাধনরূপ মহাকার্য্য-সাধনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। দাম্ভের পূর্ব্বে ইতালীয় ভাষা ওজস্বিতায় বা কোমলতায় গৌরবান্বিত ছিল না। ভাষার এইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় দাম্ভে জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমুদ্যত হইলেন। একজনমাত্র লেখক একখানিমাত্র কাব্য প্রণয়ন করিয়া, সমগ্র সভ্যসমাজকে দেখাইলেন যে, তাঁহার স্বদেশের ভাষা কোন বিষয়ে দরিদ্র বা কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণ নহে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি লিখিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার মাতৃভাষা কোন অংশে অবজ্ঞার যোগ্য বা শব্দবৈভবে, ভাবগৌরবে ও পদসালিত্যে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য-সাধনে তাঁহার যত্ন ও উৎসাহ কিছুতেই তিরোহিত হয় নাই। তিনি যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তখন স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন। একবার কোন নির্দ্দিষ্ট পারিতোষিক লাভের জন্য কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পারিতোষিক লাভ হয় নাই।' দুর্গেশনন্দিনীর পূর্ব্বে তিনি আরও পুরস্কারের জন্য একখানি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ পুরস্কার-লাভও তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই; তাহাতেও তিনি নিরুৎসাহ হয়েন নাই। দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার সময়ে তাঁহার আত্মীয়বর্গও প্রথমে তাঁহাকে তাদৃশ উৎসাহ দেন নাই; মুদ্রিত করিবার সময়েও উহা যথারীতি সংশোধিত হয় নাই। এইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ এই গ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে তাঁহার অসামান্য কীর্ত্তির সূত্রপাত ঘটে। পরবর্ত্তী গ্রন্থে তাঁহার কীর্ত্তি দিগন্তব্যাপিনী হইয়া উঠে। তিনি অধ্যবসায়ের সহিত যে কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, এইরূপে সেই কার্য্যে তাঁহার সৌভাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি রাজকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিবিধ সদ্‌গ্রন্থ প্রচার করিয়া 'সাহিত্য-গুরু' সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার যশোরাশি সুদূর পাশ্চাত্য সমাজেও প্রসারিত হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া, ইংলণ্ডের পণ্ডিতসম্প্রদায় বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং বঙ্গভাষার ঈদৃশ সম্পত্তি দর্শনে তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত সাধুবাদ দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে যাঁহারা ইংরাজীতে সুশিক্ষিত হইয়া, বাঙ্গালা-ভাষার অনুশীলনে উদাসীন রহিয়াছেন, ইংরেজী-ভাব-ভোতে ভাসমান হইয়া, যাঁহারা বাঙ্গালার নামে নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া, অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিতেছেন, ইংরেজী-ভাষাকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া যাঁহারা সর্ব্বত্র আপনাদের বিদ্যাভিমানের পরিচয় দিতেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চরিতের এই মহাদৃষ্টান্ত তাঁহাদের উপেক্ষার বিষয় নহে।

এই ক্ষমতাশালী কৃতী পুরুষ সাহিত্যক্ষেত্রে কেবল আপনি কার্য্য করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, অপরকেও সেই ক্ষেত্রে পরিচালিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত 'বঙ্গদর্শনে' যাঁহারা লিখিতেন, তাঁহারা এখন জাতীয় ভাষার পরিপুষ্টি-সাধনে আপনাদের ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন। তিনি স্বয়ং পরিচালক হইয়া, আপনার পশ্চাতে যে সকল লেখককে রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও সাহিত্য-সেবাব্রতে একাগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন।

যিনি এইরূপ ক্ষমতায় স্বদেশের জনসাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থাবলী যে, অবিক্রীত থাকিবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। গ্রন্থ-বিক্রয়ে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইত। কিন্তু তিনি অর্থের মমতায় নিজের বিবাদের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন নাই। গ্রন্থলিখিত বিষয় পরে মনোনীত না হইলে, তিনি ঐ গ্রন্থ বন্ধ করিয়া দিতেন। বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি উহার পুনঃপ্রচার বরদাস্ত করিতেন না। এই কারণে তাঁহার 'সাম্য' পুনঃ প্রচারিত হয় নাই। একজন পুস্তকব্যবসায়ী নিজব্যয়ে ঐ পুস্তক মুদ্রিত

করিবার প্রস্তাব করিলেও তিনি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার 'বিজ্ঞান-রহস্য'ও পুনঃপ্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্ববিষয়ব্যাপিনী ছিল। তিনি আর্য্যাবর্ত্তের বশীভূত হইয়া, সেই প্রতিভা কলঙ্কিত করেন নাই। উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রে, ইতিহাসের গুহ্যের বিষয়ের উদ্ধারে, গ্রন্থ-সমালোচনে, ধর্ম্মতত্ত্বের বিচারে, রহস্যের রসবিস্তারে, তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি এই ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। তিনি রাজকীয় কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন; যথোচিত রাজভক্তির সহিত স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিলেও ঐ কার্য্যে তাঁহার সন্তোষ জন্মে নাই। দরিদ্র ক্লেশ্যুর বলিতেন যে, তিনি সাক্সনি-প্রদেশের অধিকারী হওয়া অপেক্ষা আপনার গ্রন্থাবলীর প্রণেতা বলিয়া পরিচিত হইতেই ইচ্ছা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হওয়া অপেক্ষা স্বদেশে গ্রন্থকাররূপে পরিচিত হইতে ভালবাসিতেন। তিনি পেন্‌সন লইয়া আপনার বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি ভ্রমে পড়িয়া চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি যে মাতৃভাষার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, সহৃদয় সমাজ ইহা কখনও বিস্মৃত হইবেন না। চাকরী করিলেও তিনি মাতৃভূমির সুকৃতী সন্তান। সন্তানোচিত কার্য্যে তিনি আপনার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

এই সুকৃতী সন্তান চিরদিনের জন্য মাতৃভূমির ক্রোড়দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। আমরা আজ তাঁহারই বিয়োগে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে এইস্থানে সমবেত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, তিনি আমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয় নাই। তিনি যে সকল গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থ চিরকাল আমাদের জাতীয় সমাজকে আমোদের সহিত উপদেশ দিবে। কালের পরিবর্ত্তনে এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্যের আবির্ভাব হইতে পারে, এক জনপদের পর আর এক জনপদের অভ্যুদয় ঘটিতে পারে, এক জাতির পর আর এক জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমাদের এই জাতীয় সম্বন্ধ কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না। বিক্রমাদিত্যের রত্নসিংহাসন বিলুপ্ত হইয়াছে, কালিদাসের রঘুবংশ, শকুন্তলা প্রভৃতি আজ পর্য্যন্ত নববিকশিত প্রভাতকমলের ন্যায় নবীনভাবে পরিপূর্ণ থাকিয়া সহৃদয়হৃদয়ের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীও চিরদিন এইভাবে থাকিয়া প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীর জলপ্রবাহের ন্যায় লোকের তৃপ্তিসাধন করিবে। আর যে জাতি শত তাড়নাতেও বিচলিত হয় না, "শত আঘাতেও বেদনা বোধ করে না", শত উত্তেজনাতেও জাত্যভিমানে বিসর্জ্জন দেয় না, সেই "নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়" জাতিও এই অসামান্য প্রতিভাশালী পুরুষশ্রেষ্ঠের জন্য চির দিন বিশ্বসংসারে খ্যাতিলাভ করিবে।

ছবি।

তারা কহে সিন্ধুতীর কথা,
তারা গায় বাসরের গান।
এ শ্যামল বিশ্বের মাঝারে
মুকুলিত তাদের উদ্যান।

সুধাময় মধুরিম হাসি
চিকণ অধর-মাঝে জাগে,
হৃদয়ের মুরলী বিকাশ
প্রকাশে নবীন অনুরাগে।

নবমেঘে আজি নভ ভরা,
কি জানি কেমন তাই মন,
কারে যেন পাইবার তরে,
লুকাইয়া করিছে রোদন।

স্মৃতির আলেখ্যসমুচ্চয়,
মাত হয়ে শোকের লহরে,
বসন্তের শ্যামলতা লয়ে,
বিভাসিত হৃদয়ের ঘরে।

অভিমান-সলিল-নিধান,
আদরের অমৃত-শীকর,
অপূর্ব্ব ভাতিনি যেন ধরি,
রহেছে চিত্রিত মনোহর।

চুম্বন মোতিম-মালা গাঁথি
দিয়া গেছে কম আলেপনা;
পুরাণের পরতে পরতে,
প্রকাশিত আজি সে রচনা।

এখনো নয়ন-কোণে জাগে,
এখনো পরাণ-মাঝে ভয়,
অধরের উজোর লাবণি,
বিচর্চ্চিত প্রেমের লীলায়।

সব আছে—সুখ সে যে নাই,
সন্তাপের অনল মাঝার,
সোয়াথ হারায়ে মনপ্রাণ,
করিতেছে সদা হাহাকার।

তারা গায় বাসরের গান,
তারা কয় পিরীতির কথা,
আমার এ মরমের মাঝে,
জাগে এক মর্ম্মভেদী ব্যথা।

ফুলরাশি হাসিতে যাহার
ছড়াইত সুরভির ধারা,
নবীন বসন্তে, প্রেমপিক
কুহরণে হ'ত জ্ঞানহারা;

সে কোকিল করে না কূজন
বিজন হৃদয় মাঝে আর,
শ্যামল সুস্নিগ্ধ মনোহর,
সে মাধুর্য্য করে না বিস্তার।

অবিশ্রান্ত বিষাদের ছবি—
গোধূলির মৃত কলেবর,
চারিধারে রয়েছে ছড়ান,
বন্ধ্যা সন্ধ্যা অতি ভয়ঙ্কর।

অশ্রু সেও হয়েছে উষর,
গণ্ড বহি নাহি হয় ধার,
রুক্ষপ্রায় নির্ম্মম সন্তাপ
উৎস তার করেছে সংহার।

বিঁধে নাই যে মিষ্ট কলহ,
প্রাণভরা মধুর সুভাষ,
কথায় কথায় অভিমান,
কথায় কথায় পরিহাস।

এবে শত নিমেষের উলে,
আঁধারা কলেজ ওহায়,
সে সকল হাস-পরিহাস
নিমগন গভীর নির্জ্জন।

অলস মুহূর্ত্ত রাশি রাশি,
রসিতেছে তাঁদের উপর,
প্যাতাপে পুড়েছে তারা চাপা,
অন্ধকার সেথা ভয়ঙ্কর।

সোহাগেরে করিতে নির্ম্মল,
বাঁকাইয়া গ্রীবাটি আপন,
বসনে বয়ানখানি ঢাকি,
অভিমানে থাকিত যখন—

সেই সে পিরীতি-ধরা কাঁদ,
সেই ভাব সে ভঙ্গিমা নব,
আর কি গো হেরিব নয়নে,
এ জীবন এবে দুর্ব্বিসহ।

তারা গায় পিরীতির গান,
তারা কয় হৃদয়ের কথা;
আমার এ মরমের মাঝে,
শুধু জাগে জ্বালাময়ী ব্যথা।

বাঙ্গালা ভাষা।

"ব্যাকরণরহিতা বিদ্যা,নির্ম্মলাপি ন শোভতে।
সুন্দরী রূপসম্পন্না, দরিদ্রস্য গৃহে যথা॥"

যেমন দীন-হীননিকেতনে রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না অনূঢ়া বালার কান্তি প্রকটিত হইতে পারে না, তদ্রূপ শব্দশাস্ত্রজ্ঞান-বিরহিত বিদ্যা, বিমলা হইলেও, শ্রী-প্রচারে সমর্থ হয় না।

প্রাচীন প্রবীণ বিচক্ষণগণের এই উক্তি, চিরকালই মহামূল্য। বিশেষতঃ বিদ্যমান কালে এই বচনের মূল্য কত অধিক, তাহা এক বার ভাবিলেই হৃৎপ্রত্যয় হইয়া পড়ে।

সুদীর্ঘ-মুখবন্ধ-নূন করিয়া আমরা বক্তব্য বিষয়ে অগ্রসর হইতেছি।

এ যাবৎ, সে যাবৎ।—"যাবৎ" শব্দের অর্থ 'যে পর্য্যন্ত'। কিন্তু কতকগুলি লোকে তাহা অনুধাবন না করিয়াই, ঐরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী, তাঁহাদের অধিকাংশকেই ঐ ভুল ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে পশ্চিমবঙ্গে উহার মতি গতি অনুভূত হইতেছে বলিয়া আমরা ইহা আন্দোলন করিতে বাধ্য হইতেছি। যতদি "এ যাবৎ, সে যাবৎ" পূর্ব্ববঙ্গে প্রভাব-বিস্তা ব্যাপৃত ছিলেন, ততদিন আমরা উহা গতিরোধের প্রয়াস পাই নাই। যাদৃশ স্থ উহার ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে, আ অপ্রচলিত যথায় হইবে, তাহা দেখা যাইতেছে।

১। "যাবৎ আমি না আসি, তাবৎ তুমি এখানে অপেক্ষা কর।"

২। "যাবৎ বাঁচিব, তাবৎ শিখিব।"

এই দুই বাক্যে "যাবৎ" বিশুদ্ধ ভা প্রযুক্ত। এখানে "যাবৎ" 'যে পর্য্যন্ত' ঠিক্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩। "এ যাবৎ আমরা তোমাদিগকে "নিষেধ করিয়া আসিলাম।"

এই দৃষ্টান্তে "যাবৎ" চালাইবার যো কি?

মহতী মহিমা, চমৎকারিণী গরিমা!—সতী, দুর্গা, গঙ্গা ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ। তাই সিদ্ধান্ত হইল— আকারান্ত হইলেই স্ত্রীলিঙ্গের নিয়মে গরিমা, মহিমা, লঘিমা ইত্যাদিও স্ত্রীলিঙ্গের দল-ভুক্ত হইয়া গেল?

এই সূত্রে একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। গঙ্গা,দুর্গা,লতা,রাধিকা,চপলা ইত্যাদি মূলশব্দ। উহাদের মূল আকৃতিই ঐপ্রকার। আর বালা, শ্যামা ইত্যাদিও যে স্ত্রীলিঙ্গ, তাহারও কারণ কিঐরূপ? তাহার যে নিয়ম সিদ্ধ, তাহা এই—

পুংলিঙ্গ।	স্ত্রীলিঙ্গ।
বাল	বালা
শ্যাম	শ্যামা
চপল	চঞ্চলা
অজ	অজা
দ্বিজ	দ্বিজা
বৈশ্য	বৈশ্যা

কিন্তু গরিমা, লঘিমা, মহিমা তো উক্ত দুই নিয়মের কোনটিতেই সুসাধ্য নয়; সুতরাং তাহারা স্ত্রীলিঙ্গ কেন হইল না, বোঝা গেল। উহাদের মূল যাহা, তাহা বিবেচনা করিলেই ভ্রম প্রতীত হয়।

গুরু+ইমন্=গরিমন্।
লঘু+ইমন্=লঘিমন্।
মহৎ+ইমন্=মহিমন্।

গুরু, লঘু ও মহৎ শব্দের উত্তর ইমন্ প্রত্যয়-যোগে উহারা পুংলিঙ্গ হইয়াছে। গরিমন্, লঘিমন্,মহিমন্ এই তিন মূল শব্দের প্রথমার একবচনে যথাক্রমে গরিমা, মহিমা, লঘিমা হয়। অতএব পুংলিঙ্গ-শব্দোৎপন্ন পদ, কেন স্ত্রীলিঙ্গ হইবে? না, তন্নিমিত্ত আর অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

"শতধারে","সহস্রধারে"।—'ধার' শব্দের অর্থ ক্ষুর। অতএব একটী "ধার" শব্দ ভাষায় আছে। ঐ "ধার" শব্দের সপ্তমীতে "ধারে" সিদ্ধ হয়, "ধারে" ক্রিয়া পদও হয়; তাহাতেকোন বাধা না হইতে পারে। "ধারে"—ধার করে,ঋণ করে। উপরি উক্ত দুই উদাহরণে ঐ ঐ অর্থে লেখকেরা লেখেন না। "ধারা" শব্দের সপ্তমীতে যে "ধারায়" পদটী নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে "ধারে" বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। যথা,—

"শতধারে মার বুক ভাসিয়া যাইতেছে।"

পাঠক বুঝিলেন — "ধারায়" না লিখিয়া "ধারে" লেখা হইয়াছে কি না?

হন্তারক।—"হন্তা" অর্থে হননকারী। হন ধাতু+তৃচ্=হন্তৃ। হন্তৃ শব্দের প্রথমায় হন্তা হইয়া থাকে। ইহার উপর "রক" সংযোগে 'হন্তারক' কেমন করিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ফলতঃ "হন্তারক" ভ্রান্তিসঙ্কুল। কারণ, এক ধাতুর উত্তর "তৃচ্" হইয়া আবার 'অক' বা বাঙ্গালা "রক" হয় না।

অনৈক্যতা, নৈপুণ্যতা, ঔৎসুক্যতা, ঔৎকর্ষতা, সৌজন্যতা, নিশ্চয়তা।—এই সকল শব্দেই ভুল রহিয়াছে। প্রত্যেক শব্দই দ্বিগুণ বিশেষ্য। উদাহরণ দিয়া আমাদের অভিপ্রায় পুষ্টীকৃত করিতেছি। নিম্নে বিশেষ্যের তালিকা দেওয়া গেল।

অনৈক্য	ঔৎকর্ষ
নৈপুণ্য	সৌজন্য
ঔৎসুক্য	নিশ্চয়

যে যে বিশেষণ শব্দের উত্তর ফ, ষ্ণ্য, তল

(তা) ও ত্ব প্রত্যয় করা যায়, সেগুলি বিশেষ্য হইয়া থাকে। যথা,—

বিশেষণ।	প্রত্যয়।	বিশেষ্য।
এক	+ ষ্ণ্য =	ঐক্য।
নিপুণ	+ ষ্ণ্য =	নৈপুণ্য।
উৎসুক	+ ষ্ণ্য =	ঔৎসুক্য।

আর তল্ (তা) প্রত্যয় করিলে এইপ্রকার রূপান্তর ঘটিবে,—

বিশেষণ।	প্রত্যয়।	বিশেষ্য।
এক	+ তা =	একতা।
নিপুণ	+ তা =	নিপুণতা।
উৎসুক	+ তা =	উৎসুকতা।

বঙ্গভাষায় "সুজন" কর্ম্মধারয় সমাসে। এই "সুজন" পদে "ষ্ণ্য" করিলে সৌজন্য, আর "তা" করিলে "সুজনতা" সিদ্ধ হইবে; কিন্তু "সৌজন্যতা" কোন মতেই সাধিত হইতে পারিবে না। এইরূপ—"নিস্ব্য", "উৎকর্ষ" দুই বিশেষ্য। সেই বিশেষ্যকে কেমন করিয়া পুনরায় দ্বিতীয় বিশেষ্য করা যাইতে পারে, বল?

অন্ধকারের ভাষা।—Language of darkness. (লাঙ্গয়েজ্ অব্ ডার্ক্নেস্) শব্দের ভাষান্তরে অন্ধকারের ভাষা কদাচ সৎ অনুবাদযোগ্য হওয়া কর্ত্তব্য নয়। যেখানে 'অস্পষ্ট ভাষা' বলিতে হইবে, তথায় অন্ধকারের ভাষা প্রয়োগে ইষ্টসিদ্ধি কেন হইবে?

কর্ত্তাকারক।—এখানে উক্ত শব্দ যুগল সমাস-নিষ্পন্ন; সুতরাং কর্ত্তৃকারক হওয়া উচিত। কেবল কর্ত্তা বলা চলিতে পারে। কর্ত্তা এই পদের সঙ্গে কারক পদে সমাস করিলেই কর্ত্তা এই শব্দের মূল শক্ত কর্ত্তৃ হইয়া যাইবে। তাহাই সাধারণ নিয়ম; সমাসপ্রকরণের তাহাই লক্ষণ। অসংস্কৃতজ্ঞ লোকে ঐভ্রমে নিপতিত হইয়া থাকে। কিন্তু বড়ই মর্ম্মবেদনা পাইতে হয় যে, সংস্কৃত-ব্যবসায়ী লোকেরা কি করিয়া বালকদের পাঠ্য-পুস্তকে উক্ত ভ্রান্তি চালাইয়া দেন। প্রতিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্নের 'সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ সুধাকরের' দ্বিতীয় সংস্করণেও ঐ ভুল, অম্লান-বদনে শোভমান হইয়া রহিয়াছে।

তত্রাচ।—যে বাক্যে "যদিও", "যদ্যপি" লিখিত হয়, তাহাতে লেখকেরা এখন 'তথাপি' আর সময়ে সময়ে "তত্রাচ" লিখিয়া বসেন। "তত্রাচ" শব্দকে বিশ্লেষ করিলে, 'তত্র' ও 'চ' এই দুই শব্দ লব্ধ হয়। 'তত্র' অর্থে 'সেখানে', চ অর্থে 'এবং'। দুইটিই সংস্কৃতভাষামূলক। ওরূপ স্থলে হয় 'তথাচ', না হয় 'তথাপি' হওয়াই সম্যক্ সঙ্গত।

যদ্যপিস্যাৎ, যদ্যপিস্যাৎ।—ঐপ্রকার প্রয়োগ, বিষয়ী লোকের নিকট হইতে ক্রমে সাধু-ভাষাভাষী ও সাধুভাষালেখকদের অধিকারে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। "যদ্যপি"—'যদিও' "স্যাৎ"—'হইবে'। 'যদিও হইবে' এই সূচনা করিয়া কখনকালেও কোন বাক্য রচনা হইতে পারে না—সেরূপ হওয়াই নিষিদ্ধ। তাহাতে ভাষার প্রকৃতি-বিকৃতি ঘটে। 'যদিস্যাৎ' অথবা কেবল 'যদি' বলিলেই বক্তার মনোগত ভাব ব্যক্ত হইবে।

---

* ন + ঐক্য = অনৈক্য।

রসিকত্ব।

(১)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রসশেখর, রসমঞ্জ বা রসিকশিরোমণি। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী রাধিকা, রসময়ী বা রসিকা। উভয়ের লীলাত্মক মাধুর্য্যময় ধর্ম্মের নাম রসিকত্ব; এবং এই ধর্ম্ম যাঁহারা জীবনের অবলম্বন করিয়াছেন, এবং ইহা যাঁহারা যাজন করেন, তাঁহাদিগের নাম রসিক ভক্ত। ইহাঁদিগের মতে আদিরসিকভক্ত পাঁচ জন; কাহারও কাহারও মতে নয় জন; এই জন্য রসিকত্বকে, কেহ বলেন "পঞ্চরসিকের মত", কেহ বলেন "নবরসিকের মত"। প্রথম পক্ষীয়েরা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গল রায় রামানন্দকে পঞ্চরসিক বলেন; দ্বিতীয় পক্ষীয়েরা উহার সঙ্গে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ও রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ গোবিন্দদাসকে যোগ করেন। কেহ কেহ শেষোক্ত চারি জনের, কাহারও কাহারও স্থলে, নূতন নামের সংযোগ করেন। সুতরাং নবরসিক ঠিক হইলে, সেই নয় জন যে কে কে, তাহা নির্ণয় করা সুদূর-পরাহত। "রসিকত্ব" একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, এবং 'রসিক ভক্ত' একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। ইহা না আছে শ্রীমদ্ভাগবতে, না আছে গোস্বামীদিগের গ্রন্থে। অনুমান করি, কর্ত্তাভজা বাউলের দলের সৃষ্টি হইবার পর, সেই সৃষ্টিছাড়া ধর্ম্মমতের পোষকতার নিমিত্ত একটা প্রাচীন দর্শন এবং ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি কল্পিত হইয়াছে। যাহাহউক বাহুল ও গোঁসাই মোহন্তের সহিত আলাপে জানিতে পারিয়াছি, তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনের রাসাদিলীলাকেই "রসিকত্ব" আখ্যা দিয়াছেন, এবং প্রাথমিত মহাত্মা-পুরুষেই "পঞ্চরসিক" বলিয়া বিশ্বাস করেন; এবং বলেন যে, ইহাঁরাই গ্রন্থে ও পদাবলীতে এইমত প্রচার করেন। বিল্বমঙ্গল, কিংবা রামানন্দের রচিত কোন গ্রন্থ বা পদ আছে কি না, জানিতে পারি নাই। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সর্ব্বজনবিদিত, তাহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্ভোগাদি লীলা ভিন্ন কোন ধর্ম্মের কোন কথা নাই। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি-প্রণীত "কৃষ্ণকীর্ত্তনের" উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু উহা কি স্বতন্ত্র পুস্তক, না উভয়ের পদাবলী-সংগ্রহ, তাহারও নির্ণয় এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তবে উভয়ের প্রদাবলীর মধ্যে গ্রন্থে-লিকার-ন্যায় অনেক পদ আছে, যাহাকে গোস্বামীগণ ও বাউলগণ রসিকত্ব-সূচক পদ মনে করেন, এবং উহাদিগকে রাগাত্মক পদ বলেন। আমরা তাদৃশ দুইটী পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 'রসিকত্ব বৈষ্ণবধর্ম্মের "ফ্রিমেছনরি", এবং এই সকল "ফ্রিরণীয়" পদ, "মেছনিক সাইন" অর্থাৎ 'মেছনিক' ধর্ম্মের চিহ্ন বা সঙ্কেত' ফলতঃ ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, বহুদূরস্থিত দুইটী বাউল একত্র হইলে, তাঁহারা মুহূর্ত্তমধ্যে পরস্পর চিনিয়া লয়েন; এবং প্রীতিসম্ভাষণ প্রেমালিঙ্গন প্রভৃতি করিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় পরস্পর ব্যবহার করেন।

পদগুলি এই,—

(১)

"জলের ভিতরে, আগুন জ্বালয়ে,
আগুন মেঘেতে ঘটা।
মেঘের ভিতরে, তারার উদয়,
মাঝারে রবির ছটা॥
হরিণী দেখিয়া, বাঘিনী ভাগল,
ব্যাধ পলায়ল দূরে।

সুমেরুশিখরে, সূতার গাঁথনি,
আকাশে পড়িয়া ঘুরে ॥
আকাশ-রতন, পরশে ভবন,
তিমির তরল কাঁতি।
অমিঞা উগারে, গরল বরিষে,
দরপে ভুবন ভাতি ॥
নাগর বচন, নগরী বুঝল,
নাহি সমুঝয়ে আন।
মুরখ পণ্ডিত, কোহি না সমুঝে,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥"

(২)

"চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।
সপ্ত আঁধার তাহার চিন ॥
দুইটী আঁধারে সদা পীরিতি।
তিনটি পরশে উপজে রতি ॥
নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।
দুইটী আখর পাঁচের পর ॥
কনক আসন আছয় তাতে।
মনসিজ রাজা বৈসয় যাতে।
পঞ্চরস আদি একত্রে মিলি।
যে যার স্বভাব আনন্দ কেলি ॥
অষ্ট আখর একত্রে যবে।
কনক আসন জানিবে তবে ॥
পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধের কয় ॥"

উপরুক্ত পদদুইটীর ব্যাখ্যা আমাদের সাধ্যায়ত্ত কি সাধ্যাতীত, আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিব না। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর চরণকৃপা-প্রসাদাৎ মধুর লীলারস আস্বাদনে যতটুকু অধিকার জন্মিয়াছে, তদনুসারে আমাদের প্রচারিত 'মহাজন পদাবলী সংগ্রহের' উপক্রমণিকায় ইহাদের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছি। কিন্তু পাষণ্ডদিগের ভয়ে, তথাও বিদ্যাপতি-প্রণীত পদটীর গূঢ় ব্যাখ্যা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ভাষাগত সালঙ্কার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছি। গোস্বামীগণ নিজ-জন ভিন্ন কাহাকেও রাগাত্মিক পদের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখান না দেখানও উচিত নহে। কেন-না, উহা বিষয় সর্প ধা জলন্ত পাবক লইয়া ক্রীড়াবৎ ভয়ানক ফলতঃ মধুর-রস-রসিক জিতেন্দ্রিয় ভগবদ্ভিন্ন ঐ সকল তত্ত্বে অপরের অধিকার নাই রসিকভক্ত বাউলেরা ঐ রাগাত্মিকা পদাবলী লীলারসে উন্মত্ত হইয়া, ব্রজলীলার অনুকরণ করেন। কিন্তু ইহাকে সমীচীন কার্য্য বলি আমার বোধ হয় না। যাঁহারা জীবন্মুক্ত সিদ্ধ ভক্ত, তাঁহাদের কিছুই দূষণীয় নহে; কারণ তাঁহারা "সোঽহম্" ভাবাপন্ন হইয়া, স্বীয় স বিস্মৃত হইয়া, এবং পরমাত্মায় ওতপ্রোত ভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। এরূপ ম জগতে সুদুর্লভ। কিন্তু কার্য্যতঃ দাঁড়াইয়া এই যে, যিনি কোন সামাজিক বা চারি দোষে দোষী হন, তিনিই নিত্যানন্দের দোহা দিয়া বাউল হয়েন। যিনি বাউল হয়েন, তিনি রসিকভক্ত; যিনিই রসিকভক্ত, তিনিই ব্রজ লীলার অনুকারী। কিন্তু আমার বোধ হ তাঁহারই—"পুণ্যবাতায় জন্ম শূন্য, ভণ্ডামীত চারিটী পোওয়া।" যে লীলার নায়ক প সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান, আর যাহার নাগি স্বয়ং যোগমায়ারূপিণী অদ্যাশক্তি রাধি তাঁহার অনুকরণ কি আগুন লইয়া খেলা ব ওঁরে পাষণ্ড মণ্ডামার্কণ্ড একবার দেখুক, বৈষ গ্রন্থে কি বলিতেছে :—

"সংক্ষেপে কহিল এই রস-প্রকরণ।
কিশোর কিশোরী দুঁহে হৈয়া শোভন।
দেবীসব গন্ধর্ব্বাদি যতেক আছয়।
কোথা না সম্ভবে এই রসের বিষয়॥
রসিক বলিয়া অভিমান যত হয়।
বৃথা অভিমান মাত্র শোভা নাহি পায়।
রাধাকৃষ্ণ বিনু রস না করে উদয়।
সুধাকর বিনা সুধা নাহি বরিষয়॥
যতনে গোপন করি হৃদয়ে রাখিবে।
ইহ কামুক স্থানে কভু না কহিবে॥
অধিকারী বিনা যেই ইহলীলারস।
আস্বাদিতে চাহে সেই জন পায় নাশ॥

ভরসা করি, পাঠকগণ এতক্ষণে "রসিক", "রসিয়া", "রসিকভক্ত" এই সকল শব্দের অর্থ কি তাহার আভাস পাইলেন। অধিকারী না হইয়া, নেড়ানেড়ী ও বাউল-বাউলানীগণ এই রস আস্বাদন করিতে যাইয়া যে,—

"পিপীলিকা-পাখা উঠে মরিতে পুড়িয়া"

এ বাক্যের সার্থকতা করেন, বোধ করি, তাহাও কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলেন। পাষণ্ড ভণ্ডো-মে কেবল নিজের রসাতলে যাইতেছে, তাহা নহে"; বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে এবং বঙ্গদেশকে রসাতলগামী করিতেছে। যে দেশে চৈতন্য-নিত্যানন্দের জন্ম, সে বঙ্গদেশ যে অতীব সৌভাগ্যশালী, তাহার সন্দেহ নাই; এবং সেই সৌভাগ্যের বলে—সেই চৈতন্যের প্রচারিত প্রেমভক্তির বলে,—সেই নিতাইচাঁদের অর্থাচকে-বিতরিত হরিনামের বলে, স্বদেশ কখনও রসাতলে যায় নাই। রসিকভক্ত, অর্থাৎ ভাঙ্গু বাউলগণ আপন ব্যভিচারের সমর্থন জন্য, নিজের দিতে ত্রুটি করেন না। ইহারা বলেন, যুগল হইয়া যুগলের উপাসনা করিতে হইবে। বিবাহিতা স্ত্রী লইয়া যুগল হওয়া চলে না, পরস্ত্রীসঙ্গ চাই; ইহাতে দোষ নাই, বরং না হইলে ধর্ম্মনষ্ট। ইহাঁদের যুক্তি এই, পুরুষমাত্রেই কৃষ্ণ, স্ত্রীমাত্রেই রাধা; কিন্তু পুকীয়া রাধা নহে, সে নীরয়-সম্বন্ধী এবং তজ্জাত পুত্রকন্যা "ভিজ্-রলের চাক"। তাঁহারা আরও বলেন; রমণী,—

"কুলটা হইবে, কুল না ছাড়িবে,
কলঙ্কে ভাসিবে নিতি।
হৈয়া কামরতি, ভক্তি পরপতি,
তাহাতে বলাণে সতী॥"

আবার পুরুষ,—

"রজনী দিবস, হবে পরবশ,
স্বপনে রাখিবে লেহ।
একত্রে থাকিবে, নাহি পরশিবে,
ভাবিনী ভাবের দেহ॥"

উৎসে,—

"নিশান করিবে, জল না ছুঁইবে,
না ভিজিবে মাথার কেশ।
সমুদ্রে পশিবে, নীরে না তিতিবে,
নাহি মুখদুখ-লেশ॥"

প্রাগুক্ত পদে পরপুরুষ পরস্ত্রী সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবে; কিন্তু তাঁহাদিগের মিলনে তদুভয়ের সুখ নাই, দুঃখও নাই, সুখদুঃখ রাধা-কৃষ্ণের। এ অতি শ্রুতেয়-কথা; কিন্তু ইহারা বলেন, চারিচক্র সাধন দ্বারা এ অসাধ্য ব্যাপারকে সুসাধ্য করা যায়। এই চারিচক্র সাধন এক বিষ্ণকেল—বীভৎসময়-ব্যাপার; কিন্তু যে বিষয়ের ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছি, তাহাতে উহার বিষয় না লিখিলেও বিষয়টীর অঙ্গহানি হয়। যাহা হউক, পাঠককে শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 'উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থপাঠে বরাত দিয়া, আমরা এ লজ্জাকর বিষয় বর্ণনে বিরত হইলাম। রসিকভক্তেরা বলেন, চারিচক্র-সাধনে সিদ্ধ হইলে, সন্তান-সন্ততি জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং কামভাব দূর হইয়া পুরুষের স্ত্রীসঙ্গমে এবং স্ত্রীর পুরুষ-সহবাসে বিশুদ্ধ প্রেমেরই উদয় হয়। এবং তাঁহারা কাম ও প্রেমের মধ্যে

লৌহ ও স্বর্ণের উপমা দ্বারা প্রদর্শন করিয়া বলেন,—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা,তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা,ধরে প্রেম নাম॥"

ইহার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রীগুরু বচনের টীকা-স্বরূপ কবিরাজ গোস্বামীর নিম্নলিখিত পদ-গুলির আবৃত্তি করেন,—

"বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী আর দ্বারকা-মহিষী।
অষ্টোত্তর শত ষোল হাজার রূপসী॥
তিলেক কৃষ্ণের মন হরিতে না পারে।
গোপী ভুরুভঙ্গী মাত্রে বিদ্ধে কামশরে॥
সমর্থা মূর্ত্তিমতী রতি আত্মসুখ বর্জ্জা।
অদ্বিতীয় ত্রিভুবনে সকলের পূজ্যা॥
শুদ্ধ প্রেমানন্দ ভাব, মাধুর্য্যের পুর।
কামগন্ধ নাহি মাত্র আস্বাদে মধুর॥
প্রেমানন্দে ভগমগ সুধার সাগরে।
ডুবিয়া ডুবিয়া পিয়ে তৃপ্তি না সঞ্চরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ তনু-মন।
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি পরম রতন॥
কুলশীল ধর্ম্মকর্ম্ম লোকলজ্জা ভয়।
দেহ গেহ সর্ব্বাদি কিছু না আছয়॥
মদিরা সদাঙ্ক যেন কটীর বসন।
আছে কিনা আছে তাহে নাহিআলোচন॥
তবে যে গৃহের কর্ম্ম রন্ধন-ভোজন।
দেহের অভ্যাস করে নাহি তাহে মন॥
শরীরের মার্জ্জন ভূষণ বেশ-বিন্যাস।
যতন করিয়া করে তাহাতে উল্লাস॥
কৃষ্ণ যাতে রত কৃষ্ণ সুখের বিলাস।
অতএব দেহে সৌন্দর্য্যে অভিলাষ॥
কৃষ্ণসুখে সুখী গোপী কামগন্ধহীন।
শুদ্ধ প্রেমময় ভাব কহয় প্রবীন॥"

ইসিকভক্ত বা বাউলগণ, জ্ঞানাঞ্জন, পরাবিদ্যা ও অবিদ্যা,রজলীলা ও ব্যভিচারকে এমনি টানা-পোড়েনে মিলাইয়া বয়েন যে, একটি হইতে অপরটি নির্ব্বাচন করা বড়ই দুষ্কর। কিন্তু 'বেদের কাছে সাপের হাঁচি বড় একটা ছাপা থাকে না'। তাই বলি, ইহারা যে লীলার দোহাই দিয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করেন, তাহার সহিত ইহার প্রভেদ স্বর্গ ও নরক। আজিকালি ধর্ম্মসংস্কারক-দিগের বক্তৃতায়, থিয়েটার ও যাত্রায়, কৃষ্ণ-লীলার যে একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ফেসন উঠিয়াছে, আমি তাহাতে সহানুভূতি করি না; কৃষ্ণচরিত্রকার, শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার মানিয়াও যে, লৌকিকী প্রথার বশ-বর্ত্তী হইয়া, প্রক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ব্রজলীলার অনেক কথা বাদ দিয়াছেন, আমি তাহাতেও সায় দিতে পারি না। আমিও শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরতত্ত্বে সম্পূর্ণ হৃদয়-মনের সহিত বিশ্বাস করি, এবং তাঁহাকে কেবল আদর্শ পুরুষ নহে, আদর্শ দেব বলিয়াও বিশ্বাস করি; এবং গুরুপদেশ ও সাধুদিগের কৃপায় ব্রজলীলার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতেও আপনাকে সমর্থ বিবেচনা করি। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা হইতে পারে না। তবে বাউল মহাশয়দিগকে সামান্য প্রবাদ-বাক্যে বলি,—

"যার কর্ম্ম তারে সাজে,
অন্যের নামে ঠেঙ্গী বাজে।"

কোথায় "রাজা ভোজা, আর কোথা গঙ্গা-রাম তিলি"! অতএব, বাপু সকল, "আমরা বেপ্রো হইয়া", তোমাদের "জাহাজের খবরে কাজ কি? তোমরা বাপু,সর্ব্বেশ্বর "সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনস্বামী নও; এবং তোমাদের সেবাদাসী ঠাকুরাণীরাও "কুবৈষ্ণব শরণা" আত্মতাপিনী গোপী নহেন। তবে কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিতে যাইয়া নরকের পথ প্রশস্ত কর কেন? রসিকভক্তেরা নন্দির দেখান বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও এক রহস্যজনক ব্যাপার। ইহারা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রায় রামানন্দের সহিত ষোড়শ শতাব্দীর সিরাবাইকে মিলিত করেন; যদিও এই ঐতিহাসিক ভ্রমটী বৈষ্ণবগ্রন্থপাঠেই ক্লিয়ন হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যদিচ বলেন বিদ্যাপতি পদ্মাবতীর সহিত সাধন হইতে পারে না, তথাপি জয়দেব প্রকৃতি-স্বরূপ পদ্মাবতীর উল্লেখ করেন। বিল্বমঙ্গল ও চিন্তা যে প্রণয়-সূত্রে বদ্ধ ছিলেন, তাহা ইতিহাস অপেক্ষায় করে না। কিন্তু সে প্রণয় ভক্তিমূলক নহে, নিছুবাবুর "পীরিত"। বিশেষতঃ সে "পীরিতি" ছিল, যতদিন বিল্ব-মঙ্গল ছিলেন কামাতুর লম্পট, আর চিন্তা ছিল কামাতুরা বারাঙ্গনা। যখন উভয়ের মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়,তখন কোথা বা বিল্বমঙ্গল, আর কোথা বা চিন্তা।

"চিন্তামণি বেশ্যার যে চিন্তামণি বাক্য।
তনি বিল্বমঙ্গলের হৃদে হৈল সখ্য॥
আশমন-ক্লেশ আর ভং সনা-বিশেষে।
ভাবিয়া বিবেক হৈল দৃঢ় মানসে॥
রাত্রি কৃষ্ণলীলাগানে প্রভাত হইল।
বৈরাগ্য করিয়া প্রাতে অমনি চলিল॥"

বিদ্যাপতি ও লক্ষ্মী-দেবীর অবৈধ সংযোগ-সম্বন্ধে বাউলদিগের রচিত অনেক গান আছে। কিন্তু এটিও নিশ্চিন্ত- গঞ্জিকাসুমবিমিশ্র। পঞ্চ গৌড়ের রাজা শিবসিংহ ও তদীয় পত্নী লক্ষ্মী (লছিমা দেবী) ছিলেন—বিদ্যাপতির আশ্রয়-দাতা। কথিত আছে, বিদ্যাপতি এই লছিমাকে স্বীয় উপাস্য দেবতা জ্ঞানে রাধিকারূপিণী জ্ঞান করিতেন। এবং রাজা শিবসিংহের সহিত বিদ্যাপতির একান্ত সদ্ভাব ছিল। এরূপ স্থলে, অবৈধ সংযোগের কোন কথাই আসিতে পারে না। আর এমন কোন গুপ্তসম্বন্ধ থাকিলে, সুরুচি ও লোক-লজ্জার খাতিরে বিদ্যাপতি সে কথা গোপনই রাখিতেন; তাহাহইলে প্রতিপদের ঋণিতায় শিবসিংহ ও লছিমার নাম সংযোগ করিয়া চক্কানাদ্ করিতেন না। লছিমা-বিদ্যাপতি-ঘটিত প্রচলিত প্রবাদসমূহকে আমরা আষাঢ়ে গল্প বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। বাকী রহি-লেন—চণ্ডীদাস ও রজকিনী। বাউল মহাত্মারা এতদুভয়ে প্রেমাত্মক যত গাথা এবং যত কাহিনী রচনা করুন না কেন, ইহাঁদের মধ্যে যে কোন অবৈধ প্রণয় ছিল না, তাহা নিশ্চিন্ত। তাঁহা-দের রচিত গান ও গল্প হইতেই তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারে। তাঁহারা বলেন,নান্নুর গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী স্বপ্নযোগে চণ্ডীদাসকে আদেশ করেন যে, রামী নাম্নী রজকীকনের নিকট দীক্ষিত হইয়া তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করুন, এবং রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক পদাবলী কীর্ত্তন করুন। তদনুসারে চণ্ডীদাস রামী রজকিনীকে আশ্রয় করেন। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, উভয়ের সংযোগ গুরুশিষ্যরূপে, অন্যভাবে নহে। তাহার দুইটী প্রমাণ চণ্ডীদাস-রজকিনী-কাহিনীতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রমাণ এই যে, নান্নুর-গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ রামীকে বিশালাক্ষীর অবতার মনে করিয়া, তাঁহার হস্তে অন্নগ্রহণ করিতেন, এবং কোন সময়ে অন্ন-পরিবেশন-কালে সঙ্কলে তাঁহাকে চতুর্ভুজরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, চণ্ডীদাস একদা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে,কথিত আছে,রামতারার পদস্পর্শে তিনি পুনরুজ্জীবিত হয়েন। এই দুইটী প্রমাণ দ্বারা রামীকে সামান্যা মানবী বলিয়া প্রতীত হয় না। সুতরাং তাঁহার প্রতি, চণ্ডীদাসের প্রেম—ইষ্ট-দেবের প্রতি ভক্তি, চণ্ডীদাসের প্রতি তদীয় প্রেম—উপাসকের প্রতি উপাস্যের দয়া। ইহার তৃতীয় প্রমাণ চণ্ডীদাস-কৃত রামতারার স্তোত্র; যথাঃ—

"শুন রজকিনী রামি!
ও দুটী চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি।
তুমি বেদরারিণী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নেরতারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনী-রূপ, কিশোরী-স্বরূপ,
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী-প্রেম, নিকষিত হেম,
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥"

ইহার পরও কি চণ্ডীদাস ও রজকিনী-প্রেমে কলুষতা—আবিলতা আছে বলিতে, কাহারও সাহস বা প্রবৃত্তি হইতে পারে? তবে বাউল-দিগের অসাধ্য কিছুই নাই। বাউলদের প্রধান গ্রন্থ 'রিরতিবিলাসে', পবিত্রচেতা, পবিত্রতার আদর্শপুরুষ, পবিত্রতার উৎস, ভগবান চৈতন্য-দেবতেও নায়িকা-সংযোগের আরোপ করিয়াছেন। যিনি শচীমাতা ও মালিনী ভিন্ন অপর রমণীর ছায়া-দর্শন পর্য্যন্ত করেন নাই; যিনি যুবতী স্ত্রীলোকের নিকটে ভিক্ষা-লব্ধ তণ্ডুল পরিবর্ত্তনের জন্য অতি প্রিয়ভক্ত হরিদাস ঠাকুরকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন; যিনি নিশীথ সময়ে শ্মশানোপকূলে কীর্ত্তনানন্দিনি অনুসরণ করিয়া যাইয়া, সে সঙ্গীত যুবতী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত জানিবামাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন; সেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে যাহারা লম্পট বলিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহাদের আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? ফলতঃ বাউলেরা রসিকত্ব বা পঞ্চরসিকের মতের যে ব্যাখ্যা করে, সেই ব্যাখ্যার গোড়ায়ই ভুল। বৈষ্ণব ধর্ম্মে শান্ত-দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর এই পাঁচটী রস আছে; এই পাঁচটী রস লইয়াই বৈষ্ণব ধর্ম্ম; ইহার যাজন যাঁহারা করেন, তাঁহারাই রসিক বা পঞ্চরসিক, এবং তাঁহাদিগের যাজিত ধর্ম্মই রসিকত্ব।

ঠাকুর-ঝি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অমলা অনেকক্ষণ ঐরূপ ভাবিতে লাগিল। এমন সময় সদরদরজার কড়ানাড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। ঐ শব্দ অমলার সে চিন্তায় ব্যাঘাত জন্মাইল। অমলা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল,—"ঐ কে কড়া নাড়ছে—ঐ দাদা এসেছেন।"

শরৎকুমারী কিন্তু অমলার কথায় যেন বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তবে তু আমার মাথা কিনেছেন! এখন নীচে গিয়ে কে তাঁকে দরজা খুলে দিয়ে আসবে?"

অমলা বলিল,—"আমি ঝিকে ডাকি।"

এই কথা বলিয়া, অমলা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,—"ঝি—ও ঝি—তুই কি ঘুমিয়েছিস্ বাছা?"

এইরূপ অনেক ডাকাডাকির পর, চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার ব্যাঘাতজনিত ফোঁসফোঁসানি শব্দ করিতে করিতে, ঝি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার পর ঝি প্রকৃতিস্থ হইয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিল,—"ঘুমুবো কেন গা? আমাদের গরীব-দুঃখী লোকের চোখে কি আর ঘুম আছে? আমরা যে রতর খাটাতে এসেছি—আমাদের

খাটুনির কি সোয়াস্তি আছে? সারা দিন, খাটো—সারা রাত খাটো, তবে ত দুটকুলো রুটি মাইনে পাবো; আরে আমার চাকরী রে! দেশে গিয়ে ভিক্ষে মুষ্টিও দিন চলে যাবে। মনে করেছিলুম—দিন কতক গতর খাটিয়ে কিছু টাকা জমলে, নাতিটীর বিয়ে দেবো; তা কাজ নেই মা, আমার নাতির বিয়ে—সে অমনি প্রাতঃরাক্যে বেঁচে থাক্। আমি দেশে—"

ঝির বক্তৃতা আর শেষ হয় না দেখিয়া, অমলা আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিল না। দ্বার তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং অমলা কি আর স্থির থাকিতে পারে? অমলা ঝির কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"অত বকছিস কেন বাছা? তোর বাবু এসেছেন, অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তুই এক-বার সদর দরজাটা খুলে দিয়ে আয়না বাছা! আহা! বুড়ো-মানুষ—ঘুমুচ্ছিলো!"

তখন এই 'বুড়ো' কথাটা ঝির প্রাণে বড় আঘাত করিল। ঝি বিকৃতমুখভঙ্গিমার সহিত আরম্ভ করিল,—"আর তোমাদের দয়ামায়ায় কাজ নেই! আমি বুড়ো-মানুষ! বুড়ো হলে আর এসংসারে গতর খাটিয়ে খেতে হ'ত না! দিদি বলেন—আমরা পাঁচটী লোক বই ত না; অমন পাঁচটি লোকের মুখে আগুন! এই দেখ-না, বাসন মাজ্‌তে মাজ্‌তে আমার নড়াটা টাটিয়ে গেছে।"

ঐই সময় পুনরায় কড়ানাড়ার শব্দ হইতে লাগিল। অমলা ব্যগ্র হইয়া বলিল,—"তুই আর গান দিসনা বাছা! দাদা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমি নীচে গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে আসি।"

শরৎকুমারী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার প্রাণের ভিতর কি হইতেছিল, আমরা জানি না; কিন্তু মুখে এতক্ষণ কোন কথাই প্রকাশ করে নাই। এখন অমলাকে দরজা খুলিয়া দিবার জন্য নীচে যাইতে উদ্যত দেখিয়া, শরৎকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিল,—"না ঠাকুর-ঝি, তুই দুরজা খুলে দিতে যাস্-নে; একে তোর সোমত্ত বয়েস, তাতে সে নিশ্চয় আজ মদ খেয়ে এসেছে; শেষে কি একটা কাণ্ড ঘটাবি?"

তাহার পর শরৎকুমারী ঝিকে বলিল,—"ঝি, তুই যা। কিন্তু দরজা খুলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসিস্। দেখিস, যেন সামনে পড়িস্‌নে।"

ঝি তখন পুনরায় কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া আরম্ভ করিল,—"হাঁগা, তোমার কেমন-ধারা আক্কেল গা? ননদ আপনার লোক বলে তার ইজ্জত বাঁচাচ্ছো, আর আমি গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি বলে কি আমার ইজ্জতের ভয় নেই? আমারও এককালে ভরা-যৈবন ছ্যালো, পায়ে চারগাছা মোঁ্যাক্-মল ছ্যালো, হাতে রুপোর বাউটী ছ্যালো, কানে সোনার মাকড়ী ছ্যালো, কর্ত্তার চারখানা লাঙ্গোল ছ্যালো। ওমা! গরীব হয়েছি বলে কি ধর্ম্মকথা বোয়াবো? এত অধর্ম্ম সইবে না—সইবে না।"

শরৎকুমারী আর মনোভাব গোপন করিতে পারিল না; ক্রোধভরে বলিল,—"তুই বুড়ো-মাগী, তোর এত ভয় কিসের?"

আবার সেই কথা! ঝি এবার অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল,—"হ্যাঁ গো, সাতটের কাছে আবার বুড়ো-চুড়ী আছে নাকি?"

ঝিয়ের কথার আক্কেল দেখিলে। অমলার দাদার চরিত্র-সম্বন্ধে তাহারই সম্মুখে একটা নীচবংশীয়া ঝির মুখে এরূপ জঘন্য কথা! কিন্তু অমলা সে কথা শুনিয়া কেবল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে

সে কি ঝিকেও কোন কথা বলিতে পারে? কিন্তু শরৎকুমারী তা আর অমলা নয়; অমর নিজের মুখে সে স্বামী-নিন্দা যতই করুক না কেন, একটা ঝির মুখে তাহার স্বামীর এরূপ দোষারোপ শরৎকুমারীর সহ্য হইবে কেন? শরৎকুমারী তৎক্ষণাৎ ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,—"দূর হ' হারামজাদী। ফের অমন কথা যদি মুখে আনবি ত তোকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো। এখনি গিয়ে দরজা খুলে দিগে যা।"

তখন ঝির মুখে আর কথা নাই! সে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, ধীরে ধীরে সদর দরজা খুলিয়া দিতে গেল। এতক্ষণ অমলার অনুনয়-বিনয়ে যে কাজ না হইয়াছিল, শরৎকুমারীর গর্জ্জনে সে কাজ তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হইয়া গেল।

শরৎকুমারী তখন অমলাকে বলিল,—"তুই এইবার ভোর ঘরে যা।"

অমলা ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। আর শরৎকুমারী তৎক্ষণাৎ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে ঝি, হীরালাল বাবুকে সঙ্গে লইয়া উপরে আসিয়া দেখিল যে, বাবুর শয়ন-ঘরের দরজা বন্ধ। ঘরের দরজা যে কেন বন্ধ, ঝি তাহার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। শরৎকুমারীই শেষে তাহাকে সদর দরজা খুলিয়া বাবুকে উপরে আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল, অথচ সেই শরৎকুমারী এখন নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে! মানিনীর অভিমান সে কিরূপে বুঝিবে?

ঝি তখন দরজা বন্ধ দেখিয়া আরম্ভ করিল, "ওমা! দরজা বন্ধ যে! ভাল জ্বালা বাপু! বউমা, দরজাটা খুলে দেওনা, বাবু দাঁড়িয়ে যে!"

হীরালাল বাবু আজ এক বন্ধুর বাসায় নিমন্ত্রণ গিয়াছিলেন, সুতরাং আজ তাঁহার শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি ঝিকে এইরূপ চীৎকার করিয়া ডাকিতে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"অত চেঁচিয়ে ডাকিস কেন, মাগি?"

ঝি প্রভুর কথাও সহ্য করিতে পারে না, আর তাহার মুখেরও কোন আটক নাই; সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ বাবুর মুখের উপরেই ক্রোধভরে বলিল,—"আমায় মাগী! এত রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে উঠে, বাবুকে নিয়ে এসু আর আমি হলুম কিনা মাগী!"

হীরালাল, কেবল তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর ভয়ে, ঝির চীৎকারে বিরক্ত হইয়া, তাহাকে এরূপ কথা বলিয়াছিলেন; নচেৎ তাঁহার হৃদয় এখন প্রফুল্লতায় পরিপূর্ণ। সে প্রফুল্লতার পরিচয় এই—হীরালাল বাবু তৎক্ষণাৎ অন্যসুরে ঝিকে বলিলেন,—"বাপ্‌রে! তোমায় কি মাগী বল্‌তে পারি? তুমি যে আমার ভাটপাড়ার মাঠাকুরুণ!"

ভাটপাড়ার মাঠাকুরুণ! ঝি মনে করিল, নিশ্চয় ইহা একটা ভয়ঙ্কর গালাগালি! এরূপ একটা গালাগালি সেই কলহ-প্রিয় ঝির প্রাণে সহ্য হইবে কেন? ঝি তৎক্ষণাৎ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,—"আবার আমায় বাচ্ছে-তাই গাল! ভগবান, তুমি এর বিচার করো ঠাকুর!"

এই কথা বলিয়া ঝি, তাহার নিজের আত্মদীন ক্রন্দন-অশ্রু ছাড়িয়া দিল। হীরালালের শরীরের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছিল। হীরালাল আর দাঁড়াইতে পারেন না, এমন কি তাঁহার পড়িবার ভয়ও ছিল।

সেই কারণ পুনরায় বিরক্ত হইয়া ঝিকে বলিলেন,—"আ মর্ মাগি, আবার নাকে-কান্না ধর্‌লি কেন্? আস্তে আস্তে ডাক-না, নইলে মা জানতে পারেন যে।"

এই সময় বাবুর মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। বাবুর মুখে আর কথা নাই; কিন্তু তখনও বাবু মনে মনে বলিতেছেন,—"উঃ! আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না। এখনো দরজা খুলে না? এই দেওয়ালটা ঠেস দিয়ে আর একটু দাঁড়াই। রে মন, ভুলিসনে! দরজাটা খুলে দিলেই নিশ্বেসটা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে ঢুকতে হবে—তা নইলে গন্ধ পাবে। রে জ্ঞান, সাবধানে! তুই আলোটাই আগিও কু-পোকা-র—"

মনে মনে কুপোকাৎ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে এদিকেও কুপোকাৎ! বাবু একেবারেই ধরাশায়ী! বাবুকে ভূতলে পড়িতে দেখিয়া, ঝির তখন বড় ভয় হইল; সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ও বউমা, ঝট্ করে তড়্‌কো খুলে দেও—বাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছে।"

বধূমাতা দরজার অন্তরালেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। ঝির কথায় ব্যস্ত হইয়া দরজা খুলিয়া দেখেন যে, তাঁহার অকলঙ্ক চন্দ্র ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছেন! তখন শরৎকুমারী আপনার কর্ত্তব্য ভুলিল না, অতি যত্নের সহিত অজ্ঞান-পতিকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া তাহার শুশ্রূষা আরম্ভ করিল। এই সময় ঝি-মাগী মনের সাধে চীৎকার ছাড়িল,—"হায়! হায়! নিশ্বেসও পড়ে না যে গো! ওগো, এই যে আমায় অকথা-কুকথা কয়ে গাল পাড়ছিলো গো! ওগো, এরি মধ্যে একি সর্ব্বনাশ হলো গো!"

শরৎকুমারী তখন বাবুকে লইয়াই ব্যস্ত; সুতরাং ঝির এরূপ আত্মীয়তার পুরস্কার তখন আর কিছুই দিতে পারিল না। কিন্তু ঝির সেই চীৎকারে অমলা ও তাহার মাতা "কি হয়েছে—কি হয়েছে" বলিতে বলিতে, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবুকে এরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, অমলা বলিল,—"বউ-দিদি, দাদা অমন হয়ে পড়ে আছেন কেন?"

বউ-দিদি, আপনার কপালে করাঘাত করিয়া বলিল,—"কি আর বল্‌বো—আমার মাথা আর মুণ্ডু।"

বউ-দিদি বলিতে পারিল না বটে, কিন্তু ঝি এ সময় আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ফোঁপরাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল,—"মা-ঠাকুরুণ গো, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে কি দেখছো-গো! ওগো এই বেলা কান্না-গোল তুলে দাও, গো।"

শরৎকুমারী ঝির উপর বিরক্ত হইয়া বলিল, —"আ মর নেকী মাগী, তুই অমন করে মরিস্ কেন?"

ঝি এবার সুরের পরিবর্ত্তন করিয়া নাকি-সুরে আরম্ভ করিল,—"ওগো-মাগী বল্‌তে না বল্‌তেই একজন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে গো —আর তুমি আমায় মাগী বলো-না-গো।"

বাবুর মাতা এতক্ষণ ব্যস্ততারই অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ ঝির চীৎকারে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়; তারপর এখানে আসিয়া এরূপ অবস্থা দেখিয়া, এতক্ষণ তিনি অবাক্ হইয়াই ছিলেন। এইবার কথা কহিলেন,—"একি সর্ব্বনাশ হলো! বাবা হীরালাল, কেন অমন করে রয়েছ বাবা?"

এই সময় অমলা দৌড়িয়া গিয়া একটা জলপাত্র আর একখানা পাখা আনিয়া ভ্রাতার সেবায় নিযুক্ত হইল। অমলা ব্যস্ততার সহিত শরৎকুমারীকে বলিল,—"বউদিদি, তুমি চোখে

মুখে জল দাও, আমি রান্নাঘরে যাই। কোন ভয় নেই—এখনই জ্ঞান হবে।"

শরৎকুমারী মন্ত্রের সহিত যেইরূপ করিতে আরম্ভ করিল। তখন বি পুনরায় আরম্ভ করিয়া দিল,—"আহা! আর জল দিয়েই বা কি হবে! মিন্তিরদের বড়-ছেলেটা অমনি মর খেয়ে পড়ে মরে গেল; এত জল ঢাল্‌লে —কিছুই হলেন না গো—কিছুই হলো না। হায়! হায়! তাঁই কি বাড়ীতে কেউ পুরুষ আছে গো, যে মা-বোনকে ধর্‌বে—কি এমন বিপদের সময় দুটো কথা কয়ে সান্ত্বনা কর্‌বে! একি কম বিপদের কথা গা, যে একখানা খাট কিনে আন্‌বার লোক পর্য্যন্ত নেই! বেহারা পোড়ারমুখোর মুখে আগুন! তুই মাসে ছ'টাকা করে মাইনে খাস, দুই রাঁড়িয়ে বাড়ীতে থাক্‌তে পারিস্‌নে!"

হীরালালের মাতাঠাকুরাণীর নাম সাবিত্রী। সাবিত্রীর ঝিয়ের আস্ফালন সহ্য হইল না। পুত্রের অমঙ্গল-কথা মাতার প্রাণে সহ্য হইবে কেন? তিনি ঝির উপর বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"আ মর নেকাউন্টো মাগী, তুই অমন অমঙ্গলের কথা মুখে আনিস্ কেন?"

অমলার সে সকল কথার প্রতি লক্ষ্যই ছিল না। অমলা শরৎকুমারীকে বলিল,—"বউ-দিদি, খুব করে মুখে জলের ছিটে দেও।"

শরৎকুমারী ছোরে কয়েকবার চক্ষুতে জলের ছিটা দিবামাত্র, হীরালাল চক্ষু উন্মীলন করিল। চক্ষু উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গেই হীরালাল বাবুর চৈতন্য হইল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"একি! মা, অমলা, শরৎ! আমি যে সদ খেয়ে এসেছি, তা এরা টের পেয়েছে নাকি?"

অল্পক্ষণ চিন্তার পর বুদ্ধিমান হীরালাল মাতাকে সে-বিষয় গোপন করিবার জন্য কহিলেন,—"মা, তুমি যা ভাবছ,এ তা নয়—মিথ্যা! আমার মিরগী রোগ হয়েছে।"

পুত্র যেরূপ অস্বাভাবিকস্বরে অস্পষ্ট ভাষায় এই কথা কয়েকটি বলিল, তাহাতেই মাতাঠাকুরাণীর প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি অনিমেষ-নয়নে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারী সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিল; সুতরাং মুখরা শরৎকুমারী ওর্দ্ধস্বরে গর্জ্জিয়া উঠিল,—"তোমার মরণ-রোগ হয়েছে।"

বধূর কথা মাতার প্রাণে বড় আঘাত করিল। তাঁহার সরল মনে তিনি পুত্রের কথাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁর প্রাণে বলিলেন,—"ঠিক কথা, বউ-মা!"

পরে পুত্রকেও সস্নেহ-বচনে বলিলেন,—"তোমার এমন কেন হলো বাবা? কে মা কালীঘাটের কালী, আসি তোমার মুখে দেবো—বুক চিরে রক্ত দেবো—তুমি আমার বাছাকে ভাল করে দাওমা!"

পুত্রের মঙ্গল-উদ্দেশ্যে দেবীর নিকট শাশুড়ীর এরূপ প্রার্থনা শরৎকুমারীর তাহা ভাল লাগিল না। শরৎকুমারী বলিল,—"বৌপি আবার কি হবে? দেখ্‌ছো না মা, তোমার বংশে কল্‌জা মদ দেখে মাতাল হয়েছেন্‌ছে! তোমার কি নাক্ নেই—তুমি মদের গন্ধ পাচ্ছ না?

হঠাৎ অন্ধকার গৃহে আলো জ্বলিলে, যেমন সে অন্ধকার তৎক্ষণাৎ কোথায় ছুটিয়া পলাইয়া যায়, শরৎকুমারীর এই কথায় সাবিত্রী দেবীর পুত্রের চরিত্র-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা যেন কোথায় তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। সাবিত্রী যেন হঠাৎ আকাশ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তিনি যাহা স্বপ্নেও কখন মনে করেন নাই, আজ তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। সাবিত্রী বিস্মিত-স্বরে বলিলেন,—"এ-

মদের গন্ধ! এ হারু, দুই উত্তম গোছস্!—দুই গোমায় খেছিস্! তুই যে আমার শিব-রাত্রের সল্‌তে-রে! আমি মলে তুই যে আমার মুখাগ্নি কর্‌বি রে—তুই যে আমার গিতি বেঁধে মুখে তুলে দিবি রে! তুই আমার যম আশা—"

সাবিত্রী আর বলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। হীরালালমাতার নিকট হইতে অপ্রস্তুত হইলেন; অনেক ক্ষণ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। তাহার পর একটা কথা মনে করিয়া, তখনও আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য বলিলেন,—"না মা, তুমি যে মদের গন্ধ পেয়েছ, সে মদের গন্ধ নয়। দিতের পোড়ায় বড় বেদনা হয়েছিল বলে, একটা ওষুধ দিয়েছিলেন; এ সেই ওষুধেরই গন্ধ। সে ওষুধের নাম পর্য্যন্ত আমি বলে দিতে পারি। সে ওষুধের নাম—ক্লোরিফ ইথার।"

"হায় বেলালাল! এ তোমার কি অধঃপতন! তুমি একজন শিক্ষিত, জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী যুবা; আজ কিনা তুমি তোমার পরমারাধ্য ও পূজনীয়া জননীর সম্মুখেই অবলীলাক্রমে এরূপ অন্যায় মিথ্যা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছ! এ তোমার দোষ নয়—এখন তুমি যাহার ক্রীতদাস, এ সেই রাজসীর দোষ! ধন্য সুরা! ধন্য তোমার মহিমা!"

এই সময়ে শরৎকুমারী শাশুড়ীকে বলিল,—"মা, তুমি অবাক্ হয়ে কি মাতলামো দেখছো? কথা জড়িয়ে পড়ছে, টের পাচ্ছ না? যাও, ঠাকুরঝিকে নিয়ে শোওগে যাও। যা বিধি, তুই শুগে যা।"

শরৎকুমারীর কথা শেষ হইতে না হইতেই, ঝি তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। কিন্তু শরৎকুমারীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া, অমলা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তবে শরৎকুমারীর সে কর্কশ কণ্ঠস্বর এখন আর নাই; বিশেষতঃ শেষ কয়েকটী কথা এরূপ করুণস্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল যে, সে স্বর শুনিয়া অমলার চক্ষে জল আসিল। দুই বিন্দু অশ্রুমুছিয়া, অমলা মাতার পশ্চাতে চলিল। মাতা তখন মনে মনে মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন।

আর যাব না ধরায়।

(১)

কেন ভাই আর ডাকিছ আমায়?
ইচ্ছা নাই আর রাজস* সেথায়।
তমোময় এবে দেখি সমুদয়।
ভারত এখন ঘুমাইয়া রয়!

(২)

ঘিরেছে ইহাকে অনন্ত নিশায়!
সুরজ গগনে দেখা নাহি দেয়।
ডাকিয়া ডাকিয়া হতাশ হৃদয়—
হইয়া এসেছি ভোলার আশয়!
কত যে ডেকেছি বলা নাহি যায়,
ঘরেতে রিপুরা যেন মৃতপ্রায়!

* রাজস = রাজসিক = উত্তেজনী = political.

কেঁদে কেঁদে শেষে এসেছি এখন!
কাঁদিতে আবার যাব না তথায়।

(৩)

এ আলয়ে নাহি স্মৃতির উদয়!
ভোলা সদাপ্রেমে রয়েছে ভুলে রয়!
জড় ও অজড় তাহে হয়েছে লয়!
প্রেমের সাগরে দুঃখের বিলয়!
এখানে সকলে নিত্যানন্দ-ময়!
অতীত ভুলিয়া থাকিব এথায়।

(৪)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—এক বিন্দু হয়,
সে বিন্দু ভোলার ললাটে উদয়!
জ্যোতির্ম্ময় নেত্র-রূপে দেখা যায়,
তারা রূপে তাহা ভোলাকে ভুলায়!
অন্তর্বাহ্য শ্বেত (সে) আলোক-ছটায়!
সে চিত্র দেখিলে জীব মুক্তি পায়।

(৫)

ভুলিতে অতীত ভোলার আলয়ে—
এসেছি হে সখে! প্রাণের জ্বালায়!
পেয়েছে আনন্দ অপার হৃদয়ে—
ভুলিয়া অতীত কাহিনী হেথায়!
কেন তবে আর ডাকিছ আমায়?
আমি আর ফিরে যাবনা ধরায়।

ধর্ম্মচিন্তা।

১) বলিদান।

বলিদান কাহাকে বলে?

এই প্রশ্নের উত্তরে লোকে এই বলিবেন যে, দেবোদ্দেশে পশুহাতনকে বলিদান কহে।

এইরূপ পশুঘাতনকে যদি বস্তুতঃ বলিদান বলা যায়, তাহা হইলে দেবতারা তো পিশাচতুল্য হইয়া পড়েন! কিন্তু দেবতাদিগের প্রতি এপ্রকার জঘন্য প্রকৃতি কিরূপে আরোপিত করা যাইতে পারে? যাঁহারা মনুষ্যের পরমারাধ্য, যাঁহাদের উপাসনাতে মনুষ্য পবিত্র ও মুক্ত হইবে, তাঁহাদিগকে কখনও কি এতদূর নিকৃষ্টপ্রকৃতি বলিয়া মনে করিতে পারা যায় যে, তাঁহারা পশুমাংসলোলুপ হইলে কখনই পরিতৃপ্ত হইবেন না? ইহা হইলে তো তাঁহারা মনুষ্য অপেক্ষাও অধম হইলেন!

এখানে লোকে জিজ্ঞাসা করিবেন যদি, তবে বলিদান শব্দের অর্থ কি? ইহা তো চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে, বলিদান বলিলেই দেবতাপ্রতিমার নিকটে পশুঘাতন বুঝায়?

এই প্রশ্নের উত্তর আমি এইরূপে দিতে চাহি। মনুষ্যের পশুপ্রকৃতি ও দেবপ্রকৃতি এই দুই প্রকৃতি আছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, বৈরনির্য্যাতন প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি আমাদের পশুপ্রকৃতি; আর দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকারিতা, নিঃস্বার্থতা, শিষ্টতা, ভগবদ্ভক্তি, ব্রহ্মচিন্তা প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তিই আমাদের দেবপ্রকৃতি। এ জগতে পশু-প্রকৃতির এরূপ পরাক্রম যে, তদ্দ্বারা সহজে আমাদের দেবপ্রকৃতি পরাজিত হয়। আমরা ক্ষণকালের নিমিত্তও দেবপ্রকৃতির বিকাশ না দেখিয়া, বরং অনুক্ষণ পশুপ্রকৃতিরই প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই। আমরা মর্ম্মদাই 'সংসার, সংসার,' 'আমার আমার,' ও 'টাকা টাকা' করিয়া ঘূর্ণায়মান হইতেছি। সুতরাং আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি পাইবার অবকাশ কোথায়? আমাদের অন্তঃকরণে প্রতিনিয়ত জঘন্য পশুপ্রবৃত্তিই প্রবলরূপে রাজত্ব করিতেছে। আমরা কেবলমাত্র বিষয়-বাসনা, পরদ্বেষ, পরগ্লানি, ক্রোধ, অহঙ্কার, অভিমান, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দুর্দ্দম রিপুসকলের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছি।

এই সকল দুর্জ্জয় শত্রুর যাহাতে নিপাত হয়, যেরূপ কামনা ও চেষ্টা করা কি আমাদের উচিত নয়? ইহারাই তো আমাদের প্রকৃত শত্রু; অপর শত্রু আর কে? এই সকল শত্রু, আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করিতে থাকিলে, কি প্রকারে আমাদের সুখশান্তি হইতে পারে? ইহারাই দুর্দ্দান্ত পশু; ইহাদিগকে ভগবানের নিকটে বলিদান করাকেই প্রকৃতরূপ বলিদান কহে। কিন্তু এ সকল পশু বলিদান করা কি সহজে হইতে পারে? ভগবানের নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা আমাদের হৃদয়ে যে অতুল বল উপস্থিত হইবে, সেই বলপ্রয়োগে, জ্ঞান-রূপ রজ্জু-দ্বারা ঐ সকল দুর্দ্দান্ত পশুকে দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্ব্বক, ভগবানের কৃপা-খড়্গে তাঁহার সম্মুখে বলিদান করিতে পারিলে, তবেই সিদ্ধিলাভ হইবে! অতএব প্রার্থনাই মূল। হে ভগবন্! তুমি কৃপা করিয়া আমার হৃদয়ে এরূপ বল দাও—যেন আমি অচিরে ঐ সকল দুর্দ্দান্ত পশুকে তোমার নিকটে বলিদান দিতে পারি।

* সমাধি-যোগে যোগী আপনাকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কেন্দ্রীভূত দেখিতে পান। যেমন সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্র, সেইরূপ যোগী আপনাকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতির্ম্ময় কেন্দ্র বলিয়া অনুভব করেন। যোগেশিব ভ্রূ-যুগলের মধ্যে সেই জ্যোতিঃ-কেন্দ্র দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে ত্রিলোচন। অত্যুজ্জ্বল তারার ন্যায় ইহার আভা।

নৈদাঘ নিশীথ স্বপ্ন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৈজয়ন্তী নগরী—কাণাইয়ের বাটী।

(কাণাই, রামা, ভুতো, ছিরে, তিনু এবং পাঁচুর প্রবেশ।)

কা।—আমাদের দল সব এয়েছে ত?

ভুতে।—তুই ফর্দ্দমতে একে একে তাদের ডেকে দেখ্‌না।

কা।—এ যে ফর্দ্দ! সবকটাই সহস্র-বাহু লোক! সকলে বলে যে, রাজার বিয়ে-রাতে বিটেটার করবার জন্যে এমন লোক আর পাওয়া যাবে না।

ভু।—কাণাই, প্রথম বল, কি নাটক নাচতে হবে। তার পর যারা নাচবে, তাদের নাম পড়িস; তবে সে কথার মুক্ত হয়।

কা।—আমাদের নাটকের নাম (পড়িতে পড়িতে) "শোকাবহ হাস্যাত্মক নটন্যাস ইত্যাদিতবধ।"*

ভু।—বড় মজার বহি। আমি ঠিক বল্‌ছি,

* সেক্সপিয়রের "Mid Summer Night's Dream" নামক নাটকের অনুবাদ।

ওতে বড় গঁজা আছে। এখন কাণাই, তোর নাচওয়ালাদের ডাক্। দাঁড়াও হে, সার করে দাঁড়াও।

কা।—আমি যেমন ডাকবোঁ, উতোর করিস্। ভূতনাথ তাঁতি।

ভূ।—হোঁ দে! আমার পাঠ কি বল, তার পর আর নাম করিস্।

কা।—ভূতো, তুই ইন্দ্রজিত সাজবি।

ভূ।—ইন্দ্রজিত কি ছিলো রে! রসিক না বিঙ্কি?

কা।—হ্যাঁ রে, রসিক; পীরিতির জন্য পরাণ দিয়েছিলো।

ভূ।—তবে ত্রুঁদিতে হবে বুঝি? তা হলে তুই দেখিস্, আমি আসর ভাসিয়ে দেবো, কিন্তু বিঙ্কি হলে বেশী কাঁদতে পারতাম—

"যদি পাষাণে বীজ না হবে অঙ্কুর,
তবে কেন বলি তোরে দয়াল ঠাকুর।"

দেখ্‌ছিস্ কেমন রামপ্রসাদী! এখন আর বাকি সকলের নাম বল্।

কা।—শ্রীরাম কর্ম্মকার।

ছি।—হেথা।

মা।—তুই প্রমীলা সাজবি।

ছি।—সেটা কি বলরামের গোষ্ঠী নাকি?

কা।—না রে, ইন্দ্রজিতের "হাত্তরা"।

ছি।—না ভাই, আমাকে মেয়েমানুষ সাজাস্‌নে, আমার দাড়ি উঠ্‌ছে।

কা।—তাতে আট্‌কাবে না; তোর যে মুখোস্ থাকবে। খুব ছোট্ট করে কথা বল্‌বি।

ভূ।—যদি মুখোস্ পর্‌তে হয়, তবে আমি প্রমীলাও সাজবো। আমি খুব ছোট্ট ছোট্ট বল্‌বো। "প্রমীলা প্রমীলা", "প্রাণের ইন্দ্রজিত", "তোমার প্রমীলা", "তোমার দুখিনী জননী।"—

কা।—দূর গাধা, সীতা রামের মা নহে, মাগ।

দুই ইন্দ্রজিত সাজবি, আর ছিরে প্রমীলা হবে।

ভূ।—আচ্ছা!

কা।—বেচারাম দর্জ্জি।

বে।—হাজির, কাণাই।

কা।—বেচারাম, তুমি ইন্দ্রজিতের জৌগাদী সাজবে। রামচন্দ্র স্বর্ণকার—

রা।—হেথা, কানুরাম।

কা।—তুমি ইন্দ্রজিতের বাবা, আমি প্রমীলার বাবা। তিনকড়ি কাঁসারী! তুমি হনুমান সাজবে। আর তাংলৈই একখানি থিয়েটার হলো!

তি।—হনুমানের পাঠ লেখা আছে? তা হলে আমাকে দেও, আমি শীঘ্র মুখস্থ করে নিতে পারিবে।

কা।—তোর শিখ্‌তে হবে না, তুই বক্‌তা করে ফেলবি। কারণ, তোর পাঠ কেবল গর্জ্জন মাত্র।

ভূ।—আমি হনুমান সাজবো। এমন গর্জ্জাব যে, লোকের পিলে চম্‌কে উঠে যাবে। রাজা শুনে খোস্ হবেন।

কা।—তাহলে তুই এক বিট্ কেলে করে থানা করে ফেল্‌বি; রাণী শুনে হুঁস্ত মূর্চ্ছা যাবে। তা হলেই আমাদের আর্টি নিয়ে টানাটানি।

সকলে।—তাহলে আমাদের সকলের ফাঁসি দেবে।

ভূ।—রাণী ভয়ে রাজাকে বাপ ডেকে ফেল্‌লে তো ফাঁসি দেবে! কিন্তু ভয়ে আর খুলা এত চড়িয়ে দেবে যে, পায়রার ডাকে মুখ মধুর গদ্‌গদ্‌বে। বুল্‌বুলের ডাকে গদ্‌গদ্‌বে সকলের আক্কেল গুড়ুম করে দবে।

কা।—তুই কেবল ইন্দ্রজিত সাজবি। রাবণের পুত আলকাতরা-মাখা তেলাপোকা জোয়ান ছিল।

ভূ।—আচ্ছা, তবে তাই সাজবো। হনুমানের নেজে আগুন দিতে হবে ত? নেজে আগুন দিলে যে আসর পুড়ে যাবে!

কা।—এই নে তোদের পাঠ। কাল মুখস্থ করে রাত্রে বনের ভিতর যাবি। সেখানে জ্যোৎস্না রাত্রে মহড়া হবে; তা না হলে কালেজের যত বদ ছেলে আমাদের পেছনে লাগবে, আর সব মাটি করবে। সেই বটতলা—বুঝ্‌লি?

সকলে।—আচ্ছা। (প্রস্থান।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

"সম্ভোগরত্নাকর",

"রতিশাস্ত্র", "কামরত্ন" প্রভৃতি অশ্লীল পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার করা—গবর্ণমেণ্ট হইতে নিষিদ্ধ। কেহ ওরূপ করিলে, তিনি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইয়া থাকেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের কথা, সংপ্রতি প্রকাশ্য সংবাদপত্রের সহিত ঐ তিনখানি পুস্তকের এক তাকার বিজ্ঞাপন-ক্রোড়পত্র বিলি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বটতলার একজন পুস্তক বিক্রেতা—নাম রাবণেশ্বর ঘোষ, ঠিকানা ৪০নং পরাণবাটী ষ্ট্রীট—ওরূপ একটা প্রলোভনপূর্ণ বিজ্ঞাপন, চারিদিকে বিলি করিতেছে; সুধাকর সংবাদপত্রের সহিতও উহা বিলি হইয়াছে।

কি ভয়ানক কথা! পুলিশের কি একটুও নজর পড়ে নাই? আমরা তাহাদিগকে এ বিষয়ের তত্ত্ব লইতে অনুরোধ করি। ফলতঃ গ্রাহকগণ সাবধান, ওরূপ অশ্লীল পুস্তক ক্রয় করায়, ক্রেতাও আইনে দণ্ডনীয় হইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন, এরূপ আশঙ্কাও অমূলক যে, উহাদের সম্পূর্ণ আছে যে, উহারা ঐরূপ প্রলোভনজনক পুস্তকের নাম করিয়া তাঁহাদিগকে অন্য কোন পুস্তক প্রদান করিবে। সুতরাং সকলে সাবধান! উহা বটতলার জুয়াচুরী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

'জাল রাজভাষা'।

শরৎ ভট্টাচার্য্য, বটতুলার একজন পুস্তক-বিক্রেতা। প্রান্টেট বাহির করিয়া ইনি অনেককে ঠকাইয়াছেন। তারপর, "ভাষাশিক্ষা" নামক এক পুস্তকের বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া, তাহাতে ছয় মাসে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার বুৎপত্তি লাভ হইবে—ওরূপ প্রলোভন দেখাইয়াও, অনেককে প্রতারিত করিয়াছেন। এবিষয় গত বর্ষের ৩০এ ফাল্গুনের "অনুসন্ধানে" পাঠকগণ দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু ধাউক সে কথা; এক্ষণে ইনি আবার 'রাজভাষা' নামক পুস্তকের জাল একটা সংস্করণ বাহির করিয়া বড়ই ধরা পড়িয়াছেন। ঐ পুস্তকের মালিকাধী বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এজন্য ইহাঁর নামে ছইকোর্টে নালিশ রুজু করিয়া দিয়াছেন। জজ সেণ্ট ইহাঁর নামে সম্প্রতি 'ডুল' জারি করিয়াছেন। আমরা এই বিচারের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

সাপ্তাহিক প্রসঙ্গ।

ডাকাতের সহিত যুদ্ধ।—বোম্বে হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে, বোম্বে পুলিশের সুটার সাহেবের সহিত ত্রাংহাজরায় কতকগুলি ডাকাইতের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধে গোলাগুলির বৃষ্টি হইয়াছিল, এবং খুনজখমেরও ত্রুটি হয় নাই। ইংরেজ-রাজত্বে এখনও এমন ডাকাতের ভয়!

জীবিতের গোর।—কিছুদিন হইল, ডাওলপুরে এক জীবিতের গোর হইয়া গিয়াছে। এক জন দরজী গাঁজা খাইয়া বুঁদ হইয়া পড়িয়া ছিল; তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে মৃত অনুমান করিয়া গোর দেয়। পরদিন প্রাতে এক ব্যক্তি গোরের ভিতরে ক্রন্দনের শব্দ পায়। সে তৎক্ষণাৎ নগরে গিয়া সেই সংবাদ প্রকাশ করে। অনেক লোক আসিয়া গোর খুঁড়িয়া সেই লোকটাকে বাহির করে; কিন্তু তখন সে নিশ্বাস ফেলিতে না পাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবিত থাকিলে, লোকটা প্রভু যীশুখৃষ্ট হইতে পারিত।

হিন্দুর খৃষ্টান-ধর্ম্ম-গ্রহণ।—লাহোর কলেজের বি,এ ক্লাসের দুটি ছাত্র খৃষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। সেই কারণ আর্য্যসমাজ এক সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, মিশনারী স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আর তাঁহাদের পুত্রগণকে পাঠাইবেন না। লাহোরে এই হইল; কিন্তু বাঙ্গালায় ছেলে ছাড়িয়া মেয়ে পর্য্যন্ত পাঠাইতে আরম্ভ হইয়াছে!

কুষ্ঠ-আইনের পাণ্ডুলিপি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কুষ্ঠ-আইনের পাণ্ডুলিপিখানি ভারত-গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক ষ্টেট-সেক্রেটারির অভিমতের জন্য বিলাতে পাঠান হইয়াছে। শুনিতেছি নাকি, যাহাতে কুষ্ঠরোগিগণ পরিবার-মধ্যে না থাকিতে পারে, তাহারই বন্দোবস্ত হইবে। রোগের জ্বালার উপর আবার এ কি জ্বালা!

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণার্থ সভা।—বিগত ৪ঠা মে শুক্রবার ৬টার সময় টাউনহলে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণার্থ সভা আহূত হইয়াছিল। সভায় দেশের বড় বড় বাগ্মীবরের বক্তৃতায় টাউনহল কম্পিত হইয়াছিল। এরূপ সভা সর্ব্বত্রই আহূত হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের স্মরণার্থও সভা হইয়াছিল; কিন্তু ফলে কি দাঁড়াইল?

লর্ডসভায় ভারতের রাজা-মহারাজা।—মে মাসের 'নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরীতে' প্রকাশ যে, লর্ড-সভায় ভারতের রাজা-মহারাজাগণকে মনোনীত করিবার উপায় উদ্ভাবন হইতেছে। কাশীর শিবপ্রসাদ এবং ভিঙ্গার মহারাজা এইবার লর্ড সভার সভ্য হইবার চেষ্টা করিয়া দেখুন!

গাঁজা-কমিসন।—গাঁজা-কমিসনের সভ্যগণ এইবার সিমলার শৈলশৃঙ্গে উঠিয়াছেন। সিমলা-শৈল এবার মূষিক প্রসব করিবে না তো?

রাজা বাহাদুর গোবিন্দলাল রায়।—এই দেশহিতৈষী বদান্যবর রাজা বাহাদুর কলিকাতা গোলদীঘির দক্ষিণে, কটন ইনষ্টিটিউসনের ব্যবহারার্থ একটী ত্রিতল বাড়ী খরিদ করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগে রাজা বাহাদুরের এরূপ দান অনেক আছে।

রুষ-ইংরেজে।—মস্কো গেজেটে প্রকাশ, মধ্য-এসিয়া লইয়া রুষ ও ইংরেজের মধ্যে যে অশান্তি চলিতেছিল, এক্ষণে তাহা দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে। উভয়ের মধ্যে শীঘ্রই শান্তি-স্থাপনের সম্ভাবনা। পামীরের সীমা নির্দ্দেশ জন্য কতকগুলি ইঞ্জিনিয়ারও টিফ্‌লিস্‌ হইতে পামীরে গমন করিয়াছেন। শুভ সংবাদ বটে!

চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিজ্ঞান ও সমীরণ।—ফৌজদারী বালাখানার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়েরা, এক্ষণে ঐ পত্রের প্রকাশ-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই আছেন। কাগজ বেশ চলিতেছে। উদ্যোগীদিগের অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। বঙ্কিম বাবুর সুন্দর ছবি ইহাঁরা বাহির করিয়াছেন।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান।

অষ্টম বর্ষ। { ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। } তৃতীয় সংখ্যা।

শঙ্কর-চরিত।

সংসারের যে দিকে নেত্রপাত কর, দেখিবে—মনুষ্য, ইতর জীব অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াও, মায়া-মোহের অন্ধকারে দৃগ্‌বিহীন। অনেক স্থলে পশ্বাদি অপেক্ষা ইন্দ্রিয়াধীন, এবং বাসনার তর্পণ জন্য অসদুপায়ের শরণ গ্রহণ করে। বাসনা কদাচিৎ দেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীবদিগকে অধিরোহিণীর ঊর্দ্ধপ্রান্তে উত্থাপিত করিতেছে, কখন বা কুম্ভীপাকের অন্তস্তলে স্থান প্রদান জন্য কুহক-জাল বিস্তার করিয়া কুবিগ্রহ বিধারণ করিতেছে। জীবগণের কেহ বা বাসনার মূল নির্মূল করিবার জন্য পুরুষকার-যজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ করিতেছেন, কেহ বা বাসনার অঞ্চল-দশায় আবদ্ধ হইয়া ক্রীড়নকের ন্যায় ক্রীড়িত হইতেছেন। কিন্তু বাসনার দাসত্ব-শৃঙ্খল-বন্ধনে সংসার বদ্ধ। ঐ যে সংসারত্যাগী ধ্যান-স্তিমিত-লোচনে তপশ্চর্য্যার অন্তরঙ্গ-সাধনায় আত্মোৎসর্গ করিয়া বাসনা-বীজ নিষ্পিষ্ট করিতেছেন, দ্বন্দ্ব-সহন-ক্ষমতার উৎকর্ষে প্রকৃতির পরাক্রম সঙ্কোচ করিতেছেন, শোকমোহাদি ষড়ূর্ম্মি পরিহার করিতেছেন, তাঁহারও বাসনা আছে। আর সুধাধবলিত সুরম্য হর্ম্ম্য-নিকেতন-ভোগ-সুখ-নিরত পুরুষেরও বাসনা আছে। একের বাসনা—বাসনা-মূল নির্মূল, অন্যের বাসনা—বাসনা-মূল পরিপোষণ। সকলেরই বাসনা আছে। বাসনা কাহারও নিকট বেশ-ভূষায় অনবদ্যাঙ্গী হইয়া যথেচ্ছ বিচালিত করে, কাহার বা বহির্দ্বারে বদ্ধ থাকিলেও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রভাব প্রকাশ করে, কাহারও নিকট দীনভাবে প্রবেশানুমতি পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিয়াও তিরস্কৃত হইয়া থাকে, কাহারও বা দৃশ্য-চক্রবালের মর্য্যাদা বিলঙ্ঘন করিতে বাসনার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। সংসার বাসনাময়।

শঙ্করের পিতা শিবগুরু, সংসারী হইয়াও, বাসনার তামস বা রাজস প্রভাবের তাদৃশ অধীন হইয়াছিলেন না। তদানীং ব্রাহ্মণ-জীবন, বিষয়ের বাহিরে থাকিয়া, আশ্রম-বিষয় উপভোগ করিতেন; অধুনাতন

ব্রাহ্মণের ন্যায় বিষয়-বাসনার চরণে আত্ম-বলি প্রদান করিতেন না। বিলাসিতা তখন ব্রাহ্মণের একান্ত হেয় ছিল; এখন একান্ত উপাদেয় হইয়াছে। আধুনিক ব্রাহ্মণাচার বা আত্ম-ধর্ম্ম-পরিপালন-দর্শনে তদানীন্তন ব্রাহ্মণাচার-অনুমান, একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। কলির প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তারিত হইবে; আর শিষ্টাচার-সদাচার তিরোহিত হইয়া অভিনব ব্যভিচারাচারের প্রাদুর্ভাব হইবে। শিবগুরুর সংসার-বাসনায় ঔদাস্য পূর্ব্বাবধিই ছিল। মধ্যে শিব-প্রসাদ-লাভে আদরের অঙ্কুর উন্মুখ হইতে হইতেই, শঙ্করের অমানুষিক দৈবশক্তির সন্দর্শনে ও আয়ুষ্কালের হ্রস্বতায়, আর উদ্গত হইল না। তিনি এখন সংসারে থাকিয়াও একরূপ নির্লিপ্ত। একদা তিনি অপরাহ্ণ-সময়ে কালাদিনাথ-মন্দিরের অদূরে বাপীতটে উপবিষ্ট হইয়া সরিৎ-শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। প্রতিদিন যাহা দেখিতেন, আজও তদ্রূপ দেখিয়া ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দেখিলেন, জলবেগী অবিরামবেগে চলিয়া যাইতেছে; যাহা তাহার অধিকারে উপস্থিত হয়, তাহাকেও কুক্ষিগত করিয়া চলিয়া যায়—আর ফিরে না; জল-জীবন মীনগণ স্বীয় বলে ক্ষণকাল গমনে বিরত হইলেও, আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়। শিবগুরুর মন বীচিমালার সহিত ক্রীড়া করিয়া যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। অবিলম্বে তিনি বাহ্যজগৎ ভুলিয়া দেখিতেছেন না, চিন্তিত বলিয়াও প্রতীয়মান হইল। তিনি একবার ভাবিলেন—'সূর্য্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নিয়ত উদিত-অস্তমিত হইতেছে, যথাসময়ে ঋতু-পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুখ-দুঃখ-সম্বলিত জীবজাত জন্ম-মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুর্নাশি কোনরূপেই বিচ্ছিন্ন হয় না। আত্ম-প্রিয়তম পুত্র, পিতার অপেক্ষায় জীবিত থাকে না। মৃত্যু উপস্থিত হইলে, মরণ নিশ্চয়; কিছুতেই তাহার প্রভব স্থগিত হয় না।' এইরূপ চিন্তার ক্রমশঃ সংসারের অনিত্যতায় দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়া, শিবগুরুর মনে আর এক আন্দোলন উপস্থিত হইল। 'জীব যদি মৃত্যুর অধীন, তবে আমি জন্মিলাম কেন? আমি কে? কেন ভূতে আসিলাম, আবার কোথায় যাইব? না নিধন হইলে আমার আমিত্বও বিলয়-প্রাপ্ত হইবে? যদি বিলয় পায়, তবে সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফল কোথায়? ধর্ম্মানুষ্ঠান-তপশ্চরণ কি তবে বৃথা? চিরপ্রচলিত ধর্ম্মাচরণে আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়; আমার কি কোন্ উৎকর্ষ হইতেছে? উৎকর্ষ হইলে সংসারে কেন ব্যাপৃত থাকি? সংসারের পাপতাপে কেন ক্লিষ্ট হই?' অন্য সময়ে এই সমস্ত ভাবনা শিবগুরু অনেক ভাবিয়াছেন। বিদ্যার্থীদিগকে শাস্ত্রতাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়াছেন, শাস্ত্রবিচারে বিচার করিয়াছেন; কিন্তু আজ আবার পূর্ব্বানুভূত চিন্তার উদ্রেকে আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে—'আমার কি হইবে?'—তাহাই ভাবিতেছেন; এমন সময়ে তাঁহার কর্ণবিবরে কে যেন আসিয়া সুধাবিনিদ্দিতস্বরে বলিয়া দিতে লাগিল—"কেন ভাবনায় ক্লিষ্ট হইতেছ? জগদ্গুরু তোমার গৃহে আবির্ভূত, বালক-বুদ্ধিতে তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেছ! তুমি পাঠচিন্তায় ক্লিষ্ট না হইয়া, এই মহাবাক্য নিরন্তর অনুধ্যান কর—'নাসিস্যং সংসারী তত্ত্বমসি'।"

এই মহাবাক্য শ্রবণান্তর, শিবগুরুর চিন্তাস্রোত ফিরিয়া গেল। চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া কোন প্রাণী দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন—সন্ধ্যা সমাগতা, বিহঙ্গমগণ স্ব স্ব আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। মৃদুল অনিল সৌরভ-সম্ভারে জীবজালা উপশমু করিতেছে। কুসুম-কলিকাবলী অর্দ্ধ-পরিস্ফুটিত। এই মনোরম সন্ধ্যা-মুহূর্ত্তে শিবগুরু, শিবসন্নিধানে মৃত্যুহরত্ব নিবেদন করিয়া, ধীরে ধীরে গৃহে উপস্থিত হইলেন। পালিতা কন্যা নন্দিনী, বিলম্বে উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, কোন উত্তর পাইলেন না। শঙ্কর, সমীপে সমাগত হইয়া বলিলেন,—"নাসিস্যং সংসারী তত্ত্বমসি।" যে মহাবাক্য কিয়ৎপূর্ব্বে অলক্ষিতস্বরে শ্রবণ করিয়াছিলেন, এখনও সেই স্বর,—সেই বাক্য। পূর্ব্বে শ্রাব্যিতার অভাব ছিল—এখন পুরোবর্ত্তী। শিবগুরু 'তত্ত্বমসি' ভাবিতে ভাবিতে, গৃহমধ্যে অচৈতন্য হইলেন; নিরুত্তর, নিস্পন্দ, নিষ্প্রভ—যেন যোগী যোগাসনে সমাধিমান্। ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখীন হইয়াছে। নির্ব্বিকল্প-সমাধিরত ব্রহ্মানন্দোদ্ভবকারীর সাদৃশ্যভাবে, শিবগুরু মৌনব্রত হইয়া প্রায় সার্দ্ধযাম অতিবাহন করিলেন। নন্দিনীর নিকট শিবগুরুর অবস্থা অবগত হইয়া, শঙ্কর-জননী সতীদেবী আসিয়া শিবগুরুর কথা বাহির করিলেন। শিবগুরুর আজও তাদৃশ সমাধির অধিকার না জন্মিলেও, 'তত্ত্বমসি' তত্ত্বে মনন-ধর্ম্মতার প্রাবল্য উপস্থিত হইয়াছিল। যে তত্ত্বে শ্বেতকেতু ঋষিবর নবকৃত্বঃ শ্রবণে মনন ও নিদিধ্যাসন্ন হইয়াছিল, সেই তত্ত্ব শিবগুরুর মুনোমন্দির ঝাটিতি আলোকিত করিবে—এতদূর সৌভাগ্য না থাকিলেও, শঙ্কর-সন্ততিতে অচিরে ব্রহ্মজ্যোতিঃ মুনোমধ্যে উদ্ভাসিত হইল। শঙ্কর বলিতে লাগিলেন,—"নাসিস্যং সংসারী তত্ত্বমসি।", শিবগুরু বলেন,—"তত্ত্বমসি।" শঙ্কর বলেন,—"তত্ত্বমসি।" শিবগুরু বলেন,—"তত্ত্বমসি।"

এইরূপ পিতাপুত্রে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য পরস্পর উদীরিত হইল;—শঙ্কর-জননী সতী আশ্চর্য্য, ভাবিতে ভাবিতে পার্শ্বস্থা হইলেন। কিছুকাল পরে সকলে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। শিবগুরু, চিন্তানুলে, দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাসমোচন করিয়া, বুভুক্ষা জানাইলেন। এইরূপে রাত্রি সুষুপ্তিসুখে অতিবাহিত হইল।

আশা-পাশ-শতে পরিবদ্ধজীব দেহপাতের পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও আশায় নির্ভর করিয়া শূন্যে অট্টালিকা প্রস্তুত করে, নানাবিধ সুখভোগের উপায় ও অবস্থার গৌরবে ভাবী কার্য্য নির্দ্ধারণ করে, কখন বা নির্মূল-দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মত জগৎ-নির্ম্মাণের বিবিধ উপাদান স্থির করে; কিন্তু উভয়েই কল্পভোগ বা অসুভবে অক্ষম। আশার বিচিত্র গতি! অঘটন-ঘটীয়সী আশা অপেক্ষা নির্মূল-দার্শনিকের কথার সঙ্ঘটন অল্প নহে। জীব আশায় সংসারের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া থাকে; জানে না, ভয়াল কাল মুখব্যাদান করিয়া সুদীর্ঘ হস্তে তাহার কেশাকর্ষণ করিতেছে। এই মুহূর্ত্তে যে জীব সংসার-পরিপাটীতে ব্যতিব্যস্ত, পর মুহূর্ত্তে হয় ত তাহার জীবলীলা নিঃশেষ হইয়া যাইবে—শিবগুরু একরূপ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল আর অধিক নহে; আশা ছিল, তৃতীয়াশ্রমে প্রস্থান করেন; সতীর নির্ব্বন্ধে তাহা হইতে পারে নাই। এক্ষণে, সংসার-নির্ব্বাহের সাধনগুলিকে ক্রমে ক্রমে অবহেলা করিতে লাগিলেন।

একদিবস নির্জ্জনে ভ্রাতা বিশ্বগুরুকে অনেক কথা বলিলেন। সেই সমস্ত কথা আমরা অদ্যাপি অবগত হইতে পারি নাই; সম্ভবতঃ শিবগুরুর দেহোপাতের পর শঙ্করাদির ভারগ্রহণের কথা হইবে, অথবা অন্য কথাও হইতে পারে। মায়া-মোহময় সংসারে অনেক মানুষ, মৃত্যুর পূর্ব্বে

এমন অনেক কথা বলিয়া থাকে, যাহাতে বুঝা যায় যে, তাহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী। শ্রোতৃগণ আদৌ গ্রাহ্যই তাহা উপেক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু পরিশেষে বুঝিতে পারেন পূর্ব্বোক্তি সত্য; তখন পরিদেবনা ব্যতীত আর কিছু ফল হয় না। আবার কেহ অতর্কিত-রূপে কোন কথা বলিয়া থাকেন, কার্য্যকালে তাহা যথার্থ হইল ইহা দেখিয়াও অনেকে বলিয়া থাকেন, লোকটা স্বীয় মৃত্যুকাল বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু শিবগুরু নিঃসংশয়িতরূপে অবধারণ করিয়াছিলেন, শীঘ্রই ভবলীলা শেষ করিতে হইবে। পঞ্চমবর্ষ হয় নাই বলিয়া, শঙ্করকে উপনীত করিতে পারিলেন না। তাঁহার এই আশা সফলতা-লাভ করিতে পারে নাই। সংসারী জীবের অনেক আশাই আত্মলাভ করিতে পারে না, ইহা সর্ব্বজনানুভূত। দুই একটী আশার সাফল্য হইলেই সংসারে অপার আনন্দ হয়। শিবগুরু বিপ্র, যথাবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সংশিতব্রত; চান্দ্রায়ণ, বৌদ্ধ ও শাস্ত্র-গর্হিত কাপালিক প্রভৃতির পাষণ্ডাচার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সংসারী ব্যক্তি বিদেশে গমন করিতে যেরূপ আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে নানা কথা বলিয়া যায়, শিব-গুরুও পরিণামের ব্যবস্থা নির্ব্বাহ করিলেন। চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা পরিপূত হইয়া, শেষদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময় শঙ্করকে নিকটে রাখিতেন। প্রীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে তদীয় মুখ-কমল সন্দর্শন করিতেন। স্নেহের এমনই মহিমা যে, বিপক্ষ-কষায় শিব-গুরু, শঙ্করকে পুত্রবাৎসল্যে শঙ্করূপে ভাবিয়া ধারণা স্থির করিতে পারেন নাই। সংসারে প্রতিমুহূর্ত্তেই হাসি, কান্না, অন্ধকার, আলোক প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কেহ শোক-মোহের সর্ম্মান্তিক যাতনায় পরিতপ্ত, কেহ আনন্দোদ্ভাসের স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। আজ যাহার অন্তঃকরণ সুখময়, কল্য হয় ত তাহাকে দুঃখভারে প্রপীড়িত হইয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইতেছে। শিবগুরু অসার সংসারের এই বৈচিত্র অনুভব করিয়াও, সংসার সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহার অদৃষ্টফল দৈবাধীনুকল্য ঘটিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া, চরমে ব্রহ্ম-ভাবনার স্থিরীকরণ জন্য বিশেষ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। শঙ্কর-বিগ্রহে শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞানস্ফূর্ত্তি লাভ হইল। ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়িল। পুত্রকলত্র-দিগকে শেষ দেখা দেখিয়া, প্রণবোচ্চারণ করিতে করিতে, মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন। ভৌতিক দেহ পড়িয়া রহিল। চৈতন্যে চৈতন্য মিশিয়া গেল। ঘট ভাঙ্গিল; আকাশে আকাশ মিশিয়া গেল। শঙ্কর হাসিতে লাগি-লেন। সতী দেবী এতদিন ভাবনার তীব্র দংশনের জ্বালায় তাদৃশ পীড়ানুভব করেন নাই; এখন অনাথা হইয়া কুররীর ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। নন্দিনীও তাঁহার সহিত স্বর মিশাইয়া, শোকধ্বনি তুমুল করিয়া তুলিল। বিশ্বগুরু, ক্ষণকাল তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া, যথারীতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন-পূর্ব্বক ক্রমে ঔর্দ্ধ্বদৈহিক-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন; এবং সতী, শঙ্কর ও নন্দিনীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিলেন। সতী, শঙ্কর ও নন্দিনীর মুখচন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণজালে পতি-শোকাগ্নিজ্বালা প্রশমিত করিলেন। মানব-শঙ্কর অবস্থাদৃষ্টায়ী সকলই সহন করিতে পারে। আজ যিনি শিরীষকুসুম-শয়নে শয়ন করিতে বেদনানুভব করেন, দুইদিন পরে কালের পরি-বর্ত্তনে তাঁহাকে মৃত্তিকাশয়নে শায়িত হইতে ততোধিক বেদনানুভব করিতে হয় না। দেখা যায়, যাহার বসন-প্রাচুর্য্যে শীত নিবারিত হইত, তাহার বসন-বিরহে বিবসনতায় শীত লক্ষিত হইতেছে। প্রকৃতিরই এইরূপ খেলা। দুরন্ত গ্রীষ্মের পর আষাঢ়-সম্পাতে শৈত্যানুভব—জ্যোৎস্নার পর অন্ধকার। দেহের দেহও প্রকৃতির অংশ; সুতরাং প্রকৃতি-ধর্ম্মানুগত। সতীর সমস্তই সহিয়া গেল। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন। নিত্য পতিমূর্ত্তি অন্তরে ধ্যান করিয়া, শঙ্করের বয়ন-বিধানার্থে, কঠোর ব্রতাবলম্বিনী হই-লেন। শঙ্করের পরিণাম-চিন্তা করিতেন। নন্দিনীরই বা কি হইবে? সে ভাবনাও তাঁহার মনে উদিত হইত। সপত্নীক বিশ্বগুরু ও শিবগুরুর ছাত্রবর্গ, যথাসাধ্য তদীয় পরিবা-রের পরিচর্য্যা করিতে ত্রুটি করেন নাই। সতী, শঙ্কর ও নন্দিনীর এ ধৈর্য্যস্থ সাংসারিক অবস্থিরা ঘটে নাই।

পিতার নিধন-সময়ে শঙ্করের মুখে হাস্যো-দয় হইয়াছিল। কৌমারকালে পিতার নিধন বুঝিতে না পারিয়া, শঙ্কর হাসেন নাই। যিনি বুঝিতে পারিয়া, শঙ্কর হাসেন নাই। যিনি বুঝিতে পারিয়া "তত্ত্বমসি" উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তিনি সংসার বয়সে পাণিনি-ব্যাকরণে সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, শাস্ত্রীয় বিচারে জ্ঞান-বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তৃপ্তিসাধন করিয়া-ছিলেন, ভারতের দুর্গতি যাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিয়া উদ্বেলিত করিয়াছিল, তাঁহার পিতৃ-নিধন-যোগ অমিয়াছিল না, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব। অহো হাস্যের অবশ্যম্ভাবী কোথায়? কেন হাসিয়া-ছিলেন? অনুসন্ধানে এই দেখা যায়, শঙ্করের সংসার-বন্ধনের একমাত্র অন্তরায় তিরোহিত হইয়া গেল। আর দেখিলেন—সংসারে সকলেই স্বার্থান্ধ; স্ত্রী, পতি-সেবা পতির জন্য করে না নিজের জন্য করে। পতিও স্ত্রী-প্রীতি নিজের জন্য করিয়া থাকে। এইরূপ প্রীতি-দ্বেষ প্রভৃতি জীব আত্মকল্য ও প্রতিকূল্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে; আর ঐ সমস্ত প্রীতি পরিসিত। অল্পে সুখ নাই; যাহা ভূমা, তাহাই অনন্ত সুখ। জীব অল্পত সুখের সাধনায় তাদৃশ আসক্তিমান্ না হইয়া, বিষয়-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। নিরন্তর দুঃখতরঙ্গে নিমগ্ন হইয়াও বিষয় বিসর্জ্জন করিতে পারে না; অন্তিম-সময়ে বিষয়-ভাব-নায় সদ্গতি লাভ করিতে পারে না। তখন আত্মলাভের জন্য অন্যুন্মুখবরণ তাদৃশ মনো-যোগী হয় না; কেবল উত্তরকালীন সাংসারিক ভাবনার অন্তস্তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া থাকে। কিন্তু শিবগুরু নিধন-সময়ে ব্রহ্মভাবনায় প্রস্রবণে পরিপ্লুত হইয়া, আত্মসাক্ষাৎ করিতে পারিয়া-ছিলেন—ইহাই হাস্যের নিদান। মানব, জঠর হইতে বিনির্গত হইলে, রোদন করিতে থাকে; অন্য লোকে আহ্লাদে হাসিতে থাকে। কিন্তু অন্তিম-সময়ে জগৎ যাহাতে রোরুদ্যমান হয়, মুমূর্ষু হাসিতে হাসিতে পরম পদ প্রাপ্ত হয়—এরূপ সাধনা করিতে পারিলেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সুসাধিত হয়। সংসারে অনেকেই এরূপ ভাগ্যবান্ নহেন। শিবগুরুর তাদৃশ ভাগ্য ছিল, ইহাও শঙ্করের উৎকৃষ্টতার অন্যতর কারণ। শিবগুরুর উদ্যোগে যাবতীয় পার-লৌকিক ক্রিয়া বিহিতরূপে নির্ব্বাহিত হইল।

শঙ্কর দেখিলেন, সময় দ্রুতবেগে অনন্ত-কালে মিশিয়া পড়িতেছে; জীব-জগতের আয়ুও তাহার সহচর—যায়, আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না। পাপরাক্ষসী ক্রমশঃ ভারতের সর্ব্বাবয়ব গ্রাস করিয়া ফেলিল। পাপরাক্ষসীর অন্তরায়িতে ভারত যদি জীর্ণ হইল, পুনরুদ্ধার সুকঠিন। এখন কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মবিকাসের উপযুক্ত সময়, কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। যে জন্য

ভূভারতে অবতরণ, তাহা সুসম্পন্ন হইলেই কর্ত্তব্য শেষ হয়; নচেৎ ভোগায়তন দেহধারণ ভারমাত্র। মহাত্মগণের লোকশিক্ষা ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে স্বকর্ত্তব্যতার প্রয়োজন থাকে না। এদিকে একটী জনরব ভারতের প্রায় সর্ব্বপ্রদেশে একপ্রকারে প্রচারিত হইল যে, বৌদ্ধধর্ম্মানুষ্ঠাতৃ ব্যতীত ধর্ম্মানুষ্ঠায়িগণ রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবেন। মগধরাজ এরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। পঞ্চালেশ্বর সনাতন-ধর্ম্মানুরত, বলিয়া, বৌদ্ধভক্ত মগধেশ্বর পঞ্চাল আক্রমণ করিবেন। শ্রমণগণ নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে এই ঘোষণা বিজ্ঞাপিত করিতে লাগিল। শ্রমণীগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া উহারই অনুকরণ করিতে লাগিল। এই সময়ে অনেক দুর্ব্বলাশয় বৌদ্ধ হইয়া পড়িল। কোন স্থলে বৌদ্ধের উৎপাত নিবারণ জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইল। কাপালিকগণ অরণ্যে গিরিগহ্বরেই অভিলাষানুরূপ আশ্রম স্থির করিয়া প্রেতসাধন করিত; সুযোগ পাইলেই লোকালয় হইতে বালকবালিকা অপহরণ করিয়া সর্ব্বনাশ-সাধন করিত। চার্ব্বাকাদি নাস্তিক-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ বৌদ্ধদলে মিশিয়া বৌদ্ধ-সম্প্রদায়কে বিভাগ করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাতে বৌদ্ধগণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়; যোগাচার, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও বৈভাসিক। কতক চার্ব্বাক স্বীয় নাস্তিক-সম্প্রদায়ের পরিপোষণ জন্য বৃহস্পতি-মতে প্রচারপরায়ণ হইয়া রহিল; এবং মনে যাহা সুখবোধ হয়, তাহারই উপদেশ প্রচারিত হইতে লাগিল। রাজা ভিন্ন ঈশ্বর নাই, পাপ নাই পুণ্য নাই, পরকাল নাই, কোন কিছুই নাই কেবল ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাই পরম পুরুষার্থ লোকের মন অতি সংজ্ঞেই ইহার গ্রাহক হইয়া পড়িয়াছিল। অসংযত মন যে পথে নিত্য ধাবমান হয়, এই মত তাহারই অনুযায়ী লোকে ইহা অনায়াসে প্রচারিত হইল বলিয়া লোকায়ত সম্প্রদায়ও এই সময়ে ইন্দ্রিয়-সুখের প্রপূরণ জন্য অশেষ অশ্লীলতি জন্মাইতে লাগিল। এইরূপ বহুবিধ কুমত বিস্তৃত হইয়া, ভারতের জীর্ণ হইতেছিল। ধর্ম্মরাজ্যের এই অরাজকতার পরাকাষ্ঠা প্রচার-কালীন ভগবান্ শঙ্কর আবির্ভাব। এদিকে শ্রমণোদিত ঘোর কালাদিত্যানে শিবগুরুর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল। 'সতীর অন্তরে কিরূপ পরিমাণে ভাবের উদ্রেক হইল। কালাদিত্যান মগধেশ্বর অনধীন হইলেও, বিধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের প্রচার পাছে শঙ্করকে কলুষিত করে,—ইহাই ভাবিয়া বিশ্বগুরু সতীকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া তদীয় পত্নী অনেক সময় সতীর চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়াস পাইতেন। এইরূপে শঙ্করের বয়স প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল।

শ্বেতকেতু।

(১)

শ্বেতকেতু বৈদিক কালের মহাপুরুষ। সেই প্রাচীনকালে ভারতে যতগুলি সমাজসংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, মহাত্মা শ্বেতকেতুকে তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানে আসন দেওয়া যাইতে পারে। যখন রাজশাসনের ভিত্তিমাত্র অবশিষ্ট হইয়াছিল, স্বার্থের উদ্দাম তরঙ্গ ও যথেচ্ছাচারের আবিল স্রোত হইতে সমাজের ক্ষীণ রেখা যখন ধীরে ধীরে উন্মেষিত হইতেছিল, ভারতের সেই আদিম যুগে—ভারতবাসীর সেই বিশৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায়, মহাত্মা শ্বেতকেতু আবির্ভূত হইয়া একটীমাত্র চেষ্টায় হিন্দুসমাজ গঠিত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছিলেন।" সমাজের যে সকল শক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত হইতেছিল, মহাত্মা শ্বেতকেতু স্বীয় অসামান্য প্রতিভা ও অদম্য অধ্যবসায়ের সাহায্যে তৎসমুদয়কে একত্রিত করিয়া একটী কেন্দ্ররূপে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।" বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতু-সম্বন্ধে বিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়। সেই দুইখানি প্রাচীন গ্রন্থে তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রচুর পরিচয় আছে। মহাভারতে, বর্ণিত আছে যে, ইনিই হিন্দুসমাজে প্রথমে বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বিবাহ-নিয়ম প্রচলিত ছিল না। স্ত্রীপুরুষগণ স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া মনোমত পুরুষ ও রমণীতে আসক্ত হইত এবং যতদিন ইচ্ছা একত্রে থাকিয়া আবার কামনা হইলেই পরস্পরকে ত্যাগ করিত; কোন কোন রমণী একটী পুরুষের আশ্রয়ে থাকিয়া অনায়াসে অপর পুরুষের সহিত সঙ্গত হইত; রাজশাসন তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিত না, ধর্ম্মনীতি তাহার বিরুদ্ধে অঙ্গুলিমাত্রও উঠাইতে সাহসী হইত না। প্রাচীন হিন্দুগণ এইরূপ যথেচ্ছাচারের স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে মহাত্মা শ্বেতকেতু আবির্ভূত হইয়া বিকট উদ্যমে সেই প্রতীপ তরঙ্গের গতিরোধ করিলেন। তরঙ্গ অনুকূল পথে প্রবাহিত হইল; তাহার স্বচ্ছ সলিলকণা সংস্পর্শে ভারতের ভাবী উন্নতি অঙ্কুরিত হইল। একটী মাত্র উদ্যমে, একটী মানুষের জীবনে, ভারতে একটী মহাযুগান্তর সাধিত হইল। লোকে বিস্মিত ও আশ্বস্ত হইয়া, আশাপূর্ণ-নয়নে অতীতের সহিত সেই অভিনব আবর্ত্তনের ফলাফল তুলনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

যিনি আমাদের এই অশেষ কল্যাণের নিদান, তাঁহার পবিত্র জীবনীর আলোচনা করিলেও পুণ্য আছে। এইজন্য, আমরা তাঁহার জীবনের যতদূর বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারি, —করিয়া, তৎসমুদয়ের অনুশীলন করিব। প্রথমতঃ শ্বেতকেতু কোন্ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অগ্রে তাহাই দেখিতে হইবে। ইহাতে আমরা ভারতের তদানীন্তন ধর্ম্ম ও সামাজিক চিত্রের অনেক আভাস পাইব। শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ও ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে, শ্বেতকেতু, বিদেহরাজ জনক, পঞ্চাল-রাজ প্রবাহণ

জৈবলি, এবং যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের সম্য-
সাময়িক ;—

"জনকো হ বৈ বৈদেহো ব্রাহ্মণৈর্বাবয়ন্নিঃ
সসাজগাম শ্বেতকেতুনারুণেয়েন সোমশুষ্মেণ
সাত্যযজ্ঞিনা যাজ্ঞবল্ক্যেন।"

অর্থাৎ—শ্বেতকেতু আরুণেয়, সোমশুষ্ম সাত্যযজ্ঞি ও যাজ্ঞবল্ক্য এই তিনটী ভ্রমণকারী ব্রাহ্মণের সহিত বিদেহরাজ জনকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা যে জনককে পাইলাম, ইনি সেই বিশ্রুত বিদেহবংশের প্রথম জনক কি না, তাহাই দেখিতে হইবে। বাল্মীকীয় রামায়ণ, বালকাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গে মিথিলার রাজবংশের সজ্ক্ষিপ্ত বিবরণ দেখা যায়। সীতার জনক রাজা শীরধ্বজ তথায় নিজবংশের পরিচয় দিবার নিমিত্ত বলিতেছেন,

"রাজাভূত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ স্বেনকর্ম্মণা।
নিমিঃ পরমধর্ম্মাত্মা সর্ব্বসত্ত্ববতাং বরঃ॥ ৩
তস্য পুত্রো মিথির্নাম জনকো মিথিপুত্রকঃ।
প্রথমো জনকোরাজা জনকানপ্যাবরঃ॥ ৪

এই নিমি, ভগবান্ বৈবস্বত মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ ইক্ষাকুর অন্যতম তনয়। কথিত আছে, ইক্ষাকুর একশত পুত্র ছিলেন; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিকুক্ষি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এবং নিমি মধ্যপ্রদেশে ও দণ্ডক দক্ষিণাপথে রাজত্ব পাইয়াছিলেন; অবশিষ্ট সকলে স্বেচ্ছাক্রমে আপন আপন মনোনীত স্থানে এক একটী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত নিমিই বিদেহবংশের প্রথম রাজা ও প্রতিষ্ঠাতা। ইহাঁরই কুলে সতী-সীমন্তিনী সীতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমির পুত্র মিথি; ইহা কর্ত্তৃকই মিথিলাপুরী প্রতিষ্ঠিত হয়।* । জনক ইহাঁরই পুত্র, এবং ইনিই প্রথম জনক। এক্ষণে এই জনক শ্বেতকেতুর সমসাময়িক কি না, তাহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

কৌশীতকী ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক আরণ্যক ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে, বিদেহরাজ জনক, পঞ্চালরাজ প্রবাহণ জৈবলি ও কাশ্য অজাতশত্রু, এই তিনটী রাজা এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁদের সহ যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গ্য বালাকি, চৈকিতায়ন দাল্ভ্য গৌতম ও শ্বেতকেতু প্রভৃতি ঋষিগণ আসিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাঁরা সকলেই পরস্পর সমসাময়িক। ইহাঁদিগের মধ্যে একজনের কাল নির্ণীত হইলেই শ্বেতকেতুর কালনির্ণয় সহজ হইয়া পড়িবে। ঋষিবংশ অপেক্ষা রাজবংশের নিরূপণে প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের মধ্যে কাশ্য অজাতশত্রুর বংশ লইয়া আলোচনা করিয়া দেখিব। ইনি কাশিরাজ; ইহাঁর অপর নাম কাশ্য। মহারাজ নহুষের ভ্রাতা ক্ষত্রবৃদ্ধ হইতে আদিপুরুষ। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে ইলা-পুত্র পুরূরবার ছয় তনয়; তন্মধ্যে আয়ু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আয়ুর পঞ্চ পুত্র,—নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনা।

"ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সুনহোত্র পুত্রোহভবৎ।
কাশ-লেশ-গৃৎসমদাস্তয়োরেষাং সুতা অভবন্
গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তয়িতা
অনু

কাশিস্য কাশিরাজস্ততো দীর্ঘতমাঃ
পুত্রোহভবৎ
ধন্বন্তরিঃ দীর্ঘতমঃ সোহভূৎ।"

* নিমেঃ পুত্রস্ত তজ্জৈব মিথিনাম মহান্ সুতঃ।

প্রথমং ভুজবলেনৈব তৈরহুতস্য পার্থিবঃ
নির্ম্মিতং স্বীয় নাম্নাচ মিথিলাপুরমুত্তমম।
ভবিষ্যপুরাণ

তৈরহুত অধুনা তিরুত নামে প্রসিদ্ধ।

ভাগবতে ক্ষত্রবৃদ্ধের এইরূপ বংশ-বিবরণই দেখা যায়। তবে তাঁহাদের নামে পার্থক্য লক্ষিত হয়।

"ক্ষত্রবৃদ্ধসুতস্যাসন্ সুহোত্রস্যাত্মজাত্রয়ঃ।
কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদঃ ——"

এখানে সুনহোত্রের পরিবর্ত্তে সুহোত্র এবং কাশের পরিবর্ত্তে কাশ্য নামে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু সুনহোত্র ও সুহোত্র, এবং কাশ ও কাশ্য যে এক, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কাশ্য বুধতনয় পুরূরবার অধস্তন চতুর্থ পুরুষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষাকু ও বুধের পুত্র পুরূরবা দুই জনেই সম্রাট্; কাজেই, পুরূরবা ইক্ষাকুর ভাবিনেয়। আবার আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বিদেহরাজ প্রথম জনক মহারাজ ইক্ষাকুর অধস্তন তৃতীয় পুরুষে বর্ত্তমান ছিলেন। এখানে কেবল একপুরুষের ন্যূনাধিক্য দেখা যাইতেছে। আবার কাশ্য ও জনক সমসাময়িক, এবং শ্বেতকেতু ইহাঁদের উভয়েরই সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং শ্বেতকেতু বিদেহরাজ প্রথম জনকের সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর এক কথা, বহ্ম্যক-পুত্র গার্গ্য ও ইহাঁদিগের সকলের সমসাময়িক। কৌশীতকী ব্রাহ্মণে এই গার্গ্য সম্বন্ধে এইরূপ দেখা যায়,—

"অথহৈব গার্গ্যো বালাকিরনূচানঃ
সংশ্রুষ্ট আস। সোঽহৈবসদ্ উশীনরেষু,
মৎস্যেষু কুরুপাঞ্চালেষু কাশী-বিদেহেষ্বিতি।
সহ অজাতশত্রোঃ কাশ্যাআজ্য উদ্বাহ।

অর্থাৎ, গার্গ্য বালাকি বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি উশীনর, মৎস্য, কুরুপাঞ্চাল, কাশী ও বিদেহদিগের নিকটে বাস করিতেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি অজাতশত্রু কাশ্যের নিকট আগমন করিয়াছিলেন।

পুনশ্চ, বৃহদারণ্যক উপনিষদে,—

"দৃপ্তবালাকিরহ অনূচানো গার্গ্য আস।
সহ উবাচ অজাতশত্রুং কাশ্যম্ —"

এই গার্গ্য কে, কাহার পুত্র, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। বায়ুপুরাণে ইহাঁর পরিচয় পাওয়া যায়,—

"বেণুহোত্রসুতশ্চাপি গার্গ্যো বৈ নাম বিশ্রুতঃ।
গার্গ্যস্য গর্গভূমিস্তু যৎসো বৎসস্য ভীমতঃ।"

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, গার্গ্য বেণুহোত্রপুত্র। কৌশীতকী ব্রাহ্মণে ও বৃহদারণ্যকে দেখা গেল, ইনি কাশ্যের সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কাশ্য বিদেহরাজ প্রথম জনকের সমসাময়িক, এবং শ্বেতকেতু গার্গ্যের সমসাময়িক; সুতরাং শ্বেতকেতু কাশ্যের ও প্রথম জনকের সমসাময়িক। অতএব এক্ষণে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল যে, মহাত্মা শ্বেতকেতু বিদেহরাজ প্রথম জনকের সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কাল নিরূপিত হইল। আগামীবারে তাঁহার পবিত্র জীবনীর আলোচনা করা যাইবে।

একনিষ্ঠা।

প্রেমের সৃষ্টি অপূর্ব্ব, প্রেমের দৃষ্টি অনন্যবিক্ষিপ্ত। যাহাকে ভালবাসি, তাহার মতন সুন্দর, মনোহর, নয়নানন্দদায়ক আর কোন বস্তুই সংসারে নাই ; ঠিক তেমনটী আর কখনও সৃষ্ট হয় নাই ; পরে কখনও যে তেমন আমার মনের মতন কিছু প্রস্তুত হইবে, এমন আমার ধারণা নহে, এবং সম্ভব বলিয়াও বোধ হয় না। আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহাতে ডুবিয়াছি, তাহা আর হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে ; আমি যেমন করিয়া দেখি, যেরূপে সাজাইয়া, যেভাবে দাঁড় করাইয়া, যেমন সকল ভুলিয়া, সকল তুচ্ছ করিয়া, উন্মত্ত-উদ্ভ্রান্ত হইয়া দেখি ; সেরূপে, সে ভাবে, ঠিক আমার মত হইয়া, আমার ভাবে মুগ্ধ হইয়া, আমার চক্ষে, আর কেহ দেখে না, দেখে নাই, এবং দেখিবেও না। আমার প্রণয়পাত্রের সৌন্দর্য্য এবং অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনা করিয়া বাক্যের ছটায় প্রকাশ করিতে পারিব না। কবিগুরু বাল্মীকির বর্ণনা-শক্তি আমাকে দেও, কালিদাসের উপমা-চাতুর্য্য আমাকে দেও, ভবভূতির শব্দপরিপাট্য আমার লেখনীমুখে বসাইয়া দেও, স্বয়ং দেবী ভারতী আমায় সহায় হউন, তবুও সে কেমন, তাহা তোমাকে বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিব না। যে সৌন্দর্য্যচ্ছটায় বিমুগ্ধ হইয়া দেবদানব রণ পরিহার-পূর্ব্বক অমৃতাস্বাদন আশায় বসিয়াছিলেন ; দানবগণ যাহাঁর রূপ অনিমিষ-নয়নে দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল, এবং যাহার জন্য তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল ; সেই মনোমোহিনী বিশ্ববিমোহন রূপ হইতেও আমার প্রীতিপা অতি সুন্দর, অতি মনোহর। তবে কেমন করি বলিব,—সে কেমন ? তুমি যদি আমি হইতে তোমারি যদি আমার মত চক্ষু, আমার ম ভাব হইত, তাহা হইলে তুমি, আমার চক্ষে আমার ভাবে, সেই অপরূপ রূপরাশি দেখিতে পাইতে। তাহা হইলে দেখিতে—আমা হৃদয়ের সামগ্রী ব্যতীত সংসারে আর যাহা কিছু আছে, তাহা সামান্য, সাধারণ এব হীন।

সংসারে আমার ন্যায় সকলেই দেখে সকলেই ভালবাসে, সকলেই মজিয়া ডুবি যায়। ভালবাসা সামগ্রীটা কেবল আমা একারও নহে ; ভালবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত হই কেবল আমিই যে সংসারে আসিয়াছি, তাহা নহে। কোটী কোটী জন ভালবাসার মহা সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়া উহার অথ অথাও সলিল-তলে পড়িয়া আত্মহারা হই য়াছে। কোটী কোটী মানব ভালবাসা মদিরা-পানে বিভোর হইয়া 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৃণতুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে। ভালবাসা সংসারে এই নূতন নহে ; ইহা অনাদি, অনন্ত, অ এবং অচল। তথাপি আমার কেমন মনে হয় যে, আমার মতন আর কেহ কখন ভালবাসে নাই, আমার প্রীতির সামগ্রী মত এমন অভিনব, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-উপা দানে-গঠিত আর কিছুই ইহার পূর্ব্বে সংসারে আসে নাই। আমার জীবনে ভালবাসা তড়িৎ-সঞ্চার নাকি এই প্রথম ; কাজেই, আমি যাহা দেখি, তাহা নূতন চক্ষে, নূতন ভাবে দেখি। তাই ধারণাও হয়, আমার দেখার মত দেখা বুঝি আর কেহ দেখে নাই। বাস্তবিক এই সংসারে আমার 'আমিত্ব' ত দুইটী নহে ; আমার শিক্ষা, আমারি ব্যবহার, আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আমাকে "আমার" মত তৈয়ার করিয়াছেন। আমার অবস্থাপন্ন হইয়া, আমার মত শিক্ষিত হইয়া, আমার ন্যায় পারিপার্শ্বিক-সঙ্গতির বায়ু পরিবেষ্টিত হইয়া, আর ত কেহ নাই ! সুতরাং আমি যাহা দেখি, আমি যাহা করি, আমি যাহা বুঝি, আমি যেমন করিয়া ভালবাসি, আমি যে ভাবে ছুটিয়া বেড়াই, তেমন করিয়া, সেইভাবে, ঠিক আমার মত, আর ত কেহ কিছু করিতে, বুঝিতে পারিবে না ! আমার "আমিত্ব" আমার, সুতরাং আমার ভালবাসা আমার নিজস্ব। কাজেই আমার মত ভালবাসা আর কাহারও সম্ভবে না ; এবং আমার ভালবাসার সামগ্রীর মত অদৃষ্টপূর্ব্ব অসাধারণ আর কিছুই নাই। পরের স্বর্ণকার্ত্তিকেয়-পুত্র মাতার চক্ষে ভাল বোধ হয় না, নিজের কষ্টিপাথরের নির্ম্মিত সুচিক্কণ ঘনকৃষ্ণবরণ বর্ত্তুলাকৃতি বালককেই অতি সুন্দর মনে হয় ! মায়ের কাছে কাণাখোঁড়া নাই, পরের মতামতের উপর নির্ভর নাই, পরের কথায় কর্ণপাত নাই ; তিনি স্নেহের চক্ষে নিজের তনয়কে সুন্দর দেখেন। তোমার ছেলে সুন্দর হইতে পারে, লোকনয়নাভিরাম হইতে পারে, কিন্তু তোমার কথা শুনিব না, তোমার লম্বা-চৌড়া সৌন্দর্য্য-সমালোচনায় আমি ভুলিব না। আমি বেশ জানি, আমার ছেলে চাঁদের কোনা, শশধর-সুধা-নিষ্ক্রান্ত ধন। তোমার বিচার-বিতর্ক ছাড়িয়া দিয়া, মা হইয়া পুত্র কোলে রাখিয়া, মার মতন তাহাকে যদি একবার আদর কর, ত বুঝিবে—তোমার নন্দন অনুপম, অসাধারণ, অসামান্য। মাতা হও, পিতা হও, বন্ধু হও, সখা হও, প্রণয়ী হও, যে যেভাবে মগ্ন থাক না কেন, যদি মনের সহিত লুকাচুরি না খেল, মনের মত ভালবাসিতে শিখিয়া থাক, তবে বুঝিবে যে, তোমার অনুরাগের সামগ্রী, যেমনই হউক না, তোমার চক্ষে অতি সুন্দর। তুমি বিশ্বমঙ্গলের ন্যায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি তৃণতুচ্ছ করিয়া, সকল ভুলিয়া, সকল ছাড়িয়া, কেমন পাগলের মত, উদ্ভ্রান্ত দিশাহারার ন্যায়, তীব্রতারস্বরে বলিবে—"চিন্তামণি ! তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর—অতি সুন্দর।"

ভক্তির রাজ্যে ইংরাজী উদারতা নাই। তোমারও ভাল এবং আমারও ভাল—একথা, প্রকৃত ভক্ত, যথার্থ প্রেমিক বলেন না। তোমার ভালমন্দের সংবাদ লইবার আমার কি আবশ্যক, এবং আমার অবকাশই বা কৈ ? তবে আমি জানি, আমার যাহা, তাহা ভাল—উত্তম—অতি উত্তম। ভালবাসা অন্ধ, একদেশদর্শী এবং সঙ্কীর্ণ। সকলেই সকলকে ভালবাসে ; তবে যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকেই স্পর্শমণি বলিয়া জানে। প্রণয়ের প্রথম সঞ্চারে, যখন প্রবাহের প্রথম বেগ আসিয়া সকল উলটপালট করিয়া দেয়, তখন কি-জানি মনে কি একপ্রকার অপূর্ব্ব উৎস উৎসারিত হয়—যাহাতে, কবির ভাষায়, প্রাণের কথায়, প্রণয়পাত্রের সৌন্দর্য্য, রূপমাধুর্য্য, প্রেমের অলৌকিত্ব, অপরিমেয়ত্ব দশজনকে শুনাইতে ইচ্ছা করে। কাজেই দেশের লোকের সহিত

একটু মনোবিবাদের সঞ্চার হয়। কেহ বলে, রাধাকৃষ্ণ ভাল; কেহ বলে, সীতারাম ভাল। গোল এইখানেই, বিবাদ-বিসংবাদ এইটুকু লইয়াই।

একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে, মানুষী প্রেমের মাপ-কাটিতে কি ভগবানকে ভালবাসিতে হইবে? তাঁহাকে কি সাধারণ প্রেমের ছড়া-ছড়ির মধ্যে ফেলিতে হইবে? তোমার আমার মত ভালবাসিলে কি ভগবানের কাছে প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হইবে না? উত্তরে আমরা বলিব, মানুষ ত রাক্ষসের মত অথবা দেবতার মত তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে না! মানুষের মনুষ্যত্বই আছে; সুতরাং যাহা তাহার যথাসামান্য আছে, তাঁহা দিয়াই ভগবানের পূজা করিবে। ভগবান মঙ্গলময়; যাহা তাঁহার, তাহাই পবিত্র এবং মঙ্গলাস্পদ। যদিও আমরা ক্ষুদ্র, তথাপি তাঁহার শক্তি দ্বারা সমুজ্জীবিত; সুতরাং আমাদের প্রেম-প্রীতি ভক্তিস্তুতি তাঁহার অগ্রাহ্য নহে। কাজেই মানুষের ভালবাসায় যেমন গতি ও পরিণতি, তাঁহাকে ভালবাসিলেও সেই গতি ও পরিণতি হইবে। সেই, পূর্ব্বরাগ, সেই অভিসার, সেই মান, সেই মিলন, সেই সন্দেহ সেই অনুযোগ, সেই উপরোধ, পরে সেই শান্তি, সেই বিশ্বাস! আবার যদি "মা" বলিয়া তাঁহাকে ডাক, ত যেমন শৈশব-কালে মায়ের কোলে শয়ন করিয়া স্তন মুখে দিয়া আনয়নে মায়ের সেই প্রশান্ত, স্নেহ-বিস্ফারিত নয়ন-দ্বয় দেখিতে, এবং সকলের মাতা অপেক্ষা নিজের মাকে বড় ভাল বোধ হইত; ভগবানের কাছেও ঠিক তেমনি ভাব, তেমনি দুর্ব্বাসী আসিয়া জুটিবে।

এই সংসারে থাকিয়া, ভাই-ভগ্নী-পুত্র-পরিবার লইয়া, যে সকল ভাবে বিভোর হইয়া আমরা গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করি, সেই সকল ভাবের মধ্যে একটা কোন ভাব ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিলে, ভক্তির সঞ্চার হয়। ভাব একাদশ প্রকারের, ভক্তি-সাধনা প্রণালীও একাদশ প্রকারের। ফলে, ভাবে যে সকল সাংসারিক লক্ষণ আছে, ঈশ্বরে আরোপ হইলে সেই সকল লক্ষণের পূর্ণপ্রকাশ হয়। সুতরাং সংসারের ভক্তি-ভালবাসায় যে সঙ্কীর্ণতা, যে একদেশদর্শিতা, যে বিদ্বেষলতা হয়, ঈশ্বর-ভক্তিতেও প্রথমাবস্থায় ঐ সকলের পূর্ণপ্রকাশ হয়। গোস্বামী তুলসীদাস সকল দেব-দেবীর স্তবস্তুতি করিতেন; কিন্তু পরিশেষে "সীতা-রামের" যুগলমূর্ত্তির পাদ-পদ্মে ভক্তির ভাব ঢালিয়া দিতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ত্রিভুবন "কৃষ্ণময়" দেখিতেন। ভক্ত-রামপ্রসাদ কৃষ্ণরূপেও মা-কালীর রূপ দেখিতে পাইতেন। এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। যে যে রূপে সিদ্ধ, যে যে ভাবে মগ্ন, সে সংসারেকে তদ্রূপ দেখে; এবং সেই রূপ, তাহার ওপ, শতদুন্দুভি ধ্বনিতে সংসারে প্রচার করিয়া দেয়। ফলে, ক্রমে ক্রমে অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়; এবং জাতীয় ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ বিধি উৎপন্ন হইতে পারে।

একনিষ্ঠা ভক্তির যেরূপও, একনিষ্ঠা ভক্তের ঈক্ষণ-যন্ত্র, একনিষ্ঠা ভক্তির ভিত্তিভূমি, একনিষ্ঠা ভক্তের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু ভক্তি—সাধনার সামগ্রী ভক্তের নিজস্ব, তাঁহার লুকান রতন। উহা প্রচারের ধর্ম্ম নহে, সমাজের নহে, জাতির নহে। যে অধিকারী, যে সাধক, সেই ভক্তি-রসামৃত পুনঃ করিতে অনুমতি পাইতে পারে। প্রকৃত ভক্তি ঢাকিয়া রাখিবার নহে; যে ভক্ত, সে শীঘ্রই ধরা পড়ে; এবং ভক্তির আতিশয্য-হেতু উন্মত্ত-উদ্ভ্রান্ত হইয়া, সামাজিক সকল নিয়মের বহির্ভূত হইয়া, ভক্ত পাগলের ন্যায় ব্যবহার করে। যখন সামাজিক বন্ধন দৃঢ় ছিল, তখন লোকে ভক্তকে শ্রদ্ধা করিত, পূজা করিত; কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার অচার-ব্যবহার অনুকরণ করিত না। যতী, সন্ন্যাসী, যতী, অবধূত প্রভৃতি সকলেরই উপদেশ সকলে শুনিত; কিন্তু গৃহস্থ-সংসারী তাঁহাদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিত না, এবং তাঁহারাও কখনও অসামাজিক উপদেশ গৃহস্থগণকে দিতেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শুভ নিয়মের ব্যত্যয় করেন—প্রথমে কবীর, পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তত্ত্বজ্ঞানী কবীর, তাঁহার তপঃসিদ্ধ মস্তিষ্ক-সম্ভূত তত্ত্বকথা, ছন্দোবন্ধে, দোঁহা-পদাবলীতে, সরল সহজ গ্রাম্য ভাষায়, অমৃত রচনাচাতুর্য্যের সহিত, লোকসমাজে প্রচার করিলেন; সামাজিক রীতি-নীতি-ব্যবহার, বৈষম্য ভাষার তীব্র কষাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিলেন। যাহা আবশ্যক তত্ত্বকথা, তাহা লোকসাধারণে প্রচারিত হইল; দুঃনিয়ন্ত্রিত সনাতন সমাজের এক অঙ্গ খসিয়া পড়িল। একে 'কলিকাল নিজ-দুর্বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রধান সময়', তাহার উপর কবীরের বাক্যশক্তি! দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার দল পুষ্টি করিতে লাগিল। জাতীয়তা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, লোকে ত্যাগ করিল। সকল একাকার হইবার উপক্রম হইল। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্য ভক্তির বার্ত্তা দেশে প্রকাশ করিলেন, উন্মত্ত হইয়া হরিগুণ গান করিলেন, মাতিলেন, ভুলিয়া "সকলের পদধূলি লইলেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম চুরিল, বৈদিক আর্য্য ব্যবহারের লোপ হইল, ছত্রিশ জাতি, এক করিবার চেষ্টা হইল। ফলে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, নেড়ানেড়ীর উৎপত্তি। ক্রমে ক্রমে এক দুই করিয়া অগণিত সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া ধর্ম্মের অঙ্গ জর্জ্জরিত করিল। আরও যে কত বিস্ফোটকের উৎপত্তি হইবে, তাহা ভগবানই জানেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম যদি সাধনার ধর্ম্ম হইয়া থাকিত, গুপ্তভাবে নিজ-সাধনা সিদ্ধির জন্য লোকে ধর্ম্মাচরণ করিত, এবং লোকে সামাজিক ও জাতীয় আর্যধর্ম্মের ব্যবস্থার অনুগত হইয়া চলিত, তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্ট হইত না। কিন্তু তাহা হইবার নহে; তাই একনিষ্ঠার দোহাই দিয়া, শাক্ত বৈষ্ণবের নাক কামড়াইয়া ধরিতেছেন, শৈব রামাৎগণের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। কেহ কাহারও নিন্দা করে, কেহ বা কুৎসা রটাইয়া দেয়। সকলেরই নিজের কথা, দশকাহন! কেহ কাহারও দিকে দৃষ্টি করে না।

তাহার পর, এই খর-বিলাস-বাতবিলোড়িত বিষম উনবিংশ শতাব্দী; তাহার উপর ইংরাজী শিক্ষার বিরাট প্রবাহ-আবর্ত্ত! লোকে একে চায় ত আরে পায়! অত্যাচার, অনাচার, কদাচার, জুলোকাবৎ ধর্ম্মের ও সমাজের চারিদিকে জড়াইয়া রহিল। শাস্ত্রের কদর্থ, কুটব্যাখ্যা হইল; নানা উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। সকলেই নিজের কথার জয়-ঢক্কা বাজাইয়া এক মহা শোর-গোল তুলিল। কিন্তু তখনও বৈদেশিক কথা, বৈদেশিক তত্ত্ব এবং পাশব আচার-ব্যবহারের আলোচনা হইত; সুধী ধার্ম্মিকগণ সনাতন ধর্ম্মের কোমল ক্রোড়ে নির্ব্বিবাদে নিদ্রা যাইতেন। কিন্তু কিছু দিন হইতে একটা উৎকট রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, শাস্ত্রীয় পুস্তক-বিশেষের কদর্থ করিয়া, আবার দেশের দোহাই, পূর্ব্বপুরুষের দোহাই, পুরাতন বীর্য্য-সামর্থ্যের কথা তুলিয়া, দুঃখী, দরিদ্র, ত্রস্ত, ভীত, অপমানিত হিন্দুগণের কাতর হৃদয়কে কোমল

করিয়া, এক উদ্ভট ধর্ম্মের বিকাশ হইল। গ্রামে, গ্রামে, পথে পথে, গৃহে গৃহে, প্রলম্বকেশ, স্থূলনখ, কাষায়-ভূষিত, নবীন তপস্বীর দল দেখা দিল। সকলেই যোগী, সকলেই ক্রিয়াশীল, সকলেই সংযমী! এই বিষম ক্রিয়ার তাড়সে কাহারও কাহারও হৃদ্‌রোগ হইল, কাহারও বা স্ত্রীপুত্র কাঁদিল, কাহারও বা ভাল চাকুরী গেল—বৃদ্ধ পিতামাতা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে বসিলেন, এবং কাহারও বা কেবল সূচিকণ ঘনকৃষ্ণনিবিড় গুচ্ছ গুচ্ছ চূর্ণকুন্তলের ন্যায় কেশরাশি লাভ হইল।

এখন আবার এক ভক্তিযোগের পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইয়াছে। বেশ, সুন্দর কেয়ারী-করা টেরী-ফাড়া চুল, বেশ সুবিন্যস্ত দাড়িরাশি, অতি সুঠাম পোষাক-পরিচ্ছদ; কিন্তু উনি, প্রধান চেলা, ভক্তশ্রেষ্ঠ! ভক্তির মুখে জাতি-বিচার নাই, সে প্রেমানন্দ-মেলায় সব একাকার —কিন্তু কিমাকার! সন্ধ্যা, আহ্নিক, নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া নাই; স্নান, দান, তীর্থপর্য্যটন নাই; দীনদুঃখী-অতুর-সেবা নাই; অতিথির আদর-অভ্যর্থনা নাই। আছে কেবল—নয়ন-কোনে জল-প্রস্রবণ! কাহার দোষ দিব? একনিষ্ঠার দোষ দিব, সাধন-ধর্ম্মের দোষ দিব, ধর্ম্মপ্রচারক আচার্য্যগণের দোষ দিব, না আমাদের পোড়া কপালের দোষ দিব?

একনিষ্ঠা কি, তাহা প্রথমেই যথাশক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছি। উহার অপপ্রয়োগে, অধিকার বিচার না করিয়া, কালাকাল না বুঝিয়া, এক নিষ্ঠার দোহাই দিয়া, ভক্তির সাহায্যে গায়িয়া, সাধন-ধর্ম্মের তত্ত্বকথা প্রচার করিলে, কি বিষময় ফল হয়, তাহাই যতদূর সম্ভব দেখাইলাম। কলিকালের এমনি অপূর্ব্ব মহিমা যে, যেমনই তীব্র তেজস্বী রক্তা হও না, যেমনই সরল-সুব্যাখ্যাতা হও না, তোমার বাক্যের পীযূষ-বর্ষায় ভক্তসাধু-সজ্জনের সৃষ্টি না হইয়া, ভক্ত প্রবঞ্চক, শঠ, লম্পট ধর্ম্মধ্বজীর সৃষ্টি হইতেছে। যে সুধামাখা কথা "গোপনেতে মাতৃভাষার" তাহা এখন করির ভাষায় অলঙ্কারের ছটা পত্রিকার অঙ্গাভরণ হইতেছে; যে গুরুদেব মধুর আদরের নাম গুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত হইবে, তাহা এখন প্রথ্যাতির সোপান হইয়াছে।

ভগবন্! রক্ষা কর, সুবুদ্ধি দেও, সৎপথ দেখাও, এই মূঢ়গণকে পবিত্রতার রাজপথে দাঁড় করাইয়া দেও। যেন আমরা বিনয়ী হই, অনুগত হই, সজ্জন-সেবক হই, সৎকথা-শ্রবণে অধিকারী হই। তুমি বুদ্ধি দেও, মেধা দেও, অভিনিবেশ-শক্তি দেও; তুমি অহঙ্কারকে চূর্ণ কর। বাক্‌সর্ব্বস্ব আমরা, আমাদের বাক্‌শক্তিকে হরণ কর। মঙ্গলময়, আমাদের মঙ্গলবিধান কর।

সুনীতি ও সুরুচি।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, মহারাজা উত্তানপাদের দুইটী মহিষী ছিলেন, জ্যেষ্ঠার নাম সুনীতি ও কনিষ্ঠার নাম সুরুচি। মহারাজা ছোটরাণীর বড় বশীভূত হন; এমন কি, তাঁহার অনুরোধে বড়রাণীকে বনবাসে পর্য্যন্ত পাঠান। সুনীতির গর্ভে ধ্রুব জন্ম-গ্রহণ করেন ও সুরুচির গর্ভে উত্তম জন্মান। মহাত্মা ধ্রুব পরম বৈষ্ণব ও চিরকাল ভগবানের সাধনায় কাল কাটাইলেন। তাঁহার ভ্রাতা উত্তম সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া, রাজত্ব করিলেন। কালে উত্তানপাদ মহিষীদ্বয় —সুনীতি ও সুরুচি স্বর্গারোহণ করিলেন; ধ্রুব তাঁহার স্বকীয় ধামে গেলেন, মহারাজা উত্তমও আনবলীলা সংবরণ করিলেন। সকলই গেল; কিন্তু সুনীতি ও সুরুচির ভিতর যে বিবাদ, তাহা রহিয়া গেল; তাঁহা চিরদিন চলিতে লাগিল। আজিও চলিতেছে; বোধ করি, অনন্ত কাল চলিবে।

সুনীতির অদৃষ্টে চিরদিনই বনবাসের কষ্ট-ভোগ, আর সুরুচির অদৃষ্টে রাজধানীর রাজ্য-ভোগ। আমরা সুরুচি-সম্পন্ন, যাহা হৃদয়ে আইসে, আমরা অকপটে তাহা বলিতে পারি না; কারণ, তাহা হইলেই রুচি-বিরুদ্ধ হইবে। সুরুচির এমনি অত্যাচার হইয়াছে যে, সুরুচি এই দারুণ গ্রীষ্মের সময় আমাদিগকে এই ভয়ানক গ্রীষ্মপ্রধান দেশে চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সাতপুরু কাপড় জড়াইয়া রাখে, সময়ে খাইতে দেয় না, ঘুম যাইলে ঘুমাইতে দেয় না, দুঃখ হইলে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে দেয় না, আনন্দ হইলে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে দেয় না, প্রাণের কথা সরল ও অকপট ভাবে ব্যক্ত করিতে দেয় না। আবার অপর দিকে তুমি ক্ষুধার্ত্ত না হইলেও তোমাকে খাইতে হইবে, তুমি দুঃখকষ্টে জর্জ্জরিত হইলেও ফুটিতে পারিবে না; তোমার সুখ হইয়াছে, চুপ করিয়া থাকিবে, তোমার সুখ বা দুঃখ হইলেও তাহা প্রকাশ করিতে পারিবে না, তোমার মনের ভাব, যতদূর সাধ্য গোপন করিতে হইবে।

এই সকল সুরুচির অত্যাচার! সুরুচি মহারাজার আদরে স্ত্রী। কথায় কথায় অভিমান। তোমাকে সুতরাং খুব সাবধানে চলিতে হইবে, বলিতে হইবে, বসিতে হইবে, উঠিতে হইবে। তোমার আমার নিকট সাক্ষাৎ করিতে আসিতে হইবে —নির্দ্দিষ্ট সময় একটা ঠিক করা আছে। তুমি তাহার এক দণ্ড আগে আসিলে বা পরে আসিলে তবে অমনি সুরুচির রাগ হইবে! তুমি বন্ধুসমাজে গল্প করিতেছ; কিন্তু খুব সাবধানে কথা কহিবে; দেখিও, যেন হঠাৎ একটা কিছু গ্রাম্যকথা বাহির হয় না; তাহা হইলেই তুমি মজিলে, সুরুচির কোপে পড়িলে। সুরুচির নিকট সুতরাং তোমার খুব সাবধানে থাকা চাই। সুনীতি, সুরুচির অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, সহসা ছাড়িয়া, অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন; আজিও বনে বাস করিতেছেন। তাঁহার বড় কষ্ট—বাসের কষ্ট! বাসস্থান—বিজন বিপিনে

একটী সামান্য পর্ণকুটীর, পরিধানে—চীরা-বলম্বন বা বল্কল-সম্বল, আহার—কটু-তিক্ত-কষায় বন্য ফলমূল মাত্র, পানীয়—প্রস্রবণের জল। সুরুচির সহিত তাঁহার সুখসম্পদের তুলনা হয় কি? সুরুচির সেই রাজপ্রাসাদ, বড় বড় কারুকার্য্য সুশোভিত দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা, সেই সুখার্থ মণিমুক্তা-খচিত রত্নালঙ্কার, সেই গাড়িঘুড়ির আস্ফালন, আর পানাহারের ত কথাই নাই! সুতরাং এ সংসারে সুরুচিরই জয়-জয়কার!

সাঁওতাল, কুকি প্রভৃতি দারুণ অসভ্য অরণ্যবাসী অনার্য্য জাতিরা, ভ্রমেও কখনও মিথ্যা কাহাকে বলে জানে না; চুরি, ব্যভিচার, অত্যাচার কর্ণেও শুনে নাই; ইহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি অলৌকিক গুণ। আর এদিকে ইহাদের আহার-পরিচ্ছদাদির দারুণ কষ্ট—দেখিলে ইহাদিগকে সুনীতির উপযুক্ত সন্তান বলিয়াই বোধ হয়। ইহাদের যে সকল গুণের কথা উল্লিখিত হইল, তাহা সর্ব্বদাই পুস্তকে পড়া যায় ও যাঁহারা ইহাদের সহিত কখন ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সর্ব্বদাই শুনা গিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা চালচলন বড় অসভ্য; সুতরাং সুরুচিসম্পন্ন নহে—ইহারা সুরুচির সপত্নী-পুত্র! পৌরাণিক ধ্রুবের ন্যায় এই সকল ধ্রুবেরা কখন রাজধানীতে যাইতে পারিবে না—রাজসিংহাসন পাওয়া ত দুরাশা মাত্র!

সুরুচির পুত্র উত্তম। উত্তমকে কেহ মন্দ বলিতে পারিবে না। তিনি আজন্ম উত্তম, বাপের আদুরে ছেলে, সিংহাসনের অধিকারী। কালে তিনি রাজা, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তাঁহার নিজের সুখসম্ভোষের ত কথাই নাই! তাহার উপর দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন তাঁহার হাতে। সহস্র সহস্র নরনারীর সুখদুঃখের তিনি নিয়ন্তা। সুরুচির এই ফল। আর সুনীতির ফল ধ্রুব। ধ্রুব বিজন বনে; দুঃখিনী, বনবাসিনী, মৃগিপত্নী-সহচারিণী মাতা সুনীতির ক্রোড়ে পালিত হইয়া, শিশুকাল হইতে স্থিরভাবে একান্তমনে ভগবানে মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া তাঁহার চিন্তায় মগ্ন। তিনি কালে অতীন্দ্রিয় দেবকে লাভ করিলেন; পদ্মপলাশলোচন পাইলেন; ভগবানও ধ্রুবকে কৃপাকটাক্ষে দেখিলেন। ধ্রুবের জন্ম সার্থক হইল, দুঃখিনী মাতা সুনীতির জন্মসার্থক হইল।

সুনীতি ও সুরুচির বিরোধের কথা পুরাণে বর্ণিত আছে; কিন্তু ধ্রুবের সহিত উত্তমের কখন কোন বিবাদ-বিসম্বাদ হইয়াছে বলিয়া কোথাও কোন উল্লেখ নাই। ধ্রুব, পিতার ত্যক্ত সিংহাসন উত্তম একরূপ অধিকার করিয়াছেন বলিয়া, কখন আপত্তি করেন নাই। সুনীতি-সন্তান তাহা করিবেন কেন? মহাত্মা ধ্রুব মনে করিলেন, নির্ব্বোধ ছেলেদের যেমন এটা-ওটা খেলানা দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে হয়, বাপের সেই আদুরে ছেলে উত্তম তেমনি রাজত্ব লইয়া খেলা করুক; আর তিনি বিজন বনে পর্ব্বতগুহায় থাকিয়া চিরকাল সেই—যিনি রাজার রাজা, তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখীন হইবার চেষ্টা করেন। পিতা উত্তানপাদ তাঁহাকে আদর করেন নাই, সত্য; কিন্তু যিনি রাজার রাজা, পিতার পিতা, তিনি যাহাকে আদর করিয়া কোলে লন, সেই চেষ্টায় ধ্রুব সর্ব্বদাই নিরত।

আমি যে ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উপরিলিখিত কয়েকটী কথা প্রকটিত করিলাম—তাহা যে সুস্পষ্ট করিতে পারিয়াছি, বোধ হয় না। পৌরাণিক ধ্রুবোপাখ্যান রূপক রূপ যেন কেহ মনে করেন না। আমার সে ধারণা নাই। সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস। যাহা সত্য, তাহার মার নাই, কালে তাহা ধ্বংস হয় না। ঐতিহাসিক ধ্রুবচরিত্র সত্যতা-গুণে চিরদিন সমান সজীব রহিয়া গিয়াছে, ইহাই বোধ হয় ধ্রুবের "ধ্রুবত্ব"। আবার বংশের মধ্যে একটী সুসন্তান হইলে তিনি সকলের উপরী হন, সেইজন্যই বোধ হয়, সপত্নী-পুত্র ধ্রুব, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতা সুনীতি, বিমাতা সুরুচি ও ভ্রাতা উত্তমকেও চিরজীবী করিয়াছেন। তিনি মহাত্মা, তাঁহার চক্ষে ইতরবিশেষ নাই। কিন্তু আমরা সামান্য-বুদ্ধি; তাই আমরা সুরুচিকে ধ্রুবের বিমাতা ও মহারাজা উত্তমকে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া কম ভক্তি করি। তাঁহাদিগকে ভয় করি, ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয় না। আমরা ধ্রুব নহি!

ভাষান্তরে ভাবান্তর।

কোন ভাষার একটি কথা ভাষান্তরিত বা অন্য ভাষায় অনুবাদিত হইলে, অনেক সময় সে কথাটির ভাবান্তর উপস্থিত হয়, অথচ আমাদের সে বিষয়ে কোন লক্ষ্যই থাকে না। প্রত্যেক জাতির অনেকগুলি কথায় সে জাতির একটা জাতীয় ভাব ও জাতীয় ইতিহাস থাকে। কিন্তু সে কথাটি যখন অন্য ভাষায় অনুবাদিত হয়, তখন সে জাতীয় ভাব ও জাতীয় ইতিহাস সে কথাটি প্রায়ই সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না—তাহাকে সেগুলি পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হয়। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। আমাদের ভাষার 'পুত্র' শব্দটির একটি জাতীয় ভাব ও জাতীয় ইতিহাস আছে। পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ করে যে, তাহাকে আমরা 'পুত্র' বলি। ইহাই হইল, পুত্র শব্দটির জাতীয় ইতিহাস। তাহার পর 'পুত্র' শব্দটি উচ্চারণ করিবামাত্র আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই হইল, এই কথাটির জাতীয় ভাব। এখন এই 'পুত্র' কথাটি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে আমরা 'son' কথা ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু আমাদের 'পুত্র' আর ইংরাজী son সর্ব্বাংশে কি এক হইতে পারে? ইহাতে ভাষান্তর হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাবান্তর ঘটিল না কি?

আমাদের ভাষা হইতে কোন কথা ভাষান্তর করিতে হইলে, অনেক স্থলে সে ভাষায় সেরূপ ভাবসমন্বিত কথা পাওয়া অসম্ভব; সুতরাং কেবল অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনুবাদ করিতে আমরা বাধ্য হই। স্ত্রিস্ত যখন অন্য ভাষার কথা আমরা আমাদের ভাষায় অনুবাদ করি, তখন একটু সতর্ক হইয়া আমাদের ভাষান্তর করা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থলে কেন আমরা আমাদের জাতীয় ভাব ও ইতিহাস-রূপ একটা

নূতন পরিচ্ছদ সেই ভাষার কথাটিকে পুরস্কার দিব? আমাদের মূল্যবান পৈত্রিক সম্পত্তি যদি অযাচিতভাবে বিতরণ করি, তাহা হইলে ক্রমে আমাদের কি সকল সম্পত্তি নিজের করিয়া রাখিবার যত্ন থাকিবে না।

যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে চারিদিকেই আমাদের ক্ষতি দেখিতেছি। বিজাতীয়ের সংসর্গে পড়িয়া, আমাদের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, খরচিচ্ছদ, আহার, বিহার প্রভৃতি সকল বিষয়েই একটা ভয়ানক বিপ্লব চলিতেছে। এই বিপ্লবের স্রোতে পড়িয়া, আমাদের সকল জাতীয় সম্পত্তিই ভাসিয়া চলিয়াছে—আমাদের জাতীয় ভাব ক্রমেই লোপ পাইতেছে। এ সময় যদি আমরা আমাদের বৃদ্ধ পিতামহের লাঠি-গাছটিও রক্ষা করিতে পারি, সে লাঠিও আমাদের বড় আদরের হয়। পিতার ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে আমরা সকলেই ব্যগ্র, কিন্তু এই জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে কাহাকেও সেরূপ ব্যগ্র দেখি না কেন? বিশেষতঃ যখন কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেই এই জাতীয় সম্পত্তির সমান অধিকারী, তখন সকলের সমবেত চেষ্টায় এই অমূল্য জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বড়ই সুখের বিষয়, ইদানীং আমাদের জাতীয় ভাব যেন অল্পে অল্পে জাগ্রৎ হইতেছে। অনেক হিন্দুসন্তানের এখন আর বিজাতীয় ভাবেতেতদ্বৎ শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুমুকন্দলেও হিন্দুধর্ম্মের একটা আলোচনা চলিতেছে। হিন্দুর বেদ, হিন্দুর উপনিষৎ, হিন্দুর পুরাণ, হিন্দুর গীতা প্রভৃতি যাহা এত দিন অপাঠ্য—কবির কল্পনামাত্র বলিয়া আমাদের সুকবিদের দূষিত হইত, এখন তাহাদের মুখেই এই সকলের মহিমা-কীর্ত্তন আবার শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন একটু স্রোত ফিরিয়াছে। অথবা যেরূপ ভীষণ বেগে সেই বিপ্লবের স্রোত চলিয়াছিল, সে স্রোতের সে বেগ এখন আর নাই। সুতরাং এই সময় সর্ব্বাগ্রে আমাদের জাতীয় ভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত। কারণ, জাতীয় ভাব যা চরিত্র রক্ষা করিতে না পারিলে, অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষত্ব না থাকিলে, সে জাতি অন্য জাতির নিকট কি বলিয়া আপনার পরিচয় দিবে? আর এক কথা, নদীর বাঁধ যখন ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন যদি সেই বাঁধকে রক্ষা করিতে হয়, তবে দ্বিগুণ পরিশ্রম, উৎসাহ, যত্ন ও অধ্যবসায়ের আবশ্যক করে। সেই কারণে আমরা বলিতেছি, এক্ষণে এই জাতীয় ভাব বা চরিত্র রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের দ্বিগুণ পরিশ্রম, উৎসাহ, যত্ন ও অধ্যবসায়ের আবশ্যক। আবার আমাদের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, আহার বিহার প্রভৃতিতে যেরূপ জাতীয় ভাব বর্ত্তমান আছে, আমাদের জাতীয় ভাষাতেও সেইরূপ একটা জাতীয় ভাব প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাই স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্য আমরা অদ্য এই প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

ভাষার এই জাতীয় ভাব রক্ষা সম্বন্ধে যে উপায় আমরা উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহাও অতি সাধারণের নিকট প্রস্তাব করিব। সে উপায় নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা বুঝাইতেছি।

মনে করুন, ইংরাজী ভাষায় একটী শব্দ আছে 'father'। এই "father" কথাটী আমাদের ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে আমরা সচরাচর 'পিতা' কথাটী ব্যবহার করিয়া থাকি। অর্থ এক হইলেও, ইংরাজের

'father' আর আমাদের পিতা কখনই এক হইতে পারে না। ইংরাজের 'father' কেবল জন্মদাতা ও বাল্যকালের প্রতিপালক মাত্র, কিন্তু আমাদের পিতা কি কেবল তাহাই? জন্মদাতা ও বাল্যকালের প্রতিপালক ব্যতীত আরও কিছু নয় কি? ইংরাজের father এবং sonএ যে সম্বন্ধ, আমাদের পিতা-পুত্রে কি সেই সম্বন্ধ? পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতরপ্রাণীর পিতাপুত্রে যেরূপ সম্বন্ধ, ইংরাজ জাতির father এবং son এর মধ্যে প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। ইংরাজের সমাজে এবং ব্যবহারিক আইনে কোন উপায়ক্ষম যুবা তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকেও প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহে; কিন্তু আমাদের সমাজে এবং হিন্দুশিরোধার্য্য কোন যুবার এরূপ অন্যায় ব্যবহার কি কেহ অনুমোদন করিতে পারে? সেই কারণ বলিতেছিলাম, আমাদের পিতা কেবল জন্মদাতা ও বাল্যকালের প্রতিপালক নহে; আমাদের শাস্ত্রমতে,—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

তবে কেন আমরা স্বর্গছার এই অমূল্য রত্নের বিনিময়ে কাচ গ্রহণ করি? আমাদের ভাষার একটী সূক্ষ্ম কথার এই বহুরত্নখচিত অমূল্য সুন্দর পরিচ্ছদটী, আমাদের জাতীয়ভাবের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া, অন্য ভাষার সেই অর্থবোধক কথাটীকে বিনা-মূল্যে কেন প্রদান করি? সেই কারণ আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, অতঃপর এই 'father' কথাটী অনুবাদ করিতে, হইলে, পিতা শব্দ ব্যবহার না করিয়া, কেবল 'জন্মদাতা' শব্দটী ব্যবহার করা উচিত। এরূপ করিলে অর্থের কোন গোলযোগ ঘটে না, অথচ আমাদের জাতীয় ভাব রক্ষা করা যায়। এমন সহজ উপায় থাকিতে, আমরা কতদিন এ বিষয় উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি কেন? যদিও আমাদের ভাষায় এরূপ উন্নতভাবযুক্ত কথা থাকে, যাহা অন্য ভাষায় নাই, সে ত আমাদের ভাষার গৌরবেরই কথা। তবে আমরা সে গৌরব রক্ষা না করিব কেন?

এই father কথাটীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ইংরাজী mother কথাটীর সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই বলা যাইতে পারে। এই mother কথাটীকে আমাদের ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে, আমরা সচরাচর 'জননী, মাতা বা মা' কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের মা, আর ইংরাজের mother কখনই এক হইতে পারে না। বাল্যকাল ফুরাইয়া গেলে, জননীর সহিত আমাদের সম্পর্ক ফুরায় না। জননী যতদিন জীবিত থাকিবেন, তাহার ত কথাই নাই, জননী মৃতা হইলেও আমাদিগের সহিত তাঁহার সম্পর্ক যাইবে না; কেবল আমাদের সহিত কেন—আমাদের পুত্র, পৌত্র, প্র-পৌত্র প্রভৃতি বংশাবলির সহিতও তাঁহার সম্পর্ক সমানরূপে থাকিবে। তাঁহার ঋণ কেহই পরিশোধ করিতে পারিবে না; পরিবারস্থ জীবিত লোকদিগের যেরূপ আহার যোগাইতে হয়, ভক্তির সহিত সেই মৃতা জননীরও সেইরূপে আহার যোগাইতে হইবে। ফলতঃ আমাদের 'মা' আর ইংরাজের mother কখনই এক হইতে পারে না। আমাদের—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সি।"

এই অর্থবোধক একটিমাত্র শব্দ যদি আমরা এই mother শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করি, তাহা হইলেই যথেষ্ট হয়। আমাদের মতে কেবল 'গর্ভধারিণী' কথাটিকে 'mother এর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে ছাড়িয়া দিতে পারা যায়।

তাহার পর এই wife কথাটি। আমরা সচরাচর এই ইংরাজী কথা অনুবাদে 'সহধর্ম্মিণী' বা 'স্ত্রী' কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু ইংরাজের 'wife' আর আমাদের সহধর্ম্মিণী বা স্ত্রী, আকাশ-জমী প্রভেদ। জন্মজন্মান্তরেও যাহার সহিত সম্পর্ক বিচ্যুত হয় না, ইংরাজের 'wife' কি তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে? আমাদের বিবাহ-বন্ধন জন্মান্তরেও ছিন্ন হইবার নহে, আর ইংরাজের বিবাহ-বন্ধন দিনের মধ্যে সাতবার ছিন্ন হইতে পারে। তবে আমরা ভাষার এরূপ অপব্যবহার করি কেন? আমাদের মতে এই অর্থবোধক 'ভার্য্যা' কথাটি এই কথার অনুবাদে ব্যবহার করিলে চলিতে পারে।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই—ইংরাজী ভাষার এরূপ অর্থতঃ ভাবান্তরে যে আমাদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে, তাহা কেহই উপলব্ধি করেন না। ইংরাজী-শিক্ষিতদল স্বদেশীয়ের সহিত মাতৃভাষায় কথোপকথন করিতে গিয়া প্রায় বার আনা ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা পিতার পরিবর্ত্তে father, মাতার পরিবর্ত্তে mother এবং স্ত্রীর পরিবর্ত্তে wife—এই জাতীয় ভাব বিহীন শব্দ দিবারাত্রি শত সহস্রবার ব্যবহার করিতেছেন। তাহাতে ফল হইতেছে এইযে, আমাদের পিতাকে ক্রমে আমরা ইংরাজী 'father' করিয়া তুলিতেছি। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়ই যেরূপ পিতৃভক্তি এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্যই পিতাকে তাঁহারা এখন 'ওল্ডফুল' মনে করেন। মাতাকেও আমরা ইংরাজী 'mother'এর দলভুক্ত করিতেছি, তাঁহারও প্রতি আমাদের সেরূপ ভক্তি বা শ্রদ্ধা এখন আর নাই। তিনি এখন আমাদের "বাপের পরিবার", সেবা ও শুশ্রূষার পরিবর্ত্তে এখন তাঁহার 'গুদাম ভাড়ার' ব্যবস্থা। আমাদের সহধর্ম্মিণী বা স্ত্রী এখন ষোল আনা wife হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, wife এর আদর্শে আমরা তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছি।

ভাষার অপব্যবহারের কি শোচনীয় বিষময় পরিণাম দেখুন। আমাদের এরূপ মূল্যবান জাতীয় ভাব ও জাতীয় ইতিহাস আমরা হারাইতে আরম্ভ করিয়াছি! কেবল যে ভাষার অপব্যবহারই এইরূপ হৃদয়বিদারক জাতীয় ক্ষতির একমাত্র কারণ, আমরা তাহা বলি না; কিন্তু ভাষার অপব্যবহার যে এরূপ পরিণামের অনেক অংশে সাহায্য করিতেছে, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত।

অদ্য আমরা একটা প্রস্তাব মাত্র করিয়া দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। এ প্রস্তাব আমাদিগের ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মনোনীত হইলে, সময়ে সময়ে আমরা এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ভোলার আলয়ে।

(১)

মধুমাখা কথা গরল-হৃদয়!
অনেকে রসিক পরের নিন্দাই!
অচেতন হ'য়ে অন্যে পড়ে রয়,
অক্ষম তাহারা আপন রক্ষায়!
ভারত-শ্মশানে গৃধিণী-নিচয়—
শবমাংস লয়ে প্রমত্ত ক্রীড়ায়!

(২)

প্রেমের অভাবে বিশুষ্ক হৃদয়—
নিজ নিজ প্রেমে সবে ব্যস্ত হায়!
জাতীয় গৌরব হয়েছে গো লয়,
ধন মান যশ সব লুপ্তপ্রায়!
শ্মশানের দৃশ্য দেখে ভয় হয়!
কলঙ্কিনী মাতা! দেগে প্রাণ যায়।

(৩)

সে দৃশ্য দেখিয়া কাতর অন্তর—
হইয়া এসেছি আমি গো হেথায়;
এসেছি কৈলাসে হ'য়ে হতাশয়;
রয়েছি আনন্দ-তরুর ছায়ায়!
বিভোর প্রেমেতে ভোলার আলয়!
অদ্বৈতভাবেতে পূরিত হৃদয়।

(৪)

কৈলাস-শিখরে শিবের আলয়,
অমরাবতীর দর্প-খর্ব্ব-কর!
হর-গৌরী-রূপে নিত্য জ্যোৎস্নাময়!
স্ফটিক-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যরাজিময়—
অমল ধবল গিরিরাজিচয়—
ধরে শিরে নিত্য চূড়া হিমময়।

(৫)

নন্দীভৃঙ্গী দ্বারী রয়েছে এথায়,
যোগী ও যোগিনী কোটী কোটী রয়—
গৈরিক বসনে আবরিত কায়,
মুখে ব্যোম্ ব্যোম্ করিছে সদাই;
ত্রিশূল ভীষণ করে শোভা পায়!
দুই করে শোভে রুদ্রাক্ষ-বলয়।

(৬)

রুদ্রাক্ষের মালা গলে শোভা পায়!
বিভূতি কলেবরে সদা মাখা রয়!
নয়নে নয়নে হেরে গলে যায়!
অদ্বৈত ভাবেতে লজ্জার বিলয়!
লিঙ্গ-ভেদ নাই অদ্বৈত লীলায়,
ভেদজ্ঞান লয় প্রেমের খেলায়।

(৭)

অপূর্ব্ব সকলি দেখি গো এথায়,
নাহি গো কিছুই লোক-লজ্জাভয়!
প্রেমে পাগলিনী যোগিনী যথায়—
প্রেমের পাগল সনে সদা রয়!
ভৈরবের সনে ভৈরবীনিচয়—
সাযুজ্য-নির্ব্বাণে হইয়াছে লয়।

(৮)

নাহিক কাহারো লৌক-নিন্দাভয়!
ভোলার আলয়ে নিন্দার বিলয়।
পাগলিনী আর পাগল-নিচয়—
পাগল-নাথের আলয়ে পো বয়?
সকলে পাগল হয় গো যথায়,
সেখানে কিসের লোক-লজ্জাভয়?

(৯)

ব্যোম্ ব্যোম্ রবে গগন ফাটায়—
পাগলিনী আর পাগল-নিচয়!
নাচে গায় সবে মিলিয়া তথায়,
প্রেমেতে বিভোর সবার হৃদয়!
অন্তর বাহির সরলতা-ময়!
ধবল আলয়ে ধবল আশয়।

ঠাকুর-ঝি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাতাঠাকুরাণী ও অমলা চলিয়া গেলে পর, শরৎকুমারীর মুখে ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। যতক্ষণ হীরালাল অসুস্থ-অবস্থায় ভূমিশয্যায় পড়িয়া ছিলেন, ততক্ষণ শরৎকুমারীর প্রাণ হীরালাল বাবুকে সুস্থ করিবার জন্য ব্যস্ত ছিল; কিন্তু যখন বাবু এতদূর সুস্থ হইলেন যে, মাতাঠাকুরাণীর নিকট নিজের দোষ গোপন করিবার জন্য মিথ্যাকথা বলিতেও কুণ্ঠিত নন, তখন শরৎকুমারীর ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ না পাইবে কেন? তবে শরৎকুমারীর ক্রোধের সময়-অসময় জ্ঞান নাই বা ভাবী পরিণামের প্রতিও লক্ষ্য নাই — কাহার ক্রোধেরই বা আছে? শরৎকুমারী ক্রোধ-ভরে বলিল,—"বলি, ও মাতাল ও মিথ্যা-বাদি, মা-বোনের সম্মুখে মাতলামী করতে আর মিথ্যা কথা বল্‌তে লজ্জাবোধ হলো না?"

হীরালাল তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া উত্তর করিলেন,—"সে লজ্জার মাথা তুমিই আমার খাইয়েছো।"

তাহার পর শরৎকুমারীর ক্রোধের পরিমাণ ও কর্কশ কণ্ঠ যখন হীরালাল বাবুর হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন বাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"কিন্তু শরৎ, আমার এ মাতলামীর তুমিই গুরু—আমার এ মিথ্যা কথারও তুমিই গুরু। মনে পড়ে শরৎ, আমি এক বৎসর বিজয়ার দিনে আমার বাড়ী থেকে সিদ্ধি খেয়ে ঘরে এসেছিলুম; তুমি সেইদিন আমায় মাতাল মনে করে, আমার সঙ্গে কত ঝগড়া করলে, আর সেই দিন থেকে আমার নাম মাতাল মাতাল। আর মনে পড়ে কি—আমার বন্ধু সুরেশের যে রাত্রে কলেরা হয়, আমি সে রাত্রে বাড়ী আসতে পারি-নি; সকালে এসে সমস্ত সত্যি কথা তোমায় বল্লুম; তুমি সে কথা বিশ্বাস না করে, আমার মুখের সামনে আমায় মিথ্যে-বুজ্‌রো বলেছিলে, আর সেই থেকে আমার নাম রেখেছ—মিথ্যেবাদী। শোন শরৎ, শোন! তুমি মাতাল নাম রেখেছিলে তাই আমি আজ মাতাল; আর তুমি আমার মিথ্যেবাদী নাম রেখেছিলে, তাই আমি আজ মিথ্যেবাদী।"

হীরালাল বাবুর উত্তেজিত কথায়, শরৎকুমারীর ক্রোধের মাত্রা হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইল। শরৎকুমারী তৎক্ষণাৎ ক্রোধস্বরে বলিল,—"বলি, ও সত্যবাদী যুধিষ্ঠির! আজ এত রাত্তির অবধি তোল্ চুলোয় ছিলে? আজও কোন বন্ধুর ওষ্ঠাউঠা হয়েছিলো না কি?"

হীরালাল।—এরো উত্তরে আমি মিথ্যা কথা বলিনা। এখন তোমার কৃপায় মদে আমার ঘৃণা নেই, মিথ্যে কথাও আমার মুখে আটকায় না।

শরৎ।—আর তোমায় সে পাপের ভাগী হতে হবে না; আমি সব বুঝেছি—সব জেনেছি। এত রাত্তির মদ খেয়ে কোন্ ভালবাসীর ঘরে পড়েছিলে?

হীরালাল বাবুর এখনও বেশ নেশা ছিল, মদের উত্তেজনার উপর, শরৎকুমারীর নীরস ও কর্কশ-কণ্ঠের উত্তেজনায় কেবল প্রথমে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এবার কিন্তু সেই নেশার মহিমায় সরস ভাষায় বলিলেন,—"কি মধুরভাষিণী? আবার বেশ্যা ধরাবে না কি? এতো করেও তোমার আশা মিট্‌লো না? মদ, মিথ্যে কথা—তার উপর আবার বেশ্যা! এইবার আমার আর একটা নাম বেড়ে গেল যে! প্রথমে হলুম মাতাল, তারপর হলুম মিথ্যেবাদী, এইবার আমার লম্পট! সাবাস্ সুন্দরভাষিণী—সাবাস্!"

শরৎকুমারীর এতক্ষণ পরে হঠাৎ যেন চৈতন্য হইল। শরৎকুমারীর ক্রোধের লক্ষণ আর নাই; সেই কর্কশ কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তে শরৎকুমারী এইবার মধুর-কণ্ঠে বলিল,—"আর কথায় কাজ নেই। রাত্তির শেষ হয়ে এলো, এখন গিয়ে শোবে চল, তা নইলে কাল নিশ্চয় তোমার অসুখ করবে।"

হীরালাল বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আর তোমার ঐ বিদ্যুতের আলোয় আমার কাজ নেই; যেমন অন্ধকারে আছি, যেন তেমনি অন্ধকারেই থাকি। তুমিও, এতক্ষণ যেমন সুধাবর্ষণ করছিলে, চিরকাল তেমনি সুধাবর্ষণ কর। আর মধ্যে মধ্যে এ বিদ্যুতের আলোর দরকার কি?"

শরৎকুমারীর কথার সুর তখন পুনরায় একটু চড়িয়া গেল। তবে এ চড়া তত কড়া নয়, ইহাকে মিঠে-কড়া বলা যাইতে পারে। শরৎকুমারী বলিল,—"বলি, এমন বিষ খাবার দরকার কি? সুস্থ শরীরকে অসুস্থ করে ফল কি হয়? কোন্ দিন যে রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ে মরবে!"

হীরালালের স্ফূর্ত্তির এখনও হ্রাস হয় নাই। সুতরাং স্ফূর্ত্তিযুক্তস্বরে বলিলেন,—"বা! বা! আবার রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়েও মারা যায় নাকি? সুবুদ্ধিদায়িনি! তুমি এত বুদ্ধি কোথায় পেলে? আমি যে তোমায় এতদিন কেবল মধুরভাষিণী বলেই জান্‌তুম্! দেখ, আমি মাতাল নই; একবার অজ্ঞান হয়েছিলুম বটে, কিন্তু আমার জ্ঞান টন্‌টনে আছে। তোমার যা কিছু বিদ্যে থাকে, প্রকাশ করে ফ্যালো—এ তোমার দুষ্কো মনে মুক্ত ছড়ানো হবে না।"

শরৎকুমারীর আর সহ্য হইল না; মিঠে কড়া সুর তখন পুরা কড়ায় উঠিল। সেই ক্রোধরূপ ভূতটা পুনরায় তাহার ঘাড়ে চড়িয়া বসিল। শরৎকুমারী ক্রোধস্বরে বলিল,—"তবে সমস্ত রাত বসে বসে মাতলামী কর, আমি ঘরের দরজা দিয়ে শুইগে।"

কথাটা কেবল মুখে বলা নয়; শরৎকুমারী অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া সত্যসত্যই শয়ন-ঘরে গিয়া ঘরের দরজা সুজোরে বন্ধ করিয়া দিল। ক্রোধের অসাধ্য কাজ কি আছে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শরৎকুমারী শয়ন-ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিবার পর, হীরালাল ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইচ্ছা, একবার শয্যায় গিয়া শয়ন করেন। কিন্তু সে ইচ্ছা সফল হইবে কিরূপে? শরৎকুমারী যে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে! হীরালাল দুই-একবার দরজা ঠেলিয়া আপনার সে ইচ্ছা শরৎকুমারীকে জানাইলেন; কিন্তু ক্রোধ-পরায়ণা ও মানিনী শরৎকুমারীর তখনও ক্রোধ ও মানের মাত্রার হ্রাস হয় নাই, সুতরাং হীরালালের সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হইল না। ইচ্ছা পূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু প্রাণে একটা বড় আঘাত লাগিল। হীরালাল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি; আমার শয়ন-ঘরে আমারই প্রবেশ নিষেধ। আর আমার পতিপরায়ণা স্বাধ্বী স্ত্রী আমারই পালঙ্কের উপরে সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন!"

হঠাৎ যেন একটা বৃশ্চিকদংশনের যন্ত্রণায় হীরালাল অস্থির হইয়া উঠিলেন। এখন এ যন্ত্রণার কিসে উপশম হয়, হীরালাল তাহার জন্য ব্যগ্র হইলেন। হীরালালের যন্ত্রণার উপশমের আর কি ঔষধ আছে? একটী আত্মগ্লানি আসিবার পথ তখন বন্ধ হইয়া গেল; হীরালাল উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—"মদ, কে বলে তুমি আমার শত্রু? তুমি আমার বন্ধু—পরম বন্ধু—এখন আমায় এই যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা করো।"

হীরালাল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দ্রুতপদে উপর হইতে নীচে নামিতে লাগিলেন। এখন মনে আর অন্য চিন্তা স্থান নাই—কেবল এত রাত্রিতে কোথায় মদ পাওয়া যায়! ধন্য মদ! ধন্য তোমার কুহকিনী শক্তি!

হীরালাল বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেলে পর, শরৎকুমারী মনে মনে স্থির করিল যে, এইবার দরজা ঠেলিলেই উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিবে। কিন্তু হীরালাল চলিয়া গিয়াছেন, এখন আর দরজা ঠেলিবে কে? শরৎকুমারীর যেমন কথায় কথায় ক্রোধ—সে ক্রোধ আর কতক্ষণ থাকিবে? ক্রোধ যদি গেল, তবে শরৎকুমারী কি আর তাহার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীকে বাহিরে রাখিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে পারে? শরৎকুমারী শয্যায় পড়িয়া কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করিল; তাহার পর, কি একটা কথা মনে হইবা মাত্র, ক্রোধ, মান, অভিমান সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া শরৎকুমারী দৌড়িয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। কিন্তু একি! শরৎকুমারী দরজা খুলিয়া সেই জ্যোৎস্নায় রাত্রিতে অন্ধকার দেখিল!

শরৎকুমারীর হীরালাল কোথায়? শরৎকুমারী তখন মণিহারা ফণীর ন্যায় চারিদিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। শরৎকুমারী না সেই মাথার মণি আঁচাকুড়ে ফেলিয়া দিয়াছে? তবে এখন এই গভীর রাত্রে তাহার জন্য এত দৌড়াদৌড়ি কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শরৎকুমারীর কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাহাকে বুঝিতে পারা যায় না।

তাহা বুঝিতে পারা না যাউক, কিন্তু এখন তাহার হীরালাল গেল কোথায়? হীরালালের যে আত্মগ্লানি আসিতে আসিতে পথ হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল, শরৎকুমারীর সেই আত্ম-

গ্লানি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শরৎকুমারী স্বামীর অন্বেষণ করিতেছে, আর মনে মনে বলিতেছে,—"আমার মুখে আগুন, আমার রূপের মুখে আগুন! এত চেষ্টা করি, তবু কেমন রাগ সাম্‌লাতে পারি-নে! তাঁকে দেখ্‌লেই, কেমন কোথা থেকে রাগ এসে পড়ে, আবার না দেখ্‌লে অস্থির হয়ে বেড়াই। কোথায় তুমি জীবিতেশ্বর! আর একবার দেখা দাও, আমি তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবো—দাঁতে ঘাস কুটো, বইবো। তোমায় বড় ভালবাসি, তাই বড় ব্যথা পাই—তুমি একবার আমায় দেখা দাও।"

শরৎকুমারী তখন আর স্বামীর দেখা কোথা পাইবে? নীচে—উপর সর্ব্বত্র খুঁজিল, তাহার পর সদর-দরজা খোলা দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিল। একটা নৈরাশ্যের ভীষণ আঘাতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। শরৎকুমারী এ সময় কি করিবে, প্রথমে কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না; তাহার পর ধীরে ধীরে ঝিকে ডাকিল। ঝি তখন নাসিকা-ধ্বনিতে দিক্‌দিগন্তর কম্পিত করিয়া ঘোরে নিদ্রা যাইতেছিল। শরৎকুমারী তাহাকে অনেক ডাকিল, তথাপি তাহার আর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। সে পূর্ব্ব নাসিকাধ্বনি থামিল, সে সজোরে নিশ্বাসের টান কমিল; কিন্তু সে জাগ্রৎ-নিদ্রা আর ভঙ্গ হইল না। তখন অগত্যা শরৎকুমারী, স্থির সে জাগ্রৎ-নিদ্রা ভঙ্গের আশা পরিত্যাগ করিয়া, শাশুড়ীকে সংবাদ দিল। সঙ্গে সঙ্গে অমলাও সে সংবাদ শুনিল। মাতা ও ভগিনীর প্রাণ সে সংবাদে বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। এই গভীর রাত্রিতে কোথায় কিরূপে তাঁহারা হীরালালের অনুসন্ধান করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মাতা, ভগিনী ও স্ত্রীতে অনেক পরামর্শ করিলেন; কিন্তু এরূপ অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকের দ্বারা সেই রাত্রিকালে কি উপায় স্থির হইতে পারে? অমলা নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিল। জননী সরবে চীৎকার করিয়া কাঁদিল; কিন্তু শরৎকুমারীর চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু কেহ দেখিতে পাইল না!

মুখচন্দ্র, না মুখপদ্ম?

"মুখচন্দ্র, না মুখপদ্ম?"—কবিরা আমাদের মুখের উপমা না তুলনা দিতে হইলে, হয় মুখচন্দ্র, না হয় মুখপদ্ম বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমি বলি, আমাদের এ মুখের তুলনায় আকাশের চন্দ্র বা এ দো-পুকুরের পদ্ম কোন মতেই দাঁড়াইতে পারে না। কবিরা এমুখের তুলনা দিতে আকাশ-পাতাল ত্রিভুবন খুঁজিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহারা কল্পনার নেশায় বুঁদ কিনা—তাই স্থষ্টির এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর বস্তুর পরিবর্ত্তে এক চক্রাকার চন্দ্র আর এক হাঁ-করা পদ্ম ভিন্ন আর কিছু খুঁজিয়া পান নাই! পাঠক মহাশয়-গণ! আপনাদিগের যদি গৃহিণী কেহ থাকেন, তবে ঐ গোলাকার চাঁদের সহিত আর এ দো-পুকুরের হাঁ-করা রাক্ষসী পদ্মটার সহিত

তাহার মুখের একবার তুলনা করিয়া দেখিবেন! দেখিলেই বুঝিবেন, উপমাটা ঠিক হইয়াছে কিনা? যদি না হইয়া থাকে, তবে এতকাল কবির এই অত্যাচার আপনারা সহ্য করিতেছেন কিরূপে? গুণপুরুষ কবিদের মুখে আগুন! আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, জন্ম-জন্মান্তরে তাঁহাদের যেন ঐরূপ মুখশ্রীবিশিষ্টা পত্নীই হয়! পাঠকগণ! আপনারা সাবধান হউন —কবির ছলনায় আর ভুলিবেন না।

আমরা অবলা, সরলা, কুলবালা বলিয়াই এরূপ ভয়ানক অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছি। পুরুষের মধ্যে অনেক অবলাবান্ধব নারীহিতৈষী নরবর দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আমাদিগের এই ভয়ানক অত্যাচারের প্রতি এপর্য্যন্ত কেহই দৃষ্টি করেন নাই। তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির মুখে আগুন! গুণপুরুষরা আমাদের বৈধব্য-যন্ত্রণা মোচন করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল; কিন্তু আমাদের শারীরিক সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে কবির এরূপ ভয়ানক অত্যাচারের প্রতি তাঁহারা যেন কুম্ভকর্ণের বরপুত্র! আমি শুনিয়াছি, ইংরাজের দণ্ডবিধি-আইনে এরূপ বিধান আছে যে, স্ত্রীলোকের কোনরূপ অঙ্গহানি দ্বারা সৌন্দর্য্য-হানি করিলে, ঐ আইন-অনুসারে গুরুতর দণ্ড হয়। কৃতাঞ্জলিপুটে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের প্রার্থনা এই, আমাদের সৌন্দর্য্যনষ্টকারী এই কবিকুল-নেশাখোর কবিকুলের প্রতি উপযুক্ত বিধান-মুতে দণ্ড হউক। যাঁহারা আমাদের এ মুখের সহিত আকাশের ঐ কলঙ্কিনী চন্দ্রের, আর এ দোপুকুরের পদ্মের সহিত তুলনা করিতে পারেন, তাঁহারা না পারেন কি?

এখন চন্দ্রটা কি জিনিষ, দেখা যাউক। আমি চন্দ্রের কলঙ্কের কথা ধরি না; সে ত কবিরা কল্পনা! যে এক মাসের মধ্যে একদিনও আপনার আকৃতি ও সৌন্দর্য্য স্থির রাখিতে পারে না, এরূপ অস্থায়ী-সৌন্দর্য্যশালিনীর সহিত আমাদের মুখের তুলনা! আরে ছি!! দিনে দিনে যাহার আকারের পরিবর্ত্তন হয়, যাহার মাসেমাসে অমাবস্যা-পূর্ণিমা আছে, তাহার সহিত আমাদের মুখের তুলনা? ধিক্ ধিক্—কবিকুলে শতধিক্! আমাদের মুখের অমাবস্যা-পূর্ণিমা আছে কি? কি সাদৃশ্য দেখিয়া কবিকুল এই অস্থায়ী সৌন্দর্য্যের সহিত ঐ অস্থায়ী সৌন্দর্য্যের সাদৃশ্য পাইলেন? আমি কি সাধে বলিয়াছি, তাঁহারা কজনার নেশায় বুঁদ!

তাহার পর সেই রঙ্গের কথা। "দুই দিন পরে যাহার শতদল পাপ্‌ড়ি একএকটী করিয়া ঝরিয়া যায়, তাহার সাহত আমাদের মুখের তুলনা! কোন্ গুণধর বলিয়াছেন,—"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং।" এই কি কবির রসিকতার পরিচয়? রাত্রি প্রভাত হইলে যাহার সৌন্দর্য্য থাকে না, সেই ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্যের সহিত আমাদের মুখের তুলনা?

এবার এই পর্য্যন্তই রহিল। অবলা সরলা পহিয়া আমাদিগের প্রতি কবিকুল আর কিরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন, ক্রমশঃ তাহাও প্রকাশ করিব।

রূপাভিসার।

আও আও আও পরাণ-সজনি,
বঁধুয়া দরশে যাওয়ে।
দরশ পরশ বিহনে তনুক,
সোয়াস্তি কাহেকো পাওয়ে?
নয়নাভিরাম বঁধুয়াক রূপ,
শুধই অমিঞা ছাকা।
কবি পরাভব ওরূপ বর্ণনে,
মানে পরাভব ভাষা॥
যতিহঁ বরণ, যতিহঁ গঠন,
আছত ভুবন ভরি।
বঁধুয়া রূপক, নিছনি সে সব,
বালাই লইয়া মরি॥
নবীন ক্লাটা, যোগী কাণফাটা,
রূপ নিরূপণ চাওয়ে।
ধেঁয়াই ধেঁয়াই যুগযুগান্তর,
অনুভব নাহি পাওয়ে॥
শঙ্কর, বিধিকি, পঞ্চ চতুর্ম্মুখে,
গাওত সো রূপ-গীত।
সহস্র লোচনে ওরূপ নিরখি,
ইন্দ্র নহে 'তিরপিত'॥
ওরূপ নেহারি লাজছে ঘমরি,
দামিনী চঞ্চল ভৈল।
বঁধু-রূপ হেরি শরমে শশাঙ্ক,
ক্ষীণ মলিন ভৈগেল॥
ওরূপ যদিহঁ অঞ্জন ভেলত,
রঞ্জন করিতু আঁখি।
ওরূপ যদিহঁ নবনী ভেলত,
হিয়ামে রাখিতু মাখি॥
ওরূপ যদিহঁ কুসুম-ভৈলতু,
পরিতু খোপামে তুলি।
ওরূপ যদিহঁ রেশম ভেলত,
রহিতু নাসায় দুলি॥
ওরূপ যদিহঁ অমিঞা ভেলত,
সতত লইতু তার।
এ জগবঞ্চক না মিটল সাধ,
না টুটল হাহাকার॥

অশ্রুকণার কথা।

আমি বড় অভাগিনী। সীতা যেমন স্বামী-সহবাসে বঞ্চিতা হইয়া শিঞ্জন কাননে নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন, আমিও না-জানি কেমনি কাহার শাপে সমুদ্রনদনদী হইতে চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া, নরনারীর নয়নপ্রান্তে নীরব নির্ব্বাসনযন্ত্রণা সহ্য করিতেছি। আমি অনেক সময় ভাবি,—আমি ক্ষুদ্রপ্রাণ দুর্ব্বল জলবিন্দু, এমন কি পাপ করিয়াছিলাম, যে এরূপ ভীষণরূপে দণ্ডিত হইলাম! ভাবি, কি পাপে আমি চিরদিনের জন্য স্বাধীনতা হারাইলাম! ভাবিতে ভাবিতে সুনীল আকাশপটে চাহিয়া, দেখি, নবীন নীরদমালার ক্রোড়ে, আমার ন্যায় কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা, ক্ষুদ্র হৃদয় লুকাইয়া রহিয়াছে। কখনও বা পবনহিল্লোলে মন্দমন্দ ভ্রমণ

করিতেছে। কখনও বা সৌরকরলাঞ্ছিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছে। কখনও বা ক্ষণিকলীলায় নানাবিধ মূর্ত্তিতে আলোকিত হইতেছে।

"Sometime, we see a cloud
that's dragonish,
A vapour, sometime, like a
bear, or lion,
A tower'd citadel, a hendant rock".

মধুর মধুরীগণ এই বিমানবিহারী জলবিন্দু নিচয়কে দেখিয়া কেকারবে নৃত্য করিতেছে। চিরপিপাসিত চাতক অতিমাত্র হর্ষে উৎফুল্ল হইতেছে। বিরহীবিধুরা রমণীগণ প্রিয়তমের আগমনে আশ্বস্ত হইতেছেন।

"ত্বমাকৃঢ়ঃ পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।"

আশাস্থল হইয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে—ভাবিতেও ইহাঁদের সুখ। কিন্তু হায়! আমি নিজে চিরসন্তপ্ত, কেমন করিয়া অন্যের সুখবিধান করিব? আতপদগ্ধ মরুভূমি কি কখনও মধুগন্ধ প্রসূন প্রসব করিতে পারে? আবার স্ফুটফেনখচিত ঊর্ম্মিমালাদোলিত সুবিশাল মহাসাগরের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখি, সেখানেও সিন্ধুবক্ষে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা তরঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছে। আবার, কেহ কেহ নির্ঝরিণী-মুখে পতিত হইয়া নদীবক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে। সমীরণের সহিত একতানে কুলকুলরবে গান করিতেছে। কত সুন্দর সুন্দর সৌধের প্রাঙ্গণদেশ ধৌত করিয়া যাইতেছে। ইহারাও আমা অপেক্ষা কত সুখী! আবার, ফুল্লসরসীর কোমলদলের উপর কত শিশিরকণা মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহারা ঈষৎ বাত্যাদোলিত হইলেই অভিমানভরে জলে মিশিয়া যাইতেছে। কিন্তু এ সকল সুখ বিধাতা আমার ভাগ্যে লিখেন নাই। নীরবে ঝরিয়া শুকাইবার জন্যই বুঝি আমাকে গড়িয়াছেন। সে যাহাহউক, যাহাদিগের সহিত আমার চিরকালের জন্য সম্বন্ধ, তাহাদিগের প্রীতিপ্রফুল্ল মুখের শোভা আমি দেখিতে পাই না কেন? যখন তাহারা মর্ম্মান্তিক দুঃখ বা শোকে নিপীড়িত হয়, তখন তাহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিবার জন্য আমি উছলিয়া উঠি কেন? তোমরা আমাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে ভূষিত মনে কর; কিন্তু আমার হৃদয়ে যে হলাহল নিহিত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে পাও না। তোমরা মনে কর, আমার দেহ কোমল, হৃদয়ও বুঝি শিরীষকুসুমের ন্যায় কোমল। তোমরা আমাকে এখনও চেন নাই, কখনও যেন চিনিতেও না হয়। যে আমাকে একবার চিনিয়াছে, সেই অপরিসীম দুঃখ ভোগ করিয়াছে। জনৈক বঙ্গীয় মহিলা-কবি আমাকে চিনিয়া বলিয়াছেন,—

'জুড়াইতে হৃদয়-যাতনা
হৃদয়ের সখা মনে কমি
হৃদে তোরে যত চেপে ধরি
ততই যে ছিঁড়িয়া যাঁড়িয়া
ফেলিস্ রে মরমের স্থল;
সুকোমল দেহখানি লয়ে
দারুণ নিঠুর কেন বল?'

হিমানী যেমন সুজাতপঙ্কজকোষের শ্রীকে ক্রমে ক্রমে নষ্ট করিয়া ফেলে, আমিও তেমনি নরনারীর মুখলাবণ্যের অপচয় সাধন করি। যখন তাহারা শোক বা দুঃখে বড় আকুল হয়, তখন বিরামদায়িনী নিদ্রার কোলে মাথা রাখিয়া ক্ষণকালের জন্য দুঃখ ভুলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমি চক্ষু আচ্ছন্ন করিলে, নিদ্রাও আর তাহাদিগের দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হয় না।

* * * * নিদ্রা

আকাঙ্ক্ষন্তি নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাঃ।"

মানুষের এমন শত্রু আমি, তথাপি তাহারা আমাকে ভালবাসে, আমার দুঃখে তাহারা দুঃখ প্রকাশ করে। যখন আমি উদ্বেলিত হইয়া গণ্ডদেশে আসিয়া উপনীত হই, তখন তাহারা আমাকে অঞ্চলে মুছিয়া ফেলে; পাছে আমার সুকোমল দেহ ভূমিতে আঘাত পায়, তাই অতি-যতনে অঞ্চলে মুছিয়া ফেলে। হিন্দুবিধবার ন্যায় আমি একপক্ষে তাহাদিগের অপ্রীতিকর, পক্ষান্তরে দয়ার পাত্রী। হিন্দুবিধবা যেমন কোন উৎসবের সময় উপস্থিত হইলে, সকলে বিরক্ত হয় এবং তাহা অমঙ্গলের আশঙ্কা করে, আমার সম্বন্ধেও ঠিক তাই। হিন্দুবিধবার দুঃখে যেমন সকলে সহানুভূতি প্রকাশ করে, আমার দুঃখেও তেমনি ব্যথিত হয়। যাহারা আমাকে এত ভালবাসে, আমি তাহাদিগেরই সর্ব্বনাশ করি। মনে হইলে বড় লজ্জা হয়। আর মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু কি করি, বহুকে কষ্ট দেওয়াই আমার স্বভাব। বিধাতার সৃষ্টি কি ক্রমশঃ না করিয়া থাকিতে পারে?

আমি বড় দুর্ব্বল। এত ক্ষুদ্র যে, আকাশের দিকে চাহিতে আমার ভয় হয়। ভয় হয়—কে কোথা হইতে আসিয়া নিমেষে আমার ক্ষুদ্র দেহখানি উড়াইয়া লইয়া যাইবে, কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে মিশিয়া যাইব; চিহ্নমাত্রও থাকিবে না, চিরভুবন অন্বেষণ করিলেও আর কেহ আমাকে খুঁজিয়া পাইবে না।

আমার এ অনন্তদুঃখময় জীবনেও সময়ে সময়ে সুখ অনুভব করি। যখন দীর্ঘকালের পর জননীপুত্রে কিম্বা স্বামীস্ত্রীতে সাক্ষাৎ হয়, তখন তাহাদের সুখে সুখী হইয়া আমি হাসি। আমার সে হাসি নাকি বড় নয়নপ্রীতিকর। সে হাসি দেখিয়া, কেহ বলেন,—

"A sea of melting pearls
which men call tears".

কেহ সেই হাসি সহৃদয়ভাব পরিচায়ক মনে করেন,—

"There are no faces truer than those
that are so washed".

আবার, অনেক সময় আমি কাঁদি। বড় দুঃখে বড় অভিমানে নীরবে বসিয়া কাঁদি। তখন আর কেহ দেখিতে আসে না। তখন আর কেহ অঞ্চলে মুছিয়া লয় না। নগেন্দ্রনাথ হতভাগিনী কুন্দনন্দিনীকে বিনা-দোষে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, কুন্দ যখন নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিত, তখন আমি তাহার সঙ্গে বড় কান্নাটা কাঁদিয়াছিলাম। এমন আরও কত-দিন হইয়াছে। কিন্তু সে সকল কথায় আর কায নাই।

তোমরা আমাকে চক্ষে আশ্রয় দিয়া বড় ক্লেশ পাইতেছ। আমিও যে কষ্টে আছি, তাহাও শুনিলে। যদি আমার অত্যাচার হইতে মুক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে অতল জলধিজলে আমাকে শীঘ্র নিক্ষেপ কর; আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সিন্ধুসলিলে বিলীন হই।

গাঁজাখোরের পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত 'অনুসন্ধান'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়, আজ আমার একটা দুঃখের কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিবার জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিলাম; অনুগ্রহ করিয়া আপনার জগদ্বিখ্যাত (!) 'সাপ্তাহিক অনুসন্ধানে' একটু স্থান দিয়া আমায় চিরবাধিত করিবেন। আর, আপনার কিম্বা আপনার অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার অনুসন্ধানে যদি আমার এ দুঃখ নিবারণের কোন উপায় থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া তাহা প্রকাশ করিবেন।

আমার প্রথম কথা হইতেছে—আমি সকল দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক জাতিরই একটা-না-একটা জাতীয় নেশা আছে। তবে যে প্রত্যেক জাতির সকলেই সেই জাতীয় নেশার বশীভূত, আমি ফুলের-মুকুটী কুলীন-ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া এরূপ মিথ্যা কথা কখনই কলমের মুখে আনিব না। অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে এমন নরাধম অনেক আছে, যাহারা এই জাতীয় নেশার অবমাননা করিয়া থাকে। যেমন মৎস্যও মাংস বাঙ্গালীর জাতীয় আহার হইলেও, পুরুষ-মহলে এমন অনেক অপদার্থ ভট্টাচার্য্য আছে, এবং স্ত্রীমহলে এমন অনেক অনাথা বিধবা আছে, যাহারা মৎস্য ও মাংস স্পর্শ করে না। কিন্তু তাহা বলিয়া এমন কোন্ ইতিহাসজ্ঞ আছেন, যিনি ইহাতেই মৎস্য ও মাংস বাঙ্গালীর জাতীয় আহার নয় বলিয়া ঘোষণা করিতে সাহসী হইবেন? সুতরাং প্রত্যেক জাতির যে একটা-না-একটা জাতীয় নেশা আছে, ইহা এই অকাট্য যুক্তির দ্বারা একপ্রকার স্থিরীকৃত হইল।

এখন কোন্ জাতির কি জাতীয় নেশা, অহা স্থির করা যাউক। ইহার জন্য আমাকে আর অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না; আপনারা সকলেই জানেন যে, ইংরাজের জাতীয় নেশা মদ, চীনের জাতীয় নেশা আফিং, বাঙ্গালীর জাতীয় নেশা তামাক ইত্যাদি। তবে বিবারে যে ইংরাজের নেশা হয় না, সে 'ব্রাণ্ডি' ও 'হুইস্কী' খাইয়া থাকে; আফিমে যে চীনের নেশা হয় না, সে গুলি খাইয়া থাকে; আর তামাকে যে বাঙ্গালীর নেশা হয় না, সে একটু করিয়া তামাকু অর্থাৎ গাঁজা খাইয়া থাকে। আমরা দেখুন, জাতীয় নেশার বশীভূত ব্যক্তিকে জাতির নিকট কখনই ঘৃণিত হইতে দেখি না। সুতরাং আমার স্বজাতীয়গণের নিকট নিবেদন এই, আমি গাঁজাখোর বলিয়া কেহ যেন আমায় ঘৃণা না করেন।

এখন আমার আসল কথা হইতেছে এই যে, এই জাতীয় নেশায় যদি কোন বিদেশী রাজা হস্তক্ষেপ করেন, তবে রাজার সেই অযথা হস্তক্ষেপে প্রজার মর্ম্মান্তিক বেদনা হয় কি না? সুতরাং আমি আজ এক নিদারুণ মর্ম্মান্তিক দুঃখে অভিভূত হইয়া, আপনাকে এই পত্র লিখিলাম।

শুনিতেছি নাকি, আমাদের এই নেশার রাজা গাঁজার বিপক্ষে দেশের রাজা এক কমিশন-রূপ কামান বসাইয়াছেন। যুদ্ধে রাজায় রাজায় হইলেও, আমার ন্যায় উলু খড়ের প্রাণের ভয় আছে; সেই কারণে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। এই কথা শুনে দেখিলাম, দেশের অনেক সাক্ষী এজাহার দিয়াছেন। কেবল গাঁজার কমিশনে নয়, এমন সকল কমিশনকেই তাঁহারা সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। সুতরাং সাক্ষ্য দেওয়াই যেন তাঁহাদের একটা নেশা। আমি যদি গাঁজার নেশা করিয়া গাঁজাখোর নাম পাইলাম, তাঁহারা কমিশনে নেশা করিয়া, কমিশন-খোর নাম না পাইবেন কেন? সুতরাং আমি তাঁহাদিগকে কমিশন-খোর সাক্ষী নামেই স্থভিহিত করিব।

এই কমিশনখোর সাক্ষীর মধ্যে যাঁহারা গাঁজার বিপক্ষে, গাঁজার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের প্রধান আপত্তি এই যে, গাঁজা খাইয়া কেহ পাগল হইয়াছে, সুতরাং গাঁজা বন্ধ করা উচিত। সে অনেক দিনের কথা—আমি একবার সংসারের জ্বালায় পাগল হইয়াছিলাম, এবং এমন অনেক বিশিষ্ট প্রমাণ দিতে পারিতে যে, গাঁজা অপেক্ষা সংসার

মহাশয়ের জ্বালায় এখন অনেকেই পাগল হইতেছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের উচিত নয় কি, শীঘ্রই একটা সংসার-কমিশন বসাইয়া, এদেশ হইতে সংসারের পাট উঠাইয়া দেওয়া? আমার যদি সাক্ষ্য মান্য হইত, আমি সেই খানে দাঁড়াইয়া তাঁবা, তুলসী ও গঙ্গাজল হাতে অম্লানবদনে বলিতাম যে, গাঁজা খাইলে পাগল হওয়া দূরে থাকুক, গাঁজাই পাগল হওয়া নিবারণ করে। আমি যদি গাঁজা না খাইতাম, তবে এতদিন পুনরায় সংসারের জ্বালায় কবে পাগল হইয়া, পাগলা-গারদে চিরবাসন করিতাম। পুত্রশোক পর্য্যন্ত নিবারণ করে—এমন প্রাণারাম, আনন্দময় নেশার বিপক্ষে আবার কমিশন? ছি! ছি!!

কমিশনের সাক্ষীর এইরূপ যুক্তিহীন কথা ছাড়িয়া দিয়া, গাঁজার বিপক্ষে আর কি যুক্তি আছে, দেখা যাউক। কেহ কেহ 'যেমনী-কথার দোহাই দিয়া বলেন—"গাঁজা খাইলে লক্ষ্মী ছাড়িয়া যান।" তাঁহারা যদি দেশের ভট্টাচার্য্য বা বিধবার দলভুক্ত হইতেন, তাহা হইলেও কথা ছিল না। কিন্তু তাঁহারাও নেশার বশীভূত—তবে গাঁজা না খাইয়া খান মদ! বলি বাপু হে, আমাদের এক পয়সার নেশায় লক্ষ্মী ছুটিয়া পলাইয়া যান, আর তোমাদের টাকার-শ্রাদ্ধ নেশায় লক্ষ্মী-ঠাকুরুণ একবারে অচল—অটল! দিনান্তে একটি পয়সা ফেলিয়া দিতে যিনি কাতর, আর প্রতিদিন লম্বা লম্বা চেক্ কাটিতে তিনি একেবারে মুক্তহস্ত!! এরূপ যুক্তি কোথায় পাইলে বাবা?

আর একটা প্রবাদ আছে যে, কোন অদ্ভুত কথার অবতারণা করিলেই লোকে তাঁহাকে 'গাঁজাখুরী' বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রতিদিন আমাদের কাব্য, উপন্যাস ও নাটক প্রভৃতিতে যে সকল অদ্ভুত কথা ব্যাহির হইতেছে, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই! তাহাদের বেলা হইল কি না—কবির কল্পনা; আর আমাদের বেলা সেই কথাই হইল—গাঁজাখুরী! এই কি বিচার?

দেখ বাবা, এই নেশা না করিলে মানুষ কখন এই রোগশোক জরাজীর্ণ জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসারে তিষ্ঠিতে পারে মা। সেইজন্য আমরা যে দেবতার কল্পনা করিয়াছি, তাঁহাদিগকেও নেশার বশীভূত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি; তবে কেহ সোমরস, আর কেহ গাঁজা, সিদ্ধি ইত্যাদি! স্বর্গেতেও সোমরসের চলাচলি দেখিয়া, সেই দেবাদিদেব মহাদেব গঞ্জিকানেশা আরম্ভ করিয়া দিয়া কি এক কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন! আপনারা মর্ত্তে গাঁজার পরিবর্ত্তে সোমরসের চলাচলি করিয়া অতুল কীর্ত্তি স্থাপনা করিতে ইচ্ছা করেন না কি? তাহা হইলে কেবল স্বর্গের বিপরীত মর্ত্ত্য হইবে না, নরক-বিভাগ একপ্রকার উঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে! কেমন—তাহা হইলেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না?

সম্পাদক মহাশয়! আজ কেবল গাঁজার বিরুদ্ধ-মতের খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলাম। গাঁজার প্রশংসার কথা আমি একমুখে কি বলিব? স্বয়ং পঞ্চানন পঞ্চমুখে সে গুণগান করিতে অক্ষম। তবে আপনার এবং আপনার পাঠকপাঠিকাগণের যদি অভিমত হয়, তবে বারান্তরে স্বপক্ষ-মতের অবতারণা করিতে চেষ্টা করিব।

সাপ্তাহিক প্রসঙ্গ।

গবর্ণমেণ্টের হিন্দু-বিদ্বেষ!—সম্প্রতি ভারতগবর্ণমেণ্ট গোহত্যা-সম্বন্ধীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামার একখানি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ঐরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামার তিনটী কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রথম, পোষ্টাপিস ও টেলিগ্রাফ আপিসের ক্ষিপ্ত সংবাদ-বহন-কার্য্য। দ্বিতীয়, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদিগের সকল বিষয়ে উন্নতি-লাভ। তৃতীয়, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান। উপরুক্ত তিনটী কারণের মধ্যে প্রত্যেকটীর আবার সহকারী কারণও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রথম কারণের সহকারী কারণ হইল, সংবাদপত্র; কারণ, তাহারা অতিরঞ্জিত করিয়া এই সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিবরণ প্রকাশ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় কারণের

সহকারী কারণ হইল, হিন্দুদিগের চালিত সংবাদপত্র; কারণ, তাহারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষভাবের উত্তেজনা করিয়া থাকে। তৃতীয় কারণের সহকারী কারণ হইল, সেই হিন্দুগণ; কারণ, তাঁহারা গোরক্ষিণী সভা ও হরিসভা প্রভৃতি করিয়া হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। ফলতঃ গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস এই যে, হিন্দুরাই এই সকল অনর্থের মূল। বলা বাহুল্য, এই অপূর্ব্বযুক্তিপূর্ণ রিপোর্টখানি ভূতপূর্ব্ব বড়লাট স্যান্ডডাউন, বিদায়ের পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। এরূপ নিরপেক্ষ মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতে আমরা লজ্জাবোধ করি। আমরা জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুদিগের প্রতি এরূপ অযথা দোষারোপের কারণ কি? ইহার ভিতরও কোন রাজনৈতিক রহস্য আছে নাকি?

* * *

জুরির বিচার।—গভর্ণমেণ্ট জুরির বিচারে হস্তক্ষেপ করিলে, দেশময় যে প্রবল আন্দোলন উঠিয়াছিল, সে কথা সকলেরই মনে আছে। আর সেই সময় জুরি-কমিসনও জুরির বিচার সঙ্কীর্ণ করা দূরে থাকুক, প্রশস্ত করিবার জন্যই গভর্ণমেণ্টকে উপরোধ করেন। গভর্ণমেণ্টও ঐ কমিসনের অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। এক্ষণে আমাদের নবলাট এলগিন্ বাহাদুর, যদি এই বিচার-পদ্ধতি সকল জেলাতেই প্রচলিত করেন, তবে ইহাতে কেবল গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাপালন করা হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শাসনের অতুল কীর্ত্তিস্তম্ভের ভিত্তি-স্থাপনাও হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন।—স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-চিহ্ন-স্থাপনার্থ নানাস্থানে নানা সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হইতেছে। অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, কোনরূপে একটী প্রস্তর-মূর্ত্তি স্থাপনা করিতে পারিলেই বুঝি, মৃত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হইল। সম্প্রতি হুগলিতে যে সভা হয়, তাহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সংগৃহীত অর্থে তাঁহার বাসস্থান নৈহাটি ও কাঁটালপাড়ার সন্নিকটে দুইটি পুষ্করিণী খনন করা হইবে। প্রস্তর-মূর্ত্তি স্থাপনা অপেক্ষা এরূপ স্মৃতিচিহ্নের আমরা বিশেষ পক্ষপাতী।

* * *

ড্রেনেজ বিল।—সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অস্বাস্থ্যকর স্থলের পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে। বিলখানির জন্মবৃত্তান্ত এই—১৮৯২খৃঃঅব্দের জুলাইমাসে ছোটলাট বাহাদুরের ভবনে এক বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে জল-নিকাশের ও পানীয় জলের ভালরূপ বন্দোবস্ত না থাকাই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ; সুতরাং এসম্বন্ধে একখানি আইনের আবশ্যক। উহাতে ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, অঞ্চলের লোকসাধারণ করিলে, এই আইনের দ্বারা সেই অঞ্চলে জল-নিকাশের ও পানীয়জলের সুবন্দোবস্ত করা হইবে; কিন্তু সমস্ত ব্যয় ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে দিতে হইবে। এই তো গেল বিলখানির জন্মবৃত্তান্ত! এখন, আইনে পরিণত হইলে লোকে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে বটে; কিন্তু ভাবনার বিষয়, গরীব প্রজা ইহার ব্যয় যোগাইবে কিরূপে?

* * *

দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষার আইন।—আগামী শীতকালে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় দেবোত্তর-সম্পত্তি রক্ষার জন্য এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইবে। বেসরকারী সভ্য অযোধ্যার মহারাজা এই পাণ্ডুলিপির প্রবর্ত্তক। এই আইনের অভিপ্রায় এই যে, কোন মঠের অধিকারী কোন দেবোত্তর সম্পত্তি নষ্ট করিতে পারিবেন না; তাঁহাকে ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের হিন্দু-সভ্যগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিতে হইবে। দেশে বড় বড় সভাসমিতির অন্তঃ এইরূপ প্রার্থনা। দেবোত্তর সম্পত্তির উপর গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের কথা শুনিলে, সকলেরই ভয় হয় বটে; কিন্তু সম্প্রতি তারকেশ্বরের সম্পত্তি অব্যবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিয়া এরূপ আইনের আবশ্যকতা স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে আমাদের ভাবনা, পাছে একটী অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া আর একটা অনিষ্টের সূত্রপাত হয়।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধানী

অষ্টম বর্ষ। ১১ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। চতুর্থ সংখ্যা।

কৃষ্ণরূপ।

চন্দনে চর্চ্চিত, মণ্ডন-মণ্ডিত, অপরূপ নবঘন ভাতি;
সৌরভ-সেবিত, পুষ্পবিনির্ম্মিত, অপরূপ সুশোভন কাঁতি।

কুণ্ডল কুঞ্চিত, কান্তি করম্বিত, লোচিত মোহিত বেশ;
নয়ান নন্দিত, জগত-বন্দিত, নব পীতাম্বর বেশ।

লোচনে কজ্জল, সোহন উজ্জ্বল, ললিত ভাউনি তায়;
মিরসি শোভন, মানস-মোহন, কেলি শিখণ্ডক ভায়।

শ্যাম নটবর, অতসী কন্দল, যৌবনে মারক মার;
শ্যামল কাননে, মঙ্গল নর্ত্তনে, ছড়ায় সুস্বর ধার।

রাগ বিভাসিত, মন্দস্তর স্মিত, অধরে মৃদুল রাজে;
হাস্য বিকুশনে, নীলিম গগনে, চান্দ মলিন হয় লাজে।

৫০০০০৮-চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার মত ৬৫

প্রাণ-কথা।

শিবের যে নিন্দা, সেই স্তোত্র।

শত্রুর ন্যায় নিন্দুকও মানবের পূর্ণপরিপাকের বিশেষ সহায়। পূর্ণমানব বা পূর্ণাবতার শিব ও কৃষ্ণের যত নিন্দুক—এত বোধ হয় কাহারও নহে। শিব দিগম্বর! শিব শ্মশানবাসী! শিব নেশায় ঢুলুঢুলু-নয়ন! শিব যোগিনী-গণ-মোহন! শিব হলাহল-পানে নীলকণ্ঠ! শিব ফণিভূষণ! ইত্যাদি বাক্যে শিবনিন্দা করিতে, নিন্দুকেরা আজও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু শিবের যে নিন্দা, তাহাই তাঁহার জাতি। নিন্দুকেরা শিবের নিন্দা করিতে গিয়া জগতে তাঁহার অলৌকিকত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকে মাত্র। দশদিক যাঁহার বিশাল অঙ্গকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে—অর্থাৎ যাঁহার নয়ন-জ্যোতিঃ দশদিক্ আলোকিত করিয়া অনন্ত আকাশে মিশিয়া গিয়াছে—তাঁহার আর সামান্য অম্বরে প্রয়োজন কি? দেহ যখন জ্যোতিঃ-কেন্দ্রে পরিণত হয়, তখন সে দেহ আবৃত করে—সাধ্য কাহার? অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ অঞ্চলে বাঁধিয়া গোপন করিতে পারে, এমন সামর্থ্য কে ধরে? নিন্দুক, শিবের দিগম্বরত্ব ঘোষণা করিবার সময় ভাবিয়াছিল, লোকে তাঁহাকে নির্লজ্জ বা কপর্দক-শূন্য মনে করিবে। কিন্তু নিন্দুকের কথায় ভক্তের মনে শিবের প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞান জন্মিল। ভক্ত বুঝিলেন যে, শিব জ্যোতিঃ-কেন্দ্র—সুতরাং শিবদেহ হইতে বিকীরিত জ্যোতিঃপুঞ্জই তাঁহার বসন—অন্য চেল বা কার্পাস-বস্ত্রের সে জ্যোতির্মালার নিকট ভস্মীভূত হইয়া যাইবে—এই আশঙ্কায় শিব দিগম্বর! শিবের লজ্জা নাই—কেন না শিব পূর্ণতত্ত্ব-জ্ঞানী—সুতরাং তিনি জানেন "ও একমেবাদ্বিতীয়ং"—তিনি বই এ জগতে আর অন্য সত্তা নাই। সুতরাং তিনি সদা বলেন, "সোঽহং" "শিবোঽহং"—এক ব্রহ্ম বই দ্বিতীয় নাই—এবং আমিই সেই ব্রহ্ম আত্মার অনন্ত নামের মধ্যে একটী নাম শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়। যখন পূর্ণ অদ্বিতীয় ভাবে বিভোর—তখনই তিনি দিগম্বর—কেননা তখন তাঁহার অন্যের অস্তিত্ব জ্ঞান লোপ হইয়াছে—অন্যের অস্তিত্ব জ্ঞান না থাকিলে মানুষের লজ্জা-জ্ঞান থাকে না। লজ্জা বোধ না হইলে মানুষ আপনার দেহ বসনে আবৃত করে না। সমাধি সময়েই অদ্বৈতভাবের পূর্ণস্ফুরণ হয়, সুতরাং সেই সময়ই শিব দিগম্বর। সমাধি-ভঙ্গের পর শিবের সঙ্গে যখন আবার দ্বৈত বা বহুত্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, তখন তিনি আবার ব্যাঘ্রাম্বর-পরিহিত! সংসারী শিব লৌকিক-লোচন-সমক্ষে, এই বেশে অবতারিত। তাই কোন কবি বা চিত্রকর গৌরীর পার্শ্বে শিবকে দিগম্বর বেশে চিত্রিত করেন নাই।

নিন্দুকেরা শিবকে আবার নিন্দা করিল, "শিব শ্মশানবাসী"। কিন্তু নিন্দুক জানেনা যে, তন্ত্রপ্রণেতা যোগীশ্বর শিবের উপযুক্ত সাধন-ক্ষেত্র শ্মশান! প্রবৃত্তিবর্ত্তার শিবের উপযুক্ত অঙ্গরাগ চিতাভস্ম! যে চিতাভস্ম মানবের সমস্ত গর্ব্ব ও অভিমানের—সমস্ত আশাভরসার—সমস্ত ভোগবাসনার শেষ পরিণাম, সে চিতাভস্ম শিবের অঙ্গে না উঠিলে আর কোথায় উঠিবে? বৈরাগ্যাবতার শিব ইহার মহিমা না বুঝিলে আর কে বুঝিবে? যে শব দেখিয়া সকলে পলায়ন করে—ঘৃণায় নাসিকায় বস্ত্র দিয়া চলিয়া যায়—সে শবই শিবের আসন! যে শ্মশান অপরকে দর্শন করে—এবং সে শ্মশান দর্শন-ভয়ে লোকে অন্ধকারে একদণ্ড অগ্রসর হইতে ভয় পায়, সেই বিষধর সর্পই শিবের ভূষণ! শিব-গাত্রের জ্যোতিতে তাহারা হীনপ্রভ ও অভিভূত-শক্তি হইয়া চিত্র-লিখিতের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। নিন্দুকেরা সে মহিমা বুঝিতে না পারিয়া শিবকে মোহান্ধ জগৎসমক্ষে শাপুড়িয়া বা বেদিয়া বলিয়া পরিচয় দেয়; আর শিবের জন্মদেশে যে হলাহল দেখিতেছ—তাহার জন্য তাঁহার "নীলকণ্ঠ" নাম হইয়াছে—তাহা তমোগুণ—প্রকৃত হলাহল নহে। তমোগুণের আবোহ ও অবরোহের স্থল মূলাধার হইতে দুইটি নাড়িচক্র—আর রজোগুণের আবর্ত্তনস্থল নাভিদেশ হইতে কণ্ঠমূল। শিব রজোগুণের ম্লানহীন্যের প্রলয় সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু তমোগুণ রজোগুণের সাহায্য ব্যতীত নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ। যেমন কামান দগ্ধ ও গোলকাদি থাকিলেই যে রণজয়ী হওয়া যায় এরূপ নহে, কিন্তু রণনিপুণ বীরের যুদ্ধিমত্তা ও সংশ্লেষ ব্যতীত তাহার যথার্থ প্রয়োগ হইতে পারে না, সেইরূপ তমোগুণ রজোগুণের সাহায্য ব্যতীত নিষ্ক্রিয় এবং সত্ত্বগুণের সাহায্য ব্যতীত সৃষ্টিস্থিতির অনিষ্টকর। এইজন্য শিব নিজ তমোগুণকে রজোগুণের সঙ্গে মিশাইয়া সত্ত্বগুণের পাদপীঠ-স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন—কারণ কণ্ঠমূল হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণের স্থান। লোকসাধারণ তমোগুণী বটে—কিন্তু তাহারা তমোগুণের দোষ নিদ্রা ও আলস্যাদির অধীন। সুতরাং তাহাদিগদ্বারা জগতের সঞ্জীবনী-কার্য্যের অদ্ভুত প্রলয়-কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। তমোগুণের সহিত ভক্ত রজোগুণ যুক্ত হইলেও প্রলয়-কার্য্য হয় বটে, কিন্তু সে কার্য্য ভ্রম-প্রমাদযুক্ত হওয়ায় তাঁহাতে জগতের অমঙ্গল সংঘটিত হয় মাত্র। সত্ত্বগুণের কার্য্য নিরবচ্ছিন্ন হিতকর; কারণ, ইহা ভ্রম-প্রমাদাদি-স্পর্শ-রহিত। যেখানে রজস্তমঃ সত্ত্বগুণ দ্বারা সংযমিত, সেস্থলে রজস্তমের কার্য্যও সর্ব্ব-হিতকর হইবে। শিব তমোগুণকে রজোগুণ দ্বারা উত্তেজিত ও সত্ত্বগুণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া জগতের অবিশেষ হিতকর প্রলয়-কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। উভয়গুণ দ্বারা সম্পোষিত হওয়ায়, তমোগুণ ঘনীভূত হইয়া নীলিমা ধারণ করে—এই জন্যই শিব "নীলকণ্ঠ"। তমোগুণকে তরলতর রজোগুণের উপর স্থাপিত করিতে আর কোন দেবতাই সমর্থ হন নাই। ইহা শিবের বিশিষ্ট-শক্তি। তৈল জল অপেক্ষা অধিকতর তরল—সুতরাং তৈলের স্বাভাবিক স্নিগ্ধ জলের উপরে। তৈলকে জলের নিম্নে রাখা মানবী শক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং শিবের নীলকণ্ঠত্ব তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু নিন্দুক না বুঝিয়া ইহা তাঁহার দোষ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে। নিন্দুক ইহা শিবের দোষ বলিয়া ঘোষণা না করিলে, ভক্ত-মণ্ডলী শিবের নীলকণ্ঠত্বের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিতেন না। সুতরাং শঙ্কর-মহিমা জগতে অব্যক্ত হইয়া থাকিত।

সেইরূপ নিন্দুকেরা শিবকে যোগিনীগণ-

মোহন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। শিব, দুর্গা, কালী, বগলা, তারা, ছিন্নমস্তা, গঙ্গা প্রভৃতি আদ্যাশক্তির বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিভিন্ন সময়ে রত হইয়া থাকেন, নিন্দুকেরা এইজন্য তাঁহাকে লম্পট বলিয়া গালি দেয়। কিন্তু ভক্তমণ্ডলী ইহাতে শিবের অনন্ত শক্তিমত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হন। বহুসঙ্গম দুষণীয়; কেননা, ইহাতে শক্তিক্ষয় হয়। কিন্তু যিনি অনন্ত শক্তিমান, ঊর্দ্ধরেতা ও যতানিল যোগীশ্বর, তাঁহার শক্তি ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা নাই। রমণী দেখিলেই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। কারণ, তাঁহার ধারণা-শক্তি অসীম। অথচ তিনি সাধিকাগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে কখনই পরাঙ্মুখ হন না—সাধিকাগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করিলে তাঁহার বাঞ্ছা-কল্পতরু নামে কলঙ্কারোপ হইত। নিজের কোনও কামনা না থাকিলেও যিনি অপরের কামনা পূর্ণ করিতে সক্ষম, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর। বাসনা থাকিতে কাহারও মুক্তি নাই। বাসনা কামনা-জনিত সংস্কার। এই সংস্কারের শক্তিতে আমাদের অনন্ত আবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন (evolution or devolution) সংঘটিত হয়। সুতরাং যাহার যে বিষয়ে বাসনা তাহা মিটাইয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। যে যোগিনী শিবকে পতিত্বে বরণ করিয়া নিরন্তর সাধনা করিতেছে, শিব যদি তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিতে অক্ষম হন বা সক্ষম হইয়াও সাধারণের ন্যায় লোক-লজ্জা-ভয়ে তাহাতে বিরত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর কে দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া পূজা করিবে? বাসনা পূর্ণ করিয়া মুক্তিদানে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হইলে, কে আর তাঁহার নিকট মুক্তি-ভিখারী বা মুক্তি-ভিখারিণী হইয়া দাঁড়াইবে? আর যদি তিনি বাসনা পূর্ণ করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুকই না হইবেন, তবে তত্ত্ব সাধিকা-শক্তিই বা তাঁহার পদানুসরণ করিবে কেন? আর পরম ব্রহ্মের সহিত যাঁহার অদ্বৈত সম্বন্ধ এবং আদ্যা-শক্তি যাঁহার জননী ও জায়া, তাঁহার নিকট স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদ থাকিতে পারে না। যিনি তত্ত্বমসি জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী, তাঁহার নিকট সকল শক্তিই ত ব্রহ্মের ছায়ামাত্র বলিয়া প্রতীত হইবে। সুতরাং কোন ব্রহ্ম-ছায়াই ব্রহ্মে বা ব্রহ্মসহ অদ্বৈতভাবে-অবস্থিত ব্যক্তির পরকীয়া হইতে পারে না। প্রকৃতি মাত্রই পুরুষের ছায়া বা প্রতিবিম্ব। সুতরাং নিজ প্রতিবিম্বের সহিত কোলাকুলি করিতে—নিজ প্রতিবিম্বকে চুম্বন করিতে, তত্ত্বজ্ঞানীর মনে বিচার-ভাব উদিত হয় না। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বকে চুম্বন করিতে শিশুর মনে যেমন কোনও বিকার হয় না, সেইরূপ পূর্ণতত্ত্বজ্ঞানী যোগীর স্ত্রীরূপে প্রকৃতির দর্শন ও স্পর্শন দিতেও কোনও লৌকিক বিকার উপস্থিত হয় না। যেখানে বিকার-ভাব উপস্থিত হয় সেখানে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, বুঝিতে হইবে। সুতরাং সেস্থলে এ অদ্বৈত-সাধন নিষিদ্ধ। শিব স্বপ্রণীত তন্ত্রে চক্রানুষ্ঠানের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্যও অদ্বৈত-সাধন দ্বারা বাসনা ক্ষয়-করা। শিব সে চক্রে অদ্বৈত-সাধকেরই প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। যাহাদের "আত্মপর" জ্ঞান প্রবল, তাহাদের তথায় যাইবার অধিকার নাই। "আত্মপর" জ্ঞান-বিরহিত ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত কম বলিয়াই, এখন চক্রানুষ্ঠানও বিরল-প্রচার হইয়াছে। সুতরাং শিবের মহিমা বুঝিতে লোকও অতি বিরল হইয়া পড়িয়াছে। ইহা রোপীয়েরা যজুর্ব্বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালীর গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া এই সমস্ত শাস্ত্রকে অশ্লীলতা-পূর্ণ বলিয়া জগতে উদ্ঘোষিত করিতেছেন, এবং আমাদের সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ও আপনাদের শাস্ত্রের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন ইউরোপীয়গণের শূন্যগর্ভ চীৎকারের পাড়তা বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহারাও বিধর্ম্মিগণের ন্যায় স্বধর্ম্মে ও স্বদেবতাগণে নীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্বজনোচিত ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। যতই তাঁহারা ইহার ভিতর ডুবিবেন, ততই ইহার অন্তদেশে অনন্ত রত্নরাজি কুড়াইয়া পাইবেন। নিন্দুকে যতই আমাদের ধর্ম্মের ও আমাদের দেবতাগণের নিন্দাঘোষণা করিবে, ততই আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মেষিত হইবে, এবং ততই আমরা আমাদের ধর্ম্মের ও আমাদের দেবতা-

গণের অলৌকিকত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব সুতরাং শত্রুর ন্যায় নিন্দুকও আমাদের পরম উপকারী। অতএব হে নিন্দুক! এস, আমি তোমায় প্রাণভরিয়া আলিঙ্গন করি। যাহার নিন্দায় দেবাদিদেব সদাশিবের ও ব্রহ্মের পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ছবি আমার চিত্তপটে পূর্ণপ্রতিফলিত হইয়াছে, সেই পরম-বন্ধু নিন্দুকের চরণে আমি কোটী কোটী নমস্কার করি। ধন্য নিন্দুক! ধন্য তোমার মহিমা! তুমি মানব নহ—ছদ্মবেশী দেবতা! ছলনা করিতে গিয়া তুমি আমার জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করিয়া দিয়াছ। তুমিই আমাকে সচ্চিদানন্দ পিতার ও আনন্দময়ী মাতার উপযুক্ত সন্তান করিতে চেষ্টা করিতেছ। সুতরাং আবার তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার করি।

রসিকত্ব।

(২)

প্রথম প্রস্তাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের পাঁচটী রসের উল্লেখ করিয়াছি। সেই পাঁচটী রসের নাম—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর। এই পাঁচটী রস পাঁচটি সাধন-প্রণালী। অধিকারী-ভেদে এই পাঁচটী সাধন-প্রণালী অনুসরণ-পূর্ব্বক ভগবানের সাযুজ্য-লাভ—তাঁহার সহিত মিলন-লাভ করিতে হইবে। পৃথিবীতে যত প্রধান প্রধান ধর্ম্ম আছে, সকলেই সে সকল ধর্ম্মের অধিকারী। অর্থাৎ নারিকেল বৃক্ষের কাছে না গেলেও এক কাঁদি, কাছে গেলেও এক কাঁদি, তলে দাঁড়াইলেও এক-কাঁদি, গাছে উঠিলেও এক কাঁদি, অথবা গাছের আগায় গেলেও সেই এক কাঁদি! পাঁচ ওক্ত নমাজে পড়, রোজা কর, ঈশ্বরকে পাইবে। ছয় দিন যাহা-ইচ্ছা তাই কর, সপ্তম দিনে নিয়মিত সময়ে গির্জ্জায় যাইয়া চক্ষু মুদিলেই ঈশ্বরকে পাইবে। গৃহে বা সমাজে, নির্জ্জনে বা সজনে বসিয়া, "ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" বল; চন্দন পরিয়া চোক বোঁজ; ইচ্ছা হয়, নাক ডাকাও; আর অমনি ঈশ্বরকে পাইবে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে অধিকার-ভেদ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম বলেন,—দুর্ব্বল অধিকারীর পক্ষে সাধনা একপ্রকার, সবল অধিকারীর পক্ষে অন্যপ্রকার। অর্থাৎ

অধিকারী বুঝিয়া সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন না করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না—"মাছে না উঠিতেই এক কাঁদি" মিলে না। এই অধিকার-ভেদ যে বিজ্ঞানসঙ্গত, তাহা অনেক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সে পুরাতন—এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ কথার অবতারণা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। একজন খিওসফি-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ কর্ণেল অল্‌কট্ মহাত্মার সহিত অল্পক্ষণ আমার ধর্ম্ম-বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল; তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"সাহেবেরা হিন্দুধর্ম্মকে বালকের ধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের স্বীয় ধর্ম্ম বিচারে টিকে না। আমি জ্যামিতিক সত্যের ন্যায় স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিশূন্য, অথচ হিন্দুর পৌত্তলিকতা পর্য্যন্ত দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত।" কর্ণেল সাহেব যে নূতন কিছু বলিয়াছেন, তাহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। তিনি সাহেব হইয়া এবং খৃষ্টান হইয়াও হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিকতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, তাহা প্রণিধানই আমার অভিপ্রায়। শ্রীমতী বিবী বেসান্তের বক্তৃতা-সমূহ সে দিনকার কথা, তাহার উল্লেখ করাও নিষ্প্রয়োজন। মার্কণ্ডেয় ঋষি স্তুতির প্রারম্ভে বা প্রান্তালে বলিয়াছিলেন,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতাঃ।" ইংলণ্ডের ঊনবিংশতি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার সেদিন সেই "জড়" ও "চৈতন্যের" সংমিশ্রণের কথা স্বীকার করিয়াছেন। ঋষিবাক্যকে না হয়, স্তুতি-মূলক অতিশয়োক্তি বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে; কিন্তু স্থষ্টি-প্রকরণের মূলে "প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ" কে আর্য্যদার্শনিকদিগের মূল সূত্র, তাহা অস্বীকার করিবে কিরূপে?

অধিকার-ভেদের উল্লেখ করিতে যাইয়া আমরা একটুক বেশী দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। মূল কথা, হিন্দুধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম আরও বৈজ্ঞানিক। ভরসা করি, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি মহোদয়েরা এ কথায় বিরক্ত হইবেন না। আমি হরি, হর, কালী ও কালাকে এক এবং অভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করি; সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের কোন অঙ্গের নিন্দা করিয়া আমি অপর অঙ্গের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী নহি। পাঠকগণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, সৌর, শৈব, ও গাণপত্যগণ ভগবানের ঐশ্বর্য্যের উপাসক—সুতরাং শান্ত বা দাস্য ভক্তি। বাৎসল্যের পাল্টীভাব মাতৃভাব; সেই মাতৃভাবই শাক্তের উপাস্য বস্তু। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টানদিগের ন্যায় ব্রাহ্ম-মহাশয়েরা ঈশ্বরকে পিতৃভাবে পূজা করিতেন। সেই সময়ের একটি ঘটনা মনে পড়িল; সেই ঘটনাটিতে একটি মানব জীবনের স্রোত ফিরিয়া যায়। সেই ঘটনাটির বৃত্তান্ত শুনিলে, ধর্ম্মপিপাসু কোন কোন পাঠকের কিঞ্চিৎ উপকার হইবে বিবেচনা করিয়া, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। একটী পরম ভাগবত গৃহস্থ বৈষ্ণব, একটী বৃদ্ধ প্রতিবেশীর নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন; এমন সময় তাঁহার কনিষ্ঠ ব্রাহ্ম-সহোদর তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, জ্যেষ্ঠ বলিতেছেন—'ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের (বৈষ্ণবদিগের) তৃতীয় সোপানের ধর্ম্ম, উহার উপর আমাদিগের আরো দুইটী সোপান আছে।' এই কথায় কনিষ্ঠের মনে আঘাত লাগিল, ধোঁকা ধরিল, স্রোত ফিরিল; এবং ইহার অল্প কয়েক বৎসর পরেই সে রীতিমত বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এই কনিষ্ঠ সহোদরই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অধীন ন্যূন লেখক। 'বিবর্ত্তবিলাস' গ্রন্থের সম্পাদক একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ছিলেন; তিনি স্পষ্টাক্ষরে ব্রাহ্মধর্ম্মকে "শুষ্ক চাউল ভাজা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন। যিনি ধর্ম্মের বিষয়—বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের বিষয় তুমিতলদর্শে আলোচনা করিবেন, তাঁহাকেই বৈষ্ণবধর্ম্মের অধিক বৈজ্ঞানিকতা স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে যতদূর সাধ্য, আমরা এই পঞ্চরস বা পঞ্চবিধ সাধন-প্রণালীর সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব; কিন্তু আমাদিগের পথ পরিষ্কারের জন্য প্রথমতঃ 'চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা' হইতে 'মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দের প্রশ্নোত্তর' শীর্ষক "সাধ্যনির্ণয়ের" কয়েকটী পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণ বিষ্ণুভক্তি হয়॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে ইহ হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে ইহ হয়, আগে কহ আরে।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে ইহ হয়, কিছু আগে আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

প্রভু কহ ইহোত্তম আগে কহে আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে অত্যুত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেমসাধ্যসার॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
একই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্থাদিক্যে বাড়ে সর্ব্বরসে।
শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥"

এই ষড়বিংশ পংক্তিতে কবিরাজ গোস্বামী সমগ্র বৈষ্ণবধর্ম্মের সার সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কয়েকটী পঙ্‌ক্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতে গেলে, বহুশাস্ত্র, শাস্ত্রার্থ ও টীকার প্রয়োজন। তাহা আমা মাদৃশ ক্ষুদ্রশক্তির সাধ্যাতীত। আর করিতে পারিলেও, বুঝিবে কয়জনে? উহা কিরূপ মহা প্রকাণ্ড ব্যাপার, তাহা জানিতে হইলে, সমগ্র ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, ও বিষ্ণুপুরাণের কিয়দংশ, তথা পদ্যাবলী প্রভৃতি গোস্বামী-উক্ত গ্রন্থনিচয় পাঠ করা প্রয়োজন।

এই পঞ্চবিধ সাধন-প্রণালীতে পাশ্চাত্য-দার্শনিক-মতের পক্ষপাতী পাঠকগণ ডার্ব্বিনের "বিবর্ত্তবাদ" বা "ক্রমোবিকাশ" মতের স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হইবেন। বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি ষড়দর্শনেই পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত কবিতার চরমে এই পঞ্চতন্মাত্রের যেভাবে উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সাংখ্যমতের অনুমোদিত। কেবল উহা কেন, বৈষ্ণবধর্ম্মের সমস্ত দার্শনিক মতই সাংখ্যদর্শন হইতে পরিগৃহীত। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি সাধনপ্রণালী বুঝাইবার জন্য, রায় রামানন্দ, বলিতেছেন যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ যেমন পরপর ভূতে বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্রূপ শান্ত-দাস্যাদির রস পরপর

রসকে পুষ্ট করিয়া, চরমে মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র নিত্য পদার্থ। কিন্তু তাহাদিগকে বুঝিতে হইলে, পরপর কল্পনা করিয়া বুঝিতে হইবে। আকাশের শব্দ গুণ, বায়ুর স্বীয় বিশেষ গুণ স্পর্শ, ও আকাশ হইতে গৃহীত গুণ শব্দ; সুতরাং বায়ুর গুণ দুইটী—স্পর্শ ও শব্দ। অগ্নি বা তেজের গুণ রূপ, তদতিরিক্ত আকাশ হইতে গৃহীত শব্দ, ও বায়ু হইতে স্পর্শ। সুতরাং অগ্নির গুণ—রূপ, শব্দ ও স্পর্শ। এইরূপে অপ বা জলের স্বীয় গুণ রস, অপর তিনটী ভূত হইতে গৃহীত গুণ শব্দ,স্পর্শ ও রূপ। ক্ষিতির স্বীয় গুণ গন্ধ,এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত হইতে গৃহীত গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এই পাওয়া গেল,—

(১) আকাশ বা ব্যোম্—শব্দতন্মাত্রক।

(২) বায়ু বা মরুৎ—শব্দ ও স্পর্শতন্মাত্রক।

(৩) অগ্নি বা তেজঃ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপতন্মাত্রক।

(৪) জল বা অপ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসতন্মাত্রক।

(৫) পৃথিবী বা ক্ষিতি—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্রক।

উপরে যেমন আকাশাদির গুণ পরপর ভূতে সমাহৃত হইয়া পৃথিবীতে গুণপঞ্চকের একত্র সমাবেশ বা পরিসমাপ্তি হইয়াছে, বৈষ্ণব-সাধন-প্রণালীর শান্তদাস্যাদির গুণও ভক্তরা দুই তিন করিয়া মাধুর্য্যে পঞ্চগুণের সমাহার হইয়াছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব শ্রীরূপ গোস্বামীকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, কবিরাজ গোস্বামী তদবলম্বনে নিম্নলিখিত পদরচনা করিয়া অজ্ঞানান্ধ জীবকে তাহাই শিক্ষা দিতেছেন:—

'কৃষ্ণ-নিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণ। পরব্রহ্ম পরমাত্মা কৃষ্ণে জ্ঞান প্রবীণ॥ কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে। পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥ ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রমে গৌরব প্রচুর। সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥ শান্তের' গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন। অতএব দাস্যরসের এই দুই গুণ॥ শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়। দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥ কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া-রণ। কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥ বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য 'গৌরবসম্ভ্রমহীন। অতএব সখ্য রসের তিন গুণ চিহ্ন॥ মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান। অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান॥ বাৎসল্যে শান্তের নিষ্ঠা দাস্যের সেবন। সেই সেবনের ইহা নাম যে পালন॥ সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব পার। মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥ আপনাকে পালক আর কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান। চারি রসের গুণে বাৎসল্য অধর্ম্ম সমান। মধুর রসে কৃষ্ণে নিষ্ঠা সেবা অতিশয়। সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়। কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥"

যদিও উপরে শান্তের কৃষ্ণে নিষ্ঠা ও কৃষ্ণতৃষ্ণাত্যাগ দুইটী গুণের উল্লেখ আছে, তথাপি শান্তের প্রধান বা কৃত্য ধর্ম্ম নিষ্ঠা; তৃষ্ণাত্যাগাদি আনুষঙ্গিক। তদ্রূপ দাস্যের প্রকৃত ধর্ম্ম সেবা, সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান প্রভৃতি আনুষঙ্গিক; তদ্ব্যতীত শান্ত হইতে গৃহীত গুণ নিষ্ঠা। সখ্যের প্রধান ধর্ম্ম আত্মবৎ জ্ঞান বা পূর্ণবিশ্বাস; গৃহীত ধর্ম্ম নিষ্ঠা ও সেবা।

বাৎসল্যের প্রধান ধর্ম্ম পালন; গৃহীত ধর্ম্ম নিষ্ঠা, সেবা ও আত্মবৎজ্ঞান। মাধুর্য্যের প্রধান ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে বা আত্মসমর্পণ; গৃহীত ধর্ম্ম নিষ্ঠা, সেবা, আত্মবৎজ্ঞান ও পালন।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাহইতে সংক্ষেপে এই পাইলাম,—

(১) শান্তরস—ইহার ধর্ম্ম নিষ্ঠা।

(২) দাস্যরস—" " সেবা ও নিষ্ঠা।

(৩) সখ্যরস—" " বিশ্বাস,নিষ্ঠা,সেবা।

(৪) বাৎসল্যরস—" " পালন(মমতা), বিশ্বাস, নিষ্ঠা, সেবা।

(৫) মধুররস—" " আত্মসমর্পণ,মমতা, বিশ্বাস, নিষ্ঠা, সেবা।

দুওয়ার পদ্যমাত্রেও যাহা দেখিয়াছি, এখানেও তাহা দেখিলাম।

কবিরাজ গোস্বামী, চৈতন্যচরিতামৃতের অন্য একস্থলেও সোদাহরণ এই পঞ্চরসের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"ভক্তভেদে রস্ভেদ পুঞ্চ পরকার। শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥ বাৎসল্যরতি মধুররতি এ পঞ্চবিভেদ। রতি-ভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ॥ শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য মধুররস নাম। কৃষ্ণভক্তি রসমধ্যে এই পঞ্চপ্রধান॥"

প্রত্যেক শ্রেণীর ভক্তের উদাহরণ যথা—

"শুদ্ধভক্ত নব যোগীন্দ্র সনকাদি আর। দাস্যভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার॥ সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন। বাৎসল্যভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন॥ মধুররস-ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ। মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥"

এই রস-পর্য্যায় লইয়া বৈষ্ণবসমাজে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। আমরা বৈষ্ণব-গ্রন্থ-মতে যে সকল পদ উপরে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে প্রথমে শান্ত, দ্বিতীয়ে দাস্য, তৃতীয়ে সখ্য, চতুর্থে বাৎসল্য, পঞ্চমে মধুর এইরূপ পর্য্যায় নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন সাধুভক্তের মতে বাৎসল্য-রস সখ্যের পূর্ব্বে হইবে, তাঁহারা ইহার বিবিধ প্রমাণ প্রদর্শন করেন। প্রথমতঃ যুক্তিমূলক; দ্বিতীয়তঃ বৃত্তান্তমূলক।

তাঁহাদিগের যুক্তি এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম-মতে শ্রীকৃষ্ণে রতি দ্বিবিধ। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রা ও কেবলা। যথা,—

"শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান উদ্দীপন। বাৎসল্য সখ্যে মধুররসে,সঙ্কোচন॥"

অর্থাৎ, শান্ত ও দাস্য ভক্তের রতি বিশুদ্ধ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রা, এবং উহাতে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের নিত্যস্ফূরণ ও স্মৃতি। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ভিন্ন ঐ দ্বিবিধ ভক্তের অন্য সাধনা নাই। বাৎসল্যে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা রতির সঙ্কোচন আরম্ভ মাত্র। কিন্তু ইহাতে কেবলা রতির বিশেষ স্ফূর্ত্তি দেখা যায় না। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান সাধারণতঃ প্রচ্ছন্ন ও গুপ্ত হইলেও, সময় সময় তাহার স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। কেননা, শিশু শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন, যশোমতী মৃত্তিকা ফেলিয়া দিবার জন্য পুত্রকে মুখব্যাদান করিতে বলিলেন; পুত্র মুখব্যাদান করিলে, তন্মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া যশোমতীর বাৎসল্য-ভাব দূর হইল, তিনি সম্মুখস্থ শিশুকে পরব্রহ্মরূপী ভগবান ভাবিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় সে ভাব তৎক্ষণাৎ দূর হইল। এই উপলক্ষে প্রাচীন সাধুগণ বলেন, শ্রীদামাদি রাখাল-গণের এরূপ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানস্ফূর্ত্তি কখনও হয়

নাই। সুতরাং উহা বিশুদ্ধ কেবলা রতির স্ফুরণ, সুতরাং বাৎসল্যের পরবর্ত্তী ভাব। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা বলেন, শ্রীমতী যশোমতী যখন শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে গেলেন, তখন রজ্জু যতই দীর্ঘ করেন, শিশুর শরীর বেষ্টিত হয় না, রজ্জু একটু ছোট হয়। যশোমতী নাছোড়বান্দা; ঐ রজ্জুদ্বারা দামোদরকে না বাঁধিয়া ছাড়িবেন না। মস্তকের শিখায় ফুল ছিল; বন্ধাদিতে করাতে সেই ফুল যেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে পড়িল, অমনি ছ'দিন-দড়িতে শিশু বদ্ধ হইল। অর্থাৎ যশোমতীতে শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরজ্ঞানরূপ শান্তরস ও শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পূজারূপ দাস্যভাবের এ পর্য্যন্ত অভাব ছিল; তাহা যখন চরণে পুষ্পপাতদ্বারা পূরণ হইল, তখনই বাৎসল্যভাবে ভগবানকে ভক্তি-ডোরে বন্ধন করিতে সক্ষমা হইলেন। সুতরাং উপরুক্ত ভক্ত সাধুদিগের মতে বাৎসল্য তৃতীয় রস, সখ্য তৎপরবর্ত্তী। এইরূপ মত আমৌক্তিক নহে। তবে এদ্বারা অপরের মতামত প্রামাণ্য নহে, এরূপ কাহারও মনঃকল্পিত যুক্তি খাটিবে না। যদি শ্রীমদ্ভাগবতে এ বিষয়ের স্পষ্ট মীমাংসা থাকিত, তবে কথাই ছিল না। তাহা যখন নাই, (অন্ততঃ আমরা সন্তোষজনক প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই), তখন বৈষ্ণবগ্রন্থের মতানুসারেই চলিতে হইবে। আমরা যখন এই পঞ্চরসের বিচার করিব, তখন পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, বৈষ্ণবগ্রন্থের মতও অযৌক্তিক নহে। কিন্তু সে বিচার ও আলোচনা নিতান্ত সংক্ষেপে হইবে পাঠক না; অতএব পাঠককে তৃতীয় প্রবন্ধের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

এস নিদ্রে! আমার নয়নে!

(১)

এস নিদ্রে! নয়নে আমার!
হৃদে ধরি সুখের স্বপন,
শান্তিময় পরশে তোমার,
ভুলে যাই দারুণ বেদন।

(২)

চেতনা যাতনা শুধু মোরে
আঁখি মেলি যেদিকেতে চাই,
সংসার ভরিয়া তার স্মৃতি—
শত্রু যেন হ'য়েছে সবাই।

(৩)

ওগো সেই বিদায়ের দিনে,
ভবার সে আধ অন্ধকারে,
আধ-ঘুম-চোখে সকাতরে,
মুখপানে চাহি বারে বারে।

(৪)

প্রণয়ের শেষ উপহার—
আহা! দুটি অশ্রুবিন্দু দিয়ে,
সেই যে গিয়াছে প্রিয়তমা,
তাই সদা জাগিছে হৃদয়ে।

(৫)

ভুলিতে সে বিষমমী স্মৃতি,
প্রতিক্ষণে কত কি যে করি,
ভুলিব কি? শোভনা প্রকৃতি
হাসে সদা তারে হৃদে ধরি

(৬)

মুকুলিতা নবীন যৌবনে
দোলে লতা সুমধুর বায়,
রাঙ্গিময়ী সে তনুলতায়ী—
প্রতি অঙ্গে আঁকা যেন তায়!

(৭)

নাই হেথা সে দেশের ফুল—
তবু একি বিষম চাতুরী!
সেই হাঁসি এ দেশের ফুলে—
কোথা পেলে বুঝিতে না পারি!

(৮)

হাসে সদা সেই মুদুহাসি,
প্রিয়সঙ্গ-সুখে গরবিনী;
উঠে মোর অন্তর হইতে
লক্ষ্যহারা রোদনের ধ্বনি।

(৯)

ব্যথা পেয়ে ফিরাই নয়ন,
পদতলে চাহি ধরাতল;
নীহারের প্রতিবিম্ব মাঝে—
ওগো সেই উষ্ণ অশ্রুজল!

(১০)

চমকি নয়নযুগ মুদি,
ভাবি—না চাহিব কা'র পানে;
সেই কণ্ঠে পাখী উঠে ডাকি,
প্রাণ কাঁদে বিরহের গানে।

(১১)

থেকে থেকে অধীর উছাসে,
ব'য়ে যায় বাসন্তী বাতাস;
হৃদয়ের গভীর প্রদেশে,
বহে যেন সেই খাট শ্বাস।

(১২)

ওগো মোর অন্তরে বাহিরে,
সবাই যাতনা দেয় মোরে,
ব্যথার ব্যথিত কেহ নাই,
কি যে দুখ কহিব তা কারে?

(১৩)

ধেয়ে যাই সমদুঃখী ভাবি,
প্রভাতের চক্রবাক-পাশে;
সেও দেখে উড়ে যায় দূরে,
শৈলবালা কলকলে হাসে

(১৪)

জেগে জেগে মরণ-যাতনা,
আর না সহিতে পারি প্রাণে;
সকাতরে ডাকি তাই তোমা,
এস নিদ্রে আমার নয়নে

প্রাচীন আলোক-বিজ্ঞান।

যে বাহ্যশক্তি আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ক্রিয়া করিয়া পদার্থসমূহকে দৃষ্টি-গোচর করে, সেই অলৌকিক শক্তিকে আমরা আলোক নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কোন্ সময়ে ভূমণ্ডলে এই শক্তির প্রথম বিকাশ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ দীপ্তিমান গ্রহনক্ষত্রাদির সৃষ্টিকাল হইতেই এই অদ্ভুত শক্তি ভগবানের কীর্ত্তিস্বরূপা হইয়া রহিয়াছে। যৎকালে এই সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎকাল হইতেই এইশক্তির আশ্চর্য্য কার্য্য-কলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া লোকমাত্রেই বিস্মিত হইয়াছিল,এবং এই শক্তি যে অনন্ত ঐশীশক্তির অংশমাত্র, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হইয়াছিল।

প্রাচীন-কালীয় পণ্ডিতগণ আলোক-বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে কেবলমাত্র বিগত তিন শতাব্দীর মধ্যেই প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, বলিতে হইবে। অথচ, কাচ ও ধাতুনির্ম্মিত দর্পণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে। বাইবেলের (Bible) ওল্ড-টেষ্টামেণ্টে (Old Testament) এ বিষয়ের প্রমাণ আছে।*

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের মহিলা-গণের সুচারু-মুখকমল দর্পণে প্রতিফলিত হইত। কালিদাস রঘুবংশের একস্থলে এই-রূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"দর্শনেষু পরিভোগদর্শিনী-
র্ধর্ম্মপূর্ব্বমনুপৃষ্টসংস্থিতঃ।
ছায়য়া স্মিত মনোজ্ঞয়া বধূ-
স্ত্রীনমীলিতসুখীশ্চকার সঃ।"
রঘুবংশ—উনবিংশ সর্গ।

রাজা অগ্নিবর্ণের স্ত্রীগণ দর্পণে নিজ নিজ মুখ দর্শন করিতে উদ্যত হইলে, তিনি পরিহাস করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইতেন। তৎকালে দর্পণ-মধ্যে তাঁহার সে স্মিতমধুর মুখের প্রতিবিম্ব পড়িত, তাহা দেখিয়া তাঁহারা লজ্জায় অবনতমুখী হইতেন।

কাচ প্রস্তুতের পর আতসী কাচও (যাহার সাহায্যে অগ্নি উৎপাদিত হয়) প্রস্তুত হইয়াছিল। এরিষ্টোফেন্স (Aristophanes) নামা গ্রীক কবি তাঁহার মেঘমালা (Clouds) নামক নাটকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

"Strepisiades.—You have seen at the druggist's that fine transparent stone with which fires are kindled?

Socrates.—You mean glass, do you not?

Strep.—Just so.

Soc.—Well,what will you do with that?

Strep.—When a summons is sent to me I will take this stone, and, placing myself in the sun, I will, though at a distance, melt all the writings of the summons—".Comedy of the Clouds —Act. II.

ষ্ট্রেপিসিয়াডিস।—আপনি ডাক্তারখানায় এরূপ স্বচ্ছ প্রস্তর দেখিয়া থাকিবেন, যাহা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হয়।

সক্রেটিস।—আপনি আতসী কাচের কথা বলিতেছেন, না?

ষ্ট্রেপি।—হাঁ, তাই বটে।

সক্রে।—কেন, ইহা দ্বারা আপনি কি করিবেন?

ষ্ট্রেপি।—আমার নিকট কোন শমন আসিলে, আমি রৌদ্রে দাঁড়াইয়া দূর হইতেই এই কাচ দ্বারা শমনের লেখাগুলি গলাইয়া দেলিব।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে; প্রাচীন গ্রীসে এই লেখা মোমের উপর অঙ্কিত হইত। মধ্যদীপক কাচবর্ত্তুলের বিষয় প্লিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ল্যাক্টান্‌সিয়াস্‌ও (Lactantius) বলেন যে, কাচনির্ম্মিত একটী বর্ত্তুল জলপূর্ণ করিয়া সূর্য্যের দিকে ধরিলে, প্রবল গ্রীষ্মেও অগ্নির উদ্ভব হইয়া থাকে।

আলোকের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও গতি-সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা-বিধ মত প্রচলিত ছিল। পিথাগোরস (Pythagoras) ও তৎসম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকগণ বলিতেন যে, দীপ্তিমান্ পদার্থ হইতে কিয়ৎ অতি সূক্ষ্ম আলোক-পরমাণু চক্ষে আঘাত করিয়া দৃষ্টিশক্তি উৎপাদন করে। পক্ষান্তরে প্লেটোপ্রমুখ দার্শনিকবর্গের মতে চক্ষু হইতে নির্গত কোন পদার্থের সহিত আলোক পদার্থ-বিশেষ বহির্গত পদার্থের সমাবেশেই আলোকের উৎপত্তি। ইহারা দৃষ্টিশক্তির উৎপাদনে দিবা পরস্পর বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গতি কল্পনা করিতেন। (১) চক্ষুর্নিঃসৃত আলোক-রেখা, (২) দৃষ্টপদার্থ-নিঃসৃত কোন অজ্ঞাত বস্তু, (৩) সূর্য্যরশ্মি। বিখ্যাত দার্শনিক আরিষ্টট্‌ল (Aristotle), এই উভয় মতই খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আলোক জড়পরমাণু নহে, পেলিউসিড্‌(pellucid) নামক বায়ুর ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট কোন পদার্থের ক্রিয়ামাত্র,—ইহাই তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, এবং তাঁহার গ্রন্থাদিতে তিনি এই মত প্রচার করিয়াছেন :—

"Vision is the result of some impression made upon the faculty of sense; an impression which is due to the medium which intervenes (pellucid). An intervening substance of one kind or another must necessarily be; and were this intervening space made empty, not only will the object not be seen exactly, but it will not be perceived at all".—Wallace's Translation of Aristotle's Psychology — Book II., Chapter VII.

আরিষ্টটলের মতের পোষকতার নিমিত্ত সুযুক্তির অভাব ছিল; এজন্য অনেক-দিন পর্য্যন্ত প্লেটোর মতেই সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস। অবশেষে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আলহাজেন (Alhazar) নামক আরব-দেশীয় পণ্ডিতের মতে সে বিশ্বাস দূরীভূত হইয়াছিল। চক্ষু হইতে কোন পদার্থ নির্গত হইয়া যে দৃষ্টি-শক্তি জন্মায় না, ইহা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

১২৭০ খৃষ্টাব্দে পোলাণ্ডনিবাসী ভিটে-লিও (Vitellio) নামক এক ব্যক্তি নক্ষত্রের চাক্‌চিক্যের কারণ প্রথম প্রদর্শন করেন। শূন্যস্থ বায়ুরাশির আন্দোলন-জন্যই যে চাক্‌-চিক্য দৃষ্ট হয়, ইহা তিনি সপ্রমাণ করিয়া-

* See the second Book of Moses called Exodus and the Book of Job.

ছিলেন। মৃদু-আন্দোলিত জলরাশির মধ্য দিয়া নক্ষত্ররাজি অবলোকন করিলে, তাহারা অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়—ইহাও তিনি দেখাইয়াছিলেন। জেন্‌সেন্ নামক এক ওলন্দাজ (Dutchman) প্রথম দূরবীক্ষণ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। ইটালিদেশের উজ্জ্বলরত্ন পণ্ডিতপ্রবর গ্যালিলিও, জেন্‌সেনের নিকট নির্ম্মাণপ্রণালী অবগত না হইয়া, স্বাধীনভাবে একটী দূরবীক্ষণযন্ত্র নির্ম্মাণ করেন।

১৬১১ খৃষ্টাব্দে এণ্টোনি ডমিনিস্ (Antonis De-Dominis) রামধনুর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করেন। বিখ্যাত ফরাসীপণ্ডিত ডেকার্টে (Des Cartes) এ বিষয়ে অনেক নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রশংসাভাজন হন।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ নিউটন আলোক-বিজ্ঞানে একটী যুগান্তর আনয়ন করেন। সূর্য্যালোকে যে সাতটী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক মিশ্রিত আছে, এ তত্ত্ব তিনিই প্রথমে জগতে প্রচার করেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে আলোকবিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া, বোধ হয় না। আলোকের উৎপত্তি-সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ পিথাগোরসের মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ হইতে নির্গত জড় পরমাণুরেখা চক্ষে পতিত হইয়া দৃষ্টিশক্তির বিকাশ করে, তাঁহাদের এই বিশ্বাস ছিল বলিয়া অনুমান হয়। কালিদাস রঘুর বিদ্যাধ্যয়ন বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছেন,—

"দিয়ঃ সমগ্রাঃ সগুণেন্দ্রিয়াধীঃ
ক্রমাচ্চতস্রশ্চতুরর্ণবোপমাঃ।
ততার বিদ্যাঃ পবনাতি পাতিভি-
র্দ্বিশোহরিদ্ভির্হরি তামিবেশ্বরঃ॥"

রঘুবংশ—৩সর্গ।

যেমন দিবাকর বায়ু অপেক্ষা বেগগামী অশ্বদ্বারা দিঙ্মণ্ডল উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তদ্রূপ উদারবুদ্ধি রঘু সমগ্র ধীশক্তি দ্বারা অর্থ-চতুষ্টয় সদৃশ চারি বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন।

এস্থলে মহাবেগগামী সূর্য্যরশ্মির পরিবর্ত্তে যে বায়ু অপেক্ষা বেগগামী অশ্ব কল্পিত হইয়াছে, ইহা সহজেই অনুমেয়। সৌরকরেখ যে জড়পদার্থ, এবং ইহা যে সৌরজগৎ হইতে বহির্গত হইয়া মহাবেগে ধাবিত হয় এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করে, ইহা বিংশ শ্লোকে এই বিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আলোক শক্তি ক্রিয়া মাত্র। জ্যোতির্ম্ময় পদার্থমধ্যেই যে এই শক্তি নিহিত আছে, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। এক্ষণে দেখা যাউক, কি প্রকারে এই শক্তি আমাদিগের চক্ষে আসিয়া উপনীত হয়। অনেকেই জানেন, সূর্য্যালোক প্রায় আট-মিনিট, সময়ে পৃথিবীতে আইসে; সুতরাং প্রশ্ন এই যে, এই আটমিনিট কাল আলোক বা শক্তি কোথায় সঞ্চিত থাকে এবং কিরূপেই বা পৃথিবীতে আনীত হয়? এই শক্তি শূন্য-মার্গ দিয়া না করিয়াই যে এককালীন পৃথিবীতে আসিয়াছে, আমরা কিছুতেই এরূপ অনুমান করিতে পারি না। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সূর্য্য হইতে নিক্ষিপ্ত জড় পরমাণু এই শক্তিকে বহন করিয়া এখানে আসিয়াছে, কিম্বা সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যে কোন পদার্থরাশি (Medium) দ্বারা এই শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। একটী উদাহরণ দিব। মনে করুন, পুষ্করিণীতে একখানা ছোট নৌকা স্থিরভাবে রহিয়াছে। আপনি নৌকাখানিকে আন্দোলিত করিতে মনে করিতেছেন। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য আপনি দুইটী উপায় অবলম্বন করিতে করিতে পারেন। (১) নৌকার উপরে প্রস্তর নিক্ষেপ, (২) কোন উপায়ে পুষ্করিণীতে তরঙ্গ উৎপাদন। প্রথম উপায়ে প্রস্তরসমূহ আপনার দৈহিক শক্তিকে বহন করিয়া নৌকাখানিকে স্থানভ্রষ্ট করিবে। দ্বিতীয় উপায়ে তরঙ্গ দ্বারা আপনার শক্তি সঞ্চারিত হইবে মাত্র; কিন্তু স্থানবিশেষ-স্থিত জলরাশি সরিয়া যাইবে না। সূর্য্য হইতে আলোকও এই দুই উপায়ে পৃথিবীতে আসিতে পারে। (১) সূর্য্য-নিক্ষিপ্ত জড় পরমাণু শূন্যমার্গ দিয়া শক্তি বহন করিয়া আমাদের চক্ষে আনিতে পারে। ইহা নিউটনের নির্গমন-বাদ (Emission Theory)। (২) ইথার (Ether) নামক কোন কল্পিত সূক্ষ্ম পদার্থরাশিতে উৎপন্ন আলো-তরঙ্গ আমাদের চক্ষে আঘাত করিয়া দৃষ্টিশক্তি জন্মাইতে পারে। ইহা হিগেন্স (Huyghens) প্রবর্ত্তিত তরঙ্গবাদ (Wave Theory)। নির্গমনবাদের দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় যে, বায়ু অপেক্ষা জলে ভ্রমণ করিতে আলোক কম সময় লয়। কিন্তু তরঙ্গবাদের দ্বারা ইহার বিপরীতই সিদ্ধ হয়। প্রকৃত ঘটনা তরঙ্গবাদের অনুকূল হওয়ায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, নিউটন-প্রবর্ত্তিত নির্গমনবাদ উপেক্ষা করিয়া, ক্রমে তরঙ্গ-বাদই সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

আমার স্বামী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার স্বামী—উপন্যাস নয়, সত্যঘটনা। আমি আমার পিতামাতার একমাত্র কন্যা, তাঁহাদের আর কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই, সুতরাং আমি তাঁহাদের বড় আদরের ছিলাম। আট বৎসর বয়সের সময় তাঁহারা সহাসমারোহে আমার বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফললাভ করেন। তখন আমার স্বামীর বয়স বার বৎসর মাত্র। আমার স্বামীর এজগতে অন্য কেহ আত্মীয়-স্বজন ছিল না, একজন হিতসম্পর্কীয় আত্মীয় তাঁহাকে এতদিন প্রতিপালন করিতেছিলেন; সুতরাং বিবাহের পর হইতে আমার স্বামী আমার পিতৃগৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আমার পিতার কিছু বিষয়সম্পত্তি ছিল, অথচ পুত্রসন্তান ছিল না বলিয়াই, ইচ্ছা করিয়া তিনি এইরূপ পাত্রে আমার বিবাহ দেন।

আমি শৈশবে স্বামীর সহিত খেলা করিতাম, একত্রে আহার করিতাম, একত্রে বেড়াইতাম, আর রাত্রিতে জনক-জননীর সহিত একশয্যায় স্বামী লইয়া শয়ন করিতাম। স্বামীকে যে লজ্জা করিতে হয়, তখন এ কথা আমার মনেও কখন উদয় হয় নাই। আমি দিনের বেলায় খেলাঘরের সংসার সাজাইয়া স্বামীকে দুপার ভাত আর নটে-কাঁটার তরকারী রাঁধিয়া আহার করিতে দিতাম, স্বামীর আহারান্তে আমি সেই পাতের প্রসাদও পাইতাম; আবার সন্ধ্যার সময় আমি স্বামীর পুতুলের সহিত আমার পুতুলের বিবাহ দিতাম, আর পুতুলের বাসঘর সাজাইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে

বাসর জাগিতাম। এইরূপে আমাদের বাল্য-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। আমাদের উভয়ের অন্য খেলার সঙ্গী আর কেহ ছিল না, বাল্যকাল হইতেই আমরা উভয়ে উভয়কে ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতাম না। পিতা বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া আমার স্বামীর লেখা-পড়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে সময় লেখাপড়া করিতেন, সে সময় আমিও স্বামীর সহিত একাসনে বসিয়া সেই শিক্ষকের নিকট লেখাপড়া শিখিতাম। বিবাহের পর এইরূপে আমাদের তিন চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল। আমরা উভয়ে কখন তিলার্দ্ধ যন্ত্রণাছাড়া হই নাই, এবং সে কথা কল্পনায় কখনও স্থান দিতে পারি নাই।

আমাদের উভয়েরই ভাই-ভগিনী কেহ ছিল না; সুতরাং সেই কৈশরের স্নিগ্ধ ভালবাসায় কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায়, আমরা পরস্পরে পরস্পরকে ষোল-আনা রকম ভালবাসার প্রতিদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। হায়! সেদিন—কি সুখের দিন ছিল! সে অতীত স্মৃতি এখনও মনে উদয় হইলে, আজিকার এই দুঃখের দিনেও আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। আমাদের উভয়ের ভালবাসা দেখিয়া, পিতামাতার আনন্দের সীমা ছিল না। পাড়ার অনেক ঠানদিদি, আমাদিগকে যেন দু'টি ভাইবোন বলিয়া তামাসা পর্য্যন্ত করিত। এরূপ তামাসায় আমরা এখন লজ্জাবোধ করিতাম বটে; কিন্তু সে তামাসার কথা শুনিলে, পিতামাতার আনন্দ-সাগর উথলিয়া উঠিত।

সুখের দিন চিরকাল একভাবে যায় না। আমার যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স, তখন হঠাৎ বসন্তরোগে আমার পিতামাতার মৃত্যু হইল। এই আকস্মিক বিপদে আমি কেবল পিতৃমাতৃহীন হইলাম না, আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীও পিতৃমাতৃহীন হইলেন। আমরা উভয়ে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। বালিকা বয়সে খেলাঘর বাঁধিয়া আমরা যে নকল সংসারের খেলা উভয়ে খেলিয়াছিলাম, এবং সত্যসত্যই সেই আসল সংসার আমাদের ঘাড়ে পড়িল।

শোক যতই গুরুতর হউক না কেন, তাহার বেগ চিরকাল সমানভাবে থাকিতে পারে না। আমাদেরও সে গুরুতর শোকের বেগ ক্রমে হ্রাস হইয়া গেল। আমরাও অশ্রুজল মুছিয়া মুছিতে ক্রমে সংসারী হইলাম। এইরূপে দুঃখে-কষ্টে আরও ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর এক আনন্দের দিন আসিল। আমি একটি পুত্ররত্ন প্রসব করিলাম। অনেক দিনের পর আমাদের পিতৃমাতৃশোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে পুনরায় আনন্দের তুফান উঠিল।

কিন্তু সে আনন্দ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এক যন্ত্রণাদায়ক অসমুখ রোগে আমার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামী আক্রান্ত হইলেন। আমার পুত্রের বয়স এখন দেড় বৎসর হইয়াছে, আর আজ প্রায় দেড় বৎসরই তিনি এই রোগে ভুগিতেছেন। আমি দিবারাত্রি তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকিতাম, সুতরাং আমার সাধের পুত্রটীকে আদর করিতে সময় পাইতাম না। বিধাতা আমায় সুখ ও দুঃখ কেমন সমান ওজনে দিয়াছেন—দেখিলে? আমি মনোমত স্বামী ও পুত্র লাভ করিয়াছিলাম; স্ত্রী-লোকের পক্ষে এত সুখ কাহার অদৃষ্টে ঘটে? আবার অন্যদিকে দেখুন, আমার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামী অসহ্য যন্ত্রণাময় রোগ-শয্যায় শায়িত; আর আমার অঙ্কের যষ্টি—নয়নের মণি—অনাদরে ও অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুঃখই বা আর কি আছে? তাই বলিতেছিলাম যে, বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ ও দুঃখ তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

আমি চিকিৎসার কিছুই বাকি রাখি নাই; কিন্তু সকল রকম চিকিৎসা করিয়াও স্বামীর রোগের কোন উপশম করিতে পারিলাম না। শেষে গ্রহশান্তি, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি অনেক দৈব-কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। আমার নিজের জীবনের বিনিময়েও যদি আমার স্বামীর জীবন রক্ষা করিতে পারি, আমি তাহাতেও প্রস্তুত। আর আমি কি করিব? পাছে আমার স্বামীর মনে কোন কষ্ট হয়, সেইজন্য গোপনে চক্ষের জল মুছিতাম, আর মনে মনে দিবারাত্রি ঠাকুর-দেবতাকে ডাকিতাম।

আজ সন্ধ্যাকালে আমার কোন প্রতিবেশীর নিকট কোন কথা শুনিয়া, আমার মনে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় একটি আশার সঞ্চার হইয়াছে। আশা না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। আমি পূর্ব্বে এমন অনেক আশায় বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছি, আবার দুইএক দিন পরেই নৈরাশ্যের অতল জলে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইয়াছি। কিন্তু আমার এবারকার আশা সেরূপ আশা নয়—কে যেন আমার কানে কানে বলিয়া দিল—"এ আশা তোমার নিশ্চয় সফল হইবে।"

তখন আমি আর স্থির করিতে পারিলাম না। স্বামীর অনুমতির জন্য তাঁহার চরণে লুটায় পড়িলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার স্বামীকে বলিলাম,—"দেবীপুরের মঙ্গলা দেবী খুব জাগ্রত; তাঁর পূজা দিয়ে হত্যে দিলে, তিনি নাকি স্বপ্নে অনেক ব্যারামেরও ওষুধ বলে দেন। অনেক লোক এই রকমে ওষুধ পেয়ে আরাম হয়ে গেছে। তুমি আমায় অনুমতি দাও। আমি বুক চিরে রক্ত দিয়ে তাঁর পূজা দেব; তার পর তাঁর মন্দিরে হত্যে দিয়ে অনাহারে পড়ে থাকবো। দেখি, এতেও আমার প্রতি তাঁর দয়া হয় কিনা?" আমি কথা-কয়েকটি বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলাম; তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সেই বিবর্ণ মুখখানি আরও যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। অনেকক্ষণের পর তিনি বলিলেন,—

"সাবিত্রী!—"

এই দুর্ভাগিনীর নামই সাবিত্রী। তিনি ঐ কথাটি বলিয়া, আর কোন কথাই মুখে আনিতে পারিলেন না। আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছে। সে দৃশ্য আমার অসহ্য হইল, কে যেন আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা টানিয়া ছিঁড়িতে আরম্ভ করিল। অনেক কষ্টে আমি বলিলাম,—"তুমি কাঁদছো?"

আর আমার মুখে কোন কথাই নাই। তখন আমি নিজেই কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িলাম। আজ যেন আমার কান্না-নদীর বাঁধটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এতদিন বহুকষ্টে তাহার যে জলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ সে কোন বাধাই আর মানিল না। এই সময় স্বামী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"দেখ সাবিত্রী, তুমি ত চেষ্টার কোন ত্রুটি কর-নি; এ রোগ আমার আরাম হবার হ'লে, এত দিন আরাম হ'য়ে যেতো। আর কেন বৃথা চেষ্টা ক'রে, তুমি তোমার নিজের শরীর মাটি করো? আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে; এ সময়

আর তোমায় কাছ-ছাড়া করতে ইচ্ছে হয় না।"

আমি তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম,—"আমি আর একবার চেষ্টা করে দেখবো—এই আমার শেষ চেষ্টা।"

স্বামী।—আচ্ছা, ভালই। এরপর তাহলে আর কোন চেষ্টা করবে না?

আমি।—আমায় আর অন্য চেষ্টা করতে হবে না। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ঐ অভয়া দেবীই আমায় অভয় দেবেন।

স্বামী।—তোমার সে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক; কিন্তু তোমার যে ক'দিন, সেখানে দেরী হবে, সে ক'দিন এখানে আমায় দেখবে কে?

স্বামী যে ভাবেই আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, সে আশীর্ব্বাদে যেন একটা তাড়িত-প্রবাহ হঠাৎ আমার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি বসিয়া ছিলাম, তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া বলিলাম,—"যদি আমার দেবীর চরণে যথার্থ ভক্তি থাকে, আর যদি আমি যথার্থই সতী হই, আমি অহঙ্কার করে বলছি, তোমার এ আশীর্ব্বাদ আমার নিষ্ফল হবে না। আর যে ক'দিন আমার দেরী হবে, তোমায় দেখবার বন্দোবস্তও আমি করেছি। ও বাড়ীর মোক্ষদা পিসি স্বীকার করেছেন তিনি সে ক'দিন তোমায় দেখবেন।"

আমার এই কথায় স্বামীর সেই বিষণ্ণ মুখও যেন প্রফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন —"আচ্ছা, আমায় যেন তিনি দেখবেন; কিন্তু খোকাকে কি করে তিনি রাখবেন?"

আমি।—আমি তোমায় ছেড়ে—খোকাকে ফেলে যেতে পারবো না; খোকাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো।

স্বামী।—তোমার সঙ্গে আর কে যাবে?

আমি।—গয়লা দিদি যাবে, বোধহয় বড়বউ যাবে, আরো ৩।৪ জন মেয়ে মানুষ যাবে।

স্বামী।—তা'হলে খোকাকে নিয়ে যেতে পাচ্ছো। তোমার মনে কোন আপশোষ রাখা দরকার নেই। কিন্তু যদি আর দেখা না হয়—যদি এই দেখাই আমাদের শেষ দেখা হয়, তা'হলে—

স্বামীর মুখের কথা আর শেষ হইল না। তাহার ঐ শেষ-কথায় আমার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হইল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার দু'নয়নে অশ্রুজল! তখন আমি মনে মনে বলিলাম,—"হে ভগবান, বারবার এ দৃশ্য দেখা অপেক্ষা আমায় অন্ধ করিলে না কেন?"

বসন্ত-বিরহ।

["ব্যঙ্গ-কবিতা।]

(বঙ্গীয় সেলির পদানুকরণে এই কবিতাটী লিখিত হইল।)

(১)

উদার অলস কুসুমে বিভোর,
জলদে বিজলি খেলেনা আর,
ফুলের বয়ানে নাহিক হাসনি,
সুবাসেতে দিক ভাসেনা আর।

(২)

ঘুমায়ে পড়েছে চাঁদের আলায়,
ভুলে গেছে পাখী করিতে গান,
লতিকার মত মলয়-হিল্লোলে,
অতি মৃদু মৃদু কাঁপিছে প্রাণ।

(৩)

শিথিল কুন্তল, করে ঢলঢল,
আপনারে যেন পাশরি হায়,
যমুনা উজানে বহেনা এখন,
গভীর জলদে গগন ছায়।

(৪)

মৃদাল কোমল-বাহু পরশিয়া,
মদন পড়েছে মুরছি পাশ,
কাশের ভিতর মলয়-বাতাস,
কি যেন কি কথা কহিয়ে যায়।

(৫)

ছলছল আঁখি, টলটল মন,
সুদূরে বাঁশরি ফুকারি উঠে,
নিছনি লইয়া মুরতানিলয়,
নীল নিচোলে অমনি লুটে।

(৬)

সে নাহি এলো গো আসিল মিলন,
মৃগীর নয়নে আসিল আঁখি!
উদার পরাণে জলদের কোলে,
কে তাহারে আজ রেখেছে ঢাকি।

(৭)

ওগো—তার কথা আর তুলনা তুলনা,
এ কেছে গোধূলি তাহার ছবি,
কুসুমের আহা মধুর স্তবকে,
ঘুমায়ে পড়েছে নীরব কবি।

(৮)

কুহকী লুকানে টুটিল না কেন,
এমন দারুণ কুয়াশা ঘোর!
উষার ললাটে হাসে শুকতারা,
দেখিতে দেখিতে হইবে ভোর।

(৯)

বিরহ-তুহিনে জলেনা আগুন,
শীতল নিশ্বাস সদাই বহে;
ফুলেরা কাঁদিয়া আকুল ব্যাকুল,
অবাক হইয়া চাহিয়া রহে।

(১০)

ডগর ডাগর ফেটেনা টগর,
গোলাপ প্রলাপ হৃদয়ে আনে,
চামেলির ফুল, নদী কুলকুল
দোঁহা চেয়ে থাকে দোঁহার পানে

বাঙ্গালা-ভাষা।

গতবারে "হস্তারক"-বিষয়ে আমরা বলিয়াছিলাম, 'হস্ত' শব্দের প্রথমাংশ হস্তা হয়। তদনুরূপে 'অক' বা বাঙ্গালা 'রক' হয় না। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সত্য সত্যই কি "অক" না "রক" বলিয়া কোন প্রত্যয় আছে? "ক" বলিয়া প্রত্যয় আছে। তাহার 'ন' ইৎ গিয়া "অক" ভাগ থাকে। এ স্থলে তাহা প্রযুক্ত হইবে না। মূল ধাতুর উপরই তাহার প্রয়োগ চলিতে পারে। যথা—উপ+কৃ-ধাতু +ণক (অক)=উপকারক। 'হস্তারক' স্থলে তাহার সম্ভাবনা কি? বাঙ্গালা 'রক' যাহা বলিয়াছি, তাহা কৌতুক ছলেই লিখিত হইয়াছিল। মুদ্রাঙ্কণ-প্রমাদে 'অক' না হইয়া "অক" হইয়া গিয়াছে। ঐ রূপেই আর এক ভ্রম ঘটিয়াছে। 'যদ্যপিস্যাৎ' পরিবর্ত্তে 'যদ্যপি-স্যাৎ' 'যদ্যপিস্যাৎ' এই দুইটী শীর্ষকে যে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও ঐ কারণ।

শরদিন্দু-বিনিন্দিত মুখ।—অমুকের মুখ, শরৎকালের ইন্দুকেও পরাজয় করিয়াছে, এই অর্থ প্রকাশ করিতে, যাঁহারা "শরদিন্দু-বিনিন্দিত মুখ" এই দুই শব্দ দ্বারা স্বপ্ন মনোভাব ব্যক্ত করিতে ব্যাকুল হন, উহাতে তাঁহাদের প্রতিকূল অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। কোথায় তাঁহাদের লেখায় বুঝাইবে—অমুকের রূপমণ্ডল, এত উজ্জ্বল—এত কোমল—এত সুবিমল যে, ইন্দুকে হার হারি) মানাইয়াছে;—না তাহার বিপরীতার্থ হইল! "শরদিন্দুবিনিন্দিত মুখ" শব্দের অর্থ এই—শরৎকালীন ইন্দু কর্ত্তৃক বিনিন্দিত মুখ। চন্দ্রদেব, যে মুখের নিন্দা করিয়াছেন,—তাহাই "শরদিন্দুবিনিন্দিত মুখ"। এখানে বলা উচিত —'শরদিন্দুবিনিন্দী মুখ'। যে মুখ শরৎ ঋতুর ইন্দুকে নিন্দা করে, তাহাকেই 'শরদিন্দুবিনিন্দী মুখ' বলে—ইহাই ঐ শব্দ-দ্বয়ের অর্থ। কবাদুযন্ত্রিক বলা যাউক, "শরদিন্দু" এখানে কেন বলা হইয়াছে। গ্রীষ্মেন্দু, বর্ষেন্দু, হেমন্তেন্দু, শিশিরেন্দু, বসন্তেন্দু—ইহাদের অন্যতম, কি কারণে ভাষায় লেখা না হয়? শরৎকালের ইন্দু, মেষ-নির্ম্মুক্ত—নির্ম্মেঘ; সুতরাং অমৃত, অতীক্ষ্ণ, অর্থাৎ সুস্নিগ্ধ—কোমল।

দ্বারায়, অপেক্ষায়।—"দ্বারা" "অপেক্ষা" বাঙ্গালা ভাষার অন্য শব্দ। অন্যে বিভক্তি সংযোগ না হওয়াই, ভাষার নিয়ম। সুতরাং "দ্বারায়," "অপেক্ষায়" না হইয়া, তৃতীয় স্থানে 'দ্বারা,' "অপেক্ষা" লিখিতে হইবেক।

সপ্তমীর এ, তে, য় এই তিনটী বিভক্তির চিহ্ন-মধ্যে এখানে "দ্বারা" ও "অপেক্ষা" শব্দে "য়" বিভক্তি সংযুক্ত হইতে পারিবে না। এস্থলে আর একটি বিষয়ও এই উপলক্ষে নিঃশেষ করিয়া বলিয়া যাইতে হইবে। এখানে যে "অপেক্ষা" প্রয়োগ করিতে বলিতেছি,তাহা যে ভ্রমাত্মক শব্দ, পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। সেই "অপেক্ষা" শব্দের অর্থ "হইতে", "চেয়ে"। কিন্তু আর একটী "অপেক্ষা" শব্দ আছে—তাহা বিশেষ্যপদ। সেই বিশেষ্য পদ "অপেক্ষা" শব্দে সপ্তমীর অন্যতম চিহ্ন "য়" যোগ করিয়া ভাষায় লেখা চলিবে। তাহার অর্থ 'হইতে' 'চেয়ে' নয়। তাহার

অর্থকি হইতে, উদাহরণে বোঝা যাইবে। সুতরাং দুইটি দুই দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদের ভাব পরিস্ফুট করি না কেন?

১। অমি-ব্যয় "অপেক্ষা" বিশ্রী।

২। সে এত ক্ষণ আমার "অপেক্ষায়" ছিল।

প্রথম উদাহরণে 'অপেক্ষা'=চেয়ে। দ্বিতীয় উদাহরণে "অপেক্ষায়"=অপেক্ষাতে। এখানে 'চেয়ে', 'হইতে' অর্থে উহার ব্যবহার হয় নাই, পাঠক তাহা অনুধাবন করুন।

শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম।—দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে, শব্দের উত্তর 'ইয়স' (ঈয়স্) ও তর হইয়া থাকে; ইহাই ইংরাজীতে কম্পারেটিভ ডিগ্রী (comparative degree)। আর—বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে, "ইষ্ঠ" ও "তম" প্রয়োগ করা হয়। ইংরাজীতে ইহার নাম—সুপারলেটিভ ডিগ্রী (superlative degree)। এখন বিশদ করিয়া উদাহরণ দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

শব্দ+ঈয়স্=কম্পারেটিভ ডিগ্রী।
শব্দ+ইষ্ঠ=সুপারলেটিভ ডিগ্রী।

প্রশস্য+ঈয়স্=শ্রেয়স্।	
প্রশস্য+ইষ্ঠ=শ্রেষ্ঠ।	
পরিচিতি ছেট। কম্পারেটিভ ডিগ্রী।	সুপারলেটিভ ডিগ্রী।
প্রশস্য	শ্রেয়স্ শ্রেষ্ঠ

* প্রশস্য শব্দ-স্থানে ঈয়স্, ও ইষ্ঠ বসিলে, 'প্র' আদেশ হইয়া থাকে। তৎপরে ঈয়স্, ও ইষ্ঠ যোগে সন্ধি হয়। যথা—

প্র+ঈয়স্ = শ্রেয়স্।
প্র+ইষ্ঠ = শ্রেষ্ঠ।

এই দৃষ্টান্তেই বোধগম্য হইল, "শ্রেষ্ঠ" অর্থে 'প্রধানতম'। ঐ শ্রেষ্ঠ (প্রধানতম) শব্দের উপর 'তর' বা 'তম' যোগ করা আর কি চলে? "শ্রেষ্ঠ" সুপারলেটিভ। শ্রেষ্ঠ+তম=শ্রেষ্ঠতম—দ্বিরুক্ত সুপারলেটিভ, আর শ্রেষ্ঠ+তর=শ্রেষ্ঠতর—সুপারলেটিভের উপর কম্পারেটিভ। অতএব শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম বলা ঠিক কি? "শ্রেষ্ঠ" শব্দের সঙ্গে আর "তর" বা "তম" যোগ করা চলিবে না।

ভূম্যধিকারী, ভূম্যধিকারিণী, অনুমত্যানুসারে।—ইহার ভ্রমের কারণ এই,—

অতি+আচার=অত্যাচার।
বি+আয়াম=ব্যায়াম।

হইয়া থাকে। এই কারণে "ভূম্যাধিকারী", "অনুমত্যানুসারে" চালান হইতেছে। একটু ভাবিয়া দেখিলে, এ ভ্রম প্রতীত হইবে। যথা,—

ভূমি+অধিকারী=ভূম্যধিকারী।
অনুমতি+অনুসারে=অনুমত্যনুসারে।
ভূমি+অধিকারিণী=ভূম্যধিকারিণী।

অতি+আচার, বি+আয়াম এই দুই স্থলের "আচার" ও "আয়াম" পদের আদিস্থিত "আ"কারের ন্যায় "অধিকারী" ও "অনুসারে" পদের প্রথমে "আ" নাই, কিন্তু "অ" আছে। অতএব 'ভূম্যধিকারী', "অনুমত্যানুসারে" না হইয়া, 'ভূম্যধিকারী' এবং "অনুমত্যনুসারে" কেন হইবে, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

শঙ্কর-চরিত।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শঙ্কর একদা শিব-গুরুকে উপনীত হওয়ার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। এখন সেই সময় সমাগত; পিতৃহীন শঙ্কর, জননীকে স্বাভিপ্রায় জানাইলেন। সতী, শ্রবণ করিবামাত্র আপাততঃ প্রতিবচনে সম্মত হইলেন না; অপাঙ্গে অশ্রুক্রম হইল। অনাথ পরিবারে এতাদৃশ ঘটনা বিরল নহে। ক্ষণকাল পরে সতী, শঙ্করকে বলিলেন,—"এখন উপনীত হইলে,তোমার ব্রহ্মচর্য্য-পরিপালন ক্লেশকর হইবে। সুতরাং আরও কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, উৎসাহ হইবে।" শঙ্কর,জননীর নিকট বিফল-মনোরথ হইয়া, বিশ্বরূপদর্শনে উপস্থিত হইলেন, এবং উপনয়নের জন্য অনুরোধ করিলেন; তাঁহাকে বলিলেন,—"জনকদের জীবিত থাকিলে ইহাতে আর বিলম্ব হইত না।" অনাথ বালকের দৈন্য-পূর্ণ বচন-বিন্যাসে বিশ্বগুরু স্তম্ভিত হইলেন। ক্ষণকালাতিপাতে বলিলেন,—"তুমি পিতৃহীন হইলেও ভাবিত হইও না। আমি জীবিত থাকিতে, তোমার যখন যে অভিলাষ হয়, ব্যক্ত করিবে—পূর্ণ করা যাইবে। শীঘ্রই তোমার জননীর সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করা যাইবে।" শঙ্কর, এইরূপ কথোপকথন শেষ করিয়া, বিশ্বগুরু-পত্নী বিশিষ্টাদেবীর নিকট উপস্থিত হইলে, বিশিষ্টাদেবী সস্নেহে শঙ্করকে গ্রহণ করিলেন; এবং উদ্যে খাদ্য হস্তে প্রদান করিলেন। আরক্ত পদ্মহস্তে উহা গ্রহণ করিয়া, শঙ্কর বলিলেন,—"শীঘ্র আমার উপনয়ন হইবে।" বিশিষ্টা স্মিতমুখে বলিলেন,—"তুমি ব্রহ্মচারী হইলে, নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হইবে কি" শঙ্কর বলিলেন,—"আমি যথারীতি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া চিরকাল ব্রহ্মচারী জীবন অতিবাহিত করি; সংসারের ভোগসুখে অভিলাষ নাই।" বালকের মুখে প্রৌঢ়োচিত বাক্‌বিন্যাস আকর্ণন করিয়া,বালভাবিত-যোগী ভ্রান্ত করিলেন না।

শঙ্কর, হস্তস্থ খাদ্য হস্তে করিয়া, স্বাধ্যায়াভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে এক কুষ্ঠী রোগযাতনায় বিশেষ ক্লিষ্ট হইতেছে—দেখিয়া, তাহাকে উহা প্রদান করিলেন। সুধার্ত্ত-কুষ্ঠী উহা গলাধঃ করিলে, কুষ্ঠীর শরীর প্রথমতঃ সুতপ্ত হইয়া উঠিল—অজস্র ঘর্ম্মজল বিনির্গত হইতে লাগিল। রোগী উহাই তাহার শেষমুহূর্ত্ত স্থির করিয়া বলিল,—"তোমার প্রদত্ত সুখাদ্য আমার জীবনহারক হইল; শীঘ্র অবসন্ন হইতেছে।" শঙ্কর বলিলেন,—"আমার বিনাশ নাই, আত্মা অবধ্য। তুমি তোমার ভোগদেহে অতিশয় যাতনা বোধ করিতেছ; এমন ভাবিয়া দেখ, তোমার পূর্ব্বশরীর তিরোভূত হইয়াছে।" পরক্ষণেই তাহার শরীরে হস্তাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"এই দেখ, তুমি নীরোগ হইলে।" অমনি কুষ্ঠী ক্রমশঃ স্বাস্থ্যানুভব করিতে লাগিল; শরীর নীরোগ হইয়া গেল। শরীরে রোগ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। সুচির-রোগ যাতনানুভবকারী আপনার এতাদৃশ ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া, বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল; এবং দেবতাজ্ঞানে শঙ্করের চরণ-সরোজ-সমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইল। শঙ্কর তাহাকে উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—"তোমার ব্যাধিদূর হইল বলিয়া পরম পুলকানুভব করিতেছ, কিন্তু ইহা বিশেষ আশ্চর্য্য নহে। আধি বিদূরিত করিতে পারিলে, আমি পুলকিত হইতাম। মনের রোগে জীব নিয়ত প্রপীড়িত। মনের ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য।" মুমূর্ষু কুষ্ঠী, মহাপুরুষ-বোধে শঙ্করকে বহুবিধ স্তব করিলেন। শঙ্কর বলিলেন,—"তুমি তোমার স্বগৃহে গমন করিয়া অন্যূন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-সেবা কর। গৃহস্থাশ্রম পরিপালন তোমার ভবব্যাধির মহৌষধ। বৌদ্ধের কুবুদ্ধিতে, চার্ব্বাকের প্রলোভনে আত্মবলি প্রদান করিও না।" এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইল, শঙ্করের জয়স্থান দর্শন করিয়া কৃতার্থন্মন্য হইল, এবং সকলের নিকট শঙ্করের মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। শূদ্রজাতীয় ঐ উপকৃত ব্যক্তি কোঙ্কণরাণী ছিল। শঙ্কর-স্পর্শে রোগ-মুক্ত হইয়া, পুনর্ব্বার সনাতন-ধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রিতজীবন নির্ম্মল সুখানুভব করিয়াছিল।

আর একদিন এক বর্ষীয়সী, অপরোগও বালক ক্রোড়ে করিয়া, কাঁদিয়া করিতে শঙ্করা-শ্রমে উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকটী বাক্‌শক্তি-বিহীনা ছিল। সঙ্কেতে স্বীয় দৈন্যদশা জ্ঞাপন করিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় দেখিয়া, কারুণ্যপরিপূর্ণ শঙ্করের হৃদয় ক্ষুব্ধ হইল। পরে স্ত্রীলোকটির ক্রোড়দেশে পদ্মহস্তার্পণ-পূর্ব্বক ফুৎকার প্রদান করিলেন; তৎক্ষণাৎ উহার বাক্‌শক্তির স্ফূর্ত্তি হইল। অভূতপূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে, সকলেই বিস্মিত হইল; এবং শঙ্করে দেবসত্তব মনে করিতে লাগিল।

এইরূপে শঙ্কর-বিভবের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। সময়ে সময়ে এইরূপ জনতাও হইত। কিন্তু সকলের প্রতি শঙ্করের প্রসাদ বিতরিত হয় নাই। একদা এক দস্যু, বার্দ্ধক্য-বশতঃ দুষ্কর্ম্মতঃ-বিরত হইয়া, দুষ্টব্রণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল; জনশ্রুতিতে শঙ্কর-নিকেতনে উপস্থিত হইয়া কৃপাপ্রার্থী হইয়াছিল। শঙ্কর তাহার প্রতি কটাক্ষও করেন নাই। একদা এক অন্ধ ব্যাধ, লোকনাভিলাষে শঙ্করের পাদমূলে নিপতিত হইয়াছিল; শঙ্কর তাহার প্রতি সদয় হইলেও, অন্ধের এক চক্ষু ভাল হইয়াছিল। এরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, ঐ ব্যাধ কাপালিক-হস্ত হইতে অপহৃত কন্যা উদ্ধার করিত। শঙ্করের এই অলৌকিক বিভূতি-বার্ত্তা জনপরম্পরায় দূর-দেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। বহুলোক-সমাবেশিত হইলেও, অভিলষিত ফল-লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে নাই। মহাপুরুষ-গণের পক্ষপাতিত্ব না থাকিলেও, প্রসাদাভিলাষী লোকসঙ্ঘের প্রসাদ-প্রাপ্তি অদৃষ্ট-সাপেক্ষ। যাহারা প্রসাদে বঞ্চিত হইত, তাহারাও শঙ্করের শঙ্কর-সন্নিভ দেহকান্তি বিলোকনে প্রীতি অনুভব করিত, শিরীষ-কুসুম সুকুমার দেহযষ্টি-সংস্পর্শে তপ্তহৃদয়ে শান্তি-সুখানুভব করিয়া আনন্দিত হইত।

একদিন সায়ংকালে এক মূর্খ ব্রাহ্মণ, (গায়ত্রীজ্ঞানশূন্য) ক্ষয়রোগে জীর্ণ ও জীবনে হতাশ হইয়া, শঙ্করের নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শঙ্কর তাঁহাকে সন্ধ্যোপাসনা, প্রায়শ্চিত্তজপ ও সূর্য্যোপস্থান অনুষ্ঠানের উপদেশ দিলেন; বলিলেন,—"শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ সমুদয় কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই রোগমুক্তি হইবে।" আরও বলিলেন,—"গুরুসমীপে ঐসমস্ত ক্রিয়ার পুনরুপদেশ ও অর্থচিন্তা শ্রুত হইয়া উহাতে

সংশিতব্রত হইলে, রোগে আক্রমণ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণজাতিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া সন্ধ্যা-গায়ত্রী বিসর্জ্জনে পতিত্য ঘটে, এবং রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়।" ব্রাহ্মণ ঐ কথায় নির্ভর করিয়া, স্বীয় গুরু-সেবায় সন্ধ্যাজ্ঞান-লাভ ও যথারীতি অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক নীরোগ হইয়াছিলু। এইরূপ বিভব-প্রকাশে জনআর জোলাইলে শঙ্করের আর শান্তিবোধ হইতে না; কারণ তাঁহার অভিপ্রেত-সিদ্ধির সোপান অদ্যাপি প্রস্তুত হইল না। তিনি দেখিলেন—দিন যায়, দেশ বৌদ্ধময় হইয়া উঠিল, কাপালিকের অত্যাচার একান্ত অসহ্য হইতে লাগিল। একদিন শুনিলেন,—খণ্ডগিরিতে বহু কাপালিক নানাবিধ অনাচারে দেশ-মন কলুষিত করিতেছে। কালিকার তুষ্টি-সাধনায় সতীত্ব-নাশ ও নরবলি-প্রদান করিতে তিলমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেছে না। সর্ব্বদা মদিরা-পানে অরুণ-নয়ন! দলবদ্ধ হইয়া দস্যুতা করিতেও তাহাদের বিলক্ষণ প্রবৃত্তি! এইরূপ দেশের দৌরাত্ম্য-সংবাদ শ্রবণমাত্র, শঙ্কর অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন; স্থির করিলেন—শীঘ্রই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেই হইবে। বিলম্বে দুর্ব্বিসহ উদ্বেগ।

ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এই শিক্ষালাভ হয় যে, যখনই ধর্ম্মগ্লানির পরাকাষ্ঠা উপস্থিত হইয়া অশেষ দুর্গতি হইয়াছে, তখনই মহাপুরুষাবির্ভাব হইয়াছে। লোকগণ রাজ-শাসনে একান্ত উদ্বেলিত হইতে হইতে যখন অতিশয় অসহ্য হইয়া উঠে, তখন শাসনদণ্ড বিধ্বংশ করিয়া রাজশক্তি নির্ম্মূল করিয়া দেয়, প্রকৃতিও এই নিয়মাধীন। প্রবাহ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে রোধ প্রস্তুত করিলে জলরাশি স্ফীত হইতে হইতে অভিক্রম করে; পরিবাহে প্রতিক্রিয়া সাধিত হয়। নির্ব্বাতপ্রায় ধরণীতে অল্পকাল পরে প্রলয় ঝটিকার বিলোড়ন উপস্থিত হয়। এইজন্য অনেক সময় দেশের দুর্গতি উপস্থিত হইলে, অনেক বুদ্ধিমান অত্যাচার প্রভৃতিকে প্রয়োজনীয় বোধ করেন। নির্জ্জীব দেশে সজীবতা লাভ করিবার পূর্ব্বে অত্যাচারিত না হইলে জড়ত্ব বিদূরিত হয় না। দেহের স্পন্দন প্রয়োজন। ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইলেও এই নিয়ম। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ কর্ম্মক্ষেত্র ও পুর্ব্বদেশ। পূর্ব্বদেশের মনুষ্যত্ব পূর্ণ। সেদেশে এরূপ ধর্ম্ম-বিপ্লব চিরবিরাজ করিতে পারে না; বিশেষতঃ ভারতে ধর্ম্মাভাব হইলে, জগৎ ধর্ম্মশূন্য হয়। পৃথিবীতে ধর্ম্মব্যাপদেশে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাহা আচরিত হইতেছে, তাহা সর্ব্বভাগ ভারত হইতে পরিগৃহীত। সাক্ষাৎ পরম্পরা বা সম্বন্ধে ভারত হইতে ধর্ম্মশিক্ষা প্রচারিত না হইলে, পৃথিবীতে ধর্ম্মানুষ্ঠান থাকিত না। তবে বিদেশে অনুষ্ঠাতার তাহা প্রবর্ত্তিতে বিকৃত হইয়াছে মাত্র। "ভারতে আর প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান নাই; ভারত আর কতকাল ধর্ম্মদুর্গতি-পীড়িত থাকিবে? দুর্গতি পরিহারের জন্য ভগবদাবির্ভাব!" কাজেই শঙ্করদেব বিগত প্রতীক্ষা করিতে অনভিলাষী ছিলেন।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বয়সমাত্র লক্ষ্যে অকস্মাৎ নিদারুণ অশনি-পাত হইয়াছে—'ভূদেব' ভূলোক পরিত্যাগ করিয়া দিব্যলোকে গমন করিয়াছেন। ভূদেব—ছাত্রের শিক্ষাগুরু,ভূদেব—দীনের আশ্রয়দাতা, ভূদেব—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সংরক্ষক, ভূদেব—ভূলোকে প্রকৃতই 'ভূদেব'! হতভাগ্য আমরা, আজ আমরা সেই 'ভূদেব' হারাইয়াছি! গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, রাত্রি ২টার সময়, ভূদেব ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

১২৩২ সালের ২রা ফাল্গুন ভূদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান—কলিকাতার হরিতকীবাগান। তাঁহার পিতার নাম—বিশ্বনাথ সার্ব্বভৌম। তিনি দরিদ্র নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁদিগের আদিবাস—খানাকুল-কৃষ্ণনগরে। জ্ঞাতিবিরোধ-নিবন্ধন ভূদেবের পিতামহ কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন।

নবম বর্ষ বয়সে ভূদেব সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে হিন্দুকলেজের ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। কিন্তু এসময় তিনি বিদ্যাভ্যাসে এত মনোযোগী ছিলেন যে, পঞ্চম শ্রেণী হইতে 'জুনিয়র' বৃত্তি পাইয়া একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন, এবং

অল্পদিন পরেই 'সিনিয়র' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। ইহার পর 'হিন্দু-চ্যারিটেবেল্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের' প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন, এবং সেই হইতে দেশমধ্যে স্কুল স্থাপনা করিয়া দেশে শিক্ষা-প্রচারের চেষ্টা পান—চন্দননগর, শ্রীপুর, সেহাবালা, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁহারই যত্নে স্কুলও স্থাপিত হয়।

কিন্তু এই সময় ভগিনীর বিবাহ প্রভৃতি সাংসারিক কতকগুলি কার্য্যের ভার পড়ায়, তিনি চাকুরীর চেষ্টা পান; এবং ১৮৪৯খৃষ্টাব্দে ৫০৲ টাকা বেতনে মাদ্রাসা-কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। দশমাস পরেই, তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া, রাইলি সাহেব তাঁহাকে ১৫০৲ টাকা বেতনে হাওড়া-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। ৭ বৎসর পরে তাঁহার আরও উন্নতি হয়; তিনি ৩০০৲ টাকা বেতনে হুগলী নর্ম্মাল-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন।

১৮৬২খৃষ্টাব্দে ৪০০৲ টাকা বেতনে তিনি সহকারী স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হন; ১৮৬৩ অব্দে তিনি অ্যাডিসন্যাল ইন্‌স্পেক্টর, ১৮৭৫ অব্দে সেণ্ট্রাল ডিভিসনের ইন্‌স্পেক্টর, ১৮৭৬ অব্দে হুগলী ও ওয়েষ্টার্ণ সার্কেলের ইন্‌স্পেক্টর, এবং পরে বেহার-অঞ্চলের ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন। মধ্যে একবার 'ডিরেক্টর অব্ পব্‌লিক ইন্‌ষ্ট্রুক্‌সনের' কর্ম্মও করিয়াছিলেন। ফলতঃ এইরূপ পদবৃদ্ধির সহিত তাঁহার বেতনও ক্রমশঃ ১৫০৲ টাকা হইয়াছিল।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে তিনি 'শিক্ষাদর্পণ' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন; ১৮৬৮ অব্দে "এডুকেশন গেজেটের" সম্পাদক হন। ১৮৭৭ অব্দে তিনি সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন; ১৮৮১ খৃঃ অব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন; ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে পেন্সন লন।

ভূদেব ১০খানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ' পুস্তকদ্বয় পরিণত-মস্তিষ্কের পরিপক্ক ফল।

তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দদেব ও কনিষ্ঠ মুকুন্দদেব উভয়েই কৃতী।

ভূদেবের ন্যায় ধার্ম্মিক, ভূদেবের ন্যায় প্রজ্ঞা পণ্ডিত, ভূদেবের ন্যায় বদান্য, ভূদেবের ন্যায় নিষ্ঠাবান হিন্দু বাস্তবিকই বিরল। ভূদেব সত্যই যেন 'ভূদেব'! দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসী! আর তোমরা সেই ভূদেব হারাইয়াছ! এ শোক—এ অভাব কি কখনও নিবৃত্তি হইবে?

ঠাকুর-ঝি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, ঝড় হউক—জল হউক, ইহার আর কোন ব্যতিক্রম কখনই হইতে পারে না; সুতরাং রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। যাহার সুখের রাত্রি, তাহার রাত্রি কিরূপে চলিয়া যায়, সে তাহা জানিতে পারে না; আর যাহার দুঃখের রাত্রি, সে রাত্রি কিরূপে যাইতেছে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারে। হীরালাল বাবুর সুখের রাত্রি কিরূপে প্রভাত হইয়া গেল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহার পরিবারবর্গের রাত্রি—দুঃখের রাত্রি, সুতরাং সে রাত্রি কিরূপে গত হইল, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

প্রভাতে হীরালাল বাবুর অনুসন্ধানের জন্য স্থানে স্থানে লোক পাঠান হইয়াছিল; কিন্তু বেলা দশটা পর্য্যন্ত কোন অনুসন্ধানই পাওয়া গেল না। আমাদিগের বোধ হয়, হীরালালবাবুর রাত্রি তখনও প্রভাত হয় নাই। দুই প্রহরের সময় হীরালাল বাবুর বন্ধু সুরেশ বাবু সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে,—বাবু তাঁহারই বাড়ীতে আছেন, আহারাদি তাঁহারই বাড়ীতে হইবে, সন্ধ্যার সময় তিনি তাঁহাকে বাড়ী রাখিয়া যাইবেন, উদ্বিগ্ন হইবারও কোন কারণ নাই। হীরালালের জননী প্রভৃতি সুরেশ বাবুকে সচ্চরিত্র বলিয়া জানিতেন, সুতরাং তাঁহারা এসংবাদে অনেকটা সুস্থির হইলেন।

প্রভাতে বাড়ীর সেই ঝি উঠিয়াই বাড়ী সমগরম করিতে আরম্ভ করিল, একে ত রাত্রিতে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, তাহার উপর বাবু সেই রাত্রে বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়ায় তাহার একটা দুর্ভাবনার কারণ হইয়াছিল; সুতরাং তাহার মনের অবস্থা ভাল ছিল না। তাহার প্রথম শিকার হইল—বাড়ীর সেই বেহারা। সে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র, ঝি তাহাকে অতি মধুর ভাষায় অভ্যর্থনা করিল। সে অভ্যর্থনাটা এইরূপ হইল—"পোড়ার মুখো, মনিবের মাইনে খাস্‌নে? সন্ধ্যে না হতে হতেই কোন্-চুলোয় চলে যাস্? কাল আমি না থাক্‌লে যে, বাবু মারা যেতো! তখন তোকে মাসে মাসে কে দু'টাকা ক'রে মাইনে দিতো, রে পোড়ারমুখো?"

বেহারা গোপীনাথ, ঝির এইরূপ অভ্যর্থনায় অবাক্ হইয়া রহিল। সে মনে করিল, গত রাত্রে নিশ্চয় কোন বিপদ ঘটিয়াছিল; সুতরাং রাত্রিতে বাড়ী না থাকায় তাহার অন্যায় হইয়াছে। সেই কারণ, সে ঝির এরূপ অভ্যর্থনায় একটি দ্বিরুক্তিও করিল না। ভয়ে শরৎকুমারীর নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহস হইল না। সে ধীরে ধীরে অমলার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"রাত্‌মে বাবুকো ক্যা হুয়া, মা-জী?"

মা-জী তখন কি উত্তর করিবেন, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কিছু ক্ষণ পরে অমলা বলিল,—"বাবুর অসুখ করেছিলো।"

বাবুর অসুখের কথা শুনিয়া, গোপীনাথ তাড়াতাড়ি বাবুর শয়নঘরে প্রবেশ করিল; কিন্তু সেখানে গিয়া বাবুকে দেখিতে পাইল না। সে ঘরে শরৎকুমারী ছিল; শরৎকুমারী, গোপীনাথকে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ বাবুর অনুসন্ধানে তাহাকে পাঠাইয়া দিল। গোপীনাথ তখন বাবুর অসুখটা কিরূপ তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এদিকে অমলা, ঝির রকম-সকম দেখিয়া বড়ই ভীতা হইল। পাছে তাহার দ্বারায় এই কলঙ্কের কথা ঝি কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলে, সেই কারণ তাহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিল,—"ঝি, আমার মাথা খাস্, কাল রাত্রের কথা যেন কারু কাছে বলিস্‌নে।"

অমলা আর গোপীনাথ—ঝির এই দুই শিকার এই বাড়ীতে ছিল; ইহাদেরই উপর ঝি আপনার গায়ের ঝাল মিটাইত। গোপীনাথের পালা শেষ হইয়াছে; এখন অমলাকে পাইয়া ঝি গর্জ্জিয়া উঠিল,—"হাঁ গা, সারাদিন খেটে মরবো—সারা রাত ঘুমুতে পাবো না—আর মুখের কথা একটা, তাও বলতে পার্‌বো না! এতখানি যে করে মরি, একবার সে কথা মুখেও আন্‌বো না?"

অমলা ঝির চরিত্র জানিত। তাহাকে এক-ভাবে কোন কথা বলিলে, সে কোন সময়েই সেভাবে সে কথা লইত না। তাহার নিজের একটা ভাব ছিল; সে যখন যে ভাবে থাকিত, অন্যের ভালমন্দ সকল কথা সে, তখন সেইভাবেই লইত। তবে ঝির এ রোগের ঔষধও অমলার জানা ছিল; অমলা তাহার সাদার জন্য ঝিকে, সুতরাং সেই ঔষধ প্রয়োগ করিল। আপনার বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটি মুদ্রা বাহির করিয়া ঝির হাতে দিয়া বলিল,—"ঝি, তুই আমাদের ঘরের লোক; একথা প্রকাশ হ'লে, দাদার 'নিন্দে হবে। তুই ঘরের লোক হয়ে, দাদার যাতে নিন্দে হয়, তাই কর্‌বি?"

মুদ্রার মোহিনী-শক্তিতে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, ঝি আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া বলিল,—"সে কি দিদিঠাকুরোণ? বাবুর নিন্দে আমি করবো—এমন গয়লার মেয়ে আমি নই! বাবুর যে নিন্দে কর্‌বে, আমি তার নাক্-কান্ কেটে দেবো—গাল দিয়ে তাঁর ভূত ভাগিয়ে দেবো—তবে আমি ছাড়বো!"

অমলা ধীরে ধীরে বলিল,—"তোকে গাল-মন্দ কিছুই কর্‌তে হবে না বাছা। তুই একথা প্রকাশ না কর্‌লেই হবে।"

ঝি এইবার উত্তর করিল,—"আমার কাছে আবার কথা পেরকাশ! বুক ফাট্‌বে দিদি-ঠাকুরোণ, তবু মুখ ফুট্‌বে না।"

অমলা তখন নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ঝির ত বড় বিপদ! ঝি আর কাহারও সহিত কথা কহিতে পারে না; কারণ, অন্য কথা কহিতে গেলে, যদি রাত্রের কথাটা বাহির হইয়া যায়। ঝি আজ নীরবে বাসন-মাজা, ঘর-ধোয়া প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম শেষ করিল বটে, কিন্তু ইহাতেই যেন ঝির পেট ফুলিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি একটা গুরুরোগ শীঘ্রই হইবার সম্ভব। ঝি পাড়ার মধ্যে যখন কাজকর্ম্ম করিতেছিল, তখন বাহিরের লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার তাহার কোন সুযোগ হয় নাই; সুতরাং রাত্রির সে ঘটনার বিষয় কাহাকেই বা বলিবে? কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? অমলা মাথার দিব্য দিয়া ঝিকে সে কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহার উপর ইহার জন্য তাহাকে উৎকোচ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং সেই কারণেই ত ঝির এত কষ্ট! ঝি এখন সে কথা প্রকাশ না করিলে প্রাণে মারা যায়। সুতরাং ঝির কাছে অমলার মাথার দিব্য আর সেই টাকাটি বড়, না তাহার নিজের প্রাণ বড়—ঝি এই বিষম সমস্যায় পড়িয়াছে। এমন সময় গোপীনাথ, বাবুর অনুসন্ধানে যাওয়ায় ঝির উপর বাজারে যাইবার ভার পড়িল। ঝি এই বার বিষম পরীক্ষায় পড়িল।

প্রথমে ঝি, কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া দাঁতে দাঁত বসাইয়া, মুখ লুকাইয়া বসিয়া ছিল; এমন সময় কামিনীর মা (আর একজন ঝি,) বলিল,—"কিগো মাসী, আজ তুমি বাজারে চলেছ যে?"

ঝি তখন কথা না কহিয়া কিরূপে থাকিবে? বাধ্য হইয়া বলিল,—"বেহায়া পোড়ার-মুখো বাবুকে খুঁজ্‌তে গেছে মা, তাই আমি বাজারে যাচ্ছি।"

কামিনীর মা ঐ কথা শুনিয়াই চলিয়া যায়। কিন্তু ঝির উপায় কি হইবে? সে যদি আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে ঝি ধর্ম্মের কাছে অনায়াসে খোলসা থাকিতে পারিত। কামিনীর মাকে হনহন্ করিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া, ঝি ডাকিল,—"ও কামিনীর-মা, একটা কথা শুনে যা মা! বল্‌ছিলাম কি—আমায় বল্‌তে যখন বারণ করেছে, তখন সে কথা আমার কারো কাছে বল্‌বার দরকার কি মা? বাবু রাত্তিরে রাস্তায় এসে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো; কি বাতাস করে—মুখে জল দিয়ে, তবে জ্ঞান হলো। এ দিদিমণি, যখন মাথার দিব্যি দিয়ে একথা বল্‌তে বারণ করেছেন, তখন সে কথা কাকেও বল্‌বার আমার দরকার কি মা? আমি এমন নেমকহারামী কাজ করতে পারি—বল?"

কামিনীর মা কথাটা শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেল। তখন ঝি নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার গুরুরোগ তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইয়া গেল। তখন সে দুই চক্ষে যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই নিজে ডাকিয়া ঐরূপ ভনিতার সহিত রাত্রির ঘটনার কথা শুনাইয়া দিল। অমলার অদৃষ্টের গুণে, সে অগ্নি-নির্ব্বাণের জন্য যে জল ঢালিল, সে জল, অগ্নি-সংযোগে ঘৃত হইয়া দাঁড়াইল?

শোকসভা।

স্বর্গীয় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের বিয়োগে।

গিত ৬ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়, 'সিটি-থিয়েটারে' স্বর্গীয় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের অসাময়িক বিয়োগে শোক-প্রকাশ করিবার নিমিত্ত এক সভার অধিবেশন হয়। সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এই সভা আহূত হইয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেই প্রসিদ্ধ বাগ্মীবর ও প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু মহাশয় এই সভার সভাপতি মনোনীত হন। সভার কার্য্যারম্ভ পরিসমাপ্তি-কালে 'সিটি থিয়েটারের' একজন সুদক্ষ গায়কের দ্বারা তৎকালোচিত সুর-সংযোজিত হইয়া দুইটী গান গীত হইয়াছিল। তাহার একটীর রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্রের মুখোপাধ্যায় বিদ্যানিধি মহাশয় এবং অপরটীর রচয়িতা সভাপতি মনোমোহন বাবুরই সুযোগ্য পুত্র বাবু বিমানবিহারী বসু। "অনুসন্ধানের" স্বাভাবিক প্রকৃতির ইচ্ছাসত্ত্বেও আমরা সেই শোকোদ্দীপক সুন্দর গান দুইটি এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না; আর সেই স্থানাভাব বশতঃই বক্তাগণের গভীর শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতারও সকল কথা আমরা এস্থলে প্রকাশ করিতে পারিলাম না; কেবল চুম্বকে তাহার সারসংগ্রহ মাত্র প্রদত্ত হইল।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়, শারীরিক অসুস্থতা-প্রযুক্ত সভামধ্যে উপস্থিত হইতে না পারিয়া, সভাপতি মহাশয়কে যে পত্রখানি প্রেরণ করেন, সেই পত্রখানিতে স্বর্গীয় কবিবরের সহিত তিনি কিরূপ সৌহৃদ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন—তাঁহাকে তিনি কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, তাহা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম। সে পত্রখানি এই :—

"সবিনয় নিবেদন,—

দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমার জ্বর হওয়াতে আমি অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না। যাঁহার বিয়োগে শোক-প্রকাশার্থ এই সভার

অধিবেশন হইয়াছে, তিনি আমার অকৃত্রিম সুহৃৎ ছিলেন। দীর্ঘকাল সৌহৃদ্য-সূত্রে আবদ্ধ থাকাতে আমি তাঁহার অসামান্য গুণের পরিচয় পাইয়াছি। সুবলবন্ধন-বলে তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে যেরূপ উন্নতি-লাভ করিয়া সর্ব্বজনের পরিচিত ও সর্ব্বজনের সম্মানিত হইয়াছিলেন,তাহা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটী প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। আমরা ভিন্নদেশীয় ডুবাল প্রভৃতির জীবনী-পাঠে যেরূপ উপদেশ লাভ করিতে পারি, স্বদেশীয় রাজকৃষ্ণের জীবনী-পাঠে আমাদের তদপেক্ষা অধিকতর উপদেশ লাভ হইতে পারে। রাজকৃষ্ণ আজন্ম কবি ছিলেন। তাঁহার সুললিত কবিতা, পবিত্র-সলিলা "মন্দাকিনীর ন্যায় নিরন্তর অবিরল-ধারায় প্রবাহিত হইত। তিনি অল্পবয়সে, অতি অল্পসময়ের মধ্যে, রামায়ণ মহাভারতের নব্যরস দুইখানি সুবিস্তৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান ইতিহাস। রাজকৃষ্ণ এই ইতিহাস সুললিত কবিতায় নিবদ্ধ করিয়া, দেশের যে কত উপকার করিয়াছেন, বলিয়া শেষ করা যায় না। রাজকৃষ্ণ যেরূপ সুকবি, সেইরূপ সরল-হৃদয়, বন্ধুবৎসল, নিরহঙ্কার ও নির্ব্বিরোধি ছিলেন। যখনই তাঁহাকে দেখিয়াছি, তখনই তাঁহার এই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি যখন সুস্থশরীরে ছিলেন, তখন যেরূপ সৌজন্যের পরিচয় দিতেন ; তিনি যখন রোগ-শয্যাশায়ী হইয়া প্রতিক্ষণে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতেন, তখনও সেই সরলতা ও বন্ধুবৎসলতার পরিচয় দিয়া আমার প্রীতিসাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এই অসামান্য স্নেহ ও সৌজন্য আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। তাঁহাকে হারাইয়া, আমি একজন সদাশয় সুহৃৎ, প্রবল সৎপরামর্শদাতা ও প্রীতিভাজন পরিজন হারাইয়াছি। তাঁহার বিয়োগে যে শোকগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা বাক্যে পরিস্ফুটিত বার নহে। তাঁহার স্মরণার্থ সভায় উপস্থিত হইতে না পারাতে, আমি সার-পত্র-নাই দুঃখিত হইয়াছি।" ইতি ৬ই বৈশাখ, ১৩০১ সাল।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্তস্য।"

ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ মহাশয়ও, ঐরূপ সুললিত ভাষায় এই সভার কার্য্যে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তাহার পর সভাপতি মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া রাজকৃষ্ণের কবিত্ব-শক্তির অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"রাজকৃষ্ণের পরিচয় আমি আর কি দিব? তাঁহার যশসৌরভে আজ সমগ্র বঙ্গদেশ আমোদিত হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাল্যকালে যখন 'মধুসূদ' নাম কবিতা লিখিতেন, তখনই আমি তাঁহার সে বাল্যজীবনের রচনা দেখিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির আশা করিয়াছিলাম আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে।"

সভাপতি মহাশয়, অতি সুন্দর ভাষায় অথচ সারগর্ভ কথায় মৃত কবিবরের অন্যান্য গুণের পরিচয় দিয়া, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ মহাশয়কে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। দামোদর বাবু সময়োচিত ধৃষ্টতা-ভাব রক্ষা করিয়া, রাজকৃষ্ণের নানা গুণের প্রশংসা করিয়া, এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,—"রাজকৃষ্ণ অতুলকীর্ত্তি—তাঁহারি রামায়ণ ও মহাভারত কীর্ত্তিবাসের পদ্য-রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের পদ্য-মহাভারত বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র আদৃত হইলেও, মূলের সহিত উহাদের ঐক্য নাই। কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবুর পদ্য-রামায়ণ ও পদ্য-মহাভারত মূলের সহিত ঐক্য আছে। কীর্ত্তিবাস ও কাশীরামের সঙ্গে সঙ্গে রাজকৃষ্ণের আদর বৃদ্ধি হইলে আমি বিশেষ সুখী হইব।"

উপসংহারে তিনি সেই স্পেনদেশীয় লেখক লোপ্-ভি-ভেগার সহিত আমাদের রাজকৃষ্ণের তুলনা করিয়া, তাঁহার সেই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার উপসংহার করেন।

দ্বিতীয় বক্তা—আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়। তিনি অতি গভীরভাবে শোকোদ্দীপক ভাষায় রাজকৃষ্ণের নানাগুণের প্রশংসা করিয়া, তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে অনেক আক্ষেপ করেন। রাজকৃষ্ণের জন্য শোক করিতে গিয়া, তিনি স্বর্গীয় বঙ্কিম-চন্দ্র ও ভূদেবচন্দ্রের মৃত্যুজনিত আরো দুইটি গুরুতর শোকের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

তৃতীয়-বক্তা—হাইকোর্টের উকিল শিবা-প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিনি প্রথমে অতি সুন্দর ভাষায় ও স্পষ্ট কথায় এরূপ সভাসমিতি করিয়া শোক-প্রকাশের বিরুদ্ধে বিশেষ যুক্তিপূর্ণ মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,—"নির্জ্জনে বসিয়া একাকী ক্রন্দন, করিলে সে ক্রন্দনেও সুখ আছে। আরও, এরূপ সভাসমিতি আমাদের হিন্দু-আচার-বিরুদ্ধ।" কোনরূপ স্মরণার্থ চিহ্নেরও তিনি পক্ষপাতী নহেন। সে কেবল বিদেশীয়ের সম্মান করিতে গিয়া, বিদেশীয় শিষ্টার উদর-পূরণ করা মাত্র।

চতুর্থ বক্তা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,—"রাজকৃষ্ণ কেবল কবি ছিলেন না ; বাঙ্গবে তাঁহার অনেক চিন্তাপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার বিদ্যের বীণাতেও তাঁহার সমালোচনী শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উপন্যাস, নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া, অল্পবয়সেই তিনি এক অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মরণার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বৃত্তি স্থাপিত হইলে ভাল হয়।"

পঞ্চম বক্তা—ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়। তিনি তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতায়, অতি তেজস্বিনী ভাষায় এক গভীর শোকব্যঞ্জক বক্তৃতা করিয়া, সভাস্থ সমস্ত লোককে একেবারে শোকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন। তিনি কতকগুলি অসার কথার বাহাড়ম্বর করিয়া আপনার বাগ্মিতার পরিচয় দেন নাই ; তিনি যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহার অন্তরের স্তরে স্তরে গাঁথা ; আর তিনি মৃতকবির স্মরণার্থ সর্ব্বজন-সমক্ষে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও আমাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে গাঁথা হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রথমেই আরম্ভ করেন ;—লোকে গভীর শোক প্রকাশ করিতে হইলে বলিয়া থাকেন যে, অমুকের মৃত্যুতে তাঁহার 'ডান-হাত' কাটা গিয়াছে। কিন্তু রাজকৃষ্ণের মৃত্যুতে, তিনি বলেন যে, তাঁহার শরীর, মন, প্রাণ সমস্তই কাটা গিয়াছে —কেবল ডানহাতটী পড়িয়া আছে। তৃতীয় বক্তা শিবপ্রসন্ন বাবু সভা করিয়া শোক-প্রকাশের বিরুদ্ধে যে মত প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তিনি সে মত খণ্ডন করিয়া বলেন, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে আমাদের ধর্ম্মে যে শ্রাদ্ধাদির বিধান আছে, সেই শ্রাদ্ধের সভাই, তাঁহার বিশাস-শাস্ত্র-বিহিত শোক-সভা ; সুতরাং ইহাতে অহিন্দুভাব কিছুই নাই। তিনি আরও বলেন,—"যে গ্রন্থকারের স্মৃতি রাখিবার জন্য প্রস্তর-মূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়, সে গ্রন্থকারের স্মৃতি দেশ হইতে যত শীঘ্র লোপ হয়, ততই দেশের মঙ্গল। তবে রাজকৃষ্ণ বাবুর স্মৃতি-চিহ্নের জন্য যদি আপনারা যথার্থই উৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রতি ঘরে ঘরে তাঁহার গ্রন্থরাশি

ক্রয় করিয়া রাখিলেই মৃত কবির প্রতি যথার্থ সম্মান-সূচক স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনা করা হইবে ; অথচ কবির দরিদ্র পরিবারেরাও ইহাতে বিশেষ উপকৃত হইবেন।" আমরা অমৃতবাবুর এই যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। প্রবন্ধান্তরে আমরা এবিষয়ের আন্দোলন করিতে চেষ্টা পাইব।

পরিশেষে আমাদের দেশের গৌরব, সেই শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, অমৃতলাল বাবুর প্রত্যেক কথার সমর্থন করিয়া বলেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির সহিত বাঙ্গালী জাতির উন্নতি একসূত্রে গ্রথিত। তিনি আরও বলেন, তিনি পাশব বলের পরিবর্ত্তে আধ্যাত্মিক-বলের উন্নতির পক্ষপাতী। বাঙ্গালী দুর্ব্বল বলিয়া কোন কোন বলবান্ জাতির চক্ষে ঘৃণিত হইলেও, আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারা এক সময়ে তাহারা সমগ্র পৃথিবীর নিকট পূজিত হইতে পারে। তিনি এইরূপ আরও অনেকগুলি যুক্তিপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ উপদেশ দিয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষে শোক-সভার এই ক্ষুদ্র বিবরণ-লেখকও, শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক বক্তৃতার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ দ্বারা তৎসমুদয়ই বিশেষ দক্ষতার সহিত বর্ণিত হওয়ায়, বিশেষতঃ অমৃতলাল বাবু ও মাননীয় গুরুদাস বাবুর সেই মনোমুগ্ধকর বক্তৃতার পর আর কোন কথা বলা অযুক্তিকর বিবেচনায়, সভাপতি মহাশয়ের সে অনুরোধ রক্ষা হয় নাই। নচেৎ বক্তৃতা না করিয়া, একবার দাঁড়াইয়া ক্ষণকালের ইচ্ছাও আমার ছিল ; আর ইহা ছিল—আমার সেই সুহৃদ্বর কবিবরের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। রাজকৃষ্ণের অকাল-মৃত্যুতে আমার হৃদয়ে একটী নহে দুইটী শেল বিদ্ধ হইয়াছে ; একটী দেশ-হিতৈষী স্বদেশের কবি-বিয়োগ-জনিত শোক ; আর অপর শেলটী—সংসারের আত্মীয়-বিয়োগ-জনিত শোক। আজ বিশ বৎসর কাল তাঁহার সহবাসে থাকিয়া, আমি তাঁহার অশেষ গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আজ যখন স্থানাভাব-প্রযুক্ত প্রসিদ্ধ বক্তাগণের সকল কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের সম্মান রক্ষা করিতে পারি নাই, তখন আমার ঐই ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র শোকোচ্ছ্বাসের স্থলে আর কি উল্লেখ করিব? রাজকৃষ্ণের জীবনের অনেক বিস্ময়জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিষয় আমার জানা আছে, সময়ে আমি তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব।

উপসংহারে একটী মাত্র কথা বলিব। থিয়েটার-সদৃশ্যপ্রায়, এই সভা-উপলক্ষে নিমন্ত্রিত সভাস্থ সমস্ত ভদ্রমণ্ডলীর অভ্যর্থনা ও সম্মান করিয়া, মৃত কবির প্রতি যেরূপ আন্তরিক সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।

অনুসন্ধান

কলিকাতা লিটারেচার লাইব্রেরী
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৯/এম, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। পঞ্চম সংখ্যা।

রসোচ্ছ্বাস।

রে সখি, কি পুছসি, কি কহব তোয়।
কানু-দরশ-আশা, কৈছে মিটায়ব,
বাদী সবহুঁ জন মোয়।
দৈবে দরশ যদি, পায়নু অভাগিনী,
পহিলে সরম ভেল বাদী ;
পানি পসারি জনু, দিঠি মঝু ঝাঁপল,
নয়নপল্লবযুগ রোধি।
পাসিয়া সরম, মরম যব বেঢ়ল,
কতহুঁ ত্রাসল পিয়া কেল ;
যতনহি দিঠিপর, দিঠি যব সোঁপনু,
পাপ পলক দুখ দেল।
এক বদন তনু, মঝু দুহুঁ লোচন,
দুহুঁ দিঠি ভৈ গেল ভোরা ;
অপরূপ রূপ, সায়র-মাহা পৈঠই,
না মিটল তিয়াষা হামারা।
বারইতে পলক, বিদায় তঁহি মাগল,
ঝর ঝর লোচন-বারি ;
ঝরইতে সঘনে, নয়নযুগ আঁধল,
কৈছনে হেরব মুরারী ?
বিদায় কি কাঁলে, আঁখিবারি বরখই,
বড়ি দুখ দেয়ল মোহে ;
সব জন বাদী, কাহে সখি বারব,
অভয়াকান্ত মন মোহে।

রসিকত্ব।

(৩)

আমরা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুমোদিত রসপঞ্চক, অধিকার-ভেদে, উপাসনা-পদ্ধতি মাত্র। সেই অধিকার-ভেদ বর্ত্তমান প্রস্তাবে বিচার ও ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। চরিতামৃতকার প্রবর্ত্ত সাধকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রবর্ত্ত সাধকের অপর নামই শান্তভক্ত। লক্ষণগুলি এই;—

"কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্য,সার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্গুণ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কার্য্যদক্ষ, মৌনী॥
অসৎসঙ্গী ত্যাগ, এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

ভাগবতাদি পুরাণে শম, দম, নিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়-সংযম, তিতিক্ষা, দুঃখত্যাগ, অমর্ষত্যাগ, জিহ্বাশাসন, জয়, ধৃতি, এইগুলি শান্তভক্তের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কবিরাজ গোস্বামী, উপরের কয়েক পংক্তি পয়ারে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে পুরাণোক্ত দুই-একটি লক্ষণ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং স্বকপোল-কল্পিত দুই-একটী লক্ষণ যোগ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষার দোষে—বিশেষ্য-বিশেষণের অযথা এবং অসঙ্গত সংমিশ্রণে, এক অদ্ভুত পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ঐ পংক্তি কয়েকটীর ভাব বিশুদ্ধ ভাষায় নিম্নে লিখিতেছি।

কবিরাজ পাদের মতে শান্তভক্তদিগের এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা উচিত। যথা,—দয়া, অকৃতদ্রোহতা (পরের অনিষ্ট-চেষ্টা না করা), সত্যবাদিতা, সারবত্তা, শম, দোষ-রাহিত্য, বদান্যতা, মৃদুতা, শুচিতা, অকিঞ্চনতা, পরোপকার, শান্তভাব, ভগবানে নির্ভর ও বিশ্বাস, নিষ্কামতা, নিরীহতা, স্থৈর্য্য, ষড়্‌জয়, মিতভোজন, অপ্রমত্ততা, মানহীনকে সম্মান, গাম্ভীর্য্য, কারুণ্য, মৈত্রী, কার্য্যদক্ষতা, মৌনাবলম্বন, এবং অসৎসঙ্গত্যাগ। পরিশেষে শান্তভক্ত সাধু কে নহে, তাহাও নির্দ্দেশ করিতেছেন। অর্থাৎ যিনি স্ত্রীসঙ্গে রত—কামের দাস, তিনি একজন, এবং কৃষ্ণনাম শ্রবণকীর্ত্তন মননে যাঁহার অভক্তি বা অরুচি, সেই আর একজন। এই দুইজনই অসাধু, অশান্ত, অবৈষ্ণব। বাউল মহাশয়েরা রসিকভক্ত বলিয়া পরিচয় দিবার পূর্ব্বে যেন ইহার প্রথম লক্ষণটী স্মরণ রাখেন। অর্থাৎ যাঁহারা স্ত্রী-সংসর্গ-দোষে দূষী, যাঁহারা কামান্ধ, তাঁহারা রসিক হইতে পারেন না। তাঁহারা যে মধুর, উজ্জ্বল, বা শৃঙ্গার রসের দোহাই দেন, তাহা যে কাম নহে—বিশুদ্ধ প্রেম, সে কথা আমরা পরে দেখাইব।

উপরে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ হইল, যে ব্যক্তি ঐ লক্ষণাক্রান্ত হইবেন, তিনিই বৈষ্ণব-সাধনামার্গের প্রবর্ত্ত সাধক বা শান্ত ভক্ত হইতে পারিবেন। ঐগুলি আয়ত্ত করা যে কত কষ্টকর, কত কৃচ্ছ্রসাধ্য, কত যোগ ও তপস্যার প্রয়োজন, তাহা একবার চিন্তা করিবার বিষয়। অত করিলে—অত হইতে পারিলে, তবে সে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম অধিকারী হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ-লাভে মন উন্মত্ত হইলে, সাধক বাধাবিঘ্ন কিছুই মানে না, শ্রম-কষ্ট-আয়াস কিছুই গ্রাহ্য করে না, কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণৈকশরণ হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু মনে করিলেই এই শান্তভক্ত সাধু হওয়া যায় না। নব যোগীন্দ্রগণের তপস্যা, আরাধনা, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতির সুন্দর কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতে পাঠ কর; দেখিবে—সে কি মহিয়সী অলৌকিক ব্যাপার। আবার স্মরণ রাখিও, আজন্মযোগী, সর্ব্বেন্দ্রিয়সংযমী, নিত্যসিদ্ধ শুক-সনকাদি, এই শান্তরসের রসিক। এত কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগ করিয়া—এত ত্যাগস্বীকার করিয়া—শ্রীকৃষ্ণ-পদপঙ্কজ ভিন্ন সর্ব্বার্থ তুচ্ছ করিয়া, শান্তভক্ত ভগবানের দর্শন পাইলেন বটে। কিন্তু সে ভগবান ঐশ্বর্য্যময়—আয়ত্তাতীত বস্তু; দেখিলে, প্রাণ জুড়ায়, হৃদয় নাচে, মন মাতে বটে, কিন্তু তাঁহার সামীপ্য-লাভে সাহস হয় না। সে রূপরাশি দেখিলে, নয়ন ঝলসিয়া যায়, মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; সাধক দূরে—সুদূরে—বহু দূরে থাকিয়া, সে রূপ দেখেন, আর বলেন,—

"তাতল সৈকত, বারি-বিন্দু সম,
সুত-মিত রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমপিনু,
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব! মঝু পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতয়ে তোঁহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হম নিঁদে গোঁয়ায়নু,
জরা-শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী-রসরঙ্গে মাতনু।
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি-অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহর সমানা॥

অথবা অনুতাপ করিয়া বলেন;—

যতনে যতেক ধন, পাপে বাটায়নু,
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি, হেরি কোই না পুছত,
করম সঙ্গে চলি যায়॥
হে হরি, বান্ধা; তুয়া পদনায়।
অবহেলে পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি,
পারক কি হব উপায়॥
যাবত জনম হম, তুয়া পদ না সেবিনু,
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়ল,
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥"

পরিশেষে ভক্ত কাতর-কণ্ঠে প্রার্থনা করিয়া বলেন,—

"মাধব! বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া করি না ছাড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ, গুণলেশ না পায়বি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুঁহু জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগবাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুখ, পশুপাখী যো জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গ।

করম-বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ,
মতিরহু তুয়া পরসঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥"

এস্থলে সাধকের অধিকার বড় সংকীর্ণ। সাধক ভগবানকে তিন মূর্ত্তিতে দেখিতেছেন; পালক, বিচারপতি, ও ত্রাতা। কিন্তু নিজের পালক ভাবিতে পারেন, এতটুকু অধিকার হয় নাই; সেইজন্য বলিতেছেন—"তুমি জগন্নাথ, জগতপাতা; আর আমি সেই জগতের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র জীব। অতএব তোমার পাল্য।" কিন্তু সাধক সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছেন না,—'তুমি পিতা, আমি পুত্র; অতএব তুমি পালক, আমি পাল্য।" দ্বিতীয়তঃ, সাধক স্বকৃত দুষ্কৃতি-স্মরণে ভীত হইয়া, হাকিমের নিকট হাজতের কয়েদীর ন্যায়, ভগবানের নিকট অপরাধ-মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। তৃতীয়তঃ, সাধক মুক্তি-ইচ্ছু হইয়া, ভবসিন্ধু তরিবার জন্য, ভগবানের নিকট তদীয় বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত "পদপল্লব" যাচ্ঞা করিতেছেন। এই তিনটী স্থলেই দেখা গেল, সাধক ও সাধ্যে সম্পর্ক জন্মিয়াছে। কিন্তু সে সম্পর্ক অতি দূরতর। সাধ্যের উপর সাধকের যে দাবিটুকু জন্মিয়াছে, তাহার পরিমাণ অল্প—"তুমি জগতের স্বামী, আমিও জগতের দশজনের একজন; অতএব ভবসিন্ধু তরিবার নিমিত্ত আমাকে এক তিলের জন্য তোমার পদ-পল্লব অর্পণ কর।" এ দাবি অল্প বটে; কিন্তু দাবি ত? আর ক্রমে, যে এই দাবি গুরুতর হইবে না, ক্রমে যে সর্ব্বাধিকার বিস্তার হইবে না, সে কথা তোমাকে কে বলিল? ১ ক্ষুদ্র অঙ্ক বটে; কিন্তু ইহারই মূল্য, ক্রমে দশ, শত, সহস্র, লক্ষাদি, ক্রমে অর্দ্ধ হয়।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ, মন্বন্তরের পর মন্বন্তর, ভক্তের দৈন্য, কাতরতা, প্রার্থনা শ্রবণ করিতে করিতে, ভক্তের উপর ভগবানের কৃপা হয়। তিনি ভক্তকে ইঙ্গিত করিয়া বলেন,—"আর রোদনে কাজ নাই, আর কষ্টে কাজ নাই, আর দৈন্যে কাজ নাই, তোমার সাধন শেষ হইয়াছে, বর লও। বল, কি বর চাও?" ভক্ত কৃতাঞ্জলিপুটে কহে,—"দয়াময়, যদি অধমের প্রতি দয়া করিলে, যদি পতিতকে উদ্ধার করিবে, যদি নিজগুণে কাঙ্গালকে ধন দিবে, তবে দেও সেই ধন—যাহা ব্রহ্মার দুর্ল্লভ, শিবের চিরসম্পত্তি, বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীর একমাত্র অধিকার। প্রভো! অনুমতি কর, তোমার নিকটে আসি, তোমার চরণ সেবা করি। প্রভো! স্বমেন্। নাথ!

"আর কিছু ধন চাই না আমি,
ঐ চরণ-সেবার ভিখারী।"

ভগবান পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন,—"আমায় যে যেভাবে ভজে, আমি তাহায় সেইভাবে ভজি।" সুতরাং কল্পতরুর দ্বারে ভিখারী বৈমুখ হইল না; ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল; ভক্ত সেবার অধিকার লাভ করিল। আজ হইতে শান্তভক্ত দাসোর অধিকার প্রাপ্ত হইল। সেব্য ও সেবক দূরে দূরে ছিলেন, এখন নিকট হইলেন। উভয়ের সম্বন্ধ হইল, প্রভু ও ভৃত্যের। ভৃত্যের মধ্যেও ভিন্নভিন্নরূপ সেবাধিকার দেখা যায়। মনুষ্য-সমাজে দেখি, কোন ভৃত্য প্রভুর নিকটে থাকিয়া তাঁহার চরণ সেবা করে, তাঁহার অঙ্গে তৈলমর্দ্দন করে, তাঁহাকে স্নান করায়, ইত্যাদি। কোন ভৃত্য প্রভুর সেবা পরোক্ষভাবে করে; যথা, তদীয় স্নানের জল যোগায়, তদীয় পরিচ্ছদ-পারিপাট্য

করে, তদীয় তাম্বুল সাজিয়া দেয়, তদীয় শয্যা পাতিয়া দেয়, ইত্যাদি। আর একশ্রেণীর ভৃত্য, প্রভুর প্রিয়জনের পরিচর্য্যা করে, প্রভুর গৃহাদি মার্জ্জন করে, প্রভুর প্রিয়স্থানের পর্য্যন্তও সেবা করে। শ্লোকসমূহে ও যাহা, ভক্তিরত্নাকরে তাহাই। তাহারা ভগবানের ক্লিষ্টতম দাস, তাহারা তাঁহার সমীপে থাকিয়া প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সেবা করে। যাহারা প্রিয়তর দাস, তাহারা বিগ্রহ-সেবা, শ্রীমন্দির-মার্জ্জন, তুলসীবেদী মার্জ্জন, তুলসীতরুতে জল-সেচন, ইত্যাদি পরোক্ষভাবে ভগবানের সেবা করে। আর যাহারা কেবল প্রিয়দাস, তাহারা সাধু, ভক্ত বৈষ্ণবের সেবা করে, তীর্থ-পর্য্যটন ইত্যাদি করে, ব্রতহোমাদি করে। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর দাস, এক শ্রেণীরই বটে; মূলতঃ মাত্র ভেদ। করিণ, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত—বিষ্ণু ও বৈষ্ণব এক; সুতরাং স্বয়ং তাঁহার সেবা, কিংবা বিগ্রহ-সেবা, কিংবা সাধুবৈষ্ণব-সেবা, কি তীর্থ পর্য্যটনাদি, সমস্তই সাক্ষাৎভাবে তাঁহারই সেবা। চৌষট্টি অঙ্গের ভক্তি সমস্তই শান্ত ও দাস্যভক্তের অনুষ্ঠেয়। এই চৌষট্টি অঙ্গের ভক্তিত্ব জানিলেই, পাঠক, শান্ত ও দাস্যভক্তের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অতএব বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে চৌষট্টি অঙ্গের ভক্তিত্ব নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম-জিজ্ঞাসা শিক্ষা সাধুমার্গ গমন ॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণপ্রীতে বাস।
দেহরক্ষা হেতু মাত্র অন্ন-অভিলাষ ॥
একাদশীব্রত ধাত্রী অশ্বত্থ সেবন।
বিপ্র-গো-বৈষ্ণব-সেবা অপরাধ-দুর্জ্জন ॥
অবৈষ্ণব সঙ্গ আর বহুশিষ্য ত্যাগ।
বহুগ্রন্থ ব্যাখ্যা হানি লাভেতে বিরাগ ॥
অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিবে।
গ্রাম্যকথা ত্যাগ জীবে উদ্বেগ না দিবে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন পূজা স্মরণ বন্দন।
পরিচর্য্যা সখ্য দাস্য আত্ম-নিবেদন ॥
নৃত্যগীত দণ্ডবৎ নীত অভ্যুত্থান।
অনুব্রজে ভগবানের গৃহেতে গমন ॥
পরিক্রিয়া স্তবপাঠ জপ-সংকীর্ত্তন।
ধূপমাল্য গন্ধ আদি প্রসাদ সেবন।
আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন।
প্রিয়নস্য দানধ্যান তদীয় সেবন ॥
তদীয় যে নারি হয় শ্রেষ্ঠ ভক্তিঅঙ্গ।
তুলসী সেবন আর বৈষ্ণবের সঙ্গ ॥
মথুরামণ্ডলে বাস শ্রীল ভাগবত।
শ্রবণ কর্ত্তব্য সর্ব্ব সজ্জাতির মত ॥
কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মযাত্রা মহোৎসব একান্ত শরণ ॥
কার্ত্তিকেয় ব্রত দৃঢ় নিয়ম কর্ত্তব্য।
যত্তেক কহিল সারাৎসার হয় সর্ব্ব ॥
শ্রীমূর্ত্তি সেবন শ্রদ্ধা পৌরিতিপূর্ব্বক।
এই চুতঃষষ্টী ভক্তি ত্রৈলোক্যব্যাপক ॥"

এই চতুঃষষ্টী ভক্তিমধ্যে কেবল শান্ত ভক্তের অনুষ্ঠেয় কোনগুলি, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া ভক্তিমার্গাবলম্বীর কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা উপরে শান্তভক্তের যে যে লক্ষণ দিয়াছি, এবং তাঁহার কর্ত্তব্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা যাঁহারা মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রাগুক্ত নির্দ্ধারণ অতি সহজ। অপর 'অঙ্গগুলির' অধিকাংশই শান্তভক্তের অনুষ্ঠেয়। দুই একটী মাত্র অপর তিন ভক্তের। যাহা হউক, বিবিধ সেবা দ্বারা যখন প্রভু দাসের মধ্যে হৃদ্যতা জন্মে, সম্বন্ধ যখন ঘনিষ্ট হয়, তখন ভগবান ভক্তকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন। ২ ভক্ত যখন সখ্যোচিত-ভাবে বিভোর হইয়া বলেন,—

"মায়ের মায়ায়, ভুলিয়া রহিলে
মায়ের কোলেতে ভাই।
কেন মোরা তোরি, দ্বারে দাঁড়ি রব,
আমাদের যা কি নাই?
হারে রে কানাই, সকলেই মোরা,
আহীরি গোপ-ছাবাল।
তুই বল কেনি, ঠাকুরের বেটা,
কত করিস ঠাকুরাল?
কত মারি ধরি, কাছে তোর চড়ি,
ঝুট ফল দেই মুখে।
তাই কিরে কানু, যাবি না গোঠেতে,
রহিবি মায়ের বুকে॥"

তখন পীতধড়া মোহনচূড়া ওঞ্জমালা পরিয়া, হাতে পাঁচনিবেণি লইয়া, সখাগণের পাছে পাছে না যাইয়া কি সেই মুরলীধরের সেই ত্রাম্বালরাজের আর সাধ্য আছে? এখানে ঐশ্বর্য্য নাই, বিভূতি নাই, বড়-ছোট জ্ঞান নাই, এখানে সব সমান। এখানে অভিমানের কথা,—"তুই তোর মায়ের কোলে বসিয়া থাকিবি, আমাদের কি মা নাই?" এখানে দেমাকের কথা "আমরা সকলে আহীরি গোয়ালার ছেলে; আর তুই বুঝি ঠাকুরের পো?" এখানে আদর—"মারা, ধরা, কাঁধে চড়া," আর অর্জ্জুনক মিষ্ট উচ্ছিষ্ট ফল ভগবানের বদনে অর্পণ। আহা! এ যে কি মধুর ভাব, কি অতুলন ভক্তিযোগ, কি স্বর্গীয় প্রেম, তাহা কে কহিবে? সখা ভিন্ন সখ্য-প্রেমের মাধুর্য্য কে বুঝিবে? আর কেই বা বুঝাইবে? আসার সখার সখ্য কি বিশুদ্ধভাব, কি নিশ্চিন্ত আলাপ, একবার তাহাও দেখ,—

"সুবলের সনে, বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী-বিলাস কাম॥"

তৎপর দুই জনে এমন সব কথা হইল, যাহা প্রাণের সখা ভিন্ন আর কাহারও কাঁছে বলা যায় না। যার কাছে কোন কথা বলিতে লজ্জা নাই, ভয় নাই, সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই, সেই জীবন-সখা ভিন্ন, তেমন সব কথা বলিলে, লোকে পাগল বলে। তাই শ্যাম সুবল ব্রজসুন্দর, ব্রজসুন্দরী-সহ যামিনীযোগে যে নিধুবনক্রিয়া করিয়াছিলেন, তাহা —নির্জ্জনে বসিয়া অতি বিশ্বস্ত সুবল সখাকে আবার বলিতেছেন্ :—

"কি কব রাইয়ের গুণের কথা।
সব গুণে তারে গড়িল ধাতা॥
এ রসু বিলাস করিল যত।
একমুখে তাহা কহিব কত॥
কিবা সে মধুর নটন গান।
অমিয়া অধিক করিনু পান॥
সে সব কহিতে হিয়া না বাঁধে।
দরশন লাগি পরাণ কাঁদে॥
শুন হে পরাণবন্ধু সখা।
সে ধনী পুন কি পাইব দেখা॥"

সখা ভিন্ন এরূপ বিশ্রম্ভ আলাপ কাহারও সঙ্গে হইতে পারে না। ব্রজ-রাখালের প্রতি এই এক ভাব। আবার অন্যদিকে অর্জ্জুনাদি সখার প্রতি ভগবানের কি ভাব, একবার তাহাও স্মরণ কর। বিপদে আপদে, আহবে শান্তিতে, বনে রাজপ্রাসাদে, সর্ব্বত্র শ্রীহরি পাণ্ডবের সখা, পাণ্ডবের সুহৃৎ, পাণ্ডবের মন্ত্রী, পাণ্ডবের বুদ্ধিবল। অর্জ্জুনের সঙ্গে কত সখ্যভাবই ভাব, তাহা যদি দেখিতে চাও, বুঝিতে চাও, অনুভব করিতে চাও, তবে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য পাঠ কর।

এই সখ্যভাবের পরিপাক—বাৎসল্য-প্রেম। সখ্যের মূলসূত্র—সাম্য ও বিশ্বাস। এই দুইটী ক্রমে ক্রমে গাঢ়, গাঢ়তর, গাঢ়তম হইয়া বাৎসল্য-আকার ধারণ করে। ভগবান সকল অবস্থায় ও সর্ব্বকালে ভক্তাধীন বটেন, কিন্তু বাৎসল্য-প্রেমিকের বিশেষরূপে অধীন। এখানে,—

"এ কি আশ্চর্য্য কথা,
শিষ্যের পায় গুরুর মাথা,
গাছের গোড়ায় ধরে ফুল।
পিতা পুত্রেরে ভজে,
গুরু শিষ্যেরে যজে,
আউলচাঁদ ভাবিয়া আকুল॥"

উপরের সঙ্গীতাংশ প্রহেলিকা নহে। বাৎসল্য-রসে বাস্তবিকই জগদ্‌গুরু শ্রীভগবান শিষ্য, পরমপিতা জগন্নাথ পুত্র; আর রক্তমাংস-বিশিষ্ট সামান্য মানব গুরু ও পিতা। বিশ্বপালক এখানে পাল্য, আর আহীর-আহীরিণী পালক। যে বিশ্বকুহকী, কর্ম্মসূত্র ধরিয়া, বিশ্বজীব কেন, পিতামহ ব্রহ্মা, ভূতনাথ শিব, সুরপতি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিকে পর্য্যন্ত নাচান; তিনি এখানে নিজে পুতুল হইয়া, নন্দের আঙ্গিনায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচেন, আর নন্দরাণী হাততালি দিয়া বলেন,—

"ফিরে ঘুরে তেমনি করে নাচ রে যাদুধন।
হেলে দুলে বাঁকা হয়ে নাচ রে যাদুধন॥
পায়ের উপর পা টী থুয়ে নাচ রে যাদুধন।
পেটভরে খেতে দিব নবনী মাখন॥"

গোপাল আরও নাচেন—ক্ষীর-সর-নবনী-লোভে আরও নাচেন। যিনি দামোদর —"ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদরে", তিনি কিনা ভক্তের বাঞ্ছা পুরাইতে সামান্য ক্ষীর-সরের জন্য নাচেন! ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কি ভক্ত বাৎসল্য! গোয়ালার সেয়ের কি পুণ্য-প্রভাব—কি ভক্তির জোর!

বালগোপালের একটানে পুতনাবধ—কোমল অঙ্গের এক আঘাতে জমলার্জ্জুনভঙ্গ—এক কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর উপর একটা প্রকাণ্ড গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের স্থিতি—এক পদাঘাতে সগোষ্ঠী কালীয়নাগের দমন; কিন্তু বাৎসল্যের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধা ব্রজরাজজায়া কাঁদিয়া আকুল। ভগবান গোপালকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া, কতই আনন্দ! দিন দিন গোপালের উপর উৎপাৎ ঘটিতেছে,—এই ভয়ে, মাতা বালকের শিরে রক্ষা-বন্ধন করেন, বামপদ-ধূলি তাহার মস্তকে অর্পণ করেন। কি বিশাল অধিকার! ভাবিতেও ভয় হয়! আবার দেখ।

নন্দরাজ মথুরাপতি কংশরাজের জন্য নবনীত, ক্ষীর, সর সংগ্রহ করিয়াছেন। একটু বেলা হইলে তৎসমস্ত লইয়া মথুরায় রওয়ানা হইবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ননীচোর ভাণ্ডশূন্য করিয়াছে। যশোমতী হঠাৎ ঘরে যাইয়া দেখেন, ক্ষীরশব্দের ভাণ্ড শূন্য হইয়াছে; ননীচোরের হাতেমুখে ননী, বুক বহিয়া ননী পড়িতেছে; তখন মাতা ক্রোধে ক্ষোভে কহিতেছেন,—

"ও করিলি কিরে গোপাল, ও করিলি কি?
কংশের যোগান ননী সকল খাইলি?"

তাতে ধূর্ত্তচূড়ামণি কহিতেছেন,—

"আমিত খাই নাই ননী, খাইল বলাই দাদা।
আমি যদি পাইতাম, তবে খাইতাম আধা আধা॥"

উত্তর শুনিয়া, যশোমতীর বিষম রাগ হইল। "তবেরে দুষ্ট ছেলে! নিজে ননী খেয়েছিস, তোর হাতে-মুখে ননী এখনো লেগে রয়েছে। তবু বলিস কিনা, আমি খাই নাই, বলাইদাদা খেয়েছে? আয় তোরে বাঁধি।" এই বলিয়া ছাঁদন-দড়ি আনিতে গেলেন; কপট-চূড়ামণি দৌড়িয়া নীপতরুশাখায় উঠিয়া বসিলেন। তখন গাছে গোপাল বৃক্ষ হইতে পতিত হন, এই ভয়ে নন্দরাণী আকুল। নানা

প্রলোভন দিয়া নামাইলেন ; কিন্তু নামাইয়াই বাঁধিলেন। ভক্তি ডোরে ভগবান বদ্ধ হইলেন।

ওদিকে নন্দরাজের সাধনার বলই বা কত ? যার নামের গুণে বিঘ্নবাধা দূর হয়, সেই ভগবানকে আপনার পদের বাধা হইলেন ! এই সৎসঙ্গে, শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সাম্যভাব, সকলই আছে ; বেশীর ভাব আছে—অনন্য-সাধারণ স্নেহ ও মমতা। এই মাতৃভাবের পরই পত্নীভাব। সেই পত্নীভাবে বিশ্বপতির সাধনার নামই মাধুর্য্য। পতি-পত্নীর ভাব অতি গুহ্য—অতি গোপনীয় ; তাহার ব্যাখ্যা কি সম্ভব ? ভক্তের কাছে, ভাবুকের কাছে, ব্যাখ্যা করিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু পাষণ্ড, কৈতব, অভক্তের নিকট ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ না বলিলেও ত নিস্তার নাই ! যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তাহা উদ্যাপন করিতে হইবে। যে প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। এই মাধুর্য্য-রসের উপাসক এক দ্বারকার রুক্মিণী-সত্যভামাদি মহিষীগণ ; আর ব্রজের গোপবধূগণ। যদি কোন পুরুষ এই রসের রসিক হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে গোপীভাবাক্রান্ত হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এখন মধুর রস বুঝিতে হইলে, কয়েকটী কথা অগ্রে বুঝিতে হইবে। রতি স্বকীয়া ও পরকীয়া-ভেদে দ্বিবিধ। রুক্মিণী আদির রতি স্বকীয়া ; রাধিকাদির রতি পরকীয়া। রুক্মিণী প্রভৃতিও শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, রাধিকা প্রভৃতিও তাঁহার পত্নী। প্রভেদের মধ্যে এই, রুক্মিণী প্রভৃতিরা বিবাহিতা পত্নী, রাধিকা প্রভৃতিরা অন্যের বিবাহিতা পত্নী হইয়াও কৃষ্ণপত্নী—উপপত্নী নহেন। গোপী-গণ দ্বিচারিণী নহেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রাণা, কৃষ্ণ-পরায়ণা, এবং একমাত্র কৃষ্ণৈকশরণা ছিলেন। এ বিচার দুই-চারি কথায় হয় না। যাঁহারা এসকল কথার প্রমাণ চাহেন, এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে কলিকাতা সিমুলিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহোদয়ের সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত 'শ্রীশ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়' গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গোস্বামী-গণ স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন ; কেন-না, পরকীয়া-ভাবে গাঢ়তা, মাদকতা ও তন্ময়তা অধিক। পাঠক-গণ, এ বিষয়ে যদি গোস্বামীদিগের সহিত একমত নাও হয়েন, তথাপি মহিষীগণের প্রেমাপেক্ষা গোপিকাদিগের প্রেম যে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, মহিষীদিগের সকাম প্রেম বা কাম ; গোপীর প্রেম বিশুদ্ধ প্রীতি বা প্রেম। আত্মসুখেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গ-সম্ভোগ করিতে অভিলাষিণী ছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধন-মানসে ব্রজদেবীগণ বনে বনে কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন ; তাঁহারা এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বীয় ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা-জন্য ব্যাকুলা ছিলেন না। কাম আর প্রেমে কি স্বর্গমর্ত্ত্য, দিবারাত্রি প্রভেদ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পঁক্তি পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন :—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম-মহাবল॥
বেদধর্ম্ম লোকধর্ম্ম দেহধর্ম্মকর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম॥

দুস্ত্যজ আর্য্যপথ, নিজ-পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎ সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম-নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ॥"

দেব দনুজ যক্ষ রক্ষ মানব প্রভৃতি সকলের মধ্যেই দেখা যায়, প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষ ইন্দ্রিয়-পরিচালিত হইয়া, বৈধ বা অবৈধ উপায়ে, সম্ভোগ দ্বারা কামশান্তি করেন। স্ব স্ব সুখই সেই সম্ভোগের উদ্দেশ্য, এবং পূর্ণমাত্রার সেই সুখ-প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই বিরত হয়েন না। প্রতি পুরাণে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে, এবং লোকসমাজে ইহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই ব্রজ-দেবীগণ, কেবল কৃষ্ণের সুখের জন্যই, লজ্জা, ভয়, জাতি, কুল, মান, সম্ভ্রম, সকলে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তাহাতে কি তাঁহাদিগের সুখ হইত না ? উত্তর, সুখ অবশ্যই হইত, কিন্তু সে সুখ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা-জন্য নহে। স্নানে যেমন দাতার, অতিথি-সৎকারে যেমন অতিথি-সেবকের, উপাসনায় যেমন উপাসকের সুখ, তাঁহাদিগের সুখ তদ্রূপ ছিল। ফলপ্রাপ্তির আশা পরি-শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে, তাহাকে নিষ্কাম ধর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। কিন্তু তাই বলিয়া তদ্রূপ কর্ম্ম-কারীর অদৃষ্টে কি কোন ফলভোগ হয় না ? এবং ফলভোগ হয় বলিয়া কি, সে কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলিব না ? যদি সামান্যা স্ত্রীর ন্যায়—কুলটার ন্যায়—বারবনিতার ন্যায় ইন্দ্রিয়চরি-তার্থতাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য হইত, তবে সে উদ্দেশ্য, অন্যের দ্বারা, অনেকের দ্বারা, স্ব স্ব বিবাহকারী পতিদ্বারা কি সাধন হইত না ? তবে ষোড়শ শত গোপী এক কৃষ্ণপ্রেমে কেন-মাতোয়ারা হইলেন ? আর যখন কৃষ্ণ ব্রজধামে আর প্রত্যাগমন করিলেন না, তখনই বা এত আকুলি-ব্যাকুলি কেন ? তখন আর তাঁর আসার আশায় কেন,—

"উপবন হেরিয়া, মুরছি পড়ি ভূতলে,
চিন্তিত সখিগণ সঙ্গ।
পদ-অঙ্গুলি দেই, ক্ষিতি পর লেখই,
পাণি কপোল অবলম্ব॥
অরুণ নয়ন-লোরে, তিতল কলেবরে,
বিগলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির, করইতে সংশয়
সহচরীগণ তহি শেষা॥"

তবে সেই শ্রীকৃষ্ণের জন্য কেন,—

"অতিক্ষীণ তনু অঙ্গ কাঞ্চন-রেহা।
হেরইতে কোহু না ধরে নিজ-দেহা॥
কঙ্কণ বলয়া গলিত দুই হাত।
ফুয়ল কবরি না সমবরি মাথ॥
চেতন মুরছিত বুঝই না পারি।
অনুক্ষণ ঘোর বিরহজর জারি॥"

এখনও কি বলিবে, গোপীর প্রেম কাম-গন্ধবিশিষ্ট—আবিল—কলুষিত ? ব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ যে আত্মসুখের জন্য নহে, তাহার আর একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিম্নে দেখ,—

"সখীর স্বভাব এই অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ সুখ হৈতে তাহে কোটী সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্পপাতা॥

কৃষ্ণলীলামৃতে যদ্ধিলতাকে সিঞ্চয়।
নিজসুখ হৈতে পঞ্চবাদির কোটী সুখ হয়॥"

এই ত গেল অন্য গোপিকার কথা। আবার রাধার নিস্বার্থ প্রেম—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা কেমন, তাহাও একবার দেখ,—

"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানাছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায়ন
আত্ম-সুখসুখ হতে কোটী সুখ পায়॥"

অনন্যবিশুদ্ধ প্রেমে করে রসপুষ্ট।
তা' সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া শ্যামে তার কহি কামনাম॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা নহে গোপিকার।
কৃষ্ণসুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥"

নিবুবাবুর একটি গানে কোন বিরহিণী নায়িকা, স্বীয় সখী-সম্বোধনে কহিয়াছেন,—

"যদি বুক ফেটে যায় প্রাণ সজনি,
তবু মুখ ফুটে বল্‌ব না।"

মাধুর্য্য রস ব্যাখ্যা করা সম্বন্ধে আমার দশাও ঐ নায়িকার ন্যায় হইয়াছে। শ্রীগুরু বৈষ্ণব-কৃপায় এসম্বন্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু আর বলিব না। যতটুকু বলিয়াছি, তাহাই হয় ত অনেক পাঠক অশ্লীল বলিয়া ঘৃণায় পড়িবেন না। কিন্তু যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহাদিগকে বলি,—

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

এইজন্যই বিদ্যাপতি কহিয়াছেন :—

"শৃঙ্গার রস যুঝিবে কে?
সব রস সার শৃঙ্গার।"

রসিকভক্তেরা এই ধর্ম্মেরই যাজন করেন, এবং সকলকে বলেন :—

"রসিকের সঙ্গ ধর, করণ কর,
হবে অঙ্গ কাঁচা সোনা।"

এই "করণ" বা "ক্রিয়া" কি? এবং রসিকদিগের ধর্ম্মের অর্থাৎ রসিকত্বের মূল কোথায়, তাহা অন্য একটী প্রবন্ধে বলিতে ইচ্ছা রহিল।

শঙ্কর-চরিত।

এদিকে বিশ্বগুরু শঙ্করকে উপনীত করিবেন কিনা এই চিন্তা না করিয়া, সতী দেবীর সহিত অন্যান্য বিষয়ের আলাপ করিতেন। এইরূপ দিবস রজনীতে বিশ্বগুরু সুষুপ্তি-সুখানুভব করিতেছেন। এমন সময়ে এক পরমহংস বিশ্বগুরুর শয্যা-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বগুরুকে উন্নিদ্র করিলেন, এবং বলিলেন,—"তুমি অতি শীঘ্র শঙ্করকে উপনীত করিয়া দেশের সদ্গতির দ্বার উন্মুক্ত কর। আগামী শুভমুহূর্ত্ত উপেক্ষা করিলে, তুমি দৈবকোপে পতিত হইবে। দৈব-প্রতিকূলতা দূরা তোমার মত লোকের কর্ত্তব্য নহে।" এইমাত্র বলিয়া, সন্ন্যাসিপ্রবর অন্তর্হিত হইলেন। বিশ্বগুরু

দ্বারে সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিয়া, বিস্ময়-সহকারে অনুবর্ত্তী হইয়াও, আর সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিলেন না। নৈশ অন্ধকারে অনুবর্ত্তন অকর্ত্তব্য-বোধে বিনিবৃত্ত হইলেন। মহাপুরুষ-সংসর্গ লাভ হইয়াও মনের আশা পূর্ণ হইল না বলিয়া, ক্ষুব্ধ হইলেন।

পরদিন প্রভাত হইলে, বিশ্বগুরু নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান সমাপন করিয়া, সতীদেবীর নিকটে গমন করিলেন। সতীদেবীও নিশাভাগে স্বপ্নযোগে অবগত হইয়াছিলেন যে, শঙ্করের উপনয়নে কালাতিপাত করিলে শঙ্করের অপচয় হইবে। নিশ্বাবশানে সতীদেবী ব্যাকুল-হৃদয়ে বিশ্বগুরুর সাক্ষাৎ-প্রতীক্ষায় রহিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, পরস্পরের রাত্রিকালীন অবগত ঘটনা জ্ঞাপিত হইল। বিশ্বগুরু বলিলেন, আর বিলম্ব করা অকর্ত্তব্য। দিন অবধারিত হইল। বিশ্বগুরু আচার্য্য হইবেন, স্থির হইল। তদানীং তদীয় গুরুকুলে কোন ব্যক্তিই জীবিত ছিলেন না; এইজন্য বিশ্বগুরুকে আচার্য্যত্বে ব্রতী হইতে হইয়াছিল। ক্রমে নির্দ্ধারিত দিন নিকটবর্ত্তী। শিষ্যগুরুর প্রধান-প্রধান শিষ্যগণ সমাগত হইতে লাগিলেন। পঞ্চম বর্ষে উপনয়ন প্রায়ই হয় না। এজন্য সাধারণের মনে এরূপ ধারণা হয় যে, এইরূপ উপনয়ন অশাস্ত্রীয়। কিন্তু বাস্তবিক উহা ভ্রম। ব্রহ্মবর্চ্চসকামনায় পঞ্চম বর্ষে উপনয়ন সুপ্রশস্ত।* ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানোপযোগী যাবতীয় আয়োজন সমাগত হইল। পূর্ব্ব দিবসে বিশ্বগুরু সংযত রহিলেন। শঙ্করও প্রসন্ন-বদনে শুভমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় পরিপুত-ভাবে রহিলেন। এ পর্য্যন্ত শঙ্কর কোনরূপে অপরিপূত ছিলেন না; সত্ত্ব-বিরুদ্ধ আহারও করেন নাই। তথাপি কর্ম্মারম্ভে সতর্কতার অনুষ্ঠান মাত্র।

আজ সতীর মনে আহ্লাদের পূর্ণ আবেগ উপস্থিত হইলেও, তিনি প্রভাত-মারুত-হিল্লোলের সহিত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আহ্লাদের পার্শ্বে শিবগুরু-শোকের উচ্ছ্বাসে অস্থিরতা উপস্থিত হইয়াছিল। শঙ্কর উপনীত হইবেন, তিনি অনাথা। অনাথার মানসিক উদ্যম-সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। শিবগুরু জীবিত থাকিলে আহ্লাদের আবেগ পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইত। সংসারের গতি প্রায়ই এইরূপ। কাহার বিভব থাকিলেও হয় ত জনাভাব; আবার জন থাকিলে ধনাভাব। আবার ধন-জন-পরিপূর্ণতা থাকিলে, হয় ত সে স্বাস্থ্যসুখে বঞ্চিত। ধনী দরিদ্র যেই কেন হউক না, নিরবচ্ছিন্ন সুখ কাহারও নাই। দুঃখ সুখসঙ্গিন্ন অথবা সুখ দুঃখ-সঙ্গিন্ন। সংসার-মরীচিকার এই ভ্রান্তি-বিজৃম্ভণে বিমুগ্ধ হইলেই পদে পদে সংসারাবর্ত্তে পরিভ্রামিত হইতে হয়। মতিমান-গণ এইজন্য সংসার পরিহার করিতে সতত যত্নবান। অধিকাংশই ভ্রান্তিজালাচ্ছন্ন। ভ্রান্তির ঘোর অন্ধকার-অনীশায় অভিভূত হয় নাই, এমন লোক অতি বিরল। শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, অল্পায় ব্রহ্মজ্ঞান-ব্যতীত শোক-মোহের হস্ত হইতে নিস্তার নাই। কিন্তু দ্বৈত-প্রপঞ্চেই জগৎ বিমুগ্ধ। এই বিমোহনকে সত্য স্থির করিয়া পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীনতা প্রাপ্ত হইতে হয়। স্ত্রীলোকের ভোগবাসনা বলীয়সী। কাজেই সতী, মুগ্ধা হইয়া, ধৈর্য্য-যোগে বিষাদ বিদূরিত করিলেন।

শুভমুহূর্ত্তের সুপ্রভাত হইল, আজ শঙ্করের উপনয়ন। উপনয়ন দ্বিজাতির প্রধান সংস্কার। মনুষ্য যে সংস্কার দ্বারা আচার্য্যসমীপে উপনীত হয়, তাহার নাম উপনয়ন। এ স্থান হইতে

* "ব্রহ্মবর্চ্চস কামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।"
মনু, ২য়, ৩৭।

বেদে দীক্ষা আরম্ভ হয়। এই দীক্ষাই মহা-দীক্ষা। ইহা হইতে বিপ্রজীবন সংগঠিত হইয়া, ব্রহ্মচর্য্যে ব্রহ্মগতিয়ারা, আত্মগতি লাভ হয়। আত্মলাভের এই মহাবর্ত্তন অদ্যাপি প্রচলিত, কালমাহাত্ম্যে সঙ্কুচিত হইতেছে মাত্র। শঙ্করের এই ব্রহ্মচর্য্য হইতেই পূর্ণব্রহ্মচর্য্যের আবির্ভাব ও বিস্তার হয়। দেখিতে দেখিতে শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। পবিত্র-পাণি আচার্য্য শঙ্করকে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। বিশ্বগুরু যথাশাস্ত্র যথারীতি শঙ্করকে ব্রহ্মদান করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর ব্রহ্মচর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন-পূর্ব্বক অষ্টম বর্ষ বয়সে সরহস্য সাঙ্গ চতুর্দ্দশ বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিলেন। এই বয়সে তিনি কেবল মন্ত্রবিদ্ হইয়াছিলেন না, অথর্ব্ববিদও হইয়াছিলেন। লোকাতীত শক্তিসম্পন্ন শঙ্করদেব যেমন উদাত্তাদিস্বরসংযোগে ঋক্-মন্ত্রের সংহিতা পাঠ এবং পদক্রমাদি পাঠের সুশ্রাব্যতায় শ্রোতৃজন-মন মোহন করিতেন, ক্রমে প্রভৃতি স্বর-মূর্চ্ছিত সামগানেও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। আবার যজুর্ব্বেদও পূর্ণাধিকার। ফলতঃ তিনি ত্রয়ীতে ত্রয়ীময় হইয়াছিলেন। বেদাঙ্গ বিদ্যাও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইয়াছিল। অন্যের যাহা বহুশঃ শ্রবণে পরিশ্রুত হয়, শঙ্কর তাহা সকৃৎ বিলোকনে শিক্ষা করেন। কোনদিন এরূপ দেখা যায় নাই যে, বেদের যে অংশই হউক না কেন, শঙ্করের শিক্ষা করিতে একাধিক বার শ্রবণ করিতে হইয়াছে। যেন পূর্ব্বেই তাহা অভ্যস্ত হইয়াছে; এখন পুনরাবৃত্তি মাত্র। যে সমস্ত বেদাংশে বিশ্বগুরুর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল না, শঙ্কর-সংযোগে তাহা তাঁহার বিভাসিত হইয়াছিল। শুশিষ্যের শিক্ষায় আচার্য্যেরও উপকৃতি হয়, বিদ্যাবুদ্ধির বৃদ্ধি ও সংস্কার হয়। ইহা শিক্ষিত-মাত্রেরই পরিজ্ঞাত আছে। শিবগুরু পিতৃ পিতামহ-ক্রমে প্রায় যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহার অনেক গ্রন্থ একেবারেই উদ্ঘাটিত হয় নাই। গ্রন্থজাত শঙ্করের শিক্ষার জন্যই পূর্ব্বে স্থগীকৃত হইয়াছিল। উত্তরকালে দৃষ্ট হইবে, শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী পঞ্চাশৎ বলীবর্দ্দে বহন করিত। সুতরাং শাস্ত্রগ্রন্থ অল্প ছিল না; অথবা স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য্য যে শাস্ত্র দর্শন করেন নাই, ভারতে পূর্ব্বাপর তাহার আবির্ভাব হয় নাই। তদীয় প্রসন্নগম্ভীর ভাষ্য পর্য্যালোচনা করিলেই, এই কথার যাথার্থ উপলব্ধি হইতে পারে। মেধা-স্মৃতি-ধারণা বুদ্ধিশক্তির চরমোৎকর্ষ-পরিচায়ক। শঙ্করদেব অষ্টম বর্ষে বেদাভ্যাস সম্পূর্ণ করিয়া, স্মৃতি-দর্শন-পুরাণাদি শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিলেন। উপনয়নাবধি প্রায় আট বর্ষ পর্য্যন্ত তিনি বেদাদি শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। তাদৃশ মহাপুরুষের এত দীর্ঘকালের অপেক্ষা করে না; কেবল তাতাদির অনুরোধে-উপকরণ-উৎসর্গ ব্যাপারে এত দীর্ঘ দিন লাগিয়াছিল। যাহা শঙ্করের সম্বন্ধে দীর্ঘ দিন, তাহা অন্যের পক্ষে একজীবনে ঘটিয়া উঠে না, বিশেষতঃ কলি-ঘোরে। ইহাও অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ব্যাস-তনয় শুকদেবাচার্য্য ব্যতীত বাল্যবয়সে এবম্বিধ মনীষা আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। শঙ্কর, ইতিমধ্যেই বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত স্মৃতি দর্শন পুরাণাদি সর্ব্বতন্ত্র শাস্ত্রে অধীত হইয়াছিলেন; তৎপূর্ব্বেই প্রাকৃত মাগধাদি ভাষাবিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বেদ-বিরুদ্ধ মতজাত—যাহা তদানীং ভারতের সর্ব্বস্থানে প্রচারিত হইয়া বহুধা

পাষণ্ড-বাদ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল; তাহাও জগত হইয়াছিলেন।

এখন শঙ্করের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। মূর্ত্তিমান বৈরাগ্য কদাপি সংসারে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। বৃদ্ধা জননী এখন তাঁহার একমাত্র অন্তরায়। অন্তরায় থাকিলেও, বৈরাগ্যের নিকট উহা তুচ্ছীকৃত। শঙ্কর গৃহ হইতে বিনির্গত হওয়ার দিনও সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এস্থলে শঙ্করের পবিত্র জীবনের দ্বিতীয় অবস্থা বিবৃত পরিশেষ হইল। ভাবী অবস্থা বর্ণিত হইবে। শঙ্কর ব্রহ্মচারী হইয়া বিলক্ষণ কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছেন; উপবাস, অথবা ফলমূলাহারে অনেকদিন কাটিয়া যাইত, অথচ তাহাতে তাঁহার শরীরে অবসাদ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিকাশিত হইতে লাগিল, ললাটের অর্দ্ধেন্দু ত্রিশূল-চিহ্ন সুস্পষ্ট বিরাজিত হইতে লাগিল, হস্তপদে পদ্মাদি-চিহ্ন বিভাসিত হইল, দেহাবয়বে গৌরকান্তির ঔজ্জ্বল্যে আলোক বিনির্গত হইতে লাগিল। তদীয় অবয়বে এই এক বিশেষত্ব ছিল যে, জন্মাবধি দেহ হইতে তেজ বিকীর্ণ হইত, ক্রিয়দ্দূর হইতে তেজ-পুঞ্জ দৃষ্ট হইত। এখন ব্রহ্মচর্য্যে তাহা শমিত উজ্জ্বলতর হইয়াছিল; কখন তদীয় মুখচন্দ্রিমায় প্রফুল্লতা পূর্ণিমাক্রিয় বিরাজিত, কখন বা কুঞ্চিত ললাটে গম্ভীর চিন্তার পরিচয় প্রদান করিত।

বিশ্বগুরু একদিবস শঙ্করকে বলিলেন,—"তাত! তোমার অসাধারণ ক্ষমতাস্থ সর্ব্বশাস্ত্রাধিকার হইয়াছে। ভারতবর্ষে এরূপ-কৈশোর বয়সে এতাদৃশ বিদ্যাবত্তা বোধ হয় কাহারও হয় নাই। আমরা সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। শিক্ষিতব্য আর কোন শাস্ত্রই নাই। এখন সমাবর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃ বোধ হয়।" শঙ্কর বলিলেন,—"তাত! আমি কতকগুলি গ্রন্থপাঠ করিয়াছি; কিন্তু ইহাতে আমার যে বিদ্যা হইয়াছে, তাহার পরিচয় কি? মন্ত্রবিদ্ হইলেই কি বিদ্বান হয়? আত্মবিদ্ হওয়াই প্রকৃত বিদ্যার পরিচায়ক।" আর এই সমস্তই অপরা-বিদ্যা। ভবৎপ্রসাদে পরা-বিদ্যায় অধীত হইলেও, এখনও সম্পূর্ণজ্ঞান হয় নাই।" বিশ্বগুরু বলিলেন,—"যাহা বলিলে, তাহা সত্য; গৃহী হইয়া তদনন্তর পরাবিদ্যায় দীক্ষিত হইলেই তোমার মনোভিলাষ পরিপূর্ণ হইতে পারে। বিশেষতঃ তোমার বৃদ্ধা জননী নিয়ত তোমার আশায় জীবন-ধারণ করিতেছেন। তাঁহার শুশ্রূষা করাই তোমার কর্ত্তব্য।" শঙ্কর বলিলেন,—"তাত! সংসারী হইতে আমার অনুমাত্রও বাসনা নাই। ব্রহ্মপদ-ধ্যান, মনুষ্যের সদা কর্ত্তব্য। সংসারের প্রলোভনে আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়া মানুষকে বিষয়-মদিরায় প্রমত্ত করে। কামিনী-কাঞ্চনই মানুষের সর্ব্বনাশের নিদান। সুতরাং উহা হইতে বিনিবৃত্ত থাকাই বিধেয় ও শ্রেয়ঃ।"

এইরূপ বিশ্বগুরু সংসারাশ্রম-সাধনের প্রয়োচক যত বাক্-বিন্যাস করেন, প্রবল স্রোতে বিপ্লাবিত তৃণগুচ্ছের ন্যায় তাহা ভাসিয়া যায়। বিশ্বগুরু দেখিলেন, এইরূপ বচন-প্রতিবচনে বিশেষ কোন ফল ফলিতেছে না, বরং উত্তরোত্তর শঙ্করের সংসার-পরিত্যাগে দার্ঢ্য জন্মে। এই দেখিয়া, তিনি তদীয় জননী সতীদেবীর নিকট আমূল বর্ণনা করিলেন। সতী শুনিয়া বড়ই মুহ্যমানা হইলেন। তৎক্ষণাৎ অপাঙ্গে অশ্রু বিনির্গত হইয়া দর-বিগলিত-ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং তদবস্থায় শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর তদবস্থায় সমাগতা, জননীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বন্দনান্তর বলিলেন,—"মাতঃ! আপনি

শোক-মোহে অভিভূত হইবেন না, আপনার কোন ভাবনা নাই।" সতী বলিলেন,—"শঙ্কর! সমাবর্ত্তন হইয়া স্বালয়ে প্রতিষ্ঠিত হও। তোমার নির্ম্মল-মুখেন্দু-জ্যোতিঃ-বিরহে গৃহ অন্ধকার।" শঙ্কর বলিলেন,—"সমাবর্ত্তন করিয়া স্নাতক অবস্থায় কোন রাজগৃহে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যে অধিক রাজন্যবর্গ মৌদ্ধধর্ম্মাচারে আস্থাবান। কেবল গার্হ্যাচারের ধর্ম্মে মতিমান। কিন্তু তাহা সুদূরে অবস্থিত। দক্ষিণাপথের রাজন্যগণেরও অনেকেই ধর্ম্মে আস্থাশূন্য, প্রায় বৌদ্ধ। স্নাতক পরিরক্ষণ আর কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন না। তবে স্নাতকভাবে গৃহে অবস্থান করিয়া কোন ফল নাই। অনাশ্রমী থাকা ধর্ম্ম-বিগর্হিত।" সতী, তদানীং বহু স্নাতকের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, শঙ্করকে তদনুরূপ বিধান করিতে বলিতে লাগিলেন। শঙ্করকে ক্রোড়ে করিয়া কতই প্রবোধ দিলেন। শঙ্কর নিরুত্তর। সন্ন্যাসের আচার্য্য হইয়া যাঁহাকে ভূভারত উদ্ধার করিতে হইবে, তাঁহার সংসারে নিবদ্ধ থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সতীর অনুরোধে ও কাতরোক্তিতে শঙ্কর সমাবর্ত্তনের কথঞ্চিৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সতী তাহাতেই পরিতুষ্ট হইয়া বিশ্বগুরুকে জানাইলেন, এবং বিশিষ্টাকে শঙ্করের মতি পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া স্বালয়ে আগমন করিলেন। অবিলম্বে বিহিত-বিধানে বিদ্যাব্রতাদ্যনুষ্ঠাতা শঙ্করের সমাবর্ত্তনের দিন ধার্য্য হইল।

আমার স্বামী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পর দিন প্রভাতে আমি সঙ্গিনীগণের সহিত অন্নদাদেবীর উদ্দেশে দেবীপুরে যাত্রা করিলাম। আমাদের গ্রাম হইতে দেবীপুর যাইতে হইলে প্রথমে একটা দুই ক্রোশী মাঠ পার হইয়া সংগ্রামপুর যাইতে হয়। সংগ্রামপুর হইতে বিলাসপুর-ষ্টেশনও প্রায় দুই ক্রোশ। এই বিলাসপুর-ষ্টেশন হইতে রেলগাড়ীতে দেবীপুর যাওয়া যায়।

আমরা মাঠের মধ্যস্থিত রাস্তা দিয়া চলিয়াছিলাম। দূরে বিলাসপুর-গ্রামের বৃক্ষগুলি এখান হইতে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল; সে বৃক্ষগুলি দূর হইতে দেখিতে অতি নিকটবর্ত্তী হইলেও, আমার সঙ্গিনীগণের মুখে শুনিলাম, সে গ্রাম এখান হইতে দুই ক্রোশ হইবে। এই দুই ক্রোশ অতিক্রম করিতে পারিলেই আমাদের রাস্তা-হাঁটা শেষ হয়। আমার জন্য সকলেই ভাবিত ছিল। কিন্তু আমি এরূপ পরিশ্রমে অভ্যস্ত না হইলেও, সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছিলাম। শারীরিক বল অপেক্ষা হৃদয়ের বলের কার্য্য দেখিলে, বিস্মিত হইতে হয়। আমি আজ সেই হৃদয়ের বলে বলীয়ান্। সুতরাং আমার সমকক্ষ কে হইতে পারে?

বেলা সাড়ে নয়টার সময় আমরা বিলাসপুরের ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখনও গাড়ি ছাড়িবার আধ ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। আমরা

যখন ষ্টেসনে গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়া ছিলাম, তখন ষ্টেসনের একটি বাবু মধ্যে মধ্যে আমার প্রতি সতৃষ্ণ কটাক্ষ করিতেছিল; আমি আমার শিশুপুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া অবনত-মস্তকে এক ধারে বসিয়া ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, সেই বাবুটি আমার কোন সঙ্গিনীকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সেই অপরিচিত যুবাকে আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া, আমি লজ্জায় যেন জড়সড় হইয়া যাইতে লাগিলাম। গাড়ী ছাড়িবার দশ মিনিট থাকিতে, একে একে সকলে টিকিট ক্রয় করিল। আমি টিকিট ক্রয় করিতে যাইবামাত্র, সে টিকিট-ঘর অমনি বন্ধ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু আমার টিকিট ক্রয় করা হইল না। আমি—ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সঙ্গিনীগণ সকলেই তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, আমিও তাহাদের সহিত গাড়ীতে উঠিতে গেলাম; কিন্তু আমার নিকট টিকিট ছিল না বলিয়া, আমাকে গাড়ীতে উঠিতে দেওয়া হইল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল, আমি তখন অকূল-পাথারে পড়িলাম।

শিশু পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলাম, আমার সঙ্গিনীগণও আমার জন্য ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু আমাদের সে চীৎকারের কোন ফলই হইল না। রেলের গাড়ী সশব্দে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন সে গাড়ী আমারই বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। একে আমার সঙ্গে কেহ ছিল না, তাহার উপর দেবীপুরে যাইবার জন্য আমি বড়ই ব্যগ্র; সুতরাং আমার এরূপ আকস্মিক বিপদে আমি যে কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত।

ষ্টেসনে এখন আর জনমানব নাই; কেবল সেই বাবুটি, আর দুই তিন জন তাহারই নিম্নস্থ সামান্য কর্ম্মচারী মাত্র ছিল। আমি তাহাদের ভয়েই এখন অস্থির হইয়া পড়িলাম। এরূপ বিপদের উপর অন্য বিপদের আশঙ্কাও আমার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই সময় সেই বাবুটী আসিয়া আমায় বলিল,—"তোমার কোন ভয় নাই, টিকিট ফুরিয়ে গেছে, বলেই টিকিট দেওয়া হয় নাই; এবার গাড়ী এলে, সেই গাড়ীতে তোমায় দেবীপুরে পাঠিয়ে দেবো। এখন তুমি ঘরের মধ্যে গিয়ে অপেক্ষা কর।"

আমি এরূপ বিপদের সময় অধৈর্য্য না হইয়া, ভগবানকে স্মরণ করিয়া, সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই আমার যেন হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। তখন প্রাণের ভিতর এক অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, আমি অন্যমনস্কে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছি, এমন সময় আমার সেই গৃহের মধ্যে হঠাৎ একটা শব্দ হইল! আমি সভয়ে চাহিয়া দেখিলাম যে, আমার সম্মুখে সেই বাবু আর তাহার পশ্চাতে তরবারি-হস্তে তাহারই সেই তিন জন নিম্নস্থ কর্ম্মচারী! এরূপভাবে তাহাদিগকে গৃহের মধ্যে আসিতে দেখিয়া, আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম! তখন, নিজের জীবন অপেক্ষা পুত্রটির জীবন রক্ষা করিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সেই বাবুবেশধারী বরাগ্রম তখনই আমায় বলিল,—"তোর গায়ে, আর তোর ছেলের গায়ে, যে সকল গহনা

আছে, এখনি খুলে দে, নইলে এখনি টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেল্‌বো।"

তাহার সেই কর্কশ স্বর শুনিয়া, আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি পুত্রটিকে ক্রোড়ের মধ্যে পুরিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। তখন সেই যমদূতের মতন অপর তিন জন একবারে তরবারি তুলিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে আমার উপর আসিয়া পড়িল। আমি তখন নিরুপায় বুঝিয়া, একে একে আমার ও আমার পুত্রের অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিয়া দিলাম। কিন্তু সে সমস্ত অলঙ্কার হস্তগত করিয়া, সেই নরাধম যে কথা উচ্চারণ করিল, সে কথা শুনিয়া আমার মনে হইল যে, ইতিপূর্ব্বে সেই উত্তোলিত তরবারির দ্বারা আমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হওয়াও আমার পক্ষে শুভ ছিল! আমি জীবনের অপেক্ষাও মূল্যবান্ নারীধর্ম্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া ভগবানের শরণাগত হইলাম। ভয়, লজ্জা, জীবনের আশা, সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া, পুত্র-ক্রোড়ে উদ্ধত ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমার সেইরূপ গর্জ্জনে পাপীর মনেও যেন ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন সেই নরাধম আমায় অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া নানা প্রলোভন দেখাইতে আরম্ভ করিল। আমি সহায়হীনা অবলা, আর তাহারা চারিজন কৃতান্তের ন্যায় পুরুষ; সুতরাং কৌশল ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই, এখন এই কথা কে যেন আমায় স্মরণ করাইয়া দিল। এই সমস্ত হঠাৎ আমার মুখ হইতে নির্গত হইল,—"আমায় একবার বাইরে যেতে দাও, তারপর তোমাদের কথায় সম্মত হবো।"

সেই নরাধম তৎক্ষণাৎ বলিল,—"এখন কিছুতেই বাইরে যেতে পারবে না; বাইরে গেলে, তুমি নিশ্চয় দৌড়ে পালিয়ে যাবে।"

"আমি বলিলাম,—"আমি পালিয়ে যাবো, কোথায়? এই মাঠ দিয়ে কি আমি একলা পালিয়ে যেতে পারি?"

সেই নরাধম পুনরায় বলিল,—"আচ্ছা, আমার এই তিনজন লোক তোমার সঙ্গে যাবে।"

আমি বলিলাম,—"আমি স্ত্রীলোক; আমি যে জন্য বাইরে যাবো, কোন পুরুষ আমার সঙ্গে গেলে আমার সে কাজ হবে না। ওগো, তোমরা অবিশ্বাস করো না; বরং আমার ছেলেকে তোমাদের কাছে রেখে যেতে আমি রাজি আছি।"

তখন আমার কথায় সেই নরাধম সম্মত হইল। আর সময় নাই! তখন আমি পাষাণী হইলাম; স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া, আমার সেই পাষাণহৃদয়ে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ শিশুপুত্রটীকে সজোরে ছিঁড়িয়া লইয়া, আমি স্বহস্তে যমের হস্তে তুলিয়া দিলাম। স্বহস্তে হৃদপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেও আমার তত কষ্ট হইত না! তাহার পর, ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে আসিয়া, আমি বাহির হইতে সেই গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম!

বাহিরে আসিয়া একবার চারিদিক চাহিলাম। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। গৃহে আবদ্ধ সেই নরাধমেরা এই সময় ভয়ঙ্কর একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহারা এতক্ষণে আমার কৌশল বুঝিতে পারিয়া, প্রথমে অনেক অনুনয়-বিনয় করিল। আমি কিন্তু তাহাদের সে অনুনয়-বিনয়ে-ভ্রূপাতও করিলাম না। শেষ তাহারা আমার পুত্র-হত্যার ভয় দেখাইল। কিন্তু সতীত্ব-রক্ষার জন্য না পারে কি? তাহাদের সে কথা শুনিয়া আমি প্রথমে শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার পর আর

অন্য কোন আশা নাই দেখিয়া, অসি আমার হৃদয়কে দৃঢ় করিলাম!

তাহার পর যে ঘটনা ঘটিল, আমি তাহার বর্ণনা করিতে অক্ষম। আমার শিশুপুত্রের চীৎকারে দিগ্‌দিগন্তর কম্পিত হইতেছিল; কিন্তু সেই শিশুপুত্রের জননী আমি—আমার হৃদয় তখনও অচল—অটল!

শেষ এক লোমহর্ষণ কাণ্ড! আমারই সম্মুখে আমার নয়নের মণি—অঞ্চলের নিধির রক্তমাখা ক্ষুদ্র হাত ও পা আসিয়া পড়িল। মায়ের প্রাণে আর কত সহ্য হয়? সে দৃশ্য দেখিয়া, আমি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলাম!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমার যখন জ্ঞান হইল; তখন দেখি, আমি একটা ঘরের ভিতর খাটিয়ার উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছি। সে ঘরে অনেক লোকজনও দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে পুলিশের লোকও দেখিতে পাইলাম। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তখন আমি পুত্রশোকে অধীরা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "ওগো আমার ছেলে কই?"

অনেকেই আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। আমি একটু সুস্থির হইলে, দেবীপুরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। একজন ভদ্রলোক বলিলেন,—"মা, তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমার সঙ্গে লোক দিচ্ছি, তুমি যেখানে ইচ্ছা কর, সেইখানে তোমায় পাঠিয়ে দেবো। তোমার উপরে যে ভয়ানক অত্যাচার হয়েছে, তার তদন্তের শেষ করে, তার পর তোমায় পাঠাবো। আর, দেবীপুর যেতে হলে, এখনও গাড়ী আস্‌বার বিলম্ব আছে।"

পরে শুনিলাম, এই ভদ্রলোকটী একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; আমার উপর যে ভয়ানক অত্যাচার হইয়াছে, তাহার তদারক করিবার জন্য ইনি স্বয়ং আসিয়াছেন। যখন আমি আমার সর্ব্বস্বধন হারাইয়াছি, যখন কিছুতেই আর তাহাকে পাইব না, তখন আর বৃথা তদারকে কি ফল হইবে? আমি পুত্রশোক চাপা দিয়া, স্বামীর জীবনরক্ষার জন্য বুক বাঁধিলাম। আমি তখন উন্মাদিনী!

ডেপুটী বাবু ধীরে ধীরে আমায় অনেক প্রশ্ন করিলেন। আমি একে একে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি আমার সে সমস্ত কথা লিখিয়া লইলেন। তাহার পর আর একজন সাহেব-বেশধারী রেলওয়ে-কর্ম্মচারীর এক্‌জাহার হইল। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—

"আমি ২৭নং গুডস্ ট্রেণের গার্ড। বিলাসপুরের ষ্টেশনে আমার গাড়ী থামাইবার আবশ্যক ছিল না; কিন্তু ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইয়া আমি সিগ্‌নেল নামান দেখিলাম না, সেই কারণ অগত্যা আমিয় গাড়ী থামাইতে হয়। অনেক সিটি দিয়াও কোন উত্তর পাই নাই। তখন মনে হইল, ষ্টেশনে বুঝি কোন লোক নাই। আমি গাড়ী ছাড়িয়া একজন কুলি সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম যে, ষ্টেশন জনমানবশূন্য। আমি বিস্মিত হইয়া চারিদিক দেখিতেছি, এমন ঐ সময় স্ত্রীলোকটীকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দেখিতে পাইলাম, আর একটি শিশুর রক্তমাখা ছিন্ন হাত-পাও উহার নিকটে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। পর, তাহারই নিকটের একটা ঘরের মধ্যে, এই ষ্টেশন-মাষ্টার, আর তিন জন ওঁহার সঙ্গীকে দেখিতে পাইলাম।

আমি সেরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্যে বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলাম। আমি অনুমানে সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিলাম। গাড়ীতে আমার যে আরও ৩।৪ জন লোক ছিল, তাহাদের সাহায্যে এই আগামীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া, টেলিগ্রাফের দ্বারা আপনাকে সংবাদ দিয়াছি। এই স্ত্রীলোক এখন মূর্চ্ছাভঙ্গের পর আপনার নিকট যে সকল কথা বলিল, ঐ নরাধম হত্যাকারিগণও সে সকল কথা আমার নিকট স্বীকার পাইয়াছে।"

তাহার পর ফায়ারম্যান প্রভৃতি আরও তিন-চারি জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। তাহারাও গার্ডের সমস্ত কথা সমর্থন করিল।

ডেপুটী বাবু অতি ভদ্রলোক। তিনি আমার স্বামীর পীড়ার কথা, সমস্তই আমার মুখে শুনিয়াছিলেন, এবং তখনও আমি যে দেবীপুরে যাইবার জন্য পাগলিনী, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই কারণ, তিনি দয়ার্দ্র হইয়া, একজন স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষ সঙ্গে দিয়া, আমায় দেবীপুরে পাঠাইয়া দিলেন। আমি উন্মাদিনী-বেশে, আর উন্মত্ত হৃদয়-বেগে, তাহাদিগের সঙ্গে দেবীপুরে অভয়াদেবীর মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমার সঙ্গিবীগণ তখনও তথায় ছিল, কিন্তু তাহারা আমায় দেখিয়া চিনিতে পারিল না।

আমি আর কোন্ মুখে তাহাদের কাছে আমার পরিচয় দিব? দুর্দ্দমনীয় হৃদয়বেগে আমি তখন অস্থির, অসহ্য পুত্রশোকে আমি তখন ব্যথিত। তবে স্বামীকে আরোগ্য করিবার আশা তখনও আমার হৃদয়ে ছিল বলিয়া, আমি জীবিত ছিলাম মাত্র। বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া আমি প্রথমে পূজা দিলাম। সে কঠিন হৃদয়ের রক্ত দেবীর মনঃপূত হইবে কি না, জানি না, নচেৎ আজ দেবীর সম্মুখে এ হৃদয়ের সমস্ত রক্ত ঢালিতে পারিতাম।

আমার সঙ্গিবীগণ পরে আমায় চিনিতে পারিয়াছিল, এবং আমার সঙ্গে যে স্ত্রীলোক আর পুরুষ আসিয়াছিল, তাহাদের মুখে তাহারা সমস্ত কথাও শুনিয়াছিল; সুতরাং তাহারা আমায় ফেলিয়া আর যাইতে পারিল না।

তাহার পর, আমি দেবীর অভয় চরণ শরণ করিয়া, তাঁহার মন্দিরে 'হত্যা' দিলাম। অনাহারে—অনিদ্রায় সেদিন সেরাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন শেষ রাত্রে আমার প্রতি দেবীর অনুগ্রহ হইল; স্বপ্নে দেবী আমায় দেখা দিলেন। স্বপ্নে সে অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি দেখিয়া, আমি পুত্রশোক পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলাম। স্বপ্নে আমায় এই আদেশ হইল,—"তুমি সতীত্বের পবিত্র মন্দিরে একমাত্র পুত্রকে বলিদান করিয়াছ। এই পুণ্যে তোমার স্বামী আরোগ্যলাভ করিবে। যাও বৎসে, গৃহে যাও, সতীর কষ্ট আর আমি দেখিতে পারি না। এই ঔষধ গ্রহণ কর, এ ঔষধ ধারণ করাইলে তোমার পতি আরোগ্য লাভ করিবে। আর এক বৎসরের মধ্যে পুনরায় তোমার এক পুত্র হইবে।"

আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। আনন্দে ও বিস্ময়ে আমি চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম। আবদ্ধ মুষ্টি-মধ্যে দেবী-প্রদত্ত ঔষধ দেখিয়া, আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমি বাড়ী আসিয়াছি। দেবীর কৃপায় আমার স্বামী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আর সেই দুরন্ত নরপিশাচগণ, যাহারা বিলাসপুরে আমার উপর সেই ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারাও উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছে।

আমায় সে সম্বন্ধে সেশন আদালতে সাক্ষী দিতে হইয়াছিল—সে যেন মড়ার উপর খাড়ার আঘাত। ভগবান সেই নরাধমদিগের হাত হইতে আমার নিজের ও পুত্রের জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তম আমীর সতীত্বরত্ন রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার জন্য ভগবানের নিকট চিরকৃতজ্ঞ আছি। অত্যাচারীর শাস্তির জন্য একবারও ব্যস্ত হই নাই। তাহাদিগের শাস্তিতে আমার কোন লাভও ছিল না। তাহাদিগের সকলেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল বটে, কিন্তু ইহাতে আমার সেই নয়নপুত্তলি ফিরিয়া আসিল কৈ?

যাহা হউক, দেবীর কৃপায় আমার স্বামী যখন আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন, তখন আর আমার কোন মনোকষ্ট ছিল না। এখন আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা পূর্ণমাত্রায় স্বামীর চরণে ঢালিয়া দিয়া, আমি তাঁহার সেবায় জীবন, মন ও প্রাণ সমস্ত অর্পণ করিলাম। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি স্ত্রীলোক, দেবতাদিগের অভিপ্রায় কিরূপে বুঝিব? পুত্ররত্নে বঞ্চিত করিয়া স্বামীর জীবন রক্ষা করাই যখন তাঁহাদিগের অভিপ্রেত, তখন আমি তাঁহাদের সে অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কি করিতে পারি?

এক বৎসরের অধ্যেই দেবীর শেষ অনুগ্রহের প্রমাণ পাইলাম। আমি পুনরায় পুত্র প্রসব করিলাম। এ পুত্র দেখিয়া, সকলেই চমৎকৃত হইল; নবজাত শিশুর এত রূপ, কেহ কখন দেখে নাই। পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, দেবীর সেই স্বপ্নাদেশের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে মানসচক্ষে যেন আমি সেই শেষরাত্রির সমস্ত ঘটনা দেখিতে পাইলাম। আরো দেখিলাম, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তির জ্যোতির কণা আমার পুত্রের মুখে বিরাজমান!

আমি সে স্বপ্নের কথা এ পর্য্যন্ত কাহাকেও বলি নাই। সে কথা মনে হইলেই আমার শরীর রোমাঞ্চ হইত। কিন্তু সে কথা কি আমি এ জীবনে কখন ভুলিতে পারি? সে কথা আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। যখনই আমি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতাম, তখনই দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার সেই ক্ষুদ্র হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। সেই কৃতজ্ঞতার জন্যই আমি পুত্রের নাম রাখিয়াছিলাম—দেবীপ্রসাদ।

* * *

দেবীপ্রসাদ এখন বড় হইয়াছে। এমন সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র কাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। রূপে গুণে আমার দেবীপ্রসাদ এখন সকলেরই প্রিয় হইয়াছে। আমি দেবীপ্রসাদের একলা 'মা' নই, আমার মতন এ অঞ্চলে তাহার সহস্র 'মা' আছে। দেবীপ্রসাদ কেবল আমার পুত্র নহে, দেবীপ্রসাদ এই গ্রামের যেন সর্ব্বসাধারণের পুত্র। দেবীপ্রসাদকে চক্ষের আড়াল করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু একদিন তাহাকে ছাড়িয়া না দিলে, গ্রামে হাহাকার পড়িয়া যাইত—আমার প্রতিবাসিনীগণ কোমর বাঁধিয়া আমার সহিত ঝগড়া করিতে আসিত। দেবীপ্রসাদকে অন্ততঃ একবার দেখিতে না পাইলে, অনেক বাড়ীতে সেদিন হাঁড়ি চড়িত না। আমি কি করিব? বাধ্য হইয়া অনেক সময় আমায় দেবীপ্রসাদকে ছাড়িয়া দিতে হইত। দেবীপ্রসাদ অমনি আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে বাড়ী বাড়ী ঘুড়িয়া বেড়াইত। গ্রামের লোকের কোন ভালমন্দ আহারীয় দ্রব্য থাকিলে, তাহারা অগ্রে আমার দেবীপ্রসাদকে না দিয়া খাইত না। দেবীপ্রসাদের বাড়ী ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইলে, যখন তাহার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল

হইত, তখন আমি ব্যগ্র হইয়া আর এক জনের মুখের প্রতি চাহিতাম। সে জন কে, জানো? তিনি অন্য কেহ নহেন—তিনিই, আমার স্বামী!

সম্পূর্ণ।

নৈদাঘ নিশীথ-স্বপ্ন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈজয়ন্তী নগরীর নিকটস্থ বন।

(পৌর্ণমাসীর দিক হইতে একজন পরী এবং পঞ্চুর প্রবেশ।)

পঞ্চু।—কিলো পরি! কোথায় যাচ্ছ?

পরী।—পুকুরে, গহ্বরে
অরণ্য ভিতরে
কণ্টক বনে।
সমুদ্রের জলে,
জলন্ত অনলে,
আমি ফুল-বনে, আনন্দ-মনে।
জ্যোৎস্নার জিনিয়া, চঞ্চল প্রায়,
পরীগণ বেগে ছুটিয়া যায়—
আদেশেন যবে পরীর রাণী;
গাঁথি রত্নমালা অলধির তলে,
অবচয়ি মধু কুসুম-দলে,
নক্ষত্রের জ্যোতিঃ হরিয়া আনি।
আজি পুনঃ যাই আদেশে তাঁহার,
গোলাপের দলে ঝুলাতে নীহার,
আসিবেন হেথা পরীর রাণী।

পঞ্চু।—পরীরাজ আজি হেথা উৎসব-কারণ
আসিবেন; সাবধানে করো আয়োজন,
রাণীসহ চারি চক্ষু নাহি মিলন।

স্তবীর সুন্দর এক নৃপতি-তনয়
হরিয়া এনেছে রাণী কৌতূহলময়।
সহচর করি সঙ্গে রেখেছে তাহায়,
জলে রাজা ঈর্ষানলে দেখিয়া যুবায়।
চাহে রাজা, নিজে তারে অনুচর ক'রে,
পাঠাইতে দূর দেশে, বন-বনান্তরে।
কিন্তু রাণী যুবকে না ছাড়ে, প্রাণপণ,
সাজায় কুসুমদামে হৃদয়রঞ্জন।
দু'জনে যথায় মিলে—বনে, উপবনে,
নির্ঝরিণী-কূলে, চারু নক্ষত্রকিরণে—
কুটিল কলহ বাধে; ভয়ে পরীগণ
ফুলে ফুলে লুকাইয়া বাঁচায় জীবন।

পরী।—চিনেছি তোমায় আমি, চিনেছি এখন,
তুমি সে চতুর পরী, নাম "পঞ্চানন"।
সেই তুমি, গ্রামে গ্রামে কুমারী সকলে,
ভয় দেখাইয়া, শূন্যে হাস কুতূহলে;
সর চুরি কর তুমি গোয়ালিনী-ঘরে,
ক্ষীর ছুটাইয়া দেও মালিনীর করে।

কভু তুমি পশ গিয়া দুধের ভিতরে,
অনিখাসে মথি দুধ গোয়া লিনী মরে।
নিশীথ-পান্থিকগণে পথ ভুলাইয়া,
হাস তুমি উচ্চহাসি, করতালি দিয়া।
যাহারা তোমায় বলে সাধু "পঞ্চানন",
সাধিতে তাদের কার্য্য কর প্রাণপণ।

পঞ্চু।—ধরা পড়েছি।
আমি সে আমোদপ্রিয় পরী নিশাচর,
সতত আমোদে বঞ্চি "অনঙ্গ" অন্তর।
ঘুঁড়ী হয়ে ডাকি আমি দোঁড়া যায় ছুটে,
সহিসেরা দেয় গালি, শানে মাথা কুটে।
বীরাঙ্গনা-পান-পাত্রে লুকাইয়া থাকি,
অধরে তুলিতে সুরা ভোঁ ভোঁ করে ডাকি।
"যাবাগো!" বলিয়া মাগী পাত্র দেয় ফেলে,
হাসির তরঙ্গ উঠে নাগরমণ্ডলে।
ঠানদিদিদের জল ছাঁদি আসর-জাঁকান,
আমাকে ত্রিপদী ভাবি বসিবারে যান।
কটাক্ষেতে আমি হই অন্তর তখন,
চিতপাত হয় বুড়ী ভূতলে পতন।
কাশে বুড়ী, নানা ছন্দে আবিষ্কার ধরি,
আনন্দে বালকবৃন্দ যায় গড়াগড়ি।
বাপরে! গুই অনঙ্গ আসছে।

পরী।—ঐ আমার রাণীও আসছে।
যায় একটা লঙ্কাকাণ্ড হবে দেখ্‌ছি।
একদিক হইতে পারিষদসহ অনঙ্গ, অন্যদিক হইতে পরিচারিকাসহ ত্রিতারার প্রবেশ।)

অনঙ্গ।—কি মানিনী ত্রিতারা, এই জ্যোৎস্না রাত্রিতে কেন?

ত্রিতারা।—কি ঈর্ষাতু অনঙ্গ? পরীগণ! সরে যা। তুমি কি জান না, আমি তোমার মায়া ত্যাগ করেছি?

অনঙ্গ।—পাপীয়সি! আমি কি তোর স্বামী নহি?

ত্রি।—তেমতি আমি কি পত্নী নহিগো তোমার!
কিন্তু জানি, পরীরাজ্য করি পরিহার,
গিয়াছিলে কোথা, তুমি, বাঁশরীর স্বরে,
প্রণয়-কবিতা-হারে, হরিবার তরে
প্রেমময়ী প্রেমিনী হেমলতাময়?
জানি, নাথ, আজি কেন হেথা আগমন;
হবে সেই বীরাঙ্গনা প্রেয়সী তোমার—
রাজা-সুরেশ্বর রাণী। পেয়ে সমাচার,
আসিয়াছ সাজাইতে ফুলশয্যা তার।

অ।—নিল জ্জ ত্রিতারা, ছি ছি, বলিলে কেমনে
এমন কলঙ্ক কথা! ভাবিয়াছ মনে,
জানি নাই তব প্রেম সুরেশ্বর-সনে।
তুমি না হরিয়াছিলে—ভুলেছ কি আর?
হৃতা "সুরবালা" হতে হৃদয় তাহার?

ত্রি।—এসব নিশ্চয় তব ঈর্ষার সৃজন।
মধ্যম বসন্ত হতে মিলেছি যখন,
কিবা গিরি, কি গহ্বরে, অরণ্যে, কান্তারে,
নির্ম্মল নির্ঝর-কুলে, স্রোতস্বতী-ধারে,
কিম্বা সমুদ্রের চারু ধবল বেলায়,
নাচিত অপ্সরা নিত্য, চুম্বিয়া ধরায়,
মধুর স্বননে বহে সমীরণ বহে।
ভাঙ্গিয়াছ ক্রীড়া তুমি ঈর্ষার কলহে।

অ।—যদি খোঁবরাইতে চাহ, তাহা অনায়াসে পার। সেই ছোঁড়াটাকে আমার অনুচর করিতে দেও।

ত্রি।—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও!
এই পরিরাজ্য যদি দেও বিনিময়ে,
তবু না পাইবে তারে। জননী তাহার
ছিল উপাসক মম। দূর-সুস্থগিত
ভারত-সমীরে বসি নিশীথ-সময়ে,
কতই রূপসী-কথা, শুনাতে আমারে,
অভাগিনী; কত দুঃখে, নীল-সমুদ্রের
সুবর্ণবালুকাময়ী সৈকতে বসিয়া,

হাসিতাম দুইজনে—দেখি ক্রীড়াশীল
সমীরণে গর্ভবতী তরণীর পাল।
ঝুলুকারি সেই পাল, পূর্ণ গর্ভবতী,
চঞ্চলে চরণে চলি মৈকতে বেলায়,
আনিত শঙ্খ শিলা, কতই ঝিনুকে—
যেন কত বহুমূল্য বাণিজ্যের ধন।
কিন্তু অভাগিনী হায়! ছিলি মানবী;
মরিল প্রসবকালে। মাতৃহীন শিশু
পালিতেছি, জননীর স্মৃতি-নিদর্শন—
প্রাণান্তে তাহারে নাহি ছাড়িব কখন।

অ।—তুমি আর কতদিন এই বনে থাকিবে?

ত্রি।—সম্ভবতঃ সুরেশ্বরের বিবাহ পর্য্যন্ত। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে নাচিতে ইচ্ছা কর, এবং আমাদের জ্যোৎস্না ক্রীড়া দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে আমাদের সঙ্গে আইস; না হয়, এখান হইতে যাও, আমি তোমার ক্রীড়াস্থান অনুসরণ করিব না।

অ।—আমাকে সেই ছোঁড়াটিকে দেও; তা হ'লে আমি তোমার সঙ্গে যাই।

ত্রি।—বলিয়াছি, এই সমুদয় পরীরাজ্যের বিনিময়েও দেব না। পরীগণ! চল। তোমার দিকে, যদি আমি আর এখানে থাকি।

(সসঙ্গিনী ত্রিতারার প্রস্থান।)

অ।—আচ্ছা, যাও। এই বন পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই আমি এই অপমানের প্রতিফল দিচ্ছি। পঙ্কু! শোন্। তোর মনে আছে—

সমুদ্রের অপরূপে বসি এক দিন,
শুনিতেছিলাম সুখে মধুর সঙ্গীত—
মকর-বাহিনী এক বারিদেবী-মুখে।
উত্তাল জলধি সেই, সুমধুর সুরে
ধরিলা প্রশান্ত ভাব; নক্ষত্রনিচয়
খসিয়া পড়িতেছিল উন্মত্তের মত—
শুনিতে সে বারিজার তরল-সঙ্গীত।

পঙ্কু।—হাঁ, মনে আছে।

অ।—ঠিক সে সময়ে, সহসা! দেখিলে না তুমি।
দেখিলাম শূন্যপথে সশস্ত্র মনুষ্য—
উপরে শীতল চন্দ্র, নীচে ধরাতল—
সুচারুহাসিনী এক সিমন্তিনী-পানে
হানিল সুতীক্ষ্ণ শর, শরাসন হতে,
শতকোটী চিত্ত বাণ বিঁধিতে সক্ষম।
কিন্তু মদনের সেই জলন্ত সন্ধান,
সজল চন্দ্রমালোকে নিবিল সহসা;
চলি গেলা বামা, রূপে জগতের রাণী;
কুমারী চিন্তায় মগ্না, কল্পনা-স্বপনে।
তখন কামের বাণ হইল পতন
এক ক্ষুদ্র শ্বেতপুষ্পে, আরক্ত এখন
প্রেম-অস্ত্রাঘাতে। তুমি যাও, ত্বরা করি
আন সেই ফুল; রস-সরস বাহারে—
দিলে নিদ্রা-নিমালিত নয়নপল্লবে,
কিবা নর, কিবা নারী, নিদ্রান্তে যাহারে
দেখিবে প্রথম চাহি, হবে তার তরে
প্রণয়ে পাগল। তুমি যাও, আসিও ফিরিয়া
আঁখির পলকে পুনঃ এক দণ্ডে আমি—
দিব উত্তরীয় এই পৃথিবী গলায়।

(প্রস্থান।)

অ।—এই ফুলটা পেলে, ত্রিতারা কোথায় ঘুমায়, তা তখন বেশ এবং তার চক্ষে উহার রস দেব। ঘুম ভেঙ্গে, সে সিংহই দেখুক, ভালুকই দেখুক, বাঘই দেখুক, আর ষাঁড়, বাঁদর কিংবা বনমানুষই দেখুক, পাগলের মত তার পিছে ছুটে যাবে। আর একটী শিকড়ের রস দিলেই এই ভ্রম কেটে যাবে। কিন্তু তা করার পূর্ব্বে ছোঁড়াটাকে হাত করতে হবে। এরা আবার কে?—তা আমাকে ত দেখতে

পাবে না! মজা ক'রে এদের কথাটা শুনেনিই।

(বিপিন ও তৎপশ্চাৎ মানদার প্রবেশ।)

বিপিন।—আমি ত তোমাকে বলেছি যে, আমি তোমাকে ভালবাসিনে; তবু কেন তুমি আমাকে ভূতের মত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছ? বিনোদ এবং সুন্দরী প্রনদা কোথায়? আমি একটীকে খুন করবো, আর একটী আমাকে খুন করে রেখেছে। তুমি বলেছিলে না—তারা দুই বুনে পালিয়ে এয়েছে? কিন্তু, তারা কই? তুমি যাওনা? ভাল জ্বালাতন করলে যে!

মা।—নিষ্ঠুর! আমায় কেন কর আকর্ষণ,
চুম্বক হৃদয় তব, লৌহ মম মন;
তব আকর্ষণী-শক্তি কর পরিহার,
তোমার পশ্চাতে আমি নাইব না আর।

বি।—আমি কি তোমায় অনুরক্ত করতে চেষ্টা করি? আমি কি তোমায় বলি যে, আমি তোমার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছি? বরং আমি কি তোমায় স্পষ্টাক্ষরে বলি নাই যে, আমি তোমাকে কখনও ভালবাসি নাই, ভালবাসিতে পারিব না?

মা।—আমি তথাপি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমার কুকুর। বিপিন, তুমি আমাকে যত প্রহার কর, আমি তত তোমার শরীর লেহন করি। আমাকে নিতান্তপক্ষে তোমার কুকুরটার ন্যায় ব্যবহার কর; মার, পদাঘাত কর; তথাপি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে অনুমতি দেও। তোমার প্রণয়ে ইহার অপেক্ষা, নীচস্থান আর কি হইতে পারে? তথাপি আমার পক্ষে তাহা স্বর্গ।

বি।—দেখ, আমার ঘৃণা আর অধিক উত্তেজিত করিও না। তোমাকে দেখিলে আমার গায়ে জ্বর হয়।

মা।—তোমাকে না দেখিলে আমি পীড়িত হই।

বি।—সহর ছেড়ে, যে তোমাকে ভালবাসে না—তাহার সঙ্গে রাত্রিতে একাকিনী তোমার ঐ নবীন যৌবনরঙ্গ লইয়া প্রবেশ করা, তোমার প্রক্ষে নিতান্ত নির্লজ্জের কার্য্য হইয়েছে।

মা।—তোমার চরিত্রে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে।

যখন নিরখি আমি তোমার বদন,
রজনী তখন মম নাহি লয় মনে।
কেমনে বলিব বল, অরণ্য নির্জ্জন?
তুমি যার আছ কাছে, আছে ভূমণ্ডল।
বিপিন! আমার তুমি সংসার সকল।

বি।—আমি এখনি ঐ জঙ্গলে লুকাব, তুমি হিংস্র বন্যজন্তুর মুখে পড়ে থাকবে।

মা।—হিংস্রতম পশু যেই, তাহারো হৃদয়,
কঠিন তোমার মত না হবে কখন।
পালাও, ইহাতে কিন্তু কলঙ্ক তোমার;
পালাবেন ইন্দ্র, শচী ছুটিবে পশ্চাতে,
পালাইবে ব্যাঘ্র পড়ি-অরিণীর হাতে।
পালাইবে শ্যেনপক্ষী দেখি কপোতিনী,
পালাইবে, বীর্য্য দেখি অবলা রমণী।

বি।—আমি, বাপু, তোমার সঙ্গে আর ছড়া কাটতে পারি না, তুমি আমাকে যেতে দেও। তুমি যদি তবু আমার পিছে পিছে এস, তবে এই বনে আমি তোমার অপমান করিব।

মা।—হা অদৃষ্ট! দেবালয়ে, নগরে, প্রান্তরে,
কোথা নাহি অপমান করিছ আমার।
নারীর সম্মান তুমি জননী কি হায়!
না সাধে রমণী, সাধে পুরুষ বামায়।
যাইব পশ্চাতে, হ'ক মরণ নিশ্চয়,
প্রণয় পাশকে হ'ক জীবন-ঘাতক।

(প্রস্থান।)

অ।—যাও শশিমুখী! নাহি ছাড়িতে এ বন,
সে আবে পশ্চাতে, তুমি পলাবে তখন।

(পঞ্চুর প্রবেশ)

ফুল এনেছ! সাবাস পঞ্চু!

পঞ্চু।—এই নিন।

অ।—দাও, আমাকে দাও।

জানি আমি সেই স্থান স্রোতোস্বতী-তীরে;
যথায় বাসন্তী-লতা-চন্দ্রাতপ-তলে,
কুসুম-পল্লব-কুঞ্জে, স্নাতু চন্দ্র-করে,
কুসুমশয্যায় শুয়ে ত্রিতারা সুন্দরী,
নিদ্রা যায় নৃত্যশ্রমে, পুষ্প-আবরণে
লুকাইয়া পুষ্পময়ী মূরতি তাহার,
যাইব তথায়; দিলে এই পুষ্পরস
নয়নে তাহার, হবে নিদ্রান্তে হৃদয়
সংখ্যাতীত ঘৃণাস্পদ কল্পনা-পূরিত।
পঞ্চু, তুমি ইহার কিঞ্চিৎ অংশ লইয়া
এই বনের মধ্যে প্রবেশ কর। দেখিবে, একজন
সুন্দরী যুবতী একজন দম্ভপূর্ণ যুবকের
প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছে। তুমি এই ফুলের রস
তার চোখে দিবে; কিন্তু এমনি সময়ে দিবে,
যেন নয়ন মেলিলে সেই স্ত্রীলোকটীই তাহার
প্রথম দৃশ্য পদার্থ হয়। কাক ডাকিবার পূর্ব্বে
তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।

পঞ্চু।—নৃপতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

একত্ব।

(ইংরাজী হইতে।)

গগনের স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল নীহার-কণিকা, দোলে সুখে নব-দুর্ব্বাদলে।
বসন্তের বনরাজি-প্রতিবিম্ব অকম্পিত পড়ি, তটিনীর স্বচ্ছ নীলজলে॥

রমণীয় সুশৈলজা নির্ঝরিণী, পুষ্পিত কানন, আলোক-রঞ্জিত কুঞ্জ-বন।
সুন্দর সন্ধ্যার তারা, পাংশু-মেঘ ভূরুপরি-শোভে, দশদিক উজলে কিরণ॥

শ্যামল-প্রান্তর চারু, উপত্যকা তরু-বিরাজিত, কুসুমে আবৃত গিরিকায়।
পাদপ-মণ্ডিত নদী, শর-বন-মেখলা সরসী, পুষ্প তারা তুষারের প্রায়॥

একেকে আবদ্ধ দেখ, সেই সব সজীব জগৎ, প্রেমের অনন্ত সুবন্ধনে।
জোনাকীর মৃদু আলো, তপনের অনল-কিরণ, করেছে সৃজন একই জনে॥

তোমার ইঙ্গিতে, দেব! সর্ব্ব-শক্তিমান্! তরু হ'তে মুকুল পরাগ ঝরিতেছে।
তোমার ইঙ্গিতে দেব সুমহান্! অনন্ত সাগরে স্বপন-গোলক নিভিতেছে॥

কবিবর ৺ রাজকৃষ্ণ রায়।

একজন সুরসিক সুলেখক গভীর দুঃখোচ্ছ্বাসের সহিত বড় সত্য কথাটাই বলিয়া ফেলিয়াছেন,—"কবিত্ব-মর্য্যাদা আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে ধন-মর্য্যাদা এবং পদ-মর্য্যাদার প্রায়ই সহায়বর্ত্তী। দীনাবস্থ কবিকে যে কবি বলিতে স্বভাবতঃ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইতে হয়, তাহার নিদর্শন প্রভূত। একটা নিদর্শন দেখাইতেছি; "বেশ্যার বিষপান" প্রভৃতি সাংঘাদ অধুনাতন সংবাদপত্রের স্তম্ভবিশেষে স্থান প্রাপ্ত হয়; কিন্তু মতামত প্রকাশ দূরের কথা, সংবাদ-হিসাবে (!) "রাজকৃষ্ণ বাবুর শোকসভা" আমাদের দেশীয় "জগদ্বিখ্যাত" সংবাদ-পত্রিকাদির কোনটিতে প্রকাশিত হয় নাই।"

ভাবিতে গেলে, বুঝিতে গেলে, কথা-কয়েকটীতে সমাজের প্রতি—জাতির প্রতি বড় একটা গুরুতর দোষারোপ করা হইয়াছে। কিন্তু, কথাগুলি ছত্রে ছত্রে সত্য; সুতরাং উত্তর দিবার আর কিছুই নাই।

এই দরিদ্র দেশে, অনুকষ্টের দারুণ দুর্ভাবনা-চিন্তায় নিমজ্জিত থাকিয়াও, যিনি অন্যূন দুই শত বাঙ্গালা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; নাটক, উপন্যাস, পুরাতত্ত্ব, কবিতা, ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি সকল বিষয়েই যাঁহার প্রগাঢ় ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়; রামায়ণ, মহাভারতের ন্যায় বিশাল গ্রন্থরাশি—যাহা বহু পণ্ডিতের সাহায্যে ও লক্ষাধিক

টাকা ব্যয়েও সুসম্পন্ন হওয়া সুকঠিন—যিনি সাবহেলে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন; আজ কি না, তিনি দরিদ্র বলিয়া, আমরা তাঁহার গুণের আদর করিতে ভুলিব? ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয়? আমাদের এ কলঙ্ক কি কিছুতে অপনীত হইতে পারে?

"অবিরাম গতি নদী, বাধা নাহি মানে,
বিরাম তা' কিসে গঙ্গা, কভু নাহি জানে।"

বাস্তবিক কবিবরের প্রতিটি এই উপমা খাটে। কবিবরের দ্রুত লেখনী-মুখে, স্রোতস্বতীও হারি মানে! শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—সহসা কেহ বিশ্বাস করিতেও পারিবেন না—কিন্তু আমাদের চাক্ষুষ দেখা—কবিবরের অবিশ্রান্ত লেখনী কি তরঙ্গ-প্রবাহে প্রবাহিত হইত! এমন কেহ কখনও শুনিয়াছেন কি—তিন জন লিপিকার লিপিপত্র-হস্তে অবিরামগতিতে, কবিতা লিখিয়া যাইতেছেন, আর কবিবর,মূল রামায়ণ কি মহাভারত সম্মুখে ধুলিয়া রাখিয়া, বর্ষার বারিধারার ন্যায়—প্রলয়-পবনপ্রবাহের প্রায়, অনর্গল কবিতার স্রোতে সকলকেনিমগ্ন করিতেছেন। জানি না, শুনি নাই, কোন দেশে, কোন সময়ে, এমন কোন কবির জন্ম হইয়াছিল কিনা? কিন্তু ধিক্ আমাদের—আমরা এমন কবিরও উপযুক্ত সম্মাননা করিতে শিখিলাম না?

"রাজকৃষ্ণ বাবু! আজই একখানি নূতন টকের প্রয়োজন!"—রাজকৃষ্ণ বাবু সেই দিনই একখানি নূতন নাটক লিখিয়া দিয়াছেন; অনেক সময় হয় তো সেই রাত্রেই সে নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ভাবুন দেখি, ইহা কি অসীম ক্ষমতার পরিচায়ক!

তাঁহার রোগ-শয্যায়—হায়! যাহার পর আর তাঁহাকে উঠিয়া বসিতে দেখিলাম না—তিনি "প্রতিফল" নামক একখানি উপন্যাস, আমাদের "মাসিক উপন্যাস"-পত্রের জন্য, তিন দিনে সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন—তাহাও বৈকালে দুই এক ঘণ্টা মাত্র লিখিয়া!

এইরূপ যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, কবিবরের অসাধারণ লিপিকমতায় ততই মুগ্ধ হইতে হয়। কি কবিতা, কি উপন্যাস, কি গল্প, কি অন্য যে কোন বিষয়, সাহিত্যের কোন বিভাগেই তাঁহার অনধিকার ছিল না। বাঙ্গালার এমন কবি—এমন একজন লেখককে হারাইয়াও, বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাসী যে আজিও শোকসন্তপ্ত ও ম্রিয়মাণ নহে, ইহার উপমাস্থল—

"দারিদ্রা-দোষো গুণরাশিনাশী"

এ ব্যতীত কি বলিব? আর নয় বলিব—দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ, আর দুর্ভাগা আমরা!

বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া, দেশের একজন গণ্যমান্য লেখক বলিয়া, কবিবর যেরূপ সম্মানের উচ্চসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার হৃদয়ের নানা মহত্বে, নানা গুণগরিমায়,নানা সদাচারেও, তাঁহাকে গৌরবের সেই উচ্চ চূড়ায় স্থাপিত করিয়াছে। তিনি ঋণের জ্বালায় জর্জ্জরিত, মহাজনের তাগাদাতাড়নায় অস্থিরচিত্ত, পরামর্শদাতাগণ তাঁহাকে উপদেশ দিতেছে—"রাজকৃষ্ণ বাবু, আপনি দেউলিয়া-আদালতের আশ্রয় লউন;" কিন্তু তখনও তিনি—তাঁহাকে দেবতা বলিতে ইচ্ছা হয়—বলিতেছেন,—"আমি জুয়াচুরি করিতে পারিব না; যাঁহারা আমায় দেখিয়া—আমায় বিশ্বাস করিয়া টাকা দিয়াছে. আমি কিছুতেই তাহাদিগকে ফাকি দিতে পারিব না। আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিব, সেও স্বীকার; তবু লোকে যেন না বলে—'রাজকৃষ্ণ জুয়াচোর'।" আর, বাস্তবিকই কবিবর এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া গিয়াছেন। কতদিন নিজে পেট পুরিয়া আহার করিতে পান নাই, তাঁহার পুত্র-পরিবারও কতদিন অনাহারে কাটাইয়াছে; তবু তিনি কাহাকেও ফাকি দিয়া যান নাই—আজ কেহই বলিতে পারেন না, রাজকৃষ্ণ আমায় ঠকাইয়া গিয়াছে। প্রকৃত ভিক্ষা করা যাহাকে বলে, কবিবর দ্বারে দ্বারে সেইরূপ ভিক্ষা করিয়াই, মহাজনের ঋণমুক্ত হইয়াছিলেন। দরিদ্র গরীব কবির জীবনে, ইহা কি অল্প গৌরবের বিষয়? আরও, ক্ষোভের বিষয়, এই ঋণপরিশোধের জন্য, তিনি যে ক্লেশদায়ক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন—কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় কাল কাটাইয়াছেন, তাহাই তাঁহার এই অকাল-মৃত্যুর কারণ। হায়! এ কথা ভাবিলে, এ কথা মনে হইলেও, হৃদয় ফাটিয়া যায়।

কবিবর সম্মানিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ধনী বলিয়াও সংসারে কখন প্রতিপত্তিলাভে অগ্রসর হন নাই; সুতরাং তাঁহার পক্ষে এরূপ উপায়ে ঋণশোধের চেষ্টা—এমন কি তাহাতে শরীর পর্য্যন্ত পাত করা—অধিক প্রশংসার কথা, সন্দেহ নাই। ইচ্ছা করিলে, তিনি অনায়াসেই সকলকে ফাকি দিতে পারিতেন; এবং নিজেও সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ কবিবর, ভ্রমেও কখন সে ভাবনা ভাবেন নাই। লোকের সহিত সততা-রক্ষাই যেন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল।

দরিদ্র হইলেও, কবিবর দাতা ছিলেন। সংবাদপত্রের ঘনঘটাময়ী ভাষাচ্ছেটায় তাঁহার দানকীর্ত্তি ঘোষিত না হইলেও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, কবিবরের বড় দুরবস্থার সময় যখন—একদিন বেলা দুইপ্রহরের সময়—তাহার সংসারের বাজার পর্য্যন্ত হয় নাই, হাতে একটী পয়সাও নাই—এমন সময়, তাঁহার পরিচিত একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে আসিয়া, কাতর-কণ্ঠে বলিল, —"সপরিবারে আজি আজ তিন দিন উপবাসী, আমায়, কিছু ভিক্ষা দেন।" সে কথা শুনিয়া, রাজকৃষ্ণ বাবু এতদূর ব্যথিত হইয়াছিলেন যে, ছলছল-নেত্রে, আপনার ভৃত্যের নিকট হইতে মিনতি করিয়া একটি টাকা হাওলাত লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। দরিদ্র না হইলে,দারিদ্র্য-যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতে অন্য কেহ সক্ষম হইতে পারে না।

কবিবর চরিত্র-বলেও বলীয়ান ছিলেন। তাঁহার সহিত এত ঘনিষ্ট-সূত্রে আবদ্ধ থাকা-সত্ত্বেও, আমরা কখনও তাঁহার কোন চরিত্র-দোষের কথা শুনি নাই। রঙ্গালয়ের সহিত যাঁহার এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, যিনি নিজে রঙ্গালয়ের পরিচালক ও লেখক ছিলেন; তাঁহার পক্ষে এরূপভাবে চরিত্র-রক্ষা, শুনিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

উপকারীর প্রতি কবিবর চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। জীবনে যাঁহার নিকট যে কোন উপকার তিনি পাইয়াছিলেন, মৃত্যু-শয্যায়ও, তাহা বিস্মৃত হন নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন,—অমুক আমার এই উপকার করিয়াছেন, অমুক আমায় এইরূপে উপকৃত করিয়াছেন। তিনি কথায় কথায় বলিতেন,—"গুরুদাসবাবু প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়) ও অমৃত বাবুর (ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ বাবু অমৃতলাল বসু) ঋণ আমি কখনই ভুলিতে পারিব না।" মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও, তিনি আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন, আর কাঁদিয়া-

ছেন। সে দৃশ্য দেখিয়া, আমরাও সময়ে সময়ে অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই।

তাঁহার সেই সকল গুণের কথা স্মরণ হইয়া, এখনও আমাদের হৃদয় যেন শোকভারে ভারাক্রান্ত হইতেছে মনে হইতেছে, —কবিবর, ঐ—ঐ যেন এখনও আমাদের চক্ষের উপর তাঁহার সেই অলৌকিক গুণ-গরিমা প্রদর্শন করিতেছেন। কবিবর! তুমি এখন স্বর্গে; কিন্তু হৃদয় বলিতেছে—তুমি যেন হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ। আজ আমার হৃদয়ে, কাল আর এক জনের হৃদয়ে, এইরূপে ধীরে ধীরে সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়েই যে তোমার স্বর্গপ্রভা প্রকটিত হইবে, সময় যেন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কাল বলিতেছে,—কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; আজি হউক, কালি হউক, বঙ্গবাসীর হৃদয়-দর্পণে তিনি প্রতিফলিত হইবেনই হইবেন।

ঠাকুর-ঝি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হীরালাল গত রাত্রে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিতে না পাইয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। শরৎকুমারীও দরজা খুলিয়া হীরালালকে দেখিতে না পাইয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিল। যদি শরৎকুমারী আর অল্পক্ষণ পূর্ব্বে দরজা খুলিত, তাহা হইলে কাহার এরূপ মনোকষ্টের কারণ ছিল না। কিন্তু যেদিন যে ঘটনা ঘটিবার, সেদিন সে ঘটনা ঘটিবেই—তাহার উপর কে আধিপত্য করিতে পারে?

হীরালাল বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধুর নাম পরেশনাথ। ইহার পরিচয় এখন এই পর্য্যন্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি সেই গভীর রাত্রে হীরালাল বাঁবুকে পাইয়া, মহা আহ্লাদে তাঁহার সমাদর করিলেন, এবং সেই রাত্রে হীরালাল বাবুর নিকট হইতে টাকা লইয়া স্বয়ং কোথা হইতে এক বোতল মদ কিনিয়া আনিয়া, উভয়ে সমস্ত রাত্রি মদ খাইয়া পৈশাচিক আমোদ আরম্ভ করিয়া দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই হীরালাল বাবু নেশায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, আর পরেশনাথ নেশায় উন্মত্ত হইয়া প্রতিবাসীর নিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। তাহার পর, বাড়ীর মধ্যে গিয়া স্ত্রীর উপর নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল।

বেলা নয়টার সময় হীরালাল বাবুর নিদ্রাভঙ্গ বা নেশাভঙ্গ হইল। প্রথমে চৈতন্য হইবামাত্র, তিনি যে তাঁহার চিরপরিচিত শয়ন-গৃহে আজ শয়ন করেন নাই, তাহা বুঝিতে পারিলেন। কোথায় আছেন—তাহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না বটে, কিন্তু কিরূপে সেখানে আসিলেন, তাহা বুঝিয়া ঠিক করিতে তাঁহার কিছুক্ষণ বিলম্ব হইল। প্রথমে বন্ধুর উদ্যানে নিমন্ত্রণ—সেখানে আহারাদি ও সুরাপান, তাহার পর গৃহে প্রত্যাগমন,—সেখানে জননী ও ভগিনীর নিকট নিজের অবস্থা প্রকাশ, প্রভৃতি একে একে হীরালালের সমস্ত কথাই মনে হইল। সেই স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই যেন হীরালাল বাবুর মস্তকে এক ভীষণ বজ্রাঘাত হইয়া গেল।

হীরালালের তখন ভয়ানক আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি একটা ভিন্ন মানুষের উপর পড়িয়া রহিয়াছেন, আর চারিদিকে বোতল গ্লাস প্রভৃতি ছড়ান রহিয়াছে। সে দৃশ্য দেখিয়া, লজ্জায় ও ঘৃণায় তিনি যেন মৃতপ্রায় হইয়া গেলেন। সেখানে তিলার্দ্ধ থাকিতে আর তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

তাঁহার শরীরের অবস্থাও বড় শোচনীয়। মাথা ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, মস্তকের ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় তিনি অস্থির; আর তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, উঠিয়া দাঁড়াইবারও তাঁহার যেন ক্ষমতা নাই! এত আনন্দ, এত স্ফূর্ত্তি, এত লম্ফঝম্ফের শেষ পরিণাম এই!!

অনেক কষ্টে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু রাস্তায় বাহির হইয়া অপরিচিত লোকের নিকটও মুখ দেখাইতে তাঁহার লজ্জা-বোধ হইতে লাগিল। যেন গত রাত্রে তিনি কোন ভয়ানক কুকার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার মনের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে বাড়ীর দিকেই যাইতেছিলেন; কিন্তু যখন জননী ও অমলার কথা তাঁহার মনে উদয় হইল, তখন বাড়ীর দিকে যাইতে তাঁহার আর সাহস হইল না। জননী ও অমলা যে তাঁহাকে সুরাপায়ী বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, এই কথা তাঁহার মনে উদয় হইবা-মাত্র, তিনি লজ্জায় ও ঘৃণায় আপনার মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে এ জীবনে আর কখন সুরা স্পর্শ করিবেন না।

হীরালাল তখন বাড়ীতে কোন্ মুখ লইয়া যাইবেন? কিছুক্ষণ চিন্তার পর, তাঁহার বন্ধু সুরেশ বাবুর বাড়ী যাইবারই মনস্থ করিলেন। বেলা দশটার সময়, বিমর্ষ মনে, ধীরে ধীরে, সুরেশ বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। সুরেশ বাবু হীরালাল বাবুর মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়াই বলিলেন,—"কিহে হীরালাল, তোমার ব্যাপার কি, বল দেখি? কাল রাত্রে ছিলে কোথায়?"

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হীরালাল বাবুর যেহারা গোপীনাথ, বাবুর অনুসন্ধান করিতে, সুরেশ বাবুর নিকট আসিয়াছিল। সুরেশ বাবুর নিকট হীরালালের কোন কথা গোপন ছিল না; তিনি হীরালালকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার একজন প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিলেন। সুরেশ বাবুর উপরোক্ত প্রশ্নের, হীরালাল বাবু কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; কারণ, কি উত্তর দিবেন, তখন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই। সুরেশ বাবু পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"তোমার আর কোন কথা বলিবার আবশ্যক নেই। তোমার চেহারা দেখেই আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। ক্রমে যে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ, দেখ্‌ছি!"

হীরালাল এইবার উত্তর করিলেন,—"ভাই সুরেশ, আমার মাপ কর, আমি এমন কর্ম্ম আর কখন কর্‌বো না।"

সুরেশ।—এ কথাটা কি আন্তরিক কথা, না মুখের কথা?

হীরালাল।—এ আমার আন্তরিক কথা।

সুরেশ।—হীরালাল, তোমার অনেক গুণ; সে সকল গুণের কথা মনে হ'লে, তোমায় দেবতা বলে পূজা কর্‌তে ইচ্ছা হয়; কিন্তু এক দোষে তোমার সেই সমস্ত অসাধারণ গুণ মাটী হয়ে গেল।

হীরালাল।—সুরেশ, আমি সব বুঝি, আমি সব জানি; তবে আমার মনের কষ্টের কথা যে তুমি বুঝ্‌তে পার না, এই আমার দুঃখ।

সুরেশ।—আচ্ছা, আমি স্বীকার করলুম, তোমার স্ত্রী বড় মুখরা, তাঁর যথার্থ পতি-ভক্তি নেই, তুমি তাঁর প্রণয়ে সুখী নও; কিন্তু তা বলে কি, তুমি তাঁর উপর রাগ করে নিজে অধঃপাতে যাবে? এ যে তোমার চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া হচ্ছে, দেখতে পাই। তোমার এই দোষের জন্য তোমার অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধু কিরূপ দুঃখিত, তা তুমি জান না।

হীরালাল।—সুরেশ, আমার প্রাণের কথা আমি সব বলেছি। আমার স্ত্রী আমার মনোমত হয়-নি; আমি বিবাহের পূর্ব্বে যে সুখের আশা করেছিলুম, সে আশায় সম্পূর্ণ নৈরাশ হয়েছে, প্রাণেও একটা ভয়ানক আঘাত পেয়েছি, আমার করের কথা তোমায় কি বল্‌বো? যখন মদের প্রতি আমার ভয়ানক ঘৃণা ছিল, তখন আমার স্ত্রী আমায় মাতাল বলে ঘৃণা করতো। বিনা-দোষে স্ত্রীর এরূপ ঘৃণিত হয়ে থাকা কিরূপ কষ্টকর, ভুক্তভোগী ভিন্ন বুঝতে পারে না। মদ যে শরীর ও মন উভয়ের পক্ষে ভয়ঙ্কর অনিষ্টকর, তা আমি জানি। তবে মদের এক গুণ আছে; আমি যখন মদ খাই, তখন অসহ্য যন্ত্রণাও ভুলে যাই। আজ যে তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করলুম, সে আমার নিজের ভালর জন্য নয়, সে আমার স্ত্রীর মুখ চেয়েও নয়; সে কেবল আমার জননীর মুখ চেয়ে, আর সরলা অমলার মুখ চেয়ে। তাঁদের কাছে কাল রাত্রে আমি বড় লজ্জিত হয়েছি। আর আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, তাঁরা আমার এই ব্যবহারে বড়ই মনোকষ্ট পেয়েছেন। আজ আমার ঘৃণায় আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করছে।"

এই কথা কয়েকটী বলিতে বলিতে, হীরালালের চক্ষে অশ্রুজল দেখা গেল। সুরেশ সেই অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া দিয়া, বন্ধুকে আলিঙ্গন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার সময় সুরেশ বাবু, হীরালালকে বাড়ী রাখিয়া গেলেন, এবং হীরালাল বাবুর জননীকে ডাকিয়া গোপনে কি কথা বলিয়া গেলেন। গত রাত্রের ঘটনা-সম্বন্ধে কেহ কোন কথা উল্লেখ করিল না; হীরালালও কাহারও সহিত কোনপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিলেন না, নিজগৃহে চোরের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। গৃহিণী সন্ধ্যার পর হইতে একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। শরৎকুমারী, স্বামীর আহারাদির সমস্ত উদ্যোগ যত্নের সহিত স্বহস্তে করিল বটে, কিন্তু স্বামীকে আহার করাইবার জন্য তাঁহার সম্মুখে কোন মতেই যাইতে স্বীকৃত হইল না। অমলা যত্নের সহিত ভ্রাতাকে আহার করাইল; সে সময় অন্যদিনের ন্যায় ভ্রাতার সহিত নানা-প্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়াও, তাঁহার মনের কষ্ট লাঘব করিল—যেন এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, যাহাতে তাঁহার ভ্রাতার প্রতি পূর্ব্বভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হইতে পারে। অমলার নির্ম্মল হৃদয়ে কখনও মলা স্পর্শ করিতে পারে না।

আহারাদির পর হীরালাল শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। শরৎকুমারী হীরালালের পূর্ব্বেই সে শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। সে রাত্রে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইল না। শরৎকুমারী হীরালালকে দেখিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল মাত্র; হীরালালও পশ্চাৎ বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া শয়ন করিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। শরৎকুমারী কিন্তু শয্যায় পড়িয়া সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট করিয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রা যাইতে পারে নাই।

প্রভাতে যখন হীরালাল বাহিরে আসিয়া বসিলেন, তখন তাঁহার একজন প্রতিবাসী তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হীরালাল সেই প্রতিবাসীকে বিশেষ সম্মান করিতেন, এবং তিনিও তাঁহার বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। প্রতিবাসী অন্যান্য দুই-একটী কথাবার্ত্তার পর আরম্ভ করিলেন,—"যারা হক্‌, তোমার সম্বন্ধে একটা কথা শুনে, আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে; কথাটা এত ভয়ানক যে, হঠাৎ সে কথা বিশ্বাস হয় না।"

হীরালালের মাথায় যেন একটা বজ্রাঘাত হইল; কি উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; নীরবে অবনত-মস্তকে বসিয়া রহিলেন। প্রতিবাসী পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"তোমার মতন ছেলে ত আজকের কালে দেখতে পাওয়া যায় না; তবে কেন যে তোমার নামে এমন বদনাম উঠ্‌লো—তা'ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

হীরালাল এইবার ধীরে ধীরে বলিলেন,—"কি বদনাম মশাই?"

প্রতিবাসী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"তুমি নাকি ভয়ানক বেশ্যাসক্ত হয়েছ, রাত্রে একদিনও বাড়ী থাক না, আর যে রাত্রে বাড়ী আস, তা' নাকি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ী আস?"

প্রতিবাসীর মুখে এরূপ কলঙ্কের কথা শুনিয়া, হীরালাল প্রথমে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন,—"আপনি এ কথা কার মুখে শুনলেন?"

প্রতিবাসী উত্তর করিলেন,—"কথাটা আমাদের কামিনী-মা ঝির মুখে আমি শুনেছি বটে, কিন্তু সে ঐ কথা তোমাদের বাড়ীর লোকের মুখেই শুনে গেছে।"

তখন এই 'বাড়ীর লোক' যে কে—তাহা হীরালালের জানিতে বাকী রহিল না; তাঁহার অনুমানে—এক শরৎকুমারী ভিন্ন আর অন্য কেহই হইতে পারে না। তখন হীরালাল, শরৎকুমারীর এইরূপ অযথা কলঙ্ক-রটনায়, ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; নিজের আপাতঃ কোন কথা বলিয়া সে কলঙ্ক-মোচনের কোন চেষ্টাই করিতে পারিলেন না। প্রতিবাসীর শেষ উপদেশ হইল,—"বোধ হয় কুসংসর্গে পড়ে তুমি খারাপ হয়ে গিয়েছ। তা বাপু, এইবার সাবধান হও; তোমার মাথার উপর কেউ নাই বলেই আমি একথা বল্‌ছি।"

হীরালালের মুখে আর কথা নাই। শরৎকুমারীর উপর ইহার প্রতিশোধ কিরূপে লইবেন, এখন সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত, হতভাগিনী শরৎকুমারী কিন্তু ইহার কিছুই জানে না। হীরালালের সেই ঝি যে প্রভুভক্তির পরিচয়ে কামিনীর-মাকে দিয়াছিল, এবং কামিনীর-মা তাহার কথা যে অতিরঞ্জিত করিয়া তাহার প্রভুর নিকট হীরালালের চরিত্র-সম্বন্ধে ওরূপ ভয়ঙ্কর কলঙ্কের ঘোষণা করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় আর আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কৃত্তিবাসের-স্মৃতি-চিহ্ন।—অমরকবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালা-সাহিত্যের অতুল কীর্ত্তি। কেবল কি সাহিত্যের?—কৃত্তিবাস না থাকিলে, আমাদের পূর্ব্বপিতার রামচন্দ্রের কীর্ত্তি-কলাপের কথা কয়জন বাঙ্গালী জানিত? বড়ই দুঃখের বিষয়, একটা সাহিত্য-গুরু, শিক্ষা-গুরু, ধর্ম্ম-গুরু কবির স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার স্বরচিত রামায়ণ ভিন্ন, এদেশে আর কিছুই নাই। তাঁহার বাসস্থান কোথায় ছিল,—এ কথাই হয়ত অনেক শিক্ষিত লোকে জানেন না। আমরা গত শনিবারের "বঙ্গবাসী" পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম যে, কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়া-গ্রামে তাঁহার কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য বঙ্গবাসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। সহযোগীর যেরূপ কার্য্যকুশলতার পরিচয় আমরা পূর্ব্বাপর পাইয়াছি, তাহাতে এ বিষয়ে কৃতকার্য্যতা-সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ আশা আছে। আমরা সকলকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করি। স্বদেশের এরূপ কবিকে সম্মান করিলে, জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি হয়। যাঁহারা

এই উদ্দেশ্যে চাঁদা দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ১৩৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হাই-কোর্টের এটর্ণী শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট টাকা পাঠাইলেই সাদরে গৃহীত হইবে।

কটন ইন্‌ষ্টিটিউসন্‌।—আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, রঙ্গপুরের বদান্যবর সুপ্রসিদ্ধ রাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর কটন ইন্‌ষ্টিটিউসনের ব্যবহারার্থ পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ এক সুন্দর ত্রিতল গৃহ দান করিয়াছেন। বিগত শনিবার অপরাহ্ণে, রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিবার জন্য, উক্ত স্কুলের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক এক সভা আহূত হয়। এই সভায় অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় এরূপ স্কুলের আবশ্যকতা ও রাজা বাহাদুরের বদান্যতা-সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিবার পর, স্কুলের স্বত্বাধিকারী মহাশয়, হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিয়া, রাজা বাহাদুরের এই অসাধারণ দানের প্রশংসা করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের সমর্থনে উক্ত সভা হইতে রাজা বাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করা স্থিরীকৃত হয়। মধ্যে কতকগুলি ইংরেজিপরতন্ত্র লোকে প্রচার করিয়াছিল যে, রাজা বাহাদুর তাঁহার অভিপ্রায়-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন; আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, কলেজ-স্বত্বাধের নিকটবর্ত্তী স্থানে ঐ স্কুলের উপযোগী বাড়ী না পাওয়াই এই বিলম্বের কারণ। কেবল রাজা বাহাদুরের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় এরূপ স্থলে বাড়ী খরিদ করিতে পাওয়া গিয়াছে। রাজা বাহাদুরের যশের প্রতিদ্বন্দ্বী অনেকে থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সহিত দানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আমরা কাহাকেও দেখিতে পাই না।

স্কুলের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থও রাজা বাহাদুর পূর্ব্বে অনেক টাকা দিয়াছিলেন; আমরা শুনিলাম, এবার আরও ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দিয়াছেন। আমরা এরূপ মনস্বী রাজা বাহাদুরের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শীলস্‌ ফ্রী-কলেজের উন্নতি-চেষ্টা।—স্বর্গীয় মতিলাল শীলের অতুল কীর্ত্তি—'শীলস্‌-ফ্রী-কলেজ' গরীবদুঃখীর সন্তানকে বিনা-ব্যয়ে শিক্ষাদান—সেজন্য অজস্র অর্থ রাখিয়া যাওয়া—স্বর্গীয় মহাত্মার নাম চিরস্মরণীয় রাখিয়াছে। সংপ্রতি আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, এই বিদ্যালয়ের এণ্ট্রেন্স-ক্লাসের ১২জন ছাত্রকে, বিনা-বেতনে বিদ্যালয়ে পড়িতে দেওয়া ব্যতীত, আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে, এবং 'প্রাইভেট টিউটার' রাখিয়া পড়ানরও ব্যবস্থা করা হইবে। এণ্ট্রেন্স-শ্রেণীর উপযোগী ১২ জন ছাত্রকে, আগামী ২রা জুনাই, পরীক্ষা করিয়া লওয়া হইবে। অর্থাভাবে যাঁহাদের পড়ায় ব্যাঘাত ঘটার সম্ভব, তাঁহারা ঐ সময়ের মধ্যে আবেদন করিবেন। আমরা আরও শুনিয়া সুখী হইলাম, স্কুলের ট্রাষ্টিদিগের চেষ্টায় স্কুলের আরও অনেক সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসনের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত এন, ঘোষ মহাশয়, এক্ষণে এই বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইয়া, বিশেষ যত্নের সহিত স্কুলের পর্য্যালোচনা করিতেছেন; দ্বিতীয়-শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব মিত্র মহাশয়ও বিশেষ যত্ন লইতেছেন। স্বর্গীয় মতিলাল শীলের এই কীর্ত্তির সুরক্ষণে ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত রায় কানাইলাল দে বাহাদুর, কুমার শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল শীল ও শ্রীযুক্ত বাবু মণিকলাল শীল মহাশয়গণ, অবশ্যই সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। তবে আরও ধন্যবাদের পাত্র হইতেন—আরও মুক্তকণ্ঠে আমরা তাঁহাদিগকে অন্তরের ধন্যবাদ প্রদান করিতে পারিতাম, যদি তাঁহারা স্কুলের সমস্ত দরিদ্রছাত্রের জন্য ঐরূপ আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ। ২৫এ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। ষষ্ঠ সংখ্যা।

প্রাণ-কথা।

নিন্দুক।

"নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্।" সুতরাং হে নিন্দুক! মহাত্মগণের মহচ্চরিত্রেই তোমার নিন্দার বিষয়। তুমি নীচ ও দুরাচারের নিন্দা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট কর না। কারণ, তুমি জান যে, সে নিন্দায় কোনও পৌরুষ নাই। যে মাতাল তাহাকে মাতাল বলিলে তোমার আদর কে করিবে? কিন্তু যে, কখনও মদ স্পর্শও করে নাই, তাহাকে মাতাল প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই তোমার আদর হইবে—তোমাকে লোকে ভয় করিবে। কত বড় বড় লোক শত্রুর নিন্দা শুনিবার জন্য তোমায় ডাকিয়া পাঠাইবে, তোমার হস্ত হইতে এড়াইবার জন্য তোমাকে পুজা-দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। কিন্তু তোমার মুখ বন্ধ করিয়া রাখা মানুষের অসাধ্য। আজ যে অর্থ দিয়া তোমার মুখ বন্ধ করিল, কালু তাহা অপেক্ষায় অধিকতর বলশালী বা ধনশালী ব্যক্তির সহিত যদি তাহার বিবাদ হয়, তাহা হইলে সেও তোমায় আহ্বান করিয়া অধিকতর অর্থ দিয়া তোমায় বশ করিবে। তখন তুমি পূর্ব্ববন্ধুকে একেবারে ভুলিয়া—এবং নূতন বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, জগতে পূর্ব্ববন্ধুর কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া বেড়াইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তোমার বন্ধু-বিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া, জগতের সমস্ত বড় লোকই ক্রমে তোমার নিন্দার বিষয়ীভূত হইবে। তখন সকলে ঘৃণায় তোমায় পরিহার করিবে—এবং ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুক্কুরকে দেখিলে যেমন সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ

তোমায় দেখিলে সকলে ভক্তি ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিবে। সেই শক্তির কার্য্য বলিয়া অগৎকে মান লইয়া পলায়ন করিবে। কিন্তু প্রকৃত মহাত্মাগণ তোমায় মিত্র-জ্ঞানে আলিঙ্গন করিবেন; কারণ, তাঁহারা জানেন যে, তুমি নিন্দা না করিলে তাঁহাদের চরিত্র গঠিত হইবে না। স্তুতি-নিন্দায় সমজ্ঞান না হইলে প্রকৃত মনীষী হইতে পারা যায় না। কারণ, তত্ত্বদর্শী জানেন যে, তিনি স্তুতি ও নিন্দা—এ দুঁয়ের একেরও অধিকারী নহেন। তিনি জানেন যে, তিনি কর্ত্তা নহেন—একমাত্র ব্রহ্মই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ব্যতীত জগতে অন্য কোন কার্য্যই নাই আমরা যেদিকে নয়ন ফিরাই না কেন, হয় সৃষ্টির, না হয় স্থিতির, না হয় প্রলয়ের কার্য্য দেখিব। একটী পরমাণু মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি-বলে আর একটী পরমাণুকে আপনার সহিত মিলিত করিয়া দ্ব্যণুকে পরিণত করিল। সেই দ্ব্যণুক আবার ঐ শক্তি-বলে আর একটী পরমাণুকে আকর্ষণ করিয়া ত্র্যসরেণুতে পরিণত হইল। এইরূপে সূর্য্য ও তদধীন গ্রহ ও উপগ্রহাদির সৃষ্টি হইল। জড়জগতের ন্যায় উদ্ভিদ ও চৈতন্য-জগতেও এইরূপ মিলন—এইরূপ রাসলীলা—নিরন্তর পরিদৃষ্ট হইবে। এ সমস্তই সৃষ্টিকার্য্য, সুতরাং এ সমস্তই বিধাতার কার্য্য বলিয়া অনিন্দনীয়। যে জটিল ও সূক্ষ্ম নিয়মাবলী দ্বারা এই চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ-জগতের শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে, তাহাই স্থিতির কার্য্য। যে আকর্ষণী-শক্তিতে পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া এই অপূর্ব্ব বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে, সেই আকর্ষণ-শক্তি-বলেই তাহারা আবার পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতেছে। এ উভয়বিধ শক্তিই ব্রাহ্মী আকর্ষণ-শক্তি—ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির সহচরী—সুতরাং হে নারায়ণ! আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, আমি কর্ত্তা নহি—তুমি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমায় যেরূপে চালিত কর, আমি কেবল সেইরূপই করিয়া থাকি।"

যেদিন অদ্বৈতবাদীর অন্তর হইতে কর্ত্তৃত্বাভিমান স্খলিত হইল, সেইদিনই তিনি বুঝিলেন—স্তুতি-নিন্দায় তাঁহার অধিকার নাই। সুতরাং স্তুতি-নিন্দা তাঁহার নিকট সমান হইয়া দাঁড়াইল। হে নিন্দুক! তখনই তিনি তোমার হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন। তাঁহার মন তোমার নিন্দায় বিচলিত হইল না বলিয়া, তোমার রাগ করা উচিত নহে। তিনি তোমায় ঘৃণা বা তুচ্ছ-জ্ঞান করিলেন, মনে করিও না। অদ্বৈতবাদীর কাহাকেও তুচ্ছ-জ্ঞান বা ঘৃণা করিবার অধিকার নাই; তিনি জানেন যে, তিনি ও তুমি অভিন্ন—উভয়েই ব্রহ্মছায়া বা ব্রহ্মের বিকাশ—স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদ মাত্র। আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে বলিয়া আমি সূক্ষ্ম—তুমি অজ্ঞান-তিমিরে রহিয়াছ বলিয়া তুমি স্থূল। তোমার চক্ষু থাকিতেও তুমি অন্ধ—তাই দেখিতে পাইতেছ না যে, তুমি ও আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। দেখিতে পাইতেছ না বলিয়াই তুমি আমার নিন্দা করিতেছ। যদি তুমি জানিতে পারিতে যে, আমায় নিন্দা করিলে তোমার আত্ম-নিন্দা করা হইবে, তাহাহইলে তুমি কখনও আমায় নিন্দা করিতে না। কিন্তু আমি যখন জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি ও আমি এক—ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তখন আমি কোন্ প্রাণে তোমার উপর রাগ করিব? কোন্ প্রাণে তোমার উপর প্রতিহিংসা লইব? বিশেষতঃ যখন জানিতে পারিয়াছি যে, তোমার নিন্দায় উদাসীন হইতে না পারিলে আমার পূর্ণবিকাশ হইবে না, তখন তোমাকে আমি শত্রু মনে করিতে পারি না। অতএব হে নিন্দুক! তুমি আমার শত্রু হইয়াও পরম সুহৃৎ! অতএব এস, আজ আমি প্রাণ ভরিয়া তোমায় আলিঙ্গন করি। তুমি, ভয় পাইতেছ কেন? শিশুপাল-মূর্ত্তিতে তুমি শ্রীকৃষ্ণের একাধিক শত নিন্দা করিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছিলে; কিন্তু তাহার উপর উঠায় তাঁহার সুদর্শন-চক্রে তোমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। সেই ছিন্নকণ্ঠ হইতে তোমার আত্মা জ্যোতিরূপে যখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় লইয়াছিল, তখন সকলে ভাবিয়াছিল—তোমার পূর্ণ নির্ব্বাণ হইল। কিন্তু সেই চরণ-প্রসাদে তুমি অমরত্ব লাভ করিয়াছ মাত্র—তোমার নির্ব্বাণ হয় নাই। কলিতে তুমি শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-প্রসাদে অমর ও অনন্তরূপ। যেখানেই দুই জন একত্র, সেইখানেই তুমি। সুতরাং কলিতে তুমি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, অজর ও অমর। সুতরাং তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি।

আমার প্রাণ যদিও নিরন্তর তোমার জন্য—দেশের জন্য—এবং সাধারণতঃ সকলের জন্য কাঁদিতেছে, যদিও তোমার ও অন্যান্য সকলের মঙ্গল-সাধন করাই আমার জীবনের ব্রত, যদিও আমি নিজের, ব্যক্তিগত জীবন জাতীয় জীবনে পূর্ণাহুতি দিয়াছি, যদিও জননী ও জন্মভূমিকে হৃৎকমলে আসীন করাইয়া জগৎপিতা ও জগন্মাতাকে মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক নিরন্তর যোগরত থাকি, তথাপি হে নিন্দুক! তুমি আমায় ছাড়িতে চাহ না—অথবা আমার আকর্ষণ-শক্তি এত অধিক যে, তুমি আমায় ছাড়িতে চাহিলেও ছাড়িতে পার না। লৌহশলাকা যেমন গুরু হইলেও চুম্বকের আকর্ষণ এড়াইতে পারে না, সেইরূপ তুমি নিসর্গ গুরুতর হইলেও, আমার কথা উঠিলেই গাম্ভীর্য্য-চ্যুত হইয়া পড়। আমার নিন্দা করিবার জন্য তোমার জিহ্বা শতমুখী হইয়া

উঠে। যে মুখে সহজে বাণী সরে না, সেই মুখে যেন খই ফুটিতে থাকে। তখন তোমার পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না। সম্মুখে যেই উপস্থিত হয়, তাহার নিকটই আমার নিন্দা করিয়া তোমার উদরের ক্ষীর্ত্ত তুমি কমাও। সে নিন্দার মূল যে কি, তাহা তুমি নিজেও খুঁজিয়া পাও না। তোমার রুচি-অনুসারে তুমি নূতন নূতন কাহিনী উদ্ভাবন করিয়া জগতে আমার নিন্দা ঘোষণা কর। সকল নিন্দার মূলেই শ্রোত প্রমাণ, দ্রষ্টাকে কেহ খুঁজিয়া পায় না। কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, তুমি লজ্জার খাতিরে বলিয়া ফেল যে—"আমার নিন্দার মূলে কিছুই নাই—সমস্তই তোমার উদ্ভাবনা!" পুরাকালে গ্রীসে মহাত্মা আরিষ্টাইডিসকে যখন সকলেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল—"Aristides the just" 'আরিষ্টাইডিস্ অতি ন্যায়বান্', তখন, কতিপয় নিন্দুক, তাঁহার বিশ্বজনীন প্রশংসাবাদে বিরক্ত হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে 'ভোট' দেন। তখন গ্রীসে এরূপ রীতি ছিল—যাঁহার বিরুদ্ধে অনেকে 'ভোট' দিত, তাঁহাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইত। এই প্রথাকে "অষ্ট্রেসিজম্" (ostracism) বলিত। এক জন লোক এক দিন এক ভোট-দাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়! আপনি কি জন্য 'আরিষ্টাইডিস্ দি জষ্টের' বিরুদ্ধে ভোট দিলেন?" তদুত্তরে ঢিলি বলিলেন যে,—"আরিষ্টাইডিস্ দি জষ্ট—এই কথা শুনিতে শুনিতে আমার কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে—এইজন্যই আমি তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছি।" অতএব হে নিন্দুক! আমি তোমার কোনও দোষ দেখি না। অনবরত এক জনের সকলে সুখ্যাতি করিলে, তোমার কানে ঝালাপালা ধরে বলিয়াই তুমি তাহার নিন্দা করিয়া থাক। যে নগণ্য, যাহার প্রশংসার কিছুই নাই, তুমি তাহার নিন্দা করিয়া আপনার অগৌরব কর না। অনেকেই যাঁহার সুখ্যাতি করে, তুমি তাঁহার দোষ দেখাইয়া দেও। "হংসোহহি ক্ষীরমাদত্তে" —"হংস জল ফেলিয়া দুগ্ধ পান করে।" কিন্তু তুমি তাহার বিপরীত কার্য্য কর। তুমি দুগ্ধ পরের পানের জন্য রাখিয়া, নিজে অসার জল পান কর। সুতরাং তুমিই প্রকৃত নিন্দাকর্ম্মা। অতএব আমি তোমায় বারবার নমস্কার করি। শকুনী গৃধিণী প্রভৃতিকে প্রাকৃতিক মলাপসারক (Nature's Scavenger) বলিয়া থাকে। ইহারা না থাকিলে, ভূ-পৃষ্ঠ মৃত জীবজন্তুর পূতিগন্ধময় শবে পরিপূরিত হইত—সুতরাং সেই পূতিগন্ধে উৎকট রোগের উৎপত্তি হইয়া অধিকতর জীবজন্তু সংক্ষটিত করিত। জগতের মঙ্গলের জন্য যে দেবতা শকুনী-গৃধিণীর ন্যায় নিন্দুকের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি সেই দেবতার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি। হে নিন্দুক! তত্ত্ব-জ্ঞানীর নিকটে তুমি ঘৃণার পাত্র নহ। রন্ধক যেমন বসনের মলিনতা অপনোদন করিয়া,মল-বাহক (ম্যাথর) যেমন পুরীষাদি অপসারিত করিয়া এবং শৃগাল-কুক্কুর ও শকুনী-গৃধিণী প্রভৃতি যেমন গলিত শবাদি ভক্ষণ করিয়া, নিরন্তর জড়জগতের পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে; সেইরূপ হে নিন্দুক! তুমিও অন্তর্জগতের মলিনতা শোষণ করিয়া, ইহার পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত করিতেছ। সুতরাং তুমি শত্রু হইয়াও আমার মিত্র। অতএব হে নিন্দুক! হে শত্রো! তুমি আইস! আমি প্রাণ ভরিয়া তোমায় আলিঙ্গন করি।

শ্বেতকেতু।

(২)

মহারাজ পাণ্ডু যশস্বিনী কুন্তীকে বলিয়াছিলেন;—

"অনার্ত্তাঃ কিল পুরা স্ত্রিয়ঃ আসন্ বরাননে!
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি!
তাসাং ব্যুচ্ছরমাণানাং কৌমারাৎ সুভগে পতীন্।
নাধর্ম্মোঽভূদ্ বরারোহে সহি ধর্ম্মঃ পুরাভবৎ॥

* * *

ঋষিপুত্রেঽথ তং ধর্ম্মং শ্বেতকেতুর্ন্যবর্ত্তয়ৎ।
চক্রুশ্চৈব মর্য্যাদাং ইমাঃ স্ত্রীপুংসয়োর্ভুবি॥"

অর্থাৎ, পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ অবারিতা ছিল; তৎকালে তাহারা স্বতন্ত্রা হইয়া সম্ভোগসুখাভিলাষে পর্য্যটন করিত। তাহারা কৌমার কালাবধি ব্যভিচারে রত থাকিত, তাহাতে তাহাদের অধর্ম্ম হইত না, কেন-না তাহাই পূর্ব্বকালের ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। পরে ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু সেই ধর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া, ভূমণ্ডল-মধ্যে স্ত্রীপুরুষের এই মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। বিষয়টী অতীব গুরুতর, সুতরাং আর একটু বিশদ করিয়া বলিতে হইতেছে। একদা শ্বেতকেতু পিতামাতার নিকটে বসিয়া আছেন,এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতার সমক্ষে তাঁহার জননীর হস্তধারণ করিয়া কহিলেন,—"গচ্ছাবঃ" অর্থাৎ "আইস, আমরা গমন করি।" অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক মাতাকে বলপূর্ব্বক নীয়মানা দেখিয়া, শ্বেতকেতু রোষাবিষ্ট হইলেন।* তদীয় পিতা উদ্দালক তাঁহাকে ক্রোধে কম্পমান দেখিয়া কহিলেন,—"বৎস! তুমি রাগ করিও না, ইহা সনাতন ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডল মধ্যে সর্ব্ববর্ণের অঙ্গনারাই অবারিতা। গোগণ যেরূপ ব্যবহার করে, মানবগণও স্ব স্ব বর্ণে সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। পরে ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভূমণ্ডল মধ্যে স্ত্রীপুরুষের এই মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। আমরা শুনিয়াছি, সেই অবধি মানবসমাজে স্ত্রীপুরুষের এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা অন্য প্রাণীতে নাই। শ্বেতকেতু নিয়ম করিয়াছিলেন যে, অদ্য প্রভৃতি যে নারী ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া ব্যভিচারিণী হইবে, তাহার ঘোর ভ্রূণহত্যা-সদৃশ পাতক হইবে। অপিচ,এই ভূমণ্ডলে যে পুরুষ কৌমারী ব্রহ্মচারিণী পতিব্রতা প্রণয়িনী ভার্য্যাকে অতিক্রম করিয়া পরনারী সম্ভোগ করিবে, তাহারও এরূপ পাতক হইবে।"

ইহা দ্বারা কি বুঝা যাইতেছে? মহারাজ পাণ্ডুর বাক্য বিশ্লেষিত করিলে, তন্মধ্য হইতে তদানীন্তন সমাজের একটী জীবন্ত ছবি ফুটিয়া উঠে। শ্বেতকেতু সেই মঙ্গলময় নিয়ম স্থাপন করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এক প্রকার বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। সেই প্রথা নিতান্ত বিপ্লুত, অতএব শিথিল; তাহাতে স্ত্রীপুরুষের কোনরূপ দায়িত্ব বা

* বর্দ্ধমান-রাজ-প্রচারিত মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১২২ অধ্যায়।

বন্ধন ছিল না; স্ত্রীগণ ইচ্ছা করিলে অপর পুরুষে এবং পুরুষেরা মনে করিলেই অপর স্ত্রীতে সঙ্গত হইতে পারিত। তাহাতে শাস্ত্রমত তাহাদিগকে কোনরূপ পাপে লিপ্ত হইতে হইত না। শ্বেতকেতু স্বচক্ষে এই অনন্য-প্রথা দেখিলেন, নিজে ইহার বিষদংশন সহ্য করিলেন; তাঁহার চিত্ত বিভ্রান্ত হইল, হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,এই অনর্থকর পাশব নিয়ম রহিত করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। শ্বেতকেতুর নিয়ম ঈশ্বরের প্রত্যাদেশবৎ গম্ভীরস্বরে আর্য্য ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল, ঋষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজা, মহারাজা, সকলেই অবনত মস্তকে হাস্যোৎফুল্লমুখে সেই নিয়ম স্বীকার করিলেন; সমাজের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল, কদাচারের প্রতীপ স্রোত প্রতিরুদ্ধ হইল; একদিনে একটী লোকের জীবনে সমাজ নূতন হইয়া দাঁড়াইল।

যাঁহার এমন ক্ষমতা, এতদূর অদম্য অধ্যবসায়, তিনি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ; সেই জন্য বলিয়াছি, তাঁহার পবিত্র জীবনীর আলোচনা করিলেও পুণ্য আছে। মহাপুরুষের জীবন কতকগুলি মহৎ অবদানের সমষ্টিমাত্র; সংবেষ্টক বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নিচয় যে পরিমাণে সেই সকল অবদানের সহায়তা করে, সেই পরিমাণে তৎ সমুদয়ের গৌরব এবং সেই সঙ্গে মহৎ জীবনের মহত্ত্ব বৃদ্ধি পায়। অবশ্য মানব নিয়তিসূত্রে অবস্থার অধীন হইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়; কিন্তু যিনি বীর, অবস্থা তাঁহার যতদূর প্রতিকূলতা করুক না কেন, তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত করিয়া স্বীয় মঙ্গলময় গন্তব্য পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া থাকেন; প্রতিকূল অবস্থানিচয় তাঁহার অনন্যসাধারণী শক্তির মুখে দলিত ও নিষ্পিষ্ট হইয়া তাঁহার অনুকূল হইয়া পড়ে। শত্রুগণ তাঁহার শত্রুতা করিতে গিয়া তাঁহার অপার্থিব জীবনের স্ফূর্ত্তি সাধনে সমাক সহায়তা করিয়া থাকে; এইজন্য চরিত্রের পরিস্ফুরণে প্রতিকূল ও অনুকূল উভয়বিধ অবস্থাই আবশ্যক। এইজন্যই হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ, রাবণ ও বিভীষণ, কংস ও অক্রূরের জন্ম। মহাত্মা শ্বেতকেতুর জীবনে কিরূপ অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থানিচয় উদ্ভূত হইয়া কিরূপ অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা করিয়াছিল, তাহা তদানীন্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রের বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এ বিষয়ে জাতিভেদ ও রাজশাসন দুইটী প্রধান মানদণ্ড।

জাতিভেদ।—ইহাই প্রধানতম সামাজিক ব্যবস্থা। এক দিনে এক ব্যক্তির চেষ্টায় ইহা হিন্দুসমাজে বদ্ধমূল হয় নাই; কত বিপ্লব, কত বিড়ম্বনা সহিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ এই মঙ্গলময় নিয়ম লাভ করিয়াছেন। বলিতে কি, এই জাতিভেদ-প্রথাই হিন্দুসমাজের প্রধান ভিত্তিভূমি; অন্যান্য নিয়ম ইহার শাখা-প্রশাখা মাত্র। বটবৃক্ষের মূলস্কাল যেমন তাহার শাখা হইতে উদ্ভূত হইয়া অবশেষে তাহারই অবলম্বনরূপে পরিণত হয়, এই জাতিভেদ-প্রথা সেইরূপ প্রাচীন হিন্দুদিগের স্তরে স্তরে স্ফুরিত হইয়া অবশেষে তাহাদের সমাজেরই ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিবাহ-প্রথা এই জাতিভেদের একটী প্রধান শাখা। ইহা সেই মাতার পোষণদ্রব্যে জীবন ধারণ করিয়া তাহাকেই রক্ষা করে; সুতরাং ইহাদের পরস্পরের রক্ষণ ও ক্রমোন্নেষ পরস্পরের সাহায্য-সাপেক্ষ।

জাতিভেদ-বর্জ্জিত বিবাহ-প্রথা বিবাহই নহে; তাহা চুক্তি-বিবাহ মাত্র; তাহা অগণ্য সামাজিক অনর্থের কারণ এবং সমাজ-ধ্বংসের মূল নিদান। ইহাতে বর্ণসঙ্কর উদ্ভূত হয়, এবং—

"দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥"
(গীতা, ১ অঃ, ৪২)

শ্বেতকেতুর সময়ে জাতিভেদ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কিনা, যদি হইয়া থাকে তাহা কতদূর দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মেতরের বর্ণে কিরূপ সদ্ভাব ছিল, তাহাই দেখিতে হইবে। পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্বেতকেতু বিদেহরাজ প্রথম জনকের রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বে জাতিভেদ-প্রথা যে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল, ভগবান মনুর নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। মহাত্মা মনু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবার সময় ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বলিতেছেন :—

"বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যসেবেত বিপ্রান্ বেদবিদ শুচীন্।
বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভির্পি পূজ্যতে॥ ৩৮
বয়োবিদ্যাবন্ধুমাদ্ভি রাজ্যানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
যদ্যন্ত্র আপি রাজ্যানি বিনয়ং প্রতিপদিরে॥ ৪০
বালো বা যদি বা বৃদ্ধো বিনীতো বিনয়ান্বিতঃ।
সভায়াং যবনশ্চৈব সুমুখো নিমিরেবচ॥ ৪১"

অর্থাৎ, রাজা, নিত্যতপোরত বেদপারগ শুচি ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবেন। এরূপ করিলে, হিংস্র রাক্ষসগণও তাঁহার অনুগত হইয়া মঙ্গলসাধন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অমর্য্যাদা প্রকাশ করাতে অনেক রাজা রাজ্যৈশ্বর্য্য সমেত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল; আবার মর্য্যাদা প্রদর্শন করাতে রাজ্য হীন অনেক বনবাসী ক্ষত্রিয়ও রাজ্যলাভ করিয়াছিল। এইরূপ অবিনয়-বশতঃ, বেণ, নহুষ, পীজবনপুত্র সুদাস এবং সুমুখ ও নিমি রাজ্যচ্যুত ও বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সকল রাজা, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কিরূপে অবিনয় প্রকাশ করাতে, কি উপায়ে বিনষ্ট হইয়াছিল, পুরাণজ্ঞ পাঠকমাত্রই তাহা অবগত আছেন। সুতরাং সে সকল ইতিহাসের আলোচনা সম্যক অপ্রাসঙ্গিক ও নিষ্প্রয়োজন। এস্থলে আমরা নিমির উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি যে, মহারাজ নিমি ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের প্রতি অমর্য্যাদা প্রদর্শন করাতে তাঁহার আদেশে রাজ্যচ্যুত ও বিনষ্ট হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি যে, রাজর্ষি জনক এই নিমির পৌত্র। নিমির বিবরণ পাঠ করিয়া জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে প্রভুত্বলাভের নিমিত্ত তখনও দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। পৃথুর পিতা বেণ এই দ্বন্দ্বের প্রথম উদ্ভাবক। তাহার পর নিমি, সুদাস ও রাজা বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক ইহা ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত হয়, অবশেষে হৈহয় কার্ত্তবীর্য্যের মূর্খতায় ইহা দিগ্‌দাহী তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং ক্ষত্রিয়ান্তক ভগবান্ পরশুরামের চেষ্টায় সেই প্রচণ্ড অনলে ক্ষত্রিয়গণ আপনারাই বিদগ্ধ হইয়াছিল। ধরিতে গেলে,ভগবান পরশুরামই ভারতে জাতিভেদ-প্রথা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, রাজর্ষি জনকের সময়ে জাতিভেদ-প্রথা ভারতে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় নাই। শ্বেতকেতু জনকের সমসাময়িক; সুতরাং তাঁহার সময়েও জাতিভেদ চরম স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই।

উপাসনা-তত্ত্ব।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া যেমন চিরদিন বিবাদ, তেমনি তাঁহার উপাসনা লইয়াও চিরদিন বিবাদ। বরং নাস্তিকের সংখ্যা জগতে অতি কম; কিন্তু "ঈশ্বর আছেন" একথা স্বীকার করিয়াও অনেকে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। অনেকের বিশ্বাস—"যাহা নিয়ম করিবার, ঈশ্বর তাহা একদিনেই শেষ করিয়াছেন। সেই নিয়মানুসারেই সমস্ত জগৎ পরিচালিত হইতেছে, এবং সে নিয়মের কখনও অন্যথা হইবে না। সুতরাং উপাসনার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি পাপ করিয়া থাক, অবশ্য তাহার ফলভোগ করিবে; কখনও তাহার অন্যথা হইবে না, ঈশ্বরের রাজ্যে ক্ষমা নাই।"

আবার কেহ কেহ বলেন,—"তবে তুষ্ট হওয়া বা উপাসনায় বাধ্য হওয়া, সাধারণ জীবের স্বভাব। যিনি অনন্ত জগতের কর্ত্তা, জগতের প্রাণী-মাত্র যাঁহার চক্ষে তুল্য, যাঁহার অযাচিত করুণা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান রহিয়াছে, সেই পরমপুরুষকে সাধারণ জীবের ন্যায় উপাসনা দ্বারা বাধ্য করিয়া, তাঁহা হইতে ফল-লাভের ইচ্ছা করা, নিতান্ত অনুদারশীর কার্য্য।"

কাহারও মত এই যে,—"অনন্ত জগৎ যাঁহার রাজ্য, আমরা যাঁহার দয়ায় আহারাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, যাঁহার বিশ্বভাণ্ডারে কিছুই অপ্রতুল নাই, সেই বিশ্বপতিকে অতি-তুচ্ছ গন্ধপুষ্পবস্ত্রালঙ্কার-নিষ্ঠাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করা, নিতান্ত ক্ষুদ্রান্তঃকরণের কার্য্য। যাঁহার দ্রব্য, তাঁহাকে দিয়া ফল কি?"

কেহ কেহ বলেন,—"ঈশ্বর পূর্ণানন্দস্বরূপ। আনন্দ তাঁহাতে সর্ব্বদা পূর্ণভাবে বিদ্যমান। যাহাদিগের স্থান অপূর্ণ, তাহারাই আনন্দের জন্য লালায়িত, এবং তাহারাই সেই আনন্দের স্থান পূরণের জন্য অভিলষিত বস্তু বা যশের প্রার্থী হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর সেই রূপ পূজার ভিখারী হইলে, তাঁহার পূর্ণানন্দত্বের ব্যাঘাত ঘটে। অতএব তাঁহাকে উপাসনা করা জীবের ভ্রম মাত্র।"

কেহ কেহ বলেন,—"ঈশ্বর যদি উপাসনা বাধ্য হন, তবে তাঁহাকে পক্ষপাতী বলিতে হয়। কারণ, যে তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিয়া সন্তুষ্ট করিবে, তিনি তাহাকে মঙ্গল দান করিবেন; আর যে তাঁহাকে না ডাকিল, তিনি তাহাকে নানা বিপদে নিক্ষেপ করিবেন;—ইহা হইলে অবশ্যই ঈশ্বর পক্ষপাতী। তবে আর পক্ষপাতী সাধারণ মানবের সহিত তাঁহার পার্থক্য কি?"

এইরূপ আরও অনেকে অনেক কথা বলেন, যাহাতে উপাসনার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই।

কিন্তু বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া ঘোষ করেন, প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণ যে উপাসনাকে একমাত্র জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কি কিছুই মূল নাই?—তাহা কি কেবল অসার কল্পনাপূর্ণ? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। অবশ্যই তাহার অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ও মহৎ ভাব নিহিত আছে। এক্ষণে, শাস্ত্রকার ও মহাজনদিগের পদানুসরণ করিয়া,

উপাসনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যুক্তি দ্বারা কত দূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, তাহাই দেখা যাউক।

প্রথমতঃ আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখিব যে, ঈশ্বর উপাসনায় অনুরোধে জীবকে সুখী-দুঃখী করিয়া পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করেন কি না? এবং সংসারে যে সৃষ্টি-বৈচিত্র—অর্থাৎ কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র কেহ বিদ্বান, কেহ মূর্খ, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী—দেখিতে পাই, এ সমস্ত কি সেই উপাসনার ফলজনিত, না কর্ম্মজন্য, না স্বাভাবিক, অথবা ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা সাধিত হয়? কথা বড় গুরুতর। যদি সংসারের বৈচিত্র (সুখদুঃখ) উপাসনা-জনিত হয়, তবে ঈশ্বরকে অবশ্যই উপাসনার বাধ্য পক্ষপাতী বলিতে হইবে। আর কর্ম্মজন্য হইলে, "জীব আদি, কি কর্ম্ম আদি" এই কথা লইয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং তাহার মীমাংসাও একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। অথচ, সৃষ্টি-বৈচিত্র স্বাভাবিক বলিলেও দোষ হয়; কারণ, এক শ্রেণীর পদার্থের আদিম অবস্থা ধরিয়া বিচার করিলে, এক শ্রেণীর পদার্থে দুই রূপ স্বভাব-সম্পন্ন হওয়াও অসম্ভব। আবার, ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া যদি কাহাকেও ধনী, কাহাকেও দরিদ্র, কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে প্রকারান্তরে দয়া হইতেও অত্যাচারী বলা হয়। কিন্তু যিনি এই অনন্ত জগতের অধীশ্বর, যাঁহার সুনিয়মে এই বিশাল অনন্ত বিশ্ব একসূত্রে গ্রথিত, প্রত্যেক গ্রহনক্ষত্র প্রত্যেক জড়পদার্থ যাঁহার দুর্ম্মানসের পরিচয় দিতেছে, সেই জগন্নিয়ন্তা কি ইচ্ছা-পূর্ব্বক এক সন্তানকে স্বর্গের উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়া অন্য সন্তানকে নরক-নিলয়ে নির্ব্বাসিত করেন? এ কথা চিন্তা করাও পাপ। "ঈশ্বরের রাজ্যে পক্ষপাত বা স্বেচ্ছাচার স্থান পায় না। একবার, জ্ঞান-নয়নে চাহিয়া দেখ, স্পষ্টই দেখিতে পাইবে, ঈশ্বরের বিচার সর্ব্বত্র সমান। যে যে কার্য্য মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে, তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও পক্ষপাত নাই।

জীব-জগতের প্রধান কার্য্য—জন্ম, জরা (রোগ), বিদ্যালাভ, জ্ঞানলাভ, মৃত্যু। দেখ, ইহার কোন একটী কার্য্যে ঈশ্বরের পক্ষপাত আছে কি না? তুমি, আমি, সম্রাট, ভিখারী, পিপীলিকা, বা জগতস্থ সমস্ত জীবকেই একরূপে একভাবে কেবল দেহমাত্র সম্বল লইয়া জগতে আসিতে হইয়াছে। কেহ একটী কপর্দ্দক বা একটুকরা বস্ত্র লইয়া এ জগতে প্রবেশ করিতে পারে নাই, এবং সেই সমস্ত রোগ ভিন্ন কাহারও কোনরূপ ক্ষমতা ছিল না। রাজরাণী বা ভিখারিণী কাহারও পক্ষে প্রসব-বেদনার তারতম্য নাই, এবং প্রত্যেক সদ্যপ্রসূত শিশুর মনের সুখ-দুঃখ একরূপ। ভিখারী-শিশুকে তাহার মাতৃক্রোড় হইতে লইয়া রাজসিংহাসনে বসাও, কখনই সে সুখী হইবে না। সম্রাট-কুমারের সহিত ভিখারী-শিশুর আহারীয় দ্রব্যেরও কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং এস্থলে (জগতে প্রবেশের সময়) ঈশ্বরের কার্য্য সর্ব্বত্র সকলের প্রতি সমান।

জীবনের প্রধান কার্য্য—বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানলাভ। এই উভয় কার্য্যেও ঈশ্বরের পক্ষপাত দেখিতে পাওয়া যায় না। একজন দরিদ্র সন্তানকে শিক্ষার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইবে, একজন সম্রাট-পুত্রকেও ঠিক সেইরূপ পরিশ্রম করিতে হইবে। শিক্ষককে লক্ষ মুদ্রা দিলেও, বিনা-পরিশ্রমে ধনী বালক একটী শব্দ শিখা করিতে পারিবে না। এস্থলে যদি ঈশ্বরের কিছুমাত্রও পক্ষপাত থাকিত, তবে আর ধনী-সন্তানগণ কখনই মূর্খ হইত না। জ্ঞান-

লাভও, বিদ্যাশিক্ষার ন্যায় স্বীয় চেষ্টার ফল মাত্র।

রোগ-যন্ত্রণার নিকট ধনী ও দরিদ্র নাই। কাল-বশে জরা, জীবমাত্রকেই সমভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে। সুতরাং সে বিষয়েও ঈশ্বরের পক্ষপাত নাই। তৎপর মৃত্যু; মৃত্যুতেও আমরা ঈশ্বরের পক্ষপাত দেখিতে পাই না। এ বিশ্ব-সংসার ভগবানের বিচিত্র নাট্যশালা; যে যে ভাবেই কেন জীবন-নাটকের অভিনয় করুক না, কিন্তু শেষ যবনিকা পতনের সময় সকলের পক্ষেই সেই এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য—যাইবার সময় সকলেরই এক-পথ। রাজা হও, কাঙ্গাল হও, কীটই হও, কাহারও কিছু লইয়া যাইবার সাধ্য নাই, সকলকেই এক অবস্থায় একভাবে দেহ পর্য্যন্ত রাখিয়া চলিয়া যাইতে হয়। সুতরাং এক্ষেত্রেও ঈশ্বরের বিচার সকলের পক্ষে সমান।

তবে গোলযোগ যাহা কিছু—জীব-নের সুখদুঃখ লইয়া। তাহাও ভ্রান্ত জীবের ভ্রম মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাহাতেও কোন পক্ষপাত নাই।

যখন মানব-জ্ঞানের অতীত অন্ধকারময় দেশ হইতে, অভেদ্য যবনিকার পার্শ্ব দিয়া, আত্মরহীন শক্তিহীন মানব-শিশু, ক্ষেদার্দ্র কলেবরে উলঙ্গাবস্থায় সংসারে প্রবেশ করে; তখন কে তাহাকে আদরের সহিত কোলে তুলিয়া লইয়া স্তন্যদানে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে? "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—যিনি সর্ব্ব-ভূতে মাতৃরূপে বিরাজমান, তিনিই তখন সেই সদ্যপ্রসূত শিশুর একমাত্র গতি। ঈশ্বর সকলেরই গতি, কিন্তু অগতিকে তিনি প্রত্যক্ষ-ভাবে দয়া করেন, এবং শক্তি-সম্পন্নকে শক্তির ভিতর দিয়া অপ্রত্যক্ষভাবে দয়া করেন। যত দিন শিশুর পাশ ফিরিবার শক্তি নাই, কথা কহিবার শক্তি নাই, ততদিন তাহার কত আদর! সে শয্যা-বস্ত্রে বা অঙ্গে সর্ব্বদা মলমূত্র ত্যাগ করিতেছে, তাহাতে কাহারও বিরক্তি বা ঘৃণা নাই। শিশু খাইতে চাহে না, ভোজনের কোন চেষ্টা করে না, অথচ সর্ব্বদা তাহার আহারীয় প্রস্তুত রহিয়াছে—সে গলাধঃকরণে অনিচ্ছা করিলেও অগ্রাহ্য হয় না তাহার উদরস্থ হইতেছে। স্নেহময়ী জননী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বর্গের দেবীর ন্যায় রাত্রিদিবা শিশুর সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। মাতার নিকট সেই শক্তি-হীন অপোগণ্ড শিশুর যে আদর, তুমি ধনী হও, ক্ষমবান্ হও, তোমাকে আর সে রূপ আদর কেহ আদর করিবে না। এখনকার আদর কেবল বিনিময়-মাত্র।

যখন শিশু ক্রমশঃ কথা কহিতে শিখিল, হাঁটিতে শিখিল, ঈশ্বর তখন ক্রমশঃ হু-এক পা করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন। যখন মানব পূর্ণবয়ব প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি তাহাকে স্বাধীনতা দিয়া একেবারে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সে অবস্থায় মানবের সুখদুঃখ তাহার স্বেচ্ছার অধীন।

জীব স্বাধীন বটে, কিন্তু সেই স্বাধীনতা সীমাবিশিষ্ট। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী অপেক্ষা মনুষ্যের স্বাধীনতা অনেক অধিক, কিন্তু তাই বলিয়া মনুষ্যও স্বাধীনতার নির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না। যেমন নদীগর্ভে কোন নাবিক ইচ্ছামতে তরী ইতস্ততঃ সঞ্চালনে সমর্থ হয়, এবং পটুতানুসারে লক্ষ্য স্থানে সত্বর নিরাপদে বা বিপদগ্রস্ত হইয়া দীর্ঘকালে উপ-নীত হয়, অথচ কেহই নদীবক্ষ অতিক্রম করিয়া স্থলপথে নৌকা চালাইতে পারে না; তদ্রূপ জীবগণও, ইচ্ছানুসারে নির্দ্দিষ্ট সীমা মধ্যে স্বাধীনতা পরিচালন করিয়া, কর্ম্মানুসারে কাল্পনিক সুখদুঃখ ভোগ করে, এবং কেহ শীঘ্র

কেহ বিলম্বে লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হয়। সুতরাং সেই কাল্পনিক সুখদুঃখদাতাও ঈশ্বর নহেন; এবং তাঁহাকে কখনই পক্ষপাতী বলা যাইতে পারে না।

এস্থলে যে "কাল্পনিক" সুখদুঃখ বলা হইল, তাহার কারণ এই, সংসারিক সুখদুঃখ—প্রকৃত-সুখদুঃখ নহে। তাহা জীবের কল্পনাসম্ভূত। কারণ, প্রকৃত পদার্থের নির্দ্দিষ্ট একটী রূপ বা অবস্থা আছে। কিন্তু সুখদুঃখের সেরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট রূপ বা অবস্থা নাই। সুখ দুঃখ মান-সিক বৃত্তিবিশেষ; তাহাও আবার সকলের পক্ষে তুল্য নহে। তুমি যাহাতে সুখানুভব কর, অন্যে তাহাতে দুঃখ পায়। একজন উপাদেয় আহারীয় দ্রব্যে সুখী, অন্য একজন উত্তম পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট; আবার এমন ব্যক্তি আছে যে, সে উত্তম পরিচ্ছদ, উত্তম শয্যা, উপাদেয় খাদ্য, ধন, জন, অট্টালিকা প্রভৃতি কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে—সন্তুষ্ট কেবল সন্ন্যাসে। আবার ধন, মান সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, কেবল কৌপিন ধারণেও কেহ কেহ মহা-সুখী হইয়া থাকেন। সুতরাং সুখদুঃখের কোন নির্দ্দিষ্ট অবয়ব নাই। অভাব-কল্পনাই দুঃখ এবং তন্নিবারণেচ্ছাই সুখের আশা। সংসারে (জীবন্মুক্ত ভিন্ন) প্রকৃত সুখ কেহই প্রাপ্ত হয় না। যখন অভাব-কল্পনাই দুঃখ, তখন সুখদুঃখকে "কাল্পনিক" বৈ আর কি বলিব? সুতরাং স্বাধীন জীব অসার কল্পনা-বলে যে দুঃখ আনয়ন করিবে, তজ্জন্য ঈশ্বরকে পক্ষ-পাতী বলা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য।

এস্থলে যে "অসার অভাব-কল্পনা" বলা হইল, তাহার কারণ এই,—মনুষ্যের প্রকৃত অভাব অতি কম। কেবল অবস্থাবিশেষে অভাব-কল্পনা করিয়া স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখ আনয়ন করে। মনে কর, আজ তোমার দশ টাকা মাসিক আয়, সুতরাং তোমার পাঁচক ব্রাহ্মণ না থাকায় কোন কষ্ট নাই। কিন্তু যে দিন একশত টাকা তোমার মাসিক আয় হইবে, সেদিন আর পাচক ব্রাহ্মণ ভিন্ন একদিনও চলিবে না; অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যয়ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাড়াইতে হইবে। সুতরাং অর্থের অনাটনে দুঃখ। যদি তুমি ঐ অবস্থায় পাচক ব্রাহ্মণের অভাব-কল্পনা না করিতে, তবে, তাহা না থাকিলেও তোমার অচল বা দুঃখ হইত না। এইরূপ—

"নিঃস্বো ব্যাধি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ। লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতি শ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ। শক্রেশ শ্চ পুনর্হিরণ্যগর্ভ পদং পুনঃ পুনরহো অশৌধবিং কোগতঃ।"

যাহার কিছুই নাই, সে শত মুদ্রা পাই-লেই সুখী হইব মনে করে। কিন্তু যাহার শত মুদ্রা আছে, সে সহস্র মুদ্রা, সহস্রপতি লক্ষ মুদ্রা, লক্ষাধিপ ক্ষিতিপতিত্ব, ক্ষিতিপতি সম্রাট হইতে, সম্রাট ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে, ইন্দ্র ব্রহ্মা হইতে এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ, বর্ত্তমানাবস্থাতে কেহই সন্তুষ্ট নহে; সকলেই স্বীয় স্বীয় অবস্থাতে ইচ্ছা-পূর্ব্বক অভাব-কল্পনা করিয়া দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং স্বাধীন জীবের ঐরূপ স্বেচ্ছালব্ধ দুঃখের জন্য ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলা যায় না। তুমি এক জনকে অট্টালিকার উপরিভাগে সুকোমল শয্যায় শায়িত দেখিয়া তাহাকে অতিশয় সুখী মনে করিতেছ; অথচ তোমার তাহা নাই, এই অসার অভাব-কল্পনা করিয়া দুঃখভোগ করি-তেছ। মনে কর, একজন মুক্তিকার বা তৃণ-শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে, আর একজন দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শুইয়া অন্তর্দ্দেবনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে,

ইহার মধ্যে সুখী কে? তবে কেন সুকোমল শয্যার অভাব-কল্পনা করিয়া দুঃখ পাও? সুখ-দুঃখ মানসিক বৃত্তি মাত্র; সুতরাং শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তুলনা করিলে, ধনী-দরিদ্রে কোন ন্যূনাধিক হইবে না। সুতরাং জীবনকালের কাল্পনিক সুখদুঃখের জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করিও না। উপাসনার লালসায় ঈশ্বর তোমাদিগকে এই কাল্পনিক সুখদুঃখ প্রদান করেন নাই।

তুমি উপাসনা কর বা না কর, তাহাতে ঈশ্বরের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, লাভালাভ তোমার। উপাসনা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধির উপায়ান্তর নাই, চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন অভাব-কল্পনা দূর হয় না, অগচ অভাব-কল্পনা। ত্যাগ ভিন্নও পূর্ণসুখ হয় না। সুতরাং উপাসনা কেবল তোমার মঙ্গলের জন্য। এক্ষণে দেখা উচিত, সেই উপাসনা কাহাকে বলে। যথা,—

"সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানসব্যাপার-রূপাণি শাস্ত্রিস্য রিদ্যাদিনি।"

সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক চিন্তাকেই উপাসনা বলা যায়। এবং সেই ব্রহ্মচিন্তা-রূপ উপাসনা দ্বারাই জীবগণ অভাব-কল্পনা ত্যাগ-জন্য বাসনা-পরিরহিত হইয়া পূর্ণসুখ (মুক্তি) লাভ করে। এখন দেখা যাউক, ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় কেন?

ব্রহ্ম চিন্তা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবার কারণ এই; ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, চিন্ময় এবং পূর্ণানন্দ। তাঁহাতে আমার সুখদুঃখাদির কল্পনা নাই। তিনি শোকাদি দ্বারা অভিভূত হন না, স্তুতি-নিন্দা তাঁহার পক্ষে তুল্য এবং তিনি অভ্রান্ত পরম পুরুষ। অতএব জীবগণ যে, যে বিষয়ে আসক্ত হইয়া একাগ্রমনে অনুধ্যান করে, সে সেই একাগ্রতা দ্বারা অভিলষিত প্রয়োজনের স্বরূপ বা অভাব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, নিরন্তর কুৎসিত চিন্তা দ্বারা হৃদয় কলুষিত হইয়া ক্রমে তাহা পাপ-চিত্রে চিত্রিত এবং পাপের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। আবার সচ্চিন্তা দ্বারা হৃদয় সাধুভাবে পূর্ণ হইয়া তাহা পুণ্যভূমি বা শান্তি-নিলয় হইয়া উঠে। অর্থাৎ, একাগ্রমনে যে যে বিষয়ের চিন্তায় রত হয়, মানসিক সঙ্গ দ্বারা সে সেই বিষয়েরই অনুরূপতা লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ অবিনাশী ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা যে জীবগণ অসার অভাব-কল্পনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া চির-সুখী হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

তুমি মনে কর, ঈশ্বর তোমার স্তুতিস্তব লালায়িত, অথবা তুমি উপাসনা করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিবে। কিন্তু তাহা নহে। তুমি উপাসনা কর—তুমিই কৃতার্থ হইবে। তাঁহার নিকট ত্যাজ্য-গ্রাহ্য নাই, তাঁহার দ্বার দ্বার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত; যে তাহাতে প্রবেশের চেষ্টা করে, সেই প্রবেশ করিতে পারে। যেমন সমুদ্র সকলকেই জলদানে প্রস্তুত, তাঁহার ভূমি উর্ব্বরা হইয়া অবগাহন করিলে সকলেই শীতল হইবে, পান করিলে সকলেরই পিপাসা নিবৃত্তি হইবে; তদ্রূপ, উপাসনা দ্বারা মোহ-জনিত কাল্পনিক দুঃখ ত্যাগ করিলে, সকলেই শান্তিময় পরম পুরুষকে লাভ করিয়া চিরসুখ প্রাপ্ত হইবে।

অথবা, তুমি উপাসনা দ্বারা সুখ প্রাপ্ত হও বা না হও, তথাপি তোমার পক্ষে উপাসনা জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, মানবহৃদয় স্বভাবতঃই কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। কাহারও একটু মহিমা দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রশংসা করা, কাহারও নিকট কিঞ্চিৎ উপকার প্রাপ্ত হইলে আজীবন তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা—মনুষ্যজীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহার নাই, সে মনুষ্যত্ববিহীন, অকৃতজ্ঞ, পশু পদবাচ্য।

মানবগণ যখন সামান্য কার্য্যের জন্য সাধারণ জীবের গুণানুবাদ করাকে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে, তখন অনন্ত মহিমাময়ের বিচিত্র কার্য্য দেখিয়া, বা প্রতিপলে তাঁহার দয়া অনুভব করিয়া, কেন না তাঁহার উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইবে? যদি এত অপার মহিমা দেখিয়াও কেহ তাঁহার গুণানুবাদ না করে, বা সর্ব্বদা তাঁহার অযাচিত দয়া লাভ করিয়াও তাঁহার উপাসনায় রত না হয়, তবে এ জগতে তাহার তুল্য অকৃতজ্ঞ কে আছে?

ভূগর্ভের প্রত্যেক স্তরে জল আছে, খনন ভিন্ন তাহার বিকাশ হয় না। গাভীর স্তনে দুগ্ধ আছে, বৎসসংযোগে দোহন ভিন্ন তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কাষ্ঠে অগ্নি আছে, ঘর্ষণ-ক্রিয়া ভিন্ন প্রজ্বলিত হয় না। তদ্রূপ, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও, উপাসনা ভিন্ন তাঁহার সত্তা অনুভব হয় না। যথা যোগী যাজ্ঞবল্ক্য কথিতং—

"অবাং সর্পি শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণং।
নিস্তত্ত্ব কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধং॥
এবং মহি শরীরস্থ সর্পিবৎ পরমেশ্বর
বিনা-চোপাসনা দেব ন করোতি হিতং নৃণাং॥"

এইরূপ হিন্দুর প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থেই উপাসনার প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে বারংবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

উপাসনার অর্থ—সগুণ ব্রহ্ম চিন্তা হইলেও, উপাসনার বহুবিধ প্রকারভেদ আছে। যথা, পুষ্প-পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা, জপ, যজ্ঞাদি, অথবা কাল-বিশেষে ও স্থানবিশেষে বহুসংখ্যক ব্যক্তি একত্র সম্মিলিত হইয়া দর্শন, স্পর্শন, নামকীর্ত্তন প্রভৃতি। একাকী নিভৃতস্থলে বসিয়া উপাসনা করা নিত্য, ও স্থান-কাল-ভেদে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা করা কাম্য। নিত্য ও কাম্য এই উভয়রূপ উপাসনাই চিত্তশুদ্ধির কারণ, তথাপি নিত্যোপাসনা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্নানপানাদির জন্য প্রত্যেক মনুষ্যই সামর্থ্যানুরূপ নিজনিজ বাসস্থানে বা তন্নিকটস্থ স্থলে কূপাদি খনন করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি একত্রিত হইয়া পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করে। কোন কোন স্থলে বহুসংখ্যক ব্যক্তির চেষ্টায় বৃহৎ জলাশয়াদি খনিত হইয়া থাকে। আবার কোন কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি একাকীও খাল কাটাইয়া নদীর সহিত যোগ করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন, নদী, হ্রদ প্রভৃতি স্বাভাবিক জলাশয়ও অনেক আছে। কিন্তু নিজের বাটীর কূপে যেরূপ অধিকার, সেরূপ অধিকার পুষ্করিণীতে নাই। আবার সাধারণের স্নান নদী-হ্রদাদিতে আরও অধিকার কম। তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক কখন কখন নদী জলে অবগাহন করিয়া প্রভূত আনন্দলাভ করিতে পারা যায়। উপাসনা-সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম। নিজের বা নিজ পরিবারের মঙ্গলের জন্য নিত্য-উপাসনারূপ একটী কূপ হৃদয়ক্ষেত্রে খনন করা মনুষ্য-মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন দেবগৃহে পাঁচ জনে মিলিয়া বন্দনাদিরূপ উপাসনা করাও মন্দ নহে। কিন্তু ভাগের পুষ্করিণীর ন্যায় তাহাতে সেরূপ অধিকার থাকে না। আবার তীর্থাদিতেও অনেক সময় উপাসনার ফল-লাভ হয়, কিন্তু নদীস্নানের ন্যায় তাহাও সকলের ভাগ্যে ঘটে না, এবং ঘটিলেও তাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ অধিকার নাই—অথচ, তাহা সংসারীর পক্ষে নিত্যসংঘটন অসম্ভব। সুতরাং নিজের জন্য অবশ্যই একটী পৃথক্ কূপ চাই। নিজের অধিকারে বসিয়া সমস্ত দিন আনন্দনীর পান কর, ইচ্ছা-হয়ারে তাহাতে ডুবিয়া থাক, কেহই তোমাকে

বাধা দিতে পারিবে না। অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই নিত্য-উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাসনার দ্বারা, কেবল নিজের চিত্তশুদ্ধি কেন—অন্যেরও উপকার সাধিত হয়। উপাসনার শক্তি-অনুসারে কোন্ কোন্ মহাত্মা ধর্ম্ম-স্রোতে দেশ-দেশান্তর পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জগতে যত প্রাকার শক্তি আছে, তন্মধ্যে উপাসনার তুল্য বল আর দ্বিতীয় নাই। উপাসনা-বলে অসাধ্য সাধিত হয়। কোন সময়ে কোন সম্রাট অর্থ বা অস্ত্র-বলে কোন নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। বরং ধর্ম্মের জন্য কোনরূপ রাজাজ্ঞা প্রচার হইলে, তাহাতে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। যে স্থলে রাজশক্তি পরাভূত, সে স্থলে তো অন্য শক্তির কথা উত্থাপন করাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু, যাহা সম্রাটের পক্ষে অসাধ্য, এক জন নিরাশ্রয় ভিক্ষুক উপাসনা-বলে অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। কৌপিনধারী চৈতন্যদেব কেবল চক্ষের জলে দেশ ভাসাইয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষের জলে হরিনামের যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, আজিও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই—এখনও লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাঁহার নাম লইয়া জীবন সার্থক বোধ করিতেছে। এইরূপ বুদ্ধদেব প্রভৃতির অনুলি-সঙ্কেতেও কোটি কোটি ব্যক্তি তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইতে সেই সমস্ত মহাপুরুষ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম মানবসমাজে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তুমি-আমি উচ্চতর হইলেও, সামান্য একটী ব্যক্তিকে সামান্য একটী কথা বিশ্বাস করাইতে পারিনা। অনেক মহামহোপাধ্যায়ের কথাও কোন কার্য্যে আইসে না। অথচ, একজন সংসার-ত্যাগী নিরাশ্রয় মানবের কথায় কোটি কোটি ব্যক্তি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহার পদানুসরণ করে। এ কি সাধারণ আশ্চর্য্য! বল দেখি, আর কোন্ শক্তি-বলে এরূপ ঘটনা হয়? যেস্থলে রাজশক্তি, অর্থবল, বিদ্যাবল সমস্ত পরাভূত, সেস্থলে কোন্ শক্তি এত আধিপত্য সংস্থাপন করে? সে শক্তি আর কিছুই নহে, সে শক্তি কেবল "উপাসনার"। কেবল উপাসনা ভিন্ন এত শক্তি আর কাহারও নাই যে, কোটি কোটি হৃদয়ের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া সকলকে একপথের পথিক করিতে পারে। উপাসনার এই প্রত্যক্ষ শক্তি দেখিয়াও যদি আমরা তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করি, তবে তাহা কেবল আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য কুতর্ক ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? যদি উপাসনার অন্য কোন প্রয়োজন না থাকে, তথাপি কেবল আত্ম-তুষ্টির জন্যও তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাসনাতে যে বিমল আনন্দ লাভ হয়, তাহা আর কিছুতেই হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সে পথের পথিক হইয়াছে, সে জানে, তাহাতে কত আনন্দ। জীব কেবল প্রতি-নিয়ত সুখ চায়; যদি উপাসনাতে এত সুখ, তবে তাহা ত্যাগ করিবে কেন? উপাসনার প্রথমাবস্থায় কিছু ক্লেশ আছে বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম বড়ই সুখকর। কেহ কেহ প্রথমাবস্থার দুঃখ দেখিয়াই তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন—উপাসনায় দুঃখ ভিন্ন কিছুই সুখ নাই। যাঁহারা উপাসনায় সুখ নাই বলিয়া উপাসনা করেন না, তাঁহাদিগকে আমরা কেবল এই কথা বলিতে চাই যে, যে ব্যক্তি যাহা উপভোগ করে নাই, সে তাহার সুখদুঃখ জানিবে কিরূপে?

এইলে অমৃতকৃষ্ণ পরমহংসের একটী কথা বলিতে হইল। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রে সমুদ্রের রত্নাকর নাম পাঠ করিয়া, দারিদ্র্য-নিবারণের জন্য সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়াছিল, এবং ক্রমে সমুদ্রতীরের নানাস্থানে রত্ন অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু কোন স্থলেই রত্নের অনুসন্ধান পাইল না। তখন শাস্ত্রের কথা অবিশ্বাস করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু, ঐ ব্রাহ্মণ রত্ন পাইল না বলিয়া, কি সাগর-গর্ভে প্রকৃতই রত্ন নাই? না, তাহা নহে; সাগর চিরদিনই রত্নাকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। তবে "ডুবুরী" না হইলে তাহা লাভ করা যায় না। যদি সমুদ্র হইতে রত্নলাভ করিতে চাও, তবে ক্রমে ডুবিতে শিখা কর। যখন ডুবিতে শিখিবে, তখন অবশ্য রত্ন পাইবে। কিন্তু তীরে থাকিয়া রত্ন লাভের আশা করিলে, কখনই তাহা ফলবতী হইবে না। যদি উপাসনার সুখ বুঝিতে চাও, তবে সাধক হও। সাধক না হইলে, সাধনের সুখ বুঝিতে পারিবে না। ক্রমে যোগ যত গাঢ় হইবে, ততই আনন্দ লাভ করিবে।

শোক-সঙ্গীত।

রাগিণী—বাগেশ্রী; তাল ঠেকা।

(স্পষ্ট হসন্ত চিহ্ন ব্যতীত আর সব অজন্ত।)

(১)

কোথা গেলে, আমায় একা ফেলে,
সংসার-তুফানে ঘোরে?
বিশ্ব ক'রো না প্রিয়ে, সাথে নে যেতে আমারে!

(২)

তোমা ভিন্ন শূন্য দেহ, রহিতে এ শূন্যগেহে,
কিছুতে প্রাণ না চাহে, পুত্রস্নেহে কিবা করে?

(৩)

(আক্ষেপ।)

জীবনে চির-জড়িতা, তমালে মাধবী যথা,
ছিন্ন করি সেই লতা, বিধাতা দহিল মোরে।
হৃদয় জুড়িয়া ছিলে, শূন্য করি পলাইলে,
যে পাথারে ভাসাইলে, পার তায় দেখিনা রে!

(৪)

সংসার-বন্ধন তুমি, তুমি হ'লে অগ্রগামী,
কি বন্ধনে আর রব আমি,
বাঁধে কি রে ছিন্ন-ডোরে?

স্মরণ করিতে গুণ, মনাগুন শতগুণ,
রাবণের চিতা যেন, জ্বলিল জীবন ভরে!

(৫)

পতি-পুত্র-নাতি-কোলে, পুণ্যধামে গেলে চ'লে,
ধন্য পুণ্যবতী ব'লে, লোকে তাই গৌরব করে!
কিন্তু সেই যশোগানে, কানে যেন বজ্রহানে,
যে জ্বালা এ বৃদ্ধ প্রাণে, তারা কি বুঝিতে পারে?

(৬)

ভুলিতে যতন যত, যাতনা প্রবল তত,
চিত নিতান্ত ব্যথিত, আশা হত একেবারে!
শুমুরে পরাণ কাঁদে, প্রকাশিতে লাজ বাধে,
এত যে হয় এ বিচ্ছেদে, কভু ভাবিনি অন্তরে!

(৭)

পতিহারা সতী যারা, নয়নে গলিতধারা,
ফুকুরে কাঁদিয়ে তারা, তবু তো জুড়াতে পারে!

* কবির পত্নী-বিয়োগ-উপলক্ষে লিখিত।

অভাগা পুরুষজাতি, দহিতেছি দিবারাতি,
তথাপি নাহি শকতি,ডুকরে ডাকিতে তোরে!

(৮)

জুড়াতে আর নাহি স্থান, যথা-যাই যেন শ্মশান,
এ দুঃখের পরিমাণ, অন্যে কি করিতে পারে?
কারে কই আর মনের কথা,
কে বুঝিবে প্রাণের ব্যথা?
রব যথা রবে তথা,সে কথা ঠিক রাখিলে রে!

(৯)

তীর্থে দেহে ভ্রমি ঘরে, কি আনন্দ আহা তরে,
খাটি সুখ সম্ভবে ভবে, ভাবিত মন হর্ষভরে!
গ্রন্থি বাঁধা ভীর্থ-নীরে,কি রঙ্গ তায় ক'রেছি রে!
তেমি ক'রে আবার ফিরে,
যাবার সাধ যম নিল হ'রে!

(১০)

ডুবিয়ে রোগ-সাগরে, জরজর কলেবরে,
পড়িয়ে ছিলে যে ঘরে, তবু জুড়াতে আমারে!
কে আর সে সুধাস্বরে, সে পবিত্র প্রেমভরে,
অভাগা ভোর এলে ঘরে,
সম্ভাষিবে তেমন করে!

(১১)

নিতান্ত কাতরা নিজে,(আহা কি যাতনা সে যে,)
তবু পতি-সেবা-কাজে, ভার দিতে সকলেরে!
হয় যাতে সব পরিপাটি,কিছুতে না ঘটে ত্রুটি,
সে সব কথা খুঁটিনাটি, সুধাতে বুঝাতে ধীরে!

(১২)

যা কিছু সাজায়ে ঘরে, রেখে গেছ থরে থরে,
দেখে কেবল মরি ঝুরে,
সব আমারি সুখের তরে!
তোমার নিজ-সুখের মতন,
কিছুই তো তায় নাই আয়োজন,
সে নিঃস্বার্থ প্রাণের যতন,
আর কি পাব সংসারে!

(১৩)

এত যে প্রাণের নিধি, উভয়ে অস্থির-হৃদি,
নিদয় হ'য়ে কেন বিধি,সে অস্থি ভিন্ন করে?
এই ছিল এই নাই, আর না দেখিতে পাই,
কোথা গেল ভাবি গো তাই,
মিলিবে কি দেহান্তরে!

(১৪)

সে কথা কেউ বলে যদি, তবু তো পরাণ বাঁধি,
আশাভরে ভবনদী, পারের তরে রই এপারে!
কিন্তু তা যে কেউ বলে না,
সবাই বলে আর পাবে না,
হতাশে প্রাণ বাঁচে না, নিরাশে হায় দগ্ধ করে!

(১৫)

ভেবে তাই বুঝেছি সার,
সে যদি না হ'লো আমার,
বিচ্ছেদ ভয় নাই প্রণয়ে যাঁর,
তাঁরেই এবার রব ধ'রে!
দয়াময় দেও পদছায়া,
ঘুচাও সব অনিত্য মায়া,
তুমিই পুত্র, পতি, জায়া,
মন যেন মেরে মনে করে!

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

আমরা পূর্ব্বেই পাঠকবর্গকে একটী হৃদয়-বিদারক মর্ম্মভেদী শোকসংবাদ প্রদান করিয়াছি। যে মহাপুরুষ বীরদম্ভে এই পতনোন্মুখ হিন্দুসমাজের উদ্ধার-সাধন-নিমিত্ত দৃঢ়ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভূদেব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চিরানন্দ স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। বঙ্গের সকলেই ভূদেব বাবুকে বিলক্ষণ জানেন, এবং সকলেই তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অধিক পরিচয় দিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। তাঁহার জীবন-চরিত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা যে তাহাতেই সবিস্তারে বর্ণিত হইবে—তাহাতে আর সন্দেহ নাই; সুতরাং তাঁহার জন্মস্থান, বিদ্যাশিক্ষা ও পদোন্নতি-বিবরণে এই প্রবন্ধের কলেবর পূর্ণ করার আবশ্যক নাই। আর তাঁহার জীবনের স্থূল স্থূল ঘটনার বিষয় পূর্ব্বেই "অনুসন্ধানে" প্রকাশিত হইয়াছে। আজি তাঁহার অভাবে আমরা যে কি অনির্ব্বচনীয় ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম,তাহারই আলোচনায় আমরা নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছি। অনেক মহামহিমান্বিত ব্যক্তি এই কয়েক বৎসর আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন; অনেক মহামূল্য অত্যুজ্জ্বল নানাগুণান্বিত রত্ন আমরা হারাইয়াছি; কিন্তু এবার আমরা যে রত্ন হারাইলাম, তাহার তুলনা নাই—বলিতে কি, সর্ব্বস্ব হারাইলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশে প্রবেশ হওয়া অবধি আমরা আমাদিগের ধর্ম্ম, আমাদিগের জাতীয়তা, আমাদিগের স্বাধীনতা, আমাদিগের ব্রহ্মতেজ, এমন কি, আমাদিগের আমিত্ব পর্য্যন্ত হারাইতে আরম্ভ করিয়াছি। পশ্চিম দেশের বাহ্য যৌদ্দর্য্যশালী আচার, ব্যবহার, বেশ, ভূষা, ধর্ম্ম, নীতি, কার্য্য-প্রণালী, আমাদিগের চক্ষে ধাঁধা উৎপাদন করিয়াছে। আমরা সকলেই ঐ সকল বিষয়ে পশ্চিমদেশীয় অনুকরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আপনাদের সমস্ত পরিত্যাগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলাম। যে স্রোত বহিয়াছিল—আর কিছুদিন সে স্রোতের বেগ থাকিলে, আমাদিগের আমিত্ব নিশ্চয় এত দিনে লোপ হইয়া যাইত। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ সেই বিষম স্রোত স্তম্ভীভূত হইয়াছে। যে কয়েক জন মহাপুরুষের যত্নে এই স্রোত স্তম্ভীভূত হইয়াছে,তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় পরমাত্মীয় ভূদেবকে আমরা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মনে করি; কেন না, শিক্ষা দান ও সৎ দৃষ্টান্তপ্রদর্শন—এই উভয় প্রকারেই আমাদিগের ধর্ম্ম ও জাতীয়তা প্রভৃতি রক্ষা-বিধানে একাকী তিনিই বিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন। অনেকে অনেক বক্তৃতা ও অনেক উপদেশ দান করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য দ্বারা লোকের মতি-গতি ফিরাইতে সক্ষম হয়েন নাই। ভূদেব অসাধারণ অধ্যবসায়-গুণে প্রতিপদে সেই মহাকার্য্য সাধন করিয়া 'ভূদেব' নাম সার্থক করিয়াছেন। সেই কারণ, তাঁহাকে ভূদেববাবু না বলিয়া ভূদেব বলিয়াই আমরা পরিতোষ লাভ করি।

যে সময়ে ভূদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় ভয়ানক কাল ছিল; সেই কালে যিনি পাশ্চাত্য বিদ্যার অনুশীলন করিতেন, তিনি আচারে, ব্যবহারে, ধর্ম্মে, সর্ব্ব প্রকারেই সম্পূর্ণরূপে সাহেব-পদবী-লাভে যত্নবান হইতেন। সে সময়ে, যিনি কিয়ৎ পরিমাণেও জাতীয় রীতিনীতির অনুসরণ করিতেন, শিক্ষিত সমাজে তিনি নিতান্ত ঘৃণার্হ হইতেন। সেই জন্য অল্পশিক্ষিতেরাও আপনাদের বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিবার জন্য, পাশ্চাত্য ধরণে সজ্জিত হইতেন। এবম্ভূত তমসাচ্ছন্ন কালে ভূদেব বাবু জন্মগ্রহণ করিয়া ও নিয়ত পাশ্চাত্য-বিদ্যার অনুশীলন করিয়া, এক দিনের নিমিত্তও কক্ষভ্রষ্ট হয়েন নাই। তাঁহার যে সকল সহাধ্যায়ী ছিলেন, তাহাদের সকলেই, হয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, নয় নব্য ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ছিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার চিত্তের বৈকল্য জন্মাইতে পারেন নাই। তিনি প্রথমে অর্থোপায়ের যে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সমস্তই রাজানুগ্রহমূলক; কিন্তু অধিকতর রাজানুগ্রহ পাইবার আশায় তিনি কখন উচ্চপদস্থ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সাহেবগণের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। উপরিতন ইংরাজগণের অনেকেরই সহিত তাঁহার প্রকৃত বন্ধুত্ব জন্মিলেও, সে বন্ধুত্বের খাতিরে কখন তিনি স্বধর্ম্মের বিপরীত ব্যবহার করেন নাই। কোন উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ান এক সময়ে তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা আমাদিগকে আর্য্য আর্য্য বল, কিন্তু প্রকৃত আর্য্যের মূর্ত্তি এক ভূদেব বাবু ভিন্ন আর কোন দেশীয়তেই দেখিতে পাই না।"

অনেকে মনে করিতে পারেন, বর্ত্তমান-কালে কয়েকজন পণ্ডিত হিন্দুধর্ম্মের প্রচারে যে নূতন আয়োজন করিয়াছিলেন, হয় ত সেই সকল বক্তৃতাদির মর্ম্ম শ্রবণে আমাদের ভূদেবের মনে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিভাব জন্মিয়াছে, সাধারণ শিক্ষিতের ন্যায় পূর্ব্বে তাঁহার হৃদয়ে ইংরাজী-ভাব প্রবলতর ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহার প্রচারিত 'শিক্ষাদর্পণ' দেখিলেই এ বিষয়ের সন্দেহ দূরীভূত হইবে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সেই পত্রিকায় তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও জাতীয়তা সম্বন্ধে যে সকল উচ্চদরের প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে সময়ের লেখকগণ স্বপ্নেও সেরূপ ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যে সময় তিনি প্রথম আডিশন্যাল ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন, সেই সময়ে আমি একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম—সে প্রায় ৩০ বৎসরের কথা। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ সে সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া, নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা উঠিয়াছিল, তৎপ্রসঙ্গে আমাদের ভূদেব কহিলেন,—"রাজা বিশ্বামিত্র মহাত্মা বসিষ্ঠের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলে, তাঁহা কামধেনুর প্রভাবে রাজার সমস্ত সেনাকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া ঐ কামধেনু প্রাপ্তির বাসনায় মুনিকে উহার বিনিময়ে সহস্র সহস্র গাভী ও প্রভূত ধনদান করিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র কামধেনু দিতে স্বীকার করিলেন না। তখন তিনি বলপ্রয়োগে গ্রহণ করিবার মানসে সৈন্যদিগকে সজ্জিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঋষির প্রাণশক্তি কামধেনু সহস্র সহস্র সৈন্য সৃষ্টি করিয়া, রাজাকে রণে পরাজিত করিল। আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মরূপ কামধেনুর সৃষ্ট সেনাবিশেষ। দলে দলে হিন্দু সন্তান সে সময় খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছিল, এই নবজাত ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশের সেই বিপদ শান্তি করিতেছে। একার্য্য শেষ করিয়া এই সেনা চলিয়া যাইবে। নির্ব্বিঘ্নে হিন্দুধর্ম্ম তখন আবার দেখা দিবে।" ৩০ বৎসর পূর্ব্বকার এই বাক্য দ্বারা তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তিনি যে পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার আরও অনেক নিদর্শন আছে। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা শেষে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল।

এদিকে যতবারই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, ততবারই তিনি বলিয়াছেন,—"আমি যতই হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ সকল পাঠ করিতেছি, ততই আমার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে।" পূর্ব্বে ইংরাজী অধ্যয়ন ও পরকীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত, শাস্ত্র আলোচনার সময় সেরূপ পাইতেন না, কাজেই হিন্দুশাস্ত্র যে সকল অমূল্য রত্নে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহা দেখিবার অবসর পান নাই। যখন দেখিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার শ্রদ্ধার বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে কেবল উপযুক্ত পিতার পুত্র ও তাঁহার সমস্ত গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়াই, সেই পাশ্চাত্য বিদ্যাতমসাচ্ছন্ন কালেও স্বধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন—রত্ন সকল শ্রেণিতে না পাওয়াতে, প্রচারকার্য্যে সচেষ্ট হয়েন নাই। পরে যত জানিতে লাগিলেন, তত পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ প্রভৃতি নামে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া সাধারণের গোচর করিয়াছেন। আমারও কয়েকখানি পুস্তকে ঐরূপ প্রবন্ধের কিছু কিছু আলোচনা থাকায়, আমাকেও তিনি ভালবাসিতেন ও আবর করিয়া তাঁহার প্রবন্ধাদি শ্রবণ করাইতেন। তিনি ঐ প্রসঙ্গে শত শত বার আমাকে বলিয়াছেন,—"হিন্দু শাস্ত্রে যে সকল অমূল্য রত্ন রহিয়াছে, পৃথিবীর কোন শাস্ত্রগ্রন্থেই তাহা নাই।" তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ অসাধারণ পণ্ডিত ও তেজস্বী ছিলেন; সেই মহাত্মভব পিতার গুণে, ইংরাজী বিদ্যায় অশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াও, আজীবন স্বধর্ম্ম-নিরত ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। ইংরাজীশিক্ষা এক দিনও তাঁহাকে কেন্দ্রভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।" তিনি কতবার বলিয়াছেন—"আমি এ পর্য্যন্ত বহুতর গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু আমার পিতার নিকট যেরূপ অমূল্য রত্ন পাইয়াছি, সেরূপ আর কুত্রাপি পাই নাই।" জানি না, সত্য সত্যই তাঁহার পিতা এবম্ভূত গুণ-সম্পন্ন ছিলেন কি না; কিম্বা ভূদেবের অসাধারণ পিতৃভক্তি এরূপ বিশ্বাসের সৃষ্টি। বাস্তবিক, তাঁহার পিতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। কেহ কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে নিন্দা করিলে, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেন,—"ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিন্দা আমার নিতান্ত অসহ্য, আমার পিতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন।" প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত শঙ্কর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দিতে গেলে; ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইয়াছিল; তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "হিন্দু-ধর্ম্ম এমন ভিত্তিহীন ধর্ম্ম নহে যে তাহার পতন হইবে। ধর্ম্মমণ্ডলী বা কোন সভা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি করার কোন আবশ্যক নাই, 'তেজীয়ান্ ধর্ম্ম আপনিই মাথা তুলিবে। তবে একটী কার্য্য আছে; ব্রাহ্মধর্ম্ম ধনাভাব-প্রযুক্ত শাস্ত্রালাপ পরিত্যাগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রালাপে নিযুক্ত করিবার জন্য কিছু কিছু বৃত্তি স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। যদি অইরূপে ধর্ম্মোন্নতির চেষ্টা করা হয়, তাহাতে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে স্বীকৃত আছি। অন্য কোনরূপ উন্নতির

চেষ্টায় আমার মত নাই।" পরে অধ্যাপকগণের বৃত্তির জন্য তিনি বাৎসরিক একশত টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়ের কথোপকথনকালে একজন বলিয়াছিলেন,—"এক্ষণে ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমস্ত স্বকর্ম্মচারী হইয়াছেন।" ভূদেব বাবু তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি এমন অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত দেখিয়াছি যে, তাঁহাদিগের গুণাবলী আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়, পৃথিবীর কোন স্থানেই এরূপ গুণসম্পন্ন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে পূর্ব্বে ঐরূপ ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক ছিল, এক্ষণে কিছু কমিয়াছে; উৎসাহের অভাবই তাহার প্রধান কারণ।" হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যে তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ছিল, তাহার আরও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সকলের বর্ণনা নিতান্ত অসম্ভব। মৃত্যুকালেও তিনি স্বধর্ম্মরায়ণতার উজ্জ্বল নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রাচীন স্বধর্ম্মনিরত ধার্ম্মিকগণ যে প্রণালীতে অকাতরে স্বীয় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন, ঠিক সেইরূপেই এই মহাত্মা আপনার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি 'গঙ্গা গঙ্গা' নাম মুখে উচ্চারণ করিয়া, আপনাকে তীরস্থ করত: অন্তিম-সময়োচিত কার্য্য করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে তখনই তাঁহাকে তীরস্থ করিয়া অন্তর্জলে নামান হইল। মহাপুরুষ রীতিমত গঙ্গাজলে শায়িত হইয়া, যখন শুনিলেন,পুত্র, কন্যা, পৌত্র,দৌহিত্র, দৌহিত্রী, পৌত্রকন্যা, দৌহিত্রকন্যা, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী প্রভৃতি স্বজনবর্গ উপস্থিত, তখন পুত্রদ্বয়ের গলা ধরিয়া অশ্রুর শোধ আদর করিলেন, এবং সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিয়া সুস্থহৃদয়ে ইষ্টদেবকে প্রণাম করিলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই সকলকেই শোকবিহ্বল করিয়া তিনি ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন। অধিকারের কোন বিকার হইল না—যেন সহজেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

ভূদেব বাবুর অনেক প্রকার গুণ ছিল। সে সকল গুণের আলোচনা আমরা অদ্য করিতেছি না; কেন না, এ রকম গুণসম্পন্ন লোক দুই চারি জন পাওয়া যায়। যদি কেবল তাঁহার ঐ সকল গুণমাত্রই থাকিত, তাহাহইলে এইশত বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা তত শোক করিতে পারিতাম না; কিন্তু যে অনন্যসাধারণ গুণের বিষয় আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সেই গুণের জন্য তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সের মৃত্যুকেও আমরা অকাল-মৃত্যু বোধ করি। এই দুর্দ্দিনে আর কিছু দিন যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন,তাহা হইলে আমাদের আশা ফলোন্মুখ হইত; কিন্তু তাঁহার অভাবে সে আশা ছিন্নমূল হইয়া গিয়াছে, সেইজন্যই বলিতেছি যে আমাদের ক্ষতি অসহনীয়।

সত্য বটে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যেরূপ আচারসম্পন্ন ও তাঁহাদের শাস্ত্রের প্রতি যেরূপ ভক্তি, ভূদেবের তাহা অপেক্ষা অধিক ছিল বলিতে সাহস হয় না; কিন্তু তাহা হইলেও শত শত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের আচরণে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধার উদয় হইতে পারে, একা ভূদেব বাবুর 'আচরণের' উদাহরণে, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ ভক্তি জন্মে; কারণ,তিনি ইংরাজী বিদ্যাতেই ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ইংরাজী আচার-ব্যবহার সমস্তই তাঁহার সম্মুখে নিয়ত বিদ্যমান ছিল, পাশ্চাত্য সকলপ্রকার জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের মর্ম্মই তিনি অবগত ছিলেন, আর পাশ্চাত্য সুখলিপ্সা নিয়তই তাঁহাকে বেগে আকর্ষণ করিত। এ অবস্থায়, যখন তিনি আগাগোড়া কঠোর আর্য্যধর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন সহজেই বুঝিতে হইবে, পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে, পাশ্চাত্য সুখের উপকরণ, প্রকৃত সুখের কারণ নহে। বিকৃতমস্তিষ্ক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানিগণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে যেরূপ সহজেই উপহাস করিতেন, আমাদের ভূদেব বাবুকে সেরূপ পারিতেন না। সেইজন্য শত শত ব্রাহ্মণপণ্ডিত অপেক্ষা একাকী তাঁহার দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতেছিল। এক্ষণে আমাদের এই আশাভরসা গঙ্গাসলিলে নিমজ্জিত হইয়াছে, হিন্দুর ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে? বিধাতা কি একাবারেই আমাদের উপর নির্দ্দয় হইয়াছেন! আমাদের কি আর কোন আশা নাই! কিন্তু সুখের বিষয়—সেই ধর্ম্মবীর আমাদের আশা-সলিলের একটী পন্থা করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় সকলেই জানেন, কিছুদিন পূর্ব্বে নগদ দেড়লক্ষ টাকা এবং 'এডুকেশন গেজেটের' সমস্ত আয় তাঁহার পিতার নামে উৎসর্গ করিয়া 'বিশ্বনাথ ফণ্ড' নামে একটী ফণ্ড স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; সেই ফণ্ড হইতে সুচরিত্র-সম্পন্ন অধ্যাপকগণ অন্যূন বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা এবং বেদবেদান্ত পাঠার্থী-ছাত্রগণ অন্যূন বার্ষিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি পাইবেন। এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ অধ্যাপনায় ও ছাত্রগণের শুচরিত্র সম্পাদনে যত্নবান থাকিবেন এবং ছাত্রগণ বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া-ধর্ম্মশাস্ত্রের মহিমা প্রচার করিতে থাকিবেন। তাহা হইলেই আমাদের অভীষ্ট অবশ্যই সিদ্ধ হইবে, এবং তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কালে কত শত এইরূপ বৃত্তির ব্যবস্থা হইবে। স্বর্গীয় ভূদেব বলিয়া গিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইলেই হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিত হইবে।" এ বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়াবদ্ধ হইয়াছিল, সেইজন্য তিনি এই অপরিমিত ধন আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন; নচেৎ,যিনি কেবল মাত্র চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, বড় বড় রাজা মহারাজাও যে পরিমিত ধনদানে কাতর হয়েন, অকাতরে সে পরিমিত ধনদানে সক্ষম হইতেন না।" এই যে অতুল ধন দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পুত্রগণকে কিছুমাত্র দুঃখিত করেন নাই; পিতৃতুল্য গুণবান্ পুত্রগণ অকপটচিত্তে তাঁহার সঙ্কল্প-সাধনে অনুমোদন করিয়াছেন।

ঠাকুর-ঝি।

নবম পরিচ্ছেদ।

শরৎকুমারীর উপর হীরালাল বাবুর ক্রোধ উপরোক্ত ঘটনায় চূড়ান্ত হইয়া গেল; সুতরাং হীরালাল স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ একবারেই বন্ধ করিয়া দিলেন। এদিকে স্বামীর এইরূপ ব্যবহারে শরৎকুমারীর অভিমানের মাত্রাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; শরৎকুমারী প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সে অভিমানের হ্রাস করিতে পারিল না। শরৎকুমারীর একান্ত ইচ্ছা, যাহাতে স্বামীর সহিত কোনরূপ মনোমালিন্য না থাকে; কিন্তু স্বামী যখন বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তখন মানিনী শরৎকুমারী আর কি করিতে পারে? শরৎকুমারীর অভিমানের কারণও যথেষ্ট ছিল, সুতরাং এ সময় তাহাকে আমরা দোষী করিতে পারি না। হীরালাল বাবুর যেরূপ মনের বিশ্বাস, তাহাতে তাঁহার শরৎকুমারীর প্রতি ক্রোধের কারণও যথেষ্ট ছিল, সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাঁহাকেই বা দোষী করি কিরূপে? এবিষয়ে তবে দোষী কে? অনেক সময় ঘটনাচক্রে পড়িয়া এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

এইরূপে দুই তিন দিন কাটিয়া গেল, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে গোলযোগ হইয়াছিল, তাহা আর মিটিল না। এদিকে হীরালাল কিন্তু নিয়মিত সময়ে কার্য্যালয়ে যাইয়া থাকেন, এবং নিয়মিত সময়েই কার্য্যালয় হইতে বাড়ী ফিরিয়া আইসেন। কোন বন্ধু-বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান না। সন্ধ্যার পরেই যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেন, সে অভ্যাসও এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছেন। হীরালালের মনে কিন্তু সুখ ছিল না, তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষভাবে থাকিতেন। মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলে, সে দুঃখেরও অনেক লাঘব হয়—হীরালাল বাবুর যে সুযোগও ঘটিয়া উঠে নাই; সুতরাং তাঁহার দুঃখভার ক্রমেই গুরুতর হইতে লাগিল। তাঁহার অন্যান্য বন্ধুর মধ্যে সুরেশ বাবুর সহিত তিনি একত্রে এক আফিসে কর্ম্ম করিতেন, সুতরাং প্রত্যহই উভয়ের সাক্ষাৎ হইত, তথাপি হীরালাল বাবু তাঁহাকেও সে মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেন না। তাঁহার কলঙ্কের কথা যে তাঁহারই স্ত্রী দ্বারা অন্যায়রূপে অভিরঞ্জিত হইয়া প্রতিবাসি-মহলে প্রচার হইয়া গিয়াছে—সে কথা তিনি তাঁহার প্রাণের বন্ধু সুরেশ বাবুর নিকট প্রকাশ করিতেও লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। যদিন হীরালালের অবস্থা এইরূপ তখন এক দিন কার্য্যালয় হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় পথে পরেশনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পরেশনাথ হীরালাল বাবুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"কি হে, তোমার ব্যাপারখানা কি? আর দেখা নাই যে? সন্ধ্যের পর আর আমাদের বাসায় যাও না কেন? কোন অপরাধ করেছি নাকি?"

হীরালালের বড় চক্ষুলজ্জা; তিনি মনে মনে পরেশনাথকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন, কিন্তু মুখে কোন কথা বলিতে পারিতেন না। তিনি বলিলেন,—"তোমার আবার অপরাধ কি! আমার মনের অবস্থা ভাল নয়, তাই সন্ধ্যের পর আর কোথাও যাই না।"

পরেশনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"মনের অবস্থা ভাল নয় বলে, কি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে নেই?"

হীরালাল।—আরো একটু কারণ আছে; আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যে মদ আর স্পর্শ করবো না।

পরেশনাথ পুনরায় হাসিয়া বলিল,—"তা বেস্ করেছ। তবে একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস্ করি—এ প্রতিজ্ঞাটা কেন করা হলো?"

হীরালাল।—বড় দুর্ন্নাম রটেছে; এতদিন কথাটা কেউ জানতো না, এখন অনেকেই জেনেছে।

পরেশ।—যদি দুর্ন্নামেরই এত ভয় ছিল, তবে কথাটা প্রকাশ হ'বার পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞাটা করলে ভাল হতো। যখন অনেকেই জেনেছে, তখন আর ভয় কিসের? আর এক কথা—এতে দুর্ন্নামই বা কি? আজকাল মদ কে না খায়?

হীরালাল।—অনেকে খেলেও—যারা খায়, লোকে তাদের নিন্দে ভিন্ন প্রশংসা আর কে করে বল?

পরেশ।—যারা নিন্দে করে, তারাই আবার গোপনে গোপনে মদ খেয়ে থাকে। নিন্দে করা যাদের স্বভাব, তারাই নিন্দে করে—ভাল লোকে নিন্দে করে না। আমি ত নাম-কাটা সেপাই, কারু নিন্দেতে ভয় করি না।

হীরালাল।—তুমি আর কাকে ভয় করবে? তোমারি ভয়ে সকলেই অস্থির। আমার মতন তোমার মা নেই, ভগিনী নেই, আত্মীয়-স্বজনও কেউ নেই, তবে আর কাকে ভয় করবে?

পরেশ।—তুমিও আর ছেটি—ছেলেটি নও, যে মা, বোন, আত্মীয়-স্বজনকে ভয় করে চলবে! পরিশ্রম করে টাকা রোজকার করছো, তাদের সকলকে প্রতিপালন করছো, আর নিজের আয়েস কিছু করবে না যাবা? তুমি তো তোমার স্ত্রীর দুঃখের বিষ! তোমার সংসারে তোমার সুখ কি? তবু দুদণ্ড বন্ধুবান্ধব নিয়ে যে আমোদ-আহ্লাদ কর, সেই ত তোমার সুখ-এ সুখও যদি ছেড়ে দাও, তবে কি সুখে এ সংসারে থাকবে বাবা?

এতক্ষণের পর পরেশনাথের কথাটা হীরালাল বাবুর মনোমত হইল। তিনিও যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। হীরালাল তখন মনে মনে ভাবিলেন,—"বাস্তবিক এ সংসারে আমার সুখ কি? এই যে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ঘরে যাচ্ছি—সেখানে গিয়েই বা কি সুখ পাব?"

হঠাৎ এই সময় কিন্তু সেই স্নেহময়ী জননী আর ভক্তিমতী সহোদরার কথা হীরালালের মনে উদয় হইল। সেই স্নেহময়ী জননী আর সেই ভ্রাতৃগতপ্রাণা অসলার স্নেহ ও ভালবাসায় কি হীরালালের সুখ নাই? হীরালাল বাবুর মন পরেশনাথের কথায় যত দূর অগ্রসর হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ ততদূর যেন ফিরিয়া আসিল। তিনি যে কথা পরেশনাথকে বলিতে যাইতেছিলেন, সে মুখের কথা তাঁহার মুখেই রহিয়া গেল। তিনি তখন মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরেশনাথ পুনরায় আরম্ভ করিল,—"তোমার মন খারাপ হয়েছে বলছো, তা যে তোমার বাধিনী স্ত্রী ঘরে আছে তাতে ঘরে বসে থাকলে কি আর তোমার মন ভাল হবে? মন খারাপ হয়ে থাকে, মন যাতে ভাল হয়, তাই করা। আচ্ছা ভাই, মনকে ভাল করবার, মদের চেয়ে আর অন্য ওষুধ কিছু আছে কি?"

পরেশনাথের প্রশ্নে হীরালালের যে চিন্তা

কোথায় চলিয়া গেল। হীরালাল উত্তর করিলেন,—"অল্পমাত্রায় খেলে, মন ভাল হয় বটে।"

পরেশনাথ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"আচ্ছা, বেশ—অল্পমাত্রাতেই খাও। তুমি আর বেশী কলে খাও?"

হীরালালের মনের ঘোড়া কেমন আল্গা হইয়া গিয়াছিল। অগ্রগামী মন পশ্চাৎপদ হইয়া ফিরিয়া আসিলেও সেখানে অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। হীরালাল যেন একটা বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। পরেশনাথের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিলেন; এইবার যে স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেস্থান হইতে দুইদিকে দুইটী রাস্তা গিয়াছে। একদিকে হীরালাল বাবুর বাড়ী যাইবার রাস্তা, আর তাহার ঠিক বিপরীত দিকে পরেশনাথের বাসায় যাইবার রাস্তা। পরেশনাথ এইবার বলিল,—"এস—এখন আর বাড়ী গিয়ে কি করবে? আমাদের বাসায় একবার বেড়িয়ে যাবে, চল।"

পরেশনাথের বাসায় বেড়াইতে যাওয়ার অন্য একটী অর্থ ছিল; সুতরাং হীরালাল তখন কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, দুই পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। হীরালালকে এইরূপ চিন্তিত দেখিয়া, পরেশনাথ তাঁহার হাত ধরিয়া টানিল। তখন অগত্যা স্রোতমুখে পতিত তৃণের ন্যায় হীরালাল ভাসিয়া চলিলেন। তখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাশক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার আর রহিল না। হীরালালকে বাসায় লইয়া গিয়া পরেশনাথের আনন্দের সীমা ছিল না। অপহৃত বস্তু ফিরিয়া পাইলেও লোকের এত আনন্দ হয় না।

দশম পরিচ্ছেদ।

আমরা এইবার পরেশনাথের পরিচয় দিব। পরেশনাথের সকল পরিচয় আমরা জানি না; তবে যে পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই আমরা এস্থলে প্রকাশ করিব। বর্ত্তমানের সন্নিকটে যে গ্রামে পরেশনাথের নিবাস, সে গ্রামের নাম আমরা জানি না; তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে, সে গ্রামে পরেশনাথের গৃহ বা বিষয়-সম্পত্তি এখন আর কিছুই নাই। পরেশনাথ সে সমস্তই বিক্রয় করিয়া গ্রামের সহিত সম্পর্ক লোপ করিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং সে গ্রামের অনুসন্ধান করিবার এখন আর কোন আবশ্যক নাই।

পরেশনাথ স্কুলে কোন্ অমীদারের সরকারে চাকুরী করিত, আজ ছয় বৎসর হইল, পরেশনাথের সে চাকুরীও গিয়াছে। পরেশনাথ বিনা দোষে কর্ম্মচ্যুত হয় নাই; যে ওরুতর দোষে তাহার কর্ম্ম যায়, সে কর্ম্ম যাওয়ায় পরেশনাথ আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিল। তাহার পর পরেশনাথ কলিকাতায় আসিয়া চাকুরীর উমেদারী করে; কিন্তু কলিকাতায় কোনরূপ চাকুরী না হওয়ায়, পরেশনাথ দালালী-কার্য্যে নিযুক্ত হয়। জমীদারী সরকারে অনেক দিন চাকুরী করায়, সকল প্রকার আদালতের কার্য্য পরেশনাথের বিলক্ষণ জানা ছিল, সেই কারণ কলিকাতায় আসিয়া কোন পক্ষের মকর্দ্দমার তদ্বিরের দ্বারাও পরেশনাথ অনেক সময় বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করিত। আর দালালীর কার্য্যের মধ্যে হাণ্ডনোট ও ক্যাপ্তেনবাবুর দালালী ভিন্ন অন্য দালালীতে পরেশনাথের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। তবে দশ টাকা উপার্জ্জন হইবার আশা থাকিলে পরেশনাথ সকলপ্রকার দালালীর কার্য্যই করিত। আবার সময়ে সময়ে ঘটকালী

করিতেও আমরা পরেশনাথকে দেখিয়াছি। ষ্টেটের উপর পরেশনাথের উপার্জ্জন মন্দ ছিল না। তবে সমস্তে সময়ে তাহাকে অর্থের জন্য অনেক কষ্ট পাইতে হইত, এমন কি কোন কোন দিন অর্দ্ধাভাবে আহার পর্য্যন্ত হইত না। আবার যখন একটা দাঁও মারিত, তখন পরেশনাথের ধুমধাম দেখে কে? যতদিন সে টাকা একবারে নিঃশেষ না হয়, ততদিন পরেশনাথ অর্থ উপার্জ্জনের কোন চেষ্টাই করিত না। অর্থের অনাটন পড়িলে, জাল-জুয়াচুরী প্রতারণা-প্রবঞ্চনা প্রভৃতিতেও পরেশনাথ বিশেষ অভ্যস্ত ছিল। সে সময় দুই চারি টাকার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেও পরেশনাথ প্রস্তুত থাকিত। ফলতঃ, যে কোন উপায়ে হউক, পরেশনাথের অভাব মোচন হইলেই হইল, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি পরেশনাথের কোন ন্যায্য ছিল না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, এত উপার্জ্জনেও পরেশনাথের অভাব ঘুচিত না কেন? তাহার প্রধান কারণ—পরেশনাথ ভয়ানক সুরাপায়ী ছিল, আর স্বচ্ছন্দ অবস্থায় আহার-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বাবুগিরিতেও পরেশনাথ যে-হিসাবী খরচ করিত। অর্থ থাকিলে কিরূপে সেই অর্থের অপব্যয় করিবে, পরেশনাথ তখন কেবল সেই চেষ্টায়ই ফিরিত। ফল কথা—অধর্ম্মের উপার্জ্জনের অর্থ এইরূপেই অপব্যয় হইয়া থাকে।

পরেশনাথের পরিবারের মধ্যে স্ত্রী, দশ বৎসরের এক কন্যা, আর ছয় মাসের এক পুত্র। পরেশনাথের অত্যাচারে দাসদাসী তাহার বাসায় অধিক দিন থাকিতে পারিত না, সর্ব্বদাই দাসদাসীর পরিবর্ত্তন হইত। আবার অনেক সময় কোন দাসদাসী থাকিত না। পরেশনাথের স্ত্রী নিস্তারিণী সহস্তেই সমস্ত গৃহকার্য্য করিত, তাহার বালিকা কন্যা সুখদাও এই বয়সে সমস্ত গৃহকার্য্য শিখিয়াছিল। নিস্তারিণী স্বামীর এত অত্যাচার সহ্য করিত, যে তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। পরেশনাথ প্রতিদিন সুরাপান করিত, আর সুরাপান করিয়া তাহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য ছিল—নিস্তারিণীকে প্রহার করা। সে প্রহারও সহজ প্রহার নয়, সময়ে সময়ে সে প্রহারে নিস্তারিণীর জীবনসঙ্কট পর্য্যন্ত হইত। পরেশনাথের বালিকা কন্যা সুখদাও পিতার অনেক অত্যাচার সহ্য করিত। তবে কেবল মৃত্যুতা অবস্থাতেই পরেশনাথের এই সকল অত্যাচার ছিল, সহজ অবস্থায় এরূপ ছিল না।

এখন, পরেশনাথের সহিত হীরালালবাবুর বন্ধুত্ব কিরূপে হইল, আমরা এইবার তাহা প্রকাশ করিব। পরেশনাথ প্রথম কলিকাতায় আসিয়া যখন চাকুরীর উমেদারী করে, সেই সময় তাঁহার সাহেবের জমিদারীর একজন প্রধান কর্ম্মচারীর আবশ্যক হয়; পরেশনাথ সন্ধান লইয়া হীরালাল বাবুর সহিত এই সময় আলাপ করে, এবং তাঁহাকে একজন সাহেবের প্রিয়-পাত্র জানিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনা করিয়া বসে। জমিদারী-কার্য্যে পরেশনাথ যে বিশেষ উপযুক্ত, তখন হীরালাল বাবুর মনে এইরূপ একটা ধারণা হইয়াছিল। হীরালাল পরেশনাথের চাকুরীর জন্য সাহেবকে অনুরোধ পর্য্যন্ত করেন। সাহেবও পরেশনাথকে চাকুরী দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তবে পরেশনাথ উপযুক্ত জামিন দিতে অক্ষম হওয়ায় তাহার সে চাকুরী হয় নাই। সে সময় পরেশনাথের এরূপ চেষ্টা ছিল যে, হীরালাল বাবুকেই তাহার জামিনের স্বলাভিষিক্ত করিবে; হীরালালের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে তিনিও ইহাতে অস্বীকার ছিলেন না; তবে কেবল তাঁহার বন্ধু

সুরেশ বাবুর অনুরোধে তিনি শেষে একজন অপরিচিত বন্ধুর জামিন হইতে স্বীকৃত হইলেন না।

পরেশনাথ কিন্তু হীরালাল বাবুকে চিনিতে পারিয়াছিল; এরূপ পরোপকারী সরলপ্রকৃতি লোকের দ্বারা ভবিষ্যতে অনেক কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে মনেকরিয়া,পরেশনাথ বন্ধুত্বের ভিত্তি ক্রমে দৃঢ় করিতে আরম্ভ করিল। এইক লিকাতায় হীরালাল বাবুর সহিত অনেক বড়-লোকের বন্ধুত্ব ছিল, সুতরাং পরেশনাথের বিষয়-কার্য্য-সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক সাহায্য হীরালাল বাবু করিতেন। ইহা ব্যতীত অর্থের অনাটনেও পরেশনাথ-সম্বন্ধে হীরালাল মুক্তহস্ত ছিলেন। সুতরাং এরূপ একটী উত্তম শিকার পরেশনাথ কি সহজে ছাড়িতে পারে? তবে সত্যের অনুরোধে আমরা এই কথা বলিতে বাধ্য যে, পরেশনাথ হীরালালের এরূপ একজন মনস্কামনাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিল যে, অন্যে তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট করিলে, পরেশনাথ প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকিত। তবে তাহার নিজের স্বার্থের জন্য বন্ধুর মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি করা পরেশনাথের কুষ্ঠিতে কখন লেখে নাই। সেই কারণ, আপনার কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে পরেশনাথ কাহারও শুভাশুভ দেখিতে বাধ্য ছিল না। হীরালালের অসাধারণ ওণই অনেক সময় দোষের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। সেই কারণেই পরেশনাথ এই অসাধারণ বন্ধুরত্ন লাভ করিয়াছিলেন।

হীরালাল যে সুরপাড়ী হইয়াছিলেন,তাহার মূলও এই পরেশনাথ। আমরা হীরালালকে যেরূপ সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান বলিয়া জানি, তাহাতে কেবল শরৎকুমারীর নির্বুদ্ধিতাই হীরালালের অধঃপতনের কারণ নয়। পরেশনাথের কৌশলজালে আবদ্ধ হইয়া হীরালাল শরৎকুমারীর হৃদয়নিহিত গভীর প্রণয়ের কোন অনুসন্ধান লইতেন না। পরেশনাথ তাহার স্ত্রীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিত, সে পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। এহেন বন্ধু সহবাসে শরৎকুমারী তাহার স্বামীর নিকট আর অধিক কি আশা করিতে পারে?

নৈদাঘ নিশীথ-স্বপ্ন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বন।)

(ত্রিতারার সহ চরীগণ-সহ প্রবেশ।)

ত্রি। আইস সকলে,
ঝরেক পাখিয়া গাও অপ্সরা-সঙ্গীত,
যাও তার পরে কেহ, ফেলিতে বাহিয়া
গোলাপের ক্ষুদ্র পোকা, মল্লিকা বেলার;
ওই যে কর্কশকণ্ঠ ঘুরন্ত পেচক—
তুলেছে বিকট ধ্বনি-বিজন অরণ্যে—
তাড়াও তাহারে কেহ;কেহ-বা কোমল
শীতল সঙ্গীত-স্বরে, নিদ্রাসুখকরী
নয়নপল্লবে মম কর আকর্ষণ।

(পরীদিগের গান এবং ত্রিতারার নিদ্রা।)

পরী।—চল, আমরা যাই, রাণীর নিদ্রা হয়েছে। একজন মাত্র দূরে প্রহরী থাক।

(প্রস্থান।)

(অনঙ্গের প্রবেশ এবং ত্রিতারার নেত্রে পুষ্পরস প্রদান।)

অ।—দেখিবে যাহারে নয়ন খুলি,
তার প্রেমে যাবে জগত ভুলি,
কাঁদিবে বিষাদ-লহরী তুলি,
হ'ক সে বানর, অথবা নর,
বনের বরাহ, আকাশচর,
হবে প্রাণ হ'তে অধিকতর।

(প্রস্থান।)

(বিন্দোদ এবং প্রমদার প্রবেশ।)

বি।—বন-পর্য্যটনে তুমি ক্লান্ত প্রিয়তমে!
ভুলিয়াছি পথ আমি যেন মনে লয়,
এখানে বিশ্রামি প্রিয়ে, যাবত গগনে
আনন্দ-প্রভাত-রশ্মি না হয় উদয়।
প্র।—বিনোদ, তোমার শয্যা কর অন্বেষণ,
আমি এই দুর্ব্বাদলে পাতিব শয়ন।
বি।—মম ভুজোপরে রাখ মস্তক সুন্দর,
এক প্রাণ, এই শয্যা, দুই কলেবর।
প্র।—না—না নাথ! ক্ষম এই কুমারী বালায়,
রমণীর লজ্জারত্ন অমূল্য ধরায়।
জানি আমি তব প্রেম অমর অচল,
তথাপি সঙ্কোচ, নারী-হৃদয় দুর্ব্বল।
বি।—বিনোদের প্রেম, প্রিয়ে, বিনোদের প্রাণ,
প্রেম যাবে, প্রাণ রবে, প্রেয়সী আমার!
ভাবিও না মনে। নিশি হয় অবসান,
নিদ্রা যাও, নিদ্রা যাব অদূরে তোমার।

(উভয়ের নিদ্রা।)

(পঞ্চুর প্রবেশ।)

প।—বাবা! বনে ঘুরে ঘুরে প্রাণটা গেল; কে কা কেও ত পেলেম না যে, ফুলের রস তাকে দিয়ে প্রেমের ঢেউ তুলে একবার মজা দেখি। বা! এরা কে? এও ত একটী পুরুষ এবং একটী স্ত্রীলোক দেখ্‌ছি। আচ্ছা, নাক দেখে ঘুমুচ্ছে! বাবা! মাটিতে পড়ে এত ঘুম! তবে এরাই বা হবে? দিব্যি স্ত্রীলোকটী! ভয়েতে এই বেটা কাটখোট্টার কাছে শোয় নাই। বেটা চাষা! ঘুমোও তুমি, তোমার চোকে পুরোমাত্রায় এই পীরিতের রস ঢেলে দিচ্ছি! যা ঘুমোচ্ছ এই,এবার জাগ্‌লে আর শীঘ্র ঘুমের ভাবনা ভাব্‌তে হবে না। কায ত হলো, আমি এখন অনঙ্গের কাছে যাই।

(প্রস্থান।)

(বিপিন এবং মানদার প্রবেশ।)

মা।—বিপিন! আমাকে যুন কর্ত্তে হয় কর, তথাপি একবার দাঁড়াও।

বি।—দেখ, আমি তোমাকে বার্‌বার্ বলছি—ভাল হবে না, তুমি আমার পিছুপিছু এস- না।

মা।—প্রাণেশ্বর! তুমি কি আমাকে এরূপে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? না, এত নিষ্ঠুর হইও না।

বি।—তোমার যদি লজ্জাভয় কিছুই না থাকে, তুমি থাক; আমি চল্লেম।

(প্রস্থান।)

মা।—আর ত পারি না; প্রাণ যায় যে আমার?

(দ্রুত নিশ্বাস।)

যত উপাসনা, যুবা বাড়িছে তাহার।
প্রমদাই সুখী, চারু নয়ন তাহার,
না জানি কতই শোভা, সৌন্দর্য্য-আধার।
কিসে নেত্রে তার, এত হইল উজ্জ্বল?
অশ্রুতে? আমারও ত নয়নে জল
ঝরে দিবানিশি;—না—না, কুরঙ্গিণী আমি,
পলে পলায়েছে দূরে দেখি তফাতি।
বিপিন মানব, তবে কি দোষ তাহার,
আমায় পিশাচী মত করে পরিহার।
জানিলাম—প্রবঞ্চক আরসি আমার

তুমনে আমার নেত্র সহ প্রমদার
বিস্ফারিত নেত্র সহ।

একি? বিনোদ? মাটিতে শুয়ে? মৃত না জীবিত? কৈ, কোন অঙ্গ কি ক্ষত তো দেখ্‌ছ না? বিনোদ? ও বিনোদ? বিনোদ? বি।—দহিব অনলে আমি তোমার কারণ।
নিৰ্ম্মলা মানস, স্বচ্ছ দরপণ মত
বক্ষ তব, অন্তরালে কোমল হৃদয়
ওই দেখিতেছি আমি। কোথায়, বিপিন, মরিবে পাপিষ্ঠ আজি, করবালে মম।

মা।—ছি! ছি! বিনোদ, অমন কথা বলো না। বালাই! সে তোমার প্রমদাকে ভালবাসে বলেই বা কি হলো, তোমার প্রমদা ত তাকে ভালবাসে না? তবে, বাপু, তোমার সুখের ব্যাঘাত কি?

বি।—সুখ? প্রমদার প্রেমে সুখ?
অনুতাপে মরি,
কিযে কষ্টে কাল তার অনুরাগে পড়ি
কাটাচ্ছ? প্রমদা নহে—মানদা আমার প্রাণেশ্বরী! প্রাণেশ্বরী! বিনিময়ে তার, চাহি না ইন্দ্রের শচী; মন্মথমোহিনী মানদা! আমার তুমি জীবনসঙ্গিনী। মনের বাসনা প্রিয়ে, জ্ঞানের অধীন, সে জ্ঞানে বুঝিনু, রূপ তোমার অসীম। সময়েতে ফুটে ফুল; সময়ে আমার হলো, এতদিনে প্রিয়ে, জ্ঞানের সঞ্চার। কাঁরল-তোমারে চারু-নয়নে, মোহিত, অসম প্রেমের কার্য্য যথায় লিখিত।

—মা।—বিনোদ! কেন আমার প্রতি এই উপহাস? আমি কিসে তোমার এই উপহাসভাজন হইলাম? ইহা কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নহে যে, বিপিনের কাছে আমি ঘৃণিত; এক দিন, এক বার, তাহার একটী সুদৃষ্টি পাইতে পারিলাম না! তার উপর তুমিও কি আমার রূপ নাই বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলে? কেন আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার? কেন এরূপ ঘৃণিতভাবে আমাকে তোমার ভালবাসা জানাচ্ছ? আমি জানিতাম, তুমি ভদ্রতার আদর্শ—

হা অদৃষ্ট! এক জন ঘৃণা করে যারে,
সমস্ত জগত কি গো উপহাসে তারে?
(প্রস্থান।)

বি।—ভাগ্যিস প্রমদাকে দেখে নাই! প্রমদে! তুমি সুখে নিদ্রা যাও, কিন্তু আর বিনোদের নিকট এসো না। যেমন অতি মিষ্টি খাইলে টক্ খাইতে ইচ্ছা করে, কিম্বা যে দুষ্কর্ম্মের দ্বারা লোক একবার প্রতারিত হয়, তাহাকে যেরূপ ভয়ানক ঘৃণা করে, আমারও সেইরূপ হইয়াছে। আমার আর ইহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে না। যাই, দেখি, মানদা কোথায় গেল। প্রাণপণে তাহার প্রণয় পাইবার চেষ্টা করিব।
(প্রস্থান।)

প্র।—উঃ! মলেম গো! বিনোদ! আমায় রক্ষা কর। আমার বুকের উপর থেকে এই সাপটি টেনে ফেল। উঃ! একি ভয়ানক স্বপ্ন! বিনোদ! দেখ, ভয়ে আমার গা কাঁপছে। আমার বোধ হচ্ছিল, যেন একটী সাপ এসে আমার অন্তঃকরণটী খেয়ে ফেল্‌ছে, আর তুমি তামাসা দেখ্‌ছ, আর হাস্‌ছ! বিনোদ!—একি?—কোথায়? বিনোদ! প্রাণ! একি?—শব্দের সঙ্গে চলে গেলে নাকি? কোন শব্দ কোন কথাই শুনা যাচ্ছে না যে! সর্ব্বনাশ!—তুমি কোথায় গেলে? দোহাই তোমার, কথা কও, আমি ভয়ে মূর্চ্ছা যাচ্ছি যে! সে কি, তবে কি সত্য সত্যই তুমি আমার নিকটে নাই! তোমাকে পাই, আর মৃত্যুকেই পাই!—
(ত্রাসে বেগে প্রস্থান।)

মতামত।

পুস্তক সম্বন্ধে

কুমার-সম্ভব।— বঙ্গানুবাদ—১ম হইতে ৬ষ্ঠ সর্গ।—ভদ্রক হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত। মূল্য ॥৵০

কালিদাসের কুমারসম্ভব অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার,বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। সুললিত বাঙ্গালা কবিতায় সেই সৌন্দর্য্য প্রকটন করিয়াছেন। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। এরূপ পুস্তক প্রচারে ভাষার পরিপুষ্টি সাধিত হয়, বলিতে পারা যায়।

জ্বর-চিকিৎসা।—৩য় ভাগ—শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী মৈত্র এম-বি প্রণীত ও কলেজ ষ্ট্রীট মৈত্র কোম্পানীর হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

মৈত্র মহাশয় কলিকাতার একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞ-বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। এই তৃতীয় খণ্ডে সুন্দর প্রণালী-ক্রমে চিকিৎসিত রোগীর বিবরণসহ ঔষধপ্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। পুস্তকখানি বড়ই উপযোগী হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের এ পুস্তক তো উপকারে আসিবেই; অধিকন্তু, মৈত্র মহাশয়ের তিন খণ্ড 'জ্বরচিকিৎসা' মনোনিবেশ-পূর্ব্বক পাঠ করিলে, প্রত্যেক গৃহস্থ ব্যক্তিও যে প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইবেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়। ফলতঃ এরূপ পুস্তকের সর্ব্বত্র প্রচার হয়, ইহাই আমাদের বাসনা।

পত্র-পঞ্জিকা।—৩১নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, মুর্গিহাটা, হইতে এ, সি মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা প্রকাশিত। বিনামূল্যে বিতরিত।

এই পত্র-পঞ্জিকায় ১৩০১ সালের ইংরাজী ও বাঙ্গালা মাস, তিথি ও বার প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে। দেখিতে সুন্দর বটে। আধ আনার টিকিট পাঠাইলে,১০খানা পাইতে পারা যায়।

রঙ্গভূমি-সম্বন্ধে।

মিনার্ভা থিয়েটার।—সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, বড়ই সুকৌশল-সুদক্ষতার সহিত মিনার্ভা-রঙ্গালয়ের পরিচালনা করিতেছেন। দেশের রুচি বুঝিয়া —লোকের মন বুঝিয়া, ওস্তাদী ধরণে, এমন সুশৃঙ্খলভাবে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃত্ব-করণ—গিরীশ বাবুর মত উপযুক্ত ব্যক্তিরই ক্ষমতাধীন। ফলতঃ মিনার্ভা-রঙ্গালয়ে সাধারণে সন্তুষ্ট, লোকসমাগমও যথেষ্ট, দর্শকের পরিচর্য্যাদির বন্দোবস্তও প্রচুর।

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার।—এই রঙ্গ-ভূমির পরিচালকেরা পুরাতন ভাল ভাল নাটকের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া, আমরা সুখী হইলাম। কেবল পুরাতন নাটক নয়, অভিনেতৃগণের ও অভিনেতানের মধ্যেও সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন লোক দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। গীতি নাট্যের (Melo Drama) অভিনয়ে এই সম্প্রদায় বিশেষ পারদর্শী।

নিবেদন।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়েরা অদ্যাবধি "অনুসন্ধানের" অষ্টম বর্ষের (১৩০১সালের) অগ্রিম মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন একটু সত্বর তাঁহাদের টাকা চারিটী পাঠাইয়া দেন। 'সাপ্তাহিক অনুসন্ধান' যেরূপ ব্যয়বাহুল্য গুরুতর ব্যাপার, ভরসা করি, সে সকল বিষয় চিন্তা করিয়া, মূল্যের টাকা চারিটি পাঠাইতে কেহই বিরত হইবেন না।

বিশেষ, আরও পরে টাকা দিলে, পঞ্চাদ্ধের হারে তাঁহাদিগকে টাকা দিতে হইবে, স্মরণার্থ নিবেদন। নিয়মিত পত্রিকা পাইয়া, কেহই যে নিয়মের ব্যত্যয় করিবেন না, সম্পূর্ণ ভরসা করি।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী, কার্য্যাধ্যক্ষ।
অনুসন্ধান-কার্য্যালয়, ১৮৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"অনুসন্ধানের" নিয়মাবলী।

১। গ্রাহক-নম্বর ব্যতীত, কি ঠিকানা-পরিবর্ত্তন, কি টাকা জমা, কোন কার্য্যই হয় না। প্রতিবারের কাগজের মোড়কে গ্রাহক-নম্বর থাকে।

২। "সাপ্তাহিক অনুসন্ধানের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই, ৪৲ চারি টাকা। পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৫৲ পাঁচ টাকা।

৩। পুরাতন গ্রাহকগণ নূতন বর্ষের প্রথম কাগজ-প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে এবং নূতন গ্রাহকগণ এক মাস মধ্যে টাকা দিলেই অগ্রিম হিসাবে গৃহীত হইবে; তৎপরে টাকা দিলে, পশ্চাদ্দেয় হিসাবে জমা হইবে।

৪। কের কোন সংখ্যা না পাইলে, তৎপর-সংখ্যা-প্রাপ্তির পরই জানাইতে হইবে। ঊর্দ্ধপক্ষে দুই সংখ্যা না পাইলে, নিয়মিত সময়ান্তে, তৎক্ষণাৎ তাহা জ্ঞাতব্য। অধিক পরে জানাইলে, আমরা তাহার দায়ী হইব না। সে ক্ষেত্রে প্রতি সংখ্যার দাম ৵০ আনা।

৫। লেখকগণ ভিন্ন, পত্রোত্তর-প্রার্থী হইলে, রিপ্লাই কার্ডে বা টিকিট-সহ পত্র লিখিতে হয়।

'অনুসন্ধানে' বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

(ক) বিজ্ঞাপনের মূল্য—এক বৎসর কোন বিজ্ঞাপন চলিলে, প্রতিবার প্রতি ছত্র এক আনা। প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲ পাঁচ টাকা।

তদ্ভিন্ন, একবারের জন্য—প্রতি ছত্র ।০ চারি আনা; এক মাসের জন্য প্রতি ছত্র প্রত্যেক বার ৵০ আনা; তিন মাসের জন্য—প্রতিবার প্রত্যেক ছত্র ৵০ আনা; ছয় মাসের জন্য—প্রতিবার প্রতি ছত্র ৵১০ আনা।

কি বিজ্ঞাপনের টাকা, কি গ্রাহকগণের দেয় টাকা, 'অনুসন্ধান'-সংক্রান্ত সকল টাকাকড়ি সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
'অনুসন্ধান'-কার্য্যালয়, ১৮৯ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান।

অষ্টম বর্ষ। ১লা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। সপ্তম সংখ্যা।

ভূষণ।

(খাম্বাজ।)

অন্তরে ভূষণ, মদনমোহন, ব্রজের বিনোদ রায়।
বাহিরে ভূষণ, শ্যামের পীরিতি, যখান সকল গায়।

হৃদয়ে ভূষণ, সে করপল্লব, অধরে ভূষণ নাম।
নয়নে ভূষণ, সে শ্যাম-মূরতি, মধুর সুন্দর ঠাম।

গোকুল ভরিয়া, কলঙ্ক-ভূষণ, কুজনে সতত গায়।
করের ভূষণ, সে পদ্ম-পল্লব, সুনীল বসন গায়।

নাসার ভূষণ, শ্যামল তিলক, শ্যামল শেখর গন্ধ।
কোলের ভূষণ, নীলকান্ত মণি, সৌরভে ভ্রমর অন্ধ।

সর্ব্বাঙ্গ-ভূষণ শ্যামের পীরিতি, কীরিতি আমার ভাল।
কুঞ্জের ভূষণ, গোপিনী-রঞ্জন, রূপেতে গোকুল আলো।

শয়নে ভূষণ, শ্যাম-আলিঙ্গন, স্বপনে ভূষণ শ্যাম।
শ্রবণ-ভূষণ, সুধুই শুনিতে, সুন্দর বঁধুর নাম॥

অন্তরে বাহিরে, ভূষণ আমার, ব্রজের বিনোদ রায়।
কহে রসরাজ, কেন হরিনাম, লেখনা সকল গায়?

অবতার প্রয়োজন ও বুদ্ধাবতার।

(৩)

আমরা ইতিপূর্ব্বে বুদ্ধাবতার-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি, পাঠকগণ তাহাতে ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশই দেখিয়াছেন। ফলতঃ বুদ্ধাবতারের পরেও যে অনেক পুরাণ রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; অতএব এই সকল পুরাণে ভূতকালের নির্দ্দেশ থাকাই স্বাভাবিক। পরন্তু বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন পুরাণে বুদ্ধদেব-সম্বন্ধীয় শ্লোকসকল প্রক্ষিপ্ত হওয়াও অসম্ভাবিত নহে। কেন-না, অনেক পুরাণেই নানাবিষয়ক প্রক্ষিপ্ত বচনাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণে কায়স্থজাতি-সম্বন্ধে কতিপয় প্রক্ষিপ্ত বচন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ঐ উহাতে কায়স্থজাতির "ঘোষ-বসু" প্রভৃতি আধুনিক উপাধির পর্য্যন্ত উল্লেখ দেখা যায়। পূর্ব্বাপর-সমন্বয়-জ্ঞানবিহীন পরবর্ত্তী গণ্ডিত-নামধারীদিগের দ্বারা এইরূপে পুরাণাদি বহুশাস্ত্র দূষিত হইয়াছে। এই দূষণ নিমিত্ত প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বও ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। যে যাহা হউক, সম্প্রতি এ প্রবন্ধে পুরাণ-সম্বন্ধে আর অধিক কিছু না লিখিয়া, বৌদ্ধদিগের কতিপয় প্রধান সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত সঙ্ক্ষেপে লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যে যে সকল বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন সরস্বতীর প্রস্থান-ভেদ প্রভৃতি পুস্তকে যে সকল বৌদ্ধমত লিখিত আছে, আমরা তাহারই অনুবাদ করিব। প্রস্থান-ভেদে বৌদ্ধদিগের ছয়টি মাত্র সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, চার্ব্বাক ও দিগম্বর। মাধ্যমিকাদি চারি সম্প্রদায় সাধারণতঃ সৌগত নামে অভিহিত হয়। মতান্তরে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-মাত্রই 'সৌগত' নামে উক্ত হইয়া থাকে। আর বেদান্ত-ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য, যে "লোকায়তিক" মতের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন, "চার্ব্বাক"। এই লোকায়তিক সম্প্রদায়েই অন্তর্গত। উক্ত উভয় মতের কিছুমাত্র বৈশিষ্ট নাই। ইহাদিগের ভীষণ নাস্তিকতার বিষয় যথাস্থানে অতঃপর পরিব্যক্ত হইবে। পরন্তু দাক্ষিণাত্যের নর্ম্মদানদী-তীরে ধর্ম্মপ্রচারকালে বুদ্ধদেব যাহাদিগকে "অহৎমৎ মহাধর্ম্ম" এই উপদেশ প্রদান করেন * এবং তজ্জন্য তিনি নিজে "অর্হত" এবং সেই সকল উপদিষ্ট ব্যক্তি "আর্হত" নামে খ্যাত হন। সেই "আর্হত" সম্প্রদায়ের নামান্তরই দিগম্বর। উল্লিখিত ৬ ছয় সম্প্রদায়ের নাম-লক্ষণাদি নিম্নে লিখিত হইতেছে। যথা;—

১। মাধ্যমিক। ইহাঁরা শূন্যবাদী; ইহাঁদিগের মতে—সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্য ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। শূন্য হইতেই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে এবং শূন্যেই ইহার বিলয় হইবে। মাধ্যমিকেরা বলেন—যে সমস্ত বস্তু স্বপ্নাবস্থাতে দৃষ্ট হয়, জাগ্রতাবস্থাতে তাহার কিছুই দেখা যায় না। পরন্তু জাগ্রতাবস্থাতে যে সকল বস্তু দেখা যায়, স্বপ্নাবস্থাতে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না, আর সুষুপ্তি অবস্থাতেও কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না। অতএব, কোন বস্তুই যে সত্য নহে, ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে।

২। যোগাচার। ইহাঁরা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী, ক্ষণিক সুখই ইহাঁদিগের মতে পরম পুরুষার্থ, ক্ষণিক বিজ্ঞানকেই ইহাঁরা বিশ্ব-সৃষ্টির মূল কারণ বলেন। ক্ষণিক বিজ্ঞান দুই প্রকার; যথা,—প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ও আলয়-বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ও সুষুপ্তি অবস্থাতে যে জ্ঞান হয়, তাঁহাকে আলয়-বিজ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞান কেবল আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

৩। সৌত্রান্তিক। ইহাঁদিগের মতে—জ্ঞান দ্বারা যে ক্ষণিক বাহ্য পদার্থের অনুমান করা যায়, তাহাই পরম পুরুষার্থ। অর্থাৎ বাহ্যার্থ জ্ঞান ব্যতীত পদার্থান্তর নাই।

৪। বৈভাষিক। ইহাঁরা বলেন—ক্ষণিক বাহ্যার্থই পরম পুরুষার্থ; কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, জ্ঞানসিদ্ধ নহে। তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ইহাঁরা প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যতীত বেদাদি অন্য কোন প্রমাণ স্বীকার করেন না।*

* বুদ্ধদেবের নামান্তর "সুগত"; সুতরাং বৌদ্ধসাধারণের নাম "সৌগত" হওয়াই সঙ্গত। বুদ্ধদেব, বহুনামে খ্যাত হইয়াছেন। বৌদ্ধপণ্ডিত মহামতি অমরসিংহ তাঁহার নিজকৃত "অমরকোষ" অভিধানে বুদ্ধদেবের যে সকল নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহার অনুবাদ করা যাইতেছে। যথা,—সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, বুদ্ধ, ধর্ম্মরাজ, তথাগত, সমন্তভদ্র, ভগবান্, আদিব্রিক, লোকজিৎ, জিন, ষড়ভিজ্ঞ, দশবল, অদ্বয়বাদী, বিনায়ক, মুনীন্দ্র, শ্রীমান্, শাস্তা, মুনি, শাক্যমুনি, শাক্যসিংহ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, শৌদ্ধদনি, গৌতম, অর্কবন্ধু ও মায়াদেবী-সুত।

'অমরবিবেক' নামে 'অমরকোষের' যে প্রসিদ্ধ টীকা আছে, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, সর্ব্বজ্ঞ হইতে মুনি পর্য্যন্ত যে ১৮টী নাম, ইহাই আদিবুদ্ধের—আর শাক্যমুনি হইতে মায়াদেবীসুত পর্য্যন্ত যে সাতটী নাম, ইহা বুদ্ধের অবান্তর-ভেদ যে শাক্যমুনি, তাঁহারই। যথা,—ইত্যষ্টাদশ বুদ্ধস্য। শাক্যমুনি-শাক্যসিংহ-সর্ব্বার্থসিদ্ধ-শৌদ্ধদনি-গৌতম-অর্কবন্ধু-মায়াদেবী-সুত ইতি সপ্তনামানি বুদ্ধাবান্তরভেদস্য শাক্যমুনেঃ। (বোম্বাই রাজকীয় পুস্তকালয়াধ্যক্ষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত অমরকোষাভিধান)।

এতদ্দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, বিষ্ণু

* অনেক প্রকার প্রমাণ থাকিলেও, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (বেদ) আর্য্যশাস্ত্রের এই তিনটি প্রধান প্রমাণ। এই তিন প্রমাণ যাঁহারা স্বীকার না করেন, আর্য্যশাস্ত্রমতে তাঁহারা নাস্তিক; সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রমতে বৈভাষিকেরাও যে নাস্তিক, ইহা বলা বাহুল্য। ভগবান বুদ্ধদেব বেদের হিংসাপ্রধান যজ্ঞভাগের মূলে আদর করেন নাই; কিন্তু তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ের অনেকেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে

৫। চার্ব্বাক। ইহারা দেহাত্মবাদী। অর্থাৎ দেহ ব্যতীত অন্য পৃথক্ আত্মা স্বীকার করে না। যে দেহ সেই আত্মা। দেহের বিনাশেই মৃত্যুর, আত্মারও বিনাশ হয়। চার্ব্বাকেরা বলেন, ক্ষিতি, জল, অগ্নি ও বায়ু—এই চারিভূতের সম্মিলনে দেহের উৎপত্তি হয়। যদিও ভূতসকল অচেতন, তথাপি তৎসকল মিলিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতেচৈতন্য জন্মে। *

হরিদ্রা পীতবর্ণ ও চুণ শুভ্রবর্ণ; কিন্তু উভয়ের সম্মিলনে রক্তবর্ণের উৎপত্তি হয়। এইরূপ, দেহ অচেতন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইলেও, তাহাতে চৈতন্যোৎপত্তি অসম্ভব নহে। আমি কৃশ, আমি স্থূল ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারেও আত্মাই স্থূল-কৃশাদি-রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে—দেহই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা নাই। এমতে প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর প্রমাণ নাই। উত্তম অশন, বসন ও স্ত্রীসম্ভোগাদি সুখই পরম পুরুষার্থ। সুখের অনুষঙ্গী, অবশ্যম্ভাবী, দুঃখ-ভোগের ভয়ে সুখোপভোগ পরিত্যাগ করা মূর্খের কার্য্য। পশুদ্বারা শস্যাপচয়ের ভয়ে কৃষক কখনই বীজবপনে ক্ষান্ত হয় না; ইত্যাদি। বৃহস্পতি নামক নাস্তিক আচার্য্য বলেন,—স্বর্গ, অপবর্গ, পরলোক সকলই মিথ্যা। বর্ণাশ্রমাচারের কোন ফল নাই। অগ্নিহোত্র, বেদ, দণ্ডধারণ ও ভস্মগুণ্ঠন এসকল বুদ্ধি, পৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশু হনন করিলে সেই পশুর যদি স্বর্গলাভ হয়, তবে যজ্ঞকারী ব্যক্তি পশুর পরিবর্ত্তে তাহার পিতাকে কেন হনন না করে। শ্রাদ্ধান্ন-ভোজনে যদি মৃতব্যক্তির তৃপ্তিবৃত্তি হইতে পারে, তবে বিদেশ-গত আত্মীয়-স্বজনকে পাথেয় না দিয়া বাটীতে তাহার শ্রাদ্ধ করিলেই হয়। জীবাত্মা শরীর ত্যাগে যদি পরলোকে যাইতে পারে, তবে বন্ধুগণের স্নেহবশতঃ পুর্ব্ব-দেহেই কেন আগমন না করে? মৃত ব্যক্তির প্রেতকার্য্য শ্রাদ্ধ কিছুই নহে; উহা কেবল ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় মাত্র। ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোক-মিলিত হইয়া বেদ-রচনা করিয়াছে। অশ্বমেধ-যজ্ঞে যজমান-পত্নীর অশ্বের শিশ্ন গ্রহণ করিবার বিধি ভণ্ডের, স্বর্গ-নরকাদির বিষয় ধূর্ত্তের ও মৎস্য মাংস-ভোজনের বিধি রাক্ষসের প্রণীত।

মাধ্যমিক হইতে বৈভাষিক পর্য্যন্ত চারি সম্প্রদায়ের সাধারণ নাম "সৌগত"। সৌগত-মতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও শিশ্ন এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্র এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়। পঞ্চ মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশায়তন শরীরের সম্যক্ শুশ্রূষা করাই প্রধান কর্ম্ম। এমতে দেবতা সুগত, জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, প্রত্যক্ষ ও অনুমান দুই প্রমাণ। দুঃখ, আয়তন, সমুদায় ও মার্গ এই চারি তত্ত্ব। বিজ্ঞান-স্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কার-স্কন্ধ, ও রূপস্কন্ধ, এই পঞ্চস্কন্ধকে দুঃখতত্ত্বকহে। পঞ্চেন্দ্রিয়, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এই পাঁচ বিষয় এবং মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশটি আয়তন-তত্ত্ব। মনুষ্যাদিগের অন্তঃকরণে স্বাভাবিক যে রাগ-দ্বেষাদি জন্মে, তাহা সমুদায়-তত্ত্ব নামে অভিহিত হয়। সকল সংস্কারই ক্ষণমাত্রস্থায়ী—এইপ্রকার যে স্থির বাসনা, তাহার নাম মার্গ-তত্ত্ব। এই মার্গতত্ত্বই মোক্ষ। চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্ণভোজন, সমূহা-জ্ঞান ও রক্তাম্বর এই সকল বৌদ্ধলিঙ্গের মতে ধর্ম্মের অঙ্গ।

* অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবায়ুনভোনলাঃ।
চতুভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যং সুপজায়তে॥

ইত্যাদি।

* ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং। ভস্মগুণ্ঠনং।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে নমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হন্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চ তৃপ্তিকারকং।
গচ্ছন্তামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়-কল্পনং॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেহ-বিনির্গতঃ।
কস্মান্ন্যুদ্যে ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নন্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ।
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্ত নিশাচরাঃ।
জর্ফরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতং॥
অশ্বস্যাত্রহি শিশ্নস্য পত্নীগ্রাহ্যেতি প্রকীর্ত্তিতং।
তদ্বেত্তৃন্নরকে ঘোরে গ্রাহয়ন্তীতি প্রকীর্ত্তিতং॥
মাংসানাং খাদনং তদ্বৎ নিশাচর সমীরিতং।

(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ।)

মানবাত্মার ইতিহাস।

রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে আকাশের গা হইতে সরিয়া গেল; সূর্য্যদেব রাঙা আলো গায়ে মেখে, অপরূপময় রাঙা আলো ছড়াইতে ছড়াইতে, নীল আকাশে রাঙামুখে দেখা দিলেন। শিশির-স্নাত রক্ত-পট-বস্ত্রপরিহিত জগৎ, পবিত্র দেহে, পবিত্র-মনে, বিশ্বপ্রষ্টার পূজা করিতে আসিল। প্রাতঃসমীরণ, জীবের কানে অনন্ত-দেবের অনন্ত করুণার মধুর গীতি গাহিতে গাহিতে ছুটিল। পাপ ভুলিয়া—শোক-তাপ-যন্ত্রণা ভুলিয়া, যেন বিশ্বমণ্ডলীর সমগ্র জীব এক বিরাট স্তুতিগানে জগৎ-কর্ত্তার মহিমা-ঘোষণায় নিযুক্ত হইল। একসুরে সব প্রাণ নাচিতেছে, এক আনন্দে সব হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে—ঈশ্বর-প্রেমের প্রবল-স্রোতে জীব ভাসিয়া চলিয়াছে। কি জানি কি এক শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, মানবের মন ঈশ্বরের সিংহাসন-প্রান্তে আসিয়া পড়িল; স্রষ্টা ও সৃষ্টের মধ্যে ব্যবধান দূরতা কমিয়া আসিল।

বেলা হইতে লাগিল। প্রকৃতি হইতে স্নিগ্ধতা, মধুরতা, সে দিব্যভাব লুপ্ত হইল। বিশাল আকাশ, সংসারের মত দয়ামায়াশূন্য নিষ্ঠুর-দৃষ্টিতে মানুষের পানে চাহিয়া রহিল। কর্ম্মক্ষেত্রের কোলাহলে সে স্তুতিগান অস্পষ্ট হইয়া আসিল। মানুষ-মন তাহার ক্ষণিক পবিত্রতা হারাইল। কুপ্রবৃত্তিরা, পবিত্রতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, স্বার্থকে রাজাসনে বসাইল। বিষয়-বাসনার উন্মাদ-উত্তেজনায় উন্মত্ত মানব, সংসার-জনতার প্রবল-স্রোতে—স্বার্থের উত্তাল তরঙ্গে, স্বর্গদ্বার হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। সায়াহ্নে আবার, স্নাত-প্রতিস্নাতে অবসন্ন অনুতপ্ত-হৃদয় মানব, পুনর্ব্বার শান্তি চাহিল, প্রভাতের সে পবিত্রতা খুঁজিল, যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেইখানে ফিরিয়া যাইতে তাহার প্রাণ কাঁদিল।

জীবনের প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা কি ঠিক এইরূপ নহে? কে না স্বীকার করিবে যে, জীবনের প্রারম্ভে আমরা ঈশ্বরের অধিকতর নিকটে ছিলাম এবং বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন পবিত্রতা হারাইতেছে—আমরা স্বর্গরাজ্য হইতে দূরে আসিয়া পড়িতেছি? "শিশু ঈশ্বর-মহিমার জলন্ত প্রতিকৃতি" দেখিতে পায়, বৃদ্ধের জ্ঞান—অন্ধ, অস্পষ্ট। মানুষ যত সংসারের তীব্র সুরাপান

করে,ততই তাহার দিব্যভাব লুপ্ত হয়,ততই সে ভুলিয়া যায় যে—সে স্বর্গ হইতে আসিয়াছে, স্বর্গই তাহার প্রকৃত আবাস।"* এ নূতন কথা নহে ; বোধ হয়, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে লোকে এই কথা ভাবিয়াছিল। কত কবি,কত দার্শনিক, কত গ্রন্থকার—ভগন্ (Vaughan) †, হুড (Hood), শেলী (Shelly), ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) গাহিয়াছেন ; ডেকন্, ডিকেন্স (Diekens"), ল্যাম্ব (Lamb), ডিকুইন্সি (Dequincey) তাহার প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন। কবি দার্শনিকদের কথা ছাড়িয়া দেও ; যিনি ঈশ্বর-পুত্র বলিয়া সংসারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের দ্বারা উপাসিত হইতেছেন, যাঁহার বাক্য ঈশ্বর-বাক্য না হইলেও জ্ঞানগর্ভ ও নীতিপূর্ণ বলিয়া জগৎময় স্বীকৃত, তিনিই বলিয়াছেন,—"হে ঈশ্বর, তুমি যাহা বুদ্ধিগর্ব্বিত ও জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিদিগকে দেখাও নাই, তাহা শিশুদিগকে জানিতে দিয়াছ।" (Thou hast hid these things from the wise and the prudent and hast revealed them unto babes." Mat.xi. 25.)

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, ইহা যদি সত্য হয়,তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে,বয়োবৃদ্ধি-সহকারে উন্নতি না হইয়া অবনতি হইতেছে। সক্রেটিস ও প্লেটোর "জ্ঞানই ধর্ম্ম"; লকের (Lockeএ) 'টেবিউলা রোসার' (Tabula Rosa) তাহা হইলে কি উত্তর হইবে ?

১। সক্রেটিস্ বলেন—জ্ঞানই পুণ্য, কাজেই অজ্ঞানতা বা জ্ঞানাভাবই পাপ। জানিয়া শুনিয়া কেহ যে কখন পাপাচরণ করিতে পারে, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। যে সব বুঝে—সব জানে, সেই ধর্ম্মাচারী ; সৎকর্ম্ম কাহাকে বলে—যে বুঝে, সেই সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করে, না করিয়া থাকিতে পারে না। সক্রেটিসের মতে—সৎকর্ম্ম অর্থে নিজের ও সমাজের অভ্যুদয়োপযোগী কর্ম্ম।

বয়োবৃদ্ধি-সহকারে জ্ঞানেরও বৃদ্ধি হয়। জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানও বাড়িতে থাকে। পুণ্যবৃদ্ধির সহিত আমরা ঈশ্বরের নিকটে আনীত হই। অতএব, বয়োবৃদ্ধির সহিত ঈশ্বর ও আমাদিগের মধ্যে নৈকট্য স্থাপিত হয়।

এখন দেখিতে হইবে, জ্ঞানই পুণ্য কি না ? সংসারের অধর্ম্মাচারীদিগের মধ্যে এমন কেহ কি নাই, যে জানিয়া-শুনিয়া পাপ করে ? চোর চুরি করে ; সে কি বুঝে না যে, চুরি করা পাপ ? হত্যাকারী হত্যাকার্য্য কি দোষাবহ জ্ঞান করে না ? আমি বলি যে, শুধু জ্ঞানকৃত পাপাচরণের জন্যই আমরা 'পাপী-অধার্ম্মিক' নাম দিই, জ্ঞানকৃত পাপাচারীকে 'পাপী' বলিয়া ঘৃণা করি, ইহ জগতে শাস্তি দিই, পরজগতে পাপের ফল-ভোগ করিবে বলিয়া ভীতি-প্রদর্শন করি। আমি না জানিয়া তোমার প্রতি করিলাম—তুমি ক্ষমা করিলে ; কিন্তু আমি জানিয়া-শুনিয়া যদি তোমার অনিষ্টানুষ্ঠান করি, তাহা হইলে কি তুমি ক্ষমা করিবে ? আইনেও জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত দুষ্কর্ম্মের বিভেদ স্বীকার করা হয় ; (culpable homicide amounting to murder), জ্ঞানকৃত নরহত্যার জন্য শাস্তি হইল—ফাঁসি, কিন্তু (culpable homicide not amounting to murder) অজ্ঞানকৃত নরহত্যার জন্য শুদ্ধ কারাবাস বা দণ্ডান্তর-ব্যবস্থা। তবেই বলিতে হইবে যে, জ্ঞানকৃত পাপানুষ্ঠান শুধু পাপ নহে—জ্ঞানকৃত বলিয়া অধিক দোষাবহ। জ্ঞানেই পাপ, অজ্ঞানতায় পাপ নাই।

তার পর সক্রেটিস বলিয়াছেন—সৎকর্ম্ম অর্থে নিজের ও সমাজের মঙ্গলোপযোগী কর্ম্ম। দেখা যাউক, ইহা কত দূর সত্য। আধুনিক (ultilarian) মুসলবাদী-দার্শনিকেরা ইহাই সমর্থন করেন। আমি স্থানান্তরে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি ; অতএব তাহার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। সেখানে একপ্রকার প্রমাণ করা হইয়াছে যে,—এইমত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, সৎকর্ম্ম অর্থে মঙ্গলময় কার্য্য বুঝায় না, সদসৎ জ্ঞান বিবেক-শক্তির (conscience) কোন বিশেষ গুণ-মাত্র। বিবেক-শক্তি আমাদের সহজাত ; কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না ; কি সৎ, কি অসৎ, বিবেক-শক্তি স্বতঃই ইহা বুঝিতে পারে। এই বিবেক-শক্তি (conscience) বয়োবৃদ্ধি-সহকারে বৃদ্ধি না হইয়া "বরং হ্রাস হয়" ; সংসারের কোলাহলে স্বার্থের প্রলোভনপূর্ণ উচ্চহাস্যকারে ইহার কণ্ঠস্বর ডুবিয়া যায়। অতএব, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য জ্ঞানের, বয়োবৃদ্ধির আবশ্যক হয় না।

* "Your young men shall see visions,your old men shall dream dreams"—inferreth that young men are admitted nearer to God than old,because vision is a clearer revealation than a dream ; and certainly the more a man drinketh of the world, the more it intoxicateth".

Becon's Essays.

† "Happy those days when I
Shined in my angel-fancy."&c.
Vaughan's Lament:

"But new it is little joy.
To know I am farther off from heaven
Than when I was boy."
Hood.

* গত বর্ষের পৌষ মাসের 'অনুসন্ধানে' "নীতি সম্বন্ধে দুএক কথা" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ।

প্লেটো সক্রেটিসের শিষ্য ; তিনিও পুণ্যকে সুখের মূলাপেক্ষা করিয়াছেন। জ্ঞানের দ্বারা পুণ্যলাভ হয় ; পুণ্য বা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানই মানবের সুখ, আর এই সুখই মানব-জীবনের একমাত্র-উদ্দেশ্য (Summum Bonum)। কিন্তু এই—Sumum Bonum—মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে একটু গোলযোগ আছে। প্লেটো ভিন্ন স্থানে ভিন্নপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। একস্থানে (Republic) বলিয়াছেন—এই Sumum Bohum ঈশ্বরের অনুগ্রহ। তাহাহইলে জ্ঞানই পুণ্য বলা যাইতে পারে না ; কারণ, "কোনটী ঈশ্বরের অভিপ্রেত,কোনটী নহে"—ইহা শুধু বিবেক-শক্তিদ্বারা স্থিরীকৃত হয়। অপর একস্থানে বলিয়াছেন—ইহা সুখ, জ্ঞানাত্মা-উদ্ভূত সুখ। প্রশ্ন,জ্ঞানাত্মা কাহাকে বলে ? শরীর ও মনের মধ্যে সম্বন্ধের কারণ দেখাইবার জন্য, প্লেটো স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—আত্মা দুইভাগে বিভক্ত। একভাগ পবিত্র, দিব্য, নিত্য ; তাহার নাম জ্ঞানাত্মা (Rational soul)। অপর-ভাগ অপবিত্র,পাশব ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ, নশ্বর ; তাহার নাম অজ্ঞানাত্মা (Irrational soul)। শরীর, অজ্ঞানাত্মা দ্বারা মনের উপর আধিপত্য করে, মন ইহারই দ্বারা শরীরের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। এই অজ্ঞানাত্মা যেন শরীর ও মনের মধ্যে ব্যবস্থিত সেতু ; দুয়েরই গুণ ইহাতে আছে। আত্মাকে এইরূপে দুই ভাগে বিভাগ আজকাল নূতন বলিয়া বোধ হইবে না। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ প্লিনী (Pliny) বলেন,—"কোন জীব মানুষ অপেক্ষা উচ্চ নহে, আবার কেহই মানবের মত নীচ নহে।" বাট্‌লার (Butler) তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধসমূহের ভূমিকায় ইহারই সমর্থন করিয়াছেন। "মানবচরিত্র একদিকে পশু অপেক্ষাও

নীচ, রাক্ষস অপেক্ষাও ভীষণ, অপর দিকে সুন্দর, মহান্।"

হীন, ধনী, নীচ, মহান্, দুজ্ঞেয় মানব চরিত; বিষম জড়িত, চমৎকার!
কত যে মহান্—যিনি সৃজিলা তাহায় দূর জগতের ভিন্ন উপাদানে কৌশলে গঠিত! অনন্ত জীবের রাজ্যে সুমহান্ জীব; শূন্য একধারে, অপরেতে ঈশ্বর, মধ্যে তুমি ব্যবস্থিত! কলুষিত দিব্য জ্যোতিঃ! অনন্ত তেজের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ!
ঈশ-পরিমার তুমি অধিকারী! ধূলি পরিণাম তব! শক্তিহীন! মৃত্যুশূন্য! তুমি নীচ কীট! দেবতা প্রকৃতি!

কান্টের (Kant) Pure Reason এবং Practical Reason প্রেটোর আত্মা ও জ্ঞানাত্মার মত বলিয়াই বোধ হয়।

আত্মাকে এইরূপে দুইভাগে বিভক্ত করায়, সুখও দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে;—অজ্ঞাত্মা-জনিত সুখ, ও জ্ঞানাত্মা-উদ্ভূত সুখ। পুণ্যই যদি সুখ হয়, আর সুখই পুণ্য হয়, তাহা হইলে এই উভয় প্রকার সুখকেই পুণ্য বলিতে হইবে। কিন্তু প্লেটো তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না; একস্থানে(Phoedo) বলিয়াছেন—অজ্ঞাত্মাজনিত সুখ পুণ্য নহে, আবার একস্থানে বলিয়াছেন; অজ্ঞাত্মাজনিত সমস্ত সুখই পাপ নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে এ জীবন একপ্রকার সুখশূন্য-বলিয়া বিবেচিত হইত; কারণ, জ্ঞানাত্মা-জনিত সুখ কইসাধ্য (Banquet)। কিন্তু মোটের উপর বোধ হয় যে, তিনি জ্ঞানাত্মা-জনিত সুখকেই "উচ্চ প্রকারের" সুখ—অর্থাৎ যথার্থ সুখ বলিয়া জ্ঞান করেন। ইহাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—Summum Bonum. তাহা হইলে, সকল প্রকার সুখই পবিত্র নহে। এখন দেখা যাউক, কিসের জন্য এ উচ্চনীচ-ভেদ।

প্রাণীসমস্ত দুইভাগে বিভক্ত করিলাম—উদ্ভিদ্ ও জন্তু। ইহা ন্যায্য; কারণ, উদ্ভিদ্ ও জন্তু উভয়কেই "জীব" বলিতে পারি। আবার দেখি, ইহাদের মধ্যে একটি বিভেদও আছে; উদ্ভিদের গতিশক্তি নাই, জন্তু গতিশীল। গতিশক্তির উপস্থিতি-অনুপস্থিতি জন্য এই বিভাগ। ইহাই (fundamentum divisionis), বা Differentia বিভেদক গুণ। এখন দেখা যাউক, প্লেটোর সুখকে দুইভাগে বিভক্ত করায় কি দোষ হইতে পারে। এখানে fundamentum divisionis কি? সুখভাব (pleasure-ableness) নহে; কারণ, এ গুণ দুই বিভাগেই আছে; অতএব ইহা অবশ্য সুখভাব ব্যতীত আর কিছু হইবে। সে আর কিছু কি? ইহার একমাত্র উত্তর হইতে পারে—"সদ্-সৎত্ব" (moral worth; rightness & wrongness)। তাহা হইলে সুখ শুধু জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সদসদ্ভাবই Summum Bonum. ইহা আমাদের বিবেকশক্তি দ্বারা (conscience) উপলব্ধ হয়; বিবেকশক্তি স্রষ্টার কর্তৃত্ব আমাদের সহজাত। অতএব, জ্ঞানই মুখ্য এবং বয়োবৃদ্ধি-সহকারে পুণ্যবৃদ্ধি হয়, একথা বলা যাইতে পারে না।

এখানে কান্টের সম্বন্ধেও দু'এক কথা বলা যাইতে পারে। কান্টও এইরূপে মানবাত্মাকে Practical Reason ও Pure Reason এ বিভক্ত করিয়াছেন। Practical Reason কতকটা আমাদের বিবেকশক্তির মত। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য—সদাচরণ; কিন্তু Pure Reason এর Summum Bonum সুখ। এখন, সুখ ও সদাচরণের কিরূপ সম্বন্ধ? প্রাচীন নীতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কেহ কেহ সদাচরণকেই সর্বস্ব আর পুণ্যকে তাহার অঙ্গবিশেষ বলিয়া জ্ঞান করেন (Stoics), কেহ কেহ সুখকেই সর্বস্ব আর পুণ্যকে তাহার অঙ্গবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন (Epicureans)। কান্ট বলেন, সুখ ও সদাচরণের মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ। কিন্তু সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহারা পরস্পর বিরোধী। কান্ট ইহার উত্তরে বলেন যে—এরূপ হয়, শুধু আত্মা এই দুইভাগে বিভক্ত বলিয়া। মানবাত্মার যদি শুধু Practical Reason হইত, তাহাহইলে পুণ্যই সুখ আর সুখই পুণ্য, বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু তাহা যখন নহে, সৎ কর্ম্মাচরণই তাহা হইলে Summum Bonum কে মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব Practical Reason সদাচরণ করিতে হইবে—"সদাচরণ করা উচিত" ইহাই ভাষ্য। তাহা হইলে সৎকর্ম্মে আর আনন্দ নাই, প্রীতি নাই; কর্ত্তব্য-সাধন শুধু গুরু-ভার-বহন মাত্র; "না করিলে নয়" ভাবিয়া, লোকে অনিচ্ছায় অনিচ্ছায় সৎকর্ম্ম করিবে। সৎকর্ম্ম যদি এইরূপ আনন্দশূন্য, আলোকশূন্য ব্যাপার হইত, তাহা হইলে জগতে কয়জন সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিত? কবি শিলার (Schiller) ইহারই উপর বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"স্নেহ-হেতু মন মোর উপকারে ব্রতী,
তবে হায় পুণ্যলাভ হইল কোথায়?"

ইহাতে বুঝা যায় যে, অনুভূতি-শক্তি বিবেক-শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে না। বলা বাহুল্য, এখানে ইহা ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ অনুভূতি নহে। জ্যাকোবীর মত সম্যক পর্য্যালোচনা করিলে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবেক।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মানবের স্বাধীন নির্ব্বাচন-শক্তি ও জীবাত্মার অনন্তকালব্যাপী স্থায়িত্বের প্রমাণের জন্য কান্ট এই বিভাগ করিয়াছিলেন। Pure Reason এর ইহারা জ্ঞেয় নহে, কিন্তু Practical Reason এর দ্বারা বটে। কিন্তু ইহাতেও লোকের সন্দেহ মিটিল না—স্থিরতা মিলিল না। তাই জ্যাকোবি (Jacobi) এক নূতন মতের সৃষ্টি করিলেন। জ্যাকোবি বলেন যে, দার্শনিক প্রমাণ শুধু অঁইদ্বাদ (Fatalism) ও নাস্তিকতার পরিপোষক। স্পিনোজা (Spinoza) সকল কথার উত্তর দিতে গিয়াছিলেন; তাই তাঁহার ধর্ম্ম নাস্তিকতা-মাত্র। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে; কিন্তু যে ঈশ্বরের নির্ব্বাচন-শক্তি (Will) নাই, যাহার জ্ঞান নাই, যাঁহার কার্য্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নাই, তিনি আবার ঈশ্বর কিসে? অতএব, একপ আস্তিকবাদ নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শুধু স্পিনোজা নহেন, যে কোন ব্যক্তি এইরূপ প্রমাণ দিতে গিয়াছেন, তিনিই এই বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন। ঈশ্বর অসীম—ইয়ত্তাশূন্য;

"The most opposite instincts exist in his mind; actuated by combativeness, destructiveness, acquisitiveness and self-esteem, the moral sentiments being in abeyance he is almost a friend. On the contrary, when inspired by benevolence, veneration, hope, conscientiousness, ideality and intellect, the benignity and serenity beaming from his eyes and radiating from his countenance make him appear lovely, noble and gigantically great."

Combe's Constitution of Man.

†How powerful, how rich, how abject, how august
How complicate, how wonderful, is man!
How passing wonder He who made him such!

* * *

A heir of glory! A frail child of dust!
Helpless immortal! insect infinite!
A worm! a God!

Young's Night Thoughts.

যদি তিনি আমাদের অসীম সামান্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়েন, তাহা হইলে তিনি আর অসীম হইলেন কৈ? ঈশ্বর মনুষ্য-জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাতব্য হইলে, আর ঈশ্বর নহেন। তবে ঈশ্বরকে কিরূপে জানিব? তদ্ভরে জ্যাকোবি (Jacobi) বলেন—আমাদের "বিশ্বাস" (Belief, faith), ও অনুভূতি-শক্তির (Feelings) দ্বারা। এ বিশ্বাস দর্শনের উপর নির্ভর করে না—এ অনুভূতি-শক্তি ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ নহে। তুমি বুদ্ধিমান, তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যবান, তোমার কথায় যে বিশ্বাস করি, ইহা সে বিশ্বাস নহে। ইহা শুধু আমাদের মনের বিশ্বাস। যে কোন বক্তার কথা পড়িলেই, সতঃই বিশ্বাস জন্মে; তাহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসই এই "বিশ্বাস"। আরও দেখা যায়, "বিশ্বাস" না থাকিলে জ্ঞান-লাভ অসম্ভব—"বিশ্বাস" জ্ঞানের ভিত্তি-স্বরূপ। বিশ্বাস আবার (Feelings) অনুভূতি-শক্তি-সাপেক্ষ। অতএব, অনুভূতি-শক্তিই মানব-মনের সারভূত (Essence)।

অনুভূতি-শক্তি দ্বারা ঈশ্বর-জ্ঞান জন্মে, বিবেকশক্তি ঈশ্বরাভিপ্রায় জানাইয়া দেয়। তবে কেন ইহারা পরস্পর বিরোধী হইবে? অতএব, ধর্ম্ম ও সুখ একই। লোকে যে বলে ধর্ম্মের জন্য মানুষ কষ্ট পায়—তাহা ভুল। মনে কর ল্যাটিমার (Latimire) সত্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া অগ্নিতে দগ্ধ হইলেন; লোকে বলিল যে, সৎকর্ম্মের জন্য তাঁহারা এই ক্লেশ—এই যন্ত্রণা। কিন্তু, কে বলিল সে মরণেও তাঁহার সুখ ছিল না? সত্যের অনুসরণ-জনিত মৃত্যু, হয় ত তিনি সত্যের অপলাপ-জনিত মৃত্যু-হস্ত হইতে পরিত্রাণ অপেক্ষা, সুখাবহ বিবেচনা করেন।

(Feelings) অনুভূতি-শক্তিই তাহা হইলে স্থির ঈশ্বর-জ্ঞানের হেতুভূত।* এখন "Feelings" কোন্ সময় বেশী প্রবল—বাল্যে না বার্দ্ধক্যে? "বিশ্বাস" কখন বেশী? সকলেই স্বীকার করিবেন, বাল্যে। তাহা হইলে—জীবনের প্রারম্ভে যে আমরা ঈশ্বরের অতি নিকটে ছিলাম, বয়োবৃদ্ধি-সহকারে দূরে আসিয়া পড়িতেছি, ইহা সপ্রমাণ। (ক্রমশঃ।)

কৌলীন্য-প্রথা।

কৌলীন্য-প্রথা কি, কি উদ্দেশ্যে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বঙ্গদেশের সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। কিন্তু ইংরেজী-আমলের আরম্ভ হইতেই, এদেশের অন্যান্য সামাজিক রীতিনীতির ন্যায় দোষ-কীর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, কৌলীন্য-প্রথার প্রতিও তদ্রূপ বা ততোধিক দোষারোপ করা হইতেছে। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতা এদেশে প্রচারিত হওয়ার পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত, কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে বহুতর নিন্দা—সভাতে বক্তৃতাতে, পুস্তকাদিতে ও সংবাদপত্রে—প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই কৌলীন্য-প্রথাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন; অধিক কি—এপর্য্যন্ত কৌলীন্য-প্রথার স্বপক্ষে শিক্ষিত মহোদয়দের

* *Vide* Jacobi's Dauid Hume on Feita.

মুখে একটী কথাও শুনা যায় নাই। ফলতঃ শিক্ষিত-সম্প্রদায়গণ কৌলীন্য-প্রথার যেরূপ অজস্র নিন্দা প্রচার করিয়া থাকেন, কৌলীন্য-প্রথা প্রকৃতপক্ষে সেইরূপ দোষনীয় কি না, ও কৌলীন্য-প্রথা দ্বারা বঙ্গসমাজের কোন্ প্রকার উন্নতি হইয়াছে কি না, ইহা প্রত্যেকেরই আলোচনা ও চিন্তার বিষয়। আজ আমরা আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তা ও আলোচনার ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করিব।

মহারাজ আদিশূর যাগযজ্ঞশীল পঞ্চগোত্রের পঞ্চজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তৎসঙ্গে পঞ্চজন শূদ্র কান্যকুব্জ হইতে এদেশে আনয়ন করেন। তাঁহারা সেইদেশের ও এতদ্দেশীয় স্ত্রীপুত্রগণ-সহ এদেশে বাস করায়, ও কালক্রমে তাঁহাদের বহুতর সন্তান-সন্ততিগণের বৃদ্ধি দেখিয়া, মহারাজ বল্লাল সেন ইহাঁদের মধ্যে কৌলীন্য-মর্য্যাদা ও বিবাহ-সম্বন্ধে কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে পঞ্চগোত্রের পঞ্চজন ব্রাহ্মণের বংশধরগণের মধ্যেই নানা শ্রেণীবিভাগ ও বিবাহ-সম্বন্ধে নানা-প্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এমত নহে। ব্রাহ্মণের সঙ্গে আগত পঞ্চশূদ্রের বংশধরগণের ও বৈদ্যদের মধ্যেও কৌলীন্য-মর্য্যাদা ও বিবাহ-সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তৎপরে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন ও দেবীবর ঘটক বিবাহ-সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মহারাজ বল্লাল সেনের এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ, কৌলীন্য-মর্য্যাদা ও বিবাহ-প্রথাকে আজকালকার শিক্ষিত-শ্রেণীরা সকলেই নিরতিশয় নিন্দা ও ঘৃণা করেন। কিন্তু, আমাদের বিবেচনায়, মহারাজ বল্লাল সেন একজন বিজ্ঞজন, বুদ্ধিমান, ভবিষ্যদ্দর্শী চিন্তাশীল ও সমাজহিতৈষী ছিলেন, এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধিব্যবস্থা হিন্দুর সম্পূর্ণ উপযোগী।

উচ্চশ্রেণীর লোকেরা অথবা উচ্চশ্রেণীর বংশধরগণ যাহাতে বিবাহ-প্রথা দ্বারা নিম্ন-শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া নীচ হইতে না পারেন, এইজন্যই বিবাহ-সম্বন্ধে তিনি নানা রূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা উচ্চবংশে কন্যাদান করুন, কোন প্রতিবন্ধক ছিল না; যেহেতু প্রাচীন সমাজে তাঁহাতে তাঁহাদের বিশেষ গৌরব ছিল। ফলতঃ মহারাজ বল্লাল সেন কৌলীন্য-প্রথা বঙ্গসমাজে বিধিবদ্ধ করিয়া যাওয়াতেই, বঙ্গসমাজ এখনও এত উন্নত রহিয়াছে। আজকাল বাঙ্গালী জাতি যে জগতে (বিদ্যাবুদ্ধিতে) উন্নত-জাতি পরিচয় দিতেছেন, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ হইতেছে—কৌলীন্য-প্রথা। আমরা ভারতের বহুতর স্থান পরিভ্রমণ ও বহুতর ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের সহিত আলাপ করিয়াছি; কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিতে বাঙ্গালী-জাতির সহিত তুলনা হইতে পারে, এমত জাতি ভারতে আর নাই। কিন্তু বাঙ্গালী-জাতির এই গৌরব কিসে হইল? কৌলীন্য-প্রথাই ইহার একমাত্র কারণ। ইহা ভিন্ন আর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ বাঙ্গালী-জাতির মধ্যে কুলীন-সম্প্রদায়স্থ লোকেরাই বঙ্গীয় সমাজে উন্নত, প্রতিভাশালী ও হৃদয়বান বলিয়া সর্ব্বত্রই পরিচিত। বাঙ্গালী-জাতির মধ্যে যে কয়েকটি লোক জগতের লোকের নিকট উন্নত, প্রতিভাশালী ও হৃদয়বান বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা প্রায় সকলেই কুলীন অথবা কুলীন-বংশধর। যথা,—রাজা রামমোহন রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বন্দ্যোপাধ্যায়), উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,

মুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক্তার), ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ওকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, কালিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নতর্করত্ন, রামতনু লাহিড়ী, প্রসন্নকুমার লাহিড়ী, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, নরেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, ওঙ্কারপ্রসাদ সেন, কে. জি. গুপ্ত, কালীপদ গুপ্ত, বি. জল. গুপ্ত, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, জগদ্বন্ধু বসু, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রমাধব ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি। ফলতঃ বঙ্গের অধিকাংশ সদাশিয়, উন্নতিশীল, প্রতিভাশালী, হৃদয়বান মহাত্মাগণ—কুলীন অথবা কুলীনের বংশধর। বর্ত্তমান সমাজের অনেক বংশজ-শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষগণ কুলীন ছিলেন। এভিন্ন, কৌলীন্য-প্রথার সৃষ্টির সময় হইতে যাঁহারা বংশজ ও শ্রোত্রিয় প্রভৃতি ছিলেন, তাঁহারাও, উচ্চশ্রেণীস্থ কুলীন-সম্প্রদায়ের নিকট কন্যা দান করিয়া ও সর্ব্বদা কুলীন-সম্প্রদায়ের সহিত বসবাস ও সংসর্গে, অনেক উন্নতি-লাভ করিয়াছেন। অনেকে বলেন,—মহারাজ বল্লাল সেন কুলীনদের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আজকালকার কুলীনদের মধ্যে তাহা প্রায়ই লক্ষিত হয় না। ফলতঃ সেই সময়কার ন্যায় কুলীনদের আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, তপঃ, দান, সত্য প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি না থাকিলেও, একেবারে লোপ পায় নাই। এখনও ঐ সকল সদ্‌গুণ কুলীন-সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহুপরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। এইজন্য, জগতের সমস্ত সভ্য-সমাজেই ন্যূনাধিক পরিমাণে কৌলীন্য-প্রথা দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং বংশানুক্রমে তাঁহারাও সেই কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিলে, উচ্চ প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া স্বভাবিক; উচ্চবংশের আদি সর্ব্বত্রই বিদ্যা, বুদ্ধি ও যোগ্যতায় বিলাতে কত অমূল্য অসংখ্য লোক আছেন; কিন্তু নীচ বংশের লোকেরাই সাধারণতঃ উচ্চ রাজকার্য্য পাওয়ার দাবি-দাওয়া করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ, কৌলীন্য-প্রথা দ্বারা বাঙ্গালী জাতির মস্তিষ্ক যে অনেকটা উন্নত হইয়াছে—কি বুঝিয়াছে, ইহা স্বীকার করেন; কিন্তু কৌলীন্য-প্রথা দ্বারা বহুবিবাহ এদেশে প্রচারিত হওয়ায়, সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। ফলতঃ মহারাজ বল্লাল সেন যে—উদ্দেশ্যে যে ভাবে কৌলীন্য-প্রথা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য অতীব মহৎ ছিল। তৎপরে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন ও দেবীবর ঘটক প্রভৃতি, ব্রাহ্মণ-সমাজে "মেলবন্ধ" করিয়া, সমাজের নানা অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন। তবে আজকাল আমরা বহুবিবাহের যতটা দোষ দেখিতে পাইতেছি, প্রাচীন কর্ত্তারা বোধ হয় তত দোষ অনুভব করিতেন না। বরং তাঁহারা কৌলীন্য-প্রথাকে অতীব শ্রদ্ধার চক্ষেই অবলোকন করিতেন। আরও, পূর্ব্বে এদেশে বহুবিবাহ-প্রথা সমাজে প্রচলন হওয়ার নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণ দেখা যায়।

১। আজকাল যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই, তাঁর গৃহপালিত গরু, ছাগল, পক্ষী, কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, ইত্যাদির, উপযুক্ত সময়ে, উচ্চশ্রেণীর অথবা সমশ্রেণীর স্বজাতীয়-দ্বারা সন্তান উৎপাদন করাইয়া থাকেন; প্রাচীন কর্ত্তারা, উচ্চ-বংশে কন্যাদের বিবাহ প্রদান করিয়া, উচ্চ-শ্রেণীর—একান্ত-পক্ষে সমশ্রেণীর সন্তান (দৌহিত্র, দৌহিত্রী) উৎপাদন করাইতে বিশেষ যত্ন-চেষ্টা করিতেন; উচ্চ-বংশে কন্যা-সম্প্রদান করিয়া ধন্য হইতেন। প্রাচীন কর্ত্তারা এইরূপ উচ্চ-বংশে কন্যা-সম্প্রদান করায়ই তো, আজকাল কুলীন-সন্তানেরা প্রতিভাশালী ও উচ্চ-হৃদয়ের পরিচায়কদিতে-সক্ষম হইতেছেন।

২। উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদনই পূর্ব্বকার লোকের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল। সেইজন্যই একটী উচ্চ-বংশোদ্ভব কুলীনের নিকট বহুকন্যা সম্প্রদান করিতেন।

৩। পূর্ব্বে লোকের খাওয়া-পরার জন্য মাত্রই ভাবনা ছিল না। কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রভৃতিকে আহ্লাদের সহিত প্রতিপালন করিতেন, অথবা প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইতেন।

৪। সেই-কালে ইন্দ্রিয়-উত্তেজক ও প্রলোভনের নানাপ্রকার কারণ বর্ত্তমান ছিল না। সুতরাং রমণীরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও ভোগবিলাসের জন্য আজকালকার ন্যায় এত ব্যাকুল হইতেন না।

৫। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশের স্ত্রীপুরুষের সহবাস-সম্বন্ধে কতকগুলি কঠোর নিয়ম ছিল। ঋতুর সময় ভিন্ন অন্য সময়ে পুরুষ সংসর্গের বড় প্রয়োজন মনে করিতেন না। আজকালিকার ন্যায় পশুবৃত্তি-চরিতার্থই বিবাহের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল না। পশু ও ইতরজীবেরা যেরূপ নিয়মের অধীন হইয়া সন্তান উৎপাদন করিত, প্রাচীন-কালে স্ত্রী-পুরুষেরাও সেইরূপ নিয়মের অধীনে থাকিয়া সন্তান উৎপাদন করিতেন। আজকাল-

কার লোকেরা পশু অপেক্ষাও অধম হইয়াছেন। কোনপ্রকার নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে আজকাল কেহই স্বীকার ও আবশ্যক-বোধ করেন না। ফলও তজ্জন্যই হইতেছে; অকাল-মৃত্যু, নানাপ্রকার উৎকট পীড়া, অন্যায়, দুর্ব্বল-প্রকৃতি প্রভৃতি কারণে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে।

৬। প্রাচীন রমণীরা লেখাপড়া না শিখিলেও, ধর্ম্মজীবনে উন্নত ছিলেন। তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রাদি কথক-ঠাকুর ও ব্রাহ্মণদের মুখে শ্রবণ করিয়া, অনেকটা ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতি-লাভ করিতে সক্ষম হইতেন। এভিন্ন, প্রাচীন-কালে সামাজিক নিয়ম কঠোর ছিল। কাহারও কোন চরিত্র দোষ দেখিলে, সমাজ তাহাদিগকে কঠোরভাবে শাস্তি-প্রদান করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে নানাকারণে বহুবিবাহ-প্রথা নাই বলিলেও হয়। বহুবিবাহ-প্রথা বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল ও ধর্ম্মনীতিবিহীন সমাজে থাকাও কর্ত্তব্য নহে। এভিন্ন, বর্ত্তমান-সময়ে, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রভৃতিকে প্রতিপালন করা অনেকেরই সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে, যে গভীর উদ্দেশ্যে মহারাজ বল্লাল সেন কৌলীন্য-প্রথা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সেই মূল উদ্দেশ্য যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য সকলেরই বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ফলতঃ কৌলীন্য-প্রথার দোষগুলি সমাজ হইতে উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক; এভিন্ন কৌলীন্য-প্রথাকে সমূলে নাশ করিলে অর্থাৎ বিবাহাদি-সম্বন্ধে কোনপ্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ না থাকিলে, অতি সত্বর হিন্দুসমাজের বিশেষ অনিষ্ট ও আরও অধঃপতন হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজ নানা-কারণে হীন হইয়া পড়িয়াছে; এ সময় কৌলীন্য-প্রথা প্রভৃতি সামাজিক প্রথা একেবারে

উঠাইয়া দিলে, সমাজ নিশ্চয় ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

কৌলীন্য-প্রথা-সম্বন্ধে আমাদের বহুতর কথা বলিবার থাকিলেও, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহারে একটি কথা হিন্দুসমাজের ও হিন্দুসমাজ হইতে যাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নিকট নিবেদন করা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। ভরসা করি, আমাদের কথা সকলেই বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

উপরে কুলীন ও কুলীন-বংশধরগণের মধ্যে যে কয়েকটী মহাত্মার নাম-মাত্র উল্লেখ করিয়াছি, ইহাঁরা ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষিত কুলীন মহাশয়েরা অনেকেই কৌলীন্য-প্রথাকে অন্তর ঘৃণা করেন ও কৌলীন্য-প্রথা সমাজ হইতে সমূলে নাশ করিতে অনেকেই সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে যত্ন-চেষ্টা করিয়া থাকেন। এদেশের উচ্চশিক্ষিত কুলীন মহাত্মারা যে কৌলীন্য-প্রথার ফলেই প্রতিভাশালী, বিদ্বান্ ও হৃদয়বান্ হইয়াছেন, একথা তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না বা বুঝিতে কখনও চেষ্টা করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। তাঁহারা না বুঝুন, কি বুঝিতে না পারুন, তাহাতে তত ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কিন্তু তাঁহাদের উপদেশে যে অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণীরাও কৌলীন্য-প্রথাকে ঘৃণা করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, ইহাই হইতেছে ভাবনার বিষয়।

আজকাল যাঁহারা কৌলীন্য-প্রথা ও হিন্দুসমাজের অন্যান্য প্রথাকে ঘৃণা কল্পন ও হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কৌলীন্য-উপাধি কেন ধারণ করেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কোন ব্যক্তির নামের পশ্চাতে বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, লাহিড়ী, ভাদুড়ী, সান্যাল, সেন, গুপ্ত, ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র প্রভৃতি উপাধি থাকিলে, সর্ব্বসাধারণ লোকে তাঁহাকে কুলীন বলিয়া বুঝেন ও চিনেন। ফলতঃ উপরি-উক্ত উপাধিগুলি কুলীন ভিন্ন আর কাহারও ব্যবহার করিবার দাবি-দাওয়া মাত্রই নাই; যাঁহারা কৌলীন্য-প্রথার কোনই নিয়ম-পালন করেন না, পিতৃ-পুরুষের কোন ধারই ধারেন না, তাঁহারা বংশের ঘৃণিত উপাধি গ্রহণ করেন কেন? কেবল উপাধি গ্রহণ করিয়া বংশের পরিচয় রাখায় আবশ্যক কি? আমাদের মতে এই সকল উপাধি তাঁহাদের গ্রহণ করা নিতান্তই অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ। আমরা ভরসা করি, যাঁহারা কৌলীন্য-প্রথায় ঘৃণা করেন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে কৌলীন্য-উপাধি পরিত্যাগ করিবেন। কারণ, হিন্দুসমাজের সর্ব্বসাধারণ লোকেরা, কে কুলীন—কে অকুলীন, তাহা বুঝিয়া ও চিনিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এভিন্ন, উপাধি-সংযুক্ত নাম বলায়, অনেক উচ্চ-শ্রেণীর কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতিকে, সেই সকল বিধর্ম্মী, পতিত-ব্রাহ্মণ-সন্তানের পদধূলি গ্রহণ করিতেও, আমরা সময় সময় দেখিতে পাইয়া থাকি।

ঠাকুর-ঝি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মানুষ যতই কেন সচ্চরিত্র, যতই কেন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও গুণবান্ হউক না, একবার পদস্খলন হইলে আর তাহার রক্ষা নাই। হীরালালের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তিনি যখন কলেজে পড়িতেন, তখন তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অলঙ্কার-স্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণের কোন পরামর্শ আবশ্যক হইলে, সকলেই হীরালাল বাবুর নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার ন্যায় দয়ালু, পরোপকারী ও মিষ্টভাষী লোক অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই হীরালালের এক-বার পদস্খলনের পর আর উত্থান-শক্তি নাই!

প্রতিজ্ঞা করিয়াও, হীরালালের সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না। তিন দিন যাইতে না যাইতে হীরালাল সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন। এমন কোন ঘটনাই ঘটে নাই, যাহাতে এরূপ লোকের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে পারে। একজন অসৎ প্রকৃতির লোক—যাহাকে হীরালাল মনে মনে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহারই অনুরোধে, হীরা-লালের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। আমরা সেই কারণেই বলিতেছিলাম, মানুষ যতই কেন উন্নত হউক না, একবার অবনতি হইলে আর তাহার রক্ষা নাই।

পাপের এমনি মোহিনী শক্তিই বটে! পরেশনাথ একবার অনুরোধ করিল, আর হীরা-লাল অমনি হিতাহিত-বিবেচনা-শক্তিহীন হইয়া পরেশনাথের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পরেশ-নাথের এ অনুরোধ রক্ষা না করিলে হীরালালের কি ক্ষতি হইত? হীরালালের প্রতিজ্ঞার মূল্য এইবার বুঝিতে পারা গেল। হীরালালের আকাঙ্ক্ষা-বহ্নি তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত ছিল; পরেশনাথের একটি ফুৎকারে তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। হীরালাল তাঁহার দুষ্প্রবৃত্তি দমনের আর কোন চেষ্টা করিলেন না; জননীর স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসা, তখন কোথায় ভাসিয়া গেল; হীরালাল, পরেশনাথের সঙ্গে তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে সময় হীরালালের মনে কোনরূপ স্ফূর্ত্তি ছিল না; একটা দুষ্কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে মনের অবস্থা যেরূপ হয়, হীরালাল বাবুর মনের অবস্থাও তখন সেইরূপ। তাহার পর স্ফূর্ত্তি-দায়িনী সুরেশ্বরীর প্রসাদে তাঁহার বিষণ্ণ মন ক্রমে প্রফুল্ল হইতে লাগিল। তবে এবার হীরা-লাল অতি সাবধানে অল্প-পরিমাণ গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন। পরেশনাথের ইহাতে কোন আপত্তি ছিল না; বরং ইহাতে তাহার ভাগের পরিমাণ অধিক হইবে মনে করিয়া, পরেশনাথ সন্তুষ্ট। তবে সে যে হীরালালকে অধিক পরিমাণে পান করাইবার জন্য অনেক সময় জেদাজিদি করিত, তাহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, হীরালালই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন, উন্মত্ততা না জন্মিলে হীরালাল অকা-

তরে অর্থব্যয় করিবেন কেন? আজ কি ভাবিয়া, পরেশনাথ অল্পে অল্পেই হীরালালকে অব্যাহতি দিল; আর এদিকেও অধিকমাত্রায় পান করিয়া তাহার উন্মত্ততা বৃদ্ধি হইয়াছিল। উন্মত্ততা বৃদ্ধি হইলেই তাহার সঙ্গে পরেশনাথের পৈশাচিক ক্রিয়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুরাপান করিয়া পরেশনাথ এরূপ জঘন্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল যে, হীরালাল তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

যে ব্যক্তি যে প্রকৃতির লোক, উন্মত্ত অবস্থায় দেখিলেই তাহার সে প্রকৃতি অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তখন আর তাহার চরিত্রের উপর কোন আবরণ থাকে না; চক্ষুলজ্জা, লোকলজ্জা প্রভৃতি কোনরূপ লজ্জা-ভয়ও থাকে না; সুতরাং এই সময় তাহার প্রকৃতি বুঝিতে আর অধিক কষ্ট পাইতে হয় না। ইতর-শ্রেণীর লোকে এই জন্য সুরা-পান করিয়া কিরূপ জঘন্য ব্যবহার করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কোন কোন শিষ্টশান্ত ভদ্রলোকও এই কারণ ইতর-শ্রেণীর লোক অপেক্ষাও উন্মত্তাবস্থায় অতি জঘন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। পরেশনাথের প্রকৃতি আমাদের জানিতে বাকী নাই; পরেশনাথ উন্মত্তাবস্থায় প্রথমেই ইতর-ভাষায় কথা-বার্ত্তা ব্যবহৃত করিল। তাহার পর আর সে গৃহের মধ্যে থাকিতে পারিল না; রাস্তায় বাহির হইয়া অশ্লীল ভাষায় প্রতিবাসীদিগকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। সে পাড়ায় কয়েক-ঘর নিরীহ ভদ্রলোকের বাস ছিল, তাহাই পরেশনাথের "ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলো।" পরেশনাথ কিন্তু এদিকে উন্মত্ত হইলেও নিরীহ প্রকৃতির লোক দেখিয়া অত্যাচার করিত।

এই সময় রাস্তা দিয়া একজন বলবান যুবক যাইতেছিল। ভদ্রলোকের প্রতি পরেশনাথের এরূপ ভয়ানক অত্যাচার দেখিয়া যুবক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে অত্যাচার নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। সেই কারণ, তৎক্ষণাৎ পরেশনাথের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইল, এবং সে বিরোধে পরেশনাথের লাভ হইল কয়েক প্রহার।

সে যুবক ও প্রহার করিয়া প্রস্থান করিল। সে প্রহারও কিছু গুরুতর হইয়াছিল। কিন্তু সে অপরিচিত যুবক চলিয়া গেলে পর, পরেশ-নাথের বিক্রম দেখে কে? পাড়ার সেই নিরীহ ভদ্রলোকদিগের উপরই তাহার বিক্রম জাহির হইল। তাহারা পরেশনাথের ভয়ে সদরবাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেছিল, তাহার কটুকথার বিপক্ষে একটিও রিফ্লাই করে নাই। তাহার ফল হইল জান, কিন্তু ফল আবার কি হইবে? তাহাদেরই উপর অতি জঘন্য ভাষায় পরেশনাথের অজস্র গালি-বর্ষণ! যে সহ্য করে, তাহার সহ্যের তখন আর সীমা থাকে না!

কিন্তু ইহাতেও পরেশনাথের সে প্রহারের জ্বালা নিবারণ হইল না। তখন, কাহাকেও স্বহস্তে প্রহার না করিলে যে সে জ্বালা নিবারণ হইবে না, ইহাই পরেশনাথের দৃঢ় বিশ্বাস। প্রহার আর কাহাকে করিবে? রাস্তায় তখন লোকের সমাগম হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এক জন ভদ্রলোকের এরূপ ব্যবহারে ইতর-ভদ্র সকলেরই মুখে বিদ্রূপোক্তি প্রকাশ পাইতেছিল। রাস্তার কোন লোককে প্রহার করিলে তৎক্ষণাৎ হাতে হাতে যে ফল হইবে, পরেশনাথ অজ্ঞানাবস্থাতেও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। আর অমনি প্রহার করা দূরে থাকুক, রাস্তার লোকে ক্রমে যেরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে পরেশনাথ নিজেই পুনরায় যে তাহাদের দ্বারা শীঘ্রই প্রহারিত হইবে—সে বিশ্বাসও তখন তাহার মনে উদয় হইয়াছিল। সুতরাং অগত্যা পরেশ-নাথ নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া, বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, পরেশনাথ অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অল্পক্ষণ পরেই পরেশনাথের অন্দরের মধ্য হইতে একটা ভয়ানক আর্ত্তনাদ উঠিল। তাহার স্ত্রী নিস্তারিণী ও তাহার বালিকা কন্যা সুখদার আর্ত্তনাদে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল। পরেশনাথ উন্মত্তাবস্থায় যখন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখনই তাহার স্ত্রী নিস্তারিণী রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। আর তাহার কন্যা সুখদা—জননীর সেই কার্য্যে সহা-য়তা করিতে ছিল। পরেশনাথের অবস্থা দেখিয়া তাহাদের প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। পরেশনাথ রন্ধন গৃহে দৌড়িয়া গিয়া আরম্ভ করিল,—"কৈ—কি রান্না হয়েছে, দেখি।"

নিস্তারিণীর মুখে কথা নাই। কারণ, তখনও তাহার রন্ধন-কার্য্য শেষ হয় নাই। পরেশনাথ গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"কি! এখনও হয়-নি?"

নিস্তারিণী ভয়ে ভয়ে বলিল,—"ভাত হয়েছে—ডালও হয়েছে—এই মাছের তর-কারীটে হলেই হয়। একটু দেরী কর আমি-শীগ্‌গীর রেঁধে দিচ্ছি।"

পরেশনাথ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল,—"কি হারামজাদী! আমি দেরী কর্‌বো! আমি কি তোর গোলাম? আবি-হারামী ভাত দে-আও।"

নিস্তারিণী স্বামীর স্বভাব জানিত। এরূপ যন্ত্রণায় আজ্ঞা-প্রতিপালনে বিলম্ব করিলে, তাঁহার জীবন-সঙ্কট হইবে ভাবিয়া, তাড়াতাড়ি ভাত ও দাল যাহা প্রস্তুত ছিল, স্বামীর সম্মুখে ধরিয়া দিল। সে ভাত ও দাল দেখিয়া, পরেশনাথ একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; মুখে একটিও কথা না বলিয়া, তৎক্ষণাৎ চুলের মুটি ধরিয়া স্ত্রীকে দুইতিনবার সজোরে পদা-ঘাত করিল। সে প্রহারে নিস্তারিণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। জননীকে ঐরূপ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, সুখদার প্রাণ স্থির হইবে কেন? সুখদা তৎক্ষণাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং দৌড়িয়া গিয়া মাতার চক্ষে ও মুখে জল দিয়া তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল। সুখদা এইরূপ চীৎকার করিয়া, ক্রন্দন করাতে—বিশেষতঃ নিস্তা-রিণী শুশ্রূষায় নিযুক্ত হওয়াতে, তাহার নিষ্ঠুর পিতার ক্রোধ তখন কন্যার উপর পড়িল। পরেশনাথ তখন সুখদাকে অতি নিষ্ঠুররূপে প্রহার আরম্ভ করিল। বালিকা সুখদা, পশুবৎ উন্মত্ত পিতার সে প্রহার সহ্য করিবে কিরূপে? সুতরাং সুখদা আরও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। নিস্তারিণী স্বামীর প্রহার স্বচক্ষে নীরবে সহ্য করিত, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনের অধিকারও ছিল না। কিন্তু তাহার স্নেহের কন্যা সুখদাকে অন্যায়রূপে প্রহারিত হইতে দেখিয়া, মায়ের প্রাণ কি স্থির থাকিতে পারে? নিস্তারিণীও উচ্চৈঃস্বরে চীৎ-কার করিয়া উঠিল। তখন মাতা ও কন্যার আর্ত্তনাদে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল।

নরাধম পরেশনাথের ইহাতেও ক্রোধের শান্তি হইল না। স্ত্রী ও কন্যার ক্রন্দনে যে পাষাণহৃদয় কিছুমাত্র ব্যথিত হওয়া দূরে থাকুক, পরেশনাথ তখনও উন্মত্তাবস্থায় সেই অন্নপূর্ণ থাল দূরে নিক্ষেপ করিল। ভীষণ শব্দের সহিত সে থাল দূরে খণ্ড খণ্ড হইয়া,

অন্নের সহিত চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তাহার পর সেই ভাত ও ডালের হাঁড়ির অবস্থাও সেইরূপ হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন একটা প্রলয় হইয়া গেল। সেই মনুষ্য-নামধারী পিশাচ তখন, আপনার পৈশাচিক কার্য্য শেষ করিয়া,উন্মত্তভাবে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

মাতা ও কন্যা একত্রে ক্রন্দন করিতে বসিল। মাতা কন্যার অশ্রুজল মুছাইয়া দিল, কন্যাও মাতার অবিরাম অশ্রুজল মুছাইতে লাগিল। সুখদা জননীর চক্ষের জল যতই মুছাইতে থাকে, জননীর সেই অবিশ্রান্ত ধারা ততই বহিতে থাকে। এখন সুখদার চক্ষে আর জল নাই, সুখদার প্রাণ এখন জননীর জন্য আকুল হইয়াছে।

আগ্রহের সহিত সুখদা বলিল,—"মা, বড় লেগেছে কি?"

নিস্তারিণী আপনার বস্ত্রাঞ্চলে সর্ব্বস্থে সে অশ্রুজল মুঁছিয়া বলিল,—"না মা, আমায় লাগে-নি।" কিন্তু কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে, পুনরায় অবিশ্রান্ত ধারা কোথা হইতে আসিয়া, তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল।

সুখদা পুনরায় বলিল,—"তবে তুই আজ এত কাঁদ্‌ছিস্ কেন, মা?"

নিস্তারিণী উত্তর করিল,—"আমি আমার জন্যে কাঁদি না মা, তোর জন্যে কাঁদ্‌ছি। তুই দুধের বাছা, এত মার খেলে কদিন বাঁচ্‌বি?"

নিস্তারিণীর কান্না তখনও শেষ হয় নাই, আজ যেন তাহার সেই কান্না-নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুখদা স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার সেই ভাসাভাসা চক্ষু দুইটি পুনরায় অশ্রুজল-ভারাক্রান্ত হইল। সুখদা ছলছল-নেত্রে বলিল,—"মা, আজ তোর বড় লেগেছে, ঐ যে রক্তে তোর কাপড় ভিজে গিয়েছে। মা, বাবার মার খেয়ে খেয়ে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, বাবা মারলে আমায় আর লাগে না। তোকে মার্‌তে দেখ্‌লেই আমার কান্না পায়।"

নিস্তারিণী কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, —"হা হতভাগিনী! এই বয়সে তোর কি কষ্ট! মা সুখদা, আমি তোর কষ্ট আর দেখ্‌তে পারি-নে যে! তোকে এক দিনের তরেও সুখী দেখ্‌লে,আমি সুখে মর্‌তে পারি। এমন অদৃষ্ট করেছিলুম, এমন কোন আত্মীয় নেই, যেখানে তোকে পাঠিয়ে দিয়ে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মর্‌তে পারি।"

সুখদা কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলিল,— "আমি তোকে ছেড়ে কোথাও থাক্‌তে পারবো না মা! আমি গেলে, বাবা সেই দিনই তোকে মেরে ফেল্‌বে। আমায় ফেলে, তুইও কোথাও যাস্‌নে মা!"

নিস্তারিণীর মুখে আর কথা নাই। কিছু ক্ষণ কেবল ঘুমরিয়া ঘুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পর উন্মাদিনীর ন্যায় একবার চারিদিক চাহিয়া বলিল,—"হা অদৃষ্ট! বাছা আজ কেবল মার খেয়ে শুয়ে থাক্‌বে। রান্না-ভাত সব নষ্ট করে গেল! ঘরে আর হাঁড়িও নেই যে,আবার চাল চড়িয়ে দেবো।"

এই কথা বলিয়া নিস্তারিণী উচ্চৈঃস্বরে রোদিয়া উঠিল। সুখদা জননীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল,—"আমার ত ক্ষিদে পায়নি মা! তুই সেজন্যে কাঁদিস্ কেন? আমি যেদিন বাবার হাতে মার খাই, সেদিন ত আমার ক্ষিদে থাকে না!"

এই সময় পুনরায় নিস্তারিণীর ক্ষতস্থানে সুখদার দৃষ্টি পড়িল। সুখদা তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল ও একখণ্ড ছিন্নবস্ত্র আনিয়া

জননীর ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতে গেল। নিস্তারিণীর সেদিকে লক্ষ্য নাই, আঘাতের কোন বেদনা এখন সে অনুভব করিতে পারিতেছিল না, এখন কেবল মনের বেদনায় নিস্তারিণী অস্থির। সুখদা ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া বলিল; —"মা, পয়সা দে-না, এই বেলা তোর জন্যে কিছু খাবার কিনে আনি! বেশী রাত হলে, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।"

নিস্তারিণী বলিল—"পয়সা কোথায় পাবো মা? আমি বড় হতভাগিনী। আমি—"

নিস্তারিণী আর কথা কহিতে পারিল না। গুরুন তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুখদাও আর কোন কথা কহিল না।

কি আশ্চর্য্য! সেই পাষণ্ড নরাধম স্বামী বা পিতার বিরুদ্ধে তাহার স্ত্রী বা কন্যা কেহই একটীও কথা বলিল না? মা ও মেয়েতে এত দুঃখের কথা হইল, কিন্তু তাহাদের সকল দুঃখের আকর সেই নিষ্ঠুর স্বামী ও পিতার বিপক্ষে কেহ কোন কথা বলিল না। সেই স্বামী-নামের অযোগ্য পশুর প্রতিও নিস্তারিণীর পতিভক্তি ছিল। আর ক্ষুদ্র বালিকা সুখদার শিক্ষার আদর্শ—তাহার সেই জননী; সুতরাং সুখদাও যে সেই নিষ্ঠুর পিতাকে ভক্তি করে, এ কথা বলাই বাহুল্য। তদ্ভিন্ন, সুখদা যে তাহার পিতাকে যমের মতন ভয় করিত, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি।

নিস্তারিণী যে কথা বলিতে গিয়া বলিতে পারে নাই,এইবার সেই কথা আরম্ভ করিল,— "আমি কোন্‌দিক্ ভাব্‌বো? সেই যে বেরিয়ে গেছে—সে অবশ্যই কোথায় কি কর্‌ছে—তাই বা কে জানে? এমন লোক নেই, যে তাকে ধরে বাড়ীতে নিয়ে আসে। আমাদের মাসুক, কাটুক, আমরা সহ্য কর্‌বো; পরে কর্‌বে কেন? এখন, তার উপায় কি করি? কেন এমন মদ খেতে শিখেছিলো?"

সুখদা ছলছল-নেত্রে বলিল,—"বাবা কেন মদ খেতে শিখেছিল জানিস্ মা—আমাদের মার্‌বে বলে। তুই দেখিস্-নে, বাবা মদ খেলেই আমাদের মারে! কৈ—অন্য সময় ত মারে না?"

এই সময় শয়ন-গৃহের মধ্যে একটা ভয়ানক শব্দ হইল। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই পরেশনাথের শিশু পুত্রটি ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল। মাতা ও কন্যা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। পুত্রের ক্রন্দনে মাতার প্রাণ কি স্থির থাকিতে পারে? মাতা দৌড়িয়া গৃহের মধ্যে গেল। আর মাতাকে ঐরূপভাবে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়া, কন্যাও কি স্থির থাকিতে পারে? তখন মাতা ও কন্যা প্রদীপ-হস্তে সেই গৃহের মধ্যে গিয়া দেখিল যে,পরেশনাথ নেশায় অচেতন হইয়া, শয্যার উপর পড়িয়া আছে। বোধ হয়, শয়ন করিবার সময় শিশু-পুত্রটির উপরেই শুইয়া পড়িয়াছিল; সেই কারণ,গুরুভার আঘাত পাইয়া, পুত্রটি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। নচেৎ পরেশনাথ,পিতা হইয়া এইরূপ শিশু-পুত্রকে যে স্ব-ইচ্ছায় প্রহার করিয়াছে, একথা আমরা মনে ধারণা করিতেও পারি না। যাহা হউক, সৌভাগ্য-ক্রমে তাহার যে জীবন-রক্ষা হইয়াছে,সেই ভাল। নিস্তারিণী দৌড়িয়া আসিয়া,পুত্র কোলে লইল। আমরা জানি, পুত্র ঐরূপ চীৎকার করিয়া উঠিলেই বলিয়াই, জননী দৌড়িয়া গিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইতে পারিয়াছিল; নচেৎ,নিষ্ঠুর স্বামীর প্রহারে নিস্তারিণীর উঠিবার ক্ষমতা ছিল না। এ পৃথিবী ছাড়া, নরক বলিয়া আবার অন্য কোন স্থান আছে নাকি?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মকাল—পূর্ণিমার রাত্রি। সুনীল নভোমণ্ডলে পূর্ণিমার চন্দ্র পূর্ণকলা বিস্তার করিয়া হাসিতেছে। চন্দ্রের সে হাসিতে এখন যেন চারিদিক আলোকিত। গঙ্গার নিশির অন্ধকার সে হাসির তোড়ে কি টিকিতে পারে? সে অন্ধকার আজ কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু এক কথা জিজ্ঞাসা করি—আজ চন্দ্রের এত হাসি কেন?

নিস্তারিণীর উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছে। এত জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছিল—যেন সেই জ্যোৎস্নারাশিতে তাহার শয্যা ডুবিয়া গিয়াছে, আর সেই-জ্যোৎস্নার উপর নিস্তারিণী এখন স্বামী পুত্র ও কন্যা লইয়া ভাসিতেছে। নিস্তারিণী সেই জ্যোৎস্না-প্লাবিত শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সেইজন্যই কি চন্দ্রের আজ এত হাসি?

চন্দ্রমা! তোমার ও হাসি—তোমার ও জ্যোৎস্না লুকাইয়া ফেল। আজিকার দিনেও যদি তুমি হাস্ত বা তোমার ঐ জ্যোৎস্না ছড়াও; একে ত তুমি কলঙ্কী, তাহার উপর এ ঘোরতর কলঙ্ক রাখিবার স্থান তুমি কোথায় পাইবে? ঐ যে অবলা, স্বামী পুত্র ও কন্যা লইয়া, তোমার ঐ সুন্দর জ্যোৎস্নার মধ্যে থাকিয়াও ছট্‌ফট্ করিতেছে; উহার প্রাণের ভিতর কি হইতেছে, তাহা কি তুমি জান? যদি জানিতে, তোমার ঐ পাষাণ হৃদয়ও এতক্ষণ ঐ অবলার দুঃখে গলিয়া যাইত।

নিস্তারিণী আর থাকিতে পারিল না, প্রাণের জ্বালায় উঠিয়া বসিল। উঠিয়া বসিয়াই, প্রথমে সুখদার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। সুখদার সেই প্রফুল্ল-ক্ষুদ্র মুখখানি আজ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। নিস্তারিণী সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সুখদার ঐরূপ শুষ্কমুখ দেখিতে পারে না। আজ যে-আহার অভাবে তাহার মুখ ঐরূপ শুষ্ক হইয়াছে, তখন এই কথাই হঠাৎ নিস্তারিণীর মনে উদয় হইল। সে কথা মনে হইবামাত্র, মায়ের প্রাণ যে কতদূর আকুল হইয়া উঠিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাহার পর নিস্তারিণী সতৃষ্ণনয়নে সেই বালিকার মুখখানি দেখিতে লাগিল। সেই শুষ্ক ক্ষুদ্র মুখখানি ভয়ে ক্রমে যেন আরও সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। কন্যার সে ভয়ের কারণও মাতা তখন বুঝিতে পারিল। একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, মাতা, কন্যার সেই ক্ষুদ্র মুখ চুম্বন করিল। সেই সুদীর্ঘ নিশ্বাস ও প্রগাঢ় চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন মাতার হৃদয়ের একটা বন্ধন তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া গেল! মাতার উন্মাদিনী দৃষ্টি তখন অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। সে দৃষ্টি কি দেখিল, দেখিল—তাহার সেই শিশুপুত্র, ক্রন্দনের পর নিদ্রিতাবস্থাতে, তখনও মধ্যে মধ্যে ফোঁপাইতেছে। সে ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণে এত ভয় কেন হইতে আসিল? ভয়ে সে শিশুও যেন মধ্যে মধ্যে চম্‌কাইয়া উঠিতেছিল। মাতা এবারেও একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, সেই শিশুপুত্রের মুখচুম্বন করিল—এবারেও ঐ দীর্ঘনিশ্বাস ও চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে মাতার হৃদয়ের আর একটি বন্ধন ছিঁড়িল। মাতা আর সেদিকে চাহিল না, এবার অন্যদিকে চাহিল। অন্যদিকে কি দেখিল? দেখিল—তাহার ইহকালের সাক্ষাৎ দেবতা ও পরকালের মুক্তিদাতা স্বামী, নেশায় অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। নিস্তারিণী তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া, সেই পাষণ্ড স্বামীর চরণ ধরিয়া বলিল,—"স্বামীন্! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর। আমি যে কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাতে তুমি না ক্ষমা করিলে, আমার আর অন্য উপায় নেই। তোমার সেবা করিলে আমার ধর্ম্ম হ'তো, আমি জানি; কিন্তু আমি অভাগিনী, আমার অদৃষ্টে যে সুখ ঘটিবে কেন? আমায় ক্ষমা 'কর—আমায় ক্ষমা কর।"

নিস্তারিণী আর কথা কহিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। দুইবিন্দু অশ্রু মুছিয়া, নিস্তারিণী স্বামীর চরণে প্রণাম করিল।

একি! নিস্তারিণী এ কি করিতেছে? উন্মাদিনী কড়িকাঠে রজ্জু টাঙাইতেছে কেন? তবে কি মনোদুঃখে সতী আত্মঘাতিনী হইবে? যাহার কল্পনায় শরীর রোমাঞ্চিত হয়, যে কথা মনে ধারণা করিতে পারা যায় না, তাহাই কি আমাদের স্বচক্ষে দেখিতে হইবে?

নিস্তারিণী ফের—ফের একবার ফিরিয়া চাও! তোমার ঐ পাষণ্ড স্বামীর প্রতি না চাও, একবার ঐ স্নেহের পুতলি শিশুর মুখপানে চাও! আর, যাহার শুষ্কমুখ দেখিলে তুমি পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে, তোমার, ঐ সুখদার মুখপানে একবার চাও! জীবন্মৃত নিস্তারিণী এত বল কোথায় পাইল, আমরা জানিনা; কিন্তু নিস্তারিণী শপথ করিয়া আপনার মৃত্যুর যত্ন প্রস্তুত করিয়া লইল। নিস্তারিণী আমাদের কথা শুনিল না; নিস্তারিণী কাহারও পানে চাহিল না।

কি কর নিস্তারিণী—কি কর! সেই জ্যোৎস্নালোকে, স্বামী, পুত্র ও কন্যার মুখ দেখিতে দেখিতে, নিস্তারিণী মরণের লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। আমাদের হৃদয়ও বড় কঠিন; সেই কারণ এই লোমহর্ষণ দৃশ্যের এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। কিন্তু আর অধিক অগ্রসর হইতে আমরা পারিলাম না। আর, পারিয়াই বা ফল কি?

দেখিতে দেখিতে, সেই দুঃখময় জীবনের যবনিকা পতন হইয়া গেল!

চন্দ্রমার সে সুধাময় জ্যোৎস্না আর নাই! এই সময় কোথা হইতে একখণ্ড মেঘ আসিয়া, সেই পূর্ণিমার চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল। ঘনঘোর ঘটায় তৎক্ষণাৎ চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। মেঘগর্জ্জন ও বজ্রনাদে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি দেখা দিল। এ কি?—প্রকৃতির আকস্মিক পরিবর্ত্তন, না প্রলয়?

পাগ্‌লা-গারদ।

শ্রীহরি দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। অনেক যোগাড়-যন্ত্রে, অনেক সুপারিসে, পাগ্‌লা-গারদে প্রবেশের অনুমতি পাইলাম। দ্বাররক্ষক দ্বারের অর্গল খুলিয়া দিল। আমাকে দেখাইয়া দিল—ঠিক সিধা-পথে যাইবেন, তার পর দক্ষিণ-দিকে।

আমি ভিতরে প্রবেশ করিতেছি। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, চতুর্দ্দিকে সু-উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত, সম্মুখেই সুপ্রশস্ত সুরঙ্গীন ইষ্টক-নির্ম্মিত পথ। দূরে—অনতিদূরে, উন্মাদদিগের গৃহ—দূর হইতে দেখিতে, সুন্দর অট্টালিকা-শ্রেণী—কেমন সুশৃঙ্খলায় যেন—এক-একখানি অভগ্ন সমকোন-ইষ্টকে সুগঠিত।

দ্বার অতিক্রমের পর, সেই পথ ধরিয়া,

আমি সেই অট্টালিকা-অভিমুখে চলিয়াছি। বড়ই চিন্তা—কতক্ষণে শ্রীহরি দাদার সাক্ষাৎ পাইব? আহা! বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ নাই—মন বড়ই ব্যাকুল—ত্রিকুণ্ঠে দাদার সঙ্গে দেখা হয়! এ বৃহৎ অট্টালিকার ভিতর অসংখ্য অগণ্য উন্মাদ। সে উন্মাদের রাজ্য হইতে দাদাকে খুঁজিয়া পাইব কি?

খুঁজি ভগবান সুবিধা-মতই দিলেন। এক নগ্নদেহ দিব্যকান্তি যুবাপুরুষ হাসিতে হাসিতে আসিয়া, আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কার খোঁজ করছেন?" আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনি বলিতে পারেন কি, আমার শ্রীহরি দাদা কোন্ ঘরে থাকেন?"

"আসুন!—আসুন! এই আমার সঙ্গে আসুন!—আমি আপনাকে আপনার শ্রীহরি দাদার কাছে নিয়ে যাচ্ছি!"—যুবাপুরুষ আগ্রহ-সহকারে, আমার হাত ধরিয়া আমায় টানিতে লাগিলেন।

আমি মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলাম; ভাবিলাম,—"আহা! এমন সরল সাধু লোক তো কোথাও দেখি নাই!"

কিন্তু, এ কি? পরক্ষণেই, অট্টালিকার দিক হইতে ছুটিতে ছুটিতে, আর একজন আসিয়া বলিতে লাগিল,—"ম'শায়, যাবেন না—যাবেন না! ও বেটা পাগল—ও বেটা পাগল! ও বেটা ঐ পুকুরের দিকে নিয়ে গিয়ে, আপনাকে জলে ঠেলে ফেলে দেবে। সাবধান—সাবধান! আমার সঙ্গে আসুন।"

আমার যেন হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। তাই তো—পাগলই তো বটে! পাগলের বুদ্ধি—জলে ঠেলে ফেলে দিলেও দিতে পারে!" আমি পিছাইয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু, তখন তাহাদের দুইজনের মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে। এ বলে,—"তুই বেটা তো পাগল! তুই ওঁকে কোথায় নিয়ে যাবি?" সেও বলে,—"তুই বেটা তো পাগল! তুই ওঁকে কোথায় নিয়ে যাবি?" এই লইয়া, তাহাদের দুইজনে বিষম মারামারি বাধিয়া গেল। পথের মধ্যে এই কাণ্ড! আমি আর না পারি অগ্রসর হইতে, না পারি পিছাইয়া আসিতে।

ইতিমধ্যে আর এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। সুপ্রবীণ, পরিপক্ক কেশ, দীর্ঘ-ললাট, ঋষিতুল্য-মহিমান্বিত। তিনি আসিয়া, আমায় ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ম'শায়, পাগলের হাতে পড়েছিলেন, তা ভয় নেই; কার কাছে যাবেন, আসুন। আমি লইয়া যাইতেছি।"

আমারও কানে কানে কে যেন বলিয়া দিল,—"হাঁ, ইনিই তোমার উপযুক্ত লোক; ইনিই তোমাকে তোমার শ্রীহরি দাদার নিকট পৌঁছিয়া দিবেন।" আমি অবনত-মস্তকে বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বৃদ্ধ আরও বলিলেন—তিনি 'আমার শ্রীহরি' দাদাকে বিশেষরূপে চেনেন, তাঁর সঙ্গে গেলে ঠিক যাওয়া যাবে।

আমি এক-মনে চলিয়াছি। বৃদ্ধ যেদিকে লইয়া যাইতেছেন, আমি সেইদিকে চলিয়াছি। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে—একি! এত দুর্গন্ধ কেন, এ আবার কোথায় নিয়ে যায়—আমরা মলমূত্র-নির্গমের পথে গিয়া উপস্থিত! বৃদ্ধ আরও আমায় অগ্রসর করিতে বদ্ধপরিকর; আমি নাকে-মুখে কাপড় গুঁজিতেছি, বৃদ্ধ তখনও আমায় সেইদিকে টানিয়া লইয়া যায়! আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম! প্রাণ 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক-ছাড়িতে লাগিল। মনে হইল,—"না, আর শ্রীহরি দাদার সঙ্গে দেখা করার দরকার নাই।" কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই ছাড়ে না।

এদিকে অন্যান্য দুইব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত অন্যায় চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"ম'শায়, পাগলের সঙ্গে কোথায় যান? ওদিকে যে মলমূত্রের স্থান! যাবেন না—যাবেন না।" এই বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়া, তাহারা সেই বৃদ্ধের উপর বড়ই তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিল; বলিতে লাগিল,—"বেটা পাগল! বেটা ভদ্রলোককে ওদিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল? বেটাকে এখনই উপযুক্ত শাস্তি দেব এর!"

তাহাদের বিবাদের অবসরে, আমি তো ছুটিতে ছুটিতে আবার দরজার দিকে ফিরিতে লাগিলাম। কিন্তু, তখনও নিস্তার নাই! এ জিজ্ঞাসা করে,—"ম'শায়, কোথায় যাবেন?" ও জিজ্ঞাসা করে,—"ম'শায়, কোথায় যাবেন?"

কেহ বা আমার কাপড় ধরিয়া টানাটানি করে, কেহ-বা হাত-পা ধরিয়া টানাটানি করে। আমার প্রাণ তো ওষ্ঠাগত—আমি তখন পলাইতে পারিলে বাঁচি!—কাজ নেই আমার আর শ্রীহরি দাদার সঙ্গে দেখা করায়!

এই গোলোযোগে ক্রমে প্রহরীরাও দুই-একজন আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি পরে বুঝিয়াছিলাম, যে দ্বাররক্ষক আমায় দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিতে দিয়াছিল,—সেও সে গোলোযোগ নিবৃত্তি করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু আমার আর তখন শ্রীহরি দাদার সহিত সাক্ষাৎ করার স্পৃহা নাই; আমি তখন পলাইতে পারিলেই বাঁচি! আমার আর কোন দিকে লক্ষ্য করিবার তখন অবসর নাই—কাহারও কথা শুনিতেও প্রবৃত্তি নাই! আমি তখন সকলকেই ভাবিতেছি—পাগল! ভাবিতেছি—পাগলের হাত হইতে পলাইতে পারিলেই রক্ষা।

এই সংসার-পাগলা-গারদে আমাদের এখন ঠিক এই অবস্থা। সেই পূজ্যপাদ পিতা-পিতামহগণ—সেই যোগসিদ্ধ জ্ঞানগুরু আর্য্য-মহর্ষিগণ—আমাদিগকে, এই সংসার-ক্ষেত্রের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন; আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন—ঐ—ঐ পথে যাইলে আমরা আমাদের সেই অভীষ্ট দেবতা শ্রীহরির শ্রীচরণ লাভ করিব। দীক্ষা, উপনয়ন প্রভৃতি, আমাদের সেই প্রথম প্রবেশ।

কিন্তু, মতিভ্রান্ত হতভাগ্য আমরা—আমরা সেই গুরুদর্শিত পথে একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই, সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হই; পথে যাঁহাকে দেখি, সন্দিগ্ধমনে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি,—"ম'শায়, কোন্ পথে যাইলে তাঁর সাক্ষাৎ পাইব?" অমনি একজন এক পথ দেখাইয়া দেয়। আমরাও আমাদের সেই পূজ্যপাদ পিতা-পিতামহ-প্রদর্শিত পথ ছাড়িয়া, সেই নূতন পথে অগ্রসর হইতে থাকি। কিন্তু, সে পথেও যখন নানা অন্তরায়-বিঘ্ন দেখিতে পাই, তখন আবার আর-একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া আর এক নূতন পথে অগ্রসর হই—নিজধর্ম্ম ছাড়িয়া ক্রমে পরধর্ম্ম, উপধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পথে বিলীন হই। জানি না, বুঝি না—বুঝিতে তখন আর চেষ্টাও থাকে না—হয়! কি করিতে গিয়া কি করিতেছি! কি পরিতাপের বিষয়, লোকপূজ্য সেই সনাতন ধর্ম্ম ছাড়িয়া, তখন গিয়া অধর্ম্ম-নাস্তিকতার আশ্রয় পর্য্যন্ত লইয়া থাকি। কখনও বা ব্রাহ্ম-মহাত্মা আসিয়া আলোকে লইয়া যাইতে চাহেন, কখনও বা খৃষ্টান মহোদয় আসিয়া স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দেন, কখনও বা কত কে আসিয়া আমায় সঙ্গে লইতে চাহেন। আমি আর ভাবিবার অবসরও পাই না—কোথায় কোন্ পথে যাইব?

হিন্দু! তুমি এখন জীবনের এই সন্ধি-স্থলে দণ্ডায়মান! সেই তপঃজ্ঞানসিদ্ধ পিতৃ-পিতামহের প্রবর্ত্তিত পথ ছাড়িয়া, সেই সর্ব্ববয়বসম্মত আদর্শধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, বিধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেছ! একবার ভ্রমেও বুঝিতেছ না—ভ্রমেও ভাবিতেছ না—অবহেলায় কি অমূল্য রত্নই হারাইতে বসিয়াছ!

এখনও সময় আছে—এখনও সামর্থ্য আছে—এখনও একবার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখ—তুমি কি ফেলিয়া কি লইতেছ! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, তুমি কাঞ্চন ফেলিয়া কাচের আদর করিতে যাইতেছ—মুক্তা ফেলিয়া আসল সাঁচ্চার অনাদর করিতেছ! তোমায় ধিক্!

চাঁদের হাট।

(ব্যঙ্গকাব্য।)

কাব্যি লেখার সাধ গিয়েছে,
লিখ্‌তে হ'ল ধেঁয়ালে।
পড়বে যারা, মজ্‌বে তারা,
মিলিয়ে দিলাম দেয়ালে।

এমন জোরের ছন্দবন্ধ, এমন ললিত গান,
শুন্‌লে পরে, স্নিগ্ধ হ'য়ে, যাবে সবার প্রাণ।
কাকের গাঁদি রাশিরাশি, উড়ে তেছে ঐ আকাশে
চাঁদের মুখের লজ্জা-ঘেয়ে, তাই কুমুদী বিকাশে।
প্রেমটা যেন স্বপ্ন-মোহ, দুদিন পরে যায় ভেঙে,
দারিদজনে, হারিয়ে নিধি, বেড়ায় যেন ভিখ্ মেঙে
নবরসের সেরা রসে বঙ্গ মাতোয়ারা,
হাসি-কান্নার বিল্‌বিলিনি প্যান্‌প্যানানি ভরা।
জুয়েচোরের অগ্রগণ্য, ডাক্‌বুকুজের টেক্কা,
তাদের বাঁশীর খড়্‌খড়ানি বৃন্দাবনের একা।
যোগের কথা, যাগের কথা, যত 'নন্সেন্স' আছে,
বোকা দেখে এগিয়ে, গিয়ে ঝাড়েন তাদের কাছে
গলার স্বরে সনেজদারে সেই কথাটাই ভাবে।
ধরা পড়েছে যে জানোয়ার, কর্ব আর রবে।

সত্যি সত্যি আমি যে গো হয়ে পড়লেম কবি।
অবাক্ হয়ে খামকে রবে ঠাকুরবাড়ীর রবি।
রুচির গুরু ধর্ম্মধ্বজী, দুতীর গুরু হ'য়ে,
শেলীর উপর আসন দেবেন, নানান কথা ক'য়ে।
বাঙ্গলার মাঝে কবি হওয়া শুরু কথা নয়।
সত্তে-ণত্বে জ্ঞান না হলেও কবির থোড়াই ভয়।
'ক্লিটিক' চূড়া ব্রাহ্ম দেবী, একটা পেয়ে তাড়া;
নবীন সেনে, সপ্তস্বর্গে, করে দিয়েছেন খাড়া।
ডোবা-চুবি নুয়ে কৌ বড়, সাতটা সাগর পিয়ে;
দত্ত হরেণ বার হয়েছেন, অপ্সরা বিদ্যে দিয়ে।
তার কোটেসনের আড়ম্বরে সবাই পেল ভয়।
ধমক খেয়ে, চমক পেয়ে, দেবী বাবু রয়।
আড়ম্বরের হেম বাঁড়ুয্যে মিটমিটে জ্বলে।
উল্কা হ'য়ে নবীন সেন আকাশ দিয়ে চলে।
পলাশীর জয় শুড়ুম-গাড়ুম, শুনে প্রাণ ফাটে,
তিতুমীরের কেল্লা ওখান, প্রকাশ কল্লাম হাটে।
'কেটো'র মত নাম হয়েছে, 'কেটোর মত যাবে,
কবি ভাবেন, কুরুক্ষেত্র অমরতা পাবে।

ভাবতে মানা করিনেক, ভাবুন গিয়ে নিরালায়;
ডিভিউ পড়ে মাথা যেন বিকল হয়ে নাহি যায়
সূক্ষ্মটাই ছবির সেরা—যেন রত্ন একমুটি,
বীতার প্রাণে কৃষ্ণ-গড়া, আর কলা সব ভারকুটি।
ঐ ছবিতেই 'র‍্যাফেল' বলে তোমায় মনে হয়;
উকরার হি-হি হাসি—শাঁকচুন্নির ভয়।
বেণোয়ারির জারি-জুরি, বড়াল কবির ঢং;
সেন কামিনীর রুচির লোভা, দেবেন সেনের রং।
দুই যে রং, নহেক এমন, বেরং আছে ঢের;
'মিঠে-কড়ায়' 'হুইপ' দিতে পেয়েছিলাম টের।
'অকথার' শোকপ্রতিভা, মানকুমারীর গান,
রবিশ্মির সোণার তরী—মর্ত্ত্যে সুধা-পান।
'সনেট' লেখক নৃত্যভাষা, আর কটকের মজুন্দার,
সমাজপতি, গুপ্তজ্ঞান, এঁরা ভাষার সমেজদার।
ঠাকুরবাড়ীর কুচোকাচা কবিরিদলের বাটথারা,
তাদের কথা জানিনেক, তারা আমার হাতছাড়া।
তবে পাগল সবাই তারা, ধারেনাক ভাষার ধার,
সমনোদওয়া তাদেরলেখা, নিজেইবলেচমৎকার।
সাধারণীরঅক্ষয় দাদা, 'ফিলোজফার' চন্দ্রনাথ,
তাহুসিংহেরকেদারিনিতে একেবারে চিৎপাৎ।
বান্ধবেরসম্পাদকটী হয়ে আছেন 'ডেড্‌লেটার',
কলম তাঁর চল্লেপরে হতেন তিনি ঢের 'বেটার'।
একবিঘে পড়লে পরে, বলে বসতেন "উদীয়মান",
ব্যাকরণে নীরস হ'লেও, চিন্তনেতে এসার্স্যান।
সিংহেরজোয়া ব্যাঘ্র ঈশান, লম্ফদেন ফাক্‌তালে।
গ্যারিক্ গিরিশ মাল্লে হয়ে রঙ্গ করে ঝাঁপতালে।
ব্রাউনিংএর ডাক শুনিয়ে, বিহারী এলো এগিয়ে,
জয়ভূমির 'আর্টিকেলে' জগৎ দিল জেগিয়ে।
যার হয়েছে ঠাকুরদাস, 'সাতনরিটে' গলায় দিয়ে,
গোণারটোপর মাথায় দিয়ে, বনধেঁকেবরুলো টিয়ে।
গোবিন্দলেখক, মেঘেহিনী লেখক, রমণী শুদ্ধ বাকী,
ঘোরোদ এখন প্রত্ন-তত্ত্বী, কোথায় তুলে রাখি!
রজনী গুপ্ত মনে করেন; তিনি 'ডক্টর' গালা,
কিন্তু আমার যুটলনাক, মনে পড়্‌লো কালা।

'তাষারচটক খুবই বটে, 'স্থূলবুকে' কিন্তু টান;
তা' না হলে, ইতিহাসে হতেন্ তিনি মূর্ত্তিমান।
বঙ্গবাসীর 'লেট এডিটার' ওদের জ্ঞানেন রায়,
ভূদেবেরে তর্ক করে 'ডিফিট' কত্তে চায়।
'পতাকাতে' কেরামৎটা পেয়েছিলাম টের;
'আর লিখনা রায় মহাশয়, তোমার এলেম ঢের!
একে চন্দ্র, দু'য়ে পক্ষ, আর চাদের বেদ,
জ্ঞানেনদাদা চান উঠাতে বাঙ্গমার জ্যোতির্ভেদ।
হ'য়ের কোটার হরিসাধন লিখতেন একরকম।
'মার্সি নারি' হ'য়ে এখন, করেন রবির বক্‌রকম।
বিদ্যানেরশেষ সিভিলরমেশসেকেণ্ডক্লাস্ অবতার,
জেলেখাঁতাঁরআয়েসারপট কানায় বলে চমৎকার।
ফুঁয়ে ভরা সংসারটা, তাঁরি আবীরব্রাহ্ম আপিস,
সাহিত্যতেবারহচ্ছে, সেটা ই দেখছি সবরাবির্স।
'জিনিয়সের' জারিজুরি এঁরাই করেন বন্ধে,
পাল্লে লিখ্‌তে আমার মত, হাতছুলাতেন রন্ধে।
ঠাকুরবাড়ীর সিংহী রায়, ছেঁড়া পুঁথি খুঁজি,
কোপমারেন ঝোপ বুঝে, দেখান বিদ্যেরপুঁজি।
ডাকমহলের পূর্ণচন্দ্র ভাবে ভাবের ভাণ্ডারী,
হালের পাশে 'সিট্' লয়েছে, মনে ভেবে কাণ্ডারী।
কারমাজি তার, দেখি কত, মিল পড়েছে সাতখানা,
কুফেরগলায় দিলেধোঁচা, আমারআছেওণ-জানা।
ব্যাটবলের 'ফিলজফি', বেদব্যাখ্যার ভঙ্গিমা,
শুধুই সেটা কটমট, নাইক তাতেই রঙ্গিমা।
দাদার দাদা দ্বিজেন দাদা, লোকটা বটে সারাল,
জ্যাটামি তাঁর 'আর্য্যামিতে' বুদ্ধিখানি ধরাল।
দর্শনেতে বিদ্যে আছে কৃষ্ণকমল-বুঝেছে,
কম্‌টি-তত্ত্ব লিখতে গিয়ে ধাকা বড় খেয়েছে।
স্বরব্যঞ্জন, আঙ্ক আঙ্ক, সিদ্ধি আর ফলা।
দানোদয়ের কথাটা তো হলনা বলা।
বোকার দলে নবেল লিখে, নামটী কিনিয়াছে;
মর্ম্মযোটা কম্‌বে বলে, খেঁসলামনা কাছে।
অধিক বল্লে, 'হিউমারটী' যদি কমে যায়,
'রাইজিং পোয়েট' পড়ে যাবে ভীষণ দরিয়ায়।

বঙ্কিমের মিরেন্দাকে ছেঁচে চড়ে টেনে তুলে;
ছেঁচে চড়ামিটে দেখালে তেজ, কারদানিটে ভুলে।
মেরেছুলান নভেললিখে, যোগেন 'নভেলিষ্ট'।
মনে মনে বড়াই তাঁর—তিনিই 'রিয়েলিষ্ট'।
বেরু করেছেন 'কনে-বৌ', আর 'আমাদের ঝি',
পত্রিচয়টা আরও পাবেন, বেরুলে 'ঠাকুরঝি'।
স্বরেশবাবুএমন 'ভিভিড' দেন্ বলেইত প্রাণচটে,
ভাষানীহোষ্ঠ,ভালদেখেতাঁর, জলসিতে বুকফাটে
চন্দ্রনাথটা আমারিমতন অহঙ্কারী একরোকা;
আদর তেমন হলোনাক,বঙ্গের্পাঠকপ্রায়বোকা।
পোড়ুবে তারা,'মডেলভগ্নী'বঙ্গবাসীর বিরাট্ দান;
উপমাটা জুগিয়ে এল, সস্তা পয়সায় তাড়ি-প্রান।
নবেলেখায় রবীন্দ্রনাথ,তোমারকাছে হারমানে;
তোমার সে মধুরভাষার,সবারকেমন প্রাণটানে।
গাঁয়েমানেনাআপনি ভোলে,আরযতসবচুনাপুঁটি,
তোদেরকেলেখাচাইনেভাই,করিসনাকভিরকুটি।
দেবীরপত্রে মহেন্দ্র, বাড়িয়ে দিলে তোদের মান;
তিনি যেমি সিথিকিকেণ্ড, তেমি তাঁর হানিমান
বাঙ্গলাভাষায় বিদ্যে তোমার,পেরেছিভাইজাতে;
আবোলআবোল কত বক, একখোলা ধানভাতে।
অত্রিমনু নথের কোণায়, যাজ্ঞ্যবল্ক ধনুর্ধর,
তোমার মত আর হয়নি শ্রীঘুনজের পর!
জোঁকের গায়ে জোঁক বসেনাএই'বিওরি'মেনে;
কল্পতরুর 'অথরীটকে' আন্লৌমনাক টেনে।
সিসেভরা নয়ক মাথা,আছে বটে ইস্পাত;
ভাঁড়ামিটে না থাকলে,করে বসতে বাজিমাত।
উমেদারীর,জোরে হারাণ,মাথায়,এঁটেজমপত্র।
লিখেছ তো রাবিস খালি,তাও আবার ছুঁছত্র।

মধুসূদনের 'বায়োগ্রাফার' স্বরভিন্ন এডিটার;
পাহাড়ে এক বই লিখেছে,সবপৃষ্ঠাই অন্ধকার।
বন্ধুরা তাঁর হয় তো বলেন্—এমন ঘুমো বই,
বাঙ্গলার মাঝে কে লিখেছে,এর তুলনা কই?
এর তুলনা নাইক সই, এর তুলনা নাই,
তাঁতিমিনসে খুঁজে বেড়ায় তার দোয়া গাই।
পুঁতিখেটেছে,রাতজেগেছে,কালিনেড়েছেকত;
তবু কিছুই লেখেনিক, লিখবায় ছিল যত।
বঁধু তোমায় বলিহারি, বলিহারি বঁধু;
ভাঁড়ুক জনে আপনি পাবে, মধুর মাঝে মধু।
পঞ্চবেদীর দুই মাইনস্, আর বন্দ্যো হরিপ্রভ,
কতকলেখা ভাল লেখে,অনেকলেখাই ছাইপাঁশ
এইত কজন,কুড়ুম কাড়ুম করেন বঙ্গের আসরে,
এঁদের আবার জারিজুরি—দেখে,হাসি পায়রে।
হুদ করলে বঙ্গ থাকায়,এদুঃখ আর কব কায়,
ব্যঙ্গকাব্য ভীষণ শল্য, সত্যি কথা লেখা দায়!
আমার মত ইঙ্গিতেতে ব্যস্ত করা সোজা নয়,
হেসেখুসে পড়বে সবাই,লাগবেনা'ক কার ভয়।
এ মস্তারার অর্থ নাইকভেবেনেবে সবাই নিজে,
এ'স্যাটায়ার' পড়লেকারু উঠবেনাক নয়নভিজে

[আসল কথা।]

বাঙ্গালাদেশের সাহিত্যের
সিংহাসনের পদ খালি,
বস্‌তে আমার সাধ গিয়েছে,
তোমরা দেওগো হাততালি।

মুখচন্দ্র, না মুখপদ্ম?

বর্ত্তমান বর্ষের ৯ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখের "অনুসন্ধান"-পত্রে, "মুখ চন্দ্র, না মুখপদ্ম" প্রবন্ধে, কবির বিরুদ্ধে শ্রীমতী যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের একুশ আনা (ষোল আনার উপর পাঁচ আনা কর্জ্জ করিয়া) সহানুভূতি আছে। সুন্দরীর মুখের সহিত আবার চাঁদের তুলনা—পদ্মের উপমা? মুখশ্রীতে কৃষ্ণপেচকী হইলেও তিনি "সুন্দরী"-পদবাচ্যা, বর্ণে বায়সী হইলেও তাঁহার "সুন্দরী" নাম মৌরস-পাট্টা করা, তাঁহার শ্রী-মুখের সহিত 'চক্রাকার' চাঁদের এবং হাঁ-করা পদ্মের তুলনা—কবির কি অনির্ব্বচনীয়, অসামান্য, অমানুষিক বে-আদবী! শ্রীমতীর শ্রী-পক্ষ সমর্থন করা সমস্ত "নারী-হিতৈষী নরবরেরই" কর্ত্তব্য—ওকালতনামার অভাবই বোধ হয়, এই অনুচিত ঔদাস্যের কারণ। আর যদি আমাদিগকে বিচারকের আসন প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে অগ্রেই রসিকবিত্ত ও কল্পনা বাজেয়াপ্ত করিয়া, তাঁহাকে বৈজ্ঞানিকের 'কঠোর নিষ্ঠুর' আসনে বসাইতাম; তৎপরে অবলা সরলা অমলা চপলা তুলবালাগণের অমর্য্যাদা করা অপরাধের জন্য দণ্ডবিধির অতিরিক্ত ধারা-অনুসারে শয়নমন্দিরের প্রাচীর-চতুষ্টয়ের মধ্যে তাঁহার যাবজ্জীবন কারাবাসের বন্দোবস্ত করিতাম; অথবা মস্তাস্তরে তৃণদ্বারা 'মত্তহস্তী বাঁধিয়া ছোটবুড়ো মহাশয় ওরফে শ্রীশ্রীদেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় তাঁহাকে সেই অবলা সরলার পদানত করিয়া দিতাম। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আমাদিগকে কেহ বিচারকের আসনে বসান্ নাই, এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসার জন্য আমাদিগকে মধ্যস্থও কেহ মানেন নাই।

সাহিত্য-রাজ্যে রাজা নাই; কবিত্ব-মহলে বড়ই অত্যাচার, অনাচার, যথেচ্ছাচার। কবিগণ সুন্দরীকুলকে লইয়া বড়ই যাহা-ইচ্ছা-তাই করিয়া থাকেন; তাঁহার কলম চাপিয়া ধরে, এমন লোক ভূমণ্ডলে বড়ই দুর্ল্লভ। বলি বাপু হে! তোমাদিগের আসমানী কির আমল হইতে প্রচলিত অত্যাচারের দিন আর নাই। এখন দ্বষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, সভ্যতার গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলোকে এখন জগৎ আলোকিত, পুলকিত; সর্ব্বত্রই সাম্য ও স্বাধীনতার ঢেউ উঠিয়াছে,এমন্ কি আবহমান-কালের গলিত দলিত জীর্ণ শীর্ণ রমণী-হৃদয়ের ভাঙ্গা-চুরা আগড়খানিতেও সজোরে ধাক্কা মারিতেছে। এখন কি আর তোমাদিগের অত্যাচার খাটে? তাই বলি যে,সুন্দরীর সুন্দর মুখের তুলনা এখন আর তুলিও না। প্রাচীন কালে চাঁদ-পদ্মের সহিত রমণীমুখের তুলনা করিয়াছ, তখন শোভা পাইয়াছে এবং তুমিও করতালি ও বাহবা পাইয়াছ; কিন্তু এখন সে কালও নাই এবং সে মুখও নাই, সুতরাং সে মুখের আর সে তুলনাও নাই। সে মুখের তুলনা সেই মুখ ভিন্ন আর কিছুই নাই—যেমন "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা"। অচঞ্চল চাঁদ-পদ্মের সহিত রমণীমুখের তুলনা সেকালে খাটিয়া থাকিবে; কেন্ না, সেকালে রমণী-মুখ আদৌ চলিত না। কিন্তু এখনকার নিয়ত-চলচ্ছক্তি-বিশিষ্ট মুখের সহিত, অচঞ্চল প্রদার্থের তুলনা কি প্রকারে চলিতে পারে? পুর্ব্বে সাত চড়েও যে মুখ হইতে কথাটি বাহির হইত না, বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিত না, এখন বক্তার ছোটে সেই মুখে খই ফুটিতেছে, বর্ষার সঙ্কলন একটানা স্রোত ছুটিয়াছে।

গোড়া পুরুষ-বেচারায় বিনা-অপরাধে সেই মুখ হইতে এখন নায়েগ্রা-প্রপাতের ন্যায় অমৃত-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছে। সেকালে যে মুখ বেলা তৃতীয় প্রহরের পরে—যখন সংসারে কেহই আর অভুক্ত নাই—নিভৃত গৃহের কোনে মৃদুমন্দভাবে চলিত, এখন কাজের পুরীষ ভক্ষণের অগ্রেই সে মুখ চলিয়া থাকে। আর সর্ব্বসমক্ষে চলা, কিম্বা সকল সময়ে চলা, কিম্বা যাহা-তাহা সম্বন্ধে চলা,এ সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কেন অশ্লীলতার (?) পরিচয় দিব? এই ত গেল অতি সংক্ষেপে চলা-অচলা সম্বন্ধে কবির বে-আব্রুবীর কথা!

তাহার পরে আকৃতি-প্রকৃতির কথা! তিথি-অনুসারে চন্দ্র দৃশ্য-অদৃশ্য হইয়া থাকে, কিন্তু এখনকার মুখ-চন্দ্র একেবারেই অদৃশ্য হইতে জানে না—শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে, কিছুদিন পরে বোধ হয়, 'ঘোমটা' শব্দটাকে অভিধানের পৃষ্ঠা হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। সূর্য্য-প্রণয়িনী পদ্ম সূর্য্যের অবিদ্যমানে মুদিত হয়, কিন্তু এখনকার মুখ-পদ্ম আর স্বামীর পরোয়া করে না এবং কোন কালেই মুদিত হয় না। আবার দেখুন, কবির কি ব্যাকরণ বোধ! যে চন্দ্র ব্যাকরণের মতে পুংলিঙ্গ এবং পদ্ম স্ত্রীবলিঙ্গ শব্দ, তাহাদিগের সহিত রমণী-মুখের তুলনা—কবির ব্যাকরণ-বোধের বালাই লইয়া মরি! এখনকার রমণী-মুখ কোন বিষয়েই চাঁদ-পদ্মের সহিত তুলনীয় নহে; তথাপি হতভাগা কবির কি দুর্দ্দিসহ জুলুম!

কোমলত্ব-সম্বন্ধে সাবেক তুলনা আর চলে না। কোমলত্বের দিন গিয়াছে। রমণীগণকে ক্রমে স্পার্টাস রমণী হইতে হইবে। "ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন মৃদুমলয়ে"র আর চলে না; তাহার স্থলে "শুষ্ককাষ্ঠের তিষ্ঠত্যগ্রে" চাই নিতুবা ভারত-উদ্ধারের পথ প্রশস্ত হইবে না—"তুমিমে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে" থাকিবে—এইজন্য, কোমল কমলদল-তুল্য রমণী-মুখ এখন বিরল হইতেছে; সুতরাং খোড়া-চড়া, ডন-পাড়া, বেলুন-উড়া রমণী-মুখের সহিত নিরীহ পদ্মের তুলনা নিতান্ত অমর্য্যাদাসূচক। একারণই যদি একটা ফুলের সহিত তুলনা আবশ্যক হয়, তাহাহইলে শিমুলের সহিত তুলনা করিতে পার; কেন না, দুইই সমান—আর কিছুতে হউক না হউক—গুণে এবং মেজাজে, তদ্ভির কাঁটাতেও বটে। বর্ণেও এখন পদ্মের তুলনা খাটে না। কেন না,এখন সাবান-বিমর্দ্দিত ও পাউডার ঘর্ষিত মুখের আর পদ্মাভরণ নাই—এখন সে মুখ হইয়াছে ছাইমাখা সন্ন্যাসীর দেহ অথবা মিউনিসিপ্যালিটীর অনুগৃহীত কাঁচা রাস্তা। তাহার পরে লাবণ্য—তাহাতেও তুলনা খাটে না। নীরস বিরস কাট-খোট্টা আধা-পুরুষ-আধা-রমণী মুখের আবার লাবণ্য কি? লজ্জাই স্ত্রীলোকের লাবণ্য; কিন্তু সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে তাহা উড়িয়া গিয়া, অসভ্য-সমাজের অন্ধকারে আশ্রয় পাইয়াছে। লজ্জাই সকল অনর্থের মূল, অতএব তাহাকে উৎপাটন করা আবশ্যক; নতুবা "সাগর ছেঁচে রতন" মিলবে কেন? লাবণ্য এক্ষণে লুপ্তপ্রায়; যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল লাবণ্যকুমারী, লাবণ্যময়ী, লাবণ্যবতী প্রভৃতি নামে—ভরসা করি, এ লাবণ্যটুকুও ক্রমে লুপ্ত হইবে।

চাঁদ-পদ্মের প্রভার সহিত যদি বকেয়া কবিগণ রমণী-মুখের তুলনা ফিরিয়া থাকেন, আমরা বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি যে, এখন সে গিয়েও তুলনা খাটে না। পাতিব্রতই রমণীর আভা, প্রভা, বিভা, শোভা, যাহা কিছু বল; কিন্তু এখন সে ভার পড়িয়াছে—পুরুষের উপরে। এখন আর পতিব্রতা নারী বড় একটা দেখিতে পাইবেন না; দেখিতে পাইবেন, কেবল—পত্নীব্রত পুরুষ। সুতরাং এখনকার রমণীতে প্রভা নাই, এবং চাঁদ-পদ্মের সহিত তজ্জন্য তাঁহার মুখের তুলনাও সম্ভবে না। এখনকার রমণীর প্রভা কেবল "প্রভাবতী" নামে! কোন্ বিষয়ে বলিব? —কোন বিষয়েই এখন চাঁদ-পদ্মের সহিত শ্রীমুখের সাদৃশ্য নাই। দিবসে পদ্ম ফুটে এবং রজনীতে চাঁদ উঠে; কিন্তু মুখ-চন্দ্র বা মুখ-পদ্মের দিবস-রজনী নাই, উদয়-অস্ত হইবার সময় অসময় নাই—আবশ্যক হইলে ২৪ ঘণ্টাই অক্ষত, অথবা স্থানান্তরে সমুদিত। আকাশের চাঁদ সকলেরই দুষ্প্রাপ্য এবং অগাধ-জলে কণ্টক-বিশিষ্ট নালের পদ্মও সহজলভ্য নহে; কিন্তু মুখ-চন্দ্র বা মুখ-পদ্ম তাদৃশ দুষ্প্রাপ্য নহে; তাহার প্রধান সাক্ষী—কন্যাভার-গ্রস্ত মহাপুরুষগণ—ঘরের কড়ি দিয়া বিদায় এখন-কার সমাজ-পদ্ধতি। এইপ্রকার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থাতেও কবির চাঁদ-পদ্মের সহিত রমণী-মুখের তুলনাকে, বে-আন্দাজ বে-আদবী না বলিয়া, আর কি বলি বলুন দেখি?

পুষ্পের মধু সর্ব্বজন-প্রশংসিত, আর চন্দ্রের সুধার জন্যই তাহার নাম সুধাংশু; কিন্তু শ্রীমুখপঙ্কজ অথবা বিধু-বদন হইতে মধু নিঃসৃত হইতে আজকাল আর কেহ দৈখিতে পান কি? মধুর পরিবর্ত্তে শ্রীমুখ হইতে গালি-গরল বর্ষণ হইয়া থাকে। মধুদানের ব্রত উঠিয়া গিয়াছে; সুতরাং মধুচক্রে এখন কেবল মাছির তাঁক জল ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাহার পরে চাঁদ-পদ্মের গুণ 'শৈত্য', কিন্তু এখনকার শ্রীমুখ-চন্দ্র বা শ্রীমুখ-পদ্মের গুণ 'উষ্ণতা'; তাহা স্বভাবতঃই হউক, আর কাহার শিক্ষাগুণে, কাহার দেখে শুনে, কাহার বা সখ করিয়া,কাহার বা দায়ে পড়িয়া। এইপ্রকার চাঁদ-পদ্মের যত গুণ আছে, শ্রীমুখের সহিত তাহার একটার তুলনা হয় না। পূর্ব্বে যাহাও ছিল,এখন তাহা দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—

"গুণ হয়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়।"

"অধিক লিখিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।"

নতুবা কবির অন্যায় আচরণের আমরা আরও সমালোচনা করিতে পারিতাম! আমরা "নারী-হিতৈষী" অপক্ষপাতী বলিয়াই বিনা ওকালতনামাতে সুন্দরীগণের পক্ষ হইতে দুই-এক কথা বলিলাম মাত্র। পারিতোষিক বা পারিশ্রমিক স্বরূপ আমরা কিছুই প্রত্যাশা করি না; সুতরাং ভরসা করি, ঘোড়শোপচারে জলযোগের ব্যবস্থা হইতে সুন্দরীগণ বিরত থাকিবেন।

মতামত।

গ্রন্থাবলী—৭ম ভাগ।—কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। কবিবরের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রবন্ধ-গুলি শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে সেই বীণা-রঙ্গভূমির অভিনীত 'বীরে মালিনী' আর 'মাসিক উপন্যাসে' প্রকাশিত 'প্রতিফল' উপন্যাস প্রভৃতি কতকগুলি সুন্দর গ্রন্থ আছে। কবিবরের অন্যান্য গ্রন্থাবলী যেরূপ সাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছে; তদ্রূপ ত্বরি, এই শেষ গ্রন্থাবলীও তাঁহাদের নিকট সেইরূপ আদৃত হইবে। তবে আমাদের দুঃখ এই—ইহার পর কবিবরের আর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইবে না—এই সপ্তম ভাগ গ্রন্থাবলীই তাঁহার শেষ গ্রন্থাবলী। "প্রতিফল", উপন্যাসখানি তিনি মৃত্যুশয্যায় লিখিয়াছেন। উপন্যাসেও যে কবিবর সিদ্ধ হস্ত ছিলেন, ইহাতে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। এই গ্রন্থাবলী র মূল্য ২৲ দুই টাকা, কিন্তু সম্প্রতি ১৲ এক টাকা মূল্যেই প্রকাশক বিক্রয় করিতেছেন।

নিবেদন।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়েরা অদ্যাবধি "অনুসন্ধানের" অষ্টম বর্ষের (১৩০১সালের) অগ্রিম মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন একটু সত্বর তাঁহাদের টাকা চারিটী পাঠাইয়া দেন। 'সাপ্তাহিক অনুসন্ধান' যেরূপ ব্যয়বাহুল্য শুরু তার ব্যাপার, ভরসা করি, সে সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, মূল্যের টাকা-চারিটি পাঠাইতে কেহই বিরত হইবেন না।

বিশেষ, আরও পরে টাকা দিলে, পশ্চাদ্দেয় হারে তাঁহাদিগকে টাকা দিতে হইবে, স্মরণার্থ নিবেদন। নিয়মিত পত্রিকা পাইয়া, কেহই যে নিয়মের ব্যত্যয় করিবেন না, সম্পূর্ণ ভরসা করি।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী কার্য্যাধ্যক্ষ।
অনুসন্ধান-কার্য্যালয়, ১৮৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"অনুসন্ধানের" নিয়মাবলী।

১। গ্রাহকনম্বর ব্যতীত, কি ঠিকানা-পরিবর্ত্তন, কি টাকা জমা, কোন কার্য্যই হয় না। প্রতিবারের কাগজের মোড়কে গ্রাহক-নম্বর থাকে।

২। "সাপ্তাহিক অনুসন্ধানের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই, চারি টাকা। পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৫ পাঁচ টাকা।

৩। পুরাতন গ্রাহকগণ নূতন বর্ষের প্রথম কাগজ-প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে এবং নূতন গ্রাহকগণ এক মাস মধ্যে টাকা দিলেই অগ্রিম হিসাবে গৃহীত হইবে তৎপরে টাকা দিলে, পশ্চাদ্দেয় হিসাবে জমা হইবে।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে, তৎপর-সংখ্যা-প্রাপ্তির পরই জানাইতে হইবে। উপর্য্যুপরি দুই সংখ্যা না পাইলে, নিয়মিত সময়ান্তে, তৎক্ষণাৎ তাহা জ্ঞাতব্য। অধিকপরে জানাইলে, আমরা তাহার দায়ী হইব না। সে ক্ষেত্রে প্রতি সংখ্যার দাম ৵০ আনা।

৫। লেখকগণ ভিন্ন, পত্রোত্তর-প্রার্থী হইলে, রিপ্লাই কার্ডে বা টিকিট-সহ পত্র লিখিতে হয়।

'অনুসন্ধানে' বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

(ক) বিজ্ঞাপনের মূল্য—এক বৎসর কোন বিজ্ঞাপন চলিলে, প্রতিবার প্রতি ছত্র এক আনা। প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲ পাঁচ টাকা।

তদ্ভিন্ন, একবারের জন্য—প্রতি ছত্র ।০ চারি আনা; এক মাসের জন্য প্রতি ছত্র প্রত্যেক বার ৵০ আনা; তিন মাসের জন্য—প্রতিবার প্রত্যেক ছত্র ৵০ আনা; ছয় মাসের জন্য—প্রতিবার প্রতি ছত্র ৵১০ আনা।

কি বিজ্ঞাপনের টাকা, কি গ্রাহকগণের দেয় টাকা, 'অনুসন্ধান'-সংক্রান্ত সকল টাকাকড়ি সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

'অনুসন্ধান'-কার্য্যালয়, ১৮৯ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুসন্ধান।

কলিকাতা পিটর ম্যাগাজিন লাইব্রেরী
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ। | ৮ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। | অষ্টম সংখ্যা।

সাধ।

বিহি! তোঁহে শপথি হামারি।
আন জনম মোহে, যদি পঁহু দেয়বি,
করইবি আহিরিণী নারী।
মধুর প্রেমরস, কোমল অন্তর,
তব তুঁহু দেয়বি হামে,
সব জন উপেখই, তেজই কুলশীল,
সরবস সোঁপব শ্যামে।
কুসুমিত পবন-হিল্লোলিত শীতল,
সুন্দর যমুনাক কূলে,
নব দুরবাদল-শ্যামল পুলিনহি
নীপ-কদম্বক মূলে।
নব নব ব্রজতরু পল্লব ডোড়ই
যতনে কুটির নিরমাব,
প্রেম বরত ধরি, বৈঠই তহু মাহা
নঁধুয়া-পিরীতি-গুণ গাব।
পদতলে ছামারি, যমুনা ঘন উলটই
শুনইবে সোঁ গুণগানে,
তরল হৃদয় মাহা, ধারই রাখওয়ে,
সাগর-সঙ্গ মপানে।
ঘন নব অরুন, তরুবর-কুর-মণ্ডিত,
উদয়িবে গোকুল-ভালে,
সারী শুক কোকিল, নাহ গুণ গাওয়ব,
শোভন শ্যাম তামালে।
সব-জন-সঙ্গিনী, প্রিয়-অনুরাগিণী,
সাজব সবহুঁক সাথে,
আন ভান করি, কুণ্ডমানছলে,
হেরইতে ধাওয়ব নাথে।
পেখই শ্যামর, নব-বন লাবণি,
টুটইবে আখরী ডোরি,
পেখই ভঙ্গিম, সুকুটিল চাহনি,
খসইবে গাগরী মোরি।
করবঁ সবহুঁ সাথে, তনু অবগাহব,
করব লহর-ক্রোড়ে কেলি,
কলনাদে ভানুজা, শ্যামগুণ গাওয়বে,
হামে গাওয়ব সখী মেলি।
করবঁ সো মঞ্জুল, কুঞ্জহি পেঠব,
বিনিসুতে গাঁথব মালে,
শ্যাম ভরমে হাম, প্রেম উনমাদিনী,
বেঢ়ল শ্যাম-তমালে।
মাধবী-ফুল-সুসুম-মুখ-চুম্বিত
নেহারই ভ্রমরা পাঁতি,
দুর্জ্জয়-মান-সায়রে তহু ডারব,
মলিন করব মুখকাঁতি।
করবঁ যতনে কুল-শেখ বিছাওয়ব,
বংশীবট-তরুছায়ে,
গাঢ় আলিঙ্গনে হিয়া হিয়া বাঁধই,
ঘুমাওয়ব দুহুঁ এককায়ে।
শিথী মুখ স্পন্দিত, মল্লিকা-পরিমল,
ঝরই পড়ব সব গাতে,
কিসলয়-পল্লব, যতনে দুলাওব
মধুরিম সছর বাতে।

অবতার প্রয়োজন ও বুদ্ধাবতার।

৬। দিগম্বর। ইঁহাদিগের নামান্তর আইত।* দিগম্বরদিগের মতে আত্মা দেহাতিরিক্ত পৃথক্ পদার্থ; কিন্তু আত্মার পরিমাণ আছে, তাহা দেহের তুল্য। ইঁহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানমতের বিরোধী। ইঁহারা বলেন, প্রতিদেহে পৃথক্ পৃথক্ আত্মা অবস্থান না করিলে ঐহিক ফল-সাধনের নিমিত্ত কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্ম্মে কোন-রূপেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে না। ফলভোগের নিমিত্তই লোকে কার্য্যানুষ্ঠান করে। অনুষ্ঠান-কর্ত্তা আত্মা যদি ফলভোগকালে উপস্থিত্ না থাকে,তবে একের ফলভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে না। আমি কর্ম্ম করিয়াছি, আমিই ফলভোগ করিতেছি—সক-লেরই এই অনুভব হইয়া থাকে; অতএব আত্মাকে নিত্য বলিয়াই মানিতে হইবে। আত্মার পরিমাণ দেহের তুল্য, আইতই পরমেশ্বর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও রাগাদিশূন্য।

সম্প্রতি জৈন-সম্প্রদায় ব্যতীত বৌদ্ধদিগের অন্য কোন সম্প্রদায় প্রায় দৃষ্ট হয় না। শারীরক ভাষ্যানুসারে বিলম্বন প্রতীত হয় যে, ভারত-বর্ষে যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের নানা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ছিল এবং প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে চার্ব্বাকাদি ভীষণ নাস্তিকমতের প্রাদুর্ভাব হইয়া ছিল, সেই সময়ে শিবাবতার ভগবান শঙ্করা-চার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। পাষণ্ডমতের খণ্ডনপূর্ব্বক সনাতন আর্য্যধর্ম্মের উন্নতিসাধন করাই, শঙ্করাবতারের প্রয়োজন। "তত্ত্বমসি" মহা-বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ, ভারতবাসী বহুকাল বিস্মৃত হইয়াছিল; ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাহা বিশেষ-রূপে স্মৃতিপথারূঢ় করিয়া দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এহেন মহামহিমান্বিত শঙ্কর ও পৌরাণিকদিগের দ্বারা অসৎ-শাস্ত্রপ্রচারক বলিয়া প্রকারান্তরে নিন্দিত হইয়াছেন। শঙ্করা-চার্য্যের মতকে কেহ কেহ 'আবার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

* আইতদিগের জৈন নামে একটী শাখা-সম্প্রদায় আছে;বুদ্ধদেবের। নামান্তর "জিন"; এতদনুসারে এই সম্প্রদায় "জৈন" নামে খ্যাত হইয়াছে। জৈনেরা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উপাসনা করেন না।* ইহাঁরা তীর্থঙ্কর পার্শ্ব-নাথের উপাসনা করেন। পার্শ্বনাথ একজন বৌদ্ধাচার্য্য; ইনি কাশীনগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁকে তৃতীয় বুদ্ধ বলিলে, বোধ হয়, অসঙ্গত হয় না। জৈন সাধুরা ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ, শুক্লবস্ত্র পরিধান ও কুঞ্চিত কেশ ধারণ করেন। কেহ কেহ উলঙ্গ থাকেন।* ইহাঁরা অতিশয় ক্ষমাশীল। পথ চলিবার সময় পিচ্ছিকা-দ্বারা ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে সরাইয়া, পরে পদক্ষেপ করেন। একাকী আহার করেন না। জলপাত্র ব্যবহার করেন না; হস্তদ্বারা জলপান করেন। পরন্তু স্ত্রী-সহবাসে একান্ত বিরত। শারীরক ভাষ্যানু-সারে জানা যায়, জৈনেরা "সপ্তভঙ্গীনয়" নামে সাতপ্রকার ন্যায় স্বীকার করেন। যথা;—

"স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি স্যাদস্তি চ নাস্তি চ।
স্যাদবক্তব্যঃ স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ স্যাৎ ॥
নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ।"

অর্থাৎ—অস্তি ১, নাস্তি ২, অস্তিনাস্তি ৩, অবক্তব্য ৪, অস্তি ও অবক্তব্য ৫, নাস্তি ও অবক্তব্য ৬, অস্তিনাস্তি ও অবক্তব্য ৭। এ সম্বন্ধে যাঁহাদিগের অধিক জানিবার প্রয়োজন হয়, তাঁহারা ভগবান শঙ্করাচার্য্য-কৃত শারীরক ভাষ্যের ২য় অধ্যায় পাঠ করিবেন। ইহাতে জৈনমত সমালোচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে

সম্যক্ দর্শন,সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র্য, এই তিনকে রত্নত্রয় বলা যায়। জিনোক্ত তত্ত্বের বিপরীত-জ্ঞান ও সংশয়াদি নিরাকরণ-রূপ সম্যক্ শ্রদ্ধাকে সম্যক্ দর্শন, জিনোক্ত-তত্ত্ব-জ্ঞানকে সম্যক্ জ্ঞান এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগের নাম সম্যক্ চারিত্র্য। এই চারিত্র্য আবার পাঁচ প্রকার। যথা;—অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। স্বাবর-জঙ্গম কোন প্রকার প্রাণীবিনাশ না করাই অহিংসা। যে যাহা দেয়,তাহা হইতে অধিক বস্তু গ্রহণ না করা অস্তেয়। সত্য হিতকর ও প্রিয়বাক্যের নাম সুনৃত। কাম-ক্রোধাদির পরিত্যাগ ব্রহ্মচর্য্য। সকল বিষয়ে মোহত্যাগের নাম অপরিগ্রহ। এই পাঁচ প্রকার মহাব্রত সাধন করিলে পরম পদ প্রাপ্তি হয়।

তন্ত্রশাস্ত্র যেরূপ বেদের অপেক্ষা না করিয়া অনেক বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিয়াছে; বৌদ্ধাচার্য্যগণও সেইরূপ—কেবল ধর্ম্ম নহে,—বিজ্ঞানাদি বিষয়েও বৈদিকমতের অপেক্ষা না করিয়া পৃথক জ্ঞানরাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু বেদের অপেক্ষা না-করাতে ইহাঁরা যেরূপ নাস্তিক-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, তান্ত্রিকগণ সেরূপ হন নাই†। সে যাহা হউক, ভগবান শঙ্করাচার্য্য যেরূপ তাঁহার বেদান্তভাষ্যে বৌদ্ধ-

* তান্ত্রিক কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনা-কাণ্ড সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীর। বৈদিক-প্রণালীর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। তান্ত্রিক চিকিৎসা-প্রণালীও অধিকাংশস্থলে আয়ুর্ব্বেদ-নিরপেক্ষ।* ইদানিং এদেশে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের পরিবর্ত্তে তন্ত্রোক্ত ঔষধ দ্বারাই চিকিৎসা-কার্য্য-সম্পাদিত হইয়া থাকে।

† তান্ত্রিকদিগের নাস্তিক-মধ্যে পরি-গণিত না হইবার কারণ এই যে, ইহাঁরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং আস্তিকমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। বৌদ্ধ-দিগের দার্শনিকমতের উল্লেখ ও তাহার খণ্ডন করিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় ভাস্করা-চার্য্যের শিবাদ্বৈতশিরোমণি গ্রন্থে বৌদ্ধ-জ্যোতি-র্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে সেইরূপ* উল্লেখ ও খণ্ডন দেখা যায়। বৌদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদগণ পৌরাণিক-দিগের ন্যায় পৃথিবীর মধ্যস্থলে, সুমেরু পর্ব্ব-তের অস্তিত্ব স্বীকার করেন; কিন্তু তাহাকে চতুষ্কোণ স্তম্ভ-রূপে স্বীকার করাতে, পৌরাণিক মতের বিরুদ্ধ-পথে উপনীত হইয়াছেন। এই-রূপ ভ্রান্তমতে উপনীত হওয়াতে,বৌদ্ধ-জ্যোতি-র্ব্বিদদিগকে দিনরাত্রি সম্পাদনের নিমিত্ত দুইটি সূর্য্য ও দুইটী চন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। পরন্তু বৌদ্ধ-জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে পুরাণের ন্যায় পৃথিবীর আধার-পরম্পরা মানিত হয় নাই। এমতে পৃথিবী আধার-শূন্যা, কিন্তু অচলা নহে; অনন্ত আকাশে

* বৌদ্ধগণ তাহা করেন নাই। আর্য্যশাস্ত্রানুসারে বেদের প্রামাণ্য এবং ঈশ্বর ও পরকাল-স্বীকারকে আস্তিকতা বলা যায়। এই তিনের একটীর অভাবই নাস্তিকতা। বেদে, মদ্যমান দূরে থাকুক, এক 'সৌত্রামণি যাগ' ব্যতীত অন্যত্র তাহার আজ্ঞাণও নিষিদ্ধ। তন্ত্রের বামাচার-মতে মদ্যপান অবশ্য কর্ত্তব্য; কেবল মদ্য-পান নহে, তন্ত্রের আরও এরূপ বিধান আছে—যাহা বেদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; কেবল বেদ-বিরুদ্ধ নহে, লোকাচারেরও সম্পূর্ণ প্রতি-কূল। এরূপ বিরুদ্ধ-বিধাননিবিষ্ট তান্ত্রিকমতের অনুবর্ত্তন করিয়াও তান্ত্রিকগণ আস্তিক, আর সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন হইয়াও বৌদ্ধগণ নাস্তিক-নামে অভিহিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, বেদই একমাত্র তাহার প্রধান কারণ। আর্য্য-সমাজে বেদের অপ্রতিহত প্রভাব। বৌদ্ধগণ বেদবিরুদ্ধ পথে বিচরণ করিয়াও যদি মুখে মাত্র বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন, তবে আর তাঁহারা নাস্তিক-নামে অভিহিত হইতেন না। আর্য্যসমাজের অপ্রতিহত আচার-ব্যবহার ইহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিতেছে।

পৃথিবী নিয়তই অধোগমন করিতেছে। আকাশস্থ গুরুপদার্থের পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতন-দৃষ্টেই যে বৌদ্ধ-জ্যোতির্ব্বিৎ উরুকল অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ-জ্যোতির্ব্বিৎ যে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন না, এতদ্দ্বারা ইহাও বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে।

আশ্চর্য্য এই যে, বিদেশীয় পণ্ডিত নিউটন যে পতন-দৃষ্টে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, বৌদ্ধপণ্ডিত সেই পতন দেখিয়া গভীর ভ্রান্তিসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, "চন্দনং ন বনে বনে"। আশ্চর্য্যাচার্য্য অতি আশ্চর্য্য যুক্তির সহিত বৌদ্ধ-জ্যোতিষের এই অদ্ভুত মতের খণ্ডন করিয়াছেন।*

মানবাত্মার ইতিহাস।

দ্বিতীয় আপত্তি — লকের- (Locke) "Tabula Rasa," যখন মানব জন্ম-গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার মন—শূন্য, শাদা কাগজের মত—Tabula Rasa. ইন্দ্রিয়-সকল বাহ্যবস্তুর দ্বারা পরিচালিত হইয়া সেই শূন্য মন জ্ঞানে পূর্ণ করে, সেই শাদা কাগজে লিখন সাজায়, যাহা ছিল না তাহা আনিয়া দেয়।

কেহ কেহ বলেন Tabula Rasa এই কথাটি আরিষ্টটল (Aristotle)* মানব-মন সম্বন্ধে এই অর্থে প্রথম ব্যবহার করেন। ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না; তবে লক(Locke)ই ইহাকে দার্শনিক-জগতে সম্যক্ প্রচলিত করান, ইহা সুনিশ্চিত। তাঁহার মতে—মনের নিজের কিছুই নাই—যাহা কিছু আছে, সমস্তই ইন্দ্রিয়-সকল (Senses) বাহির হইতে আনিয়া দিয়াছে। যে জ্ঞান আমরা সর্ব্ববাদীসম্মত, মনের সহজাত, Æterne Veritatis, [যেমন অসীমত্ব Infinity†), কালের অনন্তস্থায়িত্ব (Eternity), কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ (Relation of cause and effect)] বলিয়া জানি, লক (Locke)তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়োৎপন্ন বলেন। কিন্তু তিনি যে তাঁহার মত প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা ও বোধ হয় না!

(১) সকলেই স্বীকার করিবেন যে, "অসীমত্ব", "অনন্তস্থায়িত্ব" ইত্যাদির ভাব (Idea)-আমাদের মনে আছে। ইহারা কোথা হইতে আসিল? বাহ্যবস্তু হইতে ইন্দ্রিয়-দ্বারা আমরা অসীমত্ব (Immensity), "বহুকালব্যাপকত্ব" মাত্রই বুঝিতে পারি—"অসীমত্ব", "অনন্তস্থায়িত্ব" ইত্যাদির জ্ঞান জন্মে না। তারপর, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ। কার্য্য থাকিলে কারণ থাকিবে—কারণ থাকিলে, কার্য্য চাই; কার্য্য-কারণে এক অনিবার্য্য সম্বন্ধ। যদি কার্য্য-কারণ-জ্ঞান বাহ্যবস্তু হইতে জন্মিত, তাহা হইলে এরূপ বাঁধাবাঁধি-আঁটাআঁটি নিয়ম থাটিত না। এ বিষয় আমি স্থানান্তরে† স্পষ্টরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(২) মন পদার্থ নহে, বাহ্যবস্তু-জাত (Matter) পদার্থ। যদি মনে কিছু না থাকে, তাহা হইলে বাহ্যবস্তুর কার্য্য কিসের দ্বারা মনোভাবে পরিণত হইবে? বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা পাঠাইল, তাহা পদার্থমাত্র; পদার্থের মত নিশ্চেষ্ট মনের উপর তাহাদের জানিয়া বেড়ান উচিত; কিরূপে তাহারা মনোভাবত্ব প্রাপ্ত হইবে? লক (Locke) ইহার উত্তর দেন নাই।

(৩) জ্ঞান, বলিলে, দুটী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়—যে জানে,আর যাহা জানা যায়। বাহ্যবস্তুই জ্ঞেয়, আর মনই জানে; তাহা হইলে মনের জানিবার ক্ষমতা (consciousness) পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। বাহ্যবস্তুর সাহায্যে জ্ঞানের (consciousness) উৎপত্তি দেখান হইল কৈ? তার পর, আত্মার জ্ঞানের জন্য অন্ততঃ দুইটী জ্ঞাতব্য দ্রব্য আবশ্যক করে। দুইটির মধ্যে যতক্ষণ না সাদৃশ্য-বৈষম্য সম্যক বুঝিতে পারি, ততক্ষণ আমাদের কোনটিই জানা হইল না। অন্ধকার না থাকিলে আলোকে জানা যাইত না, শীতলত্ব না থাকিলে উষ্ণত্ব অনুভূত হইত না, ইত্যাদি। মনে কর, বাহ্যবস্তু আমাদের-মনে দুইটী অঙ্গপাত করিল—দুইটী অনুভব-শক্তি (Sensation)জন্মাইল; যতক্ষণ ইহাদের সাদৃশ্য ও বৈষম্যের সম্যক উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ কেহই জ্ঞানে পরিণত হইবে না। এখন, ইহাদিগকে পরস্পর মিলাইয়া দেখে কে? কে দেখে—কি কি বিষয়ে ইহাদের সাদৃশ্য, কিসেই বা ইহাদের বিভেদ? অবশ্য মনে সেরূপ কিছু থাকিতে পারে না; কারণ, লকের (Locke) মতে মন শূন্য—Tabula Rasa. অতএব, জ্ঞান অসম্ভব!

(৪) বীজ অঙ্কুরিত হইল; কালে রবির উত্তাপে, মেঘের জলে, শিশির-সেকে ফলপুষ্প পরিশোভিত বৃক্ষে পরিণত হইল। এখানে কেহ কি বলিবেন যে, ফল, পুষ্প, এই প্রকাণ্ড বৃক্ষ, সমস্তই বীজে ছিল না? অবশ্য অব্যক্ত, অপরিস্ফুট; কিন্তু সর্ষেতে ভূতের মত এই বৃক্ষ যে ক্ষুদ্র বীজে ছিল ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। রবির তাপ, বৃষ্টির জল, নূতন কিছু আনিয়া দেয় নাই; যাহা ছিল, তাহাই বর্দ্ধিত ও স্ফুরিত করিয়াছে। যাহা নিজের নাই, তাহা অপরকে কিরূপে দিবে? মনের সম্বন্ধেও কি এইরূপ নয়?

অতএব, মনকে Tabula Rasa—লিখনশূন্য শাদা কাগজ না বলিয়া, বরং সামাজিক

---

* বৌদ্ধগণ যে কারণে পৃথিবীর অধঃপতনের প্রতি বিশ্বাস করেন, মহামতি ভাস্করাচার্য্য সেই কারণ দ্বারাই উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন ;—"ভূঃ খেধঃখলু যাতীতি বুদ্ধির্বোদ্ধা মুধা কথং। যাতায়াতস্তু দৃষ্টুপি যৎ ক্ষিপ্তং গুরুক্ষিতিং॥"

অর্থ;—হে বৌদ্ধ! আকাশে-নিক্ষিপ্ত গুরু পদার্থের পৃথিবীতে যাতায়াত দেখিয়াও যে ধরণী নীচে যাইতেছে বল,এ বৃথা বুদ্ধি তোমার কেন হইল?

তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—পৃথিবী নিরন্তর নীচে পড়িয়া গেলে, আকাশে-নিক্ষিপ্ত পদার্থ তাহার উপরে উপরেই থাকিয়া যাইত ; বরং অধিক গুরু বলিয়া পৃথিবী উক্ত পদার্থ হইতে আরও শীঘ্র নীচে নামিয়া পড়িত, ক্ষিপ্ত পদার্থ কোন রূপেই ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

* Aristotle's De Anima ; see also Schwegler's Histroy of Philosophy. P. 114

* Essay on Human Understanding, Bk II., Ch. VIII. See also Fraser's Locke (Blackwood Phil Classics.)

† 'অনুসন্ধানে' "ঈশ্বরতত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ।

* Fraser বলেন যে Locke মনকে বাস্তবিক শূন্য বলেন নাই। Sensationদিগের উপলব্ধি জন্য স্বতঃজ্ঞান (Self-consciousness) বা Reflexion পূর্ব্বে হইতেই ছিল, ইহা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু Locke নিজেই যেস্থানে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। "There appears not to be any ideas in the mind before

কালিতে লেখা অদৃশ্য-লিখনযুক্ত কাগজ বলা উচিত ছিল। লেখা সবই আছে; কিন্তু ম্যাজিক-কালিতে লেখা বলিয়া দেখা যায় না। আগুনের উত্তাপ দাও, সমস্তই স্পষ্ট হইবে।

তৃতীয়তঃ, শুধু তাহাই নহে। "মানুষের মনে এখন যাহা আছে, সমস্তই শিশুতে ছিল; কিন্তু শিশুতে যাহা ছিল, সমস্তই এখন মিলিবে না। সংসারের মিশ্রামিশিতে অনেক জিনিষ হারাইয়াছি; হয় তো তাহাদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে ভুলিয়াও গিয়াছি। যত অগ্রসর হইতেছি, ততই ভুলিতেছি; শেষে সংসার-চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে, যেখান হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেইখানেই ফিরিয়া আসিলাম; বিশ্বপ্রাণের অনন্ত আত্মা হইতে আসিয়াছিলাম, তাহাতেই আবার মিশাইয়া গেলাম। মৃত্যুর পর, আর জন্মের পূর্ব্বে, তাহা হইলে একই। সেইজন্যই বোধ হয়, বার্দ্ধক্যকে দ্বিতীয়-শৈশব বলে। জন্মের পূর্ব্বে আমাদের আত্মা অসংস্থাত্মায় মিশাইয়া ছিল, তাহার মত আমাদের আত্মাও অসীম, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী; কিন্তু যেই দেহ-কারাগারে আবদ্ধ হইল, অমনি পূর্ব্বের আলোক হারাইতে আরম্ভ করিল। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই আলোক অস্পষ্ট, ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, ততই কারারুদ্ধ বায়ু দূষিত বিষাক্ত হইতে লাগিল। শেষে যখন আমাদের নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইল, কারাদ্বার উন্মুক্ত হইল; আবার আলো জ্বলিয়া উঠিল, আবার পবিত্র বায়ু বহিল; আমরা অনন্তে মিশাইলাম।" মানবমন যে দিব্য, স্বর্গজাত, তাহা সে নিজেই বুঝাইয়া দেয়; অনন্তই যে তাহার প্রকৃত আরাম, তাহা তাহার অনন্তে মিশাইবার ব্যগ্রতাতেই বুঝিতে পারা যায়।

It is our inborn impulse the ep and strong
To rush aloft, to struggle still towar ls heaven.

Goethe's Faust, Sc. I

"গগনে উধাও হয়ে, ছুটে প্রাণ অন স্থ পানে।" কিন্তু জগতে উঠিতে দেয় না—আমাদিগের চেষ্টা-ক্ষুণ্ণ বিফল হয়। সংসারে আমাদের অদম্য জ্ঞানপিপাসা মিটে না—মিটে মৃত্যুর পরে।

তার পর লকের (Locke) Tabula Rasa র প্রতিবাদ করাতে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, প্রাপ্তবয়স্ক মনুষ্যের মনে যাহা কিছু থাকে, তৎসমুদায়ই শিশুতে ছিল। এখন দেখা যাউক, শিশুতে যাহা ছিল, সে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদিগের আছে কি না?

(১) যাহা ছিল, এখন নাই,—এরূপ বস্তুর জন্যই অনুতাপ (Regret) হইয়া থাকে। মানুষ যে, বাল্য-কালের দিকে আমরণ ঔৎসুক্য-পূর্ণ-নেত্রে চাহিতে চাহিতে সংসারের পথে অগ্রসর হয়, ইহা কেহ অস্বীকার করিবে না। কে এমন সংসারে আছে যে, শৈশবের কথা ভাবিয়া কাঁদে না? তখন শিশিরসিক্ত মাঠের উপর দিয়া বায়ু বহিত, ফুল ফুটিত, সৌরভে জগৎ ভরিয়া যাইত, পৃথিবীতে ও স্বর্গে প্রভেদ ছিল না। এখন আকাশ আর তেমন নীল দেখায় না, পাখীর গান তত মধুর শুনায় না, চাঁদ আর তেমন ঐ দূরস্থ স্বর্গ-রাজ্যের কথা মনে করিয়া দেয় না, স্বর্গের অস্পষ্ট ছবি মনে অল্প প্রতিফলিত হয় না। আমরা নিজেই বুঝিতে পারি, "কি ছিলাম—কি হ'য়েছি", আলোকের রাজত্ব হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি—ধূলা-ভরা, মাটী-ভরা, হু হু করে

the senses have conveyed any in." এইজন্যই Schweigler Lockeকে বলিয়াছেন—"The father of modern materialism and empiricism". Condilcac, juffroy, Diderot ইঁহারই শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

মন।" কবি তাই উদ্দাম-প্রাণে গাহিলেন,—

"O give me back my youth again."

Goethe.

ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—সংসার হইতে কত সৌন্দর্য্য লুপ্ত হইয়াছে—

"There hath past away a glory from the earth"

শুধু কবি কেন, ঐ শ্বেতকেশ পলিত-দেহবৃদ্ধ পার্শ্বনিককে জিজ্ঞাসা কর—তিনি এই অশীতি-বর্ষ-বয়সে বুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরের কত নিকটে আসিয়াছেন? বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় তিনি অনেক জানিয়াছেন, অনেক শিখিয়াছেন, স্বীকার করি; কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ঈশ্বর-জ্ঞান নহে—পার্থিব, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ। অনেক যুক্তি দেখাইয়া, অনেক তর্ক করিয়া, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু কানে কানে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহার এখন ঈশ্বরে বিশ্বাস অধিক, না যষ্টি বৎসর পূর্ব্বে বেশী ছিল? সরলভাবে উত্তর দিতে হইলে বলিবেন,—"যখন তিনি বালক ছিলেন, তখন তাঁহার বিশ্বাস অধিক প্রবল ছিল।"

"ভক্তির জোরে হরি মিলে, তর্কে দূরে রয়।"

এই সমস্ত দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, শৈশবে যাহা ছিল, তাহা বৃদ্ধবয়সে নাই। নহিলে, কিসের জন্য এ ক্ষোভ? আর যাহা হারাইয়াছি, তাহার নাম পবিত্রতা, ঈশ্বরানুগ্রহ; কারণ, আমরা সকলে নিজেই বুঝি, যে বয়োবৃদ্ধির সহিত পবিত্রতার হ্রাস হইতেছে, কত "সি, আই, ই" কত "কে, সি, আই, ই" কত 'আবল', কত 'ডিউক' ইচ্ছা করেন যে—সময় উজান বহিতে থাকুক, আবার বাল্যকাল আসুক, লোকে আদুরে নাম-দিয়া—"ভোলা" "জগা" "মাষ্টার টম্" "মাষ্টার ডিক্" বলে ডাকুক।

(২) সকলেই স্বীকার করেন যে, জীবনের পূর্ব্বভাগে ('feelings') অনুভূতি-শক্তির প্রাবল্য বেশী, বয়ঃসহকারে এই শক্তি হীনতেজ হইয়া পড়ে। শুধু বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে না—বিশ্বাস চাই। বিশ্বাস—ঈশ্বরজ্ঞানের ভিত্তি-স্বরূপ; আবার বিশ্বাস—অনুভূতিশক্তি (feelings) সাপেক্ষ। অতএব, ঈশ্বরজ্ঞান—অনুভূতি শক্তিসাপেক্ষ। কাজেই বলিতে হইবে যে, বাল্যে আমরা অধিক ঈশ্বরের সন্নিকর্ষসুখ উপভোগ করি। অতএব, মানুষ জন্মগ্রহণান্তর ঈশ্বর হইতে দূরে যাইতে থাকে; অবশেষে জীবনবৃত্ত (The cycle of life) ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়া, আবার সেই ঈশ্বরে মিশাইয়া যায়।

(৩) মানব-সমাজের দিকে দেখ। মানব-সমাজ উন্নতি কি অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে? এগণে পার্থিব-জ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি; কিন্তু পৃথিবী ঈশ্বর হইতে কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে, দিনে দিনে নাস্তিকের সংখ্যা কত বাড়িতেছে, পাপের ভার কত জমিতেছে! আমাদের চারিযুগ, আর খৃষ্টিয়ানদের প্রথম পাপ (Fall of man) ইহারই পৃষ্ঠপোষক। সত্যযুগে শুধু পুণ্য; ত্রেতায় পাপের প্রথম আবির্ভাব; দ্বাপরে পাপ-পুণ্য সমানসমান; কলিতে পাপ পুণ্যকে কুশিত, পুণ্য নাই বলিলেই হয়। ধীরে ধীরে জগৎ স্বর্গ হইতে দূরে চলিয়াছে।

তারপর খৃষ্টিয়ানদের কথা। 'আদম' (Adam) এবং 'এবা' (Eve)। এদন্ উদ্যানে নিশিদিন ঈশ্বর দেখিতে পাইত—পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিত। কুক্ষণে শয়তানের প্ররো-

চনায় ভুলিয়া, 'হবা' জ্ঞান-বৃক্ষের ফল নিজে খাইল—'আদমকে' খাওয়াইল। জগতে পাপের প্রবেশ সেই প্রথম। 'এদন্' উদ্যান হইতে তাড়িত হইয়া, 'আদম' ও 'হবা' সংসারে ঘুরিতে লাগিল—লোকসংখ্যার সহিত পাপের ভার বাড়িতে লাগিল। কেন (Cain) ভ্রাতৃহত্যা করিল, লামেক † (Lamech) দুইজনকে হত্যা করিল সহস্র পাপের ফলভোগ করিল। ক্রমে-ক্রমে ধরা পাপে এত পরিপূর্ণ হইল যে, ঈশ্বর জলপ্লাবন করিলেন; পাপীর দল বিনষ্ট হইল কিন্তু পাপের দাগ মুছিল না। পাপ যে বাড়িতেছিল, তাহা 'বাবেল'-মন্দির (Tower of Babel) গঠনের চেষ্টায় স্পষ্ট প্রতীয়মান।

সকল ধর্ম্মই প্রায় স্বীকার করে যে, মানব-সমাজ ঈশ্বর হইতে দূরে চলিয়াছে। সমাজ জীবনে যদি ইহা সত্য হয়, প্রত্যেক মানব-সম্বন্ধেও সত্য হইবে। সমাজের উন্নতি বা অবনতি হইলে, সমাজ-ভুক্ত জীবের উন্নতি বা অবনতি হইতেছে বুঝিতে হইবে।

(৪) মানবাত্মা যে পরমাত্মা হইতে আসিয়াছে, মানব যে জন্মগ্রহণের পর ঈশ্বরত্ব হইতে দূরে ভাসিয়া চলিয়াছে, ইহা একরূপ জানা গেল।

শরীরের সহিত যে আত্মার ধ্বংস হয় না, তাহা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করেন। এখন দেখা যাউক, মৃত্যুর পর আত্মার কি হয়। অনেকের মত—মৃত্যুর পর মানবের বিচার হয় ও কর্ম্মানুযায়ী ফাহাকেও স্বর্গে, কাহাকেও বা নরকে পাঠান হয়। এখানে বলা যাইতে পারে, পাপের শাস্তি কি এইখানেই হয় না? শাস্তি অর্থে—শুধু শারীরিক ক্লেশ বলি না; সামান্য মানসিক ক্লেশ সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ—দৈহিক যন্ত্রণা হইতেও ভীষণতর। অপরাধীরা আইনের হাত এইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, কিন্তু মানসিক যন্ত্রণার হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। হত্যাকারী হত্যালব্ধ অর্থ সুখে ভোগ করিতে লাগিল; লোকের কাছে গণ্যমান্য বলিয়া প্রখ্যাত হইল; উপরতঃ তাহার মত সুখী কেহ নাই! কিন্তু কে জানিবে—তাহার মনে কি আগুন জ্বলিতেছে? কে জানিবে—সে কত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে? নিষ্পন্দ-হৃদয়ে পদশব্দ শুনিবার জন্য কত সময় উৎকর্ণ হইয়া ভয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা সহ করিয়াছে? যদি তাহার মনের ভীষণ ছবি কেহ দেখিতে পাইত, সে নিঃসন্দেহ বলিত—নরক-যন্ত্রণাও ইহার তুলনায় সুখকর। ম্যাকবেথ (Macbeth) বুঝি ইহা জানিত; তাই সে বলিয়াছিল,—"ইহজগতে পাপের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দাও, পরজন্মের জন্য ভাবি না।" * সে ত রাজা হইল, লোকে তাহাকে সুখী বলিল; তবে সে কেন অস্থির হইয়া চীৎকার করিত,—

O full of scorpins is my mind, dear wife,
তবে কেন সে বলিত—উনক্যান্! আমাদের অপেক্ষা সুখী—সে মরিয়াছে।" ম্যাকবেথ-পত্নী অতুল ধনের অধীশ্বরী, স্কটলণ্ডের রাজ্ঞী, তবুও তাহাকে কেহ সুখী বলিবে না। তাহার পরিচারিকা বলিয়াছিল—আমি রাণী হইতে চাই না।" (I would not have such

* That but this blow
Might be the be-all and the end-all here,
But here upon this bank and shoal of time,
We would jump the life to come;
But in these case,
We still have judgments here.
† Macbeth, Act. III, Sc.II (19—21)

* এই রূপক আমরা যাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহাই দেখাইতেছে। আরো ঐরূপ চেষ্টা পাব।

† Genesis Iv. 23.

a heart in my bosom for the dignity of the whole body")

সেক্ষপীয়রের অপেক্ষা মানবচরিত্র বোধ হয় অধিক কেহ বুঝে নাই—বুঝিবেও না। তিনিই দেখাইয়াছেন, পাপের শাস্তি এই খানেই হয়। তবে আর নরকের আবশ্যক কি? বরং বলনা কেন—শান্তিভোগে পবিত্রীকৃত মানবাত্মা, তাহার প্রকৃত আবাস ঈশ্বরাত্মায় মিশাইয়া গেল? ইহাই স্বর্গ। প্রাচীন গ্রীকদার্শনিকদের মধ্যে কেহ কেহ এ মতের সমর্থন করিতেন *। জর্ম্মান-পণ্ডিত (Schleremacher) প্লায়ারম্যাকার ইহাই বলেন †।

(৫) ঈশ্বর প্রেমময়, করুণাধার; তিনিই যে-সংসার মানুষকে অনন্তকালের জন্য নরক-যন্ত্রণা দিবেন, ইহা কি বিশ্বাস হয়? টেনিসন (Tennyson) তাঁহার কোন কবিতায় ইহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। একজন অশিক্ষিত অসভ্য ম্লেচ্ছ বলিতেছে,—"জগদ্ব্যাপী অন্ধকারের মধ্য দিয়া কখন কখন এক আলোক আমার চক্ষে আসিয়া পড়ে; তাহাতেই দেখি—যেন এই সংসারের আদিভূত অনাদি অনন্ত কিছু আছে। ইনিই হয়ত তোমাদের সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর। কিন্তু যিনি প্রেমময়, তিনিই যে নরকের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা আর মন বিশ্বাস করে না। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে যেন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরে দেবতাকে অণুপরমাণুতে পরিণত করেন।"

* A great part of antiquity * * * rather than be lost in the uncomfortable night of nothing were content to recede into the common being and make one particle of the common soul of all things which was no more than to return into their divine and unknown original again'.— Religio Medicii.

† "Ah yet I have had some glimmer at times, in my gleomiest woe,

(৬) যে রূপেতে জীবনের ব্যবহার করুক না কেন, সংসারের যে কোন পথে বিচরণ করুন না কেন, মৃত্যুশয্যায় সকলেই বাল্যকালের কথা ভাবে। ফলষ্টফ্, (Falstaff) পবিত্রতা কাহাকে বলে—জানিত কি না, সন্দেহ; ভীরু, আত্মগর্ব্বিত, স্বার্থপরায়ণ, ইন্দ্রিয়-পরবশ সেও —মরিবার সময় বাল্যকালের কথা ভাবিয়াছিল। লণ্ডনের দ্বিতীয় নরকস্বরূপ মদ্যশিলয়ের চিত্র তাহার চক্ষের উপর চিত্রিত হয় নাই *; শ্যামল শস্য-পূর্ণ মাঠ, তাহার শৈশবের আবাসগৃহ, দেখিতে দেখিতে, মৃত্যুচ্ছায়াজড়িত অন্ধকারময় করিয়া ফেলিয়াছিল। † রাজ্ঞী মেরী, মানফ্রেড (Man-

Of a God behind all, after all, the Great God for aught I know.
But the God of Love and Hell together they can not be thought,
If there be such a God may the Great God curse him and bring to noght.
Despair.
"His nose was as sharp as pen and a babbled o'green-fields"
Henry V. Act Ir., Sc. III
† Alice.—Away from Philip
Back in her childhood, prattling to her mother,
Of her betrothal to the Emperor."
Charles &c.
Queen Mary, Act V. Sc V.
Byron's Manfred, Act III. Sc. IV.
Marlowe's Fanstus Act V. Sc. II 45

এখানে অধিকাংশ দৃষ্টান্ত কবিদিগের হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, কবি কল্পিত ঘটনাই থাকেন, অতএব তাঁহার মত সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই, এ কথা কত ভ্রমাত্মক, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

"The Poet or Maker, the same intrinsically with the seer or gifted observer, is the best guide and help-mate with whom the Psychologist can ally himself."

Buckmill's "Mad Folk of Shakespeare".

fred), ফষ্টস (Faustus) সকলেই ইহার উদাহরণ। প্রবাসী বহুদিনের পর গৃহে ফিরিবার সময় গৃহের কথাই ভাবিয়া থাকে। মানবাত্মা ত তাহার নির্দ্দিষ্ট নিবাসে ফিরিয়া চলিয়াছে; অতএব, বাল্যকালের কথা ভাবিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে?

যদি অনন্তাত্মায় মিশিয়া যাওয়াই মানবের মুক্তি হয়, তাহাহইলে ত সকলেই আত্মহত্যা করিত—আর আত্মহত্যা পাপ বলিয়া জ্ঞান হইত না? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জীবনের প্রতি আসক্তি মানবকে আত্মহত্যা করিতে দেয় না—আর তাহার শাস্তি ও পুরস্কারের উপায় করিয়া দেয়। আত্মহত্যা পাপ, বিবেকশক্তি ইহাই বলে; ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ। ইহার শাস্তি বোধ হয় মৃত্যুকালে জীবনাসক্তি-মৃত্যুপ্রার্থীভিলাষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্পষ্ট প্রতীয়মান। মরিবার সময় যন্ত্রণাই (মানসিক) যথেষ্ট শাস্তি।

ঠাকুর-ঝি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে একটা কুসুম দেখিয়া সুখদা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"মা!"

কিন্তু কই?—সুখদার পার্শ্বে ত তাহার মা নাই! সুখদা কি যুঁয়ের স্বরে মাকে দেখিতে পাইতেছে না? কিন্তু সুখদা তাহার বাপকে আর ভাইকে যখন দেখিতে পাইতেছে, তখন তাহার মাকে দেখিতে পাইবে না কেন? সেই কুসুম দেখিয়া, সুখদার প্রাণ তাহার মার জন্য যে বড় অস্থির হইয়াছে, তাই ত—এখন সুখদার মা কোথায় গেল?

বিস্মিতা-বালিকা বিস্ময়নেত্রে গৃহের চারিদিক তখন একবার চাহিল। হরি হরি! একি? একি ভীষণ দৃশ্য!! বালিকা জাগ্রৎ না নিদ্রিত? এখনও বালিকা স্বপ্ন দেখিতেছে, না যথার্থই তাহার-জননীকে ঐরূপ ভ্রূণবিদারক অবস্থায় সম্মুখে ঝুলিতে দেখিতেছে!—সুখদা কিছু স্থির করিতে পারিল না। সে দৃশ্য দেখিয়া, সুখদা তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পর, সুখদার জননী মৃত না জীবিত? সুখদা তখন ইহাই স্থির করিবার জন্য কম্পিতহৃদয়ে উর্দ্ধনেত্রে জননীর মুখের প্রতি চাহিল। তখনও সুখদার জননীর বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় হইতে যেন স্নেহের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সে ঊর্দ্ধদৃষ্টিও যেন নিম্নে সুখদার মুখের উপর স্থাপিত হইল। কিন্তু সেই লোলজিহ্বাই সুখদার আতঙ্কের কারণ। সুখদার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সুখদা পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। এবার সেই ভীষণ চীৎকারে, নিদ্রায় ও নেশার ঘোরে অচেতন পরেশনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। আর সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া তাহার নেশার ঘোরও তৎক্ষণাৎ কাটিয়া গেল। পরেশনাথ বিস্ময়নেত্রে নিস্তারিণীর প্রতি চাহিল। তৎক্ষণাৎ, কি মনে করিয়া, অস্ত্র দ্বারা দড়ি কাটিয়া, সে নিস্তারিণীকে নামাইল। কিন্তু যে আশায় পরেশনাথ নামাইল, সে আশা বহুপূর্ব্বেই নির্ম্মূল হইয়াছিল। নিস্তারিণীর অবস্থা বুঝিয়া পরেশনাথ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আর সুখদার চীৎকারে এদিকে গগন ফাটিতেছিল। কেবল গগন ফাটিতেছিল না, সুখদার সেই ক্ষুদ্র বুকখানিও বুঝি ফাটিয়া যায়! সুখদার জননী যে তাহাকে ফেলিয়া কোথাও যাইতে পারে, এ কথা সুখদা মনে ধারণা করিতেও পারে না। আচ্ছা, সুখদাকে কাহার কাছে রাখিয়া তাহার জননী চলিয়া গেল? তাহার পিতার কাছে? সুখদা জননীকে ছাড়িয়া সেই নিষ্ঠুর পিতার কাছে একাকী কিরূপে থাকিবে? সুখদার আর পৃথিবীতে কে আছে? সুখদার ঐ ছোট ভাইটীকেই বা কে মানুষ করিবে? যদি একান্তই তাহার এ পাপ সংসার ত্যাগ করা আবশ্যক হইয়াছিল, তবে তাহাদেরও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়াই কি তাহার উচিত ছিল না? সুখদার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ে তখন এইরূপ প্রবল ঝড় বহিতেছিল।

আর পরেশনাথ? ভয়ে ও বিস্ময়ে পরেশনাথের প্রাণ এখন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে নরকুম আপনার বুদ্ধিকৌশলের গৌরব করিয়া বেড়াইত, এখন তাহার সে বুদ্ধিও লোপ হইয়া গিয়াছিল। পরেশনাথ যত বড় পাষণ্ড হউক না কেন, এখন সে তাহার নিজের কীর্ত্তি দেখিয়া নিজেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে! দেখ—নরাধম দেখ! তোর সহবাসের পৈশাচিক-ক্রিয়ার পরিণাম দেখ! পাপীর মুখ ভয়ের বিবর্ণ-রাজ্য। পরেশনাথ এই ঘটনায় এখন ভয়েই অস্থির হইয়াছিল। নিস্তারিণীর মৃত্যুতে পরেশনাথ এত দুঃখিত নহে; কিরূপে এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবে, এই চিন্তায় পরেশনাথ তখন অস্থির।

এরূপস্থলে পুলিসে সংবাদ দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া, পরেশনাথ আর কাল বিলম্ব না করিয়া, তৎক্ষণাৎ পুলিসে সংবাদ দিল।

তখন পুলিসের তারাকের একটা ধুম পড়িয়া গেল। ইন্‌স্পেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালা পরেশনাথের বাড়ী পরিপূর্ণ হইল। পাড়ার নিরীহ ভদ্রলোকেরা ভয়ে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু এদিকে পরেশনাথের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা লোকারণ্য হইল; রাস্তার লোকারণ্যের মধ্যে পাড়ার লোকও অনেক ছিল। তাহারা পরস্পরে নানাকথা কহিতে লাগিল। রাত্রি দশটার পর, পরেশনাথের বাড়ীর ভিতর হইতে যে ভয়ানক ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল—একথাও তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতেছিল। ফলকথা, যে পরেশনাথের স্ত্রী যে আত্মঘাতী হয় নাই, পরেশনাথ নিজেই যে তাহাকে হত্যা করিয়া এখন এইরূপ রটাইতেছে, এ বিশ্বাস অনেকেরই মনে ধারণা হইয়া গিয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই, এইরূপ একটা সংবাদ পাইলেন। তখন, মহাদম্ভে সম্‌সম্‌ শব্দে চারিদিক কম্পিত করিতে করিতে, তিনি দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমেই লাসের পরীক্ষাকরা হইল। নিস্তারিণীর-মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন ও তাহার বস্ত্রে রক্তের দাগ দেখিয়া, ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের আর আহ্লাদের সীমা নাই—তিনি যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন! তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ জমাদার সাহেবের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"জমাদার সাহেব, এ খুনী মাম্‌লা মালুম হোতা, আসামীকো পাকাড়কে রাখো।"

"যো-হুকুম খোদাবন্দ।" বলিয়া, খাঁ-সাহেব পরেশনাথকে দুইজন পাহারাওয়ালার জিম্মায় রাখিয়া দিল। ভয়ে তখন পরেশনাথের প্রাণ

উড়িয়া গেল। সাহেবের Medical Jurisprudence পড়া ছিল কিনা, বলিতে পারি না; কিন্তু নিস্তারিণীর সেই মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া, কথিত অপঘাত-মৃত্যুর কোন চিহ্নই সাহেব দেখিতে পাইলেন না। তখন জমাদার খাঁ সাহেবকে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমিকো ক্যা মালুম হোতা, খাঁ সাহেব?"

খাঁ সাহেব আজ বিশ বৎসর কলিকাতা-পুলিসে কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহার অজানিত কিছুই ছিল না; বিশেষতঃ তিনি এরূপে অনেক অপঘাতককে খুন, আর খুনকে অপঘাত করিয়াছেন। সুতরাং ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের কথায় পোষকতা করিয়া বলিলেন,—"এ আউরত আলবৎ খুন হুয়া।"

সাহেবের আহ্লাদের আর সীমা নাই। অনেক দিনের পর আজ তিনি একটা খুনী মামলা পাইয়াছেন। এখন এই খুনের সহিত পরমেশ্বরকে গাঁথিয়া দিতে পারিলেই তাঁহার কার্য্যোদ্ধার হয়। এই কার্য্যটা কিরূপে করিবেন, তাহার জন্য একটু স্থির হইয়া চিন্তা করার আবশ্যক; এ দিকে বাহিরের লোকের কোলাহলে সাহেব মাথা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এত গোলে তিনি মামলা সাজাইবেন কিরূপে? সুতরাং সাহেব বিরক্ত হইয়া একজন পাহারাওলাকে হুকুম দিলেন—"বাহারকা আদমী সব হাঁকার দেও।"

তখন পাহারাওলা রুল হস্তে দৌড়িয়া বাহিরের দিকে ছুটিল। সেই একজন মাত্র পাহারাওলা দেখিয়া, বাহিরের অসংখ্য জনস্রোতও—যে যে দিকে পাইল, ছুটিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই রাস্তা জনমানবশূন্য হইয়া গেল। পাহারাওলা তখন আপনার কার্য্যোদ্ধার করিয়া মহা উল্লাসে পুনরায় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আর সেই লজ্জাশীল লোকগুলি অমনি এক এক জন করিয়া পুনরায় সেই স্থানে একত্রিত হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব প্রথমেই সেই দশম বৎসরের বালিকা সুখদাকে লইয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। সে হতভাগিনী বালিকার বিপদের উপর আবার বিপদ দেখা সাহেব প্রথমেই তাহাকে প্রশ্ন করিল—"তোমার মাকে কে খুন করিয়াছে, তুমি জান?"

সেই পুলিসের লোকজন দেখিয়াই—সুখদার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল; সাহেবের এরূপ প্রশ্নের সে কি উত্তর দিবে? সুখদাকে নীরব দেখিয়া সাহেব একটা ভীষণ ধমক দিলেন। সে ধমকে সুখদা কাঁদিয়া ফেলিল। জমাদার একজন বিচক্ষণ লোক; সে তখন সুখদাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া অনেক সান্ত্বনা করিল এবং সমস্ত কথা সত্য বলিলে কোন ভয় নাই, এই কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া পুনরায় সাহেবের নিকট আসিল, সাহেবকেও কানে কানে কি কথা বলিল। সাহেব তখন প্রশ্ন করিল,—"কাল রাত্রে তোমার বাপের সহিত তোমার মায়ের কোন বিবাদ হইয়াছিল?"

সুখদা উত্তর করিল,—"হাঁ।"

সাহেব তাড়াতাড়ি সেই কথা লিখিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু খাঁ সাহেব ইঙ্গিতের দ্বারা সে কথা লিখিতে সাহেবকে নিষেধ করিলেন। সাহেব পুলিশবিভাগে অনেকদিন মাত্র কার্য্য করিতেছেন। এ সকল বিষয়ে সাহেবের অভিজ্ঞতা অতি অল্পই ছিল, কিরূপে মোকর্দ্দমা চালাইতে হয়,

সাহেবের এখনও সে শিক্ষা হয় নাই। খাঁ-সাহেব এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, সাহেবকে পীড়িত দেখিয়া এইবার নিজেই সুখদাকে প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন,—"কাল রাত্রে তোমাদের বাড়ীতে কে কে ছিল?"

সুখদা।—আমি, বাবা, মা, আর আমার ছোট ভাইটী।

খাঁ-সাহেব।—রাত্রি দশটার সময় তোমরা চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিলে কেন?

সুখদা।—বাবা মেরেছিলেন বলে।

খাঁ-সাহেব।—কাকে মেরেছিলো?

সুখদা।—মাকে আর আমাকে।

খাঁ-সাহেব।—কেন মেরেছিলো?

সুখদা।—রাঁধতে দেরী হয়েছিলো বলে।

খাঁ-সাহেব।—প্রথমে কাকে মেরেছিলো?

সুখদা।—মাকে।

খাঁ-সাহেব।—কি দিয়ে মেরেছিলো?

সুখদা।—হাত দিয়ে।

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আর থাকিতে পারিলেন না। সুখদার এআহারে আহ্লাদে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিতেছিল। তিনি এই সময় প্রশ্ন করিয়া বসিলেন,—"সেই আঘাতেই তোমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে কি না?"

সাহেবের প্রশ্ন শুনিয়া খাঁ-সাহেব মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু উপরওয়ালার উপর তিনি আর কি কথা কহিবেন? কাজেই চুপ করিয়া রহিলেন। সুখদা সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলিল,—"সে আঘাতে মার মৃত্যু হবে কেন? মা সেই জন্য রাগ করে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেন।"

বালিকার উত্তর শুনিয়া সাহেব তখন খাঁ-সাহেবেরই মুখের দিকে চাহিলেন। সে চাহনির অর্থ এই—"আমি আর কোন প্রশ্ন করিব না, তুমি যেন তেন প্রকারেণ এ মকদ্দমার একটা উপায় কর।"

খাঁ-সাহেব তখন কিছু গম্ভীর হইয়া গোঁপে চাড়া দিতে দিতে পুনরায় প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন,—"তুমি সে কথা কি করে জান্‌লে?"

সুখদা।—সকাল বেলা ঘুম ভেঙ্গে আমি দেখি, মা আমার কাছে নেই। তার পর চারদিকে চেয়ে দেখতে পেলুম যে ঐ কড়ি-কাঠে দড়ি গলায় বেঁধে মা ঝুল্‌ছে।

খাঁ-সাহেব।—তখন তোমার বাবা কোথায় ছিলো?

সুখদা।—বাবা এই ঘরেতেই তখনও ঘুমুচ্ছিল।

খাঁ-সাহেব।—তুমি ঐ রকম অবস্থায় তোমার মাকে দেখে কি কর্‌লে?

সুখদা।—আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌লুম।

খাঁ-সাহেব।—আর তোমার বাবা সে সময় নাক ডাকিয়া ঘুমুতে লাগ্‌লেন?

সুখদা।—আমার চীৎকারে আমার বাবার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিলো।

খাঁ-সাহেব।—ঘুম ভেঙ্গে গেল, তোমার বাপ কি কর্‌লে?

সুখদা।—তাড়াতাড়ি উঠে গলার দড়ি কেটে দিয়েছিলেন।

খাঁ-সাহেব।—ঘুম ভেঙ্গে উঠেই অমনি দড়ি কেটে দিল, আর একটি কথা বল্‌লে না?

সুখদা।—এপ্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিল না; সে বালিকা, এরূপ অবস্থায় যে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে, তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে। ইহার অধিক এরূপ অবস্থাপন্ন বালিকার নিকট আমরা আর

কি আশা করিতে পারি? সুখদাকে নিরুত্তর দেখিয়া, খাঁ-সাহেব আস্ফালন করিয়া সাহেবকে বলিলেন—"এ লেড্‌কীকা সামুনে খুন হুয়া নেই। লেকেন্ ঐ হরিমজীদ জরুরকো যে খুন কিয়া, এ লেড়কীকো এজাহারমে হামারা মালুম্ হোতা।"

ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের আর আহ্লাদের সীমা নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ লাসশুদ্ধ আসামীকে চালান দিতে প্রস্তুত। জমাদার খাঁসাহেব কিন্তু এই সময় পাড়ার তিন চারি জন সাক্ষ্য লইয়া উপস্থিত হইল, তাহারা সকলেই গতরাত্রে সুরাপান করিয়া পরেশনাথের অত্যাচারের কথা বলিল। আর রাত্রি দুশটার পর যে একটা ভয়ানক আর্ত্তনাদ-ধ্বনি তাহার বাড়ীর মধ্য হইতে উঠিয়াছিল, সে কথাও এজাহারে প্রকাশ করিল। তখন পরেশনাথকে খুনের আসামী করিয়া লাস-সমেত চালান দেওয়া হইল। পরেশনাথ এই ঘটনায় হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যাইবার সময় সে একজন লোকের দ্বারা হীরালাল বাবুকে আকস্মিক বিপদের সংবাদ দিতে সক্ষম হইয়াছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হীরালাল বাবু আফিস যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় একজন লোক আসিয়া পরেশনাথের এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ তাঁহাকে দিল। হীরালাল সে সংবাদে প্রথমে অনেকক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন; তাহার পর আর আপিসে না গিয়া পরেশনাথের বাসার দিকে ছুটিলেন। লোকের মুখেতে কথা শুনিলে হীরালালের প্রাণ স্বভাবতঃই আকুল হইয়া উঠে। এ সময় কেহ তাঁহার সাহায্য-প্রার্থী হইলে, তিনি নিজের কাজকর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া, তাহার সেই বিপদ হইতে—তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা—হীরালালের স্বভাব-সিদ্ধ। নিজের সহস্র কর্ম্ম ক্ষতি করিয়া যদি পরের তিলমাত্র উপকার হয়, হীরালাল তাহার জন্যও সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। পরোপকার ধর্ম্ম বটে, কিন্তু হীরালালের চরিত্রে সে পরোপকারের যেরূপ আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অনেক সময় ধর্ম্ম বলিতেও আমাদের কুণ্ঠিত হইতে হয়।

হীরালাল পরেশনাথের বাসায় আসিয়া দেখিলেন যে, তাহার শিশুপুত্র আর বালিকা কন্যা ভিন্ন সে বাসায় আর কেহ নাই। সেই ছোট ভাইটিকে কোড়ে লইয়া, সুখদা তখন চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছিল; হীরালালকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হীরালালের অনেক সান্ত্বনার পর সুখদা একটু সুস্থির হইল। তাহার পর তাহারই মুখে হীরালাল গতরাত্রের ও অদ্যকার প্রাতের সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। তাহার পর সুখদার চক্ষের জল স্বহস্তে মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—"তুমি কেঁদনা মা! যা বিপদ হবার, তা হয়ে গেছে; এখন তার আর কোন উপায় নেই। তবে তোমার বাপের জন্য কোন ভয় নেই; আমি এখনি গিয়ে তাঁকে কেড়ে আন্‌ছি। তবে তোমায় একলা এঘর, অবস্থায় এ বাড়ীতে রেখে কি করে যাবো? আগে তোমায় আমাদের বাড়ী রেখে আসি চল, তার পর তোমার বাবাকে এনে দেবো।

সুখদার এরূপ বিপদের সময় কোনরূপ সান্ত্বনা করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটে একজন লোক প্রাণীও ছিল না। সুখদার জীবনের একমাত্র অবলম্বন তাহার মাতাকে সে আজ অকস্মাৎ যমের মত হারাইয়াছে, তাহার পর ভাল হউক—মন্দ হউক, এরূপ বিপদে একমাত্র ভরসা-স্থল পিতাকেও খুনী আসামী করিয়া পুলিস ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র ভাইটীরই বা এখন কি উপায় হইবে?

ইহারই মধ্যে সে শিশু ক্ষুধায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত রাত্রি হইতে সুখদারও আহার হয় নাই; কিন্তু সুখদার মনে সে কথা এখন স্থান পায় নাই। সে বালিকার নিকট একটী পয়সা ছিল না, থাকিলেই বা কাহার নিকট সেই শিশুটী রাখিয়া সুখদা তাহার দুধের চেষ্টায় যাইবে? ঐ ক্ষুদ্র বালিকা যেদিকে চায়, সেইদিকেই অন্ধকার দেখে। দশ বৎসরের বালিকা হইলেও সুখদার সেই ক্ষুদ্রহৃদয় এই সকল ভীষণ বিপদ্‌তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল। কিন্তু সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, সর্ব্বমঙ্গলময় ঈশ্বর কি অনাথা বালিকার উপায় করিবেন না? ঐ দেখ, সেই অকূলের কাণ্ডারী হরি হীরালালরূপে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুখদা তখন অকূল সাগরের কূল পাইল। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কাকা বাবু, আমার মাকে কি আর দেখ্‌তে পাবো না?"

যেরূপ কাতরকণ্ঠে সুখদার ঐ কথা কয়েকটী উচ্চারিত হইল, তাহাতেই হীরালালের প্রাণ একেবারে আকুল হইয়া উঠিল। যে চক্ষের জল হীরালাল এতক্ষণ অনেক কষ্টে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন সে চক্ষের জল আর তিনি ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। হীরালাল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"তুমি কেঁদ না মা। আগে তোমায় আমার বাড়ীতে রেখে আসি, চল, তারপর, যা যা কর্ত্তে হয়, তা আমি কর্‌বো। এখানে আর দেরী করা হবে না। দেরী, কর্‌লে অনিষ্ট হতে পারে।"

সুখদা তৎক্ষণাৎ চক্ষের জল মুছিয়া সেই ছোট ভাইটিকে বুকে তুলিয়া দাঁড়াইয়া, উঠিল, এবং হীরালালের সঙ্গে তাঁহার বাড়ী যাইবার জন্য এখন ব্যস্ত হইতে লাগিল। হীরালাল তখন পরেশনাথের বাড়ীর চাবিবন্ধ করিয়া সেই বালিকাকে সঙ্গে লইয়া নিজবাড়ীতে চলিলেন। সম্মুখে একখানি ভাড়াটে গাড়ী দেখিয়া, হীরালাল সেই গাড়ী ভাড়া করিলেন, এবং তাহাতে সুখদাকে উঠিতে বলিলেন। সুখদা সেই গাড়ীতে উঠিলে পর, হীরালাল তাহার ক্রোড়স্থিত শিশুকে নিজের ক্রোড়ে লইতে গেলেন; কিন্তু সুখদা তাহাতে কোন ক্রমেই সম্মত হইল না। কিছুদূর গাড়ী যাইতে না যাইতেই সেই ক্রোড়স্থ শিশু কিন্তু নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

দুই চারি কথায় সমস্ত পরিচয় দিয়া, হীরালাল, অমলার নিকট সুখদা আর তাহার ভ্রাতাকে রাখিয়া, পরেশনাথের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ বাহির হইলেন। অমলা ভিন্ন তখন আর কাহাকেও হীরালাল কোন কথা বলিলেন না। ভ্রাতা ভগিনীকে চিনিত; আর ভগিনীও ভ্রাতাকে জানিত; সুতরাং সে সময় অমলাও আর অধিক কথা কহিয়া ভ্রাতার সময় নষ্ট করিল না।

পুলিসেরই একজন প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত হীরালালের পরিচয় ছিল। হীরালাল প্রথমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন; তিনি একজন তাঁহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীকে কি উপদেশ দিয়া, হীরালালকে তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দিলেন। তিনি, হীরালালকে লইয়া, প্রথমে যে থানায় হইতে তদারক হইয়াছিল, সেই থানায় আসিলেন, সেখানে যাহা যাহা জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল,

সমস্ত জ্ঞানিয়া কমিশনর সাহেবের আফিসে হীরালাল বাবুকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া মেডিকেলকলেজে আসিলেন। সেখানে খুবপ্রিন্সিপালদল জানিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষার ফল যে কিরূপ হইল, অনেক চেষ্টা করিয়াও তখন তাহা জানিতে পারা গেল না। সেদিন রাত্রি দশটার পর হরিলাল বিমনমনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পাঠক ও পাঠ্য।

প্রায় দেড় শত বৎসর গত হইল, পণ্ডিতপ্রবর Dr. Johnson বলিয়াছেন,—"One of the peculiarities which distinguish the present age is the multiplication of books." আবার কয়েক বৎসর হইল, বিলাতের Fortnightly Review নামক সাময়িক পত্রের কোন খ্যাতিবান্ লেখক সেই কথা তুলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন,—"It is probable that even Dr. Johnson's forcible vocabulary would have been inadequate to express his amazement, if he could have forseen the plethora in the book-market of today." বিলাতী লেখকের এই কথা আমাদিগের নগণ্য বঙ্গসাহিত্যেও আজকাল পূর্ণমাত্রায় প্রযুজ্য বোধ হয়। বটতলার বাজারের অসার গ্রন্থবৃদ্ধিই বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের বিষম বিশেষত্ব; সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের খরস্রোতও বাঙ্গালী পাঠকের মরুময় হৃদয়ক্ষেত্রে কম কার্য্যকারী নহে। নটবর গিরিশচন্দ্রের এবং কবিবর রাজকৃষ্ণের লেখনী নিয়তই রাশি রাশি গ্রন্থ প্রসব করিতেছে—

"অবিরাম গতি নদী বাধা নাহি মানে।
বিরাম যে কি তা গঙ্গা কভু নাহি জানে॥"

সে লেখনীর বিরাম নাই, সে গ্রন্থ-পাঠকেরও অসদ্ভাব নাই। প্রয়োজন মতে সৃষ্টি কোন মতে সম্ভবে না; পাঠকের আকাঙ্ক্ষানুসারেই পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে। কবিবর রাজকৃষ্ণ তাই "প্রহ্লাদ-চরিত্র" ছাড়িয়া শেষে "চতুরালীর" চটক দেখাইয়াছিলেন, রঙ্গপ্রবীর মনোমোহনও, বৃদ্ধবয়সে "রামাভিষেক" ছাড়িয়া কিছুদিন "রাসলীলা" খুলিয়াছিলেন। উপন্যাসের আসরেও আর বড় "দেবীচৌধুরাণী"র উৎপত্তি দেখা যায় না; বর্ত্তমান রুচির বাজারে "মডেল ভগিনী"ই রিয়ম মজা লুটিতেছেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, সুধুমাত্র সাহিত্যপাঠেই, সাধারণতঃ সকলের অনুরাগ অধিক। এ অনুরাগের দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম ও প্রধান কারণ—শিক্ষিতাভিমানী ইংরাজীনবিশ ব্যক্তিগণের, সাধারণতঃ, বঙ্গভাষার প্রতিবড়ই বিরাগ,—বঙ্গসাহিত্যে কোন সারবান্ গ্রন্থ আছে, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাসের অতীত; তাঁহারা না ইংরাজী সাহিত্যের যোলকলায় মূর্ত্তিমান্, না সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় আত্মবান্, অথচ বহুসাহিত্য বিলোড়ন করিয়া কোন সারতত্ত্ব উদ্ধারেও ঘোর অপমান জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন কচিৎ যে কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ ক্রয় করেন, তাহা, অন্তঃপুরে প্রকাশেই নিবদ্ধ হইয়া থাকে। অর্দ্ধশিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা মহিলা-মহলে পুস্তকের মর্য্যাদা-নির্দ্ধারণ বড় সহজ ব্যাপার নহে; তাঁহারা সহজেই নবীন-নধর কুসুম-কোমল উপকথা পাঠের পক্ষপাতী; সুতরাং ঐ শ্রেণীর পুস্তকের কাটতি অধিক। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল পাঠক ধনী, বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই দৈনন্দিন বিষয়-কার্য্য সমাধানের পর কঠোর শাস্ত্রচর্চ্চা বা দার্শনিক চিন্তায় কালক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক। গ্রন্থপাঠ তাঁহাদিগের শ্রান্তিহরণের অন্যতম উপকরণ; সুতরাং মস্তিষ্ক-পরিচালক গ্রন্থাদি তাঁহাদিগের নিতান্তই রুচিবিরুদ্ধ। তাঁহারা উদ্ভ্রান্ত-আবেগময়, শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ, রসলালিত্য-পরিপ্লুত নাটকাদি বা নবন্যাসেই গ্রন্থপাঠের চরম সুখ উপলব্ধি করেন;—পাঠ করিতে করিতে, তাঁহারা কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন উৎসাহভরে উত্তেজিত হয়েন, কখন নৈরাশ্যের অন্ধকূপে ডুবিয়া যান, কখন বা আকাশকুসুম প্রেমাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইয়া দিগ্বিদিক্ শূন্য দেখেন। যত নব নব নবন্যাস, রসময় হাস্যরসাত্মক, ইহাঁদিগের জন্য প্রসূত হয়। এতদ্দ্বারা আমরা যে উপন্যাস ও নাটকের অনাদর করিতেছি, ইহা যেন কেহ বিবেচনা না করেন। সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভেদ করিয়া, কবি ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের আদর্শ নবন্যাস ও নাটকাকারে অঙ্কিত করেন। সেই সমস্ত আদর্শচরিত্র সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দর্শন করা সকলের ভাগ্যে সম্ভবে না; কিন্তু সংসারতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের মানসপ্রসূত সেই সমস্ত আদর্শচরিত্রে আত্মগঠন করিতে পারিলে, এবং নরপিশাচের মধ্যে দেবচরিত্র বাছিয়া লইতে পারিলে, জীবনের মহদুদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হয়। উপন্যাস ও নাটকপ্রিয় পাঠকগণ এই উদ্দেশ্য-সাধনে বিশেষ সৌভাগ্যবান, সন্দেহ নাই। তবে যাঁহারা উপন্যাস বা নাটকগত চরিত্র বিশ্লেষণ না করিয়া, কেবল আখ্যায়িকার অপরূপত্বে আত্মহারা হয়েন, তাঁহাদিগের পক্ষে উল্লিখিত শ্রেণীর গ্রন্থপাঠ কেবল বিড়ম্বনাময় বলিতে হইবেক। আর নিরবচ্ছিন্ন নাটক-নবন্যাসের কুঅভ্যাস হইতে দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্পশাস্ত্রের বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে না পারিলে, আমাদিগের প্রকৃত উন্নতির আশা অল্প;—"সৌত্রিক গুল্ম আর নগর" ছাড়িয়া "সাত্বিক সাংখ্যসূত্র" "আচাভুয়ার বোঁয়াচাক" ছাড়িয়া "শ্রীমদ্ভবদ্গীতোপনিষদ"—"গোপালভাঁড়ের মহাভারত" ছাড়িয়া "ভগবান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত" পাঠ করিতে যতদিন না আমাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে, ততদিন আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ সুদূরপরাহত।

কোন সাধারণ পুস্তকালয়ের সহিত সংশ্রব-কালে আমরা দেখিয়াছি, সংগৃহীত পুস্তকগুলির মধ্যে শততরা—

	গ্রন্থসংখ্যা।	পাঠকসংখ্যা।
১। শাস্ত্র ও ধর্ম্মপুস্তক	১০	১০
২। দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প	৩	৫
৩। সাধারণ সাহিত্য	১৬	১৬
৪। কাব্য	১৩০	৭
৫। ইতিহাস	৩	২
৬। জীবনচরিত	৭	২
৭। নবন্যাস ও উপাখ্যান	২৩	৪৮
৮। নাটক ও প্রহসন	২০	১১

এ পুস্তকালয় নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার

* এই প্রবন্ধ শেষ করার পর আমরা ত্রিভুবন শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে শ্রবণ করিলাম যে, কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় ইহলীলা শেষ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় কবি শান্তিভোগ করুন—ইহাই এখন একমাত্র প্রার্থনা।

গ্রন্থ ও পাঠক-সংখ্যার অনুপাতে, বৃহত্তের তুলনায়, বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে, বোধ হয় না। হইলেও, এতদ্দ্বারাই সাধারণ পাঠকের পাঠ্যের রুচির কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। দেখা যায়, মাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ ও ইতিহাসেরই পাঠকোপযোগী পুঁথি-গ্রন্থ আছে; দর্শন-বিজ্ঞান, কাব্য-সাহিত্য, জীবনচরিত, অধিক কি—নাটক-প্রহসনের পর্য্যন্ত পাঠক-অপেক্ষা পাঠ্যগ্রন্থেরই উৎপত্তি অধিক; আর এক নবন্যাসের রাজারই দ্রব্য অপেক্ষা ক্রেতা অধিক। 'সুকুমার-সাহিত্য'-পাঠের এই অনুরাগ কেবল বঙ্গীয় পাঠকের মধ্যেই প্রবল নহে। ইউরোপবাসীর পাঠ করিবার অভ্যাস বড়ই প্রবল; আহার-বিহারের ন্যায় গ্রন্থ-পাঠ তাঁহাদিগের "নিত্য-কর্ম্ম-পদ্ধতি"; সেই ইউরোপবাসীর মধ্যেও সুকুমার-সাহিত্য-সেবীর সংখ্যাই অধিক। উল্লিখিত Fortnightly Reviewর লেখক এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"The popular taste favors ephemeral literature, produced vry rapidly, and designed to fit the fashion of the hour to afford a momentary excitement, or to gratify some immoderate curiosity rather than works of a solid character and more enduring interest which cannot be either written or read at the same extravagant rate and which do not need to be continually replaced by fresh matter." রুচির হেতু নিরূপণে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আমরাও প্রায় এই কথাই বলিয়াছি।

পাঠকের রুচির আভাস কতক পরিমাণে দিয়াছি, এখন পাঠ্যগ্রন্থের উৎপত্তির বৈকল্প একটু বুঝা যাউক। অনেক সময়ে দেখা যায়, পাঠকের রুচির মত সদ্‌গ্রন্থ বঙ্গভাষায় মিলে না; জ্ঞানপিপাসু পাঠককে সুতরাং স্বস্তবিষয়ক গ্রন্থের জন্য পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কোন্ কোন্ বিষয়ে আমাদিগের ভাষায় এই অভাব, বর্ত্তমান প্রসঙ্গালোচনায় তাহারও কতক আভাস পাওয়া যাইবে।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের পুস্তকাগারের বার্ষিক সমালোচনা 'পাঠে' বুঝা যায়, প্রতি বৎসর ন্যূনাধিক সার্দ্ধদ্বিসহস্র পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রণীত হয়। শিশুপ্রাণ ভাষার পক্ষে এই সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, ইহার মধ্যে মৌলিক বা সারবান্ গ্রন্থ নিতান্ত বিরল; শিশুপাঠ্য এবং অনুবাদপ্রধান পুস্তক ও বটতলার বিদ্যাবাগীশদিগের কপোল-কল্পিত গদ্যপদ্যময় পুস্তিকাতেই এই সংখ্যার সারভাগ সংগঠিত। শাস্ত্র ও ধর্ম্মগ্রন্থের অসদ্ভাব আজকাল অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে; 'বঙ্গবাসী'র "শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ" এই কার্য্যের অগ্রণী—"বঙ্গবাসী'র অধ্যক্ষগণ পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ দ্বারা সাধারণের মহৎ উপকার সাধন করিতেছেন। কিন্তু এ কার্য্যেও "শাস্ত্রপ্রকাশ"-রূপ কর্ত্তব্য পালন অপেক্ষা অর্থাগমের চেষ্টাই অধিক বোধ হয়; প্রকাশিত গ্রন্থের একাধিক গার্হস্থ্য সংস্করণ চলিতেছে, কিন্তু সমগ্র পুরাণানুবাদ-প্রমুখ আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তি অথবা অসমাপিত বা অল্প-প্রকাশিত গ্রন্থের প্রচার বড় দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অসংখ্য সংস্করণ বাহির হইয়াছে; কিন্তু, তত্ত্বকথা-প্রসঙ্গে বড় ন্যূন না হইলেও যোগবাশিষ্ঠের বড় প্রচার দেখিতে পাই না। ভূকৈলাস-রাজবাটী হইতে প্রকাশিত সংস্করণ ভিন্ন উহার অপর কোন সংস্করণ আছে কি না, আমরা অবগত নহি; থাকিলেও, তাহার সংখ্যা এত অল্প যে, আর নূতন চারি সংস্করণ

বাহির করিলেও, বোধ করি, উক্ত গ্রন্থের এক-চতুর্থাংশ অভাব বিদূরিত হয় না। এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, শাস্ত্র-প্রকাশক-মহলে কি এমন কেহ নাই? হিন্দুশাস্ত্রোক্ত গ্রন্থের বহুল প্রচার দেখিলে হৃদয়ে বাস্তবিক আশার সঞ্চার হয়—পাশ্চাত্য-শিক্ষায় অনুপ্রাণিত বিকৃত মস্তিষ্কে আর্য্যঋষিগণোক্ত সদ্‌জ্ঞান-সঞ্চারিত হইবার পথ অনেক পরিমাণে প্রসারিত হয়। মৌভাগ্যের বিষয়, 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের মতি-গতি ফিরিতেছে, হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা জন্মিতেছে, হিন্দুর পুরাণেতিহাসের সূক্ষ্মত্ত্ব আবিষ্কারে অনেকে সচেষ্ট হইতেছেন। উল্লিখিত তালিকার হিসাবে ধর্ম্মগ্রন্থের সংখ্যোপযোগী পাঠক আছেন, ইহাও সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, হিন্দুপ্রধান বঙ্গভূমি হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে প্লাবিত হউক, প্রত্যেক বঙ্গবাসী হিন্দুসন্তানের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হউক, হিন্দুর পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাস পুনর্জ্জীবিত হউক।

দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের বড়ই অভাব। শিল্প ত বাঙ্গালার অভিধান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেই হয়। দেশীয় সহজ শিল্পের অনুশীলন, শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট নিতান্তই অপ্রত্যেক্ষ; বৈদেশিক শিল্পের অবতারণাও তাঁহাদিগের বক্তৃতাতেই শুনা যায়—কার্য্যক্ষেত্রে তাহার লক্ষণ বড় দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং, তদ্বিষয়ক গ্রন্থের আশা দুরাশা-মাত্র। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়-রত্ন মহাশয়োপাধ্যায় সম্পাদিত 'মীমাংসা-দর্শন,' স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত 'দৈব-দর্শন' এবং পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালী-বর বেদান্তবাগীশ-ব্যাখ্যাত 'সাংখ্য' ও 'পাতঞ্জল' দর্শন—দার্শনিক গ্রন্থসমূহের শীর্ষস্থানীয়; ধীমান্ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দার্শনিক প্রবন্ধগুলিও বাঙ্গালা ভাষার মহার্ঘ সম্পত্তি। তদ্ভিন্ন, সম্প্রতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন-তর্করত্ন মহাশয় 'ন্যায়' ও 'বেদান্ত' দর্শনের ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত হইয়াছেন; কার্য্য-কুশল শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-বিজয় বসু মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতেন ও লিখিয়া থাকেন; কিন্তু ইহার সমস্তই সাময়িক পত্রে পর্য্যবসিত—সংস্কৃতভাবে গ্রন্থাকারে পরিণত হইলে, ইহাও বঙ্গভাষার যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিবে। ফলতঃ দার্শনিক তত্ত্বের জন্য হিন্দুসন্তানের বড় চিন্তা নাই; হিন্দুর শাস্ত্রসাগর মন্থন করিলে দার্শনিক কৌস্তুভমণি বিস্তর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখন সাধারণ পাঠকের বোধ-সৌকর্য্যার্থে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় বাহির করা সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়; বাঙ্গালী পাঠক এখন অনেকেই পাশ্চাত্যদর্শনে শিক্ষিত—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের সময়য় ও পরস্পর বিবাদ-ভঞ্জনে লক্ষ্য রাখা বর্ত্তমান দার্শনিক লেখক-মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাহাতে এরূপ গ্রন্থ-পাঠের প্রবৃত্তিও শিক্ষিত বাঙ্গালীর অল্পে অল্পে জন্মিতে পারে। বিজ্ঞানালোচনায় বাঙ্গালীর আজও বড় প্রবৃত্তি দেখা যায় না; বৈজ্ঞানিক গ্রন্থপাঠ বাঙ্গালীর বিদ্যালয়েই পরিসমাপ্ত হয়—বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া আর কেহ বড় তাহার বন্ধন উন্মোচন করেন না। বিজ্ঞান-নামধেয় যে দুই-একখান বাঙ্গালা পুস্তক বাহির হয়, তাহা বালকদিগের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত; আর যে দুই-একজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিনিযুক্ত, বাঙ্গালা ভাষার সহিত তাঁহাদিগের বড় সম্বন্ধ নাই। এরূপ অবস্থায় বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুসন্ধান করা বিড়ম্বনা মাত্র। আর্য্যজাতির চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থেরও আজকাল অনেক বঙ্গানুবাদ

বাহিক হইতেছে; কিন্তু তাহা সাধারণ পাঠকের বড় প্রয়োজন সাধন করে না—সংস্কৃত-ভাষানভিজ্ঞ চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের পক্ষে তাহা বিশেষ উপকারী বটে। চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি গ্রন্থের এক-একখানি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকা-প্রযুক্ত, সকল গ্রন্থ একবারে পাঠ করিতে না পারিলে সমগ্র শাস্ত্রের বিবরণ বুঝা যায় না। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন গুপ্ত মহাশয় এই অসুবিধা অনুভব করিয়া আর্য্য ঋষিগণ-প্রণীত উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংকলন-পূর্ব্বক একাধারে "আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান" নামক গ্রন্থ গ্রথিত করিয়াছেন। এই এক গ্রন্থ পাঠে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের মূল তথ্য অনেক পরিমাণে অবগত হইতে পারা যায়,—সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বেশ রুচিকর বোধ হয়; এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রকাশ আর্য্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিস্তারের বিলক্ষণ প্রয়োজন-সাধক হইতে পারে। আর এক কথা; আজকাল এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত এবং হেকিমি—এই চারিবিধ চিকিৎসাই বঙ্গে প্রবলভাবে চলিতেছে। বাঙ্গালী রোগীর পক্ষে ইহার কোন্‌টায় কিরূপ উপকার, ভুক্তভোগী-মাত্রেই তাহা জ্ঞাত আছেন; কিন্তু তাহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা, বৈজ্ঞানিক ব্যতীত অপরের পক্ষে সম্ভবে না। বর্ত্তমান অবস্থার সেরূপ চেষ্টা বড় আবশ্যক বোধ হয়; সম্প্রতি 'ডাক্তার-কবিরাজ-সম্বাদে' সে চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া, অন্যান্য ধীবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এইকার্য্যে অগ্রসর হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারিবে।

সাধারণ সাহিত্যের অন্তর্গত 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' বঙ্গভাষায় নিতান্ত বিরল। উপন্যাসের সরস ভাষায় মন মাতাইতে বঙ্গীয় লেখক যত নিপুণ, দেশের কথা সরল ভাষায় বিবৃত করিতে তত যত্নবান নহেন। ভোলানাথ বাবুর 'Travels,' প্রতাপ বাবুর 'Tour,' অমৃত বাবুর 'Reminiscences,' ত্রৈলোক্য বাবুর 'Visit to Europe,' রমেশ বাবুর 'Three years in Europe'—এ সমস্তই ইংরাজি সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে; বঙ্গভাষায় লিখিত হইলেও গিরিশ বাবুর 'বিলাতের পত্র' বিলাতী কথাতেই পরিপূর্ণ। এক 'বঙ্গ মহিলার আর্য্যাবর্ত্তই বঙ্গভাষার নিজস্ব; তদ্ভিন্ন, 'কাশীর নীই হইতে কুমার পর্য্যন্ত,' 'উদাসীন সত্যপ্রবার আসাম-ভ্রমণ,' এবং [illegible] কান্ত বাবু ও পদ্মনাভ ঘোষাল মহাশয়ের 'ভারত-ভ্রমণ' ও বঙ্গভাষায় লিখিত দেশের কথা বটে; স্বর্গীয় সঞ্জীববাবুর 'পালামৌ' ও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য; যেভাবে দেশ ও দেশের দ্রব্য লেখা ও পাঠককে দেখান উচিত, এক সঞ্জীববাবু ভিন্ন অপরকেহই সেভাবে দেখান নাই। কিন্তু সঞ্জীববাবুর দৃষ্টি ও ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যভূমি পালামৌয়ে নিবদ্ধ; সুতরাং এশ্রেণীর গ্রন্থের পাঠক থাকিলেও পাঠ্যের নিতান্ত অসদ্ভাব। বিদ্যাচর্চ্চায়, পয়সার চেষ্টায়, শিক্ষিত বাঙ্গালী অল্পকাল বহু দেশ-বিদেশ পর্য্যটন করিতেছেন; তাঁহারা কেন যে স্ব স্ব ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গভাষার একটা সামান্য অভাব পূরণে যত্ন করেন না, তাহা অন্তর্য্যামী বিধাতাই বলিতে পারেন।

'অভিধান'ও সাধারণ সাহিত্যের অন্তর্গত। বঙ্গভাষার শব্দশক্তি কিরূপে সাধিত হইয়াছে বুঝিতে হইলে, একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধানের প্রয়োজন। 'শব্দার্থবিদ্যা,' 'প্রকৃতিবোধ,' 'প্রকৃতিনির্ণয়' প্রভৃতি যে সমস্ত অভিধান সচরাচর দেখা যায়, তাহা সংস্কৃতজাত শব্দেই সম্পূর্ণ; বঙ্গভাষার মধ্যে কিন্তু অনেক গ্রাম্য শব্দ আছে, এবং বঙ্গবিজেতা ভিন্ন ভিন্ন রাজার অনেক কথাও কাল-পরম্পরায় অলক্ষ্যে আমাদিগের ভাষার সহিত সংজড়িত হইয়া উহার যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গভাষার ব্যুৎপত্তি-লাভের জন্য এই সমস্ত কথারই তথ্য জানা আবশ্যক। এইরূপ তথ্যজ্ঞাপক একখানি সম্পূর্ণ অভিধানের এতদিন বড়ই অভাব ছিল। সম্প্রতি 'বিশ্বকোষ' নামক বিস্তৃত গ্রন্থ এই অভাব পূরণে প্রস্তুত হইয়াছে। বস্তুতঃ 'বিশ্বকোষ' বঙ্গভাষার এক অমূল্য রত্ন। [illegible]তে 'শব্দকল্পদ্রুম' ও ইংরাজীতে 'Encyclopœdica Britannica' যেরূপ ঐ দুই ভাষার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ, বঙ্গভাষার 'বিশ্বকোষ' তদ্রূপ গৌরবের সামগ্রী। দেশের প্রধান প্রধান পত্র-সম্পাদকগণ এবং বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ও 'এসিয়াটিক সোসাইটির' পুস্তকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ একবাক্যে এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন; এমত স্থলে আমাদিগের পক্ষে উহার গুণব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে এক কথা; অন্যূন আর্ট বৎসর ব্যাপী কঠোর পরিশ্রমে 'অ' হইতে 'ঔ' পরিসমাপ্ত হইয়াছে; ব্যঞ্জনের বর্ণ ত্রিংশ বর্ণ কত দিনে সমাপ্ত হইবে, বিধাতাই বলিতে পারেন। বিশ্বকোষের বর্ত্তমান সঙ্কলকার শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বিলক্ষণ উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়সম্পন্ন পুরুষ সত্য; কিন্তু একের চেষ্টায় এই গুরুতর সুসম্পন্ন হওয়া বহু অর্থ ও সমধ সাপেক্ষ; বঙ্গের ধনী ও বিদ্যোৎসাহী সুসন্তানগণ তাঁহার কার্য্যের সহায় হউন,—আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

নবন্যাস ও উপাখ্যানের ন্যায় কাব্য-গ্রন্থেরও আজকাল অভ্যুদয় বলিতে হইবে। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিমবাবু-লব্ধ যশের প্রত্যাশায় অধিকাংশ লেখকই আখ্যায়িকার আলেখ্য চিত্রনে নিযুক্ত; অন্যদিকে অনুনাদন কয়েক জন শিক্ষিত যুবা ও সুশিক্ষিতা মহিলা কাব্য-কুঞ্জেই লিপিকুশল। 'মাইকেল' মৃত এবং 'হেমচন্দ্র' হীনপ্রভ হইলেও, এই নবীন কবিদিগের কাব্য বঙ্গের কোমল সাহিত্যকে সজীব রাখিয়াছে। প্রবীণ 'নবীন'ও নিরুদ্যম নহেন; ধীরে ধীরে তাঁহার কৃষ্ণ, ঈষ্ট, বুদ্ধ বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে লীলা করিতেছেন। নূতন নাটকের কিন্তু নিত্য অভাব দেখিতেছি। কথোপকথন-মূলক অনেক পুস্তিকারই নাট্যাখ্যা দেখা যায় বটে, কিন্তু খ্যাতপ্রতিষ্ঠাতমস্ব প্রকৃত নাটকত্ব-পূর্ণ গ্রন্থ তন্মধ্যে একখানা মিলাও দুষ্কর। নাট্যাখ্যাজড়িত অনুনাদন গ্রন্থের মধ্যে 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত 'বিবাহ-বিভ্রাট' ও 'তরবালা' নামক পুস্তকদ্বয়ে অনেক পরিমাণে নাটকত্ব লক্ষিত হয়; সমাজ-চিত্র অঙ্কিত করিতে তিনি অনেকটা লিপিকুশল, কিন্তু তৎপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থে 'ঘাত' আছে 'প্রতিঘাত' নাই, তাহার অধিকাংশই একদেশ-বর্ণনে—ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি শ্লেষোক্তি-বর্ষণে—দূষিত।

অমৃতবাবু সমাজ-চিত্র-অঙ্কনে পারদর্শী; কিন্তু তাঁহার অনুকরণে অনেক অপদার্থ গ্রন্থ আজকাল বিস্তর বাহির হইতেছে। ঐ প্রধান প্রধান রঙ্গালয়ে যত্নের সহিত অভিনীত হইতেছে। নাটকের নাটকত্ব না দেখাইয়া চটকের চাকচিক্য মোহিত করাই আজকাল রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের লক্ষ্য দাঁড়াইয়াছে; তাই আজ-কাল বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নটও 'আবু হোসেন' গড়িতে যত্নবান। হিন্দুর পুরাণ নিতান্ত পুরা-

তন (!) হওয়াতে অধুনাতন নাটককারগণ আবিষ্য ও পারস্য 'উপন্যাসে নাটকের চরিত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন; তাই আজকাল 'লয়লা-মজনু', 'গুল্ বকাওয়ালী', 'আবু-হোসেন' প্রভৃতি গ্রন্থের সৃষ্টি হইতেছে। চরিত্র-শিক্ষা যে নাটক-পাঠের বা অভিনয়-দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য, নট ও নাট্যামোদী দর্শক এবং পাঠক—উভয়েই তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন, তাই নিজের সমাজচিত্র ছাড়িয়া গ্রন্থকারগণ বিদেশী ও বিধর্মীর সমাজ-চিত্র আঁকিতেছেন। কবিগুরু সেক্ষপীয়রের 'ম্যাক্-বেথ' নাটকাংশে জগতের এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বটে; কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালীর চরিত্র গঠিত হইবার উপকরণ অতি অল্পই পাওয়া যায়। নটচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র সেই 'ম্যাক্‌বেথের' 'বঙ্গানুবাদ করিয়া' যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহাতে বঙ্গের রঙ্গ-সাহিত্যের বড় পরিপুষ্টি হয় নাই; প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে হরলাল রায় মহাশয় ঐ নাটক অবলম্বনে যে 'ক্ষত্রপাল' নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদিগের দেশের ছায়া অনেকটা প্রতিফলিত ছিল—দেশীয় দৃষ্টিতে দেখিবার অনেক দ্রব্য-সামগ্রী ছিল। এই সকল নানাবিধ কারণেই, বোধ হয়, রঙ-তামাসা দেখিবার দর্শক-সংখ্যা যত অধিক, নাটক-পাঠকের সংখ্যা তত নহে; বস্তুতঃ আজকাল নাটক-নামধেয় গ্রন্থে পড়িবার পদার্থ কিছুই পাওয়া যায় না।

উপন্যাসের আসরে 'উমির-ওয়ার' বিস্তর, কিন্তু কার্য্যকুশল লোক নিতান্তই অল্প। যে অবধি বঙ্কিম বাবু কলম ছাড়িয়াছেন, তদবধি ভাল উপন্যাস আর নয়নগোচর হয় না; 'স্বর্ণলতা'-প্রণেতার স্বর্গপ্রাপ্তির সঙ্গে সামাজিক আলেখ্যও আর বড় দেখা যায় না। শিক্ষা-নবিশদিগের মধ্যে চর্ব্বিত-চর্ব্বনই অধিক। এরূপ অবস্থায় সুকুমার সাহিত্যের কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করাই লেখক-পাঠক উভয়ের পক্ষে মঙ্গলকর।

জীবনচরিত কচিৎ কখন এক-আধখান বাহির হয় বটে; তবে তাহারও অধিকাংশ অসম্পূর্ণ ও একদেশ-দোষে দূষিত। জীবন-চরিত লিখিবার উপকরণ সংগ্রহে বঙ্গীয় লেখক যথোপযোগী যত্ন করেন না; যত্ন করিলে কিরূপ সামগ্রী জন্মে, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'মাইকেলের জীবনী' লিখিয়া তাহার পরিচয় দিয়াছেন। এই আদর্শে জীবনচরিত লিখিতে সকল গ্রন্থকারের যত্ন করা উচিত। রঙ্গভাষা সকল বিষয়ে কিছু কিছু অগ্রসর, কেবল ইতিহাস-প্রণয়নসম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের ইতিহাসের প্রতি বিলক্ষণ লক্ষ্য আছে বটে, কিন্তু এক 'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস' প্রণয়নের পর তিনিও একরূপ নিশ্চেষ্ট। স্বর্গীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'Ancient India'র অবাধ অনুবাদ বাহির হইতেছে; উহা পরিসমাপ্ত হইয়া পুস্তকাকারে পরিণত হইলে, বঙ্গসাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পত্তি বলিয়া গণিত হইতে পারিবে। কিন্তু এরূপ দুই-একজনের চেষ্টায় কতদূর কার্য্য হইতে পারে? নিরবচ্ছিন্ন কাব্যবিতাময় কুসুম-কলা পরিহার করিয়া বঙ্গের গ্রন্থকারগণ যাহাতে চরিতেতিহাসের সুপক্ক ফল প্রসব করিতে লক্ষ্যবদ্ধ হয়েন, বঙ্গসাহিত্যসেবী আমাদিগের ইহাই আন্তরিক কামনা।

বঙ্গভাষায় 'রাজনৈতিক সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থের বড়ই অভাব'—বলিয়া কেহ কেহ আক্ষেপ করেন। কংগ্রেস-কুঞ্জবিহারী কুলতিলকেরাই, বোধ করি, এইরূপ আক্ষেপকারীদিগের অগ্রণী। কার্য্য-কারণ-পরম্পরায় দেখা যায়, 'কংগ্রেস' কর্ত্তৃক দেশের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট সাধিত হইতেছে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কথা ধরি না—তাহাতে আমাদিগের অধিকারও নাই, আস্থাও নাই—কিন্তু জেতা-বিজিতের মধ্যে পরস্পর অকারণ মনোমালিন্য, রাজনীর প্রতি ইংরাজের বহুদিন-প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধার ক্রম-লোপ, এবং দেশের আভ্যন্তরিক দুর্দ্দশার ক্রমোন্নতি যে ঐ এক 'কংগ্রেস' হইতে হইতেছে তাহা প্রত্যহ নয়নগোচর হইতেছে। আর, বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ অবনতির হেতুই এ 'কংগ্রেস'; কংগ্রেসভুক্ত মহাত্মারা স্বদেশভাষার ধার ধারেন না, স্বজাতির সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চাহেন না—অধিক কি, অনেকে পৈতৃকবংশনাম ও বাস্তুভূমি পর্য্যন্ত বৈতরণীর জলে বিসর্জ্জন দিয়া বসেন। ইংরাজিতে তাঁহাদিগের কথা, ইংরাজিতে তাঁহাদিগের চিন্তা, অধিক কি—ইংরাজিভাবে তাঁহাদিগের নিশ্বাস-প্রশ্বাস; সে অবস্থায় রাজনৈতিক সাহিত্য ইংরাজী ভিন্ন বঙ্গভাষায় বাহির হইবে কিরূপে? রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা তাঁহারা—রাজনৈতিক গগণের জ্বলন্তক্ষত্রস্থানীয়; তাঁহাদিগের সাহিত্য-স্রোত 'টেম্‌স্'-সঙ্গমে সংমিলিত, বিলাতের ভারতবর্ষে ('India'তে) প্রবাহিত। বঙ্গভাষায় রাজনৈতিক সাহিত্য সৃষ্ট হইতে পারে, বঙ্গের—কেবল বঙ্গের কেন, সমগ্র ভারতভূমির—এখনও সে অবস্থা দাঁড়ায় নাই; সে সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা এখন সম্পূর্ণ বিড়ম্বনাময়। বিখ্যাত সমালোচক Mathew Arnold বলিয়াছেন,— "The exercise of the creative power in the production of great works of literature or art.....is not at all epochs and under all conditions possible; and therefore labor may be vanily spent in attempting it, which might with more fruit be used in preparing for (তিনি স্থানান্তরে আরও বলিয়াছেন,—it, in rendering it possible." "For people enamoured of their own newly discerned right, to attempt to impose it upon us as ours, and violently to substitute their right for our force, is an act of tyranny, and to be resisted" *এই কথাগুলি বড় মূল্যবান; দেশ-কাল-অবস্থা-অনুসারে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক সাহিত্য সৃষ্ট হইতে পারে না। সেরূপ চেষ্টায় সময়ের অপব্যবহার না করিয়া যাহাতে রাজনীতি সামগ্রীটা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি—অন্ততঃ 'স্বায়ত্ত শাসনের' কার্য্যটা সুশৃঙ্খলে চালাইতে পারি—তৎপক্ষে মনোযোগে অধিকতর সুফলের সম্ভাবনা। আর যাঁহারা দেশের আভ্যন্তরিক মঙ্গলের চেষ্টায় মনোনিবেশ না করিয়া, ভুয়া গলাবাজিতে, দেশোদ্ধার করিতে চাহেন, আমাদিগকে রাজনৈতিক শাস্ত্রে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পান, আমাদিগের শক্তি-বিনিময়ে তাঁহাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে অগ্রসর হয়েন—দেশহিতৈষিতার ধুয়া ধরিলেও—তাঁহারা আমাদিগের প্রকৃত হিতৈষী নহেন, তাঁহাদিগের কার্য্যে বাধা দেওয়াই বঙ্গভূমির পক্ষে মঙ্গলকর।

সাময়িক পত্রও পাঠ্য-বিষয়ের এক প্রধান সামগ্রী। উপযুক্ত প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে সময়ান্তরে চেষ্টা করা যাইবে।

* Essays in Criticism. — I. The Function of Criticism at the Present Time.

সেই সে আমার!

নিখিল চিন্তার পাশে, যাহার স্মৃতিটী ভাসে,
হৃদয়ে চিত্রিত সদা যার মুখখানি,
প্রকৃতির অঙ্ক ভরি, যাহার সুষমা হেরি,
দিগন্ত ভরিয়া শুনি যার বীণাধ্বনি!

পায়ে পড়ি খাও মোর মাথা,
এনে দাও তাহার বারতা,
কোন্ দেশে এসেছি গো ফেলি,
সে আমার আছে একাকিনী!

বলি শুন পরিচয় তার,
যেখানেতে পাবে দেখা তার!
অন্বেষণ কর সেই ঠাঁই,
যেথা যেথা শোভার ভাণ্ডার।

মূর্ত্তিমতী সরলতা, ক্ষুদ্র সরমের লতা,
ভাল করি চিনে না সংসার,
যাহার দেখিবে হেন ভাব,
চিন্তারতা সেই সে আমার!

খুঁজ তারে সেই ঠাঁই, যেথা কলহ নাই,
আনন্দ-হিল্লোল নাহি হয় প্রবাহিত;
ধরাধামে নিভৃত যে ঠাঁই,
উচ্চহাসি উচ্চভাষ নাই,
সেইখানে স্বর্গকান্তি আছে বিরাজিত।

সংসারের প্রান্তদেশে, সদাই সে একাকিনী,
নয়নে ঘন অশ্রুধার;
মুছিতে মুছিতে যাঁর, ভিজেছে আঁচলখানি,
চিন্তারতা সেই সে আমার।

দেখিবারে পাবে সন্ধ্যাকালে,
শিশু দিঠি দূরে প্রসারিয়া,
আছে কোন সুরম্যের দেবী,
সরোবর-তীরে দাঁড়াইয়া!

পদতলে নিরমল, প্রশান্ত সরসী-জল,
দূর গর্ভে নভস্তল, অনন্ত চিত্রিত,
অতি ধীর বায়ুভরে, পদ্মের পরাগ নড়ে,
শ্রান্ত যে তরঙ্গগুলি হয়েছে নিদ্রিত।

আকাশের বড় সে তারাটী,
দূর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে ফুটি,
স্নিগ্ধ তীরে তরুশাখে, মধুরে পাখীটী ডাকে,
পাতাগুলি থেকে থেকে হতেছে কম্পিত।

সেইখানে সেই তরুতলে,
রাখি দৃষ্টি আকাশের কোলে,
কি জানি কি খুঁজিছে তাহার;
দেখিলেই পারিবে চিনিতে,
চিন্তারতা সেই সে আমার!

যে'ও দেখি সেই পুষ্পবনে,
দেখিবারে পাইবে যেখানে,
শতচ্ছিন্ন ফুলগুলি, চুম্বিছে চরণধূলি,
বস্ত্রখসা অর্দ্ধছিন্ন পড়ে স্থানে স্থানে;

সুকোমল শত শত পাড়া,
শত খণ্ডে পড়ে হেথা সেথা,
দেখিলেই পারিবে বুঝিতে,
কে যেন ছিঁড়েছে আন-মনে।

দেখা যদি পাও তথা কার,
কাঁদকাঁদ মুখখানি তার,
যেন সুবনের লতা, আতপে দগধপ্রায়,
গগনের প্রান্তে যেন ক্ষীণ চন্দ্ররেখা;

পুষ্প যিনি ফুলহাসি, পুষ্পের সুষমারাশি,
সুতপ্ত চিন্তার এক আবরণে ঢাকা।
যেন সে সংসার রাখি দূরে,
বলিবারে এসেছে কাহারে,

হৃদয়ের ভাষাটী তাহার;
দেখিলেই পারিবে চিনিতে,
চিন্তারতা সেই সে আমার!

নিশীথে নিদ্রার ক্রোড়ে, জগৎ ঘুমালে পরে,
দেখিবারে পাও যদি কোন শয্যাতলে;
স্বপ্নময়ী, নিদ্রাবেশে, কভু কাঁদে, কভু হাসে,
মুদিত নয়ন দুটী ভাসে অশ্রুজলে।

কভু বা সে উঠিয়া চমকি,
সচকিতে শয্যাপাশ দেখি,
একটী দীরঘ শ্বাস ফেলি,
আবার লুটায় শয্যাতলে।

কভু বা বসিয়া বাতায়নে,
চাহে শুধু প্রভাতের পানে;
কি যে তার হৃদি-জ্বালা, বৃশ্চিক-দংশন;
পারে নাহি করিতে নিবারণ।

সমীর শিশিরাসার, পুষ্পের সৌরভ-ভার,
পারে না করিতে তার শান্তির সঞ্চার;
দাবদগ্ধা কুররীর মত,
চিন্তারতা সেই সে আমার!

মানুষ, না বৃক্ষ?

কমলাকান্ত আফিমের গুণে পৃথিবীর যাবতীয় সামগ্রীকে রং-বেরং দেখিতে পাইতেন। তাঁহার অহিফেন-অর্জ্জিত দিব্যচক্ষুতে সংসারকে দিব্যভাবে দেখিতে পাইতেন, এবং দেখিয়া শুনিয়া দিব্যভাবায় সেই সব দিব্য কথা প্রকাশ করিতেন। তেমন করিয়া আর কেহ কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিবেন না; সে তীব্র উক্তি, সে ব্যঙ্গ—অনুকরণ করা অসাধ্য। তবে একদিন আমার খেয়ালের ঝোঁকে আমাদের দেশের লোকগুলাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ বলিয়া বোধ হইল। নেশার ঝোঁকে যেদিকে তাকাই, দেখি—বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই তরুরাজির দ্বারা পরিপূর্ণ, এবং পরিবেষ্টিত। একটাও মানুষের শব্দ নাই—সব নিস্তব্ধ, নিষ্পন্দ, অচল, অযাচ্য! বড় গোলে পড়িলাম। কাহাকে বা জিজ্ঞাসা করি—এ কোন দেশ—এ কোথায় আসিলাম—সব এমন কেন হইল? নির্জ্জন, নিষ্পন্দ প্রদেশ; বড় ভয় হইল—"দুর্গা রক্ষা কর" বলিয়া চেঁচাইলাম। গাছগুলা যেন আমার কান্না দেখিয়া হাসিয়া উঠিল; বোধ হইল, যেন তাহারা কি কানাকানি করিতেছে। বুঝিলাম,—এ মায়াবীর দেশ; এসব গাছ নহে—সব মানুষ; নহিলে, আমার মনের ভাব কেমন করিয়া বুঝিতে সক্ষম হয়—এমন সময় দৈববাণী হইল; শুনিলাম, কে যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—"বাবা! বাস্তবিক এসব একটাও গাছ নহে, তোমার দেশের বাঙ্গালী বাবুরা কর্ম্মগুণে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঔষধ-সেবনজন্য তোমার এখন দিব্যচক্ষু লাভ হইয়াছে, তাই ইঁহাদিগের প্রকৃত অবস্থা অনুধ্যান করিয়াছ। কিন্তু নেশা ছুটিলে যখন সম্যপ্রাকৃতিক হইবে, তখন আবার যে-কে-সেই দেখিবে; যেমন দেশ, নগর, গ্রাম আছে, তাহাই দেখিতে

পাইবে। তবে তোমার কৌতূহল নিবারণ জন্য কাহারা কোন্ জাতীয় বৃক্ষ হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া বলি; সাবধানে শ্রবণ কর।

১। ঐ যে মধ্যে মধ্যে মুখ লম্বা লম্বা, সকল গাছের উপর মাথা তুলিয়া, বিলাতী ঝাউ সরু সরু পাতা লইয়া সোঁ-সোঁ করিতেছে—উহারা তোমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর দল — উহারা 'এ্যাজিটেটরগণ'। বিলাতী-ঝাউ-গাছের দূরপ্রসারী ডাল নাই, ঘনবিন্যস্ত পত্রবিহীনী নাই, সুশীতল ছায়া নাই, সুস্বাদু ফল নাই। উহা স্বল ত্রিকোণের আকারে আকাশ ভেদ করিয়া উঠে, এবং একটু ঝাতাসের চুম্বনে সোঁ-সোঁ হু-হু শব্দে দিগ্‌দেশ আমোদিত করিয়া দেয়; মনে হয়—কত বড়ই ঝড় আসিতেছে, হয় ত ঘর-দুয়ার ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কিছুই থাকিবে না। যাঁহারা ধনী-প্রাসাদ-সমতুল্য বড় বড় বাটীতে বাস করেন, তাঁহাদের বাটীর সম্মুখের বাগানে ইহার বাহার আছে বটে, এবং ইহার হা-হুতাশ শব্দে তাঁহারা উল্লসিত হইতে পারেন। তোমাদের দেশের বাবু-আন্দোলকগণও, একটু বায়ুর প্রকোপ হইলেই, কথায়—বক্তৃতায় দেশ ভরিয়া দেন; হু-হু সোঁ-সোঁ শব্দে কান ঝালাপালা করিয়া দেন। বস্, এইটুকুই; এতদ্ব্যতীত, পৃথিবীর আর কাহারও ইহা দ্বারা কোন উপকার নাই। ক্ষুধিত, আর্ত্ত, ব্যথিত, দীনদরিদ্র, ইহার শীতল ছায়ায় শীতগুতাপ-ক্লান্তি নিবারণ করিতে পারে না, ফলে পেট ভরে না—ক্ষুধাও নিবারণ হয় না। লাভের মধ্যে কেবল—ইহারাই লম্বা হইয়া আকাশ ভেদ করিয়া সকলের মাথার উপর উঠিয়া থাকে। কাষ্ঠেও কোন উপকার নাই; পুড়াইয়া ছাই করিলে, ভাল ছাই হয় না; কেন-না, উহা অসার; তাই ভাল কয়লাও হয় না। কেবল ধনীর নন্দনকাননে শোভা পাইতে পারে মাত্র—তাহাও বিলাতীভাবাপন্ন ধনীর বিলাস-কাননে, অন্যত্র নহে। ইংলণ্ডেশ্বরীর ইংলণ্ডে কেবল ইহা আবদ্ধ থাকিলে ভাল হইত। আমাদের এ প্রখর-রবিকর-প্রভা-বিস্তারী ভারত-আকাশের তলে, ক্ষুধিত-আর্ত্ত-দীন-দুঃখী-অঙ্কুর-পরিপূর্ণ ভারত-মহা-শ্মশানে, এ ইংরাজ-ভোগোপযোগী বিলাতী-ঝাউ না রাখিলেই শুভ।

২। ঐ যে ছোট-বড় খেজুর-গাছগুলি দেখিতেছ, উহারা তোমাদের দেশের ধর্ম্মপ্রচারকগণ; আচার্য্য, উপাচার্য্য, স্বামী, পণ্ডিত ইত্যাদি। উহাদের গা বাহিয়া অনবরত রস গড়াইয়া পড়িতেছে; কাহারও কাহারও গলায় ভাঁড় টাঙ্গান আছে। গাছের বড় ডাল নাই, মাথার উপর কেবল বড় বড় কাঁটাযুক্ত পাতা ও পাতলা ডাল। উহার ছায়া নাই, শীতলতা নাই, সৌন্দর্য্য নাই। তোমাদের দেশের অনেক প্রচারকের অনবরত দরবিগলিত ধারায় কপোল বাহিয়া জল পড়িতে থাকে; জল-সেচনের বড়ই বাড়াবাড়ি, 'খোঁচা মারিলেই হইল। ঊষাকালে এই রস পান করিলে একটু ঠাণ্ডা হয়, এবং জল-বৃদ্ধি হয় মাত্র। কোন কোন প্রচারক এই রসকে জাল দিয়া গুড়-চিনি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া কিছু সম্বতিও করেন। মাথার কাছে যাও, ত সঙ্কীর্ণতার গোঁড়ামির বড় বড় খেজুর-কাঁটা তোমার হাতে-গায়ে ফুটিতে থাকিবে; ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া দূরে পলাইতে হইবে। তবে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া খেজুর-পাতা দিয়া পাখা নির্ম্মাণ করিলে, গরমের নিদারুণ সময়ে একটু আরাম দিতে পারে।

৩। ঐ যে নিম্বগাছগুলি দেখিতেছ, উহারা—আমাদের দেশের উকীল-সম্প্রদায়। নিমের বাতাস বড় শীতল; কিন্তু বাঁদরে ফল খায়, এবং দরিদ্র পথের বালকে খায়। নিম বড় তিক্ত, কিন্তু রসবৃদ্ধি ও পাঁচড়া-চুলকানির পক্ষে অমোঘ ঔষধ। নিমের কাষ্ঠে ঢেঁকি হয় ও জগন্নাথ হয়। উকীলের মুখ বড় মিষ্ট, বড় আশাপ্রদ, বড় শান্তিবিধায়ক। বিনা-মূল্যের পরামর্শ লও, স্বর্গের শীতলতা ও উৎফুল্লতা হাতে পাইবে। যদি তোমার রস হইয়া থাকে; বড় টাকার কামড়ানি, অর্থের আঁচড়ানি, অহঙ্কারের ধড়ফড়ানি হইয়া থাকে; উকীলের কাছে যাও—দেখিলুম সব শুকাইয়া যাইবে। উকীল যখন মুন্সেফ হয়েন, তখন তিনি নিম-কাষ্ঠের ঢেঁকি; ঘুন ধরে না, উয়ে খায় না, অথচ দিবারাত্রি-শকাল-সন্ধ্যা ক্যাঁচ্ চলে। উকীল যখন হাইকোর্টের জজ হয়েন, তখন তিনি দারুব্রহ্ম ঠুঁটো জগন্নাথ; কেবল খড় নাড়িতেছেন, আর দাদার রায়ে 'রায় দিতেছেন।' তখন তাঁহার হাত-পা সব সংযত, মুখব্যাদ পর্য্যন্তও যেন সংযত। ভিতর বড় তিত—উকীলের ভিতর বড় তিত। দাঁত বসায় কাহার সাধ্য?

৪। ঐ যে কলাগাছের শ্রেণী দেখিতেছ, উহা তোমাদের দেশের 'ডিপুটি কুল-কাতরিণ' গৃহস্থের নিকট কলাগাছের সকলই দরকারী। ভারত-গৃহস্থের (ইংরাজের) ডিপুটিগণ দ্বারা সকল কার্য্য সাধন হয়। কলাপাতে ব্রাহ্মণ-ভোজন হয়, পাঁঠা কাটিয়া মাংস রাখা হয়, শ্রাদ্ধের হবিষ্য হয়; কলায়-বাঁদর-ভুলান হয়, ভোকার সর্দ্দি হয়; ছোবড়া অঞ্চলে বাঁধিলে মা-ষষ্ঠীর কৃপা হয়; থোলার শ্রাদ্ধের ভূর্জ্জি সাজান হয়। ডিপুটি দ্বারা কি না হয়? সবই হয়; বাঁদর ভুলান হইতে কত মহা মহা-পুরুষের 'আদ্য-শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হয়।

৫। দূরে রিঙ্গিত বালুকাভূমে যে কণ্টকী ইত্যাদি লতা রহিয়াছে, উহারা তোমাদের দেশের লেখক-গ্রন্থকারগণ। বিস্তীর্ণ বালুকা-ক্ষেত্রে বায়ু বিতাড়িত হইয়া, মাথা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া, কি জানি, কি কথা বালুকা-যন্ত্রে লিখিতেছে; কতবার মুছিতেছে, কতবার ডুবিতেছে, আবার লিখিতেছে। উহাদের মধ্যে অনেক-গুলি তরমুজের লতা আছে; দেশে মানুষ নাই, নচেৎ ঐ উত্তপ্ত বালুকারাশি সরাইয়া অতি উপাদেয় বিশাল তরমুজ বাহির করিতে পারিত।

আদেশ-বাণী নেশার ঘোরে বসিয়া শুনিতেছি— খুব জমাট নেশায় খুব 'কেলায়ার ভোয়েন্সে' মগ আছি; এমন সময়ে বুঝিলাম, আমার গৃহলক্ষ্মী—শ্রীমতী পুরা ১০৫ সিক্কার ওজনের ভাগলপুরী একটী 'কৌলেঁ' সহিত আমার পৃষ্ঠের স্বনিষ্টালাপ করিয়া দিতেছেন। সে কোমল করসংস্পর্শে আমার আড়াই সের সিদ্ধির নেশা ছুটিয়া গেল। কিন্তু তখনও চমক ভাঙ্গে নাই; তাই কাতর-স্বরে জিজ্ঞাসিলাম,—"প্রভু! শীঘ্র বলিয়া দেও, এই আমার নামার্দ্ধ-ভাগিনী, বিনয়নম্রমুখিতা, সম্যক্-পরিচ্ছদ-পরিবৃতা, মহাশয়া কোন্-জাতীয়া বৃক্ষ?" কে যেন হিস্ হিস্ করিয়া কানের কাছে বলিয়া গেল,—"অশ্বত্থজী!" গৃহিণী 'রুরেঁকে' করিয়া বলিলেন,—'এলোকেশী!" হবেও বা! কোন্‌টা ঠিক, তাহা ঠাওরান ভার। পাঠক! নির্দ্দেশ করিতে পারেন ত দেখুন?

অনুসন্ধান সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

পুরোহিত-দর্পণের প্রতারণা।

এবারের নূতন পঞ্জিকার "পুরোহিত দর্পণ" নামে এক পুস্তকের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। বিজ্ঞাপনটীর মর্ম্ম এই যে, একখানি 'পুরোহিত দর্পণ' সংগ্রহ থাকিলে, পুরোহিতদিগের আর কোন কর্ম্ম আটক হইবে না। বিজ্ঞাপনদাতার নাম—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, ঠিকানা—অনন্তপুর, ভায়া কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া।

এই বিজ্ঞাপনদাতার নাম ও ঠিকানা দেখিয়াই আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, ইহার মূলে প্রতারণা আছে। সুরেন্দ্রনাথের আরও নানা প্রতারণার কাহিনী পূর্ব্বে পূর্ব্বে 'অনুসন্ধানে' বাহির হইয়াছিল। তখন উহার নাম—ব্যবু সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 'ছিল'; এখন আবার তাহাতে বিদ্যাবিনোদ সংযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু যাউক সে কথা। এই বিদ্যাবিনোদ-বেশে তিনি কিরূপ কি প্রতারণা করিতেছেন, তাহাই একবার দেখুন। এসব বিষয় বারবার লিখিয়া, আর আমরা লিখিবই না মনস্থ করিয়াছিলাম; কিন্তু দেশের লোক এখনও যে এ সকল বিজ্ঞাপন-মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

'পুরোহিত দর্পণের প্রতারণা' সম্বন্ধে আমরা যে সকল অভিযোগ পাইতেছি, তাহার একটী অভিযোগ দেখুন, এই,—

"সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়, নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এবারকার নূতন পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন-দৃষ্টে আমি প্রলোভনে পড়িয়া এক পুস্তক আনিয়া লিখি। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমি কতকগুলি বাজে পুস্তক পাইয়াছি মাত্র। ২৩ খানা পত্র লিখিলাম, তাহারও প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় অদ্য আপনাকে জানাইতেছি। ভরসা করি, অপরকে সতর্ক করিবেন।

অনন্তপুর, ভায়া কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া, জেলা —ঠিকানার সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহোদয় বিজ্ঞাপন দেন, 'পুরোহিত-দর্পণ' (ত্রিবেদী সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড তাহাতে আছে বলিয়া) এবং তাহার উপহার তর্ণী (ভাল) প্রভৃতি ৪খানি শাস্ত্রীয় পুস্তক ১৷৷০ আনায় (সডাক) পাওয়া যাইবেক। যেরূপ বিজ্ঞাপন, তাহাতে বিবেচনা হইল, একখানি 'পুরোহিত-দর্পণ' সংগ্রহ থাকিলে, পুরোহিতদিগের আর কোন কর্ম্ম আটক হইবে না। কিন্তু আমি ১৷৷০ দিয়া পার্শেল খুলিয়া দেখি, তাহাতে ১২৯৭ সালের ৫। ৬ খণ্ড পুরাতন 'মাসিক সমালোচক' পত্র এবং ২।৩টী কর্ণা মেথা ২য়র্দ্ধা এক 'পুরোহিত-দর্পণ'। আমরা দরিদ্র, অনেক কষ্টে ১৷৷০ দিয়াছি। উহা ফেরত চাহিয়াও তাহা পাইলাম না। ইতি

শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন।
সাতক্ষীরা জমীদার বাটী, সাতক্ষীরা পোঃ, জেলা—খুলনা।"

এই তো ব্যাপার! ইহার উপর আর বলিবই বা কি, ভাবিয়া পাই না। লুব্ধ গ্রাহক ইহাতেও যে শিক্ষা পান না, এই আশ্চর্য্য। যাহা-হউক, এখনও আমরা এসম্বন্ধে সাধারণকে সতর্ক করিতেছি—সকলে সাবধান!

"গোপাল-ভাঁড়"

নামক এক পুস্তকের বড়ই জাঁকাল বিজ্ঞাপন আজকাল মফঃস্বলে বিলি হইতেছে। অবশ্য বটতলার ধনুর্দ্ধরগণ এই বিজ্ঞাপন জারির করিতেছেন। বিজ্ঞাপনের চটক দেখে কে? তাহাতে গোপালভাঁড়ের সমস্ত রহস্যাবলী সংগৃহীত হইয়াছে, বিজ্ঞাপনের এমনই বোলচাল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, গোপালভাঁড়ের রহস্যাবলীর দোহাই দিয়া, ঐ পুস্তকে অনেক বাজে যাচ্ছে-তাই জিনিস দেওয়া হইয়াছে; অশ্লীল কথারও আলোচনার পুস্তক খানি কলুষিত করা হইয়াছে। এরূপ অপাঠ্য পুস্তকের এরূপ লোকভুলান বিজ্ঞাপন—বড়ই অন্যায় কথা। দেশের ও পাঠকের দুর্ভাগ্যের কথা ত বটেই! এসব বিজ্ঞাপনে পাঠকগণ ভুলিতেছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৯/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

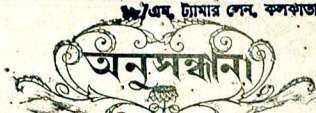

অষ্টম বর্ষ। ১৫ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। নবম সংখ্যা।

রসোচ্ছ্বাস।

আজু নিশিযোগে, পরাণ বঁধুয়া, আওল নিয়ড়ে মোর।
অতি অপরূপ, রূপ তনু হেরি, নয়ান ভৈগেল ভোর॥
অনিমিখ আঁখে, নেহারি নেহারি, রূপেতে ভরল দিঠি।
অমিয়-যামিনী, রভসে গোঁয়ানু, লাখুল পরশ-সিঠি॥
হিয়া-গেহ মাহে, শিরিতি-আসনে, বৈঠল পরাণ-পিয়া।
লোচন-ভৃঙ্গারে, ভকতি-অশ্রুতে, দিনু পদ ধুয়াইয়া॥
পিরিতি-থালিতে, পিরিতি-মোদক, ভখিল পরাণ-বঁধু।
পিরিতি-কমলে, ভোমরা যৈছন, পীয়ল পিরিতি-মধু॥
মুখ পাখালিয়া, পিরিতি-পালঙ্কে, বৈঠল বঁধুয়া সুখে।
মৃদুকি হাসিয়া, নয়ান ঠারিয়া, দিনু যে তাম্বুল মুখে॥
হসিত বয়ানে, মধু মুখপানে, চাওল পরাণ-নাথ।
আনন্দে অবশ, বাসন যৈছন, পাওল গগন হাত॥
দুহাত পসারি, বঁধুয়া তখন, আওলিল মুখে কোলে।
কি কহব সখি, কতিহুঁ আঁদর, বঞ্চল মধুর বোলে॥
নয়ানে নয়ানে, বয়ানে বয়ানে, বুকে বুকে মুখে মুখে।
বঁধুয়ার সনে, স্বপনের ঘোরে, যামিনী জাগিনু সুখে॥
নিঁদ ভেগ দূর, ভাঙ্গিল স্বপন, হারানু পরাণ-নাথে।
তাজিয়া পরম, শরম ভরম, ঝুরোঁ রজনু মাঁথে॥
বঁধুর মিলনে, বঞ্চিত হোয়ল, তবে জীউঁ কাঁহে রাখি।
দীন জগবন্ধু, নিচয় মরিব, বিরহ-গরল ভখি॥

ধর্ম্মচিত্র।

(১)

জগতে নানা ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও তাহার মূলে মাত্র পৃথক পৃথক দুইটী চিত্র। এক-একটী মূল ধর্ম্ম হইতে যদিও বহু শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া তাহাকে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূলের কোন অপচয় হয় নাই। এক হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্গত যে কত প্রকার সম্প্রদায়-ভেদ আছে, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করা অতি-শয় কঠিন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত; যথা,—"চতুঃ প্রাদ্বানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাষিকাদয়ঃ"; তৎপরে তাহার আরও শাখা-প্রশাখা আছে। এইরূপ, মুসলমান-ধর্ম্ম বা খৃষ্ট-ধর্ম্মেও অনেকপ্রকার সম্প্রা-দায়-ভেদ লক্ষিত হয়; কিন্তু উল্লিখিত সমস্ত ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব প্রায় একরূপ। সমস্ত ধর্ম্মের মত এই যে,—একমাত্র অনন্ত-মহিমাময় ঈশ্বর হইতেই এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, এবং সেই ইচ্ছাময় সর্ব্বজ্ঞ পরম পুরুষই জগতের নিয়ন্তা; আবার সর্ব্বব্যাপী জগন্নি-দান ঈশ্বরেই কালে এই জগৎ লয়প্রাপ্ত হই-তেছে। ফলতঃ, উল্লিখিত ধর্ম্মসমূহ পৃথক আকারে পৃথকভাবে গঠিত হইয়া থাকিলেও, মূল উপাদান এক। সুতরাং এই সমস্ত ধর্ম্ম-মতের মূল চিত্রও একরূপ। এতদ্ব্যতীত আর একটী মত আছে; যাহার চিত্র ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেই মতে—এই দৃশ্যমান জগতের কোন পৃথক স্রষ্টা নাই; প্রাকৃতিক নিয়মেই জগৎ পরিচালিত, সংযোগ-বিশ্লে-ষাত্মিক জড়-শক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মূল। এ মতে, প্রাকৃতিক জড় শক্তি ব্যতীত ঈশ্বরের পৃথক কোন সত্তা স্বীকার করা হয় নাই। সুতরাং পূর্ব্ব-চিত্রের সহিত তুলনায় এ চিত্রটী সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব, এই দুইটী ধর্ম্ম-চিত্রের প্রধান প্রধান অংশে কি কি পার্থক্য আছে, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

শাস্ত্র, যুক্তি ইত্যাদি কোন বিষয়ের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, কেবল স্বীয় অনুসন্ধানাত্মিকা বুদ্ধিবলে মানব-হৃদয়ে প্রথমে এই কয়টি প্রশ্ন উদয় হয় যে,—"আমি কে?" "জগৎ কি?" "জগতের নিয়ন্তা কে?" এই তিনটিই ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুর প্রথম প্রশ্ন; এবং এই তিনটী বিষয়ের মীমাংসা লইয়াই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রে আরও কতকগুলি প্রধান কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, পরলোক, জন্মান্তর, পাপ, পুণ্য, কর্ম্মফল, উপাসনা, মুক্তি, জাতিভেদ, আচার-ভেদ ইত্যাদি।

প্রথম প্রশ্ন—আমি কে?

'আমি কে, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ কি?'—ইহাই মনুষ্যের প্রথম প্রশ্ন। যে 'আমিত্ব' লইয়া সংসার, যে 'আমার আমার' জীবনের মূল মন্ত্র, দেহাভিমানী জীব যাহা ভুলিয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না, সেই 'আমি' কে —এ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া, মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। যেমন 'আমার গৃহ', 'আমার ধন', 'আমার স্ত্রী', 'আমার পুত্র,' প্রভৃতি সমস্তই 'আমার'; তেমনি 'আমার হস্ত,' 'আমার পদ', 'আমার চক্ষু,' 'আমার কর্ণ,' 'আমার দেহ,' 'আমার মন,' 'আমার বুদ্ধি' ইত্যাদি এ সমস্তও 'আমার'। তবে এ দেহ-রাজ্যে 'অহং'-রূপী কর্ত্তা কে? কাহার সুখের জন্য এত চেষ্টা?*, যাহাকে কখন দেখি-নাই, যাহাকে কখন দেখিব না, তাহাকে এত ভালবাসি কেন? সমস্ত জগৎ রসাতলে যাউক, তথাপি 'আমি' থাকি। সে 'আমি' কে? যে 'আমি' লইয়া জগতে আসিয়াছি, যাহাকে লইয়া চিরজীবন কাটাইব, যাহার সঙ্গে জীবলীলা সাঙ্গ হইবে, সে কি পদার্থ, তাহা অবশ্যই স্থির হওয়া উচিত। তাহা স্থির না হইলেও, অন্ততঃ আমার শান্তির জন্য একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত। এখন দেখা যাউক, এসম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিপ্রায় কি?

নিরীশ্বরবাদীরা বলেন—'আমি'-শব্দের বাচক দেহাতিরিক্ত কোন অনন্ত (আত্মা) নাই। নাস্তিক-মতে এই স্থূলশরীরই 'আমি' শব্দের বাচক; যথা,—"সবা এষ পুরুষেহন্ন-রসময় ইত্যাদি শ্রুতেঃ"(ইতি চার্ব্বাকঃ)। আবার নিরীশ্বরবাদিগণ-মধ্যে কাহারও কাহারও মতে দেহস্থ ইন্দ্রিয়-সমষ্টিই আত্মা-শব্দের বাচক। যথা,—"তেহ প্রাণাঃ প্রজাপতিং সমেত্য ব্রুরু-বিত্যাদি শ্রুতেঃ।" অপরঞ্চ—"ইন্দ্রিয়ানামা-ভাবে শরীরচলনাভাবাৎ ইন্দ্রিয়ান্যাত্মেতি ব্যবহিতঃ॥" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গণের-অভাবে দেহ-যাত্রা-নির্ব্বাহের উপযুক্ত-অভাব-হেতু ইন্দ্রিয়-সমষ্টি-কেই আত্মা বলা হইয়াছে।* এই উভয় মতে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও, ইহাদের উদ্দেশ্য ঠিক একরূপ; কেহ বা স্থূলদেহকে, কেহ বা চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি স্থূলইন্দ্রিয়সমষ্টিকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইমতে 'ক্ষিত্যপতেজঃ-মরুৎ' এই চারি ভূতের পরিমিশ্রণ ক্রিয়া দ্বারা চৈতন্যোৎপত্তি হয়। এই চৈতন্যই আত্মা বা 'অহং'-পদবাচ্য। যথা,—

"অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ,
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্য শ্চৈতন্যমুপজায়তে।"
ইতি চার্ব্বাকঃ।

যেমন দুইটী প্রাকৃতিক পদার্থের সংযোগে রাসায়নিক পরিমিশ্রণ দ্বারা একটি নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়; তদ্রূপ, পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর পরিমিশ্রণে চৈতন্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাই নাস্তিক-মতের আত্মা বা আমিত্ব।

নিরীশ্বরবাদী ভিন্ন আর সমস্ত ধর্ম্মমতেই আত্মা দেহাতিরিক্ত পৃথক পদার্থ। তৎসম্বন্ধে নানাবিধ মতভেদ থাকিলেও, মূলে আত্মার স্বরূপ প্রায় একরূপ।

হিন্দু-ধর্ম্মের প্রধান শাস্ত্র বেদান্ত-দর্শন, শ্রীমদ্ভাগবৎ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতির অভি-প্রায়—আত্মা-সম্বন্ধে প্রায় একরূপ। এই সমস্ত মতে আত্মা দুইপ্রকার; পরমাত্মা ও জীবাত্মা। পরমাত্মা নিত্যচৈতন্য, সর্ব্বব্যাপী, সাক্ষীস্বরূপ, এবং মায়োপহিত চিদাভাস জীবাত্মা-সংজ্ঞক, ভোক্তাস্বরূপ। পরমাত্মার অংশভূত জীবাত্মাও দেহাতিরিক্ত নিত্য পদার্থ, দেহাদির নাশে আত্মার নাশ হয় না। যথা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং,—

"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

অর্থাৎ, আত্মার জন্ম নাই, ক্ষয় নাই, পরি-ণাম নাই। সুতরাং শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মার নাশ হয় না। কারণ, আত্মা অবি-নাশী।

এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, মন, ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশাবয়বের নাম লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর। এই সূক্ষ্ম-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাই জীব। আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু ঘটস্থিত আকাশ

যেমন ঘটাকাশ-রূপে প্রতীয়মান হয়,' অথচ ঘট-নাশে তৎস্থিত আকাশের নাশ হয় না; তদ্রূপ, সর্ব্বব্যাপী আত্মাই মায়াবশে সপ্তদশাবয়ব-বিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীরস্থ হইয়া জীবরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, অথচ সেই সূক্ষ্ম শরীরের ধ্বংস হইলে আত্মার নাশ হয় না। ঘটস্থ আকাশ যেমন ঘটের সহিত একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করে, তদ্রূপ সূক্ষ্ম শরীরস্থ আত্মাও একদেহ হইতে অন্যদেহে গমন করিয়া থাকে; তাহাকেই লোকে মৃত্যু বলে। কিন্তু এইরূপ মৃত্যুতে দেহের নাশ হৈ সূক্ষ্ম শরীরস্থ জীবাত্মার নাশ হয় না। যথা: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ঃ—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোপরানি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

অর্থাৎ, মনুষ্য যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতনবস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ জীবাত্মাও জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ পরিগ্রহণ করে।

মহর্ষি গৌতম-কৃত 'ন্যায়দর্শন'-মতেও জীবাত্মা দেহাতিরিক্ত পৃথক পদার্থ। কিন্তু তাহা সর্ব্বব্যাপী নহে; প্রতি শরীরস্থ আত্মাই পৃথক।

সাঙ্খ্য-মতেও আত্মা দেহাতিরিক্ত পদার্থ। ঐ মতে—মহত্তত্ত্ব, বুদ্ধি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র—এই সপ্তদশাবয়ব মিলিত হইয়া, সূক্ষ্মশরীর নির্ম্মিত হয়। যথা,—

"সপ্তদশৈক লিঙ্গং।" সাংখ্য-দর্শন।

সাঙ্খ্যমতে এই সর্ব্বাবয়ব সূক্ষ্মশরীরই পুরুষ-সংজ্ঞায় অভিহিত এবং প্রত্যেক স্থূলদেহ শরীরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিষ্ঠাতা পুরুষ-(জীবাত্মা) স্বরূপে বিরাজমান। এইরূপে, পুরাণ-সংহিতা-তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রই জীবাত্মাকে দেহাতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, জ্ঞানময় আত্মা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকেন। নচেৎ, দেহের যে কোন স্থান স্পর্শ করিলে, কিরূপে তাহা আত্মার জ্ঞানগোচর হইবে? কেহ বলেন,—তাহা নহে; আত্মা দেহের কোন প্রধান স্থানে থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণের সহায়তায় মনের দ্বারা সমস্ত বিষয়ের গুণ গ্রহণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন,—যেরূপ গৃহস্থিত দীপ গৃহের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া বিরল পরমাণুরূপে সমস্ত গৃহ আলোকিত করে, তদ্রূপ আত্মাও দেহের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া সমস্ত দেহে জ্ঞান বিকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপ আরও মতভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু এস্থলে সে সমস্ত বিষয়ের বিচার নিষ্প্রয়োজন। কারণ,আত্মার স্বরূপ নির্ণয়-সম্বন্ধে কিছু মতভেদ থাকিলেও, আত্মা যে দেহাতিরিক্ত পদার্থ, তাহা সমস্ত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রই একবাক্যে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। কেবল হিন্দুগণ কেন—আস্তিকমাত্রেই জীবাত্মাকে দেহাতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং 'আমিত্বের' বিরোধ কেবল নিরীশ্বরবাদীর সহিত। অতএব, এক্ষণে দেখা যাউক—নিরীশ্বরবাদিগণ যে স্থূলদেহ বা ইন্দ্রিয়-সমষ্টিকে আত্মা বলিয়া থাকে তাহাই যুক্তিযুক্ত, না ঈশ্বরবাদিগণ যে আত্মাকে দেহাতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া থাকে তাহাই যুক্তিমূলক।

মনে কর, আত্মা যদি দেহাতিরিক্ত পদার্থ না হইত, তবে কখনই দেহ বা স্থূল ইন্দ্রিয় বিদ্যমানে, জীবের মৃত্যু হইত না; দেহের কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকিতেও, তাহাতে আত্মার ক্রিয়া প্রকাশিত হইত। মৃত্যুর পূর্ব্বে যে জীবদেহ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দৃঢ় এবং সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম ছিল, মৃত্যুর পূর্ব্বে যে দেহ আত্মীয়-পরিবারবর্গের নয়নানন্দবর্দ্ধক ছিল, মৃত্যুর পরে, কি জানি কি এক পদার্থের অভাবে,সেই দেহ জড়বৎ অবস্থায় আত্মীয়বর্গের ঘৃণা ও ভয়ের আস্পদ হইল। সেই দেহ, সেই চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমস্তই বিদ্যমান; অথচ কাহারও কোন শক্তি নাই। সমস্তই সেই কাষ্ঠাদিবৎ অসাড়। সমস্তই আছে, অথচ সে নাই; সমস্তই আছে, আর সে দীপ্তি নাই! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে দেহ ভয়াতুরের সাহসের আস্পদ ছিল, এখন সেই দেহই ভীষণ শ্মশান; যে দেহ লইয়া, নিবিড় নিশীথে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রাণপ্রিয়তমা সুখসুখ অনুভব করিত, এখন সেই প্রিয়তমা সেই দেহের প্রতি তাকাইতেও ভীতা হইতেছে। যদি দেহই আত্মা হইবে, তবে আর এরূপ হইবে কেন? যে ভৌতিক পরিমিশ্রণে চৈতন্যোৎপত্তি হইয়াছিল, এখনও সেই সংযোগ বর্ত্তমান; তবে কেন চিরচৈতন্য লোপ হইল? আরও একটি বিশেষ কথা; রসায়নতত্ত্ববিদ্গণ জীবদেহের সমস্ত পদার্থই রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিশ্লেষ করিয়া তাহার পরিমাণ স্থির করিতে পারেন। কিন্তু সেই পরিমাণ পদার্থ-সমূহ একত্র করিলে, তাহাতে চৈতন্যোৎপত্তি হয় কি? বিজ্ঞানবলে কি এপর্য্যন্ত কেহ একটি ইতর প্রাণীও নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? তবে কেন ভৌতিক পরিমিশ্রণে চৈতন্যোৎপত্তি বিশ্বাস করিব? যে মতে "ন প্রত্যক্ষপ্রমাণং," সে মতাবলম্বী কেহ যখন ভৌতিক পদার্থের সংযোগে চৈতন্যোৎপাদন করিতে সক্ষম নহে, তখন তাহার মুখের কথা কেন বিশ্বাস করিব?

বিশেষতঃ যাহাতে যাহা নাই, তাহা হইতে কখনও তাহা হইতে পারে না। পঞ্চমহাভূত জড়; অর্থাৎ অচেতন পদার্থ। সুতরাং তাহা হইতে চৈতন্যোৎপত্তি নিতান্ত অসম্ভব। বিভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত দুইটি অচেতন পদার্থের সংযোগে একটি নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু তাহাও তজ্জাতীয় অচেতন। অচেতন পদার্থ হইতে কখনই চৈতন্যোৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং "চতুর্ভ্যঃ খলুভূতেভ্যশ্চেতন্যমুপজায়তে" একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহে; সেইজন্য, তাহার স্বরূপ-নির্দ্ধারণ-সম্বন্ধে আস্তিক-সম্প্রদায়-মধ্যেও নানাপ্রকার মতভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু, মতভেদ থাকিলেও, মূলে কোন বিবাদ নাই; সকলেই আত্মাকে দেহাতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

আকাশ-কুসুম।

আকাশে কি ফুল ফোটে? ক্ষণিক-চক্রমণ্ডলশোভিত ঊর্দ্ধমিত শিরোদেশে কি কখনও প্রজ্বলিত মণির দীপ্তি দেখিয়াছ? স্বর্গবিহঙ্গমের হৈমকণ্ঠনিঃসৃত সুস্বরসম্পৃক্ত কাকলি কি কখনও শুনিয়াছ? তুমি বলিবে—এ সকলই কল্পনার মধুময় চিত্র, স্বপ্নরাজ্যের সুধারশির ন্যায় অসার, অলীক ও মনোমুগ্ধকর। বিহঙ্গের সুকোমল দেহ আবার কবে হইতে সুবর্ণদীপ্তিমণ্ডিত হইল? যে কালভুজঙ্গের দশন-পংক্তিতে ভীষণ হলাহল অন্তর্হিত থাকে, নীল-

কাঞ্চনমণি আবার কবে হইতে তাহার শিরো-ভূষণ হইল ? যে আকাশ অনলকণাবর্ষী প্রচণ্ড দিনকরের লীলাভবন, তাহা আবার কবে হইতে দিব্যকুসুমসমলঙ্কৃত মঙ্গল বন-ভবনে পরিণত হইল ?

তুমি ঐ উদ্যান-শৌভিনী সদ্য-প্রস্ফুটিতা সুহাসিনী যুথিকার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ; সুনীল নভোমণ্ডলে পুষ্পোদ্যম হয় কি না, দেখিবার তোমার অবকাশ নাই। তুমি যুথিকা-সুন্দরীর নিরুপম সৌন্দর্য্যে চিরপুলকিত; উদ্যানে প্রবেশমাত্র তোমাকে দেখিলে তাহার অধরে মৃদুহাসি দেখা দেয়, সে সুধালহরীতে তোমার হৃদয় ভাসিয়া যায়, তখন তাহার মুখস্যাকুতাঘ্রাণলোলুপ হইয়া জগৎসংসার ভুলিয়া যাও; আর আকাশের দিকে চাহিবে কি ! এই নববৌবনলাবণ্যোচ্ছা-সিতা স্ফুটন্তজ্যোৎস্নাস্বরূপিণী যুথিকার সৌরভ-সৌন্দর্য্যে তোমার হৃদয় ভরিয়াগিয়াছে। এতটুকু স্থান তোমার হৃদয়ে নাই, যে ঐ উপান্ত-নির্ব্বাসিতা ধূলাবলুণ্ঠিতা অভা-গিনী মল্লিকার প্রতি একবার ফিরিয়া দেখ; এতটুকু স্থান তোমার হৃদয়ে নাই, যে অভি-মানিনীকে তোমার সুকোমল-করস্পর্শজনিত সুখ অনুভব করিতে দেও; এতটুকু স্থান তোমার হৃদয়ে নাই, যে উহার নবনীত দেহ হইতে অযত্নসঞ্চিত ধূলিরাশি মুছিয়া দেও! এত বিহ্বল, এত প্রেমোন্মত্ত তোমার হৃদয়; আকাশে ফুল ফোটে কিনা, তুমি কেমন করিয়া জানিবে ? তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিবেন—ঠিক, আকাশে ত কখনও ফুল দেখি নাই ! হয় ত উনি একদিন গোলাপের সৌন্দর্য্যের বড় পক্ষ-পাতী ছিলেন, গোলাপের সৌরভগ্রহণ-জন্য বড় আকুল হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া যাই-তেন ; কিন্তু হায় ! রূপগর্ব্বিতা গোলাপসুন্দরী বুঝি ইহাঁকে দেখিয়া গরবে মুখ লুকাইত; আর সেই অবধি—সেই নিরাশপ্রণয়াবধি,সমগ্র কুসুম-জাতিকে ইনি বড় ঘৃণা করেন, কোনও ফুলের দিকে আর ফিরিয়া চান না, দেখিয়াও দেখেন না। অথবা, কোন নিশিগন্ধাকে হয় ত একদিন প্রাণেপ্রাণে ভালবাসিয়াছিলেন, নিশিও হয় ত হৃদয়নিহিত সৌন্দর্য্য ইহাঁর চরণ-তলে লুটাইয়াছিল, ইহাঁর অকৃত্রিম দেহের প্রতিদান দিয়াছিল ; কিন্তু বিকট কীটদংশনে নিশি অকালে প্রাণ হারাইয়াছে, ইহাঁরও হৃদয় চির-দিনের জন্য অন্ধকার হইয়াছে; আর কোন ফুলই সে অপরিমিত প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের তিমির-রাশি বিনাশ করিতে পারে না।

তোমার সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি হয় ত বিদ্যুদ্দামনিন্দিত ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিবেন—তোমরা ভূমিতে চন্দ্র দেখ, আকাশে ফুল দেখিবে এটা কি বড় আশ্চর্য্য ? বাস্তবিক তিনি আর আকাশে কুসুম দেখিবেন কি—সময় সময় তাঁহার সদর্শন-লালসাই তোমার নিকট "আকাশ-কুসুমে"র ন্যায় প্রতী-মান হয়—সময় সময় তাঁহার বন্ধুকপুষ্পনিন্দিত সুচারুঅধরপ্রান্তে হাসি দেখিলে তোমার এত বিস্ময় হয়, যে আকাশে ফুলফুটিতে দেখিলেও বোধ হয় ততটা হয় না। হয় ত তাঁহার সেই হাসি দেখিতে দেখিতে তোমার পক্ষ্মপংক্তি নিমেষে অলস হইয়া আসে, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার শক্তি আর তোমাতে থাকে না। তাই বলিতেছিলাম, তোমরা কেহ আকাশ-কুসুম দেখ নাই; কেন না, দেখি-বার অবকাশ, অভিরুচি বা শক্তি তোমাদের নাই।

এমনটী কিন্তু আমার ছিল না। বলিতে পারি না কেন, পৃথিবীর ফুলে আমার মন উঠিত না। বলিতে পারি না কেন, কোন্ অপার্থিব শোভাময় কুসুমরাশির দিকে মন আমার স্বতঃই প্রধাবিত-হইত ! যদি পৃথিবীতে এমন কোন্ ফুল দেখিতাম—যাহা চিরবিকশিত, চিরপরিমলপ্রফুল্ল, কীট যাহাকে দংশন করে না, অকালে যাহা বৃন্তচ্যুত হয় না, তাহা হইলে বোধ হয় আমার হৃদয় ভরিত। কিন্তু এহেন কুসুম পৃথিবীতে কোথায় ?

একদিন রাত্রি শয়ন করিয়া নির্নিমেষ নয়নে চাঁদ দেখিতেছি। বাসন্তী পূর্ণচন্দ্রের বিদ্রুকৌমুদীরাশিতে ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত হই-য়াছে, আকাশ নীলিমপ্রভাময়, জলদবিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রকিরণ ভাস্বর, বড় নয়নস্নিগ্ধকর। প্রকৃতি-রাণী যেন ফুলসাজে সাজিয়া মৃদুমধুর হাসিতে-ছেন। ধীরে, অতি ধীরে, মৃদুল বায়ু বহিতেছে। মধ্যে মধ্যে পাপিয়া, রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, সুস্বরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া দিতেছে। চকোর-চকোরী আহ্লাদে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতির এই অনি-র্ব্বচনীয়া শোভা সন্দর্শনে আমার চিত্ত বিমো-হিত-হইল। আমি সতৃষ্ণনয়নে চন্দ্রকে নিরী-ক্ষণ করিতেছি; এমন সময়, অজ্ঞনিদ্রাকর্ষণে বড় মনোমুগ্ধকর স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, চন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে আমি চন্দ্রলোকে গিয়াছি। তাহার অনতিদূরে যেন এক বিচিত্র পুষ্পবৃক্ষে একটী পরমমনোজ্ঞ ফুলফুটিয়া রহি-য়াছে। ইহার বর্ণ জ্যোৎস্নার ন্যায়, দ্যুতি বড় শীতল, বড় কোমল, বড় হৃদয়স্পর্শী। ইহার পরিমলে যেন সমগ্র চন্দ্রলোক সুবাসিত হই-য়াছে। সে পরিমলের তুলনা পৃথিবীতে নাই, সে পরিমল স্বর্গীয়। আমি যেন বিকারগ্রস্ত হৃদয়ে সেই ফুল তুলিতে গেলাম; বাসনা—পৃথি-বীতে এ রত্ন লইয়া আসিব। ফুল যেন আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সকাতরে গাহিল,—

"অভাগীরে দুখ দিতে, কেন এত বাসনা ;
পেয়েছি বিষম জ্বালা, ফিরে আর যাব না।
ওগো ছুঁয়োনা গো, আমায় ছুঁয়োনা।"

আমি তাহার বাধা শুনিলাম না। আকুল হইয়া হাত বাড়াইলাম ; ধরি—ধরি, এমন সময় সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের কথাই কেবল মনে হইতে লাগিল। এমন সুন্দর ফুল ত কখনও দেখি নাই! যে চন্দ্রের রূপে আকৃষ্ট হইয়া আকাশে ছুটিয়া গেলাম,এ ফুলের শোভা যে সে চন্দ্র অপেক্ষাও মনোহর ! এমন ভুবন-ভরা রূপ, এমন প্রাণভরা হাসি—এমন ফুল ত কখনও দেখি নাই ! এমন দিগন্তব্যাপ্ত সৌরভ—এমন চন্দ্র-কুরনিশ্চিত লাবণ্য—এমন ফুল ত কখনও দেখি নাই! এমন সুষমা, এমন পরিমল, নন্দন-কাননে আছে কিনা সন্দেহ। আচ্ছা, আমি আদর করিয়া আনিতে চাহিলাম ; আসিতে চাহিবে না কেন ? ঐ যে কি গানটা গাহিতে ছিল, ভাল নয়নে আসিতেছে না।—"অভাগীরে দুখ দিতে গাহিতেছিল না ? এমন-সুকোমল কুসুমকে কি কোন নির্দ্দয় চরণে দলিত করিয়া-ছিল ? এ-ফুল কি পৃথিবীতে আসিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছিল? তাই হবে ! তা না হ'লে আর ফিরে আসিতে চাহিতেছিল না কেন? পৃথিবীর কেহ বোধ হয় বড় অযত্ন করিয়াছে, অনাদরে বোধ হয় মনে বড় ব্যথা পাইয়াছে। তাই বুঝি গাহিতেছিল,—"পেয়েছি, বিষম জ্বালা ফিরে আর যাব না!" আচ্ছা, আবার কি দৈবিতে পাইব ? স্বপ্নেও কি আর একবার দেখা হইবে না ? যদি আবার স্বপ্নে দেখিতে পাই, তাহাহইলে বলিব,—"চল, দিনেকের জন্য চল, তোমার অতুল রূপরাশি আমার বন্ধু-দিগকে দেখাইবে, চল।" আমার কাতর-প্রার্থনা কি শুনিবে না ? না হয় আবার বলিব—

"প্রাণতুল্য ভালবাসিব, আদর করিব, অযতনে আর ব্যথা পাইতে হইবে না, চল।" কিন্তু যদি আমার কাতরতায় তাহার হৃদয় দ্রব না হয়,—যদি আবার বিষাদ-হাসি হাসিয়া বীণাঝঙ্কারবৎ সকরুণস্বরে গায়—"ফিরে আর যাব না!"

এই স্বপ্নদর্শনাবধি স্বর্গীয়কুসুমসন্দর্শনলিপ্সু হইয়া অজস্র রোদন করিতাম। এক দিন রোদন করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়াছি; নিদ্রায় আবার স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম—আবার যেন ফুলের কাছে গিয়াছি, আবার যেন সকাতরে তাহাকে আমার সঙ্গে আসিতে বলিতেছি। ফুল যেন আবার আসিতে সম্মত হইল; মধুর হাসি হাসিয়া বলিল,—"তোমার ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াছি; তোমার সঙ্গে পৃথিবীতে যাইব, চল।"

আমি যেমন উল্লাসে অধীর হইয়া ফুলটী আনিতে যাইব, অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলাম, ফুলটী আমার হৃদয়ে পতিত রহিয়াছে। ইহার স্পর্শ বড় শীতল; আমার হৃদয়ে যেন সুধা সিঞ্চিত হইতে লাগিল। আমি সেই হইতে কোমলপত্রসমাস্তীর্ণ পুষ্পশয্যায় ফুলটী রাখিয়া দিতাম; ফুলটী সভামণ্ডলমধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইত। শোকদুঃখে ন হৃদয়গ্রন্থি বড় শিথিল হইত, তখন ফুলটীকে দেখিলেই সমস্ত ভুলিয়া যাইতাম। ফুলের সহবাসে কয়েকদিন বড় সুখে ছিলাম। কিন্তু আমি হতভাগ্য, আমার অদৃষ্টে এ স্বর্গসুখ কয়দিন? একদিন অকস্মাৎ আমার স্নেহকুসুম বড় বিবর্ণ হইল। যাহার জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত হইত, সেই পূর্ণচন্দ্রদ্যুতি ফুলের দেহে কালিমা-মাখান হইল। বায়ু-সঞ্চালন করিলাম, শীতল জলবিন্দু ইহার দেহে ছিটাইলাম; বিরহবিধুরা রমণীর কপোলে অশ্রুকণার ন্যায় শোভা হইল। কিন্তু প্রতিকার আর হইল না। আমার হৃদয় শূন্য করিয়া ফুলটী নিমেষে অদৃশ্য হইল।

বিধাতা আমার ক্লেশের জন্যই বুঝি আকাশে বিচিত্র পুষ্প সৃষ্টি করিয়াছিলেন! এই মনোহর পুষ্প কিছুদিন আমার হৃদয় আলোকিত করিয়াছিল। সে আজ কতদিন আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার স্বর্গীয় সৌরভে আমার প্রাণ আজিও আমোদিত রহিয়াছে। আমার, এই হৃদয়রোপিত জীবন-কুসুম কে কাড়িয়া লইল? হায়! দেখিতে দেখিতে আমার স্বপনের ছবি কোথায় মিলাইয়া গেল?

নৈদাঘ নিশীথ-স্বপ্ন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক। বন—ত্রিতারা নিদ্রিতা।

(কাণাই, রামা, ভূতো, ছিরে, তিনু, পাঁচুর প্রবেশ)

ভূ।—সব এয়েছে ত?

কা।—বা! বা! কি মজার মুজরার স্থান হয়েছে। এই খোলা যায়গাটা হবে আমাদের "এছ্‌টেজ," আর এই জঙ্গলটী হবে "গ্রিনরুম"। রাজার কাছে যে রকম করে দেখাতে হবে, আজ এখানেও সেইরূপ পুরা মুজরা করতে হবে।

ভূ।—কাণাই?

কা।—কিরে গদা, কি?

ভূ।—দেখ তোর নাটকে এমন সব কারখানা আছে, যা লোকে ভাল বল্‌বে না। প্রথমতঃ, ইন্দ্রজিত তরবার খুলে আপনাকে আপনি খুন করবে—এ রাণী কখনও দেখতে পারবে না। তার উপায় কি?

তি।—তাই ত!

পা।—ঐ খুনটা বাদ দিতে হবে।

ভূ।—বাদ দেবে কেন, আমি তার পথ ঠাউরে রেখেছি। আমি আসরে নেবে প্রথমেই বলে রাখবো যে, আমরা খুনোখুনি করবো না, আর ইন্দ্রজিত বাস্তবিক মরবে না। বরং একেবারে বলে ফেলবো—ইন্দ্রজিত, ইন্দ্রজিত নহে, ভূতো তাঁতি। তাহা হলে আর কোন সন্দেহ থাকবে না

কা।—তাই ই করতে হবে—আর তার জন্যে একটা ছড়া বাঁধতে হবে।

তি।—রাণী কি সিংহী দেখে ভয় পাবে না?

পা।—ভয়? আমার বোধ হয়, বাঘুরের মত দেজ্‌ভুলে পালাবে।

ভূ।—তাই ত! মেয়ে-মানুষের কাছে সিংহী? বাপ রে! তা হবে না। ছুগী-ঠাকুরণের পায়ের নিচে মিনসে চোরাকে কেমন কামড়ে ধরেছে, দেখেছিস্ ত। সেই সিংহী যদি আবার নড়ে-চড়ে, রাণী ত রাণী, রাণীর বাপ রাজা শুদ্ধ হুমড়ে পড়বে।

কা।—তার জন্যে আর একটা ছড়া বেঁধে বল্‌তে হবে—সিংহী সিংহী নহে।

ভূ।—সিংহী-বেটার নাম বলে দিতে হবে; আর অর্দ্ধেক মুখ সিংহীর গলার উপর দিয়ে দেখা যাওয়া চাই। আর সে এরূপ বল্‌বে,—"রাণী! মা রাণী! তুমি ডরিও না, তুমি ভয় পেও না। তুমি যদি ভেবে থাক আমি সিংহী, আমি তা কিছু নহি, তোমার ভুল, আমিও অন্য এক মানুষের মত এক মানুষ।" তারপর, সে তার নাম বলবে, এবং বলে ফেলবে, যে, আমি রামা।

কা।—আচ্ছা, তাও যেন হলো; কিন্তু আর দুটো খটকা আছে। "এছ্‌টেজে" চাঁদনী আনবি কেমন করে?, ইন্দ্রজিত আর প্রমীলা চাঁদনিতে মিলেছিল যে!

তি।—কেন সেখানে দোকান সাজিয়ে দেব, আর বলবো—এটা চাঁদনি।

কা।—আরে গাধা, চাঁদনি রাজার নহে, চাঁদের চাঁদনি।

তি।—বটে, আমাদের থিয়েটারের রাতে চাঁদনি উঠে না?

ভূ।—পাঁজি দেখ, পুঁজি দেখ, দেখ—সে রাত চাঁদনি হবে কি না।

কা।—ঠিক সে রাত চাঁদনি হবে।

ভূ।—তার আর মস্কিল কি? আমরা যে ঘরে আসর করবো, সে ঘরের একটা জানলা খুলে রাখবো।

কা।—তা না হয়, এক জনা গায়ে সব জঙ্গল বেঁধে আর একটা লণ্ঠন হাতে করে, চাঁদ সেজে আসবে। কিন্তু আর একটা চাই—একটা দেয়াল চাই। কারণ, পুরাণে আছে যে, ইন্দ্রজিত প্রমীলা দেয়ালের ছিদ্র দিয়ে কথা কয়েছিল।

তি।—তা দেয়াল সাজলেই হবে, কি বলিস্ ভূতো?

ভূ।—হাঁ, একজন গায়ে চুন-শুরকি মেখে দেয়াল হবে। আর এমনি আঙ্গুল খুলে থাকবে, তার ভিতর দিয়া ইন্দ্রজিত প্রমীলা কথা কবে।

কা।—এখন সব ঠিক হলো। এখন দেখি, সব বাপের বেটারা মুজরো কর। ইন্দ্র-

জিত, তুই আরম্ভ কর ; যখন তোর পাঠ শেষ হবে, তুই ঐ জঙ্গলের মধ্যে যাবি এবং সেরূপ সকলেই পাঠ শেষ হলে করবে।

প।—(পঞ্চু পশ্চাতে প্রবেশ) পরী রাণীর শয়ন-কক্ষের এত নিকটে এরা কে ?. বা! এরা যে আচ্ছা অভিনয় আরম্ভ করেছে! আচ্ছা, আমি দর্শক হচ্ছি ; যদি আবশ্যক হয়, "এন্টার" ও হবো।

কা।—ইন্দ্রজিত, কৈ বলতে আরম্ভ কর। প্রমীলা, তুমি দাঁড়াও।

ভু।—প্রেমের প্রমীলা তুমি কুসুমের কলা—

কা।—বাপের কলা বা, কুসুমের কলা কিরে ? কুসুম-কোমলা।

ভু।—হাঁ, হাঁ, কুসুম-কোমলা, কুসুম-কোমলা, কুসুম-কোমলা, (মুখভঙ্গি করিয়া আওড়ান)।

কুসুম সৌরভময় নিশ্বাস তোমার।

ও কিসের শব্দ ? তুমি একটু দাঁড়াও, এখনি আসিব। (প্রস্থান।)

ছি।—আমি কি এখন বলবো ?

কা।—বলবি বই কি ? ঢেঁকিরাম! বুঝতে পারলি না, ও শব্দ শুনে কিসের শব্দ-তা দেখতে গেলো ; এখনি আবার আসবে।

ছি।—(আওড়ান)।

বীরবর ইন্দ্রজিত ! দূর্ব্বাদলশ্যাম,
প্রেমের পোলাও তুমি রস-ঘৃতে মাখা,
ক্লান্তিহীন প্রেম তব, হায় মরি যেন
ভাড়াটে গাড়ীর ন্যায় অশ্বিনীকুমার।

মিলিব দুজনে শালা-মন্দির-সমীপে।

কা।—দূর বেটা বক্কেশ্বর ? "শালার মন্দির" তোর কোন শালা শিখিয়েছিল ? বেটা! "শূল-মন্দিরকে" "শালার মন্দির" করে ফেলেছে! ঐ দিকে আবার ইন্দ্রজিতের পাঠ শুদ্ধ বলে ফেল্লে। বেটা জাত কর্ম্মকার, খেলে লোহা পেটাচ্ছে। তুই "অশ্বিনীকুমার" পর্য্যন্ত বলে চুপ করবি।

ছি।—হাঁ! ভাড়াটে গাড়ীর আশ্বিনীকুমার।

(পঞ্চু এবং গাধার মুখোস মাথায় ভূতোর প্রবেশ।)

ভু।—প্রমীলে! তোমার আমি, নিতান্ত তোমার।

কা।—বাপ-রে! রাক্ষস! ওরে ভূতে পেয়েছেরে! পালারে পালা।

(চীৎকার করিতে করিতে পঞ্চু ও ভূতো ভিন্ন সকলের প্রস্থান।)

প।—বা! বেশ মানিয়াছে। দিব্যি ইন্দ্র-জিত হয়েছে! একে আজ সারা রাত্রি বনে বনে ঘুরিয়ে মজা করতে হবে।

জঙ্গলে জঙ্গলে পঙ্গলে বনে,
ঘুরিবে বেড়াবে আমার সনে ;
কভু ঘোড়া আমি, কুকুর কখন,
কভু সিংহ আমি, করিব গর্জ্জন,
ভূতের আগুন দেখাব কখন।

(বগল বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।)

ভু।—বাপের কলা খা ; এ শালারা পাজালো কেন ? আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে বুঝি এ ফিকির করেছে।

তি।—ও ভূতো, তুই এমন হলি কেমন করে ? এ কি দেখছি ?

ভু।—তোর মাথা হয়েছি। তোর গাধার মুণ্ড, তুই তেমনি দেখছিস।

(ত্রিস্রুর ভয়ে প্রস্থান ও কাণাইয়ের প্রবেশ।)

কা।—ও ভূতো, ও ভূতো, একি হলো, তোর মাথা বদলে গিয়েছে।

(ভয়ে প্রস্থান।)

ভু।—আমি এ শালাদের বাঁদরামি বুঝতে পেরেছি। তারা বুঝেছে, আমি গাধা, আমি

এতে ভয় পাব। আমি এখান থেকে এক-পা সরবো না ; দেখি, তারা কি করে। আমি এখানে বাবুর মত বেড়াব, আর গান করবো, ; তারা শুনবে, আর বুঝবে যে, ভূতো ভূতের ভয় করে না।

(তারা।—(জাগিয়া) কোন দেবী আজি হায় ফুলশয্যা হতে জাগালে আমায় ?

(ভূতোর গান ও নৃত্য।)

ত্রি।—মানব, বিনয় করি গাও আর বার,
শ্রবণ-মোহিত ধ্বনি সুমধুর স্বর,
নয়ন, নিরখি ওই মূরতি সুন্দর।
তবরূপে, তবগুণে ভুলিনু এমন,
দেখিয়া হৃদয়ে হলে প্রেমেতে মগন।

ভু।—সুন্দরি! তোমার বোধ হয় বুদ্ধির ভুল হয়েছে। আর, বুদ্ধি আর পিরীত এক গায়গায় থাকে না। আমি যে সময়ে সময়ে সুন্দর দেখাই, তা বড় মিথ্যা নহে।

ত্রি।—তুমি যেমন, বুদ্ধিমান্ তেমনি সুন্দর।

ভু।—না, তার কোনটাই নাই। বুদ্ধি থাকলে, আমি এ বন থেকে বেরুতে পারতেম। ও শালাদের ফিকিরে পড়ে, রাতটা এমনি গেল ; কাল তাঁতিনী ঝাঁটার উপর ঝাঁটা দেবে—পিটে তাঁত বসাবে।

ত্রি।—ছাড়িবে এ বন ? না না, এমন বাসনা করিওনা প্রাণনাথ! ছাড়িতে দিব না।
নহি হীনা পরী আমি ; এখনও আমার
যৌবন রহিছে পূর্ণ বসন্ত-সম্ভার।
তুমি মম প্রাণনাথ, চল মম সনে,
সেবিবে তোমায় পরী-সহচরী-গণে।
প্রবেশি জলধি-তলে হরিয়া রতন,
সাজাবে মুকুটে তব চারু চন্দ্রানন ;
কুসুম-শয্যায় তুমি করিলে শয়ন,
করিবে অপ্সরা-গীত সুধা-বরিষণ।

উঁচাব তোমার জন্য মানবত্ব আমি,
হইবে পরীর মত সমীরণ-গামী।
এ সংবেল, বক-ফুল, বকুল, বেগুন।
(বেলফুল, বকফুল, বকুলফুল, বেগুনফুল, প্রভৃতি সহচরীর প্রবেশ।)

বেল।—সব এয়েছিস ?

বক।—এয়েছি গো।

বকুল।—এয়েছি।

বেগুন।—এয়েছি।

সকলে।—রাণীর কি আজ্ঞা ?

ত্রি।—বিনয়ে তোমরা এই সুজনে তুষিবে।
বেড়াবে অরণ্যে, সঙ্গে নাচিবে গাহিবে।
দোলাইবে গলে, তার পারিজাত-হার,
আনিয়া অমৃত-ফল যোগাবে আহার।
পান-হেতু পুষ্পমধু করিবে হরণ ;
সুমুক্ষিকার মোম আলোক-কারণ,
হরিবে ; জোনাকি, ক্ষুদ্র অনল-নয়নে,
জ্বালাইয়া সেই বাতি, প্রাণের সখায়
উঠাইবে-শোয়াইবে কুসুম-শয্যায়।
প্রজাপতি চারুপক্ষে, চন্দ্রের কিরণে,
মুদিত নয়নে হাত করিবে ব্যজন।
সকলে তাহাকে কর প্রীতি-সম্ভাষণ।

বেল।—প্রণাম মহাশয়!

বক।—প্রণাম।

বকুল।—প্রণাম।

বেগুন।—প্রণাম।

ভু।—আমি হুজুরীদিগকে আশীর্ব্বাদ করি। আমি হুজুরীদিগের নাম জানতে চাই।

বক।—বকফুল।

ভু।—হুজুরী বকফুল, আমি, আপনাকে দেখিয়া বড় খুসী হইলাম। আমি যেন প্রভাব সময়ে আপনাকে হাজির পাই। মহাশয়ার নাম ?

বেল।—বেল ফুল।

ভূ।—দিব্যি নাম। যেমন চেহারাটী, তেমনি নামটী। সুন্দরী, আমি যেন বিদ্যানার নিকট আপনাকে পাই। মহাশয়ার নাম?

বেওন।—বেওনফুল।

ভূ।—বড় খুসী হলেম। আমি কিছু বেওন বেশী ভৎসক্ষরি, তা বলিয়া আপনি বিরক্ত হইবেন না। আমি ছলপ করিয়া বলিতে পারি, আমি কখন বেওন-ফুল খাই নাই। তবে ভূতনাথ বেওন-ভাজিয়ে বড় ভক্ত বটেন। যদি পরীরাজ্যে তাহা পাওয়া যায়, তবে আমি আর এ মুলুক ছেড়ে যাব না।

চল সখি! নিয়ে নাথে নিকুঞ্জে আমার;
ওই দেখ নিশানাথ, সজল নয়ন
জাগরণে; নিশি-শেষে কাঁদেন যখন,
কাঁদে পুষ্পচয়; ভাসে নীহারে বদন;
অস্পষ্ট সঙ্গীতে যেন বিষাদিত মন।

আকাশে তড়িৎ।

বিদ্যুৎ ও তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গের অভিন্নতা।

অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, বিদ্যুৎ ও তড়িৎপ্রভব-যন্ত্রের বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ-মধ্যে এক অসাধারণ সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুরাকালে নিউটন, হক্সলি, টিণ্ডেল, ওয়াল,গ্রে প্রভৃতি পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ যন্ত্রীয় স্ফুলিঙ্গ ও তৎসহ শ্রুত শব্দের সহিত যথাক্রমে বৈদ্যুতিক আলোক ও বজ্রপতন শব্দের অভিন্নতা অনুমান করেন। বস্তুতঃ এইরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এই বিষয়ে বিজ্ঞানবিৎ ফ্র্যাঙ্কলিন সমধিক প্রশংসার্হ। বহুসংখ্যক তড়িৎ-কোষের সাহায্যে, তিনিই প্রথমে বিদ্যুৎ ও যন্ত্রীয় স্ফুলিঙ্গের একত্ব প্রতিপাদন করেন। ১৭৪৯খৃঃ অব্দে প্রকাশিত তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তে, মেঘ হইতে সূচ্যগ্র ধাতুদণ্ড দ্বারা বিদ্যুৎ আনয়নের উপায়ের উল্লেখ আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, তড়িৎ ত্রিশূল-দ্বারা আকৃষ্ট হয়। বিদ্যুৎ বস্তুতঃ এইরূপে আকৃষ্ট হয় কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অল্প। কিন্তু বিদ্যুৎ ও যন্ত্রীয় তড়িতের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে এতদূর সৌসাদৃশ্য দেখা যায় যে, তাহাতে আমাদের অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। ফরাসী দেশে ফ্র্যাঙ্কলিনের আবিষ্কৃত উপায়-অনুসারে, তাঁহার পূর্ব্বেই, ড্যালিবার্ড ইহার পরীক্ষা করেন।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে পারিসহরের নিকটবর্ত্তী মারলি-লা-ভিলিতে তিনি ৪০ফিট উচ্চ একটী লোহদণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া উপরের মেঘ হইতে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ আকর্ষণ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ফ্র্যাঙ্কলিন ইহার সত্যাসত্য-নিরূপণের জন্য ফিলাডেলফিয়া সহরের কোন উচ্চস্থানে একটী তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড উত্তোলন করিবার মানস করেন। কিন্তু দৈবক্রমে এক আশ্চর্য্য উপায় তাঁহার বুদ্ধিগোচর হইল। বাল্যকালে অনেকেই ঘুড়ি উড়াইয়া থাকেন। তিনি এই সামান্য ঘুড়ি উড়াইয়া আকাশের উচ্চতম প্রদেশ হইতে বিদ্যুৎ-আকর্ষণে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ড্যালিবার্ড কর্ত্তৃক পরীক্ষার

অব্যবহিত পরেই, ১৭৫২খৃঃ অব্দের জুন মাসে, ফ্র্যাঙ্কলিন ফিলাডেলফিয়ার সমীপবর্ত্তী একটী ময়দানে একখানি ঘুড়ি উড়াইয়া দেন। তৎকালে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। ঘুড়িতে তিনি সাধারণ সূতা ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহার শেষে একটী চাবি সংলগ্ন ছিল। নিরাপদ হইবার জন্য তাঁহার হস্ত ও চাবিটীর মধ্যে একটী রেশমী ফিতা রাখিয়াছিলেন। রেশম তড়িৎ-কুপরিচালক, এইজন্য তাঁহার কোনরূপ ভয়ের কারণ ছিল না। ঐ ফিতা একটী বৃক্ষে আবদ্ধ করা হয়। চাবির নিকট তাঁহার হস্ত প্রদানে প্রথমে কোনরূপ স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন না; ক্রমে তিনি হতাশ হইতে আসিলেন। সহসা প্রবল বারি-পাত আরম্ভ হইল। সূত্র বৃষ্টিজলে শীঘ্রই উত্তম-পরিচালক হওয়াতে, মেঘ হইতে পৃথিবীতে তড়িৎ-পরিচালনা করিতে লাগিল। রেশমী ফিতা, বৃক্ষের ছায়ায় ছিল বলিয়া, জলে সিক্ত হইতে পারে নাই। অচিরাৎ তিনি বহুসংখ্যক স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন যে, এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনাবলী সন্দর্শনে তিনি আনন্দাশ্রু নিবর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই সকল স্ফুলিঙ্গ দ্বারা লিডেন বোতল প্রভৃতিকে তড়িদ্ধান ও তড়িৎ-শক্তির নানারূপ প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইতে পারে।

যদিও ফ্রাঙ্কলিন ধাতু-নির্ম্মিত বিদ্যুৎসমূহের প্রধাণ আবিষ্কার করেন, কিন্তু তিনি ইহার যথার্থ কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ঘুড়ি আকাশের বিদ্যুৎ আকর্ষণ করিয়া লইল। বস্তুতঃ তাহা যথার্থ ঘটনা নহে। ইহা তড়িৎ-সঞ্চারণ-ক্রিয়ার একটী সহজ উদাহরণ। সূত্র ও ঘুড়ির উপর তড়িদ্ধান মেঘের তড়িৎ-সঞ্চালন কার্য্য মাত্র। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে এইরূপ ঘুড়ি দ্বারা পরীক্ষা, রোমাস কর্ত্তৃক পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়।

ঘুড়ি-খানিতে একটী ধাতব বিন্দু সংলগ্ন করিয়া, তিনি তাড়িদ্ধান মেঘমালার মধ্যে উড়াইয়া দেন। সূত্রমধ্যে একগাছি সরু তার ছিল; ইহার একদিকে উক্ত বিন্দুর সহিত ও অপরদিক সূত্রের শেষাংশ হইতে কিছু দূরে একটী তড়িদ্বীক্ষণ বা তড়িদ্যান যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন ছিল। এই যন্ত্রের দ্বারা তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ ও ধর্ম্ম জানিতে পারা যায়। রোমাস এইরূপে পরিচালক-তারের অগ্রভাগ হইতে কেবল যে বহুসংখ্যক স্ফুলিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এরূপ নহে; ইহাদের সহিত ১ ইঞ্চি প্রস্থ ও ৯। ১০ ফিট দীর্ঘ অগ্নিফলক নির্গত হইয়াছিল। এফ্‌ষ্টার অল্পকালে উক্ত বর্ণনীয়-অনুরূপ ন্যূন-সংখ্যায় ৩০টী অগ্নিশিখা ব্যতীত ৬৭ ফিট ও তদপেক্ষা ন্যূন দৈর্ঘ্যের বহুসংখ্যক স্ফুলিঙ্গ উৎপাদিত হইয়াছিল। ক্যাভালো আকাশের তাড়িৎ-সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার-পূর্ব্বক বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি-সাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে সেণ্টপিটার্স বর্ণনিবাসী অধ্যাপক রিচম্যান, ড্যালিবার্ডের যন্ত্রের অনুরূপ একটী যন্ত্রের দ্বারা আকাশের তড়িৎ-সম্বন্ধীয় পরীক্ষা করিতে করিতে, সহসা একটী স্ফুলিঙ্গ দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ঝড়ের সহিত বজ্রপতন হইতে থাকিলে, সেই সময় কাহারও এইরূপ ঘুড়ির দ্বারা পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করা অনুচিত। বিশেষ সতর্ক না হইলে, প্রাণসংশয় পর্য্যন্ত, ঘটিতে পারে। এইরূপ ঘটনাতেই রিচম্যান মানব-লীলা সম্বরণ করেন। ৪ ফিট উচ্চ ও ২ ফিট প্রশস্ত একখানি ঘুড়ি হইলেই পরীক্ষা করিতে

পারা যায়। পরীক্ষার ফলাফল সমস্তই সূত্রের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়ে সম্যক বিজ্ঞ ক্যাভালো বলেন যে, দুই গাছা সরু সুতলি সুতার সহিত সূক্ষ্ম একগাছি তাম্র-তারের একত্রীকরণে উত্তম সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ-রূপে জানিতে হইলে, ক্যাভালো-কৃত 'ইলেক্ট্রিসিটি' পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ সকলের পাঠ করা উচিত। ফ্রাঙ্কলিন্ নিম্নলিখিত কার্য্যাবলীর বিবরণের দ্বারা তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ ও বিদ্যুতের ঐক্য সপ্রমাণ করেন। যথা,—আলোক-প্রদান, আলোকের বর্ণ, বক্র পথ, দ্রুতগতি, ধাতুর দ্বারা পরিচালনা, শব্দ উৎপাদন, জল ও বরফের মধ্যে পরিচালন, অপরিচালক দ্রব্যের বিদারণ, জীবগণের প্রাণনাশ, ধাতু-দ্রবণ, দাহ দ্রব্যসমূহে অগ্নি-সংযোগ, গন্ধকের মত গন্ধ (ইহার কারণ এক্ষণে জানা গিয়াছে, বায়ুর অম্লজান তড়িৎ-শক্তি দ্বারা ওজোন বায়ুতে পরিণত হয়। ওজোনের গন্ধই তড়িৎ-প্রভন-যন্ত্রের কার্য্যকালে ও বজ্রপতনের সময় অনুভব করিতে পারা যায়)। পূর্ব্বে তিনি স্কারও দেখিয়াছিলেন যে, লৌহশলাকা-সকল বিদ্যুৎ ও তড়িৎ-শক্তির দ্বারা—আকর্ষণী শক্তি প্রাপ্ত হয়। ঝড়ের সময় বজ্রপতনকালে জাহাজের মাস্তুলের উপরিভাগে একপ্রকার নীলাভ আলোক-শিখা দেখা যায়। ইউরোপীয় নাবিকগণ ইহাকে "সেণ্ট এল্‌মোর অগ্নি" বলিয়া থাকেন। ইহার সহিত তিনি বিন্দুসমূহ হইতে নির্গত—"অত্যুজ্জ্বল" স্ফুলিঙ্গের ("Glow" discharge) তুলনা করিয়াছেন।

আকাশে সাধারণ তড়িৎ।

১৭৫২খৃঃ অব্দে লেমনিয়ার ঝড় ও বজ্র-পতনের অবর্ত্তমানে বায়ুর নৈসর্গিক অবস্থাতে আকাশে তড়িতের অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত করেন। ক্যাভালো, বেকারিয়া, সেকা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে আমাদের অনেক নূতন জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। অধুনা কুইটলেট ও স্যার ডব্লিউ টমসন, অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া, নানাবিধ নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভূ-বায়ু, আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত থাকিলে, সংযোগ তড়িতান্বিত হয়। স্থানীয় উষ্ণতা ও দিবসের সময়ের আধিক্যানুসারে তড়িৎ ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বাপেক্ষা নির্জ্জন স্থানে তড়িৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। গৃহাভ্যন্তরে, রাজপথে, বৃক্ষে সুশীতল তলদেশে ও অন্যান্য আবৃত স্থানে তড়িতের অস্তিত্বের কোনরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। সহরের প্রকাশ্য ময়দানে, সেতুর নদীতীরবর্ত্তী ঘাটের উপর, সংযোগে তড়িৎ শীঘ্র অনুভূত হয়। সমতল-ক্ষেত্রের ৫ ফিট উচ্চে সাধারণতঃ ইহা বর্ত্তমান দেখা যায়। উচ্চতার আধিক্যানুসারে তড়িৎ-শক্তির বৃদ্ধি হয়।

আকাশ মেঘাবৃত থাকিলে, তড়িৎ কখন সংযোগাত্মক কখন বা বিয়োগাত্মক হইয়া থাকে। তড়িদ্বান মেঘের গতাগতে, বিদ্যুতের তড়িৎ অনেকবার ইহার চিহ্ন পরিবর্ত্তন করে। ঝড়, বৃষ্টি বা বরফ-পতন-কালে বায়ুমণ্ডল একদিন একপ্রকার—পরদিন অন্যপ্রকার তড়িতান্বিত হইতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ দ্বিপ্রকার দিবস-সকলের সংখ্যা প্রায় সমান।

বায়ু সাধারণতঃ সংযোগে তড়িতান্বিত। এই তড়িৎ, তড়িৎ-সঞ্চার-ক্রিয়া দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে সাম্যাবস্থায় তাড়িৎকে পৃথক করিয়া বিরত তাড়িৎকে আকর্ষণ ও সমতড়িৎকে বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে। সেই নিমিত্ত পৃথিবী পৃষ্ঠদেশে বিয়োগ-তড়িৎ ও অধিক নিম্নে

সংযোগ-তড়িৎ দেখা যায়। বিজ্ঞানবিৎ দেলারিয়ার এই বিষয় পরীক্ষা করিয়া ভূপৃষ্ঠকে সর্ব্বদাই বিয়োগ-তড়িতান্বিত বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ভূগোলক ও বায়ুরাশি যেই নিমিত্ত একটী লিডেন বোতলের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। এই বোতলের বহির্ভাগ তড়িজ্জনক যন্ত্রের প্রধান পরিচালক-দণ্ডের সহিত সংযুক্ত থাকায়, সংযোগ-তড়িতান্বিত হয় অন্তর্দেশ পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন থাকাতে, তড়িৎ-সঞ্চারণ-ক্রিয়া দ্বারা বিয়োগ-তড়িতান্বিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের বহির্ভাগ, বায়ুরাশির সহিত, এবং অন্তর্দেশ, ভূপৃষ্ঠের সহিত তুলনীয়।

বায়ুর অবস্থা ভাল থাকিলে, বিয়োগ-তড়িৎ কদাচিৎ দেখা যায়। ১৫ বৎসরের মধ্যে বেকারিয়া কেবল ৬বার মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বায়ু বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। তড়িতাবস্থার নির্দ্দিষ্টরূপে পরিবর্ত্তন হইলে, বায়ুর অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা যায় থাকে। সেকা বলেন যে, বৃষ্টি নিবারণের পর, প্রবল অধিক তড়িতের নিদর্শন প্রাপ্ত হইলে, বায়ুর অবস্থা কয়েক দিবসের নিমিত্ত নিশ্চয়ই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ডেলম্যান, অনেক পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাতে শিশির ও কুয়াসার আধিক্যের সহিত তড়িতের আধিক্য হয়।

বাৎসরিক ও দৈনিক পরিবর্ত্তন।

কিউ ও নভস্কোসিয়ার অন্তঃস্থাতী উইণ্ডসোর পরীক্ষা-মন্দিরে এই বিষয়েই রীতিমত পরীক্ষা হইয়াছিল। ক্রেসেলস্ দেশে কুইটলেট দৈনিক পরিবর্ত্তনের তালিকায় দুইবার সর্ব্বোচ্চ বৃদ্ধি ও দুইবার সর্ব্বনিম্ন হ্রাসের উল্লেখ করিয়াছেন। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে, গ্রীষ্মকালে প্রাতে ৮টা ও বৈকালে ৯ ঘটিকার সময়, শীতকালে প্রাতে ১০টা ও বৈকালে ৯ঘটিকার সময়, যথাক্রমে দুইবার পূর্ণবৃদ্ধির সময়। গ্রীষ্মকালে বৈকালে ৩টার ও মধ্যরাত্রে, পূর্ণহ্রাস ঘটিয়া থাকে। মে ও জুন মাস অপেক্ষা জানুয়ারি মাসে তড়িৎ-শক্তি ১৩ গুণ প্রবল বলিয়া কুইটলেট বর্ণনা করিয়াছেন। কিউ প্রদেশে অধ্যাপক বি, ষ্টুয়ার্ট গ্রীষ্মকালে প্রাতে ৮টার সময় ও শীতকালে প্রাতে ১০টার সময় পূর্ণবৃদ্ধি ও গ্রীষ্মকালে, বৈকালে ১০টার সময়ও শীতকালে ৭টার সময় পূর্ণহ্রাসের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পারিসহরে মাসকার্ট মধ্যরাত্রের পূর্ব্বেই একবার পূর্ণবৃদ্ধি দেখিয়াছিলেন। সূর্য্য-উদয়ে তড়িৎ শক্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়া বৈকাল ৩টার সময় পূর্ণহ্রাস হইয়াছিল। তৎপরে রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত ইহার ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কখন কখন ঝড়ের গতির দিক-অনুসারে বায়ুর তড়িতের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, ও বরফ-পতন-কালীন বায়ুর গতি-অনুসারে ভূবায়ু কখন সংযোগ কখন বা বিয়োগ-তড়িতান্বিত দেখা যায়। উত্তর-বায়ু বহিলে, সংযোগ-তড়িৎ ও দক্ষিণ-বায়ু প্রবাহিত হইলে বিয়োগ তড়িৎ দৃষ্ট হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি।

মৃণালিনী।

[মানুষ কেন কার্য্য করিলে প্রায়ই পূর্ব্ব-সংস্কার তাঁহার সেই কার্য্যের মধ্যে অলক্ষ্যে জড়িত হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব-লিখিত বা পূর্ব্বলিখিত বিষয় বা চরিত্র সেইরূপ নিজের লেখায় আপনা হইতে আসিয়া সংমিলিত হয়। এই কারণে বঙ্কিম বাবুর "চন্দ্রশেখর", স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্রের "কণ্ঠমালায়" রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এ কারণেই শুনা যায়, বঙ্কিমবাবুর "দুর্গেশ-নন্দিনীর" মধ্যে 'আইভ্যানোর' (Ivanhoe) ভাব ও চরিত্রের ছায়া পড়িয়াছে। পুনরপি এই কারণেই বোধ হয়, বঙ্কিমবাবুর স্বগঠিত "শ্রী" ও "প্রফুল্লমুখীর" চিত্রে পরস্পর অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়; আবার তাঁহার "দুর্গেশনন্দিনী" ও 'মৃণালিনী"-গত চরিত্রগুলির মধ্যে অনেকস্থলে ঐক্য দেখা যায়। নিম্নে এইরূপ কয়েকটী চরিত্রের উল্লেখ করা গেল :—

দুর্গেশনন্দিনী।		মৃণালিনী।
জগৎসিংহ	... ...	হেমচন্দ্র।
তিলোত্তমা	... ...	মৃণালিনী।
অভিরামস্বামী	... ...	মাধবাচার্য্য।
বিমলা	... ...	মনোরমা।
বিদ্যাদিগ্‌গজ	... ...	দিগ্বিজয়।
আস্মানি	... ...	গিরিজায়া।

নাই এক আয়েষা। না থাকিবারই কথা; আয়েষাকে লইয়াই "দুর্গেশনন্দিনীর" মৌলিকত্ব-সম্বন্ধে এত গোলযোগ। যাহাহউক, এ সকল তত্ত্বের আলোচনায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই; 'মৃণালিনী'-গত সৌন্দর্য্যরাশি লোক-সমক্ষে ধারণ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য;—তাহারই চেষ্টা করা যাউক।]

প্রথম খণ্ড।

রঙ্গভূমে হিন্দুর দুর্গতি।

যে দুই এক জন হিন্দু, কৌতূহলের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া, সাহসে ভর করিয়া, রঙ্গদর্শনে আসিয়াছিল, তাহারা সকলের পশ্চাতে স্থান পাইল অথবা পাইল না, কেননা যবনদিগের বেত্রঘাতে ও পদাঘাতে পীড়িত এবং ভীত হইয়া অনেককে পলায়ন করিতে হইল।

[জেতার নিকট বিজিতের চিরদিনই এই-রূপ দুর্গতি। আজকাল ইংরাজের রঙ্গালয়ে নগণ্য 'নেটিভে'র যে ইহাপেক্ষাও দুর্গতি ঘটিতেছে, তাহা কাহারও জানিতে বাকী নাই।]

হিন্দুর ধনু-খেলা ঘুচিতেছে।

যবন। তুই তীর ধনু লইয়া এখানে আসিয়াছিস্ কেন?

হিন্দু। আমি বাল্যকালে তীর-ধনু লইয়া খেলা করিতাম। সেই অবধি অভ্যাস-দোষে তীর-ধনু আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

যবন। হিন্দুদিগের যে অভ্যাসদোষ ক্রমে ঘুচিতেছে, এ খেলায় আর এখন কাহারো সুখ নাই।

[এখন একেবারেই ঘুচিয়াছে। তাম-নায়-পাশাই এখন 'কাফেরের' নিত্যসুখের জীবন-সামগ্রী!—কোন কোন ক্ষেত্রে 'লন-টেনিস' ও 'ফুট-বল' সুখোৎপাদন করিতেছে।]

হিন্দু যুবার রূপ।

যুবকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের ন্যূন। শরীর ঈষন্মাত্র দীর্ঘ, এবং অনতিস্থূল ও বল-ব্যঞ্জক। মস্তক যেরূপ পরিমিত হইলে শরীরো-পযোগী হইত, তদপেক্ষা বৃহৎ, এবং তাহার গঠন অতি রমণীয়। ললাট প্রশস্ত বটে, কিন্তু অধঃপ্রদেশ অনতিপুষ্ট, তাহার মধ্যদেশে "গলদণ্ড" নামে পরিচিত শিরা প্রকটিত। ভ্রূযুগ সূক্ষ্ম, তরললোম; তত্তলস্থ অস্থি কিছু উন্নত। চক্ষুঃ বিশেষ আয়ত নহে, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য-গুণে আয়ত বলিয়া বোধ হইত। নাসা মুখের উপযোগী; অত্যন্ত দীর্ঘ নহে, কিন্তু অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র; সর্ব্বদা পরস্পরে সংশ্লিষ্ট। পার্শ্বভাগে অপষ্ট মণ্ডলাঙ্ক রেখায় বেষ্টিত। ওষ্ঠে ও চিবুকে কোমল নবীন রোমাবলী শোভা পাইতেছিল। অঙ্গের গঠন, বলসূচক হইলেও, কর্কশতাশূন্য। বর্ণ প্রায় সম্পূর্ণ গৌর। অঙ্গে কবচ, মস্তকে উষ্ণীষ, পৃষ্ঠে তূণীর লম্বিত, করে ধনুঃ, কটিবন্ধে অসি।

[পাঠক! এই রূপের সহিত 'দুর্গেশনন্দিনীর' প্রথম খণ্ডে চিত্রিত "রাজপুত যুবার রূপ" তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিবেন।]

গঙ্গাযমুনা-যঙ্গমে প্রাবৃট দিনান্তশোভা।

প্রাবৃট কাল, কিন্তু মেঘ নাই; অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গমালাবৎ পশ্চিম-গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্য্যদেব অস্ত-গমন করিয়াছিলেন। বর্ষার জলসঞ্চারে গঙ্গা-যমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণ-তায় উন্মাদিনী, যেন দুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনা-ঞ্চলাগ্রবৎ তরঙ্গমালা পবন-তাড়িত হইয়া ফেনে প্রতিঘাত করিতেছিল। বর্ষাকালে সেই গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমের জলময় শোভা যে না দেখিল, তাহার বৃথায় চক্ষুঃ।

সংসার-বিরাগী ব্রাহ্মণের রূপ।

ব্রাহ্মণ অতি দীর্ঘাকার পুরুষ; শরীর শুষ্ক; মাথা মুখমণ্ডলে শ্বেতশ্মশ্রু বিরাজিত, ললাট-ও বিরলকেশ তালুদেখে অল্পমাত্র বিভূতি-শোভা। ব্রাহ্মণের কান্তিগম্ভীর এবং কটাক্ষ কঠিন; দেখিলে তাঁহাকে নির্দ্দয় বা অভক্তিভাজন, বলিয়া বোধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, অথচ শঙ্কা হইত।

শত্রুশাসনে পরাঙ্মুখ হওয়া কাপুরুষতা।

মাধবাচার্য্য। (হেমচন্দ্রের প্রতি) এই কি তোমার দেবভক্তি? ভাল তাহাই না হউক, দেবতারা অস্মদ্ধর্ম্ম-সাধন জন্য তোমার ন্যায় মনুষ্যের সাহায্যের অপেক্ষা করেন না। কিন্তু তুমি কাপুরুষ যদি না হও, তবে তুমি কি প্রকারে শত্রুশাসন হইতে অবসৃত হইতে চাও?—এই কি তোমার বীরধর্ম্ম?—এই কি তোমার শিক্ষা? রাজবংশে জন্মিয়া কি প্রকারে আপন অপহৃত রাজ্যোদ্ধারে বিমুখ হইতে চাহিতেছ?

[হেমচন্দ্রের প্রতি মাধবাচার্য্যের এই উৎসাহ-বাণী শ্রবণ করিয়া, অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের কথা সহজেই মনোমধ্যে উপনীত হয়;—

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥
মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

* * *

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপস্যসি॥]

ইতিহাসলেখকের লেখনীর গতি বিচিত্র।

বাষ্পীয় রথের গতি অতি বিচিত্র। দিল্লী হইতে কলিকাতা আসিতে দুই দিন লাগে না। কিন্তু ইতিহাসলেখকের লেখনীর গতি আরও বিচিত্র। পাঠক মহাশয় এইমাত্র দিল্লীতে; তৎপরে প্রয়াগে;—এক্ষণে আবার প্রাচীন

নগরীলক্ষ্মণাবতীতে আসিয়া তাঁহাকে জয়কেশ-শর্ম্মার গৃহাভ্যন্তরে নেত্রপাত করিতে হইল।

হিন্দুরমণীর চরিত্রে-জ্ঞান।

মণি। ঐ কথাটী মনে পড়িলেও আমার বড় অসুখ হয়। তুমি কুমারী হইয়া কিরূপে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে?

মৃণা। অসুখ কেন সখি—তিনিই আমার স্বামী। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ কখন আমার স্বামী হইবে না।

মণি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত তিনি স্বামী হয়েন নাই। সুতরাং সাধনীর তাহা অকর্ত্তব্য। * * তোমার চরিত্রে এমন কলঙ্ক—ইহা যখনই মনে পড়ে, তখনই আমার শরীরে জ্বর আইসে।

[কালের কুটিল গতি। কুমারী অবস্থায় পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করা, আর স্বামী থাকিলে কৌশলে তাঁহাকে বর্জ্জন করাই এখনকার দিনে আদর্শরমণীর লক্ষণ। এ লক্ষণের ব্যক্তিক্রম দেখিলেই শরীরে জ্বর আইসে!]

বালক ও বৃদ্ধের বিবেচনাশক্তি তুল্য নহে।

বালকে ভাবিয়া থাকে, বালক ও বৃদ্ধ উভয়ের বিবেচনাশক্তি তুল্য; কিন্তু তাহা নহে। এ বয়সে পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় বালকের অপেক্ষা আমাদিগের পরিণামদর্শিতা যে অধিক, তাহাতে সন্দেহ করিও না।

গিরিজায়ায় গীত।*

মধুরহাসিনি, মধুরহাসিনি শ্যাম-বিনোদিনি রে!
কহলো নাগরি,গেহ পরিহরি,কাহে বিবাসিনী রে।
বৃন্দাবনধন,গোপিনীমোহন, কাহে তু তেয়াগী রে।
দেশ-দেশ পর,হো শ্যামসুন্দর,ফিরে তুয়াপাশি রে।
বকুচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে, বহুত পিয়াসা রে।
চন্দ্রমাশালিনী,যা মধুযামিনী,না মিটিল আশা রে।

* তৃতীয় খণ্ডে গিরিজায়ার গীত দেখুন।

সা নিশা সময়ি, কহলো সুন্দরী, "কাঁহা মিলে দেখা রে।
শুনি যাওয়ে চলি,বাজরি মুরলী,বনে বনে একা রে।

ভিখারিণী রূপ।

ভিখারিণীর বয়স ষোড়শ বৎসর। ষোড়শী, বর্ণ্মাকৃতা এবং কৃষ্ণাঙ্গী। গিরিজায়া প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা। তাই বলিয়া তাহার গায়ে জল বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালী মাখিলে জল মাখিয়াছে বোধ হইত, কিম্বা জলে স্নানিলে কালি বোধ হইত, এমত নহে। যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাকিলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে কয়লা বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু বর্ণ যেমন হউক না কেন, ভিখারিণী কুরূপা নহে। তাহার অঙ্গ পরিষ্কার,সুমার্জ্জিত, চাকচিক্যবিশিষ্ট; মুখবাদি প্রসন্ন; চক্ষু দুটি বড়, অত্যন্ত শ্বেত, চকচকে, হাস্যময়; লোচনতারা নিবিড় কৃষ্ণ, একটী তারার পার্শ্বে একটি তিল। ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র, রক্তপ্রভ, তদন্তরে অতি পরিষ্কার অমল শ্বেত, কুসুমকলিকাসন্নিভ দুই শ্রেণী দন্ত। কেশগুলি সূক্ষ্ম, গ্রীবার উপরে মোহিনী কবরী, তাহাতে যুথিকার মালা বেষ্টিত। যৌবন-সঞ্চারে শরীরের গঠন সুন্দর হইয়াছিল, যেন কৃষ্ণপ্রস্তরে কোন শিল্পকার পুত্তল খোদিত করিয়াছিল। পরিচ্ছদ অতি সামান্য কিন্তু পরিষ্কার, ধৃত-কর্ম্মে পরিপূর্ণ নহে। অঙ্গ একেবারে নিরাভরণ নহে; অথচ অলঙ্কারগুলি ভিখারীর যোগ্য বটে; —প্রকোষ্ঠে পিত্তলের বলয়, গলায় কাচের মালা, নাসিকায় ক্ষুদ্র একটী তিলক, ভ্রূমধ্যে ক্ষুদ্র একটী চন্দনের টিপ।

কথার বাণিজ্য।

মৃ। সে বণিক্ কিসের বাণিজ্য করে?

গি। যাহার বাণিজ্য সকলে করে—

মৃ। সে কিসের বাণিজ্য?

গি। কথার বাণিজ্য।

মৃ। এ নূতন বাণিজ্য বটে। তাহাতে লাভালাভ কিরূপ?

গি। ইহাতে লাভের অংশ প্রীতি, অলাভ কলহ।

মৃ। ইহার মহাজন কে?

গি। যে মহা জন।

মৃ। তুমি ইহার কি?

গি। নন্দা মুটে।

মৃ। ভাল—তোমার বোঝা নামাও, সামগ্রী কি আছে দেখি।

গি। এ সামগ্রী দেখে না,—শুনে।

মণিচুরি।

যমুনার জলে মোরে কি নিধি মিলিল।
কাঁপ দিয়া পশি' জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কতুহলে, যে রতনে—
নিদার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
কণ্ঠের কাটিল ডোর, মণি হ'রে নিল।

ব্যাপারির অবস্থা।

ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি, ফিরমু বহু দেশ।
কাঁহা মেরে কান্ত বরণ, কাঁহা রাজ-বেশ॥
হিয়াপর রোপণু পরুজ, কৈছু যতন ভারি।
সোহি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মৃণাল হামারি॥

মৃণালিনী কোথায়?

কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পাড়িয়া মরমে॥
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন।
চরণ বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন॥
বলে রাজহংস,কোথা করিবে গমন।
হৃদয়-কমলে মোর তোমার আসন॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়-কমলে।
কাঁপিল কণ্টক সহ মৃণালিনী জলে॥

হেন কালে কাল মেঘ উদিল আকাশে।
উড়িল মরালরাজ মানস-বিলাসে॥
ভাসিল হৃদয়-পদ্ম তার বেগভরে।
ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে॥

মৃণালিনীর দশা।

দেখিলাম সরোবরে, কাঁপিছে পবন ভরে,
মৃণাল উপরে মৃণালিনী।

মৃণালিনীর সঙ্গী।

মেঘ দরশনে হায় চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয় রে॥
মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে॥

দ্বিতীয় খণ্ড।

মূর্খ কে?

মূর্খ তিন জন। যে আত্মক্ষমায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিষেধক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে।

[শেষোক্ত মূর্খ আজকাল ঘরে ঘরে।]

কুসুমনির্ম্মিতা দেবী-প্রতিমা।

দেখিয়া প্রথম মুহূর্ত্তে বোধ হইল,সম্মুখে একখানি কুসুমনির্ম্মিতা দেবী-প্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব। তৃতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশল-সীমা-রূপিণী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।

প্রকৃতির এক অঙ্ক।

সান্ধ্যগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনী-দত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় আচ্ছাদিত হইল। নক্ষত্রমণ্ডলে পরিচারিকা-

হস্তস্থালিত দীপ-মালার ন্যায় অথবা প্রভাতে উদ্যমশূন্য সুখসমূহের ন্যায়, আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকারে নদীহৃদয়ে নৈশ-সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতর বেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে, রমণী হৃদয়ে নায়কসংস্পর্শ-জনিত প্রকম্পের ন্যায়, নদীবক্ষে তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। কূলে তরঙ্গাভিঘাতজনিত ফেণপুঞ্জে শ্বেতপুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল। বহুলোকের কোলাহলের ন্যায় বীচিরব উত্থিত হইতে লাগিল।

নিঃস্বার্থ প্রেম।

গি। তোমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না?

মৃ। না।

গি। তবে যাইতেছ কেন?

মৃ। তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না, কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিব। তাঁহাকে দেখিতেই যাইতেছি।

গি। (সহাস্য)।

চরণতলে বিশ্বহে শ্যাম পরাণ রতন।
দিব না তোমারে নাথ নিছার যৌবন॥
এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল,
দিবা-নিশি মোরে নাথ দিবে দরশন॥

[গিরিজায়া বুঝিল, পরাণ-রতনের বিনিময়ে দিবানিশি দরশন মিলিবে; মৃণালিনী কিন্তু মনে মনে বলিতেছিলেন—

"তোমার ঐ মুখশশি, হেরে আনন্দেতে ভাসি,
তাই তোমারে দেখতে আসি, দেখা দিতে আসি না

ইহাতে স্বার্থ আছে, কিন্তু যিনি বলিয়াছেন—চোখের দেখা দেখতে এলে, তাওদেখা নাহিমেলে

দারুণ ভাচ্ছিল্যভাবে, সে কবে পলায়ন;—
তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মর্ম্মভেদী নীরে,
মুহূর্ত্তেও দেখা পেলে, স্বর্গ হাতে পাই যেন।"

তিনিই, বোধ করি, যথার্থ প্রেমিক; কিন্তু ইহাও একেবারে স্বার্থের ছায়াশূন্য নহে। প্রেমিক আরও সুন্দর প্রেমের কথা শুনাইয়াছেন—

"সে যদি না ভালবাসে, নাহি যায় তা'র পাশে,
তবু তা'র প্রেম-আশে বদ্ধ হ'য়ে রহিব।
না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,
তবু সে বিধুবদন বিরলেতে ভাবিব।"

কিন্তু, ইহাই কি একেবারে নিষ্কাম্যকামনার—আকাঙ্ক্ষার—আত্ম-পরিতৃপ্তির-সুস্পৃহারেখা ইহার মধ্যেও অলক্ষ্যে অঙ্কিত বোধ হয়। এইজন্যই "সন্ন্যাসী" তাঁহার আত্ম-কাহিনী বিবরণ কালে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

"However *Nishkama* the heart of a *Grihastha* may be, it cannot be absolutely *Nishkama* and must be tinged with desires"]

অপ্রেমিকের গান।

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে॥
ভাসল তরি সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জল-খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে॥
গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে।
মনে করি কূলে ফিরি, বাহিতে যে নারি ধীরি
কূলেতে কণ্টকতরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে॥
যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরি,
সে কভু দিল না পদ তরণীর অঙ্গে।

প্রকৃতির শোভা।

নবীন শরদুদয়। রজনী চন্দ্রিকাপ্লাবিনী, আকাশ নির্ম্মল, বিস্তৃত, নক্ষত্রখচিত, ক্বচিৎ স্তরপরম্পরা-বিন্যস্ত শ্বেতাম্বুদমালায় বিভূষিত। বাতায়নপথে অদূরবর্ত্তিনী ভাগীরথীও দেখা যাইতেছিল; ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুস্রোতবিসর্পিণী, চন্দ্রকর-প্রতিঘাতে উজ্জ্বল তরঙ্গিণী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারিসমাগম-প্রমাদিনী,

বাতায়নপথে বায়ু প্রবেশ করিতেছিল। বায়ু গঙ্গাতরঙ্গে নিক্ষিপ্ত জলকণা-সংস্পর্শে শীতল, নিশা-সমাগমে প্রফুল্ল বন্যকুসুম-সংস্পর্শে সুগন্ধী; চন্দ্রকর-প্রতিঘাতী শ্যামলোজ্জ্বল বৃক্ষপত্র বিধৃত করিয়া, নদীতীর-বিরাজিত কাশকুসুম আন্দোলিত করিয়া, বায়ু বাতায়নপথে প্রবেশ করিতেছিল।

মনোরমার রূপ।

মনোরমার রূপরাশি অতুল—চক্ষে ধরে না। একে বর্ণ সোনার চাঁপা; তাহাতে ভুজঙ্গশিশুশ্রেণীর ন্যায়, কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত নির্ম্মল ললাট; ভ্রমর-ভ্রর-স্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার, চঞ্চল, লোচনযুগল; মৃদুমন্দ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রক্ত যুক্ত সুগঠন নাসা; অধরোষ্ঠ যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত, প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে প্রোদ্ভিন্ন, রক্তকুসুমাবলীর স্তরযুগল তুল্য; কপোল যেন চন্দ্রকরোজ্জ্বল, নিতান্ত স্থির, প্রস্ফুট-বিস্তারবৎ প্রসন্ন; শারকহিংসা-শঙ্কায় হংসীর ন্যায় গ্রীবা,—বেণী বাঁধিলেও সে গ্রীবার উপরে অবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশকলাপ আসিয়া কেলি করে। স্থিরদরদ যদি কুসুমকোমল হইত, কিম্বা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিম্বা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত—সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত। এ সকলই অন্য সুন্দরীর আছে; মনোরমার রূপরাশি অতুল, কেবল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌকুমার্য্যের জন্য। তাঁহার বদন সুকুমার,—অধর, ভ্রূযুগ, ললাট সুকুমার। সুকুমার কপোল; সুকুমার কেশ। অলক্তকাবলী যে ভুজঙ্গশিশুরূপী, সেও সুকুমার ভুজঙ্গশিশু। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গীতে, সৌকুমার্য্য; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে, সৌকুমার্য্য; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সৌকুমার্য্য; সুকুমার চরণ, চরণ-বিন্যাস সুকুমার। গমন সুকুমার—বসন্তবায়ু-সঞ্চালিত কুসুমিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য; বচন সুকুমার—নিশীথ-সময়ে জলরাশি-পার হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুল্য; কটাক্ষ সুকুমার,—ক্ষণমাত্র জন্য মেঘমালাযুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাততুল্য; আর ঐই যে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছেন,—উন্নতমুখী, নয়নতারা ঊর্দ্ধস্থাপন, স্পন্দিত, আর বাপীজলাভ্র অবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ একহস্তে ধরিয়া, এক-চরণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্ত্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছেন—ও ভঙ্গীও সুকুমার; নবীন সূর্য্যাগ্রে সদ্য-প্রফুল্ল দল-মালাময়ী নলিনীর ন্যায় সুকুমার।

ঠাকুর-ঝি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হীরালালের মুখে সুখদার পরিচয় ও তাহাদের আকস্মিক বিপদের সংবাদ পাইয়া, অমলার হৃদয় সুখদার জন্য আকুল হইয়াছিল; তাহার পর সুখদার ঐ শুষ্কমুখ দেখিয়া, পরদুঃখকাতরা অমলার হৃদয় যেন সহানুভূতিতে গলিয়া গেল। সে হৃদয় এত কোমল যে, পরদুঃখ-বহ্নির আঁচ সহ্য করিতে পারে না; অথচ আবার এত দৃঢ় যে, নিজের অসহনীয় দুঃখেও সে হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। সে

কখন-কোমল কখন-দৃঢ় হৃদয়ও আমরা এক প্রকার বুঝাইতে পারি, কিন্তু সে হৃদয় এরূপ তেজস্বিনী বুদ্ধির আধার কিরূপে হইল, তাহা বুঝাইতে পারি না। অমলা বাল-বিধবা, সুতরাং তাহার মতন দুঃখিনী এ পৃথিবীতে আর কে আছে? কিন্তু নিজের সে দুঃখের কথা অমলার মনে কখনও উদয় হইত না। অমলা যেন বাল্য-বিধবা হইয়াই মাতৃগর্ভ হইতে সুখদুঃখময় সংসারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সুতরাং ইহাতে অমলার আর দুঃখ কি? কিন্তু তাহার ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, বা জননী প্রভৃতির বিষয় মুখ দেখিলে অমলার দুঃখের আর সীমা থাকিত না। এ সকল আত্মীয়ের কথা দূরে থাকুক—অমলা অপর কাহার দুঃখও দেখিতে পারিত না। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীর জন্যও অমলার প্রাণ কাঁদিত। অমলা নিজের অসহনীয় দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করিত না, অথচ পরের দুঃখের কথা শুনিলে কাঁদিয়া আকুল হইত। অমলা কাঁদিয়া আকুল হইত বটে, কিন্তু সে কান্নাও অনেক সময় কেহ দেখিতে পাইত না। অমলা নীরবে অন্তরে অন্তরে কাঁদিত, অথচ সে সময় অমলার বুদ্ধিস্থির থাকিত। তাহার যতদূর ক্ষমতা, প্রাণপণে সে দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিত। পরদুঃখ মোচনে অমলা আত্মহারা হইত বটে, কিন্তু কখন বুদ্ধি-হারা হইত না। সে সময়ে কি উপায় অবলম্বন করিলে সে দুঃখ মোচন হইতে পারে, অমলার তেজস্বিনী বুদ্ধি তাহা জানিত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অমলা বাল-বিধবা। দশ বৎসর বয়সের সময় অমলা বিধবা হইয়াছিল, সুতরাং তাহার স্বামীর সহিত ভালবাসা জন্মাইবার পূর্ব্বেই তাহার কপাল পুড়িয়া যায়। সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় সে স্বামীর একটী স্মৃতিও তাহার হৃদয় মধ্যে নিহিত ছিল। কিসে কি হইল জানি না, অমলার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তাহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই আধারশূন্য ভালবাসা সে ক্ষুদ্র হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। তখন অমলার আর আত্মীয়পর জ্ঞান রহিল না। বর্ষায় নদীর জলে প্লাবিত হইয়া যেমন তাহার নিকটস্থ সকল জমী ডুবাইয়া রাখে, সেইরূপ যে অমলার নিকটবর্ত্তী হইত, সেই যেন অমলার ভালবাসায় ডুবিয়া থাকিত।

অমলা সুখদাকে প্রথমে আহার করাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু সুখদা বলিল,—"আমার খেতে ইচ্ছে নেই; তোমাদের ঘরে যদি দুধ থাকে, তবে আমার ভাইকে একটু দাও।"

অমলা তাড়াতাড়ি দুধ আনিয়া তখন সেই শিশুকে খাওয়াইতে আরম্ভ করিল। দুধ খাওয়ান শেষ হইলে পর অমলার একটী কথা মনে পড়িয়া গেল; অমলা তখন এক বাটী তৈল আনিয়া প্রথমে শিশুটিকে মাখাইল, তাহার পর সুখদাকে মাখাইতে বসিল। তেল মাখান শেষ হইলে, অমলা দুইজনকে স্নান করাইয়া দিল; সুখদা এক বস্ত্রে আসিয়াছিল, অমলা তাহাকে একখানি নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে দিল। এই সময় সেই ঝি এক ঠোঙা খাবার আনিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। কিন্তু ঝি, সুখদা আর তাহার সেই শিশু ভ্রাতাকে দেখিয়া, অনেকক্ষণ বিস্মিত-নেত্রে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অমলা যখন তাড়াতাড়ি ঝিকে খাবার কিনিতে পাঠাইয়া ছিল, তখন ঝি মনে করিয়াছিল যে, নিশ্চয় কোন কুটুম্ব বা কুটুম্বিনী আসিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এখন সুখদা আর তাহার ভ্রাতাকে দেখিয়া ঝি বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। ঠোঙাটি অমলার হাতে দিয়া ঝি জিজ্ঞাসা করিল—"কে এয়া গা?"

অমলা উত্তর করিল,—"পরেশ বাবুর মেয়ে আর ছেলে।"

ঝি।—পরেশ বাবু। কোন পরেশ বাবু?

অমলা।—দাদার বন্ধু—পরেশ বাবু।

ঝি।—তাই ভাল। তোমায় ব্যস্ত দেখে আমি মনে করেছিলুম, বুঝি তোমার শ্বশুর-ঘরু থেকে কোন কুটুম্ব এসেছে।

অমলা ঝির সে কথায় কান না দিয়া, তখন সুখদাকে সেই খাবার খাইতে অনুরোধ করিল। এতক্ষণ সুখদা অমলার মিষ্ট কথায় সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অমলা যখন তাকে খাইবার জন্য যত্ন করিতে লাগিল, তখন সুখদার জননীর কথা মনে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ে হঠাৎ একটা বিশাল শোকসিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিল। সুখদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"ওগো, আমার মা না খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরে গেছে, আমার আর খাবার ইচ্ছে নেই।"

অমলা সুখদাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল,—"স্নান করে অমনি থাকতে নেই মা। অমনি থাকলে, ঐ ভাইটির অকল্যাণ হবে যে। যা হবার হয়ে গেছে মা, এখন ঐ ছোট ভাইটির কল্যাণ চাই।"

সুখদা আর দ্বিরুক্তি করিল না, তৎক্ষণাৎ চক্ষের জল মুছিয়া সেই খাবারের কিয়দংশ খাইল। এইবার সেই ঝি আরম্ভ করিল,—"ওমা! গলায় দড়ি দিয়ে যা করে গেছে, এখন কি পরের বাড়ী অমনতে আছে! তিনি বাবু, তোমার আক্কেলখানা কি? তুমি ওর ভেয়ের কল্যেণ খুঁজছো, আর নিজের ভায়ের অকল্যাণ করছো যে! ওর মা আজ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, আর তুমি ওকে বাড়ীর ভেতর আসতে দিলে! তোমার কি ধর্ম্মকর্ম্ম জ্ঞান নেই! তুমি কি বলে ওকে ছুঁলে?"

ঝির কথা শুনিয়া, সুখদা তখন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া অমলার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, অমলাও সে চাহনীর অর্থ বুঝিল। তৎক্ষণাৎ ঝিকে ইঙ্গিতের দ্বারা এইরূপ কথা বলিতে নিষেধ করিয়া বলিল,—"তুই বাছা, একটু চুপ কর। পরের ভাল কর্লে, নিজের কখন মন্দ হয় না। আমি স্নান করবো এখন; তুই বাছা, মাকে যেন কোন কথা বলিস্‌নে।"

ঝিকে একবার এককথা বলিতে নিষেধ করায় সে সেই নিষেধ-আজ্ঞা যেরূপ পালন করিয়াছিল, এবারও সেইরূপ পালন করিল। একটা অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে ঝি পূর্ব্বের ন্যায় এবারও অজ্ঞাতসারে আর একটা অগ্নি জ্বালাইয়া দিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সাবিত্রী যখন ঝির মুখে পরেশনাথের স্ত্রীর অপঘাত-মৃত্যুর কথা শুনিলেন, তখন এইরূপ আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া পরেশনাথের জন্য তাঁহারও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তিনি যখন শুনিলেন যে, সেই অপঘাত-মৃত্যুর পর তাহার পুত্রকন্যা তাঁহারই বাড়ীতে আসিয়াছে, এবং তাঁহারই কন্যা অমলা তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছে, তখন তাঁহার সেই সকরুণভাব ক্রোধে পরিণত হইল। সে ক্রোধের পূর্ণ মাত্রা তখন অমলার উপর পড়িল। তিনি তাড়াতাড়ি অমলার নিকট আসিলেন। অমলা তখন ঘরের মেজে শয্যা প্রস্তুত করিয়া সুখদার ছোট ভাইটীকে ঘুম পাড়াইতেছিল। সাবিত্রী যেরূপ ক্রোধান্বিত হইয়া আসিয়াছিলেন,

কন্যার সম্মুখে আসিয়া কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। সেই অপগণ্ড শিশু আর মাতৃহীনা বালিকার মুখ দেখিয়া, গৃহিণীর ক্রোধ কোথায় চলিয়া গেল। তিনি স্থির ন্যায় তাহাদের সম্মুখে কোন কথা না বলিয়া কন্যাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন,—"এরা কে?"

অমলা তাহার ভ্রাতার মুখে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিল, অকপটচিত্তে জননীর নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। সাবিত্রী আপনার পুত্রের মুখে পরেশনাথের নাম-মাত্র শুনিয়াছিলেন, তাহার অন্য পরিচয় কিছুই জানিতেন না; সুতরাং তাহার বিপক্ষে কোন কথা না বলিয়া কেবল মাত্র বলিলেন,—"এদের এখানে আন্‌লে কে?"

অমলা।—দাদা এনেছেন।

সাবিত্রী।—হীরালাল আফিস যায়নি?

অমলা।—একজন বন্ধুলোকের এরূপ বিপদের কথা শুনে, কি করে আফিস্ যাবেন?

সাবিত্রী।—আফিসে না গেলে তার চাকরী থাকবে কেন? এখন সে গিয়েছে কোথায়?

অমলা।—পুলিশের লোকে পরেশ বাবুকে কি বিপদে ফেলেছে, তাই তিনি বোধ হয়, এদের এখানে রেখে পুলিশেই গেছেন।

অমলার এই কথায় গৃহিণীর ক্রোধের চিহ্ন পুনরায় দেখা দিল। পুত্র আফিসে না গিয়া পরের জন্য থানা-পুলিশ করিয়া বেড়াইতেছে, আর তাঁহার কন্যা গৃহে বসিয়া গৃহস্থের মঙ্গলা-মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া এক ভিন্ন-জাতীয় আত্মস্বার্থিনীর অপঘাত-মৃত্যুর পর তাহারই পুত্রকন্যা লইয়া সান্ত্বনা করাইয়াছে। গৃহিণীর প্রাণে তাহা সহ্য হইবে কেন? সুতরাং গৃহিণী রাগিয়া কন্যাকে বলিলেন—"যেমন ভাই, তেম্নি বোন—আমার অদৃষ্টে দুই সমান হয়েছে। কেউ আমাকে তোরা সুখী কর্‌বিনে। আজ ওদের বাড়ীতে মড়া মরেছে, আর আমার বাড়ী এসে ওরা নাইলে? এস্‌ক্তিও তোদের নেই? আমি তোদের জ্বালায় যে জ্বালাতন হলেম।"

এসময় কোন কথা বলিয়া জননীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলে, জননীর ক্রোধ হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হইবার সম্ভব। সেই কারণ, অমলা এসময় কোন কথা বলিল না, নীরবে জননীর তিরস্কার সহ্য করিতে লাগিল। সাবিত্রীর ক্রোধের একটু উপশম হইলে বলিলেন,—"এখন যাও, ফের নাওগে যাও, না নাইলে কিন্তু ঘর-সংসারের কোন জিনিষপত্র ছুঁও না।"

অমলা ধীরে ধীরে স্নান করিতে যাইতেছিল, জননী পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন,—"ভাত খেয়ে নাইলে যদি তোর অসুখ করে। না হয় একটু গঙ্গাজল স্পর্শ করে থাকগে যা।"

অমলা বুঝিল যে মায়ের মনে এখন আর ক্রোধ নাই, সেই কারণ সাহস করিয়া বলিল,—"আমি ত এখনও ভাত খাইনি মা। আমি স্নান করে, তার পর ভাত খাবো।"

জননী বিস্মিতা হইয়া বলিলেন,—"হা আমার অদেষ্ট! বাড়ী শুদ্ধ সবাই খেয়েছে, বেলা আড়াইটে হলো, আর এখনও তুই ভাত খাস্‌নি।"

অমলা।—হাঁ মা। ঐ মেয়েটীকে না খাইয়ে, কি করে খাবো?

সাবিত্রী।—ওরা তো তোর জাতকুটুম্ব-জাত-গুষ্টি কেউ নয়! তবে পরের জন্যে তোর এত প্রাণ কাঁদে কেন?

অমলা তখন কি উত্তর দিবে? কেন যে পরের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদে, অমলা নিজেই তাহা জানিত না।

সাবিত্রী পুনরায় বলিল,—"ওকে কি আজ ভাত খেতে আছে? আর থাকলেও আমাদের হাঁড়ির ভাত ও কে কি করেই বা দ?"

অমলা।—মা, ও ত বালিকা। ওকি সে সকল নিয়ম মান্‌তে পারে? আর আমি শুনেছি, অপঘাত মৃত্যু হলে, তার আর শুদ্ধ নিতে হয় না।

সাবিত্রী।—এখন কে সে বিধেন আনে? এ বাইরের পাশ ঘরে আনা কেন? এতখানি বেলা হলো, এখনো ভাত না খেয়ে এই সকল হচ্ছে।

অমলা।—মা, আজ ত ঐ মেয়েটীকে নিরিমিষ খেতে হয়, তা আমার ভাত থেকে দুটি ভাত দিই না। আহা! ছেলেমানুষ, না খেয়ে মুখখানি শুকিয়ে গেছে।

সাবিত্রী।—আমি তোকে আট্‌কে, পারবো না, তুই যা জানিস্ কর্ মা। এখন আর পিত্তি বাড়াস্‌নে, শীগ্‌গীর দুটী ভাত মুখে দিগে যা।

এই কথা বলিয়া সাবিত্রী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রতি পাদবিক্ষেপে অসন্তোষ প্রকাশ পাইতে লাগিল। অমলাই জননীর অসন্তোষের কারণ, সুতরাং অমলা বিদ্যমানে পুনরায় সুখদার নিকট ফিরিয়া আসিল। সুখদাকে আহার করাইয়া আপনি যৎকিঞ্চিৎ আহার করিল। আহারান্তে সুখদাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে আপনার শয্যায় শয়ন করাইল। অমলার প্রবোধ-বাক্যের কি মোহিনীশক্তি ছিল, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সুখদা নিদ্রিতা হইল। তখন অমলা ধীরে ধীরে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া, শরৎকুমারীর নিকটে গেল। শরৎকুমারীর মনে যে এখনও সুখ নাই, সে কথা কেবল অমলাই জানিত।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অমলা শরৎকুমারীর গৃহে আসিয়া দেখিল যে, তখনও শরৎকুমারী নির্জ্জনে বসিয়া কি ভাবিতেছে। অমলা সে গৃহে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল,—"বউ-দিদি!"

বউ-দিদি তৎক্ষণাৎ অমলার দিকে ফিরিয়া চাহিল বটে, কিন্তু অমলা বউ-দিদির নিকট আজ যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারে নাই বলিয়া বউ-দিদির অমলার উপরও যেন একটু অভিমান হইয়াছে, সেই কারণ অমলাকে দেখিয়া বউ-দিদি এখন কোনরূপ অভ্যর্থনা না করিয়া পুনরায় মুখ ফিরাইয়া বসিল। বুদ্ধিমতী অমলা সে ভাব বুঝিতে পারিল। তাড়াতাড়ি শরৎকুমারীর নিকট আসিয়া বলিল,—"বউ-দিদি, আজ একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। দাদা আফিস যাবার খণ্টা খানেক পরেই——"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অমলা চুপ করিতে বাধ্য হইল, কারণ অমলার মুখে এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই তাহারই নিজের কোন অমঙ্গলের সংবাদ মনে করিয়া শরৎকুমারীর প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। শরৎকুমারী তাহার স্বামীর জন্য সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিত। সুতরাং অমলার মুখে এই পর্য্যন্ত শুনিয়া তাহার যেরূপ অবস্থা হইল, তাহা দেখিয়া অমলা সে কথা বন্ধ করিয়া বলিল,—"দাদার কোন অমঙ্গলের কথা নয়, দাদার বন্ধু পরেশ বাবুর স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেন। তাই দাদার আজ আফিস্‌যাওয়া হয়-নি। পরেশ বাবুর কেউ নেই, কিনা; তাই তাঁর একটি ছোট ছেলে আর মেয়ে আমার কাছে দিয়ে গেছেন। তুমি একবার সেই মা-মরা ছেলে-মেয়ের মুখ দেখ্‌লেই, তাদের জন্য তোমারও প্রাণ কাঁদবে। আমি তাদের জন্যে এতক্ষণ তোমার কাছেও আস্‌তে পারিনি।

তা তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ বউ-দিদি?"

অমলার কথা শুনিয়া শরৎকুমারীর অভিমান কোথায় চলিয়া গেল। প্রমেশনাথ বাবুর এরূপ বিপদের সংবাদেও তাহার প্রাণ আকুল হইয়াছিল, কিন্তু শরৎকুমারীর ঐটে কেমন দোষ—সে ভাব তৎক্ষণাৎ গোপন করিয়া ফেলিল এবং কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল,—"আমি আবার কারু উপর রাগ করবো? তোমাদের দয়ার শরীর, পরের দুঃখে তোমরা ভাই বোনে একবারে আকুল হয়ে পড়, ঘর সংসারের কথা পর্য্যন্ত তোমাদের মনে থাকে না। আমাদের কঠিন প্রাণ, কৃঠিন প্রাণ বলেই এখনও বেঁচে আছি।"

শরৎকুমারীর কৃত্রিম ক্রোধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, কারণ তাহার কথা কয়েকটি শেষ হইতে না হইতেই কোথা হইতে দুই ফোটা চক্ষের জল তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল। সে অঞ্চলে তাহার বাহ্য ক্রোধাগ্নিও তৎক্ষণাৎ নিবিয়া গেল। এখন পরদুঃখে যতদূর কাতর মা হউক, নিজের দুঃখে শরৎকুমারীর প্রাণ আকুল হইয়াছিল। পরদুঃখে শরৎকুমারীর প্রাণ কি আকুল হয় না? যে দিবারাত্রি মন-আগুনে পুড়িতে পারে, দুঃখ যাহার নিকট একরূপ পরিচিত, তাহার যে পরের দুঃখে প্রাণ কাঁদে না, একথা কখনই আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। তবে শরৎকুমারী অমলার ন্যায় আত্মহারা হইয়া পরের দুঃখে মগ্ন হইতে পারিত না।

শরৎকুমারীর চক্ষে জল দেখিয়া অমলার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। অমলা বলিল,—"কেন, বউ-দিদি, মিছে-মিছি ভেবে ভেবে শরীর নষ্ট করিস্? সুখ-দোষে গড়ে, দাদা এখন একটু আধটু মদ খেতে শিখেছেন বইত নয়, তা দুদিন পরে সে দোষ সেরে যাবে। তা নইলে, আমার দাদার মতন বিদ্বান, বুদ্ধিমান পরোপকারী—"

অমলার কথায় বাধা দিয়া তৎক্ষণাৎ শরৎকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিল,—"চুপ্ আর বলিস্‌নে চুপ। যাকে প্রথমে মাতাল বলে পরিচয় দিয়েছিস্, তার বিদ্যে-বুদ্ধি ও পরোপকারের পরিচয় আর দিতে হয় না। মাতাল বল্লেই সেই সঙ্গে তার সব পরিচয় দেওয়া হয়।"

অমলা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য পুনরায় বলিল—"দাদা মাতাল বলে—"

'কিন্তু এ আবার কি? শরৎকুমারী এই সময় সগর্জ্জনে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"অমলি, পোড়ার-মুখী—তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! তুই আমারই সুমুখে আমার স্বামীকে মাতাল বলিস্!"

অমলা অপ্রস্তুত হইয়া থতমত খাইয়া গেল। শরৎকুমারীর ভ্রম দূর করিবার জন্য কিছুক্ষণ পরে বলিল,—"তুমি হঠাৎ রাগ করে উঠলে কেন বউ-দিদি? আমি ত দাদাকে মাতাল"—

শরৎকুমারী পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"আবার!"

অমলার মুখে আর কথা নাই, সে তখন বিস্মিত হইয়া শরৎকুমারীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। অমলা বুদ্ধিমতী হইলেও প্রণয়ের এ রহস্য বুঝিবে কিরূপে! বউদিদি তাহার দাদার নাম রাখিয়াছিল—মাতাল। উঠিতে বসিতে তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়াই ডাকিত। আর, কথার উত্তরে ঐ কথা বলিয়াই অমলা এত দোষী হইল! কৈ, অমলা ত তাহার দাদাকে মাতাল বলিয়া কখনই ঘৃণা করে না! সে পূর্ব্বে তাহার দাদাকে যেভাবে দেখিত, এখনও ত ঠিক সেইভাবেই দেখিয়া থাকে।

তবে অমলার উপর তাহার বউদিদির এত রাগ কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অমলা বুদ্ধিমতী হইলেও চতুরা নহে—অমলা সরলা। আর বিশেষতঃ সে বালবিধবা, সুতরাং সে শরৎকুমারীর প্রণয়রহস্য কিরূপে বুঝিবে? অমলা কিন্তু এই সময় একটা কথা বলিতে ছাড়িল না। অমলা বলিল,—"যে কথা শুনলে, তোমার মনে কষ্ট হয়, সে কথা তবে তুমি নিজের মুখে অন্যের কাছে কি করে বল বউদিদি?"

শরৎ।—সাধে বলি—গায়ের জ্বালায় বলি। এমনিকরে তাকে গালমন্দ না দিলে আমার গায়ের জ্বালা নিবারণ হয় না যে!

অমলা।—আমার খাট হয়েছে বউ-দিদি। তোমার মনে কষ্ট হবে জান্‌লে, কি আমি সে কথা মুখে আনি?

শরৎ।—দেখ ঠাকুর-ঝি! আমার বাপ বিদ্বান আর সচ্চরিত্র দেখেই বিয়ে দিয়েছিলেন; আমিও তাঁকে এখনও সেই বিদ্বান আর সচ্চরিত্র বলেই জানি। অনেক সময় তার এই সব ব্যবহারে তার চরিত্রের ওপর সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু অনেক সময় আবার তার মুখে দুই একটি ভাল কথা শুনলেই আমার মনে আর কোন সন্দেহই থাকে না। কিন্তু ঠাকুর-ঝি, এবারকার গতিক আমি ভাল বুঝ্‌ছি না; সেই শনিবার থেকে আজ পাঁচদিন আমার সঙ্গে একটিও বাক্যালাপ করেনি।

এই কথা কয়েকটী বলিতে বলিতে শরৎকুমারী কাঁদিয়া আকুল হইল। অমলার নিকট হৃদয়ের সে ভাব আর গোপন রাখিতে পারিল না। অমলা তাহার বউদিদিকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল,—"ছি বউদিদি, দাদা পাঁচদিন কথা কননি বলে, তোমার অত কষ্ট?"

শরৎ।—ঠাকুর-ঝি, স্ত্রীপুরুষে একত্রে থেকে কথা না কয়ে থাকা যে কি কষ্ট তা তুই কি কোরে বুঝ্‌বি? এর চেয়ে তোর দাদা মাতাল হয়ে এসে, যদি আমায় গাল দিতো, বোধ হয়, তাতে আমার এতো কষ্ট হতো না।

অমলা।—আচ্ছা বউদিদি, তুমি কথা কইলেও দাদা তোমার সে কথার উত্তর দেন না।

শরৎ।—আমি কি তোর দাদার কাছে সেধে কথা কইতে যাবো নাকি?

অমলা।—কেন তাতে দোষ কি?

শরৎকুমারী পুনরায় নিজমূর্ত্তি ধরিল, এইবার যেন রাগিয়া বলিল—"আমার এত দায় নেই।" তার ইচ্ছে হয়, সে কথা কইবে, ইচ্ছে না হয়, তার কথা কয়বার দরকার নেই।"

অমলাকে আমরা বুদ্ধিমতী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমরা বুঝিতেছি যে অমলার সে বুদ্ধির একটা সীমা আছে। অমলা অন্য সকল কথা বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহার বউদিদির সকল সময়ের সকল কথা বুঝিতে পারে না।

সেই কারণ অমলা পুনরায় বলিল,—"বউদিদি, স্বামীর কাছে আবার মান অপমান কি? স্বামীর মানেই স্ত্রীর মান, আর তাঁহারই অপমানে স্ত্রীর অপমান।"

শরৎকুমারী হাসিয়া অমলার গালে ঠোনা মারিয়া বলিল—"তুই যে দিনকার ছুঁড়ি, তুই স্বামীর মান অপমানের কি ধার ধারিস্‌লা?"

অমলার গালে কোনরূপ আঘাত না লাগিলেও সে ঠোনাটা কিন্তু যেন তাহার প্রাণে গিয়া আঘাত করিল। অমলা যে বাল-বিধবা এই কথা তৎক্ষণাৎ অমলার মনে উদয় হইয়াছিল। সুতরাং অমলার মুখখানি তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণ হইল। এ বিষণ্ণতার কারণ অমলা না শরৎকুমারী?

আমরা জানি অমলা নিজের দুঃখদুর্দ্দশার কথা ভাবিতে কখন সময় পাইত না।

এই সময় শরৎকুমারী আবার তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল—"কই পরেশ বাবুর ছেলে মেয়ে কোথায়? আমার নিজের দুঃখ ভাব্‌বারই সময় পাইনে, তা পরের দুঃখ ভাবি কখন?"

অমলার বিষণ্ণতা অমনি দূর হইয়া গেল, আর কোন কথা না বলিয়া যেখানে সুখদাকে রাখিয়া আসিয়াছিল, সেইখানে শরৎকুমারীকে লইয়া চলিল। পরের দুঃখের কথা মনে হইলে অমলা নিজের দুঃখ তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যাইত।

মতামত।

পুস্তক সম্বন্ধে।—

ভক্ত-চরিতামৃত।—অর্থাৎ গৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীমৎ-রূপ,সনাতন ও জীব গোস্বামীর বিস্তৃত জীবন-চরিত। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

ভগবদ্ভক্ত রূপ, সনাতন প্রভৃতির নাম আর আজকাল হিন্দুর অবিদিত নাই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীমৎ রূপ-সনাতনের নাম ও আজকাল বৈষ্ণব-হিন্দুর উপাসনার সামগ্রী। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকে সেই ভগবদ্ভক্ত রূপ-সনাতনের জীবনী প্রবর্ত্তন করিয়া, ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ইহাতে শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপ-সনাতনের ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক নানা উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে। ফলতঃ এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিলে আমরা সুখী হইব।

রঙ্গভূমি সম্বন্ধে।

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার।—সম্প্রতি মৃণালিনীর অভিনয়ে ইহাঁরা বিশেষ গুণপণা প্রদর্শন করিতেছেন। পুরাতন ও দক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের সম্মিলনে ইহাঁদের যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যাইতেছে।

ষ্টার থিয়েটার।—ধরণ-ধারণ, চালন-চলন, আদব-কায়দায়, ইহাঁদের বিশেষ বাহাদুরী দেখা যায়। এ বিষয়ে এ কোম্পানীর ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইহাঁদের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাঁদের বন্দোবস্ত-গুণে বাস্তবিকই আমরা অনেক সময় মুগ্ধ হইয়াছি।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান।

অষ্টম বর্ষ। ২২এ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। দশম সংখ্যা।

সাধ।

সঙ্গীতের ছায়া-মাঝে বিছানা রচিয়া,
রহিব শুইয়ে।
ঘুমময়ী নিদ্রা আসি, বসিবে শিয়রে হাসি,
সুধারে তাহার পানে থাকিব চাহিয়ে;
স্মৃতিরে ভুলিয়ে।
নিরাড়ি শিশুর হাসি ভাষা বিরচিয়া,
আমাকে মোহিয়া;
কল্পনা ছড়াবে পাখা, কথা কবে মধুমাখা,
জেছিনায় দুজনাএ যাইবে ভাসিয়া;
সে কথা শুনিয়া।
দেখিতে একটি শুধু পরাণ-পুতনে,
সাধ যায়ে মনে;
এত কি মাধুরী-মাখা, এত কি অমিয়-ঢাকা,
সেই পুরাতন আহা, তাই ভাবি মনে;
সে সাধ তো পোরেনি জীবনে।
নূতন হইতে সে যে-নবীনতা ময়,
অমিয় আলয়;
যার প্রেম চাহিয়াছি, যারে ভাল বাসিয়াছি,
চিরদিন রহিয়াছে সে যে প্রেমময়;
সাধ তার দেখিতে হৃদয়।
আমারে দেখিয়ে তার কোন পিরা দিয়ে,
যায় রুধির বহিয়ে।
প্রণয়ের মাঝে তার, সন্দেহ কি আছে আর,
ভালবাসা-শশী তার কোন পাখি নিয়ে
খেলা করে জ্ঞান হারাইয়ে?
সে ভাব আমায় তুমি দেখাও কল্পনে,
দেখি সুগোপনে।
যা দেখিতে আমি চাই, স্থিরদৃষ্টি দিয়া তাই,
দেখিতে বাসনা মোর বসি এ বিজনে;
তুমি দেখাও গোপনে।
মনেতে যেমন ভাবি যদি হয় তাই,
কিছু নাহি চাই;
দৃষ্টি দিয়া এ হৃদয়, তাতে গিয়ে হবে লয়,
বাসনা আমার মনে আর কিছু নাই;
শুধু তারে দেখিবারে চাই!
আর—আর!
যদি নাহি স্থান থাকে আমার সেথায়,
তবে কি করিব হায়!
অতি দূরে পলাইয়া, চেতনারে তেয়াগিয়া,
অচেতন হয়ে আমি রহিব তথায়;
জীবনের কাছ হতে লইব বিদায়!

৪০০০০৮-[illegible] ১৮৯।৮৪

ধর্ম্মচিত্র।

(২.)

দ্বিতীয় প্রশ্ন।—জগৎ কি?

নিরীশ্বরবাদিগণ এই দৃশ্যমান জগৎকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করেন। এখন যেমন দেখিতে পাইতেছি, অনাদি অনন্ত কাল ইহা এইভাবেই চলিয়া আসিতেছে। জগৎ কেহ কখন সৃজন করে নাই বা কখন ইহার ধ্বংস হইবে না। যখন বীজ ভিন্ন অঙ্কুরোৎপন্ন হয় না, আবার বৃক্ষ ভিন্নও বীজ জন্মে না, শুক্রবিন্দু ভিন্ন মনুষ্য জন্মে না, আবার মনুষ্য ভিন্ন শুক্রবিন্দু উৎপন্ন হয় না, এবং এইরূপে জাগতিক প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তির কারণ প্রত্যেক পদার্থে নিহিত রহিয়াছে, তখন প্রত্যেক পদার্থই অনাদি।

আস্তিক-সম্প্রদায় মধ্যে কেহ কেহ জগতের ধারাবাহিক নিত্যত্ব স্বীকার করিলেও, জগৎ অনাদি বলিয়া স্বীকার করেন না। আস্তিক-মতে জগৎ সৃষ্টবস্তু। জগতের উৎপত্তি-সম্বন্ধে আস্তিক-শাস্ত্র-মধ্যে মতভেদ থাকিলেও, সকল মতেই জগতের উৎপত্তি এবং লয় আছে।

বেদান্তমতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই জগৎ-সৃষ্টির কারণ। ব্রহ্মের আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুইটী শক্তি আছে। আবরণ-শক্তি দ্বারা আবৃত আত্মার কর্তৃত্বাদি সংসারে সম্ভাবনা হয়, ও বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা পরমাত্মাতে জগৎ-ভ্রম অর্থাৎ ভ্রমাত্মক এই দৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হয়। যথা,—

"বিক্ষেপশক্তি-লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডাওং জগৎসৃজে।"

বিক্ষেপ-শক্তিশালী অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য হইতে আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ও তন্মাত্রাবস্থিত সূক্ষ্ম-ভূত হইতে সূক্ষ্মশরীর এবং তন্মাত্রাবস্থিত সূক্ষ্ম-ভূত হইতে পরিমিশ্রণ-ক্রিয়া দ্বারা আকাশাদি স্থূল-মহাভূতের উৎপত্তি হয়। এই দৃশ্যমান জগৎ সেই স্থূল ভূতের পরিণাম মাত্র। আবার প্রলয়কালে এই জড়জগৎ স্ব স্ব কারণেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতি কতিপয় মহাপুরাণেও সৃষ্টি-প্রকরণ প্রায় বেদান্তদর্শনের অনুরূপ। তবে অত্যল্পমাত্র প্রভেদ। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ভগবানেক আসেদ মগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণং॥
সবাএব তদা দ্রষ্টা না পশ্যদ্দৃশ্যমেকবাট।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্॥"

আত্মার আত্মাস্বরূপ জগৎস্বামী সেই পরমাত্মা, যিনি সৃষ্টি-সময়ে নানাবুদ্ধিতে পৃথকভাবে উপলক্ষিত হয়েন, তাঁহার আত্মেচ্ছা লীনা হইলে (মহাপ্রলয় সময়ে) এই বিশ্ব একমাত্র ভগবৎস্বরূপ ছিল। সে সময় তিনি স্বয়ং দ্রষ্টা হইলেও, অন্য দৃশ্যপদার্থ কিছুই ছিল না। তাঁহার মায়া-শক্তি তাঁহাতে লীনা থাকা-হেতু দৃশ্যবস্তুর অভাবে আপনি যখন অভাব বলিয়া বোধ করিলেন, তখন তিনি সৃষ্টি-ইচ্ছা করিয়া—

"সাবৈ এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা,
মায়ানাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥"

দ্রষ্টা পরমেশ্বরের দ্রষ্ট দৃশ্যানুসন্ধানরূপা মায়া-শক্তি দ্বারা ভগবান এই পরিদৃশ্যমান জগৎ নির্ম্মাণ করেন।

এই মায়া হইতেই ক্রমে মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব হইতে সূক্ষ্ম আকাশাদি, ক্রমে স্থূলজগৎ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়াছে।

সাঙ্খ্যদর্শনাদি মতেও জগৎ সৃষ্ট পদার্থ। সাঙ্খ্যমতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই সৃষ্টির মূল। এই মূল প্রকৃতি হইতেই মহদাদিক্রমে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। যথা,—

"মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাং।"

(সাঙ্খ্যদর্শন।)

সাঙ্খ্যদর্শনের সহিত পাতঞ্জল-দর্শনের সৃষ্টি-বিষয়ে অন্য কোন প্রভেদ নাই। কেবল সাঙ্খ্যমতের সৃষ্টি মূলপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ও পাতঞ্জল-মতে প্রকৃতির পর আর একটি পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যথা,—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষ
ঈশ্বরঃ॥"

অবিদ্যাজনিত ক্লেশ, কর্ম্মফল-বাসনা প্রভৃতি দ্বারা অসংস্পৃষ্ট যে পুরুষ বিশেষ (পরম পুরুষ), তিনিই ঈশ্বর।

পাতঞ্জল-মতে এই পরমপুরুষের ইচ্ছাক্রমেই প্রকৃতি-তত্ত্ব হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন হয়। আবার কালে সমুস্তই স্ব স্ব কারণে লয় পাইয়া সেই পরমপুরুষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

দেবী-ভাগবত ও মার্কণ্ডেয়-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও সৃষ্টিতত্ত্ব প্রায় সাঙ্খ্যদর্শনের অনুরূপ।

ফলতঃ জগতের উৎপত্তি-সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও, কেহই জগৎ অনাদি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। আস্তিক-শাস্ত্র-মাত্রেই জগৎকে সৃষ্টপদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে বিরোধ কেবল নিরীশ্বরবাদীর সহিত। এক্ষণে দেখা যাউক, উভয় মতের কোনটি যুক্তি প্রতিপাদ্য।

প্রথম দেখা আবশ্যক, অনাদি বা নিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, ক্ষয়োদয় নাই, পরিবর্ত্তন নাই, তাহাই অনাদি বা নিত্য। আর, যাহার উৎপত্তি, ধ্বংস, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও সীমা আছে, তাহাই অনিত্য। সুতরাং এই দৃশ্যমান জগৎকে কখনই অনাদি বা নিত্য বলা যাইতে পারে না। জগৎ-শব্দের প্রকৃতার্থ সমূহ। অতএব জগতস্থ প্রত্যেক পদার্থের সমষ্টির নাম জগৎ। কিন্তু জগতস্থ ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন পদার্থকেই আমরা অসীম বা ক্ষয়োদয়-বিরহিত দেখিতে পাই না। চেতন-অচেতন বহু পদার্থের আধার এই পৃথিবী যত বৃহৎ হউক না কেন, তাহা অসীম নহে। আবার পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য এগার কোটী গুণ বৃহৎ, অথচ তাহাও অসীম নহে। এইরূপে জগতের সমস্ত পদার্থই সান্ত, অতএব সমস্তই অনিত্য। যে পদার্থের সমষ্টি লইয়া জগৎ, তাহার কিয়দংশ অনিত্য হইলেই জগতের অনিত্যতা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং উৎপত্তি-ধ্বংস-পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনশীল সান্ত জগৎ যে সৃষ্ট পদার্থ, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তৃতীয় প্রশ্ন।—জগতের নিয়ন্তা কে?

কোনরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও, মানব-হৃদয়ে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, এই দৃশ্যমান্ বিশ্বযন্ত্রের নিয়ন্তা কে? কাহার অথও আজ্ঞায় অনন্ত গগনমার্গে এই সুবিশাল জ্যোতিশ্চক্র প্রতিনিয়ত স্ব স্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতেছে? কাহার আজ্ঞায় দিন রাত্রি পক্ষ ঋতু অয়ণ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইতেছে? কাহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য তাপ দিতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ

করিতেছে? কাহার আজ্ঞায় তরুলতা জন্মি, ভেঁছে, ফুল ফুটিতেছে, ফল ফলিতেছে? এই জড়জগৎ অবিরামগতিতে নিয়ত ঘুরিতেছে কেন? কে চালায়, কেন চলে? বিশ্বযন্ত্র পরিচালনের প্রয়োজন কি? প্রশ্নগুলি সমস্ত মানবের লক্ষ্যেই একরূপ, কিন্তু উত্তর পৃথক্ পৃথক্।

নিরীশ্বরবাদিগণ বলিয়া থাকেন, এই বিশ্ব প্রাকৃতিক শক্তিবলে পরিচালিত, ইহার কোন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা নাই। তদ্ভিন্ন কেহ বলেন, প্রত্যেক পদার্থে প্রাকৃতিক শক্তি পৃথক্ পৃথক্; আবার কেহ বলেন, সমস্ত জগতের মূলে এক আদিশক্তি প্রতিনিয়ত ক্রিয়া বিকাশ করিতেছে। কিন্তু ঐ উভয় মতেই উহা জড়-শক্তি। যেমন চুম্বকের সন্নিধানে লৌহ রাখিলে অচেতন চুম্বক তাহাকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ জগতের প্রত্যেক পদার্থই প্রতিনিয়ত নিয়মানুসারে পদার্থান্তরকে আকর্ষণ করিতেছে; এবং কেন্দ্রাভিকর্ষিণী ও কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিবলে সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী ও সমস্ত গ্রহনক্ষত্রাদি স্ব স্ব গতিপথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। এই পৃথিবী ও গ্রহনক্ষত্রাদির গতি দ্বারাই দিবা রাত্রি পক্ষ ঋতু অয়ন প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত হয়, এবং সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ও লয় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, ইহার কোন স্বতন্ত্র চৈতন্যময় চালক নাই।

অপর পক্ষ আস্তিকগণ বলেন, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অনন্তনিয়মেই জগৎ পরিচালিত হইতেছে। ঈশ্বরের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সেই সুনিয়ম রক্ষা করিতেছেন। ঈশ্বর নিয়ামক, প্রকৃতি সেই নিয়মের ধারিণী। আস্তিক-সম্প্রদায়-মধ্যে এতৎসম্বন্ধে অনেকপ্রকার মতভেদ আছে। কেহ বলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভেই ঈশ্বর সমস্ত বিধিবদ্ধ করিয়া স্বয়ং নির্লিপ্তভাবে আছেন। তাঁহার সেই অখণ্ডনিয়মানুসারেই অনন্তকাল জগৎ পরিচালিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি প্রত্যেক জন্মাদ্যবস্থাদেই সমস্ত নিয়ম রচনা করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন, জড়-জগতের পক্ষে তাঁহার কৃত নিয়মগুলি অখণ্ডভাবে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু চৈতন্যময় জীবের পক্ষে সে ব্যবস্থা নহে। কর্ম্মানুসারে জীবের উন্নতি-অবনতি হইলেও, অনেক সময় জীবের জন্য তাঁহাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু ভক্তি-শাস্ত্রের কথা এ সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভক্তি-শাস্ত্রের মতে ভক্তবৎসল ভগবান্ জড়জগতের জন্য যে নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পক্ষে তাহাও অখণ্ডনীয় নহে। ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তের জন্য প্রতিনিয়ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া, নিয়মরক্ষা-নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। তিনিই যাহার জীবনসর্ব্বস্ব, সে প্রাকৃতিক নিয়মের বাধ্যতা স্বীকার করে না। ভক্ত আইনের দাস নহে, আইন ভক্তের দাস। ভক্তের নিকট ভগবান্ ইচ্ছাময়, সুতরাং ভক্তের আবদার তাঁহাকে প্রতিনিয়তই সঙ্কুচিত করিতে হয়। প্রেম সাধ্যক পদার্থ নহে, তাহা স্বয়ং জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। প্রেম স্বভাবতঃ অন্ধ; তাহার নিকট ভালমন্দ বিচার নাই, সে কখনও নিয়ম-নীতির অনুসরণ করিতে চায় না। সুতরাং সে শাস্ত্রের কোন কথা লইয়া বিচার করিবার আবশ্যক নাই।

এক্ষণে যুক্তি দ্বারা নাস্তিক-মতের নিরসন ও আস্তিক-মতের যে পার্থক্য, তাহা লইয়া আলোচনা করিব।

"ঈশ্বর" ও "প্রকৃতি" এ দুইটি শব্দই শুটিকত বর্ণসমষ্টি বৈ আর কিছুই নহে। যদি প্রকৃতিকে চৈতন্যস্বরূপা সর্ব্বশক্তিমতী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতির আর বড় অধিক অন্তর থাকিবে না। আর যদি প্রকৃতিকে বা প্রাকৃতিক শক্তিকে জড় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়িবে। সুতরাং যাঁহারা প্রকৃতিকে চৈতন্যস্বরূপা বলেন, তাঁহাদিগের সহিত বিশেষ বিরোধ নাই। তবে যাঁহারা প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক শক্তিকে জড়ত্ব কল্পনা করেন, তাঁহাদিগের মত খণ্ডনের জন্যই যুক্তির প্রয়োজন।

১ম। আমরা এই দৃশ্যমান জগতে যে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পাই, তাহা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা, চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ। এই তিন শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণী-মধ্যে আবার অসংখ্য শ্রেণী-বিভাগ আছে। আবার এই অসংখ্য শ্রেণী মধ্যে প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর অবয়বও বিভিন্ন শ্রেণীর ওষধিসমষ্টি মাত্র। সুতরাং একটী বালুকাকণার সদৃশ আর একটী বালুকণা নাই, এক বৃক্ষের একটী পত্রের সদৃশ দ্বিতীয় পত্র নাই, একটী জীবের অনুরূপ দ্বিতীয় জীব নাই, অথবা জীবদেহের কোন একটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সদৃশ অন্য একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই। অথচ প্রত্যেক পদার্থে এবং প্রত্যেক পদার্থের এক-একটী সূক্ষ্মাংশে এক একটী বিভিন্ন শক্তি বিদ্যমান। এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থে বিভিন্ন শক্তি দেখিয়া, নিরীশ্বরবাদিগণ সমস্ত জগতের একটী আদি-শক্তি স্বীকার করেন না। কিন্তু আস্তিক-সম্প্রদায় জগতের সমস্ত পদার্থে পৃথক পৃথক-শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াও, তাঁহারা সমস্ত জগতের মূলে এক ত্রিগুণাত্মিকা আদি-শক্তি স্বীকার করেন। এস্থলে আমরা সমষ্টি ও ব্যষ্টি দুইটীমাত্র উদাহরণ দিয়া, আস্তিক-মতের শ্রেষ্ঠতা দেখাইতে চেষ্টা করিব। একটী সামান্য কৃষকের ক্ষেত্রের পার্শ্বে অপর একটী কৃষকের ক্ষেত্র থাকিলে তাহারা সীমা লইয়া পরস্পরের সর্ব্বদা বিবাদ হয়, এবং পরস্পর পরস্পরের সীমা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে। এইরূপে, একজন সম্রাট অপর এক জনের সাম্রাজ্য অধিকার করিবার জন্য নিয়ত চেষ্টিত থাকিয়া, সুযোগ পাইলেই তাহা স্ব-রাজ্যভুক্ত করেন, এবং যতদিন তাহা সাধিত না হয়, ততদিন পরস্পরের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম চলিতে থাকে। কিন্তু এই বিরাট বিশ্বরাজ্যের মধ্যে কত সৌরজগৎ, কত সূর্য্য, কত চন্দ্র, কত গ্রহ-উপগ্রহাদি আছে, এবং তাহারা ভীষণবেগে স্ব স্ব গতিপথে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে; তাহাদিগের মধ্যে কখনও কোন বিরোধ দেখিতে পাই না, বরং প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের আশ্চর্য্য সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। এই গ্রহনক্ষত্রাদির সংস্থান দ্বারাই জগতের সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি, পরিবর্ত্তন ও লয় হইতেছে। যদি এই গ্রহ-উপগ্রহাদি প্রত্যেকে এক একটী পৃথক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইত, তবে কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ থাকিত না, এবং গতিপথে পরস্পর সংঘর্ষণ হইয়া সমস্ত জগতে প্রলয়-কাল উপস্থিত হইত। কিন্তু কখনও এরূপ ঘটনা সংঘটন হয় নাই। বরং সকলেই একসূত্রে গ্রথিতের ন্যায় একের সাধনায়ত্তে স্ব স্ব কক্ষপথে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া, এই বিশাল বিশ্বে যে এক নিয়ন্তার অধীন, ইহাই প্রমাণিত করিতেছে। আবার এই সমষ্টির ব্যষ্টিস্বরূপ জীবদেহ বা তরুলতাদির প্রতি চাহিয়া দেখ, তাহাতেও এই নিয়ম দেখিতে পাইবে। জীবদেহের বা তরুলতাদির প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বিভিন্নাবয়ব এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রের শক্তি বা ক্রিয়াও

সম্পূর্ণ পৃথক ; অথচ প্রত্যেকের সহিত অভিন্ন সম্বন্ধ—সমস্ত অবয়বে সমস্ত শক্তির একত্র সংস্থানের নাম জীব বা তরুলতাদি। সুতরাং ব্যষ্টিভাবে সামান্য একটি পিপীলিকা বা তৃণাঙ্কুর হইতে সুবৃহৎ গ্রহাদি পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদার্থে পৃথক পৃথক শক্তি থাকিলেও, সমস্তই সমষ্টিরূপে এক আদি-শক্তির অধীন। এই অনন্ত জগৎ যে সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণাত্মিকা এক মহাশক্তির অধীন, তাহা সর্ব্বদাই সকলের প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রত্যেক পদার্থের আকৃতি-প্রকৃতি পৃথক পৃথক হইলেও, সমস্ত পদার্থই সত্ত্বরজস্তম অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধীন। অতএব, একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন সমস্ত পদার্থের মূলে যে একটি শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যেমন, একটিমাত্র বাষ্পীয়-যন্ত্রের সহিত নানাপ্রকার যন্ত্র সংযোগ করিয়া দিলে তাহাতে যেরূপ এক-এক স্থলে এক-একটি পৃথক কার্য্য (অর্থাৎ কোন স্থলে ময়দা ভাঙ্গা, কোন স্থলে মুদ্রাঙ্কণ কোন স্থলে তৈল বাহির প্রভৃতি নানা কার্য্য) এককালে সম্পন্ন হয়; তদ্রূপ, বহুযন্ত্র-সমন্বিত এই সুবিশাল বিশ্বযন্ত্রের মূলেও একমাত্র ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে পৃথক পৃথক ক্রিয়া বিকাশ করেন।

২য়। সমস্ত জগতের মূলে যে এক আদি শক্তির কথা বলা হইল, এক্ষণে দেখিতে হইবে, তাহার স্বরূপ কি? অর্থাৎ ঐ মহাশক্তি জড়, না চৈতন্যময়। নাস্তিকেরা ঐ শক্তিকে জড়-শক্তি এবং আস্তিকগণ নিত্যচৈতন্যরূপা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এস্থলে নিরীশ্বরবাদিগণের উক্তি নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ, জড়শক্তি কখনই নিয়ম-বিধানে সমর্থা হইতে পারে না। নিয়ম-সংস্থান বুদ্ধি-বৃত্তির কার্য্য। যাহা করিতে যে-শক্তির প্রয়োজন, তাহার প্রতিক্রিয়া করিতেও সেই শক্তির প্রয়োজন। একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর যে পরিমাণ শক্তিপ্রয়োগে একস্থানে স্থাপিত করা হয়, সেই পরিমাণ শক্তি-ব্যতীত তাহা কখনই স্থানান্তরিত করা যাইবে না। কালিদাস যে শক্তিবলে শকুন্তলা রচনা করিয়াছেন, তত্তুল্য কবিত্ব-শক্তি ভিন্ন অপর কেহ উহা লিখিতে সমর্থ হইবে না। এই নিয়মে যাহার যতটুকু বুদ্ধি, সে ততটুকু বৈজ্ঞানিক নিয়মের তত্ত্ব-নির্ণয়ে সমর্থ। সুতরাং বুদ্ধি ভিন্ন যখন প্রাকৃতিক নিয়ম স্থির করা যায় না, তখন ঐ নিয়মও যে বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ। কিন্তু বুদ্ধি কখনও চৈতন্যের আশ্রয় ব্যতীত জড়-শক্তিতে অবস্থান করিতে পারে না। বিশেষতঃ এই দৃশ্যমান জগতের কোন নিয়মই উদ্দেশ্য-শূন্য নহে। মানব-শিশুর একমাত্র ভরসা দুগ্ধ। কিন্তু তাহার ভাণ্ডার-গৃহ মাতৃ-হৃদয়ে শিশু জন্মিবার অনেক পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভ্রূণ গর্ভস্থ না হইলে সে ভাণ্ডারে দুগ্ধসংগৃহীত হয় না, অথচ যথাকালে সেই ভাণ্ডার দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়। মাতা পূর্ব্বেই যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতেন, গর্ভাবস্থাতেও ঠিক তাহাই করেন; কিন্তু পূর্ব্বে যে পদার্থে মাতৃস্তনে ক্ষীর উৎপন্ন হইত না, গর্ভাবস্থাতে আবার সেই পদার্থ হইতে ক্ষীর উৎপন্ন হয়; এবং শিশু পাকস্থলীর পরিপাক-ক্রিয়ার সমর্থানুসারে ঐ স্তন্যদুগ্ধ ক্রমে গাঢ় হইয়া প্রয়োজনাভাবে তিরোহিত হইয়া যায়। আবার প্রয়োজনানুসারে পুনঃপুনঃ ঐরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া, কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে উদয় না হয় যে, এইরূপ আপেক্ষিক কার্য্য কখনই উদ্দেশ্যশূন্য নহে। কিন্তু

এইরূপ আপেক্ষিক প্রয়োজন বুঝিয়া নিয়ম নির্দ্ধারণ করা, কি জড়শক্তির দ্বারা সম্ভব হইতে পারে? না, তাহা কখনই নহে। আরও দেখ, জড়শক্তিসম্পন্ন বাষ্পীয়যন্ত্রের দ্বারা অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে নানাবিধ কার্য্য সাধন হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার নির্ম্মাতা বা চালক চিচ্ছক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিময় জীব। ঐ যন্ত্রের মূলে চিচ্ছক্তি না থাকিলে, কখনই উহা কার্য্যক্ষম হইতে পারিত না। তদ্রূপ, এই জড়-শক্তি-সম্পন্ন বিশাল বিশ্বযন্ত্রের মূলেও কোন অপরিসীম চিচ্ছক্তি না থাকিলে, কখনই ইহা এরূপ সুনিয়মে পরিচালিত হইত না।

সমস্ত জগতের মূলে যদি এক আদি-শক্তি ও তাহা চৈতন্যময়ী প্রতিপন্ন হইল, তবে ঐ শক্তিকে দেবী-ভাগবৎ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি শাক্তমতের "প্রকৃতি" বলা যাইতে পারে, এবং ঐ শক্তিকে ব্রহ্মশক্তি বা সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী বলিলেও কোন দোষ ঘটিতে পারে না। কারণ, চৈতন্যময়ী আদিশক্তির সহিত ঈশ্বরের অতি অল্পই প্রভেদ।

এক্ষণে দেখা যাউক, আস্তিক-মত-মধ্যে এই জগতের নিয়ম-সম্বন্ধে যে কিছু মতভেদ আছে, তাহার কোনটী যুক্তিযুক্ত। কেহ বলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বেই ঈশ্বর এই সৃষ্টির সমস্ত নিয়ম স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, অনন্তকাল সেই নিয়মেই সৃষ্টির কার্য্য চলিবে, কখনও তাহার অন্যথা হইবে না। যেরূপ, কোন এক ব্যক্তি একটি ঘটিকা-যন্ত্র প্রস্তুত করিলে তাহার গতি প্রভৃতির নিয়ম ঘড়ি-প্রস্তুতের পূর্ব্বেই স্থির করে, এবং যত দিন ঐ ঘড়ি টিকিত না হয়, ততদিন ঐ নিয়মেই চলে; তদ্রূপ, এই বিশ্বরূপ ঘটিকা-যন্ত্রও মহা প্রলয়ের কাল পর্য্যন্ত এক নিয়মেই পরিচালিত হইবে। আবার বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ বলেন যে, জড়-জগতের পক্ষে তাহা অখণ্ডনীয় বটে, কিন্তু চৈতন্যময় জীবের পক্ষে সে নিয়ম নহে। চৈতন্যময় জীবের পক্ষে মোটামুটি একটা নিয়ম থাকিলেও, অনেক সময় ঈশ্বরকে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে হয়। নচেৎ, জড়ের সহিত চৈতন্যের কোন প্রভেদ থাকে না। কারণ, স্বাধীনতাই চৈতন্যের লক্ষণ। কিন্তু চৈতন্যময় জীবের সেই স্বাধীনতা সীমা-বিশিষ্ট। আবার কর্ম্মানুসারে ক্রমে সেই স্বাধীনতা কর্ম্মাধীন হইয়া থাকে, এবং সেইজন্যই অনেক সময় ইচ্ছা-সত্ত্বেও জীব সেই স্বাধীনতা-বৃত্তি অভিলষিত পথে পরিচালিত করিতে পারেন। জীবকে সীমা-বিশিষ্ট স্বাধীন না বলিলে, পাপ-পুণ্যের জন্যও জীব দায়ী হইতে পারে না। পাপ-পুণ্যের ফলে যখন জীবকে সুখদুঃখের ভাগী হইতে হয়, তখন তাহাকে অবশ্যই স্বাধীন বলিতে হইবে। নচেৎ, জীবের পাপের জন্য ঈশ্বরের প্রতি অবৈধরূপে দোষারোপ করা হয়। সুতরাং জীব সীমাবিশিষ্ট স্বাধীন। অতএব, স্বাধীন জীবের নিয়ম-বিগর্হিত কার্য্য-পরম্পরা দ্বারা যখন জগতে নানারূপ ভৌতিক বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই শান্তি-স্থাপনের জন্য ঈশ্বরকে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে হইয়া থাকে; এবং এইজন্যই সময় সময় অবতারের প্রয়োজন। যথা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি অর্থাৎ হ্রাস এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময়েই ভূমি আমাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি (অবতার-রূপে প্রকাশিত হই)।

আস্তিকগণ-মধ্যে যে সামান্য মতভেদ

লক্ষিত হয়, তাহার মুখে কোন দোষ না থাকিলেও, উল্লিখিত মতদ্বয় মধ্যে আমরা পরোক্ত মতকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করি।

শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড কোন এক অনন্তশক্তিসম্পন্ন পরম পুরুষ বা পরমা-প্রকৃতি অথবা প্রকৃতি-পুরুষাত্মক পরমব্রহ্মের ইচ্ছা ও নিয়মবলে পরিচালিত হইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি।

মৃণালিনী।

তৃতীয় খণ্ড।

এ সংসারে রত্ন—রমণীর হৃদয়।

কে বলে সমুদ্রতলে রত্ন জন্মে? এ সংসারে রত্ন—রমণীর হৃদয়।

মেয়ে-মানুষের মুখ বন্ধ থাকিবার নহে।

এই যে ছুঁড়ি ঘরের ভিতর বসিয়া আছে, এ ছুঁড়ি বোবা, নহিলে, এখনও কথা কয় না কেন? মেয়ে-মানুষের মুখ, এখনও বন্ধ!

রূপজ মোহ ও স্ত্রীপুরুষের অবাধ সংঘর্ষণ প্রণয়োদ্দীপক।

প্রশ্ন। কি বুঝিলে?

উত্তর। কয়েকটী লক্ষণমাত্র।

প্র। কি কি লক্ষণ?

উ। ১। মেয়েটী আশ্চর্য্য সুন্দরী;—আগুনের কাছে ঘৃত কি গাঢ় থাকে?

২। মনোরমা ত হেমচন্দ্রকে ভালবাসে, নহিলে এত যত্ন করিল কেন?

৩। একত্রে বাস।

৪। একত্রে রাত্রে পর্য্যটন।

৫। চুপি চুপি কথা।

প্র। মনোরমা ভালবাসে; হেমচন্দ্রের কি?

উ। বাতাস না থাকিলে কি জলে ঢেউ হয়?

[গিরিজায়া নিরক্ষর ভিখারিণী, শুনা কথায় তাহার সকল শিক্ষার পরিসমাপ্তি। সে বুঝি কোথায় শুনিয়াছিল—

"ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।
তস্মাদ্ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্বুধঃ॥"

তাই উল্লিখিত যুক্তি বাহির করিল। কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, ঐ সমস্ত লক্ষণে প্রণয় জন্মে বটে, কিন্তু সে অপবিত্র স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় নহে—ভ্রাতা-ভগিনীর স্বর্গীয় নিঃস্বার্থ প্রেম। প্রমাণ, মনোরমা ও হেমচন্দ্রের ভালবাসা।]

গিরিজায়ার গীত।

১। কাহে সোই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজ কি কিশোর সোই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।
মিলি গই নাগরী, ভুলি গেই মাধব,
রূপ-বিহীন গোপকুমারী।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক,
হেম বঁধু রূপকি ভিখারী॥
আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলনু,
হৃদি বৈঠু চরণ যুগল।
যমুনা-সলিলে সই, অব তনু ডারব,
আন সখি ভখিব গরল॥
কিবা কানন-বল্লরী, গল বেড়ি বান্ধই,
নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে—শ্যাম শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম জপয়ি
ছার তনু করব বিনাশ।

২। এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে,
কিম্বা জন্ম-জন্মান্তরে এ সাধ মোর পুরাইবে।
বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুনঃ,
আমারে আবার যেন, রমণী-জনম দিবে।
লাজ-ভয় তেয়াগিব, এ সাধ মোর পুরাইব,
সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখিব নিশি দিবে॥*

উদ্দেশ্য-বিহীন দৃষ্টির স্বরূপ নির্ণয়।

হেমচন্দ্র মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন; আবার চক্ষু অবনত করিলেন; পুনর্ব্বার উন্মুক্ত-গবাক্ষপটে দৃষ্টি করিলেন; আবার মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা বুঝিলেন যে, দৃষ্টির এইরূপ গতির কোন উদ্দেশ্য নাই। যখন কথা কণ্ঠাগত, অথচ বলিবার নহে, তখনই এইরূপ দৃষ্টি হয়।

প্রণয়ের বেগ অনিবার্য্য।

মনোরমা। বুঝিয়াছি। তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে।

হেমচন্দ্র। ভালবাসিতাম। (নীরবে রোদন)।

ম। (বিরক্তভাবে) ছি, ছি! প্রতারণা! এ সংসার প্রতারণা, প্রতারণা! কেবল প্রতারণা!

হে। (বিস্মিত ভাবে) কি প্রতারণা করিলাম?

ম। ভালবাসিতাম কি? তুমি ভালবাস। নহিলে কাঁদিলে কেন?—কি? আজ তোমার স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার প্রণয় বিনষ্ট হইয়াছে? কে তোমায় এমত প্রবোধ দিয়াছে?—এ কেবল বীরদম্ভকারী পুরুষদিগের দর্পমাত্র। অহঙ্কার করিয়া প্রণয়-অগ্নি নির্ব্বাণ করা যায়? তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কুল-পরিপ্লাবিনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না।

গঙ্গাপ্রবাহ-রহস্য।

পুরাণে আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন; এক দাম্ভিক মত্তহস্তী তাহার বেগ সম্বরণ করিতে গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি?—গঙ্গা প্রেম-প্রবাহ-স্বরূপ; ইহা জগদীশ্বর-পাদপদ্ম-নিঃসৃত, ইহা জগতে পবিত্র; যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়-জটাবিহারিণী; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধরে* * *। দাম্ভিক হস্তী দম্ভের অবতার-স্বরূপ, সে প্রণয়-বেগে ভাসিয়া যায়। প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী

---

* বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থগুলির মধ্যে "মৃণালিনী"তে সর্ব্বাপেক্ষা গীতিবাহুল্য এবং তাহার অধিকাংশই ব্রজবুলিতে ব্রজের কথায় পরিপূর্ণ। বঙ্গীয় পাঠককে এই সুললিত গীত শুনাইবার জন্যই, বোধ করি, ভিখারিণী গিরিজায়ার সৃষ্টি। এই গীতি বাহুল্যের জন্যও কবিকে নানা নিন্দুকের নানা কথা শুনিতে হইয়াছে; কিন্তু নিন্দুকের নিন্দা বায়ুপ্রবাহে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, আর গিরিজায়া, কত কাল গত হইল, গান শুনাইয়াছে—এখন পর্য্যন্ত তাহার সেই সুললিত সঙ্গীত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গীত হইতেছে। এই গীত বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য রত্ন; যত দিন বঙ্গভাষার জীবনী-শক্তি থাকিবে, ততদিন এই গানের মর্য্যাদাও অক্ষয় রহিবে; এই ভরসায় আমরা সকল গীতগুলি উদ্ধৃত করিলাম। গিরিজা বাবু যেমন বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থগত অনেকগুলি চরিত্রের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই গীতগুলি তদ্রূপ বিশ্লিষ্টভাবে বুঝাইবার সামগ্রী; 'অনুসন্ধানের' গত বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় একজন রসজ্ঞ লেখক এই কার্য্যের পথ প্রদর্শন করিয়া ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন। ভরসা করি, তিনি অন্যান্য গীতগুলির এইরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

হয়,—প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শতপাত্রে ন্যস্ত হয়,—পরিশেষে যাগর-সঙ্গমে লয়প্রাপ্ত হয়,—সংসারস্থ সর্ব্বজীবে বিলীন হয়।

প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই।

পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে, কেন না প্রণয় অমূল্য।* তাই, যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে? যে মন্দ, তাকে যে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে, আমি তাকে বড় ভালবাসি।

স্ত্রীলোকের সতীত্ব।

স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর ধর্ম্ম নাই; যে স্ত্রীর সতীত্ব নাই, সে শূকরীর অপেক্ষাও অধম। সতীত্বের হানি কেবল কার্য্যেই ঘটে, এমত নহে; স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও সতীত্বের বিঘ্ন। তুমি বিধবা,—যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া থাকিবে।

স্মৃতি ইচ্ছাধীন নহে।

মনোরমা। স্মৃতি কি আপন ইচ্ছাধীন? একি পাট কাপড়—মনে করিলে তুলিব, মনে করিলে পরিব?

হেমচন্দ্র। তুমি এক প্রকার মন্দ বলিতেছ না। বিস্মৃতি স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়া নহে; লোক আত্মগুরিমায় অন্ধ হইয়া পরের প্রতি যে সকল উপদেশ দান করে, তন্মধ্যে "বিস্মৃত হও" এই উপদেশের অপেক্ষা হাস্যাস্পদ আর কিছুই নাই।

ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।

হেম। ধর্ম্মের অপেক্ষা প্রণয় ন্যূন। ধর্ম্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে।

মনো। আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা জানি না। আমি এইমাত্র জানি ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।

[মনোরমা কোমৎ-শিষ্য; কিন্তু হেমচন্দ্রের নীতা-শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মে বিশ্বাস। তিনি বলিতেছেন—]

অধর্ম্মের উৎপত্তি।

সাবধান, মনোরমে! বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে; ভ্রান্তি হইতে অধর্ম্ম জন্মে। তোমার ভ্রান্তি পর্য্যন্ত হইয়াছে।

[ভ্রান্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত ঘটে—অধর্ম্মই বিনাশের হেতু—

"ধ্যায়তে বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"*]

প্রেমাসক্ত ব্যক্তি অন্ধ নহে, চক্ষুষ্মান্।

যুনানীয়েরা প্রণয়ের কুপিদ্‌কে অন্ধ বলিয়া কল্পনা করিত। তিনি কাণা হউন, কিন্তু তাঁহার সেবক-সেবিকারা রাত্রি দিন চক্ষুঃ চাহিয়া থাকে। যে বলে যে প্রেমাসক্ত-ব্যক্তি অন্ধ, সে হতি-মূর্খ। আমি যদি অন্যাপেক্ষা তোমাকে অধিক ভালবাসি, তাহাহইলে ইহা নিশ্চিত যে, অন্যে যাহা দেখিতে পায় তদপেক্ষা তোমার অধিক গুণ দেখি। সুতরাং এখানে অন্যাপেক্ষা আমার দৃষ্টির তীব্রতা অধিক। তবে অন্ধ হইলাম কৈ?

শারদীয় নৈশশোভা।

শারদীয়া পূর্ণিমার প্রদীপ্ত কৌমুদীতে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ নীলাম্বু অধিকতর নীলোজ্জ্বল হইয়া

* গীতা। ২। ৬২—৬৩।

প্রভাসিত হইতেছিল। তদুপরি স্পন্দনরহিত কুসুমমালা অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত হইয়া নীলজলে-প্রতিবিম্বিত হইতেছিল; চারিদিকে বৃক্ষমালা নিঃশব্দে পরম্পরাশ্লিষ্ট হইয়া আকাশের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছিল; কচিৎ দুই একটী দীর্ঘ শাখা উর্দ্ধোত্থিত হইয়া রহিয়াছিল। তলস্থ অন্ধকারপুঞ্জ-মধ্য হইতে কুসুম-সৌরভ আসিতেছিল।

কবি।

গিরিজায়া ভিখারিণী-বেশে কবি; স্বয়ং যখন কবিতা রচনা করুক বা না করুক, কবির স্বভাবসিদ্ধ চিত্তচাঞ্চল্যপরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং কবি। কে না জানে যে, কবির মনঃসরোবরে বায়ু বহিলে বীচি বিঘূর্ণিত হয়।

বিষাদসঙ্গীত।

পরাণ না গেলো।
যে দিন দেখনু সই যমুনা কি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,
ওঁহি পর পিয় সই, কাহে বারি-তীরে,
জীবন না গেলো?

ফিরে ঘর আয়নু, না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখিনীরে-আপনা আঁচোলি,
সেই সেই পিয় সই, কাহে লো পরাণি,
তইখন না গেলো?

শুননু শ্রবণ-পথে মধুর বাজে,
রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিন-মাঝে,
যব শুনন্ লাগি সই সো মধুর বোলি,
জীবন না গেলো?

ধায়নু পিয় সই, মোহি উপকূলে,
লুটায়নু কাঁদি সই শ্যাম-পদমূলে;
মোহি পদমূলে রই কাহে লো হামারি
মরণ না ভেল?

অশ্রু-দুঃখের শমতা প্রকাশক।

গিরিজায়া বুঝিতে পারিলেন যে, যখন মৃণালিনীর চক্ষে জল আসিয়াছে—তখন তাঁহার ক্লেশের কিছু শমতা হইয়াছে। ইহা সকলে বুঝে না—মনে করে—"কই—ইহার চক্ষে ত জল দেখিলাম না? তবে ইহার কিসের দুঃখ?" যদি ইহা সকলে বুঝিত, সংসারের কত মর্ম্ম-পীড়াই না জানি নিবারণ হইত।

স্নেহ কি একদিনে ধ্বংস হয়।

স্নেহ কি এতদিনে ধ্বংস হইয়া থাকে? বহু দিন অবধি পার্ব্বতীয় বারি পৃথিবী-হৃদয়ে বিচরণ করিয়া আপন গতিপথ খোদিত করে, একদিনের সূর্য্যোত্তাপে কি সে নদী শুকায়? জলের যে পথ খোদিত হইয়াছে, জল সেই পথেই যাইবে, সে পথ রোধ কর, পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে।

যে কখন রোদন করে নাই, তাহাকে বিশ্বাস করি ও না।

যে কখন রোদন করে নাই, সে মনুষ্যমধ্যে অধম। তাহাকে বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও, সে পৃথিবীর সুখ কখনও ভোগ করে না—পরের সুখও ক্ষণ তাহার সহ্য হয় না। এমত হইতে পারে যে, কোন আত্মচিত্তবিজয়ী মহাত্মা বিনা বাষ্পমোচনে গুরুতর মনঃপীড়া সকল সহ্য করিতেছেন, এবং করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি যদি কস্মিন্‌কালে একদিন বিরলে এক-বিন্দু অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত করিয়া না থাকেন, তবে তিনি চিত্তজয়ী মহাত্মা হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমি বরং চোরের সহিত প্রণয় করিব, তথাপি তাঁহার সহিত নহে।

শারদ নিশীথ শোভা।

নিশীথ সময়ে স্বচ্ছসলিলা বাপীতীরের চারিদিকে নিবিড় বন, ঘন বিন্যস্ত লতাপ্রসূ-

বিশোভী বিশাল বিটপীসকল দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল ;সম্মুখে নীল-নীরদ-খণ্ডবৎ দীর্ঘিকা শৈবাল-কুমুদ-কহ্লার সহিত বিস্তৃত রহিয়াছিল। শিরোপরে চন্দ্রনক্ষত্রজলদ সহিত আকাশ আলোকে হাসিতেছিল। চন্দ্রালোক—আকাশে, রুক্ষশিরে, লতা-পল্লবে, বাপী-সোপানে, নীলজলে, সর্ব্বত্র হাসিতেছিল। প্রকৃতি প্রসন্নাননা, ধৈর্য্যময়ী।

ধৈর্য্যহীন ব্যক্তি সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত।

যাহার ধৈর্য্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, সে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত। কবি কল্পনা করিয়াছেন যে, কেবল অধৈর্য্যমাত্র দোষে বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের নিপাত হইয়াছিল ;—"অশ্বত্থামা হতঃ" এই শব্দমাত্র শুনিয়া তিনি ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলেন, প্রত্যুত্তর দ্বারা সবিশেষ তত্ত্ব লইলেন না।

চতুর্থ খণ্ড।

স্ত্রীপুত্রবিহীন পুরী কাননং হইতে অন্ধকার।

পশুপতি উচ্চ অট্টালিকায় বহুভৃত্য সমভিব্যাহারে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুরী কানন হইতে অন্ধকার। গৃহ যাহাতে আলো হয়, স্ত্রীপুত্রপরিবার—এ সকলই তাঁহার গৃহে ছিল না।

কুলরীতি।

কুলরীতি ত শাস্ত্রমূলক নহে। কুলনাশে ধর্ম্মনাশ বা জাতিভেদ হয় না।

[অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

"কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥"*

সে কিন্তু বংশোচ্ছেদের কথা; আর পশুপতি কহিতেছেন, কৌলীন্য-নাশের কথা। আধুনিক সমাজ-সংস্কারকগণ জাত্যন্তর-পরিগ্রহের ব্যবস্থা প্রচলন করিতে লঘুহস্ত না হইয়া পশুপতি-প্রস্তাবিত কৌলীন্যরীতি সমুচ্ছেদের যত্ন করিলে সমাজের অধিকতর সঙ্গল হইতে পারিত।]

চাতুর্য্যেই বঙ্গের জয়।

বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্য্যেই ইহার জয়।

[কেবল বঙ্গভূমি কেন?—ভারতের সর্ব্বত্র চিরকাল এইভাব। চতুর শ্রীকৃষ্ণ হইতে আমাদিগের সম্মুখস্থ Diplomatist দল—সকলে একই কার্য্যে নিযুক্ত এবং সমভাবে সফলকাম।]

বঙ্গের সুখসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত।

বঙ্গজয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয়-অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম। আকাশের সামান্য নক্ষত্রটীও অস্ত গেলে পুনরুদিত হয়।

[সর্ব্বান্তর্য্যামী বিধাতাই কেবল গ্রন্থকারের এই হতাশ প্রশ্নের উত্তরদানে সক্ষম। নীরবে কাল প্রতীক্ষা কর—দৈববাণী উত্তর শুনাইবে।]

সুখী কে?

গিরি। ঠাকুরাণি! এ সংসারে আপনি সুখী।

মৃণা। কেন?

গিরি। আপনি রাগ করেন না

* গীতা। ১।৩৯।

মৃণা। আমিই সুখী—কিন্তু তাহার জন্য নহে।

গিরি। তবে কিসে?

মৃণা। হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। পাপীর ঈশ্বর-জ্ঞান।

মা জগদম্বে! আর তোকে জগদম্বা বলিব না আর তোমার পূজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব না। আইশব আমি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করিলাম—ঐ পদধ্যান ইহজন্মে সার করিয়াছিলাম—এখন মা একদিনের পাপে সর্ব্বস্ব হারাইলাম। তবে কি জন্য তোমার পূজা করিয়াছিলাম? কেনই বা তুমি আমার পাপমতি অপনীত না করিলে?

[আমি ত "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"]

ধর্ম্মচিন্তা ও বৈধহিংসা-বিচার।

আমরা অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ভ্রমপ্রমাদাদি-পরিপূর্ণ মানব, নিয়ম-পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস না করিয়া, একমাত্র চিন্তার সাহায্যে ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি আমাদের আছে কি? যুগযুগান্ত অনন্যচিত্তে গুরুশুশ্রূষা-পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচারিগণ যে গুরুতর বিষয়ের কতকাংশমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেন, দু'চার পাত অনুবাদ আওড়াইয়া, ম দু'চার পাত পুস্তকে চক্ষুঃসংযোগ করিয়া, অথবা দুটী একটী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা কখনও কি সম্ভবপর হয়? সাধারণতঃ টেলিগ্রাফের কৌশলটী চিন্তা করিতে গেলে যাঁহাদের চক্ষুস্থির হয়, মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হয়, বিঘূর্ণিত হইয়া যাইতে থাকে, তাঁহাদের পক্ষে কেবলমাত্র চিন্তা করিয়া ধর্ম্মের মর্ম্ম স্থির করিতে যাওয়াটা অনধিকার চর্চ্চা বৈ আর কিছুই নহে।

ধর্ম্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্বের যাদৃচ্ছিক পর্য্যালোচনা করিতে আমরা অধিকারী কি না? এ বিষয়ের উত্তর বেদান্ত কিরূপ দিতেছেন, তাহা একটু অভিনিবেশের সহিত পাঠ করিলেই বুঝা যাইতে পারে। যথা,—

"অধিকারীতু বিধিবদধীত বেদ-বেদাঙ্গ-ত্বেন আপাততোঽধিগতাখিল বেদার্থোঽস্মিন জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জন-পুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত নিখিল কল্মষতয়া নিতান্ত নির্ম্মলঃ শান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন প্রমাতা।"

অর্থ।—যথোক্তবিধানে যিনি বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার স্থূলমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, ইহজন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ কার্য্য বর্জ্জনপূর্ব্বক কেবলমাত্র নিত্য-নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত এবং উপাসনা প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহার পাপরাশি বিদূরিত ও চিত্তের নির্ম্মলতা সংসাধিত হইয়াছে, যিনি চতুর্ব্বিধ

সাধন দ্বারা। (নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেকাদি দ্বারা) তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর-তত্ত্ব পর্য্যালোচনায় প্রকৃতাধিকারী, এবং তিনিই ধর্ম্মশাস্ত্রাদির যুক্তি-বিজ্ঞান্থ হইতে পারেন।

আমাদের মত ব্যক্তিগণের কিন্তু "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এবং "স্বর্গ্যে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এই মহার্থযুক্ত বাক্যের অনুসরণ করাই সুসঙ্গতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রকৃত পক্ষে নৈষ্টিক ধার্ম্মিক যাঁহারা, তাঁহাদিগকেও ঐ পদবী অনুসরণ করিতে দেখা যায়।

যুক্তি বা তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না বলিয়াই যে ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিব, অথবা মনঃকল্পিত একটা-একরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকে বহুরূপী সাজাইব, তাহা কখনও সঙ্গত নহে; "ধর্ম্ম" এই শব্দটী আমরা যাহা হইতে জ্ঞাত হইয়াছি, সেই বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র হইতেই ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রণালীটীও অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করি। বেদ স্মৃতি তন্ত্রাদি শাস্ত্রগুলি ধর্ম্ম-রাজ্যে আমাদিগকে যে পথে চালাইবে, সে পথে না চলিয়া অন্য পথে পদার্পণ করিলে, ভ্রান্ত পথিকবৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ-মাত্রই সার হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ অতি অল্প।

গত ২৮এ বৈশাখের 'অনুসন্ধানে' "ধর্ম্মচিন্তা —বলিদান" নামক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে বলিদানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দর্শনে কাম্যকর্ম্মপরায়ণ অনেক ধার্ম্মিকের মনেই কিছু কিছু সংশয় সমুত্থাপিত হইয়াছে। ঐরূপ ব্যাখ্যা নূতন না হইলেও, সংশয়োৎপাদনে চর্ব্বিতচর্ব্বনবৎ কার্য্যকারিতাশালী বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

বলিদান কাহাকে বলে? এই প্রশ্ন ঐ প্রবন্ধের অগ্রভাগে শোভা বিস্তার করিতেছে, এবং শারীরিক পাশবী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরের নিকট বলিদান করাকেই প্রকৃতরূপ বলিদান কহে, ইহাই প্রবন্ধে স্থিরসিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে।

প্রবন্ধ-লেখকের মতে দেবোদ্দেশে পশুঘাতন প্রথাটী নিতান্ত গর্হিত ও শাস্ত্রাভিমতনহে বলিয়া প্রতীত হইতেছে। কিন্তু এটী তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম; অধিকারীভেদে নিষেধ ও বিধান উভয়ই শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে। প্রথমতঃ দেখা যাউক, হিংসা-সম্বন্ধে বেদাদির কিরূপ অভিপ্রায়,—

"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি (ইতি শ্রুতিঃ)। ইত্যত্র সর্ব্বশব্দস্য ব্যাপকার্থতয়া এতদ্বিধি-মনুল্লঙ্ঘ্য বায়ব্যং শ্বেতং ছাগলমালভেতেত্যাদি বিধেরিষয়তয়া প্রাপ্তেরগত্যাবৈধাতিরিক্ত বিষয়ত্বং।"

শ্রুতি বলিতেছেন, সর্ব্বপ্রাণী-বিষয়ক হিংসা করিবে না। আবার বায়ু দেবতার যাগে শ্বেত-ছাগল-চ্ছেদনের বিধান শ্রুতিই প্রতিপাদন করিয়াছেন। "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি বিধিও বেদ-সম্মত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, "মাহিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" এই বিধির বিষয়—বৈধাতিরিক্ত হিংসাতে। অতএব বৈধ হিংসাটী শাস্ত্রের একবারে অসম্মত বলিয়া তত ঘৃণিত নাও হইতে পারে। বিশেষতঃ—

"যজ্ঞার্থে পশবস্সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্ যজ্ঞেবধোঽবধঃ॥"

অর্থাৎ,—স্বয়ং ব্রহ্মা যজ্ঞার্থে পশুগণ সৃষ্টি করিয়াছেন, এইহেতুই পশুঘাতন করিতেছি; যজ্ঞার্থে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই যজ্ঞে পশুবধও বধ-মধ্যে পরিগণিত নহে, অর্থাৎ যজ্ঞার্থে পশু-বধকারী ব্যক্তি তৎবধজনিত পাপী নহে। 'রাজমার্ত্তণ্ডে' লিখিত আছে। যথা,—

"নানাপাশুকমজ্জমাংসরুধিরৈঃ কৃত্বানবম্যাং বলিং"।

নানাবিধ পশুর রক্তমাংসমজ্জা দ্বারা নবমীতে বলিদান-পূর্ব্বক দশমীতে জগদম্বার বিসর্জ্জন করিবে। ইত্যাদি বহুবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারাই পশুঘাতের শাস্ত্রসিদ্ধত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। "পশুঘাতস্ত কর্ত্তব্যো ধর্ম্মাদ্ধবধস্তথা।" ইহা দ্বারা আরও বিস্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে। এই সমস্ত স্থলে পশু শব্দের অর্থ, যদি শারীরিক পাশবী বৃত্তিগুলিকে ধরা যায়, তাহা হইলে বিষয় গোলমালের বিষয় হইয়া পড়ে। যথা,—

"বলিদানবিধৌ—স্থূলক্ষণাক্রান্তং পশুং দ্যোগ্রে সমানীয় শূন্যমধ্যে সিন্দূরং দত্ত্বা মূল-মন্ত্রষ্টবীজপুটং প্রোক্ষয়েৎ।" পশুশব্দ-বাচ্য যদি ইন্দ্রিয়গ্রামই হয়, তাহাহইলে শূন্যমধ্যে সিন্দূর দিবে কাহার? প্রোক্ষণাদিই বা কাহাকে করিতে হইবে।

পশুযাগে "প্রহতং রক্ষস্ব" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রদ্বারাই বা কাহার রক্ষা সংসাধিত হইবে?

যদি কাম-ক্রোধ প্রভৃতিকেই পশু বলা যায়, তবে প্রহত কাম-ক্রোধের আবার রক্ষণে প্রয়োজন কি?

বিশেষতঃ, কাম-ক্রোধোচ্ছেদনকেই যদি বলি বলা হয়, তবে সাত্ত্বিকী পূজায় আবার নিরামিষ বলি বিধানের তাৎপর্য্য থাকে কৈ? যথা,—কুষ্মাণ্ডমিক্ষুদণ্ডঞ্চেত্যাদি।

নিরামিষ শব্দের প্রয়োগ হেতুই যে সামিষ বলি আছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতে পারে।

কাম-ক্রোধাদিকে মানসিক পূজাতে বলি দিতে অর্থাৎ উচ্ছেদন করিতে পারে, কিন্তু সাকার উপাসনায় বলি-শব্দ-প্রতিপাদ্য পশুঘাতকে স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ, শাস্ত্র ত মাঠে মারা যাইবে, পূর্ব্বপুরুষগণকেও মূর্খ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বলি গ্রহণ করিলেই যে দেবতাগণ মনুষ্য হইতেও জঘন্য হইয়া যাইবে, এটি বড়ই রহস্যের কথা। যাঁহারা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে সম্যক্ সমর্থ, তাঁহারা মনুষ্য হইতেও যে জঘন্য হইতে পারেন—কিসে? তাহা আমরা বুঝি না। বিশেষতঃ, পশুযোনি হইতে নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে, এমত উপায় আর কি আছে?

তাই বলি, বেদবোধিত কার্য্যে যে সকল পশু বিধি-অনুসারে ছেদিত হয়, তাহারই নির্ব্বাণ বা স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে—ইহাও শাস্ত্রানুমোদিত। সুতরাং বলিদান যে একেবারেই শাস্ত্রানুমোদিত নহে, এ কথা স্বীকার করিতে পারিলাম না।

শ্বেতকেতু।

(৩)

মহাত্মা শ্বেতকেতু যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ভারতীয় আর্য্যদিগের কিরূপ সামাজিক অবস্থা ছিল, তাহা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি যে, জাতিভেদ তখন দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় নাই, কারণ তখনও ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে সমাজে প্রভুত্ব-লাভের জন্য দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক উভয়বিধ ব্যাপারে সমাজের শীর্ষস্থানে আসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বিবাহ-প্রথা পণ্যবিধানরূপে প্রচলিত ছিল; যথেচ্ছাচার ইহার অস্থিমজ্জার

সহিত জড়িত ছিল। সমাজ ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারিত না, রাজা ইহার বিরুদ্ধে অঙ্গুলি মাত্র উদ্যত করিতেন না, অথবা করিবার অধিকার ছিল না। লোকে এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া ইহা হইতে উদ্ধারের আশায় উন্মুখ হইয়া কালযাপন করিতেছিল, এমন সময়ে মহাপুরুষ শ্বেতকেতুর বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হইল। সেই শঙ্খের শব্দে সমগ্র আর্য্য-ভারত স্তম্ভিত হইল; হিমালয় হইতে মহর্ষি অগস্তের আশ্রম পর্য্যন্ত তীব্র তেজে একটা বিকট জীবনী-শক্তির দ্রুত সঞ্চার হইল, ভারতের চতুর্দ্দিক চমকিত হইয়া আশাপূর্ণনয়নে মস্তক উন্নত করিল।

ভারতের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা মহাত্মা শ্বেতকেতুর চরিত্র-গঠনে যেরূপ সহায়তা করিয়াছিল, রাজনৈতিক অবস্থা হইতে তিনি তাহা অপেক্ষা অল্প সাহায্য পান নাই। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, মহাপুরুষের জীবন কতকগুলি মহদ্ভাবনার সমষ্টি মাত্র। তাঁহার দেহ ক্ষুদ্র, সামান্য, সীমাবদ্ধ; কিন্তু সেই সসীম শরীরের মধ্যে অসীম সমাজের পূর্ণ প্রতিবিম্ব স্তরে স্তরে স্ফূরিত হইতে থাকে। সঞ্জীবন মন্ত্রবলে তিনি তাহাকে সঞ্জীব করিয়া লয়েন এবং বীরের ন্যায় প্রত্যেকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই যুদ্ধে সামাজিক ও রাজতন্ত্র যথেষ্ট সাহায্য করে। মহাত্মা শ্বেতকেতুর সেই অনন্যসাধারণ অবদানে সমাজ ও রাজা কি পরিমাণে সহায়তা করিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে; পরন্তু তাঁহার সময়ে আর্য্য-ভারতের রাজ-তন্ত্র কিরূপ ছিল, এক্ষণে তাহাই দেখা আবশ্যক।

আমরা দেখিয়াছি যে, মহাত্মা শ্বেতকেতু রাজর্ষি প্রথম জনকের সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই জনকের বিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সমস্ত বিবরণ বিক্ষিপ্ত হইলেও ঐতিহাসিকের পক্ষে বিশেষ আদরের সামগ্রী; কারণ, সেই সমস্ত সামান্য সামান্য বিবরণে, ইতিহাসের অপূর্ব্ব মূল সূত্র গ্রথিত রহিয়াছে। এই সূত্রের উপনিষদে আমরা তিনটী রাজার নামোল্লেখ দেখিতে পাই,—বিদেহরাজ জনক, কাশীরাজ অজাতশত্রু এবং পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ। ইঁহারা তদানীন্তন ভারতে তিনটী প্রধান রাজা ছিলেন, তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইঁহারা যজ্ঞ ও পুরুষবার বংশধরদ্বয় তৎকালে ভারতের তিনটী পবিত্র প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ইহাঁদের ন্যায় প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। জনক ও প্রবাহণ কেবল যে, রাজমণ্ডলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এমত নহে; তদানীন্তন ব্রাহ্মণমণ্ডলেরও উপর কিয়ৎপরিমাণে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কহোল ও অষ্টাবক্র এবং উদ্দালক ও শ্বেতকেতুর ইতিহাস ইহার একটী প্রদীপ্ত প্রমাণ। বর্ণিত আছে, রাজর্ষি জনকের একশত গুরু ছিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁহাদিগের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেখিয়া অবশেষে তিনিই এক মাত্র তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য যে কিরূপ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, জনকের ইতিহাস পাঠ করিলে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। ইহাঁরই চেষ্টায় জনকের রাজত্বকাল ভারতের বৈদিক সাহিত্যের সুবর্ণযুগ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এমন কি ভারত মহিলাগণও পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া জগৎকে মোহিত করিয়াছিলেন; লোকপূজ্যা মহামান্যা মৈত্রেয়ী ও গার্গী তাহার জলন্ত প্রমাণ। মহাভারতে বনপর্ব্বে কহোল, অষ্টাবক্র ও শ্বেতকেতুর একটী বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে। তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, রাজর্ষি জনকের সহিত আধ্যাত্মিক তর্কে যে কোন ব্রাহ্মণ পরাস্ত হইতেন, রাজা তাঁহাকে জলমধ্যস্থ গৃহে আবদ্ধ রাখিতেন; ঋষি কহোল তর্কে পরাভূত হইয়া উক্ত রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন; অষ্টম বর্ষীয় অষ্টাবক্র তাহা মাতার নিকট অবগত হইয়া জনক সমীপে গমন করেন এবং তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া পিতার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত বালক, শ্বেতকেতুর ভাগিনেয়। ইহাঁরা উভয়েই সমবয়স্ক। এই বিবরণ পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ মাত্রেই রাজর্ষি জনকের নিকট সম্মান পাইতেন না; যাঁহারা বেদবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাঁহারাই পূজিত হইতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিলে ভারতের পৌরাণিক যুগে কোন রাজাই নিষ্কৃতি পাইতেন না। কিন্তু এরূপ ব্যবহারকে বাস্তবিক অত্যাচার বলা যাইতে পারে কি না সন্দেহ; কেন না অপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা যেমন লজ্জিত হইতেন, পারদর্শী পণ্ডিতগণ সেইরূপ উচ্চ সম্মান ও প্রচুর ধনধান্য লাভ করিতেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, রাজর্ষি জনক বিদ্যার আদর বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উৎকৃষ্ট উপায়েই তদীয় রাজত্বকালে যাজ্ঞবল্ক্য, শ্বেতকেতু ও অষ্টাবক্রের ন্যায় বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিত এবং গার্গী ও মৈত্রেয়ীর ন্যায় অদ্বিতীয়া বিদুষীগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব হইতে যে একটী সমবেত শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাই মহাত্মা শ্বেতকেতুর প্রধান সহায়। তিনি সেই শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিজের আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত অনন্যসাধারণ উদ্যম মিশাইয়া সমাজের বিরাটমঞ্চে বিরাট প্রথারূপ সেই বিশাল বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

প্রতিমা।

প্রথম অধ্যায়।

"বলি হ্যাগা! তোমাদের প্রতিমার যে বিয়ের কথা শুন্‌ছিলাম, তা হবে নাকি?"

সন্ধ্যা বেলায় হ্রদের ঘাটে জল আনিতে গিয়া, হরিপুরের প্রসন্ন দিদি প্রতিমার মাকে এই প্রশ্ন করিল।

প্রতিমার জননী প্রতিমাকে সঙ্গে করিয়া জল লইয়া হ্রদের ঘাট হইতে গৃহাভিমুখিনী হইয়াছিলেন, এমন সময় প্রসন্ন দিদির এই প্রশ্নে তাঁহার গতি রোধ হইল, একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন "হাঁ মা! কথা'ত হ'চ্ছে, এখন হ'লেই হয়।"

"তা বেশ, বেশ, হবে বৈকি, মেয়ের কোলে প্রতিমা ও তের চোদ্দ বছর হ'ল; বাসুনের ঘরে আর কি বিয়ে না দিলে মানায়; তা এ বিয়ে হ'ল কোথায়?"

"মাস্টর পাড়ায়।"

"ছেলেটী দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন, ছুপয়সার সংস্থান আছে ত?"

হ্যাঁ ছেলেটী দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল, তবে বিষয় আশয় এমন বড় একটা কিছু নাই, আর একটু দোষ ছেলেটী দোজবেরে!"

"ওমা সেকি? বল কিগা? দোজবেরে! এ সম্বন্ধ জোটালে কে; এমন সোণার ডালি মেয়ে দোজবেরে ঘরে দেবে? আর কি দেশে পাত্র জুট্‌ছে না।

কে যুটলো মা? নানান্ জায়গায় কথা হ'ল কোন খানে সুবিধে হ'ল না।"

"কেন? সেই যে কোন্ রাজবাড়ীতে কথা হ'চ্ছিল, সেখানে কি হ'ল।"

"সেখানে তাদের ত খুব মন, এখন ও খটক যাওয়া আসা কচ্ছে তা বাড়ীতে তাঁদের যে মত হয় না, বলেন আমার প্রতিমাকে অত দূরে পাঠিয়ে থাকতে পারবো।"

"তা বল্লে কি হয়, মেয়ে যাতে সুখে থাকে তাই দেখেইত মা! বিয়ে দিতে হয়, আর তোমার প্রতিমা যেমন মেয়ে ও রাজা রাজ্ঞির ঘরেই শোভা পায়। দোজবেরে বরে কি বিয়ে দিতে আছে, তাতে ব'লছো যে বিষয় আশয় তমন কিছু নাই, এ যে হাতপায়ে বেধে ল'ফেলে দেওয়া হবে।"

"পাত্রটী দোজবেরে বটে, কিন্তু বেশি বয়স নয়, তেইশ চব্বিশ বছর হবে; আর শুন্‌তে পাচ্ছি জাত্যংশে বিদ্যে বুদ্ধিতে খুব ভাল, অলঙ্কার প্রস্তুতিকার তাও দশখানা দেবে।"

"ওসব খটকের কথা শুনোনা মা শুনোনা, আমি সাগর পাড়ার সবারই নাড়ী নক্ষত্র জানি, তাদের কারও কিছু নাই; সেখানে ঘরদার মেয়ের বিয়ে দেবার নামও করোনা। আর আছে কে? শ্বশুর, শাশুড়ী আছে?"

"শ্বশুর নাই, শাশুড়ী আছে।"

যখন প্রতিমার জননীর সঙ্গে প্রসন্ন দিদির এই সকল কথা হইতেছিল, তখন অদূরবর্ত্তিনী সন্ধ্যার ছায়ায় হ্রদের তীরটী মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছিল; পশ্চিমের রক্ত-কিরণ হ্রদের নীল বক্ষে, নিস্তব্ধ তরুশ্রেণীর শীর্ষস্থ পল্লবের অগ্রভাগে পতিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল; পশ্চিম আকাশের রক্ত প্রভা সুন্দর, হ্রদবক্ষে সুনির্ম্মল জলরাশি সুন্দর, তীরে তরু-রাজী সুন্দর, তাহা অপেক্ষাও সুন্দর দেখাইতেছিল প্রতিমার কৈশোর ও যৌবন বিসিদ্ধ লাবণ্যময় মুখখানি। প্রতিমা জননীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আপনার বিবাহের কথা শুনিয়া সেই সুন্দর মুখখানি বিনত করিয়া দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তীরস্থ সিক্ত মৃত্তিকা খনন করিতেছিল, আর কর্ণ দ্বারা প্রসন্ন দিদির সেই কথাগুলি যেন অমৃতবৎ পান করিতেছিল, মনে মনে ভাবিতেছিল আমিত প্রসন্ন দিদিকে এসব কথা বলি নাই, তবে সে কেমন করিয়া আমার মনের কথা জানিল।

প্রসন্ন ঠাকুরাণী পুনঃপুনঃ প্রতিমার জননীকে নিষেধ করিল, বলিল "এবিষয় দিও না, দিও না, দিলে আমার কথা বুঝ্‌তে পারবে, বড় মেয়েটীর যেমন দেখে দিয়েছ, এটীরও তেম্‌নি দেখে শুনে দাও গে, দশ টাকা খরচ হবে, তা ব'লে কি হয়?"

প্রতিমার জননী বলিলেন "তা মা! আমাদের কথায় কি আসে যায়, আমরা মেয়ে মানুষ বৈত নয়, তাঁদের যা মত হ'বে তাই হ'বে; আমি যা বল যাই কও মা! ওসব প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, যেখানে ভবিতব্য আছে সেইখানে হবেই হবে।"

"তা'ত হবে, তা ব'লেত আর লোকে দেখে শুনে আধবুড়ো নিমুকুদে, ঘরে খেতে নাই, এমন বরে বিয়ে দেয় না? আর

দেখ্‌ছোনা মা! বিয়ের কথা শুনে তোমার মেয়ের মুখখানি কেমন হয়ে গিয়েছে, হাজার হ'ক সেয়ানা হ'য়েছে।"

এইবার প্রতিমার মুখখানি যেন শুকাইয়া গেল, মৃদু স্বরে বলিল "মা! চল বাড়ী যাই, তুলসী তলায় প্রদীপ দিতে হ'বে।" এই বলিয়া প্রতিমা একটু অগ্রবর্ত্তিনী হইল, প্রতিমার মা প্রসন্ন ঠাকুরাণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, বলিয়া গেলেন "একবার আমাদের বাড়ী যেও।"

এই স্থানে প্রসন্ন ঠাকুরাণীর একটু পরিচয় দিয়া লই। সে কুলীন বামুনের মেয়ে, বাল বিধবা, আজন্ম পিত্রালয়বাসিনী। অন্য দিকের স্বভাবচরিত্র ভাল; বয়স এক্ষণে ৫০।৫৫ বৎসর, শরীর স্বভাবতঃ রুগ্ন, কণ্ঠস্বর সর্ব্বদাই রুদ্ধনে বাঁধা। সেই হরিপুরের ছোট বড় সকল ঘরের মেয়েরাই তাহার নিকট এই পৃথিবীটার খবর পায়। প্রসন্নঠাকুরাণী যখন যাহার সহিত কথা বলে, তখন সৈকত ক্ষেত্রের বারিবিন্দুর ন্যায় তাহা তাহার মর্ম্মতলে প্রবেশ করে। কত যেন সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী; কত মিষ্ট মিষ্ট কথা বলিয়া তাহার অন্তরের সর্দ্দর্য লুঠন করে, তাহার পর আবার সেই সকল কথার ঘায়ই তাহার প্রাণে আবার আগুন জ্বালিয়া দেয়, পাড়ার যে কিছু কলহ, অন্তর্বিবাদ, প্রসন্ন ঠাকুরাণী কোন না কোন রকমে তাহার ভিতর থাকিতেই যায়; কাহারও ভাল দেখিলে তাহার চক্ষুঃপ্রদাহ উপস্থিত হয়।

প্রতিমার জননীকে বিদায় দিয়া প্রসন্ন ঠাকুরাণী যেন ফাঁপরে পড়িল, বুকের ভিতর কি যেন একটা হাঁচড় পাঁচড় করিতে লাগিল; ঘরের চারিদিকের খাটগুলি চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, সুতরাং কলসী খুলি করিয়া তীরের উপর উঠিল।

পাড়ার নাপিত বৌ সেই সময় জল নিতে আসিতেছিল, প্রসন্ন ঠাকুরাণী তাহাকে পাইয়া যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; নাপিতবৌ বড় আমুদে মেয়ে, সে সর্ব্বদাই হাসে, হাসিতে ভালবাসে, সে হাসিতে হাসিতে বলিল "কি গা ঠাকুরঝি ঠাকরুণ! আজ যে একলাই!"

"একলাই বটে- কিন্তু মিনসের কি আক্কেল গো, কোলের মেয়েটী তাকে, কিনা মড়ার হাড়ে দিচ্ছে, নেহাত গরীব নয়, দশ টাকার সংস্থান ত আছে?"

নাপিত বৌ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি গা ঠাকুর-ঝি ঠাকুরুণ, কি হয়েছে?"

"কেন, শুনিস্ নাই? তোদের বাড়ীর কাছে যে বাড়ী,—বাঁড়ুয্যেদের প্রতিমার যে বিয়ে?"

"তা'ত হ'বে শুনছি।"

"আর তোর মাথা শুনছিস্, একটা আধবুড়ো মিন্‌সে, দোজবেরে কি তেজবেরে তাই বা কে জানে, ঘরে চাল নাই, কোথায় কার বাসায় থেকে ভাত রাঁধে, তারই সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রেছে। হাঁগা, একটু কি মমতাও হ'ল না।"

"সত্যি নাকি? তাত কৈ শুনি নাই!"

"শুনবি কি! একি শুনবার কথা। হয়ত ভিতরে ভিতরে একটী পুঁটলী টাকা খেয়েছে, তা নৈলে কি আর দেখে-শুনে অমন বরে বিয়ে দেয়?"

নাপিত-বৌয়ের একথাগুলি শুনিতে মিষ্ট বোধ হইল না। সে বাঁড়ুয্যেদিগকে ভালবাসে, সে তাহাদের মঙ্গলথা সহিতে পারে না, তাহার উপর সে প্রতিমাকে সকলের চেয়ে ভালবাসে, তাহার গাঢ় বিশ্বাস যে—প্রতিমার রাজার ঘরে বিয়ে হবে, প্রতিমা রাজরাণী হবে। "সন্ধ্যা হল, শীগ্‌গির ঘাটে হ'তে আসি" বলিয়া, বিদায় হইল।

অগত্যা প্রসন্ন ঠাকুরাণীকে পদযুগলে একটু বলপ্রয়োগ করিতে হইল, প্রকৃতির সে রম্য নিকেতন ছাড়িয়া প্রসন্ন ঠাকুরাণী অদৃশ্যা হইল। কিন্তু সেদিন হরিপুরের এমন একটী প্রাণীও থাকিল না যে, সে প্রতিমার ভাবী স্বামীর এই অদ্ভুত পরিচয় পাইল না। ভাল মন্দ সব রকমেরই মানুষ আছে; কেহ সুখী হইল, কেহ দুঃখিত হইল, সেদিন যতক্ষণ পর্য্যন্ত হরিপুরে মানুষের কলরব ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল প্রতিমার বিবাহের কথা লইয়া, তাহার অদৃষ্ট লইয়া, আর বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের বিবেচনা লইয়া, আন্দোলন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নবকুসুমিতা বাসন্তী বল্লরীর মত তন্বঙ্গরুচি, তাহার উপর অর্দ্ধস্ফুট যৌবনের ধীর পদবিক্ষেপ নয়নের একপার্শ্বে হাস্য, একপার্শ্বে লজ্জা গতি কখন দ্রুত, কখন মন্থর; অধরে প্রীতি, হৃদয়ে সরলতা, অপাঙ্গে ব্রীড়া, আর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া সেই ঈষন্মুকুলিত যৌবন; প্রতিমাকে যে দেখিত, সেই ভালবাসিত।

সেই হরিপুর গ্রামটী অতি ক্ষুদ্র; তথায় কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, দুই ঘর নাপিত, আর কয়েক ঘর সদ্‌গোপের বসতি ছিল। দক্ষিণে একটি স্বচ্ছসলিলা সুবিস্তীর্ণা নদী, পূর্ব্বে গ্রামের একটু দূরে প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী; গ্রামটীর মধ্যস্থলে ও চতুর্দ্দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহপ্রণালীতে পরিশোভিত, দূর হইতে দেখিলে একটী রমণীয় কানন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেই বৃক্ষসমূহের পত্রান্তরালবর্ত্তী মধ্যে নানাপ্রকার বিহঙ্গ কলকূজন করিত। একটী বালিকা আশৈশব সেই অস্নিগ্ধ ছায়াতলে বেড়াইয়া, বেড়াইয়া সেই পক্ষীগুলির গান শুনিত; প্রতিমা হরিপুরের সেই সকল পক্ষীগুলিকেই চিনিত।

প্রতিমার পিতা হরসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পল্লীর মধ্যে একজন মাননীয় ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার দুইটি পুত্র দুইটী কন্যা; পুত্র দুইটি শিশু, দ্বিতীয়া কন্যা প্রতিমা; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুত্র দুইটী অপেক্ষাও প্রতিমাকে অধিক ভালবাসিতেন; প্রতিমার যখন অষ্টম বৎসর বয়স, তখন হইতে তিনি প্রতিমার উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন। কোথাও মনোমত জুটিয়া উঠে নাই। দেখিতে দেখিতে প্রতিমা এখন তের চৌদ্দ বৎসরের হইয়া উঠিয়াছে, আর বিবাহ না দিয়া কেমন করিয়া থাকিবেন, তাই সাগরপাড়ায় দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র পাইয়া সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকিলেও বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বালিকা প্রতিমা এতদিন কুটিল সংসারের বহুদূরে থাকিয়া, দেববালার ন্যায় হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত। যতদিন যৌবনের উন্মেষ হয় নাই, ততদিন প্রতিমা, তাহাদের বাটীর সম্মুখস্থ আম্রগাছটির উপর বসিয়া পাপিয়া ডাকিলে, সেও "চোক গেল" বলিয়া তাহার অনুকরণ করিত; প্রজাপতি উড়িয়া গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যাইত; সন্ধ্যাবেলায় হ্রদের তীরে গিয়া কত কি বলিয়া শব্দ করিয়া দূরে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিয়া হাসিত। এখন প্রতিমার দেহকান্তিতে যৌবনাঙ্কুর ঈষৎ উদ্ভিন্ন হইয়াছে, সে এখন প্রভাতে উঠে; তাহাদের বাটীর কাছে একটী ফুলের বাগান, সে বাগান জলে হাত দুইয়া সেই ফুলের বাগানে যায়; প্রাতঃসমীরণ তাহার ললাটবিলম্বিত গুচ্ছ গুচ্ছ কেশদাম ধীরে ধীরে আন্দোলিত করে; সে প্রজাপতি উড়াইয়া, ভ্রমর তাড়াইয়া, দেবপূজার জন্য পুষ্প তুলিয়া আনে; গৃহকার্য্যে মাতার সহায়তা করে। একটু বেলা হইলে, সে তাহার সই শোভাদের বাড়ী বেড়াইতে যায়। কেবল

শোভাদের বাড়ী নহে; পল্লীর মধ্যে এমন একটী বাড়ীও নাই যেখানে প্রতিমা দিন মানের মধ্যে একটী বারও পদার্পণ করে না। সে বৈকালে নাপিত-বৌয়ের চুল বাঁধিয়া দেয়, সদ্‌গোপদের মোহাগীর টিপ ক্লাটিয়া দেয়, পাড়ার কাঁহারও ছেলে কাঁদিলে প্রতিমা দিয়া ঘুম পাড়াইয়া আইসে, দ্বিপ্রহরে মায়ের কাছে বসিয়া রামায়ণ মহাভারত পড়ে।

প্রতিমা আজ প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিল। সে পূর্ব্বদিন তাহার মায়ের সঙ্গে হ্রদের ঘাটে গিয়া হৃদয়ের যেন কি একটু আনন্দ হারাইয়া আসিয়াছিল; সে রাত্রিতে, কি জানি কেন, তাহার ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই। প্রতিমা অন্য দিন হাসিতে হাসিতে উঠিয়া সমস্ত দিন হাসিয়া আবার হাসিতে হাসিতে ঘুমাইত, আজ সে প্রাতঃকালে উঠিয়া যেন তেমন হাসি হাসিতে পারিল না। পুষ্পচয়নে গেল, অন্য দিনের মত ফুল তুলিতে পারিল না, অর্ঘ্য দিবার দুর্ব্বাগুলি তুলিতে তুলিয়া আসিল। বাটীতে আসিয়া ফুলগুলি রাখিয়া তাড়াতাড়ি শোভার কাছে গেল; সেখানেও সুখ পাইল না; শোভা, শোভার মা, শোভার দিদি, সবাই তাহার বিবাহের কথা তুলিয়া তাহাকে কষ্ট দিতে লাগিল। "আহা! এমন মেয়ে, দ্বিতীয় পক্ষের বর, বয়স বেশী, বিদ্যে-আশায় নেই"—এমনি কত কথা বলিতে লাগিল। সেখান হইতে নাপিত-বৌয়ের কাছে গেল, সেখানেও এই কথা, অন্য বাটী গেল, সেখানেও সেই কথা। প্রতিমার অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়মধ্যে একটি কালু-কীট প্রবেশ করিল; সে যেখানে যায়, সেইখানেই তাহার বিবাহের কথা শুনিতে পায়। তাহার মনের ভিতর কি যেন একটা যাতনা হইতে লাগিল; সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল আর কাহার বাড়ী যাইব না। প্রতিমা যে প্রফুল্লতা টুকু লইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশটুকু বিসর্জ্জন দিয়া ম্লানমুখে বাটী ফিরিয়া আসিল।

সেইদিন হইতে বালিকা প্রতিমা অন্তরালে দাঁড়াইতে শিখিল। সে সময় পাইলেই নির্জ্জন খুঁজিত; নীরবে তাহার নয়নযুগল অশ্রুবারি সিক্ত হইত কি না, কে বলিতে পারে?

প্রতিমা তাহার সঙ্গিনীদের স্বামী দেখিয়াছে, তাহাদের অলঙ্কারের বাক্স দেখিয়াছে, ভাল ভাল কাপড় দেখিয়াছে, আরও কত কি দেখিয়াছে; "ছোটবেলা হইতে মায়ের কাছে, পিসির কাছে, পাড়া-প্রতিবাসীর কাছে শুনিয়া আসিতেছে, তাহার বিবাহ হইলে, সকলের চেয়ে তার ভাল স্বামী হইবে, ভাল গহনা হইবে, কত ঘুমধাম হইবে, কত বাজনা বাজিবে; এত দিন-না হয় ছোট ছিল, এখন ত সকলই বুঝিতে পারে? এখন বুঝিল—তাহার সে সকল সাধ পূর্ণ হইবে না, মা বাপের সকল কথাই মিথ্যা, তার দিদিদের বর তার বর চাইতে ভাল; তার বর বুড়ো, দোজবরে; নতুবা পাড়ার সকল লোক তাহাকে দেখিলেই তাহার বিবাহের কথা তুলিয়া হাসে কেন?

বিবাহ হইবে বলিয়া প্রতিমার মনে একটা বড় আনন্দ ছিল, সে আনন্দে নিরানন্দ হইল; অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে মনে মনে স্থির করিল,—"মা-বাপের দোষ নাই, বিবাহ বুঝি যাহার ভাগ্যে যেমন জুটে, তেমনি হয়। তা বিবাহ হয় হউক, কিন্তু আমি সে দোজবরে বুড়ো বরের মুখ দেখিব না, তাহার পানে চাহিব না, তাহার সঙ্গে কথা কহিব না, কখন শ্বশুরবাড়ী যাইব না।"

কপোতী পক্ষপুটে যেমন আপন শাবক-

গুলি রাখিয়া রাখে, প্রতিমা আপন ক্ষুদ্র হৃদয়, টুকুর ভিতর নিজের এই কঠোর প্রতিজ্ঞাগুলি ঢাকিয়া রাখিল। হরিপুরের কেহই তাহা জানিল না।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাগরপাড়ার ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় সেকেলে মোক্তার ছিলেন। মাসে হাজার দেড় হাজার টাকা রোজগার করিতেন, কিন্তু এক পয়সাও বাঁচাইতে পারিতেন না। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, দোল-দুর্গোৎসব, দান, অনাথ-পালন প্রভৃতি সৎকার্য্যে সমস্তই ব্যয় হইয়া যাইত। তিনি মৃত্যুকালে কিছুই সঞ্চয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

তাঁহার মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র শ্যামাপদ বাবু পৈত্রিক ওকালতীর উত্তরাধিকারী হইয়া পিতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। দেশের মধ্যে তাঁহার সুখ্যাতির পরিসীমা ছিল না। তিনিও পৈত্রিক ব্যবসায় মোক্তারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় অতি অল্প বয়সেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র শৈলরাজের বয়ঃক্রম আট বৎসর; শ্যামাপদ বাবুর স্ত্রী, শৈলরাজকে বুকে করিয়া স্বামীর শোক ভুলিয়া ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই শৈলরাজের মুখমণ্ডলে প্রতিভার জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইত; তাহার আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই অনুমান করিত, বলে সে একজন বড়লোক হইবে। সে যাহা দেখিত তাহাই খিণ্ডিত; ছোট-বেলা হইতে মুখে মুখে কবিতা রচনা করিত। তাহার শিক্ষকেরা এতাদৃশ শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন; শুনিয়া শৈলরাজের জননীর আহ্লাদ ধরিত না।

পিতৃ-বিয়োগের কিছুকাল পরে শৈলরাজের উচ্চশিক্ষায় কিছু ব্যাঘাত পড়িল। এমন সম্পত্তি ছিল না, যাহা দ্বারা উচ্চশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে; বিশেষ বড় হইয়া শৈলরাজও দেখিল যে, চাকরী না করিলে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন। সেইজন্য, তাহার বয়স যখন চতুর্দ্দশ বর্ষ, তখন সে স্কুল ছাড়িয়া চাকরী-অন্বেষণে বহির্গত হইল, এবং গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটি জমিদারের বাটীতে সামান্য একটি চাকরীতে নিযুক্ত হইল।

শৈলরাজ চাকরি করে, সঙ্গে সঙ্গে অবসর মত গৃহে বসিয়া উচ্চ উচ্চ বিষয়ের পুস্তক-সকল পাঠ করে, কবিতা লেখে, পুস্তক রচনা করে, নিকটবর্ত্তী সভাসমিতিতে সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করে, গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই তাহার এই অল্প বয়সে অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হয়; কিন্তু সে দরিদ্র, সেইজন্য তাহার গুণের প্রকৃত আদর হয় না, তাহার প্রশংসাধ্বনি দিগন্ত-ব্যাপিনী হয় না।

শৈলরাজের জননী বড় ধর্ম্মপরায়ণা; শৈলরাজ বাল্যকাল হইতে সেই ধর্ম্মপরায়ণা জননীর কোলে বসিয়া আপনার ধর্ম্মময় জীবন সংগঠন করিতে শিখিয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধর্ম্মপিপাসাও প্রবল হইয়াছিল; সে পরের দুঃখে কাঁদিয়া আকুল হইত, দেশের দুর্গতি দেখিলে ব্যথিত হইত; পরের জন্য, দেশের জন্য, যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই সে চিন্তা করিত। কিন্তু সে আপনাকে দরিদ্র বলিয়া জানিত, সেইজন্য তাহার নীরব হৃদয়ের চিন্তা নীরবেই থাকিয়া যাইত।

সে পাপ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে ভালবাসিত; সেইজন্য জমিদার বাড়ীতে তাহার বড়একটা আদর হইল না; জমীদারী সেরেস্তায় শৈলরাজের স্থান হইল না সে চাকরী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গেল।

তের বৎসর বয়সের সময় শৈলরাজের বিবাহ হয়। তাহার পত্নী সুশীলা এবং সুশীলা ছিল; পাড়ার মেয়েরা বলে, তাহার রূপে ঘর আলো হইত, গুণে ঋষিরও মোহিত হইত। কিন্তু শৈলরাজ তেমন রূপবতী গুণবতী ভার্য্যা পাইয়াও একদিনের জন্য আপনাকে সুখী বোধ করিতে পারে নাই; সে যখনই নিরাভরণা স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া দেখিত, তখনই তাহার বড়-একটা কষ্ট হইত। কিন্তু সেই পতিব্রতা সরলা রমণী সেজন্য এক মুহূর্ত্তের জন্যও দুঃখিতা ছিল না, দেবতার মত পতি পাইয়া সর্ব্বদা সহাস্যবদনে থাকিত, সে ভাবিত—তাহার মত ভাগ্যবতী বুঝি আর কেহ নাই। কিন্তু সেই সুরসুন্দরী অধিক দিন এ মর জগতে থাকিল না, শৈলরাজের হৃদয়ে একটী নিদারুণ আঘাত দিয়া, মরণে স্বর্গধামে চলিয়া গেল; দুঃখী শৈলরাজ সংসারে একাকী হইল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর শৈলরাজ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, আর বিবাহ করিবে না। এই সঙ্কল্প করিয়া সে পাঁচ বৎসর কাটাইয়াছে। পাঁচ বৎসর কাল নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছে। যেখানে গিয়াছে, সেইখানেই তাহার যশঃ-সৌরভ বিকীর্ণ হইয়াছে; সে সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত হইয়াছে, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার কবিত্বের বড়ই সুনাম হইতেছে কিন্তু আর্থিক অবস্থার তাদৃশ উন্নতি হয় নাই; যদি হৃদয়ের অনুরূপ একটী চাকরী পাইয়াছে, বড় তাহাতে তাদৃশ অর্থাগমের সম্ভাবনা নাই, যাহা পায়, তাহাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়াই সুকঠিন।

শৈলরাজের জননী সর্ব্বদা আক্ষেপ করেন, পুত্রকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করেন। শৈলরাজ শুনিয়াও শুনে না, একে বিবাহে অনিচ্ছা তাহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, এখন বিবাহ করিতে বলিলে লোকের নিকট উপহাস্যাস্পদ হইতে হইবে—অর্থহীন নিঃসম্বল শৈলরাজকে কে কন্যাদান করিবে?

পাড়ার মেয়েরা মেস ছেলে শৈলরাজের জননীকে সর্ব্বদা কষ্ট দিত; বলিত,—"আহা! মা! একটী ছেলে, তারও বিয়ে দিতে পারলে না! আর দেবেই বা কেমন করে? আর কি বিয়ের কাল আছে, অত টাকা শৈলরাজ কি জোটাতে পারবে দশ টাকা হাতে থাকত, তাও বা হয় হ'ত। জননী নীরবে সে বাক্যগুলি শুনিতেন, তাঁহার হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশন করিত, মনে মনে ভাবিতেন,—'পাড়ার নির্গুণ, অসচ্চরিত্র কুৎসিত বালকদেরও বিবাহ হইতেছে, আমার শৈলের কেন হয় না?' তিনি ইহা জানিতেন না যে, স্বার্থপর সমাজ কেবল অর্থের দাস, ঘৃণিত সমাজে প্রকৃত গুণের আদর নাই; তাহাই যদি থাকিবে, তাহা হইলে এ হিন্দু-সমাজ দিনদিন এরূপ হতভাগ্য এবং অধঃপতিত হইবে কেন?

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল। সকলেরই পরিবর্ত্তন আছে; শৈলরাজের হৃদয়েরও পরিবর্ত্তন হইল, জীবনে সে কি যেন একটা অভাব অনুভব করিতে লাগিল, স্থির করিল—সংসারী হইয়া থাকিতে গেলে, বিবাহ করা উচিত। পাছে তাহার বিবাহ-চেষ্টা শুনিয়া তাহার শত্রুগণ অন্তরালে বসিয়া হাসে করে এই আশঙ্কায় তাহার উন্নত ও তেজস্বী হৃদয়ের এই নিভৃত চিন্তাটী অতি সংগোপনে আপনার মাতুলের

নিকট প্রকাশ করিল। তাহার মাতুল বড় বিবেচক মনুষ্য ছিলেন। তিনি পাত্রী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

শৈলরাজ যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই সত্য হইল। কেহই শৈলরাজের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হয় না; একে দ্বিতীয় পক্ষ তাহার উপর বিষয়-সম্পত্তি তেমন কিছু নাই, শুনিয়া সকলেই পিছাইয়া পড়ে। এইরূপে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল।

মাঘ মাসের শেষে প্রতিমার পিতা শৈলরাজের নাম শুনিতে পাইলেন। তাহার পিতা ও পিতামহের নাম তাঁহার শোনা ছিল; এক্ষণে নানাস্থানে শৈলরাজের সুখ্যাতি শুনিতে পাইলেন। মন আকৃষ্ট হইল, শৈলরাজকে দেখিতে সাগরপাড়া আসিলেন।

দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র বলিয়া তাঁহার মনে মনে একটু সন্দেহ ছিল, এক্ষণে শৈলরাজকে দেখিয়া তাঁহার সে সন্দেহ ভাঙ্গিল। শৈলরাজের জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু, প্রশস্ত ললাট আর সেই প্রশান্ত বদনমণ্ডলব্যাপিণী প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; মনে মনে করিলেন,—আমার প্রতিমা যেমন, শৈলরাজও তাহার অনুরূপ পাত্রই হইবেন। তবে কিনা, দ্বিতীয় পক্ষ, বিষয়-সম্পত্তি বিশেষ কিছু নাই, এরূপ স্থলে অলঙ্কারের মাত্রাটা কিছু অধিক না হইলে চলিবে না, সুবর্ণ অলঙ্কার দশ খানা না দিতে পারিলে কেমন করিয়া বিবাহ হইবে?"

বিবাহ সম্বন্ধীয় যাহা কিছু কথাবার্ত্তা শৈলরাজের মাতুলের সঙ্গেই হইতেছিল, অলঙ্কারাদির কথাও হইল। দেশকালজ্ঞ মাতুল, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, প্রতিমার পিতা যে যে অলঙ্কারের কথা বলিলেন, তিনি তাহাই দিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি ইহা নিশ্চয় জানিতেন যে শৈলরাজের এ সকল অলঙ্কার দিবার ক্ষমতা নাই। তথাপি, স্বীকার না করিলে যদি সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাহইলে বিবাহ হওয়া সুকঠিন হইবে, এই ভাবিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে,—এখন ত স্বীকার করা যাউক, তাহার পর বিবাহ হইয়া গেলে, ক্রমানিকটা লোকলজ্জার সহ করিব। প্রতিমার পিতা আরও বলিলেন,—"যে আমার ছোট মেয়েটীর বিবাহে, মেয়ে ছেলেদের ইচ্ছা যে বিবাহে একটু সৌষ্ঠব হয়, বাদ্য-ভাণ্ডের আয়োজনটা যেন একটু ভাল হয়।" শৈলরাজের মাতুল তাহাতেও স্বীকৃত হইলেন।

বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গেল; বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা, যে যাহার স্থানে চলিয়া গেলেন, শৈলরাজের জননীর আহ্লাদ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

আজ ফাল্গুন মাসের ১১ই; প্রতিমার বিবাহ, হরিপুরের বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী লোকে ভরিয়া গিয়াছে, সকলেরই মুখে এক কথা "আহা! সোণা নয় সেজে, শুনেছে বরের বয়স বেশী, তা কাঁদবে বৈকি, একটু দেখে শুনে দিলেই হ'ত, না হয় আর দশ দিন দেরী হ'ত।"

বাঁড়ুয্যে মহাশয় কোন কার্য্যোদ্ধারে যখন বাটীর ভিতর যাইতেছেন, তখন তাঁহাকে সকলে যেন ছিনে জোঁকের মত ধরিয়া ফেলিতেছে, শত রূপ হইতে শত শত প্রশ্ন-বাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইতেছে, কেহ বলিতেছে "হ্যাঁ গো, তুমি ত দেখে এসেছ, সত্যি ক'রে বল দেখি পাত্রের বয়স কত? তোমার মেয়ে যে কেঁদে আকুল হ'ল" কেহ বলিতেছে হ্যাঁগা কাকা, বলি বাজনা টাজনা আসবে ত?

"তা দোজবরে বরে দিচ্ছ, বলি গয়না পত্র লেখাপা দেবে ত?" বাঁড়ুয্যে মহাশয় কাহার কথায় যে উত্তর দিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। এক কথায় সকল কথার উত্তর দিতেছেন, "ওগো —তোমরা সব এমন ক'রে মিছা খোল করে কেন মেয়েটাকে কাঁদাচ্চ? পাত্র আসুক, এসে দেখে নিও।"

অমনি কোন একটি প্রাচীনার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিবাদ্রিতেছে "তা'ত বটে, তা'ত বটে, তা'ত বটে, আপন মেয়ে দেখে শুনে কে আর জলে ফেলে দেয়।"

এই প্রকার রমণী-মণ্ডলে কোলাহলের মধ্যে পড়িয়া প্রতিমা আজ তাহার হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছে না, সে এতদিন চক্ষুজল চাপিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহার দুইটী গণ্ড বহিয়া অনর্গল অশ্রুধারা বহিতেছে, সে কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছে না, কাহারও মুখপানে চাহিতেছে না, তাহাদের লক্ষিত গার্হীঘরের দুয়ারের একটী কপাট বন্ধ করিয়া তাহার আড়ালে বসিয়া কেবল কাঁদিতেছে, এরূপ ঠাকুরদালীর রোপিত বিষবৃক্ষের বীজ আজ প্রথম অঙ্কুরিত হইল।

প্রতিমা যেখানে বসিয়া কেবল কাঁদিতেছিল, তাহার অনতিদূরে প্রতিমার দিদি প্রফুল্লময়ী পান সাজিতেছিল, সহসা প্রফুল্ল ঠাকুরাণী সেই ঘরের মধ্যে দেখা দিলেন, একবার প্রতিমার দিকে চাহিলেন, একটু হাসিলেন, এবং প্রফুল্লকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —"হাঁরে প্রফুল্ল! তোর বন যে কুড়ো বরের ঘরে কেঁদে আকুল হ'ল; একটু বুঝিয়ে শুকিয়ে ঠাণ্ডা ক'র।"

প্রফুল্ল একটু দুঃখিত ভাবে বলিল "আর কি বুঝাব শুধাব দিদি! বাবার যেমন আক্কেল নাই, তাই যুগলের জেড়ে খেয়ে কিনা এক দোজবরে বর ঠিক করেন!"

"সত্যি বটে বন; এও কি হ'তে হয়! এ কিছু কুলীনের করণ নয়, কেনা বেচার বিয়ে নয়, দানের মেয়ে একটু ভাল রকম দেখে শুনে দিলেই হ'ত, এতে যে দশ জনে দশ কথা বল্‌বে।"

"দশ জনে দশ কথা বলুক তাতেও দুঃখ নাই; কিন্তু প্রতিমার অদৃষ্টে সুখ হ'লনা। বাবা বরাবরই বল্‌তেন প্রতিমার খুব ভাল ঘর ভাল বর দেখে বিয়ে দিব, তাতে যত টাকা খরচ হয় ক'রবো।"

"আর তোমার বাবার কথা বলনা, আর তারই বা দোষ কি? তোমার মত বুদ্ধি অদৃষ্ট নিয়ে আস্‌তে পারতো তা হ'লে আপনিই ভাল বরঘর জুটিয়ে, যেমন তলিস্যে ক'রে এসেছে, তেম্‌নি পাবে।"

"বাবা'ত এখনও বল্‌ছেন, দোজবরের হ'ক বয়স অল্প, দেখ্‌তে শুনতে খুব ভাল, লেখা পড়াও খুব জানে।"

"তা আহ্লাদে দোজবরেতে ঘুচ্‌বেনা; বয়স আর কতই কম হ'বে? না হয় চারিপাই হ'ক, আর যেমন শুনতে পাচ্ছি গয়না গাঁটে যে দিতে পারবে এমনত মনে ধরে না। তা বাই হ'ক ভোরের বর এলনা কেন?"

"আসবার ত খুব মন ছিল, তা আস্‌তে পেলেন কৈ; যেখানে চাকরী করেন সেই রাজার ছেলের রাজটীকে হবে, তাতেই ছুটী পেলেন না।"

"বটে! সে এলেও তবু দুদণ্ড ঠাট্টা তামাসাটা ক'রতে পেতুম, আমিত ভাই তোমার বাসর জাগ্‌তে থাকবোনা, গুড়ো দুড়ো নিয়ে কি

আর বলার হয়? তোমরা কেউ যে সুখে বাসর জাগবে তা মনে ক'রনা, প্রতিমাকে নিয়েই তোমাদিগকে অস্থির হ'তে হবে, কান্না কি থাকবে? যখন দেখতে পাবে তখন কাটা কৈ ধড়ফড় কর্‌বে?"

"না দিদি না, তা কর্‌বে না, প্রতিমা আমাদের খুব সুবুদ্ধি,"

"সুবুদ্ধি ত বটে, আচ্ছা প্রসূন, তুইই মনে ক'রে দেখ দেখি তোর বরটী যদি দোজবরে হ'ত তা হ'লে তোর মনটী কেমন হ'ত?"

"সে কথাটী সত্যি বটে"

"তবে আপনা দিয়ে দেখলেই হয়" বলিতে বলিতে প্রসন্ন ঠাকুরাণী একবার প্রতিমার কাছে গেলেন, ঘমুকের মত দাঁড়াইয়া, প্রতিমার মুখের কাছে মুখটী লইয়া গিয়া বলিলেন, "প্রতিমা! কেঁদনা; ছি বন্ কাঁদতে কি আছে, তা বয়স হ'ল ত অতি কি? বুড়ো বড় ভাল বাসবে।"

প্রতিমা হাত দিয়া প্রসন্ন ঠাকুরাণীর মুখটী ঠেলিয়া দিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

প্রসন্ন ঠাকুরাণী প্রফুল্লের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন "প্রতিমা, ও কি তেমনি মেয়ে, যে অভিমানী, হয়ত সে বরের সঙ্গে কথাই কবে না।"

এমন সময় শোভা সেই ঘরে দৌড়িয়া আসিল, বলিল "বড় দিদি তোমরা সব এস না, আমু বাগানের কাছে দেখে এলাম পাল্কী আসছে।

"সত্যি নাকি, চল যাই এস দিদি, বর দেখিগে, আমাদের ভাগ্যিটাই কেমন দেখে আসি, এসে আবার পান সাজবো।"

এই বলিয়া প্রফুল্ল উঠিয়া শোভার সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল। প্রতিমার বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ করিতে লাগিল। প্রসন্ন ঠাকুরাণী বর দেখিতে গেল না, সে প্রতিমার মায়ের কাছে গেল বলিল "হ্যাঁগা! শুনেছি বর আসছে, তা বাজনা বাদ্যি কৈ? তোমরা ত বাজনা আসবে বাজনা আসবে ক'রে ধুম করেছিলে, এখন যে একটী টেমটেমিরও সাড়া নেই।" এমন সময় বহির্ব্বাটীতে বরের শুভাগমন সূচক হুলুধ্বনি পড়িল, প্রতিমার মা যেন চমকিয়া উঠিলেন "তবে ঠাকুর কি আমার প্রতিমার বিয়ের আশা পোড়াই কি এমনি?" এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন।

"বালাই, ষাট্ ষাট্ কেঁদনা কেঁদনা, এ সময় কি কাঁদতে আছে? আমিত তখনই তোমাদিগকে বলেছি তাদের কার ও কিছু নাই বাজনা বাদ্যি কর্‌বে কোথা হ'তে। যা হ'চ্ছে সেই ভাল, প্রতিমার হাতের নোয়া বজায় থাকুক ও হতেই সুখ হবে।" প্রসন্ন ঠাকুরাণী এই বলিয়া প্রতিমার মাকে প্রবোধ দিল, সেই প্রবোধ বাক্য শুনিয়া প্রতিমার পিসিও কাঁদিয়া উঠিলেন, প্রসন্ন ঠাকুরাণী ফোঁস ফোঁস করিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। বাটীর মধ্যে মহা একটা কলরব পড়িয়া গেল, প্রতিমা ভাবিল তাহার বুড়ো বরের বুঝি দাঁত নাই, তাই এত কান্না।

এমন সময় পাড়ার কেলে নাপিত "বাবা! কি ভারী একি আমার সাধ্যি, পাকা হাড় কিনা কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে এক ষ্টার জল দাও ত গো খাই" এই বলিতে বলিতে বাটীতে প্রবেশ করিল। প্রতিমা কপাটের একখানি খুলিয়া একখানির আড়ালে বসিয়া ছিল; এইবার দুই খানি বন্ধ করিয়া দিল।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ব্রেজিলে বাঙ্গালী বীর।—ভীরুতা বাঙ্গালীর চিরকলঙ্ক। বাঙ্গালী কখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া রাজপুতের ন্যায় যে, বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, এখন অনেকে তাহা বিশ্বাস করিতে চান না। প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির নাম এখন পৌরাণিক কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে; রাম ও রাবণ তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু আজি এই দুর্দ্দিনে শ্রীমান সুরেশচন্দ্র নিবাস সুদূর মার্কিন দেশে ব্রেজিলে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত শত্রু সৈন্যের সম্মুখে যে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা শুনিলে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। সুরেশচন্দ্রের নিবাস কলিকাতার সহরতলী—কড়েয়া। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সুরেশ খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন; তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর মাত্র। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাতে সুরেশ আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। কি অভিপ্রায়ে তিনি পিতৃনির্ব্বাসনের সমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু ইহার পরেই সুরেশচন্দ্র একখানি জাহাজের সামান্য খালাশী হইয়া লিভে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় একটী মার্কিনদলে নানা প্রকার ব্যায়াম কৌশল দেখাইতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি অর্ণবপোতে যান, এবং তথা হইতে ব্রেজিলে উপস্থিত হয়েন। সেই সময়ে ব্রেজিলে বিপ্লব-বহ্নি দিগ্‌দাহীতেজে প্রজ্বলিত। সুরেশ অশিক্ষিত বীরবদনের পক্ষপাতী। সেই ভীষণ যুদ্ধে তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সামান্য পদাতিদলে ভ্রাম্যমান হইয়া অম্লানবদনে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুদ্ধনৈপুণ্য ও অদম্য অধ্যবসায় দর্শনে অচিরে প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে একটী রাজিনীর লেফ্‌টেনাণ্ট পদে উন্নীত করিয়া দিলেন। কথিত আছে, একদিন সেই ভয়াবহ সমরক্ষেত্রে শত্রু সৈন্যের প্রচণ্ড বিক্রমে গবর্ণমেণ্টের সেনা ত্রস্ত ও বিত্রস্ত হইয়া পড়িলে বীর সুরেশ শত্রুর নিবিড় গোলা বর্ষণের মধ্যে সদর্পে ঝাঁপ দিয়া গম্ভীর রবে বলিয়াছিলেন, "বীরপ্রসূ পবিত্র ভারতভূমির সন্তান হইয়া কিরূপে শত্রুর কামান হস্তগত করিবে তাহা দেখ!" বীরের বাক্য ফলিল। কিন্তু আজি সুরেশচন্দ্র নিরুদ্দেশ লোকের আশঙ্কা—তিনি শত্রুহস্তে পতিত। সুরেশ বাঙ্গালীয় মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন; স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ ত্যাগ করিয়াও তিনি মাতৃভূমিকে ভুলিতে পারেন নাই।

বিপ্লব ও অশান্তি।—য়ুরোপের সর্ব্বত্রই একটা বিপ্লবের বিভীষিকা নিত্য জাগ্রত। এজন্য রাজার নিদ্রা নাই, রাজ প্রতিনিধির শান্তি নাই, প্রজার সুখ নাই—সকলেই যেন সর্ব্বদাই সশঙ্ক। কে কাহার প্রাণনাশ করে, এই ভয়ে সকলেই ব্যাকুল। পাপের প্রাদুর্ভাবে প্রায় সমগ্র য়ুরোপ রসাতলগত হইবার উপক্রম হইয়াছে;—এখন ভূভারহরণ না হইলে আর নিস্তার নাই। প্রতিক্রিয়া বহুদিন আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু তাহার ফল অতীব ভয়াবহ। কতকগুলা নৃশংস ব্যক্তি দল বাঁধিয়া রাজা ও রাজ শাসনের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত! সাম্য, স্বাধীনতা ও বিশ্বজনীন

ভ্রাতৃত্ব ইহাদের মূল মন্ত্র কিনা জানিনা, কিন্তু তাহাহইলে সাধারণ তন্ত্রের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইবে কেন? সেদিন ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট কার্ণো, শান্তো নামক এক দুষ্কৃতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। নিহিলিষ্ট, এনার্কিষ্ট ও সোশিয়ালিষ্ট প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায় য়ুরোপে অশান্তির কণ্টক রোপণ করিতেছে, শান্তো তাহাদিগের একজন প্রধান নায়ক।

বিষম আশঙ্কা।—আশিয়া মহাদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল বেলাভূমে সুদূর কোরিয়া রাজ্য লইয়া চীন ও জাপানে বিষম গণ্ডগোল বাধিয়াছে। উভয়েই উক্ত রাজ্যে স্ব স্ব প্রভুতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এদিকে রুষভল্লুক মধ্যস্থ হইয়া উভয় কেই বঞ্চনা করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে, এদিকে আবার বৃটিশ কেশরী মহাসমর আশঙ্কা করিয়া প্রশান্ত সাগরে শান্তি রক্ষার অভিপ্রায়ে একটা কৌশল জাল বিস্তার করিতে প্রস্তুত। পরিণামে কাহার কৌশল সিদ্ধ হয় বলা যায় না। যদি রুষ ভল্লুক কিছু মাত্র করে, তাহা হইলে বৃটিশ কেশরী অল্পে ছাড়িবেন না। বৃটিয়, রুষ, চীন ও জাপান রণরঙ্গে মাতিলে সমগ্র আশিয়া তোলপাড় হইবে।

শ্যামে ফরাসী।—ফরাসী আবার শ্যাম রাজ্য লইয়া পড়িয়াছেন; গত বৎসর সামান্য যুদ্ধ ব্যাপারেই যে বিবাদ মিটিয়া হইয়াছিল, ফরাসীর চেষ্টায় আবার তাহা জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন ফরাসী বলিতেছে "শ্যামরাজ! তুমি আমায় দাসখৎ লিখিয়া দাও!" শ্যাম এখন ফাঁপরে পড়িয়াছেন; একুল বৃটিশ এসংবাদে বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন; পরিণামে কি দাঁড়ায় কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

নূতন কীর্ত্তি।—ছোটলাট সার চার্লস্ এলিয়টের নিত্য নূতন নূতন কীর্ত্তি স্থাপিত হইতেছে। ইনি আমাদিগকে হাড়েনাড়ে জ্বালাইয়া তবে ছাড়িবেন। উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সেটলমেণ্ট অফিসার মিঃ রেডিসের কথা এখনও অনেকে ভুলেন নাই। এই মহাপ্রভু তত্রত্য কোন জমিদারকে ঘোরতর অবমানিত করিতে সার এণ্টনী ম্যাকডোনেল তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া ময়মনসিংহের এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নামাইয়া দিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, এক বৎসরের জন্য রেডিস সাহেবের পদোন্নতি হইবে না। সার চার্লস্ এলিয়ট ফিরিয়া আসিয়া প্রতিনিধি ছোটলাটের এই বেয়াদবী সহ্য করিতে পারিলেন না; অচিরে রেডিস জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইলেন। আমরা এই ব্যবহারে বিস্মিত হই নাই; কিন্তু ছোট লাটের এই সৎকীর্ত্তি লইয়া বিলাতে কুমন্ত্রস মহাসভায় আন্দোলন হইয়াছিল। ভারতবন্ধু ওয়েডরবর্ণ ষ্টেটসেক্রেটরীকে ছোটলাটের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ লইতে বলিয়াছিলেন; তদনুসারে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। কিন্তু প্রভু যে কৈফিয়ৎ দেন, তাহা পাঠ করিলে ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ছোটলাট বলিয়াছেন যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পীড়া হওয়াতে এবং জেলায় তৎকালে অন্য কোন সিভিলিয়ান না থাকাতে তিনি অগত্যা মিঃ রেডিসকে ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুবিশাল বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার এই বালসুলভ ক্রন্দন-কফ-মিশ্রিত কৈফিয়তে ওয়েডরবর্ণ প্রমুখ মেম্বর বৃন্দ হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু ষ্টেটসেক্রেটরী ইহাতেই সন্তুষ্ট!

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

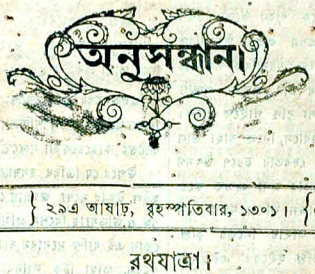

অষ্টম বর্ষ। ২৯এ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। একাদশ সংখ্যা।

রথযাত্রা।

ভগবান বিষ্ণুর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ যাত্রা; রথযাত্রা তাহার অন্যতম:

"বৈশাখে চান্দনী যাত্রা জ্যৈষ্ঠে স্নাপহ্যদারিতা।
আষাঢ়ে রথযাত্রা স্যাৎ শ্রাবণে শয়নী তথা॥
ভাদ্রে দক্ষিণপার্শ্বীয়া আশ্বিনে বামপার্শ্বিকা।
উত্থানী কার্ত্তিকে মাসি স্যাদ্দামনী মার্গশীর্ষকে॥
পৌষে পুষ্যাভিষেকঃ স্যাদ্মাঘে শাষ্যোদনী তথা।
ফাল্গুনে দোলযাত্রা স্যাদ্ষৈচত্রে মদনভঞ্জিকা॥"

এই সকল যাত্রা ঋতু ও কালের সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহাতে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর অকপট ভগবদ্ভক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবতার্চ্চে আত্মবলিদানই প্রকৃত পূজা; যিনি যে স্বরূপাংশে উপাস্য দেবতায় তন্ময় হইয়া আত্মহারা হয়েন, দেবতার সহিত তাঁহার প্রভেদ ততই কমিয়া যায়; তাঁহার পূজাও ততই ফলবতী হয়; ততই তিনি ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকেন। শৌচ, সারল্য ও আর্জ্জব, দেবারাধনার তিনটী প্রধান উপাদান। সরল না হইতে পারিলে কেহই দেবতায় তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারে না; এইজন্য সারল্য পরম সাধনার ধন, যোগীরও আরাধ্য বস্তু। ভগবান শুকদেব অল্পে যে সারল্য লাভ করিয়াছিলেন, পরিণতপ্রজ্ঞ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জ্ঞানমার্গে ভূয়সী উন্নতি লাভ করিয়াও তাহা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। সেই জন্য তিনি নখ শুকের প্রতি জলকেলিরতা দিব্যাঙ্গনাগণের উপেক্ষা দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন। সারল্যে নির্ব্বিকারত্বের চরম উৎকর্ষ। কঠোর পুরুশোক উহাকে কলুষিত করিতে পারে না; স্বার্থপরতা ইহার ত্রিসীমায় প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। যিনি যে পরিমাণে আত্মত্যাগী, তিনি সেই পরিমাণে সরল। বশিষ্ঠদেব স্বয়ং যোগশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াও সর্ব্বতোভাবে সরল হইতে পারেন নাই; সেইজন্যই তিনি পুত্রের মৃত্যুতে শোকদেশে পাষাণ বাঁধিয়া শতদ্রু নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

হিন্দু শৈশব হইতেই এই সরলতা শিক্ষা

করেন; বাল্যকালে মনের ফুল তুলিয়া যখন আমাদের বালকবালিকাগণ মনোমত পুতুল গড়িয়া তাহাকে পূজা করে, তখন তাহাদের সারল্যের প্রথম প্রস্রবণ উৎসারিত হয়। ইহার পর ক্রমে বয়সাধিক্য-সহকারে প্রতিমা-পূজা, কুলদেবতার অর্চ্চনা, প্রভৃতি ব্যাপারে তাহার সারল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হিন্দু নিজে যাহা ভালবাসে, নিজে যাহা ভাল বোধ করে, তাহাই দেবতার চরণে উৎসর্গ করে, তাহাই দেবতার জন্য প্রস্তুত করে, অথবা তাহারই আয়োজন করিয়া থাকে। সে জানে যে, যাহাতে তাহার নিজের তৃপ্তি, তাহাতেই দেবতার তৃপ্তি হইবে। এইজন্যই সে শীতকালে স্বীয় উপাস্য দেবতাকে শীতবস্ত্রে জড়িত রাখে, বৈশাখের বিকট জ্বালায় তাঁহার দেহ শীতল চন্দনে লেপিত করে। এই সরলতা লইয়াই ভগবান বিষ্ণুর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ যাত্রা বিহিত হইয়াছে। পরন্তু এই সকল যাত্রার মধ্যে রথযাত্রা অসন্দেহে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই রথযাত্রা কোথা হইতে কোন সময়ে কি উপায়ে এদেশে প্রচলিত হইল, তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শাস্ত্রে অন্যান্য যেসকল দেবতার রথযাত্রা বর্ণিত আছে, তাহার উল্লেখ করিব। আমরা ভবিষ্য পুরাণে ব্রহ্মার এবং কৌর্ম্মে আদ্যাশক্তি মহামায়ার রথযাত্রার বৃত্তান্ত দেখিতে পাই; তদ্ব্যতীত সূর্য্য, চন্দ্র ও ইন্দ্রাদিরও পৃথক্ পৃথক রথযাত্রার উল্লেখ দেখা যায়। কার্ত্তিক মাসে ব্রহ্মার রথযাত্রা হইয়া থাকে:—

"কার্ত্তিকে মাসি দেবস্য রথযাত্রা প্রকীর্ত্তিতা।
যাং কৃত্বা মানবো ভক্ত্যা যাতি ব্রহ্মসলোকতাম্।
কার্ত্তিকে মাসি রাজেন্দ্র পৌর্ণমাস্যাং চতুর্মুখম্।
মার্গেন চর্ম্মণা সার্দ্ধং সাবিত্র্যা পরমং তপঃ।
ব্রহ্মায়েত্রথমারুহ্য সর্ব্বদেবাদ্যৈঃ সমবিতম্।
স্বাপয়েদ্ রথমধ্যিস্থা তু সলোকং নগরং প্রতি।"

এইরূপ মহাদেবীর রথযাত্রায়ও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রথ কিরূপ, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল:—

"দন্তিদন্তময়ৈর্দৈত্যৈঃ সবজ্রৈঃ সুশোভনৈঃ।
বিচিত্রপঙ্করাসাদ্যৈম বিভিরূপশোভিতৈঃ।
রথস্তৈঃ কারয়েদ্দেব্যা সপ্তভৌমং মনোরমম্।"

উপরে যে ত্রিবিধ রথযাত্রার বিষয় কথিত হইল, ইহার মধ্যে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাই বঙ্গ ও উড়িষ্যায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। কোন্ সময়ে কোন্ এই ব্যক্তি মনোরম যাত্রা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। কথিত আছে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ইহার প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা। কিন্তু মূলে এই ইন্দ্রদ্যুম্ন লইয়াই বিষম গোলযোগ। পূর্ব্বে অনেকের ধারণা ছিল যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কিন্তু আধুনিক গবেষণা ও অনুসন্ধানে সে মত অমূলক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে*। প্রয়োজন-বোধে শ্লোকটী এইস্থানে উদ্ধৃত হইল:—

"পাদৌ যস্য ধরাত্তরীক্ষমখিলং নাভিশ্চ
সর্ব্বা দিশঃ।
শ্রোত্রে নেত্রযুগং রবীন্দু যুগলং মূর্দ্ধাপিচ
দ্যৌরসৌ।
প্রাসাদং পুরুষোত্তমস্য নৃপতিঃ কোনাম
কর্ত্তুংক্ষমঃ।
দত্যেত্যাদ্যনৃপৈরুপেক্ষিতময়ং চক্রেহথ
গঙ্গেশ্বরঃ। ২৭॥

অর্থাৎ, এই ধরিত্রী যাঁহার চরণযুগল, অখিল অন্তরীক্ষ যাঁহার নাভি, দিকসকল যাঁহার কর্ণদ্বয়, সূর্য্যচন্দ্র নয়নযুগল, এবং স্বর্গলোক যাঁহার মস্তক; সেই বিশ্বময় পুরুষোত্তমের মন্দির কোন্ নৃপতি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ? এই রূপ ভাবিয়াই" যেন পূর্ব্বতন নরপতিগণ ভগবানের মন্দির-নির্ম্মাণে সাহসী হয়েন নাই; পরিশেষে মহারাজ গঙ্গেশ্বর (চোড়গঙ্গ) সেই মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। এই শ্লোকটী দ্বারা ইন্দ্রদ্যুম্নের কীর্ত্তি-কলাপ অধঃক্ষিপ্ত হইয়াছে। অনেকে এইজন্য আদৌ তাঁহার অস্তিত্বেই সন্দেহ করেন; এই সন্দেহ যুক্তিযুক্ত কিনা, এ স্থলে তাহার আলোচনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ যদি ইন্দ্রদ্যুম্নকেই জগন্নাথদেবের রথযাত্রার প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে আমরা ইহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না; কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? ইহাতে প্রাচীন-কীর্ত্তিপ্রিয় ভক্তগণের বিরক্তি হইতে পারে, কিন্তু কঠোর ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে আমরা কালের পরিবর্ত্তন করিতে পারি না। এস্থলে ভক্তগণ কঠোপনিষদের "—শরীরং রথমুক্তমং" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বাক্যটীর উল্লেখ করিয়া রথযাত্রার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিবেন। করুন, তাহাতে আপত্তি নাই; কারণ, পূর্ব্বকালে হইতে ভারতে যুদ্ধরথ, যানরথ, পুষ্পকরণ, প্রভৃতি রথ-নামে পরিচিত স্থানেকপ্রকার যান ছিল; দেবতা ও রাজগণ সেই সকল রথে আরোহণ করিয়া অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিতেন; কিন্তু জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার ন্যায় এরূপ আড়ম্বরময় যাত্রা পূর্ব্বে ছিল কিনা, তাহা দেখিতে হইবে।

* প্রসিদ্ধ "বিশ্বকোষ"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু উৎকল ভ্রমণ করিয়া যে কয়েকখানি নূতন তাম্রলিপি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একখানিতে দেখা যায় যে, গঙ্গাবংশের প্রতিষ্ঠাপনকর্ত্তা মহারাজ চোড়গঙ্গদেবই এই মন্দির স্থাপন করেন। বিশ্বকোষ ৩১৩—৩১৫ পৃষ্ঠা।

বৈষ্ণবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রথারোহণে মথুরা-যাত্রাকে এরূপ রথযাত্রার একটী আদিম দৃষ্টান্ত বলিয়া সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন।

অনেকের ধারণা যে, জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা বুদ্ধ ও জিনদেবের রথ-যাত্রার অনুকরণে প্রচলিত হইয়াছিল। তাঁহারা অসমতের দৃঢ়ীকরণ-উদ্দেশ্যে জগন্নাথদেবকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিভেদ বলিয়া প্রচার করিয়াথাকেন। তাঁহারা বলেন যে, ভগবান্ বুদ্ধের একটী দন্ত কলিঙ্গ-রাজের নিকট গোপনে রক্ষিত হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা সেই দন্ত রথে স্থাপিত করিয়া প্রতি বৎসর এইরূপে নগর ভ্রমণ করিত। কালে তাহার পরিবর্ত্তে বুদ্ধদেব, ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ মন্ত্রের প্রতিমূর্ত্তি রথোপরি স্থাপিত হয়। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র, ও সুভদ্রা এই তিনটী দেবতার অনুকরণে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, তাঁহাদের প্রথম মত কিয়দংশে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে; কারণ, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মধ্যে এরূপ রথযাত্রা অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থ ও গাথাসমূহে ইহার বহুল উল্লেখ দেখা যায়। প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ৪০০ খৃষ্টাব্দে ভারতের অভিমুখে যাত্রাকালে বর্ত্তমান লুলঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে বুদ্ধদেবের এইরূপ রথযাত্রা দেখিয়াছিলেন; জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সহিত তাঁহার যে প্রায় সকল বিষয়েই সৌসাদৃশ্য আছে, পাঠক ফা-হিয়ানের নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।

"From the first day of the fourth-month they sweep and water the thorough-fares within the city and decorate the streets. Above the-city-gate[thby stretch a great awning and use every kind of adornment This is where the king and the queen and court.

ladies take their place. * * * About three or four *li* from the city they make a four-wheeled image-car about 30 ft. high, in appearance like a moving palace, adorned with the seven precious substances. They fix upon it streamers of silk and canopy-curtains. The figure is placed in the car, with two Bodhisattvas as companions, whilst the Devas attend on them; all kinds of polished ornaments made of gold and silver hang suspended in the air."

—*Fo-kwo-ki*, Chap. IV.

ইহার ভাবার্থ এই,—চতুর্থ মাসের প্রথম দিবস হইতেই নাগরিকগণ নগরের পথঘাট সকল ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া সাজাইতে আরম্ভ করে। নগরদ্বারের শিরোদেশে একখানি বিশাল চন্দ্রাতপ বিস্তৃত হয় এবং নানাবিধ মণ্ডনে মণ্ডিত হইয়া থাকে। এই চন্দ্রাতপের নিম্নেই রাজা, রাণী ও পুরস্ত্রীগণ আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। * * * নগরের অদূরে চতুশ্চক্রসমন্বিত বিংশতিহস্ত উচ্চ একখানি রথ নির্ম্মিত হয়। তাহা দেখিতে চলৎ প্রাসাদের ন্যায়। তাহা নানাবিধ রত্নভূষণে শোভিত এবং ধ্বজাপতাকায় সজ্জিত। এই রথে ভগবান বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত। দুইদিকে দুইটী বোধীসত্ত্ব তাঁহার সহচররূপে আসীন; দেবতারা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত।

দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ফা হিয়ান বুদ্ধদেবের যে রথযাত্রা দেখিয়াছিলেন, অদ্য জগন্নাথ দেবের ঠিক সেইরূপ রথযাত্রা আমরা দেখিতেছি। এইরূপ রথযাত্রা অন্যান্য প্রাচীন জাতির মধ্যে এককালে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মিশর দেশে অসুয়েশ (Osirijs) দেব ও ঈশা (Isis) দেবীর এইরূপ রথযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। স্কন্দনভ ও মর্ম্মণ্য দেশেও অতি প্রাচীনকালে বোধেন (বুধ বা বুদ্ধ?) দেবকে এইরূপ রথে স্থাপিত করিয়া নগর ভ্রমণ করা হইত।

এই রথযাত্রার বিবিধ উৎপত্তি ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উদ্ভাবিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কঠোপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ বচনটীই বিশেষ আদৃত। উপাস্য দেবতা বা ব্যক্তির প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অনেকে তাঁহাকে রথে বা শকটে স্থাপিত করিয়া আপনারাই বহন করিয়া থাকে; এ প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে; সেদিন লর্ড রিপণের প্রতিও প্রগাঢ় ভক্তির এরূপ নিদর্শন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়া সকল স্থানেই যে এরূপ ইতিহাস-প্রোক্ত আচার বা ব্যবহারকে রূপক বলিয়া তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহা কিরূপে সমীচীন হইতে পারে? বলা বাহুল্য যে, এরূপ রথযাত্রাকে অনেকে রূপক বলিয়া জ্ঞান করেন; যখন শ্রীরামলক্ষ্মণ ও শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরাদিকেই কোন কোন মহাত্মা রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন রথযাত্রা যে রূপকরূপে অবতারিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। ফলতঃ ইহা যাহাই হউক, ভক্তের প্রাণ ইহার প্রচলিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না। "রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" আমাদের এই পঞ্চভূতময় শরীর রথস্বরূপ; পরমাত্মা রথীরূপে ইহাকে চালিত করিতেছেন। এই রথের স্বাতন্ত্র্য নাই, স্বাধীনতা নাই, রথিতে তন্ময় হইয়া তাঁহারই নিয়োগমত চলিতেছে। ভক্ত যখন এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিবে, তখনই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিবে,—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

যে সকল ভক্ত রথিতে তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারেন না, তাঁহারাই ঐ কাষ্ঠময় রথে ভগবান বামনদেবের চরণে প্রাণ উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পদতলে পতিত হয়েন; এবং যাঁহারা তদ্দূর দুঃসাহস করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা দূর হইতে রথের রজ্জু স্পর্শ করিয়াই আপনাদিগকে পাপমুক্ত জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাস হিন্দুর অস্থিমজ্জার সহিত গঠিত; শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, হিন্দুর বক্ষের উপর দিয়া কত ধর্ম্মবিপ্লব প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে, হিন্দুর ধর্ম্মনীতি-শাস্ত্রের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু "রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" এই সুদৃঢ় বিশ্বাস অদ্যমাত্রও কম্পিত হয় নাই। আজি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কঠোর শাসনে চক্রপাণি চতুর্ভুজের রথচক্রে জীবন উৎসর্গ করিতে কেহই পায় না বটে, কিন্তু যখন আষাঢ়ের শুক্লা তৃতীয়ার অভ্যুদয়ে রথোৎসবের বার্ত্তারব দিগন্ত কাঁপাইয়া জাগিয়া উঠে, তখন হিন্দুর হৃদয় সংসারের বিষ-কাননহইতে পলায়ন করিয়া উদ্দামবেগে ভগবানের চরণতলে উপনীত হইবার জন্য ধাবমান হয়।

তাড়িৎ-শক্তি-নির্ণয়।

(পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক।)

এই বিশ্বের মধ্যে কেবল একমাত্র আকর্ষণকারী শক্তি (magent) বর্ত্তমান আছে। ঐ শক্তি হইতে সমস্ত বস্তুর আকর্ষণী শক্তি জন্মে। ক্যাবেলিষ্টগণ উক্ত শক্তিকেই বিশ্বের কেন্দ্রস্থ আধ্যাত্মিক তেজোময়ী শক্তিবিশেষ বা (বিধাতা) জগদীশ্বর কহেন। কার্টার সাহেবের মত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহবর্গ ও নক্ষত্রগণ প্রচুর পরিমাণে ঐ শক্তিবিশিষ্ট। কিন্তু উহারা স্বতঃই ঐ শক্তিবিশিষ্ট নহে; উপরি-উক্ত আধ্যাত্মিক তেজোময়ী শক্তির অন্তর্ভূত থাকিয়া ঐ শক্তি বিশিষ্ট হয়।

ক্যাবেলিষ্টগণ তাঁহাদের জেনেসেস্ নামক ধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম অংশে বলিয়া গিয়াছেন যে, জ্যোতিঃই সৈকিরথ (বুদ্ধি); উহাই সমস্ত বাহ্য জ্ঞানের মাতৃস্বরূপ; উহাই ওয়া ঐশ্বরিক জ্ঞান। সৃষ্টির উপদেশদাতৃকে (Evangelist) বলিয়াছেন যে, ঐ জ্যোতিঃই সেই সর্ব্বশক্তিমান হইতে প্রথম সৃষ্ট বা উৎপন্ন। এই জ্যোতিঃ হইতে মনুষ্যের জীবন। জ্যোতিঃ ও জীবন এই উভয়েই তড়িৎ বলিয়া পরিগণিত এবং এই তড়িৎ বিশ্বব্যাপিনী সজীবতার মূল সূত্র। ঐ তড়িৎ-শক্তি সমস্ত পদার্থকে সজীবতা প্রদান করে। আলোক বহুরূপধারী ঐন্দ্রজালিকের ন্যায়; কারণ, সৃষ্টিকর্ত্তার পবিত্র ইচ্ছানিবন্ধন ইহা ভিন্ন ভিন্ন আকারে অবস্থান করিয়া নিজ সর্ব্বশক্তিমত্তা দ্বারা সর্ব্ব আকারের বস্তু ও সর্ব্বপ্রকার জন্তু সৃষ্টি করিতেছে। ঐ আলোকের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তমান শক্তি-ভাণ্ডার হইতে সমস্ত পদার্থ ও তাহাদের আধ্যাত্মিক তেজ উৎপাদিত হয়। ইহাই সমস্ত আধিভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়ার এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কার্য্যের আদি কারণ; ইহা জীবনদাতা ও জগৎস্রষ্টা; ইহার আদিকারণ বা মূল হইতে ক্রমে ক্রমে সহস্র সহস্র প্রত্যক্ষ ও অদৃশ্য

জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রেটোর পরমেশ্বর ত্রিশক্তির একশক্তি হইতে এই আলোক ঘনীভূত করিয়া একটী প্রজ্বলিত বিন্দুই আমাদের সূর্য্য; এই সূর্য্যের নিজের আলোক বা উষ্ণতা উৎপাদন করিবার ক্ষমতা নাই; সূর্য্য উক্ত আলোকের আধার বা কাচযন্ত্রবিশেষের স্বরূপ। এই জন্যই মৌলিক আলোক জড়পদার্থসম্ভূত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং সৌরজগতের উপর ঘনীভূত হইয়া সর্ব্বপ্রকার শক্তির সমতা স্থাপন করে। যদি ইহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অপ্রশস্ত সীমা অতিক্রম না করে, তাহাহইলে আমরা সহজেই বুঝাইতে পারি যে, পুরাকালের কোন জাতি এমন কি সূর্য্য-উপাসকগণ পর্য্যন্তও প্রত্যক্ষ সূর্য্যকে তাঁহাদের অশরীরী অদৃশ্য কেন্দ্রস্থিত আধ্যাত্মিক সূর্য্যরূপ ঈশ্বরের প্রতিমা ভিন্ন আর কিছুই মনে করিত না। আধুনিক বিজ্ঞানানুসারে আমরা অবগত হই, সূর্য্য হইতে আলোক এবং উত্তাপ উৎপন্ন হয়, এবং এই গ্রহই দৃষ্ট জগতের জীবনদাতা। কিন্তু প্রাচীনদিগের ঐরূপ বিশ্বাস ছিল না।

ওর্ফেয়ে কথিত আছে যে, "অগ্নির জ্যোতিঃ অবিনাশী, তাঁহার অত্যুজ্জ্বল, সর্ব্বব্যাপী, অনিবৃত্ত ও অক্ষয়শীল রশ্মি দিনরাত্রি কখন আলোক-দানে বিরত হয় না।" এখানে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, উপরোক্ত বাক্যগুলি আধ্যাত্মিক কৈশ্চিক সূর্য্য-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ঐ আধ্যাত্মিক সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বব্যাপী, অক্ষয়শীল এবং সমস্ত বস্তুর জীবনদাতা। তিনিই অহংবিন্দু। এই বিশ্বের প্রত্যেক বিন্দুকে সেই বিন্দু বলা যাইতে পারে; ঐ বিন্দু একটী কল্পিত বৃত্তের কেন্দ্র, কিন্তু ঐ বৃত্তের অস্তিত্বাভাব। তিনি শূন্যময়, আধ্যাত্মিক অগ্নি সর্ব্বব্যাপী, বুদ্ধির অগম্য, অনন্ত আকাশ অর্থাৎ বিশ্বের জীবন ও আত্মা-স্বরূপ। এইজন্য পদার্থবাদিগণ স্বমত-সমর্থনে হতাশ ও অকৃতকার্য্য হন; তাঁহারা একদিন না একদিন স্বীকার করিবেন যে, পৃথিবীর অসীম চলৎশক্তি-সমূহের চিরস্থায়ী সমতা-রক্ষার কারণ অদৃত দৈবী তড়িৎ-শক্তি এবং সূর্য্য বিদ্যমিত সহস্র সহস্র চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণকারী পদার্থ সকলের মধ্যে একটী। আমেরিকি সূর্য্যকে জেনারেল প্লেজেণ্টনের মতানুসারে আলোক-প্রতিফলনের যন্ত্রবিশেষ বলিতে পারি; চন্দ্র বা আকাশস্থিত উজ্জ্বল নক্ষত্রবর্গের ন্যায় সূর্য্যেরও স্বতঃই কোন জ্যোতি বা উত্তাপ নাই।

প্রকৃত পক্ষে (বিশ্বে) চৌম্বক আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ ভিন্ন নিউটনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ বলিয়া কোন বস্তু নাই; সৌর জগৎস্থ গ্রহবর্গের স্ব স্ব পথে গতি, তাহাদের ভার-মাধ্যাকর্ষণ গুণে নহে, সমস্ত গ্রহ অপেক্ষা অধিক আকর্ষণকারী শক্তিবিশিষ্ট সূর্য্য দ্বারা উহাদের গতি সুনিয়মে রক্ষিত হয়। জেনারল প্লেজেণ্টন প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা আলোক এবং উত্তাপের জন্য সূর্য্যের নিকট ঋণী নহি, আলোক স্বতঃউৎপন্ন অধিদেবতা, পরমেশ্বর যখনই ইচ্ছাপূর্ব্বক আজ্ঞা করিলেন যে আলোক হউক, সেই মুহূর্ত্তেই আলোক উৎপন্ন হইল। এই আলোকের অতিক্রান্ত ও সার্দ্ধক্ষণিক অনিবৃত্ত গতি জন্য পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী বস্তুর সহিত ঘর্ষণ হয়, এবং সেই ঘর্ষণে উত্তাপ হয়। সংক্ষেপতঃ জেনারল প্লেজেণ্টন আমাদিগকে ক্যাবেলিষ্টদিগের প্রথম মতের সহিত যে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন তাহাতে আমরা প্রাপ্ত হই যে, মেফিরা বা বুদ্ধি, এনমফ বা ঐশ্বরিক জ্ঞান উভয়ে মিলিত হইয়া সমস্ত

জ্যোতি ও অদৃশ্য জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত মত "যে সূর্য্য আলোকরাশি বাষ্পাকার বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত, ইহা দেখাইয়া করিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে, আলোক সূর্য্য দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া গ্রহবর্গের ও নক্ষত্রগণের পরিভ্রমণ-স্থানের মধ্য দিয়া যায়, এবং ঐ আলোক যাইবার সময় (ঘর্ষণ দ্বারা) প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ মিশ্রিত হইয়া উত্তাপ উৎপাদন করে, এবং চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হইবার ক্ষমতাবিশিষ্ট বস্তুতে ঐ ও আকর্ষণ করে। সূর্য্য, গ্রহবর্গ ও ক্ষুদ্র তারাসমষ্টি সকলের চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ-শক্তি আছে।

ইন্দ্রজালের অত্যাশ্চর্য্যকতার সম্ভাবনা প্রমাণ করা যেরূপ সহজ, এরূপ আর কোন বিষয় নহে। এই যে, বিশ্বব্যাপী চুম্বকময় সূত্রের তড়িৎ-তরঙ্গমালা ব্রহ্মাণ্ডকে সমভাবে রাখিয়াছে এবং যাহার নিজের অক্ষান্ত গতিদ্বারা অসীম সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণুর মধ্য দিয়াসঞ্চরণ যাইতেছে, সেই সমুদ্রের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দ্বারা সুভাবজাত জ্ঞানশক্তি হইতে যোগিগণ এই মহৎ রহস্যের আদি ও অন্ত নিতে সমর্থ হন। যদিও উহার পরীক্ষা যথেষ্ট ও প্রমাণসাপেক্ষ নহে, ঐশ্বরিক বিশ্বাসস্বরূপ এই কার্য্যকারী শক্তির বিষয় আমরা মনস্তত্ত্ব, শরীর-তত্ত্ব, পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপের গূঢ়ভাব অবগত হইতে পারি।

উপরে পাশ্চাত্য মতের সার সঙ্কলিত হইল। বৈদিককালে আমুদের আর্য্য ঋষিগণ কিরূপে তড়িৎ-শক্তির নির্ণয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

উপরোক্ত মতের সহিত আমাদের বৈদিক মত সামঞ্জস্য প্রতিপাদন জন্য এইস্থানে গায়ত্রীর ভর্গ শব্দের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

ভেতি ভাসয়তে লোকান্ বেত্তি রঞ্জয়তে প্রজাঃ গ ইত্যাদ্যচ্ছতেঽর্জ্জনং ভরগো ভর্গ উচ্যতে। (টীকা) অয়মেবস্তু ভর্গো বহিরাকাশে সূর্য্য মণ্ডলাভ্যেপি।

সকল প্রাণীনাং হৃদয়মধ্যে জীবভূতঃ প্রতিবসতি,

আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং

হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি।৩।

(অর্ণ) ভৃজি ধাতুর অর্থ পাক; যেহেতু তিনি সকল পদার্থকে পাক করেন, পুণ্যের ফলও নিষ্পাদন করেন, এবং সর্ব্বদা ভাজমান বা দেদীপ্যমান অর্থাৎ প্রলয়কালে কালাগ্নিরূপ গ্রহণ করিয়া সপ্তরশ্মি সপ্তজ্বালান্বিত হইয়া জগৎকে হরণ করেন; এই হেতু উক্ত তেজকে ভর্গ বলে।৫।

সকলকে প্রকাশিত করেন, এমতে তাঁহাকে (ড) বলে, (ভাসি—ড); সকলকে রাগান্বিত করেন, এমতে র বলে (রন্‌জিত); সর্ব্বদা গমন করে, এমতে গ বলে (গম—ড)। পশ্চাৎ উক্ত তিন পদের পূর্ব্বোদ্ধারাদির ন্যায় এখন এই সকল বিশেষণ দ্বারা এই বিশিষ্টার্থ বোধ হইতেছে যে, সকল ভূতাত্মাস্বরূপ সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যগত আদিত্য-দেবতা-স্বরূপ পুরুষই ভর্গ শব্দের অর্থ তাহাও তিনি কহিয়াছেন ৬।

সামবেদীয় সন্ধ্যার ২২ পৃষ্ঠা সূর্য্যোপস্থানে ১৩ম শ্লোক ও ২৪ পৃষ্ঠার ১২শ শ্লোক দৃষ্টি করুন।

ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ

দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং (১০ম শ্লোক)।

জগৎ প্রকাশনের জন্য রশ্মিগণ অংশুমালী সূর্য্যদেবকে বহন করিতেছে। ১০।

"ওঁ জাত বেদসে শুনবাম সোমমরাতীয়তোনি দহাতি বেদঃ সনঃ পরিষদতি দুর্গাণি বিশ্বনাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যাগ্নি॥" ১২॥

যে অগ্নি আমাদিগের ভস্ম করেন, বেদ সকল অধীন করেন, তরীদ্বারা তটিনী-উত্তীর্ণের ন্যায় যে অগ্নি দ্বারা এই বিশ্ব পার হইতে পারা যায়, আমরা সেই অগ্নি জন্য সোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। ১২।

প্রতিমা।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রতিমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর প্রতিমা চোক মেলিয়া চাহেনা, কাহারও সহিত কথা বলে না, হরিপুরের সদ্গোপদের যে মেয়েটী তাহার সঙ্গে আসিয়াছে, সে তাহার সেই রাজুদিদির কাছে বসিয়া কেবল সর্ব্বদা কাঁদে।

যেদিন বরণ করে আসে, সেদিন নগরপাড়ার সন্ধ্যামাসী, ইচ্ছাপিসি, শুকু মণি, নবীন দাদার বৌ, এমনি শত শত মেয়ে বরণ দেখিতে আসেন। যাঁহাদিগকে লইয়া প্রতি বৈকালে সাগরপাড়ার ঘোষেদের বাড়ী ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়, ক'নে পাল্কী হইতে না নামিতে নামিতে তাঁহারা কন্যার রূপগুণ সম্বন্ধে আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। মস্তকের কেশাগ্র হইতে পদনখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের ললিত বর্ণনায় বর্ণিত হইয়া গেল; কালিদাস, বেদব্যাস, বাল্মিকী হার মানিয়া কিছুকালের জন্য গা-ঢাকা হইলেন। মন্তব্য প্রকাশিত হইল,—"তা দেখ্‌তে শুন্‌তে নিতান্ত মন্দ নয়; তবে রং টা বড় ফ্যাকাসে, চোকদুটী আর একটু বড় হ'লে ভাল হ'ত, নাকটি আর একটু যদি উঁচু হ'ত তা'হলে দিব্যি মানান্-সই হ'ত, সম্মুখের দাঁত দুটী অত বড় মানায় না, তা যা হ'য়েছে সেই ভাল, হাতের নোয়া বজায় রেখে জন্মজন্ম এই সুখ করুক।" ইত্যাদি। উপসংহারে সন্ধ্যামাসী বলিলেন,—"না তা, বেশ হ'য়েছে, আমাদের গেরস্থ-ঘরে বেশী সোন্দরে কাজ কি? শৈলের পত্নী-ভাগ্যিটা ভাল। আহা! সে বৌ কি বৌই ছিল—যেন মোণার পুতলি।"

ইচ্ছাপিসি সে বাক্যের পোষকতা করিলেন,—"সে রূপের কথা কি ব'লবার? যেমন রূপ, তেমনি গুণ। শৈলের যেই নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ, নইলে তেমন বৌও কি মরে? আহা! বরুণী-গিন্নীর বউ। তা যেমন গিয়েছিল, আবার তেমনি হ'ল।"

সন্ধ্যামাসী ইচ্ছাপিসির শেষকথায় প্রতিবাদ করিলেন; বলিলেন,—"দেখ্ ইচ্ছে! যা বলিস্ আর যা করিস্, তেমন আর পৃথিবী খুঁজলে হবে না। যেমন যাদু, তেমন কি আর হয়?"

অবগুণ্ঠনবতী প্রতিমা, মাসীর পাড়ার মেয়েরা কে কি বলে শুনিবার জন্য, কান পাতিয়াছিল; সে অনন্যমনে এই সকল সমালোচনা শুনিয়াছে; শুনিয়া শুনিয়া সে মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে,—"এ গাঁয়ের মাগীরাও ভারি দুষ্টু, কথাগুলো কাট্ কাট্ দেখ্‌ছি।"

প্রতিমার মত বধূ পাইয়া, শৈলরাজের জননীর যে কি আহ্লাদ হইয়াছে, তাহা অপরে কে অনুভব করিবে, তিনিই তাহা অনুভব করিতেছেন, শতমুখে প্রতিমার রূপের প্রশংসা করিয়া তিনি যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না।

কেবল শৈলরাজের হৃদয়ে এ আনন্দের দিনেও আনন্দ নাই। যে শৈলরাজ সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত, হাস্যবদন, বিবাহের পর হইতে তাহার সে হাস্য, সে প্রফুল্লতা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, ললাটদেশে গভীর চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। সে প্রতিমাকে দেখিয়াছে, প্রতিমার শারদ-জ্যোৎস্নার ন্যায় লাবণ্য-লীলা দেখিয়াছে—তাহার প্রাণে সুখ নাই। বিবাহে রাজিতে বাদ্যভাণ্ড হয় নাই বলিয়া তাহার শাশুড়ী-ঠাকুরাণী ও পিসাস-ঠাকুরাণীর রোদন-ধ্বনি শুনিয়াছে, বিবাহের পরদিন একটী যন্ত্রণা-প্রদ ঘটনা সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সেই অবধি সে তাহার হৃদয়ের আনন্দ হারাইয়াছে।

শৈলরাজের মাতুল প্রতিমার পিতার নিকট যে সকল অলঙ্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা প্রায় সহস্রাধিক টাকা মূল্যের; বাস্তবিক শৈলরাজ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানেনা, বাদ্য-ভাণ্ড যে করিতে হইবে তাহাও সে অবগত নহে, তাহার বিশ্বাস ছিল যে জগদ্বাসুঘায়ী সকল বিষয় সম্পন্ন হইবে; এ দিকে প্রতিমার পিতার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বনেদি-ঘরের ছেলে, সক্ষম, অলঙ্কারের মাত্রাটা অবশ্য আশানুরূপই হইবে, আর সেই আশাসে ভর করিয়াই তিনি আপন বাটীস্থ সকলকে আশান্বিত ও আশ্বস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে যখন শৈলরাজের প্রদত্ত অলঙ্কারসমূহ বাহির হইল, তখন বাটীর মধ্যে যেন একটা মরাকান্না পড়িয়া গেল—রমণীমণ্ডলীর "আহা! ছি ছি!" শব্দে চারিদিক কোলাহলময় হইয়া পড়িল, প্রতিমাকে কোলে বসাইয়া প্রতিমার পিসি বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিলেন, অলঙ্কারগুলি ছুঁড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। শৈলরাজ সে সকল স্বচক্ষে দেখিল, তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু তাহার দুঃখ সেখানে কে বুঝিবে?

প্রতিমার পিতাও তখন ইন্দ্রজালমুগ্ধবৎ হইয়াছিলেন। তিনি দুঃখে-ক্ষোভে এমন সকল বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যাহাতে শৈলরাজের এক একটী হৃদয়-তন্তু বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আর সেই পাড়ার মহিলামণ্ডলী—তাহাদের যে বিষময় বিদ্রূপ-বাক্যবাণ, শৈলরাজ তাহা অপেক্ষা বজ্রকেও সুকোমল-ললিয়া কল্পনা করিতে লাগিল।

সকলই সহ্য হয়, কিন্তু প্রতিমা যে তাহার পিসিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিতেছিল, সেই দৃশ্যটী শৈলরাজের পক্ষে অসনীয় হইয়া পড়িল, নীরবে আপনিই আপনার ভাগ্যকে ধিক্কার প্রদান লাগিল, মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—'যে এমন সোণার প্রতিমা মনের মত করিয়া সাজাইতে না পারে, সে হতভাগ্য কেন বিবাহ করে?"

এই সকল ব্যাপারে শৈলরাজকে বড়ই ব্যথিত করিয়াছে। এখন তাহার প্রধান চিন্তা, কি দিয়া প্রতিমাকে সাজায়, কেমন করিয়া এ লোকলজ্জা হইতে উদ্ধার পায়।

কাল প্রতিমা হরিপুর যাইবে। শৈলরাজ সঙ্গে যাইতে পারিবে না, তাহার ছুটি ফুরাইয়াছে, তাহাকে চাকরী-স্থানে যাইতে হইবে। প্রতিমার সহিত এখন আর কতদিন দেখা-সাক্ষাৎ হইবে না; যতদিন পুনঃসাক্ষাৎ না হয়, ততদিন প্রতিমার হৃদয়খানি তাহার নিকট অপরিচিত থাকিয়া যাইবে।

প্রতিমার ভাল গহনা হয় নাই বলিয়াই কি

সে কাঁদিয়াছে? তাহার হৃদয় কি ক্ষুদ্র? শৈলরাজের প্রাণের সহিত কি তাহার প্রাণের সম্মিলন হইবে না? শৈলরাজ একবিন্দু ভালবাসা পাইলে স্বর্গের সুখকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে, প্রতিমা কি সে ভালবাসা চায় না?

ইচ্ছা করিলে শৈলরাজ আরও কিছুদিন ছুটী লইতে পারে; প্রতিমার সঙ্গে হরিপুরও যাইতে পারে; কিন্তু বিবাহের সময় সেখানকার যে অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছে,-তাহা যদি স্থায়ী হইয়া থাকে, তাহা হইলে শৈলরাজ নরকে যাউক না কেন—সেখানেও বুঝি সুখ আছে; আগে কিছু অলঙ্কার না দিয়া, শৈলরাজ আর সেখানে যাইবে না।

সাগরের পার আছে, পৃথিবীর সীমা আছে; শৈলরাজ এই চিন্তা-সমুদ্রের সীমা পাইল না।

পরদিন প্রাতঃকালে, শৈলরাজ দেখিল, প্রতিমা প্রফুল্লমুখে শিবিকায় চড়িতেছে; এখনও প্রতিমার সহিত তাহার বাক্যালাপ হয় নাই; তবু মনে হইতে লাগিল, হৃদয়ের খানিকটা স্থান যেন খালি হইয়া যাইতেছে; প্রতিমা দুই দিন মাত্র ছিল, হাসে নাই, কথা কহে নাই, দুই দিন কেবল কাঁদিয়াছে; তথাপি আজ প্রতিমা যাইতেছে বলিয়া বাড়ীটা খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল।

প্রতিমার যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে শৈলরাজের কোন বন্ধু তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া শুনিতে পাইলেন যে—"শৈলরাজও চাকরী স্থানে চলিয়া গিয়াছে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মধ্যে একটা বৃহৎ গ্রীষ্মঋতু চলিয়া গেল; একদিন শ্রাবণ মাসের বিকাল-বেলায় হরিপুরের প্রসন্নঠাকুরাণীর যেন একটা মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। সে হ্রদের ঘাটে গিয়া শুনিয়া আসিল যে,—"বাঁড়ুয্যেদের ছোটজামাই প্রতিমার জন্য খুব ভাল একজোড়া সোনার বালা আর একখানা সোনার কি ভাল গয়না পাঠাইয়া দিয়াছে; নাপিত-বৌ তার ভারি সুখ্যাতি করিয়াছে। শোভা পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়াইয়াছে যে—তেমন গয়না হরিপুরের কাহারও নাই।"

একে শৈলরাজ বুড়ো নয়; যাহারা প্রতিমার সুখের ঈর্ষা করে না, বাঁড়ুয্যেদের জামাই ভাল হইলে যাহদের চোক টাটায় না, তাহারা সকলেই বলিয়াছে—"প্রতিমার বরের মত এমন বর কা'রও হয় নাই"; তাহার উপর সেই শৈলরাজ সোনার অলঙ্কার পাঠাইয়া দিয়াছে। তবে ত প্রসন্নঠাকুরাণীর সকল ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হইল? সে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। ধীরে ধীরে বলাকা-গমনে প্রতিমাদের বাটী-উদ্দেশে বাহির হইল।

প্রতিমার মা'র আ'জ বড় আহ্লাদ। তিনি প্রতিমাকে আজ নূতন-পুরাতন সকল অলঙ্কারগুলি পরাইয়া দিয়াছেন; অলঙ্কার আসার সংবাদ পাইয়া, পাড়ার দশজন মেয়ে, সুমনে হ'ক কুমনে হ'ক, দেখিতে আসিয়াছে। তিনি দশজনের কাছে আপনার জামাই'এর সুখ্যাতি করিতেছেন।

"কৈ গা! শুন্‌লাম, জামাই নাকি গয়না পাঠিয়েছে! কৈ, দেখা দেখি, কেমন গয়না?"—এই বলিতে বলিতে, প্রসন্নঠাকুরাণী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রতিমার মা "এস, এস, মা এস, দেখবে বৈকি, তোমরা দশজনে না দেখ'লে কে দেখবে?"—এই বলিয়া, প্রসন্ন-ঠাকুরাণীকে আহ্বান করিলেন।

অলঙ্কার প্রতিমার গায়েই ছিল। প্রসন্ন-ঠাকুরাণী বসিলে, তিনি প্রথমে প্রতিমার হাত-দুখানি ধরিয়া নূতন সোনার বালা দেখাইলেন। সুবর্ণ-বলয়ের উজ্জ্বল জ্যোতিতে প্রসন্ন ঠাকুরাণীর শিরায় শিরায় যেন তাড়িত-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল; সে অনিমেষ-লোচনে দেখিতে লাগিল, বেশ করিয়া এপাশ-ওপাশ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, কোনখানে খুঁত নাই। তাহার শ্বশুর-কুলে ত সুবর্ণের সংস্পর্শ নাই—পিতৃকুলে সপ্তম সৎ-মার কাণে ঢেঁরী ছিল, নাকে নত ছিল, বড় ভাই'এর বড় বৌ'এর বাজু, সিঁতি, আর ঝুমকা আছে; অতএব প্রসন্ন-ঠাকুরাণী যেন মস্ত একটা পোদ্দার, এমনি ভাবে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিল—"তা গড়ন ভাল, এখন এইগুলোই সব হ'য়েছে, সেদিন আমার ভাশুরঝির দ্যাওর বল্‌ছিল যে, কল্‌কাতার ভদ্রঘরের মেয়েরাও এখন এই গহনা পরছে।"

প্রসন্ন-ঠাকুরাণীর এই বাক্যে সকলেই যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। প্রতিমার পিসি ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেকি গো ভাইঝি! সোনার গহনা ভদ্রঘরের মেয়েরা বৈ আর কারা প'রবে? আগে কি কল্‌কাতার মেয়েরা সোনার গয়না পরতো না?"

"প'রবে না কেন? সোনার গয়না প'রতো, এগুলো কেউ ছুঁত না! তার পর নচ্ছার মাগিদের দেখাদেখি সবাই এখন এই গহনা পরেছে, অল্প-পয়সায় পাচ্ছে কিনা?" প্রতিমার সোনার-বালা দেখিয়া যাহাদের মনের ভিতরটা খুঁত খুঁত করিতেছিল, তাহারা প্রসন্ন ঠাকুরাণীর এইবাক্য শুনিয়া একটু প্রফুল্ল হইল। প্রতিমার মা একটু বিমর্ষভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি এ সোনার গয়না নয়?" প্রসন্ন ঠাকুরাণীর রসনায় তখন যেন সরস্বতী বসিলেন; বলিলেন,—"তোমরা যেমন ক্ষেপী! কেন, সোনা কি কখন দেখ নাই? পাঁচখান নিজেরও ত আছে! সোনার রং আর পিতলের রং—এ'ত দেখ্‌লেই চেনা যায়! কিন্তু এ ধ'রবার যো নেই বলে, কোন গাঁয়ে কাদের মেয়ের বিয়েয় এমনি সব গয়না দিয়েছিল; তিন জন সেকরা তিন দিন ধরে তাকে পুড়িয়ে তবে তাকে ঠাওরায়। গাঁয়ে স্যাকরাও আছে, এখনি ডেকে দেখালেই টের পাবে। না বাপু! ব'ল্‌লে তোমরা আবার রাগ করবে, ভাব্‌বে—মাগী আমাদের নিন্দে ক'র্‌ছে।"

প্রতিমার মা বলিলেন,—"তা, রাগ ক'রবো কেন বাছা? তুমি ত আর কিছু মন্দ কথা বল নাই? সত্যি কথা ব'ল্‌বে, তাতে আর রাগ কি?"

"সত্যি কথা যদি শুন্‌বে, তবে ও গয়না আর মেয়ের গায়ে তুলনা, দশ জনে নিন্দে করবে। কিছু নেই—সেই ভাল, হলকরা গয়না প'রে কি তোমার মেয়ে বেড়্‌তে পারে? আর তোমাদিগেও বলিহারী যাই!—এই সেদিন বিয়ে হ'ল, এখনও গায়ের হলুদ উঠে নাই, এরই মধ্যে তোমার জামাই সোনার গয়না দেবে কোথা হ'তে বাছা! তাও ত বুঝতে হয়?

শেষকথাগুলি প্রতিমার জননীর হৃদয় স্পর্শ করিল। ভাবিতে লাগিলেন,—"প্রসন্নঠাকুরাণী যাহা বলিতেছেন, তাহা মিথ্যা নহে; কারণ, দুই-তিন মাসমাত্র বিবাহ হইয়াছে, ইহারই মধ্যে এত টাকা সংগ্রহ করা জামাতার পক্ষে অসম্ভব; লোকমুখে যে, হ'লকরা গয়নার কথা শোনা যায়, আমাদের মনস্তুষ্টির জন্য তাহাই পাঠাইয়া দিয়াছে।" প্রসন্নঠাকুরাণীকে বলিলেন,—"তুমি যা ব'লে, সেকথা বড় মিথ্যা নয়। যদি তাই হয়

তাহলে প্রতিমাকে গয়না চুঁতেও দিবে না। আচ্ছা, কাল স্যাকরা-বাড়ী গিয়ে দেখিয়ে এলেই সব টের পাওয়া যাবে।"

"উঁহু, তা ক'র না, তা ক'র না; স্যাকরারা কিছুই ঠাওরাতে পারবে না, লাভে হ'তে এম্‌নি বর্ষ-রং ব'রে দেবে যে তোমার জামাই ফিরে চাইলেও দিতে পারবে না। কেন, জিনিস দেখে কি টের পাচ্ছ না? তার এক জেল্লা, আর এ যেন মিটমিট ক'রছে। কেমন লা হারাণি! তোরা ত টের সোন্না-দানা পরিস্; তোর কি মনে হ'চ্ছে?"

হারাণি চন্দনপুরের সোনারবেনেদের মেয়ে। হরিপুরের কাছেই সে গ্রাম, আজ হরিপুর বেড়াইতে আসিয়াছিল। প্রসন্নঠাকুরাণীর প্রশ্নে সে একটু হাসিয়া কিছু ভারিভারি-মুখে বলিল, —"তা বটে দিদি, সোনার মতন ত লাগে না। সোণার রঙ্গে আর এর রঙ্গে ঢের তফাৎ।"

এইবার সকলে যো পাইল,—"তাই ত বটে, আমিও তাই ভাবছিলাম—বলি, রঙ্গটা এমন মিট্‌মিটে কেন?" প্রথমে একজন ইহা বলিয়া সূচনা করিলেন, অম্‌নি আর একজন বলিলেন, —"আমি ত অনেকক্ষণ তা টের পেয়েছি, মুখ ফুটে বল্লে প্রতিমার মা কি মনে ভাববে ব'লে কিছু বলি নাই, যতই কেন হক করুক না আসল আর নকল চোখে পড়লেই চেনা যায়।" আর একজন বলিলেন,—"আমি এক পুঁটের জোড় দেখেই ঠিক করেছি, এ পিতল না হয়ে যায় না।" ইত্যাদি। কেবল খোভা বলিল,—"না সোনার গয়না নয়?" তোমরা সব ভারি সোনা চেন কিনা?" নাপিত-বৌ কিছু বলিল না; বিরক্তভাবে প্রসন্নঠাকুরাণীর মুখপানে একবার চাহিয়া তখনই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দশজনেরই মুখে এক কথা! আর যে কথা বলিতেছে, তাহা নিতান্ত অসংলগ্ন কথাও নহে প্রতিমার জননীর হাস্যবদন ম্লান হইল, পিসি-মার অন্তর বিষন্ন হইল, তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন—যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কি লজ্জার কথা!

প্রতিমা সেখান হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া সমস্ত গহনাগুলি খুলিয়া মেজের উপর ছড়াইয়া দিল।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। প্রসন্নঠাকুরাণী যেন একটা দিগ্বিজয় করিয়া সদলে হাসিতে হাসিতে বাহির হইল।

এদিকে শৈলরাজ বিবাহের পর চাকরী-স্থানে আসিয়া সর্ব্বদা অন্যমনস্ক ও বিরস ভাবে থাকিত। কার্য্যে উৎসাহ নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই! শৈলরাজের বন্ধুরা বলিতেন—"শৈলরাজ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ ক'রে একেবারে ঘরে গিয়েছেন।"

আজ কয়দিন হইতে শৈলরাজ একটু যেন প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে। গত আষাঢ় মাসে সে একখানি পুস্তক ছাপায়, ভাগ্যক্রমে পুস্তক খানির বাজারে বেশ কাটতি হইয়াছে, আষাঢ় মাসের শেষে পুস্তকের লাভের দরুণ দেড়শত টাকা পাইয়াছিল; সহসা অভাব-সত্ত্বেও শৈল-রাজ সেই টাকা অন্য কোন বিষয়ে ব্যয় না করিয়া প্রতিমার জন্য একযোড়া সোনার বালা আর কি অলঙ্কার গড়াইয়া পাঠাইয়া দিয়াছে; তাহাতেই মনটা একটু ভাল আছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডাকপিয়ন কয়েকখানি চিঠি শৈলরাজের হাতে দিয়া গেল। তাহার মধ্যে একখানি শৈলরাজের শ্বশুরের হাতের লেখা। শৈলরাজ সর্ব্বাগ্রে সেই পত্রখানি পাঠ করিল। পত্রখানির মর্ম্ম এই :—

"তুমি যে অলঙ্কার পাঠাইয়াছ, তাহা ভদ্র লোকের মেয়েরা ব্যবহার করে না। এরূপ

অলঙ্কার পাঠাইয়া আমাদিগকে লোকের নিকট হাস্যাস্পদ করা হইয়াছে মাত্র। যাহা হউক, অলঙ্কারগুলিকে যত্ন করিয়া রাখা হইল, আসিলে প্রাইতে পারিবে। অপর মঙ্গল, তোমার মঙ্গলে সুখী করিবে।"

যদি সেই মুহূর্ত্তেই শৈলরাজকে শূন্যের উপর রাখিয়া পদতলে পৃথিবীটা হুহু করিয়া নিম্নভাগে সরিয়া যাইত, তথাপি শৈলরাজ এত বিস্মিত হইত না। সে যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, ক্রোধে দুঃখে তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, কাগজ কলম লইয়া তখনই পত্রের উত্তর লিখিতে বসিল। কি লিখিল, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু পত্রের যে উত্তর আসিয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ যে তাহার শ্বশুর বড়ই লজ্জিত হইয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

আশ্বিন মাস; পূজা আসিয়া ফুরাইয়া গিয়াছে। চাতকীদের পিপাসানল, এক ছাট জল পাইয়া, আবার ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া উঠি-তেছে; শৈলরাজ পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়া প্রতিমাকে দেখিবার জন্য শ্বশুরবাড়ী আসি-য়াছে।

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া তাহার মানসিক যন্ত্রণা আরও বাড়িয়াছে, গহনা-গহনায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, ঠাকরুণদিদি-দের শাকাযন্ত্রণা আর তাহার সহ্য হই-তেছে না। যিনিই আসিতেছেন, তিনিই বলিতেছেন,—"বলি হাঁহে বর! ফাকি দিয়ে বিয়ে ত ক'রলে, এখন দশখান অলঙ্কার-পাতি দাও! অমন সোনার বৌ পেয়েছ, তা ভাল ক'রে না সাজালে মানাবে কেন?" আইবুড়ো মেয়ের মতন সর্ব্বদা মুখটী নামিয়ে থাকে, দেখতে যে আমাদেরই কষ্ট হয়। আজ কালকার কলিকালের মেয়ে, সহজে কি ওদের মন পাওয়া যায়? ওরা এখন ছেলে-মানুষ, ভালমন্দ দশখান পরবার সময়; এখন তা না পেলে, ভাল লাগবে কেন, কথা বল্‌বে কেন?"

শৈলরাজ কথাগুলি মনন করিয়া রাখি-য়াছে। দুই দিন শয্যাপার্শ্বে প্রতিমাকে পাইয়া-ছিল, প্রতিমা মুখ ফিরায় নাই, কথা কহে নাই। দুই দিনই শৈলরাজ প্রতিমাকে কথা কহাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; চেষ্টামাত্রেই প্রতিমা কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যাত্যাগ করিয়া অন্যঘরে উঠিয়া গিয়াছে। শৈলরাজ বুঝিয়াছে যে,—দরিদ্রের জীবনসর্ব্বস্ব দিয়াও তাহার ভাল-বাসার আশা বৃথা, ঠাকরুণদিদিদের কথা সত্য, তাহার ভবিষ্য-জীবনের সকল সুখ নিঃশেষিত হইয়াছে, সে শান্তির, নিয়ের অন্বেষণ করিতে করিতে ভীষণ মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়ি-য়াছে।

আজ শেষ দিন, শেষ পরীক্ষা গৃহীত হইবে, প্রতিমার হৃদয়-মধ্যে শৈলরাজ বিন্দুমাত্র স্থান পাইয়াছে কিনা তাহাই একবার অন্বেষণ করিবে। তাহাতে, হয় প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইবে, নয় অনন্ত-জীবনের জন্য হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিবে। সেদিন যে শৈলরাজের মনের কি অবস্থা, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

দিন আর যায় না, সূর্য্যের গতি যেন রুদ্ধ হইয়াছে। শৈলরাজ দুইবার ঘুমাইয়াছে, তিন-বার আম-বাগানের মধ্য দিয়া হ্রদের ধারে বেড়াইয়া আসিয়াছে, শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া একখানি "প্রাচীন পদাবলী" পুস্তক পাইয়া ছিল—তাহা হইতে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের বিরচিত পূর্ব্বরাগ-সম্বন্ধীয় সমস্ত কবিতাগুলি পাঠ করিয়াছে, তবু দিন ফুরায় না। শোভা

আসিয়াছিল, নাপিত-বৌ আসিয়াছিল, সোহাগী আসিয়াছিল। তাহারা কতক্ষণ ধরিয়া শৈলরাজকে ঠাট্টা-তামাসা করিয়া গিয়াছে, তবু ত যেখানকার সূর্য্য সেইখানে রহিয়াছে? দুঃখের সময় সকলেই বাদী, সুখে শত শত অন্তরায়।

সেদিন শৈলরাজের সূর্য্য অস্ত যাইতে বহু সময় লাগিল, বহু কষ্ট দিয়া রবি ডুবিয়া গেল, হরিপুরের কলকণ্ঠ পাখীগুলি কলরবে ডাকিয়া উঠিল, হ্রদের নীলবর্ণ জলের উপর সন্ধ্যার ছায়া পড়িয়া আরও গাঢ় করিয়া তুলিল। অন্য দিন হইলে শৈলরাজ এই সমস্ত প্রকৃতি-শোভা দেখিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতে পারিত; কিন্তু আজি তাহার মন বহির্জগতের বহু দূরে।

রাত্রি প্রহরেকের সময় অন্তঃপুর মধ্যস্থ একটী গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া, উৎকণ্ঠিত শৈলরাজ, মধুর হইতে মধুরতর—শাখাচ্যুত পুষ্প-পতনের শব্দ অপেক্ষাও অশব্দ একটী পদ-সঞ্চার-শব্দ শুনিতে পাইল। তত মৃদু শব্দ, তবু যেন শৈলরাজের হৃদয়ে আসিয়া সজোরে প্রতিঘাত করিতে লাগিল। তাহার বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ শব্দ হইতে লাগিল। অতি ধীরে অতি নিঃশব্দে, দ্বারটী উন্মোচিত হইল; একটী অবগুণ্ঠনবতী বালা রমণী সেই প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিল; শৈলরাজ শুইয়া ছিল, শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

প্রতিমার গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বে গৃহমধ্যে দীপ জ্বলিতেছিল। প্রতিমা প্রথমেই দীপটী নির্ব্বাপিত করিল; তাহার পর দ্বারটী আবার তেমনি ধীরে ধীরে বন্ধ করিল, ধীরে ধীরে শৈলরাজের শয্যার একপার্শ্বে আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শয়ন করিল।

শৈলরাজ ইহার পূর্ব্বে দুই দিনও এই ভাব দেখিয়াছে, বহু চেষ্টা করিয়াও মুখ ফিরাইতে পারে নাই। আজ তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া কথা কহিবে; সেত তাহার স্বামী বটে!

প্রতিমা শয়ন করিলে, শৈলরাজ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিল। অনুভব করিতে লাগিল যে, প্রতিমা তাহার সর্ব্ব-সমাগত-জনিত হৃদয়োচ্ছ্বাস লুক্কায়িত রাখিবার চেষ্টা পাইতেছে, কিছুক্ষণের জন্য নিশ্বাস একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইতেছে। যখন নিশ্বাস পড়িতেছে, তখন অতি সুদীর্ঘ নিশ্বাস। শৈলরাজ ভাবিতে লাগিল,—"এখন কি করি? কথা কহাইবার চেষ্টা করি কি না? যদি অন্য দিনের মত উঠিয়া যায়? তাহাতেই বা ক্ষতি কি? শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া এরূপ অবস্থায় থাকা অপেক্ষা উঠিয়া যাওয়াই ভাল। আজিও যদি কথা না কহে, তাহাহইলেই ত আমার পরীক্ষা শেষ হইবে!—মনের সন্দেহ রাখি কেন? যদি কথা কহে, তাহাহইলে কথার ভাবেও মনের অনেকটা পরিচয় পাইব। ভাল যে বাসে না, তাহা নিশ্চয়; ভাল যদি বাসিত, তাহা হইলে এক দিনের জন্যও কি একটু অনুযোগ দেখাইত না? বিবাহের সময় হইতেই আমার প্রতি ঘৃণার ভাব জন্মিয়াছে, নতুবা আমার দেওয়া কোন জিনিসই ব্যবহার করে না কেন? গৃহস্থ লোকের যেমন বসন-ভূষণ থাকা উচিত, সকলই ত রহিয়াছে; সে সকল ত কৈ স্পর্শও করে না? না করুক, তাহাতে দুঃখ নাই; অলঙ্কারাদি যে ভালবাসার নিদান, সে ভালবাসা আমি চাই না, ধনের বিনিময়ে মন কিনিয়া সুখ কি? আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিলাম, তাহাতে সে ভালবাসিল না; প্রচুর অর্থ ঢালিয়া বিলাস, অমনি ভালবাসা পাইলাম। ছি ছি! যে এমন স্বার্থপরতাপূর্ণ কপট ভালবাসা প্রার্থনা করে, সে ত পশু! যাহাই হউক, আর বিলম্ব করা

হইবে না; যদি ঘুমাইয়া পড়ে, তাহাহইলেও দিব!"

শৈলরাজ কিছুক্ষণ এইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে প্রতিমার নিকট সরিয়া গেল, প্রতিমার গায়ে হাত দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "প্রতিমা!"

প্রতিমা উত্তর দিল না। আবার ডাকিল,—"প্রতিমা!" এবারও উত্তর নাই, প্রতিমার সর্ব্বশরীর যেন নিস্পন্দ বোধ হইতে লাগিল। তখন শৈলরাজ প্রতিমার মুখমণ্ডলের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। আবার মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল,—"প্রতিমা, তুমি এখানে এমন ক'রে পড়ে কেন? ভাল ক'রে সরে শোওনা; এমন ক'রে থাকলে যে কষ্ট হবে!"

এইবার প্রতিমা কথা কহিল। শৈলরাজের মনে আশা ছিল, প্রতিমা কথা কহিলে, নন্দন-বনের ভ্রমরীর গুন্‌গুন্ শব্দের মত—স্বর্গীয় কল্পবৃক্ষের শাখান্থিত স্বর্গবিহঙ্গীর রসজনিত মত, কোন মধুর শব্দে তাহার শ্রুতি-মূল বিমোহিত হইবে; কিন্তু প্রতিমা যখন কথা কহিল, তখন সে তেমন মধুর শব্দ শুনিতে পাইল না, মানুষে যেমন কথা কয় প্রতিমাও তেমনি কহিল। শৈলরাজ শুনিয়া তাহার আশানুরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। তথে আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রতিমা আজ সামান্য চেষ্টাতেই কথা কহিল। তবে বুঝি প্রতিমার মন ফিরিয়াছে! প্রতিমা অতি মৃদুস্বরে বলিল,—"বেশ, তুমি সরে যাও; আমার গায়ে হাত দিও না।"

"কেন, তোমার গায়ে হাত দিলে কি কষ্ট হয়?"

"হয়।"

"কৈ! আমার ত হয় না, তুমি আমার গায়ে হাত দাও, দেখ আমি কত আহ্লাদিত হই।"

"আমি গায়ে হাত দেব না, তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও।"

"আমি সরে যাব না; গায়ে হাত দিলে কি কষ্ট হয়, তাই আমাকে বল।"

"তা আমি জানি না, তুমি বিরক্ত ক'র না; অমন কর্‌লে, আমি ওঘরে উঠে যাব।"

"উঠে যাবে যদি, তবে এলে কেন?"

"সে আমার ইচ্ছা। ইচ্ছা হয়েছিল, এসেছি লাম; আবার ইচ্ছা হবে, উঠে যাব।"

এইবার শৈলরাজ ভাবিল—এই বুঝি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের অভিনয় আরম্ভ হইল। একটু নীরবে থাকিয়া বলিল,—"আচ্ছা, আমি তোমার স্বামী, স্বামীর প্রতি তোমার কি একটু ভালবাসা হয় না?"

"না।"

"আমি ত তোমাকে খুব ভালবাসি। দেখ, তোমার একটী কথার জন্য আমি কত লালায়িত।"

"আমাকে ভালবাসতে হবে না; হয় তুমি ঘুমাও, নয় আমার কাছ থেকে সরে যাও।"

"আমি তোমার কাছে থাক্‌লে তোমার কি এতই কষ্ট হয়?"

"খুব কষ্ট হয়।"

"কেন এত কষ্ট হয়?"

"তা আমি জানিনা। তুমি আমাকে অমন ক'রে বিরক্ত কর্‌লে, আমি নিশ্চয় ওঘরে উঠে যাব।"

"তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ইচ্ছা হয় থাক, না হয় উঠে যাও। কয়টী কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি; তাহার যথার্থ উত্তর দেও দেখি। তুমি এখন নিতান্ত বালিকা নও, অবশ্য সকল বিষয়ই বুঝ্‌তে পার; আচ্ছা, আমি যদি কাল তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে তুমি যাবে কি না?"

"কিছুতেই না।"

"তবে কি চিরকালি বাপের বাড়ী থাকবে?"

"তা বৈ আর কোথা যাব?"

"কেন, আমাদের বাড়ী যাবে না?"

"কি কর্ত্তে তোমাদের বাড়ী যাব?"

"শ্বশুর-বাড়ী কি ক'ত্তে যায়, তাকি জান না?"

"না—তা জানিনে, তুমি বিরক্ত কর না, তুমি বিরক্ত ক'র না, তুমি ভারী দুষ্ট।"

"আমি দুষ্ট, বটি; কিন্তু তুমি বালিকা, জান না যে, স্ত্রীলোকের শ্বশুর-বাড়ী ভিন্ন আর কোথাও স্থান নাই।"

"না থাকুক, আমি সে সাগরপাড়া যাব না।"

"আমার কাছে থাকতে তোমার সাধ হয় না?"

"না।"

"তবে আমা চাইতে তোমার বাপের বাড়ী বড়?"

"তা ত বটেই।"

"আচ্ছা বেশ, এইবার তোমাকে আমার শেষ-প্রশ্ন,—আচ্ছা বল দেখি, তুমি এইখানে থাকতে চাও, না আমাকে চাও।"

"আমি এইখানে থাকতে চাই।"

"তুমি ছেলে-মানুষ, ভাল করে বুঝে বল—তুমি আমাকে চাও না?"

"না।"

"চাও না?"

"না—না—না: তুমি আমাকে আর বিরক্ত ক'র না, এবার হ'তে আমি তোমার কথার আর উত্তর দিব না?"

"আচ্ছা, আর তোমাকে বিরক্ত করবো না, এই আমার শেষ কথা হ'ল। যদি কখন নিজে ইচ্ছা ক'রে কথা কইতে চাও তবে কথা ক'বো; দেখা দেখিরও আজ এই শেষ, স্বামী কিরূপ সামগ্রী, তা যদি কখন জান্‌তে পেরে, স্বামীসেবা করতে চাও, তবেই দেখা হবে। নতুবা এই শেষ দেখা।"

শৈলরাজ ভগ্নকণ্ঠে শেষকয়টী কথা বলিয়া, শয্যার একপার্শ্বে গিয়া শয়ন করিল; তাহার প্রতিমাময় হৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিল—অন্ধকার! পশ্চিমদিকে একটী জানালা ছিল, খুলিয়া দিল; দেখিল, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় পৃথিবী আলোকিত হইয়াছে। সেই জ্যোৎস্নালোকের ভিতর দিয়া দূরদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিতে পাইল, যেন তাহার জীবনের অতীত চিত্রগুলি একটী একটী করিয়া প্রস্ফুটিত হইতেছে, যেন সেই জ্যোৎস্নাসনে বসিয়া তাহার স্বর্গীয়া প্রথমা স্ত্রী বিজয়ের হাসি হাসিতেছে। আর চক্ষুজল রোধ করিতে পারিল না, প্রতিমার শয্যায় শয়ন করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল।

যে শৈলরাজের মত দুঃখী, নিদ্রাও বুঝি তাহাকে স্পর্শ করে না। শৈলরাজ কত চেষ্টা করিল, তাহার নিদ্রা আসিল না। সে কখন শয্যার উপর উঠিয়া বসে, আবার শয়ন করে, কখন এপাশ-ওপাশ করে। এমনিভাবে রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইল।

আকাশের তারাও বুঝিতে গণিতে পারা যায়, কিন্তু শৈলরাজ সে রাত্রিতে কত কি যে ভাবিল, তাহা গণনায় আসে না। কখন রাগিল, কখন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল; তারপরভাবে, ভূতের যেমন আন্দোলিত হয়, তাহার অন্তরের ভিতরও তেমনি আন্দোলিত হইতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, স্থির করিল,—"আর কখন হরিপুর আসিব না, আর কখন প্রতিমার মুখ দেখিব না।" কিন্তু শেষের কথাটী ভাবিতে তাহার হৃদপিণ্ড ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল।

যাহাকে ভুলিবার যায়, সে যদি ভাল না বাসে, তাহাহইলে প্রাণটা যেন ফাটিয়া যায়; ভালবাসিব বাসিব বলিয়া মনে যে একটা আশা থাকে তাহাতে নিরাশ হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন শূন্য হইয়া যায়। বিবাহের পর হইতে শৈলরাজ যে স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করিয়াছিল, তাহার সে স্বর্গরাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহার মত দুঃখী জগতে বুঝি কেহ নাই। এমনি ভীষণ অন্তর্যাতনা ভোগ করিয়া, তাহার একটু স্বপ্নময়ী নিদ্রাবেশ হইল।

শৈলরাজ ত ঘুমাইল, প্রতিমাও কি ঘুমাইয়াছে? প্রতিমা ঘুমায় নাই; শৈলরাজ ভগ্নকণ্ঠে শেষ যে কয়টী কথা বলিয়া নীরব হইয়াছে, সেই কয়টী কথায় তাহার বুকে বড় লাগিয়াছে। প্রতিমার সম্মুখে কেহ কাঁদিলে সেও কাঁদিয়া আকুল হয়। তাহার সম্মুখে কেহ কাতরকণ্ঠে কোন কথা বলিলে তাহার চক্ষু দুটী ছলছল করিত, মুখখানি কাঁদকাঁদ হইত; সে শৈলরাজকে কাতর দেখিয়া তাহা সহিতে পারিবে কেন? তাহার প্রাণের ভিতর বড় একটা কষ্ট হইতেছিল, সে ভাবিয়া ভাবিয়া বড় ভাবিতে লাগিল—"আমি কেন বলিলাম 'তোমাকে চাই না, আমি ত মনে মনে চাই, তবে মিথ্যা করিয়া কেন বলিলাম 'তোমাকে চাই না'। এখন যদি একবার জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে এখনই বলি—'আমি তোমাকে চাই'। এখন যদি এক হাতে আকাশের খুব বড় একটা চাঁদ লইয়া বলে 'তুমি কি চাও'? আমি এখনই বলি—আমি ও চাঁদ চাই না—"তোমাকে চাই।" আচ্ছা, এখন আর একবার জিজ্ঞাসা করিতেছে না কেন? বড়াই কি ঘুমাইয়াছে? যদি ঘুমাইল, তবে তাহা হইলে আমাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়া ঘুমাইল না কেন,—'তুমি কি চাও?' আমি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতাম—'আমি তোমাকে চাই।' এখন আর রেশী রাত্ নাই, আজ আর কিছু বলিব না, কাল যখন জিজ্ঞাসা করিবে তখনই বলিব—'আমি তোমাকে চাই।' যদি জিজ্ঞাসা না করে, তাহা হইলে আমি আপন হইতে বলিব—আমি তোমাকে চাই।"

রাত্রি ভোর হইয়া আসিয়াছে, গগনের পূর্ব্বললাট ধীরে ধীরে পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। প্রতিমা, একটী পাখীও না ডাকিতে উঠিয়া বাহিরে যাইবার জন্য, সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। অন্য দিন উঠিয়া কত যেন অপরাধিনীর মত তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া যায়, আজ তাহা করিল না, আজ তাহার ইচ্ছা হইল, শৈলরাজকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া যায়; প্রসন্নদিদির মুখে শুনিয়া অবধি তাহার মনে বড় একটা ভয় ছিল, ইহার পূর্ব্বে অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে অতি সূক্ষ্মদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে দুই একবার শৈলরাজের মুখপানে চাহিয়াছিল তাহাও অতি ভয়ে ভয়ে; পলক পড়িতে না পড়িতে তুলিয়া লইয়াছে। আজ তাহার ইচ্ছা হইল—অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া স্থিরকটাক্ষে শৈলরাজকে দেখিয়া যায়; সে বাহিরে গেল না, সাবধানে শৈলরাজের কাছে সরিয়া আসিল।

বাতায়ন দিয়া সুনির্ম্মল চন্দ্ররশ্মি শৈলরাজের প্রশান্ত বদনমণ্ডলের উপর পতিত হইয়াছে, প্রতিমা সেই শারদ জ্যোৎস্না-বিধৌত মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিল, চাহিবামাত্র তাহার শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল, সম্মুখে দেখিল—জ্যোতির্ম্ময়!

প্রতিমা একব্যর স্বপ্ন দেখিয়াছিল—তাহার যেন একটী পোষা হরিণ হারাইয়াছে, সে নদীর ধারে সেইটীকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, হঠাৎ কে যেন ঠেলিয়া তাহাকে

গঙ্গার গর্ভে ফেলিয়া দিল, উঁচু পাহাড়—আর উঠিতে পারে না, কত চেষ্টা করিল, তবু উঠিতে পারিল না, অবশেষে কাঁদিতে লাগিল। উপর দিয়া কত লোক চলিয়া যায়, প্রতিমা সকলকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইতে বলে—কেহই লয় না, সকলেই হাঁসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। সহসা প্রতিমা দেখিল—আকাশ হইতে একজন দেবতা তাহাকে তুলিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া। প্রতিমাও হাত বাড়াইয়া দিল। তিনি হাত দুখানি ধরিয়া তীরের উপর উঠাইয়া দিলেন।

সে স্বপ্নটী অনেক দিন দেখিয়াছে, কিন্তু স্বপ্নটী ভুলে নাই, স্বপ্নের সে দেবতাটী ভুলে নাই, থাকিয়া থাকিয়া তাহার সেই দেবতার কথা মনে হইত। আজ যেন শয্যার উপর সেই দেবতাকে দেখিতে পাইল! যেন কোন অপরিচিত দেশের সৌন্দর্য্য-প্রভাবে তাহার হৃদয় প্লাবিত হইয়া গেল। বয়ঃসন্ধি সময় হইতে সে কি যেন একটী খুঁজিতেছিল, আজ যেন অকস্মাৎ তাহা কুড়াইয়া পাইল।

তাহার পর দিন প্রতিমা আর শৈলরাজকে দেখিতে পাইল না, শৈলরাজ প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া প্রভাতেই চলিয়া গিয়াছে; প্রতিমার সঙ্গিনীরা কিন্তু সেদিন তাহাকে বড় ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল; নাপিত-বৌ বলিল,—"কি ভাই, তিন দিনেই যে চোখ ছলছল" শোভা বলিল,—"সারা রাত জেগে সইয়ের চোক লাল হ'য়েছে।" প্রতিমার জননী, প্রতিমার অসাক্ষাতে তাহার পিসিমাকে বলিলেন, —"দেখেছ ঠাকুরঝি! প্রতিমা আজ একটী ভাতও মুখে দিতে পারলে না।"

খুনী কে?

১)

কার্ত্তিক মাস; শুক্লা প্রতিপদ,—প্রত্যুষে হুগলির প্রধান পুলিস্ ষ্টেসনে একটা জেলে আসিয়া খবর দিল, চুঁচুড়ার চরে একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটী দেখিতে পরমরূপসী; সর্ব্বাঙ্গে রক্তের দাগ; গলা এক কাণ হইতে অন্য কাণ পর্য্যন্ত দ্বিধা বিভক্ত। শুনিয়া চমকিত হইলাম, এবং অচিরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি লইয়া লাশের তত্ত্বাবধানে প্রবৃত্ত হইলাম। জেলেকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল,—"নৌকা হইতে দেখিয়াছি।" তাহাকে সঙ্গে লইলাম এবং তাহারই নৌকা করিয়া চরের কাছে উপস্থিত হইয়া নৌকা হইতে দেখিলাম; কিছুই দেখিতে পাইলাম না। জেলেকে জিজ্ঞাসা করিলাম; তাহার মুখ শুকাইয়া গেল; সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহাকে নজরবন্দী রাখিতে বলিয়া ধীরে ধীরে তীরে উঠিলাম। কার্ত্তিক মাসের শিশিরে তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত চর মুক্তাজালাবৃত সবুজ গালিচার মত শোভা পাইতেছিল। সেই মুক্তাজাল নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন; যেন একসূত্রে গাঁথা; কেবল যে স্থান দিয়া একটী শৃগাল বা একটী খরগোস চলিয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থানে তাহার পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। নৌকা হইতে তীরে উঠিয়াই দেখিলাম, দুইজন মানুষ তীর হইতে সেই দিকে গিয়াছে এবং তাহার পর আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তির পদাঙ্ক বড়, অপরের ছোট। অনুসন্ধানে জানিলাম জেলের একটী ছেলে তাহার সঙ্গে ছিল। সুতরাং সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল যে, হয়ত জেলে পুত্রকে সঙ্গে লইয়া এই কাজ করিয়া গিয়াছে। গত রাত্রে কালীপূজা গিয়াছে; হয়ত কোন স্ত্রীলোক প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিল; জেলে লোভে পড়িয়া এই কাজ করিয়াছে। যাহা হউক দেখা যাউক, ক্রমেই বুঝা যাইবে। ধীরে ধীরে লাশের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সেই শবদেহ স্বর আলো করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ললাটে—বক্ষে—উভয় চক্ষে রক্তের দাগ, দূর হইতে বোধ হইতেছিল যেন তুষীকৃত শ্বেতশতদল পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে যাইয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই তাহার গলদেশ এক কাণ হইতে অন্য কাণ পর্য্যন্ত বিদারিত। শবদেহ চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে; তাহার খোঁপায় হীরার ফুল, কাণে সোণার মাকড়ী, তাহাতে মুক্তা ও নীলকান্ত গ্রথিত; বাহুতে সোণার তাবিজ ও বাজু—ডায়মনকাটা। প্রকোষ্ঠে চুড়োয়ার বালা। সীমন্তে সিন্দুর; পা দুখানি আলতা দিয়া কামান। ভাবিলাম যদি জেলে বেটা খুন করিল, তবে এমন বহুমূল্য অলঙ্কার লইল না কেন? রমণীর কণ্ঠে বা কটিদেশে কিছুই দেখিতে পাইলাম না; তবে কি হত্যাকারী ঐ দুই অঙ্গের অলঙ্কার লইয়াছে? নানা প্রকার সন্দেহে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, লাশ লইয়া পুলিসে ফিরিয়া আসিলাম; বৃদ্ধ জালিক আমাদের সঙ্গেই রহিল। মৃত দেহের পোষ্টমার্টম পরীক্ষার জন্য তাহা গবর্ণমেণ্ট ডাক্তারের নিকট প্রেরিত হইল। যতক্ষণ না ডাক্তারের তদন্ত হয়, ততক্ষণ কিছুই করা যাইতে পারে না, সুতরাং জেলেকে আপাততঃ নজরবন্দী রাখা হইল।

যথাকালে ডাক্তার সাহেবের তদারক শেষ হইল; পরীক্ষায় জানা গেল যে, রাত্রি ১০টা কি ১২টার মধ্যে খুন হইয়াছে; তীক্ষ্ণ ক্ষুর দ্বারা গলা কাটা হইয়াছে। ক্ষুর যেভাবে দক্ষিণ ভাগ হইতে বামভাগ পর্য্যন্ত চালিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে সহসা বোধ হয় রমণী আত্মহত্যা করিয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, অপর লোকেই ইহাকে হত্যা করিয়াছে এবং যে হত্যা করিয়াছে হয় সে ন্যাটা, নতুবা লোকের চোখে ধুলা দিবার নিমিত্ত বামহস্তে ক্ষুর চালাইয়াছে; কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হত্যাকারী শিক্ষিত। জেলের ন্যায় অশিক্ষিত লোকে এরূপ সুকৌশলে হত্যা করিতে পারে না। রমণীর লাবণ্য ও বর্ণ দেখিলে প্রথমে তাহাকে হিন্দু বলিতে পারা যায় না; সহসা মুসলমানী বলিয়া সন্দেহ হয়; কারণ সুন্দরী হিন্দু ও মুসলমান রমণীগণের অঙ্গবর্ণের অনেকটা পার্থক্য দেখা যায়। তাহার পর তাহার চরণতল ও সীমন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, সে বাস্তবিকই মুসলমানী। চরণে আল্‌তা, সাবান দিয়া ধৌত করিবামাত্র আল্‌তার রঙ্ উঠিয়া গেল এবং তাহার ভিতর হইতে মেহদীপাতার রঙ্ ফুটিয়া বাহির হইল। সেইরূপ সীমন্ত ধৌত করিবামাত্র সিন্দুরের দাগ উঠিয়া গেল এবং সেই স্থানে সিন্দুরের চিহ্নমাত্র রহিল না। এইরূপ এক একটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তন্নতন্নরূপে পরীক্ষা করাতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, রমণী হিন্দু নহে, মুসলমানী। হত্যাকারী সাধারণের চক্ষে ধূলি

দ্বার অভিপ্রায়ে এই চাতুর্য্যজাল বিস্তার করিয়াছে!

তবে এ রমণী কে?

(২)

এ রমণী কে? প্রথমে তাহার পরিচয় পাওয়াই বিষম গোলযোগ। জালিককে ভয় দেখাইলাম, অবশেষে সে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। সেইদিন প্রত্যূষে সে জাল ঝাড়িবার অভিপ্রায়ে ডিঙ্গিতে উঠিবার সময় দেখিল —তাহার হালটী কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে; হাল নহিলে ডিঙ্গি চলিবে না; সুতরাং আর একটী হাল তৈয়ারি করিবার নিমিত্ত চরে উঠিয়া পিতাপুত্রে একটী ঝাউডাল কাটিতে গেল; পুত্র গাছে উঠিল, পিতা নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই ঝাউ গাছটীর অদূরেই মৃতদেহ পড়িয়াছিল। গাছ হইতে নামিবার সময় পুত্র তাহা দেখিতে পাইল এবং পিতাকে দেখাইল। ভয়ে দুজনেই পলাইয়া আসিল এবং আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত পুলিসে খবর দিল। জেলের এজাহার লওয়া হইলে তাহার দশমবর্ষীয় পুত্রকে আনিয়া পরীক্ষা করা হইল; বালকও সেই এক কথাই বলিল। সুতরাং তাহাদিগের উপর আর কোন সন্দেহ না করিয়াই মেজিষ্ট্রেট পিতাপুত্র উভয়কেই ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু লাশের অনন্যতা প্রমাণ (identification) লইয়া বড়ই গোলযোগ হইল; সকলেই কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল, এ রমণী কে? হুগলি ও চুঁচুড়ার যত ধনী মুসলমান ছিল, সকলকে একে একে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইল; কিন্তু কেহই চিনিতে পারিল না। মুসলমানদিগের অবরোধপ্রথা অতীব কঠোর, সুতরাং বাহিরের লোক দ্বারা রমণীর অনন্যতা প্রমাণ একপ্রকার অসম্ভব।

এ পক্ষে হতাশ হইয়া আর একটী কৌশল অবলম্বন করিলাম। হুগলি ও চুঁচুড়ায় যতগুলি ছুরি, কাঁচি প্রভৃতির দোকান ছিল, তৎসমস্তেই সন্ধান লইলাম যে, দুই এক দিনের মধ্যে কেহ ছুরি কিম্বা ক্ষুর বিক্রয় করিয়াছে কি না? অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে জানিতে পারিলাম যে, গত কল্য অপরাহ্ণে জনৈক মুসলমান চাপরাশী একখানি ক্ষুর কিনিয়া লইয়া গিয়াছে। দোকানদার তাহাকে দেখাইয়া দিতে পারে। দোকানদারের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলাম। সে ক্রমে ক্রমে এপাড়ায় ওপাড়ায় ঘুরিয়া অবশেষে চুঁচুড়ার একটী বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বাড়ীটী দেখিতে অতীব মনোরম; বোধ হয় যেন কোন নবাব বা জমিদার বাস করিত। দোকানদার সেই বাটীতে উপস্থিত হইয়াই চাপরাশীর অনুসন্ধান করিল। বাহিরে একটী দ্বারবান বসিয়া ছিল; আমাদিগকে দেখিয়াই সে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। আমি তখন "ইউনিফর্ম্ম" পরিয়া ছিলাম, সঙ্গে ৭।৮ জন কনষ্টেবলও ছিল। সুতরাং দ্বারবানকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিলাম এবং বাটীর কর্ত্তার নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"হুজুর! কর্ত্তার নাম নবাব হোসেন আলি। একমাস হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

"তাঁহার বাটীতে কে আছে?"

"কেহই নাই,—কেবল আমরা আছি।"

"তাঁহার স্ত্রী কোথায়?" এই প্রশ্ন শুনিয়াই হতভাগ্য দ্বারবান বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। অনেক মিষ্ট কথায় তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "তোর কিছুই ভয় নাই। সকল কথা ঠিক করিয়া বল, এখনই ছাড়িয়া দেব।" দ্বারবান প্রথমে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার পর আরও দুই এক্‌বার মিষ্ট কথা বলাতে তার মুখ ফুটিল; সে বলিল—"কি হইয়াছে ঠিক বলিতে পারি না।—তবে গত রাত্রি হইতে মার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহার বিছানা রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে।"

"চাপরাশী কোথায়?"

"তাহারও কোন সন্ধান নাই।"

"বাটীতে আর কে থাকিত?"

"সুলতান খোরমেদ।"

"তিনি কোথায়?"

"তাঁহারও কি হইয়াছে বলিতে পারি না; কারণ তাঁহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। আর তাঁহার বিছানায় রক্তের ঢেউ খেলিতেছে।"

শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। কিন্তু একটা বিষম সন্দেহ রহিয়া গেল। চাপরাশীকে পাইয়া কতকটা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তাহাকে না পাওয়াতে ভাবিতে লাগিলাম যে, খুনী কে? —চাপরাশী না খোরমেদ?

কে তুমি?

কে তুমি কাহার বালা ছিলে কার ঘরে—
নন্দনকাননে কিম্বা কৈলাশশিখরে?
চাঁদের কিরণে ছিলে,
কিম্বা সৌদামিনী-কোলে,
কিম্বা ছিলে কামিনীর নখর অধরে?

শরতের সুস্মিত জ্যোৎস্নার প্রায়,
শিকালীর সৌরভেতে, সঙ্গীত সুধায়,
কোকিলের কুহুরবে,
বীণার ঝঙ্কারে ইবে,
কোথা যেন মনে হয় দেখেছি তোমায়।

ছিলে কি শান্তির ধামে পুণ্য তপোবনে,
ব্যাঘ্র যথা খায় তৃণ হরিণীর সনে?
প্রভাত-সমীরে খেলে
লতাপাতা, হেলে দুলে,
তার মাঝে দেখেছি কি ইন্দু-নিভাননে?

কিসের বিরচিত তব কমনীয় কায়া?
বুঝিতে না পারি তুমি প্রত্যক্ষ কি-মায়া।
সুষুপ্ত শিশুর হাসি,
অস্ফুটিত ফুলরাশি,
কিম্বা স্নিগ্ধ সরোনীরে কমলের ছায়া?

হৃদে বা বাল্যের স্মৃতি, সুখের স্বপন,
বহুদিন সংগোপনে প্রিয়-সম্মিলন,
অস্ফুট আশার বাণী,
দূরবনে বংশীধ্বনি,
মরুমাঝে কিম্বা হবে গুপ্ত প্রস্রবণ।

তোমার স্বরূপ দেবি! কিছু নাহি জানি,
তিলোত্তমা হয়ে বুঝি হেন অনুমানি,
যেখানে সুন্দর যাহা
সংগ্রহ করিয়া তাহা
গঠিল বিধাতা বুঝি দেব দেহখানি!

রমণীয় যাহা কিছু সকলের সার—
তুমিই কেবল বুঝি তুলনা তোমার!
কুসুম-সৌরভে গড়া,
বসন্ত-বাতাসে বেড়া,
কঠোর নিষ্ঠুর বিশ্বে কেবা আছে আর?

প্রেমের অক্ষয় উৎস তোমার অন্তর,
মধুর প্রকৃতি তব সর্ব্বমনোহর,
তোমার প্রসাদ-মাগে—
নিত্য নব অনুরাগে—
দেব-নর-যক্ষ-রক্ষ, ব্রহ্মা-হরি-হর।

ভক্তবালক।

বৈষ্ণবতত্ত্বের গূঢ়গম্ভীর তাৎপর্য্যার্থ এবং সৌভাগ্যবান্ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনিই মোহিত না হইয়া পারেন নাই। বঙ্গের বিগত বৈষ্ণবযুগের সাহিত্য নানাভাবে নানারূপে ইষ্টসাধনায় ভগবানের সহিত ভক্তের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। ইহার প্রতি ছত্রে, প্রতি পৃষ্ঠায় শান্ত-দাস্য-সখ্যাদি ভাবের উপাদেয় ব্যাখ্যা প্রস্ফুটিত। আজ আমরা 'সখ্য' ভাবটি লইয়া একটি ভক্তবালক-জীবনের আলোচনা করিব।

জঙ্গলময় গ্রামের মধ্যভাগে একখানি অতিজীর্ণ পর্ণকুটীরে একটি বিধবা তাহার একমাত্র পুত্র লইয়া বাস করিত। বিধবার সেই পুত্র-ব্যতীত সংসারে আপনার বলিতে আর কেহ ছিল না। শোক-তাপ-দুঃখ-বিজড়িত অশেষ যন্ত্রণার মধ্যেও দুঃখিনী তাহার একমাত্র জীবনাবলম্বনের মুখখানি দেখিয়া সময়ে অশেষ শান্তি পাইত। পতি-বিয়োগ-বিধুরা অনাথিনী হিন্দুবিধবা অত দুঃখেও প্রাণাধিক সন্তানকে বুকে ধরিয়া ক্ষণেক সকল জ্বালা ভুলিত।

যে গ্রাম খানিতে বিধবা বাস করিত, তাহারই প্রান্তভাগে গ্রাম্য বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসের জন্য পাঠশালা ছিল। একমাত্র গুরুমহাশয় তাহার অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বালকগণ গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ডের গুরুবর্ষণ সহ্য করিয়া, তাঁহার ভোজন-পরিতৃষ্টির জন্য নানাবিধ আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া তবে ভারতী-প্রসাদ লাভ করিত। সেই পাঠশালাই বিধবার সন্তান হরিদাস বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত ছিল। বালক হরিদাসকে গভীর অরণ্য অতিক্রম করিয়া তবে পাঠশালে যাইতে হইত। মধ্যে মধ্যে সেই জঙ্গলের শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড়তায় একাকী বালক ভয় পাইত; কিন্তু উপায় কি। দুঃখিনী বিধবার সন্তানকে কে সঙ্গে করিয়া পাঠশালে লইয়া যায়? নিরুপায় বালক অগত্যা সেই অরণ্যের মধ্য দিয়াই পাঠশালে যাইত গভীর বনের মধ্যে একাকী আসিতে বালক হয় ত ভয় পায়, ইহাই আশঙ্কা করিয়া জননী একদিন হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু বালক সে কথার কোনই উত্তর দিল না,—নীরবে সজলনয়নে ভূমিতলে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া রহিল। বিধবা বুঝিলেন, তাঁহার অনুমান সত্য। একমাত্র পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় জননীর প্রাণ ব্যাকুল হইল,—তৎক্ষণাৎ তিনি ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনা করিলেন। পর দিন পুত্র-সঙ্গে জননী, গুরুমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া যাহাতে তিনি বালককে একটু সকালে ছুটি দেন—তাহাই প্রার্থনা করিলেন। সে প্রার্থনায় আপাততঃ ফল ফলিল, কিন্তু তাহার পর পুনরায় যথাপূর্ব্ব বিলম্ব হইতে লাগিল। একদিন পাঠশালা হইতে ফিরিয়া বড়ই পৌঁছিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অন্ধকার বনাভ্যন্তরে বালক বড়ই ভীত হইয়াছে। ভয় পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে আসিয়া তাহার মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। স্নেহময়ী জননী ব্যস্ত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলে বালক কহিল,—'গুরুমহাশয় এখন আর সকালে ছুটি দেন না।' জননী তখন হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া বলিলেন,—'বাছা! পাঠশালা হইতে আসিতে বনের ভিতর যখন তোমার বড় ভয় হয়, তখন একবার তুমি শ্রীমধুসূদন, শ্রীমধুসূদন বলিয়া ডাকিও, তোমার ভয় থাকিবে না।' বালক কহিল,—'না। আমি ত অত বড় নাম ডাকিতে পারিব না; আমায় ছোট একটা নাম বলিয়া দাও।' মা বলিলেন,—'ভাল তুমি মধু বলিয়া ডাকিও।' বালকের মুখশ্রী প্রফুল্ল হইল, সস্মিতবদনে মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—'মা! মধুদাদা আমাদের কে হয়? আমি ডাকলে মধুদাদা কি আমার কাছে আসবে?' জননী সন্তানের অত্যন্ত ব্যগ্রতা দেখিয়া বলিলেন,—'তোমার মধুদাদা বিপদে হরি; যে তাঁহাকে সরলপ্রাণে ডাকিতে পারে, তিনি তার কাছে আসেন। তুমি পথে আসিতে যখন ভয় পাও, তখন তোমার মধুদাদাকে ডাকিও, তবে আর ভয় থাকিবে না।'

সরল বালকের কোমল হৃদয়ে জননী যে বিশ্বাস অঙ্কিত করিয়া দিলেন, সেই মুহূর্ত্তে প্রস্তরোপরি লৌহ-লেখনীর ন্যায় তাহা বসিয়া গেল। প্রত্যক্ষরূপে বালক মায়ের সে বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিল। পাপতাপময় সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতক্ষত সরল শিশুর সেই মুহূর্ত্তে এই বিশ্বাস, যেন মধুদাদা তাহাদেরই একজন কেহ! সরল বালক মাতৃবাক্যের প্রতি অসীম বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রত্যহ পাঠশালা হইতে আসিবার সময় উচ্চৈঃস্বরে 'মধুদাদা কোথায় গো? মধুদাদা কোথায় গো?' বলিয়া ডাকিত; ডাকিবা মাত্র কোথা হইতে একটী ভুবন-মোহন বলিষ্ঠকায় যুবক আসিয়া বালকের হাতখানি ধরিয়া নিরাপদে তাহাকে বিধবার কুটীরের সম্মুখে রাখিয়া যাইত। এই যুবক কে?—সাক্ষাৎ ভগবান্ বালকের অভয়দাতারূপে মানববেশে উপস্থিত। বালক জ্ঞানে না, কোন মহাশক্তি তাহার পথপ্রদর্শক,—সংসার-বিমূঢ়া বিধবা জানেনা, কে তাহার বালকের হাত ধরিয়া নিরাপদে মাতৃ-সকাশে রাখিয়া যায়। হায়! হতভাগিনী মনে করে, বুঝি ভগবানের কৃপায় কোন সহৃদয় ব্যক্তির কৃপা-দৃষ্টি তাহার বালকের প্রতি পতিত হইয়াছে, বুঝি তিনি দয়া করিয়া তাহাকে গৃহে রাখিয়া যান। অবোধ বিধবা জানিত না, কাহার করুণা তাহার সন্তানের প্রতি বর্ষিত হইয়াছে,—জানিত না দেবগণের বাঞ্ছিত রত্ন, যোগীজনের আরাধ্য ধন, স্বয়ং তাহার ভাগ্যবান সন্তানের সুহৃদ। ছেলেয় একদিন জননী সন্তানকে যে কথা বলিয়াছিল, আজ তাহাই যাথার্থ্যে পরিণত হইয়াছে। অবিশ্বাসী অজ্ঞাসভরে বালককে যে কথা বলিয়াছিল, সরল-বিশ্বাসী শিশু অবিশ্বাসীর মুখ হইতে, শুনিয়া নিজে তাহাই লাভ করিয়াছে; আর যে জননী মধুদাদার কথা বালককে জানাইয়া দিয়াছে, সে একবার মধুদাদাকে স্বচক্ষেও দেখিতে পাইল না। ইহারই নাম 'পরে আসিয়া আগে যাওয়া।' জননী অজ্ঞানান্ধকারে পড়িয়া রহিল, বিশ্বাসী শিশু ভগবানের পরম-পদ-রেণু প্রাপ্ত হইলেন। উপদেষ্টা যে-সেই থাকিল, মাতৃ-বাক্যে আস্থাবান বিশ্বাসী শিশু মধুদাদার কোমল কোলে স্থান পাইল।

বালক প্রত্যহ পাঠশালা যাইয়া পাঠাভ্যাস করে, প্রত্যহ মধুদাদার সাক্ষাৎ পায়। বালক এখন আর ভয় করে না। গভীর অরণ্যের মধ্যেও সে এখন ভয় পায়

না। যদি মধুদাদাকে এক দিন একদিন দেখিতে না পায়, তবে সেই নিবিড় বনাভ্যন্তরে ছল্ ছল্ চক্ষে দাঁড়াইয়া বিহ্বল বালক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকে,—"মধুদাদা গো?" মধুদাদার সাধ্য কি সে আহ্বান অগ্রাহ্য করেন? মধুদাদা অমনি হাজির! 'মধুদাদা তুমি দেরি কর কেন?' বলিয়া বালক অমনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। মধুদাদা তখন অস্থির! তিনি বালকের অভিমান সহ্য করিতে পারেন কৈ? ঐ যে উহার সহিত তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন! কত সোহাগ করিয়া, হাত ধরিয়া কোলে তুলিয়া বালককে সুখী করিলেন। কৈ, বালকের উপরত মধুদাদার অভিমান হয় না? বালকই যে তাহার মধুদাদার প্রতি অভিমান করিল! হায়! ভগবান ভক্তের বুঝি এতই ভিখারী! ভক্তের সে অভিমানে তাঁহার এতই সুখ!

দিন যাইতে লাগিল। মধুদাদার অপার প্রেম-সমুদ্রে ডুবিয়া বালক হরিদাস দিনদিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। এক দিন হঠাৎ গুরু মহাশয়ের মাতৃবিয়োগ হইল। যথারীতি শ্রাদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল এবং গ্রামস্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইল। গুরুমহাশয়ের একমাত্র ভরসা তাঁহার ছাত্র-মণ্ডলী। সুতরাং তিনি প্রত্যেক বালককে আজ্ঞা দিলেন, যাহার যাহা সাধ্য, শ্রাদ্ধে তাহাকে তাহাই যোগাইতে হইবে। সকল বালক বিনাবাক্যে গুরুমহাশয়ের সাহায্যে স্বীকৃত হইল। হরিদাসের প্রতি দধির ভারার্পণ হইয়াছে। শ্রাদ্ধে যত দধির আবশ্যক, হরিদাস তাহা যোগাইবে ইহাই স্বীকার করিল। দুঃখিনী, অনাথা বিধবার শিশুপুত্র শ্রাদ্ধবাড়ীর "সমুদায় দধি দিতে পারিবে ইহা গুরুমহাশয় প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না; যাহা হউক, অবশেষে হয় ত বিধবার সঞ্চিত কিছু থাকিতেও পারে ভাবিয়া তাহার প্রতিই দধির ভারার্পণ করিয়া গুরুমহাশয় নিশ্চিন্ত রহিলেন। বালক বুঝিল না, তাহার গুরুমহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে কত দধি আবশ্যক হইবে, সে শ্রাদ্ধের দিন তাহার মধুদাদার নিকট হইতে এক ভাণ্ড দধি চাহিয়া লইয়া গুরুমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইবে ইহাই সে যুক্তি-সঙ্গত মনে করিল। ক্রমে শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত। গুরুমহাশয় সোৎসুকচিত্তে হরিদাসের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সকল বালক আসিয়াছে, হরিদাস আসে নাই। গুরুমহাশয় অতিশয় ব্যস্ত। বুঝি দধির অভাবে আজ সমুদায় আয়োজন বিফল হয়। বুঝি সামান্য শিশুর বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া আজ নিমন্ত্রিত ভদ্র-মণ্ডলীর নিকট অপ্রস্তুত হইতে হয়। গুরুমহাশয় এদিকে দধির জন্য ব্যস্ত, আর একদিকে হরিদাস তাহার মধুদাদার নিকট উপস্থিত! মধুদাদাকে গুরুমহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধের কথা জানাইয়া সে দধির কথা কহিল। মধুদাদা তখনি কোথা হইতে যেন একটি অতি ক্ষুদ্র ভাণ্ডপূর্ণ দধি আনিয়া বালকের প্রদান করিলেন। বালক বিনা বাক্যব্যয়ে তখনি দধিভাণ্ড হস্তে হাসিতে হাসিতে গুরুমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল। গুরুমহাশয় সোৎসুক নয়নে হরিদাসের অপেক্ষা করিতেছিলেন; এখন সামান্য একটি ভাণ্ডে দধি লইয়া আসিতে দেখিয়া অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন; অতিতেজে হরিদাসের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার নবনীত কোমল, সুন্দর গণ্ডে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিলেন। তাঁহার ক্রোধানল এইখানেই নির্বাণ হইল না,—বেত্র দ্বারা বালকের পৃষ্ঠদেশে নির্ম্মমের ন্যায় শতাধিক আঘাত করিলেন। তাহার কোমল পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত-চিহ্ন সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। দরদরিত ধারায় শোণিতপাত হইতে লাগিল। সুশীল, শান্ত, গুরুভক্ত বালক হরিদাস নীরবে সে কঠোর শাস্তি সহ্য করিল, —পৃষ্ঠদেশে শোণিত-ধারার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত আমন্ত্রিত গণ গুরুমহাশয়কে তখন নিবৃত্ত করিয়া অগত্যা বিনা দধিতেই ভোজন, ব্যাপার সমাপন করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। গুরুমহাশয় নিবৃত্ত হইলে ক্রমে আহার্য্য পরিবেশিত হইল; নিমন্ত্রিতগণ আহারে উপবিষ্ট হইলেন। ভোজন অর্দ্ধেক সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় দধিভাণ্ড নির্ম্মিতগণের লোলুপ দৃষ্টি বালক হরিদাস-আনীত ক্ষুদ্র ভাণ্ডটির প্রতি পতিত হইল। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া মনের কথা প্রকাশ করিতে পারিল না; অবশেষে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাহসে ভর করিয়া কহিলেন,—'যদি ঐ বালক পরিশ্রম করিয়া ঐ দধিভাণ্ডটি লইয়াই আসিয়াছে, তবে উহা বৃথা যায় কেন? অতএব উহার বিহিত হওয়া আবশ্যক।' ব্রাহ্মণের বাক্য সকলেরই অমতবোধ হইল। একবাক্যে সকলেই যৎকিঞ্চিৎ দধির আস্বাদনে ইচ্ছুক হইলেন। ক্ষুদ্র দধিভাণ্ড আনীত হইল এবং তন্মধ্য হইতে দধি সকলকেই পরিবেশিত হইল;—সাশ্চর্য্যে পরিবেশনকারী চাহিয়া দেখিল দধিভাণ্ড তখনও পরিপূর্ণ। দ্বিতীয়বার একে একে সকলকে পরিবেশিত হইল, তথাপি দধিভাণ্ড পরিপূর্ণ। সকলে পেট ভরিয়া দধি খাইলেন। কেবল ইহাই নয়, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ জীবনে এমন সুস্বাদু দধি খাইতে পান নাই। যেন এ দধিতে কি একটু বিশেষ গুণ ছিল, তাহা আগন্তুক নয়। দধি-ব্যাপারে শ্রাদ্ধবাড়ীর সকলে বিস্মিত হইয়া গেল; কেহই এ রহস্য-উদ্ঘাটন করিতে পারিল না।

অদূরে গুরুমহাশয় দ্বারা রজ্জুবদ্ধ বালক দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল,—এক এক সময় সে তাহার মধুদাদাকে ভাবিতেছিল। অচিরে বালক বন্ধন-বিমুক্ত হইল; গুরু মহাশয় সোৎসুকে বালককে সকল ব্যাপারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক কিছুই জানে না; সে কিছুই বলিতে পারিল না। সে কেবল তাহার মধুদাদাকে জানে, তাঁহারই কথা বলিল।

গুরু মহাশয় তখন বুঝিলেন, এ মধুদাদা কে? মুহূর্ত্তে তাঁহার পাপ-কলুষিত অজ্ঞানান্ধ চক্ষু ফুটিল; মুহূর্ত্তে তড়িতের ন্যায় অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল,—অনুতাপের তুষানলে সে পাপাত্মাকে পোড়াইতে লাগিল। নিরপরাধ বালককে বিশেষতঃ স্বয়ং বিশ্বেশ্বরের কৃপাপাত্র বালককে শারীরিক গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তিনি আতঙ্কিত ও অনুতাপিত হইলেন। গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। সুকৌশলে গললগ্নীকৃত বাসে গুরু মহাশয় সপ্তম বর্ষীয় বালক হরিদাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। বালক ব্যাকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ জানাইল, সে কিছুই জানে না; তাহার মধুদাদা জানেন। তাঁহার কাছে যাইলে গুরু মহাশয় সকল জানিতে পারিবেন। শুনিবামাত্র গুরু মহাশয় শিষ্য বালকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া মধুদাদার দর্শনাভিলাষে বনের মধ্যে চলিলেন। গভীর বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভক্ত হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,—মধুদাদা গো?—কোথায় মধুদাদা? মধুদাদার উত্তর দিলেন কে? বালক উচ্চৈঃস্বরে, রুদ্ধকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ যখন ডাকিতে লাগিল, তখন মধু দাদা আসিয়া বালকের সম্মুখে

উপস্থিত হইলেন! বালক তাহার গুরু মহাশয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া মধুদাদাকে দেখিতে কহিল। কিন্তু হায়! বালক জানে না সে যে প্রেমের অধিকারী তাহার শিক্ষাদাতা গুরু তাহাতে বঞ্চিত! বালক ভাগ্য-বলে যে রত্ন দেখিতে পাইয়াছে," মন্দভাগ্য গুরু তাহা দেখিবে কি প্রকারে? সাক্ষাৎ ভগবানরূপী মধুদাদা হরিদাসের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, অজ্ঞানান্ধ গুরু তাহা পাপ চক্ষে দেখিতে পাইল না! গুরু মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কোথায় তোমার মধুদাদা?' বালক অঙ্গুলী-সঙ্কেতে সম্মুখবর্ত্তী মধুদাদাকে দেখাইয়া দিল। কিন্তু কৈ, তথাপি গুরুমহাশয় দেবদুর্ল্লভ সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। গুরু-মহাশয় তখন আর্ত্তস্বরে হরিদাসের নিকট তাহার মধুদাদার দর্শন প্রার্থনা করিলেন। বালক হরিদাস বহু অনুরোধ করিবার পর মধুদাদা আপন পৃষ্ঠদেশ দেখাইয়া বলিলেন,—দেখ ভাই, তোমার মধুদাদার কি দশা হইয়াছে! তোমার পাপিষ্ঠ গুরুমহাশয় আমার কি দুর্দ্দশা করিয়াছে! যে আমার ভালবাসার জনকে যন্ত্রণা দিয়া আমাকে তাহার সমদুঃখভাগী করে, আমি তাঁকে দেখা দিই না।' বালক অশ্রুপূর্ণ লোচনে দেখিল, বেত্রাঘাতে তাহার নিজ পৃষ্ঠদেশ যেমন ক্ষত বিক্ষত, তাহার মধুদাদারও তাহাই হইয়াছে! দেখিয়া বালক কাঁদিয়া আকুল।

গুরুমহাশয় সে মনোমোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। আজীবন অনুতাপের পর অমিময় অর্ঘ্যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে লাগিল।

ভক্ত হরিদাস মাতৃসকাশে তাহার মধুদাদার আশ্চর্য্য-কীর্ত্তি-কথা কহিতে চলিল। তিনি সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। হঠাৎ যেন কিসের এক অন্ধকারময় যবনিকা তাঁহার হৃদয়পট হইতে সরিয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে জননী তাঁহার হরিদাসের মধুদাদাকে দেখিতে ছুটিলেন। বহু সাধ্য সাধনার পর—বহুতপ্ত-অশ্রুজল-সেচনের পর তবে আজ হরিদাস-জননী—যাঁহারা প্রেমে যমুনা উজান বহিয়াছিল, যে প্রেমের মোহে বৃন্দাবনের কুল-বালা কুলমানে জলাঞ্জলি দিয়াছিল, যে দেবতা নখাগ্রে গোবর্দ্ধন ধরিয়াছিলেন, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরু-ক্ষেত্রে যে দেবতা অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন,—সেই নব-ঘন-শ্যাম-সুন্দর মূর্ত্তি চক্ষে দেখিয়া ধন্যা হইল। হরিদাসকে গর্ভে ধরিয়া পাপ-জীবন উদ্ধার পাইল। কর্ম্মকাণ্ডময় সহস্র জটিল-জঞ্জালময় পথ পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত হরিদাস কেবল বিশ্বাসের বলে মধুসূদনকে পাইয়া ধন্য হইল,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পবিত্র জীবনী-পাঠকেও ধন্য করিল।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভেদনীতি।—বঙ্গের বর্ত্তমান ছোটলাট স্যার চার্লস এলিয়টকে অনেকে অযোগ্য শাসন-কর্ত্তা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। রাজনিন্দা মহাপাপ, কিন্তু রাজপুরুষের নিন্দাও পাতক নহে। তথাপি যাঁহার হস্তে সাত কোটী বঙ্গ-বাসীর অদৃষ্টসূত্র ন্যস্ত, তাঁহাকে সহসা অযোগ্য বলিতে সাহস হয় না। আমরা বলি, তিনি বিশেষ সুযোগ্য, কারণ তিনি ভেদনীতিতে পরম পণ্ডিত। কৌরব মন্ত্রী কুণিক অথবা কৌটিল্যের ভেদনীতিতে এতটা পারদর্শিতা ছিল কিনা সন্দেহ। কুণিক পাণ্ডবদিগের সংহার সাধনে সুমন্ত্রণা দিয়াছিলেন, কৌটিল্য বহুস্থে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন, আমাদিগের ছোটলাট আজি হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রবজ্র নিক্ষেপ করিতেছেন। গত বর্ষের গোহত্যা সঙ্কল্প দাঙ্গা হাঙ্গামায় প্রায় সর্ব্বত্রই মুসলমান-দিগের দোষ সাব্যস্ত হইল। আজিমগড়, বালিয়া, বসন্তপুর, বোম্বাই, রেঙ্গুন—সর্ব্বত্রই মুসলমানগণ দঙ্গার উত্তেজনা করিয়াছিল, এই কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল, কিন্তু লাট চার্লস্ এলিয়ট বিশ্বাস করিলেন না। তিনি ও তাঁহার ন্যায় কতিপয় মহাপুরুষ হিন্দুদিগের উপর সকল দোষ চাপাইতে বড় ভাল বাসেন। হিন্দুরা কেন যে তাঁহাদের বিষদৃষ্টিতে পড়িল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। হিন্দুরা নিরীহ; কখনই দাঙ্গাহাঙ্গামা ভাল বাসে না। এই তাহাদের অপরাধ! হিন্দুদিগকে পদতলে দলিত করিয়া তাঁহারা মুসলমানদিগকে মাথার উপর তুলিয়াছেন; এরূপ ভেদনীতিতে কি ফল ফলিবে?

***

অপরাধী কে?—কাল-মাহাত্ম্যে সকলই বিপরীত হইয়া পড়িল। ছোট লাট বলিতেছেন হিন্দুরাই আদৌ অপরাধী; হিন্দুরা কংগ্রেস করিয়াছে, আন্দোলন করিতেছে, দেশে দেশে গাত্রে ত্যাগ দিয়া ষড়যন্ত্র করিতেছে, উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া দুরাকাঙ্ক্ষী হইয়াছে; ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গোরক্ষণী সভা-স্থাপন করিয়া নানা আড়ম্বর করিতেছে; পার্লামেণ্টে হিন্দু-দিগের বন্ধু। ছোট লাটের কথায় উত্তেজিত হইয়া ইণ্ডিয়ান-প্রমুখ এঙ্গ্লোইণ্ডিয়ান সম্পাদকগণ বলিতেছেন, "এ ছার হিন্দুকুলকে নির্ম্মূল কর।" হিন্দুরা যদি জুলু অথবা কুলু, পাপুয়ান কিম্বা রেড-ইণ্ডিয়ান হইত, তাহা হইলে হিন্দু-শত্রুদিগের মনোবাঞ্ছা সহজেই পূর্ণ হইত; কিন্তু তাহা নহে; হিন্দু সভ্য-জগতের মধ্যে প্রাচীনতম; মিশর, এসিরিয়া, ব্যাবিলন এককালে প্রাচীন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজি তাহাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। হিন্দু তাহাদিগের অপেক্ষা প্রাচীন হইয়াও, পরা ও অপরা বিদ্যায় তাহাদিগের শিক্ষাগুরু হইয়াও, সহস্র সহস্র বৎসর পরিয়া অসভ্য যবনদিগের অত্যাচার সহিয়াও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; ইহাই আমাদিগের স্থিতিশীলতার প্রদীপ্ত পরিচয়। ধর্ম্ম ভিন্ন এ জগতে কেহই কাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। সেই ধর্ম্মের সার মর্ম্ম হিন্দু যেমন বুঝিয়াছে, এমন আর কেহই নহে। সেইজন্য মহাকালের মহাশক্তিমান ক্ষেত্রের ভস্মরাশির উপরেও হিন্দু মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আজি দেশের রাজা যদি হিন্দুর বিরোধী হয়েন, তাহা হইলে আমা-দের চিরসখায় ধর্ম্ম আমাদিগকে রক্ষা করিবে। ভগবানের চরণে আমাদের এই প্রার্থনা যেন হিন্দুকে অধার্ম্মিক ও রাজদ্রোহী বলিয়া নিন্দিত হইতে না হয়।

গোরক্ষা ও গো-হত্যা।—গো-জাতি মানবের অশেষ মঙ্গলের নিদান। সেই জন্য হিন্দু গাভীকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া পূজা করে। মুসলমানগণ গোজাতি হইতে প্রভূত উপকার পাইয়াও তাহাদিগকে সংহার করিতে সর্ব্বদাই বদ্ধপরিকর। যাহা বিশ্বের মঙ্গল-নিদান, হিন্দু তাহাকেই রক্ষা করিতে উদ্যত— ইহাই হিন্দুর অপরাধ; মুসলমানগণ তাহাকে সবংশে ধ্বংস করিতে চেষ্টিত, এই জন্য কি তাহারা গবর্ণমেণ্টের এত প্রিয়? যদি এইরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হইতে হয়, হিন্দু চিরকাল অপ্রিয় থাকিবে, তথাপি গো-হত্যার প্রশ্রয় দিতে পারিবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সকল রাজপুরুষই যে, এই উপায়ে প্রীতি ও অপ্রীতি পরিমাপিত করেন, তাহা নহে। একটী দৃষ্টান্ত দিব,—মিঃ এডগার গলব্রেথ উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ এটাওয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট। তত্রত্য কতকগুলা মুসমলমান একটী উৎসৃষ্ট বৃষকে গুলি করিয়া তাহার গলা কাটিয়া হালাল করিয়াছিল। হিন্দু পল্লীর মধ্যস্থলে শত শত হিন্দুর সম্মুখে এই লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় হয়; তথাপি পাছে কোন গোলমাল হয়, এই ভয়ে হিন্দুরা একটী কথা পর্য্যন্ত কহিল না। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাদিগকে ছাড়িলেন না; অপরাধী মুসলমানদিগের প্রত্যেককে তিনি ছয় মাস করিয়া কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। হিন্দুবিদ্বেষী কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচার হইলে হয়ত তিনি একটা গোল বাধাইয়া বা আইনের কূট তর্ক তুলিয়া হিন্দুদিগকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিতেন। ন্যায়-পর গলব্রেথের ন্যায় ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতের জেলায় জেলায় থাকিলে হিন্দু-মুসলমানের সঙ্কটকালে দেশের মহোপকার সাধিত হইত।

* * *

নূতন ব্যাধ্যা।—কি গুণে মুসলমানেরা গবর্ণমেণ্টের চুনয়নে পড়িল, আমরা এতদিন তাহা বুঝিতে পারি নাই। নানালোকে নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক হয় নাই, সম্প্রতি পাইওনিয়ার পত্রিকার কোন সংবাদদাতা ইহার প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুসলমান-দিগকে গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই চটাইতে পারেন না; কেন না (১) ইংলণ্ডকে ইজিপ্ট হস্তগত রাখিতে হইবে, (২) আফগানস্থানের সহিত সদ্ভাব ও সখ্য চিরকাল বজায় রাখিতে হইবে, (৩) আফ্রিকার মুসলমানদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইবে, (৪) কালে মুসলমান ধর্ম্ম য়ুরোপের প্রধান ধর্ম্ম হইবে। মুসলমানেরা এই ব্যাখ্যার বড়ই প্রশংসা করিবে, সন্দেহ নাই। যদি গবর্ণমেণ্টের মুসলমান-প্রীতির ইহাই প্রকৃত কারণ হয়, তাহা হইলে বলিব হিন্দুরা মুসলমানদিগের অপেক্ষা শতগুণে ভাগ্যবান। যাহা হউক যুক্তিচতুষ্টয় অতীব সমীচীন;—বিশেষতঃ চতুর্থ যুক্তিটিতে লেখকের চতুরতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই যুক্তিটী বিশ্লেষিত করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ক্রমে স্নিগ্ধ অপলেপ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে! যাহা হউক মুসলমান ধর্ম্ম কালে য়ুরোপের প্রধান ধর্ম্ম হইবে! যদি হয়,তাহা হইলে ভূমধ্যস্থ সাগর অল্প দিনের মধ্যে শোণিত-সাগরে পরিণত হইবে; তাহা হইলে ঊর্দ্ধবানকে ভূভারহরণে তত বেশী কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না।

রাজকুমারীর স্বয়ংবর।

চাম্পাপুর নামে এক প্রাচীন নগর ছিল; এবং তথায় এক রাজা ও রাজ্ঞী বাস করিতেন, এবং আর তাঁহাদের এক রূপবতী কন্যা ছিল। সেই দুহিতার বদনশোভা, যেন পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় ছিল। তাঁহার মস্তকের কেশের ছটা যেন কৃষ্ণ বর্ণের মেঘের ন্যায় ছিল; তাঁহার নয়নযুগল যেন মৃগের চক্ষুর ন্যায় ছিল; চক্ষের ভ্রূদ্বয় ছিল যেন দুইখানি ধনুকের ন্যায়; নাসিকা ছিল যেন শুক পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায়; তাঁহার গলদেশ ছিল যেন, কপোতের গলার ন্যায়; এবং দন্তপাতি ছিল যেন দাড়িম্বদানার ন্যায়; ও তাঁহার ওষ্ঠাধর ছিল যেন বিম্ব ফলের রক্তিমাবর্ণের ন্যায়; এবং তাঁহার মধ্যদেশ ছিল যেন শার্দ্দূলের কটিদেশের ন্যায়; তাঁহার হস্ত দ্বয়ের ও পদতলের কোমলতা ছিল যেন কোমল কমলিনীর ন্যায়; তাঁহার অঙ্গের লাবণ্য ছিল যেন চম্পক পুষ্পের গৌর বর্ণের ন্যায়; এবং সংক্ষেপে কহিতে হইলে, ইহাই দেখিতে পাওয়া যাইবেক, যে, তাঁহার যৌবনের চিক্কণতা যেন নব শশীর কলার ন্যায় দিনে দিনে বৃদ্ধি হইতে ছিল। যখন ঐ কন্যার বয়ঃক্রম পরিণয়ের উপযুক্ত হইল, তখন তাঁহার জনক জননী, তাঁহার কারণ অতি উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। যখন ভূপতি মনুষ্য মুগগণের প্রতিমূর্ত্তি সকল তাঁহাকে দেখাইলেন; তখন তন্মধ্যে একখানিও তাঁহার মনোনীত হইল না; এবং তিনি কহিলেন যে হে পিতঃ! যখন আপনি কন্যা দান করিবেন, তখন যেন আপনি আমাকে কেবল এক ব্যক্তির হস্তেই সমর্পণ করুন, যিনি ত্রিগুণ বিশিষ্ট হইবেন; যথা রূপবান, বলবান, ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গুণে গুণবান। সমস্তক্রমে কতিপয় ব্যক্তি বিবাহার্থে আসিয়া উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিল; কিন্তু তন্মধ্যে এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কহিল, যে "অস্ত্র বিদ্যায় কেবল আমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদবাচন করি; আমার তুল্যনা তুমি আর কেথিাই পাইবেক নাহি; কেন কারণ, আমি এমন বাণ ত্যাগ করিতে পারি, যে তাহা এক অদৃশ্য বস্তুকে ভেদ করিতে পারিবেক, এমন এক বস্তু যাহাকে কেবল কর্ণেই শ্রবণ করা হইয়াছে, কিন্তু কখন চক্ষে দেখা হয় নাই; আর আমার রূপের বিষয় কহিবার কিছুই আবশ্যক নাই, উহার গৌরব জগতে বিদিত আছে;—আর তাহার সাক্ষ্য আপনারাও সম্মুখে দেখিতে পাইতেছেন।" এমতে রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের জন্য ঐ সুপরুষকে এক উপযুক্ত বরপাত্র বলিয়া মনোনীত করা হইল।

এক্ষণে তোমাকে আমি আর এক রকমের বাণের কথা কহিতেছি; এবং এই বাণও এমন এক বস্তুকে বিদ্ধ করিতে পারিবেক, যে, যাহার বিষয় কেবল ভোগ করাই হইয়াছে, কিন্তু কখনই উহাকে দৃশ্যগম্য করা হয় নাই। তিন বৎসর গত হইল, এক দিবস যখন আমি লক্ষ্ণৌ নগরের বাজারের ভিতর দিয়া গমন করিতেছিলাম; সেই সময়ে, আমি দেখিতে পাইলাম, যে, ঐ যে ভয়ঙ্কর পীড়ন, যাহা ওলাউঠা নামে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা তখন ঐ ব্যক্তিগণের উপর পীড়ন করিতেছিল। যদিও মহৎ মহৎ ঔষধী সকল, যাহা ঐ লোক মধ্যে বিদিত ছিল, তাহা ব্যবহার করা হইতে ছিল বটে; কিন্তু তত্রাচ শত শত মনুষ্যগণ কালের করাল গ্রাসে প্রতিদিন পতিত হইতে ছিল। ঐ শোকান্বিত ব্যক্তিগণের বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, আমি আমার অন্তঃকরণে, ক্ষোভিত ও ব্যথিত হইয়া, এই কথা কহিলাম যে, হায়! কেহ কি এমন কোন ঔষধী প্রকাশ করিতে পারেন নাহি? যে, তদ্দ্বারা এই রোগ হইতে মনুষ্যগণ সম্পূর্ণ ও নিশ্চয় রূপে নিস্তার পাইতে পারে। মনুষ্যবর্গ মধ্যে সকলেই, সময়ে সময়ে বেদনা হইতে যন্ত্রণা পাইয়া থাকে। এবং এই ভূতলে আমরা অন্য কোন বস্তুকে এত আশঙ্কা করি নাহি, যত বেদনার যন্ত্রণাকে করিয়া থাকি। এই রোগের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবার কারণ চিকিৎসা বিদ্যা বিষয়ক পণ্ডিতগণ, সকল দেশেই, শত শত বৎসরাবধি, আপনাদিগের বুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও মর্ম্মজ্ঞতা সহকারে, কোন এক উপায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে।

এবং এই পৃথিবীস্থ মনুষ্য জাতির মধ্যে সকলেই, পর দুঃখে দুঃখী হইয়া, সাহায্য করিবার জন্য আপনাপন হস্ত বিস্তারিত করিয়া দিবেন, যদ্যপি উহার দ্বারা কোন্ উপকার দর্শাইতে পারা যায়।

এক্ষণে যখন সিগেল্‌স্ পেএন্ কিন্ নামক ঔষধীটী প্রকাশ করা হইয়াছে; তখন উহাকে, সমস্ত যন্ত্রণাভিত্রিক্ত মানব সমূহের দ্বারা হর্ষের সহিত, আহ্বান করা হইবেক। এবং ইহাই হয় এ বাণ যন্ত্রদ্বারা ওলাউঠা নামক রোগকে বিদ্ধ করিতে পারা যাইবেক; এবং তোমার দেহ হইতে উহাকে সমূলোৎপাটন করিয়া ফেলিতে পারা যাইবেক। এই পেএন্ কিন্ নামক ঔষধটী ব্যবহার করিবামাত্রেই, প্রায় ক্ষণকালের মধ্যেই এই প্রাকস্থলীর মধ্য হইতে আকড়ান ও বৈদনাকে দূর করিয়া দিবেক। এবং এই পেএন্ কিন্ নামক ঔষধীর কেবল কএকটী মাত্রাই সেবন করিলে, উদরাময় একেবারে স্থগিত হইয়া যাইবেক। হায় হায়! যখন আমি এ লক্ষ্ণৌ নগরে ছিলাম; যদ্যপি সেই সময়ে, এ পেএন্ কিন্ নামক ঔষধীটী প্রকাশ পাইয়া ব্যবহার করা হইত, তাহা হইলে, যে কতই লোকের প্রাণ রক্ষা পাইতে পারিত; তাহা আমি কহিয়া জানাইতে পারি নাহি। কিন্তু, তত্রাচ ইহা কি এক সুখদের বিষয় হয়, যে, এক্ষণে আমরা উহার প্রকাশ হইবার সুসমাচার বিদিত করিতে সক্ষম হই।

সিগেল্‌স্ পেএন্ কিন্ নামক ঔষধীটী ধর্ম্ম গুণে কেবল উদ্ভিজ্জ বস্তু সংযুক্ত নির্ম্মিত হইয়াছে; এবং উহা যে কেবল সর্ব্বাপেক্ষা অতি উত্তম ও সজীব গাছগাছড়ার সহিত প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য হয়।

বোতল পিছু মূল্য—এক টাকা। এই পেএন্ কিন্ ঔষধী ব্যবহার করিবার নিয়ম সকল, ঐ বোতলের মোড়ক কাগজে দেখিতে পাওয়া যাইবেক।

এই ঔষধী ভারতভূমির সকল প্রধান প্রধান বাজারেতে পাওয়া যাইবেক; কিম্বা অধিকারীদিগের ঠিক বরাবর নিকট হইতে পাওয়া যাইবেক। ঠিকানা—এ, যে, হোয়াইট্ নিম্‌ বিল্ডিং, ৫ নম্বর, ফর্ব্বিস্ ষ্ট্রীট, বম্বে।

K. D

ডায়মণ্ড মেডিকেল হল।

পাইকারী ও খুচরা ডাক্তারী ঔষধ বিক্রেতা।
কার্সিস্ বাজারের সুপ্রসিদ্ধ মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, নিয়োজিত।
১৬৮ নং হেরিসন রোড, বড় বাজার, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সম্প্রতি 'ম্যালাবো' জাহাজে নূতন ঔষধ ডাক্তারি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি বিলাতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দোকান হইতে আমরা আনাইয়াছি; এবং সে সকল দ্রব্য সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে আমরা বিক্রয় করিতেছি।

একজন বিচক্ষণ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে প্রেস্‌ক্রিপসনের ঔষধ সকল প্রস্তুত করা হয়, এবং তিনি রোগী দেখিবার জন্য সর্ব্বদাই ডাক্তারখানায় উপস্থিত থাকেন।

অসুমানিক সিকিমূল্যে পাঠাইয়া দিলে মফস্বলে ভি, পি, পোষ্টে ঔষধ পাঠান যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

অতি আবশ্যকীয় সংবাদ।

বিষহরি বা জুনা কি? ইহা ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস L. H. M. S. মহাশয়ের পারা ও উপরংশ-জনিত ঘায়ের অব্যর্থ মহৌষধ। মেরুদণ্ড ঘাই হউক, ১৫দিনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। বিষহরি যাবতীয় সার্সার্সা শীর্ষস্থানীয়। মেহ, প্রমেহ রোগের আশুসংহারক, এবং সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত। যেহেতু ইহা দেশীয় গাছগাছড়ার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত। মূল্য সেবনের ঔষধ ১, প্রলেপ ১, প্যাকিং মাঃ ৵৹। ভিঃ পিতে পাঠান যায়। এজেন্ট, টকুর পাল এণ্ড কোং খোংড়াপটী, কলিকাতা।

চন্দ্র এণ্ড ব্রাদার্স

৯নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

জরীপের যাবতীয় সরঞ্জাম বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ও জরীপের যন্ত্র সকল অল্প সময় মধ্যে উত্তমরূপে সুলভ মূল্যে মেরামত হইয়া যাবে।

অনুসন্ধান।

কলিকাতা লিটরেরী ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ | ৪ঠা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১ | দ্বাদশ সংখ্যা।

যমলোক ও সারমেয়।

শ্মশান-সৈকতে জলন্ত চিতানলে প্রাণের প্রাণ দগ্ধ হইতেছে; এতদিন যে হৃদয় হৃদয়ের প্রধান অধিষ্ঠাতৃ-দেবরূপে, আনন্দের প্রধান উৎসরূপে, অঙ্গের অমৃত ও নয়নের জ্যোতি স্বরূপ ছিল; যাহাকে সুখের সমুজ্জ্বল ক্রোড়ে লালিত করিয়াও তৃপ্তি হয় নাই, আজি সে চিরকালের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে; কোথায় কোন্ অনির্দ্দিষ্ট স্থানে, কিরূপ ভাগ্যের ক্রোড়ে যাইয়া পড়িতেছে, কেহ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না, তথাপি প্রিয়তম ব্যক্তির ভবিষ্যৎ সুখ-সম্ভাবনা, কল্পনা করিয়া চির সুখের আবাস যমলোকের মনোহর দৃশ্য যেন চক্ষে দেখিয়া, তথায় দেবতাগণের সহিত তাহাকে আসীন হইতে বলিতেছে। পুরাণে যমলোকের যে বীভৎস দৃশ্য চিত্রিত আছে, ঋগ্বেদে আমরা সেরূপ দেখিতে পাই না; বেদের যম পুরস্কারদাতা ও স্বর্গসুখ-বিধান-কর্ত্তা; এই জন্য ঋষি বলিতেছেন,

"পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু
বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানং।
বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং
যমং রাজানং হবিষা দুবস্য।"

অর্থাৎ হে অন্তঃকরণ! তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়া সেবা কর। তিনি সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়া যান, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন; তাঁহার নিকটই সকল লোকে গমন করে*। সুতরাং যে যমের নাম শ্রবণ করিবা মাত্র আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আতঙ্কে শিহরিত হয়, যে যমালয়ের ভয়াবহ দৃশ্য ও বিকট দণ্ডের বিষয় ভাবিয়া লোকে চিরজীবী হইতে কামনা করে, এ সেই যম এবং ইহা সেই যমালয় নহে। এই জন্য তাহাকে বলিতেছেন যে, "উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবং।" দুইটী রাজা যম ও বরুণ শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ করিতেছেন, ইঁহাদিগকে যাইয়া দর্শন কর। কিন্তু এই স্বর্গসুখদাতা যমরাজার স্বর্গসুখময় লোকের দ্বারদেশে ঐ যে চারি চক্ষুবিশিষ্ট বিচিত্রবর্ণধারী দুইটী কুক্কুর প্রহরীরূপে সঞ্চরমান রহিয়াছে, উহারা কে? এ শুন বন্ধু বা জ্ঞাতি-মৃত ব্যক্তিকে সাবধান করিয়া দিবার নিমিত্ত বলিতেছেন:——

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত ঋগ্বেদ ১০ম, ১৪ সূ।

"অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ
শবলৌ সাধুনা পথ।"

চতুরক্ষিবিশিষ্ট বিচিত্রবর্ণযুক্ত সরমাগর্ভজ এ যে দুই কুক্কুর রহিয়াছে, উহাদের নিকট দিয়া শীঘ্র চলিয়া যাও।

তৎপরে যমকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,

"যৌতে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ
চতুরক্ষৌ পথিরক্ষৌ নৃচক্ষসৌ।
তাভ্যামেনং পরিদেহি রাজন্
স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি॥"

অর্থাৎ "হে যম! তোমার প্রহরী স্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষু, যাহারা পথ রক্ষা করে এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়; তাহাদিগের কোপ হইতে এই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা কর।" হে রাজা! ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগী কর।" এই দুইটী যমদূতের বৃহৎ বৃহৎ নাসিকা; ইহারা "অসৃতৃপৌ" অর্থাৎ প্রাণ ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হয়। ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, এই দুইটী সারমেয় দেখিতে যেমন ভীষণ, তেমনই ভীষণপ্রকৃতি। কিন্তু ইহারা কে? যে যমালয় স্বর্গসুখের আকর, ধর্ম্মের পুরস্কার ভূমি, তাহার দ্বারদেশে এরূপ ভীষণপ্রকৃতি দুইটী কুক্কুর কেন? ঋষি বলিতেছেন, "যমসা দূতৌ চরতে জনাঁ অনু" সেই যমদূতদ্বয় সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে; ইহারই বা অর্থ কি? মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানকালে একটী কুক্কুর যুধিষ্ঠিরের পথ দেখাইয়া গিয়াছিল। ইহাতে বোধ হইতেছে ঋগ্বেদের এই সারমেয়-প্রসঙ্গ মহাভারতে উদ্ধৃত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদেও "অথর্ব্ববেদে ও ঋগ্বেদের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী দেখা যায়; সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে ঋগ্বেদের কল্পনা ক্রমে ক্রমে পুরাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্রীস ও নর ওয়ে—এমন কি উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের মধ্যেও এইরূপ কুক্কুরের বিবরণ দেখা যায়; অর্থাৎ ইহা তাহাদের প্রায় একরূপই আকৃতি, প্রকৃতি ও ভক্তির বিষয় বর্ণিত আছে। পার্শি, তুরাণীয় ও সেমিটিক জাতি সমূহের মধ্যেও এককালে এইরূপ ধারণা ছিল। গ্রীসের সকল কাব্যেই এই কুক্কুরের দুইটী সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তবে কেহ ইহাকে শতশীর্ষ, কেহ বা বহুশীর্ষ এবং কেহ কেহ ত্রি-শীর্ষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই ইহাকে যমলোকের রক্ষক বলিয়াছেন। মৃত্যুর ইহার বৃত্তি বিষয়ে হিন্দু ও গ্রীক পুরাণে অণুমাত্র অনৈক্য নাই। গ্রীসের পৌরাণিক গ্রন্থে এই কুক্কুর কেরবেরস্ নামে অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা সর্ব্বভক্ষক মহাকালের রূপক মাত্র; ইহার তিনটী মস্তক; সেই তিনটী মাথা ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। মহাকবি মিল্‌টন ইহাকে লোকের বিবেকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য কবিগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে পৃথিবীর গ্রন্থ কেহবা ষড়-রিপুর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পুরাতত্ত্ববিৎ ব্রায়ান্ট বলেন, কেরবেরস্ শব্দের অর্থ আলোক-ভূমি।*

ফলতঃ যমের দূত স্বরূপ এই দুইটী ভীমাকার সারমেয় যে কি, অদ্যাপি তাহা অভ্রান্তরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। ম্যাক্স মুলর প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, উষা ও তন্মধ্যে অন্ধকার এই দুইটী কুক্কুররূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে সরমা অর্থে উষা। কিন্তু এই মত যে, যুক্তিসিদ্ধ নহে, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

* Proceedings of the Asiatic society of Bengal. May, 1881. P. 93.

ডাক্তার মিত্র বলেন, এজগতে যাহা হিন্দু মনোরম ও প্রাণময়, তাহারই সহিত ইহার তুলনা দেখা যায়; তবে মৃত্যু ও ধ্বংসের শক্তি ইহার সম্বন্ধ কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? তদ্ব্যতীত, উষার জীবন্ত ও ভাস্বর প্রভাব কিরূপে এরূপ দুটো অধন্য জন্তু সৃষ্ট হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। যদি সূর্য্যের প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সান্ধ্য গতির সহিত মানবের শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের তুলনা করা যায়, এবং সূর্য্যাস্তই যদি জীবনের অবসান বুঝায়, তাহা হইলেও সারমেয় দ্বয়কে উষার পুত্র বলা যাইতে পারেনা; কারণ যাহা উজ্জ্বল ও জীবন্ত মূর্ত্তির প্রতিমা, তাহাই উষা, এবং উষার পুত্র মৃত্যুরূপ অন্ধকারের প্রতিকৃতি না হইয়া নবীন ও উদ্যমময় জীবনের প্রতিমূর্ত্তি হইবে।

তবে উষার অন্ধকার কি? যদি বল উষার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্ধকার; তাহা হইলেও তর্কের নিরসন হয় না; কারণ সেই অন্ধকার অবশ্য উষার আলোকে অল্প সময় মধ্যেই বিলীন হইবে। এস্থলে অন্ধকারের পর আলোকের অভ্যুদয়; কিন্তু আলোকের পর অন্ধকারের সমাগম নহে। অতএব জীবনরূপ জীবন্ত আলোকের অবসানান্তে কৃতান্তপুরীর দ্বারস্থ কুক্কুরদ্বয়ের সহিত উষাগ্র অন্ধকারের তুলনা কিরূপে হইতে পারে?

এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তিসিদ্ধ তর্কের পর ডাক্তার মিত্র বলিয়াছেন, সূর্য্যের কিরণ লইয়া দ্বয়ের নানাস্থানে যে সকল পৌরাণিক গাথা প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় দ্বারা এই সারমেয়-রূপকের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হইতে পারে না; ইহাতে আরও কিছু আবশ্যক। বোধ হয় প্রাচীনকালে অন্ত্যেষ্টি সৎকার যে প্রণালী-ক্রমে সম্পাদিত হইত, তাহার সহিত ইহার কিছু সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

মানব-সমাজের অতীব আদিম অবস্থায় লোকে মৃতদেহ প্রায়ই নিকটস্থ বনজঙ্গলে ফেলিয়া দিত; সেখানে তাহা পচিয়া ক্রমে নষ্ট হইত, অথবা শৃগালকুক্কুরগণ ও শকুনি প্রভৃতি শবভোজী হিংস্র সকল আসিয়া তাহা উদরসাৎ করিত। ক্রমে যত কাল অতীত হইতে লাগিল, কেহ কেহ হয়ত বন্য কুক্কুর বা শৃগাল দ্বারা আস্থীয় বন্ধুর শবদেহের সৎকার রহিত করিয়া গৃহপালিত কুক্কুরগণের সম্মুখে মৃতদেহ নিক্ষেপ করিত। এই উপায় অদ্ভুত ও অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; কারণ বর্ত্তমান কালেও পার্শিরা শকুনি দ্বারা শবদেহ খাওয়াইয়া থাকে। সেই-রূপ হয়ত আর্য্যেরা অতি পুরাকালে শবদেহের ভোজনার্থ কুক্কুর নিযুক্ত করিত: কালে তাহা সামাজিক ব্যবস্থারূপে পরিণত হইয়াছে।

হীরোডোটস্ বলেন, প্রাচীন পারসিক-দিগের মধ্যে কোন পুরুষ মরিলে তাহার মৃত দেহ অগ্রে কুক্কুর বা শবভোজী পক্ষীর সম্মুখে স্থাপিত হইত। তাহারা তাহা ছিন্নভিন্ন করিলে তবে তাহা গোর দেওয়া হইত। মেজাই দিগের মধ্যে এ প্রথা বহুদিন প্রচলিত ছিল। ষ্ট্রাবো বলেন "সগ্‌দীয়ান্ ও ব্যাকট্রিয়ানগণ কুক্কুর দ্বারা মৃতদেহ ভক্ষিত হইলে তবে, তাহা সংকৃত হইয়াছে মনে করিত। এই জন্য তাহাদিগের কুক্কুরওলাকে "সমাধিকারী" বলা হইত। সিসিরোর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন হীরকানিয়ানদিগেরও মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। জষ্টিন বলেন, পারদজাতিও এই নিয়মে মৃতদেহের সৎকার করিত। ব্রিজ্ঞলক্ষি উত্তর দেশীয় মঙ্গোলীয় দিগের মধ্যে ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, উত্তর মঙ্গোলিয়ার কোন কোন স্থানে রাশী রাশী নর-কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়।

কুক্কুর ও শৃগালগণ ভূত ও পিশাচগণের ন্যায় সেইরূপ অস্থিস্তূপের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে। হোরেশ-হিলা-সেনা নামক জনৈক কাপুচীন সন্ন্যাসী ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে লোমা নগরে ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন যে, লোকে মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাড়িয়া কুক্কুরদিগকে খাইতে দিত। প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক এবে ডুক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিব্বতে এই প্রথা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান পার্শীগণ শবদেহ শবাগারে শকুনি সমূহের সম্মুখে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে দুই একটী কুক্কুরকে তাহা দেখাইয়া থাকে। বঙ্গে নগরে অবস্থিতি-কালে স্বির মহাশয় স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি বলিয়াছেন যে, এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, আর্য্যগণ এককালে মৃতদেহগুলি কুক্কুর দিয়া খাওয়াইতেন, তাহা হইলে যমালয়ের দ্বারদেশস্থ সারমেয়-রহস্য সহজেই উদ্ঘাটিত হইতে পারে। ডাক্তার মিত্রের এইমত যুক্তিযুক্ত কিনা, পরে আমরা তাহার বিচার করিব।*

তড়িৎ-শক্তি।

অন্তর ও বাহ্য জগৎব্যাপিনী।

বাহ্য জগতে তড়িৎ-শক্তির যে যে গুণ, ক্ষমতা ও ক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, পাশ্চাত্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই তড়িতের গুণগ্রাম-বর্ণন আমাদের এপ্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; অন্তর্জগৎস্থ তড়িৎশক্তি বা আধ্যাত্মিক অগ্নি কি? তাহাই সংক্ষেপতঃ দেখান আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আধ্যাত্মিক তড়িৎ-শক্তিই ব্রহ্মতেজ, এবং এ ব্রহ্মতেজে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। এই তড়িৎ-শক্তিই ব্রহ্মাণ্ডের আধার, এই শক্তির অভ্যন্তরে ব্রহ্মের অনন্ত প্রজ্ঞা অন্তর্নিহিত আছে, ইহাই চিচ্ছক্তি বা বেদমাতা গায়ত্রী। এই শক্তিই কার্য্যক্ষেত্রে ছয় ভাগে বিভক্ত, যথা ;—১পরা, ২ জ্ঞান, ৩ ইচ্ছা, ৪ ক্রিয়া, ৫ কুণ্ডলিনী ও ৬ মাতৃকা-শক্তি। প্রথম পরা শক্তিই আমাদিগের পুরাণে-শ্রেষ্ঠ বা মহাশক্তি বলিয়া বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শক্তি আমাদের পুরাণোক্ত পঞ্চ আদ্যাশক্তি যথা—সরস্বতী, লক্ষ্মী, রাধা, দুর্গা ও সাবিত্রী। উপরি-উক্ত ষট্ শক্তিই আদ্যাশক্তি বা জগদ্‌যোনি হইলেও মানবে উহাদের আধিপত্য বিকাশ আছে, কিন্তু অবিদ্যাযোগে মলিনভাবে বিকাশ হয়; অতএব উপরি-উক্ত ৬টী শক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য-অর্থ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১। পরাশক্তি অর্থে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বা ক্ষমতা; জ্যোতি এবং তেজ ইহার অন্তর্গত।

২। জ্ঞানশক্তি অর্থে প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। এই শক্তি দুইভাগে বিভক্ত। যথা ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান বা বাহ্য জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান বা আত্ম-জ্ঞান।

(অ) ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান ও বাহ্যজ্ঞান আধিভৌতিক তেজ হইতে উদ্ভেজিত ও বিকশিত হয়, যথা—(১) মনের ভাব-বিকাশ ও ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা; (২) অতীত ঘটনার স্মৃতি ও ভবিষ্যৎ আশা, (৩) মনোভাব ও অনুভূতি-শ্রেণী সমূহের সংশ্লেষণ এবং অনুভাব্য ও তৎসাধ্য বিষয় সকল সংগ্রহ ও পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় এবং তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বাহ্য জাগতিক ব্যাপার ধারণা।

ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান যথা—

(অ) ১ আধ্যাত্মিক তেজ হইতে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়বোধ এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান জ্ঞান, ২ স্থান ও কালের ব্যাপকত্ব বা প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ।

৩। ইচ্ছাশক্তি, (Power of will) ইহার প্রভাবে বিশেষ বিশেষ স্নায়ুবীয় বেগ বা স্রোত উৎপন্ন ও বিকাশিত হইয়া ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক মাংসপেশিসকল পরিচালিত ও ঈপ্সিত ক্রিয়াভিমুখী করে।

৪। ক্রিয়াশক্তি, গূঢ় মানসিক ভাব বা চিন্তাশক্তি স্বকীয় উচ্ছ্বাস বশতঃই কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশমান হইয়া দৃশ্যফল উৎপন্ন করে। প্রাচীনদিগের মতে মনের প্রগাঢ় ইচ্ছা কোন বিষয়ের ধারণার সহিত গাঢ়রূপে সংযুক্ত হইলে তদ্দ্বারা বা বিষয়ে প্রকাশমান হয় এবং তাহা হইতে কার্য্যকরী শক্তি উৎপন্ন হয়; এরূপে অদম্য স্পৃহা ঈপ্সিত-ফলানুগামী হইয়া থাকে। উপরি-উক্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তি দ্বারা যোগিগণ অদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিতে পারেন।

৫। কুণ্ডলিনী শক্তি, প্রকৃত পক্ষে ইহাই পরাক্রম বা বল (Power or Force) (ক) উহার গতি সর্পের গতির ন্যায় বক্র, ইহাই জগতের জীবনী-শক্তি এবং ইহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। এ শক্তির তড়িৎ এবং চুম্বক আকর্ষণ (Eeoctricity and Magnetism) ইহার বিকাশিত অবস্থা। মিঃ হারবার্টের মতে ইহাই জীবনীশক্তির মূল এবং ইহাদ্বারা নিয়ত বস্তুর পরস্পর আভ্যন্তরিক ও বাহ্য সম্বন্ধের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়; এই নিমিত্তই হিন্দুদিগের মতে ইহাই পুনর্জ্জন্মের হেতুভূত। (খ) এই কুণ্ডলিনীশক্তি তান্ত্রিক ষট্‌চক্রের মৌলিক চক্র, উহা মূলাধারে অবস্থিত (গ)। যোগিদিগের এই শক্তি আয়ত্ত হইলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

৬। মাতৃকাশক্তি, ইহাই শব্দশক্তি;

---

* Origin of Myth about Kerberos by Dr. R. L. Mitra.

(ক) যে শক্তি দ্বারা কোন স্থির বস্তুর গতি হয় বা গতি বিশিষ্ট বস্তু কোন প্রতিবন্ধক দ্বারা স্থির হয় অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা কোন বস্তু স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরিত হয়, তাহার নাম (Force); আর উপরি উক্ত যে বল (Force) দ্বারা গতি (Motion) উৎপন্ন হয় তাহাকে পরাক্রম বা powor বলে।

(খ) মন্ত্রশক্তি-বর্ণন-কালে এই শক্তির বর্ণন করিব।

(গ) সৌর জগতের গ্রহ-চক্রের সহিত মানবের ষটচক্রের সম্বন্ধ-বর্ণনকালে মূলাধার কুণ্ডলিনী শক্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হইবে। ইহাই হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের গায়ত্রীর একটী অবস্থা বা সাবিত্রী, গায়ত্রী কবচ দ্রষ্টব্য। যথা ;—"মূলাধারেষু যা নিত্যা কুণ্ডলীতত্ত্বরূপিণী। সুষুম্নাতিস্থমা পরমা বিসতন্তু বরূপিণী বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রভাকারা কুণ্ডলাকৃতিরূপিণী। পরমব্রহ্মপৃচ্ছিনী—আধারাধেয় সম্বন্ধাং গায়ত্রী ব্রাহ্মণঃ স্মৃত। অতএব পরং ব্রহ্ম কথতে চোচ্চারাত্মকং। ব্রাহ্মণ• ত্রৈষ জীবাত্মা• গায়ত্রীসহিত• বপুঃ। আত্মনো জন্মসাত্তোজে প্রলীনকলিকোপমং। নির্দ্দুমণ্ড যথা জ্যোতি স্তৈলাগ্নিবর্ত্তিযোগতঃ। তজ্জ্যোতিঃ পরমংব্রহ্ম সএব পরমঃ শিবঃ।

গীতাদি ও প্রাচীনদিগের মনুশাস্ত্রাদি এই শক্তির অন্তর্গত (ক)।

এই ষট্‌শক্তি-যোগে ঈশ্বর (অনন্ত প্রজ্ঞা ও উদ্যমের কেন্দ্র) মানসাকারে পরিণত হন এবং ইহাই ব্রাহ্মাণ্ডিক অহংতত্ত্ব বা সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা।

ইহাই প্রাথমিক অবস্থা প্রজ্ঞা বা মহত্তত্ত্ব। প্রকৃতক্ষেত্রে এই মহত্তত্ত্ব ও সৃষ্টাভিমানরূপ অহংতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন সৌর জগৎ অর্থাৎ অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির হেতুভূত। এই অহংতত্ত্বই ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক প্রত্যেক সৌর জগতের সৃষ্টিকরা শক্তি গ্রহ-দেবতা (Planetary spirit), রূপে পরিণত হইয়াছে।

কুণ্ডলিনী-শক্তি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শক্তি ৬ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে কুণ্ডলিনী-শক্তিই পূর্ব্বে তড়িৎ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইলে অবশিষ্ট ৫টী শক্তি কি তড়িৎ-শক্তি নহে? যদি না হয়, তবে পরাশক্তি বা মূলশক্তিকে তড়িৎশক্তি বলা যাইতে পারে না, তড়িৎ কেবল কুণ্ডলিনী শক্তি অর্থাৎ এ মূল শক্তির নির্দ্দিষ্ট অবস্থা বা অংশ বিশেষকে বলা যায়, কিন্তু জ্যোতিঃ ও তেজ যে তড়িৎ হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত। এ জ্যোতিঃ ও তেজ যে আদি প্রধান পরাশক্তির অন্তর্গত, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং ঐ পরাশক্তি পৌরাণিক মতে পরব্রহ্মাশক্তির মূল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এ জ্যোতিঃ ও তেজ হইতে দৃশ্য জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় জ্যোতিঃ ও তেজই ঈশ্বরের পরাশক্তি বা দেবী প্রকৃতি, বিশেষতঃ গায়ত্রীর প্রকৃত অর্থ ভূঃভুবঃস্বঃপৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ অর্থাৎ জগতের স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর তৎসবিতুঃ—তৎপ্রসবিতৃ এই ত্রিভুবন যাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা দেবস্য দীপ্তিক্রিয়ামানস্য যোভর্গ নো অস্মাকং ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি তং বরেণ্যং ভর্গংধীমহি চিন্তয়ামঃ—সেই জ্যোতি-র্জ্ঞানের যে তেজ হইতে আধ্যাত্মিকের বৃদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে সেই তেজ চিন্তা করি।

কারণ হইতে সূক্ষ্ম জগৎ এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূল জগৎ গঠিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ চিচ্ছক্তিই সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের কারণ-শরীরে-মূল, উহাই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের তেজস্বরূপ, ঐ তেজই ভর্গ।

উপরি-উক্ত কয়েকটী প্রমাণ দ্বারা মূল শক্তিই মহাতড়িৎশক্তি প্রতিপন্ন হইতেছে; এ তড়িৎশক্তিই গায়ত্রী এবং তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত আদি পরাশক্তি। কুণ্ডলিনী শক্তি পরাশক্তি বা গায়ত্রীর একটী অবস্থা বিশেষ, তবে অন্য কোন শক্তিকে তড়িৎ-শক্তি না বলিয়া কেবল কুণ্ডলিনী শক্তিকে তড়িৎ-শক্তি বলার তাৎপর্য্য কি? এই প্রশ্ন অতীব গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার পূর্ব্বে আর একটী গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক। জ্যোতিঃ ও তেজ যদি জগতের সূক্ষ্ম এবং প্রথম সৃষ্ট (First Emanation) তবে দার্শনিক দিগের মতে তেজ তৃতীয় স্থানীয় কেন? প্রথম আকাশ, ইহাতে কেবল শব্দ ও গুণ আছে, আকাশ হইতে উৎপন্ন বায়ু, ইহার শব্দ ও স্পর্শ দুইটী গুণ আছে, বায়ু হইতে তেজ, ইহার শব্দ স্পর্শরূপ তিনটী গুণ আছে, অতএব তেজ তৃতীয় স্থানীয়। ইহার উত্তর এই, যাহাকে আমরা সচরাচর তেজ বলি, উহা দৃশ্য তেজ, এইজন্যই উহার উপরি-উক্ত তিনটী গুণের আরোপ হইয়াছে। আকাশই শুধু তাহা হিন্দু শাস্ত্রের আবরণ ভেদ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ক্রমানুকি সন্ধ্যা-বন্দনার মধ্যে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিশেষতঃ ভগ-দ্গীতাই উহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ; কিন্তু গায়ত্রী সন্ধ্যাগীতা সমস্তই আধ্যাত্মিক ভাবে বর্ণিত। এ আধ্যাত্মিক ভাব হইতেই যে আধিভৌতিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বিশদ রূপে বর্ণন করিয়াছি, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তিও মহাতড়িৎ-শক্তি কোন্ অবস্থা হইতে ক্রমান্বয়ে কি প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের পরিচিত তড়িতে পরিণত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ হিন্দু শাস্ত্রে স্পষ্ট পাওয়া যায় না এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক গণ তড়িৎ-শক্তির যতদূর গুণ ও অবস্থা অবগত হইয়াছেন, তাহাদের সেই পরিচিত তড়িতের সহিত জীবনী-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি জ্ঞান-শক্তি ও তদন্তর্গত অনুভূতি, চিন্তা, আসক্তি, বাসনা, স্মৃতি, আশা, হর্ষবিষাদ ও ক্রোধ ভয় প্রভৃতি বহুবিধ মানবীয় শক্তি ও বৃত্তির সম্বন্ধ যখন কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই, তখন উহার আধ্যাত্মিক শক্তি কি প্রকারে নির্ণীত হইবে? যদিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে তড়িতের বহুবিধ গুণগ্রাম

(ক) শক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যার সময় ইহার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব।

চিন্তা, যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা আবিষ্কার করিয়া মানব-জগতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, কিন্তু জীব-তত্ত্ব বা মানবীয় বৃত্তি ও শক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্বন্ধে কিছুই অবগত হইতে বা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। প্রকৃত পক্ষে মহাতড়িৎ-শক্তির সহস্রাংশের একাংশ আবিষ্কৃত হয় নাই। এক পক্ষে প্রাচীন হিন্দু তত্ত্ব শাস্ত্র-প্রকাশকগণ ঐ মহাশক্তিরূপ মহা-গিরির শিখর বা মস্তকের শিখার স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহারই ছায়া অবলম্বন করিয়া ঐ অবলম্বিত ছায়া নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়াছেন এবং পৌরাণিকগণ তাহাকে আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। অন্য পক্ষে আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ঐ মহাগিরির পাদদেশে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান ও ঐ পাদদেশস্থিত বহুবিধ লতাগুল্মাদি আবিষ্কার করিয়া অন্ধ ও পীড়াগ্রস্ত মানবজাতির চর্ম্মপীড়ার অনেক উপশম করিয়াছেন; কিন্তু ঐ মহাগিরির উপরিভাগ হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত যে কত রত্ন, মণি, মাণিক্য ও মহৌষধি অন্তর্নিহিত আছে, তাহা কিছুই আবিষ্কৃত না হওয়ায় অন্ধ ও পীড়াগ্রস্ত মানবের চক্ষু প্রস্ফুটিত বা চর্ম্মের নিম্নে মজ্জা পর্য্যন্ত রোগের কিছুই উপশম হয় নাই।

রসিকত্ব।

(৪)

আমরা তৃতীয় প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে, ভগবানের সহিত শান্ত ভক্তের সম্বন্ধ অতি দূরতর। সম্বন্ধ অধিকতর নিকট না হইলে ভগবানের উপর ভক্তের প্রেমভক্তির উদয় হয় না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বংশী শিক্ষা উপলক্ষে প্রায় তদ্রূপ মতই ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা,——

প্রেমভক্তি আত্মহৃদয়-সম্বন্ধ ব্যতীত,
কখন নাহিক হয় জানিবে নিশ্চিত।

সেই সে সম্বন্ধ ব্রজে চতুর্ব্বিধ হয়।
প্রভু, সখা, পুত্র, কান্ত, মহাজনে কয়॥
তন্মধ্যে উত্তম কান্ত সম্বন্ধ-বাধানি।
যার অন্তর্ভূত সদা ত্রিসম্বন্ধ জানি॥
এই লাগি ভাগ্যবান জীব সমুদয়।
রসরাজ কৃষ্ণে কান্তভাবেতে ভজয়॥

পূর্ব্বে কবিরাজ গোস্বামীর নিকট যাহা শিখিয়াছি, এখানেও তাহাই আবার দেখিতেছি; অর্থাৎ এই পঞ্চ রসের মধ্যে শৃঙ্গার বা মধুর রসই প্রধান; কারণ ইহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের সমাবেশ ও পরিস্ফুরণ আছে। বংশী-শিক্ষার অন্য এক স্থলে এই রস-পঞ্চকের প্রভেদ বড় সুন্দর উপায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,——

শান্ত তামা, দাস্য কাঁসা, সখ্য রূপা গণি।
বাৎসল্য সোনা, শৃঙ্গার রত্ন-চিন্তামণি॥

এই পঞ্চরস-রূপ ধাতু ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিতে পাওয়া যায়, এবং ভাগ্য, বা অধিকার, বা কর্ম্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ধাতু উত্তোলনের প্রচ্ছিন্না স্বতন্ত্র। শুন মহাপ্রভু বংশীবদনকে কি বলিতেছেন :——

ধ্বনিতে সকল ধাতু বিরাজ করয়।
ভাগ্য অনুসারে কিন্তু লাভালাভ হয়॥
মাত্র করমের ফলে তামা লাভ হয়।
জ্ঞানের ফলেতে কাঁসা লাভ শুনিশ্চয়॥
কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি ফলে রূপালাভ জানি।
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ফলে সোনা লাভ মণি॥
শুঁবিশুদ্ধা ভক্তি-প্রেম পিরিতের ফলে।
রত্ন-চিন্তামণি লাভ মহাজনে বলে॥

আমরা তৃতীয় প্রস্তাবে মহাজন-বাক্য ও যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছি যে, গোপী প্রেমে কলুষ ও আবিলতা নাই, উহা কামগন্ধশূন্য —বিশুদ্ধ প্রেম। পবিত্রতার আদর্শ যে চৈতন্যদেব—যিনি রাধাকৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, তিনি এসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, পাঠক একবার তাহাও দেখ। এস্থলে পাঠকের একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মহাপ্রভু বাঙ্গালী ছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার কোন রচনা আছে বলিয়া আমরা জানিতে পাই নাই, এবং আমরা বৈষ্ণব সাহিত্য যত টুকু অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহার কুত্রাপি এসম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখি নাই। আমরা যে সকল পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিব, উহাঁ ভাব মহাপ্রভুর এবং ভাষা প্রেমদাসের। কিন্তু এসকল ভাবই বলুন, আর ভাষাই বলুন, মহাপ্রভু বা প্রেমদাসের মনঃ-কল্পিত নহে। উহা শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, গৌতমীয়-তন্ত্র প্রভৃতির বচন দ্বারা সমর্থিত। আমরা বাঙ্গালা প্রবন্ধে সংস্কৃত কি ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার বুকনি দিতে নিতান্ত নারাজ, তাই বলিয়া সংস্কৃত বচনগুলি উদ্ধৃত করিলাম না; যাঁহার তৎসমস্ত পাঠের ইচ্ছা হয়, তিনি একখণ্ড বংশী-শিক্ষা ক্রয় করিয়া লইবেন।

এস্থলে আর একটী কথা। কোন কোন পাঠক বলিতে পারেন যে, এবন্ধলেখক মধুর রসের ব্যাখ্যানোপলক্ষে গোপীপ্রেম সম্বন্ধে ত ঢের কথা বলিয়াছেন, আবার সে সম্বন্ধে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন কি? তদুত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা যথেষ্ট নহে, এ বিষয়ে বলিবার কথা অনেক আছে। এবং তাহা না বলিলেও "রসিকত্ব" বিষয়ক অবতারণাই আদৌ নিষ্ফল হইবে। আমরা যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিতে চাই, তাহা আমাদের বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ হইবে। কারণ প্রথমতঃ উহা শাস্ত্রোক্তি; দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং ভগবানরূপী মহাপ্রভুর উক্তি; তৃতীয়তঃ অন্যতম মহাজনশ্রেষ্ঠ প্রেমদাসের উক্তি।

কিন্তু এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে, শুকদেব গোস্বামীকে মহারাজ পরীক্ষিত যে প্রশ্নটী করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্নটী উদ্ধৃত করিতেছি। অর্থাৎ—

"ঈশ্বর ভগবান ধর্ম্মের সংস্থাপনার্থ এবং অধর্ম্মের প্রশমনার্থ অংশের সহিত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব হে ব্রহ্মন্! তিনি ধর্ম্ম-সেতুর রক্ষা, কর্ত্তা, ও ধর্ম্মবিক্রিয়া হইয়া, কিরূপে পরদারাভিমর্ষণরূপ গর্হিতাচরণ (অধর্ম্ম) করিলেন?"

মহারাজ পরীক্ষিত পুনর্ব্বার বলিতেছেন—
"সুহৃৎ আপ্তকাম, তবে তিনি কি অভিপ্রায়ে নিন্দ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? হে সুব্রত! আমাদিগের এই সংশয়চ্ছেদন করুন।"

রাধাকৃষ্ণপ্রেম কামগন্ধহীন, উহা পরদার নহে, বা নিন্দনীয় কার্য্য নহে, গোঁড়ামি করিয়া এসকল কথা বলিলে, আজিকালিকার দিনে কেহ বিশ্বাস করিবে না। আমরা যথা-যথা এপ্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইব।

প্রস্তাবিত পূর্ব্বোল্লেখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথমতঃ পরদার কি?

আনন্দ-চিন্ময় রসে যাঁর নিত্য শোভা।
সেই রসরাজ সর্ব্বজন মনোলোভা॥
পরদার সহ তাঁর ব্রজের লীলায়।
নিত্য সুবিহার এই কহিনু তোমায়॥
হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি স্বরূপা সবারে।
পরদার বলি সর্ব্ব শাস্ত্রেতে সুকারে॥
সেই পরদারগণ অধ্যাদি স্বরূপে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি নিত্য সেবে রসভূপে॥
পরশব্দে শ্রেষ্ঠ কহি দারাগৌর প্রকৃতি।
সেই সে প্রকৃতি গোপী শাস্ত্রেতে বিবৃতি॥
অতএব যেই গোপী সেই পরদার।
ইহা কাছে নিগূঢ়ার্থ করিনু প্রচার॥
এই হেতু রসরাজ শ্রীনন্দ-নন্দনে।
পরদারে রতিক্রীড়া বিজে নাহি ভণে॥
যিনি আত্মারাম তাঁর পরদারে রতি।
কভু নাহি হয় এই জানিহ সুমতি॥
অপরের দারা কভু নহে গোপীগণ।
তাহার বারতা এবে করহ শ্রবণ॥
হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপা হন যাঁরা।
গোপিকা শব্দের বাচ্যা হয়েন তাঁহারা॥
সেই গোপী শব্দে শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি নিচয়।
রসরাজ লাগি সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়য়॥
গোপিকার মুখ্যা হন শ্রীমতী রাধিকা।
মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাম রসিকা॥

পুনঃ—

রসরাজ মূর্ত্তি কৃষ্ণে আহ্লাদে সতত।
তেঁই আহ্লাদিনী নাম শাস্ত্রেতে বেকত॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়রূপ রসের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব হয়।
সেই মহাভাব রূপা রাধিকা নিশ্চয়॥
হ্লাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকা।
যার বৃত্তিরূপা হয় সকল গোপিকা॥
এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হ্লাদিনী শক্তির নাম, রাধা কেন? এবং সেই রাধা বৃষভানুসুতা, এই কথারই বা অর্থ কি?

সুখময় রসরাজ-আরাধনা-কর্ম্ম।
নিরন্তর করে যেই ছাড়ি সর্ব্ব ধর্ম্ম॥
তাঁহাকেই রাধা কহে কহিনু বিস্তারি।
সেই রাধা হয় বৃষভানুর ঝিয়ারী॥
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রূপে যিনি সদা দীপ্যমান।
বৃষভানু বলি তার হয়ত আখ্যান॥

রাধাকৃষ্ণপ্রেম বুঝিতে হইলে, "রাধা" কি যেমন বুঝিতে হইবে; তেমনি "কৃষ্ণ" কি তাহাও বুঝিতে হইবে। এবং সেই কৃষ্ণের "নন্দনন্দন", "যশোদানন্দন", এবং "শ্যামসুন্দর," এই তিনটী বিশেষণই বা কেন, তাহাও বুঝিতে

হইবে। অতএব সর্ব্বপ্রভু বংশীবদন কে, ক্রমে তাহা বলিতেছেন। প্রথমে "কৃষ্ণ" কাহাকে বলি ?

মায়ুর্য্যাদি গুণে যিনি প্রকৃতির মন।
আকর্ষিয়া সচ্চিদেতে করেন রমণ॥
তাঁহাকেই কৃষ্ণ বলি জানহ নিশ্চয়॥

তিনি "নন্দ-নন্দন", ও "যশোদানন্দন" কথার অর্থ কি?

নন্দার্থে আনন্দ কহে শাস্ত্রিক সকলে।
নন্দন শব্দেরও অর্থ আনন্দকে বলে॥
অতএব আনন্দের আনন্দকারীরে।
নন্দের নন্দন বলি গায় যত ধরে॥
যশোদার্থে ভক্তি আদি যশ প্রদায়িনী।
তাহার আনন্দদাতা শ্রীকৃষ্ণ বাখানি॥

সংপ্রতি "শ্যাম সুন্দর" বিশেষণের অর্থ কি ?

শ্যামার্থে শৃঙ্গার এই কহিনু নিশ্চয়।
সুন্দর শব্দের অর্থ স্বরূপ কহয়॥
অতএব শৃঙ্গার স্বরূপ মূর্ত্তিধর।
শ্রীশ্যামসুন্দর হয় অভিধা তাঁহার॥

"শ্যামসুন্দরের" অর্থ যদি "শৃঙ্গার স্বরূপ" হইল; তবে শৃঙ্গার শব্দের অর্থ কি ?

প্রকৃতি পুরুষ ছুয়ে সুরত কারণ।
সংযোগ বাঞ্ছায় হৃদে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
শৃঙ্গার শব্দেতে কহি সুরত ব্যাপার।
অপ্রাকৃতরূপে যাহা ব্রজে পরচার॥

ব্রজের শৃঙ্গারকে অপ্রাকৃত বলি কেন ?

নিত্য বৃন্দাবনে নাই মন্মথ বিলাস।
প্রেমের বিলাস তথা জানিবে নির্য্যাস॥
মন্মথ মথন রসরাজ কৃষ্ণ হয়।
এহেতু মন্মথ ক্রীড়া তাঁর কভু নয়॥
কৃষ্ণ সুখে সুখী গোপী কাম গন্ধহীনা।
প্রেমের স্বরূপাকৃষ্ণ সেবাতে প্রবীণা॥

পুনশ্চ:—

অপ্রাকৃত পতি কৃষ্ণ সর্ব্ব আত্মারাম্।
ভুবনের পতি বলি যাহার আখ্যান॥
এই হেতু বৃন্দাবনে গোপী সকলেতে।
প্রাকৃত সতীত্ব ধর্ম্ম ছাড়ি আনন্দেতে॥
কৃষ্ণ সুখ লাগি সদা হইয়া তৎপর।
অনন্য ভাবেতে কৃষ্ণ ভজে নিরন্তর॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
যৈছে মলপূর্ণ লৌহ, নির্ম্মল কাঞ্চন॥
সাধারণী, সামঞ্জস্যা, সামর্থ্য এ তিন।
প্রেমের লক্ষণ শাস্ত্রে কহে ভিন ভিন॥
নিজসুখ বাঞ্ছে যেই সে সাধারণী।
উভয়ের সুখ বাঞ্ছে সামঞ্জস্যা গণি॥
কান্তসুখ বাঞ্ছে মাত্র সামর্থা সকল।
এহেতু সামর্থা হয় অত্যন্ত বিরল॥
আহ্লাদিনী আর তার বৃত্তিরূপা যাঁরা।
সামর্থা পাত্রীর মধ্যে গণনীয়া তাঁরা॥
ব্রজবিনা সামর্থার নাহি দেখি বাস।
সামর্থার পাত্রী ব্রজ গোপিকা নির্য্যাস॥

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের মীমাংসাজন্য আমাদিগের যে সকল কথার প্রয়োজন, তাহা উদ্ধৃত শ্লোকনিচয়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কিন্তু সেই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শুকদেব প্রদত্ত উত্তর গুলিও উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

প্রথম উত্তর এই—"ঈশ্বরগণের সাহস ধর্ম্মব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বভুক্ অগ্নির ন্যায় তাহা সেই তেজস্বিগণের দোষে নিমিত্ত হয় না।"

দ্বিতীয় উত্তর—"যিনি গোপীগণ, তাঁহাদিগে পতিগণ, ও নিখিলদেহিগণের অন্তরে বিচরণ করিতেছেন, এবং যিনি অধ্যক্ষ, তিনিই এই ক্রীড়াপ্রসঙ্গে দেহ ভজনা করিয়া থাকেন।"

আমাদিগের যাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা উদ্ধৃত করিলাম, এখন মূল প্রশ্নে যথাসাধ্য মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ। বংশীশিক্ষা হইতে যে সকল গান উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে রাধা গোপী ও কৃষ্ণ

শব্দের যেসকল ব্যাখ্যা আছে, তাহা সাংখ্যমত ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়; কিন্তু ঈশ্বর ক্রীড়াশীল। অর্থাৎ ব্রহ্মরূপী পরমাত্মা বা পুরুষ যখন মায়ারূপিণী প্রকৃতি সহ সংমিশ্রিত হয়েন, তখনই তিনি ক্রিয়াশীল ঈশ্বর নামে অভিহিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই পরমাত্মারূপী মহা পুরুষ এবং রাধা ও তাঁহার অংশরূপিনী, ব্রজদেবীগণ হ্লাদিনি শক্তিরূপা মহাপ্রকৃতি। এই উভয়ের মিলন বা সৃষ্টি ক্রিয়ার নাম শ্রীকৃষ্ণের পরদার গমন। ফলতঃ গোপীগণও পরের দারা (স্ত্রী) নহে, এবং শ্রীকৃষ্ণ পরদারাভিগামী লম্পট পরপুরুষ নহেন।

দ্বিতীয়তঃ। রাধাতন্ত্রে দৃষ্ট হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক ধর্ম্ম-আচরণে ইচ্ছুক হইয়া, ত্রিপুরেশ্বরীর আরাধনা করিয়া, মন্মথ মথন পূর্ব্বক উর্দ্ধরেতা হয়েন। ত্রিপুরেশ্বরী সন্তুষ্ট হইয়া পদ্মবন হইতে স্বয়ম্ভবা শ্রীরাধাকে প্রকৃতিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন। এতদুভয়ের কুলাচার ক্রিয়াই নিত্যবিহার নামে প্রসিদ্ধ। এই কুলাচার প্রকৃত খণ্ডরতি নহে, মহারতি—অপ্রাকৃত শৃঙ্গার। ভাষার অপূর্ণতা হেতু ইহাকে "রতি" "শৃঙ্গার" ইত্যাদি নাম দেওয়াতেই মহালোলযোগ হইয়াছে। ফলতঃ এ এ নামধেয় জঘন্য-ব্যাপার এই ক্রিয়ার ত্রিসীমায়ও যাইতে পারে না; ইহা মুহাযোগ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধামন্ত্রে দীক্ষিত; ভগবতী আদ্যাশক্তি রাধাকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতা। এই ক্রিয়া বা কৌলিকাচার দ্বারা উভয় উভয়কে সাধনা করিয়াছেন; ইচ্ছা হয়—এই সাধনাকে প্রেম বল—নীরসত্বশূন্যবিশিষ্ট কাম বলিও না। অনন্যা শক্তি এই আদ্যাশক্তিই অংশরূপিণী, সুতরাং রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, ইহাঁদের সহিতও তাহাই। তবে ভাব ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, আর মহাভাব মহাভাবগ্রাহী ভগবানে যদি কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকে, তবে ততটুকু বিভিন্নতা মাত্র। কিন্তু আমি মনে করি, মূল প্রকৃতিও যাহা, অংশ প্রকৃতিও তাহা; সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কুলাচার প্রকৃতি পুরুষ লইয়া, অথচ তাহাতে কাম সম্বন্ধ নাই। কুলধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িতা ও প্রচারক মহাদেব, কামভস্ম করিবার পর মহামায়াতে উপরত হইয়াছিলেন; এবং তিনি যোগীশ্বর মহাযোগী—মদনান্তকারী।

তৃতীয়তঃ। যেমন কালী, তারা, বগলামুখী প্রভৃতি মহাযোগিনীগণ মহাদেবকে পতিভাবে ভজনা করাতে, মহাদেব তাঁহাদিগের বাঞ্ছা পূর্ণ-করিয়া "যোগিনী-মনমোহন" নাম ধারণ করিয়াছিলেন; দেবকন্যাগণও সেইরূপ ভগবানে পতি কামনা করিয়া, বৃন্দাবনে গোপী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং দিবানিশি কৃষ্ণৈকশরণা ও অনন্য-কর্ম্মা ও অনন্য-ধর্ম্মা হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে আরাধনা করিতেন; তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিরূপে তাহাদিগের সহিত সতত বিহার করিয়া "গোপীজনবল্লভ" নাম ধারণ করিয়াছিলেন। গোস্বামী ও স্বামীপাদের ব্যাখ্যানুসারে দেখা যায়, ইহাঁর অনেক গোপী চিরকুমারী ছিলেন; তাঁহাদের সম্বন্ধে পারদারিকতা বা অসতীত্বের কোন তর্কই উঠিতে পারে না। কিন্তু অনেকে বিবাহিতা ছিলেন; ইহাঁদের সহিত সুরত ক্রীড়ায় পরদারাভিগমন দোষাভাস আসিতে পারে। কিন্তু রাস পঞ্চাধ্যায়ে দেখিতে পাই, এই সকল গোপী স্বীয় স্বীয় পতির পার্শ্বে শায়িতা থাকাতে, কৃষ্ণের প্রতি এই সকল গোপের অসূয়া হয় নাই। অথচ এই সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঠিক সেই সময়ে রাসলীলা করিয়াছিলেন। এক সময়ে এক বস্তু ভিন্ন

ভিন্ন স্থানে থাকিতে পারে না। বিজ্ঞানের এই সূত্র সামান্য যোগবলের নিকটই যখন পরাস্ত, তখন অখিলব্রহ্মাণ্ডপতির শক্তির নিকট কোন তুচ্ছ কথা? ব্রহ্মা সবৎসা ও সরক্ষকা নবলক্ষ ধেনু হরণ করিলে, যিনি ইচ্ছাক্রমে তত ধেনু, তত বৎসা, তত গোপাল সৃজন করিয়া পিতামহের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন, তিনি যে গোপীর মত গোপী সৃজন করিয়া পতিপার্শ্বে স্থাপিত রাখিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? আমার বিশ্বাস, শ্রীমদ্ভাগবতে বিবাহিতা গোপীগণের যে উল্লেখ আছে, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী, তাঁহাদিগের ছায়ারূপাগণ অন্য গোপবনিতা। সুতরাং স্ব স্ব পত্নীগমন যদি অধর্ম্ম না হয়, তবে মহাদেবের যোগিনী-সঙ্গম কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের গোপীবিহার কেন দোষাবহ হইবে? গোপীগণ যে পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে পতি কামনা করিয়া পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণার্থ রাস পঞ্চাধ্যায়ের পঞ্চম অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী যাহা বলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী কৃত তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—

"হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! হে দেবি! তোমাকে নমস্কার; তুমি নন্দগোপ নন্দনকে আমার পতি করিয়া দাও।" এই বলিয়া প্রত্যেক গোপ কুমারীই পূর্ব্বে ভগবানকে পতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভগবানও যথাকালে আবির্ভূত হইয়া—"অবলাগণ! তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও, আমি আগামিনী রজনীসমূহে তোমাদিগের সহিত বিহার করিব—এই বলিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকেরই সহিত বিহার করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। বলা বাহুল্য, যে এই বিহার গন্ধর্ব্ব বিবাহ চতুর্থতঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে, ব্রহ্মা ও নারদ গোপনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সুতরাং রাধিকার সহিত বিহার, শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপত্নী, সম্ভোগমাত্র। কুতার্কিকেরা কহিবেন, রাধিকা যেন কৃষ্ণের ধর্ম্মপত্নী হইলেন; অন্য গোপীদিগকে ত কৃষ্ণ বিবাহ করেন নাই। তদুত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, তাহাদিগকেও তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রমাণ—"কাত্যায়নি—মহামায়ে" ইত্যাদি গোপীদিগের পতিকামনা, এবং সেই কামনা পুরণার্থ তাহাদিগের সহিত বিহার বা গন্ধর্ব্ব বিবাহ। দ্বিতীয় প্রমাণ, গোপীগণ যখন রাধিকার অংশরূপী, তখন পূর্ব্বের বিবাহেই অংশের বিবাহ হইয়াছিল। তৃতীয় প্রমাণ, বোধ হয় পূর্ব্বে রাজকন্যাদিগের যাঁহারা সহচরী থাকিতেন, তাঁহাদিগের আর অন্যত্র বিবাহ ছিল না; যাঁহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইত, তিনিই তাহাদিগেরও পতি হইতেন। শুনিতে পাই, অদ্যাপিও পাণ্ডববংশীয় আগড়তলা রাজপরিবার ও শৈবপ্রধান কোচবিহারের রাজপরিবার মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। রাজা যে মহিলাকে বিবাহ করেন, তাঁহার আটজন সহচরী নাকি "এয়ো" কর্ম্ম করে; এবং এই আটজনের আর বিবাহ হয় না, তাঁহারা রাজার "কোছারাণী" হয়েন; এবং তাঁহাদিগের গর্ভজাত সন্তানেরা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী পর্য্যন্ত হইতে পারে। আর একটী আপত্তি হইতে পারে; অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত পূর্ব্বে গোপনে বিবাহ হইলেও রাধিকার রায়ান ঘোষের সহিত ত পরে প্রকাশ্য পরিণয় হয়। সুতরাং রাধা দ্বিচারিণী। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণে এ আপত্তির খণ্ডন রহিয়াছে; অর্থাৎ রাধিকা সহ রায়ানের বিবাহের প্রাক্কালেই শিশুকৃষ্ণ

রোরুদ্যমান হইয়া রায়ানের ক্রোড়ে, আরোহণ করেন, এবং পদাঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা রায়ানের পুংস্ত্ব হরণ করেন; রায়ান নপুংসক হয়েন। অপর গোপীগণের স্বামী সহবাসের তাদৃশ বিঘ্ন কিছু ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না; কিন্তু তাঁহারা যে কখনও স্বামী-সহবাস করিয়াছেন, তাহাও কোন গ্রন্থে নাই; বরং তাহা না করিবার আভাসই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পঞ্চমতঃ। বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে একদা গোপিনীগণ দধি দুগ্ধের পসরা লইয়া মথুরায় বিক্রয় করিতে যাইবেন কামনা করিয়া যমুনা-তটে যাইয়া উপস্থিত। কিন্তু খেয়া নৌকায় নাবিক নাই, তাঁহাদিগকে কে পার করে? রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ যখন দানলীলা করিতে মনস্থ করিতেন, তখন যমুনার ঘাটে দানী হইতেন। সুতরাং কর্ণধার-বিহীন তরণী দেখিয়া, গোপীগণ ভরকর্ণধারের নিকট যাইয়া বলিলেন:—শ্যামসুন্দর! মদনমোহন! আমাদের বেচাকেনার সময় বহিয়া যায়, আমাদিগকে পার করিয়া দাও। তোমার কিছু ক্ষীর শর খেতে দিব।" ধূর্ত্তরাজ আজ ব্রজের বেটা রাজা—ভদ্রলোক, কিছুতেই মাঝিগিরিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু ব্রজদেবীদিগের একান্ত অনুনয়-বিনয়ে বশীভূত হইয়া, শেষে বলিলেন:—"আমায়পার করিতে হইবে না। তোমরা যাইয়া যমুনার নিকট বল, শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও প্রাণী হিংসা না করিয়া থাকেন, তবে যমুনে তুমি আমাদিগকে পথ দাও, আমরা পার হইয়া মথুরায় যাই।" গোপীগণ কহিলেন—"অতি সৎপরামর্শ! তুমি যদি প্রাণীহিংসা না করিয়াছ, তবে পুতনা, অঘাসুর, বকাসুর, বৃষাসুর, ইহাদিগকে কে নিপাত করিল?" শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তবে যমুনাকে বলিও, শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও অন্নগ্রহণ না করিয়া থাকেন, তবে তুমি আমাদিগকে পথ দাও"। গোপীগণ হাসিয়া বলিলেন—"এ আরো উত্তম কথা! কিন্তু, শঠ, সেদিন যে যজ্ঞপত্নীদিগের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিল, সেকি তুমি নও।" কৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন:—"তা যাক্, এবার তোমাদিগকে খাটি পরামর্শ দিতেছি। তোমরা যমুনাকে যাইয়া বল, হে যমুনে, শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও পরস্ত্রী-গমন না করিয়া থাকেন, তবে, তুমি আমাদিগকে পথ প্রদান কর। আমরা পার হইয়া যাই।" এই কথা শুনিয়া গোপাঙ্গনাগণ পরস্পরের গাত্রে হাসিয়া, ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন। ব্রজবন্ধুগণ, এই সকল কথায় বিশ্বাস করুন আর না করুন, অনন্যোপায় হইয়া যমুনাকে ঐ সকল কথা বলিলেন। যমুনায় পথ পড়িল, গোপবধূগণ পার হইয়া গেলেন। এই তিনটি কথার মধ্যে শেষ কথাটি আমাদের আলোচ্য। পুরাণ-পরম্পরা-মতে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের যে বিবাহ নির্ব্বাহের কথা উপরে বলিয়াছি, তাহা যদি মান, তবে কোন গোল রহিল না, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কখনও পরস্ত্রী-গমন করেন নাই। আর যদি পুরাণ না মানিয়া তন্ত্রের কথা মান, তাহাহইলেও তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে—গোপীগণের সহিত যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত রতি হয় নাই; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন চরম ধাতু অবরুদ্ধ করিয়া গোপীদিগের সহিত সুরত ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাহাকে স্তম্ভনই বলা যাইতে পারে না; পরন্তু আর আপন স্ত্রীর কথা কি? শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের ন্যায় ঊর্দ্ধরেতা হইয়া যে গোপী সহ বিহার করিতেন, তাহার দুইটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে। তুমি শাক্ত হও, শৈব হও, ব্রাহ্ম হও, খৃষ্টান হও, বা মুসলমানই হও, এই দুইটি প্রমাণের

বিরুদ্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই। প্রথম প্রমাণ এই লোক সত্য কেন সবল কামপরতন্ত্র ও সুস্থ হউক না; সমগ্র বৃষ্য ও বাজীকরণ অধিকারের ঔষধাদি সেবন পূর্ব্বক সে যতই কেন ধারণাশক্তি বর্দ্ধিত করুক না; সে একাদিক্রমে সপ্তাহৈকাল দুইটী কামুকা স্ত্রীর পরিতৃপ্তি সাধন করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র গোপিনীর সহিত নিত্য বিহার করিতেন। ঊর্দ্ধরেতা ভিন্ন এরূপ অসীম শক্তি কাহারও হইতে পারে না। দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে এই, ষোড়শ সহস্র গোপিনীর কাহারও সন্তান হয় নাই। বীজও, ক্ষেত্রের বা উভয়ের দোষে সন্তান জন্মে না। এত গুলি ক্ষেত্রের মধ্যে একটির ঊর্ব্বর ছিলনা একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বীজের দোষও বলিতে পারিনা, কারণ এই শ্রীকৃষ্ণই ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশের জনয়িতা। সুতরাং ব্রজবিহারকে কুলধর্ম্ম-যাজন ভিন্ন আর কি বলিতে চাও?

ষষ্ঠতঃ। সামান্য ব্যক্তির পক্ষে যাহা অধর্ম্ম, দেবতা ও ঋষিদিগের পক্ষে তাহা অধর্ম্ম নহে। যথা, ব্রহ্মার দুহিতৃ-হরণ, ইন্দ্র ও চন্দ্রের গুরুপত্নী-হরণ, বৃহস্পতির পূর্ণগর্ভা ভ্রাতৃজায়া-হরণ, বিশ্বামিত্রের ঊর্ব্বশী-সহবাস, ইত্যাদিতে শাস্ত্রানুসারে পাপ হয় না। কারণ তেজিয়ানের পক্ষে কিছুই দোষাবহ নহে। সুতরাং যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের অবতার, তাঁহার পক্ষে পাপ পুণ্যের কথাই হইতে পারে না। এই উত্তর শুকদেব পরীক্ষিতকে দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা অক্ষম হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত পাঠককে বুঝাইতে বসিয়াছি। "জোর যার মুলুক তার", "যার মাটি, তার লাঠি", এরূপ তর্ক বা যুক্তি অবলম্বন করিতে আমাদিগের লজ্জা বোধ করে। "মানুষের বেলা" যাহা "পাপ কর্ম্ম" তাহা "দেবতার বেলা লীলা" কেন হইবে? এবং হইলেও, সে যুক্তি শুনিয়া কেন সন্তুষ্ট হইব? যিনি জগৎপতি, তিনি তোমার পতি, তোমার মাতার পতি, তোমার মাতামহীরও পতি, তিনি তোমার দূরস্থ ঘনিষ্ট যে যেখানে আছেন, সকলেরই পতি। সুতরাং সবাই যাঁহার দারা, তাঁর আবার পরদার কে? আর সেই বিশ্বপ্রেমিকের প্রেমপাত্রী হইল ব্রজদেবীগণ কেনইবা কলঙ্কিনী হইবেন? এই স্থলে ছেলেবেলার একটী সুন্দর সঙ্গীত স্মরণ হইল; তাহা পাঠকমহাশয়দিগকে উপহার দিয়া, এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

"সই, শ্যামের প্রেমে, কেবা না মজেছে,
এই গোকুলে?
সবার হয় আনন্দ, হেরে সে গোবিন্দ,
কলঙ্ক হয়, কেবল আমার কপালে।
সই লো, এবিশ্বমণ্ডলে, কে না, হরি বলে,
যে না বলে সেই জনাত বিহ্বল।
নারদ দেব-ঋষি, এ নামে উদাসি,
দিবানিশি সে যে বলে হরি-বোল॥
কিন্তু আমি যদি বলি হরি, পাপ্ নদী কয়
"কি কিশোরী।"
কি শুনিতে, কি শুনি; সই, পোড়া কপালে
কি এমনি ফলে!"

কিন্তু "আহা ব্রজগোপীগণ ভিন্ন শ্যাম কলঙ্কে কলঙ্কিনী হইবার ত্রিভুবনে আর কার অধিকার আছে!" এ কলঙ্ক-হার ব্রজদেবীগণেরই উপযুক্ত অলঙ্কার।"

এই প্রবন্ধে শ্রীরাম-রসিক রস-শেখর ও রাস-রসিকা রসময়ী রাধার "রসিকত্ব" শেষ হইল। এই মধুর বৃন্দাবনের মধুর রসই প্রচলিত "রসিকত্বের" মূল। তত্ত্বকান্ত প্রকটন করিব কি না বিশেষ চিন্তা ও বিবেচনার বিষয়। কিন্তু আমার যেন বোধ হয় আমি

"মূলেই" অনেক "ভুল" করিয়াছি। ফলতঃ আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির এরূপ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাই যে অনুচিত হইয়াছে তাহা আমি দ্বিতীয়বার প্রস্তাব লিখিবার সময়ই বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু তথাপি যে আরও দুইটী প্রস্তাব লিখিলাম, তাহার বিশেষ কারণ আছে। সৌভাগ্য ক্রমে "অনুসন্ধান" এমন একটী মহাত্মার কৃপা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে যে, প্রবন্ধ-লেখকের মতে একমাত্র তিনি এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত। এই প্রবন্ধগুলির অসম্পূর্ণতা দর্শনে তিনি এবিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়া প্রবন্ধ লেখকের ও অনুসন্ধানের সমস্ত বৈষ্ণব-পাঠকের রাধাকৃষ্ণ লীলা-পীযূষতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিবেন, এই ভরসায় আমি জানিয়া শুনিয়া বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়াইয়াছি। সেই অসীম শ্রদ্ধাভাজন মহাত্মার নাম রায় গোবিন্দ মোহন বিদ্যাবিনোদ বাহাদুর।

ঠাকুর বংশ।

(১)

১৪৯৪ শকাব্দ। শকাব্দার যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুর্দ্ধর্ষ পাঠান শক্তি পরাভূত করিয়া মোগলের সৌভাগ্য-রবি ভরতগগনে উজ্জ্বল প্রভায় সমুদিত হইয়াছিল। যে শকাব্দীর মধ্য সময়ে সম্রাট-কুল-গৌরব আকবর সাহের স্বচ্ছচ্ছত্রের সুশীতল ছায়ায় হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র জনস্থানবাসী শান্তি উপভোগ করিতেছিল; যে সময়ে অত্যাচার-পীড়িত হিন্দুগণ যুধিষ্ঠিরের পুণ্যময় সিংহাসনে অস্পৃশ্য যবনকে সমাসীন দেখিয়া সাম্যনীতির মুখচুম্বনে তায় "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া আকবরের মহিমা কীর্ত্তন করিত; যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজপুত-কুল চূড়া বীরেন্দ্র-কেশরী রাণা প্রতাপ সিংহ প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর্য্যগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, যে শুভ সময়ে ভক্তাবতার চৈতন্যদেব জাতিভেদ-বিলোপী প্রেমভক্তিপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্মের বর্ণীয় জ্যোতিতে ধর্ম্ম জগতের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছিলেন, যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার আদিকবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির আবির্ভাব হয়; যে সময়ে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নামক গ্রন্থরচনা করিয়া বঙ্গের নিত্য নৈমিত্তিক আচার ব্যবহার বিধিবদ্ধ করেন; যে সময়ে দর্শনাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র মহামহোপাধ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি "চিন্তামণি-দীধিতি" নামক বিখ্যাত ন্যায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মিথিলার খ্যাতনামা পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রকে বিচারে পরাভূত করিয়া নবদ্বীপের গৌরব বিস্তার করেন; যে সময়ে চৈতন্য-শিষ্য রূপ সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রেম-ভক্তি-বিষয়ক নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন; যে সময়ে কৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশ তন্ত্রসার সঙ্কলন করিয়া আগম শাস্ত্রে কীর্ত্তিস্থাপন করেন; যে সময়ে বঙ্গদেশের পালনভার দিল্লীর অধীনে বঙ্গের প্রবল প্রতাপান্বিত "বার-ভুঞা" খ্যাত দ্বাদশজন জমিদারের হস্তে ন্যস্ত ছিল; যে সময়ে

বারেন্দ্রকুল-তিলক (বীর-ভূঞার একতম) তাহীরপুরের রাজা কংসনারায়ণ, কুলশাস্ত্র-বিশারদ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী দ্বারা বারেন্দ্র কুলীন শ্রোত্রিয়গণকে আট পঙ্‌ক্তিতে বিভক্ত ও কাপের সহিত স্থানদানে ভোজনে কুলীনের কুল-পাতের পরিবর্ত্তে "কুশগারি-সংযোগে" (করণ দ্বারা) কুলনাশের ব্যবস্থা করিয়া বারেন্দ্র সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন;—যে সময়ে বিজাতীয় রাজার শাসনাধীন থাকিয়াও ভারত বীরত্বে এবং সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম ও সামাজিকতা সম্বন্ধে সমুন্নত ছিল;—সেই শুভ-সময়ে—সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে—১৪৯৯ শকে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ক্ষুদ্র পল্লী "বাসথামায়" নামক গ্রামে রামচন্দ্র মিশ্রের ঔরসে "মোহন মিশ্র বা ওপচন্দ্র ঠাকুর" জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্র মিশ্র বিশেষ ধনশালী ছিলেন না; কিন্তু বারেন্দ্র সমাজে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। রামচন্দ্র মিশ্র কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চগোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে বেদী-সংহারি-প্রণেতা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের বংশজাত ছিলেন। পশ্চিম প্রদেশের কান্যকুব্জের সেই মিশ্র আখ্যা এখনও বাসথামারের মিশ্রবংশে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রামচন্দ্র মিশ্রের তিনপুত্র,—প্রথম গোপীবল্লভ মিশ্র, দ্বিতীয় মোহন মিশ্র এবং কনিষ্ঠ বিশ্বনাথ তালুকদার। গোপীবল্লভ মিশ্র বাসথামারে পৈত্রিক ভদ্রাসনেই বাস করেন; শ্বশুর সারের বর্ত্তমান মিশ্রগণ তাঁহারই বংশধর। কনিষ্ঠ বিশ্বনাথ নাটোরের অধীন কাজলাহার গ্রামে বাস করেন এবং তালুক ক্রয় করিয়া তালুকদার আখ্যা লাভ করেন। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্বনাথ তালুকদারের বংশে একটী "অবীরা" ভিন্ন আর কেহই জীবিত নাই। রামচন্দ্র মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্র মোহন মিশ্রই এই প্রস্তাবের আলোচ্য, সেইজন্য গোপী বল্লভ ও বিশ্বনাথ মিশ্রের বিষয় উল্লেখ মাত্র করিয়া কেবল মোহন মিশ্রের জীবনী ও বংশাবলী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাল্যাবস্থা হইতেই মোহন মিশ্রের মুখমণ্ডল ধ্যানাক্রান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে অসাধারণ পুরুষ বলিয়া মনে করিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ও বিবিধ সদ্‌গুণ-সম্পন্ন হইয়া উঠেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই ধর্ম্ম-বিষয়ে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। তদবধি তিনি ধর্ম্মানুশীলনে যত্নবান হইয়া ধার্ম্মিকগণের উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মোহন মিশ্রের কৈশোরোচিত চিত্ত-চাঞ্চল্য বা সাংসারিক ভোগবিলাসাসক্তি ছিল না। নিরন্তর ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন, দেবারাধনা এবং সাধুসঙ্গেই তাঁহার এই অকালোচিত ধর্ম্মানুরক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু এই অসাময়িক ধর্ম্মানুরাগ এবং সংসার-বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহার পিতামাতার মনে সর্ব্বদাই একটী অশুভ চিন্তার উদয় হইত। স্নেহাতিশয্যে সন্তানের ভাবিষ্যচ্চিন্তা জনককননী যেরূপ আশঙ্কার বর্ণে চিত্রিত করেন, অনেক স্থলে তাহা কল্পনামূলক হইলেও কোন কোনটা সত্যে পরিণত হয়।

মোহন মিশ্র একদিন সায়ংকালে নদীতীরে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় নিকটস্থ বটবৃক্ষমূলে একজন জটাজুটধারী ধ্যাননিমগ্ন মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন। মহাপুরুষের সেই দেবোপম উজ্জ্বল কান্তি—শ্বেত শ্মশ্রুবিরাজিত প্রশান্ত মুখমণ্ডল মোহন মিশ্রের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় করিয়া দিল। তিনি ধীর-পাদবিক্ষেপে সেই ধ্যাননিশ্চল মূর্ত্তির নিকট উপস্থিত হইয়া অনিমিষ নয়নে তাঁহার জ্ঞানগম্ভীর বদনমণ্ডল অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই মহাপুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি মধুরনেত্রে মোহন মিশ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বোধহয় মোহন মিশ্রের মুখমণ্ডলাক্রান্ত কিশোর-কান্তি তাঁহার স্নেহাকর্ষণে সমর্থ হইল। তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাকে নিকটস্থ হইতে বলিলেন, মোহন মিশ্র আনন্দোৎফুল্লচিত্তে নিকটস্থ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক যথোচিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সন্ধ্যা রজনী পর্য্যন্ত উভয়ে নানাকথোপকথন হইল, পরদিন প্রত্যূষে আর কেহই সেই মহাপুরুষ অথবা মোহন মিশ্রকে দেখিতে পাইল না। রামচন্দ্র মিশ্রের অশুভ আশঙ্কা দূরবর্ত্তী হইল, মোহন মিশ্র সেই আগন্তুক ইতালীনের অনুবর্ত্তী হইলেন।

পরদিন প্রত্যূষে মোহন মিশ্রের জনক-জননী নানাস্থানে লোক পাঠাইয়া বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলেন,—নদীতে জাল ফেলাইলেন,—কিন্তু কোন উদ্দেশই প্রাপ্ত হইলেন না, —অবশেষে হৃদয়বিদারক ক্রন্দন-ধ্বনিতে মিশ্র ভবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শোকাকুল জনক-জননী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। মোহন মিশ্রের গুপ্তপ্রস্থান, কজনার ইন্দ্রজালে নানামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, প্রতিবেশীগণের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিল। হাটে ঘাটে, মাঠপুরে সর্ব্বত্রই এ কথা আলোচিত ও ঝঙ্কারিত হইতে লাগিল। কিন্তু সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ক্রমে এ আন্দোলন থামিয়া গেল; ক্রমে ক্রমে দিন, পক্ষ, মাস, বৎসর অন্তে মোহন মিশ্রের নাম পর্য্যন্ত লোকের স্মৃতি হইতে অন্তর্হিত হইল—কেবল জনকজননীর শোকক্ষত হৃদয়ে সেই স্মৃতি অনল-অঙ্গরে অঙ্কিত রহিল।

মোহন মিশ্র ক্রমে দশ বৎসর কাল সেই মহাপুরুষের অনুবর্ত্তী হইয়া দেশ, দেশান্তর, পর্ব্বত, কানন, সমুদ্রতীর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিলেন। কেবল ভ্রমণেই এই দশ বৎসর অতিবাহিত হয় নাই। তিনি প্রতিনিয়ত যথাযোগ্য গুরু-শুশ্রূষা দ্বারা সেই অনেয় শাস্ত্রার্থদর্শী মহাপুরুষের জ্ঞানসমুদ্রমথিত উপদেশরত্নরাজিতে অঙ্কস্থ হইয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মার্থীর অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক গুহ্য তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

দুর্গীর্ঘ পর্য্যটনের পর পবিত্র কামরূপ ক্ষেত্র উভয়ের নয়নপথে পতিত হইল। মহাপুরুষ মোহন মিশ্রকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন :—"এই সেই কামরূপক্ষেত্র। এ পর্ব্বতেই আধ্যাত্মিক রক্তপাষাণময়ী ব্রহ্মযোনিরূপে বিরাজিতা আছেন, শাক্ত সাধনের পক্ষে এমন পবিত্র স্থান জগতে আর দ্বিতীয় নাই। চল, অদ্যই তোমাকে মহাপীঠ সন্নিধানে দীক্ষিত করিয়া যোগসাধনে নিযুক্ত করি, এবং আমিও জীবনের অবশিষ্টাংশ এ পর্ব্বতেই সমাধিস্থ হইয়া শেষ করিব।"

প্রকৃতির ক্রীড়াভূমি সেই কামরূপ পর্ব্বতে অধিরোহণ করিয়া শুভক্ষণে মোহনমিশ্র কামাখ্যানন্দির মহাপুরুষ কর্ত্তৃক শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। নিশুম্ভ কাঞ্চন মণি সংযোগে অধিকতর উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিল। বিশুদ্ধাত্মা মোহনমিশ্র তন্ত্রমন্ত্র প্রভাবে অধিকতর প্রতিভাশালী হইয়া উঠিলেন।

মহাপুরুষ শাক্ত কি বৈষ্ণব ছিলেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু তিনি যে সাকারোপাসক ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ, তাঁহার সঙ্গে প্রস্তরময় "কালাচাঁদ" (কৃষ্ণ) বিগ্রহ ছিলেন, তিনি তুলসীচন্দন দ্বারা প্রতিদিন সেই কালাচাঁদ বিগ্রহের অর্চ্চনা করিতেন। কিন্তু কৃষ্ণ বিগ্রহ

দেখিয়াই মহাপুরুষকে কুকোপার্সক স্থির করা যাইতে পারে না।" কারণ ভস্ম, ত্রিপুণ্ড্র, রুদ্রাক্ষ রক্তচন্দন প্রভৃতি শাক্তাচারের উপকরণও তাঁহার সঙ্গে লক্ষিত হইত। তবে, সর্ব্বোপ করণের সামঞ্জস্য দেখিয়া বুদ্ধিমান মাত্রেই তাঁহাকে প্রকৃতজ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করিত।

মোহনমিশ্র গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তপস্যার উপযুক্ত নিভৃতস্থানে যথাবিধি তান্ত্রিক যোগসাধনে নিযুক্ত হইলেন। শিষ্যের প্রথমোদ্যম কিরূপভাবে পর্য্যবসিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মহাপুরুষ তৎকালে সমাধিস্থ হইলেন না। কিন্তু, যখন তিনি মোহনমিশ্রকে গুরুর উপযুক্ত শিষ্য বলিয়া বোধ করিলেন,তখন স্বয়ংও সমাধিস্থ হইলেন।

সংসারীর ন্যায় যোগজীবনের অধিক পরিবর্ত্তন নাই। মাস, ঋতু, বৎসর করিয়া, ক্রমে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল, তথাপি মোহন মিশ্রের তপস্যার বিরাম হইল না। ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর সাধনে ব্রতী হইতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ কঠোর সাধনের পর ইষ্টদেবীর দয়া হইল,—মোহন মিশ্র স্বয়ং যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ হইলেন। পূর্ণানন্দের আনন্দ-জ্যোতিতে তপঃক্লিষ্ট সাধকের বদন-মণ্ডল অপূর্ব্বভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

মোহনমিশ্র আসন হইতে উত্থিত হইয়া গুরুর নিকট গমন করিলেন। তখন গুরুশিষ্য উভয়ের হৃদয়কন্দর হইতে যে, কি পবিত্র আনন্দ উৎস উথলিয়া উঠিল, তাহা পার্থিব উপমায় প্রকাশযোগ্য নহে। শিষ্য গুরুর চরণে প্রণত হইলেন,—গুরু প্রেমানন্দে শিষ্যকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন,—উভয়ে উভয়ের ভুজ-পাশে বদ্ধ,—তখন গুরুশিষ্যের হৃদয়ে হৃদয়ে এক হইয়া গেল, উভয়ে উভয়ের স্কন্ধদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন—সে স্বর্গীয় অশ্রুর মূল্য নাই। কতক্ষণ যে এভাবে গত হইল, তাহা উভয়েই অনুভব করিতে পারিলেন না; উভয়ে পূর্ণকাম হইয়া আরও এক বৎসর ঐ পর্ব্বতে বাস করিলেন।

কাল ধীর-নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে প্রতিনিয়ত অনন্তপথে চলিয়া আসিতেছে,—বিরাম নাই, প্রতীক্ষা নাই—অনন্তকাল একই ভাব। অথচ সেই নীরব চক্র-বিবর্ত্তনে কলাকাষ্ঠা নিমিষ হইতে কত যুগ যুগান্তর কল্পান্তকাল অতীত হইতেছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। সম্রাট,ভিক্ষুক, বৃদ্ধ, বালক, গৃহী, সন্ন্যাসী, বালুকা, বিশ্ব, সকলেই সেই চক্রের অধীন। কাল পূর্ণ হইলে সকলকেই সেই কালসমুদ্রে মিশিয়া যাইতে হইবে। আজি মোহন মিশ্রের গুরুদেবের সেই অন্তিমকাল উপস্থিত। মহাপুরুষ গম্ভীরভাবে মোহন মিশ্রকে কয়েকটী সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া সযত্ন-সেবিত সুন্দর প্রস্তরময় কালাচাঁদ বিগ্রহ তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন, এবং রাজসাহীর অধীন 'পেউস' গ্রামে অনাদিলিঙ্গ পিঙ্গলেশ্বর সন্নিধানে আরও কিছুকাল যোগসাধনের অনুমতি করিয়া অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রে 'অন্তিম-আসনে সমাধি অবলম্বন করিলেন। মহাপুরুষের পবিত্র আত্মা ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের ক্রোড়ে চির শান্তি লাভ করিল।

পরমজ্ঞানী মোহন মিশ্রের নিকট জগতের নশ্বরতা অপরিজ্ঞাত না থাকিলেও তাঁহার গুরুর শোক তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি শোকাকুল হৃদয়ে গুরুর ঔর্দ্ধদৈহিক যথাবিহিত সৎকার করিয়া পর দিবসেই কালাচাঁদ বিগ্রহসহ পেউস গ্রামোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

পেউস অতি ক্ষুদ্র পল্লী। গ্রামে ঘর কয়

নীচ শ্রেণীর দরিদ্র অধিবাসী ব্যতীত ভদ্রলোকের বাস নাই। চতুর্দ্দিক জঙ্গলাকীর্ণ, নদী নাই, ভাল পুষ্করিণী নাই, কেবল তালগাছ আর উষর ক্ষেত্র, কিন্তু এ কদর্য্য পল্লীতে বনের মধ্যে দেবাদিদেবের অনাদিলিঙ্গ বিরাজিত আছে; সময়ে সময়ে তথায় দু-একটী সাধু মহাত্মা আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। এমন স্থানে কেন যে এ অনাদিলিঙ্গ, কেনই বা তথায় সাধুগণের সময় সময় আগমন হয়, তাহা কে বলিতে পারে? তবে, যাহাতে মনুষ্যের অনাদর, ভগবানের তাহাতে অনাদর নাই। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের পক্ষে সকল স্থানই তুল্য। বিশেষতঃ ঈশ্বরের ভূতভাবনভাব শ্মশানবাসের জন্যই প্রসিদ্ধ।

মোহনমিশ্র কালাচাঁদ বিগ্রহসহ যথাসময়ে ঐ পেউস গ্রামে উপনীত হইলেন। অনাদিলিঙ্গ "পিঙ্গলেশ্বর" দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না! তখন গুরুর অন্তিমাদেশ অনুসারে শিবসন্নিধানে যোগ অবলম্বন করিলেন। গ্রামপার্শ্বস্থ অনেক লোক তাঁহাকে ক্ষমতাশালী উদাসীন জানিয়া, নানা প্রয়োজনীয় কথা এবং ঔষধাদির জন্য প্রতিদিন আসিতে লাগিল। কিন্তু কেহই ফললাভে সমর্থ হইল না। যোগমগ্ন সাধুর নিকট বিষয়ীর উত্তর প্রাপ্তি অসম্ভব! এইরূপে এক বৎসর অতীত হইলে মোহনমিশ্রের যোগ সমাধা হইল। তিনি ইষ্টদেবীর নিকট-সংসারাশ্রম গ্রহণের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। বাল্যাবধি তাঁহার সংসারে আসক্তি ছিল না। তাই তিনি চিরকৌমার্য্যে জীবনযাপনের আশায় তান্ত্রিক যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু, আজি তাঁহাকে ঈশ্বরাদেশে সংসারাশ্রম-গ্রহণে অভিলাষী হইতে হইল। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময়ে "দৈববাণির" কথা লিখিয়া সভ্যসমাজে অন্ধবিশ্বাসের পরিচয় দিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কেমন করিয়া লিখিব যে সেই নির্ম্মলচেতা আশৈশব বৈরাগী যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যে সংসারাশ্রম গ্রহণ জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন!

ঠাকুর-ঝি।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

পরদিন অতি প্রত্যূষে হীরালাল লালবাজারের পুলিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় আসিয়া শুনিলেন যে দশটার পর কুরোনারের বিচারালয়ে পরেশনাথের স্ত্রীর মৃত্যু কিরূপে হইয়াছে, তাহার বিচার হইবে। হীরালাল একে এই বিচারের ফল জানিবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন, তাহার উপর মোকদ্দমার তদ্বির জন্যও তাঁহার উপস্থিত থাকা বিশেষ আবশ্যক, এই কারণ সেদিনও হীরালাল বাবুর আফিস যাওয়া হইল না। পরের উপকার করিতে যাইয়া, হীরালাল সকল সময়েই নিজের কাজ ভুলিয়া যাইতেন।

বিচারপতির বিবরণ এস্থলে প্রকাশ করা আমরা আবশ্যক বোধ করি না, তবে সে

বিচারের ফল যাহা হইল, তাহা প্রকাশ করিতেছি। করোনারের বিচারে নিস্তারিণী যে গলায় দড়ি দিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে, তাহাই স্থিরীকৃত হইল; তবে হীরালাল বসু যোক্ষদ্দমার তদ্বির না করিলে যে এইরূপ ফল হইত না—একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি। আর পুলিসের মোকদ্দমার তদ্বিরের যে অর্থ, তাহাও বোধ হয়, এজলে আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না। হীরালাল কেবল শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা পরের উপকার করিতেন না, আবশ্যক হইলে যথাশক্তি ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

পরেশনাথকে পুলিসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। এখন তাহার বালিকা কন্যা ও শিশু পুত্রের দশা কি হইবে—একথা কিন্তু প্রথমে হীরালাল বাবুর মনে উদয় হইয়াছিল। পরেশনাথ এখন খুনী মোকদ্দমার দায় হইতে উদ্ধার পাইয়া আনন্দে অধীর, সুতরাং তাহার সে সকল কথা ভাবিবার অবকাশ ছিল না। হীরালাল প্রথমে পরেশ নাথকে তাঁহারই বাড়ীতে সঙ্গে করিয়া আনিলেন এবং বিশেষ যত্নের সহিত সে দিন তাহাকে আহারাদি করাইলেন। সন্ধ্যার পর হীরালাল বাবু বলিলেন—"পরেশ, তোমার সংসারের বন্দোবস্ত এখন কিরূপ করবে?"

পরেশনাথ এখন একবারে গঙ্গাজল। তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"আমি ভাই, সে বিষয় কিছু জানি না, তুমি যা ভাল বিবেচনা করিবে তাই হবে।"

হীরালাল। তোমার সংসারের কাজে কর্ম্ম করবে কে? তোমার ছেলেমেয়ে মানুষ করবেই বা কে? তোমার কি কোন আত্মীয় স্বজন নেই?

পরেশ। তেমন আত্মীয় স্বজন এখন আর কে আছে? যখন সময় ভাল ছিল, তখন অনেকই ছিল, এখন আর কেউ নেই।

হীরালাল। তা হলে ত তোমায় এক জন বাড়ী আর একজন কি রাখতে হবে।

পরেশনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"আমারত চাকুরী বাকুরী নেই, এখন তাদের খরচ জোগাই কোথা থেকে?"

পরেশনাথের এই কথা শুনিয়া হীরালাল বাবু চিন্তিত হইলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রমে গম্ভীর হইতে লাগিল। তিনি মাহার জন্য এইরূপ আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন, সেই পরেশনাথ কিন্তু এ সময় কিরূপে এক বেলের ব্রাণ্ডির প্রস্তাব হীরালাল বাবুর নিকট করিবে, তাহারই সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। আজ এত বড় একটা মোকদ্দমার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে; সুতরাং পরেশনাথ এখন সুরাপান করিয়া আনন্দ করিবার জন্য অন্তরে এ সকল কথা এখন তাহার ভাল লাগিবে কেন? পরেশনাথ হীরালাল বাবুকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বলিল, —"ভাই, এখন ও সকল কথা থাক্, কাল সকালে সে বিষয়ে একটা যুক্তি করে যা হয়, স্থির করা যাবে। এখন বল ছিলাম কি, কাল থেকে তোমার বড় কষ্ট গিয়েছে, এই সন্ধ্যার সময় সেই কষ্টের লাঘব করলে ভাল হয় না?

পরেশ নাথের কথা শুনিয়া হীরালাল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আমার আর অন্য কোন কষ্টই হয়নি, কেবল কষ্ট হয়েছে, সেই সতীলক্ষ্মীর এরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে।"

তাহার পর হঠাৎ একটা কথা তাঁহার মনে এই সময় উদয় হওয়ায় হীরালালবাবু বলিলেন,—"কুকষ্টের লাঘব কি করলে হয়, পরেশ?"

পরেশনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া চুপি চুপি বলিল,—"তোমার মনটা বড় খারাপ আছে দেখছি, একটু খেলে ভাল হয়, না?"

পরেশনাথের কথায় হীরালাল মনে মনে বড় বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"আমার মনই খারাপ হয়েছে—আর তোমার মনে কি কোন কষ্ট হয়-নি পরেশ? পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছ বটে, কিন্তু একরকম তুমিই তোমার স্ত্রীকে খুন করেছ বল্‌তে হবে। সেই সতী-লক্ষ্মীর মৃত্যুতে তোমার কি একটুও কষ্ট হয়নি পরেশ?"

পরেশনাথ তখন বিষণ্ণমনে বলিল,—"আমার মনেও কষ্ট হয়েছে বৈ কি? আর তুমিও যা বল্‌ছ, সে কথাও ঠিক। আমার মতন নরাধম আর কে আছে? আমিই স্বহস্তে স্ত্রীহত্যা করেছি। তুমি আমার যথার্থ বন্ধু ছিলে, তাই এ কথা বল্‌তে সাহস করেছ। অনুতাপে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। এখন তুমি আর একটি উপকার কর, আমায় আজ একটু মদ খাওয়াও; তা নইলে আমার এ কষ্ট সহ্য হবে না।"

পরেশনাথের এতক্ষণ কোন কষ্ট বা অনুতাপ ছিল না; হীরালালবাবুর কথায় হঠাৎ এই কষ্ট আর অনুতাপ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হীরালাল বাবু পরেশকে জানিতেন, সুতরাং পরেশ নাথের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন তাঁহার বুঝিতে আর বাকী রহিল না। হীরালাল তৎক্ষণাৎ বলিলেন, —"তোমার যদি যথার্থ অনুতাপ হয়ে থাকে, তবে জীবনে কখন মদ স্পর্শ করো না। মদই তোমার সর্ব্বনাশ করেছে—তুমি মদ খেয়ে অত্যাচার করেছিলে বলেই ত, সেই সতীলক্ষ্মী মনের দুঃখে তোমায় ফেলে স্বর্গে চলে গেছে। করোনারের বিচারে সে সকল কথাই ত প্রকাশ হয়ে গেছে। এখন সে সকল কথা আমার মনে হলে তোমার মুখ দেখ্‌তে আমার ঘৃণা বোধ হয়। কেন তোমার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে, তা বল্‌তে পারি না— কিন্তু তুমি নরকের কীট, তোমার সংসর্গে যেন শত্রুতেও না আসে।"

হীরালালের ভর্ৎসনায় পরেশনাথ অনেক ক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"বাস্তবিক আমি নরকেরই কীট; কিন্তু ভাই, মদ আমি কখনও ত্যাগ করতে পারবো না। যে ক'দিন বাঁচবো, মদ খেয়ে কাটিয়ে যাব; তাহলেই পৃথিবীর পাপের ভারও শীঘ্র গীঘ্রই লাঘব হবে।"

হীরালাল।—দেখ পরেশ, আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তুমি একসময়ে খুব ভাললোক ছিলে, কিন্তু এখন মদই তোমার সর্ব্বনাশ করেছে। তোমায় আমি অনেক সময় মনে মনে ঘৃণা করি, আবার তোমার দুঃখ দেখ্‌লে তোমার জন্য প্রাণ কাঁদে, তোমায় দুদিন না দেখ্‌তে পেলে আমি অধৈর্য্য হই। আমার এত বন্ধু-বান্ধব থাকৃতে, অবসর পেলেই কেবল তোমার কাছেই যেতে ইচ্ছে করে। আমি অন্য কাজে বাড়ী থেকে বেরুলেও, ঘুরে-ফিরে কি জানি কেন শেষে তোমার কাছেই এসে পড়ি। এখন তোমার ভাবনা ভেবেই আমি অস্থির হয়েছি। তুমি যদি মদ ছাড়তে না পার, তবে তোমার ছেলেমেয়ের দশা কি হবে? না, আমি আর ভাবতে পারি না—কি কুক্ষণেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল!"

হীরালালের মনে এখন আর কিছুই স্থান পায় না, তিনি কেবল পরেশনাথের মাতৃহীনা পুত্রকন্যার জন্য একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আর পরেশনাথ তখন অন্তরের কৃত্রিম শোক-প্রকাশক সুদীর্ঘ নিশ্বাসে সেই স্থলের নিস্তব্ধতা মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ করিতেছিল। হীরালাল অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন,—"আমি তোমায় থাকবার স্থান দিতে পারি। আমার বাড়ীর যে খণ্ডটা আমি ভাড়া

দিই,এখন সে খেতে ভাড়াটে নেই ; এতে আমার মাসে পনের টাকা ভাড়া লোকসান হবে, আমি তাও সহ্য করতে পারিব ; কিন্তু এর বেশী আমি আর কোন সাহায্য করতে পারি না।"

পরেশনাথের তখন আনন্দের সীমা নাই ; সে আহ্লাদে তোড়ে তাঁহার সেই কৃত্রিম শোকটা কোথায় উড়িয়া গেল। পরেশনাথ আনন্দে অধীর হইয়া বলিল,—"আমি আর কোন সাহায্য চাই না। তোমার বাড়ীতে যদি থাকতে পাই, তা হলে আমার ছেলেমেয়ের বিষয় কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে দু'পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা করতে পারি।"

হীরালাল বলিলেন,—"আপাততঃ এখন তাই হ'ক, তার পর অন্য বন্দোবস্ত করা যাবে।"

পরেশনাথ মনে মনে বলিল,—"অন্য বন্দোবস্ত আর কিছুই করতে হ'বে না ; এতদিন পরে আমার গ্রহ কেটে গেছে দেখ্‌ছি।"

কিন্তু এত আনন্দের সময় পরেশনাথ একটু সুরাপান না করিয়া কি থাকিতে পারে ? পরেশনাথ আনন্দে অন্য সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সুরার কথা ভুলিতে পারে নাই। পরেশনাথ বলিল,—"ভাই, সব বন্দোবস্ত ভাল করেছ। আমি তোমার ঋণ কখন শুধ্‌তে পার্‌বো না। এখন একটু মদের বন্দোবস্ত করলেই সবদিক রক্ষা হয়। তোমারও বড় কষ্ট হয়েছে, এস এখন দু'জনে একটু আমোদ করি।"

পরেশনাথের কথায় এবার হীরালাল অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"কি বল্লে পরেশ, আমোদ করি! আজ কি তোমার আমোদ করবার দিন! তোমার অনুতাপও বুঝেছি—আর তোমার কষ্টও বুঝ্‌তে পেরেছি। একটু মদ পেলেই তুমি হাতে স্বর্গ পাও! তোমার এত দূর অধঃপতন হয়েছে—তোমায় ধিক্!"

পরেশনাথ তখন আর থাকিতে পারিল না, মুক্তকণ্ঠে বলিল,—"ভাই, তুমি উৎসন্ন কর, আর লাথিঝ্যাঁটা যাই মার, আজ একটু মদ আমায় দিতেই হবে।"

হীরালাল।—আমি ত আর মদ খাবো না। মার মাথার দিব্যিতে যা হয়নি, স্ত্রীর দীর্ঘনিশ্বাসে যা হয়নি, আজ তোমার ব্যবহার দেখে আমার সে জ্ঞান হয়েছে—মদে আমার ঘৃণা জন্মেছে। যে মদের পরিণাম তুমি—সে মদ না বিষ! সে বিষ ইচ্ছে করে লোকে খায় কেন ?"

আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি, পরেশনাথের নিকট আজ কিছু পয়সা থাকিলে, পরেশনাথ কখনই হীরালালের নিকট এ প্রস্তাব করিতে আর সাহসী হইত না। কিন্তু পরেশনাথের অন্য উপায় কিছুই নাই, সুতরাং বাধ্য হইয়া পুনরায় তাহাকে বলিতে হইল,—"তুমি যা বল্‌ছ, তা আমিও অস্বীকার করি না ; কিন্তু আজ আমায় মাপ করতে হবে। না হয়, সাড়ে চারি আনা পয়সা আমার ধার দাও ; আজ একটু আমায় খেতেই হবে।"

হীরালাল।—আর আমি যদি তোমায় পয়সা না ধার দিই, তা হলে কি করে খাবে ?

পরেশ।—যেমন করে হ'ক, সে পয়সা আমায় যোগাড় করতেই হবে।

হীরালাল।—যদি অন্য কেউ ধরে না দেয়, তবে কি করে যোগাড় করবে ?

পরেশ।—আমি চুরি করবো—ডাকাতি করবো—খুন করবো।

হীরালাল শিহরিয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ পরেশনাথের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সে মুখে কেবল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরেশনাথ তখন কপট, কখন সরল। কপট হয় মদের জন্য—সরলও হয় মদের জন্য! ধন্য মদ!!

হীরালাল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাড়াতাড়ি সাড়ে চারি আনা পয়সা দিয়া পরেশনাথকে বিদায় করিয়া দিলেন।

বিদায়।

আসি—আসি তবে প্রিয়ে!
হরি তোর অপাঙ্গ-লহরী,
বদনের বিমল মাধুরী,
সয়ে জড়িত মৃদু মরমের হাসিটুকু—
অধরে যা পড়িত ঝরিয়ে,
প্রাণের উৎসাহ-বল, হ'রে লয়ে সে সকল,
বিনিময়ে অশ্রুবিন্দু দিয়ে,
আসি—আসি তবে প্রিয়ে!

ছিল যে হৃদয়খানি, অমরার উপবন
সদা প্রফুল্লিত,
প্রেমের অমৃতময়ী মধুরতা মন্দাকিনী
হ'ত প্রবাহিত।
ভেঙ্গে দিয়ে সে কোমল হৃদি,
শুষ্ক করি সোহাগের নদী,
প্রেমের প্রতিমাখানি নয়ন অন্তরে রাখি,
স্বপ্নময়ী স্মৃতিটুকু ল'য়ে
আসি—আসি তবে প্রিয়ে!

পিপাসিত চাতকের মত
আশা কত র'য়েছে জাগিয়া,
অতৃপ্ত মিলনের তৃষা
রহিয়াছে জীবন ব্যাপিয়া।
শিশুর স্বপন মত, কত যে প্রেমের কথা
জাগিছে অন্তরে;
ভাষা যে শব্দহীন, পাই নাই প্রাণাধিকে,
বলিবারে তোরে,
রুদ্ধ আছে অন্তরের ভাষা,
তৃপ্ত নহে আশার সে আশা;
বুকের মাঝারে ধরি অবিতৃপ্ত আশানিদ্ধ,
ভগ্ন প্রাণে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
আসি—আসি তবে প্রিয়ে!

ক্ষুদ্র ঐ কোকিলের গান,
ব্যাকুল করিবে তোর প্রাণ,
এই শয্যা, এই গৃহ, সবাই কাঁদাবে তোরে;
অতীতের চিত্রপটখানি—
যখন দেখিবি সখি, ও দুটী খঞ্জন-আঁখি
অশ্রুজলে ভিজিবে অমনি।
কক্ষপথে চন্দ্রমার ভাতি,
মিলনের দূরগত স্মৃতি,
ধীরে ধীরে আনিবে বহিয়া;
সন্ধ্যাকালে সঙ্গীহারা, অধীরা কপোতী মত,
কেঁদ প্রিয়ে, বিরলে বসিয়া।
আজি তোর নবকুসুমিতা,
জীবন ব্যাপিনী আশালতা,
নিষ্ঠুরতা চরণে দলিয়ে,
আসি—আসি তবে প্রিয়ে!

মুছে ফেল আঁখি দুটী, কেঁদনা সরলে আর;
তোল মুখখানি;

শুনে যাই, শ্রান্তিহরা, মধুমাখা কণ্ঠে তোর,
মধুরিম বাণী।
পরিণাম নয়নের ধার,
প্রেমের এ চির পুরস্কার—
তের তাই মনে,
স্মরিয়া এ অভাগারে, কাঁদিয়া উঠিলে প্রাণ
বেঁধ প্রাণ বৈর্য্যের বন্ধনে।

দেখ প্রিয়ে পুরব দুয়ারে,
ডাকে উষা বিহগীর স্বরে,
ডুবে গেছে শুকতারা, আঁধারদীপ জ্যোতিঃধারা
নাহি যারা যেতেছে উঠিয়ে,
আসিও প্রাণের প্রাণ রাখি,
আমি—আসি তবে প্রিয়ে!

মতামত।

পুস্তক সম্বন্ধে।

মৃন্ময়ী।—দ্বিতীয় সংস্করণ।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ-বারিধি-প্রণীত মূল্য ১৲ টাকা।

বাঙ্গালা ভাষার এই একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক।—'মৃন্ময়ী'—পণ্ডিত গোবিন্দমোহন রায় মহাশয়ের বহুল গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়। অনন্ত রত্নের আকরস্বরূপিণী 'মৃন্ময়ী' পৃথিবী—এই 'মৃন্ময়ী' সেই রত্নগর্ভা মৃন্ময়ীর রত্নসংগ্রহ। এই ধরণীত্রী পৃথিবীর আকার,গতি প্রভৃতির বিষয়ে সেই পুণ্যপাদ মহর্ষি মনীষীগণের মত—এবং আধুনিক বৈধেশিক মত যে তাহা হইতে কোন অংশে নূতন নহে, 'মৃন্ময়ী' তাহারই পরিচয়। 'মৃন্ময়ী' দেখাইয়াছেন যে, এদেশে পাশ্চাত্য-আলোকপ্রবেশের বহুপূর্ব্বে, 'মৃন্ময়ী'-তত্ত্ব বিশদ ও বিস্তৃতরূপে হিন্দুশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছিল—পরন্তু অধুনা-প্রবর্ত্তিত তত্ত্ব অভিনব নহে। ফলতঃ এই 'মৃন্ময়ী'-তত্ত্ব আলোচনায় রায় মহাশয় আপনার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ, জন্মভূমির প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

'হিন্দুদিগের কিছুই ছিল না'—যে সকল দুরক্ষরদিগের বিশ্বাস, তাঁহারা একবার এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখুন—চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিবে। ফলতঃ এ পুস্তকে দেখিবার, শিখিবার ও বুঝিবার অনেক আছে। এমন কি, সেই জন্য, সময়ান্তরে এই পুস্তকের সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনাও আমাদের আছে।

শ্যামা সঙ্গীত।—বৈদ্যবংশোদ্ভবা জনৈক ভদ্রমহিলা কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

শ্যামা-বিষয়ক কতকগুলি সঙ্গীত ইহাতে আছে। তাহাতে রচয়িতার ধর্ম্মভাব ও রচনাশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আজ কালের স্ত্রীলোকে নাটক-উপন্যাস না লিখিয়া যে এরূপ ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, ইহাতে আমরা অত্যন্তবিসন্তুষ্ট হইলাম।

মায়াবিনী।—উপন্যাস। শ্রীযুক্ত রোহিণী কুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা।

গ্রন্থকার মহাশয়, ইতিপূর্ব্বে 'কনকলতা' 'চিতোর-উদ্ধার' 'চণ্ডবিক্রম' ও 'সোমেশ্বরবালা' প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া, ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার এই 'মায়াবিনী' উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া, আমরাও বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। "স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"—এই ঘটনামূলক উপন্যাস খানিতে, মহাকবির এই মহাবাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। দুষ্টা স্ত্রীর দ্বারা—সদ্গুণমণ্ডিত কালসর্পের ন্যায়—সংসারের যে কি মহদনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, এবং তাহাতে অবশেষে যে সংসার-স্বামীর জীবন লইয়াও টানাটানি পড়ে, এই উপন্যাসে একটী মর্ম্মান্তিনায় তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা সরল, রচনা সহজবোধ্য, ধারাও সৌষ্ঠবসম্পন্ন। ফলতঃ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতেও গ্রন্থকার মহাশয় আপনার রচনাশক্তিরও গুণগরিমার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকের সমুহ প্রচার-কামনা করি।

উপসংহারে এই গ্রন্থকারকে আর একটী বিষয়ে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি একজন গিশিষ্ট ধনশালী জমীদার, বয়স তরুণ; কিন্তু, সাধারণ জমীদার-সন্তানগণের ন্যায় বিপথে বহুর্থব্যয়িতে পরিচালিত না হইয়া, তিনি যে এইরূপে সাহিত্যালোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, ইহা আমাদের বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়—বাঙ্গালা ভাষারও ইহা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। এই মহদুদ্দেশ্যে—সাহিত্য-সেবায় নিয়োজিত থাকার জন্য, আমরা রোহিণী বাবুকে অন্তরের ধন্যবাদ প্রদান করি।

স্বাস্থ্যসোপান।—প্রথম ভাগ।—শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ৷৵০ দশ আনা।

"এই, ইংরাজী-বিপ্লাবিত দেশে ইংলণ্ডীয় স্বাস্থ্যরক্ষা-প্রণালীই প্রচলিত। কিন্তু এতদ্দেশীয় সেকালের প্রাচীন লোক কি নিয়মে অবস্থান করিয়া নিরোগী এবং দীর্ঘজীবী হইতেন, তাহা বড়-একটা কাহারও বিদিত নাই।"—এইরূপ সূচনার সহিত এই পুস্তকে 'ঋষি প্রণীত বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থোক্ত স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ' প্রকটিত হইয়াছে।

এই পুস্তকখানি বালকবালিকাদিগের পাঠোদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। ভাষাও সরল। আমরা এই পুস্তকের প্রতিষ্ঠা-কামনা করি। ভরসা করি, অমৃত বাবুর শ্রম সার্থক হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

যুগবিপর্য্যয়।—এতদিন "নেটিভ"দিগের জীবনের কিছুই মূল্য ছিল না; দুর্দ্দান্ত গোরাগণ ইচ্ছা করিলেই যাহার তাহার উপর গুলি চালাইত;—যেন নেটিভগণ বনের পশু। ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রভৃতির কথা ভারতবাসীর হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিয়াছে; সেদিন মিয়ার্চের্ম নামক জনৈক গোরা একটী মুসলমান টঙ্গাওয়ালাকে গুলি করিয়াছিল। তাহাতেই হতভাগার মৃত্যু হয়। লাহোরের প্রধান বিচারালয়ে হত্যাকারীর বিচার হয়। বিচারক রিজার্ড

সাহেব মিয়াচেমকে এক বৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আমামীর বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা দিবার সময় মাননীয় বিচারপতি যে একটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ভারতের সকল বিচারকের হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক। মিঃ জষ্টিস রিডাজ বলিয়াছেন "দেশীয় প্রজাকে গুলি করিলে যে বিপদে পড়িতে হয়, তাহা তোমরা বৃথনই ভুলিবে না, এই জন্যই তোমাকে দণ্ডিত করিলাম।" বিচারপতির এই বাক্যে কোন কোন এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সম্পাদকের বিষম হৃদয়জ্বালা আরম্ভ হইয়াছে এত দিন তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, নেটিভদিগের জীবনের কোন মূল্যই নাই, কিন্তু এক্ষণে সে ধারণা দূর হইল। এই মহাপ্রভুরা কি তবে ভারতবর্ষীয় বৃটিশ সৈন্যদিগকে বিদ্রোহী হইতে বলিবেন?

***

আনুষঙ্গিক ব্যাপার। চিকাগোরে যে শ্বেত-প্রাসাদে গত বৎসর বিশ্বপ্রদর্শনী বসিয়াছিল, সংপ্রতি তাহা ভস্মে পরিণত হইয়াছে। তাহা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে; দুর্দ্দান্ত শ্রমজীবিগণ এই ভয়াবহ কাণ্ডের অভিনেতা। কয়লা-বিভ্রাটে উক্ত নগরে প্রায় দুই লক্ষ লোক ধর্ম্ম ঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র ও অগ্নির সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাজ্যের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট ক্লেভেলেণ্ড তাহাদিকে বিস্তর ভয় দেখাইলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল না। শেষে সৈন্য পর্য্যন্ত আসিল তাহাতেও কিছু ফল হইল না। শুনা যায় নগরের অধিবাসিগণ এমন কি নাগরিক সেনাও বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল। কিন্তু পিঙ্কারটনদিগের দুরভিসন্ধি সফল হইল না। সামান্য সামান্য দাঙ্গা হাঙ্গামাতেই তাহারা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে এবং শেষে নিজ নিজ কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইয়াছে। যুক্তরাজ্যে পুনর্ব্বার শান্তি বিরাজ করিতেছে। আমেরিকার এই ভয়াবহ অন্তর্বিবাদে সমগ্র সভ্য জগৎ বিস্মিত। দুর্দ্দান্ত নিহিলিষ্টগণের দুরভিসন্ধি কি জগতের সর্ব্বত্র সংক্রামিত হইল।

***

সুসংবাদ।—ইতিপূর্ব্বে আমরা বাঙ্গালী বীর সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের কথা পাঠকদিগকে জানাইয়াছিলাম। এত দিন তিনি নিরুদ্দেশ ছিলেন। এই সংবাদে ভারতবাসী মাত্রেরই —বিশেষতঃ বঙ্গবাসী মাত্রেরই বিষম আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। সুরেশ বাঙ্গালীর বহুদিনের কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন। আজি আমরা তাঁহার সুসংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তিনি উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়াছিলেন; সেই জন্য এতদিন তাঁহার কোন খবর পাওয়া যায় নাই; মম্প্রতি তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহার পিতৃব্য মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি সুরেশচন্দ্র নিরাময় শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সেই সুদূর ব্রেজিল দেশে বীরত্বের মশোমুকুট মস্তকে ধারণ করুন।

***

বিষম আশঙ্কা।—আমাদের পরিণতপ্রজ্ঞ ছোট লাট আর একটী সৎকীর্ত্তি স্থাপন করিতে উদ্যত। সকলেই জানেন তিনি আমাদের উচ্চ শিক্ষার বিষম বিরোধী। উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গালীর চোকগুলি ফুটিয়াছে। এজন্য তাহাদিগকে কোন বিষয়েই পরাস্ত করিতে পারা যায় না; অতএব সেই উচ্চ শিক্ষার মূলেই কুঠারাঘাত করা আবশ্যক। গদিতে বসিয়াই সার চার্লস এলিয়ট এই

মন্ত্রের সাধনায় ধৃতব্রত হইয়াছেন। এক একে যেন ফুল সমূহের উপর তাঁহার বিষদৃষ্টি পড়িল। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু হইল না; অবশেষে তিনি আর একটী উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন। গতপূর্ব্ব বুধবারের কলিকাতা গেজেটে ব্যয়ত শাসন সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিবার সময় একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, "প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ না করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড উচ্চ অঙ্গের শিক্ষার আনুকূল্য করিতে পারিবেন না।" এই মন্তব্যের মূলে যে দুরভিসন্ধি নিহিত রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কেহ সৎকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া অমরত্ব লাভ করেন; কেহ আবার তাহার ধ্বংস করিয়া অমর হইয়া থাকেন। মহাত্মা ক্যাম্বেল ও রিপণের সুকীর্ত্তি মহোচ্চস্বরে এলিয়ট লোপ করিতে উদ্যত।

***

কোরিয়া।—কোরিয়া-সংবাদ আশাপ্রদ নহে; চীন ও জাপানে যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে; এদিকে রুষ ও ইংরাজ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইহাতে উভয় জাতিরই স্বার্থ আছে। দেখাদেখি ফ্রান্স আসিয়া সহসে উপস্থিত হইয়াছে। য়ুরোপের তিনটী পরাক্রান্ত জাতি ঘটনাস্থলে আসিয়াছে; কিন্তু এই তিন জাতির মধ্যে চতুর কে? আমাদিগের পুণ্য হইতেই ধারণা হইয়াছে, চীনেরা বাজি মাত করিবে। এখন আমরা দেখিতেছি আমাদের ধারণা ভ্রান্ত নহে। গত সোমবার সেণ্টপিটর্স বর্গ হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে যে, একা ইংরাজ মধ্যস্থ হইয়া যদি চীন-জাপানের বিবাদ মিটাইতে যান, তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। এখন ভালয় ভালয় সঙ্কট দূর হইলেই মঙ্গল। কিন্তু এই গোলমালে আবার একটী নূতন বিপদ দেখা দিয়াছে;—কোরিয়ার অন্তর্গত চিন্নালপো নামক নগরে যতগুলি য়ুরোপ ছিল; সংবাদ আসিয়াছে, কোরিয়াবাসীরা তাহাদিগের মধ্যে অনেককেই সংহার করিয়াছে। এই সংবাদে ফরাসীদিগের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে।

***

একদেশদর্শিতা।—"মাহাট্টা" নামক সংবাদ-পত্রে গবর্ণমেণ্টের একদেশদর্শিতার একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে একখানি "সার্কুলার জারি করিয়াছেন যে, মুসলমানদিগের মসিদ কিম্বা অন্য কোন ধর্ম্ম-মন্দিরের সম্মুখ দিয়া কোন হিন্দুই বাজনা বাজাইয়া যাইতে পারিবে না। বলা বাহুল্য মুসলমানদিগের কিন্তু কোন বিষয়েই বাধা নাই। তাহারা হিন্দু দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তুমুল বাদোদ্যম করিলেও বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট কিছুই বলিবেন না, আমরা গবর্ণমেণ্টের এই নীতির প্রশংসা করিতে পারি না। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দু মুসলমানে বিবাদ বাধাইতে গবর্ণমেণ্টই সচেষ্ট। হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব থাকিলে দেশের মঙ্গল, সেই সঙ্গে রাজ্য ও রাজারও মঙ্গল। হিন্দু মুসলমানকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসে; এরূপ অবস্থায় যদি মুসলমানেরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিন্দুর সহিত বিবাদ করে, তাহা হইলে তাহা আত্মঘাতিনী নীতি ভিন্ন আর কি বলিব?

***

খোসনাম।—রাজপুরুষ মাত্রই খোসনামের ভিখারী;—বিশেষতঃ যাঁহাদিগকে উর্দ্ধতন রাজপুরুষদিগের মন রাখিতে হয়, অথবা যাঁহারা ভারত হইতে বিদায় লইয়া অন্য স্থানে কোন উচ্চ পদলাভের আশা করেন, বিদায়কালে তাঁহারা নিজ নিজ শাসিত দেশ

বা প্রবেশ হইতে নামোসনাম লইবার চেষ্টা করেন। পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চাহিতে হইত, না! দেশের অধিবাসিগণ তাঁহাদিগের গুণে মোহিত হইয়া আপনারাই ভক্তি ও প্রশংসার পুষ্পহার অর্পণ করিত; কিন্তু আজি কাল তাহার বিপরীত অবস্থা দেখা যাইতেছে। প্রজারা অসন্তুষ্ট; কিন্তু রাজপুরুষের যোগ্যনাম চাই, কাজেই ভিতরে ভিতরে একটা চেষ্টা চলিতে লাগিল। তাঁহার দুই একজন অনুচর-যা জুটিল; ছলে বলে, বা প্রলোভনে প্রশংসাপত্র হস্তগত হইল। যাঁহারা রাজপ্রসাদ বা উচ্চ উপাধি-লাভের অভিলাষী, তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন, কিন্তু দেশের মধ্যবিত্ত লোক সে পথে যাইলেন না। এ সামান্য বিড়ম্বনা নহে; লর্ড ল্যান্সডাউনের সময়ে এই বিড়ম্বনা যথেষ্ট হইয়াছিল। আবার সার চার্লস এলিয়টের সময়ে সেইরূপ একটা বিড়ম্বনা হইবে। সারচার্লস সম্প্রতি মফস্বলে পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া বেড়াতেছেন। কোন কোন স্থানে কোন কোন লোক তাঁহাকে অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা করিবে; কিন্তু সেই অভিনন্দন-পত্রে তাঁহার কোন সংকীর্ত্তির উল্লেখ থাকিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

***

ভাগ্য-বৈচিত্র্য।—চোর চুরি করিয়া জেলে যায়, কিন্তু যাহার টাকা কড়ি চুরি যায়, তাহাকে যে, জেলে যাইতে হয়, ইহা সামান্য অন্ধ-বিড়ম্বনা নহে। কিছু দিন পূর্ব্বে লাহোরের কোন প্রকাশ্য বাজারে একটা পাঠান স্বীয় কণ্ঠরোধ করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়; পুলিশ তাহাকে ধরিয়া তাহার জীবন রক্ষা করে; কিন্তু পরিণামে আত্মহত্যা চেষ্টার অপরাধে হতভাগ্যের কারাবাস হয়। তাহার অপরাধ এই যে, চোরে তাহার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লয়। নিঃসম্বল হইয়া বেচারা পুলিশের শরণাপন্ন হয়। পুলিশ কিছুই করিল না। নৈরাশ্যে আত্মহারা হইয়া পাঠান আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করে। এরূপ অন্যায় তাহাকে জেলে না পাঠাইয়া তাহার ভরণ পোষণের কোন উপায় বিধান করিলে কি ভাল হইত না? সে যেন জেলে খাইতে পাইবে, কিন্তু চোর ধরার কোন চেষ্টা হইল না কেন?

***

বিচার-বিভ্রাট।—ছয়বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামের একটা লোকের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়,—অপরাধ গৃহদাহ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা। ভয়ে সে কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়া এইখানেই একখানি দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। ছয় বৎসর পরে একবার দেশে যাইয়া হতভাগা নিজের কোন আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় পাইল। এওদিন পুলিশ ঘুমাইয়াছিল, কিন্তু এইবার তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিল। তাহারা অপরাধী ও তাহার আশ্রয়দাতাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। রায়ের বিচারে প্রথম আসামী মুক্তি পাইল, কিন্তু তাহার আশ্রয়দাতা নিষ্কৃতি পাইল না। জজ সাহেব এসেসারদিগের মত অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে দুইবৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। হাইকোর্টে আপীল করিয়া বেচারা অব্যাহতি পাইয়াছে; কিন্তু এই বিচারে একটা বৈচিত্র্য দেখ,—সে যাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল, যখন তাহারই অপরাধ সাব্যস্ত হইল না, তখন তাহার কি অপরাধে জজসাহেব খুঁজিয়া পাইলেন?

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ } ১১ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১ { ত্রয়োদশ সংখ্যা।

দেবযান।

সত্য যুগ; আর্য্য ভারতে আর্য্য ঋষিও রাজার অপ্রতিহত প্রভুতা;—সনাতন ধর্ম্মের বিশুদ্ধ ও বিমল জ্যোতি নগ্ন প্রকৃতির সুকুমার ক্রোড় হইতে ধীরে ধীরে বিস্ফুরিত; রাজশাসন অনার্য্যগণের অধঃপতিত বক্ষের উপর দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান; সমাজশাসন পরস্পর বিসম্বাদী স্বার্থরক্ষামূলক নিগূঢ় নীতিসমূহের ক্রমোন্মেষে সহকারে অল্পে অল্পে পরিণতির পথে ধাবমান। অভাব, অনটন, জীবন-সংগ্রাম তখন কাহারও কল্পনাতেও স্থান পায় নাই। তৃপ্তি ও সন্তোষের অমৃত-প্রস্রবণে আর্য্য মাত্রেরই হৃদয় সিঞ্চিত হইলেও কেহই হতোদ্যম হয় নাই। রাজা প্রজা সকলেরই ইচ্ছা ভারতের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক। সুখও শান্তির স্বর্গীয় নিকেতন ভারতের সেই আদিম যুগে—উন্নতির সেই উচ্ছ্বাস-কালে যাজ্ঞবল্ক্য, শ্বেতকেতু ও অষ্টাবক্র—এই তিনটী ঋষি ভগবানের ত্রিমূর্ত্তিরূপে ত্রয়ীবিদ্যার সার সংকর্ষ করিয়া এক একটী সংকর্ষরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের জলন্ত বিদ্যালোকের সম্মুখে অন্যান্য ঋষিগণ অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান, কিন্তু তিনটী রাজা তাঁহাদের ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গৌরবে মস্তক উন্নত করিয়া যেন স্পর্দ্ধা ও অবজ্ঞার হাসি হাসিতেছিলেন। সেই তিনটী মহামান্য ভূপতি বিদেহরাজ প্রথম জনক, পঞ্চালরাজ প্রবাহণ জৈবলি এবং কাশীরাজ অজাতশত্রু।

অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ প্রভৃতির লীলা-কলাপ কর্ম্মকাণ্ডের চরম স্ফূর্ত্তি সাধন করিয়া এখন জ্ঞানকাণ্ডের শান্তি ও অমৃতময় ক্রোড়ে ধীরে ধীরে নিলীন হইতেছিল;—সেসময়ে লোকের আর তত আদর নাই, পুরুষমেধে তত আসক্তি নাই, হত্যার বিভীষিকায় আর কাহারও তত আনন্দ হয় না। তখন অনেকের মনে আধ্যাত্মিক চিন্তার আবির্ভাব হইতেছিল; হিংসামূলক যাগযজ্ঞে যাঁহারা আত্মোদ্ধারের উপায় উদ্ভাবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আদৌ সেই উচ্চতরের প্রতিই সন্দিহান। সত্যযুগের জ্ঞানোন্নতির সেই সুখময় কালে, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের সেই অর্দ্ধসম্মিলন-সময়ে পঞ্চালরাজ প্রবাহণ একদা নির্জ্জনে বসিয়া জীবের নিয়তির

বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন।

পুরূরবা, নিমি প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত নরপতিগণ আজি কোথায়? যে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য মহারাজ নিমিকে ব্রহ্মশাপ গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, আজি তিনি সেই যজ্ঞের কিরূপ ফল কোথায় থাকিয়া উপভোগ করিতেছেন? কিসের জন্য এত নরহত্যা, পশুহত্যা হইল? কি উদ্দেশ্যে রাশী রাশী সোমরস নিষিক্ত হইল? কোনইবা এত হবির্ভস্ম হইল? দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল; মহারাজ প্রবাহণের এ তর্কের মীমাংসা হইল না। নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার যেন গভীরতর হইল; তিনি উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, তবে কি পরলোক নাই? ইহ সংসারেই কি সকলের অবসান হয়? সেই মুহূর্ত্তেই যেন কোন অদৃশ্য দেবতা পাঞ্চাল রাজের হৃদয়ের তামসী যবনিকা তুলিয়া লইলেন; তৎক্ষণই আর একটী অজ্ঞাত দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; অন্তর ও বাহ্য যেন একত্রে মিশিয়া গেল। বিস্ময় ও আনন্দে বিভোর হইয়া তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন;—যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময় ও আনন্দ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

তিনি দেখিলেন অনন্ত কালের অনন্ত বক্ষস্থলে তাঁহাপথের ন্যায় দুইটী পথ উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। যে পথটী উত্তর দিকে বিস্তৃত, রাজা তাহাতেই দৃষ্টি সংযত করিলেন,—দেখিলেন বিদ্যুতের বিমল বিদ্যুদ্বিতীয় বিমানে আলোকিত করিয়া বিমল শুভ্রবসনধারী শান্তস্বভাব মহাত্মাগণ সেই পথে ক্রমশ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাদের সম্মুখে অর্চ্চি, ও অহর্দ্দেবতা, তাহার উপর শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, তদূর্দ্ধে দেবলোক; দেবলোকের পর বিদ্যুৎ-লোক, তদুপরি ব্রহ্মলোক;—বিমল জ্যোতি-পুঞ্জের এক একটী স্তরের ন্যায় এই সপ্ত লোক বিরাজ করিতেছে। ভাগ্যবান্ আত্মা সমুদায় ক্রমে ক্রমে এক একটী লোক অতিক্রম করিয়া ক্রমশ ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতেছেন, পরিশেষে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া অনন্ত শান্তিলাভে সুখী হইতেছেন। তথা হইতে তাঁহাদিগকে আর প্রত্যাবর্ত্ত হইতে হইতেছে না।

জীবিতাবস্থায় মৃতের গূঢ় রহস্য অবলোকন করিয়া পাঞ্চালরাজ প্রবাহণের যেন সশরীরে ব্রহ্মলোক-লাভ হইল; তথাপি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বিপরীত দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন;—দেখিলেন রক্তাম্বরধারী কতকগুলি লোক সেই পথে অগ্রসর হইয়া চন্দ্রলোক প্রভৃতি দেবলোকে উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু কিছুকাল পরে আবার পৃথিবীতে আসিতেছে। যাহারা কখন অধ্যাত্ম জ্ঞানের বিমল আস্বাদন লাভ করে নাই, কেবল যাগ-যজ্ঞ ও দান পূজা করিয়াই কাল অতিবাহিত করিয়াছিল, অবিতৃপ্ত আশার পূর্ণ পরিতৃপ্তির জন্যই তাহাদিগের বারবার এইরূপ আবৃত্তি হইতেছে।

ভাল, দুইটী পথ কি? রাজা ভাবিলেন এ দুইটী পথের নাম কি? যেন কোন অদৃশ্য দেবতা বলিয়া দিলেন, দেবযান ও পিতৃযান। যে পথটী ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে বিস্তৃত, ব্রহ্মলোকে যাহার পর্য্যবসান, তাহাই দেবযান এবং যেটী ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে বিস্তৃত হইয়া পান্থ সকলকে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে ফেলিয়া দিতেছে, তাহাই পিতৃযান। সেই দিন—সত্য-যুগের সেই স্মরণীয় দিবসে পাঞ্চাল রাজ প্রবাহণ জৈবলি যে মহাসত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আলোকে একদা সমস্ত সভ্য জগৎ আলোকিত হইয়াছিল; যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় পরমপ্রতিভাগণও সেই সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; আজি সহস্র সহস্র বৎসর দূরে থাকিয়া অজ্ঞান ও দুর্ভাগ্যের অন্তর্গত গর্ভে নিমগ্ন হইয়াও ভারতসন্তানগণ তাহার ক্ষীণ জ্যোতি দর্শন করিতেছে এবং সেই গৌরবময় অতীতের অতুল আলোকের বন্দনা করিয়া বর্ত্তমান যাতনা ভুলিতে চাহিতেছে।

রাজা প্রবাহণ যে অপূর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন, তাহা শ্বেতকেতুর ন্যায় পণ্ডিতগণ কল্পনা করিতেও পারেন নাই, সেই জন্য তিনি এ বিষয়ে ব্রাহ্মণদের শিক্ষাগুরু। এ কথা সত্য কিনা শ্বেতকেতু-প্রবাহণ-সংবাদ তাহার প্রদীপ্ত প্রমাণ।

"শ্বেতকেতুর বা আরুণেয়ঃ পঞ্চালানাং পরিসমাজগাম। স আজগাম জৈবলিং প্রত্যুবাচ পরিচর্য্যমাণং তমুদ্বীক্ষ্যাভ্যুবাদ কুমার ত্বয়েতি। সত্তো ত ইতি প্রতিশ্রবায়ানুশিষ্টোঽধি পিতরমেত্যেমিতি হোবাচ।"

আরুণি-নন্দন শ্বেতকেতু সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া স্বীয় যশোবিভা বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে পিতার আদেশানুসারে পঞ্চালরাজ-সভায় আগমন করিলেন। তথায় রাজ-পারিষদবর্গকে পরাস্ত করিয়া রাজাকে পরাভূত করিবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পঞ্চালরাজ প্রবাহণ জৈবলি শ্বেতকেতুর জ্ঞানগর্ব্বের কথা শুনিয়াছিলেন; এক্ষণে এই ব্রাহ্মণ-কুমারের দর্পচূর্ণ করিতে হইবে, মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র অনাদর সহকারে "ওহে কুমার!" বলিয়া আহ্বান করিলেন; "তুমি পিতার নিকট সমস্ত বিদ্যা শিখিয়াছ?"

"হাঁ শিখিয়াছি!"

শ্বেতকেতুর এই সগর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন:—

"বেত্থ যথেমাঃ প্রজাঃ প্রযত্যো বিপ্রতিপদ্যন্তা ইতি?"

এই সকল প্রজা মৃত্যুর পর যে প্রকারে যথায় যায়, তুমি কি তাহা জান?"

"নেতি হোবাচ" শ্বেতকেতু উত্তর করিলেন "না, তাহা আমি জানি না।

"বেত্থো যথেমং লোকং পুনরাপদ্যন্তা ইতি?" রাজা বলিলেন 'তাহারা এই লোকে যেরূপ পুনর্ব্বার আইসে, তাহা তুমি জান?

"নেতি হৈবোবাচ" শ্বেতকেতু বলিলেন না তাহাও জানিনা।

"বেত্থো যথাসৌ লোক এবং বহুভি পুনঃপুনঃ প্রযদ্ভির্ন সংপূর্য্যতা ইতি?" নিত্য কত লোক মরিতেছে, তথাপি সেই লোক কেন পরিপূর্ণ হইতেছে না, তাহা তুমি জান?

"নেতি হৈবোবাচ"

না তাহাও জানি না।

* * * *

"বেত্থো দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং পিতৃযানস্য বা যৎকৃতা দেবযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযানং বা?" রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "লোকে কিরূপ কর্ম্ম করিলে দেবযান পথে এবং কোন কর্ম্ম দ্বারাই বা পিতৃযান পথে গমন করে, তাহা কি তুমি জান?

"নাহমত একঞ্চন বেদেতি হোবাচ।" শ্বেতকেতু বলিলেন, "আমি ইহার একটীও জানি না।"

শ্বেতকেতুর গর্ব্বোন্নত মস্তক অবনত হইল! তাঁহার পিতা যে, তাঁহাকে সকল বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, এখন এই নবীন বিদ্যা কোথা হইতে আসিল? রাজা তাঁহাকে পাদ্যার্ঘাদি

দ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু শ্বেতকেতু তাহাতে অনাদর করিয়া অভিভগ্ন হৃদয়ে পিতৃসন্নিধানে প্রতিগমন পূর্ব্বক বলিলেন, "ভাব! কিলনো ভবান্ পুরানুশিষ্টানবোচ ইতি।" হে পিতঃ! আমাদিগের সমাবর্ত্তন কালে আপনি যে বলিয়াছিলেন তোমরা সকল বিদ্যা লাভ করিয়াছ।"

পুত্রকে সান্ত্বিমানে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া এবং এই অমর্ষপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আরুণি বলিলেন "কথং নুমেধ ইতি?" সুবুদ্ধি পুত্র! কেন কি হইয়াছে? তোমার এ দুঃখ কিসের জন্য?"

শ্বেতকেতু তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিয়া রাজার পঞ্চ প্রশ্নের উল্লেখ করিলেন; তাঁহার মনে ধারণা হইল বুঝি পিতা সেই গূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্ব তাঁহাকে শিক্ষা দেন নাই। নতুবা পরম পণ্ডিত আরুণি যে সেই প্রশ্নটী প্রশ্নের বিষয় জানেন না, একথা বালকের সুকুমার হৃদয়ে কিছুতেই স্থান পাইল না। কিন্তু তাঁহার পিতা যখন বলিলেন "যদহং কিঞ্চ বেদ সর্ব্বমহং তত্ত্বভ্যবোচং" আমি যাহা যাহা জানিতাম, তোমাকে তৎসমস্তই শিক্ষা দিয়াছি। নতুবা তোমার অপেক্ষা আর আমার কে প্রিয়তর আছে যে, তাহার জন্য সেই তত্ত্ব গোপনে রাখিব?" এই কথা বলিয়া মহর্ষি আরুণি পঞ্চালরাজ প্রবাহণ জৈবলির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে সেই পরম আধ্যাত্মিক রহস্য লাভ করিলেন। "তেষ ঐবমেতদ্বিদ্বেচাসী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেহর্চিরভিসংভবন্ত্যর্চির্যোহহ রহ আপূর্য্যমাণ পক্ষমাপূর্য্যমাণাৎ পক্ষাদ্যান্ ষন্মা সান্নুদঙ্ডেতি উদিত্য এতি। মাসেভ্যো দেবলোকং। দেব লোকাদাদিত্যম্। আদিত্যাৎ বৈদ্যুতং। তান্ বৈদ্যুতান পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান গময়তি। তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি, তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ। ১৫। (১)

পূর্ব্বে শ্রদ্ধা সহকারে পঞ্চাগ্নির কথা বলিয়া রাজা বলিতেছেন যাঁহারা বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন প্রভৃতি দ্বারা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, "স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর তাঁহারা প্রথমতঃ অর্চ্চি নামক দেবতার অভিমুখে উপস্থিত হন। অনন্তর তথা হইতে অহর্দ্দেবতার নিকট গমন করেন। পরে অহর্দ্দেবতা তাঁহাকে শুক্ল পক্ষাভিমানিনী দেবতার নিকট সমর্পণ করেন, ক্রমে শুক্লপক্ষ দেবতা তাঁহাকে ষন্মাস করতঃ সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের নিকট সমর্পণ করেন। অনন্তর তিনি সেই যন্মাস দেবতা কর্ত্তৃক অতিবাহিত হইয়া দেবলোক প্রাপ্ত হন। দেবলোক হইতে আদিত্য লোক এবং তথা হইতে তিনি বিদ্যুৎলোকে গমন করেন। বিদ্যুৎলোকে গমন করিলে পর ব্রহ্মলোকবাসী অমানব পুরুষেরা আগমন করতঃ তাঁহাকে সেই অক্ষয়, অব্যয় ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।" অনন্তর তিনি সেইস্থানে থাকিয়া ক্রমে সম্বধিক উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকেন, এবং অনেক কল্পান্তকাল বাস করেন (২)" ব্রহ্মলোক হইতে আর তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয়না। আর জনন-মরণ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। এইপথই দেবযান। কিন্তু যাঁহারা

(১) পূর্ণা—আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৭৭০ পৃষ্ঠা।

(২) ডাক্তার রামদাস সেন প্রণীত "গুহ্যতত্ত্বরহস্য" নামক উপনিষদ্ গ্রন্থের "দেবযান" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ডাক্তার সেন আর্য্যগণের ইতিহাস ও অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তর গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেশের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

দেবযানজাদির অনুষ্ঠানেই কাল অতিবাহিত করেন, কিন্তু অধ্যাত্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন না, স্বরূপ পরব্রহ্মের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না, তাঁহারা এই পথে গতি পান না। তাঁহাদিগের জন্য অন্য পথ নির্দ্দিষ্ট —তাহা পিতৃযান।

প্রতিমা।

(৩)

অষ্টম অধ্যায়।

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, প্রতিমার যৌবন হাতে লাগিল আম গাছটীতে মুকুল ধরিয়াছে। শোভা শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে, রাজীব-বৌর কোলে একটী মেয়ে হইয়াছে—যেন শৈলরাজের বিশেষ কোন সংবাদ নাই; তবে দেশে রাষ্ট্র শৈলরাজের এখন ভারী চাকরী, কোথাকার রাজার ছেলের সঙ্গে ভোট বেলায় ভাব হইয়াছিল, সেই এখন বড় হইয়া আপন রাজ্য হাতে পেয়ে শৈলরাজকে আপনার কাছে নিয়ে গিয়েছে। শৈলরাজ এখন বা করে তাই হয়, সরকার হ'তে তার মাসটা গুন মাস হয়েছে। একথা সোহাগীর বাবা গুড় বেচিতে গিয়া শুনিয়া আসিয়াছে। সোহাগী শপথ করিয়া প্রতিমার কাছে বলিয়াছে একথা সত্য।

আজ চারি বৎসর পূর্ব্বে একদিন প্রভাতে প্রতিমা তাহার মনটুকু হারাইয়াছিল। সেই মনটুকুর বিনিময়ে পাইয়াছিল একটী জীবনব্যাপী আশাময় যন্ত্রণা। এই চারি বৎসরকাল একাকিনী প্রতিমা সেই যন্ত্রণা বহন করিয়া আসিয়াছে, আর পারিতেছে না। তাহার সেই অস্ফুট যৌবন এখন পূর্ণ বিকশিত; কিন্তু সে যৌবনে যেন স্ফূর্ত্তি নাই! মুখখানি দেখিলেই মনে হয় প্রাণের ভিতর শত শত আশা জাগরিত রহিয়াছে; কিন্তু তাহার একটীও যেন পূর্ণ হইবার নহে। মুখ নিরানন্দ, হাস্য শুষ্ক, নয়ন জ্যোতিঃহীন।

যতদিন পর্য্যন্ত প্রতিমার বালিকাভাব ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত সে পিতৃগৃহে সুখ পাইয়াছে; তখন যে সুখে সুখী হইত, এখন ত আর সে সুখে সুখী হইতে পারিতেছে না; তখন তাহার বালিকা-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশাগুলি বোধ হয় সহজেই পূর্ণ হইত, সেই জন্য তখন সুখ ছিল; এখন তাহার প্রাণ যাহা চায়—তাহা পায় না। শৈলরাজ প্রতিমার বুকের মাঝখানটা চিরিয়া দেখিল না কেন? তাহা হইলেই ত বুঝিতে পারিত যে, সে কি চায়; শৈলরাজ আর এক দিন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল না কেন কেন—'তুমি কি চাও?' প্রতিমা অম্লানবদনে মুক্তকণ্ঠে বলিত—"আমি তোমাকে চাই।" শৈলরাজ যদি তাহা না শুনিত তাহা হইলে প্রতিমা তাহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিত—"আমি তোমাকে চাই"। এখন প্রতিমা তাহার জীবনটুকু দিয়াও কি শৈলরাজকে দেখিতে পায় না?

"শৈলরাজের বড় চাকরী হইয়াছে, দেশ বিদেশে যশোগান হইতেছে। প্রতিমার-মা তাহা শুনিতেন; শুনিতে শুনিতে যখনই প্রতিমার মুখপানে চাহিতেন, তখনই তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইত; লোকে জানুক না জানুক—তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শৈলরাজ রাগ করিয়াছে, তাঁহার অনেক কথা মনে পড়িত—ভাবিতেন বুঝি, আমাদেরই দোষে প্রতিমার এত কষ্ট।"

এক দিন ডাক-পিয়ন প্রতিমার পিতার হস্তে একটী 'ইন সিওর পার্শেল' দিয়া গেল। পার্শেল দিয়া যাইবামাত্র দুই একটী করিয়া অনেকগুলি লোক সেখানে জড় হইয়া গেল, বাতাসে যেন সে সংবাদটা বহন করিতে লাগিল। বাঁড়ুয্যে মহাশয় দেখিলেন—শৈলরাজই তাহার প্রেরক, তিন চারি বৎসর পর আজ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

পুলিন্দা বহিষ্কাটীতে খোলা হইয়া বাড়ীর ভিতর গেল, যাহারা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা দেখিল—কেবল সুবর্ণ ও হীরকখচিত অলঙ্কার! দুই এক খানি নয়, প্রতিমার যে খানে যাঁহা সাজে, ততগুলি অলঙ্কার! আজ আর কাহারও মুখে কথা নাই, এ উহার মুখ পানে চাহিতে লাগিল, কেবল একটী রমণী একটু জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তা প্রতিমার তপস্যা ভাল।"

আনন্দে প্রতিমার জননীর নয়ন দিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতেছে, তিনি এক এক খানি করিয়া অলঙ্কার বাহির করিয়া প্রতিবেশী-দিগকে দেখাইতেছেন, প্রতিমা একটু দূরে দ্বারের একগাছি শিকল ধরিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অলঙ্কারগুলি সমস্ত বাহির হইলে একখানি পত্র বাহির হইল। সুবর্ণ রঞ্জিত একখানি খামের উপর লেখা—"শ্রীমতী প্রতিমা দেবী"। তাহার এক পার্শ্বে লেখা—"অপরের দর্শন নিষেধ।"

পত্রখানি বাহির হইবামাত্র প্রতিমা ব্যগ্রভাবে আসিয়া পত্রখানি গ্রহণ করিল। তাহা দেখিয়া মেয়েমহলে বড় একটা হাসি পড়িয়া গেল। প্রতিমা সে হাস্যের দিকে লক্ষ্য করিল না, দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বাহিরে রমণীমণ্ডলীর কলরব, প্রতিমা গৃহ মধ্যে গিয়া কলরবশূন্য পার্থিব জগতের অতীত যেন কোন এক জগতে গিয়া বসিল। উদ্বেগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া স্বেদজল বহির্গত হইতে লাগিল, সে নীরবে পত্রখানি পাঠ আরম্ভ করিল।

"প্রতিমা!

অনেক দিনের পর আমি আজ আবার তোমাকে কষ্ট দিতে চলিলাম। বহুদিন বহুদূরে থাকিয়া আগেকার সকল কথাই বোধ হয় ভুলিতে পারিয়াছিলে—এই পত্র খানি পাইলে আবার সব মনে পড়িবে। যাহার ছায়া স্পর্শও তোমার পক্ষে কষ্টকর, আবার তাহার স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইবে! সে জন্য যদি আমার কিছু অপরাধ হয়—তাহা মার্জ্জনা করিও।

আমি তোমাকে এ পত্রও লিখিতাম না, কিন্তু তুমি একদিনও আমাকে মুখ ফুটিয়া কথা বল নাই বলিয়া, আমিও আমার মনের অনেকগুলি কথা তোমাকে বলিতে পাই নাই। যখন পুনরায় দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই, তখন পত্র লেখা ভিন্ন আর অন্য উপায় কি? সেই জন্য লিখিলাম।

বোধ হয় স্মরণ আছে—যেদিন তোমার সহিত আমার শেষ দেখা, সেই দিন তুমি বলিয়াছিলে—"আমি তোমাকে চাই না, বাবা চাই; তাহা অবশ্য পাইয়াছ; আশা পূর্ণ হইলেই মানুষ যখন সুখী, তখন তুমিও সুখী হইয়াছ। নিকটে বা দূরে যেখানেই তুমি থাকনা কেন, এখনও আমি 'তুমি সুখে আছ' —এই কথাটী শুনিতে পাইলেও সুখী হই।

আমি শুনিয়াছি কোন রাজবাড়ীতে তোমার বিবাহের কথা হইয়াছিল, সেখানে বিবাহ হইলে, তুমি কত সুখী হইতে পারিতে; তুমি অভাগিনী সেই জন্য সে বিবাহ হয় নাই। তোমার পিতা বুঝিতে না পারিয়া একদল দরিদ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া তোমাকে চির জীবনের মত কাঁদাইয়াছেন, কেবল তোমাকে কাঁদাইয়াছেন তাহা নহে, আমাদেরও কাঁদাইয়াছেন। আমি নিজের সুখের জন্য কাঁদি না, তোমাকে মনে করিয়া কাঁদি, তোমার অদৃষ্ট ভাবিয়া কাঁদি। আমিইত তোমার মনের সুখ কাড়িয়া লইয়াছি।

বিবাহের পরদিন আমার দেওয়া সেই অলঙ্কারগুলি দেখিয়া যে তোমার পিসিমা'র চোখে বসিয়া কাঁদিয়াছিলে, তাহা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না; আমি তখন সংসারের সকল দিক ভাল করিয়া চিনিতাম না। সকলই আমার মনের মত দেখিতাম। সেই দিনের পর হইতে আমি অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারিয়াছি, সেই শিক্ষার গুণেই আমি মনুষ্য সমাজের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছি; সেই শিক্ষার, বলেই আমি জীবনে উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। বোধ হয় তুমি তাহাতে সুখী হইবে যে আমি এখন কোন রাজার প্রধান মন্ত্রী।

কিন্তু এ মন্ত্রীত্বে আমার সুখ নাই। তুমি যদি একটী দিনের জন্যও একটী বার আমাকে ডাকিয়া কথা কহিতে, তাহা হইলে আমি সমুদায় পৃথিবীর আধিপত্যও তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিতাম। আমি দরিদ্র বলিয়া, তুমি এবং তোমার পিতা, মাতা ও আত্মীয় স্বজন সকলেই যে আমায় ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতে, আমি তাহার অনেক পরিচয় পাইয়াছিলাম; আমি সত্য কথা বলিলে মিথ্যা হইয়া যাইত, সুবর্ণ পাইলে পিত্তল হইয়া যাইত, একমাত্র অর্থাভাব বশতঃ আমি মিথ্যাবাদী ও প্রতারক প্রতিপন্ন হইয়াছিলাম।

তখন হইতে আমি জানিতাম, পবিত্র দাম্পত্য সুখ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না, সে বৎসর পূজার পর আমি তোমাদের বাড়ী গেলাম, তুমি যেন ম্রিয়মাণ হইয়া গেলে! সর্ব্বদা ম্লানভাবে থাকিতে, ময়লা কাপড় পরিতে, আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়াও কাঁদিতে; কেবল তোমাকে দেখিবার জন্যই সে বার হরিপুর গিয়াছিলাম, তোমার এক বিন্দু ভালবাসার জন্যই গিয়াছিলাম; দুর্ভাগ্য আমি, পাইলাম না, আমার হৃৎপিণ্ড পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল।

যাক সে সকল কথাতে কাজ নাই, সেত যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। বহুদিন প্রবাসে প্রবাসে ফিরিয়া আমি অনেক অংশে হৃদয়কে সংযত করিতে পারিয়াছি, আমার জীবনের যে সকল আশা ও উৎসাহ ছিল, সে সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়াছি। এখন আমার আর মনুষ্য হৃদয় নাই, আমি আমার কোমল প্রবৃত্তি গুলি হারাইয়া রাক্ষসপ্রকৃতি ধারণ করিয়াছি।

তুমি যতই কেন ঘৃণার চক্ষুতে দেখ না, আমি জানি তুমি আমার যথাশাস্ত্র বিবাহিতা ধর্ম্ম-পত্নী; যেদিন হইতে তোমাকে বিবাহ করিয়াছি, সেই দিন হইতে তোমার সুখ দুঃখের ভার আমার হাতে পড়িয়াছে। আপনা আপনি বিবেচনা করিয়া সাধ্যানুসারে তোমার দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা পাওয়া আমার অবশ্য উচিত, অবশ্য মনের সুখ কেহ কাহারও দিতে পারে না, তুমি মনের যে সুখ হারাইয়াছ,

অহাত আমি দিতে পারিব না; তবে অলঙ্কারের জন্য বড় আগ্রহ করিয়াছিল, সেই জন্য আজ এই অলঙ্কার গুলি পাঠাইলাম। ইহাতেও যদি তোমার কিছুমাত্র দুঃখ নিবারণ হয়, তাহা হইলেও আমি আমাকে কৃতার্থ ও সুখী মনে করিব।

আজ চারি বৎসর পূর্ব্বে তোমার নিকট শেষ বিদায় লইয়া আসিয়াছি, অদ্য অপর সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। যাহা চাহিয়াছিলে, তাহা তোমাকে দিলাম; যাহা চাও নাই, তাহা আর কখন পাইবে না। এ পৃথিবীতে ত পাইবে না, অন্য জগতের কথা তাহা কেমন করিয়া বলিব?

প্রতিমা! আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে কেন—তাহা জানিনা; আমি অনেক দিন প্রতিমাবিসর্জ্জন দিয়াছি। তোমার হৃদয়ে যদি অন্য কোন আশা থাকে, তুমিও তাহা বিসর্জ্জন করিও; যদি কখন মনে পড়ে যে তোমার স্বামী বড় দরিদ্র অভাগা ছিল, তাহা হইলে পার ত একবিন্দু অশ্রুধার তাহার উদ্দেশে বর্ষণ করিও; আর একটী অনুরোধ যে ধর্ম্ম রমণীর পবিত্র ভূষণ—পবিত্র সৌন্দর্য্য—সেই ধর্ম্ম সতত রক্ষা করিও। আমি আশীর্ব্বাদ করি, ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন। আমার আশা পূর্ণ হইল, ব্রত উদ্‌যাপিত হইল; প্রতিমা—দুঃখিনি! এই আমার শেষ সম্ভাষণ!!"

পত্রখানি পাঠ করিয়া যে প্রতিমার কি ভাব হইল, তাহা মানুষে কেহ জানিল না, আকাশবিহারী দেবতা তাহা জানিলেন, আর জানিল প্রতিমা।

সে অলঙ্কার বাক্সে তোলাই থাকিল, প্রতিমা তাহা স্পর্শ ও করিল না। সর্ব্বশুদ্ধ যে দুই এক খানি অলঙ্কার পরিত, তাহাও খুলিয়া ফেলিল, লোকে বলাবলি করিতে লাগিল —"প্রতিমা তাহার স্বামীর উপর রাগ করিয়াছে।" কেহ জিজ্ঞাসা করিলে প্রতিমা বলিত —"এ গহনা ভাল নয়, এর চাইতে ভাল গহনা আছে, সেই গহনা এলে তবে পরবো।"

—০—

নবম অধ্যায়।

এ বৎসর সাগরপাড়ায় পূজার ভারটা শৈলরাজ বাবু—নূতন বাড়ীতে নূতন প্রতিমা আনিয়াছেন, আমোদ প্রমোদের চূড়ান্ত হইবে। ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালি বিদায় তাহারও বাকী নাই। সাগর পাড়ার আশে পাশের গ্রাম গুলিতে যেখানে দুই চারি জন লোক একত্র হইতেছে—সেইখানেই এই কথা।

হরিপুরের সে সংবাদ আসিল, ষষ্ঠীর দিন একটী আধবুড়ো মেয়ে মানুষ একখানি পত্র নিমন্ত্রণ পত্র, কিছু মিষ্টান্ন আর প্রতিমার জন্য একখানি বারাণসী সাড়ী লইয়া প্রতিমার বাটী প্রবেশ করিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পত্রখানি পাঠ করিলেন, স্ত্রীলোকের কাপড় দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।

সমস্ত দিন নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার পর প্রতিমার পিসি স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ বাছা বড়বৌ পূজার এত দুন তা প্রতিমার শাশুড়ী নিয়ে গেলেন না?"

"নিয়ে যাবেন বৈ কি মা! আমি আসার সময় শৈলর-মা সে কথা আমাকে দশবার বল্লে দিলেন, বল্লেন যে, মেয়েমানুষের বড় তাড়াতাড়ি পূজা আরম্ভ হ'ল, বৌমাটিকে আনতে সময় পেলাম না। একে দিন ভাল নাই তাতে এখনও নূতন বস্ত্র হয় নাই, দিদিন অমনি কেমন করে বৌ নিয়ে আসবো? পূজোর কটা দিন

বেরিয়ে যাক, একটা ভাল দিন দেখে বৌমাকে নিয়ে আসবো।"

কথা গুলি শুনিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইলেন, বলিলেন—"তাত বটে বাছা! এদিনে অক্ষণে আর কেমন করে নিয়ে যাবেন, তা ভালই হ'ল, আমাদের ছেলে পুজার কটা দিন আমাদের কাছেই থাকুক, পূজার পর তাঁহাদের বৌ তাঁরা নিয়ে যাবেন।"

"নিয়ে যাবেন বৈকি মা—বৌ বৌ করে অস্থির, বল্‌ছেন বৌমা নইলে আমার বাড়ী মানাচ্ছে না, আমি যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছি—তখনও বল্‌ছেন আমার বৌমাটি যেমন হয়েছে—ভাল করে দেখে আসিস, আর বলে আসিস—পূজার পর পাল্‌কী বেহারা দেবে যেয়ানরে যেন ওঁরার টোজর না করেন; বৌমাকে যেন পাঠিয়ে দেন।"

"তা দিব বৈকি মা! তাঁদের সামগ্রী তাঁরা নিয়ে যাবেন, তাতে আর আমাদের ওজর কি? মেয়ের যতদিন বিয়ে না হয়, ততদিনই মা বাপের; এখন আমাদের মেয়ে তাঁহাদের হয়েছে, তাঁহাদের যা ইচ্ছে তাই করবেন। তুমি যখন এস, তখন জামাই'এর সঙ্গে দেখা হয় নাই? তিনি কিছু বলেন টলেন নাই?"

"হেই মা! আমি কি সেখানে যেতে পাই, এক ঘর লোক গস্ গস্ কচ্ছে, রাজ্যির লোক দেখা কর্ত্তে এসেছে, যে সে লোকের আর কি সেখানে যাবার যো আছে? শৈল'র মা বলেছিলেন যে যাবার সময় শৈলকে বলে যাস্ খণ্ডর শাশুড়ীকে যদি কিছু বল্‌বার থাকে বলে দিবে। দুবার তিনি ডাকতে পাঠালেন, তা লোকের ভিড়ে আস্‌তে পেলে কৈ? একটা ছোঁড়াকে দিয়ে ঐ চিঠি খানা পাঠিয়ে দিলেন।"

"বটে? তা না দেখা হক, আমরাও ঠিক করে রেখেছি পূজা ফুরুলেই জামাই নিয়ে আসবো; দাদা দুই এক দিনের মধ্যেই যেতেন, তা ভালই হল—এক কাজে দুই কাজ হবে; সেই বিয়ের বছর এসেওত তিনটি দিনের বেশী থাকতে পান নাই। এবার আমরা নিয়ে এসে দশ দিন রাখবো।"

"রাখবে বৈকি, যে ভাগ্নে মানুষ ছেলে, বল্লেই দশ দিন থাকবে; বাপের মতন তেমনি নরম স্বভাব, গরীব দুঃখীর উপর দয়া কত, আসতে না আস্‌তে দুনৌকা কাপড় উঠিয়া গিয়াছে।"

সাগর পাড়ার স্ত্রীলোকটী প্রতিমার পিসির সঙ্গে এই সকল কথাবার্ত্তা বলিতেছিল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার চক্ষুনি আসিতেছিল। প্রতিমার পিসি তাহা বুঝিতে পারিয়া নৈশ রন্ধনের উদ্যোগে চলিয়া গেলেন; সেও অবসর বুঝিয়া একটু কাত হইয়া পা ছড়াইয়া দিল।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রতিমার পিতা সাগর পাড়ার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"আমি আসিবার সময় জামাই সঙ্গে করিয়া আনিব—সেজন্য দুই এক দিন অপেক্ষা করিতে হয়, তাহাও থাকিব।" মুহূর্ত্তেকে এ সংবাদ হরিপুরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। যাহারা চারি বৎসর পূর্ব্বে দরিদ্র শৈলরাজকে বিষময় বিদ্রূপবাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহারাই এখন শৈলরাজকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল। শৈলরাজ আসিলে কি কি বলিয়া রসালাপ করিবে, কে কোন্ তামাসা করিবে—মেয়েমহলে তাহার একটা আন্দোলন পড়িয়া গেল। আর একটী দুঃখিনী যুবতী তাহার হৃদয়মরুতে অতি সংগোপনে সযত্নে ক্ষুদ্র একটী আশালতার বীজ বপন করিল।

যথা সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাগর

পাড়ায় উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ শৈলরাজের নূতন বাটী দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—লোকে পরিপূর্ণ, ভ্রমরের মত শৈলরাজের বিস্তর আত্মীয় স্বজন জুটিয়া গিয়াছে; যেদিকে নেত্রপাত করেন, সেই দিকেই যেন উৎসব আর উৎসাহ বিদ্যমান। সর্ব্বত্রই আনন্দময় কলরব; প্রত্যেক বিষয়ে তিনি জামাতার ভাগ্যোন্নতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

শৈলরাজ শুনিতে পাইল—শ্বশুর আসিয়াছেন। ব্যস্তভাবে নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে পদবন্দনা করিল, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শৈলরাজকে আলিঙ্গন করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। শৈলরাজও প্রতি প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন; কিছুক্ষণ এইরূপ স্বাগত প্রশ্নের পর শৈলরাজকে কার্য্যান্তরে যাইতে হইল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুখাসনে বিশ্রাম লাভ করিলেন।

পূজার তিন দিন বড় আমোদে কাটিতে লাগিল। চারিদিকে ধন্য ধন্য শব্দ হইতে লাগিল। অসংখ্য দীন দরিদ্র দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। পাড়ার ছেলেরা যাত্রার সঙের অনুকরণ করিতে লাগিল। মেয়েরা নর্ত্তকীর রূপ, গুণের প্রশংসা করিতে লাগিল। গ্রামের আপামর সাধারণ সকলেরই বাড়ী লুচি সন্দেশে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তিন দিন সাগর পাড়ার আর কাহারও বাড়ী হাঁড়ি চড়িল না, সকল সালগ্রাম গুলিকেই এ তিনদিন দুগ্ধ চিপিটক খাইয়া থাকিতে হইল। নবমী পূজার রাত্রিতে শৈলরাজের গুরুপুরোহিতে একটা হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। পুরোহিত বলেন, এ ব্যাপারে প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, ইষ্টদেব বলেন—"যে বিশ হাজারের কম বলে, আমি তাহার মুখদর্শন করি না।"

যাহার বাড়ীতে এত আনন্দ উৎসব সে কেন আনন্দপ্রকাশ করে না, যাঁর বাড়ীতে হাসির তরঙ্গ ছুটিয়াছে, সে কেন হাসে না? শৈলরাজ যখনই সুসজ্জিত চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যস্থিতা সুসজ্জিতা প্রতিমার পানে চাহিয়াছে, তখনই তাহার দুটী চক্ষু জলে ভাসিয়া গিয়াছে, সে অশ্রুবিন্দু লুকাইবার কত চেষ্টা করিতেছে—পারিতেছে না, যে তাহা দেখিতে পাইতেছে সে বলিতেছে—"শৈলরাজ বাবু বড়ভক্ত।" ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"অষ্ট বয়সে যে প্রেমাশ্রু পতন, তাহা কেবল জগদম্বার কৃপা।" শৈলরাজ যে সাধ করিয়া তাহার হৃদয়ের আনন্দ হারাইতে বসিয়াছে, তাহা তো কেহ বুঝিতেছে না।

নবমী পূজার দিন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাটীর মধ্যে বসিয়া শৈলরাজের জননীর সঙ্গে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময় শৈলরাজও সেই স্থানে উপস্থিত হইল, শৈলরাজকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাহার জননী বলিলেন, "বাবা শৈল! তোমার শ্বশুর বলছেন পূজার পর একবার হরিপুর যাও, সেখানে তোমার শাশুড়ী, পিসেস্ তাঁরা তোমাকে দেখ্‌বার জন্য ভারী ব্যস্ত হয়েছেন।"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সে কথায় যোগ দিলেন, বলিলেন—"হাঁ—মেয়েরা সব ব্যস্ত বটে, প্রায় চার পাঁচ বৎসর দেখে নাই, তোমার বাড়ী আসার সংবাদ পেয়ে অবধি সকলেই একবারে বগ্‌গ হ'য়ে প'ড়েছে। পরশু দিন যেতেই হ'চ্ছে।" শৈলরাজ অতি বিনীতভাবে বলিল—"যাবার'ত কোন বাধা নাই, তবে একটী বাধা এই, যে পূজার পর আর বাড়ী থাকতে পাচ্ছিনে, হাতে এমন কতকগুলি কাজ পড়েছে যে, কোজাগর পূর্ণিমার পূর্ব্বেই সেখানে না পঁহুছিলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।"

"তা ব'লে কি তুমি বাপু অন্ততঃ একদিনের জন্যও যেতে হবে, না গেলে সকলেরই বড়ই আশাভঙ্গ হবে, সকলেই বিশেষ কষ্ট পাবে।"

"সে কথাও সত্য বটে, কিন্তু বাহাদুর যেরূপ ভাবে পত্র লিখেছেন, তাতে বোধ হয় আমাকে পাঁচ দিন সেই খানেই রওনা হ'তে হ'চ্ছে।"

"বিশেষ কাজ থাকলে যেতে হবে বৈকি, তথাপি একবার হরিপুর যেতে হচ্ছে, নেহাত থাকতে না পার, একবার দেখা দিয়ে চ'লে এলেই হবে।"

শৈলরাজের জননী বলিলেন—"তা একবার যাবে বৈকি, না গেলে কি হয়, সবাই আশা ক'রে রয়েছে, হাজার হ'ক তুমি জামাই; আপন পেটের ছেলে যেমন, জামাইও তেমন।"

শৈলরাজ জননীর কথায় আর কিছু উত্তর দিল না, "দেখি যদি সময় পাই, তবে যাব" এই বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

আহা! কে এ দুঃখিনী সন্ধ্যা বেলায় সন্ধ্যার প্রদীপহস্তে দাঁড়াইয়া আকাশপানে চাহিয়া রহিয়াছে? আনন্দময়ীর আগমনে সমস্ত বঙ্গদেশ আনন্দসাগরে ভাসিতেছে—হতভাগিনীর হৃদয়ে আনন্দ নাই কেন? সবাই আজ নূতন কাপড় পরিয়াছে, এ কেন এক খানি ছিন্ন মলিনবস্ত্র দিয়া আপনার প্রস্ফুটিত যৌবনকান্তি ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অভাগিনী আকাশের উপর কি হারাইয়াছে, তাই এমন ব্যাকুলদৃষ্টিতে অন্বেষণ করিতেছে?

প্রতিমা বিজয়া দশমীর সন্ধ্যাকালে বড় আশা প্রাণে ধরিয়া সন্ধ্যার প্রদীপ দেখাইবার ছলে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সহসা শুনিতে পাইল, কে যেন দূরে বলিতেছে—"কাকা

ফিরে এল, জামাই আনতে গিয়েছিল, তা জামাই এল না।"

গ্রামের আশে পাশে চারি দিকে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছে। সহসা প্রতিমার হৃদয়ে ও যেন বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। যে আশালতাটি রোপণ করিয়াছিল, সহসা বর্জ্জনাঘাতে তাহা যেন ঝলসিয়া গেল। সে সন্ধ্যার বাতাসে আপনার গাঢ়শ্বাস মিশাইয়া দিয়া নিঃশব্দে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

পূজার পর এক মাস কাটিয়া গেল, শৈলরাজ চাকরীস্থানে গেল। কেহ প্রতিমাকে শ্বশুর বাড়ী হইতে লইতে আসিল না। তখন সকলে বুঝিতে পারিল—প্রতিমার অদৃষ্ট ভাল নয়—ভিতরে গুরুতর কথা জন্মিয়াছে। প্রসন্ন ঠাকুরাণী রাষ্ট্র করিল—"আস্‌ছে অগ্রহায়ণে আবার শৈলরাজের বিয়ে।"

ক্রমে হেমন্ত কাল আসিল। শারদীয় সুনির্ম্মল আকাশমণ্ডল ক্রমশঃ ধূসরবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। নক্ষত্রসভা ম্লান হইল, নবশিশির সংস্পর্শে মৃণালিনীদল সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। প্রতিমার হৃদয়াকাশ যে ধূসরতায় আচ্ছন্ন হইতেছে, তাহা আর কি কখন ঘুচিবে? তাহার সঙ্কুচিত আশামুকুল আর কি কখন প্রস্ফুটিত হইবে? সে আপনার শূন্যহৃদয়টুকু লইয়া নবীন হেমন্তের শুভ্র ব্যবাহন করিল।

দারুণ শীতে জীবজগৎ কাঁপিতেছে, হতভাগিনী প্রতিমার শীত নাই। সে প্রতিপ্রাতঃ সময়ে আপন অঞ্চলমাত্র আশ্রয় করিয়া, নদীতীরে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, দলে দলে চক্রবাক্ চক্রবাকী ক্রীড়া করে—সে তাহাই চাহিয়া চাহিয়া দেখে। "জানি না কোন দম্পতি আপন ভাষায় কি বলে—প্রতিমা তাহা শুনিয়া শুনিয়া কত যেন ব্যথার

ব্যথী মত কাঁদিয়া ফেলে। প্রতিমা কি তাহাদের ভাষা শিখিয়াছে?

শীতান্তে বসন্তের নবরাজ্যাধিকারের ঘোষণা পড়িয়া গেল। বিহঙ্গকুল কলস্বরে ডাকিয়া উঠিল, মধু সমাগমোল্লসিত মধুপকুল মধুমাখা পুষ্পাধর চুম্বন করিল। মধুর মলয় মন্থরগমনে চারিদিকে মধুরতা ছড়াইতে লাগিল, শীতার্ত্ত তরুলতার নবপল্লব উদ্গত হইল; প্রতিমার হৃদয়কাননের আশালতা কি মুকুলিতা হইবে না? তাহার দেহলতা যে বিরহ তুষারসম্পাতে সঙ্কুচিতা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আর কি কখন তাহা প্রফুল্লিতা হইবে না?

নিদাঘের দারুণ মধ্যাহ্নে সমস্ত জগত যেন নিস্তব্ধ। পল্লবের হাওয়ার মধ্যে বসিয়া চাতকী উর্দ্ধমুখে—ফটিক জল—ফটিক জল, করিয়া ডাকিতেছে; সে তাহার তৃষ্ণার বারি খাইবে। কিন্তু অভাগিনী যে অম্বুদেরপানে চাহিয়া আছে, আর কি তাহা উদিত হইবে না? এক বিন্দু বারি বর্ষণ করিয়া কি তাহার জীবনের তৃষ্ণা নিবারণ করিবে না?

বর্ষার জলধরদল অজস্র বারি বর্ষণ করিতে লাগিল, বর্ষার প্লাবনে চারিদিক ডুবিয়া যাইতে লাগিল; প্রতিমাদের আমগাছের কাছে বান আসিল, কত দিন কত নৌকা সেই আম গাছের কাছ দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া যায়। প্রতিমা প্রতিদিন তাহা চাহিয়া চাহিয়া দেখে। প্রতিমা যাহা হারাইয়াছে, তাহা লইয়া আর এক খানি নৌকা অমনি করিয়া ভাসিয়া আসে না কেন? প্রতিমা একবার যদি তাহা দেখিতে পাইয়া মরে, তাহা হইলেও তাহার সুখের সীমা থাকিবে না।

বর্ষা গেল, শরৎকালে আবার পূজা আসিল। সংবাদ আসিল—আবার শৈলরাজ বাটী আসিয়াছে; সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাগরপাড়া গেলেন। শৈলরাজকে আসিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন, শৈলরাজ সোণার প্রতিমা পায়ে ঠেলিয়াছে, নানা প্রকার আপত্তি করিয়া তাঁহার উদ্যম ভঙ্গ করিয়া দিল, নিরাশ হইলেন।

প্রতিমা এক দিন তাহার জীবনের সুখটুকু হারাইয়াছিল, এখন একে একে সমস্ত হারাইতে লাগিল, তাহার রূপলাবণ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্য গেল, লজ্জা গেল; এক দিন প্রতিমার মা কাঁদিতে কাঁদিতে একটি কথা তাহার স্বামীকে জানাইলেন; তিনি প্রথমে তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলেন, শেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর প্রতিমাকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসাই স্থির হইল।

একটী শুভদিন নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রতিমা বেশভূষা করিল না, চুল বাঁধিল না, যেমন বেশে ছিল, তেমনি বেশে পাল্কীতে উঠিল; কিন্তু যত্ন করিয়া তাহার বস্ত্রালঙ্কারগুলি পাল্কীর একপাশে তুলিয়া লইল। প্রতিমার জননী কাঁদিলেন, পিসিমা কাঁদিলেন, প্রতিমা কাঁদিল না, স্থিরপ্রতিজ্ঞা এবং হাস্য ও রোদনের মধ্যবর্ত্তী যে একটী ভাব তাহাই তাহার মুখ-মণ্ডলে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বাহকেরা শিবির বহন করিল। বিবাহের সময় যে রাজুদিদি সঙ্গে গিয়াছিল, আজিও সেই সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

যথাসময়ে তাহারা সাগর পাড়া আসিয়া উপস্থিত হইল; প্রতিমা পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া রাজুদিদির সঙ্গে খিড়কি দুয়ার দিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। আপনার স্বামীর অন্তঃপুর, তবু যেন বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল; তাহার ধৈর্য্য, স্থিরপ্রতিজ্ঞা যেন ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল।

অন্তঃপুর মধ্যে বিবিধ প্রকারের স্ত্রীলোক বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, অনেকে বাটী প্রবেশকারিণী প্রতিমা ও রাজুকে দেখিল, কিন্তু প্রতিমা ছিন্নবসনা ও মলিনা; তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কেহ প্রয়োজন বলিয়াই বোধ করিল না; তখন রাজু একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল—"মা ঠাকুরুণরা সব কোথায় গা! তোমাদের বউ এল দেখ।"

শৈলরাজের জননীর কানে এ কথাটী প্রবেশ করিল, তিনি গৃহমধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন, প্রতিমাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন কিন্তু চিনিতে পারিলেন না, বলিলেন—"এটী কাদের বৌ!"

প্রতিমা গিয়া শাশুড়ীর পদধূলি মাথায় দিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা! আমি প্রতিমা—তোমার দাসী! তোমার কাছে এলাম!"

শৈলরাজের জননী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন "অ্যাঁ— প্রতিমা! আমার বৌমা! বৌমার আমার এমন বেশ! হায়রে কপাল আমার বৌমা কিনা কাঙ্গালিনীর মত এল, এস মা আমার, আ'জ আমার কি সুপ্রভাত, আ'জ আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এল।"—এই বলিতে বলিতে প্রতিমাকে কোলের কাছে লইয়া গিয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

প্রতিমা মাতৃস্নেহ ভুলিয়া গেল, শৈলরাজের জননী আবার বলিতে লাগিলেন "মায়ের আমার এমন মলিনবেশ দেখে কি আমি থাকতে পারি? আমার সেই সোণার প্রতিমার দশা এই হ'য়েছে? আহা! মায়ের আমার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে। ওগো তোরা কে আছিস্ শীগ্গির ক'রে জল এনে বাছার মুখে চ'খে দে, আমি ও ঘর হ'তে সন্দেশ আনি, ভাল কাপড় আনি।"

প্রতিমা বলিল—"মা! এখন আমি এই কাপড় প'রেই থাকি, খানিক পরে——

শৈলরাজের জননী প্রতিমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তিনি দ্রুতপদে গৃহান্তরে গমন করিলেন।

সেই সময়ে বাটীর বরদাঝি প্রতিমার কাছে আসিল, একটু হাসিয়া বলিল—"হঁগো বৌ ঠাকুরুণ! বলি চিন্তে পার?" প্রতিমা কেমন করিয়া চিনিবে? বলিল—"না চিন্তে ত পারলাম না, তুমি কে?"

"আমি যে বরদা-ঝি।"

এই সময়ে রাজু প্রতিমাকে কি ইঙ্গিত করিল, প্রতিমা ইঙ্গিত বুঝিয়া বরদাকে বলিল "বটে তা বেশ! আচ্ছা ঝি! একটী কথা জিজ্ঞাসা কব্বি, বল দেখি, তোমাদের বাবু এখন কোথায়?"

"বাবু ওপর ঘরে আছেন।"

"সেখানে আর কে আছে?"

বরদা এবার একটু বেশী হাসিল, হাসিতে হাসিতে বলিল—"থাকবে আবার কে? কেউ নাই।"

"তুমি আমাকে সেই ঘরটী দেখিয়ে দিতে পার?"

এবার বরদার দাঁতের গোড়া পর্য্যন্ত বাহির হইয়া গেল, বলিল—"পারবোনা কেন; যাবে নাকি?"

"যাব।"

"তবে—এস।"

এই বলিয়া বরদা অগ্রবর্ত্তিনী হইল, প্রতিমা তাহার সুখদুঃখের সঙ্গিনী রাজু দিদির মুখপানে একবার চাহিল, চাহিবা মাত্র বড় বড় দুইটী ফোঁটা তাহার কপোলদেশে গড়াইয়া পড়িল। ছি প্রতিমা! স্বামী-সন্দর্শনের সময় কি কাঁদিতে আছে?

রাজু বলিল—"যাও দিদি! যা কপালে আছে, তাই হবে।"

একটী ঘরের পর আর একটী ঘর পার হইয়া বরদা অঙ্গুলি দিয়া শৈলরাজের ঘরটী দেখাইয়া দিয়া মুখ কাড়ুর দিয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে গেল।

লজ্জা! আর কেন যন্ত্রণা দাও, আর কেন প্রতিমার চরণযুগল বেড়িয়া ধর; তোমার জন্যইত অভাগিনীর এত যন্ত্রণা!

প্রতিমা জগজ্জননীর চরণধ্যান করিতে করিতে সেই গৃহ প্রবেশ করিল।

—০০—

একাদশ অধ্যায়।

মধ্যাহ্ন সময়ে শৈলরাজ অন্তঃপুরস্থ দ্বিতল একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কবিতা-পুস্তক পাঠ করিতেছিল, পাঠ করিতে করিতে একস্থানে দেখিতে পাইল—লেখা রহিয়াছে:—

সজনি! মরু মনে এবড়ি ধন্দা
যাতক চাহি, তিয়াষল অন্ধল
চকোর চাহি রহু চন্দা।"

এই দুই ছত্র পাঠ করিয়া সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, মনে মনে ভাবিল, এমন প্রেম বুঝি মানুষের হয় না; তাহা যদি হইত তাহা হইলে আমি প্রতিমার নিকট হইতে একখানি পত্রও কি পাইতাম না? সেবার তেমন কঠোরভাবে পত্র লিখিলাম, তাহারও ত কোন উত্তর পাইলাম না। স্বীকার করি,প্রথম প্রথম লজ্জা বশতঃ হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে পারে না, কিন্তু চিরদিনই কি হৃদয়-কপাট রুদ্ধ থাকে? যাক সে চিন্তা করিয়া লাভ কি? কিন্তু প্রতিমাকে ভুলিতে পারি না কেন? তাহার স্মৃতিইত আমার জীবনের দুঃখের কারণ, তবু তাহারই কথা মনে করি কেন? তবে কি প্রতিমা আমাকে অন্তরে অন্তরে ভালবাসে? যে যাহাকে ভাল বাসে, তাহার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদে; সে যদি না ভালবাসিত, তাহা হইলে প্রাণ এমন করিয়া কাঁদিত না; আচ্ছা, আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম না কেন? আমার প্রাণের ভিতর যে আগুণ জ্বলিয়াছে, তাহার প্রাণেও যদি সেই আগুণ জ্বলিয়া থাকে, তাহা হইলে হতভাগিনীর কি দারুণ যন্ত্রণা! আমি ত তাহার উপর রাগ করি নাই, আমি অভিমান করিয়া আছি। প্রতিমা যদি একটীবার হাসিয়া কথা বলে—তাহা হইলে আমার এ পর্ব্বত পরিমাণ অভিমান কোথায় ভাসিয়াযায়। ভাবিতে ভাবিতে আর একটী কবিতা তাহার নয়ন গোচর হইল; পাঠ করিল—

শুন শুন হে বিনোদ রায়,
তোমারে ছাড়িয়া, যে দুখে আছিনু
নিবেদি যে তুয়া পায়।
না জানি কি ক্ষণে, কুমতি হইল,
গরবে ভরিয়া গেনু;
তোমা হেন ধন, হেলায় হারায়ে,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু।
জনম অবধি, মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি
প্রাণসখিগণ দেখে প্রাণসম
পরাণ বঁধুয়া তুমি;
সখীগণে বলে, শ্যাম সোহাগিনী
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি আদর, তঁহু বাড়ায়লি
অব টুটায়ব কে?

আর পাঠ করা হইল না, পড়িতে পড়িতে নিদ্রাবেশে তাহার নয়ন যুগল মুদিয়া আসিতে লাগিল, সে পুস্তকখানি বুকের উপর রাখিয়া নিদ্রা জন্য নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিল।

আজ চারি পাঁচ বৎসর শৈলরাজ যুথিকে

সুখ অনুভব করে নাই, যখনই নিদ্রা গিয়াছে, তখনই কত কি স্বপ্নে তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। আজিও নিদ্রাগম হইবামাত্র সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। দেখিল—প্রতিমা যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মান ভিক্ষা চাহিতেছে,কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "হামারি আদর, তুঁহু বাড়ায়লি, অব টুটায়ব কে?" আমরি মরি কি সুন্দর! দেববালার মত মুখকান্তি আলুলায়িত কেশপাশ, অস্থিপঞ্জর সার! কে যেন শৈলরাজের পায়ে ধরিয়া মিনতিছে—"তোমা হেন বঁধু হেলায় হারায়ে, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু।" প্রতিমার মত মুখ, প্রতিমার মত দুঃখিনী, প্রতিমার মত মলিন-বরণা! কে যেন কাঁদিতেছে আর বলিতেছে—"তোমারে ছাড়িয়া, যে দুখে আছিনু, নিবেদি যে তুয়া পায়।" প্রীতি, ভক্তি, দয়া, সরলতা সবগুলি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া দাড়াইয়াছে। সকলের মধ্যে বসিয়া প্রতিমা নির্নিমেষে শৈলরাজের মুখপানে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—"নাথ! দুঃখিনীর হৃদয়সর্ব্বস্ব ধন। বল এ দাসীর কি অপরাধ? বল আর পায়ে ঠেলিবে না।"

বড় একটা যন্ত্রণা অনুভব করিয়া শৈলরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখিল—আমরি মরি! পদতলে স্বপ্নময়ী সেই প্রতিমা—সেই কৃষ্ণাঙ্গী মলিনবসনা প্রতিমা কাঁদিতেছে, যার মানভিক্ষা চাহিতেছে, তাহার উফ অশ্রুজলে শৈলরাজের চরণতল অভিষিক্ত হইতেছে।

আর কি মন ধৈর্য্য মানে? আর কি অভিমান হৃদয়াবেগ রুদ্ধ রাখিতে পারে? শৈলরাজ উপ্তবৎ দুইবাহু প্রসারিত করিয়া "প্রতিমা আমার হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী প্রতিমা! তোমার এই বেশ!"—বলিতে বলিতে প্রতিমাকে আপন বক্ষোপরি ধারণ করিল। অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদ্বেগে দুটি কণ্ঠই রুদ্ধ হইয়া গেল; দুই জনে দুইজনার মুখপানে চাহিতে চাহিতে যে নয়নজল বর্ষণ করিতে লাগিল, স্বর্গের দেবতারা তাহা চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রথম হৃদয়াবেগ শান্ত হইলে, শৈলরাজ প্রতিমাকে অঙ্কোপরি বসাইয়া ঘন ঘন মুখচুম্বন করিলেন, চুম্বনকালে শত শত অশ্রুবিন্দু প্রতিমার গণ্ডোপরি পতিত হইয়া তাহার অশ্রুধারার সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল; প্রতিমার বুকের ভিতর যত যন্ত্রণা রুদ্ধ ছিল, আজ যেন অশ্রুধারারূপে সে সকল বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। প্রথমে রোদন, তাহার পর হৃদয়ের অস্পষ্ট ভাষায় নয়নে নয়নে সম্ভাষণ হইয়া গেল, তাহার পর শৈলরাজ গদগদকণ্ঠে বলিল—"প্রতিমা! আমি পাষাণ হইতেও পাষাণ! রাক্ষস অপেক্ষাও নিষ্ঠুর! তুমি স্বর্গের দেবী! আমার শত শত অপরাধ তুমি মার্জ্জনা করিবে?"

আজ শৈলরাজের এ সম্ভাষণে সরলা প্রতিমার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল; শৈলরাজের বুকের উপর মুখখানি লুকাইয়া অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিল—"আমি তোমার পদসেবার দাসী। দাসীর কাছে তোমার আবার অপরাধ কি,নাথ?"

"না প্রতিমা! অপরাধ যদি না হবে, তা হলে তোমার এ মূর্ত্তি হবে কেন? এমন অস্থিপঞ্জরসার হবে কেন? এ মলিন বেশ হবে কেন?"

"আমার অন্য বেশে কাজ কি? যে তোমা হেন রত্নকুমারী হারিয়েছিল, তার আবার সাজ সজ্জায় কাজ কি? আমি যদি বুঝতে না পেরে কখন কোন অপরাধ করে থাকি, তুমি তা মার্জ্জনা কর।"

"তোমার অপরাধ? আর ব্যথা দিও না, এস, আজ আমার শূন্যহৃদয় সিংহাসনে অনন্ত জীবনের জন্য স্বর্ণ-প্রতিমা স্থাপিত করি, তোমার সংস্পর্শে আমার এ নরকসদৃশ দেহ পবিত্র হ'ক।"

এই বলিয়া শৈলরাজ পুনরায় প্রতিমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিল,প্রতিমা রামায়ণও মহাভারত পড়িয়াছে, সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এই সুখের জন্যই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী আপন আপন বনবাসী স্বামীর সঙ্গে বনবাসিনী! এখন যদি আমার মরণ হয়, তাহা হইলে আমার কত সুখ!!

উপসংহার।

শুভ মুহূর্ত্তে ফুল ফুটিল, মরুভূমে অমৃত বৃষ্টি হইল, প্রতিমার সুখের শেষ নাই।

মিলনের কয়েক দিন পরে শৈলরাজ আপন আত্মীয় কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিল। প্রতিমা সেদিন স্বহস্তে রন্ধন করিল। রন্ধনান্তে শৈলরাজের জননী মুনোহর বস্ত্রালঙ্কার দিয়া প্রতিমাকে সাজাইয়া দিলেন। প্রতিমা সজ্জিত হইয়া অন্ন ব্যঞ্জনের থালা হস্তে যখন পরিবেশন করিতে বাহির হইল, তখন সকলে দেখিল যেন রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা আসিয়া স্বয়ং দাঁড়াইয়াছেন।

উৎসবান্তে শৈলরাজ প্রতিমাকে সঙ্গে করিয়া বিশেষ আড়ম্বরের সহিত হরিপুর গেল, প্রতিমার সৌভাগ্য দেখিয়া সকলেই আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। নাপিত বৌ, শোভা, সোহাগী এরা পাঁচ বৎসরের পর প্রতিমার সহিত প্রাণ খুলিয়া হাসিল। সেখানেও কয়দিন উৎসবের স্রোত চলিতে লাগিল। কেবল প্রসন্ন ঠাকুরাণী সে উৎসবে যোগ দিতে পারিল না।

একদিন শোভা আসিয়া শৈলরাজকে বলিল,—"হাঁ ভাই, তোমরা এমন নির্ব্বোধ কেন?"

শৈলরাজ একটু হাসিয়া বলিল "কিসে?"

"কিসে! তা বটে। কেন জাননা? ছেলে মানুষ কথা না কইলে অত রাগ কর কেন? যদি সই না যেত?"

"না গেলে আর অধিক দিন বাঁচতাম না।"

"বটে? তবুও ভাল। তুমি বাঁচ আর না বাঁচ একজন কিন্তু সত্যি সত্যিই বাঁচত না।"

"আর লজ্জা দিতে হবে না, খুব শিক্ষা পেয়েছি।"

শোভা হাসিয়া চলিয়া গেল।

তিন বৎসর পরে প্রতিমার একটি কন্যা হইল, তাহার নাম রাখিল প্রভাত। শৈলরাজের অনুগ্রহে শোভার স্বামীর বড় চাকরী হইল, নাপিত বৌয়ের দালান হইল, সোহাগীর গা ভরা গয়না হইল, আর আমাদের প্রসন্ন ঠাকুরাণী বিষম শ্লেষ্মরোগে শয্যাগতা হইল। এইবার আমাদের উপন্যাস ফুরাইল।

হিন্দুর জ্যোতিষ।

প্রথম প্রস্তাব।

জগদ্বিধাতে তমসাং নিহন্ত্রে
গোত্রে প্রজানাং ফলসম্প্রদাত্রে।
গন্ধে ক্ষণং শ্রোত্রসি ভাব কর্ত্রে
তস্মৈ নমো ধীবিধয়ে সবিত্রে॥

জ্যোতিষ হিন্দুর সর্ব্বস্বধন। জ্যোতিষ নহিলে হিন্দুর এক মুহূর্ত্তও চলে না। যে সময়ে জীব গর্ভশয্যায় শয়ন করে, সেই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত—শুধু মৃত্যুকাল কেন?—মৃত্যুর পর পর্য্যন্তও জ্যোতিষের সহিত হিন্দুর অতি নিকট সম্বন্ধ। হিন্দুর জীবনের প্রতি কার্য্যে জ্যোতিষের সাহায্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এজন্য প্রত্যেক হিন্দুরই অল্পাধিক জ্যোতিষ জানা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু কালের গতিতে আমাদের দেশে জ্যোতিষের চর্চ্চা একরূপ লোপ হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

শুনিতে পাই, কিছু কাল পূর্ব্বে ধর্ম্মকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাত্রেই বিশেষরূপ জ্যোতিষজ্ঞ না হইতে পারিলে,—অন্ততঃ, যাত্রা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যোতিষতত্ত্বগুলিও পাঠ না করিলে—শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া আখ্যাত হইতেন না; কিন্তু এখন এই বঙ্গদেশে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে পঞ্জিকার "যাত্রাশুভ" দেখিয়াই পণ্ডিতেরা (!!) যাত্রিক দিন নির্ণয় করিয়া দিয়া থাকেন। ব্যক্তি বিশেষে শুভ দিন নির্ণয় করিয়া দিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই। জ্যোতিষের কঠিন সমস্যার কথা ত কঠিন ও সমস্যার কথা!

এই খানে একটি ঘটনা বিবৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন স্থানে এক বিবাহ সভায় অনেকগুলি ভট্টাচার্য্যের সমাবেশ হইয়াছিল। সকলেই পণ্ডিত; কাজেই বিবাহ-লগ্ন লইয়াই তাঁহাদের তর্ক হইতেছিল। আমি কৌতূহলী হইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া সেই তর্ক শুনিতেছিলাম। গতিক দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে সে তর্ক ত সমাপ্ত হইবেই না, তবে মুখে মুখে মীমাংসা হইতে হইতে শেষে হাতে হাতে মীমাংসা না হইলেই রক্ষা। কারণ পণ্ডিতগুলির মধ্যে কতকগুলি বরপক্ষীয় এবং কতকগুলি কন্যাপক্ষীয়।

আমি এই অবসরে তাঁহাদের তর্কনিবৃত্তির জন্য অতি বিনীতভাবে বলিলাম, "মহাশয়, বহুদিন হইতে আমার একটী সন্দেহ আছে, আপনারা সকলেই পণ্ডিত, অতএব যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার সন্দেহ দূর করিয়া দেন,তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই। সন্দেহ এই,—'পঞ্জিকাতে দেখি, উদয়ের সময়ে সূর্য্য যে রাশিতে থাকেন, সে রাশির পরিমাণ উর্দ্ধ সংখ্যায় দণ্ডের অধিক নয়, কিন্তু ক্রিয়া করাইবার সময় আপনারা সেই প্রাতঃকালের রাশিরই উল্লেখ করিয়া "অমুকরাশিস্থে ভাস্করে" বলেন কেন?

আমার প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহারা সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এই সহজ কথাটা বুঝিতে পার না। প্রাতঃকালে সূর্য্য

যেখানে থাকেন, সেই রাশিটাই আবহমানকাল সূর্য্যের রাশি বলিয়া ধরা হইয়া থাকে ; কেন না সূর্য্য কখন্ কোন্ খানে থাকেন, তাই ঠিক করিবার জন্য ত আর সিলেট পেন্‌সিল সংযোগ করিয়া ক্রিয়াকর্ম্ম করাইতে যাওয়া যায় না। আমি বলিলাম, "যদি ক্রিয়ার সময়ে সূর্য্য আর এক স্থানেই থাকেন, তবে সামান্য শ্লেট আর পেন্‌সিলের জন্য সে স্থানটা ঠিক করা হয় না কেন? ইহাতে ত কর্ম্মে ব্যতিক্রম হয়।"

উত্তর।—"না হে, তা হয় না, পুরুষানুক্রমে যাহা হইয়া আসিতেছে, তাহা না করাই পাপ!—বিশেষতঃ যখন রাত্রিকালে সূর্য্যদেব শয়ন করেন, তখন কি বলা যাবে?"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "সে সময় 'শয্যাস্থিতে ভাস্করে' বলিতেই বা দোষ কি?"

এই সকল পণ্ডিতেরাই আবার লগ্ন লইয়া তর্ক করিতেছিলেন! যাঁহারা লগ্ন আর রবি-ভোগ্য রাশির পার্থক্য বুঝেন, তাঁহারাই বুঝেন "অমুক রাশিস্থে ভাস্করে" কেন বলা হয়। ফল কথা—এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে জ্যোতিষে সামান্য-মাত্র জ্ঞানহীন অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ আমাদেরই শাস্ত্রে আছেঃ—

"সিদ্ধান্ত সংহিতাহোরারূপ স্কন্ধত্রয়াত্মকং।
বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষুর্জ্জ্যোতিঃ শাস্ত্রমকল্মষং॥
বিনৈতদখিলং শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্ম ন সিধ্যতি।
তস্মাজ্জগদ্ধিতায়েদং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা॥
অতএব দ্বিজৈরেতদধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।

ব্রাহ্মণমাত্রেরই ইহা যত্নের সহিত অধ্যয়ন করা উচিত। কেন না "বিনৈতদখিলং শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্মন সিধ্যতি।" আজ কাল যে আমরা ক্রিয়া কর্ম্মের ফল পাই না, কেন, তাহা ত আর বুঝিতে বাকী রহিল না।

এইবার দেখা যাউক এই শাস্ত্র কিরূপ? যাহার অভাবে এত অমঙ্গল হইতে পারে, তাহা স্বরূপ কি? জ্যোতিষ বেদের ষড়ঙ্গের একটী অঙ্গ।

"শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চয়ঃ।
জ্যোতিষাময়নংচৈব বেদাঙ্গানি ষড়েবতু॥"

বেদাধ্যয়ন ও বেদবিহিত ক্রিয়া কর্ম্মাদির কালনির্ণয়ের জন্যই জ্যোতিষের প্রয়োজন। এই জন্যই জ্যোতিষ একটী বেদাঙ্গ যথা—

"বেদাস্তাবদ্‌যজ্ঞ কর্ম্মপ্রবৃত্তা,
যজ্ঞা প্রোক্তাস্তেতু কালাশ্রয়েণ।
শাস্ত্রাদস্মাৎ কালবোধো যতঃ স্যাৎ
বেদাঙ্গত্বং জ্যোতিষস্যোক্তমস্মাৎ॥"

বেদাঙ্গসমূহের মধ্যে এই জ্যোতিষ আবার প্রধান বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"যথা শিখা ময়ূরানাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্দ্ধি সংস্থিতং।
শুভক্ষণ ক্রিয়ারম্ভ জনিতাপূর্ব্বসম্ভবাঃ।
সম্পদঃ সর্ব্বলোকানাং জ্যোতিষস্য প্রয়োজনম্॥"

জ্যোতিষের মত প্রত্যক্ষ শাস্ত্র আর নাই। যে ব্যক্তি যথারীতি জ্যোতিষ ও জ্যোতিষের আনুসঙ্গিক শাস্ত্রনিচয় অভ্যাস করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন, তিনি যে ত্রিকালদর্শী হইতে পারেন, তৎপক্ষে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। গ্রহনক্ষত্রসমূহের সহিত মানবদেহে —শুধু মানব দেহের কেন—পার্থিব সমুদয় পদার্থেরই যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা যিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। তিথিবিশেষে রোগ-বিশেষের হ্রাস বৃদ্ধি—জোয়ার ভাটার সময় পরিবর্ত্তন —এই সমুদায় দ্বারা গ্রহগণের—বিশেষতঃ চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি ভালরূপ জ্যোতিষ জানেন, তাঁহার নিকট কাহারও বিশুদ্ধ জন্মকোষ্ঠী বা জন্ম সময়ের রাশি চক্রখানি দিলে, সেই ব্যক্তির তাৎ

কালিক শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ঠিক বলিয়া দিতে পারেন, ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ, রোগ শোক, ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি সমুদায়ই রাশিচক্রসংস্থান দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে। এই জন্যই জ্যোতিষ শাস্ত্র অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারে যে—

"বিফলান্যানি শাস্ত্রাণি
বিবাদেষু কেবলং।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং
চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ॥"

এই জ্যোতিষ শাস্ত্র অতি প্রাচীন। এত প্রাচীন যে, তাহার সময় নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যখন জ্যোতিষ একটি বেদাঙ্গ; তখন ইহা যে বেদের সমসাময়িক, এই মাত্রই নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উল্লেখ করিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এসিয়াটিক সোসাইটির একজন সদস্য জন বেন্টলি (John Bentley)। ইনি হিন্দুদিগের বিবিধ জ্যোতিষগ্রন্থের ও গ্রন্থকর্ত্তাদিগের এবং প্রসঙ্গতঃ অনেক পৌরাণিক ঘটনার সময়-নিরূপণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিই তাঁহার গ্রন্থের * প্রারম্ভে হিন্দুর জ্যোতিষের উৎপত্তি-সময়ের-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া বলিয়াছেন—"The early part of Astronomy among the Hindus, like that of all other nations, is involved in great obscurity. We can find no certain trace, who the persons were that first began the science, nor the means employed by them for effecting thier grand purpose."

আর একজন পণ্ডিত পিতর বর্লো (Peter Barlow), তিনি হিন্দুদিগের প্রাচীন জ্যোতিষকে শাস্ত্র বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু ইহার প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন। তিনি বলেন "However ancient may be the rude observations of the Chinese and Indians they possessed no science properly so called." কিন্তু রিচার্ড এ. প্রক্টর (Richard A. Proctor) পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদমণ্ডলীর মধ্যে একজন নিতান্ত সামান্য নহেন, তিনি প্রাচীন জ্যোতিষের ইতিহাস লিখিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "The claims of the Indians rest on a more solid foundation. We are in possession of the tables from which they compute the eclipses and places of the planets and of the method by which they effect the computations. We have, in short, an Indian Astronomy committed to writing, which represents the celestial Phenomena with considerable exactness and which, therefore, could only be produced by a people far advanced in science" † কিন্তু তিনিও এই শাস্ত্র কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। ফল কথা হিন্দুর জ্যোতিষ যে অত্যন্ত প্রাচীন, তৎপক্ষে কিছু মাত্রও সন্দেহ নাই।

এই শাস্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, গণিত জ্যোতিষ ও ফলিত

* A Historical View of the Hindu Astronomy, Part. I, Sec 1.

* The Encyclopedia of Astronomy p. 493.
† Encyclopedia Britannica Vol II.

জ্যোতিষ। ফলিত জ্যোতিষ আবার বহুভাগে বিভক্ত, যথাঃ—জাতক, প্রশ্ন, রাষ্ট্রবিপ্লব, শাকুনশাস্ত্র, সামুদ্রিক শাস্ত্র, রোগাদি গণনা, ঝড় বৃষ্টি গণনা ইত্যাদি।

জ্যোতিষকে আবার কোথাও ত্রিস্কন্ধ—কোথাও বা পঞ্চস্কন্ধ বলিয়া বিভিন্নরূপে বিভক্ত করা হইয়াছে। ত্রিস্কন্ধ যথা নারদীয়ে——

“সিদ্ধান্ত সংহিতা হোরারূপস্কন্ধ ত্রয়াত্মকং॥”

অন্যত্র পঞ্চস্কন্ধ যথাঃ—

“পঞ্চস্কন্ধমিদং শাস্ত্রং হোরাগণিতসংহিতা।
কেরলী শাকুনঞ্চৈব ইত্যাদি”

“শব্দকল্পদ্রুমধৃত প্রশ্নরত্নটীকা।”

ইহার মধ্যে সিদ্ধান্ত বা গণিতস্কন্ধ দ্বারা গ্রহগণের গতিবিধি নিরূপিত ও গ্রহণাদি গণিত হইয়া থাকে। এই স্কন্ধ ব্যতীত অন্য স্কন্ধ সমুহের ফল সুচারুরূপে নির্ণীত হইতে পারে না। সংহিতাস্কন্ধ দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্মনিচয়ের সময়াদি ব্যবস্থিত হয়। হোরাস্কন্ধ দ্বারা রাশ্যাদি বিষয়ে বহুবিধ গণনা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; ইহাও গণিতের এক অংশ। ফলিতাংশের সহিত এই অংশের বিশেষ সম্পর্ক আছে। কেরলী দ্বারা প্রশ্ন গণিত হয়। শাকুনশাস্ত্র দ্বারা জীবজন্তুর স্বরযোগে বিবিধ বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে।

জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে; তন্মধ্যে সূর্য্যসিদ্ধান্তই প্রাচীনতম বলিয়া অনুমিত হয়। কান্যকুব্জনিবাসী বলভদ্র প্রণীত সঙ্কায়ণরত্নে ১৮জন জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তকারের নাম পাওয়া যায়; যথা—১সূর্য্য ২ব্রহ্মা ৩ব্যাস, ৪বশিষ্ঠ, ৫অত্রি, ৬পরাশর, ৭কশ্যপ, ৮নারদ, ৯গণ, ১০মরীচি, ১১মনু, ১২অঙ্গিরা, ১৩লোমশ, ১৪পৌলিন, ১৫চ্যবন, ১৬যবন, ১৭বৃহস্পতি ও ১৮শৌনক। এতদ্ব্যতীত ভৃগু সংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন সংহিতা গ্রন্থও বর্ত্তমান আছে। আমরা এই প্রবন্ধে প্রথমতঃ গণিতজ্যোতিষ তৎপরে ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা করিব।

ঠাকুর-ঝি।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরালাল বাবুর বাড়ী কলিকাতা, পটলডাঙ্গায়। আমরা শুনিয়াছি, কলিকাতায় ইহাদের অনেক দিনের বাস। বাড়ীখানি দেখিলে সে প্রমাণের আর আবশ্যক করে না। পল্লীগ্রামের বাড়ীর ন্যায় রীতিমত দুই মহল বাড়ী এবং বাড়ীর সংলগ্ন এক খানি ক্ষুদ্র বাগান ও খালি জমী প্রভৃতি দেখিলেই বহুদিনের বাস বলিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সে সময় কলিকাতার জমীর এত অধিক মূল্য ছিল না, বিগত বিশবৎসরের মধ্যে কলিকাতার জমীর মূল্য কোন কোন স্থলে শতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং এখন গৃহস্থলোক দুই-এক কাঠা জমীর উপরেই দুই মহল বাড়ী প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

হীরালালের বাড়ীর সম্মুখেই অনেকখানি খালি জমী পড়িয়াছিল, প্রজা বিলি করিলে বিলক্ষণ দশ টাকা আয় হইতে পারিত, কিন্তু বাড়ীর শোভা নষ্ট হইবে বলিয়া হীরালাল বাবু সে জমী প্রজা বিলি করেন নাই; অথচ সে জমীর শোভার জন্য কোনরূপ ফুলবাগানের বন্দোবস্ত ছিল না, কেবল স্বভাবজাত নবদূর্ব্বাদলসকল যেন বাড়ীর সম্মুখে—দুই পার্শ্বে দুইখানি—সবুজ রংয়ের গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছিল। সদর দরজা পার হইলেই ডানদিকে দরওয়ান, বেহারা প্রভৃতি ভৃত্যগণের থাকিবার স্থান এবং বামদিকে একটি বিস্তৃর্ণগৃহ; পূর্ব্বে সে গৃহে কাছারী বসিত, এখন জমীদারীই নাই, তা কাছারী বসিবে কিরূপে? এখন ইহাকে একটা গুদাম ঘরের ন্যায় ব্যবহার করা হয়, অনেক অনাবশ্যকীয় দ্রব্য এই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তাহার পরই বিস্তৃর্ণ প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িতে হয়। উত্তর মুখে সদরদরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণে আসিতে হয়। এই প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে বৃহৎ সাতটি খিলানযুক্ত পূজার দালান। দালানের মধ্যেও তিনটা মহল; দালান, দরদালান ও রক্। এরূপ বৃহৎ দালান কলিকাতায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দালানের কার্য্য অনেক দিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এখন কেবল কতকগুলি উট্‌কো পায়রা সেই দালানে উৎপাৎ করিয়া বেড়ায়। তবে এই বাড়ীর বেহারার অনুগ্রহে সে উৎপাতেরও অনেকটা লাঘব হইয়া আসিয়াছিল। প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে দালান এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে এই দালানের সহিত চক-মিলান বারাণ্ডা আর উত্তরদিকে অন্দর-বাড়ী। সদর বাড়ীর বৈটকখানা প্রভৃতি সমস্তই দ্বিতলের উপর।

সদরবাড়ীর ন্যায় অন্দর বাড়ীও প্রকাণ্ড, তবে ঐ অন্দরের পশ্চিমাংশের কতকটা এখন ঘেরিয়া আর একটা খণ্ড করা হইয়াছে। তবে সে খণ্ড দ্বিতল নহে। হীরালাল বাবুর অন্দরের উত্তরাংশের ঘরগুলিও একতালা আর অন্যান্য সমস্তই দ্বিতল। সেই কারণ পশ্চিমাংশের খণ্ডে হীরালাল বাবুর অন্দর হইতে যাইতে ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে ঐ একতালা ঘরের ছাদের উপর দিয়া যাওয়া যায়। ঐ খণ্ড ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে, সেই কারণ তাহার প্রবেশের দরজা প্রভৃতি সমস্তই স্বতন্ত্র ছিল। তবে গৃহস্থ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভাড়া দেওয়া হইত না। সেই ভাড়াটিয়ার স্ত্রীলোকগণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ছাদ দিয়া হীরালাল বাবুর অন্দরের মধ্যে আসিতে পারিত, এবং তাঁহার বাড়ীর স্ত্রীলোকগণও ইচ্ছা করিলে ভাড়াটিয়াদিগের অন্দরের মধ্যে গিয়া স্ত্রীলোকগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারিত। কেহ কাহার অন্দরের মধ্যে না গেলেও হীরালাল বাবুর অন্দরের একতালা অংশের ছাদের সহিত ঐ খণ্ডের ছাদ এক থাকায়, এই ছাদে বসিয়াই অনেক সময় উভয় বাড়ীর স্ত্রীলোকগণের কথোপকথন চলিত।

হীরালালের বাড়ীর সম্বন্ধে আমাদের এত কথা বলিবার কিছুই আবশ্যক ছিল না, কেবল পরেশনাথ এখন এই অন্দরের-পশ্চিমাংশের খণ্ডে আসিয়া বাস করিতেছে বলিয়াই, আমরা এত কথা বলিলাম। সেই বালিকা কন্যা সুখদা ও শিশুপুত্র বলিয়া পরেশনাথের সংসার। অন্য কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না। পরেশনাথ স্বয়ংই রন্ধনাদি করিবে, এইরূপ স্থির ছিল। প্রথম প্রথম পরেশনাথ স্বয়ংই সমস্ত সাংসারিক কার্য্য স্বহস্তে করিত। তাহার পর পরেশনাথ দেখিল ইহা তাহার পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক, কারণ পরেশনাথের কোনরূপ নির্দ্ধারিত চাকুরী না থাকিলেও, তাহাকে উপার্জ্জনের জন্য সর্ব্বদাই বাহিরে যাইতে হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দালালি, মোকদ্দমার তদ্বির, মিথ্যাসাক্ষী দেওয়া প্রভৃতি পরেশনাথের অনেক রকম ব্যবসা ছিল। বাড়ীতে সাংসা-

রিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে তাহার এই সকল ব্যবসা মাটি হইয়া যায়। সুতরাং পরেশনাথ কিরূপে সাংসারিক কার্য্য লইয়া সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিতে পারে? এদিকে বেতন দিয়া লোক রাখিবার ক্ষমতা পরেশনাথের ছিল না, আর বেতন দিতে স্বীকৃত হইলেও কোন দাসদাসী তাহার বাসায় থাকিতে চাহিত না। সুতরাং ক্রমে ক্রমে সাংসারিক কার্য্যের ভার পড়িল—সেই ক্ষুদ্র বালিকা সুখদারই উপর!

সুখদা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ঘর-দোওয়া ঝাঁট-দেওয়া, বাসন-মাজা প্রভৃতি কার্য্য সেরে করিত, তাহার পর উনুনে আগুন দিয়া স্নান করিতে যাইত। সুখদা দুগ্ধ-আল দিয়া সর্ব্ব প্রথমে সেই ভাইটীকে দুগ্ধপান করাইত, তাহার পর রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত থাকিত। সুখদা হাঁড়িতে চাউল ঢালিয়া দিয়া যে অবসরটুকু পাইত, সেই সময় ছোট ভাইটীকে লইয়া একটু খেলাও করিত। অনেকসময় রন্ধনাদি শেষ করিয়া তাহাকে পিতার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইত। পরেশনাথের বাড়ী ফিরিয়া আসিবার কোন নির্দ্ধারিত সময় ছিল না; কোন দিন দশটার পরেই আসিত, আবার কোন দিন বাড়ী ফিরিয়া আসিতে আড়াই প্রহর অতীত হইয়া যাইত। বালিকা পিতার জন্যে আহার করিতে পারিত না, ক্ষুধায় অস্থির হইলেও বালিকার অসাধারণ সহিষ্ণুতা ছিল।

যাহার যেরূপ অবস্থা, বিধাতা তাহার প্রকৃতিও সেইরূপ ধাতুতে গঠন করিয়া থাকেন। দশম বৎসরের বালিকা যে এরূপ একটি ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতে সক্ষম হইতে পারে, একথা শুনিলে হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না; কিন্তু সুখদা এখন যে অবস্থায় পড়িয়াছে, তাহাতে সেই মঙ্গলময় ঈশ্বর তাহাকে এরূপ পরিশ্রমীও কষ্টসহিষ্ণু না করিলে, বোধ হয়, সুখদাও তাহার ভ্রাতার জীবন এতদিন থাকিত কি না সন্দেহ।

আহারের পর সুখদা পুনরায় বাসন-মাজা, ঘর-ধোওয়া প্রভৃতি কার্য্য শেষ করিত, তাহার পর ছোট ভাইটিকে দুধ খাওয়াইয়া তাহাকে লইয়াই একটু খেলা করিত। আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাঁধিতে বসিত। অনেক সময় সেই ভাইটিকে কোলে লইয়াই তাহাকে রাঁধিতে হইত। তবে যদি কৌশলে তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পারিত, তবে সেই রন্ধনশালার এক ধারেই তাহাকে শয়ন করাইয়া সুখদা রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত থাকিত। এ শিশুও আপন অবস্থা কতক বুঝিত; অন্যান্য শিশুর ন্যায় ইহাকে সর্ব্বদাই কোলে লইয়া থাকিতে হইত না। সেরূপ হইলে সুখদার যন্ত্রণার সীমা থাকিত না।

সন্ধ্যা হইলেই সুখদার প্রাণের ভিতর কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইত; বালিকা এই সময় এক অব্যক্ত যন্ত্রণা প্রাণের ভিতর অনুভব করিত। সুখদার পিতা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে যত রাত্রি হইত, বালিকার প্রাণে ততই যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইত; বালিকা ভয়ে মৃত্যুপ্রায় হইয়া পড়িত। বালিকা কি তবে ভূতের ভয়ে ভীত হইত? সুখদা যে অবস্থায় পড়িয়াছে, সে অবস্থায় ভূতের ভয় থাকিতে পারে না। সুখদা পিতার ভয়ে এইসময় যেরূপ ভীত হইয়া পড়িত; তাহাতে ভূতের ভয় তাহার মনের মধ্যে কোন মতেই স্থান পাইত না; সন্ধ্যার পর তাহার সেই ক্ষুদ্রহৃদয় পিতার ভয়েই পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। সে ভয়ের কারণ বলিতেছি।

পরেশনাথ প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সুরাপান করিয়া বাড়ীতে আসিত, তবে যে দিন যে রূপ অর্থ হাতে থাকিত, তাহার সুরাপানের মাত্রাও সেই দিন সেইরূপ হইত। পিতার বাড়ী ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইলেই সুখদার প্রাণ ভয়ে উড়িয়া যাইত; কারণ সেই দিন পরেশনাথ অধিক মাত্রায় সুরাপান করিত। এরূপ অবস্থায় সুখদা সাংসারিক এই গুরুতর পরিশ্রমের পর সেই নিষ্ঠুর পিতার হস্তে প্রহার পর্য্যন্তও খাইত। আচ্ছা, সুখদার কি কোন সুখ এপৃথিবীতে ছিল না? কেহ কি তাহার দুঃখে সহানুভূতি করিত না? কেহ কি তাহার সাংসারিক কার্য্যে সাহায্যও করিত না? কেহ কি তাহাকে আদর যত্ন করিত না? বাস্তবিক যদি এইরূপ হইত তবে সুখদা কতদিন জীবিত থাকিতে পারিত? এক দেববালা সুখদার সুখের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। পক্ষী যেমন আপন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আপনার শাবককে রক্ষা করে, সেই দেববালা সেইরূপ যত্নের সহিত সর্ব্বদাই সুখদাকে রক্ষা করিত। সে দেববালা অন্য কেহ নহে, সে আমাদের সেই বালবিধবা অমলা!

ঠাকুর বংশ।

(২)

মোহন মিশ্র কালাচাঁদ বিগ্রহ লইয়া দৈত্যক নিবাস খাসখামারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পেউঙ্গ হইতে খাসখামার অধিক দিনের পথ নহে। তিনি পর দিবসেই সেই বৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্রে খাসখামারে উপস্থিত হইলেন।

পরিবর্ত্তন-শীল কালের নিকট কিছুই স্থিরাধীন নহে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বস্তু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; কিন্তু সে সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন সাধারণ বুদ্ধির অগম্য হইলেও নিজদেহের বাল্য, যৌবন, জরাভাব সকলেরই প্রত্যক্ষ। দুই বৎসর পূর্ব্বে যেস্থানে যাহা দেখিয়াছি, আজি তাহা নাই,—যাহা ছিল না, আজি তাহা বিদ্যমান। মোহন মিশ্র খাসখামার গ্রামে যাহা দেখিয়া গিয়াছিলেন, আজি তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। সুদীর্ঘ চতুর্ব্বিংশতি বৎসরে খাসখামার ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার স্নেহময় জনক জননী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তৎকালে যাহারা বৃদ্ধ ছিল, তাহারা প্রায়ই পরলোকগত। যাহারা যুবা ছিল তাহারা বৃদ্ধ হইয়াছে, যাহারা তাঁহার সহচর ছিল এক্ষণে তাঁহারা প্রৌঢ়। যাহারা তাঁহার গ্রামত্যাগকালে জন্ম গ্রহণ করে নাই। তাহারা এক্ষণে যুবক; সুতরাং মোহন মিশ্র কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না, তাঁহাকেও কেহ চিনিতে পারিল না। সকলেই তাঁহাকে পরিব্রাজক কায়রূপী সন্ন্যাসী বলিয়া স্থির করিল।

রামচন্দ্র মিশ্রের লোকান্তরগমনের পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ মিশ্র কাজলাহার গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন; জ্যেষ্ঠ গোপীবল্লভ এক্ষণে পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটীর সম্পূর্ণ

অধিকারী। মোহন মিশ্র বহুকাল পরে ভ্রাতৃ-সন্দর্শন লাভ করিলেন। গোপাবল্লভের এক্ষণে শারীরিক অনুস্থান্ত হইলেও মোহন মিশ্র তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। কিন্তু গোপীবল্লভ কনিষ্ঠ সহোদরকে চিনিতে পারিলেন না। মোহন মিশ্র আনুপূর্ব্বিক পরিচয় প্রদান করিলেন—তথাপি তিনি চিনিতে পারিলেন না। ঘোর স্বার্থ আসিয়া গোপীবল্লভকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পরিচয় প্রদানের পর প্রাচীন অধিবাসী ও অন্যান্য আত্মীয়গণ অনেকে তাঁহাকে চিনিতে পারিল বটে, কিন্তু গোপীবল্লভ কিছুতেই স্বীয় সহোদরকে চিনিতে পারিলেন না। উদারহৃদয় মোহন মিশ্র আর তাঁহার সহিত বাদানুবাদ না করিয়া পরদিন প্রত্যূষেই বাস ধামার ত্যাগ করিলেন।

মোহন মিশ্র বাসধামীর হইতে বহির্গত হইয়া বর্ত্তমান পাকুড়িয়া গ্রামে উপনীত হইলেন। সে সময় পাকুড়িয়াতে লোকালয় ছিল না। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত মাঠ ও মধ্যে মধ্যে উচ্চভূমি। বর্ষাকালে মাঠগুলি জলে পূর্ণ হইয়া যাইত, কেবল ক্ষুদ্র দ্বীপাকার ২৪টি উচ্চভূমি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না। ঐ সমস্ত ভূমি বৃক্ষাদি-পরিশূন্য। কেবল একটী অত্যন্তসলিলা সঙ্কীর্ণা স্রোতস্বিনীর পশ্চিমতীরে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর একটী প্রকাণ্ড "পাকুড়" বৃক্ষ ছিল। মোহনমিশ্র ঐ পাকুড় বৃক্ষতলেই প্রথম আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জানিনা কি বুঝিয়া তাঁহার ঐ জনহীন বৃক্ষাদি-পরিশূন্য প্রান্তর মধ্যে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষ জন্মিল।

ক্রমে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে প্রকাশ পাইল যে কামরূপ হইতে একজন মহাতেজস্বী উদাসীন আসিয়া নদীতীরে আসন নির্দ্দেশ করিয়াছে। প্রতিদিন নানা স্থান হইতে বহুতর লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল এবং তাঁহার জ্ঞানগর্ভ মিষ্টালাপে সকলেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইল। ক্রমশঃ তিনি বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কালাচাঁদ বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। ঐ পাকুড় বৃক্ষই তাঁহার প্রথম আশ্রয়; সেই জন্য ঐ বৃক্ষের নামানুসারে গ্রামের নাম "পাকুড়িয়া" নির্দ্ধারিত হইল।

মোহনমিশ্র প্রায় ছয়মাস কাল ঐ স্থানে বাস করিয়া ঈশ্বরারাধেশ-পালন জন্য দার-পরিগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই সেই অজ্ঞাতকুলশীল উদাসীন পাত্রে কন্যাদান করিতে সম্মত হইল না। তখন তিনি বারেন্দ্রকুলের কর্ত্তা তাহীরপুরের রাজা কংসনারায়ণের নিকট গমন করিয়া (ঈশ্বরাদেশে) তাঁহার দার-পরিগ্রহের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। যদিও মোহনমিশ্রের আকৃতিগত অসাধারণ তেজস্বিতা দেখিয়া রাজা কংসনারায়ণের তত্দূর অবিশ্বাস জন্মিল না, তথাপি কিছুদিন পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার ক্ষমতা জানিবার বাসনায়, তৎকালে কোনও উত্তর দান না করিয়া, তাঁহার বাসের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

মোহন মিশ্র তান্ত্রিক "যোগ-বলে রাজা নারায়ণকে কতকগুলি অমানুষিক কার্য্য প্রদর্শন করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার ভক্তির পাত্র হইয়া উঠিলেন। আর মোহন মিশ্রের থাকে তাঁহার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। রাজা প্রতিদিনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানাবিধ ধর্ম্মালাপ করিতেন,এবং তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। রাজা কংস নারায়ণের প্রথমে উদাসীন গ্রাম-নিবাসী কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তীর গৃহ-গুরুসম্পদা ভবাণী দেবীর সহিত মোহন

মিশ্রের পরিগ্রহ-সম্বন্ধ স্থির হইল। রাজা, মোহন মিশ্রকে স্বীয় নিকটে কুটুম্ব বলিয়া সমাজে পরিচিত করিলেন, সুতরাং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও কোন আপত্তি রহিল না। শুভদিনে উদাসী গ্রামে দম্পতি কুসুম-যুগল এক সূত্রে গ্রথিত হইল। দর্শকগণ মণি-কাঞ্চন যোগ ও স্বর-স্বার্থতী-মিলন প্রত্যক্ষ করিলেন।

বিবাহের অল্পদিন পরেই মোহন মিশ্র সস্ত্রীক পাকুড়িয়া গ্রামে আগমন করিলেন। পাকুড়িয়া হইতে উদাসী গ্রাম দুই ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। সুতরাং কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বদাই কন্যাজামাতার তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেন।

যে কারণে মোহন মিশ্র বঙ্গীয় সমাজে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন,—যে কারণে বারেন্দ্র সমাজের গণ্য মান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন,—যে জন্য মোহন মিশ্রের নামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বংশধরগণ বারেন্দ্র কুলে বিখ্যাত,—যে জন্য অদ্য বঙ্গেশ্বর নাটোরাধিপতি, পূর্ব্ব ময়মনসিংহের বিখ্যাত জমিদারগণ, কুলিন-শ্রেষ্ঠ বুলিহারের রাজবংশ তাঁহার বংশধরগণকে গুরুত্বে বরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন,—এই সময় হইতেই সেই সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। যোগাচার-মিশ্রিত গৃহস্থাশ্রম এবং "নাকারোপাসনার সামঞ্জস্য বিধান" জন্য মহাপুরুষ মোহন মিশ্র বঙ্গীয় সমাজে দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

মোহন মিশ্রের অত্যন্ত পূর্ব্বে সংসার-ত্যাগী শ্রীচৈতন্যদেব যে স্বর্গীয় কৃষ্ণ-প্রেমের পবিত্র স্রোতে দেশ ভাসাইয়া ঈশ্বরবত্তারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন,—তাঁহার অন্তর্দ্ধানের অব্যবহিত পরেই সে পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম, কতকগুলি স্বার্থান্ধ ব্যক্তির হস্তে পতিত হইয়া ঘোর দেবদ্বেষী ও জাতিনাশক ধর্ম্মে পরিণত হয়। ক্রমে "নেড়ানেড়ীর দল" শাকের সহিত একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন, একত্র বাস এমন কি কথোপকথন পর্য্যন্ত ত্যাগ করে। বিষপত্র জবাকুসুম রক্তচন্দন প্রভৃতি শাক্তাচারের দ্রব্য এবং শক্তিরূপের নাম গ্রহণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের পক্ষে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়াছিল। এইরূপ শাক্ত বৈষ্ণবে বিষম বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে ধর্ম্ম-জগতে এক ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। এক মাত্র সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম আর্য্যের মোহে পড়িয়া দুইটী বিভিন্ন ধর্ম্মে পরিণত হইল। হিন্দুধর্ম্মের এই বিপ্লব সময়েই মহাত্মা মোহন মিশ্রের অভ্যুদয়। বোধ হয় শাক্ত বৈষ্ণবের এই সর্ব্বনাশিনী শত্রুতা নিরসনের জন্যই যেন ঈশ্বরাদেশে মোহন মিশ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল।

মোহন মিশ্র স্বয়ং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত এবং তান্ত্রিক যোগাচারী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার গৃহ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ কালাচাঁদ (কৃষ্ণ) মূর্ত্তির, অসীম ভক্তি সহকারে যথারীতি বৈষ্ণবোক্ত বিধানে সেবা করিতেন। মহা সমারোহে কালাচাঁদের দোল-যাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। দোলের সময় মোহন মিশ্র কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়া বৈষ্ণবগণের সহিত যেরূপ একাত্ম ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহাতে পরম বৈষ্ণবগণও তাঁহাকে দ্বিতীয় চৈতন্যদেব বলিয়া স্বীকার করিত। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ, কালাচাঁদের দোলের সময় মোহন মিশ্র-সিরতিত প্রেমভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত,—যন্ত্র স্থানীয় বিবেচনায়,——মুখ্যকালে গায়ক দ্বারা গান করাইয়া থাকেন। মোহন মিশ্র দিবাতে কালাচাঁদের নিরামিষ প্রসাদ গ্রহণ করিতেন, এবং রাত্রিতে শাক্ত সাধনের জন্য সস্ত্রীক হইয়া মৎস্য মাংস দ্বারা ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করিতেন।

মোহন মিশ্রের এই দ্বিধা-বিরহিত অপূর্ব্ব-ভাব, অসাধারণ মার্জন-বল, মোহনাত্মক জ্ঞান-উপদেশ, অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। ঘোর শাক্ত-দেষী বৈষ্ণবগণও তাঁহার নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যে রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের বারেন্দ্র কুলতিলক ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট অভিলষিত (শক্তি বা কৃষ্ণ) মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

মোহনমিশ্রের অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা ছিল না। কিন্তু তাঁহার ধনবান শিষ্যগণ আত্মচরিতার্থতা-লাভের জন্য কতিপয় বর্ষের মধ্যেই তাঁহাকে বিপুল ঐশ্বর্যশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। মোহনমিশ্রের ঐসমস্ত অর্থের অধিকাংশই দৈবকার্য্য এবং পরোপকারের জন্য ব্যয়িত হইত। তিনি প্রথমে কালাচাঁদের ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করাইয়া পরে অন্যান্য গৃহাদি ইষ্টক নির্ম্মিত করিলেন। অদ্যাপি তাঁহার নিজ বাসের দালানটী বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেহই মহাপুরুষের বাসগৃহের ইষ্টকখণ্ড কার্য্যান্তরে ব্যবহার করিতে সাহসী হয় নাই। মোহনমিশ্র, ইষ্টক-সোপানযুক্ত একশত পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়া গ্রামবাসিগণের জলকষ্ট দূর করিয়াছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে পাকুড়িয়া গ্রাম মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরোপম পল্লীতে পরিণত হইল। নানা সদ্‌গুণের আধার বলিয়া তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ও দেশবাসিগণ তাঁহাকে "গুণচন্দ্র ঠাকুর" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার বংশধরগণ ঠাকুর উপাধিতে অভিহিত।

কালক্রমে গুণচন্দ্র ঠাকুরের তিনটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল; প্রথম—রত্ন গর্ভ মজুমদার, দ্বিতীয় শ্রীগর্ভ ঠাকুর, তৃতীয় কাশীনাথ ঠাকুর। প্রথম পুত্র পারস্য ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া নবাবের অধীনে চাকরী গ্রহণ করিলে, তজ্জন্য গুণ চন্দ্র ঠাকুর "ঠাকুর" আখ্যার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে মজুমদার উপাধিতে অভিহিত করেন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ মজুমদার উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

রত্নগর্ভ মজুমদার বিজাতীয়ের বেতন গ্রহণ করার জন্য পৈত্রিক ধনের বা শিষ্যাদির অংশ প্রাপ্ত হয়েন নাই।

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীগর্ভ ঠাকুর সংস্কৃত ভাষা পারদর্শিতা এবং শাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার লাভ করেন। তিনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতার সর্ব্ব প্রকার গুণের অধিকারী হইলেন।

তৃতীয়পুত্র কাশীনাথঠাকুর, বিশেষ শাস্ত্রার্থদর্শী ছিলেন। তাঁহার যৌবনসুলভ চাঞ্চল্য বা সংসারাসক্তি ছিল না। যৌবনারম্ভেই তিনি জনসমাজে "সাধক" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

উল্লিখিত সময়ে রত্নগর্ভ মজুমদারের তিন পুত্র, ও শ্রীগর্ভঠাকুরের পাঁচপুত্র ও আটটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। কাশীনাথঠাকুর নিঃসন্তান রহিলেন।

বিরহ।

বিরহ রে! জনম জনম তোহে মাগি।
পিয়া মঝু অন্তরে, নিশি দিশি বৈঠই,
একই তিয়া ওণ লাগি।
তুয়া লাগি, শ্যাম-নাম মঝু জীবন
তুয়া লাগি পিয়া ওণ গাই;
তুয়া লাগি, যোহুঁ মিলনে না পায়নু
অব মঝু-সোহুঁ পাই।
পামরী হাম ধ্যান নাহি জানত
অব তু শিখাওয়লি মোহে;
শ্যাম দি আঁখর মধুরিম মন্তর
জাগই অন্তর-গেহে।
যব হাম শ্যাম-মিলন সুখে আছনু
তব হাম কছু নাহি জানি
মান গরব ভরে, আছনু গরবিনী
অবহুঁ বুঝলু অনুমানি।
অবহাম জগভরি, পিয়াদরূপ দেখই
তোঁহারি সঙ্গ সুখ লাগি
সোঙরিতে নাম, লোরে ভর লোচন
অতএ মানিয়ে বহু ভাগি।
তুয়া লাগি নাহ নাম ওণ গাবই
শাপ পরাণ বাহিরাব
অভয়াকান্ত আশোয়াস মিটায়ওব
আন জনমে পুনঃ পাব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চীন ও জাপান।—কোরিয়া লইয়া চীন ও জাপানে ঘোর যুদ্ধ বাধিল। উভয় পক্ষেই যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে; জল ও স্থল—উভয় প্রকার যুদ্ধে কোরিয়ার ভাগ্য নির্ণীত হইবে। এই জন্য সৈন্য ও রণপোত সকল সজ্জিত হইতেছে। গত পত্র যাহা লিখা ও সংবাদই হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহা অতীব ভীতিকর। যুদ্ধ তিন দিবস পূর্ব্বে অনেকে ভাবিয়াছিল যে, চীন ও জাপানে বাস্তবিকই যুদ্ধ বাধিয়াছে, এখন আমরা দেখি দেহে যুদ্ধ স্থগিত বাধে নাই, কিন্তু আর না বাধিয়া থাকে না। আমরা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, এই সময় আসিয়া মহাদেশের একটী বিষম অনর্থ ঘটিতে পারে, কারণ ইংরাজ, রুষ ও ফরাসী এই তিনটী শক্তি এখন আসিয়া খণ্ডে তিনটী প্রধান বল জড়ো করিয়াছে। চীন ও জাপানে যুদ্ধ বাধিলে ইহারা কোন দলে যোগ দান করিবে। এতদ্ভয় স্থলে কোরিয়া-সমর হইতে সমগ্র আসিয়া মহাদেশে ভীষণ বহ্নি প্রজ্বলিত হইবে। তাহার পরিণাম-ফল ভয়ানক।

* * *

আমদানী শুল্ক।—বৃদ্ধি ম্যাঞ্চেষ্টারেরই জয় হইল। এত আন্দোলন ও আবেদন সমস্তই বিফল হইয়া গেল; ডিউকে ষ্টেট সেক্রেটরীর আসল টলিল না। তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়দিগের উপর কেন এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এখন ম্যাঞ্চেষ্টরকে ছাড়িয়া দেওয়াতে তিন কোটি টাকার ক্ষতি হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্র দূর করিবার উদ্দেশ্যে কত উপায় উদ্ভাবিত করিতেছেন, কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টারের আমদানী দ্রব্যজাতে কিছুতেই কর স্থাপন করিতে সাহসী হইতেছেন না। গত সপ্তাহে লর্ড ল্যান্সডাউন ও লর্ড রোজবেরি পার্লিয়ামেণ্টের লর্ড সভায় এই আমদানি-শুল্কের বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়াছিলেন; তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, কিছুতে হইতে ভারতে অন্যান্য যে সকল দ্রব্যজাত আমদানি হয়, যখন তৎসমুদয়ের উপর শুল্ক স্থাপিত হইল, তখন একমাত্র ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবয়দিগকে অব্যাহতি দিবার কারণ কি? বলা বাহুল্য হেটসেক্রেটরি কাঁকা, আওয়াজে এই প্রশ্ন উড়াইয়া দিতে ত্রুটি করেন নাই।

লোমহর্ষণ ব্যাপার।—মহরম সর্ব্বত্রই বিনা বিবাদে বা বিপদে সম্পন্ন হইয়াছে, কেবল রাজসাহীতে সেরূপ হয় নাই, রামপুর বোয়ালিয়া সহরে গবর্ণমেণ্টের অপ্রিয়-মূল্যকারিতায় যে বিষম অনর্থ ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। ইহা হিন্দু মুসলমানেরও বা মুসলমানে মুসলমানে দাঙ্গা নহে; ইহা পুলিশের সহিত হাঙ্গামা কিম্বা শান্তি ভঙ্গের ফল নহে;—ইহা সশস্ত্র পুলিশের ভীমের লোমহর্ষণ অভিনয়। কলিকাতার প্রাতঃহিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র সমূহে সত্য ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা বেঙ্গলি ও অমৃতবাজার হইতে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। মহরমের রাত্রে বোয়ালিয়ার নাটোর রোড ও কলেজ রোডের

সংযোগস্থলে তাজিয়া লইয়া মুসলমানেরা লাঠি খেলাইতে খেলাইতে আসিতেছিল; ছাদের উপর ও পথে অসংখ্য দর্শক দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল; এমন সময়ে তত্রত্য পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অপর তিনটী সাহেবের সহিত সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং মুসলমানদিগের হাত হইতে লাঠি কাড়িয়া লইতে বলিলেন। সকলে বিনা বাক্যে লাঠি ফেলিয়া দিল। সেই সময়ে কতকগুলি লোক সেইস্থান হইতে দ্রুতপদে পলায়ন করিতেছিল; সশস্ত্র পুলিশ অমনি তাহাদিগের উপর গুলি ছুড়িল। তাহাতে ছাদের উপরিস্থ ও পরিপার্শ্বস্থ অনেক নিরীহ দর্শক আহত হইল। তখনই নগর মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল; বিনা কারণে পুলিশের ভয়াবহ নৃশংস ব্যবহার দর্শনে সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। যে সকল ব্যক্তি আহত হইয়াছিল, স্থানীয় কলেজের ছাত্র অশ্বিনীকুমার মৈত্র তাহাদিগের অন্যতম। ইনি ছাদে দাঁড়াইয়া ছিলেন; একটা গুলি ইহাঁর মস্তকাবরক মাংস ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল; আর একটু হইলেই ইহাঁর মস্তিষ্ক আহত হইত। বাবু এ, কে, মৈত্র ইহাঁর অগ্রজ। তিনি গোয়ালিয়ার জনৈক উকিল। পরদিন প্রাতে তিনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ প্রাইসের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনার তদন্ত করিতে বলিলেন। অনুসন্ধানে যাহা প্রকাশ পাইল তাহা আরও ভয়াবহ। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিশ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন "আমি পুলিশ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, পুলিশকে কেহই গুলি ছুড়িতে বলে নাই, তাহারা স্বেচ্ছামত এই কাজ করিয়াছে; নতুবা গুলি ছুড়িবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, লোকগুলা ভয়ে ইতস্ততঃ পালাইতেছিল; সেরূপ অবস্থায় তাহাদের উপর গুলি ছাড়া বড়ই অন্যায় হইয়াছে। এজন্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বড়ই দুঃখিত।"

শুনিতেছি অপর একটী ছাত্র এবং অন্য দুইটী ব্যক্তি আহত হইয়াছিল। এখন আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, কেহই মারা পড়ে নাই। কিন্তু যদি মারা পড়িত, তাহা হইলে কি হইত? তজ্জন্য কে দায়ী? পুলিশকে যখন গুলি বারুদ ও বন্দুক দিয়া সজ্জিত করা হয়, সেই সময়ে আমাদের সহযোগিগণ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এখন দেখিতেছি, তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। জগতের আর কোন সভ্য রাজ্যে আর কোন সভ্য জাতির উপর কি এরূপ অত্যাচার হয়?

প্লাবন।—বঙ্গের কোন কোন স্থান ভিন্ন ভারতের আর প্রায় সকল প্রদেশেই এবার অধিক বৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টির প্রাবল্যে পঞ্জাব, মধ্য ভারত, বোম্বাই প্রদেশে বন্যা দেখা দিয়াছে। স্থানে স্থানে রেলপথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেতু ভগ্ন হইয়াছে, তারের স্তম্ভ ভাসিয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা জি, আই, পি লাইনে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এই অত্যধিক বর্ষা জন্য স্থানে স্থানে কৃষিকার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে না; সেইরূপ আবার যে সকল স্থানে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে, তথায় ধান্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। বৃষ্টির অভাবে লোকে বীজ রোপণ করিতে পারিতেছে না। ইহার উপর স্থানে স্থানে সামান্য ঝড় হইতেছে। ফলতঃ বিধির মনে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে। ভারতে অন্নকষ্ট এখন সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। দেশে প্রচুর শস্য হইলেও রপ্তানীর কল্যাণে দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে নিত্যই অশ্রুজলে অন্ন সিদ্ধ করিতে হইতেছে। জানি না এ বিষম কষ্ট কতদিনে দূর হইবে।

⁂

দোষ কাহার?—ভাগ্যদোষে আমরা নিজেই দোষী, তবে আর কাহার দোষ দিব? কিন্তু চখের জল চখেই শুকাইবে, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পাব না; মর্ম্মের বেদনা খুলিয়া বলিতে পারিব না? ইংরাজ! এই কি তোমার নিরপেক্ষ শাসন? এই কি তোমার শ্বেতকৃষ্ণে সমান ভাব? তোমার গোরা সৈন্যগণ যখন তখন ভারতবাসীকে পশুর ন্যায় হত্যা করিতেছে, তথাপি কচিৎ কেহ সামান্য শাস্তি পাইতেছে, আর ভারতবাসী আত্মরক্ষা করিতে গিয়া গোরাকে হত্যা করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে। ওহারা, ওয়েব ও মিয়াচেম প্রভৃতির কথা পাঠকগণ অবগত আছেন। সম্প্রতি আর একটা গোরার কথা বলিতেছি;—আর্ম্মষ্ট্রঙ্ নামে একটা গোরা একটী বন্ধুর সহিত পঞ্জাবের কোন বাজারে দুইটা পানার্থ নল কিনিতে যায়; জনৈক মুসলমান সেই সময় তাহাকে ছুরি বিক্রয় করিতে আসিল। আর্ম্মষ্ট্রঙ্ ছুরি লইয়া দেখিল কিন্তু দরে বনিল না বলিয়া সেই ছুরি লইয়াই ছুরি-বিক্রেতার বক্ষে আঘাত করিল; বলা বাহুল্য হতভাগার তাহাতেই প্রাণবিয়োগ হয়। পঞ্জাবের প্রধান আদালতে হত্যাকারীর বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারের ফল এখনও জানা যায় নাই; তবে এই মাত্র জানা গিয়াছে যে, জুরির বিচারে আর্ম্মষ্ট্রঙের হঠকারিতা অপরাধ মাত্র সাব্যস্ত হইয়াছে।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন. কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান।

অষ্টম বর্ষ। } ১৮ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। { চতুর্দ্দশ সংখ্যা।

হিন্দুর আশা।

পুরাণকার বলেন, সূর্য্যবংশীয় রাজা মুচুকুন্দ দেবকার্য্য সাধন করিয়া সত্যযুগে শৈল-গুহায় শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই মহা গভীর অদ্ভুত নিদ্রায় তিন যুগ অতীত হয়; পরে কলির প্রারম্ভে তিনি জাগিয়া উঠেন। তাঁহার সেই শয়নের আদিতে দেবকার্য্য—অন্তে দেবকার্য্য; শয়নের অগ্রে তিনি অসুর-কুল সংহার করিয়া সুরবৃন্দকে নিষ্কণ্টক করেন, শয়নান্তে লোচন-বহ্নিতে কালযবনকে দগ্ধ করেন; তাহাতে তদানীন্তন ভারতের একটী প্রধান শান্তি-বিঘাতকের ধ্বংস হয়। রাজা মুচুকুন্দ যখন শয়ন করিয়াছিলেন, তখন ভারতে সুখ ও শান্তির প্রস্রবণ সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান; রোগ শোক জরা মরণ তখন অকালে কাহাকেও আচ্ছন্ন করিতে পারিত না; বৃক্ষ সকল কালে প্রচুর ফুল-ফল প্রসব করিত, ওষধিসমূহ লোকের আজীব শস্য সমর্পণ করিয়া কালে তপঃকর্ষিত দেহ ত্যাগ করিত; গাভীগণ সকলের অভিলষিত অমৃতরস বর্ষণ করিয়া কামদুধা নামের সাফল্য সাধন করিত। তখন ভারতের মৃত্তিকায় অমৃত, সলিলে অমৃত, বায়ুতে অমৃত; বলিতে কি পঞ্চভূতের প্রত্যেক সম্মিলনে অমৃত ক্ষরিত হইত; পরমাণুর প্রত্যেক স্পন্দনে অমৃত স্পন্দিত হইয়া অমরগণেরও ঈর্ষা উদ্রিক্ত করিত। সেইজন্য তাঁহারা স্বর্গরাজ্য হইতে সর্ব্বদাই ভারতের সৌভাগ্য কীর্ত্তন করিয়া বলিতেন—

"ধন্যাস্তু যে ভারত-ভূমি-ভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষা সুরত্বাৎ ॥"

মুচুকুন্দ যখন দেবকার্য্য সাধন করিয়া সুরলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মনে কত তেজ,—কত উৎসাহ,—কত আনন্দ! সেই তেজে যেন সমগ্র সভ্যজগতের প্রাণবায়ু কেন্দ্রীভূত; সেই উৎসাহে যেন ত্রিভুবনের তড়িৎ-শক্তি স্ফুরিত, সেই আনন্দে যেন বিশ্বের হ্লাদিনীশক্তি তরঙ্গায়িত। স্বর্গলোক হইতে দৃঢ়পদে ভূলোকে অবতরণ করিতে করিতে তিনি একবার ভারতের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন;—দেখিলেন আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্তে আর্য্যের বিজয়-পতাকা

উড্ডীন,—ব্রহ্মবিগণের সামগানের এবং যাজ্ঞিকের যজ্ঞধূমে সমগ্র প্রদেশ প্রতিধ্বনিত, সরযূতী ও দৃষদ্বতী, বিতস্তা ও সর্যূ, গঙ্গা ও চর্ম্মণ্বতী সেই মধুর প্রতিধ্বনিতে তালে তালে নৃত্য করিয়া স্ব স্ব গন্তব্যপথে ধাবমান ;—বলিতে কি সুমেরুস্বর্ণশৃঙ্গ হইতে বিন্ধ্যাচলের অগস্ত্যচরণাঙ্কিত সানু পর্য্যন্ত একটী অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় তেজ দ্বিরা সৌদামিনীর ন্যায় ভারতের চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সেই তেজের সম্মুখে অন্ধকারের ন্যায় অনার্য্যগণ পলায়ন করিয়াছিল।

এইরূপে দৈত্যের ত্রাসোৎপাদন এবং দেবের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া মহারাজা মুচুকুন্দ গিরিগুহায় শয়ন করিলেন। তিনি স্বহস্তে যে বিজয় চক্র চালাইলেন, তাহা অধিকতর তেজ সহকারে চলিতে লাগিল। তিনি যে বিক্রম-বহ্নি বিন্ধ্যাচলের উচ্চশৃঙ্গে জ্বলিতে দেখিয়াছিলেন,তাহা প্রচণ্ড দাবানল-তেজে দগ্ধকারণ্য ও সমগ্র দক্ষিণাপথ দগ্ধ করিয়া লঙ্কার হেমকূট-পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল ;—মান্ধাতা ও সগরের গঙ্গাস্থবিধৌত চিতাভস্মের উপর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সমগ্র জগতের সার সংকর্ষণ করিয়া সরযূতীরে উদ্ভূত হইলেন :—কোশলরাজ্য ভারতে অতুলনীয় হইল। রাজচক্রবর্ত্তী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অতিমানুষ অবদান দ্বারা যে তেজ সমগ্র আর্য্যভারতে সমভাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল ;—ভগবান মনুর সাধুনাস্থল অযোধ্যা তাহার কেন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্রের দেহত্যাগে সেই তেজ বিষমভাবে ভারতের ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল।

মহারাজা মুচুকুন্দ সেই অপূর্ব্ব বীর্য্য-বহ্নির দিগ্‌দাহী তেজোগা চালিয়া দিয়া ভারতের সেই অতুল্য গৌরবের স্মৃতিস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে গিরিগুহায় নিদ্রিত ছিলেন। তিনটী যুগ পরিবর্ত্তন-চক্র তাঁহার বক্ষের উপর আবর্ত্তিত হইল ; জগদ্ভক্ষক কালের কঠোরহস্ত বজ্রসারময় সংসারের যত পরিবর্ত্তন সাধন করিল, কিন্তু মুচুকুন্দের সেই বিরাট শরীরে সামান্য আণবিক পরিবর্ত্তনও হইল না।

ক্রমে কলি আসিয়া কালবক্ষে কলুষ-কলঙ্ক অঙ্কিত করিল ; ধর্ম্মের ত্রিপাদ খণ্ডিত হইল, অধর্ম্মের ত্রিপাদ বৃদ্ধি পাইল ; সেই সঙ্গে ভারতের ধর্ম্ম্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা প্রকার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সনাতন ধর্ম্মের বিরাট ভস্ম মন্দিরে অগণ্য রন্ধ্রপথে অগণ্য অধর্ম্ম ও অপধর্ম্ম সকল প্রবেশ করিতে লাগিল ; সমাজ যথেচ্ছাচারী স্বার্থপর ভণ্ডদিগের লীলাস্থল হইয়া পড়িল ; দম্ভস্ফীত বিকৃত-মস্তিষ্ক ক্ষত্রিয়গণের পরস্পর-বিস্বাদী উদ্ভট ব্যবহারে ভারতীয় রাজন্য-সমাজে একটা বিকট অনৈক্য বিরাজ করিতে লাগিল ; সুযোগ বুঝিয়া শক, যবন, পহ্লব, পারদ, হূন প্রভৃতি ম্লেচ্ছ ও অন্তেবাসিগণ কৌশলে তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৈষম্য-বিষবীজ বপণ এবং সেই সঙ্গে আত্মশক্ত দৃঢ় করিতে লাগিল। ভারত ধীরে যায়, সনাতন ধর্ম্ম উৎসন্নপ্রায়,—এমন সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন। অগৎ-জয়ী কালের৪ বিজেতা মুচুকুন্দের কাল পূর্ণ হইল ; নয়নানলে কাল যবনকে দগ্ধ করিয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিলেন এবং পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া অনন্তে প্রবিষ্ট হইলেন। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ মুচুকুন্দের কথা বলা হইল ; কিন্তু ইহার সহিত কি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সাদৃশ্য নাই ?—আছে ; তাহা পরে দেখাইব।

সেইদিন হইতে শত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে ; ভারতের ধর্ম্ম্য ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ;—এককালে

যথায় স্বাধীনতার শান্তোজ্জ্বল হাস্য অনন্ত তরঙ্গভঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইত, আজি তথায় মর্ম্মভেদী পরাধীনতা অর্দ্ধ-হাস্য ও অর্দ্ধ-ক্রন্দন মিশ্রিত পৈশাচিক রবে লোকের অস্থিমজ্জা চর্ব্বণ করিতেছে ; আর সে তেজ নাই, সে উৎসাহ নাই, সেই আনন্দ নাই ; —সকলই ফুরাইয়াছে,—সমস্তই অদৃশ্য হইয়াছে ; জড়তা, নির্জ্জীবতা, নিঃস্পন্দতা ভারতের সর্ব্বস্থান অধিকার করিয়াছে। এখন ভারত-ভূমি বিশাল শ্মশান-ক্ষেত্র। ইহার চতুর্দ্দিকে ভগ্ন বশিষ্ঠ, ভার্গব দাশরথি, বাল্মীকি ব্যাস, ও কুরুপাণ্ডব অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত ;—তাঁহাদের পবিত্র চিতাভস্ম হইতে অর্দ্ধ নিদ্রিত—অর্দ্ধ জাগ্রৎ—যেন কোন অপরাদ্ধ্যে ভাষমান, আত্মবিস্মৃত—কতকগুলা ক্ষীণপ্রাণ নরকঙ্কাল পিশাচের তাণ্ডব উল্লাসে পরস্পরের অস্থি মাংস চর্ব্বণ ও রুধির পান করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। কে কোন দিকে যাইতেছে, কে কাহার বক্ষ চিরিয়া শোণিত পান করিতেছে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। আত্মবিস্মৃতের বিকৃত 'বিভ্রান্ত' স্বপ্নদর্শনের ন্যায় ইহাদের হাস্য ও রোদন শ্মশানবিহারী শৃগাল কুক্কুরগণের কিলাকিলা রবের সহিত মিশাইয়া যাইতেছে। বলিতে পার—কেন এমন হইল ? বলিতে পার—কোন্ অপরাধে, কোন্ দেবতার অভিসম্পাতে আজি ভারতবাসীকে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল ? বলিতে পার —কিসে ইহার মোচন হইবে ? তবে কি এই দারুণ যাতনা হইতে ভারতবাসী আর মুক্তি পাইবে না ? কে বলিল ?—না, তবে স্বপ্ন, মায়া-বিভ্রম, ইন্দ্রজাল !

তুমি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ; বশিষ্ঠ ও ব্যাসের ব্রাহ্মণত্ব আংশুনিক, মাত্রায় তোমাতে সংক্রামিত ; ভাগ্য দেবতার সুপ্রসাদে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ; প্রকৃত না হউক, অপ্রকৃত ও কাল্পনিক সুখে সুখী ; তুমি কি এই যাতনার অনুভব করিতেছ না ?—যদি করিতেছ, তবে ইহার নিরাকরণের নিমিত্ত কি চেষ্টা করিতেছ ? স্বদেশ ও স্বজাতির দগ্ধহৃদয়ে অমৃত-বারি সিঞ্চন করিবার নিমিত্ত তুমি কি উদ্যোগ করিয়াছ ?

তুমি স্মার্ত্ত-বা স্বার্থচূড়ামণ্যুপাধিক তৈলঈপ্রার্থী টোলা ব্রাহ্মণ ; তোমার সর্ব্বস্বই অক্ষত-কদলী ও সৈন্ধব লবণ ; ভিক্ষাভাবে সময়ে সময়ে দেবলত্ব আশ্রয় কর ; তোমার স্বরে বিড়ম্বনা ; বাহিরে যাতনা। ভাল—তুমি কি সেই যাতনার অনুভব করিতেছ ? সুখ-সম্পদ, রাজভোগ যখন তোমার কপালে নাই, তখন তুমি কেন আর ভ্রান্ত আশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আকাশকুসুমের অনুসরণ করিতেছ ? যে আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া মহাপুরুষ অগস্ত্য ভিক্ষামাত্র-অবলম্বনে স্বজাতি এ স্বদেশের নবীনহৃদয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ; তুমি তাঁহার অতুলনীয় ব্রাহ্মণত্বের ছায়ামাত্র স্মরণ করিয়া মিথ্যা উড়াইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছ, কিন্তু স্বজাতির মৃতদেহে মৃতসঞ্জীবনী শক্তি নিষিক্ত করিবার নিমিত্ত কখন কি চেষ্টা ও করিয়াছিলে ?

তুমি অতুল মনের অধীশ্বর। বিপুল অর্থভাণ্ড করিয়া "মহারাজ" উপাধি লাভ করিয়াছ। বলিতে পার—এই শূন্য উপাধিতে কি আছে ? ইহাতে যে কাল্পনিক সুখ বা তৃপ্তি ভোগ করিতেছ, তাহা কি স্বপ্নদর্শন বা বিকার-বিজৃম্ভন নহে ? ভাল, নিজের অথর্ব্ব প্রভুর মক মিটাইবার জন্য, তুমি যে রাশি রাশি অর্থ অনর্থক নষ্ট কর, তাহার এক সহস্রাংশ কি কখন স্বজাতির দুঃখ ও দুরবস্থা-মোচনের জন্য নিয়োগ

করিয়াছিলে ? ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া বল, —যখন তুমি বিলাসভূমিতে বিলাসতরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দাও, তখন কি স্বদেশ ও স্বজাতির কথা একবারও তোমার মনে পড়ে ? তোমরা কি ছিলে, কি হইয়াছে ! সিংহের শাবক হইয়া আজি শৃগালেরও অধম !—নিজের সমাজের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিতেছ না !

দেখ আত্মহত্যা মহাপাপ; মাতৃহত্যা তাহা অপেক্ষা ঘোরতর মহাপাপ ; "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—সেই জন্মভূমির অপকার না কর ; কিন্তু তুমি যে তাঁহার দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টা করিতেছ না—ইহা কি পাপ নহে ? তবে আর মাতৃহত্যা কাহাকে বলিব ? তোমরাই হিন্দুর একমাত্র আশা। এই জরাজীর্ণ পীড়াগ্রস্ত ভগ্ন হিন্দুসমাজ-সংস্কারভার তোমাদেরই হাতে। ইহার যেখানে যে কিছু অভাব আছে, যেখানে যে কিছু দোষ আছে, সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া মোচন করিতে হইবে, তবে হিন্দুর জাতীয়তা আবার হইবে।

তড়িৎ শক্তি।

(১)

জ্যোতিঃ ও তাপ প্রভৃতি সমস্তই শুদ্ধ তড়িৎ-সমুদ্ভূত আকাশ হইতে উৎপন্ন এবং ঐ জ্যোতিঃ ও তাপ হইতে সমস্ত দৃশ্য পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দুদিগের মতে তেজ হইতে জল, জল হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি। তৈজস পরমাণু সকল যতই একত্রিত ও ঘনীভূত হয়, ততই বাষ্পাকারে পরিণত হয়, ঐ বাষ্প ঘনীভূত হইলে ক্রমে মেঘের আকার ধারণ করে, ঐ ঘনীভূত বাষ্পের বাহ্য ও অন্তর্জগীন তাপের হ্রাস হইলে অত্যন্ত ঘনীভূত হয়, ঐ ঘনীভূত বাষ্প বা মেঘ হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি হয়, অতএব তেজ হইতে জলের আর একটী অতিরিক্ত গুণ রস। জল ঘনীভূত হইলে তাহার বিকৃতিই মৃত্তিকা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকা ও জলকে বিশ্লেষিত করিয়া বহুবিধ রূঢ় পদার্থে পরিণত করিলেও এ সকল ঔপাদানিক পদার্থ হইতে একেবারে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইতে পারে না ; সূক্ষ্ম পদার্থ সকল ক্রমান্বয় বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্থূল পদার্থে পরিণত হয়।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যখন প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে তড়িৎ বা শক্তি বিদ্যমান আছে, তখন বস্তু হইতে তড়িতের উৎপত্তি কি তড়িৎ শক্তি হইতে বস্তুর উৎপত্তি ; অনেকে বলিতে পারেন গুণ, বস্তু শক্তির একটী অবস্থা বা বিকাশ মাত্র, যথা অগ্নির দাহিকা শক্তি এবং উষ্ণতাই উহার গুণ। বস্তু ব্যতীত গুণ হইতে পারে না, বস্তুরই গুণ আছে, অগ্নি বস্তুর উত্তাপ তাহার গুণ, আপনার জ্বর হইয়াছে, আপনার শরীরে উত্তাপ গুণ প্রকাশ হইয়াছে। অতএব যখন পদার্থ মধ্যেই গুণ আছে, তখন পদার্থ হইতে গুণ স্বতন্ত্র নহে ; এবং গুণ

শক্তির একটী অবস্থা বা বিকাশ মাত্র, বস্তুর মধ্যে শক্তি আছে বা বস্তু হইতে শক্তি উৎপন্ন হয়, শক্তি হইতে বস্তু কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে ? বস্তুর মূল পরমাণু অদৃশ্য, এক্ষণে শক্তি ও অদৃশ্য, এক্ষণে শক্তি হইতে বস্তু, কি বস্তু হইতে শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার মীমাংসা আবশ্যক ; কিন্তু পূর্ব্ব পক্ষ প্রতিজ্ঞার নিরসন না হইলে শেষ ফলুর মীমাংসা কখনই হইতে পারে না, এইক্ষণ আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ যে, তড়িতের ধর্ম্ম বা তড়িৎশক্তি হইতে উৎপন্ন ইহা স্বীকৃত এবং পৃথিব্যাদি গ্রহের নির্দ্দিষ্ট পথে সূর্য্যমণ্ডল পরিভ্রমণের মূল কারণই যে সূর্য্য ও পৃথিবীর আকর্ষণ, ইহাও প্রায় সর্ব্ববাদি-সম্মত।

সূর্য্য হইতে পৃথিব্যাদি গ্রহগণ বহুদূরে অবস্থিত, মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত অসীম শূন্য বা আকাশ ; ঐ আকাশের মধ্য দিয়া উহাদের আকর্ষণ-ক্রিয়া কেবল পরস্পরের শক্তিসম্ভূত ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর মধ্যবর্ত্তিতায় সম্পাদিত বলা যাইতে পারে না। অবশ্যই একথা স্বীকার্য্য যে ঐ অসীম অনন্তাকাশে পরমাণু-পুঞ্জ বিস্তৃত, ঐ পরমাণুর মধ্যেও আকর্ষণ বিক্ষেপণ-শক্তি এবং বিস্তৃতি ও সঙ্কোচ (অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকতা) গুণ আছে, অতএব পরমাণু-পুঞ্জ পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী থাকায় ঐ সকল পরমাণু-পুঞ্জের মধ্যবর্ত্তিতায় উভয়ের আকর্ষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে—এই তর্ক উত্থিত হইতে পারে ; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পরমাণু পরস্পরের মধ্যেও শূন্য বা আকাশ আছে ; যদি তাহা না থাকিত, তবে অনন্ত আকাশস্থ সমস্ত পরমাণু ঘনীভূত হইয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড একটী কঠিন পিণ্ডবৎ হইত, পরস্পরের পার্থক্য থাকিত না ; এমন কি কঠিন বস্তুর মধ্যে যে শূন্য আছে, তাহা পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রসম্মত। প্রাচীনমতেও পঞ্চভূতের আকাশ গণনীয়, অতএব ঐ আকাশই শক্তিময়, এই আকাশীয় শক্তিই সূর্য্য ও পৃথিব্যাদি গ্রহগণের অবস্থান ও সংস্রব রক্ষা করিতেছে, ইহা দ্বারা শক্তির পৃথক অস্তিত্ব একপ্রকারে প্রমাণিত হইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন কেবল পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ শক্তি দ্বারা এই গুরুতর ব্যাপার সম্পাদনের আর একটী প্রতিবন্ধক আছে, ঐ পরমাণুর মধ্যে ঐরূপ আকর্ষণ-শক্তি আছে, সেইরূপ অবস্থা-ভেদে বিক্ষেপণ বা বিয়োজন শক্তিও আছে ; যদি কেবল পরমাণুর মধ্যবর্ত্তিতায় সূর্য্য ও গ্রহগণের মধ্যে আকর্ষণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইত, তবে ঐ পরমাণুপুঞ্জের পরস্পরের মধ্যে বিক্ষেপণ ও বিয়োজন শক্তি প্রভাবে সূর্য্য ও পৃথিব্যাদির মধ্যস্থ আকর্ষণ সূত্রটী মধ্যে মধ্যে ছিঁড়িয়া যাইত, কিন্তু পরমাণুপুঞ্জ পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ঐ আকর্ষণ-সূত্রটী অচ্ছেদ্য রাখিয়াছে ; বিশেষতঃ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি ; সূক্ষ্ম অবশ্যই কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যে হেতু স্থূল পদার্থ যখন উৎপত্তি ও বিনাশশীল, তখন উহাকে কার্য্য ভিন্ন কারণ বলা যাইতে পারে না। অতএব স্থূলের কারণই সূক্ষ্ম, আবার সূক্ষ্ম অবশ্যই কোন কারণ সম্ভূত পরমাণু স্থূল পদার্থের উপাদান ; অবশ্যই উহা সূক্ষ্ম পদার্থ বা কার্য্য, ঐ সূক্ষ্ম পদার্থের বা কার্য্যের অবশ্যই কারণ আছে, কারণ ভিন্ন কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। একথা সত্য যে, পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যই পরবর্ত্তী কার্য্যের কারণস্বরূপ ; অতএব আদিম বা প্রথম কার্য্য স্বয়ম্ভূত এবং উহা তৎপরবর্ত্তী কার্য্য সকলের কারণস্বরূপ বলাতে আপত্তি কি ? পরমাণুর আদিম

অবস্থাকে স্বয়ম্ভূত বলিতে চাও বল ; কিন্তু পরমাণুকে জগতের আদিকারণ বলিতে পার না। এই যে মানবের জ্ঞান শক্তি, এবং যোগীদিগের ঋতম্ভরা যোগশক্তি এবং ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আরোপ, ইহা সমস্ত কি কেবল পরমাণুর সংযোগ ও রাসায়নিক ক্রিয়া? এই যে ন্যূনপ্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ড প্রদেশে সমস্ত পশুই লোমাবৃত ; কিন্তু মানব লোমাবৃত নহে—ইহাকি কেবল পরমাণুর ক্রিয়া বা তথাকার প্রাকৃতিক নিয়মের ফল? ইহা কি স্বতন্ত্র কোন বিবেক-শক্তি (Intelbctual power) মূলক নহে? পশুর বিবেক-শক্তি না থাকায় তাহার স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা রক্ষিত, এইজন্য তথাকার প্রকৃতি অনুযায়ী পশুর শরীর রক্ষার্থে তাহাদের লোমাবৃত হওয়া প্রয়োজন, মনুষ্যগণ বিবেক শক্তিবলে আত্মরক্ষায় সক্ষম ; সুতরাং তথাকার প্রকৃতি অনুযায়ী লোমাবৃত হওয়ার প্রয়োজন থাকিলেও মানবের পক্ষে অপ্রয়োজন, এই বিবেক-শক্তিমূলক সৃষ্টি কেবল কি পরমাণুসম্ভূত এই। অসীম সৃষ্টির কারণ কি স্বয়ং এই পরমাণু? প্রথমতঃ পরমাণু কাহাকে বলে? বস্তুর সূক্ষ্ম যে অংশ আর বিভক্ত হইতে পারেনা, সেই সূক্ষ্মতম অংশই পরমাণু। প্রকৃত পক্ষে পরমাণু বস্তুর অংশ না বলিয়া পরমাণুর সমষ্টি বস্তু বলা যাইতে পারে। এই পরমাণুপুঞ্জের সংযোগ বিয়োগ ও বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে বাহ্য বস্তুর উৎপত্তি। এই পরমাণু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে, এমনকি বায়বীয় সূক্ষ্ম শরীরও নহে। উহা আকাশীয় সূক্ষ্মতম পদার্থ, যাহাকে আমরা পরমাণু বলি, তাহা প্রকৃতির প্রথম বিকশিত পদার্থ, তাহার অবিকাশিত অবস্থাই শক্তি, উহাদ্বারা সাম্য বৈষম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে এই বিচিত্রময় অনন্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং সেই শক্তি কর্ত্তৃকই অতি ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে জ্ঞানবুদ্ধিবিশিষ্ট মানব ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিবেকমূলক সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইতেছে, উহাই অনন্ত জ্ঞানের জ্যোতিঃ বা চিচ্ছক্তি।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শক্তি কারণ, পরমাণু তাহার কার্য্য। পরমাণু হইতে সে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, অনন্ত শক্তিই তাহার মূল। ঐ শক্তি দ্বারাই জাগতিক ব্যাপার সম্পন্ন হইলে, সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি করিলে প্রত্যেক ব্যাপারে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈভিক ভাব আছে ; শক্তি আধ্যাত্মিক, বস্তু আধিভৌতিক, সুতরাং কারণ আধ্যাত্মিক, কার্য্য আধিভৌতিক, ভগবদ্ভাবাতীত ঐ সত্তের পোষণ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে পরব্রহ্ম হইতে দৃশ্য জাগতিক সমস্ত ব্যাপার সংক্ষেপতঃ তিনভাবে বিভক্ত বা উহার তিনটী অবস্থা ব্যক্ত আছে। যথা ১ম সাম্য, ২য় বৈষম্যের প্রত্যেক কারণ, ৩য় তাহার কার্য্য।

যথা অক্ষরং পরমং ব্রহ্মস্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতং।
৮মঃ ৩ শ্লোক

যিনি পরম অক্ষর, তিনিই ব্রহ্ম (অর্থাৎ সাম্য) স্বভাবই অধ্যাত্ম (উহাই বৈষম্যের কারণ) প্রাণীদিগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির যজ্ঞাখ্য কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। (এস্থলে যজ্ঞ অর্থে যৌগিক ক্রিয়া বা বৈষম্য)।

অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধি দৈবতং
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহে ভৃতাম্বর।
৮মঃ ৪ শ্লোক

হে জীব সত্তম! নশ্বর পদার্থ অধিভূত, বিশ্বগর্ভ নামা পুরুষ অধিদেব এবং বিশ্বস্বরূপ অধিযজ্ঞ পুরুষ আমিই, এই অধিযজ্ঞ পুরুষই মনুষ্য দেহে বিদ্যমান থাকেন। এই অধিভূত কর্ম্মময় জগৎ, আধিদৈব শক্তিময় প্রকৃতি, অধিযজ্ঞ জ্ঞানময় ঈশ্বর শৈথ্যোক্ত করিতা অপেক্ষা প্রথমোক্ত কবিতার সহিত আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিশেষ সম্বন্ধ ; উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি (অর্থাৎ বিস্তৃতি বা বৈষম্যাই) কার্য্য, উহার কারণ আধ্যাত্মিক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শক্তি ৩ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক শক্তির দুইটী কেন্দ্র, কারণ ও কার্য্য, শক্তি কারণাভিমুখী হইলে ক্রমিক কারণ হইতে মূল কারণাভিমুখে উহার গতি হয়, এবং কার্য্যাভিমুখী হইলে উহা এক কার্য্য হইতে ক্রমিক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যাভিমুখী হয়। এই ৩টী শক্তির মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তি শক্তির আধার (Focus or reservoir), অন্যান্য শক্তি এ কুণ্ডলিনী শক্তির অনুগামী। বহির্ম্মুখিনী কুণ্ডলিনী শক্তির স্বাভাবিক ধর্ম্ম বৈষম্য বা বিস্তৃতি, উৎপত্তি ও বৃদ্ধি উহার কার্য্য। এ কুণ্ডলিনী শক্তি জীবনী শক্তি স্বরূপা ; যেমন সূর্য্য বাহ্য জাগতিক শক্তির আধার ; সেইরূপ কুণ্ডলিনী শক্তি অন্তঃশক্তির আধার এ কুণ্ডলিনী শক্তির ক্রমিক বহির্ম্মুখ গতি হইতে সমস্ত স্থূল বাকাশির ও জড় পদার্থাভ্যন্তরে ও তৎক্রিয়া অনুভূত হয় ; ঐ জড়াভ্যন্তরস্থ তড়িৎশক্তির কিয়দংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আবিষ্কার ও আয়ত্তাধীন করিয়া তদ্দ্বারা বাহ্য জগতের মহৎকার্য্যসকল সাধন করিতেছেন। এই শক্তি আবিষ্কার হইতে টেলিগ্রাফ্, ফনোগ্রাফ্ ও টেলিফোন্ প্রভৃতি এবং ঈথরের রূপান্তরিত ফলস্বরূপ রেলওয়ে, ষ্টীমার প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, ও বহুবিধ পাদার্থিক ও রাসায়নিক অদ্ভুতকীর্ত্তি সকল সম্পাদিত হইতেছে।

জন্মান্তর।

জন্মান্তর আছে কি না? ইহা একটী বিবাদের বিষয়। অনন্তকাল হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র জীব কাল-কবলিত হইতেছে, অপর সহস্র জীব জন্মগ্রহণ করিতেছে, কিন্তু এই জীবগণ কোন্ অজ্ঞাত অন্ধকারময় দেশ হইতে আইসে, আবার কোন্ অজ্ঞাত দেশেই বা যায়, তাহা তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। সকলেই কি এক দেশ হইতে আইসে; আবার এক দেশেই যায়, না কর্ম্মানুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে যাইয়া থাকে? এবং যেখানে-যায় চিরকাল সে কি সেইখানেই থাকে, না আবার কর্ম্মানুসারে তাহাকে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়? এ সকল তত্ত্ব নিঃসন্দেহরূপে প্রকাশিত হওয়া বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত নহে। বোধ হয় এই গুরুতত্ত্বের মীমাংসা দৃঢ়ভাবে জীব-হৃদয়ে অঙ্কিত হইলে সৃষ্টি কার্য্যের কোন ব্যাঘাত ঘটে, তাই এসব রহস্য সন্দেহের গাঢ় অন্ধকারে লুক্কায়িত। শাস্ত্রে এসব বিষয়ের মীমাংসা আছে, কিন্তু তাহা ঠিক একরূপ নহে ; এক এক ধর্ম্মে জন্মান্তরবাদ এক এক রূপ। পরস্পরে অনেক অনৈক্য। তথাপি অধিক মতের

সারাংশ প্রায় একরূপ। আস্তিক শাস্ত্র মাত্রেই প্রায় কর্ম্মানুসারে জন্মান্তর স্বীকার করেন। তবে আস্তিকমতেও কোন কোন ধর্ম্মের সম্প্রদায় বিশেষে জন্মান্তর স্বীকৃত হয় নাই। যাহা হউক মতভেদ থাকিলেও আস্তিক শাস্ত্রের মূল অভিপ্রায় একরূপ। কিন্তু নাস্তিক ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নাস্তিক মতে যেরূপ পরলোক নাই, তেমন জন্মান্তরও নাই। নাস্তিক মতে জন্মান্তর থাকা মস্তবগরও নহে। কারণ যে মতে দেহাতিরিক্ত পৃথক আত্মাই স্বীকৃত হয় নাই। সেমতে কখনই জন্মান্তর থাকিতে পারে না।

এই জন্মান্তর সম্বন্ধে আস্তিকগণ মধ্যেও কেহ কেহ বলেন এই শরীরেই পাপপুণ্য-জনিত সুকৃতি দুষ্কৃতির ভোগ হইয়া থাকে; এর জন্মার্জ্জিত পাপাদির ফল জন্মান্তরের ভোগ করিতে হয় না। কারণ যখন এক জন্মের কোন কথাই জন্মান্তরে স্মরণ থাকে না, তখন এক জন্মের পাপপুণ্যের ফলভোগ অন্য জন্মে হইলে তদ্দ্বারা আত্মার দণ্ড বা পুরস্কার কিছুই হইল না। "আমি এই কার্য্য করিয়াছিলাম তাহার ফল হইল" ইত্যাকার জ্ঞান না হইলে জন্মান্তর-স্বীকারের প্রয়োজন কি?

আবার পুরাণাদি মতে কর্ম্মই জন্মান্তরের কারণ; কর্ম্ম দ্বারাই জীবগণ জন্মান্তরে নানা যোনি প্রাপ্ত হয়। যথা:—

"অনেক শত সহস্র জন্ম সঞ্চিতং
পুণ্যাপুণ্য মুদ্ভবং সুখদুঃখাদ্যকারোদ্ভবং"

(মার্কণ্ডেয় পুরাণং)

মনুষ্য বহু শত সহস্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যে পাপপুণ্য সঞ্চয় করে, তাহাই তাহার সুখ দুঃখের অঙ্কুর উৎপাদন করিয়া থাকে। অধিক যথা,—

"পুনশ্চ গর্ভে ভবতি জায়তেচ পুনর্নরঃ"

(বিষ্ণুপুরাণ)

জীবগণ স্বর্গভোগ বা নরক ভোগের পর পুনর্ব্বার গর্ভস্থ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

এইরূপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, তন্ত্র, দর্শন, সংহিতাদিতেও জন্মান্তর স্বীকৃত হইয়াছে। এক্ষণ যুক্তি দ্বারা আমরা জন্মান্তর স্বীকারের প্রয়োজন দেখাইব।

জন্মান্তরে পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ থাকিলে কখনই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহিত হইত না। এরূপ ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইত যে তাহা চিন্তার অতীত। জীব কর্ম্মানুসারে শত সহস্র জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে। কিন্তু সেই সমস্ত জন্মের কথা যদি তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইত, তবে সম্বন্ধবিচার লইয়াই বিষম সমস্যা ঘটিত। (রাম) এ জন্মে যাহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে, হয়ত কোন জন্মে সে তাহার জননী বা ভগ্নী ছিল। রাম কিরূপে অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহার সহিত পতি পত্নীভাবে ব্যবহার করিবে? অদ্য যাহাকে পরম মিত্র মনে করিতেছি, হয়ত জন্মান্তরে সে আমার ঘোর শত্রু ছিল, হয়ত সে আমার ধন মান ও দারাপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার প্রতিশোধ লইতে পারি নাই। অদ্য যে সম্রাটের সিংহাসনে অধিরূঢ়, হয়ত জন্মান্তরে সে এক জন অতি হীন জাতীয় নীচ প্রকৃতির লোকের কৃমিরাদি জঘন্য জীব ছিল। সুতরাং তৎপ্রতি আজ সম্রাটের সম্মান প্রদর্শন করিতে লোকের মনে কতদূর শ্রদ্ধা জন্মিবে? এবং সেই সম্রাটের মনে যদি সহস্র সহস্র জন্মের বৈর সমুদিত থাকিত, তবে তাহার সেই বৈর নির্য্যাতন প্রবৃত্তি প্রবল হইলে দেশের পক্ষেই কি ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত হইত? আজ যে একটি সম্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া খ্যাতি প্রতি-

পত্তিতে অধিতীয়, সে যদি জানিতে পারে যে তাহার পূর্ব্ব জন্মের বৃদ্ধা জননী ভিক্ষা বৃত্তি ও প্রসূতিনী পত্নী বেশ্যা বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তবে কি তাহার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে? এইরূপ যত চিন্তা করিবে, ততই দেখিতে পাইবে যে, যদি জীবগণ জন্ম জন্মান্তরের কথা স্মরণ করিতে পারিত, তবে তাহাদিগের অন্তঃকরণে কি ভয়ঙ্কর অশান্তি উপস্থিত হইয়া এই সংসারকে বিষময় করিয়া তুলিত। পরস্পরের হৃদয়ে এরূপভাব বিদ্যমান থাকিলে কখনই সংসার চলিত না।

বিশেষতঃ জন্মান্তরের কথা স্মরণ থাকিলে পাপী জীবনের দুর্ব্বিষহ পাপভার বহন করা জীবের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত। মনে কর এই জীবনে কোন গুরুতর পাপ করিলে তাহার অনুতাপেই সমস্ত জীবন অশান্তিময় হয়। যাঁর সহস্র সহস্র জন্মের গুরুতর পাপের কথা এক সময়ে মনে হইলে বা ঐ সব পাপের ফল জন্মজন্মান্তরে লক্ষ লক্ষ বৎসর ভোগ করিতে হইবে মনে হইলে, জীবগণ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িত। সুতরাং তাহাদিগ দ্বারা সংসারের কোন কার্য্যই সাধিত হইত না।—

অথচ জন্মান্তরের স্মরণ থাকা জীবের পক্ষে একরূপ অসম্ভব; কারণ এই জন্মের বাল্যকালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে, তাহাই যখন স্মরণ থাকে না, প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে তাহার অধিকাংশ কথাই যখন কিছুদিন পরে স্মরণ থাকে না, তখন বিগত জন্মের কথা মৃত্যুর (অত্যন্ত বিস্মৃতির) পর কিরূপে স্মরণ থাকিবে? বেদে অত্যন্ত বিস্মৃতির নামই মৃত্যু। সুতরাং পাপ পুণ্যের দণ্ডপুরস্কারের জন্য জন্মান্তরের কথা স্মরণ থাকা অসম্ভব। এবং স্মরণ থাকিলেও মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হইত। কিন্তু যদিও জীব "এই পাপের জন্য আমার এই দুঃখ ঘটিয়াছে ইহা নিশ্চয় জানিতে না পারুক, তথাপি দুঃখের সময় তাহা পাপের ফল বলিয়া অবশ্যই বোধ করিয়া থাকে।

ভূমিষ্ঠসময় জন্ম মাত্রেই দুগ্ধ পান করে, কেহ তাহাদিগকে শিক্ষা দেয় না। কূর্ম্ম জাতীয় কতিপয় জীব জল হইতে ভীরে উঠিয়া প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে যাইয়া ডিম্ব প্রসব করে, এবং তাহা অতি সুন্দর নিয়মে ভূগর্ভে রাখিয়া আইসে, কিন্তু আর সেই ডিম্বের সহিত তাহার জননীর কোন সম্পর্ক থাকেনা। কতিপয় মাসান্তে যথাকালে ডিম্ব বিদারণ করিয়া তাহা হইতে কমঠ শিশু বহির্গত হয়। সে সময় কেহই তাহার রক্ষক বা শিক্ষক থাকে না, সে আপনা আপনিই জল খুঁজিয়া লয়; এবং কোন কমঠশিশু ঘটনাক্রমে এমন স্থানে (কূপাদিতে) যাইয়া পড়ে যে, এজীবনে সে আর তাহার স্বজাতীয়ের সাক্ষাৎ পায় না। অথচ কমঠ জীবনের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তৎসমস্তই সে আপনা হইতেই শিখিয়া থাকে। সদ্য প্রসূত কমঠশিশুর নিকট কেহ যাইবা মাত্র সে অতি দ্রুত পলায়ন করে। এই অননুভূত বিষয়ের জ্ঞান সে কাহার নিকট শিক্ষা করিল? যে একবার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, সে পুনর্ব্বার আঘাতের ভয়ে ভীত হয়, কিন্তু যে কখনও আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই, বা জগতের চিত্র পর্য্যন্তও যাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হয় নাই, সে কেন অন্য জীব দেখিয়া ভয় করে? নাস্তিকগণ বলেন এইরূপ অবস্থায় একমাত্র স্বভাবই তাহার শিক্ষক। কিন্তু স্বভাব শিক্ষক কথাটা যেন শুনিতে ভাল লাগেনা। মনুষ্য বুদ্ধি যেখানে পরাস্ত তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকৃত হয়। নচেৎ কারণ ভিন্ন কোন কার্য্যই হয়না। সুতরাং এইরূপ অননুভূত

বিষয়ের জ্ঞান সম্বন্ধে আস্তিকগণ জন্মান্তরীয় সংস্কারকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জীব সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আমুক্তি পর্য্যন্ত কর্ম্মানুসারে সমস্ত যোনিই বার বার পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; এবং যখন যে যোনি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার জন্মান্তরীয় তত্তদ্দেহের সংস্কার মনোমধ্যে উদিত হয়। সেই জন্মান্তরীয় সংস্কার বশতই সদ্যপ্রসূত গোবৎস স্তন্য খুঁজিয়া লয়, কণ্ঠ শিশু জল খুঁজিয়া লয়; এবং অন্যান্য প্রাণীও আপন আপন বৃত্তির অনুসরণ করে। আস্তিক মতের এই কথাটি নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

বিশেষতঃ জন্মান্তর বা পরলোক স্বীকার না করিলে ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে; এই জন্যই যদি জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক হইত, তবে পাপের স্রোত ভয়ঙ্কর প্রবল ও সাধু প্রবৃত্তি অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িত। বর্ত্তমান সময়ে জন্মান্তরে অধিকাংশের অবিশ্বাস বলিয়াই পাপের বেগ ক্রমেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে। জন্মান্তরে বা পরলোকে সুখের আশা না থাকিলে কে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সাধু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত? কোন বীর পরোপকারের জন্য, অসহায়া পর নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য স্বেচ্ছা পূর্ব্বক জীবন দান করিত? সুতরাং জন্মান্তরবাদই পাপের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পবিত্র প্রেমের ভবিষ্যৎ ভরসা, সাধু কার্য্যের উৎসাহদাতা এবং নিরাশ জীবনের একমাত্র প্রিয়তম বন্ধু।

অশ্রু-বিন্দু।

প্রাবৃটের প্রভাতের পটে,
স্পন্দহীনা নলিনীর সমা,
প্রথম-মিলন-নিশার শেষে,
সমুখে দাঁড়ায়ে মনোরমা।
নীলোৎপল নয়নযুগল,
হৃদয়ের স্বচ্ছ দরপণ;
প্রতিবিম্ব ফেলিয়াছে তায়,
পুষ্পিত সে হৃদয়-কানন।
লক্ষ্যহারা, উদাস চাহনি,
কি যে ব্যথা বলিতে তা নারে;
চাহিতে চাহিতে মুখ খানি,
ভেসে গেল অবিরল ধারে।

প্রাণভরা যাতনা তাহার,
ওগো সে যে কেঁদে হল সারা;
আমার হৃদয়ভরা সুখ,
দেখে সেই নয়নের ধারা।
সিক্ত করি নয়ন পল্লব,
বিন্দু পড়ে বিন্দুর উপরে;
স্বর্গ হতে সুরবালা যেন,
ঢালে সুধা আমার অন্তরে।
কি যেন হারায়ে ছিল মোর,
পাই নাই করি অন্বেষণ;
একটী অশ্রুর-বিন্দু কাছে,
পেলাম সেই হারান রতন।

প্রণয়ের প্রথম উন্মেষ,
সংশয়ে শঙ্কিত সদা প্রাণ;
"কি জানি হৃদয়খানি মাঝে,
আছে কি না আছে কিছু স্থান।
অকপট হৃদয় তত বটে,
তবু ভাল বাসে কি না বাসে;
আধভাঙ্গা ঘুমের স্বপন,
এই নাই, পুনঃ ফিরে আসে।
অশ্রুরূপী দেবতা বা হবে,
ভাষিতে সে সন্দেহ আমার;
অশরীরী মধুর বচনে,
বলে গেল 'তোমার' 'তোমার'।

আনন্দের হিল্লোলে ভাসিয়া,
প্রাণময় হ'ল প্রতিধ্বনি,
আমি তার সে আমার বটে,
কাঁদ তবে কাঁদ সুহাসিনী।
স্বর্গ হতে শান্তিময় স্থান,
বহে যথা প্রেম-প্রবাহিনী;
বেথানে প্রীতির গাঢ়ছায়া,
অঙ্গ তার সুন্দর শরণি।
আছে কিগো এ হেন রতন,
কল্পনা ভাণ্ডারে শোভাময়;
এক বিন্দু হেন অশ্রুসনে,
হ'তে পারে ঋণ বিনিময়।

অবতার প্রয়োজন ও বুদ্ধাবতার।

(৫)

বৌদ্ধদিগের যতগুলি সম্প্রদায় আছে, তন্মধ্যে নাস্তিক্য বিষয়ে যেরূপ চার্ব্বাক *, আস্তিক্য বিষয়ে সেইরূপ দিগম্বর সম্প্রদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈদিক মতের সহিত এই সম্প্রদায়ের অতি অল্পই মতভেদ দৃষ্ট হয়, দিগম্বর সম্প্রদায় যদি বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করিতেন, তবে আর তাঁহারা কোন রূপেই নাস্তিক শব্দের বাচ্য হইতেন না। আত্মা, পরকাল ও বেদের

(*) মহাভারতীয় মৌষলপর্ব্বের ৩য় অধ্যায়ে চার্ব্বাক মতের উল্লেখ দেখা যায়, মহাভারত-রচনার বহুকাল পরে বুদ্ধাবতার এবং বুদ্ধাবতারের বহুকাল পরে বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে চার্ব্বাক সম্প্রদায়ের উৎপত্তির প্রমাণ অগ্রাহ্য হওয়া যায়। এমতাবস্থায় মহাভারতে চার্ব্বাক মতের উল্লেখ নিতান্তই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। এ বিষয়ে কতকভেদে কল্পনা করিয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হইতেছে না; পরন্তু ইহা যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপও বোধ হয় না, আমাদিগের বোধ হয় অতি প্রাচীন কালেও নাস্তিক মতের অস্তিত্ব ছিল। সেই নাস্তিক মতাবলম্বীগণই মহাভারতে চার্ব্বাক নামে অভিহিত হইয়াছে অথবা প্রাচীন কালে চার্ব্বাক নামক কোন নাস্তিক আচার্য্য সংগৃহীত হইয়াছিলেন। কাল সহকারে বৌদ্ধদিগের মধ্যে এই চার্ব্বাক মতের পুনরুল্লেখ হয়। যে সকল ব্যক্তি কোন প্রকার শাস্ত্রমতের অনুবর্ত্তন এবং প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জড় পদার্থ ব্যতীত অতীন্দ্রিয় কোন পদার্থ স্বীকার না করেন, নাস্তিক্য মত তাদৃশ ব্যক্তিগণের স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত। ভারতের চার্ব্বাক মতের ন্যায় সম্প্রতি ইউরোপ খণ্ডেও নাস্তিক্য-বাদের প্রচার দেখা যায়, অনেকেই আত্মার পুনর্জ্জন্ম ও পরকাল স্বীকার করেন না। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা আত্মা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতের সহিতও ভারতীয় অধ্যাত্ম-তত্ত্ব মতের ঐক্য নাই। ইহাঁদিগের কেহ কেহ মনকে অথবা স্নায়ু সকলের সমষ্টি ভাবকেই আত্মা বলেন। ডাক্তার বেঁা বলেন; "মানসিক শক্তিই

প্রামাণ্যতা অস্বীকারই ন্যূনাধিকতার কারণ, ইহার একটী অস্বীকার করিলেই আর্য্যশাস্ত্রমতে নাস্তিক মধ্যে পরিগণিত হইতে হয়। দিগম্বর সম্প্রদায়, আত্মা ও পুরুষ স্বীকার করিয়াও কেবল বেদের অপৌরুষেয়তা † স্বীকার

আত্মার পদার্থ ও উপাদান আর তদসম্বন্ধেই আত্মা ইত্যাদি "গীরউইলিয়ম্ হামিল্টনের মতে আত্মার স্বরূপ অজ্ঞেয়, আত্মা বিষয়ক তাহা কাহারই জানিবার শক্তি নাই। আর্য্য শাস্ত্রের অজ্ঞেয়বাদ আছে। কিন্তু হামিল্টনের অজ্ঞেয়বাদ হইতে ইহা ভিন্নরূপ। আর্য্য-শাস্ত্রে আত্মা, বাক্য মনের অগোচর ; কিন্তু নিজবোধ রূপ। মৃত্যুরপর শাস্ত্রে আত্মানুসন্ধানের পরামর্শ আছে। হামিল্টন আত্মতত্ত্ব জানে সর্ব্বথা অসামর্থ্য স্বীকার করিয়া অনভিজ্ঞতে সন্তুষ্ট থাকিতে পরামর্শ দিয়াছেন। অতএব বলা বাহুল্য যে আমরা তাঁহা অপেক্ষা চার্ব্বাক মতের পরিপোষণ করিয়াছেন। হামিল্টন প্রচ্ছন্ন চার্ব্বাক।

অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় মহর্ষিগণের আত্মিক মতভেদ নাই। দ্বৈতাদ্বৈত বিষয়ে মতভেদ আছে ; কিন্তু তাহা তাত্ত্বিক নহে। কেননা উক্ত উভয়বাদীই আত্মাকে অবিনশ্বর ও দেহাতিরিক্ত জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; তবে দ্বৈতবাদিগণ জীব চৈতন্য ও ব্রহ্ম চৈতন্যে আংশিক ভেদ এবং অদ্বৈতবাদিগণ উভয়ের অত্যন্ত অভিন্নত্ব স্বীকার করেন মাত্র। পরন্তু আধ্যাত্মিগণ অবিসম্বাদিতরূপে প্রাণীমাত্রেই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় আধুনিক পণ্ডিতদিগের আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকে মনুষ্যেতর পশ্বাদি প্রাণির আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ডাক্তার ফ্যেচার ও ডাক্তার ড্রিসডেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, মনুষ্যেতর প্রাণীর আত্মা নাই কেবল মন আছে। ফ্যেচারের মতে চিন্তা শক্তিই মন তাহা অনাদি পদার্থ। মন, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা সম্ভূত ক্রিয়ামাত্র ; কিন্তু আত্মা অজন্ম নহে, ইহা জড়াতীত অবিনশ্বর পদার্থ ; এবং মানুষের জ্ঞানের অগম্য। ইত্যাদি—

† যে শাস্ত্র কোন ব্যক্তি বিশেষ কর্ত্তৃক প্রণীত নহে যাহা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, তাহাই অপৌরুষের নামে না করাতেই নাস্তিক মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ‡ বাস্তবিক বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে নিরপেক্ষভাবে দিগম্বর সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহার

উদারতা ও সারবত্তা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়। এধর্ম্মে আত্মা ও পরকাল মানিত হইয়াছে, ধর্ম্মসাধনের মূল কারণ জিতেন্দ্রিয়তা, তাহার—বাচিক ও মানসিক সাধনশীলতা সরল হইয়াছে। বেদে সাত্ত্বিক ধর্ম্ম নামে যাহা উক্ত হইয়াছে, দিগম্বর সম্প্রদায়ে তাহার অসত্ত্বার অভাব নাই ; অধিকন্তু "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" জগতে কেবল এই সম্প্রদায়েই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জগতের সর্ব্বত্রই মানবরূপী রাক্ষসগণের দ্বারা প্রতিনিয়ত নিরীহ পশু পক্ষী সকল হত ও নিঃশেষপ্রায় হইতেছে ; অন্য কোথা ও ইহাদিগের পরিত্রাণ নাই কেবল এই ভারতের দিগম্বর সম্প্রদায়ই প্রাণিগণের অভয়প্রদ শান্তি-নিকেতনস্বরূপ। অতএব আমাদিগের নিতান্ত বিশ্বাস যে, দিগম্বর সম্প্রদায়ের কল্যাণে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্ব লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। এ স্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও এ সম্বন্ধে সামান্য গৌরবাস্পদ নহে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও প্রাণীহিংসা বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান। সে যাহা হউক এ সম্বন্ধে আর লিপিবাহুল্য না করিয়া দিগম্বর সম্প্রদায়ের জীবাত্মা সম্বন্ধে মত ও বিশ্বাস বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা পূর্ব্বক আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

দিগম্বর সম্প্রদায়, জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; কিন্তু ইঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে, আত্মার পরিমাণ আছে তাহা দেহের তুল্য। বাস্তবিক এরূপ স্বীকার করিলে জগতে যে জন্তুর আকার যতবড়, তাহার আত্মাকেও তত বড় বলিয়া মানিতে হয়, অতএব স্থূলচর্ম্মটুগিরের মধ্যে হস্তিকেই মহাত্মা বলা যাইতে পারে ; বাস্তবিক তাহা নহে। দেহ স্বভাবতই পরিচ্ছিন্ন পদার্থ, আত্মার পরিমাণ নাই। আত্মা, আদি-মধ্য-অন্ত-রহিত। ভৌতিক পদার্থের আত্মার আদ্যন্ত দর্শনেই যে, দিগম্বর সম্প্রদায় উক্ত বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছেন, ইহা সুস্পষ্ট ঔদয়জন্ম হয়, ঘটাকাশের ঘটের অবয়ব—অনুসারে অথবা বায়ুর তদাধারের অবয়ব—অনুসারে যেরূপ তদাকারত্ব হয় অর্থাৎ চতুষ্কোণ ঘটস্থ আকাশ যেরূপ চতুষ্কোণ অথবা গোলাকার ঘটস্থ বায়ু যেরূপ গোলাকাররূপে প্রতীয়মান হয়, দিগম্বরগণ আত্মাকেও সেইরূপ স্থূলদেহের তুল্য মনে করেন। বাস্তবিক আত্মা যে, কোন ভৌতিক পদার্থের ন্যায় নহে এবং কোন জড় পদার্থ যে আত্মার আধার হইতে পারে না, দিগম্বর সম্প্রদায় এ বিষয় প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। সত্য বটে আর্য্যশাস্ত্রেও জীবাত্মাশরীরাবচ্ছিন্নরূপে উক্ত হইয়াছেন ; কিন্তু উহা স্থূল শরীর নহে, —সূক্ষ্ম শরীর। আত্মা যেরূপ ইন্দ্রিয়াতীত এই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ; আত্মা এই লিঙ্গ শরীরাবচ্ছিন্ন ; সুতরাং আত্মা স্থূলদেহের পরিমাণ তুল্য হইতে পারেন না। স্থূল ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে লয় প্রাপ্ত হয়, লিঙ্গদেহের বিনাশে আত্মাও সেইরূপ পরমাত্মাতে অভেদলয় প্রাপ্ত হয়। যে পর্য্যন্ত লিঙ্গদেহের বিনাশ না হয়, সে পর্য্যন্ত সহস্র স্থূল দেহের নাশেও আত্মার পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌ত্বের অবসান হয় না। এই পৃথক্‌ত্বের অবসানই মুক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান এই মুক্তির কারণ। বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, লিঙ্গশরীর নামে মাত্র-শরীর ; বাস্তবিক ইহা ঔপাধিক মাত্র, স্থূল শরীরের ন্যায় ইহা ভৌতিক পদার্থ নহে, উপাধি-বিনাশও যাহা লিঙ্গদেহের বিনাশও তাহাই। "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ জীবও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান বলা যায় ; তত্ত্বজ্ঞান হইলেই এই ঔপাধি

বিনষ্ট হয়। দিগম্বর সম্প্রদায়ও মুক্তি স্বীকার করেন। একমাত্র নির্ব্বাণই ইহাদিগের চরম লক্ষ্য। এই নির্ব্বাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত দিগম্বর সম্প্রদায়ের সাধকগণ অতিকঠোর তপস্যা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই তপস্যার বিবরণ পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

আমার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার! আমার! আমার! আমি কে তার খোঁজ নাই—কিন্তু চারিদিকেই আমার। এই 'আমার' কথাটি লইয়াই সংসার—আর এই সংসারময়ই 'আমার'। 'আমার' আছে—তাই এসংসারে আমি আছি,'অমার'না থাকিলে এ সংসারে আমি থাকিতে পারিতাম না। সংসারের সুখ দুঃখ মান অপমান,ঐশ্বর্য্য দরিদ্রতা প্রভৃতি সকলই এই 'আমার' কথাটির উপর নির্ভর করে। এ হেন 'আমার' কথাটির মূল্য কি যদি তোমরা জানিতে ইচ্ছা কর, তবে একটী গল্প বলি শুন।

এক দিন বৈকালে দুইটি বালক এক প্রকাণ্ড আম-বাগানের মধ্যে খেলা করিতেছিল। জ্যৈষ্ঠ মাস, বেলা তখন দুপহর বজিয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যকিরণের সে তেজ এখন আর নাই। চিরদিনই বা কাহার তেজ সমানভাবে থাকে, তা বল। পাকা-আমের গন্ধে চারিদিক আমোদিত; ফুলের গন্ধ ভাল না ফলের গন্ধ ভাল? আর যেখানে সৌগন্ধ সেই খানেই মধুকর, তা মধু থাকুক বা না থাকুক, তাহার সেই গুণ গুণ রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। আবার মধুকরের গুণ গুণানির সঙ্গে ভোমরার ভোঁ ভোঁয়ানিও আছে; যেন বিয়ে-বাড়ীর রোসন-চৌকির বাজনা আরম্ভ হইয়াছে। সে বা ভোঁ ভোঁ করিয়া সুর দিতেছে, আর সে বা ওগ ওগ করিয়া রাগিনী আলাপ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে কাক প্রভৃতি পক্ষিকুলের কলরবটি বিয়ে বাড়ীর অঙ্গহীন হইতে পারিত। ঐ যা—আমরা যে গল্পের গোড়ার কথাইভুলিয়াগিয়াছি। হাঁ কি বলিতেছিলাম—দুইটি বালক এই আম বাগানে খেলা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে বড়টির নাম সজনী, আর ছোটটির নাম রজনী। নামের মিল দেখিয়া কেহ যেন এই দুইটিকে সহোদর মনে করিবেন না। নামের মিল হইয়াছে, মনের মিল দেখিয়া আবার সহোদর নয় বলিয়া পরস্পরের মধ্যে যে সহোদর সদৃশ ভালবাসা ছিল না—এরূপও যেন কেহ মনে না করেন। এক মায়ের পেটে না জন্মালেও যে দুইটি বালকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহোদরসদৃশ স্নেহ বর্ত্তমান পারে, তাহার প্রমাণ এই সজনী আর রজনী।

রজনীর বয়স সাত বৎসর, আর রজনী মাত্র পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই নির্জ্জন আম-বাগানে আসিয়া খেলা করিতে তাহাদের অন্য উদ্দেশ্যও ছিল; একটি আম

পড়িলে, হয় সজনী না হয় রজনীই দৌড়িয়া গিয়া তাহা কুড়াইত। আম পড়িলে, খেলা ফেলিয়া তাহারা আম কুড়াইতে দৌড়াইত; সুতরাং বালকদিগের খেলার সঙ্গে সঙ্গে মাংসারিক কার্য্যও হইতেছিল।

হঠাৎ পশ্চিম দিকে এক খানা কাল মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে সেই মেঘখানা অন্য দিকেও ছড়াইয়া পড়িল। জল হয়—হয়, আর দেরী নাই, এমন সময় কোথা হইতে একটা ঝড় আসিয়া সেই মেঘখানাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। যেরূপ জল হইবার আশা করা গিয়াছিল, সেরূপ জল আর হইল না; কিন্তু খুব একটা ঝড় হইল। এই ঝড়ে সজনী আর রজনীর আনন্দের সীমা ছিল না; তাহারা উভয়েই রাশীকৃত আম কুড়াইয়া একস্থানে জড় করিতে লাগিল। ঝড় ক্রমে এত প্রবল হইতে লাগিল, যে সেই ঝড়ে বড়ের ডাল ভাঙ্গিয়া তাহাদের ঘাড়ে পড়িবার সম্ভব, কিন্তু বাকুবন্ধয়ের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। বৃক্ষেরই বা কোন্ থাকে?

তখন তাহারা মহানন্দে খেলা ভুলিয়া গিয়া কেবল আম কুড়াইতে লাগিল। যতই ঝড়ের বৃদ্ধি, ততই টিপ্ টাপ্ শব্দের বৃদ্ধি, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আনন্দের বৃদ্ধি! এদিকে সন্ধ্যা হইবার আর অধিক বিলম্ব ছিল না, কিন্তু সে দিকে কি আর এখন ঐ বালক দ্বয়ের লক্ষ্য ছিল?

এমন সময় ঝড়ের সেই হুহুমানি শব্দের মধ্যে দিগন্তব্যাপি গম্ভীর শব্দ হইল—"ও—ও —ও—স — জ — নী — ই — সি—ই।" কিন্তু তখন আর সে শব্দটা কে শোনে? সজনী তখন আম কুড়াইতেই উন্মত্ত, শব্দটা ক্রমে যেন সচল হইয়া নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। শেষে যখন সেই শব্দটা ঝড়ের কাঁধে বসিয়া মিশিয়া আম-বাগান কম্পিত করিতে লাগিল, তখন সেই বালকদ্বয় মুহূর্ত্তের জন্য একবার সেই শব্দের দিকে চাহিয়া দেখিল যে সজনীর পিতা সম্মুখে দণ্ডায়মান!

সজনীর পিতার নাম রোহিণীকান্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি এই ঝড়ের সময় পুত্রকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া মহাভীত হইয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে এই আম বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! তখন টিপ্ টাপ্ আম্র-পতনের সঙ্গে সঙ্গে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পতনের শব্দও আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ একটী ছাতাও আনিয়াছিলেন, পুত্রটীকে ছাতার মধ্যে লইলেন, বিশেষরূপ ভৎ সনা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহার একত্রিত আম্ররাশি দেখিয়া আহ্লাদে ভৎ সনার কথা ভুলিয়া গেলেন! এইবার মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন সজনী রজনীকে ডাকিল —"আয়না ভাই, আমার বাবার ছাতির ভেতর।"

কিন্তু রোহিণীকান্ত একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"তাইত এক ছাতিতে তিনজন কি করে যাওয়া যাবে? ওরে রজনী, তুই কাপড় খানা ন্যাড়াটো হয়ে মাথায় দে।"

তাহার পর সজনীর পিতা আমগুলি পরিধেয় বস্ত্রের এক অংশে তাড়াতাড়ি বাঁধিয়া লইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বাড়ীর দিকে দৌড়িলেন। রজনীর দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। কিন্তু সজনীর প্রাণ পড়িয়া রহিল—রজনীর দিকে। সে রজনীকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"আয় ভাই রজনী, তুইও আমার বাবার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া আয়।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, আর এই ঝড় জলে রজনী একলা কিরূপে এই আম

বাগানে থাকিবে।" অগত্যা রজনী তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল, কিন্তু সে তাহার সকল আম গুলি সঙ্গে লইতে পারিল না। যতদূর পারিল লইল। এত কষ্টের আমগুলি ফেলিয়া যাইতে রজনীর চক্ষে জল পড়িল। কিন্তু সে চক্ষের জলের দিকে কে আর লক্ষ্য করিবে বল? সে জল বৃষ্টির অবিশ্রান্ত জলের সঙ্গেই মিশিয়া গেল; সজনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও তাহা দেখিতে পাইল না।

সজনী পিতার ক্রোড়ে চড়িয়াছিল, আর রজনী তাহাদের পশ্চাতে দৌড়িয়া যাইতে যাইতে মধ্যে মধ্যে আছাড় খাইতেছিল। আজ সজনী আর রজনীর হঠাৎ এইরূপ ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিল কেন? সজনীও যে, আর রজনীও তু সেই। তবে রোহিণীকান্ত বহু যত্নে একজনকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, এবং আর একজনের প্রতি একবার ভুলিয়াও ফিরিয়া চাহিতেছেন না কেন? তাহার আর অন্য কারণ কিছুই নয়, রজনী তাহার পর, আর সজনী তাহার সেই—"আমার"।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রজনী যখন গৃহে আসিয়া পৌঁছিল; তখন কিন্তু একজন স্ত্রীলোক উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইল। তবে রজনীর ও "আমার" বলিবার ছিল। যে স্ত্রীলোক দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইল, সে রজনীর জননী—নাম কমলা।

কমলা রজনীকে কোলে লইয়া তাহার সর্ব্ব শরীর অতি যত্নের সহিত মুছাইয়া দিল। পুত্রকে এই ঝড়জলে আম কুড়াইয়া আনিতে দেখিয়া কমলা কিন্তু সন্তুষ্ট হইলেন না; পুত্র মাতাকে বলিল—"মা, অনেক আম কুড়িয়েছিলুম, আন্‌তে পারলুম না, সজনীর বাপ দিয়ে তার আম নিয়ে এলো, আর আমার গুলো পড়ে রইলো।"

কমলা পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"আমার আমে কাজ নেই বাবা। তুমিযে আমার ঘরে ফিরে এসেছ—তাই ঢের। আমি মনে করেছিলুম, তুমি সজনীদের বাড়ীতে আছ। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসেছিলুম, জল ধরলেই তোমায় আন্‌তে যেতুম।"

রজনী বলিল—"দেখ মা, সজনীর বাপ সজনীকে ছাতির ভেতর কোলে করে নিয়ে এলো, আর আমি তাদের পেছনে দৌড়ে আস্‌তে আস্‌তে বড় পড়ে গেছি মা।

কমলা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"ওঠে! তোমার কোথাও লাগে নাই ত বাবা?"

রজনী।—না আমার মা, লাগেনে। আমার লাগ্‌লে তুই কাঁদিস্ কেন মা?

কমলা।—তুমি যে আমার সর্ব্বস্বধন বাবা।

রজনী।—হাঁ মা, সজনীর বাপ সজনীকে কত আদর করে, সতীশের বাপ সতীশকে কেমন জুতো কিনে দিয়েছে। আর আমার বাপ নেই কেন মা?

কমলা।—তোমারও তিনি আছেন।

রজনী। তবে আমার বাবা আমায় আদর করে না, জুতো কিনে দেয় না কেন মা?

পুত্রের এই কথায় এইবার মাতার চক্ষে জল আসিল। অনেকদিনের একটী পুরাতন স্মৃতি কোথা হইতে এই সময় আসিয়া তাহার শোকসাগর উথলিয়া দিল। মাতা তখন পুত্রের সে প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। পুত্র বিস্মিত হইয়া বলিল—"তুই কাঁদিস কেন মা?"

কমলা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া রজনীর মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"দুখিনীর ধন আমার, আমার অদৃষ্টে মন্দ বলেই তোমাকে কেউ আদর করেনা বাবা।"

রজনী এইবার বলিল—"আমার বাবা কোথায় মা?"

কমলা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তিনি কোথায় আছেন, কেউ জানে না, বাবা। তুমি যখন পেটে, তখন তিনি একটা মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর সংবাদ পেঁয়েছি,—বেঁচে আছেন; কিন্তু কোথায় আছেন কেউ জানে না বাবা।"

রজনী এইবার বলিল—"মা, আমার বাবাকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে করে। সবাই 'বাবা' বলে যখন ডাকে আমারও সে সময় বাবা বলে ডাকতে বড় সাধ যায়।"

পুত্রের এই কথায় মাতার শোকসাগর পুনরায় উথলিয়া উঠিল। মাতা তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। মাতাকে এরূপ ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া পুত্রের চক্ষেও কোথা হইতে জল আসিল। পুত্রও কাঁদিয়া আকুল; কিন্তু পুত্র কাঁদে—মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া। পুত্রকে কাঁদিতে দেখিয়া মাতা তখন অনেক কষ্টে স্থির হইল। পুত্রের ক্রন্দনও তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল। পুত্র এইবার বলিল—"মা, বাবাকে খুঁজ্‌তে কেন?"

কমলা এবার কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কে খুঁজ্‌বে বাবা?"

রজনী অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল। সেই ক্ষুদ্র বালকেরও আবার চিন্তা, শক্তি আছে না কি? তাহার পর বলিল—"মা, ছুটী কবে দেবে; আমি বড় হলে খুঁজে আন্‌বো।"

মাতা আহ্লাদে পুত্রকে সস্নেহে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার তাহার মুখচুম্বন

করিতে করিতে বলিল—"তুমি আমার বেঁচে থাক বাবা।"

মাতার আহ্লাদে সস্নেহ আলিঙ্গন আর ঐ বারম্বার মুখচুম্বনের অর্থ কি জান? ইহাদেরও অর্থ সেই, "আমার।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর প্রায় বারো বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। রজনী এখন আর নিতান্ত বালক নহে। সে বৈধব্যাবস্থায় জননীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে কর্ত্তব্য মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। সর্ব্বদাই তাহার পিতার কথা মনে হইত; তবে কি উপায়ে তাঁহার অনুসন্ধান করিবে, তাহা কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না। এই সময় একদিন রজনী তাহার মাতাকে বলিল—"মা তুমি আমায় অনুমতি কর; আমি বাবার অনুসন্ধানে যাব।"

কমলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমি বড় হতভাগিনী, তাই তোমায় কোথাও যেতে দিতে আমার মন সরে না। আমি কি করে তোমায় একলা বিদেশে যেতে দেব বাবা?"

রজনী তৎক্ষণাৎ বলিল—"সজনী আমার সঙ্গে যাবে মা। তার মামা কল্‌কেতার একজন বড় লোক। সজনী বলে—তাঁর কাছে গেলেই নিশ্চয় কোন উপায় হতে পারে। আমি আর সজনী কালই কল্‌কেতা যাব মা।"

কমলা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—"বাবা, তুমি আমার অন্ধের যষ্টি—নয়নের মণি, তুমি গেলে, আমি কাকে নিয়ে এসংসারে থাকবো বাবা?"

রজনী। মা, আমার বেশী দেরী হবে না।

তুমি কিছু ভেবোনা; আমি বাবাকে সঙ্গে করে তবে ঘরে আসবো।

কমলা। রজনী, তোর মুখ চেয়ে আমি সকল কষ্ট ভুলে আছি। তোকে ছেড়ে আমি কি করে থাকবো বাবা?

রজনী। মা, তোমার দুঃখ দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায়। এখন বড় হয়েছি, এ সময় যদি তোমার দুঃখ দূর করবার চেষ্টা না করি, তবে আমার জন্মই যে বৃথা মা।

কমলা। তুমি আমার বেঁচে থাকলে, আমি তোমায় নিয়ে সুখী হতে পারবো। তুমি কোথাও যাবে বললে, আমার প্রাণের ভেতর এমন করে কেন বাবা?

রজনী। মা, আমি এখন আর ছেলে-মানুষ নই! এখন আমি যদি বাবার অনুসন্ধান না করি; তাহলে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে মা?

কমলা। তুমি আমার দুঃখিনীর ধন বলে, আমার কেমন নানা দুর্ভাবনা আসে। যদি সেখানে কোন অসুখ করে, তবে তোমায় কে দেখবে বাবা?

রজনী। আমি এখন সজনীর মামার বাড়ী গিয়ে থাকবো, সেখানে অসুখ করলে তারা দেখবে। আর আমায় ভগবান দেখবে মা। হাঁমা, তোমার কি ভগবানে বিশ্বাস নেই?

কমলা বলিল—"কে জানে বাবা, আমার প্রাণের ভেতর এমন করে কেন! তুই একবার সজনীকে ডাক; আমি তাকে একবার ভাল করে জিজ্ঞেস করি।"

রজনী তৎক্ষণাৎ সজনীকে ডাকিতে গেল, কমলা অনেকক্ষণ অন্যমনে কি চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় সজনী আসিয়া বলিল-'কেন মাসি-মা, আমায় ডেকেছ?'

কমলা বলিল—"হাঁ বাবা, কল্‌কেতায় তোমার মামার বাড়ী গেলে কি কোন অনুসন্ধান করতে পারবে?"

সজনী। মাসিমা, তুমিত কলকেতা কখন দেখনি; এ পৃথিবীর সকল দেশের লোক সেখানে আছে; আর যেমকল খবরের কাগজ আছে, তাতে পৃথিবীর খবর পাওয়া যায়। সেখানে গেলেই মেসো মশাইয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারবে।

সজনীর পশ্চাতেই রজনী ছিল, এইবার রজনী বলিল—"কেমন মা, আমি যা বলছিলুম, তাই ঠিক কি না? তুমি যদি আমায় না পাঠিয়ে দাও, তাহলে কিন্তু ভেবে ভেবেই আমার অসুখ করবে।"

কমলা তখন শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"সে কিরে বাবা!"

সজনী বলিল—"আর আমার সঙ্গে যখন যাবে, তখন তোমার আর ভয় কি মাসিমা! রজনী যেখানেই যাক, আমিত তার সঙ্গে থাকবো। তুমি কিছুই ভেবোনা মাসি মা।

কমলা বলিল—"আচ্ছা বাবা, তবে তাই হবে।"

সজনী বলিল—"কাল সকালে দিন ভাল আছে, আমরা কালই যাবো।"

পর দিন প্রাতে রজনী আর সজনী কলিকাতার উদ্দেশে যাত্রা করিল। কমলা সজল নয়নে উভয়কে বিদায় দিল। উভয়েই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গেল বটে, কিন্তু সজনী অপেক্ষা রজনীর জন্য কমলার প্রাণ এত কাঁদিতেছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরও সেই 'আমার'?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রজনীর যে গ্রামে বাস, তাহার নাম গোপালপুর। এই গোপালপুর হইতে গাংনা ষ্টেশন প্রায় আট ক্রোশ। গাংনা হইতে রেলের গাড়ীতে কলিকাতায় যাইতে হয়। গোপালপুর হইতে রজনী ও সজনী আট ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া গাংনা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল; তখন বেলা প্রায় দুইটা, সুতরাং রাত্রের ট্রেনের জন্য তাহাদিগকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। একটী দোকানে আহারাদি করিয়া তাহারা উভয়ে ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিল। যথা সময়ে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন সেই গাড়ীতে উঠিয়া পরদিন প্রত্যূষে তাহারা কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল।

সামান্য পল্লীগ্রাম হইতে ভারতের রাজধানী কলিকাতা সহরে আসিয়া পৌঁছিলে প্রথমেই বিস্মিত হইয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে হয়। এমন সুন্দর নগর পল্লীগ্রামবাসীর কল্পনাতেও আসিতে পারে না। সজনী ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় দুই একবার আসিয়াছিল, কিন্তু রজনীর জীবনের মধ্যে এই প্রথম কলিকাতাদর্শন; সুতরাং রজনী বিস্মিত-নেত্রে এই মহানগরীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিল। সজনীর মাতুল উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন বড় মানুষ হইয়া কলিকাতার শ্যামবাজারে আসিয়া বাস করিতেছেন; সুতরাং সজনী ও রজনী সেদিন শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে শ্যামবাজারে সজনীর মাতুলালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

উমাচরণ বাবু বড় ভদ্রলোক, তিনি সজনীর মুখে তাহার পিতার সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন; কিন্তু কি উপায়ে তাহার অনুসন্ধান করিবেন, তাহা কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। একজন বালকের এরূপ পিতৃভক্তি দেখিয়া তিনিও তাহাকে প্রাণপণে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

রজনীর পিতার নাম দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়। উমাচরণ বাবু প্রথমে যে সকল স্থানে তাঁহার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, সেই সকল স্থানে পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না অবশেষে তিনি কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে নিম্নলিখিত একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন:—

"জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামনিবাসী শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজ সতের বৎসর নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তিনি কোথায় আছেন—জীবিত কি মৃত, তাঁহার স্ত্রীপুত্র কিছুই জানেন না। তাঁহার নিরুদ্দেশ হইবার তিন মাস পরেই এক পুত্র জন্মিয়াছে; সেই পুত্র এখন বড় হইয়া পিতার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে। যদি কেহ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারেন, তাহা হইলে একটী অনাথ ব্রাহ্মণ পরিবারের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। আর দুর্গাদাস বাবু! এই বিজ্ঞাপন যদি আপনার চক্ষে পড়ে, তবে একবার আপনার সেই পতিব্রতা স্ত্রী ও স্নেহের পুত্রের বিষয় ভাবিয়া দেখিবেন। আর আপনি যে কারণে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, এখন সে বিষয়ে লজ্জা করিবারও কোন কারণই নাই। আপনি গৃহে ফিরিয়া আসিবেন বা কোথায় আছেন সংবাদ দিবেন।"

এই বিজ্ঞাপন তিন সপ্তাহ প্রকাশ হইবার পর ঢাকা জেলা হইতে স্বয়ং দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক খানি পত্র উমাচরণ বাবুকে লিখিলেন! সে পত্র পাইয়া রজনীর আনন্দের সীমা রহিল না। এত দিনের পরে পিতার অনুসন্ধান পাইয়া রজনী যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ

জননীকে এই সংবাদ দিয়া, মধ্যে একখানি পত্র লিখিলেন এবং তাঁহার পিতাকেও অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া এক খানি পত্র লেখা হইল। এইরূপ ২।৩ খানি পত্র লেখার পর তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিতে সম্মত হইলেন। তিনি যে তারিখে ঢাকা অঞ্চল হইতে বাড়ী রওনা হইবেন, স্থির হইল; তাহার পরদিন রাত্রের মেল গাড়ীতে সজনী ও রজনী মহা আনন্দের সহিত কলিকাতা হইতে বাড়ী রওনা হইলেন। পাংসা ষ্টেসনে গোয়ালন্দের গাড়ী রাত্রি দশটার সময় আসিয়া পৌঁছিয়া থাকে; কিন্তু শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে যে গাড়ী গোয়ালন্দে যায়, সে গাড়ী পাংসা ষ্টেশনে পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় চারিটা বাজিয়া যায়। রজনী তাহার পিতাকে জীবনে কখন দেখে নাই; সুতরাং পাংসা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তাঁহার কোন অনুসন্ধানই করিতে পারিল না।

তখন দুই বন্ধুতে মনে করিল যে হয়ত তিনি অগ্রেই দেশে চলিয়া গিয়া থাকিবেন; তথাপি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ষ্টেশনে অপেক্ষা করিয়া দেখিল। তাহার পর উভয়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিল। রাস্তায় অনেক লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু কিরূপে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। বেলা দশটার সময় তাহারা এক চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইখানে আহারাদি করিয়া বৈকালে দেশে যাওয়া তখন স্থির করা হইল।

এই চটিতে আরো অনেক যাত্রী আহারাদির উদ্যোগ করিতেছিল। আজ রজনীর শরীর বড় ভাল নয়, পিতার সহিত দেখা হইবে—এই আহ্লাদে গত রাত্রে গাড়ীতে তাহার নিদ্রা হয় নাই; রাস্তায় আসিতে আসিতে তাহার দুই বার ভেদও হইয়াছিল। এই চটিতে যখন তাহারা আসিয়া পৌঁছিল, তখন রজনী বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, নচেৎ পিতৃদর্শন লাভের জন্য সে যেরূপ অধৈর্য্য, তাহাতে কেবল আহারাদির জন্য চটিতে কিছুতেই বিলম্ব করিত না।

চটিতে আসিয়া পৌঁছিবার অর্দ্ধঘণ্টা পরেই রজনীর পুনরায় একবার ভেদ হইল; এবার সে এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, আর নদীর ঘাট হইতে আসিতে পারে না। রজনী অনেক কষ্টে চটিতে আসিয়াই সজনীকে বলিল—"এবার আমার ভয়ানক এক দাস্ত হয়েছে, শরীর যেন অবসন্ন হয়ে পড়ছে, আমি যেন চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কাণেও ভাল শুনতে পাচ্ছি না।"

সজনী রজনীর মুখের দিকে চাহিয়াই শিহরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু যেন কোটরে প্রবেশ করিয়াছে, চক্ষুর সে জ্যোতিঃও যেন আর নাই! রজনী আর বসিতে পারিল না। তখন সজনী তাড়াতাড়ি একখানি মাদুর পাতিয়া দিয়া বন্ধুর শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। রজনী সেই শয্যায় শয়ন করিয়া যেন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল; তাহার হাতে পায়ে খিল্ ধরিতে লাগিল। পিপাসায় ছাতি ফাটিতে লাগিল। এক গেলাস জল খাইবার পরই ভয়ানক বমি হইল। চিকিৎসার জন্য সজনী ব্যস্ত হইল, কিন্তু বন্ধুকে তাহার নিকট রাখিয়া চিকিৎসক আনিতে যাইবে? একজন লোককে গ্রামের মধ্যে ডাক্তার আনিতে পাঠাইল, কিন্তু ডাক্তার যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিল না, সুতরাং সজনী বড়ই বিপদে পড়িল।

চটিতে আর একটী বিভ্রাট পড়িয়া গেল। এখন রজনীর যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইল, তাহাতে তাহার জীবনের আশা আর নাই

চটিতে যে সকল লোক রন্ধনাদি করিতেছিল, যাহাতে কোনরূপ বিপদ ঘটিলে তাহাদের আহারের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে; সেই কারণ তাহারাও বড় উত্তিগ্ন হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ এই অবস্থাতেই রজনীকে ঔষধাদি করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। রজনী রোগীর অবস্থা দেখিয়া সজনীকে ডাকিয়া বলিল—"যখন ডাক্তার পাওয়া গেল না, তখন এক কাজ কর, এই বেলা ঐ নদীর ধারে নিয়ে যাই; নদীর হাওয়া লাগ্‌লে এ রোগের উপকার হতে পারে।"

ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যের কারণ এই চটির মধ্যে ঐ রোগীর মৃত্যু হইলে তাঁহার আহারের ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু সজনীও তখন প্রায় জ্ঞানশূন্য; ডাক্তার না পাওয়ায় তাহার প্রাণের বন্ধু রজনী বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছে। দূর হইতে আসিবার সময় রজনীর জননী কাতর যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, এখন সে সকল কথাও সজনীর মনে পড়িতেছে। এরূপ মৈমাংসার সময় কেহ কোনরূপ আশা দিলে তখন আর কোন বিবেচনা-শক্তি থাকে না। সুতরাং সজনী তখন তাহাই করিল, দুই তিনজন লোকের সাহায্যে সজনী রজনীকে ধরাধরি করিয়া সেই নদীর তীরে লইয়া গেল।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে যখন সেই ব্রাহ্মণ আহার করিতে বসিবেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে সেই রোগীর মৃত্যু হইয়াছে। ব্রাহ্মণ তখন দক্ষিণের নিকট আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখ্‌লেন মশাই! ভাগ্যি কৌশল করে নদীর ধারে আমি পাঠিয়ে দিলুম, তা নইলে এই রান্না ভাত সব নষ্ট হয়ে যেতো। যান সকলকে এই মুখের গ্রাস ফেলে যেতে হতো।"

অন্য একজন বলিল—"কেবল কি তাই? মশাই, ওরোগীর কাছে থাকলেও রোগে ধরে; আমরা কি করবো বলে একটু ইতস্তত করছিলুম; কিন্তু আপনি বড় বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন।"

ব্রাহ্মণের তখন আনন্দের সীমা নাই, তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এসব কাজে চক্ষু লজ্জা করিতে গেলে কি চলে মশাই?"

ব্রাহ্মণ এইবার প্রফুল্ল মনে আহার করিতে বসিলেন; আহার শেষ করিয়া তিনি যখন তামাক খাইতে খাইতে সম্বাগণের সহিত এইরূপ হাস্য মৃত্যুর নানা প্রকার গল্প করিতেছেন, এমন সময় সজনীকান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণের সে দিকে লক্ষ্যই নাই; তিনি তাঁহার গল্প লইয়াই ব্যস্ত। এমন সময় গ্রামের চৌকিদার আসিয়া সজনীকে জিজ্ঞাসা করিল—"যে লোকটী ভেদবমিতে মরে গেছে, তার বাড়ী কোথায় মশাই?"

সজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"গোপালপুর।"

এই গোপালপুর গ্রামের নামটা হঠাৎ তখন ব্রাহ্মণের কাণে গেল। কে যেন তৎক্ষণাৎ একটা উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা ব্রাহ্মণের প্রাণে ছ্যাঁকা দিল। ব্রাহ্মণের আর গল্প করা বা তামাক খাওয়া হইল না। ধীরে ধীরে হুকাটি রাখিয়া ব্রাহ্মণ তখন সজনীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

এই সময় নাম লেখা শেষ করিয়া সেই গ্রাম্য-চৌকিদার জিজ্ঞাসা করিল—"এর বাপের নাম কি মশাই?"

সজনী তখন আরো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো এর বাপ আজ সতের বৎসর নিরুদ্দেশ, সেই অনুসন্ধান করবার জন্যই

বাড়ী থেকে আমরা বেরিয়েছিলুম। এর বাপের নাম দুর্গাদাস চুটোপাধ্যায়।"

ব্রাহ্মণ সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিলেন,এইবার তাঁহার সর্ব্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! তাহার পর চৌকিদারের প্রশ্ন হইল —"নাম কি ?"

সজনী এইবার চক্ষের জল মুছিয়া বলিল— "নাম রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।"

ব্রাহ্মণ তখন চীৎকার করিয়া বলিল— "আমার পুত্র রজনী—আমার! আমার! আমার!!—"

এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতেই ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল! সে দিকে প্রথম কাহার দৃষ্টি ছিল না,এইক্ষণে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্টহইল। তখন সকলে তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণের মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতে আসিয়া দেখিল যে ব্রাহ্মণের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে।

তখন সকলে বিস্মিত হইয়া ব্রাহ্মণের এরূপ হঠাৎ মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সজনী কেবল তাহার মৃত্যুর কারণ বুঝিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণই যে রজনীর পিতা দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, সজনীর তাহা জানিতে বাকি রহিল না। সজনীর নিকট সমস্ত শুনিয়া সেই বিস্মিত লোকমণ্ডলী তখন তাহার মৃত্যুর কারণও স্থির করিল! এইবার তোমরাও এই 'আমার' কথাটির মূল্য জানিতে পারিবে। এই ব্রাহ্মণের মৃত্যুর কারণ কে জান? এ মৃত্যুর কারণও সেই—'আমার'।

খুনী কে ?

(২)

খুনী কে? চাপরাশী না সুলতান খোরসেদ? দুই জনই অদৃশ্য, সুতরাং ইহাদিগের মধ্যে কে খুন করিয়াছে, তাই তখন বুঝিতে পারিলাম না। দরোয়ানকে তার পর খোরসেদের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে তৎসম্বন্ধে কোন খবরই দিতে পারিল না। কেবল এইমাত্র বলিল—"তিনি নবাব সাহেবের বন্ধু; নবাব তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহার নিবাস কোথা ?"

দরোয়ান কিছুই বলিতে পারিল না। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমার মনে হইল যে, অন্তঃপুরটা একবার খুঁজিয়া দেখা উচিত। তখনই অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং একেবারে নবাবের শয়ন-গৃহে উপস্থিত হইলাম। গৃহের সৌন্দর্য্য ও সাজসজ্জার কথা আর কি বলিব; আমার বোধ হইতে লাগিল যেন আমি ইন্দ্রপুরীতে প্রবেশ করিলাম। সেই প্রকোষ্ঠে দুই খানি সুন্দর খাটে দুইটী শয্যা;—দেখিয়া বিস্মিত হইলাম "দুইটী বিছানাই রক্তাক্ত! একি! তবে কি খোরসেদকেও কেহ হত্যা করিয়াছে? গৃহের দর্পণ ও দেরাজ প্রভৃতি ভগ্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; দুই একখানি অলঙ্কার ও দুই চারিটী মোহর শয্যার উপরে গৃহের মধ্যে নানা স্থানে ছড়ান। দেখিয়া সহসা বোধ হয়, যেন কোন দস্যু ইহাদিগের দুই জনকে হত্যা করিয়া রত্ন ও অলঙ্কার প্রভৃতি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তখন চাপরাশীর উপরই সন্দেহ দৃঢ় হইল। মনে মনে স্থির করিলাম "আগে চাপরাশীকে ধরিতে হইবে; তাহাকে পাইলেই সকলই ধরা পড়িবে।" কিন্তু দরওয়ানকে ছাড়িলাম না; তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর সকল স্থল খুঁজিয়া বেড়াইলাম;—প্রত্যেক গৃহ ও অলিগলি অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু পাইলাম না।

মনোমধ্যে এই একটা বিষম সন্দেহ হইল যে, বেবাড়ীতে কি অপর কোন স্ত্রীলোক থাকিত না? নবাবের স্ত্রী তত রূপবতী, কিন্তু তাহার সঙ্গে কোন সখী ছিল না?" দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল "কখনও অপর কোন স্ত্রীলোককে দেখি নাই।"

একটা বিষম সন্দেহ হইল, তবে কি সেই স্ত্রীলোকটী অন্তঃপুরচারিণী ভদ্রমহিলা নহে? বারবনিতা হইলে অবশ্য তাহার সঙ্গে অনেক গুলি স্ত্রীলোক থাকিত।

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ফলতঃ মনোমধ্যে একটা বিষম সন্দেহ রহিয়া গেল। এত সামান্য রহস্য নহে!

(৩)

দিন গেল, পক্ষ গেল, ক্রমে মাস অতীত হইল, কিন্তু সেই চাপরাশীর কোন সন্ধান পাইলাম না। ছদ্মবেশে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে বড়ই ধিক্কার হইল, ভাবিলাম এত দিন ধরিয়া পুলিশে কাজ করিতেছি; এত খুনি জালিয়াত ও জুয়াচোর ধরিলাম, শেষে এই খুনের কিছুই কিনারা করিতে পারিলাম না। অনুসন্ধানে জানিলাম সেই চাপরাশির নাম এনায়েত, বাড়ী পাণ্ডুয়া। ফকির সাজিয়া তথায় যাইলাম; তাহার বাড়ীতে সন্ধান লইলাম, কিন্তু কেহই কিছুই বলিতে পারিল না; পাড়ায় শুনিলাম সে অনেক দিন বাড়ী আইসে নাই। তবে-ইত বিষম গোলযোগ! এক মাস অতীত হইল তথাপি খুনের কিনারা হইল না; ইহা কি কম বিড়ম্বনা! যাহা হউক নিরুৎসাহ হইলাম না; মনে মনে স্থির করিলাম যখন এই বিষয়ের ভার লইয়াছি, তখন প্রাণপণে ইহার উদ্ধার করিতে হইবে।

পাণ্ডুয়ায় একটী পুলিশ ষ্টেশন আছে, সেখানে একটী দারগা থাকেন। সেদিন তাঁহারই কাছে আহারাদি করিয়া এনতাজের সমস্ত সন্ধান লইলাম; তাহার যেখানে যত কুটুম্ব আছে সমস্ত অবগত হইলাম এবং তাহার আত্মীয় স্বজন ও বাটীর লোকজনের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। ক্রমে তাহার শ্বশুরালয়েও সন্ধান লইলাম; কিন্তু সেখানেও কিছুই জানিতে পারিলাম না! এই রূপে প্রায় দেড়মাস কটিয়া গেল, ওদিকে উপর হইতে ক্রমাগত ছাড়া আসিতে লাগিল; পুলিশের বড় সাহেব একদিন নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি পুরাতন দারগা, বিশেষ পরদর্শী তুমি এসম্বন্ধে কিছুই বাহির করিতে পারিতেছ না। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়।"

সেই দিন প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি প্রাণ যায়, তাহাও ভাল, তথাপি ইহার একটা কিনারা করিতেই হইবে। পুনর্ব্বার ছদ্মবেশে বাহির হইলাম, এইবার সঙ্গে এক ডজন পুলিস প্রহরী লইলাম। তাহারাও ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে কিছু দূরে দূরে চলিতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার চটিতে বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটা ফকির তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম

যে, সে নূতন ব্যবসায়ী, এখনও চালচলন দোরস্ত হয় নাই। সন্দেহ হইল; যত্ন করিয়া ডাকিলাম এবং এক ছিলিম চরস সাজিয়া খাইতে দিলাম।" ফকির প্রথমে ইতস্ততঃ করিল দেখিয়া আমি নিজে তাহার ধূমপান করিলাম, পরে তাহার হাতে দিলাম। তখন তাহার কোন সন্দেহ রহিল না। হাত হইতে লইয়া টানিতে লাগিল এবং খুব দম ভরিয়া টানিয়া হাসিতে হাসিতে কলকে নামাইয়া রাখিল।

আমি বলিলাম, "আল্লার এমনই কেরামত যে, এতদিনের পর তোমার মত দোস্তকে দেখিতে পাইলাম।"

ফকির একটু বিস্মিত হইল; একটু চিন্তা করিয়া বলিল "তুমি কি আমাকে চেন?"

আমি "বাঃ! তুমি কি সব ভুলে গেছ, কেন গতবৎসর পিরপুকুরে গোছল করিবার সময় তোমার সাতে তোমাদের ঘরে গিয়াছিলাম, কেমন মনে পড়ছে না? সেই যে, তার পর তুমি খুলতান খোরসেদের সঙ্গে জগলি গেলে।"

ফকির আরও বিস্মিত হইল, বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে আমাকে দেখিতে লাগিল। তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম কাজ হইয়াছে, ঔষধ কাজ করিয়াছে। এত দিনে কৃতকার্য্য হইলাম। আবার সেইরূপ মৃদু অথচ হৃদয়গ্রাহীভাবে বলিলাম—"তা ভাই, এ বেশ কেন? তোমার মা বাপ সেদিন কেঁদেই সাঁরা। তোমার এ বেশ ধারণ করিবার দরকার কি? আমাদের মাগ ছেলে নাই, সেই জন্য এই বেশ; তুমি কেন এরোজ করলে? চল, তোমার বাড়ী যাই; আমি তোমার বাপের কাছে কথা দিয়াছি যে তোমাকে খুঁজিয়া লইয়া যাইব।"

"না এখন বাড়ী যাইব না" ফকির বলিল, "না এখন বাড়ী যাইব না। যাইলে বিপদ ঘটিবে, দশ বৎসর এই বেশে থাকিব তাহার পর যদি পারি মাগছেলের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

শিকার হস্তগত, আর ভাবনা কি? তথাপি সকল সন্দেহ দূর করিবার মানসে বলিলাম—"এনওজ! তুমি সে জন্য কিছুই ভাবিও না। পঁচিস বৎসর আল্লার নাম লইয়া দেশে দেশে বেড়াইতেছি; তোমার ভাবনার কারণ বুঝিয়াছি। আমি তোমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিব।"

এনওজ কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"এ মিছে বিপদ; আমি কোন দোষেই দোষী নই। তবু আমার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। খুন করিল একজন আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"আরে ভাই তাওকি আমি জানিতে পারি নাই? সেই জন্যইত তোমাকে বলিতেছি, তোমার কিছু ভয় নাই। তুমি আমার মঙ্গে চল, আমি তোমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিব।"

"কোথায় যাইব?"

"তুমি যদি খুন কর নাই তবে তোমার এত ভয় কেন? যে খুনী, তাহাকে ধরাইয়া দিলেই তোমার সকল বিপদ দূর হইবে।——"এই কথা বলিতে আমি খুনী হইতে একটা বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইলাম; অমনি বার জন সমজ্জ পুলিশ প্রহরী আসিয়া এনওজকে গ্রেপ্তার করিল। জালে ধরা পড়িয়া এনওজ ভয়বিহ্বল ভাবে বলিল "আমি খুন করি নাই; দোহাই দারোগা বাবু! আমি খুন করি নাই; আমাকে ছাড়িয়া দিন্।"

"তবে কে খুন করিয়াছে?"

"খুলতান খোরসেদ।"

"খোরসেদ কি বাঁচিয়া আছে? তুমি তাহাকে ধরিয়া দিতে পার?"

"তাহাকে কেহই মারে নাই, সে নিজে হত্যা করিয়া পা ঢাকা দিয়াছে। তাহাকে ধরিয়া ফাঁসি দিন। আমি দোষী নহি।"

"তোমার ভয় নাই। তুমি আমার সঙ্গে আইস, তোমার কোন বিপদ হইবে না।"

ঠাকুর-ঝি।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমরা পূর্ব্বেই বলি পরেশনাথের পরিণাম দেখিয়া হীরালালের চৈতন্য হইয়াছিল, কিন্তু শরৎকুমারীর সহিত তাহার মন-মালিন্য এখনও দূর হয় নাই। হীরালাল এখন নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই কারণ সে মন-মালিন্য দূর করিবার জন্য হীরালাল এখন উৎসুক। শরৎকুমারীর অভিমান কিন্তু এখনও হ্রাস হয় নাই; সেই কারণ হীরালালের সহিত এখনও তাহার বাক্যালাপ ছিল না। স্ত্রী-পুরুষ রাত্রে এক শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত; অথচ তাহাদের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল না, এটা যে বড়ই অশুভ লক্ষণ, তাহার আর সন্দেহ নাই।

হীরালালের ঘাড়ের ভূত এখন তাহাকে ঘাড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং হীরালাল এখন সে কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। একদিন রাত্রে হীরালাল সতীর শয্যায় শয়ন করিয়া এই সকল কথা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং এইরূপ স্ত্রীপুরুষের নীরবে থাকার যে অসহ্য যন্ত্রণা তাহাও বিশেষরূপে ভোগ করিতেছিলেন। প্রথমে তিনি যে নিদ্রা যাইতেছেন না, সে কথা শরৎকুমারী যাহাতে বুঝিতে পারে, তাহার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন; তাহার পর—তিনি যে প্রাণের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন—বাহিরে সে যন্ত্রণাসূচকভাবও মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার শরৎকুমারীর অভিমান ভাঙ্গিল না!

এ সময়ই শরৎকুমারী কি সুখে নিদ্রা যাইতে ছিল? শরৎকুমারী এ সময় যদি নিদ্রা যাইতে পারিত, তাহা হইলে আমাদের কোন দুঃখ ছিল না; কিন্তু শরৎকুমারীত নিদ্রা যাইতে পারে নাই, শরৎকুমারীও শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে ছিল, তাহার প্রাণের ভিতরও সে যে অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না! তবে শরৎকুমারী বাহিরে সে যন্ত্রণার কোন চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল না। বাহিক আকারে সে যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকাশ পাইলে যে, শরৎকুমারীর মঙ্গল ছিল, সুতরাং শরৎকুমারী সে পথে যাইবে কেন? নিয়তিকে কে লঙ্ঘন করিতে পারে বল?

হীরালাল যখন আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না—যখন নীরবে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ তাহার প্রাণের ভিতর যেন একটা আগুন

জলিয়া উঠিল, তখন হীরালাল উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—"শরৎ!"

তৎক্ষণাৎ সেই গভীর রাত্রের নীরব ও নিস্তব্ধ প্রকৃতি কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনি উত্তর করিল—"শরৎ!"

আর কোন উত্তর নাই! হীরালাল স্তম্ভিত হইলেন। অনেকক্ষণ বিস্মিত হইয়া নীরবে রহিলেন! আবার কি মনে ভাবিয়া ঈষৎরায় হীরালাল ডাকিলেন—"শরৎ!"

এবারও কোন উত্তর নাই! তখন হীরালালের হৃদয়ের একটা বাঁধ অল্প অল্প করিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সুতরাং অন্য চিন্তারও আর অবসর ছিল না। হীরালাল মূহূর্ত্তের মধ্যে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া এইবার শরৎকুমারীর গা ঠেলিয়া ডাকিলেন—"শরৎ!"

কিন্তু এবারও হীরালাল কোন উত্তর পাইলেন না। মানিনীর মান-সমুদ্র তখন সেই ডাকে উথলিয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং শরৎকুমারী কি উত্তর দিতে পারে? হীরালাল এইবার বলিলেন—"শরৎ, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।"

হীরালালের কণ্ঠস্বর করুণরসোদ্দীপক! বাষ্পকুণ্ঠে গদগদস্বরে ঐ কথা কয়েকটি উচ্চারিত হইল, কিন্তু কই তাহাতেও মানিনীর মান ভাঙ্গিল না! সে মান এখন ভাঙ্গিবে কিরূপে? শরৎকুমারীর মান-সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়া তাহার হৃদয়কে এখন প্লাবিত করিয়াছিল। হীরালালের এইবার চক্ষে জল আসিল। হীরালাল শরৎকুমারীর চরণে লুটিয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।"

শরৎকুমারী এখনও বাহিরে অচল—অটল। কিন্তু ভিতরে অভিমানের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল, সুতরাং শরৎকুমারী কোন উত্তরই দিল না।

এইবার হীরালাল কিন্তু অধিকতর বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। এই অসহ্য যন্ত্রণা আবার পুনরায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ক্রোধে, ঘৃণায় ও লজ্জায় তখন তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই শয্যা হইতে একেবারে লাফাইয়া ঘরের মধ্যে পড়িলেন। উন্মত্ত হৃদয়-বেগ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। হীরালাল সে গৃহে আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারই শয্যা-গৃহ এবং তাহার পক্ষে নরকসদৃশ মনে হইতে লাগিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় দৌড়িয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শরৎকুমারি! আবার বলি ফের—ফের—ফের! একবার তোমার হৃদয়সর্ব্বস্ব স্বামীর প্রতি ফিরিয়া চাও। একবার একটি মাত্র কথা কহিয়া তাহার উদ্বেলিত হৃদয়কে শান্ত কর। কিন্তু শরৎকুমারীও তখন অভিমানে হিতাহিত জ্ঞানহারা! সুতরাং শরৎ এখন আর আমাদের কথা শুনিবে কেন?

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ফোরিয়া-সংবাদ।—চীন ও জাপানে যুদ্ধ বাধিয়াছে। ইতিমধ্যেই এক ব্যয় যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; সকল যুদ্ধেই আপাততঃ চীন পরাস্ত হইয়াছে; কিন্তু পরে কি দাঁড়াইবে, কিছুই বলা যায় না; কারণ চীনের সেনাবল অপর্য্যাপ্ত। চীন এখনও সর্ব্বান্তঃকরণে সমরে প্রবৃত্ত হয় নাই। কোরিয়ার রাজা জাপানে বন্দী হইয়াছেন। যুদ্ধ এখনও তত প্রচণ্ড না হইলেও উভয় পক্ষে সৈন্য-নাশ হইতেছে।

***

মহরম বিভ্রাট।—রামপুর বোয়ালিয়া সহরে মহরমের রাত্রে পুলিশের দোষে যে ভীষণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, গত বারে পাঠকদিগকে আমরা তাহা জানাইয়াছি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই ঘটনার অনুসন্ধানে বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের উল্লেখ করিয়া আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। কলিকাতা হইতে পুলিশ বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল স্বয়ং এ ঘটনার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত বোয়ালিয়া গমন করিয়াছেন। ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, তিনি ট্রকিল যাহা হউক, কে, মৈত্র কিম্বা আহত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহাকেও না ডাকিয়া একাকী তদারক করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার কার্য্য কিরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে বলিতে পারি না।

***

জীবনের মূল্য।—গোরাসৈন্য আর্শ্বষ্ট্রঙ্গ স্যাহো-য়ের পার্শ্বস্থ মিয়ানমিরের বাজারে বেড়াইতে গিয়া কিরূপে এক হতভাগ্য ছুরি-বিক্রেতার প্রাণনাশ করিয়াছিল এবং লাহোরের প্রধান বিচারালয়ে সাহেব বিচারকের নিকট তাহার কিরূপ বিচার হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানাইয়াছি। জজ সাহেব ছুরির সহিত একমত হইয়া স্থির করিলেন, আর্শ্বষ্ট্রঙ্গ তখন সুরাপানে মত্ত ছিল; সে হত্যা করিবার ইচ্ছায় ছোরাওয়ালার প্রতি ছুরিকা নিক্ষেপ করে নাই; তাহার হঠকারিতায় হতভাগার মৃত্যু হইয়াছে। অতএব ইহার কি দণ্ড হইতে পারে? অনেক চিন্তার পর জজ সাহেব বাহাদুর আর্শ্বষ্ট্রঙ্গের ২২০ টাকা অর্থদণ্ড করিলেন। এই টাকা নিহত ব্যক্তির পরিবার বর্গকে তাহার জীবনের মূল্যস্বরূপ দেওয়া হইবে। ইহা কিরূপ সুবিচার, তাহা আর বলিতে হইবে না। অত্যাচারী পুলিশ প্রহরী ও নরপশু গোরা সৈন্যগণের হস্তে প্রতিনিয়ত ধন, প্রাণ ও মান মর্য্যাদা হারাইয়া যদি ভারতবাসিকে ধর্ম্মাধিকরণে এইরূপ সুবিচারের উপর জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা হইলে বৃটিশ শাসনের উপর আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িবে না কমিবে?

***

স্ত্রীবিবেচনা। আমাদের গবর্ণমেণ্টের কি যে অভিপ্রায় তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ভারতবাসী রাজদরবারের সমস্ত উচ্চ উচ্চ পদ হইতে ক্রমে ক্রমে বঞ্চিত হইতেছেন। মহারাণীর ঘোষণাপত্র ক্রমে অমর্য্যাদার অতলজলে নিক্ষিপ্ত হইতে চলিল। তবে আর আশা কি? পবলিক সর্ভিস কমি-

শন যাহা অনুরোধ করিলেন, তাহাও রক্ষিত হইল না। গবর্ণমেণ্ট কি তবে আপনার ইচ্ছামত কাজ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে একটী বিজ্ঞাপনী হইয়াছে যে আগামী ডিসেম্বর মাসে বুক্ষ ও আসামের পুলিশ বিভাগের উচ্চতন কর্ম্মচারী নিয়োগের নিমিত্ত একটী পরীক্ষা হইবে; সেই পরীক্ষায় কেবল য়ুরোপীয় পদপ্রার্থীরই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ইহাতেই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে পুলিশ বিভাগের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-পদ য়ুরোপীয়গণের একচেটীয়া হইল, ভারতবাসী ইহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না। গবর্ণমেণ্টের এইঅনুদার আচরণের কঠোর প্রতিবাদ করা আবশ্যক। ভারতশাসনে ভারতবাসীর কি কোন অধিকার থাকিবে না?

আবার দাঙ্গা—খবর আসিয়াছে যে, মহরমের সময় কনোজনগরে হিন্দু মুসলমানে প্রচণ্ড দাঙ্গা হইয়াছিল; তাহাতে উভয় পক্ষে বিস্তর লোক আহত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই মারা পড়ে নাই; এখনও বিশেষ সমাচার পাওয়া যায় নাই। একটী বৃক্ষ লইয়াই দাঙ্গার সূত্র। কোন হিন্দুর একটী বৃক্ষ মুসলমানদিগের তাজিয়া যাত্রার পথে বাধা দেওয়াতে মুসলমানেরা সেই বৃক্ষটী কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতেই দাঙ্গা বাধে।

আর একটী সুবিচার।—কাশীতে সৈন্যদিগের ছাউনি। বিগত ২৯শে মে তারিখে প্রায় চল্লিশ জন সিপাহি সেনানিবেশ হইতে বাহির হইয়া নিকটস্থ শিবপুর নামক গ্রামে প্রবেশ করিল এবং সম্মুখে যাহাকে পাইল তাহাকেই লাঠি, সোঁটা, ইট ও পাথর দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাহাদের হস্তে নিগৃহীত হইল। দারুণ আঘাতে অনেক লোক আহত হইল; অনেকে হাসপাতালে গেল; তথায় দুইটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইল। কাশীর সেসন্‌স জজের কোর্টে সিপাহীদিগের বিচার হয়। যখন তাহারা গ্রামবাসীদিগকে আক্রমণ করে, তখন সন্ধ্যা; সুতরাং অল্প অল্প অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আহত ব্যক্তিরা সিপাহীদিগকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু গ্রামের অপরাপর লোকে চিনিয়াছিল। তাহারা দলবদ্ধ সৈন্যগণের মধ্য হইতে সাত জনকে চিনিয়া লইয়াছিল। সেই সাত জনই মুসলমান; তাহারাই আসামী বলিয়া বিচারালয়ে নীত হয়। কিন্তু জজ সাহেব তাহাদিগের সকলকেই নির্দ্দোষি বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন ঐ সাত জনই যে, দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়াছিল, সাক্ষীরা তাহা প্রমাণ করিতে পারে নাই, কাজেকাজেই তাহাদিগকে অব্যাহতি দিতে হইল। হইতে পারে, তাহারা নির্দ্দোষ, কিন্তু কতকগুলি সিপাহী শিবপুরে যাইয়া মারপিট করিয়াছিল, তাহাতে তিন জন গুরুতর এবং অপরাপর কতকি আহত হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। কিন্তু তাহারা ত সিপাহী? তাহারা ত ছাউনী হইতে বাহির হইয়াছিল? তবে তাহারা কোথা গেল?

মঙ্গল ও অমঙ্গলের কথা।

এই সংসারে মানব লীলা নির্ব্বাহ করিবার কালে উভয় মঙ্গল ও অমঙ্গলের দশা ঘটিয়া থাকে; এবং মনুষ্যের জীবন যাত্রার লৌকিক কর্ম্মের উপর দমন শক্তি ধারণ করিবার জন্য উভয়েই নিযুক্ত হইয়া অংশের ভাগী হইতেন; কিন্তু তদুপরান্তে কোন এক সময়ে অমঙ্গলগণ প্রবল হইয়া, মঙ্গলগণ সমূহকে, এই সংসার হইতে দূরীভূত করিয়াদিল; এবং অমঙ্গল সকল আপন সংখ্যায় মঙ্গলগণ অল্পসঙ্খ্যক হইবার কারণ উহারা তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া এই সংসার সিংহাসনের উপর আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিল। তাহাতে মঙ্গলগণ সমূহ উড্ডীয়মান হইয়া অমরপুরে গমন করিল, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের প্রতিবাদীগণের উপর এক ধর্ম্ম প্রতিদ্বন্দ্বের যাচ্ঞা করিলেন; এবং তাঁহারা জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, যে, তাঁহাদিগকে যেন ঐ "দুরাত্মাগণের" সহিত আর সহবাস করিতে না হয়। যেমত এক্ষণে [illegible] কোন বস্তুর উপর সাধারণীয় মিলিতাংশ আর কিছু ছিল নাহি বলিয়া, এবং একত্রে আর সহবাস করিতে পারিলেন না বলিয়া, উহারা অনন্তরত এক অনন্ত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল; সে কারণ এই মঙ্গলগণ সমূহ পরমেশ্বরের নিকট এই নিবেদন করিল, যে তাঁহাদের ভবিষ্যতের রক্ষার নিমিত্ত, এক অন্তর্জনীয় ব্যবস্থা স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে। তাহাতে ঈশ্বর তাঁহাদের যাচ্ঞা না নামঞ্জুর করিলেন; এবং অতঃপরে এই "আজ্ঞা" দিলেন, যে, সেই সমস্তাদি ঐ অমঙ্গলগণ, কল্প এই পৃথিবীস্থ মনুষ্য সমাজে যাইবার কালীন, কেবল আপনাপন দিগের মধ্য হইতে লইয়া যাইবেক; কিন্তু মঙ্গল সমূহের মধ্য হইতে উহারা কেবল একে, একে মনুষ্য ভবনে গমন করিবেন; এবং সেই মনুষ্যাবধি এই অমঙ্গলের প্রাদুর্ভাব অধিক হইল; কারণ উহারা একে একে না আসিয়া যেন দলবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিলেন। এবং যখন মঙ্গল সকল স্বর্গ হইতেই নির্গত হইয়া, আমাদিগকে কেবল একটী একটী ও ভিন্ন ভিন্ন করিয়া প্রদান করা হইয়াছে এবং উহা সকলকে একে একে করিয়া কেবল ঐ সকল ব্যক্তিগণকেই প্রদান করা হইয়াছে যাহারা উহাকে বুঝিয়া লইতে পারেন।

অমঙ্গলের দুষ্টচিন্তা সকল যত এক ব্যক্তির অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল, উহার বর্ণনা সকল তিনি আমাকে ব্যাখ্যান করিয়া কহিলেন; যে তিনি লণ্ডন নগর পরিত্যাগ করিয়া কানপুর শহরে বাস করিতেছিলেন; এবং বয়িষা কালের আগমনেতে কয়েক দিবসাবধি তিনি বৃষ্টিতে ভিজিয়া পিয়া তাঁহার ঠাণ্ডী হইয়াছিল; এবং উহার কিয়ৎ কাল পরে তাঁহার নিকটে অমঙ্গল সকলের দুষ্টাগমন হইল। তখন তিনি ক্লান্ত ও শ্রান্ত বোধ করিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি উৎসাহ ও ভরসা হীন হইয়া পড়িলেন; এবং সুকল বস্তুই তাঁহার পক্ষে বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল; এবং তিনি ক্রমে ক্ষীণ ও নির্ম্মর্ম হইয়া পড়িলেন। প্রথমে তাঁহার মুখে বিস্বাদ জন্মাইল; এবং আহারের জন্য অনিচ্ছা ঘটিল; যাহাই কিছু হউক না কেন তাহা খাইলে পরে, তাঁহার বমঃ স্থলে ও পৃষ্ঠ দেশে বেদনা ধরিত। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে, বংক্ষণে, ও পদদ্বয়ে, সুদ্ধ মস্ত ওরুতর বেদনা ও ভার বোধ হইত। উহার কিছু কাল পরে তাঁহার হস্তদ্বয় ফুলিয়া উঠিল; এবং তাঁহার পদদ্বয়ের মাংসপেশী, ও স্নায়ু সকল বেদনা প্রযুক্ত ভারি বোধ হইত। তিনি রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না এবং কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অতি সামান্য বা কিছুই বিশ্রাম প্রাপ্ত হেন নাই। তিনি ক্রমে ক্রমে অতি ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন। তিনি যৎকিঞ্চিৎ সময়ের জন্যেও নিদ্রা যাইলে বেদনার দরুণ তাঁহার নিদ্রা ত্বরায় ভঙ্গ হইয়া যাইত। কত মাসাবধি তিনি এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। তিনি আমাকে এমত কহিয়াছিলেন, যে, যদিও ডাক্তি ঔষধের উপর অনেকানেক টাকা সকল ব্যয় করিয়াছি বটে, কিন্তু ছত্রাক কতক মাসের পরে আমি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টাবস্থায় পতিত হইয়াছি; এবং আমি নির্ভরসা হইয়া এই বিলাপ করিলাম, যে, "আমি তোমার হস্তে

পতিত হইয়াছি, এবং যদিও এখন প্রাণে বাচিয়া আছি বটে, কিন্তু তজ্জন্য উহাতে আমার কি উপকার হইবেক? যন্ত্রাপি, কোন এক ব্যক্তি যমদ্বারের নিকট কিছুকালের জন্য জীবিত থাকিতে পারে বটে; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার আপন জীবনের উপর কি ভরসা আছে? কখন ভাল, কখন মন্দ, এইরূপ অবস্থায়, যখন তিনি দিন পাত করিতেছিলেন; তখন তিনি, সিগেলস্ কিউরেটীভ সিরপ্ নামে যে একটী মহৌষধী আছে, তাহা শ্রবণ করিলেন; এবং ঐ ঔষধীর দ্বারা যে নানা মহা মহা আশ্চর্য্য রোগ সকল আরোগ্য হইয়া গিয়াছে শুনিয়া, ঐ ঔষধীর একটী বোতল প্রাপ্ত হইয়া সেবন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে, উহার তিন সপ্তাহের মধ্যেই আরাম বোধ পাইলেন। তাঁহার ক্ষুধার পুনরাগমন হইল। তাঁহার আহার্য্য পরিপাক পাইতে লাগিল; এবং দিবসাবধি, তিনি কোন বস্তু কর্ত্তৃক আর পীড়িত বোধ করেন নাই। যদিও অমঙ্গল সকলে তাঁহাকে ফলত হস্তগত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তিনি মঙ্গল সকলের মধ্যে একটীকে বুঝিয়া লইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি সেই জন্য, ঐ ভয়ঙ্কর রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিলেন। সিগেল্স্ কিউরেটীভ সিরপ্ নামে যে একটী ঔষধ আছে, তাহা-ঐ মঙ্গলদেবীর স্বর্গদূতের স্বরূপ হইয়া, আসিয়া, বিধিমতে তাঁহার উপকার করিলেন; এবং তাঁহার আপন সরল সাহিত্যের দ্বারা "অমঙ্গলের দশাকে" ত্বরায় দূর করিয়া দিয়া "মঙ্গলের দশা" স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ

অতি আবশ্যকীয় সংবাদ।

বিষহরি বা জুনা কি? ইহা ডাক্তার শ্রীশশিভূষন বিশ্বাস L. H. M. S. মহাশয়ের পারা ও উপদংশ-জনিত ঘায়ের অব্যর্থ মহৌষধ। যেরূপ খাই দুউক, ইহাতে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। বিষহরি ঘাবতীয় সর্দ্দারি শীর্ষস্থানীয়। মেহ, প্রমেহ রোগের আশুসংহারক, এবং সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত। যেহেতু ইহা দেশীয় গাছ-গাছড়ার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত মূল্য সেবনের ঔষধ ১, প্রলেপ ১, প্যাকিং ডাঃ মাঃ ।৵। ভিঃ পিতে পাঠান যায়। এজেন্ট টকচক পাল এবং কোং খোংড়াপটী,কলিকাতা

আর ভয় নাই! আরোগ্য করিয়া ঔষধের মূল্য লইব।!

পারদনাশক পঞ্চানন ঘৃত।

যাঁহাদের ধারণা পারাদোষ একাকালে আরাম হয় না, তাঁহাদের বিশ্বাসের জন্য আমরা রোগ আরাম করিয়া পরে মূল্য লইতে প্রস্তুত আছি। তবে পরে টাকা আদায়ের উপযুক্ত জামিন বা অগ্রিমেণ্ট আবশ্যক। আমরা অহঙ্কার করিয়া বলিতেপারি,যেরূপ অম্বার যতদিনের রোগ হউক না কেন, এই ঔষধে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি (২০ দিনের) ১৲ টাকা। শান্তি আশ্রম—৬৪নং মুন্সাপুর ষ্ট্রীট কলিতা।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৪৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান

অষ্টম বর্ষ। | ২৫ এ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। | পঞ্চদশ সংখ্যা।

হিন্দু কি নিদ্রিত?

ধীরে—ধীরে—ধীরে! নীরবে—নিঃশব্দ পদসঞ্চারে—সাবধানে!—দেখিও অমর-আত্মার শক্তি-সঞ্চোগে বাধা দিওনা। তোমার ঐ অপবিত্র-শরীর-স্পর্শে পবিত্রতার আবাসভূমি, ধর্ম্মীর সারল্য ও সৌকুমার্য্যের অনন্ত প্রস্রবণ কলুষিত হইবে, তোমার উষ্ণ শ্বাসে বিশ্বের মরণ ও দয়াদাক্ষিণ্যের শুশীতল উৎস বিশুষ্ক হইবে;—তাই বলিতেছি, ঐ পবিত্রস্থানে যাওনা।—যাইবে ত অগ্রে নিজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কর, সারল্যের পবিত্র হোমধূমে, হৃদয়কে শোধিত করিয়া লও, নীচতা স্বার্থপরতা স্বার্থপরতা পরশ্রীকাতরতা, পরগ্লানি, "আত্মপ্রসাদ প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল ভুলিয়া যাও; একতা, আত্মত্যাগ ও বিশ্বপ্রেমের মূল মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননী জন্মভূমির পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে অগ্রসর হও—ধীরে—ধীরে—ধীরে! দম্ভ ত্যাগ কর, অহংকার দমীভূত কর, বিলাস-লালসায় জলাঞ্জলি দাও, —যাও একমনে—একাগ্র চিত্তে—মহাপুরুষগণের চরণ-প্রান্তে উপনীত হও; তবে সিদ্ধ হইবে; তবে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তবে তুমি হিন্দু নামের যোগ্য হইবে।

কিন্তু তুমি কি হিন্দু নহ? সেই ত বশিষ্ঠ বাল্মীকি, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের নামে তোমার শরীর লোমাঞ্চিত হয়, সেইত দধীচির আত্মত্যাগে, অর্জ্জুনের আত্ম-হৃদয়পাতে তোমার শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত তীব্রবেগে ধাবমান হয়, সেইত বেদের নামে তোমার অন্তঃকরণের নিভৃত কন্দরে স্বর্গীয় পবিত্রতার সঞ্চার হয়; তবে তুমি হিন্দু নহ কেন? দুর্গোৎসব হইতে ষষ্ঠী ও পঞ্চানন্দের পূজা পর্য্যন্ত সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে তোমার অনুরাগ আছে, তাহা সকলেই জানে, কিন্তু যে অবিচলিত একাগ্রতা সহকারে মহারাজা সুরথ আদ্যাশক্তির চরণ-তলে স্বহস্তে স্বীয় হৃদয় শোণিত ঢালিয়া দিয়াছিলেন, সেই একাগ্রতা কোথায়? যে একাগ্রতার উন্মাদিনী

শক্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া এককালে মহাষ্টমীর দিনে তোমার ও আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই মহাদেবীর চরণে আত্মবলি দিতেন, সেই একাগ্রতা কোথায়? কি দুঃখের বিষয়, তুমি পূজার মহিমা ভুলিয়া গিয়াছ; পূজার অর্থ অন্যরূপে প্রতিপাদন করিতে শিখিয়াছ; সেইজন্যই তোমার এত দুর্গতি। দেবতার্থে আত্মবলিদানই প্রকৃত পূজা, যিনি যে পরিমাণে আত্মত্যাগ করিতে সক্ষম, যে পরিমাণে দেবতার মহিমায় তন্ময় হইয়া আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্যত, স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গল-কামনায় সর্ব্বমঙ্গলার তৃপ্তিবিধান করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে দেবপূজায় কৃতকার্য্য; তিনিই প্রকৃত পূজা করিতে পারেন; তাঁহারই পূজা দেবতার প্রীতি সম্পাদন করিতে সমর্থ;—বলিতে কি তাঁহার পূজাই প্রকৃত পূজা; নতুবা আত্ম-গৌরব লোক-সমাজে প্রচারিত করিবার উদ্দেশ্যে, আপনার সমৃদ্ধতা অথবা কপট ধর্ম্ম জগতে জাহির করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা পূজা যে একটা পুরাতন লৌকিক ব্যাপার বলিয়া ভাবিয়া, না-করিলে-নয়-তাই-করিতে হয়, জ্ঞানে তুমি যে প্রতিবৎসর মহামায়ার পূজা কর, তাহাই কি প্রকৃত পূজা? দেখ কপটতা ও ভণ্ডামি অন্যত্র কৃতকার্য্য হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের বিমল জ্যোতির সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না। যেখানে ভণ্ডামি, সেই খানেই অধঃপতন,—সেই অধঃপতনে কেবল নিজের পতন হয় না, আত্মীয় স্বজনগণের বন্ধুবান্ধবের ও দেশের পতন হয়, শেষে পিতৃলোকেরও অধঃপতন হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি যতক্ষণ না কপটতা ত্যাগ করিবে, পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে পূজা করিতে শিখিবে, [illegible] তোমার যাতনা দূর হইবে না।

তোমাকে মুচুকন্দের কথা বলিয়াছি, পুরাণে তুমি তাঁহার কথা পাঠ করিয়াছ, তিনি দেবশত্রু দৈত্যকুল সংহার করিয়া যেরূপে গিরিগুহায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন, এবং জাগিয়া উঠিয়া কাল-যবনকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই। আজি মুচুকুন্দের সহিত বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের তুলনা কর,—তুলনা করিয়া দেখ যে, ইহা এখন সূর্য্যবংশীয় মহাপুরুষের ন্যায় নিদ্রিত কি না? কিন্তু ইহার দেব কার্য্য কোথায়? এক সময়ে ইহার বিশ্ববিজয়ী বিক্রমের সম্মুখে জগতের অন্যান্য জাতি দমিত হইয়া ভূমিতল চুম্বন করিয়াছিল, একদা ইহার অকপট ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রভাবে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল;—একদা ইহার বীরনাদে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল,—একদা জগতে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যময়, তাহাই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্ট উপাদান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল; তাহাই হিন্দুর বা হিন্দু সমাজের দেবকার্য্য। সেই দেব কার্য্যের পর হিন্দু সমাজ সে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছে, তাহা আর ভাঙ্গিল না। তাহার পর গ্রীস ঘুমাইল, রোম ঘুমাইল, কাল ক্রমে আবার জাগিয়া উঠিল; আবার তাহাদের প্রাচীন গৌরব পুনরুজ্জীবিত হইয়া জগতে বিস্তৃত হইল, কিন্তু হিন্দু সমাজও আর জাগিয়া উঠিল না। মহাকালের মহাশ্মশানক্ষেত্রে যে সকল মহাপুরুষ অনন্ত মহানিদ্রায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহারাও কি আর উঠিবেন না?—কে বলিল?—ভ্রম; তাঁহারা উঠিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে জাগাইতে হইবে; তাঁহাদিগের অমরাত্মাকে উদ্বোধিত করিতে হইবে। ধর্ম্মই তাঁহাদিগের জীবন, সরলতাই তাঁহাদিগের আত্মা; আত্মত্যাগই তাঁহাদিগের মূল মন্ত্র;—সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, সেই আত্মায় অনুপ্রাণিত হইয়া, সেই জীবনে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া অকপট ধর্ম্মানুরাগে মত্ত হও, তাহা হইলেই তাঁহাদিগকে জাগাইতে পারিবে; তাহা হইলে জগৎ জানিবে হিন্দু নিদ্রিত নহে। দেখ পবিত্র ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই কোন জাতিকে চিরজাগ্রত রাখিতে পারে না; তোমাদের ধর্ম্ম জগতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; ভাগ্যদোষে, বিধির বিড়ম্বনায় সেই পরম ধর্ম্ম তোমাদিগের বিলাস দ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। তোমরা বিকারগ্রস্তের ন্যায় সেই ধর্ম্ম পালন করিতেছ, কিন্তু তাহাতে তোমাদের ঐকান্তিকতা দেখিতেছি না। এক্ষণে যাহাতে সেই ঐকান্তিকতা জন্মে, তাহাই করিতে যত্নবান হও; তাহা হইলে তোমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইবে এবং অগ্রে দেবকার্য্য যেরূপে সম্পাদন করিয়াছিলে, এ নিদ্রাভঙ্গের পর আবার সেই রূপ দেবকার্য্য সাধন করিতে পারিবে। তাহাহইলে মহারাজা মুচুকুন্দ যেমন নিদ্রাভঙ্গের পর ভারতের দুঃখরূপী কাল যবনকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তোমরাও সেইরূপ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের দুরবস্থা দূর করিতে পারিবে; তখন জগৎ জানিবে হিন্দু নিদ্রিত নহে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার।

দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত করিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত করিয়া অবিরাম শব্দ উঠিতেছে 'আমার'; যেখানে প্রাণীজগৎ,—যেখানে জীবের মনোবৃত্তির ক্রিয়া, সেই খানেই 'আমার' এই শব্দের প্রতিধ্বনি! ধীরে ধীরে সংসার-স্রোত বহিয়া যাইতেছে, অগণ্য জীব সে ধীর স্রোতে গা ঢালিয়া কোন অলক্ষিত প্রদেশে ভাসিয়া যাইতেছে, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, সকলেই 'আমিত্বে' বিভোর, মুখে কেবল অবিশ্রান্ত শব্দ "আমার আমার!"

বস্তুতঃ ঐ আমিত্ব টুকু লইয়াই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য; আমার বলিয়াই এ জগৎ এত সুন্দর। যেখানে আমিত্ব সেইখানেই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা, ভক্তির আধিক্য, স্নেহ মমতার পূর্ণবিকাশ। প্রীতি বল, ভক্তি বল, শ্রদ্ধা বল, দয়া বল, হৃদয়-স্ফুরিত যে কোন বৃত্তিই বল না কেন সকলই ঐ আমিত্ব-গ্রথিত। আমি যদি কখন না থাকিতাম, আমার আমিত্ব যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই সোণার সংসার এত দিন কোথায় থাকিত? আমাকে লইয়া এ জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। আমি যত দিন ক্রিয়াশীল থাকিব, পার্থিব জগতের অস্তিত্বও ততদিন থাকিবে, আমি যখন ক্রিয়া-বিরহিত, জগৎও তখন নিঃস্পন্দ অস্তিত্বশূন্য।

কেবল আমিত আমি নই, তুমিও আমি, আমিও আমি;—যেখানে চৈতন্য সেই খানেই আমি; যাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সেই বলিবে আমি; যেখানে আমি নাই সেখানে পৃথিবী নাই, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা নাই; মন প্রাণ ইন্দ্রিয় নাই, কাজেই সেখানে কিছুই নাই তাহা হইলেই এজগতের আদিতে আমি,

মধ্যে আমি, শেষেও আমি ; বস্তুতঃ ঐই জড় জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা অনুভূতির পদার্থ ; আমি বলিতে ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ-ত্রিশিষ্ট এ টী দেহ মাত্র বুঝি ; আমার এই ইন্দ্রিয়াদিও নিত্য পদার্থ নহে। সুতরাং দৃশ্যমান জগৎও নিত্য পদার্থ নহে। চক্ষুর অস্তিত্ব আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষীভূত সৌন্দর্য্য-রাশিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, আবার দর্শন-শক্তি নষ্ট হইয়া যাউক ; সঙ্গে সঙ্গে বালকের মধুর হাসা, কুসুমের কমনীয় কান্তি, চন্দ্রমার সুবিমল জ্যোৎস্না-রাশিও নষ্ট হইয়া যাইবে ; পর্ব্বতশ্রেণীর আকাশ-বিদীর্ণ-কারী উত্তুঙ্গ দেহ, নীল-জলধির গাম্ভীর্য্য-পরিপূর্ণ বিশাল বিস্তৃতি, মহান্ আকাশের মহান্ অনন্তত্ব, তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যাইবে, এক কথায় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এ যে পাপীয়ার কণ্ঠনিঃসৃত মধুর স্বর-লহরী দিগঙ্গনার অক্ষ-ভরিয়া অমৃত বৃষ্টি করিতেছে, এ যে তড়িদ্দাম-শোভিত, মেঘ-মালার গগন-বিদারী ভৈরব গর্জ্জনে কর্ণ বধিরপ্রায় হইতেছে, এ যে প্রেমিক প্রেমিকার পবিত্র প্রণয়-সম্ভাষে স্বর্গের পবিত্রতা ঢালিয়া দিতেছে ; এ সকলের অস্তিত্ব কাহার উপর নির্ভর করিতেছে ? কেবল আমার শ্রবণশক্তির উপর নয় কি ? এ শক্তি নষ্ট হইয়া যাউক, সঙ্গে সঙ্গে সুখের জগৎও নীরব হইয়া যাইবে। বসন্ত সমীরের সুখস্পর্শ, অর্দ্ধ জাগ্রদবস্থায় প্রণয়িনীর সুকোমল কর-স্পর্শজনিত সুখ, নিদাঘ সূর্য্যকরের প্রচণ্ডতা, হিমশিলার শীতলতা স্পর্শশক্তি বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ; এমনি করিয়া যত গুলি ইন্দ্রিয় আছে, দেহ হইতে একটী একটী করিয়া বিচ্ছিন্ন হউক, সঙ্গে সঙ্গে জগতেরও অনুভূতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবে, দেখা যাইতেছে যে, আমি আছি বলিয়াই এরূপও রহিয়াছে। তবেই এই কেবল একটী আমি নই, 'আমি' আমি এই —জগন্মণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছি।

কিন্তু এই যে 'আমিত্ব' ইহা আমিত্বের পূর্ণ বিকাশ না হইলে অনুভব হয়না ; সহজ জ্ঞান এই আমিত্বের বহু দূরে অবস্থিত। যখন জ্ঞানের পূর্ণ উন্নতি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি, তখন জ্ঞানী সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে আপনাকে অবস্থিত দেখিয়া সুখ দুঃখ পরিশূন্য হইয়া নীরবে পরমানন্দ লাভ করিতে থাকেন।

আবার এই আমিত্ব যখন সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া সহজ জ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হয়, তখন ইহা জীবমুক্তির উপায়, স্বর্গের সোপান এবং ঈশ্বরের সন্নিধান স্বরূপ হইয়া মায়ার দৃঢ় বন্ধন হইয়া দাঁড়ায়। আমরা সেই বিশ্বব্যাপী 'আমিত্ব' টুকু উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই 'আমার' 'আমার' করিয়া, এত হাহা-কার করিতেছি। সহজ জ্ঞানে আমিত্বের উদ্রেক মাত্র ; সাধারণ জীবে তাহাই হয় বলিয়াই জীব-প্রকৃতি সীমাবদ্ধ, সীমাবদ্ধ বলিয়াই প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা বিশ্বব্যাপিনী নহে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি নহে, ভক্তি নির্ঝরিণী দিগন্ত-প্রসারিণী নহে ; সমাজ-হৃদয়ে এত যে বিদ্বেষবহ্নি প্রতিনিয়ত প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, দম্ভ অহঙ্কার সগর্ব্ব পদবিক্ষেপে, সমাজ-হৃদয় প্রতিমুহূর্ত্তে বিকম্পিত করিতেছে, প্রতিহৃদয়ে দারুণ স্বার্থপরতা যে অনুক্ষণ ক্রিয়া করিতেছে, তাহার মূলীভূত কারণ সহজ জ্ঞানে সঙ্কীর্ণ-হৃদয়ের আমিত্ব বোধ ; ইহাতে স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে, যাহা সমাজের কলঙ্ক, জীবের বন্ধন তাহা ঐ সহজ জ্ঞানজ অপূর্ণ আমিত্বের গর্ভ হইতে প্রসূত।

ঐ অন্ধ আমিত্বের প্রভাবেই মনুষ্য একদেশদর্শী ; আমার বলিয়াই তার আমার এই দেহকে সর্ব্বাপেক্ষা যত্ন করি, আমার চক্ষুতে কুৎসিত হইলেও আমার বলিয়াই ঐ তনয়টীর মুখমণ্ডলে জগতের সৌন্দর্য্য একাধারে দেখিতে পাই, আমার বলিয়াই সেই মুখখানির—যে মুখ দেখিয়া তুমি ঘৃণার সহিত চক্ষু ফিরাইতে চাও, সেই মুখখানির সৌন্দর্য্যের তুলনা এত বড় সংসার খুঁজিয়া পাইনা। আমিত্ব নাই বলিয়াই তুমি শ্বেতাঙ্গী অপরার মার্জ্জার নয়নে স্বর্গীয় শোভার সমাবেশ দেখিতে পাওনা, আবার তোমার বড় মোহাগের বড় আদরের ইন্দীবর-নয়ন দুটী জাতি বিশেষের হৃদয়ে ঘৃণার উদ্দীপনা করিয়া দেয়। বিদেশীয় অপেক্ষা স্বদেশীয়ের প্রতি, আমার স্বদেশীয় অপেক্ষা আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি এবং প্রতিবেশী অপেক্ষা আত্ম-পরিজনের প্রতি তোমার এত অধিক স্নেহ কিসের ? পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের জন্য —আবার ভারতবর্ষের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা-গুল্মপরিশোভিত কানন-পরিবৃত অতিক্ষুদ্র পল্লীর জন্য তোমার প্রাণ, কাঁদে কেন ? তুমি

দুষ্ট ছাড়িয়া কৃষ্ণ পূজা করিতে চাও কেন ? জগতকে কর্ম্মনাশা অথবা বৈতরণী সদৃশ জ্ঞান করিয়া গঙ্গার প্রসন্ন সলিলে অবগাহন করিতে চাও কেন ? কারণ এ সকল স্থানে তোমার আমিত্বের অসম্পূর্ণ বিকাশ, সেই জন্য তুমি সামান্য-জ্ঞান-রহিত, একদেশদর্শী ; যাহা তুমি আমার বলিয়া জান, তাহার প্রতি তোমার গভীর অনুরাগ ; কিন্তু এইজ্ঞান যে সুখ শান্তি এবং মুক্তির পথের কণ্টক, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না ? অতএব হে ভ্রান্ত জীব ! আর বৃথা 'আমার' 'আমার' করিয়া চীৎকার করিয়া মায়াজালে জড়িত হইও না, যদি দুঃখ পরিশূন্য, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করিতে চাও, তবে হৃদয়কে প্রশস্ত কর, ধীরে ধীরে সমস্ত জগৎকে ঐ হৃদয়ে স্থান দাও, সর্ব্বভূতে তুমি তোমাকে দৃষ্টি করিতে শিক্ষা কর, প্রকৃত সুখী হইবে, জ্বালা যন্ত্রণাময় হৃদয়ে শান্তিলাভ করিবে, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন, অপার্থিব, অপরিমেয় আনন্দরাশি উপভোগ করিবে।

শ্রীশ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তেমনি।

তেমনি হাসিছে চাঁদ আকাশের গায়,
তেমনি ত চকোরিণী সুধা লোভে ধায় ;
তেমনি বিটপ-শ্রেণী পাগলের পারা,
তেমনি জোছনা মেথে হেসে হেসে সারা।
তেমনি শিশির গতে বসন্ত-উদয়,
তেমনি কোকিল কুজে তেমনি মলয়।
তেমনি প্রভাতে পাখী বসি শাখী'পরে
তেমনি হরষে গায় সুমধুর স্বরে।
তেমনি গাছেতে ফুল ঝাঁকে ঝাঁকে ফোটে,
তেমনি ওঞ্জন করি অলিকুল ছোটে।
তেমনি কাতরে বারি চাতকিনী চায়,
তেমনি নবীন ঘন নীলাকাশ ছায়।
তেমনি গোলাপ যুঁই সুবাস বিতরে,
তেমনি সমীর লয়ে বয় ধীরে ধীরে।

তেমনি শোভিছে তারা নিশীথ গগনে
তেমনি খদ্যোতরাজি আঁধার বিজনে।
তেমনি কানন মাঝে নবীনা বরষা
তেমনি আদরে বেড়ে তরু সারি সারি।
তেমনি গাছের নীচে সুশীতল ছায়,
তেমনি মৃদুল বায় শরীর জুড়ায়।
তেমনি বরষা-কালে প্রকৃতি সুন্দরী
তেমনি গরবে হাসে পরি নীলাম্বরী।
তেমনি তটিনী বুকে তরী ভেসে যায়,
তেমনি লহরীগুলি তর তরে ধায়।

তেমনি সরসী জলে প্রফুল্লনলিনী
তেমনি ত হেলে দুলে খেলিছে হংসিনী।
তেমনি ভ্রমর পাঁতি কমল উপরে
তেমনি কুমুদী হাসে হেরে শশধরে।
তেমনি লোহিত রবি সায়াহ্ন গগনে
তেমনি উজলে দিশি সোণার কিরণে।
প্রকৃতির শোভা যত সকলি তেমনি আছে
কেবল আমারি হায় সুখটুকু চলে গেছে।

শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী দাসী।

বারেন্দ্র ঠাকুর বংশ।

(২)

পরমার্থবিদ্ ওণচন্দ্র ঠাকুর ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়া ত্রিনবতি বর্ষ পর্য্যন্ত রোগ শোক বিরহিত ভাবে জীবিত ছিলেন; তাঁহার অলৌকিক যশোরাশি বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কালাচাঁদ মাত্র সহায একজন উদাসীন ছাসিয়া সর্ব্বপ্রকার সুখ সৌভাগ্যের উচ্চতম শৃঙ্গ লাভ করিলেন। পাকুড়িয়া গ্রামের প্রথম সংস্থাপন সময়ে গ্রামের দশ দিকে যথাশাস্ত্রে কীলক প্রোথিত হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির বীজ রোপিত হয়। যে পাকুড় বৃক্ষের নামানুসারে গ্রামের নাম পাকুড়িয়া হয়, ঐ বৃক্ষ-মূলে ওণচন্দ্র ঠাকুর প্রতিবর্ষে বনদুর্গার পূজা করিতেন। সম্প্রতি ঐস্থান ষষ্ঠীতলা নামে অভিহিত। ওণচন্দ্র ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ প্রতিবর্ষে এবং অন্নাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে ষষ্ঠীতলায় ঐ পাকুড় বৃক্ষমূলে পূজা প্রদান করিয়া থাকেন। এই রূপ প্রসিদ্ধ আছে যে এ বৃক্ষের উন্নতি অবনতির সহিত ওণচন্দ্র ঠাকুরের বংশের উন্নতি এবং বৃক্ষবিনাশের সঙ্গে বংশের বিনাশ হইয়া থাকে। ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি জীর্ণাবস্থায় বিদ্যমান আছে, বংশের অবস্থাও বর্ত্তমান সময়ে ঠিক বৃক্ষানুরূপই বটে।

ত্রিনবতিবর্ষ বয়ঃক্রমে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ মোহনমিশ্র বা ওণচন্দ্র ঠাকুর পার্থিব কার্য্য সমাধা করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার লোকান্তর-গমনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ বিশেষতঃ বারেন্দ্র সমাজ যে একটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু মহাত্মা মোহনমিশ্র ভবিষ্যৎ বংশের জন্য যে বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, কালে তাহা বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণতি পাইয়া ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়াছিল।

মহাসমারোহে ওণচন্দ্র ঠাকুরের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বহুধনধান্য শিষ্য-সহায়-শালী পুত্র-পৌত্রাদি-সমন্বিত বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ মোহনমিশ্রের শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া বারেন্দ্র সমাজের একটী স্মরণীয় ঘটনা।

২

রত্নগর্ভ মজুমদার বাদসাহের অধীনে উচ্চ পদে অভিষিক্ত হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি অল্প কাল মধ্যেই ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক অট্টালিকা সমূহে স্বীয় বাসভবন রাজভবন তুল্য করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বিলুপ্ত ভূত গৌরবের ভস্মরেখা ইষ্টক-স্তূপে পরিণত রহিয়াছে।

রত্নগর্ভ মজুমদারের তিন পুত্র। প্রথম রাজা রাম, দ্বিতীয় অভিরাম, তৃতীয় হরেকৃষ্ণ। প্রথম পুত্র রাজারাম মজুমদারের রাম ও শ্যাম নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ শ্যাম মজুমদার অল্প বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হন। জ্যেষ্ঠ রাম মজুমদারের তিন পুত্র জন্মে। প্রথম রামকৃষ্ণ, দ্বিতীয় শিবকৃষ্ণ, এবং তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণ। কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ মজুমদার দারপরিগ্রহের পূর্ব্বেই লোকান্তর গমন করেন।

রাম মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ মজুমদারের তিন পুত্র। প্রথম রামরত্ন মজুমদার, দ্বিতীয় রঘুনাথ মজুমদার, তৃতীয় রামনাথ সিদ্ধান্ত।

জ্যেষ্ঠ রামরত্ন মজুমদারের একমাত্র পুত্র কালীকান্ত মজুমদার। কালীকান্ত দুই বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নীর গর্ভে তারিণী কান্ত মজুমদার নামে একপুত্র, এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে রুদ্রকান্ত মজুমদার নামে একপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তারিণী কান্ত মজুমদারের পুত্রসন্তান না হওয়ায় তিনি স্ববংশজ হরকান্ত মজুমদারকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। হরকান্ত মজুমদার নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোকগত হন।

রামকৃষ্ণ মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ মজুমদার দুই বিবাহ করেন। তাঁহার তিনপুত্র জন্মে। প্রথম পক্ষে প্রাণনাথ মজুমদার ও ভৈরব নাথ মজুমদার, দ্বিতীয় পক্ষে জয়চন্দ্র মজুমদার। ভৈরব নাথ ও জয়চন্দ্র নিঃসন্তান কেবল প্রাণনাথ মজুমদারের গঙ্গানাথ নামে এক পুত্র জন্মে। এ গঙ্গানাথ মজুমদারের পুত্র পঞ্চানন বা পাঁচু মজুমদার। পাঁচু মজুমদার মজুমদারের সন্তানাদি না হওয়ায় রঘুনাথ মজুমদারের বংশ তাঁহাতেই পরিসমাপ্তি লাভ করে।

রামকৃষ্ণ মজুমদারের তৃতীয় পুত্র রামনাথ সিদ্ধান্ত অতিশয় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাঁহার ভবাণী প্রসাদ মজুমদার নামে একপুত্র জন্মে। ভবাণী প্রসাদ নিঃসন্তান হওয়ায় রামকৃষ্ণ মজুমদারের বংশ বিলুপ্ত হয়।

আধ্যাত্মিক সৃষ্টিতেও সপত্নী বিদ্বেষ বিদ্যমান। যে স্থলে লক্ষ্মীর কৃপা সে স্থলে সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি নাই। কিন্তু যে স্থলে আদ্যাশক্তির কৃপা সে স্থলে উভয়েই অবিরোধে বাস করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র শিবকৃষ্ণ মজুমদারের প্রতি ব্রহ্মময়ী প্রসন্না, তাই তাঁহার প্রতি লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়েই সপত্নী ভাব-ভুলিয়া সুখী করিয়াছিলেন। শিবকৃষ্ণ মজুমদারের সময়—মজুমদার বংশ, ধন, জন, কুল শীল বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে সমাজের শীর্ষস্থানে আরূঢ় হইয়াছিল। শিবকৃষ্ণ মজুমদারের দুই পুত্র। প্রথম রাধা কান্ত মজুমদার, দ্বিতীয় কালীদেব পঞ্চানন। কালীদেব পঞ্চানন তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। শিবকৃষ্ণ মজুমদারের কন্যা রুদ্রাণী দেবী অতিশয় রূপবতী ছিলেন। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী নরাবিল পটীর নায়ক যুগল কিশোর রায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেই বিবাহে

ময়মনসিংহের প্রায় সমস্ত জমিদার এবং বারেন্দ্র সমাজের প্রধান প্রধান কুলীনগণ পাকুড়িয়া গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন।

শিবকৃষ্ণের প্রথম পুত্র রাধাকান্ত মজুমদারের তিন পুত্র, ও এক কন্যা। পুত্রগণের নাম দুর্গাকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, এবং কমলাকান্ত, কন্যার নাম গঙ্গাদেবী। গঙ্গাদেবী অতিশয় রূপবতী এবং ধার্ম্মিকা ছিলেন, ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কালীপুর নিবাসী হরনাথ চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। হরনাথ চৌধুরী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, গঙ্গাদেবী কৃষ্ণনাথ চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণ নাথ চৌধুরী অসিদ্ধ হওয়ায় কালীপুরের বর্ত্তমান জমিদার প্রসিদ্ধ লাহিড়ী চৌধুরীগণ উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে ঐ বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হন। অসিদ্ধ দত্তক কৃষ্ণনাথ চৌধুরী স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে যশের সহিত মুরশিদাবাদ নগরীতে জীবন যাপন করিয়া অন্তিমে গঙ্গালাভ করিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয়া গঙ্গাদেবীর প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি পূর্ব্বময়মনসিংহের গৌরবের স্থল। কালীপুরের শ্রীশ্রী৺ সিদ্ধিকালী ও হরগঙ্গেশ্বর শিব স্থাপন করিয়া এবং গঙ্গা সাগর নামক বৃহৎ জলাশয় খনন করিয়া তিনি কীর্ত্তি জগতের অক্ষয় স্বর্গে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাধাকান্ত মজুমদারের প্রথম পুত্র ও তৃতীয় পুত্র নিঃসন্তান। দ্বিতীয় পুত্র দুর্গাকান্ত মজুমদারের তিন পুত্র ও দুই কন্যা। প্রথম ভবানীকান্ত মজুমদার, দ্বিতীয় কাশীকান্ত মজুমদার, তৃতীয় চন্দ্রকান্ত মজুমদার। তৃতীয় পুত্র চন্দ্রকান্তকে পাকুড়িয়ায় মৈত্রের বংশে দত্তক রূপে প্রদান করেন। তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন। ভবানীকান্ত ও কাশীকান্ত অধিক দিন জীবিত ছিলেন না; তাঁহার অবিবাহিতাবস্থায় পরলোকগত হওয়ায় রাধাকান্ত মজুমদারের বংশ বিলুপ্ত হয়।

শিবকৃষ্ণ মজুমদারের তৃতীয় পুত্র কার্ত্তিকের পঞ্চাননের এক পুত্র। পুত্রের নাম রামজীবন মজুমদার। রামজীবনের দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম পুত্র কালীসুন্দর মজুমদার নিঃসন্তানে দ্বিতীয় পুত্র "———" ওরফে ফেলনী মজুমদারের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পুত্রের নাম কালী প্রসন্ন মজুমদার। কন্যার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। কালী প্রসন্ন মজুমদার নীল প্রসন্ন ও নীরদ প্রসন্ন নামক দুইটী নাবালক পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া অত্যল্প দিন হইল পরলোকগত হইয়াছেন এবং ইহার কিছুদিন পরেই নীল প্রসন্ন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

হিন্দুর জ্যোতিষ।

(২)

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

অচিন্ত্যাব্যক্ত রূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত-জগদাধার-মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ।

বর্ত্তমান সময়ে যে সমুদায় জ্যোতিষগ্রন্থ দৃষ্টিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে সূর্য্যসিদ্ধান্তই প্রাচীন ও প্রধান। সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে লিখিত আছে——

"ময়রিশিষ্টে তু কৃতে ময়নামা মহাসুরঃ।
রহস্যং পরমং পুণ্যং জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানমুত্তমং॥
লোকগ্রহাণামখিলং জ্যোতিষাং গতি-কারণং।
আরাধয়ন্ বিবস্বন্তং তপশ্চক্রে সুদুশ্চরং॥
তোষিতস্তপসা তেন প্রীতস্তস্মৈ বরার্থিনে।
প্রদাদাং চরিতং প্রাদাদ্ময়ায় সবিতা স্বয়ং॥"

সত্যযুগের শেষ ভাগে মহাসুরময় গ্রহগণের গতি কারণ ইত্যাদি তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য সূর্য্যদেবের উদ্দেশে দারুণ তপস্যা করিয়া যাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে তিনি ময়কে গ্রহগতি জ্ঞানের সাধন এই বেদাঙ্গ শাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

সুতরাং সত্যযুগের শেষে বা ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে এই সিদ্ধান্ত ময়াসুর কর্ত্তৃক সংকলিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

কিন্তু পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনেকেই আমাদের চতুর্যুগ—শুধু চতুর্যুগ কেন—মন্বাদি সমস্ত পর্য্যন্ত সাড়ে চারি হাজার বর্ষের মধ্যে শেষ করিতে চান*। তাঁহারা পৃথিবীকে অধিক পুরাতন বলিতে সম্মত নহেন, কেন না তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের হিসাবে ভুল হয়। এ সম্বন্ধে জন বেন্টলি তাঁহার গ্রন্থে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলে আমার কথায় স্পষ্ট হইবে। তিনি লিখিয়াছেন—

"If we were to believe in the antequity of Hindu books. * * then the Mosaic account is all a fable or a fiction." আর এক স্থলে "It saps the very foundation of our religion." *

মোজেসের লিখিত বর্ণনায় মিলে না অর্থাৎ তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটে

---

* বেন্টলি সাহেবের মতে

সত্যযুগ আরম্ভ খৃষ্টাব্দ জন্মের	২৩৫২	বর্ষ	পূর্ব্বে	
ত্রেতাযুগ আরম্ভ	"	১৫২৮	"	"
দ্বাপরযুগ আরম্ভ	"	৯০১	"	"
কলিযুগ আরম্ভ	"	৫৪০	"	"

সুতরাং সত্যযুগ-পরিমাণ ৮২৪ বর্ষ, ত্রেতা যুগের পরিমাণ ৬২৭ বর্ষ, দ্বাপর যুগের পরিমাণ ৩৬১ বর্ষ। ইহা অপেক্ষা সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ ছিলনা বলাই ভাল ছিল। কোন কোন পণ্ডিত তাহাই বলেন।

প্রথম	মন্বন্তর	আরম্ভ	খৃঃ পূঃ	৪২২৫	অব্দে
দ্বিতীয়	"	"	"	৩৮৯১	"
তৃতীয়	"	"	"	৩৩৫৮	"
চতুর্থ	"	"	"	২৮৭৭	"
পঞ্চম	"	"	"	২৩৮৮	"
ষষ্ঠ	"	"	"	২০৪০	"
সপ্তম	"	"	"	১৫২৮	"
অষ্টম	"	"	"	৯০৪৩	"
নবম	"	"	"	৫৫৫	"
দশম	"	"	খৃষ্ট জন্মের	৩১ বর্ষ	পরে

সুতরাং তাঁহার-মতে এখন কোন মন্বন্তর, তাহা স্থির করা দুরূহ কেননা দশম মন্বন্তর কবে শেষ হইবে—শেষ হইবে কিনা তাহা তিনি কিছুই বলেন নাই।—(H.H.A.PT, Sec.V.)

* H. H. A. PTI. H. XXI.

কাজেই তাঁহারা আমাদের শাস্ত্রীয় কাল বিভাগ ও সৃষ্টি প্রকরণ বিশ্বাস করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদের বৈজ্ঞানিকেরাই এখন আর পৃথিবীকে এত নবীনা বিবেচনা করেন না *। কিন্তু সে কথা আমাদের আজিকার আলোচ্য বিষয় নহে। আজিকার আলোচ্য বিষয় সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

বেণ্টলি যেরূপে চতুর্যুগ বিভাগকরিয়াছেন, সেই অনুসারে খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ ১৫২৮ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছে বলিতে হয়, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকে বজায় রাখিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ খৃষ্ট জন্মের ৩১০২ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু বেণ্টলি তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন; তিনি বলেন খৃষ্টজন্মের প্রায় ১০০০ এক হাজার বৎসর পরে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। যে যুক্তি অবলম্বনে তিনি এ কথা বলেন, তাহা এসিয়াটিক রিসার্চেস্ নামক গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে তাঁহার প্রবন্ধের বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল †; কিন্তু এ সম্বন্ধেও আমরা এক্ষণে বলিব না।

ফল কথা যদি তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের লিখিত সৃষ্টিকাল প্রভৃতির সহিত সময়ের সামঞ্জস্য হইতেছে না বলিয়া তাঁহারা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত মতে অশ্রদ্ধা করেন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? আমরা আমাদের নিজ ধর্ম্মশাস্ত্র সংক্রান্ত মত অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের কথায় শ্রদ্ধা করিব কেন? বিশেষ যখন আমাদের চিরপ্রচলিত সৃষ্টি-কাল তাঁহাদের বিজ্ঞান অস্বীকার করে না।

আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্মত কাল বিভাগ এইরূপ:—

"লোকানামন্তকৃৎ কালঃ কালোহন্যঃ কলনাত্মকঃ।
স দ্বিধা স্থূল সূক্ষ্মত্বান্মূর্ত্ত শ্চামূর্ত্তউচ্যতে॥
প্রাণাদি কথিতো মূর্ত্ত স্ত্রুট্যাদ্যোহমূর্ত্তসংজ্ঞকঃ।
ষড়্‌ভিঃ প্রাণৈঃ বিনাড়ী স্যাৎ তৎষষ্ঠ্যা নাড়িকাস্মৃতঃ।
নাড়ীষষ্ঠ্যাতু নাক্ষত্রমহোরাত্রং প্রকীর্ত্তিতং॥
তৎ ত্রিংশতা ভবেন্মাসঃ সাবনোহর্কোদয়ৈস্তথা।
ঐন্দবস্তিথিভিস্তদ্বৎ সংক্রান্ত্যাঃ সৌর উচ্যতে।
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং তদহরুচ্যতে।
সুরাসুরাণামন্যোহন্যমহোরাত্রং বিপর্য্যয়াৎ॥
তদ্দ্বাদশ সহস্রানি চতুর্যুগ মুদাহৃতং॥
সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া দ্বিত্রিসাগরৈরযুতাহতৈঃ।
সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ সহিতং বিজ্ঞেয়ং তচ্চতুর্যুগং।
কৃতাদীনাং ব্যবস্থেয়ং ধর্ম্মপদোব্যবস্থয়া।
যুগস্য দশমো ভাগঃ চতুস্ত্রিদ্বেক সংগুণঃ।
ক্রমাৎ কৃতযুগাদনাং ষষ্ঠাংশ সন্ধয়ো স্বকঃ॥
যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে।
কৃতাব্দসংখ্যা তস্যান্তে সন্ধিঃ প্রোক্তোজলপ্লবঃ॥
সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পেজ্ঞেয়া চতুর্দ্দশঃ।
কৃতপ্রমাণঃ কল্পাদৌ সন্ধি পঞ্চদশস্মৃতঃ॥
ইত্থং যুগ সহস্রেণ ভূতসংহারকারকঃ।
কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং শর্ব্বরী তস্য তাবতী॥
পরমায়ুশতং তস্য তয়াহোরাত্রসংখ্যয়া।

যোহর্দ্ধমিতং তস্য শেষাকল্পোহয়মাদিমঃ॥
স্মাচ্চ মনবঃ ষড়ব্যতীতাঃ সসন্ধয়ঃ।
স্বতস্যচ মনোর্যুগানাং ত্রিঘনো গতঃ॥
বিংশাদ যুগাদাস্মৎ যাতমেতৎ কৃতংযুগং।
তঃকাল-প্রসংখ্যায় সংখ্যামেকত্র চিন্তয়েৎ॥
গ্রহর্ক্ষ দেবদৈতাদি সৃজতোহস্য চরাচরং।
তাদ্রিবেদা দিব্যাব্দাঃ শতঘ্না বেধসো গতাঃ॥"

(সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ, মধ্যাধিকারঃ)

কাল দ্বিবিধ, মহাকাল ও খণ্ড কাল। যে কালের আদি অন্ত নাই, তাহাই মহাকাল। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এবং এই মত কত শত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই মহাকাল-সাগরে বুদ্বুদের ন্যায় উঠিতেছে ও বিলীন হইতেছে। সেই মহাকালের কোন এক সময় হইতে পরিমাণ আরম্ভ করিয়া মানব যে কাল পরিমাণ করে, তাহারই নাম খণ্ডকাল। এই খণ্ডকালের পরিমাণও আবার দ্বিবিধ। মূর্ত্ত বা স্থূল এবং অমূর্ত্ত বা সূক্ষ্ম। স্থূলরূপে যে কাল পরিমাণ করা যায়, অর্থাৎ যে কাল ব্যবধান অনুভব করা মানবের ক্ষমতার আয়ত্ত তাহাই মূর্ত্ত বা স্থূল পরিমাণ। কালের অতি সূক্ষ্মতম অংশ যাহা মানবেন্দ্রিয়ের অনুভবসাধ্য নয় কেবল বোধগম্য তাহাই অমূর্ত্ত। প্রাণাদি কাল বিভাগ মূর্ত্ত ও ত্রুট্যাদি বিভাগই অমূর্ত্ত নামে অভিহিত *।

মূর্ত্তকালই জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় গণনাদি-কার্য্যে অধিক ব্যবহৃত হয়; তাহা এই—

৬ প্রাণে = ১ বিনাড়ী বা পল।
৬০ পলে = ১ নাড়িকা বা দণ্ড
৬০ দণ্ড = ১ নাক্ষত্র অহোরাত্র
৩০ নাক্ষত্র অহোরাত্র ১ নাক্ষত্র মাস
১২ নাক্ষত্র মাস = ১ নাক্ষত্র বৎসর

এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এক সাবন অহোরাত্র। চন্দ্রের এক তিথি-ভোগের কাল এক চান্দ্র অহোরাত্র।

---

* "Yet it is with time-intervals measurable by hundreds of millions of years that we have to deal in considering only our earth's history, nay two of three hundreds of millions of years only carrise back to a period when the earth was in a state of development—R.A.Proctor's our place among infinites.

† Vide Asiatic Researches vols VI. & VIII.

* অমূর্ত্তবিভাগ জ্যোতিষে প্রয়োজনীয় না হইলেও প্রসঙ্গত তাহা এস্থলে ভারতকোষ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"২ পরমাণুতে = ১ অণু। (১)
৩ অণু = ১ ত্র্যসরেণু

(১) সূর্য্য-কিরণ গবাক্ষ-পথে গৃহে প্রবিষ্ট হইলে সেই আলোকে যে ক্ষুদ্র পদার্থ বিচরণ করিতে দেখা যায়, তাহারই এক একটি ত্র্যসরেণু। অণু বা পরমাণু নয়নগোচর নহে। সূর্য্যের তিন ত্র্যসরেণু পরিমিত স্থান গমনে যে সময় লাগে তাহাকে ত্রুটি বলে।

৩ ত্র্যসরেণু = ১ ত্রুটি।
১০০ ত্রুটি = ১ বেধ।
৩ বেধ = ১ লব।
৩ লব = ১ নিমেষ।
৩ নিমেষ = ১ ক্ষণ।
৫ ক্ষণ = ১ কাষ্ঠা।
১ কাষ্ঠা = ১ লঘু।
১৫ লঘু = ১ নাড়িকা (দণ্ড)
২ নাড়িকা = ১ মুহূর্ত্ত।"

(ভারতকোষ ১ম খণ্ড কাল দেখ)

এই পরিমাণানুযায়ী মুহূর্ত্ত ও দণ্ড কোষ্ঠী গণনায় ব্যবহৃত হয়। কোষ্ঠীর মুহূর্ত্ত ও দণ্ডমান দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সূর্য্যের গতির উপর এই কাল-বিভাগ নির্ভর করে বলিয়া সকল দিনে মুহূর্ত্ত ও দণ্ডের পরিমাণ সমান হয় না॥

† এই বিভাগ সূর্য্যসিদ্ধান্ত সম্মত। অধুনা আমাদের দেশে দণ্ডের এইরূপ ভাগ ব্যবহৃত হয়।

৬০ প্রত্যণুপলে ১ অণুপল।
৬০ অণুপলে ১ বিপল।
৬০ বিপলে ১ পল।
৬০ পলে ১ দণ্ড।

কিন্তু পলের পর দশমিক ধরিয়া হিসাব করিলে বেশী নির্ভুল হয়।

৩০ সাবন বা চান্দ্র অহোরাত্র = ১ সাবন
বা চান্দ্র মাস
১২ ,, ,, মাস = ১ ,, বৎসর।

সূর্য্যের এক রাশি-ভোগ-কালের পরিমাণ এক সৌর মাস; দ্বাদশ সৌরমাসে একবৎসর। এক সৌর মাসে এক দিব্য অহোরাত্র। দেবতা ও অসুরদিগের অহোরাত্রের পরিমাণ একই; তবে, যখন দেবতাদিগের দিবস সেই সময় অসুরদিগের রাত্রি। কারণ দেবতাদিগের আবাস স্থান সুমেরু পর্ব্বতের উপরিভাগে। অসুরদিগের বাসস্থান কুমেরু পর্ব্বতের উপরি ভাগে।

৩০ দিব্য অহোরাত্র = ১ দিব্য মাস।
১২ দিব্য মাস = ১ দিব্য বৎসর।
১২০০০ দিব্য বৎসর = ১ মহাযুগ বা ৪ যুগ।
৪৩২০০০ সৌর বৎসর = ১ মহাযুগ।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সহিত পরিমাণ লিখিত হইল——

সত্যযুগ	১৪৪০০০০	সৌরবৎসর
,, সন্ধ্যা	১৪৪০০০	,,
,, সন্ধ্যাংশ	১৪৪০০০	,,
সত্যযুগ সমষ্টি	১৭২৮০০০	,,
ত্রেতাযুগ	১২৯৬০০০০	,,
,, সন্ধ্যা	১২৯৬০০০	,,
,, সন্ধ্যাংশ	১২৯৬০০০	,,
ত্রেতাযুগ সমষ্টি	১২৯৬০০০	,,
দ্বাপর যুগ	৮৬৪০০০০	,,
,, সন্ধ্যা	৮৬৪০০০	,,
,, সন্ধ্যাংশ	৮৬৪০০০	,,
দ্বাপরযুগ সমষ্টি	৮৬৪০০০০	,,
কলিযুগ	৩৬০০০০	,,
,, সন্ধ্যা	৩৬০০০	,,
,, সন্ধ্যাংশ	৩৬০০০	,,
কলিযুগ সমষ্টি	৪৩২০০০	,,
চতুর্যুগ সমষ্টি	৪৩২০০০০	,,
৭১ মহাযুগ		১ মন্বন্তর
১০০০ মহাযুগ		১ কল্প
২ কল্প		১ ব্রাহ্ম অহোরাত্র
৩০৬৭২০০০ সৌরবৎসর		১ মন্বন্তর
৪৩২০০০০০০ সৌরবৎসর		১ কল্প
৮৬৪০০০০০০ ,,		১ ব্রাহ্ম অহোরাত্র
২৫৯২০০০০০০০ ,,		১ ব্রাহ্ম মাস
৩১১০৪০০০০০০০ ,,		১ ব্রাহ্ম বৎসর

একশত ব্রাহ্মবৎসর পরিমিত কাল ব্রহ্মার পরমায়ু; তাহার পঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হইয়া এক্ষণে একপঞ্চাশৎ বৎসরের শ্বেতবরাহ কল্প চলিতেছে। ঐ কল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরে (ত্রিযুগ) অর্থাৎ ২৭ মহাযুগ অতীত হইয়া অষ্টাবিংশতি মহাযুগের সসন্ধ্যাসন্ধ্যাংশ সত্য ত্রেতা দ্বাপর অতীত হইয়া এই ১৮ ১৬ শকাব্দে কলির ৪৯৯৫ বর্ষ অতীত হইয়াছে। এই মহাযুগেরই সত্যযুগান্তে সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।

তুমি কি আমার?

নিশীথে নীরবে কেন,
মুখানি হৃদয়ে রাখি
অলস অধীর প্রাণে
আনমনে চেয়ে থাকি?
মুকুলিত অলক রাজি
নবকিসলয় সাজি
ইন্দীবর আঁখি চুমে
সমীর পরশে;
লুকায়ে শরত-শশী
পিয়ে মুখ-সুধারাশি
ঘুমে বিহঙ্গমকুল
মনের হরষে;
কাঁপে পাতা, কাঁপে ফুল
কভু চায় মুখপানে
কি জানি কি কথা অই
বলে যায় কাণে কাণে।
হুহু করে প্রাণ মোর
বিষম ভাবনা ভার
তুমি কি আমার তাই
বল শুনি একবার
যখন আকুল হয়ে
মুখপানে চেয়ে রও
কি কথাটী কবে ভেবে
কি কথাটী ভুলে যাও;
বলি বলি মনে কর
তবুও বলিতে নার
মরমে লুকায়ে থাকে
সরমের ভার;
আঁখি সরলতা আঁকা—
প্রণয়-পীযুষ মাখা,
নীরব নিস্পন্দ যেন
সুধা-পারাবার;
হিয়া দুরু দুরু করে
অধর কালিমা ধরে
শিহরে সুতনুখানি
বলনা কিসের তরে?
আবেশে অলস মুখী
নিমেষে নয়ন ঝরে;
হতাশ আকুল প্রাণে
মুখপানে চেয়ে থাকি।
তুমি কি আমার তাই
বল প্রিয়ে বল দেখি!
বিরহ বিদায় কালে
চুমিয়ে অধর খানি
অশ্রু কলুষিত চোখে
নিরখি নয়নমণি।
হৃদয় নিভৃত হ'তে
কি জানি কি সচকিতে
কেঁদে উঠে দুঃখসিন্ধু
উথলে অমনি;
এত যে প্রয়াস করি
তবুত রোধিতে নারি
নিরাশার যাতনায়
বিকল পরাণী;
সুধামাখা লিপিপানে
অমৃতসিঞ্চিত প্রাণে
বঞ্চিত হইলে তাহে
যাতনায় জ্বলে মরি
না দেখে তোমারে বল
কি দেখে জীবন ধরি?

এতদূরে যাতনা মোর
কেবলি তোমার তরে।
তুমি কি আমার তাই
একবার বল মোরে।
তুমিত হৃদয়-শশী
নিশীথে উদয় হও।
কাঁদিলেও দিনমানে
বারেক না ফিরে চাও
চকোর দর্শন-আশে
ছুটে যায় তব পাশে
অম্বরে লুকাও মুখ
সেত মরে যাতনায়;
না জানি কি মনোদুখে
বচন না সরে মুখে

ময়মের হাসি টুকু
মরমে নিভিয়া যায়;
বিলোল কটাক্ষ ত্রাসে
নয়ন মুদিয়া আসে
জ্ঞান হয় এত সাধ
সকলি রহিল বাকী;
নয়ন মেলিয়া দেখি
চলে গেছে প্রাণপাখী
আকুল হয়েছি বড়
পড়িয়ে প্রণয়-ফাঁদে
তুমি কি আমার তাই
শুনিতে পরাণ কাঁদে।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

আকাশে তড়িৎ।

(২)

পীরামীডের উপর তড়িৎ।

সার্ ডব্লিউ সিমেন্স স্বরচিত নিজ জীবন-বৃত্তে একটী কৌতুকাবহ গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কোন সময়ে মিশর দেশে গিয়াছিলেন। জনৈক আরবদেশবাসীর নিকট আগন্তু হইলেন যে, পিরামিডের শিখরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া হস্ত উত্তোলন করিবামাত্র অস্পষ্ট শীতধ্বনি কর্ণগোচর হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দেহাভ্যন্তরে অত্যল্প-কষ্ট অনুভব হয়। আগন্তুক আরব এইরূপ ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিল। কিন্তু হস্ত উত্তোলন না করিলে কোনরূপ শীতধ্বনি বা কষ্ট অনুভব করা যায় না।

এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সিমেন্স পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। এই সময়ে মিশরে "ক্যাসিন" নামে এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। ভারতবর্ষে যেমন স্থানে স্থানে লু নামক বায়ু প্রবাহ দেখা যায়, সেইরূপ আশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের মরুভূমি হইতে সাইমুম নামক এক প্রকার উষ্ণ বায়ু সঞ্চালিত হইতে থাকে। ইজিপ্টে এপ্রিল হইতে জুন পর্য্যন্ত ইহা বর্ত্তমান থাকে। সাধারণতঃ পঞ্চাশ দিবস থাকে বলিয়া ইহাকে ক্যাসিসন্ (অর্থাৎ পঞ্চাশৎ) নাম প্রদান করা হইয়াছে। এই সময় কেহই গৃহের বহির্ভাগে গমন করেনা। কিন্তু বায়ুর এইরূপ অবস্থা আকাশের তড়িৎ

মন্থরীয় পরীক্ষার বিশেষ উপযোগী। উষ্ণ বায়ু তড়িৎ-অপরিচালক।

পরীক্ষা করিয়া তিনি উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়াছেনঃ—"অনুসন্ধানে আমি তাহার বাক্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলাম। পিরামিডে উঠিয়া প্রথমে কোন রূপ নিদর্শন পাইলামনা। অঙ্গুলি বিস্তার পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করিবামাত্র সূচীবেধের ন্যায় ক্লেশ অনুভব করিলাম। একটী বোতল হইতে গ্লাসে সুরা ঢালিয়া পান করিতে উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে সহসা একটী দারুণ মাংসেতে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিলাম। ইহাতে আকাশের তড়িৎই মূল কারণ বলিয়া সন্দেহ অনুমিত হইল। তৎপরে একটী মন্ত্রপূর্ণ বোতল একখানি সিক্ত কাগজে আবৃত করিলাম। এইরূপে একটী লিডেন বোতল প্রস্তুত হইল। ঐ বোতলটী মস্তকের উপর উত্তোলন করিবামাত্র বায়ুর তড়িতের দ্বারা আক্রান্ত হইল। শীঘ্রই বোতল হইতে অধিরত বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গে নির্গত হইতে লাগিল। পথ প্রদর্শকস্বরূপ আমাদের সহিত কয়ক জন আরব ছিল। তাহারা এরূপ আশ্চর্য্য আলোক দেখিয়া পূর্ব্বেই আমাদের উপর ঘোর সন্দিহান হইয়াছিল। তাহারা এক্ষণে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। সহসা তাহারা দলপতির ইঙ্গিত ক্রমে আমার সহচর বর্গের হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। আরবেরা তাহাদিগকে পিরামিডের তলদেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বল প্রয়োগ করিতে লাগিল। আমি পিরামিডের সর্ব্বোচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম। দলপতি সেথ ক্রমে আমার নিকট আগমন করিতে লাগিল। সঙ্গে একজন দ্বিভাষী ছিল। তাহার কথায় বুঝিলাম যে আরবেরা আমাদিগকে পিরামিড পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলিতেছে। তাহারা সকলে একমত হইয়া এই সংস্কল্প করিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস যে আমরা ভোজবাজী দেখাইতেছি। ইহাতে তাহাদের উপার্জ্জনের পথ একবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আমি তাহাদের আদেশ অগ্রাহ্য করিলে, সেথ আমার বাম হস্ত ধারণ করিল। বস্তুতঃ আমি এইরূপ ঘটনাই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। বাজীকরের মত ভাব দেখাইয়া আমি দক্ষিণ হস্তদ্বারা লিডেন বোতলটী ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলাম। পরে বোতলটী সেথের নাসিকাগ্রের নিকটবর্ত্তী করিবামাত্র বোতল হইতে আমার বাহুতে একটি কষ্টকর সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইলাম। সেথও যে ইহার অনুরূপ সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেখিলাম, সেথ নির্ব্বাক অবস্থায় প্রস্তরখণ্ডের উপর পতিত রহিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত্ত অত্যন্ত দুর্ভাবনায় অতিবাহিত হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই সহসা ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া সৈ ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল; দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে পিরামিডের সুবৃহৎ ধাপ সকল উল্লম্ফনে অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিল। আরবেরা এই ব্যাপার ভীতনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছিল। দলপতির দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার সহচরদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমরা পিরামিডের অধিকারী হইলাম।

আকাশে তড়িতের কারণ।

আকাশে কিরূপে তড়িতের উৎপত্তি হইল তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। পণ্ডিত গণের মধ্যেএ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে। পেলটিয়ার বাষ্প নিঃসরণই মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সত্যত সম্বন্ধে তিনি কোন সন্তোষজনক

কারণ প্রদর্শন করেন নাই। পরীক্ষা মন্দিরে যে সকল পরীক্ষায় বাষ্পনিঃসরণ তড়িদ্বহ পত্রির কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, একটু অনুধাবন করিলেই ঘর্ষণই তাহাদের প্রকৃত কারণ বলিয়া অনুমিত হইবে। এই অনুমান বস্তুত অমূলক নহে। আরমষ্ট্রং কৃত তড়িজ্জনক যন্ত্র ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল। কিন্তু তরল পদার্থ হইতে বাষ্প নিঃসরণ-কালে তড়িৎ শক্তির বিকাশ দেখা যায়। তরল পদার্থ ও বাষ্প বিভিন্ন প্রকৃতির তড়িৎ-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে। একটী উষ্ণ-প্ল্যাটি-নাম পাত্রে তপ্ত জল রাখিলে বাষ্প উঠিতেছে দেখা যায়। এই সময় প্রবল তড়িৎ উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত সমুদ্র-সমীপবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে তড়িতের আধিক্য হইয়া থাকে। কলিকাতার বায়ুতে যে, অধিক পরিমাণে তড়িৎ বর্ত্তমান ইহা একটী কারণ।

উদ্ভিদ সমূহের মধ্যে অনবরত রাসায়নিক কার্য্য হইতেছে। ইহাকেই অনেকে তড়িৎ উৎপাদক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বার্ক উদ্ভিদ জীবনে তড়িতের উদ্ভব দৃষ্টি করিয়াছিলেন মূল প্রধান অংশ সকল সংযোগ ও পৃথক্ বিয়োগ-তড়িদ্বিত হয়। এ সম্বন্ধে অদ্যাপি বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

কখন কখন তরল পদার্থের কণা সমূহের পরস্পরের ও পৃথিবীর সহিত সংঘর্ষণে তড়িৎ উত্তেজিত হইয়া থাকে। ঝড় ও বৃষ্টির সময় বরফ পতন হইতে থাকিলে ভূপৃষ্ঠে তড়িৎ সঞ্চার হয়। আকাশের তড়িতের ইহাও একটী কারণ হওয়া অসম্ভব নহে।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ঠাকুর-ঝি।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরালাল শয়নগৃহ হইতে বাহির হইলেন বটে কিন্তু বাড়ীর বাহির হইলেন না; পরেশ নাথ যে খণ্ডে থাকে, সেই খণ্ডে আসিয়া পরেশ নাথকে ডাকিলেন। পরেশনাথ হীরালালের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া দিল। হীরালাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"পরেশ, তোমার ঘরে মদ আছে?"

পরেশ বিস্মিত হইয়া হীরালালের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল; হীরালাল পুনরায় বলিল —"এখন যদি তুমি আমায় একটু মদ খাও-য়াইতে পার, তবে যথার্থ বন্ধুর কাজ কর।"

এইবার পরেশনাথ কথা কহিল—"তার আর ভাবনা কি—কল্‌কেতা সহরে সমস্ত রাত্রি—যখনই মনে করবে—তখনই মদ পাওয়া যায়।"

হীরালাল মনে মনে সহরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল—"কিন্তু এখন আমার কাছে টাকা নেই; হয় তোমার দোকান থেকে ধার করে আনতে হবে, না হয় তোমার কাছে টাকা যদি থাকে, আমায় দুটো টাকা ধার দাও, কাল সকালে আমি বার টাকা দেবো।"

দৈব ঘটনায় পরেশনাথের নিকট তখন টাকাও ছিল, সুতরাং পরেশনাথ মহা আনন্দের সহিত বলিল—"তা এখনি হচ্ছে; কিন্তু

তোমার ব্যাপারখানা কি? হঠাৎ এত রাত্রে এখোল চাপ্‌লো যে? 'তুমি যে ছাড়তে পারবে না, তা আমি জানতুম।...এ জিনিসের রস যে একবার পেয়েছে সে কি আর ছাড়তে পারে?"

হীরা। ও সকল কথা থাক্; এখন তুমি বিদায় দাও, দেরী করলে আমার প্রাণ যাবে, এইটি মনে রেখো।"

হীরালালের অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া পরেশনাথ পুনরায় একবার হীরালালের মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু সে সময় সাহস করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না। পরেশ নাথ তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া টাকা লইয়া ফেলিল। সেই সময় হীরালাল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"তোমায় কত দূর যেতে হবে?"

পরেশনাথ উত্তর করিল—"দূরে যাবো কেন এই সামনের দোকান থেকেই আনবো।"

হীরালাল বড়ই অধৈর্য্য, সেই কারণ এইবার যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"ও দোকা-নতনার পরই বন্ধ হয়ে যায়।"

পরেশনাথ হাসিয়া বলিল—"নটার পর সব দোকানই বন্ধ হয়, কিন্তু বিক্রী বন্ধ হয় না।"

উপরোক্ত কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে পরেশনাথ একবারে গৃহের বাহিরে আসিয়া পড়িল—তখন হীরালাল একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রোধ, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জা, অপমান একত্রে এই কয়েকটি তখন হীরালালে হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, হীরালাল প্রাণের ভিতর যে অল্প যন্ত্রণাভোগ করিতেছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এ সময় মদের অভাবে বিষ খাইলেও সে বিষ পান করিতে কুণ্ঠিত হইত না। হীরালাল তখন মনে মনে বলিতেছিল—"এত বেল্লা এত অহঙ্কার! আমায় এতদূর তাচ্ছল্য অবজ্ঞা, থাক—এর—প্রতিশোধ আমি নেবো —নেবো—নেবো। এত অভিমান নয়! এ তাচ্ছল্য—ঘৃণা—অবজ্ঞা! পায়ে পর্য্যন্ত—ধর-লুম, তবুও অভিমান গেল না! আচ্ছা, থাক—থাক—থাক্।"

এই সময় পরেশনাথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। হীরালাল পরেশনাথকে দেখিয়া বলিলেন—"আমায় এক গেলাস শিগ্‌গীর করে ঢেলে দে ভাই।"

বিনায়োগে হঠাৎ আসন্নমৃত্যু রোগীকে যেরূপ তাড়াতাড়ি ঔষধ সেবন করান হয়, পরেশনাথ সেইরূপ তাড়াতাড়ি এক গেলাস ঢালিয়া প্রথমেই হীরালালকে দিল, হীরালাল বিশেষ আগ্রহের সহিত তৎক্ষণাৎ তাহা পান করিয়া শূন্য গেলাসটি পরেশনাথের হাতে দিল। তাঁহার পর পরেশনাথ পান করিল।

এইরূপ দুই তিন বার চলিয়া গেল, তত্রাচ হীরালাল ক্রমেই যেন গম্ভীর হইতে লাগিল; আজ আর তাঁহার সে রসিকতা, বাক্‌চাতুর্য্য, বা চপলতা নাই! মুখে কথা পর্য্যন্ত ছিল না। এই সময় হীরালালের প্রাণের ভিতর যে একটা আনন্দের ফোয়ারা ছুটিত, আজি আর সে ফোয়ারা ছুটিল না; কে যেন তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে!

হীরালাল বাবুর দেখাদেখি পরেশনাথও প্রথমে বিশেষ ফোন আনন্দ প্রকাশ করে নাই; কিন্তু এখন তাহার প্রাণ স্ফূর্ত্তিতে ভরা, সে স্ফূর্ত্তি সে কতক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারে? সুতরাং সে মধ্যে মধ্যে দুই একটা আনন্দের ছুঁচো বাজী ও তুবড়ী ছাড়িতে লাগিল; কিন্তু তত্রাচ হীরালাল প্রাণের ভিতর তাহা গিয়া পৌঁছিল না। পরেশনাথও আর এরূপ নীরবে থাকিতে পারে না। এইবার হীরা-লালকে বলিল—"এতদিনের পর যদি রোজা

খুলুন, তবে এখনও ঘুমন মাইয়ে রয়েছে কেন বাবা? দুই একটা খোলচাল ছাড়, প্রাণটা ওর হয়ে যাক্।"

হীরালাল। আজ আর আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছেনা পরেশ?

পরেশ। আজ বাবা, তোমার রকম সকম দেখে আমিত একবারে মরে রয়েছি। বলি, ব্যাপার খানা কি বল দেখি।

হীরালাল। ব্যাপার বড় গুরুতর। আচ্ছা পরেশ, স্ত্রীলোকের অভিমান কিসে যায় জান?

পরেশ। ভোমার স্ত্রীলোকের ধার ধার আমি ধারি না—ওই সংসারের বিষময় ফলটা এ যাত্রা বিশ্বেশ্বরকে দিয়ে এসেছি বাবা। ও সব তত্ত্ব জানিনে। তবে মদের নেশা কিসে যায় বলতে পারি; আবার অন্য মদে বেশী নেশা কিসে হয়, তাও বলতে পারি। খাও দাও আমোদ কর বাবা, ওসব ছেঁড়া নেটা ভেবে মিছেমিছি মন খারাপ কর কেন?"

হীরালাল এতক্ষণের পর প্রাণের কপাট খুলিয়া বলিল—"দেখ পরেশ, আজ প্রায় এক মাস হলো আমার স্ত্রী আমার উপর অভিমান করে আমার সঙ্গে কথা কয়নি; কেবল যে আমারই দোষ ছিল তা নয়, দোষ আমাদের উভয়েরই ছিল। সেই জন্য আমিও তার সঙ্গে কথা কইনি। তবে না কয়া কয়ে কি চিরকালই থাকা যায়? আমার মনের ভাব—সে আগে একটি কথা কইলেই আমি কথা কই। কিন্তু সে সাধ আমার আর মিটলো না—আজ আমিই আগে কথা কইলুম, কিন্তু তবুও তার একটিও মুখের কথা শুনতে পেলুম না। শেষে পায়ে পর্য্যন্ত ধরলুম—পরেশ, পায়ে পর্য্যন্ত ধরলুম—।"

হীরালালের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহার মুখে আর কথা বাহির হইল না। পরেশনাথ এই সময় হীরালালের সে হৃদয়ের ভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া বিস্মিত স্বরে বলিল—"আরে বলো কি? তোমাকে একটা মানুষের মতন মানুষ বলে জানতুম, তুমি বিদ্যমান বুদ্ধিমান পরোপকারী—শেষে তুমি একটা মেয়ে মানুষের পায়ে ধরলে!"

হীরালাল পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—"পায়ে ধরি তায় ক্ষতি নেই পরেশ, কিন্তু সে পায়ে ধরায় ত কোন ফল হয়নি।"

এই কথা কয়েকটী বলিতে বলিতে হীরালাল কাঁদিয়া আকুল হইলেন। হীরালালকে কাঁদিতে দেখিয়া পরেশনাথের নেশা ছুটিয়া গেল। পরেশনাথ তখন পুনরায় গেলাসে মদ ঢালিয়া অগ্রে আপনি পান করিল, তাহার পর আর এক গেলাস ঢালিয়া হীরালালকে পান করিতে দিল। হীরালাল চক্ষের জল মুছিয়া সেই গেলাসটী পান করিল। হীরালাল যখন কাঁদিয়াছে, তখন আর তার কি?

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে হীরালাল শয়ন-গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরে—যেরূপ হইয়া থাকে—শরৎকুমারীর চৈতন্য হইল। শরৎকুমারী যে একটা বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহা মনে বুঝিতে পারিল। তখন শরৎ হীরালালের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু হীরালালের ত এখন আর কোন সাড়াশব্দ নাই! শরৎকুমারী ইহা স্থানিতে হীরালাল অন্দরের মধ্যেই আছে; কারণ সে মাঝের দরজা কিম্বা সদর বাড়ীর দরজা খোলার কোন শব্দই পায় নাই। হীরালাল যখন আজ অন্দরের মধ্যেই আছেন তখন

কি পুনরায় আর একবার ঘরের মধ্যে আসিবেন না? আচ্ছা, ঘরের মধ্যে নাই আসুন—এখন কে একটা সাড়াশব্দ পাইলে, শরৎকুমারী ছুটিয়া গিয়া তাহার চরণে লুটিয়া পড়ে। কই—কোন সাড়াশব্দ নাই! তবে শরৎকুমারীর একমাত্র ভরসা হীরালাল অন্দরের মধ্যেই আছেন। কিন্তু তত্রাচ শরৎকুমারী আর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিল না। শরৎকুমারী ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের আলো জ্বালিল, তাহার পর দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। কিন্তু বাহিরে আসিয়া হীরালালকে ত দেখিতে পাইল না; তবে হীরালাল কোথায় গেল?

শরৎকুমারী প্রথমে সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিল, কিন্তু কই ছাদেত হীরালাল নাই! শরৎকুমারী একটু বিস্মিত হইল। তখন বিষয় মনে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল; আসিতে আসিতে আপনাকে শত সহস্র গালি দিল, দেবদেবীর নিকট শত সহস্র বার নিজের মৃত্যু প্রার্থনা করিতে লাগিল। এইবার হীরালালের জন্য শরৎকুমারীর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তখন তাহার সেই দারুণ অভিমান কোথায় চলিয়া গেল। মণিহারা ফণিনীর ন্যায় শরৎকুমারী অন্দরের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। শরৎকুমারী তখন মনে মনে বলিতেছিল—"কোথায় তুমি? আমায় একবার দেখা দাও, আমি আমার এপাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। একবারে আসিয়া আমার এ পাষাণ হৃদয়ে পদাঘাত করিয়া যাও—স্বহস্তে আমার অপরাধের ক্ষমা কর।"

শরৎকুমারী উন্মাদিনীর ন্যায় চাহিয়া দেখিল হীরালাল নাই! তখন হীরালালের অদর্শনই যেন তাহার গলে একটা কণ্ঠের মত হইল, সে দণ্ডের পরিবর্ত্তে তখন শরৎকুমারী প্রাণদণ্ড লইতেও প্রস্তুত! হায়, শরৎকুমারী! আমরা তোমায় চিনিতে পারিলাম না!

শরৎকুমারী এইবার একটি দরজার নিকট গিয়া ডাকিল—"ঠাকুরঝি!"

আর দ্বিতীয় ডাক ডাকিতে হইল না; তৎক্ষণাৎ অমলা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—"কি বৌ?"

শরৎকুমারীর মুখে আর কথা নাই! কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। কেবল অমলার হাত ধরিয়া তাহাকে আপনার ঘরের দিকে লইয়া চলিল। পরস্পরকাতরা অমলা পরের দুঃখ নিবারণের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত; অমলা একটিও দ্বিরুক্তি না করিয়া উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে শরৎকুমারীর সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। শরৎকুমারী অমলাকে আপনার গৃহে আনিল, সেখানে আসিয়াই অমলা বলিল—"দাদা বরে নাই?"

অমনি সঙ্গে সঙ্গে তখন দাদার জন্য অমলার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অমলা অনিমিষনয়নে তাহার বৌঠাকুরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শরৎকুমারী এইবার কথা কহিল—"তোমার দাদা ঘরে নেই বলেইত তোমায় ডেকে আনলুম।"

অমলার প্রাণের ভিতর ধড়াস ধড়াস শব্দ হইতে লাগিল, অমলা কম্পিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে বলিল—"দাদা কোথায় বউ দিদি?"

শরৎকুমারী এইবার নিজের মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—"দেখিস্, তুই যেন মূর্চ্ছা টুর্চ্ছা যাস্‌নে। দাদাকে না দেখলেই যেন্তই অন্ধকার দেখিস?"

অমলার দেহে এইবার প্রাণ আসিল, প্রথমে তাহার বউ দিদির কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার প্রাণে বড় ভয় হইয়াছিল; কিন্তু এবার শরৎ-

কুমারীর কণ্ঠস্বর ত আর সেরূপ নাই।' তবে নিশ্চয়ই অমলার বুঝিবার ভ্রম হইয়াছিল, অমলা হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহার কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু অমলার প্রাণ এখনও সম্পূর্ণ সুস্থির হইতেছে না কেন? তাহার দাদাকে দেখিবার জন্য মন এত ব্যাকুল হয় কেন? অমলা পুনরায় বলিল—"দাদা কোথায় গেছে, বল না বউ দিদি?"

শরৎকুমারী অম্লানবদনে বলিল "চুলোয় গেছে, সে কোথায় যায়, আমায় কি বলে যায়?"

শরৎকুমারীর সে আত্মগ্লানি—সে মর্ম্মভেদী অনুতাপ কোথায় গেল? অমলার সম্মুখে আবার এরূপ বলিতেছে কেন? আমরাত মুখেই বলিয়াছি—তোমরা শরৎকুমারীকে সহজে চিনিতে পারিবে না।

শরৎকুমারী এইবার বলিলেন—"দাদার জন্য যদি এত অধৈর্য্য হয়ে থাকিস্, তবে তাকে খুঁজে বার কর্ না। আমিও বরং তোর সঙ্গে খুঁজবো এখন; তোর দাদা এই অন্দরের মধ্যেই কোথায় লুকিয়ে আছে।"

এই কথা বলিতে বলিতে শরৎকুমারী অমলার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। সেটানে অমলার অঙ্গে লাগিতেছিল, কিন্তু তাহার দাদার জন্য তাহার প্রাণ টানিতেছিল, সুতরাং অমলা তখন সে বেদনা অনুভব করিতে পারিল না। শরৎকুমারী তাহাকে বাহিরে লইয়া গিয়া বলিল—"এই খানেই কোথায় আছে, শিগ্‌গীর খুঁজে বার কর। নইলে এই বারাণ্ডা থেকে, তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।"

শরৎকুমারী ক্রমে যতই অধৈর্য্য হইতেছে, ততই আবার তাহার হৃদয়ের ভাব বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। শরৎকুমারী অন্যের কাছে আপনার তেজ ও অহঙ্কার বাহিরে সমান রাখিতে পারে, কিন্তু অমলার কাছে তাহার সে সামঞ্জস্য সকল সময় ঠিক রাখিতে পারে না। অমলা শরৎকুমারীকে কতক কতক চিনিত; সেই কারণ কি ভাবিয়া বলিল—"বউদিদি, আমি ঘরে যাই, তা হলেই দাদা ঘরে আসবেন এখন। আমার সমুখে তিনি হয়ত আসবেন না।"

শরৎকুমারী তখন দাঁত কড়মড় করিয়া বলিল—"তুইত তাকে যাদু করেছিস্, সে তোকে দেখলেই আসবে, আমায় দেখলে আসবে না। শিগ্‌গীর খুঁজে বার কর—কর—কর।"

অমলারই হস্তে তখন প্রদীপ দিল, সেই প্রদীপের আলোকে শরৎকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল শরৎকুমারীর নয়নে ক্রোধাগ্নি দেদীপ্যমান আর তাহার সেই নয়নেরই প্রান্তে অশ্রুবিন্দু!

শরৎকুমারী কি বহুরূপী?

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

খুনী কে?

(৩)

ফকির ওরফে এনতাজ খানসামা নজরবন্দী রহিল। আপাততঃ তাহার বিচার হইল না। তাহাকে হস্তগত রাখিয়া সুলতান থোরসেদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহাকে পূর্ব্বে আমি কখনও দেখিনাই; খানসামার কাছে তাহার চেহারা ও চাল চলন সম্বন্ধে যত কিছু জানা যায়, সমস্তই জানিয়া লইলাম। তাহার ফটো আছে কি না বাটীতে যাইয়া পুনর্ব্বার অনুসন্ধান করিলাম। প্রত্যেক দেরাজ ও বাক্স খুঁজিয়া একটী পুরাতন বাক্সের ভিতর এক খানি পুরাতন নিগেটিভ্ ফটো পাইলাম; তাহাতে অনেকটা সুবিধা হইল। ফটো লইয়া খানসামাকে দেখাইলাম, সে বলিল "হাঁহাই সুলতানের চেহারা।" ফটো পকেটে রাখিয়া দিলাম এবং সুলতানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই সময়ে আমার মনোমধ্যে এই চিন্তার উদয় হইল যে, সুলতান নবাব পত্নীকে হত্যা করিল কেন? অর্থলোভে না বিদ্বেষ বশতঃ? খানসামাকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; সে প্রথমে কিছুই বলিল না; খুব পীড়াপীড়ি করাতে অবশেষে কতক কতক বলিল; তাহাতে জানিতে পারিলাম যে নবাব-পত্নীর সহিত সুলতানের প্রসক্তি ছিল; নবাবের মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই দুইজনে হৃদয়ের বিনিময় করিয়াছিল; কিন্তু তখন দেখা শুনা গোপনে চলিত; নবাবের মৃত্যুর পর উভয়ে স্ত্রীপুরুষের ন্যায় ঘরকন্না করিতেছিল; পরে এই হত্যা। এই সকল বিবরণ শুনিয়া মনোমধ্যে সহসা ধারণা হইল অর্থলোভে অথবা বিদ্বেষ জন্য হত্যা নহে, ইহার অন্য নিগূঢ় কারণ আছে? সুলতানের আরও বিশেষ খবর জানিবার প্রয়োজন হইল; খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সুলতানের সহিত নবাবের কি সম্বন্ধ?

খানসামা বলিল—"না অপর কোন সম্বন্ধই নাই; থোরসেদ অনাথ দরিদ্রের সন্তান। নবাব তাহাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন, বন্ধুভাবে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেন।"

"বন্ধুর সহিত এত ঘনিষ্ঠতা যে, একত্রে এক বাটীতে এক অন্তঃপুরে বাস? ভাল নবাব, সুলতানের সহিত তাঁহার পত্নীর গুপ্ত প্রণয়ের বিষয় তিনি জানিতেন?"

"তিনি স্বচক্ষে অনেকবার তাঁহাদিগকে একত্রে থাকিতে দেখিয়াছিলেন।"

"তবে তিনি কিছু বলিতেন না?"

"কিছুই নয়। তিনিও গোপনে রাখিয়াছিলেন; তবে ভিতরে ভিতরে সমস্তই খবর লইতেন।"

"তাঁহার কতদিন হইল মৃত্যু হইয়াছে?"

"তিন মাস হইতে চলিল।"

"তুমি জান কিরোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে?"

খানসামা চুপ করিয়া রহিল। তাহার মুখখানি দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল; মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিয়া ভিতরের রহস্য বাহির করিয়া লইলাম। খানসামা বলিল,—

"বিষে"

আমি চমকিয়া উঠিলাম—বলিলাম—"কি বিষ! বিষ! কে বিষ দিল?"

"তাঁহার পত্নী ও বন্ধু।"

এই সময় যেন একটা নূতন আলোক আমার মনোমধ্যে প্রতিভাত হইল। থানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "নবাবের সন্তান আদি কি?

"কিছুই নাই।"

"তবে তাঁহার সম্পত্তির কে অধিকারী হইল? তিনি কি কিছু উইল করিয়া গিয়াছেন?"

"হাঁ, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে সমস্তই ঠিক করিয়া গিয়াছেন।"

"তুমি কি সে উইল দেখিয়াছ?"

"আজ্ঞা না। আমি শুনিয়াছি তিনি সুলতানকেই উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন।"

তখন সমস্তই বুঝিতে পরিলাম; যে সুলতান নবাবের এত শত্রুতা করিল নবাব অবশেষে তাহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া গেলেন? প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাল তুমি কি জান্ যে, নবাবের বিধবা পত্নীর সহিত সুলতানের বিবাহের কোন কথা ছিল?"

"আজ্ঞা ছিল?"

"কিরূপে জানিলে?—তাহা হইলে তুমি উইল দেখিয়াছ বল?

"আমি দেখি নাই, শুনিয়াছি।" আর অধিক গোলমাল না করিয়া কালেক্টরী হইতে উইলের নকল লইলাম;—দেখিলাম তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে যে, সুলতান খোরসেদ আমার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিলে তবে আমার সমস্ত বিষয়ের মালিক হইবে।"

ভাল এরূপ বন্ধনীর প্রয়োজন কি? তবে ইহার ভিতর আরও কোন গুরুতর রহস্য আছে? খুনের রাত্রে থানসামা ঘটনা-স্থানে ছিল কি জানি না, জানিয়া লইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে কিছুতেই কোন কথা স্বীকার করিল না। সে বলিল "সে দিন আমি বাড়ীতে ছিলাম বটে, কিন্তু কিরূপে হত্যা হইল, হত্যাকারী কোথায় পলাইল, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।"

"তবে তুমি শুধু শুধু ফকির সাজলে কেন, তোমার কিসের ভয়?"

"ভয়ের কারণ আছে, আপনি বোধ হয় জানেন যে, আমিই খুনের দিনে নিজে দুধ কিনিতে গিয়াছিলাম। তা ছাড়া সকলেই জানেন যে, আমি খোরসেদের পেয়ারের চাকর তিনি আমাকে না বলিয়া কোন কাজ করিতেন না।"

"তবে খুনের কথা একেবারে বলেন নাই?"

"আজ্ঞা তিনি কিছুই বলেন নাই; খুনের পর সমস্ত বিষয় জানিতে পারিলাম; কাজেই বিপদের আশঙ্কায় গা ঢাকা দিলাম।"

"তবে লাস সরাইল কে?"

"তাহাও বলিতে পারি না।" আমাকে চিন্তিত দেখিয়া থানসামা বলিল "বড়া ভাবিতেছেন কেন? আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, খোরসেদই হত্যা করিয়াছে।"

"তুমি বলিতে পার সুলতান খোরসেদের সহিত অপর কোন স্ত্রীলোকের আলাপ ছিল? তুমি নির্ভয়ে বল, তোমার কোন বিপদ হইবে না; তুমি মহারাণীর সাক্ষী হইবে।"

অনেক সাধ্যসাধনার পর এন্ তাজ বলিল "নসিব্ উন্নেসার সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ ছিল?"

"নসিব্-উন্নেসা কে?"

"হবিবর; চুঁচুঁড়ারএকজন প্রসিদ্ধ সওদাগর। নসিব তাঁহারই কন্যা।"

সেই দিনই নসিব-উন্নেসার সমস্ত সন্ধান লইলাম; তাহাতে জানিতে পারিলাম যে, সে রাত্রী পূজার রাত্রেই অদৃশ্য হইয়াছে। তখন সমস্ত ব্যাপার স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। মনে উৎসাহ হইল; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম "বোধ হইতেছে শীঘ্রই খুনের কিনারা হইবে।"

(৪)

খোরসেদের ফটো লইয়া তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। প্রথমেই কলিকাতায় আসিলাম; সহরের সমস্ত গলির বাড়ী ঘর সন্ধান লইলাম; সকল থানায় খবর করিলাম; সহরে যে কোন বাড়ীতে নূতন বামনী আসিয়াছে, তাহাদের বিশেষ সন্ধান লইলাম; কিন্তু কাজে কিছুই হইল না। এইরূপে আরও দুই মাস কাটিয়া গেল। এক দিন আমি হরধারের ঘাটে বসিয়া ঘাটের দিকে চাহিয়া আছি। কত স্ত্রীপুরুষ স্নান করিতে আসিতেছে ও স্নান করিয়া উঠিয়া যাইতেছে। সকলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছি একটার কিছু পূর্ব্বে একটী ব্রাহ্মণ স্নান করিতে আসিলেন। তাঁহার হাতে ফুলের সাজি, বগলে গামছা জড়ান একখানি কাপড়; মাথা নেড়ে উড়ে—বরণে কামান। বয়স অনুমান ৫০ বৎসর; নয়ন দ্বয়ে তীক্ষ্ণ জ্যোতি। দাড়ী গোপ কিছুই নাই। ফুলের সাজি পৈঠায় রাখিয়া তিনি স্নান করিতে নামিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া অবধি হইতে লাগিল যেন কৃতবার তাঁহাকে দেখিয়াছি; পকেট হইতে ফটো বাহির করিয়া দেখিলাম, নাক, কাণ, চোখ, ঠোঁট ও কপাল—সমস্তই মিলিয়া গেল; অমিল মধ্যে দাড়ী গোপ নাই, মাথা ভট্টাচার্য্য ধরণে কামান। সন্দেহ হইল; আমার সঙ্গে যে চাকর ছিল, তাহাকে সমস্ত কাপড় চোপড় রাখিতে দিয়া তেলমাখিয়া স্নান করিতে নামিলাম এবং যেখানে সেই ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন, তাঁহার কাছে গিয়া স্নান করিতে লাগিলাম। তিনি তখন আহ্নিক করিতেছিলেন; কি মন্ত্র বলিয়া এবং কিরূপ প্রক্রিয়ায় করিতেছিলেন, আমার দৃষ্টি সেই দিকেই রহিল; দেখিলাম সকলই ভুল। মন্ত্রত কিছুই বলিতেছেন না, কেবল ওঙ্কারেরই কিছু বেশী ঘটা; অন্য কথার বেলা কেবল "ওঁ, ওঁ, ওঁ সহি সহি" সঙ্গেই ক্রসমই বাড়িতে লাগিল। তাড়াতাড়ী স্নান করিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনি তীরে উঠিয়া কাপড় ছাড়িলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় সাজি লইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। প্রথমে স্নানের সময় তিনি আমার প্রতি একটু লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমাকে পশ্চাতে যাইতে দেখিয়া ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; সেই দৃষ্টির অর্থ আছে। বিশ বৎসর পুলিশে কাজ করিয়া আর কিছু না বুঝি লোকের মুখভাব দেখিয়া মন পড়িতে কতকটা শিখিয়াছি। তাঁহার সেই দৃষ্টির বিশেষ অর্থ ছিল। ক্রমে আমি তাঁহার খুব নিকটে যাইলাম। তখন তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "আপনার নিবাস কোথায়?"

"বাস ময়মনসিংহ; এখানে চাকরীর অনুরোধে আসিয়া মিছামিছি বসিয়া আছি প্যাটের ভাত ত মিলিতেছে না। হা আজব সহর কেউ না খাইতে পারিয়া ফেলিয়া দেয় কেউ এক বেলাও খাইতে পায় না।" পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ সম্পূর্ণ ঠিক নকল করিয়াছিলাম। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে কিছুই

সন্দেহ করিলেন না। সেই সুযোগে তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা চালাইবার উপায় হইল। তাঁহার বাসা কোথা জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন পটলডাঙ্গায় সুতরাং সেই পথে যাইয়া তাঁহার বাড়ী দেখিয়া লইলাম। সেই দিন হইতে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে তাঁহার বাসার পাশ দিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তাঁহার বড়ীটী অতি সামান্য; দোতালা হইলে কি হয় বাহিরে দেখিতে অতিশয় কদর্য্য। তিনি কি সূত্রে কলিকাতায় আসিয়াছেন; জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন তাঁহার স্ত্রীর বড় ব্যারাম তাই চিকিৎসা করাইতেছেন। কবিরাজি চিকিৎসা চলিতেছে।

কোন্ কবিরাজ দেখিতেছেন, জিজ্ঞাসা করাতে তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "রামচরণ গুপ্ত।" আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। রামচরণ নামে কোন কবিরাজ ছিল না, তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু সে কথা আর ভাঙ্গিলাম না। যাহা হউক নানা কৌশলে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়াইতে লাগিলাম। প্রথম প্রথম তিনি আমাকে দেখিলে একটু বিরক্ত হইতেন, ক্রমে সেই বিরক্তিভাব দূর হইল; এখন একটু আদর করিয়া দুই চারিটী কথা বলেন; তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমার বাটী নয়মনসিংহ জেলায় এবং আমি উমেদার।

একদিন তাঁহার বৈঠকখানায় দুইজনে বসিয়া কথা কহিতেছি, এমন সময়ে আমি সুলতান খোরসেদের সেই ফটোগ্রাফখানি বাহির করিয়া বলিলাম, "মশাই, এটাকে আপনারা কি বলেন? এযে জ্যান্ত মানুষ!" ফটো খানি দেখিয়াই তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল; অল্প বিহ্বল ভাবে বলিলেন "দেখি" দেখি!" আমি তাঁহার হাতে দিলাম না। সেই দিন এন্‌তাজ খানসামাকে আমি সঙ্গে আনিয়াছিলাম; পাছে সেই ব্রাহ্মণ দেখিতে পায় এজন্য পার্শ্বের বাটীতে লুকাইয়া রাখিয়া ছিলাম। ব্রাহ্মণ ফটো দেখিয়া একটু অন্য মনা হইলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। খানসামা তাহাকে দেখিয়া আমাকে তাড়াতাড়ি বলিল,—"শিকার হস্তগত।" তখনই পুলিস লইয়া আমি বাড়ী ঘেরাও করিলাম এবং ব্রাহ্মণকে ধরিবার জন্য খানসামার সহিত থানার ইন্‌স্পেক্টরকে যাইতে বলিলাম। বাড়ী ঘেরাও করিয়াই আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম;—প্রবেশ করিয়া দেখিলাম এক পরমা রূপসী একা এক ঘরে বিরাজ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং হঠাৎ সম্মুখস্থ দেরাজ হইতে একটী রিভল্‌ভার বাহির করিয়া বলিলেন, "একপদ অগ্রসর হইলেই হয় তুমি মরিবে, নতুবা আমি মরিব।" দেখিয়া বুঝিলাম রিভল্‌ভার খালি নহে। বল প্রয়োগ বিফল দেখিয়া মিষ্ট কথায় বলিলাম "আপনি কেন আত্মহত্যা করিবেন; সুলতান গঙ্গার ঘাটে ধরা পড়িয়াছেন; এন্‌তাজ খানসামা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছে। বাঁচিতে চানত পিস্তলটী ফেলিয়া দিন।" রমণী পিস্তলটী রাখিল; তাহার মুখ তখন ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল, নয়ন যুগল দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। আমি বুঝাইয়া বলিলাম "এখন পলাইবার আর উপায় নাই; এই বেলা আমার সঙ্গে আসুন তাহা হইলে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন। আপনার পিতা হবিবর নীচে অপেক্ষা করিতেছেন আপনি তাঁহার সহিত ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারেন; তিনি আপনার জন্য বড়ই কাতর; দুঃখ পিতাকে ছাড়িয়া একটা খুনের সঙ্গে চলিয়া যাওয়া ভাল হয় নাই; যাহা হউক আসুন আমার সঙ্গে আসুন" এইবার রমণী কাঁদিয়া ফেলিল,—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমি আর যাইব না, যখন সকলের মরা পড়িয়াছে, তখন আমার আর বাঁচিয়া ফল কি? তোমরা তাহার সহিত আমাকেও ফাঁসি দাও।" বলিয়া খুসায় মূর্চ্ছিত হইয়া আর্ত্তস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

সেই সময়ে ইন্‌স্পেক্টর সেই ব্রাহ্মণ ওরফে খোরসেদকে ধরিয়া লইয়া আসিল। খোরসেদ আমাকে দেখিয়া ক্রোধোন্মত্ত ভাবে বলিলেন "ব্যাটা মুন্নমননসিংহের বাঙ্গাল! তোর এই সব কাণ্ড।

জগলির দায়রায় খোরসেদের বিচার হইল; সে আদ্যোপান্ত সমস্ত স্বীকার করিল এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

শ্রীঅঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

যুদ্ধসংবাদ।—এত দিনে "স্বর্গ বাসিগণের" বিবেচনা হইল। জাপান আগেই আক্রমণ করিল, জাহাজ ডুবাইয়া দিল, সৈন্য সামন্ত হত্যা করিল, তথাপি অমরেন্দ্রের আসন টলে নাই। উভয় পক্ষে প্রায় চারি সহস্র সৈন্য মারা পড়িল, এখন চীন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যুদ্ধ রীতিমত করিতে হইবে। এই প্রতিজ্ঞা করা হইতে বিপুল শোণিত-পাত হইবে। তবে একটা সুসংবাদ এই যে, ইংলণ্ড অথবা অন্য কখনও কোন পক্ষে বিশেষ ভর করেন নাই। ইহাঁদের এইরূপ ঔদাসীন্য কতদিন থাকিবে বলা যায় না।

* *

ফক ও ভক্ষক।—মিঃ বিটসন বেল খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট; মফঃসলে পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনে বড় ব্যাপৃত। একদা কি কুক্ষণে তাঁহার সুমতি হইল বলিতে পারি না, তিনি সদরের জমিদারী কাছারীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কেশবলাল মিত্র নামে এক-মাত্র মেম্বরার ছিল; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নায়েব কোথায়?" কেশব বাবু বলিল "নায়েব সদর জেলায় গিয়াছে।" এই কথা শেষ হইতে না হইতে সাহেবের হস্তস্থিত চাবুক কেশবের উন্মুক্ত পৃষ্ঠে পতিত হইতে আরম্ভ হইল। হতভাগ্য কেশব যন্ত্রণায় অস্থির,—কাঁদিয়া আকুল। কি কারণে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার উপর এত সুপ্রসন্ন হইলেন কেশব তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহার পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত,—রুধিরে আপ্লুত। সেই অবস্থাতেই কেশব খুলনায় যাইয়া ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট বাবু সতীশচন্দ্র বসুর নিকট নালিশ করিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে নালিশ! ডেপুটী বাবু শুনিয়াই অজ্ঞান। তিনি প্রভুর নামে কি করিয়া নালিশের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন? তাও কি পারেন? কেশব পৃষ্ঠের শোণিতাক্ত ক্ষতচিহ্ন দেখাইল; তথাপি ডেপুটি বাবুর দয়া হইল না। তিনি তাহার

আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন ;—শুধু তাহাই নহে, কেশবকে মিথ্যা অভিযোগের জন্য পুলিশ সোপর্দ্দ করিতে চাহিলেন। নিরুপায় হইয়া কেশব জজ বাহাদুরের শরণাগত হইল। ডেপুটি বাবুর ব্যবহারে জজ বিশেষ বিরক্ত ও দুঃখিত। মোকদ্দমার সমস্ত কাগজ পত্রের নকল দিতে আদেশ করিয়া তিনি কেশবের উকিলের হাতে বেল সাহেবের স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র দিলেন। বেল সাহেবসেই পত্রে নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, হঠাৎ ক্রোধোদয় হওয়াতে আমি কেশবকে প্রহার করিয়াছি ;—ক্রোধোদয়ের কারণ—শুদ্ধ! ম্যাজিষ্ট্রেট মনে করিয়াছিলেন যে, জমিদারের কাচারীতে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি দুধ খাইতে পাইবেন; কিন্তু কোথায় দুধ? কাজেই তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যিনি জেলার কর্ত্তা; যাঁহার অনুগ্রহের উপর লক্ষ লক্ষ মানবের সুখ-দুঃখ নির্ভর করিতেছে, সামান্য দুগ্ধের জন্য তাঁহার এই ব্যবহার! হা দগ্ধ অদৃষ্ট! ইহাঁরাই আবার ভারত শাসন করিবেন? যিনি রক্ষক, তিনিই ভক্ষক! বল মা তাম্র দাঁড়াই কোথায়?

ডেপুটী বাবু।—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মিঃ বেল হঠাৎ ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বালকের ন্যায় এই অন্যায় কাজ করিয়াছেন, একথা তিনি সেই পত্রে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু ডেপুটী বাবুর এ কি ব্যবহার! প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি অম্লান বদনে কেশবের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন, তাহার উপর আবার উল্টা চাপ! এই কি তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান! ইহাঁর মত দুই চারিটী ডেপুটী ধর্ম্মাধিকরণে স্থান পাইলেই বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল হইবে সন্দেহ নাই!. আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট এই দুই মহাপ্রভুর মহনীয় চরিত্রের বিচার করিবেন।

***

রাজা ও প্রজা।—রাজা ও রাজপ্রতিনিধির পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন ভারতে নূতন নহে। হিন্দু নরপতিগণ প্রজার অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন এবং তাহাদের সুখ দুঃখের কথা স্বকর্ণে শুনিবার নিমিত্ত কখন ছদ্মবেশে, কখন বা প্রকাশ্যে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতেন। তাহাতে দেশের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইত না। ইংরেজের শাসনেও সার রিচার্ড ক্যাম্বেল ও সার এশলি ইডেন সাহেবও মফঃসলে যাইয়া অম্লান বদনে জনতার মধ্যে প্রবেশ করিতেন এবং প্রজারা যাহা বলিত বা কোন আবেদন করিত, সানন্দে ও সাগ্রহে সমুদায়ই শুনিতেন। কিন্তু আমাদের ভাগ্য-দোষে সে কাল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেদিন ছোট লাট সার চার্লস্ এলিয়টের ঢাকা-পরিদর্শন-কালে দুইটী সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলা তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া দুই খানি দরখাস্ত দিয়াছিলেন, কিন্তু ছোট লাট দুইখানিই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। একখানিতে কোর্টফি ষ্টাম্প ছিল না, সেই জন্য তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে ;. অপর খানি কি দোষে তাঁহার শ্রীহস্তস্থ স্থান পাইল না, বলিতে পারি না। স্থূলাঙ্গের অর্থাগমের দিকে ছোট লাটের নিয়তই চেষ্টা; ইহা নিতান্তই প্রশংসনীয়; কিন্তু কৃপা-ভিখারিণী অনাথার অশ্রুজলে মূহিত কি অর্থের তুলনা হইতে পারে?

***

দোষ কাহার?—কিন্তু কাহার দোষ দিব! কপাল-দোষে আমরা দোষী। ছোট লাট অর্থপ্রিয়; যাহাতে রাজকোষের বৃদ্ধি না হয়, তাহা তিনি কখনই করিতে ভাল বাসেন না; কিন্তু ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ও কি তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত? এই ম্যাজিষ্ট্রেট সে দিন

মফঃসল ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে মইপরা এক বৃদ্ধা তাঁহার অনুগ্রহলাভের জন্য তাঁহার দুটী পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুদ্বারা অভিষিক্ত করিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্রোধের সীমা রহিল না। যেন এক মহাপাতক তাঁহাকে স্পর্শ করিল; তিনি রাগে পা ছাড়াইয়া লইলেন। তাঁহার এই ব্যবহারে ফরিদপুরে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

***

বিচিত্র ব্যাপার!—সহযোগী "মাহারাট্টা" বলেন, দাক্ষিণাত্যের কোন সহরে একটী মুসলমান প্রকাশ্য স্থলে গোহত্যা করিয়াছিল। সেই স্থানে সেই কারণে একবার ভীষণ বাধা হাঙ্গামা হইয়াছিল। এই জন্য তত্রত্য ডাউনীর ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। গবর্ণমেণ্টের অথবা জেলার খোদ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোন লোক নাকি মোকদ্দমার ফলাফল দেখিতেছিলেন; আসামী দণ্ডিত হইলে পর বিচারকের নিকট উপর হইতে এক কড়া চিঠি আসিল; পত্র পাঠ করিয়াই তাঁহার চক্ষু স্থির! কেন তিনি সেই মুসলমানকে সেরূপ গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন, এই জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করা হইয়াছিল। ইহাতে আমরা কি বুঝিব?

***

অশ্রুবিন্দু।—ঢাকা গেজেট তত্রত্য জুরারিদিগের দুর্গতি স্মরণ করিয়া অশ্রুত্যাগ করিয়াছেন। জুরারিদিগের বসিবার স্থান নাই; তাঁহাদিগকে দূরদেশ হইতে আসিতে হয়; কখন কখন সমস্যাভাবে অনেককে অনাহারে থাকিতে হয়। কামাই হইলে রক্ষা নাই, —অমনি জরিমানা! বিশ্রাম করিবার অবসর থাকুক বা না থাকুক, তাহাদিগকে ১১ টার সময় আদালতে উপস্থিত থাকিতেই হইবে; কিন্তু জজ সাহেব ১ টার পূর্ব্বে কচিৎ আগমন করেন। হয়ত বিচার আরম্ভ হইবার ৩৪ দিন পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে আসিতে হয়; ইহাতে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হউক, তজ্জন্য কেহই দায়ী নহে। জুরারিদিগের এই দুর্গতি মফঃসলের প্রায় সকল আদালতেই দেখিতে পাওয়া যায়; এই জন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অনেক স্থানে জুরিতে বসিতে ইচ্ছা করেন না। এই দুর্গতি দূর না করিলে জুরি-প্রথার উন্নতি কিরূপে হইতে পারে?

***

রঙ্গভূমি।—কলিকাতার তিনটী প্রধান রঙ্গভূমিতে তিন খানি নূতন পুস্তকের অভিনয় হইতেছে। মিনার্ভায় "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" বেঙ্গলে "হরি-অন্বেষণ" এবং ষ্টারে "অন্নদা-মঙ্গল" নাট্যরঙ্গে নাট্যামোদীর আনন্দ বর্দ্ধন করিবে সন্দেহ নাই। অদ্য আমরা পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের অভিনয় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। নাটক খানি গিরিশ বাবুর মধুময়ী লেখনী-প্রসূত; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে মনোরম। গত শনিবার আমরা এই মনোহর দৃশ্যকাব্যের অভিনয় দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। দ্রৌপদী, অর্জ্জুন, ভীম ও বালক অভিমন্যুর স্বভাব-সুন্দর অভিনয়ে শ্রোতা ও দর্শক মাত্রেই মোহিত হইয়াছিলেন। দ্রৌপদীর পাতিব্রত্য, দুঃশলাবেশী অর্জ্জুনের হৃদয়োন্মাদিনী বীর্য্যমত্ততা, ভীমের অতুলনীয় সাহস ও তেজস্বিতা এবং মূর্খ কীচকের ভীরুজন সুলভ কামোন্মত্ততা শ্রোতার হৃদয়ে যুগপৎ প্রীতি ও অপ্রীতির সঞ্চার করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং পুণ্যের পুরস্কার বিধান-পূর্ব্বক নাট্যালঙ্কারের সম্পূর্ণ গৌরব রক্ষা করিয়াছে। দুই এক বিষয়ে যে সামান্য দোষ আছে ক্রমে তাহার সংশোধন হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

নিবেদন।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়েরা অদ্যাবধি "অনুসন্ধানের" অষ্টম বর্ষের (১৩০১সালের) অগ্রিম মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন একটু সত্বর তাঁহাদের দেয় চারিটী পাঠাইয়া দেন। 'সাপ্তাহিক অনুসন্ধান' যেরূপ ব্যয়বাহুল্য গুরুতর ব্যাপার, ভরসা করি, সে সকল বিষয় চিন্তা করিয়া, মূল্যের টাকা চারিটি পাঠাইতে কেহই বিরত হইবেন না।

বিশেষ, আরও পরে টাকা দিলে, পশ্চাদ্দেয় হারে তাঁহাদিগকে টাকা দিতে হইবে, স্মরণার্থ নিবেদন। নিয়মিত পত্রিকা পাইয়া, কেহই যে নিয়মের ব্যত্যয় করিবেন না সম্পূর্ণ ভরসা করি।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী, কার্য্যাধ্যক্ষ।
অনুসন্ধান-কার্য্যালয়, ১৮৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

"অনুসন্ধানের" নিয়মাবলি।

১। গ্রাহক-নম্বর ব্যতীত, কি ঠিকানা-পরিবর্ত্তন, কি টাকা জমা, কোন কার্য্যই হয় না। প্রতিবারের কাগজের মোড়কে গ্রাহক-নম্বর থাকে।

২। "সাপ্তাহিক-অনুসন্ধানের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই, ৪৲ চারি টাকা। পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৫৲ পাঁচ টাকা।

৩। পুরাতন গ্রাহকগণ নূতন বর্ষের প্রথম কাগজ-প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে এবং নূতন গ্রাহকগণ এক মাস মধ্যে টাকা দিলেই অগ্রিম হিসাবে গৃহীত হইবে। তৎপরে টাকা দিলে, পশ্চাদ্দেয় হিসাবে জমা হইবে।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে, তৎপর-সংখ্যা প্রাপ্তির পরই জানাইতে হইবে। উপর্য্যুপরি দুই সংখ্যা না পাইলে, নিয়মিত সময়ান্তে, তৎক্ষণাৎ তাহা জ্ঞাতব্য। অধিক পরে জানাইলে, আমরা তাহার দায়ী হইব না। সে ক্ষেত্রে প্রতি সংখ্যার দাম ৵০ আনা।

৫। লেখকগণ ভিন্ন, পত্রোত্তর-প্রার্থী হইলে, রিপ্লাই কার্ডে বা টিকিট-সহ পত্র লিখিতে হয়।

'অনুসন্ধানে' বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

(ক) বিজ্ঞাপনের মূল্য—এক বৎসর কোন বিজ্ঞাপন চলিলে, প্রতিবার প্রতি ছত্র এক আনা, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲ পাঁচ টাকা।

তদ্ভিন্ন, একবারের জন্য—প্রতি ছত্র।০ চারি আনা; এক মাসের জন্য প্রতি ছত্র প্রত্যেক বার ৵০ আনা; তিন মাসের জন্য—প্রতিবার প্রত্যেক ছত্র ৵০ আনা; ছয় মাসের জন্য—প্রতিবার প্রতি ছত্র ৵১০ আনা।

কি বিজ্ঞাপনের টাকা, কি গ্রাহকগণের দেয় টাকা, 'অনুসন্ধান'-সংক্রান্ত সকল টাকাকড়ি সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
'অনুসন্ধানি' কার্য্যালয়, ১৮৯ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ। | ১লা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। | ষোড়শ সংখ্যা।

আত্মোৎসর্গ।

"কোথা মা আমার! স্থিতি-প্রলয়-রূপিণী; জগজ্জননী, সংসারের সুখ-শান্তি-প্রদায়িনী; কোথা আদ্যাশক্তি স্বরূপিণী—মা আমার একবার দেখা দাও।" পুণ্যভূমি কাশীর মণিকর্ণিকা-তীরে বসিয়া একদিন মহর্ষি অগস্ত্য জগতের আদিভূতা পরাশক্তিকে এইরূপে আহ্বান করিয়াছিলেন। তখন ভারতে আর্য্য-রাজত্ব দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অনার্য্যশক্তি তখনও সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হয় নাই;—বিন্ধ্য ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত তখনও দৈত্যদানবের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় নাই; বাতাপি ও ইল্বলের প্রেতাত্মা দাক্ষিণাত্যের প্রবেশদ্বার রোধ করিয়া বিন্ধ্যাচলের শিরোদেশে বিরাজ করিতেছিল। এমন কি পুরাণকারগণ বলেন যে বিন্ধ্যের প্রচণ্ড প্রতাপে সূর্য্যের গতি পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার অভ্যন্তরে যে কোন ঐতিহাসিক রহস্য রূপকাকারে প্রচ্ছন্ন থাকুক না কেন, সহজ বুদ্ধিতেই ইহাই বুঝা যায় যে, মহর্ষি অগস্ত্য বিন্ধ্যগিরির বিরাট পাষাণপ্রাকার ভেদ করিয়া রাক্ষস নিষেবিত দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশ সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত করিয়াছিলেন; তাঁহার এই মহদ্বদান্যের বিষয় হিন্দুসাত্রেরই অবিদিত নাই; কিন্তু ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান কালেয় অসুরগণের নিধন-সাধন। এই সকল অসুরগণ ঋষিদিগের উপর কিরূপ ভীষণ অত্যাচার করিত, মহাভারত হইতে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল :—"লোমশ কহিলেন,—সেইকালেয় অসুরেরা কবচধারণ জলনিধি আশ্রয় করিয়া ত্রৈলোক্য নাশে প্রবৃত্ত হইল। সেই ক্রূর দৈত্যেরা নিত্য নিত্য নিশাসময়ে আশ্রম ও পুণ্যায়তনস্থ মুনিদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। দুরাত্মারা বশিষ্ঠাশ্রমে একশত আশী জন বিপ্র ও তদ্ভিন্ন নয় জন তপস্বীকে ভক্ষণ করিল। মহর্ষি চ্যবনের পুণ্যাশ্রমে ফলমূলাশী এক শত মুনিকে ভক্ষণ করিল এবং ভরদ্বাজাশ্রমস্থ বায়ু

ও জলজন্তু [illegible] নিয়ত ব্রহ্মচারীকে বিনাশ করিল। তাহারা রাত্রিকালে এইরূপ করে, দিবসে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহারা কাল প্রেরিত ও মত্তপ্রায় হইয়া ভুজবল দর্পে এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক দ্বিজগণকে রজনীভাগে হনন করত সকল আশ্রমেই ধাবন করিয়া বেড়াইত; কিন্তু কোন মনুষ্য তাহাদিগকে জানিতে পারিত না। প্রভাতকালে নিয়মাহার-কর্ষিত মুনিদিগের মাংসবিহীন রুধির মজ্জা ও অন্ত্র রহিত এবং ভগ্নসন্ধি মৃত শরীর সকল ভূতলে দৃষ্ট হইত; এমন কি সমাকীর্ণ শঙ্খরাশির ন্যায় অস্থি সমূহ দ্বারা ভূতল প্রকাশ পাইত; এবং ভগ্ন কলস শ্রুবাদি ও বিকীর্ণ অগ্নিহোত্র সামগ্রী দ্বারা যজ্ঞস্থান সমাবৃত থাকিত। তখন সমস্ত জগৎ কালেয় ভয়ে পীড়িত হওয়াতে উৎসাহ শূন্য হইল। সাধ্যায়, বষটকার, যজ্ঞোৎসব ও ক্রিয়াকলাপ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। মানবগণ এইরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে আরব্ধ হইলে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থ দিগ্‌দিগন্তর পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ গুহা প্রবেশ করিল; কেহ কেহ নির্ঝর মধ্যে গিয়া লুক্কায়িত হইয়া রহিল, কেহ কেহ বা মরণোদ্বেগে ভয় প্রযুক্তই প্রাণত্যাগ করিল। তখন কোন কোন মহাধানুষ্কী শূর পুরুষেরা পরম হর্ষিত হইয়া দানবদিগের অন্বেষণে অত্যন্ত প্রযত্নপর হইল; কিন্তু অসুরেরা সমুদ্র আশ্রয় করিয়া থাকায় তাহাদিগকে তাহারা জানিতে পারিল না, সুতরাং অতিশয় শ্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে গৃহে প্রত্যাগত হইতে হইল। যজ্ঞোৎসব ক্রিয়া রহিত হওয়াতে সমস্ত লোক হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, মহেন্দ্রাদি ত্রিদশবৃন্দ সাতিশয় পীড়িত হইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ভয় প্রযুক্ত মন্ত্রণা পূর্ব্বক শরণ্য [illegible] দেব বিষ্ণু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন”* এবং নানাবিধ মধুর ও বিনীত বাক্যে তাঁহার স্তব করিয়া অবশেষে বলিলেন, “নিশা সময়ে কে যে ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ করে, তাহার কিছুই অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ব্রাহ্মণেরা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইলে পৃথিবী ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইলে স্বর্গও বিনষ্ট হইবে; অতএব তোমার পরিরক্ষিত লোক সকল যাহাতে তোমার প্রসাদে ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, তাহা কর।”

বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবগণ! প্রজাদিগের ক্ষয়ের কারণ সমস্ত আমার বিদিত হইয়াছে; তাহা তোমাদিগের নিকট বলি, তোমরা সুস্থ চিত্তে শ্রবণ কর। কালেয় নামে বিখ্যাত মহাভীষণ কতকগুলা দানব আছে; ইতিপূর্ব্বে তাহারা বৃত্রকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত জগৎ বিলোড়ন করিয়া বেড়াইত। এক্ষণে তাহারা বৃত্রাসুরকে ধীমান বাসব কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া জীবন রক্ষার্থ উদধি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারাই কুম্ভীরাদি ভীষণ জলজন্তু-সমাকুল বরুণালয়ে থাকিয়া জগতের উৎসাদনার্থ রজনী যোগে মুনিদিগকে বিনষ্ট করিতেছে; কিন্তু তাহাদিগকে বিনাশ করা অশক্য, কারণ তাহারা সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব যাহাতে সমুদ্র ক্ষয় হয় তদ্বিষয়ে তোমরা যত্ন কর। সমুদ্র শোষণ ব্যতিরেকে তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে না; কিন্তু সমুদ্র শোষণ করা একমাত্র অগস্ত্য ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই।”

দেবতারা অবিলম্বে অগস্ত্যাশ্রমে উপনীত হইলেন; ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্য তখন আর্য্যাবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া দৈত্যপূর্ণ দাক্ষিণাত্যে গিয়া আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। সেই সকল দৈত্য আর কেহই নহে—নরমাংসাশী অসভ্য অনার্য্যজাতি। তাহাদিগের ভয়ে মহা ক্ষত্রিয়বীরও সেই বিপদ-সঙ্কুল নিবিড় গিরি গহন ও অরণ্য প্রবেশ করিতে পারিতেন না; কিন্তু মহাবীর অগস্ত্য অম্লান বদনে শৈশবের লীলা-নিকেতন পরম পবিত্র বারানসী ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সাধ্বী পত্নী বিদর্ভ-রাজনন্দিনী লোপামুদ্রার সহিত সেই দুর্গম দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিলেন, রাক্ষসের রাজ্যে আর্য্যের উপনিবেশ স্থাপিত হইল; মানুষভক্ষক অতীব অসভ্য দানব-দেশে আর্য্য সভ্যতার সূচনা হইল, জগৎ দেখিল চতুর্ব্বিধ সাহু অয়ে যাহারা আশৈশব প্রতিপালিত, অস্ত্রশস্ত্র চালনায় সর্ব্বদাই নীরত, তাহারা যাহা পারিল না, কন্দমূল-ফলাহারী অস্ত্রহীন ব্রাহ্মণে তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতেন; এই জন্য ব্রাহ্মণই আর্য্য সভ্যতার প্রথম ও প্রধান বিস্তার-কর্ত্তা। ব্রাহ্মণই আত্মোৎসর্গের পবিত্র দৃষ্টান্ত জগতে প্রথম দেখাইয়াছিলন, পরস্বার্থে নিজস্বার্থ কিরূপে বলি দিতে হয়, পরের সুখের জন্য আত্ম জীবন কিরূপে উৎসর্গ করিতে হয়, অজ্ঞানরূপ গভীর যবনিকার তিমিরাবরণে কিরূপে জ্ঞান গৌরবের প্রখর জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে হয়, ব্রাহ্মণই জগতে প্রথমে তাহা দেখাইয়া যান। আজি সেই ব্রাহ্মণের আদিগুরু মহাত্মা অগস্ত্য জগতের মঙ্গলের জন্য বিশ্বের শান্তিবিঘাতক কালেয় নামক দৈত্যদিগকে সংহার করিয়াছিলেন।

দেবগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অতুলনীয় অবদান পরম্পরার উল্লেখ পূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, “হে মুনেং! পূর্ব্বে যখন লোক সকল নহুষ কর্ত্তৃক সন্তপ্ত হইয়াছিল; তখন আপনি তাহাদিগের গতিস্বরূপ হইয়া সেই লোককণ্টক নহুষকে স্বর্গচ্যুত করিয়া স্বর্গের ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছেন এবং ভূধর-শ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যগিরি রোষ বশতঃ প্রভাকরের গতি রোধার্থ সহসা অতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু আপনার বচন উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অদ্যাপি তাঁহাকে খর্ব্ব হইয়া রহিতে হইয়াছে।” এই স্থানে পুরাণকারের রচনায় কালব্যত্যয় দোষ ঘটিয়াছে; যে অগস্ত্য বিন্ধ্যগিরির গর্ব্ব দূর করিয়াছিলেন, তিনি নহুষ রাজার দর্পহারী এবং তিনিই কি কালেয় দৈত্যদিগের সংহারকর্ত্তা? অথবা আগে কালেয় সংহার, বিন্ধ্যের গর্ব্বহরণ, না নহুষের গর্ব্বক্ষয়? আমরা কিন্তু দেখিলাম যে, কালেয় দৈত্যগণ বৃত্রাসুরের অনুচর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; বৃত্রাসুর ভারতের কোন আদিম যুগে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা কাহারও বোধ হয় অবিদিত নাই; চন্দ্রবংশীয় নহুষ রাজা সেই স্মরণীয় ঘটনার কতকাল পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও সকলে অবগত আছেন। কিন্তু এ বিষয় এক্ষণে আমাদের আলোচ্য নহে; আমরা কেবল মহর্ষি অগস্ত্যের আত্মত্যাগের একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত আজি পাঠকদিগকে উপহার দিলাম। যদি কেহ এই ঘটনাকে অমূলক বলিয়া অবিশ্বাস করেন, তাহাতে আমাদিগের বিশেষ কোন আপত্তি নাই, কারণ তাঁহারা যে. ইহা গল্প বলিয়াও স্বীকার করিবেন আমাদের সে রূপ ভরসা আছে। তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, কারণ গল্প হইতেও লোকে নীতি শিক্ষা করিয়া থাকে। অগস্ত্যের এই অতুলনীয় আত্মত্যাগ ও অবদানের, বিবরণ গল্প বলিয়া গ্রহণ করিলেও তাঁহারা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

আত্মত্যাগই জগতে সুখ, শান্তি ও উন্নতির মূল কারণ। লোকে যদি আত্মত্যাগ না করিত, যদি পশুর ন্যায় নিজ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির চরিতার্থতা

---

* বর্দ্ধমান রাজপ্রচারিত মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১০২ অধ্যায়।

সাধন করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিত, নিজের স্বার্থে পর-স্বার্থের, পুর্ণ আহুতি প্রদান করিত, তাহা হইলে জগৎ সেই আদিম অসভ্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। আত্মত্যাগ আছে বলিয়া আজি পাশ্চাত্য জগৎ উন্নতির চরম সীমায় উত্থিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের বিপুল আলোচনায় লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সমাধানে আজি ইহা সকলের বরেণ্য হইতে পারিয়াছে এবং অন্যান্য মহাদেশ আয়ত্ত করিতে অগ্রসর হইতেছে। ভারতে একদা কালে আত্মোৎসর্গই হিন্দু মাত্রেরই মূল মন্ত্র ছিল। সেই জন্য ভারত প্রাচীন জগতে সকলের শীর্ষস্থানে আসন অধিকার করিয়াছিল। সেই পরম পবিত্র স্বর্গীয় মন্ত্রের অনুপম প্রভাবেই জগতের শ্রেষ্ঠতম প্রাচীনতম সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম নৃশংস পশুপ্রবৃত্তি শত্রুদিগের নিকট সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অশেষ বিড়ম্বনা সহ্য করিয়াও আজি পর্য্যন্ত অটল রহিয়াছে। সেই মহামন্ত্র ভুলিয়াছে বলিয়া ভারত অধঃপতিত হইয়াছে, এই যে ভারত এককালে ফিনিসিয়া ও ইজিপ্ট, গ্রীস ও রোমেরও শিক্ষা-গুরু ছিল, আজি তাহা নবীন য়ুরোপের চরণতলে শিষ্যভাবে আসীন।

শ্রীমহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাপ ও পুণ্য।

পাপ ও পুণ্যের নির্ব্বাচন সকল সমাজে একরূপ নহে। আস্তিক মতে পাপ পুণ্য সমস্তই ঈশ্বরের নিয়মাধীন। ঈশ্বরের নিয়ম রক্ষা করাই পুণ্য ও তাহা লঙ্ঘন করাই পাপ। দেশ, কাল, পাত্রানুসারে রাজা বা সমাজ তাহার কিয়দংশের প্রকাশক ও রক্ষক মাত্র। কিন্তু রাজা বা সমাজের ভ্রম দৃষ্টিতে কোন প্রকৃত অপরাধী নিষ্পাপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও সে ঈশ্বরের নিকট কখনই ক্ষমা পাইবে না। ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাকে সে পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এক্ষণে পাপ পুণ্য সম্বন্ধে কোন মত শ্রেষ্ঠ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

জগতের মঙ্গলজনক কার্য্য পুণ্য এবং অমঙ্গলজনক কার্য্যই পাপ, এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু তাহার অবয়ব, নিয়মকর্ত্তা ও ফলদাতা লইয়াই মত-ভেদ।

১ম। পাপের অবয়ব সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত। কেহ কেহ বলিতে পারেন পাপ নিরবয়ব পদার্থ, তাহার আবার একটা অবয়ব কি? কথা সত্য, কিন্তু নিরবয়ব পদার্থের অবস্থাভেদ দ্বারা একটা আকার মনে মনে কল্পনা করিয়া লইতে হয়। নতুবা কবির পাপের চিত্র বা ছবি অঙ্কিত করিতে বিপদে পড়িতে হইবে। যাহা হউক এস্থলে সে মীমাংসার কোন প্রয়োজন নাই। এস্থলে পাপের অবয়ব শব্দে পাপের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া লইব।

পাপের স্বরূপ কি?

কেহ কেহ বলেন——

"পুণ্যং পরোপকারঞ্চ
পাপঞ্চ পরপীড়নে"

পরোপকারই পুণ্য এবং পরপীড়নের নাম পাপ। কিন্তু কেবল পরপীড়নই যে পাপ একথা কখনও স্বীকার্য্য নহে। দুঃখই পাপের ফল। নিজের যাহাতে শারীরিক বা মানসিক প্রকৃত দুঃখ হয় তাহাকে কিরূপে পাপ না বলিব? অকারণ নিজের শারীরিক পীড়া প্রদান করা কি পাপ নহে? আত্মহত্যা মহা পাপের পর্য্যায়ভুক্ত। যাহার সংসারে আত্মীয় বলিবার কেহ নাই, যাহাদ্বারা জগতের কোন উপকার নাই, যাহার জীবন ক্লেশময় ভার স্বরূপ, সে যদি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করে, তথাপি তাহা মহাপাপ। সুতরাং কিরূপে বলিব যে কেবল 'পাপক পরপীড়নে'?

আবার সকল দেশে সকল অবস্থায় সকল ধর্ম্মে একটী কার্য্য পাপজনক নহে। যথা হিন্দু জাতিতে সগোত্রে বিবাহ পাপ, গোত্রান্তরেও আত্মীয় বলিয়া অনেক পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রে, মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। মুসলমান বা ইংরেজ জাতিতে সাক্ষাৎ খুড়তুত ভগ্নীকেও বিবাহ করিতে বাধা নাই। কিন্তু আবার যে ইংরেজ খুড়তুত ভগ্নীকে অম্লান চিত্তে বিবাহ করেন, তিনি শ্যালিকে কখন বিবাহ করিতে পারেন না। ইজিপ্ট দেশের কোন কোন জাতিতে সহোদরা ভগ্নীর সহিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সুতরাং এক জাতিতে যাহা মনে করে ঘোর দুষ্কর্ম্ম; অপর জাতির পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মে কুলনারীগণ পরপুরুষের মুখাবলোকন করিলে বা তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিলেও কলুষিতা হইবে, যথা;

নান্যং বক্ত্রং নিরীক্ষেত নান্যং সম্ভাষণঞ্চরেৎ।
নচাঙ্গং দর্শয়েদ্ধন্যান্য ভর্ত্তুরাজ্ঞানুসারিণী॥"

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

পতিব্রতা নারী অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করিবে না, বা পর পুরুষের সহিত আলাপ করিবে না। কিন্তু কোন জাতিতে পর-পুরুষের সহিত একত্রে পান ভোজন নৃত্য ক্রীড়া, উদ্যান-বিহার প্রভৃতি কিছুই পাপাহ নহে, বরং সভ্যতা।

হিন্দুর বিধর্ম্মিগণ কখনই পত্যন্তর গ্রহণ করিবে না। জীবনের অবশিষ্টকাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারিণী হইয়া থাকিবে। যথা

"ব্রহ্মচর্য্য তদাধারোহণঞ্চ"

বিধবা নারী পতির অনুমৃতা হইবে বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। কিন্তু অন্যান্য অনেক ধর্ম্মেই বিধবাগণ আমরণ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পত্যন্তর গ্রহণ করিয়াও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন না।

পর পুরুষের সহিত স্ত্রীজাতির সম্মিলন প্রায় সমস্ত দেশে সমস্ত জাতিতেই পাপাবহ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু মালবদেশের অকৃত বৈবাহিক প্রথানুসারে নায়ের (ক্ষত্রিয় বা রাজা) জাতিসধ্যে তাহার বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়। মালবের নায়ের জাতীয়া কন্যাগণের পরিণয়-কার্য্য যে পুরুষের সহিত সংপন্ন হয়, তাহার সহিত বিবাহান্তে আর কোনই সম্বন্ধ থাকে না। তৎপর সমবংশীয় কোন যুবকের সহিত তাহার প্রণয় সম্মিলন হয়, এবং তদীয় ঔরসজাত সন্তানগণ মাতামহের ধনাধিকার করে। মালবের নায়ের (রাজা) জাতীয় পুত্রগণ পিতৃধনাধিকারী হয় না, এবং পিতাকেও সন্তানদিগের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হয় না। এইরূপ প্রথাই মালবের চিরপ্রচলিত ধর্ম্ম। সুতরাং "বৈবাহিক প্রথা সম্বন্ধে এক দেশে এক জাতিতে যাহা অধর্ম্ম, তাহাই আবার ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতিতে ধর্ম্ম বলিয়া

পরিগণিত। হিন্দুজাতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ নির্ব্বিশেষে পরস্পর হীনবর্ণের অন্নাদি ভোজন নিতান্ত পাপাবহ বলিয়া বোধ করেন এবং হিন্দুমাত্রেই যবনাদির স্পৃষ্টান্ন প্লাপজনক বলিয়া ভোজন করে না; কিন্তু আবার কতকগুলি জাতি এবং সম্প্রদায় আছে, যাহারা হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি কোন জাতির স্পৃষ্টান্ন ভোজন দুষনীয় বলিয়া বোধ করে না, বরং জাতিভেদ স্বীকার করাই তাহাদিগের পাপজনক।

এইরূপে এক এক দেশে এক এক জাতির পক্ষে যাহা পাপ, আবার ভিন্নদেশে যা ভিন্ন সম্প্রদায়ে বা ভিন্ন জাতির পক্ষে তাহাই পুণ্য বলিয়া গণ্য হিন্দুরসহিত মুসলমানের ধর্ম্ম ভাব ঠিক বিপরীত। হিন্দুর পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মজনক, প্রায় সে সমস্তই মুসলমানের পক্ষে অকর্ত্তব্য বা পাপাবহ। এতদ্দ্বারা দৈখিতে পাওয়া যায় যে, পুণ্য পাপের কোন নির্দ্দিষ্ট অবয়ব বা স্বরূপ নাই। সুতরাং নাস্তিকগণ যে পুণ্য পাপকে দেশ, কাল, জাতির অবস্থা ও সুবিধানুসারে-সমাজ গঠিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই সাধারণ দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিদ্বারা ইহার অভ্যন্তর ভেদ করিলে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

আবার নিরীশ্বরবাদী মধ্যে আর একটি সম্প্রদায় আছে, যাহারা পুণ্য পাপ কিছুই স্বীকার করে না। তাহাদিগের মতে পাপ কেবল স্বার্থান্ধ ব্যক্তির শাসন বাক্য মাত্র; এবং পাপের প্রতিফল কেবল দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার মাত্র। তাহারা বলে এই দৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক পদার্থেই মনুষ্য সাধারণের তুল্যাধিকার, স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের স্বকল্পিত নিয়ম ভিন্ন তৎসম্বন্ধে কোন অপ্রতিহত নিয়ম নাই। কৌশলে বলবানের চক্ষে ধূলি দিয়া অথবা বলদর্পে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিরস্ত করিয়া যাহা আত্মসাৎ করিতে পারিবে, তাহাই তোমার নিজস্ব। দুই চারি টাকা বা দুই এক বিঘা ভূমির কথা দূরে থাকুক একটি বিশাল সাম্রাজ্য বল পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বিনিময়ে কাড়িয়া লইয়া; নিরীহ গৃহস্থগণের ধন, মান, প্রাণ, অপহরণ করিয়া একজন সম্রাট হইলেন। সেই অপহৃত ধনে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার হইল। তিনি দয়া করিয়া বা স্বীয় সুবিধার জন্য যাহাকে যাহা দান করিলেন, তাহাতে তাহার অধীন সত্ত্ব জন্মিল। কিন্তু একজন দীন হীন কাঙ্গাল উদরান্নের আশায় অধীর হইয়া যদি প্রাণ সঙ্কট সময়েও ঐ ধনের অতি ক্ষুদ্রাংশ গ্রহণ করে, তবে সে মহাপাপী, তাহার ইহ জগতে কারাবাস ও লোকান্তরে অনন্ত নরক। যখন প্রাকৃতিক নিয়মে কাহারও কোন অধিকারের সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই; পৃথিবীতে যখন সকলেরই তুল্যাধিকার, তখন বলাপহৃত ধন গোপনে তোমার ধনাগার হইতে আমার অধিকারে আনিলে কি জন্য আমি পাপী হইব? একজন জরাজীর্ণ ধনী বা কুলীন বৃদ্ধ পঞ্চাশটি রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন, সমাজে সে নির্দ্দোষী। কিন্তু একজন অবিবাহিত যুবক সকামা কোন রমণীতে উপগত হইলে সমাজে তাহার স্থান নাই, রাজদ্বারে কারাদণ্ড এবং পরলোকে যমদণ্ড। কি ঐরূপ সম্ভোগে প্রাকৃতিক নিয়মের কোনই অন্যথাচরণ ঘটে না; এবং সম্বন্ধে কেবল সমাজ কল্পিত স্বার্থপূর্ণ নিয়ম ভিন্ন সনাতন বিধিও কিছু নাই। দুর্ব্বলের পক্ষে যাহা পাপ, সবলের পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম। অন্যের বিবাহিতা পত্নীর প্রতি কুভাবে দৃক্‌পাত করাও পাপ, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজাগণ যে বলপূর্ব্বক বহু প্রাণী হত্যা করিয়া অন্যের পত্নী কাড়িয়া লইতেন, তাহা তাঁহাদের ধর্ম্ম। "ক্ষাত্রধর্ম্ম দ্বারা-লাভ বিক্রম প্রকাশি" অন্যের কথা দূরে থাকুক ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির। ভীষ্মদেবও কাশীরাজ-দুহিতাত্রয়কে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

যথা,—

তত্র ভীষ্ম মহাতেজা স্বাজহার বলেনবৈ।
নির্ঘাত্য রাজকং সর্ব্বং রথেনৈকেন বীর্য্যবান্।"

মহাবলশালী ভীষ্ম দেব সেই সভায় একাকী সমস্ত নৃপতিগণকে পরাজয় করিয়া (কাশীরাজ) কন্যাগণকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন। সুতরাং পাপ কেবল কল্পনার বিভীষিকা বৈ আর কিছুই নহে।

ভারতে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, সেই সময় চার্ব্বাকাদি নাস্তিক সম্প্রদায় স্বীয়মত পরিপোষণ জন্য বৃহস্পতি মতে প্রচারপরায়ণ হইয়া, এইরূপে পাপ নাই, পুণ্য নাই, পরলোক নাই প্রভৃতি আপাতমধুর বাক্যে মুগ্ধদর্শী ব্যক্তিগণকে স্বমতে আনয়ন করিত। প্রকৃত পক্ষে জগতে পাপ পুণ্য দণ্ড পুরস্কার না থাকিলে মনুষ্য যে শ্মশানে পরিণত হইয়া পিশাচের লীলাক্ষেত্র হইত, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিশেষতঃ জগতে পাপ পুণ্য না থাকিলে পশু সহিত মনুষ্যের প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য রক্ষিত না। পাপ পুণ্য লইয়াই পশু অপেক্ষা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেই পুণ্যই মনুষ্য সমাজে মনুষ্যকে ক্রমোচ্চ স্থানে স্থাপিত করে।

যাহাদিগের আহার বিহার বাসস্থান প্রভৃতির কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহারাই পশু। পশুগণ সামান্য এক মুষ্টি অন্নের জন্য পরস্পর আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া দারুণ ক্লেশ সহ্য করে, অথচ অনেক সময় পরস্পর সংঘর্ষণে আহারীয় দ্রব্যাদি ধূলিসাৎ হইয়া যায়। আবার অনেক পশু একটি স্ত্রীতে কামাসক্ত হইয়া ঘোর যুদ্ধে রত হইয়া এবং বলবান প্রতিদ্বন্দ্বীর আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। পশুগণ মধ্যে কোনরূপ নিয়ম না থাকাই তাহাদিগের এরূপ দুর্দ্দশার কারণ। পক্ষী জাতি পশু অপেক্ষা উন্নত জীব, কারণ তাহাদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ের সুনিয়ম আছে। তাহারা পশুর ন্যায় স্বেচ্ছাচারী নহে। মনুষ্য জাতি সমস্ত ইতর প্রাণী অপেক্ষা উন্নত, কারণ তাহাদিগের প্রত্যেক কার্য্যই নিয়মের অধীন। সেই নিয়ম লঙ্ঘনই পাপ এবং তাহা রক্ষা করাই পুণ্য। সেই নিয়ম যে যত দূর রক্ষা করিতে পারে, সমাজে সাধু বলিয়া তাহার তত গৌরব। আবার যথেচ্ছাচরণ দ্বারা মনুষ্য পশুপদবাচ্য হইয়া থাকে। সুতরাং মনুষ্য নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিলে অবশ্যই তাহাকে পাপ পুণ্য স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

বসন্তের স্মৃতি।

বহুকাল পরে কেন পুন এ বসন্ত বায়
সেই মত ধীরে ধীরে আসিয়া লাগিল গায় ?
বহুকাল পরে যেন বিস্মৃত স্বপন মোর
ধীরে ধীরে ঊষা মারে ছড়ায়ে ঘুমের ঘোর ;
বহুকাল পরে যেন উন্মাদ জাগিল প্রাণে
বহুকাল পরে কেন সে আবার পড়ে মনে ?
দারুণ নিদাঘে যবে তাপিত ঝরিত প্রাণ,
"দে জল" "দে জল" বলি চাতক গাহিত গান,
নিবিড় বটের শাখে ঝঙ্কারিত পিকবর,
দারুণ রবির করে শুকাইত সরোবর,
তখন (ও) ত তার স্মৃতি জাগিত হৃদয়ে মম ;
কিন্তু এ বসন্ত স্মৃতি নহেত তাহার সম।
নিদাঘে মূরতি তা'র যখন(ই) পড়েছে মনে,
শশাঙ্কের শীতলতা হেরিতাম সে আননে।
প্রাবৃটে, আকাশে, যবে হত নব ঘনোদ্গম,
দিবানিশি ধারা-পাতে পৃথিবী সলিলময়,
ফুটিয়া কদম্ব যবে নাচিত সমীর সনে,
বিজলী জলদ বুকে হাসিত রে ক্ষণে ক্ষণে,
জলদ গর্জ্জিত যবে হুঙ্কারে অবিরল
নীরব হইত ভয়ে তরুশাখে পিকদল,
তখন নূতন রূপে জাগিত যে স্মৃতি তার
নব রবি সম রূপ ভাবিতাম বার বার।
শরতে আবার যবে আকাশে হাসিত চাঁদ,
হরিত বেশেতে ধরা ধরিত নূতন ছাঁদ,
ক্ষুব্ধ নদী সরোবর পরিপূর্ণ একাকার
ছুটিত সাগরে নদী ঢালিতে হৃদয় তা'র ;
ফুটিত আঁধার রাতে আকাশে অযুত তারা
তখন(ও) কি স্মৃতি তার করিত না আত্মহারা ?
তখন(ও) ত তারে আমি স্মরিতাম অবিরত ;
এ যেন নূতন স্মৃতি, কে জানে কিসের মত !
হেমন্তে প্রভাতী বায়ু যখন লাগিত গায়,
শিহরিত তনু মোর, কেন যে জানিনা হায়!
হেরিতাম নিশীথেযে কাঁদিতে পাগল দল
বিষাদের অশ্রু রাশী ঢালে তারা অবিরল ;
আকাশেতে ম্লান মুখে বিষাদে হাসিত চাঁদ,
প্রাণের কি যেন তার অপূর্ণ রয়েছে সাধ !
তখন তাহার স্মৃতি ব'লে যেন দিত মোরে
এরূপ বিষাদ, হায় ! থাকিবে না চিরতরে!
এইত শীতে সে দিন শীত কাঁপাইয়ে ত্রিভুবন,
গেল চলি, বসন্তেরে করি ধরা সমর্পণ ;
তরুণ তেয়াগিল শুষ্ক পর্ণ-আভরণ,
শুকাইল সরোবরে সাধের কমল-বন,
আর যত ফুল দল ঝরিল শীতের ভয়ে,
কেবল রহিল গাঁদা আঁধারে আলোক হয়ে ;
তখন(ও) ত তা'র স্মৃতি জেগেছিল হৃদে মোর ;
সে স্মৃতি কি এই স্মৃতি ? এযে সন্ধ্যা সে যে ভোর
আবার হাসিল ধরা বসন্তের সমাগমে
আবার শোভিল বন অযুত কুসুমছায়ে,
নাচিল নবীন লতা নব কিশলয়পরি
ছুটিল মলয় পুন সৌরভ করিয়া চুরি,
কোকিল পঞ্চমে ওই ডাকিল রসাল শাখে,
ভ্রমর গুঞ্জরি পুন পুষ্প রেণু গায়ে মাখে,
সকলিত সেইরূপ ফিরে এল পুনরায়,
বসন্তের স্মৃতি কেন তাহারে না আনে হায়?
বসন্তের স্মৃতি যেন বলে দেয় কাণে কাণে—
কি এক অভাব তব লুকায়ে রয়েছে প্রাণে ;
কোকিলের কুহুস্বরে সে অভাব বেড়ে যায়,
মলয়-পরশে দেহ, প্রাণ করে হায় হায় ;
প্রাণ যেন চাহে সদা প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন,
কার সনে ? খুঁজে তাও দেখিতে না পায় মন।

শ্রীযোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়।

বিরহোচ্ছ্বাস।

শুন সজনি ! দারুণ বিরহ-বিকার ;
জীবন মরণ মঝু, ছুঁহু ভেল সঙ্কট,
কিয়ে করব পরকার।
নিশি দিন যো পিয়া, হিয়াপর রাখত,
পলক না অন্তর কেল ;
কোমল হৃদয়, কপাট উদ্ঘাটই,
প্রেম রতন মোহে দেল।
সোই বঁধুয়া অব, মধুপ-চরিত ভেল ;
না বুঝনু কিয়ে দোখ লাগি ;
ইহ ভব সোঁপরি, অন্তর ঝুরত
তবহুঁ মরণ মানি ভাগি।
পুনঃ যব ভাবই মরব বিয়োগিনী,
মরণ সহজ সেহ জানি,
আন জনম যদি, পুনঃ নাহি পাওয়ই—
তবকি করব অগেয়ানী ?
অছুক প্রাণ, নাম সুখ হোয়ত,
কিয়ে কাজ শ্যামরি সঙ্গ ;
মরণক সঙ্গহি, সবহুঁ জুরাওব
চরণ ধ্যান সুখ ভঙ্গ ;
ইহ বিরহানলে, তনু যদি তেজব,
রোয়বে 'শ্যাম' হামারি ;
ইথি লাগি মরণ শরণ নাহি রাগই,
অভয়া কান্থ বনিহারী।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ফুলকুমারী।

ফুলকুমারী রামমণির মেয়ে, গর্ভজাতা কি পালিতা—তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না। রামমণির এক সময়ে অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। তাহার পর তাহার ন্যায় হতভাগিনীগণের শেষদশায় যেরূপ হইয়া থাকে—রামমণি এখন দাসীবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাও গৃহস্থের বাড়ী নয়, এক বেশ্যালয়ে। রামমণি পূর্ব্বে ছিল বেশ্যা, এখন হইয়াছে বেশ্যার দাসী। উন্নতি না অবনতি ?

ফুলবাগানে একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া রামমণি ফুলকুমারীকে লইয়া বাস করে। ফুলকুমারী নিকটস্থ এক মিশনারী বালিকা-বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিত ; বারো বৎসর বয়সের সময় ফুলকুমারী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তাহার পর ফুলকুমারী আর সে বিদ্যালয়ে যাইত না। রামমণি যে বেশ্যার নিকট চাকরী করিত, সে বেশ্যা বিডন ষ্ট্রীটের কোন প্রসিদ্ধ থিয়েটারের একজন অভিনেত্রী। রামমণি তখন এই অভিনেত্রীর সঙ্গে ফুলকুমারীকে সেই থিয়েটারে অভিনয়-কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিল।

ফুলকুমারী বড় বুদ্ধিমতী, সাধারণ অভিনেতীগণের অপেক্ষা লেখা পড়াও ভালরূপ শিক্ষা করিয়াছিল, তাহার উপর ফুলকুমারীর কণ্ঠস্বর বড় সুন্দর, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই

ফুলকুমারী অভিনয়কার্য্যে বিশেষ দক্ষতালাভ করিল। থিয়েটারের অধ্যক্ষ ফুলকুমারীর পোনের টাকা মাসিক বেতন ধার্য্য করিয়া দিল। রামমণির আর আহ্লাদের সীমা নাই,সে তখন তাহার চাকরী ছাড়িয়া দিল,আর ফুলকুমারী সেই ফুলবাগানের খোলার ঘর ত্যাগ করিয়া, বিডন উদ্যানের সম্মুখে এক দ্বিতল গৃহে আসিয়াবাস করিতে লাগিল।

(২)

বিডন ষ্ট্রীটের থিয়েটারগৃহ আজ লোকে লোকারণ্য। বৈকাল হইতেই টিকিটঘরে ভয়ানক জনতা, টিকিট ক্রয় করাই দুঃসাধ্য। আজ এই থিয়েটারে একখানি নূতন গীতিনাট্য "মদনভস্মের" প্রথম অভিনয়। নায়িকা—রতি সেই ফুলকুমারী। ফুলকুমারীর নামের জন্যই হউক,কিম্বা নূতন গীতিনাট্যের অভিনয় জন্যই হউক, আজ থিয়েটারে এই অসাধারণ লোকারণ্য। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আটআনার সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, সাতটার সময় এক টাকার টিকিট আর নাই; আট্টার সময় দুই টাকার টিকিট আর পাওয়া গেল না; নয়টার সময় কোন টিকিটই আর নাই।

যাহারা টিকিট পাইয়াছিল, তাহারা আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান মনে করিল। থিয়েটার গৃহের দরজা খোলা হইবামাত্র সেই ভয়ানক জনস্রোত এরূপ বেগে দুয়ারের দিকে দৌড়িল যে, অনেকগুলি ক্ষীণজীবির জীবনসঙ্কট হইয়া দাঁড়াইল। যাহারা টিকিট পাইল না, তাহাদের মধ্যে অনেকেই গৃহে ফিরিয়া গেল না। দুই এক পয়সা খরচ করিয়া তৈয়ারী তামাক, ছাঁচি পান, লেমনেড, সোডা, কুলী বরফ আর বেলফুলের সম্মান রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল; থিয়েটারের সম্মুখভূমি এখন যেন রণতলা কি চড়কহাট। বলিয়া মনে হয়। সুতরাং থিয়েটারের দরজা খোলা হইলেও রাস্তার জনতার কোন হ্রাস হয় নাই।

নয়টা বাজিতে আর প্রায় দশমিনিট বিলম্ব আছে,এমন সময় ফিটন,ব্রহাম্,বেরুস্,ল্যাণ্ডো ও যারব্যাং প্রভৃতি নানারকমের গাড়ি সকল একে একে আসিতে আরম্ভ করিল। থিয়েটার গৃহের সম্মুখে আর লোকের জনতা নাই। তাহারা অন্য দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। থিয়েটারের অধ্যক্ষ গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের নানা রকমের পোষাক; পৃথিবীর এমন সুসভ্য জাতি নাই, যাহাদের জাতীয় পোষাক এই বাবুরদলে দেখিতে পাইবেনা। রাস্তার লোকেরা হাঁ করিয়া এই সকল অসাধারণ বাবু দেখিতেছিল, আর পুলীশ ও থিয়েটারের দ্বারক্ষকের নিকট ধাক্কা খাইতেছিল। বাবুরা গটমট করিয়া একবারে সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। ঠিক নয়টার সময় বিজয়পুরের মহারাজা আসিলেন; তিনি আসিয়াছিলেন চৌদ্ডীতে। তখন একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল; থিয়েটরের কর্ত্তৃপক্ষগণ মহা শশব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল।

বিজয়পুরের মহারাজও তাঁহার রাজকীয় নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন। আর এদিকে দর্শকমণ্ডলী ভয়ানক করতালিধ্বনি দিয়া উঠিল। নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, ওভার অভিনয় আরম্ভ হয় নাই, সেই কারণ দর্শকমণ্ডলী অধৈর্য্য-সূচক করতালিধ্বনি করিল. কিন্তু মহারাজা মনে করিলেন যে, এই ক্রতালিধ্বনি করিয়া সাধারণে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। এই সময় ঢং ঢং করিয়া নেপথ্যে তৃতীয় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা উঠিয়া গেল আর তৎক্ষণাৎ একতান বাদন আরম্ভ হইল।

থিয়েটারগৃহে যে কলরব হইতেছিল, সেই সঙ্গে তাহাও থামিয়া গেল!

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়া দর্শকগণ সন্তোষ পাইল না, কিন্তু অবশেষে শেষ দৃশ্যে যখন মদন ও রতির প্রবেশ হইল, তখন সেই রতি দেখিয়াই সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। রতি ফুলকুমারী ফুলধনুকরে ফুলসাজে সজ্জিতা, সুতরাং দর্শকবৃন্দের মুণ্ডপাত! মদনকে বড় কিছু করিতে হইল না, রতি একাই মদনের কার্য্য করিল। তাহার পর রতির সঙ্গীতের কথা আর কি বলিব? যেন কোথা হইতে এক ঐন্দ্রজালিক স্বরলহরী আসিয়া দর্শকবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধীভূতের ন্যায় স্তম্ভিত করিয়া রাখিল! সে সঙ্গীত হইতেছিল দেব-সভায়, দৃশ্যপটে যেটুকু দেব সভার দেবত্বের অভাব ছিল, রতির সঙ্গীতে তাহা পুরণ হইয়া গেল।

প্রথম অঙ্কের অভিনয়ের পর পান তামাকের দোকানে কেবল রতি ফুলকুমারীর কথাই আন্দোলন হইতে লাগিল। ফুলকুমারীর বাড়ীর ঠিকানার জন্য এখন বাবুরা অস্থির। এক-জন পান তামাক বিক্রেতা বলিল—"ফুলকুমারী আমাদের ফুলবাগানের রামমণির মেয়ে।"

একজন উদীয়মান নবীন কবি তৎক্ষণাৎ কবিতা রচনা করিল—

"ফুল বাগানের ফুলকুমারী ফুলধনু করে।
হানিয়াছে তীক্ষ্ণশর আমার হৃদয় উপরে॥"

শেষ অঙ্কে মদনভস্মের পর যখন রতির বিলাপসঙ্গীত আরম্ভ হইল, তখন দর্শকগণ একবারে মোহিত হইলেন। সে দিন বাড়ী ফিরিয়া অবশিষ্ট রাত্রি অনেকের নিদ্রা হইল না; যাহাদের নিদ্রা হইল, তাহারা স্বপ্নে সেই ফুলকুমারীকেই দেখিল।

(৩)

পর দিন বেলা নয়টার সময় ফুলকুমারীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহার পূর্ব্বেই ফুলকুমারীর নাম কিন্তু কলিকাতার সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। আজিকার ইংরাজী বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদ পত্রে ফুলকুমারীর সুখ্যাতি ধরে না। বড়লোকের বৈঠকখানায়, ছাত্রদিগের বাসাবাড়ীতে, ট্রামকোম্পানির ট্রামওয়েগাড়ীতে প্রাতঃকাল হইতে কেবল ফুলকুমারীর কথা আন্দোলন চলিতে লাগিল। তাহার রূপের সমালোচনা, তাহার বয়সের সমালোচনা, তাহার সঙ্গীতের সমালোচনা, তাহার হাব-ভাবের সমালোচনা ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ দিকে ফুলকুমারীর গৃহে কিন্তু অন্য নাই, নিদ্রা ভাঙ্গিবার পর সে যে কি খাইবে সে দিন তাহার সংস্থানও ছিল না। তাহার উপর আবার পাওনাদারের তাগাদা। প্রথমে আসিল—বাড়ীওয়ালার সরকার, তিন মাসের ভাড়া পাওনা; আজ তাহা শোধ করিবার কথা। রামমণি তাহাকে মিনতি করিয়া বলিল—"আজও মাইনে পায়নি বাবা, এইবার মাইলে পেলেই আগে তোমার ভাড়া দেবো।"

সরকার রাগিয়া বলিল—"কেন, নূতন বই থিয়েটারে খুল্‌লেই ভাড়া দেবার কথা; কালত সেই নূতন বই খোলা হয়েছে। আমাদের বাবু বল্‌ছিলেন—তোমার মেয়ের সুখ্যাতি খবরের কাগজে ধরে না; তবে আজ ভাড়া দেবে না কেন?"

মেয়ের সুখ্যাতির কথা শুনিয়া রামমণির আহ্লাদের সীমা নাই; তখন সরকারকে ঘরের মধ্যে আদর করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমার মেয়ের কথা খবরের কাগজে কি লিখিছে সরকার মশাই?"

সরকার মহাশয় যাহা যাহা শুনিয়াছিল, সমস্তই বলিল। তখন রামমণি দৌড়িয়া গিয়া ফুলকুমারীকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত শুনাইল।

ফুলকুমারী কেবল ফাঁক্‌ওষ্ঠে চারিদিকে বৈদ্যুতিক হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল। সরকার মহাশয় সেই হাসি-টুকুর মোহিনীশক্তিতে বশীভূত হইয়া আর ভাড়ার কথা উত্থাপন করিতে পারিল না।

তাহার পর তাগাদা করিতে আসিল, সেই পাড়ার মুদী। রামমণি সংবাদপত্রে ফুলকুমারীর সুখ্যাতির কথা বলিয়া তাহাকে মোহিত করিতে গেল; কিন্তু মূর্খ মুদী সংবাদ পত্রের মহিমা বুঝিল না; সে কেবল টাকার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। তখন রামমণি তাহাকে মনে মনে গালি দিল; কিন্তু প্রকাশ্যে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া আর দুই এক দিন অপেক্ষা করিতে বলিল। মুদী তখন অতি মধুরভাষায় ফুলকুমারীর গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে চলিয়া গেল। তারপর তাগাদায় জি, সি, সাহার লোক আসিল; ফুলকুমারী এখন থিয়েটারের অভিনেত্রী, সুতরাং মদের দেনা না করিলে তাহার চলিবে কেন! শুঁড়ীর তাগাদা বড়ই কড়া, তত্রাচ সে কেবল একটা মিটেকড়া ঝগড়া করিয়া চলিয়া গেল!

এদিকে বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল, ফুলকুমারীর তখনও হাঁড়ী চড়িল না। কোথা হইতে দুটী পান্তা ভাত আনিয়া রামমণি ফুলকুমারীকে খাওয়াইল; আর এক পয়সার মুড়ী আনিয়া আপনি খাইল, একটী পালিত বিড়ালকে তাহারও এক মুঠা দিল। এই সময় ফুলকুমারীর অনুগ্রহপ্রার্থী একজন থিয়েটারের ছোঁড়া থাকগুলি ইংরাজী বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র আনিয়া গতরাত্রের অভিনয়ের সমালোচনা ফুলকুমারীকে পড়িয়া শুনাইল; তাহার ইংরাজী সমালোচনার বাঙ্গালা অর্থ করিয়া দিল। ফুলকুমারী সে সমালোচনা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। একখানা বাঙ্গালা সংবাদ পত্র নিজে রাখিয়া, সমস্ত সংবাদপত্র পুনরায় থিয়েটারে ফেরৎ পাঠাইয়া দিল। সেই সংবাদ পত্র খানা লইয়া ফুলকুমারী পুনঃ মনোনিবেশ করিয়াছে, এমন সময় একখানি জুড়ী ফুলকুমারীর বাড়ীর দরজায় আসিয়া লাগিল। চারি জন সম্ভ্রান্ত বাবু সেই গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীতে আরো অন্যান্য অনেক স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে বারাণ্ডায় আসিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা কাকে খুঁজচেন?"

বাবুদিগের মধ্যে একজন বলিল—"ফুলকুমারী এ বাড়ীতে থাকে?"

সেই স্ত্রীলোকদিগের মুখ তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া গেল, তাহারা আর সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। সে কথাটা কিন্তু রামমণির কাণে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, রামমণি তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল—"ফুলকুমারী এই বাড়ীতেই থাকে; আপনারা উপরে উঠে আসুন।"

বাবুর দল তখন হাসির ধ্বনিতে সে বাড়ী কম্পিত করিতে করিতে উপরে ফুলকুমারীর ঘরে আসিয়া বসিল। ফুলকুমারীকে দেখিয়া তাহারা যেন স্বর্গ হাতে পাইল!

এক ঘণ্টা পরে দুইটি স্কুলের বালক পুস্তক হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারাও ফুলকুমারীর জন্য উমেদার! স্কুলে আজ আর অধ্যাপনা হয় নাই; কলিকাতার সমস্ত ফুলবাগান অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছে, শেষে বিডন-বাগানে আসিয়া ফুলকুমারীর অনুসন্ধান পাইয়াছে। সেই অল্পবয়স্ক বালকগণকে দেখিয়া বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ হাসিয়া লুটিয়া পড়িল, কিন্তু রামমণি তাড়াতাড়ি আসিয়া বালকদ্বয়ের কাণে কাণে কি বলিল, তাহার পর তাহার নিজের ঘরে তাহাদিগকে বসাইয়া

এক ঘণ্টা পরে একজন ধনী মাড়োয়াড়ী আসিয়া উপস্থিত। রামমণির আজ আর আনন্দের সীমা নাই; বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের যেরূপ গাত্রদাহের বৃদ্ধি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রামমণিরও সেইরূপ আনন্দের বৃদ্ধি। সে আনন্দে অধীর হইয়া দুই তিনটা আছাড় খাইয়া ফেলিল। সেই মাড়োয়াড়ীকে আদর করিয়া ছাতে লইয়া গিয়া রামমণি বসাইল।

বাবুরা বিদায় হইবার পর রামমণি সেই ধনী মাড়োয়াড়ীকে প্রথমে ফুলকুমারীর ঘরে আসিতে দিল। আর সেই স্কুলের বালকদ্বয় যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই রহিল; তাহারা রামমণির ছেড়ামাদুরে বসিয়া তাহার ঘোলো ছঁকায় তামাক খাইয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিল! তবে ফুলকুমারী একবার সেই ঘরে গিয়া হাসিতে হাসিতে হেলিয়া দুলিয়া তাহাদের দুইজনকে দুইটি পান দিয়া আসিয়াছিল!

একজন খেমটাওয়ালা ওস্তাদজী এই সময় আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়াই রামমণিকে বলিল—"ফুলকুমারীকে আজ মহারাজের বাগানে যেতে হবে।"

রামমণি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রামমণি কি আজ স্বপ্ন দেখিতেছে না কি? কিন্তু স্বপ্নেও সে কখন যাহা ভাবে নাই, আজ তাহার ঘরেই তাহাই ঘটিয়াছে। রামমণি কি উত্তর দিবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অনেকক্ষণের পর বলিল—"কত টাকা দেবে?"

ওস্তাদজী বলিল—"টাকার জন্য ভাবনা কি? যা চাইবে, তাই পাবে।"

রামমণি দুই হাতে একবার চক্ষুদ্বয় রগড়াইয়া লইল; তাহার পর বলিল—"সে কথা কাজের নয়, টাকার বিষয় আগে স্থির হওয়াই ভাল।"

ওস্তাদজী দেখিল যে অধিক টাকার লোভ না দেখাইলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না; সেই কারণ দশটাকা মাত্র হাতে রাখিয়া একবারেই বলিল—"আচ্ছা, চাল্লিশ টাকা পাবে।"

রামমণি চাল্লিশ টাকা কাহাকে বলে জানে না। সে একটু শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"তাতে কি হয়? এক বাবু—সাড়ে সাতগণ্ডা টাকা মাসে মাইনে দিতে চেয়েছিল, তাতেই যার আমি রাজী হইনি।"

ওস্তাদজী তখন রামমণির গণিতশাস্ত্রের বুৎপত্তি দেখিয়া অবাক্! এমন সময় স্বয়ং ফুলকুমারী আসিয়া আসরে নামিল। ফুলকুমারী গৃহের মধ্যে থাকিয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল; তাহার জননীর শেষ কথায় আর গৃহের মধ্যে থাকিতে পারিল না; তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ওস্তাদজীকে বলিল—"তুমি মায়ের সঙ্গে ফুরণ করছ কি? মহারাজের যে অনুগ্রহ হয়েছে, সেই যথেষ্ট; টাকার ফুরণ তোমায় করতে হবে না। তবে আমি এখন যেতে পারবো না; থিয়েটারে ফেরৎ যেতে পারি।"

ওস্তাদজী তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল। ফুলকুমারী একে একে সকলকে বিদায় করিয়া দিয়া সন্ধ্যার সময় থিয়েটারে চলিয়া গেল।

(৪)

ফুলকুমারীর অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার ঐশ্বর্য্যের আর সীমা নাই; কলিকাতার অনেক বড়লোক এখন ফুলকুমারীর গোলাম। রামমণিও এখন আর সে রামমণি নাই; সে রামমণি এক দিন কুড়ির অধিক গণিতে জানিত না; সে রাম-

মণি এখন হাজার ধার্য্যন্ত গণিতে পারে। তবে রামমণির এক দোষ, রামমণি কেবল টাকা সঞ্চয় করিতে জানে, খরচ করিতে জানে না!

ফুলকুমারী এখনও নিয়মিতরূপে থিয়েটারে যায়। থিয়েটারই তাহার লক্ষ্মী, সে কি থিয়েটার ত্যাগ করিতে পারে? আর থিয়েটারেও তাহার সম্মান ও প্রতিপত্তির সীমা ছিল না; ফুলকুমারীর সন্তোষের জন্য থিয়েটারের অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। ফুলকুমারী এক দিন থিয়েটারে না গেলে থিয়েটার চলা ভার। অন্যান্য অভিনেত্রীগণ সকলেই মনে মনে ফুলকুমারীর হিংসা করিত, কিন্তু প্রকাশ্যে কাহারও কোন কথা বলিতে সাহস হইত না।

ফুলকুমারীর গুণও অনেক ছিল, সে যে-রূপ আশাতীত অর্থ উপার্জ্জন করিত, সেইরূপ তাহার সদ্ব্যবহার করিতেও জানিত। দরিদ্রকে অর্থ সাহায্য করিত, তাহার সমশ্রেণীর কোন পীড়িতা হতভাগিনীর শুশ্রূষা করিবার কেহ না থাকিলে ফুলকুমারী নিজে সুহস্তে তাহার শুশ্রূষার ভার লইত। যদিও অনেক দান ফুলকুমারী গোপনে করিত বটে, কিন্তু সে সকল কথা গোপন থাকিত না; সেই কারণ অনেক সাধারণ হিতকরকার্য্যের চাঁদার খাতা ফুলকুমারীর নিকট গিয়া পৌঁছিত। আর দরিদ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিও ফুলকুমারীর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল, এমন বাঙ্গালা পুস্তক ছিল না, যে পুস্তক ফুলকুমারী ক্রয় করে নাই। এমন সংবাদ বা সাময়িকপত্র নাই, ফুলকুমারী যাহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নয়। এই সকল কারণে রামমণি কন্যার উপর সর্ব্বদাই বড় বিরক্ত হইত, কিন্তু ফুলকুমারী তাহা গ্রাহ্য করিত না।

(৫)

ফুলকুমারীকে থিয়েটারে সকল নাটকেরই নায়িকার অংশ অভিনয় করিতে হইত। সে কখন নিস্বার্থ প্রণয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইত,—কখন প্রণয়ে আত্মহারা হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিত, কখন সীতারূপে পতিভক্তির চরম উৎকর্ষ দেখাইত, কখন সাবিত্রীরূপে অবতীর্ণা হইয়া সতীত্বের মহিমায় দর্শকমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিত। এই সকল বিভিন্ন ক্রমাগত অভিনয় করিয়া ফুলকুমারীর হৃদয়ের সময়ে সময়ে একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার হইত। অনেক সময় ফুলকুমারী নিজে পাপময় জীবনের বিষয় ভাবিত; সে কথা মনে হইলে ফুলকুমারীর অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিত। ফুলকুমারী নিজের কার্য্যে নিজে সন্তুষ্ট হইত না? কেহ তাহার যথার্থ ঐশ্বর্য্যের উল্লেখ করিলে, ফুলকুমারী মুক্ত কণ্ঠে বলিত, তাহার ন্যায় অসুখী পৃথিবীতে আর কেহ নাই। বাস্তবিক কি জানি কেন—ফুলকুমারীর মনে একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে বেশ্যাশ্রেণীর মত হতভাগিনী আর জগতে নাই। ইহারা অতুল ধনের অধিকারিণী হইলেও পথের একজন ভিখারিণীর অপেক্ষাও অসুখী। নানারূপ শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারে অতিশীঘ্রই ইহাদের দেহ ও মন নষ্ট হইয়া যায়; পরের মনস্তুষ্টির জন্য ইহাদিগকে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়; প্রাণের ভিতর আগুণ জ্বলিতেছে কিন্তু মুখে হাসি দেখাইতে হয়; আর সকল কষ্টের উপর কষ্ট এই—মুক্তি মান-পাপকে লইয়া ইহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। যত দিন সময় থাকে, অনেক আত্মীয় বন্ধু দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অসময়ে—যে সময়েই আসুক না কেন, বিশেষ আবশ্যক সে সময় আর কোন আত্মীয় থাকে না। শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক বা সামাজিক—কোন সুখই যাহাদের নাই

তাহাদের মত হতভাগিনী আর কে আছে? কে বলে পাপের শাস্তির স্বতন্ত্র নরক আছে?

এই সকল কথা স্পষ্ট করিয়া ফুলকুমারী তাহার ঐশ্বর্য্যের প্রশংসাকারীর মুখের সম্মুখে বলিত। তাহার অনুগ্রহপ্রার্থী বড় লোক দিগকেও স্পষ্ট কথা বলিতে ফুলকুমারী এখন আর কুণ্ঠিত হইত না।

এক দিন ফুলকুমারী রাত্রী দুইটার সময় অভিনয় কার্য্য শেষ করিয়া গৃহে আসিয়া দেখিল, যে তাহারই বিশেষ পরিচিত এক মহারাজ তখন সেই গৃহে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। ফুলকুমারী মহারাজকে প্রথমে দুই এক কথায় আপ্যায়িত করিয়া পরে বলিল—"মহারাজ! মানুষের জীবনটা যে একখানা নাটক তা আমাদের মত হতভাগিনীদের জীবন সম্বন্ধেই বিশেষ খাটে। নাটক, বল্‌তে আমরা তো এই বুঝি, ঘণ্টাখানেক ঝড় হ'ক বিয়েটারে যেতেই হবে। আর শরীর অসুখ হ'ক, মনে স্ফূর্ত্তি থাক আর না থাক, অভিনয়ের রাত্রিতে অভিনয় কর্‌তেই হবে। মনে এক ভাব, আর মুখে তার ঠিক বিপরীত ভাব, এরই নামত অভিনয়? তাহলে বাস্তবিক চব্বিশ ঘণ্টাই অভিনয় করি। এই দেখুনা, থিয়েটারে অভিনয় শেষ করে এসে, এখন ঘরে বসে আপনাকে নিয়ে অভিনয় আরম্ভ করবো। থিয়েটারের মহারাজা সাজা মহারাজা, আর আপনি আসল মহারাজা হলে মহারাজার জন্য যখন এতদূর করে এসে, তখন ঘরে বসে আসল মহারাজা হয়ে কি ছেড়ে দিতে পারি? ঘুমে শরীর অবশ হয়ে পড়ছে তবুত আপনাকে নিয়ে এখন আমায় আমোদ করতে হবে। এও অভিনয় নয়ত কি মহারাজ? আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও অভিনয় করি।

মহারাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"তোমার এইরূপ স্পষ্ট কথায় আমাদের কিনে রেখে দিয়েছ। সেই জন্য তোমার কাছে যেমন আমোদ পাই এমন আমোদ আর কোথাও পাই না।"

ফুলকুমারী অমনি একটী গান ধরিল—

"মুখে হাসি থাকলে কি হয়
আমার প্রাণ যে কাঁদে দিবানিশি।"

(৬)

একদিন সাবিত্রীর অংশ অভিনয় করিতে করিতে ফুলকুমারীর জনৈক বন্ধু উদ্দীপিত হইল। সতীত্বের মহিমার অভিনয় দ্বারা দর্শকবৃন্দকে মোহিত করিতে গিয়া সাবিত্রী নিজেই সে অভিনয়ে মোহিত হইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই ফুলকুমারী এই পাপ পথ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। একটা মর্ম্মভেদী অনুতাপ আসিয়া ফুলকুমারীর হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই দিন থিয়েটার হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ফুলকুমারী তাহার দ্বার রক্ষককে হুকুম দিল যে যেন কাহাকেও তাহার বাড়ী প্রবেশ করিতে না দেয়। সেই দিন হইতে মহারাজা, রাজা, জমীদার, রায় বাহাদুর, উকিল, ডাক্তার, বণিক, সকলেই বিফলমনোরথ হইয়া একে একে ফিরিতে আরম্ভ করিল। তাঁহাদিগের মনঃকষ্টের আর সীমা ছিল না; সকলেই নিজের নিজের দুর্ভাগ্যের কথা মনে মনে অনুমান করিল, প্রকৃত কারণ কেহই অনুসন্ধান করিতে পারিল না। দিনকতক রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সকল দেশহিতকর আন্দোলন একবারে বন্ধ হইয়া গেল। সভাগৃহ, বাগান বাড়ী, বৈঠকখানা, আফিশ, আদালত—যেখানেই যাও, কেবল ঐ কথারই আন্দোলন শুনিতে পাইবে। থিয়েটার জগতে একটা প্রলয় হইয়া গিয়াছে—এইরূপ শতশত নানা প্রবন্ধ সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইতে

লাগিল। সাধারণের নিকট হইতে একটা "ডেপিউটেশন" একদিন ফুলকুমারীর দরজায় নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু সেও প্রবেশাধিকার পাইল না।

এ দিকে এই ঘটনায় রামমণির মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইয়া গিয়াছে। তাহার যেন হঠাৎ স্বর্গ হইতে একবারে নরকে পতন হইয়াছে; ফুলকুমারীর মৃত্যু হইলে রামমণির এত কষ্ট হইত না। রামমণি অনেক বুঝাইল, অনেক দৃষ্টান্ত দিল, অনেক শাস্ত্রের কথা পর্য্যন্ত তাহার স্বপক্ষে উদাহরণ দিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া দেখিল, বিষ খাইয়া মরিবার ভয়ও দেখাইল, কিন্তু তত্রাচ ফুলকুমারী অচল—অটল! শেষে সন্ন্যাসী, ফকির, মহন্তের শরণাগত হইল; ওঝা আনিয়া ঝাড়াইল, তত্রাচ যে ফুলকুমারী—সেই ফুলকুমারী! রামমণি তখন আপনার অদৃষ্টে করাঘাত করে, আর কাঁদে। রামমণি আর কি করিবে?

(৭)

ফুলকুমারী এখন নির্জ্জনে বসিয়া সর্ব্বদাই চিন্তা করে। এখন তাহার প্রধান চিন্তার বিষয় এই—তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না? যদি তাহাদের এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তবে ফুলকুমারী তাহার জন্যও প্রস্তুত। ফুলকুমারীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান কে দিবে? ফুলকুমারী তাহার জন্য স্বহস্তে ভাট-পাড়া, নবদ্বীপ, কাশী, দ্রাবিড় পর্য্যন্ত পত্র লিখিল, কিন্তু কেহই তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিল না; সকলেরই এই উত্তর —"এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

ফুলকুমারী ত আজন্ম পাপের ক্রোড়ে পালিতা, সুতরাং ফুলকুমারীর আর অপরাধ কি? ফুলকুমারী নিরাশায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। সে অজ্ঞাতে যাহা পাপ করিয়াছে তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই, এই কথা তাহার মনে উদয় হইত; তত্তে মর্ম্মান্তিক দুঃখে ফুলকুমারী মৃতপ্রায় হইয়া যাইত।

যখন কেহই তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিতে পারিল না, তখন ফুলকুমারী নিজে প্রায়শ্চিত্ত বিধান নিজেই করিল। সমস্ত অলঙ্কার, বস্ত্র, আসবাব প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া প্রথমে অর্থ সংগ্রহ করিল। তাহার পর সেই অর্থে গঙ্গাতীরে দুইটী মন্দির স্থাপন করিল, তাহার এই অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইল—সতীত্ব উজ্জ্বল প্রতিমা সেই সাবিত্রী, আর অপরটীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী পতিভক্তির মূর্ত্তিমতী ছবি সেই জনক-নন্দিনী সীতা।

এই দেবালয়ের সংলগ্ন একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিল। সে আশ্রমের নাম হইল—"হতভাগিনী আশ্রম" ফুলকুমারীর আপনার ন্যায় পতিতাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া এই আশ্রমে রাখিত এবং তাহাদের ভরণ পোষণের সমস্ত ব্যয় নিজে বহন করিত। এই সকল হতভাগিনীদিগের সহিত ফুলকুমারী তাহার অনুতাপিত অবশিষ্ট জীবন—ভারতের কোন জগতের—দুই আদর্শ সতীর সেবায় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

ফুলকুমারীর এখন কি আর সেরূপ ছিল? ফুলকুমারীর পরিধান গৈরিক বসন, মস্তক মুণ্ডিত, অঙ্গ অলঙ্কার-বিহীন, কিন্তু এখনও সে রূপের জ্যোতিঃ না থাকিলেও কোথা হইতে অন্য একটা কিসের জ্যোতিঃ তাহার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইত। সে জ্যোতিঃ যে দেখিত, সেই স্তম্ভিত হইয়া থাকিত।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বল্মীক পুত্তিকা।

মানবগণ যেমন সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, সেইরূপ কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যেও সমাজপ্রথা প্রচলিত দেখা গিয়াছে। মধুমক্ষিকা, বল্মীক পুত্তিকা ও পিপীলিকা প্রভৃতি এইরূপ সমাজ-ভুক্ত জীবের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মধুমক্ষিকার সমাজ-প্রথা ইহাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পুত্তিকারও আচরণ অল্প বিস্ময়জনক নহে। ইংরাজীতে পুত্তিকাকে (white ants) অর্থাৎ শ্বেত পিপীলিকা বলিয়া থাকে। এই নামের জন্য অনেকের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ ইহাদের পিপীলিকার সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তবে আচার ও ব্যবহারে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাদিগকে শ্বেত পিপীলিকা কহে। পিপীলিকার ও মধুমক্ষিকার মধ্যে মানবের শিক্ষার বিষয় যথেষ্ট বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং ইহাদের বিষয় সকলেই অল্পাধিক জ্ঞাত আছেন।

পুত্তিকার বৃত্তান্ত অতিশয় কৌতুকপ্রদ। ইহারা সাধারণতঃ— সকলের নয়ন-পথে পতিত হয় না। মধুমক্ষিকারা মানব-সমাজের কোন রূপ অনিষ্ট চেষ্টা করে না, বরং বহুকষ্টে একটী উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। পুত্তিকার আচরণ ভিন্ন প্রকার। ইহারা মানবসমাজের অনিষ্ট করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে এবং সময়ে সময়ে প্রভূত ক্ষতিও করিয়া থাকে।

পৃথিবীতে যেরূপ বহু প্রকার মানব সমাজ বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের সমাজও সেইরূপ বহুসংখ্যক। একটী মানব সমাজে বহুসংখ্যক মানব বাস করিয়া থাকে। ইহাদের সমাজেও সংখ্যাতীত পুত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রায় সকলেই পক্ষবিহীন। প্রতি সমাজে কেবল দুইটী পুত্তিকার পক্ষ হইয়া থাকে। ইহার একটী পুরুষ অপরটী স্ত্রীপুত্তিকা। ইহারা ইহাদের রাজা ও রাণী।

প্রত্যেক পুত্তিকা সমাজে পাঁচ প্রকারের কীট বর্ত্তমান থাকে। (১) রাণী বা স্ত্রী, (২) রাজা বা পুরুষ, (৩) শ্রমজীবি, (৪) পরী, (৫) যোদ্ধা বা ক্লীব।

রাজা ও রাণী বিশেষ সম্মানার্হ। সকলেই তাহাদিগের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। রাজা ও রাণীকে কোনরূপ কার্য্য করিতে হয় না। সন্তান উৎপাদনই তাহাদের একমাত্র কার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের বড় বড় চক্ষু আছে। সাধারণ প্রজারা সকলেই অন্ধ।

সমাজে শ্রমজীবির সংখ্যাই অধিক। ইহারা যোদ্ধাদিগের শতগুণ হইবে। পুত্তিকার অপেক্ষা ইহাদের অবয়ব অনেক ছোট। সর্ব্বাপেক্ষা রাজা ও রাণী আকৃতিতে বৃহৎ; শ্রমজীবিরা সমাজের সকল প্রকারের শিল্প কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারাই কেহ কেহ মিস্ত্রী —গৃহনির্ম্মাণ ও কীর্ত্ত সংস্কার ইহাদের কার্য্য। কেহ কেহ রাজার শরীর রক্ষকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। কতক গুলিকে প্রাচীর কার্য্য করিতে হয়। রাণী প্রসব হইলে, ইহারা ডিম গুলি লইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দেয়। ইহারা তাহার নিমিত্ত পূর্ব্বেই গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া রাখে। ইহারা এইসকল গৃহের শান্তি-রক্ষক; ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইলে,

ইহারা তাহাদের ধাত্রীর কার্য্য করিয়া থাকে। যত্ন পূর্ব্বক আহার প্রদান ও প্রতিপালন করিয়া ছানাগুলিকে বড় করিয়া তুলে।

বল্মীক-কীটের মাথাটী একটু বড় ও একটু লম্বা। ইহাদের অস্ত্রের ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র চোয়াল আছে। তাহা দ্বারা ইহারা শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। পরীগুলি দেখিতে শ্রমজীবির ন্যায়। ইহাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী পরী বর্ত্তমান আছে। কিন্তু ইহাদের ছোট ছোট ডানা আছে। সন্ধ্যাকালে ইহারা দলে দলে উড়িতে আরম্ভ করে। ইহাদিগকে দেখিতে পাইলে লোকে বৃষ্টি হইবে বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে। ইহারা গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমে আলোক নিবাইয়া দেয়। নিকটে জাহাজ থাকিলে কখন কখন অসংখ্য পুত্তিকা দলবদ্ধ হইয়া তাহার উপর গিয়া পড়ে; পরদিন সকালে ইহাদিগকে ভূমিতলে ও জলের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। এই সময় ইহাদের আর ডানা থাকে না। ইহাদিগের চারিদিকেই শত্রু। পতঙ্গ, খগ, পিপীলিকা, পক্ষী ও সর্প সকলেই ইহাদিগকে আহার করিতে ভাল বাসে। পক্ষ-বিহীন হওয়াতে ইহারা নিঃসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ইহারা সহজেই বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী ও বলবান হইয়া ভীরু কাপুরুষের মত ব্যবহার করিয়া থাকে। শত্রুরা ইহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহাতে কোনরূপ বাধা দেয় না। শত্রু নিতান্ত হীন-বল হইলেও আত্মরক্ষায় কোন চেষ্টা করিতে দেখা যায় না। এইরূপ শত কোটী বল্মীক পরী বাহির হইলে, এক যোড়াও বাঁচিয়া থাকে, কিনা সন্দেহ। যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারা তখন স্ত্রী পরীর পশ্চাৎ ধাবিত হয়। কখন কখন দুইটী পুরুষ কোন সুন্দরী স্ত্রী লাভের নিমিত্ত পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে। এই সময় ইহারা দ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। ইষ্ট ইণ্ডিসের অধিবাসীরা ইহাদিগকে নানারূপ কৌশলে ধরিয়া আহার করিয়া থাকে। বেশী খাইলে অত্যন্ত পেটের অসুখ হইয়া ২০ ঘণ্টার মধ্যে মানুষ মরিয়া যায়। অল্প পরিমাণে খাইলে ইহা সুখাদ্য ও পুষ্টিকর।

এই অদ্ভুত প্রাণীর আশ্চর্য্য নিয়মতন্ত্র প্রথানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রথমে ইহাদের কোন রাজা ও রাণী বর্ত্তমান থাকে না। অসংখ্য শ্রমজীবী একত্রে মিলিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। পথিমধ্যে কোন রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে দেখিতে পাইলে, সসম্ভ্রমে—তাহাদের রাজা ও রাণী হইতে প্রার্থনা করিয়া থাকে। রাজদম্পতি তাহাতে স্বীকৃত হইলে, শ্রমজীবিরা তৎক্ষণাৎ রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। গৃহটীর মধ্যে রাজা ও রাণীকে প্রবেশ করাইয়া তাহারা গৃহের দরজা প্রস্তুত করিয়া থাকে। রাজা ও রাণীকে বাহিরে আসিতে না দেওয়াই দরজার উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত তাহারা কোনরূপ কাষ্ঠের বা অন্য কোন দ্রব্যের দরজা প্রস্তুত করে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজা ও রাণী আকৃতিতে সকলাপেক্ষা বৃহৎ। সেই জন্য তাহারা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহের সম্মুখে একটী ছোট ছিদ্র করিয়া থাকে। ইহারি ভিতর দিয়া শ্রমজীবি যোদ্ধা প্রভৃতি সকলেই যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু রাজা রাণীর আর কখন গৃহের বাহিরে আসিবার সম্ভাবনা থাকে না; ইহাদের রাজা ও রাণী এক প্রকার বন্দী।

এইরূপ বন্দী অবস্থায় রাণী গর্ভবতী হয়। ইহার গর্ভ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্ব্ব গর্ভাবস্থায় সহস্র শরীর অপেক্ষা প্রায় দুই হাজার গুণ বড় হইয়া থাকে। তিন হাজার শ্রমজীবি একত্র করিলে যত বড় হয়, রাণীর শরীর এখন প্রায় সেইরূপ হয়।

রাজা ও রাণীকে আহার বা বিহারের জন্য কোনরূপ চিন্তা করিতে হয় না। যখনি যাহা অভাব হয়, শ্রমজীবিরা তখনি তাহা আহরণ করিয়া আনিয়া দেয়। রাণীর গর্ভাবস্থায় তাহারা রাজপ্রাসাদ আরও বড় করিয়া প্রস্তুত করে। এই পুত্তিকাগণ অতিশয় স্বাধীনচেতা। সকলেই রাজা ও রাণীর সম্মুখে যাইতে পারে। ইহারা অতিশয় রাজভক্ত। যাহাতে রাজ-দম্পতি সুখে থাকে, তদ্বিষয়ে তাহারা বিশেষ যত্নবান। কেবল বন্দীভাব মোচন করিতে সকলেই নারাজ। প্রসব হইলে রাণীকে মাতার ন্যায় কোন কার্য্যই করিতে হয় না। বল্মীকগুলি শ্রমজীবিরাই ইহাদের ধাত্রীর কার্য্য করিয়া থাকে। রাণী মিনিটে প্রায় ৬০টী ডিম প্রসব করে। এইরূপে সমস্ত দিনে প্রায় আট হাজার ডিম উৎপন্ন হয়। দুই বৎসর কাল রাণীর যৌবন অবস্থা। এইকালের মধ্যে যে কত প্রাণী জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

ইহাদের ধাত্রীগণের ব্যাপারও আশ্চর্য্য-জনক। রাজগৃহে ইহারা দলে দলে ফিরিতেছে। যেমন রাণী প্রসব হইতেছে, অমনি ইহারা—আপনাদের মস্তকের মত করিয়া—ডিমগুলিকে লইয়া—ভিন্ন ভিন্ন গৃহে লইয়া গিয়া থাকে। এইখানে ছানাগুলি যতদিন না বড় হয়, ইহারা সমভাবে লালন পালন করিতে থাকে।

রাজগৃহে আরও কতকগুলি পুত্তিকা দেখা যায়; তাহারা রাজার দেহরক্ষক। এই কার্য্যে বহুসংখ্যক শ্রমজীবি ও যোদ্ধা নিযুক্ত থাকে। রাজা ও রাণীর সুখ ও দুঃখের উপর সমস্ত উপনিবেশের সুখ ও দুঃখ নির্ভর করে বলিয়া, ইহারা রাজা ও রাণীর সুখের নিমিত্ত নিজেরা অনেক কষ্ট স্বীকার করে। বিশেষ বিপদাপন্ন হইলেও ইহারা কখনও রাজা ও রাণীকে পরিত্যাগ করে না।

বল্মীক পুত্তিকাদের মধ্যে নানাপ্রকার জাতি আছে। ইহাদের গৃহাদি নির্ম্মাণও নানা প্রকার। গৃহগুলি কখন কখন ১২ফিট উচ্চ হইতে দেখা যায়। আফ্রিকায় ও সেনিগালে অনেক বল্মীকনগর ও উপনগর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের গৃহ-নির্ম্মাণের কৌশল প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ঠাকুর-বি।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শরৎকুমারী বহুরূপী হউক আর যাহাই হউক, তাহার নয়নে অগ্নি ও জলের একত্র সমাবেশ দেখিয়া অমলা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে আবার শরৎকুমারীর সে রূপ অদৃশ্য হইল। শরৎকুমারী প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"ঠাকুরঝি, আমার বোধ হয়, তবে বা ভাড়াটিয়াবাড়ীর দরজা খুলে চলে

গেছে, না হয় ওদের ঘরেই আছে। আমি ছাদের ওপর দাঁড়াই, তুই নীচে গিয়ে ওদের দরজা খোলা আছে কি না দেখে আয়, কি কোন সাড়া শব্দ পাস্ কি না শুনে আয়।"

অমলা তাহার বউ দিদির জন্য কি না করিতে পারে? অমলা তৎক্ষণাৎ পরেশনাথের বাড়ীর মধ্যে গেল, এবং নিচে নামিয়াই দাদার কণ্ঠস্বর শুনিয়া শরৎকুমারীকে বলিল—"দাদা ওদের বাড়ীতেই আছেন; সুখদার বাপের সঙ্গে কি কথা কইছেন।"

শরৎকুমারী বলিল—"তুই ডাকতে পারলি নে কেন?"

শরৎকুমারী এখন এতই অধৈর্য্য যে, তাহার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। অমলা বলিল—"আমি কি কোরে ডাকবো বউদিদি? আমি কি সুখদার বাপের সাম্‌নে কথা কই?"

শরৎকুমারী তখন আরো অধৈর্য্য হইয়া বলিল—"তা হ'ক, দুই না হয় এই ছাদের উপর থেকে ডাক।"

অমলা বলিল—"মাকে না হয়, ডাকতে বল্‌বো?"

শরৎকুমারী আর সে কথার উত্তর করিল না,—দৌড়িয়া শাশুড়ীর শয়ন-গৃহে গিয়া ডাকিল—"মা।"

গৃহের ভিতর হইতে শাশুড়ী ঠাকুরাণী উত্তর করিলেন—"কেন গা, বউ মা?"

শরৎকুমারী আগ্রহের সহিত বলিল—"একবার শীগ্‌গীর উঠে এসো ত।"

বধূমাতার কথা শুনিয়া গৃহিণীর প্রাণ উড়িয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। দরজা খুলিবার সময় কুড়কাচি তাহার কপালে লাগিল। কিন্তু সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না; তিনি বাহিরে আসিয়াই বলিলেন—"কি হয়েছে গা বউ মা?"

শরৎকুমারীর মুখে তখন আর কথা নাই; তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া অমলা বলিল—"কিছু হয় নে মা। দাদা রাত্রে উঠে ঘরথেকে সুখদার বাপের কাছে গেছেন, তাই বউদিদি তোমায় দাদাকে ডেকে দেবার জন্য ডাকুছে।" সাবিত্রী তখন দুই তিনটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বলিল—"হীরুর সঙ্গে বউ মা ঝগড়া করেছে বুঝি?"

সে প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? সাবিত্রী তখন বধূমাতাকে মৃদু ভৎর্সনা আরম্ভ করিলেন—"অমন করে কি ঝগড়া করতে হয় মা? হীরু আমার সোণার ছেলে, সে ত তোমায় কখন বাপু কড়া কথা বলে না। তুমি বরং তাকে অনেক সময় যা মুখে আসে, তখনই তাই বল। এখনত আর ছেলে মানুষটি নও মা। আজি আর কত দিন বাঁচ্‌বো বল? এ ঘর সংসার তোমাকেই সব করতে হবে। আজ কালের ছেলে পিলে—"

শরৎকুমারী নিজে শাশুড়ীকে এখন কোন কথা বলিতে পারে না; অথচ এতদূর অধৈর্য্য যে তাহার স্বামীকে আনিয়া দিয়া শাশুড়ী প্রহার করিলেও শরৎকুমারী ক্ষমানবদনে তাহা সহ্য করিতে পারে, কিন্তু এখন এরূপ উপদেশে বৃথা সময় নষ্ট করা শরৎকুমারী সহ্য করিতে পারে না। মুখেই বা শাশুড়ীকে সে কথা কিরূপে বলে? শরৎকুমারী অমলার গা টিপিয়া তাহাকে কি ইঙ্গিত করিল। অমলা তখন জননীর কথায় বাধা দিয়া বলিল—"আগে দাদাকে ডেকে নিয়ে এসো না মা; তারপর সে কথা হবে এখন, দাদা যদি সে দিনের মতন এই রাত্রে কোথাও চলে যান।"

সাবিত্রী আর দেরী করিলেন না; তখন পরেশনাথের বাড়ী গিয়া হীরালালকে ডাকিলেন। হীরালাল জননীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রথমে একটু ভীত হইল; তাহার পর অতি সাবধানে উত্তর করিল—"কেন মা?"

জননী তখন বলিলেন—"আমি বল্‌ছি—তুই ঘরে আয় বাপ্।"

হীরালাল ধীরে ধীরে পরেশনাথের ঘর হইতে বাহির হইয়া মাতার কাছে আসিলেন; সে খানে আসিয়া জননীকে বলিলেন—"আমায় ঘরে আস্‌তে কেন বল মা? আমার আবার কিসের ঘরসংসার? আমার ঘরত তুমি শ্মশান করে রেখেছ মা।"

পুত্রের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া মাতার প্রাণ ঝর ঝরিত হইল। বধূমাতার অনাদরে যে পুত্রের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে—তিনি সেই কণ্ঠস্বরেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি পুত্রকে গৃহে আনিয়া বলিলেন—"বউ মা নির্ব্বোধ, ছেলে মানুষ, কিসে কি হয়, সে বুদ্ধি হয়নি বাবা। তা হলে কি আর তোমায় অনাদর করে? তুমি ও আমার নির্ব্বোধ ছেলে নও বাবা। আমি বউমাকে অনেক বুঝিয়েছি, তা আবাগের বেটি কিছুতেই বুঝ্‌বে না। এ দিকে মুখে কিছু বড়াই করে, সে সব বোঝে।"

হীরালালের এখনত আর জননীর নিকটও মনের কথা গোপন রাখিতে পারিবে না। তাহার প্রাণের ভিতরও যাহা হইতেছিল, এই সময় সকলের সম্মুখে সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে হৃদয়ের ভার লাঘব হইতে পারে। সুতরাং হীরালাল বলিল—"আর বুঝিয়ে দরকার নাই, মা। আমি এখন সব ভালরূপই বুঝ্‌তে পেরেছি।"

বধূমাতা সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল, সুতরাং তাহার মুখটাহিয়া ছুটো কথা বলিলে ভাল দেখায় না; আর সাবিত্রী বধূর স্বভাবও ভালরূপ জানিতেন, সুতরাং এইবার বলিলেন—"তা বলে কি এই রাত্রে, ছেলে মানুষ বউটিকে একলা ফেলে তোমার ঘর থেকে উঠে যাওয়া ভাল হয়েছে বাবা? তাই না হয়, আমাদেরই ঘরে থাক, পরের ঘরে গিয়ে এত রাত্রে কি হচ্ছিল বাবা?"

হীরালাল তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"আমি তোমার কাছে এক দিন একটা মিথ্যা কথা বলেছিলুম, কিন্তু আর মিথ্যে কথা বলবো না; আমি পরেশনাথের কাছে বসে এতক্ষণ মদ খাচ্ছিলুম মা।"

যে তিনজন সেখানে ছিল, হঠাৎ সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলে লোকে যেরূপ শিহরিয়া উঠে, তিন জনেই সেইরূপ শিহরিয়া উঠিল। রাগে শরৎকুমারী কাঁপিতে আরম্ভ করিল, অমলা তাহাকে না ধরিলে বোধ হয় এতক্ষণ সে পড়িয়া যাইত। অমলার প্রাণ তাহার দাদার জন্য কাঁদিয়া উঠিল; সে তাহার দাদার মনের অবস্থা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল। তখন তাহার বউদিদির উপরই বড় রাগ হইল। পুত্রের নিজের মুখে এই সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া সাবিত্রীর প্রাণ উড়িয়া গেল। সাবিত্রীর মুখে আর কথা বাহির হয় না; অনেক কষ্টে সাবিত্রী বলিল—"কি সর্ব্বনাশ! তুই এই রাত্রিতে ওখানে গিয়ে আমার মাথা খাচ্ছিলি? তুইত ছেড়ে দিস্‌লি? আবার ও বিষ কেন খেতে আরম্ভ করলি বাবা? ওযে বিষ তাকি তুই জানিস্‌নে?"

হীরালাল গম্ভীরস্বরে বলিল—"আমি ও বিষ বলে জানি বলেইত খাই।"

সাবিত্রী বিস্মিত হইয়া বলিল—"কেন—কি দুঃখে জেনেশুনে এমন বিষ খাস্ বাবা?"

এইবার হীরালালের সপ্তদুঃখ-সমুদ্র এককালীন উথলিয়া উঠিল। হীরালাল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমার যে

কি দুঃখ তা আর মা, তোমায় মুখে জানাব কি! যদি এ বুক চিরে দেখো তা হলে কতক বুঝ্‌তে পারবে!" বলিতে বলিতে হিরালাল কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

পুত্রকে রোদন করিতে দেখিয়া জননী কি আর স্থির থাকিতে পারেন? মায়ের প্রাণও সেই সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া উঠিল। তিনি পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"ছি বাবা! তুমিও আমার তেমন ছেলে নও; এই সঙ্গদোষে পড়ে বারজনে তোমায় খারাপ করেছে। পরেশকে আমি আশ্রয় দিয়ে রেখেছি; তার এই কাজ! সে আমার বাড়ীতে থেকে আমারই সর্ব্বনাশ কর্‌ছে!"

হীরালাল চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—"না মা, পরেশের কোন দোষ নাই। আমি ইচ্ছে করে আজ মদ খেয়েছি।"

জননী পুত্রের মুখেরদিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"তোমায় আমার মাথার দিব্যি, তুমি আর কখন খেয়ো না বাবা। এবার খেলে আমার মরা-মুখ—"

হীরালাল মাতার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"তুমি আর দিব্যি দিওনা মা। আমি তোমার কুসন্তান জন্মেছি। আমাহতে তোমার আর কোন কাজই হবে না। আমি মাতাল, আমাকে তোমরা সকলে ঘৃণা কর। আমি বংশের কুলাঙ্গার, আমি যখন তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি, তখন আমার নরকেও স্থান হবে না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি—আমি অনেক প্রতিজ্ঞা করেছি—কিন্তু ঐ সর্ব্বনাশী থাক্‌তে—"

হীরালাল আর বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। এই সময় শরৎকুমারী আর থাকিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"মা, ওর কান্না দেখে তুমিও কাঁদ্‌ছো যে! ওকি কান্না? ও মাতলামী কর্‌ছে বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? মা-ব'নের সামনে মাতলামী করতে লজ্জা করে না! গলায় দড়ি।"

হীরালাল তৎক্ষণাৎ আরক্তনয়নে শরৎকুমারীর দিকে একবার চাহিল; কিন্তু কি মনে করিয়া সে রাগ সামলাইয়া লইয়া বলিল—"মা, আমি তোমার বিছানায় গিয়ে শুইগে। তোমরা আমার ঘরে গিয়ে শোও।"

হীরালাল আর সেখানে রহিল না, তৎক্ষণাৎ তাহার জননীর শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। শরৎকুমারী বড় আশায় নিরাশ হইল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গিরিজায়ার গীত।

যেমন রাধা কৃষ্ণের মধ্যে বৃন্দা দূতী, বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে হীরামালিনী, তেমনি হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর মধ্যে গিরিজায়া। গিরিজায়া না থাকিলে হয় ত আমরা মৃণালিনীকে দেখিতে পাইতাম না—হেমচন্দ্র "শুধুই মদন" রূপে বিরাজ করিতেন। একের সহিত অন্যকে মিলাইবার জন্য মধ্যস্থ এক ব্যক্তি আবশ্যক; দুই রাজ্যে সন্ধি সংস্থাপনের জন্য রাজদূত, পাত্র পাত্রীর বিবাহের জন্য ঘটক এবং দুইটী ফুল একত্র গ্রথিত করিবার জন্য সূত্র যে মূল্য বহন করে, মৃণালিনী হেমচন্দ্রের মিলনের জন্য গিরিজায়ারও সেই মূল্য। গিরিজায়া ব্যতিরেকে মৃণালিনীর সন্ধান করা হেমচন্দ্রের পক্ষে অসাধ্য হইত এবং সেই বিশ্বাসেই মাধবাচার্য্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "পার, তাহার সন্ধান করিয়া সাক্ষাৎ কর।"

গিরিজায়া হেমচন্দ্রের নিয়োজিতা দূতী—উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত "মৃণালিনী"—পাঠক সে পরিচয় যথেষ্ট পাইয়াছেন। গিরিজায়া বয়সে ষোড়শী হইলেও বুদ্ধিমতী—তাহার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া একদিন হেমচন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন, "গিরিজায়ে! তুমি বয়সে বালিকা মাত্র। তোমার ন্যায় বালিকা আর দেখি নাই," মৃণালিনীকেও বলিতে হইয়াছিল, "গিরিজায়া! তুমি ভিখারিণী বেশে কোন মায়াবিনী।" গিরিজায়া কৃষ্ণবর্ণা হইলেও কুরূপা নহে, ভিখারীর মেয়ে হইলেও নির্গুণা নহে। ভিখারিণী অল্প বয়সেই প্রণয়ের সন্ধি বিগ্রহে ব্যুৎপন্না, মানব-চরিত্র জ্ঞানে সুপণ্ডিতা, প্রত্যুৎপন্নমতি-বিশিষ্টা। গিরিজায়া সরলা, নির্ভয়হৃদয়া, সুচরিত্রা, সুরসিকা, সুগায়িকা। ইহার অধিক গুণবিশিষ্টা দূতী হেমচন্দ্র আর কোথায় পাইবেন?

মৃণালিনীর সন্ধানে হেমচন্দ্র ঘাট, বাট তট, মাঠ এবং বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, কোথাও সন্ধান করিতে পারেন নাই—গিরিজায়াকে পাইয়া যেন মরুমাঝে ফলফুলে শোভিত-তরুলতা-বিশিষ্ট ওয়েসিসে পৌঁছিবার পথ-প্রদর্শিকা পাইয়াছিলেন। পিতৃস্থানীয় অজ্ঞাতকুলশীলার আশ্রয়দাতা হৃষীকেশ ভিন্ন পুরুষান্তরের সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধা সুবিস্তীর্ণ গৌড় নগরে সামান্য ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরবাসিনী মৃণালিনীর সন্ধান করা হেমচন্দ্রের সাধ্যাতীত—সুচতুর ডিটেক্‌টিভ্ পোলিশেরও অসাধ্য। কিন্তু ভিখারিণী বালিকাকে তাঁহার সন্ধান করিতে বড় অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই, অধিক দিন দ্বারে দ্বারে গীত গাহিয়া বেড়াইতে হয় নাই—কণ্টকের দ্বারা কণ্টক বাহির করা অথবা চোরের দ্বারা চোর ধরা গুরুতর ব্যাপার নহে। হেমচন্দ্র উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নিয়োজিত করিয়াছিলেন—ভিখারিণীর কোন স্থানেই প্রবেশ নিষিদ্ধ নহে—অন্তঃপুরবাসিনীর সাক্ষাৎ তাহার পক্ষে দুর্লভ নহে—খনি হইতে মণি উদ্ধার করিবার জন্য গিরিজায়াই প্রকৃত জহরী। যে উপায়ে গিরিজায়া রত্ন উদ্ধার করিয়াছিল, তাহাও তাহার পক্ষে উপযুক্ত বটে।

যে সময়ের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, সে সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে ভারত উদ্ভাসিত হয় নাই—"ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলে কেহই তাহাকে বিমুখ করিত না। কিন্তু কেবল দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলে দূতীর কার্য্য হয় না, গুপ্ত চরের গুপ্ত রত্ন উদ্ধার করা হয় না। সেই জন্য গিরিজায়ার গীতের সৃষ্টি। ভিক্ষা দানটা সাধারণতঃ ছোট ছোট বালক বালিকা বা বৃদ্ধের কার্য্য—যুবতীগণ সংসারের অন্য কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতেন। এমত অবস্থায় সাধারণ ভিখারিণীর পক্ষে মৃণালিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু সঙ্গীত দ্বারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই আকৃষ্ট করা যায়, বিশেষতঃ রমণীগণ সঙ্গীতের অধিক পক্ষপাতিনী। সঙ্গীতের আদর কোথায় নাই? যেখানে প্রেম সেই খানেই সঙ্গীতের আদর, আর রমণী-হৃদয় প্রেমের বিপুল পয়োধি। দুই চারিটা নীরস কর্কশ কঠোর হৃদয় অকাল-কুষ্মাণ্ড ব্যতীত মনুষ্য মাত্রই সঙ্গীতপ্রিয়—সঙ্গীতে যে মোহিত হইল না, তাহার মনুষ্য জন্ম বৃথা, পশু জন্মও বৃথা। যৌবনেই প্রেমের জোর জোয়ার, সেই জন্য যুবক যুবতীগণই সঙ্গীতে অধিক বিমোহিত।

মৃণালিনী যুবতী, তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি হেমচন্দ্রের প্রেমে আজও পরিপূর্ণ, প্রতিমুহূর্ত্তেই তিনি হেমচন্দ্রকে আপন হৃদয়-কমলে বিরাজ করিতে দেখিতেছিলেন। সুতরাং মৃণালিনী যে গিরিজায়ার গানে আকৃষ্ট হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সুগায়কের তানলয়-বিশুদ্ধ রাগালাপ শ্রবণ করা সচরাচর সুবক্তাগণের ভাগ্যে ঘটে না, ঘটিলেও তাহা দুর্ব্বোধ্য ও কর্কশ বলিয়া উপেক্ষিত। বামাকণ্ঠের কাছে ওস্তাদজীর গুরুবৎ চীৎকার? বামাকণ্ঠ সুমধুর বংশীবাদন —ওস্তাদজীর কণ্ঠধ্বনি তীব্র রণভেরী। সুশিক্ষিত গায়ক অপেক্ষা অশিক্ষিতা গায়িকা সুশ্রোতৃদিগের নিকট অধিক আদৃতা। ছোট মিঞা অপেক্ষা হরিদাসী বৈষ্ণবী তাঁহাদিগের নিকটে গায় ভাল—ভিখারিণী বৈষ্ণবী পাড়ায় আসিলে আজিও উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিনে পাড়ার সমস্ত স্ত্রীলোকগণ তাহার গান শুনিতে একত্রিত হইয়া থাকে। একটু সঙ্গীতজ্ঞ হইলে ভিখারির পশারও মন্দ জমে না—গিরিজায়া সুগায়িকা এবং তাহার দিব্য গলা বলিয়া তাহার পশার মন্দ ছিল না।

হেমচন্দ্র প্রেম-তরঙ্গে ভাসমান বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সংসার চিনিতেন না, এমত নহে, তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস মধ্য অবস্থায় গীত হইলে তাহা যে সর্ব্বত্র আদৃত হইবে না, তাহা বুঝিতেন। সেই জন্য সুকৌশলে তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস জগৎপূজ্য রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ছাঁচে ঢালিলেন, রাধাকৃষ্ণের প্রেম রাজ্যের সর্ব্বত্র পূজ্য, প্রেমের প্রকৃত ছবি, প্রেম রস প্লুত হিন্দুর অন্তঃপুরে তাঁহাদিগের "রস-তরঙ্গ-লীলা" গান করিতে কিছু মাত্র বাধা বিঘ্ন নাই; সুতরাং ভিখারিণীর সর্ব্বত্র ভ্রমনের পথ আরও পরিষ্কৃত করা হইয়াছিল। গিরিজায়ার গীত পাড়ায় পাড়ায় দ্বারে দ্বারে গীত হইলেও সাধারণের জন্য তাহা নহে, মৃণালিনীর প্রতিই তাহার লক্ষ্য; সুতরাং মৃণালিনীকে রাধিকার স্বত্বাভিষিক্ত করা হইল—ঘটনা-সাদৃশ্য রহিল তাঁহাকে রাধিকার স্বত্বাভিষিক্ত করা অসম্ভব হয় নাই। সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া গিরিজায়া মৃণালিনীর সন্ধানে বাহির হইল—এ পাড়ায় সে পাড়ায় গাহিয়া-বেড়াইতে লাগিল। রোগ নির্ণীত না হইলে ঔষধ ধরিবে কেন? যে কয়দিন গিরিজায়া হৃষীকেশ শর্ম্মার বাটীর সন্ধান না পাইয়া পাড়ায় পাড়ায় গান গাহিল, সে কয়দিন কোন ফল ফলিল না; ক্রমান্বয়ে হৃষীকেশ শর্ম্মার বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া গান ধরিবা মাত্র ক্ষত মুখে ঔষধ পড়িল, চোরা রণে মৃণালিনী বিদ্ধ হইল।

যৎকালে গিরিজায়া বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া গান আরম্ভ করিল, তৎকালে মৃণালিনী হৃষীকেশ শর্ম্মার কন্যা মণিমালিনীর সহিত অন্তঃপুর মধ্যে কক্ষ-প্রাচীরে আলেখ্য দর্শিতেছিলেন; আর মৃণালিনী হেমচন্দ্র বিরহ-জনিত আপন জীবনের দুঃখ-কাহিনী বলিতেছিলেন, মণিমালিনী শুনিতেছিলেন, উপযুক্ত সময়েই গিরিজায়া গাইল—

মথুরাবাসিনী, মধুর-হাসিনী,
শ্যাম-বিলাসিনী রে।"

গিরিজায়া বংশী বাদনবৎ সুস্বরবামাকণ্ঠে গাহিল; সঙ্গীত ধ্বনি মৃণালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল; মৃণালিনী চমকিত হইয়া কহিলেন, "ও কি ও সই?" আর তাঁহার অলেখ্য দেখা হইল না—বোধ হয় হাত কাঁপিল; কেন না তৎকালে তাঁহার হৃদয় কাঁপিতেছিল—আশা, উৎসাহ, আনন্দ ও ভয়ে। গান শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সই কোথায় গান করিতেছে?" তাঁহার সন্দেহ হইল যে, কে যেন

তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিল; কেন না এ প্রদেশে তিনিই-ত মথুরা-বাসিনী তাঁহার পিতা মথুরানিবাসী জনৈক শ্রেষ্ঠী। নৌকামগ্ন বিপন্ন ব্যক্তি তৃণ পাইলে তাহাই অবলম্বন করে, মৃণালিনীও তাহাই করিলেন, "শ্যামবিলাসিনী" রাধারমণকে ভুলিয়া গিয়া আপনাকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিলেন। গিরিজায়া গাহিল—

"কহ লো নাগরী, গেহ পরিহরি,
কাঁহে বিবাসিনী—রে।"

মৃণালিনী ভাবিলেন, তিনিইত গৃহত্যাগিনী বিরাগিনী; মাধবাচার্য্যের চক্রে পড়িয়া মথুরাত্যাগিনী হইয়া সপ্তাহ তে গৌড় নগরে পরাশ্রয়ে প্রবাসযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। গিরিজায়া তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া গাহিতেছে, এবম্প্রকার সন্দেহ ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হইতে লাগিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন, "সখি, কে গাইতেছে জান?" তিনি জানিতে চাহিলেন, গায়িকা মৃণালিনীর পরিচিতা কি না; কেন না কোন পরিচিতা গায়িকা হইলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিবার সম্ভাবনা নাই, গায়িকা পরিচিতা হইলে "শ্যাম-বিলাসিনী" মৃণালিনী নহে, "শ্যামবিলাসিনী" রাধিকা হইবে। তাঁহার তখনও ভয় রহিয়াছে যে, গায়িকা মণিমালিনীর পরিচিতা হইয়া পাছে তাঁহার সকল আশায় জল দেয়—পরিচিতা গায়িকার তাঁহার কথা জানিবার সম্ভাবনা কোথায়? মণিমালিনী উত্তরে যখন বলিলেন, "কোন ভিখারিণী হইবে"; তখন যেন মৃণালিনী কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি যে গানের লক্ষ্য—সে বিশ্বাস ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। ভিখারিণী পূর্ব্ববৎ গাহিতে লাগিল—

"বৃন্দাবন ধন, গোপিনী মোহন,
কাহে তু তেয়াগী—রে।
দেশ দেশ পর, লো শ্যাম সুন্দর,
ফিরে তুয়া লাগি—রে।"

আর কি সন্দেহ থাকে? মৃণালিনী বুঝিলেন, এ তাঁহারই হেমচন্দ্র। "বৃন্দাবন ধন, গোপিনী মোহন"—হেমচন্দ্র ব্যতীত আর কেহ নহেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার দুঃখ নিশার অবসান হইয়া আসিয়াছে। অচিরে তিনি হেমচন্দ্রের সংবাদ পাইবেন, হেমচন্দ্র ও তাঁহার সন্ধান পাইবেন। মৃণালিনী বেগের সহিত কহিলেন,—"সই, সই! উহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আন।" অকূল সমুদ্রে ভাসমানা মৃণালিনী এত দিনে বুঝি একখানি ভেলা পাইলেন, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর বুঝি এত দিনে পিঞ্জরার উদ্ঘাটিত হইল। আনন্দাধিক্যের সময়ে লোকের ধৈর্য্য থাকে না, চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, হৃদয়ের মধ্যে যে তরঙ্গ খেলিতে থাকে, তাহা কোন ক্রমেই গোপন করা যায় না; সেই জন্য মৃণালিনী "বেগের সহিত" ভিখারিণীকে ডাকিতে বলিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ভুলেন নাই যে, যে বহির্ব্বাটীতে পুরুষান্তরের সহিত সাক্ষাৎ সম্ভব, তথায় তাঁহার যাইতে নিষেধ আছে। তিনি ভুলেন নাই, পরগৃহে পরাশ্রমে যাহার বাস, বাটীর মধ্যে অপরিচিতা ভিখারিণীকে ডাকিয়া আনিতে তাঁহার অধিকার নাই। ভুলিলে, মণিমালিনীকে ডাকিতে না বলিয়া আপনিই দৌড়িয়া যাইতেন—কর্ত্তব্য কি সহসে লোকে উপেক্ষা করিতে পারে? মণিমালিনী ভিখারিণীকে ডাকিতে গেলেন, এ দিকে গিরিজায়া গাহিতে লাগিল—

"বিকচ-নলিনে, যমুনা পুলিনে,
বহুত পিয়াসা—রে।"

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মহরম্ বিভ্রাট।—রামপুর বোয়ালিয়ারে গত মহরমের সময় পুলিশের হস্তে চারিটী ভদ্রলোক জখম হইয়াছিলেন; এ সংবাদ আমরা যথাকালে দিয়াছি, পুলিশ বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল বাহাদুর নিজে এই লোমহর্ষণ ব্যাপারের তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার অনুসন্ধান শেষ হইয়াছে। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইন্‌স্‌পেক্টর, হেড কন্‌ষ্টেবল্ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, কন্‌ষ্টেবলদিগকে গুলি চালাইতে কেহই হুকুম দেয় নাই; তাহারা আপনারা গুলি চালাইয়াছিল। তাহারা কিন্তু বলিতেছে যে, তাহাদিগকে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল; যাহা হউক, হতভাগ্যদিগের বিচার হইতেছে, বচ্‌ারের ফলাফল শীঘ্রই জানা যাইবে।

***

ধর্ম্মে বাধা।—সীতাপুরে শঙ্খধ্বনি লইয়া বিষম গণ্ডগোল বাধিয়াছে; হিন্দুরা শঙ্খধ্বনি করিয়া পূজা করে, মুসলমানদিগের তাহা সহ্য হয় না, তাহারা তত্রত্য ডেপুটিকমিশনার মিঃ রজারের কাছে নালিশ করিল। রজার সাহেব শুনিয়াই অজ্ঞান;—কি হিন্দুরা শাঁখ বাজাইবে? মুসলমানেরা ঢাকঢোল বাজাইবে, বিকট রবে সহর তোলপাড় করিবে, কিন্তু তাহা বলিয়া নিরীহ হিন্দু দেবালয়ে শাঁখ বাজাইবে, এও কি সহ্য করা যায়?—দাও হিন্দুকে জেলে দাও। অমনি গৌরী শঙ্কর নামক একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে হাজতে টানিয়া আনা হইল; সে বেশী করিয়া শাঁক বাজাইয়াছে, ইহাই তাহার অপরাধ। ডেপুটি কমিশনার তাহাকে ৫০০৲ শত টাকা করিয়া দুইটী জামিন দিতে বলিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোথায় হাজার টাকা পাইবে? কাজেই তাহাকে আরও নয় দিন হাজতে থাকিতে হইল। তাহার পর তাহার বিচার হইল; আসামীর বিরুদ্ধে যত সাক্ষী—সকলেই মুসলমান; সুতরাং বিচার যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিচারে গৌরী শঙ্করের ১০৲ টাকা জরিমানা হইল। মুসলমানেরা ঢাকঢোল বাজাইবে, কিন্তু হিন্দু একটু বেশি করিয়া শাঁক বাজাইলেই হাজতে যাইবে! কথাটার আরও একটু রহস্য আছে, অতিরিক্ত শব্দধ্বনি কাহাকে বলে? বৃটিশ আইনেও ইহার কোন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। প্রবীণ সহযোগী "অমৃতবাজার" বলেন, যেমন তাপমাপ যন্ত্র, নাড়ীমাপ যন্ত্র, প্রভৃতি যন্ত্র আছে, সেইরূপ শব্দমাপ যন্ত্রও বোধ হয় একটী সৃষ্টি করিতে হইবে, নতুবা হিন্দুরাও অতিরিক্ত শঙ্খধ্বনি করিবে!

***

নাগপঞ্চমী।—ইহা হিন্দুমাত্রেরই একটী প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান। রাজপুতানা ও দক্ষিণাত্যে ইহা মহাধুম ধামের সহিত সম্পাদিত হয়। পুণা সহরে ইহার বড়ই আড়ম্বর। এতদিন তথায় কোন-বাধা ছিল না, কিন্তু এবার বিষম ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। জেলার কর্ত্তৃপক্ষ নগরের প্রধান হিন্দুদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—প্রকাশ্য রাজপথে বাদ্য বাজাইয়া তোমরা নাগ-পঞ্চমীর সময় প্রতিমা লইয়া যাইতে পারিবে না; এইরূপ মৌকুতি পত্রে স্বাক্ষর কর এবং নগরে তির

মাসের জন্য শান্তিরক্ষার দায়ী হইবে, এইরূপ মর্ম্মে মুচলেখা লিখিয়া দাও।" হিন্দুরা হতাশ হইয়া পড়িলেন। মহরমের সময় মুসলমানেরা নিকট বাদ্যোদ্যম করিয়া তাণ্ডবনৃত্যে সহর আলোড়িত করিল, কিন্তু তাহাদিগের নিকট মুচলেখা লিখাইয়া লওয়া হয় নাই। আমরা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম যে, হিন্দুরা নাগরাজের প্রতিমা লইয়া রাজপথে বাহির হইয়াছিল। বলিয়া তাহাদিগকে পুলিশ সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় কি? হিন্দুরা কি কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পাইবে না?

***

কৃত্রিম দ্বীপ।—আমেরিকার সকলই অদ্ভুত। শুনা যায়, তত্রত্য কোন হোটেল ওয়ালা আটলাণ্টিক মহাসাগরের বক্ষে একটী কৃত্রিম দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় হোটেল স্থাপিত করিবেন। মহাদ্বীপে মশকের বড়ই উপদ্রব; কিন্তু এই কৃত্রিম দ্বীপে সেরূপ কোন উপদ্রব থাকিবে না; লোক জন সুখে বাস করিবে। হোটেল-ওয়ালাও কোন রাজাকে খাজনা দিবে না, কারণ সে যেখানে দ্বীপ নির্ম্মাণ করিবে, তাহা বরুণের রাজ্য। দ্বীপটী কি কৌশলে নির্ম্মিত হইবে, এখনও তাহা সবিশেষ জানা যায় নাই; শুনা যাইতেছে যে, সমুদ্রের যে প্রদেশে দ্বীপটী স্থাপিত হইবে, তাহা অধিক গভীর নহে; এইজন্য তথায় প্রকাণ্ড লৌহস্তম্ভ প্রোথিত হইবে; সেই সকল স্তম্ভের উপর নাকি দ্বীপ নির্ম্মিত হইবে।

***

নূতন উপায়।—ডাক্তার লাবোর্ড জলম ব্যক্তিদিগের জীবন রক্ষার একটী নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। জলমগ্ন ব্যক্তির জিহ্বা ধরিয়া টানিলে তাহার উদরস্থ সমস্ত জল বাহির হইয়া পড়ে। এমন কি অন্যান্য উপায় নিষ্ফল হইলেও এই উপায়েই তিনি অনেক রোগীর জীবন রক্ষা করিয়াছেন। উপায়টী মন্দ নহে, পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

***

আবার নানাসাহেব।—আলাহাবাদের "মর্ণিং পোষ্ট" নামক সংবাদপত্রে একটা আজগুবী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে;—আবার আর একটী নানাসাহেব ধরা পড়িয়াছে। সহযোগী বলেন যে, এই ব্যাপার লইয়া বম্বে সহরে হলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী নানাসাহেবকে দেখিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদিগের সকলের সাক্ষ্য লওয়া হইতেছে। স্থানীয় সংবাদ পত্রে কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথাই দেখা যায় না।

নিবেদন।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়েরা অদ্যাবধি "অনুসন্ধানের" অগ্রিম বর্ষের (১৩০১সালের) অগ্রিম মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন একটু সত্বর তাঁহাদের টাকা চারিটী পাঠাইয়া দেন। 'সাপ্তাহিক অনুসন্ধান' যেরূপ ব্যয়বাহুল্য গুরুতর ব্যাপার, ভরসা করি, সে সকল বিষয় চিন্তা করিয়া, মূল্যের টাকা চারিটি পাঠাইতে কেহই বিরত হইবেন না।

বিশেষ, আরও পরে টাকা দিলে, পশ্চাদ্দেয় হারে তাঁহাদিগকে টাকা দিতে হইবে, স্মরণার্থ নিবেদন। নিয়মিত পত্রিকা পাইয়া, কেহই যে নিয়মের ব্যত্যয় করিবেন না সম্পূর্ণ ভরসা করি।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,কার্য্যাধ্যক্ষ।
অনুসন্ধান-কার্য্যালয়, ১৮৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

"অনুসন্ধানের" নিয়মাবলি।

১। গ্রাহক-নম্বর ব্যতীত, কি 'ঠিকানা-পরিবর্ত্তন, কি টাকা জমা, কোন কার্য্যই হয় না। প্রতিবারের কাগজের মোড়কে গ্রাহক-নম্বর থাকে।

২। "সাপ্তাহিক অনুসন্ধানের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই, ৪ চারি টাকা। পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৫ পাঁচ টাকা।

৩। পুরাতন গ্রাহকগণ নূতন বর্ষের প্রথম কাগজ-প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে এবং নূতন গ্রাহকগণ এক মাস মধ্যে টাকা দিলেই অগ্রিম হিসাবে গৃহীত হইবে। তৎপরে টাকা দিলে, পশ্চাদ্দেয় হিসাবে জমা হইবে।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে, তৎপর-সংখ্যা প্রাপ্তির পরই জানাইতে হইবে। উপর্য্যুপরি দুই সংখ্যা না পাইলে, নিয়মিত সময়ান্তে, তৎক্ষণাৎ তাহা জ্ঞাতব্য। অধিক পরে জানাইলে, আমরা তাহার দায়ী হইব না। সে ক্ষেত্রে প্রতি সংখ্যার দাম ৵০ আনা।

৫। লেখকগণ ভিন্ন, পত্রোত্তর-প্রার্থী হইলে, রিপ্লাই কার্ডে বা টিকিট-সহ পত্র লিখিতে হয়।

'অনুসন্ধানে' বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

(ক) বিজ্ঞাপনের মূল্য—এক বৎসর কোন বিজ্ঞাপন চলিলে, প্রতিবার প্রতি ছত্র এক আনা, প্রতি পৃষ্ঠা ৫ পাঁচ টাকা।

তদ্ভিন্ন, একবারের জন্য—প্রতি ছত্র।০ চারি আনা; এক মাসের জন্য প্রতি ছত্র প্রত্যেক বার ৵০ আনা; তিন মাসের জন্য—প্রতিবার প্রত্যেক ছত্র ৵০ আনা; ছয় মাসের জন্য—প্রতিবার প্রতি ছত্র ৵১০ আনা।

কি বিজ্ঞাপনের টাকা, কি গ্রাহকগণের দেয় টাকা, 'অনুসন্ধান'-সংক্রান্ত সকল টাকাকড়ি সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,
কার্য্যাধ্যক্ষ
'অনুসন্ধান' কার্য্যালয়, ১৮৯ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা হিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ। } ৮ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। { সপ্তদশ সংখ্যা

বেণ রাজা।

বেণ অতি প্রাচীন রাজা। যখন ভারতে রাজা ও প্রজার স্বত্ব অতি সামান্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, জাতিভেদ যখন উন্মেষিত হয় নাই, যজ্ঞযুগের সেই প্রথম কালে—ভারতের সেই আদিম অবস্থায় অঙ্গনন্দন বেণ রাজার ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার উপর আপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে বেণ সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র দেখিতে পাই যে, তিনি দাতা ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। শ্লোকটি এই——

"এতদুহূঃসীমে পৃথবাণে বেণে প্রারমে বোচমন্থরে মনর্ব্বৎসু।
যে যুক্ত্বায় পঞ্চ শতা অসময় পথা নিশ্রাব্যেষাম্॥"

অর্থাৎ যে সকল দেবতা পঞ্চশত রথে বধ যোজনা করিয়া যজ্ঞস্থলে গমন করেন, তাঁহাদিগের বিবরণ-সম্বলিত স্তব আমি শুনিয়াছি পৃথাণ, বেণ ও অসুর রাম এই সকল ধনাঢ্য রাজার নিকট পাঠ করিয়াছি।

মহর্ষি তাব এই সূক্তের রচয়িতা। তাঁহার গীত এই ঋকে বেণ রাজার সুখ্যাতি ভিন্ন নিন্দার কোন কথাই নাই। [illegible] মহাভারত ও পুরাণসমূহে ইহার ঠিক বিপরীত বিবরণ লক্ষিত হয়। ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

"বহবো হবিনষ্টায়ষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বেণো বিনষ্টোহবিনয়ান্নষ্টঃ শ্বেচ্ছ পার্থিবঃ।
সুদাসো যবনশ্চৈব সুমুখো নিমিরেবচ॥৪১"

অর্থাৎ অবিনয় বশত অনেক রাজা রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বিনয় বশতঃ অনেকে বনবাসী হইয়াও রাজ্যাদি লাভ করিয়াছেন; বেণ নহুষ, পৌরাণ্যপুত্র সুদাসু এবং সুমুখ ও নিমি অবিনয়ী ছিলেন বলিয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

এখানে আমরা বেণ সম্বন্ধে এই মাত্র দেখিতে পাই যে, তিনি অবিনয়ী ছিলেন, সেই জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে আমরা ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই। সেই বিবরণ অতীব মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ।

অঙ্গের পুত্র বেণ। ঐ বেণ মৃগয়ায়

আসক্ত হইয়া ব্যাধের ন্যায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক বনে যাইত এবং অসতের ন্যায় নির্দ্দয় ভাবে নিরাশ্রয় মৃগগণকে বধ করিত। তাহার নিষ্ঠুরতায় প্রজাগণ এত ভীত হইয়াছিল যে, কদাচিৎ তাহাকে দেখিতে পাইলেই তাহারা "এই বেণ আসিতেছে" বলিয়া চীৎকার করিত। বেণের নির্দ্দয়তার কথা কি বলিব? বাল্যকালে বয়স্যগণ সঙ্গে খেলা করিতে করিতে সেই নির্দ্দয়স্বভাব রাজকুমার তাহাদিগকে পশুর ন্যায় মারিয়া ফেলিত। পুত্রের এরূপ খলস্বভাব দেখিয়া অঙ্গরাজ তাহাকে বিবিধ প্রকারে শাসন করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, সে কোন রূপেই শাসিত হইল না, তখন তাঁহার দুঃখের আর সীমা রহিল না। সংসারে তাঁহার বিষম বৈরাগ্য জন্মিল; তিনি একদা গভীর রজনীযোগে সমস্তই ত্যাগ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন রাজার পুরোহিত ও মন্ত্রী অনন্যোপায় হইয়া দুষ্ট বেণকেই রাজাসনে স্থাপিত করিলেন। প্রচণ্ড শমন বেণ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া লোকপাল সকলের ঐশ্বর্য্য দ্বারা দিন দিন বড়ই উদ্ধত হইতে লাগিল। আমিই শূর, আমিই পণ্ডিত —এইরূপ অভিমানে উন্মত্ত হইয়া সে মহাভাগ ব্যক্তিদিগকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে ঐশ্বর্য্য-মদে অন্ধ-পর্দ্মিত হইয়া সেই দুর্দ্দর্শ রাজা নিরঙ্কুশ গজেন্দ্রের ন্যায় রথারূঢ় হইয়া সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিল। তাহার ভ্রমণে স্বর্গ মর্ত্ত কম্পমান হইল। অনন্তর সে ভেরি দ্বারা এই ঘোষণা করিল যে, "ব্রাহ্মণগণ সাবধান, কখন যাগ বা হোম করিও না।" এইরূপে বেণ স্বীয় অধিকার মধ্যে ধর্ম্মকর্ম্ম একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। দুশ্চরিত্র বেণের এই প্রকার অনাচরণ দেখিয়া মুনিগণ বুঝিলেন,—লোক সকলের মহাবিপদ উপস্থিত। অনন্তর সকলে দয়াবশে মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, কাষ্ঠখণ্ডের মূল ও অগ্রভাগ এককালে অগ্নি দ্বারা উদ্দীপিত হইলে তদ্ভস্ম পিপীলিকার যেমন উভয়দিক হইতে বিপদ উপস্থিত হয়, কোন দিকেই পরিত্রাণের পথ থাকে না; সেইরূপ তখন প্রজা সকলের ভয় ও রাজা উভয় দিক হইতেই সুমহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা অরাজক ভয়ে বেণকে রাজা করিয়াছিলাম; কিন্তু ইহা হইতেই প্রজাগণের মহৎ উৎপাত উপস্থিত হইল। এখন কি উপায়ে প্রজার মঙ্গল হইবে? দুষ্ট দ্বারা কাল সর্পকে প্রতিপালন করিলে প্রতিপালককেই অনর্থ ঘটিয়া থাকে। বেণ দুষ্টপালিত কাল সর্পবৎ আমাদের অনিষ্ট সাধন করিতেছে। সে প্রজাগণকে বিনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার পাপ যাহাতে আমাদিগকে স্পর্শ না করে, এই নিমিত্ত চল আমরা তাহাকে এক বার মান্য না করিয়া দেখি। এ রাজার পাপ আমাদিগকে স্পর্শ করিবার কারণ আছে, কারণ উহাকে দুর্ব্বৃত্ত জানিয়াও আমরা রাজা করিয়াছি। তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে বিবিধ প্রকারে বুঝাইব। বুঝিয়াও যদি সে আমাদের বাক্য গ্রহণ না করে, তাহা হইলে আমরা স্ব স্ব তেজ দ্বারা তাহাকে দগ্ধ করিব।"

মুনিগণ এরূপ স্থির করিয়া স্ব স্ব ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক বেণের নিকট গমন করিলেন এবং মধুর বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "হে রাজন! আমরা তোমাকে যাহা জ্ঞাপন করিব, শ্রবণ কর। আমাদের কথা শুনিলে তোমার আয়ু, শ্রী, বল ও কীর্ত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। কায়মনোবাক্যে শোধন পূর্ব্বক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অশোক-লোক লাভ করিতে পারা যায়। অধিক কি, নিষ্কাম মানবদিগের এ ধর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভও হইয়া থাকে। হে বীর! প্রজাবর্গের কল্যাণ স্বরূপ পরম পদার্থ ধর্ম্ম যেন নষ্ট না হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে রাজার রাজৈশ্বর্য্য বিনষ্ট হয়।" দুষ্ট হরি ও চৌরাদি হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া যে রাজা বিহিত কর গ্রহণ করেন, তাঁহার ইহকালে ও পরকালে পরম লাভ হয়। যাঁহার রাজ্যে ও পুর মধ্যে প্রজাগণ স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যজ্ঞপুরুষের পূজা করেন, সেই রাজার প্রতি ভগবান পরিতুষ্ট হয়েন। * * * তোমার অদেশবাসী যে সকল ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞদ্রব্যাদি দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে তোমার উৎসাহ দেওয়া উচিত। ব্রাহ্মণেরা তোমার রাজ্যে যজ্ঞ বিস্তার করিয়া তদ্দ্বারা যে সকল দেবতার অর্চ্চনা করিতেছেন, তাঁহারা তুষ্ট হইলে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবেন। অতএব তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা করা তোমার একান্ত অনুচিত।"

বেণ ক্রোধে অধীর হইয়া উত্তর দিল, "তোমরা বড় মূর্খ; তাই অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া নিন্দিতেছ। আমি সকলের অন্নদাতা স্বামী; যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা উপপতির ন্যায় অন্যের উপাসনা করে, তাহারা অতি দুষ্ট। আমাকে নৃপরূপী ঈশ্বর জানিয়াও তোমরা বৃথা করিতেছ। এই অপরাধে ইহলোকে ও পরলোকে কুত্রাপি তোমাদের মঙ্গল হইবে না। যজ্ঞপুরুষকে? যেমন কুলটা কামিনী লম্পটের প্রতি স্নেহবতী হয়, তোমরা সেইরূপ যাদৃশ প্রভুর প্রতি আস্থা ত্যাগ করিয়া, কাহাকে এই ভক্তি করিতেছ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য, সোম, পৃথিবী, জল—এই সকল ও অন্যান্য যে যে দেবতা বর ও শাপ প্রদানে সমর্থ, তাঁহারা সকলেই শরীরেই বর্ত্তমান; রাজা সর্ব্বদেব স্বরূপ; সুতরাং রাজাই ঈশ্বর; আমি সেই রাজা। তোমরা মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমারই উদ্দেশে যজ্ঞ কর এবং আমার নিমিত্ত পূজার সামগ্রী আহরণ কর। আমা ভিন্ন আর কে পূজনীয় আছে?" পাপাত্মা বেণ বিপরীত বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই প্রকার কহিলে মুনিগণ পুনর্ব্বার বিবিধ বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই উৎপথগামী দুরাত্মা সমস্ত মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল; সুতরাং মুনিগণের প্রার্থনানুসারে কার্য্য করিল না। পণ্ডিতাভিমানী বেণ এই প্রকার বারম্বার মুনিগণের অপমান করিল। মুনিগণ তখন তাহার প্রতি কুপিত হইয়া এক বাক্যে কহিতে লাগিলেন;—"এই পাপাত্মা অতিশয় দারুণপ্রকৃতি; শীঘ্র ইহাকে সংহার কর;—এ পাপটা জীবিত থাকিলে নিশ্চয় জগৎকে দগ্ধ করিবে। এ অতি দুরাচার! এটা এমনই নির্লজ্জ যে, যজ্ঞাধিপতি পরম পুরুষ, শ্রীবৎসলাঞ্ছন বিষ্ণুর নিন্দা করিল! এই অমঙ্গলমূর্ত্তি বেণ ভিন্ন অন্য কাহারও মুখে কখন ওরূপ বিষ্ণু নিন্দা শুনি নাই। এ পাপাত্মা বড়ই কুতঘ্ন। বিষ্ণুর অনুগ্রহে এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া সে বিষ্ণুরই নিন্দা করিতেছে।"

মুনিগণের ক্রোধ পূর্ব্বে গূঢ় ছিল; এক্ষণে তাহা দ্বিগুণতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিয়া বেণকে বধ করিলেন।" *

বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে ঠিক এইরূপ বিবরণই দেখা যায়; তবে বিষ্ণুপুরাণে বেণের হত্যা সম্বন্ধে একটু নূতন রহস্য প্রকটিত আছে:—

* বঙ্গবাসী শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ, ১৩।১৪ অধ্যায় দেখ।

ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে কোপামর্ষসমন্বিতাঃ।
"হন্যতাম্, হন্যতাম্ পাপঃ" ইত্যূচুস্তে পরস্পরম্ ॥
"যো যজ্ঞপুরুষং দেবং অনাদিনিধনং প্রভুম্।
বিনিন্দত্যধমাচারো ন স যোগ্যো ভুবঃ পতিঃ ॥"

ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রপূতেস্তে কুশৈর্মুনিগণাঃ নৃপম্।
নির্জ্ঘ্নুর্নিহতং পূর্ব্বং ভগবন্নিন্দনাদিনা ॥

অর্থাৎ অনন্তর সেই মুনিগণ দারুণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া "পাপাত্মাকে বধ কর" পরস্পরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—যে অধম ব্যক্তি যজ্ঞপুরুষ অনাদিনিধন নারায়ণকে নিন্দা করে, সে কখনই পৃথিবীর পতি হইতে পারে না।" এই বলিয়া তাঁহারা মন্ত্রপূত কুশদ্বারা সেই রাজাকে বধ করিলেন;—ভগবানের নিন্দা করাতে সে পূর্ব্ব হইতেই হত হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, বেণের হত্যা বিষয়ে একটু সামান্য ভিন্নতা থাকিলেও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, রাজাধম বেণ মুনিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। রাজহত্যা! বড় সামান্য কথা নহে!

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৩
ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নিহৃত্য শাশ্বতীঃ॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা ॥ ৫
সোগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥ ৭
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্যইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ৮

ইহার সংক্ষেপার্থ এই যে, এই জগৎ সংসারের রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, বরুণ, পবন প্রভৃতি দেবতাগণের অংশে রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব রাজা বালক হইলেও মহতী দেবতা জ্ঞানে তাঁহার সম্মান করা উচিত। এমন যে রাজা, তাঁহাকে মুনিগণ হত্যা করিয়া কি পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন? না, তাহা নহে; যে ভগবান মনু রাজাকে দেবতা বলিয়াছেন, তিনিই আবার সেই সপ্তম অধ্যায়ের অন্যত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াগিয়াছেন,—

মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোঽচিরাদ্ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ ॥ ১১১

যে রাজা দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ধনহরণ মারণাদি কষ্টে প্রজাবর্গকে পীড়ন করে, সে অচিরে সবান্ধবে রাজ্য ও প্রাণ হইতে বিচ্যুত হয়। সুতরাং রাজা হইলেই যে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মান্য করিতে হইবে, তাহা হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। সেই জন্য বেণ নিমি, সুদাস, নহুষ প্রভৃতি বধ ও পদচ্যুত করিয়া মুনিগণ পাপে লিপ্ত হয়েন নাই।

শ্রীঅজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলঙ্কিনী না সূর্য্যমুখী?

(১)

বালকবালিকায় প্রণয় হয় কি না জানি না, কিন্তু মদনগঞ্জের ঘোষেদের বিজয়ের সহিত ঐ গ্রামের দত্তদের সূর্য্যমুখীর বড় ভাব ছিল। বিজয় আনন্দ ঘোষের একমাত্র পুত্র, আর সূর্য্যমুখী সনাতন দত্তের একমাত্র কন্যা। আনন্দ ঘোষ ঐ গ্রামের জমীদার—বনিয়াদী বড় লোক, আর সনাতন দত্ত কলিকাতায় নানারূপ ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া নূতন বড় মানুষ হইয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে এই দত্তজের সহিত ঘোষ মহাশয়ের একটা কুটুম্বিতা করিবার ইচ্ছা জন্মিল, কারণ সূর্য্যমুখী মেয়েটি বড় সুন্দরী, তাহার উপর নূতন বড় মানুষ সনাতন দত্ত একমাত্র কন্যার বিবাহে কোন্ না দশ টাকা খরচপত্র করিবে? প্রথমে মেয়ে মেয়ে এই বিবাহের কথা উঠে, তাহার পর এক বৎসর পূজার সময় দত্তজ মহাশয় বাড়ী আসিলে এ সম্বন্ধের কথাবার্ত্তা এক প্রকার স্থির হইয়া যায়। তখন বিজয়ের বয়স বার বৎসর, আর সূর্য্যমুখী সবেমাত্র সাত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই এই দুই বালক বালিকার মধ্যে বিশেষ ভাব ছিল। তোমরা ইহাকে প্রণয় বলিবে—কি ভালবাসা বলিবে জানি না, কিন্তু আমরা কোন কথা গোপন করিব না।

(২)

সেই বৎসর পূজার পর একদিন বৈকালে দত্তবাড়ীর সম্মুখ দিয়া বিজয় চলিয়া যাইতেছিল, সূর্য্যমুখী বিজয়কে বাড়ীর সম্মুখে পাইয়া আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া আসিয়া ডাকিল—"বিজয় আয় না ভাই—খেলা করি।"

বিজয় প্রথমে একবার চারিদিক চাহিল, তাহার পর বলিল—"তোর সঙ্গেত আমার আর খেলা করতে নেই।"

সূর্য্যমুখীর প্রফুল্ল মুখখানি তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণ হইয়া গেল, সূর্য্যমুখী সেই বিষণ্ণ মুখে বলিল—"কেন ভাই; আমি কি দোষ্ করেছি?"

সূর্য্যমুখীর বিষণ্ণমুখ দেখিয়া বিজয় আগ্রহের সহিত তাড়াতাড়ী বলিল—"না সূর্য্যমুখী, তুই দোষ করবি কেন? এখন আগেকার মতন দুজনে খেল্‌লে লোকে যে নিন্দে করবে।"

সূর্য্যমুখীত এবার আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কেন নিন্দে করবে ভাই? সেদিন বামুনদের সতীশ খেলা করতে এসে, আমায় বড় মেরেছিল, মা তাই কেবল তোর সঙ্গে খেল্‌তে বলে দিয়েছে। আমাদের বাড়ীতে আয় না ভাই, মা তোকে দেখ্‌লে কত আহ্লাদ করবে এখন। আমি কেমন পুতুলের কাপড় সব আজ দুকুর বেলা রং করেছি; আমার পুতুলের সঙ্গে তোর পুতুলের বিয়ে দিবি?"

বিজয় এবার হাসিয়া বলিল—"সূর্য্যমুখি, তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে যে—তা তুই জানিস্?"

সূর্য্যমুখী তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"হাঁ, তাত আমি জানি।"

বিজয় সেইরূপ হাসিতে হাসিতে বলিল—"কি করে জান্‌লি বল দেখি।"

সূর্য্যমুখী এবার ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে

বুক ফুলাইয়া বলিল—"কেন মা বলেছে, তুমি যে আমার বর।"

বিজয়। তা বরের সঙ্গে কি খেলা করতে আছে?

সূর্য্যমুখী। কেন, আমিত তোমার সঙ্গে বরাবরই খেলা করি।

বিজয়। বরের সঙ্গে ক'নে খেলা করলে, লোকে নিন্দে করবে যে।

সূর্য্যমুখী। তবে তোকে আমি বিয়ে করবো না, আমি তোর সঙ্গে বরাবর খেলা করবো।

সে প্রস্তাব বিজয়ের কিন্তু ভাল লাগিল না, বিজয় তখন একবার চারিদিক চাহিয়া চুপিচুপি বলিল,—"তবে আমাদের বাগানবাড়ীতে চল, সেখানে দুজনে খেলা করবো এখন।"

সূর্য্যমুখী। কেন আমি কেমন আমাদের ছাতে খেলাঘর করেছি, তুই আর আসিসনে বলে আমি সে খেলাঘরে খেলিনে। সেই যে এক দিন দুজনে ঝুড় বুড় খেলেছিলুঁ; তুই বর হয়েছিলি, আর আমি ক'নে হয়েছিলুম। তুই না এলে, আমার আর খেলা হয় না; আমার আর কার সঙ্গে ভাই, খেলতে ইচ্ছে করে না।

এমন সময় সূর্য্যমুখীর ঠাকুর মা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয় তাঁহাকে দেখিয়া সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ ভোঁ করিয়া দৌড়িল, আর সূর্য্যমুখী বিস্ফারিতনেত্রে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

(৩)

সূর্য্যমুখীর ঠাকুর-মা তখন হাসিতে হাসিতে বলিল—"কি লো সূর্য্যমুখী, বরের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিলো?"

সূর্য্যমুখী তখন ছল্ ছল্ নেত্রে বলিল—"বিজয় আমার সঙ্গে খেলতে চায় না কেন ঠাকুর মা?"

সূর্য্যমুখীর ছল্ ছল্ নেত্র দেখিয়া কিন্তু তাহার ঠাকুরমার আহ্লাদের সীমা নাই; তিনি হাঁসিতে হাঁসিতে একবারে লুটিয়া পড়িতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন—"হাঁলো, তুই যে এরই মধ্যে বরের জন্যে পাগল হয়ে উঠলি!"

ঠাকুর মার কথায় সূর্য্যমুখীর বড় রাগ হইল, সে রাগ করিয়া সেই দিনই তাহার এত সাধের খেলাঘর সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিল; সেই দিন হইতে আর কাহার সহিত সূর্য্যমুখী খেলা করিত না।

(৪)

তাহার পর আবার দুই বৎসর গত হইয়া গেল। এখন সূর্য্যমুখীর জ্ঞান হইয়াছে, এখন বিজয়ের সহিত তাহার দেখা হইলে, সূর্য্যমুখী এখন আর হাসিতে হাসিতে বিজয়ের নিকট দৌড়িয়া যায় না; বিজয় তাহাকে গোপনে কোন কথা বলিতে আসিলে, বরং সূর্য্যমুখী সেখান হইতে দৌড়িয়া পালাইয়া যায়। হঠাৎ কোন স্থানে দেখা হইলে সূর্য্যমুখী এখন লজ্জায় চক্ষু দুটি অবনত করিত, আর বিজয় সুবিধা পাইলেই অমনি তাহার সেই লজ্জাবনত মুখকমলের প্রতি বক্রদৃষ্টি করিতে থাকিত।

এরূপ সুবিধা কিন্তু সকল সময় ঘটিয়া উঠিত না; সেই কারণ বিজয় অনেক সময় দত্তবাড়ীর চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইত; তত্রাচ বিনা কারণে সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রাণের সূর্য্যমুখীর সহিত দেখা করিতে পারিত না। তবে কখন সূর্য্যমুখী নিমন্ত্রিত হইয়া বিজয়দের বাড়ী আসিত, আবার কখন বিজয় নিমন্ত্রিত হইয়া সূর্য্যমুখীদের বাড়ী যাইত, কিন্তু এরূপ নিমন্ত্রণ ত আর সচরাচর ঘটিত না, কাজেই অনেক সময় বিজয়কে দত্তবাড়ীর

চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। আর সূর্য্যমুখী কি করিত? সে এখন বড় লাজুক; বিজয়কে দেখিবার ইচ্ছা হইলে সে তাহাকে কি কি দিয়া গোপনে ছাদের উপর হইতে দেখিত; আর বিজয় ব্যর্থমনোরথ হইয়া বিষণ্ণমনে গৃহে ফিরিয়া আসিত। বালিকার দুঃখ দেখিলে?

(৫)

বিজয়ের সে ঘোরাতেও সুখ ছিল, সুখ না থাকিলে সে প্রতিদিন এইরূপ কেন ঘুরিয়া বেড়াইবে? আর সূর্য্যমুখী গোপনে বিজয়কে দেখিয়াও সুখী হইত; কিন্তু এই সুখের সময় একটা দুঃখের কথা বলি শুন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সনাতন দত্তের কলিকাতায় অনেক রকম কারবার ছিল; কিজানি কেন দত্তজের সেই সকল কারবারে হঠাৎ অনেক টাকা দেনা দাঁড়াইল। তখন এক একটি করিয়া ক্রমে তাঁহার সমস্তকারবার নষ্টহইয়া গেল, তত্রাচ দেনা গেল না; কাজেই দত্তজের বিষয়সম্পত্তির উপরও টান পড়িল। এই সময় দত্তজ একবার দেশে আসিয়া আনন্দ ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আনন্দ ঘোষ শিহরিয়া উঠিলেন।

অনেক রাত্রি ধরিয়া একটা পরামর্শ হইল, কিন্তু সনাতন সে পরামর্শে সম্মত হইলেন না। ফাল্গুন বলিলেন—"আমি অধর্ম্ম করতে পারবো না, সমস্ত বেচে কিনে দেনা দেবো।"

আনন্দ ঘোষ তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তা হলে খাবে কি? তোমার স্ত্রী পরিবারের উপায় কি হবে?"

সনাতন। অদেষ্টে যা আছে, তাই হবে, তা বলে অধর্ম্ম করবো?

আনন্দ। আমি অধর্ম্ম করতে বলছি না—কারবারের দেনার জন্য সমস্ত কারবার থেকে যা হয়, পাওনদার সকলকে দিয়ে দেউলিয়া হও; আর বিষয়সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সব বেনামী করে রাখ; সকলেই ত এইরূপ করে থাকে।

সনাতন। সকলে করে করুক, কিন্তু আমি তা পারবো না।

আনন্দ বাবু এইবার বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তবে তুমি ধর্ম্ম নিয়েই থাক—তোমার বিষয় বুদ্ধি কিছুই নেই।"

সনাতন। নিলামে বিক্রি হলে মাটীর দরে বিক্রি হয়ে যাবে। তাহলে বিষয়ও যাবে, আর দেনাও থাকবে। আপনি দাঁড়িয়ে, আমার এই দায় থেকে উদ্ধার করুন; আপনি দাঁড়ালে সে বিষয়ের দরও হবে।

আনন্দ বাবু অবজ্ঞাসূচক ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আমি আর তোমার কোন সম্পর্কে থাকবো না; মনে করেছিলুম—তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে একটা কুটুম্বিতে করবো, কিন্তু আজ আমি সে সঙ্কল্পও ত্যাগ করলুম। তুমি তোমার কন্যার অন্য পাত্র স্থির করো।"

বাল্যকাল হইতে উভয়ের মধ্যে একটা বন্ধুত্বও ছিল, সেই কারণ আনন্দবাবুর কথা শুনিয়া দত্তজ মহাশয়ের মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইল। আর একটিও কথা তিনি বলিলেন না, কেবল নীরবে দুই ফোঁটা চক্ষের জল মুছিয়া বিষণ্ণমনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

কি সর্ব্বনাশ! তবে বিজয় আর সূর্য্যমুখীর দশা কি হইবে?

(৬)

কেবল ভদ্রাসন বাড়ী আর সামান্য জমী-জমা ব্যতীত সনাতনের আর কিছুই নাই। দেনা পরিশোধের জন্য সনাতনকে সমস্তই

বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। যাহার পাঁচসাত লাখ টাকা কারবারে খাটিত, আজ সে উদরান্নের জন্য লালায়িত! মা কমলা, তুমি এরূপ ধার্ম্মিক লোকের প্রতি অচলা না হইয়া চঞ্চলা হইলে কেন মা?

সনাতন কিন্তু তাহার জন্য দুঃখিত নহে, তাহার সন্তোষের কারণ—সে এখন ঋণী হইয়াছে। তবে সনাতনের দুঃখ কেবল তাহার সেই কন্যাটির জন্য। সনাতন এখন কন্যার পাত্র পাইবে কোথায়?

পাত্র অনেক পাওয়া যায় বটে; কিন্তু কন্যা পাত্রস্থ করিতে যে অর্থের আবশ্যক, সনাতনের এখনত তাহার সে সঙ্গতি নাই; সুতরাং তাহার ভাবনার কথাইত বটে। আর এক ভাবনার কথা বলি শুন। এক দিন সনাতনের গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নিকট আসিয়া বলিল—"ওগো, যেমন করে পার, বিজয়ের সঙ্গে আমার সূর্য্যমুখীর বিয়ে দাও; আর না হয় মেয়েটির হাত ধরে ঘোষেদের বাড়ীতে তুলে দিয়ে আগ। বিজয়কে আমি ছেলের মতন ভালবাসি; ওকে দেখ্‌লে এখন আমার প্রাণ ফেটে যায়।"

সনাতন তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"মা প্রাণ থাক্‌তে হবে না, তার জন্যে বৃথা অনুরোধ করোনা। গ্রহবশতঃ ধন হারিয়েছি—কিন্তু মান হারাতে পারবো না।"

গৃহিণী পূর্ব্বের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তবে কি হবে? অন্যত্রে বিয়ের কথা হলে, আমার সূর্য্যমুখীর চক্ষু দুটি অমনি ছল ছল করতে থাকে; আর তাই দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায়। আমি স্বচক্ষে গোপনে থেকে দেখেছি বিজয় এক দিন আমার সূর্য্যমুখীকে দেখে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলো। আমিও তাই দেখে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠ্‌লুম। এর কি কিছু উপায় হতে পারে না? আমি যে আর এসকল চক্ষে দেখ্‌তে পারি না।"

সনাতন দৃঢ়তার সহিত স্থিরভাবে বলিলেন—"দেখ্‌তে না পার, মেয়েটাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল; সব আপদ চুকে যাবে।"

গৃহিণী অমনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"অমন কথা মুখে আন্‌লে কি করে।"

একটা মর্ম্মবেদনায় সনাতনের তখন মস্তিষ্ক স্থির ছিল না, কিন্তু সনাতন তখনও সেইরূপ স্থিরভাবে বলিলেন—"কেবল মুখে বলা নয়, আমি স্বহস্তে সূর্য্যমুখীকে বলিদান দিতে পারি, তবুও আনন্দ ঘোষের কাছে মাথা হেঁট হতে পারি না।"

গৃহিণী আর সেখানে দাঁড়াইল না, বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। আর একজন বালিকা এই সকল কথা গোপনে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, সে গৃহিণীকে গৃহের বাহিরে আসিতে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। বালিকাটি কে?

(৭)

বালিকাটি আবার কে? সেই সূর্য্যমুখী। সূর্য্যমুখী এখন দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং যৌবনসুলভ চিক্কের পূর্ব্বভাগ এখন তাহার অঙ্গে দেখা দিয়াছে। সূর্য্যমুখীর বিবাহের জন্য এখন তাহার আত্মীয় স্বজন সকলেই উদ্বিগ্ন, কিন্তু সূর্য্যমুখী বিবাহের পরিবর্ত্তে মৃত্যুকামনা করিয়া প্রতিদিন সকল গ্রাম্য দেবতার দ্বারে দ্বারে মাথা কুঁড়িয়া থাকে। আর কি করিবে বল?

এদিকে অন্যত্রে বিজয়ের একটা সম্বন্ধও স্থির হইয়াছিল, কিন্তু বিজয় জননীকে স্পষ্ট বলিল—"মা, তুমি বাবাকে স্পষ্ট বল—আমি এখন বিয়ে কর্‌বো না; তিনি যদি এবিয়ে স্থির করেন, তবে আমি বিবাগী হয়ে ঘর থেকে চলে যাব।"

সুতরাং সে বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল। আ-

নন্দবাবু ভার্য্যার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, সনাতনদত্তের কন্যার বিবাহ না হইয়া গেলে আর তিনি পুত্রের বিবাহের কথা কোথাও উত্থাপন করিবেন না।

দুই মাস পরেই দত্তজের কন্যার পাত্র স্থির হইল। দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র কিন্তু খুব ধনবান, আর প্রথম পক্ষের কোন সন্তান সন্ততি নাই—পাত্রের বাড়ী কলিকাতায়। পাত্র স্বয়ং কর্ত্তা, স্বয়ং আসিয়া কন্যা দেখিয়া গেল; সে কন্যা দেখিয়া পাত্র মোহিত হইল, সুতরাং দত্তজের এক পয়সা ব্যয় নাই।

এরূপ পাত্র কি সনাতন ছাড়িয়া দিতে পারে? সুতরাং বিবাহের একটা দিন স্থির হইয়া গেল। যথাসময়ে গ্রামময় এ সংবাদ রাষ্ট্র হইল; তখন বিজয়ের মস্তকে যেন অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! এপর্য্যন্ত বিজয়ের আশা ছিল যে সূর্য্যমুখী তাহার ভিন্ন আর কাহারও হইবে না।

সূর্য্যমুখী কি করিবে? বালিকা সেই বিবাহের উৎসবের মধ্যে, নীরবে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে পিতার মানমন্দিরে নিজের জীবনের সকল সুখ, সকল আশাভরসা বলি দিল, সুতরাং শুভক্ষণেই হউক আর অশুভক্ষণেই হউক, সূর্য্যমুখীর বিবাহ হইয়া গেল। আর এত সূর্য্যমুখীর বিবাহ নয়—এ যেন তাহার সেই পিতার ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত হইল। এ বিবাহ যেন ঠিক্ পিতৃহস্তে ছ্যাঁড়া ভেড়া ড্যাং!

(৮)

সূর্য্যমুখীর প্রাণটাও যেন কাটা ছাগলের মত ছট্‌পট্ করিয়াছিল; কিন্তু তাহা হইতে আর কি হইবে? এখন আর তো কোন উপায় নাই। সূর্য্যমুখী এখন আর কি করিবে? প্রজ্বলিত অগ্নিরাশিতে নিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় নীরবে দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইতে লাগিল। আর সেই বিবাহের পর দিন বিজয় আজন্মজয় করিতে অক্ষম হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, কেহ জানিতে পারিল না। পিতার অতুল সম্পত্তি, জননীর অপার স্নেহ, স্বদেশের অনন্ত মায়া—কিছুতেই বিজয়কে গৃহে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। নিরাশপ্রণয়ে উত্তেজিত হৃদয় কি কখন গৃহে স্থির থাকিতে পারে?

গৃহত্যাগ করিয়া বিজয় সন্ন্যাসী হইল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যত দিন না আত্মজয় করিতে সক্ষম হইবে, তত দিন আর গৃহে ফিরিবে না। অনেক তীর্থে ঘুরিল, অনেক দেবদেবী দেখিল, কিন্তু তাহার সেই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত দেবী প্রতিমাকে আর ভুলিতে পারিল না।

(৯)

আনন্দ ঘোষের সংসারে একটা ভয়ানক বিভ্রাট পড়িয়া গেল। পুত্রশোকে বিজয়ের জননী উন্মাদিনী হইলেন। তিনি কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন বা 'বিজয় বিজয়' করিয়া চীৎকার করেন। আনন্দের সংসার এখন নিরানন্দময়, এ নিরানন্দের মূল কিন্তু আনন্দ স্বয়ং, এ কথা তিনিও মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং অন্তর্নিহিত হৃদয়ভেদী দুঃখের পরিমাণ কে করিতে পারে?

সনাতনের কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ না দিলে যে এতদূর ঘটিবে—এ কথা তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। এখন কিন্তু আর উপায় নাই। আনন্দ ঘোষের সমস্ত জমীদারী দান করিলেও যদি ইহার কোন উপায় হয়। আনন্দ তাহাতে প্রস্তুত। আনন্দের জীবন দান করিলেও কি ইহার কোন উপায় হয় না?

সূর্য্যমুখী শ্বশুরালয় হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। মদনগন্ধে আসিয়া সে বিজয়ের গৃহ-

ত্যাগের কথা সমস্ত শুনিল। সে কথা গ্রামের কেহ জানিতে বাকি ছিল না। স্ত্রী পুরুষ ভদ্র অভদ্র সকল মহলেই এই কথাটার কিছু-দিন ধরিয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল। এ কথার প্রসঙ্গে কেহ বা কাঁদিত, কেহ বা হাসিত; গ্রামে শত্রু মিত্র সকলেরই আছে। যাহারা অন্যত্র হাসিত, সেই পুত্রশোকে উন্মাদিনী বিজয়ের জননীকে দেখিলে কিন্তু তাহারাই আবার অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিত না। অনেকেই আনন্দ ঘোষকে এখন নির্ব্বোধ বলিয়া গালি দিত, কিন্তু পূর্ব্বে এ পরামর্শ তাহারা কেহই তাহাকে দেয় নাই। এই সকল আন্দোলনে সূর্য্যমুখীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইতে লাগিল। বিজয় তাহার জন্য গৃহত্যাগী—একথা সেই ক্ষুদ্র বালিকার মনে উদয় হইলে, তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইত। তাহার স্বামী প্রদত্ত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি সে প্রাণ থাকিতে কখন ব্যবহার করিতে পারিত না। সূর্য্যমুখী গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও তাহার মন কিন্তু বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে কাহার কাছে কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না; মনে মনে দিবারাত্রি সূর্য্যমুখী বিজয়ের বিষয় ভাবিত; অনেক সময় স্বপ্নে বিজয়কে দেখিতে পাইত, অনেক সময় 'বিজয়—বিজয়' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। সে সময় যে নিকটে জাগ্রত থাকিত, সেই শিহরিয়া উঠিত!

(১১)

এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। সূর্য্যমুখী এখন শ্বশুরালয়েই থাকে; কিন্তু মেঘানে থাকিলেও বিজয়ের সংবাদ লইতে ভুলিত না। বিজয় আর দেশে ফিরিয়া আসিল না। সনাতন পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করিয়া আপনার অবস্থার উন্নতি করিল, কিন্তু বিজয় আর দেশে ফিরিয়া আসিল না। আনন্দ ঘোষ মনে মনে ভাবিত, সকলের সকল হইল, কেবল তাহার বিজয় আর দেশে ফিরিয়া আসিল না। ঘোষজের এ মর্ম্মান্তিক দুঃখ রাখিবার স্থান আছে কি?

দত্তজের সুখের সংসারেও দুঃখ দেখা দিল; দুঃখকে কেহ নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে না। একদিন দিবা দুইপ্রহরের সময় দত্তজের গৃহ হইতে একটা ক্রন্দনের রোল শোনা গেল। সে হৃদয়বিদারক ক্রন্দনের ধ্বনি যে শুনিল, সেই তাহার কারণ জানিবার জন্য দত্তবাড়ীর দিকে ছুটিল। তাহার কারণ আর কিছুই নয়—সূর্য্যমুখীর কপাল পুড়িয়াছে—সূর্য্যমুখী এই বয়সেই বিধবা!

(১২)

সূর্য্যমুখী বিধবা হইল বটে, কিন্তু সূর্য্যমুখী এখন অতুল ধনের অধিকারিণী। তাহার স্বামী মৃত্যুকালে অনেক সম্পত্তি রাখিয়া মরিয়াছিল, সে সকল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া সূর্য্যমুখীর প্রথম কার্য্য হইল তীর্থভ্রমণ। সূর্য্যমুখী ভারতের কোন তীর্থ বাকী রাখিল না; কিন্তু তাহার সে তীর্থ ভ্রমণের কোন ফলই হয় নাই; কারণ সে দেবদেবী দর্শনেচ্ছায় তীর্থে তীর্থে অন্য কাহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত। সে যাহার অন্বেষণ করিত, এই তেত্রিশ কোটী দেব-তার মধ্যে সেই দেবতাই কিন্তু তাহার ইষ্টদেব!

সকল তীর্থ ঘুরিয়া শেষ সূর্য্যমুখী বিজয়কে দেখে ফিরিয়া আসিল। একদিন কালীঘাটে কালী বাড়ীর মধ্যে সূর্য্যমুখী প্রবেশ করিয়াছে এমন সময় সম্মুখে লাট-মন্দিরে দেখিল—তাহার ইষ্টদেব—সন্ন্যাসীবেশে ইষ্টদেব!

সূর্য্যমুখীর আর কালী মন্দিরে প্রবেশ করা হইল না। সঙ্গিনিগণ কালিদর্শন করিতে গেল, কিন্তু সূর্য্যমুখী অমনি ধীরে ধীরে কম্পিতহৃদয়ে লাটমন্দিরে গিয়া উঠিল। কেন যে সে সময় মূর্চ্ছিতা হইল না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

(১৩)

সূর্য্যমুখী তাহার পর সেই সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া ভক্তিসহকারে তাহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী বিস্মিতনেত্রে অনেকক্ষণ সূর্য্যমুখীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। কেহ দেখিতে পাইল কি না জানি না, কিন্তু আমরা দেখিয়া ছিলাম সে সময় সেই সন্ন্যাসীর নয়নপ্রান্তে দুই ফোঁটা অশ্রুজল!

সূর্য্যমুখী গললগ্নবাসে ভগ্নকণ্ঠে বলিল,—"প্রভো! এ হতভাগিনীকে চিনতে পারেন কি?"

সেই দুই বিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—"চিনিয়াছি, আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্মে যেন তোমার মতি অচলা থাকে।"

সূর্য্যমুখী এইবার বলিল—"আজ একবৎসর ধরিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাবার জন্য তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—অনেক কষ্টে আজ দর্শন পেলেম।"

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আমার জন্য তোমার তীর্থভ্রমণ! কেন—আমি তোমার কে?"

সেই বিজয়ের মুখে এই কথা! সূর্য্যমুখী ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে বলিল—"আপনি এই হতভাগিনীর জন্যই গৃহত্যাগী হয়েছিলেন, আমি আপনাকে অনুসন্ধান না কর্‌লে আমার ধর্ম্ম থাকিবে কেন?"

সন্ন্যাসী তখন দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"যে নারী

মনে মনে পরপুরুষের বিষয় চিন্তা করে, তাহার অনন্ত নরক হয়। যে এক সময় তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল, তোমার স্বামীর মৃত্যুর পরেই তুমি তাহার অনুসন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ, সুতরাং তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠা আর কে আছে? আমি—এক দেবী প্রতিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করে, গৃহত্যাগী হয়েছিলুম, এত দিন যেখানেই থাকি, সেই দেবীপ্রতিমাই পূজা করে আস্‌ছি। আমি জানতুম্ সে দেবী, এখন—"

সেই সময় সূর্য্যমুখী বলিল—"প্রভো, সূর্য্য-মুখী কোন কালেই দেবী নয়, সূর্য্যমুখী বরাবরই মানবী। সূর্য্যমুখী তোমার আজন্ম দাসী।"

সন্ন্যাসীর মুখ হইতে তখন বজ্র গম্ভীর শব্দ হইল—"সূর্য্যমুখী কলঙ্কিনী!"

উন্মাদিনীর ন্যায় সূর্য্যমুখী ও চীৎকার করিয়া উঠিল—"কলঙ্কিনী না সূর্য্যমুখী?"

পুনরায় সেইরূপ গম্ভীরশব্দ হইল—"কলঙ্কিনী।"

সূর্য্যমুখীর মাথায় যেন বজ্রাঘাৎ হইল; এবার কিন্তু সূর্য্যমুখী বিনীতস্বরে বলিল—"আমি আজীবন তোমারই চরণধ্যান করে আস্‌ছি, তোমাকেই আমার ইষ্ট দেব মনে করে প্রতিদিন পূজা করি। তোমার সম্মুখে সত্য করিতেছি—এ হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য কেহ স্থান পায় নাই। আর তোমার মুখেই শুনলাম, তুমি এখনও আমায় চরণে স্থান দিয়া রেখেছ। অন্যে বলে বলুক—তুমি আমায় কলঙ্কিনী বলো না। তুমি অন্তর্যামী তুমি আমার হৃদয় জান, তুমি আমায় কলঙ্কিনী বলো না। আমি অন্তর্যামীর নিকট কলঙ্কিনী নই।"

পুনরায় সেই গম্ভীরস্বরে বিজয় বলিল—"সূর্য্যমুখী, এখন তুমি সকলের নিকটেই কলঙ্কিনী।"

বার বার তিনবার! সে ক্ষুদ্র প্রাণে আর কত সহ্য হইতে পারে? সূর্য্যমুখী সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে

তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ী তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতে গিয়া দেখিল সূর্য্যমুখীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে! তখন সেই মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া সন্ন্যাসী কাঁদিয়া আকুল হইল। কিন্তু একবার সজল নয়নে সন্ন্যাসী সেই মৃত্যু বিবর্ণীকৃতমুখ খানির প্রতি চাহিয়া দেখিল যে সে মুখ তখন হাসাময়ী!

সন্ন্যাসীর অবশিষ্ট জীবন কঠোর সাধনায় অতিবাহিত হইল। সে সাধনার মূলমন্ত্র ছিল—"কলঙ্কিনী না সূর্য্যমুখী?"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আকাশে তড়িৎ।

(৩)

ঝড়ের সময় বজ্রাঘাতের কারণ।

কঠিন ও তরল পদার্থের আভ্যন্তরীণ অংশসমূহ কখন তড়িৎ ধর্ম্মাক্রান্ত হয় না। আক্রান্ত হইলে দ্রব্যের আচ্ছাদনে তড়িতের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত একটী ফাঁপা গোলক তড়িদ্বান হইলে, অভ্যন্তরে তড়িতের কোন ক্রিয়া হয় না। কিন্তু বায়ু ও বাষ্পের প্রকৃতি ভিন্ন রূপ। বহুসংখ্যক পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র অংশ সমূহের একত্রীকরণে উৎপন্ন বলিয়া ইহাদের সমস্ত স্থলেই তড়িদ্বান হইতে পারে। কোন গৃহে তড়িৎ যন্ত্রের কার্য্য হইলে, ঐ গৃহের বায়ুরাশি তড়িদ্বান হইয়া উঠে। এই প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে যে বায়বীয় তড়িতের বাষ্প নিঃসরণ একটী প্রধান কারণ। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে সর্ব্বদা বাষ্প নিঃসরণ হওয়াতে মেঘমালা অত্যধিক পরিমাণে তড়িৎশক্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বায়ু অপেক্ষা জল তড়িতের উত্তম পরিচালক। বায়ুমণ্ডলে বহুসংখ্যক জলকণা ভাসমান রহিয়াছে। ইহারা শীঘ্র তড়িদ্বান হইয়া উঠে। লর্ড র‍্যালি পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে জলবিন্দু সমূহ তড়িদ্বান হইলে পরস্পর একত্র হইবার নিমিত্ত আকৃষ্ট হয়। এইরূপ আকর্ষণ হেতু পরস্পরের সংঘর্ষণ হইলে তড়িদ্বান জলকণা সমূহ বিপ্রকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রূপে তড়িৎ দ্বারা সামান্য বৃষ্টি বা পসলার উৎপাদক হওয়া অসম্ভব নহে।

মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী সমস্ত দ্রব্যকেই আপনার কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। এই আকর্ষণের কখন বিরাম হয় না। জলকণা সমূহ আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইতে থাকে। ইহারা আবার তড়িদ্বান বলিয়া পরস্পর আকৃষ্ট হয়। এই রূপে অনেক গুলি ক্ষুদ্র জলকণা একত্রিত হইয়া একটী বৃহৎ জলগোলক বা ফোঁটা উৎপন্ন করে। প্রত্যেক জলকণার তড়িৎ এক্ষণে গোলকটীর বহির্দেশে একত্রিত্ হইল। ইহাতে গোলকের আবরণে তড়িতের ঘনত্ব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু মোট তড়িৎ শক্তির বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং কেবল আবরণের তড়িৎ ঘনীভূত হয় বলিয়া ঘনত্বের সমানুপাতে বৈদ্যুতিক প্রভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না।* একটী উদাহরণ দ্বারা বিষয়টী আরও বিশদ করা যাইতে পারে। মনে করুন, চৌষট্টীটী জলকণার একত্রীকরণে একটী বড় ফোঁটার উৎপত্তি হইল। প্রত্যেক জলকণা তড়িদ্বান; ইহাদের প্রত্যেকের তড়িৎপরিমাণ এক ধরিলে, উৎপন্ন গোলকটীর আবরণে তড়িৎপরিমাণ চৌষট্টী ধরিতে হইবে। কেননা সমস্ত তড়িতই গোলকের উপরিভাগে একত্রিত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক জলকণার ব্যাসার্দ্ধ এক ধরিলে, উৎপন্ন গোলকের ব্যাসার্দ্ধ চৌষট্টী গুণ অধিক না হইয়া কেবল মাত্র চারি গুণ অধিক হইবে। আরও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে গোলকের ব্যাসার্দ্ধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে; বৃদ্ধির সমানুপাতে তড়িৎধারকতা শক্তিরও বৃদ্ধি হয়। এই এই নিমিত্ত তড়িৎধারকতা শক্তি চারি গুণ অধিক হইল। এক্ষণে তড়িৎ পরিমাণ বা চৌষট্টীকে ধারকতা শক্তি বা চারি দ্বারা ভাগ করিলে বৈদ্যুতিক প্রভাবের পরিমাণ ষোড়শ জানিতে পারা গেল। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইল যে ঘনত্বের বৃদ্ধির সমানুপাতে বৈদ্যুতিক প্রভাব বৃদ্ধি হয় না।

একখানি মেঘে ঐ রূপ কত জলকণা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অতীব দুরূহ। এই সকল কণা একত্রিত হইলে, মেঘের নিম্নভাগে তড়িৎ শক্তির আধিক্য ঘটিয়া থাকে। এই মেঘের তড়িৎ-সঞ্চারণ-ক্রিয়া

* বৈদ্যুতিক প্রভাব বস্তুতঃ ঠিক কার্য্যকরী শক্তি নহে। ইহাকে বরং কার্য্য বলা যাইতে পারে। ইংরাজীতে ইহাকে Electrostatic Potential বলে। অসীম দূরত্ব হইতে সংযোগে তড়িতের "এক"কে (unit) কোন স্থানে আনিতে হইলে যে কার্য্য করিতে হয়, সেই কার্য্যই সেই স্থানের বৈদ্যুতিক প্রভাব।

দ্বারা ভূপৃষ্ঠের সাম্যাবস্থার তড়িৎকে বিভাগ করিয়া পৃথিবীর উপরে বিষম তড়িৎ আকর্ষণ করে। ভূপৃষ্ঠ এই সময় ঠিক সংগ্রাহক পাতের (condensing plate) ন্যায় কার্য্য করে। এই রূপে ভূপৃষ্ঠে তড়িতের প্রভাব ক্রমাগত অধিক হয়। ভিন্ন প্রকৃতির তড়িৎ স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়। মেঘের ও পৃথিবীর তড়িৎ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং এই উভয় তড়িৎ-মধ্যবর্ত্তী বায়ুরাশী ভেদ করিয়া পরস্পর মিলিত হয়। এই মিলনের ফলস্বরূপ আমরা যে আলোক দেখিতে পাই, তাহাকে বিদ্যুৎ বলিয়া থাকি। আর অল্প পরেই যে ভীষণ নিনাদ শ্রবণগোচর হয়, তাহাই বজ্র-নির্ঘোষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। (১)

এই তড়িৎ সংযোগে মেঘের আবরণের তড়িতের সহিত মিলিত হয়। মেঘের অন্যান্য স্থানের তড়িৎ এক্ষণে তড়িৎশূন্য অংশসমূহের উপর কার্য্য করিয়া আভ্যন্তরীণ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই কারণে বজ্রমেঘের নিম্নদেশ ঈষৎ চেপ্টা ও ঊর্দ্ধাংশ ক্রমাগত তড়িৎ পরিচালনের নিমিত্ত স্ফীত দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদ্যুতের গতি ও আকৃতি।

বায়ুমণ্ডলে নানারূপ দ্রব্য অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি তড়িৎ পরিচালক। কতকগুলি তড়িৎ প্রতিরোধক। শূন্য কি অন্তরায়বিহীন স্থান বিদ্যুতের সরলরৈখিক গতি। কিন্তু তড়িৎ প্রতিরোধক দ্রব্যাদির ব্যবধান থাকিলে, গতির পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপ দিক-পরিবর্ত্তনের কারণ অদ্যাপি নিশ্চয়রূপে জানা যায় নাই। বোধ হয় প্রতিরোধক দ্রব্য দ্বারা সরলরৈখিক গতি হইতে হঠাৎ দিক পরিবর্ত্তিত হইয়া বিদ্যুৎ সমুখীন সহজপথে গমন করে। যে পথে

পরিচালক দ্রব্যই অধিক, সেই পথই সহজ পথ।

অ্যারাগো তিন প্রকারের বিদ্যুৎ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ চারি প্রকার বিদ্যুতের উল্লেখ করিয়া থাকেন। ১ম। আঁকা-বাঁকা বা চিম্‌টাসদৃশ। ইহাই সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বায়ুতে অপরিচালক কঠিন অংশের অস্তিত্ব বা দূরবর্ত্তী স্থানের তড়িৎশক্তির আকর্ষণ বশতঃ বিদ্যুতের এইরূপ আকার হইয়া থাকে। ২য়। আবরণবৎ আকৃতি। মেঘ হইতে সহসা তাড়িতালোক নির্গত হইয়া সমস্ত আকাশকে যেন একবারে আলোকিত করিয়া তুলে। বোধ হয়, আকাশের কোন দূরবর্ত্তী স্থানে সংঘটিত বিদ্যুতের প্রতিবিম্ব পড়ে; এইরূপে আকৃতির উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। ৩য়। উচ্চ বা গ্রীষ্মকালীন বিদ্যুৎ। এই প্রকার বিদ্যুতের আলোক অত্যন্ত ক্ষীণপ্রভ। ইহার পরে বজ্র পতনের শব্দ শুনিতে কর্ণগোচর হয় না। যে দিন অত্যন্ত উষ্ণতা অনুভব করা যায়, সেই দিবসের অবসান কালে বিদ্যুৎ হইতে থাকিলে দিঙ্মণ্ডলের সমীপবর্ত্তীস্থানে ইহা দৃষ্টিগোচর হয়। বোধ হয় দিঙ্মণ্ডলের নিম্ন স্থানের বিদ্যুতালোক আকাশে প্রতিফলিত হইলে ইহার উৎপত্তি হয়। ৪র্থ। গোলকবৎ। ইহা দেখিতে ঠিক গোলকের মত। মেঘ হইতে পৃথিবীর দিকে ধীরে ধীরে নামিতে থাকে। পরিমধ্যে হঠাৎ ভীষণ নাদে বিদীর্ণ হইয়া যায়। কখন কখন ভূমিতলে পতিত হইয়া রবারের বলের ন্যায় পুনরায় লাফাইয়া উঠে; এইরূপ বিদ্যুৎ অতি অল্পই দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না। তড়িজ্জনক যন্ত্রের স্ফুলিঙ্গ কখন কখন এইরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে। ব্যাভালো প্রবল তড়িদ্যান লিডেন বোতলে সংযুক্ত তাম্রতারের উপর দিয়া এইরূপ গোলককে উঠিবার ও নামিবার সময় বিদীর্ণ হইতে দেখিয়াছিলেন। প্রাস্টে তাঁহার যন্ত্র হইতে এইরূপ গোলক উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ।

কবি।

ধীরে চলে ফিরে চায়,
যা দেখে তা দেখে আঁখিভরে,
আঁখি দিয়ে প্রাণ পায়।
আঁখি দিয়ে মধু পান করে,
নয়ন প্রথমময় তার,
কখন সে মুখে সবাকার।

ফুল ফুল সুখকর,
বনের বিনোদ-অলঙ্কার
হাসে হাসি মনোহর
মুখখানি দেখিয়া সবার,

মনের আকৃতি যত আছে—
কহে সবে সখাটির কাছে।
চির শিশু জ্ঞানবান
পরিপূর্ণ সারলো জগৎ,
সুচিন্তায় উজ্জ্বল ধেয়ান
কার্য্যগুলি পবিত্রতাময়,
বসুধায় কেহ নাহি পর,
সদা পূত নির্ম্মল অন্তর।

ভাবে ভোর অবিরল,
ছন্দে করে জীবন প্রদান,

চিত্ত তাহেতেই বিনির্ম্মল
ভাষা পায় অভিনব প্রাণ
মর্ত্তভাব ছাড়ি চিন্তা রাশি
অনন্তের পথে যায় ভাসি।

আত্মার-কলক-হর মালা
স্নেহোপরে হয়ে প্রসারিত
করে চিত্তে বিশ্বপ্রেমে আলা
বিশ্ব হয় প্রেমে পুলকিত

তুমি কবি প্রতিভা-আধার
প্রণিপাত চরণে তোমার।

অমৃতময় সংস্কৃতি তোমার
বিরাজে তীর্থের পবিত্রতা,
দেব তুমি সংসার মাঝার
ঢাল প্রাণ বিনাশি জড়তা;
দেব! তব সংগীত শুনিয়া
শোক তাপ যায় পলাইয়া।

শ্রীগোনোয়ারীলাল গোস্বামী।

ঠাকুর বংশ।

(২)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১৫৮৬ শকাব্দা। কূটনীতিজ্ঞ মোগল-সম্রাট আরঙ্গেব যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, যখন বীর কুলশেখর শিবজী মহারাষ্ট্রভূমে অসীম ভুজবীর্য্য প্রকাশ করিয়া দিল্লীর ময়ূরাসন বিকম্পিত করিতেছিলেন, যে সময় সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত, যে সময় নাটোরের সৌভাগ্য সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কাল, যে সময়ে ময়মনসিংহ ও মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারিগণ রাজসাহীর অধীন "কড়ুই", ও "খাঁকইর" গ্রামে বাস করিতেন, সেই ১৫৮৬ শকাব্দায় গুণচন্দ্র ঠাকুরের পরলোক গমনের পর তদীয় দ্বিতীয় পুত্র মহাত্মা শ্রীজগৎ ঠাকুর বা রাঘবেন্দ্রঠাকুর এবং তৃতীয় পুত্র সাধকশ্রেষ্ঠ কাশীনাথ ঠাকুর পৈত্রিক সম্পত্তি ও শিষ্যাদির অধিকারী হন। তাঁহারা যে কেবল পিতার ধনাধিকার করিয়াছিলেন এমত নহে, মহাপুরুষ গুণচন্দ্র ঠাকুরের সর্ব্বপ্রকার গুণেরও অধিকারী হইয়া ছিলেন। "আকরে পদ্মরাগানাং জন্ম কচে মনেঃ কুতঃ"—পদ্মরাগ মণির আকরে কখনও কাচ জন্মে না—এই প্রসিদ্ধ বাক্যের সার্থকতা উভয় ভ্রাতাতেই পরিলক্ষিত হইত। কনিষ্ঠ কাশীনাথ ঠাকুর সর্ব্বদা সাধনেই লিপ্ত থাকিতেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ রাঘবেন্দ্র ঠাকুর ঐহিক পারত্রিক উভয় কার্য্যেই তুল্য ক্ষমবান ছিলেন।

তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, শীঘ্রই মহাত্মা গুণচন্দ্র ঠাকুরের অভাবশোক শিষ্যবৃন্দ ও আত্মীয়গণের অন্তর হইতে বিদূরিত করিয়া ছিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাঘব ঠাকুরের পাঁচ পুত্র ও আট কন্যা। প্রথম পুত্র কৃষ্ণদেব বাচস্পতি, দ্বিতীয়, হরিদেব ঠাকুর, তৃতীয় কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর, চতুর্থ গঙ্গাধর বাচস্পতি এবং পঞ্চম মহাদেব ঠাকুর।

রাঘব ঠাকুর বারেন্দ্রকুলের আটঘটীতে আটটী কন্যাদান করেন ও বহুকুলীনের কুলো-

ছার করিয়া কুলশাস্ত্রে আটপটীর "মুপ" নামে অভিহিত হন। কুলশাস্ত্র বিশারদগণ তাঁহাকে "সার্ব্বস্বাত্মিক" পদ প্রদান করেন। সেই সার্ব্বস্বাত্মিক পদের গৌরবে বারেন্দ্র কুলতিলক রাঘব ঠাকুরের বংশধরগণকে অনেক দিন পর্য্যন্ত পটা-ন্তর দোষে লিপ্ত হইতে ও কাপ ব্যবধান দিতে হয় নাই।

রাঘব ঠাকুর বহু জলাশয় খনন ও অনেক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "পঞ্চমুণ্ডী আসন" * যুক্ত ইষ্টক নির্ম্মিত বৃহৎ বাঙ্গলা বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার বংশ-ধরগণের অযত্নে ঐ বাঙ্গলার উপরে বৃক্ষাদি জন্মিয়া সেই পুরাতন কীর্ত্তি লোপ করিয়াছে। এখনো তাহার ভগ্নাবশেষ বিষধরগণের আবাস স্থান।

রাঘব ঠাকুর অতি সুপণ্ডিত, কার্য্যক্ষম, দয়ালু, সুধীর, দাতা এবং সাধক ছিলেন। যে সকল গুণের পূর্ণবিকাশে মনুষ্য দেবসম্মান লাভের অধিকারী হয়, রাঘব ঠাকুরে তাহার কোনটীরই অভাব পরলক্ষিত হইত না। তাঁহার ঐ সমস্ত দেবোপম গুণে শিষ্য সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তিনি দেশগুরু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সুবিখ্যাত নাটোরাধিপতি "রায় রাঘা" রঘু-নন্দন এবং মহারাজা রামজীবন যখন পুঁটীয়ায় ছিলেন, যখন তাঁহাদের ভাবী সৌভাগ্য অদৃষ্টের অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন ছিল, যখন তাঁহারা সামান্য ব্রাহ্মণ পরিচয় মাত্র ছিলেন, তখন তাঁহারা উভয় সহোদরে মহাত্মা রাঘঠাকুরের গুণকীর্ত্তন

* পঞ্চমুণ্ডী আসন—তন্ত্রোক্ত সাধনের প্রধান স্থান। গুপ্ত দ্রব্যাদি দ্বারা বহু আয়াসে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধক ভিন্ন অন্যের ঐ আসনে বসিবার অধিকার নাই।

শুনিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের আশ্রয়ে পাকুড়িয়া গ্রামে উপনীত হন। সেই সর্ব্ব গুলক্ষণাক্রান্ত ভাতৃদ্বয়ের পবিত্র স্বভাব এবং অমায়ার ভক্তি রাঘব ঠাকুরের স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হইল। তিনি শুভদিন নির্দ্ধারণ করিয়া ভাতৃ-দ্বয়কে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। প্রবাদ আছে, রঘুনন্দন ও রামজীবনের দীক্ষাকালে হোমাগ্নি উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধোত্থিত হইয়াছিল। রাঘব ঠাকুর এই শুভ লক্ষণ দেখিয়া শিষ্যদ্বয়ের ভাবী সৌভাগ্য নির্ণয় করিয়া-ছিলেন।

দীক্ষার পর রঘুনন্দন ও রামজীবন কায়-মনোবাক্যে গুরু সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের অকপট ভক্তি এবং অক্লান্ত গুরু শুশ্রূষা ভাবী সৌভাগ্যের বীজ রোপণ করিল। শত শত ধনবান সম্ভ্রান্তশিষ্য বিদ্যমানেও দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানদ্বয় রাঘব ঠাকুরের অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিল। শিষ্যদ্বয়ের কল্যাণার্থ তিনি মহান দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। মহাতপা রাঘব ঠাকুরের সে উদ্যম ব্যর্থ হইল না। "নচ দৈবাৎ পরং বলম্"—অত্যল্প দিনের মধ্যেই অভাবনীয়রূপে রঘুনন্দন বঙ্গ-বেহার উড়িষ্যার নবাবের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন এবং কনিষ্ঠ রামজীবন অর্দ্ধবঙ্গের রাজরাজেশ্বর হইয়া নাটোরে রাজ-ধানী স্থাপন করিলেন।

নাটোরের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাকুড়ি-য়ার সৌভাগ্য শতগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অদ্ধবঙ্গেশ্বরের ঠাকুর বলিয়া মোহন মিত্রের বংশ প্রসিদ্ধ "পাকুড়িয়ার ঠাকুর" আখ্যায়

* রঘুনন্দনের অভাবনীয় উন্নতির জন্য "রঘুনন্দনী বাড়" বলিয়া লোকে উচ্চের উপমা দিয়া থাকে। নাটোরের সৌভাগ্যোদয়ের বিবরণ অন্যান্য গ্রন্থে আছে বলিয়া আমরা তাহা হইতে বিরত থাকিলাম।

প্রচারিত এবং পাকুড়িয়ার ঠাকুরগণ জগদ্গুরু নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

নাটোরের সৌভাগ্য সূর্য্য উজ্জ্বলকিরণে উদ্ভাসিত হইলে মহারাজা রামজীবন রাঘব ঠাকুরকে এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়া-ছিলেন, সুতরাং রাঘব ঠাকুর ধনে মানে কুলে শীলে বারেন্দ্র সমাজের অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

যখন নাটোরের অদৃষ্টচক্র অপ্রতিহত প্রভাবে অর্দ্ধবঙ্গ গ্রাসি করিতেছিল, সেই সময় রাজসিংহের জমিদার বংশের আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৌধুরী রাঘব ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলে, যে সময়ে মহারাজা রামজীবন সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তিবলবে বঙ্গের প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারীর ভূসম্পত্তি স্বরাজ্যভুক্ত করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্বীয় বিপুল সম্পত্তি রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী রাঘব ঠাকুরের দয়াপ্রার্থী হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এ অমূলক কিম্বদন্তী বিশ্বাসযোগ্য নহে। রাঘব ঠাকুরের অসাধা-রণ তপঃপ্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণচৌধুরীকে ভক্তি প্রণোদিত করিয়াছিল।

রাঘব ঠাকুর ক্রমে স্বীয় নিঃস্ব আত্মীয়গণকে গুরুদ্বয়াতে আনিয়া বসতি করাইয়াছিলেন; তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই হইতে পাকুড়িয়া গ্রামে ব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে-ছিল। কালক্রমে ঠাকুরবংশের অনুগ্রহে বেত্রবতী, শর্ম্মা, সন্যাল, বাগচী, ভাদুড়ী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণও পাকুড়িয়ার সমাজ অধিবাসী মধ্যে পরিগণিত হন। সম-বসিসহৃদ ডোহাখোলার সান্যাল জমিদারগণ এবং সাবনা-হরিপুরের মৈত্রেয় জমিদারগণ পূর্ব্বে পাকুড়িয়ায় বাস করিতেন, ঠাকুর বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা এবং অন্যান্য অনেক উচ্চবংশীয় ব্যক্তি পাকুড়িয়া ত্যাগ করিয়া ভিন্ন স্থানে বাস করিয়াছেন।

রাঘব ঠাকুরের পাঁচ পুত্র মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মহাদেব ঠাকুরকে মহাত্মা কাশীনাথ ঠাকুর নিঃসন্তান হইলেও সংসার বৈরাগ্যহেতু দত্তক পুত্র-গ্রহণে অভিলাষী ছিলেন না। কিন্তু জ্যেষ্ঠ রাঘব ঠাকুর আজ্ঞাইতিমধ্যে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যে কারণে রাঘব ঠাকুর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিশেষ যত্নে বাধ্য করিয়া পৌষ আত্মজকে দত্তক প্রদান করিয়াছিলেন, সে অলৌকিক প্রসিদ্ধ ঘটনা বিখ্যাত কাশীনাথ ঠাকুরের জীবনী মধ্যে বিবৃত হইবে।

রাঘবঠাকুর তপঃপ্রভাবে এবং প্রতিভাবলে যশোমণ্ডিত সুদীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিয়া উননবতিবর্ষ বয়ঃক্রমে গঙ্গা যাত্রা করেন এবং অত্যল্পকাল গঙ্গাতীরে (বড় নগরে) বাস করিয়া ভাগীরথীর পবিত্রসলিলে নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া অনন্ত ধামে গমন করেন। তাঁহার অন্তিম সময়টী সুধীজীবনাভিনয়ের শেষ অঙ্কের শোকপূর্ণ গম্ভীর দৃশ্য। ঐরূপ মহান দৃশ্য অতি বিরল। যথানিয়মে পরলৌকাস্তি মহাত্মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গঙ্গাতীরেই সম্পন্ন করিয়া, কাশীনাথ ঠাকুর জাতুষ্পত্রাদিসহ পাকুড়িয়ায় প্রত্যাগত হইলেন। রাঘবঠাকুরের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে মহা সমারোহে দানসাগর ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল।" স্বয়ং যিনি লক্ষাধিপতি অর্দ্ধবঙ্গেশ্বর মহারাজা রামজীবন প্রভৃতি যাঁহার শিষ্য, সাক্ষাৎ শঙ্করতুল্য কাশীনাথ যুঁহার অনুজ, যিনি ইন্দ্রতুল্য পুত্র-গণ এবং কন্যা জামাতা বহু আত্মীয় বিদ্যমান রাখিয়া বৃদ্ধ শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার 'দানসাগর' ক্রিয়া যে সর্ব্বাঙ্গ

সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি?

মোহন মিশ্রের পবিত্রবংশে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিলেও রাঘব ঠাকুরের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন অসাধারণ পুরুষ আর কেহই লক্ষিত হয় নাই। মোহন মিশ্র হইতে যে ঠাকুরবংশরূপ বিশাল মহীরুহের উদ্ভব হইয়াছিল, রাঘব ঠাকুর তাহার স্কন্ধ। রাঘব ঠাকুরের পঞ্চ পুত্র হইতেই বরিয়া ও পাকুড়িয়া এই উভয় গ্রাম ঠাকুরবংশে পূর্ণ হইয়াছিল। বহুপুরুষ-পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মা রাঘব ঠাকুরের পবিত্র নাম তদ্বংশীয়গণের এই শোচনীয় অবস্থাতেও প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। সর্ব্বদা কথাচ্ছলেও সেই পবিত্র নাম পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

কাশীনাথ ঠাকুর।

ঐ যে শিরোভাগে মহাতপোবলসম্পন্ন পুরুষ-প্রবরের নাম দেখিতে পাইতেছ, উনিই মহাপুরুষ মোহন-মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ ঠাকুর। ইঁহার অলৌকিক সাধনশক্তিই ঠাকুর বংশকে মহামহিমান্বিত করিয়াছিল। কাশীনাথ ঠাকুর তত্ত্বজ্ঞানের সম্যক অপরিস্ফুট সময়ে পিতামাতার বহু দার পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি সংসারাসক্ত হন নাই। বাল্যাবধিই তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ ও দয়ার ভাগ প্রবল ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন মহাসাধক হইয়া উঠিলেন। বিষয়ের ভোগবিলাস তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে নাই। কেবল সংসারী বলিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে অপরিহার্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। দিবসের অধিকাংশসময়ই তাঁহার ইষ্টপূজা হোম সাধ্যাদি ইষ্টকার্য্যেই অতিবাহিত হইত। প্রত্যহ সায়ংকালে দেবীমণ্ডপের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তথায় অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত মহাযোগে নিমগ্ন থাকিতেন। সাংসারিক কোন প্রকার বিঘ্ন বিভীষিকা তাঁহার সেই প্রাত্যহিক উপাসনায় বাধা জন্মাইতে পারিত না। তাঁহার অসামান্য তপঃপ্রভাবে সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ কাশীনাথ বলিয়া মনে করিত। কাশীনাথ ঠাকুর যে কাষ্ঠাসনে বসিয়া উপাসনা করিতেন, সেই আগমোক্ত পবিত্র কাষ্ঠাসন অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক প্রতিদিন বিধিমত গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছে; এবং সম্প্রতি সেই আসন চন্দনচর্চ্চিত ও বস্ত্রবেষ্টিত হইয়া দেবীমণ্ডপে সংস্থাপিত রহিয়াছে।

কাশীনাথ ঠাকুর ১৬১৩ শকে দেবীমণ্ডপের স্থানে কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টকময় একটী সুবৃহৎ বাঙ্গলা নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে আগমোক্ত "পঞ্চমুণ্ডী" আসন স্থাপনা করেন। দুইশত বৎসরেরও পূর্ব্বের সেই কীর্ত্তি অদ্যাপি কাশীনাথ ঠাকুরের নাম প্রদীপ্ত রাখিয়াছে। কালের কঠোর তরঙ্গাভিঘাত আজিও সে বাঙ্গালার বিশেষ কোন অপচয় করিতে পারে নাই। বিগত ১২৯২ সনের আষাঢ়াদি মাসের উপর্য্যুপরি ভীষণ ভূকম্পনেও সেই বাঙ্গালা অক্ষত রহিয়াছে। তৎকালে স্থাপত্য বিদ্যার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল এই প্রসিদ্ধ বাঙ্গালাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অধুনে ঐ বাঙ্গালার ছাদে কয়েকটী বৃক্ষ জন্মিয়াছে বলিয়াই সন্দেহ নচেৎ এ মন্দির আরও দুইশত বৎসর যে, অক্ষত থাকিতে পারিত তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐ পুরাতন বাঙ্গালার প্রবেশ দ্বারের উপর ভিত্তি সংলগ্ন ইষ্টক ফলকে যে শ্লোকটী খোদিত আছে, তাহা বহুযত্নে উদ্ধার করিয়া নিম্নে লিখিত হইল;—

শ্রীশ্রীশ্রীরাধাবল্লভো জয়তি।
ধরণীধর সুতো বাসগেহং
সুসৌধং।
রাধাদ্যেষ্টায় ভবান্যৈ শ্রুতবিধি বিধিনা তারিণী
তোষণায়।

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মা তদনুসুতদুহুঃ শান্তবীচক্রিযুক্তঃ
শাকে রামেন্দুষট্‌কৌ গৃহমিদমদদদ্বেদবেদ্যৈ
ভবান্যৈ।
শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

ঠাকুর-বিবাহ।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

এইবার হীরালালের রীতিমত অধঃপতন আরম্ভ হইল। হীরালাল বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইলেও দুইজায় নিজের অধঃপতন নিজে আরম্ভ করিল। মধ্যাহ্নে মস্তকের উপর থাকিয়া অপরাহ্নে দিবাকরের যেরূপ ক্রমে ক্রমে অধঃপতন হয়, একসময় উন্নত থাকিয়া দিবাকরের ন্যায় হীরালালেরও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে অধঃপতন হইল। অধঃপতনের সময় দিবাকরের যেমন সে পূর্ব্বতেজ আর থাকে না; হীরালালেরও হৃদয়ের সে পূর্ব্বতেজ এখন আর নাই। সহস্র কর থাকিতেও দিবাকর যেমন নিজের উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করে না, সহস্র উপায় থাকিতেও হীরালালও তাহার উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টাই আর করিল না। স্ত্রীর উপর ক্রোধোদ্রেক হইয়া হীরালাল ক্রমে অধঃপতনের নিম্নস্তরে আসিয়া নামিতে লাগিল। অথচ সে স্ত্রী পতিপরায়ণা ও সাধ্বী! তাহার পতিব্রতা ও সতীত্বের তেজ কেবল অভিমানভরে আবৃত আছে মাত্র। এদিকে স্বামীও তাহার পত্নীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে; উভয়ের পবিত্র প্রণয়ের কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ঘটনাচক্রে পড়িয়া স্বামী স্ত্রীর হৃদয় বুঝিল না, স্ত্রীও স্বামীর মনোগতভাব বুঝিতে পারিল না। উভয়েই নির্ম্মল সুখের প্রণয়ে কলনায় দুঃখ সৃজন করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা দিবানিশি ভোগ করিতে লাগিল। আমরা ইহাকে নিয়তি বলিব, না অদৃষ্ট বলিব?

নিয়তি হউক, আর অদৃষ্টই হউক—আমরা কিন্তু এই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কাহাকে দোষী করিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। স্বামীর কি স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ছিল না? স্বামীর স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা ছিল; কিন্তু স্বামীর মর্ম্মান্তিক দুঃখ যে তিনি স্ত্রীর নিকট সে ভালবাসার প্রতিদান পান নাই। এ দুঃখ বড় সহজ দুঃখ নহে। স্ত্রীরও সেইরূপ যথার্থ পতিভক্তি ছিল, কিন্তু স্ত্রীর মর্ম্মভেদী দুঃখ এই যে সে স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিতা! স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুঃখ আর আছে কি? এখন ঘটনাচক্রের কি অপূর্ব্ব কৌশল দেখিলে! আমরা সেই জন্যই বলিতেছিলাম এই; মনুষ্যমণ্ডলের মধ্যে আমরা কাহাকে দোষী করিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

হীরালালকে আমরা পরোপকারী ও দয়ালু বলিয়া পরিচয় দিয়াছি, কিন্তু তাহার যে পরোপকার আর দয়ার কার্য্যক্ষেত্রে এক পরেশনাথ ব্যতীত এখন আর অন্য কেহ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, হীরালালের প্রবৃত্তি পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে থাকিলেও হীরালাল এখন অন্য কাহার সংসর্গে বড় আসিত না। সুতরাং তাহার সেই পরোপকার ও দয়ার কার্য্যক্ষেত্র এক পরেশনাথ ব্যতীত আর কে হইতে পারে? আমরা সেইজন্যই বলিতেছিলাম—হীরালালের অধঃপতনের বাকী কি?

হীরালাল যে সুরাপায়ী, এখন তাহা জানিতে আর কাহার বাকী ছিল না। সুতরাং হীরালালেরও সে লজ্জাভয় আর নাই। এখন হীরালাল প্রকাশ্যে আপন বৈঠকখানায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নিয়মিতরূপে সুরাপান করিত। হীরালাল কি তাহার নিজের অধঃপতন নিজে বুঝিতে পারিত না? হীরালাল সকলই বুঝিত, কিন্তু মনে কোনরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইতে দিত না; হীরালালের মনে দৃঢ় বিশ্বাস এই—শরৎকুমারীর অবজ্ঞা ও ঘৃণাই তাহার এই অধঃপতনের কারণ; সুতরাং হীরালাল এই কারণ দর্শাইয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিয়া রাখিত। বাস্তবিক একটা গভীর চিন্তা দিবারাত্রি হীরালালের হৃদয় মধ্যে জ্বলিত। হীরালালের মনের বিশ্বাস, সুরাপানে সে চিন্তা নির্ব্বাণ হইতে পারে; ইহাই হীরালালের ভ্রম ও অধঃপতনের কারণ।

শরৎকুমারীর কথা আমরা আর কি বলিব? শরৎকুমারীও এখন আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল; শরৎকুমারী এখন অভিমান ত্যাগ করিবার জন্যও প্রাণপণে চেষ্টা করিত; কিন্তু হীরালালকে দেখিলে কোথা হইতে তাহার অভিমান-সাগর উথলিয়া উঠিত, আর কেবল কি অভিমান? সে অভিমানের সঙ্গে অহঙ্কার, তেজ এবং দর্পও মিশ্রিত ছিল। এখন শরৎকুমারীর এ অহঙ্কার, তেজ এবং দর্প কিসের? এই কথাটা বুঝাইতে পারিলেই শরৎকুমারীর চরিত্র-সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝিতে পারা যাইবে। শরৎকুমারীর তা সনে মনে বিশ্বাস ছিল যে স্ত্রীলোকের স্বামীর প্রতি যাহা কর্ত্তব্য সে পক্ষে তাহার কোন ত্রুটিই ছিল না; শরৎকুমারী স্বামী ন্যায়বিচার, বুদ্ধিবান ও পরোপকারী স্বামী আর কাহার আছে? ইহাই শরৎকুমারীর অহঙ্কার, তেজ, ও দর্প মিশ্রিত অভিমানের কারণ। এখন শরৎকুমারীর ভুল দেখিলে?

হীরালালের ও শরৎকুমারীর অবস্থা ও দুঃখ বর্ণনা করা যায়, কিন্তু অমলার অবস্থা ও দুঃখ বর্ণনা করা যায় না। অমলাও সকল বুঝিতে পারিয়াছিল, এবং প্রাণপণে প্রতিকারের চেষ্টাও করিত; অমলার অদৃষ্টক্রমে সে চেষ্টার কিন্তু কোন ফল হইত না। অথচ তাহার দাদা ও বউদিদির জন্য অমলার প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিত। অমলার দুঃখের সীমা আছে কি? একদিন অমলা শরৎকুমারীকে বলিল,—"বউদিদি, তুমি একটু শক্ত না হলে সবদিক নষ্ট হয়।"

শরৎকুমারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"সবদিক নষ্ট হবার আর বাকি কি?"

অমলা।—বউদিদি, তুমি চেষ্টা করলেই সবদিক রক্ষা হয়।

শরৎ।—আমি কি চেষ্টা করবো?

অমলা।—তুমি দাদার মনের মতন কাজ কর—তিনি যাতে সুখী হন, তাই কর।

শরৎ।—মন না পেলে মনের মতন কাজ কি করে করবো? কিসে সুখী হন, আর কিসে অসুখী হন, আমি কি করে জানবো?

অমলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"সেকি বউদিদি—তুমি তাঁর স্ত্রী, তুমি চেষ্টা করলেই তাঁর মন পাবে—কিসে সুখী হন, তাও জানতে পারে।"

শরৎকুমারী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"তিনি যখন ও ঘরে থাকবেন, আর আমি বুঝি তাঁর মন পাবার জন্যে খোসামোদ করে ডেকে?"

অমলা।—সে খোসামোদে কি অপমান আছে বউ দিদি? স্বামীর কাছে স্ত্রীর আবার মান-অপমান কি?

অমলার এই কথা শুনিয়া শরৎকুমারী বড় বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তোর আর আমায় সে বিষয়ে উপদেশ দিতে হবে না; আমায় যে তোর কাছে সে উপদেশ নিতে হয়, তবে আমার গলায় দড়ি।"

শরৎকুমারীকে রাগত দেখিয়া অমলা বড় লজ্জিত হইল। অমলা তখন মিনতি করিয়া বলিল,—"তুমি রাগ কর কেন বউদিদি? তোমার কষ্ট দেখে আমার প্রাণ বড় কাঁদে, তাই আমি তোমায় কোন কথা না বলে থাকতে পারি না। আমাদের সুখের সংসার দিনে দিনে কি হয়ে যাচ্ছে, দেখ্‌ছ বউদিদি?"

অমলা আর চক্ষের জল রাখিতে পারিল না; অমলার কণ্ঠস্বরে শরৎকুমারীর দৃষ্টি অমলার প্রতি আকৃষ্ট হইল। অমলা চাহিয়া দেখিল, চক্ষের জলে অমলার বক্ষঃস্থল ভাসিতেছে! সে চক্ষের জল দেখিয়া শরৎকুমারীর ক্রোধ কোথায় উড়িয়া গেল। শরৎকুমারী বলিল,—"ঠাকুর-ঝি, আমার জন্যে যে তোর প্রাণ কাঁদে, তা কি আমি জানিনে? তুই আছিস্ বাই আমি এখনও বেঁচে আছি, তা না হলে আমার কি বেঁচে থাকবার কথা? তোকে অনেক সময় আমি অনেক মন্দ কথা যে বলি, সে কেবল আমার মনের ঠিক থাকে না, আর তোকে ভালবাসি বলেই বলি। তুই না থাকলে এত দিন যে আমি পাগল হয়ে যেতুম, ঠাকুর-ঝি।"

শরৎকুমারীও আর থাকিতে পারিল না, অজস্র অশ্রুবিন্দু অবিশ্রান্ত ধারায় প্রবাহিত হইয়া তাহারও বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল। সে দৃশ্য অমলার প্রাণে বড় আঘাত করিল। অমলা নিজে পরের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে জানে, কিন্তু পরের চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখিতে পারে না। অমলার সান্ত্বনায় শরৎকুমারী একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল,—"অমলা, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমার ত কষ্ট পাবার কথা নয়, কেবল অদৃষ্টের দোষই কষ্ট পাই।"

অমলা এইবার সাহস করিয়া বলিল,—"বউদিদি, কেবল অদৃষ্টকে দোষ দিলে কি হবে? অনেক সময় আমাদের নিজের দোষেই অদৃষ্ট মন্দ হয়। তুমি চেষ্টা করলে তোমার স্বামীকে কি তুমি ভাল করতে পার না বউদিদি?"

শরৎকুমারী অমলার এই উত্তেজিত কথায় তাহার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু সে মুখের ভাব দেখিয়া অমলা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল,—"অমলা, আমি তোর কথাই শুনবো। আজ থেকে আমি সেই চেষ্টাই করবো।"

শরৎকুমারীর মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন দেখিয়া অমলার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মতামত।

"শত শনিবার রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে "হরি-অন্বেষণ"নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। আজি কালি হিন্দুর ধর্ম্মমতে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, হরি-অন্বেষণ তাহার একটী পরিণত ফল বলা যাইতে পারে; সুতরাং সময়ের উপযুক্ত বলিতে হইবে। যাহা সময়ের উপযুক্ত, তাহাই লোকের আদরের সামগ্রী। ইহাতে কোমল মলয়-সমীরণে ললিত-লবঙ্গলতার লোচন-লোভের লহরী-লীলা নাই, বসন্ত-কোকিলের কুহু এবং সেই সঙ্গে বিরহবিধুরা, মিলনমুখরা কমলিনীর অথবা কঠোর-কান্তাবিরহ-কাতর কালাচাঁদের "উঁহু" নাই। ইহাতে নায়ক নায়িকার"মরি-মরি—ধরি—ধরি—চলিতে-চরণ টলে"ইত্যাদি গুরুপত্নীর-ভাবাপন্ন "প্যাথেটিক্" প্রণয় সঙ্গীত নাই; ইহাতে আসক্তিপিশু যুবক যুবতীর প্রেম নাই,—কিন্তু পরম পবিত্র প্রকৃত প্রেম আছে। যাঁহার প্রেমে চাঁদ উঠে, তারা ছুটে,বিশ্বসংসারে সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্যের মহিমা বিস্তার করিবার নিমিত্ত কাননে কুসুম ফুটে; বালকের অমিয় হাসো, সতীর সুমধুর আস্যে যাঁহার প্রেম প্রতিনিয়ত ফুটিয়া থাকে, চরমের পরম গতি বিশ্বপতি হরির সেই অনুপম, স্তুতি-লনীয় দুর্লভ পবিত্র প্রেমের লীলা হরি-অন্বেষণের আদ্যোপান্ত সুন্দররূপে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি-ক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

বঙ্গরঙ্গভূমির প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাস মিলনে যে অনুপম ধর্ম্মভাবের সূচনা করিয়াছিলেন, হরি-অন্বেষণে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া বিষয় বিষয় বাসনায় আত্মহারা না হইয়া যাঁহারা আত্ম-অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন, বিহারী বাবুর "হরি-অন্বেষণ" পাঠ করিলে এবং রঙ্গরঙ্গভূমে ইহার অভিনয় দেখিলে তাঁহাদের সেই বাসনা চরিতার্থ হইবে। পরম পবিত্র হরি-প্রেম যে, কাহারও নিজস্ব নহে, অশেষশাস্ত্রজ্ঞ পরমযোগী শাণ্ডিল্য ও হিংসা-পরায়ণ মূর্খ কালকা ব্যাধ এবং গাঁজা খোর খাঙ্গা গোঁসাঁই মস্তারাম বাবাজি ও গাঁজি শের আলির অভিনয় দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মহৎ। যে বিশ্বজনীন সাম্প্রদায়িকত্ববিহীন ঈশ্বরজ্ঞান চৈতন্য দেব এই অধঃপতিত বঙ্গদেশে সর্ব্ব প্রথম জীবন্তভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ পরম হংস যাহার মহিমা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, গ্রন্থকার হরি-অন্বেষণে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবের বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অভিনয় নির্দ্দোষ না হইলেও মনোজ্ঞ হইয়াছিল। বেদিনীগণের নৃত্যগীত, কাঁকনী বেদিনীর সুধাতুল্য শিশুগণের করুণ-সঙ্গীত, এবং ব্যাধগণের তাণ্ডব নৃত্যগীত সকলেরই মনোহরণ করিয়াছিল। কালকা ব্যাধের বিশুদ্ধ তানলয়যুক্ত হরিগুণ-গান শ্রবণ করিলে প্রেমিক আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

খুলনাকণ্ড।—খুলনার ধর্ম্মীবতার ও তাঁহার সমস্ত বিশ্বস্ত বাহনের ব্যাপার লইয়া দেশে তুমুল পড়িয়া গিয়াছে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সামান্য দুঙ্গের জন্য যে, এরূপ ভয়ানক গণ্ডগোল বাধাইতে পারেন, এ বিশ্বাস এতদিন কাহারও ছিল না। যাহাহউক,আমরা হতভাগ্য বেচারী বাবু সতীশচন্দ্রের জন্য বড়ই দুঃখিত। আহা! শুনিতেছি বেচারার নাকি মাথা ঠিক নাই; বহুদিন হইতে মস্তিষ্ক-পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন; যদি এরূপ হয়, তবে তাঁহার ন্যায় এ বিড়ম্বনা কেন? তিনি যে চাকুরি স্বীকার করিয়াছেন, উহাতে অনেকেরই মাথা ঘুরিয়া পড়ে, এরূপ অবস্থায় ঘরে বসিয়া শান্তি সন্তোষ করা শত গুণে শ্রেয়। মিঃ টিসডল বেলের জন্য আমরা তত দুঃখিত নই, কারণ আমরা শুনিয়াছিলাম যে, তিনি বাবু কেবশলাল মিত্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ক্ষতিপূরণ করিবেন; সুতরাং বেঙ্গবাবুর কৌন্সিল মিঃ মনোমোহন ঘোষ ক্রোধক্ষমা উঠাইয়া লইতে সম্মত হইয়াছেন; কিন্তু এখন আবার শুনা যাইতেছে যে, মিঃ বেল ক্ষমা প্রার্থনার নিমিত্ত যে সকল মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছিলেন, বেল সাহেব তাহাতে সন্তুষ্ট হয়েন নাই! তবে নিতান্তই মৌকদ্দমা চলিবে?—চলুক, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।" বেল সাহেবের এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় পুরুষত্ব আছে।

***

চীন ও জাপান।—যুদ্ধ এখনও সমভাবে চলিতেছে; চীন প্রায়ই পরাস্ত হইতেছে; এবং জাপান জয়লাভে বলবান্ হইয়া উঠিতেছে। ইতিপূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, চীন যেরূপ সুবিশাল রাজ্য, ইহার বলও সেইরূপ অদম্য; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, চীনের কোন ক্ষমতাই নাই; ইহার প্রধান কারণ এই যে, চীনের শাসনকার্য্য নিতান্ত দূষিত; ইহার আগাগোড়া গলদ। চীনের সৈন্য সংখ্যা অগণিত হইলেও তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত নিপুণ যোদ্ধা আছে কি না সন্দেহ। ফলতঃ যুদ্ধের পরিণাম কি দাঁড়ায়, তাহা এখনও বুঝা যায় নাই। শুনা যাইতেছে যে, রুষ চীনের সহিত মিলিত হইবে; সেইজন্য চীন পামির সম্বন্ধে রুষকে বিশেষ সাহায্য করিবে; এরূপ হইলে ইংরেজ যে, নিশ্চিন্ত থাকিবে এমত আশা করা যায় না। আমরা পূর্ব্ব হইতেই বলিতেছি, কোরিয়া লইয়া আশিয়া মহাদেশে ভীষণ সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে।

***

অপূর্ব্ব মিলন।—ইংরেজ ও ফরাশী এবং ফরাশী ও জর্ম্মানের মধ্যে চিরকালই অহি-নকুলের ভাব; কিছুদিন পূর্ব্বে নানা কারণে এই ২বের ভাব ঘোরতর বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সকলেরই মূলে স্বার্থ। এখন আবার শুনিতেছি যে, ফরাশী ও ইংরাজে এবং ফরাশী ও জর্ম্মানে প্রগাঢ় মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে। শুনিলে সহসা বিশ্বাস হয় না; আবার অবিশ্বাসও করা যায় না; কারণ আফ্রিকা লইয়া এই তিন জাতির সমান স্বার্থ; ভলে বলে আফ্রিকার মুসলমানদিগকে উচ্ছিন্ন করিয়া খৃষ্টানের মহিমা

তথায় বিস্তার করিতেই হইবে; বোধ হয় সেইজন্যই ইহারা মিলিয়াছে।

* * *

বিনামা-বিভ্রাট।—ইংরেজের রুষভীতি, বায়ুভীতি প্রভৃতি কতকগুলি বিষম আতঙ্ক আছে, আলাহাবাদের "মর্ণিং পোষ্ট" বলেন, যে, সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষের বিনামা-ভীতি উপস্থিত হইয়াছে। তত্রত্য ছোটলাট নাকি এই নিয়ম করিয়াছেন যে, ইতঃপর আসামীরা জুতা পায়ে দিয়া কোন বিচারকের সম্মুখে যাইতে পাইবে না; যাইবার আগে তাহাদিগকে জুতা খুলিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে। একথা সত্য কিনা বলিতে পারি না। তবে এরূপ হাস্যোদ্দীপক বিধি প্রবর্ত্তনের একটা কারণও খুঁজিয়া পাওয়া যায়;—ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি আসামী বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের জুতা খুলিয়া তাঁহাকে ছুড়িয়া মারিয়াছিল।

* * *

দণ্ড। রামপুর বোয়ালিয়ার মহরম বিভ্রাট লইয়া চারিজন কনষ্টেবলের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা উঠিয়াছিল রাজশাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার বিচার করিয়াছেন। তাঁহার বিচারে কনষ্টেবল চতুষ্টয় প্রত্যেকেই একমাস একদিন করিয়া সামান্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। বিচারকালে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও দুইজন হেড কনষ্টেবলের স্বাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল। ইহাঁরা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, ইহাদিগকে কেহই গুলি ছাড়িতে হুকুম দেয় নাই। ইহারা কিন্তু বরাবর বলিয়াছিল যে, পুলিশ ইনস্পেক্টরের হুকুমে গুলি ছাড়িয়াছিল। দণ্ডিত কনষ্টেবলগণ তজ্জন্য সেশন্‌স জজের নিকট নাকি পুনর্বিচারের আবেদন করিয়াছে; ইহাদের পুনর্বিচারে যে কোন ফল হউক না কেন, এই বিভ্রাটে গবর্ণমেণ্টের কতকটা শিক্ষা হইল। বিবেকবিহীন পুলিশ কনষ্টেবলদিগকে সশস্ত্র করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে একটা বিষম অনর্থের সূচনা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা মরহম কালীন দাঙ্গা হাঙ্গামায় অনেক সময় দেখা গিয়াছে; এবারেও তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। ইহাতেও কি গবর্ণমেণ্টের জ্ঞানোদয় হইবে না?

* * *

বিষের আলা।—পঞ্জাবে জনবৃদ্ধি। তথায় হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সমান; শিখের সংখ্যাও কম নহে। গোহত্যা হইলে পাছে বিষম দাঙ্গা বাধে, এই ভয়ে তত্রত্য ডেপুটী কমিশনর বিগত ইদের সময় তথায় মুসলমানদিগকে গোহত্যা করিতে দেন নাই। এইজন্য মুসলমানেরা অবশ্য দুঃখিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা হিন্দুবিদ্বেষী কোন কোন এঙ্গলোইণ্ডিয়ান সম্পাদকের মাথা কান্না দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। এই সকল মুসলমান-বন্ধুর আস্ফালন পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের আসন টলিয়াছিল; শেষে ইহার অনুসন্ধান হয়; অনুসন্ধানের ফল মুসলমানদিগের প্রীতিকর হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। করুণা কুণ্ডীগণের ক্রন্দনে এইবার আকাশ পাতাল আলোড়িত হইবে।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

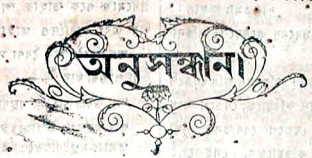

অষ্টম বর্ষ। } ১৫ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। { অষ্টাদশ সংখ্যা।

পৃথু রাজা।

সকল প্রাচীন দেশেরই পৌরাণিক বৃত্তান্ত রূপক ও গল্পের আবরণে আচ্ছাদিত। সেই আবরণ উন্মোচন করিতে পারিলে অনেক ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। সেই সমস্ত ঐতিহাসিক সত্যই আজি স্বার্থ-বঞ্চিত অধঃপতিত ভারতবাসীর একমাত্র মনুনার ধন। ভারতের অতীত গৌরবের ভস্মরাশির উপর বসিয়া আজি যে, আমরা অতীত স্মৃতির আদর করিতেছি, তাহাতেই আমাদের জীবন এখনও নির্ব্বাণ হয় নাই। যেদিন আমাদের অতীতে অনাদর হইবে, যেদিন আমরা মহাত্মা পিতৃপুরুষগণের মহীয়সী কীর্ত্তির কথা ভুলিয়া যাইব, সেই দিন আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। আমাদের জাতীয় জীবন আজি নির্ব্বাণপ্রায় বটে, কিন্তু অতীত গৌরবের স্মৃতিরূপ ক্ষীণদীপালোক ইহাকে পুনর্ব্বার প্রজ্জ্বলিত করিবে। যেদিন মহাপুরুষের কণ্ঠের উদ্যম ও অদম্য অধ্যবসায়ে প্রাচীন ভারত তদানীন্তন সভ্য-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাঁহাদের পবিত্র চরিতমালা প্রত্যেক ভারত সন্তানের প্রাতঃস্মরণীয় হওয়াই আবশ্যক। মহারথ পৃথু তাঁহাদের আদি। আজি যে পৃথিবীতে বাস করিয়া আমরা দয়াময় হরির অপার করুণা সম্ভোগ করিতেছি, ইহা তাঁহারই কন্যা বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

পৃথু ভারতের আদিম রাজা। সত্যযুগের কোন সময়ে ইনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সেই জন্য আমি সে বিষয় লইয়া বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডার না করিয়া তদীয় অনুপম বীর-চরিত বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া আজি পাঠকদিগকে উপহার দিব। প্রথমতঃ বেদে তাঁহার সম্বন্ধে কি আছে, আমি তাহাই দেখিব। ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, ও শতপথ ব্রাহ্মণে পৃথু সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ, ৮ম মণ্ডল, ৯ম সূক্তে,—

"মদ্বয়াং কক্ষীবান উশিজঃ ব্যখ্যৎ ঋষির্দীর্ঘতমাঃ জুহাব।"
দীর্ঘতমাঃ জুহাব।'
পৃথীষদ বাং বৈণ্যঃ সদনেষু এবেদতো অশ্বিনা
চেতয়েথাম্।"

অর্থাৎ হে ঋষিদ্বয়! কক্ষিবান ঋষি যেরূপে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে, যেরূপে বাস ও দীর্ঘতমা এবং যেরূপে বেণপুত্রময় পৃথী যজ্ঞগৃহে আহ্বান করিয়াছেন, সেইরূপেই আমি স্তব করিতেছি; আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

এই ঋকে পৃথুর যে যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ দেখা যায়, দশম মণ্ডলে ১৪৮ সূক্তে তাহার অল্প বিস্তৃত বিবরণ প্রকটিত আছে। বর্ণিত আছে পৃথু ঋষি এই সূক্তের রচয়িতা; তবে কি পৃথু রাজা ও পৃথু ঋষি এক ব্যক্তি?—এই সূক্তের পঞ্চম ঋকে আছে,

——"প্রুধি হবমিন্দ্র শূর পৃথ্যাঃ উত
স্তবসে বেণ্যস্য অর্কৈঃ" এটী ঋকের অংশ মাত্র; পরন্তু সমগ্র পঞ্চম ঋকের অনুবাদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত হইল :—

"হে বীর ইন্দ্র! আমি পৃথু তোমাকে ডাকিতেছি, আমার আহ্বান শ্রবণ কর, বেণের পুত্র পৃথুর স্তবের দ্বারা তোমাকে স্তব করা হইতেছে। এই বেণপুত্র ঘৃতযুক্ত যজ্ঞগৃহে আসিয়া তোমাকে স্তব করিয়াছে। আর স্তবোচ্চারণকারিগণও ধাবিত হইতেছে; যেরূপ তরঙ্গগণ নিম্নপথে ধাবিত হয়, তদ্রূপ ধাবিত হইতেছে।" ঋষি পৃথু ও রাজা পৃথু এক কি না, তদ্বিষয়ে যে সন্দেহ আছে, এই ঋকদ্বারা সে সন্দেহ সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইল না। কিন্তু মহাত্মা সায়ণ ইঁহাদের উভয়কেই এক বলিয়া আমাদের সেই সন্দেহ দূর করিয়াছেন। তিনি বলেন পৃথু রাজা পরে রাজর্ষি হইয়াছিলেন। ফলকথা তিনি যে রাজর্ষি ছিলেন, প্রথমোক্ত ঋকে তাহার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায় এবং পুরাণেও তাহার বিবরণ আছে।

অথর্ব্ববেদে পৃথু বৈণ্য সম্বন্ধে এই কয়েকটী কথা পাওয়া যায় :—

"সা উদক্রামৎ সা মনুষ্যান্ আগচ্ছৎ।
তাং মনুষ্যাঃ উপাধ্রষন্ ইরাবত্যেহি ইতি।
তস্যাঃ মনুষ্যৈরুপতাপাৎ সাসীৎ পৃথিবী পাত্রস্।
তাং পৃথী বৈণ্যোহ দোহ্যং তাং কৃষিং শস্যঞ্চ অধোক্।"

অর্থাৎ তিনি (বিরাজ বা আদ্যাশক্তি) উত্থিত হইলেন; তিনি মনুষ্যগণের নিকট আসিলেন। মানুষেরা তাঁহাকে "আইহ ইরাবতি!" এই বলিয়া আহ্বান করিল। বৈবস্বত মনু তাঁহার বৎস, পৃথিবী তাঁহার পাত্র। পৃথী বৈণ্য তাঁহাকে দোহন করিলেন। তিনি তাঁহা হইতে কৃষি ও শস্য দোহন করিলেন।

অথর্ব্ববেদের এই একটী মাত্র শ্লোকে ভারতের একটী প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। বর্ণিত আছে পৃথু রাজাই জগতে সর্ব্বপ্রথম কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কেহই ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে জানিতেন না। পুরাণেএই বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে পৃথু সম্বন্ধে এই বিবরণ পাওয়া যায়;—"পৃথী হ বৈ বৈণ্যো মনুষ্যানাং প্রথমোঽভিষিষিচে অর্থাৎ মনুষ্যদিগের মধ্যে পৃথী বৈণ্য প্রথম রাজা হয়েন। এক্ষণে জানা গেল যে, বেণকুলজ পৃথু মনুষ্যলোকের প্রথম রাজা; তিনি জগতে কৃষিকার্য্য প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন; তিনি পরে রাজর্ষি হইয়া যজ্ঞ করেন। ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথাই সংক্ষেপে পাওয়া গেল; কিন্তু তাঁহার জন্ম ও কীর্ত্তি কলাপ

বৃত্তান্ত বিস্তৃত বিবরণ না জানিলে কাহারও দৃষ্টি হইতে পারে না; এইজন্য মদনুবাদিত ভাগবত পুরাণ হইতে তাহা এস্থলে সঙ্কলিত হইল।

অনন্তর ব্রাহ্মণেরা বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে এক স্ত্রী ও এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। স্ত্রী এবং পুরুষ দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সেই দুইটীকে ভগবানের অংশ জ্ঞান করিয়া কহিতে লাগিলেন "এই পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর পবিত্র অংশ, এই স্ত্রীটী লক্ষ্মীর পবিত্র অংশ। এই পুরুষ সকল রাজার প্রথম হইয়া যশস্বিতার করিবেন, ইঁহার নাম পৃথু রহিল; ইনি রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন। ইনি চারু-দর্শনা, গুণের সকলের গুণধরস্বরূপা লক্ষ্মী উৎপন্ন হইলেন; ইঁহার নাম অর্চ্চি, এই সাধ্বীরা পৃথুকেই বিবাহ করিবেন। এই পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ, কেবল লোক রক্ষা করিবার বাসনায় জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই অর্চ্চি স্বয়ং লক্ষ্মী; ইনি ভগবান ব্যতীত কোথাও অবস্থিতি করেন না, সেই জন্যই একত্রে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

ভগবানের অংশরূপী পৃথু উৎপন্ন হইলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বেরা গান আরম্ভ করিল। স্বর্গে শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ ও দুন্দুভি প্রভৃতির বাদ্য আরম্ভ হইল। অবশেষে সমস্ত দেবঋষি ও পিতৃগণ ঐস্থানে আগমন করিলেন। জগদ্গুরু ব্রহ্মা সমস্ত দেব ও ঋষিবৃন্দের সহিত আগমন করিয়া দেখিলেন, পৃথু দক্ষিণহস্তে চক্রচিহ্ন এবং চরণে পদ্ম পরিচয় রহিয়াছে, তাহাতে তিনি অনুমান করিলেন, "এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভগবানের অংশ।" যাঁহার চক্ররেখা অন্যরেখা দ্বারা বিলুপ্ত হয় না, তিনি পরম পুরুষ ভগবানের অংশ। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অভিষেক ধর্ম্মের উদ্যোগ করিলেন। অনন্তর পৃথুর অভিষেকার্থ নানা লোক নানা স্থান হইতে আভিষেচনিক দ্রব্য আহরণ করিতে লাগিল; ও অন্যান্য প্রাণী সরিৎ, সাগর, ভূধর, নাগ, গো, পক্ষী, মৃগ এবং পৃথিবী, আকাশ যথোপযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিল। মহারাজ পৃথু সুন্দর বসন পরিধান করিয়া ও সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া যথাবিধি রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, এবং সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা পত্নী অর্চ্চির সহিত অপর এক অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। মহারাজ পৃথুর নিমিত্ত কুবের কাঞ্চনময় আসন উপহার প্রদান করিলেন এবং বরুণ চন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ ছত্র আনিয়া দিলেন। বরুণের ঐ ছত্র হইতে সতত সলিল ক্ষরিত হইত। বায়ু দুইটী ব্যজন প্রদান করিলেন। ধর্ম্ম একটী কীর্ত্তিময়ী মালা, ইন্দ্র উৎকৃষ্ট কিরিট, যম দমন সাধন দণ্ড, ব্রহ্মা দেবময় কবচ, সরস্বতী মনোহর হার, হরি সুদর্শন চক্র, এবং লক্ষ্মী চিরস্থায়িনী সম্পত্তি প্রদান করিলেন। অধিক কি বলিব, ভগবান রুদ্র তাঁহাকে একখানি খড়্গ দিলেন; সেই অসির কোষে দশটী চন্দ্রাকার প্রতিবিম্ব ফলিত ছিল। অম্বিকাও এক চর্ম্ম আনিয়া উপহার দিলেন; তাহাতে শত শত চন্দ্রের আকৃতি অঙ্কিত ছিল। চন্দ্র অমৃতময় অশ্ব এবং বিশ্বকর্ম্মা অত্যুৎকৃষ্ট একখানি রথ আনিয়া দিলেন। অগ্নি, ছাগ ও গোশৃঙ্গে নির্ম্মিত ধনু, সূর্য্য রশ্মিময় বাণ এবং পৃথিবী যোগময়ী পাদুকা তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। আকাশ সর্ব্বদাই পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। খেচরগণ তাঁহাকে নাট্য, গীত, বাদ্য এবং অন্তর্দ্ধানবিদ্যা দান করিলেন। ঋষিগণ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণেরা পৃথুরাজকে, "তুমি প্রজা-পালক হইলে"—বলিয়া আমন্ত্রণপূর্ব্বক, যখন রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, তৎকালে ধরণী অন্নহীন হইয়াছিলেন; প্রজাবর্গ ক্ষুধায় ক্ষীণকলেবর হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিল এবং কাতরে কহিতে লাগিল—মহারাজ! বৃক্ষ সকল যেমন কোটরস্থ অগ্নি দ্বারা তাপিত হয়, আমরা সেইরূপ জঠরানল দ্বারা সন্তাপিত হইতেছি। ব্রাহ্মণেরা আপনাকে আমাদের অন্নদাতা পতি বলিয়া স্তব করিলেন; আপনি আমাদের শরণ্য—আপনার শরণাগত হইলাম। হে নরদেবশ্রেষ্ঠ! আমরা ক্ষুধায় অতিশয় পীড়িত হইতেছি, যতক্ষণ অন্নাভাবে বিনষ্ট না হই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি অন্ন প্রদান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। রাজন্! আপনি অখিল লোকের পালক এবং সকলের অন্নদাতা।"

পৃথু প্রজাপুঞ্জের ঐ প্রকার সকরুণ বিলাপ বাক্য শুনিয়া, অনেকক্ষণ অনন্যচিত্তে চিন্তা করিয়া, প্রজাদের ক্লেশের হেতু বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুদ্ধিবলে এই নিশ্চয় করিলেন, পৃথিবী ওষধি সকলের বীজ গ্রাস করিয়া থাকিবে; তাহাতেই শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে না, সুতরাং দুর্ভিক্ষবশতঃ প্রজাদের ক্লেশ হইতেছে। তাহাতে মহাত্মা পৃথুর নিদারুণ ক্রোধ উদিত হইল, তিনি কুপিত ত্রিপুরারির ন্যায় পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া শর-সন্ধান করিলেন। তাঁহাকে অস্ত্র উদ্যত করিতে দেখিয়া ধরণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভয়বশতঃ গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক তিনি ব্যাধ-বিতাড়িত হরিণীর ন্যায়, পলায়নপরায়ণ হইলেন। পৃথুও ক্রোধে রক্তলোচন হইয়া ধনুকে শরযোজনা পূর্ব্বক পৃথিবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনন্তর, অবনী, স্বর্গ, মর্ত্ত ও অন্তরীক্ষে যে কোন স্থানে দৌড়িয়া যান, সেই স্থানেই পৃথুকে উদ্যতাস্ত্র দেখিতে পান। সুতরাং যেমন মৃত্যু হইতে প্রজাদের পরিত্রাণ হয় না, সেইরূপ পৃথু হইতে পৃথিবী সেইরূপ আপনার পরিত্রাণ না দেখিয়া অতীব ভীতা হইলেন এবং পলায়নে ক্ষান্ত হইয়া কাতর-হৃদয়ে সবিনয় বচনে বলিতে লাগিলেন; "হে মহাভাগ! আমাকে ক্ষমা করুন। প্রভো! লোকে আপনাকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া জানে। আপনি কিরূপে এই দীনহীনা অবলার প্রাণবধ করিবেন? আপনার ন্যায় কারুণিক ও দীনবৎসল ব্যক্তির কথা কি? সামান্য ব্যক্তিরাও মহিলার অপরাধ পাইলেও তাহাকে প্রহার করে না। হে রাজন্! আপনি প্রজা-পালনার্থ আমাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের দৃঢ়তর নৌকা স্বরূপ হইয়াছি; কেননা আমার উপরেই এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে; আমাকে বিদীর্ণ করিয়া জলরাশির উপরে আপনি আপনার আত্মাকে এবং সমস্ত প্রজাকে কিরূপে শাসন করিবেন?

পৃথিবীর কাতরবচন শুনিয়া পৃথু কহিলেন, "বসুধে! তুমি আমার আদেশ পালন কর না, সেই হেতু আমি তোমাকে সংহার করিব। কি আশ্চর্য্য! তুমি যজ্ঞে দেবতারূপে ভাগ লইতেছ, অথচ ধান্যাদি দানে কিছুমাত্র মনোযোগ কর না! যে স্ত্রী গোরূপিণী হইয়া নিত্য দুগ্ধ দোহন না; সেই দুষ্টার প্রতি দণ্ড বিধান কি উচিত হয় না?"

ব্রহ্মা অগ্রে যে সকল ওষধিবীজ সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই তুমি আপনার অভ্যন্তরে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ; আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সে সকল প্রত্যর্পণ করিতেছ না, তোমার বুদ্ধি বড় মন্দ। অতএব বাণ দ্বারা তোমার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিব। তখন আমি তোমার মাংস দ্বারা এই ক্ষুধাতুর প্রাণীর বিলাপ শান্তি করিতে পারিব। যে ব্যক্তি প্রাণিমাত্রে নির্দ্দয় এবং আত্মম্ভরি হইয়া

ক্ষুদ্র অধম আর কে আছে? সে পুরুষই হউক, কিম্বা স্ত্রীবই হউক, তাহাকে হত্যা করিলে পাপ হয় না। তুমি অতি গর্ব্বিতা এবং দুর্ম্মদা; তোমাকে এই বাণ দ্বারা ছেদন করিয়া তিল তিল বিভাগ করিব। অবশেষে যোগবলে আমি স্বয়ং এই সকল প্রজার ভার বহন করিব।" পৃথুরাজা এই প্রকারে কৃতান্তের ন্যায় ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐরূপ কহিলে, পৃথিবীর কলেবর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি প্রণামানন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন; "মহারাজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমার পৃষ্ঠে যে সমস্ত ওষধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমি দেখিলাম অসুরধারী দুষ্ট লোকেরা সে সকল ভোগ করিতেছে, এবং আপনার সদৃশ লোকপালেরাও চৌরাদি নিবারণ দ্বারা আমার পালন ব্যবস্থাদি প্রবর্ত্তন দ্বারা আমার আদর করিতেছেন না। সকল লোকেই চোর হইয়া উঠিতেছে; এতদ্ব্যতীত যজ্ঞাদি সেই সমস্ত ওষধি গ্রাস করিয়া রাখিয়াছি। যদি আমি এরূপ না করিতাম, তবে দুষ্ট ব্যক্তিরা সমুদায় খাইয়া ফেলিত, ওষধি সকলের নামও শুনিতে পাইতেন না এবং যজ্ঞাদি সিদ্ধিও হইতে পারিত না। সেই সকল ওষধি আমার উদরস্থ হইয়া কালবশতঃ জীর্ণ হইতেছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনি উপায় দ্বারা তৎসমুদায়কে উদ্ধার করুন, আমাকে বধ করিলে কি হইবে? হে বীর, আমি আপনার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছি। আপনি আমার বৎস, দোহনপাত্র, এবং দোগ্ধা আনিয়া উপস্থিত করুন। আমি রাসনারূপ কীরময় মামগ্রী সকল প্রদান করিব।" প্রাণি-সকলের অভীপ্সিত এবং বলকর অন্নও নিঃসৃত করিয়া সকলের বাসনা পূর্ণ করিব। মহারাজ অগ্রে আমাকে সমতল করুন। দেবতা যেমন সর্ব্বত্র সমান ভাবে জল-বর্ষণ করেন, সেইরূপ আমার দুগ্ধ যেন বর্ষা অপগত হইলেও সর্ব্ব-স্থানে সমান রূপ দৃষ্ট হয়।" পৃথিবীর এই সমস্ত প্রিয় অথচ হিতবাক্য শুনিয়া পৃথুর পরিতোষ জন্মিল; তিনি মনুকে বৎস করিয়া স্বীয় হস্তরূপ পাত্রে ওষধি সকল দোহন করিলেন।

মহারাজ পৃথুর এই অনুপম আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্নভোজী জীব সকল এই পৃথিবী হইতে বৎস পাত্রাদি ভেদে স্ব স্ব অভীষ্ট অন্ন দোহন করিয়া লইল। দোহনকার্য্য সমাধা হইলে পৃথু পৃথিবীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং দুহিতৃ-রাৎসল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সস্নেহে তাঁহাকে হৃহিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন; প্রবলপরাক্রম বেণতনয় রাজরাজ পৃথু স্বীয় ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল চূর্ণ করিয়া পৃথিবীকে প্রায় সমতল করিলেন এবং তাহাকে দোহন করিয়া প্রজাদের জীবনোপায় স্থির করিয়া দিলেন। তিনি অবনীর উপরে নানাস্থানে প্রজাদিগের যথোপযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে গ্রাম, পুর, পত্তন বিবিধ দুর্গ, ঘোষ-পল্লী, ব্রজ, শিবির, আকর, খেট, খর্ব্বট, সকল নির্ম্মিত হইল। পৃথুর পূর্ব্বে ধরণীমণ্ডলে এ প্রকার পুর গ্রামাদি ছিল না। গৃহাদি বাস-ভূমি পাইয়া প্রজা সকল নির্ভয়ে স্ব স্বস্থানে পরমসুখে বাস করিতে লাগিল।

ভারতের আদিম রাজা মহাত্মা পৃথু সম্বন্ধে উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তাহার অলঙ্কার-ভাগ ত্যাগ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনিই প্রথমে ভারতে কৃষি কার্য্যের প্রবর্ত্তনা করেন। তাঁহার ও তাঁহার পিতা বেণের চরিত্র তুলনায় সম্যলোচনা করিলে পাঠক অনেকগুলি রাজনৈতিক গূঢ় রহস্য জানিতে পারিবেন।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শঙ্কর চরিত।

গৃহত্যাগ।

আমরা ভগবান শঙ্করাচার্য্যের শিক্ষা বিবরণ সম্পূর্ণ করিলাম। অন্যতর চরিত-লেখকের মতে ঐর্দ্ধকে লিখিত বিবরণের পার্থক্য আছে; নিম্নে তাহা বিবৃত হইল। ইঁহারা শঙ্কর দেবের আবির্ভাব-কাল, বিক্রমার্ক নৃপতির বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন, শঙ্কর দেবের অলৌকিক প্রতিভা-বহ্নিতে বৌদ্ধ-পাপ ভস্মীভূত হইয়া গেলে, সনাতন-ধর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ পুনর্জ্জীবিত হন। বিক্রমাদিত্য তাহারই ফল স্বরূপে বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মব্রতের পরিপালক হইয়াছিলেন এবং ভারতের রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মতঃ শাসন ও বিদ্যোৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধাদি নাস্তিকগণ তৎপূর্ব্বেই শোথ রোগের ন্যায় অসার স্থূলতা ধারণ করিয়া অচিরে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শঙ্কর দেব তিন বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইলেও বিচলিত বা কাতর হয়েন নাই। তাঁহার দুঃখিনী জননী নিজে ও জ্ঞাতিগণ সাহায্যে যথাসময়ে যথাশাস্ত্র শঙ্করের কালাশৌচ অপনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলের প্রথায় শাস্ত্রের অলঙ্ঘ্য শাসনপ্রেরণায় পুত্রের অপ্রাকৃতিক অনন্যসুলভ প্রতিভা বিলোকনে, সতীদেবী পঞ্চম বর্ষেই শঙ্করকে উপনীত করিয়াছিলেন। শঙ্কর উপনীত হইয়া শাস্ত্র-শাসন বশে গুরু কুলে বাস ও নৈষ্ঠিকবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অধ্যয়নাদি করিতে লাগিলেন।

প্রসিদ্ধি আছে যে মহাত্মা শঙ্কর একবৎসর বয়সে দেশভাষা, দ্বিতীয় বর্ষে অক্ষর গ্রহণ ও পুরাণাদি শাস্ত্র শ্রবণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৃতীয় বর্ষে তিনি পিতৃহীন হন। এই সময়ে তাঁহার অনন্যসুলভ ক্ষমতা ও শাস্ত্রার্থ বিষয়ক অদ্ভুত প্রতিভা বিকাশিত হইয়াছিল। চতুর্থ বর্ষে সম্পূর্ণ মাহেশ্বরী শক্তি সমাবিষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর পঞ্চম বর্ষে উপযুক্ত আচার্য্য সমীপে উপনীত হইয়া সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং নিজেই নিজ অধীত শাস্ত্রার্থ উন্নয়ন করিয়া সতীর্থদিগকে সুচারুরূপে উপদেশ দিতেন। ষষ্ঠ বর্ষ-পরিশেষে, নির্ম্মল ব্রহ্মতেজোশানিত বুদ্ধিপ্রভায় বেদার্থচয়ের গ্রন্থিভেদ করিতে তাঁহার কোন বাধা ঘটিত না। এইরূপে সপ্তম বর্ষে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার অলৌকিক বুদ্ধিতে সমস্ত বিদ্যাই বিভাত হইয়াছিল। অষ্টম বর্ষের প্রারম্ভে সমাবর্ত্তন করিয়া স্বালয়ে আগমনপূর্ব্বক মাতৃসেবায় নিযুক্ত হইলেন। পঞ্চম প্রারম্ভ হইতে অষ্টম প্রারম্ভ সমাপ্তি —এই বর্ষ ত্রয়াধিক কালের মধ্যে তিনি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ জ্যোতিষ যাবতীয় বেদ, সমস্ত পুরাণ, সমস্ত ধর্ম্ম সংহিতা, জৈমিনী কৃত ধর্ম্ম মীমাংসা, ব্যাস প্রণীত ব্রহ্ম মীমাংসা, সাঙ্খ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক ও ভট্টপাদের কর্ম্ম মীমাংসা প্রভৃতি সমস্তই অবগত হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক বৈয়াকিরণগণ বলিয়া থাকেন আচার্য্য শঙ্কর, অষ্টম বর্ষ বয়স-কালে বেদে ব্রহ্মার ন্যায়, বেদাঙ্গে গর্গমুনিসদৃশ, শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বিচারে দেবগুরু বৃহস্পতি সদৃশ, তত্ত্বজ্ঞানে ব্যাসদেব সদৃশ, জ্ঞানভক্তি প্রচারে শুকদেব সদৃশ,শঙ্করাচার্য্যের বিদ্যাভ্যাস কালের যে অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও দুইটী অদ্ভুত ক্ষমতার বিবরণ লিখিত হইতেছে।

প্রথম দুই তিন মাস অধ্যয়ন করিয়াই গুরুদেব বৃহস্পতি সদৃশ, তত্ত্বজ্ঞানে ব্যাসদেব সদৃশ, জ্ঞানভক্তি প্রচারে শুকদেব সদৃশ,শঙ্করাচার্য্যের বিদ্যাভ্যাস কালের যে অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও দুইটী অদ্ভুত ক্ষমতার বিবরণ লিখিত হইতেছে।

প্রথম দুই তিন মাস অধ্যয়ন করিয়াই গুরুদেব হওয়া এবং ভিক্ষাচ্ছলে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য দুঃখ বিনাশ। প্রসিদ্ধি আছে শঙ্কর গুরুগৃহে অবস্থান সময়ে, কোন ধর্ম্মপরায়ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আমাকে ভিক্ষা দেও।" ব্রাহ্মণ-পত্নী সেই অনুপম দেবকান্তি শিশু ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষাপ্রার্থী সন্দর্শন করিয়া বিষণ্ণবদনে রোদন করিতে লাগিলেন, এই সংসারে সুকৃতি জনের জীবনই ধন্য। যাহারা এতাদৃশ জ্যোতিঃপূর্ণ শিশু ব্রহ্মচারীদিগকে ভোজন দান করিয়া পুণ্যলাভ করিতেছেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই সৌভাগ্যশালী। গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া এরূপ ভিক্ষা-প্রদানেও আমরা অসমর্থ। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, দৈব আমাদের সম্পূর্ণ প্রতিকূল, আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চনা করিয়াছেন; তন্নিমিত্ত আমরা ভিক্ষা বিতরণ করিতে অশক্ত। ধিক্ আমাদের জীবনে শত ধিক্! ব্রাহ্মণ-গেহিনী এইরূপ করুণ বাক্য উচ্চারণ করিয়া অবশেষে ভগ্নীদিগের মধ্যে চন্দ্রসন্নিভ সেই শিশু ব্রহ্মচারীকে ভক্তিপূর্ব্বক একটী আমলকী ফল প্রদান করিলেন। শঙ্কর ব্রাহ্মণপত্নীর তাদৃশ দুঃখব্যঞ্জক কাতর বচন শ্রবণান্তর দ্রবীভূত হইলেন এবং তদ্দুষ্টেই হরি-হৃৎপদ্ম-বিহারিণী লক্ষ্মীদেবীকে স্তুতিযোগে সুপ্রসন্না করিলেন। কমল-নিবাসিনী ইন্দিরা শঙ্কর স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া মধু-রিপু-হৃদয়ে আর থাকিতে পারিলেন না; চঞ্চলা অবিলম্বে তৎসমক্ষে আবির্ভূতা হইলেন। কহিলেন, "ব্রহ্মণ-নন্দন! আমি প্রীত হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" শঙ্কর লক্ষ্মী দেবীকে সমীপবর্ত্তিনী দেখিয়া পুনর্ব্বার স্তব ও বন্দনাদি করিলেন, এবং বলিলেন, "জগদম্বে! যদি তুমি বরদা হও, তবে এই বিপ্রপত্নীর পুণ্য-ভবনে প্রবিষ্টা হইয়া ইঁহার গৃহ সুবর্ণ-পূর্ণ কর এবং ইহাঁকে কিছুকালের জন্য আশ্রিত কর।" লক্ষ্মীদেবী মহাশুভব শঙ্কর কর্ত্তৃক উক্তরূপে প্রার্থিতা হইয়া সেই ধর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণ-গৃহে প্রবিষ্টা হইলেন এবং তদীয় গৃহ সুবর্ণ-পূর্ণ করিয়া দৃষ্টি রক্ষা পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে মহাত্মা শঙ্করের কৃপাদৃষ্টিতে সেই ধনদরিদ্র ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও প্রভূত ধনের অধিকারী হইলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা অল্প কালও অপ্রকাশ থাকিল না। শীঘ্রই লোক-পরম্পরায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। কেবল জনপদ-নিবাসিগণ ঐ ঘটনা স্মরণ পূর্ব্বক শঙ্করকে দেবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিল। তদবধি তাঁহার বেদ-মর্ম্ম-জ্ঞতা —এই উপনাম দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইল। সেই শিশুকায় ব্রাহ্মণ-তনয়ের তাৎকালিক রূপ, বেশ, অঙ্গ-সৌষ্ঠব, বুদ্ধিমত্তা, বিনয় গাম্ভীর্য্য ও তিতিক্ষা প্রভৃতি এবং মুনিজনোচিত সদ্‌গুণাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া লোক সকল বারপরনাই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিল।

তাঁহার লাবণ্যময় দেহ, বিভূতি-ভূষিত ললাটে অর্দ্ধেন্দুলাঞ্ছন, পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, মুখমণ্ডলে অলৌকিক ব্রহ্মতেজ বিরাজিত ছিল। মুনি-মণ্ডলী মধ্যে অবস্থিতিকালে লোকে তাঁহাকে কামজয়ী মহাদেবের লীলা মূর্ত্তি বলিয়া বিবেচনা করিত। ব্রহ্মচারি-শ্রেষ্ঠ শিশু-শঙ্কর যখন বেদবাণী উচ্চারণ করিতেন, তৎকালীন প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ তখন

তাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিতেন। তদীয় হৃদয়ে ক্ষমারূপা লক্ষ্মী বিরাজিত থাকায় সুধীগণ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

এইরূপে তাঁহার বয়সের সপ্তম অতিগত হইল। মহাযশা শঙ্কর গুরুকুলবাসরত অর্থাৎ সমাবর্ত্তন উদ্‌যাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। স্বজনানুরোধে এইরূপ প্রবৃত্তি। গুরুও সানন্দচিত্তে অনুমতি প্রদান করিলে যথাশাস্ত্র সমাবৃত্ত হইয়া গৃহে, পুত্র-বিরহ-বিহ্বলা জননীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন কিন্তু পবিত্রান্তরে রিবেকবহ্নি সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। জননী-সেবা, বেদাভ্যাস, অগ্নিসেবা ও সূর্য্যোপস্থাপনা প্রভৃতি গার্হস্থোচিত সৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকায় তদীয় বহিঃকান্তি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিনী ও আধ্যাত্মিক তেজ নিতান্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাবতীয় শঙ্কর-চরিত লেখকগণ একবাক্যে লিখিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান এই সময়েই নিরবশেষে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এদিকে শঙ্কর-জননী সতিদেবী দেখিলেন—ছেষ, অসূয়া ও হিংসার আকর স্বরূপ প্রত্যেক সুধাই নির্ব্বিকারচিত্তে তাঁহার শিশু সন্তানকে সমাদর করিয়া থাকে এবং অত্যন্ত আদরণীয় বৃদ্ধগণ ও তাঁহার বালক শঙ্করকে স্ব স্ব আসন প্রদান করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কষ্ট বোধ করিতেন না। মহামতি শঙ্করাচার্য্যের এমন এক শ্রী-সৌষ্ঠব ও অসাধারণ মহিমা ছিল যে, যতই কেন উচ্চতম মান্য লোক হউন না শঙ্করকে দেখিলে সকলেরই তদ্ভিকটে অঞ্জনিবদ্ধ হইবার ইচ্ছা হইত। তদীয় কোমলতর বচন-বিন্যাস, অদ্ভুততম-সাধুচরিত্র, আশ্চর্য্য মধুর-বুদ্ধি, অলৌকিক মানসিক বল, লোকাতীত তেজ ও অনুপম দেহ—এই সকল অবলোকন করিয়া শঙ্কর-মাতা হর্ষোৎফুল্লা হইতে লাগিলেন। অন্যান্য ব্যক্তিও তাঁহার নিকট মুগ্ধ হইতে লাগিল।

শ্রীকামাখ্যা মোহন শাস্ত্রী
সরস্বতী।

হিন্দুর জ্যোতিষ।

(৩)

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ব্রহ্মার জীবনের পঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হইয়াছে, এক্ষণে এক পঞ্চাশৎ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্মার উৎপত্তি হইতে বর্ত্তমান ১৮১৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৩০১ সনে ১৫,৫৫,২১,৯৭,২৯,৪৮,৯৯৫ সৌরবৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবী এত অধিক কাল মনুষ্যের আবাস হইয়া আজি পর্য্যন্ত একই ভাবে বর্ত্তমান নহে। কল্পান্তে যা হইয়া থাকে, বর্ত্তমান কল্পের প্রারম্ভ অবধিও ইহা মনুষ্যের আবাসোপযোগী নহে। সৃষ্টি রচিতে ব্রহ্মার কিছু সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল।

গ্রহর্ক্ষ-দৈবদৈত্যাদি
স্বজতোঽস্য চরাচরম্।
কৃতাদ্রিবেদা দিব্যাব্দাঃ
শতঘ্না বেধসো গতাঃ॥

অর্থাৎ বর্ত্তমান কল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম সত্যযুগের শেষ পর্য্যন্ত যে সময় (যে সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়) তাহার মধ্যে শত গুণিত কৃতাদ্রি বেদমিত দিব্যবর্ষ অর্থাৎ ৪৭৪০০ দিব্যবর্ষ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গ্রহ নক্ষত্রে, দেবদৈত্যাদি-চরাচর সৃজনে অতিবাহিত হইয়াছিল।

সন্ধি, ছয় মন্বন্তর, বৈবস্বত মন্বন্তরের ২৭ মহাযুগ ও বর্ত্তমান মহাযুগের সত্যযুগের শেষ পর্য্যন্ত ৫৪৭৪৪০০ দিব্যবর্ষ

∴ ৫৪৭৪৪০০—৪৭৪০০ = ৫৪২৭০০০ দিব্যবর্ষ।

অর্থাৎ সৃষ্টির পর বর্ত্তমান মহাযুগের শেষ পর্য্যন্ত ৫৪২৭০০০ দিব্যবর্ষ অতীত হইয়াছে। ৩৬০ সৌর বৎসরে এক দিব্য বৎসর।

∴ ৫৪২৭০০০ × ৩৬০

= ১৯৫০৭২০০০

ত্রেতাযুগ = ১২৯৬০০০

দ্বাপর = ৮৬৪০০০

কলের্গতাব্দ = ৪৯৯৫

সুতরাং ১৯৫৫৮৮৪৯৯৫

সৌরবৎসর অতীত হইল মনুষ্যাদি চরাচর পুনঃসৃজিত হইয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পৃথিবী মনুষ্য-বাসোপযোগী রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ১৯৫৩৭২০০০ বৎসর বর্ত্তমান মহাযুগের সত্যযুগান্ত পর্য্যন্ত অতীত হইয়াছে। এই অঙ্কটি ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে, অতএব এইটি স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয় বলিয়া অঙ্কটি দুই-বার উল্লিখিত হইল।

এইক্ষণে গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে কথিত হইতেছে।

পশ্চাৎ ব্রজন্তোঽতিজবাৎ
নক্ষত্রৈঃ সততং গ্রহাঃ।
জীয়মানাস্তু লম্বন্তে
তুল্যমেব সমাগমাৎ॥২৫॥

অর্থাৎ গ্রহগণ তুল্যবলেই পশ্চিমাভিমুখে স্ব স্ব পথে গমন করিতেছে, কিন্তু নক্ষত্রগণ দ্রুততর গমন করে বলিয়া গ্রহগণ পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া পড়ে।

প্রাগ্‌গতিত্বমতস্তেষাং

ভগণৈঃ প্রত্যহং গতিঃ।
পরিণাহবশাদ্বিদ্যা
তদ্বশাত্তানি ভুঞ্জতে ॥ ২৬ ॥

অর্থাৎ গ্রহগণ নক্ষত্র নিচয় অপেক্ষা মন্দ গতি সম্পন্ন এই জন্যই তাহাদিগের পূর্ব্বদিকে গতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রহগণের গতিপথ সমান নহে এজন্য তাহাদের দৈনিক গতিও সমান নহে। এই দৈনিক গতির তারতম্য হেতুই গ্রহবিশেষের নক্ষত্র-চক্র বা রাশি-চক্র অতিক্রম করিতে সময়ের তারতম্য হইয়া থাকে।

শীঘ্রগাস্তান্যথাজেন
কালেন মহতাল্পগঃ।
তেষাস্তু পরিবর্ত্তেন
পৌষ্ণান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ ॥২৭ ॥

অর্থাৎ শীঘ্রগামী যে সকল গ্রহ তাহারা অল্প সময়েই রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। অল্পগামী বা মন্দগামী গ্রহনিচয় বিলম্বে রাশি-চক্র অতিক্রম করে। রেবতী নক্ষত্রে তাহাদের ভগণ বা রাশিচক্র-ভ্রমণ শেষ হইয়া অশ্বিনীতে পুনরারম্ভ হয়।

এইক্ষণে রাশিচক্র-বিভাগ কথিত হইতেছে

বিকলানাং কলা ষষ্ট্যা
তৎষষ্ট্যা ভাগ উচ্যতে।
তদ্রিংশতা ভবেদ্রাশিঃ
ভগণো দ্বাদশৈব তে ॥ ২৮ ॥

অর্থাৎ ৬০ বিকলায় এক কলা, ৬০ কলায় এক ভাগ বা অংশ ৩০ অংশে এক রাশি, দ্বাদশ রাশিতে এক ভগণ হয়।

ভগণ শব্দে নক্ষত্র-নিচয় অর্থাৎ ২৭ নক্ষত্র পুঞ্জে রাশি-চক্র বা ভগণ গঠিত। যে পরিমাণ সময়ে কোন গ্রহ একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিতে পারে তাহাই তাহার এক ভগণকাল। ইংরাজীতে অংশকে ডিগ্রি, কলাকে মিনিট, বিকলাকে সেকেণ্ড বলে; প্রায় সকল জাতিই রাশিচক্র—বিভাগ একবিধ।

যুগে সূর্য্যজশুক্রাণাম্
ষড়চতুষ্করদার্ণবাঃ।
কুজার্কি-গুরু-শীঘ্রাণাং
ভগণাঃ পূর্ব্বযায়িনাম্ ॥ ২৯ ॥

অর্থাৎ এক মহাযুগে সূর্য্য, বুধ ও শুক্রের এবং মঙ্গলের শনির ও বৃহস্পতির শীঘ্রের ৪৩২০০০০ ভগণ হয়।

এই স্থলে শীঘ্র এই শব্দটি একটু বিশদ করা প্রয়োজন। মঙ্গল শনি ও বৃহস্পতি কক্ষা বা গতিপথের যে অংশ পৃথিবী হইতে অধিক দূরে তাহাই ঐ সমস্ত গ্রহের শীঘ্রোচ্চ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা ইংরাজী জ্যোতিষ বা কেবল মাত্র ইংরাজী ভূগোল পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা যদিও পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে বলিয়াই জানেন তথাপি এই প্রবন্ধটি পাঠ করিবার সময় কেবল তাহারা পৃথিবীকে অচল বলিয়া মনে করিয়া লইবেন। তাঁহাদের জ্ঞান আছে মধ্যস্থলে সূর্য্য অবস্থিত; তাহার চারি-ধারে, প্রথম বুধ (Mercury) তৎপর শুক্র (Venus) পৃথিবী (Earth) মঙ্গল (Mars) বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn) ইত্যাদি গ্রহ-গণ ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু অন্ততঃ এই প্রবন্ধ পাঠের সময় তাহাদের মনে করা উচিত যে স্থলে পৃথিবী তাহার চতুর্দ্দিকে চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি যথা ক্রমে গতি ভ্রমণ করিতেছে।

ইন্দোরসাগিত্রিত্রীণ্
সপ্তভূধর মার্গনাঃ
দস্রত্র্যষ্টরসাঙ্কাঙ্কি
লোচনানি কুজস্যতু ॥ ৩০ ॥

অর্থাৎ চন্দ্রের ভগণ সংখ্যা ৫৭৭৫৩৩৩৬ এবং মঙ্গলের ভগণ সংখ্যা ২২৯৬৮৩২ নির্ণীত হইয়াছে।

বুধশীঘ্রস্য শূন্যর্ত্তু
খাদিত্র্যঙ্কনগেন্দবঃ।
বৃহস্পতে র্খদস্রাক্ষি
বেদযড় বহ্নয়স্তথা ॥ ৩১ ॥

অর্থাৎ বুধশীঘ্রের ১৭৯৩৭০৪০ ভগণ ও বৃহস্পতির ৩৬৪২২০ ভগণ হইয়া থাকে।

সিতশীঘ্রস্য ষট্‌সপ্ত
ত্রিযমাগ্নিখভূদরাঃ।
শনের্ভূ জঙ্গযট্ পক্ষ
রসবেদনিশাকরাঃ ॥ ৩২ ॥

অর্থাৎ শুক্রশীঘ্রের ৭০২২৩৭৬ ভগণ ও শনির ১৪৬৫৬৮ ভগণ হইয়া থাকে।

চন্দ্রোচ্চস্যাগ্নি শূন্যাগ্নি
বসুসর্পার্ণবাযুগে।
বামস্য পাতস্য বস্বগ্নি
যমাবিশিখিদ্রস্রকাঃ ॥ ৩৩ ॥

অর্থাৎ চন্দ্রোচ্চের ৪৮৮২০৩ ভগণ ও রাহুর ৩২২৬ ভগণ হয়।

ভানামষ্টাঙ্কিবস্বদ্রি
ত্রিদ্বিদ্যষ্টশরেন্দবঃ।
তোদয়ো ভগণৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ
উণাঃ স্বোদয়ো যুগে ॥ ৩৪ ॥

অর্থাৎ নক্ষত্রগণের এক মহাযুগে ভগণ হয়া ১৫৮২২৩৭৮২৮ অর্থাৎ এক মহাযুগে ১৫৮২২৩৭৮২৮ নাক্ষত্র দিন হয়, নাক্ষত্রিক ভগণ হইতে যে কোন গ্রহের ভগণ বাদ দিলে ঐ গ্রহ মধ্যে ঐ গ্রহের উদয়-পরিমাণ অবগত হওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক কয়টী হইতে, প্রত্যেক গ্রহের এক এক ভগণ কত দিনে সম্পন্ন হয়, অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সময় মধ্যে কোন গ্রহের কত ভগণ হইতে পারে, তাহা ত্রৈরাশিক দ্বারা সহজেই নির্ণয় করা যাইতে পারে।

এই স্থলে ৩৪ শ্লোকানুযায়ী গ্রহের উদয় পরিমাণ নির্ণয়ের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ম উদাহরণ। এক মহাযুগে সূর্য্য কত বার উদিত হইয়া থাকেন?

∴ এক মহাযুগে নাক্ষত্রিক ভগণ ১৫৮২২৩ ৭৮২৮ এবং „ সূর্য্যের ভগণ ৪৩২০০০০

∴ ১৫৮২২৩৭৮২৮—৪৩২০০০০
=১৫৭৯৯৭৮২৮ সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে।

২য় উদাহরণ। ১৮৮০০০০ বর্ষে কত সূর্য্যোদয়?

∴ ১৮৮০০০০ বর্ষে নাক্ষত্রিক ভগণ ৩৯৫৯৪৫৭ এবং ঐ সংখ্যার বর্ষে সূর্য্যের ভগণ ১৮৮০০০০

∴ ৩৯৫৯৪৫৭—১৮৮০০০০
=৩৯৪৪৭৩৪৫৭ সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে।

৩য় উদাহরণ। এক মহাযুগে কত চন্দ্রোদয়?

∴ এক মহাযুগে নাক্ষত্রিক ভগণ ১৫৮২২৩ ৭৮৮৮ এবং এক মহাযুগে চন্দ্রের ভগণ ৫৫৭৭৫৩৩৩৬

∴ ১৫৮২২৩৭৮২৮—৫৭৭৫৩৩৩৬
=১৫২৪৪৮৪৪৯২ চন্দ্রোদয় হইয়া থাকে।

প্রত্যেক মাসে সূর্য্যোদয় অপেক্ষা কমবার চন্দ্রোদয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানেন।

ভবন্তি শশিনো মাসাঃ
সূর্য্যেন্দু-ভগণান্তরং।
রবের্মাসোনিতাস্তেতু
শেষাঃ সূর্য্যধিমাসকাঃ ॥ ৩৫

অর্থাৎ সূর্য্যের ভগণ ও চন্দ্রের ভগণের অন্তর চান্দ্রমাস। চান্দ্রমাস হইতে সৌরমাস বাদদিলে অধিমাস সংখ্যা পাওয়া যায়।

৪র্থ উদাহরণ। এক মহাযুগে কত চান্দ্র মাস?

∴ চন্দ্রের ভগণ—সূর্য্যের ভগণ=চান্দ্রমাস

∴ ৫৭৭৫৩৩৩৬−৪৩২০০০০

=৫৩৪৩৩৩৩৬ চান্দ্রমাস।

৫ম উদাহরণ। একমহাযুগে কত অধিমাস?

∴ ৪৩২০০০০×১২=৫১৮৪০০০০ সৌরমাস এক মহাযুগে

∴ চান্দ্রমাস—সৌরমাস=অধিমাস

∴ ৫৩৩৩৩৩৬−৫১৮৪০০০০=১৫৩৩৩৬ অধিমাস॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।

ঠাকুর-ঝি।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ শনিবার, রাত্রি দুই প্রহরের সময় হীরালাল বৈঠকখানা হইতে বাড়ীর ভিতর আসিলেন। শরৎকুমারী স্বামীকে আহারাদি করাইবার জন্য তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল; হীরালাল আহার করিবেন কি—অকস্মাৎ শরৎকুমারীর এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন! এই সময় একটা ঘোরতর সন্দেহও তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। যে শরৎকুমারী তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাইত না, আজ সেই শরৎকুমারী তাঁহাকে স্বহস্তে আহার করাইবার জন্য রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া কেন? মনে কোন কু-অভিসন্ধি লাইতে? এই সকল আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে বিষ থাকিতে পারে না কি? শরৎকুমারীর কার্য্য দেখিয়া হীরালালের মনে তখন এইরূপ ভাব উদিত হইতে লাগিল। আজ শনিবার হইলেও যে তাঁহার জ্ঞানের ব্যতিক্রম হয় নাই, সেই জন্য আপনার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলেন, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই আহারীয় দ্রব্য তিনি স্পর্শও করিবেন না।

হীরালালকে শয়ন করিতে যাইতে দেখিয়া শরৎকুমারী বলিল—"আমি, তোমার খাবার নিয়ে বসে আছি, আগে খাও।" যে কারণেই হউক, শরৎকুমারীর এ কথাগুলিও অপ্রীতিকর বোধ হইল। হীরালাল তাহার এই অর্থ করিলেন যে, নিশ্চয়ই তবে মনের মধ্যে কোন কু-অভিসন্ধি আছে। বড় রাগও হইল, হীরালাল তখন উত্তর করিলেন—"খাবার নিয়ে বসে আছ, তাত দেখতে পাচ্ছি, এখন মৎলবটা কি প্রকাশ করে বল দেখি।"

শরৎ।—তোমায় আগে হবে, তার পর শুতে পাবে।

হীরালাল। একবারে জন্মের মত শুতে হবে না কি?

শরৎকুমারী স্বামীর কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না, তত্রাচ তাহার প্রাণে একটা আঘাত লাগিল। শরৎ হীরালালের মুখের প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল; তাহার পর বলিল—"আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।"

হীরালাল তখন ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল—"আমি কিন্তু তোমার কথা, ভাব, কাজ সবই বুঝতে পাচ্ছি।"

শরৎকুমারী এইবার সজল নয়নে বলিল—"আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধ করেছি, আমি তখন সে সব বুঝতে পারি-নি, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।"

হীরালাল তখন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। শরৎকুমারী কাঁদিতেছে আর হীরালাল হাসিতেছে! এ হাসি-কান্নার অর্থ আপনারা বুঝিতে পারিলেন কি? সে হাসি থামিয়া হীরালাল বলিলেন—"এখন আয়োজনটা কি করেছ বল? কত বিষ এতে মিশিয়ে রেখেছ আর। কত খেলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হবে বল?"

শরৎকুমারী একথার আর কি উত্তর দিবে? নীরবে তখন রোদন আরম্ভ করিয়া দিল। পূর্ব্বে শরৎকুমারীর এক ফোঁটা চক্ষের জলে যাহা হইত, এখন অবিশ্রান্ত অশ্রুবিন্দুতেও তাহা হইল না! হায় শরৎকুমারী! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে? এযে তোমার রোগীর মৃত্যুর পর ঔষধ সেবন করান হইতেছে। শরৎকুমারী কিন্তু আর কোন কথা বলিল না, এখন তাহার অনেক কথা মনে হইতে লাগিল, কিন্তু মুখে কোন কথাই আসিল না। হীরালালের মন কিন্তু এখন বড় প্রফুল্ল, হীরালাল প্রফুল্লমনেই বলিলেন,—"আর মায়া-কান্না কাঁদবার দরকার নাই, বিষ খেয়ে মরতে প্রস্তুত আছি, তবু তোমার মায়া-কান্না দেখতে পারবো না।"

শরৎকুমারী তখন আর থাকিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। হীরালালের তাহাতে আনন্দের আর সীমা নাই! সেই পরদুঃখ-কাতর হৃদয় এখন আপনার স্ত্রীর দুঃখে আনন্দে অধীর! শরৎকুমারী তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা না কর্‌লে, আমি এ প্রাণ আর রাখ্‌বো না।"

হীরালাল তখন আরম্ভ করিল—"ছি! শরৎকুমারি ছি! তোমার এই কাজ? যে তোমার দাসানুদাসেরও যোগ্য নয়, যে একদিন এইরূপ তোমার পায়ে ধরে, কত মিনতি করে, ক্ষমা চেয়েছিল, যার দিকে তুমি সে সময় একবার ফিরেও চাও-নি; আজ কি না তুমি তার পায়ে ধরে কাঁদ্‌ছো! ছি! ছি! ছি! তোমার এমন মতিগতি কেন হলো শরৎকুমারি? তোমার সে অহঙ্কার—সে তেজ—সে দর্প কোথায় গেল? তোমার কি এমন করে কাঁদা শোভা পায়? যে একসময় তোমার অনুগ্রহলাভের জন্য তোমার পিছু পিছু ফির্‌তো, যে তোমার মুখে একটি ভাল কথা শুন্‌তে পেলে স্বর্গ হাতে পেতো, আজ কি না তুমি তারই পায়ে পড়ে কাঁদ্‌ছো! এ তোমার মান না অপমান শরৎকুমারি? এতে তোমার মানের লাঘব হবে—না গৌরব বৃদ্ধি হবে শরৎকুমারি?"

হীরালালের শ্লেষবাক্যে শরৎকুমারীর সেই নীরবে রোদন ভিন্ন আর কোন উত্তরই নাই। হীরালালের আনন্দের বৃদ্ধি ভিন্ন কিন্তু এখন আর হ্রাস ছিল না। হীরালাল পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"আর নয়, আমার পা ছেড়ে দাও, মনে করেছিলুম, ঘরে এসে তুমুবো; তাও অদৃষ্টে নেই। এখন ছেড়ে দাও, আমি প্রাণ নিয়ে পালাই। তুমি যা মনে করছো, আমি মদ খাই বটে, কিন্তু এখন আর অজ্ঞান হয়ে পড়ি না; আমার বিলক্ষণ জ্ঞান থাকে। তোমার কার্য্যোদ্ধার হলো না বলে, আমিও

দুঃখিত হলেম। এখন আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাইরে গিয়ে একটু ঘুমুই।"

শরৎকুমারী বলিল—"আমার অপরাধের কি ক্ষমা নেই? তুমি ক্ষমা না করলে, আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো।"

হীরালাল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শরৎকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কি তাহার সেই শরৎকুমারী? হীরালাল কিছুই বুঝিতে পারিল না, তাহার বিপক্ষে যেন ভয়ঙ্কর কি একটা ষড়যন্ত্র হইতেছে, হীরালাল তখন মনে মনে এইরূপ স্থির করিল। হীরালাল অস্থির হইয়া পড়িল, একটা ভাবী বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শনিবারের পর দিনই রবিবার। রবিবারে আফিসাদি বন্ধ থাকে, সেই জন্যই শনিবারের এত আদর। আজ রবিবার প্রাতঃকাল হইতেই হীরালাল বাবুর বৈঠকখানায় বিলক্ষণ ধূমধাম। এখন হীরালালের অনেক নূতন বন্ধু জুটিয়াছে, তবে সে সকল বন্ধু পরেশনাথ শ্রেণীর অন্তর্গত। হীরালালের এখন আর লোকলজ্জার ভয় নাই; আজ প্রাতঃকাল হইতেই যেরূপ আমোদের ধুম পড়িয়া গিয়াছে, সে আমোদের তোড়ে প্রতিবাসিগণ পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বৈঠকখানায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর যেরূপ পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হইয়া থাকে, আজ দিবাভাগেই তাহার মাত্রা কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া গেল। তবে সে সকল পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনেতা হীরালাল স্বয়ং নহে, পরেশনাথপ্রমুখ বন্ধুগণেই সে অভিনয়ের ভার লইয়াছিল। হীরালালেরও ইহাতে যথেষ্ট আনন্দ ও উৎসাহ ছিল, সুতরাং সে অভিনয়ে কোনরূপে বাধা বা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতায় হীরালালের পূর্ব্বপুরুষগণের বহুকালের বাস; সুতরাং সে পাড়ায় হীরালাল বাবুর প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল, পাড়ার সকলেই তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিল, সুতরাং হীরালালের এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তবে কেহ কোন কথা হীরালালকে সাহস করিয়া বলিত না, তাঁহার ব্যবহার দেখিয়াই তাহারা স্তম্ভিত। ভাল যদি মন্দ হয়, তবে তাহার চূড়ান্তের আর সীমা থাকে না। হীরালালের প্রতিবাসী, আত্মীয় বন্ধু সকলেরই নিকট তাহার ভয়ঙ্কর দুর্নাম রটিয়াছিল, অনেক সময় তাঁহাদের মধ্যে হীরালালের এইরূপ পরিবর্ত্তনের আন্দোলন হইত। অনেকে তাঁহার পূর্ব্বচরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া নীরবে তাহার জন্য অশ্রুমোচন করিত।

সুরার কি অপার মহিমা! যে হীরালালের নাম শুনিলে পূর্ব্বে লোকের আনন্দ-সাগর উথলিয়া উঠিত, এখন সেই হীরালালের নাম শুনিলে সকলেই ঘৃণার সহিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকে। সুরার অসাধ্য কার্য্য এ পৃথিবীতে আর কি আছে? কিন্তু যে সুরা সোণার হীরালালকে মাটি করিয়াছে, তাহার অন্য ক্ষমতার পরিচয়ের আর আবশ্যক নাই। এ পৃথিবীতে এমন পাপ নাই, এই সুরা যাহার জন্ম দিতে পারে না; কিন্তু যে সুরা হীরালালের ন্যায় নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ঘোরতর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিতে পারে, সে সুরা পারে না—এমন কাজই বা কি আছে? হে সুরে! তোমার অতুল ক্ষমতার আর কি পরিচয় দিব? তোমাকে মহাপরাক্রমশালী

জানিয়া স্বয়ং রাজা তোমার পৃষ্ঠপোষক। তুমি যে সংসারে একবার প্রবেশ কর, সে সংসার অল্পদিনের মধ্যেই শ্মশানে পরিণত হয়। তুমি যে দিক দিয়া যাও, সেই দিকেই হাহাকার! সতীর দীর্ঘ নিশ্বাস, বিধবার অশ্রুজল, বালকবালিকার ক্রন্দন—এ সকলই তোমার অঙ্গের আভরণ। তোমায় কোটী কোটী নমস্কার!

আজ দিবা দুই প্রহর পর্য্যন্ত হীরালালের বৈঠকখানায় সেই পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় চলিয়াছে। এখনও হীরালালের স্নানাহার পর্য্যন্ত হয় নাই, আজ যে তাহার স্নানাহার হইবে, সে আশাও নাই। এমন সময় তাঁহার বন্ধু সুরেন্দ্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হীরালাল সুরেশকে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, বন্ধুকে কোনরূপ অভ্যর্থনা পর্য্যন্ত করিলেন না। সুরেশ বাবু সে বিষয়ে কোন লক্ষ্য না করিয়া, ধীরে ধীরে হীরালালের নিকটে গিয়া বসিলেন। তাঁহার উপস্থিত বন্ধুগণের আমোদে বড় ব্যাঘাত পড়িল। হীরালাল ইঙ্গিতের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে গৃহে যাইতে বলিলেন। তাহারা সকলেই বিষণ্ণমনে গৃহে চলিয়া গেল, কেবল পরেশনাথ গেল না। সে সময় তাহার হঠাৎ সেখান হইতে উঠিয়া যাইবার অবস্থাও নয়। তাহারা চলিয়া গেলে পর সুরেশ বাবু বলিলেন—"এ পর্য্যন্ত কি স্নানাহার হয়নি নাকি?"

হীরালাল উত্তর করিলেন—" না। বেলা বড় বেজেছে?"

সুরেশ।—বেলা প্রায় একটা বাজে।

হীরালাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"সে কি এরই মধ্যে একটা বাজে!"

সুরেশ।—ভায়া, সমস্ত লোকের হাত ধরা নয়। আর তুমি যে যে আমোদে ছিলে, এতে কটা বাজ্‌বে, তা কি করে টের পাবে?

হীরালালের মুখে আর কথা নাই; হীরালাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। সুরেশ বাবু তখন পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"এত বেলা পর্য্যন্ত স্নানাহার না করে, কেবল মদ খাওয়া হচ্ছে বুঝি? এরকম কল্লে ক'দিন বাঁচ্‌বে?"

হীরালাল এই বার গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"আমার মরণই ভাল। দিবারাত্র মনের অসুখে থাকলে, বেঁচে থেকে আর সুখ কি?"

সুরেশ।—দিবারাত্র মনের অসুখটা কিসে হয়?

হীরালাল।—কেন তুমি কি তার কারণ জান না?

সুরেশ।—জানি—তোমার স্ত্রী তোমার মনের মতন নয়। এ সংসারে ক'জনের স্ত্রী মনের মত হয়? তা বলে এমন করে, নিজে অধঃপাতে যাও কেন?

হীরালাল।—মন ভাল থাকবে বলে।

সুরেশ।—আমি জানতুম, তুমি ভালরূপ লেখা পড়া শিখেছ, তোমায় ভালরূপ বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে; এখন দেখ্‌ছি—তুমি একটি নিরেট মূর্খ। মদ খেয়ে খানিকক্ষণ 'হোহা' কর্‌লেই বুঝি মন ভাল থাকে? শরীরের সঙ্গে আর মনের সঙ্গে যে কি নিকট সম্বন্ধ তা কি তুমি জান না? যাতে শরীর নষ্ট হয়, তাতে কি কখন মন ভাল থাকতে পারে?

হীরালাল এইবার উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, —"ভাই সুরেশ, তোমায় আমার মনের কথা সব খুলে বল্‌ছি। আমি আমোদ করবো বলে, মদ খাই না; আমি আমার জীবনকে নষ্ট কর্‌বার জন্যেই মদ

খাই। একদিন হঠাৎ বিষ খেয়ে মরার চেয়ে, ক্রমে ক্রমে এই রকমে মরা কি ভাল নয়?"

সুরেন্দ্রও এবার উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"তোমার মরাই ভাল—এরূপ ঘৃণিত জীবন রাখার চেয়ে, এখন মরাই ভাল। আর তোমার মৃত্যু ত এক প্রকার হয়েই গেছে। আমার সেই প্রাণের বন্ধু হীরালাল ত এখন আর নাই, সে ত অনেক দিন মরে গেছে। এখন তার সেই মৃত দেহে এক কুলাঙ্গার প্রবেশ করে, এই সকল কের্ত্তেকারী করছে বইত নয়।"

হীরালাল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"মরবো—আর দিনকতক পরে মরবো। যে আমার জীবনের সকল সুখ, সকল আশা-ভরসা নষ্ট করেছে, তার জীবনের সকল সুখ সকল আশাভরসা নষ্ট করে, তবে মরবো। আমি প্রাণে যে জ্বালা পেয়েছি, দিবারাত্রি যে জ্বালা ভোগ করছি, সে জ্বালা যখন সে অনুভব করবে দেখতে পাবো, আমি সেই দিনই মরবো।"

সুরেশ-বাবু তখন বিরক্তভাবে বলিলেন—"তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি এখন সবলোপ পেয়ে গেছে। এ তোমার চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া হচ্ছে। তুমি তোমার স্ত্রীর উপর রাগ করে, তোমার নির্ম্মল চরিত্র হারাচ্ছ; এ ক্ষতি তোমার কিছুতেই পূরণ হবে না। নির্ম্মল চরিত্র অপেক্ষা মানুষের মূল্যবান্ সম্পত্তি আর কিছুই নাই।"

হীরালাল। আমি সব বুঝি—সব জানি। কিন্তু আমার প্রাণের জ্বালা কেউ বুঝতে পারে না—এই আমার দুঃখ। আমি যে অধঃপাতে যাচ্ছি, তাকি আমি বুঝতে পারি নাঁ? কিন্তু এই অধঃপাতে যাওয়া ভিন্ন আর আমার অন্য উপায় কিছুই নাই। এরূপ মনের কষ্টে অনেকে ত পাগল হয়, মনে কর, আমি পাগলই হয়েছি।

সুরেশ। তুমিত একলা, অধঃপাতে যাচ্ছ না; সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরও অনিষ্ট করছো যে। আমি শুনতে পাই, তোমার অনেক দেনা দাঁড়িয়েছে। তোমার দেনা হবারত কোন কারণ নাই। তুমি আপিসে প্রতিমাসে দেড়শত টাকা বেতন পাও, তা ছাড়া তোমার পৈতৃক সম্পত্তির আয়ও আছে। তোমার দেনা হয় কেন আমায় বুঝিয়ে দিতে পার? এখন যেরূপ দাঁড়াচ্ছে, তাতে তোমার আপিসের চাকরী ত থাকা অসম্ভব; আর দেনাও যা দাঁড়িয়েছে, তাতে পৈতৃক সম্পত্তি বেচে তোমার দেনা দিতে হবে। তুমি যদি ইচ্ছে করেই তোমার জীবন নষ্ট কর, তাহলে তোমার বৃদ্ধ মা আর বিধবা ভগিনীর কি উপায় হবে বল দেখি?

হীরালাল এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; এইবার পরেশনাথ উত্তর করিল,—"যার অদেষ্টে যা আছে, তাই হবে। সে ভাবনা, এখন ভাবনার দরকার কি? এখন যে কয়দিন এ পৃথিবীতে থাকতে হবে, আমোদ করে, কাটিয়ে দিতে পারলেই হলো।"

সুরাপানে উন্মত্ত পরেশনাথের উপরোক্ত অশ্লীল-জড়ান-কথা কয়েকটি শুনিয়া সুরেশ বাবু ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করছি না। তোমাদের মত কতকগুলা নরাধম জুটেইত এই সোণার হীরালালকে মাটি করেছো।"

তাহার পর তিনি হীরালালকে বলিলেন, —"এখন এসকল কথার সময় নয়, আগে তুমি স্নানাহার কর, তার পর এসকল কথা হবে। কিন্তু সে স্থানে আর কেউ থাকতে পারবে না; কেবল তুমি আর আমি থাকবো।"

পরেশনাথ তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বোতলে অবশিষ্ট সুরা গেলাসে ঢালিয়া সুরেশের সম্মুখে তাহা পান করিল। তাহার পর টলিতে টলিতে আর অস্পষ্ট ভাষায় কি বকিতে বকিতে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। সুরেশ-চন্দ্র অবাক্ হইয়া তাহার ব্যবহার দেখিতে লাগিলেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রাণের মিলন।

(ছোটগল্প)

(১)

এখনও ভাল ফরসা হয় নাই, পূর্ব্বদিক অল্প অল্প রাঙ্গা রাঙ্গা হইয়া আসিতেছিল। নীরব নিস্তব্ধ-নিকুঞ্জবৃন্দে তখনও ঘনান্ধকার পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত; বসন্ত-কোকিলের মধুর-উচ্ছ্বাস দিগ্-দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইয়া অনন্ত-আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছিল। সমস্ত রাত্রি সংসারে আধিপত্য করিয়া, অন্ধকার যেন ভয়ে ভয়ে সরিয়া যাইতেছিল—অন্ধকারের ক্রোড়ে শীতালোক এখানে সেখানে উঁকি মারিয়া যেন বসন্তব্রহ্মাণ্ডের অনিত্যতার পরিচয় দিতেছিল।

এমন সময়ে কুসুমোদ্যানে, একটী বালিকা একমনে ফুল তুলিতেছিল। বসন্তকাল; বাগানে নানাজাতীয় সুরভি-কুসুম বিকসিত হইয়া, পবনদেবের "গন্ধবহ নাম সার্থক করিয়া দিয়াছিল। বসন্ত-উষার ধীর মধুর মলয়-সমীর ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল—সুরভি-কুসুম-পরিমল বহন করিয়া বালিকার প্রীতি উৎপাদনের জন্যই যেন, বার-বার তাহার অঞ্চল এবং কপোলের কেশ-গুচ্ছ দোলাইয়া দিতেছিল।

বেহায়া মলয়ার এইরূপ বেয়াদবী কিন্তু বালিকার অধিকক্ষণ ভাল লাগিল না;—বালিকা একটু বিরক্ত হইয়া "আর পারিনে থাকুগে" বলিয়া, নিকটস্থ একটী কুঞ্জ-কুটীরে প্রবেশ করিল। তখন কুঞ্জ-কুটীরে অল্প অল্প আলো প্রবেশ করিয়াছিল, বালিকা ভাল ভাল ফুলগুলি বাছিয়া সযত্নে মালা গাঁথিতে লাগিল।

বালিকার বয়স দ্বাদশ বৎসর, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, নয়ন আকর্ণবিশ্রান্ত, "খগরাজি পায় লাজ নাসিকা অতুল;" হরধনুকে পরাজয় করিতে না পারিলেও ভ্রূ সুন্দর, চিকুররাশি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, চিবুক রক্তাভ, অধরপ্রান্ত রক্তরাগরঞ্জিত, সুন্দর ওষ্ঠে রক্তরাগের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতেছে। এক কথায় বালিকা সুন্দরী—অনেক সুন্দরীর মধ্যেও সুন্দরী—কামিনী-কুসুমকুলের শ্রেষ্ঠ কুসুম-কলিকা; নব-বসন্ত-সমাগমে হাস্যময়ী প্রেমরূপ নীহারবিন্দু এখনও স্পর্শকরে নাই, কিন্তু বিকাশ-কাল বোধ হয় আর অধিক দূরে নাই।

বালিকা মালা গাঁথিতেছিল, দেখিতে দেখিতে মালা-গাঁথা সমাপ্ত হইল। বালিকা যেন একটু ব্যস্ত হইয়া, একবার আকাশের পানে, একবার তাহার চারিদিকে চাহিল। ক্রমে তাহার চঞ্চল চল্ চল্ করিয়া আসিল। দুই এক বিন্দু অশ্রু অজানিতভাবে তাহার রক্তাভ গণ্ডদেশ বাহিয়া মালার উপর পড়িল। যত সময় যাইতে লাগিল, বালিকা ততই

অধীরা হইতে লাগিল। পরে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, কুঞ্জবন হইতে বাহির হইল। চারিদিক চাহিতে চাহিতে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল। অগ্রসর হইতে হইতে অস্ফুটস্বরে বলিল—"এখনও তিনি এলেন না কেন, আজ যে তিনি আসবেন বলিয়াছিলেন, হা ভগবন! কি করিলে?"

ভগবান সুস্থি বালিকার দুঃখ দেখিয়া সদয় হইলেন। অচিরে তাহার অদূরে এক যুবা-মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল — যুবক বালিকারই দিকে আসিতেছিল। যুবককে দেখিয়া, বালিকার শোকাশ্রুপূর্ণ নয়নে আবার আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল—দুঃখ-ক্লিষ্ট বদনে আবার আনন্দের ছবি প্রতিভাত হইল।

যুবক সুন্দর—প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সুন্দর না হইলেও সুন্দর—সে সৌন্দর্য্যে, সৌন্দর্য্য আছে—মাধুর্য্য আছে।

যুবক ক্রমে বালিকার নিকটবর্ত্তী হইল। ক্ষনেক ক্ষণ উভয়েই নীরব রহিল—উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে যুবক বলিল—"প্রভো! আজ তোমায় এত বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? তোমার বিষণ্ণতা দেখিলে যে আমার বুক ফাটিয়া যায়!"

বালিকার নাম প্রভাময়ী। প্রভাময়ী যুবকের কথার কোনও উত্তর প্রদান করিল না—পূর্ব্বের ন্যায় নতমুখে রহিল।

যুবক প্রভাময়ীর হাত ধরিয়া পুনরায় বলিল—"একি! প্রভা তুমি কাঁদিতেছ কেন? ছি! আজ-তোমার জন্য গোলাপ ফুল আনিতে একটু আসিতে দেরি হইয়াছে বলিয়া কি কাঁদিতে হয়?"

বালিকা এবার আর নীরবে থাকিতে পারিল না; আস্তে আস্তে অস্ফুট স্বরে বলিল—"ও কিছু নয়, সুধীর! ও কিছু নয়।"

যুবকের নাম সুধীর। সুধীর প্রভাময়ীর রোদনের কারণ বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া হস্তস্থিত দুইটী ভাল বড় গোলাপ প্রভা করায়তে পরাইয়া দিয়া, তাহার আরক্তিম গণ্ডদেশ সাদরে চুম্বন করিল।

এইবার বালিকা সব ভুলিয়া গেল। অতি মুচ্ছিয়া সানন্দে পূর্ব্ব-গ্রথিত মালা সুধীরের গলায় দিয়া কোমলস্বরে বলিল—"তাই এমন করিয়া কি চিরদিন তোমার গলায় মালা দিতে পারিব? সুধীর! আমরা চিরদিন কি এমনিই থাকিতে পারিব?"

(২)

এই আছে এই নাই। এই পূর্ণিমা চন্দ্রিকা প্রকৃতিকে হাসাইলেন—অন্ধকার নাই, আবার অমানিশায় চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত হইল—প্রকৃতির সে হাসি নাই—চন্দ্রকরে অমল-ধবল কিরণের সে ঢলঢল ভাবও আর নাই। এই শিশু ছিল, কিছুদিন পরে যুবা হইল—শৈশবাবস্থা নাই, আবার যৌবন বার্দ্ধক্যে পরিণত হইল—সে যৌবনাবস্থা নাই; কিছুদিন পরে বৃদ্ধ আবার সংসার ছাড়িয়া—সংসারের লীলাখেলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল — তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। দিবাভাগে দিবাকর আছেন—নিশাকর নাই, রজনীতে রজনীকর আছেন—দিবাকর নাই। যাহার সুখ ছিল, দুঃখ হইল—আর সুখ নাই। যাহার প্রতি ভালবাসা ছিল, তাহার প্রতি মনের বিকার জন্মিল—আর সে ভালবাসা নাই। এই আছে এই নাই। তাই বলি সংসারে কিছুই চিরদিন থাকে না—জগৎপ্রভা ক্ষণবিস্ফূর্ত্তির ন্যায় সকলই ক্ষণিক—সকলই এই আছে এই নাই।

যে প্রভাময়ীকে একদিন কত আদরে কুঞ্জকুটীরে মালা গাঁথিতে দেখিয়াছিলেন—যে

প্রভাময়ীর অনুপম-রূপলাবণ্য-সন্দর্শনে এক দিনও না সুখী হইয়াছিলেন, ঐ দেখুন পাঠক! আজ সে প্রভাময়ীর বিম্বাধরে সে সুখ হাস্যরেখা আর দেখা যাইতেছে না। প্রভাময়ীর ললিত লাবণ্যচ্ছটার সে লালিত্য—সে ঔজ্জ্বল্য, রক্তিম গণ্ডের সে সৌন্দর্য্য; সে সুষমা আর নাই। প্রভাময়ীর শরীর আজ বিশীর্ণ, আয়তলোচন বিশুষ্ক, অসম্বদ্ধ চিকুর-রাশি চারিদিকে অযথা বিক্ষিপ্ত! হায়! কে ইহার রহস্য বুঝিবে?

আজ এক বৎসর হইল, প্রভাময়ীর পরিণয় হইয়াছে—সুধীরের সহিত নয়—অপর এক যুবকের সহিত। প্রভাময়ী এবং সুধীরের বাড়ী কাছাকাছি ছিল; বাল্যকাল হইতে উহারা একসঙ্গেই খেলা করিয়া বেড়াইত। প্রভাময়ীর মাতার বড় ইচ্ছা ছিল, তিনি তাহাকে সচ্চরিত্র সুধীরের হস্তে সমর্পণ করেন। কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা! প্রভাময়ীর পিতা সুধীরকে পছন্দ করিলেন না। তিনি এক যুবকের সহিত প্রভার পরিণয়-কার্য্য সাঙ্গ করিলেন।

শ্বশুরালয়ে, প্রভাময়ীর আদরের সীমা ছিল না, যত্নের ত্রুটি ছিল না, মনোমত গহনার অভাব, বা স্বামী মোহাগের সাধ্যসাধনা ছিল না। কিন্তু এত আদর—এত যত্ন—এত সোহাগও প্রভাময়ীর ভাল লাগিল না—প্রভাময়ী মন ভুলাইতে পারিল না। দিন দিন প্রভাময়ীর দৃষ্টি চঞ্চল, মুখ মলিন, সকল কার্য্যে কেমন-কেমন অমনোযোগ হইতে লাগিল—প্রভাময়ী দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। হায়, প্রভাময়ি! আপনার অংসের জন্য হৃদয়ের মধ্যে এমন বিষাদের জলন্ত চিতা সাজাইয়াছিলে!

দুই মাস হইল, প্রভাময়ীর জ্বর হইয়াছে। চিকিৎসার জন্য প্রভা পিত্রালয়ে আইসে। নানা প্রকার চিকিৎসা হয়, কিন্তু জ্বর কিছুতেই কমে নাই। জ্বর, থাকিয়া, থাকিয়া বিকারে পরিণত হয়। সেই বিকারেই আজ প্রভাময়ী আচ্ছন্না—তাঁহার শরীর বিশীর্ণ—আয়তলোচন অনন্ত-নিদ্রায় ঢুলঢুল! হায়! ইহা কি বিকার? সুধীর ভিন্ন কে ইহার উত্তর দিবে?

প্রভাময়ীর মৃত্যুর আর মুহূর্ত্ত মাত্র সময় অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে কোথা হইতে একজন যুবক দৌড়িয়া আসিয়া প্রভাময়ীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। প্রভাময়ীর পিতা-মাতা তাহার শিয়রে বসিয়াছিলেন। তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সকলেরই যেন অল্প বলিয়া বোধ হইল — একবার মনের মধ্য ক্ষীণ স্মৃতির বিকাশ হইয়া তাঁহাদিগকে বড়ই ব্যথিত করিল। পরক্ষণেই দেখিলেন প্রভাময়ীর পার্শ্বে একজন যুবক প্রভাময়ীর সহিত অনন্ত নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিয়াছে। সেই যুবক সুধীর!

শ্রীকুঞ্জবিহারী বসাক।

কুঞ্জে আনা।

আজি কুঞ্জে এস না বঁধুরে,
তোমার ও আঁখিজলে
রাধারাণী নাহি টলে,
আমরা গুঞ্জরী আছি কুঞ্জের দুয়ারে
কুঞ্জকানন মানা আছি হে তোমারে।
চম্পক বরণী রাই
চম্পক দেখলে তাই
নীল মেঘ দেখে তেন কবরী বন্ধন,
করভুলে চূত শূলে করিবু গীড়ন।
রাধিকার মত হাস
কুন্দ ফুলে পরকাশ,
কুন্দ-কুসমেতে বঁধু করগে চুম্বন,
দাড়িম্ব বিদরে মুখা
যাও বঁধু যাও তথা,
আভাসে দেখিবে, তার দশন উজল
ফুটিছে কদম দেখি ভেবো উরুস্থল
বঁধু ফেল অশ্রুজল।
ফল পুষ্প হেরে হেরে
তৃষা যদি না নিবারে,
চন্দ্রমুখ চন্দ্র গিয়া হওতে চকোর,
নারী বিনে রজনী ফুটায়
সেথা গিয়ে পান কর মধু
আজি হেথা হতে চাও বঁধু।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ

মতামত।

চণ্ডবিক্রম।—শ্রীযুক্তরোহিনীকুমার সেন গুপ্ত প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। রাজপুতকুল-গৌরব ধর্ম্মপরায়ণ মহামতি চণ্ডের আখ্যায়িকা উপন্যাস-আকারে এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডের ন্যায় মহাপুরুষের জীবনী যেরূপ আকারে হউক, যতই প্রচারিত হয়, ততই সমাজের ও দেশের মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে। রোহিণী বাবু সেই লোকশিক্ষাপ্রদ কাহিনী এইরূপে সাধারণের পাঠ্যরূপে প্রচারিত করিয়া অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।—তাঁহার ভাষা সরল, সুপাঠ্য—অভিবর্ণনা সুন্দর ও অনুরূপ; চরিত্র গঠন প্রশংসনীয়—তিনি লোকেও তাঁহার উপন্যাস বুঝিতে পারে—বুঝিয়া, যাহাতে একত্রে আমোদ ও শিক্ষা পায়, তিনি এমনই ভাবে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার এই পুস্তকের প্রতিষ্ঠা কামনা করি; এবং আশা করি—তাঁহার দ্বারা এই-রূপে বঙ্গসাহিত্য লাভবান্ হইবে।

ছন্দোবোধ শব্দ সাগর শ্রীকালী মোহন রায় চৌধুরী সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ তিন খণ্ডে সমাপ্ত; তিন খণ্ডই আমরা পাইয়াছি। গ্রন্থের নামটী খুব জাঁকাল,—বিষয়েরও বিশেষ আড়-ম্বর আছে। "বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত বাঙ্গালা, যাবনিক ইংরেজি" ও বঙ্গপুরের ব্যব-হার্য্য যাবতীয় শব্দনিচয়ের শ্রেণীবদ্ধ উচ্চারণ ক্রমে, 'ছন্দোবন্ধাদি লিখনোপযোগী অভিধান" —ইহাই গ্রন্থের প্রথম পরিচয়। দ্বিতীয় পরি-চয় গ্রন্থকার নিজ মুখেই মুখবন্ধে ছন্দোবন্ধে দিয়াছেন; তৃতীয় পরিচয় উপসংহারে এবং পরিশেষে গ্রন্থকারের আদ্যন্তযুক্ত পদ্যে প্রকা-শিত। কিন্তু এত পরিচয়ের 'আড়ম্বরের মধ্য হইতে আমরা গ্রন্থেরই পরিচয় কিছু দিতে পারি কেমনা তাহা হইলেই গ্রন্থকারেরও পরি-চয় পাওয়া যাইবে।

"দুর্লভ কবির জন্ম যেজন প্রযাস।
ইহাতে তাদের হবে কিছু অবসাদ।
এ সব আশার এই শব্দের সাগর।
নূতন হইল সৃষ্টি বাঙ্গালা ভিতর॥"

বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালায় কবির সংখ্যা খুব কম; গ্রন্থকারের আশাসে যদি নির্ভর করা যায়, তাহা হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ঘরে ঘরে কবি জন্মিবে; সুতরাং এ গ্রন্থ বাঙ্গালি মাত্রেই আদরের সামগ্রী; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যাঁহাদের কবিত্ব-শক্তি আপনা হইতে উদ্বেলিত হয়, তাঁহারা কয়খানি ছন্দো-বোধ শব্দ সাগর মন্থন করিয়া থাকেন? কালি-দাস ও ভবভূতি; বিদ্যাপতি ও মুকুন্দরাম কয়-খানি অভিধান মুখস্থ করিয়াছিলেন? সে যাহা হউক, গ্রন্থ খানি বৃহৎ; কালীমোহন বাবু বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন; এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় নাই। যাঁহারা অক্ষর গণিয়া গণিয়া অভিধান দেখিয়া পদ্য লিখিতে ইচ্ছা করেন, ইহা তাঁহা-দের কাজে লাগিবে।

কেরল সামুদ্রিক স্বর জ্যোতিষশাস্ত্র সংগ্রহ। শ্রীকেদার নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক হিন্দি ভাষা হইতে অনুবাদিত। এই গ্রন্থ খানি প্রথমে তৈলঙ্গ ও পরে হিন্দি ভাষাতে প্রকাশিত হয়, সম্প্রতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। আজি কালি হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি লোকের দিন দিন আদর বাড়িতেছে; কিন্তু সমগ্রাভাবে ও উপযুক্ত পুস্তকের অভাবে সকলে তাহা অধিগত করিতে পারে না। গ্রন্থকার এই অভাব দূর করিবার ইচ্ছায় জ্যোতিষের তিনটী অতি প্রয়োজনীয় ও গুরু-তর বিষয় এইগ্রন্থে সহজ উপায়ে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সুখের বিষয় তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। অনুবাদ বিশদ ও সরল হইয়াছে।

শ্রীমৎ রঘুনাথ গোস্বামীর জীবনচরিত শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। হরি-ভক্তি-পরায়ণ পরম ধার্ম্মিক রঘুনাথ গোস্বামীর ন্যায় সাধুপুরুষ সংসারে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও ইনি দুর্লভ হরিপ্রেমের জন্য স্বেচ্ছায় সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভগবান্ চৈতন্য দেবের সঙ্কীর্ত্তনসুখ লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার অকপট ধর্ম্মানুরাগ ও আত্মত্যাগের কথা শুনিলে, বিস্মিত হইতে হয়। পুস্তিকাখানি ছোট, কিন্তু ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। ভাষা অদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও মনোহারিণী।

সুহৃদ্—মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা, ইডেন হিন্দু হষ্টেল হইতে প্রকাশিত। পত্রিকা খানি কতকগুলি গ্রাজুয়েট ও অণ্ডারগ্রাজুয়েট কর্ত্তৃক পরিচালিত। বিগত বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয়বিধ প্রবন্ধই থাকে। প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য। কলেজের শিক্ষিত ছাত্রবৃন্দের মধ্যে যে, বাঙ্গালা ভাষার আদর দিন দিন বাড়ি-তেছে, ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই; সেই জন্য আমরা সুহৃদের দীর্ঘ জীবন কামনা করি, সুহৃদ এক্ষন শিশু, এবং ইহার পালন-কর্ত্তারাও এখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই, সেই জন্য তাঁহা-দিগকে ধীরে ধীরে সতর্কভাবে শিশু-সুহৃদের পরিপোষণ করিতে পরামর্শ দিতেছি।

সপ্তাধ্যায়ঃ—মহর্ষি বৃহস্পতি প্রণীত, শ্রীতীর্থারপদ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যেন সকলিতশ্চানু বাদিতঃ প্রকাশিতশ্চ। হিন্দু শাস্ত্র মতে স্বপ্ন কখনই অমূলক চিন্তা নহে, ইহার অর্থ আছে। কি রূপ স্বপ্ন দেখিলে কেমন ফল হয়, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহা বিশদরূপে বুঝা-ইয়া দিবার জন্য মূল ও তাহার অনুবাদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং কংসের স্বপ্ন

বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়া তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কি উপায়ে দুঃস্বপ্নের শান্তি করা যায়, তাহাও এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রকটিত হইয়াছে। অনুবাদ অবিকল ও বিশুদ্ধ।

যোগিনী শ্রীঅতুলানন্দ গুপ্ত প্রণীত। ইহা একখানি ছোট নভেল; পতিভক্তি-প্রদর্শনই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার বোধ হয় বালক, অথবা নবীন চিত্রকর। গ্রন্থের নায়িকা উমাকে সতীর আদর্শ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পাকা চিত্রকর হইলে উমার চিত্র আরও ফুটিয়া উঠিত। চিত্রকরের নৈপুণ্য অভাবে চিত্রগুলি অস্ফুট রহিয়া গিয়াছে।

কবিতা-প্রসূন (দ্বিতীয় ভাগ) শ্রীরাজেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত। মধ্য বাঙ্গালা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠোপযোগী করিয়া এই কবিতা পুস্তকাখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে এবং ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতির এক একটী কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার নিজেও দুই একটী কবিতা রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নিজের কবিতাগুলি বাহির না করিলেই ভাল হইত। ইহার রচিত যমুনা শীর্ষক কবিতাটী আগা গোড়া আতীয় সঙ্গীতের নকল; দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার তাহা স্বীকার করেন নাই।

বিদ্যাসার।—বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত। মূল্য পাঁচসিকা; পূজার মধ্যে লইলে এক টাকা। ইতিপূর্ব্বে জন্মভূমিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিশুদ্ধির সহিত বিহারী বাবু এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার যেরূপ সংগ্রহ ও লিপিচাতুর্য্য দেখিলাম, তাঁহার ভাষার যেরূপ মোহিনীশক্তি, তাহাতে এই জীবনচরিত যে এক উপাদেয় উৎকৃষ্ট সামগ্রী হইবে, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগরের এই জীবনচরিত স্কুলের পাঠ্য করা কর্ত্তব্য; ইহা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব বিদূরিত হইবে ভরসা করি।

ষ্টার থিয়েটার।—ষ্টারথিয়েটারে নূতন গীতিনাট্য "অন্নদামঙ্গলের" অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। অমর কবি ভারতচন্দ্রের "অন্নদা-মঙ্গল" অবলম্বনেই ইহার অধিকাংশ রচিত। ষ্টার কোম্পানির অভিনয়, দৃশ্যপট, সঙ্গীত, এমন কি আদ্যকায়দা পর্য্যন্ত সকলই অদ্ভুত সকলই সুন্দর। আমরা এই নূতন গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, বিশেষতঃ ধ্যানময় মহাদেব কর্ত্তৃক মদনদাহনের অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল। অন্নদামঙ্গলের সহিত অমৃত বাবুর অমৃতময় লেখনী প্রসূত সেই "বাবুর" অভিনয় পূর্ব্বের ন্যায় সতেজে চলিতেছে। বাবু আমাদের বর্ত্তমান "বাবু সমাজের" একখানি জীবন্ত ফটোগ্রাফ। আমরা সে অভিনয় দেখিয়া হাসিব কি কাঁদিব —ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। এখন ইহার এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর অভিনয় দেখিয়া "বাবু" সমাজের চৈতন্য হইলে আমরা সুখী হইব। এরূপ বর্ষার সময় ষ্টার রঙ্গমঞ্চে যে প্রতি অভিনয়-রাত্রিতেই লোকে লোকারণ্য হয়, ইহা থিয়েটার কোম্পানির পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চীন ও জাপান।—যুদ্ধ ক্রমশই ঘোরতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। চীন পরাস্ত হইয়াও সাহস হারায় নাই; বরং ইহার উদ্যম ও উত্তেজনা দিন দিন বাড়িতেছে। চীন দিন দিন নূতন সেনাবল সংগ্রহ করিতেছে। সম্প্রতি একটী যুদ্ধে চীন পরাস্ত হইলে চীন সেনাপতি এরূপ কৌশলে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ সঙ্গে লইয়া প্রধান সেনাদলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন যে, সমস্ত সভ্য জগতে তাঁহার প্রশংসার আর সীমা নাই। এ যে দেখি পরাজয়েও জয়-লাভ!

***

লর্ড-সভা।—পার্লিয়ামেণ্টের লর্ড সভার বিরুদ্ধে ইংরেজের জনসাধারণ খড়্গহস্ত হইয়াছে। যাহাতে লর্ড সভা উঠাইয়া দেওয়া হয়, এই উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে আন্দোলন হইয়া থাকে; সম্প্রতি ইহা ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে। গত রবিবার লণ্ডনের হাইডপার্কে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়; প্রায় ৭০ হাজার লোক এই সভায় যোগ দিয়াছিল। আমাদের প্রাজ্ঞ বন্ধু মিঃ দাদাভাই নৌরোজি এই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। লর্ড সভার উচ্ছেদ-সাধনই এই সভার প্রধান মন্তব্য।

***

নানাসাহেব।—বম্বে সহরে আবার নানা-সাহেব ধরা পড়িয়াছে বলিয়া মধ্যে যে মহা হলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, সম্প্রতি তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ জনৈক সন্ন্যাসীকে ধরিয়া নানাসাহেব বানাইয়াছিলেন; কিন্তু সাক্ষ্যের জোরে তাহা উড়িয়া গিয়াছে। জাল নানা এখন প্রাণে প্রাণে নিষ্কৃতি পাইয়াছে।

***

খুলনা বিভ্রাট।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বেটসন্ রেল ও বাবু কেশবলাল মিত্রের মধ্যে মিট মাট হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সংবাদ আসিয়াছিল যে, ২৪ পরগণায় এই মোকদ্দমা চলিবে। তাহাতে নানা লোকে নানা কথা বলিয়াছিল;—বিশেষতঃ ইংলিশম্যান বাঙ্গালির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়াছিল। এখন সকলেই সন্তুষ্ট হইবে। সন্তোষের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ব্যাপারের পরিণাম-ফল তত প্রীতিপ্রদ নহে। ইতিপূর্ব্বে জনরব উঠিয়াছিল যে, কেসল গবর্ণমেণ্ট হতভাগ্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সতীশচন্দ্র বসুকে নামাইয়া দিয়াছেন; সে জনরব ঠিক নহে। আমরা শুনিতেছি যে, তাঁহাকে এখন কিছুদিনের জন্য অবসর দেওয়া হইয়াছে। যতদিন না তাঁহার মন ঠিক হয়, যতদিন না তিনি সিভিল সার্জ্জনের নিকট হইতে স্বীয় আরোগ্য-লাভের "সার্টিফিকেট" লইতে পারেন, ততদিন তাঁহাকে বেকার থাকিতে হইবে। বেল সাহেব এই বিভ্রাটের নায়ক হইয়া অক্ষত শরীরে স্বীয় পদমর্য্যাদায় আসীন রহিলেন, তাঁহাকে বাঁচাইতে গিয়া সতীশচন্দ্র শাস্তি পাইল!

নাগপঞ্চমী।—পুনরায় নাগ পঞ্চমী লইয়া হিন্দুদিগের প্রতি যে নির্য্যাতন হইয়াছিল,

ইতিপূর্ব্বে তাহার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। পুলিশের কর্ত্তা এই আদেশ দিয়াছিলেন যে মুসলমানদিগের মস্জিদের নিকটে হিন্দুরা বাজনা বাজাইতে পাইবে না। হিন্দুরা এই আদেশ অগ্রাহ্য করাতে পুনার ম্যাজিষ্ট্রেট সাতজন আসামীর ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড করিয়াছেন। অর্থদণ্ড না দিতে পারিলে তাহাদিগের প্রত্যেককে একমাস করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। এদিকে হিন্দুরা পুলিশের কর্ত্তার নামে ক্ষতিপূরণের দাবিতে দেওয়ানী আদালতে যে নালিশ করিয়াছেন, তাহার এখনও মীমাংসা হয় নাই।

হিন্দু ও মুসলমান।—হিন্দু ও মুসলমানে এতদিন সদ্ভাব ছিল; সেই সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ থাকিলে উভয়েরই মঙ্গল হয়; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চতুরতায় ভুলিয়া কতকগুলি অজ্ঞ মুসলমান হিন্দুদিগের সহিত বিবাদ করিতেছে। এই বিবাদে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই বিশেষ ক্ষতি হইবে; এ বিষয় যাহাতে অজ্ঞ মুসলমানদিগের হৃদয়ঙ্গম হয়, প্রাজ্ঞ মুসলমানদিগের সেই চেষ্টা করা উচিত; আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, নাগপঞ্চমী সংক্রান্ত মোকদ্দমায় পুনার হিন্দুরা হারিয়া যাওয়াতে তত্রত্য কতকগুলি মুসলমানের অতীব আনন্দ হইয়াছে!; পুনার গণপতি মহোৎসব নামে আর একটী মহোৎসব প্রতিবৎসর এই সময়ে হইয়া থাকে। মুসলমানেরা এই মহোৎসব বন্ধ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কি এই আবেদন গ্রাহ্য করিবেন?" হিন্দুরা কি তবে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে না?

গোরক্ষায় বিপদ।—সহযোগী "এডুকেটে" বলেন বালিয়া জেলার কোন হিন্দু কশাইকে গরু বিক্রয় করা হইবে না, এই মর্ম্মে তত্রত্য হিন্দুদিগকে উত্তেজিত করাতে দুই বৎসরের জন্য ফারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান পেনালকোডের কোন ধারামতে তাহার এই দণ্ড হইল, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। তবে কি গোরক্ষা করা অপরাধ?" এই বিচার কে করিল? দেশে আর কত কাল এরূপ বিচার চলিবে? গবর্ণমেণ্ট কি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন না? পার্লিয়ামেণ্টে এই সকল ব্যাপারের আন্দোলন হইবে, আমাদের এইরূপ আশা আছে।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান

অষ্টম বর্ষ। ২২এ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। উনবিংশ সংখ্যা

ঘুম কি ভাঙ্গিবে না?

নিদ্রার পর জাগরণ,জাগরণের পর নিদ্রা—ইহাই বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক নিয়ম। তবে আজি হিন্দুর প্রাণে এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখিতেছি কেন? সুদীর্ঘ নিদ্রার পর কেহই আবার না জাগিয়া থাকিতে পারে না; যে আর জাগে না, সে একেবারে অনন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন হয়; কিন্তু জন্মান্তরে আবার সে জাগিয়া উঠে। তবে যে আর কখনই জাগে না, তাহার অনন্ত নিবৃত্তি হইয়া থাকে;—তাহাই বোধ। মহারাজ মুচুকুন্দ তিন যুগ ঘুমাইয়া আবার জাগিলেন, জাগিয়া দেখিলেন যে, যে জন্য জাগরণ তাহা সিদ্ধ হইয়াছে,—কাল যবনের নিধন হইয়াছে; আর জাগরণের প্রয়োজন নাই, তাই তিনি অনন্ত নিদ্রায় অনন্ত নিবৃত্তি লাভ করিলেন। যত দিন ভারত স্বাধীন ছিল, হিন্দু সমাজ জাগৃৎ ছিল,ততদিন মুচুকুন্দ মরিয়াও জাগিয়া ছিলেন। ইজিপ্ট, ফিনিশিয়া, ব্যাবিলন, মিডিয়া, বহু দিন হইল ঘুমাইয়াছে, এতদিনেও তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তাহাদের অতীত স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রাচীন গৌরবের অল্প নিদর্শনই আছে, তাহাদের বীরগণের রূপান্তরিত অতি সামান্য সত্তাও জগতের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তাঁহাদিগের চিতাভস্মের উপর অন্যান্য জাতি উদ্ভূত হইয়া তাহাদিগের অজ্ঞাবশিষ্ট অস্থিমজ্জা উদরসাৎ করিয়াছে; তবে আর কি উপায়ে জাগিবে?

গ্রীস ও রোম ঘুমাইয়া আবার জাগিল; —যদিও রূপান্তরিত, তথাপি এ জাগরণে প্রাণ আছে। কিন্তু ভারত কি আর জাগিবে না? তবে কি হিন্দুর ঘুম আর ভাঙ্গিবে না?—কে বলিল? এখনও হিন্দু নামে অনেকের ধমনী মধ্যে তপ্ত শোণিত তীব্রতেজে ধাবমান হয়, হিন্দুর অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া অনেক মৃতকল্প দেহযষ্টি শ্মশান-শয্যা হইতে উত্থান করিতে চেষ্টা করে, হিন্দুর অতীত স্বদেশানুরাগ, দেবভক্তি ও পিতৃভক্তির কণামাত্র কল্পনায়

উদিত হইতেছে। হিন্দু-কলঙ্কিদের অত্যাচারের অঙ্কুশ-তাড়নে ভয় ও ঘৃণিত ঈর্ষা হৃদয়ে দুঃখ ও শোচনার দারানল জ্বালিয়া দেয়। হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইল, তথাপি আত্মরক্ষার উপায় নাই। তবে কি আশা নাই? হিন্দু কি আর জাগিবে না? যদি না জাগে, তবে আর এ বিড়ম্বনা কেন? এ কপট-লীলা কেন? এ ভণ্ড-অনুরাগ কিসের জন্য? জগতের নিকট ঘৃণা, অস্থিরা, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও পরশুরামের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেছ, অথচ সেই অমরাত্মা মহাপুরুষগণের পরম পদের অবমাননা করিতেছ, তাঁহাদের লোকাতিগ স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংস করিতে উদ্যোগী হইতেছ;—কি কপটতা!

যখন এত ভণ্ডামি, এত কাপুরুষতা, তখন জাগিয়া কাজ নাই। সেই জন্য বলিতেছি এত বিড়ম্বনা কেন? যাহাদিগের হৃদয় এত দুর্ব্বল, মন এত ভঙ্গুর, শরীর এত অসহিষ্ণু, তাহাদিগের আর জাগিয়া কাজ নাই;—অনন্ত নিদ্রা তাহাদিগের দীর্ঘ-নিদ্রার স্থান অধিকার করুক। সপ্ত সিন্ধুর সলিলরাশি উদ্বেল হইয়া তাহাদিগের সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন লোপ করুক; হিন্দুনাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হউক। তাহা হইলে এ কলঙ্ক-কালিমা আর দেখিতে হয় না। এত অত্যাচার উৎপীড়ন,—সমাজের এত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও, হিন্দুকলঙ্কিদের এত কষাঘাত সহিয়াও যখন নিদ্রা-ভঙ্গ হইতেছে না, চৈতন্যের পুনরুদয় হইতেছে না, যাতনা বোধ হইতেছে না, তখন আর আশা কৈ?—তখন আর আশা করিতেও সাহস হয় না! হিন্দু! তোমার রাজনৈতিক অধঃপতন হইয়াছে, সেইজন্য তুমি বড় দুঃখিত,কিন্তু তুমি জাননা যে, আগে সমাজের অধঃপতন না হইলে জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের পতন হয় না। তোমার সমাজ রোগ-শোকে জর্জ্জরিত, নানা-

হরে বলের লঙ্কার হউক, শোণিতের বিষ বিরাজিছে, অপঘাত হউক, তখন ক্ষত ধারায় হইবে, সমাজের তদেহে নবজীবন সঞ্চার হইবে, তখন সমাজ জাগিবে; তাহার পর রাজনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা করিলে ফলিতে পারে। নতুবা এখন কেবল "রাজনীতি রাজনীতি" করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? যতদিন তোমার সামাজিক জীবন পুনরুদ্ভাগ না হয়, যতদিন তোমার ধর্ম্মের বন্ধন অক্ষুণ্ণ ও দৃঢ় না হয়, যতদিন তুমি নিজ বেদনা বিরাট হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র রক্ষিত তেজে সাহিত করিতে না পারিতেছ, ততদিন তোমার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইবে না।

জগতের অতীত অতিপ্রাচীন ইতিহাস দেখ,—জলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে সামাজিক অধঃপতনই সকল জাতির রাজনৈতিক অধঃপতনের মূল কারণ। লোক গুরু মনীষিগণ বলেন একমাত্র পাশব বল অধিককাল জগতে রাজত্ব করিতে পারে না; ধর্ম্মবল একমাত্র বল; এই বলের সম্মুখে বিষাহী বজ্রও শীতলার্দ্র চন্দনে পরিণত হয়, অভেদী পাষাণ প্রাকারও কুসুমজালের দৃঢ়তর ব্যবধানের ন্যায় অধিকার করে। এই বলের সাহায্যে ভগবান্ বশিষ্ঠ বলোদ্ধত বিশ্বামিত্রের অযুত সৈন্য নিপাতিত করিয়াছিলেন, একাকী শ্রীরামচন্দ্র শৈলমেখলা গম্ভীরা ভারতভূমিতে আর্য্যের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতে পারিয়াছিলেন। আজি এ দুর্দ্দম জাতি কেবল পাশব বলের আশ্রয়ে কোটি কোটি লোকের অদৃষ্ট চক্র চালিত করিতেছে,—ধর্ম্মে যাহাদের আদৌ স্পৃহা নাই, যাহাদিগের সমাজ এখনও অঙ্কুরিত হইয়াছে কিন্তু স্ফুরিত হয় নাই, তাহাদের অধঃপতন সুদূরপরাহত নহে। দেখ ধর্ম্মই জগতের প্রাণ, ধর্ম্ম রক্ষার্থই সমাজ, সমাজ লইয়াই রাজনীতি; সুতরাং ধর্ম্মই সকল প্রকার বলের ভিত্তিভূমি। অপরাপর যে সকল বীরগণ অতুলনীয় অবদান দ্বারা জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের উন্নতির মূলে ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সেইজন্য বলিতেছি অগ্রে ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কার কর, পরে রাজনীতির সংস্কার করিতে পারিবে, নতুবা সকলই বৃথা হইবে। ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কার হইলে রাজনৈতিক সংস্কার আপনা হইতেই সাধিত হইবে, তাহাতে বিশেষ কোন বিকট উদ্যমের প্রয়োজন হইবে না।

তুমি সমাজ সংস্কার করিবে কিন্তু তোমার সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সে অধ্যবসায় কৈ? সকল চেষ্টার মূলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এ অধ্যবসায়। তোমার উদ্যম ও চেষ্টা যেন রঙ্গভূমির অভিনয়; যতক্ষণ তুমি দৃশ্যপটের সম্মুখে থাক,ততক্ষণ তোমার আস্ফালনের তুলনা নাই, কিন্তু পটক্ষেপণ হইলেই আবার জড়তা, নিস্তব্ধতা, নিঃস্পন্দতা তোমাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; তুমি পূর্ব্বের ন্যায় আবার সেই অনুত জীব হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও। তখন অভিনয়ের কথা আর একবার মনেও ভাবিয়া দেখ না। এ রঙ্গশালা, এ নটনাটন ছাড়িয়া দাও; অকপট হইতে চেষ্টা কর। যাহা করিবে যেন অন্তরাত্মার আদেশ মতই করিতেছ, এই ধারণা থাকে। শত বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইলেও তাহার সম্পাদন হইতে নিবৃত্ত হইবে না; "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পাতন," ইহা হিন্দুরই বচন। তবে এ বচনে তোমার আসক্তি কৈ? শুক পক্ষীর ন্যায় তুমি সময়ে সময়ে ইহার কেবল আবৃত্তি কর, কিন্তু ইহার অর্থ

বুঝিয়াও তদনুসারে কাজ করিতে পার না। তবে তোমার আশা কৈ?

হিন্দু! তুমি ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছ;—স্বপ্নমোহে নানা রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছ; কখন রাজা হইতেছ, বাদুমোহ হইতেছ, আবার নিঃস্ব নিঃসহায় ভিখারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছ; কখন রাজ্যেশ্বর হইয়া কোটি কোটি লোকের অদৃষ্টচক্র চালিত করিতেছ, লক্ষ লক্ষ লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইতেছ,—সে সকলই তোমার স্বপ্ন; তাহার স্থায়িত্ব নাই; তাহার স্থায়িত্ব থাকিতে পারে না; কারণ তোমার নিজেরই স্থায়িত্ব নাই, তুমি বালের কুটীর মত প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছ। যখন যে জাতি প্রবলতর হইয়া তোমার দেশে রাজত্ব করিতেছে, তুমি তখন সেই জাতিরই অঙ্কগত হইতেছ; আবার তাহাদের অপগমে বলবত্তর জাতির পদলেহন করিতেছ। ইহাই কি তোমার জাতীয় বৈচিত্র্য! হায় কি ভ্রান্ত! তুমি পূর্ব্বের স্মৃতি সমস্তই ভুলিয়া গেলে! নতুবা আত্মবিস্মৃতের ন্যায় আজি ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়া যাইবে কেন!

আজি হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে যে আগুন জ্বলিতেছে,তাহাতে তোমার জাতীয়তা পুড়িয়া ছাই হইবার উপক্রম হইয়াছে। তোমার জাতীয়তা গেলে তুমি কি লইয়া আর এ সংসারে থাকিবে? যে জাতীয়তা সহস্র সহস্র বৎসরের সহস্র সহস্র মহাবীরের লক্ষ লক্ষ অবদানের পরিণত ফল, আজি তাহা তোমার দোষে সম্পূর্ণ দগ্ধ হইতেছে, তুমি দেখিয়াও তাহা দেখিতেছ না। তুমি কেবল "স্বার্থ" লইয়াই ব্যস্ত! কিন্তু হিন্দু, বল দেখি তোমার স্বার্থ কি? শুদ্ধ পরপদলেহনও নিজের উদর পূরণই কি তোমার স্বার্থ? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমাকে মনুষ্য-সমাজে স্থান দেওয়া উচিত নহে। কারণ যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তোমাতে তাহার কিছুইত দেখি না। উদর-পূরণই যদি একমাত্র স্বার্থ হয়, তাহা হইলে পশুও মানবে কি প্রভেদ রহিল? কিন্তু দেখ পশুও আত্মরক্ষা করিতে পারে, কিন্তু তোমার চক্ষুর উপর তোমার ধর্ম্মে আঘাত পড়িতেছে;—যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণ অম্লান বদনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজি নিকৃষ্ট কলির প্রভাবে তাহা ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, বৃষরূপী ভগবান ধর্ম্ম চতুষ্পদ-বিহীন হইয়া অধর্ম্মের কঠোর তাড়নায় অবিরত আর্ত্তনাদ করিতেছেন, তুমি তাহা দেখিয়াও দেখিতেছ না। তুমি কেবল উদর লইয়াই ব্যস্ত! কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখিতেছ না যে, তোমার সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষা না করিলে দুই দিন পরে তোমার উদর পূর্ত্তিও হইবে না। তখন অনাহারে নিজের অস্থি-মাংস চর্ব্বণ করিয়া তোমাকে মহাশ্মশানে প্রেতের ন্যায় ভ্রমণ করিতে হইবে;—বুঝি সে দুর্দ্দিন সুদূরপরাহত নহে!

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দু-বিধবা।

এত দিনের তর্ক-বিচারের পর এখন এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, "হিন্দুবিধবার বিবাহ হইবে না। ভাল-মন্দর কথা নহে, উচিত-অনুচিতের বিবেচনা নহে, বাঙ্গালার বিশাল হিন্দুসমাজের এই অভিমতি ও অনুশাসন যে, হিন্দুবিধবা বিলাস-বিভ্রম ত্যাগ করিবেন, আমোদ-প্রমোদ ভুলিবেন, সুখশাসনকে জলাঞ্জলি দিবেন, এবং সংসারে সন্ন্যাসিনী সাজিয়া হিন্দুর গৃহে গৃহে সাক্ষাৎ দেবী সাবিত্রী-রূপিণী হইয়া বিরাজ করিবেন। হিন্দুবিধবার এই আদর্শ চিত্র। এই আলেখ্যের সম্মুখে হিন্দু-গৃহস্থকে প্রতিদিন দেহের এবং শ্রদ্ধার, ভক্তির এবং প্রীতির কুসুমাঞ্জলি দিতে হইবে। হিন্দুপিতা যাহার সুখ-সম্পাদনের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, সৎপাত্রে দান করিয়াছিলেন, সেই কন্যা যদি বিধি-বিড়ম্বনায় বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহাকে চিরজীবন ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিতে হইবে; অন্যের সুখের পথে উন্মুক্ত রাখিবার জন্য তাহাকে সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে। কারণ, হিন্দুর এই ধারণা যে, সুখ-সাধনের প্রতিযোগিতা দুঃখের উৎপাদক। একেই সাধারণতঃ সামান্য প্রতিযোগিতাতে ঈর্ষার উদ্রেক হয়, এবং পরিণামে শত্রুতাকারতা উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে চিরদুঃখী করে; তাহার উপর, সংসারের সুখ, যাহা কেবল মনুষ্যশক্তির ও বুদ্ধির আয়ত্ত নহে, অবস্থার উপর যাহা ষোলআনা নির্ভর করে, যদি প্রতিযোগিতার সামগ্রী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অচিরেই সংসার হইতে সকল সুখই পলায়ন করিয়া যাইবে। আবার দাম্পত্যসুখের নিদান ডাক পড়িলে,অতি অল্প লোকেরই সুখী হইবার আশা থাকে; এবং ক্রেতা ও বিক্রেতাকেও সমর্থশালী হইতে হইবে। বিশেষতঃ দর-কষা-মাজা করিতে গেলেই, আমাদিগকে অনেকটা আন্দাজ এবং লোকের উপর কার্য্য করিতে হয়। পরন্তু হিন্দুর বিশ্বাস যে, এই সংসারে কেহ কাহারও সুখের সহায়ক হইতে হইতে পারে না। সুখী হইতে হইলে সুখের উপাদানকে মনোমত করিয়া লইতে হইবে, এবং প্রকৃতির পথকে সংযত ও শাসনে রাখিতে হইবে। একেই ত দাম্পত্য-প্রণয়-জনিত সুখ দুরারাধ্য, তাহার উপর হিন্দুর একান্নবর্ত্তী সংসার। দশজনের মুখাপেক্ষী থাকিয়া, শতপোষী হইয়া দুঃখীর দেশে দরিদ্রের মত, মুখের গ্রাস ক্ষুধার্ত্ত-ব্যথিতকে দান করিয়া, আনাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। হিন্দু আজন্ম দুঃখী; যে সামান্য সংসার-সুখ লইয়া অশায় বুক বাঁধিয়া রহিয়াছে, তাহা যদি বিষম প্রতিযোগিতার সামগ্রী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে হিন্দুজাতির উচ্ছেদ নিশ্চিত। কেন না, যখন অসাধ্যসাধন করিলেও সমাজের এক ভাগ নিশ্চয়ই দুঃখের পঙ্কে নিমগ্ন থাকিবে, তখন দেখিয়া শুনিয়া সমাজের এক অঙ্গকে দুঃখের তৃপ্তির জন্য রাখিয়া দিয়া, বাকীটুকু বিষম সমকক্ষতার ঝঞ্ঝাবাত হইতে খুব উচ্চে রক্ষা করিলেই মঙ্গল। কারণ, সুখের জন্য প্রতিযোগীতার চেষ্টা হইলে একজন জিতিবে, অন্যকে হার মানিতে হইবে। যিনি পশ্চাৎপদ হইবেন, তাঁহাকেই দুঃখের সহযাত্রী

হইতে হইবে; ফলে, সমাজের এক অংশকে দরিদ্রের ভাগ্য অবলম্বন করিতে হইবে। তখন উদ্যম-ভঙ্গ দুঃখী ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলিয়া যায় এবং সেই ঈর্ষার বিষে সমাজকে জর্জ্জরিত করে। তাই হিন্দু দুঃখীর কর্ত্তব্য-ভার এক শ্রেণীর স্কন্ধে চাপাইয়া বাকী সকলকে সুখের সুবাতাসে পরিতৃপ্ত করিবার বিশেষ চেষ্টা করে; এবং বোধ হয়, এই কারণেই হিন্দুসমাজে বালিকাবিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। স্বামীর মনোমত এবং সংসারের ও সমাজের আদেশ-মত সুশিক্ষিতা হইয়া বালিকা দেবী হইয়া থাকিবে—ইহাই বালিকা বিবাহের উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত পিতামাতার উপর কন্যার বিবাহকার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া সমর্পণ করিলে, সমাজের সকল কল্যাণের এক এক বার বিবাহ হওয়া সম্ভব হয়; এবং কন্যকা অবস্থায় বিবাহের উদ্যোগ করিলে নির্ব্বাচনের গোল হয় না। ফলে, সকল বালিকাকেই সুখী হইবার উদ্দেশ্যে জীবনের মধ্যে একটা অবসর দেওয়া হয়।

হিন্দুসমাজের ভিত্তি পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠাপিত। "নিবৃত্তিমার্গই হিন্দুর" শস্তব্যপন্থা। যতদূর সম্ভব প্রবৃত্তির বিষম সর্ব্বগ্রামী তুফানে সংযত এবং শাসনে রাখিয়া, সংসারের ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে। বিবাহ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; বিবাহের উদ্দেশ্য পবিত্র থাকিলে, বিবাহপদ্ধতি পুণ্যমাখা হইলে, গৃহ-প্রাঙ্গণে পবিত্র বায়ু সঞ্চালন হইবে; তাই লালসা-প্রধান বিবাহ-বিধির বিরোধী—হিন্দু। আর তাই, বিলাস-বিজড়িতমুখ, উদ্দাম প্রবৃত্তি-প্রপীড়িত, মদোন্মত্ত যুবককে নিজে বাছিয়া দেখিয়া বুঝিয়া বিবাহ করিবার অনুমতি হিন্দু কখনই দিবেন না। তাহা দিলে, প্রকারান্তরে গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত হইবে, এবং কন্যকা অবস্থায় কাহারও বিবাহ হইবে না। যুবতী, সমর্থা, বিলাসিনী, তন্বিনী হইলে তাহার আদর যুবক-সমাজে বাড়িবে। পরিণামে সমাজও স্বেচ্ছাচারের বিষম তাড়নে জর্জ্জরিত হইবে। পক্ষান্তরে বালিকা বিবাহ চলন থাকায়, "ডাইভোর্স"-প্রথা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হয় নাই। যে হেতু, চেষ্টা করিলে বালিকার কোমল মন যথোপযোগী শিক্ষিত করা যায়। পরন্তু সমর্থ যুবকযুবতীর বিবাহ বিধি হইলে, নির্ব্বাচন-প্রথার আদর বাড়িবে, কাযেই রুচি অরুচির কথা উঠিবে, এবং মনোমালিন্য ঘটিলেই স্বামী-স্ত্রী পৃথক হইবার চেষ্টা, উদ্যোগ এবং উপায় করিবে।

বিধবা-বিবাহ যুবতী-বিবাহের আকারান্তর মাত্র। এতদ্ব্যতীত বিধবা, কুমারী-যুবতীগণ অপেক্ষা বিবাহ ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞা এবং সমর্থা। সুতরাং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে প্রকারান্তরে যুবতীরই আদর বাড়িবে; কাজেই অনূঢ়াগণও যুবতী না হইলে মনোমত বর পাইবেন না। সমাজে নির্ব্বাচন প্রথার প্রচলিত হইবে, বিবাহ সংস্কার চুক্তির বিষয় হইবে, কথায় কথায় স্বামী-স্ত্রী পৃথক হইবে, শেষে "এক যুবতীর শতেক পতি হইবে;" আর কুৎসিতা, কুরূপা, কৃষ্ণবর্ণাদের বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হইবে। যে সমাজে সংযমের আদর, যে সমাজে ত্যাগের মহা গৌরব, যে সমাজে শান্ত, দান্ত, সমাহিত, অধিষ্ঠিত দেবতার ন্যায় পূজিত; সেই সমাজে বিলাসের লালসার, আশা-আকাঙ্ক্ষার ভীষণ স্রোত-প্রবাহ ছুটাইয়া দেওয়া এবং উহার সর্ব্বোচ্ছৃঙ্খলের পন্থা পরিষ্কার করা একই কথা। বিশেষতঃ দুঃখকে সমষ্টিভাবে সঞ্চিত রাখিয়া, দুঃখের দুর্গন্ধিকে প্রতিযোগী তার অনুকূল বাতাসে সমাজময় না ছড়াইয়া দিয়া, নিষ্কাসী ও সংগমিগণের মধ্যে আবদ্ধ

রাখিয়া সমাজের মঙ্গলকামনার জন্য সেই শ্রেণীর লোককে সর্ব্বত্যাগী হইয়া থাকিতে হয়; এবং যেমন উত্তম গঠনই সমাজের ধরিত্রী অথবা অস্থচ্ছল অবস্থায় বাস করে। পক্ষান্তরে সুখার আলা, অতৃপ্ত বাসনার অস্থ শাখাত, ঈর্ষার কপটতা, মানুষকে দানব করিয়া ফেলে; এবং সর্ব্বত্যাগের, সংযমের এবং দুঃখিকার জীবন্ত আদর্শ চক্ষের সম্মুখে সর্ব্বদা না থাকিলে, এই দানবীভাবাপন্ন দরিদ্রগণ সমাজে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত করে। তাই মর্ত্তীর দুঃখ বিমোচন জন্য, দরিদ্রের দারিদ্র্য পীড়া নিবারণ জন্য, হতাশের মনের ক্ষোভ দূর করিবার জন্য, দুরাকাঙ্ক্ষের আকাঙ্ক্ষা সংযত করিবার জন্য, ঈর্ষার ঈর্ষানল নিভাইবার জন্য, পিশাচের পৈশাচিকপ্রবৃত্তি দমন করিবার জন্য, দানবের সর্ব্বনাশীবুদ্ধি শাসনে রাখিবার জন্য, হিন্দুর গৃহে গৃহে হিন্দু বিধবা সাক্ষাৎ সারিত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, শান্তি, ক্ষমা, দয়া, ক্ষমা, তুষ্টি, ত্যাগ, সংযম, তেজ এবং পবিত্রতার অসামান্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রমণীতনিনী মনুষ্যপ্রকৃতিকে ধর্ম্মের এবং বিবাসের নিগড়ে বদ্ধ রাখেন। হিন্দুর বিধবা ব্রতপরায়ণা, ব্রহ্মচারিণী। যাহা অসাধ্য সাধন, সেই উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখা, হিন্দু বিধবার একমাত্র ব্রত এবং উপাস্য। এই জন্য হিন্দু বিধবার আহার নিদ্রা নাই, বস্ত্রালঙ্কার নাই, কেশ বিন্যাস নাই, সুখ লিপ্সা নাই, এবং আমোদ প্রমোদ নাই। হিন্দুর বিধবা চিরবসনপরিহিতা, রুক্ষকেশা, ব্রত উপবাসযুক্তা এবং সর্ব্বত্যাগিনী। যে দেশের গৃহে গৃহে এমন শান্তিময়ী দেবী বিরাজ করেন, যে দেশের দুঃখী দরিদ্র সদা সর্ব্বদা মর্ত্তত্যাগের এমন জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পায়, সে দেশে কখনও ইউরোপের ন্যায় "অ্যানারকীষ্ট" আদি দৈত্যদানবগণ বিচরণ স্থান পায় না। সে দেশ পবিত্র এবং জগতের আদর্শ এবং সেই দেশের বিধবাগণ সংসারের ইষ্টদেবী—ভারতী।

এখন দেখা কর্ত্তব্য—এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রদোষ সময়ে, পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রবীণ, সভ্যতালোকে সমুন্নাসিতবুদ্ধি এবং সমদর্শী হিন্দুগণের গৃহে গৃহী বিধবার কেমন আদর! দেখা কর্ত্তব্য—হিন্দুধর্ম্ম এবং শাস্ত্রে নবপ্রভাবনমিত শিক্ষিত হিন্দুগণ বিধবাকে কেমন সম্মানের সহিত রক্ষা করেন। শাস্ত্রগ্রন্থে বিধবার যে পবিত্র ছবি অঙ্কিত আছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আর বাঙ্গালী আমরা—আমাদের গৃহে গৃহে এখন বিধবার কেমন ছবি? সধবা হইতে বিধবাকে এখন আর সহজে বাছিয়া লওয়া যায় না। সধবার ন্যায় বিধবারও তেমনি আগুল ফিরিঙ্গিত, সুরম্য তৈলসিক্ত, সুচিক্কণ গুচ্ছ গুচ্ছ কেশরাশি, দুগ্ধঘৃতাদি উষ্ণ এবং উত্তেজক আহারে পরিপুষ্ট পূর্ণাবয়ব দেহযষ্টি; সর্ব্বদাই অধরোষ্ঠ তাম্বুলরাগরঞ্জিত; নাই কেবল কাপড়ের ওলটান পাড়, হাতে বলয়াদি অলঙ্কার, এবং সিঁথিতে সিন্দুর বিন্দুপ্রভা ও চারুচরণযুগলে অলক্তকশোভা। সত্যুবা সত্য বাঙ্গালিনী বিধবা, সধবারন্যায় সর্ব্বদা উপন্যাস নাটক-নভেল-পাঠরতা, প্রণয়বিরহ মিলনাদির প্রসঙ্গে প্রমোদিতা, নবোঢ়াদম্পতি বিশেষের ব্যবহার সমালোচিনউৎপরা; এবং আড্ডিপাত্যায়, বাসরজাগরণে, কোন নিরক্ষরা কিংবোদ্ধার প্রথম প্রণয়-পত্রের দুরসাল উত্তর লিখনে সিদ্ধা। বাঙ্গালিনী বিধবা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করে না, ব্রতনিয়ম জানে না, সদালোচনা মানে না, সেবা-শ্রদ্ধা বুঝে না এবং হিন্দুর

গৃহে ধর্ম্মের ভাব জীবন্ত রাখিবার চেষ্টা করে না। বাঙ্গালিনী বিধবা গৃহস্থের সকলসন্ধ্যা কেবল পাচিকার কর্ম্ম করে, বালক বালিকাগণের ধাত্রীস্থানীয়া হয়, বিলাসিনী ভ্রাতৃজায়াগণের সেবিকা—সহচরীর কার্য্য করে, তাহাদের, মাথার চুল বাঁধিয়া দেয়, সিন্দুর পরাইয়া দেয়, টিপ কাটিয়া দেয়, সকল বিলাসোপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করে এবং সোহাগিনী হইবার নানা ইঙ্গিত ও নবযুবতীগণকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেয়।' যখন এইসকল অত্যাবশ্যকীয়, অপরিহার্য্য কর্ম্ম করিয়া একটু বসিবার অবসর পায়, তখন বাঙ্গালিনী বিধবা পরনিন্দা করে, কুলস্ত্রীর চরিত্রের গ্লানি করে, বৃথা কথার কাটাকাটি করিয়া অকথ্য অশ্রাব্য শালির ঝঙ্কারে গৃহস্থের গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া দেয়। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থসকল বিধবা বিবাহ দিতে নিষেধ করে, সুতরাং বিধবাবিবাহ রহিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রসকল বিধবাকে ব্রহ্মচারিণী করিয়াছে; মস্তকমুণ্ডণ করিতে উপদেশ দেয়, কাষায় ধারণ করিবার বিধি দেয়, ব্রত উপবাসাদি দ্বারা শরীর শীর্ণ করিতে আজ্ঞা দেয় এবং সংসারের যাবৎ কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া বিধবাকে সদা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে বলে।

কামস্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূল ফলৈঃ।
নতু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরন্তপে॥
আসীতা মরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তীতমনুত্তমম্॥

মনুসংহিতা।

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥

পরাশর সংহিতা।

এই ত বচন প্রমাণ, সমগ্রহিন্দু শাস্ত্রের অভিমতিও এই এবং ইহার বিপক্ষপক্ষে শাস্ত্রবচন বাহির করা অসম্ভব। তাই আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, আমরা কি এই সকল উপদেশানুযায়ী কার্য্য করি? আমাদের স্নেহময়ী বয়স্থাকন্যা, যাহার সংসারের কোন সার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই, যাহাকে সুখী করিবার জন্য সৎপাত্রে সমর্পণ করিবার জন্য আমরা গ্রামে—গ্রামে পথে পথে ভিখারীর বেশে বেড়াইয়াছি, যাহার সামান্য অসুখ হইলে, ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি—সেই সাধের কন্যা, যৌবনের দ্বারে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই যদি বিধিবিড়ম্বনায় বিধবা হয়, তাহা হইলে যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বিধবা-বিবাহ অপ্রচলিত করিয়াছি, সেই শাস্ত্রের বিধিব্যবস্থাদ্বারা আমাদের আদরের কন্যাকে ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনী সাজাইতে পারি কি? পারি না, এবং এ কর্ম্মের উপযুক্ত হৃদয়ের দৃঢ়তা এবং সংশিক্ষার তেজোপ্রভাব নাই বলিয়াই মনে হয়, এমন করিয়া হিন্দুকুলকজ্জল হইয়া ব্যবহারে শাস্ত্রের অপবাদ করিয়া, কৃমিকীটের ন্যায় কেবল জীবন ধারণ করিয়া থাকা, আমাদের পক্ষে বিশেষ লজ্জার বিষয়।

রক্তমাংসের অবরদস্তি সহিয়া প্রবৃত্তির তীব্রতা। আবার আহারাচ্ছাদনে সেই প্রবৃত্তির পরিপুষ্টি। কাযেই প্রবৃত্তিদমনে রাখিতে হইলেই আহারাচ্ছাদনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, আহারীয় সামগ্রীর বিশেষ ঝাড়াই বাছাই করিতে হইবে। তাই ব্রহ্মচারীর ব্যবহারের উপর শাস্ত্রের এত কড়া, এবং সেইজন্যই বিধবা সংসারের তাপে সুখে বঞ্চিতা। তবে এখন কেবল বিলাসিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেও চলিবে না, বিলাসিতাটের গোলে অনেক অনূঢ়া যুবতী কন্যা বাঙ্গালীর গৃহে বর্ত্তমানা। তাহাদের অনেকের একটা সুসিদ্ধ ডিম, দুই পেয়ালা চা, দিব আলু, দুই টুকরা রুটি খাইয়া প্রাতর্ভোজন হয়। তাহার উপর বিলাসের শিক্ষা এবং ব্যবহার। ফলে ব্রহ্মচর্য্যের মাথায় কুঠারাঘাত হইতেছে। যাউক এ ক্ষেত্রে আর শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কথা বাড়াইব না। অবস্থার বিশেষের অঙ্গে সূচী ফুটিবে। তবে মনে মনে হয়, এমন করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমিমনে প্রবৃত্তির মুখে ইন্ধন যোগাইয়া যুবতী বিধবা এবং অনূঢ়াগণকে অতৃপ্তবাসনার তুষানলবদ্ধ করা অপেক্ষা, তাহাদিগকে মারিয়া ফেলা অধিক দয়ার পরিচায়ক।

অবশ্য সফল সামাজিক মাতব্বরিগণের ইচ্ছা এবং বাসনা যে, স্ত্রীচরিত্র পবিত্র থাকে, এবং তাহার জন্য বিধিমত চেষ্টা করাও সকলের কর্ত্তব্য। নচেৎ সমাজে সঙ্করের বিপত্তি অধিক হইবে। দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি লোকে ভুলিবে, কারণ এ সকল গুণ যার তার কখনই সমলব্ধ্য নহে। সুতরাং সমাজ পিশাচের বাসস্থান হইবে। আর্য্য ঋষিগণ এই কথা বুঝিতেন, তাই সমগ্র আর্য্যশাস্ত্রের মর্ম্মে মর্ম্মে এই কথা গাঁথা, তাই হিন্দু ললনা মানবী নহেন দেবী, তাই হিন্দু কন্যাগণ কামিনী নহেন—পূর্ণশক্তি; তাই হিন্দু ভাবুক ভীতিকে আদ্যশক্তি জগদ্ধাত্রীর অংশরূপা বলেন। স্ত্রীজাতি পবিত্র থাকিলে, গৃহ পবিত্র থাকিবে, দেশ পবিত্র হইবে, মনুষ্যসমাজ দেবতার বাসোপযোগি হইবে। স্ত্রী বাসনী হইলে, মনুষ্য ব্যবহার ভুলিবে, ধর্ম্ম ছাড়িবে, সমাজ শৃঙ্খলায় জলাঞ্জলি দিবে, এবং নিজ মনুষ্যত্বকে পাপের পঙ্কে ডুবাইয়া পিশাচের ভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে। স্ত্রী আদ্যা শক্তি ভারতী। স্ত্রী-বুদ্ধির ইঙ্গিতে মনুষ্য সমাজ পরিচালিত। স্ত্রী বিলাসিনী হইলে, মনুষ্য বিলাসী হইবে, স্ত্রী দেবী হইলে, মনুষ্য দেবতা হইবে। স্ত্রী-প্রকৃতি কোমল—মধুর—মনোহর। সংপথাবলম্বিনী হইলে স্ত্রী মহালক্ষ্মী—জগন্মাতা; কুটিলা, প্রখরা, চতুরা হইলে স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। সুতরাং সকল কার্য্যের পূর্ব্বে স্ত্রী-শিক্ষা প্রথম কার্য্য। অবশ্যই যে শিক্ষার প্রভাবে এম এ, বিএ, উপাধিযুক্ত হওয়া যায়—সে শিক্ষার কথা বলিতেছি না। যে শিক্ষায় কামিনীকুল সাধ্বী এবং ব্রতচারিণী হইতে পারে, সেই শিক্ষাই আমাদের আশু অবলম্বনীয়। তবে এখন অনেক বাঙ্গালিনী গ্রন্থকর্ত্রী কবি এবং সমালোচিকা হইয়াছেন। হয়ত অনেক লেখিকা বিধবা, কিন্তু তাঁহাদের পদ্যের চরণে চরণে প্রেমের ঢেউ উঠিয়াছে—রসের ফোয়ারা ফুটিয়াছে, এবং বিষাদের, ক্ষোভের বিকট উক্তিতে পুস্তক ও প্রবন্ধ সকল কলুষিত। আবার কেহ কেহ নূতন সভ্যতার ঝোঁকে, নির্ব্বাচন-প্রথার ঢেউয়ে গড়িয়া অনূঢ়া পূর্ণযুবতী কাজেই লেখিকা হইয়া বিদ্রূপের—বিরক্তির তীব্র শ্লেষবচনে সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূর্ণ করিয়াছেন। "ভলটেয়ারী" অবজ্ঞা, অভক্তি, এবং অন্যান্য দেখিয়া মনে বড় আশঙ্কা হয়। যে অবজ্ঞার প্রবল ফুৎকারে সংসারের তাবৎ রীতি নীতি, ধর্ম্মকর্ম্ম, শ্রদ্ধাভক্তি, পূজাপদ্ধতি একেবারে কোথায় উড়িয়া যায়, সেই অবজ্ঞার বিকাশ কামিনী লেখনীনিঃসৃত হইলে বড়ই আশঙ্কার কথা, বলিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়চাঁদী প্রেমচাঁদী শিক্ষা হিন্দু ললনাগণকে

দীক্ষিত করিও না, তক্টেয়ার, তিতেরো, মোলেয়া—আনফাইরী পড়িয়া বিলাসের, ব্যসনের, ঔদ্ধত্যের এবং স্বেচ্ছাচারের মহামন্ত্রে হিন্দুকুল লক্ষ্মীগণকে উন্মাদিনী এবং উত্তেজিতা করিও না।। এমন শিক্ষার সর্ব্বনাশই সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালিনী কখনও বিলাসিনী নহেন, সংসারের মাঙ্গলিক কর্ম্মে তাঁহারা সদাই বিব্রত, কাজেই তাঁহাদের বেশবিন্যাসের অবকাশ থাকিত না। কিন্তু এখন মহাবশ্যকীয় সর্ব্বগ্রাসী "টয়লেট" পরিসমাপ্ত হইলে তাঁহাদের কর্ম্ম খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়। হি মা! এই হতভাগার দেশে, এই দলিত মথিত ভীরু দরিদ্রের দেশে, এই উদ্যম-উদ্যোগ-বিহীন অসার নিষ্পন্দের দেশে তোমরাই ত সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী। তোমাদের কাব্যস্থার এবং শুষ্কসার গুণে চিরদরিদ্রের গৃহে সচ্ছলতা আইসে, তোমাদের সেবা ও শুশ্রূষার প্রভাবে চিররোগ শয্যাশায়ী দশহস্তীর বল পায়, তোমাদের সান্ত্বনার মহাসঙ্গে আর্ত্ত ব্যথিত স্থির হয়, তোমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া হতাশ আশ্বস্ত হয়, দীন দুঃখী নিশ্চিন্ত হয়। তোমরা সম্পদে লক্ষ্মী, বিপদে তারিণী, শোকে শান্তিময়ী ভৈরবী, ঐশ্বর্য্যে কমলা। তোমাদের নিকট উদ্যম পুরুষ সংযম শিখিবে, শান্তি বুঝিবে, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। মা, যেমন পূর্ব্বে তোমরা বাঙ্গালির গৃহে গৃহে গৃহধর্ম্মিণী ব্রতচারিণী ছিলে, যেমন ধাত্রীরূপে উচ্ছৃঙ্খল সমাজ রক্ষা করিতে, আবার যেমনি ইষ্টদেবী হইয়া বাঙ্গালির গৃহে গৃহে বিরাজ কর। মা, তোমার বিলাসের সাজ ত্যাগ কর, তোমার নাটক-উপন্যাস দূরে রাখ, তোমার বালকবালিকাগণের "ধাইমাদেন্স" অবাধাতি দিয়া ছেলেদের কোলে লইয়া মা হইয়া ঘর আলো করিয়া বস। মা, তোমার হারমোনিয়মের শব্দে ও সীতের ঝঙ্কারে ভিক্ষার্থীর আর্ত্তরব তোমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে না, তাই দেশ হা হা শব্দে পরিপূর্ণ। মা, তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চার জন্য অতিথ-পথিক শুষ্কমুখে তোমার দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়। মা, তোমার অলঙ্কার বস্ত্রাদির খরচে বালক বালিকাগণের সুশিক্ষা হয় না। মা, মঙ্গলময়ি একবার নয়ন মেলিয়া দেখ ;—দেখ মা, তোমার সর্ব্বনাশী আলস্য এবং অবজ্ঞা বশতঃ সমগ্রদেশ ক্ষুধার্ত্ত-ব্যথিতের কাতর শব্দে পূর্ণ; তোমার সুস্তানগণ অপুষ্ট দেহ, ক্ষীণ, বলহীন। তোমার ঘোর নিদ্রার জন্য গৃহের দেবদেবীর সেবা হয় না;—উঠ মা—জাগ মা। আবার তেমি তোমার স্নেহের, ভক্তির, বিশ্বাসের পবিত্র বায়ু সঞ্চালনে বাঙ্গালীর গৃহকে স্বর্গ হইতেও পবিত্র ও শান্তি-পূর্ণ কর। আদ্যাশক্তি! তোমার শক্তিকণা না পাইলে স্থাণুজ বাঙ্গালী পুরুষগণ আর কখনও জীবন পাইবে না, উদ্যম-উৎসাহ একেবারে ভুলিবে, পৃথিবীর মধ্যে যে মহামান্য স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা আর কখনও পাইবে না। কবি তোমার এক অপরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই সর্ব্বাদর্শ প্রফুল্লময়ীর ন্যায় প্রফুল্লমুখে, চারিদিক প্রফুল্লিত করিয়া একবার এস মা। সীতা-সাবিত্রীর পবিত্র নিশ্বাসে সংসারের সকল পাপ দূর কর, সকল ব্যথার উপশম কর। পরাধীন, পরপদানত পরমুখাপেক্ষী, পরপদলেহী আমরা, তোমাদের শক্তি না পাইলে ত্বরায় আমাদের নাম জগতের পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। তুমি বিধবার বসনে নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখাও, তুমি প্রসূতি হইয়া লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য দেখাইয়া দেও, তুমি পাতিব্রত্যে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া আমাদের

মুখোজ্জ্বল কর—আমাদিগকে কৃতার্থ কর। কি বলিব মা—তুমিত দেখিলেই দেখিতে পার, বুঝিলেই সব বুঝিতে পার, তোমার সকল সংবাদই আছে। তবে কেন আর ইয়াদিনী বিবসনা হইয়া থাক। মা, তোমার পবিত্রতার, বিশ্বাসের, শ্রদ্ধার, ভক্তির বসন পর, এ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া একবার কমলা—রাজরাজেশ্বরী হইয়া বিরাজ কর। তোমার আশীর্ব্বাদে দেশে নীরোগের, সচ্ছলতার, সুখ এবং ধর্ম্মের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইবে, মঙ্গলধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইবে এবং হাসির লহরীতে প্রকৃতি জাগিয়া উঠিবে। জাগ মা!

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঠাকুর-ঝি।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরালাল বাবুর বৈঠকখানা হইতে টলিতে টলিতে পরেশনাথ নিজের বাসার দিকে চলিল। বাসায় প্রবেশের পূর্ব্বেই দ্বারের কপাটে সজোরে পদাঘাত করাতে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। সেই শব্দে সুখদার প্রাণ একবারে উড়িয়া গেল। সুখদা তখন রন্ধনশালায় পিতার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। কপাটের সেই ভয়ঙ্কর শব্দে পিতা কিরূপ অবস্থায় আসিতেছেন, তাহা সে বালিকার বুঝিতে বাকি রহিল না। বালিকার প্রাণের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতে লাগিল; ভয়ে বালিকা তখন মৃতপ্রায় হইয়া রহিল। এই সময়, সেই উন্মুক্ত পরেশনাথ বিকৃত কণ্ঠে ডাকিল—"সুখি!"

সুখদা কোন উত্তর দিবে কি—ভয়েতেই তখন তাহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। পরেশ নাথ উন্মত্তভাবে পুনরায় ডাকিল—"সুখি!"

যাহার ন্যায় অসুখী বোধ হয়, এ পৃথিবীতে নাই, জন্মাবধি যে সুখের আস্বাদ কখন পায় নাই, যাহার সকল সুখের কণ্টক তাহার জন্মদাতা পিতা, সেই নরাধম পিতা এখন কন্যাকে ডাকিতেছে—"সুখি!"

সুখদার কোন উত্তর না পাইয়া পরেশনাথের ক্রোধের সীমা নাই; পরেশনাথ ক্রোধে অন্ধ হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে রন্ধনশালার দিকে আসিতে লাগিল। সে গর্জ্জন শুনিয়া সুখদার চৈতন্য হইল, সুখদা তখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার জন্য রান্নাঘরের দরজার দিকে দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু সেখানে আসিয়া দেখিল—তাহারই পিতারূপী কালান্তক যম দুই হাতে তখন দরজা আটকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!

সুখদা আর কি করিবে? সেই গৃহের মধ্যেই দৌড়িয়া গেল। কিন্তু সে গৃহের মধ্যে দৌড়িয়া আর কোথায় যাইবে? তাহার পশ্চাতে টলিতে টলিতে সেই পিতারূপী যমও চলিয়াছিল। সুখদা অগত্যা সেই ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আর সেই নরাধম পিতা ক্ষুধিত

ব্যাঘ্রের ন্যায় সেই প্রাণভয়ে ভীতা বালিকার উপর লাফাইয়া পড়িল! বালিকার চুলের মুঁটি ধরিয়া টানিতে টানিতে উন্মত্ত পরেশনাথ তাহাকে গৃহের বাহিরে আনিল।

গৃহের বাহিরে আনিয়াই প্রহার! সে প্রহার সহজ প্রহার নহে—ঘৃণায় ও ক্রোধে উন্মত্ত পশুর হস্তের প্রহার! দয়া নাই—মায়া নাই—গুন করিয়া ফেলিবারও ভয় নাই—এমন নৃশংস পিতার হস্তের প্রহার! বালিকার করুণ আর্ত্তনাদে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল, তত্রাচ সে প্রহারের বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—অবিশ্রান্ত প্রহার! সে প্রহারে বালিকা নির্জ্জীব হইয়া প্রাঙ্গণে মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিল। তখন পরেশনাথ তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং উন্মত্তভাবে সেইখানে বেড়াইতে লাগিল, তখনও কি সে নরাধম প্রহারে বিরত ছিল? সুধদা ক্রন্দন করিলেই পরেশনাথ দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিতে লাগিল। প্রহারে কি ক্রন্দন নিবারণ হয়? এ দিকে কিন্তু ক্রন্দনের মাত্রা বৃদ্ধি হইলেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রহারের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতেছিল। সুধদা কাতর কণ্ঠে বলিতেছিল—"বাবা, আর আমায় মেরো না, তোমার পায়ে পড়ি, আর আমায় মেরো না, এবার মেলে আমি মরে যাব। না হয়, একবারে মেরে ফেল; বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, এমন করে না মেরে, আমায় একবারে মেরে ফেলো।"

কি হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ! কিন্তু বালিকার সেই ক্ষীণ কোমল কণ্ঠবিনিঃসৃত করুণবিলাপধ্বনিতে কর্ণপাত করিবে কে? নরক, কে বলে তোমার জন্য ভয়ঙ্কর স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে? আমরা বলি—এই পরেশনাথই মূর্ত্তিমান নরক। আর স্বর্গ, এ পাপময় পৃথিবীতে কি তোমার কোন চিহ্নই নাই? এ বালিকার আর্ত্তনাদ কি কাহার কর্ণে গিয়া পৌছিল না? সে মর্ম্মভেদী ক্রন্দন অন্য কাহার নিকট না পৌছিলেও যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—অগতির গতি—অনাথের বন্ধু—সেই অন্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী ভগবানের কর্ণে গিয়াও পৌছিল না কি? ঐ দেখ স্বয়ং ভগবান মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে বালিকার উদ্ধারের জন্য বিদ্যুৎবেগে দৌড়িয়া আসিতেছে! ভয় নাই—লজ্জা নাই—কেবল হৃদয়ের আবেগে যেন দয়ারূপিণী উন্মাদিনী মূর্ত্তি!

পরেশনাথ একবার পশ্চাৎ ফিরিবামাত্র, সেই মূর্ত্তি নিমেষের মধ্যে বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া বিদ্যুৎবেগে সেস্থান হইতে দৌড়িয়া গেল! পরেশনাথ ফিরিল, দেখিল—সুধদা আর সে স্থানে নাই। বিবরে আনীত শিকার হঠাৎ অদৃশ্য হইলে ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেমন হুঙ্কার করিয়া উঠে, পরেশ সেইরূপ একটা ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিয়া উঠিল!

এখন সেই মূর্ত্তিমতী দয়া কে?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার কে—সেই পরদুঃখকাতরা অমলা। অমলা আজ প্রাতে জননীর অজ্ঞাতে চুপিচুপি সুধদার নিকট আসিয়া তাহার সাংসারিক কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিল; তাহার পর তাহার রন্ধনাদির উদ্যোগ করিয়া দিয়া সুধদার সেই শিশুভাতাটিকে লইয়া গিয়া আপনার শয্যায় ঘুম পাড়াইয়া রাখিল। অমলার মাতা কন্যার এরূপ ব্যবহার ভাল বাসিতেন না; সেই কারণ অমলা সদা সশঙ্কিতভাবে জননীকে গোপন করিয়া এই সকল কার্য্য করিত। অমলা সুধদায় সাংসারিক কোন কাজ করিতেছে, এমন সময় যদি কেহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত

হয়, অমলা অমনি সে কাজ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়া যেন সুধদার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেই তাহার বাড়ী আসিয়াছে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিত। পরেশনাথের স্বভাব চরিত্র ঐরূপ জন্য, এবং সে অমলার স্বজাতীয় নহে; এদিকে অমলা ব্রাহ্মণের ঘরের বাল-বিধবা; এই কারণ অমলার জননী অমলাকে সুধদার নিকট যাইতে সর্ব্বদাই নিষেধ করিতেন। অমলা কিন্তু জননীর সে আজ্ঞা পালন করিতে পারিত না; সুধদা আর তাহার সেই শিশু-ভ্রাতাটির জন্য সর্ব্বদাই তাহার প্রাণ কাঁদিত। তার অমলা বড় বুদ্ধিমতী, এরূপ সময় সুধদার নিকট যাইত, যে সময় পরেশনাথ বাড়ীতে থাকিত না, হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলে অমলা এরূপ কৌশলে সেস্থান হইতে পলায়ন করিত যে পরেশনাথ তাহাকে দেখিতে পাইত না।

আজ যখন পরেশনাথ সুধদাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছিল, তখন অমলা তাহার মুখে দরজা বন্ধ করিয়া গোপনে পরেশনাথের সেই শিশুপুত্রটিকে দুগ্ধপান করাইতেছিল, সেই কারণ সুধদার আর্ত্তনাদ অমলার কর্ণে গিয়া প্রথমে পৌছিতে পারে নাই। কিন্তু যে সময় সুধদা প্রাণের ভিতর কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি সেই শিশুটিকে পুনরায় শয্যায় শয়ন করাইয়া অমলা গৃহের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। তখন সুধদার আর্ত্তনাদ দরদার কর্ণে গিয়া পৌছিল। অমলা কি আর স্থির থাকিতে পারে? জননীর ভয়—পরেশনাথের ভয়—সকল ভয় বিস্মৃত হইয়া অমলা তখন বালিকার উদ্ধারের জন্য দৌড়িল।

বালিকাকে সেই নির্দ্দয় পিতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া অমলা তাহাকেও আপনার গৃহে আনিল। সুধদা তখন এক প্রকার জ্ঞান-শূন্যা—মৃতপ্রায়! অমলা প্রাণপণে তাহার শুশ্রূষা আরম্ভ করিল। প্রথমে চক্ষে ও মুখে জল দিয়া তাহাকে কতকটা প্রকৃতিস্থ করিল; অমলাকে দেখিয়াই সুধদার যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হইয়াছিল, কিন্তু কথা কহিবার শক্তি তখনও সুধদার ছিল না। সুধদার নিশ্বাসের টান এখনও বড় প্রবল, থাকিয়া থাকিয়া সে দীর্ঘ নিশ্বাসও যেন আট্‌কাইয়া যাইতেছিল। অমলা তাড়াতাড়ি গরম দুধ আনিয়া ধীরে ধীরে অঙ্গে অঙ্গে সুধদাকে খাওয়াইতে আরম্ভ করিল। এইরূপ শুশ্রূষায় সুধদা একটু বল পাইয়া বলিল—"মা! তুমি আমায় কেন বাঁচালে? আমি মলেই বেঁচে যেতুম।"

বলিতে বলিতে বালিকার অশ্রুধারা প্রবাহিত করিয়া অশ্রুধারা ছুটিল। বালিকা এখন অমলাকে "মা" বলিয়া সম্বোধন করে; বালিকার মা-বলা-সাধ এখনও মেটে নাই, তাই অমলা হইয়াছে সুধদার মা। সে 'মা' সম্বোধনে সেই বাল-বিধবা অমলার হৃদয়-নিহিত মাতৃস্নেহ কোথা হইতে আসিয়া তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহার পর মুহূর্ত্তেই সুধদার মর্ম্মান্তিক কথায় অমলার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সেই অশ্রুপ্লাবিত শুষ্কমুখ দেখিয়া অমলাও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। অমলাও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"তোর মতন ছোট মেয়ে এত কষ্ট সহ্য ক'রে, ক'দিন বাঁচ্‌বে? এ বয়সে কেউ কি এত কষ্ট সহ্য কর্‌তে পারে? তার উপর আবার প্রহার! সুধদা, তোর কথা মনে হলে আমার প্রাণ ফেটে যায়। বিধাতা——"

অমলা আর বলিতে পারিল না। তখন তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অমলাকে কাঁদিতে দেখিয়া সুধদা আর কাঁদিল না।

অমলা সুধাদাকে ভালবাসে, আর সুধদা কি অমলাকে ভাল বাসে না? পিতার প্রহার ও গর্জ্জনে সুধদা ক্রন্দন বন্ধ করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহাকে কাঁদিতে দেখিলে তাহার মাতৃস্থানীয়া অমলা যখন কাঁদে, তখন সুধদা কি আর কাঁদিতে পারে?

সুধদা আর কাঁদিল না; সুধদাকে একটু সুস্থির হইতে দেখিয়া অমলার এই সময় হঠাৎ একটা কথা স্মরণ হইল। অমলা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"সুধদা তোমার খাওয়া হয়েছে?"

সুধদা প্রশ্নের কোন উত্তর করিল না; অমলা তখন আর সে স্থানে রহিল না, সে গৃহ হইতে কোথায় চলিয়া গেল। অমলা ক্ষণপরেই অন্নব্যঞ্জন লইয়া সেই গৃহের মধ্যে আসিল। কিন্তু তখনও সুধদার উঠিবার শক্তি ছিল না। অমলা স্বহস্তে ধীরে ধীরে তাহাকে আহার করাইতে আরম্ভ করিল। এমন সময় সেই ঘরে প্রবেশ করিল—সেই ঝাড়ীর ঝি।

ঝি সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার পর আরম্ভ করিল—"ও মা কি ঘেন্না—কি ঘেন্না, আমি যাব কোথা! জাতধর্ম্ম কি নেই? বামুনের ঘরের বিধবা হয়ে, নিজে হাতে করে কায়েতের মেয়েকে ভাত খাওয়াচ্ছে গা! হাঁগা, তুমি কি কিরিষ্টান্ না কি? বলি, ঘরে বসে, এমনি করে কি জাতধর্ম্মের মাতা খেতে হয়?"

ঝিকে দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া অমলা একটু অপ্রস্তুত হইল। অমলা জাতিভেদ মানিত কিন্তু এরূপ অবস্থায় তাহার সে সকল কথা মনে উদয় হইত না। অমলা আগ্রহের সহিত মিনতি করিয়া ঝিকে বলিল—"ঝি, তুই চুপ কর, এখনি মা শুনতে পেলে আমায় বড় বকবেন। এরূপ বিপদের সময় সে কথা কি মনে থাকে বাছা?"

ঝিকে যখন চুপ করিতে বলা হইয়াছে, তখন ঝি কি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে? ঝি এইবার উচ্চকণ্ঠে বলিল—"তা মাঠাকুরুণ শুনতে পাবে বলে, চখের ওপর দেখে, এ সকল কি সহ্য করা যায়? ওমা! যাদের এককোঁড় পরকালের ভয় নেই, এমন বাকুলে আবার চাকুরী করতে আছে?"

অমলা তখন পুনরায় মিনতি করিয়া বলিল—"ওঝি, তোর পায়ে পড়ি, তুই একটু চুপ কর্। আমি এই কটি ভাত খাইয়ে দিয়ে, স্নান করে আস্‌বো।"

ঝি এইবার রাগিয়া বলিল—"কি! বামুনের মেয়ে হয়ে, আমার পায়ে পড়্!"

তাহার পর ঝি ক্রন্দনের সুরে আরম্ভ করিল—"আমাকে অধঃপাতে দেবার লেগে সবাই আমার পায়ে পড়তে আসে। আমি এমন বাকুলে আর থাকবো না; এদের ধর্ম্ম কর্ম্ম নেই; পতোর খাটিয়ে খেতে এসেছি বলে কি আমি জাতধর্ম্ম খোয়াবো?"

অমলা ঝিকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইল; কিন্তু কিছুতেই অমলা সে ঝিকে সান্ত্বনা করিতে পারিল না। অমলার সান্ত্বনা-বাক্যে ঝির ধর্ম্মভয় ও ক্রন্দনের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এমন সময় স্বয়ং সাবিত্রী ঠাকুরাণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঝির এইরূপ ব্যবহারে সুধদাকে আহার করান তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঝিকে সান্ত্বনা করিতেই অমলা তখন ব্যস্ত, সুতরাং সুধদাকে আর আহার করাইবে কিরূপে? সাবিত্রী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই কন্যাকে তদবস্থায় দেখিলেন। ভয়ে অমলা জড়সড় হইয়া গেল, কিন্তু সাবিত্রী একটীও কথা বলিলেন না। সাবিত্রী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"হা আমার অদৃষ্ট! আমার ছেলেমেয়েরই সমান হলো, তবে আমি কি সুখে এসংসারে থাকবো? আমার যা কিছু আছে, বেচে কিনে আমি কাশী চলে যাব। এত বেলা হয়েছে, এখনও যদি নিজে না খেয়ে, শতিকজ্বেতের শত্রুটী ছুঁয়ে বেড়াবি, তবে আর বাঁচবি কি করে?"

সুধদার এইবার আহার শেষ হইয়াছিল, সুতরাং অমলা আর একটিও কথা না বলিয়া নীরবে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কর্ম্মফল।

কর্ম্ম ফল! কর্ম্ম ফল!! কর্ম্ম ফল!!! ফলের মুখেই ঐ কথা। কিন্তু বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াও ত মনোমত উত্তর পাই না। যত প্রত্যেক শাস্ত্রে, প্রত্যেক পুরাণে, কর্ম্মফলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মহাদর্শী খনাম প্রসিদ্ধ শিহ্লনমিশ্র তাঁহার বহুবিখ্যাত শান্তি শতকের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন:—

মনস্যামো দেবান্নহু হতবিধে স্তেহ্পি বশগাঃ,
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈকফলদঃ;
নমঃ কর্ম্মভ্যস্তে বিধিরপি যেভ্যঃ প্রভবতি॥১

তবে সেই কর্ম্ম-ফল কি?

কর্ম্মফল কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইলে, পূর্ব্বজন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কলেজ-ছেলে বাবুর দল, পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যেমন পৃথিবীতে আসিয়াছি, আবার তেমনিই পৃথিবীতে মিশিয়া যাইব; পরজন্ম এবং পূর্ব্ব জন্মের দরকার কিছুই নাই। ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার তাঁহারই ইচ্ছায় লয় পাই।" একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য; ভগবান যে এই অসমুদ্র ক্ষিতিতল, জল, এত দিবারাত্রি অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে আর কোন প্রকার সন্দেহ নাই; এবং তাঁহারই অভিপ্রায়ে যে আমরা লয় প্রাপ্ত হইতেছি এবং হইব, তাহাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু ভগবানের অংশস্বরূপ প্রত্যেক দেহধারী জীবদেহে সূক্ষ্ম আত্মা বিরাজ করিতেছে। এই আত্মাই অবিনাশী বলিয়া সুধীগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ কালে লিধন প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু আত্মা কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। স্থূলদেহ বিনাশের সঙ্গে সূক্ষ্মাত্মা জীব ব্যাপার নিত্য ব্রহ্ম

(আত্মা) কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে না। ভগবান বলিয়াছেন।"

"অবিনাশি তুতদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য নকশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥"

তবে আত্মা অবিনাশী। যতকাল পর্য্যন্ত আত্মা সেই পরমাত্মায় বিলীন না হইবে, ততকাল পর্য্যন্ত ইহাকে পুনঃপুনঃজন্ম এবং মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। জীবাত্মা জীর্ণ শরীর হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্য এক অভিনব দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। ভগবান্ বলিয়াছেনঃ—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতিনবানি দেহী॥"

মনুষ্যগণ, জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেমন নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ জীবাত্মা, জীর্ণ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। সুতরাং পুনঃ পুনঃ জন্ম এবং মৃত্যু যন্ত্রণা দ্বারা যতকাল পর্য্যন্ত আত্মা পরিশোধিত না হইবে, ততকাল পর্য্যন্ত তাহাকে জন্ম ধারণ করিতেই হইবে। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংমিলনের নাম মুক্তি; প্রত্যেক জীবাত্মাই এই মুক্তি প্রার্থনা করে। কিন্তু পাপক্ষয় না হইলে এই মিলন অসম্ভব; তাই পাপক্ষয়ের প্রায়শ্চিত্ত বিধান জন্য আত্মা, অতীব কঠোর জন্ম এবং মৃত্যু-যন্ত্রণা পুনঃ পুনঃ সহ্য করিয়া থাকে। "ললিত বিস্তার" নামক সর্ব্ব প্রধান বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাই যে, ভগবান বুদ্ধদেব ৫০৬ বার বিবিধ আকারে জন্ম পরিগ্রহ করণান্তর পরিশেষে 'বুদ্ধ' জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সামান্য সামান্য কীট হইতে তিনি 'ব্রহ্মা' পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ নহুষ অন্তিমে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যোগোপনিষৎ গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, ভগবান শুকদেব নানা প্রকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিশেষে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। যখন পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর জীবাত্মা, মধ্যে পরমাত্মা সূক্ষ্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন অবস্থান্তরিত দেহে জীবাত্মার অবস্থানহেতু দেখিতে হইবে।

প্রবল পরাক্রান্ত জর্ম্মান সম্রাটকে, পরমেশ্বর যে উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, একজন অভিশয় দীন দুঃখীকেও সেই উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তবে সেই সম্রাট বা কেন প্রতিদিন কোটি কোটি লোকদ্বারা সেবিত হইতেছেন, আর সেই দীন দুঃখীই বা কেন একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে। ভগবান নিরপেক্ষ, সার্ব্বভৌম নৃপতিকে তিনি যে প্রকার স্নেহ করেন, আর সেই দরিদ্রকেও সেই প্রকার স্নেহ করিয়া থাকেন। তবে ইহার কারণ কি? কারণ সেই কর্ম্ম ফল।

মনুষ্য-জন্ম অতিশয় দুর্ল্লভ; কারণ এই জন্মেই আত্মার উন্নতি দ্বারা সদ্গতির পথ প্রশস্ত হয়। ইতর প্রাণীদের ন্যায় আহার, ভয়, নিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক বৃত্তি মনুষ্য হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়াও অন্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ ভগবান আমাদিগকে বিবেক এবং বুদ্ধি শক্তি প্রদান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা চালিত হইয়া আমরা পাপ এবং পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকি। জগৎপিতা পরীক্ষার নিমিত্ত আমাদের নিকট দুইটী পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী পাপ—অপরটী পুণ্য। আমাদের ইচ্ছানুরূপ পথে প্রবেশ করিয়া পাপ অথবা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকি। ইহাই মনুষ্যের "কর্ম্মফল"।

প্রত্যেক জীবাত্মারই কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিতে হইবে! কেহ বা সর্ব্বভোগ নৃপতি

হয়া সংসারে অশেষ প্রকার সুখ ভোগ করিতেছে আবার কেহ বা চীরবাস পরিধানপূর্ব্বক মাথায় সূর্য্যের প্রচণ্ডতাপে দগ্ধীভূত হইয়া সংসারের জন্য ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। কেহ পুণ্যকার্য্য দ্বারা আত্মার উন্নতি বিধান করিতেছেন পাপকার্য্য দ্বারা তদ্বৈপরিক অবনতি হইয়া থাকে। কর্ম্মফলে মহারাজ নহুষ ইন্দ্রত্ব চ্যুত করিয়াও আবার সেই কর্ম্মফলেই ব্রহ্মত্বে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"ধর্ম্মেন গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদধর্ম্মেন"

অর্থাৎ ইহজীবনে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিলে পরকালে সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আর অধর্ম্মোপার্জ্জন করিলে অধোগতি হইয়া থাকে। এই মহাবাক্যটী স্বতঃসিদ্ধ। জগৎপিতার প্রতি নিয়ম প্রতিপালন করিলে ধর্ম্মোপার্জ্জন, অন্যথা পাপার্জ্জন হইয়া থাকে। এই পাপ এবং পুণ্যের ফলভোগ আত্মাই করিয়া থাকে। জীবাত্মার পরিশুদ্ধির জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে কর্ম্মই গতি; কর্ম্ম দ্বারাই আত্মা সদ্গতি এবং অসদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য-জীবন লাভ করিলে কর্ম্ম অপরিহার্য্য; তবে যে কর্ম্ম দ্বারা আত্মার এবং জগতের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম, এবং ইহা দ্বারাই জীবাত্মা সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে। জীবাত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া যত বার নূতন দেহ আশ্রয় করিবেন, ছায়ার ন্যায় কর্ম্মফল তাঁহার অনুগমন করিবে। এই হেই বিবেকের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মা শিখলগ সিঙ্ক বলিয়াছেন,

"আকাশমুৎপতন্তু গচ্ছন্তু বা দিগন্ত
মন্তোনিধিং বিশন্তু তিষ্ঠন্তু বা যথেষ্টং।
জন্মান্তরার্জ্জিত-শুভাশুভ-কৃতরাশ্যং
ছায়েব নত্যজতি কর্ম্ম-ফলানুবন্ধি॥"

সংসারে দেখিতেছি, যে অনেক লোক নানাবিধ পাপকার্য্য দ্বারা অশেষ ধন সম্পত্তি অর্জ্জন করতঃ পুত্র পৌত্রাদি সহ সুখে কালাতিবাহিত করিতেছে। আবার কোথাও কোন পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি নানাপ্রকার আর্থিক, শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট পাইতেছেন। একটু মনঃসংযোগ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব যে, এই রহস্যের অন্তঃস্তলে কর্ম্মফল নিহিত রহিয়াছে। যিনি বর্ত্তমানে অনেক পাপার্জ্জন দ্বারা সুখী হইতেছেন, তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল অবশ্যই শ্রেষ্ঠ ছিল, তাই তিনি নিরাপদে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিতেছেন; আর যিনি ধার্ম্মিক হইয়াও অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল অবশ্যই নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু ইহকালের কর্ম্মফল, ইহকালে ভোগ না হইলেও, পরকালে যে অবশ্যই হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

কর্ম্মফল ভোগ দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিলেই মুক্তির সোপানমার্গে আরোহণ করা যায়; কিন্তু এই উৎকর্ষ লাভ এক জীবনে হয় না। বহুবার জন্ম-গ্রহণান্তর বহু তপস্যার ফলে আত্মাকে এই অবস্থায় আনিতে হয়। বারান্তরে বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীরোহিণী কুমার সেন গুপ্ত।

নৈদাঘ নিশীথ স্বপ্ন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বনের অন্য অংশে)

(অনঙ্গের প্রবেশ)

অ। না জানি ত্রিতারা নিদ্রাভঙ্গে কি দেখে খেপেছে?

(পঞ্চুর প্রবেশ)

এই যে পঞ্চু এয়েছে। কিরে ক্ষেপা! আজ এই বনে রাত্রি কেমন যাচ্ছে?

প। মহারাজ! রাণী এক অদ্ভুত জানোয়ার নিয়ে খেপেছেন। রাণী যখন নিদ্রিতা ছিলেন, তাঁর নিকুঞ্জে কতকগুলি কামার কাঁশারী একত্র হইয়া রাজার বিবাহ রাত্রির জন্যে, এক নাটকাভিনয় শিখা কচ্ছিল। তাদের মধ্যে যেটী নেহাত বোকা, সে মেঘনাদ সেজেছিল। সে বেটা যাই একটী বনে প্রবেশ করেছে, অমনি তার মাথায় একটী গাধার মুণ্ড বসিয়ে দিয়েছি। যেই মেঘনাদ প্রমীলার সঙ্গে কথা কইতে এলেন, আর এক তামাসা আরম্ভ হলো। যেমন হঠাৎ একটী বন্দুক আওয়াজ শুনে চরের পাখিগুলি চেঁচা চেঁচি করে উড়ে যায়, তেমনি সখিরা পালাতে লাগ্‌লো, একজন আর একজনের গায়ে পড়ে আছাড় খেতে লাগলো। কেহবা "খুন কল্লে" আ "খুন কল্লে" বলে চীৎকার ক'রে লোক ডাকতে লাগ্‌লো। আর বনের কাঁটায় পড়ে পড়ে অঙ্গ বিক্ষত হতে লাগলো। আমি গাধামুণ্ড ইন্দ্রজিতকে দেখানে রেখে এলেম, গোলমালে রাণী জেগে গাই তাহাকে দেখেছেন, অমনি গাধার পিরীতে ক্ষেপে গেছেন।

অ। বাহবা পঞ্চু! সাবাস। বড় মজা হয়েছে তো। আমার অতিরিক্ত হয়েছে। সে ছুটোর চোকে যে ফুলের রস দিতে বলে ছিলেম, তাহা দিয়েছিস?

প। যুবকটী ঘুমুচ্ছিলো, তার চোকে রস দিয়ে এসেছি, আর সেই যুবতী কাছে বসেছিল, জাগ্‌লেই তাকে দেখ্‌বে।

(প্রমোদা এবং বিপিনের প্রবেশ)

অ। সরে দাঁড়া—এ সেই যুবকটী বটে।

প। যুবতীটী সেই কিন্তু সেই পুরুষ নহে।

বি। কেন তিরস্কার কর অনুরক্ত জনে,
রাধ এই বিষ রাশি শক্তির কারণে।

প্র। তিরস্কার তুচ্ছ কথা—তা হতে অধম
ব্যবহার-যোগ্য তুমি পাপী নরাধম।
নাশিয়াছ যেই রক্তে, হও নিমজ্জিত,
বধিয়া আমায়। হায়! অভিন্ন যেমন
দিবা, দিবাকর, ছিনু আমরা দুজন।
নিদ্রাগত প্রমোদায় ফেলিয়া কাননে,
সে গিয়েছে ছেড়ে? না না, যানে না যে মনে
আকাশ ছাড়িতে পারে, ওই চন্দ্রমায়,
বিনোদ ছাড়িতে তবু পারেন না আমায়।
অবশ্য তাহাকে তুমি করেছ নিধন,
হন্তার মতন তব মূরতি ভীষণ।

বি। হন্তা নহি, হত আমি, প্রমোদা তোমার
নিষ্ঠুরতা-বিদ্ধ এই হৃদয় আমার।
হন্তা তুমি, তবু হায়! মূরতি তোমার
ওই চন্দ্র জিনি হায়! শোভার আধার।

প্র। কি ছাই এরূপ, মম বিনোদের কাছে।
বিপিন! বলনা হায়! সে কি বেঁচে আছে!

বি। থাক্ তার মৃত দেহ শৃগাল গৃধিনী।
প্র। পাপিষ্ঠ! নির্দ্দয়! তুই চণ্ডাল অধম!
আকাশে কি নাহি বজ্র রে তোর কারণ?
রমণীর ধৈর্য্যচ্যুত করিলি আমারে,
সত্যই কি হত ই করেছিস তারে?
মানব-সমাজে তোর না হইবে স্থান,
নরক-নিবাসী তুই, নারকী-প্রধান।
কি সাধ জাগাতে তুমি চাহে তার পানে,
নিদ্রায় কি তবে তারে বধিলে পরাণে?
বন্য পরাক্রম তব, নিদ্রিত হনন!
সামান্য ভুজঙ্গে, কিরে পারেনা তেমন?
অধম্য ভুজঙ্গ হতে তুমি নীচাশয়,
ভুজঙ্গ তোমার মত স্বার্থপর নয়।

বি। কেন মিছে তিরস্কার কর ক্রোধভরে,
আমি বিনোদের রক্তে কলঙ্কিত নই;
এখন ও সত্যতে ক'রে নেই খাসরোধ,

প্র। পায় পড়ি, বল ভাল আছত বিনোদ?

বি। যদি বা বলিতে পারি, কি ফল আমার?

প্র। প্রনোদার মুখ দেখিবেনা আর।
জীবিত কি মৃত, প্রাণ বিনোদ আমার,
তুমি দ্বন্দ্বিতের কাছে থাকিব না আর।

(প্রস্থান)

বি। নিষ্ফল এ বাঁধিনীর পশ্চাৎ গমন,
ক্লান্ত দেহ, এইখানে করিব শয়ন।
যতই বিষাদ মম হতেছে প্রবল;
ততই নিদ্রার ঋণ বাড়িছে কেবল,
আজি এইখানে দেখি করিয়া শয়ন,
শোধিতে সে ঋণ যদি পারি কিছুক্ষণ।

(নিদ্রা)

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

ভবল্ খুন!!

রামধন ঘোষাল মতি ঘোষকে খুন করিয়াছে বলিয়া বর্দ্ধমানের সেশনস জজ তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। হাইকোর্টের সম্মতি গ্রহণের নিমিত্ত জজের সেই ভীষণ আজ্ঞা কলিকাতায় আসিল। হাইকোর্টের যেন বিচক্ষণ দৈশীয় বিচারপতি খুনের সমস্ত প্রমাণগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"বড় সাহেবের রায় গ্রাহ্য করিতে পারা যায় না; রামধন ঘোষাল বোধ হয় প্রকৃত খুনী নহে। খুনের পুনর্ব্বার তদারক হউক, যতদিন খাসল খুনী বাহির না হয়, ততদিন রামধন হাজতে থাকুক।"

মোকদ্দমায় খুন সম্বন্ধে এই বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে;—রামধন ঘোষালের পিতার নাম হরগোবিন্দ ঘোষাল, নিবাস শালকিয়া, হাবড়া, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কুবাজপুরের মতি ঘোষকে কিছু টাকা ধার দিয়াছিল। মতি তাহার কাছে টাকা লইয়া শালকিয়ায় একখানি মুদির দোকান করিয়াছিল; বিস্তর দেনা থওয়াতে দোকান ফেলিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছিল; রামধন ঘোষালের প্রায় ৩০০৲ তিনশত টাকার মধ্যে একটী পয়সাও দেয় নাই, রামধন ঘোষাল দুই তিনবার তাগাদা করিয়া শেষে নালিশের ভয় দেখাইয়া তাগাদা করিতে

যায়; কুবাজপুরের মাঠে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়; রামধন তাহাকে বিস্তর গালি গালাজ করিয়া শেষে তাহারই কোদাল লইয়া তাহাকে খুন করে। ভূতো ও পাঁচু—দুইজন প্রধান সাক্ষী। তাহাদের বাড়ী রাণীগঞ্জের অন্তর্গত মামুদপুর। তাহারা মজুর। মতি ঘোষের জমিতে তাহারা খাটিতেছিল; রামধন ঘোষাল জংশন-ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিয়া কুবাজপুরে যাইতে যাইতে পথিমধ্যেই মতিকে খুন করে।

দায়রায় জুরি রামধনকে নির্দ্দোষ বলিয়া ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু জজ সাহেব প্রমাণের মুখে তাহাকে দোষী ও হত্যাকারী বলিয়া স্থির করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। তাঁহার বিচার ভাল কি মন্দ পরে জানা যাইবে। হাইকোর্টের উক্ত আদেশ পাইবামাত্র তদনুসারে কাজ করা হইল এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আজি কালি হুগলি ও বর্দ্ধমানে তোমার মত উপযুক্ত ডিটেক্‌টিভ্ অফিসার নাই; ব্যাপারটা বড় সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে না। প্রকৃত হত্যাকারীকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলে উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষরিত ওয়ারেণ্ট লইয়া দুর্গা নাম স্মরণ করিতে করিতে বাহির হইলাম।

(২)

অকূল পাথার, ভাবিয়া কূলকিনারা পাই না; যদি রামধন খুন করিল না, তবে কে খুন করিল? আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য সেই দুইটী প্রধান সাক্ষী ভূতো ও পাঁচুর সন্ধান লওয়া। তাহাদের দুই জনকে ধরিতে পারিলে কতকটা খবর পাওয়া যাইবে। সেই জন্য অগ্রে তাহাদের গ্রামে মামুদপুরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম, তাহারা সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে,—কোথায় গিয়াছে, কেন গিয়াছে,—কেহই তাহা বলিতে পারিল না। তাহাদের স্ত্রী পরিবার তাহাদের সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে। সঙ্কট আরও বাড়িল; ভূতো-পাঁচুর চেহারা কিরূপ, তাহা আমি কখন চক্ষেও দেখি নাই; মামুদপুরের কুলিদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে তাহাদের আকারাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জ্ঞান হইল না। সুতরাং কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। এক জন কুলিকে ভাল চাকরি দিবার প্রলোভন দেখাইয়া সঙ্গে লইলাম। মামুদপুর হইতে কুবাজপুরে আসিলাম। তথায় রমানাথ মুখোপাধ্যায়ের একটী অনূঢ়া কন্যা ছিল। কন্যা অরুন্ধতী; এই সংবাদ পাইয়া তাঁহারই বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলাম। আমার কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত সেই কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ যাহাতে স্থির হয়, তদুপযোগী কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। কুলে শীলে সমস্তই মিলিয়া গেল, সুতরাং ব্রাহ্মণের খুব বিশ্বাস হইল যে, বিবাহ হইবে। তিনি সেইজন্য যথোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন। রীতিমত জলযোগের পর কন্যা দেখিলাম, কোথায় পুত্র, কোথায় বা বিবাহ; মূলময় কার্য্যোদ্ধার। কিন্তু রমানাথ বাবুকে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে দিলাম না। এক পক্ষ পরে, তিনি আমার ভ্রাতাকে দেখিতে যাইবেন, এইরূপ স্থির হইল। রমানাথ ধনী; তাহার পুত্র, বাগান, জমি, জরাত বিস্তর। তিন খানি লাঙ্গলের চাষ। বর্দ্ধমান, জেলার লোক, সুতরাং ঘরে ঘরে গাঁতি জাল; গাঁতির জালে দরকার হইলে জেলেকে ডাকিতে হয় না। সন্ধ্যার কিছু পরে তাহার একটী চাকর গাঁতি জাল লইয়া চারিটী মাঝারি মাছ ধরিয়া আনিল; ঘরে আট দশটা গাই গোরু; দুধের অভাব নাই।

যথা রাজ্ঞী, রাত্রে রীতিমত চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় হইল; রমানাথ বাবুর যত্ন ও আদরের আর সীমা রহিল না। আহারান্তে তিনি শয্যার আয়োজন করিয়া দিয়া নিজে আমার কাছে শয়ন করিলেন। অনেক কথা চলিতে লাগিল; কথায় কথায় গ্রামের অবস্থা, চাষবাসের অবস্থা, কি রকম লোকের সাহায্যে চাষ করা হয়, কোথাকার লোকজন আসিয়া মজুর খাটে, সেই সকল লোকের কিরূপ অবস্থা ও চরিত্র, গ্রামে শান্তি বিরাজ করে কি না, এখন গ্রামে খুন, বা চুরি ডাকাতি হইয়াছিল কি না, এই সকল কথা, কৌশলে বাহির করিয়া লইলাম। এই সকল বিষয়ের আলোচনায় রাত্রি ১টা বাজিয়া গেল। তখন নিদ্রার আবেশ হইল। রমানাথ বাবুও ঘুমাইলেন। কিছুক্ষণ পরে একটা বিকট চীৎকারে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; চারিদিকেই "খুন! খুন!" করিয়া চীৎকার। রমানাথ ত্রস্তব্যস্ত-ভাবে গাত্রোত্থান করিয়া গোয়াল বাড়ীতে ছুটিয়া গেলেন, কারণ সেই বাড়ীতেই চীৎকার হইতেছিল। সেই বাড়ীতে রমানাথ বাবুর রাখালগুলি থাকে। আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম; গোয়ালবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—একটা লোকের গলা কাটা! রক্তের ধারায় তাহার বিছানা প্লাবিত! আমি গিয়া দেখিলাম—তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়াছে; পাশে দুইটী লোক দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। রমানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ ব্যক্তি কে? ইহার নাম কি? কে ইহাকে খুন করিল?

রমানাথ বাবু বিহ্বলভাবে বলিলেন, "হতভাগা ভূতো সর্ব্বনাশ করিল।"

ভূতো নাম শুনিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু তখন কিছুই না বলিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম, "খুন হ'ল কে? ইহার নাম কি?"

রমানাথ বাবু কম্পালে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"আমার মাথা আর মুণ্ড;—ইহার নাম পাঁচু। মহাশয় এটাকে আমি বড় ভাল বাসিতাম। পাজি ভূতো এই সর্ব্বনাশ করিল।"

শিকার হস্তগত! যাহাদিগকে ধরিব বলিয়া এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে আসিলাম, তাহারা হস্তগত হইয়াও হইল না। কিন্তু ভূতো যখন খুন করিয়াছে, তখন আর সে কোথায় পলাইবে? এইবার তাহাকে ধরিয়াছি। এইবার কুবাজপুরের পূর্ব্ব খুনের প্রকৃত তদন্ত হইবে।

(৩)

মামুদপুর হইতে যে লোকটাকে আনিয়াছিলাম। সে ভূতো ও পাঁচু দুই জনকেই চিনিত। পাঁচুকে দেখিয়া, সে চিনিতে পারিল। পরদিন প্রত্যূষে রমানাথ বাবুর নিকট বিদায় লইলাম। যাইবার সময় তিনি কন্যার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিলেন না। আমিও তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়া, যদুকে (আমার চাকরকে) সঙ্গে লইয়া কুবাজপুর হইতে বাহির হইলাম। কুবাজপুর সাহেবগঞ্জ থানার এলাকাভুক্ত; তথায় উপস্থিত হইয়া দারোগাকে খুনের কথা জানাইলাম এবং লাশ ও যে অস্ত্রদ্বারা ভূতোকে খুন করিয়াছে, সেই অস্ত্রখানি একেবারে বর্দ্ধমানে চালান করিতে বলিয়া খুনীর অনুসন্ধান করিতে বলিলাম এবং নিজে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই দিনই গ্রামে গ্রামে খুনের কথা প্রচার করিয়া দেওয়া হইল; এবং সাহেবগঞ্জ থানায় ও তাহার অন্তর্গত সকল গ্রামে

যত কনষ্টেবল ও চৌকিদার ছিল, সকলকেই সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল; সকলেই তখন যমদূতের ন্যায় গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতে লাগিল। যেখানে যত নূতন ছোটলোক দেখিল, সকলেরই পরিচয় লইয়া, যাহার উপর সন্দেহ হইল, তখনই নজরবন্দী রাখিয়া দিল। এইরূপে তিন ঘণ্টার মধ্যেই হুলস্থূল পড়িয়া গেল। লোকে ভয়ে একেবারে তটস্থ হইয়া পড়িল। ভূতো পাঁচুকে খুন করিয়াছে; তাহাদের দুইজনকে অনেকেই চিনিত; যাহারা চিনিত, তাহারা জানিত যে, ভূতো ও পাঁচুতে হরিহরাত্মান সুতরাং ভূতো যে, পাঁচুকে খুন করিয়াছে, একথা সহসা কেহ বিশ্বাস করিল না; কিন্তু যখন কোন কোন লোক লাশ দেখিয়া গিয়া বলিল, তখন অনেকের বিশ্বাস হইল।

এই খুনে আমার কাজের একটু সুবিধা হইল; কেননা এই কথার মত আন্দোলন হইতে লাগিল, ততই পূর্ব্ব খুনের কথা অনেক পরিমাণে জাগিয়া উঠিল। কেহ বলিল—"সুবাজপুর হ'লো কি? এই সে দিন একটা খুন হ'ল, আবার এর মধ্যেই আর একটা খুন!" কেহ আবার বলিল—"এই দুই বেটাই যত নষ্টের জড়; সেই খুনে এই দুই বেটা প্রধান সাক্ষী ছিল। আবার এই খুনে দু বেটার এক বেটার খুন হ'ল, আর এক বেটা খুন করল।" সেই দিন অপরাহ্ণ-অনুমান পাঁচ ঘটিকার সময় আমি কুঁয়াজপুরের নিকটস্থ মাঠ দিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, কয়েক জন কৃষক নিড়ান বন্ধ করিয়া মণ্ডলাকারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কি গল্প করিতেছে। ধান কেনী গোছ ভাব করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম,—"ব্রাহ্মণ, তামাক খাইবার বড় ইচ্ছা, বাপু একবার কল্‌কেটা দাওত।"

হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত বাবুদের ধর্ম্মভাব যাহাই হউক নিম্ন শ্রেণীয় কৃষকগণ এখনও ব্রাহ্মণ দেখিলে ভক্তিভরে প্রণত না হইয়া থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল, তাড়াতাড়ি আর একটী নূতন কলিকা সাজিয়া আনিয়া দিল। বসিয়া বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলাম। আমাকে দেখিয়া তাহারা চুপ করিয়া রহিল। অবসর বুঝিয়া আমি খুনের কথা তুলিলাম;—বলিলাম "ভূতো বেটা কি বদমাস, সেই সে দিনে বুড় ব্রহ্মণকে ফাঁশালে, আবার কাল কিনা পাঁচুকে খুন করলে; কিন্তু এইবার তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

এই কথা শুনিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল; তন্মধ্যে একজন বলিল—"ঠাকুর ব্রহ্মহত্যা কি সহজ পাপ; হারামজাদা নিজে খুন ক'রে সেই বুড়ো বামুনকে ফাঁশালে! আহা! ঠাকুরের কোন দোষ ছিল না; এতদিন হয়ত তেনার ফাশি হয়ে গেছে; কিন্তু এইবার বাছাধন গেলেন।"

আর একজন সেইখান হইতে একখানি কোদাল তুলিয়া লইয়া সক্রোধে অঙ্গভঙ্গি করিয়া বলিল—"এই কোদালে বেটার মাথাটা আধখানা করে ফেলি।"

আমি বলিলাম "বাপু! হরি আছেন, তাহাকে কোদাল মারিতে হইবে না; তিনি ইহার বিচার করিবেন।"

এতদিনে আসল কথা পাঁইলাম। মনে মনে আনন্দ হইল; "তবে কি ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই নির্দ্দোষ? দেখা যাক্।"

শ্রীঅঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর যাব না।

(১)

"জয় হরি হর" "শঙ্করের জয়!"
"জয় ভোলানাথ!" "সদাশিব জয়!"
"দুর্গতি-নাশিনী দুর্গে তব জয়!"
"গণেশ কার্ত্তিক—তোমাদের জয়!"
বলিছে সকলে সদাই তথায়;
কেহ বলে—"নিত্য নিরঞ্জন জয়!"

(২)

নিদ্রিত মানবগণ যে নিশায়—
সে নিশায় জাগ্রত সাধক-নিচয়:
আসনে আসীন গাঢ় সাধনায়—
সাধক সাধিকা ব্রহ্ম-জ্যোতির্ম্ময়!
কুলকুণ্ডলিনী জ্যোতির ছটায়—
কোটী কোটী রবি মুখে শোভা পায়।

(৩)

দশ দিক আলো কিরণচ্ছটায়।
ত্রিনয়ন শোভে যোগের প্রভায়।
তৃতীয় লোচন হ'তে বাহিরায়—
কিরণের মালা মোহিয়া শোভায়।
সে জ্যোতিঃ চিনিতে যোগ-নেত্র চাই—
যোগীর মহিমা জানে মৃত্যুঞ্জয়!

(৪)

যোগী বিনা আর যোগীর হৃদয়,
কে জানিবে হায়—সদা প্রেমময়?
বিশ্ব-প্রেমে পূর্ণ পুরিত দয়ায়।
তাই এসেছি গো যোগীন্দ্র-আলয়।
যাবনা ফিরিয়া আর গো ধরায়,
শান্তিধামে থাকি হব শান্তিময়।

(৫)

যোগীন্দ্রের মনে থাকিব হেথায়,
মৃত্যুঞ্জয় মনে হব মৃত্যুঞ্জয়।
পুরিব সকল আদ্যাশক্তি মায়—
যাঁহাদের বরে জীব শিব হয়।
সাধিব প্রণব যোগে দেবতায়—
ব্রহ্মরূপ নিত্য শান্তির আলয়।

(৬)

সগুণে নির্গুণে পুরিব তাঁহায়,
সাকার হইতে যাব নিরাকার;
ফিরিবনা ভাই দুঃখের ধরায়,
নিরন্তর করে যথা হাহাকার!
মরিব ফিরিয়া যাইবে তথায়—
নির্ব্বাণে যাইয়া জুড়ার জ্বালায়।

(৭)

অথবা কৈলাসে হ'য়ে মৃত্যুঞ্জয়,
থাকিব সুখের দিন-অপেক্ষায়;
থাকিব এখানে, করি গো বিনয়
যত দিন হায় ভারত ঘুমায়।
জাগিলে ভারত যাইব ধরায়,
দল বল সহ প্রফুল্ল হিয়ায়।

(৮)

আজিকার মত হই গো বিদায়!
ভারতে যাইতে ব'লনা আমায়,
ভারত দেখিয়া তাপিত হৃদয়!
আর্য্যভূমি এবে চিতাভস্ম-ময়।
অধিকাংশ লোক বিভোর নিদ্রায়,
জীবন্ত যাহারা তারা (ও) মৃত-প্রায়।

(৯)

প্রেমের অভাবে সুখে শব-কায়!
শবের উপর দিয়া সবে যায়!
অনন্ত দাসত্বে জর্জ্জরিত-কায়!

মেচ্ছ যবনেতে দলিছে তাহায়!
এ দৃশ্যে পরাণ কাঁদে উত্তরায়!
সহেনা। সহেনা। হৃদি জ্বলে যায়।
(১০)
ভুলিয়া যাতনা রয়েছি হেথায়,
বার বার কেন ডাকিছ আমায়?
ভোলার আলয়ে স্মৃতির বিলয়,
স্মৃতি-লোপে হয় সুখের উদয়,
সুখে আছি আমি ক্ষতি কি তাহায়
যাও যাও যাও—যাবনা তথায়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

মতামত।

পুস্তক সম্বন্ধে

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ১ম ও ২য় সংখ্যা।—"পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্লোকের প্রসিদ্ধ টীকা, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত পয়ারের টীকা ও শ্রীমাখন লাল দাস ভাগবতভূষণ কৃত সুধা-সারকিণীনাম তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা-সম্বলিত।"—চন্দ্র ব্রাদার, ১৮ নং রাধাবাজারে প্রাপ্য।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণব-হিন্দুর আদরের সামগ্রী। ইহার নূতন পরিচয় কি দিব? সটীক খণ্ডশঃ এই পুস্তকের প্রচার করিয়া, প্রচারক মহাশয়গণ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন এই পুস্তক সম্পূর্ণ হইলে, এক উপাদেয় বস্তু হইবে—সন্দেহ নাই।

—০—

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেম ধর্ম্ম।—শ্রীযুক্ত চন্দ্রবিনোদ পালচৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ।০ আনা।

শ্রীচৈতন্য দেবের বিশ্বজনীন প্রেম ও ধর্ম্মের বিষয়, যখনই যেভাবে আলোচিত হইতে দেখি, তখনই প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। চন্দ্রবিনোদ বাবু সরল মধুর ভাষায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সেই প্রেম-ধর্ম্মের অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহার এই পুস্তিকায়, হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য প্রেমের অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইতে পারে। এরূপ পুস্তকের প্রচার করাতে আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। আরও ধন্যবাদ দিই যে,তিনি একজন জমীদার-সন্তান হইয়াও—কালোচিত বিষয়-ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া বঙ্গভাষায় ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সেবায় নিয়োজিত হইয়াছেন।

রঙ্গভূমি—সম্বন্ধে

ষ্টারথিয়েটার।—আগামী শনিবার ষ্টার থিয়েটারে, স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" অভিনীত হইবে। উক্ত রঙ্গালয়ের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস হইতে, বহু পরিশ্রমে, "চন্দ্রশেখর" নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। যেরূপ পরিচয় পাইলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল—ঐ নাটকের অভিনয় জন্য ইঁহারা বিস্তর আয়োজন ও উদ্যোগ করিয়াছেন; সময়োচিত দৃশ্য-পট, বেশভূষা, কিছুরই ত্রুটি করা হইতেছে না। অমৃত বাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শৃঙ্খলা-পারিপাট্যে 'চন্দ্রশেখর' যে বিশেষ প্রসংশার্হ হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

যুদ্ধ সংবাদ।—চীন ও জাপানের যুদ্ধ বন্ধ হইবার মিটিবার আশা নাই। দিন দিন উভয় পক্ষের আয়োজন, চেষ্টা ও উদ্যোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গত সপ্তাহে চীন-দেশীয় পাঁচ সহস্র কোরিয়া সৈন্যের সাহায্যে কোরিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও জাপানের উৎসাহ কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। এখন কি জাপান চীনের পিকিন নগর আক্রমণের উদ্যোগে আছে। এদিকে মিশনারিগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া চীনপ্রবাসী ব্যক্তিমাত্রেই প্রাণের আতঙ্কে ভীত হইয়াছেন। এ আতঙ্কের কারণও আছে, গত শনিবার এক ভয়ঙ্কর অত্যাচারের সংবাদ আসিয়াছে। একদল চীনটংকুইনের ফরাসীকলেক্টারের গৃহ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে,এবং তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে কোথায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সংবাদ আরো ভীষণ; রুষ-রণতরি সকল সসাজে কোরিয়া অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। জলযুদ্ধের এরূপ সকল রকম আয়োজন সঙ্গে লইয়া হঠাৎ রুষ কেন কোরিয়ার দিকে চলিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এখনও জানা যায় নাই। যেরূপ গতিক, তাহাতে সে কথা কি আর জানিতে বাকি থাকে? রুষ কিন্তু মুখে বলিতেছে—কেবল রণশিক্ষা অর্থাৎ রাশিবার জন্যই এই সমরি-প্রেরণ। রুষের কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু রুষ যদি চীনের সহিত মিলিত হয়, তবে এ যুদ্ধের পরিণাম যে কি দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। ফরাসী ও জর্ম্মাণও যে রুষের তলে তলে আছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাকি কেবল ইংরাজ; ইংরাজকে তাহা হইলে বাধ্য হইয়া জাপানের সহিত যোগ দিতে হইবে। আমরা ইহারই মধ্যে সাতপাঁচ ভাবিয়া আকুল হইয়াছি। এ যুদ্ধের পরিণাম কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

***

রাজ্ঞীর ঘোষণাপত্র। আমাদের মহারাণী এই চীন ও জাপানের যুদ্ধ সম্বন্ধে এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞা এই যে, তাঁহার স্বদেশের কি বিদেশের কোন প্রজা যেন কোন রকমে এ যুদ্ধের সংস্রবে না থাকেন। এমন কি উভয় পক্ষের যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় কোন বিভাগে চাকুরী পর্য্যন্ত যেন কেহ গ্রহণ না করেন। এ সংবাদ শুভ বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা হইলেই বাঁচি।

***

অগ্নিকাণ্ড। গত মঙ্গলবার বৈকালে মুচি-খোলায় এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। গার্ডেনরিচের কলের মজুরগণ যে বস্তীতে বাস করে, সেই বস্তীর দক্ষিণাংশ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। দুই জন স্ত্রীলোক এবং অনেক-গুলি গৃহপালিত পশু অগ্নিদেবের উদরসাৎ হইয়াছে। গরীব মজুরদিগের উপর এমন অসময়ে অগ্নিদেবের এ প্রকোপ কেন?

***

বুদ্ধগয়া। গয়ায় বুদ্ধদেবের যে মন্দির আছে, সেই মন্দির আজ পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া হিন্দু পুরোহিতদিগের তত্ত্বাবধানেই রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এতদিন পরে মহাবোধী সমাজের তাহা বড় অসহ্য হইয়াছে;

তাঁহাদের এখন বিশেষ চেষ্টা,—যাহাতে বৌদ্ধদিগের হস্তে এই মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়। কেবল বৌদ্ধগণ নয়, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী স্যার এডউইন আরনল্ড ইহার প্রধান উদ্যোগী। আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এই মন্দির সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই—"বুদ্ধদেবের মন্দির যখন পাঁচ শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া হিন্দু সন্ন্যাসীর অধীনে রহিয়াছে, আর যখন বৌদ্ধদিগকে মন্দিরের কার্য্য করিতে হিন্দুগণ কোন বাধা দেয় নাই, তখন মহাবোধী সমাজের হস্তে এই মন্দির অর্পণ করিবার বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কারণ দেখিতেছেন না।" গবর্ণমেণ্টের এই যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য পাঠ করিয়া আমরা আমাদের বর্ত্তমান রাজেশ্বরকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। কার্য্য সুখ্যাতির উপযুক্ত হইলে আমরাও যে সুখ্যাতি করিতে জানি, একথা যেন গবর্ণমেণ্টের স্মরণ থাকে।

কাবুল সংবাদ। পাইন সাহেব আমিরকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য এখনও উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া আছেন। আমীর কিন্তু এখনও কোন স্পষ্ট কথা বলেন নাই; তবে কার্য্যোদ্ধারের আশার এখন বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় নাই। বেতোবোগী বেচারীকে কি এ যাত্রা অব্যাহতি দিলে চলে না?

মর্ম্মান্ত প্রদেশ। এদিকে কিন্তু সীমা-কমিসনের কার্য্য অপ্রান্ত চলিতেছে। বেলুচিস্থান ও আফ্‌গানিস্থানের সীমা শীঘ্রই নির্দ্দিষ্ট হইবে। বৃটীশ সিংহের এ সকল মনে মনে 'লক্ষাভাগ' এখন রুষ-ভল্লুক মানিলেই আমরা রক্ষা পাই।

বিচার-বিভ্রাট। মফঃস্বলের ফৌজদারীবিচারের আপিল কলিকাতা হাইকোর্টে হইয়া থাকে। এবার উপর্য্যুপরি কয়েকটি মোকর্দ্দমার আপিলের ফল দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি,১ম। এসেসরগণের মতের বিরুদ্ধে সেসন-জজের বিচারে রামচন্দ্র হাওলদারের ফাঁসি হুকুম হইয়াছিল, এখন হাইকোর্টে আপিলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হইয়াছে। ২য়। আলিপুরের সেসন-জজ মাতঙ্গিনী দাসীর যে ফাঁসির আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সে ফাঁসিও মকুব হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হইয়াছে। ৩য় গয়ার সেসন জজের চারিটী আশামীকে ফাঁসী করার দরুণ দীর্ঘকালের জন্য মেয়াদ দিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই নির্দ্দোষ হইয়া আপীলে খালাস পাইয়াছে। ৪র্থ, খুলনার সেসন-জজ বাহাদুর যে খুনী মোকর্দ্দমার বিচারে এক জনকে ফাঁসীর আর অন্য দুইজনকে যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আপীলে সকল আসামীই অব্যাহতি পাইয়াছে। ৫ম। আরও একটী মোকদ্দমায় এইরূপ আসামী প্রাণদণ্ডে পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা পাইয়াছে। এখন এই হাইকোর্টের পুনর্ব্বিচারে কতগুলি লোকের জীবন রক্ষা ও কত নির্দ্দোষ ব্যক্তি অব্যাহতি পাইল দেখিলেন? একই আইনে এরূপ জীবন্ত বিচার-বিভ্রাট ঘটে কেন? ইহা কি মফঃস্বলের জলবায়ুর গুণ—না ইহার ভিতর অন্য কোন গূঢ় কারণ লুক্কায়িত আছে? অন্য কারণ যাহাই থাকুক, হাইকোর্ট কেন যে উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারীর চক্ষুশূল, এইবার তাহা বুঝিতে পারা গেল।

কলিকা... লিটল ... জিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান।

৪র্থ বর্ষ } ২৯এ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। { বিংশ সংখ্যা।

হিন্দু সমাজ।

তেজোবীর্য্যাপহারী দুরন্ত কলির দারুণ ছায়া প্রাচীন আর্য্য সমাজের বিরাট গাত্রে ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিলে একদা গোতমাদি ঋষিগণ পুরাবৃত্তবিৎ সূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "সাধো! আমাদের উপায় কি?" তখন ভারতীয় আর্য্য সমাজে কলির অবশ্যম্ভাবী অনর্থ সকল অল্পে অল্পে প্রবেশ করিতেছিল,—ধর্ম্মের ক্রমশঃ ক্ষয় এবং অধর্ম্ম ও অপধর্ম্মনিচয় অদৃশ্যভাবে বৃদ্ধিশীল হইতেছিল, জীবন-সংগ্রামের কোলাহলে, তর্কে অবিরত পূর্ণসংঘর্ষে—ভণ্ডতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি কদর্য্য কুপ্রবৃত্তি নিচয় অল্পে অল্পে প্রশ্রয় পাইতেছিল, তাই সেই ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ ভারতের ভয়াবহ ভাবী পরিণাম গণিয়া বিভ্রান্তচিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সাধো! আমাদের উপায় কি?" আজি সেই দুর্জ্জয় কলির পূর্ণ প্রতাপ ভারতে প্রসৃত, আজি সেই লীয়মান ধর্ম্মজ্যোতিঃ মর্ত্যের অন্ধকারে নিমগ্ন হইবার উপক্রম; আজি সেই ভীষণ জীবন-সংগ্রাম শতগুণে ভীষণতর হইয়া হিন্দুর বলবুদ্ধি সমূলে উচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত। কালের কুটিল মাহাত্ম্যে গৌরবদীপিত মধ্যাহ্নে আজি ঘোরা তামসী নিশীথিনীর নৈরাশ্যপূর্ণ অঙ্কে নিলীন হইয়া পড়িয়াছে; সেইজন্য আমরা শতকণ্ঠ একত্রে মিলাইয়া সহস্র হতাশ হৃদয় এক সূত্রে বাঁধিয়া,—লক্ষ লক্ষ কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছি "সাধো! আমাদের উপায় কি?" কে আমাদের এ কঠোর প্রশ্নের উত্তর দিবে? কোন মহাপুরুষ আজি সেই পুরাণতত্ত্বজ্ঞ সূতের স্থান অধিকার করিবে? চতুর্দ্দিকে মহাশশ্মান, স্তূপীকৃত চিতাভস্মে সর্ব্বস্থল মহাচ্ছন্ন; ভগ্ন, পরশুরাম, বশিষ্ঠ, পরাশর, ধ্রুভৃতি মহর্ষিগণ কালনদীর বিশাল সৈকতে চিতাশয্যায় অনন্ত নিদ্রায় শয়ান; অর্দ্ধ নিদ্রিত, অর্দ্ধ জাগ্রৎ,—যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে ভ্রাম্যমান, শত শত নরকঙ্কাল, লক্ষ্যভ্রষ্ট ও উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে; এ

বৈষম্য, বিশৃঙ্খলার অনন্ত আবেগময় মুহূর্ত্তে আজি কে আমাদিগকে বলিয়া দিবে "আমাদিগের উপায় কি?" আমরা সব দেখিতেছি, সব শুনিতেছি, দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিয়াছি; কিছুই বুঝিতেছি না; দুঃখের বিষয় বুঝিবার চেষ্টাও করিতেছি না; অথবা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না! তবে কে আমাদিগকে বুঝাইবে? তবে কে আমাদিগকে বলিয়া দিবে "আমাদিগের উপায় কি?" আমাদিগের দারুণ দুর্ভাগ্য তাই যাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা উপহসিত হইতেছেন; যাঁহারা কথঞ্চিৎ উপায় দেখাইতে অগ্রসর, তাঁহারা পুরস্কারের পরিবর্ত্তে তিরস্কার পাইতেছেন, অনুরাগের বিনিময়ে বিরাগের বিষানলে দগ্ধ হইতেছেন।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাচীন খাস্ত্রকারগণ অদ্ভুত ভবিষ্যদ্দর্শন-বলে আমাদের এই বর্ত্তমান দুরবস্থার ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন:—কলির প্রভাবে মানুষের নীচদৃষ্টি, অল্পভাগ্য ও ধনহীনতা জন্মিবে; নগর সকল দস্যুদলে পরিপূর্ণ এবং পাষণ্ডগণে কলঙ্কিত হইবে; রাজারা প্রজার শোণিত শোষণ করিতে থাকিবে; শূদ্রেরা তপোবেশধারী হইয়া প্রতিগ্রাহী হইবে, ধর্ম্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উত্তম ব্যক্তির আসনে বসিয়া ধর্ম্মকথা বলিতে থাকিবে। ব্রাহ্মণের উদর চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত থাকিবে। এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য যে সকল সামাজিক বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন, আজি আমরা তাহার সমুদায় প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আজি ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম শর্ম্মণ্য পণ্ডিতগণের করায়ত্ত;—হিন্দু তাহা বুঝে না;—বুঝিতে চেষ্টাও করেনা; ব্রাহ্মণ এখন শূদ্রের আসনে আসীন, শূদ্র ব্রাহ্মণের আসন অধিকার করিতে উদ্যত,—ধর্ম্মধ্বজিতা এখন সাদ্যন্ত নিদর্শন, আড়ম্বর সর্ব্বজ্ঞতার পরিচায়ক, ধর্ম্ম কর্ম্ম ধনের সুবর্ণ বর্ম্মে শোভমান, বিবাহ পণ দ্রব্যে পরিণত,—পুত্র-বিক্রয় এখন সকল বর্ণেরই অর্থাগমের প্রধান উপায়;—শ্রাদ্ধ তিথিতত্ত্ব, মলমাস-তত্ত্ব এখন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত। তৃষ্ণার্ত্ত পিতৃপুরুষগণের বিশুষ্ক ওষ্ঠাধর হইতে অনর্গল গণ্ডূষ কাড়িয়া লইয়া বারুণীর বরানলে ঢালিয়া দিতেছে, শত শত পুতহব্য হুতাশনের জ্বালা হইতে উদ্ধৃত হইয়া "সাপারে" হত হইতেছে। কেন এমন হইল?—বলিতে পার হিন্দুধর্ম্মের স্তরে স্তরে এই বিষানল কে ঢালিয়া দিল? কে হিন্দুর সম্মুখে এই সর্ব্বনাশের দ্বার উন্মুক্ত করিল? কোন পিশাচ হিন্দুর বলবুদ্ধি হরণ করিয়া লইল? যে হিন্দু শাস্ত্র-কলাপ আজিও জগতে অতুলনীয়, যাহার অতীত বীরত্ব ও মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত আজিও জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে—আজি তাহার এ দুর্দ্দশা কেন?

সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, সমাজ একদিনে গঠিত হয় না, একদিনে পুষ্টিলাভ করিতে পারে না; বৃক্ষ অঙ্কুর হইতে যেমন ক্রমে ক্রমে পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়, সমাজ সেইরূপ ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। মৃত্তিকা, জল বায়ু প্রভৃতি সংঘের অবস্থা যেমন বৃক্ষের পোষণে সহায়তা বা প্রতিকূলতা করে, দেশকাল-পাত্রাদিও সেইরূপ মানব সমাজের উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধনে আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্য করিয়া থাকে। সেই সকল অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা নিচয়ের দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষের ফলই সমাজ ও লোকচরিত্র। আমাদের হিন্দু সমাজ

...গঠিত হয় নাই, একদিনে পরিপুষ্ট ...নাই,—একদিনেও এই বর্ত্তমান দুরবস্থায় ...পতিত হয় নাই। ইহার অভ্যুদয় ও অধঃ...নের মধ্যে বহুযুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। ...য মহাপুরুষ সেই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ...র্ভূত ও অন্তর্হিত হইয়াছেন; তাঁহারা ...সমস্ত সংবেষ্টক অবস্থানিচয়ের অনুকূল ...প্রতিকূল অবস্থায় স্ব স্ব জীবন গঠিত ...করিয়াও আমরা কখঞ্চিৎ শান্তি ...। তাঁহাদিগের সেই অতুলনীয় অতি...দ্ধিক চরিত্রের সহিত আমাদের হীন ...নের তুলনা করিলে কিছুতেই শোক ...রণ করিতে পারি না। কিন্তু আর শোকের ...রী গাহিয়া ফল কি? দগ্ধমরুশ্মশান ...য় হিন্দু সমাজের ভস্মরাশির উপর আর ...অশ্রুবিন্দু ফেলিয়া কি হইবে? যে জাতি ...ধি সহস্র বৎসর ধরিয়া পরপীড়নে কাঁদি...ছে, তাহার ক্রন্দনের মাত্রা বাড়াইয়া ফল ...? তাহাতে অধঃপতন অধিকতর দারুণ, ...বিস্তর শোকাবহ হইবে বৈ নয়;—তবে ...য়া কাজ নাই। এখন এই ক্রন্দন যাহাতে ...কমে যায়, যাহাতে অশ্রুবারি মুছিতে পারা ...য়, তাহাই করিতে চেষ্টা করা উচিত। ...পতঃ তাহা বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইলে, ...ষ মাত্রেরই তাহাতে বিরত হওয়া উচিত, ...বিস্তর শোকাবহ হইবে বৈ নয়;—তবে ...য়া কাজ নাই। এখন এই ক্রন্দন যাহাতে ...কমে যায়, যাহাতে অশ্রুবারি মুছিতে পারা ...য়, তাহাই করিতে চেষ্টা করা উচিত। ...পতঃ তাহা বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইলে, ...ষ মাত্রেরই তাহাতে বিরত হওয়া উচিত, ...র কিন্তু এই ক্রন্দন দূর করিতে হইবে। ...র কাঁদিয়া অঙ্গে তাহাই দেখিতে হইবে। ...র নির্ণয় না হইলে, তাহার নিদান জানা ...লে, তাহার চিকিৎসা কিরূপে হইতে ...? আজি হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র যে ভ্রান্তি, ...ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে, তন্ন তন্ন করিয়া তাহার আদ্যন্ত পরীক্ষা করিতে হইবে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার সমস্ত কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে, তবে তাহার প্রতিকার করিতে পারা যাইবে; নতুবা সকলই বিফল হইবে।

যে সকল কারণ পরম্পরার সহযোগে আমাদিগের সমাজের এই দুরবস্থা হইয়াছে, তৎসমুদয়কেই খুঁজিয়া বাহির করিয়া সংহার করাই একমাত্র চিকিৎসা। সেই সকল কারণ কালে যাহাতে আর না উদিত হইতে পায়, তাহাই চিকিৎসার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং যে সকল কারণে আমাদিগের সামাজিক অধঃপতন হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে তাহারই আলোচনা করিব। যদি আমাদের বন্ধুগণ আর উদাসীন না থাকিয়া আমাদিগের সহিত যোগ দেন, তাহা হইলে সকল বিষয়েই সুবিধা হইতে পারে। যদি সকলে কায়মনোবাক্যে আপনাদের দুরবস্থামোচনের চেষ্টা করে, তাহা হইলে চেষ্টা অল্পদিনের মধ্যেই ফলবতী হয়। হিন্দু! আর কতকাল উদাসীন থাকিবে? যাতনায় কবে তোমার যাতনা-বোধ হইবে? কবে তুমি সে যাতনার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিবে? বহুদিন হইতে তোমার সমাজ অধঃপতিত হইয়াছে,—সে অধঃপতন তোমার রাজনৈতিক অধঃপতনের বহুপূর্ব্বে ঘটিয়াছে; আজি দুর্ভাগ্যের প্রগাঢ়তায় তাহার মাত্রা বাড়িয়াছে। ইতিহাস খুলিয়া দেখ—তোমার সামাজিক অধঃপতন কবে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাইবে। পৌরাণিকগণ বলেন যে, কলির সঙ্গে সঙ্গেই তোমার সামাজিক অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের সেই মন্তব্যবাক্য আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। যেদিন কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানভূমে আর্য্য-বীরত্বের সমাধি হইল, তাহার পর যে দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া

গেলেন, সেইদিন—সেই দুর্দ্দিন হইতেই হিন্দুর দুর্দ্দশার সূচনা। সেই শোকাবহ দুর্দ্দিনে যে যাতনার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার আর নিবৃত্তি হইল না। হিন্দুর যে গৌরব-রবি ভারতের শৌর্য্য বীর্য্য ও গৌরব গরিমা হরণ করিয়া ক্রুরপাণ্ডবের বিশাল শোণিত-হ্রদে নিমগ্ন হইয়াছিল, আর তিনি উঠিলেন না। পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের সহিত হিন্দুর আদ্যাশক্তি ভারত ত্যাগ করিয়া হিমালয়ে ফিরিয়া গেলেন। যে শক্তির সর্ব্বতোমুখিন তেজোবহ্নির সম্মুখে পুরুদের সলিলরাশি উদ্বেল হইয়া দৈত্য ও দানবদিগকে ভাসাইয়া দিয়াছিল, পুণ্যতোয়া সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর বেদগান-প্রতিধ্বনিত সৈকত ভূমে একদা যাহা ব্রাহ্মীশ্রীরূপে যিনি বিরাজ করিতেন, বশিষ্ঠের স্নেহদেহে আবির্ভূত হইয়া যিনি দৃপ্ত ক্ষত্রিয় বীর বিশ্বামিত্রের জ্ঞানানলে ঊর্দ্ধীপিত করিয়া দিলেন, ভার্গবের শাণিত কুঠারে, সগর রাজের ঔর্ব্বাগ্নিবাণে, শ্রীরামের শৈবশরাসনে আশ্রয় হইয়া যিনি ভারতের শত্রুকুল সংহার করিয়া দেশরক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি বহুদিন ভারত ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সেই মহাশক্তি হিন্দু সমাজকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। আবার তাঁহাকে ডাকিতে হইবে;—কায়মনোবাক্যে মায়ের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া অকপটভাবে ডাকিতে হইবে, তবে মা আসিবেন। মা আসিলে হৃদয়ে বল পাইব, সামাজিক দুরবস্থা মোচন করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও সাহস পাইব; নতুবা হিন্দু সমাজে এই উৎশৃঙ্খল ভাব দূর হইবে না;—যাতনার নিবৃত্তি হইবে না; হিন্দু আবার আত্মহারা ফিরিয়া পাইবে না। তাই বলি একবার তাঁহাকে অকপটভাবে প্রাণ ভরিয়া ডাক—সন্তানের দুঃখ দেখিয়া মা কখন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুদ্ধাবতার।

কুমারিল ভট্ট।

কলির দুই সহস্র বৎসর অতীত হইলে ভারতে বুদ্ধাবতার হয়, এ বিষয়ের প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে প্রকটিত করিয়াছি। বুদ্ধাবতারের পরে ন্যূনাধিক ১৫০০ পোনের শত বৎসর ব্যাপিয়া ভারতে ক্রমশই বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছে। ভারতে যে সময়ে শূদ্র রাজগণের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইতেছিল, সেই সময়েই বৌদ্ধধর্ম্ম অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং সেই সময়েই তাহা ভারতবর্ষ-বহির্ভূত নানাদিগ্ দেশে ও দ্বীপ দ্বীপান্তরে প্রসারণশীল হইয়াছিল। তৎকালে ভারতের শূদ্ররাজগণের সভাতে ব্রাহ্মণ মন্ত্রিদিগের সহিত বৌদ্ধমন্ত্রিগণও রাজকার্য্যে পর্য্যালোচনা করিতেন। এই সময়ে বৌদ্ধ প্রচারকগণ পরমোৎসাহে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ ও "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" মতের প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মনোহর উপদেশ শ্রবণে ও উপদেষ্টৃগণের ত্রিন্দ্রিয়সংযতাদি অসাধারণ গুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতাপে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ এক প্রকার বিলোপ প্রায় প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থাকালে কুমারিলভট্ট (*) নামে একজন অসাধারণ মীমাংসা পণ্ডিত আর্য্যাবর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতাপে বৈদিক ক্রিয়া কলাপের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া বৈদিক মতের অনুকূলে বৌদ্ধাচার্য্যদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু বৌদ্ধতর্কশাস্ত্রে ইহাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকাতে পরাজিত হইয়া পরিশেষে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বৌদ্ধমতে আশানুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার নিমিত্ত তাৎকালিক প্রধান বৌদ্ধাচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। একদিন কুমারিল ভট্ট, বৌদ্ধ সভায় বৌদ্ধাচার্য্যের সমীপে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে একজন প্রতিভাসম্পন্ন বৌদ্ধ পণ্ডিত কথাপ্রসঙ্গে বৈদিক মতের প্রতি নানা প্রকার দোষারোপ করিতেছিলেন। তৎশ্রবণে কুমারিল ভট্ট অতিশয় ব্যথিত হইলেন:—সহসা তাঁহার নয়নদ্বয় প্রাবিত করিয়া অশ্রুপাত হইল। পার্শ্বস্থ বৌদ্ধগণ ভট্টপাদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া জানিতে পারিল এবং তাঁহার সেই অপরাধের দণ্ড প্রদানার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহাকে অত্যুচ্চ প্রাসাদ-শিখর হইতে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ করিল। জানিতে পারিয়া কুমারিল ভট্ট কহিলেন "যদি বেদ সত্য হয়, পতনে নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে না।" অনন্তর বৌদ্ধগণ, ভট্টপাদকে প্রাসাদ-শিখর হইতে ফেলিয়া দিল; কিন্তু ইহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল না। কেবল একটি চক্ষু নষ্ট হইল। (*)

অতঃপর কুমারিল ভট্ট বেদমার্গ সংরক্ষণার্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরাজয় নিমিত্ত মলয়বরে গমন করিলেন এবং তুমুল সংগ্রামে তাৎকালিক জৈন মহাপণ্ডিত শীঘ্র গুরুকে পরাজিত করিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন। বৌদ্ধদিগের এই পরাজয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের অপ্রতিহত উন্নতির পথ রুদ্ধ এবং বেদমার্গ অনেকাংশে উন্মুক্ত হইল। কুমারিলের অব্যবহিত পরেই ভগবান শঙ্করাচার্য্যের বৌদ্ধ বিজয়। শঙ্করাচার্য্য দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের যে ক্ষতি হইয়াছে এ পর্য্যন্ত তাহার আর পরিপূরণ হয় নাই। ক্ষতির পূরণ দূরে থাকুক বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পত্তি নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে মাত্রবার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে; একমাত্র জৈন সম্প্রদায়ই ভারতে বুদ্ধদেবের অহিংসা পরমধর্ম্মের যথাযথরূপে পালন করিতেছেন।

মহাত্মা কুমারিল ভট্ট, উল্লিখিত প্রকারে স্বীয় গুরু জৈনাচার্য্যকে বিচারে পরাভূত করার পর আপনাকে গুরু-হত্যাপাপে লিপ্ত বলিয়া

(*) খৃষ্টশকের পঞ্চম শতাব্দীতে কুমারিল বিদ্যমান ছিলেন এইমাত্র অবগত হওয়া যায়। কুমারিলের শেষাবস্থায় ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়। কুমারিলকে কেহ কেহ কুমারলীল নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইনি "তুতাত" "ভট্ট" ও "ভট্টপাদ" নামেও বিখ্যাত। ইনি জৈমিনি সূত্রের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার।

(*) আনন্দ গিরিকৃত শঙ্কর-বিজয় ও মাধবাচার্য্য কৃত সংক্ষেপ শঙ্করবিজয় গ্রন্থের ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্থির করিলেন। বাস্তবিক সাক্ষাৎ বধ না করিলেও তিনি যে গুরুর তেজোনাশ করিয়াছেন, তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং মীমাংসকপ্রবর ভট্টপাদ গুরুবধ-পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত তুষানলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। শঙ্কর-বিজয়ের মতে পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগে এই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ভট্টপাদের এই শোচনীয় প্রায়শ্চিত্তে তাৎকালিক বৈদ্বিক সমাজ শোক দুঃখে মুহ্যমান হইয়াছিলেন। ধর্ম্মবিশ্বাসের আশ্চর্য্য প্রভাবে ভট্টপাদ তুষানলের ন্যায় কষ্টকর মৃত্যুকেও অবলীলাক্রমে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক এই সময়ে ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্ব-রচিত বেদান্ত-দর্শনের শারীরক ভাষ্য ভট্টপাদকে দেখাইবার নিমিত্ত প্রয়াগধামে গমন করিয়া তাঁহাকে তুষানলমধ্যে অবস্থিত দেখিতে পান। ভট্টপাদের প্রভাকরাদি প্রিয় শিষ্যগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে তৎকালে তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য তদবস্থ কুমারিল ভট্টকে যথোচিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন "আমি আপনাকে আমার ভাষ্য দেখাইতেছি আপনি ইহার একটি বার্ত্তিক প্রস্তুত করুন" ভট্টপাদ উত্তর করিলেন, "আমি অনেক দিন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি (*) তুমি বিশ্বরূপ মণ্ডন মিশ্রের (†) নিকটে গমন কর; তিনি তোমার ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করিয়া দিবেন।"

সংক্ষেপ শঙ্কর জয়ের ৮ম অধ্যায়ে মাধবাচার্য্য কুমারিল ভট্ট সম্বন্ধে যে প্রশংসাবাদ লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা;—

গিরেরবপ্লুত্য গতিং সতাং যঃ
প্রামাণ্যমাম্নায় গিরামবাসীৎ।
যস্য প্রসাদাৎ ত্রিদিবৌকসোপি
প্রপেদিরে প্রাক্তন-যজ্ঞ-ভাগান্।
অয়ংস্থধীতাখিল-বেদমন্ত্রঃ
কুলঙ্কবালোড়িত-সর্ব্বতন্ত্রঃ।
নিতান্ত-দূরীকৃত দুষ্টতন্ত্র
ত্রৈলোক্য-বিভ্রাম্যিত-কীর্ত্তিরস্তাঃ॥

অর্থ;—সাধুগণের গতিস্বরূপ যিনি গিরি হইতে অবতরণ (*) পূর্ব্বক বেদবচন সকলের প্রামাণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু যাঁহার প্রসাদে দেবতারাও প্রাক্তন যজ্ঞভাগ লাভে সমর্থ হইয়াছেন, ত্রৈলোক্য-বিভ্রাম্যিত-কীর্ত্তি যজ্ঞ স্বরূপ তিনি (কুমারিল) সমুদয় শাস্ত্রালোড়ন পূর্ব্বক বেদ বিরুদ্ধ শাস্ত্রকে (বৌদ্ধমতকে) দূরীকৃত করিয়াছেন।

বাস্তবিক ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব-কালে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে কুমারিল ভট্টই বৌদ্ধ মতের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম-প্রচারে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন। কুমারিল কিরূপে বৌদ্ধ মতের নিরসন করেন তৎকৃত তন্ত্র বার্ত্তিক পাঠে তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভট্টপাদ কর্ত্তৃক বৌদ্ধমত প্রতিহত হইলে তাঁহার জীবদ্দশাতেই অনেক বৌদ্ধ বেদমার্গ অবলম্বন করেন, বলা বাহুল্য যে, এ দৃশ্য ভট্টপাদের অনির্ব্বচনীয় আনন্দজনক হইয়াছিল। যে নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ-পণ, তাহার সাক্ষাদ্দর্শনে তিনি মৃত্যুকেও অমৃত বোধ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক বৌদ্ধ-বিজয়ই ভট্টপাদের অমরত্ব-লাভের প্রধান কারণ। শ্রীগোবিন্দ মোহন রায়।

(*) এই পঞ্চত্বের তাৎপর্য্যার্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে বিরত হওয়া।

(†) মণ্ডনমিশ্র কুমারিল ভট্টের ভগিনীপতি।

(*) কুমারিলভট্ট অনেক দিন দাক্ষিণাত্যে বাস করেন; বোধ হয় তত্তত্য কোন পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশে ইহাঁর আশ্রম-পদ ছিল।

ভালবাসা।

মধুমাখা প্রীতিভরা ওরে ভালবাসা,
দুকুমার দেহ তোর কম্পমধ্যে কেন ভোর
কটাক্ষে ছুটতে থাকে দারুণ নিরাশা।
কেন হেন বিচঞ্চল তুই ভালবাসা?
একটু বিরাগ আসি ছুঁইলে নয়ন,
যখনি মনেতে হয় তুই বুঝি তুই নয়,
মুখখানি যেই তোর করি দরশন
সন্দেহের ছায়া এসে পড়ে অকারণ!
মদনেরে ভস্ম করে যদি,
সেই ছাই পারি মাখিবারে,
সেই দিন, সেই দিন তবে
যোগি-বেশে তোমার দুয়ারে,
ভালবাসা আসিব আবার
এই শেষ নতুবা আমার।
সেই দিন পুত হ'য়ে আসিব যখন
অপূর্ণ পরশ সুখ, কদর্য্য অতন্দ্র মুখ
হৃদয়েরে পারিবেনা করিতে বেষ্টন,
প্রাণে প্রাণে সেই দিন হবে আলিঙ্গন।
সুকুমার কুসুম-শরীর,
কামময় পাপ আলিঙ্গনে,
মত্ত হয়ে স্পর্শ করে যেই
পাপতার বাখানি কেমনে?
তোমারে পঙ্কিল করে যেই,
পাপী কেহ নাহি তার মত,
আত্মজয়ী হ'য়েছে যেজন,
কাম তৃষা করিয়াছে হত,
স্পর্শ করি তোমার অধর,
হয় শুদ্ধ-সেজন অমর।
বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ, অতীত সমান,
হবে তুমি দীর্ঘকায়, অনাদি অনন্ত প্রায়,
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা-উল্কাময় প্রাণ
তোমারি সঙ্গেতে থাকি পাবে পরিত্রাণ।
দীর্ঘকায় কালের সমান,
ভালবাসা, অনম লভিয়া,
না গিয়ছে যে পথে সময়,
সেই পথে যাইবে ছুটিয়া।
তোর তরে ওরে ভালবাসা,
অনন্তের বাড়িবে শরীর
তোর ওই নূতন গগনে
ফুটিবেক নূতন মিহির।
মুখ তোর চাঁদের সমান,
দাঁত গুলি নব কুন্দ-কলি,
চোখ দুটি নীলিমায় ভরা,
কথা গুলি পাখির কাকলী,
চরণটি উষার মতন,
চলনে চরণ-পদ্ম-ফুল,
হেঁসে করে লাবণ্য বিস্তার;
মন ভৃঙ্গ সদাই আকুল।
দেবতার মত যার সুন্দর হৃদয়,
সে হৃদয়ই যেন তোর, ভাবে হ'য়ে থাকে তোর
সেই যেন সঙ্গে তোর, করেরে প্রণয়,
তার মত সখা তুই পাবিনা কোথায়।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

মুক্তি।

অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি। নাস্তিকেরা দেহান্তে মুক্তি হয় একথা স্বীকার করেন না। নাস্তিক মতে অঙ্গসালিঙ্গন-জনিত সুখাদিই পরম পুরুষার্থ। যে মতে দেহাতিরিক্ত আত্মার পৃথক সত্তা স্বীকৃত হয় নাই, সে মতে আর কাহার মুক্তি হইবে?

আস্তিক মাত্রেই মুক্তি স্বীকার করেন। আস্তিক মতে "জ্ঞানান্মুক্তি"—জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। কেহ কেহ বলেন যখন ঈশ্বর জ্ঞানময় বা জ্ঞানস্বরূপ তখন, জ্ঞান হইতে মুক্তি না বলিয়া জ্ঞানই মুক্তি বলা উচিত। জ্ঞানের স্বরূপ লইয়াই মহা বিবাদ, সেইজন্য এস্থলে আমরা জ্ঞানের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি।

জ্ঞান দুই প্রকার, সাধারণ জ্ঞান ও পরম জ্ঞান। ইন্দ্রিয় জন্য যে বিষয়গোচর জ্ঞান, তাহাই সাধারণ জ্ঞান, আর আচার্য্যোপদেশ এবং উপাসনা জাত যে জ্ঞান তাহাই পরম জ্ঞান। বিষয়গোচর জ্ঞান সমস্ত প্রাণীতেই আছে এবং জাতীয় প্রয়োজনানুসারে তাহা সকলের পক্ষেই সমান। মনুষ্যের বিষয়গোচর জ্ঞান পশুপক্ষীতে নাই এবং পশু পক্ষী বা সামান্য একটী কীটের জ্ঞানও মনুষ্যে নাই। সুতরাং বিষয়গোচর জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানী "দ বাচ্য হয় না।" যথা—

"জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে,
বিষয়স্য মহাভাগ জাতিভৈচব পৃথক্ পৃথক্

* * *

যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাং
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ॥

(মার্কণ্ডেয় পুরাণং)

সমস্ত জীবেরই বিষয়গোচর (আহারাদি বিষয়ে) জ্ঞান আছে, এবং সেই বিষয় গোচর জ্ঞান জাতি নির্ব্বিশেষে পৃথক পৃথক্। মনুষ্যেরা জ্ঞানী সত্য, কিন্তু কেবল মনুষ্যই যে জ্ঞানী তাহা নহে, কেননা পশু পক্ষী মৃগাদিরও সেইরূপ জীবসাধারণ জ্ঞান আছে। এইরূপ মনুষ্যের, যে জ্ঞান আছে তাহা পশু পক্ষীদেরও আছে এবং পশু পক্ষীদের যে জ্ঞান আছে, তাহা মনুষ্যদেরও আছে। সুতরাং জীবমাত্রেই (সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে) তুল্যরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট। কিন্তু ঐ জ্ঞান দ্বারা কেহই জ্ঞানীপদবাচ্য হইতে পারে না।

অতএব "জ্ঞানান্মুক্তি" এ জ্ঞান হইতে নহে। যে জ্ঞান লাভের যোগ্য বলিয়া জীব জগতে মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠতা; জ্ঞানান্মুক্তি সেই পরম জ্ঞান হইতে। এক্ষণ দেখা উচিত জ্ঞানের স্বরূপ কি? জ্ঞানের স্বরূপ এক এক মতে এক এক প্রকার। সুতরাং এক কথাতে ইহার স্বরূপ নির্দ্দেশ হইবে না!

পাশ্চাত্য দর্শন জ্ঞান সম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন তাহাও একরূপ নহে। তাহাও মতভেদে পৃথক পৃথক্। কেহ বলেন জীবগণ জ্ঞান বা আত্মা লইয়া জগতে প্রবেশ করে না। প্রথমে কেবল অঙ্গসঞ্চালনের শক্তি মাত্র বিদ্যমান থাকে। সেই অঙ্গ-চালনা

ক্রমশঃ পদার্থ জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়-শক্তির বিকাশ হয়। ইন্দ্রিয়গণের ভূয়োদর্শন দ্বারাই ক্রমঃ জ্ঞান-বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই মতে মন এক খানি "সাদা কাগজ" ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা তাহাতে ক্রমে জ্ঞানের ছবি অঙ্কিত হয়।

আবার কেহ বলেন; জ্ঞান জীবের সহজাত। প্রথমতঃ তাহা অপ্রষ্ট থাকে এবং ক্রমে ইন্দ্রিয়-শক্তি দ্বারা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এইমতে মন একখানি ঐন্দ্রজালিক কাগজ যাহার বস্তু দ্বারা অস্পষ্ট লিখা যেমন অগ্নিতাপে পরিবিকাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সমস্ত জ্ঞান মনে অস্পষ্ট ভাবে থাকে, ক্রমে পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ দ্বারা তাহা স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

হিন্দু দার্শনিক মধ্যেও জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বেদান্ত দর্শনের মতে জ্ঞান আত্মাতে প্রভেদ নাই;—আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ।

"নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাব
প্রত্যক্ চৈতন্যমেবাস্ম তত্ত্বং"

অবিনাশী বিশুদ্ধ জাগ্রৎ মুক্ত সত্য স্বভাব নিত্য-চৈতন্যই আত্মা।

যথা

"নভ্রহ্মচারী নগৃহী বনস্থো ভিক্ষু
—নচাহং নিজ বোধরূপঃ॥"

আমি ব্রহ্মচারী, গৃহী, বনবাসী বা ভিক্ষু নহি; আমি আত্ম জ্ঞান স্বরূপ।

নৈয়ায়িকেরা জ্ঞানের সহিত আত্মার প্রভেদ কল্পনা করেন। ঐ মতে জ্ঞান আত্মা হইতে ভিন্ন এবং জ্ঞানের সহিত আত্মার আধার আধেয় সম্বন্ধ। যথা "জ্ঞানাধিকরণ আত্মা" আত্মা জ্ঞানের আধার।

সর্ব্বব্যবহার হেতু বুদ্ধি র্জ্ঞানং"

সমস্ত ব্যবহারের হেতুভূত বুদ্ধির নাম জ্ঞান।

"সাচ দ্বিবিধা স্মৃতিরনুভবশ্চ"

সেই জ্ঞান দুই প্রকার,—স্মৃতি এবং অনুভব। সংস্কার মাত্র জন্য জ্ঞানের নাম স্মৃতি এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত জ্ঞানের নাম অনুভব।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ মধ্যে যাঁহারা সদ্য প্রসূত শিশুর জ্ঞান ও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা ক্রমশ জ্ঞানোৎপত্তি হয় এবং জ্ঞান সমষ্টিকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাঁহাদিগের মতকে সুযুক্তিপূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কারণ ঐ মতে আত্মা ও মন পৃথক নহে। সুতরাং আত্মাবিহীন জীবের মন থাকা অসম্ভব। অথচ আমরা সর্ব্বদা দৃঢ় রূপে জানিতে পারিতেছি যে, মনঃ সংযোগ ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয়ই স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়ের গুণগ্রহণে সমর্থ হয় না। অতএব একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে জ্ঞানের প্রতি মনই প্রধান কারণ, ইন্দ্রিয় কেবল দ্বার স্বরূপ। তুমি কোন বিষয়ে গাঢ় চিন্তামগ্ন রহিয়াছ, এমন সময় কেহ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তুমি তাহাকে দেখিতে পাইলেনা বা কথাও শুনিলে না; সুতরাং মনঃ সংযোগ ভিন্ন যে কোন রূপ জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারেনা ইহা অভ্রান্ত সত্য। এক্ষণ দেখিতে হইতেছে যে আত্মা বা মন বিহীন জীব কিরূপে কেবল ইন্দ্রিয় শক্তির সহায়তায় জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে? যখন তাহা হয়না, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞান জীবের সহজাত।

দেবেন্দ্রদর্শন যে আত্মার সহিত জ্ঞানের অভেদ-কল্পনা করেন, তাহাও সুযুক্তিপূর্ণ নহে, কারণ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি

জ্ঞানের অভাবে আত্মার অভাব হয় না। জীবের তিনটি অবস্থা, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। স্বপ্নাবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়ের কোন শক্তি থাকে না, অথচ কর্তৃত্ব-বিহীন জ্ঞান মনমুখরত স্বপ্ন-কল্পিত বিষয়ের অনুগামী হইয়া আত্মাকে সুখদুঃখের ভাগী করে। সুতরাং ইন্দ্রিয় সমষ্টি জ্ঞান নহে। আবার যখন সুষুপ্তি-অবস্থায় বা মূর্চ্ছাবস্থায় জ্ঞানের অভাব হয়, তখনও আত্মার অভাব হয় না। সুষুপ্তি অবস্থাতেও শরীরস্থ শ্বাস-যন্ত্র পরিপাক-যন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াবান থাকে; সুতরাং জ্ঞান হইতে আত্মা পৃথক পদার্থ।

আত্মা হইতে জ্ঞান পৃথক বটে, কিন্তু জীবের সহজাত, সুতরাং ন্যায় দর্শন মতে "সর্ব্ব ব্যবহার হেতু বুদ্ধি জ্ঞানং" ইহাই যুক্তি প্রতিপাদ্য।

এক্ষণ দেখা উচিত জ্ঞান যদি জীবের সহজাত হয়, বা বেদান্ত মতের আত্মাই হয়, তবে "জ্ঞানাদ্মুক্তি" একথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তাহা হইলেত জীব সর্ব্বদাই মুক্ত। অতএব এতক্ষণ যে জ্ঞানের কথার আলোচনা করিলাম, এ জ্ঞান সে জ্ঞান নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—জ্ঞান দুই প্রকার। বিষয়-গোচর জ্ঞান ও পরম জ্ঞান। এই বিষয় গোচর জ্ঞান বেদান্ত মতের অবিদ্যা জনিত অজ্ঞান এবং গুরূপদেশাদি দ্বারা অজ্ঞানতা নাশ হইলে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহাই পরম জ্ঞান। সেই পরম জ্ঞানই বেদান্ত মতের আত্মার স্বরূপ। ন্যায় দর্শনের মতেও জ্ঞান দুই প্রকার, মিথ্যাজ্ঞান ও প্রমাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান অযথার্থ এবং প্রমাজ্ঞান যথার্থ। সুতরাং জীবের সহজাত যে জ্ঞান তদ্দ্বারা মুক্তি লাভ হইতে পারে না। বরং ঐ অযথার্থ জ্ঞানের অভাব হইয়া পরম জ্ঞান উদিত হইলেই আরও একটু বিশদরূপে না বলিলে পরিস্ফুট হইবে না।

বেদান্ত মতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ভ্রমাত্মক। কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য পদার্থ, আর সমস্তই অসত্য। আমাদিগের যে সহজ জ্ঞান ইহাও প্রকৃত জ্ঞান নহে। এই সহজ জ্ঞান অবিদ্যা জনিত অজ্ঞানতা মাত্র। জীব এই ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বশীভূত হইয়াই ব্রহ্ম জগৎ কল্পনা করে, এবং গুরূপদেশাদি ও ধ্যান ধারণা সমাধি দ্বারা অজ্ঞানতা ও তজ্জনিত কার্য্য সংস্কারাদি বিনাশ হইলেই পরম জ্ঞান লাভ করে। পরম জ্ঞান লাভ হইলে জ্ঞানানন্দ স্বরূপ পরম-ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ইহাই বেদান্ত মতের "জ্ঞানাম্মুক্তি" যথা—

"অজ্ঞান তৎকার্য্য সংস্কারানামপি
বিনাশাৎ পরম কৈবল্য মানন্দকারণ
—মখিলভেদপ্রতিভাস রহিতমখণ্ড
ব্রহ্মাবতিষ্ঠতে।" ইত্যাদি শ্রুতে।

পুরাণাদি অন্যান্য হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রও "আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ওমায় সকলং জগৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রকারান্তরে সকলেই বেদের অনুসরণ করিয়া দৃশ্যমান জগৎকে—অজ্ঞানতার কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাকে কিরূপে ভ্রম বলিয়া বিশ্বাস করিব? এস্থলে বৈদান্তিকেরা উত্তর করেন, স্বপ্নে তোমরা যাহা দেখ তাহা কি সত্য? কোন পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া একমাত্র মায়াময়ী (স্বপ্নদেবী) যখন কেবল কল্পনার সহায়তায় দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তোমার উপর কর্তৃত্ব করিতে থাকে, যখন আত্মা জ্ঞান বা যাহা কিছু তোমার সমস্তই মায়ার হস্তের ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া তখন কি তুমি বুঝিতে পার যে ইহা সত্য নয়? না তাহা কখনই পার না, যদি তাহা না পার তবে, এখনই বা কিসে বুঝিবে যে যাহা দেখিতেছি তাহা সত্য নহে।

বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত কেবল শাস্ত্রবাদ নয়। বৈজ্ঞানিকেরাও প্রকারান্তরে এই মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। আমরা যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শুনি, সে সমস্তই ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-মাত্র। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ভিন্ন পদার্থের আর কিছুই নাই। কিন্তু এ সমস্তই ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্য। একে একে দেখিলে দেখিতে পাইবে পদার্থে ইহার কিছু নাই। যথা ক্রমে তাহা দেখাইতেছি।

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

ঠাকুর-বি।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরালালের অধঃপতন এইবার চরম সীমায় উঠিয়াছে; এখন দিবারাত্রি হীরালাল শ্মশানে উন্মত্ত থাকে। আফিসের সাহেবেরা পর্য্যন্ত হীরালালের উপর বিরক্ত হইয়াছেন। প্রতি সোমবারেই হীরালালের আফিস কামাই হয়। আর বুঝি তাহার চাকুরি থাকে না। একে চারিদিকের দেনার জ্বালায় হীরালাল অস্থিত্যক্ত। অনেক সময় তাহার মনে এই আসে বড় অসুখ থাকে; সে অসুখ মন করিবার আবার ঔষধ সেই সুরা। হীরালালের এখন দৃঢ় বিশ্বাস এ রোগের ইহা ব্যতীত আর অন্য ঔষধ নাই!

আফিসে হীরালালের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। সাহেবেরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিত এবং বিশ্বাস করিত। কিন্তু ইদানীং হীরালালের উপর সাহেবদিগের সে বিশ্বাসের দৃঢ়তা যেন হ্রাস হইয়াছিল, এবং তাঁহার নিম্ন কর্ম্মচারিগণও তাঁহাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান করিত না। হীরালাল এই সকল বিষয় বুঝিয়াও বুঝিত না। এখন আর কি সে হীরালাল আছে?

একদিন হীরালাল আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছেন, এমন সময় আফিসের বড় সাহেব হীরালালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হীরালালের আজ বড় সাহেবের গৃহে যাইবার সময় কি জানি কেন প্রাণের ভিতর ধড়াস ধড়াস শব্দ হইতে লাগিল। অন্য দিন বড় সাহেবের গৃহে যাইতে হীরালালের প্রাণে এত ভয় কখন হয় নাই। হীরালাল সাহেবের সম্মুখে গিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার সুতার হিসাব সমস্ত ঠিক আছে?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া হীরালালের মাথায় যেন হঠাৎ বজ্রাঘাত হইল; কিন্তু তিনি সে সময় সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন—"হাঁ মহাশয়, সমস্তই ঠিক আছে।"

বড় সাহেব, তখন আজ্ঞা করিলেন—"তোমার সমস্ত হিসাব এই দুই ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দাও।"

হীরালাল বিষণ্ণমনে সেই দুই ব্যক্তির দিকে চাহিলেন,তাহারা দুই জনেই অপরিচিত ইংরাজ; সুতরাং হীরালাল বিস্মিত হইয়া কেবল তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেন তাঁহার প্রভুর হঠাৎ এইরূপ আজ্ঞা হইল, তিনি তখন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এইবার বড় সাহেব যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"ইহারা সরকারী হিসাব-পরিদর্শক, আমাদের সুতার হিসাবে অনেক টাকা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে, ইহাঁদিগকে আনিয়াছি; তুমি সমস্ত হিসাব ও তহবিল ইহাঁদিগকে বুঝাইয়া দিবে।"

হীরালালের মাথায় এইবার যথার্থ বজ্রাঘাত হইল। হীরালাল চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তবে হীরালালের মনে নিশ্চয়ই পাপ আছে! তাহা না হইলে তিসাব দিবার নাম শুনিয়া হীরালালের মুখ এত বিমর্ষ হইবে কেন? সে দিন কতক বুঝাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু একদিনে আর সমস্ত হিসাব বুঝান হইতে পারে না। হীরালাল সে দিনকার মতন নিস্তার পাইল, এবং পর দিন শরীর অসুস্থ ভাণ করিয়া আর আফিসে গেল না। সাহেব-দিগের ভয়ানক সন্দেহ হইল, সন্দেহ কেন—হীরালালের সুতার হিসাবে যে বিলক্ষণ গোল-যোগ আছে, তাহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস হইয়া গেল। বড় সাহেব নিজে হীরালালকে দেখিতে তাহার বাড়ীতে আসিলেন; কিন্তু হীরালাল বড়সাহেবের সহিত দেখা করিতে সাহস করিল না। তখন সাহেব ক্রোধে অন্ধ হইয়া হীরালালকে পুলিস আদালতে, তহবিল তছরূপাত, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য এক ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন। সেইদিন বেলা দুই প্রহরের সময় হঠাৎ পুলিসের লোকে হীরালালের বাড়ী ঘেরিয়া ফেলিল; হীরালাল তখন অন্তঃপুরের মধ্যেই ছিল। এই সময়ে পাইয়া অন্দরের পশ্চাৎদিকে অন্য এক প্রতিবেশীর ছাদে লাফাইয়া পড়িয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল। সেইদিন হইতে হীরালাল গৃহত্যাগী হইল। আজ এখানে, কাল সেখানে—এইরূপ লুকাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু এইরূপে জীবন অতিবাহিত করা হীরালালের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইল; তখন হীরালাল আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

কি উপায়ে আত্মহত্যা করিবে, তাহা স্থির করিতে হীরালালের দুই দিবস কাটিয়া গেল! শেষে বিষপানে জীবন নষ্ট করা স্থির হইল। বিষ সংগ্রহ করা পর্য্যন্ত হইল। হীরালাল সে দিন এক আত্মীয়ের গৃহে লুক্কায়িত অবস্থায় ছিল। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, সে বাড়ীর সকলে এখন নিদ্রিত, কেবল হীরালালের চক্ষে নিদ্রা নাই। আজ হীরালালের অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা একে একে মনে পড়িতে লাগিল। বন্ধু সুরেশ চন্দ্রের কথাও এই সময় তাহার মনে উদয় হইল। সুরেশচন্দ্রের সেই তিরস্কার,—"তোমার মরাই ভাল—এরূপ ঘৃণিত জীবন ও অসার শরীর রাখার চেয়ে এখন মরাই ভাল"—এখনও যেন হীরালালের কর্ণে বাজিতে ছিল। হীরালালের সকলই গিয়াছে, মান, সম্ভ্রম, যশ, খ্যাতি, চরিত্র—সকলই গিয়াছে, তবে কি সুখে সে আর এ পাপময় জীবন রাখিবে? শেষে কারাগারে জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা এ পাপের বোঝা নামানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। হীরালালের কলঙ্কের আর বাকি কি? হীরালাল একটী ক্ষুদ্র গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া এই সকল কথা ভাবিতেছিল। আর না—আর চিন্তা করা নাই; হীরালালের হস্তে বিষ-পাত্র। কিন্তু হীরালালের সে হস্ত এখন কাঁপিতেছে কেন? ঐ বিষপাত্র মুখে তুলিয়া দিতে সে হস্তের কি ক্ষমতা নাই? আবার এ কি! হীরালালের চক্ষু জল কেন? হীরালাল কাঁদিল, সেই বিষপাত্র হস্তে করিয়াই কাঁদিল! আত্মহত্যা করিতে যে সাহস আবশ্যক, হীরালালের সে সাহস নাই। এই সময় তাহার সেই স্নেহময়ী জননীর কথা আজ উদয় হইল, আর সেই মূর্ত্তিমতী দরলতা, সেই ভাগ্যগতপ্রাণা ভক্তিপ্রবণা সেই পরদুঃখকাতরা দয়ার প্রতিমা—অমলাকে কি হীরালাল ভুলিতে পারিয়াছিল? তাহার পর সেই অকপট বন্ধু সুরেশ-চন্দ্রের কথাই বা হীরালাল কিরূপে ভুলিবে? হীরালাল আর আত্মহত্যা করা হইল না, হীরালাল বিষের পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে হীরালাল চীৎকার করিয়া উঠিল—"দয়াময়, রক্ষা কর—এ যাত্রা আমায় রক্ষা কর।"

এই সময়ে কে বাহিরের দরজা ঠেলিয়া চুপি চুপি ডাকিল—"হীরালাল, দরজাটা খুলে দাও।"

সেই গভীর রাত্রে সেই চির পরিচিত স্বর শুনিয়া হীরালাল শিহরিয়া উঠিল, তৎ-ক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। দরজা খুলিয়া সম্মুখে দেখিল—সুরেশচন্দ্র।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুরেশ চন্দ্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সুরেশকে দেখিয়া হীরালাল আর কোন কথা বলিল না, কেবল কাঁদিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। সুরেশও কাঁদিল, তবে সে ক্রন্দন যতদূর পারিল, সুরেশ গোপন করিয়া কাঁদিল। উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলে প্রথমে সুরেশ আরম্ভ করিল—"আমি আজ ৪।৫ দিন ধরে তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, আজ অনেক কষ্টে তোমার দেখা পেয়েছি। আমি তোমার আফিসের লোক বলে, তুমি কোথায় থাক আমাকেও কেউ বিশ্বাস করে বলে দেয় না। তুমি কি স্থির করেছ? এরূপ লুকিয়ে লুকিয়ে আর কত দিন কাটাবে? সুতার হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরি গিয়াছে—তুমি এত টাকা কি কর্‌লে?"

হীরালাল শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"আমি এত টাকা কখনই চুরি করি নাই, আমার বোধ হয়, আট দশ হাজার টাকা নিয়ে থাকবো। আর সে টাকা চুরি কর্‌বো বলেও লই নাই। দুশো পাঁচশো করে, বিশেষ আবশ্যক পড়েছিল বলেই নিয়েছিলুম; আমার সময়মত পরিশোধ করবার ইচ্ছা আমার ছিল, তাহার চেষ্টাও আমি কর্‌ছিলাম, এমন সময় এই ঘটনা ঘট্‌লো।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন—"তুমি যে এত টাকা লও নাই, তা আমি জানি। তোমার বুদ্ধির দোষে এখন এ সমস্ত টাকা তোমার ঘাড়ে পড়্‌ছে। তুমি নিজে ভাল হলে, আর এরূপ ঘটত না। তোমায় আমি অনেক বলেছি এসময় আর কোন কথা বল্‌বো না। তোমায় নিশ্চয় জেলে যেতে হবে দেখ্‌ছি। এখন কি কর্‌বে স্থির করেছ বল?"

হীরালাল একটা বিষয় স্থির করিয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে সকল গোল-যোগ মিটিয়া যাইত। হীরালাল তখন সতৃষ্ণ নয়নে একবার সেই নিক্ষিপ্ত বিষপাত্রের দিকে চাহিল, এখনও সে পাত্র বিষে পূর্ণ ছিল; হীরা-লাল কিন্তু তখন মনে স্থির করিল যে, ঐ পাত্রে এখন আর বিষ নাই—আছে কেবল অমৃত।

সুতরাং সুরেশচন্দ্রের সে প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিল না। সুরেশ বাবু পুনরায় বলিলেন,—"তুমি এতদিন নিন্দা ধরা পড়তে, কেবল আমি গোলযোগ করে রেখেছি। আর পারি না—এখন কি করবে স্থির করেছ বল?"

হীরালাল মনে মনে যাহা স্থির করিয়াছিল, সে বিষয় সুরেশচন্দ্রের নিকট গোপন করিয়া প্রকাশ্যে বলিল—"যা অদৃষ্টে আছে, হবে। কিন্তু এ সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় ভাল হয়েছে। আমি আর এ কষ্ট সহ্য করতে পারি না; এ কষ্ট সহ্য করার চেয়ে মৃত্যু হওয়া ভাল। আমি আর গোপনে থাকবো না, এখন তুমি আমার মা আর ভগিনীর তত্ত্বাবধানের ভার নিলে, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। আমার বাড়ী ঘর যা কিছু আছে, তাতে কিছুই থাকবে না; কিন্তু অমলার যা কিছু আছে, তাতে তাদের কোন কষ্ট হবে না। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, আমি তোমার মতন বন্ধু পাবো না; তোমার কথা শুনলে আজ আমার এ দশা হতো না। তুমি এ বিষয় স্বীকার হলে, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

সুরেশ বাবু হীরালালের মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"তোমার স্ত্রীর কথা কিছু বল্‌ছো না যে।"

হীরালাল। তার বাপ ভাই আছে, কিন্তু এদের আর কেউ নাই।

এই কথা কয়েকটী বলিতে বলিতে হীরালালের দুই চক্ষু পুনরায় অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। সুরেশ বাবু তখন বলিলেন—"তাই হবে। কিন্তু এখন যথার্থ করে বল দেখি, তুমি আত্মহত্যার মতলব করেছ কি না?"

হীরালাল। সে মতলবত করেছিলুম, কিন্তু সে সাহস আমার হলো না। পাপীর মৃত্যুর ভয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ঐ দেখ, বিষ এখনও পড়ে রয়েছে।

হীরালালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হঠাৎ এই কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। চন্দ্র শিহরিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ সে বিষ হস্তগত করিয়া বলিলেন—"আর তোমায় যদি এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি?"

হীরালাল বিস্মিতনেত্রে সুরেশ চন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মুখে কোন কথাই তখন বলিতে পারিল না। সুরেশ চন্দ্র বলিলেন—"আমি এ যাত্রা তোমায় উদ্ধার করতে পারি, যদি তুমি সমস্ত কুসঙ্গ ত্যাগ করে পুনরায় ভদ্র হবে প্রতিজ্ঞা কর।"

হীরালাল। আমি অনেক সময় তোমার কাছে আর মদ স্পর্শ করবো না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার প্রাণপণে চেষ্টাও করেছি, কিন্তু একবারও সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি নাই। আমি অনেক প্রতিজ্ঞা করেছি—আর প্রতিজ্ঞা করবো না। আর এ বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার পাবো, তাওত বুঝতে পাচ্ছি না।"

সুরেশ। এই পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহেবরা পেলেই, তারা তোমায় ছেড়ে দেবে, আমি এ বিষয় ঠিক করেছি।

হীরালাল। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবো কোথায়?" আমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করলেওত হবে না।

সুরেশ। আমি সে বিষয়ও স্থির করেছি; তবে কেবল তোমার সর্ব্বস্বতে হবে না; তোমার আত্মীয় বন্ধুর সর্ব্বস্বও এতে দিতে হবে।

হীরালাল। কি করে এত টাকার যোগাড় হবে, তাত আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

সুরেশ। আমি তারও ঠিক করেছি; তোমার বাড়ীর দর হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা।

হীরালাল। তারপর, তারপর আর আমার কি আছে?

সুরেশ। তোমার স্ত্রীর গহনা আর তোমার মায়ের হাতের নগদ টাকায় পাঁচ হাজার হবে।

হীরালাল। আমার স্ত্রী সে গহনা দেবে কেন?

সুরেশ। তোমার স্ত্রীকে যেরূপ ভাব, যার আমিও তোমার মুখে শুনে তাঁকে যেরূপ মনে করেছি, তিনি সেরূপ নন। আমি তার অনেক পরিচয় পেয়েছি, সে সকল কথা তোমায় পরে বলবো।

হীরালাল। আচ্ছা, ত্রিশহাজার, তারপর?

সুরেশ। তোমার ভগিনীর গহনা, নগদ টাকা আর বঙ্গ প্রদত্ত কোম্পানীর কাগজে প্রায় পনের হাজার টাকা হবে।

হীরালাল। অমলার যথাসর্ব্বস্ব আমি নেবো? সে হতভাগিনী বিধবার যা কিছু আছে তা কি করে নেবো?

সুরেশ। হীরালাল, তোমার মতন সৌভাগ্যবান আমি ত কাকেও দেখিনি। আমি এত দিন জানতে পেরেছি—তোমার স্ত্রী, ভগিনী, মা সকলই ভাল, কেবল তুমি নিজের দোষে তোমার সংসার শ্মশান করেছ। অমলা তাহার বাড়ীখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করে, সেই টাকা তোমার উদ্ধারের জন্য দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু পুত্রকন্যাহীন বিধবা সে বাড়ী বিক্রয় করবে কেমন করে? তাই সে বাড়ী বিক্রয় হলো না। অমলার মত ভগিনী কাহার হয় না; তুমি এ টাকা না নিলে তার মনে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দেওয়া হবে।

হীরালাল। তা হলে এখন আরো পাঁচ হাজার টাকার দরকার। সে টাকারই বা যোগাড় হবে কি করে?

সুরেশ। আমি তোমার একজন অতি গরীব বন্ধু। কলকেতায় আমার কোন সম্পত্তি নাই, কিন্তু দেশে আমার যে বাড়ীঘর জমাজমী আছে, সেই সমস্ত বাঁধা দিয়ে আমি পাঁচ হাজার টাকা দেবো। "হীরালাল বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সুরেশচন্দ্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিল—"ভাই সুরেশ, তোমার ঋণ আমি এ জীবনে কখন পরিশোধ করতে পারবো না। কিন্তু আমায় ক্ষমা কর; আমি এরকম করে উদ্ধার হতে চাই না; আমি বরং জেলে গিয়ে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।"

সুরেশ। তুমি সেজন্য চিন্তিত হয়ো না। আমি এ বিপদের সময় যদি তোমার কোন উপকারে আসতে পারি, ওরে আমার জীবন মার্থক মনে করবো। আমিও তোমার নিকট অনেক সময় অনেক উপকার পেয়েছি। আর এ সম্বন্ধে অমুমত করো না। এখন রাত্রি অনেক হয়েছে, আমি আজ আসি, কাল আবার দেখা হবে। আর তোমায় এখান সেখান করে বেড়াতে হবে না; এই খানেই থাক। ওয়ারেণ্টে ধরবার আর কোন ভয় নেই।

সুরেশচন্দ্র চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় সেই বিষপাত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে ভুলিলেন না। হীরালাল তখন এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমি কি ছিলাম, আর কি হয়েছি! মান, সম্ভ্রম, চরিত্র সকলই গিয়েছে; বিষয় সম্পত্তি যা কিছু আছে, তাও যায়। এখন আমি পথের ভিখারী, কেবল আমি একলা কেন—আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মীয় বন্ধুকেও আমি পথের ভিখারী করলুম। আমার মতন নরাধম আর কে আছে?"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুরেশচন্দ্রের চেষ্টায় হীরালাল পঞ্চাশ হাজার টাকা আফিসের সাহেবদিগকে ক্ষতি পূরণ করিয়া এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু হীরালালের এখন আর কিছুই নাই, আছে কেবল দেনা। হীরালাল আফিস্ হইতে. কখনই এত টাকা আত্মসাৎ করে নাই; তবে এত পাকা সুতার হিসাবে কিরূপে বাহির হইল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। যাহা হউক, হীরালাল এখন হইতে আবার এ সংসারে নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছে। অমলার স্বামীর শ্যামবাজারে বাড়ী ছিল, এত দিন তাহার ভাড়া অমলা পাইত, এখন সে ভাড়াটিয়া তুলিয়া দিয়া হীরালাল সেই বাড়ীতে গিয়া বাস করিতেছে। সে বাড়ীর কতক অংশ আত্মার ভাড়া দেওয়াও আছে; তাহার মাসিক আয় কুড়ি টাকা মাত্র। এখন অমলার এই কুড়িটী টাকার উপর নির্ভর করিয়া হীরালালের জননী অতি কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিলেন। সংসারে পরিবারের সংখ্যাও অল্প নহে। হীরালাল, তাহার জননী সাবিত্রী, স্ত্রী শরৎকুমারী, ভগিনী অমলা, এই চারিজন; ইহা ব্যতীত পরেশনাথের সেই কন্যা সুধদা, আর পুত্র অমরনাথের প্রতিপালনের ভারও এখন অমলার ঘাড়েই পড়িয়াছিল। কারণ হীরালালের সেই বিপদের পর, পরেশনাথের আর কোন সুসংবাদ পাওয়া যায় নাই; আপনার পুত্র কন্যার কোন সংবাদও সে আর লইত না। এখন এ সংসারে অন্য কোন দাসদাসী ছিল না; তবে সে বৃদ্ধা ঝি অন্য বাড়ী চাকরী করিলেও, এই বাড়ীতে রাত্রে শয়ন করিত, এবং বিনা বেতনে অনেক কাজ কর্ম্মও করিত; তবে অমলা তাহাকে সে সকল কাজ করিতে দিতে সম্মত ছিল না; কারণ অমলা কাজ ছাড়া একদণ্ড থাকিতে পারিত না।

এখন এ সংসারের জীবন্ত অমলা, কিন্তু অমলা এ সংসারে দাসীর ন্যায় থাকিত, এবং সেইরূপ থাকিতেই ভালবাসিত। একদিন শরৎকুমারী অমলাকে বলিল,—"ঠাকুরঝি, তুমি না থাকলে আমাদের দশা কি হতো?"

অমলা সে কথা শুনিয়া একটু দুঃখিত হইয়া বলিল,—"বউদিদি, যখন তখনই তুমি ঐ কথা বলো। কেন, আমাকে কি পর মনে কর, বউদিদি?"

শরৎকুমারী বলিল,—"তোমায় যদি পর মনে করবো, তবে আমাদের আপনার লোক আর কে আছে? আমি সে ভাবে বল্‌ছি না। তোমার মতন ঠাকুর-ঝি যদি না থাকতো, কি তোমার স্বামীর এই বিষয় যদি তুমি না পেতে, তবে আমাদের দশা কি হতো? আমরা তা হলেত পথের ভিখারী হয়েছিলাম।"

অমলা।—অমন কথা কি বল্‌তে আছে, বউদিদি। দাদা বেঁচে থাকুক; আবার তোমার সব হবে। বউদিদি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার দাদাকে সুখী কর, তা হলে আমরা সকলেই আবার সুখী হতে পারবো। দাদার মুখ বিষণ্ণ দেখ্‌লে, আমার প্রাণ ফেটে যায়।

শরৎ। আমি কি করবো, ঠাকুরঝি? আমার সে অভিমান, অহঙ্কার, দর্প এখন সব চূর্ণ হয়ে গেছে। আমিত তাঁকে সুখী করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে থাকি। তিনি এখন সদাই অন্যমনস্ক; ঘৃণায়, লজ্জায় ও অনুতাপে এখন তাঁর হৃদয় সর্ব্বদাই দগ্ধ হচ্ছে; আমি এত চেষ্টা করেও তাঁকে সুখী করতে পাচ্ছি না।

অমলা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,—"কিসের লা—কিসের লজ্জা? আমার দাদা কখনও নরো অনিষ্ট করেন নাই, তাঁহার দ্বারা কোন দিন—কি লজ্জাজনক কাজ যে হতে পারে, তা আমি স্বচক্ষে দেখ্‌লেও বিশ্বাস করি না।"

শরৎকুমারী অবাক হইয়া অমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অমলা তখন পুনরায় বলিল—"বউদিদি, আমি অহঙ্কার করে বল্‌ছি; দাদাদের এমন দিন আবার আস্‌বে, যেদিন তাঁর সুখ্যাতি এ পৃথিবীতে ধরবে না।"

শরৎকুমারী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমার বড় ভয় হয়, পাছে এই রকম ভেবে ভেবে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়। এখন আর দাদাকে তাঁর ঘরে দেখতে পাই না; কেবল এক মনে সুরেশ বাবু।"

অমলা। সুরেশ বাবু মানুষ নন, নিশ্চয় কোন দেবতা।" আর নয়ত, বোধ হয়, পূর্ব্বজন্মে আমাদের মায়ের পেটের ভাই ছিলেন; নইলে এত দূর কি পরে করে?

শরৎ। আমি যা মনে করি কাজে তার কিছুই করতে পারি না। আমার মনে হয়, যদি প্রাণ দিয়ে তোমার দাদাকে সুখী করি, তা আমি বড় হতভাগিনী, কাজের সময় কিছুই করতে পারি না। এখন ঘরে বসে এরূপ ভেবে ভেবে কি করে তাঁর মন ভাল হবে? তিনি আর সুরেশ বাবু আমার ভরসা। তাঁরা দুজনে চেষ্টা করলে, নিশ্চয় তাঁকে আবার সুখী করতে পার। আমার যা সে বিষয়ে যে, কিছু হয়—তাত বোধ হয় না।

অমলা। বউদিদি, সুরেশ বাবু সে বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টায় আছেন। আমিও যতদূর পারি তোমাকে সাহায্য করবো। কিন্তু তোমার এরূপ করলে চল্‌বে না।

শরৎ। তোমার সেই পত্র পড়েই সুরেশ বাবু তোমার দাদাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে এতদূর করেছিলেন; তুমি না হয়, সুরেশ বাবুকে এই বিষয়ের জন্যও আর একখানা পত্র লিখ না। তোমার ওপরই এখন আমাদের সকল নির্ভর করছে।

অমলা। তাঁকে পত্র লিখ্‌তে হবে কেন? তিনি নিজের মুখেই বলেছেন—যে, অন্য লোকে আফিসের যে সকল টাকা চুরি করে, দাদাকে এই পঞ্চাশ হাজার টাকার দায়ী করেছেন, তাদের চুরি তিনি ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় আছেন। আর দাদার পুনরায় ঐ আফিসে যাতে চাকরী হয়, তিনি এখন সে চেষ্টাও করছেন।

শরৎকুমারী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"ভগবান সুরেশ বাবুর মঙ্গল করুন।"

এই সময় সাবিত্রী সেই স্থানে আসিয়া বলিল—"মা অমলা, আজত ঘরে আর চাল নেই, হাঁড়ি এমন করে, ঘরে বসে থাকলে কি করে সংসার চল্‌বে? তুমি তাকে কোন কথা বল্‌তে বারণ কর, কিন্তু এখন আমি কি করি?"

অমলা তৎক্ষণাৎ বলিল—"দাদাকে কোন কথা বলো না মা। আমি তার উপায় কর্‌ছি।"

এই বলিয়া অমলা তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেল; এবং অল্পক্ষণ পরেই কোথা হইতে দুইটি টাকা আনিয়া জননীর হাতে দিল। সাবিত্রী তখন অবাক্ হইয়া কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রাক্ষস-পাদপ।

সে কালে লঙ্কায় কত রাক্ষস ছিল। রামায়ণে কত রাক্ষসের যুদ্ধ পড়িয়াছি; যখন খুব ছোট ছিলাম, ঠাকুরমার কাছে কত রাক্ষসের গল্প শুনিয়াছি। সময়ে সময়ে তখন মনে বড়ই ভয় হইত। যাহা শুনিতাম, তাহাই বিশ্বাস করিতাম। ছোট ছেলেদের মনটী যেমন সরল! তখন একবার যাহা মনে আঁকিয়াছি, শত চেষ্টায় তাহার লয় হইল না। ভূতের গল্প, বাঘের গল্প, এখন আমার ঠিক মনে আছে।

তারপর বড় একটু বড় হইলাম। ইতিহাস ভূগোল পড়িলাম। পণ্ডিত বুঝাইয়া দিলেন যে, রাক্ষস বা ভূত বলিয়া কোন পদার্থই নাই, ও কেবল গল্প কথা। প্রথমে বিশ্বাস করি নাই; মনে একটু ত্রাস হইয়াছিল। একবার মনে ভাবিলাম যে, পণ্ডিত মহাশয়কে একবার মাঠের মাঝে ভূতে ধরে, তাহা হইলে ভূত আছে কিনা টের পান। ভূতে ধরিল না, আমিও বুঝিলাম তবে পণ্ডিত মহাশয়ের কথাই সত্য, ঠাকুরমার সমস্ত কথাই মিথ্যা। কিন্তু একটু সন্দেহ রহিয়া গেল, পণ্ডিত মহাশয় ব্রাহ্মণ, তাই বোধ হয় ভূতও কিছুই করে নাই।

আবার যখন ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলাম, ভূত ও রাক্ষস অমনি দূরে দূরে যাইতে লাগিল। এ, বি, সি পড়ি আর ভূত ও রাক্ষস আমার মন থেকে দশ হাত তফাতে পড়িতে লাগিল। তার পর সেকেণ্ডবুক সায় হইলে, রাক্ষসের গল্প শুনিলে হাসি পাইত। ঠাকুরমার সঙ্গে কত ঠাট্টাই করিতাম।

তারপর যতই বেশী বেশী পড়িতে লাগিলাম ততই আমার মনে অন্যরূপ ধারণা হইতে লাগিল। শেষে ঠাকুরমার-গল্প কতকাংশে সত্য বুঝিলাম; রাক্ষস বলিয়া বিশেষ কোন জাতি নাই বটে, কিন্তু সব জাতির মধ্যে রাক্ষস থাকিতে পারে। অনেক মানুষ আছে যাহারা কাঁচা মাংস খাইয়া থাকে—কেহ বা নরমাংস খাইতে ভাল বাসে—ইহারা নর-রাক্ষস। পশুদের মধ্যে ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতিকে রাক্ষস বলা যাইতে পারে, এমন কি নিরীহ উদ্ভিদসকলের মধ্যেও অনেক মাংসাশী রাক্ষস আছে। ইহারা মাংস খাইতে বড় ভাল বাসে; উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণের কি ভুল রহিয়াছে! গাছপালা যেন কতই ভাল মানুষ, কিন্তু তাহাদের ভিতরের দুষ্টতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আজ সেই রাক্ষস পাদপ সম্বন্ধে দুটকত কথা বলিব।

এই উদ্ভিদ রাক্ষস অনেক প্রকার। সংক্ষেপে কয়েকটীর বৃত্তান্ত বলিতেছি।

---

* প্রায় দুই সপ্তাহ হইল, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভায়, এস, বি, ঘিজ, বি, এস, সি; এম, বি-(এডেন) মাংসাশী তরু সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। উদ্ভিদ বেত্তা প্রসিদ্ধ ডাক্তার কি এস, আর, এস, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও ডাক্তার আর্কিবল্ড প্রভৃতি অনেক পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল। তাহাতে বক্তা অনেক প্রকার যন্ত্র ও ছবি দ্বারা দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটী তাহার বক্তৃতার সারাংশ, এবং ডাক্তার কি-এর, মেডিকেল কলেজের বক্তৃতা ও অন্যান্য পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল।

১। ড্রসেরা—ইহাদের মধ্যে প্রায় শত প্রকার শ্রেণী-বিস্তার আছে। ইহারা প্রায় জলাভূমিতেই জন্মে। চারি পাঁচটী পাতা ঘুরি উপরি থাকে—দেখিতে যেন একটী গুচ্ছ। সরসা গাছের গায় যেমন কাঁটা থাকে তেমন প্রত্যেক পাতার চারিধারে বড় বড় কাঁটা দেখা যায়। মনসার কাঁটার ন্যায় সচরাচর তীক্ষ্ণ, কিন্তু ইহাদের সেরূপ নয়। ইহাদের কাঁটার গোড়াতে একটী গোল গ্রন্থি gland আছে এবং সে গ্রন্থি হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়। সেই রস আটার মত চট্‌চটে। কিছুতে লাগিলেই অমনি জড়াইয়া ধরে। আর ছাড়িতে চাহে না। ইহাদের কাঁটাগুলিও ঠিক সেই রকম। কিছু গায়ে লাগিলেই অমনি কাটাগুলি সঙ্কুচিত হয়। উপরে যে আটার কথা বলিলাম, ঐ আটাতে বেশ একটু সঞ্চার আছে। প্রলোভন কে এড়াইতে পারে? মানবই ভ্রান্ত, কীট পতঙ্গের ত কথাই নাই। পতঙ্গগুলি উড়িয়া একটী পাতার উপর যেমন বসে, অমনি কাঁটাগুলি মুইয়া যায়। বেচারার আর পরিত্রাণ নাই। রাক্ষসের হাতে কাহার বা রক্ষা আছে? এমন কি দেবতা রামচন্দ্রকেও কত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

আমাদের পেটের ভিতর হজম করিবার যেমন রস কল আছে, ইহাদের ঠিক সেইরূপ নাই বটে, কিন্তু সেব কল মানুষের ও গাছের ঠিক সমান। আমাদের পেটের ভিতর এক প্রকার রস আছে, ইংরাজীতে তাহাকে Gastric Juice বলে—আমাদের বড় সহজ কথা নয়। এই রসই আমাদের পরিপাক-শক্তির মূলাধার। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে আমাদের এই পাচন-রস ও এই সকল গাছের আটার মত রস, একই পদার্থ। মোটামুটী এই রসের উপকরণ অম্ল ও পেপ্‌সিন। মিছরি জলে ফেলিলে খানিক পরে তাহা জলে গলে যায়; সেইরূপ মাংস ঐ রসে গলে যায়। তারপর আমরা যেমন হজম করিয়া থাকি, এই সব গাছেরা সেইরূপে হজম করিয়া থাকে। প্রথমে সকলের বড় বিশ্বাস হয় না। পণ্ডিতেরাও পরীক্ষা না করে কোন কথা বিশ্বাস করেন না। ডারউইন্ সেইজন্য ইহার পরীক্ষা করেন। ডারউইন সাহেবের নাম বোধ হয় সকলেই জানেন। তিনি মানব-কুলের বড়ই হিতৈষী। তিনি একটা ড্রসেরা গাছের চারিদিকে লোহার জাল দিয়া ঢেকে রেখেছিলেন যেন গাছের শত্রু না জুটে। তারপর তিনি গাছটার অর্দ্ধেককে ননী, মাংস প্রভৃতি খাওয়াইতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি দেখিলেন যে গাছটার যে অংশে তিনি খাবার দিয়াছিলেন, সেই আধখানা মোটা ও বড় হইয়াছে এবং রংটা যেন একটু ফুটন্ত। আর দানাও প্রায় অপর অংশ অপেক্ষা পাঁচগুণ বেশী জমাইয়াছে। আমাদের খাইবার জন্য মুখ আছে। ওদের মুখের বদলে, ঠিক মাঝখানে একটি গ্রন্থি আছে। আমাদের গায়ে একটি মাছি বসিলেই যেমন মানুষ-রাজা শাস্ত্র জানিতে পারে। ওদের এই গ্রন্থিটির উপর পোকা বসিলেই, অপরাপর সমস্ত কাঁটাগুলি জানিতে পারে। আর অমনি সকলে মিলিয়া পোকাটিকে চাপিয়া ধরে। আবার যদি কেহ গালে ফেলিয়া দেয় তাহলেত আর কথাই নাই; কিন্তু আমাদের রায় হাড় দিয়া রায়ের তুলিয়া খাইতে হয়। ইহাদের কাঁটাগুলিও সেইরূপ কার্য্য করে। যদি পোকাটী একেবারে মাঝখানে না বসিয়া ধারের একটী কাঁটার উপর বসে,

তাহলে সেই কাটাটী থাকিয়া যায় ও পোকা টীকে আর একটী কুঁড়ির উপর ফেলে। সে কাটাটীও ঐরূপ কুরিতে থাকে। অবশেষে পোকাটীকে সেই মাঝখানে আসিতেই হয় অমনি পাতার সেই খানে পোকাটী নখর দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্ত ধামে চলিয়া যায়।

ডুসেরা অনেক স্থানে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম, ছোটনাগপুর, বর্দ্ধমান, হুগলি, প্রভৃতি স্থানে এই জাতীয় রাক্ষস পাদপ দেখা গিয়াছে, এতদ্ভিন্ন ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়, উত্তমাশা অন্তরীপে, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাদের আস্বাদ একটু টক। ইহাদের মধ্যে কোন কোন বৃক্ষ ছাগল, গরু প্রভৃতির পক্ষে বিষ। সূর্য্যের উত্তাপে ইহাদের কাটা হইতে রস নির্গত হয় বলিয়া ইহাকে Sundew অর্থাৎ সূর্য-শিশির বলিয়া থাকে।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

যুদ্ধ সংবাদ। চীন ও জাপান এই উভয় জাতির যুদ্ধের আয়োজন ও উদ্যোগ পুরের ন্যায়ই সমভাবেই চলিতেছে; তবে গত সপ্তাহে কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হয় নাই। উত্তর কোরিয়াতুর্গে জাপান কর্ত্তৃক কতকগুলি চীনসৈন্য আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; তাহারা নাকি আহারাভাবে অর্দ্ধমাংসে জীবনধারণ করিতেছে এ অর্দ্ধমেধ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি কত দিনে হইবে, কে বলিতে পারে? আবার গত সোমবার সংবাদ আসিয়াছে যে, নিউব্যাংএ একদল চীন জাপানবাসীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। তুর জন জাপানবাসী স্ত্রীলোক বৃটিশ মিনিষ্টার ফিনএর আশ্রয় প্রার্থনা করে; এই সময় বহুসংখ্যক লোক আপন আপন জীবন রক্ষা করিবার জন্য চারিদিক হইতে জাহাজের উপরে উঠিতে চেষ্টা পায়; তাহাদের চেষ্টায় তৎক্ষণাৎ বাধা দেওয়া হয়; ফিনং জাহাজ আত্মরক্ষার জন্য অগত্যা মাল না তুলিয়া লইয়াই সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় উভয় জাতির মধ্যে যে এখনও ভয়ানক বিদ্বেষ ভাব চলিতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এদিকে আবার রুষ্টার সংবাদে দিতেছেন যে, শীঘ্রই উভয় জাতির মধ্যে অর্দ্ধস্থায়ী সন্ধি স্থাপিত হইবে। এখন এই অর্দ্ধস্থায়ী চিরস্থায়ী হইলেই আমরা বাঁচি।

খিদিরপুর ডক্। এত সাধের খিদিরপুরের ডকে এখনও লোকসান হইতেছে। এত অর্থ ব্যয় করিয়া এ লোকসান থাকায় কেন? সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, সাধারণ আয় হইতে এ ক্ষতি পুরণের জন্য এক কপর্দ্দকও দেওয়া হইবেনা; এ দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির হস্তে এ ডক্ ইজারা দিতেও গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত নহেন। আমাদিগের মতে আরো এক কোটী টাকা ব্যয় করিয়া এ ডক্ পুরণ করিয়া পূর্ব্বে এস স্থান যেরূপ ছিল, এখন আবার সেইরূপ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষতিপূরণ করা অপেক্ষা মাটি দিয়া পুরণ করা ভাল নয় কি?

নূতন গোলযোগ। পূর্ব্ব আফ্রিকার ট্রান্সভাল রাজ্যে বড়ই গোলযোগ বাধিয়াছে। এই দেশবাসীরা জর্ম্মাণদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কিল্ওয়া নগর আক্রমণ করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া দুইখানি জর্ম্মান রণতরি দ্রুতবেগে পূর্ব্ব আফ্রিকাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। চারিদিকেই অশান্তির সংবাদ! হায় এই অশান্তির কারণ কি? ইহা কি শান্তি-বিধায়কদিগের নিষ্কাম রাজ্যাপহরণ নহে?

হিন্দু ও মুসলমান। পুনায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব এখনও প্রশমিত হয় নাই। জনরব যে, হিন্দুগণ মুসলমানদিগের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন সম্পর্ক রাখিবে না—এইরূপ ধর্ম্মঘট নাকি করিয়াছে। এই জন্য গত রবিবার মুসলমানদিগের এক সভায় বিশ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া তাহাদের জাতীয়দিগের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য স্থানে স্থানে দোকান খোলা হইবে, —এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমরা এ সংবাদে বড়ই দুঃখিত হইলাম, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষভাব—এই উভয় জাতির পক্ষেই বিশেষ অনিষ্টজনক। হিন্দু এখন ভারতের ডান হাত, আর মুসলমান তাঁহার বাম হাত। এই উভয় হাতে যদ্যবারি বিবাদ করিয়া বসিবে হয়,—এ চেরা কাহার কাহার আছে! আমরা দিবাচক্ষে দেখিতেছি—আমাদের জাতীয় মহাসমিতি যাহা গড়িতেছে, এই হিন্দু ও মুসলমান বিবাদে তাহা ভাঙ্গিতেছে। এ সকল কথা আর কত স্পষ্ট করিয়া বলিব?

পূজা উপলক্ষে ছুটি। গত কল্য হইতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে হাইকোর্টের অরিজিনেল সাইড বন্ধ হইয়াছে। আগামী ২২শে নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এবার ছুটির সময় বিচারপতি মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় এবং মান্যবর সেল সাহেব বিচারাসনে বসিবেন।

আগামী কংগ্রেস। মান্দ্রাজে আগামী কংগ্রেসের জন্য বিপুল আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ দুইশত জনের এক কমিটি গঠিত হইবে। মান্দ্রাজের প্রতি জেলা হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়া এই কমিটি গঠিত হইতেছে। প্রতি জেলার গৃহে গৃহে এই মহাসভার সংবাদ দেওয়া হইতেছে এবং সক্ষম ব্যক্তির নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহও চলিতেছে। মান্দ্রাজবাসীর যেরূপ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এবারকার মহাসভা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

চিৎপুরে দুইটি খুন। বলদাঁও আগুরী নামক এক ব্যক্তি নাকি রামচরণ আগুরী এবং তাহার স্ত্রী ভৈরবীকে গত শুক্রবার রাত্রে খুন করিয়াছে। রামচরণের কন্যা রাজবালা স্বচক্ষে তাহার পিতাকে ঐ ব্যক্তির দ্বারা খুন হইতে দেখিয়াছে। নবাব আমির হোসেনের এজলাসে এখন এই মোকদ্দমা চলিতেছে। মোকদ্দমার ফল পরে প্রকাশ করা যাইবে।

বম্বাই গবর্ণমেণ্ট ও মহারট্টা। পুনার মহারাট্টা সংবাদ পত্র মসজিদের সম্মুখে হিন্দুর বাদ্যোৎসব সম্বন্ধে নাকি অনেক অযথা

অমূলক কথা লিখিয়াছিলেন, সেই কারণ বম্বাই-গবর্ণমেণ্ট এই সংবাদপত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, মহারাট্টার ন্যায় সংবাদ পত্রে এরূপ অসত্য কথা প্রকাশ হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। এরূপ মিথ্যা সংবাদে এই উভয় জাতির মধ্যে কেবল বিদ্বেষভাব বৃদ্ধি পাইবে। সংবাদ পত্র মাত্রেই গবর্ণমেণ্টের সহিত এই বিদ্বেষ ভাব নিবারণের চেষ্টা না করিয়া, উত্তেজনা করা বড়ই অন্যায়। এখন মহারাট্টা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কি উত্তর দিবেন?

⁂

চুম্বনের পরিণাম! কিছু দিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজের ডাক্তার স্মিথ সাহেব এক সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গিনীর নিকট চুম্বন প্রার্থনা করেন। সেই স্ত্রীলোকের স্বামী ডাক্তার সাহেবের বিপক্ষে এই কারণ এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। সম্প্রতি ভারত সচিব এই উপলক্ষে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুমতি করিয়াছেন যে ডাক্তার স্মিথ সাহেবকে এখনই যেন চাকুরীতে জবাব দিতে বাধ্য করা হয়। আর যদি ডাক্তার সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তবে ভারতসচিবের অনুমতিক্রমে তাহাকে যেন কর্ম্মচ্যুত করা হয়। তিনি তাঁহার পদের অর্দ্ধেক বেতন মাত্র পেন্সন পাইবেন। স্ত্রীলোকটি দেশীয় হইলে কি এরূপ কঠোরদণ্ডাজ্ঞা হইত? আর এক কথা—ডাক্তারদিগের চরিত্র নির্ম্মল হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এই ঘটনায় ডাক্তারমাত্রেরই চৈতন্য হওয়া উচিত। তবে তাঁহাদের ভরসা এই—বিচারটা এ দেশে হইলে হয়ত চুম্বনের ক্ষতি পূরণের জন্য কিঞ্চিৎ মূল্য ধরিয়া দিলেই সমস্ত গোলযোগ ও মিটিয়া যাইত।

⁂

ভ্রাতৃহন্তার ফাঁসি। গত বৃহস্পতিবার প্রাতে ভ্রাতৃহন্তা দুরাত্মা মতিলালের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। মতিলাল কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে স্বহস্তে খুন করে। ফাঁসির সময় মতিলাল কোনরূপ অস্থির হয় নাই। মুখে 'হরিবোল—হরিবোল' বলিতে বলিতে সে ফাঁসি-কাষ্ঠ হইতে ঝুলিয়া পড়ে। এখন হরি নামে এরূপ পাপীর পাপের লাঘব হইবে না কি?

⁂

টাউন হলের সভা। বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর বুধবার টাউনহলে হিন্দুদিগের এক সভা হয়। এই সভার উদ্দেশ্য চিকাগোর ধর্ম্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া এবং আমেরিকাবাসিগণ যে স্বামীজীকে বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এই সভায় চারি সহস্রেরও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভা সম্বন্ধে বড়ই একটা রহস্য আছে। হিন্দু পেট্রিয়ট বলিতেছেন—ইহা হিন্দুদিগের সভা, কিন্তু আমাদের ব্রাহ্ম-সহযোগিনী সঞ্জীবনী বলিতেছেন যে বিবেকানন্দ একসময়ে তাঁহাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন গায়ক ছিলেন, এবং তিনি চিকাগোমেলায় যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা হিন্দুধর্ম্ম নয়—ব্রাহ্মধর্ম্ম, কেহ কারণ সেদিনকার সভায় অনেক ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং এ সভাকে হিন্দু সভা না বলিয়া ব্রাহ্মসভা বলা উচিত। এ দিকে এক জন আমেরিকা প্রবাসীকে হিন্দু বলিতে সহযোগী বঙ্গবাসী প্রস্তুত নহেন; সুতরাং টাউন হলের সভায় বঙ্গবাসীর চিহ্নিত হিন্দু রাজা প্যারিমোহন সভাপতি হইলেও তাহার মতে উহা হিন্দুর সভা নয়। এখন বল না ভায়া, আমরা দাঁড়াই কোথায়?

⁂

রুষ-গুপ্তচর। কাশ্মীরে নাকি রুষের গুপ্তচর ধৃত হইয়াছে। গুপ্তচরেরা কিন্তু বলে, তাহারা কাষ্ঠব্যবসায়ী, কাঠের অনুসন্ধানে এখানে আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া কাশ্মীর হইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি, ঘর পোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখিলেই ভয় পায়, কিন্তু এ আবার কি?

⁂

দেবোত্তর সম্পত্তি। দেবোত্তর সম্পত্তি যাহাতে বোর্ডের হিন্দু সভ্যগণের কর্ত্তৃত্বাধীন হয়, তাহার জন্য দেশময় তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। সর্ব্বাধিকারী প্রমুখ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা এবং বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ইণ্ডিয়ান সভা ইহার জন্য বড়ই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এদিকে আমাদের কোন কোন হিন্দু-সহযোগী এরূপ অযথা হস্তক্ষেপ অন্যায় বলিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। তাঁহাদের ভয় এই—বোর্ডের সভাপতি যখন প্রায়ই সরকারী কর্ম্মচারী, আরো যখন হিন্দু অহিন্দু সকল সভ্যই সভাপতির অধীন, তখন প্রকারান্তরে দেবোত্তর সম্পত্তিতে গবর্ণমেণ্টেরই হস্তক্ষেপ করা হইবে। আমরা অন্যান্য সকলের কথা ধরি না; হিন্দুর দেবোত্তর সম্পত্তি কেন—দেবতা শুদ্ধ লোপ হইলেও তাঁহাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু সর্ব্বাধিকারী মহাশয় দেশহিতৈষী হিন্দু বলিয়া নিজে পরিচয় দিয়া থাকেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি বিপক্ষের এই যুক্তির বিরুদ্ধে কি বলিতে চাহেন?

গোঁফ বিভ্রাট। পঞ্জাবের এক সহকারী কমিশনর একদিন রাত্রে নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলেন যে তাঁহারি একদিকের গোঁফ আদৌ নাই! নিকটে একব্যক্তি তৎক্ষণাৎ কাঁচিহস্তে ধৃত হইল। বিচারে তাহার ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়; কিন্তু আপিলে সে ব্যক্তি বেকসুর খালাস পায়; কারণ দণ্ডবিধি আইনে গোঁফ কাটার কোন শাস্তিবিধান নাই। এরূপ হইলে উচ্চকর্ম্মচারিদিগের গুম্ফরক্ষার উপায় কি? আমাদের মতে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বিচারপতিগণকে জুতার প্রহার হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, পঞ্জাবে উচ্চকর্ম্মচারিগণের গোঁফ রক্ষার জন্য সেইরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিলে ভাল হয়।

⁂

ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষ।—আমরা ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষের সংবাদে বড়ই ভীত হইয়াছি। নব্য ভারতের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী যে ভয়ানক সংবাদ ধারাবাহী রূপে সঞ্জীবনীতে এবং গতসংখ্যার নব্যভারতে প্রকাশ করিতেছেন; তাহা পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। গবর্ণমেণ্টের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয় না। স্থানীয় লোকের দ্বারা আর কত সাহায্য হইবে? ফরিদপুরের মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় বঙ্গেশ্বরের তথায় উপস্থিতি-কালে এ কথা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন; তাহার ফল এই হয় যে আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট দশ হাজার টাকা মাত্র মঞ্জুর করেন। সহস্র সহস্র দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তির সাহায্যে রাজার উপযুক্ত দানই হইয়াছে। তবুও নিজের

পকেট হইতে দিতে হয় নাই। এখন বঙ্গেশ্বরের দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় হইয়াছে দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করা।

নূতন শিল্প। বড়ই আহ্লাদের বিষয় যে আজকাল দেশীয় লোকে নূতন শিল্পকৌশল উদ্ভাবন বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। বাবু জগবীশর ঘটক জলের উপর দুই চাকার গাড়ী চালাইয়া যশস্বী হইয়াছেন। যশোরের একজন ব্রাহ্মণ দুই চাকার গাড়ীর নিয়ম অবলম্বনে খোড়ায় টানা গাড়ী চালাইবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মেজিষ্ট্রেট সুলতান মোহিদ্দীন সাহেব ঊর্দ্ধে জল তুলিবার এক নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। সম্প্রতি আবার বাবু ঈশ্বর চন্দ্র মজুমদার নামক জনৈক শিক্ষিত বাঙ্গালী কোন যুরোপীয় কলের সাহায্য না লইয়া বিনাতে দেশলাই প্রস্তুত করিয়া এক নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শিক্ষিত দেশীয় লোকে উদরান্নের জন্য চাকুরীর উমেদারী না করিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতি করিবার চেষ্টা করিলে দেশের ও জাতীয় কলঙ্ক ও দারিদ্র্য ঘুচিয়া যায়।

মতামত।

ষ্টারে চন্দ্রশেখর। গত শনিবার আমরা ষ্টারে বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখক স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্রের অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত "চন্দ্রশেখরের" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রায় বিশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে বঙ্গরঙ্গভূমিতে ঐ চন্দ্রশেখরের অভিনয় করিবার একবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে অভিনয়ে উক্ত রঙ্গভূমি কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে নাই। বাস্তবিক "চন্দ্রশেখর" নাটকাকারে পরিণত করা সহজ নহে। আমরা যখন দেখিতে যাই, তখন এই নাটকের অভিনয় দেখিয়া যে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব, সে আশা আমাদের ছিল না। কিন্তু এখন আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে সেদিন এই নাটকের প্রথম অভিনয় দেখিয়াই আমরা আশাতীত সন্তোষ লাভ করিয়াছি। যিনি এই উপন্যাসকে এরূপ সুন্দর নাটকে পরিণত করিয়াছেন আমাদের মতে তিনি সর্ব্বাংশে প্রশংসার্হ। তিনি দুই তিনটি নূতন চরিত্র সন্নিবেশিত করিয়া উপন্যাসের অস্ফুট অনেক চরিত্রকে নাটকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের অস্ফুট চরিত্র নাটকে পরিস্ফুট করা সামান্য বাহাদুরীর কর্ম্ম নহে। আমরা "দুর্গেশনন্দিনী" বা "মৃণালিনীর" অভিনয় দেখিতে গিয়া দেখিয়াছি যে, যেখানে নাটককার নিজের বিদ্যা প্রকাশ করিতে গিয়াছেন, সেই খানেই উপন্যাস-লেখককে একবারে মাটী করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু বড়ই আহ্লাদের বিষয় যে নবীন নাটকে সে দোষ স্পর্শ করে নাই।

এক প্রভু ও তাঁহার অশ্ব রক্ষক ভৃত্যের কথা।

এক অশ্বারোহী কোন এক সহরে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলেন, যে সে স্থানে বহুসংখ্যক দস্যুর প্রভাব আছে; তাহাতে তিনি, রজনীর আগমনে, আপন অশ্বরক্ষক ভৃত্যকে কহিল, যে "তুমি নিদ্রা যাও, এবং আমি প্রতিহারীর কার্য্য করি; কারণ আমি তোমার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি নাহি।" তাহাতে ঐ অশ্ব ভৃত্য উত্তর করিল, যে, হায়, হায়, মম প্রভু! এ সকল কেমন কথা? মম সমীপে জাগরিত হইয়া থাকিবেক ও আমি সুখে নিদ্রা যাইব; সে বিষয়ে আমি কোন মতেই সম্মতি প্রদান করিতে পারি নাহি।" তাহাতে, ক্ষণ কালের মধ্যেই প্রভু নিদ্রাগত হইলেন; এবং তিন ঘণ্টা পশ্চাতে তিনি জাগরিত হইয়া, আপন অশ্ব ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন; যে, "তুমি কি করিতেছ?" তাহাতে সে উত্তর করিল; যে, "জগদীশ্বর জলের উপর যে কিরূপে মনের বস্তা বাঁধিয়াছেন? আমি তাহারই বিষয় ধ্যান করিতেছি।" তাহাতে প্রভু কহিলেন; যে, "আমি এই আশঙ্কা করি যে তস্করের আগমনে, তুমি উহার বিষয় কিছুই জানিতে পারিবেক নাহি।" তাহাতে তিনি উত্তর করিল; যে, "ও, মম স্বামী! আপনি সুখে নিদ্রা যান; ও, আমি উহার প্রতিকার করিব।" তাহাতে প্রভু পুনরায় নিদ্রাগমন করিলেন; এবং মধ্যরাত্রে জাগরিত হইয়া, তিনি হাঁকদিয়া ডাকিয়া কহিলেন; যে, "ও, রে ঘোটক ভৃত্য! তুই কি করিতেছিস্;" তাহাতে, সে, উত্তর করিল; যে, "আমি এই বিবেচনা করিতেছি; যে কি প্রকারে পরমেশ্বর আকাশমণ্ডলকে স্তম্ভাগ্র ব্যতিরেকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন?" তাহাতে প্রভু উত্তর করিল, যে, "আমার এই আশঙ্কা হইতেছে, যে তোমার এই ধ্যানাবস্থার মধ্যে দস্যুগণ আসিয়া এই অশ্বকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবেক।" তাহাতে তিনি উত্তর করিল, যে, "হে মম প্রভু! আমি জাগরিত আছি, সে বারণ দস্যুগণ কেমন করিয়া আসিতে পারিবেক?" তাহাতে ঐ প্রভু পুনরায় নিদ্রাগত হইলেন; এবং যখন কেবল রাত্রি একঘণ্টা মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তখন তিনি জাগরিত হইয়া, ঐ অশ্ব ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন; যে তিনি কি করিতেছ? তাহাতে সে উত্তর করিল; যে, "এখন আমি এই বিবেচনা করিতেছি, যে, যখন দস্যুগণ আসিয়া, অশ্ব অপহরণ করিয়াছে; তখন আগামী কল্য, আঁহার পৃষ্ঠাসন কি আমি আমার মস্তোকোপরি লইয়া যাইব, বা প্রভু মহাশয় আপনি স্বয়ং লইয়া যাইবেন।"

এমতে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; যে, ঐ অশ্ব ভৃত্য বাচালতার বিষয়ে অতি পটু ছিল; কিন্তু সতর্কতার বিষয়ে কিছুই নহে। কিন্তু, যখন দস্যুগণ অশ্বাপহরণ করিয়া লইয়া গেল; তখন যে কোন ব্যক্তি ঐ অশ্বের পৃষ্ঠাসনকে বহন করিয়া লইয়া যাইবেক? তাহা কিছু অধিক ভাবনার কথা নহে। সেই জন্য প্রতি মনুষ্য তাঁহার আপনার প্রতিহারী আপনই হওয়া উচিত হয়; এবং আপনার বোঝা অবশ্য আপনই বহন করিবেক; কিন্তু, সে যাহা হউক অনাবশ্যকের বোঝা বহন করিবার কিছুই আবশ্যক নাহি। কিন্তু কোন এক সময়ে এক ব্যক্তি আমাকে কহিয়াছিল, যে, জীবন হয় এক বোঝার স্বরূপ; তাহাতে আমি তাহাকে কহিলাম, যে, "কেন কি কারণ?" এমতে তিনি বলিলেন, যে, "আমি এমন বোধ করিতেছি, যে, যেন কোন কিছু অমঙ্গলের ঘটনা ঘটিবার সংঘটনা হইতেছে। আমার ক্ষুধা মন্দ, আর যদিও, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া থাকি বটে; কিন্তু তজ্জাত, আহারের পর, আমার মনে কিছু স্ফূর্ত্তি না হইয়া বরং সর্ব্বদাই আমি ক্লান্ত, অবসন্ন, ক্ষীণ, ও উৎসাহহীন হইয়া থাকি। আমার পাকস্থালীতে ও, পার্শ্বদেশে দারুণ বেদনা আছে; আর আমার মস্তকে এত বেদনা হয়, যে বোধ করি, ঠিক যেন উহা যাঁতার প্রস্তরদ্বয়ের মধ্যে পিষণ হইতেছে; এবং আর আমার অবস্থা ক্রমে ক্রমে কেবলই অধিকাধিক মন্দই হইয়া যাইতেছে।" আহা, বেচারা ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে! তিনি

বিজ্ঞাপন।

আপন পাকস্থালীতে, মুটিয়ার মস্তকের ভারের অপেক্ষাও, অধিক ভার বহন করেন। কিন্তু ঐ মন্তব্যের উপর কি ব্যাঘাত জন্মিয়াছে? উহার যে কি হইয়াছে, তাহা আমরা ত্বরাই দেখিতে পাইব। উহার রোগের নিকট, মুত্রপিণ্ডের বা মূত্রাধারের রোগ বা কি হয়? আর উহার রোগের নিকটে, বাত ব্যাধি, বা যকৃতের পীড়াই বা কি হয়? আর উহার নিকট পৈত্তিকবৃদ্ধি ব্যাধিই বা কি হয়? এবং উহার নিকট নানা বিধ জ্বর সকলই বা কি হয়? এবং ঐ সকল বিবিধ প্রকারের ব্যাধি, যাহা হইতে আমরা যন্ত্রণা পাইয়া থাকি তাহারও বা উহার নিকট কি হয়? তাহারত বাস্তবিক কোন আসল রোগ নহে; উহারা হয় কেবল, এক সর্ব্ব শক্তিশালী; ও যন্ত্রণাদায়ক; ও সাংঘাতিক রোগের লক্ষণ সকল; এবং ঐ রোগ অপাক, বা অজীর্ণ নামে বিদিত আছে। উহা সকল হয় কেবল এই রোগের কতকগুলি চিহ্ন সমূহ; যথা মন আহারের পশ্চাত অবসন্ন; পাকস্থালী যেন শূলমুরছিত ও শীতল বোধ হওয়া; শিরঃপীড়া; পৃষ্ঠ বেদনা ও বক্ষঃস্থলে বেদনা; হঠাৎ গাত্রোত্থাপনে মস্তক ঘূর্ণায়মান হওয়া; দৃশ্যের অস্পষ্টতা হওয়া; উদরে বায়ু জমান; ময়লাচ্ছাদিত জিহ্বা; কণ্ঠ ও মুখ মধ্যে মন্দ গ্যাস ও মন্দ জলের সঞ্চার; ভজনিদ্রা। এই লক্ষণ সকল প্রত্যেক রোগীর উপরেই দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু, উহাদের মধ্যে কোন একটা লক্ষণ থাকিলেই, ইহা জানিতে পারা যাইবেক, যে সেস্থানে অজীর্ণ জন্মিয়াছে। উহাতে তোমার কি করা আবশ্যক হইতেছে? তোমার এই করা আবশ্যক হইতেছে, যে তুমি তোমার আপনার পাকস্থালী ও অন্তর দেশ হইতে, ময়লা ও মল দূর করিয়া দিবে; আর আপন রুধিরও পরিষ্কার করিবেক; এবং তাহা হইলে তোমার আহারের পরিপাকের পুনরাগমন হইবেক। যদি বল ইহাতে, তোমার কি উপকার হইবেক? তাহাতে আমি এই কহিতেছি; যে অপাক ও অজীর্ণ; এবং তদ্ভবজ অন্যান্য যত সকল ব্যাধি জন্মাইতে পারে, তাহাদের সকলের পক্ষে, সিগেলস কিউরেটিভ সিরপ্ নামক ঔষধটি, সর্ব্বাপেক্ষা সতেজ ও সজীব এবং সর্ব্বগুণ ভেষজের সহিত প্রস্তুত করা হইয়াছে; এবং সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিজ্জ সামগ্রীর সহিত মিশ্রিত হইবার কারণ, উহাকে সর্ব্বলোকের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যাইবেক। ইহা অবশ্য স্মরণ করিয়া রাখিবেক; যে বাহ্যক্রিয়া রীতি মতে পরিষ্কার রাখিবার জন্য, এবং শরীরের প্রত্যাঙ্গে সুন্দর ও সতেজ স্বাস্থ্য পুনঃস্থাপন করিবার জন্য, যত কিছু ঔষধী বিদিত আছে তন্মধ্যে, কেবল উহাই হয় সর্ব্বাপেক্ষা সাত্ত্বিক ফলদায়ক। তোমার নিকেতন যেন সদাই সুখ সাগরে ভাসিতে থাকে, ও তোমার সন্তান যেন তোমার প্রতিবিম্বের আচ্ছাদনে প্রতিফলিত হইয়া আপন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেন।

সিগেল্স্ কিউরেটিভ্ সিরপ্ নামক ঔষধীটী, ভারতভূমের প্রধান প্রধান বাজার সকলেতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিম্বা অধিকারীর নিকট বরাবর নিকট হইতে প্রাপ্য হওয়া যাইবেক। তাঁহার ঠিকানা, এ, যে, হোয়াইট্, লিমিটেড, ৫ নম্বর, ফর্বিস্ ষ্ট্রীট, বম্বে।

বোতল পিছু মূল্য ১ এক টকা, ২ দুই টকা, ও ৪ চারি টকা। ঔষধ সেবন করিবার নিয়ম সকল, বোতলের গাত্রের মোড়ক কাগজে দেখিতে পাওয়া যাইবেক।

M. G.

অতি আবশ্যকয় সংবাদ।

বিষহরি বা জুনা কি? ইহা ডাক্তার শ্রীশশিভূষন বিশ্বাস L. H. M. S. মহাশয়ের পারা ও উপদংশ-জনিত ঘায়ের অব্যর্থ মহৌষধ। যেরূপ খাই হউক, ১৫দিনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। বিষহরি যাবতীয় সার্সার শীর্ষস্থানীয়। মেহ, প্রমেহ রোগের আশুসংহারক, এবং সম্পূর্ণ পারাবির্জ্জিত। যেহেতু ইহা দেশীয় গাছ-গাছড়ার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত মূল্য সেবনের ঔষধ ১, প্রলেপ ১, প্যাকিং ভাঃ মাঃ ।৵। ভিঃ পিতে পাঠান যায়। একেক বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং খোড়াপটী-কলিকাতা

অনুসন্ধানী
কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী
নিবেদনী কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ | ৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। | একবিংশ সংখ্যা।

সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামীর

জাতি-নির্ণয়।

গৌড়বাদসাহ হোসেন সাহার মন্ত্রিপদে থাকার সময়ে সনাতন রূপের নবীনাবাস ও মাতৃ মল্লিকের উপাধি থাকাতে, এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সমক্ষে "যবন জাতি" বলিয়া আত্মপরিচয় দেওয়াতে, অনেকের মনে ইহাঁদিগের জাতি লইয়া ঘোর সন্দেহ আছে। কেহ বলেন ইহাঁরা পূর্ব্বে যবন ছিলেন। কেহবা ধর্ম্ম অবলম্বনের পর রূপসনাতন নাম হয়; কেহ বলেন, (শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ইহাঁদের মধ্যে একজন) ইহাঁরা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে জাতি দিয়া মুসলমান হয়েন, পরিশেষে শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয় লইয়া সনাতন রূপ নাম ধারণ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "রূপসনাতন" প্রবন্ধের সমালোচনা পরে করিবার ইচ্ছা রহিল। আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, তাঁহার যদি বৈষ্ণব গ্রন্থে দৃষ্টি থাকিত, তবে তিনি ইহাঁদের জাতি লইয়া গোলোক-ধাঁধায় পড়িতেন না, এবং পরিশেষে অনুমানের আশ্রয় লইয়া "অশ্বত্থামা হত ইতি, গজের" মত মীমাংসা করিতেন না। যেহাহাই হউক, আমরা জীব গোস্বামীকৃত "লঘুতোষণী" হইতে তদীয়বংশ পত্রিকাখানি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

উদ্যচ্ছারদ্বপদ্মরাজিতবতী যস্যাস্মুতপ্রাবিণী
জিহ্বা-কন্দলতাত্রয়ী মধুকরী ভূয়োনরী নৃত্যতে।
রেজে রাজসভা সভাজিতপদঃ কর্ণাট-ভূমিপতি;
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরুর্ভুবি ভরদ্বাজাখ্য গ্রামনীঃ।১।
পুত্রস্তস্য নৃপশ্চয় কশ্যপকুলা মারোহতো রোহিণী
কান্তস্পর্দ্ধি যশোভরঃ সুরপতেস্তুল্য প্রভাবোঽভবৎ।

সর্ব্বজ্ঞাপতি পূজিতোঽখিলযজুর্বৈ দিক্ বিশ্রামভূ
র্লক্ষ্মীবান নিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিংদিগন্তে
যথিবান ।২।

মহিষ্যোভূপস্য প্রথিতযশসস্যস্য তনয়ো
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বর হরি হরাখ্যৌ গুণনিধী।
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতর ভাবং নহুবিধে
জগন্মান্যঃ শাস্ত্রানিজ নিজগুণ প্রেরিততয়া।৩।
বিভজ্যস্বং রাজ্যং মধুরিপু পুরপ্রস্থিতি দিনে
পিতাতাভ্যাং রূপেশ্বর হরিহরাভ্যাং কিলদদৌ।
নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথকনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদাধ্যানাৎ কুলতিলকমজ্ঞংশয়দসৌ ॥৪॥
শ্রীরূপেশ্বর দেব এবমরিভি র্নিতৃতাজ্য ক্রমাদ্।

অষ্টাভিস্তরবৈঃ সমং ন্যয়িতয়া পৌরস্ত্য দেশং যযৌ।
তথাসৌশিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সখ্যুঃ সুখং সংবসন
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদ্ধনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধং ॥৫॥

যজুর্বেদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সৎক্রৌপনিষদঃ
রসাজ্ঞায়াঃ যস্যস্ফুট মখটয়ত্তণ্ডবিরুলাং।
জগন্নাথ প্রেমোল্লাসিত হৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
নয়াতঃ কেষাম্বাসকিল নৃপরূপেশ্বরসুতঃ ॥৬॥

বিহায় স্বনশেশ্বরঃ শিখরভূমি-বাসস্পৃহাং
স্ফুরত্ত সুরতরঙ্গিনী-তট-নিবাস পর্য্যুৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দ্দনু স্থিতিপ পুজ্যপাদক্রমা
দুবাস নবহট্টকে সকিল পদ্মনাভঃ কৃতী ॥৭॥

মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজতস্তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ
কন্যাষ্টাদশকেন সার্দ্ধমভবন্মেতস্তু পঞ্চাত্মজাঃ।
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথস্ত নারায়ণো-
ধীরঃ

শ্রীল মুরারিরুত্তম স্তনঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী ॥৮॥
জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান কুমারাবিধঃ
কক্ষিজ্যোহমবাপ্য সৎকুলজ নির্দ্ধলয়ংসসন্ততঃ।
তৎপুত্রেষু অহিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ শ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্রমমুজ্জ্বেচ্ছ পুনশ্চক্রুস্তবামর্চ্চিতং ॥ ৯ ॥

সংপ্রতি ভক্তি-রত্নাকর হইতেও ঐ রূপ পত্রিকা দিতেছি।

১। মহাপুজ্য ভরদ্বাজ গোত্র যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ শ্রীবিপ্ররাজ। ইনি সর্ব্ববেদজ্ঞ, মহাপরাক্রম, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, কর্ণাট-ক্ষত্রিয়বংশ-বতংস ছিলেন; ইনি যবনপর নাই ঐশ্বর্য্যশালীও ছিলেন।

২। বিপ্ররাজের পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ। ইনিও ইন্দ্রতুল্য প্রতাপান্বিত, মহাধনী, লক্ষ্মীবান, ও বেদজ্ঞ ছিলেন। ইহাঁর দুই স্ত্রী ছিল। এই দুই স্ত্রীর গর্ভে রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে রূপেশ্বর জ্যেষ্ঠ, হরিহর কনিষ্ঠ। উভয়েই বিদ্বান্ ও গুণবান দেখিয়া অনিরুদ্ধ পৈতৃক জমিদারি তুল্যাংশে উভয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। কিন্তু পিতার লোকান্তর হইলে, কনিষ্ঠ হরিহর জ্যেষ্ঠের ভূসম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

৩। রূপেশ্বর বিতচ্যুত ও সপত্নিক হইয়া পৌরস্ত্য দেশে গমন করিলেন। তথা শিখরেশ্বর নামে এক বন্ধুর সাহায্য পাইয়া, সেই স্থলেই বাস করিলেন। কিছুদিনান্তর পদ্মনাভ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। পদ্মনাভ যজুর্ব্বেদবেত্তা। অশেষ ওষধিজ্ঞান, বিপুল বশস্বী ও অতিশয় সচ্চরিত্র ছিলেন। ইনি গঙ্গাতীরে নৈহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং তথায়ই ইহাঁর পাঁচ, পুত্র ও অষ্টাদশ কন্যা হয়।

৪। রূপেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম শ্রীপুরুষোত্তম; দ্বিতীয় জগন্নাথ, তৃতীয় নারায়ণ, চতুর্থ মুরারী, পঞ্চম বা সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দ। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ মুকুন্দ প্রবীণ, ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বোত্তম ছিলেন। পুরুষোত্তম স্বগৃহে জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন।

৫। শ্রীমুকুন্দদেবের পুত্র শ্রীকুমার। এই কুমার দ্বিপ্রকুলপ্রদীপ, শুদ্ধাচার ও যাজিক ছিলেন। কদাচার লোকের স্পর্শ ভয়ে ইনি সর্ব্বদা ভীত ছিলেন। ইনি কদাচিৎ যবন স্পৃষ্ট হইলে প্রায়শ্চিত্ত ও উপবাস করিতেন। জ্ঞাতিগণের বিরোধ বশতঃ ইনি প্রথমে শ্রীপালে, পরে যশোর জিলার অন্তর্গত ফতয়াবাদে যাইয়া বাস করেন।

৬। কুমারদেবের অনেকগুলি সন্তান সন্ততি জন্মে। তন্মধ্যে তিন পুত্র বিশেষ খ্যাত, সনাতন, রূপ, ও শ্রীবল্লভ। এই শ্রীবল্লভের পুত্রই জীব গোস্বামী।

বটব্যাল মহাশয় ব্যঙ্গ সম্বন্ধেও একটী ভ্রম করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল অনুপম, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপা লইয়া বৈষ্ণব হইলে, তিনি শ্রীবল্লভ নাম দেন। কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত নরহরি চক্রবর্ত্তীর মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলেন :—

"শ্রীরূপের অনুজ বল্লভ বিজ্ঞবর
অনুপম নাম থুইলা গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥"

এবং এই বল্লভ বা অনুপমই শ্রীগৌরাঙ্গের নাম "গৌরসুন্দর" রাখিয়াছিলেন। বটব্যাল মহাশয় অনুমান করেন, সনাতনরূপ পূর্ব্বে গ্রহণই ছিলেন, পরে যবন হইয়াছিলেন—নংভোঃ। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি খুব এক হাত গালি দিয়াছেন। গালি দিন, তাতে সনাতনরূপের কোন ক্ষতি নাই। কারণ তাঁহারা স্বর্গগত (বড়াল মহাশয়ের মতে হয়ত নরকস্থ); কিন্তু কুকুচি ও ধৃষ্টতেকতার পরিচয় দিয়া বটব্যাল মহাশয় তাঁহ সুনামের ক্ষতি করিয়াছেন। তিনি শাক্ত হইলেও, এবিষয়ে কোন কৈফিয়ত নাই। তবে যদি ব্রাহ্ম হয়েন, তবে কোন কথা নাই।

চৈতন্য চরিতামৃত হইতে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সনাতনরূপ আপনারাদিগকে "যবন জাতি" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; সুতরাং এই কুলজ জবাবের উপর নির্ভর করিয়া বটব্যাল মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা জাতি দিয়া যবন হইয়াছিলেন। লেখক একজন "অভিজ্ঞ" ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ষ্টেটিউটরি সিভিলিয়ান, এবং অধুনা ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট; সুতরাং তাঁহার, আইন ঘটিত ভুল দেখাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা ও বেয়াদপি। কিন্তু সত্যের অনুরোধে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, প্রমাণঘটিত আইনে তিনি কি পড়েন নাই যে, অপর বিধ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হইলে কেবল কবুল জবাবের উপরে নির্ভর করিয়া, সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। নর্টন সাহেব কৃত প্রমাণ বিষয়ক আইনে এমন কি একটী মোকদ্দমার উল্লেখ নাই, যেখানে একব্যক্তি অপর একজন নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে খুন করিয়াছে বলিয়া কবুল করিয়াছিল, পরে সেই নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া হাজির হয়?

বটব্যাল মহাশয় চৈতন্য চরিতামৃতের দুই চারি পাত উলটান ভিন্ন, অন্য বৈষ্ণব গ্রন্থ যে, পাঠ করেন নাই, তাঁহার প্রবন্ধে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। তিনি বৈষ্ণবদিগের আচারব্যবহার, স্বভাবচরিত্র বিষয়েও অভিজ্ঞ বলিয়া বোধ হয় না। আমরা সসম্মানে বিনীতভাবে তাঁহাকে জানাইতেছি, যে নিজের দীনতা প্রদর্শন ভগবৎ-ভক্তের একটী প্রধান লক্ষণ। তাঁহারা বাক্যে, কার্য্যে ও ব্যবহারে সর্ব্বত্র আপনাদিগের যার পর নাই দৈন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কারণ "তৃণ হইতেও নীচ হইবে" এই তাঁহাদিগের ধর্ম্মের উপদেশ। যে কুমার দেব অকস্মাৎ যবনস্পৃষ্ট হইলে প্রায়শ্চিত্ত ও উপবাস করিতেন, তাঁহারা এহেন পিতার পুত্র হইয়া যবনের চাকুরি গ্রহণ, সর্ব্বদা যবন সহবাস করিয়া, আপনাদিগকে ঘৃণ্য যবন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; বাস্তবিক তাঁহারা জাতি হারাইয়াছিলেন না। এ ব্যাখ্যা আমার মন গড়া নয়

ভক্তিরত্নাকর কি বলিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা দেখুনঃ—

"পিতা পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারিতে মনে মানিয়ে ধিক্কার॥
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয়॥
করি মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে জান।
এহেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান॥
যৈছে মনোবৃত্তি তাহা কিছুনাহি হয়।
ইথে অতি দীনহীন আপনা মানয়॥
নীচ জাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচ জাত্যাদিক উক্তি তার।
বিপ্ররাজ হইয়া মহা খেদ—মুক্তাস্তরে।
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে॥
শ্রীচৈতন্য কৃপায়ীরে তাঁর ঐছে রীত।
আপনা উত্তম বুদ্ধি নহে কদাচিত॥
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
যৈছে দৈন্য করে তৈছে নাকরয়ে অন্য।
তঠন ভক্ত দৈন্য রসে নিমগ্ন সদায়।
দৈন্যে যে আনন্দ তাহা জানে গৌররায়॥"

শ্রীজগবন্ধু ভদ্র।

মুক্তি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শুনি, তৎসমস্তই ইন্দ্রিয়ফল মাত্র; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ ভিন্ন পদার্থের আর কিছুই নাই। সেই রূপ, রস প্রভৃতি কি?

রূপ।—রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, অর্থাৎ চক্ষু যাহা দেখিতে পায়। চক্ষু দেখিতে পায় কেবল পদার্থের বর্ণ। বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। সেই বর্ণ পদার্থে নাই, সূর্য্যালোকে যে সাতটি বর্ণ আছে, তাহাই পদার্থ বিশেষে প্রতিফলিত হয়। যে পদার্থ আলোকের যে বর্ণ গ্রহণ করে, সে সেই বর্ণের পদার্থ বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি। এক পদার্থে নানারূপ উপাদান থাকে বলিয়াই, আমরা পুষ্প প্রভৃতিতে নানা বর্ণ দেখিতে পাই, কিন্তু যে স্থলে আলোক নাই, সে স্থলে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। যদি পদার্থে বর্ণ থাকিত, তবে অন্ধকারেও আমরা তাহা দেখিতে পাইতাম। সুতরাং ইহা স্থির পদার্থে রূপ (বর্ণ) নাই।

রস।—রস পদার্থের রাসন প্রত্যক্ষ। রসনেন্দ্রিয় যাহা বুঝিতে পারে, তাহাই পদার্থের রস বা স্বাদ। কিন্তু সে স্বাদ ও পদার্থে নাই। কারণ পদার্থে স্বাদ থাকিলে, এক পদার্থের স্বাদ এক এক শ্রেণীর প্রাণী এক এক রূপ বোধ করিত না। তুমি যাহা মিষ্ট বোধ কর, অন্য শ্রেণীর প্রাণী তাহাকে অতি কদর্য্য বোধ করে। আবার অন্য শ্রেণী যাহা মিষ্ট বোধ করে, তুমি তাহাকে নিতান্ত কটু বোধ কর। অন্য শ্রেণীর কথা দূরে থাকুক, মনুষ্য মধ্যেই কোন কোন পদার্থ এক এক জনের নিকট এক এক রূপ স্বাদ বোধ হইয়া থাকে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তুমিই আজ যে পদার্থকে প্রলোভিত হইতেছ, হয়ত সমস্যান্তরে রুচির বৈপরীত্যহেতু তুমিই আবার

ধাবুক—এক ব্যক্তিই বিভিন্ন সময়ে এক এক পদার্থের স্বাদ বিভিন্ন বলিয়া বোধ করে। তাহাতে এমন সময় উপস্থিত হয় যে, যাবদীয় পদার্থই আমরা কখন লবণাক্ত, কখন মিষ্ট, কখন তিক্ত বোধ করিয়া থাকি। সুতরাং পদার্থে স্বাদ থাকিলে, সর্ব্বদা সমস্ত প্রাণীই তাহা একরূপ বোধ করিত। যখন তাহা হয় না, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, স্বাদ পদার্থে নাই, তাহা রসনেন্দ্রিয়ের শক্তি মাত্র।

গন্ধ।—গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। দুর্গন্ধ দূরের বিচারক ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ফুলের সৌরভ বিষ্ঠার দুর্গন্ধ প্রভৃতি পদার্থের গুণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তি তাহাই বিবেচ্য বিষয়। গন্ধ যদি পদার্থে থাকিত, তবে সকল প্রাণীই সর্ব্বদা এক পদার্থের গন্ধ এক ভাবে গ্রহণ করিত। কিন্তু আমরা তাহার বিপরীত দেখিতে পাই। যে কর্পূরকে তুমি সুগন্ধ বোধ কর, সেই কর্পূরের গন্ধে ছারপোকা প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী মরিয়া যায় বা গৃহত্যাগ করে। সুতরাং কর্পূর তোমাদিগের পক্ষে সুগন্ধ হইলেও অনেক প্রাণীর পক্ষে তাহা অসহ্য দুর্গন্ধ। তুমি যে গলিত শবদেহের গন্ধ বজ্রে নাসিকা আচ্ছাদন করিয়াও নিস্তার হইতে পার না। সেই গন্ধ আবার শকুনি গৃধিনী শৃগালাদির নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া পরিতৃপ্তি লোভে উন্মত্তবৎ করে। বিষ্ঠার গন্ধ তোমার নিকট যতই কেন দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ হউক না, কিন্তু বিষ্ঠাভোজী বা বিষ্ঠা কৃমির নিকট তেমন সদ্‌গন্ধ বোধ হয়, পৃথিবীতে যার দ্বিতীয় নাই। মনুষ্য মধ্যেও এক পদার্থের গন্ধ সকলে একরূপ মনে করে না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তুমিই আজ যে গন্ধে প্রলোভিত হইতেছ, হয়ত সমস্যান্তরে রুচির বৈপরীত্যহেতু তুমিই আবার সেই সুগন্ধকে দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ করিবে, সুতরাং গন্ধ পদার্থের গুণ নহে, ঘ্রাণশক্তি এবং রুচির তারতম্য মাত্র।

শব্দ।—শ্রাবণ জ্ঞানের নাম শব্দ, শব্দও যে, কোন পদার্থে আছে, তাহা নহে। কণ্ঠতালুকাভিঘাতজনিত বা অন্য কোনরূপ আঘাতে শব্দের উৎপত্তি হয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি ও রুচি অনুসারে প্রাণিগণ তাহার কঠোরতা বা মৃদু মধুরতা অনুভব করে। সুতরাং শব্দও কোন পদার্থে বিদ্যমান নাই।

স্পর্শ।—ত্বাচ প্রত্যক্ষ-বিষয়কে স্পর্শ বলে। স্পর্শজ্ঞান দ্বারা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতীতও আমরা পদার্থের সত্তা এবং কোমলতা ও কঠোরতা প্রভৃতি ও অনুভব করি। সে স্পর্শও পদার্থে নাই। এক পদার্থের স্পর্শ সকলের পক্ষে তুল্য নহে। যে পদার্থের স্পর্শে এক শ্রেণীর জীবের আনন্দানুভব হয়, সেই স্পর্শ তোমার পক্ষে ঔষধের পীড়াদায়ক হইতে পারে। আমি যে পদার্থের স্পর্শে সুখী হই, তুমি হয়ত তাহাতে ক্লেশানুভব কর। পুরুষের পক্ষে যে স্পর্শ সুখকর, স্ত্রীজাতির পক্ষে তাহা নহে। তুমিই আজ যে স্পর্শের জন্য লালায়িত, হয়ত সময়ে তাহা তোমার বিরক্তকর হইবে। আবার তুকের কোন অংশের স্পর্শশক্তির অভাব হইলে সে অংশ দ্বারা পদার্থের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অনুভব করা যায় না। সুতরাং স্পর্শও পদার্থে নাই, তাহাও কেবল "ত্বগিন্দ্রিয়ের শক্তি এবং রুচি বিভিন্নতার পরিণাম মাত্র।

এক্ষণ দেখা যাইতেছে—আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি বা অনুভব করি, সে সমস্ত কিছুই নহে, তাহা কেবল আমাদিগের ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও রুচিবিভিন্নতা মাত্র। এস্থলে কেহ কেহ

বলিতে পারেন যে, ইন্দ্রিয় শক্তি বা রুচি অনুসারে এক পদার্থের গুণ বিভিন্ন শ্রেণীর জীব বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করুক; কিন্তু পদার্থ না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয়ই তাহার সত্তা অনুভব করিতে পারে না। আমি বলি তাহা পারে। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বপ্নাবস্থায় কোন পদার্থেরই প্রয়োজন হয় না, অথচ সর্ব্ব প্রকার (পদার্থজনিত) জ্ঞানই হইয়া থাকে। তুমি বলিবে —স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞান ইন্দ্রিয় জন্য নহে, তাহা কেবল মনঃ কল্পিত বিষয় মাত্র। কিন্তু আমি দেখাইব—জাগ্রতাবস্থাতেও ঐ ঘটনা অনেক সময় প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। একজন উন্মাদ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি— জাগ্রতাবস্থায় তোমার সহিত স্বাভাবিক আলাপাদি করিতেছে, তুমি কিছুতেই তাহাকে পাগল বলিয়া জানিতে পারিতেছ না, এমন সময় সে অকস্মাৎ চিকিৎসক ন্যায় ফিরিয়া চাহিয়া, যেন কোন প্রবাসীজনের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইল। তুমি সে স্থানে আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু সে পাগল দেখিতেছে; তাহার হস্ত ধরিয়া কথোকপথন করিতেছে, কাঁদিতেছে, অভিমান করিতেছে, ভৎর্সনা করিতেছে, আবার মিষ্ট কথায় পায় ধরিয়া ক্ষমা চাহিতেছে, তুমি দেখিয়া অবাক্। তুমি তাহাকে ডাকিলে আবার সে তোমার সহিত ভাল ভাবে কথা কহিতে লাগিল, তুমি দেখিলে তাহাতে পাগলের কোন চিহ্নই নাই। আবার হয়ত সে তোমাকে সখ্যস্থ হাসিয়া বলিবে, "মহাশয়, দেখুন দেখি কি অন্যায়! আমি উহাকে সর্ব্বদা বারণ করি— লোকসমক্ষে আমার নিকট আসিয়া লজ্জা দিস্ না, কিন্তু সে তাহা কিছুতেই মানিবে না, এই দেখুন—আপনার সাক্ষাতে আসিয়া কিরূপভাবে আমাকে লজ্জা দিতেছে। তুমি তখন বুঝিলে, এ ব্যক্তি পাগল। কিন্তু সে যাহাই হউক, তাহার দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তিই জাগ্রৎ, অথচ সে শূন্যময় তাহার প্রত্যয়কে দেখিতে পাইতেছে। কেবল দেখা নহে, তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছে, তাহার হস্ত ধারণ করিতেছে। এ সকলকে কি বলিবে? ইহা কি পদার্থভিন্ন জ্ঞান নহে? তুমি বলিবে উহা ভ্রমজ্ঞান। বেদান্ত বলেন, আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহাও ভ্রমজ্ঞান। এই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া ইউরোপীয় কোন কোন দার্শনিকও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই দৃশ্যমান জগৎ কিছুই নহে, ইহা কেবল কতকগুলি জ্ঞানসমষ্টি মাত্র (a bundle of sensation)। সুতরাং বলিতে হইবে বেদান্তের মায়াবাদ কেবল অন্ধবিশ্বাস নহে।

প্রথমেই বলা হইয়াছে—জ্ঞান দুই প্রকার, সাধারণ জ্ঞান ও পরম জ্ঞান; এবং গুরূপদেশাদি ও উপাসনা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই পরমজ্ঞান। সাধারণ জ্ঞান ভ্রমাত্মক; ও সেই ভ্রমাত্মক জ্ঞানের নাশ হইলে যে পরম জ্ঞান উদিত হয়, তাহাই সত্য। সেই পরম জ্ঞান দ্বারাই জীব মুক্তি লাভ করে। সুতরাং "জ্ঞানামুক্তি" ইহা বিজ্ঞানমূলক ও সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত।

উপাসনা দ্বারা অজ্ঞানান্ধতানাশ হইলে মুমুক্ষু জীব তাহার সম্মুখে এক অপার জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মসমুদ্র প্রত্যক্ষ করে, এবং তাহাতে সন্তরণ করিতে অভিলাষী হয়। মুমুক্ষু তখন প্রফুল্লচিত্তে সংসার তীর হইতে ব্রহ্মসমুদ্রে অবতরণ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমেই গভীর জল, আর চরণে মৃত্তিকা স্পর্শ হয় না; মুমুক্ষু তখন সাঁতার দিয়া অগ্রসর হয়। আনন্দসাগরে সাঁতারে অতুল আনন্দ! জীব সন্তরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্মুখে ব্রহ্ম সমুদ্র, পশ্চাতে সংসার। পোতাশ্রয়ী যখন তীরত্যাগ করিয়া ক্রমে সহাসমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়, তখন আর সেই তীরের কুক্ষরেখা কিছুই দেখা যায় না—ক্রমে তাহাও অদৃশ্য হইয়া যায়। উপরে অনন্ত আকাশ, চতুর্দ্দিকে অনন্ত সাগর—যে দিকে তাকাও সেই দিকেই অনন্ত। মুমুক্ষু জীবের চক্ষেও তদ্রূপ, ক্রমে সমস্ত অপসৃত হইয়া একটী সূক্ষ্ম কৃষ্ণ রেখায় পরিণত হয়। ক্রমে তাহাও থাকে না। তখন ইহলে অনন্ত ব্রহ্মাকাশ, চতুর্দ্দিকে অনন্ত ব্রহ্ম সমুদ্র, তদধ্যে অহংব্রহ্মপী মুমুক্ষু জীব, কখন ডুবিতেছে, কখন ভাসিতেছে—ইহারই নাম "সবিকল্প সমাধি"। সমাধির যে অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত আত্মার কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদজ্ঞান থাকে, তাহারই নাম সবিকল্প সমাধি। ক্রমে তাহাও নীচুত হয়। এতক্ষণ যে অহংবুদ্ধটি সমুদ্রমধ্যে ন্যাচিতেছিল; তাহা সাগরে মিশিয়া গেল। জীববুদ্বুদের মধ্যে যে অহংবায়ুটুকু ছিল; তাহা বাহির হইয়া গেল, জলে জল মিশিল, আর চিহ্ন রহিল না। মুমুক্ষু এতক্ষণ যে অহংজ্ঞান লইয়া সাঁতার দিতেছিলেন, তাহা ব্রহ্মসমুদ্রে হারাইয়া ফেলিলেন। ইহারই নাম "নির্ব্বিকল্প সমাধি"। যে অবস্থায় উপাস্যের সহিত উপাসকের অভেদ হইয়া যায়, সেই অবস্থাকেই নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে। ইহাই বেদের মুক্তি। ইহা ভিন্ন আরও চারিপ্রকার মুক্তি আছে। যথা—সারূপ্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, সালোক্য। ঐ চারি প্রকার মুক্তিই ভক্তিশাস্ত্রসম্মত। আমরা স্থানান্তরে ঐ চতুর্ব্বিধ মুক্তির বিষয় বিশেষরূপ আলোচনা করিব।

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

রাক্ষস-পাদপ।

২। ডায়োনিয়া :—ইংরাজীতে ইহার আর একটী নাম "Venesus's fly-trap. ইহাকে কেহ কেহ প্রকৃতির "অদ্ভুত লীলা" বা Nature's wonder বলিয়া থাকেন। উত্তর আমেরিকা এই গাছ দেখা যায়। ইহাদের পাতাগুলি একটী ওষ্ঠের মত। প্রত্যেক পাতাটীর মধ্যে একটী খাঁজ আছে। কাজেই পাতাটীর দুইটী ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগের চারিদিকে শক্ত শক্ত কাঁটা, আর মাঝখানে তিনটী করিয়া ছোট ছোট চুল থাকে। এই চুলগুলিও গজারকী লতার পাতার মত, কেহ ছুঁইলেই মুড়িয়া যায়। ছোট কীট পতঙ্গ আসিয়া বসিলেই এই চুলগুলি তাহাদের গায় লাগে; আর অমনি পাতার দুইটী ভাগ মুড়িয়া যায়। তার পর,যেরূপে হজম হয়—তাহা গতবারে বলিয়াছি।

এই সকল গাছের আর একটী অসাধারণ গুণ আছে। এমন কি মানুষেরও এরূপ গুণ নাই। পিটুলির চিনিরপুলি, ন্যাকড়ার লুচি খাইয়া কত জামাই "নিজে ঠকিয়াছেন ও অন্যদিগকে হাসাইয়াছেন! কিন্তু ইহাদের সেরূপ ভুল হয় না। তবুও ইহাদের চক্ষু নাই। তুমি যদি একটা পাথরকুচি বা সোণার গোকা ইহাদের উপর বসাইয়া দাও, তাহলে এই গাছগুলি চুপ করিয়া থাকিবে।

যেন আদবেই ক্ষিধে নাই। কিন্তু জীবন্ত পোকা আসিলেই ইহারা বেশ বুঝিতে পারে। অমনি হাত পা ছড়াইয়া ওঁটাইয়া কত অভ্যর্থনা করিতে থাকে, এবং বেশী ভাল বাসে বলিয়াই আপনার উদরের মধ্যে নিরাপদে রাখিয়া দেয়। প্রথমে পোকা বসিলেই ইহারা ধরে না। জীবন্ত পোকা কখন স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না। একবার উড়ে, আবার বসে; ইহাতে প্রায় এক মিনিট সময় লাগে। এইরূপ তিন চারিবার করিতে থাকিলে, ইহারা বুঝিতে পারে যে, একটা শিকার জুটিয়াছে। অন্য কোন অচেতন পদার্থের এরূপ করিবার সম্ভব নাই। তবে যদি তুমি একটা কাগজের পোকা তৈয়ারি করিয়া একটা সুতা দেঁধে, গাছের উপর নাচাইতে থাক, তাহলে গাছটী কি করিবে বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ গাছটা খাইতে যাইবে, কেন না গাছ আর তোমার মত ন্যায় শাস্ত্র পড়েনি।

৩। অ্যালড্রোভ্যাণ্ডা। ইউরোপে, আমেরিকায় ও অন্যান্য স্থানে অনেক পাওয়া যায়। আমাদের ঘরের কানাচেও ঢের মেলে। কলিকাতার চারিদিকে, খাল ও বিলে, ধাপার মাঠে, মুক্তলা প্রভৃতি স্থানের পুকুরেও অনেক আছে। বোধ হয়, জলে অনেকে ঝাঁজি দেখিয়া থাকিবেন। ইহাকেও এক প্রকার ঝাঁজি বলিলেও চলে। এই লতার কোন রূপ মূল নাই। জলের উপর যেন অনন্ত শয়নে ভাসিতেছে। পাতাগুলি লতাদেহের চারিদিকে ঘেরিয়া থাকে। ইহাদের পত্রেও ছোট ভাব আছে। ইহাদের বাহিরের দিকে কতকগুলি কাঁটার মত ও ভিতরদিকে পূর্ব্বের ন্যায় অনেকগুলি গ্রন্থি ও চুল আছে। এই হইতে রস নির্গত হয়। পতঙ্গ বসিলে পূর্ব্বের মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৪। পিচার:—ইহাকে আমরা ঘটনা গাছ বলিতে পারি। সিসিলি, ভারতবর্ষ—মালয় উপদ্বীপ, লঙ্কা, বোর্ণিও ও চীন প্রভৃতি স্থানে ইহাদের জন্মস্থান। ইহাদের আর একটী নাম নেপেন্থিস। ইহা দেখিতে ঠিক বদনার মত। ভিতরে ফাঁপা। কিন্তু ইহার মুখের দিক ভিতরে মোড়া। আজকাল এক রকম কাচের দোয়াত উঠিয়াছে, মুখে কোন রূপ ছিপি নাই। অথচ উপুড় করিলেও কালী পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার মধ্যে কালী ঢালিয়া দিতে কোন কষ্টই নাই। এই পিচারের আকৃতি ঠিক এই দোয়াতের মত। মাছি পোকা প্রভৃতিরা অতি সহজে ইহার মধ্যে যাইতে পারে। কিন্তু বাহিরে আসিবার ইচ্ছা হইলে বড়ই গোলমাল। পিচারের মধ্যে বৃষ্টির জল পড়িলে বাহির হইবার সুবিধা নাই। আর ইহার মধ্যে অনেক গুলি গ্রন্থি আছে, তাহা হইতেও ঠিক পূর্ব্বের মত আটা বাহির হয়। ইহার রংটা বেশ জমকাল। পতঙ্গেরা প্রথমে রূপোন্মাদ বশতঃ আসিয়া থাকে। পরে জল দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। পিচার তখন সাধ্যমত অতিথি সৎকারের চেষ্টা পায়। পতঙ্গরা পলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু যেমন উপরে উঠিতে যাইবে, অমনি পুনরায় গড়াইয়া জলের ভিতর আসিয়া পড়ে; ও তাহাতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে। পিচারের আর দোষ কি—মৃতপতঙ্গটী জমক্রমে খাইয়া ফেলে। এইরূপ এক এক সময়ে পিচারের ভিতর পাঁচ ছয়টী মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে। কখন কখন বৈষ্ণব পিচারও দেখা গিয়াছে। ইহাদের মাংস না হইলে ও চলে, তবে হইলে ক্ষতি নাই। আবার কতকগুলিকে বাড়িতে আনিয়া সিদ্ধমাংস খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, বাবাজীউর তাতেও অরুচি নাই। ইহারা

মধ্যাহ্নের পনির খাইতে বড় ভাল বাসে। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে এইরূপ তিনটী পিচার আছে। পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়াছেন যে, পিচারের মধ্যে বিন্ অক্সালেট বাহির হইয়াছে, মিডারিয়েট অব্ সোডা, গ্যালিক এসিড ও অন্যান্য প্রকার অম্ল আছে। উত্তর আমেরিকাতে সারিসিনিয়া নামে এক জাতীয় গাছ আছে; তাহাতে কতকগুলি পিচার একত্রে জন্মিয়া হইয়া থাকে।

৫। আরটিকিউলিয়া বা র‍্যাডারপ্ল্যাণ্ট। ইহাদের পেটের ভিতর একটী মূত্রাধার আছে। তাহাতেই, তাহাকেই র‍্যাডার বলে। এই প্রথম পাতার মধ্যে ঐরূপ র‍্যাডার-আকৃতি দেখা যায় বলিয়া, উহাকে র‍্যাডার ওয়ার্ট বলে। এই র‍্যাডারের মধ্যে এক প্রকার তরল পদার্থ দেখা যায়। পুকুরে এই গাছ প্রায়ই দেখা যায়। ইহাদের ফুল অল্প হল্‌দে রঙের। ইনফিউসোরিয়া—(এক প্রকারক্ষুদ্র জীব) এই র‍্যাডারের মধ্যে প্রবেশ করে; কিন্তু বাহিরে আসিতে পারে না। বোধ হয় ইহারা মাছ ধরিবার ঘুনি দেখিয়াছেন। মাছ ঘুনির ভিতরে অনায়াসে যাইতে পারে, কিন্তু বাহিরে আসিবার সময় সরু সরু বাঁশের আগাগুলি গায় লাগে বলিয়া আর বাহিরে আসিতে পারে না। এইরূপ করিয়া ইহারা জীবন্ত ইন্দুরও ধরিয়া থাকে। র‍্যাডারের মুখেও ঐরূপ কল আছে। পোকা একবার ভিতরে আসিয়া আর কখনও কষ্ট করিয়া বাহিরে আসিতে পারে না। সম্ভবতঃ নিশ্বাস বন্ধ—উহাদের মৃত্যু ঘটে। ইউরোপ, আমেরিকা, বোর্ণিও, ও ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ইহারা বাস করে। এই সমস্ত বৃত্তান্ত দেখিয়া কে বলিতে পারে যে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে একবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অধিকাংশ আহার বিভিন্ন হইলেও সমস্ত কখনই একবারে অসমান নহে। উদ্ভিদের প্রধান আহার অঙ্গারক জব্য। তাহার মধ্যে আঙ্গার, যবক্ষারজান, উদ্‌জান, গন্ধক ও অম্লজানই প্রধান। বৃক্ষের পত্রে একপ্রকার সবুজ রং আছে। তাহাকে ক্লোরোফিল্ বলে। ইহারই জন্য সাধারণতঃ গাছের পাতা সবুজ দেখায়। ইহারা উদ্ভিদ জীবনে বিশেষ কার্য্য সমাধান করে। বায়ুতে আঙ্গারিকাম্ল আছে। এই আঙ্গারিকাম্ল পাতার ছোট ছোট ছিদ্র দ্বারা ক্লোরোফিলে স্পর্শ করিবা মাত্র, মৌলিক অংশ সমূহে পতিত হয়। একভাগ অঙ্গার ও দুই ভাগ অম্লজানের মিশ্রণেই আঙ্গারিক অম্ল প্রস্তুত হয়। ক্লোরোফিল এই এক ভাগ অঙ্গার রাখিয়া দিয়া, দুই ভাগ অম্লজান পুনরায় বায়ুকে ফিরাইয়া দেয়। এইরূপে অঙ্গার লয় বলিয়াই আমরা কাঠ পোড়াইয়া কয়লা করিতে পারি। অন্যান্য খাদ্য মূলের দ্বারা আহরণ করে। এমোনিয়া ও বায়ু হইতে যবক্ষারজান, জল হইতে উদ্‌জান, ও অম্লজান, এবং পৃথিবী হইতে গন্ধকাদি আহার্য্য বস্তু প্রাপ্ত হয়। প্রাণীদিগের আহার সাধারণত জান্তব বস্তু:—চাউল, চিনি, তৈল, ঘৃত, চর্ব্বি, মাংস ইত্যাদি। জান্তব ও অজান্তবকে ইংরাজী organic ও inorganic বলিয়া থাকে। কিন্তু আমরা এই প্রবন্ধে দেখিলাম যে, উদ্ভিদেরাও কেহ কেহ জান্তব দ্রব্য আহার করিয়া থাকে। অতএব খাদ্য সম্বন্ধে জীব ও উদ্ভিদে সম্পূর্ণ প্রভেদ নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে প্রাণী চলিতে পারে, আর উদ্ভিদ্ পারে না। ইহা কিন্তু খুব ভুল। এমন অনেক জীব আছে, যাহারা আদতেই চলিতে পারে না,—যেমন পলিপস্, স্পঞ্জ প্রভৃতি। যাদুঘরের নীচের

তালায় invertebrate প্রদর্শনীতে ঐরূপ অনেক পলিপস্ ও স্পঞ্জ দেখিতে পাইবে। আবার এমন শত শত উদ্ভিদ রহিয়াছে যাহারা মনের স্বচ্ছন্দে বেড়াইতেছে, এমোরিমী ইহার উদাহরণ স্থল। উদ্ভিদ ত দূরের কথা, অচেতন পদার্থ এক প্রকার পাথর খণ্ড চূর্ণীকৃত হইলে, ক্ষুদ্রাংশ সকল লাফাইতে থাকে। তাহা হইলে গমনাগমনের শক্তি দ্বারা জীবে ও উদ্ভিদে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিতে পারি না।

আরও এমন জীব দেখা গিয়াছে—যাহারা ঠিক গাছের মত আহার করে। তাহারা শরীরের ক্লোরোফিল দ্বারা বায়ু হইতে অঙ্গার আহরণ করিয়া থাকে।

উদ্ভিদের ও জীবের স্পর্শ-শক্তি আছে। শিকার জুটিলে কিরূপে কাটাগুলি আপনি আপনি মুদিয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর আমাদের গায়ে পোকাটী পড়িলেই অমনি আমরাও তাহা বুঝিতে পারি।

জীবজগতে যেরূপ স্ত্রীপুরুষ আছে। উদ্ভিদেও তাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরন্তু সন্তান-উৎপাদনক্রিয়া সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নাই।

সমস্ত চেতন পদার্থের মূলভিত্তি এক প্রকার অল্প তরল বস্তু; ইহাকে প্রোটোপ্লাজম্ বলে। ইহাতে জীবজগতের সমস্ত কার্য্যই দেখা যায়। এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে, জীবজগতের সমস্ত কার্য্য অল্পাধিক পরিমাণে উদ্ভিদজগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে; অর্থাৎ উদ্ভিদেরাও এইরূপ প্রোটোপ্লাজম্ হইতে উৎপন্ন। পণ্ডিতেরা আরও ঠিক করিয়াছেন যে, জীব ও উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাজম্ একই উপাদানে নির্ম্মিত; অর্থাৎ উভয়ের মধ্যেই অঙ্গার, যবক্ষারজান ও উদ্‌জান সমান পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা হইলে জীব ও উদ্ভিদ প্রোটোপ্লাজম একই বস্তু এই প্রোটোপ্লাজমের একদিকে জীব অন্য দিকে উদ্ভিদ। জীব ও উদ্ভিদ ভাই ভাই—বড়জোর জীবকে উদ্ভিদের বড় দাদা বলিতে পার। যেমন একটী বীজ হইতে একটী গাছ হয়; আবার একটী গাছের অনেক শাখা থাকে, তাহা হইতে আবার প্রশাখা ও তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরু ডাল দেখা যায়, সেইরূপ এই প্রোটোপ্লাজম্ এই চেতন ও উদ্ভিদ জগতে মহারাজ স্বরূপ; জীব জগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ সেই জীবজাত মহাবৃক্ষের শাখা ও প্রশাখা মাত্র। আর এই প্রোটোপ্ল্যাজমের মূলে এক অদৃশ্য ক্ষমতা প্রকাশমান রহিয়াছে, তিনি অদৃশ্য হইলেও তাঁহার কার্য্যাবলী তাঁহাকে দৃশ্যমান করিয়া রাখিয়াছে। আমরা যতই তাঁহার কার্য্যাবলীর অনুসন্ধান করিব, ততই তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইব। আইস, সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হই।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রদ্বীপ।

বঙ্গদেশের অনেক প্রাচীন পাঠক বোধ হয় চন্দ্রদ্বীপের নাম শুনিয়াছেন। অদ্য হইতে প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গদেশের মধ্যে একটী প্রধান স্থান ছিল। উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা সমূহ, ইহার রাজধানী "বারপাশা" নামক স্থানে শোভা পাইত। দেশীয় বিদেশীয় বণিকগণের পণ্য-বিপণিকায় এই নগরের শোভা সম্পাদন করিত; নৈশ প্রহরীর হরণ করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক আলোক-মালা ইহার রাজপথ সমূহের শোভা বর্দ্ধন করিত। পান্থনিবাস, দুর্গ, প্রভৃতিতে রাজধানীর সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিত। রঞ্জিত তুরঙ্গের হ্রেষারব, মত্ত মাতঙ্গের বৃংহিত নাদ, এবং বীরগণের সিংহনাদে রঙ্গভূমি ধ্বনিত হইত। প্রবল প্রতাপশালী দুর্দ্দমনীয় মানসম্পন্ন রাজেন্দ্রগণ এইস্থানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের বাহুবলে সমগ্র বঙ্গদেশ, এবং সুদূর সমুদ্রোপকূলস্থিত, ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজ্য সকল বিত্রাসিত হইত।

দিল্লীর সম্রাটগণ, চন্দ্রদ্বীপাধিপতিগণের সৌর্য্যে এবং বীর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজোপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বহু কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের বংশধরগণ, সম্রাট-প্রদত্ত বিপুল জায়গীর এবং রাজসম্মান ভোগ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বনাশক কালের ভীষণ প্রহারে আজ সেই চন্দ্রদ্বীপের পুরাতন কীর্ত্তির অনেকাংশ একেবারে লোপ পাইয়াছে। যে যে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাসমূহ আকাশ স্পর্শ করিত, আজ সেই সেই স্থানে কতকগুলি ইষ্টকের পুঞ্জ পড়িয়া রহিয়াছে। তদুপরি রাশি রাশি কণ্টকাকীর্ণ ঝোপ, এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষসকল সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শৃগাল, শূকর, দ্বীপি, এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ অজগর সমূহ ইতস্ততঃ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। রাজাদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি মধ্যে "দুর্গাসাগর" নামক বৃহৎ জলাশয় ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। রাজধানীর অবস্থা অতীব শোচনীয়; উচ্চ উচ্চ রাজ-প্রাসাদ সকল ভূমিসাৎ হইয়াছে; চতুর্দ্দিক এতদূর জঙ্গলাকীর্ণ যে, দিবা দুইপ্রহরের সময়ও বহুলোক এবং অশ্বাদি সমভিব্যাহারে না লইয়া তাহার নিকট দিয়া যাইতে কাহারও সাহস হয় না। এক প্রান্তে দরিদ্রীভূত রাজপরিবার ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অতি ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

অতি পূর্ব্বকালে চন্দ্রদ্বীপ "স্বনাম-খ্যাত" ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহা বাখরগঞ্জ জেলার একটী সামান্য পরগণা মাত্র। এই প্রসিদ্ধ স্থানের কোন ইতিহাস ছিল না। শ্রীযুক্ত এইচ, বিভারিজ্ সাহেব যখন এই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; তখন তিনি বহু কষ্টে ইহার কথঞ্চিৎ পৌরাণিক তত্ত্ব, এবং ইহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কোন ইতিহাস প্রণীত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না।

অতি পূর্ব্বকালে এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের অধিকাংশ উত্তাল-তরঙ্গময়ী এক বিশাল নদীর গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। এই নদীর নাম

সুগন্ধা; (*) এদেশে ঐ নদীর নাম "সোন্ধা" বলিয়া প্রচলিত।

অতি পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ ব্যতীত এই জেলায় আর কোন স্থান ছিল না; ক্রমে ক্রমে ঐ চন্দ্রদ্বীপ হইতে প্রায় ৫০ পঞ্চাশটির অধিক পরগণা সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ চন্দ্রদ্বীপের সৃষ্টি সম্বন্ধে দুইটি আশ্চর্য্য কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মাননীয় বেভারিজ সাহেব মহোদয় তাঁহার গ্রন্থে ঐ দুইটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। আমিও পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার জন্য ঐ দুইটি গল্প প্রকটিত করিলাম। যখন এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের প্রায় অধিকাংশ স্থল সুগন্ধা নদীর গর্ভে নিমজ্জিত ছিল, তখন বিক্রমপুর পরগণায় চন্দ্র শেখর নামক এক ধার্ম্মিক শুদ্ধাত্মা তপোরত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।

তিনি সর্ব্বদা পূজা, যোগ, ইষ্টমন্ত্র জপ প্রভৃতি দ্বারা সময়াতিবাহিত করিতেন। তাঁহাকে সুপাত্র দেখিয়া অন্য এক ব্রাহ্মণ সন্তান তাঁহার সহিত স্বীয় সর্ব্বগুণসম্পন্না পরমা সুন্দরী কন্যার বিবাহ প্রদান করিলেন। সম্প্রদানের সময় চন্দ্রশেখর সভয়ে শুনিলেন যে, তাঁহার নববিবাহিতা পত্নীর নামের সহিত তাঁহার উপাস্যদেবীর নাম এক। তাঁহার মস্তকে যেন সহস্র বজ্রাঘাত হইল। যে উপাস্য দেবীকে দিবারাত্রি ডাকিয়া থাকেন,আজ তাঁহার সেই উপাস্যদেবীকে নাম ধরিয়া আরাধনা করিবে, এখন তাঁহার স্ত্রীকে মনে পড়িবে; যাহাকে মা বলিয়া ডাকিলে,স্ত্রীর নাম স্মরণ হইবে,এবং সেই স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে নিশ্চয়ই তিনি পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইবেন; অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের হৃদয়ে এই সকল চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি মনে ভাবিলেন, বরং তিনি এই প্রকার পাপে লিপ্ত হইয়াছেন; তখন জীবনত্যাগ ব্যতীত, কিছুতেই আর এই অতি গর্হিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করার পূর্ব্বেই তিনি আত্মনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ধীরে ধীরে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইল, বর-কন্যার স্ত্রী-আচার পর্য্যন্ত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে, বাসরঘরে যাইবার পূর্ব্বেই কৌশলে, পলায়ন করিলেন। সেই বিবাহের বেশে, নিশীথ সময়, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ একাকী পলায়ন করিয়া স্বগৃহে আসিলেন। ধীরে ধীরে একখানি ক্ষুদ্র তরণী আরোহণ করিয়া ক্ষুদ্রদণ্ডেপণী সহযোগে ভাসমান হইলেন। তৎকালে বিক্রমপুরের দক্ষিণে অনন্ত জলরাশি। ব্রাহ্মণ এই সমুদ্রতুল্য নদীগর্ভে আত্মনাশ করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষেপণী সহযোগে সেই উত্তালতরঙ্গ মধ্যে স্বীয় ক্ষুদ্র জীর্ণ তরণী ভাসাইলেন।

অর্দ্ধনিশি রাত্রি প্রভাত হইল। চতুর্দ্দিকে অনন্ত জলরাশি, তরঙ্গাভিঘাতের প্রলয়ভীতিকর শব্দ, বায়ুর উচ্ছৃঙ্খল গতি। ব্রাহ্মণ একাকী সেই ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন।

এই প্রকারে সেই দিন ও রাত্রি গত হইল, তার পর দিন সূর্য্যোদয়ের পর, ব্রাহ্মণ, অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র তরী-আরোহণে অসামান্য রূপবতী এক কিশোরীকে দেখিতে পাইলেন। এই সমুদ্রতুল্য ভীষণ নদীগর্ভে, একাকিনী, এক বালিকাকে দেখিতে পাইয়া, চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন এবং কৌতূহলী হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার তরণী বালিকার তরণীর নিকটবর্ত্তী হইলে, ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কোন সাহসে একাকী এই সমুদ্রমধ্যে আসিয়াছ? তোমার কি প্রাণের ভয় নাই?" ব্রাহ্মণের কথা শেষ হইলে কিশোরী বলিল,—"আমি বীরবন্যা, নদীতে বাস করাই আমার ধর্ম্ম, এবং ব্যবসা; ইহাতে আমি কোনপ্রকার ভীতা বা সঙ্কুচিতা হই নাই। কিন্তু আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিতা হইলাম, যে, আপনি একাকী কি জন্য, এই ভীষণ নদীতে আসিয়াছেন, আপনার কি প্রাণের ভয় নাই?"

বালিকার এই কথা শুনিয়া চন্দ্র শেখর দ্বিরাবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া নিজ মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। বীর-কন্যা তাঁহার কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিল, "ঠাকুর! দেখিতেছি আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অনেক শাস্ত্র, তন্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছেন; আপনি এই সামান্য রহস্যভেদ করিতে না পারিয়া, আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন? আপনি, কি জানেন না, যে জগন্মাতা ভগবতী, প্রত্যেক নারীতে অংশরূপে অধিষ্ঠিতা? আপনার, মা, পিতামহী, মাতামহী, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি এই পৃথিবীর যাবতীয় নারীতে যে তিনি অংশরূপে বিরাজিতা, তাহা কি আপনি জানিয়াও জানেন না? আবার যে প্রত্যেক পুরুষদেহে, ভগবান মহাদেব অংশরূপে বিরাজিত, তাহাও, কি দুনিয়া মিয়াছেন? ইহাতে যদি পাপ হইত, তবে বিধাতা কিছুতেই সৃষ্টি করিতেন না। যান ঠাকুর, বাড়ী গিয়া স্ত্রীর সহিত, স্বধর্ম্ম, গোপন করুন।"

(*) মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় প্রণীত অন্নদামঙ্গলের মধ্যে আমরা সুগন্ধার উল্লেখ দেখিতে পাই, জগন্মাতা দক্ষালয়ে প্রাণত্যাগ করিলে, শোকোন্মত্ত মহাদেব, সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলে বিষ্ণু চক্রদ্বারা সতীদেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করেন। জগদম্বার নাসিকা এই নদীমধ্যে পতিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম সুগন্ধা হইয়াছে।

বীরবহিতার বাক্য শেষ হইলে, ব্রাহ্মণের ভ্রমান্ধকার দূর হইল। "অজবস্থা বীরকন্যার মুখ হইতে এই প্রকার সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া, চন্দ্রশেখর যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, এক লম্ফে বীরব-কন্যার নৌকায় গিয়া দুই হস্তে কিশোরীর পদযুগল ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, —"মা, তোমার কথায় আমার মোহ ঘুচিয়াছে। বীরব-কন্যার মুখ হইতে এই প্রকার সারগর্ভ কথা কিছুতেই বহির্গত হইতে পারে না; তুমি অবশ্যই কোন দেবী, ছল করিয়া ভুলাইতে আসিয়াছ। তোমার সত্য পরিচয় প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।" এই বলিয়া চন্দ্রশেখর ঐ রমণীর চরণযুগের উপর স্বীয় মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।—বীরকন্যা, ব্রাহ্মণের এই প্রকার আচরণে ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল :—"আমি অস্পৃশ্যা বীরব-কন্যা; তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া আমার পদযুগ মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া আমার অকল্যাণ করিতেছ? শীঘ্র আমার পদযুগ ত্যাগ কর।"

এই বলিয়া সে দুই হস্তদ্বারা, ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে স্বীয় পদযুগ মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কিছুতেই পদত্যাগ করিলেন না, গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"আমার নিশ্চয়ই বিশ্বাস হইতেছে, তুমি কোন দেবী, অভ্যাগতে ছলদ্বারা ভুলাইতে আসিয়াছ। তোমার প্রকৃত পরিচয় না পাইলে, কিছুতেই তোমার পদযুগল ত্যাগ করিব না; বরং এখনই তোমার পদে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিব। তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ ঘটিবে।"

রমণী কিছুতেই আত্মপরিচয় দিতে স্বীকৃতা হইলেন না। এই প্রকার অনেকক্ষণ গত হইলে পর, চন্দ্রশেখর যখন দেখিলেন, যে

ইনি কিছুতেই আত্মপরিচয় দিবেন না, তখন আত্মগোপন করিবার জন্য নদীমধ্যে ঝম্প দিয়া পতিত হইলেন। তখন সেই রমণী বলিলেন, "বৎস চন্দ্রশেখর, আমি এতক্ষণ তোমার ভক্তি এবং দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতেছিলাম। তুমি যাহাকে দিবারাত্রি, ভক্তিসহকারে আরাধনা করিয়া থাক, আমি তোমার সেই উপাস্যদেবী। বৎস! আত্মগোপন করা মহাপাপ; তুমি গাত্রোত্থান কর।"

চন্দ্রশেখর অতীব আহ্লাদিত হইয়া, দেবীর আদেশানুযায়ী সেই নৌকায় উঠিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। যাঁহাকে মনে মনে, দিবারাত্রি চিন্তা করিয়া থাকেন, যাঁহার পদ পাইবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি কঠোর যোগাবলম্বনে, শত সহস্র বৎসর আরাধনা করিয়া থাকেন, আজ সেই দেবদুর্লভ চরণদর্শন পাইয়া চন্দ্রশেখর পুনঃ পুনঃ সেই চরণে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহার স্তবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলেন। চন্দ্রশেখর যুক্তকরে দেবীস্বরূপ দর্শন করিতে প্রার্থনা করিলে, তৎক্ষণাৎ দয়াময়ী রূপ ধারণ করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

দেবী বলিলেন—"বৎস! আজ যেস্থানে তুমি আমার দর্শন পাইলে; আমার বরে অতি শীঘ্রই এই বিপুল জলরাশি সুবর্ণময়ী মেদিনীতে পরিণত হইবে, এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তুমিই রাজত্ব করিবে।" চন্দ্রশেখর পুনঃ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা যখন পূর্ব্বপুণ্যফলে, তোমার পবিত্রচরণ দর্শন পাইয়াছি, তখন রাজ্যভোগে, আর আমার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই। কেবল এইবর দিও মা! যেন বারংবার আর এই পাপময়ী পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করিয়া, পুনঃ পুনঃ জন্মও মৃত্যু-যাতনা ভোগ করিতে না হয়।"

দেবী "তথাস্তু" বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। চন্দ্রশেখরও বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

সেইদিন সেই নব আবিষ্কৃত ভূমিখণ্ড চন্দ্রশেখরের নামে "চন্দ্রদ্বীপ" বলিয়া প্রচারিত হইল।*

চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে আরও একটী গল্প প্রচলিত আছে। পরে তাহা বলিব।

শ্রীরোহিনীকুমার সেন গুপ্ত।

* District of Buckergunj By H. Beveridge B. C. S. Page 73.

সখা।

যতখানি আমি দিয়ে ঘেরা ছিল তোর মন
ততখানি ছিল অধিকারে;
গানে প্রাণে সুরে সুরে হেরিলে সৌন্দর্য্য শিখা
স্থাপিতাম তাহার মাঝারে।
রতন-খচিত কোষ কোথা সেই অধিকার
আর তুই কোথা গেলি বল?

যতখানি আপনার ছিলাম আমিরে তোর
সে কি সখা কুয়াশা কেবল?
অসীম পরশ লভি কত বড় পর তুই
হয়েছিস্ না জানি এখন?
পরত্ব বিভব পেলে অতি ক্ষুদ্র আপনারে
এইভাবে করিতে কি হয়রে বর্জ্জন?

হায় আমি কোন স্থানে এখন দাড়াই হায়
চারিধারে স্বার্থের গর্জ্জন।
আপন হইতে গেলে সবাই চরণে ঠেলে,
কতব্যস্ত করে অকারণ।
ঔদার্য্যের জ্যোতির্ম্ময় শিখাকার, স্থাপিপ্রাণে;
নিরাশায় তাড়াইব দূরে?
জগতের হাহাকার সংসারের ঘোর জ্বালা
ভুলে রব এবে কার সুরে?
জীবন আনন্দ উৎস বিশুষ্কহইয়ে গেছে—
মজ্জাগত দারুণ অনলে
আপন অবস্থা স্মরি একা বসি নিরজনে,
লুকাইয়া ভাসি অশ্রুজলে।

সংসারের কঠোরতা সহিতে না পারি দোঁহে
খুঁজে খুঁজে নিরালয় গিয়া
দুজনের চিন্তা দিয়া আনন্দের ছবি গড়ি
বিমোহিত করিতাম হিয়া।
এখন সে নিরজনে একা যদি যাই কভু
টুটে গিয়া নির্জ্জনের বুক
প্রতিধ্বনি ছুটে এসে হৃদয়ে আসন রচি
বিষাদে ঢাকিয়া দেয় মুখ।
তুই পর হ'য়ে গিয়ে কেমন হইয়ে গেছি
সংসারের শতেক বন্ধন
একটী একটি করি টুটিয়া গিয়াছে সব
হইয়াছি পর যেন আপনি আপন।

শ্রীবেনোয়ারী লাল গোস্বামী।

হিন্দু সমাজ।

জাতিভেদ।

হিন্দু সমাজ যে কয়েকটী দৃঢ়তর স্তম্ভের উপর স্থাপিত, জাতিভেদ তন্মধ্যে প্রধান। এই স্তম্ভের বলেই হিন্দু সমাজ এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; নতুবা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহার উপর যে ভীষণ অত্যাচার হইতেছে, শত শত প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ইহার বক্ষের উপর চলিয়া যাইয়াছে ও যাইতেছে, এই প্রধান স্তম্ভ স্খলিত হইলে এতদিন ইহা কোথায় চলিয়া যাইত, আজি হয়ত হিন্দুর নাম পর্য্যন্ত জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইত। জাতিভেদ আছে, বলিয়াই শত শত সঙ্করবর্ণ হিন্দুসমাজের বিরাট গাত্রে বিষ-কণার বিস্তার করিয়াও ইহার বিশেষ কিছু অনিষ্ট করিতে পারে নাই, লক্ষ লক্ষ ম্লেচ্ছ ও যবন সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও ইহার ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং এই জাতিভেদ, হিন্দু সমাজের প্রধান অমৃতপ্রাশ। আজিকার ব্যাধিগ্রস্ত জর্জ্জরিত হিন্দু সমাজ এই অমৃতপ্রাশ সেবন করিয়া এখনও সজীব রহিয়াছে।

অনেকের ধারণা এই জাতিভেদই হিন্দুর অধঃপতনের প্রধান কারণ; এই জাতিভেদ না থাকিলে হিন্দুগণ এখনও স্বাধীন থাকিত; এই ধারণা যে বিষম ভ্রমমূলক, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। আমাদের বালকগণ ইংরেজি ইতিহাস পাঠ করিয়া এই ভ্রম সংগ্রহ করে;—সেই সকল হাস্যোদ্দীপক ইতিহাসে লিখিত আছে যে, চতুর ব্রাহ্মণগণ

আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জাতিভেদরূপ এই কঠোর শৃঙ্খলদ্বারা হিন্দু সমাজের সর্ব্বাঙ্গ বাঁধিয়া রাখিয়াছে।" যে সকল অর্ব্বাচীন ঐতিহাসিকের লেখনী হইতে এইরূপ অসার মত প্রসূত হয়, তাহাদিগকে পণ্ডিতসমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত; কারণ তাহারা লোকচরিত্রের তিল মাত্রও আলোচনা করিয়া দেখে নাই। জাতিভেদ যে, প্রাকৃতিক নিয়মে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তর হইতে ক্রমে ক্রমে উন্মেষিত হইয়াছে, অথবা আপনা হইতে উন্মেষিত হইয়া হিন্দুসমাজকে ক্রমে ক্রমে গঠিত করিয়াছে বীরমালা গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা গিয়াছে *। তাহাতে ঋগ্বিচন সকল উদ্ধৃত করিয়া এবং সমাজ তত্ত্বের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যসমাজ কর্ম্মবশে ক্রমে ক্রমে চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা প্রজাবৃদ্ধি, ও বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রাম—এই বর্ণবিভাগের তিনটী প্রধান কারণ। ঋগ্বেদের অন্তর্গত পুরুষ সূক্তের বচন, মহাভারতোক্ত মহর্ষি ভৃগুর ব্যাখ্যা এবং বায়ু পুরাণাদির মত বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

জাতিভেদ একটী বিশাল সামাজিক ব্যবস্থা; ইহা এক দিনে বা এক বৎসরে বিধিবদ্ধ হয় নাই। শত শত বৎসর ধরিয়া প্রাচীন আর্য্যসমাজের সহিত ইহা ক্রমে ক্রমে পুষ্টি ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। ইহা যে, শুধু ভারতবর্ষেই বিদ্যমান আছে, এমত নহে; কোন না কোন আকারে ইহাকে সকল সভ্যসমাজেই দেখা যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, মিশর, গ্রীস, রোম ও পারসিক প্রভৃতি সকল প্রাচীনদেশে ও জাতির মধ্যে, ইহা এককালে প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতবর হেরোডোটস্ বলেন যে, মিশরবাসিদিগের সাতটী জাতি ছিল; ডায়োডোরস ও প্লেটোর মতে তাহারা পাঁচটী জাতিতে এবং ষ্ট্রাবোর মতে তিনটী মাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্লেটোর টিসিয়স পাঠে জানা যায় যে, এথেনিয়ানদিগের মধ্যেও এইরূপ একটী জাতিভেদ ছিল। হেরোডোটস্ বলেন, প্রাচীন মীড়দিগের মধ্যেও এইরূপ জাতিভেদ প্রচলিত ছিল। ম্যালকম প্রণীত পারস্য ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, প্রসিদ্ধ পারসিক রাজা জামসীদ স্বীয় প্রজাবর্গকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এমন কি ইংরেজের পূর্ব্ব পুরুষ প্রাচীন এঙ্গলো-শাক্সেনদিগের মধ্যেও এককালে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত ছিল। সেই জাতিভেদ বৃত্তি ও ব্যবসায়গত; যথা, বণিক ও শিল্পকর, কৃষক, সৈনিক ও পুরোহিত। এইচারিটী সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের কেমন সুন্দর সাদৃশ্য! পণ্ডিতবর মোক্ষমূলার বলেন বর্ত্তমান ইংরেজদিগের মধ্যেও জাতিভেদ প্রথার সম্মান প্রভাব নাই * সে জাতিভেদ অর্থ মূলক; কিন্তু হিন্দুর জাতিভেদ সেরূপ নহে, ইহা ধর্ম্মমূলক—সুতরাং সাত্ত্বিক; অপরটী তামসিক। একটীর উদ্দেশ্য সমাজ রক্ষা—অপরটীর অভিসন্ধি সমাজ-ধ্বংস। ভারতীয় আর্য্যের জাতিভেদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরিভাগে সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত, ইংরেজ প্রভৃতির জাতিভেদ এখনও অপস্থায়ী সামান্য বৈশ্যবৃত্তির উপর ন্যস্ত;—অদ্যাপি তাহার বৈশ্যত্ব স্থিরীকৃত হয় নাই; তাহার নীতি গঠনতা লাভ করে নাই। নানা কারণে তাহা এখনও একটী দুরূহ সামাজিক সমস্যা-রূপে রহিয়াছে। কত দিনে তাহার মীমাংসা হইবে, অনুমান করা কঠিন। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যের জাতিভেদ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গঠিত সামাজিক নিয়মে পরিণত হইয়াছে। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়:—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্য কৃতঃ।
উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত॥১২

শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত বাজসনেয়ী সংহিতা এবং অথর্ব্ববেদেও এই পুরুষ সূক্তের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত শতপথব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও কৌশীতকী ব্রাহ্মণেও ইহার ছায়া দেখা যায়। কিন্তু সে সকল প্রাচীন ঋষি-বচনের আলোচনা এখনে হইতে পারে না। সেই সকল বর্ণিকের রূপকালঙ্কারে আচ্ছন্ন হইলেও তন্মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় গূঢ় ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। ভগবান ভৃগু গীতা অমায়ুষী প্রতিভা দ্বারা সেই মহাসত্য উদ্ধৃত করিয়া জগতের সম্মুখে জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়া গিয়াছেন:—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বমব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥"

অর্থাৎ বর্ণ সকলের ইতর বিশেষ নাই; পূর্ব্বে ব্রহ্মা যখন এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তখন ইহা কেবল ব্রাহ্মণময় ছিল,—তখন বর্ণভেদ ছিল না। ক্রমে সেই ব্রাহ্মণ জাতিই কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।

মহাভারতের এই বচন দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল যে, প্রথমে বর্ণভেদ ছিল না; তৎকালে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, ক্রমে বৃত্তি ও ব্যবসায় ভেদে বর্ণের প্রভেদ ঘটিল। পরিশেষে সুবিশাল আর্য্য সমাজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়িল। কোন অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় এই ব্যাপার ঘটিল মহাভারতে তাহাও স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে:—

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মাঃ রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজা ক্ষত্রতাংগতাঃ।
গোভ্যোরক্ষিঃ সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাংগতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধা সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃশৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাংগতাঃ।
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজাঃ বর্ণান্তরংগতাঃ॥

ম—ভা—শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অঃ।

যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ কামভোগে অনুরক্ত, তীক্ষ্ণস্বভাব, ক্রোধন, সাহসিক, স্বধর্ম্মত্যাগী ও লোহিতাঙ্গ, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা গোসমুদয় হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া কৃষিজীবী হইয়াছে এবং স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, সেই পীতবর্ণ ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যত্ব লাভ করিয়াছে, এবং যে সকল দ্বিজগণ হিংসা ও মিথ্যারত, জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত যাহারা সকল প্রকার কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে, যাহারা কৃষ্ণবর্ণ ও শৌচপরিভ্রষ্ট, তাহারাই শূদ্র হইয়াছে। এই সমস্ত কর্ম্মদ্বারা পৃথক্‌কৃত ব্রাহ্মণেরাই বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে।

বর্ণভেদের ইহা অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ব্যাখ্যা আর কি হইতে পারে? এরূপ জীবন্ত প্রমাণ সত্ত্বেও কে আবার বলিবে যে, জাতিভেদ কুটিল স্বার্থপর ব্রাহ্মণের সৃষ্টি? মহর্ষি

* বীরমালা ১-২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

* Indian Wisdom, Intro; XXIV of PP 231–232.

ভূগুর এই একটীমাত্র বচনেই সুবিশাল হিন্দু-সমাজের একটী প্রকাণ্ড তত্ত্ব বীজাকারে নিহিত রহিয়াছে! ইহা সমাজতত্ত্ববিদের বিশেষ আদরের সামগ্রী। ইহার সহিত ঋগ্‌বেদোক্ত পুরুষসূক্ত এবং ব্রাহ্মণ ও উপনিষদাদির যে অলঙ্কৃত মতের সহজেই সামঞ্জস্য হইতে পারে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুর-ঝি।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরালাল এখন আর বাড়ীর বাহির হয় না; এখন তাহার লোকলজ্জা ভয়ও ছিল, আর অন্য এক কারণও ছিল। সে কারণ অন্য কিছুই নহে—হীরালালের হৃদয়ে এখনও এতদূর বল হয় নাই যে, হীরালাল পূর্ব্ব সঙ্গিগণের প্রলোভন হইতে রক্ষা হইতে পারে। সুরেশ বাবুর চেষ্টায় হীরালাল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার দুই এক দিন পরেই তাহার সুরা-পানেচ্ছা ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল। হীরালাল এত চেষ্টা করিতে লাগিল, তত্রাচ সে পাপ ইচ্ছাকে কিছুতেই দমন করিতে পারিল না। সন্ধ্যার পরই হীরালালের এই পাপ-ইচ্ছা এতদূর প্রবল হইত যে, হীরালালকে তখন এক অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বেড়াইতে হইত। আপনার অবস্থা আপনিই অনুভব করিয়া হীরালাল বিস্মিত হইত। হীরালালের শিক্ষার আর বাকি কি? হীরালাল কি ছিল, এখন কি হইয়াছে; তত্রাচ এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তনেও হীরালালের সুরার প্রতি ঘৃণা জন্মিল না কেন? এ প্রশ্ন শত শত বার হীরালালের মনে উদয় হইয়াছে, তত্রাচ হীরালাল তাহার কোন মীমাংসা করিতে সক্ষম হয় নাই। এ সময় হীরালালের যদি অর্থ থাকিলে, হীরালাল যে পুনরায় সুরাসক্ত হইয়া পড়িতেন না, এ কথা আমাদের আর বিশ্বাস হয় না।

একজন শিক্ষিত যুবকের এরূপ পরিবর্ত্তন বড়ই শোচনীয় বিষয়। সুরার কি মোহিনী শক্তি! যাহার জন্য হীরালাল সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; যশ, মান, খ্যাতি, চরিত্র সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়াছে—সেই পাপচিন্তা হীরালাল কিন্তু এখনও পরিত্যাগ করিতে পারিল না! মানুষ কি এতই অভ্যাসের দাস? যে শিক্ষা এরূপ কু-অভ্যাসের হস্ত হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিকেও উদ্ধার করিতে পারে না, সে শিক্ষা ধিক্! যে চরিত্র হইতে এরূপ কলঙ্কের রাশ এত চেষ্টা করিয়াও দূর করা যায় না, সে চরিত্র ধিক্! যে হৃদয় এত দুর্ব্বল, যে এরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের পরও বশীভূত হয় না, সে হৃদয় কেও ধিক্!

হীরালাল নির্জ্জনে বসিয়া আপনার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় সুরেশচন্দ্র আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য দুই এক কথার পর সুরেশ বলিলেন—"তুমি এরূপ অনর্থক সময় নষ্ট করিলে চলবে না; তোমার গলায় এত বড় সংসার—কোন রকম উপার্জ্জনের চেষ্টা কর।"

হীরালাল দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিল—"ভাই সুরেশ, তোমার মতন বন্ধু আমার আর এ পৃথিবীতে নাই, তোমার কাছে কোন কথা গোপন করবো না। আমার পাপের এখনও প্রায়শ্চিত্তের বাকি আছে; এখনও সন্ধ্যার পর একটু মদের জন্য আমার মন অস্থির হয়ে পড়ে। ভাই, আমি এত চেষ্টা করছি, তত্রাচ আমি আমার মনকে বশ করতে পাচ্ছিনা। কি অশুভ-ক্ষণেই মদ খেতে শিখেছিলুম—এ বিষ কেউ যেন কখন স্পর্শ না করে।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন—"তুমি এরূপ চুপ করে বসে থাকলে, ঐ সব কু-প্রবৃত্তি মনের মধ্যে আসবেই ত। উপার্জ্জনের কোন উপায় স্থির করতে না পার, পরোপকারের জন্য জীবনকে উৎসর্গ কর, পূর্ব্বে সে কাজেতে তোমার বিশেষ আনন্দ ছিল, তুমি ত পরের কাজ পেলে নিজের কাজ ভুলে যাও। এখন সে কাজেও তোমার উৎসাহ নাই কেন?"

হীরালাল। আমি কোন মুখে আর ভদ্র-সমাজে মুখ দেখাবো? কে আর আমার ন্যায় নরাধমের কাছে উপকার প্রত্যাশা করবে?

সুরেশ। তোমার এতদূর অনুতাপ হয়েছে, তত্রাচ মদের প্রতি তোমার এখনো ঘৃণা হলো না। তোমার এ অনুতাপ কি তবে আন্তরিক নয়?"

হীরালাল। আমি এত নীচ হয়ে পড়েছি যে তুমিও আর আমায় বিশ্বাস কর না; আমি তোমার কাছেও কি মুখে কৃত্রিম অনুতাপ করবো? ভাই সুরেশ, তুমি আমার অবস্থা বুঝতে পাচ্ছো না, এ অবস্থা তোমায় বোঝাইতেও আমার ক্ষমতা নাই। আমি নিজে

মদের গুণ সব বুঝতে, সব জানছি—এই মদেরই জন্যে যেরূপ বিপদে পড়েছিলুম, এরূপ বিপদে একজন শত্রুরও যেন না পড়ে; তবুও এই মুহূর্ত্তে কেউ যদি আমায় এক গেলাস মদ এনে দেয়, আমি অমৃত জ্ঞানে তা খাই। আমার অবস্থা তুমি বুঝতে পারলে কি?

সুরেশচন্দ্রের চক্ষে এই সময় কোথা হইতে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, সে অশ্রুবিন্দু মুছিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন—"তোমায় আমি কিছুতেই সুখী করতে পারলেম না। তোমার এ অবস্থা শুনলে আমার প্রাণ ফেটে যায়। আজ একটা শুভ সংবাদ দিতে আমি এসেছি, কিন্তু তোমার মর্ম্মান্তিক কথা শুনে—আমি সে কথাও ভুলে গেছি। আফিসে, যে টাকার দাবী হয়ে, তুমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছ, সে টাকা যে তুমি একলা চুরি করনি, সে বিশ্বাস সাহেবদের হয়েছে; সদরমেট, গুদামসরকার প্রভৃতিও যে তোমার অসাবধানতার দরুণ অনেক টাকা চুরি করেছে, তার প্রমাণ সাহেবেরা পেয়েছেন। আফিসে তাই নিয়ে একটা হলস্থুল পড়েছে। আর তোমার অবস্থার কথা শুনে, সাহেবদের দয়াও হয়েছে। শেষে কি দাঁড়াবে জানি না; বোধ হয়—এ ঘটনায় তোমার ভাল হতে পারে।"

হীরালাল বিস্মিতনেত্রে অনেকক্ষণ সুরেশ চন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"ভাই সুরেশ, তোমার ঋণ আমি এ জীবনে কখনও পরিশোধ করতে পারবো না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এ সকলই তোমার চেষ্টায় হচ্ছে। কিন্তু ভাই, আমার মনের পরিবর্ত্তন না হলে, কিছুতেই আমি সুখী হতে পারবো না।"

সুরেশ চন্দ্র বলিলেন—"তোমায় আমি আর কি উপদেশ দিব? এরূপ চুপ করে, কখনও

বসে থেকো না। না, ঘুঁয়ে, ঘরে ঘসে ধর্ম্মকর্ম্মে মন দাও, তাহলেও তোমার মন ভাল হতে পারবে। আজ আমি আসি, কাল আবার দেখা করবো।"

এই কথা বলিয়া সুরেশ চন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিলেন; হীরালাল একমনে কি চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় সেই গৃহে অমলা প্রবেশ করিল। অমলা তাহার দাদাকে এরূপ বিষণ্ণ-মনে চিন্তা করিতে দেখিয়া, মনে মনে বড় ব্যথা পাইল। অমলা তৎক্ষণাৎ বলিল—"দাদা, তুমি কি ভাবছ? তোমার কিসের ভাবনা? যা হয়ে গেছে, তার জন্যে ভেবে ভেবে নিজের শরীর মাটি কর কেন দাদা?"

অমলার সেই মিষ্ট কথায় হীরালালের প্রাণের জ্বালা, অগ্নিতে জলসিঞ্চনের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইল; হীরালাল ধীরে ধীরে বলিল—"অমলা, তোমার ঋণ জন্মে পরিশোধ করতে পারবো না। কিন্তু আমি অতি নরাধম, আমি তোমার দাদা হবার উপযুক্ত নই, আমায় তুমি আর দাদা বলে ডেকো না।"

হীরালালের একথা অমলার মনোমত হইল না, এখনও ভ্রাতার প্রতি অমলার অচলা ভক্তি; হীরালালের কথায় সে ভ্রাতৃ-ভক্তির প্রবলস্রোতে হঠাৎ যেন একটা বাধা পাইল; অমলা সেই জন্য উত্তেজিত স্বরে বলিল—"আমি তোমায় দাদা বলে ডাকবো না—আমার দাদার মতন আর কার দাদা আছে? আমি আর কিছুরই অহঙ্কার করি না, আমি কেবল আমার দাদার অহঙ্কার করি।"

হীরালালের চক্ষে জল আসিল, হীরালাল-সজল নেত্রে বলিল—"তোমার হৃদয় নির্ম্মল, তোমার মন সরল, তাই তুমি সকলকেই নির্ম্মল ও সরল দেখ। আমার ন্যায় নরাধম বোধ হয়, এ পাপময় পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। এক মায়ের উদরে জন্মগ্রহণ করিলেও, তুমি স্বর্গ, আর আমি নরক। তোমার অধিক আর কি বলবো—আমি এমনই নরাধম যে এরূপ অবস্থাতেও আমার চৈতন্য হয় নাই। যে মদে আমার এই সর্ব্বনাশ হয়েছে, সেই মদের জন্য এখনও লালায়িত। আমি—"

হীরালাল আর কোন কথা বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। হীরালাল নীরবে অবনতমস্তকে রোদন করিতে লাগিল। যখন পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া অমলার দিকে চাহিল: তখন যে দৃশ্য হীরালাল দেখিল, তাহাতে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হীরালাল দেখিল—অমলার চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রুজল!

কি! অমলার চক্ষে অশ্রুজল! ভ্রাতার অবস্থার কথা শুনিয়া ভ্রাতৃগতপ্রাণা ভগিনীর চক্ষে দুইটি পবিত্র অশ্রুবিন্দু! সে, দুইটি ক্ষুদ্র অতিক্ষুদ্র বিন্দুর আবার কি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা! ভগিনীর সেই পবিত্র—অতি পবিত্র অশ্রুবিন্দুতে ভ্রাতার হৃদয়ের দুরপনেয় কলঙ্করেখা যেন তৎক্ষণাৎ মুছিয়া গেল! হীরালালের সে পাপ প্রবৃত্তি আর নাই! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে হীরালাল সেই হীরালাল ছিল, এখন আর সে হীরালাল নাই। হীরালাল কি স্বপ্ন দেখিতেছে না কি!

মাতার অনুরোধ—স্ত্রীর অভিমান—বন্ধুর উপরোধ এবং সমস্ত আত্মীয় স্বজনের গঞ্জনা ও লাঞ্ছনায় যাহা ঘটে নাই, সেই অসম্ভব ঘটনা এখন সংঘটিত হইল। ইহাদের সকলের লক্ষ লক্ষ অশ্রুবিন্দু সে কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিল, সেই কার্য্য, আজ অমলার দুই বিন্দু মাত্র অশ্রুজলে সক্ষম হইল। ধন্য অমলা! ধন্য তোমার পবিত্র অশ্রুবিন্দু!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মতামত।

ষ্টারে চন্দ্রশেখর।—আমরা গত বারে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস খানিকে কিরূপ একখানি সুন্দর নাটকে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, কেবল এই কথাই বলিয়াছিলাম। এবার অভিনয় ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। আমরা ইহার অভিনয় দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছি যে, এখন ইহার উপযুক্ত প্রশংসা করিতেও আমরা অক্ষম; আর "অনুসন্ধানের" ঘান-সঙ্কীর্ণতা হেতু এবারও যাহা বলিবার ইচ্ছা ছিল, সে সমস্ত কথা বলিতে পারিলাম না বলিয়া আমাদের আক্ষেপ রহিয়া গেল।

এই নাটকের দৃশ্যপট সকল এতদূর সুন্দর হইয়াছে যে, সেশীর চিত্রকরের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আর এক কথা কি দৃশ্যপট, কি পরিচ্ছদ অলঙ্কার প্রভৃতি সকল বিষয়েই তৎসময়োপযোগী করিয়া রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ এই নাটকের নাটকত্ব বজায় রাখিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই বিষয়ে কলিকাতার আর কোন দেশীয় রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের দৃষ্টি নাই। তাঁহারা ব্যয়বাহুল্য-ভয়ে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে দেশকালপাত্র কিছুই বিবেচনা করেন না। তাহার পর এই নাটকের অভিনেতা ও অভিনেত্রী মনোনয়নও সুন্দর হইয়াছিল, তবে রমানন্দস্বামী একজন সুদীর্ঘ শ্মশ্রু-জটাধারী সন্ন্যাসীর প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় ব্যক্তি হইলেই ভাল হইত।

তাহার পর অভিনয়ের কথা। আমরা যাহাকে রাখিয়া কাহার সুখ্যাতি করিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। "সরলার" প্রথম অভিনয় দেখিয়া আমরা যেরূপ মোহিত হইয়াছিলাম, এই "চন্দ্রশেখর" অভিনয় দেখিয়া আমরা তাহা অপেক্ষা অধিক মোহিত হইয়াছি। অভিনেতৃগণের মধ্যে চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, রমানন্দ, নবাব, ফষ্টার প্রভৃতি সকলেরই অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। তবে প্রতাপের অভিনয়ের শেষ অংশ আমাদের সন্তোষজনক হয় নাই, প্রথম হইতে গঙ্গাবক্ষে শৈবলিনীর সন্তরণ পর্য্যন্ত প্রতাপের অভিনয় অতি সুখকর হইয়াছিল, তাহার পর প্রতাপকে যেন সে প্রতাপ মনে হয় না। রণোন্মত্ত প্রতাপ আর রণভূমির মৃতপ্রায় প্রতাপ—প্রতাপের এই দুই অংশ আয়ো ভাল হওয়া উচিত। যে অংশের উপন্যাস পাঠে প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠে, সে অংশের অভিনয় দর্শনে যদি আত্মহারা না হইলাম, তবে অভিনয়কে আমরা অভিনয় বলিতে ইচ্ছা করি না। প্রতাপের অভিনেতা ষ্টার রঙ্গভূমির একজন নূতন অভিনেতা হইলেও ভবিষ্যতে তিনি ষ্টারের একজন Rising star হইবেন বলিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম।

অভিনেত্রীগণের মধ্যে শৈবলিনী, দলনী, কুলসম প্রভৃতি সকলেরই অভিনয় বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহারা সকলেই বিশেষ প্রশংসার যোগ্যা। উপসংহারে আমরা এই মাত্র বলিব—যদি স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর "দুর্গেশনন্দিনী" ও "মৃণালিনী", আজ পঁচিশ-বৎসর অভিনয়েও পুরাতন না হয়, তবে ষ্টারের "চন্দ্রশেখর" শত বৎসরের অভিনয়েও

পুরাতন হইবে না। আমরা সকলকেই ষ্টারের "চন্দ্রশেখর" অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস গঙ্গাবক্ষে শৈবলিনী ও প্রতাপের অভিনয় দর্শনেই তাঁহাদের টিকিটের মূল্য পরিশোধ হইবে।

বেঙ্গলে—বিষবৃক্ষ। বঙ্গরঙ্গভূমে বঙ্কিমের বিষবৃক্ষের অভিনয় হইতেছে। দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীর অভিনয়ে বঙ্গরঙ্গভূমি যে অনুপম সাফল্য লাভ করিয়াছেন, বিষবৃক্ষের অভিনয়ে ততদূর কৃতকার্য্য না হইলেও ইহাতে অভিনেতৃগণের গুণপণার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত যেরূপ করুণারসে পরিপূর্ণ, অভিনয়ও অনেক স্থলে তদনুরূপ হইয়াছিল। সূর্য্যমুখী, কমলমণি ও হীরার অভিনয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সুতরাং মনোহর হইয়াছিল। কুন্দনন্দিনী আরও একটু মৃদু ও লজ্জাবনতা হইলে ভাল হইত; ইহার হাবভাব আরও একটু সংযত হইলে অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে। মোটের উপর কুন্দের অভিনয়ও ভাল হইয়াছিল। পুরুষদিগের মধ্যে দেবেন্দ্রের অভিনয়ে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি; ইহার গানগুলি বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছিল; নগেন্দ্র অভিনয়ে সিদ্ধহস্ত; কিন্তু ইহার "ন্যাশন্যালী" ধরণের সুরের জন্য সময়ে সময়ে ইহার অভিনয় একটু অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল।

ইন্দুমতী।—শ্রীযোগেশ লাল তালুকদার প্রণীত। এখানি একখানি সামাজিক উপন্যাস। গ্রন্থকার মুখবন্ধে "নিবেদন" করিয়াছেন যে, উপন্যাসের উন্নতি-সাধনের ইচ্ছায় ইন্দুমতী রচনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য অবশ্য মহৎ বলিতে হইবে, কিন্তু তাহা সিদ্ধ হইবার বিলম্ব আছে, কারণ ভাষা দেখিয়া বোধ হইতেছে ইহা তাঁহার প্রথম উদ্যম। তবে এই বিষয় লইয়া পড়িয়া থাকিলে কালে তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। ফল কথা, ইন্দুমতী পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি; এই প্রথম উদ্যমে যশোদা বাবু চরিত্র-চিত্রণে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় রচনা-বিষয়ে সাবধান হইলে ইনি কালে একটী ভাল উপন্যাস-লেখক হইবেন। গ্রন্থোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে নায়ক নরেন্দ্র নাথ ও ছুটী গৌরমণি চরিত্র বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সরল ও সুললিত। ছাপা ও বাঁধা পরিপাটী।

আমরা পাবনা জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের প্রণীত "মর্ত্তে পারিজাত" নামক আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। বিদ্যার মাহাত্ম্য ও কালিদাসের মহিমা-বর্ণনই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। উপন্যাসের প্রধান-প্রধান লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলে, ইহাকে উপন্যাস বলা যায় না, কিন্তু গ্রন্থখানি উপন্যাসের ধরণেই লেখা। বাঙ্গালা ভাষার উপর লেখকের বিলক্ষণ অধিকার আছে। ভাষা মার্জ্জিত, সংস্কৃত, ওজস্বল, অথচ প্রাঞ্জল। স্বভাব যা রূপ বর্ণন যেখানে, সেইখানেই লেখক দক্ষ খেলোয়াড়ের ন্যায় ভাষায় বিচিত্র করতব দেখাইয়াছেন। যে বিশুদ্ধ রসিকতার জন্য, লেখক বিশেষ প্রসিদ্ধ, তাহা এই গ্রন্থমধ্যেও প্রচুর পরিমাণে আছে। এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় অধিক উদ্ধৃত করিবার উপায় নাই। তথাপি একটী স্থল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সন্ধ্যা সমাগত, আহারের সম্ভারনা সম্পূর্ণ উপস্থিত। একদল শৃগাল একত্র সমবেত হইয়া আনন্দ কোলাহল করিতেছে। লেখক কহিতেছেন, "তন্মধ্যে একটী 'ক্যা হুয়া হুয়া'; আর একটী 'যো হুয়া সো হুয়া'; তৃতীয়টী 'ক্যা হোগা'; এবং আর একটী 'মজা হোগা', এইরূপ শব্দ করিতে লাগিল।" তৎপরে রসিক লেখক জিজ্ঞাসা করিতেছেন "পাঠক! সকল দেশের শৃগালই হিন্দী বলে কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পার?" লেখক রসিকতার ন্যায় বঙ্কিম-শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন।

লেখক প্রথম উদ্যমেই যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে ভরসা করা যায়, যদি বাগ্‌দেবীর সেবাতে বিরত না হয়েন, তবে একজন উৎকৃষ্ট লেখক হইতে পারিবেন। মোটের উপর এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি, লেখক উৎসাহের উপযুক্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

যুদ্ধ-সংবাদ।—চীন ও জাপানে যুদ্ধ কবে থামিবে, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। গত শনিবার পিঙ্গইয়াঙ্গ নামক স্থানে উভয় পক্ষে একটী ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই যুদ্ধে চীন প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে, তাহাদের প্রায় ষোল হাজার সৈন্য হত, আহত ও বন্দী হইয়াছে। জাপান কেবল ৩০টী সৈন্য হারাইয়াছে এবং ২৭০ জন মাত্র জাপানী সৈন্য আহত হইয়াছে। বিজয়লক্ষ্মী ক্রমে জাপানের বরমালিনী হইতেছেন; কিন্তু এইত সবে সন্ধ্যা।

* *

পুণায় ভীষণ দাঙ্গা।—আমরা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, অবশেষে তাহাই ঘটিল। গত সপ্তাহে গণপতি-যাত্রা উপলক্ষে পুণা-নগরে হিন্দু মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে নাগপঞ্চমী মেলায় ইহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল; সেইজন্য আমরা বঙ্গে গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক হইতে বলিয়াছিলাম; কিন্তু প্রাত্যহিক সকল প্রকার সংবাদপত্রে যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আদৌ মনোযোগ করেন নাই। আমরা দেখিয়া বিস্মিতও স্তম্ভিত হইলাম যে, মুসলমানগণই হিন্দুদিগকে প্রথম আক্রমণ করে। হিন্দুরা গবর্ণমেণ্টের অভয় বচনে নির্ভর করিয়া গণপতির প্রতিমূর্ত্তি লইয়া একটী মস্‌জিদের সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে মুসলমানেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। দুই-তিন ঘণ্টা ধরিয়া উভয়দলে মারামারী হয়; তাহাতে একটি মুসলমান হত এবং অনেকগুলি হিন্দু আহত হইয়াছিল। মুসলমানগণ গণদেবের কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য হিন্দুরা মুসলমানদের মস্‌জিদে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি চূর্ণ করিয়াছিল। হিন্দু মুসলমানে এরূপ দাঙ্গা কি বম্বে গবর্ণমেণ্টের শোচনীয় অযোগ্যতার পরিচায়ক নহে?

* *

বিড়ম্বনা।—আমাদের নির্ভীক সহযোগী হিতবাদী বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। উদ্ভটন রাজপুরুষদিগের অপার

মহিমার নানা বিবরণ প্রকাশ করিয়া ইনি দেশের অনেক উপকার করিতেছেন। সম্প্রতি ছোট লাটের যে অশ্ব একটী অদ্ভুত কীর্ত্তি হিতবাদী-স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কিছুতেই বিস্ময় সম্বরণ করা যায় না। কথাটী এই, ছোটলাটের কোন প্রিয় চাকরের বিরুদ্ধে আলিপুরের মুনসুবীতে একটা নালিশ হয়। যেদিন মোকদ্দমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার পূর্ব্ব দিবসে ছোটলাট দার্জ্জিলিং যাইবেন স্থির করেন, কিন্তু সেই পেয়ারের চাকরকে ছাড়িয়া তিনি যাইতে পারেন না। কি করেন? তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরী মুনসব মহাশয়কে মোকদ্দমা মুলতবী রাখিতে অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লেখেন। মুনসব উভয় সঙ্কটে পড়িলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি জজ সাহেবের পরামর্শ চাহিলেন। জজ সাহেব বলিলেন যে, বিচার-ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবার অন্য কাহারও অধিকার নাই। কাজেই ছোট লাট প্রিয় ভৃত্যকে ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন!

***

চুম্বন-রহস্য।—মার্জ্জন মেজর স্মিথ কোন শ্বেতাঙ্গিনী-পর-রমণীর চন্দ্রমুখে চুম্বন চাহিয়া চারুরি হারাইলেন; কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া এদেশে ইণ্ডিয়ান সম্পাদক-সমাজে যে প্রতিবাদের ঘুম পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেক অদ্ভুত রহস্য বাহির হইয়াছে। সকলের কথা ছাড়িয়া, আমরা একমাত্র পাইওনিয়রের প্রসঙ্গ তুলিব। এই মহাপ্রভু বলিতেছেন যে, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সুন্দরীর মুখচুম্বন-অপরাধে যদি সকল রাজকর্ম্মচারিকেই বরখাস্ত করেন, তাহাহইলে মমর-বিভাগ একেবারে শূন্য হইয়া পড়িবেণ পাইওনিয়রের এই কথায় আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না। বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ও আলাতন না হইলে কেহ স্বমুখে নিজ সম্প্রদায়ের কলঙ্ক প্রকাশ করে না। কিন্তু এই সময়ে আমাদের গ্রিফিন ও এশ্‌বর্ণকে মনে পড়িতেছে! যাহারা একদিন আদর্শসতী হিন্দু মহিলাকে অসতীর কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, আজি আপনাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক পাইওনিয়রের মুখে আপনাদের এই জঘন্য কলঙ্ক-কাহিনী শুনিয়া তাহারা কি বলিবে?

***

জৈন ও পাইুর।—জলাতঙ্ক রোগের প্রতিকার করিবার উদ্দেশ্যে মহাত্মা পাইুর প্রবর্ত্তিত নিয়মে জগতের নানা স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপিত হইতেছে; ভারতেরও স্থানে স্থানে ইহার বিপুল আয়োজন হইতেছে। কিন্তু জৈনগণ ইতিমধ্যেই ইহার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদের রোল তুলিয়াছে। ইহারা বলেন যে পাইুরের চিকিৎসা-প্রণালী ভারতে প্রবর্ত্তিত হইলে অনর্থক অসংখ্য পশুহত্যা হইবে। ভারতের নানা স্থানে সভাসমিতি স্থাপিত করিয়া ইহারা এইরূপ তুমুল আন্দোলন করিয়াছে। এই আন্দোলন ধর্ম্মমূলক; সুতরাং ইহাদের কথায় কর্ণপাত করা গবর্ণমেণ্টের উচিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান

৪র্থ বর্ষ | ১২ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। | দ্বাবিংশ সংখ্যা।

পদ্মলোচন খুড়ো।

আফিঙ টুকু খাওয়া আমার অভ্যাস অনেক দিন হতে। "সংসারে আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক যদি শুধু আফিঙ থাকিত, তাহাতেই আর কিছুই আবশ্যক হইত না"—এই ঋষিবাদি-সম্মত দার্শনিক মতের অনুবর্ত্তন করিয়া আমি একে একে সমস্ত নশ্বর স্বার্থের স্বার্থের দ্রব্যজাতের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি; এখন সংসারে শুধু আমি ও আফিঙ। আফিঙের একটি দিব্য, স্বর্গীয় বস্তু বিশেষ। ইহা সেবন করাকে কু-অভ্যাস বলা শুধু ঘোরতর মূর্খতা ও অদূরদর্শিতা প্রকাশ মাত্র। ইহা অমৃত, দেবভোগ্য; সেবনে সংসারের যন্ত্রণা, শোক, তাপ, দুঃখ কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। অচিরাৎ অমরত্ব প্রাপ্ত হয়; পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করা যায়। এ শুধু আমার মত নহে এ মতের পোষকতা অনেক লব্ধনামা ব্যক্তিও করিয়া থাকেন;—যথা ডিকুইন্সি, কোলরিজ, কমলাকান্ত। কে না স্বীকার করিবেন যে, পূর্ব্বোক্তদুই প্রসিদ্ধ লেখক আফিঙ-সেবন-ব্যতীত কখনই এতদূর যশস্বী হইতে পারিতেন না? আফিঙ লেখকের লেখনী, কবির কল্পনা, নির্ধনের ধন, রোগীর ঔষধ, শোকতপ্তের সান্ত্বনা, সংসারে সকল অভাবের পূর্ণতা-সম্পাদক। যদি ইহা বিশ্বাস না হয় De Quincey'র "আত্মচরিত" দেখ, Coleridge এর Kubla Khan পড়,—সন্দেহ অপনীত হইবে।

আমি যে আফিঙকে "স্বর্গীয়" "দিব্য" "দেবভোগ্য" বলিয়াছি, তাহার অর্থ আছে। তোমরা বল যে আফিঙ Papaver Somniferum বা পোস্তবৃক্ষের নির্য্যাস মাত্র। ইহাতে আফিঙের উৎপত্তির নিগূঢ় কারণ দেখান হইল না। আজ কাল বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে লোকের মন বড়ই সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; উপরটী দেখিয়াই সন্তুষ্ট হয়: তলাইয়া বুঝিতে, ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যে

কোন একটী ব্যাপারের মূল কারণ পর্য্যন্ত যাইতে কাহারও প্রবৃত্তি নাই—সাহস নাই। বারুদে আগুন লাগিল আর শব্দ হইল, বৈজ্ঞানিক বলিলেন "অগ্নি সংযোগ" "শব্দ হইবার কারণ!" আরে ছিঃ! এও কি একটা কথা?—Immediate antecedent ত সত্য-যুগের ব্যাপার। সাধারণ লোকের মতে তাই মত না দিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে সেকেলে পথে পদার্পণ না করিয়া আমি আমার আবিষ্কারিকা ধীশক্তির বলে, গভীর-গবেষণার সাহায্যে, আর অহিফেনের করুণাপূর্ণ অনুগ্রহে এক নূতন উৎপত্তি-কারণ স্থির করিয়াছি। কথাটী পৌরাণিক; অথচ একদা দেবরাজ ইন্দ্র বিষম-বিপদ-সঙ্কুল অসুর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রবিদ্ধ, শোণিতে* দেহ ভাসমান। যন্ত্রণায় জিদিবেশ্বর নিতান্ত ব্যথিত ও অস্থির হইয়া পড়িলেন। পতিপরায়ণা শচীর অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও যন্ত্রণার কিছু উপশম হইল না। তখন দেবগণ ভীত হইয়া ব্রিয়মনে ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা যবিশেষ অবগত হইয়া বলিলেন "হে দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না—সুরারি-ত্বরায় সুস্থ হইবেন। বৈদ্যশ্রেষ্ঠ কৈলাসনাথ মহাদেবকে সংবাদ দাও। তিনি অচিরাৎ ইহার প্রতীকার করিবেন।" তাঁহারা তাহাই করিলে, অনতিবিলম্বে মহেশ্বর বৃষারোহণে ইন্দ্রলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং সুরারিকে ক্ষতাদি বিশেষ যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "হে শচীকান্ত! তোমার চিন্তা আবশ্যক; তুমি নিদ্রিত হইলে সমস্ত বেদনা দূর হইবে।" দেবতারা নিদ্রা কাহাকে বলে, কেহ জানিতেন না; দেবলোকে চিরকাল দিন,—আলোক। রাত্রি নাই, অন্ধকার নাই, নিদ্রোপযোগী কোন বন্দোবস্তই নাই। বিশেষতঃ দেবতাগণকে সৃষ্টি রক্ষার জন্য সতত পাহারা দিতে হইত—দৈত্যভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত—কাজেই নিদ্রার বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিলেও (কিন্তু ছিল না) তাঁহারা কার্য্যতঃ সে সুখোপভোগে বঞ্চিত ছিলেন। অতএব নিদ্রা শব্দের কেহ মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া করযোড়ে দেবাদিদেব ভর্গবান চন্দ্রচূড়কে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হে পার্ব্বতীনাথ! আমাদের অজ্ঞতার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া আদেশ করুন "নিদ্রা কাহাকে কহে।" শশাঙ্কশেখর উত্তর করিলেন—হে দেবগণ! তোমরা অনেক সময় দৈত্যগণের মৃত্যু দেখিয়াছ; নিদ্রা সেইরূপ একপ্রকার চৈতন্যশূন্য অবস্থা বিশেষ। অবে বিভেদ এই যে মৃতাবস্থায় মানসিক প্রক্রিয়ার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না, চিৎশক্তি অড়ের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়, শারীরিক-বৃত্তিগুলিও নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করে। কিন্তু নিদ্রায় সেরূপ নহে; ইহাতে মানসিক ক্রিয়া প্রথমতঃ লক্ষিত হয়; কোন কোন দৈহিক ব্যাপারের সম্যক পরিস্ফুরণ দেখা যায় (যেমন পচন কার্য্য)। দার্শনিকদিগের এ বিষয়ে মতভেদ* থাকিলেও আমি যাহা বলিলাম তাহা

* "দেবশোণিত" অর্থাৎ "Ichor" Homer বলেন।

A Pure emanation :uncorrupted flood
Unlike our gross diseased teres-tiral blood"
Illiad.

* মতভেদ যথা Locke বলেন "The soul thinks not always for there is no proof Motive sleep "(Bk II, ch. L Essay concerning Human understanding) ইহার প্রতিবাদ দেখ Liebnit's Mayeh Essais.

স্বীকার করিয়া লইতে আপত্তি দেখি না। তবে আমি দেবরাজের নিদ্রাবিধানোপযোগী ঔষধ প্রস্তুত করিতে চলিলাম।" এই বলিয়া ধন্বন্তরি স্বীয় ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পুরাণ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডারের পুত্র সিজার বোর্জিয়া (Caesor Borgia) ও তাঁহার শিক্ষাদাত্রী La Tofania যে উপায়ে নানা প্রকার বিষাক্ত দ্রব্যের সৃষ্টি করিত, অবিকল সেই প্রকরণে,—Retort, Distiller, condenser, প্রভৃতি যন্ত্রাদির যন্ত্র সাহায্যে মহাদেব তাঁহার সর্প সকলের মুখনিঃসৃত ফেন হইতে এক প্রকার ঔষধ নির্য্যাসবৎ বস্তু প্রস্তুত করিলেন। ইহার নাম মর্ত্তলোকে "অহিফেন"—অহি অর্থাৎ সর্প তাহার মুখনিঃসৃত ফেন হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এরূপ কোন পদার্থ। অহিফেন শব্দে ইহার উৎপত্তি কারণ বুঝা যাইতেছে। অনন্তর ভগবান বৃষভবাহন অহিফেন হস্তে দেবরাজ সমীপে আসিয়া কহিলেন "হে সুরেন্দ্র! আমি ঔষধ আনয়ন করিয়াছি ইহা পান করিলে অচিরাৎ তুমি যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ইহা আর কিছুই নহে শুদ্ধ কঠিনীভূত নিদ্রামাত্র*। বরফ ও বাষ্পে যে সম্বন্ধ অহিফেন ও নিদ্রায় সেই সম্বন্ধ। এই ঔষধ পান করিবার দুই প্রকার বিধি আছে; প্রথম সামান্য পরিমাণে ইহা লইয়া গলাধঃকরণ, দ্বিতীয়, অগ্নি সাহায্যে ইহাকে ধূমে পরিণত করিয়া সেই ধূম পান। দ্বিতীয় উপায়ে পান করিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা বলিয়া আমি তোমাকে প্রথম উপায়ে সেবন করিতে উপদেশ দিতেছি। ইহার প্রধান অনুপান দুগ্ধ"। এইরূপ সেবন বিধি সবিশেষ বিবৃত করিয়া মহাদেব দেবরাজকে "নীরোগ হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদান্তর কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন। দেবরাজও অহিফেন সেবন করিয়া গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলেন। তাঁহাকে এইরূপে নিদ্রিত দেখিয়া দেবতারা বলিলেন "এস আমরাও ইহা পান করিয়া বরক্লান্তি অপনোদন করি।" "এইরূপে একে একে সমস্ত দেবগণ নিদ্রা-ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিতে লাগিলেন; দেবীগণও বিরাম-লাভেচ্ছায় তাঁহাদের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। বৈকুণ্ঠে, ক্ষীরলোকে, স্বর্গের সকল স্থানেই সংবাদ পৌঁছিল যে মহাদেব এক আশ্চর্য্য ওষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। অনন্তর শুনিয়া সকলে ইন্দ্রলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিতে গিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া ভূমে শায়িত হইলেন। দেবলোক নিস্তব্ধ নিঃসাড়; উচ্চধ্বনি নাই, হর্ষকোলাহল নাই। ব্রহ্মা এতক্ষণ যোগমগ্ন ছিলেন—কিছুই জানিতেন না। যোগভঙ্গ হইলে দেবলোকের এইরূপ অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধানার্থ সুরেন্দ্রভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন;—দেখিলেন দেবগণ নিদ্রিত হইয়া ভূম্যবলুণ্ঠিত দেহে অবস্থিতি করিতেছেন; দেবরাজের মস্তকে কিরীট নাই; হস্ত হইতে বজ্র স্খলিত হইয়া দূরে পড়িয়া রহিয়াছে; পদতলে আলুলায়িতকুন্তলা আলুথালুবেশে শচী শায়িতা;—অদূরে বিশাল তেজোগর্ভ-বপু নারায়ণ সুমেরু শৈলের ন্যায় পতিত। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধূলায়; কৌস্তুভ

* মহাদেব Nonmena ও Phenomena বিভেদ বোধ হয় সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। একটু পূর্ব্বে নিদ্রাকে কোন একটী বিশেষ অবস্থা" বলিয়াছেন এখানে আবার 'পদার্থ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। Phenomena মানসিক ব্যাপার; noumena পার্থ matter ;" মনকে aettenuated form of matter বলিয়া মহাদেবকে materiaist শ্রেণীভুক্ত করিলে বোধ হয় কথাটা তত অসঙ্গত বোধ হইবে না।

ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত নিকটে জলিতেছে। পদ্মযোনি ধ্যানস্থ হইয়া অবিলম্বে ইহার কারণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তখন মহাদেবের ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাঁহার সাতিশয় কৌতূহল জন্মিল,—নারায়ণের হস্ত হইতে অহিফেন লইয়া একটু সেবন করিলেন,—চক্ষু মুদিয়া আসিল; শরীর অবশ হইয়া পড়িল; নিদ্রায় ব্রহ্মা ঢলিয়া পড়িলেন। —হস্তস্থিত ভুক্তাবশিষ্ট অহিফেন পড়িয়া গেল। ‡

From morn

To noon it fell, from noon to dewy eve
A summer's day, and with the setting sun
Droppped from the zenith like a star,

ভূ-পৃষ্ঠে পড়িয়া সেই দিব্য বস্তু অহিফেন বৃক্ষে পরিণত হইল। ত্রয়োত্রিশকোটী দেবতা নিদ্রিত রহিলেন। বাকী থাকিলেন শুধু চারি জন ১। যম;—পাছে তাঁহার বন্ধীবর্গ এই সংবাদ পাইলে বলপূর্ব্বক ইহা পান করিয়া ফেলে এবং এইরূপে তাঁহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করে, এই ভয়ে ইচ্ছা থাকিলেও তিনি ইন্দ্রলোকে যাইতে পারেন নাই। ২। মহাদেব;—তিনি বিষ খাইয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন অহিফেন আর তাঁহার কি করিবে? ৩। চন্দ্র,—তাঁহার শীতল নিবাসে অহিফেন এত কঠিনতা প্রাপ্ত হইল যে, তাহা গলাধঃকরণ দুঃসাধ্য কাজেই চন্দ্রদেবকে নিরস্ত হইতে হইল। ৪। সূর্য্য—তাঁহার উষ্ণ-হস্তস্পর্শে অহিফেন "স্বপ্ন ও নিদ্রায়" পরিণত হইয়া জগৎময় পরিব্যাপ্ত হইল। ভগবান মরীচিমালী একবার ভাবিতেছিলেন যে মহাদেব কর্ত্তৃক দ্বিতীয় উপায়ে অহিফেন সেবন করিবেন;—কিন্তু "ভাতার কাশরোগ আছে আমারও হইতে পারে" এই ভয়ে ধূমপান করিতে সাহস হইল না। ইতি অহিফেনোৎপত্তি-বিবরণ সমাপ্তং।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

পাপ ও পুণ্য।

(৬)

এখন দেখা যাউক, পাপপুণ্য সমাজগঠিত না ঈশ্বরাভিপ্রেত। যাহা দ্বারা শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক দুঃখ হয়—তাহাই পাপ। মনুষ্যগণ ক্রমে এক বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিয়া যাহা পাপ বলিয়া স্থির করিয়াছে, এবং যাহা নিজে করিলে অন্যের অপকার হয়, তাহা ভবিষ্যতে অন্য কেহ করিলে নিজেরও ঐরূপ অপকার ঘটিতে পারে—এই বিবেচনা করিয়াই রাজা বা সমাজপতিগণ পাপের পরিমাণানুসারে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে পাপ পুণ্য সমাজগঠিত বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাপপুণ্য সমাজগঠিত নহে, পাপপুণ্য ঈশ্বরিক নিয়ম। ঈশ্বরিক নিয়ম রক্ষা করাই পুণ্য এবং তাহা লঙ্ঘন করাই পাপ। সমাজ তাহার প্রকাশক এবং রক্ষক মাত্র। যে কার্য্যের পরিণাম দুঃখময়, তাহাই পাপ। কিন্তু সেই দুঃখটি সমাজ গঠিত নহে। কুকার্য্যের অভ্যন্তরে ঐশ্বরিক নিয়মেই দুঃখ লুক্কায়িত থাকে। মনুষ্য সেই দুষ্কার্য্য করিয়া দুঃখ পায়, এবং সমাজ এইরূপ কার্য্য পরম্পরাদ্বারা পাপ স্থির করিয়া দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং দুষ্কার্য্য মধ্যে যে পাপ নিহিত আছে, তাহা সমাজ-সৃষ্ট নহে, তাহা ঐশ্বরিক নিয়ম।

শাস্ত্রে আছে—ঋতুভিগমন পাপ। মানব সমাজ স্থির করিল, ঋতুকালে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে উপদংশের বিষ থাকে এবং ঋত সংযোগে তাহা মনুষ্য শরীরে প্রসারিত হইয়া কালে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। সুতরাং সমাজ তাহা ঘৃণনীয় বোধ করিয়া ঋতুভিগমন নিষেধ করিল।

এখন দেখা উচিত যে, এই ঋতুভিগমন পাপ কি সমাজগঠিত? না তাহা নহে। ঋতুকালে যে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে উপদংশের বিষ থাকে, তাহা সমাজ কৃত বিধি নহে। তাহা ঐশ্বরিক নিয়ম। সুতরাং সমাজ পাপের সৃষ্টা নহে, প্রকাশক মাত্র।

পাপের দণ্ডদাতাও ঈশ্বর। যদিও আমরা রাজা বা সমাজপতিকে দণ্ড দিতে দেখিতে পাই, তাহাও পরম্পরাভাবে ঐশ্বরিক নিয়ম। যিনি আইনকর্ত্তা, তিনিই ভিন্নমূর্ত্তিতে দণ্ড বিধাতা। যে পাপী ধন-বলে বা অন্য কোন বলে রাজা বা সমাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নির্দ্দোষ হইল, সে কখনই ঈশ্বরের নিকট নিষ্পাপ হইতে পারিবে না। তাহাকে অবশ্যই একদিন না একদিন তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। এস্থলে কেহ কেহ বলেন যে যে সমস্ত পাপীর দণ্ড হয় না, মানসিক যন্ত্রণা তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত। আমিও বলি মনোনরকের সাধারণ নাম। মনোনরকের ভীষণ যন্ত্রণা দ্বারা অনেকেরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই মানসিক যন্ত্রণা কেন হয়? মনের একজন পুলীশ কর্ম্মচারী মিথ্যা কথা সাজাইয়া। একটি নির্দ্দোষব্যক্তিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবার ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইল। রক্তের তেজে, তখন স্ফূর্ত্তিতে বুক ফুলিয়া উঠিল। উচ্চপদ—মোটা বেতন, সমাজ খ্যাতি, সুতরাং সেই মহাপাপকে পাপ বলিয়াই গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু ক্রমে রক্তের তেজ কমিয়া আসিতে লাগিল, আর ঐ পাপ চিন্তা প্রবল হইতে লাগিল। নির্জ্জনে বসিলে ঐ চিন্তা, শয়ন করিলে ঐ চিন্তা, ক্রমে ঐ চিন্তা তাহার মস্তক সহস্রটি হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য মনে শান্তি নাই। সর্ব্বদা মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির। বল দেখি, এ মনোনরক কেন? তখন তাহার সে দোষ প্রকাশের ভয় নাই, সমাজের ভয় নাই, তবে কেন সে ভীত হয়? সে ভয় কাহার? এক্ষণ অবশ্য বলিতে হইবে যে, সে ভয় কোন অপ্রত্যক্ষ দণ্ডদাতা হইতে। যে সর্ব্বব্যাপী নয়ন অন্তরে থাকিয়া সমস্ত পাপ প্রত্যক্ষ করে, যে সর্ব্বব্যাপী হস্ত হইতে কোন পাপীর নিস্তার নাই, সেই অপক্ষপাতী দণ্ডবিধাতার ভয়েই পাপীর হৃদয়ে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। মনুষ্য যদি নিশ্চয় জানিত যে, কোন ক্রমে রাজা বা সমাজকে প্রতারিত করিতে পারিলে পাপের আর কোন দণ্ড নাই, তবে গুপ্ত পাপের স্রোত এত প্রবল হইত যে তদ্দ্বারা সংসারে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইত।

বিশেষতঃ—"জগৎ কর্ত্তা পরমেশ্বর পাপীর দণ্ড-বিধাতা" এই বিশ্বাসই দুর্ব্বলের একমাত্র

† দেবতারা অমৃত, সুরা বা সুধা পান করিতেন তাই বোধ হয় অহিফেন তাঁহাদের পক্ষে বেশী নিদ্রাকারক।

শান্তিস্থান। মনে কর, আজি তোমার অপেক্ষা কোন প্রবল ব্যক্তি তোমার প্রতি পাশবিক অত্যাচার করিল, কিন্তু তুমি দুর্ব্বল তাহার কোনই প্রতিকার করিতে পারিলে না, তখন তোমার মনে কি কোন অপক্ষপাতী বিচারকের কথা উদিত হইবে না? তখন কি তুমি সেই আদালতে দরখাস্ত দিয়া ফলের প্রত্যাশায় ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকিবে না? অবশ্য থাকিবে। এবং দৈব ঘটনায় সেই পরাক্রমশালী অত্যাচারীর কোন অমঙ্গল হইতে দেখিলে তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইবে। তখন তুমি দুই হাত তুলিয়া সেই ন্যায় বিচারের প্রশংসা করিতে থাকিবে। কেবল তুমি কেন সেই ন্যায় বিচারের জন্য তোমার স্বদেশবাসীরাও আনন্দিত মনে বিচারকের প্রশংসা করিবে। যে অত্যাচারী (পাপী) রাজশাসন বা সমাজ শাসনের বহির্ভূত, তাহার দৈবকৃত অমঙ্গলে কে না সন্তুষ্ট হয়? সুতরাং বলিতে হইবে ঈশ্বরই পাপীর একমাত্র দণ্ডদাতা। রাজশাসন বা সমাজ-শাসন তাঁহারই অন্যতর শক্তি মাত্র।

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

বর্ষা-বিরহ।

শরৎকাল।

বরষা ভইল শেষ; ভাদরে যমুনা বারি
হানে সখি একুল ও কুল
কেমনে বঁধুয়া মোর আসিবে গোকুলে সখি?
যমুনা যে ভেল প্রতিকুল।
ভাসাইয়ে উভ তট পশিছে কানন মাঝ
কাঁহে সখি যমুনার বারি?
চ্ড়িছে কি শ্যামে মোর দিবে কি আমায় ফিরি?
বুঝল কি বিরহ হমারি?
অথবা, যমুনা বুঝি মোর সম অভাগিনী
ধায় নাথ তরে অবিরাম;
কেমনে যাইব হাম ভাদরে যমুনা পার?
শ্যাম সনে বিধি মোরে বাম॥
আশিন আসিল সই ধরা হরষিত ভেল
রাকা শশী হাসল আকাশে,
হরিত বরণ ভেল কাননে যতেক তরু,
কাঁপে লতা অনিল পরশে;
কেতকী কাননে সখি পশিয়া ভ্রমরা দল
যোগী সাজে পরাগ মাখিয়ে;
দে সখি ভসম দে আমিও সাজব যোগী,
যোগী হব কানুর লাগিয়ে।
শরতে শারদা পায় ছার তনু তেয়াগিব
শ্যাম নাম জপি অবিরাম;
জপই যে শ্যাম নাম নাহিক মরণ তার
শ্যাম সনে বিধি মোরে বাম॥

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ভবল্ খুন!!

(২)

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ রামধন ঘোষাল যে, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ; তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ পাই বা না পাই, মনে কিন্তু একটা ধারণা হইল;—যেন অন্তরাত্মা তারস্বরে বলিতে লাগিলেন, রামধন ঘোষালের কোন অপরাধ নাই। এইরূপ ভূতোর বধার্থ যত আন্দোলন করিতে লাগিলাম, ততই দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ভূতোই মতি ঘোষকে খুন করিয়াছে। প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক যে, রামধন ঘোষাল মতি ঘোষকে কেন খুন করিবে? সে তাহাকে টাকা ধার দিয়াছিল; টাকা না পাওয়াতে দুই তিন বার মতির দেশে তাগাদা করিতে গিয়াছিল; এইত মনান্তরের কারণ; এই সামান্য কারণে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মতির দেশে যাইয়া তাহাকে খুন করিবে? সে মতিকে খুন করিবে বলিয়া শালিকা হইতে চালচিঁড়ে বাঁধিয়া ৫০।৬০ ক্রোশ দূরে যাইবে?

দ্বিতীয় কথা মতিকে কোদালে করিয়া কাটিয়াছিল। যদি ব্রাহ্মণ তাহাকে খুন করিল, তবে কোদাল কোথা পাইল? আশ্বিন মাস; বর্দ্ধমান জেলার অধিকাংশ জমিতেই ধানের চাষ হয়। এই সময়ে এই সকল স্থানে রোজ গলায় করিয়া ধান বাড়িতে থাকে; যদি জলে প্রায় পূর্ণ; নিড়ান শেষ হইয়া যায়। এসময়ে তবে মাঠে কোদাল কিসের জন্য? আর যদিই কেহ ঘাই ঘোগ বাঁধিবার জন্য কোদাল লইয়া যায়, তাহাও অল্প;—ব্রাহ্মণ কোথায় কোদাল পাইলেন? ভূতো ও পাঁচু সাক্ষ্যে বলিয়াছিল যে, ব্রাহ্মণ তাহাদিগের হাত হইতে কোদাল কাড়িয়া লইয়া মতিকে খুন করিয়াছিল, একি সত্য? ব্রাহ্মণের গায়ে এত জোর যে, সে ভূতোর হাত থেকে কোদাল কাড়িয়া লইয়া বলবান্ ও যুবা পুরুষ মতি ঘোষকে খুন করিল?

তৃতীয় কথা ভূতো ও পাঁচু মতি ঘোষের সঙ্গে তাহারই জমিতে মজুর খাটিতেছিল; সুতরাং এক জমিতেই তিন জনে কাজ করিতেছিল। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ তাহাদের দুই জনের মধ্য হইতে মতিকে খুন করিল! কথাটা কেমন কেমন বোধ হইল।

এইরূপ নানা প্রকার সন্দেহ হওয়াতে আমি একেবারে বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলাম;—উদ্দেশ্য একবার ব্রাহ্মণকে স্বচক্ষে দেখিয়া স্বকর্ণে তাহার কাছে সমস্ত কথা শুনিব। যাইবার আগে তিনটী পাকা গোয়েন্দা রাখিয়া যাইলাম। তাহারা কুবাজপুর ও তাহার নিকটস্থ গ্রামে সন্ধান লইবে; ইহাই তাহাদিগের উপর আদেশ। বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম,—করিয়া কুবাজপুরের দ্বিতীয় খুনের কথা বলিলাম এবং দুইটী খুন সম্বন্ধে যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সমস্তই নিবেদন করিলাম। সাহেব শুনিয়া খুসী হইলেন; বলিলেন "তোমার কপাল বড় ভাল, ভগবান তোমার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।" তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আমি জেলখানায় উপস্থিত হইলাম এবং ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।—দেখিলাম ব্রাহ্মণ একমনে হরিনাম জপ করিতেছেন। দেখিয়া বোধ হইল তাঁহার বয়ঃক্রম ৫২।৫৩ বৎসর হইবে। মাথার চুল

প্রায় সমস্তই সাদা। গোঁফ দাড়ি কামান তবে হাজতে থাকাতে অল্প অল্প গোঁফ দাড়ি গজাইয়া উঠিয়াছে।" আকৃতি মধ্যম, গঠন বলিষ্ঠ,—হাড়ে মাসে জড়িত। বর্ণ গৌর; একে বয়েস বেশি হইয়াছে, তাহার উপর এই মনঃকষ্ট; বর্ণ ম্লান ও ফ্যাকাসে হইয়া পড়িয়াছে; মুখাবয়ব দীনতা-ব্যঞ্জক; গণ্ড স্ফীত, ললাটের মাংস কোঁচ। ব্রাহ্মণ হাতে পৈতা জড়াইয়া একমনে ইষ্টদেবকে স্মরণ করিতেছেন। আমি ধীরে ধীরে তাঁহার কামরায় উপস্থিত হইলাম সেই জন্য প্রথমে তিনি জানিতে পারিলেন না। তাহার পর একটু শব্দ হওয়াতেই মুখ তুলিয়া দেখিলেন—আমি তখন "ইউনিফর্ম্ম" পরিয়া ছিলাম;—সুতরাং আমাকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণ ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমার কি কাল পূর্ণ হইয়াছে।" তখনই তাঁহার নিষ্পন্ন নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম, "কোন ভয় নাই, আপনি মুক্তি পাইবেন।"

ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আর মুক্তি পাইবার ইচ্ছা নাই; আর বাঁচিবারও সাধ নাই;—যে রাজ্যে এত অবিচার; সে রাজ্যে বাস করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল।"

আমি বুঝিলাম ব্রাহ্মণ শিক্ষিত। অধিকতর বিনয় সহকারে বলিলাম, "রাজার কিছুই দোষ নাই;—আইনের দোষ; কিন্তু তাই বা কৈ? যদি রাজ্য মন্দ হইবে, যদি আইনের দোষ থাকিবে, তাহা হইলে আপনি এতদিন বাঁচিয়া থাকিতেন না।"

ব্রাহ্মণের নিষ্প্রভ মুখে এক অপূর্ব্ব তেজ দেখা দিল; তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন "আইনে আমার কি ভাল করিল? আইন ত আমাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলাইয়াছিল, কেবল হাইকোর্ট স্থগিত রাখিল। হাইকোর্ট না থাকিলে প্রত্যহ আমার মত কত নির্দ্দোষী ব্যক্তির ফাঁসি হইত, তাহা কে বলিতে পারে?"

আমি দেখিলাম এবিষয় লইয়া ব্রাহ্মণের সহিত আর তর্ক করা বৃথা। সুতরাং অন্য কথা বলা দরকার। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; দেখিয়া বোধ হইতেছে, পরম হিন্দু। আপনি সত্য করিয়া বলুন মতি ঘোষকে খুন করিয়াছেন কি না?"

ব্রাহ্মণ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "বার বার এই বিড়ম্বনা কেন? তোমাদের পুলিশ হইতে আরম্ভ করিয়া জজ সাহেবের এজলাস পর্য্যন্ত সকলেরই কাছে ত এই কথা বলিয়াছি; তবে আর সে কথা কেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লইয়া বারম্বার এই পরিহাস করিয়া তোমরা কি সুখ পাও?" সবিস্ময়ে দেখিলাম ব্রাহ্মণের ওষ্ঠাধরের দৃঢ়তা যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। একটু সাঁত্বনা করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞা না, ইহা পরিহাস নয়; এতদিনে খুনের যথার্থ কিনারা হইয়াছে; ভূতোর সব বদমায়েসী প্রকাশ পাইয়াছে; সেই জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি বিরক্ত হইবেন না, অথবা অন্য রকম কিছু মনে করিবেন না; আপনি নিশ্চয় মুক্তি পাইবেন। এক্ষণে আমার একটী মাত্র জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি প্রাণ খুলিয়া বলুন; আপনার কোন ভয় নাই। হাইকোর্টের দৃঢ় বিশ্বাস আপনি খুন করেন নাই; তবে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; মতি ঘোষ কিরূপে খুন হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, একবার আমার কাছে বলুন; মন খুলিয়া বলুন; কিছুই সঙ্গোপন করিবেন না।"

ব্রাহ্মণ।—ডেপুটীবাবু ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যে কথা বলিয়াছি, তা ছাড়া আর কিছুই জানি না।"

আমি।—জানেন না সত্য, তবু আমার কাছে আর একবার বলিলে আপনার মঙ্গল হইবে।

ব্রাহ্মণ তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে বলিলেন।—"৩রা আশ্বিন, বুধবার ৪ঠার টে্নে আমি হাবড়া ষ্টেশনে উঠি; তার পর অনুমান ছটার সময়ে জংশনে নামিয়া কুষ্ণনগরে যাই। ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর দেড় ক্রোশ। আল পথ; সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু আকাশ বেশ পরিষ্কার; লোকজন না লইয়াই ষ্টেশন হইতে চলনা হইলাম। অভিপ্রায়, একেবারে মতির বাটীতে গিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া তবে জলযোগ করিব। পূর্ব্বে ঐ পথে আমি আরও দুইবার গিয়াছিলাম; সুতরাং ঘাতায়াতের জন্য কোন লোক সঙ্গে লইলাম না। কুবাজ পুরের কাছে পৌঁছিয়াছি, এমন সময়ে 'বাপরে মেরে ফেল্লে রে!' এই ভীষণ কথা শুনিতে পাইলাম। গোধূলি উত্তীর্ণ হইয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধছায়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে সেই চীৎকার শুনিয়া ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল; আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম; এক দিকে দেখিলাম ছুটো লোক। দেখি একটা লোককে চাপিয়া ধরিয়া কি করিতেছে,—ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম,—যাহা দেখিলাম প্রাণ উড়িয়া গেল, দেখিলাম একটা লোক দু মুষ্টিতে কোদাল তুলিয়া আর একটা লোককে কোপাইতেছে। অন্য লোকটী সেই লোককে চাপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। দেখিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন। একে আল পথ, তাহার তার সন্ধ্যার অল্প অল্প অন্ধকার; তাহাতে আবার এই ভীষণ দৃশ্য। ভয়ে দিক্ ভুল হইল; যে দিকে আল দেখিলাম, সেই দিকেই ছুটিতে লাগিলাম। সে সময়ে পেছু ফিরিয়া দেখিতে আর সাহস হইল না। কিছুদূর যাইয়া একবার পেছু ফিরিয়া দেখিলাম;—যাহা দেখিলাম তাহাতে দেহে যেন প্রাণ আর রহিল না; দেখিলাম সেই দুইটা লোক যমদূতের মত আমার পেছু পেছু ছুটিয়া আসিতেছে; তাদের হাতে সেই কোদাল; বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে, একটা খুন করিবার জন্য তাহারা আমাকেও খুন করিতে আসিতেছে। আহি মধুসূদন! আর বুঝি বাঁচিলাম না। ধরিল—ধরিল! হায় টাকার তাগাদায় এসে শেষে বিদেশে খুনীর হাতে প্রাণ দিলাম! প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম; বুড় বয়স আর কত ছুটিব, পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তাহারা প্রায় আমার নাগাইল ধরিয়াছে, এমন সময়ে দেখিলাম আর দুজন লোক আমার দিকে আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়াই রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম, "বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; বাবু রক্ষা কর।"

তাহাদের মধ্যে একজন আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া শান্তভাবে বলিল 'ঠাকুর ভয় নাই। ঠাণ্ডা হও।"

আমি বলিলাম "ঐ দেখ, ঐ দেখ, যমদূত আসিতেছে" বলিয়া পশ্চাতে দেখাইয়া দিলাম। এবং নিজেও সভয়ে দেখিলাম। তখন তাহাদের কোদাল দেখিলাম না। দুই জনেই চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "ঐ খুন করে পালাচ্ছে —খুন করে পালাচ্ছে—ধর ধর।" আমি দেখিলাম বিপরীত। দেখিতে দেখিতে লোক ছুটো আসিয়া আমাকে ধরিল। একজন সজোরে আমার গলা টিপিয়া দিল—এমনি জোরে টিপিল যেন আমার শ্বাস রোধ হইয়া

আসিল। যে দুটো লোক আমাকে অভয় দিয়াছিল, তাহারা চমকিয়া বলিল "খুন কিরে ভূতো! কাকে খুন করলে?"

খুনেদের মধ্যে একজন বলিল "মতিঘোষকে খুন করেছে। এই লোকটা খুন করে পালিয়ে আসছে।" মতি ঘোষ কে, তখন তাহা ভাবিবার আমার সময় হইল না। পর মুহূর্ত্তেই ভূতো বজ্রমুষ্টিতে আমাকে ধরিয়া গ্রামের ভিতর লইয়া গেল। তার পর পুলিশ আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিল।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ব্রাহ্মণ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম "আপনার কিছু ভয় নাই; সত্য কথা প্রকাশ হইয়াছে," আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণের প্রথম এজাহারের সকল ছিল, তাহার কথা শেষ হইলে সেই কাগজখানি বাহির করিয়া একবার মিলাইয়া লইলাম। সমস্তই মিলিয়া গেল।

(৪)

এই ঘটনার পরে কুখাজপুরে আবার ফিরিয়া যাইলাম। শুনিলাম তখনও ভূতোকে কেহই ধরিতে পারে নাই। এইবার দ্বিতীয় খুনের তদন্ত আরম্ভ করিলাম। ভাবিলাম যে এই খুনের কিনারা হইলে হয়ত প্রথম খুনেরও কিনারা হইতে পারে। ভূতো পাঁচুকে কেন খুন করিল? অবশ্য কোন গূঢ় কারণ থাকিবে। সন্ধানে জানিলাম সেই গূঢ় কারণ—রমণী। জগতে একমাত্র রমণীই অধিকাংশ খুনের কারণ। রমণীর জন্য জগতে যত খুন, যত নারামারি, যত যুদ্ধ হইয়াছে, রাজ্য বা সম্পত্তির জন্য তত হয় নাই। কিন্তু এ রমণী কে?—ইহার নাম সৌরভী; চুলের মেয়ে, বাড়ী মামুদপুরে। সৌরভীর বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু কখন সে শ্বশুর বাড়ী যায় নাই ভূতোর সঙ্গেই তার অধিক প্রসক্তি। সেই জন্য তাহারই সহিত মামুদপুর হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। মামুদপুর হইতে আসিয়া কুখাজপুরে বাসা লইয়াছিল; পাঁচু তাহার বাল্য বন্ধু; সুতরাং তাহার সঙ্গেই থাকিত। ভূতো অপেক্ষা পাঁচু দেখিতে ভাল; সুতরাং সৌরভী হতভাগিনী গোপনে তাহাকেই আত্ম সমর্পণ করিল। প্রথমে ভূতো তাহা জানিতে পারিল না। শেষে সন্দেহ হইল;—ক্রমে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইল। আর কি সহ্য করিতে পারে?—ভূতো পাঁচুকে খুন করিয়া মনের জ্বালা জুড়াইল।

এই সমস্ত সংবাদ পাইবামাত্র আমি নিজ চক্ষে সকলই দেখিতে পাইলাম—বুঝিলাম যে মতি ঘোষও এই কারণে খুন হইয়াছিল। এখন সৌরভীকে পাইলেই সকল খুনের তত্ত্ব হয়। সৌরভী সেই কুখাজপুরেই ছিল; তাহাকে আনাইয়া ভয় বৈরাগ্য প্রলোভন দেখাইয়া সকল কথা বাহির করিয়া লইলাম—তখন বুঝিলাম যে, তাহারই জন্য ভূতোও পাঁচু মতি ঘোষকে খুন করিয়াছে এবং অশেষে ভূতো পাঁচুকে খুন করিয়াছে। সৌরভীকে যত্ন করিয়া বর্দ্ধমান পাঠাইয়া দিলাম,—দিয়া ভূতোর সন্ধান করিতে লাগিলাম।

সৌরভী প্রথমে কিছুতেই বর্দ্ধমান যাইতে চাহিল না; বিস্তর কাঁদাকাটী, করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার কথা কে শুনে? হই দারওগাতেই সোজা হইল। পাঁচুর খুনের পর যখন ভূতো হঠাৎ একেবারে অদৃশ্য হইয়াছিল, তখন লোকে সৌরভীর দিকে একটু নজর রাখিয়াছিল;—সৌরভী প্রায়ই একটা বটে পুকুরে যাইত; সেই পুকুরটী পানায় পরিপূর্ণ। সৌরভী দিনের মধ্যে সেই পুকুরে ৪।৫ বার নামিত। কুখাজপুরে অনেক ভাল ভাল পুকুর থাকিতে সৌরভী সেই একটা পুকুরে কেন যাইত, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। গ্রামের সামান্য সন্দেহ হইয়াছিল; তাহারা পুকুরের পাড় খুঁজিয়া বেড়াইত, কিন্তু তাহারা কিছুই দেখিতে পায় নাই। আমি কিন্তু অনিবার্য্য স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম; ৪।৫ জন চৌকিদার সঙ্গে লইয়া আমি সেই পুকুরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তাহার যেদিকেই ঘাট নাই; সমস্ত পুকুরটী পানায় পরিপূর্ণ। জলে এমনই দুর্গন্ধ যে, কাহার সাধ্য একটু মুখে দেয়।—পুকুরের সর্ব্বত্র চাহিয়া দেখিলাম,—"একস্থানে একটী হাঁড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। হাঁড়িটী উপুড় হইয়া রহিয়াছে—যেন জলের ভিতর হইতে তাহা বাঁধিয়া রাখিয়া দিয়াছে। হাঁড়িটী দেখিয়াই আমার সন্দেহ হইল; এত হাঁড়ি কখনই উপুড় হইয়া ভাসিতে পারে না—নিশ্চয় হইয়া ভাসিবে। তখনই পুকুরের চারি দিক ঘেরিয়া দাঁড়াইতে বলিলাম এবং একটী ঢিল মারিলাম; অমনি হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গেল;—সেই সঙ্গে যেন একটী মাথা জলে নিমগ্ন হইল। সকলেই সাধুবাদ দিল। তখন শত শত লোকে পুকুর ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর বার কোথায়? ক্ষণ পরেই পুকুরের এককোণে সেই মাথাটা জাগিয়া উঠিল; তখনই শত শত কণ্ঠের চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঐ ভূতো! ভূতোকে মার—মার!" মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘন ঘন লোষ্ট্রবৃষ্টি হইল; কিন্তু আমি সকলকে বারণ করিয়া কৌশলে ভূতোকে ধরিলাম। এইবার যাদুধন যায় কোথায়?

* * * *

বর্দ্ধমানের সেশন জজ ভূতোর বিচার করিলেন—পুলিশ যে জজ নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে ফাঁসাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,' তাঁহাকে বদলি করা হইয়াছে। এবার নূতন জজ আসিয়াছেন; তিনিই ভূতোর বিচার করিলেন। পূর্ব্বোক্ত সেই জুরিই বসিল। তাঁহাদের সম্মুখে ভূতো নিজের দোষ স্বীকার করিল। ফাঁসী-কাষ্ঠে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল। রামধন সোয়াল বেকসুর খালাস পাইল।

শ্রীঅঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঠাকুর-ঝি।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরেশনাথ কোথায়? এ সংসারে আর কে তাহার সন্ধান লইবে? কেবল একমাত্র বালা এখনও তাহার নিষ্ঠুর পিতাকে ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু পরাশ্রিতা ক্ষুদ্র বালিকা কিরূপে তাহার পিতার অনুসন্ধান করিবে? কেন এরূপ হইল? হীরালালের সেই বিপদের দিন পুত্র-কন্যাকে ফেলিয়া হঠাৎ পরেশনাথ কোথায় চলিয়া গেল? হীরালালের এখন সাংসারিক অবস্থা অসচ্ছল হইলেও অমলার যত্নে সুখদা ও তাহার ভ্রাতা অমরনাথের কোন

কষ্ট ছিল না; অমলা নিজে প্রেটে না খাইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইত। তত্রাচ সময়ে সময়ে সুখদার কিছুতেই সুখ ছিল না; কেবল পিতার সংবাদ পাইবার জন্য সুখদা অনেক সময় বিষণ্ণ থাকিতেন। সুখদা তাহার সে মনোকষ্ট আর কাহার কাছে বলিবে? আর কাহাই বা সুখদার বিষণ্ণমুখ দেখিলে প্রাণ ফাটিবে? অমলা একদিন জিজ্ঞাসা করিল—"সুখদা, তোর কোন কষ্ট হলে আমায় বলিস্। আমি মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাই—তুই বসে বসে কি ভাবিস্, তুইও ছেলে মানুষ, তোর আবার এত কিসের ভাব্‌না?"

সুখদা যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"না মা, আমার অন্য কষ্ট নেই। তবে বাবার জন্যে বড় মন-কেমন করে। আমি অনেক দিন কোন খবর পাইনে।"

বালিকা কথা কয়েকটী বলিয়াই বিষণ্ণ-মুখখানি অবনত করিল। সুখদার সে ভাব দেখিয়া অমলার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। অমলা তখন আর কোন কথা বলিল না; কিন্তু অমলা মনে মনে স্থির করিল যে, বালিকার বিষণ্ণভাবের যথেষ্ট কারণ আছে। এতদিন অমলা যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায় এ কথা তাহার মনে উদয় হইতে পারে না। এখন অমলা আর কি করিবে? পরেশনাথের সংবাদের জন্য তাহার ভ্রাতাকে অনুরোধ করিল। হীরালালও এতদিন পরেশনাথের বিশেষ কোন সংবাদ জানিতেন না। তবে সে যে এই কলিকাতাতেই আছে, এ কথা জানিতেন। আর পরেশনাথের প্রকৃতিও হীরালাল জানিতেন; সুতরাং, তাঁহার বিপদের সময় পরেশনাথের অদর্শনে, তিনি বিস্মিত হয়েন নাই। তাঁহার বিপদই যে পরেশনাথের অদর্শনের কারণ, তিনি মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন। আজ অমলার কথায় হীরালালও পরেশনাথের সংবাদ লইবার জন্য বড় উৎসুক হইলেন। তিনি কিরূপে তাহার অনুসন্ধান পাইবেন — মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সুরেশ বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেশ বাবুকে দেখিয়া হীরালালের প্রথম প্রশ্ন হইল—"আচ্ছা সুরেশ, তুমি পরেশের কোন সংবাদ জান কি?"

সুরেশচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"কেন—সে কুলাঙ্গারের সংবাদে তোমার দরকার কি?"

হীরালাল। তুমি কি জান না, তাহার ছেলে-মেয়ে আমার বাড়ীতে রয়েছে।

সুরেশ। তা জানি—আবার তাকেও কি বাড়ীতে রাখবে না কি?

হীরালাল। আমার যা অবস্থা, তাতে আমি নিজেই খেতে পাই না, তা তাকে এনে রাখ্‌বো কোথা থেকে?

সুরেশ। না—পরেশনাথের দায় থেকে তুমি এখন নিশ্চিন্ত হতে পার—সে এখন আছে, পাগ্‌লা গারদে।

হীরালাল বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি! পরেশ পাগল হয়েছে? তাত আমি কিছু জানিনে!"

সুরেশ বাবু বলিলেন—"মদের পরিণাম! পূর্ণিমার শান্তি কি এ পৃথিবীতে হয় না মনে কর না কি? পাপের শাস্তি এই পৃথিবীতেই হয়। আর তোমার পরেশনাথের জীবনীত একখানি মদের ইতিহাস। তত্ত্বসন্ধান মাত্রেই হবে সে কত নীচ হয়, তা পরেশনাথই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গিয়েছে।"

হীরালাল। আমারো সেই সর্ব্বনাশ করেছে।

তার কুচক্রে পড়েই আমি সেই বিষ খেতে শিখেছিলুম।

সুরেশ। শুধু তোমার কেন—তোমার মতন কত শত লোকের ঐ পরেশ সর্ব্বনাশ করেছে।

হীরালাল। এখন সে সব কথা মনে হলে, আমার তার উপর বড় ঘৃণা হয়।

সুরেশ। আরো ঘৃণার কথা বলি শুন। তুমি যখন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াইতে লাগ্‌লে, আমি তোমারই "অনুসন্ধানের জন্য প্রথমে পরেশনাথকে খুঁজে বেড়াই। অনেক অনুসন্ধানের পর একদিন তাকে ধরেছিলুম। দেখ্‌লুম, পরেশ নাথের আর সে শ্রী নেই; তুমি বল্যে বিশ্বাস কর্‌বে না—পরেশ নাথ রাস্তার লোকের কাছে পয়সা ভিক্ষে করে, করে বেড়াচ্ছে; যেই কিছু জমাচ্ছে, অমনি মদের দোকানে গিয়ে মদ খাচ্ছে। তার সে চেহারা দেখ্‌লে ভয় হয়, মানুষ যে এত দূর পশুর সমান হতে পারে, তা আমি জান্‌তুম না। অনেকক্ষণ সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে, আমি তার এই সকল কাণ্ড দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। তার মঙ্গে কথা কইতে আমার ঘৃণা বোধ হলো। আমি তোমার কথা তাকে আর জিজ্ঞেস্ করলুম না। তখন পরেশ নাথের অবস্থা দেখে, তোমার জন্য আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো। আমি চখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে সেখান থেকে চলে এলুম।

হীরালাল সুরেশ বাবুর কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তার পর পরেশ পাগ্‌লা গারদে গেল কেন?"

সুরেশ। পাগোল হয়েছে বলেই, পাগ্‌লা গারদে গেছে। এ রকম মদ খেয়ে বেড়াবে, শেষ পাগল হবে না ত কি হবে? রাস্তায় মাতাল পাগল হয়ে লোকের উপর অত্যাচার করে বেড়াত। তার পর পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়ে, এখন পাগলা-গারদে রেখেছে। আমি তাকে সেখানেও একদিন দেখতে গিয়েছিলুম; কিন্তু রবিবার ভিন্ন অন্যবারে দেখ্‌তে যেতে দেয় না; তাই দেখা হলো না।

হীরালাল তখন আগ্রহের সহিত বলিল—"আজ ত রবিবার। চল না ভাই, আজ একবার তাকে দেখে আসি।"

সুরেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"তা চল। এখন তাকে দেখলে পুণ্য আছে। অন্তত মদের পরিণাম দেখে, মদের প্রতি একটা চিরস্থায়ী ঘৃণা হতে পারবে।"

সেইদিন বৈকালে হীরালাল ও সুরেশ বাবু বাবুলাশ্রমে পরেশনাথকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

ষট ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পড়ের মাঠের দক্ষিণাংশে আলিপুরের সীমানায় এই বাবুলাশ্রম। বাবুলাশ্রমটী যেন একখানি প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ী। চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত; কেবল উত্তর দিকে একটি প্রবেশের পথ আছে। গেটের পার্শ্বেই দ্বাররক্ষকের গৃহ, আর গেট হইতে দুই দিকে দুইটী রাস্তা ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুইধারে শ্রেণীবদ্ধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাউগাছ। গেটে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার একতল বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বাড়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কুঠারীতে বিভক্ত, এবং লোহার রেলের দ্বারা সম্মুখ দিকে দৃঢ়ীকৃত। উত্তরদিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রাঙ্গণে একটী সুন্দর পুষ্পোদ্যান। সে উদ্যান দেশীবিলাতী নানা পুষ্পে সুশোভিত। দিনের বেলা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠারীগুলি শূন্য পড়িয়া থাকে, সন্ধ্যার

সময় প্রত্যেক কুঠারীতে এক এক জন বাতুলকে শিঞ্জরাবদ্ধ করা হয়। আবার প্রাতঃকালে পিঞ্জর হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করা হয়। প্রথমতঃ বাতুলাশ্রম দুইটী প্রধানী বিভাগে বিভক্ত যাহারা ফৌজদারী আসামী হইয়া পুলিসের দ্বারা প্রেরিত হয়, তাহারা এক বিভাগ; আর যাহারা ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহিত কোন আত্মীয় স্বজনের দ্বারা প্রেরিত হয়, তাহারা এক বিভাগ। দ্বিতীয় বিভাগের বাতুলের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য মাসে মাসে নির্দ্ধারিত অর্থ দিতে হয়। প্রথম শ্রেণীর বাতুলকে মাসিক ৪০৲ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর বাতুলকে মাসিক ২০৲ টাকা, আর তৃতীয় শ্রেণীর বাতুলকে মাসিক ১২৲ টাকা করিয়া প্রতিমাসে অগ্রিম দিতে হয়। পুলিসপ্রেরিত বাতুলের ব্যয় স্বর্ণমেণ্ট নিজ হইতে বহন করিয়া থাকেন; এবং কারাগৃহের ন্যায় তাহাদিগকেও কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়। দ্বিতীয় বিভাগের বাতুলগণের কঠিন পরিশ্রমের ব্যবস্থা আছে; কারণ, ডাক্তারদিগের মতে ঔষধের অপেক্ষায় পরিশ্রমে এ রোগে বিশেষ উপকার হয়।

এখন কিরূপ পরিশ্রমের ব্যবস্থা আছে বলিতেছি। পাগল যখন নানা রকমের, তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির পাগলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিশ্রমের ব্যবস্থা আছে। যাহারা জ্ঞানশূন্য উন্মাদ; তাহারা আর পরিশ্রম করিবে কি? চিঁড়িয়াখানার হিংস্রক জন্তুর ন্যায় কেবল পিঞ্জরাবদ্ধ থাকে। যাহাদের কঠিন পরিশ্রমের ব্যবস্থা হয়, তাহাদিগকে পাথর-ভাঙ্গা, ঘানি-টানা প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়। পুলিস-প্রেরিত বাতুল প্রায়ই এইরূপ কঠিন পরিশ্রম করিয়া থাকে। যাহাদের লঘু পরিশ্রমের ব্যবস্থা, তাহারা ফুলগাছে জল দেওয়া, চট্ বা কাপড় বোনা, প্রভৃতি কার্য্য করে।

এই আশ্রমের মধ্যস্থলে একটী দ্বিতল গৃহ, সেই গৃহে এই আশ্রমের প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী বাস করেন। তাহার পর আর একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, সেই প্রাঙ্গণের দক্ষিণাংশে পাগোলদিগের থাকিবার গৃহও আছে। দুর্দ্দান্ত পাগলদিগকে এই স্থানে রাখা হয়, কারণ তাহাদের এখান হইতে পলায়ন করিবার আর উপায় থাকে না।

পরেশনাথকে বাতুলাশ্রমের এই স্থানেই রাখা হইয়াছিল, তবে পরেশনাথ বন্যহিংস্রক জন্তুর ন্যায় পিঞ্জরাবদ্ধ। হীরালাল ও সুরেশ বাবু এই আশ্রমে আসিয়া পরেশনাথের কথা জিজ্ঞাসা করিলে একজন জমাদার সেই পিঞ্জরাবদ্ধ পরেশনাথকে দেখাইয়া দিল। কিন্তু তাঁহারা হঠাৎ সে পরেশনাথকে চিনিতে পারিলেন না। পরেশনাথ তখন উলঙ্গ অবস্থায় সেই পিঞ্জরের এক স্থানে বসিয়াছিল। দূরে এই আশ্রমের চিহ্নিত একখানা বস্ত্র পড়িয়াছিল। পরেশনাথ কিন্তু কিছুক্ষণ হীরালালের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হীরালালকে চিনিতে পারিল। চিনিতে পারিয়া একটা বিকট হাস্য করিয়া পরেশনাথ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বিড় বিড় করিয়া মনে মনে কি বকিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আবার একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। পরেশনাথ হীরালালকে চিনিতে পারিয়াও কিছু কথা কহিল না; কারণ সে কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াও কথা কহিতে পারিতেছিল না। মধ্যে মধ্যে মনুষ্যের অবোধ্য ভাষায় কি বলিতেছিল, কিন্তু সে ভাষা হীরালাল ও সুরেশচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন না।

এই সময়ে সেই স্থানের একজন কর্ম্মচারী

সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি হীরালাল ও সুরেশ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনাদের সঙ্গে এব্যক্তির কোন সম্বন্ধ আছে না কি?"

হীরালাল উত্তর করিলেন—"কোন সম্বন্ধ নাই, তবে পরিচিত বটে, তাই আজ দেখ্‌তে এসেছি। এই অবস্থা দেখে, আমরাও আশ্চর্য্য হয়েছি। এরকম পাগল কি কখন আরাম হয় মহাশয়?"

কর্ম্মচারী। এখানকার ডাক্তারেরা বলেছেন—এ পাগল কখন আরাম হবে না; তবে এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হতে পারে।

হীরালাল। এরূপ পাগল হবার কারণ তাঁরা কি স্থির করেছেন?

কর্ম্মচারী। এ ব্যক্তি মদ খেয়ে খেয়ে পাগল হয়েছে। এখন মদের প্রতি ইহার কিরূপ বিদ্বেষ হয়েছে দেখ্‌বেন?

এই কথা বলিয়া সেই কর্ম্মচারী একজন চাকরকে একটা বোতল ও গেলাস আনিতে বলিলেন। সেই বোতল আর গেলাস আনিবামাত্র পরেশ নাথের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। তখন পরেশ নাথ যেন প্রাণভয়ে ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পিঞ্জরের এক কোণে দাঁড়াইয়া পুনরায় বিকট চীৎকার আরম্ভ করিল। ঘোর রূপ জীবন হানিকর বস্তু সম্মুখে দেখিলে, প্রাণ ভয়ে লোকে যেরূপ চীৎকার করে, এ চীৎকার সেইরূপ। ভূতগ্রস্ত রোগী ওঝা কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া যেরূপ চীৎকার করে—এ চীৎকারও সেইরূপ।

সেই কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে সেই বোতল গেলাস স্থানান্তরিত করিতে বলিলেন। তখন পরেশনাথ কিছুক্ষণ হাঁপাইতে থাকিল। হীরালাল আর সুরেশচন্দ্র আর সে স্থানে থাকিতে পারিলেন না। উভয়ে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। উভয়ের সে চক্ষের জলও কি পবিত্র!

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুখদা তাহার পিতার সংবাদ পাইল, কিন্তু সে সংবাদে সুখদা সুখী হইল না। অমলা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইল, এবং তাহার পিতা যে পরে আরোগ্য লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, সে বিশ্বাস তাহার মনে দৃঢ় করিয়া দিল। সুখদা সেই আশায় রহিল।

শরৎকুমারী এখন আর সে শরৎকুমারী নাই। তাহার এখন আর সেরূপ কথায় কথায় অভিমান হয় না; অতিরিক্ত অভিমানের ফল দেখিয়া শরৎকুমারী এখন বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে। এখন এই দুঃখের সংসারে শরৎকুমারী কোন বিষয়েই আর মানঅপমান জ্ঞান করিত না; প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম করিত। তবে সেই প্রথমা ঝি তাহাকে অনেক সময় কাজকর্ম্ম করিতে দিত না; সে এখন অন্যের বাড়ী চাকরী করিত, কিন্তু অবসর পাঁইলেই হীরালালের বাড়ী দৌড়িয়া আসিত; আর রাত্রিতে এইখানেই শয়ন করিত। শরৎকুমারী ও অমলা তাহাকে কাজকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিত,—"কেন মা? আমরা গুরুত খাটিয়ে খাই বলে, কি আমাদের পরকালের ভয় নেই? এতকাল যার নুন খেয়েছি, এখন তার সময় মন্দ হয়েছে বলে আমি যদি না দেখি, তবে আমার ধর্ম্মে সবে কেন? আমায় কাজ করতে না দিলে, আমি এইখানে মাথা খুঁড়ে মর্‌বো।"

হীরালালও এখন আর সে হীরালাল

নাইপ এতদিন পরে হীরালাল নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিল। স্ত্রী মলে হইলে যে তাহার উপর রাগ করিয়া নিজে অধঃপাতে যাইতে হইবে, এরূপ ভ্রম হীরালালের কেন যে হইয়াছিল, এখন অনেক সময় হীরালাল সেই কথা ভাবিত। তাহার পর হীরালালের আর এক ভ্রম দূর হইয়াছে। হীরালাল এখন বুঝিতে পারিয়াছিল, শরৎকুমারী তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। মুখে যতই দুর্ব্বাক্য বলুক না কেন; তাহার হৃদয়ের ভিতর অসীম ভালবাসা লুক্কায়িত ছিল। হীরালাল এখন শরৎকুমারীর গুণেও মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। শরৎকুমারীর প্রণয়ের সুস্নিগ্ধ ছায়ায় হীরালালের দারিদ্র্যতাপদগ্ধপ্রাণ এখন সুশীতল হইয়াছে। যে শরৎকুমারীকে দেখিলে হীরালালের প্রাণের ভিতর যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিত, এখন সেই শরৎকুমারীকে এক দণ্ড না দেখিতে পাইলে, হীরালাল এখন চারিদিক শূন্য দেখে।

আর অমলার কথা আমরা কি বলিব? এ সংসারের কুলীন অকুলীনের প্রতি অমলা সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিত। অমলা ইচ্ছা করিয়া প্রায় প্রতিদিন অর্দ্ধাশন আহার করিত, অমলা ছিন্ন বস্ত্র খেলাই করিয়া নিজে পরিধান করিত; এবং এ দুঃখের সংসারে কাহার কোন কষ্ট নাই, এই কথা জানিতে পারিলেই যেন স্বর্গ হাতে পাইত।

সাবিত্রীও সকল সময় কন্যার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। এখন এসংসার দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল অর্থের দ্বারা সাংসারিক সুখ হয় না, সাংসারিক সুখ অর্থে নাই, সাংসারিক সুখ সংসারীর মনে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শারদ-চন্দ্রমা।

এস এস চন্দ্রমা
শরতের সোহাগ মাখিয়া
আলো করি গগণ প্রাঙ্গন
বিভাসিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া,
তোমার বদন হেরে, ভুলে অশ্রু বরষণ,
দূরে চলে গেছে জলধর;
গগণ নীলিমা মাঝি, স্বচ্ছ সুষমার কোলে
আসন পেতেছে মনোহর।
এস শশী শরতের কোলে—
ভাসি স্নিগ্ধ সুধার হিল্লোলে,
আলো কর ধরা;
সোণার কিরণ তব, প্রকৃতি লাগিয়া যায়,
সাজুক রূপসী মনোহরা।
মধুর কিরণে তব, আছে কি মাধুরী যে!
বুঝিতে না পারি;
পরশে সরস প্রাণ, হৃদয় জুড়ায়ে যায়,
ঘুচে আঁখি বারি।
কত জনে আশা বীথি প্রাণে,
চাহিয়ে রয়েছে তোমা পানে
কি যেন হারায়ে,
তোমার বিমল বিভা, দূর চন্দ্রলোক হতে
যেন সে হারান-নিধি আনিবে বহিয়ে,

সাথি তব কিরণ বিমল
আলো হ'বে গগণ মণ্ডল,
আলো হ'বে ধরার বদন,
হ'বে আলো কুসুম কানন,
ফুটিবে মুকুল,
তব যে সোণার গন্ধ, উঠিবে ফুটিয়া হে
হেরি রশ্মি সুষমা অতুল।
অতি দূরে অতি ধীরে ধীরে
দেখা দিলে কত দিন পরে,
তব যে হৃদয়-তন্ত্রী, উঠিল বাজিয়া হে
চেয়ে তোমা পানে
মন্দার কুসুম মত, কত যে মলিন মুখ
উঠিল ফুটিয়া আহা বিমল কিরণে।
তোমার হাসির চেয়ে হাসি
অধরেতে উঠিল ফুটিয়া
নিভৃত সে নয়নের কোণে
অশ্রুবিন্দু গেল শুকাইয়া।
এ আহ্লাদ-রাশি
ছিল এতদিন? বল কোন্ দেশ হ'তে—
এনে, হেথা ঠেলে দিলে শশি?
ঘুচাইতে বিরহ বিষাদ
এনে দিলে কি শুভ সম্বাদ!
তাই নিশামণি!
মুছিয়া নয়ন দুটী, তুলিয়া অঞ্চল তার
পাড়িছে কুসুম-শয্যা কুসুমহাসিনী
পুষ্পবনে পুষ্পজিনি বালা
বিনি সূতে কেন গাঁথে মালা,
চেয়ে চেয়ে তোমার বদন?
সাজায়ে কুসুমাঞ্জলি, করিবে কি সুহাসিনী
শরতের শুভ আবাহন?
এসহে শারদ-শশি, ভুবন করিয়ে আলো
ব'স স্বর্ণাসনে
সুখের বাসনা গুলি, সফল করিয়ে দাও
স্নিগ্ধ পরশনে।
আশার মুকুলগুলি উঠুক ফুটিয়া
হাসি মুখে দেখ তুমি সুদূরে থাকিয়া।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দু-সমাজ।

বর্ণভেদ ও জাতিভেদ।

আমরা সচরাচর "জাতিভেদ" পদই ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু বেদ, উপনিষদ্ ও স্মৃতি সমূহে "বর্ণ"—এই পদেরই বহুল ব্যবহার দেখা যায়; ইহাতে বর্ণভেদ ও জাতিভেদ একই বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক কি বর্ণভেদ ও জাতিভেদে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখা যায় না?—আমরা এক্ষণে তাহাই দেখিতেছি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে "ঋগ্ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ"

অর্থাৎ, ঋগ্বেদ হইতেই বৈশ্য বর্ণের উৎপত্তি। মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতেও এইরূপ "বর্ণ" পদেরই অধিক

উল্লেখ আছে; কচিৎ কোন স্থানে "দ্বিজাতি" "ক্ষত্রিয়জাতি" প্রভৃতি পদের ব্যবহার দেখা যায়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনোমধ্যে এই সন্দেহের উদয় হয় যে, বর্ণভেদ ও জাতিভেদ বুঝি এক।—ক্রমে তাহা দেখা যাইতেছে। এক্ষণে বর্ণভেদ পদ্ধতী কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহাই দেখা আবশ্যক। মহাভারত ও হরিবংশের কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিশেষ বিশেষ বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এইজন্য এই বিভাগ চতুষ্টয় বর্ণনামেই কথিত হইয়া থাকে। শ্বেত, লোহিত, পীত, অসিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বর্ণরূপে সূচিত হইয়াছে।—

ব্রাহ্মণাক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম !
যেচান্যে ভূতসঙ্ঘানাংবর্ণাংস্তাংশ্চাপি নির্ম্মমে ॥
ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা ॥
ম—ভা—শান্তিপর্ব্ব ১৮৭ অঃ

হরিবংশেও এইরূপ বর্ণিত আছে;—

শ্বেতলোহিতকৈর্ব্বর্ণৈ পীতৈর্নীলৈশ্চ ব্রাহ্মণাঃ
অভিনির্বর্ত্তিতাঃ বর্ণাশ্চিন্তয়ানেন বিষ্ণুনা
ততোবর্ণত্বমাপন্নাঃ প্রজালোকে চতুর্ব্বিধাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহীপতে।

কিন্তু বর্ণচতুষ্টয়ের এই বিভিন্নতা কিরূপে সংঘটিত হইল? যখন মানব মাত্রই মনুর সন্তান, কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শ্রমে যখন সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকে, তখন এই বর্ণভেদ কিরূপে ঘটিল? যদি সিতাসিত, রক্তপীতাদি বর্ণের অনুসারেই ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ বিভক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার পূর্ব্বে বর্ণের এরূপ পার্থক্য কিরূপে কোন্ কারণে সংঘটিত হইল?—এই গভীর প্রশ্ন লইয়া একদা প্রাচীন আর্য্য সমাজ আলোড়িত হইয়াছিল। পরিশেষে মহর্ষি ভৃগু "ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং" এই সমীচীন প্রত্যুত্তর দানে সেই প্রশ্নের নিরসন করিয়াছিলেন। সংক্ষেপতঃ কর্ম্মই বর্ণবিভাগের মূল কারণ; সিতাসিত ও পীতলোহিতাদি বর্ণ, কর্ত্তার রূপকময় বিশেষণ মাত্র; কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা অর্থহীন নহে। পূর্ব্বে বলা হইল যে,—

"ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকোবর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা॥"

ইহার বিশেষ অর্থ আছে। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ইহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেখা যায়;—"পরন্ত শুক্লস্বিমলং বিশোকং গতক্লমং" অর্থাৎ শুক্ল বিমল, বিশোক ও গতক্লম। ইহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। শুক্ল বর্ণ বিমল নিষ্কলঙ্ক, উদার ও প্রসন্ন;—শান্তির পরিচায়ক, পূর্ণতা, প্রাচীনতা ও পবিত্রতার নিদান। ইহা সত্ত্বগুণের আধার: শম, দম, সত্য, শৌচ, দয়া ও আর্জ্জবের আকর; হিংসাবিহীন, নিরহঙ্কার, নির্ব্বিকার, বিশুদ্ধচেতা; ক্ষান্তিশান্তির পূর্ণ অবতার, ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদ ব্রাহ্মণগণ সেইজন্য শ্বেতবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণ।—রক্তবর্ণ ক্রোধ ও হিংসায় পরিচায়ক; রক্ত বলের আকর; জীবনী শক্তির প্রধান নিদান, সুতরাং কামভোগেরও নিদান। ক্ষত্রিয় রজোগুণের আধার; বিক্রমের অবতার; সংসার-স্থিতির অন্যতম প্রধান সহায়; সেইজন্য ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ।

বৈশ্য পীতবর্ণ।—পীতবর্ণ ধনধান্যের নিদর্শন। বৈশ্য ধনধান্যের উৎপাদক ও শ্রীবৃদ্ধিকারক; সেইজন্য বৈশ্য পীতবর্ণ; সেইজন্য ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পীতবর্ণা। বৈশ্য রজঃ ও তমোগুণের একত্র মিশ্রণে উৎপন্ন; রক্ত রজোগুণের পরিচায়ক; তমঃ কৃষ্ণবর্ণ; কৃষ্ণ ও রক্তের মিশ্রণে পীতবর্ণ উদ্ভূত হয়; সেইজন্য বৈশ্য পীতবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বৈশ্যের চরিত্রেও উক্ত দ্বিবিধ গুণের কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈশ্য দেশের ধন উত্তপাদন ও ধন বৃদ্ধি করিয়া দেশরক্ষণে বিশেষ সহায়তা করে; কিন্তু অর্থোপার্জ্জনে তাহার আসক্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে ক্রমে লালসা বৃদ্ধি পাইল; ক্রমে তমোগুণ আসিয়া তাহার অন্তঃকরণ অধিকার করিল; সেই জন্য বৈশ্য রজঃ ও তমোগুণের আধার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

শূদ্র কৃষ্ণ বর্ণ।—কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণের পরিচায়ক; হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যা, অজ্ঞানতা, প্রভৃতি বৃত্তি তমোগুণের কার্য্য। শূদ্র স্বভাবতঃ হিংসারত, বিদ্বেষী, মিথ্যাপ্রিয় ও অজ্ঞান; সেইজন্য শূদ্র তমোগুণান্বিত; অতএব শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ। এইজন্য শূদ্রগণ আর্য্যসমাজে ঘৃণিত হইয়া আসিতেছে।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মই বর্ণভেদের প্রধান কারণ; অর্থাৎ পূর্ব্বে সকলই ব্রাহ্মণ ছিল, কর্ম্মবশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে; সুতরাং কর্ম্মই বর্ণভেদের আদি কারণ অথবা বর্ণের পার্থক্য হইতেই বর্ণভেদ এবং তাহা হইতেই কর্ম্মের পার্থক্য হইয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে। সংক্ষেপে এস্থলে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। যে সকল প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনা ভারতে বর্ণভেদের প্রবর্ত্তনায় সহায়তা করিয়াছে, তৎসমুদয়কে ইহার মুখ্য কারণ বলা যাইতে পারে; আমরা সেই সকল কারণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। ১ম ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা। দেশের জলবায়ু, মানবের খাদ্যাখাদ্য, ও তজ্জন্য শারীরিক ও মানসিক অবস্থা,—এই কারণেরই অন্তর্গত। ২য় প্রজাবৃদ্ধি বা যুগধর্ম্ম। ইহাকে কিয়ৎপরিমাণে প্রথম কারণেরই পরিণাম-ফল বলা যাইতে পারে। তৃতীয় কারণ জীবিকা বা জীবনসংগ্রাম। ইহা প্রথম ও দ্বিতীয় কারণের পরিণামফল হইলেও স্বতন্ত্র কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এস্থলে দ্বিতীয় কারণটীই বিশেষ আলোচ্য। কাল যতই অতীত হইতে লাগিল, দেশে লোকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; লোকসংখ্যার বৃদ্ধিতে জীবন-সংগ্রাম বৃদ্ধি পাইল। পূর্ব্বে সকলে স্বচ্ছন্দ-বনজাত কন্দমূলফলে জীবনধারণ করিতেন, ক্রমে তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিল। এই সময়ে মহারাজ পৃথু ভারতে অবতীর্ণ হয়েন। তিনি দেখিলেন যে, কন্দমূল ফলে লোকের আর আহার সংস্থান হয় না; ক্রমে দেশে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা দেখা দিল; অনাহারে লোকজন অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই তিনি কৃষি দ্বারা শস্য উৎপাদন করিবার উপায় প্রবর্ত্তিত করিলেন। লোকের দুঃখ দূর হইল। কিন্তু লোক-সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রজাবৃদ্ধির সহিত আবাস—ভূমির পরিসর বৃদ্ধি অনিবার্য্য হইয়া উঠিল; সুতরাং আদিম অধিবাসিগণের সহিত সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। এইরূপেই দেবদৈত্যের সংগ্রাম-সূচনা। দেবতা অর্থাৎ আর্য্যদিগের রণনৈপুণ্য ও বুদ্ধির সম্মুখে দৈত্য অর্থাৎ অনার্য্যগণ দাঁড়াইতে পারিল না। তাহারা সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই আর্য্যদিগের উপর নানা অত্যাচার ও উপদ্রব করিতে লাগিল; সুতরাং তাহাদিগের দমন, রাজ্যবিস্তার ও দেশ রক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি আর্য্যকে নিত্য ব্যাপৃত থাকিতে হইল

যাহারা বলদর্পিত, সহংসিক ও ক্রোধনস্বভাব তাহারা ঐরূপ যুদ্ধকার্য্যে প্রস্তুত হইল। এইরূপে ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয়বর্ণের সৃষ্টি হইল। যুদ্ধাদি হিংসাকর কার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকাতে তাহাদিগের হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিসকল কঠিন হইয়া পড়িল; অধিকন্তু নূতন নূতন জয়লাভের সহিত লালসা ও জিঘাংসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তখন সত্ত্বগুণপ্রধানা ব্রাহ্মণ-বৃত্তিতে তাহাদের আর আদর রহিল না। এইরূপে কৃষিও বাণিজ্যাদি যাহাদিগের জীবিকা হইয়া পড়িল, তাহারা ক্রমে ক্রমে একটী নূতন সম্প্রদায়ে পরিণত হইল; তাহারাই বৈশ্য। শূদ্রেরও উৎপত্তি-কারণ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

বর্ণ বিভাগের এই সকল কারণের অনুশীলন করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বিশেষ গুণই বর্ণভেদের প্রধান কারণ—যে ব্রাহ্মণের গুণে অসংস্কৃত, সেই ব্রাহ্মণ হইত; যে ক্ষত্রিয়-গুণাবলম্বী, সে ক্ষত্রিয় বর্ণে গমন করিত, বৈশ্যের গুণাবিত ব্যক্তি বৈশ্য বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইত। নতুবা বৈশ্যের গুণযুক্ত ব্যক্তি কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারিত না। এককালে ভারতীয় আর্য্য সম্প্রদায়ে ইহাই বর্ণভেদের প্রধান নিয়মরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। এই

১৪০১ সাল।] প্রতারণা-প্রবঞ্চনা। ৬১৭

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা

পূজা সন্নিকট,

জুয়াচোরদেরও নানামূর্ত্তি।

নানা রঙ বেরঙের বিজ্ঞাপন হ্যাণ্ডবিল আজ কাল রক্ষঃস্থলে বিতরিত হইতেছে; নানারূপে হিতৈষ মফঃস্বলবাসীদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য চারিদিক হইতে ফাঁদ পাতা হইতেছে। আমরা প্রতিনিয়তই রাশি রাশি ঐরূপ বিজ্ঞাপন পত্র প্রাপ্ত হইতেছি; এবং যাহাকে রাখিয়া যে কাহার নাম অগ্রে উল্লেখ করি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বস্তুতঃ ব্যাপার বড় গুরুতর—সমস্যা চারিদিকেই, 'সাবধান—সাবধান! সম্মুখে জুয়াচুরীর বিষম ফাঁদ—নিরীহ মফঃস্বলবাসী সাবধান!

'কেমিকেল সোণার' গহনার বিজ্ঞাপন পূর্ব্বে বাজারে নানা ঢঙ্গে চলিতেছে। সেই 'খাঁটির গহনা'—সাজারের ৵০ আনার মালের ১৲ টাকা দাম চড়াইয়া—এখন কেমিকেল সোণা'! এবিষয় আর অধিক কি বলিব?

'ঘটতলার পুস্তক'—সাধারণতই লিখিত মূল্যের অষ্টমাংশে বা ষোড়শাংশে বিক্রীত হয়। কিন্তু জুয়াচোরেরা এখন আমার সুযোগ পাইয়া কি মূল্য অর্দ্ধমূল্যের হুজুগ দেখাইয়া, ডবল ডবল দাম লইয়া তাহাই আবার সস্তাভাবে বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে। ইহারই বা আর কত পরিচয় দিব?

এইরূপ সখের জিনিষের বাজারেও এসময় নানা উৎপাত উপদ্রব প্রবেশ করিয়াছে। "সুবাসিত গোলাপী নারিকেল তেলের" তো কথাই নাই; যাহার কিছু সম্বল নাই, সেও গোটাকতক পচাপাতা ও খানিকটা রঙ গুলিয়া, একটা তেল বাহির করিয়া বসিয়াছে।

ঔষধের—বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাজারের তো কথাই নাই। অর্দ্ধমূল্যে, সিকি মূল্যে, সঙ্গে আবার উপহার যোগাইয়া, ঔষধের বাজারেও জুয়াচোরদের অপ্রতুল নাই।

উপহার—ঘড়ি, জুড়ি, বাড়ী, গাড়ী যেন কিছুরই অভাব নাই। আজব সহর কলিকাতা—আজব কারখানা এখানকার!

এক এক করিয়া পরিচয় দিতে গেলে, দশখানা অনুসন্ধানেও তাহাদের স্থান হয় না। সুতরাং গুরুত্ব অনুসারে এক এক করিয়া এক একখানি বিজ্ঞাপনের আলোচনা করা যাউক।

প্রথম বিজ্ঞাপন খানি—

"মানুষের নূতন উদ্যম।

বিশ্ববন্ধু।

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সহ ৩ টাকা মাত্র।"

এই শীর্ষক। বিজ্ঞাপনটী ডিমাই এক ফর্ম্মা, অষ্টপৃষ্ঠেলমাটে লেখা। প্রথমেই সূচনায় আছে, "পাঠকগণ! কখন স্বপ্নেও যাহা আশা করেন নাই, মুহূর্ত্তের জন্যও যে ধারণা আপনাদের অন্তঃকরণে উদিত হয় নাই, এতদিনে সেই আশা—সেই ধারণা ফলবতী হইতে চলিল।"

ইহার পরেই ঐ বিজ্ঞাপনে—দেশময় প্রতারক,সকলে সাবধান,আমরাই সাধু—এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া, ঐ "পত্রের প্রয়োজনীয়তা কি", "ঐ পত্রে থাকিবে কি" উহার মূল্যের কথা,"চারি দফা" মূল্যবান উপহার" "দেখুন," "বিশেষ দ্রষ্টব্য" "অদ্ভুত পরীক্ষা", "উপহারের দ্রব্য," "আরও সুবিধা"—এইরূপ নানা প্রস্তাবে সাধারণকে আকৃষ্ট করিবার আয়োজন করা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনে দফায় দফায় বলা হইয়াছে—"আমরা লক্ষ টাকার জিনিষ এক টাকায় দিব না, ছাগল কিনিলে হাতী উপহার দিব না।" কিন্তু পরক্ষণেই "দেখুন" বলিয়া চারিদফা মূল্যবান উপহারের এক দফার পরিচয় দেওয়া হইতেছে এই,——

১। আসল খাঁটি "সোনার পাথর বসান মনোহর কারুকার্য্য বিশিষ্ট একসেট্ গলার বোতাম।—ইহা গিল্টি করা পিত্তল বা কেমিকেল স্বর্ণে নির্ম্মিত নহে, আসল ১৬ টাকা দরের সোণায় নির্ম্মিত, কসিয়া বা ঘেরুপ ভাবে ইচ্ছা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।। বোতামগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর, এ পর্য্যন্ত বিলাত ভিন্ন এ দেশে এরূপ মনোহর দ্রব্য কখনও প্রস্তুত হয় নাই। বাজারে এইরূপ এক সেট বোতামের মূল্য অন্তত ৫্ টাকা।"

এ ছাড়া, "জগদ্ধর" উপন্যাস, "দোঁহাবলী" (তুলসী দাসের) "কেমনে ভবির কলির জীব"—এসকলও ঐ উপহারের মধ্যে।

শুধু ইহাতেই কি নিস্তার আছে? ইহার উপর অদ্ভুত পরীক্ষার অথবা উপহার।——

উপহারের দ্রব্য।

১। সোণার মাকড়ী। ২। সাদা বসান সোণার আংটী। ৩। রূপার চুড়ী। ৪। রূপার চিরুণী। ৫। সৈলাইয়ের কল। ৬। সাটীনের বডী। ৭। শালের গলাবন্ধ। ৮। রেশমের রুমাল। ৯। ওয়াচ ঘড়ী। ১০। অর্গান যন্ত্র। ১১। দুরবীক্ষণ। ১২। কুরিয়ার ব্যাগ। ১৩। ইম্পাতের ক্যাশবাক্স। ১৪। ম্যাজিক ল্যাম্প। ১৫। বেষাই সাড়ী। ১৬। অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত। ১৭। বিষ্ণু হরিবংশ। ১৮। ওয়েবেষ্টরের ডিক্সনারি। ১৯। জারের ৪০ বৎসরের প্র্যাক্টুশ্ল ২০। থার্ম্মমিটার।

আরও সুবিধা।

একটী সুদৃশ্য আসল রূপা বাঁধান কলম উপহার পাইবেন।"

বুঝিলেন ব্যাপারখানা? মায় ডাকমাশুল ৩ তিন টাকা কাগজের দর—আর তাহারই এই সব উপহার! বলুন দেখি, ইহাকে কি বলিব? প্রতারণা আর কাহাকে বলে বলুন দেখি?

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই,মফঃস্বলের নিরীহ ব্যক্তিরা এই বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হইতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ'বঙ্গবাসী'-পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহাদের আপিসে প্রেরিত, এরূপ অভিযোগ-পত্র আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন এবং আমরাও নানা স্থান হইতে এরূপ পাইতেছি। কাগজ তো বাহির হয় নাই; অধিকন্তু, বিজ্ঞাপিত ঠিকানা ৪৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট গিয়া, কার্য্যাধ্যক্ষ নক্ষত্রচন্দ্র বসুর সহিতও সাক্ষাৎ হয় না। এখন ব্যাপার খানা কি—বলুন দেখি?

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর দান-কীর্ত্তি।—মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানকীর্ত্তি অতুলনীয়। দেশের প্রায় সকল সদনুষ্ঠানেই তাঁহার অশেষ দান মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি আবার মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে জলের কল স্থাপন সম্বন্ধে তিনি এক অমানুষী দানশক্তি ও অকৃত্রিম লোকানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ কল-স্থাপনায় যত কিছু টাকা ব্যয় হইবে, সমস্তই তিনি স্বয়ং প্রদান করিবেন স্বীকৃত হইয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহার যোগ্য কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর এবং তদীয় সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য মহোদয়ও আপনাদের বিশেষ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণই দেখিতে পাই,—"দাতায় দান করেন, বধিরের প্রাণ ফাটে"; আজকাল দেশের অধিকাংশ দাতারই মন্ত্রণাদাতাগণের প্রায় এই ভাব। কিন্তু মহারাণী উক্ত পারিষদদ্বয়ের চরিত্রে তাহার বিপরীত ভাব অবলোকন করিয়া—অধিকন্তু তাঁহাদিগকে মহারাণীর দানকার্য্যে সহায়তা দ্বারা মহানুভবের পরিচয় দিতে দেখিয়া, আমরা বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছি; ঈশ্বরের অনুগ্রহে, এক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থলে উপযুক্ত পাত্রেরই সমাবেশ হইয়াছে বলিতে হইবে। এক্ষণে দরিদ্র সাধারণের প্রার্থনায় এবং ভগবানের কৃপায় ইহাঁদের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হউক, এই আমাদের বাসনা।

যুদ্ধ সংবাদ।—চীন ও জাপান স্থল ও জলে সমরানল জ্বালাইয়াছে। পিঙইয়াঙ্গ যুদ্ধে চীনের বিশ সহস্র সৈন্য হত, আহত ও বন্দী হইল, চীনের ছয় জন সেনাপতি বিজয়ী জাপানের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল; তথাপি চীনের ভয় নাই। তাহার অতুল বিক্রম প্রত্যেক পরাজয়ে দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিতেছে। মধ্যে আর এ দুই দিনটা জলযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং স্থলযুদ্ধ প্রায় প্রত্যহই হইতেছে। গত সপ্তাহে যুলু নদের মোহানা দেশে উভয় দলে ভীষণ জলযুদ্ধ হইয়াছিল; তাহাতে চীনের চারিখানি যুদ্ধজাহাজ জলমগ্ন হয় এবং একখানি দগ্ধ হইয়া যায়। জাপানের একখানিও জাহাজ নষ্ট হয় নাই; তবে শুনা যাইতেছে যে, তাহার ১৮০ জন সৈন্য হত ও আহত হইয়াছে।

রুষের ভাবগতি।—এই ভীষণ চীন-জাপান যুদ্ধে সমগ্র য়ুরোপ ধীর ও প্রশান্তভাবে ঘটনাস্রোত দেখিতেছে। যুদ্ধ যতই ঘোরতর হইতেছে, ততই য়ুরোপীয় রাজাদিগের ধৈর্য্য বিচ্যুত হইতেছে। রুষ এতদিন নীরবে ছিলেন, কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারেন না; কোরিয়া জাপানের হস্তগত হইলে, তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হইবে, সেই জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু রুষ সম্রাট সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত; তাঁহার এখন জীবন সংশয়, নতুবা ঘটনাস্রোত কোনদিকে প্রবাহিত হইত, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে একটা রহস্য আছে। জারের পীড়ার বিবরণ রুষ গবর্ণমেণ্ট গোপন করিতেছে, ইহাতে অন্যান্য য়ুরোপীয় গবর্ণমেণ্টের—বিশেষতঃ ইংলণ্ডের বিষম সন্দেহ হইয়াছে। "টাইমস্" বলেন—রুষের ভাবগতি দেখিয়া বোধ হইতেছে জার চীনের সহিত মিলিত

হইবেন, এরূপ হইলে ইংলণ্ড কৈননা জাপানের সহায়তা করিবেন? ফলতঃ আমরা প্রথমেই যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম হয়ত তাহাই ঘটিবে; হয়ত এই চীন-জাপান যুদ্ধে সমগ্র য়ুরোপ রণরঙ্গে মত্ত হইবে।

***

কলিকাতায় আত্মহত্যার বৃদ্ধি।—গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তীস্থলে আত্মহত্যার বড়ই বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। গতবৎসরের সংখ্যা ৮২, এ বৎসর তাহার স্থলে হইয়াছে ১০২, ইহার মধ্যে শত করা ৪৫ জন আফিমসেবনে, আর ৩৪ জন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কেহ কেহ অবাধে আফিম বিক্রয়ই এরূপ বৃদ্ধির কারণ অনুমান করেন। কিন্তু আমরা একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নই। আমাদের মতে পাশ্চাত্য সভ্যতার বৃদ্ধিই এরূপ আত্মহত্যা বৃদ্ধির কারণ যে দেশ যত অধিক সভ্য, সেই দেশে আত্মহত্যা ততই অধিক—একথা প্রমাণ করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে ধর্ম্মবলের হানি হয়, এবং নানারূপ অভাব বৃদ্ধি করিয়া লোকের জীবন কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। তখন আত্মহত্যা ভিন্ন আর কি উপায় থাকে?

চৈতন্য লাইব্রেরি।—চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষে আগামী ১লা অক্টোবর, সোমবার, সন্ধ্যা ৬ টার সময়, মিনার্ভা থিয়েটরে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "মেয়েলি ছড়া" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

***

অনুসন্ধান-সমিতির সভ্যগণের সভা।—গত কল্য বুধবার অপরাহ্ণ ৫ঘটিকার সময়, অনুসন্ধান-সমিতির সভ্যগণের এক সভা হয়। "কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য আরও সুচারুরূপে চলিতে পারে"—তাহা নির্দ্ধারণ করাই ঐ সভাধিবেশনের উদ্দেশ্য। সভায় সভ্যগণও তাঁহাদিগের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক সভার সংক্ষিপ্ত কার্য্যপ্রণালী বিবৃত হইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় নিম্নলিখিত তিনটী প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিএল, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রথম প্রস্তাব।—অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য আরও বিস্তৃতরূপে সম্পন্ন করিবার আয়োজন করা আবশ্যক, এবং তাহার জন্য যথোচিত চেষ্টা করা হউক।

প্রস্তাবক।—শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ. হেডমাষ্টার রিপণ কলেজিয়েট স্কুল, বিদিরপুর ব্রাঞ্চ।

অনুমোদক।—শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়, সুপারিণ্টেণ্ড, রাজা বাহাদুর গোবিন্দলাল রায়ের ষ্টেট।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।—সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহে সদাশয়তার জন্য সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করা হউক।

প্রস্তাবক।—ডাক্তার বিপিনবিহারী কব্যাল বি.এ.।

অনুমোদক।—শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় প্রস্তাব।—উপরোক্ত কার্য্যের সহায়ভূতির জন্য এই বিবরণীর এক একখানি সমস্ত সংবাদ পত্রে প্রকাশ জন্য পাঠাইয়া দিয়া, সম্পাদক মহাশয়দিগকে এই বিষয়ে উচিত মত সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক।—ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী।

অনুমোদক।—শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিএ।

কাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ | ১৯শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। | ত্রয়োবিংশ সংখ্যা।

জাগ মা!

জাগ মা! জাগ মা আমার! এক বৎসর গতীত হইয়াছে; সেই সঙ্গে ভারত-সন্তানের রোদন-রোল বর্ষার পঙ্কিল-জল-স্রোতের ন্যায় অনন্ত দিগন্তে মিলাইবার উপক্রম করিতেছে; আশা—আশ্বাস—আকাঙ্ক্ষায় প্রস্ফুটিত হইয়া দীন হীন ভারতবাসীর মন শারদীয় সরোজের ন্যায় হাস্য অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে; জলে—জলে—অন্তরীক্ষে সকলেই নবীন উৎসাহে আবার জাগিয়া উঠিয়াছে; তবে মা, তুমি কেন জাগিবে না?—জাগিবে বৈ কি; তুমি মা আমার! তুমি জাগিবে বলিয়া ধরণী জাগিয়াছে; আজি সেই জন্য তাহার সর্ব্বত্রই হাস্য ও উৎসাহ। বনে—প্রান্তরে—শস্য ক্ষেত্রে চারিধারে বিকসিত কাশকুসুম উদাসভাবে মন্দ মন্দ মারুত-ভরে আন্দোলিত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে; আতটপূর্ণা তটিনী পঙ্কিল মলিনবাস পরিত্যাগ করিয়া বিমল শুভ্র বসন ধারণ পূর্ব্বক প্রশান্তভাবে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে; দিগঙ্গনাগণ কমলমালার সৌরভভার চুরি করিয়া অনন্ত গগনরূপ থালীতে অনন্ত তারাকুসুম রাখিয়া তোমার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে; তোমারই জন্য শারদ চন্দ্রমা বিশ্বপ্রক্ষালের সৌন্দর্য্য-রাশি সংগ্রহ করিয়া সহাস্যমুখে জগৎকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তবে তুমি জাগ মা!

জগজ্জননি! আদ্যাশক্তিস্বরূপিণি! সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কারিণি! তোমাকে না দেখিলে শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব—বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব লোপ পায়; নরলোক ত কোন্ ছার, ত্রিদিবের আনন্দজ্যোতিঃ নিবিয়া যায়। একদিন তুমি মহাদেবকে ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলে বলিয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সহসা নিবিড় অন্ধকারময় পাতালে নিমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আজি এক বৎসর আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছ, তবে মা, এই হতভাগ্য সন্তানদিগের কি দুর্দ্দশা

হইয়াছে, [illegible] তোমার মুখ চাহিয়াই শতাব্দীর ভারত-সন্তান সমস্ত অশেষ ক্লেশ সহিয়া রহিয়াছে; নির্জ্জীব দেহ শত্রুর বিবিধতাড়না সহ্য করিয়া কেবল তোমা-

[illegible] জাগ মা! লক্ষ লক্ষ হিন্দুসন্তান আজি কাতর কণ্ঠে করজোড়ে তোমাকে ডাকিতেছে—জাগ মা!

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবাহনা

মা! তোর চরণ পানে, চেয়ে আছি কতদিন,
আয়! আয়! জগত-জননি!
ছাড়িয়া কৈলাস-ধাম, সুচির শান্তির পুরী,
শুনে যা মা, রোদনের ধ্বনি।
এধরা দুঃখের ঠাঁই, সদা বিষময় শ্বাসে,
দগ্ধ তনু অবিরাম জ্বলে,
সুদীর্ঘ কালের পরে, জুড়াই প্রাণের জ্বালা,
বসি তোর স্নেহময় কোলে।
স্মরিয়া তোমার নাম, কাঁদি যে মা অবিরাম,
বাসনা শুনিতে বুঝি কাণে;
অতি উর্দ্ধ অদ্রিশিরে, সে নিত্য আনন্দ ধাম,
রোদন কি পশে না সেখানে?
আয় মা! আনন্দময়ী, দে'খে যা ধরণী তোর,
দিয়ে যা শান্তির রেণু-কণা;
সংসার তাপিত প্রাণ, বসিয়া স্নেহের ছায়
ভুলে যাই প্রাণের যাতনা।
অনন্ত রাজ্যের রাণী, রাজরাজেশ্বরী তুই,
কোথা তোরে দিব মা আসন?
পাতার কুটীরবাসী, দরিদ্র সন্তান তোর,
জ্ঞান-ভক্তি-বিহীন জীবন।
মলিন মালঞ্চ-মন, ফুটেনা কুসুম রাশি,
কি দিয়ে মা! অঞ্জলি সাজাব?
ভুবন-পূজিত তোর, অভয়-চরণ দুটি,
ভাবি তাই কি দিয়ে পূজিব?
আর ত কিছুই নাই, দিয়েছ যা দিব তাই,
কাঁদিব চরণ দুটি ধ'রে;
পে'তে দিব হৃদাসন, পাপ-পঙ্কে কলুষিত
অভিষেক করি অশ্রুনীরে।
বাসনার সূত্র দিয়ে, গেঁথেছি আশার হার,
অঞ্জলি প্রাণের ব্যথা মোর;
অধম সন্তান ব'লে, ঠেলিস চরণে যদি
জননি! কলঙ্ক হবে তোর।
দেখ্‌সো সারদে! তুই, ধরায় আসিবি ব'লে,
শরৎ সেজেছে মনোহর:
আকাশ ধরণীতল, নির্ম্মল সুষমাময়,
প্রস্ফুটিত স্নিগ্ধ চন্দ্রকর।
সাজিয়াছে দিগঙ্গনা, সুনীল বসন পরি,
ঝরিতেছে কাশ পুষ্প হাসি;
আনন্দে বিভোর হ'য়ে, মোহাগে পড়িছে ঢ'লে,
তরুতলে সেফালিকা রাশি।
শুক্র-তারা-বিন্দুভালে, পরিয়া জ্যোতিষ্ক-হার,
সন্ধ্যা-কোলে সাজে নিশীথিনী।
সাজে শিশিরের ছলে, প্রেম অশ্রু বরষিয়া
পুষ্পময়ী ঊষা বিনোদিনী।

গগন মুকুতা করে, করে পরিষ্কৃত পথ,
আলো করি জলে পদ্ম ফুটে;
দিতে এ বারতা শুভ, খরস্রোতা তরঙ্গিণী,
সাগর-সঙ্গম পানে ছুটে।
কত যে প্রাণের ব্যথা, তবু তোর আগমনে,
সবার মলিন মুখে হাসি;
কুটীরে কুটীর-বাসী, ছত্রধর সিংহাসনে,
যেতেছে উৎসব-স্রোতে ভাসি।
হাসি মুখে মাগো তুই, আসিস্ ধরণী-তলে;
তাই বুঝি জগৎ হাসিছে,
অন্ধকারে, শশি তোর, উজ্জ্বল হাসির রেখা,
স্বর্গের আলোক ছড়াইছে।
এস এস দুঃখহরা, দুঃখের মন্দির মাঝে,
ঘুচাও মা! দুঃখের রোদন;
বসিয়া মায়ের কাছে, বলি অতীতের কথা,
ভুলে যাই ভবিষ্য স্বপন।
অপার অনন্ত তোর অগাধ স্নেহের সিন্ধু,
স্নেহ ভরে দেখা তাই দিলে;
মা ব'লে ডাকিব ব'লে, আছি মা, চাহিয়া পথ,
আয় মা; ভুলে নে স্নেহে কোলে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এস মা!

এস মা! সংসারের সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-কারিণি! ত্রিগুণ মূর্ত্তিমান করিয়া ভক্তের হৃদয়ে আনন্দের বিমল স্রোত ঢালিয়া দিয়া একবার এস! মনের গভীর বিষাদ-তিমির দূর হইবে, আশার সুষমা করুণার কমল-হাস্যে আমার ফুটিয়া উঠিবে। এস মা,—একবার এস; তুমি সংসারের সৃষ্টিকারিণী। ব্রহ্মা তোমার জঠর গর্ভের একটী জলবুদ্‌বুদ মাত্র। তুমি তাঁহাকে সৃষ্টি করিবার শক্তি দিয়াছ বলিয়াই আজি তিনি ব্রহ্মা; তাই আজি তিনি স্বীয় জঠরের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এমন দিন গিয়াছে যেদিন পদ্মযোনি পদ্মগর্ভে উৎপন্ন হইয়া নিজের উৎপত্তি-কারণ নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। তখন তাঁহাকে যে দিব্যজ্ঞান কে দিয়াছিলেন? কে তাঁহার হৃদয়ে জ্যোতিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? মা! তুমি বিশ্বের আলোক। মহাপ্রলয়ের পর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অনন্তকাল-গর্ভে বিলীন হইলে যখন নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, যখন স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল সর্ব্বত্রই সূচীভেদ্য তমোরাশি তালপিণ্ডের ন্যায় ঘুরিতে থাকে, তখন মা, তুমিই উৎকট জ্যোতিরূপে সেই অনন্ত অন্ধকাররাশির অন্তর্বিধান কর। তুমি সূর্য্যের জ্যোতি; স্থাবর জঙ্গম তোমারই অনুগ্রহে সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হয়। তুমি অগ্নিতে তাপ, চন্দ্রে জ্যোৎস্না, কুসুমে সৌকুমার্য্য, সলিলে শীতলতা, জ্যোৎস্নায় স্নেহ; তুমি মাতৃবক্ষে মায়ারূপে প্রবেশ করিয়া সন্তান-গণের রক্ষাবিধান কর। তোমাকে না দেখিয়া বিশ্বসংসার দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া রহিয়াছে; মা, একবার আসিয়া করুণাদৃষ্টিতে সকলকে বাঁচাইয়া দাও। তুমি বিশ্বের প্রাণ; পঞ্চ-প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী, পঞ্চ তন্মাত্রারও জননী।

জননি! যেদিন এই বিশাল বিশ্বসংসারের প্রথম সৃষ্টি হইল, যেদিন ঋতুগণ পঞ্চভূতের এই

অপূর্ব্ব পরিণতি দেখিয়া আনন্দ গদগদ ভাবে তোমার গুণগান করিল;—যেদিন তুমি তাহাদের গুণগানে আনন্দিত হইয়া, সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ নক্ষত্র-মালিনী, কাননকুন্তলা, শৈলমেখলা সাগরাম্বরা বসুন্ধরাকে অঙ্গুলি মাত্রে ধারণ করিয়া তাহাদিগকে দেখাইলে, সেদিনে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে, সেই মূর্ত্তিতে দেখা দিও না। শক্তিহীন ভারতসন্তান এখন শক্তির ভিখারী; শক্তি হারাইয়া আমরা শক্র-পদতলে নিয়ত দলিত হইতেছি, অসুরমর্দ্দিনি! আমাদের দুরবস্থারূপ অসুর নাশ করিয়া সন্তান দিগকে রক্ষা কর। যে মূর্ত্তিতে মধুকৈটভকে বধ করিয়া;—মহিষাসুরকে সংহার করিয়া দেবতাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেই মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও। তোমার আবির্ভাবে আমাদের শক্র নাশ হইবে, ভারত আবার আনন্দ-সাগরে ভাসিবে; ভারত সন্তান তোমার মঙ্গল সঙ্গীত গাহিয়া দেশে বিদেশে তোমার অপার করুণা-কাহিনী কীর্ত্তন করিবে। এস মা, একবার এস। ভারতে আর্য্য সভ্যতার আদিকালে যে মূর্ত্তিতে তুমি মহর্ষি অগস্ত্যের মা-সমন্দিরে আবির্ভূত হইয়া কালকেয় দৈত্যদিগের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলে, যে মূর্ত্তিতে তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়াছিলে, মহারাজ মুচুকুন্দের সদ্য-জাগ্রৎ নয়নে উদিত হইয়া কাল যবনকে সংহার করিয়াছিলে, সেই ভয়াবহ মূর্ত্তিতে দেখা দাও। দুর্ব্বল ভারতসন্তান; বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া শান্তরসের সেবা করিয়াছে; শান্তির সেবা করিতে গিয়া সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা অশান্তির বিষদংশন সহ্য করিয়াছি; আর শান্তি চাহি না;—আর তোমার হাস্যোৎফুল্ল শান্তরসোপেত শিবানী মূর্ত্তি দেখিতে চাহি না। এখন ভীম—ভীষণ—বীভৎস বেশে, অসুর-সংহারিণী দশভুজা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া উৎকট উৎসাহ বহ্নি নির্জ্জীব ভারত সন্তানের অস্থিমজ্জায় ঢালিয়া দাও। প্রাণের মায়া মমতা ছাড়িয়া, ভয়, কার্পণ্য, কাপুরুষতা ত্যাগ করিয়া, মন্ত্রে সিদ্ধি-লাভের নিমিত্ত সকলে স্বহস্তে বুক চিরিয়া শোণিত-দানে তোমার পূজা করুক। জাগ মা। এস মা! দেখা দাও মা। আর কতকাল এ যাতনা ভোগ করিব? কাপুরুষ লম্বশাটপটাবরণে, ভীরুতার কলঙ্কাবরণে আত্মবিস্মৃতির নিবিড় অপসারে ভারতবাসী আর কতকাল ঘুমিয়া বেড়াইবে? দাও মা তোমার দশহস্তে দশদিক হইতে তেজোরাশি সঞ্চিত করিয়া আমাদিগের দুর্ব্বল হৃদয়ে জ্বালিয়া দাও; হৃদয়ে বল পাইয়া কায়মনোবাক্যে তোমার আরাধনা করি।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

এস মা শঙ্করি।

এস মা শঙ্করি! গিরি পরিহরি,
গিরিশ-হৃদয় বাসিনি!
দরিদ্র কুটীরে আয় মা ঈশ্বরি!
পাপ-তাপ-শোক-নাশিনি!

বরষ ধরিয়া অবিরল মাগো
ঝরিয়াছে জল নয়নে,
সে সলিল দিয়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
ধোয়াব ও তোর চরণে।

সংসারের জ্বালা শত শত দাগ
রেখেছে হৃদয়ে গাঁথিয়ে,
পাষাণ কঠিন সেই যে বিবিত্র
রয়েছি আসন পাতিয়ে!
আয় মা শিবাণি! দয়াময়ি! আজ
কাঙ্গাল ছেলের ভবনে।
অন্তরের মাঝে নিভৃত বেদনা
নিবেদিব তব চরণে।
মার কাছে বই কার কাছে আর
জানাইব দুঃখ-বেদন?
মা বই বল না কে আর সংসারে
শুনিবে কাতর রোদন?
বরষের পরে আসিবি মা ঘরে
দেখিবি নিকটে সন্তানে,
মা মা মা মা বলে তোর কাছে গিয়ে
দেখাব আঘাত পরাণে!
এস মা শঙ্করি! শৈল পরিহরি!
মহেশ-হৃদয় বাসিনি!
দশ প্রহরণ দশ করে শোভে,
অশুভ-নিকর-নাশিনি!
এস মা তোমার পুরাতন বঙ্গে
সুরথ-সমাধি যেথানে,
তোমারে আনিয়া তটিনীর তীরে
পূজেছিল ভক্তি-বিধানে।
যেখানে মুকুন্দ যেখানে প্রসাদ
ভক্তি গদগদ অন্তরে,
তোমারে সাধিয়া মা মা মা মা বলি
কাঁদাইল চর-অচরে।
দেখেছ তখন এবঙ্গ ধরণী
সুজলা সুফলা শ্যামলা,
(মাগো!) দেখ আসি আজ কি দশা তাহার,
মরু-শীর্ণ শোক-বিহ্বলা!
আয় মা শঙ্করি! এ সময়ে আয়
দশ প্রহরণ ধারিণি!
তোর পদার্পণে পলাবে অশুভ
তুই মা অশিব বারিণী।

প্রকৃতির সজ্জা।

তুই মা! আসিবি, আহ্লাদে বিহ্বলা
দরিদ্রা প্রকৃতি সুন্দরী
মুছিল আনন বাঁধিল কুন্তল
দুখজ্বালা সব পাসরি;
যা আছে সম্বল তাই নিয়ে বালা
করিছে সংস্কার ভবনে;
শুভ্র কাশ ফুল ফুটিয়ে দুলায়ে
পুলকিছে বঙ্গ-ভুবনে।
তরু-লতাগুলি ফুলেতে ভরায়ে
বলিছে ডাকিতে তোমারে,
ওই দেখ তারা ব্যগ্র পসারিয়া
ধরি আছে কুসুম হারে!
ছোট ছোট সব সাদা মেঘ গুলি
দিতেছে ভাসায়ে আকাশে,
দিন দিন কলা বাড়াইছে চাঁদে
তারা হার ছড়াইয়ে পাশে!
মা তোমার পুণ্য আবাহন-গান
বিহগের কণ্ঠে গাহিছে,
ভরন্ত হৃদির কিমল আসনে
বসাইতে তোমা চাহিছে!

কত কত আশা!

আয় মা! ত্রিদিব—কৈলাস ছাড়িয়া
দরিদ্র সন্তান-ভবনে,
তোর আগমনে কি বিমল হাসি
ফুটেছে ধরায় গগনে!
শ্যামনার ফুল ফুটেছিল কত
আঁধারে পড়েছে খসিয়া,
নৈরাশ্যের কত দীরঘ নিশ্বাস
গিয়াছে মা! শূন্যে মিশিয়া
হতাশের আশা কাঙালের ধন

কাল সনে কত বিগত!
বিয়োগ-বিধুর আকুল নয়নে
ঝরিয়াছে জল নিয়ত!
সেই শোক তাপ সব ভুলে গিয়ে
প্রফুল্ল মা দেখ ধরণী,
ও চরণ তোর হরে সব জ্বালা
আয় মা হরের ঘরণি!
ও পাদ পঙ্কজ হেরে মা মানবে
কি এক আনন্দে গলিবে,
তোর চারিধারে মা মা মা মা বলে
নাচিবে সকলে মিলিয়ে!
ভুলিবে বিষাদ ভুলিবে বিষাদ
ভুলিবে যতেক ক্লামনা।
সব ভুলে গিয়ে ও চরণ-দুটী
দেখিতে কেবল বাসনা!
অধম সন্তানে সন্তান বলিয়ে
দিও স্নেহ, ভালবেসো মা!
ঘুচাতে বেদনা হীন বাঙ্গালীর
বরষে বরষে এসো মা!

শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষাল।

ঠাকুর-ঝি।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুখের পর দুঃখ ভাল, না দুঃখের পর সুখ ভাল? অনেকের মতে দুঃখের পরই সুখ ভাল। আমরা বলি সুখ আর দুঃখ লইয়াই যখন জীবন, তখন তাহার আবার ভালমন্দ কি? দুঃখের পর সুখই হউক, আর সুখের পর দুঃখই হউক—সকল অবস্থাতেই আমাদিগকে ধীর ও স্থির থাকিতে হইবে। সুখে যে উন্মত্ত হয় না, দুঃখেও যে অস্থির নয়—সেই মানুষ। সুখ দুঃখ সমুদয় জীবনের জোয়ার ভাঁটা। যে নদীতে জোয়ার ভাঁটা নাই, সে নদীত নদীই নয়। হয় সে কাণা নদীর ন্যায় ক্ষুদ্র তটিনী, আর না হয় পদ্মার ন্যায় অতি ভীষণ অবিশ্বাসী—ভয়ঙ্কর নদ। এ পৃথিবীতে সকলেই সুখের জন্যই লালায়িত; দুঃখকে আর কেহ চায় না; যে চায় সে বেচারি এপৃথিবীতে ঘৃণিত ও অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকে।

কিন্তু যে কখন দুঃখের আস্বাদ পায় নাই; সে কি সুখের প্রকৃত আস্বাদ-গ্রহণে সক্ষম হইতে পারে? আবার সেইরূপ যে কখন সুখের মধুর আস্বাদ গ্রহণ করে নাই, সে কি দুঃখের তিক্ত আস্বাদের তীব্রতা অনুভব করিতে পারে?

হীরালালের এ দুঃখের অবস্থাও চিরকাল সমভাবে থাকিতে পারে না। একদিন বৈকালে সুরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি হীরালালের নিকটে আসিয়া বলিল—"ভাই, এত দিন পরে, আমার পরিশ্রম সফল হইয়াছে। আজ আফিসে হুলস্থুল পড়ে গেছে। সদর মেঃ গুদাম সরকার, কেশিয়ার সকলেরই চুরি ধরা পড়েছে। তুমি যে এত টাকা ভাঙ্গ নাই; তা সাহেবেরা এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছে। কাল থেকে তোমায় আফিস্ যেতে হবে। আমার মুখে তোমার সকল অবস্থার কথা শুনে, বড় সাহেবের দয়া হয়েছে। তোমার কাছ থেকে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা লওয়া হয়েছে, সে টাকা তোমায় ফেরৎ দেওয়া হবে। কাল থেকে তোমায় আপিসে যেতে হবে, সে কথা তোমায় বল্‌তে, বড় সাহেব আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে।"

হীরালাল অবাক্ হইয়া সুরেশচন্দ্রের এই সকল কথা শুনিতে লাগিলেন। অন্য কেহ এরূপ কথা বলিলে হীরালাল কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না; কিন্তু সেই প্রাণের বন্ধু সুরেশের কথায় কি হীরালালের অবিশ্বাস হইতে পারে? হীরালাল অনেকক্ষণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। একি স্বপ্ন না সত্য? কেবল এই কথাই তখন হীরালালের মনে উদয় হইতে লাগিল। হীরালালের মুখে আর কোন কথাই নাই; সুরেশচন্দ্র পুনরায় বলিল—"আমার মুখে তোমার সকল কথা শুনে আপিসের অন্যান্য সকলেই তোমার জন্য দুঃখিত। আর তুমি না হলে ওআফিস অন্ধও চল্‌বে না। গত বৎসরের হিসাব পরিষ্কার হয়নি বলে, এবারের মেলে বড় বড়া চিঠি এসেছে। আর তুমি না থাকায় বেকায়েদে ক্ষতি হয়, সাহেবেরা এখন তা বেশ বুঝতে পেরেছে।"

হীরালাল এইবার বলিলেন—"ভাই সুরেশ, তোমার কথা শুনে, আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, তা তোমায় আর কি বল্‌ব? তোমা হইতেই আমার এ নূতন জীবন পেয়েছি, আজ সেই জীবন রক্ষার উপায় তুমিই করে দিলে। আজ কেবল আমার একলার নয়, আমার সঙ্গে সঙ্গে আরো পাঁচ ছাটির জীবনরক্ষা হলো। তোমার ঋণ আমি এ জীবনে কখন পরিশোধ কর্‌তে পারবো না।"

সুরেশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—"হীরালাল তুমি কি তবে এর জন্যে আমায় ধন্যবাদ দিচ্ছ নাকি?"

হীরালাল বলিলেন—"তোমার আবার ধন্যবাদ কি দিব? তুমি একটু বসো আমি একবার এসংবাদ মাকে দিয়ে আসি।"

হীরালাল বাড়ীর মধ্যে গিয়া ডাকিল—"মা!" আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ের সেই ক্ষুদ্র 'মা' শব্দটী সাবিত্রীর শুষ্ক আনন্দসাগরে পুনরায় সুখের তরঙ্গ তুলিল। সাবিত্রী দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন—"কি বাবা?"

হীরালাল প্রথমে মুখে কোন কথা না বলিয়া ভক্তিভরে জননীর চরণে প্রণত হইলেন। জননী আনন্দাশ্রু মুছিতে মুছিতে পুত্রের শরীরে হস্ত স্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। হীরালাল বলিল—"মা, সাহেব আবার চাকরীর জন্য আমায় ডেকেছেন, কাল থেকে আমায় আফিসে বেরুতে হবে। আর আফিসের তত টাকা যে আমি ভাঙ্গিনি, তা সাহেবেরা এখন জান্‌তে পেরেছেন। আমার সে পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে যা তাদেরকাছ থেকে আদায় হবে, তা ফেরত দেবেন বলেছেন।"

সে সংবাদে জননীর আনন্দের আর সীমা নাই। তিনি আনন্দে অধীরা হইয়া দেবদেবীর পূজার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারী ও অমলা প্রভৃতি এই সংবাদ পাইয়া সেইখানে ছুটিয়া আসিল। তাহাদেরও আনন্দের আজ সীমা নাই। শরৎকুমারী আনন্দে একটা আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। অমলা আনন্দে বিহ্বল হইয়া ক্রোড়স্থিত অমরনাথের মুখ চুম্বন করিল।

উপসংহার।

হীরালাল পুনরায় তাহার সেই পৈত্রিক বাড়ীতে আসিয়াছেন। যে লোক বাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন, মায় শুদ্ধ টাকা ফেরৎ পাইয়া তিনি সেই বাড়ী পুনরায় হীরালালকে

বিক্রয় করিয়াছেন। আফিসে হীরালালের সম্মান এখন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে; আত্মীয়বন্ধু সকলেরই হীরালাল এখন অধিকতর প্রিয়। হীরালাল এখন যেন নবজীবন লাভ করিয়া নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে নামিয়াছেন। কাহার কোন বিপদের কথা শুনিলে হীরালালকে আর ডাকিতে হয় না, হীরালাল প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিত। কি সম্পদে, কি বিপদে, হীরালাল না হইলে তাঁহার আত্মীয়বন্ধুর কোন কাজই সিদ্ধ হইত না।

অমলার সমস্ত টাকা হীরালাল তাহাকে ফেরৎ দিয়াছিল, কিন্তু অমলা সে টাকা লইয়া কি করিবে? ভ্রাতার ন্যায় ভগিনীর জীবনও পরের জন্য। অমলা অনেক টাকা খরচ করিয়া এক সুপাত্রে সুখদার বিবাহ দিয়াছিল, আর অমরনাথের লেখাপড়া শিক্ষারও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিল। অমলার অমানুষিকগুণে সেই চিরদুঃখিনী অঞ্চলা সুখদার এখন সুখের সীমা রহিল না।

হীরালালের সংসার এমন সুখের সংসার হইয়াছে! হীরালালের সুখ্যাতি এখন আবার সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অমলার ভবিষ্যদ্বাণী এতদিন পরে পূর্ণ হইয়াছে। শরৎকুমারীর সে কথা মনে ছিল, একদিন বৈকালে তাঁদের উপর বসিয়া উভয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শরৎকুমারী বলিল — "ঠাকুর-ঝি, তোর এত গুণ—তা আমি আগে জানতুম না।"

অমলা নিজের গুণ নিজে বুঝিতে পারিত না এবং নিজের সুখ্যাতিও শুনিতে ভালবাসিত না, সেই কারণ বলিল —"আমার আবার গুণ কি বউ দিদি?"

শরৎ।—তোর কোন্ গুণের কথা বেখে, কোন্ গুণের কথা বলবো ঠাকুর-ঝি? তোর গুণের কথা কখন কি ভুলতে পারবো?

অমলা।—আমিত এ সংসারে বৃথা জন্মে ছিলুম বউদিদি। আমার দ্বারা কি কখন কার উপকার হতে পারে?

শরৎকুমারী এবার একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—"তবে আমার এত সুখ—এত ঐশ্বর্য্য আবার হলো কেন? তুই যদি না থাকতিস—কি তোর যদি এতগুণ না থাকুতো, তবে আমার আজ কি অবস্থা হতো একবার ভেবে দেখদেখি ঠাকুর-ঝি।"

ঠাকুর-ঝি তখন বিরক্ত হইয়া বলিল—"তোমার ও সকল কথা এখন থাক্, বউদিদি। এখন সুখদাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আমি কি করে থাকুবো বল দেখি।"

অমলার কথা শুনিয়া শরৎকুমারীর চক্ষে জল আসিল, দুই হস্তে সে চক্ষের জল মুছিয়া শরৎকুমারী বলিল—"একটা রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ের প্রতি যার এত ভালবাসা, তার গুণের কথা কি মুখে বলে শেষ করা যায়!

অমলা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"তোমার কাছে বউ-দিদি, আমি কথায় পার্‌বো না।"

শরৎকুমারী।—"আমরা কেবল কথা জানি, কাজ করতে জানিনে। তোমার কিন্তু কাজ দেখে, সকলে আবাক্ হয়ে গেছে। আমি তোমার দাদার কাছে শুনেছি, সুরেশ বাবু বলেছেন—তুমি মানবী নও, মানবী আকারে দেবী।" অমলার মুখখানি অমনি শুকাইয়া গেল। অমলা এরূপ আত্মপ্রশংসায় ভীত হইয়া বলিল —"আমি সুরেশ বাবুকে দেবতার ন্যায় সম্মান ও ভক্তিকরি, তিনি এমন কথা কেন বল্‌লেন বউ দিদি? সুরেশ বাবুর মতন দাদার বন্ধু আর কে আছে?

শরৎকুমারী হাসিয়া বলিল —"সকল চেষ্টারই মূল কিন্তু তুমি ঠাকুর-ঝি।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সম্পূর্ণ।

পূজার গল্প।

গোবিন্দপুরের জমীদারের বাড়ী এ বৎসর পূজার বড় ধুম। জমীদার বাবু এ বৎসর রাজসেট হইতে রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছেন;—এত ধুমধামের কারণও তাই। রায়বাহাদুর উপাধির সহিত দুর্গোৎসবের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা জানি না; কিন্তু জমীদার মহাশয় এবৎসর এ উপাধিলাভ না হইলে, সা দুর্গার মস্তকে পুষ্পাঞ্জলি হইত কি না সন্দেহ। জমীদার বাবুর পূর্ব্বে নাম ছিল—সীতানাথ ঘোষ, এখন হইয়াছে—রায় সীতানাথ ঘোষ বাহাদুর। রায় বাহাদুরের জমীদারীর বার্ষিক আয় প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা, তবে এবৎসর হইতে আরও আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে এই উপাধিলাভের সহিত দুর্গোৎসবের কোন সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু আমরা রায় বাহাদুরের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর মুখে শুনিয়াছিলে, এই উপাধিলাভের সহিত তাঁহার আয়বৃদ্ধি স্বনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। সীতানাথ বাবু উপাধি লাভ করিয়াই জমীদারীতে সংবাদ পাঠাইলেন—"যখন স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি দান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, তখন প্রজাগণকে প্রতিটাকায় চারি আনা বৃদ্ধি দিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতে হইবে।" অনেক কাঁদাকাটির পর শেষে দুই আনায় রফা হইয়াছিল, সুতরাং রায় বাহাদুরের প্রজাবৎসলতার বিষয় কেন যে সংবাদপত্রে ঘোষিত হয় নাই, আমরা আজও তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না।

এইবার পূজার ধুমের কথা বলিব। গেট হইতে বৈঠকখানা পর্য্যন্ত সকল স্থানই উত্তম-রূপ সুসজ্জিত, কেবল ঠাকুর দালানের শোভার মধ্যে মা দশভুজার আনন্দময়ী মূর্ত্তি। সন্ধ্যা-দেবীর আলোর আড়ম্বরই যেন চারিদিকেই বাড়ি লইয়াছে ও দেয়ালগিরীর বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু পূজার দালানের আলোর বন্দোবস্তের মধ্যে একটী মাটীর প্রদীপ। উপর আলো রাত্রিকে দিন করিয়া ফেলে, কিন্তু পূজার দালানে সেই মাটীর প্রদীপ টিম্ টিম্ করে জ্বলে। পূজার দালানের সম্মুখে আসিলে একটী কুয়াশার বন্দোবস্ত, কিন্তু উপরের বৈঠক-খানায় বাই যেমনটার ঝঙ্কারটী। সে বাই যেমনটী আবার পঞ্চমীর দিনই শেষ হইয়াছে। সুতরাং পঞ্চমীর দিন হইতেই সীতানাথ বাবু বড় বিমর্ষ; অনেক স্থানাভাবের সমাগম হেতু; তাহাদিগের আদর অভ্যর্থনা করিতেই রায় বাহাদুর অন্য কাজ আর কিছুই দেখিতে পান না। তবে পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত কাজের ভার এক একজনের উপর দেওয়া ছিল, তাই রক্ষা। পূজার ভার ছিল পুরোহিত ঠাকুরের উপর; রাহ্মণ ভোজনের ভার ছিল জমীদারীর নায়েব গোমস্তার উপর। আঙ্গাজি-বিদায়ের ভার ছিল, দ্বারবক্ষকের উপর। আর পরিবেশনের ভার ছিল, বাড়ীর পাচক রাহ্মণ-দিগের উপর। ইহা বাতীত বাজে লোকের অভ্যর্থনা সেই দ্বারবক্ষকেই করিতে হইত।

তবে এই সকল কাজেই যে, সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, আমরা সাহস করিয়া এ কথা কিরূপে বলিব? তবে রায় মহাশয়ের প্রকৃত পক্ষে সন্তুষ্টির জন্য কোনরূপ বিশেষ গোল-যোগ হয় নাই। সপ্তমী পূজার দিনেরই

ঘটনার কথা বলি শুনি। প্রথমে পুরোহিত-মহাশয় আসিয়া বিনীতভাবে যোড় হস্তে প্রার্থনা করিলেন—"হুজুর, এবার পূজার কাপড়ের অনুলান পড়্‌ছে দশ খানা শাটীর ফর্দ্দ দিয়াছিলাম, কিন্তু পাঁচখানা বই শাড়ী কেনা হয় নাই।"

রায় বাহাদুর ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া হুকুম দিলেন—"আচ্ছা পাঁচখান শাড়ীতে যতদূর পূজো হয়, এ বৎসর ততদূরই হ'ক।"

দুই প্রহরের সময় নায়েব আসিয়া কর যোড়ে নিবেদন করিল—"যেরূপ ব্রাহ্মণের আমদানি দেখিতেছি, তাতে মিষ্টান্ন আর কিছু বাড়িয়ে না দিলে কোনরূপেই কুলান হবে না।"

রায় বাহাদুর তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"তবে ব্রাহ্মণদের আর দেবার আবশ্যকতা নেই, কেবল লুচি চিনির বন্দোবস্ত করে দাও। কাল খেমটাওয়ালা ওস্তাদজীরা মিষ্টান্ন পায় নাই, আজ তাহাদের ভাল ক'রে খাওয়াও।"

বেলা দুইটার সময় পাচক ব্রাহ্মণ আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল—"হুজুর আর আমি পরিবেশন করতে পারবো না; শুধু চিনি পাতে দিতে গেলে বামুনরা মারতে আসে।"

রায় বাহাদুর তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন,—"তবে চিনি দেওয়া বন্ধ করে দাও। এক খানা কলাপাত পর্য্যন্ত আর বামুনদের যেন না দেওয়া হয়।"

বেলা পাঁচটার সময় রামসিং পাঁড়ে আসিয়া হুজুরে সংবাদ দিল—"ধর্ম্মাবতার বিস্তর কাঙ্গালী জুটেছে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে; এখন তাহাদের প্রতি কি হুকুম হয়।

ধর্ম্মাবতার তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন "সব হাঁকায়ে দেও।"

আর সন্ধ্যার সময় যখন রায়বাহাদুরের একজন মোসাহেব আসিয়া কাণে কাণে বলিল—"হুজুর, আজ যে সপ্তমী পুজো, আজ দুকের ব্রাণ্ডিতে কি হবে? দশ আনীর বাবুদের আসবার কথা আছে; আর দুকের ব্রাণ্ডি না হ'লে চল্‌বে না?"

তখন রায় বাহাদুর একবারে শয্যায় হইয়া পড়িল। ম্যানেজার, দাওয়ান, কারকুণ প্রভৃতি সকলকেই তলব হইল, কিন্তু এরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার তাহাদের কাহারও উপর বিশ্বাস হইল না। শেষে একজন সকল কার্য্যে বিশ্বাসী সওয়ারকে তৎক্ষণাৎ নবাবগঞ্জে পাঠাইয়া দেওয়া হইল; এবং এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছিতে পারিলে তাহাকে পাঁচ টাকার পারিতোষিকের লোভ পর্য্যন্ত দেখান হইল।

তাহার পর আর বাজে কথা কি শুনিবেন? সন্ধ্যার পরের কথা বলি শুনুন। সন্ধ্যার পরেই রায় বাহাদুর স্বয়ং আসিয়া গেটের নিকট দাঁড়াইলেন। আর বড় বড় বাবুরা একে একে জুড়ীগাড়ী করিয়া নামিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার ধুম দেখে কে! শেক-হ্যাণ্ডেরও আর সীমা ছিল না। এইরূপ আটটা পর্য্যন্ত গেল। তাহার পর রায় বাহাদুর স্বয়ং আর অভ্যর্থনার জন্য গেটের নিকট অপেক্ষা করিলেন না।

তখন তবলার চাঁটিতে সরগরম হইতে লাগিল। বেহালার সুর আর ঠিক হয় না; এত কাণ মলা খাইল, তবু যেন একটু পিড়ি পিড়িং করিতে লাগিল। কিন্তু যখন বাইজীর ঘুঙুরের শব্দ সেই শব্দে যোগ দিল, তখন আর কিছুই বেসুর রহিল না। "সোভান আল্লা, জীতরহ বাইজী।" রবে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল। এদিকে সেই বিস্তীর্ণ বৈঠকখানায় আর লোক ধরেন

না, একটা মধুর গজল—"হুঁইয়া—হুঁইয়া—হুঁ যাবে সে ইয়া"—আরম্ভ হইয়াছিল; রসিক রায় বাহাদুরের উপর ঈষৎ বঙ্কিম দৃষ্টি ফেলিয়া এই গীত গাহিতেছিল, সুতরাং এসময় রায় বাহাদুরের আর মাথা ঠিক ছিল না। তিনি স্বর্গে আছেন কি মর্ত্তে আছেন এবং মীমাংসাই তখন করিতে অক্ষম।

রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বাইনাচ হইল, দুই জন বাইজীতে আর কতক্ষণ পারে বলুন? আর বাইজীরা গায় ভাল বটে, তাহাদের হাবভাবও দেখিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বর্গ হাতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু সে গানে বাবুদের তেমন মজা হয় না। সুতরাং বাইজী দিগের দশটার পরেই সমাধা হইয়া গেল। তখন আসরে আসিল খ্যামটাওয়ালিগণ। ও বলিলাম কেন জানেন?—একবার এক জন বা দুজনটী বলিয়া। তাহাদের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই একটা আনন্দের তুফান উঠিল। সে তুফানে স্বয়ং রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

তখন কোন ইয়ারের প্রস্তাবে ডিকাণ্টার, গ্লাস প্রভৃতি সমস্তই প্রকাশ্য ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের তুফানে কে যেন আগুণ ধরাইয়া দিল, অথবা আমোদের ফোয়ারার কে যেন অকস্মাৎ কল টিপিয়া দিল। ইয়ারকির তোড়ে কাহার সাধ্য তখন দাঁড়াইতে পারে?

প্রথমেই নাচ আরম্ভ হইল। মাচিল সেই খেমটাওয়ালিগণ বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই মনপ্রাণ তালে তালে নাচিয়া উঠিতেছিল। আহা! কি সুন্দর নাচ! তাহাকে ছাই এক রকম! নানা অঙ্গভঙ্গির সহিত নানা রকমের নাচ! মা জগদম্বা! তুমিই সার্থক! তোমার কল্যাণেই এমন সুন্দর নাচ! যদি হিন্দুধর্ম্মে কিছু সারবত্তা থাকে, তবে ঐ নাচ! মা, যদি তোমারই কৃপায় এরূপ নাচ দেখিতে পাই; তবে বৎসরান্তে কেন—তুমি মাসে মাসে এস মা। তখন বাবুদিগের মনে এই সকল কথার উদয় হইতেছিল। আর এদিকেও নাচের সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল—"প্রাণ যারে চায়, পোড়া মান ও সাজে না সখি।"

তখন 'তোফা—তোফা' রবে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল। একজন নির্লজ্জ কুলাঙ্গার দুইটি গ্লাসে সুরা ঢালিয়া এই সময় দৌড়িয়া দুইজন নর্ত্তকীকে দিয়া আসিল। আর তাহারাও নাচ ও গান বন্ধ না করিয়া ফাঁকের মাঝে দুইজনে দুইটি গ্লাস শূন্য করিল। তখন চারিদিকে করতালির ধ্বনি পড়িয়া গেল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে টাকার বৃষ্টি হইতে লাগিল। মা দশভুজে। তোমার পূজায় এত আনন্দ বলিয়াই কি এ পূজাকে মহাপূজা বলে?

মা আনন্দময়ি! সপ্তমীতে এইরূপ আনন্দে কাটিয়া গেল, কিন্তু অষ্টমীতে আর এরূপ আনন্দে কাটে না মা। অষ্টমীর দিন বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সকলেই অচৈতন্য! পুরোহিত ঠাকুর অষ্টমীর বলীর ন্যায় ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রায় বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার! সপ্তমীর পূজার সময় একবার অনুগ্রহ করিয়া পূজার দালানে আসিতে আজ্ঞা হউক।"

যেন পুরোহিত ঠাকুরেরই মা বাপ মরা দায়! ধর্ম্মাবতার তখন আরক্ত লোচনদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—"ভ্যাম ইউপিট পুরুৎ, আমায় মাতাল মনে করে তুমি আমার পূজা পণ্ড করবে মনে করেছ বাবা! তা কোন মতেই হচ্ছে না। পূজোর কথামাত্র ব্যতি-

ক্রম তুলে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগবে। সন্ধ্যে পুজো কি তুলসী বেলা হয় বাবা? তুমি কি আমায় মাতাল পেয়েছ নাকি। সন্ধে পুজো হবে সেই সন্ধে বেলায়।" পাড়া —সুয়ার—গাধা—।"

আর এ দিকেও পুরোহিত বেগতিক বুঝিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে চম্পট। পুরোহিত-ঠাকুরের বড় সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, সময় বুঝিয়া চম্পট দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা না হইলেই এ দিকেও চটাপটের ব্যবস্থা হইত। তাহার পরেই আর কি—

"যে মাটিতে পড়ে লোক সেই মাটি ধরে।
বারেক পড়িয়া যদি—কে কবে উঠে ছাড়ে।"

সেই নিশি প্রথম দর্শনের খোলই আরম্ভ হইল। একজন আফিসের কেরাণী মোসাহেব এই সময় রসিকতা করিল—"আজ আমাদের মেলা ভে।"

আর একজন বাবু এই সময় অষ্টমীর মহাপ্রসাদের জন্য ব্যস্ত হইলেন। ভোগের পূর্ব্বেই রায়-বাহাদুরের হুকুমে তখন সেই মহাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আর অঙ্গহানি হয় কেন? দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে গজেন্দ্র গমনে 'মজাভরে দেরে পিয়ালা—মজাভরে দেরে' গাহিতে গাহিতে, এক ডানাকাটা পরী হয়ে যেন স্বর্গ হইতে সেই মর্ত্তের আনন্দ-ধামে শুভাগমন করিল।

আর পারি না—মা আনন্দময়ীর আগমন উপলক্ষে আনন্দের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া লেখনীর কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছি; কিন্তু আর পারি না। যাঁহারা হিন্দু বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই হিন্দুয়ানির চূড়ান্ত দৃশ্য অঙ্কিত করিতে আর পারি না। মা দশভুজে? নবমীতে তোমার নীতি অসংখ্য বলি হয়? সেই অসংখ্য বলির মধ্যে এই সকল কুলাঙ্গারের পশুজন্ম-উদ্ধারের একটা উপায় করে দাও মা মা! অন্ততঃ আমি এই নরকের দৃশ্য বর্ণনার হস্ত হইতে উদ্ধার পাই।

এই নবমীতে অনেক ছাগ পশুর উদ্ধার হইয়া গেল, কিন্তু এসকল মনুষ্য পশুর আর উদ্ধার হইল না। আর একটী বলি বলিব, তাহাহইলে এ নরকযন্ত্রণা হইতে অন্ততঃ আমরা উদ্ধার পাই। নবমীর দিন সাহেবদিগের থানার বন্দোবস্ত। কিন্তু সে থানার পূর্ব্বে অনেকে থানায় পড়িয়া ধড়াধড়ি দিল। আর যে ভগবতীর পূজার এত ধুম—তাদের সহিত সেই ভগবতীর মাংসেরও ছড়াছড়ি হইল। ইহাই কি দুর্গোৎসব? ইহাই কি আদ্যাশক্তি মহামায়ার ষোড়শোপচারে পূজা?—এইরূপ পূজাতেই কি শ্রীল রাজা উদ্ধার পাইয়াছিলেন?—জগন্নাথ শ্রীঘরচন্দ্র রাক্ষস-সমরে জয়ী হইয়াছিলেন? হা ধিক! আজি অদৃষ্ট-দোষে এইরূপ ন্যায়ের জনক পশু ও পিশাচোচিত জঘন্য পূজা-পদ্ধতি অনুপতিত বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এ কপিকুযোচিত কদর্যতা, এই তমঃকর ভণ্ডামী, এই নরঘাতিনী নিশাচ-পূজা কবে বঙ্গ হইতে অন্তর্হিত হইবে? কবে বাঙ্গালী পূর্ব্বের মত কামমদোন্মত্তে মায়ের প্রকৃত পূজা করিতে শিখিবে?—শিখিবে না কি?

মা! মা! মা! এরূপ নরকের দৃশ্য অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে মৃত্যু লিখিলে না কেন মা?

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শিশু ভক্ত যুগল।

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জগৎপ্রসিদ্ধ শ্রীবল্লভের পুত্র শ্রীপাদ জীব গোস্বামী এবং শ্রীখণ্ডবাসী পূজ্যপাদ নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং পরম বৈষ্ণব শ্রীরঘুনন্দন দাসের পুত্র, অভিরাম গোস্বামীর রসিকা ও শ্রীবীরেশ্বর ঠাকুরের নিতান্ত অনুগত শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর আমাদিগের শিশু ভক্ত যুগল। আমরা প্রথমে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর বাল্য ইতিহাস-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

রূপ সনাতন উভয়েই গৌড়াধিপতি হোসেন শাহ মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অপার ঐশ্বর্য্য, অতুল ক্ষমতা, অপ্রতিম আধিপত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্যাবলম্বনে ইহাঁরা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শরণ লইয়াছিলেন এবং তদীয় আদেশ ক্রমে বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিতে তথায় গমন করিয়াছিলেন। সংসার ত্যাগের সময় ধনরত্নাদি, সৎপাত্রে বিতরণ করিয়া গেলেও তাহাতে তাঁহারা রাজার সুখ সম্ভোগে কালযাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু পিতাপুত্র কাহারও বিষয় বিভবের প্রতি মন নাই, গৃহে থাকিয়াও উভয়ে সন্ন্যাসী। শ্রীজীবের বয়ঃক্রম তখন অতি অল্প, কিন্তু এই বৈশবেই তাঁহাতে বিরক্ত সন্ন্যাসীর লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইত। সনাতনরূপ বৃন্দাবনে যাইবার পর অবধি শ্রীজীবের মনে যেন কি হইল; তখন:—

"নানারত্ন ভূষা পরিধেয় সূক্ষ্মবাস।
অপূর্ব্ব শয়ন শয্যা ভোজন বিলাস।
এ সব ছাড়িল কিছু নাহি ভুঞ্জে চিতে।
রাজ্যাদি বিষয় বার্ত্তা না পারে শুনিতে।"

এই বৈশব-বৈরাগ্যে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। জগতের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, যৌবনে বা প্রৌঢ়বয়সে যে ত্যাগ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বাল্যেই তাহার সূচনা হইয়াছে। জেমস্ মিটেন ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় ইঞ্জিনিয়র। কথিত আছে যে, যে সকল ক্রীড়নকে কোন প্রকার কলকৌশল থাকিত, তাহা ভিন্ন আর কোনরূপ খেলনা লইয়া তিনি খেলা করিতেন না। ওলণ্ডাজ দেশের এক প্রকার কৌশল সম্পন্ন খেলনা লইয়া তিনি তাহার চরণ খুলিয়া, লইতে, এবং পুনরায় সংযোগ করিতে পারিতেন। তখন তিনি নিতান্ত দুগ্ধ-পোষ্য শিশু, এবং কেহই উহা তাঁহাকে শিক্ষা দেয় নাই। ইনি বাল্যেই একটী ছিদ্র চর্ম্মনল দ্বারা একটী দমকল প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এবং ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে বায়ু চালিত একটী জাতাকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আবার বাষ্পীয় শকটাদির আবিষ্কারক জেমস্ ওয়াটসনের শৈশব-ইতিহাসে দেখা যায় যে, তিনি অতি শৈশবেই মৃত্তিকা দ্বারা বাষ্পীয় শকট ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহা লইয়া ক্রীড়া করিতেন। নিউটন একটী পুরাতন কাষ্ঠের বাক্স দ্বারা অভিনব প্রণালীতে একটী জলঘড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তখন তিনি নিতান্ত অপগণ্ড শিশু। রাজা আলফ্রেড বাল্যেই সমবয়স্ক বালক লইয়া যুদ্ধের অভিনয় করিতেন। আর উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। ইহাতেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীজীব গোস্বামীর বাল্যবৈরাগ্যে বিচিত্রতা কিছুই নাই। কর্ম্মভূমি খেতখীলধামী জড়োপাসক, সুতরাং তজ্জন্য বালকদিগের ক্রিয়াকাণ্ড

তত্ত্বতা বৃক্ষাদিরও নাম জড়জগৎ লইয়া। তাই স্মটন, হিঙ্কেলস, নিউটন প্রভৃতি কলকৌশল পূর্ণ যন্ত্র লইয়া ক্রীড়া করিতেন। জ্ঞান-ভূমি ভারতবর্ষবাসীর মানস আধ্যাত্মিক বিষয়-প্রবণ; তাই ভারত-বালক ধ্রুব প্রহ্লাদের ন্যায় জীব গোস্বামীও শৈশবেই পার্থিব বিষয় প্রতি বিরক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক বিষয়-রসে রসিক হইয়াছিলেন। ইহাতে অবিশ্বাস বা সন্দেহ করিবার কিছুই নাই, এবং অবিশ্বাস বা সন্দেহ করিবার কাহারও অধিকারও নাই। শ্রীজীব বাল্যে আরো কি করিতেন, শ্রবণ করুন:—

"অল্প বয়সে অতি গভীর অন্তর।
শ্রীমদ্ভাগবতে জানে প্রাণের সোসর॥
সদা কৃষ্ণ-কথা-সুখ-সমুদ্রে সাঁতারে।
অন্যকথা কেহো ভয়ে কহিতে নাপারে॥"

য়ুরোপীয় বালকবীরদিগের শৈশব ক্রীড়ার বিষয়ে উপরে যৎকিঞ্চিৎ যাহা উল্লেখ করিয়াছি, ঠিক তদ্রূপ ব্যাপার শ্রীজীব জীবনেও দৃষ্ট হইয়াছে। আমি নিজে কিছু না বলিয়া ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর কথায় তাহা পাঠককে জানাইতেছি:—

"শ্রীজীব বালক কালে বালকের সনে।
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ভিন্ন খেলা নাহি জানে॥
কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া।
করিতেন পূজা পুষ্পচন্দনাদি দিয়া॥
বিবিধভূষণ বস্ত্রে শোভা অতিশয়।
অনিমিষ নেত্রে দেখি উল্লাস হৃদয়॥
কনক পুতলি প্রায় পড়ি ক্ষিতিতলে।
করিতে প্রণাম সিক্ত হৈতো নেত্রজলে॥
বিবিধ মিষ্টান্ন অতি যত্নে ভোগ-দিয়া।
ভুঞ্জিতেন প্রসাদ বালকগণে লৈয়া॥
কৃষ্ণ বলরাম বিনা কিছুই না ভায়।
একাকীও দোঁহে লৈয়া নির্জ্জনে খেলায়॥
শয়ন সময়ে দোঁহে রাখিয়ে বক্ষেতে।
মাতা পিতা কৌতুকেও না পারে লইতে॥"

বালকেরা মিষ্টান্নের আস্বাদ পাইলে, তাহা হইতে নিবৃত্ত করা মাতা পিতা বা কাহারই বড় সহায়ত্ত নহে। যে কেহ হউক না কেন, বালক হাতের সন্দেশ কাহাকেও দিতে রাজি নহে। জোর করিয়া লইতে চেষ্টা কর বালকও জোর করিবে। যদি তোমার বলে পরাস্ত হইয়া সন্দেশটী তোমায় অনিচ্ছা পূর্ব্বক দিতে বাধ্য হয়, বা তুমি জোর করিয়া তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লও, তখন বালক অনন্যোপায় হইয়া দুর্ব্বলের সম্বল রোদনকে আশ্রয় করিবে। এই ত গেল মিষ্টান্নের কথা। পরমার্থতত্ত্বরূপ মিষ্টান্নে যে কেবল মিষ্টত্ব আছে, তাহা নহে, উহাতে ভয়ানক মাদকতাও আছে। তাহা না থাকিলে বালক প্রহ্লাদ শাণিত কৃপাণ, ভীষণ মাতঙ্গ-প্রদত্ত, প্রজ্বলিত পাবককুণ্ড, প্রাণহারি ভুজঙ্গস্থল প্রভৃতিকে, কেন তৃণজ্ঞান করিয়া উন্মত্তবৎ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন? আহা! যে ভাগ্যবানের হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়, সে কি এই তুচ্ছ পৃথিবীর তুচ্ছ বিষয়ে স্পৃহা রাখিতে পারে? না সংসারের সুখ-সম্পদে তার মন আর আকুষ্ট হয়? তখন তাহার নিকট কর্পূরবাসিত পরমান্ন, নিষ্ফল বৎ তিক্ত ও পূতিগন্ধময়; দুগ্ধফেননিভ বিচিত্র শয্যা, কণ্টকশয্যা, বা শর-শয্যা; বহুমূল্য বসন ভূষণ, লৌহ নিগড়। তখন সে আর কিছুই চাহে না; কিছুই আর তার নিকট ভাল লাগে না;—চায় কেবল সেই প্রাণেশ্বরকে; ভালবাসে কেবল সেই:—

দলিতাঞ্জন-পুঞ্জ-গঞ্জন-কালিন্দা-বরণ।"
আমরা তাই দেখিয়াছি বালক শ্রীজীব

"নানারঙ্গ ভূষা" "সুস্নাবাস," "অপূর্ব্ব শয়ন ক্রিয়া" প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বালক রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনে বসিয়া, নয়ন মুদ্রিত করিয়া কি চিন্তা করে, আর নেত্র-যুগশতধারে অশ্রু বিগলিত হয়; তাহাতে বক্ষঃস্থল বসন ভিজিয়া যায়; কখন বা নাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে উন্মত্ত হইয়া, বাহুযুগল ঊর্দ্ধে তুলিয়া পূর্ব্বক উদ্দণ্ড নৃত্য করে; কখনও বা "হে দয়ার্দ্র দীননাথ, হে পতিতপাবন, আমায় দেখা দেও; আমায় পরিত্যাগ করিও না।" ইহা বলিতে বলিতে একদিকে উর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হয়; কখনও বা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া যায়। অঙ্গে স্বেদ, স্থৈর্য্য প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ প্রকাশিত হয়; শরীর নিঃস্পন্দ মৃতবৎ, অথচ রুদ্ধপ্রায় হইতে "হা কৃষ্ণ! হা দয়াময়" প্রভৃতি বাক্য উচ্চারিত হয়। ইহার শৈশবেই ভগবৎ অনুরাগের প্রাবল্য দেখিয়া সকলেই কাণাকাণি করিতেন, এবালক কখনও গৃহে থাকিবে না। কখনও সুখ সম্পদ ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। একদা শ্রীজীব মূর্চ্ছিতাবস্থায় আছেন, আত্মীয় স্বজন চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া রুদ্ধনোদনের চেষ্টা করিতেছে, এবং বলাকলি করিতেছে, "এই বালকের উপর শ্রীকৃষ্ণের অজস্র কৃপা হইয়াছে।" এই কথা শ্রীজীবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি উঠিয়া বসিয়া, দীনভাবে প্রত্যেকের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন "দীননাথ কৃপাময় হরি কি আমায় দয়া করিবেন? আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার যেন সেই পদে মতি হয়, আমি যেন সেই কৃপাময়ের কৃপালব-লাভে বঞ্চিত না হই।" বলিতে বলিতে সস্নেহে কহিলেন, "কৃষ্ণপদে তোমার মতি হউক, তুমি তাঁহার চরণ লাভ কর।"

শাস্ত্রে আছে "যে যাদৃশী ভাবনা করে, তার তাদৃশী সিদ্ধিলাভ হয়।" বালক শ্রীজীব দিবানিশি সংসার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে বিক্রীত হইবেন, আশা করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই আশা পূর্ণ হইল; গুরুজনের আশীর্ব্বাদের ফলও ফলিল। শ্রীশ্রীজীবের জ্যেষ্ঠ ও খুল্লতাতদ্বয় বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন; জননী অল্প বয়সেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন; পিতা ছিলেন পরমার্থ-পথের একমাত্র কণ্টক; কিন্তু অল্পকাল মধ্যেঃ—

"গঙ্গাতীরে বল্লভের হৈল পরলোক।
অল্পকালে শ্রীজীব পাইলা মহাশোক।"

অজ্ঞানেরই শোকে মুহ্যমান হইয়া দিগ্‌বিদিগ শূন্য দেখে। কিন্তু জ্ঞানীগণ শোকরূপ-কুঠারে মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া ভববন্ধন-মুক্ত হয়েন। আমাদের বালক শ্রীজীব পিতার পরলোক-গমনের পর বিষয়-সম্পত্তিতে পদার্পণ করিয়া, সংসারে নির্লিপ্ত হইলেন। অন্তরের অনুরাগ, চিরদিন অন্তরে লুক্কায়িত না থাকিয়া, বাহ্যে প্রকাশ পায়। কণ্ঠে তুলসী মালা, অঙ্গে নামাবলী, ললাটে হরিমন্দিরের তিলক, এগুলি বৈষ্ণবের বাহ্য চিহ্নমাত্র। বৈষ্ণবতা অন্তরের বস্তু; কিন্তু অন্তরে বৈষ্ণবত্বের উদয় হইলে, এই বাহ্য চিহ্ন আপনিই আসিয়া পড়ে। তাই অতি শৈশবেই দেখা যাইত, শ্রীজীবের—

"অপূর্ব্ব তুলসীমালা কণ্ঠে সুকোমলে।
কিবা শুভ্র যজ্ঞসূত্রগলে॥"

পিতৃবিয়োগের পর শ্রীজীব যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন একদিন তিনি একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন, সেই স্বপ্নই তাঁহাকে গৌর নিতাই-প্রেমে মাতোয়ারা করিল। যখন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তখন এই-

রূপই হইয়া থাকে।' বালক শ্রীজীব একদা স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেনঃ—

"হইলা প্রত্যক্ষ প্রভু কৃষ্ণ বলরাম।
শ্যাম শুক্ল রূপ দোঁহে আনন্দের ধাম॥
দোঁহারি অদ্ভুত বেশ কন্দর্পমোহন।
অঙ্গের ভঙ্গীতে মত্ত করে ত্রিভুবন॥
এবে দোঁহে দেখি পুনঃ দেখে গৌরবর্ণ।
ঝলমল করয়ে জিনিয়া শুদ্ধ স্বর্ণ॥
দুহুঁ অঙ্গ সৌরভে ব্যাপিল ত্রিভুবন।
তাহে ধৈর্য্য ধরে এছে নাহি কোন॥
শ্রীজীবের মনে মহা হৈল চমৎকার;
অনিমিষ নেত্রে শোভা দেখয়ে দোঁহার
ভাসয়ে দীঘল দুটী নয়নের জলে।
লোটাইয়া পড়ে দুই প্রভু পদতলে॥
করুণাসমুদ্র গৌর নিত্যানন্দ রায়।
পাদপদ্ম দিলেন শ্রীজীবের মাথায়॥"

বালকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইল; শ্রীব "হা গৌর, হা নিত্যানন্দ" বলিয়া নবদ্বীপে চলিলেন। কিছু দিন মধ্যে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া, প্রভু নিত্যানন্দের আকর্ষণে শ্রীজীব একায়েক শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে যাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে;—

"সেইপথে আইসে বৈষ্ণব কতজন॥
শ্রীজীবে দেখিয়া সবে মনের উল্লাসে।
শীঘ্র গেলা শ্রীপণ্ডিত শ্রীবাস-আবাসে॥
নিত্যানন্দ প্রভু তথা প্রিয়গণ সঙ্গে।
বসিয়া আছেন মহা প্রেমানন্দ-রঙ্গে।
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু হাসিয়া কহয়।
শ্রীজীব আসিবে মোর মনে হেন লয়॥"

এই স্থলে পাঠক একটী কথা বিবেচনা করিবেন। শ্রীজীব যখন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ-বহির্ভাগে আসিয়াছেন, তখন প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতকে কহিতেছেন" অদ্য শ্রীজীব আমার নিকট আসিবে, আমার এইরূপ জ্ঞান হইতেছে।" প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্কর্ষণ-রূপী শ্রীবলরামের অবতার বলিয়া যে তিনি এইরূপ বুঝিলেন, তাহা নহে। যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহার আপন মনের টানেই, এ সকল কথা জানিতে পারে। বিদেশবাসী পুত্র কবে বাড়ী আসিবে, মাতার নিকট কেহ না বলিলেও তিনি দুই এক দিন পূর্ব্বে উহা জানিতে পারেন, এবং অন্যের নিকট বলেন। এইরূপ পত্নীও কখন কখন পতির আগমন সংবাদ মন-ভাবে অগ্রেই প্রাপ্ত হয়েন। এই জন্যই থিওসফিষ্ট ও প্রেততত্ত্বজ্ঞেরা বলেন, মানুষের মনে মনে বৈদ্যুতিক সংবাদ প্রতি-মুহূর্ত্তে চলিতেছে। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ লইয়া আমরা আলোচনা করিব না, কারণ তাহার এ স্থল নহে। তবে এরূপ যে হয়, তাহা প্রায় সকল স্ত্রী পুরুষই কোন না কোন সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই মনের টানে, আকর্ষণে, বা আধ্যাত্মিক সংযোগে, প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীজীবের আসন্ন আগমন জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী বা লেখকের গোঁড়ামী নাই, এবং বিস্ময়ের বিষয়ও কিছুমাত্র নাই। যাহাহউক, তৎপরে কি হইল, ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর মুখেই পাঠক শ্রবণ করুন:—

"প্রভু আগে বৈষ্ণবেরা কহে ধীরে ধীরে।
শ্রীজীব আইলা প্রভু-ভবন-বাহিরে॥
শুনি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
শ্রীজীবেরে শীঘ্র লোক দ্বারা আনাইলা।
শ্রীজীব অধীর হৈলা প্রভুর দর্শনে।
নিবারিতে নারে অশ্রুধারা দুনয়নে।
কহয়ে যতেক দৈন্য কহনে না যায়।
লোটাইয়া পড়ে প্রভু নিত্যানন্দ-পায়॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহা বাৎসল্যে বিহ্বল।
ধরিল শ্রীজীব মাথে চরণযুগল॥
শ্রীজীবের অনুগ্রহ সীমা প্রকাশিলা।
ভূমি হৈতে তুলি দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥
প্রভু প্রেমাবেশে কহে তোমার নিমিত্তে।
আইলাম শীঘ্র হেথা খড়দহ হইতে॥
ঐছে কতকহি শ্রীজীবেরে কত কৈলা।
শ্রীবাসাদি ভক্ত অনুগ্রহ করাইলা॥
নিকটে রাখিয়া অতি আনন্দ হিয়ায়।
শ্রীজীবে পশ্চিম দেশ করয়ে বিদায়॥"

প্রভু নিত্যানন্দের অনুমতি-ক্রমে বালক-ভক্ত শ্রীজীব জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যদ্বয়ের পদানুসরণে:—

"ছিঁড় কাঁথা, মুড় মাথা, করোয়া লয়ে করে"

কাঙ্গালবেশে "ব্রজনগরে" গমন করিলেন। শিশু-ভক্ত শ্রীজীবের কাহিনী সুতরাং এই খানেই সমাপ্ত হইল।

সংপ্রতি আমরা দ্বিতীয় শিশুভক্ত শ্রীরঘুনন্দনঠাকুরের বাল্য-ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পাঠক, হয়ত আপনারা ক্ষিতীশ-বংশাবলীতে ঘোষ ঠাকুরের গোপীনাথের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের শিশু-সন্তান শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহকে ভয় প্রদর্শন করিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি খাওয়াইয়াছিলেন। রঘুনন্দনও শৈশবে সেইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ শকাব্দের প্রারম্ভে শ্রীখণ্ড গ্রামে মুকুন্দদাস নামে একব্যক্তি বাস করিতেন। ইঁহার গৃহে গোপীনাথ নামে এক পাষাণময় বিগ্রহ স্থাপিত ছিলেন। মুকুন্দদাস স্বয়ং ঐ বিগ্রহের সেবা করিতেন। একদা কার্য্যানুরোধে মুকুন্দকে গ্রামান্তরে যাইতে হইয়াছিল। যাইবার সময় মুকুন্দ স্বীয় শিশুপুত্র রঘুনন্দনকে বলিয়া গেলেন, "দেখিও বাপ, যত্নে প্রভুর সেবা করিও। সেবার যেন ত্রুটি না হয়

বিগ্রহের অর্চ্চনার সময় হইলে, রঘুনন্দন নৈবেদ্যাদি উপকরণ প্রস্তুত করিয়া দেবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল "ঠাকুর খাও"। ঠাকুর খাইতেছেন না দেখিয়া রঘুনন্দন আবার বলিতে লাগিল "বাবা তোমাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে বলিয়া গিয়াছেন; তবে ঠাকুর কেন খাও না? আমার মাথা খাও, আর হাত তুলে বসে থাকিও না। খাও, খাও, খাও।" ঠাকুর তথাপি খান না। তখন দুঃখে ও অভিমানে, রঘুনন্দন "খাও," "খাও" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশুর ক্রন্দনে ঠাকুর কেন, ঠাকুরের বাবাও স্থির থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ এ ঠাকুর বড়ই কোমল-হৃদয়, ইনি ভক্তের রোদন—ভক্তের আর্ত্তনাদ—ভক্তের ব্যাকুলতা আদৌ সহ করিতে পারেন না। ইনি এক বালক-ভক্তের প্রাণ রক্ষার্থে দুর্গম অরণ্যানীতে—ব্যাঘ্র ভল্লুক ব্যালকুল-সঙ্কুল অটবীতে উপস্থিত হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন। যে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-লাঞ্ছিত শ্রীচরণ বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত; যে পাদপদ্ম কমলার কোমল-কর-সেবিত; যে পূতাম্বু হইতে পতিতপাবনী সুরধুনীর উদ্ভব; সেই চরণে শত শত কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছিল। আর একটী বালক-ভক্তের অনুরোধে কারাগৃহে বাস ও বিষ-লড্ডুক ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই ভক্তবৎসল ভগবান আজ শিশু রঘুনন্দনের ভক্তিব্যঞ্জক রোদনে স্থির থাকিতে না পারিয়া আহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু দামোদরের উদর ত অল্পে পূর্ণ হইবার নয়, তাই খাইতে খাইতে সব খাইয়াছেন, অবশিষ্ট কিছুই রহিল না। মুকুন্দ গৃহে আসিয়া, ঠাকুরের প্রসাদ চাহিলেন, রঘুনন্দন বলিলেন "বাবা, ঠাকুর ত সব খাইয়াছেন, প্রসাদ আবার পাবে

কোথা ?" রঘুর কাণ্ড শুনিয়া মুকুন্দ বিস্মিত —স্তম্ভিত—রোমাঞ্চিত; বলিলেন "বাবা বলিল কি? তোর কথায় ত আমার প্রত্যয় হয় না। হয়ত তুই নিজে সব খাইয়া ঠাকুরের বদনাম করিতেছিস্"। সরলমতি রঘুনন্দন বলিল "বাবা, ঠাকুরেরই শপথ। আমি কিছু খাই নাই, ঠাকুর নিজেই সব খাইয়াছে। তোমার বিশ্বাস না হয়, আর এক দিন আমি ঠাকুরকে খাওয়াইব; তুমি গোপনে দেখিও।" মুকুন্দ বলিলেন "বেশ কথা, তাই হবে।" কয়েক দিন পর মুকুন্দ সুস্বাদু লড্ডুক প্রস্তুত করিয়া, রঘুনন্দনের হস্তে দিয়া বলিলেন "আজ তুমি ঠাকুরকে এই লাড়ু খাওয়াও, আমি লুকাইয়া দেখিব।" মুকুন্দ একস্থানে লুকাইয়া রহিলেন—কিন্তু যিনি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ, সর্ব্বদর্শী, অন্তর্যামী, তাঁহার কাছে আবার লুকালুকি কি? প্রিয়দর্শন পাঠক, এ লুকালুকির অর্থ শিশুভক্ত রঘুনন্দনের মাহাত্ম্য প্রকাশ, ও মুকুন্দের বহুদিনের সেবার ফল। বালক রঘুনন্দনের আগ্রহ, অনুনয়, পরিশেষে রোদনে নাড়ু-গোপাল, নাড়ু খাইতে লাগিলেন; কিন্তু অর্দ্ধেক খাইতে না খাইতে মুকুন্দ সম্মুখে উপস্থিত, সুতরাং আর খাওয়া হইল না। অর্দ্ধ-ভুক্ত লড্ডুক প্রভুর হস্তেই রহিল। "হায়! কি কর্ম্ম করিলাম বলিয়া মুকুন্দদাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তবৎসল, ভগবান মূর্চ্ছাবশে, মুকুন্দকে আত্মসাৎ করিয়া তাহার মূর্চ্ছা বিনোদন করিলেন। তখন পিতাপুত্রে আনন্দে মৃত্য করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন—

"জয় জয় গোবিন্দ গোপীনাথ,
ও রাধার মনচোর মুকুন্দ দয়া কর হে।"

উপরের বৃত্তান্ত, প্রাচীন পাট-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের সমসাময়িক পরম ভক্ত, শ্রীউদ্ধব দাস নিম্নলিখিত সুললিত পদে প্রকটন করিয়াছেন :—

"প্রকট শ্রীখণ্ড বাস, নাম শ্রীমুকুন্দ দাস,
ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি।
গেলা কোন কার্য্যান্তরে, সেবা করিবার তরে,
শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি।
ঘরে আছে কৃষ্ণ সেবা, যত্ন করি খাওয়াইবা,
এত বলি মুকুন্দ চলিলা।
পিতার আদেশ পাইয়া, সেবার সামগ্রী লৈয়া
গোপীনাথের সম্মুখে আইলা।
শ্রীরঘুনন্দন অতি, বয়ঃক্রমে শিশুমতি
খাও বলে কাঁদিতে কাঁদিতে।
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে, না রাখিয়া অবশেষে,
সকল খাইলে অলক্ষিতে।
আসিয়া মুকুন্দদাস, কহে বালকের পাশ,
প্রসাদী নৈবেদ্য আন দেখি।
শিশু কহে বাপ শুন, সকলি খাইলা পুন,
অবশেষ কিছুই না রাখি।
শুনি অপরূপ হেন, বিস্মিত হৃদয়ে পুন
আরদিন বালকে কহিয়া।
সেবা অনুমতি দিয়া, বাড়ীর বাহির হৈয়া,
পুনঃ আসি রহে লুকাইয়া॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি, হয়ে হরষিত মতি,
গোপীনাথে নাড়ু দিয়া করে।
খাও খাও বলে ঘন, অর্দ্ধেক খাইতেছেন,
সময়ে মুকুন্দে দেখি দ্বারে॥
যে খাইল রহে তেন, আর না খাইল পুন,
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন করিয়া কোলে, গদ গদ স্বরে বলে,
নয়নে বরিষে ঘন লোর॥
অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে, অর্দ্ধ নাড়ু আছে ঘরে,
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই,
এ উদ্ধব দাস রস ভণে॥

শ্রীরঘুনন্দনের বয়ঃক্রম বর্ণন চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ, তখন শ্রীপাদ অভিরাম স্বামী ইহাঁকে গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা করিয়া ঘরের বাহির এবং ওঁর শিষ্য দুই পাগলে, তিন পাগলের পদাশ্রয় করেন। এই তিন পাগলকে পাঠক কি চিনিতে পারিলেন? যদি না পারিয়া থাকেন, তবে এক বঙ্গ পাগলের গান হতে এই তিন পাগলের পরিচয় দিতেছি;—

"বুঝ বে কি পাগলের খেলা?
এ যে পাগলে পাগলে খেলা।
গিরাই পাগল, চৈতে পাগল, আর এক পাগল অদ্বৈ।
তারা তিন পাগলে নৈদা আসি রাধা বলি কাঁদে॥

উদ্ধবদাস ঠাকুর আর একটী পদে, অভিরাম রঘুনন্দনের মিলন বর্ণন করিয়াছেন। এই পদটী উদ্ধৃত করিয়াই, আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। এই দুইটী পদই ধানশ্রী রাগিণী একতালে গীত হইতে পারে :—

"পুরবে শ্রীদাম, এবে অভিরাম,
মহা তেজঃপুঞ্জ রাশি।
বাঁশী বাজাইতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
শ্রীখণ্ড গ্রামেতে আসি॥
দেখিয়া মুকুন্দে, কহয়ে আনন্দে,
কোথায় রঘুনন্দন।
তাহারে দেখিতে, আইলাম এথাতে,
আসিদেহ দরশন॥
শুনি ভয় পাইয়া, রাখে লুকাইয়া,
গৃহেতে দুয়ার দিয়া।
তেঁহো নাহি ঘরে, বলে যুক্তি করে,
অভিরাম গেল না দেখিয়া॥
বড় ডাঙ্গী নামে, স্থান নিরজনে,
নৈরাশ হইয়া বসি।
বুঝি তার মন, শ্রীরঘুনন্দন,
অলক্ষিতে মিলে আসি॥
দেখিয়া তাঁহারে, দণ্ডবৎ করে,
দুই চারি পাঁচ সাতে।
শ্রীরঘুনন্দন, করি আলিঙ্গন,
আনন্দ আবেশে মাতে॥
এবে দুহুঁ মেলি, নাচে কুতুহলী,
নিজ পহুঁ গুণ গাইয়া।
চরণ ঝাড়িতে, নূপুর পড়িয়ে
আকাই হাটেতে যাইয়া॥
অভিরাম সনে, শ্রীরঘুনন্দন,
মিলন হইল শুনি।
সঘনে মুকুন্দ, হুই নিরানন্দ,
কাঁদে শিরে কর হানি॥
পত্নীর সহিতে, বিষাদিত চিতে,
আইলা দুহুঁর পাশ।
দুহুঁ মৃত্য গীত, দেখি হরষিত,
ভণয়ে উদ্ধব দাস॥

শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

পদ্মলোচন খুড়ো।

(২)

আজ একটু বেশী মাত্রায় আফিম বাড়াইয়া গঙ্গাতীরে গিয়া বসিয়াছি; দিব্য বাতাস বহিতেছে; নদীর কলকল ধ্বনি, মেয়ে ওলার হাসির শব্দ, মলের রুণু ঝুনু বাদ্য সকলে মিলে যেন কি এক সুরে আমার কাণের কাছে গান গাহিতেছে। আমি চক্ষু মুদিয়া, ঘাটের সিঁড়িতে হেলান দিয়া বসিয়া আছি আর শুনিতেছি।—আঃ কি আরাম! ক্রমে যেন সে গান থামিয়া গেল; সে ঘাট, সে নদী, কোথায় মিশাইল। চেয়ে দেখি আমি এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে। অন্ধকার, অথচ অল্প দেখা যায়—Darkness visible—; অস্পষ্ট আলোকে প্রান্তর যেন অনন্ত; একটী গাছ নাই, ঘাস নাই, মানুষ নাই, শুধু মাঠ; দিগ্‌ভ্রান্তি নয়নে অন্ধকার পানে চাহিয়া আছে। আমি চলিতে লাগিলাম; কিন্তু কোথায়? কোন্ দিকে? মাঠ আর শেষ হয় না; পা আর চলে না; ভাবিতে ভাবিতে বসিয়া পড়িলাম। হঠাৎ বোধ হইল যেন অন্ধকার আর নাই,—আলোক হইয়াছে। চারি দিকে চাহিলাম; দেখি একদিকে আকাশ-সীমান্তে যেন একটু আলোক দেখা গিয়াছে; বোধ হয় সূর্য্য উঠিতেছে। সেই আলোক অন্ধকার সরাইয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে লাগিল;—রশ্মিগুলা এধার ওধার ছড়াইয়া পড়িল। দেখিলাম সূর্য্য নহে, রাশি রাশি সুবর্ণ মেঘ, তাহার উপর স্বর্ণকায় এক বিরাট-পুরুষ স্বর্ণদণ্ড হস্তে অর্দ্ধশায়িত রহিয়াছে; চারিদিকে জ্যোতি ঠিকরিয়া পড়িতেছে। নিকটে আরও নিকটে, বাতাসে মেঘরাশি ভাসিয়া আসিতেছে; অন্ধকারে অঞ্চল লুটাইয়া আগে ও পাশে ছুটিতেছে। পুরুষের নয়নদ্বয় জ্বলিতেছে; সুবর্ণ বর্ণ কেশ-পাশ বায়ুভরে দুলিতেছে। আমি ভীত; স্তম্ভিত। মেঘ হইতে অবতরণ করিয়া সেই বিশালকায় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আমার কাছে আসিল। ভয়ে আমার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে,—কি করিব কোথায় পলাইব, ভাবিতে ভাবিতে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তখন "জলদ্ভা মেঘের মত স্তনিত-গম্ভীর" মহাশব্দের মত স্বরে সেই পুরুষ আমায় বলিলেন "তোমার ভয় নাই। আমি Gabriel; এই পরিচ্ছদ পরিধান কর, এই মুকুট শিরে ধারণ কর; তাহা হইলেই তুমি এ অন্ধকারের উপত্যকা পার হইয়া যাইতে পারিবে।" আমি পরিচ্ছদ ও মুকুট গ্রহণ করিলাম। Gabriel আবার মেঘারোহণে আকাশ-পথে-ভাসিয়া গেলেন। পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, মুকুট মাথায় দিয়া দেখি যেন আমার দেহে নূতন বলের সঞ্চার হইয়াছে, আমার মাথায় যেন কি জ্বলিতেছে; অন্ধকার আর নাই, চলিতেও আর কষ্ট হয় না। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; বড় উচ্চ, বড় বন্ধুর; উপর দিকে চাহিলেই মাথা যেন ঘুরিয়া পড়ে; পথ নাই কি করিয়া ইহার উপর উঠিব ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময় পশ্চাদ্দিক হইতে কে

বলিল "কি, পদ্মলোচন, কি ভাবিতেছ?" স্মিত হইয়া ফিরিয়া দেখি শান্তমূর্ত্তি একটী পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার উন্নত ললাট যেন সরস্বতীর সিংহাসন, চক্ষে প্রতিভার জ্যোতিঃ, ওষ্ঠ-প্রান্তে মৃদু হাসি,—বড় শান্তিময়; দেখিলেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কে? আমার নাম বা কিরূপে জানিলেন।" তিনি বলিলেন "আমার নাম উইলিয়ম—সেক্ষপিয়র আমি সকলকার নাম জানি। তুমি পাহাড়ে উঠিবে? এস যাই" এই বলিয়া আমার হস্ত ধরিয়া উপরে লইয়া চলিলেন—পাহাড়ে উঠিতে আর কোন কষ্টানুভব হইল না। আমিত অবাক্? একি ভূতের দেশ! মলে কি এইখানে আসে? তবে আমি কি মরেছি নাকি? ইনি সেক্ষপীয়র; এখানে কেন? আমায় কোথায় লইয়া চলিয়াছেন? আচ্ছা যদি ইনি সত্যই সেক্ষপিয়র হন তবে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক না কেন যে টমাস-লুসির হরিণ চুরি, ল্যাটিন স্পিক-পড়া, মাইন-শিঙ্কার কথাগুলা সত্য কি না! কোন নাটকের কোন অংশগুলা তাঁহার নিজের? কোন গুলাই বা অপরের! তিনি মিডল্‌টন হইতে না মিডল্‌টন তাঁহা হইতে চুরি করিয়াছিলেন? যে নাটকগুলা কাহার উদ্দেশে লিখিত? যার সে গোলমেলে স্থান গুলা যাহা ভাবিয়া ভাবিয়া পোপ প্রভৃতি টীকাকারগণ কলমাশক্তি প্রায় নিঃশেষ করিয়া রাখিয়াছিলেন—যে গুলা আমার সেক্ষপীয়র—পাঠের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক—সে গুলার অর্থ করিয়া লওয়া যাউক না কেন? জিজ্ঞাসাত করিব ভাবিলাম, কিন্তু ভয় হইল পাছে একে আর হয়, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলি; তাহা হইলেই মারা যাইব? এদেশের দেশে আদব কায়দা, আচার ব্যবহার কিছুই জানা নাই; কাজ নাই বাপু, এখন জিজ্ঞাসা করে। কিছু দিন যাউক, একটু ঘনিষ্ঠতা বেশী হউক, রীতিনীতি গুলা একটু হস্তগত করিয়া লই, তখন না হয় জিজ্ঞাসা করা যাইবে। সেই ভাল, নয়? একেবারে এতগুলা ভাবনা হড়াহুড়ি করে আমার মনের উপর আসিয়া পড়িল; তোলপাড়া করিয়া তুলিল; আমি অস্থির হইলাম। মনন চমক ভাঙ্গিল তখন দেখি এক প্রকাণ্ড লৌহ-প্রাচীর বেষ্টিত সৌধসমূখে আসিয়া উপস্থিত। পাহাড়ের মত প্রাচীরগুলা ঝাড় উচু করে চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে; সম্মুখে এক লোহার ফটক। সেক্ষপীয়র স্বর্ণনির্ম্মিত চাবি হস্তে ফটক সন্নিধানে গেলেন; অমনি বিকট শব্দে দ্বার উন্মুক্ত হইল:—

On a sudden open fly
With impetuous recoil and jaring sourd
The infernal doors ;and on their hinges grate
Harsh thunder

আমি আর নীরব থাকিতে পারিলাম না; জিজ্ঞাসা করিলাম "এটা কি?"

সেক্ষপীয়র উত্তর দিলেন "এটা ভগবানের উপাসনাবাস; আমি ইহার রক্ষক।"

"ভাল বুঝিতে পারিলাম না; পৃথিবীই ত ভগবানের পাগলা গারদ, তবে আবার এটা কেন? আর আপনিইবা রক্ষক নিযুক্ত হইলেন কেন?"

তিনি বলিলেন "পৃথিবীটে পাগলা গারদ বটে। কিন্তু সেখানে যাহাদের পাগলামীর বড় বাড়ি হয়-চিকিৎসক সূর্য্যতনয় তাহাদিগকে এখানে পাঠাইয়া দেন,—তাহাদিগের জন্যই ইহার সৃষ্টি। আর আমায় রক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে কেন বুঝিলে না? অন্য লোকের অপেক্ষা আমি মানুষের পাগলামী কিছু বেশী

বুঝি, বলে। এখন চল ; তোমাকে আমার সব ওয়ার্ডগুলি দেখাইয়া আনি।"

প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, উলঙ্গবাসের বন্দোবস্ত কতকটা আমাদের দেশের পাগলা গারদের মত—তবে অনুষ্ঠান কিছু বৃহত্তর। সম্মুখেই একটা, বড় বড় অক্ষরে লেখা Lovers ward বা প্রণয়ী-বিভাগ।" সেখানে আমার পথপ্রদর্শকের সাহায্যে দেখিলাম একধারে জুপিটরের স্ত্রী ইভাদ্‌নি প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে, কেশপাশ আলুলায়িত; আকার ভীতিব্যঞ্জক; আকর্ণ বিশ্রান্ত, নয়নদ্বয় বিস্ফারিত, নির্নিমিষ, যেন সম্মুখে কোন ভীষণ ব্যাপারের সঙ্ঘটন হইতেছে। অদূরে লেওডেমায়া, (Laodamea) গালে হাত দিয়া বেড়াইতেছে, দৃষ্টি শূন্যপানে যেন কাহাকে খুঁজিতেছে; রাজ্ঞী ডাইডো (Dido) সন্ধ্যক্ষরিত-রুধিরাপ্লুত দেহে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্টা, পার্শ্বে Sapho গান গাহিতেছে,—দুজনেরই চক্ষু দিয়া অবিরল বারিধারা বহিতেছে! অনতিদূরে একক্ষুদ্র নদী; তাঁহে এক গ্রীক যুবক উপবিষ্ট, সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একবার নদীপানে—একবার আকাশ পানে চাহিতেছে; যুবকের পশ্চাতে এক ভীমকায় ঘিহুদী দণ্ডায়মান—অন্ধ চক্ষু দিয়া অবিশ্রান্ত রক্ত পড়িতেছে; মুণ্ডিত মস্তক; তাহাতে শোণিত-রেখা, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে। একধারে জলন্ত চিতা, বহ্নি-বিচ্ছুরিত (Sardanopolous) সার্ডেনোপোলাস Myrhaর হস্ত ধরিয়া উহা প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিকটে Ash (কীট বিশেষ) হস্তে ত্রিভুবনসুন্দরী Cleopatra সাশ্চর্য্য হইয়া একদৃষ্টে তাহাদিগের দিকে দেখিতেছে; পার্শ্বে হেমগিরি চূড়ার নগ্নস মহাবলী Antony শায়িত, বক্ষে তরবারি বিদ্ধ, শোণিতে সর্ব্বাঙ্গ ভাসমান। সম্মুখে এক উদ্যান মধ্যে ফুলময়ী ওফিলিয়া, দেসদেমনার হাত ধরিয়া গান গাহিতে গাহিতে বন-দেবীর মত বেড়াইতেছে; একবৃক্ষতলে "পরিপাটু-দুর্ব্বল-কপোল-সুন্দর-মূর্ত্তে বেলভিদিয়া জুলিয়েটের সহিত আসীনা; একটু দূরে উন্মত্ত বেশে, আরক্তলোচনে, ছোরা হস্তে Othello পাদচারণ করিতেছে; অযত্ন-পরিহিত পরিচ্ছদে, ধূলিধূসরিতাঙ্গে হ্যামলেট আপন মনে কি বলিতে বলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক ধরাশায়ী শুষ্ক বৃক্ষ কাণ্ডোপরি রাজমুকুট শিরে রাজ্ঞী Many উপবিষ্টা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শুধু বলিতেছে—Ah Philip Philip Philip উদ্যানের পরই এক রণ-ক্ষেত্র; ভীষণ প্রান্তর; রাশি রাশি শব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, শৃগাল কুক্কুরের হর্ষোৎফুল্ল বিকট চীৎকারে দিগন্ত শব্দিত; চতুর্দ্দিক অন্ধকার সে ভীষণ স্থানে আলোক হস্তে শব রাশির মধ্যে কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

এই সকল দেখিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম যদি সকল কবি, সকল দার্শনিক এস্থানে আবদ্ধ থাকেন, তবে সেক্সপীয়র কেন অমুক্ত? জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না; মনে মনে একটা কারণ ঠিক করিয়া লইলাম। চোরকে অর্থাৎ মহারাণীর পক্ষে সাক্ষীর মত খাড়া করিয়া যেমন সাধু চোরকে শাস্তি দেওয়া হয়, এও কি তেমনি? এই সময় দেখি এক কৃষ্ণকায় পুরুষ মহিষারোহণে বিচরণ করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলে তনিলাম—তিনি ডাক্তার ওয়ার্ডের রোগী দেখিয়া বেড়াইতেছেন; ইনিই বোধ হয় উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিসকলকে পৃথিবী হইতে এখানে পাঠাইয়া থাকেন।

দূর হ'ক। পঙ্গলোচন আর ভাবিতে পারে না। ভেবে ভেবে মাথা গরম হ'য়ে

গেছে। এখন একটু মৌতাত না করিলে আর বাঁচি না। যাহ'ক হারা, অপিয়ম কমিন এবার বাঁচ য়ে দিয়েছে। আফিম খাও, আফিম-খাও! যদি বাঁচিতে চাও ত আফিম—কেবল আফিম খাও! তোমাদের শরীর অল্প দিনের মধ্যেই পোস্তবৃক্ষে পরিণত হ'বে। মা জগদম্বে! এবার তোমাকে বুকচিরে বাটী ভরে আফিম দিব।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

দুর্গাপূজা।

হাসে ধরা মনোহরা শারদ শোভায়।
ধোয়া, পোঁছা চাঁদ-খানি আকাশের গায়॥
দুর্গতি দূরিতে দুর্গা আসিবেন ভবে।
দিন-দিন সেদিন গণিছেন সবে॥
সমীর বহিলে ধীর প্রদোষ সময়।
'পুজো পুজো হা(ও)য়া যেন কেন মনে হয়॥
ভাদ্দুরে রোদ্দুরে লোক ছিল আলাতন।
আশ্বিন তপন ঢালে মধুর কিরণ॥
রোদ যেন পুজো পুজো দুর্গা মাখা দীপ্তি।
গরমে সরমে মরি ও বু প্রাণে তৃপ্তি॥
সোণার পুতুল শিশু অথল সরল।
সবা হতে বাড়াদের আমোদ প্রবল॥
পরিবে নূতন বাস দুর্গা দরশনে।
আশায় হাসিছে সুখে প্রফুল্ল বদনে॥
কারো সাধ মনে মনে নিকার-বোকার।
সাটীনের চিনে-কোট কারো আব্‌দার॥
মিলিটারি ট্যারা টুপি কেহ শিরে চায়।
কেহ সুখী তাজে, যদি সাজিবারে পায়॥
কোন কোন ছোটবাবু বারোতে প্রবীণ।
পাঞ্জাবী পিরাণ চান বুক মস্‌লিন॥
কাহারো কামিনী-ভাব বাইশে আবেশ।
ছাতিখোরা মতিহার কামিজ সরেশ॥
আসি বলে পার্শীকোট খোলে কারো অঙ্গে॥
চা(য়ে)নাকোটে বা(য়ে)না কাল কলারের সঙ্গে,
কুসুম-কলিকা মত বালিকার দল।
নূতন গাউন তরে হয়েছে পাগল॥
ছোট ছোট মাথা গুলি কাল কাল চুল।
মানায় কেমন তায় বন্দে সফুল॥
মৌন মুখে মিষ্টি হাসি লাজে সরে যায়।
ফোট ফোট কলিগুলি বুকে বড়ি চায়॥
যৌবন তুফান অঙ্গে নয়নে অনঙ্গ।
হেসে হেসে পতি পাশে যোড়শীর রঙ্গ॥
একেত কুৎসিতা আমি বিধাতার বাদ।
পুরিল না এ জনমে কোন তব সাধ॥
কেমনে পূজার দিনে হাসি দেখি মুখে।
পড়ে পড়ে ভাবি তাই হাত দিয়ে বুকে॥
শুনেছি দরজিত্বরে বিধাতা ধরায়।
ফ্যাশনি বসনে নাকি কালোকে তরায়॥
কত শত নাহি জানি কত আছে নাম।
আদায় ব্যাপারী কবে জাহাজের কাম॥
সুলকা ঝলক শুনি খোলে ভাল বক্ষে।
কে জানে কেমন ভাই দেখি নাই চক্ষে॥

ঝলমল মখমল সাদার কাজে।
জ্যাকেট টকটক নাকি কাজোকেও সাজে॥
বোম্বাই আম্বাই ভাই করিনা কখন।
কুসুমি রেশমে জরি শাড়ীখানি এন॥
দিব মা এ সঙ্গে নাথ কিছু জেন মনে।
আপনি না সাজ যদি নূতন বসনে॥
যেমন তেমন থাক নারী মন-চোরা।
সোহাগে সাজিলে বুঝি প্রাণে মার ছোরা॥
রেশমী রঙ্গিন মোজা সাজিবে চরণে।
বুকে তুলে নেব আমি শ্রীদুর্গা স্মরণে॥
চারু অঙ্গে কারু কাজ সাটিনের কোট।
কাঞ্চনের সনে হবে মাণিকের 'জোট॥
আদরে পাগ্‌লী দির হৃদয় আসন।
রাজসাজে হৃদিরাজ তুসো প্রাণ মন॥
বিলম্বে বাড়াবে দর্প কোম্পানীর দল।
বাছপড়া গছাইবে করিয়ে কৌশল॥
তোমার পরশ পতি বুকে বাজে মোর।
আগেতে তাগাটা তাই করি এত জোর॥
পেয়েছে কে-মামা সবে নূতন জামাই।
জুটিয়া কমিটি করে তর্কের সমাই॥
বিয়ের দ'য়ের দাম চোকেনি এখন।
শ্বশুর কহুর তাঁর কন্যা-উৎপাদন॥
নিতান্ত চিন্তিত হেরি প্রাণের কান্তায়।
হস্ত দস্ত প্রাণ অস্ত করিয়ে শান্তায়॥
হয়েছে না ধার আর হতে বাকি আছে।
হবেই নামিতে যবে চড়িয়াছি গাছে॥
ভেবনা ভামিনী তুমি লুকায়োনা হাসি।
বেয়ের বাপের শ্রাদ্ধ করিব প্রেয়সী॥
জম্‌জমা জামাজোড়া চিকণ-বসন।
তোমার জামায়ে প্রিয়ে করিব প্রেরণ॥
আশায় বরষে হর্ষ প্রবাসীর মনে।
শুভ অবসরে যাবে প্রিয়-দরশনে॥
প্রণয় পরীক্ষা,তরে প্রতীক্ষায় ঘরে।
বিরহিনী হেমাঙ্গিনী বসে আশা করে॥
সখি মাঝে পড়িয়াছে রাধারাধি বাজি।
কার পতি কালি আসে কার সাঁজে আজি।
মনে মনে জনে জনে-মানে প্রাণপণে।
মনে যেন রাখে নাথ চিকণ বসনে॥
বেশের অধিক কারো কেশে অনুরাগ।
"কুন্তলীন" চাহিয়াছে করিয়ে সোহাগ॥
মাথা ঘসে আছে বসে মাখিয়া সাবান।
উথলে উঠেছে চুলে প্রবল তুফান॥
কবরী বাঁধিবে সতী পতি এলে ঘরে।
রতিরূপে চুপে চুপে চুমিবে আদরে॥
জীবনান্তে গ্রামান্ত র নাহি হন যাঁরা।
পূজার বাজারে আজি সহরেতে তাঁরা॥
বিপণী বিপণি অতি সাজায়ে যতনে।
বিনয়ের বৃষ্টি করে "বাবু" আবাহনে।
বঙ্গের মাঝারে আজি রঙ্গের বাজার।
পাখা পেয়ে ওড়ে টাকা হাজার হাজার॥
দশ হাতে দশভুজা বাঁটেন আনন্দ।
হাস হাস হাস,ছাড় হিংসা দ্বেষ দ্বন্দ্ব॥
জয় দুর্গা জয় দুর্গা ভক্তি দেখা মনে।
শক্তি দে শক্তি দে শক্তি সংসারের রণে।

শ্রীঅমৃত লাল বসু।

বিশেষ বক্তব্য।

আনন্দময়ীর আগমনে সমগ্র ভারতভূমি আজি আনন্দে নিমগ্ন;—স্থলে—জলে—অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রেই আজি আনন্দস্রোত উচ্ছ সিত-বেগে ধাবমান। সম্বৎসর অশেষ কষ্ট ও বিড়ম্বনা সহিয়া ভারতবাসী আজি জগন্মাতার বরদামূর্ত্তি দেখিয়া কিছুদিন শান্তি সম্ভোগ করিবেন। আমরাও সেইজন্য গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকদিগের নিকট এক পক্ষের জন্য অবসর লইতেছি।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ } ৯ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। { চতুর্বিংশ সংখ্যা।

বিজয়া।

মা আনন্দময়ী এলেন আর চলিয়া গেলেন; তিন দিন তিন মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। সুখের দিন দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়, দুঃখের রাত্রি পোহাইয়াও পোহায় না। মা আসিবেন, সমগ্র ভারত আনন্দে ভাসিবে, সমস্ত প্রকৃতি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া সুখের হাসি হাসিবে; তারিণী দুঃখনাশিনী জীবের দুঃখ নাশিবেন;—সম্বৎসর এইরূপ কত আশা, কত ভরসা মনোমধ্যে পোষণ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু কৈ, কখন আশা তো পূরিল না! ত্রিতাপে মানব তাপিত; রোগ শোকে জর্জ্জরিত,—জগন্মাতার পূজা করিবার আয়োজন করিয়াও অনেকে হত রোগ-শয্যায় কাল কাটাইয়াছে; কেহ প্রাণের প্রাণকে বিসর্জ্জন দিয়াছে;—কেহবা হৃদয় চিরিয়া রক্ত দিবে মনে করিয়াও সুহৃদ্বে হৃৎপিণ্ড ছেদন করিতে বাধা হইয়াছে। জগতী আশাপূর্ণা সকলের আশা পূর্ণ করিলেন না; কিন্তু তাহা বলিয়া কি সকলে আশা ছাড়িতে পারে? মাতার রাতুল চরণে ভক্তের আশা ভরসা জড়িত; আর সকল আশা ভরসা সফল না হইলেও ভক্ত মুক্তির এই প্রধান সাধন কি হেলায় হারাইবে?

আদি কবি বাল্মীকি যাহাই বলুন না কেন, ভক্তচূড়ামণি পুরাবিদ রাবণকে বধ করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভগবতী দুর্গার অকালে পূজা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আশা পূর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ম্যুয়র পূজার কালাকাল নাই; ভক্তি-ভরে মা বলিয়া ডাকিলেই সকলেই অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। কিন্তু বাহ্য প্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির এমনই ঘনিষ্ট সম্পর্ক যে, কিছুতেই তাহা বিমুক্ত হইতে পারে না। বাহ্য প্রকৃতি হাসিলে অন্তঃপ্রকৃতি হাসিবে;—কাঁদিলে—কাঁদিবে; শরতের ঔদার্য্যময়ী বাহ্যপ্রকৃতি দিঙ্‌মণ্ডলের সহিত মানবের হৃদয়াকাশ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়; প্রকৃতি-পূজক হিন্দু

তাহাতে আনন্দে বিভোর হইয়া মূল-প্রকৃতি আনন্দময়ীর পূজায় মগ্ন হয়। যখন ভৌতিক বাধা থাকে না, মন তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বতোমুখিন্ ভক্তি-স্রোতে ভাসিয়া যায়। সেই জন্যই শরতে শারদীয়া পূজায় এত উৎসব, এত আগ্রহ।

জননী ত্রিগুণধারিণী; তাঁহার গুণের বিকাশই এই বিশ্বসংসার। কৃতজ্ঞ ভারতবাসী চিরকালই গুণের পক্ষপাতী; তিন দিনে ত্রি-নয়নার ত্রিগুণের পূজা করিয়া বিজয়া দশমীতে সিদ্ধি লাভ করিবে, এই বাসনায় জীবন ধারণ করিয়া ছিল। যে ভাগ্যবান্, সে ভবতারীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিল; দুর্ভাগ্যবান্ সুখদুঃখের সমীকরণে অসমর্থ হইয়া পাষাণ হৃদিতাকে পাষাণী বলিয়া মনের ক্ষোভ দূর করিল;—তাঁহার সিদ্ধি সুদূর-পরাহত।

শুনিয়াছি বিজয়া দশমীতে দাশরথি দশাননকে বধ করিয়া রাক্ষস সমরে জয়লাভ করিয়াছিলেন, সেই জন্য ইহা বিজয়া নামে প্রসিদ্ধ। জয়োদ্ধত কপি সৈন্যগণ রক্তাক্ত কলেবরে পরস্পরকে বক্ষে ধারণ করিয়া রণশ্রম দূর করিয়াছিল। তাহাতে তাহাদের যে আনন্দ হইয়াছিল, আজি বহু সহস্র বৎসর দূরে থাকিয়াও আমরা তাহার অনুকরণে সেইরূপ আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ভারতবাসীর পক্ষে জয় পরাজয় উভয়ই সমান; পরপদ-প্রহারে পরপদ-বলেহনে আমাদের অস্থিমজ্জা নিষ্পিষ্ট; বর্ত্তমান ভাবিয়া ভবিষ্যৎ সুখের আশা ভরসা অতল জলে ফেলিয়া দিয়াছি; তথাপি যখন দিগন্ত কাঁপাইয়া দশমীর বিজয় বাদ্য বাজিয়া উঠে; ভক্তগণ আদ্যাশক্তির প্রতিমা জলে বিসর্জ্জন দিয়া শূন্যমনে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া যখন পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে থাকে; আনন্দাশ্রুতে সকলের বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হয়; তখন আর শক্র মিত্র ভেদাভেদ থাকে না;—সকলই আনন্দময়, এমন্ই সুখের আকর; সর্ব্বত্রই সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সাধীনতা অবাধে প্রবাহিত। গুরুজনের আশীর্ব্বাদে, সমবয়স্কের ঈষৎ আলিঙ্গনে, আশীর্ব্বাদের আন্তরিক নমস্কিয়ায় বর্ত্তমান ভুলিয়া যাই;—মনে হয় যেন সকলে দেবলোকে ভ্রমণ করিয়া দেবগণের সহিত খেলা করিতেছি;—যেন সে খেলা আর ফুরাইবে না। মা ধরাধাম ছাড়িয়া দিব্যলোকে আসিয়াছেন; আমরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তথায় আসিয়াছি। আর পাপতাপ-পূর্ণ পৃথিবীতে যাইব না, মার ছেলে মাকে আর ছাড়িতে হইবে না,—মা আর ছাড়িয়া দিবেন না। কিন্তু রজনীর অপগমে উষার অভ্যুদয় যখন শূন্য চণ্ডীমণ্ডপের মগ্ন দৃশ্য প্রকাশ করিয়া দেয়, তখন বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে পারি,—বুঝিতে পারি যে এই পৃথিবীতে সুখ চিরস্থায়ী নহে। তখন সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়;—কোথায় রাবণ-নাশন রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব,—কোথায় বা বিজয়োদ্যুক্ত ত্রিলোকবাসীর কোলাহল; বন্য কপি ও ভল্লুকের হুলাহুলি;—আর কোথায় বা দুরাচার-রাক্ষস গ্রাস হইতে সদ্য-বিমুক্ত ভারত ভূমির সানন্দ দৃশ্য?—সকলই স্বপ্ন, সমস্তই মায়া, সমুদয়ই মরীচিকা! বিড়ম্বিত ভারত-সন্তান স্বপ্ন দেখিতেছিল, এক মুহূর্ত্তে সেই সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; আবার সেই নিদারুণ নির্জ্জীবতা, নিস্পন্দতা, অসাড়তা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; আবার সেই শক্রর শ্রবণ-ভৈরব বিকট হাস্য প্রাণশূন্য কতকগুলা কঙ্কালকে আতঙ্কে কাঁপাইয়া দিগ্ দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে! ভারত যায়—যায়—রসাতলে নিমগ্ন প্রায়! কোথা মা আমার, আদ্যাশক্তি! এই সময়ে একবার দেখা দাও। মা! তোমাকে কায়-মনোবাক্যে পূজা করিয়া রামচন্দ্র মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমার কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিয়াছিলেন; বিজ্ঞানহীন বনচারী কালিদাস একাত্তে মহাকবি হইতে পারিয়াছিলেন; তিন দিন, তিন রাত্রি ধরিয়া অবিরত পূজা করিয়া হিন্দু সন্তান কি বরলাভ করিল? কৈ, কোনরূপ পরিবর্ত্তন তো দেখিতেছি না? দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসী সেই প্রকারেই মোহিনী হিন্দুর গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া সুখ-সৌভাগ্য গ্রাস করিতেছে, আশা, উৎসাহ ও মানুষের মানুষী কোরকে দলিত করিয়া ফেলিতেছে। জননি! তবে কি সকলই বিফল হইল? তবে কি করুণাময়ীর আর সে করুণা নাই? পাষাণের দয়া কি বাস্তবিকই পাষাণী হইলেন?—কি দয়া! কি মূর্খতা! কি বিষম অন্ধবিশ্বাস! জগন্মাতার যে উপযুক্ত পূজা হইল না, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিল না! গৃহে গৃহে প্রতিমা; গৃহে গৃহে উদ্যোগ, আয়োজন; পল্লীতে পল্লীতে উল্লাস-কোলাহল; কিন্তু বল দেখি, কয়জন হিন্দু-সন্তান কায়মনোবাক্যে মাতার পূজা করিল? কয়জনই বা কপটতা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া জননীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিল? এঁতে গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু কৈ কয়টী স্থানে প্রকৃত পূজা দেখিতে পাইলাম? কয়টী গৃহে প্রকৃত সাত্ত্বিক পূজার আদর দেখিলাম? প্রায় সর্ব্বত্রই আত্মসর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত অসংযত আড়ম্বরের পূর্ণ তামসিক উচ্ছ্বাস;—বিকৃত-বদন বিকৃতাক্ষ বানরগণের বিকট বারুণী-বিলাস!—ভণ্ড পাষণ্ডগণের তাণ্ডব নৃত্য! কৈ, সেই একপ্রাণতা কৈ? সেই গতানুগতিকী তন্ময়তা কোথায়? মূঢ়! তোমার আত্মাভিমান এখনও পূর্ণ মাত্রায় বিস্ফুরিত হইতেছে; সম্মান ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে উপার্জ্জিত দুশ্চিন্তময় অর্থের কিয়দংশ ব্যয় করিয়া স্বীয় সমৃদ্ধতা দেখাইবার নিমিত্ত পূজার আয়োজন করিয়াছিলে; দুই চারিটা ছাগ পশু উৎসর্গ করিয়া, হয়ত মূর্খ বিবেক-বিহীন অসংস্কৃত পুরোহিতের অশুদ্ধ মন্ত্রপাঠ শুনিয়া স্বীয় অহমিকায় পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছ; কিন্তু তোমার পূজা কোথায়? তোমার আত্মোৎসর্গ কোথায়? যতদিন তুমি অহঙ্কার না ছাড়িবে, যতদিন তুমি আড়ম্বর ত্যাগ করিতে না পারিবে, যতদিন না ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কায়মনোবাক্যে দৈবতার চরণে আত্ম বলি না দিবে, ততদিন তোমার শারদীয়া পূজা পিশাচের পরিচর্য্যা ও রঙ্গভূমে অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই নহে, ততদিন তোমার বিজয়া-উৎসব বিজয়া সেবী উন্মাদের ভ্রান্তিবিলাস ভিন্ন আর কিছুই হইবে না; ততদিন ভারত তোমার পঙ্কে যে শয়ান, সেই শয়ানই থাকিবে।

শ্রীযতেন্দ্রের বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিরুপমা।

(উপন্যাস।)

প্রথম অধ্যায়।

মালঞ্চা—ক্ষুদ্র একখানি গ্রাম; গ্রামটী ক্ষুদ্র হইলেও তাহার আভ্যন্তরিক অবস্থা মন্দ নহে। গ্রামে কয়েক ঘর বড় লোকের বাস; সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দ্বারা গ্রামটীর মধ্যস্থল সুশোভিত; সেই অট্টালিকা শ্রেণীর মধ্যস্থলে সামান্য একটী মৃন্ময় বাটীতে দরিদ্র একটী ব্রাহ্মণের বাস। ব্রাহ্মণের নাম পীতাম্বর সান্যাল; তাঁহার একটী কন্যা ভিন্ন অন্য কোন সন্তান সন্ততি নাই; কন্যাটীর নাম নিরুপমা; মধ্যাহ্ন সময়ে সান্যাল মহাশয় তাঁহার ভগ্নপ্রায় বৈঠকখানায় বসিয়া প্রতিবেশী ভ্রাতা রাধাবিনোদ মৈত্রের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন।

রাধাবিনোদ বাবু একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি; ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেখানে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন; সেই সময়ে তিনি বিপুল পরিশ্রম সহকারে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; অর্থও যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছেন; এখন স্বেচ্ছায় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাটীতেই আছেন। বয়ঃক্রম প্রায় ৩০ বৎসর; তাহার সন্তান সন্ততি কিছুই নাই; তিনি পরোপকারী, সদাশয় এবং দয়ালু বলিয়া দেশের মধ্যে যথেষ্ট সম্মান আছে।

যখন কথোপকথন হইতেছিল, তখন সান্যাল মহাশয়ের বাম হস্তে একটী হুঁকা ও সামক কলিকা বর্ত্তমান ছিল, কলিকা তখনও হুঁকার শিরোপরি স্থান লাভ করে নাই, কারণ তাহার গর্ভস্থ অগ্নির দাহিকাশক্তি মন্দীভূত হওয়ায় সান্যাল মহাশয় তাহার চিকিৎসা-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, দক্ষিণ হস্তস্থ চিমটার সাহায্যে ওতপ্রোত করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ ফুৎকার দিতেছিলেন। দৈবক্রমে মধ্যস্থলের দুইটী দন্তের অভাব হওয়াতে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মুখামৃত এতই অধিক পরিমাণে বর্ষিত হইতেছিল যে, তজ্জন্য অগ্নি কোন ক্রমেই আপনার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতেছিল না। যাহাই হউক তিনি এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াও রাধাবিনোদ বাবুর সহিত কথোপকথনে বিরত হয়েন নাই।

রাধাবিনোদ বাবু সান্যাল মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কি দাদা! এ বৎসরও'ত কেটে যায়, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভাদ্র মাস এসে পড়্‌লো, কৈ এবারও তো কিছু ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লেন না?"

"কি করি বল ভাই! ভাগ্যে না থাকিলে কিছুই হয় না, আর ক'রে উঠ্‌বো বা কি, এ কি সহজ কথা, আমার'ত ইচ্ছা এই আষাঢ় মাসেই কাজ শেষ ক'রে ফেলি, এখনই ঘরে থেকে দুশো টাকা বা'র কর্‌তে পার্‌তাম তা হলে কি অমন এম্‌নি করে দিন গুন্‌তে হ'ত?

"সে কথা অবশ্য যথার্থ বটে, এ সকল কেবল টাকার কাজ, তা ব'লেই বা হচ্ছে কি? মেয়ের বিয়েও তো দিতে হবে? সকল দায়ের মধ্যে কন্যাদায় এক প্রধান দায়, বিশেষ ব্রাহ্মণের ঘরে।"

"তা কি আর জানিনে ভাই; সেই ভাবনা ভেবে ভেবেই তো আমি ক্ষিপ্ত কুক্কুরের মত হ'য়েছি, কি যে ক'রবো, কিছুই ঠিক্ ক'র্ত্তে পাচ্ছিনে, কি উপায় করি বল্ দেখি?"

"তাই'ত? আমিও মধ্যে মধ্যে আপনার এই চিন্তা করি, কিছুই স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারিনে; আচ্ছা আপনার যজমান কয় ঘরের ঘরটা ভাল, ওরা কিছু সাহায্য কর্‌বে না?"

"আরে রাম! রাম! ও যজমানের কথা আর বল না, ওদের কাছে কি কিছু ভরসা আছে?"

"কেন? অবস্থা ভাল—"

"রেখে দাও তোমার অবস্থা ভাল, আগে এসব যজমান হ'তেই পিতা পিতামহের ঘরটা খোলা দুর্গোৎসব হ'য়েছে, এখন হ'ল সরোটারা জাত-মান্যা, পূজা পার্ব্বণ সে সব'ত উঠ্‌তেই দিয়েছে; ব'ল্‌বো কি ভাই, ওনতে গাই ওদের বাসায় গেলে ভিখিরীতে এক মুঠো দিতে পারে না।"

"বলেন কি, সত্য নাকি? তবে ও যজমান রেখে নাম মাত্র?"

"তা বৈ আর কি; সবাই হ'ল চাকুরে, যখন আপন স্ত্রী পুত্র স্কন্ধে ক'রে শৃগাল দুহুরের মত এ দেশ ও দেশ ক'রে বেড়াচ্ছে; দেশের সঙ্গে, বাড়ীর সঙ্গে এক প্রকার সম্বন্ধ লোপ ব'লেই হয়।"

"দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ লোপ হ'লতো, তাতে আপনার ক্ষতি কি? ছেলে মেয়ের বিয়ে পৈতে তো আছে?"

"তা'ত আছে, তা থাকুলে হবে কি? পুরোহিতকে কিছু কি দিতে চায়? আর সে দু পাঁচ টাকার জন্য মগের মুল্লুক যেতেও পারিনে; আগে মেয়েগুলো মাঝে মাঝে দু একটা ব্রত নিয়ম ক'র্ত্তো, তাতেও কিছু কিছু পাওনা হ'ত, এখন ব্রত দূরে থাক্; স্ত্রীর সিঁদুর পর্য্যন্ত দেয় না।"

"তা না দিক্, কন্যাদায় ব'লে ধর্‌লে, অবশ্যই কিছু সাহায্য কর্ত্তে পারে।"

"তুমি তা মনেও ক'র না, ও অকাল কুষ্মাণ্ডদের কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত, নিতান্ত পেড়াপীড়ি ক'রে ধর্‌লে যদিও সাহায্য করে, তা এমনি ক'রবে যে, কন্যাদানের দক্ষিণাটাও তাতে কুলাবে না। ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে একটা সদুপায় কিছু বল।"

"আর কি উপায় ব'ল্‌বো? তবে না হয় একবার দেশের বড় লোকদের কাছে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কন্যাদায় ব'লে কিছু নিয়ে আসুন।"

"সে আশায়ও এক প্রকার জলাঞ্জলি, আর কি সে কাল আছে? এখন কেবল সই সুপারিসের দান, কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায় ব'ল্লে এখন আর কেউ কিছু দেয় না, গেলেই বলে তুমি কার লোক? যদি সুপারিসের জোর থাকে তবেই দশ টাকা হয়, নৈলে অর্দ্ধচন্দ্র খেতে হয়।"

"না—না, আপনি যে সব কথাই উড়িয়ে দিচ্ছেন, কেন মাঝে মাঝেই'ত বড় লোকের দানের কথা খবরের কাগজে বা'র হচ্ছে, তারা মনে ক'ল্লে কি আপনার এই মেয়েটার বিবাহ দিতে পারে না?"

"মনে ক'ল্লে পা'র্ব্বে না কেন? এখনই পারে, আমি'ত আর খবরের কাগজে নাম তুলে দিতে পার্‌বো না। রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, ছি আই, আই' না কি বলে এ সকল খেতাবও দিতে পা'র্ব্ব না, তবে আমাকে দেবে কেন? এখনই একটা বড় সাহেব সুবোর খানসামার কন্যাদায় হ'ক্, দে'খ্‌বে দশ হাজার

টাকা বেরিয়ে যাবে ; গরীব ব্রাহ্মণের প্রতি আর কি কেউ চায়? তাই যদি চা'বে, তাহ'লে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এরূপ দুর্দ্দশাই বা হ'বে কেন?"

"তবে উপায়?"

"উপায় ভগবানের নাম ; তিনি যা ক'র্‌বেন তাই হবে, ভাগ্যে গৌরীদানের ফল থাকে, তাহ'লে অবশ্যই হবে ; ব্রহ্মত্ব কয় বিঘা ছিল ব'লে বৎসর বৎসর গোটাকতক ধান পাই, তাই অন্নকষ্ট হয় না ; নতুবা এই দুর্ভিক্ষের সময় অন্নাভাবেই মারা যেতে হ'ত। মেয়ের বিয়ে সে ত দূরের কথা।

এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তার পর সান্যাল মহাশয় বৃদ্ধাঙ্গুলির স্পর্শ দ্বারা জানিলেন, কলিকা হিমাঙ্গ হইয়াছে, এজন্য তিনি রাধাবিনোদ বাবুকে বসিতে অনুরোধ করিয়া অগ্নি অন্বেষণে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই অগ্নি সংগ্রহ করিয়া কিছু প্রসন্ন বদনে রাধাবিনোদ বাবুর পার্শ্বে বসিলেন।

রাধাবিনোদ বাবু তাঁহাকে তাদৃশ প্রফুল্ল দেখিয়া, ঈষৎ হাস্য-মুখে প্রশ্ন করিলেন "কি দাদা! বড় যে হাসিমুখ, বৌ ঠাকুরুণের সঙ্গে বুঝি রসালাপ হ'য়ে গেল?"

"না ভাই! রসালাপ নয়; তবে কিনা ব্রহ্মবাটী বড় সদাশিব মনুষ্য ; যতই কেন দুঃখ কষ্ট হ'ক না, সর্ব্বদাই হাস্য বদন, এই দেখ গেলাম আর হাস্‌তে হাস্‌তে এক কাঁড়ি আগুণ তুলে দিলেন। 'তা যাই হ'ক ভাই! এখন যে কথাটা পে'ড়েছ তার একটা মীমাংসা হ'ক, আমি প্রতিদিনই মনে করি তোমাকে একবার ব'ল্‌বো, আ'জ আপনা হ'তেই যখন তুলেছ তখন এর সুপরামর্শ যা হয় তা কর। একটা সদুপায় আমাকে দেখিয়ে দাও।

"উপায় এখনই ত ব'লেন ভগবানের নাম, অবশ্য তিনিই উপায় ক'রবেন, ভাল পাত্র কোন খানে সন্ধানে আছে?"

"তাই বা কে জানে ভাই, নিজের অবস্থা ভেবে আমি ও সকল বিষয়ে বড় একটা চেষ্টা করি নাই, তবে উড়ো উড়ো শুন্‌ছি গোকুল নগরে এক পাত্র আছে, তাদের ঝাঁড়ও বড় বেশী নয়, ছেলেটীও ভাল।"

"তবে চলুন, একদিন তাই না হয় গিয়ে দেখে আসা যা'ক। পাত্র স্থির হ'লে তার পর টাকা কড়ির বিষয় দেখা যাবে।"

"সেই কথাই ভাল, তোমারই ভাই ভরসা, যে দিকে যা ক'ল্লে ভাল হয় তাই কর, আমিত বৃথা মনুষ্য—"

"আচ্ছা! সে জন্য আপনাকে আর কিছু বেশী ব'ল্‌তে হবে না, এখন পাত্র জুটলেই হয়। এখন আমি আসি, আপনি একটা ভাল দিন দেখে রাখবেন, সন্ধ্যা বেলায় এসে যাওয়ার পরামর্শ করা যাবে।"

এই বলিয়া রাধাবিনোদ বাবু গাত্রোত্থান করিলেন, সান্যাল মহাশয়ও তাঁকা হস্তে বিপুল আনন্দভরে বাটী মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভবিষ্যতে-সংসার নাট্যশালায় জীবন-নাটোর যে সকল অভিনয় হইবে, ক্ষুদ্র বালিকা আপন খেলা ঘরে বসিয়া অনন্য-মনে এখন হইতে সেই সকল যেন অভ্যাস করিতেছে; নিরুপমাদের বাটীর এক পার্শ্বে তাহার খেলিবার ঘর, সেই ঘরের ভিতর আপনার হৃদয়ের উপযোগী ক্ষুদ্র একটী গৃহস্থালী সাজান; তাহার ভিতর বসিয়া নিরুপমা আজ তাহার পুতুলের বিবাহের উদ্যোগ করিতেছে; সঙ্গী

বালী নিকটে কেহ নাই, আপনার অকপট হৃদয়ে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, আপন মনে সেই ওলি উচ্চারণ করিতেছে, আর মেয়ের বিবাহের যুত কিছু আয়োজন, ঐশ্রান্তরাল সব ওলি ঠিক্ করিয়া করিয়া রাখিতেছে। নিরুপমা যদি উপন্যাসের ন্যায়িকার মত সুন্দরী হ'ত, তাহা হইলে বলিতে পারিতাম, যে, সে, এই ক্ষুদ্র খেলা ঘরখানি আলো করিয়া বসিয়া রহিয়াছে ; কিন্তু নিরুপমার সে ঘরখানা করা রূপ নাই। যেরূপ দৃষ্টি-পথে পড়িলে, নয়ন ঝল্‌সিয়া যায় অথবা যে রূপ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া-চন্দ্র রশ্মির ন্যায় সমস্ত জীবন সুস্নিগ্ধ কিরণে প্লাবিত করে, বিধাতা নিরুপমাকে সে সৌন্দর্য্য দেন নাই। তাহার সুচিক্কণ বর্ণ শ্যাম, মস্তকে কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশপাশ; শ্যাম নয়নের তারা দুটী কাল তাহাও গাঢ় শ্যাম; তাহার ললাট ও কটি ভীষ, ওষ্ঠাধর রক্তাভ এবং মৃদু মৃদু হাস্য বিজড়িত; মুখমণ্ডলে প্রসন্নতা, বাল-স্বভাব-সুলভ সরলতা সতত বিদ্যমান; লোকে নিরুপমাকে সুন্দরী বলে না অথচ কুৎসিৎ বলিয়াও কেহ ঘৃণা করে না, বরং সে নিকটে থাকিলে সকলেই সুখী হয়।

নিরুপমা আজীবন দারিদ্র্য-কোলে পরিপালিতা, আপনার বিহীনতার বীজ শৈশব হইতেই তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছে। তাহার রাগ নাই, অভিমান নাই, সর্ব্বদাই প্রফুল্ল চিত্ত; সে যদিও বালিকা তথাপি পিতা মাতার সাংসারিক অবস্থা সে বুঝিয়াছে, বসন ভূষণ যাহা পায় তাহাতেই পরিতৃপ্তি, তাহাদের বাটীর চারিদিকে বড় বড় অট্টালিকা, সেই অট্টালিকার ভিতর তাহার সমবয়স্কা বালিকাদের নানা প্রকার অলঙ্কার, নিরুপমা কখন সেদিকে চাহিয়াও দেখে না; সে সকলেরই নিকট সসঙ্কুচিত ভাবে থাকে; তাহার প্রকৃতি কোমল, নবোদ্ভিন্ন দূর্ব্বাদল অপেক্ষাও নমনীয়; তাহার হাস্য মৃদু, গতি মৃদু, কথা গুলি অতি মৃদু মৃদু। দারিদ্র্য প্রকৃতি শৈশব হইতে তাহাকে এই মৃদুতা শিক্ষা দিতেছে।

তাহার বয়স এখন অষ্টম বৎসর মাত্র। সান্যাল মহাশয় অধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনুষ্য, শাস্ত্র বাক্যে তাঁহার গাঢ় বিশ্বাস, অষ্টম বৎসরের মধ্যে কন্যাদান না করিলে গৌরী দানের ফল লাভ হইবে না, সেই জন্য বালিকা নিরুপমার বিবাহের জন্য এত চিন্তিত; অবস্থা ভাল নহে, কাজেই তিনি অন্তরের এ উচ্চ অভিলাষটী পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না। একমাত্র কন্যা নিরুপমা, তেমন স্নেহের পাত্রী চিরজীবন সুখে থাকে, তাহাও অবশ্য দেখিয়া শুনিয়া দিতে হয়, কিন্তু দেশে পাত্রের যেরূপ দর শুনিতেছেন, তাহাতে তিনি এক প্রকার নিরাশ হইয়াছেন।

নিরুপমা যেখানে আপন খেলা-ঘরে বসিয়া খেলা করিতেছিল, তাহার জননী সেই সময় সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নিরুপমা জননীকে দেখিয়া একটু হাসিল, হাসিতে হাসিতে বলিল "মা! আমাদের বাড়ী আজ তোমার নেমন্তন্ন।

জননীর স্নেহ-সমুদ্র উথলিয়া পড়িল, সহাস্য বদনে বলিলেন "কেন গা! কিসের নেমন্তন্ন আজ তোমার বেটার বিয়ে নাকি?"

"বেটার নয়, মেয়ের ; আমার গঙ্গাজলের বেটার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে।"

"বটে? তা বেশ! কি কি খেতে দিবে বল দেখি?"

"কেন, নেয়ে এসে এখনই সব রাঁধ্‌বো, ভাত, মাছ, সন্দেশ, পরমান্ন—"

"এত যোগাড়? তা, এ বিয়ে হবে কখন?"

কেন সন্ধ্যা বেলাক্ষ এখনই দেখবে কত বাজনা বাজবে, মশাল জলবে, আমি এখনই নাপীত-বাড়ী গিয়ে আল্‌তা নিয়ে আস্‌বো, আর সব এয়ো ডেকে আন্‌বো।"

"তা'তু আন্‌বে, তেল হলুদ ক'রবে না?"

"এই—সে যে কা'ল হয়ে গিয়েছে, আ'জ কি হলুদ তেল হয়, আজ যে বিয়ে।"

"বটে? তাতু জানি নে।"

"ও মা তুমি এত বড় মানুষ তবু জান না?"

"তা না জানি, তুমি আমাকে শিখিয়ে দিও, এখন এস তোমার চুল বেঁধে দিই গে, চুল বেঁধে এসে আবার বিয়ের উজ্জুগ ক'র।"

"না—এখন আমি চুল বাঁধ্‌তে যাবনা, এখন আমার কত কাজ বাকী র'য়েছে?"

"তা থাকুক, চুল না বাঁধ্‌লে হয়? আ'জ যে তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌বে?"

নিরুপমা আর আপত্তি করিলনা, খেলা-ঘর ছাড়িয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, জননী কোলে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে মুখ চুম্বন করিলেন। নিরুপমা মায়ের মুখখানে চাহিয়া চাহিয়া বলিল—

"মা! সেই ছড়াটা কি? আর একবার বল না? আমি শিখ্‌বো।"

"কোনটা?

"কেন সেই যে—"সীতার মত সতী হব।"

"সেইটে? কেন সেটা'ত তুমি শিখেছিলে।"

"আবটা পারি নাই।"

"আচ্ছা যে টুকু গে'রেছ সেই টুকু বল দেখি?

"সীতার মত সতী হব।"

রামের মত পতি পাব,

লক্ষণের মত দেওর পাব,

দশরথের মত শ্বশুর পাব,

কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব,

জ্যেষ্ঠাদীর মত রাঁদুনী হব—তার পর?

"এইত সব জান, তবে আবার কেন?"

এই বলিয়া তিনি পুনরায় নিরুপমার মুখ-চুম্বন করিলেন। নিরুপমা আবার ছড়াটি বলিতে লাগিল।

নিরুপমা! তোমার শৈশবের এই কামনা-হীন প্রার্থনা, তোমার এই সোহাগ-সংসিক্ত মধুর ভাষা, যিনি দুঃখ দারিদ্র্যভঞ্জন, তাঁহার কর্ণমূলে স্থান পা'ক। তোমাকে চিরজীবন যেন এমনি আনন্দ সাগরে ভাসিতে দেখি, সংসার-নাট্যশালায় তোমার দুঃখময় অভিনয় দেখিয়া কখন যেন কাঁদিতে না হয়।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের উপপত্তি।

শাস্ত্রীয় বিধান সকল আঁতাকিক, ইহা তর্ক ও যুক্তির বিষয়ীভূত নহে, অবিচারে পালনীয়। এইরূপ শাস্ত্রশাসন থাকাতে মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান পিপাসা সত্ত্বেও অনেক স্থলে শাস্ত্রবিধির নিগূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার রীতি সাধারণে প্রচলিত ছিল না। কালের পরিবর্ত্তন সহকারে সম্প্রতি অনেকের উক্ত নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইবার প্রবৃত্তি বলবতী হইলেও আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। প্রতি আমরা শাস্ত্রের একটী নিগূঢ় তাৎপর্য্য, যা অনেকেরই অবিদিত রহিয়াছে, এস্থলে ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

চন্দ্রলোক বা চন্দ্রমণ্ডল এবং অন্যান্য নক্ষত্রগ্রহ হইতে পৃথিবীর অধিকতর নিকট-বর্ত্তী, ঔপপত্তিক জ্যোতিঃশাস্ত্র তাহা বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়াছে। চন্দ্রমণ্ডল যে, কেবল পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী এরূপ নহে, ইহাকে পৃথিবীর অংশ বিশেষও বলা যায়। বিশাল জল-গর্ভস্থ কোন মহাদ্বীপের সমীপবর্ত্তী মহাদ্বীপ যেরূপ সেই মহাদ্বীপের অধিকাংশ জল ধারণ করে, অনন্ত আকাশ-গর্ভস্থ পৃথিবী তদ্রূপ চন্দ্রমণ্ডলও সেইরূপ (১) তবে পৃথিবীতে মৃত্তিকার ভাগ অধিক থাকাতে যেরূপ ইহা "মৃন্ময়ী" নামে অভিহিত হয়, চন্দ্রমণ্ডলে জলের ভাগ বেশী থাকায় সেইরূপ তাহাকে "জলময়" বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক চন্দ্রমণ্ডল যে জলময়, জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) জলময় হইলেও এতদ্‌মণ্ডলে প্রাণী-বিশেষের বসবাস আছে। বিশেষতঃ চন্দ্রমণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগে পিতৃলোকের অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়। (৩) চন্দ্রমণ্ডলে গোলার্দ্ধ মাত্র মানুষের দৃশ্য, অপর গোলার্দ্ধ কদাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। অদৃশ্য-ভাগকেই ঊর্দ্ধ বলা যায়, এই ঊর্দ্ধ-ভাগেই পিতৃলোক। সূর্য্যের দর্শন অদর্শনই যেরূপ পৃথিবীতে দিবারাত্রীর কারণ, পিতৃ-লোকেও সেইরূপ একমাত্র সূর্য্যই দিবারাত্রীর কারণ স্বরূপ। (৪) কিন্তু পৃথিবীতে যেরূপ চতুর্ব্বিংশতি ঘটিকাতে দিবারাত্রী সম্পন্ন হয়, চন্দ্রলোকে সেরূপ হয় না? কৃষ্ণাষ্টমীর শেষ অর্দ্ধাংশ হইতে শুক্লাষ্টমীর প্রথমার্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত পিতৃলোকের দিবস এবং শুক্লাষ্টমীর শেষার্দ্ধাংশ হইতে কৃষ্ণাষ্টমীর প্রথমার্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত উক্ত লোকের রাত্রীর পরিমাণ। সুতরাং অমাবস্যা পিতৃলোকের মধ্যাহ্ন এবং পূর্ণিমা মধ্যরাত্রি। কৃষ্ণাষ্টমী প্রাতঃকাল, আর শুক্লাষ্টমী সন্ধ্যা। অতএব মানবগণের এক চান্দ্রমাসের পরিমাণও যাহা, পিতৃগণের এক দিবারাত্রীর পরিমাণও তাহাই। চন্দ্রমণ্ডলে পিতৃগণ ব্যতীত অপর কোন প্রাণীর অবস্থান আছে কি না, এ প্রবন্ধে আমরা তাহার আলোচনা করিব না। পিতৃ-গণেরই বিশেষ পরিচয় প্রদান করিব। কেন না পিতৃগণই এ প্রবন্ধের বিষয়। আর্য্যশাস্ত্রে অনাবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি ভেদে মানবগণের দুই প্রকার পারলৌকিক গতি উক্ত হইয়াছে। যে সকল মানব জ্ঞান ও ভক্তিযোগের দ্বারা পুণ্য-পাপ বিনাশের পর মুক্তিযোগ্য হন, মৃত্যুর পর(৫)

(১) কোন কোন ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন যে, চন্দ্রমণ্ডল প্রথমতঃ পৃথিবীর পৃথক্ গ্রহরূপে পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন ছিল; পৃথিবীর ঘূর্ণন-বেগে পরে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এ মতে বিশ্বাস করিবার কোন উপযুক্ত কারণ পাওয়া যায় না।

(২) উপচিতি মুপঘাতি শৌক্ল্য মিন্দো-
স্তাজত ইনং ব্রজতশ্চ মেচকত্ত্বং।
জলময় জল স্যস্য গোলকত্বাৎ
প্রভবতি তীক্ষ্ণ বিষাণ রূপ তাস্য॥
(শৃঙ্গোন্নতি বাসনা গোলাধ্যায়)

২

(৩) বিঘূর্ণভাগে পিতরো বসন্ত। স্বাধঃ সুধাদীধিতি মাসনস্তি। (গোলাধ্যায়)

(৪) কুপৃষ্ঠগানাং ছ্যনিশং যথা মৃণাং
তথা পিতৃণাং শশি পৃষ্ঠবাসিনাং॥
(গোলাধ্যায়)

(৫) অমাবস্যাতে যেরূপ ইন্দুক্ষয় বলা যায়; কিন্তু অমাবস্যাতে চন্দ্রবিম্বের বিন্দুমাত্রও ক্ষয় হয় না, কেবল চন্দ্রকলারই ক্ষয় হইয়া থাকে।

তাঁহাদিগের আত্মা সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলে নীত হন। সূর্য্যমণ্ডলই বিষ্ণুলোক, এই অনাময় বিষ্ণুলোকে যাইয়া সেই আত্মা সবিতা দেবের ভর্গরূপ ব্রহ্মতেজে বিলীন হয়, সুতরাং এরূপ আত্মার আর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না। জ্ঞানীগণ ব্রহ্ম নির্ব্বাণ ও ভক্তগণ সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত মুক্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হন। পরন্তু যে সকল জ্ঞান ও ভক্তিহীন মানব সদসৎকর্ম্ম দ্বারা পুণ্য-পাপ সঞ্চয় করে, পুণ্য-পাপের উপযুক্ত ফলভোগের নিমিত্ত তাহাদিগের আত্মা মৃত্যুর পরে, চন্দ্র-রশ্মি অবলম্বন পূর্ব্বক চন্দ্রলোকে নীত হয়। এই চন্দ্রলোকগত আত্মা সকলই পিতৃলোকে বা পিতৃগণ নামে অভিহিত হন। (৬) চন্দ্র-লোকগত আত্মার পুনরাবৃত্তি হয় অর্থাৎ শুভাশুভ ফলভোগের নিমিত্ত ইহাদিগের পুন-র্জ্জন্ম হইয়া থাকে। মৃত্যুর পরে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়—হিন্দুসমাজের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা এ বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস করে; কিন্তু কি প্রকারে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়—কি প্রকারেই বা জীব মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, এ বিষয় অনেকেরই অবিদিত রহিয়াছে। বিদেশীয় ও বিজাতীয় কৃতবিদ্য লোকেরা আর্য্যশাস্ত্রের এই জন্মান্তর-বাদের কথা শুনিয়া কেহ হাস্য-রসে—হাবু-ডুবু খান, কেহ বা হিন্দুদিগের অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা মনে করিয়া বিস্ময়-সাগরের অন্তস্তলে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। সে যাহা হউক, জন্মা-ন্তর-বাদ অভ্রান্ত অথবা ভ্রান্তি-সংকুল, এ স্থলে সে বিষয়ের কোন বিচার করিব না। আর্য্য-শাস্ত্রানুসারে জীবের কিরূপে জন্মান্তর হয় সংক্ষেপাক্ষরে তাহাই পরিব্যক্ত করিব।

কেশাগ্রকে শত ভাগ করিলে তাহা যে প্রকার সূক্ষ্ম হয়, জীবাত্মা তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থ অর্থাৎ জড়সম্বন্ধে সেরূপ পরমাণু-চেতন সম্বন্ধে সেইরূপ জীবাত্মা। এই আত্মা প্রাকৃত নিয়মানুসারে শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে নীত হইয়া নিয়মিত কালান্তে নীহার-সংযুক্ত হয় এবং পৃথিবীর শস্যাদি খাদ্য বস্তুজাত পতিত হইয়া কিছু-কাল উহাতে অবস্থিতি করে, তদনন্তর মনুষ্যাদির খাদ্যযোগে রেতঃরূপে স্ত্রী-গর্ভে প্রবেশ করিয়া, কর্ম্মানুরূপ শরীরী হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে। কর্ম্মানুসারেই মনুষ্য পশু ও তীর্য্যগাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। (৭) আনুসাঙ্গিক জীবের জন্মান্তরের বিষয় যথা-শাস্ত্র উক্ত হইল; সম্প্রতি প্রকৃতের অনুসরণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। হিন্দুশাস্ত্রে যে পিতৃলোকের পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবার বিধান আছে, ইদানীং অনেক হিন্দু সন্তানই তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন; আজকাল সচরাচর পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ প্রায় দেখা যায় না।

দেহের সর্ব্বথা ক্রিয়াশক্তি-রাহিত্যকেও সেইরূপ আত্মার মৃত্যু বলা যায়, বাস্তবিক দেহাশ্রিত আত্মার বিনাশ হয় না।

(৬) অগ্নি জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ যণ্মাসা উত্তরায়নং। তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণ যণ্মাসা দক্ষিণায়নং। তত্র চান্দ্রমাসং জ্যোতি র্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ইত্যাদি

(ভগবদ্গীতা ৮ অধ্যায়)

(৭) পতিত্বা মণ্ডলে চেন্দোস্তুতো নীহার সংযুতঃ।
ভূমৌ পতিত্বা ব্রীহ্যাদৌ ততস্ত্বিত্বা চিরং পুনঃ।
ভুক্ত্বা চতুর্ব্বিধং ভোজ্যং পুরুষৈঃ ভুজ্যতে ততঃ।
রেতো ভূত্বা পুনস্তেন স্তুতো ত্রাত্মোন সিঞ্চিতঃ।
যোনি রক্তেন সংযুক্তং জরায়ু পরিবেষ্টিতঃ।
ইত্যাদি

(অধ্যাত্ম রামায়ন কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ড ৮ সর্গ)

এই শ্রাদ্ধ অমাবস্যা তিথিতে করিবার বিধান আছে। শ্রাদ্ধে যে পিণ্ড প্রদান করা যায়, তাহা পিতৃগণের ভোজ্যরূপেই কল্পিত হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগের মধ্যাহ্নই ভোজনের কাল, তদনুসারে ইহারা পিতৃগণের পিণ্ড-রূপ ভোজ্যের পিতৃলোকের মধ্যাহ্ন অমাবস্যা তিথিতেই প্রদান করে। অমাবস্যাতে পিতৃ-শ্রাদ্ধের ইহাই মুক্তিযুক্ত কারণ। কদাচিৎ পিতৃলোকের প্রাতঃকাল কৃষ্ণাষ্টমীতেও শ্রাদ্ধ করিবার বিধান আছে। পূর্ব্বকালে ঋষি-বংশে প্রাতর্ভোজনের রীতিও প্রচলিত ছিল; সুতরাং তাঁহারা পিতৃগণকে প্রাতর্ভোজন করাইবেন আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ মধ্যাহ্নই ভোজনের মুখ্যকাল।

শাস্ত্রালোচনা দ্বারা অমরধামে পিতৃ-শ্রাদ্ধের যে কারণ আমরা উপলব্ধি করিয়াছি, এস্থলে তাহাই ব্যক্ত করিলাম। অভিজ্ঞ পাঠক ইহাতে যদি কোন ভ্রমপ্রমাদ দেখিতে পান, তাহার সংশোধন অথবা এতদপেক্ষা অন্য কোন উপায়ের যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিলে, পরম লাভ বোধ করিব। কেন না শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ করাই আমা-দিগের আন্তরিক ইচ্ছা।

শ্রীগোবিন্দমোহন রায়।

বিজয়া।

(ক্ষুদ্র গল্প)

(১)

আবার বঙ্গে বাজনা বাজিল। সুনীল গগনে শরতের চাঁদ আবার সুবিমল হাসি হাসিতে লাগিল। শোক-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া বাঙ্গালি-হৃদয় আবার মায়ের পূজায় মাতিয়া উঠিল। প্রবাসী হেমচন্দ্রের মনেও সে স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল। বহুদিন হইল দেশে যান নাই, তাই আজ নব-আশায় বুক বাঁধিয়া, হৃদয়ে সুখের প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রবাস-গৃহে উদ্যাপনে মনস্থ করিয়াছেন। সপরি-বারে নৌকাযোগে রওনা হইলেন। যমুনার জল স্থলে শ্বেতোর্ম্মিরাশী দলিত করিয়া নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝিরা ধীর বাতাসে পাইল তুলিয়া দিল; নৌকা ক্রমে প্রয়াগের নিকট আসিল।

দিবা অবসান-প্রায়। সুদূর অম্বরে দিবাকর সিন্দুর ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইলেন। দূর হইতে প্রয়াগের সান্ধ্য-আরতির মধুর ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। হেমচন্দ্রের মনে আশা-প্রদীপ আবার দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। পিতা মাতার প্রশান্ত মূর্ত্তি হৃদয়ে মুকুর করিয়া আবার উৎসাহে হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

কিন্তু একি! অকস্মাৎ চারিদিক ঘনমেঘে আচ্ছন্ন হইল। সজোরে বায়ু বহিতে লাগিল। কল্লোলিনী গভীর গর্জ্জনে নাচিয়া উঠিল।

উহার উপর ঊর্ম্মি আসিয়া নৌকা অতলশ্রী করিল। ঝড়-বৃষ্টি-মহাপ্রলয়;—সেই ঘনান্ধকারে কে কোথায় ভাসিয়া গেল।

(২)

প্রসাদপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এলাহাবাদের প্রায় দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। জগৎ বাবু গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। বাড়ীতে নিয়মিত পূজা পার্ব্বণাদি হইয়া থাকে। হেমচন্দ্রই তাঁহার একমাত্র সন্তান। আজ তিন বৎসর হইল তিনি হেমচন্দ্রকে দেখেন নাই। হেমচন্দ্র পরিবার লইয়া বাড়ী আসিতেছেন, তাই এবার পূজায় বড় ধুম। বহুদিন পরে পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দর্শন করিবেন; বড়ই আনন্দে সমস্ত আয়োজন করিতেছেন।

প্রসাদপুরের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে ভগ্ন প্রাচীর-বেষ্টিত একটি ভগ্ন অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। একদিন ঐ ভগ্ন স্তূপ হৈমময় ছিল, কত সুখ-শান্তির আবাস ছিল। হায়! আজ কালের গতিতে সকলই ভস্মস্তূপে পরিণত। উহাই হেমচন্দ্রের শ্বশুর-বাড়ী। হেমচন্দ্রের শ্বশুর বহুদিন হইল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ শ্বাশুড়ী আজিও আশায় বুক বাঁধিয়া সেই শৃগাল-গৃধিনীর বিকট চিৎকারের মধ্যেও দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। তিন বৎসর পরে তাঁহার একমাত্র হৃদয়ের ধন বিজয়াকে দেখিবেন, তাই শ্মশানে আজিও কুসুম ফুটিয়াছে!

(৩)

ক্রমে ষষ্ঠীর নিশি প্রভাত হইল। চারিদিকে মঙ্গল-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। কিন্তু জগৎ বাবুর বাড়ী আজ নীরব। বাড়ীর চারিদিকে যেন বিষাদের ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জীবন-সর্ব্বস্ব পুত্রী পুত্র বিসর্জ্জন দিয়া হেমচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। আশা, উৎসাহ, সুখ শান্তি, সকলই চলিয়া গিয়াছে; নীরব একটি প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হেমচন্দ্র আজ গভীর বিষাদ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন।

একে একে চারিদিন অতিবাহিত হইল। কাল বিজয়া আবার প্রভাত হইল। বিজয়ার আনন্দে লোক মাতিয়া উঠিল। বৈকালে আবার বিজয়ার কোলাহলে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইল। কিন্তু এ বিষাদ-প্রকোষ্ঠে যেন আর দিনমনি দেখা দিলেন না।

হেমচন্দ্রের দেহ কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে। গভীর শোকে শীর্ণ হইয়াছে, হৃদয়ের আশা-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্র সেই নীরব প্রকোষ্ঠে শ্মশানের ছাই বুকে লইয়া পড়িয়া আছেন। এত অনুরোধ, এত আশার ছবি, এত সুখস্বপ্ন —কিছুতেই সে রাত্রিতে দরজা খুলিলেন না। পিতার অশ্রু, মাতার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ এবং আত্মীয় জনের দুঃখসন্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস কিছুই করিতে পারিল না। নিরাশায় একরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

(৪)

রাত্রি অধিক হইয়াছে। চারিদিক নীরব, জন-কোলাহল-শূন্য। চন্দ্রের সুবিমল জ্যোৎস্না বাতায়ন পথ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছে। সে নির্ম্মল চাঁদের হাসি আজ হেমচন্দ্রের নিকট বিষবৎ বোধ হইতেছে। তিনি ধীরে ধীরে একবার উন্মুক্ত বাতায়ন পানে তাকাইলেন। একখানি বিষাদ-প্রতিমা নয়ন-পথে পতিত হইল। স্থির, ধীর, নিশ্চল, স্পন্দহীন ছবিখানি আলুলায়িত কেশে পাগলিনী বেশে হেমচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমচন্দ্র হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। একি স্বপ্ন! সম্মুখে কি তাঁহারই প্রাণের বিজয়া!! আর না—আর থাকিতে পারিলেন না। সেই ক্ষীনদেহে প্রফুল্ল হইল। হৃদ প্রসারিত করিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন—"বিজয়া—আয়—বুকে আয়, প্রা—ণ—ধা—ধ," আর বলিতে পারিলেন না। আলেখ্য নয়নপথ হইতে অপসারিত হইল। হেমচন্দ্র মূর্চ্ছা গেলেন। গৃহ অন্ধকারে পূর্ণ হইল। সমস্ত ধরণিকা অন্ধকারে ঢাকিয়া 'বিজয়ার চন্দ্র' ধীরে ধীরে অস্ত গেলেন। গৃহ প্রাঙ্গন পিতা-মাতার দারুণ ক্রন্দনে পূর্ণ হইল। হেমচন্দ্রের বোধ চারিদিকে যেন শ্মশানের অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

(৫)

হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর দুইটি বৎসর ধীরে ধীরে কালের হিল্লোলে ডুব দিল। একদিন সন্ধ্যার সময় সকলে দেখিল, দূর হইতে একটী সন্ন্যাসিনী গ্রামে প্রবেশ করিতেছে। দেখিবার জন্য তৎলোক সমবেত হইল। পাগলিনী-বেশে দ্রুত পদক্ষেপে সন্ন্যাসিনী গ্রামে প্রবেশ করিল। হস্তে লম্বমান ত্রিশূল, মস্তকে কেশপাশ বিন্যস্ত ও দুর্দ্দিনমিত; অঙ্গে ভস্ম বিলেপিত, পরিধানে বৈরিক বসন, মুখমণ্ডলে গভীর কালিমা-রাশী। সন্ন্যাসিনী নিঃশঙ্কে গ্রামে প্রবেশ করিল। দূরে হেমচন্দ্রের বৃহৎ অট্টালিকা—আজ ভগ্নাংশোদ্যত। সন্ন্যাসিনীর মনে এক অতীত-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল। নীরবে অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে সন্ন্যাসিনী উদ্দেশে প্রণাম করিল। সকলে স্তম্ভিত, ভীত ও চকিত।

ক্রমে গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসিনী প্রসাদপুরের দুই ক্রোশ দূরস্থ একটি ভগ্ন অট্টালিকার নিকট আসিল। শাদ্দ-শৃগালের বিকট রব ব্যতীত আর কিছুই শ্রুত হইল না। নীরবে অশ্রু মুছিতে মুছিতে দূরস্থিত একটি ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া, সেই দারুণ অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। দ্বারে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসিনী ডাকিল—"মা।"

এক দুখিনী অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। "কে ও মা, আমার হৃদয়ের ধন বিজয়া এলি," বলিতে বলিতে দুখিনী মূর্চ্ছা গেল।

(৬)

চারি বৎসর পরের একটি দৃশ্য। নিশি অবসান-প্রায়। যমুনা-তটে বসিয়া একটি ভৈরবী বীণা বাজাইতে বাজাইতে গাহিল—"কাল বিজয়া-নিশি কেন রে পোহালো"। উষা-সমীর ধীরে ধীরে বৃক্ষপত্র কম্পিত করিয়া গাহিল—"নিশি কেন রে পোহালো" সম্মুখে কল্লোলিনী কলনাদে তরঙ্গ তুলিয়া গাহিতে লাগিল—"নিশি কেন রে পোহালো।"

আবার ভৈরবী তান ধরিল—"সারদচন্দ্রে কলঙ্ক কেনরে পশিলো" সুদূর অম্বরে শুকতারা যেন মৃদু কম্পনে গাহিল—"কলঙ্ক কেন রে পশিলো।" আবার বায়ুর হিল্লোলে শব্দ হইল—"কলঙ্ক কেন রে পশিলো।" যমুনা-তরঙ্গে আবার গাহিল—"কেন রে পাশলী।"

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। সেই জন-শূন্য নীরব যমুনা-তট জন-কোলাহলে পূর্ণ হইতে লাগিল। দূরে "বিজয়া মন্দিরের" দ্বারে সহস্র সহস্র অনাথ, অতুর, দীন দুঃখী আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্দ্ধ ক্রোশ দূরস্থ যমুনা-তট হইতে "বিজয়া মন্দিরের" দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আজ লোকে লোকারণ্য। সকলেই উৎসুক-মনে বিজয়ার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে ভৈরবী-বেশে বিজয়া বাহির হইলেন। চির দুঃখীর মুখেও আজ হাসি দেখা দিল। বিজয়া ধীরে ধীরে গিয়া অন্নছত্রের দ্বার খুলিলেন। সহস্র সহস্র লোক বিজয়ার

পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সারাদিন ধরিয়া বিজয়া ঐ সমস্ত দুঃখী 'দরিদ্র-দিগকে অন্নদান করিলেন। মহানন্দে সকলে হেমচন্দ্র ও বিজয়ার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যার পর চারিদিক কম্পিত করিয়া কীর্ত্তন বাহির হইল। দূর-আকাশে সে কীর্ত্তন ধ্বনিত হইল। যমুনার কাল জল সে রসে উছলিয়া উঠিল।

(৭)

পাঠক! এই গভীর নিশীথে ঐ মন্দিরা-ভ্যন্তরে একবার নয়ন ফিরাও। ঐ দেখ এক আজ-বসনা, আলুলায়িত-কুন্তলা বিধবা যুবতী, ফুল বিল্বদল সম্মুখে রাখিয়া, যুক্ত-করে ও অবনত-শিরে, নিমিলিত-নয়নে' হেমচন্দ্রের হৈম-মূর্ত্তির পূজা করিতেছেন। একপার্শ্বে সুবর্ণ দেউটী জ্বলিতেছে, অপর পার্শ্বে বৃহৎ ত্রিশূল লম্বমান রহিয়াছে। রমণীর কুসুম অঙ্গে আর্দ্র গেরুয়া বসন; তাহার অশ্রুজলে ভাসমান। রমণী যুক্ত করে, অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"স্বামীন্ দেবতা! আমায় ক্ষমা কর। হতভাগিনী বিজয়া আজ তোমার পূজা করিতেছে। দেব! আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার আদেশ প্রতিপালন করিয়া পরজন্মে তোমারই চরণে স্থান পাই।

* * *

এই খানেই "বিজয়া উৎসবের" দৃশ্য শেষ করিলাম। এখনও এলাহাবাদের দক্ষিণে সেই মন্দিরে উৎসব হইয়া থাকে, হৈম-মূর্ত্তির নিকট সোণার দেউটী জলিয়া থাকে। কিন্তু আর সে বিজয়া নাই—আর সেখানে নিশি-শেষে বীণার ঝঙ্কারও শোনা যায় না।

কন্যাভার ও সমাজ সংস্কার।

বাহ্য জগতের অনেক বিষয় লইয়াই শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ-কাল উন্নতির সোপানে ধীরে ধীরে অধিরোহণ করিতে সচেষ্ট এবং অনেকাংশে সফলকাম; সমাজ-সংস্কার ব্যাপারটাও তাঁহার কর্ত্তব্যের বহির্ভূত নহে। কিন্তু স্বদেশের ও স্বজাতির প্রকৃত কল্যাণকর বিষয়ে তাঁহাকে অতই হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায়। রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে ইংরাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার—জেতা-বিজিতের মধ্যে সাম্য সংস্থাপন করিবার—সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই; আমাদিগের জাতীয় সমাজে বিজাতীয় রীতি প্রবর্ত্তনেও অশান্তি বিভিন্ন সুমঙ্গলের চিহ্ন দেখা যায় না। এরূপ অবস্থায় ঐ সমস্ত অনাবশ্যক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করার পূর্ব্বে জাতীয় সমাজের কলঙ্ক অপনোদনে বদ্ধপরিকর হওয়া অধিকতর সমীচীন বোধ হয়।

অন্য কলঙ্কের কথা উত্থাপন করার পূর্ব্বে আমরা বর্ত্তমান আন্দোলনমূলক কন্যা-ভার ব্যাপারে দুই চারি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কন্যাভার-প্রপীড়িত মধ্যবিধ ভদ্রসন্তানের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন, সেই ভার লাঘব করিতে

গিয়ে কত উপকার সাধন হয় এবং তাহা বর্ত্তমান থাকাতে কত ভদ্র পরিবার একেবারে ধ্বংস হইতেছে। "বঙ্গবাসী" প্রভৃতি অনেক সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে ইহার আলোচনা হইয়াছে, কত সভা-সমিতিতেও এই কথা উত্থাপিত হইয়াছে, সুধিগণ সমৌলিক কায়স্থবংশজ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকার মহাশয় স্বীয় কন্যাভারাক্রান্ত হৃদয়ের এই কুপ্রথার বিষময় ফল সুধী-সমাজে ব্যক্ত করিয়াছেন, কুলীন-কায়স্থ-বংশোদ্ভব স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয় প্রাণের আবেগে এই কুপ্রথাময় সমাজ-চিত্র তাঁহার বিবাহ-বিভ্রাটে অঙ্কিত করিয়াছেন, রাজা শশিশেখরে-শ্বর এবং স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তত্তৎ সমাজ হইতে এই কুপ্রথা দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কিছুতেই এই কলঙ্কময় কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ হয় নাই—পুত্রের বিবাহের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে কোন পিতা-মাতাই পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। নিজ নিজ কন্যার বিবাহে সকলেই দারুণ দুশ্চিন্তার অধীন হয়েন, এই কুপ্রথার প্রতি কটূক্তি ও দুষ্টাক্ষ কটাক্ষপাতও করিয়া থাকেন, কিন্তু পরক্ষণেই পুত্রের বিবাহকালে, সেই ঘৃণার্হ অর্থলিপ্সা পরিহার করিতে পারেন না, বরং কন্যার বিবাহজনিত ব্যয়ও এই সূত্রে মিটাইয়া লইতে বদ্ধপরিকর হয়েন। যাঁহাদিগের পুত্র-কন্যা উভয়ই আছে, তাঁহাদিগের পক্ষে এ ভোগ মিটাইবার বরং সুযোগ হইতে পারে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, এমন অনেকে আছেন, যাঁহা-দিগের কন্যা মাত্র সার—তাহাও একটী নহে, হয়ত উপর্য্যুপরি ৩।৪টী। এরূপ অবস্থাতেও স্বচ্ছল সংসারের পক্ষে অবশ্য বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে না পারে; কিন্তু সংসারে স্বচ্ছল অপেক্ষা নিঃস্বের ভাগ্যই অধিক—এই সমস্ত নিঃস্ব পরিবার নিতান্ত অর্থাভাব সত্ত্বেও সৎ-পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিবার সাধ না মিটাইয়া থাকিতে পারেন না, সুতরাং দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়া পড়েন—অধিক কি, অনেক সময়, নিজ 'বাস্তু' খানি পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া বসেন।

স্থল বিশেষে শুনা যায়, এই কন্যাভার অপনোদনের নিমিত্ত অনেকে সদ্যোজাত শিশুর প্রাণসংহার করিয়া বসে। এই লোম-হর্ষণ কাণ্ড হিন্দু পিতামাতার পক্ষে সম্ভব কি না বলিতে পারি না; তবে পুত্র-কন্যার জন্মোপ-লক্ষে পিতামাতার মানসিক অবস্থার তারতম্য স্পষ্টই লক্ষ্য করিয়াছি। পুত্র প্রসবের সময় গর্ভ-ধারিণীর যেরূপ আনন্দ, যেরূপ উৎসাহ, এমন আর কিছুতেই হয় না। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার আশার সঞ্চার হয়,—তাহার বিদ্যানু-শীলনের উন্নতি দর্শনে উৎসাহপ্রোত প্রবল হয়,—আবার যদি 'ছেলে পাঁশ করা' হয়, তবে আর পুত্র-প্রসবিনীর আহ্লাদের ইয়ত্তা থাকে না, তিনি তখন মনুষ্যকে তৃণ-জ্ঞান করেন, ধরাকে 'সরাখান' দেখেন, আর পুত্রের বিবা-হের নিমিত্ত করাল-বদনা ভীমা-মূর্ত্তিতে কন্যা-কর্ত্তার যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে মুখব্যাদান করেন!—দুঃখিনী কন্যা-প্রসবিনীর, পক্ষান্তরে সুখের লেশ মাত্র নাই; কন্যার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার উদরে অন্ন যায় না, স্বামী ও আত্মীয় গুরুজনের গঞ্জনাতে অস্থির হইতে হয়, কন্যার বিনাশ না হউক—নিজের জীবন জাহ্নবীর জলে বিসর্জ্জন দিতে দারুণ আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পুত্রের বিদ্যা-শিক্ষার জন্য পিতা যদি কিছু ঋণগ্রস্ত হয়েন, পুত্রের বিবাহ দিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিবেন, "উপরন্তু যৎকিঞ্চিৎ" সংস্থান করিবেন বলিয়া তিনি সময় প্রতীক্ষা

করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্য কন্যাকর্ত্তা আযোবন এ দেশ ও দেশ করিয়া, কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়া দুঃখে শাকান্নে উদর-পূর্ত্তি করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক কন্যা পার করিতে সে সমস্ত জলাঞ্জলি দিলেন। সাম্যবাদী সংস্কারক দল অন্যবিধ সংস্কারের পূর্ব্বে এই নিদারুণ বৈষম্য দূর করা কি সমাজের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর বোধ করেন না?

সামাজিক উন্নতির পথের এই কণ্টক অপসারিত করেন, এই কলঙ্কময় কুপ্রথায় মূলোচ্ছেদ করেন, আমাদিগের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে এমন কৈ দেখতে পাই না। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডিগ্রীধারী যুবক এই কুপ্রথা দূর করিবার অভিপ্রায়ে, কিছু কাল গত হইল, এক সমিতি করিয়াছিলেন এবং আপনাপন বিবাহকালে তাঁহারা ততঃ শ্বশুর মহাশয়ের অথবা অর্থশোষণ করিবেন না বলিয়া আপনাদিগের মধ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, জ্ঞানতিবিলম্বেই এই সভার সম্পাদক মহাশয়—অদ্যুনা এক জন সঙ্গ মান্য উকীল—স্বীয় বিবাহ কালে সাংসারিক সম্পূর্ণ স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও "অর্দ্ধেক রাজত্ব আর এক রূপবতী কন্যা" লাভের লোভ ত্যাগ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারের হেতু জিজ্ঞাসিত হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর—শিক্ষিত সমাজের একজন অগ্রণী—রৈবাহিক ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার শিরে সমস্ত দোষ আরোপণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করেন নাই। সুশিক্ষিত এবং সদ্বাত ও সদ্‌গুণসম্পন্ন সভ্যের নিকটেই যখন সমাজের এইরূপ অবস্থা বিপর্য্যয় সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াই সুদূর মরুবাসী শৈল-প্রবাসী বাবু রসিকলাল রায় সম্প্রতি রাজ সরকারে এই কুপ্রথার প্রতিকার-প্রার্থী হইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা কতদূর সফল হইবে, বা সুফল প্রসব করিবে, বিধাতাই জানেন। তবে, তাহা লইয়া আজ কাল একটু আন্দোলন চলিতেছে। হিন্দু সমাজের মুসলমান-প্রথাদী 'বঙ্গবাসী' তাহাতে একটু ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। রসিক বাবু তাহার 'উত্তরে' বঙ্গবাসীর প্রতি কিঞ্চিৎ ভ্রূকুটী বিক্ষেপ করিয়াছেন—এ সমস্ত আমরা দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছি। এই গুরুতর প্রশ্ন—'বঙ্গবাসী' এবং রসিকবাবু—উভয়েরই হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কন্যা-ভারের গুরুত্ব ও সমাজের অবস্থা বুঝিয়া উভয়েই মর্ম্মাহত। তবে রসিক বাবু উপায়ান্তর অবধারণে অক্ষম হইয়া রাজদ্বারে সাহায্য-প্রার্থী, আর স্কটিশ্যান রাজার নিকট হিন্দুর সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা অবৈধ বিবেচনায় 'বঙ্গবাসী' রসিক বাবুর ব্যবহারে বিশেষ রুষ্ট। এখন কাহার কথামত কার্য্য করি; কি উপায়ে এই কঠোর সমাজ-কলঙ্ক দূর করিতে পারি—এই ভাবনায় আমরা আত্মহারা।

'বঙ্গবাসী' আমাদিগের হিন্দুসমাজের মুখপত্র—হিন্দুর হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অহর্নিশ সচে ; তাঁহারই কথা প্রথমে আলোচনা করা যাউক। "খৃষ্টান ইংরেজ-রাজ হিন্দুর সামাজিক আচার-ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করেন," ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনাভিপ্রেত—প্রকৃত হিন্দুমাত্রেরই অনভিমত হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। বস্তুতঃ বিধবার দুঃখে বিকলচিত্ত স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবা-বিবাহ, সমাজ-সংস্কার-কল্পে কৌলীন্য-প্রথার বাহুল্যজনিত বিহিত জাত্যন্তর-পরিগ্রহ, পার্শি-পুত্রবের নিতান্ত মর্ম্মপীড়ক সহবাস-সম্মতি, প্রভৃতি যে কোন কার্য্যে সরকার বাহাদুরকে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা গিয়াছে, তাহাতেই অহিন্দুত্বের লক্ষণ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছে।

এমান বিষয়ও সরকার বাহাদুরের শাসন-প্রণাম হইলে হিন্দুর দুর্গতি নিতান্ত বিসদৃশ হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রতিকারের দ্বিতীয় উপায় কি? বঙ্গবাসীতত এই "রোজনকরার পুথা তুলিয়া অনেকবার হিন্দুসমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কৈ, তাহাতে কি কোন ফল দর্শিয়াছে? উপস্থিত ক্ষেত্রে বঙ্গবাসী বলেন, "এই যে বিবাহ ব্যয়, ইহার প্রতিকারের জন্য সামাজিক শাসনে, সমাজের অঙ্গে বল বাড়াইয়া সামাজিক বলে, ইহার প্রতিকার-শাসনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা হইয়াছিল কি?"—বহুদর্শী প্রবাসীর মুখে একথা শুনিয়া বাস্তবিক আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। সামান্য চেষ্টা না হইয়াছে একপ নহে; তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। অতঃপর সামাজিক শাসনে, সামাজিক বলে প্রাণপণে প্রতিকার-চেষ্টার কথা। আমরা জিজ্ঞাসা করি, বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজ কোথা যে তাহার বল থাকিবে ও শাসন চলিবে? অবশ্য-প্রতিপাদ্য কোন্ কর্ম্ম সমাজ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতেছে, 'আর তাহার প্রত্যবায়ের বা কাহার প্রতি কি দণ্ড বিধান হইতেছে? আজকাল সম্ভ্রান্ত ও সম্মতি-সম্পন্ন অনেক পরিবারেই প্রত্যহ, এবং অধিকতর পর্ব্বোপলক্ষে, 'অমাদ্য' ভক্ষিত হইতেছে; দুর্গোৎসব-কুল-কেশরী কুলের মুকুটী মহাশয় সমাজমাঝে মস্ত হইয়া পরক্ষণেই শুদ্ধাচারী কায়স্থ সন্তানের প্রসাদ দানে প্রস্তুত; এইরূপ শত শত অবৈধ আচারে সমাজ মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছেন, কাহার সাধ্য তজ্জন্য অনুষ্ঠান-কর্ত্তাকে সমাজ-চ্যুত করে? সত্য ও সরলতার পরিবর্ত্তে কাপট্য ও কলুষিতাকে প্রশ্রয় দেওয়াই সমাজের কার্য্য দেখা যাইতেছে ইহার হেতু কি?—হেতু অন্য কিছুই নহে,

সমাজ শাসক, সমাজের অধিনায়ক, সমাজপতি না থাকাতেই সমাজের এই দুর্গতি, সমাজভুক্ত সদস্য মাত্রের এই দারুণ স্বেচ্ছাচারিতা। যে সময়ের কথা লইয়া আমরা সমাজের দোহাই দিয়া থাকি, সে সময়ে কর্ত্তব্য-পরায়ণ অধর্ম্মকুশল সমাজপতি ছিলেন, সমাজের প্রত্যেক কার্য্য তাঁহার সুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হইত। সে সমাজপতি অপর কেহ নহে—স্বয়ং স্বদেশীয় রাজা; রাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিপ্রথাই কৌলীন্য, প্রথা এখনও পর্য্যন্ত সমাজে, ন্যূনাধিক, আধিপত্য বিস্তার করিতেছে,—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও সমাজপতি ছিলেন বলিয়া তাঁহার দোহাই দিয়া "এখন পর্য্যন্ত অনেকে হিন্দুয়ানী রক্ষণ করিতেছেন,—পুরাকালে বল্কলধারী অরণ্যচারী তাপসগণও সমাজপতি রাজার শাসন মানিয়া চলিতেন। এক দেশের দুর্ভাগ্য, হিন্দুর দেশে অহিন্দু রাজা, প্রজা সাধারণও শিক্ষা ও সংসর্গ দোষে আচারভ্রষ্ট; কাজেই সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন ঘটিলেই বর্ত্তমান বিভিন্নধর্ম্মী সমাজের অধিনায়ক ইংরেজরাজের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এখন কি উপায়ে সমাজের অঙ্গে বল বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কি উপায়ে সামাজিক সুশাসন চলিতে পারে, 'বঙ্গবাসী' অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার পন্থা নির্দ্দেশ করিবেন কি? 'বঙ্গবাসী'ই বলিয়া থাকেন, ভুয়া গলাবাজী অপেক্ষা প্রকৃত কার্য্য করা অধিকতর ফলোপধায়ক; বর্ত্তমান ব্যাপারেও 'বঙ্গবাসী' কেবল ব্যক্তি বিশেষের কার্য্যের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ বা মৌখিক ব্যবস্থা বিধানের পরিবর্ত্তে স্বয়ং কার্য্য সাধন করিলে সমধিক সদ্ভদয়তার পরিচয় দিতে পারিবেন। রাজ-শক্তির গতিরোধ করিতে গিয়া "সহবাস-সম্মতি" সূত্রে তিনি পূর্ব্বিফল মনোরথ অধিকন্তু বলপ্রযুক্ত হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন ; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই, বরং এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তিনি সমাজের সার ভাগ হইতে সহায়তা লাভ করিবেন এবং কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিলে শত শত কন্যা-ভারগ্রস্ত সংসারের শুভাশীর্ব্বাদ সম্ভোগ করিতে পারিবেন—হিন্দু সমাজের নেতা বলিয়াও লোক-সমক্ষে আত্ম-পরিচয় দিতে সক্ষম হইবেন।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

"কাঁহা মৃণাল হামারি ?"

মৃণালিনী বলিলেন 'মৃণাল কোথায় ?' আমি সন্ধান বলিয়া দিতে পারি, তাহা মনে রাখিতে পারিবে ? গিরিজায়া বলিল 'পারিব।' মৃণালিনী বলিলেন—

"কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে॥
রাজহংস দেখি এক নয়ন রঞ্জন।
চরণে বেড়িয়ে তাঁরে, করিল বন্ধন॥
বলে, হংস রাজ কোথা করিবে গমন।
হৃদয় কমলে মোর, তোমার আসন॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয় কমলে।
কাঁপিল কণ্টক সহ মৃণালিনী জলে॥
হেন কালে কাল মেঘ উদিল আকাশে।
উড়িল নরাল-রাজ, মানস বিলাসে॥
ভাসিল হৃদয় পদ্ম, তার বেগ ভরে।
ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে॥"

ফুলের শিরোমণি স্থলে গোলাপ, জলে কমল ; উভয়েরই বৃন্তে কাঁটা। যে বিধাতা মধুতে মক্ষিকার দংশন মিশ্রিত করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই সৃষ্টি। সংসারের যাবতীয় পদার্থই ভাল মন্দ মিশ্রিত। যাহা ভাল, তাহাই মন্দ—নিরবচ্ছিন্ন ভাল সংসারে কিছুই নাই। প্রণয়ে সংশয়, মিলনে বিচ্ছেদ, স্নেহে আশঙ্কা আলোকে ছায়া, বিদ্যুতে জীবন-নাশিনী শক্তি, কুসুমে কীট, মৃণালে কণ্টক—যাহা সু, তাহাই একটা না একটা কু-মিশ্রিত। সংসার দেবতা ও দানবের রাজ্য—ইহাতে angel এবং Satan উভয়ই আছে। সু, কু উভয়েরই আবশ্যক—নহিলে সুর আদর হইবে কেন, তাহার মর্য্যাদা লোকে বুঝিবে কেন ? অমানিশা না থাকিলে কি পূর্ণচন্দ্রের শোভায় কেহ বিমোহিত হইত ? দুঃখাবসানে সুখ, অথবা দুঃখকে ভিত্তি করিয়া সুখের উৎপত্তি। সুখের সময়ে দুঃখের স্মৃতি যেমন সুখের মূল্য বৃদ্ধি করে, দুঃখের সময়ে সুখের স্মৃতি তেমনই মর্ম্মান্তিক যাতনা দেয়। মৃণালিনী এক্ষণে হেমচন্দ্র-বিস্মৃতা, নির্ব্বাসিতা, পরগৃহে প্রপীড়িতা—সুখের স্মৃতিটা তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত দিতেছে। অতুল ধনশালী শ্রেষ্ঠীর কন্যা, আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী-পরিবৃতা, পরম সুখ সম্পদে পালিতা, কণ্ঠহারবৎ হেমচন্দ্রের গললগ্না মৃণালিনীতে আর হৃষীকেশ শর্ম্মার কন্যার সহ মৃণালিনীতে, আকাশ পাতাল "প্রভেদ! মৃণালিনীর কোষ্ঠিপত্রে গ্রহের দশাটা কিছু অধিক মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়—'কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে' তাঁহার প্রাণের কথা ; মৃণালিনীতে

ত্বই সুন্দররূপে প্রযুক্ত। মৃণালিনীকে তাহার মত সাংসারিক অবস্থাপন্ন অন্যান্য রমণীদিগের অপেক্ষা অধিক কষ্ট পাইতে হইয়াছে ; কিন্তু বিধাতার কৃপায় অবশেষে সকল দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করিয়া হেমচন্দ্রের সেবায় নিরত থাকিয়া সুখী হইতে পারিয়াছেন। যমুনায় নৌকামগ্ন হইয়া-ডুবিয়া গিয়াছিলেন, একেশ্বর ভাসিতেছিল ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মগধ রাজপুত্র হেমচন্দ্র দৈবযোগে নৌকায় বেড়াইতেছিলেন, তিনি জলে পড়িয়া মৃণালিনীকে উঠাইলেন। এইখানে কণ্টকে গঠিত মৃণাল মনরঞ্জন রাজহংস দেখিয়া তাহাকে চরণে বেড়িয়া বন্ধন করিল। প্রেম-রজ্জু দ্বারা মৃণালিনী হেমচন্দ্রকে বন্ধন করিলেন, তাঁহার হৃদয়ের প্রেম-সিংহাসনে বসাইলেন — রাজহংসও তাঁহার হৃদয়-কমলে বসিল। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী যে কয়দিন একত্রে বাস করিলেন, সেই ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি দুর্য্যোগের কয় দিনে উভয়ে উভয়ের অন্তঃকরনের পরিচয় পাইলেন—রাজহংস- মৃণালে বাঁধা পড়িল। আরও তো বিস্তর জলচর পক্ষী আছে ; কিন্তু মৃণাল তাহাদিগের না বাঁধিয়া রাজহংসকেই বাঁধে—যে বাঁধিতে জানে এবং যে বাঁধা পড়িতে জানে, বাঁধা-বাঁধিটা তাহাদিগের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে—মৃণালে কখন মত্ত হস্তী বাঁধা পড়ে না, সেইই নিগড়েই তাহার বন্ধন। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী উভয়ে উভয়ের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিলেন ; সুতরাং গোপনে অকৃতজ্ঞতা মাখা হেমচন্দ্রকে ঘঁষারীতি মৃণালিনী সম্প্রদান করিলেন—প্রকাশ্যে এ বিবাহের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ মৃণালিনীর "বাপ বৌদ্ধ, মগধরাজ বৌদ্ধের বিষম শত্রু"। সত্য বটে "আসিয়া বসিল হংস হৃদয় কমলে" ; কিন্তু "কাঁপিল কণ্টক সহ মৃণালিনী জলে"। মৃণালিনী যে কেবলই পুলকে "কাঁপিল," তাহা নহে—হেমচন্দ্রকে বিবাহ করিয়া মৃণালিনী স্বচ্ছন্দ-মনা হইতে পারেন নাই, তাঁহাকে ভয়ে ও হতাশায় কাঁপিতে হইয়াছিল। কারণ তাঁহার পিতা তাঁহাকে কুমারী বলিয়া জানিতেন ; সুতরাং অন্য পাত্রের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করিলেন, জর করিয়া মৃণালিনী সে দায়ে মুক্ত হইলেন। কেবল যে অন্য পাত্রে বিবাহিতা হইবার আশঙ্কা, এমন নহে ; সৎকার্য্যেও পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজনকে লুকাইয়া করিলে চিত্ত-প্রসাদ জন্মে না। যাহাই হউক, হেমচন্দ্র লাভ করিয়া এক পক্ষে যে মৃণালিনী সুখী হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক পক্ষে বলিলাম, তাহার কারণ, সুখ এমন্টা অখণ্ড রাশি নহে ; ষোল আনা সুখ কেহ কখন দেখিয়াছেন কি ? সুখ একটী ভগ্নাংশ, কখনই সম্পূর্ণ হইবে না—সম্পূর্ণতার যতই নিকটবর্ত্তী হউক না তথাপি ভগ্নাংশ ভগ্নাংশই থাকিবে। কিন্তু বিধাতার প্রাণে মৃণালিনীর এ সুখ সহ্য হইল না—"হেন কালে কাল মেঘ উদিল আকাশে"। মৃণালিনীতে হেমচন্দ্রকে একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া মাধবাচার্য্য তাঁহার পিতৃরাজ্যোদ্ধার সম্বন্ধে সন্দীহান হইলেন, কারণ মৃণালিনী তাঁহার হৃদয় করিয়া থাকিলে যবন পরাজয় করে কে ? মাধবাচার্য্য মৃণালিনীকে দেবকার্য্যের বিঘ্ন বিবেচনায় তাঁহাকে মথুরা হইতে গৌড় নগরে নির্ব্বাসিতা করিলেন। নির্ব্বাসন যন্ত্রণায় মৃণালিনী জীবন্মৃতা, হেমচন্দ্রের বিরহে বড়ই মর্ম্মপীড়িতা। পিতা মাতা, আত্মীয়, স্বজনের প্রতি যে স্নেহ ভালবাসা, তাহা এখন এক হেমচন্দ্রমুখী হইয়া যে হেমচন্দ্রে ন্যস্ত, সেই হেমচন্দ্র হইতে মৃণালিনী বিমুক্তা ; সুতরাং

"ভাসিল হৃদয় পদ্ম তার বেগ ভরে।
ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে॥"

'মৃণাল কোথায় সন্ধান বলিয়া দিয়া মৃণা-

লিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন গিরিজায়া, গীত শিখিতে পারিবে?" গীত শিক্ষা তাহার উপজীবিকা; সুতরাং—

"গি। তা পারিব। চক্ষের জলটুকু শুদ্ধ কি শিখিব?

মৃ। না। এ ব্যবসায় আমার লাভের মধ্যে ঐ টুকু!"

বড় দুঃখেই মৃণালিনী রোদন করিয়া ফেলিলেন! বড় দুঃখেই বলিলেন 'এ ব্যবসায় আমার-লাভের মধ্যে ঐ টুকু'। বস্তুত হেমচন্দ্রে অনুরক্তা হইয়া তাঁহাকে পদে পদে কাঁদিতে হইয়াছে, হৃদয়ের মধ্যে অনেক বৃশ্চিক-দংশন সহ্য করিতে হইয়াছে। সহ্য করাই রমণী-প্রকৃতি; সেই জন্য মৃণালিনী সকলই সহিয়াছেন। তাঁহার সংবাদ শুনিয়া হেমচন্দ্র কি বলেন, শুনিবার জন্য মৃণালিনী বড় ব্যাকুলা হইলেন; গিরিজায়াকে বলিলেন "তোমার বোঝা কাল আবার আনিও। যদি কিনিবার কোন সামগ্রী থাকে, তবে তাহা আমি কিনিব।" ধন্য সহিষ্ণুতা! তাই কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় মানিল না, অবাধ্য হইয়া বসিল; সুতরাং গিরিজায়ার গমন কালে তাহাকে একখানি পুরাতন বস্ত্র ভিক্ষা দিবার সুযোগে "কানে কানে বলিলেন 'আমার ধৈর্য্য হইতেছে না, কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিব না; তুমি আজ রাত্রি প্রহরেকের সময় আসিয়া এই গৃহের উত্তর দিকে অবস্থিতি করিও; তথায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তোমার বণিক যদি আসেন সঙ্গে আনিও।" মৃণালিনী জানিতেন এম, হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতে তাঁহার এক্ষণে নিষেধ আছে; কিন্তু আর কি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন? ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে, সে সীমা আরও অতিক্রম না করিলে রমণী 'দুর্ব্বলা, অবলা' বলিয়া পরিচিত হইবে কেন? হেমচন্দ্র গৌড় নগরেই আছেন তথাপি তাঁহার সহিত সাক্ষাতে যত্নবতী না হইলে, তাঁহাকে কোমল হৃদয়া রমনীকুলের শ্রেণী হইতে বাহিরে গিয়া পড়িতে হয়। কঠোর কর্ত্তব্য পুরুষের পক্ষে, রমণীরা চিরদিনই হৃদয়-নেগের বশবর্ত্তিনী—কবিশ্রেষ্ঠ মিল্টন ইভের চিত্রে ইহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সন্ধান করিতে পারিলেন না। তিনি যে মৃণালিনীর প্রণয়ে মুগ্ধ হন, মাধবাচার্য্যের তাহা অভিপ্রেত নহে। হেমচন্দ্র ইহা জানিতেন; সুতরাং মাধবাচার্য্যই মৃণালিনীকে কোথায় রাখিয়াছেন, তাঁহার মনে এবম্প্রকার সন্দেহ হইল। সন্দেহের একটু কারণও ছিল —যে সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় পাঠাইয়া দিলে মৃণালিনী তাঁহার সহিত বাটীর পশ্চাদ্বর্ত্তি উপবনে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন, পত্রের স্বরূপ মাধবাচার্য্য সেই অঙ্গুরীয় চাহিয়া লইয়াছিলেন; হেমচন্দ্র অন্য অঙ্গুরীয় দিতে চাহিলে গ্রহণ করেন নাই। হেমচন্দ্র সন্দেহ ভঞ্জনার্থ প্রয়াগে মাধবাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তথায় জানিলেন যে, মৃণালিনী সুদূর গৌড় নগরে তাঁহার এক শিষ্যের বাটীতে আছেন—পুরুষান্তরের সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। যাহার যেখানে ব্যথা তাহার সেইখানে হাত; হেমচন্দ্র গৌড় নগরে উপস্থিত হইলেন, গিরিজায়া ভিখারিণীকে মৃণালিনীর সন্ধান করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া সুবর্ণধন বণিকের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মৃণালিনীর সন্ধান করিতে গিরিজায়ার যত বিলম্ব হইতে লাগিল, হেমচন্দ্র তত 'ব্যস্ত' হইতে লাগিলেন। গিরিজায়া কখন আসিয়া শুভ সংবাদ দেয়, এই আশায় প্রত্যহ

প্রাতঃকালের পথ পানে চাহিয়া থাকিতেন। যেদিন গিরিজায়া মৃণালিনীর সন্ধান করিল, সেদিন হেমচন্দ্রের নিকটে ফিরিয়া আসিতে তাহার কিছু বিলম্ব হইল। হেমচন্দ্র বাগের সুস্থিত অশোক বৃক্ষের মূলে বসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—অশোক বুঝি সে শোক নিবারণে সমর্থ! গিরিজায়া আসিল না—হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে তাহার অনুসন্ধানে পাঠাইয়া তরুমূলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন মৃদু মৃদু গাইলেন—

"বিকচ নলিনে, যমুনা পুলীনে,
বহত পিয়াসা—রে।"

পশ্চাৎ হইতে গিরিজায়া গাইল—

"চন্দ্রমাশালিনী, যা মধু যামিনী
না মিটিল আশা রে॥"

তখা মিটিল না, শুনিয়া "হেমচন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুট স্বরে যেন আপনা-আপনি কহিতে লাগিলেন এত যত্নেও যদি সন্ধান না পাইলাম, তবে আর বৃথা আশা—কেন মিছা কালক্ষেপ করিয়া আত্মকর্ম্ম নষ্ট করি;—দিবাময়ে! কালি তোমাদিগের নগর হইতে বিদায় হইব।'

'তথাস্তু' বলিয়া গিরিজায়া মৃদু মৃদু গান করিতে লাগিল—

শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী।
বনে বনে একা—রে॥

হে। ও গীত এই পর্য্যন্ত।' অন্য গীত গাও। গিরিজায়া গাইল—

যে ফুল ফুটিত সখি গৃহ তরু শাখে—,
কেন রে পবনা, উড়ালি তাকে?"

পিতৃগৃহ হইতে মৃণালিনীকে মাধবাচার্য্য কোথায় উড়াইয়া দিলেন, এই ভাবে গিরিজায়া গাইল; কিন্তু ইহাও হেমচন্দ্রের ভাল লাগিল না। গিরিজায়া অন্য গীত গাহিল——

"কণ্টকে গাঠিল বিধি মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল থাকিয়া মরমে॥"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই হেমচন্দ্র বুঝিলেন, গিরিজায়া মৃণালিনীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে! আগ্রহ আনন্দ ও উদ্যমের সহিত "কণ্টকে গঠিল" হইতে "মৃণালিনী মরে" পর্য্যন্ত সমস্ত গীতটী শুনিলেন। সে সময়ে তাঁহার হৃদয় এত দ্রবীভূত যে, তিনি যেন কোন স্বর্গীয় সঙ্গীত সুধায় অবগাহন করিতেছেন। গীত শুনিয়া "বাষ্পাকুল-লোচনে গদ-গদস্বরে গিরিজায়াকে কহিলেন—এ আমারই মৃণালিনী, তুমি তাহাকে কোথায় দেখিলে?" গিরিজায়া যেখানে গীত শিখিল, সেখানে 'চক্ষের জল' যেখানে গীত গাহিল, সেখানেও 'বাষ্পাকুল-লোচন।' চক্ষের জলের সহিত যে কতখানি হৃদয়ের মর্ম্ম সরিয়া যায়, তাহা যে কখন চক্ষের জল ফেলে নাই, তাহাকে বুঝান বিড়ম্বনা মাত্র। চক্ষের জল দুঃখের পরিচায়ক হইলেও আনন্দের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ; আনন্দ বা তাহার স্মৃতির উদয় হইলেই অশ্রু নির্গত হইয়া থাকে—যে কাঁদে না, তাহার হৃদয় খর-পোড়া মাটীর মত নীরস, রুক্ষ, উৎকট বিকট, হেমচন্দ্রের দুঃখের দিনে, সুখ-স্মৃতির উদয় হইল, তাঁহার চক্ষে জল আসিল, 'বাষ্পাকুল-লোচনে' জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি তাহাকে কোথায় দেখিলে?' গিরিজায়া এত দিনে, সফল শ্রম হইয়াছে, তাহার স্থিতিস্থাপক হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছে না; তাহার রসের তরঙ্গ বহিতে লাগিল—যাহার হৃদয়ে আনন্দ আছে, সেসকল সময়েই রসিক। বিশেষতঃ গিরি-জায়ার বয়স ষোড়শ বৎসর, যে সময়ে রসের তরঙ্গ চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় উথলিয়া উঠে। ষোড়শী রসবতী গিরিজায়া মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে যাহা বলিল,

তাহার অর্থ—বায়ু বহিলে সূক্ষ্ম নালের উপর পদ্ম যেমন আন্দোলিত হয়, অথচ নাল ছাড়িয়া ভাসিয়া যাইতে পারে না, বিরহ-বাত্যা সন্তাড়িতা মৃণালিনীকেও তদ্রূপ সূক্ষ্ম আশার উপর নির্ভর করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বিকম্পিত হইতে দেখিলাম—

"দেখিলাম সরোবরে, কাঁপিছে পবন ভরে,
মৃণাল উপরে মৃণালিনী।"

হেমচন্দ্র এ সময়ে ব্যগ্রতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার কি রূপকালঙ্কার ভাল লাগে? কাব্যালঙ্কার আমোদ বিলাসের সামগ্রী এসময়ে সাদা গদ্য চাই, সাদা গদ্যে মৃণালিনীর সংবাদ চাই। গিরিজায়ার কিন্তু রস-তরঙ্গ থামে না—হেমচন্দ্র যত জিজ্ঞাসা করেন 'কোথায়-মৃণালিনী,' 'এ নগরে কোন্ স্থানে,' 'সে এখান হইতে কত দূর,' 'কোন্ দিকে যাইতে হয়' গিরিজায়ার রসের ফোয়ারা ততই ছুটিতে থাকে, ততই রহস্য তামাসার সহিত উত্তর দেয়। অবশেষে হেমচন্দ্র যখন 'মাথা ভাঙ্গিয়া' ফেলিতে চাহিলেন, তখন গিরিজায়া কহিল "শান্ত হউন। পথ বলিয়া দিলে কি আপনি চিনিতে পারিবেন? যদি তা না পারিবেন, তবে জিজ্ঞাসার আবশ্যক? আজ্ঞা করিলে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।"

"মেঘ মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল।" আর্টলাস্টিক্ মহাসাগরে যে ভেলা সকলের যে সার, জীবনের যে জীবন তাহাকে হারাইয়া পুনঃপ্রাপ্ত হইলে কি যে থাকিতে পারে? হেমচন্দ্র গিরিজায়াকে তোমার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হউক বলিয়া মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ বা অভিসম্পাত করিলে তাহা নিশ্চিত ফলিবে—গিরিজায়ার 'সর্ব্ব কামনা' কি, তাহা বলিতে পারিনা; কিন্তু তাহার প্রধান কামনা যে সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি। হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন—"মৃণালিনী কি বলিয়াছে। তাহা বলিয়াছি—

ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিজয়া।—শারদীয় বিজয়োৎসবের পর গুরুজনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ এবং আশীর্ভাজনদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমরা পশ্চাতে আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। ত্রিতাপনাশিনীর আগমনে লোকে ত্রিতাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে, আশা করিয়াছিল, কিন্তু পাপ ম্যালেরিয়া এবার সে আশা বিফল করিল। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড প্রকোপ; হুগলি ও বর্দ্ধমান ও নদিয়ার এক একটী পল্লীগ্রাম এক একটী হাঁসপাতালে পরিণত; ওদিকে ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষের করালমূর্ত্তি প্রতিক্ষণে বিকটাকার বিস্তার করিতেছে; আবার সুদূর দাক্ষিণাত্যে মাতারা নগরে অন্তর্গত বাই নামক সহরে কঁতিপয় ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশা দেখিয়া তত্রত্য এগার হাজার হিন্দুগণ এখনও অশ্রুমোচন করিতেছেন। হিন্দু রাজরোষে পড়িয়াছে; চারিদিকে তাহাদের নির্য্যাতন হইতেছে। এখন আমাদের

ল আশা-ভরসা দুর্গতিনাশিনী দুর্গার
শনে।

***

রাবণ নিগ্রহ।—কুষ্ণনে ২৭শে সেপ্টেম্বর
ন ভারতে দেখা দিল;—সেই দিনে—সেই
দিন বাই নামক সহরের ১৩ জন বৃদ্ধমান্য
হিন্দু কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের অপরাধ অতি সামান্য; ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা অবহেলা করিয়া তাঁহারা মুসলমানদের মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া বাজনা বাজাইয়া যা করিয়াছিলেন। তাহাতে দাঙ্গা হাঙ্গামা য় নাই,—রক্তারক্তি হয় নাই; তথাপি হাদিগকে জেলে যাইতে হইল! এই দারুণ অন্যায় হইতে হিন্দুকুলকে কে রক্ষা করিবে!

***

যুদ্ধ সংবাদ।—চীন ও জাপানে যুদ্ধ এখনও সমভাবে চলিতেছে। সকল সময়ে ঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। যুদ্ধস্থল হইতে সংবাদ যখনে শুনিতে পাওয়া যায়, তথা হইতে ভারতে আসে; সুতরাং কাজেই সমাচার পাইতে একটু বিলম্ব হয় এবং সেই সঙ্গে "সাত নকলে আসল খাস্তা" হওয়াও অসম্ভব নহে। সে যাহা হউক, বিগত এক পক্ষের মধ্যে সমর-ক্ষেত্রে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তদ্দ্বারা এইমাত্র জানা যায় যে, চীনেরা জয়ী হয় নহে। নানা লোকে নানা কথা বলিতেছে;—কেহ বলিতেছে জাপান কোরিয়া দখল করিয়া চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, চীনরাজ নিরুপায় হইয়া সীমান্তস্থিত সমস্ত সহর হইতে রাজকীয় দ্রব্য সামগ্রী পিকিনে লইয়া যাইতেছেন। ইহাঁদের কমিসেরিয়েট বিভাগে বড়ই বেবন্দোবস্ত। রসদ ও পোষাক রাশি রাশি চুরি যাইতেছে; সৈন্যগণ আহার ও পরিচ্ছদের অভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে। আবার কেহ কেহ বলিতেছে যে, চীন অজেয়; জাপান শত চেষ্টা করিলেও চীনকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। কাহার কথায় বিশ্বাস করিব? য়ুরোপের বড় বড় রাজনীতিকের বিশ্বাস যে, চীন নিশ্চয়ই পরাস্ত হইবে। জাপান হইতে এখনও দলে দলে সৈন্য যাইতেছে। জাপানীদিগের উদ্যোগ ও উদ্যেজনা দেখিলে সহসা মনে হয় যে, বিজয়লক্ষ্মী ইহাদিগেরই সঙ্গশায়িনী হইবেন; কিন্তু ভবিষ্যতের নিবিড় তমোময় গর্ভে কাহার দৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে? চীন ও জাপানের ভবিতব্য ভবিষ্যতে জানা যাইবে।

***

রুষ সম্রাট।—জারের অবস্থা নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন; তিনি সাঙ্ঘাতিক পীড়াক্রান্ত; ইতিপূর্ব্বে সকলে বলিতেছিলেন যে, সম্রাটের মূত্রগ্রন্থির পীড়া হইয়াছে; এখন আবার শুনা যাইতেছে যে, তাঁহার মূত্রগ্রন্থির কর্কট রোগ হইয়াছে। উভয়বিধ পীড়াই মারাত্মক। তাঁহার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে; সমগ্র রুষ-রাজ্যে রাজভক্ত প্রজাবর্গ বিষম আশঙ্কায় আকুল হইয়া পড়িয়াছে। সকলেরই ধারণা জারের মৃত্যু আসন্ন।

***

আমির।—কাবুলের আমির আবদর রহমনও সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত। বিষম বাতরোগে বহুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে; ইহার উপর সম্প্রতি নানা উপসর্গ আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সকলেই তাঁহার আশা ত্যাগ করিয়াছিল; একদিন সংবাদ রাষ্ট্র হইল যে, আমির পঞ্চত্ব পাইয়াছেন; তাহার পর দিনেই সংবাদ আসিল যে তিনি মরেন নাই, কিন্তু তাঁহার জীবনের আর আশা নাই। তিনি অন্তিম-

কালের উপযুক্ত সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন; জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্দ্দার হবিবুল্লাকেই কাবুলের সিংহাসনে বসাইবেন,—ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। প্রধান সেনাপতি গোলাম হাইদার খাঁ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ আমিরের আজ্ঞায় তাঁহার মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে আসিতেছেন।

ভাবী আশঙ্কা।—জার ও আমির উভয়েরই অন্তিম কাল। এখন ভগবানের কৃপায় যদি দুইজনেই এ যাত্রা রক্ষা পান, তাহা হইলেই জগতের মঙ্গল, নতুবা বিষম অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। উভয়েরই হস্তে জগতের শান্তিসূত্র ধৃত রহিয়াছে;—একজনের মৃত্যু হইলে সেই শান্তিসূত্র ছিন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।—ঈশ্বর না করুন, কিন্তু আজ যদি জারের লোকান্তর হয়, তাহা হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসন অধিকার করিয়াই কল্য হয়ত য়ুরোপ কিম্বা এশিয়ামণ্ডলে সমরানল জ্বালাইয়া তুলিবেন। পিতা যেরূপ শান্তিপ্রিয়, পুত্র সেরূপ নহেন। রুষের যে ভীষণ বাষ্পীয়শক্তি বিস্ফোটনশীল বিশাল অনল-স্তূপের ন্যায় প্রতিমূর্ত্তিতে জগৎ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত তীব্র অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছিল, বর্ত্তমান শান্তিপ্রিয় সম্রাটের চেষ্টায় এতদিন তাহা উদ্বেল হইতে পারে নাই; কিন্তু ইনি চক্ষু মুদিত করিলেই তাহা আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড ধাতুনিঃস্রবের ন্যায় জগতের একদিক দগ্ধ করিবে;—এই আশঙ্কায় সকলেই এক্ষণে ব্যাকুল হইতেছেন। আর যদি আমির আবদর রহমন আজি পরলোকগত হয়েন, কাল আফগানস্থান লইয়া রুষ ও বৃটীশে বিষম বিবাদ বাধিবে। ইতিমধ্যেই রুষের প্রধান মুখপত্র "নব-বৃন্দিমা" বলিতেছেন যে, আমিরের মৃত্যুতে ইংরাজ, যদি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্দ্দার হবিবুল্লা খাঁকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইয়া আফগান সীমান্তে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে রুষ কখনই নীরবে থাকিবে না;—তাহা হইলে রুষও সেইরূপে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিবেন। ফলে আফগানস্থান লইয়া সিংহ-ভল্লুকে বুঝি মহাদ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। আমরা মিথ্যা আশঙ্কা করিতেছি না; ইহার আরও নিগূঢ় কারণ আছে। আমিরের অন্তিম কাল উপস্থিত, এই সংবাদে বিলাতে হলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। লর্ড রবার্টস্ প্রভৃতি বড় বড় লোক ইতিমধ্যেই কাবুল-প্রবাসী ইংরেজ নরনারীগণের জন্য ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছেন। লর্ড রবার্টস্ কাবুলিদিগকে ভাল রকম জানেন; তিনি স্বহস্তে তথায় যে ভয়াবহ শোনিতপাতাদির অভিনয় করিয়া আসিয়াছিলেন, আজি তাহারই প্রতিশোধ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, বৃটীশ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে এই বেলা কাবুল হইতে পলাইয়া আসুক, নতুবা মঙ্গল নাই।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান।

অষ্টম বর্ষ। ১৬ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। পঞ্চবিংশ সংখ্যা।

সৃষ্টি ও প্রলয়।

সৃষ্টিস্থিতি ও বিনাশ লইয়াই জগৎ। যাহা আছে, তাহা এক দিন জন্মিয়াছে—আবার এক-দিন লয় পাইবে, ইহাই প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধান। তুমি ভুবনবিজয়ী বীর হও, তোমার শক্তিসংঘর্ষে সসাগরা পৃথিবী বাত্যাভিহতা লতার ন্যায় কম্পিতা ও পর্য্যুদস্তা হউক, শত শত সুধিবা সহস্র সহস্র কুশলতা অযুত অযুত সার্থকতা দাসীর ন্যায় তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা থাকুক, তথাপি শতশক্তি-প্রয়োগে, শতকৌশলে মৃত্যুর অনিবার্য্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি তোমার নাই। "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং" মহাকবির এই মহাবাক্য সার্থক। যখন জন্মিয়াছ, যখন জীবজগতে অস্তিত্ব জাগাইয়া হর্ষ-বিষাদের ক্রীড়া করিতেছ, তখন তোমার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ধনী বা নির্ধন, জ্ঞানী বা মূঢ়, সুরূপ বা কুৎসিত, সকলের পক্ষেই এই একই প্রথা—একই ব্যবস্থা। এই যে অনন্ত বৈচিত্র্যময় মনোমদ বৈচিত্র্যে বিশ্বরাজ্য ভরিয়া রহিয়াছে,—নবীন বল্লরীর নধর লাবণ্য, বিশাল বিটপীর স্নিগ্ধশ্যামোজ্জ্বল মোহনকান্তি, গগণোন্নতশীর্ষ ভীম ভূধর, কি অনন্তনীলিমামণ্ডিত সমুদ্রের ভীম গভীর ভঙ্গী,—এই যে প্রকৃতি-বক্ষে বিভিন্ন সৌন্দর্য্যের প্রদর্শনী খুলিয়া দিয়াছে, ইহারাও প্রাকৃতিকী বিনাশ-বিধির বহির্ভূত নহে। তৃণ হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত একই নিয়ম সূত্রে সম্বদ্ধ আছে। বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে এ অপরাবর্ত্তিত নিয়মের ব্যভিচার বা বিকল্প নাই।

চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদাই ত প্রকৃতির এই লীলা দেখিতেছ। কত প্রাণী জন্মিতেছে—দুই দিন দশ দিন সুখদুঃখের খেলা খেলিতেছে, আবার অতীতের ক্রোড়ে লুকাইতেছে; কত ফুল, ফুটিতেছে—কিছুক্ষণের জন্য প্রকৃতির হাসি ফুটাইয়া, সদ্গন্ধের ফুয়ারা ছুটাইয়া, আবার কালগর্ভে ঝরিয়া পড়িতেছে; ইহা ত সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছ। কিন্তু জীব কেন জন্মে, কেন যায়, কিজন্য আসে, কোথায় যায়,

ইহা একবার নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছ কি? বর্ত্তমানের সুখদুঃখজড়িত অবস্থা-মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যতের চিত্রটা একবার পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছ কি? যে তত্ত্বের মীমাংসা হইলে সংসারের অনেক কথার গোল মিটিয়া যায়, তাহার জন্য যদি না মাথা ঘামাইয়া থাক, তবে ভাই, তোমার চিন্তাশক্তির সার্থকতা কি?

কিরূপে সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কোন অজ্ঞেয় কারণে বা কোন অদ্ভুতশক্তিবলে জড়জগতের উৎপত্তি হয়, এ প্রশ্নের উত্তরের পক্ষে তিনটী-মাত্র উপায় আছে,—শাস্ত্র, যুক্তি এবং উপদেশ. শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও উপদেশ দিবার অধিকার নাই। উপদেষ্টা যাহা বলিবেন, তাহা বহু গ্রন্থের সার মর্ম্মমাত্র। সুতরাং উপদেশে আর শাস্ত্রে মূলগত পার্থক্য অতি সামান্য। আর যুক্তি—যুক্তির ভিত্তি বড়ই ভঙ্গুর। ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধিবৃত্তির উপরই যুক্তির আসন, সুতরাং সহজেই উহা স্থানচ্যুত ও নিরসিত হইতে পারে। তুমি যাহা বলিবে, তাহা বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত মিলাইয়া দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে হইবে, নচেৎ তোমার কথার মূল্য নাই,—এইপ্রকার যুক্তিবাদী হইতে সুফলের আশা নাই। শত শত মনস্বীর সারাজীবনের চেষ্টায় যে তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, বহুচিন্তায় বহু পরীক্ষায় যাহা সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাও বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিতে অনেকে প্রস্তুত নহে। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে এ প্রতিবাদ সফল। তাঁহাদের জন্যই যুক্তির অবতারণা। নচেৎ যাহারা কণিকামাত্র বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া জ্ঞানবারিধি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের মীমাংসায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, আত্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ তাবৎ সিদ্ধান্তকেই যাহারা ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া মনে করে, তাহাদের জন্য আমাদের এ চেষ্টা নহে। আত্মশ্লাঘাজাত স্বাতন্ত্র্য হইতে যে যুক্তির উৎপত্তি, আমরা তাহাকে শতহস্ত দূর হইতে নমস্কার করি।

হিন্দুশাস্ত্রমতে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে হইলে দুইটী নিত্যবস্তু স্বীকার পাইতে হইবে। উহারা প্রকৃতি এবং পুরুষ নামে অভিহিত। পুরুষ চেতন, প্রকৃতি জড়, পুরুষ নির্লিপ্ত, প্রকৃতি আসক্ত। প্রকৃতিই জগৎকার্য্যের জননী, পুরুষ তাহার দ্রষ্টামাত্র। "প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ" প্রকার যিনি করেন, পরিবর্ত্তন যিনি ঘটান, তিনিই প্রকৃতি। আর, "তদ্দর্শিনমুদাসিনং স্বমেকং পুরুষং বিদুঃ" প্রকৃতির কার্য্যদর্শক নির্লিপ্ত পদার্থবিশেষই পুরুষ। ঐ পুরুষ এবং প্রকৃতি পরস্পর বিভিন্নগুণধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও, পরস্পর নিত্যসংযুক্ত। চেতন পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃই প্রকৃতির কার্য্যকারিতা। জড়প্রকৃতির তিনটী প্রধান শক্তি আছে; উহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামে অভিহিত। সত্ত্ব-শক্তি থাকে বলিয়া ক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে, এইজন্য তাহার অপর নাম স্থিতিকারণ। রজোগুণের সদ্ভাবে ক্রিয়ার বিকাশ হয়, এইজন্য তাহার অপর আখ্যা ক্রিয়াত্মিকা শক্তি। আর, তমোগুণের জন্যই ক্রিয়ার পরিণতি ঘটে—কার্য্যশেষ হইলে আর ক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তাই উহার অপর সংজ্ঞা আবরণী-শক্তি। এই গুণত্রিতয় হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ সংঘটিত হয়। রজোগুণের ক্রিয়া, উৎপত্তি; উৎপত্তিই সৃষ্টি। তমোগুণের ধর্ম্ম বিনাশ, বিনাশেই প্রলয়। এই সৃষ্টি এবং প্রলয়ই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য।

এইমাত্র যে পুরুষ-প্রকৃতির কথা উল্লিখিত হইল, উহাদের একটী আদি-কারণ আছে। তাহা ব্রহ্ম নামে পরিচিত। ঐ ব্রহ্মাখ্য পরম

পুরুষই জগতের মূল। তিনি নিত্য, সত্য, শুদ্ধ, অনাদি, নিরাকার, এবং নির্ব্বিকার। প্রকৃতি এবং পুরুষ তাঁহারই দুই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। তাঁহারই কোন অজ্ঞাতশক্তি ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত, আর সেই ক্রিয়াত্মিকা শক্তিকে নিয়মিত করিবার জন্য অপর এক অজ্ঞাত শক্তি পুরুষরূপে অবস্থিত। এই উভয়বিধ শক্তি নিত্যসংযুক্ত আছে—এই সংযোগই সৃষ্টির মূল। বেদান্তকার বলেন,—"নতঃ উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়ো রজয়োরুভয় যুক্তা ভ্রমন্ত্যাহুভূতো জগবুদ্বুদবং।"

যেমন কেবল বায়ু বা কেবল জল হইতে বুদ্বুদের উদ্ভব হইতে পারে না, তদ্রূপ প্রকৃতি-পুরুষের একতরের সৃষ্টিপ্রকাশ-শক্তি নাই। উভয়ের সংযোগই সৃষ্টিক্রিয়ার প্রধান সাধন। পুরুষ নিজে কিছুই করেন না, জগতের তাবৎ কার্য্য প্রকৃতি হইতেই হয়, কিন্তু পুরুষের সান্নিধ্য ভিন্ন প্রকৃতির কার্য্যশক্তি থাকে না, তাই প্রকৃতিকে জড় বলে। কিন্তু প্রকৃতি নিজে জড় হইলেও চেতনাময় পুরুষ সংযোগে সজীব। সাংখ্যকার উপমা দ্বারা এই কথা বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছেন,—"তৎ সন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।১।৯৬।" অর্থাৎ অয়স্কান্তমণি বা স্পর্শমণি-সংযোগে লৌহ যেরূপ [illegible] প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পুরুষ-সন্নিধানে নিয়ন্তাবস্থিত বলিয়া প্রকৃতিতে পুরুষের সমস্ত গুণ সংক্রামিত হইয়া থাকে। ঐ প্রকৃতির অপর নাম মায়া বা অবিদ্যা,—তন্ত্রমতে উনিই আদ্যাশক্তি নামে অভিহিতা। আর যে অনন্তশক্তিমান্ পুরুষের প্রভায় প্রভাবিত হইয়া প্রকৃতির এত কর্ত্তৃত্ব—এত লীলা-বৈচিত্র্য, সেই পুরুষেরই অপর নাম হিরণ্যগর্ভ, বৈরাজপুরুষ বা সগুণ ব্রহ্ম।

পুরুষাত্মিকা প্রকৃতি যে ত্রিগুণান্বিতা, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ঐ ত্রিবিধ শক্তির তিনটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন; তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্র নামে পরিচিত। ঐ তিন মূর্ত্তি ব্রহ্ম হইতে সম্বন্ধবিচ্যুত নহেন। তাই যে প্রকৃতিকে শ্রুতি "অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমমেঃ" বলিয়া অভিবাদন করিয়াছেন, সেই প্রকৃতির কার্য্যনিয়ন্তা পরম পুরুষকে আর্য্যমহর্ষিগণ—

"নমো রজোজুষে সৃষ্টৌ স্থিতৌসত্ত্বময়ায় চ।
তমোরূপায় সংহারে ত্রিরূপায় স্বয়ম্ভবে॥"

বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। আর্য্য কবিও—

"নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয় বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে॥"

বলিয়া পুরুষ-প্রকৃতির অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সত্ত্বগুণাধার বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, রজোগুণময় ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তমোগুণাবতার রুদ্র সংহার বা প্রলয়কর্ত্তা। ঐ গুণত্রিতয়ই জগৎ-বৈচিত্র্যের হেতুভূত, আর ঐ "গুণাঃ প্রকৃতিজাঃ স্মৃতাঃ" প্রকৃতিই যে জগজ্জননী, আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র শতমুখে তাহা বিবৃত করিয়াছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে chaotic matterকেই জগতের মূল উপাদান বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। ঐ matter জড়পদার্থ। মূলে যাহা নাই, অংশে তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব; সুতরাং ঐ অনাসঙ্গ জড়পদার্থ হইতে এই জ্ঞানময় চেতনাময় জীবজগতের উৎপত্তির কথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য নহে। আমাদের মূলা প্রকৃতি আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের inanimate matter এক নহে। প্রকৃতি জড় হইলেও চেতনপুরুষ-সংযোগে সজীব, কিন্তু matter নিত্য জড়। প্রকৃতির ইংরাজী প্রতিশব্দ universal life বলিলে অনেকাংশে খাটিতে পারে।

'বিজ্ঞানমতে এই বিশাল বিশ্বক্রিয়ার বিকাশ মাত্র। ঐ ক্রিয়া-প্রকাশের পক্ষে দুইটীমাত্র

শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে; তাহাদের নাম higher potential energy and lower potential energy অর্থাৎ উচ্চতর শক্তি ও নিম্নতর শক্তি। ঐ উচ্চতর শক্তি যখন নিম্নতর শক্তির অনুসরণ করে, তখনই কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহাই সৃষ্টির হেতু। যখন ঐ উচ্চশক্তি ক্রমাবনতিতে zero potential এ পরিণত হয়, তখনই kinatic energy র অত্যন্ত অভাব ঘটে। উহাই প্রলয়ের কারণ।

হিন্দুশাস্ত্রের সহিত এই মতের অনেকটা একতা আছে; higher potential energy কে সত্ত্বগুণ, kinatic potential energy কে রজোগুণ এবং lower potential energy কে তমোগুণ রূপে গ্রহণ করিলে উভয় মতের একতা স্পষ্টই প্রতীত হইবে। এই জগৎ রজোগুণের ব্যাপ্তি বা বিকাশ মাত্র। রজোগুণের প্রভাবেই জগতের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি। কিন্তু উহার মূলে সত্ত্বগুণ বা উচ্চতর শক্তি আছে বলিয়াই জগতের এত ক্রিয়াশীলতা। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের ঐ তিনটী কথা ছাড়া আমরা আরও এক সর্ব্বোচ্চশক্তির কল্পনা করি। ঐ শক্তি প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে পূর্ব্বোক্ত গুণত্রিতয়েরই পরিচালক। উহাই ঈশ্বর-পদবাচ্য। ঈশ্বরেচ্ছাই সৃষ্টির মূল উপাদান।

বুঝিলাম, উচ্চতর শক্তি নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু কেন হয়? কে ঐ অসংখ্য শক্তিকে যথানির্দ্দিষ্ট পথে নিয়ন্ত্রিত করে? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এ প্রশ্নের অবিসংবাদিত উত্তর দিতে পারে নাই। উচ্চশক্তি নিয়মশক্তির অনুসরণ করিতে করিতে কালক্রমে যখন একেবারে সর্ব্বনিয়মশক্তিতে পরিণত হয়, যখন জগতের কার্য্য বন্ধ হয়, তখন কে পুনর্ব্বার সেই শক্তির উদ্বোধন করে? কে সেই নিয়মশক্তিতে পরিণত শক্তিকে উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া তোলে? কে সেই অনন্ত ধ্বংসের দগ্ধবক্ষে সৃষ্টির বীজ ফুটাইয়া দেয়? এ প্রশ্নের উত্তরও বিজ্ঞান ভালরূপ দিতে পারে নাই, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে ইহার উত্তর আছে। "তৎসচ্ছাত্মা সংগুহ্য ত্বং মহাযোগিনীপরা.....জগৎস্বজঃ" ইত্যাদি বচন দ্বারা ঈশ্বরেচ্ছাই যে সৃষ্টির মূলকারণ, তাহা আর্য্যশাস্ত্র শতমুখে নির্দ্দেশ করিয়াছে। চিদানন্দময়ের ইচ্ছা বা ঈক্ষণানুসারে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গুণক্ষোভবশতঃই যে সৃষ্টিক্রিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা আর্য্যমহর্ষিগণ শত দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছেন,—

"চিদানন্দঃ পরংব্রহ্ম তচ্ছায়া সমুপস্থিতা।
সত্ত্বরজস্তমোময়ী প্রকৃতি দ্বিবিধা চ সা।
শুদ্ধাশুদ্ধা বিভেদিভ্যাং মায়া বিদ্যেচ তেমতে।
মায়া বশ বশীকৃত্য শাশ্বৎ সর্ব্বজ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যা বশগাশ্চান্যে তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।"

সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিতা প্রকৃতি শুদ্ধাশুদ্ধা ভেদে দুই প্রকার। ঐ শুদ্ধা প্রকৃতিতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের চিদাভাস পড়িলে, ঐ শুদ্ধা প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ পায়; এবং অশুদ্ধা প্রকৃতিতে চিদাভাস পড়িলে প্রাণীজগতের উৎপত্তি হয়। ঐ জীবগণ অবিদ্যার অধীন এবং গুণবৈচিত্র্যে বহুজাতীয়। যাহাতে সত্ত্বগুণের আধিক্য তাহা দেবতা, যাহাতে ত্রিগুণের সমতা তাহাই মনুষ্য এবং যাহাতে তমোগুণের প্রাধান্য তাহাই তির্য্যগাদি মনুষ্যেতর জীব।

যুক্তি বা কার্য্যকারণ-বিচারে সাধারণ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বের ন্যায় অজ্ঞেয় অচিন্ত্য অসাধারণ বিষয়ে কেবল কার্য্য-কারণের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে গেলে ঘোর নাস্তিকতা আসিয়া পড়ে; সমস্ত অলৌকিক কার্য্যেই ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার ভিন্ন অন্য

পন্থা নাই। তাই ঈশ্বরকে সর্ব্বগুণময় ও সর্ব্বরূপে ভাবিতে শাস্ত্রানুশাসন আছে। শাস্ত্র, বিশ্বাসী জন্য। যিনি ঈশ্বরকে নিরাধার-রূপে না ভাবিবেন, তিনি অতি বুদ্ধিজ ও বিবেচক হইলেও হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম বোধ করিবার শক্তি তাঁহার নাই। এই বিজ্ঞানবিহিত যুগে বিজাতীয় শিক্ষায় বিকৃতমস্তিষ্ক শিক্ষিতগণের নিকটে একথা জানাইয়া রাখার দরকার আছে।

"যথা প্রজাতন্ত্র নিবৃত্তঃ"—যে বস্তু যাহা হইতে জন্মিয়াছে, পরিণামে তাহাতেই লয় পাইবে। এই কথা প্রাণীসম্বন্ধে সম্যক রূপে হইতে পারে। জীবগণ যে স্থান হইতে আসিয়াছে, মহাচক্র ঘুরিয়া আবার সেই স্থানেই যাইবে। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, প্রকৃতির ক্রোড়েই লয় পাইবে—ইহাই নিয়মের পরিণাম। জীব সেই অনন্ত পথের যাত্রী মাত্র। কর্ম্মফলে সংসারের সুখদুঃখ ভুগিয়া শীঘ্র বা বিলম্বে একদিন সেই অনন্তের ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিবেই করিবে; যে জলবিন্দু, মাসান্তে বর্ষান্তে বা যুগযুগান্তে, একদিন সেই মহাসমুদ্রে মিশিবেই মিশিবে। ইহাই তাহার পরিণাম ধর্ম্ম। সংসারচক্রে ভ্রমণ জীবের জীবত্ব গন্তব্য পথ শেষ করাই শেষ লক্ষ্য। এ সংসার-চক্র যে আগে ঘুরিয়া আসিবে, সেই বাজি জিতিবে—সকল প্রকার আধিব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সেই চিরশান্তির অমর পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

যখন এই পথটুকু শেষ করিতেই হইবে, তবে ভাই, বৃথা কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, পথের দূরত্ব বাড়াও কেন? মহাজন-প্রদর্শিত সুগম পথে না গিয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিপথে ঘুরিয়া বৃথা ক্লান্ত হও কেন? সংসার-প্রান্তশালায় যতবার বিশ্রাম করিবে, তোমার দুঃখের জ্বালা ততই পুরিয়া উঠিবে। তাই বলি, যদি সেইস্থানে যাইতেই হয়—যে স্থানে দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, অভাব নাই, অভিযোগ নাই, যেখানে নিত্য সুখ, অচ্ছিন্ন তৃপ্তি ও অনন্ত মাধুর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই—সেই নিত্যধামে যাইতেই হয়, তবে পথপ্রদর্শকনিদ্দিষ্ট সদ্গুরুর উপদেশ-মতে পূর্ব্বোপাসনার প্রশস্ত পন্থপথের একতম অবলম্বন করিতে ক্ষান্ত থাক কেন? যদি সোজা পথে অক্রেশে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে চাও, তবে পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্করস্বামীর নির্দ্দেশানুবর্ত্তী হইয়া—

"একান্তে সুখমাস্বতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং।
পূর্ব্যাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্ব্যাপিতং দৃশ্যতাম্॥
প্রাক্কর্ম্ম প্রবিলোপ্যতাং চিতিবলান্ নাপ্যুত্তরৈ শ্লিষ্যতাং।
প্রারব্ধং ত্বিহ ভুজ্যতাং অথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্।"

তবেই তোমার সংসারবন্ধন ঘুচিবে, তবেই মনুষ্যজন্ম সফল হইবে। ভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ॥

তাই অনুরোধ করি, যদি চিরনির্ব্বাণ লাভ করিতে চাও তবে হৃদয় খুলিয়া, সকল ভুলিয়া তন্ময় হইয়া, সেই অনাথশরণ দীনবন্ধুর পাদপদ্মে শরণ লও।

শ্রীবরদাচরণ বিদ্যারত্ন।

নিরুপমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্যোমকেশ গোকুলনগরের রামশঙ্কর তর্কালঙ্কারের দৌহিত্র; অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, শৈশব হইতে মাতামহাশ্রয়েই প্রতিপালিত; এক্ষণে বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসর; দেখিতে সুঠাম; শরীর কিছু উন্নত ও বলিষ্ঠ; সদ্যবিকশিত তরুণ যৌবনের পূর্ণতা-প্রাপ্ত ও লাবণ্যময়, ললাট সুপ্রশস্ত, চক্ষু জ্যোতির্ম্ময়, হাস্য সরল; বক্ষঃস্থল প্রসারিত এবং গ্রীবাদেশ সর্ব্বদাই যেন অভিমানোন্নত; সহসা দেখিলে একটী তেজস্বী ও সাহসী যুবা বলিয়া বোধ হয়।

ব্যোমকেশের পিতৃমাতৃবিয়োগের পর তাহার এক বিধবা মাসী তাহাকে প্রতিপালন করেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকেই আপন জননী বলিয়া জানিত, তাঁহারও অবশ্য ব্যোমকেশের উপর পুত্রস্নেহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। তিনি কিছু মুখরা ছিলেন, তাঁহার ভয়ে ব্যোমকেশকে কেহই কিছু বলিতে পারিত না, এমন কি তর্কালঙ্কার মহাশয়ও কোন দোষের জন্য তাহাকে তত সনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন।

বাল্যকালে ব্যোমকেশ অতিশয় চঞ্চল এবং উদ্ধতপ্রকৃতি ছিল; তাহার উপর মাসীর অতিরিক্ত আদর ও মোহাগ পাইয়া সে প্রায় সকলের শাসনকেই অতিক্রম করিয়াছিল; সে বাটী হইতে বাহির হইলে একটা কিছু গোলযোগ না ঘটাইয়া বাটী প্রবেশ করিত না।

প্রাতেই স্কুল; তর্কালঙ্কার মহাশয় ব্যোমকেশকে স্কুলে দিতেন, কিন্তু ব্যোমকেশ অধিকাংশ দিনই স্কুলে যাইত না, পথি মধ্যে অন্যান্য বালকদিগের সহিত ঝগড়া করিয়া পলিয়াসক অন্যত্রবে চলিয়া যাইত, কোন দিন বা মাঠে ঘোড়া ধরিয়া ঘোড়-দৌড় করিয়া বেড়াইত, আবার স্কুলের ছুটীর সময় সকল ছেলে যেমন বাটী যাইত সেও তেমনি বাটী যাইত। এমন একটী দিন যাইত না, যেদিন ব্যোমকেশের নামে দুই তিনটী অভিযোগ না হইত। সে রামুন-ঠাকুরুণের নারিকেল চুরী করিয়া খাইত, বাটীর নিকটস্থ কুম্ভকারবিদ্যের হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিত; ময়রাদের দোকান হইতে সন্দেশ তুলিয়া লইয়া পলাইত, এবং কি ব্যোমকেশ আসিতেছে দেখিলে সকলে শশব্যস্ত হইত; কোন গুরুতর অভিযোগ হইলে তাহার জ্যেষ্ঠ মাতুল, কি তর্কালঙ্কার মহাশয় যদি কোন দিন শাসন করিতেন, তাহা হইলে তাহার মাসীঠাকুরুণী এমন নাকি-সুর ধরিতেন যে, বাটীতে তিষ্ঠান ভার হইত। এইরূপভাবে ব্যোমকেশের বাল্য-জীবন অতিবাহিত হইল। যখন তাহার বয়স এক দশ বর্ষ, তখন তাহার মাসীও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে ব্যোমকেশকে কিছু শান্তপ্রকৃতি বোধ হইতে লাগিল, সে লেখাপড়ায়ও কথঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিল, তাহার দুই বৎসর পরে সে মাইনার-স্কলার-বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল।

আমরা যে সময়ের কথা অবতারণা করিয়াছি, এখন আর সে ব্যোমকেশ নাই। এখন ব্যোমকেশ সাহসী, মিষ্টভাষী, পরোপকারী এবং সদানন্দ। আজ দুই বৎসর হইল, তাহার মাতামহ-মাতামহীরও মৃত্যু হইয়াছে; মুকুলেরা এখন বাটীর কর্ত্তা, মাতুলানীরা গৃহিণী; কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাতুলানীরা ব্যোমকেশকে বড় একটা স্নেহের চক্ষুতে দেখিতে পারেন না।

মাতুলদের অবস্থা উন্নত, ব্যোমকেশকে কোনরূপ কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে হয় না, এখন তাহার গীতবাদ্যে বড় অনুরাগ; গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার পর সে কলিকাতায় শিখিবার জন্য একটী কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মাতামহের মৃত্যুর পর হইতে আর পড়ার সুবিধা থাকিল না, সেই অবধি এখন বাটীতে থাকিয়া গীতবাদ্য আমোদপ্রমোদে মনোনিবেশ করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অধিকাংশ ব্যক্তিই আপন অনাথা ভগিনী প্রভৃতিকে আপনার গলগ্রহ বলিয়া বিবেচনা করেন। ব্যোমকেশ যদিও এখন তাহার মাতুলদিগের গলগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তথাপি ব্যোমকেশ একটা বিবাহ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিলেই ভাল হয়, মনের ভাবটা এতদূর পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা ব্যোমকেশের বিবাহ জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন; এবং এজন্য অনুসন্ধান করিতেছেন, যাহাতে অধিক অর্থ ব্যয় না হয়। পাত্রী কুৎসিৎ বা সুন্দরী যাহাই হউক না কেন, তাঁহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

কিন্তু ব্যোমকেশের রূপতৃষ্ণা অতিশয় প্রবল; সে সৌন্দর্য্যের জন্য লালায়িত; সে আপন বন্ধুবান্ধবের নিকট বলিয়া রাখে যে—পাত্রী সুন্দরী না হইলে সে বিবাহ করিবে না, কুরূপা স্ত্রী হইলে সে দেশত্যাগ করিয়া যাইবে। সে অনেক উপন্যাস পড়িয়াছে, পড়িয়া পড়িয়া উপন্যাসের প্রেম, উপন্যাসের নায়িকা, উপন্যাসের মত বিরহ-মিলন লাভ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে।

ভাগ্যচক্র কখন যে কোন্ পথে আবর্ত্তন করে, তাহা কে বলিতে পারে? সরলা নিরুপমায় ললাট-পটে তাহার ভবিষ্য-জীবনের কোন্ চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? সেদিন নিরুপমার পিতা রাধাবিনোদ বাবুর নিকট যে পাত্রের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে পাত্র এই ব্যোমকেশ!

রাধাবিনোদ বাবুর সহিত যেদিন পরামর্শ হয়, তাহার তিন দিন পরে সরলপ্রকৃতি সান্যাল মহাশয় ও রাধাবিনোদ বাবু উভয়ে মিলিত হইয়া গোকুলনগরে উপস্থিত হইলেন। ব্যোমকেশের জ্যেষ্ঠ মাতুল বাটীতে উপস্থিত ছিলেন; তিনি অভ্যর্থনা-সহকারে উভয়কে উপবেশন করাইলেন। তাঁহাদিগের মনোগত অভিপ্রায় অবশ্য অব্যক্ত থাকিল না, ব্যোমকেশের মাতুল আহ্লাদসহকারে তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

আহারাদির পর একটী শুভক্ষণ দেখিয়া পাত্র দেখান হইল। পাত্র দেখিয়া দুই জনেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, বিবাহ-সম্বন্ধে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। রাধাবিনোদ বাবু ব্যোমকেশের মাতুলকে বলিলেন,—"আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে, বিবাহ-কার্য্যটী শীঘ্রই সুসম্পন্ন হয়।"

মাতুল বলিলেন,—"আমারও সেই ইচ্ছা, শুভকার্য্য যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।"

"তবে এ বিষয়ে আর যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তা প্রকাশ করুন।"

এইবার সান্যাল মহাশয় বলিলেন,—"আর বক্তব্য কি? দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি, আমি পাঁচটী হরীতকী দিয়ে কন্যাদান কর্ব্বো, দয়া ক'রে

ছ পাঁচ জনে মিলে পরীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়ে কন্যাটী নিয়ে আসবেন।"

ব্যোমকেশের মাতুল বলিলেন,—"সে কথা আপনাকে আর অধিক বল্‌তে হবে না। আমারও তেমন ইচ্ছা নয় যে, অধিক ধুমধাম করি। তবে ছোট-বেলা থেকে ভাগনেটী সলায় পড়েছে; যেমন ক'রে হ'ক বিবাহাদি দিয়ে একটা কুল-কিনারা ক'রে দিতে হবে তো, আজ কাল্‌কার দিনে আপন-আপন পরিবার প্রতিপালন করাই কঠিন হয়ে উঠেছে; ভাগ্‌নে-ভাগনী —সে ত অনেক দূরের কথা।"

রাধাবিনোদ বাবু বলিলেন,—"আপনারা বিশিষ্ট সন্তান। আপনার পিতা একজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত। আপনারা যদি এরূপ না ক'র্ব্বেন, তবে কে ক'র্ব্বে বলুন? বিশেষ, আপনারা হ'চ্ছেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, সমাজের ভূষণ!"

"সে নিজগুণে যাই বলুন; এই দেখুন, স্বর্গীয় কর্ত্তার আমলে যে সকল রীতিনীতি ছিল, আমি সে সকল কিছুই বদলাই নাই। সেই যাই হ'ক, তবে কথাটা হ'চ্ছে এই—পাত্রটী একবার দেখ্‌তে হ'চ্ছে।"

"তা দেখ্‌বেন বৈকি! তা না দেখ্‌লে কি হয়? তবে আগামী কল্যই আপনারা পাত্রী দেখ্‌তে চলুন। আর যা দেখবেন, তা আমি পূর্ব্বেই বলে দিয়েছি, মেয়েটী দেখ্‌তে শুন্‌তে সর্ব্বাংশে ভাল; কেবল রঙটী একটু ময়লা।"

রাধাবিনোদ বাবুর শেষ কথাটী শুনিয়া সান্যাল মহাশয় একটু ব্যঙ্গভাবে বলিলেন,—"না ভায়া! এখন আর তেমন ময়লা নেই। তুমি যখন দেখেছিলে, তখন হয় ত ছেলেমানুষ, চুলোকারা মেখে ছিল, এখন একবার দেখো দেখি, ঠিক তার গর্ভধারিণীর রঙ।"

ব্যোমকেশের মাতুল একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আর হ'লই বা ময়লা, এত আর বিনু দোকানদারী নয়? মেয়েমানুষ—মুখ চোখ থাক্‌লেই হ'ল, গৃহস্থালির কাজকর্ম্ম ক'র্ত্তে পার্লেই হ'ল।"

রাধাবিনোদ বাবু বলিলেন,—'সে ত ঠিক কথা। তথাপি সকল বিষয় খুলে বলাই ভাল।"

ব্যোমকেশের মাতুল এবার একটু গম্ভীর-ভাবে বলিলেন,—"সে ত ভদ্রের উচিতই বটে; তবে আমাদের কথাটাও তাদ্‌চুর হ'ক; পাত্র ত আপনারা দেখ্‌লেন, আপন ভাগ্নে, নিজমুখে প্রশংসা করা অবশ্য ভাল দেখায় না, অমন ছেলে এ এলাকার মধ্যে নাই। আমা এই পাত্র দিয়েই খালাস! অলঙ্কার পত্র—সে সকলের বেশী যে আড়ম্বর, তা ক'র্ত্তে পার্ব্বে না; তবে গৃহস্থদরে ন্যায্য যা নৈলে না, তা অবশ্যই দিতে হবে।"

সান্যাল মহাশয়ের মুখখানি একটু ম্লান হইল; তিনি বলিলেন,—"সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। আপনারা সৎ সন্তান, যা ভাল বিবেচনা হয় তাই ক'রবেন, আমাই ভাল হ'চ্ছে এই আমার যথেষ্ট; তবে গহনা-পত্র দেন আপনাদেরই থাক্‌বে, দশজন আপনাদেরই সুখ্যাতি ক'রবে, তাতে আর আমার লাভালাভ কি?"

ব্যোমকেশের মাতুল সে কথারি পোষকতা করিয়া বলিলেন,—"সে ত বটেই! তবে কিনা আগে সকল কথার খোলসা হওয়াই ভাল; শেষকালে যে একটা গোলযোগ হয়, সেটা ভাল দেখায় না; আমি এখন থেকেই বলাই, কতকগুলো যে অলঙ্কার তা দিতে পারবো না, আপনি যেমন কন্যা দিয়ে খালাস আমিও তেম্‌নি পাত্র দিয়ে খালাস।"

রাধাবিনোদ বাবু বলিলেন,—'উহার সে বিষয়ে আর বাক্‌নিষ্পত্তি ক'র্ত্তে না।"

কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কথা-বার্ত্তা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হইল, সন্ধ্যা-বন্দনাদির জন্য তিন জনে গাত্রোত্থান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রাবণ মাসের শেষ, ফুল ফুটিলে কে রাখিতে পারে? আজ তিন দিন হইল, ব্যোমকেশের সহিত নিরুপমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নিরুপমার পিতার এক পয়সা ব্যয় নাই, রাধা-বিনোদ বাবুই সমস্ত সাহায্য করিয়াছেন; মহাল মহাশয় রামশঙ্কর তর্কালঙ্কারের নিকটে কন্যাদান করিয়া আপনাকে চরার্থ বোধ করিতেছেন। নিরুপমার জননী ঘর সুন্দর জামাতা পাইয়া আহ্লাদসাগরে ভাসিতেছেন, ডাকিয়া ডাকিয়া সকলকে আপন রূপবান জামাই দেখাইতেছেন, দশজনে বলিতেছে—"সান্যাল মহাশয়ের পূর্ব্ব জন্মের কৃতি ছিল, তাই এমন জামাই হইয়াছে।"

আর নিরুপমা তাহার যে কি আহ্লাদ, তাহা কে বলিতে পারে? তাহার বিবাহ হই-য়াছে, এই তার প্রথম আহ্লাদ! দ্বিতীয়তঃ নূতন পট্টবস্ত্র পরিতে পাইয়াছে, সুবর্ণ অলঙ্কার ছয় সাত খানা নূতন কাপড় হইয়াছে, তাহার সাত আট খানা নূতন কাপড় হইয়াছে, এজন্য তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর ভিতর আনন্দ ধরিবার স্থান নাই, ধীরে নিরুপমা আজ মনে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

আজ নিরুপমার ফুলশয্যা। সে তাহার সঙ্গিনীদের সহিত আপন ফুলশয্যার ফুল তুলিয়া তুলিয়া বেড়াইতেছে। বালিকা, বিবাহের কথা শুনিলে—তাঁহার বরের কথা শুনিলে, লজ্জিত হয়; কিন্তু ফুলশয্যা কি, তাহা জানেনা বটে—যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহা-কেই বলিতেছে—"আজ আমার ফুলশয্যা।" যিনি শুনিতেছেন, তিনি হাসিয়া আকুল হইতেছেন।

বাটীতে নূতন জামাই; কত লোক আসিতেছে যাইতেছে, কত রঙ্গতামাসা হইতেছে, সকলেই আনন্দিত; কেবল ব্যোম কেশ নিরানন্দ! নিরুপমাকে সে শুভদৃষ্টিতে দেখিতে পারে নাই; তাহার হৃদয় যাহা অন্বে-ষণ করে, নিরুপমার শ্যামকান্তির ভিতর সে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় নাই বলিয়াতাহার বড়ই ক্রোধ ও আক্ষেপ হইয়াছে। বিবাহের পরদিন সে আপনার এ হৃদয়ব্যথা চাপিয়া রাখিতে পারে নাই, প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। নিরুপমাও তাহা বুঝি শুনিয়াছিল; কিন্তু সে কি তাহা স্মরণ রাখিতে পারে? শিশুমতি, তখনই তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

আজ বিকাল-বেলায় পাড়ার মেয়েরা ব্যোমকেশকে বাটীর ভিতর লইয়া নানা প্রকার হাস্যকৌতুক করিতেছে। নবীনা প্রবীণা অনেকগুলি রমণী ব্যোমকেশকে ঘেরিয়া বসিয়াছেন; তাঁহাদের সকলেরই মুখভরা হাসি, প্রাণে যেন আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতেছে; কিন্তু ব্যোমকেশের তেমন স্ফূর্ত্তি নাই, কতই যেন অন্য মনস্ক। স্ত্রীমণ্ডলী হইতে তাহার প্রতি যে সকল সরস প্রশ্নবাণ বর্ষিত হইতেছে, সে তাহার উপযুক্ত; কোন উত্তর দিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সে আজ প্রথম হইতে সকল বিষয়েই ঠকিয়া যাইতেছে; প্রথমতঃ, সে আসনে বসিবা-মাত্র রমণীমণ্ডলের বিদ্রূপময় উচ্চহাস্যে আসনপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—সে আসন কৃত্রিম, কেবল রঙ্গের গুঁড়ি দ্বারা প্রস্তুত, তাহার পরিধেয় বস্ত্রে সমস্ত রঙ্গ লাগিয়া গিয়াছে, সে মাটীতেই বসিয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ জলযোগের সময় সে হস্ত প্রসারণ

মাত্র তাহার সম্মুখস্থ মিষ্টান্নাদির থালা সরসর করিয়া সরিয়া গিয়াছে। তৃতীয়তঃ জলপান করিবার জন্য জলের গ্লাসের আবরণ উন্মোচন করিয়া জলের পরিবর্ত্তে তাহার ভিতর ফুলের মালা দেখিতে পাইয়াছে। চতুর্থতঃ বালুকাপূর্ণ গাড়ু হইতে জল ঢালিতে গিয়া এক বিন্দু জল না পাইয়া অপ্রতিভ হইয়াছে। তাহার উপর, পানের ডিবার ভিতর আরসুলা, পানে কাঁকড়, দ্রোণ পুষ্পের ভাত প্রভৃতি যাহা যাহা তাহাকে ঠকাইবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল, সবগুলিতেই ঠকিয়া গিয়াছে। মহিলামণ্ডলীর আনন্দের সীমা নাই, আজ তাহাদের জয় জয় পড়িয়া গিয়াছে; ব্যোমকেশ বাসর-ঘরে বাসরবিজয়ী উপাধি পাইয়াছিল, কিন্তু আজ তাহাকে হারি মানিতে হইয়াছে!

মহা তরঙ্গ ছুটিতেছে, এমন সময় বড়-বাড়ীর রাঙ্গাদিদি সেই আসরে দেখা দিলেন। তিনি সম্পর্কে সান্যাল মহাশয়ের খুড়ী। তিনি আসিবা-মাত্র সকলকলরবে একটা জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল; তিনি মুখভরা হাসি লইয়া সেই নারী সভার ভিতর আসন গ্রহণ করিলেন।

লীলাবতী—বলিল—"দিদি! তুমি এতক্ষণ ছিলে না, আজ আর ভেড়াকান্তের দুর্দ্দশার সীমা নাই।"

"কেন লা? চোর বেঁধেছিস্ নাকি?"

"জিজ্ঞাসা করেই দেখ না।"

"আমি জিজ্ঞাসা ক'রলে কি আর উত্তর দিবে? আমরা হ'লাম বুড়ো-ধুড়ো মানুষ, আমাদিগে কি আর মনে ধ'রবে?"

"তা ধরবে বৈকি? তুমি ত আর কালো নও; কালোই না হয় মনে ধরে না।"

এইবার রাঙ্গাদিদি ব্যোমকেশের চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন,—"কি ভাই নাতজামাই, কথা ক'চ্ছনা যে! সত্যি নাকি? আজ কি সত্যি সত্যিই নাকে-কাণে খত দিয়াছ?"

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া বলিল,—"ততদূর এখনও হয় নাই, হ'তেও বড় বেশী নাই; এখন আপনার যখন শুভাগমন হ'ল, তখন বোধ হ'চ্ছে এইবার পূর্ণাহুতি হবে।"

অমনি হ-হ হি-হি শব্দে একটা হাস্যরব উত্থিত হইল; দশজনের এক সঙ্গে দশ কথায় একটা যেন কলরব হইয়া পড়িল। থাকমণি বলিল,—"শুনলে রাঙ্গা দিদি, আ'জ আপন মুখেই স্বীকার ক'রছে।" প্রমদা বলিল,—"আহা! আ'র কিছু বল না, এখনই কেঁদে ফেল্‌বে।" ষোষালদের ছোট-বৌ বলিল,—"কাঁদবে কেন? কাঁদলে এখনই মাথার জল ঢেলে দিব।" হেমলতা বলিল,—"সত্যি বটে আহা! মুখখানি চুণপারা হ'য়ে গিয়েছে, চোঁখ ছলছল ক'রছে। দেখ ভাই! তুমি আমার সোদর মানুষ ভালবাস; দে'খো যেন রাঙ্গাদিদি গায়ে আবার ঢলে প'ড়না।"

শেষের কথাটায় হাসির মাত্রাটা আরও একটু বাড়িয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে একটু মন্দীভূত হইলে, রাঙ্গাদিদি বলিলেন,—"আচ্ছা, এখন ওসব কথা থা'ক, ছুটো আসল কথা জিজ্ঞাসা করি। বলি, হাঁহে হনুমান! কনে কালো হয়েছে ব'লে নাকি রাগ ক'রেছ?"

ব্যোমকেশ একটু লজ্জিতভাবে বলিল,—"কে বল্লে? কৈ না।"

"আর না? ব'লে—কত কেঁদেছ, মাথা কুটেছ!"

আবার কলকল শব্দ উত্থিত হইল। ষোষেদের কিরণ বলিল,—"আঃ! আর মাথা কুটে কাজ নাই, ভাগ্যি যে,অমন বৌ পেয়েছ।"

লীলাবতী বলিল,—না-না-না, তোরা বুঝতে পারিস-নি, নিজে হ'চ্ছেন বনমানুষ, তা বনছরার চিনবেন কেমন ক'রে?" সুখদা বলিল,—"এটা কেবল কথার কথা, নিজের ওসর বাড়ান; একটু বড় হ'তে দে, দেখ্‌বি পায়ে লুটোলুটি ক'রবে।"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন,—"তা আর ব'লতে? নিরুপমা যেমন মেয়ে, অমন মুখ চোখ কার আছে? রঙ্ক কি সবারই ফরসা হয়? বড় হ'লে আবার ঐ রঙই কেমন কাঁচ কাঁচ হবে।"

লীলাবতী ব্যোমকেশের গালে একটী গুল্লির আঘাত করিয়া বলিল,—"বলি ও উজবুক! রা'গকাণা হ'য়েছ নাকি? ভালমন্দ চিন্‌তে পার না? কালো ভাল, না তোমার এই বক্‌ রঙ্ ভাল?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তোমাদের মতটাই আগে বল।"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন,—"কালো জগৎ আলো।"

থাকমণি বলিল,—"কালো রূপ ভালবাসি, তাইতে কালা দেখ্‌তে আসি।"

সুখদা বলিল,—"কোকিল যে কালো তাতে কিবা আসে যায়?"

মধুযোদের দামিনী হালে শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে, আসিবার আগের দিন তাহার শ্বশুর-বাড়ীর গ্রামে একদল 'কালীয়-দমনের' যাত্রার 'মানভঞ্জনের' গান হইয়াছিল; শ্রীমতী রাধা মান করিয়া যে কথা-গুলি বলিয়াছিল, সে কথাগুলি প্রায় মুখস্থ করিয়া আসিয়া, সে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া একটু টানা-টানা সুরে সেইগুলি আওড়াইতে লাগিল—"ওহে সখি! আমি আর কালোরূপ দেখ্‌বো না, কাল মণি রাখ্‌বো না, কালো কেশ পুষ্‌বো, কালো ভুক কামায় না, কালোজল খাব না, কাল নাম শুনবো না।"

এবার দামিনীই আসর গরম করিয়া তুলিল। একটু ঠাণ্ডা হইলে রাঙ্গাদিদি অপর সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হাঁ লা, তোরা ত, যজ্ঞে কথাতেই সময় কাটাচ্ছিস্; আমাদের

যে সুব লক্ষণ আছে, সে সব কিছু করেছিস্?"

লীলাবতী বলিল,—"তা আর আমরা কখন করলুম—আমরা কি সব জানি? এখন তুমি এলে, লক্ষণ-টক্ষণ যা কর্ত্তে হয়, তা কর।"

"দূর ছুঁড়ীরে, তবে ক'রেছিস কি? নিরুপমাকে ডেকে নিয়ে আয়। আজ ফুল-শয্যার দিন, জামাইকে যে ক'নে কোলে ক'রে ব'সতে হয়।" এই বলিয়া, রাঙ্গাদিদি ব্যোম-কেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ওহে নাত-জামাই, এবার ঠাট্টা-তামাসা নয়, এবার সত্যি সত্যিই তোমাকে একটী কাজ করতে হ'চ্ছে।"

"কি আজ্ঞা করুন, হাজির ত আছিই।"

"শুধু হাজির থা'কলে হবে না; আমাদের বরাবরকার নিয়ম এই যে, ফুলশয্যার দিন জামাইকে তেল সিঁদুর কপালে দিয়ে ক'নে কোলে ক'রে বস্‌তে হয়, তাই একবার ক'রতে হ'চ্ছে।"

"সে ভারটা আপনাদের উপরেই দিলাম। আমার হ'য়ে আপনারাই করুন"

"ওমা, তা ব'ল্লে কি হয়? লক্ষণ না করলে চল্‌বে কেন? আমরা ত কোলে করব মানুষই ক'রেছি; এখন তোমার কোলে দিলাম, তুমি একবার কোলে ক'রে ব'স।"

"সে ত চিরদিনই ক'র্‌বো,—এখন——"

মৃদু কলরবে ব্যোমকেশের কথা ঢাকিয়া গেল,—"শুনলি? এইবার সত্যি কথা বেরিয়ে পড়েছে। তা'ত ক'রবেই; তবে তখন ত আমরা দে'খ্‌তে যাব্‌ না, এখন আমাদের সম্মুখে একবার কোলে কর।" এই বলিয়া লীলাবতী ছুটিয়া নিরুপমাকে আনিতে গেল।

ব্যোমকেশ এইবার সম্মুখে ব্রহ্মাস্ত্র দেখিয়া বুঝিল, আর রণজয়ের আশা নাই, সম্মুখযুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়াই উচিত।

এমন সময় বহির্ব্বাটী হইতে গ্রামের একটী

যুবক উচ্চকণ্ঠে ব্যোমকেশের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে শুনিতে পাইয়া, ব্যোমকেশ, ব্যস্তভাবে সেই মহিলাগণের নিকট বিদায় লইয়া, দ্রুতপদে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বিবিধ সমালোচনার পর সে নারী-সভাও ভঙ্গ হইল।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বর্ষ-বিরহ।

(১)

কার্ত্তিক-সমাগমে, তমাল কেনলো কাঁদে?
কার লাগি, কে আছে উহারি?
নিশিশেষে, তরুতলে, নেহার নেহার সখি,
ঝরঝরে ঝরে আঁখি-বারি।

(২)

কালার বিহনে সই, ঝরিছে সবার আঁখি,
মোর আঁখি কেন-না ঝরিবে?
পরাণ গলিয়া সই, আঁখি পথে বাহিরায়,
এততেও শ্যাম না আসিবে?

(৩)

কত আর কাঁদি কাঁদি, নিরখিব আশাপথ?
কত দিন জপিব সে নাম?
সে নাম জপিলে সই, দ্বিগুণ পরাণ জ্বলে,
শ্যাম সনে বিধি মোরে বাম॥

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রসোচ্ছ্বাস।

রে সখি! কি কহসি মোহে নিদান!
কহইতে বাত, মরম-দুখ বাঢ়ত,
সংশয় ভেল পরাণ।
তেজলু গুরুকুল, আকুল না গণইনু,
করল ছঁ তাকর সঙ্গ;
বিহি মোহে দারুণ, ভেল অবসজন,
ছুঁহুকুল পুরল কলঙ্ক।
হাম অবলা মতি, বাম গোকুলপুরী,
না গণনু পরিণাম এহ?
কানু নিঠুর মোহে, এবে যদি ভৈ গেল,
কৈছনে বাঁধব থেহ?
আপন করম, দোষে দুখ পায়নু,
কছুক করব অনুযোগ;
কালী ব্রজ কহ, ত্বরিতে মিলায়ব,
তেজহ অন্তর-ক্ষোভ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কন্যাভার ও সমাজ সংস্কার।

(২)

'বঙ্গবাসী' আরও বলিয়াছেন,—"তাঁহার (রসিক বাবুর) হয়ত ধারণা, বিবাহ-ব্যয় ভিন্ন দেশে আর অত্যাচার নাই।" এ সামাজিক পীড়নের ন্যায় আর পীড়ন নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রাজা যে সব পীড়ন একটু ইচ্ছা করিলেই নিবারণ করিতে পারেন, তৎসমুদায়ের প্রতিকার হইয়াছে কি?" রসিক বাবুর ধারণা যাহাই হউক, দেশে এইরূপ সমাজিক পীড়নের ন্যায় পীড়ন আছে, সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া ত আমরা বুঝিতে অক্ষম। পীড়নের গুরুত্ব লঘু বোধ সকলের মস্তিষ্কে সমভাবে প্রবেশ করায়; এ পীড়ন যদি অপেক্ষাকৃত লঘু বোধ হয়, তবে তাহার নিবারণপ্রার্থী নিজপক্ষ হইবার জন্য বলিতে পারেন যে, এই সামান্য ব্যাপারই যখন আমাদিগের সমাজের সাধারণ, তখন গুরুতর কাণ্ডের কথা ত উত্থাপন করাই বাতুলতা। পক্ষান্তরে, যদি ইহাই গুরুতর বলিয়া বোধ হয়, তবে, তর্কের খাতিরে, বলাইতে পারে যে, এইরূপ বিষম সমস্যার সমাধান রাজদ্বারে উপনীত হওয়া আবশ্যক, অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বিষয় অল্প চেষ্টাতেই মীমাংসার হইতে পারিবে। ফলতঃ, পীড়ন পীড়ন—তাহার আবার অগ্রপশ্চাৎ কি? আপনি যে বিষয়ের প্রতিকারে সচেষ্ট হইন, আমি সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি; আপনার চেষ্টায় যদি সহানুভূতি প্রকাশ করি; আমার কার্য্যে আপনি সহায় হউন;—এইরূপ পরস্পর পরস্পরের আনুকূল্যে ও শক্তিবিনিময়ে দেশের দুঃখ দূর করাই ত প্রকৃত স্বদেশহিতৈষীর কার্য্য, নতুবা আপন সঙ্কীর্ণ মতের সীমামধ্যে বদ্ধ থাকিয়া অন্যের চেষ্টা প্রতিরোধ করা মহৎ হৃদয়ের পরিচয় নহে। অবশ্য সমাজবিরুদ্ধ চেষ্টার প্রশ্রয় দিবার কথা বলিতেছি না; সমাজনীতির অধীন থাকিয়া সুকৌশল অবলম্বনের কথাই কহিতেছি।

শুনিয়াছি, সরকার বাহাদুর 'কাদাপাড়া' জাতির বিবাহ-ব্যয়ের একটা 'রেট' বাঁধিয়া দিয়াছেন। সরকার কর্ত্তৃক সকল জাতির বিবাহ-ব্যয়ের তদ্রূপ একটা রেট বাঁধাই, বোধ করি, রসিকবাবুর অভিপ্রেত; আর তাহাই 'বঙ্গবাসী'র দৃষ্টিতে অহিন্দুর কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। রসিকবাবুর চেষ্টার বহু পূর্ব্বে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র 'ঝী'র দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে উপজিত এই রেট বাঁধার অভিপ্রায় সাধারণ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন; * কৈ, উক্ত গ্রন্থের সমালোচনায় অমৃত বাবুর ঝী'র কথা ত অহিন্দুয়ানীর লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয় নাই? সহবাস-সম্মতির আইন-প্রসঙ্গে স্মরণ হয়, তদানীন্তন মহামতি বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, মন্নীতি ও সদাচারবিরুদ্ধ কোনরূপ সমাজধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে সরকার বাহাদুরের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এই হৃশিক্ষা ও সভ্যতার দিনে পুত্রবিবাহরূপ ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন ও তদ্দ্বারা কন্যাভারগ্রস্ত সংসারের সহায়সাধন করা অপেক্ষা কুনীতি ও কদাচার আর কি হইতে পারে? অতএব, ইংরাজ রাজের নিকট ইহার প্রতিকার-বিধানের জন্য চেষ্টা নিতান্ত অযৌক্তিক বোধ হয় না। পরন্তু, সহবাস-সম্মতিসূত্রে প্রকারান্তরে আমাদিগের জাতীয় ধর্ম্মে যেরূপ আঘাত পড়িয়াছে, কন্যা-বিবাহের ব্যয়ভার-লাঘব-বিধি দ্বারা সেরূপ কোন আশঙ্কা দেখা যায় না;—হিন্দুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ায় শ্মশান-ঘাটের ব্যয়-নির্দ্ধারণ-করায় যখন ইংরাজ বাহাদুরের কার্য্যে আমরা কোন রূপ সমাজ বা ধর্ম্মগত প্রত্যবায় বোধ করিতে পারি নাই, তখন বিবাহ-ব্যয়-সূত্রে সমাজ-ধর্ম্মে আঘাত লাগিবার কথা আমরা উত্থাপন করিতেই পারি না। বরং সরকার বাহাদুর

* "পোড়া কোম্পানিতে এত কচ্চে, এর আর একটা কিছু কোত্তে পারে না; ঘাটে ঘাটে যেমন মড়া পোড়ানর রেট বেঁধে দিয়েছে, ছেলে মেয়ের বেরও তেমনি একটা কিছু ক'রে দেয়, তাহলে মুদ্দফরাস বরের বাপ গুলো জব্দ হয়।"

বিবাহ-বিভ্রাট। ১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।

কর্ত্তৃক বরের একটা মূল্য নির্দ্ধারিত হইলে, ইতর-ভদ্র, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত —সকল সংসারেরই নূনাধিক উপকার সাধিত হইবে, এবং সমগ্র বাঙ্গালার, অধিক কি ভারতের সকল স্থানের, কন্যাভারগ্রস্ত নিঃস্ব পিতামাতা তজ্জন্য সরকার বাহাদুরকে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিবেন। আপনাপন কন্যাকে চিরদিনের জন্য অন্য সংসারে পাঠাইবার সময়, সাধ্যমত সুসজ্জিত করিয়া দিতে, বা পুত্রোপম জামাতাকে যথাসাধ্য যৌতুক দান করিতে, কোন পিতামাতাই পশ্চাৎপদ হইবেন না; সুতরাং তৎপক্ষে বরপক্ষীয়ের তাড়না নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব, কন্যাকর্ত্তা অকাতরে যাহা যৌতুকস্বরূপ দিতে পারেন, বরকর্ত্তা তাহাই লইয়া যাহাতে সন্তুষ্ট হয়েন, অনর্থক বহুল অর্থের লোভ না করেন, তৎপক্ষে একটা বিধি ধার্য্য হইলে সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কা দেখা যায় না। আমাদিগের সমাজ-কলঙ্ক ভিন্ন সমাজভুক্ত সরকার-বাহাদুরের-গোচর করা নিতান্ত সহজের কথা, সন্দেহ নাই; 'বঙ্গবাসী' বা অপর কোন স্বদেশহিতৈষী সাধুপুরুষ স্বকীয় সামাজিক চেষ্টায় এই কুপ্রথা রোধ করিতে পারেন—পরম মঙ্গল, কিন্তু তদভাবে রসিক বাবুর কার্য্য ভিন্ন গত্যন্তর দেখা যায় না।

তবে রসিক বাবুর কার্য্যেও আমরা অবৈধ আচার দেখিতে পাই ও নিষ্ফলতা আশঙ্কা করি। বস্তুতঃ, 'বঙ্গবাসী' যেরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন, তিনি হিন্দুসমাজের নিকট নিষ্কলঙ্কাতিশয়-সহকারে এই প্রতিষ্কারেচ্ছা প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন কি? দুই একজন কে কোথায় কিভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তদ্ন্ত কথায় তাহারই নিষ্ফলতার উপর নির্ভর করিয়া একেবারে লাট-দরবারে এই কথা জ্ঞাপন করা বাস্তবিক হিন্দুর পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে বটে। মৌখিক ও আন্তরিক চেষ্টার তারতম্য বুঝাইয়া তিনি 'বঙ্গবাসী'র প্রতি বিদ্রূপ নিক্ষেপ ও নিজের স্কন্ধে বাহাদুরী আরোপ করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু আপনার স্বরের কুৎসা পরকে পরিজ্ঞাত করাই কি আন্তরিক চেষ্টার নিদর্শন? বড়-ছোট লাট-বিশাটের নিকট তিনি ইংরাজি ভাষায় ইংরাজি মন্ত্রে স্বদেশীয়ের কুলকলঙ্ক জ্ঞাপন করিতে পারিবেন, আর দেশের গণ্য, মান্য, স্বদেশহৎসল কৃতকর্ম্মা লোকদিগের সমীপে মুখের কথায় মাতৃভাষায় সেই বিষয় একবার জানাইতে পারিলেন না? ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায়, একদিকে দশ-পাঁচটাকা ব্যয় করিয়া দুই-এক খানা পত্র লেখার কার্য্য, অন্যদিকে দেশের প্রকৃত মঙ্গলার্থে স্বদেশীয়ের দ্বারে দ্বারে প্রার্থনা; একদিকে বিনা ব্যয়ে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নাম বিস্তার, অপরদিকে স্বার্থশূন্য হইয়া প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন; একদিকে কল্পনা-প্রসূত কলমুদ্দাবাজি, অপরদিকে হৃদয়-নিহিত পুরুষকার। প্রথমটাই আমাদিগের পক্ষে সংক্রামক, কৃতকার্য্যেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ, স্বদেশীয়ের হৃদে, সম্পূর্ণ চেষ্টা সত্ত্বেও, নির্য্যাতন সহ্য করার পর সরকার-সমীপে উপনীত হওয়া উচিত ছিল; নচেৎ, 'বঙ্গবাসী' চেষ্টা করেন নাই বলিয়া তাঁহারই শিরে সমস্ত দোষ অর্পণ পূর্ব্বক, ইংরাজরাজের নিকট দুইখানি পত্র সেখায় আন্তরিক চেষ্টার লক্ষণ দেখা যায় না। তবুও করি, বিদ্বেষশূন্য হইয়া রসিকবাবু স্থিরচিত্তে ইহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

আর এক কথা। রসিকবাবুর কার্য্যে হুজুরের আশাও অল্প। বড়লাট ও প্রাদেশিক লাট মহোদয়েরা তাঁহার পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার ভিন্ন অপর কি কার্য্য করিয়াছেন, বা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, আমরা অবগত নহি। যদি, সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক এপক্ষে কোন চেষ্টা না করার সম্ভব বোধ হয়। বাল্যবিবাহ-প্রথা রোধ করাই অসমাজনিষ্ঠ ইংরাজরাজের অন্যতম লক্ষ্য বোধ হয়; সহবাস-সম্মতির আইন দ্বারা সরকার বাহাদুর পরোক্ষভাবে সেই লক্ষ্যই সিদ্ধ করিয়াছেন।

বিবাহ-ব্যয়ের গুরুত্বেও প্রকারান্তরে সেই লক্ষ্যই সিদ্ধ হইতেছে; অর্থের অসচ্ছলতা-নিবন্ধন অভিভাবকগণ অগত্যা আপনাপন কন্যাকে অধিক বয়সে বিবাহ দিতে বাধ্য হইতেছেন,—সংস্কারতন্ত্রী সম্ভ্রান্তিসম্পন্ন ব্যক্তি-গণ যেমন স্বেচ্ছামত কন্যাকে বড় করিয়া যাইবেন, প্রাচীনমতাবলম্বী পিতা ব্যয়ের অসঙ্গতি-হেতু অনিচ্ছাতেও কন্যার বিবাহে বিলম্ব করিয়া বসেন—আজ-কাল ১১।১২ বৎসরের নিম্নে বালিকার বিবাহ প্রায়ই দেখা যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অশেষ নিগ্রহ সহ্য করিয়া, প্রজাসাধারণের অপ্রীতিভাজন হইয়া, নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন-পূর্ব্বক সরকার বাহাদুরকে যে উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইয়াছে, বিনা চেষ্টায়, হিন্দুর স্বীয় সামাজিক কুপ্রথায়, তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সমাকুলভাবে সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং, ঐ প্রথা রোধ করায় সরকারের প্রত্যবায় জন্মিতে পারে না। তারপর, প্রকৃতই যদি বাল্যবিবাহের প্রভাবে বিবাহ-ব্যয়ের একটা মাত্রা নির্দ্ধারিত হয়, কয়জন কন্যাকর্ত্তা তদ্দ্বারা উপকার লাভ করিবেন? নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে কন্যা-সম্প্রদানে কোন গতিকে কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে; বরকর্ত্তা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ের অধীন হইবেন, অতএব আপন অভিপ্রায়-সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি পুত্রের বিবাহ কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিতে পারিবেন; অগত্যা কন্যাকর্ত্তাকে আপন কার্য্যসিদ্ধির জন্য, আইনের বিপক্ষেও, বরকর্ত্তাকে গোপনে উৎকোচ দান করিতে হইবে।—আইন-বিগর্হিত এইরূপ কত কাজ সংসারে অবাধে চলিয়া আসিতেছে—উৎকোচের অভিযোগে বিচারপ্রার্থী কত লোক ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়াই তত্রত্য কর্ম্মচারীকে উৎকোচ দিতেছে—তাহার কি প্রতিবিধান হইয়াছে? আর উৎকোচ-লুব্ধ ঐরূপ বরকর্ত্তার বিরুদ্ধে রাজসরকারে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া কয়জন কন্যাকর্ত্তা বৈবাহিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে, কন্যার চিরকালের অশান্তির কারণ হইতে, প্রস্তুত হইবেন? অতএব, আইন বিধিবদ্ধ হইলেও, প্রকৃত উপকারের প্রত্যাশা বড় দেখা যায় না।

অতএব, দেখা যাইতেছে, 'বঙ্গবাসী'র বাক্যে বা রসিক বাবুর কার্য্যে সমাজের কোন উপকারই নাই—সমাজ 'যে তিমিরে সে তিমিরে!' প্রত্যুত, বুঝা যাইতেছে, সমাজ কর্ত্তৃক কোন সৎকার সাধিত হইলেই সমগ্র হিন্দুসন্তানের পক্ষে শুভকর,—সরকার বাহাদুরের হস্তক্ষেপ সমাজের পক্ষে অধিকতর কলঙ্ক এবং হিন্দু-জাতির জাতীয়ত্ব লোপের অন্যতম নিদর্শন। সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয়ের বিচার-প্রণালীতেও বুঝা গিয়াছে, "সমাজশাসনের জন্য সমাজপ্রতিষ্ঠা স্বচ্ছন্দে সমাজবিগর্হিত-কার্য্যে-লিপ্ত লোক-বিশেষের ধোপা, নাপিত, পূজারী, পুরোহিত বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।" এখন, পুত্রবিবাহব্যবসায়ী ব্যক্তির প্রতি সমাজ কর্ত্তৃক ঐরূপ কঠোর দণ্ড বিহিত হইলেই প্রস্তাবিত কুপ্রথা বিলুপ্ত হইতে পারে। কিন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমাজ সেরূপ দৃঢ় কৈ—সমাজের অধিনায়ককই বা কৈ? উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে, এই উদ্দেশ্যে একটি সমাজ গঠন করা প্রথম আবশ্যক। আজকাল বর্ণ-

নির্ব্বিশেষে প্রায় এই বৈবাহিক কুপ্রথা দেখা যাইতেছে; এজন্য সকল বর্ণের লোককেই এই সমাজের অঙ্গীভূত করা যুক্তিসঙ্গত। মহানগরী কলিকাতা সকল বর্ণের অগ্রণীগণের অধিষ্ঠানস্থল, সেখানেই প্রত্যেক বর্ণীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি লইয়া এক বা ততোধিক বৈঠক করা শ্রেয়ঃ। সেই বৈঠকে বিচারিত বরের মূল্য বাঙ্গালার সর্ব্বত্র নির্দ্ধারিত করিলেই চলিবে। কলিকাতাবাসী প্রত্যেক বর্ণের সম্ভ্রান্ত লোকের পল্লীগ্রামনিবাসী কুটুম্ব থাকা সম্ভব; নব-প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে কার্য্য না করিলে পরস্পর আদান-প্রদান বন্ধ করিলেই যথেষ্ট দণ্ড হইবে, এবং তাঁহারা অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব। আপনাপন অবস্থামত অযাচিত-ভাবে কন্যা বা জামাতাকে যথেচ্ছ যৌতুক দানে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না; কিন্তু প্রাচীন কৌলীন্যমর্য্যাদার মূল্যের ন্যায় বরের মূল্য ধনী নির্ধন-সকল ক্ষেত্রে সমান হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এই অকিঞ্চিৎকর ইঙ্গিত কাহারও মর্ম্মস্পর্শ করিবে কি? 'বঙ্গবাসী' বা রসিক বাবু ব্যক্তিগত বিতণ্ডায় বাক্ষেপ না করিয়া, গড়ের মাঠের বিরাট সভা আহ্বানের চেষ্টার ন্যায়, অনন্যকর্ম্মা হইয়া, ঐক্যপ সমাজগঠন ও সমিতিস্থাপনের চেষ্টা করুন. প্রত্যেক লোক আপনাপন কর্ত্তব্য-পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন, তার পর মীমাংসা করা যাইবে—রসিকবাবুর কার্য্য বা 'বঙ্গবাসী'র বিধানের মধ্যে কোন্‌টা অধিকতর সমীচীন।

অতএব করি, আমাদিগের উদ্গিরিত মন্তব্যে 'বঙ্গবাসী' আমাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া ভ্রম করিবেন না। হিন্দুসমাজের এক হীনপ্রাণী হইয়াই সমাজের কার্য্যে মর্ম্মাহত চিত্তে এই সমস্ত কথা বলিলাম। রসিক বাবুও যেন আমাদিগের প্রতি বিরূপ হইবেন না। এক সমাজের লোক বলিয়াই বন্ধুভাবে তাঁহার কার্য্যের দোষগুণ আলোচনা করিলাম। বিদ্বেষশূন্য হইয়া উভয়পক্ষে একই উদ্দেশে, একই উপায়ে, সমান যত্ন করিলেই আমাদিগের এই নগণ্য ক্ষুদ্র প্রয়ত্নের সার্থকতা বুঝিব।

শ্রীপ চক্রবর্ত্তি ঘোষ।

কেন তবে ডেকেছিলে?

যদি হে ফিরায়ে দিবে কেন তবে ডেকেছিলে?
কেন হে হৃদয় মম লুকাইয়ে রেখেছিলে?
মোহন মুরতি ধরে,
আসিয়ে নয়ন'পরে
কেন এ মানসপটে আপনারে এঁকেছিলে?
যদি হে ফিরায়ে দিবে কেন তবে ডেকেছিলে?
একা ছিনু গৃহ-কোণে
উদাসীন আনমনে,
কেন হে জাগায়ে তুলে এ আমারে দেখেছিলে?
কে জানিত ভালবাসা,
ছিল না ত কোন আশা,
কেন এসে হৃদি মোর প্রেমমদিরে ঢেকেছিলে?
যদি কেঁ ফিরা'য়ে দিবে কেন তবে ডেকেছিলে?
কেন হে আসিয়ে ভোরে,
মোহিতে সরল মোরে,
যুগল নয়নে প্রেম-হলাহল মেখেছিলে?
চুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি,
কাতরে করুণা যাচি,
আগে কে চিনিত তোমা,কোন্‌ভাবে কোথা ছিলে?
যদি হে ফিরায়ে দিবে, কেন তবে ডেকেছিলে?

শ্রীপ্রেমনাথ ঘোষাল।

"কাঁহা মৃণাল হামারি?"

(২)

হেমচন্দ্র :—মৃণালিনী কেমন আছে?

আবার গিরিজায়ার রঙ্গরসের ঢেউ উঠিল। মনের কাছে যে সকল কথা অনাবশ্যক, দেহের কাছে তাহা অত্যাবশ্যক, বহুমূল্য; কিন্তু অন্যে তাহা বুঝে না, অনাবশ্যক কথা গুলা কত রঙ্গ-তামাসা, কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কত আমোদ-রহস্য করে! গিরিজায়াও তাহাই বলিল, কহিল "দেখিলাম, শরীরে কোন পীড়া নাই।"

হে। সুখে আছে কি ক্লেশে আছে কি বুঝিলে?

গি। শরীরে গহনা, পরণে ভাল কাপড়—ব্রাহ্মণের কন্যার মই।

হে। তুমি অধঃপাতে যাও; মনের কথা কিছু বুঝিলে?

গি। বর্ষাকালের পদ্মের মত; মুখখানি যেন জলে ভাসিতেছে।"

গিরিজায়ার উপমা দিবার শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়; বর্ষার পদ্মজলে পরিপূর্ণ হইলেও দেখিতে বড় সুন্দর। রুবিগণ মধুমুখী চক্ষুবিশিষ্ট রমণীমুখে অধিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পান—গিরিজায়া বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি-হস্ত-প্রসূত; সুতরাং মৃণালিনীকে বর্ষার পদ্মমত সৌন্দর্য্যশালী না দেখিবে কেন? গিরিজায়ার চক্ষু কেবল বহির্দৃষ্টিপটু নহে, অন্তর্দৃষ্টিতেও বড় কম নহে। হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরগৃহে কি ভাবে আছে?

গি। এই অশোক ফুলের স্তবকের মত। আপনার গৌরবে আপনি নম্র।"

এই কথাতেই, এই একমাত্র উপমাতেই বোধ হয়, মৃণালিনীর সকল পাঠকই বুঝিয়াছেন, মৃণালিনী পরগৃহে কিভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। যাহার গৌরব থাকে, তাহার মস্তক উর্দ্ধে উঠে না—লোকে তুলে। অন্তঃসারবিশিষ্ট ঢেঁকীর শব্দ কেহ বড় শুনিতে পায় না—আমরা কাঠের ঢেঁকীই সাতপাড়া গোল করিয়া বেড়াই। উপমা শুনিয়া হেমচন্দ্রকে স্বীকার করিতে হইল—"তোমার ন্যায় বালিকা আর দেখি নাই।" হেমচন্দ্র কেন, বোধ হয় সকলেই এ কথা স্বীকার করিবেন।

গিরিজায়া যাহা দেখিয়াছে, সে কথা সমাপ্ত হইল। হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"মৃণালিনী আর কি বলিল?"

অগ্রে চক্ষু উৎপরে কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে হয়। গিরিজায়ার চক্ষে মৃণালিনীকে দেখিয়া হেমচন্দ্র শুনিতে চাহিলেন, মৃণালিনী কি বলিলেন? গিরিজায়া আবার কথার উপক্রম করিল; কিন্তু গর্ব্ব হইতে বাহির হইবামাত্র মুষিককে যেমন বিড়ালে আক্রমণ করে, হেমচন্দ্র তেমনই গিরিজায়ার 'কেশাকর্ষণ' করিয়া উপমার বেগ রোধ করিলেন। হেমচন্দ্রকে রামচন্দ্র ও মৃণালিনীকে সীতার স্থানীয় করিয়া যেমন স্বয়ম্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে যাইতেছিল, যেমন গিরিজায়া গাহিল.—

"যো দিন জানকী—রঘুবীর নিরখি—"

অমনই হেমচন্দ্র তাহার কেশাকর্ষণ করিলেন।

"গি। ছাড়! ছাড়! বলি! বলি!

"যখন গিরিজায়া আদ্যোপান্ত মৃণালিনীর সহিত কথোপকথন বিবৃত করিল। পরে কহিল, মহাশয় আপনি যদি মৃণালিনীকে দেখিতে চান, তবে আমার সঙ্গে একপ্রহর রাত্রে যাত্রা করিবেন।

"হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নিঃশব্দে অশোকতলে পদচারণ করিতে লাগিলেন।"- এক্ষণে সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য কি না, হেমচন্দ্র তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য জ্ঞানে মহাবিবাদ বাধিয়া গেল। একদিকে কর্ত্তব্য মাধবাচার্য্যের মূর্ত্তি ধরিয়া বজ্রগম্ভীর শব্দে বলিতেছে 'না, কদাপি সাক্ষাৎ করা হইবে না'। অন্যদিকে অকর্ত্তব্য প্রণয়ের কোমল-মধুর গিরিজায়ার মূর্ত্তিতে বলিতেছে 'আমার সঙ্গে এক প্রহর রাত্রে যাত্রা করিবেন'। উভয় শঙ্কটে হেমচন্দ্র এক্ষণে কাহার কথা শুনেন? হয় হৃদয়-বেগ, না হয় গুরু-আজ্ঞা, একটা না একটা উল্লেঙ্ঘন করিতেই হইবে। একদিকে গুরু-আজ্ঞা অর্থাৎ যবন-জয় এবং পিতৃরাজ্যোদ্ধার, অপরদিকে প্রণয়ের দুর্দমনীয় বেগ রাখিয়া, হেমচন্দ্র তুলাদণ্ডবৎ রহিলেন; কিন্তু গুরুতে কোন দিকই কম নহে। উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিল, সহজে হেমচন্দ্র কোন মীমাংসা করিতে পারিলেন না। তিলোত্তমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিমলা জগৎসিংহকে দুর্গমধ্যে আহ্বান করিলে জগৎসিংহ যে প্রতিবন্ধক দেখিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক প্রতিবন্ধক দেখিলেন। অবশেষে হেমচন্দ্র ভগ্ন-নিষিদ্ধ বৃক্ষফল খাইতে বিরত হইলেন—কর্ত্তব্যের জয় হইল, প্রলোভন পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-কবির সকল কাব্যেই কঠোর কর্ত্তব্যের জয়, কোমল প্রলোভনের পরাজয়। কর্ত্তব্যের অনুরোধে রামের বনবাস, হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় করিয়া চণ্ডালের দাসত্ব, পাণ্ডবের নির্ব্বাসন, নলের মারধা। কর্ত্তব্যের অনুরোধে হেমচন্দ্র "বহুক্ষণ পরে কিছুমাত্র না বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে এক খানি পত্র আনিয়া গিরিজায়ার হস্তে দিলেন এবং কহিলেন—মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাতে আমার এক্ষণে অধিকার নাই, তুমি রাত্রে কথামত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং এই পত্র দিবে। কহিবে, দেবতা প্রসন্ন হইলে অবশ্য শীঘ্র বৎসরেক মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে। মৃণালিনী কি বলেন, আজ রাত্রেই আমাকে বলিয়া যাইও।"

মৃণালিনী কি বলেন, তাহা আর হেমচন্দ্রকে শুনিতে হইল না। হেমচন্দ্র হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া পৃথিবীর দিকে মুখ রাখিয়া তৃণশয্যায় সেই আকাশতলে শয়ান থাকিয়া যখন গাঢ় চিন্তায় মগ্ন, মাধবাচার্য্য সেই সময়ে পশ্চাৎ হইতে পৃষ্ঠস্পর্শ করিলেন। হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—মাধবাচার্য্য। সুযোগ পাইয়াও মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ না করাতে হেমচন্দ্র যে মাধবাচার্য্যের আদেশ পালন করিলেন, সেই মাধবাচার্য্য সম্মুখে। প্রথমে অধঃ হেমচন্দ্র ভীত হইলেন, কেন না কর্ত্তব্যকে প্রথমে উপেক্ষা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; তৎপরে তাঁহার চিত্তপ্রসাদ জন্মিল। কিন্তু মাধবাচার্য্য "কামচর না অন্তর্য্যামী?" হেমচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কোন কথা কহিতে পারিলেন না। মাধবাচার্য্য কহিলেন "বৎস! গাত্রোত্থান কর। আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি—সন্তুষ্টও হইয়াছি। তুমি আমাকে দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় চাহিয়া রহিয়াছ কেন?

হে! আপনি এখানে কোথা হইতে আসিলেন মাধবাচার্য্য কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন—'তুমি এ পর্য্যন্ত নবদ্বীপে না গিয়া পথে বিলম্ব করিতেছ—ইহাতে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি। আর তুমি যে মৃণালিনীর সন্ধান পাইয়াও আত্মগত্য প্রতিপালনের জন্য তাহার সাক্ষাতের সুযোগ উপেক্ষা করিলে, এজন্য তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে কোন তিরস্কার করিব না। কিন্তু এখানে তোমার আর বিলম্ব করা হইবে না। মৃণালিনীর প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করা হইবে না। দেবতার হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। আমি আজি নবদ্বীপে যাত্রা করিব। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে—নৌকা প্রস্তুত আছে। অস্ত্রশস্ত্রাদি গৃহমধ্য হইতে পাইয়া আইস। আমার সঙ্গে চল।'

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—হানি নাই—আমি আশা-ভরসা বিসর্জ্জন করিয়াছি। চলুন। কিন্তু—আপনি কামচর না অন্তর্য্যামী?"

তৎক্ষণাৎ মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। মৃণালিনী তাঁহার পত্র পাইয়া কি বলেন, তাহা আর হেমচন্দ্রের শুনা হইল না। ব্যাঘ্র যেমন শীকার ধরিয়া লইয়া যায়, মাধবাচার্য্য তেমনই হেমচন্দ্রকে লইয়া নবদ্বীপ-যাত্রা করিলেন।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

চন্দ্রদ্বীপ।

(২)

"চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে একজন প্রসিদ্ধ যোগী, কতিপয় শিষ্যসমভিব্যাহারে, তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। শিষ্যগণ মধ্যে রামনাথ দনুজমর্দ্দন দে নামক, চন্দ্রশেখরের একজন প্রিয়শিষ্য ছিলেন। একদা, সুরমা নদীর উপর, সকলেই রাত্রিযোগে নৌকার মধ্যে সুষুপ্ত আছেন; এমন সময় যোগী-পুরুষ স্বপ্নে দেখিলেন যে, জগদম্বা কালিকা আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন,—যেস্থানে যোগীর নৌকা রহিয়াছে, তাহার নিকটে তিনটি পাষাণময়ী দেবমূর্ত্তি জলমগ্নাবস্থায় আছে। পরে, তাঁহার প্রিয়শিষ্য দনুজমর্দ্দন কর্ত্তৃক ঐ মূর্ত্তিত্রয় উদ্ধৃত হইলে অতি শীঘ্র এই বিশাল নদী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পরিণত হইবে। স্বপ্নান্তে চন্দ্রশেখর জাগ্রৎ হইলেন। অবশিষ্ট রাত্রি আর নিদ্রা গেলেন না। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র, প্রিয়-শিষ্য দনুজমর্দ্দনকে, গোপনে কালিকার স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। দনুজমর্দ্দন গুরুর আদেশানুসারে স্বপ্নকথিত স্থানে ডুব দিলেন। প্রথমবার কাত্যায়নীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি উঠাইলেন। গুরুদেব পুনর্ব্বার ডুব দিতে আদেশ করিলেন। দনুজমর্দ্দন গোপালের মূর্ত্তি উঠাইলেন।

গুরু আবার ডুব দিতে বলিলেন। কিন্তু দনুজমর্দ্দন আর ডুব দিতে সাহসী হইলেন না। তৃতীয়বার ডুব দিলে, লক্ষ্মীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি পাওয়া যাইত।

কাত্যায়নীর এবং মদনগোপালের পাষাণ-

চন্দ্রশেখর বলিলেন,—"ভগবতী কালিকার প্রসাদে অতি সত্বরই এই বিশাল জলরাশি সর্ব্বশস্যময়ী পৃথিবীতে পরিণত হইবে, এবং ভবানীর আদেশক্রমে তোমাকে এই জন পদের রাজা হইতে হইবে। তৃতীয়বার ডুব না দিয়া অতিশয় অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য করিয়াছ।" †

এই দনুজমর্দ্দন দে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের স্থাপয়িতা। ইনি গুরুর নামানুসারে নূতন রাজ্যের নামকরণ করেন। তাই এইস্থান চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত। কেহ কেহ বা 'বাকুলা চন্দ্রদ্বীপ' বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে চন্দ্রদ্বীপ হইতে "বাকুলা" নামক একটী স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র পরগণা বাহির হইয়াছে।

দনুজমর্দ্দন রাজোপাধি ধারণ করিয়া কচুয়া * নামক স্থানে প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। দনুজ মর্দ্দনের প্রপৌত্র কৃষ্ণবল্লভের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্না কমলা নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর এই কমলা স্বামীর সহিত রাজ্য-শাসন করিতে থাকেন। এই কমলা অনেকগুলি সৎকার্য্য করিয়াছিলেন;—অতিথিশালা, পান্থ-নিবাস প্রভৃতি ছাড়াও, তিনি একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি স্থানীয় অধিবাসিগণ সেই দীর্ঘিকাকে রাণী কমলার দীঘি" বলিয়া থাকে। এই দীর্ঘিকা খনন-সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। রাণীকমলার মৃত্যুর পর, পরমানন্দ বসু রায় রাজ্যাভিষিক্ত হন। বিদ্যারিজ সাহেবের ইতিহাসে প্রকাশ যে, এই পরমানন্দ রায়, রাজা কৃষ্ণবল্লভের অন্যতম দৌহিত্র-সন্তান। কিন্তু মাধবপাশার রাজবাড়ীর,বংশ-তালিকায় প্রকাশ যে,পরমানন্দ রায় রাণী কমলার পুত্র। রাজা পরমানন্দ রায়ের পৌত্র কন্দর্প-নারায়ণ, কচুয়া হইতে রাজধানী উঠাইয়া, মাধবপাশাগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন যে, নদী অত্যন্ত প্রবল হইয়া রাজধানী আক্রমণ করায়, রাজা তথা হইতে অন্যস্থানে রাজধানী স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় হইতে ক্রমাগত রামচন্দ্র, কীর্ত্তিনারায়ণ, বাসুদেব, প্রতাপনারা-য়ণ ও প্রেমনারায়ণ রাজত্ব করেন। প্রেম-নারায়ণের কোন পুত্রসন্তান ছিল না; সুতরাং তাঁহার জামাতা রাজা গৌরিচরণ মিত্র, রাজ্য-ভার প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা উদয়নারায়ণ রাজ্য-ভার প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মেসী মজুমদার এবং সরফউদ্দিন মজুমদার নামক দুইজন মুসলমান কর্ত্তৃক তিনি রাজচ্যুত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত নীচাশয়দ্বয়, তাঁহাদের পরমাসুন্দরী ভগ্নীকে নবাবের সহিত পরিণীতা করিয়া, পুরস্কার-স্বরূপ চন্দ্রদ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া-ছিল। রাজা উদয়নারায়ণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নবাব-সদনে রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় আবেদন করিলে, নবাব বলিলেন,—"তুমি যদি একটী ব্যাঘ্রকে একাকী দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করিতে পার, তাহা-হলে তোমাকে তোমার রাজ্য প্রত্যর্পণ করা যাইবে।

রাজা স্বীকৃত হইলেন। উদয়নারায়ণ বাল্যকাল হইতে শিক্ষিত যোদ্ধা এবং নিজেও যথেষ্ট বলবান পুরুষ ছিলেন। নিরূপিত সময়ে রঙ্গভূমিতে অসিচর্ম্ম লইয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইলেন। এই লোমহর্ষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য, চতুর্দ্দিকে দর্শক-গণ নির্ব্বাক নিশ্চেষ্ট অবস্থায় দণ্ডায়মান হইল। নবাব ও তাঁহার নব প্রেয়সীর প্রতি রঙ্গভূমির পার্শ্বস্থ মঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া যুদ্ধদর্শন করিতেছিলেন। নারায়ণ আশ্চর্য্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ব্যাঘ্রের মস্তক দ্বিখণ্ড করিলেন; চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। তখন তিনি সেই রক্তবেশে নবাবের মঞ্চের নিম্নভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিকট পুরস্কার-প্রার্থনা করিলেন। প্রেম, রাজা উদয়নারায়ণের ক্ষমতা দেখিয়া, ঈর্ষ্যাকলের সহিত বিরক্ত হইয়াছিলেন; তিনি সেই মঞ্চ হইতে রাজা উদয়নারায়ণের প্রতি কটাক্ষগুলি কলার বাকুলা নিক্ষেপ করিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ, তৎক্ষণাৎ বেগমপ্রদত্ত মহামূল্য পাগড়ীসাদরে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—"আমার আশানুরূপ পুরস্কার লাভ হইয়াছে; আমার প্রার্থনানুযায়ী বাকুলা প্রাপ্ত হইলাম।".

উদয়নারায়ণ হইতে ক্রমাগত শিবনারায়ণ, পক্ষীনারায়ণ, জয়নারায়ণ, নরসিংহনারায়ণ, রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা জয়নারায়ণ রায়ের রাজত্ব-সময়ে (১৭৯৯খৃষ্টাব্দে) বাকী রাজস্ব জন্য সমস্ত চন্দ্রদ্বীপ পরগণা নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়। সেই সময় হইতে মাধবপাশার রাজ-বংশের অতিশয় শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত বীরসিংহনারায়ণ রায় অতিশয় ধার্ম্মিক ও সাধুব্যক্তি। রাজধানীর চতুঃ-পার্শ্বস্থ লাখারেজ (খানাবাড়ী) জমির সামান্য আয়দ্বারা এখন এই রাজবংশের গ্রাসাচ্ছাদন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ছোটলাট বাহাদুর সার চার্লস্ ইলিয়ট্ মহোদয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজা বীরসিংহের পুত্রকে পাঁতারহাটের সব্-রেজেষ্ট্রর নিযুক্ত করিয়া নিরুপায় রাজপরিবারের জীবন-রক্ষার কতক উপায় করিয়া দিয়াছেন।

রাজবাড়ীর বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাসমূহ এক্ষণে জীর্ণ, সংস্কারাভাবে, অনেকগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছে। বিপন্ন রাজপরিবার অতিকষ্টে দুই-একটি কোঠা মেরামত করিয়া, তথায় বাস করিতেছেন। প্রাচীন রাজগণের কীর্ত্তিমধ্যে বর্ত্তমান সময় কতকগুলি বৃহৎ জলাশয় দেখিতে পাই। তন্মধ্যে "দুর্গাসায়র" অথবা "দুর্গাসাগর" সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

শ্রীরোহিণীকুমার রায় চৌধুরী।

নির্ম্মিত মূর্ত্তি মাধবপাশার রাজবাড়িতে এখনও বর্ত্তমান আছে।

† District of Backerganj By H. Beveridge B. C. S. page 73.

* পটুয়াখালি সব্ ডিবিসনের মধ্যে, বাউ-ফলখানার অন্তর্গত তেতুলীয়া নামক নদীর পশ্চিম পারে কচুয়া গ্রাম। আজিও অনেক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকে ইহাকেই রাজবাড়ী বলে। সেই রাজ-বাড়ীর অনেক অংশ নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

সভামত।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্।

বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি কল্পে যে কোন অনুষ্ঠান, আমরা অন্তরের সহিত তাহার শুভ-কামনা করি; এবং বাঙ্গালী মাত্রেরই তাহাতে সহানুভূতি দেখান কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করি। "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্"—বঙ্গসাহিত্যের সেবা-রূপ সেই শুভসঙ্কল্প লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং উহা আমাদের বড় আদরের সামগ্রী, এবং আমরা একান্তমনে উহার প্রতিষ্ঠা কামনা করিতেছি।

'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের' উদ্দেশ্য অতি উচ্চ—সাহিত্যসেবী সুধীরনের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গভাষার উন্নতি-সাধন। বঙ্গসাহিত্যের অনেকগুলি খ্যাতনামা গ্রন্থকার ও সাহিত্যানু-রাগী উদ্যমশীল ব্যক্তি এই "সাহিত্য-পরিষদে" যোগদান করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সাহিত্য-সেবকগণ এই 'সাহিত্য-পরিষদের" পরিষদ-রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন,এবং মহারাজ-কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর নিঃস্বার্থভাবে এই পরিষদের পৃষ্ঠপোষণে মনোযান আছেন। 'নিঃ-স্বার্থভাবে' বলার তাৎপর্য্য এই যে, এ আন্দো-লনে তিনি নিজের নামটী পর্য্যন্ত সাধারণ্যে প্রকাশ করেন নাই; অথচ, তিনিই এ পরিষ-দের জীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্" হইতে "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা" নামক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে। পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত ঐ পত্রের সম্পাদক। উহার প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছে। পত্রিকা-সম্বন্ধে আমাদের দুই-একটী বক্তব্য থাকিলেও, আমরা এ পত্রিকার উন্নতি কামনা করি।

সাহিত্য-সমালোচনী সভা।

"সাহিত্য-পরিষদের" প্রসঙ্গে "জয়দেবপুর সাহিত্য-সমালোচনী" সভারও উল্লেখ অবশ্য কর্ত্তব্য। "সাহিত্য-সমালোচনী সভার" উদ্দেশ্য—এই 'সাহিত্য-পরিষদের' ন্যায় মহৎ। আজ প্রায় ১০।১৫ বৎসর হইতে তাঁহারা এক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ভাগ্য-লাদিপতি বদান্যবর রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর ঐ সভার পৃষ্ঠপোষক; এবং বঙ্গের প্রখ্যাতনামা গ্রন্থকার, অধিতীয় প্রতিভা-শালী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ইহার সম্পাদক।

"সাহিত্য-সমালোচনী সভা" এপর্য্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি কামনায় যথেষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহারা নানাপ্রকারে বিবিধ সদ্‌গ্রন্থ প্রচারের সহায়তা করিতেছেন; কোন গ্রন্থকারকে গ্রন্থপ্রণয়নে অর্থসাহায্য করিতে-ছেন, কাহারও গ্রন্থ ক্রয় করিয়া লইয়া পণ্ডিত-দিগের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন; এতদ্ভিন্ন সকল প্রকারের বাঙ্গালা-পুস্তক অন্ততঃ দুখানা করিয়াও ক্রয় করিয়া থাকেন। আমরা আজ বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, বাঙ্গালাভাষার সংস্কার ও পরিপুষ্টি জন্য তাঁহারা বিধিমতে চেষ্টিত।

"'সাহিত্য-পরিষদ' ও "সাহিত্য সম-

গানী—একই পথে একই উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ দেখিয়া কায়মনোবাক্যে এই দুই সভার কৃতিত্ব কামনা করি।

মিনার্ভা থিয়েটার।

"পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" মিনার্ভা-রঙ্গমঞ্চে পুনরভিনয় হইতেছে। অভিনয় অতি সুন্দর হইতেছে। অধিকন্তু মিনার্ভা-রঙ্গমঞ্চের বন্দোবস্ত ও সুশৃঙ্খলায় দৈশকমাত্রেই পরিতুষ্ট হইতেছেন। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেখা যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আর ও আমীর।—রুস-রাজ জারের পীড়া কি; কাবুলের আমীর কথঞ্চিৎ সুস্থ।

***

নিষ্কৃতি।—আপিলের বিচারে, গত ২৯এ অক্টোবর, পুনার দাঙ্গায় অভিযুক্ত নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। বিচারপতি বলিয়াছেন, এই উপলক্ষে, পুলিশকে অবিশ্বাসী ও অন্যান্য রাজকারী প্রভৃতি বলিতেও ত্রুটি করেন নাই।

***

চীনের যুদ্ধ।—২৬এ অক্টোবরের সংবাদ, জাপানিদিগের আক্রমণে চীনদিগকে কুইরিন দুর্গ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, এবং জাপানীরা সেই কামান ও বিস্তর যুদ্ধদ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। ২৯এ অক্টোবরের সংবাদ, চীনগণ পরিত্যক্ত অবস্থায় জালু-দুর্গ পরিত্যাগ করি-য়াছে। ৩০এ তারিখের সংবাদ, প্রায় ৭০ হাজার চীন-সৈন্য, বিংটু, পোর্ট আর্থার ও তৎসন্নিহিত স্থানে আবার দলবদ্ধ হইয়াছে; শীঘ্রই নূতন যুদ্ধের সম্ভাবনা।

***

শস্য ও জলবায়ু।—বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলার শস্য ও জলবায়ু বিষয়ক একটী বিব-রণী সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হই-য়াছে। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার ৪৫টি জেলার বিবরণ তাহাতে প্রকটিত হইয়াছে; এবং তৎপাঠে প্রায় অধিকাংশ জেলারই জলবায়ু ও শস্যের অবস্থা শুভজনক বলিয়া জানা যায়। সকল জেলাতেই শস্যের অবস্থা উত্তম; দুই এক স্থান ব্যতীত, স্বাস্থ্যের অবস্থাও মঙ্গলজনক। বলা বাহুল্য, কোন স্থানের কোন দুর্ভিক্ষাদির সংবাদ বা কোন স্থানের কোন অস্বাস্থ্যের সংবাদ উহাতে স্থান পায় নাই। কথায় বলে, "খোস, খবরের ঝুটাও ভাল।" এ বিষয়ে আমাদের প্রবোধ ঐ পর্য্যন্তই। প্রজার দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষের কথা যত অপ্রকাশ থাকে, রাজ্য ততই সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ বা রাজা ততই ন্যায়-পরায়ণ—বুঝিতে হয়; জানি না, কেবল লোককে এই বুঝাইবার জন্যই, গভর্ণমেণ্টের এই 'বাঁধি-গদের' বিজ্ঞপ্তি প্রচার কি না? নহিলে, আমরাই বা কেন দেশের অভাব-অভি-যোগের এত সংবাদ পাইয়া থাকি, আর রাজ-কীয় বিবরণীই বা এত মঙ্গলজনক সংবাদ বহন করে কেন?

***

ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ।—এই এক ফরিদ-

পুরের দুর্ভিক্ষের কথাতেই সকল অভিযোগের আরোপ করা যায়। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া, প্রজার ঘরে ঘরে ফিরিয়া, সুহৃদ-সভার প্রতিনিধিবর্গ যাহা নিত্যপ্রত্যক্ষ করিতেছেন, কমিসনার বাহাদুর দুই-এক দিনের যান যাত্রায় অমনি বলিলেন—তাহার সর্ব্বৈব মিথ্যা। প্রমাণ কি?—না, জনৈক পাদরী-পুত্রর তাঁহার কথার কিঞ্চিৎ পরিপোষক! হইতে পারে—সুহৃদ্ সভার বিবরণী রঞ্জিত: মানিলাম—সুহৃদসভার বিবরণীর অপেক্ষা অল্পসংখ্যক দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোককে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া কি একেবারে দুর্ভিক্ষ উড়িয়া গেল? অনেকে মরিতেছে না বলিয়া কি, অল্পসংখ্যক যাহারা মরিতেছে—তাহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা হইবে না? শুনিয়াছি, ঢাকা-বিভাগের কমিশনার টউড সাহেব বড় ধর্ম্মজ্ঞানী; প্রজার অহিতকর কোন কার্য্য তাঁহার দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে, অভাগাদের অদৃষ্ট-দোষে বা রাজকীয় কোন গূঢ়নীতির সার্থকতা সম্পাদন-জন্য —কিজন্য এরূপ হইল, তাহা কে বলিতে পারে? যাহাই হউক, এরূপ সকল জীবন-সঙ্কটে রাজার পুনরুদ্ধারণ প্রার্থনা করি; এবং তাহাতে লোকের সংশয়ও দূরীভূত হউক।

***

শোক সংবাদ।—(১)গত বিজয়া দশমীর দিন, বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ৬৪ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। "বাঙ্গালাভাষার ইতিহাস," "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রভৃতি বিবিধ পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। হুগলি-জেলার ইলেছোবামগুলাই তাঁহার জন্মস্থান; বহুদিন যাবৎ হুগলী-নর্ম্মাল স্কুলের তিনি অধ্যাপক ছিলেন, এবং সেই সূত্রে 'এডুকেশন গেজেটের' সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘটে। (২) সুপ্রসিদ্ধ "গোবিন্দসামন্ত" প্রভৃতি ইংরাজী-পুস্তক-প্রণেতা রেভারেণ্ড লালবিহারী দে গত সোমবার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ ইংরাজী-লেখক অল্পই দৃষ্ট হয়। শেষ-বয়সে অন্ধ হইয়াও, তিনি সাহিত্যালোচনায় বিরত হন নাই। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয়দ্বয়ের বিয়োগে বঙ্গদেশ বাস্তবিকই দুইটী রত্নহারা হইল।

***

রাজবংশের অসম্মান।—রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ নাটোর-রাজবংশের সম্মানিত পুরুষ। ইতিপূর্ব্বে কোন এক প্রজা-পীড়ন-অভিযোগে মকর্দ্দমায় তিনি সেসান-সোপর্দ্দ হন; এবং তাহাতে জামিনে খালাস থাকেন; এই জামিনী-অবস্থায় কোন কার্য্য-উপলক্ষে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; এবং এই সূত্র পাইয়া, রাজসাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাইস সাহেব, সরাসরি তাঁহার নামে আবার এক ওয়ারেণ্ট হুকুম দিয়া বসেন। রাজা বাহাদুর কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বাস করিতেছিলেন; এবং কলিকাতা হইতে গোয়েন্দা পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। অবশেষে, জজের নিকট প্রার্থনায়, তিনি অবশ্য জামিনেই খালাস পাইয়াছেন। কিন্তু আমরা এরূপ ওয়ারেণ্টের হুকুম শুনিয়াছি; এরূপ একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষকে যদি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় হউক এরূপ অন্যায়রূপে ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করিয়া লওয়া হয়, তবে আর দেশের দুর্দ্দশার বাকি রহিল কি? রাজবংশের সম্মান—রাজকীয় উপাধির গৌরব—সকলেরই কি পরিসমাপ্তি এইরূপে?

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৩৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

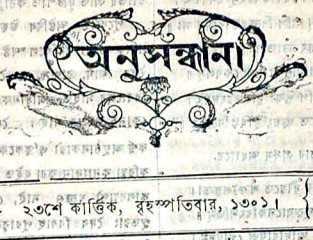

ষষ্ঠম বর্ষ। ২৩শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। ষড় বিংশ সংখ্যা।

প্রচ্ছা।*

দ্বিতীয় প্রশ্ন—অধুনাতন বঙ্গীয় সমাজে প্রচলিত বিবাহপদ্ধতি সম্বাদি মন্বর্থাবোধক বহুবিধ উদ্বাহ-প্রণালীর কোন একটির মধ্যে পরিগণিত হইবে, অথবা তাহাকে মিশ্র বলিতে হইবে, ইহাই এই প্রবন্ধে জিজ্ঞাস্য। জন সাধারণের সুবিধার্থে শাস্ত্রোক্ত বৈবাহিক বিধি, বিধেয়, ও পরিভাষা এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে,

"ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥
যড়ানুপূর্ব্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।
ষ্টি শূদ্রস্যোক্ত তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্ম্যানরাক্ষস্যান্॥
চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্যান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈক্যমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥
আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্মকুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥
একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যা প্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥
'সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি' বাচানুভাষ্য চ।
কন্যা প্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ।
জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাংহপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥
ইচ্ছয়ান্যোন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥
হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥"

মানব নবমুধ্যায়ে,

"ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্কমণু পি।
গৃহ্ণন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥
সাধনানি তু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।

* ইহার প্রথম প্রশ্ন সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক।

নাম্নীমান্নি নমঃ শব্দাদ্ধ্যাপ্তিরিতি ব্যাখ্যাতম্। [illegible]

আর্ষে গোমিথুনং শুল্কং কেচিদাহুর্মৃষৈবতৎ।
অল্পোহপ্যেবং মহান্ বাপি বিক্রয়স্তাবদেব সঃ॥
যাসাং নাদদতে শুল্কং জ্ঞাতয়ো ন সবিক্রয়ঃ।
অহ্বং তৎ কুমারীনামানৃশংস্যঞ্চ কেবলম্॥
আদদীত ন শুল্কোঽপি শুল্কং দুহিতরং দদৎ।
শুল্কং হি গৃহ্নন্ কুরুতে ছদ্মনং দুহিতৃবিক্রয়ম্॥"

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে,

"ব্রাহ্মোবিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা।
তজ্জঃপুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিম্॥
যজ্ঞস্থায়ত্বিজে দৈব আদার্ষস্ত্বার্ষ গোর্যুগম্।
চতুর্দ্দশ প্রজমজঃ পুনাত্যুত্তরসপ্ত ষট্।
ইত্যুক্তা 'চরতাং ধর্ম্মং সহ' যা দীয়তেঽর্থিনে।
স কায়ঃ পাবয়েত্তজ্জঃ ষট্ ষড়্ বংশ্যান্ সহাত্মনা॥
আসুরো দ্রবিণাদানাদ্রাক্ষর্ক্ষাৎ সমধাত্মিথঃ।
রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ॥"

স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও, স্বীয় উদ্বাহতত্ত্বে, উপরি-উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোক চতুষ্টয় সমগ্র অবলম্বন করিয়াছেন, এবং সেই চারিটী শ্লোকের ব্যাখ্যানন্তর, মনুবচনেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। শাস্ত্রান্তরে, যে সকল আচার ব্যবহার কলিতে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দ্বিজগণের অসবর্ণা-বিবাহ ব্যতীত, তদ্ব্যতীত বিবাহ-প্রণালীর অন্য কোন উল্লেখই দেখা যায় না। অতএব যুগ-ভেদে উপরি-উক্ত অষ্টবিধ বিবাহের কোন প্রভেদ শাস্ত্রসম্মত নহে। তথাচ দেশভেদে ও সাম্প্রদায়িক রীত্যনুসারে, এখন দুএকটী কোন কোন স্থানে, বা কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যেই প্রচলিত দেখা যায়, অন্যত্র বা অপর সমাজে, শাস্ত্রনিষিদ্ধ না হইলেও আচারবিরুদ্ধ বলিয়া সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। অম্মদীয় সমাজে প্রচলিত বৈবাহিক রীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ উদ্বাহ-প্রণালীর পারিভাষিক ব্যাখ্যা দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে দৈব, আর্ষ, রাক্ষস, ও পৈশাচ, এই চতুর্ব্বিধ বিবাহের সহিত, আধুনিক প্রচলিত বিবাহের কোনই সংশ্রব নাই। দৈব বিবাহে, যজ্ঞীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী ঋত্বিককে অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া কন্যাদান করা হইত। এখন সে দীর্ঘ-কালব্যাপী যজ্ঞও নাই, সে ঋত্বিকও নাই, সুতরাং দৈব বিবাহ পুরাবৃত্তে পঠিত শব্দমাত্র দাঁড়াইয়াছে। আর্ষে, বরের নিকট গোমিথুন লইয়া কন্যা প্রদত্তা হইত। এ পদ্ধতি আদিকালেই প্রচলিত ছিল। ইহা যে মনুর সময়েও নিন্দনীয় হইয়াছিল, তাহা মানব সংহিতাতেই দৃষ্ট হয়; এস্থানে তদীয় বচন পুনরুল্লিখিত হইল, যথা,

"আর্ষে গোমিথুনং শুল্কং কেচিদাহুর্মৃষৈব তৎ।
অল্পোহপ্যেবং মহান্ বাপি বিক্রয়স্তাবদেব সঃ।

রাক্ষস বিবাহে যুদ্ধে বল পূর্ব্বক কন্যা আনা হইত। পৈশাচ বিবাহে ছল পূর্ব্বক কন্যার নিদ্রিত বা মত্ত অবস্থায় নির্জ্জনে গমন করা হইত। প্রচলিত থাকা দূরে থাকুক, এই দুই পদ্ধতি এক্ষণে রাজশাসনে দণ্ডনীয়। অপর চারিটি, পদ্ধতি—প্রাজাপত্য, আসুর, ও ব্রাহ্ম।

প্রাজাপত্যবিবাহে বরের ও কন্যার পরস্পর অনুরাগ বশতঃ উভয়ের ইচ্ছাতেই মিলন হইয়া থাকে। ইহা জীবধর্ম্মমূলক, সুতরাং কখনই একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে না, সামাজিক বিধানে কথঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন মাত্র করা যাইতে পারে। অধুনা কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে ইহা সুপ্রচলিত দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ সামাজিকগণের নিকট আদরণীয় নহে। প্রাজাপত্য বিবাহে 'সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মম্' এইবাক্য প্রয়োগ করা আবশ্যক। প্রচলিত বিবাহে তাহা প্রযুক্ত হয় না। অবশিষ্ট দুইটি, আসুর ও ব্রাহ্ম, এবং তাহাদেরই অন্যতর প্রণালী বর্ত্তমান সাধারণ জনসমাজে প্রচলিত দেখা যায়। আসুর বিবাহে, কন্যাকে 'বা কন্যাবান্ধব গণকে বরপক্ষ হইতে দ্রবিণ প্রদত্ত হইয়া, কন্যা আনা হয়। ব্রাহ্মবিবাহে প্রদাতা, আহূত, যথাশ্রুতাদি, ও অর্চ্চিত বরকে, কন্যা সম্প্রদান করেন। এস্থলে যে স্থলে কন্যাবন্ধুগণ পণ লইয়া কন্যা সম্প্রদান করেন, তাহাত স্পষ্টই আসুর বিবাহ, এবং যেখানে বরপক্ষীয়ের কোন দ্রব্য গৃহীত না হইয়া, আহূত, বস্ত্রাভূষিত, ও অর্চ্চিত বরকে প্রদাতা কর্ত্তৃক কন্যা সম্প্রদান করা হয়, তাহা নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্ম বিবাহ। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রমতে এই ব্রাহ্ম বিবাহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহাতে উভয় কুলে এক বিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র হইলেন, যথা মনু—

"দশ পূর্ব্বান্ পরান্ বংশ্যানাত্মানঞ্চৈকবিংশকম্।
ব্রাহ্মীপুত্রঃ সুকৃতকৃত্যেচয়তেঽনসঃ পিতৃন্॥"

তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা।
তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিম্॥"

আধুনিক উন্নত ক্ষুদ্রসমাজে উদ্বাহক্রিয়া, যে পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, তাহাতেই, পণ দেওয়া দূরে থাকুক, অনেকস্থলে কন্যা পক্ষীয়ের যথা-শক্তিসেবা অধিকতর ব্যয় বাহুল্য সহকারেই কন্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। তথাচ, শাস্ত্রা-নভিজ্ঞতা ও বুথাদম্ভস্বর-প্রিয়তা বশতঃ, এই দুরূহসাধ্য বিবাহ কার্য্যে অপত্য-বিক্রয় দোষ সংস্পর্শ করিয়াছে কি না, তাহা বিজ্ঞ সামাজিকগণের বিবেচনার বিষয়। দুই একটি দৃষ্টান্তের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইবে।

পত্য বিবাহে 'সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মম্' এইবাক্য প্রয়োগ করা আবশ্যক। প্রচলিত বিবাহে তাহা প্রযুক্ত হয় না। অবশিষ্ট দুইটি, আসুর ও ব্রাহ্ম, এবং তাহাদেরই অন্যতর প্রণালী বর্ত্তমান সাধারণ জনসমাজে প্রচলিত দেখা যায়। আসুর বিবাহে, কন্যাকে 'বা কন্যাবান্ধব গণকে বরপক্ষ হইতে দ্রবিণ প্রদত্ত হইয়া, কন্যা আনা হয়। ব্রাহ্মবিবাহে প্রদাতা, আহূত, যথাশ্রুতাদি, ও অর্চ্চিত বরকে, কন্যা সম্প্রদান করেন। এস্থলে যে স্থলে কন্যাবন্ধুগণ পণ লইয়া কন্যা সম্প্রদান করেন, তাহাত স্পষ্টই আসুর বিবাহ, এবং যেখানে বরপক্ষীয়ের কোন দ্রব্য গৃহীত না হইয়া, আহূত, বস্ত্রাভূষিত, ও অর্চ্চিত বরকে প্রদাতা কর্ত্তৃক কন্যা সম্প্রদান করা হয়, তাহা নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্ম বিবাহ। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রমতে এই ব্রাহ্ম বিবাহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহাতে উভয় কুলে এক বিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র হইলেন, যথা মনু—

"দশ পূর্ব্বান্ পরান্ বংশ্যানাত্মানঞ্চৈকবিংশকম্।
ব্রাহ্মীপুত্রঃ সুকৃতকৃত্যেচয়তেঽনসঃ পিতৃন্॥"

তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা।
তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিম্॥"

আধুনিক উন্নত ক্ষুদ্রসমাজে উদ্বাহক্রিয়া, যে পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, তাহাতেই, পণ দেওয়া দূরে থাকুক, অনেকস্থলে কন্যা পক্ষীয়ের যথা-শক্তিসেবা অধিকতর ব্যয় বাহুল্য সহকারেই কন্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। তথাচ, শাস্ত্রা-নভিজ্ঞতা ও বৃথাদম্ভস্বর-প্রিয়তা বশতঃ, এই দুরূহসাধ্য বিবাহ কার্য্যে অপত্য-বিক্রয় দোষ সংস্পর্শ করিয়াছে কি না, তাহা বিজ্ঞ সামাজিকগণের বিবেচনার বিষয়। দুই একটি দৃষ্টান্তের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইবে।

বিবাহের গাত্র-হরিদ্রা উপলক্ষে বরপক্ষ হইতে কন্যাগৃহে যে স্বর্ণ, রৌপ্য, ও মণিমুক্ত বস্ত্রালঙ্কারাদি, ও বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী প্রেরিত হয়, তাহাতে, এবং, কন্যাপক্ষ কুল-মর্য্যাদায় উৎকৃষ্ট হইলে, 'অধিবাসী বলিয়া' যে সকল দ্রব্য ও অর্থ বরপক্ষীয় কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়, তাহাও গ্রহণ করায়, কন্যা পক্ষীয়ের অপত্য-বিক্রয়-দোষ ঘটে কি না দেখা যাউক।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে,

"ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্কমণু পি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥"

শুল্কের ন্যূনাধিক্য সম্বন্ধে ও,

"অল্পোহপ্যেবং মহান্ বাপি
বিক্রয়স্তাবদেব সঃ।"

ইহা যে সার্ব্ববর্ণিক বিধান তাহা ও মনুতে আছে,

"আদদীত ন শুল্কোঽপি শুল্কং দুহিতরং
দদৎ।
শুল্কংহি গৃহ্নন্ কুরুতে ছদ্মনং দুহিতৃবিক্রয়ম্।"

রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বেও এ বিষয়ে মনুর অবিরোধী ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা—

শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি সুতাং লোভমোহিতাঃ।
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহাকিল্বিষকারিণঃ॥
পততি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চাসপ্তমং কুলম্।
গমনাগমনে চৈব সর্ব্ব শুল্কোহভিধীয়তে॥
গমনাগমনে, পারিতোষিক-দ্রব্যস্বীকার কন্যা প্রদানার্থং কন্যাপিতৃ-বেশ্ম যাতায়াতে।

রঘুনন্দনের 'গমনাগমন' শব্দের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে কন্যার পিতৃগৃহে পারিতোষিক দ্রব্য, যাতায়াতে অপত্য বিক্রয় দোষ পৌঁছে। মনুক্ত "শুল্কমণু পি" এবং "অল্পোহপ্যেবং মহান্ বাপি" এ দুই বাক্যমধ্যেও

কোন্ সংশয় হইতে পারে না। পরন্তু এ সম্বন্ধে চিরপ্রচলিত দেশাচারের দোহাই দিবার সুযোগ নাই। গাত্র-হরিদ্রার আড়ম্বর অতি অল্পদিনই প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহাও সকল সম্প্রদায় মধ্যে, বা সর্ব্বত্র নহে। ইতঃপূর্ব্বে কেবল মাঙ্গলিক হরিদ্রা মাত্র প্রেরিত হইত, কোন দ্রব্যাদি বা মূল্যবান বস্ত্র দেওয়া হইত না। অদ্যাবধি অনেক স্থানে, ও শ্রেণীবিশেষের মধ্যে, দ্রব্যাদির কথা দূরে থাকুক, মাঙ্গলিক হরিদ্রা প্রেরণ করার প্রথাও প্রচলিত হয় নাই। ভবিষ্যতে, কন্যা সেই মূল্যবান বস্তুগুলি পতিগৃহে লইয়া যাইবে, একথা বলিলেত দোষ সংশোধন হইল না। যে হেতু বিবাহের পর পতিগৃহে লঙ্ঘন স্ত্রীজাতির বৈধ স্ত্রীধন সত্ত্বেও, বিবাহের পূর্ব্বে বরপক্ষ হইতে কন্যাকে দ্রব্যাদি প্রদত্ত হইলে, সে বিবাহ উৎকৃষ্ট ব্রাহ্ম বিবাহ হয় না, অপকৃষ্ট আসুর সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। "জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ" মনুর এই বচনানুসারে কন্যার জ্ঞাতিবর্গকে দিলেও যে দোষ হয়, কন্যাকে দিলেও সেই দোষ হয়। উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মবিবাহোদ্ভব সন্তান একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র কুলের, এই শাস্ত্রোক্ত ফল কেবল প্রধাতার কুলে নহে, কন্যা গ্রহিতার কুলেও বটে, অতএব নিকৃষ্ট বিবাহে উভয় পক্ষীয়েরই পারলৌকিক অনিষ্ট সমান।

আর একটী কথা এস্থলে বক্তব্য। পুরাকালে ব্রাহ্মকারদিগের বিশেষ আলোচনা কন্যা বিক্রয় সম্বন্ধেই দেখা যায়, তখন পুত্র বিক্রয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে কাল বিপর্য্যয়ে যখন দেখা যাইতেছে, যে দালাল দ্বারা স্পষ্ট দর কসিয়া বরের মূল্য নির্দ্ধারিত হইতেছে, এবং সেই মূল্যের ন্যূনাধিক্যানুসারে দালালিও দেওয়া হইতেছে, তখন সে বিষয়ে আর উদাসীন থাকিলে সমাজের অবনতির বেগ যে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে ইহার কিরূপ ব্যবস্থা আছে দেখা থাউক।

বৃদ্ধ মনু বলিয়াগিয়াছেন—

"অদ্ভিরেব দ্বিজাগ্র্যাণাং কন্যাদানং বিশিষ্যতে ইতরেষান্তু বর্ণানামিতরেতর কাম্যয়া।"

দ্বিজশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের কন্যাদান কেবল জল দ্বারাই সম্পন্ন হইবে, এই তাঁহারের বিশেষ বিধি। ইতরবর্ণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণে পরস্পর ইচ্ছানুরূপ দান হইবে। এস্থলে 'পরস্পরের ইচ্ছা' এই বাক্যের দোহাই দিয়া অপর জাতীয় বরের দর কসিয়া মূল্য বৃদ্ধি করা কত দূর শাস্ত্রানুযায়ী হইতে পারে, তাহা সামাজিকগণ বিবেচনা করিতে থাকুন। কিন্তু দ্বিজাগ্রগণ সে কথায় ত কোন ক্রমেই রেহাই পান না। তাঁহারের ত বিশেষ বিধি রহিয়াছে 'অদ্ভিরের দ্বিজাগ্র্যাণাম্'। অতএব এখনকার বিবাহে ক্রমশঃ যে পদ্ধতি প্রবেশ করিয়াছে, তদ্বারা স্পষ্টই ব্রাহ্মণেরা সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন, এবং অপর জাতীয়দের মধ্যে 'ইচ্ছানুরূপ' এই কথার ছলে সামাজিক বল প্রয়োগ দ্বারা অর্থাপহরণ করাতে অপত্য বিক্রয় দোষ ঘটিতেছে কি না তাহাও সকলের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

এক পক্ষে সামাজিক কুসংস্কার ও বহুদর্শনের মত সাধারণে প্রচলিত থাকায়, কন্যার উদ্বাহ অতিরাং সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। পক্ষান্তরে পুত্র বিক্রয়ীরা নিঃশঙ্ক ও নিঃসঙ্কল্প হইয়া দালালু ও দালালনীদিগকে অপত্যরূপ পণ্যবস্তুর রূপগুণাদি কীর্ত্তনার্থে প্রত্যেক পল্লির ক্রেতাগণের নিকট খোষণা পত্র প্রেরণ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় যাহা সম্ভবপর, তাহাই ঘটিতেছে। কন্যার কপের ছটা বাড়াইবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হইতেছে। গায়ানির মেঘেকে ক্ষণকালের জন্য আরমানির মেঘের মত দেখাইবার নিমিত্ত কিরূপে অঙ্গরাগ রঞ্জিত করিতে হয়, তাহা অনেকেই শিখিতেছে। কোন কোন স্থানে ভেল গহনা, ও ভেল বাসন দেখা দিতেছে। বরপক্ষীয়দের এই অগাধ্য স্বীকার করিয়া, পরে সমযজ্ঞও করা হইতেছে। অন্যান্য নানাবিধ কপটাচার ও প্রতারণারিও অসদ্ভাব দেখা যাইতেছে না। বলদেশে যে রাজপুতানার কিম্বদন্তীশ্রুত কন্যাহত্যা কাণ্ডের অভিনয় ঘটিবে না, তাহাই বা কেবলিতে পারে? অথবা অপত্যোৎপাদনের ক্রিয়ার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উপায় সকল যে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে অবসম্পিত হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে? ফল কথা সামাজিকগণ যে বিষলতা রোপণ ও পালন করিতেছেন, তাহা যে অচিরাৎ ফলবতী হইয়া সমাজ ধ্বংস করিবে, তাহারই সুস্পষ্ট লক্ষণ সকল দেখা যাইতেছে।

বিগত সেন্সসে যে লোকসংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, যে অঙ্গদেশে হিন্দুসানের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং আর্য্য ভদ্রবংশীয়দিগের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। সর্ব্বত্র ভদ্রপল্লিগ্রামের বর্ত্তমান দুরবস্থাও তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। দরিদ্র শ্রোত্রিয় ও বংশজ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পণ লইয়া কন্যা বিক্রয় করা হয়। এ দিকে কুলীনদিগকে বৃদ্ধবয়সেও এবং বহুবিধ পত্নী বর্ত্তমান সত্ত্বেও, কেবল বিবাহ ব্যবসায়মাত্র সমধর্ম্মা করণার্থে কন্যা প্রদত্তা হয়। এই উভয় বিধ বিবাহ বিভ্রাট, এবং জন সাধারণের দারিদ্র্যজনিত অকালে জরা ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব, যে সেই জনসংখ্যা হ্রাস হওয়ার কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারেনা।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকলের মুখেই এই সকল আক্ষেপ-উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল কুপ্রথার উদাহরণে রঙ্গিত দৃশ্য দেখাইয়া, নাট্যমন্দিরে শ্রোতৃবর্গের হাস্যোৎপাদন করা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। কবিগণ ও উপন্যাস-লেখকেরাও এ বিষয়ে নীরব নহেন, এবং সমাজের মধ্যে সর্ব্বত্রই ইহার প্রত্যক্ষ ফলসমূহ জীবন্ত দৃষ্টান্তে জাজ্বল্যমান দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অথচ সমাজের অধোগতির বেগ অবরোধের কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। বঙ্গীয় সমাজের জীবনী-শক্তি কি এককালীন বিনষ্ট হইয়াছে? ভারতপ্রসিদ্ধ কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের জ্ঞাতি ও নরহত্যার আশঙ্কা দূরীকরণার্থে, যে প্রকার মৃতবৎসর সকল দেখাইয়াছিলেন, আমরাও কি সেইরূপ দেখিতেছি; বিশ্ববিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, দেবমন্দির, নাট্যমন্দির, বক্তৃতা, সমিতি, সংবাদ পত্র, ব্যায়াম বিচারালয়, বিপণি, পর্ব্ব, উৎসব, আমোদ, আহ্লাদ, নৃত্য, গীত, ইত্যাদি, যাহা দেখিতেছি তাহা কি ছায়াবাজী মাজিক সকলেই কি নাটকের অভিনেতার ন্যায়, আপন আপন নির্দ্দিষ্ট অংশের অভিনয় মাত্র করিয়া চলিয়া যাইতেছেন? প্রকৃত ঘটনায় চেতন পদার্থের সত্তা, যে সকল লক্ষণ দ্বারা নিরূপিত হয়, তাহার ত কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। সুতরাং হয় আমরা নিদ্রিত, নয় মৃত? নতুবা বৈতালিক অবস্থাপন্ন হইয়া রহিয়াছি। এরূপ অবস্থায় আমাদের নাচা কোঁদা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

কন্যাচিদনুসন্ধিত্সোরিয়ম্।

নিরুপমা।

পঞ্চম অধ্যায়।

ছয়বৎসর পূর্ব্বে একদিন খেলা ঘরের ভিতর যে আনন্দময়ী নিরুপমাকে দেখিয়াছিলাম, আজ সে নিরুপমার সে আনন্দ কোথায়? সঙ্গিনী সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া যে আপন ফুল-শয্যার ফুল-তুলিয়াছিল, বিবাহ হইয়াছে বলিয়া যাহার আনন্দ রাখিবার স্থান ছিলনা, সে আজ তাহার বড় সাধের শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছে কিন্তু তাহার মুখে আর হাসি দেখিতে পাই না কেন? তাহার শৈশবের সুখ-স্বপ্নগুলি এখন ত সফল হইবার সময়, তাহা কি হইতেছে না? নতুবা নিরুপমা নির্জ্জনে দাঁড়াইয়া—চক্ষুজল মুছে কেন?

বিবাহের পর যখন প্রথম প্রথম শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছিল, তখন তাহার এত কষ্ট ছিলনা। তখন সে কিছুই জানিত না,—কিছুই বুঝিত না, স্বামীর মাতুলালয়ই আপন শ্বশুর-বাড়ী বলিয়া জানিত।" সে বাড়ীতেও বড় বড় দালান; সে গিয়া যেই দালানে দালানে বেড়াইত, ছাতের উপর উঠিয়া খেলা করিত, দ্বিতল প্রকোষ্ঠ মধ্যে শয়ন করিয়া কত সুখে ঘুমাইত। সে মনে করিত বুঝি তাহার সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে।

তাহার পর নিরুপমা এখন ত আর সে বালিকা নাই, এখন বড় হইয়া শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে, এখন সে দেখিতে পায় যে অট্টালিকার ভিতর তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই; কেহই ত তাহাকে স্নেহের চক্ষুতে চাহিয়া জল মুছাইয়া দিতে আসে না, ছোটবেলায় আসিয়া যাহাদিগের মুখে স্নেহময় সম্ভাষণ শুনিয়াছিল, এখন কেহই ত আর তেমন মিষ্ট কথা বলে না, একবিন্দু ভালবাসা পাইলে তাহার হৃদয় জয় হইয়া যায় কিন্তু কেহত তাহাকে ভালবাসে না।

শৈশবে মায়ের কাছে কত স্নেহ, কত সোহাগ পাইয়াছে, ক্ষুধা না পাইলেও মায়া দশ বার ডাকিয়া খাওয়াইয়াছেন; এখানে নিরুপমা ক্ষুধার সময় খাইতে না পাইলেও, কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে না, অতি মৃদু ক্ষুধা হৃদয়-ভরা লজ্জা, সেকি চাহিয়া খাইতে পারে? মাতুলানীরা যখন খাইতে দেন তখন সে খাইতে পায় কিন্তু,—মাতুলানীদের ত সে মাতৃস্নেহ নয়, সুতরাং নিরুপমা ক্ষুধা-তৃষ্ণার ক্লেশ নীরবে সহ্য করিতেছে।

আর সেই স্বামী—যে স্বামীর মুখ পানে চাহিতে চাহিতে সে আত্মহারা হইয়া যায়, যে স্বামী তাহার কাঁদিবার স্থান, দুঃখ রাখিবার স্থান যাহার স্নেহ ভিন্ন এ পৃথিবীতে তাহার আর কিছুই নাই—সেই স্বামীর স্নেহই কি সে পাইয়াছে? হতভাগিনী তাহা যদি পাইত; তবে তাহার আর কিসের দুঃখ? সে একটী দিনের জন্য ও স্বামীর মুখে স্নেহ-মমতার কথা শুনিতে পায় নাই, সময়ে সময়ে সামান্য একটু অপরাধে কত কর্কশ বাক্য শুনিতে হইয়াছে, সে বাল্য কালে "সীতার মত সতী হবে, রামের মত পতি পাব," বলিয়া আহ্লাদ করিত, নিরুপমা সীতার মত সতী হইতে পারিবে কিন্তু রামের মত পতি তাহার ভাগ্যে জুটিল না কেন? সেত ভাল মন্দ জানে না, তবে তাহার কেন এত যাতনা?

নিরুপমা প্রভাতে উঠে, দাসীর মত ভয়ে ভয়ে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হয়, কত যত্নে প্রাণপণে গৃহকার্য্যগুলি সমাধা করে, স্নানের সময় স্নান করিয়া আবার রন্ধন কার্য্যে নিযুক্তা হয়। তৃষ্ণায় জল নাই, ক্ষুধায় অন্ন নাই, দুইটী গণ্ড বহিয়া অশ্রু জল পড়ে, কেহই ত তাহা দেখিতে পায় না, তাহার বুকের ভিতর কত কষ্ট হয়, সে কাহারও কাছে তাহা ত বলিতে পায় না, কে বলিবে নিরুপমা কেন এত দুঃখিনী?

ব্যোমকেশ যদিও নিরুপমাকে ভাল বাসে না, কিন্তু আমার স্ত্রী বলিয়া যে একটা মমতা, তাহা তাহার আছে। সে সময়ে সময়ে নিরুপমার এই সকল কষ্ট দেখিয়া ব্যথিত হয়, কিন্তু কি করিবে, মাতুলালয় ছাড়িয়া কোথায় দাঁড়াইবে? কে তাহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিবে? এই সকল ভাবিয়া সে নীরবেই সে সকল সহ্য করিতেছে।

নিরুপমার অদৃষ্ট ভাল নহে, নতুবা সে ব্যোমকেশের ন্যায় হৃদয়বান্ ব্যক্তির স্নেহ-পাত্রে কেন বঞ্চিতা হইবে? ব্যোমকেশ নিরুপমাকে ভাল বাসিতে পারেনা বলিয়া তাহার দুঃখ হয়, সে ভাল বাসিবার জন্য কত চেষ্টা করে, কিন্তু কিজানি কেন পারেনা, যখন নিরুপমা নিকটে থাকেনা তখন সে নিরুপমার কথাই ভাবে, নিরুপমার দুঃখের বিষয় চিন্তা করে, নিজের ভাগ্যে দাম্পত্য-সুখ ঘটিল না বলিয়া মনে মনে কত আক্ষেপ করে।

ব্যোমকেশেরও মাতুলালয়ে বাস এখন কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। সে শুনিতে পায় তাহার মাতুলেরা পরস্পর বলিয়া বেড়ান—"আমরা আর পারিনা চিরকালটা ভাগ্নেকে খাওয়াম, এখন ভাগ্নে বৌকেও ভাত দিতে বসেছে, কি কর্ব্ব বল; গলায় পড়েছে করি কি?" অহার উপর তাহার মাতুলানীরা নিরুপমাকে যে সকল শ্লেষ সূচক বাক্য বলেন সে সকল শুনিয়াও ক্রোধে অভিমানে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু করিবে কি নিজের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিয়া সে সকলই সহ্য করিতেছে কিন্তু আর পারে না।

সহসা একদিন বড়ই একটা মর্ম্মবিদারক ঘটনা উপস্থিত হইল, মধ্যে প্রায় এক মাস কাল ব্যোমকেশ বাটীতে ছিলনা, স্বামীর অনুপস্থিতি কালে নিরুপমা আপনাদের শয়ন প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া নীচের একটী ঘরে আসিয়া প্রতিবেশিনী চাঁপার মাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছে শুইয়া থাকিত; তাহার পর যেদিন ব্যোমকেশ বাটী আসিল, নিরুপমা আগেকার মত শয্যা রচনা করিবার জন্য সন্ধ্যা বেলায় সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, দেখিল সেখানে শয্যাদি কিছুই নাই। অন্য ঘর হইতে বিছানা আনিয়া সযত্নে শয্যা রচনা করিতেছে এমন সময় বড় মামী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং নিরুপমাকে কিছু না বলিয়া বালিকা-রচিত সেই শয্যাগুলি ছুড়িয়া ছুড়িয়া বারান্দার বাহিরে ফেলাইয়া দিলেন। নিরুপমা বিস্মিত এবং স্তব্ধ হইয়া সভয়ে তাঁহার মুখ পানে চাহিতে লাগিল; বড় মামীর মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল সে যেন কোন একটা বড় দোষের কাজ করিয়াছে। এলেই ত সর্ব্বদা সভ্যউচিত, তাহার উপর আবার এই অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রাণ বড় আকুল হইয়া পড়িল।" অতি বিনীতভাবে বলিল,—"মামী ও বিছানা ফেলিয়া দিল কে? তবে কি ও বিছানা নয়?"

মামী কপালের উপর নাক তুলিয়া বলিলেন,—"জানিনে, যার বিছানা দেখে নেবে, এ ঘরে আর এস টেসনা, এইত মোটে চারটা

কুঠারী, এর মধ্যে তোমরা একটী জুড়ে থাকলে চল্‌বে কেন? নীচের একটা ঘর দেখে নাও গে।"

নিরুপমা তেমনি নম্রভাবে বলিল,—"তা'ত আমি জানিনে আমি মনে করি এই ঘরই বুঝি—"

"আর মনে ট'নে কর্‌তে হবে না, আজ হ'তে আর উপর ঘরে এসনা।"

নিরুপমা বড় অপ্রতিভ হইল, প্রাণে বড় একটা কষ্ট হইল, পাছে স্বামীর নিকট আবার এই বিষয়ের জন্য অপমান খাইতে হয় এই ভয়ে সে আরও আকুল হইল, তাড়াতাড়ি বিছানা গুলি তুলিয়া আনিয়া, যেখানকার বিছানা সেইখানে রাখিয়া দিয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর; আজ নিরুপমার নিদ্রাদেবী শয্যা নাই, কাহার কাছে সে এ দুঃখের কথা বলিবে? সে একাকিনী নীচের একটী ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছে, ব্যোমকেশ তখন পল্লীর মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছিল। নিরুপমা প্রতি মুহূর্ত্তে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। অন্য দিন হইলে সে একলা থাকিতে পারিত না, দারুণ মনঃকষ্টে আজ তাহার অন্তরে অন্য কোন ভয় স্থান পাইতেছে না।

অধিক রাত্রিতে ব্যোমকেশ বাটী আসিল, তাহারও বিশ্বাস যে নির্দ্দিষ্ট কক্ষেই শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, অতএব একবারে সেই ঘরে যাইবার জন্য উপরে উঠিবার সিঁড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, দরজা বন্ধ, দুই তিন বার সজোরে ধাক্কা দিল, কাহারও সাড়া পাইল না, নিরুপমা স্বামীর সাড়া পাইয়া নীরবে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; সে তখন ও কাঁদিতেছিল সুতরাং নিশ্বাস একটু জোরেই পড়িতেছিল নিশ্বাসের শব্দ পাইয়া ব্যোমকেশ একটু যেন চমকিত ভাবে বলিল,—কে?

অতি মৃদু স্বরে উত্তর হইল,—"আমি।"

"এখন, এখানে যে?"

নিরুপমা আর হৃদয়াবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না, ভালবাসা পা'ক আর না পা'ক স্বামীকে ত সম্মুখে পাইয়াছে, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সে রোদনে ব্যোমকেশেরও অন্তরে ব্যথা হইল, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিরুপমা একে একে যে ঘটনা হইয়াছিল সমুদায় বিবৃত করিল।

একে ব্যোমকেশ বিষম অভিমানী, তাহাতে আবার মাতুলদের বাক্য ও ব্যবহার, পরশ্বশ্রে সে এক প্রকার ধৈর্য্যহীন হইয়াছিল, আর একবারে অধীর হইয়া পড়িল ক্রোধান্ধ হইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইল, এবং উচ্চৈঃস্বরে তাহার মন মমাকে ডাকিতে লাগিল।

বড় মামার একটু নিদ্রাবেগ হইয়াছিল, ব্যোমকেশের আহ্বানে তাঁহার সে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, একটু চকিত ভাবে শয্যার উপর হইতেই বলিলেন,—"কি ব্যোমকেশ! ডাক কেন? কি হ'য়েছে!"

"আর কিছু হয়, কথা আপনাকে বলে যাই শুনুন, ব্যোমকেশকে আর আপনাদিগকে অন্ন দিতে হবে না, তার স্ত্রীকেও প্রতিপালন কর্‌তে হবে না যদি কখন আপনার বাড়ীর সম্মুখে দোতালা বাড়ী কর্‌তে পারি তবেই দেখে ফিরবো, নতুবা এই শেষ।"

সন্ধত্র-বেগে ব্যোমকেশ বাটী হইতে বাহির হইল; কোথায় যে গেল, সপ্তাহ কাল অনুসন্ধান করিয়াও তাহা স্থির হইল না।

মহাকান্ত এ সংবাদ পেল, নিরুপমার নিদারুণ কষ্টের কথা তাহার জনকজননী শুনিয়া

পাইলেন, আর বিলম্ব করিলেন না, সান্ত্বনা বাক্যের সহিত আসিয়া নিরুপমাকে লইয়া গেলেন, নিরুপমা মাতৃ-অঙ্ক পাইয়া মনে করিল কৃষ্ণকুঞ্জ বিস্মৃত হইল।

—০—

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ফাল্গুন মাসের শেষ, মধ্যাহ্ন কাল; মালদহের অনতিদূরে মহানন্দা নদীতীরে মালতীপুর নামক যে এক খানি গ্রামে বড় এক ঘরের কোম্পানীর রেশমের কুঠী আছে তাহারই নিকটস্থ একটী অশথ বৃক্ষ-তলে একদিন একটী যুবক অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায়, নিবিষ্টচিত্তে একটী গান গাহিতেছিল। যুবককে দেখিলেই মনে উদাসী বলিয়া মনে হয়, যেন তাহার হৃদয়ে কোন আশা উদ্যম নাই, সংসারে যেন গ্রন্থী নাই; স্রোতের তৃণের ন্যায় সে ও যেন সংসার-স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

যুবক যে গানটী গাহিতেছিল, সে গানটী 'নিত্য সঙ্গীত'। গানটীর রচনা মধুর, যুবকের ও কণ্ঠস্বর মধুর, মধুরে মধুরে মিলিত হইয়া বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। ফাল্গুন মাস, ভরা পুরা বসন্ত; অশথ গাছের নিবিড় ছায়ায় বসিয়া কোকিলের 'কুহু'র ত বিরাম নাই, কিন্তু যুবকের সে মধুর কণ্ঠনিঃসৃত স্বর-লহরী সে কোকিল কুজনকেও পরাজিত করিয়া চারিদিকে হইতে শ্রোতার মন আকৃষ্ট করিতেছিল; পথ দিয়া ব্যোমকেশ তন্ময়চিত্তে সেই বিরহ গানটী শুনিতেছিল।

ব্যোমকেশের এক কপর্দ্দকও সম্বল নাই, দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, যে বেশে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল, এখনও সেই বেশ, তাহাও আবার বড় অতিশয় মলিন হইয়াছে। কয় দিন অবিশ্রান্ত পথ হাঁটিয়া, নানা স্থানে অতিথি হইয়া আজ মালতীপুর আসিয়া পৌছিয়াছে। সে শুনিয়াছিল মালদহ রেশমের বাণিজ্য-স্থান, সেখানে অনেক সাহেবের কুঠী আছে; সে সেই কুঠীর মধ্যে কোন একটী চাকরীতে নিযুক্ত হইবে বলিয়া বরাবর মালদহ চলিয়া আসিয়াছে। মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত, এখন সে কোথায় যাইবে তাহার স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাই এই বৃক্ষ ছায়ায় বসিয়া আপাতত শ্রান্তি দূর করিতেছে।

সে যখন গান করিতেছিল, সেই সময় তাহার অলক্ষিত ভাবে দুইটী দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইতেছিল; একটী একজন উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্নেহময় দৃষ্টি, অপরটী এক তরুণী রূপলাবণ্যশালিনী রমণীর লালসাময়ী—কুটিল দৃষ্টি; যাঁহার সম্নেহ দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইতেছিল, তিনি সেই মালতীপুর কুঠীর দেওয়ান, তিনি আপন বাসার জানালা দিয়া ব্যোমকেশকে দেখিতেছিলেন, আর সুমধুর সঙ্গীতটী শুনিতেছিলেন।

কিছু ক্ষণ পরে ব্যোমকেশের সঙ্গীত সমাপ্ত হইল সে অর্দ্ধ শায়িত অবস্থা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সহজ ভাবে বসিল,—বসিবামাত্র সেই যুবতীর কুটিল কটাক্ষে তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইল। সৌন্দর্য্য-পিপাসু ব্যোমকেশ মুগ্ধ হইয়া নিমেষ হারাইয়া তাহার পানে চাহিতে লাগিল; রমণী এলোচুলে নদী-তীরে দাঁড়াইয়া আছে, বাতাসে তাহার কেশ পাশ উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে, তাহার ললিত দেহে সম্পূর্ণ যৌবন, মুখমণ্ডলে রূপের গরিমা, নয়নে লালসাপূর্ণ দৃষ্টি; ব্যোমকেশ শ্রান্তি ভুলিল, আপনা ভুলিল; রমণী কি ব্যোমকেশকে ভাল বাসিয়াছে? নতুবা এমন রিলোল দৃষ্টিতে চাহিতেছে কেন?

এমন সময় কুঠীর এক জন বরকন্দাজ

ব্যোমকেশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং দেওয়ানজীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—"এ বাবু 'দেওয়ানজী আপ্‌কো বোলাওতেঁহে" এই অবসরে দেওয়ানজী ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; ব্যোমকেশের ইচ্ছা নহে যে সে এ সময় দেওয়ানজীর নিকট যায়, কিন্তু রুক্মিণীর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ মাত্রে দেওয়ানজীর সহিত তাহার চক্ষোচোখী হইয়া গেল, আর আপত্তি করিতে পারিল না, মনটুকু সেই যুবতীর নিকট রাখিয়া ধীরে ধীরে দেওয়ানজীর নিকট উপস্থিত হইল।

উপস্থিত হইলে দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার বাড়ী কোথায়?"

"নদীয়া জেলায়"

"নদীয়া জেলা কোন্ গ্রাম?"

"গোকুল নগর"

"এখানে কোথায় থাকেন?"

"কোথায়ও থাকি না, আজ এইমাত্র এখানে এসেছি"

"কোন পরিচিত লোক আছে বুঝি?"

"না পরিচিত কেউ নাই"

"তবে কোথায় থাকবেন?"

"তার কিছু স্থিরতা নাই, যেখানে ঈশ্বর স্থান দেবেন সেইখানে থাকবো"

"সে কিরকম কথা? আপনার উদ্দেশ্য কি? কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন?"

"উদ্দেশ্য একটা চাকরী বাকরী করা, নিজের অবস্থা ভাল নয়, তাই ঘুরতে ঘুরতে এইখানে এসে পড়লাম"

"আপনার পিতা মাতা কি অন্য কোন সহোদর নাই?"

"না"

"কি চাকরী আপনি চান?"

"যা উপস্থিত হবে, তাই কর্ত্তে প্রস্তুত আছি"

"রেশম কুঠির কাজ কর্ম্ম কিছু জানেন?"

"কখন ত করি নাই, তবে দেখ্‌লে শীঘ্রই শিখ্‌তে পারি।"

"বাড়ীতে আপনার আর কে আছে?"

"স্ত্রী ভিন্ন বাড়ীতে আর কেউ নাই,"

"অল্প বেতনের যদি কোন চাকরী জুটে তা'হলে আপনি তা ক'রতে প্রস্তুত আছেন?"

"প্রস্তুত না হ'লে আর উপায় কি? যেমন চাকরীই হ'কনা বর্ত্তমান অবস্থা চাইতে ত ভাল হবে"

"তাতে আর সন্দেহ কি? কুঠির চাকরীতে বেতন অল্প বটে উপরি দশ টাকা অবশ্যই পাবেন, আর কার্য্যে একটু যশঃ দেখাতে পার্‌লে শীঘ্রই উন্নতি হবে।"

"তা যেরূপেই হ'ক আমার তাতে কিছু মাত্র আপত্তি নাই, যে কার্য্যই হ'ক না কেন আমি তাই কর্ত্তে প্রস্তুত আছি,"

"ইংরাজী লেখা পড়া আপনার কিছু জানা আছে?"

"বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই তবে কাজ চালাতে পারি।"

"তবে আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমিও ব্রাহ্মণ, আমারও বাড়ী নদে জেলায় যে কয়দিন সুবিধা না হবে সে কয়দিন আমার বাসাতেই থাকবেন, তিনটার পর আপনাকে সঙ্গে ক'রে সাহেবের কাছে নিয়ে যাব, আপাততঃ একটা মুহুরীগিরি খালি আছে, যদিও আমার হাতে বটে, তবু একবার সাহেবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়ে নিয়ে আসা ভাল, কাল থেকে আপনি কাজ করতে বসবেন। আপনার নামটি কি?"

"ব্যোমকেশ রায়"

দেওয়ানজী আর কিছু না বলিয়া বাসাভিমুখী হইলেন ব্যোমকেশও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু সেই টুকু সময়ের মধ্যে, সে দুই তিনবার মুখ ফিরাইয়া নদী তীর পানে চাহিল। দেওয়ানজী বাসার মধ্যে প্রবেশ করিলে সেই বরকন্দাজটি ব্যোমকেশের নিকট আসিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—"এ বাবুজী ঢকল নারীকা-চ্যাল ছপে নহি।

ব্যোমকেশ কিছু অপ্রতিভ হইল।

শ্রীশ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ইউরোপে এত অশান্তি কেন?

ইউরোপের সর্ব্বত্রই অশান্তি বিরাজ করিতেছে। এই অশান্তি নিবারণ জন্য ইউরোপের বহুতর মনস্বী ব্যক্তি নানা প্রকার উপায় অবলম্বন ও নানাবিধ সামাজিক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কিন্তু কোন প্রকার উপায় ও কোন নিয়মেই পাশ্চাত্য সমাজে শান্তি স্থাপন হইতেছে না। ইউরোপের সর্ব্বত্রই এইরূপ ভীষণ অশান্তির কারণ কি? আমাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, ইউরোপে বর্ণ-ভেদ প্রথা অর্থাৎ বৃত্তি সম্বন্ধে ভারতের ন্যায় কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকাতেই সে দেশের সমাজ এইরূপ দুরবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। বিলাত, মার্কিণ প্রভৃতি দেশ কুবেরের ভাণ্ডার বলিলেও হয়, অথচ সে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে গৃহ-অভাবে, বস্ত্র-অভাবে দারুণ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। এই দুঃখ কষ্টের ফলেই সে সকল দেশের সর্ব্বত্রই "সমাজ বিপ্লবকারী" লোকের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই হাহাকার মারামারি, কাটাকাটি, ধর্ম্মঘট প্রভৃতি সংঘটিত হইতেছে। সে দেশের অসংখ্য লোকের দুঃখ কষ্টের কথা শুনিলে প্রাণ অস্থির হইয়া পড়ে। কতিপয় মাস গত হইল বিবি বেশান্ত মহোদয়া বিলাত প্রভৃতি দেশের লোকের দুঃখ দরিদ্রতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন "আজ কালিকার উন্নতি কেবল মাত্র বাহ্য বিষয়-সর্ব্বস্ব। ইহা সকলই বহিঃ চাক্‌চিক্যে পরিপূর্ণ। এ উন্নতির ফলে লোকের দুর্গতি ঘুচিতেছে না, বরং লোকের দুঃখ কষ্ট দিন দিন বাড়িতেছে। লোকের কৃত্রিমতা বাড়িতেছে, কপটাচার বাড়িতেছে, পরস্পরের দ্বেষ হিংসা বাড়িতেছে, একের ভোগ বিলাস যেমন বাড়িতেছে অপরের দুঃখ কষ্টও তেমনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে প্রকৃত সুখ কিছুই নাই। লণ্ডন ইংলণ্ডের রাজধানী। বিদেশীয় নিকট লণ্ডন লক্ষ্মী দেবীর লীলা ভূমি। এই লণ্ডন সহরে অসংখ্য অসংখ্য লোকের দুঃখ কষ্ট যেরূপ ভীষণ, জগতের আর কোথাও তেমন দুঃখ কষ্ট আছে কি না, জানি না। হে ভারত সন্তানগণ! তোমরা বাহিরের লোক, ভিতরের তত্ত্ব জান না, আমি সে তত্ত্ব জানি নিজে ভুক্তভোগী। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে বা বাগাড়ম্বরে মুগ্ধ হইও না। এই বাহ্য গৌরবের এবং বাহ্য শোভার পশ্চাতে

দুঃখ দারিদ্র্যের বড়ই ভীষণ মূর্ত্তি আছে। লণ্ডন সহরের এক অংশে দেখিবে, ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি। তথাকার ধন, ঐশ্বর্য্য, সুখ, বিলাস, বাহ্যাড়ম্বর দেখিলে চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। কিন্তু সেই লণ্ডন সহরের অপর অংশ দেখিবে, অন্নকষ্ট, অনাহার, বস্ত্রাভাব রোগ এবং অতি বীভৎস ব্যাপার। স্বার্থপরতা, পাশব স্বার্থপরতা এই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণ। দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার, পরহিতৈষিতা, পরদুঃখানুভূতি এসব কিছুই দেখিতে পাইবে না। এই পৌষমাসের প্রচণ্ড শীত, পথে বরফ পড়িতেছে, কিন্তু এই দিনে অতি প্রত্যূষে একখানি লণ্ডনের ডকে গিয়া দুঃখের দৃশ্যটা দেখিয়া আইস। রাত্রি পাঁচটা শীতে পথে বাহির হইবার যো নাই। কিন্তু সেখানে কি দেখিবে? দেখিবে সহস্র সহস্র লোক বস্ত্রহীন, এই দারুণ শীতে বুক পাতিয়া সামান্য কাজের জন্য সেখানে যাইয়া জড় হইতেছে। শীতে ভ্রূক্ষেপ নাই, হস্ত কয়দিন একটুকুরাও রুটি জুটে নাই। শীর্ণ দেহে অর্দ্ধউলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আশা, আজ ডকে কাজ পাইবে, কাজ পাইলে দুপয়সা উপার্জ্জন হইবে। তদ্দ্বারা একটুকুরা রুটি কিনিয়া বহুদিনের উদর-জ্বালা নিবৃত্তি করিবে। কাজ কি সকলে পায়? কাজের জন্য মারামারি কাটাকাটি করিয়াও অনেকের কাজ জুটে না। প্রত্যহ প্রায় পঁচিশ হাজার লোক কাজ না পাইয়া হতাশ প্রাণে ডক হইতে ফিরিয়া আইসে। পেটের দায়ে একটুকুরা রুটির জন্য মহিলাগণ অপরকে আত্মসমর্পণ ও সতীত্ব জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন।"

বিবি বেশান্ত মহোদয়াই যে, দেশের অবস্থা এরূপ বর্ণন করিয়াছেন এমত নহে, বিলাত মার্কিন প্রভৃতি সকল পাশ্চাত্য দেশের সহস্র সহস্র ব্যক্তির দারুণ দুঃখ কষ্টের কথা আমরা প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রে ও পুস্তকাদি পাঠে অবগত হইতেছি। যে দেশ ধনরাশি পরিপূর্ণ সে দেশের অধিকাংশ লোকের এরূপ দুর্দ্দশা কেন? আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বৃদ্ধি সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারিতাই এই দুর্গতির একমাত্র কারণ।

ইউরোপীয়েরা মুখে "সাম্য" "সাম্য" বলিয়া চীৎকার করে সত্য, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ইউরোপের কোথাও প্রকৃত "সাম্য" নাই। সে সকল দেশে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শক্তির প্রতি দ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। যে কোন প্রকারে হউক আপন আপন শক্তির উৎকর্ষ লাভ করাই ইউরোপীয় সভ্যতার মূল নীতি। ইউরোপে যাহার বিদ্যা শিক্ষা করায় সুযোগ আছে, যাহার শরীর সুস্থ ও সবল, যাহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাও প্রবৃত্তি আছে, এভিন্ন যাহার ধন সহায় সম্পদ প্রভৃতি আছে, তাহারাই উন্নত পদ, ধনও মান লাভ করিয়া থাকে। যাহাদের এ সকল নাই তাহাদের দুঃখ কষ্টের শেষ নাই। যখন দেখা যায় প্রত্যেক লোকেরই শক্তি অর্থাৎ বল, প্রবৃত্তি, বুদ্ধি, অবস্থা, ধন প্রভৃতি সমান নহে, তখন কখনই সকলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সুখী হইতে পারে না। যাহাদের শক্তি আছে, তাহাদেরই জয় লাভ হয়। বিলাত মার্কিন প্রভৃতি দেশের লোকেরা পৃথিবীর বহুতর লোককে শক্তিহীন করিয়া ধন সংগ্রহ করিতেছেন, এ ভিন্ন তাহাদের বর্ত্তমান সময়ে ধন উপার্জ্জনের কতশত সহস্র উপায় বর্ত্তমান সত্ত্বেও তাহাদের দেশের বহু সংখ্যক লোক ভীষণ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছে। শক্তিমানেরা সমস্ত ধন গ্রহণ করিতেছেন, শক্তিহীনেরা

দারুণ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপ ইউরোপের সর্ব্বত্রই একমতে শক্তির উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য তথায় লীলা-প্রণালীর নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহাদের পূর্ব্বোক্ত সুবিধা আছে তাঁহারাই পাশাখেলায় জয় লাভ করিয়া থাকেন। ভারতের বিজ্ঞতম মহর্ষিরা এ সমস্ত বিষয় সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিয়াই ভারতে বর্ণ-ভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন। বর্ণভেদ প্রথার কল্যাণে লোকে অন্ন, বস্ত্র, গৃহ সকলেরই জুটিতেছে। বর্ণভেদ প্রথায় কাহারও বৃত্তি নাশ হইতে পারে না সুতরাং কাহাকেও অনশন জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদ প্রথা শিথিল হওয়াতেই ভারতের দুঃখ দরিদ্রতা এরূপ বৃদ্ধি হইতেছে।

ভারতের মহর্ষিরা বলিয়া গিয়াছেন, ব্রাহ্মণ জ্ঞান চর্চ্চা করুক, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করুক, বৈশ্য কৃষি বাণিজ্য এবং শূদ্র বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা ও শিল্পের ব্যবসা করুক, বর্ণসঙ্কর জাতিরা স্ব স্ব পৈত্রিক বৃত্তি অবলম্বন করুক—অন্ন, বস্ত্রও গৃহের অভাবে যেন কেহ কষ্ট না পায়। এভিন্ন যাহারা একেবারে অক্ষম, যাহাদের শক্তি নাই, তাহাদের সক্ষম ব্যক্তিরা প্রতিপালন করুক। এই প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণসঙ্কর জাতিরা নিতান্ত আপদ না হইলে কেহ কখনও অপরের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে না। শক্তির উপাসনা করিয়া কেহ কাহারও বৃত্তি নাশ না করে, এজন্য মহর্ষিরা বহুতর প্রকারের ব্যবস্থা করিয়া সমাজে সুনিয়মে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন এবং অপরে নিরাশ্রয় হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কষ্ট না পায় সে জন্য নিয়তর বৃত্তিরও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ভারতের বর্ণ-ভেদ প্রথা —বৃত্তিরক্ষা ও দুঃখ দরিদ্রতা নিবারণ রূপ সাম্য ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই জগতে মনুষ্য জাতির স্থিতির সর্ব্ব প্রধান প্রয়োজন—অন্ন, বস্ত্র, গৃহ। ইহার অভাবই প্রকৃত ও ভয়ানক অভাব। ইংরেজ জাতি এই অন্ন, বস্ত্র ও গৃহের অভাব বশতঃই পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য গ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা নিত্য নূতন শিল্প প্রসূত করিয়া পৃথিবীর নানা দেশ হইতে অর্থ লুটিয়া খাইতেছেন। বাণিজ্য বিস্তারের জন্য কত প্রকার কঠোর পরিশ্রমও ব্রত করিতেছেন। এভিন্ন অর্থোপার্জ্জন জন্য আরও কত শত সহস্র উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এত শত সহস্র উপায় সত্ত্বেও তাহাদের দেশের ৪।৫ কোটি লোকের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিতেছেন না। এই বিশাল ভারতের ২৫ কোটি লোক স্ব স্ব পৈত্রিক বৃত্তি ভিন্ন জীবন রক্ষায় আর কি উপায় আছে? এদেশের যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া পাশ্চাত্য নীতি অর্থাৎ শক্তির উপাসনা করিয়া ভারত-উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা বড়ই ভ্রান্ত সন্দেহ নাই যে একমাত্র জাতিভেদ প্রথা দ্বারা ভারতবর্ষ বহুযুগ ধরিয়া সুশৃঙ্খলে ও শান্তিতে চলিয়া আসিতেছে, সেই জাতিভেদ প্রথা যাঁহারা নষ্ট করিতে যত্নও চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা ভারতের প্রকৃত শত্রু।

ইউরোপে অশান্তির কারণ পাঠকবর্গের সমীপে মুৎক্ষেপে নিবেদন করিলাম। ইউরোপে অশান্তির প্রকৃত কারণ দর্শাইবার জন্য আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। ভারতসন্তানগণ ইউরোপীয় সভ্যতা ও প্রণালী অনুসারে ভারতবাসীগণের উন্নতির জন্য

চেষ্টা করিতেছেন এবং সেই সভ্যতা ও প্রণালী অবলম্বন করিলে, ভারতবর্ষ যে একেবারে রসাতলে যাইবে, তাহা দেখাইবার জন্য এ প্রস্তাব লিখিত হইল। এখনও সময় আছে, ভারত এখনও সম্পূর্ণরূপে রসাতলে যায় নাই। ভারতবাসিগণ প্রাচীন জাতিভেদ প্রথা দৃঢ় ভাবে পুনরায় বিধিবদ্ধ করিয়া ভারতকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

জাতিভেদ প্রথার ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বর্ণসঙ্কর প্রভৃতির জ্ঞান-উপার্জ্জনের অধিকারের তারতম্য আছে দেখিয়া ইহাকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করি না। যে প্রথায় জীবের স্থিতির সর্ব্বপ্রধান—অন্ন, বস্ত্র গৃহ প্রভৃতি—উপায় সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ আছে, সেই প্রথাই সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস। জাতিভেদ প্রথায় জীবের স্থিতির অতিউৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে। এ প্রথা নষ্ট করিয়া ভারতকে রসাতলে দিও না।

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পদ্মলোচন খুড়ো।

(৩)

কৈ আফিঙ দাও, আর কত ঘুরিয়া বেড়াইব। আফিঙ না খাইয়া ত আমি মৃতপ্রায়। কতবার আফিঙ চাহিলাম, কেহই দিল না। ঘন ঘন হাই উঠিতে লাগিল গা মাটি-মাটি করিতে লাগিল, পা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; পেট ফুলিতে লাগিল। আমি না হয় মহাকবি সেক্সপীয়রের সঙ্গে পরলোক, স্বর্গ, নরক, Hades, যা হয় কিছু বল —এই ভূতের দেশ দেখিয়া বেড়াইতেছি; Caseer, Nepoleon, Ovid, Dante প্রভৃতি সাধু সঙ্গ-সুখ ভোগ করিতেছি, কিন্তু যেখানেই যাই Gabriel দত্ত পরিচ্ছদ পরে, মাথায় মুকুট এঁটে স্বর্গেই বেড়াই আর যাই করি; আমি কিন্তু আফিঙখোর ছাড়া ত আর কিছুই নই।

কাঞ্চন্য পক্ষো যদি স্বর্ণমুক্তৌ
মাণিক্যমুক্তৌ চরণৌ চ তস্য;
একৈকপক্ষে গজরাজ-মুক্তা
তথাপি কাকো নচ রাজহংসঃ।

কাজেই আমার আফিঙ না খাইলে চলিবে কেন? না হয় স্বীকার করিলাম পাপ তাপ দৈন্য, সাধু-সমাগমে * দূর হয় কিন্তু আফিঙ খোরের মৌতাতের সময়কার কষ্ট দূর করা সাধু সমাগমের কর্ম্ম নহে. কোন শাস্ত্রেও তাহা বলে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া করযোড়ে মহাকবিকে বলিলাম,—"দেব! আমি অহিফেণ-সেবী; সংপ্রতি অহিফেণ সেবার সময়

* গঙ্গা পাপং শশীতাপং দৈন্যং কল্পতরু স্তথা।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং হরন্তি সাধু-সমাগমঃ।

অতিক্রান্ত হওয়াতে আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি—"Can Ethiope change lis skin and Leoperd his skin" একথাত আপনিই বলিয়াছেন; তবে আফিঙখোরের স্বভাব এখানে আসিলে কেন অন্যরূপ হইবে?

যদি এদেশে কোথাও আফিঙ মিলে, বলিয়া দিন—দাস শ্রীচরণে ভিক্ষা মাগিতেছে; —অনুগ্রহ করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করুন।"

বলিতে বলিতে দেখি সেক্সপিয়রের দেহ আরোপন্যাসের জিনির মত বাড়িতেছে; দেখিতে দেখিতে মস্তক আকাশ স্পর্শ করিল; পদভরে ভূকম্প হইতে লাগিল; নিশ্বাসে ঝড় বহিতে লাগিল; চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। ভীষণ হুহুঙ্কারে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই বিরাট পুরুষ বলিল "এখানে আফিঙ নাই"। অন্ধকার হইয়া গেল, সৌধ প্রাচীর ছাউনিকা, বন-উপবন, তাস-নির্ম্মিত ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি ভয়ে চক্ষু বুজিলাম।

* * *

অনেক ক্ষণ পরে চাহিয়া দেখি এ আবার কোন দেশে আসিয়া পড়িয়াছি; পরিচিতের ন্যায় অথচ স্পষ্ট মনে পড়িল না। নদীতীর হইতে গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম; যত যাই ততই বোধ হয় "যেন চিনি"। দেখিতে দেখিতে এক ভগ্নগৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; চারিদিক মনে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; উপরে পার্শ্বে, দোরে, কত গাছ জন্মিয়াছে। হঠাৎ স্মৃতিপথে যেন বিদ্যুৎ চমকাইল; চিনিতে পারিলাম—এ আমাদেরই গৃহ। বিংশতি বৎসর দেখি নাই; বড় দেখিতে ইচ্ছা হইল: ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই আমার ঘর (যাহা ছিল) দেখিতে পারিলাম না—কিজানি কেন ভয় হইল। একবার নিশীথে অমানিশায় ঘুরিতে ২ এক সুদূরবিস্তৃত শ্মশানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম; অন্ধকারে অস্পষ্ট সেই পৈশাচিক দৃশ্য দেখিয়া মনে এইরূপ আতঙ্ক হইয়াছিল, এইরূপ প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, প্রাচীরগুলা আবরণ হারাইয়াছে; কড়িতে ঝুল জমিয়াছে, কোণ গুলায় মাকড়সার রাজ্যভূমি, কার্ণিসে বাদুড়ের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। ঘরের মেজে, টেবিলে, পুস্তকরাশির উপর ধূলার একটা স্তর পড়িয়াছে, কে আর দেখে কে আর পরিষ্কার করে? আলমারির উপর রাশীকৃত পুস্তক সাজান ছিল—সময়ে কাঠ ফলক জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; পুস্তক গুলা এধার ওধার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে; টেবিল, চেয়ার গুলা উই, ইঁদুরের ভক্ষ্যের ভাণ্ডার হইয়াছে। চারি দিকে ধ্বংস-চিহ্ন আমার ঘর এখন শ্মশান। এক সময়ে ইহাই আমার পক্ষে স্বর্গ সদৃশ ছিল। এক দেবী মূর্ত্তি জগৎ আলো করা রূপের প্রভায় আমার ঘর আলোকিত করিত।—এখন সে নাই; ঘর অন্ধকার হইয়াছে।

গ্রামেই আমার বিবাহ হইয়াছিল,—বিশ বৎসর পূর্ব্বে; তখন পদ্মলোচন আফিঙ খাইত না। ছেলেবেলা আমি আমার স্ত্রীর সহিত ছুটোছুটি খেলা করিতাম, মারামারি করে চক্ষু মুছিতেও মার কাছে নালিশ করিতে যাইতাম; গাছ হইতে ফল চুরি করিয়া ভাগ করিয়া খাইতাম। বড় হইলে একত্রে রই পড়িতাম, গল্প করিতাম। আমি বিভাকে বড় ভালবাসিতাম; আমার রূপ ছিল না, গুণ ছিল না তবু-ও বিভা হয়ত আমায় ভালবাসিত। কিন্তু ভালবাসিতাম বলে দিনরাত হা হুতাশ করিতাম না—কবিতা লিখিতাম না; "ভগ্ন প্রাণ" "ভগ্ন প্রাণ" বলিয়া আকুল ক্রন্দনে আকাশ কাঁপাইতাম না।

ভালবাসা দেখাবার জন্য বলিতাম না।

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।

জিজ্ঞাসা করিতাম না,

"And wilt thou weep when I am low"

ভস্মসাৎ হলে দেহ অনন্তে মিশালে প্রাণ।
করিবে কি, স্নেহময়ি, একবিন্দু অশ্রু দান॥

ভালবাসা দেখাতে গিয়া না হয় বড় জোর তার পেনসিল্‌টা কাটিয়া দিতাম ;—না হয় পড়ার-মানে বলিয়া দিতাম। আর বিভা তার প্রতিদান স্বরূপ আমার কাগজে কালি ঢালিয়া দিত ; বহুব্যয়সাধ্য টেরিটী মুছিয়া দিত, নানা উপদ্রব করিত। প্রণয়ের জয় হউক, পৃথিবী রসাতলে যাউক! একদিন শুনিলাম আমার বিবাহ ; ভয় হইল,—শুনিলাম বিভার সঙ্গে ; আনন্দের আর সীমা রহিল না—ভাবিলাম এ সংসার শুধু সুখের। আবার দিন-কতক গেল; বিভা রুগ্ন শয্যায়—এই ঘরে শায়িতা। আমি পাশে বসিয়া আছি; বিভা আর কথা কহিতে পারে না ; কি বলিবে বলে আমার গলায় হাতটী দিয়ে মুখখানি আমার কাণের কাছে লইয়া আসিল। কথা কহিতে চেষ্টা করিল বাক্য নিঃসরিল না—মাথাটী ঝুরিয়া গিয়া বালিশের উপর পড়িল ;—কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এইখানেই আমার সুখের সমাধি হইয়াছিল। তাই সেইদিন সেই ঘর হইতে বাহির হইয়াছি—আর প্রবেশ করি নাই। আজ বহুবৎসর পরে পুনর্ব্বার সেই দেশ, সেই ঘর, সেই পথ দেখিয়া সেই সব কথা মনে পড়িল—চক্ষের সম্মুখে যেন অতীত ঘটনাবলির পুনরভিনয় দেখিতে লাগিলাম। যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম।"

* * *

"ও ঠাকুর, ওঠনা ; রাত্তির কি হয় নাই!

সুপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার চমক ভাঙ্গিল দেখি বসন্ত গোয়ালিনী। কুমলাকান্ত একদিন গোয়ালিনীর জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, আমিও বসন্তের জন্য আত্মহারা ; বল দেখি গোয়ালিনী নহিলে আফিংখোরের কে দুধ জ্বাল দেবার যোগায়? একটু ভয় হইল,—বসন্ত দুধটা অমনিই দেয় কালেই আমার মত বেওয়ারিশ জিনিসের উপর তার দাবী কিছু বেশী—"এ্যাঁ এ্যাঁ রাত্তির হয়েছে বটে?"

"তা হবে কেন? তোমার জন্যে সৃষ্টিরোধ অন্তে যাবে না আর কি? তুমি ত আর অজরকাল মণি নয়? দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বসন্তকে মহাভারত, রামায়ণ, মাঝে মাঝে পড়িয়া ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতাম। বলি ঠাকুর তোমার কি বস্‌বার দাঁড়াবার জায়গা নাই? আমি ছিটিটী খুঁজে এলুম—কোথাও নেই; শেষে দেখি এই মড়াখোটায় পড়ে গোঁ গোঁ কর্‌চ। কোন দিন তিসে কোথায় মেরে ফেলবে আর বেঘোরে মৃত্যু হয়ে আমার ঘরে গিয়ে জুটবে। না বাপু! অমন কল্লে আর আমি তোমায় আমার বাড়ীতে থাকতে দিতে পার্‌বে না। এখন চল —খোকেদের দুধের হিসেবটা করে দিতে হবে। আর সমস্ত দিন ত থাও নি—এক বাটি ক্ষীর এনেছি খাবে কি?"

আমার ব্রহ্মদৈত্য হইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ও ক্ষীর পানে সম্পূর্ণ ইচ্ছা তাহাই জ্ঞাপন করিতে করিতে চৌকিদারের সঙ্গে চোরের মত (বা চোরের সঙ্গে চৌকিদারের মত) সজল আমার খবরদারকারিণী বসন্ত গোয়ালিনীর অনুসরণ করিলাম।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

সুখ ও দুঃখ।

সুখ ও দুঃখ এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। দুঃখের বিরোধী সুখ এবং সুখের বিরোধী দুঃখ। অমুকের মনে সুখ নাই বলিলে বলিতে হয় যে ঐ ব্যক্তি আন্তরিক দুঃখী। এই সুখ এবং দুঃখ মানব জীবনে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ দ্বয় স্বরূপ পরিজ্ঞান হওয়া অতি কঠিন।

নীতিশতকে উল্লিখিত হইয়াছে,—

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতাচ
প্রিয়াচ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা
ষড়জীবলোকেষু সুখানি তাত!

হে বৎস! নিত্য ধনাগম রোগশূন্যতা এবং প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা-বশীভূত পুত্র ও অর্থকরী বিদ্যা এই ছয়টী জীবলোকে সুখদায়ী অভিহিত *।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকেও সুখ বলা যায় না, কারণ যিনি প্রত্যহ ১০০ টী টাকা উপার্জ্জন করেন, তাঁহার হয়ত ব্যয় ১৫০ টাকা ধরন। সুতরাং তখন তিনি যে করেন যে ঐ ১৫৲ টাকা হইলে সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। কিন্তু যদি তাঁহার ১৫৲ টাকা প্রাত্যহিক লাভ হইতে থাকে, অমনি তাঁহার চাল চলনও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহার স্ত্রী আর তখন পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া রন্ধনাদি করিতে চান না। সুতরাং পাচক ব্রাহ্মণের আবশ্যকতা হইল। গুরু পুরোহিত প্রভৃতি সকলেই ৩৲ টাকার স্থলে ৫৲ টাকা দাবী করিয়া বসিলেন। নিজের ও ৩ টাকা মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিলে অপদস্থ হইতে হইবে বিবেচনা করিয়া ৫৲ টাকা মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। এইরূপে ১৫৲ টাকায়ও তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। সুতরাং তখন তিনি ২০৲ টাকার আশা করেন। এইরূপে মনুষ্যের আশা ক্রমশঃ হ্রস্ব না হইয়া উত্তরোত্তর বলবতী হইতে থাকে।

কোন এক প্রাচীন কবি বলিয়াছেন।

নিঃস্বো বষ্টিশতং শতী দশশতং লক্ষং
সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতি শ্চক্রে-
শ্বরং সম্পদম্।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি ব্রহ্মাস্পদং
লিপ্সতে
ব্রহ্মা শৈবপদং শিবো হরিপদং তৃষ্ণাবধিং
কোগতঃ॥

নিঃস্ব ব্যক্তি শত মুদ্রা প্রার্থনা করে। কিন্তু শতমুদ্রা লাভ হইলে তখন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সহস্র মুদ্রা প্রার্থনা করিয়া থাকে। আবার সহস্র মুদ্রা পাইলে লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়। লক্ষ মুদ্রা পাইলে তখন তাহার মন আর সামান্য অর্থের দিকে ধাবিত না হইয়া একেবারে রাজ্যলোভে আকৃষ্ট হয়

* এই শ্লোকটীতে সুখের উপকরণ পাঁচটী বলিয়াও উহার ধর্ম্ম বিবেচনা করিলে ছয়টী হইবে। যথা ১। প্রত্যহ অর্থাগমত্ব। ২। রোগশূন্যত্ব। ৩। পত্নীর প্রিয়ত্বমত্ব। ৪। পত্নীর প্রিয়বাদিত্ব। ৫। পুত্রের বশীভূতত্ব। ৬। বিদ্যার অর্থকরত্ব।

অদৃষ্ট ক্রমে রাজ্য-লাভ ঘটিলে তিনি সমুদায় ভূমণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। সমুদয় ভূমণ্ডলের অধিপতি হইতে পারিলে ইন্দ্রত্ব; ইন্দ্রত্ব লাভ হইলে ব্রহ্মত্ব; ব্রহ্মত্ব লাভ ঘটিলে শিবপদ এবং শিবপদ প্রাপ্ত হইলে বিষ্ণুপদে বাঞ্ছা জন্মিয়া থাকে।

এইরূপে আশা উত্তরোত্তর বলবতী হইতে থাকিলে কি প্রকারে তাহাকে সুখী বলা যাইতে পারে?

অতএব উপরি-লিখিত নীতিশতকের শ্লোক দ্বারা সুখ দুঃখ প্রমাণিত হইল না।

চাণক্য লিখিয়াছেন।

অসন্তোষো হি দুঃখস্য নিদানং পরিকীর্ত্তিতং।
সন্তোষঃ সুখমূলং হি কথ্যতে তত্ত্বদর্শিভিঃ।

অসন্তোষই সমুদয় দুঃখের মূল কারণ এবং সন্তোষই সুখের প্রধান হেতু।

যিনি গৃহে বসিয়া শাকান্ন ভক্ষণ করিয়াও সন্তুষ্ট থাকেন তিনি সুখী। আর যিনি প্রবাসে থাকিয়া সহস্রমুদ্রা উপার্জ্জন করেন তিনি অসুখী। কারণ সতত আত্মীয় বন্ধু বান্ধব স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গের দূরে থাকা বশতঃ সম্পূর্ণ মানসিক প্রীতি সমুদ্ভূত হয় না।

মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন.

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকংপচতি যো নরঃ
অনৃণী চাপ্রবাসীচ স বারিচর! মোদতে।

হে বক! যিনি দিবসের অষ্টম ভাগেও অর্থাৎ অপরাহ্নে শাকান্ন পাক করিয়া ভোজন করেন এবং ঋণগ্রস্ত ও প্রবাসী নহেন তাঁহাকে আনন্দিত বলা যায়।

অতএব নীতিশতকীয় বচনে আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্তোষকেই সুখ বলিতে হইল তাহা হইলে যাঁহার প্রাত্যহিক ১০৲ টাকা আয় হয় আর তিনি যদি তাহাতেই সন্তোষ অনুভব করেন তাহা হইলে তাঁহাকে সুখী বলা যায়।

প্রাসাদয়তি যঃ কুট্যাং পর্য্যঙ্কীয়তি মঞ্চকে।
তস্য সন্তোষশীলস্য কুব্জিকাপ্যপ্সরায়তে॥

যিনি কুটীরকে প্রাসাদ জ্ঞান করেন এবং মঞ্চককে খট্টাবৎ বিবেচনা করিয়া থাকেন, এতাদৃশ সন্তোষশীল মহাপুরুষের নিকট কুব্জা নারীও অপ্সরোবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

অভীপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত্যাদি জনিত মানসিক কৃতার্থতার নাম সন্তোষ।

লোকের ইচ্ছা বিভিন্ন প্রকার হওয়াতে সন্তোষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, সুতরাং সুখও নানা প্রকার।

ক্রমেলকং নিন্দতি কোমলেচ্ছুঃ ক্রমেলকঃ
কণ্টকলম্পটস্তম্।
প্রীতৌ তয়ো রিষ্টভুজোঃ সমায়াং মধ্যস্থতা
নৈকতরোপহাসঃ॥

নৈষধচরিত ষষ্ঠ সর্গ।

কোমলবস্তুভোজী মনুষ্যেরা কণ্টক-লম্পট উষ্ট্রকে নিন্দা করে এবং কণ্টকভোজী উষ্ট্র কোমলেচ্ছু মনুষ্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। অতএব উদরপূর্ত্তি স্বরূপ প্রীতি উভয়েরই সমান হওয়াতে এক জনকে উপহাস করা মধ্যস্থতা নহে।

নবদ্বীপনিবাসী স্বর্গীয় মথুরানাথ শিরোমণি মহাশয় তিন্তিড়ী পত্র রচিত ব্যঞ্জনাদি দ্বারা যেরূপ সুখানুভব করিতেন আমরা বোধ হয় লক্ষাধীশ্বর হইলেও তাদৃশ সুখ অনুভব করিতে পারি না।*

কিন্তু আমরা "সুখমূলং হি সন্তোষঃ" ইহাকেও নিকৃষ্ট লক্ষণ বলিতে পারি না। মদ্যপায়ী ব্যক্তি মদ্য পান করিতে পাইলে যেরূপ সন্তোষ লাভ করে, বোধ করি লক্ষ মুদ্রা পাইলেও সে সেরূপ সন্তুষ্ট হয় না। তবে মদ্যপানকে সুখ বলিতে হইবে কি?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে ভগবান বলিয়াছেন—

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থলভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।

হে অর্জ্জুন! সুখী ক্ষত্রিয়েরাই এইরূপ যুদ্ধলাভ করিয়া থাকে।

কে না জানে যে যুদ্ধের তুল্য আপাততঃ বিরস পদার্থ আর কিছুই নাই? যাহাদের গায়ে সামান্য কুশকণ্টকও বিদ্ধ হইলে নিজে বুক পাতিয়া দিয়া রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, যাহাদের শরীরে সামান্য বেদনা লাগিলেও নিজের শরীরে বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম সেই সমুদয় ভ্রাতা পুত্র মাতুল শ্বশুর প্রভৃতি বন্ধুবর্গ অকাতরে প্রাণ সমর্পণ করিতে বসিয়াছে যাহাদের শরীর শস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে তাহাই আবার নিজের চক্ষে দেখিতে হইতেছে।

যদি বল বলবতী রাজ্যলাভাশা ঐ সমুদয় শোকের ব্যাপার সমুদয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করিতে দেয় না।" কিন্তু বিবেচনা করা উচিত যে যেরূপ রাজ্যলাভাশা বলবতী রহিয়াছে সেইরূপ সকলের মৃত্যুশঙ্কাও ত বলবতী রহিয়াছে। এরূপ স্থলে অর্জ্জুনের সন্তোষ কোথায়? তবে ঐরূপ যুদ্ধকে ভগবান কি প্রকারে সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন?

অতএব চাণক্য-নীতি দ্বারাও সুখ এবং দুঃখ প্রমাণিত হইল না।

ভগবান শুক্রাচার্য্য লিখিয়াছেন—

পরিণামেহি সন্তোষজনকং সুখমুচ্যতে।

যাহার পরিণাম অর্থাৎ শেষাবস্থা সন্তোষ জনক, তাহাকেই সুখ বলা যায়। ইহার বিপরীত দুঃখ।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে মদ্যপায়ী ব্যক্তির পক্ষে মদ্যপান আপাততঃ সন্তোষজনক বটে কিন্তু যখন দুর্দ্দান্ত পুলিষ তাহার কর্দ্দমলিপ্ত অঙ্গে প্রহার করিতে করিতে আদালতে উপস্থিত করে, তখন তাহার সন্তোষ কোথায়? সুতরাং মদ্যপানের পরিণতি অত্যন্ত বিরস, অতএব উহাকে সুখ বলা যায় না।

ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ আপাততঃ বিরস হইলেও উহার পরিণাম অতীব সন্তোষকর, কারণ ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করা, শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা, শক্ত্যনুসারে দান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহা না করিলে নরকগামী হইতে হয়।

গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে

ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন
বিদ্যতে।

হে অর্জ্জুন! ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের অপর শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

শক্তিতঃ দ্বিজমুখ্যেভ্যো দেয়ং রক্ষ্যা
ভয়ার্দ্দিতাঃ।

---

*এক দিবস নবদ্বীপাধিপতি স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর শিরোমণি মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনার কোন বিষয়ে অসঙ্গতি আছে কি? তদুত্তরে শিরোমণি মহাশয় বলিয়াছিলেন কৈ! আমার ত কোন বিষয়ের অসঙ্গতি নাই। তবে ন্যায় শাস্ত্রের টীকার মধ্যে একস্থানে অসঙ্গতি ছিল তাহাও ত বিগত কল্য সঙ্গত হইয়াছে।" বুদ্ধা শিরোমণি মহাশয় অসঙ্গতি শব্দের তার অর্থ বিবেচনা না করিয়া শাস্ত্রের র্থ বুঝিয়াছিলেন। অনন্তর রাজা তাঁহাকে র্থিক সাহায্য করিতে চাহিলে তিনি কহিলেন, মহাশয়! আমার ধনে প্রয়োজন কি? আমার উঠানে এই যে তিন্তিড়ী বৃক্ষ দেখিতেছেন উহা দ্বারাই সুখে স্বচ্ছন্দে আমার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। রাজা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে একটি পয়সা প্রতিগ্রহ করাইতে পারেন নাই।

অরাতিভিশ্চ যোদ্ধব্যং ইতিমে নিশ্চিতা মতিঃ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

শক্যানুসারে ব্রাহ্মণকে দানকরা উচিত। ভয়ার্ত্তদিগের রক্ষা অবশ্যকর্ত্তব্য, এবং শত্রু বর্গের সহিত যুদ্ধ করা বিধেয়। হে কৌশিক! আমি এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছি।

দাতব্যং রক্ষিতব্যঞ্চ যোদ্ধব্যং ক্ষত্রিয়েরিতি গীতঃ পুরাণৈর্মুনিভিরেষ ধর্ম্মসনাতনঃ ॥

চণ্ডকৌশিক নাটক।

দানকরা রক্ষাকরা প্রতিদ্বন্দ্বি ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়দিগের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইলে ক্ষত্রিয়বর্গ অনায়াসে স্বর্গ সুখ লাভকরে। গীতায় উক্ত হইয়াছে

হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বাবা ভোক্ষ্যসে মহীং।

হে অর্জ্জুন! হয় যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ কর, নচেৎ শত্রু জয় করিয়া পৃথিবী ভোগ কর।

অতএব ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ যতই কেন আপাততঃ বিরস হউক না, উহার পরিণাম অতীব সন্তোষকর। এই জন্যই ভগবান ঐরূপ যুদ্ধকে সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা মুক্তযোগী অর্থাৎ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগকে সুখী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহার কারণ তাঁহারা সততই প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহাদের দৈহিক শত সহস্র ক্লেশ হইলেও পরিণামে মুক্তিলাভ হইবে এই বিবেচনায় তাঁহারা সততই আনন্দময়।

শ্রীগোপাল চরণ স্মৃতি ভূষণ।

গীত-পঞ্চক।

নহাষ্টমী—উপলক্ষে।

রাগিণী কালেংড়া—তাল একতালা।

মায়ায় তব বলিহারি ওমা গিরিরাজকুমারি।
(তুমি) নিজে গৌরী পতি তোমায় বাপের বড় ত্রিপুরারি ॥
গোণার চাঁদ কার্ত্তিক নক্ষন, ফেলে গেলে শরবনে, হায় কি কঠিন মন।
ভাগ্যে ছ'জন পেলেছিল, তেঁই সে বেঁচেছে শঙ্করি ॥১॥
গণেশ তোমার আপন ছেলে, গজের মুণ্ড তারে দিলে, হায়, কি বিড়ম্বনা।
সে চড়ে মুষিকাধমে, তুমি 'বেড়াও' সিংহে চড়ি ॥২
সাপুড়ে ভাঙ্গড়পতি, অঙ্গেতে চিতা-বিভূতি, জটা দিগম্বর।
তুমি অন্ন বিলাও জনে জনে, শিব পথের ভিখারী ॥৩
বাপের সুমেয়ে হয়ে, মহিষাসুরে অভয়ে, দিয়েছ চরণ,
সে জোরে বলে পেল চরণ, (আমি) পেলেম না সিমতি করি ॥৪

নবমী উপলক্ষে।

রামপ্রসাদী সুর—তাল আড়াখেমটা।

মা হওয়া মুখের কথা নয়।
মা হতে হলে মার কাজ করতে হয় ॥
সাধ করিয়ে পেটে ধরে ছেলে পালতে নারে যে মায়,
তেমন পোড়ারমুখীর ছেলে মাগো, পেটেধরাই যে অন্যায় ॥১
ছেলে হলে মনের সাধে, মা গায় ফু দিয়ে চলতে না পায়,
ছেলের বিঠামাখা সর্ব্বাঙ্গে আপন হাতেই ধোয়াতে হয় ॥২
না খেয়ে আপনি মায়ে, সন্তানে পেট ভরে খাওয়ায়,
আবার জেগে বসে থেকে কোলে কবে সুতে ঘুম পাড়ায় ॥৩
একটা ছেলে পালতে গিয়ে, কত মা যে খাটে মেনে যায়,
তুমি সাধ করে পেটে ধ'রেছ ওমা চৌদ্দগণ্ডা তনয় ॥৪
যদি এত ছেলে পাসতে এখন, এত কষ্টই মনেতে হয়,
পেটে ধরবার বেলা তা মনে হলেই, সকল গোলযোগ মিটে যায় ॥৫
তোমার শাশুড়ী নাই, নাই বা মাতা, কে তোমার দেখবে তনয়,
তোমার পতিও ভিখারী অতি, দাসী রাখাও সহজ নয় ॥৬
শ্বেতাঙ্গিনী নও ব্রাহ্মিকা, আমার ঘাড়ে দিবে তনয়,
কালি, কালা হিন্দুর মা হয়েছ, ছেলে পালতে হবে তোমায় ॥৭

বিজয়া উপলক্ষে।

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ।

কেমনে তোমারে উমে, বল মা দিব বিদায়?
তুমি-মোদের ছেড়ে যাবে, তা ভেবে বুক ফেটে যায় ॥
তোমার শুভ আগমনে উমে, নিরানন্দ বঙ্গভূমে
আনন্দ-প্রবাহ বহিতেছিল-উৎসব-বায়,
অধুনা বিষাদ-ছায়া আবরিল বঙ্গকায় ॥১
বন্ধ দাসত্ব লৌহনিগড়ে, অধীনতা কারাগারে,
তবু তব আগমনে পাসরিয়ে ছিল তায়,
এবে তব অদর্শনে বঙ্গ হয়েছে মৃতের প্রায় ॥২
হেথা ছিল সবে তিনদিন, বঙ্গ অতি দীনহীন
যা পেয়েছে তাই দিয়ে আদর করেছে
বঙ্গের সম্বল আর, কিবা বিনা অশ্রুজল ॥৩
ছিল কোন কালে সে স্বর্ণপ্রসূ, এবে অন্নাভাবে যায় অসু
ভারতের এদুর্দ্দশায় কার না বুক ফেটেযায়?
কোন্ প্রাণে পাষাণ মেয়ে, বল ছেড়ে যাবে তায় ?৪
দূরে যেয়ে কিবা প্রয়োজন, বঙ্গপুর বটে শ্মশান,
বঙ্গবাসী কাছে কি মা শিব লাগে দীনতায়?
তাই মা বলি, অন্নপূর্ণে, দেওনা, থাক হেথায় ॥৫

কোজাগরলক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

বঙ্গে তব শুভাগমন হ'ক সংসার-বাসিনী
তোমার আশীষ আশে বঙ্গবাসী ফুল্ল বঙ্গ কামিনী ॥
নানা রঙ্গভঙ্গে দিতেছে আলিপনা, ঘরে ঘরে
ঘরে দিতেছে দীপাবলী,
বঙ্গবালা সবে এয়োতী লক্ষণা, দীনবেশভূষা ধারিণী ॥১

গগনে শোভিছে পূর্ণ শশিকলা, হেথা ঘরে
ঘরে শোভে দীপমালা, বরণডালা মাথে দীনা বঙ্গবালা, শুভাগমনা
কাঙ্ক্ষিণী ॥২

খেতে পরতে নাহি পায় বঙ্গবাসী, পুত্রে মিত্রে
সদা নেত্রনীরে ভাসি, তোমায় ঘরে নিতে সতত প্রয়াসী, খেটে মরে
দিবা যামিনী ॥৩

বঙ্গ লৌহময় দাসত্ব-নিগড়ে, দুর্ভর করভার
চাপা পৃষ্ঠোপরে, অন্নাভাবে বঙ্গ কাঁপে থরে থরে, কেশব মনো-
মোহিনী ॥৪

শ্বেতকৃষ্ণ ভেদ শোভে না তোমায়, মায়ের
চোখে সবই সমান-ভনয়, দীনহীন বঙ্গে দাও পদাশ্রয়, ওমা জলধি
নন্দিনী ॥৫

তুমি যারে তুষ্টা সেমা, পীনধন, তুমি যারে
রুষ্টা সে কৌবীন-ধন, তুমি যারে তুষ্টা (তার) কাশীতে মুরণ, (অন্যের
ফাঁসী অবশ্যম্ভাবিনী ॥৬

বঙ্গভূমি ছেড়ে গিয়েছ বিদেশে, তাই বঙ্গ সদা
দুঃখনীরে ভাসে, বস বা না বস এদাস বঙ্গবাসে, (তোমার)
চোখের দেখা দৈন্যহারিণী ॥৭

শ্রীনিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

মতামত।

ছন্দোবোধ শব্দসাগর।—শ্রীকালী মোহন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইতি-পূর্ব্বে আমরা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও রচনা প্রণালী সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি নাই। এক্ষণে কালীমোহন বাবুর সঙ্কলিত তিন খণ্ড শব্দসাগর পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় ইতিপূর্ব্বে রচিত হয় নাই। এই বিশাল গ্রন্থের সঙ্কলনে কালীমোহন বাবু যে, বস্তর পরিশ্রম, বিপুল অর্থব্যয় ও কঠোর প্রয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ইহার যে কোন একটী পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই স্পষ্ট জানা যায়। যতিরক্ষা ও ছন্দের অনুরোধে যিনি যেরূপ শব্দ ইচ্ছা করিবেন ইহাতে সেইরূপই পাইবেন। গ্রন্থখানি বাঙ্গালা শব্দের রত্নভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। পরিশেষে আমরা বন্ধু ভাবে গ্রন্থকারকে দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এরূপ প্রকাণ্ড অভিধানে গ্রন্থকার যেরূপ সতর্কতার সহিত শব্দ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা অতীব শ্লাঘনীয়; তবে প্রথম সংস্করণে এরূপ বিস্তৃত গ্রন্থ প্রায়ই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। "প্রিন্ট" "ফুন্ট" "প্রীচ্‌ট" "ওয়ালশাট" প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় কখনও স্থান পাইতে পারে না; এই প্রকার শব্দ গ্রন্থ মধ্যে নিবদ্ধ না করিলে গ্রন্থ খানি নির্দ্দোষ হইত।

প্রেমানন্দ-লহরী—(১ম খণ্ড) বহু-

রাজার হিন্দু ধর্ম্মপ্রচার-সমিতির তত্ত্বাবধায়ক শ্রীকানাই লাল দে কর্ত্তৃক রচিত। ইহা এক-খানি ক্ষুদ্র গীতি-পুস্তিকা,—সমস্ত গীত গুলিই ধর্ম্ম বিষয়ে। কানাই বাবু যে একজন প্রকৃত ভক্ত, গ্রন্থের গান গুলি দেখিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। গান গুলি সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

হিন্দু পত্রিকা।—হিন্দুধর্ম্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকা, শ্রীযুক্ত নাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। যদু বাবু একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক; সম্প্রতি হিন্দু ধর্ম্মের সেবায় ইহাঁকে আন্তরিক প্রবৃত্ত দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। হিন্দু পত্রিকায় সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক সারবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, বিবিধ দুরূহ বৈদিক রহস্য বিশদরূপে ব্যাখ্যাত ও আলো-চিত হইতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞান ও সমীরণ

শ্রীদ্বারকা নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পা-দিত এবং শ্রীআশুতোষ সেন দ্বারা প্রকাশিত। সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়েই বিশেষ উদ্যোগী। ইহাঁদের চেষ্টায় সমীরণ দ্বিতীয় বর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। অন্যান্য মাসিক পত্রিকা তিন চারি বর্ষেও যে গুণগৌরবের অধিকারী হইতে পারে না, জন্ম-বৎসরেই সমীরণ তাহা লাভ করিয়া একখানি উচ্চ অঙ্গের পত্রিকা হইতে পারিয়াছে, ইহা পরিচালকদিগের সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে। তরুণবয়স্ক কবিরাজ শ্রীমান্ আশুতোষ সেন গুপ্ত স্বীয় মূল্যবান্ সময় ও সম্পত্তি যে, এরূপ সারবান্ সাহিত্য সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি। সমীরণে আয়ুর্ব্বেদের তিনটী প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ লেখক রীতিমত লিখিতেছেন, দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

জারের মৃত্যু।—সুবিশাল রুষ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর মহানুভব এলেক্‌জন্দার গত বৃহস্পতি-বার অপরাহ্ণ ২—১৫ মিনিটে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহার ভুজভঙ্গে ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধ ভাগ শাসিত হইয়াছিল, আজি তিনি পরলোকগত। গতপূর্ব্ব বুধবার সন্ধ্যা হইতে তাঁহার জীবনী শক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে; চিকিৎসকেরা বুঝিতে পারিলেন যে, জারের মৃত্যুকাল আসন্ন; তখনই রাজ্য মধ্য হাহাকার পড়িয়া গেল। লিভাদিয়ার প্রাসাদে পুত্র ভ্রাতা ও আত্মীয় বন্ধুগণের সম্মুখে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জারের জ্ঞান ছিল।

শোক-চিহ্ন। জারের মৃত্যু জন্য সমস্ত সভ্য জগৎ শোক চিহ্ন ধারণ করিয়াছে, অথবা শোক প্রকাশ করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা ফ্রান্স ও বুল্গেরিয়ায় শোক প্রকাশের অধিক আড়-ম্বর;—এই দুই রাজ্যে—বিশেষতঃ শেষোক্ত দেশে এক সপ্তাহ ধরিয়া শোকচিহ্ন বহন করিয়াছিল এবং সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ বন্ধ ছিল।

নূতন জার। পিতার মৃত্যু হইবামাত্র আরিবিচ্ রুষ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ইনি দ্বিতীয় নিকোলস্ নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। সিংহাসনে আসীন হইয়াই নিকোলস্ রাজ্যের সর্ব্বত্র এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে, রাজ্যশাসন বিষয়ে তিনি পিতার পদবী অনুসরণ করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে ও শান্তি বিধানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিবিষ্ট থাকিবেন। ভগবান করুন নবীন সম্রাটের এই বাসনা সফল হউক।

***

যুদ্ধ সংবাদ।—চীন ও জাপানে যুদ্ধ সেইরূপ সমভাবেই চলিতেছে; মধ্যে এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত ছিল; কিন্তু আবার উভয় পক্ষই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। দেশে রাষ্ট্র যে, চীন সম্রাট হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার নাকি আত্মরক্ষা করিবার উপযুক্ত উপায় নাই;—এমন কি জাপান যদি রাজধানী পিকিন পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, চীন সম্রাট তাহার গতি রোধ করিতে পারিবেন না; কথাটা সত্য কি না বলা যায় না। চীন কি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, জাপানকে কিছুতেই আঁটিতে পারিবে না? এ দিকে আবার নাকি সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে। সভ্য জগতের প্রধান প্রধান রাজমণ্ডল প্রস্তাবিত সন্ধিবন্ধনে মধ্যস্থ থাকিয়া চীনকে যে পরিমাণে ক্ষতি-স্বীকার করিতে বলিবেন, চীন সম্রাট তাহাতেই সম্মত হইবেন। জাপান এখন সন্ধি স্থাপনে স্বীকৃত হইলে হয়।

***

আমির।—এলেকজন্দা ও আবদর রহমন উভয়েরই উপর রাহুর দৃষ্টি পড়িয়াছিল; এলেকজন্দার তাহা হইতে রক্ষা পাইলেন না, কিন্তু আবদর রহমন প্রাণে প্রাণে এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলেন। আশার অর্দ্ধেক ফলও ভাল। আমির আরোগ্য লাভ করাতে ভারতের কতকটা মঙ্গল বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে কি ঘটে, কিছুই বলা যায় না। নবীন রুষ সম্রাট নিকোলস্ যদি পিতার শান্তিময়ী নীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলেই জগতের মঙ্গল, নতুবা অনেকের বিপদ বলিতে হইবে।

***

কাবুলী-উপদ্রব।—বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই কাবুলীর উপদ্রব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে যাহারা সহরে সহরে কেবল মেওয়া ফল বিক্রয় করিয়া বেড়াইত, আজি কালি তাহারা দেশীয় সকল প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যেই একচেটিয়া করিবার চেষ্টা করিতেছে। কেবল পাশব বলের সাহায্যে নিরীহ বাঙ্গালীদিগকে নানাপ্রকারে ভয় দেখাইয়া এই সকল দুর্ব্বৃত্ত বর্ব্বর দেশীয় ব্যবসায়িগণের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বঙ্গের প্রত্যেক সহরেই এবং বড় বড় গণ্ডগ্রামে ইহাদের দোকান দেখা যায়। কিন্তু কেবল ব্যবসা করিয়াই নিরস্ত নহে;—ডাঙ্গা হাঙ্গামা মারপিট্ জবর্দ্দস্তিপ্রায়ই করিয়া থাকে; আবার নাকি সুবিধা পাইলে লুটপাটও করিতে ক্ষান্ত থাকে না। এখন শীত আরম্ভ হইল; এই সময়ে ইহাদের প্রাদুর্ভাবে দেখা যাইবে। কিন্তু ইহাদের কি দোষ দিব? আমাদের দেশের লোক ইহাদের নিকট দ্রব্যাদি কেন ক্রয় করেন, তাহা বলিতে পারি না।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ। ৩০শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। সপ্তবিংশ সংখ্যা

কন্যাদায়।

হিন্দুর সমাজে থাকিয়া দুইটি দায় আছে। একটি মাতৃ-পিতৃ দায়, অপরটি কন্যা দায়। যাহা কর্ত্তব্য, যাহা অপরিহার্য্য, যাহা না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়, তাহাই দায়। হিন্দুর পক্ষে কন্যা সৎপাত্রসাৎ করা সংসারের এক প্রধান কর্ম্ম। কন্যা অপাত্রে ন্যস্ত হইলে পিতা পাপে লিপ্ত হয়েন। কেবল ইহাই নহে; কন্যাকাল সম্বন্ধেই; আদ্য ঋতুর পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। ইহার জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইলেও, লোকের দ্বারস্থ হইতে হইলেও, নিজ মান মর্য্যাদা ত্যাগ করিতে হইলেও তাহা স্বীকার্য্য। ধন, মান, পদমর্য্যাদা এক দিকে, আর অপর দিকে সৎকুল ও সৎপাত্র। হিন্দু-পিতা পূর্ব্বের সকল তুলিই সৎ পাত্র-প্রাপ্তি আশায়, বলিদান দিতে প্রস্তুত। কাযেই হিন্দুর ঘরের মেয়ের বিবাহ একটা বিষম এবং বিরাট ব্যাপার। আজ কাল মেয়ের বিবাহ দিতে অনেকের বিশেষ অসুবিধা এবং নির্য্যাতন সহিতে হইতেছে। বিবাহ ব্যাপার ব্যয়-বাহুল্য হইয়া পড়িয়াছে এবং অতিশয় অপমানকর হইতেছে, ভাই দেশ-ব্যাপী আন্দোলনের সূচনা হইতেছে; ব্যথিত পিতৃগণের যাতনার শব্দে সমাজ কম্পিত হইতেছে। সুতরাং এখন এ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক।

বাঙ্গালীর সমাজে কন্যার বিবাহ এত দুরূহ এবং ব্যয়-সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে তিনটি কারণে। প্রথম বল্লালী কৌলিন্য প্রথা, কত-কাংশ উঠিয়া গিয়া তাহার স্থানে কালেজী কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে কালে স্মৃতি-বিষ্ণুর সন্তানগণের, শুকৃত-ভঙ্গের পুত্রের ও সাবর্ণ চৌধুরী অথবা মজুমদারদিগের দৌহিত্রগণের যে মান্য এবং পদমর্য্যাদা ছিল, একালে এম, এ, বি, এ পাশ করা, চসমা ধরা,

কামিজ পরা, উৎকট ইংরাজী শব্দ ব্যবহার, এটি বাবুদিগের তদানীন্তন সভ্যতা গুণে আদর এবং গৌরব বাড়িয়াছে। সে কালে কুলীনের ছেলেকে কন্যাদান করিতে হইলে দু দশ বিঘা জমী, বাগান, পুষ্করিণী দান করিলেই হইত এবং পরে তাহার পুত্র কন্যাগণকে ভরণপোষণ করিতে হইত। এখন টাকার প্রচলন অধিক, তাহার উপর ইংরাজী তেজারতী বুদ্ধি প্রবল, কাযেই হিন্দু-পিতা নগদ টাকা দিয়া একেবারে সকল পাপ মিটাইতে চাহেন। ফলে একেবারে অনেকগুলি টাকা দিতে হয়।

দ্বিতীয় কারণ, সে কালে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল। বড় কুলীনের ব্যাটা বড় বড় ঘরে বাইশ বার বিবাহ করিতে পারিত। সুতরাং সে কালের লোকের বুদ্ধিমত বাইশটি কন্যা একজন সৎপাত্রের হস্তে ন্যস্ত হইত। যদিচ সংখ্যায় কন্যা অধিক ছিল; কিন্তু বহু বিবাহের গুণে এবং পরিবর্ত্ত প্রথার প্রচলন থাকায় বিবাহ ব্যাপারে তখন সৎপাত্রের বাজার এত অধিক কখনও চড়িতে পারিত না। এতদ্ব্যতীত তখন কেবল কুলীনের ছেলে হইলেই সৎপাত্র হইত, এখন পাস-করা,চস্‌মা-পরা না হইলে সৎপাত্র হয় না। তবেই তখন সৎপাত্র এখনকার অপেক্ষা অধিক ছিল। হালের সৎপাত্র একে সংখ্যায় অল্প, অপরন্ত একটি বই দুইটা বিবাহ করিবে না। তাই এখনকার বিবাহ-বাজার বড় গরম, বড় চড়া।

তৃতীয় কারণ; এখন ইংরাজী পড়িয়া, ইংরাজের চাকুরী করিয়া, ইংরাজের অনুকরণে সাজ পোষাক করিয়া হিন্দু সমাজে মর্য্যাদার একটা নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। সে কালে টিকি-উড়া, গায়ে খড়ি-উড়া, পাঁচি-ধুতি-পরা, নিরক্ষর, শূন্যগর্ভ, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যাইলেও যে সমাদৃত সম্মান এবং মর্য্যাদা পাইত। এ কালে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইলেও, যদি মাথায় শিখা প্রবল হয়, এবং যথাস্থানে ইংরাজীর চুকুনী না চলাইতে পারেন, এবং অর্থাভাবে পরিচ্ছদ যথারীতি না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে, সুবর্ণ বণিকের বাটীতে যাইলেও কেহ আহ্বান করিয়া বসিবার আসন দিবে না। ইংরাজী শিখিয়া পুরাতন জাতিভেদ উঠাইবার যোগাড় হইতেছে বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে একটা নূতন পাশ্চাত্য জাতিভেদের সেবনও হইয়াছে। সুতরাং এখন বড় উকীলের কন্যার বিবাহ দিতে হইলে বামনের দোকানের মুখুয্যে মহাশয়ের শিখাযুক্ত পুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে না; দিতে হয় ত সমকক্ষ উকীল বাবুর পুত্র হইলে সর্ব্বাংশে ভাল, নচেৎ পাঁচটা পাস করা, চসমা পরা, ক্ষীণ দৃষ্টি ক্ষুদ্রহীন, শক্তিহীন, গৃহ-দ্বার শূন্য দরিদ্র বাবু পাত্রের সহিত দেওয়াও তদপেক্ষা শ্রেয়স্কর। কাজে কাজেই চাকুরে ও উকীল বাবুদের কন্যার বিবাহ দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। একে ত পুরাতন ধারণা ও বিশ্বাস গুলি একেবারে হৃদয় হইতে উন্মূলিত হয় নাই, তাহাতে গৃহিণীও পুরা হিন্দুভাবগ্রস্ত, তাই কন্যা নবম বর্ষ উত্তীর্ণ হইলেই হৃদয়ের ভিতরে একটা ছটফটানি ধরে, তাহাকে সৎপাত্রসাৎ করিবার জন্য বিশেষ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা হয়। তাহার উপর নূতন নূতন আরও অনেকগুলি আধি ব্যাধি আসিয়া জুটিয়াছে। ছেলেটি চারিটা পাস করা চাই, মেয়েলে কৌলীন্য হিসাবেও করণীয় ঘর হওয়া চাই, পুরুষ-পর্য্যায় সবই ঠিক থাকা চাই, কিছু অর্থ সঙ্গতিও থাকা আবশ্যক, কেন না দৌহিত্র মানুষ করা এখনকার ফ্যাসান নাই। বিবাহ আদান প্রদান, ঠিনি যেমন

সামগ্রী চাহিবেন, তাঁহাকে তদনুযায়ী মূল্য দিতে হইবে। এখন আমাদের আয় ৩১; সামগ্রী আবশ্যক, তাই তাহার দামও আজ ৩৭ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সেকালে কন্যাদায়-গ্রস্ত কোন পিতা সৎপাত্রের দ্বারস্থ হইয়া বিপদ জানাইলেই, তখনকার লোকে তাহাকে উদ্ধার করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। এখন লোক লৌকিকতা নাই, চক্ষুলজ্জা নাই, "ডিউটি বোধ" এবং "কন্‌সেন্স" এ সকল বালাই চুকাইয়াছে। কাজেই এখন কেহ কাহারও দ্বারস্থ হইলেই, পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য বোধের বিষম ব্যাত্যায় দয়া মায়া সব উড়াইয়া দেয় এবং হিতাহিত জ্ঞানের সূক্ষ্ম চিরে মনুষ্যত্বও নির্ম্মূল হয়। ফলে, কন্যার পিতার অনেক অপমান সহ্য করিতে হয়। তাহার উপর আবার প্রতিশোধ বুদ্ধি। সকলেরই ছেলে মেয়ে আছে; মেয়ের বিবাহের কষ্ট ও অপমান ছেলের বিবাহকালীন সুদ সমেত আদায় করিয়া লইবার প্রায় সকলেরই অধির এবং ইচ্ছা। সুতরাং ব্যাপার বড় বিষম।

আমরা যে সকল কারণ গুলি বলিলাম এবং যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলাম, তাহাতে আমাদের বোধ হয় যে, এ রোগের মহৌষধি আমাদের রাছেই আছে; এবং বিধর্ম্মী, বিদেশী বিজেতা রাজা আইনের দ্বারা কখনই ইহার প্রতিরোধ অথবা উপশম করিতে পারিবেন না। যদি আইনের সাহায্যে সামাজিক সকল ব্রণ অবাধ হইতে পারিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডেশ্বরীর বিশাল রাজ্যের মধ্যে কোন স্থান তাপ থাকিত না। আইনের দ্বারা কখনও কোনখানে কোন সামাজিক ব্যাধির উপশম হয় নাই এবং হইবেও না। আমরা দশজনে একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই এ বিভ্রাট নিমেষের মধ্যে অপসৃত হয়। যাহা হউক, এ কথা পরে হইবে, এখন দেখা উচিৎ আপাততঃ কি কি 'উপায় উদ্ভাবন হইয়াছে এবং সে সকল আমাদের কেমন উপযোগী।

এ আন্দোলনের আপাততঃ প্রধান উদ্যোগী বাবু রসিকলাল রায়। তিনি অপর কি কি উপায় করিয়াছেন আমরা জানি না; তবে শুনিয়াছি, তিনি নাকি বড় লাট, ছোট লাট, ইতি বড়, মেজ, সেজ, ছোট, নাগায়েৎ চুনা পুঁটির কাছেও ইংরাজী ভাষায় কাতর বচনে আবেদন করিয়াছেন এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রও নিজে পাইয়াছেন। অধিকন্তু তাঁর শ্লেষ বচনে, গর্ব্বোক্তি দ্বারা এবং পূর্ব্বাবাক্যের সাহায্যে "বঙ্গবাসীর" মাথায় পাথর ভাঙ্গিয়াছেন, এবং দেশের ও সমাজের অযথা নিন্দা ও অপবাদ করিয়াছেন। বস্, তাঁহার দ্বারা জজুগের এই রূপ সূচনা। আমরা সমতলক্ষেত্রবাসী উত্তুঙ্গ গিরীশৃঙ্গের পরিমার্জ্জিত ও সূক্ষ্ম বায়ু সেবন আমাদের ভাগ্যে নাই, কাযেই রসিক বাবুর এ সদুপায় কতদূর ফলোপধায়ক হইবে, তাহা আমাদের ম্লান বুদ্ধির অতীত। রসিক বাবু আমাদের বহুদিনের পরিচিত, তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষার কথা অনেকটা আমরা জানি বলিয়া, আমাদের ধারণা; তাই বলিতে ইচ্ছা করে যে, তাঁহার এতদিনের সোধিত সাধ এখন পূর্ণ হইয়াছে, তিনি দেশ-খ্যাতা, লোকমান্যন, সাহেব-জানা প্রথ্যাতযান্ ব্যক্তি হইয়াছেন। এ খ্যাতির উচ্চতর সোপানে দিন দিন তিনি আরোহণ করিতে পারিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। তাহার পর, তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কন্যাগুলি বোধ হয় ভগবানের কৃপায় এখন বয়স্থা ও বিবাহ-যোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে; এই হুজুগে যদি তাহারা সৎপাত্রসাৎ হয় ত

আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ভাল হইতে পারে, অন্ততঃ তাঁহার চক্ষে ত খুবই ভাল। তবে আমরা বুঝি যে, দেশের কুৎসা এবং নিন্দার ডালি লইয়া রাজ সরকারে কখনও উপস্থিত হইতে নাই; পদদলিত জাতির সমাজ অঙ্গে বিদেশী রাজার কর-স্পর্শ অন্যায় এবং অনুচিত। তাহার উপর স্বরের পরের সকল কথা লইয়া রাজার সমক্ষে ঘোঁট করিতেও নাই। যে করে, সে দেশের শত্রু এবং সমাজের শত্রু। ইংরাজের সমাজে কি কুপ্রথা নাই! মধ্যে মধ্যে যে দুই একটা কথা বিলাতের "সোসাইটি পেপারে" এবং মিশনরীগণের কাগজে বাহির হয়, তাহাতেই জানা যায় আমাদের ন্যায় তাহাদের সমাজও অব্যবহার ও অনাচারের দুর্গন্ধে আমোদিত। কিন্তু কয়জন ইংরাজ পার্লামেণ্টে ইহার জন্য আবেদন করেন, এবং পার্লামেণ্টও কয় জনের কথায় কর্ণপাত করেন? সমাজের দশজন মিলিয়া যাহা করিতে পারিবে, বিদেশী রাজা শত চেষ্টা করিলেও তাহার শতাংশের এক অংশও সম্পন্ন করিতে পারিবেন না। রসিক বাবুর বয়স হইয়াছে, তিনি বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য, তিনি চিন্তাশীল এবং উদ্যোগী এবং সাধু ও চরিত্রবান্, তাঁহার পক্ষে তাড়াতাড়ি হুজুগের হৈ চৈতে মাতিয়া উঠা ভাল হয় নাই। *

* এই যে তিনি লাট বড় লাটের সেক্রেটরী প্রেরিত স্বহাস্তাক্ষরযুক্ত পত্র সকল পাইয়াছেন এবং যাহা তাড়াতাড়ি সংবাদপত্রে মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা সমাজের কি উপকার হইল, অথবা হইবার আশা আছে? তিনি কি মনে করেন লাটের চিঠির নকল দেখাইয়া, আইনের ভয় দেখাইয়া দেশের লোককে তাঁহার মতানুগামী করিবেন? তিনি কি মনে করেন এত বড় বড় সাহেবের চিঠি পাইয়া তিনি বড় লোক ও দেশ-মান্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কথা সকলেই অবনত মস্তকে স্বীকার করিবে! যদি তাঁহার এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে ত তাঁহাকে আমরা "বড়ই ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় একটী জীবন পণ করিয়াও দেশে বিধবা-বিবাহ চালাইতে পারেন নাই, ন্যায়রত্ন মহাশয় মাথা কুটিয়াও যখন বিলাত-ফেরতদের সমাজে চালাইতে পারিলেন না, তখন তাঁহার ন্যায় একজন সামান্য রেলওয়ে কর্ম্মচারীর দুই দশ খানি চিঠিতে এ বিশাল, অসাড়, নিষ্পন্দ সমাজ যে বিচলিত হইবে তাহা অসম্ভব। হুজুগ অনেক হইয়াছে, হুজুগ অনেক হইবে, কিন্তু কেহ সহজে এই পুরাতন সমাজের আমূল সংস্কার করিতে পারিবেন না।

ইহার পর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয়ের সুচিন্তিত এবং সদযুক্তিপূর্ণ এবং সংকথা-সম্বলিত দুইটি প্রবন্ধ, যাহা সম্প্রতিই "অনুসন্ধানের" ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার বিপক্ষে আমাদের কোন কথাই বলিবার নাই, বরং তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা অনেক চিন্তার সামগ্রী পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহার উত্থাপিত বরের "রেটের" কথা এবং বিরাট বৈঠকের কথা লইয়া আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। তিনি বলিয়াছেন যে "প্রাচীন কৌলীন্য মর্য্যাদার মূল্যের ন্যায় বরের মূল্য ধনী নির্ধন সকল ক্ষেত্রে সমান হওয়া আবশ্যক।" আমাদের বিশ্বাস ইহা অসম্ভব এবং এরূপ বাঁধাবাঁধি করিলে উহা বহুদিন স্থায়ী হইবে না। মানুষের পুত্র কন্যার উপর প্রায় একই রকম স্নেহ থাকে। যে টুকু পুত্রের উপর অধিক স্নেহ দেখা যায়, তাহা কেবল যে বংশের নাম রক্ষা করিবে এবং অসময়ে সাহায্য করিবে এই আশায়। প্রকৃত স্নেহ

সমতা দুইএর উপর প্রায় সমানই হয়। যে ঐশ্বর্য্যবান্ ও ধনসম্পত্তিশালী, সে সহজেই কন্যাকে দান-সময়ে অধিক অর্থ ও অলঙ্কারাদি দিতে চাহিবে এবং এরূপ দান যে অন্যায় ও অনুচিত তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। পিতা যেমন পুত্রকে ধন ঐশ্বর্য্য দিবেন, তেমনি কন্যাকেও সুখী ও স্বচ্ছল রাখিতে তাঁহার ইচ্ছা হইবে। এখন, যদি "রেট" একটা বাঁধা থাকে ত প্রথমতঃ দুঃখী দরিদ্র পিতা, যিনি রেট অনুযায়ী টাকা যোগাড় করিতে না পারিবেন, তাঁহার কন্যার বিবাহ হওয়া দুষ্কর হইবে। আর ঐশ্বর্য্যশালী পিতা স্বেচ্ছায় অধিক দান করিলে সমাজে গণ্ডগোল হইবে। কারণ বরকর্ত্তারা ভিতরে ভিতরে কন্যাকর্ত্তাগণের উপর জোঁক করিয়া, মোচড় দিয়া টাকা বাহির করিবার বিশেষ উদ্যোগ, চেষ্টা ও তদ্বির করিবেন এবং প্রকাশ্যতঃও বলিবেন যে, কন্যার পিতা স্বেচ্ছায় অধিক দান করিতেছেন।" কাযেই বিবাহ ব্যাপারেও একটা ঘুষের পথ খোলা হইবে। হিন্দু-পিতা পুত্রের বিবাহ যতদিন ইচ্ছা ততদিন স্থগিত রাখিতে পারেন, তজ্জন্য না সমাজ তাঁহাকে তিরস্কার করিবে, না তিনি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন। পক্ষান্তরে হিন্দু-পিতা বয়স্থ বিবাহ আদৌ ওতুর পূর্ব্বে না দিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিবেন না। নচেৎ তাঁহার ধারণা, তাঁহার ধর্ম্ম সকলই কলুষিত ও নষ্ট হইবে। সমাজে তিনি তিরস্কৃত হইবেন। সুতরাং তাঁহারই গরজ অধিক। যাহার গরজ তাহাকেই সকল অসুবিধা ভুগিতে হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিব। কিছু দিন হইল বিহার অঞ্চলের ভাগলপুর ও পাটনা বিভাগের কায়স্থ লালাগণ পঞ্চায়ত করিয়া কন্যা-বিবাহের একটা "রেট" বাঁধিয়া দেন। কেবল আমাদের বাঙ্গালা দেশেই যে বিবাহ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে তাহা নহে; বিহারের লালাগণও কন্যার বিবাহ দিতে সর্ব্বস্বান্ত হয়। তাহাদের মত খরচ এবং অপব্যয় আমরা করিতে পারিনা, কৃষিতে আনিও না। যাহা হউক; লালাকায়স্থগণ দান, পণ, আমোদ-প্রমোদ, পাথেয় ইত্যাদি সকল বিষয়ের বাঁধা-বাঁধি রেট করেন, এবং তদনুযায়ী কিছু দিন কার্য্য চলে; পরে লুকাচুরী ঘুষ ঘাষ চলিতে লাগিল; এখন সকল নিয়ম, সকল বাঁধুনি ফাঁসিয়া গিয়াছে। একটা কথা আরও বলিয়া রাখি যে, আমাদের অপেক্ষা বিহারী সমাজের বাঁধুনি অধিকতর দৃঢ় এবং তাহাদের সমাজপতি আছে ও তাহারা অধিনায়কের কথামত কার্য্য করিয়া থাকে। এত বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিয়াও লালাকায়স্থগণ বিবাহ ব্যয় সংকোচ করিতে পারিল না। ফলে কেবল আত্মবিরোধ এবং ঈর্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। যদি পুত্রের বিবাহের একটা কাল নির্দ্ধারণ করা থাকিত, তাহা হইলে উভয় পক্ষের গরজবশতঃ ব্যয় বিষয়ে কতকটা সঙ্কুলান সম্ভব হইত। যত দিন তাহা না হইবে, ততদিন সকল আন্দোলনই নিরর্থক হইবে,—কেবল গলাবাজী ও কলমবাজীই সার হইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট।

(১)

আজ কয় দিন হইল, সুন্দরপুর গ্রামে কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। সন্ন্যাসীর ক্রিয়া কলাপ অলৌকিক। যাহাকে যাহা বলিতেছেন তাহাই ফলিতেছে, যাহাকে যে ঔষধ দিতেছেন, সেই ঔষধেই তাহার পীড়া আরোগ্য হইতেছে। বিশেষতঃ, সন্ন্যাসী কাহারও নিকট হইতে পয়সা বা শুক্লাদি লয়েন না। সমস্ত দিন অনাহারে থাকেন, সন্ধ্যার পর একটু দুগ্ধ মাত্র খান, তাহাও যদি কেহ তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক দিয়া যায়, নচেৎ তিনি উপবাসীই থাকেন। তিনি কিছু লইতেন না সত্য, কিন্তু তথাচ তাঁহার সম্মুখে, চাউল, পয়সা, দুগ্ধ, রম্ভা, বাতাসা প্রভৃতি দ্রব্য সকল রাশিকৃত থাকিত। যেহেতু সমাগত ব্যক্তিগণ কেহই শূন্য হাতে আসিত না, আসিবার সময় কিছু না কিছু হাতে করিয়া আনিত, এবং সন্ন্যাসীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেখানে রাখিয়া যাইত। সন্ধ্যার সময় তিনি সেই সকল জিনিস দরিদ্র এবং ভিক্ষুকদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন। ফলতঃ অল্প দিনের মধ্যেই সন্ন্যাসীর নাম চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

সুন্দরপুর গ্রামটি সাধারণতঃ ভদ্রপল্লী; ৪০। ৫০ ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস। গ্রামের বহির্ভাগে 'কালীতলায়' সন্ন্যাসী ঠাকুর আশ্রয় লইয়াছেন। "একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষ, তাহার নিম্নে সংস্কারাভাবে জীর্ণ একটি প্রাচীন মন্দির অথবা একটি ইষ্টক স্তূপ বলিলেই হয়, কালীতলা বলিয়া বিখ্যাত। পূর্ব্বে এই মন্দিরে চতুর্ভুজা করাল কালী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই জন্য ইহার নাম 'কালীতলা' হইয়াছিল। তাল গাছ নাই কিন্তু অদ্যাপি "তালপুকুর" নাম টুকু ঘুচে নাই। গ্রামের লোকে কখন কখন কোন মানসিক করিয়া কালীতলায় পূজা দেয়, তদ্ভিন্ন বৎসরান্তর কালীপূজার দিন গ্রামের সকলে একত্র হইয়া পূজা দিয়া থাকে। কালীতলার নীচে দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত এবং নিকটেই গ্রাম্য শ্মশান; সুতরাং সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, বটবৃক্ষটি ভূতের প্রধান আড্ডা। এই কারণে এই স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন ছিল।

গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই মুখে সন্ন্যাসীর কথা। পাড়ার মেয়েরা দল বাঁধিয়া জল আনিতে আনিতে সন্ন্যাসীর গল্প করিতে ছিল। কুলবধূরা রান্নাঘরে বসিয়া সন্ন্যাসীর কথা আলোচনা করিতেছিল। বৃদ্ধারা তপ জপ তুলিয়া সন্ন্যাসীকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে ছিলেন। যুবকেরা বাহিরে বসিয়া সন্ন্যাসীর গুণ ব্যাখ্যা করিতেছিল। লোকানদার বেচা কেনা ফেলিয়া সন্ন্যাসীর কথা বলিতেছিল। কৃষক ভুঁই নিড়াইতে নিড়াইতে সন্ন্যাসীর দানশীলতার বিস্তর সুখ্যাতি করিতেছিল। ফলতঃ সন্ন্যাসী সকলকেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল। দুইজন লোক একত্র হইলেই সন্ন্যাসীর কথা।

গ্রামের প্রবীণা ও প্রৌঢ়া রমণীগণ প্রত্যহ বৈকালে সন্ন্যাসী সন্দর্শনে অথবা একদিন রমণীগণ প্রস্থান করিবার কিয়ৎকাল পরেই একটি যুবক ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইল। যুবকের মুখখানা দেখিয়া বোধ হয় যুবক কিছু চিন্তিত। হৃষ্টপুষ্ট, সবল শরীর, শ্যামবর্ণ,

বিস্তৃত বক্ষ, প্রশস্ত ললাটদেশ, যুবকের উচ্চ বংশের পরিচয় দিতেছে। যুবক সন্ন্যাসীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। যুবক একপার্শ্বে উপবেশন করিল।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব পশ্চিমগগণে ঢলিয়া পড়িলেন। আধার আসিয়া জগৎ সংসারকে গ্রাস করিল। পক্ষীগণ ত্রাসে কূজন করিয়া উঠিল। প্রস্ফুটিত কুসুমের গন্ধ বহন করিয়া সান্ধ্য সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। সন্ধ্যাকাশে দুই একটি তারকা উদয় হইল। কৃষকগণ মাঠ হইতে একে একে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। যে দুই একটি লোক সন্ন্যাসীর নিকট বসিয়াছিল, সন্ধ্যা হইল দেখিয়া তাহারাও আস্তে আস্তে উঠিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। স্থানটি সম্পূর্ণ নির্জ্জন হইল।

পূর্ব্বোক্ত যুবক তখনও সেইভাবে বসিয়া আছে সন্ন্যাসী ডাকিলেন :—

"ললিত!"

আশ্চর্য্য! সন্ন্যাসী তাহার নাম জানিতে পারিল কি প্রকারে? কিন্তু সে ভাব শীঘ্র গোপন করিয়া ললিত উত্তর দিল :—

"দাসের প্রতি কি আজ্ঞা, প্রভো!"

সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে বলিলেন;—

"ললিত! বিস্মিত হইও না। তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ তাহাও আমি অবগত আছি। কিন্তু যদি কোন অপ্রিয় কথা হয়, তাহা শুনিতে প্রস্তুত হও; হৃদয়ে বলসঞ্চার কর।"

ললিত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল :—

"প্রভো! আমার অবাধ্যতার জন্য ক্ষমা করুন শীঘ্র আমাকে বলুন। যতই কঠোর হউক না কেন, তজ্জন্য আমি হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়াছি।"

সন্ন্যাসী ললিতের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন;—

"বৎস, উতলা হইও না;—যাহা বলিতেছি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। বিপদে অধৈর্য্য হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে। সংসারে বাস করিতে হইলেই বিপদের সহিত যুদ্ধ করা উচিত। তোমরা সংসারী, সুতরাং সর্ব্বদাই তোমাদের বিপদ আছে; সংসারী জীবের বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত। যদিও আমরা উদাসীন, তত্রাচ বিপদের ভয় এখনও আমাদের আছে। সে বিপদ,—কাম ক্রোধাদি। কিন্তু সে বিপদ এমন আর আমাদের অধৈর্য্য করিতে পারে না। সর্ব্বদাই ধর্ম্ম কর্ম্ম কর, নিষ্কামী হও, বিপদে আর তোমাকে কিছুই করিতে পারিবেক না। সর্ব্বদা মনে রাখিও, ভগবান কখনও অদূরদর্শী বা অবিবেচক নহেন। তিনি যাহা করিতেছেন বা করিবেন, তাহা, সমস্তই তোমার মঙ্গলের জন্য করিতেছেন। বিপদও লোকের মঙ্গলের জন্য হইয়া থাকে। বিপদকে যাহারা মঙ্গল, দুঃখকে যাহারা সুখ বিবেচনা করে, তাহারাই মহৎ ব্যক্তি। কামনা-শূন্য হইয়া যিনি কর্ম্ম করেন তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক।"

ললিত কম্পিত কণ্ঠে বলিল;—

"প্রভো! আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।"

সন্ন্যাসী বলিলেন;—

"আমি তোমার কথায় বিশেষ প্রীত হইলাম। সম্প্রতি তোমার স্ত্রীর গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে। সন্তানের মুখ-দর্শন মাত্রেই তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ পাইলে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। তোমরা সভ্য হইয়াছ, আজ কাল অদৃষ্ট মান না; কিন্তু এ কথা আমি স্বরূপ কহিলাম। তবে ইহার প্রতিবিধানের এক উপায় আমি বলিয়া

দিতেছি শ্রবণ কর। কামরূপে আমার গুরু আছেন; তুমি সেইখানে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর। তিনি ঋষিতুল্য ব্যক্তি। আমার কথা তাঁহার নিকট বলিও; তিনি যেরূপ উপদেশ দেন সেইরূপ করিও। তিনি যাহা বলিবেন, কখনই তাহা লঙ্ঘন হইবেক না। কিন্তু বৎস, কর্ম্মের কথা যাহা বলিলাম, তাহা যেন মনে থাকে; নিষ্কামী হও তোমার কোন বিপদ থাকিবেক না।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী নীরব হইলেন। ললিত বলিল,—

"প্রভো! আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য। আমি শীঘ্রই কামরূপে যাইব।" এই বলিয়া ললিত সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বাটী অভিমুখে প্রস্থান করিল।

(২)

রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। সুন্দরপুর গ্রামে কোন অট্টালিকাস্থ দ্বিতল প্রকোষ্ঠে ষোড়শ বর্ষিয়া একটি বালিকা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বালিকা দেখিতে শ্যামবর্ণ, হস্তপদাদি সোনালা-গালাল, মুখখানি কমনীয় বালিকা-সুলভ সরলতাময়। চক্ষু দুইটী ডাগর ডাগর; মাথায় ঘন কৃষ্ণ চিকুর রাশি। ফলতঃ বালিকাকে সর্ব্বাংশে সুন্দরী বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে সুন্দরপুর গ্রামে ধনী লোকের সংখ্যাই অধিক ছিল। কিন্তু আধুনিক অবস্থা তত ভাল নহে। আমরা যে বাড়ীটীর কথা বলিতেছি, সে বাড়ীটি ভৈরবচন্দ্র বসুর। ভৈরব বাবু সুন্দরপুরের মধ্যে ধনী এবং ক্ষমতাশালী ছিলেন। কোন মহকুমায় পেস্কারী করিতেন। সেকেলে পেস্কারী, সুতরাং মহকুমাটী তাঁহারও হাতের মধ্যে ছিল। মাসকাবারে কত টাকা উপার্জ্জন করিতেন তাঁহার হিসাব হইত না। তাঁহার বাসায় প্রত্যহ ১৫০ খানা পাতা পড়িত; যে যাইতেসেই খাইতে পাইত। ভৈরব বাবু অন্নদানে কাতর ছিলেন না। ভৈরব বাবু পয়সা পাইতেন সত্য, কিন্তু সঞ্চয় করিতে জানিতেন না; দান ধ্যানও বিস্তর ছিল। বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত।

ভৈরব বাবুর নজের সন্তানাদি ছিল না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার একটি মাত্র পুত্র ছিল। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। ভ্রাতুষ্পুত্রটি জ্যেঠা মহাশয়ের অত্যন্ত আদর পাইয়া স্কুলে যাইত না; সুতরাং মা সরস্বতীর সহিত পরিচয় খুব কমই হইয়াছিল। বিশেষতঃ ভ্রাতুষ্পুত্রের একাদশ বৎসর বয়সের সময়, নিকটস্থ কোন সম্ভ্রান্ত বংশের একটি সুপাত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া ভৈরব বাবু কুল রক্ষা করেন এবং পুত্রবধূর মুখ দর্শন করেন। তাহারপরই ভৈরব বাবুর মৃত্যু হয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং সংসারে একমাত্র নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাখিয়া তিনি পরলোকে গমন করেন।

তখন সময় বুঝিয়া চারিদিক হইতে অসংখ্য আত্মীয় বন্ধু আসিয়া তাহাদের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। অসময়ে নাবালকের সাহায্য করিতে আসিয়া যে যেদিক দিয়া পারিলেন—সমস্ত আত্মসাৎ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভৈরব বাবু অর্থ সঞ্চয় করিতে জানিতেন না; সুতরাং নগদ অর্থ ছিল না বলিলেই হয়। বিষয় আশয় প্রভৃতিও তদ্রূপ; ৫।৬ শত টাকা বাৎসরিক আয়ের অধিক ছিল না। ভৈরব বাবু কেবল বাড়ীটি নির্ম্মাণ করেন, এবং অনেক রৌপ্যের বাসন, আশা-সোটা, আসন প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন

পরে সে সব জিনিষ যে কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল কেহই বলিতে পারে না।

দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে এক জন বালিকা বসিয়া আছে। এমন সময় তাহার পার্শ্বে শব্দ হইল। বালিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। অতঃপর যুবক সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। হঠাৎ বালিকার মুখ মৃদুভাবে ফুল্ল হইল। কিন্তু যুবকের আকার ইঙ্গিত দেখিয়া, পরক্ষণেই মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্রমার ন্যায় বালিকার মুখমণ্ডল বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিল।

যুবক গৃহে প্রবেশ করিয়াই শয্যায় শুইয়া পড়িল। বালিকা সভয়ে এক পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে বীজন করিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ে নির্ব্বাক্ রহিল। পাঠককে কি বলিয়া দিতে হইবে—এই যুবকই আমাদের পূর্ব্বোক্ত ললিতকুমার, এবং বালিকা তাহার সহধর্ম্মিণী।

পরিশেষে বালিকা হৃদয়ে সাহস বাঁধিয়া বলিল:—

"তুমি আজ এত রাত ক'রে এলে কেন, এবং অমনতর কচ্ছ কেন? অসুখ হয়েছে? ও ঘর থেকে উহাদের ডাকব্ কি? আমার বড় ভয় হচ্ছে।"

ললিত তদ্রূপ নিরুত্তর। তখন বালিকা স্বামীর মাথায় হাত বুলাইতে২ কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল;—

"আমার মাথা খাও, অমন কচ্ছ কেন শীঘ্র শীঘ্র বল। আমার বড় ভয় হচ্ছে। পা টিপে দেব? বড় মাথা ধরেছে?"

অনেক ক্ষণ পরে ললিত উত্তর করিল,—"আমার কোন অসুখ করে নি, পা টিপ্‌তে হবে না।" পরে আসল কথা গোপন করিয়া স্ত্রীর মন ভুলাইবার জন্য বলিল;—"এই কাল্ সকাল বেলা তুমি বাপের বাড়ী যাবে, তাই তোমায় দেখতে পাব না—কি না, সেই জন্য মন কেমন কচ্ছে।"

এই বলিয়া ধীরে ধীরে নিজের মুখখানি স্ত্রীর মুখের নিকট লইয়া, তাহার সুন্দর কপোলে একটি চুম্বন করিলেন। বালিকা জগৎসংসার ভুলিয়া একটি স্বামীর মুখ পানে তাকাইয়া রহিল। পরিশেষে বালিকা মৃদু স্বরে বলিল,—"ওঃ তাই! আমি ভাবিয়াছিলাম না জানি কি হ'য়েছে। তার জন্যে অত দুঃখ কেন? মধ্যে মধ্যে আমাকে দেখে এস। মা তোমাকে খাওয়ার জন্য কত অনুরোধ করেন, তা তুমি একবারও যাও না। এই বার দেখব তুমি কেমন না যাও।"

ললিত অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বলিলেন,—

"কুসুম! তুমি আমাকে ভালবাস?

বালিকার নাম কুসুমকুমারী।

কুসুম এরূপ জিজ্ঞাসার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অধরে মৃদু হাসি প্রকটিত করিয়া বলিল,— সে কথা এখন জিজ্ঞাসা কেন? আমি ত আগেই বলিয়াছি। তুমি আমার স্বামী—দেবতা; আমি তোমার স্ত্রী দাসী। হিন্দু স্ত্রীর স্বামীই দেবতা। মা বলিয়াছেন, যে স্ত্রী স্বামীর মনে কষ্ট দেয় তাহার ইহকালও নাই, পর কালও নাই। পিতা মাতা যেদিন তোমার হাতে আমাকে দিয়াছেন, সেই দিন হইতেই আমি তোমার দাসী হইয়াছি। সুখে, দুঃখে, জীবনে, মরণে তোমার অনুগামী হইব। আমার ভালবাসা হৃদয়ে, সর্ব্বদাই তোমাকে হৃদয়ে রাখিব। কখনও হৃদয় হইতে বাহির করিব না। ইহাই ত হিন্দু রমণীর ভালবাসা, এবং ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তুমি কি হিন্দু রমণীর ভালবাসা তাঁহাকে বলে জান না?"

হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কুসুম এই কথাগুলি বলিল। ললিত বালিকার এই প্রকার

জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। কুসুমের হৃদয়ের অন্তস্পর্শী ভালবাসা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে বলিল, "বিধাতা তোমার মত সতী, সাধ্বী স্ত্রী যাকে দেন, তাহার সংসারে কিসের অভাব?" অনন্তর প্রকাশ্যে বলিল,—"না কুসুম তাহা বলিতেছি না। তোমাকে ছাড়তে আমার কত কষ্ট হচ্ছে। তোমার কি সেখানে গিয়া কর হবে না?"

কুসুম গম্ভীর হইয়া বলিল,—

ভগবান জানেন, আমার কষ্ট হবে কি না; —মা যদি অত করে না লিখ্‌তেন;—প্রথমবার ওখানে থাক্‌লে মাতৃবতঃ আমার কুসুমের কষ্ট হবে, বাবা যদি নেবারজন্য পাল্কী না পাঠাতেন, তাহলে আমি কিছুতেই যেতাম না। আর ওঁরাও পাঠাবার অনুমতি দিয়েছেন,—আমি যদি এখন যাওয়ার অমত করি, তবে সকলেই আমায় লজ্জাহীনা মনে করিবেন,—পিতা মাতা মন্দ বলিবেন।"

ললিত বাধা দিয়া বলিল;—"না না, কুসুম, তোমার প্রথম প্রসবের সময়;—সুতরাং মায়ের নিকট থাকাই উচিত। কেননা সেখানে মায়ের নিকট যত্ন, স্বাস্থ্য, শুশ্রূষা পাইবে, এখানে ততটা ঘটিয়া উঠিবে না।"

কুসুমের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। স্বীয় কোমল হস্তে স্বামীর হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া বলিল;—"আমি সকল কষ্টই অকাতরে সহ্য করিব। তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে দেখিয়া আসিবে? আমার মাথা খাও দেখে আস্‌বে?"

ললিতকুমার ঈষৎ হাসিয়া কুসুমের মুখ চুম্বনে আর একটি চুম্বন করিল। অনন্তর উভয়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

(৩)

পর দিবস প্রাতঃকালে পাড়ার মেয়েরা যোসেদের ছোট বৌ, বাপের বাড়ী যাইবে দেখিতে আসিয়াছে। কেহ বউয়ের চুল বাঁধিয়া দিতেছে, কেহ গহনা পরাইয়া দিতেছে, কেহ আলতা পায়ে দিয়া দিতেছে। কুসুমের কিন্তু এ সব কিছুই ভাল লাগিতেছে না; কেমন একটা বিষাদের মেঘ যেন তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশে উদয় হইয়াছে। মুখখানি বিষাদ কালিমাময়। চক্ষুদিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে, কিন্তু লোকে দেখিয়া তাহাকে নির্লজ্জা বলিবে, সেই ভয়ে গোপনে তাহা বস্ত্রাঞ্চলে মুছিতেছে। কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিতেছে, "বালিকে! তোর সুখস্বপ্ন অস্তমিতপ্রায়। কুসুমের হৃদয়ের অবস্থা বর্ণন করা দুঃসাধ্য।

সাজ গোজ হইলে, শাশুড়ী পুত্রবধূকে বলিলেন;—"বৌমা, বেহানকে বলিও, পেরথম পোয়াতী ব'লে তাঁর কাছে পাঠালাম। আর যদি না পাঠাই, তাহলে বেয়ান বল্‌বেন,—"দেখ আমার মেয়েটী পেরথম পোয়াতী আন্‌তে পাঠালাম তা বেহান পাঠালেন না। কাঁচা মেয়ে আমার কষ্ট পাবে কি বল দিদি?"

পার্শ্বস্থ বৃদ্ধা উত্তর করিলেন,—"তা বই কি বোন,—পাঠালে না বেশ ক'রে। না পাঠালে কত কথা হ'ত। পেরথম পোয়াতী কাঁচা মেয়ে। আহা ওর কিসের বয়েস, ওর কি ছেলে পিলে হবার বয়েস হয়েছে? তা মরুকগে যা হ'য়েছে বেশ হ'য়েছে। ষষ্ঠী ঠাকরুণ যদি দয়া ক'রে দিয়েছেন, এখন সুছিয়ে ঘরায় হলেই রক্ষে। আশীর্ব্বাদ করি একটা ব্যাটা ছেলে হয়ে ওর কোল যোড়া করুক।"

ললিতের মা বলিলেন,—"তা দিদি তোমরা যখন আশীর্ব্বাদ কচ্ছ, তখন অবিশ্যিই ফল হবে। আমি ঠাকুর দেবতার কাছে কত

মাথা কুটছি,—আমার ললিতের একটা ব্যাটা-ছেলে হোক। "এই বলিয়া বউকে বলিলেন, "বৌমা তোমার জেঠাই মাকে পেরণাম কর।"

কুসুম জেঠ-শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। তিনিও "চির এয়োস্ত্রী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, কুসুমের ঘোমটার কাপড়খানি খুলিয়া মুখখানি দেখিলেন। অতঃপর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"ওমা সে কি? হ্যাঁলা বৌ তোর এ কেমন ধারা ভাব লা? এয়োস্ত্রী বৌ, বাপের বাড়ী যাচ্ছে, সিঁথেতে একটু সিন্দুর দিস্ নাই। এতে যে বাছার আমার অকল্যান হবে।"

কথাটী শুনিয়া কুসুমের মন ছ্যাঁক্ করিয়া উঠিল। শাশুড়ী বলিলেন;—"ওমা তা আমি কেমন ক'রে জান্‌ব? ওরাড়ীর কাদম্বিনী বৌমার চুল বেঁধে দিচ্ছে, সে সিঁথেয় সিন্দুর দেয় নি? ওমা এমন কথা আমিত শুনি নি। এই বলিয়া কৌটা হইতে সিন্দুর লইয়া কুসুমের সিঁথেয় দিলেন।

অনন্তর বেহারারা পাল্কী উঠাইল। ললিত বাহিরে দরজার নিকট দাঁড়াইয়াছিল। পাল্কীর ভিতর হইতে দুইটী ডাগর ডাগর চোক তাহার দিকে চাহিয়াছিল। চারি চক্ষু মিলিত হইল। ললিত একটু হাসিলেন। তাহাদের কি কথা হইল তাহা তাহারাই বলিতে পারে।

একদিন আহার করিতে করিতে ললিত বলিল,—"মা।"

মাতা পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, বলিলেন,—"কেন বাবা।"

ললিত। একটা কথা বল্‌ব কি?

মা। কি কথা,—বল বাবা।

ল। তুমি রাগ্‌বে হবে ত?

মা। আগে বলই না কেন শুনি।

ল। এই বলছিলাম কি,—আর বাড়ী বসে বসে থেকে কি হবে,—তার চেয়ে বরং বিদেশে গিয়ে একটা চাকরী, বাকরীর চেষ্টা দেখিগে।

মা পুত্রের বিদেশে যাইবার ইচ্ছা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলেন;—

না বাছা তোকে আর বিদেশে গিয়ে টাকা রোজগার ক'ত্তে হবে না। যেমন করে হয় দুখে সুখে দিন কেটে যাবে। ভীব যিনি দিয়েছেন আহার তিনিই দিবেন। আর বাছা তোর কি বয়েস, যে তুই বিদেশের কষ্ট সহ্য কর্‌বি। আর তা হ'লে আমাকেই বা লোকে কি বল্‌বে। সকলেই বল্‌বে ললিতের মা টাকার জন্য কচি ছেলেটাকে বিদেশে পাঠিয়েছে। তা বাছা আমি তোকে কোন মতেই বিদেশে যেতে দিব না।"

অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"বাছা আমার ঘরে একদিন টাকা, সোনা, রূপার ছড়াছড়ি ছিল। দুই হাত দিয়া খরচ করিয়াও ফুরায় নাই। তোর জন্য তিন জন চাকরানী ছিল। দুদিন অন্তর নূতন পোষাক পরতিস্। আমার নিতান্ত পোড়া কপাল তাই আজ আমার সোনার সংসার ছারখারে গিয়াছে, নইলে আজ তোর কিসের ভাবনা।" এই বলিয়া স্নেহময়ী জননী দুই ফোঁটা চোকের জল মুছিলেন। তিনি আরও বলিলেন বিদেশ বড় খারাপ স্থান; সেখানে আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখা যায় না। বিশেষ তাঁহার এক বোনের ছেলে বিদেশে মারা গিয়েছে। সুতরাং ললিতের কিছুতেই বিদেশে যাওয়া হইতে পারে না। ললিত বেগতিক দেখিয়া সেদিন আর কোন কথা উত্থাপন করিল না।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ধর।

আত্মোৎকর্ষ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মফল ভোগ-দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিলে মুক্তির সোপানে আরোহণ করা যায়। এখন কি প্রকার উপায়ে সেই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

নিজে ইচ্ছা করিলেই যে আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হইবে, তাহা নহে। ইহার অন্তঃস্থলেও কয়েক গুরুতরি নিহীত রহিয়াছে। ভোগ দ্বারা পাপ ক্ষয় হইলে, চিত্তবৃত্তি সমূহ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বিবেক দ্বারা চালিত হইয়া আত্মগ্লানিরূপ ভয়ঙ্কর মানসিক যাতনা পাইতে থাকে। এই যাতনা ভোগান্তে মনোবৃত্তিসমূহ আপনা হইতেই সৎপথ পানে ধাবিত হইতে চেষ্টা করে, এই সময় মৃদুগুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হইলে মনোবৃত্তিসমূহ অধিকতর বিকাশিত হইয়া জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ব্যাকুলিত হয়। ইহাকেই আত্মোৎকর্ষের প্রথম সোপান বলিতে হইবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, জগদীশ্বর পাপ এবং পুণ্য উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু আমরা কেন পাপপথ নিয়ত পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করি না? ঈশ্বর নিরপেক্ষ, আমরাওঁতাঁহার সন্তান, তবে কেন তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে চিরকষ্ট দিবার জন্য দুঃখময় পাপ-পথে প্রবেশ করিতে দিয়া থাকেন? আর আমরা যখন জানিতেছিযে, পাপ আশু সুখোৎপাদক হইলেও পরিণামে অনন্ত ক্লেশ, তখন জানিয়া শুনিয়াও কেন আমরা পাপপথে প্রবেশ করিয়া থাকি।

ভগবান আমাদিগকে দুইটি সর্ব্ব প্রধান মানসিক বল প্রদান করিয়াছেন; তন্মধ্যে একটি বিবেক, অপরটি বুদ্ধিশক্তি। কোন কুকার্য্যে মন ধাবিত হইতে চেষ্টা করিলে, প্রথমতঃ বিবেক দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়; তারপর একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে, অনায়াসেই ভালমন্দ মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যগণ সময় সময় রিপুগণ দ্বারা এতদূর বশীভূত হয় যে, "বুদ্ধিশক্তি" এবং "বিবেক" ভ্রিয়মাণ হইয়া থাকে।

তখন তাহারা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া রিপু চরিতার্থ দ্বারা মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন বলিয়াছেন।

"অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতিপুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলা দিব নিয়োজিতঃ॥"

শ্রীভগবানুবাচ

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেন মিহ বৈরিণম্॥"

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, হে বার্ষ্ণেয় মনুষ্য ইচ্ছা না করিলেও কেহ তাহাকে কুপথে অর্থাৎ পাপ-পথে নিয়োজিত করিয়া থাকে?

ভগবান বলিয়াছেন, "রজোগুণ-সমুদ্ভূত কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকল মনুষ্যজগতের পরম শত্রু, ইহার প্ররোচনায়ই মনুষ্যগণ বিপথগামী হইয়া থাকে।

উল্লিখিত শ্লোকটীর ভাবার্থ পাঠক নিজ মনে একটু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারিবেন যে, সময় সময় রিপুগণ অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় হইয়া, পরম মঙ্গলময় সুকুমার চিত্তবৃত্তি সমূহকে বশীভূত করিয়া

থাকে। তখন মানব হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া রিপুগণ দর্শিত আপাত-মনোহর পাপ পথে প্রত্যেক পূর্ব্বক পরিণামে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। জগৎপিতা নিরপেক্ষ; তিনি যেমন পাপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন ঐ পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমাদিগকে বিবেক এবং বুদ্ধিশক্তি প্রদান করিয়াছেন। পশাদির বিবেক নাই; সুতরাং তাহারা স্বভাবজাত নিয়মের বাধা, তাহাদের পাপ পুণ্য কিছুই নাই। পাপ পথে আমাদের মন আকৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ বিবেক আমাদের রোষও বুঝাইয়া দেয়। তথাপিও যে আমরা পাপ পথে চালিত হইয়া থাকি, ইহা পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি এবং দুষ্কৃতির ফল। এমন অনেক উদাহরণ সংসারে দেখিতেছি যে, পরম পুণ্যাত্মার সন্তান মহাপাপে লিপ্ত হইতেছে। আবার কোন পাপাত্মার সন্তান বিনা উপদেশেই পুণ্যকার্য্যে লিপ্ত হইতেছে। তখন সেই পাপে লিপ্ত পরম পুণ্যাত্মার সন্তানকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলেও তাহা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। প্রচণ্ড উত্তপ্ত মরুভূমির উপর নিষ্পিপ্ত শীতল জলকণা যেমন তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়, তদ্রূপ তাহার তপ্তমরুবৎ হৃদয়ে সেই উপদেশ-বাণী সমূহ শুষ্ক হইয়া যাইবে। কিছুতেই তাহার চিত্তবৃত্তিগণ প্রশমিত হইবে না। তারপর কর্ম্মফল দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধি হইলে, আপনা হইতে মন পুণ্যপথে ধাবিত হইবে।

ভগবান শিঙ্কিার মিশ্রই ইহার জলন্ত উদাহরণ। আতুল সম্পদের ক্রোড়ে পালিত হইয়া, সদ্‌গুরুর নিকট তত্ত্বোপদেশ পাইয়াও তিনি নিরন্তর বেশ্যাবৃত্তি এবং এতৎসঙ্গীয় পাপে আত্মাকে কলুষিত করিতেছিলেন।

পূর্ব্ব জন্মের পাপ-ভোগ শেষ হইলে ভগবানের কৃপা দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পতিত হইল; মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মোহান্ধকার ঘুচিল; পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সমূহের জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবল আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। মানসিক সদ্‌বৃত্তি সমূহ স্ফুরিত হইলে তৎক্ষণাৎ কৃত কর্ম্ম সমূহের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া আত্মোন্নতির পথে মুক্তিলাভ প্রত্যাশায় ধাবিত হইলেন।

প্রত্যেক মনুষ্য হৃদয়েই রিপুগণ এবং মানসিক সৎবৃত্তি সমূহ বর্ত্তমান আছে। পাপাত্মার হৃদয় মধ্যে সৎবৃত্তি সমূহ রিপুগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া অতিশয় প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিয়া থাকে; সময় হইলে বিকশিত হয়, আবার পুণ্যাত্মার হৃদয়স্থিত রিপু সমূহও সদ্‌বৃত্তি দ্বারা নিগ্রহিত হইয়া সুপ্তভাবে অবস্থান করিতে থাকে; কিন্তু ত্যক্ত সংসারী যোগী মহাপুরুষগণের হৃদয় হইতে রিপুসমূহ একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়।

রিপুকুল মনুষ্যের ভয়ানক শত্রু; তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিলে কিছুতেই আত্মাকে উন্নতির পথে ধাবিত করা যায় না। দুষ্পুর রিপু সকল জ্ঞানকে তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাই যে ভগবান বলিয়াছেন—

আবৃতং জ্ঞান মেতেন জ্ঞানি নো
নিত্য বৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥

(হে কৌন্তেয় উপভোগ দ্বারায় দমন করিতে শক্তির অবিষয় অনল স্বরূপ কাম জ্ঞানিদিগের জ্ঞানকে আবরণ করে) ধীরে ধীরে রিপুগণকে বশীভূত করিতে হয়; একেবারে তাহাদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। রিপু দমন করিতে হইলে আত্মস্থ হইয়া যোগ শিক্ষা করা আবশ্যক; বিনা যোগে রিপু

চয় দমিত হইবার সম্ভব নাই। যেমন সোপানাবলীর সাহায্য ব্যতিরেকে প্রাসাদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করা যায় না; তদ্রূপ বিনা যোগাবলম্বনে আত্মোন্নতি সাধন পূর্ব্বক মোক্ষ ফল লাভ করা যায় না।

যোগ সাধন শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ মনকে সর্ব্বদা শুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে; কোন প্রকার অসদ্‌চিন্তা মনোমধ্যে স্থান দিবে না। অত্যন্ত হর্ষ; অত্যন্ত বিষাদ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতিকে যত্ন পূর্ব্বক পরিহার করিবে। আহার্য্য বস্তু গ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। যে সমস্ত দ্রব্য আহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহ প্রবল হয়, তাহা ত্যাগ করিবে। শরীরের মধ্যে যাহাতে সত্ত্বগুণের আধিক্য জন্মে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; কারণ সত্ত্বগুণই যোগিগণের যোগসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। সত্ত্বগুণ সম্বন্ধে ভাব প্রকাশে দেখিতে পাই যে,

"আস্তিক্যং প্রবিভজ্য ভোজন মসংত্যাপশ্চ
তথ্যং বচো
মেধা বুদ্ধিধৃতিক্ষমাশ্চ করুণা জ্ঞানঞ্চ নির্জ্জন্ততা।
কর্ম্মানিন্দিত মপ্রশস্ত মসদে বাদরা
দেতে সত্ত্বগুণাশ্রিত স্তস্য মনসোগীতা গুণা
—জ্ঞানিভিঃ॥"

আস্তিক (সদা সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক ভোজন, সন্তাপাভাব, মেধা, বুদ্ধি, ধৃতি, কাম ক্রোধাদি রহিত্য, ক্ষমা দয়া, আত্মজ্ঞান, অহঙ্কার রাহিত্য অনিন্দিত কার্য্য স্পৃহাভাব, বিনয়, ধর্ম্ম এই সত্ত্বগুণের লক্ষণ জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে)

উল্লিখিত কবিতা পাঠে সহজেই অনুমিত হইবে, যে সত্ত্বগুণ সর্ব্বতোভাবে যোগোপাসনার পক্ষে শ্রেষ্ঠতম। এখন কি প্রকার পথ্য করিলে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইবে তাহা দেখিতে হইবে। দ্রব্যগুণে অনেক প্রকার খাদ্যের কথা উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে গো-দুগ্ধ এবং গব্য ঘৃতই প্রশস্ত। পুরাতন চাউল, মুগ, ছোঁলার দাইল এবং সুপক্ক কদলী, আম্র, দাড়িম্ব, বেল প্রভৃতিও যোগ সাধনের পক্ষে উপযুক্ত। আমিষ একেবারে নিষিদ্ধ। কোন প্রকার উত্তেজক খাদ্য ভক্ষণ অথবা কোন প্রকার উৎকট গন্ধ গ্রহণ করিবে না।

কেবল যে আহার দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইবে তাহা নহে; ইহার সঙ্গে কতিপয় শারীরিক নিয়মও প্রতিপালন করিতে হইবে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচক্রিয়াদি সম্পাদন পূর্ব্বক স্নানান্তে শুচি হইবে; তারপর সন্ধ্যাবন্দন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে। উদর পরিপূর্ণ করিয়া আহার করা নিষিদ্ধ। অন্ততঃ উদরের একভাগ শূন্য রাখিবে। স্নিগ্ধকর সুগন্ধ দ্বারা শরীরকে সুবাসিত করিবে। দিবারাত্রির মধ্যে তিন চারিবার আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া লোমকূপ সকল পরিষ্কার করিবে। আবশ্যকীয় কার্য্য ব্যতীত কখনও বৃথা বাক্য ব্যয় করিবে না; কারণ অনেক কথা বলিলে, অবশ্যই মিথ্যা বাক্য বলিতে হয়। মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করিবে না।

আয়ুর্ব্বেদে দেখিতে পাই যে,
"ন বেগাং ধারয়েজ্জিমান্ কামাদিনাংকধারয়েৎ"
পক্ষান্তে নিম্বপত্রের রস পান করিয়া বমন করিবে এবং মাসান্তে হরিতকী ভক্ষণ পূর্ব্বক সামান্য বিরেচন করিবে। দিবানিদ্রা এবং স্ত্রী সহবাস একান্ত নিষিদ্ধ।

কতিপয় বৎসর পরে শরীরের সদ্‌বৃত্তি সমূহ আপনাপনি স্ফুরিত হইয়া থাকে। তখন মনোমধ্যে বিমল শান্তি এবং সত্ত্বগুণের আধিক্য জন্মিয়া থাকে। ইহার পর সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে কোন যোগী মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ হইলে সমধীচ্ছুক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, কুম্ভক প্রভৃতি অভ্যাস করিবেন।

উল্লিখিত ক্রিয়া সমূহ ভালরূপ অভ্যস্ত হইলে সমাধি গ্রহণ জন্য মুদ্রাভ্যাস করা আবশ্যক। মুদ্রাভ্যাস দ্বারা যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা বায়ু মস্তকে প্রবেশ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত যোগী কিছুতেই সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হন না, কিন্তু মুদ্রাভ্যাস অতিশয় কষ্টসাধ্য।

তন্ত্রে মুদ্রা দশ প্রকার বলিয়া লিখিত আছে। তন্মধ্যে খেচরী মুদ্রাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মুদ্রা অভ্যস্ত হইলে অনায়াসেই সমাধি গ্রহণ করা যায়।

হঠযোগ প্রদীপিকায় দেখিতে পাই যে, খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করিতে হইলে, জিহ্বার নিম্ন পাতলা চর্ম্ম তীক্ষ্ণ অস্ত্রে অল্পমাত্র ছেদন করিয়া প্রত্যহ সৈন্ধব লবণ এবং হরিতকী চূর্ণ দিয়া ঐস্থান মর্দ্দন করিবে। সপ্তাহকাল পরে অবশিষ্ট স্থান ঐরূপ ছেদন করিয়া ঐ সকল দ্রব্যাদি মর্দ্দন করিবে। কিন্তু প্রত্যহ গো-দুগ্ধ এবং গব্য ঘৃত দ্বারা জিহ্বা দোহন করিবে। প্রত্যহ এইপ্রকার প্রক্রিয়া করিলে তিন চারি মাস পরে জিহ্বা এত বৃহৎ হইবে যে, তাহার অগ্রভাগ দ্বারা ভ্রূর মধ্যস্থল স্পর্শ করা যাইবে। তখনই বুঝিতে হইবে যে, খেচরী মুদ্রার ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তারপর যোগী, সেই বৃহৎ জিহ্বা মুখের মধ্যে উল্টাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া পরমামৃত পান করিবেন। তখন সেই সমাধি গ্রহণাভিলাষী—

"হৃদয় কমল মধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং
হরিহর বিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যং।
জনন মরণ ভীতি ভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপং
সকল-ভুবন বীজং ব্রহ্ম চৈতন্য মীড়ে
মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্॥
তৃতীয়োল্লাসঃ

তারপর

"পশ্যন্ কুত্বা বহির্দ্বাহ্যাংশ্চক্ষু শ্চৈবান্তরে
ভ্রুবোঃ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তর চারিনৌ॥
যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি র্মুনি র্মোক্ষ পরায়ণঃ
বিগতেচ্ছাভয় ক্রোধো যঃ সদামুক্ত এবসঃ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পঞ্চমোধ্যায়ঃ।

শ্রীরোহিনীকুমার সেন গুপ্ত।

কুকুর ও তাহার প্রতিবিম্ব।

মনে কর দেখি ভাই—এই গল্পটী কোথায় পড়িয়াছ? অনেক দিনের কথা—তাহাহলেও এ গল্পটী কেহই ভুলিতে পারিবে না। সকল ভাষায় ইহার অনুবাদ আছে। লোকে বলে ইহা ঈসপ সাহেবের লেখা। আমাদের অত খবরে কাজ কি। বাঙ্গলা ভাষায় পিতা দয়ালু বিদ্যাসাগরের কথামালাতে পড়িয়াছি কেমন ত গল্পটী সব তোমাদের মনে আছে বোধ হয়।

যদি না থাকে তোমাদের ছোট ভাইয়ের বই খানি একবার পড়িও। সে কষ্ট যদি অসহ্য বোধ কর, তবে "অনুসন্ধানের" এই পাতা কয়টা বাদ দিয়া পড়িলেই চলিবে। ভাল করিয়া বুঝিবার ইচ্ছা না থাকিলে প্রবন্ধটা না পড়াই ভাল। ইহাই আমার প্রথম অনুরোধ।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে, তোমাদের আলোক বিজ্ঞানের কয়েকটী সহজ কথা মনে রাখিতে হইবে। কথাটী এই যে "আয়নাতে আপনার মুখ লোকে নিজেই দেখিতে পায়। দেখ দেখি, এ সকল কি নূতন কথা বলিতেছি? কথা নূতন নয় সত্য, কিন্তু কেন এই রূপ দেখা যায় তাহা সকলে না জানিতে পারে। তুমি জানিতে পার বটে, যদু বা রাম হয়ত জানে না, সুতরাং আমি কারণটী সহজে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

একখানি সমতল কাচের উপর একটী আলোক-রশ্মি পড়িলে, রশ্মির গতির দিক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ঘরের এক কোনে দাঁড়াইয়া বিপরীত দিকের দেয়ালে একটী রবারের বল ছুড়িয়া মারিলে বলটা কোন দিকে যায় বল দেখি? একবার একটা ঢিল না হয় ঐরকম করিয়া ছুঁড়িয়া দেখ না কেন? কই, তোমার দিকেত বলটা আসিল না। তুমি যে দিকে ছুড়িয়াছ, বলটা সে দিকেও যাইতে পারিল না—কি করিয়া যাইবে, দেয়ালে বাঁধা পড়িল যে? তুমি যদি বলটী বিপরীত দেয়ালের ঠিক মাঝখানে মার, তাহা হইলে হয় ত বলটীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া, তুমি যে কোনে দাঁড়াইয়া আছ, তাহার সোজা ঘরের অপর কোনের দিকে যাইবে। সত্য সত্যই তাহাই ঘটিয়া থাকে। ইহাতে আমি বলটী এক কোন হইতে ছুড়িতে বলিয়াছি এবং সেই জন্যই বল অপর কোনের দিকে গেল। কিন্তু তুমি ঠিক সোজা দেয়ালে বলটী ছুড়িলে, বলটী ছুড়িলে, বলটী তোমার দিকে আসিবে—অর্থাৎ এবারেও বল দিক পরিবর্ত্তন করিল।

আচ্ছা এখন বলটার কথা ছাড়িয়া দাও। মনে কর তোমার ঘরটীর মেজে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। আর তুমি সেই কোনেই দাঁড়াইয়া আছ। পূর্ব্বে যেমন বলটী ছুড়িয়াছিলে, এবারে তুমি তাহার পরিবর্ত্তে জলে একবার ঢেউ দাও। আর সেই ঢেউয়ের উপরে পাখীদের ছোট ছোট পালক ফেলিয়া দাও। এবার কি দেখিতে পাইবে? সমস্ত জলেই ঢেউ উঠিয়াছে। প্রথম হইতেই একটী ঢেউয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ঢেউটী ক্রমে-ক্রমে বিপরীত দেয়ালের মাঝখানে লাগিয়া, ঠিক বলটী যে কোনে গিয়াছিল, সেই কোনেই পৌঁছিল। কিন্তু সেই পালকটী যেখানে ছিল প্রায় সেই খানেই ভাসিতেছে, অর্থাৎ পালকটী যে ঢেউটীর উপর ছিল, সেই ঢেউয়ের জল বস্তুতঃ দেয়ালের গায় লাগে নাই। তবে দেয়ালের গায় যে ঢেউটী লাগিতে দেখিলাম, ওটী আসিল কোথা হইতে? আমাদের সেই প্রথম ঢেউটী তাহার কাছের জলে ঢেউ তুলিয়া দিয়া তখনই জলে মিলাইয়া গিয়াছে। আবার নূতন ঢেউটী আর একটী নূতন ঢেউ তুলিয়া শান্ত হইয়াছে। এইরূপে, ক্রমে দেয়ালের নিকটে ঢেউ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম ঢেউটী আর দেয়ালের কাছের ঢেউটী এক নহে। একটীকে কারণ আর অপরটীকে কার্য্য বলিতে পার।

আমরা যে আলোক দেখিতে পাই, তাহাও এক প্রকার ঢেউ। ঈথর বলিয়া একটী তরল বস্তু আছে বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে আমরা জলের তুলনা করিতে পারি। তবে ঈথর সর্ব্বাপেক্ষা তরল, স্বচ্ছ ও সর্ব্বব্যাপী। জলে ঢেউ দিলে যেমন ক্রমে সমস্ত জলেই ঢেউ দেখা যায়, সেইরূপ ঈথরেও ঘটিয়া থাকে। এই তরঙ্গের ঢেউকে আমরা "ঈথর তরঙ্গ" বলিব। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা—আমরা এই সকল ঈথর-তরঙ্গ হইতে দর্শনজ্ঞান লাভে সমর্থ হই। বলটী ছুড়িয়া দেওয়াতে সেই বলটীই দেয়ালে লাগিয়াছিল; আর অপর কোণে সেইটীই পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু প্রথম ঢেউটী, দেয়ালের বিপরীতবর্ত্তী ঢেউ ও অপর কোণের ঢেউ সকলই পৃথক। আলোক-তরঙ্গ শেষের উদাহরণটীর সহিত মিলে, বলের সহিত নহে।

এইবার একখানা আয়না সেই বিপরীত দিকে দেয়ালের মাঝখানে রাখিয়া দাও। আর তুমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছ সেই খানেই থাক। আর তোমার ছোট ভাইটীকে ঘরের সেই অপর কোণটীতে দাঁড়াইতে বল। দুজনেই আয়নার দিকে একবার চাহিলেই দুজনেরই চেহারা দেখিতে পাইবে। তোমার শরীরের আলোক-তরঙ্গ আয়নাতে লাগিয়া তোমার ভাইয়ের চক্ষুতে পড়িবে, আর ঐরূপে তুমিও তাহাকে দেখিতে পাইবে: কিন্তু তোমরা দুজনকেই সেই আয়নার পিছনে দেখিতে পাইবে। যেখানে তোমার ভাই যথার্থ দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে তাহাকে দেখিতে পাইবে না। ধর, একটা আলোকতরঙ্গ তোমার শরীর হইতে আয়নাতে পড়িল—এই আলোক-তরঙ্গকে আমরা পতন-রশ্মি বলিব। আয়নাতে পড়াতেই ইহার দিক পরিবর্ত্তন হইল—এই দিক পরিবর্ত্তনের নাম প্রতিফলন। আর তরঙ্গটী তার পর যখন তোমার ভাইয়ের দিকে যাইতে লাগিল তখন উহাকে প্রতিফলিত রশ্মি নাম দেওয়া হইয়াছে। আর ঐ দুইটী রশ্মির মিলন বিন্দু হইতে, রশ্মিদ্বয়ের সমকেন্দ্রে একটী লম্ব টানিলে, দুইটী সমান কোণ উৎপন্ন হইবে, ইহাদিগকে পতন-কোণ ও প্রতিফলিত কোণ বলিয়া থাকে। এখন তোমার ভাই প্রতিফলিত রশ্মিদ্বারা তোমাকে দেখিতে পাইতেছে। কিন্তু প্রতিফলিত রশ্মি আয়নার নিকটে বাঁকিয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তিও আর বাঁকিয়া তোমাকে যথাস্থানে দেখিতে পাইবে না। সেই প্রতিফলিত রশ্মির দিকে চাহিয়া তাহারই সোজা কোণস্থানে অর্থাৎ আয়নার পিছনে তোমায় দেখিতে পাইবে। যেখানে তোমাকে দেখা যাইবে সেইটিকে তোমার প্রতিবিম্ব বলিবে। আয়নার সম্মুখে তুমি যত দূরে থাকিবে, প্রতিবিম্বটি আয়নার ততদূর পিছনে হইবে। আর তুমি আয়নার দিকে মুখ করিয়া থাকিলে, প্রতিবিম্ব আয়নার পিছন হইতে আয়নার দিকে, অর্থাৎ তোমার দিকে, অর্থাৎ তোমার দিকে মুখ করিয়া থাকিবে। ঠিক যেন দুইজন মানুষ পরস্পরের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তুমি ডান হাতখানি নাড়িলে, প্রতিবিম্ব বাম হাতখানি নাড়িতে থাকিবে। আর প্রতিবিম্বটিকে ধরিতে গেলে তুমি ধরিতে পারিবে না। প্রতিবিম্বটি অলীক। উহার সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহার কোনরূপ অস্তিত্ব নাই।

আলোক কোন সমতল প্রতিফলকের উপর পড়িলে, পতন-রশ্মিগুলি লম্বের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, প্রতিফলিত রশ্মিগুলি সংখ্যায় ততই অল্প হইয়া পড়ে। যে আলোক-রশ্মির প্রবেশ-কোণ ৬০ ডিগ্রি, তাহার প্রতিফলিত রশ্মি শতকরা ছয়টি ছয়টি করিয়া হইয়া থাকে—অর্থাৎ একশতটি পতন-রশ্মি হইলে প্রতিফলিত রশ্মি ছয়টি মাত্র হইবে। এখন যদি পতন-রশ্মি লম্বের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয়—পতন-কোণ ত্রিশ ডিগ্রি ধরিলে প্রতিফলিত

রশ্মি শতকরা দুইটির অধিক হইবে না। আর অবশিষ্ট পতন-রশ্মিগুলি অযথাভাবে প্রতিফলিত বা প্রতিফলকের দ্বারা শোষিত হইবেক। বহু পরীক্ষার পর বুগিওর এই বিষয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই তালিকাটি ও প্রবন্ধটির সারাংশ পদার্থবিৎ ডায়োনিসিয়াস লার্ডনর কর্ত্তৃক সম্পাদিত Museum of Science of Art নামক পুস্তক খানি হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

পতন-কোণের ন্যূনাধিক্য হেতু পতন-রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মির সংখ্যার অনুপাত-জ্ঞাপক তালিকা।

প্রতিফলক	প্রবেশ কোণ	প্রবেশ-রশ্মির সংখ্যা	প্রতিফলিত রশ্মির সংখ্যা	অনিয়মিতরূপে প্রতিফলিত রশ্মির তালিকা
জল ...	৮৯° ৩০′	১০০০	৭২১	২৭৯
	৭৫° ০	,,	২১১	৭৮৯
	৬০	,,	৬৫	৯৩৫
	৩০ হইতে ০°	,,	১৮	৯৮২
		,,		
কাচ ...	৮৫	,,	৫৪৩	৪৫৭
	৭৫	,,	৩০০	৭০০
	৬০	,,	১১২	৮৮৮
	৩০	,,	২৫	৯৭৫

এই তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যখন আলোক-রশ্মির পতন-কোণ ৭৫°, তখন সমস্ত আলোকের প্রায় সিকি ভাগ ঠিক প্রতিফলিত হয়। এই জন্যই নদীর এক পাড়ের উপর দাঁড়াইলে নদীর অপর পাড়ের প্রতিবিম্ব জলে সুস্পষ্ট দেখা গিয়া থাকে; কিন্তু দ্রব্যটী যতই লম্বের নিকট আসিতে লাগিল, ততই তাহার প্রতিবিম্বের উজ্জ্বলতা কমিতে লাগিল। ৬০ ডিগ্রি পতন-কোণ হইলে, পূর্ব্বাপেক্ষা প্রতিফলিত রশ্মির সংখ্যা ১৫ গুণ কমিয়া যাইল, আর সেই অনুপাতে অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রতিবিম্বের উজ্জ্বলতা ১৫ গুণ কম হইয়া গেল। এখন যদি দর্শক পূর্ব্ব স্থান অপেক্ষা কোন উচ্চ স্থানে উঠিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে পতন-কোণ ক্রমেই ছোট হইয়া আসিবে, সুতরাং প্রতিবিম্বের উজ্জ্বলতা ততই কমিয়া আসিবে। অবশেষে পতন-কোণ যখন সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, অর্থাৎ পতন-রশ্মি যখন লম্বের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন প্রতিবিম্বটি আর ভাল দেখা যাইবে না।

একখানি জাহাজের উচ্চস্থান হইতে নীচে জলের দিকে চাহিলে, আমরা যে কোন প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই না, তাহার একটী কারণ উপরে লিখিলাম। আলোক-রশ্মিসমূহ প্রায় লম্বভাবে জলের উপর পড়াতে অতি অল্পসংখ্যক আলোক-রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া আমাদিগের চক্ষে পতিত হয়। কিন্তু সেই রশ্মি অল্প বলিয়া আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুতে কোনরূপ কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। কিন্তু বোট, নৌকা বা ডিঙ্গিতে যাইতে যাইতে মুখ বাড়াইয়া জলের দিকে চাহিলে আমরা প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়া থাকি। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—কেবল জাহাজ ও ডিঙ্গির উচ্চতার প্রভেদ। কথাটা আর একটা সহজে বলি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রতিবিম্বটি সমতল প্রতিফলকের পিছনে হইলে প্রতিবিম্বও দ্রব্য উভয়েই প্রতিফলকের সমদূরবর্ত্তী হইয়া থাকে। জাহাজের উপর হইতে তুমি যখন দেখাইতেছিলে, তখন যদি জল হইতে তোমার উচ্চতা ১২ ফিট হয়, তাহা হইলে তোমার নিকট হইতে তোমার প্রতিবিম্বটি চব্বিশ ফিট দূরে হইবে। আর যদি তুমি একখানা ডিঙ্গিতে চড়িয়া থাক, তখন জল হইতে তোমার উচ্চতা দুই ফিট হয়, তাহা হইলে তোমার প্রতিবিম্বটি তোমা হইতে চারি ফিট দূরে হইবে।

এইবার আর একটা কথা বলিতে হইবে। তুমি যখন রাত্রে পড়িতে বস, তখন প্রদীপটী একবার দুই হাত তফাতে ও আর একবার ৪ হাত দূরে রাখিয়া দেখিও, ইহাতে সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, পূর্ব্ববারে যত আলো তোমার বইয়ের উপর পড়িয়াছিল এবার তাহার অপেক্ষা কম আলো আসিতেছে। এ কথা সকলে জানে সত্য, কিন্তু কত কম তাহা সকলে না জানিতে পারে। হঠাৎ যেন বোধ হয় যে আলোর দূরত্ব অনুসারে উজ্জ্বলতার হ্রাস হইয়াছে। অর্থাৎ আলোটী এখন দ্বিগুণতর দূরে রাখিয়াছি, আলোর উজ্জ্বলতা অর্দ্ধেক হইয়া যাইবে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ঘটে না। পরীক্ষা দ্বারা ঠিক হইয়াছে যে আলোর দূরত্ব দ্বিগুণ হইলে, উজ্জ্বলতা সিকি হইয়া যাইবে। দূরত্বের বৃদ্ধির বর্গ অনুসারে আলোকের উজ্জ্বলতার হ্রাস হইয়া থাকে। যদি তুমি আলোক তিনগুণ দূরে রাখিয়া দাও, তাহা হইলে পূর্ব্বে যে পরিমাণে আলোক পাইয়াছিলে, তাহার নয়গুণ কম আলোক এবার বইখানির উপর পড়িবে।

এখন আমরা জাহাজ ও ডিঙ্গি হইতে কোন বারে কিরূপ আলো পাইব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিব। জাহাজে যখন ছিলে, তখন প্রতিবিম্বটী চব্বিশ ফিট দূরে ও ডিঙ্গিতে চড়িবার সময় প্রতিবিম্বটী ৪ ফিট তোমার নিকট হইতে দূরে ছিল। তাহা হইলে উপরের নিয়মানুসারে ও প্রথম প্রতিবিম্বটি দ্বিতীয়টীর ছয়গুণ দূরে থাকাতে, শেষোক্ত প্রতিবিম্বের উজ্জ্বলতা প্রথমটির অপেক্ষা ছত্রিশ গুণ অধিক হইবে। এই জন্যই ডিঙ্গিতে চড়িলে জলে মুখ দেখা যায়, কিন্তু জাহাজে উঠিলে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই সকল কারণ ব্যতীত আরও কতকগুলি কারণ সময়ে সময়ে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। নদীতে বেশী স্রোত থাকিলে প্রতিবিম্ব কোন সময়েই দেখা যায় না। নির্ম্মল ও স্বচ্ছ জলের গভীরদেশ সূর্য্য কিরণে আলোকিত হইলে, অনেক সময় প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। যেমন একটি সদ্গন্ধের নিকট একটী অল্প গন্ধের ঘ্রাণ অনুভব করা যায় না, কেবল সদ্গন্ধেরই আঘ্রাণ পাইয়া থাকি, সেইরূপ একটি অত্যুজ্জ্বল দ্রব্যের নিকটস্থিত অল্প আভাবিশিষ্ট দ্রব্যের উজ্জ্বলতা দৃষ্টিগোচর হয় না। নদীর জল সূর্য্যকিরণে আলোকিত হইলে, প্রতিবিম্বস্থিত আলোক আরও অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। এই বিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য সকলেই অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। একটা ফাঁকা যায়গায় এক বালতী জল রাখিয়া দাও। পাঁচ ফিট উচ্চ কোন টুলের উপর দাঁড়াইয়া জলের দিকে চাহিলে কোনরূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে না। ক্রমে তুমি যতই নীচু হইতে থাকিবে, ততই তোমার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে; কিন্তু খুব নীচু হইলেও তুমি তোমার প্রতিবিম্বটি স্পষ্ট দেখিতে পাইবে না। এখন যদি বালতিটির চারিদিকে একটা কাগজের ঘেরা করিয়া দাও বা অন্য কোন উপায়ে আলোক আসিয়া জল আলোকিত হইবার পথ বন্ধ কর,—আর তুমি যেমন

টুলের উপর আলোকে দাঁড়াইয়াছিলে সেই রূপই থাক, তাহা হইলে চারি বা পাঁচ ফিট দূরে থাকিয়াও তোমার প্রতিবিম্ব জলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ইহার কারণ পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি। প্রথমবারে জল আলোকিত হইয়াছিল বলিয়া,—প্রতিবিম্বটি দেখিতে পাও নাই। আর দ্বিতীয়বার কাগজ দ্বারা আলো আসিবার পথ বন্ধ হইল, সুতরাং প্রতিবিম্বটি পূর্ব্বের মত অনুজ্জ্বল হইলেও ত বেশ দেখা গেল।

অনেক পাঠক হয় ত অধীর হইয়াছেন। গোড়াতে কি লেখা, আর শেষে কি ফল দাঁড়াইল,' ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত "আমার প্রবন্ধটীতে বিশেষরূপে প্রযুজ্য। সেই জন্য আমি পুনরায়—কুকুরের গল্পটী বলিব। কুকুরটী একখণ্ড মাংস চুরী করিয়া নদীর ধারে দাঁড়াইল। নদীর জলে সমাংস প্রতিবিম্ব দেখিয়া, আপনার মাংস চুরিয়া প্রতিবিম্বের মাংস খাইতে গেল। আর অমনি মাংসখণ্ড মুখ হইতে নদীর জলে পড়িয়া গেল। এই ত গল্পের সারাংশ। গল্পটীর উপদেশ সম্বন্ধে আমার বলিবার কোন কথা নাই। গল্পটী যে মিথ্যা তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। গল্পটী মিথ্যা হউক আর সত্য হউক তাহাতেও কাহারও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে মিথ্যা কথা অসঙ্গত হইলে সকলের বলিবার অধিকার আছে। আমি বলিতে চাই যে, ঐ গল্পটী আদতেই হইতে পারে না নিম্নে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিলাম।

১। কুকুর যখন মাংসখণ্ড মুখে করিয়া তীরে দাঁড়াইয়াছিল, তখন সে জলের দিকে চাহিলে কোন রূপেই নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতে পারে না। কুকুরের শরীর হইতে আলোক-রশ্মি জলে প্রায় লম্বভাবে পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে জাহাজ হইতে দেখার সহিত এ ঘটনার ঐক্য আছে। পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি যে, ওরূপ স্থলে কোনরূপেই প্রতিবিম্ব দেখা যাইতে পারে না। কুকুর তীর বা কোন সেতুর উপর হইতে ঠিক নীচের জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে না।

২। একটী স্রোতস্বতীর তীর বা সেতু পাঁচ ফিটের উচ্চ ধরা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ফাকা যায়গায় স্থলে প্রতিবিম্ব দেখা যায় না তাহা ত পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি। আলোকের উজ্জ্বলতা দূরত্ব বৃদ্ধির বর্গানুসারে কমিয়া থাকে।

৩। কুকুর যখন প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে, তখন ঘটনাটী দিবসে হইয়া থাকিবে। তখন নদীর জলে বেশ আলোক আছে ধরিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, এইরূপ আলোক প্রবল হইলে প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে না। তবে যদি বল, ঘটনাটী দিবসের বটে, কিন্তু মেঘ বৃষ্টির দরুণ অনেকটা অন্ধকার হইয়াছিল। উত্তরে আমিও বলিব যে, কুকুরটার কি আর কাজ ছিল না, তাই বড় বৃষ্টির সময়—নদীতে স্নানার্থ নাইতে গিয়াছিল।

৪। আমরা দেখিয়াছি যে, নদীতে স্রোত থাকিলে প্রতিবিম্ব দেখা না যাইতে পারে। যখন মাংসখণ্ড কুকুরের মুখ হইতে পড়িয়া গেলে স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, তখন স্রোতটা যে একটু বেশী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এরূপ স্থলে কুকুর প্রতিবিম্ব-দেখিতে পাইয়াছিল কোনরূপেই মানিতে পারি না।

৫। কুকুরজাতি বুদ্ধিমান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইহাদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা পুস্তকে সকলেই পড়িয়াছ। এরূপ স্থলে কুকুরকে কেন ধরা হইল বুঝিতে পারি না। মানুষ বোকা হইয়া এই কুকুর নিন্দা বিবাস করিতে পারে, কিন্তু চতুর কুকুর কখন অদীক আশায় নিজের মুখের মাংসখণ্ড ছাড়িবে না। যদি গল্পটী একান্তই রাখিতে হয়, তাহা হইলে না হয় একটা গর্দ্দভ এক আটি ঘাস মুখে করিয়া নদীর সেতু দিয়া পার হইয়াছিল এইরূপ লিখিলেই চলিবে। তবে এক কথা—যখন গর্দ্দভ আপনার প্রতিবিম্ব আদতেই দেখিতে পাইবে না, তখন সে কি করিয়া ঘাস তাহার স্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে।

৬। লোকে আশার দাস বটে, কুকুরও যে তাহা নহে আমি এমন বলিতেছি না। তবে আমার হাতে পাঁচ টাকা থাকিলে, সেই পাঁচ টাকা অপরকে দিয়া তাহার নিকট হইতে পাঁচ টাকা লইয়া কি লাভ? কুকুরটী মাংসখণ্ডের প্রতিবিম্বকে মাংসের অনুরূপই দেখিয়াছিল, সুতরাং যাহা তাহার আছে তাহার অনুরূপ দ্রব্যে লোভ হওয়া সম্ভব নহে। তবে কুকুরটার যদি দুইখণ্ড মাংসই খাইবার ইচ্ছা ছিল বল, তাহা হইলে আমি বলিব যে কুকুর শত্রুর প্রতি আক্রমণ করিতে যাইলে, কেবল দাঁড়াইয়া মুখব্যাদন করে না। আর প্রতিবিম্বটি সত্য ধরিলেও কখন কুকুরের কাছে হইতে পারে না। প্রতিবিম্ব নদীর জলে দেখিয়া আক্রমণ করিতে হইলে নিশ্চয়ই তদভিমুখে দৌড়িয়া যাইত। কুকুরের প্রতি যাহারা এইরূপ মিথ্যা নিন্দা রটাইয়াছে, তাহারা ঐ সঙ্গে কুকুরটা মাংসের লোভে জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিল এই কথা যদি বলিতে পারিত, তাহা হইলে কুকুরটা জলে পড়িয়া জব্দ হইত, কুকুরের বোকামি আরও ভাল করিয়া দেখান হইত ও আমরা আর একটু আমোদ পাইতাম।

পরিশেষে আমার তৃতীয় অনুরোধের কথা। আমি লিখিলাম বলিয়া যেন কেহ আমাকে কুকুর-ভক্ত বলিয়া মনে না করেন। মনে করিলে আর কি করিব। তবে তোমারও লেখকের অপেক্ষা একজন জ্ঞানী ব্যক্তিও এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহার নাম বলিয়াছি। আলোক বিজ্ঞানের সরল গুটিকত কথা আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কুকুরের গুণগান করা অভিপ্রেত নহে। তবে কুকুরের গল্পটী দ্বারা কথাগুলি অনেকের মনে থাকিবে বলিয়া এত কথা লিখিলাম।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

তিউত ইল্লৎ-সংবাদ।

ফরিদপুর দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ঢাকা বিভাগের যোগ্য কমিশনার, পরদুঃখকাতর তিউত মহোদয় পূর্ব্বে যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। বঙ্গদেশের অকৃত্রিম সুহৃদ, প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত সার চার্লস ইল্লৎ বাহাদুর তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে এ সম্বন্ধে পুনর্ব্বার রিপোর্ট দিতে আদেশ করেন। মহাত্মা তিউত তদনুসারে যে

ডেমি-অফিসিয়াল কবিতাময়ী লিপি লিখিয়া পাঠান, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল। মহাত্মা তিউত সাধারণের নিকট পরদুঃখকাতর এবং সহৃদয় ব্যক্তি বলিয়াই পরিচিত; কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ভাষায় যে এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত ছিলেন না। স্বর্গীয় বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনার জন্য, ইংরাজ-কবি শ্রেণীর মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাত্মা তিউতও, এই ডেমি অফিসিয়াল কবিতার জন্য, বাঙ্গালি কবিকুলতিলকদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবেন, এরূপ আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

জয় প্রভু বঙ্গেশ্বর ইয়ৎ সুমতি।
আসমুদ্র হিমাচল সাম্রাজ্য যাঁহার
রাম-রাজ্য সম যিনি পালিছেন সুখে
প্রজাপুঞ্জে; রাম-রাজ্য সন্দেহ কি তায়!
আর কোথা, কে শুনেছে রাম-রাজ্য বিনা
ফিলিপ্স, র‍্যাডিস্, তথা কোনষ্টাম দল
লভে সমাদর হেন? কেন না জানে হায়
কতই গৌরবে ছিল, নল, নীল বীর
শ্রীরাম গবাক্ষ আদি রাম-রাজ্য কালে?
লিখেছি দুর্ভিক্ষবার্ত্তা, যা ছিল লিখিতে
দৃষ্টাদৃষ্ট শ্রুতাশ্রুত। তবু পুনর্ব্বার
(প্রভুর আদেশ যবে) লিখিব সে কথা
কি ভয় আমার যারে প্রভু অনুকূল।
কি করিবে ক্ষীণ প্রাণ বঙ্গবাসী যত
কি করিবে পাল্‌মেণ্টে "ফ্যাডিষ্টের" দল?
রক্ষিবেন প্রভু মোরে, ত্রেতায় যেমতি
রক্ষিলা অঞ্জনানন্দ বীর চূড়ামণি
লাঙ্গুলে বাঁধিয়া গড় শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
দুর্ভিক্ষ? অলীক কথা, কবির কল্পনা!
সত্য কভু নহে প্রভু; কেনা জানে ভবে,
বিধন কল্পনা-প্রিয় বাঙ্গালির জাতি।
নাটকে, নভেলে, কাব্যে, কল্পনা বিকাশ
করিতেছে, অনুদিন। কি বিচিত্র ভবে
লিখিবে "দুর্ভিক্ষ" নামে নবন্যাস এক?
কিন্তু আমি নাহি দূষি বঙ্গবাসী গণে,
করেছে মিত্রের কার্য্য তারা শত্রুভাবে;
অমল ধবল তব যশঃ সুধাকর,
কলঙ্ক না ছিল তায়, দুর্ভিক্ষ আখ্যান
কলঙ্কের বেশে এবে পরশিয়া তায়
মিটাইল সে অভাব; পূর্ণ মনস্কাম।
দুর্ভিক্ষ জাগ্রত স্বপ্ন! কহি পুনর্ব্বার;
দেখিয়াছি স্বনয়নে, কুক্কুর বিড়াল
এখনও রহেছে দেশে; মানবের দেহে
এখনও শোণিত আছে; জনক, জননী,
এখনও আপন শিশু করেনি ভোজন;
কেমনে কহিব তবে, সত্যে বিসর্জ্জিয়া
দুর্ভিক্ষ ঘটেছে দেশে? হে ধর্ম্ম আপনি
সাক্ষী হও। কোন দিন ভ্রমেও যদ্যপি
অযথার্থ কথা হায়! বাহিরিয়ু মুখে
তিউতের, তবে তারে "ফলো" দিয়া প্রভু
বিদায় করুন দূরে, কিম্বা ইচ্ছা যদি।
বসান সত্বরে আনি লেফ্টেনাণ্ট পদে॥
না হয় দুর্ভিক্ষ সত্য করিনু স্বীকার।
কিন্তু কি বিচিত্র হায়! জন্মিলে মরণ
অবশ্য ঘটিবে ভবে। দুঃখময়ী ধরা,
দুর্ভিক্ষ, যক্ষ্ম ভঙ্গ, মৃত্যু পদাঘাতে
ঘটে হেথা অনুদিন। দুর্ভিক্ষে মরণ,
প্রার্থনীয়, স্বরগের সুন্দর সোপান।
কেনা জানে শত শত ঋষি মুনি জন
কাটাইল কত বর্ষ অনাহার ব্রতে,
লভিতে স্বর্গের সুখ। কি আনন্দ তবে
অদ্যত ভারতবাসী প্রতিবর্ষে যদি
লভে এই স্বর্গসুখ অযতন শুনে।
স্বীকার করিনু সত্য দুর্ভিক্ষ বারতা।
কিন্তু কি আশঙ্কা তায়? রয়েছে যখন

"কেম্বুর" দেবের ভোজ্য। যত ইচ্ছা হয়,
মিটাক না হতভাগা বঙ্গবাসী যত
দগ্ধ উদরের জ্বালা। আহা কত শুণ
আছে প্রভু তাই তব ক্ষুদ্র তনু মাঝে;
তা না হলে, জগতের কে জানিত কবে
কেম্বুরের এত গুণ! প্রভু রিপু হায়!
হয়ত এ মহাসত্য বঙ্গদেশ হ'তে
বিলুপ্ত হইত কালে। আশা আছে মোর
কৃতজ্ঞ বাঙ্গালি জাতি স্মরিবে প্রভুরে
এই কেম্বুরের গুণে; (raleigh) র‍্যালে বাহাদুরে
স্মরে যথা বিশ্ববাসী "পোটাটোর" গুণে!
অকর্ম্মণ্য বাবু দল! সত্যই যদ্যপি
দুর্ভিক্ষ ঘটেছে দেশে। কেন আড়ম্বর!
এত হাঁক, এত ডাক, কেন তুচ্ছ কাযে?
ল'ক তারা বুদ্ধি মোর। অতি অল্প ব্যয়ে
সুসিদ্ধ হইবে কার্য্য। আগামী গেজেটে
আপনি আদেশ এক করুন জাহির,
বুদ্ধি দিয়া বাবুগণে। দুর্ভিক্ষ দমনে
তুলেছেন অর্থ তারা, অংশ মাত্রে তার
কিনিয়া আনুক "গাঁজা", (তুচ্ছ কথা নয়,
ধনীভূত ধান্য বসে এ গাঁজার মাঝে)
পাঠক্ ফরিদপুরে; কলিকা সংগ্রহ
করিবে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে আমার আদেশে;
দলে দলে স্ত্রী পুরুষ, বাল বৃদ্ধ মিলি
লাগাক গাঁজায় দম। অহো কি সুন্দর!
উঠিবে গাঁজার ধুম, হায় রে যেমতি
উঠিত যজ্ঞের ধুম তপোবন হ'তে,
সুরক্ষিত হবে ধরা, ঘুরোগ, মার্কিন
মাতিবে সে সুধাগন্ধে, নিজে ভোলানাথ
"বোবো বোম" শব্দ মুখে তাজিয়া কৈলাস
আসিবেন মর্ত্ত ধামে, সিদ্ধ হবে কায
সুধা দুগ্ধা যাবে সব। আশঙ্কা কেবল
সেই ধুম রথে পাছে আরোহণ করি,
আঁধারি মাদারিপুর, ডেপুটি মোর
চলি যান স্বর্গধামে—ফাঁকি দিয়া মোরে॥
কি আর অধিক তব; দুর্ভিক্ষ সংবাদ
সত্য হ'ক, মিথ্যা হ'ক চিন্তা নাহি তায়।
আমরা বীরের জাতি বীর অবতার,
ননীর পুতলী নই, গলিবে যে প্রাণ
দুর্ভিক্ষের কথা শুনি। দুর্জ্জয় প্রতাপে
উড়ায়েছি কত দুর্গ, কত গিরি বন,
মুহূর্ত্তে উড়াতে পারি রিক্ত, হিমাচলে,
সামান্য দুর্ভিক্ষ কথা (শুনে হাসি পায়)
পারিব না উড়াইতে, তব আশীর্ব্বাদে
দেখুন অর্পান প্রভু, এই সে এখনি
হেলায় লেখনী মোর একটু হুংকারে,
দারুণ দুর্ভিক্ষ দৈত্যে দিনু উড়াইয়া।
বাড়িতে লাগিল লিপি তবু চিরদাস
একটি বারতামাত্র নিবেদিবে পদে।
ইহকালে পত্র মোর জানি আমি ভাল
নীরবিবে, বাঙ্গ মুগ্ধ বাঙ্গালির দলে,
হায় রে হতীক্ষ্ণবিষ ভুজঙ্গ শাবকে
মণি মন্ত্রৌষধি যথা। প্রার্থনা আমার
ও হুচার তবু যবে হবে সমাহিত
ভাবিলে যে কথা আহা ভাবে আঁখি জলে
তখনও এ লিপি মম সমাধি মাঝারে
দেন যেন পাত্রী লাট; কি জানি কি ঘটে
পরকালে, দেবদূত শুনানীর যবে,
আহ্বানিয়া মৃতজনে গন্তীর নির্ঘোষে
সুধা ইবে, "কেরে ইয়ৎ, এতদিন তুই,
আছিলি ত মর্ত্ত্যধামে, কি করিলি বল?
অর্পিতে বঙ্গের ভাগ্য ছিল তোর করে,
সহস্র সহস্র প্রাণী অনি সুধানলে
কাঁদিয়াছে জানি হেথা! জননীর পাশে
দাঁড়ায়ে কাতর শিশু "দে মা অন্ন বলি"
কেঁদেছে করুণস্বরে। অভাগী জননী
কি দিবে শিশুর মুখে না পাই ভাবিয়া
হানিয়াছে শিরে কর। কত নরনারী,

অস্থিমাত্র অবশেষ গৃহস্থের দ্বারে
কুকুর বিড়াল সম ভ্রমিয়াছে দুঃখে।
বল শুনি তা সবার দুঃখ নিবারিতে
কিবা করেছিলি তুই "কোথা বঙ্গেশ্বর"
বলি শত শত প্রাণী ডেকেছিল তোরে
কি উত্তর দিয়াছিলি ?" এরূপে যখন
সুধাইবে দেবদূত, পকেট হইতে
এই যে পত্রিকা মম করিয়া বাহির,
অর্পিবেন হস্তে তাঁর। বিশেষ আমার
পরিতুষ্ট "সদাপ্রভু" হবেন তা হলে॥

কি আর লিখিব প্রভু, আজ্ঞাকারী দাস
সাধিয়াছে রাজ কার্য্য সাধ্য অনুসারে,
মনে রাখিবেন তায়। আগামী পেজেটে
হেরি যেন শ্রোমোসন নিবেদন মিতি॥

মজীবনী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

যুদ্ধ-সংবাদ।—চীনের আশা ভরসা ক্রমে লোপ পাইতে চলিল; জাপানকে সে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতেছে না। জাপানের বিজয়িনী সেনা প্রচণ্ড বিক্রমে চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। চীন এখন নিরুপায় হইল। য়ুরোপের প্রধান প্রধান রাজমণ্ডলের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছে; তাহার একান্ত ইচ্ছা তাঁহারা সকলে মিলিয়া জাপানের সহিত চীনের একটা সন্ধি বন্ধন করিয়া দেন। চীনের এই প্রস্তাবে রুষ ও ফ্রান্স সম্মত আছেন; জর্ম্মানী অসম্মত; তাঁহারা বলেন এরূপ মধ্যস্থতায় কিছুই সুফল ফলিবে না। ইংলণ্ড মধ্যপথ অবলম্বন করিতে সদাই ইচ্ছুক, এস্থলেও তিনি সেই চিরন্তন নীতি পরিহার করিতে প্রস্তুত নহেন।

***

লর্ড সভা।—লর্ড সভার বিরুদ্ধে বহুদিন হইতে প্রচণ্ড আন্দোলন চলিতেছে, এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য লর্ড সভার মূলোচ্ছেদ। সাম্যবাদী ইংলণ্ডে এরূপ আন্দোলন দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। কমন্‌স সভার সদস্যগণ বলেন যে, লর্ডগণ যদ্যপি আপনাদের মতের পরিবর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে অচিরে তাঁহাদিগের অস্তোষ্টি সংকার সাধিত হইবে। লর্ড সলস্‌বেরী এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সে দিন একটী উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতের জন্যই লর্ড সভার অস্তিত্ব একান্ত আবশ্যক; লর্ড সভা উঠাইয়া দিলে চপলমতি র‍্যাডিকেল শাসনকর্ত্তৃগণ ভারত-শাসন বিষয়ে এমনই আলগা দিবেন যে, ভারত হস্তগত রাখা কঠিন হইবে। অনুদার নীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক লর্ড সলস্‌বেরীর মুখে এরূপ কথা বেশ শোভা পায়!

***

কংগ্রেসের সভাপতি।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, মিঃ এলফ্রেড ওয়েব আগামী কংগ্রেসের সভাপতি হইতে সম্মত হইয়াছেন। ইনি ভারতের একজন অকপট বন্ধু, এবং কমন্‌স সভার একটী নির্ভীক সদস্য। ভারতের মঙ্গলোদ্দেশ্যে যত আন্দোলন হয়, ওয়েব সাহেব তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান

অষ্টম বর্ষ। } ৭ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। { অষ্টবিংশ সংখ্যা

জ্ঞান ও অজ্ঞান।

শিষ্য।—আপনি বলিয়াছেন, "অজ্ঞানকে জ্ঞানে পরিণত করাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং প্রবৃত্তি দমন ব্যতীত সর্ব্বজ্ঞানের বিকাশ হয় না,এইবাক্য সম্বন্ধে আমার প্রশ্ন এই যে, যে কোন প্রবৃত্তির বিকাশ হউক, সমস্তই প্রাকৃতিক নিয়মাধীন, প্রকৃতি ঈশ্বরের একাঙ্গ, তাহা হইলে তাহার দমন ব্যতীত জ্ঞানের বিকাশ হইবে না কেন? চিন্তা, যুক্তি, বিচার ও নানাবিধ ক্রিয়া দ্বারা বহুদর্শন ও অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারে; তদ্দ্বারা অজ্ঞানরূপ আবরণ দূরীভূত ও জ্ঞানের বিকাশ ও আয়তন পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে; কিন্তু প্রবৃত্তিকে জ্ঞানের আবরণ বলিব কেন? প্রবৃত্তিই জ্ঞানের পোষক, শরীরের রক্ষক, জীবউৎপাদক ও পরিবর্দ্ধক। মনে করুন, আমার জ্ঞানার্জ্জনের প্রবৃত্তি ভিন্ন উদ্যম, অধ্যবসায় ও মনের একাগ্রতা হইতে পারে না, আমার আহারে প্রবৃত্তি না থাকিলে শরীর রক্ষা হইতে পারে না, অর্জ্জনের স্পৃহা বা ধন অর্জ্জনের প্রবৃত্তি ব্যতীত আহার সংস্থান হইতে পারে না, কাম-প্রবৃত্তি ব্যতীত জীবোৎপত্তি হইতে পারে না, ক্রোধ-প্রবৃত্তি ব্যতীত দুষ্টের দমন হইতে পারে না ও দয়া-প্রবৃত্তি ব্যতীত পরোপকার সাধিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ যদি আপনার ঐ সিদ্ধান্ত ঠিকও হয়, তবে জগতে সকলেই প্রবৃত্তি দমন করিয়া জ্ঞানরাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে তো সৃষ্টি লোপ হইবে, যে বস্তু ভাঙ্গা, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়, তাহা হইলে চরমে সৃষ্টি-লোপ কি ঈশ্বরের অভিপ্রায়?

গুরু।—আধ্যাত্মিক কঠিন বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনা ও মীমাংসার পর আবার দর্শনশাস্ত্রের প্রথম ভাগের বর্ণমালা আলোচনা আরম্ভ করিলে এক কথায় তোমার প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে না; পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রশ্ন মীমাংসার মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর আছে,যাহা হউক পুনর্ব্বার বিশদভাবে তোমার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া

দিতেছি। লোভ, ক্রোধ, কাম, ক্রোধ, [illegible] নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার দমন করিবার আমার অধিকার কি?

গুরু।—বিবেক ও বুদ্ধি তোমার (মানবের) স্বাধীন প্রকৃতি। কাম ক্রোধ হিংসাদি পাশব-প্রকৃতি তোমাতে (মানবে) সংক্রামিত হইয়াছে। বিবেক দ্বারা ঐ সকল প্রবৃত্তি দমিত হইলে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন হয় না। অন্যের প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকাশ হয়, উদ্ভিদ-রাজ্যে বৃক্ষাদি কেবল স্বীয় শরীর পোষণের নিমিত্ত—বহিস্থ অক্সিজেন প্রভৃতি আবশ্যকীয় বস্তু আকর্ষণ করিয়া লইয়া স্বীয় জীবনী-শক্তি পরিবর্দ্ধন করে ও অনাবশ্যকীয় বা জীবন ক্ষয়-কারক বস্তু বিক্ষেপণী-শক্তি প্রভাবে দূর করিয়া দেয়, উহাই বৃক্ষদিগের প্রকৃতি। পশু পক্ষ্যাদিতে চৈতন্যের কিঞ্চিৎ বিকাশ হওয়ায় ঐ আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ অনুরাগ ও বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে। ঐ অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে কতকগুলি প্রবৃত্তির (যাহাকে আমরা নিম্নবৃত্তি বলি—কিন্তু উহার মধ্যে দুই একটি বৃত্তি মানব জগতেও প্রথমাবস্থায় প্রশংসনীয়) বিকাশ হয়, তদ্দ্বারা উহারা বাহ্যবস্তু সংগ্রহ ও অন্য ক্ষুদ্রজীব হত্যা করিয়া নিজের শরীর পোষণ করে ও শারীরিক সুখের নিমিত্ত শারীরিক বৃত্তি নিবৃত্তি করে এবং সন্ততিদিগের তাহা দিয়া জীবন রক্ষা করে। উদ্ভিদ্ বৃক্ষাদিতে যে অঙ্গ-পোষণ শক্তি আছে, জীবজন্তুর তাহাও আছে অর্থাৎ জীবগণ নিশ্বাস দ্বারা অক্সিজেন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া লয় এবং দেহ মধ্যে ভক্ষিত বস্তু, ঐ অক্সিজেন প্রভৃতির যোগে নানাবিধ আকারে পরিণত হওয়ায় তাহাদের অঙ্গ-পোষণ শক্তির সাহায্যে শারীরিক পোষণ ক্রিয়া সম্পাদন করে ও শরীর কলুষকর দোষিত বস্তু নিশ্বাস ত্যাগ দ্বারা পরিত্যাগ করে ইহাও জীবের সাধারণ প্রকৃতি। পশু জগতে বিবেক ও যুক্তিশক্তির বিকাশ না হওয়ায় জ্ঞান পরিবর্দ্ধনের ক্রমিক নিয়ম (Progressive Law) উহাদের প্রকৃতি রাজ্যে নাই। পশুকে বহুদা শিক্ষা দিলেও মানবের ন্যায় তাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্রমিক বিকাশ হইতে পারে না। মানবের চৈতন্যের সহিত জ্ঞানের প্রতিবিম্বরূপ বুদ্ধির বিকাশ হওয়ায় ঐ বুদ্ধির আভাসে পূর্ব্বোক্ত অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে পাশব প্রবৃত্তি শ্রেণীয় আর কতকগুলি নূতন বৃত্তির বিকাশ হয় (যাহাকে আমরা সদ্বৃত্তি বলি, প্রকৃত পক্ষে আমাদের বিবেক ও যুক্তি তাহাদিগকে সদ্বৃত্তি বলে) বুদ্ধির উচ্চাঙ্গ বিবেক, নিম্নাঙ্গ যুক্তি; ঐ বিবেক ও যুক্তিই প্রবৃত্তির শাসন ও নিয়মকারী শক্তি। বিবেক ও যুক্তিমূলক জ্ঞানের ক্রমোন্নতির নিয়ম (Progresive Law) কেবল মানব প্রকৃতির মধ্যে আছে, বিবেক ও যুক্তিই কেবল ঐ ক্রমোন্নতির উপাদান। উহার মধ্যে যুক্তি হইতে বিবেক এক পক্ষে যেমন উচ্চ স্তরে অবস্থিত, পক্ষান্তরে যুক্তির ন্যায় বিবেক সহজে বিকাশ হয় না। উচ্চ স্তরে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যুক্তি অনেক সময় প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া কার্য্য করে, বিবেক বিকাশ হইলে স্বাধীনভাবে কার্য্য করে; কিন্তু প্রবৃত্তির যবনিকা তাহার আভাস হঠাৎ বিকাশ হয় না, প্রায় যুক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। বিচার, নির্দ্ধারণ প্রভৃতি যুক্তির কার্য্য, যুক্তি এমন কি, অতি নীচ প্রবৃত্তির অধীন হইয়াও পড়ে, লোভ-প্রভৃতি বশতঃ চোর যে চুরী করে, তাহার মধ্যে তাহার যুক্তিমূলক বিচার ও নির্দ্ধারণ আছে; কিন্তু ঐ যুক্তি, বিচারও নির্দ্ধারণ ঐ চুরীর লোভ প্রভৃতির মণ্ডলমধ্যে অবস্থিত থাকে অর্থাৎ কিরূপ কৌশলে চুরী করিলে ধরা পড়িব না বা অধিক লাভ হইবে, এবম্বিধ দুইটী কৌশলের মধ্যে কোন্‌টী অপেক্ষাকৃত ভাল, এ সমস্তই প্রবৃত্তি-সংমিশ্রিত যুক্তির কার্য্য; কিন্তু বিবেকের কার্য্য নহে। বিবেক ন্যায়-রাজ্যে অবস্থিত, এই ন্যায় অন্যায় জ্ঞান বিবেক হইতে উৎপন্ন। উহা যখন কোন প্রবৃত্তির অধীন নহে, তখন উহা মন-রাজ্যের স্বাধীন সম্পত্তি, যদিও প্রবৃত্তির তীব্র বেগ ও আবরণী-শক্তির আচ্ছাদনে বিবেকের ক্ষীণ জ্যোতির প্রকৃত বিকাশ হয় না, যেন উহা প্রলোভনে পড়িয়া ভ্রান্ত হয়। তাহা বলিয়া বিবেক ভ্রান্ত নহে, বিবেকই স্বয়ং ঈশ্বরাংশরূপ আত্মা। বিবেক যুক্তির ন্যায় প্রবৃত্তির দাসত্ব করেন। স্বাধীন ভাবে ন্যায় অন্যায় মত প্রকাশ করে; কিন্তু আবরণ ভেদ করিয়া উহার স্বরূপ জ্যোতি সহজে বাহির হয় না, যাহা বাহির হয় তাহা আবরণ মিশ্রিত জ্যোতি, ঐ আবরণের নাম মোহ বা ভ্রান্তি, এই জন্য ভ্রান্তের ন্যায় অনুভূত হয়। বিবেক এক ও অখণ্ড এবং সত্য, ন্যায়, অন্যায় নির্ব্বাচনের কষ্টি-পাথর স্বরূপ। তবে বিভিন্ন ব্যক্তির বা বিভিন্ন জাতির অজ্ঞানাবরণের (তম ওঝের) ন্যূনাতিরেকানুসারে বিবেক ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিকাশিত হয়, উহা বিবেকের স্বরূপ জ্যোতি নহে। যদিও ভ্রান্তির মধ্য দিয়া স্বরূপ জ্যোতির ক্ষীণাভাস বাহির হয়; কিন্তু প্রবৃত্তির ও প্রবৃত্তি-মিশ্রিত যুক্তির নিকট স্থান পায় না। যুক্তি যেমন চোরের যুক্তি-শক্তিতে পরিণত হয় অর্থাৎ লোভের ক্রীতদাস হয়, বিবেক তাহা হয় না। বিবেকের মতে যদি চুরী অন্যায় হয়, তবে বিবেক নিশ্চয় বলিবেন চুরী করিও না; যুক্তির মত বিবেক কখন চোরের সাহায্যকারী হইবেন না। তবে আবরণ হেতু অন্যায় বলিয়া বোধ না হইলে প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বরূপ বিকাশ হইল না, আবরণ মিশ্রিত হইল। ভ্রান্ত বিকাশ হইলেও বিবেক স্বাধীন, যুক্তির ন্যায় নহে।

শিষ্য।—কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা ও হিংসা প্রভৃতি প্রকৃতির এক একটী বিকাশ—উহা প্রাকৃতিক নিয়মাধীন, অতএব ঐ প্রাকৃতিক

যেহেতু বিবেকের মতে যাহা অন্যায়, বিবেক কখনই তাহার সাহায্য করিবেন না, এই জন্য বিবেক স্বাধীন। যাহা হউক, বিবেক যখন স্বাধীন ও সত্যের কষ্টি-পাথর, তখন আবরণ দূরীভূত হইলে তাহার সত্যজ্ঞান (ব্রহ্ম) জ্যোতি বাহির হইতে পারে। মানব-জগতে ঋষিগণের ঐ বিবেকের দ্বারা সত্যজ্ঞান জ্যোতি বাহির হওয়ায় দর্শন-ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি প্রণীত হইয়াছিল; কিন্তু যাঁহাদের ঐ সত্যজ্ঞান জ্যোতির বিকাশ হইয়াছিল, তাঁহাদের ইঙ্গিতানুসারে ঐ সকল শাস্ত্র শিষ্য কর্ত্তৃক বিষদভাবে প্রচারিত হয়। ঐ শিষ্যগণের আবরণ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। তথেতু ও অন্যান্য কারণে ঐ সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থের সার অংশ এক হইলেও স্থানে স্থানে ভিন্ন মত আছে। যাহা হউক, আবরণ একবারে দূরীভূত ও সত্যজ্ঞান জ্যোতি বিকশিত হইলে মানব পৃথিবীতে বাস করিয়াও তাহার মন ভৌতিক জগৎ হইতে অন্তর্হিত হয়, তদনন্তর অন্তরীক্ষ ভূর্লোক অতিক্রম করিয়া স্বর্গ-রাজ্য অধিকার করিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিকাশ হইলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকাল ও ত্রিলোক তাহার নখদর্পণের ন্যায় হয় এবং বড়্‌শক্তির জননী-পরা-প্রকৃতি বিদ্যারূপে তাহার হৃদয় অধিকার করেন। অতএব জ্ঞানীগণ কর্ত্তৃক যে সকল সত্য জনসমাজে বিকাশিত হইয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া সত্য অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয় সত্য বাহির হইতে পারে। যাহাহউক-শনৈঃ বিবেকের বিকাশ ও বিবেকের সাহায্যে বুদ্ধি কর্ত্তৃক প্রবৃত্তি দমন না হইলে আবরণী-শক্তি একবারে দূরীভূত হয় না। আবরণী-শক্তিই জড়ীয় প্রকৃতি বা জড়ের উপাদান। পাষাণ, বৃক্ষাদিতে (জড় ও উদ্ভিদে) যেরূপ পোষণ শক্তি আছে; কীট পতঙ্গ ও পশ্বাদিতে যে পাশব-প্রবৃত্তি আছে এবং বুদ্ধির বিকাশ হেতু যে যুক্তি ও বিবেকের বিকাশ হয়, তাহা সমস্তই এক মানবে আছে। মানব-জগতে বিবেক ও যুক্তি বিকাশের তাৎপর্য্য এই যে,মানবের যে সকল শারিরীক ও মানসিক প্রবৃত্তি ও বৃত্তি আছে, বিবেক তাহাদিগকে আয়ত্তাধীন করিয়া সত্যপথ দেখাইয়া দিবে। প্রবৃত্তি, বিবেকের আয়ত্তাধীন হইলে প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতা ধ্বংশ হইবে, তখন যুক্তি তাহাদিগের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিবেকের উপদেশানুসারে যেখানে যে বৃত্তির বিকাশের প্রয়োজন,সেখানে সেই বৃত্তিকে চালিত করিবে, ইহারই নাম বৃত্তির অনুশীলন ও বৃত্তি-সামঞ্জস্য। প্রকৃত পক্ষে ইহাই খাটি বিশুদ্ধ মানব-প্রকৃতি। ইহা দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টি লোপ হইবার আশঙ্কা নাই এবং ইহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন বলা যাইতে পারে না, বরং ইহার অন্যথাই প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন। যদি মানব-প্রকৃতি পাশব-প্রকৃতির ন্যায় থাকাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তবে মানবে স্বাধীন বিবেক শক্তির বিকাশ হইত না ও ক্রমোন্নতির নিয়ম (Progressive Law) মানবে থাকিত না। এই তো গেল মানব-প্রকৃতি, ইহার উপর আর একটী প্রকৃতি আছে, তাহার নাম দৈবী-প্রকৃতি। এ দৈবী-প্রকৃতি বর্ত্তমান মানব-রাজ্যের উর্দ্ধে অবস্থিত, উহা দেব-রাজ্যের সম্পত্তি বা সর্গীয় বিকাশ। আমাদিগের মনের সহিত স্থূল-জগতের সম্বন্ধ,এই স্থূল-জগৎ হইতে মন অন্তর্হিত হইয়া সূক্ষ্ম ও কারণ-জগতে প্রবিষ্ট হইলে এ দৈবী-প্রকৃতির বিকাশ হয়। এ দৈবী-প্রকৃতির বিকাশ হইলে সূক্ষ্ম ও কারণ-জগতের উপর মনের আধিপত্য সংস্থাপিত হয়। উহারই নাম স্বশরীরে স্বর্গলাভ।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিরুপমা।

সপ্তম অধ্যায়।

ফাল্গুনের পর ফাল্গুন গিয়াছে, আবার ফাল্গুন আসিয়াছে, দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কত হৃদয়ের কত স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সেই যে নিশীথ সময়ে নিরুপমার হৃদয়-সর্ব্বস্বধন অভিমানভরে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা কি নিরুপমা এ জীবনে ভুলিতে পারিবে? নিরুপমা যত দিন বাঁচিবে, ততদিন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারই চিন্তা করিবে, মরিয়া যদি আবার রমণী-জন্ম লাভ করে, তবে সে জীবনেও কেবল তাঁহারই-চরণ দু-খানি ধ্যান করিবে। তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে,মালঞ্চা কি গোকুল নগরে আর বড় একটা ব্যোমকেশের কথা হয় না, যদি কখন প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার নাম উঠে, তাহা হইলে কেহ বলে, 'সে ডুবিয়া মরিয়াছে', কেহ বলে 'রেলে কাটা পড়িয়াছে' কেহ বলে 'সে সন্ন্যাসী হইয়া দেশে দেশে ফিরিতেছে।' নিরুপমা ভাবে, 'ভগবান্ লোকের শেষের কথাটাই সত্য করুন, তিনি যদি সন্ন্যাসী হইয়াও সুখে থাকেন, তাহাতে নিরুপমার ক্ষতি কি? তিনি যেখানে থাকুন, বাঁচিয়া থাকুন, সুখে থাকুন, এ জগতে নিরুপমার আর কে আছে?

নিরুপমা আজ তিন বৎসর মালঞ্চা আসিয়াছে, এখানে কাহারও কটু কথা নাই, অন্যায় তিরস্কার নাই, তবু ত নিরুপমা প্রাণে সুখ পাইতেছে না, সে মনে ভাবে, আমার সে দুঃখও ছিল ভাল, ভালবাসা পাই আর না পাই, চখের উপর দেখিতে ত পাইতাম, দেখিলেই যে তাহার সকল দুঃখ দূরে যাইত, আর কি নিরুপমা সে সুখ ফিরিয়া পাইবে না?

এই তিন বৎসর পূর্ব্বে নিরুপমার বর্ণ পরিচয় ছিল না, সে মালঞ্চা আসিয়া অবধি এক মনে লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে এখন মনের কথা বিনাইয়া বিনাইয়া লিখিতে পারে, যে কোন পুস্তক হউক না কেন, পড়িলেই বুঝিতে পারে। সে একখানি রামায়ণ কিনিয়া আনিয়াছে, অবসর পাইলেই সেই খানি হাতে করিয়া বসে, বাছিয়া বাছিয়া যেখানে যেখানে সীতার নিদারুণ দুঃখের কথা, নিদারুণ শোকের কথা আছে, সেই সেই স্থান পাঠ করে, পড়িতে পড়িতে দুইটী চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়, এক একদিন সীতার বনবাস পড়িতে পড়িতে সে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠে।

তিন বৎসর পরে নিরুপমা একটী সুখ-স্বপ্ন দেখিয়াছে, সে শুনিয়াছে, শেষ রাত্রির স্বপ্ন মিথ্যা হয় না, তাই সে স্বপ্নের কথাটী ভুলিতে পারিতেছে না, দেখিয়াছে, "যেন অনেক দিনের পর তাহার স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে,এখন আর সে বিষ-দৃষ্টি নাই; এখন তাহার প্রতি দৃষ্টিতে, প্রতি সম্ভাষণে স্নেহ ভালবাসা উছলিয়া পড়িতেছে, সে স্বামীর সঙ্গে গোকুল নগরের সেই ছাদের উপর উঠিয়াছে, ব্যোমকেশ আকাশ হইতে এক একটী করিয়া নক্ষত্র ছিঁড়িয়া বিদ্যুতের সুতা দিয়া মালা গাঁথিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিতেছে, নিরুপমা সমস্ত জগৎ বিস্মৃত হইয়া স্বামীর সেই মুখখানি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। যে সুখ-স্বপ্ন পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিয়া দিয়া জীবনকে যন্ত্রণাময় করিয়া

তুলে, কেন তাহা সফল হয় না? নিরুপমা আজ তাহাদের বহির্ব্বাটীতে দাঁড়াইয়া, তাই কেবল ভাবিতেছে,—আর পথ পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মনটা ছাঁৎ ছাঁৎ করিয়া উঠিতেছে, এমন সময় একজন অপরিচিত কৃষকায় মনুষ্য সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নিরুপমাকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এইটা কি পীতাম্বর সান্যাল মহাশয়ের বাড়ী?

নিরুপমা তেমন সুরওয়ালা কথা আর কখন শুনে নাই, বলিল "হ্যাঁ এই বাড়ীই বটে, কেন?"

"তোমার সাথে কিছু বাত আছে, তিনি বাড়ীতে আছেন ভাল?"

"বাড়ীতেই আছেন, তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

"হামার ঘর্ত মালদহ জিলা, হাঁমি লায়ের দেইয়া আছি।"

"তাঁর কাছে কি কাজ আছে?"

"হামি চ্যাংরা মানুষ, অত বুল্‌তে পার্‌ব না; তুমি তোমারে হামার বাত কহ না, এই চিঠি আছে, এতেই সব মালুম হবে।"

"কৈ চিঠি দেখি, কে চিঠি দিয়েছে?"

"তুমিই বুঝি তোমার বেটি আছ? চিটি তোমার আমাই ভেজেছে।"

নিরুপমা যেন স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিল, আর কথা বলিল না, সসম্ভ্রমে মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করিয়া দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সান্যাল মহাশয় তখন প্রাতঃসন্ধ্যা করিতেছিলেন, নিরুপমা বাটী প্রবেশ করিয়া তাহার জননীকে এই সংবাদ দিল, তিনি ধ্যান-মগ্ন স্বামীকে জানাইলেন, সান্যাল মহাশয়ের সন্ধ্যা আর সমাপ্ত হইল না, অধীরভাবে বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিলে মাঝী শির নত করিয়া "ঠাকুর মশায়! তোমার নামে একটা চিটি আছে। তোমার জামাই লা দিয়ে হামা ঘরে ভেজেছে।" এই বলিয়া একখানি পত্র সান্যাল মহাশয়ের হস্তে দিল, তিনি উদ্বেগে কাঁপিতে কাঁপিতে পত্রখানি খুলিলেন, পত্রে লেখা রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা বিজয়তে।

মালতীপুর
১৩ই ফাল্গুন।

শ্রীচরণেষু—

প্রণামান্তে নিবেদনমিদং—

অনেকদিন আপনাদের কোন সংবাদ না পাইয়া অতিশয় চিন্তিত আছি, পত্রোত্তরে কুশল সংবাদে সুখী করিবেন। আমি এক্ষণে মালদহ জেলার অধীন মালতীপুর গ্রামে সাহেবের রেশম কুঠির সহকারী দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত আছি; এখানে বাসাদি সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছি, একাকী থাকা নানাপ্রকার অসুবিধা, সেইজন্য এই নৌকা পাঠাইলাম, ইহারা আমার অধীনস্থ অতি বিশ্বাসী লোক, শ্রীমতীকে এই নৌকায় পাঠাইয়া দিবেন, এবং আপনিও সঙ্গে আসিবেন, নতুবা স্ত্রীলোকের একাকিনী আসা কিরূপে সম্ভবে; অপর মঙ্গল, অন্যান্য কথা সাক্ষাতে হইবে, পাঠান পক্ষে যেন অন্যথত না হয়, পথ খরচের জন্য ২০৲ টাকা পাঠাইলাম, মাঝিদিগের নিকট হইতে লইবেন। ইতি।— প্রণত

শ্রীবৈদ্যনাথেশ রায়।

পত্র খানি পাঠ করিতে করিতে আনন্দে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল, তাঁহার হৃদয় এতই উদ্বেলিত হইয়াছিল যে, মাঝিকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, তাহাকে বৈঠকখানায় বসিতে বলিয়া অতি ব্যস্তভাবে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

নিরুপমার জননী সংশয়ে কাঁপিতেছিলেন, সান্যাল মহাশয় বাটী প্রবেশ করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যই কি যোগকেশের পত্র! বাছা, আমার ভাল আছে?"

"হ্যাঁ যোগকেশেরই পত্র, কুশলেও আছে, নিরুপমাকে নিয়ে যাবার জন্য নৌকা পাঠিয়েছে, এই বলিয়া পত্রখানি পুনরায় পাঠ করিলেন।

তনয়া-বৎসলা জননীর যে কি আহ্লাদ হইল, কে তাহার সীমা করিতে পারে? তিনি দেবতা হইতে গিয়া যেখানে গৃহ-দেবতা শালগ্রাম আছেন, সেই খানে স্খলদ্ধীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, তাঁহার হৃদয়ের যে ভাষা তাহা অব্যক্ত থাকিয়া গেল; যিনি অন্তর্যামী, তিনি সে জননী-হৃদয়ের অস্পষ্ট ভাষা শুনিতে পাইলেন।

১৩শে কার্ত্তিক, বুধবার, কৃষ্ণা-প্রতিপদা। নিরুপমা মালতীপুর যাইবার জন্য সজ্জিতা হইল, সে যেমন করিয়া একদিন আপনার ফুলশয্যার কথা বলিয়া বলিয়া বেড়াইয়াছিল, আজও তেমনি করিয়া গ্রামের সকল বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া, আপনার মালতীপুর যাওয়ার কথা বলিয়া আসিল। নিরুপমার কেহ শত্রু নাই, নিরুপমার সুখে কাহারও ঈর্ষা নাই; তাহার স্বামী জীবিত আছে, ভাল চাকরী করিতেছে, নিরুপমাকে লইতে পাঠাইয়াছে, এ সংবাদে সকলেই সুখী; নিরুপমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলেই বিদায় দিল।

যাইবার সময় নিরুপমা ছোটবেলায় যেমন মায়ের গলা ধরিয়া কাঁদিয়াছিল, তেমনি ভাবে কাঁদিল। স্নেহ-পরায়ণা জননী কাঁদিতে কাঁদিতে তনয়ার মুখচুম্বন করিয়া বিদায় দিলেন, বলিলেন "সেখানে পঁহুছিয়েই সংবাদ দিও, মাঝে মাঝে পত্র দিও, পত্রের মধ্যে সাবধানে যেও"।

নিরুপমা নূতন কাপড় পরিয়া, চুল বাঁধিয়া, পায়ে আলতা দিয়া স্বামী সন্দর্শনে সাজিয়াছে, সে সময় তাহার সে বেশটি বড় সুন্দর দেখাইতেছে; গৃহস্থিত শালগ্রামকে প্রণাম করিল, ঠাকুরের প্রসাদী ফুল বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইল, তার পর প্রাঙ্গনের মধ্যস্থিত পূর্ণ ঘটের নিকট মস্তক নত করিল, তদনন্তর জননীর চরণ ধূলি মাথায় দিল, পিতা সঙ্গেই যাইতেছেন, তিনি পূর্ব্বেই নৌকায় গিয়াছেন; যে সকল পুজনীয়া প্রতিবেশিনী উপস্থিত ছিলেন, নিরুপমা তাঁহাদেরও চরণ বন্দনা করিল, প্রতিবেশিনী ক্রোড়ে যে দুই একটি শিশু ছিল, তাহাদের মুখচুম্বন করিল, তখন বেলা প্রায় দুই দণ্ড হইয়াছে, মালতীপুর যাইবার জন্য নিরুপমা বাটি হইতে শুভ যাত্রা করিল।

যেমন বাটি হইতে বাহির হইবে, অমনি পশ্চাতে টক্ টক্ করিয়া একটা টিকটিকির শব্দ হইল, নিরুপমার বুকের ভিতরটা যেন চমকিয়া উঠিল, প্রতিবেশিনীরা বলিলেন "একবার বসে যাও"; নিরুপমা ফিরিয়া আসিয়া বসিল; একটু পরে আবার যেমন উঠিতে যাইবে, অমনি হাঁচি পড়িল, নিরুপমা ও তাহার মাতার বুকের ভিতর ধড়্ ধড়্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। "ওমা সে কি! যাবার সময় এমন সব বাধা কেন? যাই হ'ক আবার একটু বস্" প্রতিবেশিনীরা এই কথা বলিলে নিরুপমা আবার বসিল, কিছুক্ষণ পরে জগন্মাতার চরণ ধ্যান করিতে করিতে আবার উঠিল; মনের ভিতর শত শত আশঙ্কা, বড়ই অন্য-মনস্ক, যেমন প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে আসিয়াছে, অমনি পায়ে লাগিয়া যাত্রাকালের পূর্ণ ঘটটী গড়াইয়া পড়িয়া গেল।

নিরুপমা! এখনও কি তোমার দুঃখের শেষ হয় নাই? তোমার দুঃখের রোদন এখনও কি দুঃখহারিণীর কর্ণমূলে স্থান পায় নাই? তবে এ শুভ যাত্রা সময়ে এ সকল অশুভ চিহ্ন কেন?

নানা প্রকারে বাধা পড়িল বটে, কি সে যাত্রা আর ভঙ্গ হইল না, মাঝিরা বড় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল,—অপরাহ্ণ সময়ে নিরুপমার নৌকা মালতীপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

শ্রীপ্রিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কন্যাদায়।

(২)

ঘোষ মহাশয় একটা বড় বৈঠকের কথা তুলিয়াছেন; কিন্তু কলিকাতার বসুদের দ্বারা গঠিত বৈঠকে যে কখনও কোন ফল দেখিবে তাহা আমাদের বিশ্বাস নহে। কারণ কলিকাতার বসু মহাশয়েরা দেশের সমগ্র সমাজের স্পর্শ-শূন্য ও সম্বন্ধ-রহিত। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলি। কলিকাতার বাবুরা রাজধানীবাসী বলিয়া একটু স্পর্দ্ধাযুক্ত। ইংরাজী ঢঙ্গের মত সংস্কার পুনরুদ্ধারের ব্যাপার বাহির হইয়াছে এবং তাহার বিজয়-ভেরী যাহা কিছু শব্দিত হইয়াছে তাহাও ইংরাজী নকলে এবং ইংরাজী ভাষায়, কাযেই তাঁহারা রাজদ্বারে পরিচিত বলে, পল্লিগ্রামের ও মফস্বলের উপর তাঁহাদের একটু অবজ্ঞার দৃষ্টি আছে। এতদ্ব্যতীত চাল চলনে, পোষাক পরিচ্ছদে, আহার বিহারে তাঁহারা একটু অধিক ইংরাজী গন্ধ-পূর্ণ, সুতরাং তাঁহারা মানুষিক আকার প্রকারেও পল্লিগ্রাম হইতে বহুদূর। পক্ষান্তরে পল্লিগ্রামের মহাশয়েরা কলিকাতার বাবু দেখিলে ভয়ে ও ঘৃণায় দশ হাত দূরে দাঁড়ান; তাদের আকার আচ্ছাদনও সম্পূর্ণ পৃথক। কাযেই যাহাদের মধ্যে ঘৃণা, ভয়, অবজ্ঞা, বিরক্তি আছে, এবং আহার-গত ব্যবহার-গত এবং কথঞ্চিৎ ভাষা-গতও পার্থক্য আছে; তা ছাড়া যখন কোনই বাধ্য বাধকতার সম্বন্ধ নাই, তখন তাহাদের মধ্যে যে একতা ও সমচেষ্টা অসম্ভব, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। যাহা কিছু হিঁদুয়ানী, যাহা কিছু সামাজিক সংগতি, তাহা পল্লিগ্রামেতেই আছে এবং আরও কিছু দিন থাকিবে। পল্লিগ্রাম কখনই সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ে কলিকাতার আদেশ শুনে নাই এবং ভবিষ্যতে বড় সহজে যে শুনিবে তাহাও বোধ হয় না। কলিকাতার হুজুগের বন্যা হরালীর চড়াতে আছাড় খাইয়া উলটিপালটি ভাগিরথীর অতল জলে মিলাইয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কন্যাদায় তিনটি কারণে অসহ্য গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম বল্লালী কৌলীন্য প্রথার স্থানে ইংরাজী কলেজী কৌলীন্য প্রথা প্রচলন এবং অধ্যাপক ও নৈয়ায়িক যৌতুকরূপে নগদ মুদ্রা দান ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে সমান অলঙ্কার দান, দ্বিতীয়তঃ বহুবিবাহ প্রথার উন্মূলন, তৃতীয়তঃ পূর্ব্বেকার সামাজিক পদমর্য্যাদার স্থানে নূতন ইংরাজী "পোজিসন্" (position)এর অধিষ্ঠান। এই রসিক বাবু এত হৈচৈ করিতেছেন, কন্যাদায়ে তাঁহার ছটফটানি ধরিয়াছে, তিনি কি সেকেলে ফুলসীর মালা গলায় পরা, টিকীওয়ালা, গুরু ব্রাহ্মণ দেবতাদিকে সদা প্রণামপরায়ণ, ইংরাজী অক্ষর-শূন্য, ঠেটি-পরা অথচ গোরবর্ণ ধুতী পাড়া-গেঁয়ে কোন কায়স্থের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিবেন? আমাদের বিশ্বাস তিনি কখনই দিবেন না, দিবার ইচ্ছা থাকিলে কন্যাদায় তাঁহাকে এত বিবেচনা-শূন্য করিত না। এই তিনটি কারণ ব্যতীত পুরাতন তিনটি অন্য কারণও আছে। কন্যা-বিবাহের বাঁধাবাঁধি সময় নির্দ্দেশ, অথচ পুত্রের বিবাহে তাহা নাই, আর কন্যার পিতাকেই উপযাচক হইয়া পুত্রের পিতার দ্বারস্থ হইতে হইবে, অথচ পুত্রের পিতা ঘরে থাকিয়া সুন্দরী পুত্রবধূ পাইবেন। কন্যাকর্ত্তাকে কোন কথাই বলিবার যোগ্য নাই, শেষের কারণ, বিবাহ আদান প্রদান হইলেই ঘটকের ঘটকালী ব্যাপারে এবং পুত্রের হিসাবে কেবল কন্যা গচান অথবা ন্যস্ত করা হইয়াছে, বিবাহ আর হয় না। কন্যার বিবাহ দেওয়া দায় এবং কর্ত্তব্য; অথচ পুত্রের বিবাহ দেওয়া দায় নহে, কেবল লাভের অঙ্ক রেখিতে হইবে। এই ছয়টি উপায় নিবারণের নামাবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে; এবং যখন দেশব্যাপী কষ্ট হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই কালে একটা না একটা সৎপন্থা উদ্ভূত হইবে। তবে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা ভাল বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহাই নিবেদন করিব যাত্র।

১। যেমন কন্যার বিবাহের কাল নিরূপিত আছে এবং অভিভাবকগণের উপর অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা আছে; তেমনি পুত্রের বিবাহের কাল নিরূপিত হওয়া উচিৎ এবং তাহাও কর্ত্তব্য বলিয়া ধারণা থাকা ন্যায্য। যে কারণে কন্যার বিবাহ শীঘ্র দেওয়া প্রশস্ত, সেই সকল কারণে শীঘ্র পুত্রের বিবাহ দেওয়াও কি প্রশস্ত নহে? রজস্বলা কন্যা অনূঢ়া রাখিলে পিতৃগণের নিরয়-গমন হয়; তেজস্বী, ক্ষমতাবান্ সমর্থ পুত্রকে অনূঢ় রাখিয়া, নির্ব্বীর্য্য, শক্তিহীন, দৃষ্টিক্ষীণ, সদা শঙ্কিত করিয়া রাখাও কি মহাপাপের কর্ম্ম নহে? ইংরাজী নকলে অধিক বয়সে পুত্রের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিলে, সেই ইংরাজী নকলে কন্যারও অধিক বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, সকলেই নিজ নিজ পুত্রের এম-এ পাশ না করাইলে বিবাহ দিবেন না পণ করিতেছেন, অথচ কন্যার বিবাহের সময়ে হা হুতাশে দেশ মাতাইয়া তুলিতেছেন। এমন অবস্থায় হয় মেয়েদের জন্য বিদেশ হইতে বর আনিতে হইবে, নয় যতদিন দেশের ছেলেরা এম—এ পাশ না করে, ততদিন মেয়ের বিবাহ স্থগিত রাখিতে হইবে। ছেলের বিবাহের সময়ে "আর্লি ম্যারেজের" ইংরাজী দোষ বাহির হইবে, অথচ কন্যাটির ত্রয়োদশ বর্ষের পূর্ব্বেই বিবাহ হওয়াই চাই। এক দিকে ইংরাজীর অনুকরণ, অপর দিকে হিন্দুর পক্ষ অবলম্বন। এমন দ্বৈ-টানায় থাকিতে হইলেই বিভ্রাট ঘটিবে।

২। সভ্যতা ও শিক্ষাপ্রসূত মর্য্যাদা জ্ঞানকে ও "পজিসন্" বুদ্ধিকে ত্যাগ করিয়া হিন্দুর মত যথার্থই সকলেই লোক-লৌকিকতা করিবেন। এত ইংরাজীর বিস্তার হইয়াও যখন রায় বদ্রীবাহাদুর ডিপুটী বাবুর কন্যার বিবাহ জন্য কেরাণীগিরীর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারে উপযাচক হইয়া দাঁড়াইতে হয়, তখন

পূর্ব্ব হইতেই আদর আপ্যায়িতের দ্বারা সকলের সহিত সখ্যতা স্থাপন করা এবং সকলকে সমকক্ষ জ্ঞান করা বিচক্ষণের কার্য্য। কেন না ইংরাজ-দত্ত মান, মর্য্যাদা, পদ, সম্মান আজীবন স্থায়ী, আর সমাজগত পদ ও মর্য্যাদা চিরস্থায়ী। সমাজের মানই সুধীগণ আকাঙ্ক্ষিত, যেহেতু উহা দ্বারা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সকলেই পদস্থ ও সম্মানিত থাকিতে পারে; ইংরাজের দেওয়া মান যতদিন কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিবে, ততদিন টিকিবে, পরে সবই সমান ও এক। এখন ডিপুটী অথবা সদরালার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, ইংরাজী মর্য্যাদার ঘোরে দেশের দরিদ্র ভদ্রলোক সকলকে অবজ্ঞা করিলে, তাহারাও সময় বুঝিয়া, কাঁরে ফেলিয়া মোচড়া দিবেই। ফলে বাবুর কন্যার বিবাহের সময়ে বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের রায়চাঁদ প্রেমচাঁদী ছেলে-টিকে, অনেক টাকা গনিয়া দিতে হয়। ক্রমশঃ এই টাকা দেওয়া ও টাকা পাওয়া রোগটা সংক্রামক হইয়া পড়ে। সমাজ-শুদ্ধ লোক ইহার জ্বালায় উদ্যস্ত হয়। দেশের পদস্থ বড় বাবুরা একটু অমায়িক ও যথার্থ পরোপ-কারী হইলে কালে এই বিষম বৈষম্য তিরো-হিত হইবে।

৩। সকল দেশেই সুশ্রী ও কুৎসিত আছে—তা ছেলেই কি, মেয়েই কি। বাঙ্গা-লার পুত্রবান্ পিতা সকল যদি কেবল রূপ ও কটা রং না খুঁজিয়া ভদ্রবংশে পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এ বিভ্রাট অনেক কমে। সকলেরই ছেলে মেয়ে দুই আছে, যখন তাঁহারা কাণে মেয়ের বিবাহ দিতে কষ্ট ও অপমান সহ্য করেন, সেই সময়ে যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁহাদের কাল ছেলের বিবাহের জন্য আরশানী মেয়ে খুঁজিবেন না, চলন-সহি ভদ্রবংশীয়া কন্যা হইলেই চলিবে, তাহা হইলে অনেক কষ্টের—অনেক ব্যয়ের উপশম হয়, অনেক ইতরতা দেশ হইতে দূর হয়।

৪। মেয়ের বিবাহের জন্য কেবল পাস করা, চস্‌মা-পরা বর না খুঁজিয়া শুশ্রূষা-যুক্ত ধন-ধান্যপূর্ণ বাঙ্গালানবীষ পাড়াগেঁয়ে অথচ উচ্চবংশীয় বর খুঁজিলে সব দিক বজায় থাকিবে। পাসকরা বাবুর ঘড়ি চাই, চেন চাই, আংটি চাই, এবং যতদিন ওকালতীর পসার না হয়, ততদিন বাসার খরচা যোগান চাই; আর পাড়াগেঁয়ে বরকে সালঙ্কৃতা কন্যা দান করিলেই আপদের শান্তি, মাঝে মাঝে মাছটা, শাকটা পাঠাইয়া তত্ত্ব লইলেই চলে। সুতরাং কেবল অন্যভক্ষ্যধনুর্গুণ, গৃহ-দার-শূন্য, সহায়-সম্বল-বিরহিত, পাঁচখানা ডিগ্রোমো-ওয়ালা স্পর্দ্ধার ও অহঙ্কারের অবতার শিক্ষিত বাবুকে জামাতা করিবার চেষ্টা না করিয়া, অব-স্থানুযায়ী গৃহস্থের পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করা অনেকাংশে ভাল। "বিবাহ-বিভ্রাট"প্রণেতা ত একথা আমাদের খুব ভাল করিয়াই বুঝাইয়া-ছেন। তবে কেন আমরা "নন্দলালী জামাই-য়ের জন্য পাগল হই? সে কালের ব্যবস্থামত পালটঘরে অবস্থামত বিবাহ দিলে এত গোল-যোগ হয় না। আমরা জানি, এখনও পাঁচ সাত শত টাকা খরচ করিলেই সদ্‌-গৃহস্থের ঘরে কন্যা সমর্পণ করা যায়। দেখিতেছি এ পাপের সৃষ্টি আমরা নিজেই করিয়াছি, এ হলা-হল আমরা নিজেই মথিত করিয়া তুলিয়াছি, এখন নিজেদেরই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, দেশের তত শোচনীয় অবস্থা হয় নাই, যত রসিকবাবুপ্রমুখ সকলেই বুঝাইতে চাহেন। পাস করা সামগ্রীর দাম চড়িয়াছে, তাহা খরিদ করিলেই হইল, বিলাতী মাগুল অনেক দাঁড়াবে; দেশী দ্রব্যের আমদানী ও ব্যবহার করিলে হানি কি?

সমাজের মঙ্গল চিন্তা বিজ্ঞ ও পলিতকেশ মুরুব্বিরা করিবেন ও করিতেছেন। আমাদের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পক্ষে এ সকল কথার আন্দোলন ভাল দেখায় না, তবে নাকি এখন ভোটের বাজার, আলোচনার ব্যাপার তাই এত কথা বলিলাম। সমাজের দশজনে এ বিষয়ে চিন্তা করিলে কৃতার্থ হইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট।

(৫)

যশোহর আদালত-গৃহের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া দুইজন যুবক কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। এক জন অপরকে বলিল,—

"তুমি এসেছ শুনে আমি তোমার সাথে দেখা কর্‌বার জন্য সকালে তোমাদের বাসাতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তোমায় দেখা পাই নাই।"

দ্বিতীয় যুবক উত্তর করিল,—

আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে অতদূর কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রাতে আমি অন্য একটি বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম।

প্র-যু। বটে,—খুব ঠাট্টা শিখেছ যাহ'ক, সে সব যা'ক। এখন চল তোমাকে আমাদের বাটীতে যেতে হবে। আজ শনিবার, আমি সকাল সকাল কাজ কর্ম্ম সেরে নিয়ে বাড়ী যাব, বুঝলে ত?

দ্বি-যু। আমি বিশেষ দুঃখিত হচ্ছি, যেহেতু আপনার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারিলাম না। কারণ আজ এখানে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

প্র-যু। তোমার যেহেতু টেহেতু-রেখে দাও; সে সব হচ্ছে না। যখন তোমাকে দেখতে পেয়েছি তখন আর ছাড়ছিনে।

দ্বি-যু। আমাতে ত সেরূপ কিছু নাই, যে, আপনি হাতে পেয়ে ছাড়তে চান না।

প্র-যু। নে ভাই, তোকে কথায় এঁটে ওঠা ভার। এখন আমার এই কথাটি রক্ষা কর্‌বে কি না বল? এইটিই আমার প্রথম অনুরোধ।

দ্বি-যু। আর কাহারও হইলে সতন্ত্র কথা ছিল; কিন্তু আপনার অনুরোধ—অমান্য করিবার ক্ষমতা আমার নাই। বিশেষতঃ ইহাতে আমার স্বার্থ আছে। "এই বলিয়া প্রথম যুবকের মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিল।"

প্রথম যুবক দ্বিতীয়ের পৃষ্ঠে হাত চাপ-ড়াইয়া বলিল,—"বেশ, বেশ,—খুব লেক্‌চার শিখেছ যাহ'ক। এখন আমার কথায় রাজি?"

দ্বি-যু। কাজে কাজেই।

প্র-মু। যাবে কখন?

দ্বি-মু। বল্‌বে যখন।

প্র-মু। ঠিক?

দ্বি-মু। ঠিক।

প্র-মু। তবে তুমি আমার আপিসে এসে একটু ব'স। আমি তাড়াতাড়ি কাজ কর্ম্মগুলো সেরে নিয়ে-দু-জনে বেরব এখন। বেলাও প্রায় ৪টা বাজে।

দ্বি-মু। আমার একটু দরকার আছে, সেটুকু বরং সেরে আসি বাসায় যাই। আপনি সেইখানে আমাকে দেখ্‌তে পাবেন।

প্র-মু। তবে যাও। কিন্তু ঠিক থাকে যেন। কথায় নড় চড় হয় না যেন, আমি কিন্তু ঠিক ৫টার সময় তোমার ওখানে যাব।

দ্বি-মু। আচ্ছা। তবে আমি এখন যেতে পারি?

প্র-মু। এখন যেতে পার। আমিও কাজগুলো সেরে ফেলিগে।

এই বলিয়া উভয়েই প্রস্থান করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত যুবকদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি ললিত কুমারের শ্যালক, নাম নিবারণচন্দ্র। দ্বিতীয়টি ললিতকুমার। ললিতকুমার বাড়ী হইতে যশোহর যাইবার নাম করিয়া বাহির হন; কিন্তু মনে মনে অন্যরূপ ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য যশোহরে আসিয়া নিবারণ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। কিন্তু অন্য ঘটনাক্রমে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল।

ললিত বাসায় আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিল, শ্বশুর-বাড়ী যাই কি না? আজ একমাসের অধিক হইল কুসুমের সরল মুখখানি দেখা হয় নাই; মনের মধ্যে তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল একবার ভাবিল সে সব প্রলোভন ত্যাগ করাই ভাল। কিন্তু মন যে তাহাতে রাজি হয় না। সে সরলা বালিকা ভাল মন্দ কিছুই জানে না, সুতরাং তাহার মনে কষ্ট দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। যখন সে বালিকা আমার বিদেশ গমনের কথা শুনিবে, তখন আমার নিষ্ঠুরতার কথা ভাবিয়া, কতই না কাঁদিবে, কতই না হৃদয়ে ব্যথা পাইবে। তাহার মুখখানি না দেখিয়াও যাইতে মন সরিতেছে না, দেখিলেও আবার সে লোভ ত্যাগ করা যায় না, বিশেষতঃ নিবারণ বাবুর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সুতরাং কোনমতেই আর অমত করা হইবেক না।

এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিতেছে, এমন সময় নিবারণ বাবু ডাকিল, —"ললিত।"

ললিত তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া নিবারণ বাবুকে ঘরে লইয়া বসাইল। নিবারণ বলিল,—

"আর বেশী দেরী ক'র না। শীঘ্র এস; গাড়ী প্রস্তুত; এদিকে সন্ধ্যাও হ'য়ে এল।"

ললিতকুমার বলিল,—

"আমি সোমবারের দিন আসিব ইহা স্বীকার করুন, তবে আমি যাইব।"

নি। সে হবে এখন; আগে ত চল, শেষে আস্‌বার কথা,—তা সে সময় হবে।

ল। সে হবে না; আপনি রবিবার সোমবারে আসিলে কোন আপত্তি করিবেন না।

নি। আচ্ছা চল—চল। সোমবারেই নয় এস।

তখন দুই জনে গিয়া অশ্ব শকটে উঠিলেন। ভাড়াটে গাড়ি ঘড়াং ঘড়াং করিয়া ছুটিল। নিবারণ বাবুদের বাড়ী সহর হইতে তিন মাইল ব্যবধান মাত্র। সুতরাং ঘোড়ার গাড়িতে যাইতে অধিক সময় লাগিল না বটে, কিন্তু ছ্যাকড়া গাড়ীর কল্যাণে উভয়েরই শরীর বিলক্ষণ বেদনা হ'য়েছিল। ঠিক সন্ধ্যার পর উভয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন।

(৬)

জামাতা শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়াছে, সুতরাং ভারি একটা ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। কেহ জল আনিতে ছুটিয়াছে, কেহ তামাক আনিতে ছুটিয়াছে। জেলের বাড়ী হইতে ভারি একটা রুই মাছ আনিবার জন্য কোন চাকর ছুটিয়াছে, যেন বাড়ীতে কোন উৎসব। ছোট ছোট ছেলেরা আসিয়া জামাইকে ঘিরিয়া নানা প্রকারে জ্বালাতন করিতেছে; কেহ কাণ মলিয়া দিতেছে, কেহ গলার চাদর কাড়িয়া লইতেছে, কেহ বা জুতা জোড়া সরাইয়া রাখিতেছে। শ্যালিকাকুল কোন ঘোঁজ হইতে ভগ্নিপতিকে এক একবার নজরে দেখিয়া মনের সাধ মিটাইতেছে। গৃহিণী জামাতার জলখাবার আয়োজন করিতেছেন, মেয়েরা পান সাজিতেছে, যেন সমারোহ ব্যাপার!

ললিত হস্ত-পদাদি ধৌত করিয়া বসিয়া আছেন; জনৈক ভৃত্য আসিয়া বলিল,—"আপনাকে একবার বাড়ীর ভিতর যেতে হবে।"

ললিত বাড়ীর মধ্যে একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে নানা প্রকার সুখাদ্য জলখাবার রূপার থালে সাজান রহিয়াছে দেখিলেন, কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া দেখেন, গৃহটি জনতায় গিস্ গিস্ করিতেছে। পাড়ার সব মেয়েরা সেখানে সমবেত হইয়াছে; কাল, রাঙ্গা, সাদা, গোলগী, সরু, সব রকমই আছে। বালিকা, এবং যুবতীর ভাগই বেশী; কচিৎ দুই একটি প্রৌঢ়া ছিলেন। কাহারও নাকে নথ, কাহারও কাণে দুল, কাহারও পরণে পাছা-পেড়ে সাড়ী; আবার কোন ভামিনীও 'বডি' "জ্যাকেট" পরিয়া অঙ্গের বাহার দিয়াছেন। ফলতঃ সে কক্ষটিকে একটী ক্ষুদ্র রূপের হাট' বা 'চাঁদের হাট' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ললিত একে অত্যন্ত লাজুক, তাহার উপর এতগুলি যুবতীর সম্মুখে বসিয়া জলযোগ করিবেন, আর তাঁহারা নানা প্রকার ঠাট্টা-তামাসা করিবে—মাথা কাটিয়া ফেলিলেও সে তাহা পারিবে না। কিন্তু দুষ্যন্ত-হস্তে পতিত,—উপায় নাই, তাই অগত্যা মাথা হেঁট করিয়া আসোনোপরে বসিলেন। তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় বসিতে দেখিয়া কোন সুরসিকা শ্যালিকা বলিল—

"কি বাবু মহাশয়, আমরা কি এমন কুরূপ, কুশ্রী যে, আমাদের দিকে একবার চাইতেও ইচ্ছা করে না?"

বৃদ্ধা দিদি-শাশুড়ী উত্তর দিলেন,—

"ওলো সুরবালা, তুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌নে, কারে খুয়ে কারে দেখি বলে, উনি অমন ক'রে বসে আছেন।"

পশ্চাৎ হইতে চারুবালা উত্তর করিল,—

"তবে এক কাজ করা যাক্; উহাঁর নিজের জিনিষ উহার সাম্মুখে ধরা যাক্। তাহ'লে আর কোন গোল থাকবে না।"

সুর। ওলো চারু, তুই ঠিক ঠাউরেছিস্। কিন্তু সে ত আটদৌরে আছেই; সে এখন ভাল লাগ্‌বে কেন, তুই বরং ওঁর বাঁদিকে ব'স্। তোকে ওঁর মনে ধর্‌বে।

চারু। ওলো তুই থাক্‌তে আমি বস্‌তে গেলাম কেন? তুইত আমার চেয়ে শত গুণে ভাল, তুই ব'স্ না?

ললিতকুমার তখনও সেইরূপ ভাবে বসিয়া আছে দেখিয়া দিদি-মা বলিলেন,—"নে নে ছুঁড়িরা; তোরা আর কোন্দল করিস্‌নে। ও কষ্ট ক'রে এসেছে, কিছু খাক্ আগে—তারপর যা হয় বলিস্।"

সুর। কেন, আমরা কি ওঁর হাত ধরে রেখেছি, না ওঁর মুখ সেলাই ক'রে রেখেছি

যে, উনি খেতে পাচ্ছেন না? উনি খান না, এত লজ্জাই বা কিসের?

দিদি-মা অগ্রসর হইয়া নাত-জামাইকে যত্ন করিয়া এটা ওটা খাওয়াইতে লাগিলেন। ললিত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, দিদিমার অনুরোধে এটা ওটা খাইয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। সুন্দরী সমুহ তখন সময় পাইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। মাদৃশ লেখকের পক্ষে তাহা বর্ণন করিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং ভূমিকা লিখিয়াই বিদায় হইলাম। পাঠক! যদি আপনি সুরসিক হ'য়েন, এবং যদি আপনি কখন পূর্ব্বে অবস্থায় পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনিই তাহার মর্ম্ম সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন।

(৭)

তৎপর দিবস রাত্রে ললিত শুইয়া আছে, অনেকক্ষণ পরে কুসুমকুমারী সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা অর্গল বন্ধ করিল। আজ দুই দিন কুসুমের মুখ খানিকে সদাই হাসি লাগিয়া ছিল; বোধ হয় এই পৃথিবী তাহার নিকট স্বর্গ বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিন্তু কি কারণে যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, কুসুম তাহা জানিত না; তবে স্বামীকে দেখিল যে তাহার সেরূপ ভাব হইবে, ইহা বালিকা বুঝিত। নব-বসন্ত-সমাগমে পুরাতন পত্রাপগমে বৃক্ষ-বল্লরী যেমন নূতন মুকুল ও পত্রাদিতে শোভিত হয়, শারদীয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে সরোবরে যেমন কুমুদ কহ্লার প্রস্ফুটিত হয়,প্রভাত-সমীরণ-হিল্লোলে উদ্যানে যেমন কুসুম প্রস্ফুটিত হয়; স্বামী-সমাগমে স্বাধী কুসুমেরও সেইরূপ হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

কিয়ৎকাল পরে কুসুম স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বড় গরম হচ্ছে; বাতাস করব কি?"

ল। না কুসুম, রাত জেগে বাতাস ক'রে তোমার অসুখ হ'বে। বিশেষতঃ এখন তোমার পক্ষে রাত্রি জাগরণ নিষিদ্ধ। তুমি একটু ঘুমিয়ে পড়।

কু। তুমি কি নিশ্চয়ই কাল সকালে দাদার সাথে যাবে? আর দু-দিন থাক না কেন?

ল। হাঁ, আমি কল্যই যাইব; আমার বিশেষ দরকার আছে।

অনন্তর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বলিলেন,—"বোধ হয় আর অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হইবেক না। ভগবানের মনে কি আছে কেমন করিয়া বলিব?"

সরলা কুসুম এ কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু অনেক দিন দেখা হবে না শুনে, মনে কেমন একটা আতঙ্ক হইল, বিস্তর কাঁদিয়া কাটিয়া স্বামীকে বলিল, মাসের মধ্যে অভাগিনীকে অন্ততঃ একবার দেখিয়া যাইও, ইত্যাদি। ললিত আসিল কথা গোপন করিয়া, কুসুমকে বিস্তর করিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া নিরস্ত করিল। নিদ্রার ঘোরে বালিকা স্বপ্ন দেখিতে লাগিল;—যেন দীর্ঘ জটাজুটধারী, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-বিলেপিত, কপালে ত্রিপুণ্ড্র, দীর্ঘ-ত্রিশূলধারী, নর-কঙ্কাল বিভূষিত জনৈক সন্ন্যাসী, তাহার স্বামীর চুলের মুঠা ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। বালিকা আর্ত্তনাদ করিয়া সন্ন্যাসীকে কত প্রণাম, কত মিনতি কত পায়ে মাথা খুঁড়িল, কিন্তু সে দুরন্ত ললিতকে কিছুতেই ত্যাগ করিল না। অসহায়া বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কতদূর গিয়া দেখিল, সম্মুখে তয়ানক শ্মশান,—একটী চিতা ধু—ধু করিয়া জ্বলিতেছে। সন্ন্যাসী ললিতকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিতে গেলেন, বালিকা উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া সন্ন্যাসীর পদযুগ জড়াইয়া

ধরিল। রোষকষায়িত লোচনে বালিকাকে পদাঘাতে দূরে করিয়া দিয়া, ললিতকে অগ্নি-হ্রদ মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। বালিকাও জয় মা কালী বলিয়া যেমন অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাইবে, অমনি সন্ন্যাসী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। বালিকার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইল। চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখে, রাত আর অধিক নাই, স্বামীর বাহু-পাশে আবদ্ধ রহিয়াছে। ললিত হাঁসিয়া বলিল,—"স্বপ্ন দেখে যে পড়ে ছিলে; ভাগ্যে আমি উঠেছিলাম, নৈলে বিশেষ বিপদ ঘট্‌তো।"

স্বপ্নের কথা শুনিয়া কুসুমকুমারী শিহরিয়া উঠিল। ললিত পত্নির নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে গেলেন।

* * * *

(৮)

কামরূপের পীঠস্থানের নিকট একখানি, ষ্টাইনির্ম্মিত বৃহৎ ঘরের একটী খোপে বসিয়া ললিতকুমার পত্র লিখিতেছে। ঘরটি খুব ছোটখাট, আসবাবের মধ্যে একখানি খাটিয়া, একটী লোটা, বিছানা, বালিস ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন তবলা, ঢোলক, সেতার, তানপুরা,এস্রাজ প্রভৃতি কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রও ছিল। ললিত-কুমার সঙ্গীত-বিদ্যার বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

পত্রখানি লিখিয়া একবার পড়িলেন;—

"প্রায় ৫ মাস গত হইতে চলিল,—আপনাদের কিম্বা বাড়ীর কোন সম্বাদ পাই নাই; তাহাতে অত্যন্ত চিন্তিত আছি। সে দোষ আমারই। কারণ আমি যদি ঠিকানা লিখিতাম, তাহা হইলে এতদিন অবশ্যই সম্বাদ পাইতাম। সে যাহা হউক, শীঘ্রই আমাকে সকল সংবাদ দিয়া সুখী করিবেন। আমি কাহাকেও আমার বর্ত্তমান অবস্থানের বিষয় লিখি নাই; কেবল আপনাকে না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার একটি অনুরোধ,—আমি কোথায়, কি অবস্থায় আছি, কাহাকেও লিখিবেন না। শৈকলের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে আপনি আমাকে লিখিবেন। মাকে এবং আর আর সকলকে বুঝাইয়া বলিবেন,—আমি ভাল আছি, আমার জন্য ভাবিবার কোন কারণ নাই, শীঘ্রই বাটি যাইব। ৫০্ টি টাকা আপনার নিকট পাঠাইলাম, কুসুমের শ্বশুরের জন্য ২০্ টাকা রাখিয়া বাকী ৩০্ টাকা বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবেন।

আমি এখানে বেশ আছি; তবে আপনাদের অদর্শনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। এখানকার কোন জমিদারের পুত্রকে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা দিতেছি; তাহাতে মাসিক ৪০্ টাকা করিয়া পাইতেছি। খরচ খরচা বাদে যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলাম,অদ্য তাহা পাঠাইলাম। ভাই, আমি আশা করি আমার অপরাধ লইবেন না, এবং আমার অনুরোধ কয়েকটী রক্ষা করিয়া চিঠি লিখিবেন। আপনার পত্র পাইলে আর আর বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিব। আমি শারীরিক ভাল আছি; আপনাদের কুশল লিখিবেন নিবেদন মিতি।

আপনারই

হতভাগ্য ললিত—

দুই সপ্তাহ গত হইল। একদিন বৈকালে ললিত নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইল;—

ললিত!

তোমার পত্র পাইয়া যুগপৎ আহ্লাদিত এবং দুঃখিত হইলাম। আহ্লাদিত হইলাম সংবাদ পাইয়া, দুঃখিত হইলাম তোমার এরূপ আচরণের জন্য,—তুমি কাহাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছ সেইজন্য। তোমার

জন্য সকলেই চিন্তিত ছিলেন; বিশেষতঃ তোমার মাতাঠাকুরাণী কাঁদিয়াই দিন কাটাইতেন। তোমার আর বিদেশে থাকিবার প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই বাটী আসিবে। যদি এই মধ্যের মধ্যে না আইস, তবে এখান হইতে কেহ যাইয়া তোমাকে লইয়া আসিবেন, ইহা বুঝিয়া যাহা উচিৎ বিবেচনা হয় লিখিও।

তুমি বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবে, অদ্য ২ মাস হইল তোমার একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ শিশু এবং তাহার মাতা ভাল আছে। শ্রীমতী সর্ব্বদাই কাঁদে, আমরা তাহাকে সাধ্যমত বুঝাইয়া রাখিয়াছি, তুমি অন্ততঃ তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিও। তুমি ত অবুঝ নও, ভাবিয়া দেখ দেখি, কাজ কি ভাল করিয়াছ? কাহাকে না বলিয়া যাওয়া কি তোমার পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে? আমরা সকলেই ব্যস্ত, চিন্তিত। তোমার অনুসন্ধানের জন্য কত কষ্ট এবং অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। আমি ভগিনীর নিকট কোন বিষয় গোপন করি নাই, করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। তোমার অর্থোপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই, সত্বর বাড়ী আইস ইহাই আমাদের সকলের ইচ্ছা। তোমাদের এবং আমাদের বাড়ীর সকল সংবাদ মঙ্গল, কেবল তোমার অদর্শন জনিত দুঃখ মাত্র। শীঘ্র শীঘ্র তোমার পত্র পাইবার প্রত্যাশায় রহিলাম ইতি।

তোমারই—
নিবারণ

ললিত অভিনিবেশ পূর্ব্বক পত্রখানি পাঠ করিল। তাহার একটি কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে, অমনি ধড়াস্ করিয়া "কালী তলার" সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়িল। সন্ন্যাসী ত তবে ঠিক বলিয়াছিলেন। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, তজ্জন্য ললিত কাতর নহে। ভগবানের মনের বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবেক, তজ্জন্য চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই; বরং নিজেকে নিজে কষ্ট দেওয়া মাত্র। ভবানীর প্রধান পুরোহিত তাঁহাকে অভয় দিয়াছেন এবং তাঁহার মনস্কামনা ভবানীর পূজা দিয়াছেন। যাক, সে বিষয়ের আন্দোলনে কোন ফল নাই। কিন্তু একখানি মুখ মনে পড়িল,—সে মুখখানি আজ অনেক দিন দেখা ঘটে নাই; মুখখানি যেন চক্ষের নিকট দেখিতে পাইলেন। মুখখানির আর সে সৌন্দর্য্য নাই, যে সৌন্দর্য্যে একদিন তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আজ সে মুখখানি অশ্রুসিক্ত মলিন, উন্মাদিনীর ন্যায়। ললিত হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা পাইয়া, বিছানায় মুখ লুকাইয়া, বালকের ন্যায় রোদন করিল।

(৯)

আরও ৮।১০ দিন অতিবাহিত হইল। ভাবিয়া ভাবিয়া ললিতের বদনে কালিমার রেখা পড়িয়াছে। যতই নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করে, ততই চিন্তা আসিয়া তাহাকে ঘেরে। ললিত দিনে দিনে উন্মনা হইতে লাগিল; সকলেই তাহার এবম্বিধ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল।

একদিন প্রাতে ললিত একখানি পত্র পড়িতেছিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া রহিল; অনন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিঠি খানা দুইবার পাঠ করিল:—

শ্রীচরণে দাসীর শত কোটী প্রণাম। কি লিখিতে হয় জানি না; পত্র লিখিয়া যদি অপরাধিনী হ'য়ে থাকি নিজ দয়াগুণে মাপ করিও। আমার জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই নাই; যে অবধি তুমি দাসীকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছ, সেই হইতেই জ্ঞান বুদ্ধি হারাইয়াছি। নাথ! অভাগিনীর অপরাধ কি? কি দোষে

তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলে? যদি অজ্ঞানে কোন দোষ করিয়া থাকি, তাহা মাপ করিতে হইবে।

* * * *

তুমি আমাকে টাকা পাঠাইয়াছ; আমার টাকার কোন প্রয়োজন নাই। তুমিই আমার সব। তোমার সহিত আমি গাছতলায় থাকিলেও সুখী হইব। কিন্তু তোমার বিহনে মাটীকাতে শয়ন, রাজভোগ ভক্ষণেও আমার অনন্ত যন্ত্রনা। ছার অর্থ আমি চাই না, ইহা লইয়া আমি কি করিব?

একদিন—তুমি আমায়-জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তোমায় ভালবাসি কি না; তাহার অর্থ আমি এত দিনে বুঝিতে পারিয়াছি। আমার মাথা খাও শীঘ্র বাড়ী আইস। অধিক লিখিতে পারিলাম না। আর আর যাহার পত্রে লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় শীঘ্র বাড়ীতে না আসিলে দাসীকে দেখিতে পাইবে না। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

সেবিকা—
কুসুম।

ললিত বাড়ী যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু অলক্ষ্যে অদৃষ্ট তাহার অন্য ব্যবস্থা করিতে লাগিল। বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রধান পুরোহিতকে ভবানীর অনুমতি লইতে বলিলেন।

* * * *

আগুন!! আগুন!! আগুন!! কৈচৈ ব্যাপার লাগিয়া গেল। রাত্রি দ্বি-প্রহর অতীত হইয়াছে মাত্র, এমন সময় চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল আগুন, আগুন, ঐ আগুন! আশ্রম দিয়া অসংখ্য লোক কাতারে কাতারে ছুটিল। কে কাহার গায়ে পড়ে; যেন কি একটা বিভীষিকা কাণ্ড হইতেছে। সকলেই একদিকে লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতেছে। লোক সকল আসিয়া দেখিল, কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের নিকট একখানি বৃহৎ গৃহ পু—পু করিয়া জ্বলিতেছে। অগ্নির শিখায় চতুর্দ্দিক আলোকিত। ক্রমে দুই একজন করিয়া অনেক লোক জড় হইল। কিন্তু অগ্নিদেবের প্রচণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়া, কেহই গৃহ-মধ্যস্থ দ্রব্য সামগ্রী বা নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল না। সকলেই বলিতে লাগিল অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, কিন্তু কাজের বেলায় সকলেই নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিল।

(১০)

ললিত যে ঘরে থাকিত, তাহার পার্শ্বে অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর ছিল; সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরে অনেক গুলি স্ত্রী পুরুষ বাস করিত। হঠাৎ একটা চেঁচা চেঁচিতে ললিতের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন গৃহ অন্ধ-দগ্ধ হইয়াছে। শীঘ্র শীঘ্র আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি লইয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, চারিদিকে লোকের জনতা হইয়াছে, কিন্তু কেহই অগ্রসর হইতেছে না। তখন অনুসন্ধান করিতে লাগিল, ঘরের সমস্ত লোক বাহির হইয়াছে কিনা। জনৈক বৃদ্ধা-কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া বলিতেছে, "ওগো আমার বৃদ্ধ স্বামী ও ছোট ছেলেটি ঘরে আছে; তাহাদের তোমরা বাঁচাও"। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডের ভিতর যাইতে সাহস করিতেছে না। ললিত বৃদ্ধাকে চিনিতেন। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণের কন্যা, একটি ছোট ছেলে লইয়া স্বামীর সহিত তীর্থ করিতে আসিয়াছেন।

বৃদ্ধা সকলকে নিরুদ্যম দেখিয়া ললিতের নিকট আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—

"বাবা কেহ ত আমার কথা শুনিল না। তুমি যদি দুটি জীবের প্রাণ রাখ, তা'হলে ভগবান তোমার ভাল করবেন, না হ'লে আমিত ঐ আগুনে ঝাঁপ দিব।" ললিতের শরীরে বিলক্ষণ শক্তি ছিল, এবং মনেও প্রভুর সাহস ছিল। দেখিল, সাহায্যাভাবে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং একটি শিশুর জীবন নষ্ট হয়। সুতরাং নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা কোন মতেই উচিৎ নহে। তখন সন্ন্যাসীর জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ মনে পড়িল "নিস্কামী হও।—কামনা-শূন্য হইয়া যিনি কর্ম্ম করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক।" কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিল, তোমার পরীক্ষা উপস্থিত, নিশ্চেষ্ট হইও না। ললিত "জয় জগদীশ্বর" বলিয়া অগ্রসর হইল। তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। উপস্থিত বৃদ্ধেরা দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

ঘরের দরজা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। কয়েক জন লোক জল ঢালিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিল। ললিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু বাহির হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইল। ঘর পড়ে পড়ে হইল, সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া ললিত দেখিল, ঘরটি ধোঁয়াকৃ পূর্ণ; নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। তাহাতে আবার অত্যন্ত অন্ধকার। দুই একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ গায়ে পড়িতে লাগিল। কিন্তু হরি! হরি! একি! বৃদ্ধ বা তাহার ছোট ছেলেটি কোথায়? ললিত ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিল "ভগবান তোমার একি লীলা!" অনন্তর অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিতে পাইল, বৃদ্ধ এবং ছোট ছেলেটি খাটিয়ার নীচে মৃতবৎ পড়িয়া আছে। তখন জয় মা কালী বলিয়া বৃদ্ধকে কোলে তুলিয়া দরজার নিকট আসিল। সকলেই উল্লাসে জয় জয় করিয়া উঠিল। কিন্তু দরজা পুনর্ব্বার ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। অনেক কষ্টে অগ্নি কথঞ্চিৎ নির্ব্বাণ হইলে ললিত বৃদ্ধকে বলপূর্ব্বক দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া অচেতন বালককে ক্রোড়ে করিয়া বহির্গমনের চেষ্টা করিল। কিন্তু তখন প্রবলবেগে চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলিতেছিল; শত চেষ্টায়ও লোকে আগুনের তেজ কমাইতে পারিল না। ঘর পড়ে পড়ে হইল। আর দুই মিনিটের মধ্যেই জ্বলন্ত-গৃহ ভূমিস্যাৎ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে দুইটি জীবনও অনন্তকালের জন্য নিভিয়া যাইবে। সকলেই সমস্বরে বলিল, "শীঘ্র বাহির হও, শীঘ্র বাহির হও।" কিন্তু বাহির হইবার পথ কৈ? ললিত সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বানীর কথা মনে করিলেন; একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—"ভগবান, ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এক ফোটা জল চোক দিয়া গড়াইয়া পড়িল। এমন সময়—হরি! হরি! দগ্ধ-গৃহ ভূমিস্যাৎ হইল, সকলেই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। নিষ্ঠুর ভবিতব্য ফলিল!

* * *

প্রধান পুরোহিতের পত্র পৌঁছিল। পাঠক! আর কি দেখিবেন? পুত্র-শোকাতুরা বৃদ্ধা জননীর অবস্থা দেখিবেন, অথবা কুসুম—সুকোমলা, স্বামীগত-প্রাণা, স্বাধ্বী, সরলা,—বালিকা কুসুমকুমারীর বৈধব্য-বেশ দেখিবেন? আমরা কিন্তু তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ধর।

সমাপ্ত।

হোসেন খাঁর অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী।

আজ অনেক দিনের কথা, সমগ্র কলিকাতা নগরী বিখ্যাত হোসেন খাঁর অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া কৌশলে মুগ্ধ হইয়াছিল। পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে বোধ হয় ঐ সকল ক্রীড়াদি চাক্ষুষ অবলোকন করিয়াছেন। হাজারং নামে তাঁহার কোন অদৃশ্য অনুচর সর্ব্বদা অলক্ষ্যে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত। হোসেন খাঁ যে একজন সিদ্ধপুরুষ, তাহা বোধ হয় অনেকে স্বীকার করিবেন। অদ্য আমরা তাঁহার কয়েকটি তামাসার বিষয় নিয়ে বিবৃত করিতেছি। উহার সত্যতা সম্বন্ধে তিলার্দ্ধ মাত্র সন্দেহ নাই। যাহারা উহা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অদ্যাপি জীবিত আছেন এবং তাঁহাদের একজনের নিকট হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

(১)

এক দিবস প্রাতে হোসেন খাঁ তাঁহার রাস্তার উপরিস্থ বৈঠকখানায় কোন বন্ধুর সহিত বসিয়া আছেন। রাস্তা দিয়া কমলা-লেবুওয়ালা হাঁকিতে হাঁকিতে যাইতেছে। লেবুওয়ালাকে ডাকিয়া দাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "পয়সা পয়সা"। খাঁ সাহেব উত্তর করিলেন, "না,—পয়সায় জোড়া।" সে দরে দিতে অস্বীকৃত হইয়া লোকটা চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই ঘরের ছাদ হইতে অকস্মাৎ ঝুপ্ ঝাপ করিয়া কমলা-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঠিক বোধ হইল যেন কেহ ছাদ ভেদ করিয়া ঐরূপে লেবু ফেলিতেছে। সেই সময় কাঁদিতে কাঁদিতে শূন্য ঝাঁকা হস্তে সেই ফেরিওয়ালাও আসিয়া উপস্থিত। তাহার লেবুগুলি হঠাৎ উড়িয়া গিয়াছে বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। তখন খাঁ সাহেব হাসিতে হাসিতে গৃহ-তলস্থিত লেবুগুলি তাহাকে কুড়াইয়া লইতে বলিলেন। লোকটা অবাক্ হইয়া লেবু লইয়া প্রস্থান করিল।

(২)

আর একবার ছাদু বাবুর বাড়ীর বারাণ্ডায় তাঁহার পুত্র, কোন আত্মীয় ও হোসেন খাঁর সহিত বৈকালে পাশুচারি করিতেছেন। সঙ্গী আত্মীয় ব্যক্তি খাঁ সাহেবকে কোন তামাসা দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন খাঁ সাহেব ছাদু বাবুর পুত্রের ৫,০০০ টাকা মূল্যের হীরক অঙ্গুরিটী চাহিয়া লইলেন। উহা রুমালে দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া তাহার সহিত একটি ঢিল বাঁধিয়া রাস্তার অপর পারে মাঠের পুষ্করিণীতে জোরে ফেলিয়া দিলেন। সকলে দেখিল রুমাল ডুবিয়া গেল এবং তাহার শব্দ পর্য্যন্ত শুনা গেল। অল্পক্ষণ পরে তাঁহারা বলিলেন যে, "আংটি ফিরাইয়া আনুন।" হোসেন খাঁ প্রত্যুত্তর করিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই আমি আপনাদের সম্মুখে উহা জলে ফেলিয়া দিয়াছি, এখন কি করিয়া তাহা আবার আনিব?" উত্তর শুনিয়া সকলে কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন, এবং সেই আত্মীয় ভদ্রলোকটি কহিলেন:—"যদি আংটি ফিরাইয়া না দেন, তবে পুকুরের ধারে

রক্ষক নিযুক্ত করিয়া দুঁবুরি নামাইয়া আংটি তুলিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া খাঁ সাহেব হাসিয়া বলিলেন যদি আসনাদের এতদূর হইয়া থাকে, তবে ওদিক হইতে মুখ ফেরান্ এবং হাত পাতুন্—এই বলিয়া তিনরার হাজারাতের নাম উচ্চারণ করিলেন। হাত পাতিবামাত্র হঠাৎ তাঁহার হাতে আকাশ হইতে টুপ করিয়া ভিজা, কাদা-মাখা সেই রুমালখানি পড়িল। আশ্চর্য্যের বিষয়, খুলিয়া দেখা গেল, সেই আংটি ঠিক পূর্ব্বাবস্থায় রহিয়াছে।

(৩)

আর একদিন কোন ভদ্রলোক একজন সৌখিন ধনাঢ্যের সহিত তাঁহার সহরতলীর বাগানে গাড়ী করিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে হোসেন খাঁ আছেন। পথিমধ্যে সেই ভদ্রলোকটী হোসেন খাঁকে বলিলেন, "আমার অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে, কিছু খাওয়াও। সদ্য গাছ হইতে তোলা খুব উৎকৃষ্ট আঙ্গুর ফল আমাকে এখন খাওয়াইতে হইবে।" তাহার উত্তরে খাঁ সাহেব বলিলেন, তাহা কিরূপে সম্ভবে? এখন ত আঙ্গুরের সময় নয়"। তাহাতে নিবৃত্তি না হইয়া বারম্বার অনুরোধ করায় খাঁ সাহেব অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন "হাত পাতুন্"। এই বলিয়া অপরিচিত ভাষায় কি উচ্চারণ করিয়া হাজারৎকে ডাকিলেন। গাড়ী খুব দ্রুতবেগে বাগানাভিমুখে চলিতেছে, তদবস্থায় আসমান হইতে ঠেক যেন তাঁহাদের প্রসারিত করপুটে এক থোলো আঙ্গুর ঝুপ করিয়া দিল। তখনও বোঁটা হইতে রস ঝরিতেছে এবং উহা যে সদ্য আহরণ করা হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। উহা আস্বাদনে যে অতীব উপাদেয় সে বিষয় উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। তেমন আঙ্গুর কলিকাতায় আর কখনও কেহ খান নাই।

(৪)

একবার কোন একটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হোসেন খাঁর সমভিব্যাহারে দেওয়ালীর রাত্রে আলো দেখিবার জন্য গাড়ী করিয়া বহির্গত হইলেন। তাঁহাদের গাড়ী যখন চীৎপুর রোড দিয়া যায়, তখন সেই স্থানে একটী ত্রিতল বড় বাড়ীতে রোশনায়ের খুব ধুম দেখিতে পাইলেন। ঝাড়, লণ্ঠন, চীনের আলো প্রভৃতি আলোর উপকরণের দ্বারায় বাড়ীটী প্রদীপ্ত। দীপালোকে আমাবস্যার অন্ধকার দিনে পরিণত হইয়াছিল। গাড়ী সেইখানে থামিলে হোসেন খাঁ বলিলেন "একটী তামাসা দেখিবেন?" এই বলিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া দুই হাতের মধ্যে নাড়িলেন। তৎক্ষণাৎ এত আলো সব নিবিয়া গেল। আমাবস্যা পুনরায় ফিরিয়া আসিল। বাটী-স্থ লোক অবাক্! বাতাসের যুঁ মাত্র নাই, কি করিয়া এত দীপ নির্ব্বাণ হইল? ইহা কি কোন ভৌতিক কাণ্ড! তাহারা পুনর্ব্বার আলো জ্বালিতে আরম্ভ করিল। যখন অর্দ্ধেক দীপ আলোকিত হইয়াছে, তখন আবার খাঁ সাহেব রুমাল নাড়িলেন। আবার যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। তখন সকলে একস্বরে বলিয়া উঠিল—"খোঁজ, নিশ্চয়ই হোসেন খাঁ নিকটে আসিয়া থাকিবেক। এ নিশ্চয়ই তাহার কার্য্য।" ইহা শুনিয়া দ্রুতগামী গাড়ী করিয়া খাঁ সাহেব ও তাঁহার বন্ধু সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

(৫)

কোন এক প্রসিদ্ধ ধনকুবের তাঁহার কলিকাতার সহরতলীর বিলাস উদ্যানে এক দিন (garden party) বাগানভোজের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সহরের রাজা, মহারাজা সকলেই আমন্ত্রিত হইয়াছেন। সঙ্গে হোসেন

খাঁও আছেন। নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা দেখিলেন, সকল আয়োজন ঠিক হইয়াছে, কেবল মাত্র চাকরের ক্রটীতে আঙ্গুরের বাক্স বাটী হইতে আনা হয় নাই। সেই সামান্য ত্রুটি কেন থাকে, এই বিবেচনায় সকলে খাঁ সাহেবকে অনুরোধ করিলেন—"খাঁ সাহেব আঙ্গুরের বাক্সটি বাটী হইতে আনাইয়া দিউন।" খাঁ সাহেব প্রথমে আপত্তি করিয়া পরে স্বীকৃত হইলেন এবং হাজারৎকে উহা আনিতে আজ্ঞা করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই আকাশ হইতে ধীরে ধীরে বাক্স ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। উহা উন্মোচন করিয়া দেখা গেল, যে প্রকার অর্দ্ধপূর্ণ অবস্থায় বাটীতে রাখিয়া আসা হইয়াছিল, ঠিক তদবস্থায় আছে। সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

এই প্রকার হোসেন খাঁর অনেক কীর্ত্তির বিষয় শুনা যায়। তাহা সকল সংগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ পাঠকবর্গকে উপহার দিবার মানস আছে।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি, এল।

মতামত।

মিনার্ভায় স্বপ্নের-ফুল। গত শনিবার মিনার্ভা থিয়েটারে শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ্চন্দ্র ঘোষের নূতন গীতি-নাট্য "স্বপ্নের ফুলের" প্রথম অভিনয় হইয়া গিয়াছে। গীতি-নাট্যের নাচ-গানের আমোদের সহিত এবার গিরিশ বাবু আধ্যাত্মিক ভাবের সমাবেশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, গিরিশ বাবুর ন্যায় একজন প্রতিভাশালী লেখকের পক্ষে সকলই শোভা পায়। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি উচ্চ, যে এ গীত-নাট্যে সে উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা এই নূতন গীতি-নাট্যের নাচ গানে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইহার প্রস্তাবনাটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। বনের দৃশ্যপটও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এবং পরিচ্ছদগুলিও অতি সুন্দর। উক্ত ভাবের গীত রচনায় গিরিশ বাবুর সমকক্ষ এখন আর কেহই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অভিনেত্রীদিগের মধ্যে মনোহরার অভিনয় বাস্তবিকই মনোহর হইয়াছিল।

বঙ্গ-রঙ্গভূমে পুরুবিক্রম। — পুরুবিক্রম নাটকের নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর ইহার প্রণেতা। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পুরুরাজ ইহার নায়ক; বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ভীমকান্তগুণান্বিতা ক্ষত্রিয়-ললনা ঐরাবিলা ইহার নায়িকা। গ্রীস দেশের অধীশ্বর মহাপরাক্রান্ত আলেক্জাণ্ডার পারস্যাধিপতি দারায়ুসকে পরাজয় পূর্ব্বক যখন আপনার বিজয়ী-চমূ ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর করেন,

তখন অসহায় ও গৃহ-বিচ্ছেদে হীনবল হইয়াও পুরুরাজ যে কিরূপ অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা গ্রীকদিগের বর্ণিত বৃত্তান্ত পাঠে চমৎকৃত হইতে হয়। আজ দুই সহস্র বৎসর পরে হীনবীর্য্য ভারতবাসীর সম্মুখে সেই দৃশ্য ধারণ করিয়া বঙ্গ-রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মহৎ জনের কার্য্যকলাপ আলোচনা জাতীয় চরিত্র গঠনের এক অমোঘ উপায়। ইতিহাস ও রঙ্গভূমি এইরূপ আলোচনার প্রস্তুতিস্বরূপ। অবিরত একপ্রকার ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় অভিনয়ের মধ্যে ভারতের এক অতীত, ভারতবাসীর অধুনা কল্পনাতীত, গৌরবের ঘটনা স্মরণ ও গায়িকার মুখে ভারতের কীর্ত্তিগাথা শ্রবণ করিয়া, আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়েও এক অভিনব শক্তি অনুভূত হইয়াছিল। পুরুরাজের বীরত্বব্যঞ্জক বপু, অশ্বারোহণে সৈন্যগণ প্রতি উৎসাহজনক উক্তি, ঐলবিলার প্রেমাকাঙ্ক্ষা হইলেও বীরোচিত ধৈর্য্য, ও আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের ভয়ঙ্করী প্রতিমূর্ত্তি, সমস্তই দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। আর ঐলবিলা—স্বভাবের ফুল্ল কুসুম রণসজ্জায় ভূষিতা—পঞ্চনদের রাজনৈতিক গগণের ধ্রুবতারা; জন্মভূমির প্রতি কি অন্তর্নিহিত প্রেম, কাপুরুষ তক্ষশীলের প্রতি কি ঘৃণা-ব্যঞ্জক দৃষ্টি, আর বীরের প্রতি কেমন ভালবাসা মিশ্রিত ভক্তিভাব! এইরূপ নারী ব্যতীত কি কোন জাতির উন্নতি হয়। এতদ্ভিন্ন সেকেন্দর সাহের অভিনয়ও অতি সুন্দর হইয়াছে। তক্ষশীলের সহিত তাহার ভগিনীর প্রেমালাপ অরুচিকর ও অস্বাভাবিক বলিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে নাটক খানি ইহার জন্য দায়ী। অভিনয়ে গানের সংখ্যা কিছু কম হইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস! এ অভাব পূরণ করা কর্ত্তৃপক্ষগণের একেবারে অসাধ্য নহে। আমরা সকলকে এই নূতন অভিনয় দেখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে ভাবিবার ও শিখিবার অনেক জিনিষ আছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

যুদ্ধ-সংবাদ। চীনের অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। কোন রকমে জাপানের সহিত একটা সন্ধি স্থাপনা হইলেই এখন চীনের মান রক্ষা হয়। জার্ম্মানীর কি অভিসন্ধি বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু জার্ম্মানী এখনও এই সন্ধির জন্য রুষ ও ফ্রান্স প্রভৃতির সহিত যোগ দিতে প্রস্তুত নয়। ব্রিটিশ মন্ত্রিগণ কিন্তু এই সন্ধির প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এই যুদ্ধের অবসান হইলে আমরাও সুখী হইব।

জারের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া। বিগত সোমবার সেণ্ট পিটার্স বর্গে রুষ জারের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই দিন ইংলণ্ডের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার

এবিডে এবং ফ্রান্সের প্যারিস নগরের রুষ-ভজনালয়ে সম্রাটের সম্মানার্থে শোক-প্রকাশক প্রার্থনা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে স্বয়ং প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ সেণ্টপিটার্স বর্গে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে আগামী কল্য শুক্রবার আবার নূতন সম্রাটের বিবাহের দিনস্থির হইয়া গিয়াছে। পিতার সমাধির তিন দিবস পরেই পুত্রের বিবাহের উৎসব আমাদের চক্ষে ভাল দেখায় না। বিবাহের দিনস্থির অন্ততঃ এক মাস পরে করিলে কি ক্ষতি হইত?

ভূমিকম্প। দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলি দ্বীপে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ম্যাগেক্লিফ্‌স্ নগরের একটি গির্জ্জা ভূমিস্যাৎ হইয়াই ৪৭ জন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে; ইহা ব্যতিত বহুসংখ্যক লোক আহত হইয়াছে। এই অঞ্চলে আরও কত জন এই দুর্ঘটনায় যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। প্রাণের ভয়ে অধিবাসীরা তাম্বু দিয়া জাহাজে গিয়া বাস করিতেছে। এখন ঐ অঞ্চলের আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত না হইলেই মঙ্গল।

মাদ্রাজের জাতীয় সভা। আগামী জাতীয় সভার উদ্যোগের বড়ই ধুম লাগিয়া গিয়াছে। ম্যানডন উদ্যানে সভার অধিবেশনের স্থান নিরূপিত হইয়াছে। এই মনোহর উদ্যানে, এরূপ মহাসভার অধিবেশনেরও উপযুক্ত স্থান। টেণ্ট থেকে হইতে ইহা পাঁচ মিনিটের রাস্তা। ভারতের নানা দেশের ও নানা জাতীয় প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিবার বড়ও বিশেষ বন্দোবস্ত হইতেছে। সভাগৃহ প্রস্তুত কার্য্য ইহারই মধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সে সভাগৃহে পাঁচ সহস্র লোকের সমাবেশ হইতে পারিবে। অন্যান্য অঞ্চল হইতে প্রতিনিধি পাঠাইবার উদ্যোগের সংবাদও পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই বঙ্গদেশে এখনও সেরূপ কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। আমরা ভরসা করি, আর কাল-বিলম্ব না করিয়া এই জাতীয় মহাসভায় প্রতিনিধি পাঠাইবার এখন হইতে সকলে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকুন। বৎসরান্তে এ সুখের সম্মিলনের কথা কেহ যেন বিস্মৃত না হন। আর সময় নাই, মাতৃ-পূজার জন্য সকলেই প্রস্তুত হইতে থাকুন।

ভাবি বঙ্গেশ্বর। আমাদের কোন সহযোগী বলেন যে, যাহাতে ইলিয়ট সাহেবের স্থানে স্যার এন্‌থনী মাকডোন্যাল সাহেব বঙ্গের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর না হইতে পারেন, ইহারই মধ্যে নাকি তাহার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। তাঁহারা ম্যাকডোন্যালের পরিবর্ত্তে মেকিঞ্জি সাহেবের পক্ষপাতী। এই উভয়ের প্রতিই আমাদের সমান শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, এখন এই বর্ত্তমান ইলিয়টের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেই আমরা বাঁচি।

লর্ড হারিষের হিন্দু-বিদ্বেষ। বোম্বাইয়ের লর্ড হারিষ হিন্দু প্রতি প্রকাশ্যরূপে বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে এখনও কুণ্ঠিত নহেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পুনার হিন্দু ও মুসলমান জজের বিচারের ফল দেখিয়াও তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। যে ১৪ জন হিন্দু আসামী ধৃত হইয়া বিচারার্থে প্রেরিত হইয়াছিল, বিচারপতি ও জুরিগণ একবাক্যে তাহাদিগকে সকলকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তিলাভ দিয়াছেন। তাঁতা সাহেব নাতুর সকর্দ্দমার রায়ে বিচারপতি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—(১)

এরূপ জনতাকে অবৈধ জনতা বলা যাইতে পারে না, (২) সুরকারী রাস্তায় ধর্ম্মের উদ্দেশে বাদ্য বাজানায় হিন্দুদিগের সম্পূর্ণ অধিকার আছে; (৩) এ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের ব্যবহারে কোনরূপ অন্যায় কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় নাই। (৪) মুসলমানগণ হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিবার জন্যই সেই গভীর রাত্রে উপাসনার ভান করিয়া মুসজিদের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। লর্ড হারিষেরই একজন নিয়পদস্থ কর্ম্মচারির মুখেই যখন এইরূপ কথা, তখন আমরা এ সম্বন্ধে আর কি বলিব? কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই, লর্ড হারিষের ন্যায় একজন উচ্চপদস্থ রাজ-প্রতিনিধি এখনও প্রকাশ্যভাবে হিন্দুদিগের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছেন। শাসনকর্ত্তার অযথা পক্ষপাতে কেবল বঙ্গদেশ জ্বালাতন নহে?

নাটোরের মোকর্দ্দমা। রাজসাহীর শেসন্স জজ মিষ্টার এল. পালিতের এজলাসে নাটোরের রাজার মোকর্দ্দমা এখনও সমভাবে চলিতেছে। বাদী গঙ্গাগোবিন্দ সরকারের পক্ষে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছেন, মিষ্টার এ, চৌধুরী। ইহাঁর সহকারী হইয়াছেন রাজসাহীর সরকারী উকীল এবং আরও তিনটী অন্য উকীল। প্রতিবাদী রাজা যোগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির পক্ষে ব্যারিষ্টার আছেন, ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জী, মিষ্টার গার্থ ও কটন। অর্থের শ্রাদ্ধ যে কিরূপ হইতেছে, ইহাতেই সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। এত দিনে বাদীর পক্ষে কেবল চারিজন মাত্র সাক্ষের এজাহার হইয়াছে। কত দিনে যে মোকর্দ্দমার শেষ হইবে, তাহা এখনও বলা যায় না। এ মোকর্দ্দমার সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার এখনও সময় হয় নাই; সেই কারণ আমরা এ সম্বন্ধে এখন কোন কথাই উল্লেখ করিব না।

বিবেকানন্দ স্বামী। কলিকাতার টাউনহলে সভা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া যে পত্র পাঠান হয়, চিকাগো মেলার ধর্ম্মসভার সভাপতি রেভারেণ্ড বরোস্ সাহেব সেই পত্রের উত্তরে সভাপতি রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়কে এক পত্র পাঠাইয়াছেন। সে পত্রপাঠ করিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম যে এখন হইতে আমেরিকাবাসীদিগের হিন্দুর পুরাতন শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়াছে। এ সংবাদ পাইয়া আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি মতিগতি ফিরিবে কি?

বর্দ্ধমানের কমিশনার। বর্দ্ধমানের কমিশনার ওয়েস্ সাহেব আরও চারিমাসের ছুটি বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছেন। আমরা এ সংবাদে আহ্লাদিত হইয়াছি কারণ সুযোগ্য প্রতিনিধি মিষ্টার আর, সি, দত্ত তাঁহার শাসন নৈপুণ্য ক্ষমতা দেখাইবার আরও চারি মাস কাল ইহার জন্য সময় পাইলেন। এই ঘটনায় এখন সহযোগী ইংলিশম্যানের মস্তিষ্ক স্থির থাকিলেই আমরা রক্ষা পাই।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

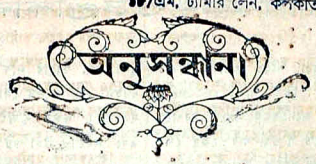

অষ্টম বর্ষ। ১৪ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। উনত্রিংশ সংখ্যা

সম্মিলন।

(১)

ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীদল, মিলিতে নদীর সাথে, ছুটে যায় আকুল পরাণে।
কলকণ্ঠে স্রোতস্বতী, গাহিয়ে প্রণয়-গীতি, ধেয়ে চলে সাগরের পানে॥
মধুর উচ্ছাস-ভরে, পাগল পবন-দল, প্রেমখেলা খেলিছে গগনে।
অবেগেতে আত্মহারা, ছুয়ে যেন মাতোয়ারা, চিরতরে হারায় আপনে॥
ত্রিভুবনে দেখি নাথ! কোথা নাহি অমিলন, একা হেথা কেহ নহি বিহরে।
মিলন সকল ঠাঁই, প্রাণে প্রাণে বাঁধাবাঁধি, অটুট অচ্ছেদ্য প্রেমডোরে॥
বিশ্ব-সম্মিলন-নীতি, ছড়াতে ভুবন-মাঝে, স্বভাবের স্বর্গীয় নিয়মে।
তবে কেন দয়াময়! মিলিতে চরণে তব, স্থান নাহি দেও এ অধমে॥

(২)

দূরে ঐ নগরাজি, প্রশান্ত প্রেমের ভাবে, মাথা তুলি চুমিছে গগনে।
বিশাল বারিধি বক্ষে, কোটি কোটি বীচিমালা, নাচিতেছে বদ্ধ-আলিঙ্গনে॥
মোহন বল্লরী-মাঝে, ফুলে ফুলে করে খেলা, পাতার কোমল নীল কোলে।
কুসুমে কুসুমে মরি, ভালবাসা-প্রতিদান, কি লহরী প্রতিবুকে খেলে॥
উজল অরুণ-আভা, আরক্তি প্রকৃতি-কায়া, হাসি হাসি আলিঙ্গে ধরারে।
বিমল চন্দ্রিকা মালা, ছড়ায়ে সুষমারাশি, শতমুখে চুমিছে সাগরে॥
সংসার-মরীচি-মাঝে, অন্ধ আমি দয়াময়! সন্ধ্যাহীন আমার জীবন।
ভ্রমেও ভাবিনা কভু, কিরূপে তোমারে মনে, কবে হবে শুভ সম্মিলন॥

শ্রীমনোজমোহন বসু, বি এ।

কবিকঙ্কণ ও চণ্ডীকাব্য।

এইবারে আমরা কবির সুপ্রসিদ্ধ 'চণ্ডীকাব্য' সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে অনেকেরই সম্বন্ধে দৈবানুগ্রহের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে সাধারণ সমক্ষে আপন গ্রন্থমধ্যে আপনাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া পরিচয় দিয়াও গিয়াছেন। আমাদিগের এই দেবাধীন দেশে, যাহা কিছু অসাধারণ, তাহাতেই যে দৈবের দোহাই আছেই আছে, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত। হয় ত ইতিতেও কবির যে ব্যক্তি-বিশেষের অসাধারণ শক্তি, একথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের কবিকঙ্কণও আপন গ্রন্থমধ্যে স্পষ্টাক্ষরে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ—এমন কি তিনি নিজেও বৈষ্ণবাচারী ছিলেন; তাঁহার পর যখন তিনি দামুন্যা ছাড়িয়া দেশান্তরে পলায়ন করিতেছিলেন, তখন মেদিনীপুরের অন্তর্গত গোপড়া গ্রামে নিদ্রিতাবস্থায় চণ্ডীর প্রত্যাদেশ লাভ করেন। শুনা যায়, দেবী তাঁহাকে শক্তি-মন্ত্র প্রদান করিয়া তাহাই যপ করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। কবি আপনার কুলদেবতা ও কুলমন্ত্র পরিত্যাগে হিন্দুধর্ম্মানুসারে চুড়ান্তের শঙ্কা জানাইলে, তিনি প্রত্যাদেশ করেন যে—কালকূট অভিন্ন, ইহা তিনি প্রত্যেক করিতে পারিবেন। তাঁহার সমভিব্যাহারেই যে পৌরাণ মূর্ত্তি ছিল, তাহার পার্শ্বদেশ হইতে সিংহ-বাহিনী মূর্ত্তি সংলগ্ন দেখিয়া তিনি পুলকিত হইলেন। উভয় মূর্ত্তিই অধ্যাত্মবিনির্ম্মিত এবং অদ্যাপি উহা ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের কুলদেবতারূপে সম্পূজিত। দেবী চণ্ডিকা তাঁহাকে যে বীজমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কোন তন্ত্রেই উক্ত নাই। একথা তাঁহার বংশধরদিগের মুখেও শুনা যায় এবং কবি নিজেও তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"পড়েছি অনেক তন্ত্র, নাহি জানি কোন মন্ত্র,
আজ্ঞা দিলা যপি নিত্য নিত্য।"

দেবী দয়া করিয়া তাঁহাকে আপন মহিমা-বর্ণনে আজ্ঞা করেন, তদনুসারেই আরড়া-ব্রাহ্মণভূমিতে তাঁহার রচনা আরম্ভ করেন। যথা,—

"দেবী চণ্ডী মহামায়া, দিলেন চরণ-ছায়া,
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।"

সেকালের রাজাগণ বড়ই কাব্যামোদী ছিলেন, কবির যথেচ্ছ সমাদর ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন-চিন্তা দূর করিতেন; কবি নিশ্চিন্তমনে কাব্যসুধা বিতরণে পৃষ্ঠপোষকের চিত্ততুষ্টি ও তৎসহ জায়ার পুষ্টিসাধন করিতেন। এরূপ না হইলে, বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে অনেককেই ইংরেজ-কবি 'গ্রে' উক্ত নীরব কবির দলে নীরবে মিশিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে হইত।

* "কহার অজ্ঞাত, মহামিত্র জগন্নাথ,
একভাবে পূজিল গোপাল;
বিনম্রে মাগিল বর, মস্ত যপি নিরন্তর,
মৌনাস্যে ভুঞ্জি বহুকাল।"

† Some mute inglorious Milton
here may rest.
Grey.

কবিকঙ্কণ চণ্ডী রচনা করিতে লাগিলেন, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাগরাগিণীতে তাল-মান সুসঙ্গত করিয়া তাহা গীত হইতে থাকিল। কবি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না, অথচ তাঁহার স্বহস্তলিখিত গ্রন্থে প্রত্যেক কবিতারই উপরে কোন্ রাগ বা রাগিণীতে তাহা গাহিতে হইবে তাহা লিখিত আছে। ব্রাহ্মণভূমির রাজসভায় গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে একজন সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ গায়ক ছিলেন; তিনিই তাহা গান করিতেন। গোপালের বাস "পাথরকুচা" নামক গ্রামে ছিল। কবি যে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না, তাহা নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—

"লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ, নাহি সঙ্গীতের পন্থ,
কৃপা করি দিলা গুরুভার।
অনভিজ্ঞ তালমানে, কেমনে শিখাব আনে,
দোষগুণ সকলি তোমার।"

অন্যত্র,—

"নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি,
গাওনেরে দিলেন ভূষণ।"

চণ্ডীকাব্য গ্রন্থকারের রচনা-গুণে এরূপ সুশ্রাব্য ও চিত্তস্পর্শী হইয়াছিল যে, অল্পদিন মধ্যেই গায়কদিগের দ্বারা উহা সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়া উঠে; দেবী-পরিতোষের জন্য শক্তি-উপাসকমাত্রেই ক্রমশঃ পূজাপর্ব্ব-উপলক্ষে চণ্ডীর গান গাওয়ান অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে জ্ঞান করিতে থাকেন; এমন কি, অনেকে উহা রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় সংকল্প করিয়া শ্রবণ করিতেন। আজিকালিও উক্ত প্রথা পল্লিগ্রামে একবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

গায়কদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ সেকালে, অনেকেই যত্নবত্ত্ব-জ্ঞানশূন্য ছিল। এজন্য, উহার এতাধিক পাঠান্তর ঘটিয়াছে যে, মূল চণ্ডী যাহা এ পর্য্যন্তও দামুন্যা-গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাটীতে আছে তাহার সহিত আজিকালিকার মুদ্রিত পুস্তক সকল মিলাইলে স্থানে স্থানে বোধ হয় না যে উহা এক স্বাক্ষরে লিখিত। এক্ষণে, উহার বিলক্ষণ রচনা-পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় কবির লিখিত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নাই। প্রাদ্যন্ত এইরূপ-দক্ষে, কবির বংশধরগণের জ্ঞাতিবিরোধ-প্রযুক্ত উহা দুই সমান অংশে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমাংশটুকু পূর্ব্বোক্ত সিংহ-বাহিনী দেবীমূর্ত্তির সহিত এখনও একত্র আছে; অবশিষ্টাংশ কোথায় কিরূপে নষ্ট হইয়াছে, তাহা জানিবারও উপায় নাই। এখন যে অংশটুকু আছে, তাহাতে "ধুল্লনার ছাগরক্ষা" পর্য্যন্ত আছে। "কলিঙ্গ ভূপতি কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব" পর্য্যন্ত পাঠ, আমরা তদ্দৃষ্টে সংশোধিত, করিয়া লইয়াছি। তাহার পর মধ্যে মধ্যে বহুদিনের লিখিত অক্ষরের বিলোপ-হেতু উদ্ধার করিতে অসমর্থ হই। এই অংশটুকুর মধ্যে ভগবতী, রাম, লক্ষ্মী ও মহাদেবের বন্দনা যেরূপ আছে, বাবু অক্ষয়চরণ সরকার সম্পাদিত—কি বটতলার মুদ্রিত চণ্ডী, উভয়বিধ চণ্ডী হইতে তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, আমরা নিম্নে ঐ কয়টী অংশ, উদ্ধৃত করিলাম,—

(১)

ভগবতী-বন্দনা।

সুরট।

কৃপা কর নারায়ণী, কামদাত্রী কাত্যায়নী
কলিকাল-কলুষনাশিনী।
অমরনগরনারী, সুচারু সুবিদ্যাধরী,
সুবিদিত তনু বিলাসিনী॥

যাঁহার মহিমা-বাণী, বীণা-বিরাজিত পাণি,
সরস্বতী গান নিরন্তর।
বিরিঞ্চির মুখপদ্ম, যাঁহার মানস-সদ্ম,
বেদরূপা বচন বিস্তর॥
বন্দো মহেন্দ্রের মাতা, হিমালয় গিরিসুতা,
মেনকার জঠরবাসিনী।
মুখর নূপুর-স্বনে, হংসরাজ রব জিনে,
দিতিসুত-ত্রাস-বিনাশিনী॥
পট্টাম্বর-পরিধানা, মায়াপি ভীষণাননা,
ঈশানগৃহিণী গুহমাতা।
দৈত্যরণে ঘোর স্বনা, বিহর চঞ্চলমনা,
সুরবর নাগনর নতা॥*
ভুজয় সিংহের স্কন্ধে, দক্ষিণ পদারবিন্দে,
বামপদ মহিষ-আসনে।
অসুরের বক্ষস্থলে, বিন্ধিলেন মহাশূলে,
করে ধরি কুন্তল-বন্ধনে॥
আপাদলম্বিত মালা, শত শত সঙ্গে বালা,
স্তুতি করে বিধিবিপ্র যারে।
অতুলনা রূপসীমা, ত্রিভুবনে নিরুপমা,
শত কোটী প্রণাম তোমারে॥
অসুযুগ অবতার, তব ত্রিভুবন সার,
বসুমতী ভারাবহরবে।
তুমি পুত্রপণের পরে, দ্বিজ কবি কঙ্কণেরে,
দেহ নিজ চরণ-শরণে॥

(২)

শ্রীরাম-বন্দনা।

দশ রথ-সুত খ্যাত, রামনাম সুবিখ্যাত,
দেব দেব কৌশল্যানন্দন।
অঙ্গে যার অধিপতি, সঙ্গে শোভে সীতাসতী,
শিরে ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ॥
বন্দো রাম কমললোচন।

* "সীতা" ও পড়া যাইতে পারে।

তনু দুর্ব্বাদল শ্যাম, করেতে কোদণ্ড বাণ,
দেবঋষি করয়ে স্তবন॥
অঙ্গে আভরণ বজ্র, আজানুলম্বিত বাহু,
অনুপম চাক বিলোচন।
গমনে তুলনাহীন, আর চারু মধ্য ক্ষীণ,
শিরে চারু মুকুট ভূষণ॥
কুঞ্চিত কুঞ্চিত কেশ, মদন নিন্দিয়া বেশ,
যিনি মুখ কত সুধাকর।
কনককুণ্ডল শ্রুতি, পরিধান দিব্যদ্যুতি,
নখদেশে ভাসে সুধাকর॥
সুপণ্ডিত দয়াবান, প্রিয় দ্বিজে দেন দান,
ধনুর্দ্ধর ধর্ম্ম-অবতার।
রিপুজনে যেন যম, প্রজার পালনে ক্ষম,
হনুমান সহচর যাঁর॥
বশিষ্ঠ পুরোহিত, গুহক চণ্ডাল মিত,
মন্ত্রী সে জম্বুক জাম্ববান।
দেবাসুর কপি আদি, নিশাচর নানাবিধি,
সর্ব্ব-সেনা রামের পরাণ॥
শ্রীরাম গুণের নিধি, ছেলে বান্ধি মহোদধি,
ভুজবলে বধিলা রাবণ।
রত্নময় লঙ্কাপুরী, বিভীষণে রাজা করি,
দিলা ধনজন-সিংহাসন॥
শুনরে সকল লোক, খণ্ডিবা দুর্গতি-শোক,
রামনাম-রস সুধাতরি।
যে রামনামের গুণে, অন্তে চলে জনজনে,
রাম কারে বৈকুণ্ঠনগরী॥
হৃদয়মিশ্রের সুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
রামপদসুধাসুত, মকরন্দ অলি দ্বিজ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস-গান॥

(৩)

লক্ষ্মীর বন্দনা।

মল্লার।

ত্যজিত বল্লভা দেবী ব্রহ্মার জননী!
তোমার চরণ বন্দি যুড়ি দুই পাণি॥

যখন প্রলয়ে হরি অনন্ত শয়ন।
তাঁহার উদরে গো আছিলা ত্রিভুবন॥
জয় জয়া নাশ তব নাহি কোন কালে।
তখন কেবল ছিলা হরি পদতলে॥
অনল গরল আদি কুম্ভীর মকর।
কত কত নাহি আছে সমুদ্র ভিতর॥
তুমি গো পরম রত্ন সকল সংসারে।
তোমা কন্যা হৈতে রত্নাকর বলি তারে॥
ধনজন যৌবন নগর নিকেতন।
পদাতি বারণ বাজী রথ সিংহাসন॥
তার অহঙ্কার গো তাবৎ শোভা করে।
কৃপাময়ী কমলা যাবৎ থাক ঘরে॥
তোমারে চঞ্চলা লক্ষ্মী বলে যেই জনে।
তোমার মহিমা তারা কিছুই না জানে॥
ছাড়হ যেজনে মাতা তার দোষ দেখি।
অদোষী জনেরে লক্ষ্মী চিরকাল সুখী॥
কাব্যকোষ অলঙ্কার ভারত পুরাণ।
নাটক নাটিকা জানে কাব্যের বিধান॥
যদি দয়া না হৈয়া তোমার হেন জনে।
বসিতে না জানে সে লোকের বিদ্যমানে॥
কুল বিদ্যা রূপ গুণ সুবুদ্ধি সুধীর।
যাহার মন্দিরে লক্ষ্মী তুমি আছ স্থির॥
তুমি গো বল্লভা দয়া নাহি কর যারে।
আছুক অন্যের কথা দারা নিজে তারে॥
তুমি সে ছাড়িলে গো অমর-জনে মরে।
দুর্ব্বাসার শাপেতে রাখিলা পুরন্দরে॥
তোমা ভক্তিহীন তরে বিফল জীবন।
কৃপা কর নারায়ণী লই হুঁ শরণ॥
লক্ষ্মণ-সাধী কবি শ্রীমুকুন্দ গায়।
ভকত জনেরে লক্ষ্মী হবে বরদায়॥

(৪)

শিব বন্দনা।

পুরবী।

ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, শোভেন বৃষভ-যান,
বন্ধ ত্রিলোচন ত্রিপুরারি।
জটায় জাহ্নবী স্থিতি, ভালে শোভে বসুমতী
বাসুকী-ভূষণ শূলধারী॥
শিঙ্গা সে ডমরুধারী, জিনি তনু গৌপ্যগিরি,
প্রসন্নমর্দ্দন পূজাসন।
সুরাসুর আদি নর, যক্ষ রক্ষ নিশাচর,
সবে শিবে করয়ে পূজন॥
গলে দোলে অস্থিমাল, করে শোভে নৃ-কপাল,
সর্প-অঙ্গে বিভূতি ভূষণ।
কৃতাঙ্গ বার-বসনে, চিতায় পিশাচগণে,
সঙ্গে সহচর যক্ষগণ॥
সঙ্গেতে প্রমথগণ, নৃত্যগীত অনুক্ষণ,
অমঙ্গল শিবমহাশয়।
বর দেন যেই জনে, সেই ত্রিভুবন জিনে,
শিববরে থাকয়ে নির্ভয়॥
সমুদ্র-মন্থন-কালে, দহে বিষকালানলে,
ত্রিভুবন হয় বিনাশন।
দেবতা করিলা স্তুতি, বিষ পিলা পশুপতি,
তবে রক্ষা পায় ত্রিভুবন॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

সাহিত্য ও সমালোচনা।

সাহিত্যিক সমালোচন দেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকে ইহা আশাপ্রদ ও জ্ঞানপ্রদ মনে করেন। বঙ্গিম বাবুকে হেম বাবু "সাহিত্যরাজ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সাহিত্যরাজ 'প্রচার' প্রকাশের ভূমিকায় এবম্বিধ সাময়িক সাহিত্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। রমেশ বাবু 'বঙ্গবিজেতা' প্রকাশের পূর্ব্বে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশের কল্পনা করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর যাহা বলিবার, তাহা 'বান্ধবেই' বলা হইয়াছে। বরীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সময় ও অর্থ থাকা সত্ত্বেও ইহার মোহিনী শক্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ হয় নাই। নবীন বাবুর বুঝি এক্ষণে বৃহৎ কাব্য বা মাসিকে বাহির হয়। একদা মাসে মাসে কবিতাই বাহির হইতে লাগিল; রাজকৃষ্ণ বাবুর "বীণা" বোধ হয় এখনও অনেকের স্মৃতিপথে থাকিবেক। এতদ্ভিন্ন, আরও কত সমালোচন-পত্র পতঙ্গবৎ উড়িয়া ফিরিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে।

আধুনিক সাহিত্য-সংসারে এ জিনিসকে উপস্থিত করিল? কাহার মস্তিষ্ক সাধারণের এরূপ হিতের চিন্তায় আদৌ ব্যাপৃত হইয়াছিল? 'অনুসন্ধানে' ইহার একটু অনুসন্ধান কি প্রীতিপ্রদ হইবে না?

১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে চিন্তা-প্রসূতি ফ্রান্সভূমিতে সমালোচন-পত্রের জন্ম। পারী-পালেমেণ্টের কাউন্সিলর 'ডেনিস্ ডি স্যালো' (Denis 'De Sallo) সমালোচন-পত্রের পিতামহ। তাঁহার 'জর্ন্যাল ডেস্ স্যাভানস্' (Journal des Scavans) প্রথম সমালোচন পত্র। ইহা প্রকাশের পূর্ব্বে সম্পাদকের যে বড় বলবতী আশা ছিল, এরূপ বোধ হয় না। ইহা তাঁহার ঢাকরের নামেই প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু এক বৎসর অতীত না হইতেই, ইহার এমন আদর হইল যে সমস্ত ইউরোপে অনুকরণ আরম্ভ হইল এবং অনেক ইউরোপীয় ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইল। যেমন আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র খ্যাত সমালোচক, তেমনি 'স্যালো' ফ্রান্সে যশস্বী সমালোচক হইয়াছিলেন। তাঁহার সমালোচনায় তীব্র বিদ্রূপ নিহিত থাকিত। এজন্য অচিরে তাঁহাকে অনেকের কোপানলে পতিত হইতে হইল। অনেক আইন-প্রণেতা সাহসের সমালোচনায় অসন্তুষ্ট হইয়া এক দীর্ঘ প্রস্তাবে প্রকাশ করিতে বসিলেন যে, আইন-ব্যবসায়ীর আইন-ব্যবসায়ীকে নিন্দা করা অবিধি। যাঁহারা দিগকে উকীলের বিরুদ্ধে এদেশে মোকদ্দমা করিতে হইয়াছে, তাঁহারা বোধ হয় উকীল-নিন্দেশের সময় এতাদৃশ আপত্তির রসাস্বাদন করিয়া থাকিবেন। আবার কেহ কেহ বলিলেন, সমস্ত গ্রন্থকারের উপর এইরূপ একজন অত্যাচারীর সিংহাসন স্থাপিত করিয়া দেওয়া নির্দ্দয়তার একশেষ হইয়াছে। এইপ্রকার মস্তিষ্কালোড়নে বিরক্ত হইয়া, ফ্রান্সের বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনার সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পত্র তিন খণ্ড (volume) ভিন্ন আর বাহির হইল না।

'স্যালোর' উত্তরাধিকারী 'আব্বে গোল্লোইস' (Abbe Gollois); তৎপরে খ্যাতমানা 'বেল' এবং 'লে-ক্লার্ক' (Bayle and Le-clerk) ফ্রান্সে এই ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছেন। গালোইস্ ১৭ বেল ৩৬ এবং লে-ক্লার্ক ৮২ খণ্ড সাহিত্যিক সমালোচন রাখিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসবেত্তা গিবন (Gibbon), লে-ক্লার্কের সমালোচন শিক্ষাপ্রদ ও প্রীতিপদ বলিয়া মনে করিতেন। বেলও অতি যত্নতার সহিত তাঁর কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। বেলের সমালোচন কিঞ্চিৎ বিদ্রূপাত্মক।

জর্ম্মানীতে এবং ইংলণ্ডেও সমালোচন-পত্রের আদি-সম্পাদক ফরাসী জাতি। 'বিবলিওথিকিউ জারমানিকিউ' এবং 'বিবলিওথিকিউ ব্রিটানিকিউ' (Bibliotheque Germanique and Bibliotheque Britannique) উভয় সমালোচন-পত্রই ফরাসী পণ্ডিত দ্বারা পরিচালিত। ১৭২০ হইতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫০ খণ্ডে উহার প্রথমখানি এবং ১৭৩৩ হইতে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৮ খণ্ডে দ্বিতীয়খানি সম্পূর্ণ হইয়াছিল। লণ্ডনের 'জর্ন্যাল বিটানিকিউ' (Journal Britannique) নামক আর একখানি খ্যাত প্রাচীন সমালোচন-পত্রও জনৈক লণ্ডনবাসী বিদেশী চিকিৎসক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। তাঁহার নাম ডাক্তার মাটী (Dr. Maty)। ইতিহাসবেত্তা গিবন ইহার নিকট অনেকাংশে ঋণী। ইংরেজ-লিখিত প্রথম ইংরেজী-পত্র 'মন্থলি রিভিউ' (Monthly Review) ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রথমতঃ বাহির হয়।

২২৯ বৎসরে পৃথিবীতে এই সকল পত্র দ্বারা সাহিত্যক্ষেত্রে কি যুগান্তরই উপস্থিত হইয়াছে! ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি সকলই ইহার আলোচনার অধীন হইয়াছে। লেখক ও পাঠক উভয়ে কৌতূহলের সহিত ইহার সেবায় রত। অল্পব্যয়ে ও অনায়াসে উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হইতেছে। বর্ত্তমান যুগের, সমালোচন-পত্র এক বিশেষত্ব।

বঙ্গদেশে যে সকল সমালোচন-পত্র বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব নবজীবন ও প্রচার সুখ্যাতির সহিত পরিচালিত হইয়াছিল; কিন্তু একখানিও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ইহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া, কেহ কেহ পাঠকবর্গের দোষ-ঘোষণা করিয়াছেন। পাঠকেরা অনেকে কাগজ লইয়া মূল্য প্রেরণ করেন নাই—এই অপবাদ সর্ব্বত্র শুনিতে পাই। এ অপবাদ হইতে যে বঙ্গদেশের পাঠক সকলেই মুক্ত, এ কথা বলিতেছি না। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উপরোক্ত খ্যাত সমালোচন-পত্রগুলি উঠিয়া যাওয়ার অন্যতম কারণও আছে। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হস্তে ভারতী, নব্যভারত ও অনুসন্ধান দীর্ঘায়ুর পরিচয় দিতেছে। এস্থলে লর্ড বিকন্সফিল্ডের পিতা আইজাক্ ডিস্রেলীর উপদেশ-বাক্য বোধ হয় একটু উপকারজনক হইতে পারে। তিনি বলেন,—

"It is impossible to form a literary journal in a manner such as might be wished, it must be the work of many of different tempers and talents. An individual, however versatile and extensive his genius, would soon be exhausted. * * A prospect always extending as we proceed, the frequent novelty of the matter the pride of considering oneself as the arbiter of literature animate a journalist at the commencement of his career; but the literary Hercules becomes fatigued; and to supply his craving pages he gives copies extracts till the journal becomes tedious or fails in variety."—Curioseties of literature, Vol. I, page 16.

"কিরূপে চালাইলে একখানি সাহিত্যিক পত্র অভীপ্সিতরূপ চলিবে, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; তবে ইহা ভিন্ন ভিন্ন রুচির ও ভিন্ন ভিন্ন শক্তিশালী ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, ইহা নিশ্চিত। প্রতিভা যতই কেন দর্পতোমুখী হউক না, অচিরেই শ্রান্তি, ক্লান্তি ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। * * *। প্রথমে কার্য্যক্ষেত্রের প্রসারের আশা, বিষয়ের নূতনত্ব এবং সাহিত্য-জগতে একাধিপত্য করিব বলিয়া মনের অহঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ই কার্য্যারম্ভের সময় সম্পাদককে উত্তেজিত করে। কিন্তু ক্রমেই তাঁহাকে অবসন্ন হইতে হয় এবং শেষে যেন-তেন প্রকারে কাগজ চালাইতে হয়। ইহাতে লোকের বিরক্তি না হইবে কেন?"

আমরা যে সকল বঙ্গীয় পত্রের নাম করিলাম, তাহার অনেকই যে এই কারণে গতাসু, এবিষয় কি সন্দেহ আছে? কেন 'বঙ্গদর্শন,' কেন 'নবজীবন,' কেন 'প্রচারের' প্রচার বন্ধ হইল? 'বান্ধব' কেন উঠিয়া গেল? ইহাদের সম্পাদকেরা ত সাহিত্য-ক্ষেত্রের হরকুলীশ!

সমালোচন-পত্রের সম্পাদক কিরূপ হইলে চলিতে পারে, তদ্বিষয়ও একটী উপদেশ-বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

"He (a perfect journalist) must be tolerably acquainted with the subjects on: no *common* acquirement. He must possess the *literary history of his own times*, a science which Fontenelle observes is almost distinct from any other. It is the result of an active curiosity which takes a timely interest in the tastes and pursuits of the age while it saves the journalist from some ridiculous blunders.'

"মাসিক পত্রের সম্পাদকের লিখিতব্য বিষয়ে অন্ততঃ মধ্যময় কমেরও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ বড় সহজ কথা নহে। তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসও জানা আবশ্যক। ফন্টেনেলের মতে সাহিত্যিক বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে পৃথক্। ইহার বলে সময়ের রুচি ও প্রবৃত্তির গতি কৌতূহলের সহিত অবধারিত হয় এবং হাস্যজনক ভ্রমপ্রমাদ হইতে সম্পাদক মুক্ত হইয়া থাকেন।"

এক্ষণে পাঠকেরা অনুমান করুন, আমাদের কোন্ মাসিকখানি দীর্ঘজীবী হইবেক? বোধ হয় অনেকে ইহা স্বীকার করিতে পারেন যে, 'বিষয়ের বহুত্বে ও নূতনত্বে "নব্যভারত" ও "অনুসন্ধান" কাহারও নিকট হীন নহে। ইহাতে অনেক নূতন নূতন লেখকেরও নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহাও নূতনত্ব রক্ষার এক উদ্যম'। ডিস্‌রেলী সাহেব এতাদৃশ পত্রের দীর্ঘজীবনের জন্য প্রবন্ধ লেখকগণের পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবও করিয়াছেন। কোন এক নির্দ্দিষ্ট মত সমর্থন করিতে যে কাগজের জন্ম, বর্ণভেদ-প্রধান দেশে তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অধিক আশা নাই।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

হিন্দুর জ্যোতিষ।

(৪)

পূর্ব্ব প্রস্তাবের শেষভাগে যে অধিমাস শব্দের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারই বিষয় একটু বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে। পঞ্জিকায় দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রত্যেক সৌরমাসের মধ্যে সেই নামের একটি চান্দ্রমাস আরম্ভ হইয়া তাহার পর মাসে শেষ হয়। ইহাই মুখ্য চান্দ্র নামে খ্যাত। উহা অমাবস্যার শেষ হইলেই আরম্ভ হইয়া পর অমাবস্যায় শেষ হয়। পূর্ণিমার শেষ হইতে অর্থাৎ কৃষ্ণা-প্রতিপদ হইতে তাহার পূর্ণিমা পর্য্যন্তও আর একবিধ চান্দ্রমাস গণনা করা হয়। উহা গৌণচান্দ্র নামে খ্যাত।

ত্রিশ তিথিতেই এক চান্দ্রমাস। সুতরাং ত্রিশ চান্দ্রদিন উহার পরিমাণ হইলেও, উহার পরিমাণ যে যথার্থ ত্রিশ দিন নহে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখা যায় না।

যদি কখনও ঘটে যে কোন মাসের মধ্যে একটি চান্দ্রমাস আরম্ভ হইয়া সেইটি শেষ হয় ও আবার আর এক চান্দ্রমাস আরম্ভ হয়, তাহাহইলে, সেটি আরম্ভ হইয়া শেষ হইবে, সেইটি মলমাস বা অধিমাস নামে কথিত হইয়া থাকে। ঐ অধিমাসের পর আবার সেই নামেই এক চান্দ্রমাস আরম্ভ করা হইয়া থাকে।

উদাহরণ। কোন বৎসর (সন ১৩০০ সালে) ১লা আষাঢ় বেলা ১২টা ৪৬ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ডের সময় মুখ্য চান্দ্রজ্যৈষ্ঠ অশেষ হইয়া মুখ্য চান্দ্র আষাঢ় আরম্ভ হইল। ঐ চান্দ্র আষাঢ় যদি শ্রবণ নক্ষত্রে অত্যল্প কালও থাকিত, তাহা হইলে ঐ মাস মলমাস হইত না। কিন্তু তাহা না হইয়া ৩০এ আষাঢ় রাত্রি ৬টা ৫৫ মিনিট ৩১ সেকেণ্ড সময়ে সমাপ্ত হইয়াছে। কাজেই উহা মলমাস বা অধিমাস নামে গণিত হইয়া ঐ ৬টা ৫৫মিনিট ৩১সেকেণ্ডের পর হইতে আবার শুদ্ধ মুখ্য চান্দ্র আষাঢ়ই গণিত হইতে আরম্ভ হইল। এরূপ না করিয়া যদি ঐ সময় হইতে মুখ্য চান্দ্রশ্রাবণ গণিত হইত, তাহা হইলে যে সকল পর্ব্বাহ চান্দ্রমাস অনুসারে সম্পন্ন করা হয়, তাহা মহরম প্রভৃতি পর্ব্বের মত প্রতি বৎসর এক এক মাস অগ্রসর হইত। আধুনিক কি, খৃষ্টীয়সব ১৩০১ সালের ২০এ আশ্বিন আরম্ভ না হইয়া ২১এ ভাদ্র আরম্ভ হইত। এইজন্যই ক্ষয়মাসের প্রয়োজন।

"সাবনাহানি চান্দ্রেভ্যো
ছাব্দ্যোঃ খ্রোজ্যুতিথিক্ষয়াঃ।
উদয়াদুদয়ং ভানোঃ
ভূমিসাবনসাংজ্ঞা ঃ॥ ৩৬॥"

সাবনদিন হইতে চান্দ্রদিন সংখ্যা বাদ দিলে তিথি ক্ষয় পাওয়া যায়। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে কাল, তাহাকে সৌরসাবন দিন* কহে॥৩৬॥

* সাধারণতঃ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সাবন দিন গণিত হইলেও, অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্তই গণিবার রীতি শাস্ত্রে আছে। সে বিষয় স্থানান্তরে লিখিত হইবে।

বসুদ্ব্যষ্টাব্ধিরাশাঙ্ক-
সপ্তাব্ধিতিথয়ো যুগে।
চান্দ্রাঃ খষ্টিখখব্যোম-
খাগ্নিখর্ত্তু নিশাকরাঃ ॥৩৭॥

এক মহাযুগে ১৫৭৭৯১৭৮২৮ সাধনদিন এবং ৫৬৩০০০০৮০ চান্দ্রদিন হইয়া থাকে ॥৩৭॥

ষড়্বহ্নিত্রিহতাশাঙ্ক-
তিথয়স্তাধিমাসকাঃ।
তিথিক্ষয়া ষমার্ণাব্ধি-
ষ্ট্যষ্ট ব্যোমখবাধিনঃ ॥৩৮॥

এবং ১৫৯৩৩৩৬ অধিমাস ও ২৫০৮২২৫২ তিথিক্ষয় হইয়া থাকে ॥৩৮॥

প্রথমতঃ অঙ্ক কসিবার সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিয়া তাহার ফলগুলিকে শ্লোকবদ্ধ করিয়া দিবার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সকল শ্লোক কণ্ঠস্থ থাকিলে অনেক স্থলে গণনার সুবিধা হয়।

খচন্দ্রকৃতমুদ্রাষ্ট-
কূপরুদ্রবিমাঙ্কাঃ।
ভবন্তি ভোগ্যা ভানু
ভগণৈরুদিতাঃ কৃতাঃ ॥৩৯॥

এক মহাযুগে সৌরমাস সংখ্যা ৫১৮৪০০০ পুরুকথিত নাক্ষত্রদিন হইতে সূর্য্যের ভগণ বাদ দিলে ভৌমদিন পাওয়া যায়।

অধিমাসোনরাত্র্যঙ্ক-
চান্দ্রসাবনবাসরাঃ।
এতে সহস্রগুণিতাঃ
কল্পে সূর্য্যভগণাঃ ॥৪০॥

এক মহাযুগের অধিমাসাদির পরিমাণকে সহস্র গুণিত করিলে এক কল্পের অধিমাসাদি হইয়া থাকে ॥৪০॥

প্রাগগতেঃ সূর্য্যমন্দস্য
কল্পে সপ্তাষ্ট বহ্নয়ঃ।
কৌজস্য বেদখযমা
বৌধস্যাষ্টির্ত্ত বহ্নয়ঃ ॥৪১॥
খখ বজ্রানি জৈবস্য
সৌক্রস্যার্থ গুণেষবঃ।
গোঃ যমাঃ শনিমন্দস্য
পাতানামথ বামতঃ ॥৪২॥
মন্দস্রস্তক কৌজস্য
বৌধস্যাষ্টাঃ সাগরাঃ।
কৃতাদ্রি চন্দ্রা জৈবস্য
ত্রিখাকাশ ভূগোস্তথা ॥৪৩॥
শনিপাতস্য ভগণাঃ
কল্পে যমরসর্ত্তবঃ।
ভগণাঃ পূর্ব্বমেবাত্র
প্রোক্তাশ্চন্দ্রোচ্চ পাতয়োঃ ॥৪৪॥

এককল্পে সূর্য্যের মন্দোচ্চ ভগণ ৩৮৭,মঙ্গলের ২০৪, বুধের ৩৬৮, গুরুর ১০০, শুক্রের ৩৩, শনির ৩৯,মঙ্গলের পাতভগণ ২১৪, বুধের ৪৮, গুরুর ১৭৪, শুক্রের ৯০৩, শনির ৬৬২ বুঝিতে হইবে। চন্দ্রের উচ্চ ও পাতের ভগণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এই পাঁতের ভগণ পশ্চিম গতি বা বক্র ॥৪১-৪৪॥

নিরুপমা।

অষ্টম অধ্যায়।

মালতীপুর গ্রামের মধ্যে শাদা ধপ্‌ধপে একটা বাড়ী; সেই বাটীর মধ্যে একটী প্রকোষ্ঠ অতি সুসজ্জিত। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে; মালতীপুরে আর জনমানবের সাড়া নাই, কেবল মাঝে মাঝে চৌকীদারের হৈ-হৈ শব্দ শুনা যাইতেছে। ব্যোমকেশ সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে একখানি পর্য্যঙ্কের উপর শয়ন করিয়া; আর তাহার নিকটে সম্পূর্ণ-যৌবনা একটী স্ত্রীলোক—মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

ব্যোমকেশ যেদিন প্রথম মালতীপুর আইসে, সেইদিন অশ্বত্থমূলে বসিয়া যে, মূরতীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল,এ পাপীষ্ঠা সেই—নাম মদনমুঞ্জরী। ব্যোমকেশ যেমন রূপের ভিখারী,এও তেমনি সৌন্দর্য্যাভিধারিণী। স্বামীর মৃত্যুর পরহইতে হতভাগিনী আপনার অন্তরের অদম্য পাপস্পৃহা পূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছিল; সেদিন যেমন ব্যোমকেশের মনোমোহন মূর্ত্তিটী চক্ষুর উপর পড়িয়াছিল, অমনি পাপীয়সী আপনার মনোপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, ব্যোমকেশও তাহাকে আপনার হৃদয়-সিংহাসনে স্থান দিয়াছিল; বিধাতার জোটা-জোট, এখন সেই মণিকাঞ্চন শুভ-সংযোগ হইয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশকে যদি মালতীপুর ছেড়িয়া অন্যস্থানে যাইতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় এ মিলন হইত না। দেওয়ানজীর অনুকম্পায় প্রথম চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া,সে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল; তাহার সচ্চরিত্রতা এবং কর্ম্মদক্ষতা-বিষয়ে যথেষ্ট প্রশংসা হইতে লাগিল; ম্যানেজার সাহেব তাহার কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নূতন এক সহকারী দেওয়ানের পদ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে সেই কাজে নিযুক্ত করিলেন। মদনমুঞ্জরীকে প্রথম যেদিন দেখিয়াছিল, তাহার পরদিনই সে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল; প্রথম বৎসর কার্য্যের উৎসাহে তাহার হৃদয়ে অন্য কোন চিন্তাই স্থান পায় নাই।

দ্বিতীয় বর্ষে তাহার এমনি কতকগুলি কুসঙ্গ জুটিল যে, সংসর্গে ও উত্তেজনায় আপনার চরিত্র বজায় রাখিতে পারিল না। একে যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাস, তাহার উপর কুসংসর্গ উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিপথে চালিত করিল। এদিকে মদনমুঞ্জরীও,ব্যোমকেশকে মালতীপুরে অবস্থান করিতে দেখিয়া অবধি, তাহার ভাল-বাসা লাভ করিবার জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল; কত প্রেমলিপি,কত প্রেম-উপহার,পাপ-পথের সাহায্যকারিনী পাপীষ্ঠা দূতীদিগের দ্বারা, ব্যোমকেশের নিকট পাঠাইতে লাগিল। একে ব্যোমকেশ ভালবাসা ও সৌন্দর্য্যের জন্য লালা-য়িত ছিল, তাহার উপর সঙ্গদোষ-হেতু তাহার অন্তঃকরণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আর সে বিধবা, রূপসিকা, সুন্দরী এবং অভিভাবকহীনা মদনমুঞ্জরীকে উপেক্ষা করিতে পারিল না; ভবিষ্যৎ ভুলিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া,

নিরুপমার অশ্রু-অভিষিক্ত মুখখানি ভুলিয়া, মদনমুঞ্জরীর সেই কলুষিত রূপ সাগরে ঝাঁপ দিল— পাপীয়সীও আপন নারীধর্ম্ম চরণে দলিত করিয়া জীবনপ্লাবিনী পাপস্রোতে গা ঢালিয়া দিল।

প্রথম প্রথম লোকলজ্জা ও কলঙ্ক-ভয়ে দেখা-সাক্ষাৎ অতি সংগোপনেই হইত। কিন্তু পাপ কখন গোপন থাকে না, ক্রমে এই কথা লইয়া লোকে কানাকানি করিতে লাগিল। কথাটা যখন একটু উচ্চ হইল, তখন মদনমুঞ্জরীর দুই-একজন আত্মীয় তাহাকে শাসন করিবার নানা-প্রকার চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। ব্যোমকেশেরও পাপ ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া পড়িল; লজ্জার গ্রন্থী ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল; চক্ষুর আবরণ ক্রমে সরিয়া পড়িতে লাগিল। এখন আর কিছুমাত্র আবরণ নাই. ব্যোমকেশ অবাধে এখন তাহার বাটীতে যাতায়াত করিতেছে, অকুণ্ঠিত-চিত্তে স্ত্রীপুরুষের ন্যায় সেই পাপীষ্ঠা-সংসর্গে কালাতিপাত করিতেছে। ব্যোমকেশ যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিল, সে প্রতিজ্ঞা এখন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। অর্থ যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছে, কিন্তু সমুদায়ই সেই মদনমুঞ্জরীর কর-তলগত হইতেছে। এখনও তাহার সে অভিমান, সাহস, দম্ভ, সহৃদয়তা সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে; কেবল রূপের কাঙ্গাল, সৌন্দর্য্য পাইয়া নিরুপমার সে অশ্রু-অভিষিক্ত মুখখানি ভুলিয়া গিয়াছে।

নিশীথ সময়ে সেই প্রকোষ্ঠ-মধ্যে দুই জনে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। মদনমুঞ্জরীর প্রতি কথাতেই সোহাগ-ভালবাসা যেন গড়াইয়া পড়িতেছিল; আর ভ্রান্ত ব্যোমকেশ ভাবিতেছিল—জগতে বুঝি আর কাহারও এমন ভালবাসা নাই, এমন নিঃস্বার্থ প্রেম বুঝি পৃথিবী খুঁজিলে মিলে না।

মদনমুঞ্জরী বলিল,—"বল দেখি, কেন তোমাকে এত ভালবাসি?"

ব্যোমকেশ।—কেমন ক'রে ব'লবো? তোমার মন বোধ হয় কেবল ভালবাসাময়, তাই ভালবাস।

মদনমুঞ্জরী।—না, কেবল তা নয়। তোমার এই হাসিটুকু দেখে কেবল ভালবাসি। এই হাসিটুকুর জন্ম আমি সব ছেড়েছি।

ব্যোমকেশ।—আর আমি কি তোমাকে ভালবাসি না?

মদনমুঞ্জরী।—তা আমি ব'লছি না; তুমি ভালবাস আর না বাস, আমি তোমাকে ভাল বাসবো; তুমি আমাকে দূর ক'রে দাও, একশ-বার লাথি মার, আমি দেশে দেশে ভিক্ষা করে বেড়াব, আর তোমাকে ভালবাসবো।

ব্যোমকেশ।—আমিও এই বিধুমুখখানি জীবনে-মরণে প্রাণে-প্রাণে গেঁথে রাখবো।

মদনমুঞ্জরী।—ঈঃ—তা আর হ'তে হয় না! জানি, তোমার মন যেমন; তোমরা ত ভোমরা, হতভাগিনীরাই কেবল কেঁদে কেঁদে মরে; তোমরা কি চেয়ে দেখ?

ব্যোমকেশ।—তবে তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর।

মদনমুঞ্জরী।—তোমাকে অবিশ্বাস করিনা, তোমাদের পুরুষ-জা'তকে করি। মনে ক'রে দেখ দেখি—সেই প্রথম দিন! তুমি গাছতলায় শুয়ে, আমি তোমাকে দেখ্‌লাম আর মন-প্রাণ স'পে দিলাম! তুমি কি তা পারলে? তুমি আমার পানে কতবার চেয়ে দেখ্‌লে; শেষে বুঝি ভাল লাগ্‌ল না, তাই উঠে চ'লে গেলে।

ব্যোমকেশ।—না মদন! তুমি সেটা ভুল বুঝেছ; আমিও তখনই তোমাকে আমার যা-কিছু সমর্পণ ক'রেছি। উঠে গিয়েছিলাম বটে; কিন্তু সে যে কত কষ্টে, তা আর কি বলবো? সেইদিন থেকে আমি তোমার জন্য যেন পাগ-লের মত হ'য়েছিলাম।

মদনমুঞ্জরী।—আচ্ছা, তার পর যদি আর দেখা না হ'ত?

ব্যোমকেশ।—তা হ'লে চিরকাল তোমাকে মনে ক'রে কাঁদ্‌তে হ'ত।

মদনমুঞ্জরী।—নাও—আর এত ভালবাসায় কাজ নাই। তোমার মন আমি বেশ বুঝেছি। আমার প্রতি যদি এতই ভালবাসা, তবে গিন্নী আনতে আবার নৌকা পাঠালে কেন?

ব্যোমকেশ।—ওঃ! তুমি এটাও ভুল বুঝেছ, এর মধ্যে অনেক কথা আছে।

মদনমুঞ্জরী।—তা ব'ল্‌তে হবে কেন? আমি সে কথা বুঝেছি।

ব্যোমকেশ।—না—না, রাগ কর না; বলি শোননা, শুনলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে এখন। প্রথম, ভাত রাঁধবার জন্য একটা বামুনকে অকারণে মাসে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে দিতে হচ্ছে; দ্বিতীয়তঃ—এখানে আমি ব'লে দেও-য়ানজী আমার উপর বড় চ'টে আছেন; শুন্‌লাম সা'হেবকেও নাকি একথা ব'লেছেন; তাই পরিবার নিয়ে এসে মধ্যে একটা বাঁধ দেওয়া।

মদনমুঞ্জরী।—আচ্ছা, তা না হয় হ'ল, একটা কথা সত্য করে বল দেখি, সে এলে আমার কাছে আসবে ত?—না সে চাঁদমুখ দেখে সব ভুলে যাবে?

ব্যোমকেশ।—দে'খ্‌তেই পাবে। এখন মুখে বলা—সেটা কেবল বেশীর ভাগ। আমি ত তাকে দুই চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে।

মদনমুঞ্জরী।—তা দেখ্‌তেই পাব। হাঁ—হাঁ, ভাল একটা কথা মনে হ'ল; সেই যে অনন্তের কথা ব'লেছিলে, তার কি ক'র্‌লে?

ব্যোমকেশ।—সে ত বরাত দিয়ে রেখেছি, দুপাঁচ দিনের মধ্যেই হবে। নূতন অনন্ত এলে ও পুরাণ যোড়াটা কি করবে?

মদনমুঞ্জরী।—কেন? তুলে রা'খ্‌বো! দু যোড়া কি থাক্‌তে নাই?

ব্যোমকেশ।—তা আর থাক্‌বে না কেন?

মদনমুঞ্জরী।—তবে আর তা জিজ্ঞেসা কেন? আর আমার বেগুনফুলের যে নীলাম্বরী কিনে দেব ব'লেছিলে, তার কি হ'ল?

ব্যোমকেশ।—ঐ যা! ওটা ত মনেই ছিল না! আচ্ছা, কালসকালেই এনে দেব।

মদনমুঞ্জরী।—শুধু বেগুনফুলকে দিলে হবে না; তার বোনের একটা মেয়ে আছে, তাকেও একখানা দিতে হবে।

ব্যোমকেশ।—সত্যি নাকি! তবে ত দেখ্‌ছি, অনেক টাকার কাজ।

মদনমুঞ্জরী।—এই নাও; আমি একটা কিছু বল্‌লেই যদি অনেক টাকার কাজ হ'য়ে দাঁড়ায় মনে কর, তবে দিও না।

ব্যোমকেশ।—ছি ছি, রাগ কর কেন? আমি কি দেবনা ব'ল্‌ছি? কাল সকালে এনে দিলেই ত হ'ল।

মদনমুঞ্জরী।—আচ্ছা, তাই দিও—দিও। কেবল কাপড় দিলে ত হবে না, তার সঙ্গে সন্দেশও দু টাকার দিতে হবে।

ব্যোমকেশ।—আচ্ছা, তাও দেওয়া যাবে।

মদনমুঞ্জরী।—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এইবার বেশ্ বুঝে-শুঝে উত্তর দিও।

ব্যোমকেশ।—কি, বল?

মদনমুঞ্জরী।—আমি যদি মরি?

ব্যোমকেশ।—উঃ—ও কথা ব'ল না, ব'ল না; তাহলে আমার বুক ফেটে যাবে।

মদনমুঞ্জরী রমনি ব্যোমকেশের বুকের উপর মুখখানি লুকাইল। ব্যোমকেশ ত্রিভুবন খুঁজিল; মদনমুঞ্জরীর তুলনা পাইল না।

নবম অধ্যায়।

নিরুপমা যখন নৌকায় চড়িয়া মালতীপুর আসিতেছিল, তখন সে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিল—"সেখানে গিয়া পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিব—আর আমাকে নয়নের অন্তর করিও না।" কিন্তু মালতীপুর আসিয়া, স্বামীর মুখপানে চাহিয়া আহ্লাদে সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে; অনেক দিনান্তে দেখা-সাক্ষাতের পর প্রথম যে লজ্জা—সে লজ্জা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে, সেইজন্য সে তাহার মনের কথাটি প্রকাশ করিতে পারে নাই।

নিরুপমা আজ ছয় মাস মালতীপুর আসিয়াছে; কিন্তু কৈ, তাহার একটী আশাও ত পূর্ণ হয় নাই! জুড়াইবার জন্য যাঁহার কাছে আসিয়াছে; কৈ, তাঁর সোহাগ তো পায় নাই? সাধী-প্রাণ স্বামীর কাছে যাহা চায়, নিরুপমাও তো তাহা চায়; তবে সে তাহা পায় না কেন? সে স্বামীর সুখের জন্য প্রাণ দিতে পারে; সে মরিলে ব্যোমকেশ যদি সুখী হয়, তবে তাহার হৃদয় চিরিয়া প্রাণটুকু বাহির করিয়া লয় না কেন?

ব্যোমকেশ বাহিরে অমায়িক, বন্ধুপ্রেমিক, পরোপকারী, দয়ালু; কিন্তু নিরুপমার কাছে আসিলেই তত কঠোর হয় কেন? পরের দুঃখ দেখিলে ব্যোমকেশের হৃদয় ব্যথিত হয়, কিন্তু নিরুপমার দুঃখ সে বুঝে না কেন? নিরুপমাও তো পর অপেক্ষা পর, তবে তাহার নয়ন-জলে ব্যোমকেশের কঠিন হৃদয় আর্দ্র হয় না কেন?

ব্যোমকেশ মদনমুঞ্জরীর নিকট বলিয়াছিল যে, কেবল ভাত রাঁধিবার জন্য আর দেওয়ানজীর মন রাখিবার জন্য নিরুপমাকে লইয়া আসিতেছে। সেটা কিন্তু তাহার মনোগত অভিপ্রায় নহে; সেও কেবল মন-রাখা কথা মাত্র; কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যোমকেশ ধর্ম্মপত্নী প্রতিপালন কর্ত্তব্য বলিয়াই নিরুপমাকে আনিতে পাঠাইয়াছিল। যখন আনিতে পাঠাইয়াছিল, তখন তাহারও মনে আশা ছিল,—এইবার আনিয়া সুখে দুইজনে গৃহস্থালী পাতাইব; কিন্তু চিরদুঃখিনী নিরুপমার কপালে সে সুখ ঘটিবে কেন?

নিরুপমা যেদিন মালতীপুর আসে, সেদিন শয্যাপার্শ্বে স্বামীকে দেখিয়া আপনাকে পৃথিবীর অধীশ্বরী অপেক্ষাও সুখী মনে করিয়াছিল। কিন্তু সে তো মদনমুঞ্জরী নহে সে তেমন হাবভাব কোথায় পাইবে? তেমন সুচিকন চাহনী, সে মনভুলান হাসি, কোথায় পাইবে? দেবতায় দেবতা যে স্বামী, তাহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে, তাহাই ভাবিয়া সে আকুল! সে মদনমুঞ্জরীর মত কপট ভালবাসার কথা কোথায় পাইবে? ব্যোমকেশ সেই সকলই চায়; রূপে যে অন্ধ, সে কি প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে? ব্যোমকেশ নিরুপমার পার্শ্বে গিয়া সে সুখ পায় নাই। নিরুপমা তাহার জীবনের জীবনে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে; তেমনি সন্তুষ্টচিত্তভাবে, তেমনি সন্তুষ্ট অন্তরে, তেমনি সলজ্জনয়নে, স্বামীপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অতুল সুখ অনুভব করিয়াছে, ব্যোমকেশ যে দুই-একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, অতি মৃদুভাবে তাহার সরল উত্তর দিয়াছে। ব্যোমকেশ সেইসকল দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছে, নিরুপমা মদনমুঞ্জরীর দাসীর যোগ্য নয়! সে তেমন ভালবাসা কোথায় পাইবে?

সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন নিরুপমা যে দুই একটী মৃদু কথা শুনিয়াছিল, তাহার পর আর তাহার ভাগ্যে সে সুখ ঘটে নাই। শয্যাপার্শ্বে স্বামীকে প্রায় প্রতিদিনই দেখিতে পায়, কিন্তু কথাবার্ত্তা বড় একটা হয় না, অধিকাংশ দিনই দুইজনে শয্যার দুইপার্শ্বে শয়ন করিয়া সমস্ত রজনী যাপন করে। ব্যথার ব্যথী কে আছে, নিরুপমা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে—কেন এমন হয়?

এত কষ্ট—তবু নিরুপমা একটী দিনের জন্যও স্বামীর দোষ ইহা মনে করিতে পারে না; সে ভাবে—আমি হয় তো কোন দোষ করিয়াছি, তাই স্বামী দেখিতে পারেন না। কিন্তু কি যে দোষ, তাহা সে খুঁজিয়া পায় না। কত জনের মুখে মদনমুঞ্জরীর নাম শুনিতে পায়, তাহার বুক ফাটিয়া যায়, কিন্তু ভয়ে কখন সে নিজে সে কথা উচ্চারণ করে না।

এখন ব্যোমকেশ যখনই বাসায় আসে, তখনই যেন অপ্রসন্ন, রাগান্বিত! আবার বাহির হইলেই হাস্যবদন, প্রসন্নচিত্ত! নিরুপমা কত যত্নে রন্ধন করে, মনে কতখানা ভাবিতে ভাবিতে স্বামীর সম্মুখে অন্নব্যঞ্জনের থালা দিয়া আসে; এটু যদি মন্দ হয়, ব্যোমকেশের ক্রোধের পরিসীমা থাকে না, সে অন্নব্যঞ্জনের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্রোধভরে বাহির হইয়া যায়; হয় তো আর সমস্ত দিন ফিরিয়া আসে না, কি করিবে—সুশীলা সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়।

স্বামীর কাছে অবলার যেটুকু স্বাধীনতা, নিরুপমার সে স্বাধীনতা নাই। স্বামীর অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করিয়া করিয়া এখন তাহার হৃদয়ের এমনি একটী ভাব দাঁড়াইয়াছে যে, সে নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না; পরের বাড়ীতে, পরের কাছে, অতি-পর-যেমন-ভাবে থাকে, নিরুপমাকেও ঠিক সেইভাবে থাকিতে হইয়াছে। তবে প্রথম প্রথম আসিয়া তাহার যতটা কষ্ট হইত, এখন আর ততটা হয় না, সহিয়া সহিয়া হৃদয় সহিষ্ণু হইয়াছে।

বর্ষাকালে একদিন বড়ই দুর্য্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যাকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, চারিদিক নিবিড় অন্ধকার। থাকিয়া থাকিয়া নিবিড় বিদ্যুল্লতা প্রকাশ পাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ মেঘগর্জ্জন শ্রুত হইতেছে, ক্রমে রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর। নিরুপমা একাকিনী আপনার বাসায় রন্ধনঘরে বসিয়া রহিয়াছে—তাহার রন্ধন-কার্য্য অনেকক্ষণ শেষ হইয়াছে, কেবল ব্যোমকেশ এখন পর্য্যন্ত আসে নাই বলিয়া তাহাকে জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইয়াছে; নিকটে কেহ নাই, মনুষ্যের শব্দমাত্রও নাই, কেবল অন্ধকারের ভিতর বৃষ্টিপতনের ঝমঝম্ শব্দ। গৃহের মধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে; সে সেই প্রদীপের নিকট বসিয়া আপনার শৈশবের সুখের কথাগুলি একটী একটী করিয়া মনে করিতেছে। সে যখন ছোটবেলায় মায়ের কাছে থাকিত, তখন এক একদিন এমনি বর্ষা হইত, বর্ষার সময় সে কত কি ফুলের গাছ আনিয়া বাটীর ভিতর লাগাইয়া দিত; একবার তাহার লাগান গাছে যুঁই ফুটিয়াছিল, সে সেই যুঁই দিয়া 'পুণ্যিপুকুর' পূজা করিয়াছিল। আর একবার এমনি বর্ষা হইয়াছিল, সেইবার সে একদিন সন্ধ্যার সময় তাহার 'নন্দাঙ্গলদের' বাটী বেড়াইতে গিয়াছিল, তাহাদের বাটীর কাছে তালের গাছ, সেই গাছ হইতে তাল পড়িলে তাহারা দুইজনে অন্ধকারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাল কুড়াইয়া আনিয়াছিল; তাহার পর কত রাত্রি হইল, অন্ধকারে আর বাড়ী যাইতে

পারে না, অনেক রাত্রিতে তাহার পিতা আসিয়া তবে বাটী লইয়া গেলেন। শৈশবের এমনি হুত কি সুখস্মৃতি তাহার মনোমধ্যে উদিত হইতেছে; এক একটী সুখের চিন্তা ফুরাইয়া যাইতেছে, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে; এক একবার বাহিরে যখন কিছুই চমকাইতেছে, তখন অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিতেছে, গাঢ় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিতে না পাইয়া তাহার বড়ভয় লাগিতেছে। নিদ্রা তাহার নয়নে আর বড় আসে না; সে এখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিতে পারে।

সহসা খট্ খট্ করিয়া বহির্দ্বারে শব্দ হইল। নিরুপমা বুঝিল—তাহার স্বামী আসিয়াছে, অমনি শশব্যস্তে উঠিয়া প্রদীপ-হস্তে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যোমকেশ সেদিক-পানে ফিরিয়াও চাহিল না, নীরবে আপনার শয়নগৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। নিরুপমা ভাবিল—বোধ হয় কোন কাজ আছে; আরও সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল, কিন্তু ব্যোমকেশ আসিল না। তখন, কারণ জানিবার জন্য, অতি ভয়ে ভয়ে, সেও গিয়া শয়নগৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল—ব্যোমকেশ শয্যায় উপুড় শয়ন করিয়াছে। 'বুঝি কোন অসুখ হইয়াছে'—এই ভাবিয়া, তাহার আরও একটু নিকট গিয়া দাঁড়াইল। ব্যোমকেশের একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া আবার মুখ ফিরাইয়া বলিল—"এখনও যে তুমি জেগে রয়েছ, শোও নাই?"

মৃদুস্বরে নিরুপমা বলিল,—"রান্নাঘরে ভাত-বাড়া রয়েছে, ফেলে আসতে পারি নাই।"

ব্যোমকেশ।—আমি ত ভাত খাব না।

নিরুপমা।—কেন?

ব্যোমকেশ।—এত কৈফিয়তে কাজ কি? খাওনা সেই ভাল।

নিরুপমা।—কোন অসুখ করেছে নাকি?

ব্যোমকেশ।—অসুখ ত প্রতিদিনই; যেদিন থেকে বিয়ে ক'রেছি, সেইদিন হ'তেই অসুখ।

নিরুপমা।—আর ত কোন অসুখ নয়?

ব্যোমকেশ।—এর চাইতেও অসুখ চাও নাকি?

নিরুপমা।—আমি কি তোমার অসুখ চাই? তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে? তোমার অসুখ হ'লে—

ব্যোমকেশ।—আচ্ছা বাপু, আর ও প্যান্-প্যানানিতে কাজ নাই, খাবে ত খেয়ে এসে শোও।

নিরুপমা।—আমি খাব না, আমার খিদে নাই; সত্যি ক'রে বল, তুমি কেন খাবে না?

ব্যোমকেশ।—এ শেষরাত্রিতে খেয়ে কি মরবো?

নিরুপমা।—তা বটে? রাত আর বেশী নাই; এখন খেলে যদি অসুখ হয়, তবে যে কাল থেকে সকাল ক'রে রাঁধবো।

ব্যোমকেশ।—কেন জেগে থাকলে কষ্ট হয় নাকি?

নিরুপমা।—আমার আর কষ্ট কি? তোমার কষ্ট হয় ব'লেই ব'লছি।

ব্যোমকেশ।—আমার কষ্ট হবে, তাতে তোমার ক্ষতি কি?

নিরুপমা।—তোমার কষ্ট হ'লে আমার ক্ষতি হয় ব'লেই ব'লছি।

ব্যোমকেশ।—তাই যদি হবে, তবে তুমি আমার মান-অপমানের দিকে দৃষ্টি রাখনা কেন?

নিরুপমা।—আমি এমন কি কাজ ক'রেছি, যাতে তোমার অপমান হ'য়েছে?

ব্যোমকেশ।—না ক'রলে এলবো কেন? যদি কোন ভদ্রমহিলা তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছিল?

নিরুপমা।—কৈ? ভদ্রমহিলা তো কেউ আসে নাই, মদনমুঞ্জরী ব'লে একটা মন্দ-মানুষ এসেছিল।

ব্যোমকেশ।—সে ভাল হ'ক কি মন্দ হ'ক, তেমন আমি বল্‌ছিনে; সে এলে তুমি তাকে একটা কথাও বল নাই, আদর করা নাই, লতে বল নাই; সে চার দণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে বরাবর হয়ে চলে গেছে।

নিরুপমা।—তাতে যদি আমার কোন দোষ হয়ে থাকে, তা ক্ষমা কর। সে যেভাবে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দেখেই আমার মনে ঘৃণা হয়েছিল।

ব্যোমকেশ।—তা হবে বৈ কি! আমার সঙ্গে যাচাইতা ক'রে কেউ দেখা ক'র্ত্তে আসবে, আর তুমি এমনি ব্যবহার ক'রবে যে, সে একেবারে ঘাড়ে-হাড়ে চ'টে যাবে।

নিরুপমা।—এবার আমি বুঝ্‌তে পারিনি, যার কখনও এমন কাজ ক'রিনা; তুমি কি তাই জন্য রাগ ক'রে ভাত খাবেনা?

ব্যোমকেশ।—ভাত খাওয়া-না-খাওয়ার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ আছে! একবার ব'লেছি খাব না, সেই যথেষ্ট; কেন খাবে না, কিসের জন্য খাবে না, অত কথায় কাজ কি? আচ্ছা, তার নাম যে মদনমুঞ্জরী, তা তোমাকে কে ব'ল্লে?

নিরুপমা।—সে গেলে, দেওয়ানজীর বাড়ীর কি এসেছিল—তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম—সেই ব'লেছিল।

ব্যোমকেশ।—তা বেশ, যেই বলুক, এক কথা হ'চ্ছে কি, তোমার এখানে আর থাকা হচ্ছে না।

নিরুপমা।—কেন?

ব্যোমকেশ।—এখানে ত অনেকদিন থাক্‌লে, এখন মালঞ্চা কি গোকুলনগরে গিয়ে কিছুদিন থাকগে।

নিরুপমা।—তোমার কাছ থেকে গিয়ে সেখানে আমার কি সুখ?

ব্যোমকেশ।—সুখ অসুখ আবার কি? যেখানে-সেখানে এক-রায়গায় থাক্‌লেই হ'ল।

নিরুপমা।—সেখানে যেতে এখন আমার ইচ্ছা নাই।

ব্যোমকেশ।—ইচ্ছা নাই বল্‌লে, হবে কেন? সে হ'ল আপন দেশ, সেখানেও ত একটা গৃহস্থালী চাই!

নিরুপমা।—তা চাই বটে, কিন্তু এখনও ত নূতন বাড়ী তৈয়ারী হয় নাই—যখন হবে তখন যাব।

ব্যোমকেশ।—না—তা হবে না, শীঘ্রই তোমাকে যেতে হবে।

নিরুপমা।—নিতান্তই যদি বল, তবে যাব বৈ আর কি ক'রবো?

ব্যোমকেশ।—আর অভিমানে কাজ নাই, এ কিছু অভিমানের কথা নয়।

নিরুপমা।—আমি কি অভিমান ক'রছি! আমি তোমার দাসী, যা ব'ল্‌বে তাই করবো।

ব্যোমকেশ।—তা হলে ত বাঁচতাম।

নিরুপমা।—কেন? অন্যভাব কি দেখ্‌লে?

ব্যোমকেশ।—যাও—যাও, আর গোল ক'র না, একটু ঘুমুতে দাও।

টস্‌টস্ করিয়া নিরুপমার চক্ষুজল ঝরিয়া পড়িল; আর সেখানে দাঁড়াইল না, রন্ধনগৃহের কার্য্য শেষ করিবার জন্য সেখান হইতে বহির্গত হইল; সে রাত্রিতে তাহারও আর আহার হইল না। যেটুকু রাত্রি ছিল, সেটুকুর মধ্যে সে আর চক্ষুর পাতা বুজিতে পারিল না।

ইহার তিন দিন পরে সহানন্দা-তীরবাসী অনেকে দেখিয়াছিল যে, একখানি ছোট নৌকা

তীরবৎ বেগে ছুটিতেছে; তাহার ভিতর একটী যুবতী কপোলে হাত দিয়া বসিয়া আছে, তাহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে; নিকটে একটী প্রাচীনা রমণী প্রবোধ দিতেছে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চক্ষু থাকিতে অন্ধ!

'চক্ষু থাকিতে অন্ধ' একথা শুনিয়া অনেকেই বলিবেন—এ আবার কেমন কথা, চক্ষু থাকিতে মানুষ কিরূপে অন্ধ হইতে পারে? আমাদের দুরদৃষ্টের ফলে ও কালের প্রভাবে অসভ্যতাও সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া আমাদের দেশের একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। ইহাঁদের বহির্দৃষ্টিশক্তি আছে সত্য—তাহাও অনেকের আবার চশমা দ্বারা নির্ম্মল হইয়া থাকে—কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিশক্তি একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে। এসম্বন্ধে আমরা আমাদের নিজেদের কোন কথাই এস্থলে উল্লেখ করিব না; তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, এভিন্ন বক্তৃতা, পুস্তক, প্রবন্ধ ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া থাকি যে, তাঁহাদের চক্ষের অন্তর্দৃষ্টিশক্তি, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায়, একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাঁহাদের কয়েকটী কথা বা মন্তব্য এস্থলে উল্লেখ করিব।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের মহামহাপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের মত ও আমাদের শিক্ষিত-শ্রেণীর মত প্রথমতঃ আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করিব। বিলাতী-পণ্ডিত মোক্ষমুলর মহোদয় ভারতের ধর্ম্ম ও সভ্যতা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"ভারতের সভ্যতা জগতের এক অপূর্ব্ব এক অতুলনীয় পদার্থ। ভারতের সমস্ত জাতি আত্মার উন্নতি-কামনা করে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য লালায়িত হয়। ভারত ভিন্ন এ দৃশ্য আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এবং আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে, ভারত ভিন্ন এতাদৃশ উন্নতি আর কোথাও নাই। ধর্ম্মের জন্যই হিন্দুর জীবন। হিন্দুর নিদ্রায় ধর্ম্ম, পানে ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্ম ভিন্ন হিন্দুর আর কিছুই নাই। যদিচ অনেকস্থলে ধর্ম্মের আচরণে বাহ্য আবরণমাত্র—তুষমাত্র, কিন্তু এই আবরণের তলে তলে প্রকৃত ধর্ম্ম-শস্য সর্ব্বত্রই নিহিত আছে। হিন্দু জীবিত আছে—হিন্দু ধর্ম্ম-জীবন পুনর্জ্জীবিত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, হিন্দু এখনও জগতে জীবিত আছে। কেননা, ভারতের ন্যায় জগতের আর কুত্রাপি ধর্ম্মপ্রবণতার সমধিক সুবিধা নাই, অর্থাৎ ভারতই অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রকৃত কর্ম্মভূমি।"

ভারতের প্রাচীন সভ্যতার তেজ কণামাত্র দেখিয়া, মোক্ষমুলর সাহেব এই কথা বলিয়াছেন। আর আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত-নামধারী মহাত্মারা বলিয়া থাকেন,—"পাশ্চাত্য দেশবাসীদের নিকট আমরা সভ্যতা, ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষা লাভ করিয়া জ্ঞানী হইতেছি। হিন্দুর ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, প্রায় সমস্তই কুসংস্কার পরিপূর্ণ। জাতিভেদ-প্রথায় ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে; পৌত্তলিকতায় ও জন্মান্তরে বিশ্বাস করিয়া দেশ উৎসন্ন প্রায়" ইত্যাদি মন্তব্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাঁহাদের বক্তৃতায়, পুস্তকে ও সংবাদপত্রাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এভিন্ন, হিন্দুর হিন্দুশাস্ত্রে উন্নত নীতি-সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত না হইয়া, তাঁহারা পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে নীতি-সংগ্রহ করিয়া নীতিপরায়ণ হইতেছেন। চক্ষের অন্তর্দৃষ্টি শক্তিহীন না হইলে, মানুষ কখনই নিজের ঘরের কহিনুর উপেক্ষা করিয়া ভগ্ন কাচ-খণ্ডের জন্য লালায়িত হইতে পারে না।

ভারতের শিল্পবাণিজ্য-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-দেশের বহুতর মহাত্মারা বলিয়াছেন এবং এখনও বলিয়া থাকেন,—"ভারতের শিল্পের তুলনা নাই।" এই যে দেশীয় শিল্পের এত অবনতি হইয়াছে, কিন্তু এখনও এমন অনেক শিল্প ও কারুকার্য্য ভারতে বিদ্যমান আছে, যাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য-দেশবাসীগণ স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। এদেশবাসী শিক্ষিত-শ্রেণীর লোকের যত্ন ও উৎসাহ অভাবে এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। বিলাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এদেশের শিল্পবাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারিত না, যদি দেশের শিক্ষিত-শ্রেণীর লোকের দেশের দ্রব্যাদির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি থাকিত এবং ইহার উন্নতির জন্য তাঁহারা প্রাণপণে যত্ন চেষ্টা করিতেন। এই সকল শিক্ষিত লোকের আদর্শ দেখিয়া দেশের অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকরাও দেশীয় দ্রব্যাদির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীস্থ অর্দ্ধশিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের মুখে অনেক দিন হইতেই শুনিতে পাইতেছি, এবং এখনও শুনিতে পাইয়া থাকি যে,—"জাতিভেদ প্রথার দোষে এই দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারিতেছে না।" কত অসংখ্য লোক তো জাতি খোয়াইয়া বিদেশে যাইয়া কত প্রকারের উপাধি ও উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়া আসিলেন; কিন্তু কৈ, এক জন লোকের দ্বারাও তো এদেশের পুরাতন শিল্প-বাণিজ্যের একটুও উন্নতি হইল না! বরং তাঁহাদের দ্বারা দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের বহুতর প্রকারে অবনতি হইয়াছে ও হইতেছে। ফলতঃ এদেশের শিক্ষিত-শ্রেণীর লোকদের যদি দৃষ্টিশক্তি থাকিত ও স্বদেশের প্রকৃত উন্নতি করাই যদি তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইত, তবে কেবল বাক্যাড়ম্বর ও ফাঁকা সভা-সমিতি করিয়া কখনই তাঁহাদের শক্তি, সামর্থ্য ও সময় বৃথাকার্য্যে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারিতেন না। যে দেশের শিক্ষিত লোক দেশীয় দ্রব্যাদিকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করে, যে দেশের লোক উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি লাভ করিয়া বিদেশ হইতে একটি কর্ম্মকরও বাণিজ্যের দ্বারা নিজগৃহে আনিতে সক্ষম নহে, সে দেশের লোক কি বলিয়া স্বদেশহিতৈষী "ভারত-মাতার হসন্তান" প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হন, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

ভারতের আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধে বহুতর বিজ্ঞ ও বহুদর্শী বিলাতি ডাক্তার বলিয়া থাকেন যে,—"চিকিৎসা-শাস্ত্র ভারত হইতে পাশ্চাত্য-দেশসমূহে বিস্তার পাইয়াছে।" এ ভিন্ন, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের প্রাধান্য ও প্রশংসা, সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। সেদিনও সিকাগো মহা-মেলায় আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট প্রশংসা, আমরা

শুনিয়াছি, আর আমাদের দেশের শিক্ষিত মহাত্মারা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকে "অবৈজ্ঞানিক" বলিয়া ঘৃণা ও উপেক্ষা করেন। এ দেশ হইতে বিদেশে যাইয়া এবং এদেশে থাকিয়াও বহুতর ব্যক্তি সেই নকলের নকল চিকিৎসা-শাস্ত্র পাঠ করিয়া বড় বড় ডাক্তার হইয়াছেন। কিন্তু, এ পর্য্যন্ত একজন বড় ডাক্তারকে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতির জন্য চেষ্টা ও যত্ন করিতে কেহ দেখিয়াছেন কি? পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আনীত ঔষধ এদেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে এবং এদেশের অসংখ্য অর্থ বিদেশবাসিগণ লুটিয়া লইতেছেন। যদি এদেশবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিদের চক্ষুই সজীব থাকিত, তবে কি বিদেশীয়েরা, ছাইভস্ম বিক্রয় করিয়া, তাঁহাদের চক্ষের উপর হইতে এত লক্ষ লক্ষ টাকা এদেশ হইতে লুটিয়া লইতে পারিতেন? ভারতের পথে, ঘাটে, মাঠে, যেখানে-সেখানে, অসংখ্য শ্রেণীর অত্যাশ্চর্য্য, প্রত্যক্ষ ও আশুফলপ্রদ ঔষধ ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের শিক্ষিত-শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এই সকল অত্যাশ্চর্য্য ঔষধের প্রকৃত উন্নতির জন্য বিন্দুমাত্রও যত্ন-চেষ্টা দেখিতে পাই না। এই যে অসংখ্য তরুলতা প্রভৃতি ঔষধ এদেশে ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, এগুলি কি কেবল প্রকৃতির শোভা-বর্দ্ধন জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল? ইহাদের কি কোন গুণই নাই? এই সকল ঔষধ বিদেশে প্রচার ও বিক্রয় করিয়া একটি পয়সাও কি বিদেশ হইতে এদেশে আনা যাইতে পারে না?

কিন্তু এদেশের প্রকৃত উন্নতির জন্য কে চেষ্টা করিবে? যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারাই ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টায় এ সমস্তের প্রকৃত উন্নতি হইবে, তাঁহারা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া একেবারে অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা পারেন কেবল—ফাঁকা বক্তৃতা করিতে, আর লম্বা লম্বা চাঁদা তুলিয়া সভাসমিতি করিতে। দেশের প্রকৃত উন্নতি যাহাতে হইবে—দেশের ধনবৃদ্ধি যাহাতে হইবে—দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের দুঃখকষ্ট ও আর্থিক অভাব যাহাতে বিদূরিত হইবে—এইরূপ কার্য্যে যত্ন-চেষ্টা করিতে তাঁহাদের কাহাকেও প্রায় দেখা যায় না।

এইরূপ জাতীয় সাহিত্য বলুন, আর যে কোন সম্বন্ধে বলুন না কেন, প্রত্যেক বিষয়েই আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি যে, বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদের দেশের প্রকৃত উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না থাকাতেই, ভারতের এই শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে। পৃথিবীর যে কোন দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিনা কেন, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই সেই দেশের উচ্চশ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত ও মনস্বীমালী মহাত্মারাই প্রতিনিয়ত স্বদেশের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন—স্বদেশের দ্রব্যাদিতে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন—স্ব স্ব ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উন্নতির জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন—স্বদেশের ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন—এককথায় স্বদেশের যাহা কিছু আছে সমস্তেরই উন্নতির জন্য প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করেন। আর আমাদের দেশে ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ও বিপরীত দেখিতে পাইয়া থাকি। এ দেশের শিক্ষিত লোকের স্বদেশের কিছুর প্রতিই শ্রদ্ধা-ভক্তি নাই। তাঁহাদের দেখাদেখি অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকেরাও দেশীয় সমস্তের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই একমাত্র কারণেই, এদেশের ধর্ম্মের, সাহিত্যের, বাণিজ্যের ও শিল্পের দিন দিন এত অবনতি হইতেছে। শিক্ষিত মহাত্মারা যে সমস্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্বদেশ-উদ্ধারের জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন, সে সমস্ত প্রণালী দ্বারা এদেশের প্রকৃত যে উন্নতি হইবে, এমত আশা আমাদের নাই। দেশের সমস্ত অমূল্য রত্নের সাগরের অতল জলে নিক্ষেপ করিয়া, কোন্‌যুগে, কোন্ সময়, সেস্থানে চড়া পড়িবে, আর সেই চড়া হইতে পুনরায় ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া আনিব, এরূপ আশা চক্ষুষ্মান ব্যক্তির করাই কর্ত্তব্য নহে। হে শিক্ষিত ভারত-সন্তান! আপনারা একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন দেখি, এ পর্য্যন্ত আপনাদের দ্বারা দেশের প্রকৃত কি উন্নতি হইয়াছে? আপনাদের চক্ষুর উপর বিদেশীয়েরা কত প্রকারে কত অসংখ্য টাকা প্রতিনিয়ত এদেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যাইতেছে, আর আপনারা কেবল সভাসমিতি করিতেছেন—বিদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া "সভ্য" হইয়াছেন বলিয়া আস্ফালন করিতেছেন—বিদেশীয় ধর্ম্মে আস্থাবান হইতেছেন—বিদেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও পরোক্ষভাবে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন—বিদেশীয় সাহিত্যের ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিতেছেন—বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগমুক্ত হইতেছেন ও বিদেশীয় চিকিৎসা ও ঔষধের (এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ইলেক্‌ট্রোপ্যাথি প্রভৃতির)-উন্নতির জন্য বিশেষভাবে যত্ন-চেষ্টা করিতেছেন। আপনারাই বলুন দেখি, দেশের উন্নতির জন্য আপনারা কে কি করিয়াছেন? এখনও সময় আছে; এখনও ভারতের ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প, চিকিৎসা-শাস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি একেবারে অতল সমুদ্র-জলে নিমজ্জিত হয় নাই; এখনও আপনারা সকলে একপ্রাণে চেষ্টা করিলে দেশের ধনবৃদ্ধি ও কল্যাণ হইতে পারে, এবং আপনাদের আদর্শ দেখিয়া এখনও অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকেরা আপনাদের গন্তব্যপথে চলিতে ও আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ও বাধ্য হইতে পারে।

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চীনের যুদ্ধ।—চীনের সংবাদ এ সপ্তাহে বড়ই ভয়ানক। গত ২১এ নবেম্বর বুধবার, বিপুল আয়োজনের সহিত জাপানীরা চীনদিগের "পোর্ট আর্থার" দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। প্রত্যূষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়; বৈকাল ২টা পর্য্যন্ত প্রবলবেগে যুদ্ধ চলে। প্রথমে চীনেরা জিতিবার উপক্রম হইয়াছিল; অবশেষে বিষম যুদ্ধের পর জাপানীরাই জয়লাভ করিয়াছে। যুদ্ধে প্রায় দুই হাজার চীনসৈন্য হত হইয়াছে এবং জাপানীদিগের মাত্র আড়াই শত সৈন্য মারা গিয়াছে। প্রায় ১৩ হাজার চীনসৈন্য সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল; অবশিষ্ট সৈন্য পলায়ন করিয়াছে, কি অন্য কোনরূপে মারা গিয়াছে, তাহার স্থিরতা হয় নাই। এমনও সংবাদ পাওয়া যায়, তাহারা চীনদিগের কোন কোন জাহাজে আশ্রয় লইয়াছিল এবং তাহারও দুইখানা জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, পোর্ট আর্থার দখল

করিয়া, উৎসাহের সহিত জাপানীরা নিউচাঙ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে; এবং শীঘ্রই ওয়েহে-ওএ নামক স্থানে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা। এদিকে, প্রধান প্রধান রাজধিদের মধ্যস্থতায় চীনগণ যে সন্ধিপ্রার্থনা করিয়াছে, কেহ কেহ তাহাতে উদ্যোগীও হইয়াছেন; এখন জাপানীরা তাহা শুনিলে হয়! কোরিয়া ছাড়িয়া দিতে এবং যুদ্ধের ব্যয় ধরিয়া দিতেও, চীনেরা স্বীকৃত। কিন্তু যেরূপ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে শত্রুতা যে শীঘ্র মিটিবে, তাহার আশা অতি অল্প।

আরও পরের সংবাদ, ওয়েহেওএ আক্রমণ না করিয়া, জাপানীগণ একেবারে চীনের অন্যতম রাজধানী 'পিকিন' আক্রমণ করিবে; এবং চীনেরা দিনদিন অধিকতর বিমর্ষ ও হতাশ হইতেছে।

যুদ্ধ-সম্বন্ধে তারের সংবাদ তো এই। সংবাদ যদি সত্য হয়, অবশ্যই সঙ্কটের কথা বলিতে হইবে। কিন্তু সকল সংবাদে সব সময় সম্পূর্ণবিশ্বাস করাও সুকঠিন। ইতিপূর্ব্বে আর একবার 'পোর্ট আর্থার' জাপানীরা জয় করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ হইয়াছিল; কিন্তু পরে আবার তাহার বিপরীত সংবাদ—অর্থাৎ দুই তিন স্থানের যুদ্ধে চীনেরাই জিতিয়াছে এবং 'পোর্ট আর্থার' বরাবর চীনদিগের দখলেই আছে—প্রকাশিত হয়। সুতরাং আমরা যে এখনও আঁধারে, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ, প্রায় সংবাদই যেন জাপানীদিগের দ্বারা প্রেরিত হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। এরূপ অনুমান করিবার কতকটা কারণও পাওয়া যায়। সংপ্রতি "গ্রাফিক" নামক সচিত্র ইংরাজী-পত্রে চীন-জাপানের যুদ্ধের যে 'ফটোগ্রাফ'-ছবি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্টই ইহা প্রতীয়মান হয়। সে ছবিতে চীনগণকে যেন নির্জ্জীব, নিরুৎসাহ ও নিষ্পন্দভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। জাপানীদিগকে উদ্যোগী, উৎসাহী ও জীবন্তভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। এমন একটা চিত্রক্ষমতাশালী চীন—বাস্তবিকই কি এই দু'দিনের মধ্যে, হঠাৎ এত হীন হইয়া গেল? আরও, ঐ ফটোগ্রাফ্‌যে জাপানীদিগের দ্বারা প্রেরিত, তাহাও ঐ ছবির একখানির-নীচে ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত আছে। সুতরাং সংবাদে সন্দেহ করিলে না হইতে পারে? হইতে পারে—চীনেরা কোন কোন যুদ্ধে পরাজিত হইতেছে সত্য, হইতে পারে—তাহারা ক্ষতিগ্রস্তও হইতেছে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, সকল বর্ণনা সমান ঠিক নহে—সম্ভবতঃ হইতেও পারে না।

***

ফ্রান্স ও মাদাগাস্কার।—ফ্রান্সের কোন বাণিজ্যপোতের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছিল—এই হেতু দেখাইয়া, ফ্রান্স, মাদাগাস্কারে রণতরী পাঠাইতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন। ফ্রান্সের পরিষদেরা সকলেই একমত হইয়া যুদ্ধোদ্যোগে উৎসাহ দিয়াছেন। মাদাগাস্কার আঁপোয়ে মিটাইবার জন্য চেষ্টা পাইতেছিলেন; কিন্তু ফ্রান্স তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। গতকল্যকার সংবাদ, অগত্যা ফ্রীমাদাগাস্কারের রাণীও দেশের প্রজাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতেছেন।

***

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ।—এই পরিষদের উপযোগিতা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। বিশেষতঃ পরিষদ যে মূল-পাঠের উদ্ধার করিয়া, কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ-প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, ইহা বড়ই শুভসংবাদ। এই অনুষ্ঠানের সম্পাদন-সঙ্কল্পে, পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে এই পত্রখানি লিখিয়াছেন,—

"এখন কৃত্তিবাসের রামায়ণ নানাভাবে প্রকাশিত হইতেছে। একখানির সহিত আর একখানির পাঠের সাদৃশ্য নাই। মূল পাঠ নানাকারণে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিরক্ষার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মূল পাঠের উদ্ধার করিয়া রামায়ণ প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই সকল সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে পুঁথি সংগ্রহ করা আবশ্যক হইয়াছে। যাঁহাদের নিকট কৃত্তিবাসী রামায়ণের হাতে-লেখা পুঁথি অথবা ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বের মুদ্রিত গ্রন্থ আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক উহা পরিষদের কার্য্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে বা সংবাদ দিলে পরিষদ সাভিশয় উপকৃত হইবেন। যদি কেহ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পরিষদ তাঁহাকে যথোপযুক্ত মূল্য দিতেও প্রস্তুত আছেন। যাঁহারা পুঁথি দেওত পাইবার ইচ্ছা রাখেন, কার্য্য শেষ হইলে তাঁহাদের নিকট, উহা প্রত্যর্পিত হইবে, এবং তাঁহাদিগকে পরিষদের মুদ্রিত রামায়ণও দেওয়া যাইবে।"

আমাদের একান্ত ভরসা, এ অনুষ্ঠানে পরিষদ দেশের সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইবেন।

***

ভারতীয় শিল্পসমিতি।—দেশের প্রকৃত-শুভকর এই একটী সমিতির বিবরণী প্রাপ্ত হইয়া, আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বিশেষতঃ, এই সমিতিতে এমন দুই-একজন কৃতকর্ম্মা লোকের সংযোগ আছে—যাহাতে সমিতির সম্পূর্ণ সফলতার আশা করা যায়। বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির একজন প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। কেবল বক্তৃতা বা সভায় যে কাজ হয় না—উহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রেও যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য, এ তিনি বেশ বুঝেন; বিলাতে গিয়াও, ঠিক সেইভাবেই তিনি কাজ করিতে শিখিয়া আসিয়াছেন; "হাতে-হেতেড়ে কাজ করা" যাহাকে বলে, তাঁহাকে ঠিক সেই প্রকৃতির লোকই বলা যায়। তিনি অনুসন্ধান করিয়া, দেশের কোন জঙ্গলের গাছ হইতে 'পাট'বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কোন বৃক্ষের কাঁটা হতে "ব্রস" প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। আমরা তাঁহার সে পাট দেখিয়াছি; সে পাট প্রায় দেশী পাটের সমকক্ষ হইয়াছে; কত অল্পখরচে বনজঙ্গল হতে পাট বাহির হয়, আর দিন কতক পরে বোধ হয়, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। শিল্পোন্নতি-বিষয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এমনই সূক্ষ্মদৃষ্টি। শিল্প-সমিতির প্রতিষ্ঠায়, দেশের লোকের সমবেত চেষ্টায়, তিনি এখন ঐ শ্রেণীর নানাকার্য্যে সহায়তা করিতে উদ্যোগী। তাঁহার সহযোগিগণও অনেকেই উদ্যমশীলতার পরিচয় দিতেছেন। সমিতি হইতে দেশীয় শিল্পের যথাসাধ্য উৎসাহ দেওয়ায়, দেশের আরও মঙ্গলের আশা করা যায়।

***

দেশীয় শিল্পের অধোগতি।—কোনরূপ উৎসাহের অভাবেই তো দেশীয় শিল্পের আজ এরূপ অধোগতি হইয়াছে! একে বিদেশীয়ের এ ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিন, তাহাতে দেশের লোকের দেশের প্রতি উদাসীনভাব—ইহাতেই তো দেশের এমন দুর্গতি! তা না হইলে—আমরা ভ্রমেও একবার দেশের দিকে চাহিয়া দেখিলে, আদর্শ দেশীয় শিল্প কি এত শীঘ্র লোপ পাইত? ঢাকার মসলিন, ঢাকাই কাপড়, মুর্শিদাবাদের রেসমের কাপড়, শান্তিপুরের কাপড়, নানাস্থানের কারুকার্য্য—তাহা

হইলে কি এত শীঘ্র লোপ পাইত?—আর সেইস্থলে বিদেশীয় মর্য্যাদ জিনিসে আমাদিগকে ডুবাইয়া রাখিত? বিলাতী কাপড় ভিন্ন আমরা আজকাল আর কাপড় চিনি না! —কিন্তু তুলনায় সেই খুঁচে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেশী কাপড়ের প্রতি আমরা তাকাইয়াও দেখি না। দেশের শিল্প, এরূপ অবস্থায়, আর স্থান পাইবে কোথায়? কাজেই আজ আমাদের এই দশা! এ অবাধ নিস্পন্দ অবস্থায়, সমিতির ক্ষীণ-আলোক কতদূর কি করিতে পারিবেন, বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহাদের উদ্যমে—রোগীর অন্তিম দশায় মৃগনাভিসেবনবৎ যদি কোন ফল হয়! তবে একটী কথা এই, সমিতি যেমন কোন কোন শিল্পকারদিগকে পদক ও প্রশংসাপত্র দিয়া উৎসাহিত করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশের কতকগুলি লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রসার-বৃদ্ধির প্রয়াস পান, তবে দেশের প্রকৃত হিতসাধন করা হয়, আর তাহাকেই আমরা প্রকৃত কার্য্যকারিতে পারি। এই কথাটা দৃষ্টান্তদ্বারা আরও একটু বিশদ করিয়া বলিলে এইরূপ বলা যায়। এই ধরুন—দেশীয় বস্ত্র—ইহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায়। সমিতির উচিত, দেশের তন্তুবায়দিগকে উৎসাহ দেওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রসার-বৃদ্ধির চেষ্টা করা। সেরূপ চেষ্টা অবশ্য, কেবল প্রশংসা ও পদক দিয়া হইবে না; যাহাতে তাহার মূল রক্ষা হয়, তাহা করা উচিত। অন্ততঃ সমিতির সভ্যদিগেরও, বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া, তৎপক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত। নহিলে, 'পি, এম, বাকচীর কালীর' সম্বন্ধে পদক ও প্রশংসা দিয়া, লিখিবার সময় 'ষ্টিফেন্সের' কালী ব্যবহার করিলে, দেশের শিল্পোন্নতির কি সহায়তা করা হইবে, জানি না। ভাবিতে গেলে, এইরূপ অনেক বিষয় আছে—সমিতির যৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

***

দেশহিতানুষ্ঠান।—দেশের বাস্তবিক কোন হিতানুষ্ঠানে দেশের রাজা-জমীদারদিগের যদি কোন সাহায্যের সংবাদ পাওয়া যায়, তবে মন বড়ই উৎফুল্ল হয়। রঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্যমধ্যস্থ রাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল রায় বাহাদুরের দেশহিতকর কার্য্যে এইরূপ বহুল দান দেখিয়া, আমরা বড়ই সন্তুষ্ট আছি। "কটন ইনষ্টিটিউসনে" তাঁহার অপরিসীম দানশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়*; বালকদিগের ক্রীড়াভূমিতেও তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; এবং এরূপ উল্লেখযোগ্য তাঁহার আরও অনেক দান আছে। বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে তিনি, কার্য্যের গুরুত্ব ও উপযোগিতার বিষয় উপলব্ধি করিয়া, পৃষ্ঠপোষক (পেট্রণ) স্বরূপে আমাদিগকেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহার এই অনুগ্রহ ও সদিচ্ছায় আমরা অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৩৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ। ২১এ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। ত্রিংশ সংখ্যা।

ষট্ গোস্বামীপাদ।

"শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞীর করম চরণবন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ॥
এই ছয় গোসাঞীর চির দাস অনুদাস।
প্রার্থনা করয়ে শ্রীনরোত্তম দাস॥"

যিনি স্বয়ং ভক্ত, যোগী ও সিদ্ধপুরুষ; যিনি বৈষ্ণব-জগতে মহাপ্রভু চৈতন্যের প্রেমাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ; যাঁহার জীবনকাহিনী ও ও মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য বহু মহাপুরুষ, বহু গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করিয়াছেন; তিনি যাঁহাদিগের "চরণবন্দন" করিয়াছেন, এবং আপনাকে যাঁহাদিগের "চিরদাসানুদাস" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; যাঁহাদিগের বিষয়ে অনেক পুজ্যপাদ বৈষ্ণবগ্রন্থকার নানা-গ্রন্থ লিখিয়াছেন; অনেক প্রসিদ্ধ কবি যাঁহাদিগের গুণানুকীর্ত্তনাত্মক পদরচনা করিয়া আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিয়াছেন; যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের নেতা, পোষ্টা ও উপদেষ্টা; যাঁহাদিগের পাদানুসরণ না করিলে বৈষ্ণব-সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার হয় না; যাঁহারা কৃপা না করিলে ব্রজের নিগূঢ় মাধুর্য্যরসাস্বাদনের গত্যন্তর নাই; এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, আমরা সেই ছয় গোস্বামী প্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিয়া পাঠককে উপহার দিব। এই ছয় গোস্বামীর নাম উপরের কবিতায় যেভাবে আছে, আমরা ক্রমভঙ্গ না করিয়া, সেইভাবে লিখিব। এক এক জনের পরিচয় শেষ করিয়া, তাঁহাদিগের

যাঁহার যাঁহার ওপানুকীর্তনাদিক প্রাচীন পদ আমরা এপর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিব। প্রথমে—

শ্রীমৎরূপ গোস্বামী।

কুমার দেবের অনেক পুত্রসন্তান ছিল; তন্মধ্যে তিন পুত্র প্রসিদ্ধ। রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা অনুপ বা বল্লভ। রামকেলি গ্রামে ইঁহাদিগের বাসস্থান ছিল। শ্রীমৎরূপ গোস্বামী শিশুকাল হইতেই প্রগাঢ় কৃষ্ণভক্ত। নানা বিদ্যাবিশারদ হইয়া, গৌড়ের বাদশা হোসেন সাহার উজির পদে বরিত হয়েন। ইঁহার উপাধি ছিল—সাকরমল্লিক। * ইনি স্বীয় বাসভবনের সন্নিকর্ষে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড নামে দুইটী বৃহৎ বাপী খনন করাইয়া, এবং তত্তীরে একটী কদম্ব কানন প্রস্তুত করাইয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তন্মধ্যে স্বাগ্রজ সনাতনের সহিত একত্র মিলিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা করিতেন। কেহ কেহ * ইঁহাদিগকে যবনচারী বলিলেও, দেখা যাইতেছে যে, ইনি যবনের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও ইষ্টপূজা বিস্মৃত হয়েন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র, মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইবার জন্য, ক্ষণ ব্যাকুল হয়েন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের বাঞ্ছা পূরণ-মানসে বৃন্দাবন-গমনোপলক্ষে রামকেলি গ্রামে যাইয়া রূপ সনাতনকে দর্শনদান করেন। অনন্তবিলম্বে মহাত্মা রূপ গোস্বামী বিষয়জাল ছিন্ন করিয়া দীনবেশে নীলাচলে যাইয়া শ্রীচৈতন্যের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তাঁহারই আদেশে শ্রীবৃন্দাবন যাইয়া, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার ও অমূল্য গ্রন্থনিচয় প্রনয়ণ করেন। ইঁহার রচিত কতিপয় গ্রন্থের নাম এই :—ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, লঘু ভাগবতামৃত, হংসদূত, উদ্ধবদূত বা উদ্ধব-সন্দেশ, কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, লঘুগণোদ্দেশদীপিকা, বৃহৎ গণোদ্দেশদীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, ছন্দোঽষ্টাদশ, উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীরূপচিন্তামণি, হরিভক্তিরসামৃত সিন্ধুর বিন্দু, প্রযুক্তাখ্যাচন্দ্রিকা, নাটকচন্দ্রিকা, মথুরামাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, উৎকলিকাবল্লী, বাগমযুক্করণ, তুলসাষ্টক, বৃন্দাদেব্যাষ্টক, শ্রীনন্দনন্দনাষ্টক, মুকুন্দ মুক্তাবলী স্তব, বৃন্দাবন-ধ্যান, কারিকা, চাটুপুষ্পাঞ্জলী, গোবিন্দবিরুদাবলী ও প্রেমেন্দুসাগর। ১৪ ১১ শকে ইঁহার জন্ম, ১৪৮০ শকে অন্তর্দ্ধান। জীবিতকাল ৭০ বৎসর মধ্যে, গৃহস্থাশ্রমে মাত্র ২৭ বৎসর ছিলেন। ইঁহার ওপানুকীর্ত্তন পদ, যথা :—

১। বিহগড়া।

ষড় কলিরূপ শরীর না ধরিত।
তও ব্রজ-প্রেম-মহানিধি কুঠরিক কোন্ কপাট উঘারত॥ ধ্রু।
নীরক্ষীর হংসন পান বিধায়ন, কোন্ পৃথক করি পায়ত।
কো সব ত্যজি, ভজি বৃন্দাবন, কো সব গ্রন্থ বিরচিত॥
যব পিতু বনফুল, ফুলত নানাবিধ, মনরাজী অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনু পান কোন জানতু, বিদ্যমান করিবন্ধ॥
কো জানতু মথুরা-বৃন্দাবন, কো জানতু রাধা-মাধব রতি।
কো জানতু ব্রজভাব সব, কো জানতু নিগূঢ় পীরিতি॥
যাকর চরণপ্রসাদে সব জান গাই, গাও যাই সুখ পাওত।
চরণকমলে শরণাগত মাধব, তব মহিমা উচ্চসাওত॥

* মালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল সি-এস মহাশয়ের এই মত।

২। পাহিড়া।

আরে মোর শ্রীরূপগোসাঞী।
গৌরাঙ্গচাঁদের ভাব, প্রচার করিয়া সব, জানাইলেন হেন আর নাই॥ ধ্রু।
বৃন্দাবন নিত্যধাম, সর্ব্বোপরি অনুপাম, সর্ব্ব-অবতারি নন্দসুত।
তার কান্তাগণাধিকা, সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা, তার সখীগণ সঙ্গযুথ॥
রাগমার্গে তাহা পাইতে, যাহার করুণা হৈতে, বুঝিল পাইল যত জনা।
এমন দয়াল ভাই, কোথাও দেখি যে নাই, তার পদ করহ ভাবনা॥
শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা পাঞা, ভাগবত বিচারিয়া, যত ভক্তিসিদ্ধান্তে রক্ষণী।
তাহা পাঠাইয়া কত, নিজ গ্রন্থ করি যত, জীবে দিলা প্রেম-চিন্তামণি॥
রাধাকৃষ্ণ রস্য কেলি, নাট্যগীত পদ্যাবলী, শুদ্ধ পুরকীয় মত করি।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি, স্থাপন করিলা ক্ষিতি, আস্বাদিয়া তাহার মাধুরি॥
চৈতন্যে-বিরহে শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ, তাহে যত প্রলাপাদ্যবিলাপ।
সে সব কহিতে ভাই, দেহে প্রাণ রহে নাই, এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ॥

শ্রীসনাতন গোস্বামী।

ইনি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর অগ্রজ। ইনিও বাল্যাবধি কৃষ্ণভক্ত। বিদ্যাবাচস্পতির নিকট স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ইঁহার বিষয়-বুদ্ধিও অতি প্রখরা ছিল; সেইজন্য গৌড়ের বাদসাহ ইঁহাকে প্রধান সচিবের পদ প্রদান করেন। ইঁহার রাজকীয় উপাধি ছিল—"দবির খাস"। কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামী সংসারবিরাগী হইয়া যাওয়ার পর হইতেই, ইঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তথাপি যতদিন কর্ম্মপাশ ছিন্ন না হয়, ততদিন কেহই পরমার্থ আকাশমার্গে উড্ডীন হইতে পারে না। পরিশেষে শ্রিথিলীকৃত মায়াপাশ, কনিষ্ঠের একটী শ্লোকরূপ ছুরিকায় দ্বিখণ্ডিত হইল; প্রভু সনাতন বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কাশীধামে যাইয়া শ্রীচৈতন্য দেবের চরণারবিন্দে নিশ্চল ভ্রমর-ব্রত অবলম্বন করিলেন। প্রচলিত প্রবাদানুসারে, সেই শ্লোকটী এই :—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী।
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা॥
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃস্থিরং।
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

ইনিও শ্রীচৈতন্যের আদেশক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৪১০ শকে ইঁহার আবির্ভাব ও ১৪৮৬ শকে তিরোভাব হয়। বৃন্দাবনে ৪০ বৎসর বাস করিয়া, তথায়ই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম এই :—গীতাবলী, রসময়কলিকা, বৈষ্ণবতোষিণী, ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস ও শ্রীমদ্ভাগবতের দিক্-প্রদর্শনী টীকা। ইঁহার সম্বন্ধে তিনটী ও দুই ভ্রাতার সম্বন্ধে তিনটী—এই ছয়টী প্রাচীন পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

১। শ্রীরাগ।

জয় জয় পহুঁ শ্রীল সনাতন নাম।
সকল ভুবন মাহা যছু ওণ গাম॥
তেজল সকল সুখ-সম্পদ পার।
শ্রীচৈতন্য চরণযুগল করু সার॥
শ্রীবৃন্দাবনভূমে করি বাস।
লুপ্ত তীর্থ সব কয়ল প্রকাশ॥
শ্রীগোবিন্দ সেবা পরচারি।
কয়ল ভাগবত অর্থ বিচারি॥

যুগল-ভজনলীলা গুণ নাম।
করুল বিথার গ্রন্থ অনুপাম॥
সতত গৌর-প্রেমে গরগর দেহ।
ভমই বৃন্দাবনে না পায়ই থেহ॥
বিপুল পুলক ভর নয়নহরি জীর।
রাই কানু বলি পড়ই অথির॥
ভাববিভূষণ সকল শরীর।
অনুখন বিহরই যমুনাক তীর॥
যদু করুণায় বৃন্দাবন পাই।
ভাবহি মনোহর সোই গোসাঞী॥

২। সুহই।

শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন গোসাঞী,
পাতসার উজির হৈয়াছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া, বন্দী হৈতে পলাইয়া,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা॥
ছেঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
গলে ছিন্নকন্থা করি, দন্তে তৃণগুচ্ছ ধরি,
পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে॥
দরবেশ রূপ দেখি, প্রভুর সজল আঁখি,
বাহু পসারিয়া আইসে ধাঞা।
সনাতনে করি কোলে, কাতরে গোসাঞী বলে,
"মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া॥
অস্পৃশ্য পামর হীন, দুরাচার মতিহীন,
নীচসঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহি তোমা স্পর্শিবার॥
ভেটকম্বল দেখি গায়, প্রভু পুন দূর চায়,
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়িয়ারে ভোট দিয়া, ছেঁড়া এক কন্থা লৈয়া,
প্রভুস্থানে পুন আগমন॥
গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধাকৃষ্ণ-নাম-মাধুরি,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে,
প্রভু আজ্ঞায় করিলা গমনে॥
কভু কাঁদে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
ভিক্ষা-অন্ন খান একগ্রাস।
ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ-গাথা,
পরিধান ছেঁড়া বহির্ব্বাস॥
গিয়া গোসাঞী সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন,
রূপ-সঙ্গে হইল মিলন।
ধর্ম্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে, সনাতনের পদ ধরে,
কহে রূপ গদগদ বচন॥
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন,
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে,
এইরূপে কত দিন থাকে॥
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে, ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল-মূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি কাঁদে,
এইরূপে থাকে কত দিন।
গৌরপদ-প্রান্তে মন, ছাপান্ন দণ্ড ভাবন
চারি দণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, নামগুণে সদা থাকে,
অবসর নাহি একতিলে॥
কখন বনের শাক, অলবণে করি পাক,
মুখে দেন দুই চারি গ্রাস।
ছাড়ি ভোগবিলাস, ভরুতলে কৈলা বাস,
এক দুই দিন উপবাস॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় ধূসর কায়,
কণ্টকে বাজয়ে কভু পায়।
এ রাধাবল্লভ দাস, বড় মনে অভিলাষ,
কবে হব তাঁর দাসের দাস॥

৩। সুহই।

রূপের বৈরাগ্য-কালে, সনাতন বন্দীশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।

রূপেরে করুণা করি, ত্রাণ কৈলা গৌরহরি,
মো অধমে না কৈলা স্মরণে।
মোর কর্ম্মদোষ ফাঁদে, হাতে গলে পায় বান্ধে,
রাখিয়াছ কারাগারে ফেলি।
আপনি করুণাপাশে, দণ্ড করি ধরি কেশে,
চরণ নিকটে লেহ তুলি॥
পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে পাতিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
এইবার কর পরিত্রাণ॥
জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেব অজামিলে,
অনায়াসে করিলা উদ্ধার।
দেহ দুঃখ-সমুদ্রে মরে, নিস্তার করহ তারে,
তোমা বিনা নাহি হেন আর॥
হেনকালে একজনে, অলখিতে সনাতনে,
পত্রী দিল রূপের লিখন।
এ রাধাবল্লভ দাসে, মনে হৈল আশ্বাসে,
পড়ে পত্রী করিয়া গোপন॥

৪। সারঙ্গ।

জয় সাধু-শিরোমণি সনাতন-রূপ।
যো দুই প্রেম-ভকতি রসকূপ॥
রাধাকৃষ্ণ ভজন কো লাগি।
শ্রীবৃন্দাবন ধাম মে বৈরাগী॥
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
মিলল সকল ভকতগণ সাথ॥
সবে মিলি প্রেম ভকতি পরচারি।
যুগল ভজন ধন জগতে বিথারি॥
অনুখন গৌরচন্দ্র গুণ গায়।
ভরল প্রেমে ওর নাহি পায়॥
কহিহ না হেরিয়ে ঐছে উদাস।
মনোহর সতত চরণে করু আশ॥

৫। বিভাস।

জয় মোর প্রাণ সনাতন রূপ।
অগতিনকে, গতি দোঁভায়া,
যোগ যজ্ঞকে যূপ॥ ধ্রু॥
বৃন্দাবনকে, সহজ মাধুরি,
প্রেমসুধাকে কূপ।
করুণাসিন্ধু, অনাথন বন্ধু,
ভক্তসভাকে ভূপ॥
ভক্তি ভাগবত, মতহি র্চাচরণ,
কুশল সুচতুর চমূপ।
ভুবন চতুর্দ্দশ, বিদিত বিমল,
যশ-পসনাকে রসতূপ॥
চরণ-কমল, কোমল রজছায়া,
মিটত কলি বড়ি দুপ।
ব্যাস উপাসক, সর্ব্ব উপবাসে,
রাধাচরণ অনুপ।

৬। বিভাস।

জয় মোর সাধু-শিরোমণি রূপ সনাতন।
জিনকে ভক্তি, একরস নিবহী,
প্রীত কৃষ্ণরাধাতন॥ ধ্রু॥
বৃন্দাবন কি, সহজ মাধুরি,
রোম রোম সুখ গাতন।
সব তেজি, কুঞ্জ কেলি ভজি,
অহর্নিশি অতি অনুরাগ রাধাতন॥
করুণাসিন্ধু, কৃষ্ণচৈতন্য কি,
কৃপা কলি দোঁভাতন।
তিন বিনু ব্যাস, অনাথন যে সে,
সুখে তরুবর পাতন॥

শ্রীপাদ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।

এই মহাত্মা বারাণসীবাসী শ্রীতপন মিশ্রের একমাত্র পুত্র। ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে, ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন; ৭৪ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৫০১ শকে অন্তর্হিত হয়েন। ইনি অষ্টাবিংশতি বর্ষমাত্র গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন। মহাপ্রভু এই সময়ে

দুইমাসকাল ইহাঁর গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গৃহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু যতদিন পিতা জীবিত ছিলেন, ততদিন সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। পিতৃবিয়োগের পর সংসার-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইনি এক বৎসর কাল নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট অবস্থিতি করেন। তদনন্তর তাঁহারই আদেশ ও উপদেশে শ্রীবৃন্দাবন যাইয়া ৪৫ বৎসর তথায় অতিবাহিত করেন। ইহাঁর সম্বন্ধে প্রাচীন পদ,যথা,—

১। বরাড়ী।

জয়ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞী।
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণে, নিবানিশি নাহি জানে,
তুলনা দিবার নাহি ঠাঞি ॥ধ্রু॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র, তপনমিশ্রের পুত্র,
বারাণসি ছিল যাঁর বাস।
নিজগৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে,
চরণ সেবিলা দুইমাস ॥
শ্রীচৈতন্য নাম জপি, কতদিন গৃহে থাকি,
করিলেন পিতার সেবনে।
তাঁর অপ্রকট হৈলে, আসি পুন নীলাচলে,
রহিলেন প্রভুর চরণে ॥
মহাপ্রভু কৃপা করি, নিজশক্তি সঞ্চারি
পাঠাইয়া দিল বৃন্দাবন।
প্রভুর শিক্ষা হৃদে গণি, আসি বৃন্দাবনভূমি,
মিলিলেন রূপ সনাতন ॥
দুই গোসাঞী তারে পাঞা, মনে আনন্দিত হৈঞা,
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসে ভাসে।
অশ্রুপুলক কম্প, নানা ভাবাবেশে অঙ্গ,
সদা কৃষ্ণকথার উল্লাসে ॥
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে, যমুনা পুলিনে রঙ্গে,
একত্র হইয়া প্রেমসুখে।
শ্রীমদ্ভাগবত-কথা, অমৃত-সমান যাঁথা,
নিরবধি শুনে যার মুখে ॥
পরম বৈরাগ্যসীমা, সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমা,
সুস্বর অমৃতময় বাণী।
পশুপাখী পুলকিত, যার মুখে কথামৃত,
শুনিতে পাষাণ হয় পানি ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, সর্ব্বারাধ্য দুইজন,
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
এ রাধাবল্লভ বোলে, পড়িনু বিষম ভোলে,
কৃপা করি কর আত্মসাৎ ॥

শ্রীজীব গোস্বামী।

ইনি কুমার দেবের পৌত্র, অনুপমের পুত্র, ও শ্রীরূপসনাতনের প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি ব্যাল্যকাল হইতেই বিষ্ণুভক্ত। এমন কি, স্বয়ং বলরাম-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাই লইয়া বাল্য-ক্রীড়া করিতেন; অপর ক্রীড়নক স্পর্শও করিতেন না। বাল্যকাল হইতেই হরিমন্দিরে তিলক ও তুলসীমালা ধারণ করিতেন। আমরা ইহাঁর বাল্য-বৈরাগ্যের কথা "শিশুভক্ত-যুগল" শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণন করিয়াছি; সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে ইনি বৃন্দাবন ধাম গমন-পূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ও বহুল ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৪৫৫ শকে ইহাঁর প্রকট, এবং ১৫৪০ শকে অপ্রকট হয়। ইহাঁর মোট জীবিতকাল ৮৫ বৎসর; তন্মধ্যে গৃহে ছিলেন—২০ বৎসর; অবশিষ্ট ৬৫ বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী যেমন বৃন্দাদিনে গোবিন্দ জীউর মূর্ত্তি স্থাপন করেন, ইনি তদ্রূপ রাধা-দামোদরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাঁর প্রণীত গ্রন্থ-সংখ্যা রূপ-সনাতনী অপেক্ষাও অধিক। আমরা যে সকল নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই, —কৃপাসুধিস্তব, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, সূত্র-মালা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চ্চ নদীপিকা, গোপাল-বিরুদাবলী, রসামৃতশেষ, শ্রীমাধব মহোৎসব, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, ভাবার্থসূচক চম্পূ, কৃষ্ণপদচিহ্ন, শ্রীগোপালচম্পূ, তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, ভক্তি-সন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ নামক ভাগবৎটীকা, যোগসারস্তবটীকা, উজ্জ্বলনীলমণির টীকা, রসামৃতটীকা, ব্রহ্মসং-হিতার টীকা, গোপালতাপিনীর টীকা ও গায়ত্রীভাষ্য। ইহাঁর সম্বন্ধে পদ, যথা:—

১ম। দুহই

অনুপতনয়, সদয়হৃদয়,
শ্রীজীব গোসাঞী পহুঁ।
বিতর প্রসাদ, করু আশীর্ব্বাদ,
তবপদে মতি রহুঁ ॥
ভক্তিগ্রন্থ-সুধা, বিতরিয়া যুধা,
জগতের কৈলা দূর।
তব সম জ্ঞানী, না জানি না শুনি,
জ্ঞানীর তুমি ঠাকুর ॥
আবাল্য বৈরাগী, ভক্তি অনুরাগী,
ভাস ভগবৎ-প্রেমে।
লইয়া খেলিতা, লইয়া শুইতা,
নিজে গড়ি বলরামে ॥
তুলসির মালে, পরিতা ও গলে,
পরিতা তিলক ভালে।
রাধাকৃষ্ণনাম, জপি অবিরাম,
ভাসিতা নয়ান-জলে ॥
দেখি তব দৈন্য, নিতাই চৈতন্য,
স্বপনে দিলেন দেখা।
সেই হৈতে গৌর, প্রেমে হৈলা ভোর,
ছাড়িলা সংসার একা ॥
প্রেমকল্পতরু, অবধুতে গুরু,
করিয়া তার আদেশে।
কৈলা ব্রজে বাস, এ উদ্ধব দাস,
আছে তুয়া পদ-আশে ॥

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী।

ইনি ১৪২৫ শকাব্দে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত ভটমারি গ্রামে বেঙ্কট ভট্টের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ভুবনবিখ্যাত প্রবোধানন্দ সরস্বতী ইহাঁর খুল্লতাত। ইহাঁর বয়ঃক্রম যখন ৩০ বৎসর, তখন শ্রীচৈতন্য দক্ষিণাপথে ভ্রমণ জন্য গমন করেন। তৎকালে তাঁহার সহিত গোপাল ভট্টের শুভ সম্মিলন হয়। মহাপ্রভু গোপাল ভট্টের আবাসে মাসচতুষ্টয় অবস্থিতি করিয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করেন, এবং তাঁহারই আদেশে ও শক্তিসঞ্চার-প্রভাবে গোপাল ভট্ট বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক বৃন্দাবনে যাইয়া ৪৫ বৎসর তথায় বাস করেন। ইনি বেদান্তাদি নানা-বিধ শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি রাধারমণ বিগ্রহ স্থাপন-পূর্ব্বক তদীয় পূজাপদ্ধতি প্রকাশ করেন। ১৫০০শকাব্দে ইহাঁর অপ্রকট হয়। ইনি "ভক্তিবিলাস" গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থের নামান্তর "হরিভক্তিবিলাস"। ইহাঁর সম্বন্ধে ভক্তবীকান্ত দাসের নিম্নোক্ত পদটী পাওয়া যায় :—

১। দুহই।

দক্ষিণ দেশেতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
গৌরাঙ্গ যখন গেলা।
ভট্টমারি গ্রামে, শ্রীগোপাল নামে,
বে ভটের পুত্র ছিলা ॥
পরম পণ্ডিত, অতি সুচরিত,
ভট্টপুত্র শ্রীগোপাল।
রাখিয়া প্রভুরে, আপনার ঘরে,
সেবা কৈল সদাকাল ॥
পুর্ণ চারিমাস, তথা করি বাস,
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করে।
গোপালের প্রতি, দয়া করি অতি,
শক্তি সঞ্চারিলা তারে ॥

সে শক্তি-প্রভাবে, মজি ব্রজভাবে,
গোপাল বৈরাগ্য লয়।
লইয়া করঙ্গ, ধরিয়া গৌরাঙ্গ,
ব্রজেতে উদয় হয়॥
রূপাদির সঙ্গে, মিলি মনোরঙ্গে,
সাধন কৈল অপার।
তা সবার সনে, করিল যতনে,
লুপত তীর্থ উদ্ধার॥
শ্রীরাধারমণ, করিলা স্থাপন,
পূজা প্রকাশিলা তাঁর।
এ বল্লভ দাস, করি বড় আশ,
দিয়াছে তোমারে ভার॥

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

ইনি জাতিতে কায়স্থ এবং সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্যদাসের পুত্র। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত ইঁহার প্রথম মিলন হয়। ইনি পূর্ণ-যৌবন সত্ত্বে ধনসম্পত্তি ও যুবতী ভার্য্যা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উদাসীন হয়েন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ-পূর্ব্বক নীলাচলে গমন করিয়াছেন—এই তত্ত্ব পাইয়া, রঘুনাথ উন্মাদের ন্যায় পদব্রজে দ্বাদশ দিবসে পুরুষোত্তমধামে উপস্থিত হয়েন। এই দ্বাদশ দিবস মধ্যে তিন দিন মাত্র আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধন্য ইঁহার ত্যাগ-স্বীকার! ধন্য ধর্ম্মপিপাসা! আবার ইঁহার সাধনাও কঠোরতম। এই কলিকালে এত কষ্ট করিয়া, এত আত্ম-নিগ্রহ করিয়া, অপর কেহ সাধন করিয়াছেন কি না, আমরা জানি না। ইনি সমস্ত দিন মহাপ্রভুর সেবা করিয়া অপরাহ্ণে সিংহদ্বারে যাইয়া অঞ্জলি পাতিয়া থাকিতেন। যাত্রিক-প্রদত্ত মহাপ্রসাদে অঞ্জলি পূর্ণ হইলেই, তদ্দ্বারা কোন ক্রমে প্রাণধারণ করিতেন। পরে তাহাও পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কুক্কুর-মুখভ্রষ্ট দূরিত মহাপ্রসাদ ভূতল হইতে খুঁটিয়া লইয়া জলে ধৌত করিয়া, তাহাই অমৃত-জ্ঞানে আহার করিতেন।

"কুক্কুরের মুখ হতে, যদি পড়ে পৃথিবীতে,
দেবতা দুর্ল্লভ মানি খায়॥"

মহাপ্রসাদের এই মাহাত্ম্য ত সকলেই জানে; কিন্তু রঘুনাথ দাস ভিন্ন কে কবে ইহা কার্য্য দ্বারা দেখাইয়াছেন? দাস গোস্বামী এই-রূপে ১৬ বৎসর নীলাচলে বাস করিয়া, স্বরূপ দামোদরের অপ্রকটের পর, মহাপ্রভুর আদেশ-ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে গমন-পুরঃসর শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামী পাদগণের সহিত মিলিত হইয়া, রাধাকুণ্ডতীরে বাস করেন। বৃন্দাবন-বাস-কালে ইনি কঠোর সাধনের একশেষ করিয়াছিলেন। প্রতিদিন দুই কি তিন ক্ষুদ্র পাত্র তক্র পান করিয়া জীবনধারণ করিতেন। সহস্র দণ্ডবৎ, লক্ষ নামগ্রহণ, সহস্র বৈষ্ণব প্রণাম, রাত্রিদিন শ্রীরাধাকৃষ্ণের মানস-ভজন, প্রহরেক কাল মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন, তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে স্নান, সাড়ে সাত প্রহর ভক্তির সাধন, কোন কোন দিন চারিদণ্ড নিদ্রা, এই ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। ১৪২৮ শকে ইঁহার জন্ম, এবং ১৫০৪ শকে অপ্রকট। গৃহাশ্রমে ১৯ বৎসর, নীলাচলে ১৬ বৎসর, শ্রীবৃন্দাবনে ৪১ বৎসর বাস করিয়া, ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রমে বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। ইনি বিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তোত্র ও মনোশিক্ষা গ্রন্থের রচয়িতা। রাধাবল্লভ দাসের নিম্নলিখিত পদে পাঠক রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কঠোরতা-সম্বন্ধে আরও আশ্চর্য্য বিবরণ দেখিতে পাইবেন; যথা,—

১। বরাড়ী।

শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে, রঘুনাথ দাস চিতে,
পরম বৈরাগ্য উপজিল।
রাজ্য-সম্পদ, মিজরাজ্য অধিপদ,
মনপ্রাণ সকল ত্যজিল॥
দূরদৃষ্ট কৃষ্ণ নামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ, পুন রঘুনাথ দাস,
নয়নগোচর কবে হবে॥
গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া,
গোবর্দ্ধনের শীলা গুঞ্জাহারে।
বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিল তাহারে॥
চৈতন্যের অগোচরে, নিজকেশ ছিঁড়ি করে,
বিরহে আকুল ব্রজে গেল।
দেহত্যাগ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে,
দুই গোসাঞী তাঁহারে দেখিল॥
ধরি রূপ সনাতন, রাখিল তার জীবন,
দেহত্যাগ করিতে না দিলা॥
দুই গোসাঞীর আজ্ঞা পাঞা, রাধাকুণ্ড তটে গিয়া,
বাস করি নিকুঞ্জ করিলা॥
ছেঁড়া কম্বল পরিধান, বনফল গব্য খান,
অন্য আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্ত্তন করি,
রাধাপদ ভজন যাহার॥
ষোল দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ-গুণগানে,
স্মরণেতে সদাই গোঙায়।
আধি দণ্ড তন্দ্রা থাকে, স্বপনে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়॥
গৌরাঙ্গের পরাণেতে, রাধে মন-তন্দ্রারাণে,
স্বরূপোরে সদাই ধেয়ায়।
অন্তে শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে,
ভট্ট যুগ প্রিয় মহাশয়॥
শ্রীরূপের গণ যত, তাঁর পদে আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য তাঁর জীবে।
দিই আর্ত্তনাদ করি, কাঁদে বলে হরি হরি,
প্রভুর করুণা হবে কবে॥

হে রাধানবদ্ভ, গাঙ্কর্ব্বিকা বান্ধব,
রাধিকারমণ রাধানাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি কর আত্মসাথ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, যবে হৈল অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ কাঁহা রাখি,
এত বলি করয়ে ক্রন্দন॥
শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তাঁর গণ হয় যত,
অবতার শ্রীগ্রন্থে নাম।
গুপ্তব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুতি বৈষ্ণব সব,
সবারে করয়ে প্রণাম॥
রাধাকৃষ্ণ-বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
শুষ্করুক্ষ আত্মমাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে,
ফল গব্য করিল আহার॥
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেইদিনে,
কেবল করয় জলপান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ॥
শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি তাহার গণে,
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাঁদে।
হরি-কথা আলাপন, না শুনিয়া শ্রবণ,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে॥
হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ-সনাতন॥
কাঁদে গোসাঞী রাত্রিদিনে, ছাড়ি যায় তনুমনে,
ক্ষণে অশ্রু ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনার দেহভার,
বিরহে হইল জরজর॥
রাধাকুণ্ড তটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি,
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।

মন মন জিহ্বা নড়ে, প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ॥
সেই রঘুনাথ দাস, পূরাহ মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস, মনে বড়-অভিলাষ,
প্রভু মোরে কর পরসাদ॥

ষট্‌গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শেষ হইল। যাঁহারা কেবল কাব্যামোদী, উদ্ধৃত পদাবলীতে তাঁহারা কোন কাব্যীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবেন না; এবং সে আশা করিয়া লেখক এই পদগুলি উদ্ধৃত করেন নাই। ইতিহাস কাব্য অপেক্ষা কম আদরের জিনিস নহে। এই পদগুলিতে সেই ইতিহাস রহিয়াছে। আমরা অনেক কথায় ছয় গোস্বামী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এই পদগুলিতে তাহা অপেক্ষা অধিকতর ঐতিহাসিক কথা সংগৃহীত হইয়াছে। ফলতঃ এদেশে ইতিহাস বা জীবনচরিত লিখিবার রীতি নাই বলিয়া যে এক কলঙ্ক ছিল, শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী ও সমসাময়িক গ্রন্থকারগণ সে কলঙ্ক অপনোদন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থে ও পদে, কাব্য ও ইতিহাস উভয়ের উপকরণ ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত। আমরা সময়ান্তরে এবিষয়ের কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ আলোচনা করিব। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, পাঠকগণ কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন জানিতে পারিলে, আমরা শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য পরিকর ও পারিষদগণের বিবরণ প্রকটন করিব।

শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

চীন-পরিভ্রমণ।

আমরা ক্রমাগত তিন দিবস বিষম, ক্লেশাবহ পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়া জগদ্বিখ্যাত চীনদেশের প্রাচীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। সেই সময় প্রখর সূর্য্যরশ্মিতে অদূরে স্পষ্ট পর্ব্বতমালা দেখিতে পাইলাম। দুই পর্ব্বতের মধ্য-প্রদেশ যেন মেখাবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উচ্চভূমিতে অবস্থান করায় তথা হইতে প্রাচীন চীনের সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে অবলোকন করিতে করিতে তথায় বসিয়া বিশ্রাম উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। সুপ্রসিদ্ধ জগদ্বিখ্যাত চীন দেশের প্রাচীর (Great Wall) চীনদেশকে মঙ্গোলিয়া রাজ্য হইতে পৃথক করিতেছে। ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত। ইহার নির্ম্মাণকৌশল বিচিত্র ও আশ্চর্য্য। ইহার প্রস্তরগুলি সকল কোন উপকরণ দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন নহে। একের উপর আর একখানি স্থাপিত মাত্র। কিন্তু প্রাচীরের উপর "টাওয়ার"গুলি (tower) দৃঢ়রূপে প্রস্তুত, এবং ঐ মূলের "টাওয়ার" গুলির কিয়দ্দূর রক্ষিত; সেগুলি বহুকাল হইতে কালের উপদ্রব সহ করিয়াও অদ্য দৃঢ়রূপে রহিয়াছে। এই প্রসিদ্ধ প্রাচীর ইংরাজী ভাষার "এ" (A) অক্ষরের ন্যায় নির্ম্মিত। ইহা ব্যতীত আরও অন্যান সাতটি প্রাচীর আছে; সেগুলি যেন ঐ "এ" (A) অক্ষরের মধ্যস্থ দাঁড়ির ন্যায়।

আমরা গবি (Gobi) মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণে চীন-দেশের উর্ব্বরা ক্ষেত্রে উপস্থিত। শেষোক্ত প্রদেশে বৎসরে দুইটি ধান্য ও তরকারীর ফসল উৎপন্ন হয়। বিস্তৃত চীন-সাম্রাজ্যের এক অংশ জনমানবশূন্য ও অপরাংশ বহুজনাকীর্ণ। চীন সাম্রাজ্যে লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি এবং এক এক গ্রামে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক বাস করে। মঙ্গোলিয়া প্রদেশের জলবায়ু যে প্রকার স্বাস্থ্যকর, চীনের কিন্তু তদ্বিপরীত। মঙ্গোলিয়া প্রদেশ মরুময় হইলেও, তথায় বালুকণা এত ভারি যে, ঝড়েও তাহা স্বাসনসংশ্লিষ্ট হয় না। কিন্তু চীনে সামান্য বাতাসে এত অধিক পরিমাণে সূক্ষ্ম বালুকণা উঠে যে, অন্তরীক্ষে তাহা মেঘের ন্যায় বোধ হয়, এবং দৃষ্টিপথ সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করে—এমন কি, নিশ্বাস প্রশ্বাসের পর্য্যন্ত কষ্ট হয়।

এই দুই জাতির জাতীয় ও সামাজিক ভাব অনেক পৃথক। মঙ্গোলিয়া জাতি স্বভাবতঃই অতিথিসৎকারে তৎপর। কিন্তু চীনেরা অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি বিরূপ; ভিন্ন দেশীয় কেহ যেন তাহাদের সম্বন্ধীন হওয়াই তাহারা দোষাবহ জ্ঞান করে। প্রতিবেশী চীন ও মঙ্গোলিয়া জাতির মধ্যে স্বভাব ও প্রকৃতিতে যে প্রকার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর ক্ষুদ্রাপি সেরূপ বৈষম্য লক্ষিত হয় না। চীনদেশের বৃহৎ প্রাচীর বহু পূর্ব্বকালে মঙ্গোলিয়াদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য প্রস্তুত হয়। যদিও এখন উহার তত দশা, তথাপি, একাল পর্য্যন্ত পরস্পর জাতীয় একতা হয় নাই; বহু প্রাকালের যে ভাব, এখনও সেই ভাব দৃষ্ট হয়। এই দুই জাতির পরস্পর তুলনা করিলে, সততায় মঙ্গোলিয়াদিগকে এবং বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পনৈপুণ্যে চীনদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

আমরা বক্র পথ হাঁটিয়া ক্রমে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। ঐ দেশীয়েরা আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত রাস্তার দুইপার্শ্বে সারি দিয়া দাঁড়াইল। কখন কখন আমাদিগের গতিরোধের উপক্রম হইতে লাগিল। দেখিতে পাইলাম,—স্ত্রীলোকেরা চলিতে অসমর্থ, তথাপি শিশু-ক্রোড়ে করিয়া কোন জিনিষের উপর ভর দিয়া আমাদিগকে স্থির-নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছে। এই প্রদেশের লোক অনেকেই পর্ব্বতগুহায় বাস করে। ক্রমাগতঃ পাঁচ ঘণ্টা চলিয়া অবশেষে আমরা উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। কিন্তু স্থানীয় দৃশ্য কি অনির্ব্বচনীয়! এক ক্ষুদ্র নদী বক্রগতিতে এক বৃহৎ পর্ব্বত-তল দিয়া হরিৎক্ষেত্রে পড়িয়াছে। এ স্থানের শোভা কি সুন্দর ও কমনীয়! সচরাচর আমরা চিত্রপটে যে প্রকার চীনদেশীয় দৃশ্যাবলী নয়নগোচর করিয়া থাকি, তাহা এতদিন আমাদের কাল্পনিক লিপি বলিয়া অনুমিত হইত; কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়া নয়নমন সার্থক করিলাম, হৃদয় পুলকে পরিপূর্ণ হইল। দুই পার্শ্বে বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণ পাথরের পাহাড়ের মধ্যদেশে সেই উপত্যকা। তন্মধ্যে "গ্রানাইটের" (Granite) ঐক উক্ত শৈলখণ্ড স্থাপিত। কিয়দ্দূরে ভীষণাকার রক্তবর্ণ পাহাড় যেন ঝুলিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষসকল বসন্তাগমে নবপল্লবিত হইয়া ইতস্ততঃ শোভমান রহিয়াছে। প্রকৃতির কি মধুর ছবি! কি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! পাঠকগণ যদি এই স্বভাবের ছবি কল্পনা করেন ও সেই সঙ্গে পৃষ্ঠদেশে-লম্বমান বেণীসহ দুর্ব্বল মনুষ্যাকৃতি ও মোমের পুত্তলির ন্যায় রং করা স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে পান, তাহা হইলে আপনারা চীনদেশের একটক আভাস পাইবেন।

আমরা কালকান নগরে উপস্থিত হইয়া একটী চীনবাসীর বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলাম। এই বাটী নগরের বহির্ভাগে নদীর অপর পারে স্থিত। আমরা বাটীর বারাণ্ডায় বসিয়া

* কোন ইংরাজ-পরিব্রাজকের পরিভ্রমণ বৃত্তান্ত অবলম্বনে।

নির্নিমেষ নয়নে রাস্তার জীবজন্তু দেখিতাম; দেখিতে দেখিতে কখনও ক্লিষ্ট হইতাম না, বরং সন্ধ্যাগমে দুঃখিত অন্তঃকরণে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিতাম। সেখান হইতে পাল্‌কী করিয়া আমরা কালকান পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। চীনদেশের পাল্‌কী আকৃতিতে প্রায় অস্মদ্দেশস্থ পাল্‌কীর ন্যায়। তবে বিভিন্ন এই যে, ইহার দুইদিকে দুইটি করিয়া বোম সমভাবে লম্বমান আছে; এবং ইহার সম্মুখে ও পশ্চাতে দু'টি খচ্চোর জোতা থাকে। পশ্চাতের জন্তুটিকে পাল্‌কীতে জুড়িতে অত্যন্ত কষ্টকর বিধায় উহার চক্ষুতে আবরণ দেওয়া হয়। এই পাল্‌কী নিতান্ত অসুবিধাজনক। নিজে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। নড়িলেই গণ্ডগোল। বাহকগুলি সকল সময় একত্র না চলায় অত্যন্ত বিরক্তিজনক হয়। ইহা ঠিক যেন জাহাজের মতন; সর্ব্বদা গা ও মাথা টল্‌টল করিতে থাকে।

আমরা নগরের মধ্যদেশ দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। আমরা তথাকার দুর্গ দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই দুর্গের প্রাচীর নিতান্ত দৃঢ়। দুর্গ-প্রাচীর হইতে নগরের শোভা সৌন্দর্য্য অবলোকন করা যায়। এখানকার রাস্তায় যেমন জনতা, তদ্রূপ গোলমাল। দোকানীগণ তাহাদের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজনিজ দ্রব্যাদির সুখ্যাতি করিতেছে, এবং পথিকদিগকে তথায় আসিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। প্রত্যেকেই অপরের অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিবার প্রয়াস পাইতেছে। ইহার ফলে যে কি ভয়ানক হট্টগোল হইতেছে, তাহা সহজে বুঝা যায় ও ঐ কোলাহল নগরের বহুদূর হইতে শুনা যায়। কোন স্থানে খচ্চোর-আরোহী বা পাল্‌কীওয়ালা বা চীনদেশীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী "মাণ্ডারিণ"দিগের (Mandarin) কেচম্যান অথবা মুটে প্রভৃতিরা রাস্তা পরিষ্কারের নিমিত্ত বিকট চীৎকার করিতেছে। কোথাও বা বাজীকরেরা ঢাক বাজাইয়া ও বাঁশী বাজাইয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নিজনিজ বিদ্যার পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছে। শিশুরা পরস্পর মারামারি করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। ক্ষীণেরা পদ-দলিত হইবার আশঙ্কায় প্রাণপণে চেঁচাইতেছে। সামান্য ফড়েরা পরস্পর পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিতেছে। এবং ইহারই মধ্যে দিনের সময় নিরাকরণার্থ মধ্যে মধ্যে ঘড়ী বাজিতেছে। লণ্ডনের বিলিংস্‌গেটকে * (Billings Gate) চীনের রাস্তার তুলনায় হার মানিতে হয়। সহর অতিক্রম করিতে ক্রমাগত এক ঘণ্টাকাল ঐ বীভৎস ধ্বনি আমাদিগের শ্রবণ-বিবর পরিপূরিত করিয়াছিল। একটী তোরণ অতিক্রম করিয়া আমরা নগরের বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইলাম। এখানে আমাদিগের আশ্রয়দাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নিজের নিজের পাল্‌কীর ভিতর যাইয়া চুপ করিয়া বসিলাম। জানালাটি পর্য্যন্ত খুলিয়া দিতে সাহস হইল না। কিন্তু নিশাগমে তিন দিকের তিনটী জানালা খুলিয়া দিলাম। এখন দেখিতে পাইলাম যে, আমরা এক অতি সঙ্কীর্ণ পথ অতিবাহিত করিয়া যাইতেছি। উহা এত সঙ্কীর্ণ যে, এক খানি পাল্‌কী ব্যতীত অপর কিছুই যাইতে পারে না। ভীষণ-মূর্ত্তি পর্ব্বত চতুর্দ্দিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। আমরা পর্ব্বতের শীর্ষদেশ দিয়া গমন করিতেছিলাম। মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর গহ্বর দেখিয়া আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এইবার আমরা চীনদেশের দ্বিতীয় প্রাচীর দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় প্রস্তর-নির্ম্মিত; কিন্তু তাহা অপেক্ষা দৃঢ়। ইহার উপর দিয়া

যাইবার সময় কখন আমাদের পাল্‌কী এত ধীর ঘেঁসিয়া যাইতে লাগিল যে, বোধ হইতে লাগিল, এইবার বা সর্ব্বসমেত গড়াইয়া পড়ে। এইরূপ ভয় ও ত্রাসের সহিত ১০ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া এক নগরে পৌঁছিলাম। নগরের দুর্গ অতিক্রম করিবার কালে আমাদের চালকেরা বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা যে সম্প্রদায়ের লোক, তাহাদিগকে সঙ্কেতে জানাইয়া গেল। কিন্তু কেন যে উহা করিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। চীনদেশে যত অধিক গুপ্ত সম্প্রদায় আছে, বোধ হয় পৃথিবীর কুত্রাপি সে প্রকার নাই।

আমরা নগরে পৌঁছিয়া একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। চীনদেশের বাড়ীগুলি দেখিতে কি সুন্দর! সামান্য বাটীও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা শোভিত। কি টেবিল, কি টুল, কি পেয়ালা, কি চা-দানী, কি উহাদিগের আহারের কাট* প্রত্যেক বস্তুটি দেখিতে অতি মনোরম ও পরিপাটী। আমরা সামান্যরূপ আহারাদি করিয়া রাত্রিকালে হোটেলের বেঞ্চের উপর শয়ন করিলাম। পরদিন আমরা যে প্রদেশ দিয়া গমন করিতে লাগিলাম, সে দেশের স্বাভাবিক দৃশ্যের ন্যায় মনোমুগ্ধকর দৃশ্য জগতে কোথাও নাই। আমরা একটি ক্ষুদ্র নদীর গতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ইহা বক্রগতিতে পর্ব্বতের নিম্নদেশ দিয়া গমন করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের উপরস্থ বৃহৎ বৃক্ষগুলি নদীর উপরে যেন কুঞ্জের ন্যায় দেখাইতেছে; এবং উহা হইতে লতা-সকল লম্বমান হইয়া নদীগর্ভে পতিত হইয়াছে। বহু পথ অতিক্রম করিয়া আমরা এক বৃহৎ নগরে প্রবেশ করিলাম। ঐ নগর চতুর্দ্দিকে দৃঢ় দুর্গের দ্বারা বেষ্টিত। ইহার জনসংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। ইহা অতিক্রম করিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

চীনের ন্যায় জন-সংখ্যা কোন দেশে নাই। তথাপি ইহাদিগকে শাসন করিতে বহু সৈন্যের আবশ্যক হয় না। এত অধিক লোক শাসনের কৌশলটি বড়ই সামান্য। কেবলমাত্র গুপ্ত-পুলিষ ও আইনের কড়াকড়িতে এত লোক শাসিত হইতেছে। সন্তানের দোষের জন্য পিতার প্রাণ পর্য্যন্ত রাজদ্বারে সংশয়। সেইরূপ জেলার অধিবাসীদিগের অপরাধের জন্য জেলার অধীশ্বর "মাণ্ডারিণ" (Mandarin) সম্পূর্ণ দায়ী। সন্তানের জীবনের উপর পিতার সম্পূর্ণ অধিকার; দেশের লোকের উপর 'মাণ্ডারিণের" সম্পূর্ণ ক্ষমতা। এই কারণে কখনও কোন রাজবিপ্লব রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তাহা সহজে সমূলে নষ্ট হয়। নিজের সাফাই-স্বরূপ কখনও কোন কোন দোষী 'মাণ্ডারিণ' দেশের ১০।২০ জনের প্রাণদণ্ড করিয়া উচ্চ-পদস্থের মনস্তুষ্টিসাধন করেন। এই কারণে কখন কখন ভ্রমণকারীরা এককালীন ২০।৩০ জন লোকের প্রাণসংহার হইতে দেখিয়াছিল; এবং এই কারণেই বোধ হয়, চীনসম্রাট ইউরোপীয়দিগকে স্বীয় রাজ্যে আসিতে দিতে এত অনিচ্ছুক।

আমরা ঐ নগর (Ji·mily·quile) পরিত্যাগ করিয়া উপত্যকা দিয়া যাইবার সময় প্রচণ্ড বাত্যাহত হইলাম। প্রতি পদে আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, বুঝি বা প্রবল বায়ুর বেগে আমাদের জান উড়াইয়া লইয়া যায়। এইরূপ কষ্টে আমরা অবশেষে আর একটী নগরে (Chah-tchen) পৌঁছিলাম। এখানে আমরা অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। চীনদেশীয় পাল্‌কীতে ভ্রমণ ও তদ্দেশীয় কদর্য্য আহারাদিতে শরীর নিতান্তই অসুস্থ হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে আমরা দুইজন ব্যতীত

---

* লণ্ডন মহানগরের মৎস্য বিক্রয়ের স্থান।

* চীনেরা দুটি কাটি দ্বারা আহার করে।

কেহই সাক্ষী হইতে নামিলেন না। আমরা যাইয়া সরাইতে উঠিলাম। গভীর রাত্রে প্রাঙ্গণ হইতে বন্দুকের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অতি প্রত্যূষে আমরা সেই স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

চীনবিদের লম্বমান বেণী—যাহাকে ইংরাজী ভাষাতে সচরাচর (pig-tail) অর্থাৎ "শূকরের ল্যাজ" বলে, তাহার সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী বিজয়ী তাতারেরা চীন-প্রদেশ জয় করিয়া স্বীয় অসিবলে দেশমধ্যে কোরাণ প্রচারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে দেশমধ্যে প্রচার করেন যে, প্রত্যেক চীনকে মস্তক মুণ্ডন করিতে হইবে এবং আরবদিগের ন্যায় মস্তকে শিখা ধারণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য এই আজ্ঞা সকলকেই প্রতিপালন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কালের গতিতে ও চীনদিগের স্বাভাবিক নৈপুণ্য-কৌশলক্রমে ঐ শিখা সুন্দর বেণীরূপ ধারণ করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ইহাতে একপ্রকার সুবিধাও আছে। চীনে যে প্রকার ধূলির দৌরাত্ম্য, তাহাতে চীনদিগের মস্তকে ঘন কেশ থাকিলে তাহা পরিষ্কার করিতে বিশেষ কষ্টাবহ হইত এবং লোকের কি বীভৎস চেহারা হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কৃষকেরা ঐ বেণীতে বৃহৎ আর গামছা বান্ধিয়া রৌদ্রে ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করে।

ভিন্ন দেশবাসিগণ চীনদেশীয়দিগের অধ্যবসায় ও তন্নিবন্ধন সচ্ছলতা দর্শন করিলে ধন্য ধন্য করিবেন। অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রাচীন চীনদেশে সামাজিক কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত নাই। শেষোক্ত প্রদেশে কেহ নিজক্ষমতা ও বুদ্ধির বলে রাজদ্বার হইতে সম্মান বা পদলাভ করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার সন্তান তদ্রূপ গুণশালী না হইলে সেই পদ বা সম্মান পাইবেন না। তিনি তাহাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর খিতাব পাইবেন। এই প্রকারে উহা ক্রমশঃই নীচগামী হইবে ও অবশেষে উহা লুপ্ত হইবে। যদ্যপি ঐ বংশের কেহ স্বীয় কার্য্যকলাপ দ্বারা ঐ সম্মানের উপযুক্ত হন, তবে তিনি উহা লাভ করিবেন; নতুবা কেবল বড়বংশে জন্ম গ্রহণ হইয়াছে বলিয়া যে পিতার তুল্য বংশ-মর্য্যাদা পাইবেন, সে প্রথা সে দেশে নাই। এই নিয়ম যে উৎকৃষ্ট, সে বিষয় নিঃসন্দেহ; কারণ, সকলেই স্বীয় কার্য্যের দ্বারা বংশের মান-মর্য্যাদা রক্ষার প্রয়াস পাইবেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, বি-এল।

প্রাণ-কথা।

দান।

আমার প্রাণ দান করিবার জন্য সদা আকুল কেন? আমার পিতা ব্রহ্মাণ্ডপতি এবং আমার মাতা জগদীশ্বরী—ব্রহ্মাণ্ডের রত্ন-ভাণ্ডার, যাঁহাদের চরণতলে—তাঁহাদের পুত্র হইয়া আমি এ মনের সাধ পুরাইতেই বা পারিতেছি না কেন?

আমার ভাণ্ডার নিত্য পূর্ণ কেন? যাচক উপস্থিত হইলে আমি তাহার কামনা পূর্ণ করিতে পারি না কেন? অর্থাভাবে তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া প্রাণের মর্ম্মন্তুদ ব্যথায় অধীর হই কেন? যে পিতামাতা আমার হৃদয়ে এই দয়া দিয়াছেন, তাঁহারা সেই দয়া চরিতার্থ করিবার উপায় দেন নাই কেন? সকলই ত তাঁহাদের করতলস্থ—সকলই ত তাঁহাদের ইচ্ছাধীন! তবে এ বিড়ম্বনা কেন? তাঁহারা স্বয়ং অনন্ত দয়ার আধার; তাই পুত্রকেও অনন্ত দয়ার আধার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যখন অনন্ত শক্তির আধার, তখন পুত্রকেও অনন্ত শক্তিমান করিলেন না কেন? অনন্ত দয়া দিয়া অনন্ত ধন তাহাকে দিলেন না কেন? আমার পিতামাতা নিজেদের বাঞ্ছাকল্পতরু আপনাদিগেতেই আবদ্ধ রাখিলেন কেন? যখন পিতামাতা বাঞ্ছাকল্পতরু, তখন পুত্র বাঞ্ছাকল্পতরু হইলে তাঁহাদের কি ক্ষতি হইত? দীপ হইতে দীপান্তর প্রজ্বালিত করিলে, পূর্ব্ব-দীপশিখার উলজ্জতা তো কিছুই কমে না! বরং এক দীপ হইতে শত শত দীপ প্রজ্বালিত হইলে, মৌলিক দীপ-শিখার স্বরূপ অধিকতর অভিব্যক্ত ও মহিমা অধিকতর প্রচারিত হয় মাত্র। তবে আমার পিতামাতা এ খেলা খেলিলেন কেন? সকলের নিকট আমাকে অপদস্থ করিলে তাঁহারাও যে অপদস্থ হইবেন, তাঁহারা কি তাহা জানিতেন না? তাঁহারা পূর্ণসর্ব্বজ্ঞ, তাঁহারা ভবিষ্যতের সংবাদ পূর্ব্বে জানিতেন না—এ কথা কেমন করিয়া বলিব? যে শিল্পী ঘটিকা-যন্ত্র প্রস্তুত করেন, তিনি সে ঘড়ি কতদিন চলিবে ও কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিবে, তাহা পূর্ব্বে হইতেই জানেন। সুতরাং সর্ব্বশিল্পাধার আমার জনকজননী—আমার হৃদয়-ঘটিকা কিরূপে চলিবে, এবং কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিবে—তাহা পূর্ব্বে হইতেই জানেন। তবে কি আমার জনক-জননী নিষ্ঠুরতার আধার—যে পুত্রকে যাতনা দিবার জন্য তাহার হৃদয়কে কোমল করিয়া তাহার কোষ সদা শূন্য রাখিয়াছেন? পিপাসাকুল পথিককে মরীচিকায় মুগ্ধ করিয়া যেমন মরুভূমিতে লইয়া যান, ব্যাধের মুরলী-ধ্বনিতে আকৃষ্ট করিয়া হরিণীকে যেমন তাহার বাঞ্ছায় আবদ্ধ করেন, এবং বিষধর ফণীকে যেমন সঙ্গীতে বিমোহিত করিয়া তাহার নিকট

লইয়া যান, প্রাণাধিক পুত্রকেও কি তাঁহারা সেইরূপ নিশ্চিত মৃত্যুর ক্রোড়ে লইয়া যাইবার জন্য অনন্ত দয়া দিয়া তাহার চরিতার্থ করিবার উপায়ে বঞ্চিত করিয়াছেন? কারণ, এ অসহ্য যন্ত্রণা পুত্র কত দিন সহিতে পারিবে? অনন্ত-দুঃখপূর্ণ সংসারে থাকিয়া যদি লোকের দুঃখ দূর করিতে না পারিল, তবে তাহার বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন কি? নিরন্তর পরের দুঃখ দেখিতে দেখিতে তাহার কোমল হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিল। নিরন্ন ব্যক্তিগণের করুণরবশিষ্ট দেহ দেখিয়া তাহার হৃদয়-তন্ত্রীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারগুলি ছিঁড়িবার উপক্রম হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের মর্ম্মন্তুদ আঘাতে মৃতপ্রায় তারতবাসীর আর্ত্তনাদে তাহার মর্ম্মস্থল ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আর কেন? করুণাময় পিতঃ! করুণাময়ী মাতঃ! আর কেন? পরীক্ষা কি এখনও শেষ হয় নাই? এখনও কি তোমাদের সংশয় আছে যে, অর্থ দিলে আমি তোমাদিগকে ভুলিব?

না পিতঃ! না মাতঃ! আমি তোমাদিগকে আর ভুলিব না। একবার ভুলিয়া যে কষ্ট পাইয়াছি, তাহাতে আর ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। আমি তোমাদের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আর তোমাদিগকে ভুলিব না। আর একবার আমায় পরীক্ষা কর। আমায় শতভুজ কর; এবং সেই শতভুজে যাহাতে নিরন্তর দান করিতে পারি, তাহার উপায় করিয়া দাও। আমি অর্থ সঞ্চয় করিতে চাহি না; কারণ, অর্থে আমার প্রয়োজন কি? আমি বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরীর কুমার; আমার আবার নিজের অভাব কি? আমার সমস্ত ভারই তো তোমাদের উপর; তবে আমি কেন সঞ্চয় করিব? আমি তোমাদের প্রতিনিধি হইয়া যুবরাজ-পদে ব্রতী হইয়া জগতে অন্ন বিতরণ করিব। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী ভারত-

বাসীর অন্তরের অভাব মোচন করিব। পুত্রের এই বাসনা পূর্ণ কর। এইবার তোমাদের এই ব্রাহ্মণেতর নামের মহিমা পরিস্ফুটিত হইবে। আর যদি আমার এ বাসনা পূর্ণ করা তোমাদের সঙ্গত বলিয়া বোধ না হয়, তাহা হইলে আমায় আর সংসারে রাখিও না। সংসারে থাকিয়া আমি অসহ্য প্রাণীর অনন্ত দুঃখ দেখিয়া উদাসীন থাকিতে পারিব না। সুতরাং চরমে ধরিয়াছি আমার বাসনা পূর্ণ না করিলে আমায় তোমাদের রাঙ্গা চরণে লীন করিয়া লও। আমায় নির্ব্বাণ মুক্তি দাও। সংসারে আমি আর থাকিতে চাহি না। আর সন্ন্যাসেও সুখ নাই; কারণ, সন্ন্যাসীর উপর এখন বড় অত্যাচার চলিতেছে। তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়াও আমার প্রাণ বড় কাঁদে। তাঁহারা যেখানে যান, সেইখানেই শাস্ত্রিরক্ষকেরা চোর বা গুপ্তচর বলিয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, এবং বিবিধপ্রকারে যাতনা দেয়। তাঁহাদের বনে থাকিবারও উপায় নাই। কারণ, বনবিধি অতি কঠোর হইয়াছে। পূর্ব্বে যোগী-ঋষিগণ বনের ফলমূল খাইয়াই জীবনধারণ করিতেন, নদকাঠ আলিয়াই রজনীর শীত অপনীত করিতেন। কিন্তু এখন সে বন্য ফলমূল ও কাষ্ঠাদি বৈদেশিক রাজার অধিকারে আসিয়াছে; তাহা স্পর্শ করিলেই তাঁহারা চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়া থাকেন। সুতরাং রাজ-দণ্ড ভয়ে তাঁহারা বন ছাড়িয়া লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু সেখানেও রাজার যমদূতগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। এক্ষণে তাঁহারা কোথায় যাইবেন, ভাবিয়া অস্থির। সুতরাং আমি সন্ন্যাসীও হইতে চাহি না। অতএব, যদি সংসারে থাকিয়া দানব্রত উদ্‌যাপন করিতে দেও, তবে সংসারে রাখ; নতুবা তোমাদের চরণে ধরি, আমায় বিদেহ মুক্তি দাও। আর পরের দুঃখ দেখিয়া অশ্রুজল ফেলিতে পারি না! দুঃখ দূর করিবার সামর্থ্য নাই—কেবল কাঁদিয়া কি হইবে? আমার অশ্রুজলে কি ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে? অন্নাভাবে জীর্ণ-দেহ ব্যক্তির অশ্রুজল কি আমার অশ্রুজলে মূর্চ্ছিতা যাইবে? আমার "আহা" বাক্যে দুর্ভিক্ষের মর্ম্মন্তুদ তাড়না কি মন্দীভূত হইবে? অনশনে বা অর্দ্ধাশনে মৃতপ্রায় ভারতবাসীর ওষ্ঠাগত প্রাণ কি আমায় সহায়-ভূতিব্যঞ্জক বাক্যে রক্ষা হইবে? জগতের অরক্ষে কি শুদ্ধ আমার সান্ত্বনা বাক্যে দূর হইবে? অন্নাভাবে ওষ্ঠাগত প্রাণ ব্যক্তির নিকট সান্ত্বনা-বাক্য ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় হইবে। পূর্ব্বে ভারতে শতাব্দীতে একবার বা দুইবার মাত্র দুর্ভিক্ষ ঘটিত। তখন সান্ত্বনা দিবার পথ ছিল। কিন্তু এক্ষণে বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষ হইতেছে। এখন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতবাসীকে আর শুদ্ধ কথার ভুলান সম্ভব নহে। এখন শুদ্ধ সান্ত্বনা-বাক্য ভারতবাসীর দগ্ধহৃদয়ে আর স্থান পায় না। শ্বেতদ্বীপে তাহাদের সর্ব্বস্ব চালিত হইতেছে—কাঁচের বিনিময়ে ভারতের সমস্ত কাঞ্চন ধাবায় প্রেরিত হইতেছে। এখন কি ভারতবাসীর প্রাণ সান্ত্বনা মানে? স্বাধীন-বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতবাসীর যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইতেছে; এখন কোন্ প্রাণে তাহাদিগকে ভুলাইব যে,—'তোমরা স্থির হও, তোমাদের সুখের দিন আসিতেছে!' বর্ত্তমান দুঃখ একদিন নিবারণ করিতে পারিব না, তবে কোন্ প্রাণে তাহাদিগকে কেবল ভবিষ্যতের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে বলিব? অন্নাভাবে জনকজননীর সম্মুখে পুত্রকন্যা মরিতেছে দেখিয়া কোন্ প্রাণে তাহাদিগকে বলিব—'ধৈর্য্য ধরুন, আবার সুখের দিন আসিবে!' না পিতঃ! না মাতঃ! আমি এ ছদ্মসুখ শুদ্ধ ভক্তির আর করিতে পারিব না। আমি আর এ অসহ্য দৃশ্য দেখিতে পারি না। আপনাদের চরণে ধরি, কৃপা করিয়া আমাকে আত্মলীন করুন। আমি আর কিছু চাহি না। এই আমার শেষ ভিক্ষা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম্‌-এ।

সুধা না বিষ?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কেদার বাবুর কাহিনী।

চৈত্র মাস। অপরাহ্ণসময়ের নির্ম্মল বায়ু বড় মধুর। তাই প্রফুল্লকুমার আর আমি দুই জনে একবার রাজকীয় উদ্যানে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছিলাম।

প্রফুল্লকুমার একজন ডিটেক্‌টিব্ কর্ম্মচারী। আমার বাল্যবন্ধু। কিন্তু তাঁহার সহিত একত্র বাস করা আমার ভাগ্যে আর এখন বড় ঘটিয়া উঠে না। যদিও আমরা দু'জনেই একবাটীতে বাস করি, কিন্তু তাঁহাকে প্রায়ই কার্য্যগতিকে দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। তবে যখন সহরে আসেন, সেই সময়েই কেবল দুই চারি দিনের জন্য উভয়ে আনন্দে অতিবাহিত করিতে পারি।

আজ আমার বড় আনন্দের দিন! অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে বাসায় ফিরিলাম। দ্বারেই প্রফুল্লকুমারের ভৃত্য রামদাস।

রামদাস বলিল,—"বাবু! একজন বাবু আপনাকে খুঁজতে এসেছিলেন।"

প্রফুল্লকুমার কথাটা শুনিয়া কিছু বিরক্ত হইয়া আমার পানে চাহিয়া বলিলেন,—"দেখ্‌ছ ভাই! এইজন্যেই আমি বেড়াতে যেতে চাইনে।" তারপর রামদাসকে বলিলেন,—"ভাল, তুমি তাঁরে একটু বস্‌তে বল্‌লে না কেন?"

রামদাস বলিল,—"তিনি প্রায় আদ্‌ঘণ্টা বৈঠকখানায় বসেছিলেন। কিন্তু তাঁরে বড় অস্থির বলে বোধ হলো। শেষ তিনি আর চুপ করে বসে থাকতে না পেরে বল্‌লেন—'দেখ, আমি একটু রাস্তায় বেড়িয়ে আসি। শীঘ্রই ফিরে আস্‌বো। তোমার বাবু ফিরে এলে, তাঁকে আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করতে বলো।'"

কথাটা শুনিয়া প্রফুল্লকুমার কিছু প্রফুল্ল হইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কমল! আমার বোধ হয় লোকটার কোন বিশেষ বিপদ হয়ে থাকবে; নইলে, রামদাস তাঁরে অস্থির বলে মনে করতো না।"

এই কথা বলিতে বলিতে আমরা বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম। টেবিলের উপরেই একটী তামাক খাবার 'পাইপ্'। 'পাইপটী' দেখিয়া, প্রফুল্লকুমার সেটি হাতে করিয়া তুলিয়া লইলেন। বলিলেন,—"দেখ্—দেখ, ভদ্রলোকটী পাইপটি ফেলে গেছেন। এতেই বোধ হচ্ছে যে, সে ব্যক্তি বড়ই বিপন্ন; নইলে, তাঁর সখের পাইপ্ ফেলে যেতেন না।"

আমি বলিলাম,—"পাইপ্ আর সখের

কি? একটা গেলে আর একটা কেনা ত অতি সহজ। ওর আর দাম কি?"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"না ভাই, তা নয়; পাইপটার দাম অতি সামান্য হলেও, এটা যে সেই ভদ্রলোকের অতি প্রিয় জিনিস, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এই দেখ্‌চো না, পাইপটা কয়জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছিলো; অর্থব্যয় করে, এ দুই জায়গা রূপা দিয়ে মেরামত করিয়েছে। এটা মেরামত করতে যে টাকা খরচ হয়েছে, তাতে এমন দু'টা নূতন পাইপ কেনা যেতে পারে। কিন্তু যখন নূতন না কিনে এইটাই যত্ন করে মেরামত করিয়েছেন, তাতেই বোধ হচ্ছে যে, এ জিনিসটা তাঁর বড় আদরের।"

আমি প্রফুল্লকুমারের কথা শুনিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলাম,—"তার পর?"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"কমল, হেসো না ভাই। একটা সামান্য পাইপ্ থেকেও আমরা অনেক রহস্য বাহির করতে পারি। এই দেখ না কেন—এই পাইপটা যাঁর, সে ব্যক্তি দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা বাম হাতেই বেশী কাজ করতে পারেন। তাঁর গায়েও বেশ শক্তি আছে।"

আমি বলিলাম,—"কিসে জান্‌লে?"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"প্রথমতঃ দেখ, লোকটি পাইপে তামাক জ্বালাবার সময় দিয়াশালাই দিয়ে না ধরিয়ে প্রদীপের আলোকেই ধরাইয়া থাকেন। এইজন্য, পাইপটার দক্ষিণ ধারটা পুড়ে গেছে। যে ব্যক্তি দক্ষিণ-হস্তে পাইপ ধরে, তার পাইপের বামদিক পুড়ে যাওয়াই সম্ভব। যদি বল, ভুলক্রমে সে ব্যক্তি ওরূপ করতে পারে; কিন্তু তা নয়। তাহলে কেবল দক্ষিণ-ধারটাই পুড়তো না—বামধারটাও পুড়তো। তার পর দেখ, এখানে কত দাঁতের দাগ! এতেই বোধ হয়, লোকটি সবলকায়—"

প্রফুল্লকুমার আরও বক্তৃতা করিতেন; কিন্তু এই সময়ে পদশব্দ হওয়াতে বলিলেন,—"চুপ কর; বোধ হয় সেই ব্যক্তিই আস্‌চেন।"

অনতিবিলম্বে একটি দীর্ঘকায় সুবাপুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন। সুবাটির বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর। সবলকায় বটে। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আমায় অপরাধ গ্রহণ করবেন না, আমি বড় বিপন্ন। যদি একেবারে গৃহমধ্যে আসাতে কোন অপরাধ হয়ে থাকে, অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন।"

এই কথা বলিতে বলিতেই, তিনি একখানি কেদারায় বসিয়া পড়িলেন!

প্রফুল্লকুমার তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আমার বোধ হয় আপনার দু'এক-দিন ভাল নিদ্রা হয় নাই। তাতেই আপনাকে বড় দুর্ব্বল ব'লে বোধ হচ্ছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীরকে যত না ক্লান্ত করে, অনিদ্রায় তার চেয়ে অনেক বেশী কাতর করে ফেলে। এখন বলুন—আমায় কি করতে হবে?"

আগন্তুক বলিলেন,—"আমি আপনার পরামর্শ চাই। আমার সমস্ত জীবন বিষময় বোধ হচ্ছে। কি করলে আবার আমার মন সুস্থির হতে পারে, আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি। আমি আপনার নাম শুনেই এসেছি। কিন্তু আমি যে বিষয়ের পরামর্শ নিতে এসেছি, তা আপনাকে বলা উচিত কিনা, তাই এখনও বুঝ্‌তে পার্‌চি-নে।" এই কথা বলিয়াই, তিনি একটু চুপ করিলেন; অনতিবিলম্বেই আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"উচিত হোক আর অনুচিত হোক, যখন বল্‌তে এসেছি, তখন বল্‌বো; আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি, আমায় সদ্‌যুক্তি দেবেন।"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"কেদার বাবু!"

আগন্তুক বলিলেন,—"সে কি মশাই! আপনি কি আমার নাম জানেন?"

প্রফুল্লকুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মহাশয়! যদি আপনার নাম অন্যকে জান্‌তে দিবার অনিচ্ছা থাক্‌তো, তাহলে পিরাণ, চাদর ও জুতি কিনিবায় নিজের নাম দিয়ে চিহ্নিত করতেন না। তা' সে কথা যাক্; এখন বলুন কি? —এই ঘরে কত ব্যক্তি তাঁদের হৃদয়ের গুহ্যতম কথা-সকল বলে, আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন; তা সংখ্যা করা সহজ নয়। অনেকেই আবার জগদীশ্বরের কৃপায় শান্তিলাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। যদি জগদীশ্বরের অনুগ্রহে আপনার উপকার করতে পারি, তাহ'লে কৃতার্থ হ'বো। কিন্তু বিলম্ব করবেন না; যা বল্‌বার, শীঘ্র বলে ফেলুন।"

আগন্তুক বলিলেন,—"মহাশয়! আমার মন নিতান্ত অস্থির। হয় ত বল্‌তে বল্‌তে কোন্ কথা ভুলেও যেতে পারি; সুতরাং যা প্রয়োজন হবে, জিজ্ঞাসা করবেন। আমার নাম—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও, আমি পঠদ্দশাতেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করে,উপবীত ত্যাগ করেছি। বয়স তিন হলো, আমি একটি বিধবার পাণি-গ্রহণ করেছি। আমার পত্নী আমায় খুব ভালবাসেন; সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু গত সোমবার থেকে আমার মনোমধ্যে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে; আমি নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌লেও সে সন্দেহের কিছুই মীমাংসা করে উঠ্‌তে পার্‌ি-নি। আমার বোধ হয়, আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা কিছু গোপনীয় বিষয় আছে—যা তিনি আমার নিকট কিছুতেই প্রকাশ করতে পারেন না। কিন্তু পত্নীর এমন কি গোপনীয় বিষয় থাকতে পারে, যা পতির জান্‌বার পক্ষে বাধা আছে? এই বিষয়টি যতক্ষণ আমি জান্‌তে না পারচি, ততক্ষণ কিন্তু আর আমার মন স্থির হয় না। যদিও আমার পত্নী বিধবা, কিন্তু তাঁহার বয়স কেবল কুড়ি বৎসর। পূর্ব্বে তাঁর নাম্‌ ছিল—সুধাময়ী দাস। তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে বোম্বাই-নগরে ছিলেন; সেখানেই তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর পূর্ব্বস্বামী আনন্দরাম দাস, অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন; তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তিও বেশ ছিল। তাঁর প্রথম বিবাহের এক বৎসরের পরে একটী সন্তান হয়, তৎপরবৎসরেই জ্বর-রোগে তাঁর পূর্ব্বপতি ও সে সন্তানটির মৃত্যু হয়েছিল এবং তিনি বড়ই বিপন্ন অবস্থায় পড়েছিলেন। আমাদের আচার্য্য মহাশয় সে সময়ে বোম্বাই সহরেই ছিলেন; তিনি আনন্দরাম বাবুর একজন বন্ধু, তাই ইনি তাঁর সঙ্গে এখানে আসেন। আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়; সেই পরিচয় হ'তেই ক্রমে পরিণয়। বিবাহের পর তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমার হস্তে অর্পণ করেন ১ঐ সম্পত্তি নগদে ও কোম্পানীর কাগজে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। আমি ব্যবসায় করিয়া থাকি। আমারও বার্ষিক আয় খরচ-খরচা বাদে বার শত টাকার কম নয়। আমরা এখন সহরতলীর বাহিরে, একটি ছোট দোতালা বাড়ী করে, সেইখানেই থাকি। এই তিন বৎসরের মধ্যে একদিনের তরেও আমাদের মধ্যে একটি কথান্তর হয় নাই। আমার স্ত্রী, যখন আমার হস্তে তাঁর সম্পত্তি অর্পণ করতে চান, তখন আমি নিষেধ করলেও,তিনি আমাকে তাঁর নগদ টাকাগুলি আমার কারবারে খাটাতে অনুরোধ করেন, এবং কোম্পানির কাগজগুলি আমার নামে পরিবর্ত্তিত করে নিতে বলেন। এক্ষণে টাকাগুলি আমি কারবারে খাটাতে আরম্ভ করেছি বটে, কিন্তু কোম্পানির কাগজ-

গুলি তাঁর নামেই আছে। প্রায় দেড়মাস কি দুই মাস হলো, একদিন তিনি আমার কাছে এসে বল্‌লেন যে—'আমার পাঁচ শত টাকার দরকার হয়েছে, আমাকে টাকা দিতে হবে।' আমি মনে কর্‌লাম—বুঝি কোন গহনা প্রস্তুত করাবার প্রয়োজন। তাই বল্‌লাম—'একেবারে এত টাকা কি হবে?' তিনিও হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—'তুমি আমার টাকা গচ্ছিত রেখেছ; যখন দরকার হবে, চাইবো। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা চাইতে গেলে কি—কি জন্য টাকা চাই, তা বল্‌তে হয় নাকি?' আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে, পাঁচ শত টাকা দিলাম। তার পরে বল্‌লাম—'কি দরকার, তুমতে কিছু বাধা আছে না কি?'

আমার স্ত্রী বলিলেন,—'কিছু দিন পরে বল্‌বো।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কেদার বাবুর কাহিনীর শেষ।

কেদার বাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। প্রফুল্লকুমার অন্যমনস্ক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর?"

কেদার বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমরা যেখানে বাস করি, তাহার অদূরে একটি উদ্যান মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী আছে। বহুদিন থেকে ঐ বাড়ী খালি আছে। গত সোমবার দিন বিকালে আমি ভ্রমণ করতে করতে দেখ্‌লাম যে, বাড়ীটি ভাড়া হয়েছে। বাহিরে একখান গরুর গাড়ীতে করা কতকগুলি জিনিস। একখান ঘোড়ার গাড়ী অতি অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই বাগানের মধ্য হইতে ফিরিয়া গেল। আমি কৌতূহলপরবশ হইয়া বাটীতে কে আসিল জানিবার জন্য, উদ্যান মধ্যে প্রবেশ কর্‌লাম; দেখ্‌লাম—একটি বৃদ্ধা! সে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কে মশাই!"

আমি বল্লাম,—'আমি অদূরে ঐ বাড়ীতে বাস করি। আপনারা আমাদের প্রতিবেশী হলেন; তাই আপনাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এলাম।'

বৃদ্ধা বল্লে,—'বাড়ী আমিই ভাড়া নিয়েছি। যদি কখন আমার প্রয়োজন পড়ে, আপনাকে সংবাদ দিব। এখন আপনি যেতে পারেন।"

আমি বৃদ্ধার বাক্যগুলি শুনে, কিছু কষ্ট-বোধ কর্‌লাম। যাইহউক, হঠাৎ উপরদিকে দৃষ্টি পড়াতে দেখ্‌লাম, জানালায় একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে; সে আমায় দেখে একটু সরে গেল। একে সন্ধ্যাকাল, তায় দূরে; ভাল চিন্তে পারলাম না। লোকটার আকৃতি কিরূপ, তাও ভাল বুঝ্‌তে পারলাম না। মনে কর্‌লাম—হয় তো স্ত্রীলোক হবে! যাইহউক, রাত্রে আমার স্ত্রীর নিকট এ গল্প কর্‌লাম। তিনি ভালমন্দ কিছুই বল্লেন না। তৎপরে আমরা নিদ্রিত হ'লাম।

সচরাচর আমার নিদ্রা বড় প্রগাঢ়। একবার নিদ্রিত হলে প্রভাতের পূর্ব্বে কখনই নিদ্রা-ভঙ্গ হয় না। কিন্তু সেদিন মধ্যরাত্রে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো। দেখ্‌লাম, ঘরে আলো জ্বল্‌ছে—আমার পত্নী একখান মোটা চাদর গায়ে দিয়ে বাহিরে গেলেন। আমি সাশ্চর্য্যে শয্যার উপর উপবেশন করে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—ইনি গেলেন কোথায়? সদর দরজা শব্দ হলো—বুঝ্‌লাম, বাটীর বাহিরে গেলেন।

প্রায় আধ্ ঘণ্টা পরে আমার পত্নী প্রত্যাবৃত্ত হলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'সুধা! এত রাত্রে কোথা গিয়েছিলে?"

তিনি চমকিতা হইলেন। বলিলেন,—"তুমি জেগেছ?"

আমি বল্লাম,—"হাঁ জেগেছি! তুমি কোথা গিয়েছিলে?"

তিনি নিজের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"তুমি আশ্চর্য্য বোধ কর্‌তে পার। কিন্তু আমার বড় গরম বোধ হচ্ছিল; তাই একটু বাহিরে গিয়েছিলেম।"

গরম বোধ হচ্ছিল বলে, মোটাচাদর গায়ে-দেওয়া! যাই হোক, আমি আর কিছু বল্‌লাম না; কিন্তু বুঝ্‌লাম যে, তিনি আজ আমার কাছে কিছু গোপন কর্‌লেন। আমার মনটা বড় খারাপ হলো। তার পরদিন আর কর্ম্মস্থানে গেলাম না। দেখ্‌লাম, আমার স্ত্রীও কিছু চঞ্চল। যাই হউক, আমি বাড়ীতেও থাক্‌তে পারলাম না; যেমন কর্ম্মস্থানে যাই, তেমনি খাওয়া-দাওয়া করে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে, বেলা একটার সময় দারুণ পিপাসার্ত্ত হ'য়ে আবার গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হ'তে লাগ্‌লাম। এমন সময়ে দেখি, আমার পত্নী সেই বাগান-বাড়ী হ'তে বাহিরে এলেন। আমি তাঁকে দেখে আশ্চর্য্য বোধ কর্‌লাম; তিনিও আমায় দেখে চমকিত হলেন। কিন্তু শীঘ্রই মনোভাব গোপন করে বল্লেন,—"আমাদের প্রতিবেশিনী বৃদ্ধাটির সঙ্গে আলাপ কর্‌তে এসেছিলাম। তুমি কি সেজন্য আমার উপর বিরক্ত হয়েছ?"

আমি বল্‌লাম,—"কাল রাত্রেও তুমি এখানেই এসেছিলে?"

তিনি বল্‌লেন,—"সৈকি?"

আমি বল্‌লাম,—"তুমি যে এখানে এসেছিলে, তাতে আমার কিছুই সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বাটীতে কে আছে?"

তিনি বল্‌লেন,—"আমি এর আগে এখানে আসি নি।"

আমি কিছু ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লাম,—"কেন মিছে কথা বল্‌ছ? তোমার মুখভঙ্গি, তোমার গলার স্বর, তোমার দৃষ্টি, স্পষ্টই প্রকাশ করে দিচ্ছে যে, তুমি আমার কাছে কিছু গোপন কর্‌ছো। আমার সন্দেহ যদি মিথ্যা হয়, তবে চল—দুটীরে কে কে আছে, আমার সঙ্গে পরিচিত করে দেবে—চল।"

তিনি বল্লেন,—"না না, ওখানে গিয়ে কাজ নেই। চল, আমি ক্রমে তোমায় সব বল্‌বো। আমার কথায় বিশ্বাস কর! আমি কোন মন্দ অভিসন্ধিতে আসি নাই।"

আমি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাক্‌লাম। ক্ষণেক চিন্তা করে বল্লাম,—"ভাল, তুমি যে ভাবেই এসে থাক তা আমি আর অনুসন্ধান কর্‌বো না; কিন্তু তোমায় প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হ'বে যে, আর তুমি এখানে আস্‌বে না।"

তিনি বল্লেন,—'ভাল, তাই হবে। আর কখন আস্‌বো না। কিন্তু তুমি আমায় অবিশ্বাস করো না। আমি কোন অবিশ্বাসের কাজ করি-নি।"

আমরা গৃহে ফিরে এলাম। কিন্তু মনে শান্তিলাভ হলো না। কত রকমে মনকে শান্ত কর্‌তে চাইলাম; কিছুতেই শান্ত হলো না।

যাইহোক, আমি দুই দিন গৃহেই থাক্‌লাম; দিনরাত্রির মধ্যে একবারও পত্নীকে আমার নিকট হতে উঠ্‌তে দেখ্‌লাম না।

তৃতীয় দিনে কর্ম্মস্থানে গেলাম। প্রধান কর্ম্মচারী আমার অনুপস্থিতে সমস্ত কার্য্যই সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ করেছিলেন।

সচরাচর আমি পাঁচটার সময় বাটীতে ফিরে আস্‌তাম; কখন কখন তদপেক্ষাও বিলম্ব হ'ত। এক একদিন রাত্রি ৮টা পর্য্যন্তও থাক্‌বার আবশ্যক হত। কিন্তু সেদিন ২টার সময়ই বাড়ীতে ফিরে এলাম। আমি উপরে উঠ্‌ছি; দেখি, দাসী বাহিরে গেল। আমি

ঘরে গিয়ে দেখি, আমার স্ত্রী ঘরে নেই; জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি, দাসী উর্দ্ধশ্বাসে সেই বাড়ীর দিকে চলেছে। মহাশয়, বল্‌বো কি, আমার প্রাণের মধ্যে যে কি প্রকার যন্ত্রণা হতে আরম্ভ হলো, তা বল্‌তে পারি না। কাপড় না ছাড়িয়েই, আমিও সেই বাটীর দিকে যেতে আরম্ভ হলাম। এমন সময়ে আমার পত্নী দাসীর সঙ্গে ব্যস্তসমস্তভাবে ফিরে আসুচেন, দেখ্‌তে পেলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর দেখা না করে, আমি সেই বাড়ীর দিকেই গেলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য! গৃহে কেহই নাই। উপর-নীচে সকল ঘর অনুসন্ধান করলাম—জনহীন। উপরের একটি কক্ষ সুসজ্জিত; দেখি, একধারে আমার পত্নীর প্রতিমূর্ত্তি। ঐ ছবিখানি আমারই এক বন্ধু অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন। ছবিখানি আমারই শয়নকক্ষে ছিল। সকালে কর্ম্মস্থানে যাবার পূর্ব্বেও ছবিখানি দেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী ছবিখানি কার জন্যে এখানে আনলেন? বৃদ্ধাই বা কে? বাড়ীতেই বা আর কাকে কে?

নিষ্ফল হয়ে বাড়ীতে ফিরে এলাম। মনে কর্‌লাম—যদি পত্নী সকল কথা অকপটে বলে, ভাল; নৈলে, এ জন্মের মত পরিত্যাগ কর্‌বো।

এই ভেবে, আমার পাঠাগারে এসে, আমার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করতে আরম্ভ কর্‌লাম।

আমার পত্নীও আমার সঙ্গে সঙ্গেই এলেন। তিনি বল্‌লেন, —"আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বড় অপরাধ করেছি। কিন্তু যদি তুমি কারণ শোনো, নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে, সন্দেহ নাই।

আমি বললাম,—"ভাল সমুদায় কথা ভেঙ্গে বল।"

তিনি বল্‌লেন,—"তা পার্‌বো না।"

আমি বল্‌লাম,—"যদি না বল, আমি নিশ্চয়ই তোমায় বিশ্বাস কর্‌তে পারি না। যখন তুমি তোমার ছবিখানি নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়েছে, তখন সে যে তোমার আপনার লোক, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু কে সে?"

কিন্তু তিনি কিছুই বল্‌লেন না। আমি তাই গৃহত্যাগ করে কাল পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছি। মনে শান্তি নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই। হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। দিন রাত কেবল এই ভাবচি—আমার সুধা—"সুধা না বিষ?"

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কবিরত্ন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চীনের যুদ্ধ।—ইয়াকোহামা হইতে তারের সংবাদ এই যে, জাপানীরা চীনদিগের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত; কিন্তু যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ নগদ ৪০ কোটী 'য়েন' (মুদ্রা) এবং অধুনা-অধিকৃত দেশ-সকলে একাধিপত্য চাহে। আরও, চীন এ প্রস্তাবে সম্মত না হইলে, তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইতে প্রস্তুত নহে, এবং পরে অধিক পাইবার প্রত্যাশা করিবে—এমন কি, ক্রমে তাহারা চীনরাজধানী পিকিন ও তদুপ অন্যান্য স্থানও দখল করিবার ভরসা রাখে। ইহার পরের সংবাদ, জাপানীরা 'পিচিলি' উপকূল আক্রমণের জন্য বিপুল উদ্যোগ করিতেছে।

কল্যকার সংবাদ।—রাজকীয় কাগজপত্রে প্রকাশ—মাঞ্চুরিয়ার জলপথ করিতে যাইলে, রুষসাধ্যক্ষ চীন-সেনার সহিত জাপানীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী যুদ্ধ হইয়াছিল। জাপানীরা অবশেষে আণ্ডতে প্রত্যাগত হইয়া, তথায় জালুসেনের প্রধান অবস্থিতি-স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে।

***

মাদাগাস্কারের যুদ্ধ।—ফরাসীদিগের 'গ্লোবস্' নামক একখানি যুদ্ধ-জাহাজ পোর্ট সৈয়দ হইতে মাদাগাস্কারে প্রেরিত হইয়াছে।

***

নাটোরের মকর্দ্দমা।—যে মকর্দ্দমায় নাটোরের রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও তাঁহার পুত্র কুমার-বাহাদুর প্রভৃতি অভিযুক্ত হয়েন, এসেসরগণ তাহাতে তাঁহাদিগকে নির্দ্দোষী বলিয়া মত-প্রকাশ করিয়াছেন, হুজুরসাহেব বাহাদুর আগামী ১১ই ডিসেম্বর ঐ মকর্দ্দমার রায় দিবেন। এক্ষণে, রাজা ও রাজকুমার বিনা-জামিনে খালাস পাইয়াছেন; এবং মধুরানাথ পাল নামক অপর এক জন আসামী ২০০০৲ হাজার টাকার জামিনে খালাস আছে। সংবাদ এই যে কাহারও বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণ হয় নাই।

***

রাজকোষের অসচ্ছলতা।—উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যর অকলাণ্ড কল্‌ভিন্ বাহাদুর 'নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রে এই সম্বন্ধে একটী যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে যুদ্ধবিভাগের ব্যয়-বৃদ্ধিতেই এই অসচ্ছলতার প্রসার এতটা বাড়িয়াছে। সে ব্যয় কমাইবার তিনি নানারূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাব উত্তম; কিন্তু কার্য্যে ইহার কি হইবে, বলা যায় না।

***

রাজার নিকট দেশের আশা।—শিক্ষাবিভাগের সদস্য-নির্ব্বাচনের ক্ষমতা এক্ষণে কেবল 'বি-এ' উপাধিধারীদেরই আছে; কিন্তু যাহাতে 'বি-এ' উপাধি-প্রাপ্ত ব্যক্তিরাও সে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, এজন্য বড়লাট এল্‌গিন্ বাহাদুরের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণই সে আবেদন পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই সামান্য প্রার্থনায়ও বড়লাট বাহাদুর উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজার অনুগ্রহে আশা কি পর্য্যন্ত, ইহাই তাহার দৃষ্টান্ত!

***

পুলিশ-বিভাগের সংস্কার।—এই সম্বন্ধে বেশ সুন্দর কয়েকটী প্রস্তাব করিয়া, সংপ্রতি 'ইণ্ডিয়া'-পত্রে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। পুলিস বিভাগের নিম্নস্তরের সম্পূর্ণ সংস্কার ও তৎস্থলে কিছু অধিক বেতন দিয়া বিজ্ঞ-বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা—এই প্রবন্ধের অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে ব্যয়সঙ্কুলানের উপায়ও প্রবন্ধে এইরূপে স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, উচ্চতন কর্ম্মচারীদিগের বেতন কতক কমাইয়া এবং সেরূপ কোন কোন পদ একেবারে উঠাইয়া দিয়া, সেই উদ্বৃত্ত টাকায় নিম্ন-স্তরের উন্নতি সাধিত হইতে পারে। প্রবন্ধের যুক্তি বড়ই সমীচিন। পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টদিগের বেতন—১০০০৲ টাকার ৫ জন, ৯০০৲ টাকার ২ জন, ৮০০৲ টাকার ৭ জন, ৭০০৲ টাকার ১২জন, ৬০০৲ টাকার ১২জন, ৫০০৲ টাকার টাকার ১৩ জন—এখন এইরূপ আছে। ইহাতে মাসে ৩৫, ৫০০৲ টাকা ব্যয় হয়। প্রবন্ধ-লেখক বলেন, ইহার বদলে ৮৫০৲ টাকার ৫ জন, ৭০০৲ টাকার ৬ জন, ৬০০৲ টাকার ১০ জন, ৫০০৲

টাকার২৫জন এবং ৪০০৲ টাকার ১৫জন রাখিলে, মাসিক ২৭৪০০৲ টাকার চলিতে পারে। অর্থাৎ মাসিক ৬৮০০৲ টাকা ও বৎসরে প্রায় ৮১,৬০০৲ টাকা বাঁচিতে পারে। এভিন্ন সহকারীসুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের পদটী একেবারে উঠাইয়া দিলে, তাহা হইতেও ১৬৯,৮০০৲ বাঁচিতে পারে। অর্থাৎ দুই পক্ষে মোট ২৪১,৪০০৲ টাকার সাশ্রয় হয়। আর, সেই টাকা যদি নিম্ন-শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া, সেই সকল পদে ভাল-লোক রাখা হয়, তবে অনেক কার্য্যের সুবিধা হইতে পারে। প্রধানতঃ পুলিসের সব্‌ইন্‌স্পেক্টার ও হেড কন্‌ষ্টেবোলদিগের কার্য্যের যেরূপ গুরুত্ব, সেই অনুসারে বেতন বৃদ্ধি করাই উচিত; তন্নিম্নে সামান্য বাড়াইলেও চলিতে পারে। প্রবন্ধের যুক্তি বিজ্ঞমাত্রেরই অনুমোদিত হইতে পারে; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কি সে বিবেচনা করিবেন ?

***

অনুসন্ধান-সমিতির সাহায্যকারিগণ।—এ বৎসর যাঁহারা অনুসন্ধান-সমিতির প্রতি সহানুভূতি, সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষণ করিয়াছেন, পরপর তাঁহাদের নাম; যথা,—

১। কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, এ্যাটর্ণী, সভাবাজার রাজবাটী।

২। রায় রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী, জমীদার, পরিশাল।

৩। রাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর, তাজহাটরাজবাটী।

৪। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মিত্র, বি-এল, উকীল, হাইকোর্ট।

৫। শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ বসু, জমীদার, বাগবাজার।

৬। শ্রীযুক্ত রায় বিপিনবিহারী মিত্র, জমীদার, শ্যামবাজার।

৭। মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর সভাবাজার-রাজবাটী।

৮। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৯। শ্রীযুক্ত গোপাললাল মিত্র, ভাইস্ চেয়ারম্যান, কলিকাতা মিউনিঃ।

১০। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

১২। মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩। রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী, কাকিনা-রাজবাটী।

১৪। রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর, জমীদার, সেরপুর।

১৫। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরার' সম্পাদক।

১৬। পণ্ডিত কৈলাশচন্দ্র বিদ্যা ভূষণ, এম-এ

১৭। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

এই সকল মুহূনুভব এবৎসর নানারূপে অমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন ও আমাদিগের কার্য্যসম্পাদন-সম্বন্ধে বহু উপদেশ-পরামর্শ দিয়াছেন। এজন্য আমরা সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ আছি।

শীঘ্রই সমিতির একটী অধিবেশন হইবে। ইহাঁদের সকলকে এবং সমিতির অন্যান্য সহৃদয় বন্ধুবান্ধবদিগকে তাহাতে আহ্বান করিয়া, কার্য্যপ্রণালীর প্রসার ও পরিচালনার আরও সুবন্দোবস্তের উপায় অবধারিত হইবে।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান।

ষষ্ঠম বর্ষ। ২৯এ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। একত্রিংশ সংখ্যা

শিক্ষাষ্টক।

ধীবন যৌবন ধন, দারাসুত পরিজন,
সুখের সামগ্রী যত আর।
নিশির স্বপন-যথা, দেখিতে দেখিতে তথা,
কালানলে হয় ছারখার ॥১।

অহরহ কত জন, যাইছে যম-সদন,
দেখিছ শুনিছ নিরন্তর।
তথাপি চৈতন্য নাই, এ বড় আশ্চর্য্য ভাই,
মোহ-নিদ্রা ত্যজরে সত্বর ॥২।

ঘোরতর দুরাচার, ভয়ানক এ সংসার,
ইথে না পাইবে কোন সুখ।
দেখি সংসারের গতি, বিবেক বৈরাগ্যমতি,
সাধুগণ সংসার-বিমুখ ॥৩।

হোলে করি পান, অমৃতের অনুমান,
করিছ অভাগ্য মন্দমতি।
গরল-অভিমান, সদা মনে মুর্ত্তিমান,
মানুষের হায় কি দুর্গতি ॥৪।

চৈতন্য-চরণ-পদ্ম, সকল সুখের সদ্ম
ভবার্ণব তরণে তরণী।
কায়মনোবাক্যে ভজ, বিষয়-বাসনা ত্যজ,
বৃথা যায় বিষম-রজনী ॥৫।

ত্যজ মন বৃথা মায়া; নামে রুচি জীবে দয়া,
শিক্ষা কর পবিত্র সাধন।
পরনিন্দা পরপীড়া, বৃথামোহ বৃথা ক্রীড়া,
ত্যজ ভজ চৈতন্য-চরণ ॥৬।

চৈতন্য-চরণ-ভক্ত, সাধুগণে অনুরক্ত,
হও, কর সাধুসঙ্গে বাস।
হরিকথা আলাপন, হরিনাম সংকীর্ত্তন,
করিলে পুরিবে সর্ব্ব-আশ ॥৭।

শ্রবণ কীর্ত্তন আর, স্মরণ সাধন সার,
সকল সাধন-শিরোমণি।
এ তিনে ফুরিলে যত্ন, মিলিবে অমূল্য রত্ন
হরিপদ-অমৃতের খনি ॥৮।

শ্রীগোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ-বারিধি

অনুষ্ঠান।

সে এক কাল ছিল—সে এক যুগ গিয়াছে—যখন সেই আর্য্যমহর্ষিগণের সুগম্ভীর ব্রহ্ম-নির্ঘোষে জগৎ মাতোয়ারা হইয়াছিল—যখন সেই জলদগম্ভীর "ওম্"-শব্দে দিগ দিগন্ত স্তম্ভিত ও প্রকম্পিত হইত! সে এখন স্বপ্নের কথা—সে এখন প্রহেলিকা—যখন বশিষ্ঠ, শুকদেব, গর্গ—যখন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর—যখন হারীত, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য—এই ভারত-আকাশের শুকতারা-রূপে উদীয়মান হইয়াছিলেন; যখন সেই সর্ব্বহিতকাম মহানুভব মহর্ষিগণের সামগান-শান্তিহিল্লোলে সু-উচ্চ হৈম-শৃঙ্গ হইতে সুদূর কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র শান্তিময় হইয়াছিল! তখন আর কেহ কাহাকেও বলিত না—তখন আর বলিবার আবশ্যকও হইত না—লোকে আপনা-আপনিই, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, সেই মহামহিমাময়ের চরণপ্রান্তে আত্মদানে আগুয়ান হইত—লোকে বুঝিত—প্রাণে আস্বাদ পাইয়াছিল, যে, সে চরণে কি অপরিমেয় শান্তিসুধা সঞ্চিত আছে!

কিন্তু 'তেহি ন দিবসাগতা!' সেদিন আর নাই! দূরে—অতি দূরে—স্মৃতির অন্তরালে—কি জানি কোথায়—সব লুকাইয়াছে! রত্ন হারাইয়াছি—জলনিধি সে নিধি যেন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে—সুগভীর সাগরের সলিল-পঙ্কে সব যেন ডুবাইয়া লইয়াছে! মণিহারা ফণী যেন—প্রভাহীন সূর্য্য যেন—মনুষ্যত্বহীন মনুষ্য আমরা—এ ধরাধামে বিচরণ করিতেছি। এতই অধম এখন আমরা—যে, ভ্রমেও একবার ভাবি না—"হায়! কি ছিলাম? কি হইলাম? কিরূপেই বা সেই পদ-সম্পদ আবার পাইতে পারি?"

যদি কখনও কোন মহাপুরুষের কৃপা হয়, যদি কখনও কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া দেন—"হিন্দু! তুমি এই কর—হিন্দু! তুমি ওরূপ ব্যভিচার করিও না!" কিন্তু কঠোর কাল-কূটে এতই আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন. যুগধর্ম্মে এতই আমরা বিপর্য্যস্ত, যে, সে কথায় কর্ণপাতও করি না—শুনিলেও হাসিয়া উড়াইয়া দিই; এমন কি, সময়ে সময়ে আবার, শিক্ষাভিমানের মদ-গর্ব্বে উত্তর দিতেও সঙ্কুচিত হই না, যে,—"সেকেলে প্রথা এখন আর খাটিবে না। লৌকিক আচারের কাল আর এখন নাই। বাহ্য অনুষ্ঠান কেবল ভণ্ডামী মাত্র।"

কিন্তু এই কি উত্তর? সেই জ্ঞানগরীয়ান্ আর্য্যগণের বংশধরের মুখে কি এমন-সকল অসম্বদ্ধ প্রলাপ শোভা পায়? লৌকিক আচারের কি কোন ফলই নাই? বাহ্য অনুষ্ঠান প্রকৃতই কি ভণ্ডামী? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্থির-চিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে, বাস্তবিক কি দেখা যায়?

দেখা যায়—এ সংসার-মহারণ্যে থাকিয়া, সেই সুন্দর সুমহান্ পুরুষের চরণে আত্মলীন হইবার আশা করিলে, অনুষ্ঠান-মার্গ অবলম্বনই—অজ্ঞানান্ধ জীবের একমাত্র আশ্রয়। সাগর-সঙ্গমে সম্মিলন-আশা করিলে যেমন সুদুস্তর নদনদী-সকল অতিবাহন করিতে হয়, দুরবরোহ শৈলশৃঙ্গে অধিরোহণ করিতে হইলে যেমন অতিকষ্টে সেই সঙ্কীর্ণ-বন্ধুর পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে হয়, অনুষ্ঠান মনুষ্যের পক্ষে ঠিক তদ্রূপ। অমৃতের অনুসন্ধানে অমরগণকেও সমুদ্রমন্থন করিতে হইয়াছিল; অনন্তস্বরূপ লক্ষ্মণের

আবার অকাল-মৃত্যু কি?—কিন্তু সেই জগদাধার বিশ্বরূপ রামচন্দ্রও সেক্ষেত্রে বিশল্যকরণীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপ, সর্ব্বত্রই দেখা যায়, অবস্থা-বিশেষে, ঘটনা-বিপর্য্যয়ে, অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক।

ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম — পূজা-আহ্নিক-দেবসেবা—আমাদের নিকট এখন ভণ্ডামীর কার্য্য; পণ্ডিতের মস্তকের 'শিখা' দেখিলে, আমরা এখন নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসি; জ্ঞানাধার গুরুদেবের চরণপ্রান্তে মস্তক অবনমিত করিতে এখন আমরা লজ্জা পাই। কিন্তু, নিবিষ্টচিত্তে একবার চিন্তা করিয়া দেখি না,—এ অনুষ্ঠানের অন্তস্তলে কি অনন্তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে? কি উদ্দেশ্যে — জীবনের কি শুভসঙ্কল্প-সাধনে, এই সকল অনুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছে?

পাশবাচারে—পশুসংসর্গে আমাদের জীবন এখন পতনোন্মুখ; 'আরশুলার সহবাসে কাঁচপোকার ন্যায়', আমাদের জীবন এখন ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বের নিম্নস্তরে অবনমিত হইতেছে। সুতরাং এখন কি করা কর্ত্তব্য? কোন্ পথ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ?

এ অধঃপতনে—এ সময়, এখন যদি নীরব-নিস্পন্দে নীরয়-মুখে অগ্রসর হই, তবে তো আর উপায়ই নাই! না বুঝিয়া—কর্ম্মক্ষেত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি না করিয়া, যিনি অবহেলে সে গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিবেন, তিনি নরাধম—তিনি হিন্দুনামের অযোগ্য—তিনি নীরয়-নিকটে নীতপ্রায়। কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান, যিনি সুধীর, তিনি এখনও সাবধান হইবার চেষ্টা করিবেন; বুঝিবেন—অনুষ্ঠানে কি আনন্দে সদানন্দ-সম্মিলন ঘটে?

অভ্যাসে অভ্যস্থ হওয়া যায়; অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হওয়া চাই। অভ্যাসে মূর্খ পণ্ডিত হয়; অনুষ্ঠানে অসাধু সাধুত্ব পায়। পাণ্ডিত্য-লাভ করিবার অঙ্কুর যেমন অভ্যাস হইতে উৎপন্ন হয়; অনুষ্ঠান-বলে ভগবৎ-সন্নিকর্ষ-লাভের পথও তেমনি সরল হইয়া আসে।

এইখানে বড়-সুন্দর একটী গল্প মনে পড়িল।

এক চোর, কোন রাজ-অন্তঃপুরে চুরী করিতে গিয়াছে। কিন্তু রাজা ও রাজমহিষী তখনও জাগিয়া আছেন; তাঁহারা উভয়েই, আপনাদের বয়স্থা কন্যার বিবাহ-বিষয়ে চিন্তামগ্ন। রাজমহিষী বলিতেছেন,—"কন্যা আর রাখা যায় না; যেরূপে হউক, শীঘ্রই উহার বিবাহ দেন।" রাজা বিমর্ষে উত্তর দিতেছেন,—"পাত্র তো কোথাও দেখি না; সুপাত্র না পাইলে, অসাধু-অপাত্রে কন্যাদান করিয়া, শেষে কি পিতৃপুরুষগণকে পর্য্যন্ত নরকগামী করিব? আমি অর্দ্ধেক রাজত্ব দিতে প্রস্তুত—যদি সুপাত্র পাই।" কিন্তু মহিষী তাহাতেও নিরুদ্বেগ হইতে পারিলেন না; তিনি আবারও বলিলেন,—"তা' বটে! কিন্তু মেয়ে কি তবে 'আই-বুড়া' থাকিবে?" নৃপতি, অনেকক্ষণ সে কথার আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; বহুচিন্তার পর, ধীরভাবে বলিলেন,—"ভাল, আর কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিব না। শীঘ্রই আমি নৈমিষারণ্য-তীর্থে সাধুদিগের আশ্রমে গমন করিব; এবং সেখান হইতে কোন এক সাধুকে আনয়ন করিয়া, তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিব।"

চোর এই সময়, সেই গৃহের নিভৃত-কোণে বসিয়া, আপনার অভীষ্ট-সাধনের উপায় অন্বেষণ করিতেছিল। কিন্তু রাজা ও রাজমহিষীর কথোপকথন যখন সে শুনিতে পাইল, তখন তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। সে ভাবিল,—"চুরী ক'রে আমি আর কত টাকার সামগ্রীই নিতে পারব? বিশেষ, তাতে যদি ধরা পড়ি, তবে একবারে ধনে-প্রাণে মারা

যাব। কিন্তু, যদি কোনরকমে রাজার নজরে লেগে যাই, তবে আর কি ভাবনা আছে? যাই চুরীতে কাজ নাই,—আমি গিয়ে সাধুদের সঙ্গে সাধু সেজে বসে থাকিগে! সাধুরা কিছুতেই বিয়ে করতে স্বীকার হবেন না; কাজেই, আমারই বেশী প্রত্যাশা! অর্দ্ধেক রাজত্ব—বাপ!—চুরীতে আমার দরকার কি?" এইরূপ স্থির করিয়া, চোরের আর চুরী করা হইল না; পরক্ষণেই, সাধুবেশ পরিধান করিয়া, সে সেই সন্ন্যাসীর দলে গিয়া বসিয়া রহিল।

দিনের পর দিন যায়। চোর ক্রমে সন্ন্যাসীদের আচার-অনুষ্ঠানে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হইতে লাগিল; পাছে, রাজা তাহাকে চোর বলিয়া বুঝিতে পারেন—এই আশঙ্কায়, সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ন্যাসীর ক্রিয়াকাণ্ডে পারগতা লাভ করিল। ক্রমে, সাধু-সহবাসে, অভ্যাসের গুণে, অক্ষর-পরিচয়ের সহিত ভাষাবোধের ন্যায়, তাহার জ্ঞানস্ফুরণ হইয়া আসিল। এমন কি, অবশেষে—রাজা যখন পাত্র-অন্বেষণে উপস্থিত, তাহার তখন ভগবানের প্রতি তন্ময়ত্ব-ভাব! রাজা বহু অনুনয়-বিনয় করিলেন; বহু আরাধনা-আবাহন করিলেন; কিন্তু, সন্ন্যাসীদের ন্যায়, সেও তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইল।

গল্পটীর মধ্যে কি সরল-সুন্দর উপদেশ নিহিত রহিয়াছে! অনুষ্ঠানের উপযোগিতা কি প্রত্যক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে! অনুষ্ঠান; সত্যই এই অনুপম অমৃত। অমৃতপানে যেমন অমরত্ব লাভ হয়, অনুষ্ঠানে তেমনই অমরাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে। অনুষ্ঠান, আমাদিগকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া দেয়—আমাদিগকে স্বর্গের পথ-পানে টানিয়া লয়—অনুষ্ঠান এমনই অমৃতোপম জিনিস।

ইহার আরও একটী গুণ—এ জিনিষ আমরা আপনা-আপনিই লাভ করিয়া থাকি। বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, কাহাকেও শিখাইতে হয় না—কেহ শিখায়ও না—অনুষ্ঠান কেমন! আমাদের সুখ-সৌভাগ্যের বিবিধ বিধান ভগবান যেমন আপনা-আপনিই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এবং সামান্য একটু চেষ্টা করিলেই যেমন আমরা তাহা লাভ করিয়া থাকি, অনুষ্ঠান-সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ—উহা আমাদের প্রকৃতিগত। আমাদের শুভাশুভাধী-প্রকৃতিই,আমাদের জন্য, উপযোগিতা-অনুসারে, স্তরে স্তরে উহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বালিকা ধূলার ঘর বাঁধিয়া ধূলার অন্নব্যঞ্জন লইয়া ক্রীড়া করে; কিন্তু কে তাহাকে সংসার-সমাজের এই ভবিষ্য-অনুষ্ঠান শিখাইয়া দেয়? জন্মিয়াই, বৎস স্তন্যপানে আকৃষ্ট হয়; কিন্তু কে তাহাকে তাহা শিখাইয়া থাকে? এইরূপ, যেদিকে দেখিব, সেইদিকেই প্রকৃতির এই কার্য্যকারিতা দেখা যায়। সুতরাং অনুষ্ঠান যে আমাদের অস্থিমজ্জায় চির-সম্বদ্ধ—আমাদের আশৈশব প্রকৃতগত, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই।

শুধু তাহাই নহে—অনুষ্ঠান আমাদের স্বতঃশুভাশুধ্যায়ী। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের রাজ্যে সকলই যে মঙ্গলাস্পদ—অনুষ্ঠান তাহারই ভিত্তি; উহা সদাই আমাদের শুভসঙ্কল্প—হিত-কামনায় নিয়োজিত। দরিদ্রে দান করিতে আমার যে প্রবৃত্তি, পরের উপকার করিতে আমার যে লালসা, দুর্ব্বলের বল বা অসহায়ের সহায় হইতে আমার যে "আকাঙ্ক্ষা—এ সকলে কি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি, তাহা কে না অনুভব করিয়াছেন?—এতদর্থে যে অনুষ্ঠান, তাহা যে কি শান্তিপ্রদ, কি অনন্তভবনীয় চিত্তপ্রসাদকর, তাহাই বা কে না জানেন? আরও, অন্তর যে আপনা-আপনিই এতদাকর্ষণে আকর্ষিত হয়, তাহাও সহজেই অনুমেয়। সুতরাং দেখা যায়, যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু শুভসঙ্কল্পসাধক, চিত্ত সেই দিকেই আকর্ষিত—অনুষ্ঠান সেইদিকেই শুভ-স্ফূর্ত্ত। তদ্ভবিত বিকৃত-ব্যভিচারের দিকে, অনুষ্ঠান যেন আকৃষ্টিত—যেন প্রাণে-মরা—যেন মরিলে নয় তাই—যেন অনিচ্ছা-আগত—যেন প্রকৃতি-বিপর্য্যয়-ঘটিত। ফলতঃ তৃপ্তিপ্রদ যেখানে, অনুষ্ঠান সেখানেই যথাস্থানপ্রাপ্ত; এবং যথাস্থানপ্রাপ্ত বলিয়াই, আমাদের স্বতঃশুভানুধ্যায়ী।

অতএব, অনুষ্ঠান কোন ক্রমেই অনবধেয় নহে; অনুষ্ঠান সর্ব্বথা মঙ্গলবিধায়ক। ধ্যানস্তিমিত-নেত্র অনুষ্ঠানীর অনুষ্ঠান-ধারণায় সত্যই ভগবানকে পাওয়া যায়; চক্ষু মুদিয়া, হৃদয়ে হস্ত দিয়া, আরাধনা করিতে করিতেই, ক্রমে তন্ময়ত্ব-ভাব জন্মিয়া, হৃদয়ে নারায়ণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এইরূপে, অনুষ্ঠানীর চৈতন্য, সেই চৈতন্যময়ের সম্বন্ধে চৈতন্য প্রদান করে; অনুষ্ঠানীর তিলক-ভূষা বা ভস্মাধারের, হরি-হরের সাক্ষাৎকার সংঘটন করায়; অনুষ্ঠানীর "বোম্ বোম্ হরে হরে" শব্দ, সেই কৈলাসপতি অনাথনাথ ভূতনাথকে নিকটে আনিতে সক্ষম হয়; অনুষ্ঠানীর "জয় রাধাকৃষ্ণ", বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলী নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত করে। তাই বলি, হিন্দু! তুমি অনুষ্ঠান ত্যাগ করিও না—কায়মনঃ-প্রাণে অনুষ্ঠানী হও—অনুষ্ঠানই এ জীবনের একমাত্র সম্বল-সম্পত্তি।

শ্রীজ্ঞানানন্দ তত্ত্বনিধি।

প্রাণ-কথা।

জ্ঞান-স্ফুরণ।

একি! আমি উন্মত্তের ন্যায় বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া কি ভাবিতেছিলাম! আমি ব্রহ্মময়ীর পুত্র হইয়া এরূপ তত্ত্বজ্ঞানহারা কেন হইয়াছিলাম? এ মায়া কার? আমার মহামায়া মা ভিন্ন এরূপ মোহিনী শক্তি কার হইতে পারে? তিনিই ত, পুত্রকে সংসারে রাখিবার জন্য—সংসারের সুখ-ভোগ করাইবার জন্য, তাহার তত্ত্বজ্ঞান হরণ করিয়া,তাহাকে দান-বীর করিবার মানসে,তাহার নিকট হইতে এই বর-প্রার্থনা বাহির করিয়া লইয়াছেন? কিন্তু মা! তোমার পুত্রকে ভুলাইতে তোমার এত প্রয়াস কেন? তাহাকে ভুলাইয়া কাজ করান অপেক্ষা, তাহাকে বুঝাইয়া কাজ করান কি ভাল নহে? তাহার তত্ত্বজ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নির্লিপ্তভাবে তাহাকে কাজ করিতে শিখান কি তোমার কর্ত্তব্য নহে? দান করিবার দুর্নিবার পিপাসার অধীন করিয়া তাহাকে দানে প্রবৃত্ত না করিয়া, নির্লিপ্ত ও উদাসীনভাবে তাহাকে দান করিতে শিখাইলে,তোমার মাহাত্ম্য কি অধিকতর প্রচার হয় না? অয়পূর্ণে! তুমি কি স্বয়ং নিরন্তর জগতের আহার-যোজনা করিতেছ না? তোমার রাজ্যে অন্নাভাবে মৃত্যু কি ঘটিতে পারে? তোমার অনন্ত শক্তি ও অনন্ত দয়া থাকিতে, তুমি ইচ্ছা করিলে, কাহার অভাব দূর করিতে না পার? তবে তোমার পুত্রের মনে দান-পিপাসা উদ্দীপিত কর কেন? কেন তাহাকে তোমার নিকট দানের অনুকূল ধনের জন্য বর-প্রার্থনা করাও? তুমি কেন তাহাকে এ ভ্রমে পাতিত কর? তাহার নিকট অসংখ্য দীনহীন কাঙ্গাল-কাঙ্গালিনীকে পাঠাইয়া দিয়া, তাহার

অর্থগৃধ্নি ছিঁড়িতে কেন চেষ্টা কর? তাহাকে যাহা দিতেছ এবং যাহাকে যাহা দিতে বলিতেছ, এই দুইয়ের এত ন্যূনাধিক্য কেন? গাঁহারা দীনদুঃখী, তাঁহারা তো তোমার নিকটই অন্ন চাহিতেছে! তুমি তাহাদের সে অভাব ঘরেই পূরণ করিয়া দেওনা কেন? আবার পুত্রের নিকট তাহাদিগকে পাঠাও কেন? তোমার পুত্র তোমার ভাণ্ডারী হইতে অনিচ্ছুক নহে; তবে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে অন্ন না থাকিলে, তাহাতে কাহার দুনর্ম হইবে? অথবা, এও তোমার মায়া—ছলনা বা লীলা! তুমি চোরকে চুরি করিতে বলিয়া, গৃহস্থকে গিয়া সতর্ক কর। আবার গৃহস্থকে চোর ধরিতে বলিয়া, চোরকে বল—গৃহস্থকে চুরি মারিতে! আবার আহত গৃহস্থকে চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া, মৃত চোরকে হাজতে পাঠাও! আমি দেখি—সব মায়ের খেলা! কেহ বে পাপী—কেহ যে পুণ্যবান, সে কেবল মায়ের লীলা! পাপপুণ্য সকলই মায়ের লীলা—মহামায়ার মায়া! সেই বিশ্ববিমোহিনী মায়ার ছলনে, আমি ভাবি—আমি পুণ্যবান, তুমি পাপী! কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমিও পুণ্যবান নহি, তুমিও পাপী নহ; আমরা মায়ের শিশু-সন্তান।—পাপপুণ্যের অধিকারী নহি।

আমি যদি পাপপুণ্যের অধিকারী নহি, তবে দানের জন্য কেন ব্যাকুল হই? এ উন্মাদ বিজ্ঞজনা কেন? মা অনন্তভূজে! তোমার অনন্ত-ভূজ কি জগৎ-পালনে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—তাই তুমি তোমার শিশুসন্তানের সাহায্য লইতে উদ্যত হইয়াছ? তাও ত হইতে পারে না! কেন-না, তুমি অনন্ত-শক্তিশালিনী, তোমার দয়ার ন্যায় তোমার শক্তিরও সীমা নাই। তবে এ খেলা কেন? বুঝিয়াছি! লৌকিক মা-বাপে যেরূপ করেন, তোমরা দুজনে তাহাই করিতেছ। লৌকিক মা-বাপে, সন্তানের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট করিবার নিমিত্ত—দীন-দুঃখী দেখিলে সন্তানের দ্বারা দান করান; পীড়িত দেখিলে, সন্তানকে তাহার শুশ্রূষা করিতে শিখান; শোকার্ত্ত ব্যক্তি দেখিলে, সন্তানকে তাহার শোকাশ্রু মুছাইতে বলেন—এইরূপে বিবিধপ্রকারে তাহাকে দেবভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। তোমরা বিশ্বপিতা ও বিশ্বমাতা দু'জনেই তাহাই কর। তোমরা নিজে সকলই করিতে সমর্থ হইয়াও, স্বহস্তে কিছু না করিয়া, সন্তানগণ দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তোমাদের তিন পুত্র—তাই ব্রহ্মার উপর সৃষ্টির ভার, বিষ্ণুর উপর স্থিতি বা পালনের ভার ও শিবের উপর প্রলয়ের ভার দিয়া আনন্দে তাঁহাদের কার্য্য পরিদর্শন কর। তাঁহাদের বংশরক্ষার জন্য আবার, আপন ছাঁচে মা! তিন শ্রীমূর্ত্তি গড়াইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত করিয়া জগতে আনন্ত্য রক্ষা করিয়াছ। জগতে সমস্ত নরনারী দেব-দেবী—সংক্ষেপতঃ জগতের সমস্ত পিতৃপুরুষ—সেই তিন পুরুষ ও তিন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; সুতরাং তাঁহাদের গুণ ও কর্ম্মের অধিকারী। তাঁহাদের তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এবং তিন কার্য্য—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—মিশ্রিত বা অমিশ্রিত ভাবে সকল প্রকৃতি-পুরুষেই বিদ্যমান। সত্ত্বের কার্য্য স্থিতি, রজের কার্য্য সৃষ্টি এবং তমের কার্য্য প্রলয়। যাহাতে যে গুণ যে পরিমাণে বর্ত্তমান, তাহাতে সেই গুণের কার্য্য সেই পরিমাণে হইবে। এমনই তোমাদের সৃষ্টি-কৌশল যে, এই ত্রিগুণের তিন কার্য্যে এ ব্রহ্মাণ্ড আপনিই সৃষ্ট হইতেছে, আপনিই রক্ষিত হইতেছে, এবং আপনিই যথাসময়ে বিলীন হইতেছে। তোমরা দু'জনে—গুণাতীত ও ক্রিয়াতীত হইয়া, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-কার্য্য পর্য্যটন করিতেছ মাত্র। তোমাদের অনন্ত ইচ্ছাশক্তি উহাতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না—তোমরা যখন ইচ্ছা কর, তখন সাধারণ নিয়ম সকলই উল্টাইয়া যায়। ভয়ানক বৈজ্ঞানিক-বলেন, তোমরা নিয়মতন্ত্র; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী জানেন যে, তোমরা স্বতন্ত্র—অনন্ত শক্তিশালী ও অনন্ত ইচ্ছাময়। তোমরা—অনাদি প্রকৃতি-পুরুষ—কখন দ্বৈত, কখন অদ্বৈত, কখন স্ত্রীপুরুষ স্বতন্ত্র, কখন মিলিত। তোমাদের মহিমা বুঝে—সাধ্য কার মা!

তোমাদের মহিমা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না বলিয়াই, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় এত অভিভূত হই মা! বুঝিতে পারি না বলিয়াই, সংসারের তর্জ্জন-গর্জ্জনে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে! আপনাকে সতত অগ্নিপরীক্ষিতের ন্যায় বোধ হয়! ঠিক মা! এ তোমাদের মায়া, এ তোমাদের পরীক্ষা জানিয়াও, আমার প্রাণ কাঁপে কেন? আমার মনে তোমাদের করুণায় বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নাই—তথাপি আমার হৃদয়-প্রশান্ত-মহাসাগরে মধ্যে মধ্যে তরঙ্গ উঠে কেন মা! বুঝেছি! এ সকলই তোমাদের মায়া! আমার ভিত্তির দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য—এই নিরন্তর বিভীষিকা-প্রদর্শন! তোমাদের ভক্ত সন্তানগণের উপর তোমাদের এই অত্যাচার চিরপ্রসিদ্ধ। ধ্রুব প্রহ্লাদ তাহার পৌরাণিক নিদর্শন। যখন তাঁহাদিগকে কাঁদাইয়াছিলে, তখন আমাকেও কাঁদাইবে না—তাহার কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। অভয়ে! ভয় প্রদর্শন কর, তাহাতে ক্ষতি নাই—প্রাণে বধ কর, তাহাতেও আপত্তি নাই; কিন্তু সেই অন্তিমকালে যেন শরণাগত পুত্রকে তোমাদের চরণে স্থান দিতে কৃপণতা কর না। এই আমার শেষ ভিক্ষা মা! তোমরা দু'জনে আমার এই বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তোমাদের বাঞ্ছা-কল্পতরু নামের সার্থকতা করিও।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

বাঙ্গালা-ভাষা।

এক সম্প্রদায় অদূরদর্শী লোকে লিখিয়া স্বস্ব মতামত বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, কেহ কেহ বা মুখে আমাদিগকে কহিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন, আমরা যে ভ্রমপ্রদর্শন করিতেছি, তাহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক লইয়া করিলেই ঠিক নয়। তাঁহারা ভুল স্বীকার করিতেছেন, অথচ বলিতেছেন, সাময়িক পত্রে উহার আন্দোলন অপ্রয়োজনীয়। কি সূক্ষ্ম যুক্তি! কি নির্ভুল মত! বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া লোকে ভ্রমশূন্য হউক, অথচ তাঁহারাই শিক্ষিত হইয়া সাময়িক পত্রিকায় লিখিবার সময় ভুল লিখিবেন? আব্দার কম নয়! বড়ই মজার কথা! আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—বলি, সাময়িক পত্রই কি ভুল লিখিবার উপযুক্ত স্থান? যাঁহারা ভুল রক্ষার জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহাদের ওরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি? কেবল কি তাঁহাদের অজ্ঞতাই, তাহার একমাত্র কারণ হয়? ভ্রমরক্ষিণী আশা সর্ব্বকালেই নিন্দনীয়। সকল দেশে, সকল সমাজে, সকল ভাষাতেই এককালে কোন কোন লেখকদের ভ্রম

হয় সত্য; কিন্তু তাহার সংশুদ্ধিও যে যথাকালে ঘটে নাই, এমন দৃষ্টান্ত কেই দিতে পারিবেন কি?

আর এক দল বলেন, বঙ্গভাষার এখনও শিশু-কাল অনতিক্রান্ত। সুতরাং এখন তাহার ভ্রমের উপর খড়্গহস্ত হওয়া নিষ্ঠুরের কার্য্য। ভাষার শৈশবাবস্থা চিরকালই শোনা যাইতেছে। দশ বিশ বর্ষ পূর্ব্বেও ভাষার শৈশব কাল ছিল, এখনও আছে—আর ত্রিশ বৎসর পরেও তাহার শিশুত্ব ঘুচিবে না!

ইহার কারণ নিগূঢ়। এক শ্রেণীর লেখক অসতর্ক—অসাবধান। তাঁহারা ইচ্ছা করেন, ভুল চলুক; ভুল চলিলেই তাঁহাদের মঙ্গল। যে সকল লোক, ভ্রম-রক্ষায় বদ্ধকটী, তাঁহাদের সভ্রম বজায় করার যত উদ্যম, সত্য-রক্ষণে অসত্য-শোধনে তত প্রবৃত্তি কৈ?

১। পারবো, যাবো, হবো, পাঠাবো।—কোন কোন লেখক, এইপ্রকার লিখিয়া থাকেন। কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝিতে গেলেই, ঐ ধরণের ভ্রান্তি, সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। 'পারিব', 'যাইব', 'হইব', 'পাঠাইব'—এই সকলের চলিত ভাষায় অর্থাৎ কথা-বার্ত্তায় কেবল হ্রস্ব "ই" লুপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং হ্রস্ব-ইকারহীন ঐ শব্দগুলি ক্রমান্বয়ে 'পার্‌ব', 'যাব', 'হব', 'পাঠাব' এইরূপ হইয়া থাকে; বাস্তবিক এইপ্রকার হওয়াও আবশ্যক। কাহারও কাহারও অভিপ্রায় এই যে, উল্লিখিত স্থলে যে হ্রস্ব "ই" লুপ্ত হইয়াছে, উহ্যতি-চিহ্ন-বোধক ঊর্দ্ধগ প্রথম ছেদ (কমা—coma) দ্বারা ব্যক্ত করিলে ভাল হয়। অতএব, তাঁহাদের মতে যেরূপ করা কর্ত্তব্য, তাহা প্রদর্শন না করিয়া, যদি আমরা আপন মতে বলিয়া যাই, তাহাতে একদেশদর্শিতা প্রকাশ পাইবে। তাঁহাদের মতানুসারে লিখিতে গেলে—'পার্‌ব', 'যা'ব', 'হ'ব', 'পাঠা'ব' হইয়া থাকে। পাঠকেরা সামান্যরূপ মনোযোগ করিলেও লক্ষ্য করিবেন, হ্রস্ব "ই" কারের স্থানেই তাহার লোপসূচক চিহ্ন "কমার" ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কিছু নাই। তবে যাঁহারা শেষ বর্ণে 'ও'কার সংযুক্ত করিয়া 'পারবো' ইত্যাদি লিখিবার প্রয়াসী, তাঁহাদের সহিত একমত হওয়া আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক দিবেচনা করি না; এবং সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন যুক্তি আছে বলিয়াও বোধ করি না।

২। কোর্ব্বো, কোর্ব্ব, কর্ব্বো।—'করিব' শব্দকে কথোপকথনের ভাষায় প্রয়োগ করিতে গিয়া কতকগুলি লোক এতাদৃশ বিস্তৃত-কিমাকার করিয়া বসেন। ঐ রকম করিবারও কি যুক্তি, তাহা ব্যবহারকের কদাপি ভাবিয়া দেখেন না। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে ইহাই হৃদ্গম্য হইবে যে, "করিব" শব্দের চলিত আকারে হ্রস্ব "ই" বিলুপ্ত হইয়া 'কর্‌ব' হওয়া উচিত। তবে পূর্ব্বযুক্তি-অনুসারে "ক'র্‌ব" এইপ্রকার হইবারও বাধা নাই। "কোর্ব্বো", "কোর্ব্ব", "কর্ব্বো" উচ্চারণেও হয় না—কোন যুক্তিতেও হয় না। এই নিয়মেই "করিলাম" কথাবার্ত্তায় 'কর্‌লাম' বা 'ক'র্‌লাম' হইবে; কিন্তু "কল্লাম", "কোল্লাম" "কোর্‌লাম", "কোল্‌ম" ইত্যাদি অসঙ্গত বিকট আকার ধারণ করিবে না। এখানেও হ্রস্ব "ই"-কারের বিলোপ ঘটিবে। আমাদের সেই প্রথমকার নিয়ম সর্ব্বত্র একই প্রকারের। আর, আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের নিয়ম—একই স্থলে, দুই, তিন বা ততোধিক রকমের। সুতরাং বলিতে হয়—যথেচ্ছাচার বা ব্যভিচারই, তাঁহাদের নিয়ম। এক কথায় বলিতে হইলে, বলা যায়—অনিয়মই তাঁহাদের কার্য্যগুণে নিয়ম হইতেছে।

৩। করি, কচ্ছি, কর্ছি, কোর্‌ছি, কোর্‌চি, কোর্‌ছি, কোর্‌চি, বল্‌ছি, বোল্‌ছি, বোল্‌চি, যাচ্ছে, বোল্‌ছে, কর্ছে, কোর্ছে।—"করিতেছি" ধ্বনিত বাক্যে "কর্‌ছি" হইয়া থাকে। এই 'কর্‌ছি' পদের উচ্চারণে "ছ" স্বরূপে উচ্চারিত হওয়ায়, "কচ্চি" লেখায় কতিপয় লেখকের প্রবৃত্তি হয়। ফলতঃ, সবিশেষ অভিনিবেশ করিলে বোধগম্য হইবে—উহাতে না স্পষ্ট "ছ" বা না স্পষ্ট "চ" উচ্চারিত হয়। উচ্চারণ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী হইবেন্ধ মধ্যমাঝি; বরং বিশেষ লক্ষ্য করিলে 'ছ'-কারের উচ্চারণের একটু ভাল রকম আভাস আসে। সুতরাং এমন স্থলে "ছ" লেখার যুক্তি আছে। কেন না, 'করিতেছি' বাক্যের সংক্ষিপ্তাকার "কর্‌ছি"; কিন্তু "কর্‌চি" না।

আর "কচ্ছি" ও "কচ্ছি" লিখিতে 'র' কেন (/) রেফ্ হইল, তাহার নির্ণয় করা দুরূহ না হইতে পারে বটে, কিন্তু উহার মূলে আদৌ যুক্তি নাই, বিলক্ষণ বলিতে পারি। "কচ্ছি" লেখা "কর্‌ছি" হইতে প্রথমে "কচ্ছি" করিয়া পরে 'ছ'-কারের দ্বিত্ব "চ্ছ" করিয়াছেন। তাঁহাদের শেষ-যুক্তিটী সাধু প্রত্যুত্ত "র" এবং রকারের 'রেফ' করা যে অসমঞ্জস, তাহার প্রমাণ উপরেই দিয়াছি।

কোর্‌ছি, কোর্‌চি, কোচ্ছি, কোচ্ছি—এই সকলের বর্ণ-যোজনার প্রকৃতি, কি নিয়মে ঐ আকৃতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা আমাদের বিচার-মার্গ-গতি বিরূপণের অভিলাষী, তাঁহারা এই সম্বন্ধের প্রথমাংশ, উত্তম রূপ অনুশীলন করুন।

বল্‌চি, বোল্‌ছি, বোল্‌চি—ইহাদের সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র আমাদের বক্তব্য যে, যখন "বলিতেছি" হইতে উহাদের উৎপত্তি বীকার করা হয়, তাহাকে ভাঙিলে, "বল্‌ছি" ছাড়া আর কিছুই হইবে না—শুওয়া অনুচিতও নয়। এখানে ছ-কারের স্পষ্ট উচ্চারণ।

বল্লে, বোল্লে—এই দুয় শব্দের মূল "বলিলে"। উহার অন্তর্গত হ্রস্ব ই-কার বিনষ্ট হইয়া 'ব'ল্‌লে' হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

ঐ নিয়মেই "কর্ত্তে", "কোর্ত্তে" কোন মূল-শব্দের বিনিময়, বুঝিতে আর বাকী থাকে না। বলা বাহুল্য, "করিতে" হইতেই উহাদের ঈদৃশ রূপ পরিকল্পিত। "করিতে"র সংক্ষেপে 'কর্‌তে' লেখাই যে কেবল স্বাভাবিক তাহা নয়; অধিকন্তু বিশুদ্ধও বটে। বাস্তবিক "কর্ত্তে", "কোর্ত্তে" দেখিতে বিশ্রী এবং লিখনটীও কুযুক্তিপূর্ণ। সুতরাং তাঁহাদের উক্তরূপ আকার কোন প্রকারেই গ্রহণীয় হওয়া কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

৪। ইয়া, আয়ত্ত।—কৃতিত্ব, কবিত্ব, লঘুত্ব ইত্যাদি স্থলে যে নিয়মে "ত্ব" হয়, "ইয়তা", "আয়ত্ত" উদাহরণে সে নিয়মে কি কারণে "ত্ব" হইবে বল? কৃতিত্ব, কবিত্ব, লঘুত্ব এই দৃষ্টান্তত্রয়ে যে প্রণালী-অনুসারে ভিক্তি সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা এইপ্রকার,—

শব্দ।	প্রত্যয়।	পদ।
কৃতিন্	+ ত্ব	= কৃতিত্ব।
কবি	+ ত্ব	= কবিত্ব।
লঘ্	+ ত্ব	= লঘুত্ব।

কিন্তু "ইয়ত্তা" ও "আয়ত্ত" এই দুই স্থানে উক্তবিধ প্রণালীর সংযোগ বিহিত হয় নাই; কি নিমিত্ত, প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

ইয়ৎ + তা = ইয়ত্তা।
আ+ যৎ + ত = আয়ত্ত।

৫। বক্তৃগণ।—"বক্তা" একটী মূল শব্দ নয়। ইহার মূল "বক্তৃ"। "বক্তৃ" দাত-শব্দান্তর্গত 'দাতৃ'-শব্দ হইতে যেমন 'দাতা' হইয়া থাকে, 'বক্তৃ' হইতেও সেইরূপ 'বক্তা'

নিষ্পন্ন হয়। যাঁহাদের সংস্কার রহিয়াছে যে, "বক্তা" মূল শব্দ, তাঁহারাই "বক্তাগণ" লিখিতে থাকেন। তাঁহারা স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলেন,—"বালকগণ", "নরগণ", "পশুগণ", "নারীগণ" "সাধুগণ". "সুধীগণ" শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতেছে; সুতরাং "বক্তাগণ" কেনই বা না তদন্তর্গত বিবেচিত হইবে? "মনস্বীগণ", "গুণীগণ", "মানীগণ" না হইয়া, যেমন 'মনস্বিগণ' 'গুণিগণ', 'মানিগণ' হইয়া থকে; "বক্তাগণ" এই অশুদ্ধ পদের পরিবর্ত্তে সেইপ্রকার 'বক্তৃগণ' হইবে—হওয়া উচিত। "কর্ত্তাকারক" বলায় বা লেখায় যে ভুল. "বক্তাগণ" লিখিতে বা বলিতে গেলেও, সেই ভুলই হইতেছে। এমন স্থলে, কেবল "বক্তৃগণ" বিশুদ্ধ পদ। যাঁহাদের উহা লেখায় কষ্ট হইবার সম্ভাবনা. তাঁহারা "বক্তাগণ" এই ভুল অতিক্রম করিতে বরং "বক্তারা" প্রয়োগ করিতে পারেন। তাহাহইলে তাঁহারা ভ্রম-প্রমাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

৬। মনোকষ্ট, শ্রেয়োকল্প. শ্রেয়স্কল্প, মনোক্লেশ।—"মনোযোগ,", "মনোনিবেশ", "পয়োধর" অশুদ্ধ নয় বলিয়াই কি "মনোকষ্ট" ইত্যাদি চলিতে পারে? দৃষ্টান্ত দিয়া এই বিষয়টী ব্যাখ্যা করি। যথা,—

পয়ঃ + ধর = পয়োধর।
মনঃ + যোগ = মনোযোগ।
মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট।
মনঃ + ক্লেশ = মনঃক্লেশ।
শ্রেয়ঃ + কল্প = শ্রেয়ঃকল্প।
শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর।

দৃষ্টান্ত-কয়কটীর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টী ছাড়া, আর তিন স্থলে "ঃ" বিসর্গ স্থানে "ও"-কার হয় নাই; বিসর্গই (ঃ) যথাবৎ রহিয়াছে। ঐ প্রকার থাকাই নিয়ম। শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর হইতেছে; এই নজিরেই কি "শ্রেয়স্কল্প" হওয়া বৈধ বোধ হয়? ভ্রান্ত নিদর্শনের উপর নির্ভর করাতেই, ঐ শ্রেণীর ভ্রান্তি সজ্জটিত হইয়া থাকে। শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর কেন হয়, তাহার সূত্র এই,—

"কর, কার, কান্ত, কাম, কুম্ভ ও পাত্র শব্দ পরে থাকিলে, অকারের পরস্থিত বিসর্গস্থানে দন্ত্য স হয়।* যথা,—

শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর।
পুরঃ + কার = পুরস্কার।
অয়ঃ + কান্ত = অয়স্কান্ত।
মনঃ + কাম = মনস্কাম।
অয়ঃ + কুম্ভ = অয়স্কুম্ভ।

পাঁচটী বর্গের অর্থাৎ কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ ও পবর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ অর্থাৎ ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ—এই বর্ণগুলি পরপদে থাকিলে পূর্ব্বপদের বিসর্গ "ঃ" স্থানে "ও" হইবে না।

বিসর্গ-স্থানে ওকার হইবার নিয়ম এই,—

"যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ অথবা পঞ্চম বর্ণ কিংবা য, র, ল, ব, হ পরে থাকে, অকার ও পরস্থিত বিসর্গ উভয় স্থানে ও হয়। ওকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।† যথা—

শোভনঃ + গন্ধঃ = শোভনোগন্ধঃ।
নূতনঃ + ঘটঃ = নূতনোঘটঃ।
উন্নতঃ + নগঃ = উন্নতোনগঃ।
কৃতঃ + যত্ন = কৃতোযত্ন।
শান্তঃ + রোধঃ = শান্তোরোধঃ।
কৃতঃ + লোভঃ = কৃতোলোভঃ।

---

* ব্যাকরণ কৌমুদী, প্রথম ভাগ, ১১১ সূত্র।
† „ „ ১০১ „ ।

শীতঃ + বায়ুঃ = শীতোবায়ুঃ।
বামঃ + হস্তঃ = বামোহস্তঃ।

ফলতঃ মনোকষ্ট দেখিয়া, কার না মনঃকষ্ট হয়? যাঁহারা "মনোক্লেশ" চালাইতে মজবুত, তাঁহাদের অজ্ঞানতায় সমাজের প্রচুর ক্ষতি। তাঁহাদের মনোক্লেশে আমাদের যে মনঃক্লেশ অত্যন্ত হইতেছে, তাহার কি উপায়, বল?

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

নৈদাঘ নিশীথ-স্বপ্ন।*

অনঙ্গ।—পঞ্চু, করেছিস কি? তুই কার প্রকৃত প্রেমের মাথা খেয়ে এসেছিস্?

পঞ্চু।—মহারাজ! বিধাতার ভুল, আমার দোষ নহে। (স্বগতঃ) পঞ্চাননও নিজে প্রকৃত প্রেম কখনও জানেন নাই; তিনি বাড়ী বাড়ী ফলার খেয়ে কিম্বা এরূপ গালি খেয়ে বেড়ান। পরের প্রকৃত প্রেম কেমন করেই বা বুঝ্‌বেন?

অনঙ্গ।—বায়ু বেগে এই বনে ক'রে আগমন।
মানদা [illegible]। দেখ কে থায় এখন।
প্রণয়ে পীড়িত বামা, বিমলিন মুখ,
নিশ্বাস-অনলে তার শুকাইছে বুক।
পাতি মায়াজাল তারে আনগে এখন,
পুষ্পরসে রঞ্জি আমি ইহার নয়ন।

পঞ্চু।—এই তীরবেগে আমি চলিনু এখন।

(পঞ্চুর প্রস্থান।)

অনঙ্গ।—স্মর-শরাঘাতে, আরক্ত বরণ,
কুসুমাসব—
পশিয়া নয়নে, উথল ইহার
প্রণয়-স্রব।
মেলিয়া নয়ন, মানদার পানে
দেখিবে যবে;
ভাঙ্গিবে স্বপন, মানদা তখন
প্রেয়সী হবে।

(পঞ্চুর প্রবেশ।)

পঞ্চু।—পরীরাজ! দেখুন—মানদা আসছে। আর দেখুন—যে যুবার চোখে আমি ফুলের রস দিয়েছিলেম, সে কেমন সাধা-সাধি কর্‌ছে। ছোঁড়ার যেন মাতৃবিয়োগ হয়েছে! একবার মজাটা দেখুন। হরি হরি! মানুষজাত কি [illegible]!

অনঙ্গ।—সরে দাঁড়া। ওরা যে গোল কচ্ছে, তাতে আমার ভয় হচ্ছে—পাছে বিপিন জেগে উঠে।

পঞ্চু।—তাহলে হদ্দ মজাই হবে; একটী মেয়ে-মানুষ নিয়ে দুটীতেই ক্ষেপে উঠ্‌বে। দোহাই মহারাজ! এই ঝগড়াটা মাটী কর্‌বেন না; দেখা যাক, শ্রাদ্ধ কদ্দূর গড়ায়।

(বিনোদ এবং মানদার প্রবেশ।)

বিনোদ।—মানদে! তোমার কেন এ বিষম ভ্রম?
উপহাস করিতে কি ঝরে অশ্রুজল?
এই দেখ সিক্ত মম যুগল-নয়ন;
তবু কি আমার প্রেম রহস্য কেবল?

মানদা।—কেন এই বিড়ম্বনা? কেন প্রবঞ্চনা?
তব প্রেম প্রমদায়—আমায় ছলনা!

---

* সেক্ষপীয়ারের 'মিড্‌সমার নাইট ড্রিমের' (A Mid-summer Night's Dream.) অনুবাদ। তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের শেষাংশ—এই বর্ষের ১১শ সংখ্যক 'অনুসন্ধানে' প্রকাশিত অংশের পর।

ছাড়িয়াছ তুমি কিগো প্রমদার আশা ?
ভুলিলে কি ভুলা যায় প্রেম-ভালবাসা ?

বিনোদ।—ভালবাসিতাম তারে, ছিলাম অজ্ঞান !

মানদা।—আমায় বাসিছ ভাল কিসে হলো জ্ঞান ?

বিনোদ।—বিপিন তাহায়, ভালবাসেনা তোমারে !

বিপিন (জাগিয়া)।—

মানদে ! রূপসি ! তুমি মরমমোহিনী !
অতুল তোমার নেত্র, নীলমণি জিনি।
আরক্ত অধর তব—কি চারু দর্শন !
মধুপূর্ণ সুধাফল চুম্বনের ধন।
যবে কর-পদ্ম তুমি কর সঞ্চালন,
মানসে কনক-পদ্ম মলিন বরণ।
দেও প্রিয়তমে সেই কর সুকোমল !
বারেক চুম্বিয়া হই প্রেমেতে বিহ্বল।

মানদা।—হা বিধাতা ! হানবক ! তোমরা সকলে,
দহিবে আমাকে তীব্র রহস্য-অনলে ?
তোমাদের হৃদয় কি এতই পাষাণ ?
নাহি দয়া !—অবলায় এতই পীড়ন ?
করিয়াছ, কর ঘৃণা; তাহাতে কি হায় !—
পুরিল না সাধ ? ছি ছি বলনা আমায় !
মানুষ কি নহ ? ধর মানুষ-আকার ;
আমি কুলবালা—মোরে এই ব্যবহার ?
সমস্ত হৃদয় সহ ঘৃণা কর আরে,
কেন এ-প্রশংসা ?—কেন বিড়ম্বনা তারে ?
প্রতিযোগী দুইজন প্রেমে প্রমদার ;
এখন আমায় কি ছলনা আবার !
শুধু উপহাস তরে ? এ বীরত্ব-সার—
দুঃখিনী রমণী-নেত্রে অশ্রুর সঞ্চার !

বিপিন !—বিপিন ! নির্দ্দয় তুমি, ছাড়না ছলনা।
আমার হৃদয়েশ্বরী মানদা ললনা।
প্রমদা-প্রেমিক তুমি, ছাড়না তাহায়,
প্রমদার-প্রেম-রাজ্য দিলাম তোমায়।
মানদা আমার এই জীবন-জীবন,
বেসেছি বাসিব ভাল, যাবত মরণ।

মানদা।—আমি যে আর এই উপহাস
সহ্য করতে পারছি না।

বিপিন।—বিনোদ ! প্রমদা তব চাহিনা তাহায়।
ভুলিয়াছি তার প্রেম—স্বপনের প্রায়।
তার কাছে মম—আতিথ্য-গ্রহণ,
মানদা আমার চির-প্রেম নিকেতন।

বিনোদ।—মানদে ! জানিও তুমি, সব প্রবঞ্চনা।
বিপিন।—যদি তুচ্ছ কর প্রেম, নিজে যা জান না,
সমুচিত প্রতিফল পাইবে তাহার।
ওই আসিছেন দেখ, প্রেয়সী তোমার।

(প্রমদার প্রবেশ।)

প্রমদা।—তমসা রজনী করে নয়ন নিষ্ফল ;
কিন্তু করে সেই মত শ্রবণ প্রবল।
বিনোদ ! তোমারে নাহি দেখিল নয়ন ;
আনিল হেথায়, স্বর শুনিয়া শ্রবণ
নির্দ্দয় ! কেমনে এলে ছাড়িয়া আমায় ?

বিনোদ।—কেমনে থাকিব বল, প্রেমে লয়ে যায় !

প্রমদা।—আমারে ছাড়িয়া হায়, বিনোদে আমার
কার প্রেমে নিতে পারে ?

বিনোদ।—প্রেমে—মানদার !
নিশিথিনী শোভাময়ী শশি-তারাহারে ;
মানদার রূপে আরও উজলে তাহারে।
অকারণ কেন তুমি আইলে হেথায় ?
ঘৃণা করি ছেড়ে এহ, বুঝিলে না হায় !

প্রমদা।—একথা মনের নয়—মুখের কেবল।

মানদা।—মটে—বটে ! এ মায়া তোমার
কৌশল ?
তিন জনে এ মন্ত্রণা করিয়াছ হায় !
করিবে আমোদ ভাল লইয়ে আমায়।
রে প্রমদা কালামুখী ! কুতঘ্ন কামিনী !
যুগল প্রণয়ীসহ করেছ মন্ত্রণা,
জঘন্য রহস্য-জালে বঞ্চিতে আমারে ?
ভুলেছিস্ সব কথা—ভবিনীর প্রেমে
করেছি প্রতিজ্ঞা কত মিলিয়া দুজনে ?

কতদিন, কত সুখে, বসিয়া বিরলে,
চন্দ্রা-চরণ কালে কতই লাঞ্ছনা
দিয়েছি উভয়ে মিলি—বিচ্ছেদের ভয়ে ?
ভুলেছ কি—সাধের সে শৈশব-সখিত্ব—
ছিন্ন সহপাঠী যবে, সরল হৃদয়ে ?
দুই-শিশু-সুনিপুণা দেববালা মত,
রচিতাম এক ফুল—একই বসনে ;
কত সুখে একাসনে বসিয়া দুজনে,
গাইতাম গান কত, সম-সুরতানে !
আহা মরি !—যেন, এক কণ্ঠ, এক স্বর,
এক প্রাণ এক দেহ, একই মনক।
তেমতি আমরা দোঁহে বাড়িনু দুজনে,
যেন, যুগ্ম চারু রম্ভা—সরল, কোমল,
স্বতন্ত্র, অথচ সেই স্বাতন্ত্র্যে-মিলিত।
এক বৃন্তে যেন দুই বিনোদ কুসুম,
এক প্রাণ—সে দুই ছিল কালেতে।
সে প্রেম—সে ভালবাসা ছিঁড়িয়া এখন,
তুমিও মিলিলে সখি, পরজনের সনে—
উপহাসে ব্যথা দিতে দুঃখিনী জীবনে ?
রমণীর ধর্ম্ম একি ? ধর্ম্ম বন্ধুতার ?
করিবে রমণীজাতি তব তিরস্কার।

প্রমদা।—আমি ভাই তোমার রাগ দেখে
আশ্চর্য্য হচ্ছি। আমি তোমাকে ঠাট্টা করছি,
না তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ ?

প্রমদা।—বিনোদে কি বল নাই তুমি নির্লজ্জে
প্রশংসিতে মম নেত্রে, বদনমণ্ডলে,
দ্বিতীয় নায়ক তব কৃতকর্ম্মা বিপিনে—
এইমাত্র যে আমারে ঠেলিয়াছে পায়—
বলনি ডাকিতে মোরে—"মরম-মোহিনী
বিদিবসুন্দরী !" বলি ? অভাগিনী আমি,
অনাথা আমারে কেন হেন সম্ভাষণ ?
তব প্রেমে বিনোদের পুরিপূর্ণ প্রাণ,
সে কেন ছলনা করি, করে প্রেমদান ?
জানি আমি তব সম নহি রূপবতী,
না দোলে গলায় মম প্রণয়ী-স্রততী।
দুঃখিনী আমার মত নাহি এ সংসারে ;
যে না ভালবাসে, আমি ভালবাসি তারে !
তাই কি উচিত হেন ঘৃণিতে আমারে ?

প্রমদা।—তুমি কি বলছ বোন, আমি কিছুই
বুঝতে পারছি না।

মানদা।—ভণ্ড কপটতা ! এবে মলিন বদন ;
আমি ফিরাইনে মুখ, হাসি পরস্পরে
করিও নয়নভঙ্গি—মিলিয়াছ ভাল !
থাকিলে সে দয়াময়ী শীলতা তোমার,
করিতে না হেন ব্যঙ্গ আমায় কখন।
চলিলাম বোন ! দোষ আমারি সকল ;
মৃত্যুই ইহার এক প্রতি কার-স্থল !

শ্রীন বিচন্দ্র সেন।

মানব-কলঙ্ক।

বর্ত্তমান সভ্য-জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই অকাল-মৃত্যুর একটা স্রোত পড়িয়া গিয়াছে ; কেহ বা শৈশবের মুকুলিত অবস্থাতেই দলিত হইতেছে, কেহ বা যৌবনের উন্নাসময় সোপানে দণ্ডায়মান করিতে না করিতেই হঠাৎ পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণের সুকুমার অথচ কঠোর স্নেহ-বন্ধন হইতে বিচ্যুত হইতেছে, কেহ বা দাম্পত্য-পবিত্রচর্য্যার পরম পবিত্র ব্রতে

দীক্ষিত হইয়াই নবোঢ়া বনিতার ভবিষ্য-জীবন অন্ধকার করিয়া অকালে ইহলোক হইতে বিদায় লইতেছে। বলিতে পার—এই সর্ব্বনাশকর মহানর্থের কারণ কি? বলিতে পার—প্রেম, প্রীতি, উৎসাহ ও আনন্দের কল্পাদপসকল কেন অকালে ছিন্ন হইয়া অনন্ত কাল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না; একবার বর্ত্তমান সভ্যজগতের সমাজ-তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা তাহা ঠিক জানিতে পারিব।

স্ত্রীপুরুষ লইয়াই মানব-সমাজ; পুরুষ ও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য মিলন যেমন জগৎ-সৃষ্টির মূল কারণ, সেইরূপ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগই মানব-সমাজের সৃষ্টি, পুষ্টি ও উন্নতির নিদান বলিতে হইবে। সৃষ্টির এই দুইটী মূল উপাদান বিযুক্ত থাকিলে কিছুতেই সৃষ্টি হইতে পারে না। যে নিয়মে এই স্ত্রী-পুরুষ একত্র আবদ্ধ হয়, তাহা অতীব পবিত্র; তাহাই বিবাহ নামে অভিহিত। বিবাহ কতকগুলি পবিত্র ধর্ম্মনীতির সমষ্টি মাত্র;—সেই সমস্ত নীতির উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিলেই স্ত্রীপুরুষ সুখে জীবন-যাপন করিতে পারেন, এবং সুস্থ, সবল, শ্রীমান ও বুদ্ধিমান সন্তান উৎপাদন করিয়া আপনাদের সুখসম্পদ ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধির উপায় বিধান করিতে সক্ষম হয়েন। কিন্তু এই বিবাহ কিরূপে সম্পাদন করিতে হইবে, কি উপায়ে ইহা সম্পাদিত হইলে দম্পতি চিরজীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারেন, সেই সমস্ত উপায় আবার কি কি প্রক্রিয়া দ্বারা সাধিত হইতে পারে, তাহা সমাজতত্ত্বের একটী অতি প্রয়োজনীয় গুরুতর বিষয়।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ডপ্রয়োজনম্"—এই মহামূল্য মুনিবচনে মানব-সমাজে একটি প্রকাণ্ড তত্ত্ব বীজভাবে নিহিত রহিয়াছে। পুত্রের নিমিত্তই ভার্য্যা স্বীকার করিতে হয়; সেই পুত্র আবার কি নিমিত্ত? পিণ্ড-স্থাপনের নিমিত্ত; অর্থাৎ মানবগণ যে সকল সদ্বৃত্তি লইয়া পৃথিবীতে আগমন করেন, তৎসমুদয় যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, যাহাতে সেই সমুদয় সদ্বৃত্তি জগতে চিরস্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে, সেইজন্যই পুত্র আবশ্যক। ভার্য্যা হইতে মনোমত সন্তান লাভ করিতে পারা যায়, এই-জন্য আর্য্য সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, "ভার্য্যাই গার্হস্থ্য আশ্রমের মূল, ভার্য্যাই সন্তানোৎপত্তির প্রধান কারণ, ভার্য্যাই ঐহিক ও পারত্রিক সুখের নিদান।" অশেষ কল্যাণের আদি-কারণ সেই ভার্য্যা আবার কিরূপ হওয়া আবশ্যক, সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। শাস্ত্রকারগণ বলেন, আপনার অনুরূপ ভার্য্যা গ্রহণ করা আবশ্যক। অনুরূপ ভার্য্যা কাহাকে বলা যাইতে পারে, এবং তাহার আভাস দেওয়া উচিত। স্ত্রীপুরুষের সংযোগে সন্তান উৎপন্ন হয়; অতএব, পিতা-মাতা উভয়েরই স্বভাব-চরিত্র সন্তানে অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। পিতামাতার ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তিসমূহের যোগ ও বৈষম্য-ফল সন্তানে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। সুপুত্র উৎপাদন করাই মানবের প্রধান মঙ্গলসাধক; পিতামাতা সাধু ও সচরিত্র না হইলে, সুপুত্র কিরূপে উদ্ভূত হইতে পারে? অতএব, পুরুষ নিজে সচ্চরিত্র হইবে এবং সচ্চরিত্রা স্ত্রী লাভ করিতে যত্ন করিবে। এরূপ না করিলে, সংসার ভ্রমময় হইবে এবং মানবসমাজ ক্রমে ক্রমে হীন ও দূষিত হইয়া

কালে হয় ত পশুর সমতুল্য হইয়া পড়িবে। অতএব, নিজের ও বনিতার সচ্চরিত্র্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সুপুত্র উৎপাদনের চেষ্টা করা দম্পতীর প্রধান কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সভ্যসমাজে এই কর্ত্তব্যের প্রতি অল্প লোকেরই দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়; সেইজন্য হায় এত অধঃপতিত হইয়াছে। কালাকাল এবং শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি অণুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া নিকৃষ্ট পশুবৎ প্রবৃত্তির চরিতার্থসাধন করিবার নিমিত্ত পুরুষ ও স্ত্রীগণ যখন তখন রত হয়; নিজের সুখদুঃখ বা সৌখ্য-দুর্ভাগ্যের দিকে দৃষ্টি নাই, সমাজের প্রতি লক্ষ্য নাই, ভবিষ্য সন্তানের বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা নাই;—নিজে কি জন্য জগতে আসিয়াছে, কি উদ্দেশ্যে মানবরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া, পুরুষের গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্য করিয়া, বিবেকবিহীন বিমূঢ় পশুর ন্যায় কেবল মৈথুনধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কি হইবে? অতএব, এসম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাস্ত্রকারগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সেই সকল সারকথার পালন করা সংসারী মানবের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।

ভারতীয় আর্য্যগণের প্রধান শাস্ত্রকর্ত্তা ভগবান মনু বিধান করিয়াছেন—"ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা", অর্থাৎ পুরুষ সর্ব্বদা স্বীয় স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকিবে এবং নির্দ্দিষ্ট ঋতুকালে সেই স্ত্রীতে অভিগমন করিবে। ঋতুমতী পত্নীতে সঙ্গত হওয়াই শাস্ত্রসিদ্ধ;—শুধু শাস্ত্রসিদ্ধ নহে—সজ্ঞ জ্ঞানের অনুমোদিত; দেশ, নিকৃষ্ট প্রাণীগণও ঋতুকাল ভিন্ন অন্যসময়ে স্ত্রীসহবাস করে না। তাহাদিগকে আমরা মূঢ় বিবেকবিহীন পশু বলিয়া ঘৃণা করিতে পারি; কিন্তু তাহারা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের এই পরম-মঙ্গলকর নিয়ম যেরূপ পবিত্রতার সহিত পালন করে, শ্রেষ্ঠবুদ্ধিমান্ পুরুষ বিবেকী মানব সে বিষয় ভাবিলে লজ্জিত না হইয়া থাকিতে পারে না; মানবের কালাকাল নাই; স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি নাই; কেবল নিজের নিকৃষ্ট বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই পুরুষ সর্ব্বদা ব্যস্ত! অনেকে মনে করেন যে, বিবাহিতা স্ত্রীতে ইচ্ছামত যথেচ্ছাচারে অভিগমনে বাধা বা পাপ নাই; বিবাহ হইলেই যেন তাহার শত অপরাধ মার্জ্জনীয়। কিন্তু এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা হইতে পরিণামে যে বিষময় ফল ফলে, তাহা কয়জন দর্শিতা হয়? তৎকালে তাহার বিষয় একবার ভাবিয়াও দেখে না। কর্ম্মফল কতদিন না ফলিয়া থাকিতে পারে? অল্পদিনের মধ্যেই পুরুষ নানাপ্রকার দুরারোগ্য রোগে পীড়িত হয়;—অপরিমিত শুক্রক্ষয়ে সে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; তাহার মনের উৎসাহ ও উদ্যম নষ্ট হইয়া যায়; শিরঃপীড়া, ভ্রমি, পৃষ্ঠবেদনা, অজীর্ণ, পুরুষত্বহীনতা, এবং মৃগী প্রভৃতি নানাবিধ স্নায়ুরোগের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। শুক্র স্বামী কেন?—স্ত্রীও আচরে পীড়িতা হইয়া পড়ে, তাহার পীড়ায় তাহার গর্ভ দূষিত হয়। সেই দূষিত গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মে, তাহারাও অশেষ রোগের আকর হইয়া পড়ে এবং সেই সকল চিররোগী সন্তান আবার যে সকল পুত্রোৎপাদন করে, তাহারা নিরন্তর নানা রোগ ভোগ করিয়া অকালে কালকবলে পতিত হয়। এইরূপে এক ব্যক্তির অথবা একটীমাত্র দম্পতীর দোষে একটি বিশাল বংশ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং তাহাতে সমাজ ক্রমে ক্রমে হীন ও দূষিত হইয়া জাতীয় অধঃপতনের সূচনা করিয়া দেয়।

এরূপ এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, যে কি নিয়মে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ হওয়া উচিত, এই প্রশ্ন অতীব গুরুতর; কারণ, ইহাতে একটী অভিপ্রায়জনীয় গুরুতর সামাজিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। প্রথমে আমাদিগকে স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ কি, তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"। এই নিয়ম—শুদ্ধ ভারতবর্ষে নহে—সকল সভ্য দেশেই—সকল সভ্যসমাজেই প্রচলিত আছে। এই নিয়ম পবিত্র; একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত। বংশবৃদ্ধি করিবার নিমিত্তই স্ত্রীপুরুষ সৃষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষ না থাকিলে, পৃথিবীর এতদিন কবে অনন্ত ধ্বংস হইত, হয় ত ইহার কোন নিদর্শনই আমরা দেখিতে পাইতাম না। যাহাকে আমরা জগৎসংসার বলি, তাহা নিত্য নূতন মূর্ত্তির অবস্থান্তর ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং পুত্রোৎপাদন দ্বারা সমাজের অসম্পরিপুষ্ট ও উন্নতিসাধন করাই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য;—নতুবা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুবিধা বা সহায়তা নহে। অতএব যখন পুত্রোৎপাদনই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন কি হস্ত ও সুবুদ্ধি সন্তান উৎপাদন করা উচিত নহে? "উচিত নহে" এই কথা বলাতে, অনেকে মনে করিতে পারেন যে সেরূপ পুত্র-উৎপাদন যেন মানবের ইচ্ছাধীন। ইচ্ছাধীন ত বটেই!—দম্পতী ইচ্ছা করিয়াই সুপুত্র উৎপাদন করিতে পারে। প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণ কিরূপে সুপুত্র লাভ করিতেন? ঈশ্বর কি তাঁহাদের উপর সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ছিলেন যে, সেই জন্য তাঁহারা সেরূপ সৌভাগ্যশালী হইতেন? তাহা নহে; তাঁহারা স্ব স্ব সৎকর্ম্মের প্রভাবেই সেরূপ সুপুত্র লাভ করিতে পারিতেন। যে যে উপায়ে তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই সুপুত্র উৎপাদন করিতেন, তাহা প্রাচীন সংহিতা ও আয়ুর্বেদ-গ্রন্থনিচয়ে মুক্তা-মালারূপে গ্রথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা এতই অযোগ্য যে, তাঁহাদের সেই সকল পবিত্র উপদেশের প্রতি একবার লক্ষ্য করি না।

একটা বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত যে, সেকালে তাঁহারা যত সন্তান লাভ করিতেন, তাহাদিগের অধিকাংশ সুস্থ, সবল, সুবুদ্ধি ও শতায়ু হইত কেন? আর এখনকার অধিকাংশ সন্তান চিররোগী, হীনবুদ্ধি ও স্বল্পায়ু হইতেছে কেন? তুমি ইহার উত্তরে হয় ত যুগধর্ম্মের দোহাই দিয়া বলিবে যে, সত্যযুগে সকলেই সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেন, কলিতে তাহার বিপরীত হইতেছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, যুগধর্ম্ম মানুষের কর্ম্মফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কালের পরিবর্ত্তন মানুষের কার্য্যসাপেক্ষ; কিন্তু মানুষের কার্য্য কালসাপেক্ষ নহে। ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা আমাদের অন্ধকার আলোচ্য নহে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিরুপমা।

দশম অধ্যায়।

ইহার দুই বৎসর পরে আবার যখন আমরা ব্যোমকেশকে দেখিতে পাইলাম, তখন আর তাহার সে মূর্ত্তি নাই; শরীর শীর্ণ, রুগ্ন, দুইটী চক্ষুরই দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট। মদনমঞ্জরীর যে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া একদিন প্রেমালাপে মত্ত ছিল, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী একটী অপরিষ্কৃত গৃহে একখানি ভগ্নপ্রায় খাটিয়ার উপর সামান্য একটী শয্যায় স্থানলাভ করিয়াছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে; সে এখন প্রতি মুহূর্ত্তে যেন নরকের ছায়া সম্মুখে দেখিতে পাইতেছে।

নিরুপমাকে বিদায় দিবার তিন মাস পরে তাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়। বহু চেষ্টা, বহু চিকিৎসা, বহু অর্থব্যয় হইয়াছে; কিন্তু ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে; কলিকাতা গিয়া চারি মাস কাল থাকিয়া চিকিৎসা করাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হয় নাই, তাহার সকল আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। এখন হতাশ হইয়া, সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, মদনমঞ্জরীর নরক-সদৃশ গৃহের পার্শ্বে স্থানলাভ করিয়া, অতীত-সুখ-স্মৃতিতে অবিরাম দগ্ধ হইতেছে; এখন লজ্জা, ঘৃণা তাহার সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করিয়াছে। সে পূর্ব্বের সকল কথা স্মরণ করিয়া, এ সংবাদ মালঞ্চা কি গোকুলনগরে দেয় নাই; সেখানকার সকলে জানিতেছে—ব্যোমকেশ মৃগেল আছে।

এ দুঃখের সময় প্রণয়িনী মদনমঞ্জরীর সে অকপট অনুরাগ কোথায়? সেই যে লহরে লহরে প্রেমের কথা, আত্মদানের কথা, তাহাই বা কোথায়? ত্রিভুবন খুঁজিয়া যে মদনমঞ্জরীর তুলনা মিলিত না, নিরুপমা যাহার দাসীর যোগ্যও ছিল না, সেই মদনমঞ্জরী এখন আর তেমন হাসিয়া হাসিয়া ব্যোমকেশের গায়ে ঢলিয়া পড়ে না কেন? যে ব্যোমকেশের একটু মাথা ধরিলে সে কাঁদিয়া আকুল হইত, সেই ব্যোমকেশ অন্ধ হইয়া তাহার গৃহপার্শ্বে রহিয়াছে; তবু একবার আসিয়া শিয়রে বসেনা কেন?' ব্যোমকেশের বাহিরের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে; কিন্তু তাহার অন্তরের চক্ষু ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতেছে।

যত দিন পর্য্যন্ত চক্ষুর চিকিৎসা হইতেছিল, অর্থাৎ প্রথম প্রথম যখন কেহই হতাশ হয় নাই, তখন পর্য্যন্ত মদনমঞ্জরী ব্যোমকেশের যত্ন করিয়াছিল; কিন্তু, তাহার পর, কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসার পর, আর মদনমঞ্জরী ফিরিয়াও দেখে না! ব্যোমকেশ এক বৎসরের ছুটী পাইয়াছিল; সে ছুটীর পরও তাহার চক্ষুরোগ ভাল না হওয়ায়, কুঠির সাহেব সে পদে নূতন লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। ব্যোমকেশ এখন অন্ধ, চাকরীহীন, অর্থশূন্য; সুতরাং এখন আর কেমন করিয়া মদনমঞ্জরী তাহাকে ভালবাসিতে পারে?

সেখানে ব্যোমকেশের বন্ধু-বান্ধবের অভাব নাই; সদ্গুণ বন্ধুগণ প্রথমাবধি বহু চেষ্টাও করিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বরের-যাহা ইচ্ছা,কে তাহা প্রতিরোধ করিতে পারে? তাঁহারাও এক প্রকার নিরাশ হইয়াছেন; বন্ধুত্ব বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, তবে মদনমঞ্জরীর বাটী বলিয়া সেখানে সকল সময়ে তাঁহারা বড়-একটা আসিতে পারেন না।

যদি সে বাড়ীটী মদনমুঞ্জরীর হইত, তাহা হইলে ব্যোমকেশ সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিত কি না, সন্দেহ। সে বাড়ীটী তাহারই উপার্জ্জিত অর্থে নির্ম্মিত; মদনমুঞ্জরী থাকিত বলিয়া,লোকে মদনমুঞ্জরীর বাড়ী বলে। ব্যোমকেশ জানে, সে বাটী তাহার; তাহাতেই, এ বিপদের সময় নিজের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছে। বিশেষ, হাতে এখন একটী পয়সা নাই; একে অন্ধ, তাহার উপর নিঃসম্বল হইয়া কেমন করিয়া মালঞ্চা বা গোকুলনগরে যাইবেঃসে এখন ইহাই ভাবে,—"পাপ করিয়াছি,তাহার প্রতিফল পাইতেছি; মরণ হয় ত, এই নরকেই হউক; আর কাহাকেও মুখ দেখাইব না।"

যে কুঠারীতে ব্যোমকেশের শয়ন-স্থান, তাহারই একপার্শ্বে রন্ধন করিবার স্থান। যথা-সময়ে মদনমুঞ্জরী আপন মনে বকিতে বকিতে, কত ধিক্কার দিতে দিতে, রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া দেয়; অন্ধ ব্যোমকেশ, সেইখানে বসিয়া, অনুমানে অনুমানে গোটা-কতক ভাত রাঁধিয়া লয়। তাহার অন্ধ নয়ন দিয়া জলধারা বহিতে থাকে; মদনমুঞ্জরী কি তাহা মুছাইয়া দেয়?

ব্যোমকেশ আপন প্রকোষ্ঠে আপন খাটিয়ার উপর উপবিষ্ট। আর, সেই সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে মদনমুঞ্জরী তেমনি প্রফুল্লভাবে শয্যার উপর বসিয়া; তার পার্শ্বে নূতন একটা লোক; মৃদুস্বরে দুই জনের কথোপকথন হইতেছে।

পুরুষটা বলিল,—"তুমি ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেও না কেন?"

মদনমুঞ্জরী।—তা কেমন ক'রে দিব? এ বাড়ী যে ওর!

পুরুষ।—তা হ'ল ত, ব'য়ে গেল; ওকি আর তোমার সঙ্গে মকর্দ্দমা লড়্‌তে পারবে তবে আমরা ব'য়েছি কি করতে?

মদনমুঞ্জরী।—তা বটে; তবে কিনা, লোকে বড়ই নিন্দা করবে।

পুরুষ।—আ! লোকে আবার নিন্দা করবে! আর কর্‌লেই বা! তুমি এখানে থাক্‌লে তো লোকে নিন্দা ক'র্‌বে!

মদনমুঞ্জরী।—থাকব না তো কোথায় যাব? তুমি কোথাও যেতে বল নাকি?

পুরুষ।—বলি বৈ কি! ওকে তাড়িয়ে দাও, এখানকার এ ঘর-বাড়ী বিক্রী ক'রে ফেল, নগদ 'ক্যাস' কিছু হাতে করে নাও; তারপর, চল, দু'জনে কল্‌কাতায় চলে যাই, এখনই ভর-পুর আমোদ হবে।

মদনমুঞ্জরী।—তা বড় মিথ্যা নয়। তবে কিনা, এদেশে আর কখন মুখ দেখাতে পারব না।

পুরুষ।—তবে ও আপদটাকে কোনরকমে বিদায় কর।

মদনমুঞ্জরী।—বিদায় নাই বা ক'র্‌লাম! বাড়ীর একপাশে প'ড়ে র'য়েছে; আমাদের ত আর কোন ক্ষতি ক'র্‌ছেনা?

পুরুষ।—ক্ষতি আবার ক'র্‌ছেনা? দেখ দেখি—একটু চেঁচিয়ে কথা ক'বার যো নাই।

মদনমুঞ্জরী।—চেঁচিয়ে কথা কওনা; মানা ক'র্‌ছে কে?

পুরুষ।—ও না হয় কানাই হ'য়েছে। কান দু আছে—শুনতে পাবে যে!

মদনমুঞ্জরী।—পেলেই বা! তাতে আর ভয় কি?

পুরুষ।—না, মনে ক'র্‌বে কি? একদিন ওর অধীনে চাকরী ক'রেছি; চিন্‌তে পারলে, মনে মনে কত দুঃখ ক'র্‌বে।

মদনমুঞ্জরী।—মনে মনে দুঃখ ক'র্‌লে, আর না ক'র্‌লে? মুখে যদি কিছু বলে, তখন তার ওষুধ আমার কাছে আছে।

এই কথোপকথনের সময় একটী সন্ন্যাসী মদনমুঞ্জরীর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যেন সময় সন্ন্যাসীকে একেবারে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, মদনমুঞ্জরী যেন চমকিয়া উঠিল; বাহির হইয়া কর্কশ-স্বরে বলিল, "কেহে বাপু! দুপুরবেলায় একেবারে জড়্‌িয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকছিস্? ভিক্ষেনিতে হয়, ঐ বাইরে দাঁড়িয়ে নে।"

মদনমুঞ্জরীর এই বাক্যে সন্ন্যাসীর নয়নদ্বয় ক্রোধ-প্রদীপ্ত হইল; ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "পাপীয়সি! তোর বাড়ীকে আমি নরকতুল্য জ্ঞান করি, তোর প্রদত্ত ভিক্ষাকে বিষ্ঠাতুল্য জ্ঞান করি, তোকে শূকরীর মত ঘৃণা করি। পাপাত্মা—এক ব্রাহ্মণকুমার তোর পাপ-সংসর্গে থেকে থেকে অন্ধ হ'য়েছে; তাই তাকে একবার দেখ্‌তে এসেছি। এখন দেখিয়ে দে, সে কোন্‌খানে আছে!"

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া, মদনমুঞ্জরী একেবারে যেন স্তব্ধ হইয়া গেল; বলিল,—"তা এত কে জানে; ঐ দেখ, ঐ ঘরে আছে।"

সন্ন্যাসী মদনমুঞ্জরীর অঙ্গুলি-সঙ্কেত-মত ব্যোমকেশের দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইলেন; এবং গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"ব্যোমকেশ! আর কত দূর?"

ব্যোমকেশ অপরিচিত-কণ্ঠে এই প্রশ্ন শুনিয়া কিছু যেন বিস্মিতভাবে বলিল,—"কি?"

সন্ন্যাসী।—পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

ব্যোমকেশ।—আপনি কে, আমি ত চিন্‌তে পারলাম না? চিন্‌তে পারলে, নিঃসঙ্কোচে এখনই সকল কথার উত্তর দিতে পারি।

সন্ন্যাসী।—আমাকে চিন্‌তে পারবে না, চিনেও কাজ নাই। আমি একজন সন্ন্যাসী, তোমার দুঃখ শুনে দেখ্‌তে এসেছি।

ব্যোমকেশ।—দয়া ক'রে যদি এসেছেন, তবে একটু বসুন। আমি ত অন্ধ; ব'স্‌তে যে আসন দিই, এমন সাধ্যও নাই।

সন্ন্যাসী।—কেন—তোমার মদনমুঞ্জরী আসন দেবে না?

ব্যোমকেশ।—আর কেন পাপীয়সীর নাম ক'রে স্বর্গণী দেন?

সন্ন্যাসী।—এখন কি ও নাম শুনলে, তোমার যন্ত্রণা হয়? তবে এখনও এ পাপ সংসর্গে র'য়েছ কেন?

ব্যোমকেশ।—আর কোথায় যাব? জগতে আর যে কোথাও স্থান নাই!

সন্ন্যাসী।—বটে, বটে! এখনও তোমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নাই?

ব্যোমকেশ।—কিসে জান্‌লেন?

সন্ন্যাসী।—তোমার এই কথাতেই জান্‌লাম। যে, সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর এক বিন্দু দুঃখের জন্য প্রাণ দিতে পারে, যার সন্নিকট স্বর্গের ছায়া অপেক্ষাও সুশীতল; সে থাকতে যখন ব'ল্‌ছো—'জগতে আমার আর স্থান নাই', তাতেই বোধ হচ্ছে— তোমার প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হয় নাই।

ব্যোমকেশ।—তবে আপনি কি আমাকে সেইখানে যেতে বলেন? এখন সেখানে গেলে কেউ কি আর চেয়ে দেখ্‌বে?

সন্ন্যাসী।—চেয়ে দেখ্‌বে না নয়—দেখ্‌তে পারবে না। তোমার এ অবস্থা দেখ্‌বামাত্র,সে শ্রদ্ধা-ভক্তি-পরিপূর্ণ হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হবে।

ব্যোমকেশ।—এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না, পৃথিবীর সমুদায় নারীজাতির উপর আমার ঘোর অবিশ্বাস জন্মেছে।

সন্ন্যাসী।—সাধ্বীর স্নেহ-ভালবাসা অনুভব কর্‌তে পার নাই ব'লেই, তোমার এদশা হ'য়েছে। যা'ক, সে কথায় আর কাজ নাই; আর একদিন সে সকল কথা হবে। এখন,

আমি একটা কথা বলতে চাই—আচ্ছা, আমি যদি তোমার চক্ষু-রোগ আরাম ক'রে দিই, তাহ'লে তুমি আমাকে কি পুরস্কার দেবে?

ব্যোমকেশ।—আমার তো আর কিছুই নাই? যা কিছু সম্বল, সমস্ত ঐ পাপীয়সীর হাতে। ও'ত কিছু দেবে না! যদি চক্ষু পাই, তবে চিরদিন ঐ চরণে দাস হয়ে থাকবো।

সন্ন্যাসী।—আচ্ছা, তুমি ইচ্ছা করলেই যা দিতে পার—এমন কোন সামগ্রী যদি চাই, তা তুমি দেবে?

ব্যোমকেশ।—তা আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন? শক্তিতে যা হবে, তাই ও পাদপদ্মে অর্পণ করব।

সন্ন্যাসী।—দেখ, তখন তো আবার বিস্মৃত হবে না?

ব্যোমকেশ।—তখন কেন, চির-জীবনেও বিস্মৃত হ'ব না।

সন্ন্যাসী।—নিশ্চয়?

ব্যোমকেশ।—নিশ্চয়।

এই উত্তর পাইবামাত্র, সন্ন্যাসী আপন ঝোলা হইতে কি একটী তরল ঔষধ বাহির করিলেন। পরে, ব্যোমকেশের চক্ষু দুটী অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশেষ মনোযোগ-সহকারে দেখিয়া, সেই ঔষধ লাগাইয়া দিলেন, এবং একখানি মোটা কাঁপড় তিন চারি পুরু করিয়া চক্ষুর আবরণ স্বরূপ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিলেন; বলিলেন, —"এই কাপড় সাত দিন পর্য্যন্ত খুলিতে পাইবে না। অষ্টম দিনের প্রাতঃকালে আমি আসিয়া খুলিয়া দিব।" ব্যোমকেশ স্বীকৃত হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। তিনি বিদায় হইলেন।

অষ্টম দিনের প্রভাত-সময়ে আবার সেই জটাচূড়ধারী সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। ব্যোমকেশ তখন অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে,

সন্ন্যাসী গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন,—"ব্যোমকেশ! জগদম্বা যদি কৃপা করে থাকেন, তা'হলে নিশ্চয় তোমার চক্ষু নীরোগ হ'য়েছে। কিন্তু বল দেখি, তোমার বাহিরের চক্ষু প্রস্ফুটিত হ'লে তোমার অন্তশ্চক্ষু তো আবার অন্ধ হবে না?

ব্যোমকেশ।—না প্রভো! আর কখন পাপের পথে অগ্রসর হব না। যত কাল বাঁচব, আপনার শিষ্য হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে বেড়াব।

সন্ন্যাসী।—সে বহু দূরের কথা। কেন গৃহস্থ ধর্ম্মে কি তোমার আর সাধ নাই?

ব্যোমকেশ।—না ঠাকুর! আর আমি নারী-জাতির ছায়াও স্পর্শ ক'রব না।

সন্ন্যাসী।—মদনমুঞ্জরীর ব্যবহার দেখে, তুমি সমস্ত নারীজাতিকেই অবিশ্বাসিনী মনে কর নাকি? তোমার মদনমুঞ্জরী শুকরী বটে; কিন্তু যে তোমার নিরুপমার মত, সে স্বর্গের দেবী!

ব্যোমকেশ।—কেমন ক'রে তা জান্‌ব?

সন্ন্যাসী।—তুমি যদি এই অন্ধ হ'য়ে, একবার মালঞ্চা যেতে পারতে, তাহ'লেই বুঝতে পারতে। যদি দৃষ্টিশক্তি পাও, তবে আর কোন দিকে লক্ষ্য না ক'রে সেই পতিব্রতার নিকট চ'লে যাও; দেখ্‌বে, তোমার একবিন্দু ভালবাসার অভাবে সেই হতভাগিনীর কি অবস্থা হ'য়েছে।

ব্যোমকেশ।—আপনি কি তাঁকে দেখেছেন?

সন্ন্যাসী।—দেখি নাই, অনুভবেই বুঝতে পারছি।

ব্যোমকেশ।—তারা কি আপনার পরিচিত?

সন্ন্যাসী।—আমার অপরিচিত কেহ নাই; বল, সেখানে যাবে?

ব্যোমকেশ।—যাব।

সন্ন্যাসী।—নিশ্চয়?

ব্যোমকেশ।—নিশ্চয়।

সন্ন্যাসী।—আবার বল—যাবে?

ব্যোমকেশ।—আপনার পা ছুঁয়ে শপথ ক'রছি, নিশ্চয় যাব।

সন্ন্যাসীর মুখখানি প্রীতিপ্রফুল্ল হইল; তাহে ব্যোমকেশের চক্ষু-আবরণ উন্মোচন করিলেন। প্রগাঢ় অন্ধকারের ভিতর দপ্ করিয়া যেমন একটা আলো জ্বলিয়া উঠে, এই বন্ধুদ্বয়ও তেমনিভাবে ব্যোমকেশের চক্ষুর নিকট জ্বলিয়া উঠিল; দুই বৎসর হইতে যে জগৎ ব্যোমকেশের সম্মুখে প্রগাঢ় অন্ধকারে ঢাকা ছিল, মেঘান্তরাল-নির্ম্মুক্ত চন্দ্রমামণ্ডলের ন্যায় অকস্মাৎ আজ তাহা প্রকাশিত হইল। ব্যোমকেশ সেই প্রশান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর চরণ-তলে লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীশশধর চট্টোপাধ্যায়।

বিবাহ-ব্যয়-সংস্কার।

বিবাহ-ব্যয়-সংক্ষেপ জন্য আমি কর্ত্তব্য-বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া যে আন্দোলন সম্প্রতি উপস্থিত করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ আমার সাহসের প্রশংসা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার দুঃখিত প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—এই আন্দোলনে আমি একটা 'বাহবা' লইবার চেষ্টায় আছি, এবং হিন্দুসমাজের বাস্তবিক অবস্থা রাজপুরুষদিগের গোচর করিয়া একটা বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, ইত্যাদি। কিন্তু তদ্বিষয়ে বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করিতে আমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হইলেও, বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমার বন্ধুগণকে দুই একটী কথা বলার আবশ্যক বোধ করি।

হিন্দুর বিবাহ-ব্যয়-ভার যেরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভারতবাসী প্রত্যেক হিন্দুনরনারীর হৃদয়ে প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় অঙ্কিত রহিয়াছে। এই বিষম দায়ে কেহ উদ্বাস্ত, কেহ চিরনির্জ্জন, কেহ কারারুদ্ধ, কেহ কন্যাবধ-পাতকে কলুষিত, কেহ বা অকালে কালকবলে গমন করিতেছেন। এই যে বিষম কাহিনী, ইহা কি রাজপুরুষগণের অগোচর আছে? কখনই না। তবে এই আন্দোলনে আমি যে একটা 'বাহবা' লইতে অগ্রসর হইতেছি, তাহা বন্ধুগণ কোন্ বুদ্ধিতে বুঝিলেন? বিবাহ-ব্যয়ের ভীষণ পাতক হিন্দুসমাজকে কলুষিত করিল, এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিবারণার্থ দুই একটা কথা উচ্চৈঃস্বরে সাধারণ-সমক্ষে প্রকাশ করিলাম; ইহাতেই যদি আমার 'বাহবা' লইবার চেষ্টা করা হইল, তাহা হইলে বোধ হয়, ভারতবর্ষে কেন, সমগ্র পৃথিবীস্থ লোক "বাহবা" বিলাসে বিলাসী। আরও এক কথা, রাজপুরুষগণ যে হিন্দু-সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা অবগত নহেন, ইহা কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিবেন? তুমি গৃহে প্রতিদিন কি খাও, তোমার সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিবিধি কি-ভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে চালিত হইতেছে, তাহার প্রত্যেক সংবাদ রাজপুরুষগণের করতল-ন্যস্ত। এ অবস্থায়, সত্যের অনুরোধে, হিন্দু-

* শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ মহাশয়ের লিখিত "অনুসন্ধানে" প্রকাশিত প্রবন্ধ তাহার অন্যতম।

সমাজের আভ্যন্তরিক সত্য অবস্থা রাজপুরুষগণের নিকট বলার যে আমার কি অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি বরাবরই কহিয়া আসিতেছি যে, হিন্দু-বিবাহ-ব্যয়ে আমি আইনের পক্ষপাতী নহি (I am anadvocate of reform *from within*)। তবে, রাজপুরুষগণ আমাদের নিকট সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ, আমাদের আভ্যন্তরিক বিবাদ যখন আমরা নিজে মিটাইতে পারি না, তখন সেই বিবাদ-ভঞ্জনার্থ রাজপুরুষগণের "সদুপদেশ প্রার্থনা" করাটা কি অন্যায় কার্য্য? নিজেও কিছু করিব না এবং অন্যকেও কিছু করিতে দিব না—এটি হিন্দুসমাজের এক বিষম ব্যাধি বা অসরল কৌশল। এই যে পনের-কুড়ি বৎসর হইতে বিবাহ-ব্যয় হ্রাস-জন্য আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, জানিতে চাহি—ইহার জন্য কি কোন হিন্দু বিরলে একবিন্দু অশ্রুজল ফেলিয়াছেন? "এ সকল কার্য্য সমাজ দ্বারা হইবে", "সমাজ-সংস্কার সমাজের নেতা দ্বারা হইবে"—ইত্যাদি ফাকা আওয়াজে কার্য্য হইবে না। সমাজের অস্তিত্ব কোথা, তাহা দেখাও; সমাজের নেতা কে, তাহা দেখাও। নতুবা, "আমরা হিন্দু-সন্তান", "হিন্দু-শোণিত আমাদের ধমনীতে এখনও প্রবাহিত হইতেছে"—কেবল এই সকল আড়ম্বরময় বাক্যে কার্য্য হইবে না। যদি আমার উপরে নিতান্তই কাহারও বিরক্তি-বোধ হইয়া থাকে, তবে তিনি স্বয়ং এই বিবাহ-ব্যয়ের একটা সুব্যবস্থা করিয়া সমাজকে ইহার অধঃপতন হইতে রক্ষা করুন; আমিও ক্ষুদ্র চেষ্টার প্রত্যাহার করিয়া নিশ্চিন্ত হই। কেহ রাজি আছেন কি? হা হিন্দুসমাজ! পরিণামে এমন শূন্যগর্ভ ও ফাকা কথার দায়ে তোমার অস্থি-চর্ম্ম সার হইল!

শ্রীরসিকলাল রায়।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

রাবণবধ কাব্য।—প্রথম খণ্ড।—শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর বিরচিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থকার উপক্রমণিকার প্রথমেই লিখিয়াছেন,—"মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদ বধ কাব্যের পরে একখানি রাবণ-বধ কাব্য থাকিলে বঙ্গভাষা সমধিক সমুদ্ভাসিত হইবে বিবেচনায়, আমি একখানি রাবণবধ কাব্য প্রণয়ন করিয়া সমাজ-সমক্ষে উপস্থিত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" তাঁহার নমুনা,—

"চমকি বিশ্ব নববীর্য্য-সূর্য্য-নৃপ রজনি-রাজা অবসরে,
উদিত উদয়-গিরি-কাঞ্চন-মঞ্চ সুরঞ্জি নিরঞ্জন বর্ণে।
দীপ্ত রশ্মিকুল সৈন্যবৃন্দ সম ছুটিল ভয়ঙ্কর ছন্দে,
ঝটিতি বিভঞ্জিল পতিত-রজনিপতি সৈন্য-নিকর-
উড়ুপে।
ঝলমল রবিকর পুঞ্জ রঞ্জি ভব মঞ্জুল কিরণ তরঙ্গে,
স্বর্ণবর সদৃশ উজলি সমধিষ্ঠিত সুরপুর-সৌধ-সুশৃঙ্গে।
তরুণ দিবসবর পরম সুসজ্জিত কুসুম মুকুট পরি শীর্ষে,
নৃপতিপতি-শ্রী প্রকৃতি-অতুল তনু সজ্জিত করিল সহর্ষে।
সুবর্ণ গিরিবর উজ্জ্বল শীর্ষক বিমল তুহিনকণ, রঙ্গে,
মৌক্তিক অলকপুঞ্জ সম ঝলকিত রঞ্জিত রবিকর সঙ্গে।

ধবল বক নিকর অতুল বিমল সর সুললিত সুমৃদুল বক্ষে,
মধুকর গুঞ্জন কঙ্কণ নিক্কণ, সুরধুনি কিঙ্কিণি পক্ষে।"

"অন্ধ তিমিরময় দুর্গম কক্ষে,
ক্ষুদ্র রশ্মিযুত বর্ত্তি সমক্ষে,
প্রমুদিত হৃদয় বন্দি জন তুল্য,
চিত মম শুনি শিব বাক্য অমূল্য।
বিষম বিপন্ন শক্র তব শক্র,
রথিবর তুল্য রহিত রথচক্র,
বিহ্বল হৃদয় বিগত নিতান্ত,
দর্শন ইচ্ছু মাত্র তব অন্ত!"

"কথনান্তর উঠি সম্ভ্রম সহ সব বেষ্টি মিত্রবর রঙ্গে,
ঝটিতি উপস্থিত সুবিপুল জলনিধি সন্নিধি সমধিক যত্নে।
পংক্তি বদ্ধ হই রহিল সৈন্যগণ জলনিধি তট'পর ধৈর্য্যে,
নৃপতির অনুজসহ জলধিবক্ষ'পর উঠিল সুবেষ্টিত আর্য্যে।
প্রণমি নৃপতিপদ কৌশলকুলরবি সিদ্ধ পুরুষ সমচিত্তে,
হইল নিমগ্ন সকল জন বিস্ময়ি উদ্ধত জলধি বৃহত্তে।"

"শুভসর্ব্বদত্ত নরেশ্বরে,
লভ সর্ব্ব সৌখ্য সুসত্বরে।
সবদুঃখ শীঘ্র বিমর্দ্দিবে,
চিরশান্তি সূর্য্যসমুদ্ভবে।"

"কিগণি সম্প্রতি বিভো
প্রচলিত স্থির মনে?
তড়িতবৎ পরিহরি
প্রভুপদাশ্রিত জনে!
নিদয়বৎ পরিহরি
প্রিয়তমা উড়ুসনে,
কহ হৃদীশ্বর সখে
শশধরোত্থিত কবে?"

"সম্প্রতি বৎস কিজন্য উপস্থিত?
শীঘ্র সুসম্বদ সর্ব্ব অভীপ্সিত।
কর্ব্বুর মঙ্গল সম্বদ সম্প্রতি,
সিঞ্চহ অম্বু তৃষার্ত্ত হৃদিপ্রতি।"

সুবৃহৎ রাবণবধ কাব্যের ৬ স্থান হইতে সামান্য মাত্র যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতেই পাঠক অনেকটা পরিচয় পাইবেন। বুঝিবেন—গ্রন্থকার এ কাব্য-প্রণয়নে কি অপরিসীম শ্রমস্বীকার করিয়াছেন; দেখিবেন—কঠোর সংস্কৃত ছন্দ কিরূপে বাঙ্গলা-ভাষায় প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছেন। এ পুস্তকে তাঁহার সংস্কৃত-চর্চ্চার ও অভিধান-জ্ঞানের ভূয়সী প্রমাণ পাওয়া যায়; অনেক স্থলে তিনি ভাবুকতারও পরিচয় দিতে ক্রটি করেন নাই। ফলতঃ পরিশ্রম ও চর্চ্চায় যাহা হইতে পারে, তাহা তিনি করিয়াছেন; এবং সে পক্ষে যে সফলতা-লাভ সম্ভব, তাহাও লাভ করিয়াছেন। তবে দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থে তাঁহার স্বভাব-কবিত্বের পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়। তাঁহার—

"সুবর্ণ গিরিবর উজ্জ্বল শীর্ষক বিমল তুহিনকণ, রঙ্গে,
মৌক্তিক অলকপুঞ্জসম ঝলকিত রঞ্জিত রবিকর সঙ্গে।

প্রভৃতি পদে যেমন ভাব সংগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি—

"সম্প্রতি বৎস কি জন্য উপস্থিত?
শীঘ্র সুসম্বদ সর্ব্ব অভীপ্সিত।"

প্রভৃতিতে তাঁহার স্বভাব-কবিত্বের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। আর, সেই অভাবেই, তাঁহার কাব্য যেন অনুস্বার-বিসর্গহীন সংস্কৃত ছন্দ-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে, "মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ন্যায়" তাঁহার কাব্যে "বঙ্গভাষা সমধিক সমুদ্ভাসিত" হইবার আশা কিরূপে করিতে পারি? প্রতিভা ও অধ্যবসায় স্বতন্ত্র জিনিস; স্বভাব-কবিত্বে ও যত্নসাধিত-পদ্যে অনেক বিভিন্নতা। মধুসূদনের মেঘনাদবধে সেই দুই গুণের সংমিশ্রণ, তাই তাহা অত সুন্দর। সুতরাং রাবণ-বধ-রচয়িতার রচনা তত্তুলনীয় নহে। বিশেষতঃ, যে পথে তিনি সফল-প্রয়াসী, তাহা সম্যক প্রকারে ভাষার প্রকৃতিগত কি না তদ্বি-

যত্নেও সন্দেহ আছে। সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় ঠিক ওরূপভাবে নিবদ্ধ হওয়ায়, ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য্য নষ্ট হয়। সুতরাং নূতনত্ব প্রদর্শনে প্রয়াসী হইয়াও, গ্রন্থকার অনেকটা বিফলশ্রম হইয়াছেন।

ঠগী-কাহিনী।—১ম ও ২য় খণ্ড।—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তকের কিয়দংশ 'অনুসন্ধানে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ফ্লেমর প্রণীত "কন্‌ফেসন্‌ অব্‌ এ ঠগ্‌" পুস্তকের মর্ম্মানুবাদ। প্রিয়নাথ বাবুর সরল-সুন্দর ভাষার গুণে পুস্তকখানি যেন নূতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; পড়িয়া বোধ হয় না—অনুবাদ। ঠগীকাহিনী পড়িতে এতই চিত্তাকর্ষিণী।

চক্ষুঃদান।—শ্রীযুক্ত মহাদেব ঘোষ প্রণীত। এইপুস্তকের অপর নাম 'গো-দাগাদিগের চালাকী।" "গো-দাগাদিগের চালাকী" ধরিতে যে পুস্তক রচিত, সমালোচনার জন্য কি সাহসে তাহা প্রেরিত হয়—বুঝিলাম না। গো-দাগা-মহলেও বুঝি দলাদলি আছে?

কবিতা-কলাপ।—শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। গ্রন্থকার নিবেদন করিয়াছেন,—"অর্থাভাববশতঃ অনেক পুস্তক" প্রকাশ করিতে পারি নাই। এবার বহুকষ্টে কবিতা-কলাপ প্রকাশ করিতে পারিলাম। মহোদয়-দিগের অনুগ্রহ প্রার্থনীয়।" এঅনুগ্রহ প্রার্থনায় নিগ্রহ-দান করিলে, 'মহোদয়' হইতে খারিজ হইতে হয়। কাজেই, গ্রন্থকারের নিজের কথাতেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হইতেছে যে, তাঁহার "কবিতা-কলাপ, ছোট ছোট কথায় বিবিধছন্দে সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে।" আরও প্রশংসা করি—কদর্য্য ছাপার গুণে লেখা পড়িতে হয় না; এবং কায়ক্লেশে পঠিত হইলেও, নিগুণ-রচনা-গুণে উহা সম্পূর্ণরূপে পাঠ্য-নির্ব্বাচনী-সমিতির মনোনীত হইতে পারে।

সমগ্র ভারত ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর।—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রণীত। এক-খানি ইতিহাস-প্রণয়নে যে শ্রেণীর অনুসন্ধান ও গবেষণা আবশ্যক, সামান্য এই প্রশ্নোত্তর-প্রণয়নে বিদ্যানিধি মহাশয় তাহার অনেক পরিচয় দিয়াছেন। "টেক্সট্‌ বুক্‌ কমিটির অনুমোদিত" পুস্তকের প্রশ্নোত্তরে এতটা পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক হইলেও, ইহা অবশ্যই সুশিক্ষাপ্রদ হইয়াছে—স্বীকার করিতে হইবে। এ পুস্তকে বালকদের অনেকটা উপকারের আশা করা যায়।

সাময়িক-পত্র-সম্বন্ধে।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী।—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর রায় সম্পাদিত। এই পত্রের ৪ খণ্ড হস্তগত হইয়াছে। অধ্যবসায়ী সম্পাদকের সাহিত্যিক ব্রত প্রশংসনীয়। সম্পাদকের যথা-সম্ভব বিবিধ-জ্ঞানজ্ঞাপক সরল-সহজ অনেক তত্ত্ব এই পত্রিকায় প্রকটিত হইয়া থাকে। পত্রিকাখানি 'চুট্‌কীর চটকে' চাকচিক্যময়ী। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটু মার্জ্জিত রুচি আবশ্যক—চতুর্থ-খণ্ডের "পীঠে পীঠে জোড়া স্ত্রীলোক" অন্নও অল্পবস্ত্রা অথবা বসনপরিহিতা হওয়া উচিত ছিল।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/১, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান।

অষ্টম বর্ষ। ৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। দ্বাত্রিংশ সংখ্যা।

আত্মজ্ঞান।

আত্মার আত্ম-সম্মিলন-আশা। শৈলবিহারিণী শৈবলিনী সাগর-সঙ্গমে ধাবমান; প্রবাহ-ছিন্ন বালুকা-কণা সৈকত-প্রান্তে অবনত; ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড, বিস্তীর্ণ-বৃহতের দিকে অগ্রসর। এইরূপ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সকলেই আপনার জনের অন্বেষণ করিতেছে। প্রাণ, আপনার জনকে প্রাণের মধ্যে রাখিতে চায়; কর্ণ, আত্মজনের বাক্য-সুধা-সাভে উদ্‌গ্রীব; দর্শন, প্রিয়-দর্শনে অনিমিক্ষ-দৃষ্টি; ঘ্রাণ, যেন প্রিয়-পার্শে পারিজাতের আঘ্রাণ পায়।

সৌন্দর্য্য—প্রিয়-সন্দর্শনে; অমৃত—আত্ম-সন্নিধানে। আবার, সৌন্দর্য্যে—প্রিয়দর্শন; অমৃতে—আত্ম-জ্ঞান। উভয়ের মধ্যে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত আকর্ষণ—উভয়ে যেন ন্যূনাধিক স্বতঃসিদ্ধগুণে পারস্পারিক-সম্বন্ধে সম্বন্ধ। শরতের সুন্দর শশধর, আমার নিকট এত প্রিয় কেন? মর্ত্ত্যের প্রিয়-মুখশশী, কেন ত্রিদিব-সৌন্দর্য্যে তুলনীয়? অসীম সৌন্দর্য্যাধার ইন্দ্রধনু, অনন্ত আকাশের কোন্ প্রান্তে অবস্থিত; অথচ, আমার প্রাণ তারেই চায় কেন? অসীম বিশ্বের তিলমাত্র সৌন্দর্য্যে তিলোত্তমার সৃষ্টি; কিন্তু, সে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া, আমার মন রূপসীর রূপের দিকেই আকৃষ্ট হয় কেন? এদিকে আবার, অঙ্গার-স্নাত ত্রিভঙ্গ আম্রজ, আপনার নিকট কষিত-কাঞ্চনের ন্যায় সৌন্দর্য্যবান্; দর্পণ-প্রতিবিম্বে আত্ম-প্রতিকৃতি সুন্দর প্রতিফলিত দেখি। অতএব, বুঝিতে পারি—দেখিতে পাই—ভালবাসা সৌন্দর্য্য-স্বরূপিণী, সৌন্দর্য্যে আত্মপ্রীতি।

বড় মহান্ সুন্দর সত্য—ভালবাসা সৌন্দর্য্য-স্বরূপিণী। যারে ভালবাসি, যারে আপনার ভাবি, তার নিকট কি সৌন্দর্য্যাধার আর কিছু আছে? ভাল বাসিতে-বাসিতে সৌন্দর্য্য যেন আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে—ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে যেন গুণ-গৌরব বর্দ্ধিত হয়। কোন্ পরের

ঘরে—কোন্ দূরদেশে ছিল—সে; কিন্তু যেদিন হইতে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, সেই দিন হইতে অণু-পরমাণু-ক্রমে তার ভালবাসা আমার হৃদয় অধিকার করিতে বসিয়াছে; ক্রমে এখন —সে আমার—আমি কার, তাঁর রূপে আমি মগ্ন—আমার প্রেমে সে আত্মহারা। জগতে কি তার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নাই—না এই কুরূপ-কুৎসিৎ আমিই এ জগতে একমাত্র সৌন্দর্য্যাধার? তা যদি না হয়, তবে কি ইহাই সত্য নহে—যারে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করি —ভাল বাসিতে-বাসিতে, তাঁতেই সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই? শুধু সে একা কেন?—সংসারে যার দিকে তাকাই, আপনার হইতে হইতে, ক্রমেই সে সুন্দর হয়—ভাল বাসিতে-বাসিতেই ক্রমে সৌন্দর্য্য পাই।

তবে ভাল বাসি না কেন? আপনার জনে যদি এত তৃপ্তি, ভালবাসার মূলে যদি এত সৌন্দর্য্য, তবে ভাল বাসি না কেন?—আপনার বলিয়া তবে পরকে আপনদিকে টানিয়া লই না কেন? যদি নিগূঢ় অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তবে অন্তরের কোন্ গতি দেখিতে পাই?—প্রাণের প্রকৃতিগত প্রসার কোন্ দিকে—আত্মা আত্ম-অন্বেষণে কোন্ দিকে আগুয়ান? দেখিতে পাই—তাহার স্বভাবগত গতি—প্রকৃতিগত আকর্ষণ—আত্মজ্ঞানে। প্রাণ আকাঙ্ক্ষা করে—আপনার বলিয়া অপরকে আত্ম-সন্নিকটে টানিয়া লইতে; মন—কাহাকেও আপনার বলিয়া ডাকিতে পারিলেই যেন অধিক আনন্দ অনুভব করে। এ যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাব! দরিদ্রে দয়া করিবার প্রবৃত্তি, আমার অন্তরে এত জাগরূক কেন? পরের উপকার জন্য সময়ে সময়ে মনে কেন এত উদ্বেগ-ক্লেশ উপস্থিত হয়? আবার, উপকারীর প্রত্যুপকার-লালসা কার মন হৃদয়ের নিগূঢ় প্রদেশে রাজত্ব করে? এ সব কি?—হৃদয়ের এ সকল সদ্‌বৃত্তি কোন মহদুদ্দেশ্য-সাধন-সম্বন্ধে প্রেরিত হইয়াছে? ইহাদের সকলেরই মূলে কি সেই একমাত্র আত্ম-জ্ঞানতত্ত্ব নিহিত নহে? ইহাদের সকলেই কি একবাক্যে 'আমা-দিগকে এই শিক্ষা দিতেছে "মা—মানুষ! তুমি মানুষমাত্রকেই আপনার বলিয়া জ্ঞান কর?" আমি যখন দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার দেখিয়া তাহার নিরসন-জন্য ব্যাকুল হই, আমি যখন অন্নের ভিখারী দরিদ্র কাঙ্গালীকে আমার মুখের গ্রাস অকাতরে প্রদান করিতে যাই, তখন কি তাঁহাদিগকে আপনার করিয়া লই না? আমার অন্তর্নিহিত দয়া-বৃত্তি আমায় যেমন অপরের প্রতি আত্ম-জ্ঞান করিতে উপদেশ দেয়, অপরকেও কি তেমনি-তদ্বিনিময়ে আমার প্রতি অনুরক্ত হইতে পরামর্শ দেয় না? আমার প্রণয়, আমার প্রীতি, আমার ভালবাসা—এমন কি, আমার যে কোন্ গুণ-গৌরব—সকলই কি আমার প্রতি অপরের বা অপরের প্রতি আমার অনুরাগ-স্থাপনার সাহায্য করে না? ফলতঃ, আত্মনিবেশ-সহকারে দেখিলে, এই দেখা যায়—জগৎ-শুদ্ধ সকলেই যেন আমায় আপনার জন বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে, আর আমিও যেন অন্তরের অন্তস্তলে তাহাদিগকে স্থান দিবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল রহিয়াছি।

যদি তাই হয়, তবে কেন অপরকে আপনার জন করিয়া লই না? সেই সর্ব্বমঙ্গলময় পরম-পিতাই বা আমাদিগকে কেন এ শুভসূত্র ধরাইয়া দেন নাই, দেন নাই কি?—তিনি অবশ্যই তাহা ধরাইয়া দিয়াছিলেন। যেদিন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, সেদিন জননীর প্রাণে সে প্রবল পুত্রস্নেহ কে দিয়াছিল?—তার পর, জননীর প্রতি আমার সে অকপট আত্ম-নির্ভরতা—তাই বা আমি কোথায় শিখিয়াছিলাম? শুধু জনক-জননীই বা কেন?—আমার আত্ম-পরিজন, ভাই-ভগিনী—তাদের দিকে দেখিলেই বা কি দেখিতে পাই? আমার জন্মগ্রহণের কত পূর্ব্ব হইতে, কে তাহাদের প্রাণে তেমন স্নেহ-মমতা, প্রীতি-ভালবাসা স্তূপে স্তূপে সজ্জিত রাখিয়া, আমার প্রাণকে তাহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছিল? শৈশবের শিক্ষাগুরু, 'হুতে খড়ি' দিয়া অক্ষয়-অক্ষনেরই সহায়তা করেন; লিপিকুশলতা বালক অভ্যাস-বশেই শিক্ষা করে। দিগ্‌নির্ণয়-যন্ত্র দশ-দিকের এক দিকই দেখাইয়া দেয়; দর্শক, অপর কয়দিক আপনার জ্ঞানগুণেই নির্ণয় করিয়া লয়। সেইরূপ, ঈশ্বরও আমাদিগকে এক একটী মতানুষ্ঠান-সূত্র ধরাইয়া দেন; আমরা, আমাদের নিজস্ব-প্রভাবে তাহার সম্প্রসার-সঙ্কোচ করিয়া লই। সুতরাং মঙ্গলময় পরমেশ্বর যে আমাদিগকে সর্ব্বরূপে সর্ব্বজনে আত্মজ্ঞান করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা ধ্রুব সত্য; তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।

তারপর, এই আত্ম-জ্ঞানে—অপরকে আপনার ভাবিয়া ভাল বাসিতে-বাসিতে ক্রমশঃ সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রতিই প্রীতি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়, এবং তাঁহাতে আত্মলীন হওয়া যায়। কথাটা আরও একটু বিশদ করা যাউক। বিশ্বেশ্বর বিশ্ব-রূপ বিরাট পুরুষ; জল-স্থল-মরুৎ-ব্যোম চরাচর তাঁহাতে পরিব্যাপ্ত; তিনি সর্ব্বময় সর্ব্বাধার সূক্ষ্মস্বরূপ। আমাতে তোমাকে তাঁহাতে সর্ব্বের তাঁহার অংশ বিদ্যমান। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর সর্ব্বতই ন্যূনাধিক-পরিমাণে তিনি বিরাজ করিতেছেন। এরূপ স্থলে, প্রাণী-রাজ্যের এই শ্রেষ্ঠসুন্দর পদার্থ মনুষ্যে তিনি যে অনেকটা পূর্ণ-অংশে বিদ্যমান, তাহাতে আর সংশয় কি? অন্যান্য জীবজন্তু যেমন অণুপরমাণু-ক্রমে তাঁহার অংশভাগী

কৃতিত্বের তাঁহার তাহাতে সুলভ মনুষ্য-জন্ম পাইয়া আমরা যেমন অধিক পরিমাণে তন্ময়; অমরার অমরগণ তেমনি তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মলীন। আর, সেই কারণে বোধ হয়, হিন্দুশাস্ত্রে দেব-দেবীর আরাধনা-প্রণালী এত বিশদ ও বিস্তৃত—সেই কারণেই বোধ হয়, হিন্দুর দেবদেবী অসংখ্য-অপরিমিত 'তেত্রিশ কোটী' —সেই কারণেই বোধ হয়, মঙ্গলময়ের অংশ-স্বরূপে পশুপক্ষীকীটপতঙ্গ "সর্ব্বপ্রাণীই হিন্দুর আরাধনার সামগ্রী। অতএব, দেখা গেল—প্রকৃতিগত সর্ব্বপ্রাণীই ভক্তির শ্রদ্ধার, প্রীতির ও ভালবাসার সামগ্রী; এবং তাঁহার অংশাধিক্য-হেতু অমরগণের পরেই তদ্বিষয়ে মনুষ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। দেবতার দর্শন দুর্ভাধার দুরদৃষ্টসাপেক্ষ; পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয় না করিতে পারিলে—কঠিন-কুঠোরকপে আত্ম-লীন হইতে না পারিলে—বা পূর্ণ পবিত্র আত্ম-জ্ঞান না জন্মিলে, দেব-সন্নিকর্ষ দুর্লভ; এবং তাহাতে অনেক ধ্যান-ধারণা জ্ঞানগরিমার আবশ্যক। কিন্তু মনুষ্য—আমার সম-পদবী সমশ্রেণীর জীব—তার প্রতি প্রীতি-প্রেম অনায়াস-সাধ্য। সে সম্ভাষণে আমায় নিয়ন্তরে অবনমিত হইবার আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হইতেও হইবে না, বা উর্দ্ধরাজ্যে যাইবার দুশ্চিন্তা-দুরায়াস সহ্য করিতেও হইবে না। প্রকৃতি ও সময়-গত অনেক সামঞ্জস্য যখন উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান, তখন সামান্য বিভেদ অবশ্যই নিরসিত হইতে পারে। তাই বলি, যদি ভাল বাসিতে হয়, তবে, আপনাকে আপনার জনকে, আপনার সম্প্রদায়কে, আগে ভাল-বাসিতে শিখ; এবং তাহাকে ভাল বাসিতে-বাসিতেই ক্রমে ঈশ্বরকে ভালবাসা হইবে। কিন্নর-নর-অমর-ঈশ্বর যেন নিম্নোচ্চ স্তর; নিম্নে না নাম, অন্ততঃ সমান হইতেও উপরে

উঠিতে চেষ্টা কর, অবশ্যই আশানুরূপ ফল-লাভ হইবে।

আরও, যাহা ন্যায়, যাহা শুভ, প্রাণ তাহারই আকাঙ্ক্ষা করে। আত্ম-জ্ঞান আমাদের পক্ষে সেই শুভকর—সেই মঙ্গলজনক পদার্থ। আত্ম-জ্ঞানে অমঙ্গল নাই—আত্মজ্ঞানে অনিষ্টাশঙ্কা নাই—আত্মজ্ঞান সর্ব্বমঙ্গলময়। আমি পরকে যদি আপনার জ্ঞান করিতে পারি, শত্রুকে যদি মিত্র-জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে সাহসী হই, তবে আর আমার অনিষ্টাশঙ্কা কোথায়? আত্মজ্ঞানে উন্মুক্ত-প্রাণ ধ্রুব—পঞ্চম বর্ষীয় নিষ্পাপ শিশু—বিকট ব্যাঘ্র-সমক্ষে নিপতিত; কিন্তু সে তখন দেখিতেছে—সর্ব্বত্র আত্ম-ময়, সর্ব্বত্র ঈশ্বর-সামীপ্য; সুতরাং নির্ভয়ে ব্যাঘ্র-সমীপে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ, আত্মজ্ঞানে উন্মুক্ত-প্রাণ বিশ্বসঙ্গল দেখিতেছেন—সে ত সর্প নয়—চিন্তামণি যেন তাঁহার জন্য রজ্জু-স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে। আর, এই জ্ঞানেই বুদ্ধ বা সর্প-সন্নিকটে বিশ্বমঙ্গলের কোন অনিষ্ট ঘটিল না। এইরূপ, আরও বিবিধ-বিষয়ক আলোচনায় দেখান যাইতে পারে যে, আত্মজ্ঞানে কোনই অমঙ্গল নাই—আত্মজ্ঞান সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়ক।

অতএব, ব্রহ্মাণ্ডের সকলকেই আপনার বলিয়া জ্ঞান কর—আপনার জ্ঞানে প্রাণের নিকটে টানিয়া লও। অতএব,—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্র
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্র।
কস্য ত্বং বা কুতঃ আয়াত
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাত॥"

"সংসারে কেহ কাহারও আপনার নয়"—এ কবি-গীতির স্থূল-অর্থ ধরিয়া, সংসার-মরীচিকায় অন্ধ হইও না। ভাব—সকলেই আমার আপনার—জগৎ আত্মময়—ভাই ভাই এক প্রাণ, এক আত্মা। ইহাতে শুধু আত্মোন্নতি হইবে না—আত্মোৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সেই জগদাধার-সন্নিকর্ষ-লাভ সুসত্বর হইয়া আসিবে। যেমন—সাগর-সঙ্গম-প্রয়াগী স্রোতস্বতী, শাখা-সমষ্টির সংযোগ পাইলেই দ্রুতগতি লাভ করে, বা খণ্ডমেঘনিচয়ের সংযোগ ঘটিলেই ব্যষ্টি-পতন সত্বর হইয়া আসে; তেমনি, আপন-পরে অভিন্ন-জ্ঞান জন্মিলেই মুক্তির পথ সরল ও সুপ্রশস্ত হইয়া আসিবে।

শ্রীজ্ঞানানন্দ তত্ত্বরত্ন।

যোগী-সন্দর্শন।

যোগশাস্ত্র কেবল ভারতবর্ষে প্রচলিত। কি ইংরাজী, কি অন্য কোন ইউরোপীয় ভাষায়, ইহার প্রতিশব্দটী পর্য্যন্ত নাই। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ ইহার তথ্য যে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ, তাহা নিঃসন্দেহ। আর তাই, আজকালকার পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যোগশাস্ত্রকে "হম্‌বগ" (Humbug)-মিথ্যা বলিয়া, হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করেন, এবং ভোজ-বিদ্যার সহিত ইহার তুলনা করেন। যাঁহাদের জ্ঞান বাহ্য জড়পদার্থেই অনতিরিক্ত, তাঁহাদের নিকট 'যোগের যোগ্য-সমাদর প্রকৃতই অতি দুরূহ জিনিষ। যে সকল বৈজ্ঞানিকেরা কেবল জড় জগৎ ও পদার্থ-সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করেন, তাঁহারা ইহাকে উপহাস করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোগশাস্ত্র কি? যেমন, পদার্থ-বিজ্ঞান বাহ্য পার্থিব বস্তুর

বিষয় উল্লেখ করে, মনোবিজ্ঞান মনুষ্যের মানসিক জ্ঞান-সম্বন্ধে আলোচনা করে, তদ্রূপ যোগশাস্ত্র পারমার্থিক জ্ঞান-বিষয় বর্ণন করে। সংক্ষেপতঃ দৈহিক হইতে ঐশিক জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় ও অবলম্বন—যোগশাস্ত্র। অদ্যদেশীয় প্রাচ্য মণিষিগণ—বুদ্ধ হইতে ফল কি নিমিত্ত ভূতলে পড়ে, বাষ্প জল হইতে কেন গগনমার্গে উঠে—এবম্প্রকার প্রাত্যহিক ঘটনার আলোচনা পরিহার-পূর্ব্বক ইহা হইতে অধিক গভীর বিষয়ের চিন্তা করিতেন। এই জন্যই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মনোবিজ্ঞান ও যোগশাস্ত্রের এতদূর উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হন, এবং ঐ সকল অদ্যাপি সাধারণের নিকট আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। "টেলিপ্যাথি" (Telepathy), "মেস্‌মারিজম্" (Mesmerism) প্রভৃতি যে সকল নাম আমরা আজকাল শুনিতে পাই, উহাও আর কিছু নহে—উহা হিন্দু-যোগের সামান্য অনুকরণ ও সমাধির ফল মাত্র। যাহা হউক, যোগশাস্ত্র-সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ বা যোগের মাহাত্ম্য বর্ণন জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে; এ প্রবন্ধে কেবল যোগীদের কয়েকটি আশ্চর্য্য ও প্রকৃত বিবরণ বিবৃত করিব। ভরসা করি, উহা সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাগণের মনস্তুষ্টি-সাধন করিবে। ঘটনাগুলির সত্যতা-সম্বন্ধে মুখবন্ধে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই গল্পের নায়কের সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রমুখাৎ স্থূল বিবরণ অবগত হইয়া, লেখক ইহা নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা লেখকের কাল্পনিক নহে; এবং ঘটনাগুলি যে প্রকৃত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

কেদার কিঞ্চিৎ উদ্ধত-প্রকৃতির অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক। কোন দোষে বাটীর অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হওয়ায়, অভিমান করিয়া, কোন্নগর পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববিদ্যা-শিক্ষার্থ রুড়কি যাত্রা করিল। তথায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষের নিকট বিদ্যালয়ের সর্ব্ব-নিম্ন-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার নিমিত্ত আবেদন করিলে, তাঁহার কালিক অধ্যক্ষ সাহেব, তাহার ঊর্দ্ধু ভাষায় অভিজ্ঞতার পরিচায়ক কোন প্রশংসাপত্র না থাকায়, তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় রুড়কি-কলেজে প্রবেশার্থ কোন প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়ম প্রচলিত হয় নাই। কেদার নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ও হতাশ হইয়া, দেশে আর ফিরিয়া না আসিয়া, রুড়কির সন্নিকটে তাঁহার দাদা-শ্বশুরের বাটীতে গমন করিল। সেই-খানে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে, হঠাৎ এক দিবস একজন সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; সে সেই সন্ন্যাসীর সহিত নানাপ্রকার আলাপে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে, সাহসী হইয়া, একদিন, তাহাকে শিষ্য করিবার নিমিত্ত, সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করিল। তদুত্তরে সন্ন্যাসী বলিলেন যে, গুরুর আদেশ ব্যতীত তিনি তাহাকে দীক্ষা দিতে পারেন না। সে কথা শুনিয়া, কেদার, তাঁহার গুরুর নিকট লইয়া যাইবার জন্য, বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল। উত্তরে জানিল যে, তাঁহার গুরুজি ছয়দিগম্য হিমাচল-শিখরেপরি 'ছয়কৈশে' ভূপস্যা করেন। কিন্তু তাহাতেও সে নিরস্ত হইল না; তখন অগত্যা তিনি তাহাকে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

আমরা যে দিবসের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার পর দিন প্রাতঃকালে কেদারের শ্বশুর-বাটীর মূকলে তাহাকে খুঁজিয়া পায় না। তাঁহার সন্ধানে চতুর্দ্দিকে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করা হইল। বাটীতে মহা কান্নাকাটি আরম্ভ হইল। ক্রমে তাহার ধূম-রাশি কোন্নগরে কেদারের

নিজ-বাটী পর্য্যন্ত উঠিল। ক্রমে দিনান্তে সপ্তাহ, সপ্তাহান্তে পক্ষগত হইল; তথাপি কেদারের কোন তথ্য, কি সমাচার পাওয়া গেল না। কেহই কেদারকে বাটী হইতে বহির্গত হইতে দেখে নাই, কিম্বা তাহার গতিবিধির বিষয় অবগত নহে। তাহার সহসা অন্তর্ধান, যেন কোন নিগূঢ় রহস্যাবৃত বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। অনুসন্ধানে কেবল ইহা জানা গেল যে, নিশাশেষে, অন্ধকার থাকিতে, বহির্দ্বার উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক সঙ্গে একখানি কম্বল ও একটি ষট মাত্র সম্বল লইয়া, রুদ্রকি পরিত্যাগ করিয়া, কেদার কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে কেদার, সন্ন্যাসী-সমভিব্যাহারে নানা দুর্গম ও জঙ্গলময় বক্র পথ অতিক্রম করিয়া, সপ্তাহান্তে, পুণ্যসলিলা গঙ্গাতটে হরিদ্বারে আসিয়া উপনীত হইল। সর্ব্বপাপক্ষয় নিমিত্ত, কলুষনিবারিণী পতিতপাবনীতে অবগাহনার্থ, সন্ন্যাসী কেদারকে বলিলেন। তখন পৌষ মাস; পার্ব্বতীয় নদীর রীতি-অনুসারে স্রোত একমুখেই প্রধাবিত। এরূপ অবস্থায় অবগাহন করিতে, কেদারের মনে ত্রাস হওয়া অসম্ভব নহে। কেদার ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু সন্ন্যাসী কেদারের উড়ানিখানি তাহার কটিদেশে বাঁধিয়া তাহাকে জলে নামিতে বলিলেন ও নিজে উপর হইতে মুষ্টি দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রহিলেন। কিরূপ আমরা অবগত নহি, ইচ্ছা করিয়া বা অকস্মাৎ, সন্ন্যাসীর মুষ্টি শিথিল হওয়াতে, সহসা কেদার স্রোতে ভাসিয়া অনেক দূর গেল। শীঘ্র বলক্ষয় হওয়ায় এবং আতঙ্কে, কেদার অচৈতন্য হইয়া পড়িল। কেদার যখন ভাসিয়া যায়, সেই সময় একটি জলোচ্ছ্বাস ও "সত্যোয়া নাশ হয়া" এইরূপ একটি আর্ত্তনাদ শুনা গেল; তৎপরের ঘটনা কেদারের কিছুই স্মরণ নাই। কিন্তু যখন সে সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল, তখন দেখিতে পাইল যে, সঙ্গী সেই মহাপুরুষ, বৃক্ষশাখা ও পয়াদি সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা বহ্নি জ্বালিয়া, তাহার পার্শ্বে বসিয়া, তাহার উত্তাপে, তাহারি শীতল দেহ উত্তপ্ত করিতেছেন। কেদার সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলে, পুনর্ব্বার তাঁহারা তাহাদিগের অভীষ্ট গন্তব্য-প্রদেশ-মুখে যাত্রা করিল। প্রথম হইতে দশ দিবসান্তে তাহারা তথায় উপস্থিত হইল। যখন তাহারা হৃষিকেশে উপস্থিত হইল, তখন বহুপথ-পর্য্যটনে কেদার অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পদদ্বয় ফুলিয়া উঠিয়াছে; সে আর চলিতে কি দাঁড়াইতে নিতান্ত অসমর্থ।

সেইস্থানে—ঘোর-সমাধিস্থ, মুদিত-নেত্র, পুত্তলিকাবৎ নিষ্পন্দ, একাধারে ভয় ও ভক্তির আধার—সেই ঋষির সাক্ষাৎকার লাভ হইল; তিনি জীবিত কি মৃত, সহসা বুঝা ভার। সন্ন্যাসী ও কেদার—তাহারা সযত্নীন হইয়া, সেই পূজ্যপাদ ঋষিপুরুষকে ভূমিষ্ট-প্রণিপাত করিল। ঋষিশ্রেষ্ঠ, চতুষ্পার্শ্বে শিষ্যবর্গ-পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ মধুর স্বরে বেদপাঠ করিতেছেন, কেহ বা উপাসনায় রত, কেহ বা ধর্ম্ম-কর্ম্মে, অন্য কেহ বা অন্যান্য কার্য্যে তৎপর। ঐ সকল দৃশ্য, তাঁহাদের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও নিস্তব্ধতা, স্থানীয় পবিত্রতা ও দৃশ্যের সহিত মিলিত হওয়ায়, কেদারের তরুণ হৃদয়ে এক অদ্ভুত ভাব ও ভীতির উদ্রেক করিল। সে মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হইল যে—এই নশ্বর দেহ, সে সেই পুণ্যক্ষেত্রে শেষ করিবে। যাঁহারা ঐরূপ স্থানে পরিভ্রমণ না করিয়াছেন বা উহার বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত না আছেন, তাঁহারা ঐ সকল ভাব ও চিন্তার বিষয় কল্পনায় আনিতেও সক্ষম নন। ঐ অবস্থা চিত্রিত করিবার ভাষাও বুঝি বা নাই। হৃষিকেশ ঋষিগণের লীলাস্থল ও আশ্রম-ভূমি। ইহা হরিদ্বার হইতে ৭ ক্রোশ উত্তর। বিখ্যাত লক্ষ্মণঝোলা প্রভৃতি বহু প্রাচীন কালের নিদর্শন অদ্যাপি এখানে বর্ত্তমান আছে। এই স্থানে সপ্তঋষিমণ্ডলী তপস্যা করিয়াছিলেন। নিখিল আর্য্যাবর্ত্তে এবম্প্রকার যে কত আশ্রম ছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এবং ঐ সকল নির্জ্জন স্থানে ছাত্রেরা যোগ ও দর্শনশাস্ত্র-সকল পাঠ ও অভ্যাস করিত। কে বলিতে পারে—এখনও ঐ প্রকার কত আশ্রম হিমাচলের অত্যুচ্চ শিখরে বর্ত্তমান আছে?

ঋষিপ্রবরের সমাধি ভঙ্গ হইলে, উপস্থিত সকলেই তাঁহার চরণ-বন্দনা করিল। এইবার তিনি আমাদিগের পূর্ব্ব-পরিচিত সন্ন্যাসীকে, কেদারকে সঙ্গে আনিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাহার শিষ্য হইবার বাসনা সংক্ষেপে জ্ঞাত করিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ কহিলেন,—"না, উহার এখনও দীক্ষিত হইবার সময় হয় নাই। উহার অদৃষ্টে এখনও মাংসারিক দুঃখ ও ক্লেশ-ভোগের পরিশেষ হয় নাই।" তৎপর কেদারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে,—"সে এখনও মায়াসূত্রে সংসারের সহিত আবদ্ধ আছে। যতদিন না সেই সূত্রের ছেদন হয়, ততকাল উদাসীন হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। এবং সে সময়ের এখনও বিলম্ব আছে। পূর্ব্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সাহেব তাহাকে ভর্ত্তি না করাতে তাহার যে মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে, তাহা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না; কারণ, এবার তথায় ফিরিয়া গেলে, নিশ্চয় সে ছাত্ররূপে পরিগণিত হইবে। সে কি নিষ্ঠুর সন্তান! তাহার শোকে তাহার জননী নিতান্ত অধীরা ও অবসন্না হইয়া শয্যায় শায়িতে, এবং তাহার পরিবারবর্গের অন্যান্য সকলেরও সেই অবস্থা। তাহার অবিলম্বে ফিরিয়া যাওয়া উচিত।" ইহা বলিয়া, তাহাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া, তাহার হস্তে দুইখানি পেড়া ও দুইখানি বরফি দিয়া, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অদূরে প্রস্রবণের শীতল বারি পান করিবার জন্য সঙ্কেত করিলেন। ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া, কেদার তাহার গাত্রাবরণের একপার্শ্বে অবশিষ্ট বন্ধন করিয়া রাখিল। তথায় কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া, তাহার উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক সেই সন্ন্যাসীর সহ, নিতান্ত অনিচ্ছা-সহকারে, পাহাড় হইতে পুনরায় অবতরণ করিবার বাসনা করিল। আশীর্ব্বাদ সহ ঋেদারকে বিদায় দিবার কালীন, ঐ ঋষিপুঙ্গব তাহার হস্তে দুইটুকরা ইষ্টকসদৃশ পদার্থ দিয়া উহা সাবধানে ও সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য বলিলেন। কারণ, কেদারের স্ত্রী প্রতিবার প্রসবকালে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিবেন এবং কেবল ঔহার স্পর্শে তাঁহার নিরাপদে সন্তান প্রসব হইবে। কেদার, বিশেষ যত্নের সহিত, ঔহা দৃঢ়রূপে তাহার উত্তরীয়ের আর একভাগে বন্ধন করিল এবং ঋষি-বাক্য-শ্রবণে ও কার্য্যকলাপ-দর্শনে অবাক হইল—তিনি মনুষ্য কি দেবতা, সে বিষয়ে মনে মনে অনেক চিন্তা করিতে লাগিল। ঐ মহাপুরুষ কেদারের সমভিব্যাহারী, সেই সন্ন্যাসীবরকে কেদারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন—কারণ, সময়ে সময়ে তাহার ঘোর বিপদে পতিত হইবার সম্ভাবনা। ইহার পর সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন, কেদার কি প্রকার অনিচ্ছাসহ ঐ পুণ্যস্থান পরিত্যাগ করিল।

এইরূপে তিন সপ্তাহের অনুপস্থিতির পর, সহসা একদিবস একদার তাহার দাদা-শ্বশুরের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সকলে আহ্লাদিত ও বিস্মিত হইল। এই সুসমাচার তারযোগে কোন্নগরে কেদারের

বাটীতে প্রেরণ করা হইল। পরে ইহাও জানা গেল যে, ফেদারের জননী যথার্থই তাহার শোকে নিতান্ত অধীরা হইয়াছিলেন। সকলেই কেদারের সহসা তিরোভাব ও আবির্ভাবের বিষয় জানিতে উৎসুক হইয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। কেদার কাহাকেও কিছু না উত্তর দিয়া, পুনরায় রুড়কি যাইবার বন্দোবস্ত করিল।

কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এবার যখন কেদার রুড়কি-কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবের সদনে উপস্থিত হইয়া নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাত করিল; সাহেব, তাহাকে পূর্ব্ববৎ বিদায় না করিয়া, বিদ্যালয়ের কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তখনও অধস্তন শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট ছাত্রসংখ্যা পূরণ হইয়াছে কি না? তদুত্তরে "হাঁ" জানিয়াও, অধ্যক্ষ সাহেব এবার কেরাণীকে আদেশ করিলেন,—"এই যুবককে ঐ শ্রেণীতে ভর্ত্তি কর। উহাকে উর্দ্দু ভাষার জ্ঞানসম্বন্ধে প্রশংসাপত্র ছয় মাস মধ্যে দিতে হইবে।" অনেক ক্লেশের পর তাহার আশালতা ফলিত হইল বলিয়া, কেদার নিতান্ত আহ্লাদিত হইল; ঋষিবাক্যের সফলতা দৃষ্টে মনে মনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল।

কেদার যখন তাহার উত্তরীয় বসন উন্মুক্ত করিল, তখন সেই বরফি ও পেঁড়ার পরিবর্ত্তে দুইটি সুগন্ধ পুষ্প প্রাপ্ত হইয়া অধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কেদারের দিদিশাশুড়ী ঋষিদত্ত ইষ্টকখণ্ড দ্বারা প্রস্তুতিগণের উপর পরীক্ষা করিয়া উহার সম্যক্ উপকারিতার বিষয় নিশ্চিত অবগত হইলেন। ঐ দুই খণ্ডের এক খণ্ড তাঁহার নিকট রহিল ও অপর খণ্ড অদ্যাবধি কেদারের বংশাবলীতে আশ্চর্য্য পৈতৃক ধন বলিয়া রক্ষিত হইতেছে। প্রকৃতই কেদারের পত্নীকে প্রতিবার প্রসবকালে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত এবং ঐ আশ্চর্য্য-গুণ-সম্পন্ন ইষ্টক স্পর্শ ব্যতীত তাঁহার কদাপি নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইত না। এতদূর পর্য্যন্ত ঋষিবাক্য সত্য হইল।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

হিন্দুর জ্যোতিষ।

পূর্ব্বপ্রস্তাবে মন্দোচ্চ ও পাত এই দুইটি—শব্দের উল্লেখ করা গিয়াছে। এবারে সর্ব্বাগ্রে সেই দুইটির বিষয়ই একটু বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে।

মন্দোচ্চ।—গ্রহের গতিপথ বা কক্ষার যে অংশ পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে অবস্থিত, তাহাই মন্দোচ্চ শব্দে কথিত হইয়া থাকে। গ্রহের কক্ষাগুলিরও অতি স্থূল গতি আছে।

পাত।—গ্রহকক্ষা যে দুই স্থানে রাশিচক্রকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেই দুই স্পর্শ-স্থানই পাত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের পাত ও মন্দোচ্চের যে গতির পরিমাণ সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে। উহা দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ঐ গতি নির্ণয় করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার। এক কল্পে অর্থাৎ ৪৩২ কোটি বৎসরে সূর্য্য-মন্দোচ্চ ভগণ-সংখ্যা ৩৮৭; তবেই এক ভগণে অর্থাৎ একবার রাশিচক্র ভ্রমণেই প্রায় ১১১৬২৭৯১ বৎসর অতীত হইয়া যায়। রাশিচক্রের এক অংশ মাত্র স্থান গমন করিতে প্রায় ৩১০০৮ বৎসর—এমন কি এক কলা মাত্র স্থান অতিক্রান্ত হইতেই প্রায় পাঁচ শত সত্তর বৎসর অতীত হইয়া যায়। অতএব, গ্রহগণের পাত ও মন্দোচ্চের গতি এ কলিযুগের ক্ষুদ্র মনুষ্যজীবনে প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব; কেবল চন্দ্রের মন্দোচ্চ ও পাতের গতি প্রত্যক্ষ ও পরিমেয়। অন্যগুলি যোগবলে স্থিরীকৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিম্নে গ্রহগণের পাত ও মন্দোচ্চের গতির এক চক্র প্রদত্ত হইল:—

পাত ও মন্দোচ্চের গতি-পরিমাণ চক্র।

গ্রহগণ।	এক কল্পে ভগণ-সংখ্যা।	এক ভগণে বর্ষ-সংখ্যা।	এক অংশে বর্ষ-সংখ্যা।	এক কলায় বর্ষ-সংখ্যা।
রবির মন্দোচ্চের	৩৮৭	১১১৬২৭৯০·৭	৩১০৪৭·৮	৫১৬·৮
চন্দ্রের মন্দোচ্চের	৪৮৮২০৩০০০	৮·৮	·০২৪৪৩	·০০০৪০৮
,, পাতের	২৩২২৩৮০০০	১৮·৬	·০৫১৬৭	·০০০৮৬১
মঙ্গলের মন্দোচ্চের	২০৪	২১১৭৬৪৭০·৬	৫৮৮২৩·৫	৯৮০·৪
,, পাতের	২১৪	২০১৮৯৯১৫·৯	·৫৬০৭৪·৮	৯৩৪·৫
বুধের মন্দোচ্চের	৩৬৮	১১৭৩৯১৩০·৪	৩১৬০৮·৭	৫৪৩·৫
,, পাতের	৪৮৮	৮৮৫২৪৫৯·০	২৪৫৯০·২	৪০৯·৮
বৃহস্পতির মন্দোচ্চের	৯০০	৪৮০০০০·০	১৩৩৩৩৩	২২২·২
,, পাতের	১৭৪	২৪৮২৭৫৮৮·২	৬৮৯৬৫·৫	১১৪৯·৪
শুক্রের মন্দোচ্চের	৫৩৫	৮০৭৪৭৬৬·৪	২২৪২৯·৯	৩৭৩·৮
,, পাতের	৯০৩	৪৭৮৪০৫৩০·২	১৩২৮৯·০	২২১·৫
শনির মন্দোচ্চের	৩৯	১১০৭৬৯২৩০·৮	৩০৭৬৯২·৩	·৫১২৮·২
,, পাতের	৬৬২	৬৫২৫৬৭৮·২	১৮১২৬·৯	৩০২·১

অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ ভাগশেষ, দশমিক করিয়া দেওয়া গেল। কেবল চন্দ্রের দশমিক পাঁচ সংখ্যা ও ছয় সংখ্যা পর্য্যন্ত দেওয়া গেল। অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় অপরগুলিতে এক সংখ্যা মাত্র দেওয়া গিয়াছে।

যন্মনুনাক্ত সন্ধিণ্ড
কল্পিং তৎসন্ধিভিঃ সহ।
কল্পাদিসন্ধিনা সার্দ্ধং
বৈবস্বতমনোস্তথা।৪৫॥
যুগাণাং ত্রিঘ্নসং যাতং
তথা কৃতযুগং ত্রিঘ্নং।
প্রোজ্ঝ্য সৃষ্টেস্ততঃ কালং
পূর্ব্বোক্তং দিব্যসংখ্যয়া।৪৬॥
সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া জ্ঞেয়া
কৃতস্যান্তে গতা অমী।

খচতুষ্ক যমাদ্র্যধি-
শরর্ত্তু নিশাকরাঃ॥৪৭॥

সসন্ধি ছয় মন্বন্তর কল্পের আদিসন্ধি এবং বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তবিংশতি মহাযুগ ও অষ্টাবিংশতিতম মহাযুগের সত্যযুগ এই সমুদায়ের পরিমাণে বর্ষ একত্রিত করিয়া তাহা হইতে সৃষ্টি-কাল বিয়োগ করিবে। (ঐ সৃষ্টি-কাল পূর্ব্বেই ২৪ শ্লোকে দিব্যবর্ষ-পরিমাণে লিখিত হইয়াছে)। ঐ সৃষ্টিকাল সৌর বৎসরে পরিণত করিয়া বিয়োগ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে

যে, সৃষ্টির পর পূর্ব্বকথিত সত্যযুগ পর্য্যন্ত ১৯৫৩ ৭২০০০০ সৌর বৎসর অতীত হইয়াছে।

উদাহরণ।—

		দিব্য বৎসর।		সৌরবৎসর।
কলের আদিসন্ধি	=	৪৮০০	=	১৭২৮০০০
অদ্যকার ছয় মন্বন্তর	=	৫১৮০৪০০০	=	১৮৫৩৬৮০০০০
বৈবস্বতের ২৭ মহাযুগ	=	৩৭৪০০০০	=	১৩৪৪০০০০০
" গত সত্যযুগ	=	৬০০০	=	২১৬০০০
বর্ত্তমান কল্পের গত সত্য				১৯৭৩৭২০০০০ বৎসর হইতে
" যুগ পর্য্যন্ত	=	৫৩৭৪০০০	=	১৯৩৭৮৪০০০০
" কলিকাল	=	৪৭০০০	=	১৬৯২০০০০
প্রাপ্ত	=	৫৪২৭০০০	=	১৯৫৩৭২০০০০ বৎসর,

সৃষ্টির পর হইতে বর্ত্তমান মহাযুগের সত্যযুগ পর্য্যন্ত অতীত হইয়াছে।

অত ঊর্দ্ধ অমী যুক্তা

গতকালাব্দসংখ্যা।

মলীকৃত্বা যুতা মাসৈঃ

মধুশুক্লাদিভির্গতৈঃ। ৪৮ ॥

পৃথক্‌স্থাস্তেঽধিমাসঘ্নাঃ

সূর্য্যমাস বিভাজিতাঃ।

লব্ধাধিমাসকৈর্যুক্তা

দিনীকৃতা দিনন্বিতাঃ। ৪৯ ॥

দ্বিষ্ঠাস্তিথিক্ষয়াভ্যস্তাঃ

চান্দ্রসাবরভাজিতাঃ।

লব্ধোনরাত্রিরহিতা

লঙ্কায়ামার্দ্ধরাত্রিকঃ। ৫০ ॥

সাবনোহ্যগণঃ সূর্য্যাৎ

দিনমাসাব্দ আস্ততঃ।

সপ্তভিঃ ক্ষয়িতঃ শেষঃ

সূর্য্যাদ্যো বাসরেশ্বরঃ ॥ ৫১ ॥

তৎপরে অভীষ্ট কাল পর্য্যন্ত যত্ত বৎসর গত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বৎসর-সংখ্যার সহিত যোগ করিবে এবং ঐ সমুদায় বর্ষকে মাস করিয়া অভীষ্ট বর্ষের গত চৈত্রশুক্লা প্রতিপদ তিথি হইতে যত চান্দ্রমাস গত হইয়াছে, তাহাও যোগ করিবে। ঐ যোগলব্ধ ফলকে দুই স্থানে রাখিয়া, এক স্থানের অঙ্ককে এক মহাযুগের অধিমাস সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া এক মহাযুগের সৌর মাস সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিবে। তাহা হইলে যে অঙ্ক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহাই অভীষ্ট সময়ের অধিমাস সংখ্যা। উহা অপরস্থানস্থিত যোগপ্রাপ্ত মাসসংখ্যার সহিত যোগ করিয়া সমুদায়কে দিবসে পরিবর্ত্তিত করিবে। এই ফল আবার দুই স্থানে রাখিয়া, এক স্থানের অঙ্ককে এক মহাযুগের তিথিক্ষয় পরিমাণ দ্বারা গুণ করিয়া, এক মহাযুগের চান্দ্রদিবস পরিমাণ দিয়া ভাগ করিবে। * এই ভাগ-ফলই অভীষ্ট সময়ের তিথিক্ষয়-পরিমাণ। ঐ তিথিক্ষয়াঙ্ক দ্বিতীয় স্থানস্থ চান্দ্রদিবস-সমষ্টি হইতে বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক পাওয়া যাইবে, তাহাই অভীষ্ট সময়ের মধ্যরাত্রে লঙ্কার সাবন দ্যুগণ বা অহর্গণ। উহাকে দিনরাশি বা দিনগুণ্ড বলা যায়। এই অহর্গণ হইতে দিবসাধিপ, মাসাধিপ ও বর্ষাধিপ নির্ণীত হইয়া থাকে। সপ্ত দ্বারা বিভক্ত করিলে যাহা অবশেষ থাকিবে, তাহা হইতে সূর্য্যাদি বারেশ নির্ণীত হইবেন ॥ ৪৮—৫১ ॥

অতঃপর এই কয়েকটি শ্লোক উদাহরণ দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে। মনে করা যাউক, যেন

* এইস্থানে সূর্য্যসিদ্ধান্তকর্ত্তা ত্রৈরাশিকের নাম না করিয়া ৩ দুইটি ত্রৈরাশিক করিয়া দিলেন।

বর্ত্তমান ১৮১৬ শকাব্দার ৪ঠা ভাদ্রের অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত লঙ্কার সাবন অহর্গণ নির্ণয় করিতে হইবে। প্রথমতঃ—

বর্ত্তমান মহাযুগের গত সত্যযুগ পর্য্যন্ত	=	১৯৩৭২০০০০	সৌর বৎসর।
সপ্তর্ষি ত্রেতাযুগ	=	১২৯৬০০০	"
দ্বাপরযুগ	=	৮৬৪০০	"
কলিযুগ	=	৪৩২০০	"
অভীষ্টকাল পর্য্যন্ত গত	=	১৯৫৫৮৫৩২০০	"
		ইহাকে	১২ গুণ করিয়া
		২৩৪৭০৬১৯২০০	মাস হয়।
উহাতে গত চৈত্র শুক্লাপ্রতিপদ হইতে		২৩৪৭০৬১৯২৪৪	চান্দ্রমান যোগ করিয়া
		ইহল।	

যেহেতু,—

লব্ধমাস + মহাযুগের অধিমাস মহাযুগের সৌর মাস= অভীষ্ট অধিমাস।

অতএব,—

২৩৪৭০৬১৯২৪৪ + ১৫৯৩৩৬০ ÷ ৫১৮৪০০০০

= ৭২১৩৮৪৭১৬.৪২ অভীষ্ট অধিমাস।

এক্ষণে, পূর্ব্বপ্রাপ্ত মাস ২৩৪৭০৬১৯২৪৪ সহিত অভীষ্ট অধিমাস ৭২১৩৮৪৭১৬ যোগ করিলে যোগফল ২৪১৯২০০৪৬৬০ মাস হইল। উহাকে মাসিক দিন-সংখ্যা ৩০ দ্বারা গুণ করিয়া ৭২৫৭৬০১৩৯৮০০ দিন হইল। উহাতে অভীষ্ট দিন পর্য্যন্ত চান্দ্রদিন ১৮ যোগ করিয়া ৭২৫৭৬০১৩৯৮১৮ দিন হইল।

এক্ষণে, যেহেতু,—

লব্ধদিন × মহাযুগের তিথিক্ষয়+মহাযুগের চান্দ্রদিন=অভীষ্ট তিথিক্ষয়।

অতএব,—

৭২৫৭৬০১৩৯৮১৮ × ২৫০৮২২৫২ ÷ ১৬০ ৩০০০০৮০ = ১১৩৫৬০১৮৫৯৬ অভীষ্ট তিথিক্ষয়।

এক্ষণে, পূর্ব্বপ্রাপ্ত দিনসংখ্যা ৭২৫৭৬০১৩ ৯৮১৮ হইতে অভীষ্ট তিথিক্ষয় ১১৩৫৬০১৮৫৯৬ বাদ দিয়া ৭১৪৪৩৪১২২২২২ লঙ্কার আর্দ্ধরাত্রিক সাবন দ্যুগণ প্রাপ্ত হওয়া গেল।

এই দ্যুগণ, অহর্গণ বা দিনবৃন্দ জ্যোতিষে বড়ই প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন জ্যোতিষ-গ্রন্থে ইহা নির্ণয়ের বিভিন্ন নিয়ম। ফল কথা, কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে গণনা না করিলে, অনাদি কালের পরিমাণ কিরূপে হইবে? কাজেই এক-একজন জ্যোতির্ব্বিদ এক-একরূপে অহর্গণ নির্ণয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যেকেই ভিন্ন-ভিন্ন সময় হইতে উহার গণনা করিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে গণনা করিতে গেলে বৃহৎ বৃহৎ হরণ-পূরণ করিতে হয়, অন্যান্য মতে উহা অপেক্ষা স্বল্পাঙ্কে কার্য্য সাধিত করা হইয়াছে। নিম্নে সিদ্ধান্তরহস্য-মতে ও গ্রহলাঘব-মতে দিনবৃন্দ আনয়ন করিয়া দেখান যাইতেছে।

সিদ্ধান্তরহস্য মতে—"বিশ্বেষুচন্দ্রোনশুকোঽহঃপিণ্ডঃ কুভাঙ্গরামৈর্গুণিতো নগঘ্নাৎ। অঙ্গাৎ খবাণাগ্নিহরাংশযুক্তাৎ সহস্রনিঘ্নাদ্দ্যমাগ্নিবিশ্বৈঃ। যুক্তাৎ খখাষ্টোদ্ধৃতযুক্তিঘ্নাদি-গতাহযুক্তঃশশিতো দিনৌঘঃ॥"

অর্থাৎ,—প্রথমতঃ শকাব্দাঙ্ক হইতে ১৫১৩ বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক পাওয়া যায়, তাহার নাম অহঃপিণ্ড। ঐ অহঃপিণ্ডকে দুই স্থানে রাখিয়া

একস্থানে ৩৬৪ দিয়া ও অপর স্থানে ৭ দিয়া গুণ করিতে হইবে।

অজপিণ্ডকে সাত দিয়া গুণ করিয়া ২৩৫০ দিয়া ভাগ করিতে হইবেন ঐ ভাগলব্ধ অঙ্কের সহিত সপ্তগুণিত অজপিণ্ড যোগ করিবে।

অজপিণ্ড হাজারগুণ করিয়া তাহার সহিত ১৩৩২ যোগ করিয়া পূর্ব্ব-যোগফলে যোগ করিবে, এবং তাহাকে ৮০০ দিয়া ভাগ করিয়া ৩৬৪ গুণিত অজপিণ্ডের সহিত যোগ করিয়া অভীষ্ট শকের বৈশাখের দ্বিতীয় দিন হইতে অভীষ্ট দিন পর্য্যন্তের দিনসংখ্যা যোগ করিলে অভীষ্ট দিনের দিনবৃন্দ হইবে।

যেহেতু, শকাব্দাঙ্ক—১৫১৩=অজপিণ্ড;

অতএব, ১৮১৬—১৫১৩=৩০৩ অজপিণ্ড।

৩০৩ ৩০৩

৩৬৪ ৭ গুণ করিয়া

১১০২৯২ ২১২১

২১২২

এবং ——— =১৫'৭১

১৩৫০

পুনরায় ২১২১ সহিত

১'৫৭১ যোগ করিয়া

২১২২'৫৭১ হইল। তাহার সহিত সহস্র-গুণিত অজপিণ্ড ৩০৩০০০ এবং

১৩৩২ যোগ করিয়া

৩০৬৪৫৪'৫৭১ হইল।

ঐ যোগলব্ধ ৩০৬৪৫৪'৫৭১কে ৮০০ দিয়া ভাগ করিয়া ৩৮৩০৬৮২ হইল। এক্ষণে, ৩৬৪ গুণিত অজপিণ্ড = ১১০২৯২ সহিত

ঐ— ৩৮৩০৬৮২

এবং বৈশাখের ৩০

জ্যৈষ্ঠের— ৩১

আষাঢ়ের— ৩২

শ্রাবণের— ৩১

ও ভাদ্রের— ৪ দিন

যোগ করিলে, ১১০৮০৩০৬৮২

অভীষ্ট দিন পর্য্যন্ত দিনবৃন্দ।

এই দিনবৃন্দ সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত স্থূলকালের পর হইতে গুণিত না হইলেও, কার্য্যকালে তুল্য ফল হইবে। অতঃপর গ্রহ-লাঘবমতে দিনবৃন্দ করা যাইতেছে। তাহার নিয়ম:—

"দ্ব্যব্ধীন্দ্রোনিত শক ঈশহৃতঃ ফলং ন্যাস্তকাণ্ড্যং রবিহৃত শেষকং তুসুকৃতং। চৈত্রাদ্যৈঃ পৃথগমুতঃ সদৃগ্‌ঘচক্রাব্ধিগ্‌ যুক্তাদময়কলাধিমাসমৃক্ষং॥ খত্রিঘ্নং গততিথিসুদ্‌ নিরগ্রচক্রাঙ্গাংশাদ্যং পৃথগমুতোহব্ধি ষট্‌ফলক্কৈঃ। উনাদ্যৈর্বিযুতমহর্গণো ভবেদ্‌ বৈ বারঃ স্যাত্তরহতচক্রযুগণো হজাং॥" অর্থাৎ, শকাব্দ হইতে ১৪৪২ বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক হইবে; তাহাতে একাদশ দ্বারা বিভাজিত করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই চক্র-নামে অভিহিত। ভাগাবশেষ দ্বাদশ দ্বারা গুণ করিয়া তাহার সহিত চৈত্রশুক্লা প্রতিপদ তিথি হইতে যত চান্দ্রমাস অতীত হইয়াছে, তাহা যোগ করিয়া যোগলব্ধ অঙ্কের সহিত দ্বিগুণিত চক্রাঙ্ক ও দশ যোগ করিবে। তাহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিয়া পূর্ব্বলব্ধ মাসাঙ্কে যুক্ত করিবে ও তাহাকে তিথিসংখ্যা অর্থাৎ ৩০ দিয়া গুণ করিয়া চান্দ্রদিনে পরিণত করিয়া অভীষ্ট দিন পর্য্যন্ত চান্দ্রদিন সংখ্যা যোগ করিবে। পরে চক্রাঙ্কের ছয় ভাগের একভাগ তাহাতে যোগ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহারই ৬৯ ভাগের এক ভাগ তাহাতে যোগ করিবে। ইহাই গ্রহলাঘব-মতে দিনবৃন্দ বা অহর্গণ। চক্রাঙ্কের পঞ্চগুণ তাহাতে যোগ করিয়া ৭ দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট সোম আদি বার হইবেক। পূর্ব্ব উদাহরণই এই মতে গণিত হইতেছে। যথা,—

শকাব্দাঙ্ক ১৮১৬ হইতে ১৪৪২ বাদ দিয়া ৩৪ হইল। পরে, ৩৭৪ কে ১১ দিয়া ভাগ করিয়া ৩৪ হইল। বাকি কিছুই রহিল না।

সুতরাং অবশেষকে আর ১২ গুণ করিয়া ভাগ করিতে হইল না। এই ৩৪ই চক্রাঙ্ক।

চৈত্রশুক্লা প্রতিপদ হইতে ৪ চান্দ্রমাস গত, তৎসহ চক্রাঙ্ক ৩৪ কে দ্বিগুণ করিয়া ৬৮ হইল। গায়াতে ১০ যোগ করিয়া ৮২ হইল।

এই ৮২ কে ৩০ দিয়া ভাগ করিয়া ২'৪৮৪৮ হইল। ইহার সহিত ৪ চান্দ্রমাস যোগ করিয়া ৬'৪৮৪ হইল।

ইহাকে তিথিসংখ্যা ৩০ গুণ করিয়া ১৯'৪৫৪ চান্দ্রদিন হইল। ইহাতে অভীষ্ট দিন পর্য্যন্ত ১৮ চান্দ্রদিন যোগ করিলে, ৩৭'৪৫৪ চান্দ্রদিন হইল। ৩৭'৪৫৪ চান্দ্রদিন, তৎসহ চক্রাঙ্কের ষষ্ঠাংশ ৫'৬৬৬ যোগ করিয়া ৪৩'১২০ হইল।

এক্ষণে, ৪৩'১২০ + ৬৪ = ৬৭৩৭ হয়। পরে, ৪৩'১২০—৬৭৩৭=৪২'৪৪৭৩ গ্রহলাঘব-মতে দিনবৃন্দ।

তাহার সহিত পঞ্চগুণিত চক্রাঙ্ক ১৪০ যোগ করিয়া ১৮২ হইল। তাহাকে সাত দিয়া ভাগ করিলে ২৬ ভাগফল হইয়া মিলিয়া যায়। সুতরাং ঐ ৬ঠা তারিখে সোমবারাবধি গণনার সপ্তম অর্থাৎ রবিবার হইল।

'সিদ্ধান্তরহস্যের দিনবৃন্দকে ৭ দিয়া ভাগ করিয়া (১১০৮০১ + ৭) ১৫৮২৯২ হয়। সোমবারাবধি ৭ম রবিবার সূর্য্যসিদ্ধান্তের দিন-বৃন্দ বা ত্র্যুগণ ৭১৪৪০৪১২২২২ কে সাত দিয়া ভাগ করিলে, ভাগফল ১০২০৫৭৩১৭৪ হইয়া ১ বাকী থাকে। সুতরাং রবিবারাবধি প্রথম অর্থাৎ রবিবার হইল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কবিরত্ন।

নিরুপমা।

একাদশ অধ্যায়।

আজ কোজাগর-পূর্ণিমা। মালঞ্চা-গ্রামের উপর দিয়া কত গ্রামের কত লোক গঙ্গাস্নানে যাইতেছে। যে নবীন সন্ন্যাসী আজ কয়েক দিন হইতে দেখা দিয়াছেন, তিনি রাস্তার ধারে মাধাবিনোদ বাবুর বাঁধা-ঘাটের পার্শ্বে একটী বেলগাছের তলায় আসন গাড়িয়াছেন। লোকে আসিতেছে, পথ দিয়া যে যাইতেছে, সে একবার না দাঁড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না। সন্ন্যাসী অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে ধ্যানমগ্ন আছেন।

সন্ন্যাসীটী বড় বুজরুক। তিনি লোকের মুখ দেখিয়াই নাম বলিয়া দিতেছেন; সেদিন লীলা-তীর স্বামীর নাম বলিয়া দিয়াছেন, কিরণের কোন্ গ্রামে শ্বশুর-বাড়ী তাহা বলিয়া দিয়াছেন, ঘোষালদের বাড়ীতে কয়খানা ঘর আছে তিনি না দেখিয়া চক্ষু মুদিয়া তাহা বলিয়া দিয়াছেন। কেহ বলিতেছে পিশাচসিদ্ধ, কেহ বলিতেছে তাল-বেতাল-সিদ্ধ, কেহ বলিতেছে 'হয় ত কোন দেবতা শাপভ্রষ্ট—'ছল্‌তে এসেছেন; গ্রামের কৈলাস দে বলিয়াছে যে, সে শেষরাত্রিতে তাহার গরু খুঁজিতে গিয়া দেখে এসেছে—রাঙ্গিতে সন্ন্যাসীর কপালের উপর আগুন জ্বলে, চারটে হাত হয়।

তাহার উপর সন্ন্যাসী আবার হাত দেখিয়া ভবিষ্যতের শুভাশুভ বলিয়া দিতে পারেন। মেয়ে-মহলে তাহা লইয়া বড় একটা হৈ-চৈ পড়িয়া

পড়িয়া গিয়াছে। মোক্ষদার ছলের তিনটে ফাঁড়া গিয়াছে তাহা বলিয়াছেন; বড়গিন্নি লোকের ভাল করে, লোকে তাহার মন্দ করে—এ কথাও বলিয়াছেন; রাঙ্গাদিদির তীর্থে মৃত্যু হবে, তাহাও বলিয়াছেন। গ্রামের সকল লোকেই প্রায় হাত দেখাইয়াছে; কেবল একটী মেয়ে মনের দুঃখেই মরিয়া আছে, সে আপনার ভবিষ্য-জীবনের শুভাশুভ আপনিই দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, কেবল সেই হাত দেখাইতে আসে নাই। পাড়ার মেয়েরা সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; তিনি বলিয়াছেন—সম্মুখে না আসিলে কাহারও কোন কথা বলেন না।

নিরুপমার জননীকে ঐ কথা সকলেই বলিয়াছে—"নিরুপমাকে লইয়া সন্ন্যাসীঠাকুরের কাছে একবার যাইতে পারিলে যদি তাঁর দয়া হয়, তাহলে নিরুপমার কপালের দোষ ঘুচ্‌লেও ঘুচ্‌তে পারে; ওঁরা মহাপুরুষ, ওঁদের কৃপায় না হয় কি?" তাই আজ কয় দিন পরে নিরুপমার জননী অনেক বলিয়া কহিয়া নিরুপমাকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসী-ঠাকুরের কাছে আসিয়াছেন। নিরুপমার অদৃষ্টে শেষ কি আছে জানিবার জন্য গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, রাস্তায় লোকাকার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্ন্যাসী এখন ধ্যানমগ্ন; সেইজন্য নিরুপমা, জননী-সঙ্গে রমণীমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া, মহাপুরুষের ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষা করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী একটী করতালি দিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; অমনি সমস্ত দর্শকমণ্ডলী গলায় কাপড় দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া "জিতা রহো" বলিয়া সকলের প্রতি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন।

সময় বুঝিয়া, স্ত্রীলোকেরা নিরুপমাকে লইয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর কাছে দাঁড় করাইল; বলিল—"ঠাকুর! এই দেখ—সেদিন আমরা এই মেয়েটার কথা বলেছিলাম। এর হাত দেখে বল দেখি—শেষ-কলে এর কপালে সুখ আছে, কি দুঃখ আছে?"

সন্ন্যাসী নিরুপমার মুখপানে চাহিলেন, তাঁহার দৃষ্টি যেন নিশ্চল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চাহিতে চাহিতে, বড় বড় দুইটী ফোটা তাঁহার গণ্ডোপরি গড়াইয়া পড়িল। তিনি অধীরভাবে মুখ ফিরাইলেন; একটী অন্য গ্রামের লোক নিকটস্থ আর একজনকে বলিল,—"সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভাবে বোধ হচ্ছে, এ মেয়েটার কপাল ভাল নয়।"

নিরুপমার জননী একটু কাতরভাবে বলিলেন,—"কেন ঠাকুর! মুখ ফিকুলে যে? তবে কি আমার মেয়ের অদৃষ্টে সুখ নাই?"

সন্ন্যাসী কথা কহিতে যান, অমনি যেন কণ্ঠ রোধ হইয়া যায়। দুই তিন বার চেষ্টার পর বলিলেন,— "কৈ, দেখি হাতখানা?"

নিরুপমা, সন্ন্যাসীর একটু দূরে বসিয়া; অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, হাতখানি বাড়াইয়া দিল। সন্ন্যাসী হাতখানি ধরিবা-মাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হইল।

অকস্মাৎ দর্শকমণ্ডলী দেখিতে পাইল—আর একজন জটাজুটাধারী সন্ন্যাসী, 'রোম' 'রোম' শব্দ করিতে করিতে, সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই মেঘগম্ভীরস্বরে, জিজ্ঞাসিলেন,"কেমন, তোমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে?"

নবীন সন্ন্যাসী, নিরুপমার হাত ছাড়িয়া দিয়া ব্যস্ত ভাবেউঠিয়া দাঁড়াইলেন, আভূমি শির নত করিয়া করযোড়ে বলিলেন,—"হাঁ প্রভো! পরীক্ষা শেষ হইয়াছে।"

"কি বুঝিতে পারিয়াছ?"

"সাধ্বীর প্রেম স্বর্গের ছায়া অপেক্ষাও সুশীতল।"

"সৌন্দর্য্য কোথায়?"

"সাধ্বীর হৃদয়ে।"

"তবে আর কেন—ব্রত উদ্‌যাপিত হউক।"

"তথাস্তু।"

"আমার নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলে, তাহা কখন দিবে?"

"যখন চাহিবে।"

"তবে আমি এখন চাই।"

এই বলিয়া, তিনি পার্শ্ববর্ত্তিনী নিরুপমার পানে চাহিয়া বলিলেন,—"দেখি! তোমার হাত?"

নিরুপমা আবার হাতখানি বাড়াইয়া দিল। তিনি নিরুপমার হাতখানি বামহস্তে ধরিয়া, দক্ষিণহস্তস্থ আপনার মস্তকস্থ জটা টানিয়া টান দিলেন; 'খস্' করিয়া সে কৃত্রিম জটা খুলিয়া পড়িল, সে কৃত্রিম শ্মশ্রুরাজি দূরে গেল, সকল লোক বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে চাহিয়া দেখিল—তিনি সেই মালঞ্চার "রাধাবিনোদ বাবু"। রাধাবিনোদ বাবু নিরুপমার হাত ধরিয়া নবীন সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ব্যোমকেশ! তুমি আজ এই সর্ব্বজনসমক্ষে তোমার দৃষ্টিশক্তি-লাভের পুরস্কার দান কর; যে অভাগিনী দুঃখিনী, যে স্বামীর একবিন্দু স্নেহ-ভালবাসা না পাইয়াও সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামীর শুভানুধ্যায়িনী, যাহার ম্লানমুখ—যাহার প্রতি অশ্রুবিন্দু প্রতিনিয়ত আমার হৃদয়ে শত শত বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছে, যাহার পবিত্র নামের উদ্দেশে আমার যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গীকৃত করিয়াছি, যাহার অসহ্য যন্ত্রণা চক্ষুর উপর দেখিতে না পারিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া মালতীপুর গিয়াছিলাম, সেই সরলা নিরুপমাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম; আমার আর কিছু প্রার্থনা নাই, তোমার হৃদয়ে যদি কিছুমাত্র স্নেহভালবাসা থাকে, তাহা এই সাধ্বীর হৃদয় ভরিয়া ঢালিয়া দাও।"

এই বলিয়া, নিরুপমার হস্তখানি নবীন সন্ন্যাসীর হস্তে দিলেন। নবীন সন্ন্যাসীরও সে জটাজুট দূরে গেল; মুহূর্ত্ত পরে সকলে দেখিতে পাইল, সেই সরোবর-তীরে, বিল্বমূলে, হস্তের উপর হস্ত দিয়া দাঁড়াইয়া—ব্যোমকেশ ও নিরুপমা!

নিরুপমা একেবারে এত আহ্লাদ সহ্য করিতে পারিল না। সে মূর্চ্ছিতা হইয়া ব্যোমকেশের বুকের উপর পড়িয়া গেল।

উপসংহার।

এখন ব্যোমকেশ গোকুলনগরে 'মাতুলদের বাটীর সম্মুখে সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছে। রাধামাধব বাবুর সন্তান-সন্ততি নাই; তিনি আপনার প্রায় লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি 'দানপত্র' লিখিয়া নিরুপমাকে দিয়াছেন; এবং তাঁহারই প্রযত্নে কলিকাতায় একটি হোসের মধ্যে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে ব্যোমকেশের একটি চাকরী হইয়াছে। নিরুপমা স্বামী-সোহাগিনী হইয়াছে, স্বামী-হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসায় অধিকার করিয়াছে; শৈশবে সে যে সকল সুখের স্বপ্ন দেখিত, এখন একটী একটী করিয়া সে সুখস্বপ্নগুলি সফল হইতেছে; এখন তাহার একটী কন্যা, দুইটী পুত্র। নিরুপমা অধিকাংশ সময় কলিকাতায় স্বামীর নিকট থাকে, মধ্যে মধ্যে গোকুলনগরের বাটীতে আসে। মাতুল মহাশয় ও রাধাবিনোদ বাবু উভয়েই সস্ত্রীক কাশীবাস করিয়াছেন।

একদিন ব্যোমকেশ কলিকাতার বাসার শয়ন-গৃহে শয়ন করিয়া একখানি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিল, বালিকা কন্যা সুষমা তাহার মাথার কাছে বসিয়া পাকা চুল অন্বেষণ করিতেছিল; কিন্তু না পাইয়া চুলের উপর সে বড়ই রাগ করিতেছিল। ব্যোমকেশ সংবাদ-পত্রে 'বিবিধ সংবাদ' পড়িতে পড়িতে দেখিতে পাইল—একস্থানে লেখা রহিয়াছে—

"মদনমঞ্জরী নামে একটা বেশ্যা খুন হয়;

তাহার পূর্ব্বনিবাস মাদ্রাজ-জেলার অন্তর্গত মালতীপুর গ্রামে ছিল। সে প্রথম যে লোকটার সহিত কলিকাতায় আইসে, সেই নাকি তাহার প্রেমে নিরাশ হইয়াই এই হত্যাকাণ্ড করে; গত কল্য হাইকোর্টের বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছে।

সেই সময় নিরুপমা আপন ছোট ছেলেটীকে কোলে লইয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ-মাত্র, ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া সংবাদপত্রের সেই স্থানটা নিরুপমার চক্ষুর উপর ধরিল। নিরুপমা, পাঠ করিয়া একটু হাসিয়া, ব্যোমকেশের হস্ত হইতে সেই কাগজখানি কাড়িয়া লইয়া, দাঁত দিয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিল।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমাপ্ত।

নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন।*

বিনোদ।—মানদে! দাঁড়াও, শুন, রহ একতিল;
প্রেয়সি! জীবন মম! মানদা সুন্দরি!

মানদা।—চমৎকার!

প্রমদা।—প্রাণ! হেন ব্যঙ্গ করিও না আর!

বিপিন।—বিনয়ে বিফল হলে, শিখাইব বলে।

বিনোদ।—বলে? তুই শিখাইবি বলে? প্রমদার
বিনয়ের সমতুল পরাক্রম তোর?
মানদে! তোমারি প্রেম আমার জীবন;
কৃত্রিম আমার প্রেম বলিবে যে জন,
তার রক্তে মম বাক্য করিব প্রমাণ।

বিপিন।—
আমার প্রেমের কাছে তুচ্ছ সেই প্রেম।
(মানদাকে চাহিয়া।)

বিনোদ।—
মিথ্যাবাদি! দেখা অঙ্গে প্রেমের প্রমাণ।

বিপিন।—দেখাইব আয়।

প্রমদা।—হায়! একি সর্ব্বনাশ!
(বিনোদের করধারণ।)

বিনোদ।—দূর হ'রে কালামুখি!

বিপিন।—নানা,—বিধুমুখি!
কেন কষ্ট পাও তুমি, ছাড় না উহারে?
হেন কাপুরুষ কভু, পারে কি এ রণে?
বীরত্ব মুখেই শুধু!

বিনোদ।—দূরহ! সরে যা, ছাড়, ছেড়েদে আমায়;
পিশাচি! ছাড়িব তোরে ভূজঙ্গেরমত!

প্রমদা।—কেন এ নিষ্ঠুর ভাব? কেন রূপান্তর,
বল প্রিয়তম?

বিনোদ।—তোর প্রিয়তম! তুই কাল কুরূপিণী,
ঘৃণিত ঔষধি, বিষ; দূরহ! ডাকিনী।

প্রমদা।—ছাড় এই ব্যঙ্গ আর!

মানদা।—ব্যঙ্গ তোমারি সকল।

বিনোদ।—বিপিন, রাখিব পণ তোমার সহিত।

বিপিন।—কি দৃঢ় বন্ধন তব! ইচ্ছা করে মম,
হইতে ঐরূপ বন্দি, দেয়াতে বিক্রম।

বিনোদ।—
তোর ইচ্ছা মারি আমি, অবলা রমণী;
যদিও তাহারে সত্য ঘৃণা করি আমি,
কিন্তু কোন কষ্ট দিতে পারিব না তারে।

প্রমদা।—ঘৃণার অধিক কষ্ট কি আছে জগতে?
ঘৃণিছ আমায় নাথ! কোন অপরাধে?

* সেক্সপীয়রের 'মিড সমার্স নাইট্স ড্রিমের' (A Midsummer Night's Dream) মর্ম্মানুবাদ—পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

আমি কি প্রমদা নহি? তুমি সে বিনোদ?
যেমন ছিলাম আমি, আছি ত তেমন!
এ নিশীথে কত ভাল বাসিলে আমায়;
এই নিশীথেই হায়! ছাড়িলে আমায়?
কেন? ক্ষম দেবগণ!

বিনোদ।—সত্য কথা বলি,
তোমায় দেখিতে আর নাহি মম সাধ।
ছাড় আশা, ত্যজ ভ্রম, ফিরে যাও ঘরে।
নিশ্চয় জানিও, তুমি ঘৃণিত আমার;
মানদা সুন্দরী মম প্রাণ-প্রণয়িনী।

প্রমদা।—ধিক কুহকিনী! ধিক নারী-কলঙ্কিনী!
ধিক তস্করিণী! তুই অসিলি নিশীথে,
হরিতে সর্ব্বস্ব মম প্রাণেশ-হৃদয়।

মানদা।—ভালরুখা! খেয়েছ কি শীলতা নারীর?
খেয়েছ লাজের মাথা? খাইতে কি চাহ—
আমার লাজের মাথা? নীচ-সম্ভাষণে
সম্ভাষিতে তোরে—রসনা বেদনা পায়!
দূর হ'রে পোড়ামুখি! নীচতার ছবি।

প্রমদা।—নীচতার ছবি? ওহো, বুঝিয়াছি আমি,
দু'জনের দেহ-ছায়া করেছ তুলনা!
ধর্ব্ব আমি, দীর্ঘাঙ্গিনী তুমি—বুঝিয়াছি,
তোমায় দীর্ঘাঙ্গ তার হরিয়াছে মন।
ধর্ব্ব আমি! সুসজ্জিত তালতরী তুমি!
তালগাছ! হও দীর্ঘ, নয়ন তোমার—
ছুঁইতে পারিবে তবু নখর-আমার।

মানদা।—দেখ, আমি তোমাদের পায়ে
পড়ি। তোমাদের রঙ্গকরতে ইচ্ছা হয়, কর;
কিন্তু ইহাকে আমায় আক্রমণ করতে দিও না।
রাগান্বিতে আমার বিদ্যা অল্প; আর আমি
ধর্ব্ব অবলা। সে যেন আমাকে মারে না।
তোমরা মনে কর্‌তে পার যে, সে কিছু বেঁটে,
সে আমার সঙ্গে জোরে পার্‌বে না।

প্রমদা।—বেঁটে! আবার শোন।

মানদা—প্রমদা, দেখ বোন, আমাকে একপ
গালাগালি দিও না। আমি তোমাকে চিরকাল ভাল
বেসেছি, কখনও তোমার কোন অন্দ করি নাই,
কখনও তোমার কোন কথা কাহাকে বলি নাই।
কেবল বিপিনকে ভালব্যাসি বলে, তোমাদের
এই বনে পালিয়ে আস্‌বার কথাটী তাকে মাত্র
বলেছিলাম। সে তোমাদের পশ্চাৎ এসেছে;
আর তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তার পশ্চাৎ এসেছি।
এসে, তার প্রতিফল পেয়েছি, মুখ খেয়েছি,
মার খেয়েছি, শেষে পদাঘাত পর্য্যন্ত হয়ে
গেছে। তা বোন, আমার মূর্খতা আমি মাথায়
ক'রে নগরে চল্‌লাম। তোমাদের পায়ে পড়ি,
তোমরা আর আমার পশ্চাৎ আসিও না।
দেখ, আমি কেমন সরল, প্রণয়ে বিহ্বল,
আমাকে আর জ্বালা দিও না।

প্রমদা।—যেতে হয়, যাও তুমি, কে রাখে
ধরিয়া?

মানদা।—অবোধ হৃদয়, যাহা যেতেছি
রাখিয়া!

প্রমদা।—বিনোদের কাছে?

মানদা।—নানা, বিপিনের পায়ে।

বিনোদ।—মানদে! তুমি প্রমদার ভয় করিও
না; তোমার কেশাগ্রও ছুঁতে পার্‌বে না।

বিপিন।—তুমি তাহার সারথি হইলেও
কোন ভয় নাই।

মানদা।—মা গো, প্রমদা যখন রাগে, তখন
যেন বুনো-বিড়াল। সে যখন পাঠশালায় পড়্‌তো,
তখনও একটী ক্ষুদ্র খেঁকশেয়ালি ছিল। এখনও
যদি ক্ষুদ্র, তবু ওতে বিষ কত!

প্রমদা।—আবার ক্ষুদ্র! কেবল ক্ষুদ্র, আর
খর্ব্ব! এ ভিন্ন আর কথা নাই! তোমরা কি
তাকে এরূপ ক'রে আমার নিন্দে কর্‌তে দেবে?
সর, আমাকে একবার ওর কাছে যেতে দেও,
আমি তাল-গাছটা একবার মেপে নিই।

বিনোদ।—তুই এক পা এগোবি, আমি

অমনি তোকে পোকাটির মত ডলে মার্‌বো।

বিপিন।—দেখ, যে তোরে ভালবাসে না, তার খোসামুদি করে কি ফল? আর "মানদা,মানদা" করিস্ না। আবার মানদার নাম মুখে আন্‌বি, তবে তার প্রতিফল পাবি।

বিনোদ।—কি তোর হাতে প্রতিফল? চল, মানদাতে কার্ অধিকার বেশী—অস্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করি!

বিপিন।—চল মাখনলাল! কীচক-বধ দেখ্‌বে।

(বিপিন এবং বিনোদের প্রস্থান।)

প্রমদা।—সর্ব্বনাশি! তোরই জন্যে এই আগুন জ্বল্‌ল। পালাস-নে।

মানদা।—তোর কাছে আমি আর থাক্‌ব না। তোর হাত দু'খানি বিজলি-বেগে চলে; আমি তোর কাছে পার্‌ব না। আমি চল্‌লাম।

(প্রস্থান।)

প্রমদা।—আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—এ কি হলো!

(প্রস্থান।)

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

প্রাণ-কথা।

কেউ কারো নয়।

আমি কেন কাঁদি? কাহার জন্য কাঁদি? এ সংসারে কে আমার? কেন ভাবি—আমার আমার? আমার ত কাহাকেও দেখি না! আমার জন্য যাহার প্রাণ কাঁদে—এমন ত কাহাকে দেখি না! আমি প্রাণ-বিনিময়ে কাহাকে ত পাই নাই! তবে কেন কাঁদি? কাহার জন্য শোক করি? প্রাণ দিলেও যক্ষ্মা কাহাকে পাওয়া যায় না, তখন 'আমার আমার' করিয়া কেন মরি? আমার মত ভ্রান্ত বা উন্মাদ-গ্রস্ত ত আর কাহাকে দেখি না! সবই জানিতেছি—সবই বুঝিতেছি, তথাপি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না কেন? এ জগতে আমার কেহ নাই—ইহা ভাবিতে প্রাণ ফাটিয়া যায় কেন? ভালবাসার সামগ্রী কাছে না থাকিলে বা কাছে না আসিলে—প্রাণের ভিতর দাবানল চিতা জ্বলে কেন? এ দুর্ব্বলতা কেন? সংসারের ভালবাসা সমস্তই বঞ্চনালয়ের অভিনয় মাত্র জানিয়াও, আমার প্রাণ-পিপাসা মিটে না কেন? পরের প্রাণের জন্য আমার প্রাণ পাগল হয় কেন? যাহাকে ভালবাসি, তাহার প্রাণে আমার প্রাণ নিত্যযুক্ত হউক—এ ইচ্ছা বলবতী হয় কেন? প্রাণের হাটে প্রাণ কিনিতে গেলে অর্থ চাই জানিয়াও, নিধনের প্রাণ কিনিতে বাসনা কেন? এ মোহ কেন? এ বিড়ম্বনা কেন? যদি প্রাণ কিনিতে ইচ্ছা হয়, ত অগ্রে লক্ষ্মীর আরাধনা করিতে হইবে—লক্ষ্মী প্রসন্না না হইলে প্রাণ পাইব না জানিয়াও, লক্ষ্মীর আরাধনা না করিয়া, প্রাণের অনুসরণ করি কেন? আমি যাহাদিগকে ভালবাসি, যাহাদের প্রাণ-মন্দিরে আত্মপ্রাণ বলি দিয়াছি—আমি তাহাদিগের অনুসরণ করিতে যাই, আর তাহারা আমায় দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা আকুঞ্চন করিয়া পলায়ন করে। কারণ, তাহারা প্রাণ বলি চায় না—লক্ষ্মীর প্রসাদ চায়। আমি লক্ষ্মীর পূজা করি নাই—সুতরাং তাঁহার প্রসাদ কোথায় পাইব? সকল দেবতা ফেলিয়া অগ্রে তাহাদের পূজা করিয়াছি—একমাত্র পূজোপকরণ আত্ম-প্রাণ তাহাদের নিকট বলি দিয়াছি—সুতরাং অন্য দেবতার পূজা করিব কি দিয়া? এ কথা রাধি-

লেও—এ কথায় বিশ্বাস হইলেও, তাহারা আমার দিকে কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করে না; আমাকে পদদত দাস বলিয়া ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে। বেশ্যালয়ে বেশ্যাচরণে উৎসর্গী-কৃত ধন-মান-প্রাণ বিশ্বমঙ্গলের একদিন যে দশা ঘটিয়াছিল, এ সংসারেই প্রেমিকের দশা প্রতি নিয়তই সেই-রূপ ঘটিতেছে। যে ভালবাসে, তাহাকে অতি অমলোকেই ভালবাসে। যে অগ্রেই ভাল-বাসার সামগ্রীর নিকট আত্মপ্রাণ বলি দেয়, তাহার আর গৌরব থাকে না। সে তখন দরি-দ্রের ন্যায় ঘৃণার পাত্র—কারণ, তখন তাহার আর দিবার কিছুই থাকে না। এ সংসার নিরন্তর আশাচক্রে ঘুরিতেছে। যতক্ষণ আশা, তত-ক্ষণ সংসর্প পশ্চাদনুসরণ করিয়া থাকে; আশা নাই দেখিলেই—অমনি ফিরিয়া দাঁড়ায়।

এইজন্য দাতা অপেক্ষা কৃপণের আদর বড়। দাতা সমস্ত দান করিয়া ফেলিলে, তাঁহার নিকট আর ভিক্ষুক যায় না। পূর্ব্ব-দানের স্মৃতি শীঘ্রই বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন তাঁহাকে চোষিত ইক্ষুদণ্ডখণ্ডের ন্যায় মনে করিয়া, রস-লোলুপ-ব্যক্তিগণ পদদলিত করিতেও ঘৃণাবোধ করে! অপহৃত-মধু মধুচক্রের আদর কোন্ মধু-কর করিয়া থাকে? কিন্তু বদ্ধমুখ মধুপূর্ণ মধু-কলসের চতুর্দ্দিকে ভ্রমরগণ উন্মত্ত হইয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। কিছু পাইতেছে না, পাইবার আশা নাই—অথচ সমস্ত দিন তাহারা সেই মধুপূর্ণ কুম্ভের চতুর্দ্দিকে গুন্‌গুন্-রবে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিবে। ধনর্ণিগণ কৃপণের স্তুতিবাদ করিয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া সায়াহ্নে হতাশ হইয়া প্রতিদিন গৃহে ফিরিবে, তথাপি ভক্তচূড়ামণি বিদুরের আলয়ে গিয়া তণ্ডুলকণা ভিক্ষা করিবে না। শিব-কৃষ্ণ না হইয়ে, দুর্য্যো-ধনের অনুপম আতিথ্য পরিত্যাগ করিয়া, বিদুরের গৃহে আর কে খুদ খাইবে? সংসারাতীত না হইলে প্রাণের মূল্য আর কে বুঝিবে? সংসারী প্রাণ চায় না, ধন চাহে! সুতরাং আমি সংসারীর নিকট প্রাণের বিনিময়ে ঘৃণা, উপেক্ষা ও অনা-দর ভিন্ন আর কিছুই আশা করিতে পারি না। ইউরোপীয় সভ্যতায় দীক্ষিত ব্যক্তি প্রাণ-বলি চাহে না,—ধন চাহে, অন্নবস্ত্র চাহে, বিলাসিতা চাহে। যে তাহার সেই সেই অভাব মোচন করিতে পারিবে, সে তাহার নিকট প্রাণ বাঁধা রাখিতে প্রস্তুত আছে। সে প্রাণ চাহে না, প্রেম চাহে না; চাহে—ধন ও ধনলভ্য অন্নবস্ত্র ও বিলাস-সামগ্রী। যদি সেই ধন উপার্জ্জন করিতে পার, ত সকলই তোমার। নতুবা-সংসারে 'কেউ কারো নয়'। ধনহীন পুত্র—পিতামাতার নিকটেও অনাদৃত। ধনহীন স্বামী—রমণীর চক্ষুঃ শূল। ধনহীন পিতামাতা—সন্তানের ঘৃণার পাত্র। প্রভু ধনহীন হইলে, দাসদাসী তাহাকে পরিহার করে—আত্মীয়স্বজন ক্রমে ক্রমে সকলেই তাহাকে ফেলিয়া পালায়। তাই বলিতেছিলাম —সংসারে কেহ কাহারও নহে। এখন, ধনই জগতের একমাত্র নিয়ন্তা।

যদি তুমি সংসারে ভালবাসা চাও—খ্যাতি-প্রতিপত্তি চাও—তবে ঐকান্তিক-মনে কমলার উপাসনা কর। এখন সকল দেবতা, কমলা দেবীকে সিংহাসন দিয়া, সরিয়া পড়িয়াছেন। আমাদের সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া—সেই রাজ-রাজেশ্বরী বিষ্ণুমনোমোহিনীর চরণতলে সিংহা-সনে আসীন হইয়া, ধরাধামের শাসন ও পালন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। কমলার মহিমা প্রচার করাই তাঁহার ও তদধীন কর্ম্মচারিগণের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং মন! তুমি যদি এ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাও, তবে যেন তেন প্রকারেণ কমলার পূজা কর। কমলা প্রসন্না হইলে সকলেই তোমার আপনার হইবে—গৃহে ভাল-বাসা ও বাহিরে সম্মান পাইবে। আর যদি

তাহা না করিতে চাও, সংসার হইতে সরিয়া পড়—কারণ, এখানে শুন বিনা কেহ কাহারও নহে। নিত্য নৈমি, একমাত্র সখা—নিত্যনিরঞ্জন! যদি কর্ম্মনাপার্জ্জনে স্পৃহা না থাকে, তবে সময় থাকিতে সেই নিত্যনিরঞ্জনের শরণাপন্ন হও—ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইবে, এবং এক ফলের পরিবর্ত্তে চতুর্ব্বর্গ ফল করতলে পাইবে। তোমার একমাত্র সম্বল প্রাণের বিনিময়ে তুমি মানব-দুর্ল্লভ মুক্তিফল লাভ করিবে। ধর্ম্মার্থকামের বাসনা মিটাইয়া অন্তিমে বিদেহ-মুক্তি পাইবে। নিত্যনিরঞ্জনে বিলীন হইয়া সর্ব্বদুঃখের নিদান পুনঃপুনঃ আবর্ত্তনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। মন! এমন সুগম পথ থাকিতে তুমি কেন সংসারের স্বার্থ দূষিত হাটে প্রাণের ব্যাপার করিতে যাও? ফের—আর বিলম্ব করিও না—চল, নিত্যনিরঞ্জনের চরণে প্রাণ বলি দিয়া এ সাধের মানব-জন্ম সফল করি—আর যাহাতে এ ভবে না ফিরিতে হয়, তাহার উপায় করি। এস—আর বিলম্ব করিও না—বেলা গেল—জীবন-রবি অস্তমিতপ্রায়—এস, আর সংসারের হাটে ব্যাপারে কাজ নাই!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

উপায়ন।

(কোন প্রিয়বন্ধুর নব-পরিণয়-উপলক্ষে লিখিত।)

(১)

বসন্তে বাসন্তী হাসে,
দিগ্বধূ আনন্দে ভাসে,
মঞ্জুল বঞ্জুল 'পরি নব কিশলয়;'
কোকিলের কুহরণে,
কুসুমিত উপবনে,
গানে আর পরিমলে ভাসিছে মলয়!

(২)

মনোমদ শশধরে,
কি মোহ কি সুধা ক্ষরে,
প্রেমিক চকোর উর্দ্ধে উড়িয়া বেড়ায়!
অনুরাগে প্রাণলীন,
বসন্ত-যোগের দিন,
হৃদয় মনের-মত হৃদয়ের চায়।

(৩)

প্রণয়-প্রতিভা-মালা,
কোমল নলিনীবালা,
চতুর্দ্দশ বরষের মাধুর্য্যের রাণী!
উষাটি সৌন্দর্য্য-স্তর,
লাবণ্যের মণিঘর,
সরমে সখীরে কয় মরমের বাণী।

(৪)

দুটী অনুরাগময়,
পরাণের পরিণয়,
প্রণয়ের অপার্থিব স্বর্গীয় মিলন।
পরশের সৌদামিনী,
চাহনির বিকাশিনী,
চির-মন্দারের গন্ধ করুক বর্ষণ।

(৫)

প্রণয়ের মোহ ল'য়ে,
থাক সখা মত্ত হয়ে,
নলিনী তোমার হোক সাবিত্রীর ছবি।
উজল রসের গান,
গাও সখা খুলে প্রাণ,
আশীর্ব্বাদ করে আজ ভগ্ন-প্রাণ কবি।

(৬)

বাসরের কুসুমিত,
সুখস্বপ্নে বিভাসিত,
পরাণের আখ্যায়িকা থাকুক নূতন!
প্রেমের প্রথম দান—
কপোলের মধুপান,
করুক প্রাণের মাঝে স্বর্গ-বিগঠন।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

মতামত।

কঙ্কাবতী।—উপন্যাস—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। নায়ক-নায়িকার ভালবাসা না থাকিলে যেন উপন্যাসই হয় না—বাঙ্গালার অধিকাংশ উপন্যাস-লেখকের লেখায় এই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং বালকবালিকার পড়িবার উপযোগী উপন্যাস বাঙ্গালায় বিরল। ইংরাজীতে যেমন 'রবিন্‌সন্ ক্রুশো', 'ডন্‌কুইক্‌সোট' প্রভৃতির কাহিনী বালক-বালিকার কৌতূহল-উদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ, মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'কঙ্কাবতীকে' কতকটা সেই ছাঁচে গড়িয়াছেন। ইহাতে সরল সুন্দর ভাব আছে—অথচ ঠাকুরমা ঠাকুর-দাদার গল্প; গড়িতে কৌতুকপ্রদ, অথচ বুঝিলে বুঝিবারও বিলিম কম নহে। তবে আরও একটু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-শূন্য ও সহজবোধ্য হইলে, যেন আরও উপযোগী হইত; ভরসা করি, সংস্করণান্তরে তদ্বিষয় পরিলক্ষিত হইবে।

বৃন্দেলাবালা।—উপন্যাস।—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত। এই উপন্যাসের গল্পটী কৌতূহলপ্রদ; স্থানে স্থানে বিশেষ লিপি-চাতুর্য্যও লক্ষিত হয়। তবে ভাষা ও বর্ণশুদ্ধির প্রতি গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিত। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার ১৩ ছত্রের মধ্যে প্রায় ১০টী বর্ণাশুদ্ধি আছে; এবং 'অক্ষময় চালান' প্রভৃতি বাক্য চালান হইয়াছে; বিরাম-ছেদের প্রতি লক্ষ্য প্রায়ই নাই। অম্বিকা বাবু 'আমাদের' একজন হিতৈষী ও লেখক; তাঁহার মত ব্যক্তির কেন এ উদাসীনভাব, বুঝিতে পারিলাম না।

ভারত-দর্পণ।—১ম খণ্ড।—শ্রীযুক্ত রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। "মাননীয় ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের অনুমতি-অনুসারে এই গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে ভারতবর্ষের দেশ, জনপদ, নগর, নদ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতির প্রাচীন ও আধুনিক নাম ও তৎসমুদয়ের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিবরণ, সার ডব্‌লিউ ডব্‌লিউ হণ্টার, থরণ্টন, কনিংহাম ও অন্যান্য অনেক পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় গ্রন্থকারদিগের দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।" সংক্ষেপতঃ ইহা—"Encyclopedia of India in Bengali"—বাঙ্গালাভাষায় ভারতবর্ষের 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া'। সুতরাং, সম্পূর্ণ হইলে, এ গ্রন্থের উপযোগিতার বিষয় আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। রাধিকারমণ বাবু উদ্যমশীল ও সদস্তঃকরণ-সম্পন্ন ব্যক্তি; তাঁহার হস্তে এরূপ গুরুতর কার্য্যের সম্পূর্ণ সফলতার আশা করা যায়। এক্ষেত্রে তাঁহার এ শুভ-অনুষ্ঠানে, সকলেরই সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আলোচনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা।—বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলন জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, বাঙ্গালী মাত্রেরই তাহাতে সুহানুভূতি থাকা কর্ত্তব্য—সাহিত্য-সেবী আমাদের তো আছেই। 'বাঙ্গালায় তেমন চিন্তাশীল পুস্তক নাই' বলিয়া যাঁহারা আপত্তি করেন, তাঁহাদের চক্ষুর উপর সেরূপ পুস্তক এখন

অনায়াসে ধরিয়া দেওয়া যাইতে পারে—বাঙ্গালা ভাষা ক্রমশঃ এতই উন্নতি-পরায়ণা। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের "নিভৃত-চিন্তা"—ভাষায় বলুন, ভাবে বলুন—সন্দর্ভ-বিষয়েই প্রবেশিকার উপর-স্তরে নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য। কবিতা-বিষয়ে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ', হেম বাবুর 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতি অতুলনীয়। এতদ্ভিন্ন, বঙ্কিম বাবু, রজনী বাবু, শিবনাথ বাবু, বীরেশ্বর বাবু প্রভৃতির বিবিধ-বিষয়ক রচনা হইতে ও প্রাচীন কবিতা প্রভৃতি হইতেও ওরূপ গ্রন্থ-বহুল সঙ্কলিত হইতে পারে। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীর সে যুক্তি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। তবে একটা যুক্তি অনেকটা সমীচিন—বাঙ্গালা ভাষা যখন সংস্কৃত ভাষার ভিত্তির উপর স্থাপিত, তখন সে মূলচ্ছেদের চেষ্টা করিয়া উপরে উঠিবার যত্ন করা ঠিক নহে। এজন্য কেহ কেহ বলেন,—"বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত হউক—অথবা উক্ত পরীক্ষায় অন্ততঃ একবেলা সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক হইতে প্রশ্ন হউক, আর একবেলা বাঙ্গালা রচনা ও অনুবাদের নিয়ম হউক; এবং বি-এ পরীক্ষায় পাশকোর্সে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত হউক ও অন্যর কোসে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সহিত বাঙ্গালা রচনার নিয়ম হউক।" এ প্রস্তাব অসঙ্গত নহে। মূল সংস্কৃত একেবারে উঠাইয়া দিলে, ভিত্তি শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা; সংস্কৃতের উপর যখন বাঙ্গালা সংগঠিত, তখন এরূপ একটা বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। তবে যাঁহারা গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সকল বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষা চালাইবার প্রস্তাব করেন ও কেবল সাহিত্য-হিসাবে ইংরাজীকে স্থান দিতে চাহেন, তাঁহাদের অন্তর ও অভিপ্রায় উচ্চ হইলেও,তাহার সময় এখনও বহুদূরে। রাজার প্রাধান্যে ভাষার প্রধান্য; মুসলমানরাজা উর্দ্দুর পক্ষপাতী ছিলেন, হিন্দু-রাজা সংস্কৃতের সমাদর করিতেন; সুতরাং ইংরাজীকে অবনমিত রাখিয়া, সে প্রাধান্য যে বাঙ্গালার উপর প্রদত্ত হইবে—এ আশা বৃথা। বিশেষ, দেশকালপাত্রক্রমে যখন ইংরাজী না শিখিলে চলে না, ব্যবসা-বাণিজ্য কথাবার্ত্তা সর্ব্বত্রই যখন ইংরাজীর আবশ্যক, তখন ইংরাজীকে স্থানভ্রষ্ট করিলে মন্দ ফলেরই সম্ভাবনা। কালের প্রভাব সহিতেই হইবে—বৃথা আকাশ-কুসুম ধরিতে গিয়া, শেষে এ পুত্তার কুসুমকেও হারাইতে না হয়—সর্ব্বদা ইহাই স্মরণ রাখা উচিত।

বাঙ্গালীর অভাব ও অবস্থা।—লেখক, তার্কিক, পণ্ডিত বা ধার্ম্মিক—ইহাঁদের মত ভিন্ন হইতে পারে; গভীর গবেষণা গুণে, বাঙ্গালী জাতির অভাব ও অবস্থার সুন্দর সুন্দর নানা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়াও অসম্ভব নহে; কিন্তু ক্ষুদ্রমস্তিষ্কসম্পন্ন আমাদিগকে যদি এ প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমরা তদ্মুহূর্ত্তেই এক কথায় তাহার উত্তর দিতে পারি—বাঙ্গালীর আর কিছুরই অভাব নাই—যা কিছু অভাব অন্নবস্ত্রের। এ উত্তর দিবার জন্য আমাদিগকে মস্তিষ্ক ঘামাইতেও হয় না, চিন্তা করিতেও হয় না; নিত্যপ্রত্যক্ষ যে ঘটনা,সহস্র সহস্র দিন ধরিয়া চিন্তা করিলেও, তুমি আর তার নূতন কি বলিবে ভাই? উদরে অন্ন নাই—পেটে-পিঠে এক হইতেছে; আমি আর বীরত্বের ছটা দেখাইব কোথা হইতে? গৃহে আমার পুত্র-পরিবার—অনশনে অস্থির প্রাণ; আমি স্বদেশ-উদ্ধারে যোগ দিই কোন্ প্রাণে? অভাবে-অনাটনে রাজধর্ম্মে সমাজপীড়নে আমার গৃহধর্ম্ম অরক্ষিত; আমি আর ধার্ম্মিক হইব কোথা হইতে? সুতরাং অগ্রে আহার-আচ্ছাদন, পরে অন্য যা-কিছু বল। পেট না পুরিত থাকিলে কিছুই বিশ্ব

নয়। অভাবের সার অভাব—অন্ন-বস্ত্রের। মুসলমান-লীর সেই অভাবেই—আর সব অভাব। সুতরাং অভাব ও অবস্থার কথা পাড়িলে,আগেই নিজের উদরের দিকে নজর পড়ে। দেখ—আগে সেই অভাব কিসে যায়? দেশোদ্ধারের চেষ্টা, বৈদেশিক বাণিজ্যের চেষ্টা, সাহিত্যোন্নতির চেষ্টা—সব চেষ্টা হইবে ভাই, আগে এই চেষ্টা কর। ভাব—কি হইলে বা কি করিলে, নিজ প্রাণ-পরিজন রক্ষিত হইতে পারে?

যুদ্ধ-বিগ্রহ।

চীন-জাপানীয় যুদ্ধ।—গত ১২ই ডিসেম্বর 'আণ্ট' নামক স্থানে জাপানীগণ চীনদিগকে আক্রমণ করে। তৎপর দিন উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম বাধে। সে যুদ্ধে চীনগণ জয়লাভ করে এবং জাপানীরা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তৎপরে, ১৪ই ডিসেম্বর, জাপানীরা 'ফুঙচঙ' আক্রমণ করে; প্রায় ৪ সহস্র চীন-সেনা সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল; কিন্তু যুদ্ধে চীনেরাই পরাজিত হয়। যুদ্ধে চীনদিগের ৪টী কামান জাপানীদের হস্তগত হইয়াছে; এবং জাপানীদিগের প্রায় ৫০ জন সৈন্য হত ও আহত হইয়াছে। ১৫ই তারিখেই সংবাদ, জাপানীরা ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ ৫ কোটী ডোলার (প্রায় ১০ কোটী টাকা) পাইলে এখনও যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে। পিকিন-রক্ষার জন্য চীন-গভর্ণমেণ্ট আর বিদেশীয় সৈন্যের উপর ভার দিবেন না,স্থির করিয়াছেন; এখন হইতে গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং পিকিন-রক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন এবং তজ্জন্য দায়ী থাকিবেন। ১৮ই তারিখের সংবাদ, একদল জাপানীসৈন্য পূর্ব্বদিক হইতে 'নিউচাং' সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছে এবং আর একদল দক্ষিণদিক হইতে অগ্রসর হইতেছে; ক্রমেই উহারা দলপুষ্ট করিতেছে। চীন-জাপানের যুদ্ধ-মীমাংসায়, মধ্যস্থকারিণণ পিকিনে বিদেশিক জাহাজ প্রবেশের ক্ষমতা প্রার্থনা করেন; কিন্তু চীন-সম্রাজ্ঞী 'কং' তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। ইহার পরে আরও দুইটী স্থান জাপানীদের অধিকারে আসার সংবাদ আসিয়াছে।

ফরাসী-মাদাগাস্কারের যুদ্ধ।—বিলাতের 'টাইমস'-পত্রে পারিসের সংবাদদাতা 'টেলিগ্রাফ' করিয়াছেন, মাদাগাস্কারের রাণী 'রাণা-ভালোনা' ফরাসীদিগের সকলরূপ সর্ত্তে সম্মত হইয়া সন্ধি-স্থাপনায় স্বীকৃত হইয়াছেন। সংবাদদাতার আশঙ্কা, সন্ধি স্থায়ির হওয়া পর্য্যন্ত, বোধ হয় 'আণ্টানানারিভোয়' ফরাসী-সেনার আধিপত্য-রক্ষার চেষ্টা হইবে। কল্যকার 'টেলিগ্রাফ' আবার—ঠিক বিপরীত; রাণী সর্ত্তে সম্মত হন নাই,এবং দেশবাসিগণ তাঁহার উৎসাহে পূর্ব্ববৎ সৈন্যদলের পুষ্টিসাধন করিতেছে।

ওয়াজিরি-ইংরাজে যুদ্ধ।—ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে 'মসুদ' প্রদেশে 'ওয়াজিরি' নামক পার্ব্বত্য-জাতির বাস। 'মোল্লা পাওইণ্ডা' ঐ দুর্দ্দান্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিনায়ক। অনেক দিন হইতে ঐ জাতি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে নানারূপ অত্যাচার করিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে দস্যুরূপে ইংরাজদিগের অনেক 'ছাউনী' লুট করিত। এ বিষয় উহাদিগকে জানাইয়া সাবধান হইতে বলা হয়; এবং তাহা না হইলে তাহাদিগকে দমন করা হইবে—এরূপ আভাস দেওয়া হয়। পার্ব্বত্য-জাতি কিন্তু ইহাতেও সঙ্কুচিত বা ভীত হয় নাই; বরং তাহাদের দলপতি, ইংরাজপক্ষের সেনাপতি স্যর উইলিয়ামকোলকাটকে স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়াছে যে, 'ইংরাজ আগে যেন সংবাদ দেন, তাহারা যুদ্ধের

জন্য প্রস্তুত থাকিবে।' এরূপ উত্তরে, বড়লাট বাহাদুর অগত্যা সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন। এরূপ অত্যাচার—এরূপ দম্ভ দমন জন্য, চারিদিক হইতে সৈন্যদল প্রেরিত হইতেছে। দুই এক স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। দস্যুদলের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে দুই এক স্থলের টেলিগ্রাফের তার তাহারা কাটিয়া দিতেছে, এবং অলক্ষিতে লুটপাট করিতেছে; সম্মুখে অতি অল্পই অগ্রসর।

তুরস্কের উপদ্রব।—আর্ম্মেনিয়া উপকূলে ইংরাজদিগের প্রতি তুরস্ক-সেনার দুর্ব্ব্যবহার হয়। এজন্য, তুরস্ক-সম্রাটের অভিমত মত গ্রেট ব্রিটেন, রুসিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় দোষাদোষ বিচার হইবে। আপোষের সম্ভাবনা।

শোক-তাপ।

সুহৃদ্-বিয়োগ।—গত পূর্ব্ব-শুক্রবার রাত্রিতে পরম-সুহৃদ (লাহিড়ী এণ্ড কোং হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ের স্বত্বাধিকারী) ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল-মৃত্যুতে—কেবল আমরা নহি—দেশও একটী রত্ন-হারা হইল। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৬ হইয়াছিল। নিজের সামান্য অবস্থা হইতে, ধীরে ধীরে, তিনি উন্নত-পদে আরোহণ করিতেছিলেন; ইতিমধ্যেই কঠোর কাল তাঁহাকে গ্রাস করিল। দেশের সকল সদনুষ্ঠানে, তিনি একজন অকপট অনুরাগী ছিলেন। হোমিওপ্যাথি—তাঁহারই চেষ্টায় এদেশে এতটা বিস্তৃত; কংগ্রেসে তাঁহার সমূহ সহানুভূতি; বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার নিকট মাতৃরূপে পূজিত। তাঁহার এই অকাল-বিয়োগে অনেক আশা-ভরসার লোপ পাইতে চলিল।

অন্যতর।—ঐ দিনই, একই শ্মশানে, বন্ধুমাতার আর একটী সুসন্তান, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল। ইনি অতি অমায়িক উক্তঅন্তঃকরণের লোক ছিলেন। 'ওরিয়েণ্টাল সোমিনারী' স্কুলের সেক্রেটারী, 'বেঙ্গলী'-পত্রের সম্পাদক, ঠাকুর-ষ্টেটের ম্যানেজার বলিয়া এবং বিবিধ সদনুষ্ঠানে ইনি খ্যাতাপন্ন। বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল।

বিবিধ।

কাপড়ের উপর কর-ধার্য্য।—বিলাতী কাপড়ের দর বাড়িতে চলিল। এত দিন মাঞ্চেষ্টারের বণিকদের নিকট হইতে কাপড়ের উপর কর লওয়া হইত না। 'অন্যান্য সব জিনিসের উপরই আমদানী-কর লওয়া হয়, উহার উপর না হয় কেন?'—কাহারও কাহারও এরূপ মর্ম্মবেদনা দেখিয়া,গভর্ণমেণ্ট তাহাও আর ছাড়িলেন না; আগামী জানুয়ারী মাস হইতে ঐ শুল্ক গৃহীত হইবে। বোম্বের কলওয়ালারাও তাহা হইতে অব্যাহতি পাইলেন না; তাঁহাদিগকেও ঐ হিসাবে কর দিতে হইবে। ফলতঃ, যে দিক হইতেই হউক, আমাদের উপর আর একটা নূতন কর বাড়িল।

সদ্ভাব স্থাপন।—রুসিয়ার নবসম্রাট এক্ষণে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সহিত বিবিধপ্রকারে সদ্ভাব-স্থাপনার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। জানি না, অন্তরের কি অভিসন্ধি।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধানী

অষ্টম বর্ষ। | ১৩ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩১। | ত্রয়োস্ত্রিংশ সংখ্যা

প্রাণ-কথা।

যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।

ওঁ মা ব্রহ্মময়ী! তোমার অপার লীলা বুঝে, সাধ্য কার? তুমি মা অঘটনঘটনকারিণী মায়াবিনী কুহকিনী অলৌকিকী শক্তি। জগতের সকল কার্য্যেরই নেত্রী তুমি। ইচ্ছাময়ী! তোমার ইচ্ছা ব্যতীত কোন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। আমরা তোমার সন্তানগণ, তোমার ইচ্ছায় চালিত হইয়া—তোমার ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া থাকি। পুত্তলী-নর্ত্তকের করায়ত্ত তার-সংলগ্ন পুত্তলীগণ যেমন নর্ত্তকের ইচ্ছামত কখন নাচে, কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন ধান করে, কখন সশর, খোরস্বর রণে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর মারামারি-কাটাকাটি করিয়া ভূতলশায়ী হয়, অথচ আপনারা কর্ত্তা নহে; তোমার-সন্তানগণের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। তবে এইমাত্র পার্থক্য যে, পুতুল নাচের পুতুলগুলি কখন ভাবে না—কারণ তাহাদের ভাবিবার শক্তি নাই যে, তাহারা কর্ত্তা। কিন্তু আমরা ভাবি যে,—আমরাই কর্ত্তা; এ জগৎ আমাদিগেরই ইচ্ছা-শক্তিতে চলিতেছে। আমরা ইহাকে ভাঙ্গিতেছি, গড়িতেছি; কাহাকে আপন ইচ্ছামত রাখিতেছি, কাহাকে বা মারিতেছি, কাহাকে ভালবাসিতেছি, কাহাকে বা ঘৃণা করিতেছি; কখন বা শান্তিতে থাকিতেছি, কখন বা সমরাঙ্গনে প্রবৃত্ত হইতেছি; সঙ্ঘে-পতঃ যখন যাহা ইচ্ছা হইতেছে, তাহাই করিতেছি। কিন্তু ভ্রান্ত আমরা, জানি না যে, মায়ের সন্তান মায়ের ইচ্ছা ব্যতীত একপাদ অগ্রসর হইতে পারে না। জড়জগৎ যখন মায়ের ইচ্ছায় পরিচালিত হইতেছে—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত যখন নিরন্তর মায়ের আদেশ-প্রতিপালন করিতেছে, তখন চৈতন্যময়ী মার অঙ্গীভূত ক্ষুদ্র চৈতন্যগুলিও যে মায়ের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতেছে না, কে বলিতে পারে? যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি জানেন যে, জীবদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—সুতরাং স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিও নাই। তিনি জানেন যে, জনক-জননী ও-সন্তান একই ইচ্ছাসূত্রে সংগ্রথিত। এই চিরন্তী মালার নিম্নে পিতা, উর্দ্ধে

মাতা—দুইধারে মালাকারে সন্তানগণের চিন্ময় মুণ্ডমালা। দশাননের দশমুণ্ড যেমন তাঁহার দেহের উপর দশদিকে বিরাজিত ছিল, আমাদিগের মাতাপিতার চিন্ময় দেহের দশদিকে সেই সন্তানগণের চিন্ময় মুণ্ডমালা মালাকারে বা চক্রাকারে তাঁহাদের দেহের সহিত সংলগ্ন হইয়া তাঁহাদের দেহের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ দেখ, নৃমুণ্ডমালিনী মা আমার মুণ্ডমালায় বিভূষিত হইয়া নৃ-অস্থিমালা-পরিশোভিত পিতার বক্ষদেশে দণ্ডায়মান হইয়া জগৎকে দেখাইতেছেন—সন্তানকে শিখাইতেছেন—'এই দেখ, তোমাদের দেহ আমার কুক্ষিগত! তোমাদের মুণ্ডমালা আমার বক্ষে বিলম্বিত—তোমাদের অস্থিমালা তোমাদের পিতার কণ্ঠভূষণ—তোমাদের শরীরের অন্যান্য অংশের ভস্ম তোমাদের পিতার অঙ্গরাগ। তোমাদের সর্ব্বস্বই যখন আমরা হরণ করিয়াছি, তখন তোমরা আর কেন বল যে, তোমরা আমাদিগ হইতে স্বতন্ত্র। সন্তানপিপাসা মিটাইবার জন্য তোমাদের অস্থিমালা ও মুণ্ডমালা মাত্র স্বতন্ত্র রাখিয়াছি, কিন্তু কালে তাহাও কুক্ষিগত করিব। লীলা সাঙ্গ হইলেই তোমাদিগকে লয় করিয়া আমরা দু'জনেও উভয়ে লীন হইয়া ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে পরিণত হইব। আবার যে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলাম, তাহাই হইব।'

মায়ের এই গুরুগম্ভীর বাক্য যাঁহার কর্ণকুহরে একবার প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি আর আপনাতে আপনি নাই। তিনি এ সংসারে ফিরিতেছেন, ঘুরিতেছেন, কাজকর্ম্ম করিতেছেন—সত্য, কিন্তু তিনি আপনার অস্তিত্ব আর বুঝিতে পারেন না। পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত রোগীর যেমন দূষিত অঙ্গের অস্তিত্বজ্ঞান ক্রমে লোপ হইয়া যায়, এরূপ ব্যক্তিরও ব্যক্তিত্ব-জ্ঞান তখন লোপ হইয়া যায়। ব্যক্তিত্ব জ্ঞানের লোপের সহিত আত্মপর-জ্ঞান স্বভাবতঃই লোপ হইতে থাকে। কারণ, 'আত্ম' বলিয়া একটী পদার্থ না থাকিলে, 'আত্মেতর' বা 'পর' বলিয়া পদার্থ থাকিতে পারে না। ভাব, না থাকিলে অভাব থাকিতে পারে না। এই অলঙ্ঘ্য স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতিবাদ হইতে পারে না। এই অদ্বৈত-জ্ঞান জন্মিলে পাপ-পুণ্য-জ্ঞান থাকিতে পারে না; কারণ পাপ পুণ্য-জ্ঞানের ভিত্তি আত্মপরজ্ঞান। এই অদ্বৈত-জ্ঞানই মুক্তির সোপান। এই অদ্বৈত-জ্ঞান যাঁহাদের জন্মিয়াছে, তাঁহাদের সহিত আমার পূর্ণ সখ্যভাব—আমি এখন যাহা বলিতেছি, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নহে। সংসারী দ্বৈতজ্ঞানীর ব্যবহারের কথা বলিতেছি—যার জন্য চুরি করি, সেই আমায় চোর বলে।

আমাদের দেশের এখন চরমা দুর্গতি। আমরা দীন, হীন, ক্ষীণ ও পরপদদলিত। পরস্পরের প্রতি প্রেমের অভাবে আমরা পূর্ণবিকারগ্রস্ত। বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন সেবাকারী আপন ব্যক্তিগণের কাহাকেও মারে, কাহাকেও দশন-ক্ষত করে, কাহাকেও বা গালি দেয়, কাহারও গাত্রে বা থুৎকার দেয়; সেইরূপ আমাদের দেশের বিকারগ্রস্ত লোকগণ স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ স্বজাতি-প্রেমিক-দলের উপর খড়্গহস্ত। সকলেই খড়্গহস্ত, তাহা বলিতেছি না—বিকারগ্রস্ত যাঁহারা, তাঁহারাই খড়্গহস্ত। যিনি প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদিগকে ভালবাসেন, শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়া তাঁহাদের পূজা করেন, তাঁহারা সেই আত্মপূজকদিগকে বিবিধপ্রকারে নির্য্যাতিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট বারবার অগ্নিপরীক্ষা লইয়াও তাঁহারা তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সন্দেহ করেন। রামচন্দ্র সাধ্বীসতী সীতার যেরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছিলেন, ইঁহারাও সেই স্বজাতি-প্রেমিকগণকে সেইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া থাকেন। পদে পদে সন্দেহ, ও পদে পদে পরিহার। যে কখন দেশের জন্য ভাবে নাই ও ভাবে না, যে আত্ম-সর্ব্বস্ব, সে একবিন্দু স্বার্থত্যাগ না করিয়া আমোদে ও আহ্লাদে দেশের লোকের চিত্তবিনোদন করিবে ও সকলেরই প্রিয়পাত্র হইবে—আর যে মনীষী দেশের ভাবি মঙ্গলের জন্য নিরন্তর শবসাধনায় নিমগ্ন, দিবারাত্রি দেশের চিন্তায় অভিভূত, সেই মনীষী লোক-সাধারণের নিকট অনাদৃত ও অবহেলিত। লোক-সাধারণ অনেক সময় তাঁহাকে চিনিতেও পারে না; কারণ, তিনি আত্মপরিচয় দিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। যত দিন কার্য্যসিদ্ধি না হইবে—তত দিন তিনি বাচংযমী যোগী। তাঁহার জীবনে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি না হইতেও পারে—কিন্তু তিনি তাহাতে কাতর নহেন। কারণ, তিনি জানেন, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সিদ্ধিদাতার করে; সুতরাং তাঁহার উভয়েতে সমজ্ঞান। তাঁহার কার্য্য জীবনের ব্রত পালন। পিতামাতা তাঁহাকে যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন, সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হইল। তাহা হইলেই পিতামাতার ঋণ হইতে তিনি মুক্ত হইলেন। এরূপ মনীষীকে লোক চিনিতে পারে না; তাহার কারণ, তাহার বাহ্যবিকাশ নাই। তিনি জাতীয় রোগের পূর্ণচিকিৎসক। তিনি রোগীর দিকে একদৃষ্টি হইয়া রোগের মূল ও লক্ষণ সকল নির্ণয় করিতেছেন—রোগীর অজ্ঞাতসারে তাহার শরীরে তাড়িত-বেগ সঞ্চারিত করিতেছেন। রোগী বিকারে অবসন্নপ্রায়—সুতরাং একবারে বহুবল-সঞ্চারে অভিভূত হইয়া পড়িতে পারে—এই আশঙ্কায়, ধীরে ধীরে মৃদুগতিতে নিজের শরীরের তাড়িত বল তাহার শরীরে সংক্রামিত করিতেছেন। রোগী তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার উপর রাগ করিতেছে—অযথা গালিবর্ষণ করিতেছে—কখন বা প্রহার করিতেছে; তথাপি তিনি অটল অচলসম বসিয়া নিজের কার্য্য করিতেছেন। নিজের বলক্ষয় হইলেই, তিনি মন্ত্রবলে—ঐশীশক্তিপ্রভাবে—দেশান্তর বা কালান্তর হইতে বলোপচয় করিয়া—বৈদেশিক বা অতীত বীরবৃন্দের তনুপ অপহরণ করিয়া, প্রথমে নিজশরীরে সঞ্চিত করিয়া রোগীর দেহে ক্রমশঃ চালিত করিয়া দিতেছেন; রোগী বলাগমে কিঞ্চিৎ চৈতন্য পাইয়া চিকিৎসককে কলিল—'তুমি চোর, নতুবা এত বল তুমি কোথা হইতে পাইলে? তোমার শরীরে ত এত বল থাকিবার সম্ভাবনা নাই! যদি চুরি না করিতে, ত আমায় বল দিয়া তুমি জীবিত থাকিতে পারিতে না। সুতরাং তুমি চোর ও হেয়। আমি চোরের সহবাস করিতে চাহি না—তাই বলিতেছি—তুমি দূর হও, আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও।' মৃতদেহে প্রাণ পাইয়া রোগী চিকিৎসককে চোর বলিয়া গালি দিল। তখন কাজেই চিকিৎসকের মুখ হইতে এই মর্ম্মভেদী বাক্য বাহির হইল—'যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর।'

জাতীয় ব্রত।

চোর হইয়া যিনি দেশের জন্য চুরি করিতে না পারিলেন, তাঁহাকে আমি প্রকৃত স্বদেশানুরাগী বা স্বজাতি-প্রেমিক বলিতে প্রস্তুত নাহি। চোরে চুরি করে কেন? যাহার যে বস্তুর অভাব, সে যদি চাহিলে তাহা না পায়, যদি বলপূর্ব্বক তাহা লইবার ক্ষমতা তাহার না থাকে, তখন সে সেই দ্রব্য গোপনে, অধীস্বামীর অগোচরে, আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে। চোর বা দস্যুর কোনও ধর্ম্ম নাই, এরূপ নহে। তাহারা সাধারণতঃ দেবীপূজক। দেবতার চরণে অঞ্জলি দিয়া তাহারা চুরি করিতে বা দস্যুবৃত্তি

কথিতে বাহির হয়। মানুষের নাম করিয়া যাহারা বাহির হয়, তাহাদের অন্তরে কোন না কোন সঙ্কল্প অবশ্যই থাকিবে থাকিবে। তাহারা সাধন সম্বন্ধে ভাল হইতেও পারে, কিন্তু তাহাদিগের লক্ষ্য মন্দ হইতে পারে না। চোর বা দস্যুর লক্ষ্য—অন্যথা-সঞ্চয়ী কৃপণের ধন হরণ করিয়া নিজ পরিবার-প্রতিপালন ও দীনদুঃখীর অভাব মোচন। তাহারা ধার্ম্মিক বা দাতার গৃহে কখন চুরি বা ডাকাইতি করিতে যায় না, অথবা চোরিত বা লুণ্ঠিত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আপনাদিগের বিলাস-স্পৃহা চরিতার্থ করে না। অপহৃত সম্পত্তি আপনাদিগের মধ্যে প্রয়োজন ও যোগ্যতানুসারে বণ্টন করিয়া লইয়া অতিরিক্ত মায়ের পূজায় ব্যয় করে ও কিয়দংশ দীনদুঃখীকে দান করিয়া দেয়। কৃপণের ধনে দীনদুঃখীর অধিকার আছে কি না—প্রতিবেশিগণের পূর্ণ অভাব-সত্ত্বেও কাহারও ধনাদি কোমবদ্ধ করিয়া রাখা সঙ্গত কি না, সে দুরূহ নৈতিক সমস্যার মীমাংসা করা এ প্রস্তাবের লক্ষ্য নহে। তবে এই মাত্র বলিতেছি যে, চোর বা দস্যুর লক্ষ্যের সঙ্গে সাধারণ মানবের লক্ষ্যের সামঞ্জস্য আছে। সাধারণ গৃহস্থ যেমন পরিবার প্রতিপালন, দীনদুঃখীকে দান ও দেবকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য সারাদিন খাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, চোর বা দস্যু সেইরূপ নিশাচর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্যই কৃপণাদির ধন লোপাট বা বলে আত্মসাৎ করে। লক্ষ্য একই—উপায় ও সময় বিভিন্ন মাত্র। সেকেন্দর সাহ ও দস্যুর কে পার্থক্য বোধ হয় অনেকেই জানেন। সেকেন্দর সাহ দস্যুকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া তিরস্কার করিতেছিলেন। সে সেকেন্দর সাহকে স্পষ্টাক্ষরে বলিল—'আপনাতে আমাতে কার্য্য সম্বন্ধে কোনও পার্থক্য নাই। আপনি জিনীষাপরতন্ত্র হইয়া কত কত নগরী লুণ্ঠন করিতেছেন—কত কত সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভস্মস্তূপে পরিণত করিতেছেন—কত কত নরনারীকে অনাথ-অনাথিনী করিতেছেন, বিনা-কারণে জগতে সমরানল প্রজ্বালিত করিতেছেন, পরধন ও পররাজ্য অবাধে আত্মসাৎ করিতেছেন—অথচ আপনি হইলেন দিগ্বিজয়ী বীর! আর আমি উদরান্নের জন্য—পরিবার-প্রতিপালনের জন্য—প্রয়োজনমত পরসম্পত্তি বলে গ্রহণ করিতেছি—বাধা-বা দিলে কাহারও প্রাণনাশ করিতেছি না—অথচ আমি হইলাম ঘৃণ্য দস্যু! ইহা প্রবলের উপর দুর্ব্বলের অত্যাচারের অন্যতম লক্ষণ! আমি আপনা অপেক্ষা দুর্ব্বল বলিয়া আপনি আমায় শৃঙ্খলিত করিতে পারিয়াছেন। আপনি প্রবল বলিয়া জগৎ আপনাকে বীর বলিয়া পূজা করিতেছে, আর আমায় দস্যু বলিয়া ঘৃণা করিতেছে। ফল কথা, আমি যদি দস্যু হই তো, আপনি মহাদস্যু।'

দস্যুর এই কথার অন্তরে গভীর সত্য নিহিত আছে। যিনি প্রবলতম, তিনিই রাজা; তিনি সর্ব্বস্বাপহারী হইলেও তাঁহাকে চোর বা দস্যু বলিতে কাহারও সাহস হয় না। কারণ, বলিলে সে রাজদ্রোহী বলিয়া দণ্ডিত হইবে। আর ক্ষুদ্র প্রাণী চৌর্য্য বা দস্যুতা করিলে সে চোর বা দস্যু বলিয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে। সুতরাং মহা-চৌর্য্য বা মহাদস্যুর জগতের নেতা বা শাস্তা; ক্ষুদ্র চোর বা দস্যু তাঁহাদিগের আদেশে দণ্ডিত ও কারা-প্রপঞ্চ। জগতে সকলই শক্তির খেলা! পাপপুণ্য সকলই মিথ্যা! দুর্ব্বলকে দমনে রাখিবার জন্য প্রবল প্রবর্ত্তিত কৌশলমালা মাত্র!

যদি তাহাই হইল, তবে অদেশের বা স্বজাতির জন্য যাঁহারা চুরি করেন বা বলে পরদ্রব্য লুণ্ঠন করেন, তাঁহাদিগকে চোর বা দস্যু বলিব কেন? কোন স্বজাতি প্রেমিক বা স্বদেশানুরাগী দেশের জন্য চুরি বা দস্যুবৃত্তি না করিয়া দেশের মঙ্গলসাধন করিতে কবে পারিয়াছেন? আর্য্যেরা যখন আসিয়া যদি এদেশের অধিবাসিবৃন্দের নেতৃ ও পরাভি চুরণ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এখনে কয়দিন তিষ্ঠিতে পারিতেন? বিজেতৃ জাতি সঙ্গে করিয়া এত আর-সামগ্রী বা ধনরত্ন আনিতে পারে না, যাহা দ্বারা তাহারা অধিক দিন বিজাতি-ভূমিতে থাকিতে পারেন। সুতরাং চৌর্য্য বা লুণ্ঠন বা পরস্বাপহরণ ব্যতীত তাঁহাদিগের আর উপায়ান্তর থাকে না। তাঁহাদিগের নিজের কিছুই থাকে না; সুতরাং যাহা প্রয়োজন হয়, তাহাই পরের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে হয়। অবশ্য সামদানভেদও এই চারিপ্রকার রাজনীতিই তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া দেখিতে হয়। প্রথম তিনটী অকৃতকার্য্য হইলে, শেষে অবশ্যকে দণ্ড দিয়া তাহার রাজ্যধন সকলই বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হয়। বিজেতৃ আর্য্যজাতি পুরাকালে এই নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মধ্যযুগে রোমানেরা ও বর্ত্তমান যুগে ইংরাজেরাও সেই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন ও করিতেছেন। দুর্ব্বল তস্করাগিগণ স্বদেশের ও স্বজাতির জন্য প্রাণপণে দিতেছে—বিজেতৃজাতির গতি রোধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে. অথচ তাহারা হইল—'দস্যু'। আর যাঁহারা দুর্ব্বল রাজ্য-লিপ্সার উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বন্ধুভাবে প্রবেশ করিয়া নিরীহ বীরব-রাজ্য হরণ করিলেন, তাঁহারা হইলেন—'উদ্ধারকর্ত্তা'। যদি ইহাই প্রকৃত সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিব, জগৎ অসত্যকেই সত্যের সিংহাসনে বসাইয়া বৃথা পূজায় সময় নষ্ট করিতেছেন।

তাই বলিতেছি, কে প্রকৃত চোর বা দস্যু, জগতে তাহার প্রকৃত নির্ণয় হয় না। সুতরাং তাহার প্রকৃত বিচার হইবার সম্ভাবনা নাই। ভ্রমাক্ত জগৎ ইহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ে বা প্রকৃত বিচার-করণে সম্পূর্ণ অসমর্থ; কারণ, ইহা বল, চালিত এবং বলের উপাসক। যেখানেই বলের প্রাধান্য, সেখানেই বিচার-বিভ্রাট! বিচারালয়েও যেমন, ইহার বাহিরেও তেমনি। যে বড় বড় বারিষ্টার আনিতে পারিল, সে নরহত্যা করিয়াও মুক্তিলাভ করিল। আর যে দীনদুঃখী আত্মসমর্থনের জন্য উকিল মোক্তার বা বারিষ্টার আনিতে পারিল না, সে নিরীহ হইয়াও হয়ত নরহত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। এরূপ স্থলের খেলা আমরা প্রতিদিনই বিচারালয়ে দেখিতে পাই। বিচারক ও আসামী উভয়ই নিরুপায়। যাহার ধন, সেই জয়ী।

বিচারালয়ের বাহিরেও তাই। জমিদার প্রজার সর্ব্বস্বাপহরণ করিতেছেন—রাজা আবার চোরের উপর বাটপড়ি করিয়া ছলে বলে 'কৌশলে অমিদারের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতেছেন। রাজার নিকট জমিদার ও প্রজা দুইই সমান দুর্ব্বল; সুতরাং রাজা এমন আইন করিতেছেন যে, জমিদার প্রজার গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র রাখিয়া সমস্ত শোষণ করিতে পারেন এবং যেই দেখিতেছেন যে জমিদারগণ প্রজা শোষণ করিয়া স্ফীত কলেবর হইয়াছেন, অমনি এমন কর করিতেছেন যে, জমিদারগণ কষ্টে, আহৃত ধন মাথায় করিয়া লইয়া রাজার কোষ পূর্ণ করিতেছেন। এরূপ অদ্ভুত নিয়ম করিয়াছেন যে, জমিদারগণ টাকা দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। "গ্রহণ করুন! গ্রহণ করুন!" বলিয়া রাজকর্ম্মচারিগণের পায়ে ধরিতেছেন! শক্তির লীলা সকলই অপূর্ব্ব! তাই বলিতেছিলাম—জগতে পাপপুণ্য সকলই মিথ্যা—সকলই কেবল শক্তির লীলা।

যদি সকলই শক্তির লীলা হইল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহারই জয়! তাই রাজরাজেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ভগবানেরই জয়! তাই ভগবতী মহাশক্তিরই জয়! আর তাঁহাদের নিকটই তাঁহাদের উপাসকমণ্ডলীর জয়; যাঁহারা পিতার নামে বা মায়ের নামে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের জয়লক্ষ্মী করতলগতা। রাবণ সেই সর্ব্বশক্তির আধার শিবদুর্গাকে তপস্যায় বশ করিয়া জগতে কি না করিয়া গিয়াছিলেন? অদ্যুনা ইংরাজেরা সেই ভগবতী মহাশক্তির উপাসক হইয়াই জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী আধিপত্য করিতেছেন।

যদি জগতে পূজিত হইতে চাও—যদি ভারতকে আবার পূর্ব্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চাও, তবে রাবণের মত ভগবতী মহাশক্তির ও ভগবান দুর্জ্জটীর পূজক হও। শিবজীর মত 'হর হর! বোম্ বোম্!' রবে আবার ভারত গগণ আলোড়িত কর। শক্তিপূজা ব্যতীত শক্তিমান হইবার উপায় নাই। সেই শক্তিপূজার উপকরণ সামগ্রী তোমার গৃহে না থাকে, তুমি চুরি বা দস্যুবৃত্তি দ্বারা তাহা আহরণ কর—তোমার কোনও পাপস্পর্শ হইবে না। নিষ্কাম যোগীকে কর্ম্ম বাঁধিতে পারে না। তাঁহার কর্ম্ম নাই—ধর্ম্ম নাই—পাপ নাই—পুণ্য নাই; আছে একমাত্র ব্রত — জনকজননীর আদেশ প্রতিপালন। এই নিষ্কাম যোগী তোমাদিগেরই জন্য বিবিধপ্রকারে চুরি করিয়া থাকেন — সুতরাং তোমরা আর তাঁহাকে চোর বলিয়া বিড়ম্বিত হইও না। অপরে চোর বলে বলুক—কিন্তু যাহাদের জন্য চুরি করি, তাহারা চোর বলিলে প্রাণে বড় ব্যথা লাগে! কিন্তু তোমরা মনে করিও না যে, চোর বলিলেও তিনি তোমাদিগকে ঘৃণা করিবেন-বা তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অপ্রেমের ভাব তাঁহার মনে উদিত হইবে। কারণ, তিনি তোমাদের জন্য চুরি করিতেছেন বটে; কিন্তু সে তোমাদের অনুরোধে নহে—সুতরাং তোমাদের নিকট কোনও প্রতিদানের আশা রাখেন না। জনকজননীর আদেশে যাহা করিতেছেন, তাহার জন্য তিনি কোন প্রতিদান বা পুরস্কারের প্রার্থী নহেন। তিনি সেই আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলেই জীবন সার্থক ও মানব জন্ম সফল মনে করিবেন। এরূপ নিষ্কাম যোগীর চরণে আমি কোটী কোটী প্রণাম করি।

শিবজী, ওয়াসিংটন্, ওয়ালেস্, গ্যারিবল্ডী, ম্যাট্‌সিনি ও গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি সকলেই এই শ্রেণীর লোক। ইহাঁরা সকলেই স্বজাতির জন্য নিজের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সকলকেই স্বদেশের উদ্ধারের জন্য—স্বজাতির মঙ্গল-সাধনের জন্য—ধনমানপ্রাণ বলি দিতে হইয়াছিল। সকলকেই প্রয়োজন মত সবই করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা 'দস্যু' 'চোর' বা 'নরহত্যাকারী' এই সকল উপাধিতে অভিহিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা জাতীয় ব্রত হইতে কখন স্খলিত হন নাই। যাহাদের জন্য তাঁহারা চুরি করিতেন, তাহারাই তাঁহাদিগকে চোর বলিয়া ঘৃণা করিত; তথাপি তাঁহারা জীবনের ব্রত—জাতীয় ব্রত—হইতে চ্যুত হন নাই। যে জাতি পতিত—যে জাতি দুর্ভাগাগ্রস্ত—যে জাতি নিজের কিছুই নাই, সে জাতিকে যে মনীষীগণ তুলিতে চেষ্টা করেন, চৌর্য্য তাঁহাদিগের অঙ্গের ভূষণ! তাঁহাদিগকে উন্নীত জাতিগণের ধনরত্নাদি চুরি ও জ্ঞানভাণ্ডার লুঠ করিতেই হইবে। জ্ঞান চুরি, ধন চুরি, মান চুরি ও বল চুরি—সকল চুরি না করিলে একটী পতিত জাতির অভাব-মোচন — উদ্ধার-সাধন হইতেই পারে না। যে মনীষীগণ আত্মবলি দিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির জন্য এই চৌর্য্যরূপ মহাব্রতে

ব্রতী হন, আমি তাঁহাদের চরণে বারবার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করি।

যে দেশে ও জাতির মধ্যে এরূপ চোরের সংখ্যা অধিক, সেই দেশ ও সেই জাতিই জগতের আরাধ্য। ইংরাজ জাতিতে এই-রূপ চোরের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়াই ইহাঁরা সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশের অধীশ্বর। যে জাতি যেখানে যাহা পান, ছলে বলে কৌশলে সেখান হইতে তাহা লইয়া গিয়া প্রতিনিয়তই জননী-জন্মভূমির চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন, যে জাতির প্রত্যেকের আত্মচিন্তা জাতীয় চিন্তায় উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, সেই স্বজাতিপ্রেমিক শ্রেষ্ঠ ইংরাজ জাতি আমার আদর্শ। ভারতবাসী ভাই! যদি জাতীয় ব্রত শিক্ষা করিতে চাও, তবে ইংরাজ-জাতির নিকট তাহা শিক্ষা কর। ইংরাজ ইংরাজকে যেরূপ ভালবাসেন, তোমরাও আপনাদিগকে সেইরূপ ভাল বাসিতে শিখ, এবং স্বদেশ ও স্বজাতিকে বড় করিবার জন্য কোন কার্য্যকেই হেয় বা তুচ্ছ বলিয়া মনে করিও না। তাহা হইলেই তুমি জাতীয় ব্রতের পূর্ণ উদ্‌যাপন করিতে পারিবে। এরূপ দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকিতে তোমরা যদি তাহার অনুবর্ত্তন না কর, তবে বুঝিব যে, তোমাদের আর কোন আশা নাই।

রাধা কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া কুলশীল-কৃষ্ণচরণে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন—কলঙ্ককালি-মাকে আভরণ করিয়াছিলেন—তাই তিনিই কৃষ্ণকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি তুমি স্বদেশানুরাগে ও স্বজাতি-প্রেমে পূর্ণরসিক হইয়া থাক, তোমাকে কলঙ্কের ডালি মাথায় করিতে হইবে, এবং কুল-শীল-মানে জলাঞ্জলি দিতে হইবে—আর প্রাণ ও তদপেক্ষা প্রিয়তর স্ত্রীপুত্রাদিকে জন্মভূমির মন্দিরে উৎসর্গ করিতে হইবে। তবে জাতীয়ব্রতের উদ্‌যাপনা হইবে—জন্মভূমির উদ্ধারসাধন হইবে। এ বড় কঠিন সাধনা! সুতরাং ভাতৃগণ! বৃথা অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া এই বিরাট যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হউন!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

তারে-ভাল বাসি ব'লে।

তারে—ভাল বাসি ব'লে!
স্বর্গ যার কল্পনার সীমা,
ধরামাঝে নাই যে সুষমা,
আঁখি-পথে পাই তা দেখিতে;
অমরার কুঞ্জবিহারিণী,
কোকিল-বধূর কলধ্বনি,
অনুদিন পাই গো শুনিতে।

ভালবাসি ব'লে তারে, বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি,
এক ঠাঁই হ'য়েছে মিলিত!
বিশ্বব্যাপী ভালবাসা মোর,
একাধারে হ'য়েছে নিহিত।
ধরার কুসুমে আর, নাই সে মাধুরী গো,
চন্দ্রমা তাহার রূপে ম্লান,
বীণার ঝঙ্কারে আর, নাই যেন আকর্ষণী,
বিহগী ভুলেছে তার গান।

মন্থর সে মলয় সমীরে,
পরিমল বহি ধীরে ধীরে,
আস্তদেহ জুড়াত আমার ;
ভীরিতুমি শান্তি-হর বুঝি,
এর চেয়ে কিছু নাই আর।
এখন তাহাতে যেন, নাই তত শীতলতা,
তার চেয়ে স্নিগ্ধ পরশনে ;
স্বপ্নাতীত রাজ্য হ'তে, কি যেন পেয়েছি আমি,
প্রাণ তাই কঁরে অন্বেষণ।
উপমার সীমা হ'য়ে, যা কিছু সুন্দর ছিল,
রূপবতী বঁধুমতী কোলে,
তুলনায় তার কাছে, সবাই হ'য়েছে ম্লান,
ওগো শুধু ভালবাসি-ব'লে।
যখন ছিল না ভালবাসা,
আশা ছিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যপিয়া,
সমবেগে প্রেমের প্রবাহ,
দিগন্তেতে যাইত বহিয়া।
একটী হৃদয় মোর, চূর্ণ বালুকার মত
ছিল ছড়াইয়া ;
ভালবাসা-পরশনে তাহার হৃদয়-সনে,
সবটুকু গিয়াছে মিশিয়া।
আমার বলিতে ছিল প্রাণ,
তাও আর নাই,
হ'রে লয়ে একটী সূত্রেতে
গাঁথিয়ে রেখেছে এক ঠাঁই।
প্রাণ দিয়ে পেয়েছি কেবল,
প্রগাঢ় প্রেমের অশ্রুজল,
সংগোপনে বসিয়া বিরলে ;
তার কাছে প্রাণ তবু মরণে বেড়েছে ঋণ,
ওগো শুধু ভালবাসি ব'লে।
জাগরণে তাহারই ভাবনা,
নিদ্রা সদা তার স্বপ্নময়,
দূরদৃষ্টি অন্ধপ্রায় মোর,
ধ্যান ধরি হয়েছি তন্ময়।
ভবনে যখন থাকে, নয়ন তাহার কাছে,
দূরে গেলে মন যায় সাথে,
পরশে প্রফুল্ল প্রাণ, দরশনে আত্মহারা,
সম্ভাষে স্বরগ পাই হাতে।
হাসিলে অমিয়া ক্ষরে, কাঁদিলে মুকুতা ঝরে,
ভালবাসি ব'লে,
হৃদয়-রাজ্যের রাণী মোর,
রাজ্য করে ভালবাসা-ছলে।
অবিচ্ছেদ মিলনের তরে,
প্রাণ মোর সদা পিপাসিত,
অসহ বিরহ তার ব'লে,
কর্ত্তব্য হ'তেছে বিদলিত।
—কিছু লক্ষ্য নাই—
সংসার হউক ছারখার,
আমি শুধু দেখিবারে চাই ;
সম্মুখেতে পুষ্প পরিবৃত,
স্বর্গের সরণি সুচিত্রিত,
দেখি পলে পলে ;
দয়া, সত্য সরলতা, অভয় দিতেছে সবে,
ওগো শুধু ভালবাসি ব'লে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সুধামুখী।

(সত্যঘটনা মূলক উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ধীরে ধীরে পৃথিবীর কার্য্য চলিয়া যাইতেছে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ কালচক্রে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, এবং জগৎসংসারকে চালিত করিতেছে। আজ যে ব্যক্তি সংসার-মধ্যে আত্মীয়-জনপরিবৃত হইয়া স্ত্রীপুত্রকন্যা-সহ মহাসুখে কাল কাটাইতেছেন, যাঁহার গৃহ বালকবালিকার আনন্দ ধ্বনিতে, যুবতী-গণের রহস্যজনক মৃদু কথোপকথনে, বৃদ্ধের উপদেশ-বাণীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে ; হয় ত তার পরদিন দেখিবে, যে, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে, আনন্দ-কোলাহলের স্থলে গগনস্পর্শী আর্ত্তনাদে সেই গৃহ পরিপূর্ণ হইতেছে। আবার অন্যদিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, যে দম্পতি প্রাণসম একমাত্র সন্তানকে কালকবলে বিসর্জ্জন দিয়া প্রতি-দিনত হাহাকার-ধ্বনিতে রোদন করিতেছিলেন, আবার অদ্য সেই দম্পতিযুগল, ভগবৎ-প্রসাদে নব-প্রসূত সুন্দর সুলক্ষণযুক্ত পুত্রের মুখাবলোকন, করিয়া, আনন্দে হাসিতেছেন। তাই বিশ্বপতির পবিত্র নিয়মানুসারে মানবের অদৃষ্ট-চক্র নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। নিজের প্রতিবলে এই জগতীতলে, যিনি প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন, তিনিই ধন্য। এরূপ সুনামধন্য লোক, পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। নৈরাশ্যের তীব্র হুহু-ঙ্কারে, দারিদ্রের কঠোর নিষ্পেষনে, যাঁহার চিত্ত পাপপথে চালিত হয় নাই, এবং যিনি স্বকীয় আত্মাধারণ বুদ্ধিবলে ধীরে ধীরে জন্মভূমিতলে উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রশং-সার যোগ্য।

আমাদের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার কাশীনাথ বাবু সুনামপ্রসিদ্ধ। অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া, ধর্ম্মপথে থাকিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে আজ তিনি বিপুল ধনের অধীশ্বর। আজ অনেক অনাথ, দীনদরিদ্র, তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। পর্ব্বোপলক্ষে সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতিকে তিনি মুক্ত-হস্তে দান করিতেছেন। কোথাও দুর্ভিক্ষ হইতেছে, কোথাও বা স্কুল স্থাপিত হইতেছে, কোথাও বা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ; কাশীনাথ বাবু পরক্ষে জানিতে পারি-লেও, প্রত্যেক স্থানেই যথাসম্ভব দান করিতে-ছেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহার সুযশ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। গবর্ণমেণ্ট, তাঁহার অযাচিত দানশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে ধন্য-বাদ প্রদান করিতেছেন। সংসারমধ্যে কাশীনাথ বাবুর এক বিধবা ভগ্নী, স্ত্রী এবং একমাত্র দুহিতা ব্যতীত সংসারে আপনার বলিবার আর কেহ ছিল না। কিন্তু অনেক লোক তাঁহার বাড়ীতে দু'বেলা পরিতোষরূপ ভোজন করিত।

বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে বাধ্য হইয়া, পৈত্রিক ভদ্রা-সন হইতে অতিদূরে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। আগরা-নগরীতে তাঁহার নিজের একটী সুদার কর্ম্ম ছিল ; তিনি স্বয়ং ঐ কারবার চালাইতেন। জগদীশ্বরের অনুকম্পায়, দিন দিন তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। সুতরাং তিনি তথায় নিজ-বাসোপযোগী এক পরম,

সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় সপরিবারে বাস করিতেছিলেন।

কাশীনাথ বাবু নিজে যে প্রকার পরোপকারী দীতা এবং পুণ্যবান ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর চরিত্র বিপরীত ছিল। এইজন্য কাশীনাথ বাবু সর্ব্বদা দারুণ মনঃপীড়া ভোগ করিতেন। বহুবয়সেও তাঁহার কোন সন্তান হইয়াছিল না। কাশীনাথ বাবু নিজে অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও, সন্তানবিহনে সর্ব্বদা অত্যন্ত মনঃক্লেশ ভোগ করিতেন। দেবতার নিকট পূজা, হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি অনেক করা হইল; অবশেষে দেবতা সদয় হইলেন। বহু বয়সে তাঁহার পরমাসুন্দরী একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। কন্যার মুখাবলোকন করিয়া কাশীনাথ বাবু স্বর্গ হাতে পাইলেন। সর্ব্বদা তাহাকে নিকটে রাখিতেন, মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে নয়নান্তরাল করিতেন না।

এই বালিকার বয়ঃক্রম যতই বাড়িতে লাগিল, তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহাঁর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কাশীনাথ বাবু কন্যার নিষ্কলঙ্ক মুখকমল দর্শন করিয়া, অপুত্রকের কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বালিকার অর্দ্ধস্ফুট বাক্যগুলি যেন তাঁহার কর্ণকুহরে বীণাঝঙ্কারবৎ মধুর বোধ হইত। তিনি ঐ দুহিতাকে, পুত্রজ্ঞান করিয়াই, লালনপালন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে, বালিকার বয়ঃক্রম পঁচে বৎসর উত্তীর্ণ হইল।

ইহার তিন বৎসর পর হইতে আমাদের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে।

—০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিন অপরাহ্ণে কাশীনাথ বাবু তাঁহার বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। তাঁহার সদা-সহাস্য মুখকান্তি আজ ঘোর বিষণ্ণ। যমুনাপুলিন-প্রবাহিত নির্ম্মল মৃদুমন্দ সান্ধ্যবায়ু ধীরে ধীরে তাঁহার চিন্তা-ক্লিষ্ট ললাট স্পর্শ করিল। তিনি, একটী গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বস্থ হিন্দুস্থানী বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দেখ ভাই! বিধাতার ইচ্ছায় আমার কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই; বিপিনকে আমি পুত্রবৎ স্নেহ করিতাম। আজ তাহার কীর্ত্তি দেখ; পাপীষ্ঠ আজ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়া, আমার সর্ব্বনাশ-সাধন করিল। এক নয়, দুই নয়, নগদ দশ হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে; আমার জীবনে, আমি এতদূর ক্ষতিগ্রস্ত আর কখনও হই নাই।" তিনি আবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

পার্শ্বস্থ বন্ধু বলিলেন,—"কারবার করিতে গেলে সময় সময় লোকসানও দিতে হয়, এই যে বোম্বে আমার কাপড়ের কারবার আছে, গত বৎসর পাট বোঝাই জাহাজখানা আগুনে পুড়িয়া যাওয়াতে, ন্যূনকল্পে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে; কৈ, আমি ত তজ্জন্য আপনার ন্যায় অতদূর বিষাদিত হই নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিলে, আবার আপনার অপহৃত সম্পত্তি দ্বিগুণভাবে ঘরে আসিতে পারে।"

কাশীনাথবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আর ভাই, তোমার সঙ্গে কি আমার উপমা চলে? ঈশ্বর করুন, পঞ্চাশহাজার কেন—তাহার চতুর্গুণ ক্ষতিতে যেন ক্ষতিবোধ না কর। আমরা গরিব লোক; এই দশ হাজার টাকার দায় আমি সহ্য করিতে পারি, এমন ভরসা রাখি না।"

উভয়ে অনেকক্ষণ এই প্রকার নানা কথোপকথন হইতে লাগিল। পরিশেষে কাশীনাথ বাবুর বন্ধু বলিলেন,—"বিপিনকে ত অনেক দিন হইতে আপনার আপিসে দেখিয়াছি; আপনি কি ইহার চরিত্র জানিতেন না?"

সরলহৃদয় কাশীনাথ বাবু বলিলেন—"আর ভাই! সংসারে কাহাকেও বিশ্বাস করা উচিত নহে। কলিকাতার—বাবু আমার বড় উপকারী এবং বন্ধু; শুদ্ধ তাঁহারই অনুরোধে বিপিনকে গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি কোন প্রকার জামিন অথবা ডিপজিট লই নাই। আমার এই নির্ব্বুদ্ধিতার ফল হাতে হাতে ফলিল।"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, কাশীনাথ বাবু আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভাই! বলিব কি—পাপাত্মার চতুরতায় আমি এতদূর বাধ্য হইয়াছিলাম যে, কালে তাহার সহিত আমার একমাত্র কন্যা সুধামুখীর বিবাহ দিয়া আমার অবশিষ্ট সম্পত্তি তাহার নামে উইল করিয়া দিয়া যাইব। কিন্তু ভগবান আমাকে সে দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন—।"

ইতিমধ্যে প্রদোষ-কালীন সুনির্ম্মল নীল আকাশপটস্থ উজ্জ্বল তারার ন্যায়, সেই প্রশস্ত কক্ষের এক প্রান্তভাগে একটী নব ত্র মৃদু হাসিল। সুবর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায়, সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা একটী বালিকা-মূর্ত্তি সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

বালিকা ডাকিল—"বাবা!"

কাশীনাথ বাবু, মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, সেই কুমারীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সস্নেহে বলিলেন,—"এস মা! অনেকক্ষণ তোমাকে দেখিতে পাই নাই কেন?"

বালিকা দ্রুতপদে পিতার ক্রোড়ে উপবেশন করিল।

পার্শ্বস্থ বন্ধুকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কাশীনাথ বাবু বলিলেন,—"এইটী আমার এক মাত্র অন্ধনয়ন; ভগবান আমাকে পুত্র সন্তান দেন নাই বটে, কিন্তু ইহার মুখপানে চাহিয়া আমি সে দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছি।"

বালিকা পিতার মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"বাবা! তোমার মুখখানি অত মলিন হইয়াছে কেন? কোন অসুখ হইয়াছে কি?"

কাশীনাথ বাবু সস্নেহে কন্যার শিরচুম্বন করিয়া বলিলেন,—"না সুধামুখি! আমার কোন অসুখ হয় নাই।"

সুধামুখী আবার বলিল,—"তবে তোমার মুখখানি অত ভার হইয়াছে কেন?"

কাশীনাথ বাবু বলিলেন,—"মা! এ কথা তোকে বলিলে, তুই বুঝিতে পারবি না।"

বালিকা সুধামুখী পিতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পার্শ্বস্থ বন্ধু সুধামুখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"না মা! তোমার বাবার কোন অসুখ হয় নাই। তুমি খেলা করগে।"

বালিকার অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি দেখা দিল; কাশীনাথ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বাবা আমি খেলিগে।"

কাশীনাথ বাবু বলিলেন, —"যাও মা! খেলগে। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়াছে, এখন বাহিরে যাইও না।"

সুধামুখী বলিল,—"না বাবা! বাহিরে যাব না। অবিনাশ দাদা, আমার জন্য সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিয়াছে; তাই নিয়ে, তার সঙ্গে খেলা করিব।"

বালিকা সুধামুখী "অবিনাশ দাদা—অবিনাশ দাদা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। অবিনাশ আসিল। অবিনাশ সুধামুখী অপেক্ষা ৩।৪ বৎসরের বড়। অবিনাশ বাহ্য আকৃতিতে দেখিতে যে প্রকার সুন্দর, তাহার অন্তরেও তদ্রূপ। সর্ব্বদা বই লইয়া একমনে লেখাপড়া করে; কখনও কাহারও সঙ্গে ঝগড়া, মারামারি কিম্বা

আলস্যে সময়াতিবাহিত করে না। নিজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া অথবা অবকাশ পায়, তখন সুধামুখীকে লইয়া খেলা করে, উপকথা শোনায় এবং লেখা পড়া শিক্ষা দেয়। সুধামুখীও অবিনাশ দাদাকে বড় ভালবাসে; একদণ্ডও তাহার কাছ-ছাড়া হয় না। অবিনাশ যখন একমনে বই পড়ে, সুধামুখী একদৃষ্টে অবিনাশের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পাঠ সমাপন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সুধামুখী একটী কথাও বলে না, চুপ্ করিয়া অবিনাশের পার্শ্বে বসিয়া থাকে। কোন খাদ্যবস্তু পাইলে তৎক্ষণাৎ অবিনাশ দাদাকে না দিয়া তাহা খায় না। কেহ তিরস্কার করিলে, মনঃকষ্ট অবিনাশের নিকট ব্যক্ত করে—তাহার বুকে মুখখানি লুকাইয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে। আবার অবিনাশও যেন সুধামুখীকে পলকে হারায়। তাহার বাল-সুলভ ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিলে, তাহার চক্ষে জল আসে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুধামুখীর চক্ষের জল না শুখায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অবিনাশের ক্ষুদ্র হৃদয়ে একপ্রকার খিন্নতা, অব্যক্ত যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে। অবিনাশ, সন্ধ্যার সময়ে বালিকাকে লইয়া, নিকটবর্ত্তী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যায়। পুষ্পবৃক্ষ হইতে সুন্দর সুন্দর ফুলগুলি পাড়িয়া, তাহার কবরীতে পরাইয়া দেয়। গাছ হইতে সুপক্ক আম্র, নীচু, আতা—যখনকার যে ফল, আহরণ করিয়া সুধামুখীকে দেয়। সুধামুখী কিন্তু একা সে ফল ভক্ষণ করে না। অবিনাশ দাদা না খাইলে, তাহার খাওয়া হয় না। অবিনাশকে কেহ তিরস্কার করিলে, সুধামুখী বড়ই অস্থির হয়, কাঁদিয়া আকুল হয়। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই অবিনাশ দাদার নিকট আসে; আহারের সময় অবিনাশ দাদার সঙ্গে একত্র না খাইলে পেট ভরে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবিনাশ স্কুল হইতে বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন না করে, ততক্ষণ সুধামুখী বড়ই অস্থিরতার সহিত কালহরণ করিয়া থাকে। চারিটা বাজিবার সময় হইলেই, সুধামুখী, একবার অঙ্গের দরজায়, একবার বাহিরে, একবার সদরে যাইয়া, প্রতিমুহূর্ত্তে অবিনাশের আগমন-প্রত্যাশা করিয়া থাকে। দূর হইতে তাহাকে আসিতে দেখিলে,—সুধামুখী দৌড়িয়া যাইয়া তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক গৃহমধ্যে টানিয়া লইয়া আসে। হাতের বই, ছাতা ইত্যাদি নিজে লইয়া রক্ষা করে। গ্রীষ্মকালের প্রখর উষ্ণতায় তাহার ঘর্ম্মোদ্রেক হইলে, সুধামুখী স্বহস্তে তাহাকে ব্যজন করিয়া থাকে। আহা! সহোদর মতি বালিকার স্নেহ কি স্বর্গীয় পদার্থ!

কাশীনাথ বাবুর বন্ধু বলিলেন—"মগশয়! এই ছেলেটীকে আমি আপনার বাড়ীতে অনেক দিন দেখিয়াছি। এরূপ শান্তস্বভাব, সরল বালক, আমি কুত্রাপি দেখি নাই। এই ছেলেটী কি আপনার আত্মীয়?

কাশীনাথ বাবু বলিলেন—"না, এমন বিশেষ কোন আত্মীয়তা নাই; তবে, ইহার পিতার সহিত আমার বড়ই সৌহার্দ্দ ছিল। তিনি একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। রেল-পথে দারুণ দুর্ঘটনায়, তাঁহার একখানি পদ একেবারে ছেদিত হইয়াছে। তিনি বাড়িতেই থাকেন। অবিনাশকে আমিই এখানে আনিয়াছি। উমেশ বাবুর (অবিনাশের পিতা) ন্যায় সৎলোক আমি কুত্রাপি দেখি নাই; হায়! দৈব বিপাকে, তাঁহার আজ এই দশা!" কাশীনাথ একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

বালক অবিনাশও, তাহার পিতার অবস্থা স্মরণ করিয়া, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

কাশীনাথ বাবু বলিলেন—"অবিনাশ অতিশয় সুবোধ। এমন শান্ত, ধীর এবং নম্র-স্বভাব

বালক আমি অল্পই দেখিয়াছি। এই অল্প বয়সে ইহার লেখাপড়ায় যেমন মতি, এবং গুরুজনের প্রতি যে প্রকার ভক্তি তাহাতে কালে একজন বড়লোক হইতে পারিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

অবিনাশের পিতা উমেশ বাবু একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। অবিনাশই তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান। একদা রেলপথে দুর্ঘটনা হইয়াছিল; সেই সাংঘাতিক দুর্ঘটনায়, অনেক লোকের প্রাণনাশ হয়; কেহ কেহ বা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উমেশ বাবু যদিও প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছিলেন না, তথাপি পদদ্বয়ে অতিশয় সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বহু চিকিৎসায়ও সেই আঘাতের প্রতিকার না হওয়ায়, ডাক্তারগণ, নিরুপায় হইয়া, পদদ্বয় ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন।

উমেশ বাবু উচ্চ বেতনের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার মাসিক বিলক্ষণ আয় ছিল। কিন্তু রেল-দুর্ঘটনায় সাংঘাতিক আহত হওয়ার পর, চিকিৎসার জন্য, তাঁহার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের নিকট পেন্‌সন পাইবার আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু পেন্‌সনের পূর্ণ সময় হয় নাই বলিয়া, তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। উমেশ বাবু নিতান্ত নিরুপায় হইলেন।

উমেশ বাবু তখন, অনন্যোপায় হইয়া, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আপিল করিলেন। ভৌতিগাক্রমে বড়লাট বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটরী সাহেব উমেশ বাবুকে জানিতেন। দরখাস্ত প্রথম তাঁহারই হস্তে পড়িল। উমেশ বাবুর অবস্থা পাঠ করিয়া, তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন; যথাসময় বড়লাট বাহাদুর সমক্ষে দরখাস্ত পেশ হইলে, প্রাইভেট সেক্রেটরি সাহেব, লাট বাহাদুরের সমক্ষে, উমেশ বাবুর অনুকূলে অনেক কথা বলিলেন। লাট বাহাদুর অনুগ্রহ-পূর্ব্বক, বেতনের এক-চতুর্থাংশ পেন্‌সন-স্বরূপ প্রদান করিবার অনুমতি দিলেন।

যথাসময়ে উমেশ বাবু হুকুম জানিতে পারিয়া, কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন; মনে মনে ভাবিলেন, কোন প্রকারে পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

উমেশ বাবু পরম নিষ্ঠাবান হিন্দুসন্তান। আজকাল পাশ্চাত্য-শিক্ষায় বিকৃত-মস্তিষ্ক নব্য বাবুদের ন্যায়, পিতৃপিতামহাদি-কৃত্য, ব্রত, পূজা, অতিথি-সৎকার, আত্মীয়-কুটুম্বদিগের ভরণপোষণ প্রভৃতি কার্য্যে তিনি বিরত ছিলেন না। তাঁহার নিজের সামান্য পরিবার, কিন্তু তাঁহার অনাশ্রিত কুটুম্ব,-কুটুম্বিনীতে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ থাকিত। নিজের পরিবারবর্গের ন্যায়, তিনি সকলকেই বিশেষ যত্নের সহিত ভরণপোষণ করিতেন। ইহা ছাড়া, হিন্দুর বার মাসের তের পার্ব্বণ, পূর্ব্ব নিয়মে চলিত। পেন্‌সনের যে সামান্য কয়টী টাকা আয় হইত, ইহা বৃহৎ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ও সম্পূর্ণ সঙ্কুলান হইত না; তথাপি অতিকষ্টে কোন প্রকারে ঐ সমস্ত নিয়ম রক্ষায় রাখিয়াছিলেন।

উমেশ বাবুর কএকটী অপোগণ্ড শিশুসন্তান ছিল; তন্মধ্যে অবিনাশই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তাহার বয়স যখন ৮।৯ বৎসর, তখন, রেল-দুর্ঘটনায় বাধ্য হইয়া, উমেশ বাবু কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং অবিনাশের বিদ্যা উপার্জ্জন একপ্রকার বন্ধ হইয়াছিল। কাশীনাথ বাবু, উমেশ বাবুর স্বদেশীয়; বাল্যকাল হইতেই উভয়ের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে কাশীনাথ বাবু বাড়ি আসিলে, উমেশ বাবুর অবস্থা শুনিতে পাইয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহাদের বাড়িতে গমন করিয়া-

ছিলেন। উমেশ বাবুর শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া, দয়ালহৃদয় কাশীনাথ বাবুর অশ্রু-পতন হইল। অনেক কথোপকথনের পর, উমেশ বাবু, সাশ্রুলোচনে অবিনাশকে তাঁহার হাতে হাতে প্রদান করিয়া, বলিলেন,—"কাশীনাথ বাবু! বাল্যকাল হইতেই আপনি আমাকে ভাল বাসিয়াছিলেন। আমার যে অবস্থা, চক্ষেই দেখিতেছেন; আমি যে অবিনাশকে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে পারি, এমন সম্ভব নাই; আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া অবিনাশকে রক্ষা করেন, আমি আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকিব।"

কাশীনাথ বাবুর মনে স্বতঃই দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল; উমেশ বাবুর সেই কাতর-উক্তি শ্রবণ করিয়া, বিনা-বাক্যব্যয়ে, সম্মত হইলেন। তার পর হইতেই, অবিনাশ, কাশীনাথ বাবুর সঙ্গে আগরা আগমন করিয়া, তত্রত্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শ্রীরোহিণীকুমার রায় চৌধুরী।

কেদারের কাহিনী।

ইহার পর, কয়েক বৎসর মধ্যে কেদার বিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, অবশেষে গবর্ণমেণ্ট-অধীনে চাকরী স্বীকার করিয়া উজ্জয়িনী-নগরে কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। কালক্রমে হৃদয়ানন্দ সন্তান-সন্ততির মুখাবলোকন করিয়া, তাহারি বর্ত্তমান আয়দ্বারা সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তাহার জীবনের প্রতি অঙ্ক কোন অন্তর্যামী বন্ধু ও রক্ষক সতত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ভবিষ্য কি শুভ, কি অশুভ ঘটনা জ্ঞাপন করিতে বা কোন বিপদ হইতে সতর্ক করিতে, প্রতিবারই কেদারের নিকট কোন অপরিচিত ব্যক্তি আগমন করিতেন। চাকরীতে পদোন্নতি অথবা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত তাহার সম্বন্ধাদি, অধিক কি তাহার জীবন-নাটকের প্রতিপর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে তাহার নিকট অঙ্কিত হওয়ায়, প্রত্যেক ঘটনায়, সে দৃঢ়তার সহিত সমুখীন হইত। কোন সুখ কি দুঃখ অকস্মাৎ তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতে পারিত না। এই সকল কথা আমাদিগের সন্দিহান পাঠকবর্গের নিকট অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা পূর্ব্বাপর সম্পূর্ণ। যাঁহারা যোগ কিম্বা যোগীর বিষয় কিঞ্চিন্মাত্র অবগত আছেন, তাঁহাদের নিকট ইহা কিছুই অপ্রকৃত বলিয়া বোধ হইবে না। ইহা সত্য যে, ঐ প্রকার ঘটনা প্রত্যহ আমাদের সকলের জীবনে ঘটনা এবং এই কারণেই ইহা প্রথমতঃ অবিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া বোধ হয়। সাধারণতঃ যোগশাস্ত্রের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য সকলে গ্রহণ করিতে সমর্থ নন। কে বলিতে পারে—কত আশ্চর্য্য বিষয় ঐ নিগূঢ় শাস্ত্রের রহস্যাবৃত না আছে? যোগশাস্ত্রের পুনরুদ্ধারদ্বারা এখন যাহা ভৌতিক, মিথ্যা ও কল্পিত বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন তাহার রহস্য-ভেদ হইলে, আমরা স্বয়ং নিঃসন্দেহে তাহা উপলব্ধি করিতে পারি।

একদা কলিকাতা যাইবার অভিপ্রায়ে কেদার

রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে যাইতেছে; সেই সময়, জনতা অতিক্রম করিয়া, দ্রুতপদে এক সন্ন্যাসী নিকটে আসিয়া, বিশেষ ব্যগ্রতা-সহ তাহাকে এবার গৃহে যাইবার কল্পনা পরিত্যাগ করিতে বলিল; বলিল—উহার ফল অশুভকর হইবে। পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন কেদার, ঐ উপদেশ বাক্যের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া, দ্বিরুক্তি ব্যতিরেকে, নিজের গন্তব্য পথে গমন করিল; সন্ন্যাসীর ঈদৃশব্যবহারে তুষ্ট না হইয়া বরং রুষ্ট হইল। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনার সংঘটনে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইল যে, হতভাগ্য কেদারের পক্ষে সেবার সন্ন্যাসীর নিষেধ-বাক্য অবহেলা করা উচিত হয় নাই। কারণ, বাটীতে গিয়া তাহার সাংসারিক এরূপ কোন ঘটনা ঘটিল—যাহাতে তাহার মনকে আজীবন ব্যথিত করিয়াছিল।

আর একবার কেদার অশ্বারোহণে বহির্গত হইয়া বাটী ফিরিয়া আসিবার কালে অদূরে পর্ব্বত উপস্থিত এক যোগীপুরুষ তাহাকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা আহ্বান করিতেছেন, দেখিল। সে তথায় আসিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলে, সেই যোগীবর তাহাকে বলিলেন যে,—"তাহার মস্তকোপরি আশু কোন গুরুতর বিপৎপাতের আশঙ্কা আছে এবং উহা হইতে ত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা অতি বিরল। তবে তিনি যখন আবার আসিবেন, তখন যদি কেদার তাঁহাকে কোনগতিকে চিনিতে পারে, তাহা হইলে বিপদ হইতে রক্ষা হইতে পারে।" এই বলিয়া, তাঁহাকে চিনিবার সঙ্কেতটিও এই বলিয়া দিলেন যে, তিনি হাতে একটি তোতা-পাখী লইয়া আসিবেন। এই ঘটনার স্মৃতি কেদারের মন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইলে, এক দিন সন্ধ্যাকালে, একটি গলির মোড় অতিক্রম করিবার সময় দেখিতে পাইল যে, একটি সন্ন্যাসী নীরবে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে দৃষ্টিমাত্র স্মরণ হইবার কোন চিহ্ন তখন কেদারের স্মৃতি-পথে উপস্থিত হইল না। বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিবা-মাত্র, হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল যে, সন্ন্যাসীর হাতে কি যেন একটি পাখী ছিল এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্বঘটনাও স্মৃতিপথে উদয় হইল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক, তোতা-পাখী দেখিতে চিৎকার—ইহা তাহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইল। পরে দ্রুতগতি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, চাকরদিগকে তোতা-পাখী-হাতে একজন সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে নগরের চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিল। ইহা ঘটিতে দশ মিনিটের অনতিকাল বিলম্ব হইয়াছিল, কিন্তু নগর তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও, ঐ সন্ন্যাসী কোথায় চলিয়া গেলেন, কোন সমাচার পাওয়া গেল না। তিনি যেন প্রদীপ্ত উল্কার ন্যায় সহসা নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছেন।

উপরিউক্ত ঘটনার কয়েক দিবস পরে একটি সন্ন্যাসী কেদারের সমীপে আগমন করিয়া তাহাকে দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। "কেদার ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইয়া সমাচার জিজ্ঞাসা করায় তিনি ক্রন্দনোক্তিতে বলিলেন,—"বাবা! তুমি সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাকে চিনিতে পারিলে না, আমি এখন কি করিব বল। তোমার অদৃষ্টে এক অতীব দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু তুমি শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইও না। বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বিপদের সম্মুখীন হও এবং গুরুতর শোকবার্ত্তা শুনিবার জন্য মনকে প্রস্তুত কর।" কিন্তু সেই পুরুষ কেদারের কি বিপদ বা শোককর ঘটনা ঘটিয়াছে, কিছু উল্লেখ করিলেন না, এবং কেদারেরও তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। কেদার নিজ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিল এবং অল্পক্ষণ পরে

ফিরিয়া দেখিল যে, সেই যোগী তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। কেদারের ন্যায় অবিশ্বাসী জনের হৃদয়েও বিপৎপাতের আশঙ্কা উদয় হইল। সে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইল। কেদার শীঘ্রই তারযোগে বাটী হইতে সংবাদ পাইল যে, কি দারুণ শোকের নিমিত্ত যোগী তাহার মনকে দৃঢ় করিতে বলিয়াছিলেন—কেদারের স্নেহময়ী জননী আত্মসংবরণে অসমর্থা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। শৈথিল্যে বিষয়টি নিতান্ত হৃদয়-বিদারক, এবং উহা অবশ্য হইলেও নিয়ে লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কেদারের পিতা জ্বর-বিকারে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। একদিবস বৈকালে বিকারের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায়,চিকিৎসকেরা তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন বলিয়া জ্ঞাপন করিল এবং রোগীকে উক্ত পালঙ্ক হইতে অবতরণ করাইয়া ভূমিতে শয্যা-রচনা করিয়া দিবার ব্যবস্থা দিল। শিকারী রোগীকে সেই পালঙ্কে রাখা উচিৎ নয়—এই উদ্দেশ্যে, ডাক্তারেরা ঐরূপ ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু হায়! তদীয় সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর উহাকে তাঁহার পরলোক যাত্রার উদ্যোগ বলিয়া ভ্রম হইল এবং সাধ্বী সতী নারীর যাহা কর্ত্তব্য, মূঢ়ত্বমধ্যে তাহা অবধারণ করিলেন। এই পৃথিবীতে স্বামীর অঙ্কশায়িনী হইয়া মরার অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় সতী নারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? তখন আত্মঘাতের পাপের ভয় পর্য্যন্ত দূরে পলায়ন করে। ঐ সতী তৎক্ষণাৎ মনে মনে স্থির করিলেন যে, বৈধব্য-যন্ত্রণাপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়স্কর। উহা স্থির করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। এই সতী রমনী বাটীর কাহাকেও কিছু না জানাইয়া গোপনে খিড়কীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া গঙ্গা-বক্ষে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ইহ ও পরলোকে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

অন্নপূর্ণা-শতনে।

(বেহার—আড়াঠেকা।)

কে বলে তোমারে তারা ভিখারীর নারী?
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মাণ্ডের, তুমি রাজরাজেশ্বরী।
নহ মা শ্মশানবাসী, রাজধানী স্বর্ণ-কাশী,
শবাসন ত্যজি বসি, রত্ন সিংহাসনোপরি॥
নাহি সে ভীষণ ভাব, স্বভাবে মধুর ভাব,
ঘুচাতে ভব অভাব, ক্ষেমঙ্করী শুভঙ্করী॥
নহ শ্যামা বিবসনা, এবে গৌরী সুবসনা,
রত্নালঙ্কার-ভূষণা, শির-হার পরিহরি॥
পূরমায়-সুধারস, পিয়ে তৃপ্ত আশুতোষ,
উল্লাসে হ'য়ে বিবশ, নাচিছেন ত্রিপুরারী।
দাস ভাসে এই বেলা, দেও মা চরণ-ভেলা,
নহিলে আবার ভোলা, পড়িবে হৃদয়ে ধরি॥

শ্রীহরিদাস চক্রবর্ত্তী।

নিভৃত-চিন্তা।*

'নিভৃত-চিন্তা'—বাঙ্গালা ভাষার গৌরব; শুধু বাঙ্গালা ভাষারই বা বলি কেন, 'নিভৃত-চিন্তা'—সাহিত্য-সংসারের অপরূপ সৃষ্টি। কে বলে—"বাঙ্গালায় তেমন চিন্তাশীল গ্রন্থ নাই?" কে বলে—"বাঙ্গালা ভাষা অপরিস্ফুট?" এক 'নিভৃত-চিন্তাই'—একাধারে এই উভয়বিধ সংশয় প্রশ্নের নিরসন করিতে পারে। কি ভাষা-সৌন্দর্য্যে কি ভাব-মাধুর্য্যে, সর্ব্বরূপেই 'নিভৃত-চিন্তা' সাহিত্যের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্ত। 'নিভৃত-চিন্তা'—অতলস্পর্শা অমৃতময়ী নদী—যেন বর্ষাকালীন উত্তালোচ্ছলময়ী; 'নিভৃত-চিন্তা'—সুবিমল পারিজাতহারে যেন দিব্যাঙ্গনা পরিশোভিতা। 'নিভৃত-চিন্তার' ভাষাভাবে এমনই অনুপম অনির্ব্বচনীয় সংমিশ্রণ।

এই ভাষা ও ভাবের সংমিশ্রণ সম্বন্ধে কোন কবি বড় সুন্দর একটী উপমা দিয়াছেন। "তিনি বলেন,—ভাব-বিহীনা ভাষা—যেন অলঙ্কার-ভূষিতা দুশ্চিনীতা কুলটা; আর স্ফূর্ত্তিশূন্য ভাব—যেন নিরাভরণা পলিতকেশা সতী স্ত্রী; কিন্তু এতদুভয়ের একত্র-সমাবেশ—দিব্যালঙ্কারভূষিতা সুন্দরী সাধ্বী নারী। উপমাটি বড় সত্য। ভাষা ও ভাবের সুসমাবেশে প্রকৃতই হৃদয় এতদূর প্রীতি-প্রফুল্লিত হয়। 'নিভৃত-চিন্তা' এই ভাষা-ভাবে গরীয়ান; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে সমাদরের সামগ্রী।

'নিভৃত-চিন্তার' লেখকের সহিত, ইংলণ্ডীয় অদ্বিতীয় চিন্তাশীল 'এমার্শনের' রচনার তুলনা—বহু অংশে সঙ্গত হইতে পারে। তবে তাহা হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, সে রচনা অতিরিক্ত মাত্রায় ভাব-গম্ভীর; এমন কি,তাঁহার এক-একটী ছত্রের মধ্যে যেন আরও দুই-চারি বা ততোধিক ছত্রের সমাবেশ ছিল—এবং বিশেষ চিন্তাশীল মস্তিষ্ক ভিন্ন অপরে তাহার উদ্ধারে অক্ষম; আর সেই জন্যই বোধ হয়, 'এমার্শন' পড়াইবার ও বুঝাইবার অধ্যাপক অতি অল্পই দেখা যায়। কিন্তু 'নিভৃত-চিন্তা' ভাব-পরিস্ফুট; ভাষা-সাগরে ইহার ভাব-লহরী যেন স্তবকে স্তবকে সুসজ্জিত; একটী চিন্তা বেলার উল্লঙ্ঘনে চিন্তান্তরে যাওয়ার দুরাশঙ্কা না করিয়া,পর-পর ইহাতে 'পাড়ি-জমান' যায়। ফলতঃ 'নিভৃত-চিন্তা' কষ্টবোধ্য নহে, অথচ সরল-স্বাভাবিক চিন্তায় পূর্ণ। এক কথায়, ইহাতে অভাব-পূরণের আতিশয্য তত অধিক নহে—অথচ ইহা সরল ভাবুকতাময়।

ভাবুকতা-মাখান ইহার ভাষা কেমন সুললিত! ক্রিয়াপদের আধিক্য বা পুনরুক্তি নাই, অথচ পদাবলী ক্রিয়াময়! শ্রুতি যদি ভাষার মাধুর্য্য-নির্ণায়ক হয়—বাক্য-বিন্যাস-পটুতা যদি তাহার বিচার-স্থল হয়, তবে ইহা নিশ্চিত—'নিভৃত-চিন্তার' ভাষা আদর্শ-স্থানীয়। ভাষাসুন্দরীকে সজ্জিত করিবার জন্য,কেমন সুন্দর সুন্দর বাক্যাভরণ সংগৃহীত, খোদিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে! ভাবমাধুর্য্য পরিস্ফুট করিবার জন্য কেমন অনুপম উদার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে! সে ভাষা-ভাবের নমুনা-স্বরূপ আমরা 'অমৃত' প্রস্তাবটি এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। দেখিবেন—'অমৃত' প্রকৃতই অমৃত কি না?

* নিভৃত-চিন্তা—দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

"অমৃত।

সুখের যাহা সার, সাধনার যাহা চরম লক্ষ্য এবং তৃষ্ণার যাহাতে পরমা তৃপ্তি, মনুষ্যের প্রাণ চিরদিনই সেই অমৃতের জন্য লালায়িত। চন্দ্র এই বিশ্বসৃষ্টির সৌন্দর্য্যসমুদ্রের মধ্যে অমৃতের জন্য সন্তরণ করিতেছে। শ্রুতি অমৃতেরই জন্য তৃষাকুল হইয়া, সজল-জলদের গম্ভীর নির্ঘোষ, বিহঙ্গের কূজন, বীণার ঝঙ্কার, শিশুর অর্দ্ধস্ফুট কথা এবং প্রিয়জনের প্রণয়মধুর প্রিয়-সম্ভাষণ পান করিতেছে। করুণা ও বুদ্ধি ঐ একই তৃষ্ণারই অধীন হইয়া কখনও অনন্ত গৌরজগতে এবং কখনও নয়নের অতিসন্নিহিত জীব-জগতে, কখনও সাগরে, কখনও পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছে। মনুষ্য জানে না, মনুষ্য বুঝে না, কিন্তু মনুষ্যের প্রাণ, প্রাণের অভ্যন্তরীণ শক্তির মন্ত্রময় মধুর শাসনে,—অজ্ঞাতসারে ও অলক্ষিত ভাবে—অমৃতেরই অনুসন্ধানে মানবজীবনের অনন্ত ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতেছে। কেন না, প্রাণের একমাত্র অবলম্বন অমৃত।

জ্ঞান সুখের এক অক্ষয় প্রস্রবণ। জ্ঞানের সাধক গ্রন্থপত্রে কীটের মত লগ্ন রহিতেছেন; অথবা চক্ষুকে দূরবীক্ষণের সাহায্যে দূরতর দূরে প্রেরণ করিয়া, কিম্বা অণুবীক্ষণের সাহায্যে নিকটতর নিকটে আনয়ন করিয়া, সাধারণ বুদ্ধির দুরধিগম্য তত্ত্বে প্রবেশ করিতেছেন। শীতে তাঁহার শীত বোধ নাই, গ্রীষ্মে তাঁহার গ্রীষ্ম জ্ঞান নাই। তিনি সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ হইয়াও আপনার মস্ততায় আপনি প্রমত্ত। পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর সুখরাশি তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করে না। ধনীর ঘৃণার্হ ঘৃণা, পদস্থের অবজ্ঞেয় অবজ্ঞা, মূর্খের অভিমান এবং মানীর নিষ্ঠুর দৃষ্টি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি প্রকৃতির পরমারাধ্য পবিত্র মূর্ত্তির ধ্যান-যোগে জীবন্মৃত। বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবায়ু তাঁহা হইতে দূরে বহে, সমাজযন্ত্রের আবর্ত্ত ও বিবর্ত্ত-নিবহ দূরস্থ সমুদ্রের তরাঘহ আবর্ত্তের ন্যায় চিরদিনই তাঁহা হইতে দূরে রহে। ভিন্ন সংসারে নিলিপ্ত,—ভোগবাসনা ও বিষয়তৃষ্ণার অস্পৃশ্য ও অনধিগম্য। তিনি নির্ম্মলমতি নিষ্টুটনের ন্যায় প্রকৃতির দুরুপোষ্য শিশু। তাঁহার জীবনের গতি জ্ঞানার্ণবে। কিন্তু জ্ঞানে এই তৃষ্ণা ও এই আকাঙ্ক্ষা কেন?—না, জ্ঞানের অভ্যন্তরে অমৃত। জ্ঞানে যদি জ্ঞানামৃত না থাকিত, তাহা হইলে জগদারাধ্যা জগদ্ধাত্রী কখনও ঋষিহৃদয়ে সরস্বতী মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইতেন না;—এবং কি কবি, কি বৈজ্ঞানিক, কি দর্শনবেত্তা, কি ঐতিহাসিক, কেহই পৃথিবীর ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সেই সারস্বতী শক্তির আরাধনায় দেহপ্রাণ সমর্পণ করিতে পারিতেন না। অনেক লোক জ্ঞানারণ্যে প্রবেশ করিয়া অমৃত তুলিয়া অস্থি চর্ব্বণ করে, এবং সাধনার শেষ অভীষ্ট বিস্মৃত হইয়া আপনার নীরস নিষ্ঠুর চিন্তাজালে আপনি জড়িত হইয়া পড়ে। তাহারা দুর্ভাগ্য। যিনি জ্ঞানের প্রকৃত সাধক, তাঁহার পরমভোগ্য অমৃত।

জ্ঞানে আর প্রেমে সজাতীয়তা কিম্বা সাদৃশ্য না থাকিলেও, জ্ঞানের ন্যায় প্রেমও সুখের এক অনন্ত উৎস। প্রেমে ফুলের মধু, প্রেম প্রত্যক্ষ মদিরা। এই নিখিল জগৎ ঐ মধু এবং ঐ মদিরার জন্য আকুল ও অধীর। যদি অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্তও ঐ মধু এবং ঐ মদিরা পান করা যায়, তাহা হইলেও প্রেমিকের তৃষ্ণা পূর্ণ হইবার নহে। বস্তু যেমন আহুতি লাভে অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, প্রাণনিহিত প্রেম-তৃষ্ণাও আহুতিলাভে সেইরূপ বাড়িতে থাকে ও জ্বলিয়া উঠে। উহার প্রবৃত্তি আছে, নিবৃত্তি নাই,—আদি আছে, অন্ত নাই, এবং আবাহন আছে, বিসর্জ্জন নাই। উহা বিশ্বব্যাপিনী,—জগন্ময়ী। উহা পার্থিব বস্তুর সহিত সংস্পর্শ দৃষ্ট হইলেও প্রকৃত বিচারে অতি সূক্ষ্ম;—আপার্থিব। উহাতেই দেবলোকপ্রাপ্ত সমুন্নত জীবনের চরম ভোগ। যে, জীবনের কোন না কোন ক্ষণে, প্রেমের তৃষ্ণায় আকুল হয় নাই, সে জীবিত নহে। প্রেমে স্বর্গসুখের এই পূর্ব্বাস্বাদ কেন?—না, উহার অভ্যন্তরে অমৃত। জননজননী যখন সন্তানের স্নেহে বিগলিত হইয়া সন্তানের নবোদ্গত জীবনে নবজীবন লাভ করেন, তখন তাঁহারা অনুভব করিতে পান যে, ঐ স্নেহ রসাস্তরে প্রেমামৃত। প্রাণ যখন ভ্রাতার কণ্ঠে নির্ভর করিয়া, এবং বন্ধু যখন বন্ধুর অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া, আপনার ক্লান্তদেহে আশাতীত সামর্থ্য লাভ করেন, তখন তাঁহারা অনুভব করেন যে, ঐ নির্ভরের ভাবান্তরে প্রেমামৃত। আর, প্রীতিবদ্ধ দম্পতী, যখন নয়নে নয়ন মিলাইয়া,—একে অন্যের নয়নে নিজ হৃদয়ের অনন্তোন্মুখ আদর্শবিম্ব দর্শন করেন, এবং প্রাণে প্রাণে মাখামাখি হইয়া বিশ্বজীবন প্রাণসমুদ্রের অমৃততরঙ্গে ভাসিতে থাকেন, তখন তাঁহারাও প্রত্যক্ষ বুঝিতে পান যে, ঐ বাহ্যবিনিময়ই অমল, অক্ষয় প্রেমামৃত। প্রেমে যদি অমৃত না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর অধীশ্বরা প্রাণ উহার জন্য, অহর্নিশ আকুল হইত না।

কিন্তু যেমন অনেকে জ্ঞানের অন্বেষণে, ভ্রান্তির বিপাকে পড়িয়া, অমৃতভ্রমে অস্থি চর্ব্বণ করে; সেইরূপ প্রেমের অন্বেষণেও অনেকে, অতিমাত্র ভ্রান্তির বিপাকে বিভ্রান্ত হইয়া, অমৃত ভাবিয়া গরল পান করে। তাহারা হতভাগ্য। যিনি প্রেমের প্রকৃত সাধক, তাঁহার পিপাসা ও প্রাণের তৃষ্ণা অমৃতে।

এই সংসারে জ্ঞানভ্রান্তি ও প্রেমভ্রান্তের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। জ্ঞানভাণ্ডের হৃদয় আশার শ্মশান,—ঘন-গভীর-তিমিরাবৃত, নীরস, নীরব। সেখানে চক্ষু আছে, কিন্তু এস চক্ষু কিছুই দেখিতে পায় না; কর্ণ আছে, কিন্তু সে কর্ণ কাহারও প্রণয়পূর্ণ সম্ভাষণে প্রীত কিম্বা অনুপ্রাণিত হয় না। যে দিকে চাও, সেই দিকেই দগ্ধ অস্থি, দগ্ধ কঙ্কাল, দগ্ধ কঙ্কালবাহি দগ্ধ সমীর। অহো কি ভয়ঙ্কর ভাব!—হে অতীতসাক্ষি অভ্রভেদি পর্ব্বত! তুমি ঐ যে তোমার উন্নত মস্তকে তুষার-ভার বহন করিয়া এই চন্দ্রলোকময় জগতে অচঞ্চল রহিয়াছ,—বৃষ্টির মুষলধারায়, বজ্রের মুহুর্মুহুঃ আঘাতে, এবং ঝটিকার ভীমাবর্ত্তে মুহূর্ত্তের তরেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পৃথিবীর পরিবর্ত্তপ্রবাহ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ,—মনুষ্য বৃথাসুখের লালসায় বৃথাশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কিরূপে বিড়ম্বিত হইতেছে, তাহা দেখিতেছ, বল তুমি কি জান? পর্ব্বত কিছুই জানে না। জ্ঞানের অতুল বৈভব ও অতুল ভাণ্ডার যাহার চক্ষে স্তূপীকৃত ভস্ম এবং স্তূপীকৃত অঙ্গার বই আর কিছুই নহে, পর্ব্বত তাহার নিকট নিষ্পন্দ, নীরব। হে উত্তালতরঙ্গময় গভীর সমুদ্র! তুমি, ঐ যে তোমার দিগন্ত প্রসারিত বিশাল বক্ষে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া,—তরঙ্গের পৃষ্ঠে তরঙ্গ দোলাইয়া, তরঙ্গমালাময় খেলিয়া খেলিয়া, কখনও অট্টহাস্যে হাসিতেছ, কখনও ফিপ্তের মত নৃত্য করিতেছ—কখনও ক্রোধ-স্ফুরণে গর্জ্জিতেছ, কখনও আতঙ্কস্ফুরণে ফুলিয়া উঠিতেছ,—কখনও মনুষ্যের সুখ-দুঃখ হর্ষবিষাদ একই গ্রাসে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছ,—কখনও আপনার অতলস্পর্শ গহ্বর হইতে অমূল্য রত্ন আনিয়া মনুষ্যের হস্তে তুলিয়া দিতেছ,—কখনও, জীবের সুখে জন্ম হইয়া বিপাদ করিতেছ,—কখনও জীবহায়ে অনন্ত আভ্য কলাইতেছ, বল তুমি কি জান? সমুদ্র

কিছুই জানে না। সমুদ্রও ঐরূপ নিস্তব্ধ ও নীরব। হে ফুলোমুখ পাদপ, অয়ি ফুলময়ি লতিকে, হে চন্দ্র, হে সূর্য্য, হে অগণ্য নক্ষত্র নিচয়, বল তোমরা কে কি জান? এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই নিস্তব্ধ ও নীরব এবং নিবিড় অন্ধকারে অন্ধকারময়। এ ভাব বস্তুতঃই মনুষ্যপ্রাণের অসহনীয়। এই অমৃতময় সুন্দর জগতে হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বব্যাপি অন্ধকারের ঘনীভূত ভার লইয়া, উদাসীন, অনাশ্রয় ও অবলম্ব-হীনের মত অবস্থান করা বস্তুতঃই নিতান্ত ক্লেশকর।—কিন্তু যাঁহার জ্ঞাননেত্র অমৃতস্পর্শে উন্মীলিত হইয়াছে, পক্ষান্তরে তাঁহার কি শান্তি, তাঁহার কি সুখ! পূর্ব্বত ও সমুদ্র যামিনীর নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে তাঁহার নিকট পুরাতন ইতিহাসের অতি পুরাতন তত্ত্ব বিবৃত করে, তরুলতা সমীর-ভরে দুলিয়া দুলিয়া তাঁহার হৃদয়স্থ আনন্দে দোলায়িত রাখে, সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সৌন্দর্য্যের বিবিধ মূর্ত্তিতে তাঁহার চিত্তকে মোহিত করিয়া তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণারও তর্পণ করিতে রহে এবং এই অনন্তজগৎ তাঁহার আত্মায় সেই অপরিজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয় অনন্তের উদ্দীপন করিয়া তাঁহাকে উচ্চতর হইতে উচ্চতর সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়া তুলে।

প্রেমভ্রান্ত ততোধিক শোচনীয়। সে আপনার বিকৃত লালসায় স্বয়মিচ্ছ বন্দী। সে আপনার চক্ষে আপনি ইচ্ছা করিয়া ধূলি-ক্ষেপ করে,—আপনার শ্রুতিকে আপনি যত্নসহকারে বধির করিয়া রাখে। সে কখনও বিষসর্পকে চন্দনলতা বলিয়া কণ্ঠহার করে; এবং পরিশেষে সর্পবিষে জর্জ্জরিত হইয়া অশ্রুপাত করিতে থাকে;—কখনও বা অসুর কি পিশাচের ক্রূরগতি কিম্বা কোপনমতি অবলম্বন করিয়া আপনার মনুষ্যত্বকে আপনি বিনাশ করিয়া ফেলে। তখন যাহা স্বভাবতঃ ভাল, তাহার নিকট তাহাই মন্দ হয়; এবং যাহা স্বভাবতঃ মন্দ, তাহার নিকট তাহাই ভাল লাগে। তখন মুলোক, সৎকথা ও সৎপ্রসঙ্গে তাহার বিরাগ জন্মে; এবং কুলোক, কুকথা এবং কুৎসিত সংসর্গেই তাহার মন অনুরক্ত হয়। তখন সে আলোক ছাড়িয়া অন্ধকারে লুকাইতে পারিলেই সুখানুভব করে;—আপনার ভূত ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমান ক্ষণের পঙ্কিলমোহে নয়ন মুদিয়া ডুবিয়া থাকিতে পারিলেই তাহার ক্ষণিক তৃপ্তি জন্মে। সে তখন আপনাতে আপনি লজ্জিত, সতত মেঘাচ্ছন্ন, সতত শোকপূর্ণ;—আপনাতে আপনি ঘৃণার্হ তাহার অন্তরে মুমূর্ষুদাহ, অথচ আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত তৃষ্ণা। তাহার বিবেক তখন বাতাহত দীপশিখার ন্যায় নিমু নিমু জ্বলে,—দেখি দেখি করিয়াও দেখিতে পায় না;—তাহার হৃদয় তখন বিষাদময় সুখের বিষ-দংশনে অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্‌ করে, উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারে না। তখন সর্ব্বত্রই তাহার অবিশ্বাস এবং কৃত্রিম মানবতা ও কৃত্রিম অভিমানেই তাহার আত্মার বিশ্রাম। এ অবস্থা যেমন ভয়াবহ, তেমনই বিপজ্জিজনক। মনুষ্য যখন এই অবস্থায় আপতিত হইয়া পিপাসার যুগপাকে বিঘূর্ণিত হয়, শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করে, এবং মিত্রকে শত্রু জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে দূরে পলায়; আপনাকে আপনি এড়াইয়া থাকিতে চাহে, আপনাকে আপনি বঞ্চনা করিতে আরম্ভ করে,—আপনার সর্ব্বনাশ-সাধনে আপনি উন্মত্তের ন্যায় যত্নপরায়ণ হয়, তখন তাহাকে দেখিলে কাহার অন্তঃকরণ না ব্যথিত হয়? তরী নদীর স্রোতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, কর্ণধার নাই;—তরুমূলে পতিত শুষ্কপত্র বাতচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া যাইতেছে,—দিগ্‌বিদিগ্‌ গতি নাই। এ মূর্ত্তি দর্শনে কাহার চিত্ত না অমৃতস্পর্শে পবিত্র, অমৃতস্পর্শে শীতল, তাঁ

কি শান্তি, তাঁহার কি সুখ! এই সংসার তাঁহার নন্দনকানন। ইহার সর্ব্বত্রই পারিজাত-শোভা, পারিজাত-সৌরভ এবং প্রীতির মন্দাকিনী। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল হয়, কিন্তু কখনও আবিল হয় না;—চিত্ত আনন্দের নিত্য নূতন উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়, কিন্তু কখনও আপ্লুত হয় না,—এবং আত্মা অনন্ত গগনের জ্যোৎস্নার মত সকল সময়েই ঢল ঢল রহে, কিন্তু কখনও অস্তৃপ্তি, অবসাদ ও অন্তর্দ্দাহের জলন্ত চুল্লীতে ঢলিয়া পড়ে না। যাহা অমল তাহাতেই তাঁহার অনুরাগ;—এবং তাঁহার অনুরাগ ভক্তি প্রভৃতি উচ্চতম বৃত্তির সহিত অভেদবন্ধনে জড়িত ও মিশ্রিত। তাঁহার হৃদয়ের গতি বিবেকের অনুমোদিত এবং বিবেক হৃদয়ের সাহচর্য্য ও সহানুভূতিতে স্নেহাবনত। তাঁহার উৎসাহ বিষাদে অবসন্ন হয় না, আত্মার প্রসন্নকান্তি ক্রমশঃ পরিম্লান হইয়া নিবিয়া যায় না, এবং অন্তঃকরণ কামনা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির চিরকলহে সজীব নিরয়ে পরিণত পায় না। তিনি ধন্য, তিনি দেবতা, তিনি সৌভাগ্যবান্। মনুষ্যের মন এই জন্যই মনুষ্যকে অনুপ্রাণনার মাহেন্দ্রক্ষণে এই বলিয়া উপদেশ দেয় যে,—যদি জ্ঞানে ও প্রেমে কৃতার্থ হইতে চাও, তাহা হইলে অমৃতসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়, এবং অমৃতের অনাবিল তরঙ্গে মরালের মত ভাসিয়া ভাসিয়া অমৃত-বিলাস কর।

যাহারা ভাগ্যদোষে জন্মান্ধ অথবা বুদ্ধিদোষে কর্ম্মান্ধ,—স্মৃতি যাহাদিগের বুদ্ধিকর্ম্মদর্শন এবং আশা যাহাদিগের অন্ধকার, তাহারা হয় ত বিস্ময়ের অপরিব্যক্ত প্রেমে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে,—এই অমৃতসমুদ্র কোথায়? ইহা কি কবিকল্পনা, না প্রকৃত পদার্থ? ইহার অস্তিত্ব কি অনুভূত হইতে পারে? মনুষ্যের মন উচ্চতর আলোকে আলোকিত হইলে এই প্রশ্নেরও উত্তর করিয়াছে, এবং ইতিহাসের প্রথম সৃষ্টি ও মানবহৃদয়ের প্রথম বিকাশ হইতেই বলিয়া আসিতেছে যে, এই অমৃতসমুদ্র অন্তরে ও বাহিরে,—ইহারই অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব,—ইহা হইতেই জগতের শোভা, সামর্থ্য ও সুখ। আমরা এই প্রত্যক্ষ জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এবং দ্রব ও ঘন পদার্থ মাত্রেই যে, সৌন্দর্য্যের এক রমণীয় আবরণ দেখি, তাহা কি?—ঐ অমৃতসমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ। বিজ্ঞান এই বহিঃস্থ জগতের সমস্ত বস্তুতেই যে, অদৃশ্য শক্তির আনন্দময়ী লীলা নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তির উচ্ছ্বসিতভাবে বিহ্বল এবং নৈরাশ্যের অবসাদেও উৎফুল্ল এবং উদ্বোধিত হয়, তাহা কি?—ঐ অমৃত-সমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ। এই বিশ্বব্যাপি প্রাণসমুদ্রে আশা ও উল্লাস এবং সুখ ও হর্ষের যে অনন্ত লহরী অনন্ত ভঙ্গিতে খেলিতেছে, তাহা কি?—ঐ অমৃত-সমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ। আর, ভাবুকের হৃদয় ও প্রেমিকের প্রাণ, যে তরঙ্গে ভাসমান হইয়া, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করে—জ্ঞানের অগম্যকে অন্তরে স্পর্শ করিয়া শীতল হয়, তাহা কি?—ঐ অমৃত-সমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ। আমরা যে কিছুই জানিতে পাই না, কিছুই বুঝিতে পাই না, ইহার এমন অর্থ নহে যে, ঐ অমৃত-সমুদ্র দূরে রহিয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, আমরা আপনারাই বিপাকবদ্ধ ও ভোগমুগ্ধ হইয়া আপনা হইতে দূরে পড়িয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অন্তরের অন্তরতমপ্রাণ তথাপি অমৃতের জন্য তৃষ্ণায় আকুল। যখন এই বিপাকের বন্ধন ছিন্ন হইবে এবং মোহের আচ্ছাদন তিরোহিত হইয়া যাইবে, তখন সেই দূরস্থ অমৃতসমুদ্রকে আমরাও অন্তঃস্থরূপে অনুভব করিয়া জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিব; এবং আমাদিগের প্রাণ, মন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা অমৃ

তের স্রোতে ঢালিয়া দিয়া অনন্তের দিকে প্রবাহিত হইব।"

'নিভৃত-চিন্তার' প্রকৃতি বিশেষ ভাল—ইহার প্রস্তাব-গুলি সমসূত্রে—এক মহান্ উপাদানে গঠিত। জীবন-গতি-নির্ণয়ের মহান্ তত্ত্ব ইহাতে সুন্দররূপে গ্রথিত। "অমৃত"-অন্বেষণ আরম্ভে, "লোকরহস্য" উপসংহারে; ঐহিক অমরতা, অশ্রুজল, বিরাট পুরুষ, রাজা ও রাজশক্তি, লোকারণ্য—উহার অন্তর্নিহিত স্তরগত। অভিনিবেশ-সহকারে দেখিলে বুঝা যায়, ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্যের সহিত, জীবন-কাব্যের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য-তত্ত্ব ইহাতে বিবৃত। ভাবুক-জন ইহাতে ভাবসুধা পাইবেন; সাহিত্য-সেবী ইহাতে সাহিত্য-রসাস্বাদ করিবেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আলোচনা।

বাঙ্গালীর জাতীয় অভাব ও অবস্থা।—এই বিষয়ে সং প্রতি বড় গভীর চিন্তা-চর্চ্চা করিয়াছেন—শ্রীমান হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। তাঁহার সরল-সুন্দর অভিব্যক্তি—যাহা সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশন পঠিত হয় ও এক্ষণে যাহা জন্মভূমিতে প্রকাশিত হইয়াছে—তাহারই কথা বলিতেছি। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাঙ্গালীর অভাব ও অবস্থার আলোচনা করিয়েছেন; এবং তাহাতে, বাঙ্গালীর যে সকলই অভাব, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। তা' ঠিক; কিন্তু, এত গবেষণা-ভাবনার পরিচয় দিলেও, তাঁহার যে উক্তি-প্রবন্ধে আমাদের একটা অভাবের কথাই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; ভাষার ছটায়, ভাবের আবরণে বা সংগ্রহের ধাঁধায়, কিছুতেই যেন সে ভাব চাপা পড়ে নাই—পাতা-ঢাকা আগুন যেন আপনিই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেটি ফুটিয়া, স্পষ্ট দেখিতে পাই—এক অভাবেই আমাদের সব অভাব—অন্নবস্ত্রের অভাবেই আমাদিগের মর্ম্মভাব অনুভূত হইতেছে। গড়পড়তা সমগ্র পৃথিবীর ব্যক্তিগত বার্ষিক আয় দেখাইয়া, প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, ভারতবাসীর প্রত্যেকের আয় ইংরাজের আয়ের ১০ ভাগের এক ভাগেরও কম।—এমন কি, "ইংলণ্ডের লোকেরা গড়ে প্রতি বর্ষে প্রত্যেকে ৪ পাউণ্ড মূল্যের খাদ্যদ্রব্য সেবন করে; আর আমাদের গড়ে আয় ২ পাউণ্ডের অধিক নহে।" আরও, "সকল দেশেই মধ্যবিত্ত লোকের অবলম্বন প্রধানতঃ চাকরী। ভারত-গভর্ণমেণ্ট ১১ কোটী টাকা কর্ম্মচারীদিগের বেতন-হিসাবে ব্যয় করেন, তাহার মধ্যে বিদেশীয় কর্ম্মচারীরা পান ৯ কোটি টাকা আর দেশীয়েরা ২ কোটী টাকা মাত্র।" আমদানী-রপ্তানী "হিসাবেও অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের বার্ষিক লোকসান ৩০।৩২ কোটি টাকা। আয়-ব্যয়ের বিষয়-তো এই গেল; তাছাড়া, আগে "সাধারণ খাদ্যসামগ্রীর যে দর ছিল, এখন তাহার দর আটগুণ, দশগুণ, খাদ্য-বিশেষে বিশগুণেরও অধিক হইয়াছে। কিন্তু শ্রমের মূল্য তিন-চারিগুণ বাড়িয়াছে মাত্র।" অধিক দিনের কথা নয়—গত ৪০ বৎসরের মধ্যে ভারতে শ্রমের মূল্য বাড়ে নাই, কিন্তু চাউলের দর তিনগুণ বাড়িয়াছে। আমাদের অবস্থা-বিষয়ে "হণ্টার সাহেব কৃত গণনা, কুসনামূলক বা অতিরঞ্জিত নহে। হণ্টার সাহেবের গণনায় ৫ কোটি ভারতবাসী অর্দ্ধ সিনে জীবন যাপন করে। জন্মাবধি মরণান্ত এই হতভাগ্যেরা ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তির সুখ অনুভব করিতে পারে না।" ভাবুন দেখি এক অভাবেই সব অভাব কি না? বলবীর্য্য বল, ন্যায়ধর্ম্ম বল—এ অবস্থায় কিসের অভাব না হয়? সুতরাং ঐ এক অভাবেই আমাদের সকল অভাব। এক্ষণে, আমাদের সকলেরই প্রধান ও প্রথম চেষ্টা হওয়া উচিত—ঐ অভাব যাহাতে দূর হয়।

যুদ্ধ-বিগ্রহ।

চীন-জাপানীর যুদ্ধ।—গত সপ্তাহেও জাপানীদিগের বহু স্থানের জয় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'টকুজো,' 'হৈচেঙ্গ' প্রভৃতির যুদ্ধের পর মাঞ্চুরিয়া-প্রদেশ জাপানীরা দখল করিয়া লইয়াছে।

'মাঞ্চুরিয়ার' যুদ্ধে জেনারেল নগের অধিনায়কত্বে 'হৈচেঙ্গে' প্রায় দশ সহস্র চীন-সৈন্য উপস্থিত ছিল। গত ১৯এ তারিখে প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরিয়া তথায় যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পুরাজয়ের সহিত চীনদিগের বিপুল ক্ষতি হইয়াছে। সন্ধি-স্থাপনের জন্য, চীন হইতে দুই জন রাজকর্ম্মচারী জাপানে প্রেরিত হইয়াছেন। মার্কিন গভর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ আছেন; তাঁহাদের দুইজন কর্ম্মচারীও ঐ উপলক্ষে 'টকিয়ো' গিয়াছেন। যুদ্ধও চলিতেছে, সন্ধিরও আয়োজন হইতেছে—রহস্য মন্দ নহে!

যুদ্ধ-ব্যয়ে জাপানের ঋণ ক্রমেই বাড়িতেছে; এমন কি, এজন্য কেহ কেহ জাপানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও নানা আশঙ্কা করিতেছেন। ঋণ-বৃদ্ধির সহিত জাপানীরাও চীনের নিকট অধিক টাকার আশা করিতেছে।

অদ্ভুতকার সংবাদ, চীনগণ 'নিউচুঙ' পুরি-ত্যাগ করিয়া 'দেমেণ্টাস' পলায়িত হইয়াছে।

ফরাসী-মাদাগাস্কারে যুদ্ধ।—মাদাগাস্কারের গোভারা প্রকৃতই বশ্যতা স্বীকার করে নাই। যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। ২৩এ তারিখে আণ্টোগিল উপসাগরে একটি যুদ্ধ হয়; তাহাতে কিন্তু হোভারাই পরাজিত হইয়াছে—তাহাদের তামাবেত নগর ফরাসীদের অধিকারে আসিয়াছে। যুদ্ধে তিন জন হত হয়, এবং অবশিষ্ট পলায়ন করে। ইহার পরের সংবাদ, তাহারা ফরাসী-দিগের 'ইভোণ্ডা' নামক নগর অগ্নি-সংযোগে পুড়াইয়া দিয়াছে।

ওয়াজিরি-ইংরাজে যুদ্ধ।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটী যুদ্ধ মাত্র হইয়াছে। বিদ্রোহীরা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পাহাড়ের মধ্যে লুকাইতেছে। অধিকাংশ পাহাড়ী ভীত ও ত্রস্ত। দুই একদল মাত্র মধ্যেমধ্যে যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে ও শেষে পরাজিত, আহত ও পলায়নপর হইতেছে।

সভা-সমিতি।

জাতীয় মহা-সমিতি।—মাদ্রাজ নগরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন। সভাপতি—পার্লিয়ামেণ্টের জনৈক সদস্য মিঃ ব্রে ওয়েব। ২৬এ ডিসেম্বর সমিতির অধিবেশনের প্রথম দিন—অভ্যর্থনা বিভাগের সভাপতি মাননীয় রঙ্গিয়া নৈডু প্রথমে মহাসমিতির সভাপতি ও সদস্য-গণের অভ্যর্থনা-সূচক প্রস্তাব পাঠ করিয়া সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্যের বিষয় আংশিক বর্ণনা করেন, এবং মুসলমানেরা এ বৎসর সমিতির প্রতি উদাসীন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। তদ্‌পর সমিতির সভাপতি সমিতির কার্য্যকারিতা ও আবশ্যকতার বিষয় বিবৃত করেন। ২৭এ ডিসে-

স্বর—দ্বিতীয় দিন—ঐদিন প্রথমে বস্ত্র-শুল্ক আইনের অপকারিতা ও নিবারণ-চেষ্টার প্রস্তাব হয়; পরে, 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত আইনের সংশোধন প্রস্তাব-হস্ত, এবং তাহা না হওয়ায় 'বেহারের' যে বিপুল অনিষ্ট হইতেছে—তাহা প্রদর্শিত হয়।

ডাক্তারী সমিতি বা মেডিকেল কংগ্রেস।—মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসমিতি, এদিকে ডাক্তারী সমিতি। দেশ-বিদেশের প্রধান প্রধান ডাক্তার-গণের পরামর্শ-সিদ্ধান্তে দেশের স্বাস্থোন্নতি ও বিবিধ পীড়ার সুচিকিৎসা-প্রকল্পে—এই সমিতির অধিবেশন।

আমোদ-প্রমোদ।

মহিলা-শিল্প-মেলা।—১৫ই পৌষ বেথুন কলেজে বসিবে। অবলা স্ত্রীলোকদের সাহায্যার্থ। মহিলা-নির্ম্মিত নানারূপ শিল্পদ্রব্য ও খাবার প্রভৃতি বিক্রিত হইবে। পরে স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা নাটক অভিনীত হইবে। স্ত্রীলোক দর্শক ভিন্ন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। টিকিটের দাম ॥০ হইতে ৩৲ টাকা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী এই সধী-সমিতির তত্ত্বাবধায়িকা। নাট্যদর্শন-প্রিয় মহিলাগণের এ অনুষ্ঠানে সহানুভূতি-প্রদর্শন বাঞ্ছনীয়।

বড়দিনে রঙ্গভূমি-সমূহ।—মিনার্ভা, ষ্টার, রয়েল, বেঙ্গল এমারেল্ড— বড়দিনে সর্ব্বত্রই সরগরম ছিল। মিনার্ভার নূতন পকর "সভ্যতার পাও" সুন্দর হইয়াছে; আমোদ ও শিক্ষা দুই আছে। একাকার—ষ্টারে—উহাও সমানচিত্তাকর্ষক। এতদুভয়ের সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা পরে করা যাইবে।

প্রশংসা-বাদ।

গয়া-যাত্রীর সুবিধা।—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল, ডাক্তার মহাশয় বড়ই উদ্যোগী পুরুষ। গয়ার গয়ালীদের নানাবিধ অত্যাচার ছিল। তিনি এক যাত্রিনিবাস স্থাপনা করিয়া, যাত্রীদের সেই কষ্ট দূর করিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধে বহুল প্রশংসাপত্র দেখিয়া, আমরা পরম পরিতুষ্ট হইলাম। আশা করি, পাল মহাশয়, এইরূপ সুযশ ও সুনামের সহিত সাধারণের উপকার করিয়া, দেশের নিকট কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

কুষ্ঠরোগের ঔষধ।—কুষ্ঠব্যাধি যেরূপ দুরারোগ্য, তাহাতে ইহার কোন ঔষধের কথা শুনিলে, হঠাৎ অবিশ্বাস হয়। কিন্তু, বড়ই আনন্দের বিষয়—বাবু বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংপ্রতি ঐরূপ একটী তৈল ও ঔষধ বাহির করিয়া, সাধারণের সে ভ্রম-বিশ্বাস দূর করিতেছেন। সময়, সহচর, সোমপ্রকাশ ও সঞ্জীবনী প্রভৃতি পত্রিকায় এবং বহুল কৃতবিদ্য ডাক্তার মহাশয়গণ এই ঔষধের সম্বন্ধে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। আমাদেরও পরিচিত দুই-একটী বন্ধুর নিকট ঐ তৈলের প্রকৃত ফলোপধায়ক গুণের পরিচয় পাওয়া গেল। সুতরাং আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই তৈলের প্রচার কামনা করি।

কলিকাতা পিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ। ২০এ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। ৩৪শ সংখ্যা।

দুর্জ্জনাষ্টক।

দুর্জ্জন মানুষ নয়, কি জন্য জানিনা তায়,
নিরন্তর করে পাপাচার।
সতত ইন্দ্রিয়-দাস, তথাপি মুখে-প্রকাশ,
করে নিজ দেব-ব্যবহার ॥ ১।

মাখাল ফল যেমন, বহির্ভাগে সুবরণ,
অভ্যন্তরে ছাইভরা তার।
ইন্দ্রিয়ের দাস যত, বাস্তবিক সেই মত,
অন্তরে নিতান্ত কদাকার ॥ ২।

নাই লজ্জা ঘৃণা ভয়, স্বার্থসিদ্ধি যাতে হয়,
কেবল তাহার অন্বেষণ।
কভু উগ্র কভু ধীর, কভু ভীরু কভু বীর,
বহুরূপ করে সে ধারণ ॥ ৩।

কখন উঠে মাথায়, কখনো বা ধরে পায়,
কভু নিন্দা কভু স্তুতি করে।
দুর্ব্বলের কাছে শক্ত, সবলের অনুরক্ত,
দুর্জ্জন অদ্ভুত বেশ ধরে ॥ ৪।

হিতবাদী বন্ধুগণে, দ্বেষ করে মনে মনে,
আকৃতজ্ঞ অধম দুর্ম্মতি।
অনিত্য সংসার তরে, সদা পাপকার্য্য করে,
অসতের অনিবার্য্য গতি ॥ ৫।

সুজনের প্রতি রোষ, কুজনে সদা সন্তোষ,
দুর্জ্জনের দুরন্ত অন্তর।
নাই পাত্রাপাত্র জ্ঞান, অসতে প্রচুর দান,
দরিদ্র দুর্ব্বলে ভাবান্তর ॥ ৬।

নিয়ত অসাধু-সঙ্গ, সাধুজনে বহিরঙ্গ,
ভাবিয়া না করে সমাদর।
মহৎ লাঞ্ছন পাপ, জলন্ত পাবক-তাপ,
জানিয়াও না জানে পামর ॥ ৭।

দয়ার সাগর হরি, দুর্জ্জনেরে দয়া করি,
শুভবুদ্ধি কর প্রভো দান।
অধমতারণ নাম, তুমি নাথ কৃপাধাম,
কেবা আছে তোমার সমান ॥ ৮।

শ্রীগোবিন্দমোহন রায়।

প্রাণ-কথা।

দয়া ও প্রেম।

সর্ব্বভূতে সমদর্শিতাই দয়াগুণের মূল ভিত্তি। আত্মেতরের প্রতি যে স্নেহার্দ্র ভাব, তাহাকেই দয়া বলে। দয়াতে ও প্রেমে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই। তবে দয়া তরল ভাব—প্রেম ঘনীভূত ভাব। দয়ায় আত্মপর-জ্ঞান বিদ্যমান—প্রেমে তাহার লয়-ভাব। যাহাকে পর বলিয়া জানি, তাহার দুঃখ-মোচনের যে স্পৃহা, তাহাই দয়া—আর যাহাকে আপনার বলিয়া জানি, তাহার প্রতি যে স্নেহবিগলিত ভাব—তাহার সহিত যে মধুরভাবে সংমিশ্রণ—তাহাই প্রেম। পরের দুঃখ দেখিয়া, অন্তর্বিপ্লব পরিমার্জনের সকলেরই মনে দয়া উপস্থিত হয়। এই জন্যই পরের দুঃখে লোকে আর কিছু করিতে না পারুক—অন্ততঃ 'আহা' কথাটী বলিয়া নিজের সহানুভূতি জানায়। অনেক সময় এই সহানুভূতিব্যঞ্জক 'আহা' শব্দ কপটতা-মূলক বা অন্তঃসারশূন্য শিষ্টাচার (Etiquete) প্রসূত হয় বটে, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক ভাব নহে—সংসারের বিকৃত ভাব। বিকারগ্রস্ত লোক দেখিয়া প্রকৃতির ক্রিয়া অনুমান করা ঠিক নহে। পর্ব্বতের কর্দ্দমিত জল দেখিয়া জলের স্বাভাবিক ভাব স্থির করা সঙ্গত নহে।

মানুষের হৃদয়-সরোবর স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল প্রেমবারিতে পরিপূর্ণ। মন্দাকিনীর বিমল স্রোত আসিয়া যখন ইহাতে পড়ে, তখনই ইহা ক্রমশঃ তড়াগ, হ্রদ বা সাগর বা মহাসাগরে পরিণত হয়। যদি সেই হৃদয়-সরোবরে সংসারের মলবাহিনী জলপ্রণালীর জল আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই সরোবর বিষাক্ত জলাধার Cesspool হইয়া দাঁড়ায়। তখন আর তাহাতে প্রেমবারি থাকে না—তাহাতে তখন তরল হলাহলের তরঙ্গ উঠে। সে হৃদয় পরের দুঃখে নৃত্য করিতে থাকে। সুতরাং পরের দুঃখ দেখিয়া তাহা মোচন করিবার ইচ্ছা তাহাতে উদিত হইতে পারে না। সেই অস্বাভাবিক অবস্থা দেখিয়া মানব-প্রকৃতির লক্ষণ স্থির করা উচিত নহে। সুতরাং আমরা এক্ষণে যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিব, তাহা অবিকৃত মানবকে লক্ষ্য করিয়া। বৈজ্ঞানিক এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। মানব-দেহের বর্ণনা করিতে গিয়া, কোন চিকিৎসক পীড়িত দেহের বর্ণনা করেন না।

স্বচ্ছ নির্ম্মল হৃদয়ে পরের দুঃখে বেদনা জন্মিবেই জন্মিবে। সহানুভূতি-বলে সহৃদয় ব্যক্তি পরের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া মনে করিবেন। আপনার দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিবার ইচ্ছা যেমন স্বতঃই বলবতী হয়, সেইরূপ যখন পরের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া মনে হইবে, তখন তাহার অপনয়ন করিবার ইচ্ছা আপনিই উদয় হইবে। এই ইচ্ছা দয়ার সহচরী। পরের দুঃখ দর্শনে যে গলিত-ভাব—যে করুণ-রসের স্ফুরণ—তাহাই দয়া। দয়া-দেবী হৃদয়-সরোবরের ফুল-কমলে আসিয়া যেমন আবির্ভূত হন, অমনি পরদুঃখ-মোচনেচ্ছা দাসীরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কর্ত্রীর নিকট আদেশ-প্রার্থনা করে; বলে—'দেবী, আদেশ করুন, আমায় কি করিতে হইবে?' দয়া-দেবী ইচ্ছা-দাসীকে তখনই আদেশ করেন—'অবিলম্বে এই ব্যক্তির দুঃখ মোচন কর।' দাসী 'তথাস্তু' বলিয়া কর্ত্রীর আদেশ-

প্রতিপালনে ব্যতিব্যস্ত হয়, এবং গৃহস্থিত শুভুলক্ষণা দিয়াও প্রার্থী দরিদ্রকে ভোজন করায় বা অন্য যে কোনরূপে তাহার দুঃখ মোচন করিতে চেষ্টা করে। শোকাতুর হইলে দাসী তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দেয়, তৃষ্ণাতুর হইলে তাহাকে তৃষ্ণার জল আনিয়া দেয়; সংক্ষেপতঃ যাহার যে বিষয়ে অভাব, প্রাণপণে তাহার সে অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করে। ইচ্ছার অসাধ্য কিছুই নাই। দেবী-প্রসাদে ইচ্ছা অনেক সময় অভীষ্ট-সাধনে কৃতকার্য্য হয়।

প্রেমের লীলা অপূর্ব্ব। প্রেমিক আত্মজ্ঞানে আত্মহারা হইয়া যায়। সেই গলিত-ভাব দেখিয়া ইচ্ছা-দাসী সঙ্গে আসিতে সাহস করে না। না ডাকিলেই বা কোন্ কালে দাসদাসী উপস্থিত হয়? প্রেমের তন্ময়ত্ব ভাবে প্রেমিকে প্রেমিকে মিলিয়া এক হইয়া যায়। একজন কাঁদিলে আর জন কাঁদে, একজন হাসিলে অন্য জন হাসে। একজন না খাইলে আর একজন খায় না; একজন না বসনাবৃত হইলে আর একজন কটিতে বসন দেয় না। দেখিলে বোধ হয়, যেন নাভি-সংলগ্ন দুইটি যমজ ভ্রাতা বা যমজ ভগ্নী। প্রেমের অদ্বৈতভাবে লিঙ্গভেদ থাকে না। প্রেমের স্ফুরণে মানব দেব ও মানবী দেবী-রূপে পরিণত হয়। প্রেমের জ্যোতিতে জড়ত্ব দলীভূত হইয়া চৈতন্যের পূর্ণবিকাশ হয়। যিনি এই প্রেমের অদ্বৈতভাবে ভগবানে লীন হন, তিনি পূর্ণ চৈতন্যময়। তাঁহার আর ব্যক্তিগত অস্তিত্ব নাই—প্রেম-প্রকাশের শক্তি নাই—ভগবানের উপাসনায় সামর্থ্য নাই। নয়ন মুদিয়া, আসনে বসিলেই, তিনি আর নিজেকে দেখিতে পান না। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে কেবল সেই প্রেমময় বিরাট পুরুষের সত্তামাত্র উপলব্ধি হয়। ইহাকেই সমাধির অবস্থা কহে। এই সমাধির অবস্থা যাঁহার নিত্য থাকে, তিনিই জীবন্মুক্ত। তাঁহাকে পূজা করিলেই ভগবানের পূজা করা হয়। কারণ, সেখানেই সাকার ও নিরাকারের লয়-ভাব। নিরাকারের পূজা হইতে পারে না। নিরাকার যখন সাকারে আবির্ভূত, তখনই তাঁহার পূজা সম্ভাবনা। জড় প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার অর্থও—এই সাকারে নিরাকারের অবতারণা। চৈতন্যের আবির্ভাবে যখন মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজার্হা হন, তখন চিন্ময়ী মানবী-প্রতিমা যে চৈতন্যের স্ফুরণে জগতের আরাধ্যা কেন না হইবেন—তাহা আমি বুঝিতে পারি না। যোগের অলৌকিক শক্তিবলে চিন্ময়ী মানবী-মূর্ত্তিতে চৈতন্যের পূর্ণস্ফুরণ হয়। যোলকলা স্ফুরণ হইলে, নিত্য-সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন সেই মানব পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ ও শিবে চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ কলা স্ফুরণ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদিগকেও পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া থাকে। যেখানে জড় ও চৈতন্যের পূর্ণ লয়-ভাব, সেইখানেই প্রেমের পূর্ণ বিলসন। সেখানে পূর্ণ প্রেম আছে বলিয়াই, সেখানে প্রেমের বাহ্যক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রশান্ত মহাসাগরে প্রায় তরঙ্গ উঠে না। যেমনতর গভীর জলে পবনের বেগের প্রচণ্ডতা উপলব্ধি হয় না। দামোদরের গভীরতা অল্প বলিয়া, দামোদরে স্রোতের বেগ অত্যন্ত অধিক। জল এখানে চৈতন্যের সহিত তুলনীয়, আর স্থল জড়ের সহিত তুলিত। যেখানে জড়ের আধিক্য, সেইখানেই চৈতন্যের লীলা অতি প্রকট। জোয়ারের জলের প্রকোপ যেমন চড়ার উপর, চৈতন্যের প্রকোপ সেইরূপ জড়াধিক্যের উপর। জড়ের আধিক্য যেন চৈতন্যসহিতে পারেন না। সেই জন্যই জড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া আপনাতে লীন করাই যেন ইহার প্রধান কার্য্য। সে কার্য্যের প্রধান সহায় প্রেম। প্রেমময়তা চৈতন্যের একটী লক্ষণ, সেই

প্রেম দ্বারাই চৈতন্য জড়কে প্রথমে দমিত, পরে গলিত ও পরিশেষে আপনাতে লীন করিয়া নিজের অপার মহিমার পরিচয় দেন।

চৈতন্য ও ব্রহ্মতেজ একই পদার্থ। এই চৈতন্য বা ব্রহ্মতেজের সহিত জড়ের প্রচণ্ড সমর সূর্য্য-লোকে নিয়ত ঘটিতেছে। চৈতন্য বা ব্রহ্মতেজ সূর্য্য-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সমস্ত সৌরজগৎকে প্রেমডোরে আকর্ষণ করিতেছেন—জড়জগৎকে দগ্ধীভূত করিয়া আত্মলীন করিবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছেন। প্রেমের এমনই মহিমা যে, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী চৈতন্যময় পুরুষ ঘৃণিত বিষ্ঠাকেও আকর্ষণ করিতে ক্রটি করেন না। সেই আকর্ষণ-শক্তিতে সমস্ত মলিন পদার্থ বিশোধিত ও সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ আবর্ত্তিত হইতেছে। কেহ স্থির থাকিতে পারিতেছে না—সকলেই সূর্য্যবক্ষে স্থান লইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া নিরন্তর সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতেছে—অথচ নিজের জড়তা-বশতঃ তাহাতে লীন হইতে পারিতেছে না। এখন সেই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বিরাট পুরুষ জড়ের সহিত প্রেমের এই স্থূল লীলা করিতেছেন। কিন্তু সেই প্রলয়ের দিনে—যখন তাঁহার লীলা সাঙ্গ হইবে—তখন, সমস্ত সৌরজগতের ব্যষ্টিভাব অপনোদন করিয়া সেই বিরাটপুরুষ সকলকে আত্মলীন করিবেন।

এই অবস্থায় যাইবার পূর্ব্বে জড়ে জড়ে বা চৈতন্যে চৈতন্যে অথবা জড় ও চৈতন্যে প্রেমের অনেক ঝুললীলা বা রাসলীলা করিয়া নিজ-নিজ জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে।

এই প্রেমের লীলা শিক্ষা দিবার জন্যই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রকৃতি-পুরুষ লইয়া, এবং চৈতন্যের প্রেমলীলা শুদ্ধ পুরুষ লইয়া হইয়াছিল। চৈতন্য কৃষ্ণপ্রাণ ছিলেন বলিয়া, তিনি আপনাকে প্রকৃতি ও শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষ করিয়া, প্রকৃতি-পুরুষের মিলনের অভিনয় করিতেন। ভক্তগণ আপনাদিগকে নিরন্তর প্রকৃতি ভাবিতে ভাবিতে ভারনাশক্তি-বলে ক্রমে প্রকৃতিভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেন। এইজন্য বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় অনেক পরিমাণে স্ত্রীভাবাপন্ন। তাঁহাদের আকারেও রমণীসুলভ মাদুরী পরিদৃষ্ট হয়। চৈতন্যের মূর্ত্তিতে রমণীসুলভ সৌন্দর্য্য ও মাধুরী ছিল বলিয়াই, তাঁহাকে জগৎ অদ্যাপি রাধাশ্যামের সংমিশ্রণ বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, তিনি বাহিরে রাধা—ভিতরে শ্যাম। একাধারে প্রকৃতি-পুরুষের রাসলীলা করিবার জন্যই যেন তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই জন্যই ধর্ম্মসাধনের জন্য তাঁহার ধর্ম্মপত্নীর সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। তাই তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পুরুষরূপে প্রকৃতির সহিত রাসলীলা করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি রমণীমোহন-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভুবনমোহন রূপে ব্রজ-গোপিনীগণ আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন—তাঁহারা জাতিকুলমানে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ব্রজদুলালে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারা লোকনিন্দাকে অঙ্গের আভরণ করিয়াছিলেন। লোকনিন্দাকে অঙ্গের আভরণ না করিয়া, কে কবে ভগবানকে লাভ করিয়া থাকে? এই প্রেমের লীলায় রাধা সখীগণকে ও স্বয়ং কৃষ্ণকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেমের উপমা দিবার স্থল নাই। এক তুলনা-স্থল—জনকনন্দিনী সীতা। কিন্তু রামকে ভাল-বাসিবার জন্য সীতাকে ত্রিজগতে লাঞ্ছিত হইতে

হয় নাই; বরং রাম-প্রেমের জন্যই তিনি জগতের আরাধ্যা, সতীর শীর্ষস্থানীয়া বলিয়া জগতে উদ্ঘোষিতা। কিন্তু রাধাকে কৃষ্ণপ্রেমের জন্যই গৃহে ও বাহিরে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল, কলঙ্কের ডালি মাথায় ধারণ করিতে হইয়াছিল, এবং অসহ্যগঞ্জনারও পরিহাস-স্থল হইতে হইয়াছিল। কিন্তু রাধার কৃষ্ণ-প্রেম এই সকল বিভীষিকা-সত্ত্বেও এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় না। বরং এই সকল নির্য্যাতনে সেই প্রেম শতগুণ ঘনীভাব ধারণ করিয়াছিল। পুরুষের প্রেম অপেক্ষা রমণীর প্রেম অনেক অধিক ও অনেক বিশুদ্ধ,—ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই প্রেমময় শিব রাধারূপে বৃন্দাবনে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। সদাশিব ব্যতীত কৃষ্ণ-প্রেমে এত পাগল আর কে হইতে পারে? রাধার কৃষ্ণ-প্রেম যে সম্ভোগেই ক্রটিত হইয়াছিল—একপ নহে। বৃন্দাবন-লীলায় রাধার কৃষ্ণ-প্রেমের উচ্চ সমস্ত অবস্থা-মাত্র পরিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু একশত বৎসরের বিচ্ছেদে সেই প্রেম ভাগীরথীর পবিত্র বারির বসন্ত-কালীন শান্ত ও নির্ম্মল ভাব ধারণ করিয়াছিল। সেই শান্ত ও স্বচ্ছ বারিতে প্রভাসতীর্থে অপূর্ব্ব কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। রাধার হৃদয়-ভাগীরথীর স্বচ্ছ ও প্রশান্ত বারিতে কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রতিবিম্বিত হইত না। ইহাই রাধার কৃষ্ণ-প্রেমের মাহাত্ম্য। জগৎ এই পরীক্ষা-গ্রহণ করিয়াই কৃষ্ণ-নামের অগ্রে রাধার নাম সংযোজিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ—রাধাই শ্রীকৃষ্ণের আত্মা। জগৎ এখন বুঝিতে পারিয়া, রাধাকৃষ্ণের উপাসক হইয়াছে। তাই আজ 'জয় রাধাকৃষ্ণ' ধ্বনিতে ভারতগগন আপূরিত হইতেছে। পাঠক! যদি প্রকৃত প্রেম শিক্ষা করিতে চাও, তবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব বুঝিতে শিখ। হরিহরের একপ অদ্বৈত মিলন আর কখন হয় নাই, আর কখন হইবে কিনা জানি না। হরিহর বা রাধাকৃষ্ণের ন্যায় পুরুষে-পুরুষে বা প্রকৃতি-পুরুষে অদ্বৈতভাবে মিলিত হইয়া, ভারত-বাসিগণ, আবার তোমরা জগতে পূজিত হও। এই অদ্বৈত প্রেম ব্যতীত ভারতের উদ্ধারের আর কোন আশা নাই। এই প্রেমতত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা কর,—বৈদেশিক বিকৃত উপদেশে খণ্ডিত-মস্তিষ্ক হইয়া আর আত্মবঞ্চিত হইয়া থাকিও না। ভারতের রত্নভাণ্ডারে অমূল্য নিধি পাইবে, আর কাচের অনুসন্ধানে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইও না।—বৈদেশিক বিধর্ম্মীকে গুরুপদে বরণ করিও না।—যথেষ্ট হইয়াছে। আর যাইও না—এখনও ফিরিলে অনেক আশা আছে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম, এ,।

সুধামুখী।

(সত্যঘটনা-মূলক উপন্যাস।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া যাইতে লাগিল। সুধামুখী এখন বেশ বড় হইয়াছে। এখন আর সে তাহার অবিনাশ দাদার যত্নে ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায় না; উদ্যান হইতে ফুল আন, শিচু ইত্যাদি পাড়িয়া দিবার জন্য আবদার করে না; অবিনাশের পাঠাভ্যাসের সময় এখন আর পূর্ব্ববৎ তাহার মুখপানে তাকাইয়া

থাকে না; বাল্য-সুলভ চপলতা এখন আর নাই; বরং তৎস্থলে একটু গাম্ভীর্য্য হইয়াছে। প্রাতঃ সূর্য্য-তাপে ঈষৎ-উন্মেষিত কমলিনীর ন্যায় তাহার অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত লাবণ্যময়ী দেহখানি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল। নিরিড় কৃষ্ণতারযুক্ত বিস্ফারিত লোচন-যুগলের উপরে চিত্রিত ধনুখণ্ড-বং সুন্দর ভ্রূ-যুগল শোভা পাইতেছিল; পূর্ব্বে যে চক্ষে সর্ব্বদা চপলতা খেলা করিত, আজ তাহা ঈষৎ ব্রীড়া-সংযুক্ত—আপনা-আপনি নমিত হইয়া থাকে। নীল কাদম্বিনীবৎ সুচিক্কণ কেশ-রাশি; যখন আলুলায়িতভাবে অযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে, তখন সেই সুদীর্ঘ কেশ-রাশি পৃষ্ঠ-দেশকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া আগুল্ফ পর্য্যন্ত লম্বিত হয়।

সুধামুখী এখন বহির্দ্বারে আসে না, সুতরাং অবিনাশের সঙ্গে অল্পই দেখা হইয়া থাকে; কিন্তু তা বলিয়া, সুধামুখী তাহাকে ভুলিয়া যায় নাই। যখন অবিনাশ আহার করিতে অন্দরে প্রবেশ করিয়া থাকে, তখন সুধামুখী, কোন না কোন ছলে, রন্ধনগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অবিনাশকে দেখিয়া যায়। অন্যের অসাক্ষাতে বাতায়ন-ছিদ্র দিয়া অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া থাকে; দৈবাৎ অবিনাশের সেই দিকে দৃষ্টি পতিত হইলে, বালিকা সলজ্জভাবে তখনই প্রস্থান করে। তাহার অন্তঃকরণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে থাকে; যেন সুধামুখী কত অপরাধে অপরাধিনী। তাহার জননী, কোন কার্য্যের জন্য অবিনাশকে অন্তঃপুরে ডাকিলে, সুধামুখী তথা হইতে প্রস্থান করে; কিন্তু দৃষ্টির অন্তরাল হয় না, সুবিধা হইলে তাহাকে দেখিয়া লয়।

অবিনাশ এখন আর সুধামুখীকে পাঠ বলিয়া দেয় না; সুতরাং তাহার গর্ভধারিণীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠ শিখিয়া লয়। সুধামুখীর জননী ততদূর বিদুষী নন; কোন একটী কঠিন অর্থ হইলে তিনি অবিনাশের নিকট শিখিতে আদেশ করেন। অবিনাশের নিকট সুধামুখীর নিকট উচ্চারিত হইলে, তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। অবিনাশ তাহাকে পাঠ বলিয়া দিতে আসিলে, সুধামুখী তখন সকল ভুলিয়া যায়, এক মনে অবিনাশের বাক্যগুলি শ্রবণ করে—তাহার কর্ণে যেন তাহা সুমধুর শব্দে ধ্বনিত হইতে থাকে।

অবিনাশও সলজ্জভাবে আসিত; উভয়েই উভয়কে দেখিলে যেন কত সঙ্কুচিত হইত। অবিনাশের সদা-সহাস্য মুখখানি এখন গম্ভীর, তাহাতে বিষাদ-রেখা অঙ্কিত। অজানিত ভাবে দুই একটী গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস, তাহার হৃদয়ের অন্তস্তম প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইত। সুধামুখীর কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিলে, উন্মনা হইয়া একমনে তাহাই শ্রবণ করিত। পাঠসম্বন্ধীয় কোন কঠিন সমস্যায় নিযুক্ত থাকিলেও, অবিনাশ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, সেই স্বর-লহরী শ্রবণ করিত। কোন কার্য্যব্যপদেশে সুধামুখী তাহার নিকট দিয়া গমন করিলে, সে অনিমেষ লোচনে সেইদিকে তাকাইয়া থাকে। ক্ষণকাল পরে, নিজের মনে ধিক্কার দিয়া স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করে।

একদিন কাশীনাথ বাবু অবিনাশকে বলিলেন,—"বাবা অবিনাশ! আমি কয়েক মাস হইতে লক্ষ্য করিতেছি যে, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় হর্ষোৎফুল্ল নও। ইহার কারণ কি?"

অবিনাশ, নত-মস্তকে মৃদু-স্বরে বলিলেন,—"না; এমন কিছুই নহে।"

কাশীনাথ বাবু বলিলেন,—"পূর্ব্বের মত তুমি অন্তঃপুরে যাইয়া খাবার খাও না কেন? কেবল মধ্যাহ্ন আহার এবং সায়ংকালীন আহার করিবার সময় ব্যতীত তুমি কখনই অন্তঃপুরে যাও না। তুমি আমার পুত্রবৎ প্রিয়; তুমি যদি আমাদের পর ভাব, তাহা হইলে আমি মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিব।" কাশীনাথ বাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ইহার পর হইতে, স্কুলের পর, অবিনাশ খাবার খাইতে অন্তঃপুরে যাইত। সুতরাং সুধামুখীর সহিত তাহার প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। উভয়ের চক্ষে চক্ষে দৃষ্টি পড়িলে, উভয়েই সঙ্কুচিত হইত। যখন অবিনাশ অন্তঃপুরে আসিত, সুধামুখী তখন, তাহার নিকট নিজের পাঠসম্বন্ধে কোন কথা শিক্ষা করিবার থাকিলে, শিখিয়া লইত। সকলের সাক্ষাতে সেই সম্বন্ধে উভয়ে অনেক কথোপকথন করিত।

অবিনাশের বয়স ১৮।১৯ বৎসর হইয়াছে। তাহার অবিচলিত বুদ্ধি-প্রভাবে, সে এই অল্প বয়সেই বি, এ, ক্লাশে পড়িতেছে। কলেজে তাহার যথেষ্ট সুনাম, এবং প্রতিপত্তি। এফ্, এ, পরীক্ষায় সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিটিসন্ বৃত্তি (Compitition scholarship) পাইয়াছে। কাশীনাথ বাবু অবিনাশের এইপ্রকার উন্নতি দর্শনে বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।

সুধামুখীর বয়স ১৩।১৪ বৎসর হইয়াছে। সুতরাং তাহার বিবাহ-কাল উপস্থিত। কাশীনাথ বাবু যখন কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাঁহার হৃৎপিণ্ড দুর-দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। পাছে কন্যাকে বিবাহ দিয়া, তিনি এক-মাত্র সন্তানের মুখাবলোকন করিতে বঞ্চিত হন, এই চিন্তায়ই, কাশীনাথ বাবু, আজকাল করিয়া দুইতার বিবাহ-প্রস্তাব করেন নাই। কেহ সুধামুখীর বিবাহ প্রস্তাব করিলে, কাশীনাথ বাবু বলেন,—"আহা! এইটুকু মেয়ে, এখনও পর্য্যন্ত বিবাহের সমর্থ হয় নাই। আরও কিছু দিন যাক্, শেষে সৎপাত্র সহ শুভকার্য্য সম্পন্ন করা যাইবে।"

প্রকৃতপক্ষে যে সুধামুখী বিবাহ-যোগ্যা হইয়াছে, এ কথা কেহ বলিলেও, তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না; কিন্তু সুধামুখী যে এখন বালিকা নয়, কাশীনাথ বাবু তাহা বুঝিতেন। মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কোন একটী সুপাত্রের সহিত সুধামুখীকে বিবাহ দিয়া তাহাকে স্বগৃহে রাখিবেন। কাশীনাথ বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য, তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর, সমস্তই সুধামুখীর হইবে। সুতরাং যাহাতে প্রাপ্তবয়স্কে সুধামুখী, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন রূপবান স্বামীর সহিত, তাঁহার সমক্ষে ধর্ম্মার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায়। মধ্যে মধ্যে গোপনে অনেক স্থানে সুপাত্রের অনুসন্ধান করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও সুধামুখীর উপযুক্ত পাত্র খাটিয়া উঠে নাই।

একদিন সায়ংকালে কাশীনাথ বাবু সায়ংকৃত্যাদি সমাপনান্তে স্বীয় শয়নকক্ষে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী তথায় আগমন করিলেন।

কাশীনাথ বাবু বলিলেন,—"সুধামুখীর তো প্রায় বিবাহের বয়স উপস্থিত হইয়াছে; এখন তাহাকে সৎপাত্রস্থা করা উচিত। এই সম্বন্ধে আমার যে অভিপ্রায়, তাহা তোমার নিকট পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এমন একটী পাত্র আবশ্যক যে, সে সকল বিষয়েই আমার সুধামুখীর উপযুক্ত হইতে পারে। আমাদের এই সমস্তই তাহাদের হইবে। অতএব সেই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা স্থির করা যুক্তি-সঙ্গত।"

কাশীনাথ বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"আমি ত অনেক দিন হইতেই সেই কথা তোমাকে বলিয়া

আসিতেছি। তুমিই তো সুধামুখী বালিকা, সুধামুখীর বিবাহের বয়স হয় নাই" বলিয়া, আমার কথায় কর্ণপাত কর না। মেয়ে-সন্তান, রোজ রোজ বাড়ে। এখনও পর্য্যন্ত বিবাহের বয়স অতিক্রম করে নাই; যাহাতে এখনও শীঘ্র শীঘ্র শুভকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।"

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ। তারপর কাশীনাথ বাবু বলিলেন,—"আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; ভাল, অবিনাশের সঙ্গে সুধামুখীর বিবাহ দিলে কেমন হয়? অবিনাশের মত ছেলে, আজকাল পাওয়া বড় সহজ নহে। তাহার সম্বন্ধে তোমাকে অধিক আর কি বলিব?"

কাশীনাথ বাবুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার পত্নী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন,—"তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। অবিনাশের মত অমন দরিদ্র ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবে না, ত আর কাহার সঙ্গে দিবে? স্বীকার করিলাম যে, তোমার অবিনাশ লেখা-পড়া ভাল জানে; কিন্তু তাহার কুল এবং অর্থ-সম্বন্ধে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমার মেয়ে আমি জলে ডুবাইয়া দিতে পারি, তথাপি অবিনাশের মত অমন দরিদ্র সন্তানের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইতে পারি না।"

কাশীনাথ বাবু নির্ব্বাক্। অবিনাশকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; তাহার সহিত এক মাত্র দুহিতার উদ্বাহক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবেন—এই চিন্তা চিরকাল তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে জাগরূক ছিল। আজ তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বাক্যে, সেই চির-পোষিত আশালতা সমূলে ছেদিত হইল। তিনি কোন বাক্যালাপ করিলেন না; তাঁহার হৃদয় যেন পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল।

—•—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুধামুখী সমস্তই শুনিয়াছিল। একটু বড় হওয়া অবধি তাহার বিশ্বাস ছিল যে, পিতা মাতা তাহাকে অবিনাশের করেই অর্পণ করিবেন। তাই সে অবিনাশকে দেখিয়া লজ্জায় জড়সড় হইত। সম-বয়স্কাগণ, কখন পরিহাস-ছলে, অবিনাশের সহিত তাহার বিবাহ হইবে বলিলে, লজ্জায় তাহার মুখকান্তি রক্তিমভাব ধারণ করিত। শৈশবাবধি তাহাদের বাল্য-ভালবাসা, ক্রমে অব্যক্ত গভীর প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কেহ কাহারও মুখপানে চাহিত না, অথবা বিশেষ আবশ্যক না হইলে কেহ কোন প্রকার বাক্যালাপ করিত না, তথাপি উভয়ের ক্ষুদ্র হৃদয় মুখানি পরস্পরের দিকে ধাবিত হইত।

যে সময় কাশীনাথ বাবু ও তাঁহার পত্নী উভয়ে কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, সুধামুখী কোন কার্য্য-ব্যপদেশে, সেই প্রকোষ্ঠ পানে যাইতেছিলেন; এমন সময় তাঁহার এবং অবিনাশের নাম শ্রবণ করিয়া, কৌতূহল-বশতঃ সবিশেষ অবগত হইবার জন্য, অতি প্রচ্ছন্নভাবে দ্বার-পার্শ্বে লুক্কাইত হইয়া, পিতৃ-মাতৃ বাক্যালাপ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিল। সুধামুখী যে সময় মাতৃ-প্রমুখাৎ নিষ্ঠারুণ বাণী শ্রবণ করিল, তখন চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। বিচারপতির মুখে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিলে, অপরাধীর হৃদয়ে যে প্রকার আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সুধামুখীর নির্দ্দোষ হৃদয়ে ততোধিক ভয় উপস্থিত হইয়াছিল। শৈশবাবধি যাহাকে প্রাণের মত ভালবাসিয়াছে, কৈশোরে যাহাকে হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়া ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা পূজা করিয়াছে, তাহার সেই চির-আশালতা আজ অকস্মাৎ দাবাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইল। সুধামুখী, বয়সে বালিকা হইলেও, স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না; মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন তাহার ভবিষ্য-জীবননাট্যের এক এক অঙ্ক, তাহার হৃদয়-মধ্যে অভিনীত হইতে দেখিতে পাইল। ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া, অন্য এক প্রকোষ্ঠে প্রস্থান করিল।

সেই মুহূর্ত্ত হইতে বালিকা, তাহার ভবিষ্য-জীবনের সুখে জলাঞ্জলি দিল। সদা-সহাস্য মুখখানি মলিন, এবং চিন্তাভাবাপন্ন। কেহ কোথাও না থাকিলে, অতি ধীরে দুই একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে। আহারে বড় ইচ্ছা নাই। কখনও কখনও আহার করিতে ভুলিয়া যায়। যে সুধামুখী সন্ধ্যার পরই গভীর নিদ্রার মগ্ন হইত, এখন সে নিশীথ সময়ের পূর্ব্বে নিদ্রা যায় না। নিরূপিত সময়ে পিতামাতাসহ একশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু সকলে ঘুমাইলেও তাহার নিদ্রা হয় না; শয্যায় এপাশ ওপাশ করিয়া, পিতা-মাতার অজ্ঞাতিরূপে, দুই-একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস সহ, অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। তাহার হৃদয় মধ্যে যে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ্য নহে; অথবা তাহার এমন কোন সমবয়স্কা নাই যে, তাহার নিকট মনের বেদনা প্রকাশ-পূর্ব্বক কতক শান্তি উপভোগ করিতে পারে। সুতরাং সেই বিষম চিন্তা-বিষে তাহার লাবণ্যময়ী দেহখানি দিনদিন, জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল।

কাশীনাথ বাবু কন্যার শারীরিক ক্ষুরস্বার প্রতি লক্ষ্য করিলেন—প্রতি দিন কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রমাবৎ তাঁহার প্রাণোপমা দুহিতা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। কাশীনাথ বাবু মহা বুদ্ধিমান; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার একমাত্র অবলম্বন স্নেহময়ী কন্যা, তাঁহাদেরই দোষে ধীরে ধীরে শীর্ণা হইতেছে।

এক দিন তিনি স্ত্রীর সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সুধামুখীর শরীরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছ কি? মা আমার দিনদিন বড়ই শীর্ণা এবং বিবর্ণা হইতেছে।"

সুধামুখীর গর্ভধারিণী বলিলেন,—"হাঁ, কয়েক দিন হইতে দেখিতেছি, সুধামুখী কেমন-কেমন হইয়াছে। মুখখানি সর্ব্বদা মলিন, আহারে অত্যন্ত অরুচি, দিবারাত্রি কেবল একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।"

কাশীনাথ বাবু বলিলেন,—"আমি অনেক দিন লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, সুধামুখী রাত্রিতেও বড় নিদ্রা যায় না, মধ্যে মধ্যে দুই-একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে ও শয্যায় এপাশ-ওপাশ ছট্‌ফট্ করিয়া থাকে।"

কাশীনাথ বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"ভাল, একজন চিকিৎসক দেখাও না কেন? এখন, বয়সের মেয়ে, কোথায় দিন দিন বাড়িবে—না, দিন দিন আরও শীর্ণ ও বিবর্ণ হইতেছে!"

কাশীনাথ বাবু বলিলেন,—"মেয়ের যে কোনপ্রকার ব্যায়াম হইয়াছে, এরূপ আমার বোধ হয় না। বাল্যকাল হইতে অবিনাশের সহিত তাহার ভালবাসা; সেই ভালবাসা ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া, উভয়ের বিশ্বাস হইয়াছে যে, তাহারা পরিণত-সূত্রে পরস্পরকে সুখদুঃখের ভাগী করিতে পারিবে। আমার বোধ হয়, সুধামুখী তোমার ও আমার বাক্য শ্রবণ করিয়াছে; আরও সেই জন্যই বোধ হয়, তাহার মানসিক দুশ্চিন্তা।"

কাশীনাথ বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"তুমি যাহা বলিলে, ওসব কিছুই নয়। অতটুকু

মেয়ে ভালবাসার কি বুঝিবে? অবিনাশের সহিত যে তাহার আশৈশব ভালবাসা, তাহা স্বীকার করি। বাল্যবয়সের এরূপ ভালবাসা অনেক বালকবালিকার মধ্যে প্রায় অহরহ ঘটিয়া থাকে। একটু বড় হইলে ওসব আর কিছুই মনে থাকে না। সুধামুখীর বিবাহ-সম্বন্ধ ধার্য্য করিয়া যাহাতে শীঘ্র শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়, তুমি তাহার চেষ্টা কর; বিবাহ হইলে, ওসব কিছুই থাকিবে না।"

কাশীনাথ বাবু বলিলেন,—"তুমিই যখন বলিতেছ যে, সুধামুখী বাল্য-কাল হইতে অবিনাশকে ভালবাসে, তখন ইহাদের পরস্পরের বিবাহ হইলে যে উভয়েই সুখী হইতে পারিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সেইদিন তুমি অমত করিলে দেখিয়া, আমি আর সেই কথা তোমার নিকট বলি নাই। আরও দেখ, সুধামুখী যে আমাদের আর নাই; ইহাকে সুখী দেখিতে পারিলেই আমাদের জীবন সার্থক হয়। অবিনাশও খুব উৎকৃষ্ট ছেলে; তাহার যেমন রূপ, তেমন গুণ; কালেজে সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র, বিশেষ গত পরীক্ষায় সে সকলের অধিক জলপানি পাইয়াছে। এরূপ সম্বন্ধ ত্যাগ করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।"

কাশীনাথ বাবুর পত্নীর মুখ বিরক্তি-ভাব ধারণ করিল। তিনি বলিবেন,—'অবিনাশ-অবিনাশ করিয়া দেখি, তোমার কণ্ঠাগত উপস্থিত হইল। কেন, তাহার মত সুপাত্র কি আর ভারতবর্ষে নাই? অবিনাশের আর আছে কি? তাহার সেই ভাঙ্গা ঘর, আর কতকগুলি অপগণ্ড ভাই-ভগ্নী। অবিনাশের সহিত কন্যার বিবাহ দিলে, তোমার দেশীয় সমাজে কি বলিবে? ইহাতে কি আর তোমাদের আভিজাত্য রক্ষা হইবে? সেও যেমন—তারপর তাহাদের সকল সংসারের ভার তোমার একার উপর পড়িবে। মনে ভাবিয়াছ যে, তোমার এই বিপুল সম্পত্তি মেয়ে-জামাই ভোগ করিবে; তাহা নহে। তখন, সুধামুখীই আমাদের এইজন্য মনে মনে মন্দ বলিবে। তাছাড়া, অবিনাশের সঙ্গে সুধামুখীর বিবাহ হইলে, তাহার পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী ও অন্যান্য কুটুম্ব-কুটুম্বিনীতে তোমার গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন, তাহাদের জ্বালায় এই বাড়ীতে তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিবে। তোমার এই সম্বন্ধে মত হইতে পারে; কিন্তু আমার একটুও মত নাই, বরং ইহাতে আমি বিরোধী। স্বীকার করি, অবিনাশকে তুমি ভালবাস, এবং সেও খুব ভাল ছেলে; কিন্তু জামাই না করিয়া, অন্য কোন প্রকারে কি তাহার উপকার করিতে পার না?"

কাশীনাথ বাবু, সমস্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহার পত্নীর কথাগুলি মনোমধ্যে বিশেষ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তুমি যাহা যাহা বলিয়াছ, তাহাও মিথ্যা নহে। অবিনাশের সঙ্গে যে সুধামুখীর ভালবাসা, তাহা বাল্য প্রণয় মাত্র; কালে যে উহা থাকিবে না, তাহাও হইতে পারে। অবিনাশ যে কুলে-শীলে আমাদের হইতে অনেক নীচু, তাহাও সত্য; এবং এই বিবাহ হইলে, সমাজ হইতে যে অনেকটা গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে, তাহাও স্বীকার্য্য। আমি এত দিন, অবিনাশের সহিত সুধামুখীর বিবাহ দিব ভাবিয়া, দ্বিতীয় স্থানে কোন পাত্র স্থির করি নাই। এখন, তুমি কি বল?"

কাশীনাথ বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"বলিব আর কি! তোমরা পুরুষ মানুষ, আমাদের অপেক্ষা তোমরা অনেক বুঝিতে পার। যাহাতে এখন শীঘ্র শীঘ্র কন্যার বিবাহ হয়, সেই চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হও।"

কাশীনাথ বাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাঢ় চিন্তা

করিলেন। তারপর বলিলেন,—"অবিনাশের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিলে, আরও অনেক ঘুর্ঘিনা ঘটিতে পারে। মেয়ে এখন বালিকা নহে, মন্দ লোকে নানা কথা বলিতে পারে। কিন্তু অবিনাশকে আমি পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া থাকি; সুধামুখীর অন্যত্র বিবাহ হইলে, সে যে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এখন যাহাতে অবিনাশ ও সুধামুখী একস্থানে থাকিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উমেশ বাবুর অবস্থাও শোচনীয়; অবিনাশের এখন চাকরির চেষ্টা করা অতীব কর্ত্তব্য। এই বি, এ, পরীক্ষা দিলেই, কলিকাতায় আমার অনেক বন্ধুর নিকট চাকরির চেষ্টায় তাহাকে পাঠাইয়া দিব। অবিনাশ ও সুধামুখী সর্ব্বদা একস্থানে থাকিলে, তাহাদের পরস্পরের ভালবাসা ক্রমশঃই দৃঢ় হইবার সম্ভব; একে অন্যের নিকট হইতে স্থানান্তরিত হইলে, কালে উভয়েই উভয়কে বিস্মৃত হইতে পারিবে।"

কাশীনাথ বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"সে কথা মন্দ কি? অবিনাশ এখন বেশ বড় হইয়া উপযুক্ত শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে; তাহার চাকরির সংস্থান করিয়া যাহাতে পিতামাতার ভরণ-পোষণ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিয়া দাও।"

কাশীনাথ বাবু বলিলেন,—"আর একটী কথা, উমেশ বাবুর কিছু এমন সাধ্য নাই যে, তিনি স্বয়ং অবিনাশের বিবাহ দেন। সে ভার, আমিই লইব;—সুধামুখীর বিবাহ হইলেই, যাহাতে অন্য কোন সুন্দরী কন্যার সহিত অবিনাশের বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহার চেষ্টা করিব। এ বিষয় তোমার মত কি?"

কাশীনাথ বাবুর স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"অবিনাশকে আমিও খুব স্নেহ করিয়া থাকি। সুধামুখীকে আমি যে প্রকার আদর এবং স্নেহ করি, অবিনাশকে তদপেক্ষা ন্যূন আদর করি না। অবিনাশ যখন তোমারই প্রতিপালিত, তখন, তোমারই উদ্যোগ করিয়া, তাহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।"

উভয়ে এইপ্রকার পরামর্শ স্থির করিয়া, সুধামুখীর বিবাহ-সম্বন্ধ ধার্য্য করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। অবিনাশ এবং সুধামুখীর নিকট কিছুই অবিদিত রহিল না।

শ্রীরোহিণীকুমার রায় চৌধুরী।

নিভৃত-চিন্তা।

হে অন্তর্য্যামিন্! হে সর্ব্বদুঃখহারিণ্! এ আনন্দময় সংসারে তুমিই একমাত্র শান্তি-নিকেতন। তুমি অনন্তরূপে অনন্তশক্তিবক্ষে দাঁড়াইয়া অনন্তকাল দেদীপ্যমান রহিয়াছ; জগতে জগতে অনন্ত করুণা বিলাইতেছ; অনন্ত স্নেহে, অনন্ত দয়ায়, সন্তপ্ত-হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস, কাতর-নয়নের অশ্রুবিন্দু, ঐ অনন্ত কালপ্রবাহে ধীরে ধীরে মিশাইয়া দিতেছ, কিন্তু পাপী আমি, তোমাকে দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না। নয়ন-সম্মুখে তোমার বিরাটকান্তি বিভাসিত, কিন্তু আমার এ অন্ধনয়ন প্রস্ফুটিত হইতেছে না। কবে তোমায় দেখিব প্রভো? কবে এ অন্ধ-

নয়নের অশ্রুনির্ঝর শুকাইবে নাথ? দয়াময়! এ চিরাঙ্কের অবনয়ন একবার টুটাইয়া দাও—আমি একবার প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখি—পার্থিব জগতের জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তোমার অভয়পদে আত্মনিবেদন করি।

কত জনে কত কথা বলে; কেহ বলে—মাথার উপর,নক্ষত্র শশিখচিত আকাশের উপর, রবির পরিধির উপর, তোমার লীলাস্থল; কেহ বলে—নির্ব্বাত ব্যোমরাজ্যে, উজ্জ্বল কৈলাস-শিখরের বিভীষণ শৃঙ্গোপরি,তোমার চিরশান্তিময় আনন্দ-নিকেতন; কেহ বলে—ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ অচঞ্চল বিদ্যুৎপ্রভাসিত বৈকুণ্ঠধাম তোমার অবস্থিতি-স্থান! যেখানে তুমি, সেখানে শোকতাপ নাই, জ্বালা-যন্ত্রণা নাই, হিংসা-দ্বেষ নাই, এ পাপ-বহুন্ধরার সর্ব্বসন্তাপ সেখানে স্থান পায় না। তাই, যোগী যোগাসন পাতিয়া, ধ্যানী ধ্যান ধরিয়া, জ্ঞানী উজ্জ্বল জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিয়া, তোমার পরমধামে যাইবার সাধনা করে; সেই অলক্ষিত প্রদেশের অপ্রত্যক্ষ আনন্দ অনুভব করিবার জন্যই বুঝি, ঋষিগণ, এ সংসারের কোলাহল ছাড়িয়া, মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পার্থিব স্নেহ ও পার্থিব মমতা তুচ্ছ করিয়া, নীরব- অচল-গহ্বরে, মৃদু-প্রবাহিণী নির্ঝরিণী তীরে,নব নব কুসুমালঙ্কৃত বন-বিটপী তলে বসিয়া, তোমার ধ্যান ধরিয়া থাকেন। এ পৃথিবীতে তুমি নাই, এ পার্থিব জীবে তুমি নাই; তাই এ সংসার এত শোকতাপপূর্ণ, তাই পার্থিব জীব হিংসা-দ্বেষ-জর্জ্জরিত। তোমার সাধনা করিয়া যে জীবন্মুক্ত হইবে, সেই জীবলীলাবসানে তোমার অমরবাঞ্ছিত লীলা-স্থলে প্রবেশলাভ করিবে।

সত্যই কি তাই? সত্যই কি এ পৃথিবীতে তুমি নাই? ঐ শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাদলে, ঐ নবোদ্ভাসিত মিহির-মণ্ডলে, ঐ স্ফুটোন্মুখ যূথিকাগুচ্ছে, তুমি নাই? ঐ ক্ষুদ্র বিহগীর কলকণ্ঠে, ঐ পরিমল-লোলুপা ভ্রমরীর মধুর ঝঙ্কারে, ঐ বিয়োগবিধুরার উষ্ণ অশ্রুজলে, তুমি নাই? তুমি নাই যদি নাথ! তবে বসন্তসমীর ছুটিয়া আসে কেন? কোকিল কুহরে কেন? অপরিমেয় প্রেমপ্রবাহ বক্ষে ধরিয়া বীচি-মালিনী তটিনী সাগরসঙ্গমে ছুটে কেন? লতিকা মুকুলিতা হয় কেন? মুকুল ফুটে কেন? এ পৃথিবীতে যে তোমায় দেখিতে পায় না, সে বলে—এ পৃথিবীতে তুমি নাই; যে সংসারে আসিয়া প্রাণের পিপাসা তৃপ্ত করিতে পারিল না, যে উচ্চাভিলাষী হৃদয়ের অদম্য উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিল না, যে সংসারে আসিয়া আশার সামগ্রী কিছুই পাইল না, ভোগের সামগ্রী খুঁজিয়া পাইল না, সেই বলে—এ পৃথিবীতে তুমি নাই! যার শোকে সান্ত্বনা নাই, আনন্দের স্থায়িত্ব নাই, হৃদয়ে প্রেম-শান্তি-কৃতজ্ঞতা নাই, সেই বলে—এ পৃথিবীতে তুমি নাই। যে তোমাকে খুঁজিয়া পাইল না, যে তোমার মহত্ত্বের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না, যে বিপদসম্পদে তোমার লীলা বলিয়া বুঝিতে পারিল না; সেই জীবনের অলক্ষিত প্রদেশে তোমার লীলাস্থল নির্দ্দেশ করে, আশার সামগ্রী সকল তোমার সমুখীন করনা করিয়া তোমার কাছে যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, এ সংসারের অতৃপ্ত ভোগস্পৃহা তোমার সমীপে যাইয়া মিটাইতে বাসনা করে। তাই বাঞ্ছাকল্পতরু! 'আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দাও' বলিয়া,তোমার ধ্যান ধরিয়া থাকে; তাই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, সকাতরে প্রার্থনা করে—'প্রভো! আমার জীবনাবসানে, তুমি করুণাময়, ইচ্ছাময়, অভাগা আমি, আমাকে মুক্তি দিও।'

কিন্তু হায়! বুঝিতে পারিলাম না—আমি

কে? কোথায় ছিলাম? কে আমাকে এখানে আনিল? কোথায় যাইব? কে আবার মুক্তি দিবে? মুক্তি আবার কি? হে অনাথনাথ! এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তো তোমারই ইচ্ছা-প্রসূত; এক দিন 'আমি' এই ক্ষুদ্র বিন্দু তোমার ঐ মহীয়ান্ মনতে মিশাইয়া ছিলাম; তখন, তোমাতে যা আছে, আমাতেও তাহাই ছিল। তখন, দুঃখ ছিল না, কামনা ছিল না। জরা ছিল না, মৃত্যু ছিল না; পাপ-পুণ্য, দম্ভ-অহঙ্কার, হর্ষ-বিষাদ, শোক-ভয় কিছুই ছিল না, ছিল মাত্র—পরব্রহ্ম-লীন উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম পদার্থ! আমি যাহা ছিলাম, ঐ তৃণগুচ্ছও তাহাই ছিল; ঐ কুবেরী, ঐ প্রজাপতি, ঐ কেশরিণীও তাহাই ছিল। তখন বালুকাকণা-কহিমুরে প্রভেদ ছিল না, চন্দ্রসূর্য্যে প্রভেদ ছিল না, গরলামৃতে প্রভেদ ছিল না! তখন রাজপ্রাসাদ-পর্ণকুটীর ছিল না, ধনী ছিল না, দরিদ্র ছিল না; উচ্চাসিন ছিল না, নিভৃতে পাদপীঠ ছিল না। তখন নাথ! তুমিই কামী, তুমিই কামনা, তুমিই রূপ, তুমিই রূপবান, তুমিই জ্ঞান, তুমিই জ্ঞানবান, তুমিই চৈতন্য, তুমিই বুদ্ধ। আর তুমি সর্ব্বময় বলিয়া, আমিও সর্ব্বময় ছিলাম। তাহার পর, এ নাট্যশালা সাজাইল কে? আমার বহুরূপী বেশ সাজাইল কে? তোমার ইচ্ছা ভিন্ন আর কি বলিব? অনন্ত ক্রীড়াময়! ক্রীড়াছলে অনন্তমূর্ত্তিতে আপন বপু সাজাইয়াছ, লীলাছলে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিসংহার করিতেছ; আমি তোমার, আমার সুখদুঃখ তোমার, আমার পাপ-পুণ্য তোমার, আমার লীলাভূমি এ পৃথিবীও তোমার। যখন যে মূর্ত্তি দিয়া সাজাও না কেন, তোমাতেই মিশাইয়া আছি; আবার মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দাও, তখনও তোমাতেই মিশাইয়া থাকিব; সাগরবক্ষে ক্ষুদ্র বুদ্বুদ ভাঙ্গিয়া আবার মহাসাগরেই বিলীন হইয়া যাইবে।

তবে আবার মুক্তি কি? যখন মুহূর্ত্ত জন্য তোমা ছাড়া নই, তখন আবার তোমার সকাশে যাইবার জন্য ব্যাকুল হই কেন? এ পৃথিবী ভিন্ন অন্যস্থানে তোমার লীলা-নিকেতন নির্দ্দেশ করি কেন? একটী আধটী নয়—এ ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যে এমন কোটী কোটী পৃথিবী আছে, এমন কোটী কোটী চন্দ্রসূর্য্য আছে। সে সকল কি নাথ! আর কিছুই নয়, কেবল তোমার অনন্তরূপের ছায়া মাত্র।

তবেই তো বিপদে পড়িলাম। তুমি যাহা, আমিও তাহা, তুমি কারণ,আমি কার্য্য; কিন্তু নাথ! তুমি দুঃখপরিশূন্য, অভিমানশূন্য—নির্ব্বিকার, তবে আমার আমিত্ব এ সুখদুঃখ কোথা হইতে আসিল? যদি বলি—তুমি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিয়া সুখদুঃখ-অহঙ্কারপূর্ণ দেহ গড়িয়া মহীয়সী শক্তির বৈচিত্র্য দেখাইতেছ; তাহা হইলে দুষ্কৃতি-সুকৃতির দণ্ড-পুরস্কার থাকে না, তবে আর সুকৃতি-দুষ্কৃতি কি? পাপ-পুণ্যের ভেদ-ভেদ কি? তোমার লোকে তোমার সমীপে রহিয়াছি, আবার তোমাতেই মিশাইয়া যাইব; তবে লোকে 'আত্মা' 'আত্মা' বলিয়া চীৎকার করে কেন? আমার দৈহিক পরমাণু তুমি, মন তুমি, প্রাণ তুমি, আত্মা তুমি; তবে আবার পুনর্জ্জন্ম কিসে হয়? তবে আবার কেমন করিয়া সুকৃতি-দুষ্কৃতি-অনুসারে পরলোকে আত্মার সদ্গতিভোগ হয়? তোমার আবার সুকৃতি-দুষ্কৃতি কি নাথ? তোমার আবার ইহলোক পরলোক কি নাথ? তুমি সাধ করিয়া দুঃখময় মনুষ্য-দেহ ধরিয়াছ; আবার যখন ইচ্ছা করিবে, তখনই এ মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিবে।

কিন্তু লীলাময়! তোমার বিচিত্র লীলা-সমুদ্রে আমি যে হাবুডুবু খাইতেছি! তুমি দর্শনের অগোচর, বিজ্ঞানের অপরিচিত, তর্কের

বহুরূপস্থিত; ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, তোমার অচিন্ত্য অব্যক্ত মহিমা কেমন করিয়া বুঝিব? তুমি যদি সর্ব্বময়, তবে পাপে ভয় বা পুণ্যে আনন্দ প্রকাশ করে কে? দুঃখদুঃখ অনুভব করে কে? মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়-দমন করিতে চেষ্টা করে কে? মহাসাগরে যখন তরঙ্গ উত্থিত হয়, তখন ঊর্দ্ধগামী তরঙ্গসকল সাগরে মিশিতে চায় না—সাগরই তাহাকে অভিমুখে আকর্ষণ করে! —তরঙ্গ, চেষ্টা করুক বা না করুক, বায়ুপ্রবাহ মন্দীভূত হইলে, আপনিই সাগরবক্ষে বিলীন হইয়া যাইবে। এই সৃষ্টিপরম্পরাও তো সেই মহাসাগরের তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নয়! তবে তুমি, তোমাতে মিশিতে কাহার উপাসনা কর? কিসের অভাবে কাহার জন্য কাঁদ? প্রভো! বুঝিতে পারি না—তুমি আমি এক, না পৃথক্?

যদি তোমায় আমায় অভিন্ন হই, তাহা হইলে, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা যাহাই তুমি হও না কেন, তাহা দুঃখপরিশূন্য নহে, অজড় অমর অপরিবর্ত্তনীয় নহে, নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় নহে। আর পৃথক্ হইলেও, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" নহে। কারণ, একই কারণের একই কার্য্য; ব্রহ্মময় উপাদানে যাহা গঠিত, তাহা ব্রহ্মস্বরূপই প্রাপ্ত হইবে। যদি ব্রহ্মোপাদান নিষ্ক্রিকার না হইত, তাহাহইলে বিভিন্ন গুণাদির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পরাত্মা নির্ব্বিকার! তবে সত্ত্বাদি গুণের সমবায়ে জড়াদির বিভিন্নতা হইতে পারে, কিন্তু আদি-কারণ অরূপ—আবার সেই কারণই যখন কার্য্য, তখন অরূপ হইতে সরূপের সৃষ্টি কেমন করিয়া হইতে পারে? যাহা অদৃষ্ট,অব্যবহার্য্য, অলক্ষণ তাহা হইতে দৃষ্ট, ব্যবহার্য্য, সলক্ষণ সৃষ্টি হইতে পারে না। অথচ, তুমি আদি-কারণ; কিন্তু তোমাতে যাহা আছে, আমাতে তাহা নাই; আমাতে যাহা আছে, তোমাতে তাহা নাই। অর্থাৎ তুমি সচ্চিদানন্দ—আর আমি! {শোকদুঃখনিপীড়িত ঘৃণিত পার্থিব জীব!

আর যদি বলি—তুমি দুঃখপরিশূন্য,নিত্যানন্দ, নিষ্ক্রিয়, অনন্ত-ইচ্ছাময়, তুমি ইচ্ছা করিয়া তোমা হইতে পৃথক্ এই জড়জগৎ, সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি ইচ্ছা করিয়াই অশান্তি-পীড়িত জীব-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছ, তোমারই ইচ্ছায় স্ত্রীপুরুষের পার্থক্য হইয়াছে, মনুষ্য-পশুর পার্থক্য হইয়াছে, চম্পক-কিংশুকের পার্থক্য হইয়াছে, তুমি ক্রীড়াছলে এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ইন্দ্রজালময় করিয়া দিয়া অব্যবহিত অথচ অন্তরালে বসিয়া এ অদ্ভুত সৃষ্টির অদ্ভুত রহস্য দেখিতেছ; তাহা হইলে তোমার সাম্য থাকিল কৈ? যেদিন আদি সৃষ্টি করিয়াছ, সেদিন তো কাহারও কর্ম্ম ছিল না! তবে জীব-জীবনে সুখদুঃখের ন্যূনাধিক্য-হেতু যে অসোষ্ঠব তুলনা, তাহা তো সুকৃতি-দুষ্কৃতি-অনুসারে আত্মার ফলভোগ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না? আদিতে সকলই পাপপুণ্যশূন্য, সুকৃতি-দুষ্কৃতিশূন্য, নিষ্কর্ম্ম! তুমিই তো পৃথক্ পৃথক্ জীব সৃষ্টি করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম জুটাইয়া দিয়াছ! যদি তুমি দয়াময়, তবে ইচ্ছা করিয়া এমন হলাহলময় সংসার সৃজিলে কেন? যদি তুমি বৈষম্যবিরহিত, তবে একজনকে হাসাইয়া একজনকে কাঁদাইলে কেন? একটী প্রসূনে পরিমল দিয়া আর একটী পুষ্প পরিমলশূন্য করিলে কেন? একজনকে মানব করিয়া এক-জনকে পশু করিলে কেন? যখন একদিন পাপপুণ্যপরিশূন্য থাকিয়াও, তোমার ইচ্ছা মাত্রে, এই দশা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে, তখন আর পাপপুণ্যের প্রভেদ করি কেন! আমি তো তোমার ইচ্ছার প্রবাহ মাত্র; যে মুহূর্ত্তে যাহা ইচ্ছা করিবে, সেই মুহূর্ত্তে তাহা সাধিত হইবে!

তবে তুমি অনন্ত-দয়াময়ও নহ! যদি ইচ্ছা করিতে, তাহাইলে তো এ সংসারে এত দুখের তরঙ্গ উঠিত না! তুমি ইচ্ছা করিলে তো ঐ নীলোৎপল আয়ত নয়ন-দুটী অশ্রুবারি-সিক্ত হইত না! ঐ প্রফুল্লকান্তি ব্যাধি-বিশীর্ণ হইয়া অহর্দিন ম্লান হইত না!! জননী মৃতপুত্র কোড়ে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিত না, জ্যোৎস্না হসিত না, পুষ্পরাশি শুকাইত না! তুমি ইচ্ছা করিলেই তো এ হিংসা-দ্বেষ, প্রবঞ্চনা-প্রতারণা, শোক-মোহ,এজগতে স্থান পাইত না! যখন তুমি ইচ্ছা করিয়া তোমারই সৃষ্টপদার্থের অদৃষ্ট-গর্ভে এতদূর নিহিত করিয়া রাখিয়াছ,তখন তুমি দয়াময় হইলে কেমন করিয়া? প্রভো! যদি বলি—তুমি নিরবচ্ছিন্ন সুখময় সংসার সৃজন করিয়া কেবল দুঃখের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছ, জীব ইচ্ছা করিলে তোমারই প্রদত্ত শক্তিবলে সে দুঃখ-আবরণ উন্মোচন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ-সম্ভোগ করিতে পারে; অর্থাৎ, যে ঐশী শক্তি সদভি-প্রায়ে পরিচালনা করিবে, সেই সংসারের দুঃখ-পাশ ছেদ করিতে পারিবে; যে অসদভিপ্রায়ে পরিচালনা করিবে, সে ধীরে ধীরে দুঃখজালে জড়িত হইয়া পড়িবে; তাহাতেও তোমারই বৈষম্য—তোমারই নির্দ্দয়তা! যদি সমভাবে শক্তি দিয়া সকল দেহে সমভাবে স্ফুরণ করিতে তাহা হইলে সকলেই এ দুঃখজাল ছেদ করিতে পারিত। কিন্তু, তাহাও তো কর নাই! একজনের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উন্নত করিয়া দিয়াছ, একজনের বা পাপ প্রবৃত্তি উন্নত করিয়াছ। আমি যে মহা-পাপী, দিনদিন কলুষ-সাগরে ডুবিতেছি, সে দোষ কাহার? তোমার, না আমার? নির্ম্মিত পদার্থে কলঙ্ক থাকিলে, সে কলঙ্ক—নির্ম্মা-তার,না সেই পদার্থের? আমি তোমার ক্রীড়োপকরণ; আপন হাতে গড়িয়াছ; যে উপাদানে যেগুণ দিয়াছ, তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছি; তবে এখন দূরে ফেলিতে চাও কেন? এখন, এ ভয়ঙ্করভূমিতে আমাকে সং সাজাইয়া, কৌতুক-দর্শীর মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছ কেন? তবে নিশ্চয়ই প্রভো! তুমি দয়াময় নহ,নিশ্চয়ই তুমি বৈষম্য-বিরহিত নহ।

কিন্তু হায়! যখন অন্ধকার-রজনী-প্রভাতে নব রবি-ছবি ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়, তখন যে তোমার করুণার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিতে পাই! যখন বর্ষার গগনে তড়িদ্দাম-শোভিতা কাদম্বিনী মুহুর্মুহু দুন্দুভিনিনাদে তোমার মহিমা-কীর্ত্তন করে, তখন যে তোমার করুণা-সাগরে ভাসিয়া যাই! যখন সংসার-যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া শ্রান্তদেহে প্রণয়িণীর প্রফুল্লমুখ নিরীক্ষণ করি, তখন যে তোমার অনন্তকরুণা শ্রান্তদেহে অমৃত-বর্ষণ করে! জ্যোৎস্না-হাসে তোমার করুণা-হাস্য বিভাসিত হয়, পক্ষিগণ কলধ্বনি করে,নির্ঝরিণী প্রেমগাথা গায়, হৃদয়ে তোমার সান্ত্বনা বাক্য প্রবেশ করে! বায়ু বহিয়া যায়—তোমার করু-ণার ব্যজন বলিয়া অনুভব হয়। পিপাসায় শীতল বারি পান করি—মনে হয়, নিজহস্তে স্নেহের ধারা ঢালিয়া দিতেছ! দয়িত হে! তুমি যদি নির্দ্দয়, তবে এ করুণারাশি কে বিলাইতেছে? তুমি কি, তাহা জানি না,জানিতে চাহি না; কিন্তু তোমা ভিন্ন আর কাহারও কাছে কাঁদিতে সাধ হয় না! সম্পদে তোমারই মহিমা কীর্ত্তন করিব, বিপদে তোমারই শরণাপন্ন হইব, বিষম বিরহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অজস্র অশ্রুধারে তোমারই অভিষেক করিব!

শ্রীশশিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিবাহ-ব্যয়-সংস্কার।

(বাদ-প্রতিবাদ।)

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল রায় বিবাহ-ব্যয়-সংস্কার-বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি অবশ্য ধন্যবাদার্হ। তাঁহার সরলতা, সাধুতা এবং সদ্ভিপ্রায় দৃষ্টান্তের সামগ্রী। বাস্তবিক এ বিষয়ে হিন্দুসমাজের অবস্থা বড় শোচনীয়। রোগ সঙ্কট, লক্ষণ উৎকট, তাহা সকলেই স্বীকার করিবে। তবে রোগের চিকিৎসা-বিষয়ে মতদ্বৈধতা আছে, থাকিবারই সম্ভব। তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং আমাদের করিতে অনুরোধ করিতেছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে সহজ উপায় বলিয়া বোধ হয় না; এবং তদ্দ্বারা রোগের কোন উপশম হইবে না, প্রত্যুত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে। কি জন্য আমাদের এমন ধারণা হইল, তাহা পূর্ব্বেই এই "অনুসন্ধান" পত্রিকায় দুইটী পৃথক প্রবন্ধে সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়াছি। রসিক বাবু যদিচ নিজপ্রবন্ধে আমার নাম অনুগ্রহ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমার কথিত কোন যুক্তি অথবা আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন নাই; কেবল বাহিরের রাজে দুইটা কথা বলিয়াছেন মাত্র। তবে তাঁহার কথার উপর আর দুইটা কথা বলিলে আমার বক্তব্য বিষয় আরও পরিস্ফুট হয় বলিয়া, তাঁহাকে একটু বিরক্ত করিব।

১। তিনি বলিয়াছেন—ইংরাজ-রাজপুরুষগণ আমাদের বাঙ্গাভ্যন্তর সকল বিষয় অবগত আছেন; সুতরাং সত্যের খাতিরে "হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরিক সত্য অবস্থা রাজপুরুষগণকে বলা উচিত এবং কর্ত্তব্য। রসিক বাবুর এ যুক্তিটুকু আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। যিনি রাজা, তিনি মর্য্যাদার পাত্র—সম্ভ্রম, সম্মান সম্মানের সামগ্রী; বরং তাঁহার কাছে লজ্জা বিষয় গোপন করিতে হয়। তিনি রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে গোপনে সকল সমাচার রাখিতে পারেন; রাজা ত টার-ফুল্;' কিন্তু, তাই বলিয়াই কি, আমরা বেহায়া হইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিব? পিতা পুত্রের গোপনীয় অনেক কথা জানিতে পারেন; পুত্র কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে সব কখনই পিতৃসমীপে ব্যক্ত করিবেন না। পৃথিবীতে এমন মনুষ্য নাই, এমন জাতি নাই, যাহাতে অল্পাধিক অপবিত্রতা অসাধুতার মসীলেপ নাই; কিন্তু,সেইজন্য রাজা দ্বারে গিয়া সামাজিক সকল কথা খুলিয়া কে বলে কি? ইংরাজ আমাদের আদর্শ, অথচ সেই ইংরাজের মুখেই ইংরাজ-সমাজের কত উৎকট নিন্দার কথা শুনিয়াছি; কিন্তু কখনও কোন ইংরাজই ত রাজদ্বারে গিয়া এ নিন্দার দুন্দুভিধ্বনি করে নাই? পক্ষান্তরে, এ হতভাগা হিন্দুসমাজের মাথায় পদাঘাত করিয়া, কত লোকে কত কথা বলিয়াছে ও বলিতেছে। মুলাবারী এই উপায়ে বড়লোক হইলেন, রমাবাই এই হুজুক তুলিয়া গণনীয়ার মধ্যে হইয়াছেন, আর রসিক বাবুও ইংরাজী ভাষায় ইংরাজী সংবাদপত্রে ইংরাজের নিকট দেশের কুৎসা রটনা করিতেছেন। ইহা দ্বারা সমাজের যে বিশেষ কোন ফল হইবে, আমাদের সে বিশ্বাস নাই। যাহাতে কোন সুফল নাই, বরং কুফল ফলিতে পারে, তাহার জন্য, রসিক বাবুর ন্যায় বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী লোকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে, কেন না বলিব—তিনি কেবল 'বাহবার' জন্য লালায়িত? এতদ্ব্যতীত, রাজা ধর্ম্মাভ্যুদয়-অবলম্বী, রাজার সভ্যতাবুদ্ধি আমাদের হইতে অনেক পৃথক, রাজা বিদেশী, আমাদের সামাজিক সুখ-দুঃখের জন্য রাজার সহানুভূতি হইবে না। বিশেষতঃ রাজা রাজনৈতিক কারণ জন্য; আমাদের সমাজের ও ধর্ম্মের প্রভু নহেন, এবং কখনও তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই ও করিবেন বলিয়াও বোধ হয় না। এমন রাজাকে সমাজের নিন্দাবাদ শুনান যে মহৎ কার্য্য, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। রসিক বাবু আরও বলিয়াছেন যে, রাজপুরুষগণ আমাদের নিকট সাক্ষাৎ "দেবতা-স্বরূপ"। দেবতার স্বরূপ কেন? স্বয়ং ভগবানের অংশাবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে কথা এই—রাজা, হিন্দুর দেবতা হইয়াও, হিন্দুর দেশে মদের মহাসমুদ্র খুলিয়া দিয়াছেন, অহিফেনের বিষম বিহ্বলতা ছড়াইয়া দিয়াছেন, ধর্ম্মহীন ও নীতিহীন শিক্ষার বিস্তার করিয়া দানব-বুদ্ধির প্রশ্রয় দিয়াছেন। 'যে রাজা আমাদের সামাজিক ও নৈতিক এত হিতচিকীর্ষু, তিনিই যথার্থ হৃদয়ের ব্যথার কথা শুনিবার যোগ্যপাত্র বটে! যাহা হউক, বয়োবৃদ্ধির সঁহিত রসিক বাবুর রাজভক্তিটা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। রসিক বাবু কি বলিতে পারেন—তাঁহার ভিক্ষাপ্রাপ্ত 'রাজদত্ত 'সদুপদেশ'রাশি দেশের তাবৎ পণ্ডিত-মূর্খে নতশিরে মান্য করিয়া লইবে—এই মর্ম্মে তিনি কোন প্রতিশ্রুতি-পত্র পাইয়াছেন? আজকাল দেশে সদুপদেশের মন্দাকিনী বহিতেছে, প্রবল মলয় পবন প্রবাহিত হইতেছে; তবে দুঃখের বিষয়, কেহ এ মন্দাকিনীর পানীয় পান করে না, এ মলয় মারুত সেবন করে না।

২। রসিক বাবু হিন্দুসমাজের অস্থিত্ব দেখিতে পান নাই, সমাজের নেতার সংখ্যা রাখেন না। না রাখিবারই, না পাইবারই কথা—চিরকাল দূরদেশে থাকিলে দেশের ভাব হইতে অনেকটা বিচ্যুতি ঘটে। নহিলে, বাঙ্গালার সমাজ সংস্কার করিবার জন্য, তাঁহাকে 'ইংলিশম্যান' সংবাদপত্রের স্তম্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত না। বাঙ্গালীর সমাজ সংস্কার জন্য, বাঙ্গালা ভাষায়, বাঙ্গালী উপায়ে, বাঙ্গালী বাবুর কাছে আন্দোলন করিলে চলিত না কি? হিন্দু-সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করি; তেমন বন্ধন নাই, তেমন তেজস্বী নেতা নাই, লোকের তেমন ধর্ম্মবুদ্ধি নাই। তবে এখনও সমাজ প্রাণহীন হয় নাই। একে বিজীত, তাহাতে আমরা ব্যবহার-ভ্রষ্ট, কাযেই বন্ধন শিথিল হইয়াছে মাত্র—একেবারে ছিন্ন হয় নাই। হিন্দুসমাজে এখনও প্রাণ আছে;—যেহেতু বিলাত-প্রত্যাগত বাবু-সাহেবেরা সমাজে উঠিতে এত উৎসুক; যেহেতু কদাহারী-কদাচারী ব্রাহ্মদের মধ্যেও কেহ কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিতেছে; যেহেতু জন্মবিবাহমৃত্যু-বিষয়ক সকল কর্ম্মই এখনও হিন্দুর সামাজিক শাসন অনুযায়ী হইতেছে; যেহেতু অসবর্ণ বিবাহ, যুবতী-বিবাহ, গান্ধর্ব্ব-বিবাহ, এবং বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত হয় নাই; যেহেতু সামাজিক কর্ম্মে পঙ্‌ক্তি-ভোজন কালে ব্রাহ্মণ-ভোজন না হইলে শূদ্রের আহারে অধিকার নাই ও এক পঙ্‌ক্তিতে বসিবার শঙ্কা হয় না; যেহেতু এখনও যাগযজ্ঞ করিতে হইলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকাইয়া

কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়; যেহেতু প্রকাশ্য সমাজে শূদ্র প্রণব উচ্চারণ করিয়া কোন কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে পারে না; যেহেতু সধবা স্ত্রীগণ এখনও সিন্দুরবিন্দু এবং লৌহকঙ্কন ত্যাগ করে নাই। ফলতঃ, হিন্দুসমাজের নির্দ্দিষ্ট নেতা না থাকিলেও, উহার এতটুকু ধারণী শক্তি আছে যে, সহজে ম্লেচ্ছাচার সমাজে প্রচলিত করিতে কেহ সাহসী নহেন। একবারে হইতে হয়, ছেলে-মেয়ের সময়-মত বিবাহ হয় না, উপযুক্ত পাত্র মিলে না, কত কষ্ট ও কত গোলমাল সহ্য করিতে হয়। আছে বৈ কি?—হিন্দুসমাজের এখনও তেজ আছে, বল আছে, স্পর্দ্ধা আছে, সাহস আছে। ব্যবস্থা নাই, শৃঙ্খলা নাই, পারিপাট্য নাই; পরন্তু প্রভুশক্তি আছে। নহিলে, দেশের গৌরব, ধনবান, বিদ্যাবান, বিলাত-ফেরত এত বাবু-সাহেবদের কোন সমাজ-অঙ্কে স্থান দিতেছে না? নহিলে, এত বালবিধবাকে কেন চির ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করাইয়াছে? নহিলে এত করিয়াও কেন যুবতী-বিবাহ প্রচলন হইল না? যাউক, আর কথা-কাটাকাটিতে দরকার নাই। কিন্তু দুঃখ রহিল, রসিক বাবু জানিয়া—শুনিয়া ন্যাকা সাজিয়াছেন। এখন, বাজে আড়ম্বর ছাড়িয়া দিয়া, দেশের লোকের সহিত দেশী ভাবে ইহার আলোচনা করিতে দেখিলে, আমরা বিশেষ সুখী হইব। রসিক বাবু ক্ষমতাবান, তেজস্বী পুরুষ; এইরূপ চেষ্টা করুন, দেখিবেন—ভগবান নিজ কোমল করস্পর্শে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী করিবেন।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

কবিতা ও গান।

আশা।

জানেনা দু'জনে ওরা ভুলে' আছে আহা থাক্—
প্রেম-পরিণাম-লেখা ইহাদের কেটে থাক্।
আমারও ছিল দিন, উভয়ের ভালবাসা—
হতভাগা জীবনের কে জানিত হেন দশা!
কবে কোন্ শুভ হৃদে জানিনে দিয়েছি ব্যথা—
তাই বুঝি এত জ্বালা, এত ক্লেশ, এত ব্যথা!
প্রিয়-বিরহের ক্লেশ—এর বেশী কিসে হয়—
তুষানল-জ্বালা, যেন শত্রুতেও নাহি পায়।
জানিনে অশেষ কি-না, শান্তি মোর অফুরান—
আছে কিনা আছে আর এ দুখের অবসান।
যা'হবার তা'ই হবে, সয়েছি ত আরো স'ব—
আশা আছে, সাধ আছে, তারি পথ চেয়ে র'ব।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

ভীষণে-মোহন।

(ঐ দেখ) রূপের-আকর, রজত-সাগর,
প্রেমের পাথার দেব ত্রিলোচন।
(তা'তে) ফুটলো আসি, মধুর হাসি,
সোনার কমল গৌরী-রতন।
(এদিকে) পিঙ্গজটা, ভস্মছটা,
ফণির ঘটা দেখ্‌রে নয়ন।
(ওদিকে) নীরদ-নিভা, চিকুর-শোভা,
রূপের বিভা তড়িত-বরণ॥
(এ'দিকে) অস্থিমালা ভরা গলা,
কাটতটে কৃত্তি-বসন।
(ওদিকে) মুকাহারে, পটাম্বরে,
হেরিলে জুড়ায় জীবন॥

শ্রীহরিদাস চক্রবর্ত্তী।

সুধা না বিষ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লকুমারের সিদ্ধান্ত।

কেদার বাবুর সমস্ত কথাই আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিলাম। তাঁহার কথার সুর, তাঁহার মুখের ভঙ্গী, তাঁহার দীর্ঘশ্বাস, তাঁহার অশ্রুপূর্ণ নয়ন—সমস্তই তাঁহার হৃদয়ের যন্ত্রণার পরিচায়ক।

প্রফুল্লকুমার, বিশেষ মনঃসংযোগের সহিত কথাগুলি শুনিয়া, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে চিন্তা করিলেন। শেষে কেদার বাবুকে জিজ্ঞাসিলেন,—"ভাল মহাশয়, আপনি ঐ দ্বিতল বাটীর জানালায় যাহাকে দেখিয়াছিলেন, সে পুরুষ না স্ত্রীলোক?"

কেদার বাবু বলিলেন,—"সে কথা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না। কারণ, যখন আমি দেখি, তখন সন্ধ্যাকাল এবং আমিও কিছু দূরে ছিলাম।"

প্রফুল্লকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"ভাল, কতদিন হ'ল আপনার স্ত্রী ঐ পাঁচশত টাকা নিয়েছেন?"

কেদার বাবু বলিলেন,—"প্রায় দুই মাস হইবে।"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"ভাল, আপনার স্ত্রী প্রথম স্বামীর কোন চিত্র দেখেছেন?"

কেদার বাবু বলিলেন,—"না।"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"আপনার স্ত্রী কি কখন তাঁর পূর্ব্বস্বামী বা তাঁর অন্য কোন আত্মীয়ের সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলাপ করেন?"

কেদার বাবু বলিলেন,—"না।"

প্রফুল্লকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনার পত্নী বোম্বাই হইতে কোন পত্রাদি পান?"

কেদার বাবু বলিলেন,—"আমার জ্ঞাতসারে কোন পত্র কখন পান নাই।"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"আমি এসম্বন্ধে কিছুক্ষণ চিন্তা করতে ইচ্ছা করি। আপনি ততক্ষণ একবার আপনার আবাসের দিকে গমন করুন। সম্ভবতঃ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আপনি সংবাদ দিতে পারবেন যে—ঐ বাড়ীটা এখনও খালি হচ্ছেই আছে, কি যারা ছিল তারা ফিরে এসেছে। ঘটনা যেরূপ হোক না কেন, যত শীঘ্র সম্ভব, সংবাদ দিবেন। আমি অদ্য রাত্রেই সেখানে গিয়ে, যা হয় একটা মীমাংসা করব, সন্দেহ নাই। তবে যদি বাটীর অধিবাসীরা স্থানান্তরে গিয়ে থাকে, তা হলে কিছু বিলম্ব হ'তে পারে।"

কেদার বাবু বলিলেন,—"যদি বাড়ী খালি থাকে, তাহলেও কি সংবাদ দিব?"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"তাহলেও সংবাদ দিবেন। তবে অত শীঘ্র সংবাদ না দিলেও চলে। যাই হউক, আপনি অনর্থক মনকে কষ্ট দিবেন না। সংসারে কত সময় কত অঘটন ঘটে; তার জন্য নিজের মনকে ব্যথিত করা পুরুষের কর্ত্তব্য নয়।"

কেদার বাবু চলিয়া গেলেন।

প্রফুল্লকুমার আমায় জিজ্ঞাসিলেন,—"কমল! আচ্ছা, তুমি কি অনুমান কর?"

আমি বলিলাম,—"অতি গূঢ় রহস্য।"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"গূঢ় রহস্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু লোকটা কে, অনুমান কর।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি কি অনুমান করণ?"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"তাহার স্ত্রীর প্রথম স্বামী।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"হেতু?"

প্রফুল্লকুমার বলিলেন,—"বোধ হয়, এই স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যু হয় নাই। বোধ হয়, স্ত্রীলোকটি কোন গুণধরের সঙ্গে পলাইয়া এখানে আগমন করেন। তার পর, আচার্য্য মহাশয়ের আশ্রমে থেকে, ক্রমে কেদার বাবুর স্কন্ধে ভর করেছেন। তিনি প্রথমে মনে করেছিলেন যে, তাঁহার পুনরায় পতিগ্রহণবার্ত্তা তাঁহার পূর্ব্বস্বামীর অজ্ঞাত থাকবে; কিন্তু কার্য্যতঃ তা ঘটে নাই—সম্ভবতঃ ব্যাপারটা একটু ভালরকমই গড়াবে। অথবা, এমনও হইতে পারে, স্ত্রীলোকটীর এখন আবার প্রথম স্বামীর প্রতি প্রণয় উথলিয়া উঠিয়াছে—নব-স্বামীর প্রণয়ে আর মনস্তুষ্টি নাই।"

আমরা এইরূপ কথোপকথন করিতেছি, এমন সময়ে একখানি চিঠি উপস্থিত। সংবাদ —"তারা আছে।"

প্রফুল্লকুমার তখনি প্রস্তুত। আমায়ও সঙ্গে লইলেন।

—০—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মীমাংসা ও সমাপ্তি।

একঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই, আমরা কেদার বাবুর আবাস-সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। কেদার বাবু আলোক হস্তে রাস্তার ধারেই দাঁড়াইয়া ছিলেন

আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম। দেখিলাম তাঁহার মুখ বিবর্ণ, বিষণ্ণ যেন ভয়ে বিহ্বল। তিনি কম্পিত-কলেবরে প্রফুল্লকুমারের হাত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, ঐ দেখুন, সে বাড়ীতে আলো জ্বল্‌ছে; ঐ দেখুন, ঘরের মধ্যে মানুষ চলে বেড়াচ্ছে। চলুন—এখনি চলুন—শীঘ্র আমার হৃদয়ের পাষাণ অপসৃত করুন। আমি এখনও বাড়ীতে যাই নাই; যা হয় একটা মীমাংসা করে, হয় বাড়ী যাব, না হয় চিরদিনের জন্য আমার অবিমৃষ্যকারিতার ফলভোগ করবার জন্য দেশত্যাগী হ'ব। এ সন্দেহের যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।" এই বলিয়া, আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, প্রফুল্ল-কুমারের হস্ত ধারণ করিয়া, দ্রুতপদে চলিলেন।

এইবার আমরা গৃহদ্বারে উপস্থিত।

দ্বারে একটি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি আমাদের দেখিয়া কিছু সঙ্কুচিত হইলেন। কিন্তু কেদার বাবুকে দেখিয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, — "আমার কথা রাখ — গৃহমধ্যে এস না। আমি তোমার পা ছুঁয়ে শপথ কর্‌ছি, আর এখানে আস্‌ব না। এখানে যা'রা আছে, তারাও কাল থেকে এখানে থাক্‌বে না।"

কেদার বাবু বলিলেন,—"সুধা! আর না—অনেক বিশ্বাস করেছি—আর না; আজ একবার ভাল করেই দেখ্‌বো, আমার সুধা—সুধা না বিষ!" এই বলিয়া, তাঁহাকে সেখানে সেই অবস্থায় রাখিয়া, তিনি উপরে চলিলেন। দেখিলাম, রমণীও কম্পিত-কলেবরে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন।

তখনি আমার মন বলিল,—"এ উপপতিও নয়, পূর্ব্বপতিও নয়!"

তবে কি?

আমরা সেই সজ্জিত কক্ষে উপনীত হইলাম। দেখিলাম—একটি টেবিলের নিকট একটি বালিকা!—অতি ক্ষুদ্র বালিকা—বর্ণ প্রফুল্ল-কৃষ্ণ।

ঠাং কাফ্রি-বালিকা বলিয়াই অনুমতি হয়। হরি হরি! এ কি রহস্য!

বালিকা আমাদিগকে দেখিয়া উচ্চরবে হাসিতে লাগিল।

কেদার বাবু বলিলেন,—"এ কে?"

কেদার বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"এটি আমারই কন্যা। আমার পূর্ব্ব-স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল; কিন্তু কন্যাটি জীবিত ছিল।"

কেদার বাবু সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমারই কন্যা?"

বাস্তবিক আশ্চর্য্য হইবারই কথা! কেদার বাবুর পত্নী পরমা সুন্দরী, তাঁর গর্ভে এই কন্যা!

কেদার বাবুর পত্নী আপনার কণ্ঠস্থ হার হইতে একটি অনন্তক্ষুদ্র 'লকেট' লইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি এ 'লকেটটি' চিরদিনই আমার কণ্ঠে দেখ্‌ছ; কিন্তু এতে যে কি আছে, তা জান না। এই যে প্রতিমূর্ত্তিটি দেখ্‌ছ, ইনিই আমার পূর্ব্বস্বামী—ইনিই বোম্বাই-নগরের আনন্দরাম দাস। ইনি আমার পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর আমি একেই স্বেচ্ছায় বিবাহ করি। কিন্তু সে বিবাহে আমি একদিনের জন্যও অসুখী হই নাই। এই কন্যাটির জন্মের কিছু পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর নামটি বাঙ্গালী ধরণের বটে, কিন্তু তিনি ভারতবর্ষীয় কোন জাতীয় ছিলেন না। আফ্রিকা-দেশে তাঁর জন্ম হয়। আমার বালিকাটিও তার পিতৃবংশানুরূপ বর্ণ লাভ করেছে; এমন কি, সে তাঁর পিতার চেয়েও শ্যামবর্ণ। কিন্তু সে, কাল হলেও ত আমারই কন্যা—আমি ত তারে ভুল্‌তে পারিনে —এইজন্যেই তোমার কথা ফেলেও, তাকে বক্ষে ধারণ কর্‌বার জন্য ছুটে আসি। সে তার ধাত্রীর কাছে-সংস্রবে থাকলেও, আমার মন বুঝে না। তাই তাকে এতদিনের পর এখানে আনিয়েছিলাম। কিন্তু পাছে তুমি তারে ঘৃণা কর, এইজন্যই এতদিন তোমায় কিছু বলি নাই। সেদিন রাত্রে এখানেই এসেছিলাম বটে, কিন্তু তার কারণ তুমি! তুমি যদি রাত্রে আমায় এদের আস্‌বার কথা না বল্‌তে, তাহলে আমি সে রাত্রে এদের আসার খবর পেতাম না। তারপরদিন যে তুমি এখানে কারুকে দেখ্‌তে পাও নাই, তারও কারণ আর কিছুই নয়; আমিই তাদের রান্না-ঘরের পাশের চোরা-কুঠরিতে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেম! এখন, এর উপায় কি হবে?"

কেদার বাবু মুখে কিছু না বলিয়া, কার্য্যতঃ সে কথার উত্তর দিলেন। তিনি সাদরে বালিকাটিকে কোলে করিয়া লইলেন এবং বলিলেন, —"এখন, ঘরে চল; সেখানেই সকল কথার মীমাংসা হবে। আমি এ কয় দিন বড়ই অস্থির ছিলাম। আমার হৃদয়-মধ্যে কেবল একটি প্রশ্নই বজ্রের ধ্বনিতে উচ্চারিত হচ্ছিল —আমার সুধা—সুধা না বিষ!"

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কবিরত্ন।

মানব-কলঙ্ক।

(২)

সুপুত্র লাভ-সম্বন্ধে আর্য্য-ঋষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এস্থলে তাহা সঙ্ক্ষেপে পুনরুক্ত হইতে পারে। ঋতুস্নাতা ভিন্ন অন্য অবস্থায় স্ত্রীতে অভিগমন করিতে নাই; যখন পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই শরীর সুস্থ ও মন উৎফুল্ল থাকিবে, সুন্দর বেশবিন্যাস ও মাল্যচন্দনাদি ধারণ করিয়া অভিপ্রেত শয্যায় উভয়ের সম্পূর্ণ ইচ্ছার সহিত সঙ্গত হইবে। তৎকালে সুপুত্র-লাভেরই ইচ্ছা যেন উভয়েরই একমাত্র অনু-

ধ্যান হয়। সংসর্গের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষ বহুক্ষণ একত্রে আসীন হইয়া কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের আলাপ করিবে এবং সর্ব্বসমক্ষে শাস্ত্রোক্ত প্রসাদ বদন দেখিবে। এইরূপ নানাপ্রকার সদুপায় আর্য্য-সংহিতায় ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রাচীন আর্য্যগণ সেই সকল নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন বলিয়া, সুপুত্র লাভ করিতে পারিতেন; বর্ত্তমান হিন্দুগণ সেই সকল মঙ্গল-ময় নিয়মের ব্যভিচার করেন বলিয়া আজি এত হীন ও শোচনীয় দশায় নিপতিত হইয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মৈথুনধর্ম্মের ব্যভিচার বর্ত্তমান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যসমাজের সকল স্তরেই নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। লোকের যেমন বিদ্যাসুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে, সেইরূপ যদি এই অতিপ্রয়োজনীয় ও পরম-মঙ্গলকর বিষয়ে অনুরাগ জন্মে, তাহাহইলে অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের দুঃখ দূর হইতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে অতি অল্প লোকেরই লক্ষ্য আছে। সংসারাশ্রমে সকলেই সুখী হইতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যাহা নিজের ও সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গল-নিদান, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার বিষয় কেহই একবার ভাবিয়া দেখে না।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, ধনধান্য-লাভের ও স্ত্রীসংসর্গের ইচ্ছা যত পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা করা যাইবে, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন তাহা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ সেই ইচ্ছা ততই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গে বর্ত্তমান সভ্যসমাজের একটী প্রধান কলঙ্ক। এই কলঙ্কের অপনয় না করিলে সমাজের আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ একটী ভ্রান্তসংস্কার আজিকার সমাজে অতীব বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে—অনেকের ধারণা এই যে, স্বেদ, ক্লেদ, পিত্ত, লালা প্রভৃতি নিস্রাব্য পদার্থ সকল শরীর হইতে যেমন নিঃসারিত করা আবশ্যক, শুক্রও সেইরূপ নিঃসারিত করিতে হয়। অনভিজ্ঞ লোকের কথা দূরে থাকুক, অনেক চিকিৎসকও এই রিচ্‌ন মত প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই অনর্থকর ভ্রান্ত মতে ভুলিয়া অগণ্য যুবকযুবতী অকালে ইহ-লোক হইতে অপসৃত হইতেছে—অসংখ্য লোক চির-রোগশয্যায় পতিত রহিয়াছে। যৌবনে প্রবেশ করিবা-মাত্র এই ভ্রান্ত মতের অনুসরণ করিয়া, অনেকে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক নানা উপায়ে শুক্র নিঃসারিত করিয়া থাকে। এই অপকর্ম্মের বিষময় ফল তাহাদিগকে অল্প-দিনের মধ্যেই ভোগ করিতে হয়। যাহারা এই মতের প্রচার ও পোষকতা করে, তাহা-দিগের তুল্য পাপী আর কেহই নাই। এই ভ্রান্ত মতের দোহাই দিয়া লোকে প্রতিনিয়ত যে সকল পাপের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা দেখিয়াও তাহাদিগের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইতেছে না। পিত্তশ্লেষ্মাদি নিস্রাব্য পদার্থসকল শরীর হইতে নিঃসারিত না করিলে যেমন পীড়া হয়, ঐ সমস্ত মূর্খ লোকেরা ভাবে যে, শুক্র ত্যাগ না করিলে সেইরূপ পীড়া হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যে বিষম ভুল, তাহা প্রতিপন্ন করিতে অধিক প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

পাশ্চাত্য-জগতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ এক-বাক্যে স্বীকার করেন যে, স্ত্রীসংসর্গ আদৌ না করিলে অর্থাৎ শরীর হইতে শুক্র আদৌ কোন উপায়ে নিঃসারিত না করিলে কোন পীড়াই হয় না, অথবা পীড়াক্রমণের প্রবণতা জন্মে না। এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, চিরকুমার ও চিরকুমারীদিগের অপেক্ষা বিবা-হিত স্ত্রীপুরুষগণ কি অধিকদিন বাঁচিয়া থাকে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার অগ্রে এইটী স্থির করিতে হইবে যে, যাহারা বিবাহ না করিয়া চিরজীবন অতিবাহিত করে, তাহারা স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয় করে কি না? বিবাহিত স্ত্রীপুরুষদিগের কামবৃত্তি অন্তঃ-সলিলা; সুতরাং তাহার গতি ধীর ও দৃঢ়; তাহাতে একবার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে আর তাহাকে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে অবরুদ্ধ রাখিতে পারা যায় না; তখন তাহা কূল প্লাবিত করিয়া—সকল বাধা অতিক্রম করিয়া—এমন কি পাষাণ ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। আর এক কথা, বিবাহিত স্ত্রীপুরুষগণ প্রায়ই সুখী, সাবধান ও ধর্ম্মভীরু। পুত্রকলত্রের সুখের ও শান্তির জন্য তাহারা সর্ব্বদা সতর্কভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে;—বিশেষতঃ শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি। এই সকল কারণে তাহারা অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে।

সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, সভ্য-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, এ সময়ে অবি-বাহিত থাকা, অথবা কোন উপায়ে শুক্রনিষেক না করিয়া থাকা এক প্রকার অসম্ভব। মানবের স্বভাব-চরিত্র এখন অতীব দূষিত হইয়া পড়িয়াছে, ধর্ম্মের বন্ধন প্রায় সর্ব্বত্রই শিথিল হইয়াছে; এ অবস্থায়, লোকে যে ঊর্দ্ধরেতা যোগীপুরুষ হইয়া থাকিতে পারিবে, তাহা বোধ হয় না; পরন্তু তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। আমরা কাহাকেও কামপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ করিতে বলিতেছি না; তবে যাহাতে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে সকল দিক্ বজায় থাকে। এরূপ করিতে হইলে মন স্থির রাখিতে হইবে; এবং ধর্ম্মচিন্তায় মন যেমন শান্ত ও তৃপ্ত থাকে, অন্য কিছুতেই সেরূপ থাকে না। কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল নাটক-নভেল না পড়িয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিলে অথবা পবিত্র চিন্তায় মগ্ন থাকিলে, পাশবী প্রবৃত্তি অনেক পরিমাণে দমিত থাকে; এইরূপে লোকের চরিত্র শোধিত হয়। যাহারা কোনরূপ সুরা, চা, কফি ও তামাক প্রভৃতি কোনরূপ উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার না করে, চেষ্টা করিলে, তাহারা সহজেই মনোবৃত্তির উত্তেজনা দমিত করিতে পারে। এইরূপ করিতে করিতে তাহারা সহজে বুঝিতে পারে যে, তাহাদের ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইতেছে এবং এই উপায়ে তাহারা আপ-নাদের মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ করিতে পারে। কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ শয্যায় শয়ন করা উচিত; এরূপ করিলে তাহাদের উত্তেজনা কমিয়া যায় এবং শরীর সুস্থ ও সবল থাকে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

যুদ্ধবিগ্রহ।

চীন-জাপানীয় যুদ্ধ।—চীন, অনেকাংশে নত হইয়া, সর্ব্বতোভাবে সন্ধির চেষ্টা করিতেছে। চীনের পক্ষ হইতে দুই-তিন জন রাজদূত সন্ধির জন্য জাপানে গমন করিয়াছেন। এদিকে জাপানীরা কিন্তু ক্রমেই পিকিন-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। শীঘ্র কোনরূপ মিটমাট না হইলে, চীনের সম্পূর্ণ দুর্দ্দৈবের ভাবনা এখন অনেকের মনেই স্থান পাইতেছে।

ওয়াজিরি যুদ্ধ।—এ সপ্তাহেও সংবাদ পূর্ব্ববৎ। বিদ্রোহীয়েরা অলক্ষিতভাবে পশ্চাৎ হইতে মধ্যে মধ্যে ইংরাজদিগের 'ছাউনী'

আক্রমণ করিতেছে; কিন্তু সম্মুখে কেহই অগ্রসর হইতেছে না। শৈত্যাধিক্য-হেতু ইংরাজ-যুবকগণ অনেক মৈমন্‌ পীড়াক্রান্ত হইতেছেও মারা যাইতেছে।

নাটোরের মকর্দ্দমা।

রাজার দণ্ড।—এতদিন পরে নাটোর মকর্দ্দমার রায় বাহির হইয়াছে। রাজসাহীর 'অফিসিয়েটিং সেসন জজ' মিঃ এল্‌ পালিত, অনেক ভাবনা-চিন্তার পর, রায় দিয়াছেন,—"রাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারী মথুরানাথ পাল দোষী; সুতরাং রাজার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৬ মাস মেয়াদ ও ২৫,০০০৲ হাজার টাকা জরিমানা, এবং মথুরানাথ পালের ৬ মাস মেয়াদ সাব্যস্ত হইল। রাজার জরিমানার টাকা হইতে ৬ হাজার টাকা ফরিয়াদি গঙ্গাগোবিন্দ সরকারকে দেওয়া হইবে।" এ বিচারে দেশ-শুদ্ধ সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এসেসরগণ রাজাকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সকলের মনে রাজা বাহাদুরের নির্দ্দোষিতার বিষয়ই বদ্ধমূল হইয়াছিল; সুতরাং অকস্মাৎ এই নিদারুণ দণ্ড বড়ই দুশ্চিন্তামূলক, সন্দেহ নাই।

রায়ের প্রথম অংশ পড়িবার সময়ই, বৈকালে ৩টার সময়, কলিকাতায় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সেখান হইতে তারযোগে সংবাদ আসে—তিনি যেন হাইকেটে আপিলের জন্য প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু শেষ-সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় অর্থাৎ হাইকোর্টের জজগণ উঠিয়া যাওয়ার এক ঘণ্টা পরে ঐ সংবাদ আসায়, সেদিন আর কিছুই হয় নাই। পরদিন, প্রথম কাছারীতেই আপিল মঞ্জুর হইয়াছে। রাজা বাহাদুর পূর্ব্ববৎ জামিনে খালাস থাকিবেন। রাজসাহীতে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তারযোগে সংবাদ পাঠান হইয়াছে—যেন পূর্ব্ববৎ জামিনে রাজাকে খালাস দেওয়া হয়। বিচার পরে হইবে। ফলতঃ সকলেই হাইকোর্টের এই বিচারের জন্য উদ্‌গ্রীব।

মহাসমিতি।

জাতীয় মহাসমিতি।—জাতীয় মহাসমিতির প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বেই প্রকাশ করা গিয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে—বিচার-বিভাগ, সিবিল সার্ব্বিস-পরীক্ষা, ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি বহুবিধ প্রস্তাবের অবতারণা হইয়াছিল। আগামী বর্ষে পুনা-সহরে একাদশ কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

যোগ—সম্মান।

নব বর্ষের উপাধি।—নব বর্ষের উপাধি দানের মধ্যে এ বৎসর দেখিলাম, কলিকাতা-পুলিশের ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা যতদূর জানি, কলিকাতা-পুলিশের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে, গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রথম ইঁহাকেই এই সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিলেন। কলিকাতা-পুলিশে ইহার অপেক্ষা পুরাতন এবং উচ্চপদস্থ অনেক কর্ম্মচারী থাকা সত্ত্বেও, গভর্ণমেণ্ট যে ইঁহার গুণ-গৌরব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টকে আন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। পুলিশের প্রতি সাধারণতঃ লোকের অবিশ্বাস থাকিলেও, যোগেন্দ্র বাবুর উপর কিন্তু সকলের অটল বিশ্বাস দেখা যায়। সুতরাং উপযুক্ত পাত্রেই যে সম্মান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যোগেন্দ্র বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া, সাধারণের এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট দিন দিন অধিকতর সম্মানে সম্মানিত হউন; এবং অপরাপর পুলিশ-কর্ম্মচারিগণও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণে সম্মানিত হইতে চেষ্টা করুন।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা-কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান

অষ্টম বর্ষ। | ২৭এ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। | ৩৫শ সংখ্যা।

প্রাণ-কথা।

প্রাণ কাঁদে কেন?

আনন্দময়ীর পুত্র হইয়া আমার প্রাণ সদা কাঁদে কেন? কেন জগতের দুঃখ দেখিয়া আমার প্রাণ এত আকুল হয়? পুত্রশোকাতুরা জননী, পতিবিয়োগবিধুরা রমণী, পিতৃমাতৃহীনা বালিকা, সর্ব্বপরিত্যক্তা কুলত্যাগিনী, জীবিতমরনী কাঙ্গালিনী ও রুগ্নশয্যায়-শয়ানা দীনা মলিনবসনা বৃদ্ধা—এই প্রত্যেক শ্রেণীর রমণী দেখিয়া আমার প্রাণ এত আলোড়িত হয় কেন? ইঁহারা সকলেই তো আমার আনন্দময়ী মায়ের ছবি, তবে ইঁহাদের এত দুর্দ্দশা কেন? আনন্দচ্ছবির পরিবর্ত্তে ইঁহাদের সকলেরই মুখচ্ছবিতে বিষাদ-কালিমা কেন? ইঁহাদিগকে দেখিলেই শোকসাগর উথলিয়া উঠে কেন? মা কি জগতের শূন্যগর্ভ প্রমোদ-মৃত্য হরণ করিবার নিমিত্তই এই সকল বিষাদময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভাবুকের অন্তরে চিন্তাশীলতা উদ্দীপিত করিতেছেন? মায়ের লীলা বুঝা ভার। কোন্ মূর্ত্তিতে কি ভাবে কাহাকে কখন ছলনা করেন, কে বুঝিতে পারে? কে জানে তাঁহার মহিমা? কিন্তু আমি তো আনন্দময়ী মাতা ও সচ্চিদানন্দ পিতা ভিন্ন আর কিছুই জানি না! মায়ের বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিলে তাই আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। মা আমায় ভুলাইবার জন্য যখন যে মূর্ত্তি ধরুন না কেন, আমি মাকে চিনিতে পারি। তাই মায়ের আনন্দময়ী মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য মূর্ত্তিতে আমার আনন্দ হয় না। তাই মায়ের বিষাদময়ী মূর্ত্তি দর্শনে আমার চিত্তকলকে গভীর বিষাদরেখা অঙ্কিত হয়। সে দৃশ্যে নয়নে অতর্কিতভাবে অশ্রুনির্ঝর ঝরিতে থাকে। মনে হয়, মা আমার অতি নিষ্ঠুর। নতুবা, এরূপ কোমল প্রাণে এমন ব্যথা দিবেন কেন? নতুবা আনন্দময়ী হইয়া পুত্রের সম্মুখে বিষাদিনী মূর্ত্তিতে কেন আবির্ভূতা হইবেন? পুত্রকে কাঁদাইলে তাঁহার কি সুখ হইবে? মা আনন্দময়ী! তুমি আপনার 'ফটোগ্রাফ' আপনি নিরন্তর তুলিতেছ—আপনার ছাঁচে ঢালিয়া রমণীমণ্ডল নিয়ত গড়ি-

তেছ—তবে [illegible] শূন্যে এত বিভিন্ন প্রতীত হইতেছে কেন? কি সমীয়ন দিয়া তুমি প্রস্তরকে তোমা হইতে বিভিন্ন করিতেছ? তোমার প্রতিকৃতিতে, অথবা পুত্রের নয়নে রমায়ন দিতেছ, বলিয়া দেও? তোমার কৌশল তুমি ভিন্ন আর কে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম, বল?

আপনাকে অদ্বিতীয়া করিবার জন্যই কি সকল প্রকৃতিগুলিকেই বিকৃতা করিয়াছ? কাহাকে বিষাদিনী, কাহাকে উন্মাদিনী, কাহাকে কাঙ্গালিনী, কাহাকে পাপিনী, কাহাকে ডাকিনী, কাহাকে বা রাক্ষসী করিয়াছ? আপনার মত কাহাকেও কর নাই! সকলকেই সকলক চাঁদ করিয়াছ! প্রথমে গগনের চাঁদে কলঙ্ক দিয়া, সেই কলঙ্ক-তুলিকা রমণীমাত্রের মুখকমলে বুলাইয়া দিয়াছ। তোমার হস্তের অদ্ভুত নিপুণতায় সে কলঙ্ক-রেখা কাহারও মুখে পাপ-রেখায়, কাহারও মুখে দুশ্চিন্তারেখায় পরিণত হইয়াছে। একি মা! এ কি তোমার কাজ? তুমি যদি ঈর্ষা-কষায়িতা হইবে, তবে ইহারা আর কে হইবে? তোমার মত সুন্দরী—ভুবন-মোহিনী আনন্দময়ী মূর্ত্তি—ঘরে ঘরে থাকিলে কি ক্ষতি হইত মা? প্রতি গৃহ তাহাহইলে বৈকুণ্ঠধামে পরিণত হইত! প্রতি গৃহলক্ষ্মী তাহাহইলে প্রকৃত লক্ষ্মীরূপা হইতেন! তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইত মা? তোমারই মহিমা জগতে উদ্ঘোষিত হইত! তাহাহইলে প্রতি গৃহে তোমার পূজা হইত! তাহাতে তোমার কি ক্ষতি ছিল, বল না মা?

বুঝেছি—তোমার গূঢ় রহস্য! তুমি আদ্যা-শক্তি চিন্ময়ী ও আনন্দময়ী। প্রতিকৃতিতে সে সমস্ত গুণ থাকিলে, তোমার পূজা আর কে করিবে? এই ভয়ে তুমি তোমার সমস্ত প্রতিকৃতি-গুলিকে কলঙ্কিত করিয়াছ—ভাল ছবি তুলিয়া তুলিকাঘাতে কাহারও মুখে কৃষ্ণ, কাহারও মুখে নীল ও কাহারও মুখে শ্বেতবর্ণ বিন্যাস করিয়াছ। গঠনে রমণীমাত্র তোমার মত কোমলাঙ্গী হইলেও, তোমার বর্ণ-বিন্যাসের মহিমায়, সকলেই মুখচ্ছবিতে তোমা হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাই রমণী-মাত্রকে দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে—তোমার মুখচ্ছবির সহিত তুলনা করিয়া প্রাণ আকুল হইয়া উঠে! তোমার গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিয়াও নয়নে বারি সম্বরণ করিতে পারি না। এমন ছবিগুলি কেন নষ্ট করিলে বলিয়া, তোমার উপর বড় রাগ হয়। কিন্তু তখনই সে রাগ নিভিয়া যায়। তখনই মনে হয়—যদি গৃহলালাভূতা রমণীগণ মায়ের মুখচ্ছবি পাইত, তাহাহইলে কেহ কি আর মায়ের নাম করিত? রমণীমণ্ডলী মায়ের মুখচ্ছবির কণামাত্র সৌন্দর্য্য পাইয়া জগৎকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। যদি তাহারা মায়ের মত মুখচ্ছবি পূর্ণমাত্রায় পাইত, তাহাহইলে জগৎ হইতে মায়ের পূজা এতদিনে উঠিয়া যাইত। তাই বলি মন! দুঃখিনী, পাপিনী, তাপিনী বা বিষাদিনী দেখিয়া আর কাঁদিস না! ঐ দেখ, তোর মা বিশ্ববিমোহিনী-মূর্ত্তিতে তোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া! বরাভয়প্রদ বাহুযুগল প্রসারিয়া তোকে কোলে লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন! তুই বিষদ ভুলিয়া—অশ্রুজল মুছিয়া—মায়ের ছেলে শীঘ্র মায়ের কোলে যা! তোর আনন্দময়ী মায়ের মুখপানে চাহিয়া জগতের শোক-দুঃখ সমস্ত ভুলে যা! আর তথায় যাস্ না! —আর ভবের হাটের ছায়াময়ী দেখিতে গিয়া বিড়ম্বিত হ'স্ না! মা! মা! আনন্দময়ী মা! দেখ—যেন আর তোমার ক্রোড় হইতে আমায় নামিতে না হয়!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম-এ।

শঙ্কর-চরিত।

বিদ্যারণ্য মুনি (মাধবাচার্য্য) বলেন, এই সময়ে শঙ্কর-দেবের অন্য এক অলৌকিক ক্ষমতা বিকাশিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে পুণ্যা ক্ষুদ্রা সরিতের উল্লেখ করিয়াছি, পূর্ব্বে ঐ নদী শঙ্কর-স্বামীর গৃহ হইতে দূরে বহমানা ছিল। শঙ্কর, নিজ-বিভূতিবলে, সতীদেবীর সুখের নিমিত্ত গৃহপার্শ্বে আনয়ন করিয়াছিলেন। শঙ্কর-জননী একদিন স্নানার্থ উক্ত নদীতে গমন করিয়াছিলেন; তিনি প্রচণ্ড আতপ-তাপে তাপিতা হইয়া পথিমধ্যে বিকলাঙ্গ হন, সে জন্য গৃহে আসিতে তাঁহার বিলম্ব হয়। তাহা দেখিয়া, মাতৃভক্ত শঙ্কর উদ্বিগ্ন হন; এবং ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার অন্বেষণে গমন করেন। পরে, পথিমধ্যে তাঁহার তপস্বিনী জননীকে ঘর্ম্মাক্ত ও ধূলি-ধূসরিত দেহে নিপতিত দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলেন; এবং পরক্ষণেই, চিত্তবেগ সংযমন করিয়া, তৎকালোচিত শুশ্রূষায় জননীকে সুস্থ করিলেন, ও কোন স্বজন দ্বারা তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর, অলৌকিক-বিভব-সম্পন্ন ব্যোমকেশ-লাঞ্ছন, নদীকে গৃহসন্নিহিত করিবার জন্য, নদীদেবতার উপাসনা ও বেদস্তুতে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। নদীদেবতাও, সত্যবাক্ সত্যপ্রতিজ্ঞ শঙ্করদেবের স্তবে তুষ্ট হইয়া, কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, —"তুমি শৈশবকালেই জগতের হিত কামনা করিতেছ, এ নিমিত্ত প্রাতঃকালেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।" বিনীত বালক শঙ্কর, নদীদেবতাসমীপে এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া, স্তবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরদিন, অরুণ-দেব উষার স্নিগ্ধ ক্রোড়ে ক্রীড়া করিবার পূর্ব্বেই, তৎস্থান-বাসি-জনগণ দেখিয়া ছিল যে, পবিত্রা পুণ্যা নদী লক্ষ্মী-পতি বিষ্ণুর মন্দিরের নিকটে ও শঙ্করের গৃহ-সন্নিকটে কল-কলরবে আনন্দধ্বনি করিতেছে। এই সকল আখ্যান সত্য কি কাল্পনিক, অথবা ইহার মর্ম্মা-বধারণে অক্ষম হইয়া আমরা শ্রদ্ধা-বিরহিত হইতে পারি; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রকৃত জ্ঞানী পরমহংস ও সন্ন্যাসিগণ ইহা প্রীতমনে বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

শঙ্করদেবের এবম্বিধ অলৌকিক চরিত্র-বিভব দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রমণ জনগণের অন্তরে কালিমা-রেখা অঙ্কিত হইতে লাগিল; আর্য্যজনের অন্তরে উৎসাহের নির্ম্মল লহরী-লীলা খেলিতে লাগিল—নিরাশার বীজ শুষ্ক হইতে লাগিল—অকস্মাৎ দৈব-বাণীর ন্যায় আশার মোহন মূর্ত্তি বিভাসিত হইতে লাগিল। কেরল-দেশ এই সময়ে রাজ-শেখর নামা জনৈক ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় রাজার শাসনাধীন ছিল। রাজশেখরে তদানীন্তন রাজ-কুলের মধ্যে একজন প্রবল-পরাক্রম বিখ্যাত ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তদীয় রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধ পাষণ্ড প্রবিষ্ট হইয়াও, ধর্ম্মমনে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। ধার্ম্মিক রাজার শাসনগুণে অধর্ম্ম প্রবেশ করিলেও অবস্থান করিতে পারে নাই। রাজশেখর সংস্কৃত সাহিত্য-জগতেও সুপরিচিত ছিলেন। ইঁনি সংস্কৃত-ভাষায় তিন-খানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। রাজশেখর ক্ষত্রিয় হইলেও শৈব-মতাবলম্বী, সুতরাং সন্ন্যাসি-প্রিয় শঙ্করের লোকাতীত চরিত্র ও ক্ষমতার বিষয় তদীয় কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবা মাত্রই, শঙ্করকে দেখিবার জন্য একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, উপহার-সহ জনৈক অমাত্যকে তদীয়

অধিকে প্রবণ করিলেন। বিজ্ঞতম অমাত্যবর, ধনবত্ত্ব ও কতিপয় হস্তী উপঢৌকন লইয়া, শঙ্কর-সমীপে সমাগত হইলে পর, তাঁহাদের উভয়ের যে কথোপকথন হইয়াছিল, প্রত্যেক চরিত্র-লেখকই তাহা সুব্যক্তরূপে চিত্রিয়া গিয়াছেন। দেশ-কালপাত্রাভিজ্ঞ বুদ্ধিমান অমাত্য, বাল-যতি শঙ্করকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া, সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন,—'বর্ত্তমান কালে যিনি অদ্বিতীয় যোদ্ধা, সেই সুবিখ্যাত কেরল-দেশীয় ক্ষত্রিয়-নরপতি রাজশেখরের আদেশানুসারে ও স্বীয় পুণ্যফলে আজ আমি আপনাকে সন্দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম। সম্প্রতি সেই সর্ব্বনরেন্দ্র-জেতা কেরলরাজ—যাঁহার সভায় মান্য কোবিদ-কদম্ব সতত বিরাজিত, সেই মহামতি রাজ-শেখর—তদধীয় শ্রীপাদপদ্ম-রেণু-লাভে কৃতার্থ-ইচ্ছু। মহারাজ আপনাকে এই মদমত্ত দ্বিপবর ও এই রত্নরাশি অনুরাগপ্রবণচিত্তে প্রদান করিয়াছেন; গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে চরিতার্থ করুন। রাজ-ভবন শাস্ত্রানুসারে পবিত্র হইলেও, তদধীয় চরণ-স্পর্শে উহা অধিকতর পবিত্র হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।" আমাত্য এইমাত্র বলিয়া, আপনার দৌত্যকার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

উদার-মতি শঙ্কর, অমাত্যবরের সেই সকল সমীচীন বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎকালোচিত প্রত্যুত্তর দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামতি শঙ্কর বলিলেন,—"হে বদান্য! আমাদিগের অন্ন ভিক্ষালব্ধ, পরিধেয় মৃগচর্ম্ম, কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সকল শ্রুতি-স্মৃতি-বিবোধিত। ত্রৈকালিক স্নান ও অগ্নিচর্য্যা প্রভৃতি কঠোর কর্ম্ম-কলাপই আমাদিগকে শাসন করিয়া থাকে; অবৈধ ভোগ আমাদিগকে বশীভূত করিতে পারে না। আমরা ব্রহ্মচারী, বেদলাভ করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। বেদই আমাদিগকে যথাবিহিত অনুশাসন করিয়া থাকে; এজন্য আমরা অবশ্যানুষ্ঠেয় কর্ম্ম-কলাপ পরিত্যাগ করিয়া কদাচ গমনাগমন প্রভৃতি অসংভ্যোগের অধীন হইতে পারি না। হে অমাত্য! আপনি যে স্থান হইতে সমাগত হইয়াছেন, এক্ষণে যদৃচ্ছাক্রমে পুনর্ব্বার সেই স্থানে প্রতিগমন করুন। আপনার মঙ্গল হউক। আপনার প্রভুকে আমার এই অত্যন্ত প্রত্যুত্তর সমর্পণ করুন। রাজা যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার যোগ্য নহে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সংরক্ষণ করাই রাজাদিগের ধর্ম্মানুগত প্রধান কার্য্য; সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি-বর্ণের যাহা বিশুদ্ধ বৃত্তি, যাহাতে তাহা হইতে তাহারা ভ্রষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন প্রয়োগ করাই তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ সকল বর্ণ যাহাতে ধর্ম্মপথ অতিক্রম না করে, তদ্বিষয়ে তিনি মনোযোগ দান করুন। 'তোমরা আপন-আপন আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সেবা কর'—একথা তিনি যেন কাহাকেও না বলেন।"

রাজার দান এবং বাল যতি শঙ্করের উক্তি দেখিয়া, হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রই বিস্মিত হইবেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য-বিদ্যা-বিজ্ঞানে ব্রাহ্মণ-দিগকে স্বার্থপর বুঝাইতে অশেষবিধ প্রয়াস পান, তাঁহারা এরূপ নির্লোভতা দেখিয়াছেন কি? —আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এরূপ তেজ-প্রকাশে কদাপি সমর্থ হইয়াছেন কি? এরূপ সংযমন-শিক্ষা ও ক্ষমতা কোন মুহূর্ত্তে হইয়াছে কি? অনর্থক উষ্ণশোণিতে উষ্ণমস্তিষ্কতার পরিচয় দিয়া, অযথা কথা বলা কর্ত্তব্য নহে; সত্যানুসন্ধানে ক্ষমবান হইয়া অভিমত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য; পরের মুখে শুনিয়া কথা বলা বিজ্ঞ-জন-যোগ্য নহে। পরের মুখে অম্ল-চাখা বড় দোষ। পরের চক্ষে দর্শন করিলে সত্যদর্শন হওয়া অতি দুরূহ।

'বুদ্ধিমান অমাত্য, ব্রহ্মচারি-শ্রেষ্ঠ শঙ্করের এতদ্রূপ মহামহিমান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিজ স্বামীর নিকট পুনর্ব্বার প্রতিগমন করিলেন। ধরাপতি প্রত্যাগত অমাত্যের মুখে শঙ্করের প্রত্যুত্তর কথা শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং তৎসন্নিধানে উপনীত হইলেন। ব্রহ্ম-বলের নিকট ক্ষাত্র-বল চিরকালই বিনত। ব্রহ্ম-ধারণায় ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব; অধুনা উহারই অভাবে ব্রাহ্মণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। রাজা রাজ-শেখর শঙ্করাশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—বাল-ব্রহ্মচারী শঙ্কর গৃহপ্রাঙ্গণে কৃষ্ণাজিনোপরি উপবিষ্ট, বহুসংখ্যক জেতা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-বালক চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার গলদেশে সুশুভ্র যজ্ঞোপবীত, পরিধান কৃষ্ণাজিন, কটিতটে মুঞ্জ-নামক তৃণের মেখলা, শরীর চন্দ্রবর্ণ, উপরুক্ত তুলভার সুশোভিত; দেখিলে মনে হয়, যেন কৃষ্ণিংশাবতংস মুরারি-ভ্রাতা হলধর যোগিবেশে সমুপবিষ্ট আছেন। নরপাল রাজশেখর, তাদৃশ সৌম্য শঙ্কর-মূর্ত্তির সমীপস্থ হইয়া যথাবিধি প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন,—'বুঝি, সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী বিধাতা লোকোদ্ধার করিবার জন্যই এই অদ্ভুত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, ভারতের তামসী নিশার অবসানে সুখময় শুকতারা দেদীপ্যমান।"

সমুদারমতি শঙ্কর, সমাগত রাজাকে আসন প্রদান-পূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পর, ভিত্তিপতি রাজশেখর দশসহস্র সুবর্ণমুদ্রা শঙ্কর-চরণে সমর্পণ-পূর্ব্বক স্বরচিত নাটকত্রয়ের বস্তু-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্করদেব রাজশেখর বিরচিত নাটকত্রয়ের মর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং সাধুবাদ উচ্চারণ-পূর্ব্বক রাজাকে পরিতুষ্ট করিলেন। অল্পক্ষণ পরে বলিলেন,—"রাজন্! অভিলাষ ব্যক্ত করুন।" তখন সংপ্রতিজ্ঞ রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"আমি আমার কুলোচিত সুপুত্রাভিলাষী।" শঙ্কর বলিলেন,—"আপনি এই স্বর্ণমুদ্রা-সকল কোন দরিদ্র গৃহস্থ-ব্যক্তিকে দান করুন; শীঘ্রই আপনার মনোভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে।" এইরূপে সুবর্ণমুদ্রা প্রত্যর্পণ করিয়া, রাজাকে পুত্রেষ্টি যাগ আহরণ করিবার অনুরোধ করিলেন। নরপাল তদীয় উপদেশ হৃদ্গম্য করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে স্বভবনের প্রতি প্রস্থান করিলেন।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বিংশ সংবৎসর গর্ব্বিত জ্ঞানালোকে আবির্ভূত হইলে, নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধি বলিয়া বিখ্যাত হইতেন; যেহেতু, এতগুলি সুবর্ণ-মুদ্রা হস্তগত করিয়াও তৎক্ষণাৎ তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন! আর, এইজন্যই ব্রাহ্মণগণ স্বার্থ-পর ছিলেন বলিয়া নব্য-ভব্য-মুখে বিনিন্দিত! আশ্চর্য্য বিদ্যা! অসীম বুদ্ধি! বিচার-ক্ষমতাও অদ্ভুত!

এইরূপ ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা, শঙ্করের বিদ্যা-বিভববত্তার অধিকতর প্রচারিত হইল। ক্রমে তাঁহার নিকট অনেক বিদ্যার্থী যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। কেহ ফণিভাষ্য অধ্যয়ন করিতেছেন, কেহ বা দর্শনার্থ অত্যন্ত করিয়া পণ্ডিত হইতে লাগিলেন, কোন শিষ্য বা বেদান্ত শ্রবণ করিয়া আত্ম-তত্ত্বামৃতপানে অনুপম সুখানুভব করিতে লাগিলেন। শঙ্করও সাগ্রহে উপদেশ দিতে লাগিলেন। বালকের নিকট বৃদ্ধগণও প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়া জ্ঞানরত্নের অধিকারী হইতে লাগিলেন। বয়সে বৃদ্ধাপেক্ষা জ্ঞানবৃদ্ধের আদর সতত সর্ব্বত্রই আছে। শঙ্কর প্রীত-মনে অন্তেবাসীদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিতে লাগিলেন, তদধিক প্রীতির সহিত, স্বীয় আশ্রয়-স্বরূপ জননীকে সেবক-ধর্ম্মের সার-ভূত বিনয়, পরিচর্য্যা, ভক্তি, এই তিনের দ্বারা

দিনদিন আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ গৃহবাস তাঁহার বহুদিন ঘটিয়া উঠিল না; স্নাতক-অধ্যেতৃচিত কাল অতিক্রান্ত না হইতেই তাঁহার গার্হস্থ্য-মতি শিথিল হইয়া পড়িল। যিনি মূর্ত্তিমান বৈরাগ্য-ধর্ম্ম, ঘোর তামসগ্রস্ত ভারতের সুখ-বিভাকর, নাস্তিক-ত্রাস ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যোদ্ধারক শাস্ত্রের রক্ষক ও প্রচারক, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তক, নিখিল জগতের মঙ্গল, স্বজ্যোতি-প্রেমের অনন্ত মূর্ত্তি, শঙ্করূপে আবির্ভূত, শঙ্করাবতার, গৃহে নিবদ্ধ থাকা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব; তবে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা লীলা-বিলাসমাত্র।

জননীই শঙ্করের একমাত্র শরণ, শঙ্করও জননীর অনন্য-আশ্রয়; সুতরাং এতদিন উভয়েই পরস্পরের অবিরহ-কামনায় কালযাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের প্রবিজ্ চিত্ত আজ সে কামনা পরিত্যাগ করিল। ভারতের ঘোর অজ্ঞান, বেদ ও ব্রাহ্মণের দুর্গতি দর্শন করিয়া, তিনি আর গৃহে স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার মনোমধ্যে সংসারের অদৃষ্ট যাতনা অনুভূত হইল। শঙ্করের বন্ধুগণ, তাঁহাকে অত্যল্পকালেই কৃতবিদ্য ও সদ্‌গুণান্বিত দেখিয়া, গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, নির্দ্দোষ কুলে অনুরূপ কন্যার অন্বেষণ করিতেছেন; এদিকে, শঙ্কর, কোথায় কিরূপে সংসার-বিনাশের শাণিত অসি প্রাপ্ত হইবেন, মনে মনে তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছেন। উৎকট বাসনার আবেগে উপায়-সূত্র আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়, বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। শঙ্করের মন এখন এই ভাবিতেছেন,—"মম মানসিমস্তিতে সংস্থ-তির্ম্ম! আমার মন আর অনিত্য সংসার ইচ্ছা করে না!" নন্দিনী ইতিপূর্ব্বেই রাজা রাজশেখর দ্বারা সুপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছিল; এখন কেবল জননী সতীদেবীই সংসার-বন্ধনের দুশ্ছেদ্য সুদৃঢ় গ্রন্থি।

শঙ্করচরিত-লেখকগণ বলেন যে, এই সময়ে শিবাবতার শঙ্করের উক্ত শুভোদ্দেশ্য সফল করিবার অভিপ্রায়ে স্বর্গীয় সিদ্ধপুরুষগণ তাঁহার সহিত তৎকালে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। যে সকল সিদ্ধ-মহাত্মগণের সহিত শঙ্করদেবের তদানীং সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তন্মধ্যে শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ উপমন্যু, দধীচি, গৌতম ও অত্রি-মুনি ছিলেন। এই সকল মহাত্মগণ জনলোক হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহারা স্ব-মূর্ত্তিতে কি মূর্ত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা লিখিত হয় নাই। যাহা হউক,ভগবদবতারে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। যাঁহার মহিমায় সৃষ্টিস্থিতি বিনাশ সংসাধিত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন,তাঁহার পক্ষে কুত্রাপি কোন বিষয় অসম্ভব হইতে পারে না; তৎপক্ষে মনের মধ্যে দ্বৈধ-চিন্তাও পাপ। ঋষি সঙ্ঘের আবির্ভাবের পর, বিধান-বেত্তা শঙ্কর, জননীর সহিত যথাশাস্ত্র তাঁহাদের পবিত্র চরণে আন্তরিক ভক্তি-পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন; অনন্তর যথোচিত অভ্যর্থনা ও পূজাদি সমর্থ্যাকার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। কিয়ৎকালান্তরে বাল-ব্রহ্মচারী শঙ্করের সহিত মোক্ষ-নিষ্ঠ মুনিগণের মুক্তিবাদ-বিষয়ে আলাপ হইতে লাগিল। আলাপের অন্তে, শঙ্কর-জননী সতীদেবী, সেই সকল ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, মুনিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"দেবর্ষিগণ! আপনাদের আগমনে গৃহ পবিত্র হইল, আমরাও ধন্য হইয়াছি। মনস্ত দোষের আকর এই ঘোর কলিকালে আপনাদের চরণ-দর্শন লাভ করা সামান্য পুণ্য-পুঞ্জের ফল নহে। আমরা যখন তপস্যা ব্যতীত আপনাদের চরণরেণু লাভে সমর্থ হইয়াছি, তখন নিশ্চই আমাদের পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য সঞ্চিত আছে।" আপনারা তীর্থপাবন, তীর্থ সকল আপনাদের সমাগমে নির্ম্মল হইয়া থাকে। অতএব, আপনাদের দর্শন পাওয়া এ সংসারে অতি দুর্লভ; তাহাতে আবার স্বয়ং স্ব-মূর্ত্তিতে আবির্ভাব—ইহা আমাদের সাধারণ সৌভাগ্যের ফল নহে। হে প্রভুগণ! দুঃখিনীর হৃদয়ের ধন আমার শঙ্করকে আশীর্ব্বাদ করুন। আর, একান্ত বিনীতভাবে এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যদি আমার শুনিবার কোন বাধা না থাকে এবং শুনিতে অত্যন্তও অধিকার থাকে, তবে আপনারা সপ্রতি যে বালক শঙ্করকে কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করিতেছেন, সেই শঙ্করের পূর্ব্ব-হৃত্তান্ত কিরূপ, তাহা বর্ণনা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

শঙ্কর-জননীর উক্তবিধ বিনয়-প্রার্থনা শুনিয়া মহর্ষি অগস্ত্য উত্তর করিতে লাগিলেন,—"পতিব্রতে! তোমার স্বামী শিবগুরু পুত্রকামনায় ভগবান্ চন্দ্রমৌলির আরাধনা করিয়াছিলেন। তিনি আশুতোষ, তিনি সংরাধনে পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণবেশে দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন—'বৎস শিবগুরো! তুমি দীর্ঘায়ু মূর্খ শতপুত্র চাও, না সর্ব্বজ্ঞ স্বল্পায়ু একপুত্র অভিলাষ কর?' তোমার স্বামী তৎকালে বলিয়াছিলেন—'আমার সর্ব্বজ্ঞ একপুত্র হউক।' হে বর্ণাঙ্গিনি! সেই কারণে তোমার এই পুত্র স্বল্পায়ু ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। হে পতিদেবতে! ইহাঁকে তুমি জগদ্‌গুরু সদাশিব বলিয়া বিশ্বাস করিও। ইঁহার জন্য তোমার কোন ভাবনা করা কর্ত্তব্য নহে। ভারতোদ্ধারার্থ ইঁহার আবির্ভাব।"

'পুত্র অল্পায়ু' এইকথা শুনিবামাত্র, শঙ্কর-জননী সতীদেবী অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন; এবং ত্রস্ত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার এই পুত্র কতকাল জীবিত থাকিবে, তাহা আপনারা আমাকে দয়া করিয়া বলিয়া দিউন। 'পুত্র অল্পায়ু'

এই কথা শুনিবামাত্র, আমার নিরতিশয় ত্রাস জন্মিয়াছে।"

মুনি বলিলেন,—"যদ্যপি তোমার পুত্রের, আয়ু ষোড়শ বৎসর, তথাপি তোমার এই পুত্র কোন এক নিগূঢ় কারণে আরও ষোল বৎসর এই মর্ত্ত্যধামে বাস করিবেন। ব্রাহ্মণ ও বেদোদ্ধারও ইঁহার জীবনের ব্রত, পাষণ্ড-নিরসন কর্ত্তব্য কার্য্য।"

মুনিগণ এইরূপ সন্ত্রাসণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। অঙ্কুশাঘাতে আহতা করিণীর ন্যায়, প্রৌঢ়-গ্রীষ্ম-তাপ-শুষ্ক-তপ্ত পুষ্করিণীর ন্যায়, বাতাঘাতে বিকম্পিত কদলীর ন্যায়, পুত্রবৎসলা সতীদেবীও পুত্রের আয়ু-র্ব্বৃত্তান্ত শুনিয়া, তদ্রূপ দশাগ্রস্থা হইলেন। ক্রমে তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইল, মুখ ও হৃদয় শুষ্ক হইয়া আসিল, তিনি থরথর অঙ্গে কাঁপিতে লাগিলেন। মাতৃদেব শঙ্কর, তখন জননীকে শোকমুগ্ধা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"অজবোধিনী জননীর অজ্ঞানমূলক শোক শীঘ্রই অপনোদিত করা আবশ্যক।" অমনি তন্মুহূর্ত্তেই তিনি স্বীয় পবিত্র করপল্লব দ্বারা জননীর মুখমার্জ্জন-পূর্ব্বক প্রবুদ্ধ বাক্যসকল বলিতে লাগিলেন,—"মা! এত শোক কেন? শোকের কারণ কি? শান্ত হউন, শোক করিবেন না। আপনি ত অবিজ্ঞা নহেন; আপনি ত জানেন, জীবগণের সংসারা-বাস অতি ক্ষণভঙ্গুর। অতি অল্পসময়ের জন্যই জীব এই ভঙ্গ-রূপ অতিথি-ভবনে আসিয়া থাকে; আবার চলিয়া যায়। আমার আয়ু অল্প—এই শব্দমাত্র শুনিয়া, আপনার পরিবেদন করা উচিত-নহে। আপনি স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখুন —কাহার কলেবর স্থির? কাহারও নহে। বাত-বিকম্পিত পত্রাগ্র-সদৃশ চঞ্চল-স্বভাব এই কলে-বরকে স্থির বলিয়া বিশ্বাস করা কি মোহের পূর্ণ

প্রলোভন নহে? ভ্রান্তির প্রবঞ্চনা নহে? আপনি স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখুন—আপনি অকারণ ও নিষ্ফল শোক করিতেছেন কি না? আপনি পতিত হইয়াও যে ক্ষমতাসুন্দর দেহের উপর স্থির বুদ্ধি উৎপাদন করিতেছেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এরূপ কত শত বার জন্ম হইয়াছে; সেই সকল জন্মেও এইরূপ শত শত পুত্রপৌত্র জন্মিয়াছিল; কিন্তু, কেন তাহারা অনন্তকাল স্থায়ী হইল না—ইহা তাঁহারা কে কোথায় শোক করিয়াছে? স্মরণ হউক বা না হউক, ভাবিয়া দেখুন—এই আমার সংসারে আপনি কত শত বার কত শত পুত্র লালন-পালন করিয়াছেন, আমিও কত শত রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু সেই সকল পুত্র ও সেই সকল স্ত্রী কি আজও আছেন? থাকিলেও, তাহারা কোথায়? আমরাই বা কোথায়? অতএব, এই সমস্তই ইন্দ্রজালতুল্য ক্ষণিক বিভ্রম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ইহা ধ্রুব সত্যসিদ্ধান্ত। মা! আপনি নিশ্চিত জানিবেন, যে, সাংসারিক পুত্র-কলত্রাদি সংযোগ, পান্থ-সমাগমের তুল্য। পথিকগণ যেমন নানা দিগ্‌দেশ-বিভাগ হইতে সমাগত হইয়া ক্ষণকালের জন্য পান্থধামে সমবেত হয়, ক্ষণকাল পরেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যথাভিলষিত দিগ্‌দেশে গমন করে, কাহার সহিত কাহারও সম্পর্ক থাকে না, সাংসারিক সংযোগ-বিয়োগও তাদৃশ জানিবেন।"

শঙ্করের এতদ্রূপ অমৃতকল্প উপদেশে দুঃখিনী শঙ্কর-জননীর চিত্ত-বেদনা কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। সে দিবস ঐরূপেই অতিবাহিত হইল। পরদিন তিনি জননীর নিকট আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সতীদেবীর দৌর্মনস্য অপসারিত হওয়ার জন্য কালাতিপাত প্রতীক্ষা না করিয়া, ধীরে ধীরে জননীর সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"জননি! সাহারা অজ্ঞানঘোরে নিয়তই সংসার-পথে পরিভ্রমণ করে, তাহাদের অণুমাত্রও সুখ নাই। প্রত্যুত: ঐ পথে থাকিয়া, তাহারা অনন্তকাল অনন্ত নরক-যাতনা ও জন্মমৃত্যুজরাদির যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। সংসার অপার দুঃখসাগর। তৎপতিত জীবগণ দুঃখের ও দুর্গতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। অতএব, হে জননি! সংসার যখন ক্রমিক দুঃখভোগের স্থান, তখন আর ইহাতে মগ্ন থাকা প্রবুদ্ধ ব্যক্তির উচিত নয়। মা! সেইজন্যই আমি চতুর্থাশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া, সংসারবন্ধন-মোচনের জন্য যত্নবান হইবার ইচ্ছা করিয়াছি, ; প্রসন্না হইয়া আপনি অনুমতি প্রদান করুন।"

পূর্ব্বদিন শঙ্কর-জননী শঙ্করের স্বল্পায়ুর কথা শুনিয়াছেন, আজ আবার শুনিলেন—সন্ন্যাস! সতীর নির্ব্বাণোন্মুখ শোকাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। 'সন্ন্যাস' এই দুঃসহ শব্দ তাঁহাকে বজ্রাঘাত অপেক্ষা ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ভয় ও শোক দ্বিগুণতর বাড়িয়া উঠিল। অশ্রুজলে নয়ন ও শোকরুদ্ধ-বাষ্পে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল নিষ্পন্দ হইয়া রহিলেন; অনন্তর অবরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! তুমি যে চতুর্থাশ্রমের ইচ্ছা করিয়াছ, শমন সে ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। তোমার ঐ বুদ্ধি শীঘ্র নির্মূল হউক। আমার সকল আশা-ভরসা তুমি। তুমি বালক; সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কঠোরতা-সহন-ক্ষমতা তোমার হয় নাই, পরিণাম না ভাবিয়া কথা বলা উচিত নহে। সন্ন্যাসের সময়-উপস্থিত হইলে, সন্ন্যাসী হইও। সংসারে কি ধর্ম্ম হয় না? আমার অনুরোধ রক্ষা কর; প্রথমে তুমি গৃহস্থ হও, পুত্রলাভ কর, অনন্তর যথাসময়ে যতি হইও। বৎস! ইহাই সজ্জনদিগের চির-সেবিত পথ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহর্ষিগণ এইরূপ পথে থাকিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন; ইহা আমি আপ্তমুখে শ্রবণ করিয়াছি। বাছা! তোমার এই জননী চির-দুঃখিনী; বিশেষতঃ তুমিই আমার একমাত্র অশ্রয়। তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চিত আমি জীবিত থাকিব না। তোমার প্রয়ানের পর মৃত্যু হইলে, কে আমার ঔর্দ্ধদৈহিক-ক্রিয়া নিষ্পাদন করিবে, তাহা ভাবিয়া দেখ।" এইরূপ বলিতে বলিতে, শোকাবেগ প্রবল হইয়া উঠিল; যূথবিরহিত কুররীর ন্যায় তিনি রোদন আরম্ভ করিলেন। শোক-কাতরা সতীদেবী শঙ্কর-সকাশে এইরূপ বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। নিয়গার প্রবল রয় ফিরাইয়া দেওয়া কাহার সাধ্য? ঈপ্‌সিতার্থে স্থিরনিশ্চয় মন প্রতিনিবৃত্ত হয় না। শোক-নাশন শঙ্কর, অবিলম্বে-নাশক বচন-রচনা দ্বারা জননীকে বীতশোকা করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। সেদিন ঐরূপে অতিবাহিত হইল।

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রী।

সুধামুখী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে সুধামুখীর বিবাহ-সম্বন্ধ ধার্য্য হইয়া গেল। কাশীনাথ বাবু এবং তাঁহার সধর্ম্মিণী যে প্রকার পাত্রের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যক্রমে সেইপ্রকার পাত্রই জুটিয়াছে। পাত্রের যে প্রকার অল্পবয়স, তাহাতে তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্য—সুধামুখীর উপযুক্ত হইয়াছিল শলিয়া, ঘটক ঠাকুর বলিয়াছিলেন। পাত্রের পিতা একজন প্রসিদ্ধ জমিদার, সুতরাং বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী। লেখাপড়ায় নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-প্রাপ্ত! কুলে, শীলে, সর্ব্বাংশেই এই পাত্র আকলেরই মনোমত হইয়াছে। কাশীনাথ বাবু স্বয়ং সেই পাত্র দেখিয়া সম্বন্ধ পাকাপাকি করিয়া আসিয়াছেন।

সুধামুখী সমস্তই শুনিয়াছে। তাহার জীবনের একমাত্র সুখসূর্য্য যে অতি শীঘ্রই অস্তমিত হইতে চলিয়াছে, তাহা সে সমস্তই জানিতে পারিয়াছে। সুধামুখী বুদ্ধিমতী এবং স্বভাবতঃ ধীরা। সুতরাং সুধাক্ষরেও কেহ তাহার মনোগত ভাব জানিতে পারে নাই; পর্ব্বতগহ্বর-নিহিত অগ্নির ন্যায়, তাহার দুঃখাগ্নি হৃদয়-কন্দরেই নিহিত ছিল।

আর অবিনাশ? অবিনাশ পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল যে, তাহার মত দরিদ্রের কণ্ঠে, দেবরাজিত পারিজাত-মালা কখনই শোভা পাইতে পারে না। সে স্বভাবতঃ দরিদ্র-সন্তান এবং পরগৃহে পালিত; সুতরাং সুধামুখীকে পাইবার আশা যে তাহার পক্ষে আকাশ-কুসুমবৎ, তাহাও সে বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু হৃদয় তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারে নাই। বাল্যকাল হইতে যে অঙ্কুর তাহার হৃদয়-উদ্যানে বিধাতাকর্ত্তৃক সযত্নে রোপিত হইয়াছিল, তাহা এখন পল্লবান্বিত। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সেই বৃক্ষায়তন বর্দ্ধিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে সমস্ত উদ্যান ব্যাপ্ত করিল। অবিনাশ বহুকষ্টে মনকে বশীভূত

করিতেছিল; হৃদয়-দর্পণ মধ্যে যখন সুধামুখীর স্বর্গীয় মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয়, তখন অবিনাশ বহু কষ্ট করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে আপন মনে চিন্তা করে,—"সুধামুখী কে? কেনই বা তাহার জন্য আমার এত ভাবনা?" কিন্তু এই চিন্তা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। অত্যল্প কাল মধ্যেই আবার সেই মোহিনী-মূর্ত্তি ধীরে ধীরে মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে।

সুধামুখীর বিবাহসম্বন্ধ ধার্য্য হইবার পূর্ব্বে সময়ে সময়ে তাহার আশা হইত যে, হয় ত সে সুধামুখীকে আপনার বলিয়া পাইবে; কিন্তু যখন অন্যত্র সুধামুখীর উদ্বাহ-ক্রিয়া ধার্য্য হইয়াছে, তখন তাহার সেই আশা অনন্তে অন্তর্হিত হইল।

কোন প্রকারে, বি-এ, পরীক্ষা শেষ হইল। কলেজের অধ্যাপকগণের বড়ই আশা যে, অবিনাশ উৎকৃষ্টরূপে পরীক্ষায় পাশ হইতে পারিবে। কিন্তু পরীক্ষার অন্তর্দ্ধ পূর্ব্ব হইতেই তাহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া, অধ্যাপকগণ অত্যন্ত বিষাদিত হইলেন। কেহ কেহ অবিনাশের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অবিনাশ! কয়েক দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি যে, দিনদিন তোমার শরীর অতিশয় ক্ষীণ হইতেছে। পূর্ব্ববৎ স্ফূর্ত্তি একেবারেই নাই। ইহার কারণ কি? তোমার কি কোন প্রকার অসুখ হইয়াছে?"

অবিনাশ কোন উত্তর করিত না; অথবা, অনেক পীড়াপীড়ি করিলে, "মাথার অসুখ," "অনেকদিন যাবৎ বাবার চিঠি পাই নাই" ইত্যাদি বলিত। পরীক্ষার সময়, তাহার প্রশ্নোত্তর দেখিয়া, কলেজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক, অন্য অধ্যাপকের নিকট বলিয়াছিলেন,—"অবিনাশের প্রতি আমাদের অনেক আশা-ভরসা ছিল; কিন্তু যে প্রকার উত্তর করিয়াছে, তাহাতে কোনপ্রকারে পাশ হইলেই যথেষ্ট।" প্রকৃতপক্ষেও, অবিনাশ যে প্রকার পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাতে উত্তীর্ণ হইবার অল্পই আশা ছিল।

একদিন অপরাহ্নে কাশীনাথ বাবু একাকী তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময় অবিনাশকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিলেন। ধীরপাদবিক্ষেপে অবিনাশ তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইলে, কাশীনাথ বাবু সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

মৃদুস্বরে অবিনাশ বলিল,—"একটু নদীর তীরে বেড়াইতেছিলাম।"

কাশীনাথ বাবু বলিলেন,—"পরীক্ষা কেমন দিলে?"

অবিনাশ একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া উত্তর করিল,—"ভাল লিখিতে পারি নাই।"

কাশীনাথ বাবু বলিলেন,—"কেন?"

অবিনাশ বলিল,—"শরীরটা বড় ভাল নয়; মাথায় বড়ই অসুখ হইয়াছিল।"

উভয়েই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ। কিয়ৎকাল পরে কাশীনাথ বাবু বলিলেন,—"অবিনাশ! বিধাতার ইচ্ছায় তুমি এখন বড় হইয়াছ, এবং উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইয়াছ। তোমার পিতার যে প্রকার অবস্থা, তাহাও তোমার অবিদিত নাই। আমার ইচ্ছা যে, এখন তুমি, যাহাতে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, দশ টাকা আয় করিয়া, তোমার বৃদ্ধ পিতার দুঃখ দূর করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর। এ সম্বন্ধে তোমার কি মত?"

অবিনাশও তাই চায়। এখন যাহাতে সে সুধামুখীর নিকট হইতে স্থানান্তরিত হইতে পারে, ইহাই তাহার ঐকান্তিক অভিপ্রায়। সুতরাং বিশেষ কোন চিন্তা না করিয়া, ধীরে ধীরে বলিল,—"আমার আবার একটা মতের আবশ্যক কি? আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য।"

কাশীনাথ বাবু বলিলেন,—"হাঁ, আমি জীবিত থাকা-সত্ত্বে যদি তোমার কোন সুবিধা করিয়া না যাই, শেষে কি হয় বলা যায় না। কলিকাতার হরিশ বাবু আমার বড়ই বন্ধু; তাঁহার নিকট আমি এক পত্র দিতেছি। তথায়, তাঁহার ঘরে, তোমার শীঘ্রই ভাল চাকুরি হইবে। তোমার যখন ইচ্ছা, যাইতে পার।"

অবিনাশ আর মৌখিক কোন উত্তর করিল না, কেবল ঘার হেলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

কাশীনাথ বাবু ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া সায়ংকৃত্যাদি সমাপন করিবার জন্য কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অবিনাশ গণ্ডে হস্ত দিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। অনেকক্ষণ পরে মস্তকোত্তোলন-পূর্ব্বক দেখিতে পাইল, —কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে। ধীরে ধীরে সেইদিকে গমন করিয়া দেখিতে পাইল যে, সুধামুখী দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অবিনাশ ধীরে ধীরে সুধামুখীর নিকট গিয়া দাঁড়াইল। উভয়েই নিস্তব্ধ। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; বৈঠকখানা-গৃহের ফরাস-বিছানার উপর, অল্পোকাধারে উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বলিতেছিল। সেই প্রকোষ্ঠে জনপ্রাণী কেহ ছিল না।

সুধামুখী বলিল,—"অবিনাশ দাদা! আমি অনেকদিন হইতে তোমার নিকট কয়েকটী কথা বলিব বলিয়া ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু এতদিন তাহা বলিতে পারি নাই। এইমাত্র শুনিলাম যে, তুমি নাকি কলিকাতায় চাকরির চেষ্টায় যাইবে; তাই আজ বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি। তুমি শুনিবে কি?"

সুধামুখীর স্বর যেন কাঁপিতেছিল। অবিনাশও প্রথমে কোন উত্তর দিতে পারিল না। আজ সে তাহার প্রাণাধিকা সুধামুখীকে নির্দ্দয়ের মত ছাড়িয়া চলিয়াছে—এই কথা তাহার হৃদয়মধ্যে উদিত হইয়া, সন্তপ্ত ধক্-ধক্ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে বলিল,—"আর কি করিব? আমার পিতার অবস্থা ত সকলই তুমি জান! তোমাদেরই কৃপায় এখন আমি মানুষ হইয়াছি এবং তোমাদেরই অনুগ্রহে যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি। এখন যাহাতে দু'টাকা আনিয়া, তাঁহার অভাব মোচন করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিব।"

সুধামুখী বলিল,—"সে ত বেশ কথা। এখন যাহাতে তোমার পিতার দুঃখ দূর করিতে পার, তাহাই করা যুক্তিসঙ্গত। কবে যাইবে?"

অবিনাশ বলিল,—"তোমার পিতা যেদিন অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দেন, সেইদিনই যাইব।"

সুধামুখী বলিল,—"আবার কবে আসিবে?"

অবিনাশ বলিল—"পরের চাকরি করিতে গেলে স্বাধীনভাবে গমনাগমন করা যায় না। যখন ছুটী পাইব, তখনই আসিয়া তোমাদের দেখিয়া যাইব।"

উভয়েই নিস্তব্ধ; কেহ কোন কথা কহিতেছে না। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর, অবিনাশ আবার বলিল—"আমি চলিয়া গেলে, আমার জন্য কি তোমার কষ্ট হইবে?" র

স্রোতস্বতীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে, যে প্রকার দ্বিগুণ তেজের সহিত জলপ্রবাহ ধাবিত হয়, অবিনাশের ঐ একটী কথায়, সেই বাঁধটী ভাঙ্গিয়া গেল। বহুকষ্টে মনঃস্থির করিয়া, সুধামুখী আজ অবিনাশের নিকট কয়েকটী কথা বলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু অবিনাশের এই একটী বাক্যে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। নীরবে তাহার লোচনযুগল হইতে অবিরল-ধারায় অশ্রুপতন

হইতে লাগিল। কক্ষস্থিত দীপরশ্মি সেই অশ্রুজলের উপর পতিত হইয়া, যেন শতগুণে সেই অপূর্ব্ব মুখকান্তি বর্দ্ধিত করিতেছিল। অবিনাশও নীরব, তাহার চক্ষুও জলপ্লাত প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু কাহারও মুখে একটী বাক্য নাই; নীরবে মনীষনে উভয়েই পুড়িয়া ছাই হইতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে অবিনাশ বলিল—"সুধাময়ি! আমার এই প্রমোথাপনে যদি তোমার সরল প্রাণে ব্যথা পাইয়া থাক; আমাকে ক্ষমা করিও। এতকাল মধ্যে স্বপ্নেও মনোমধ্যে চিন্তা করি নাই, আমার জন্য তুমি কষ্ট পাইবে।"

অবিনাশের কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায়। ঈষৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সুধাময়ী বলিল,—"না, ওকথা স্মরণ করিয়াও আর কাজ নাই। আমি আজ তোমাকে অনেকগুলি কথা বলিব বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু এখন একটী কথাও মনে পড়িতেছে না। তুমি কি আজই যাইবে?"

অবিনাশ বলিল,—"আজ না গেলেও দু-তিনদিন মধ্যে নিশ্চয়ই যাইব। সুধাময়ি! কথাগুলি শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল।"

সুধাময়ী বলিল,—"আবার কবে আসিবে?"

অবিনাশ নিরুত্তর। সুধাময়ী আবার জিজ্ঞাসিল,—"কবে আসিবে?"

কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনে থাকিয়া, অবিনাশ বলিল,—"সুধাময়ি! আমার জ্ঞানস্বরূপে এই জীবনে তোমার নিকট কোন দিন কোন কথা গোপন করি নাই। আমি নিজেই তোমাদের স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আজ তোমার পিতৃদেব স্নেহবশে স্বয়ংই আমাকে অন্যত্র চাকুরির সুবিধা করিয়া দিবেন বলিয়াছেন। এখন, যত শীঘ্র হয়, স্থানান্তরিত হইব। আমি—"

আর বাক্য-স্ফুরণ হইলনা, আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইল।

সুধাময়ী, সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিল। ভীষণ যন্ত্রণায় তাহার অন্তস্তল দিবানিশি দগ্ধীভূত হইতেছিল, অবিনাশের হৃদয়ও তাহাতেই ততোধিক জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল। অবিনাশের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কোমলপ্রাণা সুধাময়ীর হৃদয়তন্ত্রী যেন ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল; রুদ্ধকণ্ঠে সুধাময়ী বলিল,—"অবিনাশ! তোমার—"

প্রবল আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

উভয়েই নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে সুধাময়ী আবার বলিল,—"অবিনাশ দাদা! তোমার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে। প্রতিজ্ঞা কর তাহা প্রদান করিবে! তাহাহইলে বলি।"

অবিনাশ বলিল,—"সুধাময়ি! এই নশ্বর পৃথিবীতে আমার এমন কোন বস্তু নাই, যাহা তোমাকে স্বচ্ছন্দচিত্তে অর্পণ করিতে না পারি। তোমার যাহা অভিরুচি হয়, সচ্ছন্দে বলিতে পার; আমি অবশ্যই তাহা তোমাকে প্রদান করিব।"

সুধাময়ী বলিল,—"তুমি অন্যত্র চলিয়া গেলে পর, আমার সঙ্গে তোমার আর কখনও সাক্ষাৎ না হওয়ারই সম্ভাবনা। তাই, তোমার নিকট আমার একটীমাত্র প্রার্থনা আছে। তুমি শুনিবে কি?"

অবিনাশ বলিল,—'আমি ত এইমাত্র বলিলাম যে, আমার জীবন পর্য্যন্ত পাত করিয়াও তোমার বাক্য পূরণ করিব। সুধাময়ি! তুমি কি আমাকে পরজ্ঞান কর?"

বলিতে বলিতে, তাহার চক্ষুর্দ্বয় আবার জলভারাক্রান্ত হইল।

সুধাময়ী বলিল,—"না অবিনাশ দাদা! আমি তোমাকে পর ভাবিব, এ অতি বিচিত্র কথা। তুমি অবশ্যই শুনিয়াছ যে, আগামী

ফাল্গুন-মাসে আমার বিবাহ হইবে। তোমার নিকট আমার কোন প্রার্থনা নাই; কেবল একটী ভিক্ষা, তুমি বিবাহের দিন আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে। এখন বল, আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিবে কি না?"

অবিনাশ অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সুধাময়ীর বিবাহের দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধের উদ্দেশ্য কি? কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনে থাকিয়া অবিনাশ বলিল,—"কেন সুধাময়ি! তোমার এ অনুরোধ কেন?"

সুধাময়ী বলিল,—"আমার বিশেষ আবশ্যক আছে। সেইদিন তুমি আসিলে, তাহা জানিতে পারিবে।"

অবিনাশ স্বীকৃত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে দুই তিন মাস গত হইল। অবিনাশ, কাশীনাথ বাবুর পত্র-সহ কলিকাতায় পৌঁছিয়া জনৈক বড়লোকের সাহায্যে, ব্যাঙ্কে একটী উৎকৃষ্ট কার্য্য পাইয়াছে। কলিকাতা-বাসের উপযুক্ত অর্থ রাখিয়া, অবিনাশ তাহার উপার্জ্জিত যাবতীয় অর্থ তাহার পিতৃসমীপে প্রেরণ করিত।

এদিকে সুধাময়ীর বিবাহের দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। কাশীনাথ বাবু, দেশের কালাবধিই বিদেশবাসী ছিলেন। মাতৃভূমির কৃপাদৃষ্টির পর হইতেই, তাঁহার ভদ্রাসনে বাসোপযোগী উৎকৃষ্ট ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করাইয়া, দীঘি-পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন; গ্রাম মধ্যে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তৃত করিবার জন্য, তথায় এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর মহা-সমারোহের সহিত তাঁহার বাড়ীতে সারদীয়া দুর্গোৎসব হইত; পূজার একপক্ষ পূর্ব্বে তিনি বাড়ী আসিতেন এবং শ্যামাঋজুর পরই আবার সপরিবারে আগ্রা-প্রস্থান করিতেন। পূজার সময় তাঁহার বাড়ীতে যেন সদাব্রত উপস্থিত হইত; বহু-সংখ্যক ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অতিথি, দরিদ্র ও স্বগ্রামীয় ভদ্র-সন্তানগণকে তিনি অতি পরিপাটির সহিত ভোজন করাইতেন; গ্রামস্থ অসম্পর্কীয় এবং নিঃসম্পর্কীয় অনেক লোককে বস্ত্রাদি প্রদান করিতেন। তাঁহার সরল এবং অমায়িক ব্যবহারে গ্রামস্থ সকলেই তাঁহার বাধ্যানুগত ছিল। কাশীনাথ বাবু, ভদ্রাসনে বসিয়া মহা-সমারোহের সহিত একমাত্র দুহিতার বিবাহ প্রদান করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন।

ধার্য্য তারিখের একমাস পূর্ব্বে, কাশীনাথ বাবু সপরিবারে বাড়ী আসিলেন। এদিকে বিবাহের দিনবতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই নানা আয়োজন চলিতে লাগিল। গৃহগুলি পরিষ্কার করা হইল; যেগুলির চুন-কাম খারাপ হইয়াছিল, সেইগুলি 'সুধবলিত' করা হইল। কলিকাতা হইতে প্রসিদ্ধ যাত্রার দল, বাই, খেমটা প্রভৃতি বায়না করা হইল; নানাপ্রকার আহার্য্য সামগ্রী এবং বিবিধ প্রকার ঝাড়-লণ্ঠন প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আনীত হইল। যাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, ক্রমে তাঁহাদের নিকট নিমন্ত্রণপত্র-সকল যথাসময়ে প্রেরিত হইল।

অবিনাশচন্দ্রও যথাসময়ে একখণ্ড নিমন্ত্রণপত্র পাইলেন। সেই পত্রের পার্শ্বে, কাশীনাথ বাবু স্বহস্তে, অবিনাশকে শুভকার্য্য-দর্শনে বিস্তর অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন। সেইদিন অবিনাশ আরও একখানি পত্র পাইয়াছিল। সে

পত্রখানি সুধামুখী সহস্র তাহার নিকট লিখিয়াছে। সুধামুখী লিখিয়াছিল;—

"অবিনাশ দাদা! অনেকদিন তোমার কোন পত্রাদি পাই নাই। অনেক দিনই বা বলি কেন, তুমি যেদিন হইতে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছ, তাহার পর আর তোমার কোন পত্রাদি পাই নাই। সেদিন তোমার নিকট আমি যে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তুমিও যাহা পালন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলে, সেইদিন নিকটবর্ত্তী। তোমার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া দিবার জন্য এই পত্র লিখিলাম।

শ্রীমতী সুধামুখী।"

অবিনাশ "সুধামুখীর হস্তাক্ষর চিনিত; কম্পিত-হস্তে পত্র খুলিয়া পাঠ করিল। তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত এবং স্বেদবারি বিগলিত হইল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে গতঘটনা তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। মনশ্চক্ষে যেন সুধামুখীর সেই লাবণ্য-মাখা হাসিমাখা সুন্দর মুখখানি দেখিতে লাগিল; সেই সুধামাখা কণ্ঠস্বর যেন তাহার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যাহাকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, যাহাকে ভবিষ্য জীবনের একমাত্র সুখদুঃখ-বিপদসম্পদের চির-সহচরী করিয়াছিল, তাহার জীবনের সেই অমূল্যরত্ন, আজ বলপূর্ব্বক অপহৃত হইতেছে! স্বচক্ষে জীবনের সুখতারা অস্তমিত হইতে, কে দেখিতে পারে? অবিনাশ বহুপূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, ইহজীবনে, সুধামুখীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না; যতদিন এই ধরাধামে জীবিত থাকিবে, ততদিন মনেমনে তাহারই মোহিনীমূর্ত্তি ধ্যান করিবে। আজ সুধামুখীর পত্র পাইয়া, তাহার অন্তঃকরণ দৌর্ব্বল্যমান হইতে লাগিল। একবার ভাবিতেছে—"এ জীবনে তো আর দেখা হইবে না, একবার শেষ-দেখা দেখিয়া লইব—প্রাণ ভরিয়া, সেই সুধামাখা কণ্ঠস্বর শুনিয়া লইব।" আবার ভাবিতেছে,—'আমি কোন্ প্রাণে, আমার সুধামুখীকে অন্য-কর-কবলিত হইতে দেখিব? প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার; তথাপি সহস্তে প্রাণের প্রাণকে বিসর্জ্জন দিতে পারিব না।" কিন্তু পরক্ষণেই সুধা-মুখীর সুন্দর মুখখানি তাহার মনে পড়ে। প্রবল বাত্যায় মেঘরাশি অপসারিত হইলে, চন্দ্রমার বিমল জ্যোতিতে যেমন প্রকৃতি প্রফুল্লময়ী হয়, সুধামুখীর স্মৃতিতে, অবিনাশের হৃদয় তদ্রূপ হইল। অনেক চিন্তার পর, সুধামুখীর অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য স্থির করিল।

অদ্য গোধূলি-লগ্নে সুধামুখীর উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে ও কুটুম্ব-কুটুম্বিনীতে কাশীনাথ বাবুর গৃহ পরিপূর্ণ হইল। তিনি আজকাল বড়ই ব্যতিব্যস্ত; সর্ব্বদা নানা কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, এবং আগন্তুক নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলীকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতেছেন। অন্দরেও খুব ঘটা; বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকায় গৃহ পূর্ণ হইয়াছে। বালক-বালিকার চীৎকারে, বৃদ্ধার কর্ত্তৃত্ববাক্যে, যুবতী-গণের অস্ফুট কথোপকথনে, গৃহ সর্ব্বদা শব্দায়-মান হইতেছে। কাশীনাথ বাবুর স্ত্রীও সকলকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতেছেন। নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, নিঃশেষ হই-তেছে, আবার প্রস্তুত হইতেছে। দাস-দাসীগণ অবিরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নিয়োজিত কার্য্য সমাধা করিতেছে, এবং অন্যের অন্যায়াচরণে যাহা-কিছু পাইতেছে তাহাই ম্লুখা-ইতেছে। গ্রামের মধ্যে কোন বাড়ীতে সেই দিন উনন জ্বলে নাই; স্ত্রীপুরুষ-বালকবালিকা সকলেই আজ বিবাহ-বাড়ীতে উপস্থিত। গ্রাম্য স্কুল,পাঠশালা,চতুষ্পাঠী বন্ধ হইয়াছে; ছেলেরা নানা বর্ণের পরিচ্ছদে ভূষিত ও দলবদ্ধ হইয়া বর দেখিতে ছুটিয়াছে। পাড়ার যুবকগণ কেহ কেহ একস্থানে সমবেত হইয়া, হাস্য-পরিহাস করিতেছে। কেহ বা উপস্থিত কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। নাটমন্দিরে এবং বৈঠক-খানায়, বৃহৎ 'ফরাস বিছানার' উপর বসিয়া, নানা শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকমণ্ডলী—কেহ বা ব্যাকরণ, কেহ বা সাহিত্য, কেহ বা ন্যায়, কেহ বা স্মৃতি প্রভৃতির কূট মিমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছেন; বিচার করিতে করিতে, কাহারও কাহারও বা কটিতটের আবদ্ধ বসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, অর্দ্ধবদ্ধ শিখা এলাইয়া পড়িয়াছে—তথাপি জ্ঞান নাই, স্নানাহার ভুলিয়া গিয়া সাধ্যানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছেন। বহুসংখ্যক দর্শক, সভাগৃহের চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচার শ্রবণ এবং বিবিধপ্রকার অঙ্গচালনা দর্শন করিতেছে। এদিকে মৎস্যমহলে বড়ই অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে; বহুসংখ্যক ধীবর, নানাপ্রকার জাল দ্বারা দীঘি-পুষ্করিণী তোলপাড় করিতে লাগিল; কাক, চিল, বাজ প্রভৃতিতে তীরভূমি পরিপূর্ণ হইল। ধীবরগণের অত্যাচারে ছোট, বড় মধ্যম কোন মৎস্যই নিষ্কৃতি পাইল না। পুকুরের জল কাদা হইয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি বিকলাঙ্গ হইয়া জলের উপরে সাঁতার দিতেছে; অমনি কাক, চিল, বাজসমূহ, অব্যর্থ ছোঁ মারিয়া, এক একটীকে উদরসাৎ করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের কোন কর্ম্মচারী, মৎস্য চুরি না যায়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতেছে; এবং সুবিধা পাইলে, কর্ত্তার অগোচরে, দুই-একটী মৎস্য বাড়ী পাঠাইতেছে।

এমন সময় সংবাদ আসিল যে, বর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অমনি, সকলে বর দেখিতে ছুটিল।

শ্রীরোহিণীকুমার রায় চৌধুরী।

কবিতা ও গান।

সুজনাষ্টক।

ত্রিদিবনিবাসী দেব ভূদেব সুজন।
সৌজন্যবিহীন জন্য দানব দুর্জ্জন॥ ১॥

সুজন বিজন বনে-কিম্বা জনপদে।
প্রশ্রমত সমচিত্ত সম্পদে বিপদে॥ ১৩॥

শান্তী যথা নিরবধি পাখীর আশ্রয়।
তেমতি সুজন দীনে অতি দয়াময়॥ ৬॥

ধৈর্য্যশীল নিরাবিল মতি যতি-প্রায়।
পরহিতব্রতরত পবিত্র আশয়॥ ২॥

"অমৃতপ্রাবিনী গীর বাণী হিতৈষিণী।
বাণী-বীণা-বিনিন্দিত শ্রুতি-বিনোদিনী॥ ৭॥

অবনত গুণভরে যথা ফল-ভরে।
বিরাজে পাদপরাজ জন-মনোহরে॥ ৩॥

পরিতোষে নির্ব্বিশেষে মিত্রামিত্রগণে।
সধন নির্ধন দুঃখী সুখী সর্ব্বজনে॥ ৮॥

ধনী মানী গুণী কিন্তু অভিমানী নয়।
প্রাণীমাত্রে মৈত্র চিত্র সদয় হৃদয়॥ ৪॥

শ্রীগোবিন্দমোহন রায়।

পিয়াস।

(২)

হৃদয়ের দারুণ পিয়াস!
কিছুতেই মিটেনা ত, সন্ধু পাই বাড়ে তত,
তত করে আরও উল্লাস,
তবু নাহি ছাড়ে পোড়া আশ।

(২)

সে কিরে এমনিতর হায়!
চাঁদিমার শোভা নিয়া, কুসুমের বাস দিয়া,
বিধাতা কি গড়িলেন তায়!
সে-যে রূপ ভুলা নাহি যায়!

(৩)

যেই দিন পেখনু তাহারে,
নয়ন নিচল হ'ল, আর না পলক প'ল,
না ফিরিনু পুনঃ আর ঘরে,
আকুল হইনু তার তরে।

(৪)

সঁপিয়া জীবন তার পায়,
কুলেতে দিয়াম কালী, সুখে দুখে জলাঞ্জলি,
তারি মাঝে হারা'নু আমায়,
তবু এ পিয়াস কেন হায়!

(৫)

তারি কথা ভাবি' অনুখন,
তারি সুখ-কামনায়, দিন যায় মাস-যায়,
তা'রি তরে জীবন-মরণ—
সেই নাম ধেয়ানের ধন।

(৬)

হৃদয়ের পিয়াস আমার—
এত ক'রে মিটিল না, সাধ মোর পুরিল না,
ঘুচিল না নয়ন-আসার,
সে রূপের না পাইনু পার!

(৭)

ভব-লীলা হ'লে সমাপন,
দেখিব অপর পারে, পাই কি না পাই তারে,
হয় কি না পিয়াস-বারণ,
তিরপিত হয় কি না মন!

শ্রীললিতমোহন সেন।

আক্ষেপ।

নয়ন রে! কিয়ে লাগি, অব তুঁহু ঝুর?
অবিরল রোয়ই, জনম গোঁয়ায়লি,
তবহুঁ না মনোরথ পুর?
পহিলহি নাম, শুনই যৈছে চাতকী,
রোয়লি দরশকি আশে,
শুনইতে মোহন, মুরলী-আলাপন,
তিতায়লি অঞ্চল বাসে।
যবহুঁ যতনে তুহু দরশন পাওয়লি,
ননদিনী বচন কঠোরা,
পিয়া-পরবাদ হুকুল ভরি ঘোষল,
ওমরি ওমরি শতধারা।
কবহুঁ মানভরে, কতহুঁ না রোয়লি,
জাগরি মধুময় রাতি,
মানভঙ্গ যদি, প্রেমভঙ্গ-ভয়ে,
তিতায়লি এ মঝু ছাতি।
অব কাঁহা প্রেম, শ্যাম-রস-সায়র,
কাঁহা সুখ সোয়াতি হামারী;
সব সুখ অস্ত, কান্ত পর-দেশিয়া,
বিফল তোঁহারি ঘনধারা।
রোই জনম ভরি, কিয়ে সুখ পায়লি,
তবহুঁ না হোত পেয়ান।
অভয়াকান্ত ভণ, শুনহু অগোয়ানী,
প্রেম কি এহি নিদান।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।

শিষ্য।—কাম, ক্রোধ প্রভৃতির কার্য্য আমাদের প্রকৃতিজাত। প্রকৃতিজাত, সুতরাং ধর্ম্মানুমোদিত। অতএব, ঐ সকলের দমন—কি প্রকৃতি ও নিয়ম বিরুদ্ধ নহে?*

গুরু।—ঈশ্বর যেমন ত্রিলোকের ঈশ্বর, মানব সেইরূপ এই পৃথিবীর ঈশ্বর। পৃথিবী,গ্রহ, নক্ষত্র,চন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি স্থূল জড় এবং উদ্ভিদ, জীব, জন্তু ও মানবসমষ্টি লইয়া ঈশ্বরের স্থূল-শরীর। অন্তরীক্ষে পূর্ব্বোক্ত ষড়শক্তি ও প্রকৃতির ত্রিগুণ-সংযুক্ত জাগতিক বুদ্ধি, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির উপাদানই তাঁহার সূক্ষ্ম-শরীর এবং পরব্রহ্মন (সত্যজ্ঞান) পরাশক্তি ও মূল প্রকৃতির সংযোগই তাঁহার কারণ-শরীর। সেইরূপ, মানবের পঞ্চভূতোৎপন্ন দেহ স্থূল-শরীর; প্রাণ, ইন্দ্রিয়-শক্তি ও প্রবৃত্তিময়-মনোবুদ্ধি সূক্ষ্ম-শরীর; এবং আবরণাচ্ছাদিত জ্ঞান ও প্রাকৃতিক শক্তির সংযোগ কারণ-শরীর। ঈশ্বর যেমন স্থূল-জগতে (জ্ঞানাভাসযুক্ত) স্থূল-জগন্ময়, সূক্ষ্ম-শরীরে (জ্ঞানাভাসযুক্ত) সর্ব্বশক্তিময়, কারণ-শরীরে সর্ব্বজ্ঞানময়; মানব সেইরূপ তাঁহার প্রতিকৃতিস্বরূপ এক স্থূল-জগতেই শরীরময়, প্রবৃত্তিময় ও বিবেকময়। কিন্তু ঈশ্বরের স্থূলশরীরের ক্রিয়ার সহিত স্থূল-জগতের সম্বন্ধ, কারণ-শরীরের সহিত কারণ-জগতের সম্বন্ধ; কিন্তু সাধারণ মানবের শরীর, প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির সহিত কেবল স্থূল-জগতের সম্বন্ধ। মানবের ভৌতিক দেহস্থিত পূর্ব্বোক্ত শারীরিক পোষণ-শক্তির সহিত অন্নাদি পঞ্চ-ভৌতিক জড়পদার্থের সম্বন্ধ; ভৌতিক মস্তিষ্ক-স্থিত মন ও বুদ্ধির সহিত স্থূল-জগতের বিষয়াভাবের সহিত সম্বন্ধ। উহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; একটী প্রবৃত্তির ও প্রবৃত্তি-সংমিশ্রিত যুক্তির কার্য্য, অন্যটী স্বাধীন বিবেক ও যুক্তির কার্য্য; কিন্তু উভয়েই স্থূল-জগতের সহিত সম্বন্ধ। মানবে স্বাধীন বিবেক ও যুক্তি-শক্তির পূর্ণবিকাশ হইলে, একপক্ষে মানবের যুক্তি, ভৌতিক সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত বাহ্য জগতের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়া বিপথগামী হয়; পক্ষান্তরে বিবেক, আত্ম-তত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত অন্তর্জ্জগতের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়া সত্যজ্ঞান লাভ করে। সত্যজ্ঞান লাভ হইলে, মানব সূক্ষ্ম-জগতে ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন-সর্ব্বশক্তিময় ও কারণ-জগতে সর্ব্বজ্ঞানময় হয়। যেমন স্থূল-জগতে মানবের বিবেকের বিকাশ-হেতু প্রবৃত্তি ও কার্য্য বিবেকের অধীন হয়, সেইরূপ, সূক্ষ্ম ও কারণ-জগতে যথাক্রমে সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বজ্ঞানের বিকাশ হইলে, প্রাকৃতিক তত্ত্ব এবং স্বয়ং প্রকৃতি, ঐশী পরাশক্তি এবং ঐশী পরমজ্ঞানের অধীন হয়। তখন মানব ইহলোকে থাকিয়াও সূক্ষ্ম ও কারণ-জগতের উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম হয়েন।

আসল কথা, মানবের অজ্ঞানাবরণ দূরীভূত

* বিভিন্ন পর্য্যায়ে, গুরুশিষ্যের কথোপকথনে, পুরাণের এইরূপ বহু প্রশ্নের আলোচনা হইয়াছে। ইহা তাঁহারই অনুগত। পুরাণপর মিলাইয়া পড়িলেই, সমূহ ভাব বোধগম্য হইবে। অথবা, ইহাকে স্বতন্ত্র প্রবন্ধও বলা যাইতে পারে।

হইয়া প্রবৃত্তি এবং কার্য্যে বিবেকের আয়ত্তাধীন হইলে, মানব-বুদ্ধি 'সত্যানুসন্ধানের নিমিত্ত অন্তরাভিমুখী হয়। অন্তরাভিমুখীর অর্থ এই যে, মানব, প্রবৃত্তি-চালিত বিক্ষিপ্ত মনকে সঙ্কুচিত করিয়া, সত্যজ্ঞানানুসন্ধানের নিমিত্ত চিন্তা ও বিবেকের সহিত বাহ্য বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, নিজের অন্তরের অন্তস্থলে প্রবিষ্ট হয়। ইহারই নাম ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। উহাও প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন নহে। যখন জড়-প্রকৃতি হইতে পাশব-প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ এবং পাশব-প্রকৃতি হইতে মানবপ্রকৃতি শ্রেষ্ঠ, তখন মানব-প্রকৃতি হইতে যে উচ্চতর দৈবী-প্রকৃতি নাই, কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ, মানব-প্রকৃতিতে যখন ক্রমোন্নতির নিয়ম আছে ও মানব-প্রকৃতি যখন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত উন্মুক্ত হয়—তদ্ভিন্ন সৃষ্ট-জগদাভ্যন্তরে—অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানমূলক শক্তি হইতে যখন মানবের জ্ঞানানুভূতি, বিবেক, যুক্তি ও চিন্তা প্রভৃতির বিকাশ হয়, এবং বিষয়-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে যখন ঐ জ্ঞান, বিবেক, যুক্তি ও চিন্তা প্রভৃতি জগতের মূলতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হয়, তখন মানবের জ্ঞান ও পাশবিক প্রভৃতি বাহ্যজগৎ হইতে অন্তর্ভূত হইয়া স্বস্থানে অর্থাৎ জ্ঞান ও শক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার বস্তু আপনি চিনিয়া লইতে পারিবে না বা আপনাকে আপনি চিনিয়া লইতে পারিবে না কেন? ইহার বিরুদ্ধে সন্তোষজনক হেতু কি কেহ দেখাইতে পারেন? গায়ের জোরে আমি মানি না বা বিশ্বাস করি না—ইহা স্বতন্ত্র কথা! বাহ্য-জগতে যদি মাধ্যাকর্ষণ বা কৈশিকাকর্ষণ মানব-বুদ্ধি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইতে পারে, তবে অন্তর্জগতের কৈশিকাকর্ষণ আবিষ্কৃত হয় কখন হয় নাই বা হইতে পারে না, ইহার ন্যায়-মূলক যুক্তি কি আছে? যদি মানবের আত্মধী ও বিবেকশক্তি সত্ত্বাই বা অনুশীলন দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইয়া প্রবৃত্তি-দমনপূর্ব্বক আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তবে ধী ও বিবেকের স্বাধীন কার্য্যকে তুমি প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন বলিবে কেন? মানবগণ, বিবেক ও যুক্তি হইতে স্বজাতি মানবের হিতাকাঙ্ক্ষায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যবহার-শাস্ত্র প্রণয়ন ও তাহাতে বিধিনিষেধ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন; ঐ বিধি-নিষেধ দ্বারা মানবের কুপ্রবৃত্তি দমন হয়। যদি বল—'যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে ঐ বিধি দ্বারা বলপূর্ব্বক বাধ্য করিয়া কুপ্রবৃত্তির দমনের চেষ্টা করা, প্রাকৃতিক নিয়মাধীন নহে—উহা প্রকৃতির বল প্রকাশ।" কিন্তু এ বিধি-নিষেধ কোথা হইতে আসিল? চুরি বা হত্যা করিয়া উদর-পোষণ করা দোষ, এ কথা কে বলিয়াছিল? এই বিধি-নিষেধ জ্ঞান কি মানবের বিবেক ও যুক্তিপ্রসূত নহে? ঐ বিবেক ও যুক্তি কি মানব-প্রকৃতি নহে—উহাকে কি প্রাকৃতিক বিকাশ বলিব না? যদি বল যে অনুশীলন ও শিক্ষা দ্বারা ঐ বিধি-নিষেধ স্থান উৎপন্ন হইয়াছে—উহাকে প্রাকৃতিক বিকাশ বলি কেন, তদুত্তরে আমি এই বলি যে, সর্ব্বপ্রথমে ঐ অনুশীলন ও শিক্ষার প্রবৃত্তি কে দিল? অবশ্যই মানবের প্রকৃতিতে ক্রমোন্নতির নিয়ম (Progressive Law) আছে। সেই প্রকৃতি হইতেই ন্যায়ান্যায় জ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ ন্যায়ান্যায় জ্ঞান, শিক্ষা ও অনুশীলনের উৎপত্তি। ঐ শিক্ষা ও অনুশীলন হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের ও ব্যবহার-শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তবে উহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন বলিব কেন? যদি ইহজগতের হিতাহিত ও ন্যায়ান্যায় জ্ঞান এবং তদ্ভেতু প্রবৃত্তি-দমন প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন না হয়, তবে তাহা হইতে আর এক স্তর উঠিয়া অতর্জ্জগতস্থ আত্মজ্ঞান বা আত্মানুসন্ধ

প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ হইবে কেন? ইহজগতে কুপ্রবৃত্তির দমন না হইলে যখন বিধি-নিষেধঘটিত নিয়ম প্রতিপালিত হয় না ও ঐ কুপ্রবৃত্তি দমন যখন প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন নয়, তখন প্রবৃত্তি ও তাহার জননী অপরা প্রকৃতিকে দমন-পূর্ব্বক আত্মানুসন্ধান, কখনই প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ নহে। যেহেতু, আত্মানুসন্ধানের স্বাধীন ইচ্ছা যখন মানবের জ্ঞান ও বিবেকমূলক প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং মনের স্বেচ্ছা-প্রবৃত্তি দমন ব্যতীত মনস্থিরপূর্ব্বক আত্মানুসন্ধান হইতে পারে না, তখন উহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন বলিব কেন? তোমার শেষ তর্ক এই যে—যদি সকলেই প্রবৃত্তি দমন করতঃ আত্মানুসন্ধান করে, তবে ঈশ্বরের সৃষ্টি লোপ হইবে। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। প্রকৃতি যেমন একদিকে মানবকে দৈবী প্রকৃতিতে পরিণত করে, তেমনই পাশব-প্রকৃতি মানব-প্রকৃতিতে, উদ্ভিদ্ পাশব-প্রকৃতিতে, জড় উদ্ভিদে পরিণত হয়। ইহাই সৃষ্টির ক্রম-নিয়ম (Evolution Theory) অনন্ত রাজ্যের অনন্ত ভাণ্ডারে অনন্ত উপাদান পরিপূর্ণ আছে। তাহা হইতে জগতের কার্য্য চলিতেছে ও চিরকাল চলিবে। একদিকে মানব যেমন মুক্ত হইবে, অন্যদিকে পশুজগৎ হইতে (অসুর-রাজ্যের নিয়মাবলী ক্রমে) মানবের তৎস্থান পরিপূর্ণ হইবে। অতএব, সৃষ্টিলোপের আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। অতএব, কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসাদি দমন প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ নহে, সাব্যস্ত হইল।

শিষ্য।—মহাশয়! স্বাভাবিক কাম-ক্রোধাদি প্রবৃত্তি দমন-পূর্ব্বক ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন নহে বলিয়া কতকগুলি যুক্তি দর্শাইলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ঠিক উহার বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। মনে করুন, এক-জন যোগী বারাণসী তীর্থে কোন গিরি-গুহায় জড়ের ন্যায় বসিয়া আছেন, অভ্যাস-বশতঃ আহার ত্যাগ করিয়াছেন এবং অনুশীলন দ্বারা দুই একটী অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতে পারেন; কিন্তু তদ্দ্বারা জগতের কি উপকার বা তাঁহার নিজেরই বা কি উপকার, বুঝিতে পারি না। ঐন্দ্রজালিকগণ নানাপ্রকার অলৌকিক ব্যাপার দেখাইয়া থাকেন; তাহা হইতে যোগীদিগের অলৌকিক ক্রিয়ার পার্থক্য কি?

গুরু।—পার্থক্য বিলক্ষণ আছে। ঐন্দ্রজালিকগণের ভৌতিক পদার্থের উপর আধিপত্য; আকর্ষণ-বিয়োজন, রাসায়নিক সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ ভৌতিক পদার্থের উপর কতকগুলি কৌশল লইয়া তাহাদের ইন্দ্রজালের সীমা। কিন্তু যোগীদিগের বাহ্যজগতের সহিত সংস্রব নাই; অন্তর্জগতের ষড়ৈশ্বর্য্য (অণিমা লঘিমা প্রভৃতি) লইয়া তাঁহাদের ইন্দ্রজাল। এ ষড়ৈশ্বর্য্য আন্তরিক জ্ঞানের অঙ্গ ঐ জ্ঞানৈশ্বর্য্য দ্বারা মানব এশী শক্তিসম্পন্ন হয়। অতএব, বাজিকর ও যোগীর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

যোগিগণ জড়ের ন্যায় সমাধিতে থাকেন বটে; তোমার স্থূলচক্ষে তাঁহার মহিমা তুমি বুঝিতে পারিবে না। খাদমিশ্রিত স্বর্ণ পোড়াইয়া খাদ বাহির করিয়া খাঁটি করিবার সময় স্বর্ণ বিবর্ণ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু খাদ বাহির হইয়া স্বর্ণ খাঁটি হইলে তাহার স্বরূপ উজ্জ্বলতা বাহির হয়। তুমি যে গিরিগুহাস্থিত বা তীর্থস্থ যোগীর কথা বলিলে, তাঁহারা অমিশ্র স্বর্ণ; এইজন্য তাঁহাদিগকে বিবর্ণ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা খাঁটি সোনা হইয়াছেন, সেই সকল মহাত্মাগণের দর্শন তুমি কোথা পাইবে? সেই সকল মহাত্মা বা মুক্তাত্মাগণ আবশ্যক মত এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানবিস্তার করিয়া থাকেন; এবং মানব-জগতের অন্তরে

থাকিয়াও, আবশ্যকমত কার্য্য করিয়া থাকেন। তবে প্রকৃতির বিপরীত কোন কার্য্য ঈশ্বর করেন না; মহাত্মাগণ করিবেন কেন? প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ক্রমোন্নতি হইবে; ইহার মধ্যেও উত্থান ও পতন আছে। ভূমিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে; পুনরুক্তি অনাবশ্যক। তোমরা অসার, কাষ্ঠ ও স্বর্ণের মর্ম্ম কি বুঝিবে? স্বর্ণকেই অগ্নিতে পোড়াইয়া খাদ বাহির করিয়া খাঁটি করা যায়; কাষ্ঠ অগ্নিতে দিলে ভস্মসাৎ হয়। স্বর্ণরূপ যোগিগণই যোগাগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারেন এবং খাঁটি স্বর্ণ হইতে পারেন। তদ্ভিন্ন অসার কাষ্ঠ কখনও অনুভব করিতে পারে না। অতএব, তোমরা যোগীদিগের মাহাত্ম্য কি করিয়া বুঝিবে? স্বর্ণ হইবার চেষ্টা কর; তখন স্বর্ণের খাদ কিরূপে বাহির হইয়া স্বর্ণ খাঁটি হয়, বুঝিতে পারিবে। বাক্য দ্বারা ইহার অধিক বুঝান যায় না। তবে একটী সরল কথা তোমাকে বলি; বাহ্যজগতের সহিত মনের যত দিন সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন বিবেক ও যুক্তির সহিত অন্যায় মনোবৃত্তি ও শারীরিক বৃত্তির সামঞ্জস্যভাবে অনুশীলন ও কার্য্য করা আবশ্যক। কিন্তু মন বাহ্যজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হইলে, তোমার প্রমোদ্রিখিত-মত জ্ঞানার্জ্জন বা ধনার্জ্জন বা শরীর-পোষণের নিমিত্ত কোন প্রবৃত্তির আবশ্যক নাই

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন।

অনঙ্গ।—পঞ্চু, এ সব তোর কীর্ত্তি। তুই বোধ হয় জেনে-শুনে আমোদ দেখ্‌বার জন্যে এ সব করেছিস্।

পঞ্চু।—দোহাই মহারাজের, আমি সত্য সত্যই ভুলেছিলাম। আপনি এক যুবক ও এক যুবতীর কথা বলেছিলেন; আমিও এক যুবতী ও এক যুবক পেয়েছিলাম, আর যেমন আদেশ ছিল, তাহাই প্রতিপালন করিয়াছিলাম। কিন্তু মহারাজ ভুল করে অন্যায় করি নাই; এদের ঝগড়াতে দু'শ' মজা!

অনঙ্গ।—গিয়েছে যুবকদ্বয়, প্রণয়ে পাগল,
অন্বেষিতে এই বনে সংগ্রামের স্থল।
যাও পঞ্চু, নিশিথিনী কর তমোময়;
লুকাইয়া গগনের আলোকনিচয়,
আচ্ছাদিয়া কুয়াসার ঘন আবরণে,
প্রতিকূল পথে ল'বে যুবক দু'জনে।
বিনোদের মত স্বর করিয়া তোমার,
করিবে বিপিনে তুমি শত তিরস্কার।
সেইরূপ বিপিনের স্বর অনুকারি,
দুজনে দুদিকে ল'বে এরূপে প্রতারি।
শমনের প্রতিবিম্ব নিদ্রায় যখন
শুরু করে বিনোদের মুদিবে নয়ন,
এই লতিকার রস নয়নে তাহার
দিলে ঢেলে; এই ভ্রম ঘুচিবে যুবার।
নিদ্রান্তে ভাবিবে যুবা সকলি স্বপন,
সুখে বৈজয়ন্তি-গৃহে ফিরিবে তখন।

আমি যাই, রাণী হ'তে লয়ে সে কুমার,
মোহ-স্বপ্ন হতে তারে করিতে উদ্ধার।

পঞ্চু।—যান প্রভু, বিলম্বের নাহি অবসর।
রজনী-রথের অশ্ব, লজিয়া অম্বর,
চলিছে নক্ষত্র বেগে; উষার কিরণ
ছাইছে পুরবাকাশ। অপদেবগণ
ছুটিয়াছে পালেপালে শ্মশানে-গহ্বরে
লুকাইতে পাপ দেহ সভয় অন্তরে।

অনঙ্গ।—কিন্তু পঞ্চু, আমাদের রূপ অন্যতর।
আমরা প্রভাতে কেলি করি মনোহর।
আমরা বেড়াই বনে প্রফুল্লিত মন;
যদবধি পূর্ব্বাকাশ, করি উন্মোচন
তিমির কপাট, বর্ষে আরক্ত অনল
অনন্ত সমুদ্রগর্ভে, কিরণ বিমল,
নীল লবনাম্বু করি হুবর্ণে মণ্ডিত।
যা হক, বিলম্ব আর না হয় উচিত।

(প্রস্থান।)

পঞ্চু।—
আকাশে উড়িয়ে,
নাহক দড়ি দিয়ে,
ঘুরাব বনে;
নগরে প্রান্তরে,
পঞ্চানন স্বরে,
বিচল মনে।
কে না ছুটে যায়, বিচল মনে!
এই যে একটী সম্মুখে উপস্থিত।

(বিনোদের প্রবেশ।)

বিনোদ।—কৈ, দাম্ভিক বিপিন কোথায়? এখন উত্তর করিস না কেন?

পঞ্চু।—এখানে, ধূর্ত্ত! তুরবারি হস্তে আমি প্রস্তুত; তুই এখন কোথায়?

বিনোদ।—এই তোর যম আসছে।

পঞ্চু।—আয়! চল সমান যায়গায় চল।

(স্বর অনুসরণ করিয়া বিনোদের প্রস্থান।)

(বিপিনের প্রবেশ।)

বিপিন। বিনোদ! চুপ—করেছিস্। রে ভীরু!
রে পলাতক! কোথায় কোন্ জঙ্গলে
লুকিয়েছিস, বল্!

পঞ্চু।—কাপুরুষ! দম্ভ তোর নক্ষত্রের কাছে।
বড় যুদ্ধসাধ আছে?
আয় ভীরু, আয় দেখি, আয় নরাধম,
কশাঘাতে পৃষ্ঠে রক্ত করিব নির্গম।
তোর জন্যে তরবারি যে করে ধারণ,
রমণী-অধম সেই।

বিপিন।—দাঁড়া সেইখানে।

পঞ্চু।—বুঝিব বীরত্ব তোর, চল অন্যস্থানে।

(প্রস্থান।)

(বিনোদের প্রবেশ।)

বিনোদ।—পলায় সমুখে, আর করে আবাহন,
আমি অগ্রসর হলে করে পলায়ন।
নিকৃষ্ট আমার চেয়ে বেশী দ্রুতগামী;
ছুটিয়াছি আমি, তত নহি দ্রুত আমি।
সব অন্ধকার, পথ না দেখে নয়ন;
শুইব এখানে, দিবা আসুক এখন।
যদি পাই তারে, দিবা! তোমার কৃপায়,
সমুচিত শিক্ষা আমি শিখাব উহায়।

(নিদ্রা।)

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

সমালোচনা।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গ্রন্থাবলী।—ভূতপূর্ব্ব 'আর্য্যদর্শন'-পত্রের সম্পাদক, বাঙ্গালা-সাহিত্যের গৌরবস্থল, সুপ্রসিদ্ধ প্রতিভাশালী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম-এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মহাশয়ের একপ্রস্থ গ্রন্থ, আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তান্ত, ম্যাট্‌সিনীর জীবনবৃত্তান্ত, গারিবল্ডীর জীবনবৃত্তান্ত, ওয়ালেসের জীবনবৃত্তান্ত, হৃদয়োচ্ছ্বাস, আত্মোৎসর্গ, প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা, চিন্তাতরঙ্গিণী, শান্তিপ্রসঙ্গ, প্রাণোচ্ছ্বাস, সমালোচনমালা প্রভৃতি—তাঁহার রচিত পুস্তকাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উপাদেয় সামগ্রী। এই সকল পুস্তকের সমালোচনা—এই অল্প স্থান ও সময়ে সম্ভবপর নহে। সুতরাং অদ্য তাঁহার গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্বীকার মাত্র করিতেছি। ক্রমশঃ তৎসম্বন্ধের মতামত সম্যক্ ও সূক্ষ্মরূপে আলোচিত হইবে। তবে এক্ষণে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, পুস্তকগুলি—সর্ব্বাংশে সাহিত্যের, দেশের ও জাতির মঙ্গল-বিধায়ক। ঐ শ্রেণীর গ্রন্থপাঠে মানবচরিত্র গঠিত হয়, হৃদয় ও মনের অসারতা দূরীভূত হয়, প্রাণ—সত্য ও সরলতার দিকে ধাবিত হইতে পারে। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচনার এইটিই প্রধান গুণ—উহা কপটতা-বর্জ্জিত—সরল সত্য উহাতে সুন্দররূপে বিবৃত। দেখিয়া বুঝা যায়, তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয় বিভিন্নতা খুব কম—'পেটে একভাব ও মুখে অন্যভাব' তাঁহার রচনায় অতি অল্পই দেখা যায়। সুতরাং কপটতা-পূর্ণ সংসারে তাঁহার গ্রন্থের অন্যাধিক প্রসার না হইলেও, অকপট-উদার সকলেই তাঁহার রচনার সমাদর করিয়া থাকেন। ফলতঃ এরূপভাবে স্পষ্ট কথা—সত্য কথা বলিতে, আমরা অতি অল্প লেখককেই দেখিয়া থাকি। সুতরাং উদার ও অকপট বলিয়া, তিনি আমাদের নিকট অধিক আদরণীয়—তাঁহার ভাবে ও রচনায় আমরা অধিক আনন্দিত। এক্ষণে, এই সকল পুস্তকের সম্যক প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

চিকিৎসা-পরিচয়।—দ্বিতীয় সংস্করণ।—ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিদাস চক্রবর্ত্তি-প্রণীত। শ্রীরামপুরে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য।—এই গ্রন্থকে হোমওপ্যাথিক মতে বিবিধ রোগের বিবরণ ও চিকিৎসার বিষয় বিবৃত আছে। মধ্যে মধ্যে 'টোট্‌কাটুক্‌কি' দুই চারিটি মুষ্টিযোগেরও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা এ সংস্করণের বহুল উন্নতি দেখা গেল। পুস্তকখানি গৃহস্থ মাত্রেরই উপযোগী, অথচ শিক্ষার্থী ডাক্তারগণও ইহাতে বিশেষ উপকার পাইবেন। পুস্তকের ভাষা বেশ সরল ও প্রাঞ্জল—সাধারণ ডাক্তারী পুস্তকের ন্যায় দুর্ব্বোধ নহে—এমন কি, স্ত্রীলোকেরাও ওই পুস্তকের সাহায্যে সামান্য সামান্য ব্যাধির চিকিৎসা করিতে পারিবেন। পুস্তকের মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

রঙ্গভূমি-সম্বন্ধে।

এমারেল্ড থিয়েটার।—বহুল পরিবর্ত্তন-পরিশোধনের পর, 'এমারেল্ড থিয়েটার' এবার কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তৌফি এবার স্বয়ং উক্ত রঙ্গভূমি-পরিচালনার ভার লইয়াছেন। দেখিয়া সুখী হইলাম, এবার যেন এমারেল্ডের সম্পূর্ণ সংস্কার হইয়াছে। গত বুধবার আমরা এই রঙ্গালয়ে 'রাজা বসন্ত রায়' নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বুধবারের অভিনয়, প্রধানতঃ কোন রঙ্গালয়েই ততদূর সন্তোষপ্রদ হয় না। কিন্তু আমরা দেখিয়া আশাতীত আনন্দিত হইলাম যে, সেই বহুবারদেখা পুরাতন পুস্তকের অভিনয়—এই বুধবারের অভিনয়ের দিনেও—আমাদের নিকট অভিনব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অভিনয়ে আরও একটী অভিনব বিষয় দেখিলাম। মুস্তৌফি মহাশয়কে আমরা এতদিন হাস্যরসের অবতার বলিয়াই জানিতাম; কিন্তু, সেদিন, প্রতাপাদিত্যের ঘুংখাড়িনয়ে তাঁহার বীর-রৌদ্র রসের চূড়ান্ত অভিনয় দেখিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বরসের অবতার বলিয়া ধারণা হইল। তদ্ভিন্ন, রাজা বসন্ত রায়—অতুলনীয়; 'উদয়াদিত্য, মোহন প্রভৃতিও প্রশংসনীয়। ফলতঃ, কিরূপভাবে সম্প্রদায় গঠিত করা আবশ্যক, দেখিয়া বুঝা গেল, মুস্তৌফি মহাশয় এক্ষেত্রে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। এই রঙ্গালয়ে 'মান' নামক একখানি সুন্দর গীতিনাট্যের অভিনয় হইতেছে; বারান্তরে আমরা তাহার সম্যক্ আলোচনা করিব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চীন-জাপানের যুদ্ধ।

অমানুষিকী হত্যা।—পোর্ট আর্থার জয়ের পর, নিরস্ত্র জাপানীরা, বন্দী চীন-সৈন্যদিগের প্রতি কিরূপ ভীষণ অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছে, সংপ্রতি 'টাইমস্'-পত্রে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠে জানা যায়, নিরস্ত্র অসংখ্য চীন-সেনাকে ৪ দিন ধরিয়া তাহারা হত্যা করিয়াছিল। এক-একগাছি শৃঙ্খলে অনেকগুলি চীন-সৈন্যকে একত্রে আবদ্ধ করিয়া, তন্মধ্যের কাহাকেও বা তরবারির আঘাতে, কাহাকেও বা গুলি করিয়া মারিয়াছে, কাহাকেও বা সঙ্গীনের অগ্রভাগ দিয়া খোঁচাইয়া মারা হইয়াছে। উক্ত পত্রিকার সংবাদদাতা বলেন, সত্য বটে চীনগণ যুদ্ধে জাপানীদের ক্রোধবৃদ্ধির অনেক কার্য্য করিয়াছিল; কিন্তু এমন পাশব-হত্যা একটী জাতির কলঙ্কের কথা, সন্দেহ নাই—আর জাপানের এ কলঙ্ক কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। কি ভয়ানক হৃদয়-বিদারক নৃশংস অত্যাচার? চীনে চারি শত কোটী মানবের বাস, আর ক্ষুদ্র জাপানে মাত্র চারি কোটীর ঊর্দ্ধ লোকের বাস নহে! কিন্তু চীন,

এখনও এই অত্যাচার 'সহিতেছে।' অহিফেন-বিষ-জর্জ্জরিত চীন!—বিষ-গুণে তুমি এতই অসার হইয়াছ?

জাপানের আরও আকাঙ্ক্ষা, পিকিন অধিকার না-করিয়া,তাহারা সন্ধিতে সম্মত হইবে না। এবং এখনও জর্ম্মাণী হইতে যুদ্ধবিশারদ সুদক্ষ সৈন্যদিগকে আনিয়া, তাহাদের নিকট যুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা করিতেছে।

কাপড়ের উপর কর।

বিলাতে আপত্তি।—এই নূতন করের জন্য বস্ত্র-বয়নের ভিত্তিভূমি মাঞ্চেষ্টারে বড়ই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সেখানকার বণিক-সম্প্রদায় এবং বহুল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত হইয়া সম্প্রতি 'হাউস্ অব্ কমন্সে' এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সে আবেদনে পার্লিয়ামেণ্টের সাত জন সভ্যেরও যোগ আছে। তাঁহাদের আবেদনের মর্ম্ম—বস্ত্র শুল্ক স্থাপন করিলে ব্যবসায়ের বড়ই ক্ষতি হইবে, এবং ভারত-গভর্ণমেণ্টের ব্যয় সংক্ষালনের জন্য মাঞ্চেষ্টারের বাণিজ্যে বাধা দেওয়া অযৌক্তিক।

ওম্দুর্মান-যুদ্ধ।

যুদ্ধ-ব্যাপার সেই একরূপই। মধ্যে অলক্ষিত গোলায় কর্ণেল লর্কাট হত হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে দস্যুর ন্যায় তাহারা লুণ্ঠন করিতেছে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে বরফ-পাতের জন্য ইংরাজ-পক্ষে বড়ই অসুবিধা হইয়াছে।

বিবিধ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো।—শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবৎসর নূতন 'ফেলো' মনোনীত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, এম-এ, মহাশয় নির্ব্বাচিত না হওয়ায়, অনেকেই আন্তরিক দুঃখিত। শাস্ত্রী মহাশয় রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যশালী ব্যক্তি, তাঁহার মত ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ব্বাচিত হওয়া সমূহ বাঞ্ছনীয়।

কংগ্রেসে দান-জন্য রাজার অসম্মান।—রামনাদের রাজা কংগ্রেসে দশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া, সহযোগী হিতবাদী বলেন, মাদ্রাজ-গভর্ণমেণ্ট নাকি তাঁহাকে সম্মানিত করিবার প্রথা বন্ধ করিবেন। পূর্ব্বে রাজা বাহাদুর মাদ্রাজে পদার্পণ করিলে গভর্ণমেণ্টের লোক জন ও গাড়ি-ঘোড়া গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিত; এখন হইতে নাকি তাহা আর হইবে না।

খুনী আসামীর অনুপস্থিতি।—এলাবাদের হাইকোর্টে সম্প্রতি এক বড়ই রহস্যজনক মকর্দ্দমার আপিল হইয়া গিয়াছে। বান্দার সেসন-জজ একজন আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন; অথচ, আসামী সে সময় আত্মরক্ষার জন্য আদালতে উপস্থিত ছিল না। উচ্চ-আদালত এজন্য জজের প্রতি অনুযোগ করিয়াছেন।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান

অষ্টম বর্ষ। ৪ঠা মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। ৩৬শ সংখ্যা।

শঙ্কর-চরিত।

উৎপল দিন—যেদিন শঙ্করের অষ্টমবর্ষ বয়স উত্তীর্ণ হইল, সেদিন—তাঁহাকে তীব্রতর বিশুদ্ধ বৈরাগ্য আসিয়া আক্রমণ করিল। তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন,—এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? ঋণকালের জন্যও আমার চিত্ত আর সংসার-কামনা করিতেছে না। জননীরও আমাকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইতেছে না। পরন্তু এই গুরুতর বিষয়টী বুঝাইয়া দিতেও অক্ষম হইতেছি। অবজ্ঞা করিতেও পারি না; কেন না, মাতা মহাগুরু। বিশেষতঃ, ইনি স্নেহপ্রবণা, এ বিষয়ে ইহাঁরও তত উচ্চ-দর্শন নাই। সন্ন্যাসাবলম্বন করিতে হইলে অবশ্যই ইহাঁর যৎকিঞ্চিৎ অনুশাসন অর্থাৎ ঈষৎ অনুমতির অপেক্ষা করিব; কিন্তু কোন এক বিশেষ ঘটনা ব্যতীত ইনি যে আমার অভিপ্রেত কার্য্যে অনুমতি প্রদান করিবেন, এরূপ বিবেচনা হইতেছে না।"

নির্ম্মল বৈরাগ্যবান শঙ্কর-দেব এবম্বিধ চিন্তা করিয়া, অবশেষে একদিন একাকী তরঙ্গিণী-সলিলে অবতীর্ণ হইলেন। চরিতাখ্যায়কগণ লিখিয়া গিয়াছেন এবং সন্ন্যাসিগণও বলিয়া থাকেন,—আচার্য্য শঙ্করস্বামী জননীর নিকট সন্ন্যাসানুমতি লইবার জন্য এইস্থানে এক আশ্চর্য্য মায়া বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি পুণ্যা-স্রোতস্বিনী-সলিলে অবতরণ করিবামাত্র, এক প্রকাণ্ড কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিল; তিনি গ্রাহগ্রাসে সামান্য মানবের ন্যায় প্রাণভয়ে প্রায়-বিসংজ্ঞ ও কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে জননীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন,—'মা! শীঘ্র এস; এক বলবান কুম্ভীর আমার পদদ্বয় ধারণ করিয়া ক্রমেই গভীর জলের দিকে টানিয়া লইতেছে। মা! আমি ইহার গ্রাস হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আপনার সাহায্য ব্যতীত কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। আপনি অবিলম্বে আসুন।" শঙ্করন্যস্তমানসা, তপস্বিনী শঙ্কর-জননী গৃহ হইতে একমাত্র পুত্রের রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। প্রাণ যেন উড়িয়া গেল;

দিগ্বিদিক্-বোধ তিরোহিত হইল; ব্যাকুলিত হইয়া নদী-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তীরে পিয়া দেখিলেন, শঙ্কর গ্রাহগ্রস্ত ও প্রায় জলমগ্ন। তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীয় প্রাণের উপর লক্ষ্য না রাখিয়া যে কপালে করাঘাত করিতে করিতে দ্রুতবেগে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ত্রস্ততা-প্রমাদবশতঃ তীর-প্রান্তে পতিত হইলেন। শরীরের বল চলিয়া গেল। উত্থান-ক্ষমতা বিলুপ্ত। তথাপি বহুবা চেষ্টা পাইয়া হতাশ হইলেন। জলবেগী পদদ্বয় চুম্বন করিতে লাগিল; সতীদেবী দশদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন; তখন আর কোন উপায় নাই দেখিয়া বাষ্পাবরুদ্ধ-কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন—পাগলিনীর ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। আত্মপ্রাণবিনিময়ে শঙ্করের উদ্ধার হইলে, আহ্লাদের সহিত তাহাতেই প্রস্তুত। ভারত-মাতার স্নেহ এইরূপই চলিয়া আসিতেছে। সতী দেবী উপায়-বিমূঢ়ে বলিতে লাগিলেন,—"হায়! আমার কি হইল! বিধাতা কি আমার কপালে ইহাই লিখিয়াছিলেন যে, আমার মরণের পূর্ব্বে আমার একমাত্র গতি পতির মৃত্যু হইবে—পরে আবার আমার সমক্ষেই আমার প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণ বিনাশ হইবে? হায় হায়! এ কি হইল? এখন আমি কি করি? হা মাতাদেব! আমি আপনার আরাধনায় পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু হতভাগিনী আজ তাহা ভাগ্য-দোষে হারাইল। বিশ্বনাথ! তুমিই ব্রাহ্মণের পরম দেবতা; শিশু ব্রাহ্মণকে এই ঘোরতম বিপদ-পাত হইতে উদ্ধার কর।" সতীদেবী এইরূপ কাতরোক্তি উচ্চারণ করিয়া নদীপুলিনে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন; জলময় শঙ্করও জলে থাকিয়া রোরুদ্যমান হইলেন। সতীর তাদৃশী দশা সন্দর্শনে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রও তরল হয়, এমন কি নদীপ্রবাহও যেন ক্ষণ-কালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। মাতৃবৎসল জননীর তাদৃশ ক্লেশকর অবস্থা দেখিয়া, বহুকষ্টে জলমধ্য হইতে বলিতে লাগিলেন,—"মা! এখন আর অন্য উপায় নাই; তবে এক উপায় আছে।" এই বাক্য শ্রবণমাত্র, সতীর ওষ্ঠাগত প্রাণ প্রশ্বাস হইতে লাগিল; তিনি শঙ্করের প্রতি নির্নিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। শঙ্কর বলিতে লাগিলেন,—"কে যেন আমায় বলিয়া দিতেছেন—'তোমার জননী যদি তোমাকে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হইতে অনুমতি প্রদান করেন এবং তুমি যদি মাতৃনিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এই মুহূর্ত্তেই বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ-পুরঃসর পরিব্রাজক হইতে পার, তাহা হইলে তোমার জীবন রক্ষা হইবে, কুম্ভীর তোমাকে ছাড়িয়া দিবে— কদ্দিন কালেও আর গ্রাস করিবে না'।—অতএব জননি! যদি আমার জীবন রক্ষা করা আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে আমাকে সন্ন্যাস-গ্রহণে অনুমতি করুন; আমিও আপনার অনুজ্ঞাক্রমে এই মুহূর্ত্তেই চতুর্থাশ্রম গ্রহণের সঙ্কল্প করি।"

এস্থলে গৃহ-সুখাতুরক ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্করকে নিষ্ঠুর বলিতে প্রস্তুত পান; কিন্তু সন্ন্যাসীরা বলেন—অন্যরূপ। হেই ক্ষুদ্রা সরিতে কদাপি কুম্ভীর দৃষ্ট হয় নাই। ঐ কুম্ভীর প্রকৃত কুম্ভীর নহে—মায়া-কুম্ভীর। ইহা একটা রূপকে অলঙ্কৃত। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপঃ—সংসার সমুদ্র, গৃহাদি তাহার নদী; সংসার-বিকার বা কল্পিত সুখ ও ইন্দ্রিয়-প্রলোভন প্রভৃতি কুম্ভীর; সংসার পরিত্যাগ ব্যতীত আর কোন উপায়ে এ কুম্ভীরের হস্তে পরিত্রাণ নাই—শঙ্কর স্বীয় জননীকে ইহাই বলিয়াছেন; কিছুই মিথ্যা বলেন নাই, প্রতারণাও করেন নাই।

শঙ্করমাতা যতী তখন একরূপ জ্ঞান বিধীনা হইয়াছিলেন। পুত্রের ঐ অমৃতায়মান শেষ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাল মন্দ বা অগ্রপশ্চাৎ কিছু

মাত্র বিবেচনা করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন না; বিশেষতঃ ভারতমাতা পুত্রের জন্য হৃদয়-বৃন্ত হইতে জীবন-কুসুম ছিঁড়িয়া দিতে সতত প্রস্তুত; সুতরাং সন্ন্যাসানুমতি আর অধিক কি? তৎক্ষণাৎ পুত্রকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। পুত্রের জীবন রক্ষা করাই তখনকার প্রার্থনীয়; সুতরাং তিনি ভাবিলেন—পুত্র বাঁচিয়া থাকিলে কখন না কখন দেখিতে পাইবেন, কিন্তু মৃত হইলে আর কোনও কালে দেখিতে পাইবেন না।

এতদিনের পর শঙ্করের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল; তিনি আনন্দে পুলকিত হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই মনে মনে সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন; জলচর কুম্ভীরও তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিল। তিনি তখন সবেগে তীরোপরি উঠিলেন। তীরে উঠিয়া, মাতার নিকট প্রকৃত শিশুর ন্যায় ভয়-ভীত হইতে লাগিলেন এবং শোকাকুল জননীকে নানা কথায় পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—শঙ্করের শিরীষ-কুসুম-কুক্ষুমার শরীরে গ্রাহ-গ্রাসের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হইল না, দৃষ্ট হইলে, সতীর হৃদয়-শতদলও ততোধিক বিফত হইত।

শঙ্কর প্রসন্নবদনে বলিতে লাগিলেন,—"মা! যেই আমি আপনার অনুজ্ঞাক্রমে মনে মনে সন্ন্যাস-সঙ্কল্প করিলাম, অমনি দুরন্ত জলচর নক্র আমার পদদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া সবেগে পলায়ন করিল। জননি! আপনার আজ্ঞা-ক্রমেই আমি শাস্ত্রবিধানানুসারে সঙ্কল্প-পূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি; সুতরাং এখন আর আমি গৃহী নই, এখন আমি সন্ন্যাসী। এখন আমার যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনিই উপদেশ করুন।" শুনিয়া, সতীদেবী অবাক্, শোক-দুঃখে অভিভূতা, তথাপি বলিলেন,—"আমি আর কি উপদেশ দিব, কি বলিব? আমার কিছুই বক্তব্য নাই; তুমি স্বয়ংই স্বকর্ত্তব্য বিচার কর।" এদিকে প্রতিবেশিগণ ক্রমে ক্রমে, সমবেত হইতে লাগিল। কেহ কেহ শঙ্করকে কতই প্রবোধ দিতে লাগিল। কিন্তু শঙ্করের বৈরাগ্য-বহ্নিতে মুমস্তই তুলারাশির ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া গেল। শঙ্কর সতীকে অভিলক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মাতঃ! সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য আমি স্বয়ংই অবধারণ করিব, সম্প্রতি, আমার আর একটী কথাও শুনুন। আমি সন্ন্যাসী হইলে, আপনার সেবাশুশ্রূষা ও স্নেহাচ্ছাদনের যে কষ্ট হইবে, এ সকল আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। যাহারা পৈতৃক সম্পত্তি গ্রহণ করিবে, অবশ্যই তাহারা আপনাকে অন্নবস্ত্রাদি প্রদান করিবে। আমার প্রব্রজ্যার পর যদি আপনার শরীরে কোন পীড়া হয় অথবা কালবশে আপনার মৃত্যু-ঘটনা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত জ্ঞাতিগণ ধর্ম্ম ও লোক-ভয়ে যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, এবং আপনার শিষ্যগণও যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করিবে না। বিশেষতঃ আমার গমনের পর বরং, তাহাদের অধিকতর দয়া হইবে। আপনার দেহান্ত হইলে, দাহাদি অন্ত্যকার্য্যও নির্ব্বাহ হইবে। আপনি আমার এই সন্ন্যাসে কোনরূপ উদ্বেগ, ভয় অথবা কোনরূপ দুশ্চিন্তা উঠাইবার কষ্ট করিবেন না।"

'জ্ঞাতিগণ দাহাদি করিবে'—পুত্রের এই অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণে, সতীর অন্তস্থ বিষাদানল-সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিল। তিনি গদ্‌গদস্বরে সজলনয়নে বলিলেন,—"আমি যখন তোমার সন্ন্যাস-ধর্ম্মে অনুমোদন করিয়াছি, তখন আমার আমার কোনও প্রত্যুত্তর নাই; আমার কষ্ট অপেক্ষা তোমার জীবন আমার নিকট সমধিক আদরণীয়। যাহাই হউক, আমার দেহ-পাত-সময়ে, তুমি যেখানে থাক, আসিয়া, শাস্ত্রানুসারে আমার

দাহাদি নিবাপ-ক্রিয়া সমাধান করিও। যদিও সন্ন্যাসী হইলে দাহাদি-কার্য্যে অধিকার থাকে না, তথাপি তুমি তাহা করিবে; করিলে, দোষ হইবে না। লোকাচারবিরুদ্ধ বলিয়া যদি তুমি তাহা না কর, তাহা হইলে তোমাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করা আমার বৃথা-হইবে।" এই বলিয়া, বহুক্ষণ রোদন-নিনাদে প্রতিবেশিগণের হৃদয়োচ্ছ্বাস বর্দ্ধিত করিয়া, অবিরল-অশ্রুধারায় ধরাতল আর্দ্র করিলেন।

মাতৃবৎসল শঙ্কর, জননীর তাদৃশ কাতরতা দেখিয়া,অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্তে বলিলেন,—'জননি! দিবসে রাত্রিতে কিংবা অন্য কোন সময়ে, যে কোন কারণে হউক, আপনি যখনই চিন্তা করিবেন,তখনই আমি স্বীয় আশ্রমাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনার সমীপবর্ত্তী হইব এবং আপনার মরণ সময়েও আমি আপনার দাহাদি করিব। মা! সন্ন্যাসীদিগের যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, আমি আপনার অনুরোধে সে সমস্তই স্বীকার করিলাম। কিন্তু মা! আপনিও আমার অনুরোধে আর একটী প্রার্থনায় অনুমতা হউন। 'আমি বিধবা, অনাথা, শঙ্কর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল—সন্ন্যাসী হইল' এ সকল চিন্তা আপনি করিবেন না। ইহাই আপনি আমার সমক্ষে অঙ্গীকার করুন। আমি স্বচ্ছন্দ-চিত্তে সুখের সহিত স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারিব। আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব,ইহা মনে করিয়া অবশ্যই আপনার মনে ক্লেশ হইবে; কিন্তু তাহা মনে রাখিবেন না। অধিক কি বলিব?—আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া আপনি কোনরূপ দুশ্চিন্তা করিবেন না; আমি গৃহী হইলে আপনি আমা দ্বারা যে ফল পাইতেন, আমি সত্য বলিতেছি,সন্ন্যাসী হইয়া আমি আপনাকে তদপেক্ষা শতগুণ সুফল প্রদান করিব।"

বলা বাহুল্য যে, এস্থলে ঐহিক সুফল নহে, পারলৌকিক সুফল। কুলে ব্রহ্মজ্ঞ সন্তান জন্মিলে কুল পবিত্র হয়; অতএব জননীর উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী। আর্য্যভূমির ক্রিয়াকলাপ প্রায়ই পরকাল-ফলোদ্দেশে অনুষ্ঠিত। আর্য্যগণ প্রেয়ঃ ছাড়িয়া শ্রেয়ের জন্যই ব্যস্ত। আর্য্যগণ প্রেয়ঃসাধনে সতত ব্যস্ত। সেইজন্য, সংসর্গের ফলে অধুনাতন অনেক ব্যক্তি শঙ্কর-জননীর ন্যায় পরকালের জন্য ব্যতিব্যস্ত না হইয়া, উদর-পূর্ত্ত ভোজন, নিত্য-নূতনবিন্যাস ও বিলাস-সম্ভারে কালাতিপাত করিতে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কলির ঘোর শাসন-দোষে পরিবর্ত্তন এরূপ ভাবী।

বিচক্ষণ-শিরোমণি শঙ্কর, জননীর সহিতএই রূপ কথোপকথন সমাপ্ত করিয়া, সন্নিহিত জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে আহ্বান-পূর্ব্বক বিনয়-নম্রবচনে বলিতে লাগিলেন,—'আমার মন সন্ন্যাস-ধর্ম্মে একান্ত আসক্ত হইয়াছে, তিলার্দ্ধকালও আর আমি এস্থানে থাকিব না, প্রব্রজ্যায় গমন করিব আমার এই অনাথা জননীকে আজ আপনাদের নিকট সমর্পণ করিলাম।" ব্রহ্মচারি-শ্রেষ্ঠ শঙ্কর, প্রধান জ্ঞাতি বিশ্বগুরুর নিকট সবিনয়ে করপুটে, উক্তরূপ নিবেদন করিয়া, অশ্রু-জলাবসিক্তা জননীকে জ্ঞাতিগণের নিকট সমর্পণ করিয়া, প্রব্রজ্যা-গ্রহণার্থ মনোনিবেশ করিলেন।

শুক্লের মন আজ বড়ই প্রফুল্ল, লাবণ্য-জ্যোতিঃ দ্বিগুণতর উদ্ভাসিত; রোমকূপ হইতে ব্রহ্মতেজ বিনির্গত হইতে লাগিল, সতীর হৃদয়ের ধন হৃদয় আঁধার করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। উপবাসী শঙ্কর মূর্চ্ছিত হইলেন; সতীর মনে ঐ বিষয় উদিত হইয়া, আরও যাতনা প্রদান করিতে লাগিল। কালাদিত্যের বাসিগণ 'ঐ বালক শঙ্কর সন্ন্যাসী হইয়া গেল' বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। বিশুদ্ধ

ক্ষিতিতে অনুসরণ করিয়া বিরত হইলেন। শঙ্কর আর গৃহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না।" শঙ্কর যায়, সতীর ক্রোড়ের ধন ক্রোড় ছাড়িয়া যায়, একবার নয়ন ভরিয়া সেই গৌরকান্তি শিব-রামনবপু দেখিবা জন্ম সফল করি, পুণ্যোপচয় ব্যতীত সাক্ষাৎ অসম্ভব"—এইরূপ নানা কথার আলোচনা হইতে লাগিল। অনিত্য সংসারে ধর্ম্মই সার, কিন্তু সংসারের মায়াভ্রান্ত জীব বৈরাগ্য-শুষ্ক বিমলানন্দ অনুভবে অক্ষম, সেইজন্য সংসার ত্যাগে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, ভারতের দুর্গতিরাশি অপসারিত করিবার জন্য, জাতীয়-প্রেমের মধুর সঙ্গীত ললিত-পঞ্চমতানে গান করিতে, লৌকপাপ-রাশি বিধৌত করিবার উদ্দেশে, পারমহংস ধর্ম্ম বিস্তারার্থ, শঙ্কর প্রস্থান করিলেন।

সন্ন্যাসিগণ এস্থলে শঙ্করের একটী অলৌকিক ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, ভগবান শঙ্কর সন্ন্যাস-সঙ্কল্পে বন-গমনের উদ্যোগ করিলে পর, তাঁহার গৃহ-গিরি-টস্থ পুণ্যা সরিৎ আজু অকস্মাৎ উচ্ছ্বলিত হইল, বিশাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া তীরস্থ বিষ্ণুমন্দির ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিল, মন্দির মধ্যস্থ 'অনর্ঘ' নামক বিষ্ণুবিগ্রহকে বিচলিত ও স্থানভ্রষ্ট করিবার উপক্রম করিল। ভগবান্ বিষ্ণু দৈববাণী দ্বারা কথিত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর শঙ্কর তন্মুহূর্ত্তেই সেই উদ্বেলিতা তরঙ্গিণীর 'তরঙ্গ-বিক্রম নিবারিত করিয়া স্বীয় বাহুদ্বারা মগ্নপ্রায় অনর্ঘ-বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। শঙ্করের কলেবর পরিত্যাগ দিবসে ঐ দেবায়তন জলশায়ী হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রি সরস্বতী।

আত্মা-তত্ত্ব।

শিষ্য।—মানবাত্মা ঈশ্বরের অংশ না প্রতিবিম্ব?

গুরু।—ঈশ্বরের অংশ।

শিষ্য। — তবে বেদান্তে প্রতিবিম্ব বলে কেন?

গুরু।— বেদান্তের কোন স্থানেও আত্মা ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বলিয়া নাই। বরং ভগবদ্-গীতায় ঈশ্বরাংশ বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা "মনৈবাংশ জীবলোকে জীব ভূত- সনাতন" তবে বেদান্ত ও পঞ্চদশীর কোন কোন স্থানে পরব্রহ্মের বিম্ব ঈশ্বর ও প্রতিবিম্ব জীবাত্মা বলিয়া বর্ণিত আছে। ঐ জীবাত্মা অর্থে বিজ্ঞানময় কোষ (বুদ্ধি) উহা আত্মার প্রতিবিম্ব বটে, আত্মাই ঈশ্বর। যথা—

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানীবাশয়াৎ"

ব্রহ্মই ঈশ্বর অর্থাৎ জীবাত্মা যখন যে শরীর হইতে যাহাতে গমন করেন, তৎকালে পূর্ব্ব শরীর হইতে যেমন বায়ু পুষ্প-গন্ধ লইয়া যান, সেইরূপ মন ও বুদ্ধির গন্ধ মাত্র লইয়া যান। এস্থলে ঈশ্বর এবং অন্য অনেক স্থলে আত্মাই ঈশ্বর বলিয়া বর্ণিত আছে। বেদান্ত দর্শনেও ঈশ্বরে বহুবচনান্ত পদ আছে। যথা—

"ইতি চেত্তৌ মন্ত্রৌ সিদ্ধানামপীশ্বরাণাং

দুর্জ্ঞেধতাং জগৎকারণস্য দর্শয়তঃ।"

বঙ্গার্থ—জগৎকারণ ব্রহ্ম যে দুর্জ্ঞেধ্য, সিদ্ধ ঈশ্বরগণেরও দুর্জ্ঞেধ্য, শ্রুতি তাহা দুইটী মন্ত্রে বলিয়াছেন (বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৭ পৃঃ) এস্থলে সিদ্ধ ঈশ্বরাদি মুক্তাত্মা। তদ্ভিন্ন আত্মাই যে ঈশ্বর, ইহা অনেক স্থলে বর্ণিত আছে, তবে ভগবদ্গীতায় এক স্থানে আত্মা ও ঈশ্বর মধ্যে পার্থক্য দর্শন হইয়াছে।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ
যো লোকত্রয় মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ
যস্মাৎ ক্ষর মতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিত পুরুষোত্তমঃ।

বঙ্গার্থ—ক্ষর ও অক্ষর নামে যে দুইটী পুরুষ আছে, তাহার মধ্যে ভূতগণ ক্ষর ও কূটস্থ আত্মা অক্ষর; এই উভয় পুরুষ হইতে অন্য উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন, যিনি ঈশ্বর ও নির্ব্বিকার এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিতেছেন।

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষা উত্তম, এইজন্য আমি লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছি। ভগবদ্গীতা ১৫শ অঃ ১৬।১৭।১৮ শ্লোক।

ঐ দুইপ্রকার পুরুষ অর্থে—সর্ব্বভূত ও অক্ষর আত্মা। সর্ব্বভূত অর্থে মন, বুদ্ধি ও পঞ্চ ভৌতিক দেহ; অক্ষরাত্মাই মানবাত্মা। ঈশ্বর দেহ মন বুদ্ধির অতীত; কিন্তু অক্ষর আত্মার অতীত বলা হয় নাই। আত্মা হইতে উত্তম বলা হইয়াছে, যেহেতু আত্মা কূটস্থ অর্থাৎ প্রকৃতির আবরণে (পৃথক পৃথক ভাবে) আবরিত। ঈশ্বর অবিভক্ত, তাঁহার কোন অংশ প্রকৃতির আবরণে আবরিত থাকিলেও তিনি মুক্ত; এইজন্য তিনি আত্মা হইতেও উত্তম, সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা সদ বাচ্য।

শিষ্য।—"ঈশ্বর পরব্রহ্মের বিম্ব" ইহার তাৎপর্য্য কি?

গুরু।—পরব্রহ্ম যে কি পদার্থ, তাহা সাধারণ মনুষ্য দূরে থাকুক, মহাত্মাগণও স্থির করিতে পারেন নাই। তবে সিদ্ধ মহর্ষি বা মহাত্মা-কৃত অধ্যাত্ম দর্শনের আবরণ ভেদ করিলে, পরব্রহ্মে প্রণব (ওঁ) রূপ (পূর্ব্ব বর্ণিত মত) তিনটী তত্ত্বের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যথা—সত্য জ্ঞান, পরাশক্তি ও মূল প্রকৃতি।

শিষ্য।—এই স্থানে আমি একটু বাধা দিতে বাধ্য হইলাম। আপনি বেদান্ত মতাবলম্বী হইয়াও সাংখ্য দর্শনোক্ত প্রধানা মূল প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র আসন দিতেছেন। বেদান্তে শক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে কোন ভেদ নাই; ব্রহ্মের মায়া-শক্তিই প্রকৃতি। ওঁ—(অ)—(উ)-(ম) সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার শক্তি। যথা—পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ওঁকারকে বিশ্লেষ করিয়া, আপনার বর্ণিত মত তিনটী তত্ত্ব শাস্ত্রের কোন স্থানে প্রদর্শিত হয় নাই। আপনার এই ব্যাখ্যাটী স্বকপোল কল্পিত বোধ হয়।

গুরু।—বেদান্ত দর্শনে চিৎশক্তিও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি এক, কোথাও নাই। তবে সাংখ্যের অচেতন প্রধানা মূল প্রকৃতি জগৎ কারণ বলিয়া বেদান্ত স্বীকার করেন না। চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ বলেন। শক্তি এবং প্রকৃতি উভয়ই ঈশ্বরাশ্রিত বেদান্ত দর্শনের শঙ্কর ভাষ্যে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে। যথা—"সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবা বিদ্যা কল্পিতে নাম রূপে। তত্ত্বাভ্যাত্ম্যানবিচ্ছনীয়ে সংসার প্রপঞ্চ বীজ ভূতে সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্য মায়া শক্তি প্রকৃতিরিতিচ প্রথিতে স্বাত্ম্যের ভিন্নপ্রত্যয় তাভ্যামন্তঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ আকাশোবৈ নাম নাম রূপয়ো র্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম ইতি শ্রুতেঃ।" বঙ্গার্থ—অবিদ্যা কল্পিত নামরূপ যাহা সত্য অথবা মিথ্যা দ্বারা নির্ব্বচনীয় নহে, যাহাকে অস্তি নাস্তি কোন প্রকারে নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রায় আত্মা-ভূত। সেই কল্পিত অথচ ঈশ্বরাশ্রিত অনির্ব্বাচ্য মিলিত পদার্থদ্বয় শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে মায়া-শক্তি ও প্রকৃতি নামে কথিত আছে; ঈশ্বর সেই দুই পদার্থ হইতে ভিন্ন। বেদান্তদর্শন ২য় অ, ১ম পা, ১৯ সূ, ৭৯ পৃষ্ঠা।

এখন বুঝিলে বেদান্তে শক্তি ও প্রকৃতি দুইটী পৃথকতত্ত্ব আছে। ভগবদ্গীতায় শক্তিকে পরা প্রকৃতি বা চিৎশক্তি ও মূল প্রকৃতিকে অপরা প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত আছে। তুমি প্রণব ওঁ বিশ্লেষ করিয়া যে তিনটী তত্ত্ব দর্শাইলে, উহা পৌরাণিক বিভাগ, উহা রূপক মাত্র। ঐ রূপক ভেদ করিলে ঐ কথিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর (সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার শক্তি) শক্তি, জ্ঞান ও প্রকৃতি ভিন্ন কিছুই নহে, উপলব্ধি হইবে। উহা সময়ান্তরে বুঝাইয়া দিব। এক্ষণে ঈশ্বরকে পরব্রহ্মের বিম্ব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যখন পরব্রহ্ম অবিকার অবস্থায় থাকেন, তখন অব্যক্তই ব্রহ্মের আবরণ, ঐ অব্যক্তের অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের পরম জ্ঞান সমুদ্র। স্থির অচল ও অবিকার। যখন তাঁহার শক্তিরূপিণী মহামায়া ক্রিড়াশীলা হন, তখন ঐ পরমজ্ঞান সমুদ্র-তরঙ্গময় হইয়া উঠে, ঐ তরঙ্গময় ফেনিল মহা সমুদ্র যেন একখণ্ড বিম্বময় হইয়া অনন্ত স্রোতে অনন্তাভিমুখে গমন করিতেছে। ঐ অনন্ত স্রোতস্থ বিম্বময় মহাসমুদ্ররূপ ঈশ্বরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিম্বস্থ জলাংশই মানবাত্মা বা আত্মীক বীজ। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, জলের উপাধি তরঙ্গ, ফেন, ঊর্ম্মি, বীচি, বিম্ব যাহাই হউক, ঐ সমস্তই সমুদ্র-বারি বা বারির অংশ। ঐ অনন্ত স্রোতই মায়া ও অসংখ্য বুদবুদই অবিদ্যা।

শিষ্য।—আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, সত্য-জ্ঞানই মূল, ঐ সত্যজ্ঞান হইতে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী মহাশক্তির বিকাশ হয়। ঐ মহা-শক্তিস্থ সত্যজ্ঞানের পূর্ণাভাসই ঈশ্বর। আপনার বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় প্রায় পূর্ব্বোক্ত মতের পোষক; তবে ঐ সত্য-জ্ঞানাভাসকে ব্রহ্মাণ্ডের মহত্তমত্ব মহামানস শক্তি, শব্দে অভিহিত করেন কেন?

গুরু।—জ্ঞান, শক্তি ও প্রকৃতির সংশ্লেষই মানস। সত্য-জ্ঞান এক; শক্তি ছয় (পরা-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি, কুণ্ডলিনী-শক্তি, মাতৃকা-শক্তি) এবং প্রকৃতি অসংখ্য; যথা—জড়-প্রকৃতি হইতে মানব-প্রকৃতি পর্য্যন্ত প্রকৃতির অষ্টগতি। উহাকে অপরা-প্রকৃতি কহে। তদ্ভিন্ন জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তি-রাজ্যেও প্রকৃতি আছে। উহা ঈশ্বরের দৈবী-প্রকৃতি বা বিদ্যা। প্রথমতঃ শক্তি ও জ্ঞানের সংশ্লেষণ হইতে প্রজ্ঞা ও চিন্তাকারী ক্ষমতার বিকাশ হয়, অন্যান্য জ্ঞানাঙ্গী বৃত্তি উহার অন্তর্গত। এস্থলে জ্ঞানাঙ্গী বৃত্তি শব্দের পরিবর্ত্তে ক্ষমতা শব্দ প্রযোজ্য। প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধে উহা বৃত্তি নহে, এক একটী ক্ষমতা উহাই ঈশ্বরের স্বভাব। এইজন্যই গীতাকার বলিয়াছেন, 'স্বভাবাধ্যস্ব মুচ্যতে।' অতএব ষড়-শক্তিস্থ সত্য-জ্ঞানের পূর্ণাভাসই ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা ও চিন্তাকারী ক্ষমতা। ঐ প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা মূল প্রকৃতির অধীন নহে। প্রকৃতি উহাদের অধীন। ঐ প্রজ্ঞা বা চিন্তাকারী ক্ষমতা প্রকৃতির সহিত বিকাশিত হইয়া বিবেক ও কল্পনা-রূপ সম্বোভাবাকারে পরিণত হয়। ঐ অনন্ত 'চিন্তা' বা কল্পনাই সৃষ্টিকারী জনন-শক্তি ও অনন্ত 'প্রজ্ঞা' বা বিবেকই সৃষ্টির রক্ষণ বা পালন-শক্তি উভয়ের সংশ্লে-

স্বরূপ মহত্তত্ত্বময় মহা-মানস-শক্তি, উহা কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বামস্ব নহে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মহা-মানস-শক্তি। অবিদ্যা ক্ষেত্রে উহার অনুপ্রবিষ্ট হইলে তাহার আভাসে পার্থিব মন ও বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং প্রাকৃতিক জীব পার্থিব মানবে পরিণত হয়।

শিষ্য।—আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর ও বাহ্যজগতে জ্ঞান ও অজ্ঞান দুইটী ভাব ও অভাব আছে। প্রকৃত জ্ঞানের ক্ষেত্র বিদ্যা, অজ্ঞানের ক্ষেত্র অবিদ্যা। এক্ষণে আপনি কোন্ শক্তিকে অবিদ্যা বলেন?

গুরু।—বিদ্যা বা অবিদ্যা বিশেষ কোন শক্তি নহে, অবিদ্যা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা কামিক-তত্ত্বের বীজ বিদ্যা ঐশীধী-তত্ত্বের বীজ।

শিষ্য।—স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা কামিক-তত্ত্বের বীজ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়?

গুরু।—সমস্ত শক্তির মূল যেমন পরা-শক্তি, সেইরূপ সমস্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মূলই মূল-প্রকৃতি; কিন্তু শক্তির সংযোগ ব্যতীত প্রকৃতির বিকাশ হয় না। আবার প্রকৃতির সংযোগ ব্যতীত ঐশীশক্তির বিকাশ হয় না। যখন শক্তি-রাজ্যে ঐশী প্রজ্ঞার বিকাশ হয় ও প্রকৃতি ঐ শক্তির অধীন থাকে, তখন ঐ ঐশীধী শক্তিই বিদ্যা বা দৈবী-প্রকৃতি নামে অভিহিতা হয়। উহাই ঈশ্বরের স্বভাব। আর যখন শক্তি প্রকৃতির অধীন হয় ও প্রকৃতিতে ঐশী প্রজ্ঞার বিকাশ না হয়, তখন প্রকৃতিই অবিদ্যা নামে অভিহিতা হয়; উহাই জীবের স্বভাব, অবিদ্যা রাজ্যেও পূর্ব্বোক্ত ষড়-শক্তির ন্যূনাতিরেক বিকাশ হইতে পারে। কিন্তু ঐ শক্তি প্রবৃত্তির সহচরী হয়। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিৎ যে, অবিদ্যা রাজ্যে মানব ব্যতীত অন্য কোন জীবে ঐ ষড়-শক্তির স্বাধীন বিকাশ অসম্ভব। তবে ঐ শক্তি, প্রকৃতির উত্তেজক স্বরূপে পর্য্যবসিত হয়। সাধারণ মানবেও অদ্যাপি ষড়-শক্তির স্বাধীন ভাবে পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। তবে ঐ ষড়-শক্তির অংশ মাত্র বিকাশিত হইয়াছে।

শিষ্য।—উপরোক্ত ষড়-শক্তি সমন্বিত মহা-মানস মধ্যে অনন্ত প্রজ্ঞা ও অনন্ত চিন্তা বা কল্পনার ক্ষমতা আছে বলিয়াছেন, আমার বোধ হয় চিন্তা বা কল্পনার ক্ষমতা প্রজ্ঞা এবং প্রবৃত্তির অন্তর্ভূত। মানবে বুদ্ধি এবং প্রবৃত্তি অনুরূপ চিন্তা বা কল্পনার উদয় হয় এবং ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যে তাহা ক্রিয়াভিমুখী হইলে ক্রিয়ার বিকাশ হয় অর্থাৎ প্রথমে মস্তিষ্কস্থ বুদ্ধি ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযোগে মস্তিষ্কে চিন্তা বা কল্পনা উদিত হইলে, ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যে স্নায়বীয় স্রোত এরূপ ভাবে প্রবাহিত হয় যে, তদ্দ্বারা মাংসপেশী সকলের গতি উৎপাদন করিয়া অভিলষিত বা প্রবৃত্তি অনুরূপ ক্রিয়াভিমুখী করে। আপনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, পার্থিব মানব ঈশ্বরের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রাংশ ব্যাপী যে নিয়ম প্রযোজ্য, বৃহতে বা অনন্তব্যাপী সেই একই নিয়ম প্রযোজ্য, তাহা হইলে অনন্ত প্রজ্ঞা ও প্রবৃত্তি সেওয়ায় অনন্ত চিন্তা বা কল্পনার একটী পৃথক শক্তির আরোপ করেন কেন?

গুরু।—তোমার উপরোক্ত মন্তব্যটী সর্ব্বাংশে ঠিক নহে। প্রকৃত পক্ষে চিন্তা বা কল্পনার ক্ষমতাই মানস; পূর্ব্বোক্ত ষড়-শক্তি ঐ মানস-স্বর্ভূত; প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি উহার সহকারী মাত্র। চিন্তার ক্ষমতাই মনের আদিস্তর। প্রজ্ঞা, ঐ চিন্তা বা কল্পনার ন্যায্য পথ দেখাইয়া দেয় ও সুব্যবস্থা করিয়া দেয়। অনেক সময় প্রজ্ঞার কথাতে চিন্তার স্বরূপ অশ্বের গতি প্রবৃত্তি-রূপ পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহা বলিয়া ঐ অশ্বের গতি ও পথ এক নহে; মানবে চিন্তার সহিত প্রবৃত্তির এরূপ মাখামাখি ভাব যে, প্রবৃত্তির উপাদান-ভূত প্রকৃতির সহিত চিন্তা শক্তির স্মৃতি নিকট সম্বন্ধ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যে সকল মহাত্মা প্রবৃত্তির অধীন নহেন, তাঁহাদের চিন্তার সহিত প্রবৃত্তির কোন সংস্রব নাই বলিলেই হয়। তাঁহাদের নিকট প্রজ্ঞাই চিন্তার বন্ধু ও পূর্ব্বোক্ত স্বাধীন ষড়-শক্তি তাহার সহকারী। ঈশ্বর প্রকৃতির অধীন নহেন, প্রকৃতিই তাঁহার অধীন। অতএব অনন্ত-চিন্তা বা কল্পনা-শক্তিই স্বাধীন সৃষ্টিকারী বিধাতা প্রমাণিত হইল। ঐ অনন্ত চিন্তার ক্ষমতাই (Thinking power) মহা-মানস-শক্তি। পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি-ক্ষেত্রে বা স্বভাব-ভূমিতে আদিম প্রজ্ঞা ও সৃষ্টিকারী মহামানস শক্তির অনুপ্রবেশই মানবাত্মা। পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তির অঙ্কুরই কামিক-তত্ত্ব, উহার স্থূল অবস্থাই ভৌতিক-তত্ত্ব। পূর্ব্ব-বর্ণিত মত চিদ্-জ্যোতিতে কামিক জড়তত্ত্ব পরিষ্কৃত ও তদ্দ্বারা আত্মাভাস বিকাশের উপযোগী মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হইলে, মানবাত্মার (ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও সৃষ্টিকারী মহামানস-শক্তির অঙ্কুর (Human monad) পার্থিব বাসস্থান বা ক্ষেত্র নির্ম্মিত হয়। ঐ স্বভাব-ভূমিতে অজ্ঞাভাস হেতু যে বুদ্ধির বিকাশ হয়, কোটী কোটী জন্মের পর ঐ বুদ্ধির অভিজ্ঞতা, স্বীয় জননী প্রকৃতিকে জয় করিয়া অনন্ত প্রজ্ঞা ও সৃষ্টিকারী ক্ষমতায় পরিণত হইলে, আত্মা ও পরমাত্মা এক হইয়া যায় এবং পার্থিব মানব মুক্ত হয়।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুধামুখী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে অবিনাশচন্দ্র কাশীনাথ বাবুর বাড়ী আসিলেন। সর্ব্ব প্রথমে কাশীনাথ বাবুকে দেখিতে পাইয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পদধূলী গ্রহণ করিলেন। তিনি অবিনাশকে দেখিয়া তদীয় মস্তকে হস্তার্পণ-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করতঃ কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং একটু পূর্ব্বে না আসিবার জন্য সামান্য ভৎর্সনা করিলেন। কাশীনাথ বাবু বলিলেন,—বাবা! তুমি আমার সুধামুখীর ন্যায় স্নেহের সামগ্রী; বলিতে গেলে, এই সমস্ত কার্য্য আমার প্রতিনিধি স্বরূপ তোমারই পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত, কোথায় তুমি আরও ১০।১২ দিন পূর্ব্বে আসিবে, না আজ আসিয়াছ।"

অবিনাশচন্দ্র নত-মস্তকে বলিলেন,—"কি করিব, অবসর পাই নাই; আরও বিশেষ অল্প-দিন চাকরি লইয়াছি, বিদায় দিতে বড় সাহেব অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন, অনেক কষ্টে ৭ সাত দিনের মাত্র অবসর পাইয়াছি।"

কাশীনাথ বাবু, তারপর অবিনাশের প্রতি কোন কোন কার্য্যভার অর্পণ করিয়া অন্যস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অবিনাশচন্দ্র অন্দরে প্রবেশ করিয়া কাশীনাথ বাবুর সহধর্ম্মিণীর পদযুগল বন্দনা করিলে

পর, তিনি আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক বিলম্বে আসিবার জন্য একটু অনুযোগও করিলেন।

এদিকে বর আসিয়া পৌঁছিল; বর পৌঁছিয়াছে শুনিবামাত্র, স্ত্রী-মণ্ডলীর মধ্যে একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকা সকলেই বর দেখিতে ছুটিল; যাইবার সময় যুবতীগণের অঙ্গের বসন বিস্রস্ত হইল, কবরী শিথিল হইয়া পড়িল, কে কার গায় পড়ে ঠিক নাই; অলঙ্কার-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মাতাইয়া সকলে ছুটিল; কাহারও সিকি ঘোমটা, কাহারও তাহারও কম, কাহারও বা অবগুণ্ঠন একেবারেই ছিল না; শ্বশুর, ভাসুর, স্বামী পর্য্যন্তও মানিল না; মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল; লজ্জায় লজ্জাদেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

বর আসিয়া মধ্য-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। চতুর্দ্দিকে বর-পক্ষীয় লোক এবং কন্যা-পক্ষীয় দেশী বিদেশীয় অগণিত লোক তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। ছাদে, বারাণ্ডায় ও গবাক্ষে অসংখ্য মুখপদ্ম ফুটিল; ঘেঁসাঘেঁসি ঠেসাঠেসি মেশামিশি, সকল চক্ষুই বরের উপর ন্যস্ত। নাসাভরণ এবং কর্ণের আন্দোলনে যেন বিদ্যুৎ ছটা দেখাইতেছিল; তদুপরি হাস্যের ঘটা। কেহ কেহ বা বরের রূপ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে বরটী দেখিতে বেশ সুশ্রী; নবীন নবীন গঠন, তদুপরি অপূর্ব্ব গৌরকান্তি। বয়স ১৮।১৯ বৎসরের অধিক হয় নাই; মুখমণ্ডলে "ঈষৎ গোঁপের রেখা" দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সকলেই বরের রূপ দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। কাশীনাথ বাবু দুটী মোহর প্রদান করিয়া ভাবি জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মধ্যাহ্ন সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া অবিনাশকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া আনিল। অবিনাশ ধীর পদবিক্ষেপে আসিয়া দেখিল যে, সুধামুখী, তাহার জন্য নিম্ন-তালার এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছে। তথায় আর জন-প্রাণী কেহ ছিল না। সম্মুখে ফলাধারী কৃষ্ণ-সর্পকে দর্শন করিলে, পথিকের মন যেমন হঠাৎ চমকিয়া উঠে, সুধামুখীকে তথায় একাকিনী উপবিষ্টা দেখিয়া অবিনাশের হৃদয় তদ্রূপ চমকিত হইল। সে স্তম্ভিত হইয়া তথায় দণ্ডায়মান হইল।—

সুধামুখীর মুখখানি আজ বর্ষণোন্মুখ মেঘবৎ স্থির এবং গম্ভীর। অবিনাশকে সন্দেহ করিয়া বলিল,—"অবিনাশ দাদা! আমি ভাবিয়াছিলাম যে তুমি বুঝি আসিবে না। সে যাহা হউক, তুমি যে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে স্মরণ করিয়াছ, ইহাতে সুখী হইলাম। তোমার নিকট কোন কথা বলিবার জন্য সেই দিন ডাকিয়াছিলাম, কিন্তু বলিতে পারি নাই। আজ সেই কথা বলিবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি, তুমি শুনিবে কি?"

সুধামুখীকে দেখিবামাত্র, অবিনাশের হৃদয়-নিহিত শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুকাল পরেই, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুখ-সূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইবে; তাহা চিন্তা করিয়া তাহার লোচন-যুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল।

সুধামুখী বলিল,—"অবিনাশ দাদা! তুমি অশ্রুপাত করিও না; আমি এতদিন বহু কষ্ট করিয়া যে ধৈর্য্য-ধারণ করিয়াছিলাম, তোমার মলিন অশ্রু-সিক্ত মুখখানি দেখিয়া আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে। আমরা এক বৃন্তে দুইটী ফুল ফুটিয়াছিলাম, কিন্তু প্রবল বাত্যায় আমাদের পরস্পরকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। আমাদের পরস্পরের মিলন, বিধাতার ইচ্ছা নহে, তাই বলি, অবিনাশ! তুমি আমার মত ধৈর্য্য-ধারণ কর; হৃদয়কে পাষাণ হইতেও কঠিন কর, আত্মসংযমে রত হও এবং চির-কালের মত আমাকে বিস্মৃত হও।"

সুধামুখীর স্বর কাঁপিতেছিল।

অবিনাশ নীরব। সুধামুখীর কণ্ঠস্বর যেন তাহার হৃদয়মধ্যে প্রচণ্ডবেগে প্রতিহত হইতেছিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিল; অবিনাশ আর দাঁড়াইতে পারিল না। ধীরে ধীরে তথায় বসিয়া পড়িল।

সুধামুখী বলিল,—"অবিনাশ! যাহা বলিলাম, চিরকাল স্মরণ রাখিও; আমি সাধ্যানুসারে আত্মসংযম করিয়া তোমাকে ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি, আবার বলি, তুমিও আমাকে বিস্মৃত হইতে চেষ্টা কর।" অবিনাশের বাক্য স্ফুটিল, মৃদুস্বরে বলিল,—"তবে আমাকে ডাকিলে কেন?"

সুধামুখীর বুঝি আর ধৈর্য্য থাকিল না; অবিনাশের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহার নীল লোচনযুগল আর্দ্র হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্ম-সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"ডাকিয়াছি তোমাকে বলিবার নিমিত্ত। আমার আরও একটী কথা আছে—"বলিতে বলিতে সুধামুখী স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী ক্ষুদ্র টিনের বাক্স বাহির করিয়া, অবিনাশের হস্তে প্রদান-পূর্ব্বক বলিল,—"ইহার মধ্যে যাহা আছে, তাহা তোমার, আমার বিবাহের পরদিন ইহা অতি গোপনীয় স্থানে বসিয়া খুলিও। এখন প্রতিজ্ঞা কর যে, কদাচ অন্য অথবা প্রতিজ্ঞা ইহা খুলিবে না, তোমার নিকট আমার এই শেষ ভিক্ষা।"

অবিনাশচন্দ্রের বাক্-নিষ্পত্তির ক্ষমতা যেন রহিত হইয়াছে। যন্ত্র-চালিত পুতুলের ন্যায় সেই বাক্স গ্রহণ করিল। সুধামুখী ব্যগ্রতার সহিত বলিল,—"বল অবিনাশ! বল; বল, আমার এই এই শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করিবে কি না!"

অবিনাশচন্দ্র মাথা দোলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

সুধামুখী আবার বলিল,—"এ জীবনে তোমার আমার এই প্রথম দেখা, যত কাল আমরা জীবিত থাকিব, কদাচ যেন আমাদের আর সাক্ষাৎ হয় না, মনুষ্যের মন বড়ই চঞ্চল। আবার বলি, সাধ্যানুসারে তুমি আমাকে ভুলিতে চেষ্টা করিও।"

তারপর উভয়ে উভয়কে অনিমিষ লোচনে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে অপসৃত হইল।

* * * *

শুভ গোধূলী-লগ্ন উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে গভীর নিনাদে বাদ্য বাজিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সুমধুর বামাকণ্ঠ-সম্ভূত মঙ্গল গীতি হইতে লাগিল। বিবাহ-সভায় কন্যা এবং বর-পক্ষীয় সভ্যমণ্ডলী এবং অনেক দেশী বিদেশী লোক বিবাহ সম্পর্কার্থ উপবিষ্ট হইল। উৎকৃষ্ট বিবাহ-সজ্জায় ভূষিত হইয়া বর নরসুন্দরের দ্বারা বাহিত হইয়া যথাস্থানে উপবিষ্ট হইল। আবার চতুর্দ্দিকে বাদ্য বাজিতে আরম্ভ হইল। পাত্র সভাস্থ হইবার কিছু কাল বিলম্বে পাত্রী আনিতে লোক প্রেরিত হইল। যথা সময়ে, নানাবিধ সুবর্ণালঙ্কারে সুষমা-বপুঃ-ভূষিত করিয়া অবগুণ্ঠনবতী সুধামুখী ধীরে ধীরে নিঃসহ স্থলে আগমন করিল। সুচিক্কণ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে, তাহার রূপ যেন ফুটিয়া যাইতেছিল। অত্যুজ্জ্বল দীপশিখা অঙ্গস্থিত সুবর্ণালঙ্কারে প্রতিবিম্বিত হইয়া, যেন শত সহস্র রশ্মি প্রকাশ করিতেছিল। কুঞ্চিত নিবিড় কৃষ্ণকেশরাশি, বহুতর সুগন্ধ তৈল দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইয়া, বেণীবদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময়ে কেহ সুধামুখীকে বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিলে, যথার্থই দেবকন্যা বলিয়া ভ্রম হইত। কাশীনাথ বাবু স্বয়ং যথা-

শাস্ত্র কন্যা সম্প্রদান করিলেন, নারীবৃন্দ উল্লাসে হুলুধ্বনি দিতে লাগিল।

* * *

নিশীথ সময় মহিমাটিতে নানাপ্রকার নৃত্য-গীত, আমোদ আহ্লাদাদি হইতেছিল, এমন সময় অন্দর মধ্যে তুমুল আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল; সকলে কি হইয়াছে কি হইয়াছে বলিয়া সেই দিকে ধাবিত হইলেন। সকলে গিয়া শুনিতে পাইল যে, বাসর-ঘর হইতে তুমুল ক্রন্দন-ধ্বনি শুনা যাইতেছে। স্ত্রী পুরুষ সকলে সেই ঘরের মধ্যে দলে দলে প্রবেশ করিতেছে। সকলে গিয়া দেখিল যে, বর-শয্যার উপর সুধামুখীর মৃত শরীর রক্তে ভুবিয়াছে। তাহার সুন্দর গ্রীবা, প্রায় অর্দ্ধাংশের অধিক ছেদিত; এখনও ছিন্ন-কণ্ঠ হইতে অল্প অল্প রুধির নির্গত হইতেছিল। কাশীনাথ বাবুর সহধর্ম্মিণী, এই বিভৎস দৃশ্য দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। কাশীনাথবাবু উন্মত্তবৎ হইয়াছেন; সেই রুধির-প্লাবিত মৃত শরীর বক্ষে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত হইতেছিলেন!

অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, সম্পর্কানুসারে—কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে, আর কেহ বা নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছিলেন।

হায়! বিধাতার গূঢ় ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে? যে বিবাহ-শয্যা স্বর্গের নন্দনকানন হইতেও সমধিক শ্রেষ্ঠ ছিল, এখন তাহা শ্মশান অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়াছে; যে গৃহ এই মাত্র নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদ, নৃত্য গীতাদিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, এখন তৎপরিবর্ত্তে তথায় হৃদয়-বিদারক রোদন-ধ্বনিতে নৈশাকাশ বিদীর্ণ হইতেছে। হে জগদ্বন্! তোমার লীলা তুমিই বুঝিতে পার; দেবদেব শূলপানি যাঁহার লীলার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, ক্ষুদ্র প্রাণী মানব তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে?

অবিনাশচন্দ্র! অবিনাশ কোথায়?

অবিনাশচন্দ্র বাসর-গৃহের এক কোণে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ; যেন তাহার শরীর হইতে প্রাণ-বায়ু তিরোহিত হইয়াছে।

অবিনাশচন্দ্র সুধামুখীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, ভগ্ন-প্রাণে কাশীনাথ বাবুর অন্তঃপুরস্থ উদ্যান মধ্যে এক নিভৃত স্থানে বসিয়া আপন মনে চিন্তা করিতেছিল। তাহার জীবনের জীবন সুখের ধ্রুব-তারা, আজ চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইতেছে। অবিনাশের জ্ঞান নাই, বাহ্য বস্তুর সহিত যেন কোন সম্পর্ক নাই; মুদ্রিত নয়নে সুধামুখীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছিল। এইরূপ যে কতক্ষণ সে সেই ভাবে ছিল, তাহা তাহার স্থির নাই; নিশীথ সময় তুমুল আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া, সে জাগরিত হইল। ঘন ঘন সুধামুখীর নাম উচ্চারিত হইতেছে শ্রবণ করিয়া, উন্মাদবৎ সেই দিকে ধাবিত হইল। স্বচক্ষে সুধামুখীর সেই গত-প্রাণ দেহ দর্শন করিয়া, অবিনাশচন্দ্র বজ্রাহত পাদপবৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল।

অবিনাশ অনেকক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে, দেখিতে পাইল যে, মহিমাটিতে অন্য এক প্রকোষ্ঠে সে শায়িত রহিয়াছে। তাহার শয্যা-পার্শ্বে তাহার চতুর্দ্দিকে অনেক লোক তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। অবিনাশচন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ অন্তে চক্ষুরুন্মিলন করিলে পর, জনৈক ভদ্রলোক তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"অবিনাশ! তোমার নিকট আমাদের একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে; তুমি সরল মনে তদ্বিষয় প্রদান করিলে আমরা বড় সুখী হইব।"

অবিনাশের চক্ষু হইতে এক ফোটা জলও নির্গত হয় নাই, তাহার হৃদয়স্থিত শোক, পর্ব্বত-কন্দর-নিরুদ্ধ অগ্নিবৎ জ্বলিতেছিল। ধীরে ধীরে বলিল,—"আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাস্য আছে, বলুন, আমি সরল মনে সমস্তই উত্তর করিতেছি।"

প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি সুধামুখীকে ভালবাসিতে?"

অবিনাশচন্দ্র কোন উত্তর করিতে সক্ষম হইল না; তাহার ওষ্ঠাধর মুহূর্ত্তের জন্য কম্পিত হইল, নয়নযুগল ধীরে ধীরে নিমিলিত হইল।

আবার সেই প্রশ্ন হইল। অবিনাশ ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি তাহাকে যে কি প্রকার ভাল বাসিতাম, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার সাধ্য নাই। আমার ভালবাসা অপার্থিব, ইহার নাম জানি না, ইহার পরিণাম যে কি, তাহাও জানি নাই। হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশের মধ্যে সেই অপার্থিব ভালবাসা গ্রথিত রহিয়াছে। ইহা স্বর্গের পারিজাত কুসুম এবং মন্দাকিনী-প্রবাহিত অমৃতকণা। ইহার আকার নিরূপিত নাই এবং প্রতিদান কখন প্রার্থনা করি নাই। সুধামুখীর প্রতি আমার যে কি প্রকার ভালবাসা, তাহা তোমরা কেমন করিয়া বুঝিবে। আজ এক দিন নয়, প্রায় দশ বৎসর যাবৎ তাহার প্রেমময় মোহিনী প্রতিমা হৃদয় মধ্যে স্থাপনা করিয়া সর্ব্বদা তাহার পূজা করিয়া আসিয়াছি। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারি নাই। চিরদিন মনে আশা করিয়াছিলাম যে, এক দিন প্রকৃতপক্ষে সুধামুখীকে পাইব, কিন্তু আমার ন্যায় দানবের গৃহে লক্ষ্মীর অবস্থান অসম্ভব। সুধামুখীর সঙ্গে সঙ্গে আমারও সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে। এতক্ষণ আমি সুধামুখীর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিতেছিলাম। আমি তাহাকে কখন কোথাও একাকিনী যাইতে দিই নাই। তাই আমার সুধামুখী, আমার প্রতিক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। আপনাদের যাহা জিজ্ঞাস্য করিবার আছে, বলুন, অন্তিম সময় আমি হৃদয়ের একটী কথাও গোপন করিব না।"

অবিনাশের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল।

আবার প্রশ্ন হইল,—"অদ্য মধ্যাহ্ন সময় তুমি সুধামুখীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পর কি কথোপকথন করিয়াছ?"

অবিনাশ তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিল, তার পর আবার বলিল,—"আমি মূর্খ, তখন সুধামুখীর কথা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই; সে আমার নিকট হইতে এক প্রকার চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। তখন মুণাক্ষরেও তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলে, তাহার পায় ধরিয়াও ক্ষান্ত করাইতাম। সুধামুখী যদি অন্যত্র গিয়াও সুখী হইতে পারিত, তাহা হইলেও আমার হৃদয়ে কতক শান্তি উপভোগ করিতে পারিতাম।"

আবার প্রশ্ন হইল,—"সুধামুখী তোমাকে যে বাক্স দিয়াছে, তাহার মধ্যে কি আছে, তাহা কি তুমি খুলিয়া দেখিয়াছ?"

অবিনাশ বলিল,—"না, খুলিয়া দেখি নাই, আগামী কল্য খুলিয়া দেখিব, ভাবিয়াছিলাম।"

"সে বাক্স কোথায়?"

অবিনাশ বলিল,—"অন্তঃপুরস্থ-উদ্যানের লতাকুঞ্জ মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছি।"

অবিলম্বে কয়েক জন লোক সেই বাক্স আনিতে গেল। বাক্স আনীত হইলে পর সকলেই সেই বাক্স খুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

অবিনাশ বলিল,—"চাবি আমার নিকট আছে, কিন্তু উহা এখন খুলিবেন না। সুধামুখী আমাকে পুনঃপুনঃ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বাক্স খুলিতে নিষেধ করিয়াছিল।"

সে কথা কেহ শুনিল না; অবিনাশের নিকট হইতে চাবি আনিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই বাক্স খোলা হইলে পর, সকলে দেখিতে পাইলেন যে, তাহার মধ্যে কতকগুলি স্বর্ণ এবং রৌপ্য-নির্ম্মিত অলঙ্কার, দুই খান মোহর এবং একখানি লিপি রহিয়াছে। পত্রখানি অবিনাশেরই শিরোনামাঙ্কিত। একজন তাহার নিকট পত্র আনয়ন করিলে, অবিনাশ বলিল,—"আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ শিথিল হইয়াছে। আমার সাধ্য নাই যে, পত্র পাঠ করিতে পারি। আপনাদের মধ্যে কাহারও ইচ্ছা হইলে পত্র পাঠ করিতে পারেন।

পত্রখানি সুধামুখীর স্বকরাঙ্কিত। স্থানে স্থানে অক্ষর মুছিয়া গিয়াছে; বোধ হয় পত্র লিখিবার সময়, অশ্রুপ্রবাহে ওরূপ ঘটিয়া থাকিবে। একজন ভদ্রলোক পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন :—

"প্রিয়তম!

আজ তোমাকে আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত সুমধুর সম্বোধন করিতেছি। ইহাতে কোন দোষ হইয়াছে কি না, জানি না; কেন না, যে প্রাণাধিক প্রিয়তাহাকে শুদ্ধ প্রিয়তম বলিলে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না। আজ আমার গুরুজনের ভয় নাই, সমাজ-গঞ্জনাতেও আমি ভীতা নহি; কারণ তাঁহাদের ধিক্কার আমার কর্ণগোচর হইবে না।

বাল্যাবধি তোমাকেই দেখিয়াছি, তোমারই মুখ চাহিয়া এতকাল জীবন ধারণ করিয়াছিলাম। মনে মনে বড় আশা ছিল যে—একদিন প্রকৃত-পক্ষেই তোমাকে দেখিয়া নয়ন-মন চরিতার্থ করিতে পাইব; কিন্তু অদৃষ্ট দোষে তাহা ঘটিল না।

যেদিন পিতামাতার কথোপকথনে শুনিলাম যে, আমাকে অন্য পাত্রস্থা করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা জন্মিয়াছে, সেই দিনই বুঝিলাম যে, আমার ইহ জীবনের সুখ ফুরাইয়াছে। তখনই একবার মনে হইয়াছিল; যে, পিতৃ মাতৃ সদনে আমার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করি, কিন্তু লজ্জা তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিল; সুতরাং মনাগুণে নিজেই পুড়িতে লাগিলাম। জনক জননীর নিকট যদিও মুখে কোন কথা প্রকাশ করি নাই, তথাপি তাঁহারা আমার মলিন মুখ দেখিয়া কতকটা বুঝিয়া থাকিবেন; তথাচ তাঁহাদের দয়া হইল না। তোমার মুখে শুনিয়াছি যে, পিতামাতা সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ; সুতরাং তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে ঘোরতর পাপ হয়; তাই স্থির করিলাম যে, আত্ম বলিদান দিয়া, তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।

সেই দিন পিতার সঙ্গে তোমার যে কথোপকথন হইয়াছিল, অন্তরালে থাকিয়া আমি সমস্তই শুনিয়াছিলাম। মনে ভাবিলাম যে, আমারই জন্য তুমি দেশান্তরিত হইতেছ—তখন অন্তঃকরণে যে কি ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। যদিও তোমার আমার মিলন, ইহ-জন্মে ঘটিল না, তথাপি তোমার মুখখানি দেখিয়া, স্বস্তি শান্তি ভোগ করিতে পারিতাম; কিন্তু তাহা হইল না। মনের অনেকগুলি কথা বলিবার জন্য সেইদিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম; কিন্তু তোমার অশ্রুপূর্ণ মলিন মুখখানি দেখিয়া সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। ইচ্ছা হইল যে, তবে তোমার অশ্রুর সঙ্গে অশ্রু মিশাইয়া আমারে হৃদয়ের জ্বালা কথঞ্চিৎ নিবারণ করি। তাহা পারিলাম না, যেহেতু আমার হৃদয় পাষাণ হইতেও পাষাণ। আমার পিতা অতুল ঐশ্বর্য্যের-অধিকারী, আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা; সুতরাং পিতার স্বর্গারোহণের পর, আমি তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। পিতামাতার ইচ্ছা যে, সদ্বংশ-জাত বরী-পুত্রের সহিত আমার বিবাহ প্রদান করিবেন। তুমি দরিদ্রে তাই কেহ তোমার নাম করিতেও সাহসী হইল না।

পিতৃ-মাতৃ-অর্জ্জিত এই দেহ, তাঁহাদের আজ্ঞানুযায়ী অন্যে অর্পিত হইল; কিন্তু অনেক দিন হইল, তোমার আত্মার সহিত আমার আত্মার সম্মিলন হইয়াছে, ইহা এখন তোমার; সুতরাং ইহা অন্যত্র দান করিবার শক্তি আমার নাই; সেইজন্য আমি এই ভীষণ কার্য্যে ব্রতী হইলাম।

আমি জানিতেছি যে, ইহাতে আমার পিতামাতা অন্তঃকরণে মর্ম্মভেদী বেদনা পাইবেন, তুমিও প্রাণান্তিক যাতনা পাইবে; কিন্তু আমি দ্বিচারিণী নহি। পবিত্র ঈশ্বর-সমক্ষে অনেক দিন হইল, আমি তোমাকে ধর্ম্মতঃ প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তোমারই পদে সেবিকা দাসী হইয়াছি। তুমিই আমার স্বামী—অন্য পুরুষকে ভজনা করিলে আমি ঘোরতর পাপপঙ্কে নিমজ্জিতা হইব; তাই, একটী মহাপাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, অন্য একটী মহাপাপে লিপ্ত হইতেছি। তুমিই হহার উদ্ধার-কর্ত্তা।

বাক্সের মধ্যে যে দুইটী মোহর দেখিতেছ, ইহা দ্বারা তুমি স্বয়ং আমার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে, গয়াধামে বিষ্ণু-পাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করিলে, মহাপাপী পর্য্যন্ত মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। তুমি আমার স্বামী; তুমি আমার নামে সেই গয়াক্ষেত্রে পিণ্ড প্রদান করিলে, অবশ্যই আমি মুক্তিলাভ করিতে পারিব।

তোমার নিকট আমার অনেকগুলি কথা বলিবার ছিল, কিন্তু এখন আমার কিছুই মনে হইতেছে না। আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, অন্ধকার দেখিতেছি।

তোমার নিকট আমার আর একটী অনুরোধ আছে, অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিও। যে অলঙ্কারগুলি দেখিতেছ, উহা আমার। তুমি যাহাকে বিবাহ করিবে, তাহাকে আমার নাম করিয়া ডাকিও এবং সহস্তে আমার ঐ অলঙ্কারগুলি তাহাকে পরাইয়া দিও। আমাকে স্মরণ করিয়া তাহাকে ভাল বাসিও। আমার এই শেষ ভিক্ষা, আজ নিতান্ত পাষাণীর ন্যায় তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি, আমাকে ক্ষমা করিও।

যেস্থানে লোক-রঞ্জনা, বিরহ নাই এবং যে স্থানে চির-সুখ, চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে, আমরা সেই পুণ্যময় নিকেতনে আবার সম্মিলিত হইব।

তোমার অভাগিনী—
সুধামুখী"

সুধামুখীর পত্র শেষ হইল। উপস্থিত যাবতীয় লোক নির্ব্বাক; কাহারও মুখে একটী কথা নাই। একজন অবিনাশকে ডাকিল; কোন উত্তর পাইল না। তার পর কয়েকজন তাহার নিকটে গিয়া দেখিতে পাইল যে, অবিনাশের প্রাণ-বায়ু তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; তুষ-শয্যায় স্বর্ণতনু পড়িয়া রহিয়াছে।

* * * *

সকলে সুধামুখীর সহিত অবিনাশকে শ্মশানে লইয়া উভয়কে এক চিতায় দগ্ধ করিল। বহুব্যয়ে তাহাদের সমাধি-স্থলে নানা কারুকার্য্য-খচিত দুইটী সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়া, স্বর্ণাক্ষরে তাহাদের অবিচলিত প্রণয়ের পরিণামের ইতিহাস ঘোষিত হইল।

শ্রীহিরণকুমার সেন গুপ্ত।

সমাপ্ত।

কেদারের কাহিনী।

আর একদিন কেদার প্রাতঃ ভ্রমণ করিতে যাইতেছে, হঠাৎ পথি-পার্শ্বে এক নগ্ন, কেশ-শুম্ফ (খোসা) পরমহংসকে অবলোকন করিল। অযোধ্যেশীর অনেকেরই বিশ্বাস, প্রাতে খোসার মুখ-দর্শন করা অশুভকর। কিন্তু কেদারের মনে ঐ প্রকার কোন চিন্তা উদয় হয় নাই। সে অনায়াসে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার পরিচয়াদি প্রশ্ন করিল। পরমহংস হাসিতে হাসিতে তদুত্তরে বলিলেন, "আমায় পাঁচটি মুদ্রা দিতে পার"? কেদার তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে বাসায় লইয়া আসিল এবং তথায় তাঁহাকে পাঁচটি রজত মুদ্রা প্রদান করিল। ঐ পরমহংস তাহাতে অত্যন্ত সন্তোষের ভাব প্রকাশ করিলেন। তিনি টাকাগুলি লইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং "বাবু দিয়া হায়, বাবু খুসি দিয়া হায়" এই বুলি বারম্বার বলিতে লাগিলেন। তাঁহার সরলভাব, শিশুর ন্যায় ব্যবহার ও নগ্ন অবস্থা দর্শন হওয়ায়, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় একটি জনতা হইল। তৎপ্রতি অনবধান করিয়া, তিনি কেদারকে কিছু মিষ্টান্নের জন্য অনুরোধ করিলেন। কেদার তৎক্ষণাৎ সমুখস্থ দোকান হইতে এক সের পেঁড়া আনাইয়া দিল। ঐ এক সের পেঁড়া হইতে জনতার যাবতীয় লোককে তিনি ভোজন করাইলেন এবং প্রত্যেকে চারিটি করিয়া পাইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তথাপি পাত্রস্থিত পেঁড়া সম্পূর্ণ পূর্ব্বাবস্থায় রহিল। এতাবৎ কাল পরমহংস কেবলমাত্র "বাবু দিয়া হায়" ইত্যাদি বারম্বার বলিতেছিলেন। অবশেষে সমুদায় পেঁড়াগুলিকে একটি পিণ্ডাকার করিয়া স্বয়ং উহা উদরস্থ করিলেন এবং এইবার সমুদায় পেঁড়া নিঃশেষিত হইল। সকলে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। তখন তিনি "বাবু দিয়া হায়" ইত্যাদি বলিতে বলিতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন এবং শীঘ্রই দৃষ্টি-বহির্ভূত হইলেন।

উপরিউক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে, কেদার যখন বদলী হইয়া উজ্জয়নী হইতে রাজপুতানার অন্য এক স্থানে যাইবে, সেই সময় এক দিন অতি প্রত্যূষে কেবল মাত্র—শয্যা হইতে উঠিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বহির্ব্বাটিতে পদার্পণ করিয়াছে, হঠাৎ সেই সময় কে যেন দ্বারে আঘাত করিল। সত্বর দরজা খুলিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিল যে, মহারাজা হোলকার স্বয়ং তাহার দ্বারে দণ্ডায়মান্। তাহার দৃষ্টিকে অবিশ্বাস করিয়া সে কিয়ৎকাল চক্ষু মুদ্রিত করিল এবং পুনরায় চাহিয়া দেখিল যে, সেই মহারাজ হোলকার-সদৃশ মূর্ত্তি, সেই মন্দি-মুকামুয় পরিচ্ছদ; সন্দেহ মাত্র নাই। কেদার নির্ব্বাক্! তিনি মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে কেদারের মোহ ভাঙ্গিল। "তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না; আমি সেই নগ্ন সন্ন্যাসী; কোন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমায় এই পরিচ্ছদ দিয়াছেন।" কেদারকে তথাপি নীরব দেখিয়া, তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"বৃথা কালক্ষেপের সময় নাই, বিরলে তোমায় একটি অত্যাবশ্যক কথা বলিব; শ্রবণ-পুথ হইতে সকলকে অন্তরীত যাইতে বল।" কেদার তাহাই করিল। তখন যোগীপুরুষ কেদারকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

গুরুর আবশ্যকতা।

"ভ্রান্ত পথিককে পথ দর্শন করাইতে যেমত পথপ্রদর্শকের আবশ্যক, তদ্রূপ আত্মস্তরী জন, নৈসর্গিক মায়া ও প্রেমের গোলক-ধাঁধায় নিজের পরলোকের পথ ভুলিয়াছে, তাহাকে সুপথে লইবার নিমিত্ত কোন বিশেষ লোকের প্রয়োজন। সেই লোককে "গুরু" আখ্যা দেওয়া যায়। এই সম্বন্ধে একটি গল্প বলি, শুন,—

"এক ধনুষ্পণি ব্যাধ একটি আসন্নপ্রসবা ব্যাঘ্রীর পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া উহাকে শরবদ্ধ করায়, সে গর্জ্জন করিয়া একটি খালের পরপারে লম্ফ প্রদান করাতে, তাহার ভ্রূণ তীরে পতিত হইল। এক পারে জীবিত ভ্রূণ ও অপর পারে তাহার মাতা মৃত পতিত রহিল। সেই খানে একটি শৃগালী ঐ সদ্যপ্রসূত ব্যাঘ্র-শাবককে গৃহে লইয়া নিজ স্তন্যদুগ্ধে মাতৃবৎ যত্নে পালন করিতে লাগিল। শৃগালালয়ে ব্যাঘ্র-শিশু দিনদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ এক দিবস একটি ব্যাঘ্র দেখিল, অদূরে একটি ব্যাঘ্র-শিশু অবাধে শৃগালপাল মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে। যেখানে খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধ, তথায় ঐপ্রকার শান্তি ও মৈত্রীভাব দেখিয়া, সে বংপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। সে তাহাকে অন্তরালে ডাকিয়া তাহার সঙ্গীদিগের সহিত তাহার পার্থক্য ও তাহার নিজের সহিত জাতি ও আকৃতির সাদৃশ্য বুঝাইবার বহু প্রয়াস পাইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। অবশেষে ঐ ব্যাঘ্র ঐ শিশুকে এক নদীতটে লইয়া প্রকৃতির দর্পণে ঐ স্বচ্ছজলে তাহার ও নিজের প্রতিবিম্ব দেখাইল। এইবার ঐ ব্যাঘ্রশাবক নিজের কুলশীল সম্বন্ধে বুঝিতে সক্ষম হইল। এই মূলের উপদেশে স্বতঃই প্রকাশ পাইতেছে—গুরু ব্যতীত কোন ব্যক্তি নিজে নিজেকে চিনিতে পারে না।

গুরু পইবার উপায়।

"যেমন প্রত্যেকেরই গুরু-উপদেশ প্রয়োজনীয়, সেইরূপ প্রকৃত গুরু-নির্ব্বাচন করাও আবশ্যক। বিশেষ ক্লেশ ও পরিশ্রম স্বীকার ও আত্মসংযম ব্যতীত; বিনা-অনুসন্ধানে ও সহজে প্রকৃত ও যথার্থ গুরু পাওয়া সুকঠিন। এই গল্পটি বিশেষ মনোযোগের সহিত শুন।

"এক ব্যক্তি উপযুক্ত গুরু-লাভাশায় বহুল চেষ্টা করিয়াও এতদিন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অবশেষে সে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, জঙ্গলে জঙ্গলে নিজের অভীষ্ট গুরু-অন্বেষণে ফিরিতে লাগিল। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্তি-ভাজন সমাধিস্থ এক তাপসকে দেখিতে পাইল। তাঁহাকে দেখিয়া, নিতান্ত হৃষ্টমনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিল,—"হতভাগা আমি অতিকষ্টে আপনাকে লাভ করিয়াছি; আপনিই আমার গুরু-দেব।" তিনি কহিলেন,—"না, আমি তোমার গুরু নই; তোমার গুরুদেব অমুক পর্ব্বতে তপস্যায় রত আছেন।" ইহা শুনিয়া সে বলিল,—"যাহা হউক, যখন আপনি আমার প্রকৃত গুরুর নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, তখন আপনিই আমার প্রথম গুরু।" এই বলিয়া, সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ-অভিমুখে যাত্রা করিল। বহু পথপর্য্যটনের পর, সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিল। সে তথায় এক অতি কুশিং, ব্যাধি ও জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল। দেখিল যে, সেই ব্যক্তি নিদারুণ যাতনায় ও সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠা লিপ্ত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। প্রথম দর্শন যদিও প্রীতিপ্রদ হয় নাই, তথাপি নিরস্ত না হইয়া, সে মনে মনে তর্ক করিল,—যখন এই স্থানে আমার গুরুলাভ হইবার কথা, তখন এই ব্যক্তিই আমার গুরুদেব।" সুতরাং তাঁহাকেই গুরু বলিয়া মানিতে কৃতসংকল্প হইল;

অসঙ্কোচে ঐ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রস্রবণ-বারি দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া দিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি কাতর ও কিঞ্চিৎ রুষ্টস্বরে তাহাকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। তাঁহার নিষেধ-বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, সে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। এই সময় সে হঠাৎ দেখিল যে,তাঁহার পদদ্বয় একটি শিবলিঙ্গের উপর পতিত হইয়াছে। ব্যস্ত হইয়া পদদ্বয় তথা হইতে সরাইয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল যে, উহা পূর্ব্ববৎ শিবলিঙ্গের উপর পড়িয়াছে। সেবারও তাহা সরাইয়া দিল। সেই রুগ্ন ব্যক্তি ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপে সে যতবার তাঁহার পদদ্বয় শিবলিঙ্গ হইতে সরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, ততবারই ঐ প্রকার দেখিল। সে ব্যক্তি নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল। ক্রমে ঐ রুগ্ন ব্যক্তির পীড়া উপশমিত হইল ও অবশেষে তিনি অত্যল্প সময়-মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সেই ব্যক্তিকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি চাও?" সে তুষ্টিষ্ট হইয়া নিজের উদ্দেশ্য জানাইল। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন যে,—"প্রথমে তুমি আমার শিষ্য হইবার উপযুক্ত কি না, তাহার পরিচয় দাও; পরে এ বিষয় আমি বিবেচনা করিব। আপাততঃ তুমি আমাকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধমতম বস্তুটি আনিয়া দাও।" ইহা বলিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। সে আবার নানা স্থান ঘুরিয়া, অধমতম জিনিষ মিলাইতে না পারিয়া, নিতান্ত দুঃখিত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছে, সেই সময় পথিমধ্যে সহসা এক বিকট-প্রকৃতি তাহার নয়ন-গোচর হইল। সে যতই ঐ কৃমি ও কীটের আবাসভূমি সেই নরকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই পূতিগন্ধ সমধিক নির্গত হইতে লাগিল। কি মনে ভাবিয়া সে এই স্থির গভীর চিত্তায় নিমগ্ন হইল। মনে মনে নানা প্রশ্ন করিয়া সে অবশেষে ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত করিল যে, "অহং" অপেক্ষা অধমতম আর এ জগতে কি হইতে পারে? সে তাহার গুরুদেবের নিকট ফিরিয়া গিয়া আমূল বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করাইল। তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"হাঁ! তুমি আমার শিষ্য হইবার উপযুক্ত। তুমি যথার্থ গুপ্ত ও সার কথা বুঝিয়াছ। ইহা সর্ব্বদা যেন স্মরণ থাকে যে, "অহং" সর্ব্বাপেক্ষা অধম। সতত অহংকে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিও। রাজযোগের সোপানই এই।"

এই বলিয়া গুরু শেষ করিয়া,যোগী কেদারকে বলিলেন,—"কখনও বিস্মৃত হইও না যে,আত্মজ্ঞানই এই একমাত্র কথা—যোগের মূলমন্ত্র।"

কেদারের জীবনের অবশিষ্ট অংশের সহিত আমাদের প্রবন্ধের বিশেষ সংশ্রব না থাকায়, উহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। আমরা উপরে অতি সংক্ষেপে এক বৃহৎ বিষয়ের বর্ণনার প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সে বিচার আমাদিগের পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। কিন্তু ইহা আমাদের চিরদিনের আশা যে,উপরি-উক্ত প্রকৃত ঘটনাবলী পাঠে যদি একজন অবিশ্বাসীর হৃদয়েও বিশ্বাসের উদ্রেক হয়, তবে আমাদের সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ভবিষ্যতে যোগীদের অনেক অনেক আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত বিবৃত করিবার মানস আছে।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, বি-এল।

নেপোলিয়ন।

[ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।]

নেপোলিয়ন যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন, শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। সন্ধ্যার সময় লোনোটা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন; পরদিন প্রাতে আবার অন্য একযায়গায় যুদ্ধ হইবে। সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া সৈন্যেরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পরদিন যে যুদ্ধ হইবে, রাত্রেই তাহার সমস্ত আয়োজন করিতে হইবে। অন্য কাহারও উপর যে ভার দিবেন, এমন উপযুক্ত লোক দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং সমস্ত রাত্রি নিজেই ঘোড়ায় চড়িয়া কার্য্য-পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। দ্রুত-গমনে ক্লান্ত হইয়া একটী একটী করিয়া পাঁচটী ঘোড়া মরিয়া গেল;আরোহীর কিন্তু তখনও বিশ্রাম নাই! তিনি কখন রাত্রে ৩ঘণ্টারও অধিক নিদ্রা যাইতেন না। তাঁহার মত অবিশ্রান্ত মানসিক পরিশ্রমও অল্পলোকেই করিতে পারে। যে সময় তিনি স্কুলে পড়িতেন, সেই সময় একদিন তাঁহাদের শিক্ষক একটী কঠিন অঙ্ক কসিতে দেন। উহা সমাধান করিবার জন্য নেপোলিয়ন, নিজের পাঠাগারে একাকী ক্রমাগত ১২ ঘণ্টা একাগ্রচিত্তে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দীনদুঃখীর প্রতি তিনি চিরকালই সদয় ছিলেন। বাল্যকালে একদিন তিনি ও তাঁহার ভগিনী এলিজা বাগানে খেলা করিতেছেন। তাঁহাদের জননী লিটিশিয়া প্রজাপতি ধরিবার একখানি জাল দিয়া বলিলেন,—তোমরা বাগানের বাহিরে যাইও না; এখানে দুজনে মিলিয়া খেলা কর। জননী লিটিশিয়া চলিয়া গেলে,চঞ্চলপ্রকৃতি বালকবালিকা মাতৃ-উপদেশ বিস্মৃত হইয়া বাগানের বাঁধুর্ভাগে খেলা করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় একটী ছোট মেয়ে মাথায় ডিম লইয়া বিক্রয় করিতে যাইতেছে। এলিজা হঠাৎ ধাক্কা দিয়া বালিকার ডিমগুলি ভাঁঙ্গিয়া দিল। ডিমগুলি ভাঙ্গিয়া গেল দেখিয়া বালিকা কাঁদিতে লাগিল। এলিজা কিন্তু ইচ্ছা করিয়া সেগুলি ভাঙ্গিয়া দেয় নাই; হঠাৎ ধাক্কা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তথাপি তাহার মনে বড় ভয় হইল। নেপোলিয়নকে ডাকিয়া বলিল,—"চল,আমরা পলাইয়া যাই। ও আমাদের চেনে না; সুতরাং মা এ ব্যাপার জানিতে পারিবেন না।" বালক নেপোলিয়ান কিন্তু দুঃখীর এরূপ অনিষ্ট করিয়া পলায়ন করা গর্হিত কার্য্য বুঝিয়াছিলেন। কাজেই তিনি ভগিনীর প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া, মাতার নিকট মাসিক প্রাপ্য জলখাবারের পয়সা অগ্রিম লইয়া, বালিকার ক্ষতিপূরণ করিলেন।

তাঁহার অবস্থা যখন উন্নত হইয়াছিল, সেই সময় তিনি একদিন এক দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রিয়েন নামক বিদ্যালয়ে নেপোলিয়ন নামে এক বালক পড়িত; তুমি তাহাকে চিনিতে কি?"

"তাকে খুব জানি। স্কুলের অনেক ছেলে, ফাঁকি দিবার উদ্দেশে ধার করিয়া আমার নিকট খাবার খাইত। নেপোলিয়ন তাহাদের চুরিজুয়াচুরি ধরিতে পারিয়া,তাহাদের নিকট হইতে আমার প্রাপ্য আদায় করিয়া দিতেন। তাঁহার ভয়ে কেহ আমাকে ফাঁকি দিতে পারিত না।"

নেপোলিয়ন তখন তাহাকে বলিলেন,—

"আমার নিকট তোমার এখনও কিছু পাওনা আছে।" এই বলিয়া তাহার প্রাপ্য মুদ্রা দেন।

তিনি সহায়হীন শত্রুর অনিষ্ট করেন্তেন না। সালিসেল্‌ডির চক্রান্তে একবার তিনি কয়েক দিনের জন্য বন্দী হয়েন। সেই সালিসেল্‌ডির যখন প্রাণদানের বিধান হয়, তখন তিনি প্রাণ-ভয়ে এক রমণীর গৃহে আশ্রয় লয়েন। শাসন-কর্ত্তারা ঘোষণা করিয়া দিলেন,—"যে সালিসেল্‌ডির সন্ধান দিবে, সে পুরস্কার পাইবে; এবং যে তাহাকে আশ্রয় দিবে, তাহার শাস্তি হইবে।" নেপোলিয়ন নিজ-শত্রুর গুপ্ত সন্ধান জানিতেন; কিন্তু এরূপ বিপদগ্রস্ত অসহায় ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করা কাপুরুষের কার্য্য বিবেচনা করিয়া, তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকেন।

নেপোলিয়নের একসময় কোন কার্যকর্ম্ম ছিল না। অতি কষ্টেই দিন যাইতেছিল। কোন খানেই চাকরী যোগাড় করিতে পারেন নাই। এমন সময় তাঁহার মার এক পত্র পাইলেন, "তিনি রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য দেশত্যাগ করিয়া মার্শেলিস-নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থের অনা-টনে তাঁহার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছে।" এক নিজের কষ্ট, তাহার উপর মার খেদোক্তিপূর্ণ পত্র পড়িয়া নেপোলিয়ন অধীর হইয়া পড়িলেন। আত্মহত্যা করিয়া সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করি-বেন, স্থির করিলেন। সেই উদ্দেশ্যে নদীতীরে গিয়া জলে ঝাঁপ দিবেন মনে করিতেছেন, এমন সময় ডিমার্সিস্ নামে তাঁহার এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। দুই বন্ধুর বহুদিন পরে সম্ভা-ষণ, তথাচ নেপোলিয়নের মুখে যথোচিত আনন্দ-চিহ্ন দেখা গেল না। ডিমার্সিস্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমায় এমন বিমর্ষ ও অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন? তোমাকে আত্মহত্যায় উদ্যত উন্মাদের মত দেখাইতেছে।" নেপোলিয়ন তখন তাঁহাকে নিজ অবস্থা সমস্ত বলিলেন। "এই কারণে তুমি আত্মহত্যা করিবে?"—ইহা বলিয়া, ডিমার্সিস্ তাঁহাকে ৬ হাজার সুবর্ণের 'ডলার' দিলেন। নেপোলিয়ন নিজ মাতাকে ঐ মুদ্রা পাঠা-ইয়া দিলেন। কিন্তু তাহার পর হইতেই তাঁহারি সেই বাল্যসুহৃদকে আর দেখিতে পাইলেন না। পরে যখন তাঁহার অভ্যুদয়ের অবস্থা আরম্ভ হইল, সেই সময় একদিন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। এতদিন তাঁহার অজ্ঞাতবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ডিমার্সিস্ উত্তর করিলেন,—"আমার কখনও অর্থের অনাটন হয় নাই; সেইজন্য তোমাকেও ঋণ-পরিশোধ করিতে বলি নাই। তুমি যেন শোধ করিতে পারিবে, তাহা আমি জানিতাম। আমি নির্জ্জনে মনোমত পুস্তক পাঠ করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছি। যদি তুমি আমার সন্ধান পাও, তবে সুখের হন্তারক হইবে বলিয়া গোপনে কাল কাটাইতেছিলাম।" এ সকল কথা শুনিয়াও নেপোলিয়ন কিন্তু তাঁহাকে আর ছাড়িলেন না। তাঁহাকে একটি উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন ও ৬ হাজার সুবর্ণ 'ডলারের' পরিবর্ত্তে ৬০ হাজার 'ডলার' প্রদান করিলেন।

প্রজা-সাধারণ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট কি বিরক্ত, জানিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করিতেন। একদিন কোন দোকানে গিয়া, এ-জিনিষ ও-জিনিষ কিনিতে কিনিতে, দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নেপোলিয়ন সম্বন্ধে তোমায় কি মত?" দোকানী নেপোলি-য়নের অত্যন্ত সুখ্যাতি করিতে লাগিল। তখন তিনি বলিলেন,—"আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। হয় ত আমরা এক অত্যাচারীকে তাড়াইয়া আর এক অত্যাচারীকে সিংহাসনে বসাইয়াছি।" এই সকল শুনিয়া, সেই দোকানী এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিল যে, নেপোলিয়ন সেখান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।

আর একদিন একটি স্ত্রীলোক ব্যস্ত হইয়া যাইতেছে। নেপোলিয়ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি অত তাড়াতাড়ি যাইতেছ কেন?"

সম্রাট নেপোলিয়নকে দেখিতে যাইতেছি সকলে বলিতেছে, তিনি এই পথ দিয়া যাইবেন।

"তাঁহাকে দেখিতে তোমার এত উৎসাহ কেন? একজন প্রজাপীড়ক রাজাকে তাড়াইয়া তোমরা আর একজন নির্দ্দয় লোককে সিংহা-সনে বসাইয়াছ। আগে বুর্বন-বংশীয়েরা তোমা-দের রাজা ছিল; এখন সে যায়গায় নেপোলিয়ন বসিয়াছে—এই মাত্র তফাৎ।"

স্ত্রীলোকটি নিস্তব্ধ থাকিয়া উত্তর করিল,—"বুর্বন-বংশীয়েরা আভিজাতদিগের রাজা ছিল; কিন্তু নেপোলিয়ন আমাদের জন-সাধারণ লোকের রাজা।"

ফলতঃ এই সকল উদাহরণ হইতে জানিতে পারা যায়—নেপোলিয়নের রাজসিংহাসন প্রজা-দিগের হৃদয়ে স্থাপিত ছিল।

রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি প্রজা-দিগের সাংসারিক ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

একদিন তিনি শিবিরের নিকট একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। সে তাহার ৫ বৎসর বয়স্ক পুত্রের হাত ধরিয়া যাইতেছে ও কাঁদিতেছে। নৈপোলিয়ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাঁদিতেছ কেন?" স্ত্রীলোক কোন উত্তর করিল না; কিন্তু বালকটি বলিল,—"মাকে বাবা মারিয়াছে, তাই মা কাঁদিতেছে।"

"তোমার বাবা কোথায়?"

"ঐখানে তিনি পাহারা দিতেছেন" বলিয়া, বালক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। নেপোলিয়ন সেই স্ত্রীলোককে তাহার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোক ভাবিল,—"ইনি কাপ্তেন, আমার স্বামীকে শাস্তি দিবেন বলিয়া নাম জানিতে চাহিতেছেন।" সেইজন্য কিছুতেই সে স্বামীর নাম বলিল না। তখন নেপোলিয়ন বলিলেন,—"বোধ হয় তুমি কোন দোষ করিয়াছ?"

স্ত্রীলোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি কোন দোষ করি নাই। আমার স্বামীর অনেক সংগুণ আছে। তিনি আমাকে ভালও বাসেন। দোষের মধ্যে বিনা-কারণে আমাকে কখন কখন সন্দেহ করেন। যে সময় রাগেন, তাঁহার জ্ঞান থাকে না; আমাকে বড় মারেন। এ ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন দোষ নাই।" কিন্তু রমণী কোন ক্রমেই স্বামীর নাম প্রকাশ করিল না। নেপোলিয়নের আদেশে একজন কর্ম্মচারী তাহার স্বামীর সন্ধান করিয়া তাহাকে নেপো-লিয়নের সম্মুখে উপস্থিত করিল। সেই প্রহরী নেপোলিয়নকে পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। স্ত্রীর প্রতি অসদ্ব্যবহারের জন্য নেপোলিয়ন তাহাকে ভৎর্সনা করিলেন। সে বলিল,—"আমার স্ত্রীকে পর-পুরুষের সহিত কথা কহিতে কতবার নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু সে আমার কথা গ্রাহ্য করে না। সর্ব্বদা আমার সঙ্গীদের সহিত বকামি করে।"

"অপরের সহিত কথা কহিলে দোষ কি? আমার কথা শুন; তোমার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিও না। যদি সে দুষ্কর্ম্ম করে, তাহাহইলে কখনই তাহাকে প্রফুল্ল দেখিতে পাইবে না। তোমার এরূপ ব্যবহারের জন্য সম্রাট যদি তোমায় তিরস্কার করেন, তাহাহইলে তুমি কি করবে?"

"স্ত্রী আমার, তাহার সহিত আমি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারি। সম্রাট যদি এ সম্বন্ধে আমায় কিছু বলেন, তাহাহইলে তাঁহাকে আমি বলিব—আপনি আপনার রাজ্য-রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করুন। আমার স্ত্রীর সহিত

কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা আমি নিজে ঠিক করিব।"

নেপোলিয়ন হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"যুবক তুমি সম্রাটের মুখের কথা কাড়িতেছ।"

প্রহরীর সম্মুখে যেন হঠাৎ বজ্রাঘাত হইল। সে সভয়ে মৃদুস্বরে কহিল,—"যখন আপনি আজ্ঞা করিতেছেন, তখন তাহাই হইবে। আমি আপনার আদেশ পালন করিব।"

সেই অবধি উহারা স্ত্রীপুরুষে নির্বিবাদে পরমসুখে কাল কাটাইতে লাগিল।

একদিন তিনি সভায় বসিয়া আছেন; এমন সময় সংবাদ পাইলেন, একজন পথিককে এক-জন ডাকাতে মারিয়া ফেলিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ডাকাতের দল ধরিবার জন্য সৈন্য পাঠাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া কোন লোক বলিলেন,—"সেই পথিক কি আপনার কোন আত্মীয়—যে তাহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন?" নেপোলিয়ন উত্তর করিলেন,—"সেই পথিক আত্মীয় অপেক্ষাও প্রিয়; কারণ, ঈশ্বর ওরূপ অসহায় দরিদ্র লোকের রক্ষার ভার আমার উপর দিয়াছেন।"

বিপ্লবের সময় তাঁহার যেরূপ উপস্থিত বুদ্ধি যোগাইত, তাহা অসাধারণ। কোন সময় এক সহস্র সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ন অবস্থান করি-তেছেন; এমন সময় উহার চতুর্গুণ সেনা-সহ অস্ট্রীয়-সেনাপতি তাঁহাকে ঘেরিয়া করিয়া দূতদ্বারা আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। দূতের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, নেপোলিয়ন প্রথমতঃ নিজসৈন্য-দিগকে মণ্ডলাকারে স্থাপিত করিয়া, পশ্চাৎ দূতের চক্ষু বস্ত্রাবৃত করাইয়া নিজসমক্ষে আনা-ইলেন। কৌশলে-সজ্জিত এক সহস্র সৈন্য দূতের চক্ষে বহুসংখ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। নেপোলিয়ন রুক্ষস্বরে দূতকে বলিলেন,—"তোমাদের বড় আস্পর্দ্ধা যে, বহুসংখ্যক সৈন্য-মণ্ডল-বেষ্টিত নেপোলিয়নকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিতেছ। যাহারা তোমাকে পাঠা-ইয়াছে, তাহাদের নিকট ফিরিয়া গিয়া বল—যদি তাহারা ৫ মিনিটের মধ্যে অস্ত্রত্যাগ না করে, তাহাহইলে তাহাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যু সন্নিকট।" নেপোলিয়নের-চাতুরিতে দূত প্রতা-রিত হওয়ায়, অস্ট্রীয়-সেনাপতি নিজের বিপুল সৈন্য নেপোলিয়নের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র লাহিড়ী, বি-এ।

হতাশ-প্রেম।

এখন তাহার সনে,
দেখা হ'লে সংগোপনে,
কাতরে নিশ্বাস ফেলি ধীরে চলি যায়;
প্রাণের বাসনাচয়,
যেন মিটিবার নয়,
বিষণ্ণ নয়ন দুটী ব'লে আর চায়।

আশা দিয়ে বিসর্জ্জন,
ভাবহুদি অনুক্ষণ,
ছুঁওনা ছুঁওনা ছায়া বলে যেন ছলে,—
চাহি না চো'খের দেখা,
প্রাণে থা'ক বিনিময়,
কাঁদিব জনম ভরি স্মৃতি করি কোলে।

হেথাকার দেহ নাথ,
এ দেহে দিও না হাত,
এ দেহ এখানে রবে মৃত্তিকার সনে;
পরাণে পরাণে গাঁথা,
স্বরের পরাণী মোরা,
থাকে যদি ভালবাসা মিলিব সেখানে।
সুরতের ভালবাসা,
ভগ্ন-প্রণয়ের ভাষা,
জানে না জগতে কেহ, জানিবে না আর;
শৈশবে খেলার ঘরে,
মালা গেঁথে অরজর,
সাক্ষী তার রবে—স্বপ্ন, নয়ন আমার।
অমনি সম্মুখে মোর,
স্মৃতির আলেখ্যখানি,
চিত্রিত অতীত চিত্রে পড়ে উলটিয়া;
জীবনের অন্তরালে,
বহুদূরে দেখি এক,
জীবন্ত প্রেমের ছবি প্রাণ আলিঙ্গিয়া।
উজ্জ্বল বিমানে ছুটী,
আত্মার মিলন যেন,
চারিধারে প্রতিধ্বনি ডাকে আয় আয়;
সুমুখী সুমুখ হ'তে,
দূরে মিশাইয়া যায়,
হতাশ প্রেমিক শুধু করে হায় হায়!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চীন-জাপান।

সন্ধির চেষ্টা।—চীনেরা সর্ব্বতোভাবে সন্ধির চেষ্টা পাইতেছে। চীনসম্রাট, বৈদেশিক বিভা-গের সহকারী সদস্যকে জাপানে পাঠাইতেছেন এবং যে কোন উপায়ে তিনি সন্ধিস্থাপনা করিয়া আসিবেন। শুনা যায়, মাঞ্চুরিয়া-প্রদেশে জাপানীদিগের বিপুল বিক্রম দেখিয়াই, চীনগণ সন্ধির জন্য এতদূর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সাংহাইয়ের একখানি সংবাদপত্রে যুদ্ধের অনেকটা সঠিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে; ঐ সংবাদপত্রে প্রকাশ—জাপানীরা, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ নগদ টাকা ছাড়াও, নিম্নলিখিত সর্ত্তসমূহের অভিলাষী; (১) বৈদে-শিক যে কোন রাজার বিরুদ্ধে চীনকে জাপা-নের সহায়তা করিতে হইবে; (২) চীনের যে কোন প্রদেশে জাপানের অবাধ বাণিজ্য থাকিবে, এবং চীনের উন্নতির ভারও অনে-কাংশে জাপান লইবেন; (৩) চীনের সৈন্যবল ও বাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ধির জন্য জাপানের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। সংবাদপত্রের সর্ত্তগুলি যাথার্থিক হইলে, চীনের অধঃপাতের চরমই হইবে—সুতরাং আর ভাবনার বিষয় কি?

ডেপুটির বিচার।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ফোরডাইস্‌সাহেব। তাঁহার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে নানা কথা প্রকাশ। সেই সকল কথা আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া, উকীল মহেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় অভিযুক্ত। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ বসু প্রমুখ ঢাকার প্রধানপ্রধান উকিল ও মোক্তারগণ এক্ষণে ডেপুটী সাহেবের ঐরূপ নানা দোষের উল্লেখ করিয়া, মাজিষ্ট্রেটের

কাছে এক আবেদন করিয়াছেন। ডেপুটী সাহেব ঘুষখোর ও অত্যাচারী—এইরূপ-ধরণ অভিযোগ মাজিষ্ট্রেট দোষাদোষ অনুসন্ধান করিতেছেন। বিচার চলিতেছে।

সাহিত্য-সমালোচনী সভা।

সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য জয়দেবপুর-সাহিত্য-সমালোচনী সভার অশেষ সাহায্য। সভার প্রতিষ্ঠাতা বদান্যবর রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর মহোদয়ের সাহিত্যানুরাগ প্রবল; এতদুদ্দেশ্যে অকপটে তিনি বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রধান সচিব শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়েরও তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি। তাঁহাদের উভয়ের উদ্যোগে সভার দ্বারা সাহিত্যের ও দেশের যে অশেষ কল্যাণসাধন হইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সে সকল বিষয় সাধারণের অপরিজ্ঞাত নহে। সংপ্রতি আবার উক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ঢাকা-কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ব্রাণ্ড সাহেবের রচিত "হিন্দু-জ্যোতিষ"-সম্বন্ধীয় পুস্তকের সম্পূর্ণ মুদ্রণব্যয়-স্বরূপ দুই সহস্র টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উক্ত অধ্যাপক মহাশয় একজন বহুদর্শী পণ্ডিত; এমন কি, তাঁহার ছাত্রগণও অনেকে এখন সাহিত্য-সংসারে গণ্য-মান্য। তাঁহার রচিত গ্রন্থ যে অসীম প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, তাহা বলাই বাহুল্য। এরূপ গ্রন্থ প্রকাশের সহায়তা করা রাজা বাহাদুর অবশ্যই অশেষ পুণ্যকার্য্যের মধ্যে, সন্দেহ নাই। আমরা উপরোক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের অপরাপর ছাত্রমণ্ডলীকেও নিখিলপ্রকারে তাঁহার পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার-বিষয়ে সহায়তা করিতে অনুরোধ করি।

বিবিধ।

মাদাগাস্কার-যুদ্ধ।—দুইটী যুদ্ধে ফরাসীদিগের নিকট মাদাগাস্কারের হোভারী পরাজিত হইয়াছে।

রুস-সম্রাটের শান্তি-ইচ্ছা।—সৈন্যবল-পুষ্টির জন্য সংতোষ প্রকাশ করিয়া, রুস-সম্রাট এক্ষণে কেবল রাজ্যের শান্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

যাত্রী-আইন।—পুরী-যাত্রীদের জন্য যাজপুরে যাত্রী-আইন জারি হওয়ায়, তথাকার লোকেরা বড়ই আপত্তি তুলিয়াছে।

প্রাণদণ্ডের পুনর্ব্বিচার।—বাণ্ডার জজ আসামীর অনুপস্থিতি-সময়ে যাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টে র জজেরা তাহার পুনর্বিচারের আদেশ দিয়াছেন।

ব্রিটিশ-দ্বীপে ভয়ানক ঝড়।—গত ২রা ডিসেম্বর ঝড় হয়। অনেক জাহাজ ডুবিয়াছে। রেলগাড়ি উল্টাইয়া গিয়াছে। অনেক লোকজনও মারা গিয়াছে।

প্যাটেণ্ট ঔষধ।—পাটেণ্ট ঔষধে প্রায় বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আমরা ৬৬ নং রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানার ব্রোম্যুলসন কোম্পানীর দাদের ঔষধের গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ইহাতে বিনা-যন্ত্রণায় ২৩ ঘণ্টায় দাদ আরাম হয়; অনিষ্টকর পারদাদি উহাতে নাই। শিশির দাম ৷৷ আনা মাত্র। ইহা সাধারণে ব্যবহার করিতে পারেন।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

৯ষ বর্ষ। ১১ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। ৩৭শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মমত।*

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রণীত কোন গ্রন্থ বা পদাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অথবা ছিল বলিয়াও জানা যায় না। তবে কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক ও দুই একটী বাঙ্গালা পদ, তিনি সময় সময় ভাবাবেশে উচ্চারণ করিতেন; ঐগুলি মহাপ্রভুর স্ব-রচিত বলিয়া বৈষ্ণব-গ্রন্থে গৃহীত ও বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ধর্ম্মমতের সুন্দর আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা উহা অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বংশীশিক্ষা-প্রণেতা পরমপণ্ডিত ও ভক্ত-প্রবর শ্রীপ্রেমদাস শ্রীচৈতন্য অবতারের প্রয়োজন উপলক্ষে লিখিয়াছেন :—

"কলি-পাপতাপাচ্ছন্ন দেখি ভক্তগণ।
উদয় হইয়া প্রভু শচীর ভবনে॥
দুই ভাবে দুই কার্য্য করিলা সাধন।
অন্যে ইহা নাহি জানে জানে ভক্তগণ॥
বহিরঙ্গ ভাবে হরেকৃষ্ণ রাম নাম।
প্রচারিলা জগন্মাঝে গৌর গুণধাম॥
অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে।
রসরাজ উপাসনা করিলা অর্পণে॥"

অর্থাৎ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সাধারণ জীবগণের পরিত্রাণ জন্য, নাম-সংকীর্ত্তনরূপ ধর্ম্ম প্রচার করিলেন; এবং বিশেষ অন্তরঙ্গ-স্বরূপ, রামানন্দ রায় প্রভৃতি ভক্তগণ সহ "রসরাজ উপাসনা তত্ত্ব" সাধন ও যাজন করিলেন।

এইদ্বিবিধ সাধনের মধ্যে আমরা বহিরঙ্গ সাধন-প্রণালীরই আলোচনা করিব। অপরবিধ সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল, "তাহা "রসিকত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধনিচয়ে পূর্ব্বে বলিয়াছি। সংপ্রতি "রসরাজ

---

*পাবনা—জগন্নাথ-প্রদায়িনী সভার ঐ প্রবন্ধটী পঠিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ-শ্রবণে শিক্ষিত সভ্যমণ্ডলী একই প্রীত হইয়াছিলেন যে, সভায় উপস্থিত পুজ্যপাদ মদনগোপাল গোস্বামী ও পরিব্রাজক সত্যানন্দ স্বামী প্রবন্ধ-লেখককে একটী উপাধি দান করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক তাহা অস্বীকার করায়, সভা হইতে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদানের প্রস্তাব হয়। কিন্তু লেখক-অসাক্ষাতে উহা সম্ভবিত হওয়ায়, পরিশেষে তাঁহাকে যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাভঙ্গ করেন।

উপাসনা” কি, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্য, [illegible] হইতে আর একটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। যাঁহারা ভাবুক ও রসজ্ঞ, তাঁহারা আমাদিগের পূর্ব্ব-প্রদর্শিত ব্যাখ্যার সাহায্যে, এই স্থানটীর মর্ম্মগ্রহণ করিবেন।

“সহস্র পত্রক যুক্ত গোকুল-পদ্মের।
কর্ণিকা উপরে ধাম আনন্দ কৃষ্ণের॥
সর্ব্বসুখময় ধাম মহা যন্ত্রাকার।
প্রকৃতি বলিয়া হয় আধান যাহার॥
অনুরাগ বর্ণ তার ষট্ কোন বিশিষ্ট।
বজ্রর কীলক তায় কহে যত শিষ্ট॥
ষড়ঙ্গবিশিষ্ট ষট্পদী সেই ধাম।
সেই সে ধামের হয় বৃন্দাবন নাম॥
সেই বৃন্দাবনান্তে এক পদ্ম হয়।
অষ্টদল সেই পদ্ম কহিনু নিশ্চয়॥
অষ্টদলে অষ্ট সখী করেন বিরাজ।
শুন তার মধ্যে যৈছে রহে রসরাজ॥
সে পদ্মের কর্ণিকার উপরে বেদিকা।
রত্নবেদী বলি যার আছে আখ্যায়িকা॥
সে বেদী উপরে গন্ধযুক্ত সুকোমল।
অতি মনোহর সদা করে ঝলমল॥
ত্রিধারে শোভিত তার উত্তমোপাধান।
সেই সে আসন মাঝে কৃষ্ণ ভগবান॥
হ্লাদিনী প্রকৃতি সহ করেন বিরাজ।
নিজ নিজ সেবা করে সখীর সমাজ॥
জ্যোতির্ম্ময় মহামন্ত্র কামবীজ সহ।
আনন্দাহ্লাদিনী তথা শোভে অহরহ॥
প্রেমানন্দ মহানন্দ রসের স্বরূপ।
আনন্দাহ্লাদিনী হয় জানি রসভুক॥
সেই রসরাজ কৃষ্ণ সদা শক্তিমান।
পরম পুরুষ রসরূপ ভগবান॥
পরমা প্রকৃতি সেই হ্লাদিনী প্রকৃতি।
পরম পুরুষ কৃষ্ণ হ্লাদিনীর পতি॥”

শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল-মূর্ত্তিকে হৃদপদ্মে এবম্বিধ ধ্যান করতঃ সাধক “কামবীজ-যুক্ত রসন মন্ত্র” দ্বারা সেই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিবেন। সেই কামবীজ কি? রসনমন্ত্র বা কি? এবং উপাসনার অন্যান্য ক্রমই বা কি? এ সকল কথা সাধককে স্বীয় গুরুদেবের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। এ সাধন অতি গুহ্য; তাই নিজ জন ভিন্ন এ ধর্ম্মের উপদেষ্টাগণ অন্যের নিকট প্রকাশ করেন না। তবে “ফ্রিমেছনরির” অবান্তর কথা সকল যেমন “মেছনিক” পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, গোস্বামীদিগের গ্রন্থেও তদ্রূপ এ সাধনের মোটামুটি বাহিরের কথা পাওয়া যায়। এগুলি বাহিরের কথা হইলেও, যাঁহারা চতুর, তাঁহারা ঐ সকল কথা হইতেও কিঞ্চিৎ সন্ধান পাইতে পারেন। এই সন্ধান জানাইবার জন্য আমরা ঐ বংশী-শিক্ষার অপর দুই স্থান হইতে অল্প কয়েকটি পয়ার উদ্ধৃত করিতেছি;—

“সর্ব্বভাব ছাড়ি গোপী-ভাবাশ্রয় করি।
গোপী-অনুসারে ভজ রসরাজ হরি॥
গোপী-অনুসারে পরকীয়া ভাবে সেবা।
নিত্যবৃন্দাবনে রসরাজে করে সেবা॥
সেই ভাগ্যবান জীব রসের বাজারে।
প্রেমেতে বাঁধিয়া রাখে হৃদয় মাঝারে॥”

পুনশ্চ :—

“পুরুষ প্রকৃতি ইথে সবে অধিকারী।
সবার সাধন এই কহিনু বিচারি॥
ব্রজ-অনুসারে হয় এ সাধন-ক্রম।
তাহা ছাড়া যত হয় সেই সব ভ্রম॥
অতএব এই গুহ্য সাধনের ক্রম।
সর্ব্বাশ্রয় করি কর সর্ব্বদা শিক্ষণ॥
তবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ হবে দরশন।
পুরাণ-তন্ত্রেতে এই আছে যে লিখন॥”

এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু না বলিয়া, আমরা প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিতেছি। কথিত আছে যে, শ্রীমহাপ্রভু আটটী শ্লোক দ্বারা জীবগণকে সাধারণ ধর্ম্মের পথ—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ শ্লোক আটটীর নাম শিক্ষাষ্টক। শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই সে ধর্ম্মপথস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, মহাপ্রভু কহিতেছেন;—

“চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনম্,
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতা-স্বাদনম্,
সর্ব্বাত্ম স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্॥ ১।”

অর্থাৎ, যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন দ্বারা জীবের চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয়; ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়; শ্রেয়রূপ কুমুদ-বিকাশকারী ভাব-জ্যোৎস্না বা চন্দ্রকিরণ বিতরিত হয়; যাহা বিদ্যা-বধুর জীবনস্বরূপ; আনন্দসমুদ্র বর্দ্ধনকারক; প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদদায়ক; এবং শুদ্ধ-জীবের সমস্ত স্বরূপ স্নিগ্ধকারী অবগাহনস্বরূপ; সেই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন চতুর্ব্বিধ। নাম-সংকীর্ত্তন, রূপ-সংকীর্ত্তন গুণসংকীর্ত্তন ও লীলা-সংকীর্ত্তন। সাধকের হৃদয়-ক্ষেত্রে নামরূপ অঙ্কিত হইলে, ভগবানের রূপের উদয় হয়; রূপ ধ্যান করিতে করিতে গুণের উদয় হয়; এবং ভগবৎগুণগানে চিত্ত বিগলিত হইলে, তখন তাহাতে লীলা-স্ফুরিত হয়। ইহাতে দেখা গেল যে, নামই ক্রমশঃ রূপ, গুণ, লীলারূপে পরিণত হয়। অতএব, নাম-সংকীর্ত্তনই সকল সাধনের মূল। নাম ভিন্ন জীবের মুক্তির অন্য পন্থা নাই। এইজন্য মহাপ্রভু কহিতেছেন :—

“নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহা জনিনানুরাগঃ॥ ২॥”

হে ভগবন্, তুমি জীবের প্রতি দয়া করিয়া, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, মুরারি অচ্যুত প্রভৃতি মুখ্য নামে, এবং তদেতর অধিকারীর জন্য পরমাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বনিয়ন্তা প্রভৃতি গৌণ নামে, তোমার সর্ব্বশক্তি বহুপ্রকারে অর্পণ করিয়া রাখিয়াছ; এবং জীবের দুর্ব্বলতা ও অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া, নাম-গ্রহণের জন্য কালাকালেরও নিয়ম কর নাই। দীনবন্ধো! তোমার এতই অপরিসীম করুণা! কিন্তু আমার কি বিষম দুর্দ্দৈব যে, তোমার এমন যে মধুমাখা নাম, তাহাতে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

উপরে যে দুর্দ্দৈবের কথা উল্লেখ হইল, উহা দশবিধ নামাপরাধজনিত দুর্দ্দৈব। (১) সাধু-নিন্দা, (২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিভূতি ব্রহ্মা-শিবাদিতে ভেদবুদ্ধি, (৩) গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (৪) গুরুনিন্দা, (৫) বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্রনিন্দা-(৬) হরিনামে অর্থবাদ, (৭) নামবলে অসৎ প্রবৃত্তি, (৮) অপর শুভকার্য্যের সহিত হরিনামের সমান জ্ঞান (৯) বহির্ম্মুখ ও অনধিকারীকে নামোপদেশ দান, (১০) নাম-মাহাত্ম্যে প্রীতির অভাব। শাস্ত্রানুসারে এই দশটী নামাপরাধ। নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব না ঘুচিলে, নামে রুচি ও নাম-কীর্ত্তনে অনুরাগ জন্মিতে পারে না। কিন্তু সে দুর্দ্দৈব ঘুচিবার উপায় কি? অহর্নিশি অনবরত নামগ্রহণই সেই উপায়। নামাপরাধরূপ নিদারুণ রোগের একমাত্র মহৌষধি নামসংকীর্ত্তন। কিন্তু সেই যে নামসংকীর্ত্তন, তাহাতে সকলের অধিকার নাই। কিরূপ লোক নাম-সংকীর্ত্তনে অধিকারী, তৎসম্বন্ধে মহাপ্রভু কহিতেছেন :—

“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥৩॥”

জড়-জগতে তৃণ অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। কিন্তু

সেই তৃণ অপেক্ষাও তিনি আপনাকে লঘু জ্ঞান করিবেন। যে 'ছেদকে কুঠার' দ্বারা মূলে আঘাত করিতেছে, বৃক্ষ তাহাকেও ছায়াদানে শীতল ও ফলদানে তৃপ্ত করে; সুতরাং বৃক্ষের মত সহিষ্ণু পদার্থ অতি দুর্লভ। কিন্তু যিনি বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইবেন, আর যিনি স্বয়ং অভিমান-শূন্য হইয়া, অমানী ব্যক্তিকেও সম্মান করিবেন; তিনিই সর্ব্বদা নামাপরাধ-বিবর্জ্জিত ও হরিনাম-কীর্ত্তনে অধিকারী।

তৃতীয় শ্লোকের লক্ষণাক্রান্ত হইলে, ভক্ত নাম গ্রহণের অধিকারী হন বটে; কিন্তু নাম-গ্রহণের উদ্দেশ্য মহৎ না হইলে, বিশুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয় না। অর্থাৎ যিনি নামানুরাগে অনুরাগী, তাঁহাকে অন্য সমস্ত অভিলাষ ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। "নামই ব্রহ্ম, নামই গোবিন্দ মুরারি, নামই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সেই নাম ভিন্ন আমার প্রার্থনীয়তব্য পদার্থ আর কিছুই নাই; সেই নামরূপী ভগবানই আমার পতি, আত্মার গতি, আমার ভক্তি-মুক্তি সর্ব্বসাধন, সুতরাং আমি কেবল তাঁহাকেই চাই।"—এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া যিনি নাম গ্রহণ করিবেন, তিনিই যথার্থ ভক্ত, যথার্থ ভাগ্যবান। তাই জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু চতুর্থ শ্লোকে কহিতেছেন;—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥"

হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা প্রার্থনা করি না; কিন্তু জন্মে জন্মে যেন আমি তোমাকে প্রাণেশ্বররূপে লাভ করি—তোমার প্রতি যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

সাংসারিক সুখলাভ প্রার্থনা যেন অনুচিত; কিন্তু ভগবানের নিকট সাংসারিক দুঃখ-মোচন জন্য প্রার্থনা ও কি অকর্ত্তব্য? অনাথ-ত্যতা, নির্দ্ধনতা প্রভৃতি ঐহিক অভাব মোচনের প্রার্থনা যে সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সংসার এতই প্রলোভন-পূর্ণ, ইন্দ্রিয়-গ্রামের প্রাবল্য এতই দুর্দ্দমনীয়; ষড়্‌রিপু জয় এতই কঠিন ব্যাপার, যে, ভব-সমুদ্র পারের জন্য জীতেন্দ্রিয় হইবার জন্য; রিপু-জয় করিবার জন্য, ভগবানের সাহায্য-প্রার্থনা দোষাবহ নহে। পারত্রিক মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা, জীবের অন্যতম অধিকার; সুতরাং তাহা অকর্ত্তব্য হইতে পারে না। সে প্রার্থনা কিরূপ হইবে, তাহা পরম কারুণিক মহাপ্রভু দেখাইতেছেন :—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥৫॥"

হে শ্রীনন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য-দাস। আমি এমন দয়াল প্রভুকে বিস্মৃত হইয়া বিষম ভব-সমুদ্রে পতিত হইয়াছি। হরি-দাসের যে ক্ষমতা, নিজ দোষে আমি তাহাতেও বঞ্চিত হইয়াছি। সুতরাং আমার স্বচেষ্টায় উদ্ধার পাইবার আর আশা নাই। দয়াময়! আমাকে তোমার চরণ-সরোজের ধূলিকণা-সদৃশ করিয়া রাখ, তাহা হইলেই আমার উদ্ধার হইবে; আমি আর ভব-বন্ধনে আবদ্ধ হইব না।

তোতা-পাখীর মত নাম গ্রহণ করিলেও ফল নাই। নাম গ্রহণই বল, আর প্রার্থনা করাই বল, উহা হৃদয় হইতে উদয় হওয়া চাই। উহা হৃদয়ের বস্তু—রসনার নহে। যথার্থ নাম-গ্রহণ বা প্রার্থনা করা হইল কি না, মহাপ্রভু তাহারও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদ রুদ্ধয়া গিরা।

পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ সদা,
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥"

প্রাণবল্লভ! তোমার সুধাধার মধুমাখা নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, কবে আমার নয়ন-যুগলে গলদশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইবে; কবে আমার বদনে গদ্গদ-ভাবে "হরেকৃষ্ণ" নাম উচ্চারিত হইতে হইতে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিবে; কবে আমার সমস্ত দেহ পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিবে!

নাম-গ্রহণের কি চমৎকার শক্তি! নামে প্রেম, প্রেমে রাগ, রাগে অনুরাগের উদয় হয়। এই অনুরাগ গাঢ় হইয়া যখন উন্মত্ততা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে মহাভাব বলে। মহাভাবের অবস্থায় সংযোগে সর্ব্বদা বিরহের আশঙ্কা; এবং ক্ষণকালস্থায়ী বিরহও যুগ-সহস্রের ন্যায় প্রতীয়মান। শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব-রূপা, তাই তিনি শ্রীশ্যামসুন্দরের অঙ্কে শায়িত থাকিয়াও, "হা নাথ! কোথায় গেলে?" বলিয়া চমকিয়া উঠেন; এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মৃতপ্রায় হয়েন। "নিজ কান্তা কান্তি বিনোদ," মহা-ভাবরূপী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাই জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য কি কহিতেছেন, শুনুন :—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥৭॥"

অহো! গোবিন্দ-বিরহে আমার নিমেষকে যুগ-পরিমাণ বোধ হইতেছে; আমার চক্ষু হইতে বর্ষাকালের ধারা নির্গত হইতেছে; এবং সমস্ত বিশ্ব শূন্যময় বোধ হইতেছে! অর্থাৎ, হে অন্ধ জীব! তোমার পক্ষে ঈদৃশ পুরুষার্থময় বিপ্রলম্ভ অত্যন্ত উপযোগী, এই শিক্ষা প্রদত্ত হইল।

ভক্ত যখন ভগবানের জন্য প্রার্থিতরূপ ব্যাকুল হইতে শিখিল; তখন তাহার মনে ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাব উপস্থিত হয়। স্বামীর প্রতি যেমন অচলা ভক্তি, অটল বিশ্বাস, প্রগাঢ় প্রেম-স্ত্রীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম; ভগবানের প্রতি ভক্তের যখন তদ্রূপ হয়, তখন ভক্ত ভগবান বই আর কিছু জানে না, আর কিছু মানে না, আর কিছু চিনে না! তখন ভক্ত পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা রমণীর ন্যায় ভগ-বানকে কহে :—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥"

অর্থাৎ, আমি আমার সেই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু জানি না। তিনি কৃপা করিয়া আমায় আলিঙ্গন করুন; কিম্বা রুক্ষ হইয়া আমায় পাদদলিত করুন; অথবা অদর্শন দ্বারা আমায় মর্ম্মাহত করুন; সেই প্রেম-লম্পট আমাকে যাহা করিয়া সুখী হন, তাহাই করুন; আমার তাহাই "শিরোধার্য্য। কারণ, তিনি আমার প্রাণনাথ, প্রাণপতি, তিনি ত আমার পর নহেন।

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক অবলম্বন-পূর্ব্বক তদীয় ধর্ম্মমত যথাসাধ্য যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিলাম। একটী প্রাচীন পদ মহা-প্রভুর রচিত বলিয়া অনেক সাধু বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়াছি; তাহা উদ্ধৃত করিয়া, প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি :—

"আমার হৃদয়ে পরশমণি।
নয়নের ভূষণ আমার বিভু-দরশন।
বদনের-ভূষণ আমার নাম-সংকীর্ত্তন॥
(ভূষণ বাকি কি আছেরে)
ওহে ভূষণ আমার ও পদ-সেবন।
কর্ণের ভূষণ আমার ও নাম-শ্রবণ॥
(আমি যে-ভূষণে ভূষিত আছি।)"

শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

নীরবে।

নীরব নিশীথ। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। ধরাতল নীরবতা-ক্রোড়ে সুপ্ত। তারকা-খচিত গগন-মণ্ডল নীরবে দিগন্তকে আলিঙ্গন করিতেছে। তখন, নীরবে নয়ন মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিলে, স্বতঃই মনে হয়—এই বিশ্বের কার্য্য কারণ-ব্যাপার বুঝি নীরবে!—যিনি এই চরাচর বিশ্বের রচয়িতা তিনি বুঝি বড় নিরবতা-প্রিয়! নতুবা, যেখানে, নীরবতা, সেইখানে শান্তির প্রাণ, সরলতার পবিত্র উৎস, সৌন্দর্য্যের সুরম্য লীলা-মন্দির, নিরন্তর বিরাজিত কেন? স্রষ্টা নীরবে নীরবতার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন; নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার ভিতর বিশ্ব-রচনার কল্পনা করিয়া, সৃষ্টির সারভূত সৌন্দর্য্য-রাশি নীরবতার হৃদয় ভরিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন; কোলাহলময় বিশ্ব যখন পবিত্র শান্তিসুখ অনুভব করে, তখন অতি নীরবে!

যাহা মহান্, তাহাই নীরব; যাহা সুন্দর, তাহাই নীরব; যাহা বিস্ময়ের আগার, তাহাই নীরব; আর সুখদুঃখের যে গভীর অনুভূতি, তাহাও অতি নীরবে। আকাশের মত অনন্ত আর কি কিছু দেখিয়াছ? কিন্তু বল দেখি—কত নীরব!—কত গম্ভীর! পৃথিবীর কোলাহল-রাশি অনুক্ষণ সেই অনন্তের দিকে ধাবিত হইতেছে, মহান্ অনন্তত্বে মিশাইয়া যাইতেছে; তরঙ্গ নাই, চাঞ্চল্য নাই—যখন, চাহিয়া দেখিবে, তখনই দেখিতে পাইবে—অনন্ত আকাশ-মণ্ডল স্থির, গম্ভীর, নীরব! আর ঐ অবাতসংক্ষুব্ধ-নীলাম্বুময় জলধি, বল দেখি, কত প্রশান্ত! নদী দেশে দেশে কাঁদিয়া বেড়াইয়া এইখানে আসিয়া নীরব হয়; নীরবতা ভালবাসে বলিয়াই তো, চুম্বুল ভাসাইয়া, এইখানে ছুটিয়া আইসে! আবার সেই সাগর যখন শব্দায়মান তরঙ্গায়িত হয়, তখন কি আর তাহার পানে চাহিতে পার? সমুদ্রে চির-তুষারাচ্ছন্ন অভ্রভেদী গিরিচূড়া, নিশ্চল!—নিষ্পন্দ! বল দেখি, এমন বিস্ময়ের আগার কত নীরব? নীরবতা বুঝি বড় সুখের; তাই, আকাশ নীরবে, সমুদ্র নীরবে, শৈলশৃঙ্গ নীরবে, সকলেই নীরবে শান্তি-সুখ অনুভব করে। যখন সে নীরবতা ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আকাশ বজ্র-নির্ঘোষে রোদন করে, সাগর রোদন-নিনাদে দিগন্ত কাঁপাইয়া কূলে কূলে প্রতিঘাত করিয়া বেড়ায়, পর্ব্বতের হৃদয় ফাটিয়া যায়—ঝঞ্ঝাকে ঝঞ্ঝাকে অগ্নি উদ্গীরণ করে। তাহাতেই বলিতেছিলাম—যাহা মহান্, যাহা অনন্ত, যাহা শান্তির আগার, যাহা গাম্ভীর্য্য-ভাণ্ডার, তাহাই অতি 'নীরবে'!

মধ্যাহ্ন নীরবে বহিয়া যায়, চন্দ্রমা নীরবে জ্যোৎস্নাবর্ষণ করে, প্রস্ফুটিত ফুল নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়ে। আর যখন প্রভাত-বায়ু-সঞ্চালিত শাখার কোলে বসিয়া অস্ফুট মল্লিকা মৃদু মৃদু হাস্য করে—বল দেখি, তাহা কত নীরব—কত সুন্দর! আশে-পাশে মধুকরী উড়িয়া বেড়াইতেছে, মৃদুমন্দ-পবনে হেলিয়া দুলিয়া পড়িতেছে—ভ্রান্তি নাই, বিরাম নাই, কেবল নীরবে মৃদু মৃদু হাস্য-সুধাবর্ষণ! যদি মল্লিকা ঐ মধুর হাসির মত মধুর কথা কহিয়া হাসিত, তাহা হইলে কি ঐ হাসির এত গৌরব থাকিত? যদি সুন্দর আপনাকে আপনি সুন্দর বলে, তাহা হইলে তাহার সৌন্দর্য্য কোথায় থাকে বল দেখি?

তুমি কোকিলের কূজন শুনিয়াছ, ভ্রমরের গুঞ্জন শুনিয়াছ, বীণার ঝঙ্কার শুনিয়াছ; কিন্তু রোষ-মূর্চ্ছিত সেই যে ছুটী নয়নের নীরব ভাষা, তাহার মত মধুর কি কিছু শুনিয়াছ? ভাষা যে প্রাণের কথা বাহির করিতে পারে না, নয়ন-ছুটী নীরবে একটী একটী করিয়া তাহা বাহির করিয়া দেয়; তুমি আপনা ভুলিয়া যাও, নিমেষ হারাইয়া ফেল, তোমার জীবন অনুতময় হইয়া যায় কেন, বল দেখি? আর কিছু নয়, সেই অকপট নয়ন ছুটীর পবিত্র সৌন্দর্য্য অতি নীরবে। কেবল সেইজন্য—প্রণয়ী তুমি, প্রবাসে যাইবে, গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিতে পারিতেছ না! প্রভাতের পাখীগুলি 'আর রাত্রি নাই' বলিয়া তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে, পুষ্পময়ী উষা তোমাদের শয়ন-মন্দিরের গবাক্ষদ্বারে উঁকি দিয়া এই বিরহান্ত অভিনয় দেখিতেছে আর কাঁদিতেছে, তুমি কি তাহা দেখিতে পাইতেছ? কেমন করিয়া দেখিবে? ছুটী সর্পণের মত স্বচ্ছ নয়ন দিয়া মুক্তাফল ঝরিতেছে, তুমি তাহাই দেখিয়া যে অন্ধ হারা! যথার্থ করিয়া বল দেখি, সেই ক্ষতর নয়নের সেই নীরব অশ্রুবিন্দুর তুলনা কি আর কিছু আছে? নয়ন যদি ফুকরিয়া কাঁদিত, তাহা হইলে অশ্রুবিন্দুর কি সে গভীরতা থাকিত?

নীরবতার সহিত যাহা সমশ্লিষ্ট, আপেক্ষিক তুলনায় তাহারই উৎকর্ষতা অধিক। সমস্ত মর্ম্মরা চঞ্চল, কিন্তু বৃহৎ জলচর নীরবে জলগর্ভে অবস্থান করে; যিনি জ্ঞানী, তিনি গম্ভীর; যে অন্তঃসারশূন্য, তাহার চপলতা মাত্রই সার; একখানি ক্ষুদ্র শকটচক্র একবার আবর্ত্তন করিতে ঘর্ঘর-শব্দে চারিদিক শব্দায়মান করিয়া তুলে, কিন্তু কক্ষপথে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে—বল দেখি, কত নীরবে! শোকে দুঃখে যে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে, তাহার যতটুকু যন্ত্রণা, তাহা অপেক্ষা যে নীরবে গুমরিয়া কাঁদে, তাহার যন্ত্রণা কত গভীর? যে ক্রোধকালে অস্ফালন করে, তাহার ক্রোধ অপেক্ষা, যে নীরবে ক্রোধ পোষণ করে, তাহার ক্রোধ কত ভয়ানক! তাহাতেই বলিতেছিলাম, 'যাহাতে মহত্ত্ব আছে, গম্ভীর্য্য আছে, মাধুর্য্য আছে, তাহারই ক্রিয়া অতি নীরবে। হৃৎপদ্মদল নীরবে উদ্ভিন্ন হয়, কিসলয় নীরবে উদ্গত হয়, শিশির নীরবে সঞ্চিত হয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয় নীরবে। যতক্ষণ পরিমল তৃষা নিবারিত না হয়, ততক্ষণ ভ্রমর ঝঙ্কার করে; মধুন মধুপীন করে, তখন নীরবে। যে মিহিরমণ্ডলের তরুণ কর-সম্পাতে নির্জ্জীব জগতে নবজীবন আনিয়া দেয়, উষার রক্তি মুকুটোপরি যাহার রক্তিম-ছটা দেখিয়া জড়-জগৎ মুখর হয়, তাহার উদয়াস্ত কত নীরবে বল দেখি? দিবানিশা নীরবে আসে, নীরবে যায়; ষড়ঋতু নীরবে আসে, নীরবে যায়; শত সহস্র শতাব্দীর পর একবার যে যুগান্তর, এমন যে একটা মহান্ ব্যাপার, তাহাও সম্পন্ন হয় অতি নীরবে। কবি নিভৃতে বসিয়া নীরবে চিন্তা করে, যোগী নীরবে যোগ-সাধনা করেন, ধ্যানীর ধ্যান নীরবে ভিন্ন আর কিরূপে হইবে বল? ঋষিদাস নীরবে বসিয়া শকুন্তলার চিত্র আঁকিয়াছিলেন, সীতার জীবনব্যাপী শোক বাল্মীকী নীরবে কল্পনা করিয়াছিলেন, ভাস্করাচার্য্য সপ্তর্ষিমণ্ডলের অতি সূক্ষ্ম গতি নীরবে স্থির করিয়াছিলেন। গৌতমের ন্যায়, কপিলের সাঙ্খ্য, ব্যাসের পুরাণ, মনুর সংহিতা, এই সকলের যে অমানুষী কল্পনা, তাহাও ধীরে ধীরে গভীর নীরবতার কোলে প্রসূত হইয়াছে।

যে দানে নিঃস্বার্থপরতা আছে, তাহা অতি নীরবে অনুষ্ঠিত হয়; যে হিংসাব্রতে জগতের মঙ্গল নিহিত আছে, তাহা অতি নীরবে সমাহিত হয়; যে প্রেম-প্রবাহ আত্মদান শিখাইয়া সমস্ত জীবন পরিপ্লাবিত হয়, তাহা অন্তঃসলিলা নদীর মত হৃদয়ের গভীর প্রদেশে অতি নীরবে প্রবাহিত হয়। হরিশ্চন্দ্র সসাগরা ধরার আধিপত্য নীরবে দান করিয়াছিলেন, দেবতার মঙ্গলের জন্য দধীচি নীরবে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সাবিত্রী মৃত-পতি অঙ্কে করিয়া নীরবে কাঁদিয়াছিলেন। তোমার এত বড় কংগ্রেসে সারত্ব নাই কেন? নিরাকার ভজনায় গুরুত্ব নাই কেন? ভগিনীর প্রেমে স্থায়িত্ব নাই কেন? একটু ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, সে সকল কেবল আড়ম্বরপূর্ণ, আর কোলাহলময়! আর তুমি ধর্ম্মধ্বজী, জ্ঞানবীর, কলির শুকদেব; তুমি কখন আচার্য্য, কখন পরিব্রাজক, কখন পরমহংস সাজিয়া পাথেয় সঞ্চয় করিতেছ; তুমি বিদ্যাসুন্দরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাহির করিতে পার, রাধা-কৃষ্ণের বৈজ্ঞানিক প্রেম তত্ত্ব উদ্ভাবিয়া বুঝাইয়া দিতে পার, "হা আর্য্যগণ!" বলিয়াই অনর্গল অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইতে পার, তথাপি তোমার তেমন মুক্তহস্ত নাই কেন? বলিলে—বুঝিবে না; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তোমার কর্ম্মক্ষেত্র—কোলাহলময় ভজুকের ভিতরে নয়, তোমার সাধন—অতি ধীরে, অতি নীরবে!

অধিক দূর যাইতে হইবে না, তুমি তোমার সমাজের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিবে—যখন সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, অশান্তি-পূর্ণ, ভণ্ডামি-কলরব-ময়! যখন ধর্ম্ম-বিপ্লব, রাজ-বিপ্লব, নৃশংস, স্বার্থ-পরতা, দারুণ দুর্ভিক্ষ সমাজকে বিধ্বস্ত করিতে থাকে, তখনই কোটীকণ্ঠে গগন-বিদারী ভৈরব-নিনাদ শুনিতে পাইবে; একটী একটী করিয়া সবগুলি অন্তর্হিত হইয়া যাউক, দেখিবে—সমাজ-দেহ শান্তির প্রশস্ত সলিলে বিধৌত হইতেছে, নীরবতা আসিয়া সমস্ত সমাজ অধিকার করিয়াছে। চৈতন্য, কৃষ্ণ-বিরহে নীরবে কাঁদিতেন বলিয়া, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্প্রদায় আজি এতদূর বিস্তৃত; বুদ্ধ, জীবের দুঃখ সহিতে না পারিয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া নীরবে সমাহিত হইয়াছিলেন বলিয়া, "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই মহাবাক্য পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মূল মন্ত্র! বলিয়াছি তো এবিশ্বের স্রষ্টা বড় নীরবতা-প্রিয়; তাই যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, সাধুর পীড়ন হয়, অধর্ম্মের জয় হয়, তখন পৃথিবীর হৃদয়ভেদী রোদন-ধ্বনি গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার পবিত্র লোক স্পর্শ করে, তখন সেই সর্ব্বনিয়ন্তা অবতীর্ণ হইয়া সে কলরব নিবারিত করেন, তখন সত্যধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়, সাধু পরিত্রাণ পায়, দুষ্কৃতের বিনাশ হয়, বিপ্লব-শান্ত সমাজ নিরাপদ হইয়া আবার সুখে বিশ্রাম-লাভ করে—নীরবে।

ধ্যানীর ধ্যানে, জ্ঞানীর জ্ঞানে, মানিনীর মানে, নীরবতা নাই কোন্‌খানে বল দেখি? পর্ব্বতের গুহায় খদ্যোতের আভায়, ইন্দ্রধনুর শোভায়, যেখানে চাহিবে, সেইখানে নীরবতার অধিকার। জীব-প্রকৃতি নীরবতা ভালবাসে বলিয়া, জীবের দুঃখে যাঁহার প্রাণ কাঁদে, তিনি চারিদিকে নীরবতা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দেখ ছায়া কত সুশীতল; কিন্তু কত নীরব আর সেই ভালবাসাটুকু, যাহার জন্য আয়েষা গরল খাইতে সাধ করিয়াছিল, দময়ন্তী হংসকে দূত-পদে বরণ করিয়াছিল, মহাশ্বেতা সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছিল—সেই ভালবাসার ভিতরই যদি নীরবতা না থাকিত, তাহাহইলে কি তাহার এত আদর থাকিত? মুখে ভালবাসি বলিয়া ভালবাসা জানান অপেক্ষা, নীরবে প্রাণদান কত উচ্চ, কত মহৎ; প্রেমিক তুমি তাহাও কি তোমায় আবার বলিতে হইবে? যখন তুমি প্রাণটুকু হারাইয়া সন্দেহে কাঁদিয়া মর, ভালবাসার প্রতিদান হইল কি না হইল ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পার না, তখন তাহার প্রতি অঙ্গ-ইঙ্গিতে যে অকপট অব্যক্ত প্রেমের পরিচয় দেয় তাহা দেখিয়া সত্য করিয়া বল দেখি, তুমি স্বর্গরাজ্য করতলে পাও কি না? যদি সেই গভীর ভালবাসার ভিতর নীরবতা না থাকিত, তাহাহইলে কি তুমি তেমন সুখী হইতে পার? তাইতেই বলিতেছিলাম, যদি সুখের বাসনা থাকে, তাহাহইলে অন্বেষণ করিও নীরবে।

তুমি নিদ্রা যাও নীরবে, সুখস্বপ্ন অনুভব কর নীরবে, তোমার সুখের আশা জাগরিত হয় নীরবে! যতক্ষণ মানবের জীবনব্যাপিনী তৃষ্ণা নিবারিত না হয়, ততক্ষণ মানুষ কলরব করে। শিশু নীরবে মাতৃগর্ভে বাস করে, তুমিই হইয়াই কাঁদিয়া উঠে; নীরবতা-প্রিয় জীব সংসারের কোলাহলে প্রথম প্রবেশ করিয়া ভাবে—"আমি এ কোথায় আসিলাম?" তাহার পর যেমন তাহার জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে, ততই সেই জীবনের অন্তরালবর্ত্তী দেশের নীরবতার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিতে থাকে। তাহার জীবনের যে অংশটুকু পার্থিব জড়-সংঘাতে সমুৎপন্ন, সেই টুকু কেবল পৃথিবীর মায়া ভুলিতে পারে না; আর যাহা সেই দেশ হইতে আসিয়া এদেশে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে, সে কেবল উড়িয়া সেইখানে যাইতে চায়। তাই জীব সংসার শ্রমে শ্রান্ত হইলে মহানিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করে; তখন সে তাহার পূর্ব্বাবাসিত নীরবতার মধুরতা আবার অনুভব করিতে থাকে; সেইজন্য পৃথিবীর জীব তাহার পশ্চাতে রোদন করে, সে তখন ফিরিয়াও চাহে না। পিঞ্জরের পাখী পিঞ্জর ছাড়িয়া অপার্থিব সুখ অনুভব করে নীরবে!

সেইজন্য বলিতেছি, বৃথা কলরব করিয়া কেন প্রকৃতির বিশুদ্ধতা ভঙ্গ করিতেছ? তুমি যদি যথার্থ সুখ চাও, তবে নীরবে থাকিও; যদি যশস্বী হইতে চাও, তবে নীরবে থাকিও; যদি যথার্থ প্রেমিক হও, তবে নীরবে থাকিও। অনেক চীৎকার করিয়া দেখিলে, কিন্তু প্রাণের পিপাসা তো কৈ মিটাইতে পারিলে না! যদি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করিতে চাও, তবে ঐ পথে, সাধু-জন-প্রদর্শিত সুপ্রশস্ত পথ! হৃদয়কে সংযত কর, স্বার্থকে বলি দাও; সংসারের মায়া বিস্মৃত হইয়া, গঙ্গাতীরে, হিমগিরি-শিলাতলে পদ্মাসন-বদ্ধ করিয়া যোগনিদ্রায় অভিভূত হও; মোহের আবরণ সরিয়া পড়িবে, অমৃত ঝরিয়া পড়িবে, তৃষ্ণা নিবারিত হইবে, সমাহিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করিবে—'নীরবে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আত্ম-তত্ত্ব।

শিষ্য।—আপনার ব্যাখ্যানুসারে ঐশী প্রজ্ঞা বা ধীশক্তিই বিদ্যা সাব্যস্ত হইতেছে। ঐ বিদ্যাই পূর্ব্ব-বর্ণিত-মত 'শিষ্টজিজ্ঞিষ্টিদিগের' দর্শিত ষষ্ঠ তত্ত্ব; এবং মানবাত্মাই পঞ্চম তত্ত্ব। কিন্তু আপনার উপরোক্ত বর্ণনানুসারে ঐশী প্রজ্ঞাও মানবাত্মায় অন্তর্গত। তাহা হইলে ষষ্ঠ ও পঞ্চম তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য কি?

গুরু।—"শিষ্টজিজ্ঞিষ্টিদিগের সানব-তত্ত্ব" বিদ্যা-

শের প্রণালী অনুরূপ। কিন্তু বেদান্তদর্শনের বিরোধী নহে। উহা অতি সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম বিভাগ। মানবে ব্রহ্ম (কূটস্থ চৈতন্য) হইতে অন্নময় ভৌতিক দেহ পর্য্যন্ত পাঁচ তত্ত্ব অতি সরলভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্ব আদি—সত্য-জ্ঞান-ব্রহ্ম (সপ্তম তত্ত্ব); ঐশী-প্রজ্ঞা (ষষ্ঠ তত্ত্ব); ঐশী মানস-শক্তি বা সৃষ্টিকারী মানস-তত্ত্ব (পঞ্চম তত্ত্ব); কামিক তত্ত্ব (চতুর্থ তত্ত্ব—ইহা কেবল স্বভাবশক্তিজাত); সূক্ষ্মশরীর (তৃতীয় তত্ত্ব); প্রাণ বা জৈব তত্ত্ব (দ্বিতীয় তত্ত্ব—উহা স্থূল-শরীরের সহিত সূক্ষ্ম-শরীরের সংযোজক রজ্জুস্বরূপ); স্থূল দেহ (প্রথম তত্ত্ব)। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সপ্তম ও ষষ্ঠ তত্ত্বের অধ্যাপি সাধারণ মনুষ্য-জগতে বিকাশ হয় নাই। পঞ্চম তত্ত্বের আভাস দ্বারা চতুর্থ তত্ত্বে (কামিক ক্ষেত্রে) মন ও বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে। ঐ মন ও বুদ্ধি মানবের মস্তিষ্কে ক্রিয়া করে ও ঐ মস্তিষ্কস্থ স্নায়ু সহিত সংযুক্ত হইয়া বাহ্য জগতের স্থূল-স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের যোগে বাহ্য স্থূল-জগতে প্রবিষ্ট হয়। তদ্দ্বারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, ঐ অভিজ্ঞতা হইতে ক্রমে ক্রমে বর্জ্জনে মন ও বুদ্ধি নির্ম্মল হয়; মন ও বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে, উহা স্বীয় জননী সত্তাবকে জয় করিয়া স্বয়ং অনন্ত ঐশীপ্রজ্ঞা ও সৃষ্টিকারী মানস-শক্তিতে পরিণত হয়। তদ্দ্বারা পঞ্চম ও ষষ্ঠ তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ হইলে, সপ্তম তত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞান স্বয়ং বিকাশিত হয়।

শিষ্য।—আপনার পূর্ব্ববর্ণিত মত সত্তাব-ক্ষেত্রে ঈশ্বরের যে অনু প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই অনু সত্তাবক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া সবিশেষ অভিজ্ঞতার সহিত কি পুনঃ ঈশ্বরে সংশ্লিষ্ট হইবে?

গুরু।—এখনও তোমার ভ্রম দূরীভূত হয় নাই। ঐ অনু কি ঈশ্বর হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল যে, সংশ্লিষ্ট হইবে? তাঁহার অঙ্গের অনু-বিশেষে স্তরস্বরূপ কামিক তত্ত্বের যে ক্ষুরণ হইয়াছিল, তাহার সারাংশ নির্ম্মল ও পবিত্র হইলে, তাঁহার উক্ত অনু পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইবে। অর্থাৎ উক্ত অনুপ্রবিষ্ট স্তরের সারাংশ পরিস্কৃত হইয়া উহার আবরণাংশ ধ্বংস করিয়া অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত প্রজ্ঞা ও অনন্ত-সৃষ্টিকারী মানস-শক্তিরূপ মহা-কারণ-শরীরের একটী অঙ্গ-স্বরূপে পরিণত হইবে।

শিষ্য।—এইবার আমার মনে একটী বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। ব্রহ্ম কি যুগে যুগে কল্পে কল্পে স্বীয় প্রকৃতির ক্রিয়া দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছেন?

গুরু।—পরব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়। তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি কখনও হইতে পারে না। তাঁহার মহা-মায়ারূপ অনন্ত ক্রিয়ার দুইটী রাজ্য; পরা ও অপরা। পরা রাজ্যের সম্পত্তি বিদ্যা, অপরা রাজ্যের সম্পত্তি অবিদ্যা। ঐ অপরা রাজ্যের সম্পত্তির অংশ পরা রাজ্যে ভুক্ত হইলে, তদ্দ্বারা রাজশক্তির ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় না। ইহার একটী দৃষ্টান্ত তোমাকে দিতেছি; দৃষ্টান্তটী ভাল করিয়া বুঝিলে, ঐ পরম তত্ত্বের আভাস বুঝিতে পারিবে। যেমন, রাজা, রাজ্য ও প্রজা এই তিন লইয়া রাজ-শক্তি, এবং তাহার মধ্যে রাজা ও প্রজা চেতন, রাজ্য অচেতন; সেইরূপ, পরা শক্তি, সত্যজ্ঞান ও মূল-প্রকৃতি এই তিন লইয়া পরব্রহ্ম; পরা শক্তি ও সত্যজ্ঞান চেতন, মূল প্রকৃতি অচেতন। প্রজাই রাজা ও রাজ্যের জীবন-স্বরূপ। প্রজাই সত্য, রাজা ও রাজ্য উপাধি-মাত্র। প্রজাই রাজা ও রাজ্যের আত্মা। সমষ্টি প্রজাই রাজ্যের পরমাত্মা। রাজা কেবল রাজ্যের রাজকীয় কার্য্য-সম্পাদক মাত্র। এখন মনে কর, রাজ-নিয়মানুসারে যেন সমষ্টি প্রজা-গণের পক্ষে একটী মহাসভা আছে; ঐ মহা-সভা ঈশ্বরস্থানীয়, এবং রাজশক্তি পরাশক্তি-স্থানীয়। রাজারকার্য্যে যেন রাজশক্তির পাঁচটী বিভাগ আছে—বিচার-বিভাগ, রাজস্ব-বিভাগ, যুদ্ধ-বিভাগ, শাসন-বিভাগ ও পূর্ত্ত-বিভাগ। এই পঞ্চবিভাগস্থ রাজ-শক্তিই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ আদ্যাশক্তি। ঐ সাম্রাজ্যস্থ মহাসভার সভ্য-গণের ব্যবস্থা-প্রণয়ন-ক্ষমতাই বিদ্যা। সমস্ত প্রজারই ঐ ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ মহা-সভায় প্রেরণাধিকার আছে। অতএব তাহারা বিদ্যা-রাজ্যের অন্তর্গত। মনে কর, রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত; বিদ্যা রাজ্য ও অবিদ্যা-রাজ্য। বিদ্যা-রাজ্যের প্রজাগণের বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন-ক্ষমতা আছে, অবিদ্যা-রাজ্যের প্রজাগণের ঐ ক্ষমতা নাই। বিদ্যা-রাজ্যস্থ প্রত্যেক প্রজাই যেন স্বর্গীয় মানবাত্মা। কিন্তু যখন তাহাদের ব্যষ্টি-ভাব, তখন ক্ষমতার অভাব, যখন সমষ্টিভাব, তখন রাজশক্তিসম্পন্ন। উহার সমষ্টি মহা-সভাই ঈশ্বর, অবিদ্যা-রাজ্যস্থ প্রত্যেক প্রজাই পার্থিব জীব। যেমন জীবে আত্মাভাস দ্বারা মনোবুদ্ধির বিকাশ হইলে পরোক্ষ জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেইরূপ রাজনীতি-শিক্ষা ও বিদ্যা-রাজ্যস্থ প্রজার সংস্রব ও তাহাদের আভাসে অপরা-রাজ্যের প্রজাবর্গ রাজনৈতিক শক্তির আভাস প্রাপ্ত হয়। মানব যেরূপ সাধনার দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান ও ঐশীশক্তি লাভ করিতে পারে, অপরা-রাজ্যস্থ প্রজাবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ বিদ্যা বা পরা-রাজ্যস্থ মহাসভার সভ্যপদে নীত ও রাজানুগ্রহে রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। ফল কথা, মনুষ্য ঈশ্বরের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। মূল ব্রহ্মাণ্ড, শাসন ও পালনে ঈশ্বরের অনন্ত রাজ-শক্তির আভাস, এই পার্থিব রাজনৈতিক শক্তির মধ্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যে নিয়মে শাসিত, পালিত ও সুরক্ষিত হয়, তাহার আভাসেই পার্থিব সভ্য-সাম্রাজ্য শাসিত, পালিত ও সুরক্ষিত হইয়া থাকে। যখন মনুষ্যের মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরের ও মহত্তী-শক্তির আভাসে বিকাশিত, তখন যে তাহার অনন্ত শাসন-প্রণালীর কিঞ্চিৎ আভাস রাজনীতির মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ইহার বিচিত্র কি?

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধুরা।

(১)

এই বাপিতটে সখি
প্রণয়-মধুর ভাষে
আদরে মুখানি ধরি
বলেছিল ভালবাসে।

(২)

নীলিম আকাশে শশী
হেসেছিল সুধাহাসি
নিশীথ ধরণী কোলে
ছড়ায়ে জোছনারাশি।

(৩)

নীরবে তারকারাজি
চেয়েছিল উঁকিঝুঁকি
ঘিরিয়া নবীন চাঁদে
জ্বলেছিল ঝিকিমিকি।

(৪)

কাঁপিল কুসুম লতা
মৃদুল মলয় বায়
পাপিয়া আকুল তান
ছাইল গগণ ছায়।

(৫)
এমনি সময়ে সখি
বসিয়া সোপানতলে
পূর্ণ প্রকৃতির পানে
হেরিয়াছি কুতূহলে।
(৬)
সেই ত চাঁদিমা হাসি
সকলি ত সেই আছে
বাড়াতে যাতনা হায়
সেই শুধু চন্দ্রমা গেছে।
(৭)
একাসনে তার সনে
দেখেছি যে শোভা চাঁদে
আজিকে হেরিতে তারে
কেন বা পরাণ কাঁদে।
(৮)
যদি সে যাবে লো চ'লে
কেন তবে দেখা হ'ল
নিদয় প্রণয়-শিখা
কেন হৃদে জেলে দিল।
(৯)
কি চোখে দেখেছি তারে
বলিতে পারিনে সখি
সে যেন কি যেন তরে
নিভুই নূতন দেখি।
(১০)
কোমল মাধুরী মাখা
অমিয় বচন তার
দগধ হিয়ার মাঝে
ঢালিত সুধার ধার।
(১১)
আপনা ভুলিয়ে তারে
বোন লো বাসিনু ভাল
এ ছলনাময়ার চেয়ে
না বাসাযে ছিল ভাল।
(১২)
ফুটন্ত যৌবন-কালে
হেরেছিনু সুস্থি তারে
অতৃপ্ত প্রণয়-তাপে
আজীবন দহিবারে।
(১৩)
কত বা যাতনা পেয়ে
সে আমারচলে গেছে
মধুময়ী স্মৃতি তার
মনে শুধু প'ড়ে আছে।
(১৪)
কিন্তু আর কোন আশে
রাখিব জীবন বল
আর কি আসিবে ফিরে
মুছাতে নয়ন জল।
(১৫)
জীবনের সাথী সখি
সকলি ত ফুরায়েছে
তবু কেন-নয়ন
আশা-পথ চেয়ে আছে!

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার, বি-এ।

রাঙা-বৌ।

(১)

ছেলেবেলার ধূলাখেলায় যে সুখদা আমার সঙ্গিনী ছিল, তখন কে জানিত সে আমার হবে? যখন প্রণয় বয়সের সঙ্গে যখন আমার অলক্ষিতে প্রকাশ হইয়া একদিন সহসা চিরশান্ত হৃদয়ে কি জানি-কি আকাঙ্ক্ষার প্রবল তরঙ্গ তুলিয়াছিল—সেই একদিন!

আমার পিতা অনেক দিন হইতে বিজয়-নগরে, চাকরী-উপলক্ষে। আমাদের এখন সেখানে বাসী, শুনিয়াছি সেখানে আগে আর কাহারো বাসা ছিল না। সেই একা বাড়ীতে মার বড় কষ্ট হইত, তাই বাবা কয়েকজন আত্মীয়কে অনুরোধ করায় তাঁহারা আমাদের বাসার পাশে বাসা করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। আরো তাঁদের জায়গা ছিল, তাঁদের দেখিয়া আরো কয়েকজন বাসা করিলেন। সুখদার পিতাও বিজয়নগরের রাজসরকারে কাজ করিতেন, তিনিও আমাদের পাড়ায় আসিয়া বাসা করিলেন।

এখন আমাদের মস্ত পাড়া। মেয়েরা সব বাড়ি বাড়ি ঘুরে-পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ করে। আমাদের বাসার পরে দুই বাসা, তার পরই সুখদাদের বাসা। সুখদার পিতা যেবার দেশ হইতে কর্ম্মস্থানে পরিবার আনেন, তখন সুখদার বয়স ৬।৭ বৎসর।

সুখদারা আসিলে সুখদার মা আমার মার আর এক সখী হইলেন। তিনি বড় কাল-মানুষ। সকলে তাঁহার প্রশংসা করিত। প্রত্যহ দুই প্রহরের পর পাড়ার প্রায় সকল মহিলাই তাঁর কাছে আসিতেন, সুখদার মাও আসিতেন। ক্রমে তাঁর সঙ্গে মার খুব ভাব হইল। সুখদার মা, মাকে দিদি ডাকিতেন।

আমার তখন হাতেখড়ি সারা। সকাল-সন্ধ্যায় মাষ্টার আসিয়া পড়াইত। যা শুনিতাম তখন বেশ মুখস্থ হইত। মাষ্টারকে বড় ফাঁকি দিই নাই, কিন্তু ইস্কুল ফাঁকি দিতাম খুব। না দিলে আমাদের যে খেলা হইত না! 'মাখা-ধরা' 'পেট বেদনার' ভাণ করিয়া বাড়ি আসিয়া খেলা করিবার যথেষ্ট অবসর পাইতাম। আমার ছোট একটি ষ্ট্রাসকেসের মধ্যে নানাবিধ খেলিবার পুতুল ছিল, পাড়ার ছোট ছেলে-মেয়ে সব জুটিয়া মন্ত্রর মতন কত খেলা করিতাম। সেই সঙ্গে সুখদাও ছিল। ঘরে বসিয়া খেলাধূলা করিলে মা আমায় কিছু বলিতেন না; কিন্তু আমাদের খেলা শুধু, তাই ছিল না,—দারুণ নিদাঘের উত্তপ্ত তৃতীয় প্রহরে মাথার উপর অনলবর্ষী সূর্য্যদেবকে উপেক্ষা করিয়া বাহিরে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতাম।

একদিন আমরা সদল-বলে উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের দক্ষিণ-দ্বারী ঘরে মা পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন; আমি পিপাসার্ত্ত হইয়া আমি এক ঘরে জলের কিন্‌টার ছিল সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। দরজা খুলিবার সময় চকিত-দৃষ্টিতে যেন দেখিতে পাইয়াছিলাম—ও বাড়ির অমলা-মাসীমা আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া মাকে কি দেখাইয়া দিলেন। আমি চক্ চক্ করিয়া জল খাইতেছি, এমন সময় সুখদা জানালায় মুখ বাড়াইয়া আমায় হাসিয়া বলিল—'শীগ্‌গির পালাও।' ঐ কথার সঙ্গেই সুখদা

দৌড়িল। আমার হাতের গ্লাস পড়িয়া গেল, লাফ দিয়া ঘরের বাহির হইলাম। নীচে যেমন নামিয়াছি, দেখি, পাঁচের লাঠিখানা হাতে মা দ্রুতপদে আমায় ধরিতে আসিতেছেন। আমি অমনি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলাম। সম্মুখে দেখি, সুখদারা পলাইতেছে, পেছনে আর একবার তাকাইয়া দেখিলাম মা আসিতেছেন। পেছনে তাকাইয়া অন্যায় করিয়াছিলাম, সামনে একটু জল বাধিয়াছিল সেইখানে পড়িয়া গেলাম। বেদনার জন্যে একটুও নয়—মার হাতে ধরা পড়িলাম, খেলা মাটি হইল, সকলে চলিয়া গেল, এই নৈরাশ্যে আমি যেন উঠিতে পারিলাম না; সেইখানে কাঁদিয়া ফেলিলাম। মা তখন লাঠি ফেলিয়া দিয়া তাঁহার অঞ্চলে আমার হাত বাঁধিয়া আমায় উঠাইলেন। আমি যখন মার হস্তে বন্দী, তখন উঁচিয়া দেখি, আমার সম্মুখে বিষরগন্ধার মুখখানি লইয়া সুখদা দাঁড়াইয়া আছে; সেখানে আর কেহ নাই—সকলে যে যেখানে পারে পলাইয়াছে। আমার মাটিতে পড়া তনিমাই সুখদা ফিরিয়াছিল। মা যখন আমাকে লইয়া যান, তখন সুখদার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল,—সুখদাকে দেখিয়াই তাহার মাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"শরৎ! দেখে যাও তোমার দুষ্টু মেয়ে কোদে রোদে বেড়িয়ে কি করছে!" সুখদা যেখানে ছিল, সেখানেই থাকিল, পলাইতে চেষ্টা করিল না। সুখদার মা আসিয়া মেয়ের গালে ঠোনা দিলেন। বুঝি তাহাতেই সুখদার লাগিয়াছিল, সে ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি মার হস্তে বন্ধ হইয়া ঘরে গেলাম, শরৎ মাসীমার সঙ্গে চোখ রাঙাইতে রাঙাইতে সুখদাও সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা ও সুখদার মা ঘরে আসিলে সকলে আবার খেলায় মন দিলেন। বন্দিতে ভুলিয়াছি, মা ঘরে আসিয়াই আমাকে খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধিয়াছিলেন। আমার সেই বন্ধন-দশার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এমন সময় অমলা মাসী খেলিতে খেলিতে অন্যমনস্ক হইয়া আমার দিকে তাকাইলেন। বলিলেন,—"ও দশা! ছেলের কেন এ শাস্তি! আর কতক্ষণ?" মা তখনি বলিলেন,—"হোক যেমন শাস্তি!" আমার হইয়া আর কেহই কিছু বলিল না। অমলা মাসী একবার আমার হইয়া বলিলেন, কিন্তু তিনিও খেলায় মন দিলেন, আর কিছু বলিলেন না।

এদিকে সুখদা ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিল। একবার আমার মুখের দিকে, একবার আমার বন্ধনের দিকে, আর একবার মার দিকে সঙ্কোচ-দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। অবশেষে সুখদা, আমার হাতের সঙ্গে যে কাপড় খানি বাঁধা ছিল তাহার উপর একবার হাত দিয়া তখনি আবার হাত উঠাইয়া লইল। সসঙ্কোচে সুখদা দুই-চারবার এই রকম করিতে করিতে একবার গেরো ধরিয়া টান দিয়াছে। আমি একটু হাসিলাম। আমার প্রতি সুখদার দয়া দেখিয়া তখন তাহার প্রতি আমার খুব কৃতজ্ঞতা হইল। সুখদা যখন আমার গেরো খুলিতেছিল, আমি দেখিতে পাইলাম মার মুখে যেন একটু প্রচ্ছন্ন হাসি; আমাদের দিকে বক্রদৃষ্টি করিতেছেন। আমি ভাবিলাম, সুখদা বুঝি বৃথা চেষ্টা করিল; কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, সুখদা আমার হস্ত মুক্ত করিয়া দিল। মাও একটু সরিয়া দরজার কাছ ঘেঁসিয়া বসিলেন, অমলা মাসীকেও পাশে টানিয়া লইলেন। আমার সাধ থাকিল না দৌড়িয়া বাহিরে যাই।

নিরুপায়ে তখন লক্ষী ছেলের মতন আমি ও সুখদা মাটির পুতুলগুলি বাহির করিয়া খেলিতে লাগিলাম।

এইরূপে সুখদার সহিত আমার শৈশব কাটিতে লাগিল। সেই চঞ্চল বাল্যকালে ক্ষুদ্র সুখদার একটু মুখের কথায় আমি খেলা ছাড়িয়া মার হাতে ভাত খাইতাম, ইস্কুলে যাইতাম। মাও অনেক সময় নিজে না পারিয়া আমার শাসনে সুখদার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

(২)

ছেলেবেলার ছেলেখেলা ক্রমে কমিয়া আসিল, কিন্তু দিনের মধ্যে দশ-পাঁচবার সুখদার সঙ্গে দেখা হইত। দুপুরবেলা যখন পড়িতে যাইতাম, সুখদা তখন কি করিত জানি না; কিন্তু রোজ ছুটির পরে বাসায় আসিয়া বাহিরের পড়িবার ঘরে বই ফেলিয়াই যখন বাড়ির ভিতর যাইতাম, তখনি দেখিতাম একখানি অন্যমনস্ক সুন্দর মুখ বাহিরের দরজার দিকে তাকাইয়া কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমায় দেখিবা-মাত্র তাহা মুখ প্রফুল্ল হইত, তখনি মাকে ডাকিয়া আমার আগমন-বার্ত্তা জানাইয়া দিত। মা আমায় খাবার খাইতে দিতেন; সেই সময় সুখদার হাতেও তিনি খাবার দিতেন। সুখদা বিনয় লজ্জা-মাখা মুখে মার প্রদত্ত খাদ্য তাহার সুন্দর ছোট হাতখানি পাতিয়া গ্রহণ করিত; কিন্তু ঐ তা'র কি অভ্যাস, মা যেটুকু দিতে আসিতেন একদিনও তাহার এক-চতুর্থাংশের বেশী গ্রহণ করিত না। তাও আবার নিজে কিছু মুখে দিয়া আমার মিষি-বেড়াল ও কাকাতুয়াকে সোহাগ করিয়া খাওয়ান হইত। এজন্য সুখদার উপর আমি রাগ করিতাম।

বিজয়নগরে বালিকা-বিদ্যালয় ছিল, সুখদা সেখানে পড়িত। আমার কাছে সে তাহার পড়া বুঝিয়া লইত। দশ বছরের বালিকার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও পড়ায় অনুরাগ দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতাম।

(৩)

আমি এণ্ট্রান্স পাশ করিলাম। বিজয়-নগরে পড়া শেষ হইল। এখন জনকজননী ছাড়িয়া দূরে পড়িতে যাইতে হইতেছে। শৈশব-সহচরী স্নেহের সুখদাকেও আমি ভুলি নাই। এই সব চিন্তায় আমার মন একটু আকুল। উপায় কি? কলিকাতা যাবার দিন আসিল। বিজয়নগর হইতে আমার দুই তিন-জন সমবয়স্ক বন্ধুর সঙ্গে যাইতেছিল।

বাড়ির ভিতর হইতে বিদায় লইয়া আসিবার সময় মার পায়ের উপর পড়িয়া প্রণাম করিলাম। মা যেন শত চেষ্টা করিয়াও চোখের জল লুকাইতে পারিলেন না। পাশে চাহিয়া দেখি, সুখদা আমার কাছেই দাঁড়াইয়া আছে। সেদিন সুখদার করুণ মুখশ্রীর কি সুন্দর শোভা! আজও সে ছবি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। সুখদা যেন একটু আগে নির্জ্জনে কাঁদিয়া আসিয়াছে, আমার যাইবার সময় আমায় দেখিতে আসিয়া এখানে হাসিতে চেষ্টা করিতেছে। চারু অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা, আয়ত আরক্তিম নয়নে অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্রন্দনের চিহ্ন সুস্পষ্ট! মার কাছে বিদায় লইয়া আমি সুখদার দিকে তাকাইয়া বলিলাম, —"সুখদা, আমি যাই—।" সুখদা পায়ের আঙ্গুল দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভূমিতলে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া শুধু একটু মাথা নাড়িল, কোন কথা বলিল না। এমন সময়ে পরাণদিদির পিসিমা সুখদার নাম ধরিয়া কহিলেন,—"দাদা বলে প্রাণ ছাড়ে, ওরি বড় কষ্ট হবে।" সুখদার মাও কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমি তাঁকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। আসিবার সময় সুখদা যখন আমায় প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন আর একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—

শিশিরকণার মতন অশ্রুকণা ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নপল্লব আর্দ্র করিয়াছে। আমি তখনও অশ্রুহীন, কঠিন; পবিত্র স্নেহমমতার প্রতিদান জানি না। আমি তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলাম। পথে হৃদয়ে যেন কি এক দুঃসহ যাতনাভার অনুভব করিলাম।

(৪)

এখন কলিকাতায় প্রেসিডেন্সিতে পড়ি। মেসে থাকি। রাজধানীর বিশাল ব্যস্ততা ও কোলাহলের মধ্যেও বিজয়নগরের স্বভাব-সুন্দর গ্রামদৃশ্য ও গৃহে স্নেহভালবাসার স্মৃতি আমার সমুদায় হৃদয় জুড়িয়া আছে। মার জবানি চিঠি সব সুখদার হাতের লেখা। জননীর স্নেহাশীর্বাদ-পত্রের সহিত সেই প্রিয়-পরিচিত হস্তাক্ষর আমার কত আদরের! সুখদাও আমায় চিঠি লিখিত। সপ্তাহে একখানি, সে এ নিয়মের অন্যথা করে নাই।

গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজাপার্ব্বণের ছুটিতে দিন পাইলেই বাড়ি যাইতাম। সকলকে দেখিয়া আসিতাম। দীর্ঘ প্রবাসের পর বাড়ি আমার কি মধুর বোধ হইত! সুখদা আমায় দেখিয়া কত সুখী হইত!

(৫)

সুখে দুঃখে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা দিয়া বাড়ি আসিলাম। আগে বাড়ি আসিলে আনন্দে প্রাণ ভরিয়া উঠিত, এবার তাহাতে দারুণ আঘাত লাগিল। এবার ত আমার আগমন-প্রত্যাশায় সুখদা আমাদের বাসার দরজায় দাঁড়াইয়া নাই! বাড়ির ভিতরে যাইয়া দেখিলাম—সেখানেও তুনাই! অসঙ্কোচে আমি মাকে সুখদার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মা ম্লানমুখে কহিলেন,—"সুখদা তাদের বাসায় আছে।"

পরে প্রকৃত কথা শুনিলাম—সুখদার সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্য মা বাবাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন অযোগ্য সম্বন্ধ উত্থাপনের জন্য বাবা বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ্যেই কথাটা হইয়াছিল, কাজেই সুখদার পিতা ওখনাধব সরকার মহাশয় আমাদের জাতিংশে সম্বন্ধ না হইলেও বাবার এই কথায় দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেই হইতে সুখদা আমাদের বাসায় আসে না!

শৈশবের সরল হৃদয় বয়সের স্বার্থপরতায় মলিন হয়! সমাজ ও সংসারের পদমর্য্যাদার খাতিরে অনিচ্ছায় স্নেহভালবাসা বিসর্জ্জন দিতে হয়! কে জানিত?

প্রাণে উৎকট যন্ত্রণা। একটানা স্রোত বাধা পাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, সুখদাকে আমি আমার অজ্ঞাতসারে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি! তাহাকে না পাইলে, আমার জীবন কি দুঃসহ, দুর্ব্বহ!

(৬)

শরৎবাবু আমাদের অব্যবহিত প্রতিবেশী। তাঁর দিদিমাকে আমি দিদিমা ডাকি। বুড়ী দয়াবতী, আমায় বড় ভালবাসে। সপ্ততিপর, অশক্ত, তাই বাড়ি আসিয়া আমি তাঁকে দেখিতে গিয়াছি। তাঁর নিকট হইতে উঠিয়া আসিয়া আমি যখন বারান্দায় পা দিয়াছি দেখি, তাঁদের আর একঘর হইতে বাহির হইয়া সুখদা তাদের বাসা যাইবার পথ ধরিয়াছে। এতক্ষণ সুখদা ঘরেই ছিল, আমার বাহিরে আসিবার সাড়া পাইয়া সেও বাহির হইয়াছিল।

তার মন বুঝিলাম। শুধু একটুখানি চোখের দেখা! সে দৃষ্টিতে শুধু নিরপরাধিনীর ক্ষমাভিক্ষা! তাতে কত অর্থ! আমার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল।

কিন্তু সুখদা আজ সকলের চক্ষুরন্তরালে লুকাইয়া আমায় দেখিতে চাহিতেছে। সে সাহস সুখদা আর নাই! যে আমার কাছে বসিয়া গল্প করিতে এত ভালবাসিত, সে আজ আমার সঙ্গে পরের মতন ব্যবহার করিতেছে। —না-না, সুখদার সরল দৃষ্টি ত তা বলে না। সে দৃষ্টি আমায় যাহা বলিতেছে, তাহা দেখিয়া আমার সংযমিত সুপ্ত-প্রেম জাগিয়া উঠিল, আমি সেইখানে ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইয়া তাহার নিকট আত্মবিক্রয় করিলাম। কিন্তু তবু সুখদার 'চুরি করে চাওয়া' আমার সহ্য হইল না, তখনি বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

লোকের হৃদয়হীনতা ভাবি! না হয় সুখদার সঙ্গে আমার বিবাহই হইবে না, কিন্তু তাহাকে আমি দেখিতে পাইব না কেন? তাহার প্রকাশ্য নির্দ্দোষ স্নেহ হইতে আমি বঞ্চিত হই কেন?

(৭)

এই ভাবে কয় দিন গেল। একদিন শুনি, ওখনাধব বাবু ছুটি লইতেছেন। কেন? জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মেয়ের বিবাহ দিতে দেশে যাইতেছেন।

হৃদয়ের ব্যাকুলতা আমার আরও বৃদ্ধি পাইল।

সেইদিন বৈকালে বাড়ির ভিতর খাবার খাইতেছি; কেবল মা, সেখানে আর কেহ ছিল না। আমি এ কয়দিন আত্ম-বিস্মৃত ছিলাম, নিজেই নিজেকে বুঝিতে পারি নাই। আমার শরীর ও ব্যবহারের বুঝি বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল, তাই মাকেও অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিতে পাইলাম। মার স্বভাব, আমাকে প্রকাশ্যে আমার কোন কথা বলিতেন না, কিন্তু আমার চোখের দিকে তাকাইয়া তিনি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্তল দেখিতে পাইতেন।

সেখানে কেবল আমি ও মা, কিন্তু কাহারও মুখে কথা নাই। আমি খাবার খাইতে শুধু বসিয়াছিলাম, একটুও খাইতে পারিলাম না।

দুঃখে আমার কান্না আসিতেছিল। আমি চলিয়া আসিলাম। অন্য দিন পেট-ভারে না খাইলে মা কত অনুযোগ করিতেন, আজ একটি কথাও বলিলেন না; শূন্য-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া ছিলেন।

বাড়ি এখন আমার নিকট বিষ-স্বরূপ। বাহিরে, মাঠে, নদীতীরে যাইতে পারিলে বাঁচিতাম।

সেদিন তখনি সন্ধ্যার আগে বাড়ির বাহির হইলাম। একটু রাত হইলে বাসায় ফিরিয়া আসিয়াই বুঝিলাম, কিছু পূর্ব্বে মার সঙ্গে বাবার একটা অতিশয় বিরোধের কথা হইয়া গিয়াছে। বাবা বলিতেছেন,—'তোমার কথায় আমি পিতৃ-পুরুষের সমস্যে জলাঞ্জলি দিতে পারি না। অমন ছেলে থাকিলেই কি, না থাকিলেই কি? আর কয়েকটা যে মরিয়া গেল তাতেও আমার এত কষ্ট হয় নাই, ললিতের অবাধ্যতায় আমার যতদূর হইয়াছে।'

শেষের কথাটা প্রাণে বড় লাগিল। অবাধ্যতা ত কিছু করি নাই?

সেইখানে তখন প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমরণ সুখদার মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিব, কিন্তু পিতার অবাধ্য হইব না। কোন দিনই ত হই নাই।

নানা চিন্তা ও দুঃখে আমি অবসন্ন। কাহাকেও কিছু না কহিয়া শয্যায় একটু বিশ্রাম করিতে গেলাম। শেষ রাত্রে সহসা খুব জ্বর হইল। জ্বরের তীব্রতায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

(৮)

প্রলাপ মধুর শুনিলাম তিন দিন মোহাচ্ছন্ন ছিলাম। আরও থাকিলাম না কেন? সেই সুখস্বর-রাজ্যে, আমার আত্মা চিরশান্তি লাভ করিল না কেন? অভাগা আমি আবার জাগি-

লাম। স্বপ্নে আমার স্নেহ-লতাকে পাইয়াছিলাম, জাগিয়া যদি সে স্বপ্ন অলীক হইবে, তবে জাগিলাম কেন?

অজ্ঞানাবস্থায় সুখ-স্মৃতি নীরে ডুবিয়া যেন দেখিতেছিলাম, সুখদা আমাকে দেখিতে আসিয়াছে। সেই আগেকার মতন ভালবাসা সুখদার নাম ধরিয়া ডাকিতে হঠাৎ আমার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, অনেকে আমার শয্যার চারিদিকে ম্লান-মুখে বসিয়া আছে। মা অঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জনা করিলেন। সকলে আমাকে জাগিতে দেখিয়া প্রফুল্ল হইয়াছে। কিন্তু আমার যন্ত্রণা-বোধ বেশী হইল। যেন আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না বোধ হইল। দারুণ আঘাতে আমার মর্ম্মস্থান ছিঁড়িয়া গিয়াছে; একটা অব্যক্ত মানসিক যাতনার সঙ্গে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা অনুভব করিলাম। সেই বেদনায় বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু এখন মার সঙ্গে কথা কহিতে পারি।

একটু পরে পাশের ঘরে বাবার কথা শুনিলাম। সেই সঙ্গে মা যেন ব্যাকুল অনুনয়-পূর্ণ কণ্ঠে বলিতেছেন,—'আমার চারিটি নাড়ি-ছেঁড়া ধন কালে সমর্পণ করিয়াও বাঁচিয়া আছি, আঁধার কুটীরের একমাত্র আলো ললিতের ভরসায়। এত দিন বড় সঙ্ক করিয়াছি; ললিত না বাঁচিলে আমার আশা করিও না। ছেলের কথায় মায়ের যদি অধিকার থাকে, আমায় তবে বলিতে দাও, সুখদার সঙ্গে ললিতের বিয়ে হোক্। তা না হ'লে ললিত বাঁচিবে না।'

মা নামের কি সার্থকতা! শিখসংসারে মার চেয়ে কে বেশী ভালবাসে? আমার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

সেই অবস্থায় শুনিলাম, বাবা কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন,—'তা হ'লে যদি ললিত বাঁচে, তাই হোক্।' সেই কথার সঙ্গে আমার বুকের বেদনা যেন কমিয়া আসিল।

সেদিন বাবা বলিয়াছিলেন,—অমন ছেলে থাকিলেই কি, না থাকিলেই কি,' আজ বলিলেন,—'তা' হ'লে যদি ললিত বাঁচে, তাই হোক্!'

পিতৃ-স্নেহের তুলনা নাই! ললিত বাঁচিবে।

(৯)

সেই রাত্রিতেই বাবা নিজে গুণমাধব বাবুর নিকট যান। শুনিলাম, গুণমাধব বাবুর হাত ধরিয়া বাবা বলিয়াছিলেন,—'সরকার মহাশয়! আমি যদি আত্মাভিমানের কোন কথা বলিয়া আপনার মনে কষ্ট দিয়া থাকি, সে জন্য অনুতাপিত হইয়াছি। আমার যোগ্য-পুত্র ললিতের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিয়া সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাই।'

সরকার মহাশয়ের যদি অসরল বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে এ কথাটাতেও বাবার প্রচ্ছন্ন অভিমান উপলব্ধি করিতে পারিতেন। সুখের বিষয়, তাহা না করিয়া তিনি হৃদয়ের সহিত বাবাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন নাই। একবার যে কথায় আত্ম-সম্ভ্রমে আঘাত লাগে, লাভ দেখিলেও সৎপুরুষ সে দিকে আর ঘেঁসেন না।' বোধ হয় সেই জন্যই তিনি স্বীকৃত হন নাই।

তখন যাবা আমার প্রাণের দায়ে অধীর। নিজের স্বভাব সংযম করিয়া, সরকার মহাশয়ের নিকট তাঁহার কন্যা ভিক্ষা চাহিলেন। বলিলেন,—'যদি একটি শোকাতুরা জননীকে পুত্র-শোক হ'তে রক্ষা করিতে চান, তবে ললিতকে জামাতা স্বীকার করুন।'

সরকার মহাশয় এবারে আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়াছিলেন।

(১০)

এবার ডাক্তারেরা বলিলেন, অতি দ্রুত-গতিতে আমার আরোগ্য সাধিত হইতেছে। ১৯।১২ দিন মধ্যে আমি রীতিমত পথে বেড়াইতে পারিলাম।

তার পর?—সুখের নব-বাসরশয্যা! আমার হৃদয় বুঝিয়া মার আনন্দ ধরে না। গাঁয়ের রহস্য-সম্পর্কীয়াদের অজস্র বিদ্রূপ-বাক্যবাণে আমার ও আমার প্রিয়তমা নবনায়িকার লজ্জানত বদন। কোন কোন রমণী আবার সেই মুখ দুইখানি একত্র করিয়া শোভার বর্ণনা আরম্ভ করিলেন! তখন সুখদার সরমা-রক্তিম কপোলের কি সুন্দর শোভা!

ফুলশয্যায় ফুলরাণী সুখদা আমার অতৃপ্ত তৃষিত চুম্বনের সহিত তাহার প্রিয়তমের বক্ষে মস্তকাগ্র লইল,—নির্ভর-পরায়ণার নীরব ভাষা আমায় যেন বলিল—'আমি একান্ত তোমারি।'

(১১)

সুখদাকে পুত্রবধূ পাইয়া মার আশা সফল হইল। বাবাও সুখদার গুণে 'কুলের খোঁটা' ভুলিয়াছেন। সুখদা এখন তাঁর 'লক্ষ্মী মা!'

সুখে আমার দিন কাটিতে লাগিল। সুখদাকে বুকে করিয়া আমার ভাঙা বুক জোড়া লাগিল।

(১২)

একদিন আমার ঘরে বসিয়া আহার করিতেছি। 'নূতন বউদি' ঠান্দিদি কোথা হইতে আসিয়া আমার কাছে বসিলেন। আমাদের দু'জনায় খুব রসিকতা চলিত। বর্ষীয়সী বিদ্রূপ-ব্যঙ্গে নিপুণা। এ কথা সে কথার পর তাঁর নাত্‌বৌয়ের বর্ণনা আরম্ভ হইল। নগদ এত টাকা, চেন্ ঘড়ি, হীরের আংটির গল্প করা হইল। সেই সঙ্গে কুলগৌরব আরম্ভ হইল। শেষের কথাটা আমার অসহ্য হইয়াছিল; বিশেষ আমার সুখদা পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া ছিল, মাঝে মাঝে উঁকি দিয়া আমায় দেখিতেছিল।

"আমি ঠান্দিদির কথার উত্তরে বলিলাম,—'ভারি! কুল ধুয়ে জল খাব!'

তিনি এবারে, হাসিয়া কহিলেন,—'নয়? তোমার বুঝি শুধু রাঙা-বৌ এক মানিক, তাই? আমি এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া দেখিলাম, মা নিকটে নাই; তখন অর্থপূর্ণ হাসিয়া আমি বলিলাম,—'জান না ঠান্দিদি, সাত রাজার ধন এক মানিক?'

দেখিলাম, রঙীন পর্দ্দার আড়ালে, সুখদা দাঁড়াইয়া। তাহার রক্তিমাধর প্রান্তে হাসি ধরে না! চোখে কৃতজ্ঞতার কটাক্ষ!

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

একটী আবেদন।

হে স্বদেশানুরাগি, ধর্ম্মপ্রাণ, পরম বৈষ্ণব; সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য পরিপোষক মহোদয়গণ! আমি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের লীলাত্মক ও তদীয় সাঙ্গোপাঙ্গগণের মহিমা বর্ণনাত্মক প্রাচীন পদাবলী (যাহা সাধারণতঃ গৌরচন্দ্রিকা নামে খ্যাত,) সংগ্রহ ও অন্ধকারে

প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। এই পদাবলী সংগ্রহের মূখবন্ধ-স্বরূপ একটী বিস্তৃত উপক্রমণিকা থাকিবে। তাহাতে প্রথমে মহাপ্রভুর অবতারত্ব স্থাপন জন্য শাস্ত্রীয় ও যুক্তিমূলক বিচার থাকিবে; দ্বিতীয়তঃ পদাবলীতে উল্লেখিত পারিষদ, অন্তরঙ্গ ও সাঙ্গোপাঙ্গগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকিবে; তৃতীয়তঃ শ্রীচৈতন্য দেবের ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা থাকিবে; পরিশেষে পদকর্ত্তাগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী থাকিবে। বৎসরাধিক কাল দিবারাত্র পরিশ্রম ও বহুল অর্থব্যয় করিয়া আমি এ পর্য্যন্ত প্রায় একাদশ শত পদ সংগ্রহ করিয়াছি। যদি এই সংগ্রহখানি কখনও প্রকাশিত হয়, তবে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা, গীত চিন্তামণি, ভক্তি রত্নাকর প্রভৃতি সাধারণতঃ প্রচলিত গ্রন্থে যে সকল গৌরচন্দ্রিকা নাই, তেমন শতাধিক পদ ইহাতে আছে। পদসমুদ্র গ্রন্থখানি পাই নাই; সুতরাং তাহার কথা বলিতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, এমন দুই একজন ভক্ত বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সংগ্রহের অনেক পদ তাঁহারা উক্ত গ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। এই অতিরিক্ত পদগুলি আমরা প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়া ও বৈষ্ণবগণের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। আজ পর্য্যন্ত সংগৃহীত পদগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে সাজাইয়াছি :—(১) মূলগ্রন্থ। ইহাতে কেবল মহাপ্রভুর রূপগুণপ্রভৃতি বর্ণনাত্মক পদাবলী। (২) পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টের সংখ্যা চারিটী। প্রথম পরিশিষ্টে প্রভু নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও সাঙ্গোপাঙ্গগণের পদাবলী; দ্বিতীয় পরিশিষ্টে প্রাচীন পদকর্ত্তাগণের ঔপাসুকীর্ত্তন সূচক পদাবলী; তৃতীয় পরিশিষ্টে ভজ, প্রার্থনা, মনোশিক্ষা, হরিসংকীর্ত্তন প্রভৃতি পদাবলী; এবং চতুর্থ পরিশিষ্টে নূতন সংগৃহীত পদাবলী থাকিবে। পদাবলী গুলির প্রয়োজন মত টীকা, ফুট নোটে থাকিবে। তাহার দুই একটী নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। গোবিন্দ দাসের একটী পদে মহাপ্রভু ও প্রভু নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—

"তেঁই অনুমানিয়ে দুহুঁ পরমেশ।
প্রতি দরপণে জনু রবির আবেশ॥
ইহ রসে যাঁহার নাহিক বিশোয়াস।
মলিন মুকুরে নাহি বিম্ব বিকাশ॥"

আমরা এই স্থলের এইরূপ টীকা করিয়াছি :—পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়; তবে গৌর নিতাই দ্বিধারূপে কিরূপে অবতীর্ণ হইলেন, এই সন্দেহের নিরসন জন্য কবি কহিতেছেন, —সূর্য্য-কিরণ যতগুলি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, ততগুলি সূর্য্যরূপে প্রতীয়মান হইলেও যেমন সূর্য্য এক ভিন্ন দুই নহে; তদ্রূপ নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইলেও ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই নহেন। এবং প্রভুদ্বয়ের ভগবানত্বে যাহাদের বিশ্বাস নাই, সেই পাষণ্ড নাস্তিকদিগের হৃদয়ও মলিন দর্পণ তুল্য। কারণ, মলিনত্ব-হেতু দর্পণে যেমন কোন পদার্থ প্রতিফলিত হয় না, অবিশ্বাস-রূপ মলে নাস্তিকের হৃদয় আবৃত থাকাতে, তাহাতেও প্রভুদ্বয়ের ভগবানত্ব প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না।

আর একটী পদে গোবিন্দদাস বলিয়াছেন;—

"জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন বন্দন,
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।"

"পূর্ণ" শব্দটী বারম্বার ব্যবহার করাতে, আমরা এই পংক্তির এইরূপ টীকা করিয়াছি। "গৌরাঙ্গ ভগবদ্ভক্ত নচপূর্ণ নচাংশক"—এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ গোপন করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, —"গৌরাঙ্গ পূর্ণত্বিতার বা অংশাবতার নহেন। কেবল ভগবানের ভক্ত।" ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দ কবিরাজ এই মতকে অগ্রাহ্য করিয়া

দৃঢ়তা সহকারে কহিতেছেন,—"আমার শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানের ভক্ত নহেনই, অংশাবতারও নহেন। তিনি পূর্ণ পূর্ণ অবতার।" বিজ্ঞ সাধু বৈষ্ণবেরা ইহাই এই বচনের সরল ও প্রকৃত অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ অনেক পদে মহাপ্রভুকে নবীন নাগর রূপে বর্ণন করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আমাদিগের টীকা এই যে,—

পদকর্ত্তাদিগের এই ভাবের পদগুলিকে "নাগরীর পদ" বা "রসের পদ" বলে। এই সকল পদ সম্বন্ধে একটু বিচার করা প্রয়োজন। শ্রীবিশ্বম্ভর শৈশবে অনেক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও কোনরূপ কামকটাক্ষপাত কিংবা কামভাব প্রকাশ করেন নাই। সন্ন্যাসের পূর্ব্বেই ইঁহার সর্ব্ববিষয়ে বিশুদ্ধ আদর্শ-চরিত্র দেখিতে পাই। সন্ন্যাস গ্রহণের পর, মহাপ্রভু স্বীয় ধর্ম্মপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করেন নাই। মাধবী দাসীর সহিত দুই একটী কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া, মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ পরম সাধু জিতেন্দ্রিয় দ্বিজ হরিদাসকে তিনি বর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং কেবল এই কারণে হরিদাসের সাধনার মত কঠোর সাধনাকেও "মর্কট বৈরাগ্য" বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিলেন। আবার অন্তর্লীলায় দেখিতে পাই, একদা নিশীথ সময়ে বল্লবীরে সমুদ্রতটে তান-লয়বিশুদ্ধ কোকিল কাকলী বিনিন্দিত মধুর কীর্ত্তন শ্রবণে উন্মত্ত হইয়া, মহাপ্রভু, সেই স্বরলহরী লক্ষ্য করিয়া, গায়কের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন; নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গায়িকা একটী নবযুবতী সুন্দরী স্ত্রী। তখন নয়ন মুদ্রিত ও শ্রীহরি স্মরণ করিয়া, তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া, মহাপ্রভু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। নায়িকা-মুখদর্শন বা নায়িকা-বাক্য শ্রবণে যাঁর এত ঘৃণা, তাঁহাকে লম্পট নাগর-রূপে বর্ণন-করিবার অর্থ কি? এ প্রশ্নের গৌণ ও মুখ্য দুইটী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। গৌর উত্তর এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন কংশ-সভায় উপস্থিত হয়েন, তখন তাঁহাকে কেহ শত্রুভাবে, কেহ মিত্রভাবে, কেহ পুত্রভাবে, কেহ স্বামীভাবে, কেহ রঙ্গকভাবে, কেহ প্রভুভাবে, আবার কেহ "বিনোদ-নাগর" ভাবে,—অর্থাৎ যাঁহার যেমন মনের ভাব, তিনি সেই ভাবে—তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। এখানেও তদ্রূপ, যে নয়-নভঙ্গী—যে হাস্য-রোদন দেখিয়া মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ ভাবিয়া ভক্তগণ ব্যাকুল, যে ভাব-ভঙ্গীকে বায়ু-রোগের বিকার ভাবিয়া স্নেহবতী শ্রীশচীমাতা আকুলা, তাহাকে হাবভাব মনে করিয়া, হাস্যময়ী নদীয়া নাগরীগণ যে শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর ভাবিবেন তাহার বিচিত্রতা কি? এই জন্যই সাধারণ কথায় বলে,—"কৃষ্ণ কেমন? যাঁর মন যেমন॥ মহাপ্রভুর নবীন নাগররূপ, নাগরীরূপ ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে। মুখ্য উত্তর এই :—গৌরভক্ত রসিক পদকর্ত্তাগণ বিশ্বাস করেন—"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,।" সুতরাং নিগূঢ় ভাবে, আপনারা নাগরী সাজিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গকে নবীন নাগর সাজাইয়া, তাঁহার রূপগুণ বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহারা ব্রজভাবে মাতোয়ারা—মধুর রসের রসিক রস-সেবর শ্রীমহাপ্রভুকে তাঁহারা আর কোন্ ভাবে তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন? তুমি আমি মহাপাপী, অধম, পতিত, তুই তাঁহাকে কেবল "অধম তারণ" "পতিত পাবন" বলিয়া ডাবি ও ডাকি।

মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত ও পরিকর শ্রীমাধবেন্দ্র ঘোষ একটী পদে লিখিয়াছেন যে, একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত পাশাখেলায় রত হইয়া—

"দুই চারি বলি দান ফেলে গদাধর।
পঞ্চ তিন বলি ডাকে রসিক নাগর॥"

আমরা এই দুই চরণের এইরূপ টীকা করিয়াছি;—এই সংসারে ভবের পাশা খেলিয়া কেহ জিতে, কেহ হারে। কেহ জিতে দুই চারি ইত্যাদি সমদানে; কেহ জিতে তিন পঞ্চ আদি বেশম দানে। যে যে পদ্ধতি অবলম্বনে সাধন করে, তাহার তাহাতেই সিদ্ধিলাভ হয়। লোকশিক্ষার জন্য গদাধর পণ্ডিত সঙ্কেত করিতেছেন, —আমি "হরি" বা "কৃষ্ণ", অথবা "রাধা" এই দ্বি-অক্ষরাত্মক নাম জপ করিয়া, কিংবা "হরেকৃষ্ণ" বা "রাধেকৃষ্ণ" এই চতুরক্ষর বিশিষ্ট নাম জপ করিয়া, ভবের পাশায় জিতিব। পরন্তু, দুই ও চারিতে ছয় হয়; সুতরাং ষড়রিপু জয় করিয়া সিদ্ধিলাভ করিব। কিন্তু মহাপ্রভু সঙ্কেতে বলিতেছেন যে,—"পারিতি" এই তিন অক্ষরাত্মক পদার্থ লইয়া ভজন করিলেই ভবের পাশায় জয়ী হওয়া যায়। যে খেলাতে তত পটু নহে, অর্থাৎ যে "পারিতি" বা "মধুর" রসের অধিকারী হইতে পারে নাই, তাহাকে ক্রমে শান্ত, দাস্য, সাম্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ দান শিক্ষা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। অথবা, তিন আর পাঁচে আট; সুতরাং প্রাগুক্ত পদ্ধতিপ্রকরণের সহিত প্রেম, রস, ভাব, যোগ করিয়া এই আট যোগে সাধন করিলে সিদ্ধ হওয়া যায়। অর্থাৎ হৃদয়স্থিত অষ্টদলে অষ্ট সখীর নৃত্য করাইতে পারিলেই, ভবের পাশা আর খেলিতে হয় না।

আর নমুনা তুলিয়া প্রবন্ধখানি দীর্ঘ করিব না। শ্রীশ্রী মহাপ্রভু যদি কখনও অধিকজনের আশা পূর্ণ করেন; তবে আপনারা কাঁঠালিড়ালের সাগর-বন্ধন ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যা ও আলোচনার প্রথমাংশ আপনারা প্রস্তাবাকারে দেখিবেন। মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের নমুনা অনুসন্ধানে প্রকাশিত "পূর্ব্ব গোস্বামীপাদ" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। আমরা এই কয়েকজন পরিকর ও পারিষদের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই;—পুরীদাস, মধুপণ্ডিত, মণ্ডন ঠাকুর, রূপষটক, সুধানিধি, সুদর্শন, হলায়ুধ।

এই সংগ্রহের পদকর্ত্তার সংখ্যা ৬০ কি ৭০ জন। তন্মধ্যে আংশিক বৃত্তান্ত পাইয়াছি, এই কয়েক জনের — বল্লভদাস, গোকুলদাস, স্বরূপদাস, শঙ্কর ঘোষ, ধনঞ্জয়দাস, পুরুষোত্তমদাস, গোবর্দ্ধনদাস, রাধামোহনদাস, বৈষ্ণবদাস, উদ্ধবদাস, শ্যামদাস, কানুদাস, যদুনন্দনদাস, যদুনাথদাস, বলরামদাস, জগদানন্দ, জগন্নাথদাস, রাধাবল্লভদাস, রায়শেখর।

এই কয়েক জন পদকর্ত্তার বিষয় কিছুই জানিতে পাই নাই;—মোহনদাস, রাম অনন্ত, আত্মারামদাস, প্রসাদদাস, লক্ষ্মীকান্ত, শিবরাম, রামকান্ত, ভুবন, দেবকীনন্দন, কেতকী, গোপীকান্ত, গৌরসুন্দর, নন্দরাম, হরিরাম, গোপাল ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

মহোদয়গণ, আমি অর্থোপার্জ্জন বা যশোলাভের জন্য এ কার্য্যে ব্রতী হই নাই। বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবক ও বৈষ্ণব-জগতের কথঞ্চিৎ উপকার সাধনই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব প্রাগুক্ত পরিকর ও পদকর্ত্তাদিগের বিবরণ এবং অধিকতর প্রাচীন গৌর-পদাবলী প্রদান করিয়া, যাঁহার যতদূর সাধ্য, আমাকে সাহায্য করুন; এবং সাহিত্য-ভক্ত ও বৈষ্ণব সাধুদিগের আশীর্ব্বাদভাজন হউন! এই আমার প্রার্থনা —এই আমার আবেদন।

শ্রীজগবন্ধু ভদ্র।
পাবনা—জেলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার।

হায়দারের রাজ্যপ্রাপ্তি।

পঞ্জাবের উত্তরভাগে একটি সামান্য জনপদে হায়দারের পিতা বাস করিতেন। তাঁহার নাম ফতে মহম্মদ। অবস্থা নিতান্ত হীন বলিয়া, সেখানে তাঁহাকে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদর পূরণ করিতে হইত। আপন অবস্থার উন্নতির মানসে ফতে মহম্মদ স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহীশুর দেশে আগমন করেন এবং মহীশুর-রাজার সৈন্য-বিভাগে প্রথমে সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। অদ্যদিন মধ্যে নিজ কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়ে মহীশুরের একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় স্ত্রীলোক আপন দুই কন্যাকে ফতে মহম্মদের সহিত বিবাহ দেন। উক্ত স্ত্রীলোকের স্বামী দস্যু-কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। দস্যুরা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। অন্যাভাবে অন্য উপায় না দেখিয়া, তাঁহার বিধবা পত্নী ফতে মহম্মদকে নিজ জামাতৃত্বরূপ গ্রহণ করেন। উক্ত দুই কন্যার মধ্যে ছোটটীর গর্ভে সাহাবাজ ও হায়দার নামে দুই পুত্র জন্মে। হায়দারের বয়স যখন সাত বৎসর, সেই সময় তাঁহার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। উক্ত যুদ্ধে মহীশুরের রাজাও নিহত হন। পরবর্ত্তী রাজা, ফতে মহম্মদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়েন। সুতরাং হায়দার মাতা অনন্যগতি হইয়া নিজ ভ্রাতা ইব্রাহিমের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাহাবাজ ও হায়দারকে লইয়া তাঁহার কষ্টের আর অবধি ছিল না। বাল্যকালে হায়দারের বিশেষ কোন গুণ লক্ষিত হয় নাই। শিবাজি ও রণজিৎ সিংহের ন্যায় হায়দরও নিরক্ষর ছিলেন। হায়দার যৌবনকালে মৃগয়া এবং তদনুরূপ ব্যসনে অতিবাহিত করেন। সাহাবাজ, নন্দরাজের অধীনে সৈনিকের কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করায় অত্যল্পকাল মধ্যেই সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হয়েন। এই সময় নন্দরাজ দিওলহলী নামক একটি দুর্গ আক্রমণ করেন। সাহাবাজের সাহায্যে হায়দার নন্দরাজের সৈনিক-বিভাগে প্রবিষ্ট হন। এই সময় হইতেই ভাগ্যলক্ষ্মী হায়দারের উপর সুপ্রসন্ন হয়েন। হায়দার পুরুষত্বভাব পরিত্যাগ করিয়া এমন দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন যে, সকলে হায়দারের বীরত্বে ও কার্য্যপটুতায় মুগ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি নানা উপায়ে আপন বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্যগণ তাঁহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। হায়দার পররাজ্য লুণ্ঠন করিয়া নিজের অর্থশোষের পরিবৃদ্ধি ও সৈনিকগণের বেতন প্রদান করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণও লুণ্ঠন-কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী থাকায় অল্প সময়ের মধ্যে হায়দার অতুল ধনের অধিপতি হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজে নিরক্ষর থাকায়, গণনা করিতে পারিতেন না; কিন্তু কুণ্ডিরাও নামে একজন ব্রাহ্মণ হায়দারের জমাখরচ লিখিতেন। কুণ্ডীরাও এমন চতুর ছিলেন যে, সৈন্যগণ সুস্থিত ধনও আত্মসাৎ করিতে পারিত না।

অল্পকালের মধ্যেই হায়দার সিদ্দিগলের

ফৌজদার-কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। সদসৎ জ্ঞান-শূন্য হইয়া সর্ব্বদাই বলবৃদ্ধি ও অর্থকোষের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনেই মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। রাজভাণ্ডার হইতে সৈন্যদিগের বেতন গ্রহণ করিবার সময় এরূপ কৌশলে তাহাদিগকে সন্নিবেশিত করিতেন যে, দশহাজার সৈনাকে আঠার হাজার বলিয়া ভ্রম হইত। বিবেকের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কোনরূপ অসৎ উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

এই সময় মহীশুর-রাজ্যে একটি অল্পবয়স্ক যুবা রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি নামে রাজা ছিলেন; কিন্তু নন্দরাজ ও দেবরাজ নামক দুই সহোদর ভ্রাতা রাজ্যের কর্ত্তাস্বরূপ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মহীশুর-রাজ, নন্দরাজের যথেচ্ছাচারিতা সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নন্দরাজের কৌশলে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বরং তাঁহাকে নন্দরাজের বিশেষ আয়ত্তাধীনে থাকিতে হইল। যে সমস্ত লোক নন্দরাজের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকেরই নাসিকর্ণ ছেদিত হয়। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তাঁহার এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে রাজা এবং সমস্ত প্রজাই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

হায়দারের এই সময়ে ধনের অভাব ছিল না। তাঁহার অধীনে সৈন্যও যথেষ্ট ছিল। মহীশুরের সিংহাসনই এখন তাঁহার লক্ষ্য হইয়া উঠিল। কি উপায়ে রাজাকে পদচ্যুত করিবেন, সেই ভাবনাই তাঁহার মনের শান্তিভঙ্গ করিল। তিনি জানিতে পারিলেন, নন্দরাজের সৈন্যগণ কয়েক মাসের বেতন পায় নাই। সেই সময় নানা-কারণে অর্থকৃচ্ছ্রতা-হেতু নন্দরাজও কিয়ৎকালের জন্য তাহাদের প্রাপ্য বেতন চুকাইয়া দিতে অসমর্থ ছিলেন। হায়দার গোপনে সৈন্য-দিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরামর্শে সৈন্যেরা নন্দরাজের গৃহদ্বারে অনা-হারে ধরা দিতে লাগিল। সুতরাং হিন্দুপদ্ধতি-অনুসারে নন্দরাজকেও কয়েক দিবস উপবাসী থাকিতে হইল। তিনি পরে আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মহীশুর-রাজও নন্দরাজের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া হায়দারকে তাঁহার ক্লেশ-মোচনের কারণ মনে করিয়া, তাঁহাকে রাজ্য মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলিলেন।

অল্পকালের মধ্যেই রাজা ও রাজমাতা জানিতে পারিলেন, হায়দার নন্দরাজ অপেক্ষা শতগুণে অধিক দুর্দ্দান্ত। তখন কি উপায়ে হায়দারকে দমন করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কুদীরাও হায়দারের আচরণে বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনিও রাজার সহিত ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। হায়দার ইহাদের চক্রান্ত কিছুমাত্র অবগত হইতে পারেন নাই। প্রত্যুত আপন সৈন্যগণকে রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া নিরুদ্বেগে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, বি-এ, বি-এল।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধানী

অষ্টম বর্ষ। ১৮ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। ৩৮শ সংখ্যা।

শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে।*

রাগিণী—সাহানা মিশ্রিত।

(১)

মরি মরি, গৌর হরি,
একি হেরি তব নবকায়!
কব কায় আমি, কত শোভা হায়,
কাঁচা সোণা, কি তুলনা,
চপলা সে চমকায়!
পূর্ণিমা-চন্দ্রমা-সুষমারে ল'য়ে
নিরমিল বুঝি বিধাতায়!
দশ দিশি, হাসি রাশি,
বরষিয়ে ভাসে উভরায়!
চাঁপা ফুলে, রতি তুলে,
ফুলধনু তনু নিরমায়!
মরি মরি, গৌর হরি,
একি হেরি তব নবকায়!

(২)

কেন কেন, হরি হেন,
হেরি পুন বল কোন্ দায়?
মায়া হরি', মায়া পুরী
অবতরি বল কি মায়ায়,
কিবা ভাবে, কি অভাবে,
যোগিভাবে পুন এ ধরায়?—
আজি, ত্যজি অমরায়, ওহে শ্যামরায়
পুনরায় কেন এ ধরায়?
হেথা, সুকঠিন মাটী, বাজিবে ও দুটী
রুধির ফুটিয়ে রাঙ্গা পায়!
তাই, বড় বাজে হায়, বুঝি রাঙ্গাপায়,
বাজ-প্রায় ঐ যে ভকত-হিয়ায়!

(৩)

মরি, নবীন বয়সে, নবীন সন্ন্যাসী,
গেরুয়া বসনে সোণার গায়!
আপনারে ভুলে, দুই বাহু তুলে,
উতরোলে হরিগুণ গায়!

* মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের নব কলেবর দর্শনে এই কবিতাটী লিখিত হয়।

কোথা কৃষ্ণ-ব'লে, কালিন্দীর কূলে,
কদম্বের মূলে যাঁর [illegible]
যেন, ভুবনাভিরাম, বনে যান রাম,
তেমতি কাঁদায়ে শচীমায় !
সহি-প্রাণপ্রিয়া, সতী বিষ্ণুপ্রিয়া,
কাঁদায়ে নদীয়া কোথা ধায় !
ক্রূর লীলা ছলে, চলে নীলাচলে,
বল গো কি ব'লে বুঝাই হিয়ায় !
গোরা-দরশনে, কত-কি-যে মনে,
পড়ে ক্ষণে ক্ষণে কহনে না যায় !
শত আঁখিধারে, কাঁদি হাহাকারে,
লুকাই আঁধারে বাসনা সুদায় !
হায়, কোমল বয়সে, কঠোর সন্ন্যাস,
কে শিখাল, কেবা সাজাল হায় !
মরি গৌর হরি, প্রেম ঝুরে মরি,
বলিহারি তব মহিমায় !

(৪)

প্রেমে, পবিত্র-মুরতি, পবিত্র-ভারতী,
পবিত্রিতে যদি পাপ বসুধায় !
সেই বেশ ধরি, সেই রসে ভরি,
চন্দ্রগ্রাসে হরিনাম-মহিমায় !
সেই তিথি বারে, সেই মায়াপুরে,
চারি শ বছরে এলে পুনরায় !
এস এস প্রভু, দয়ানিধি বিভু,
ভুলোনা এ মায়া ভুলোনা আমায়,
কিবা দিবারাতি, হরিনামে মাতি,
মাতাও জগতী, গতি যে না পায় !
দিবা বিভাবরী, হেরি আঁখি ভরি,
তব রূপ হেরি যেথায় সেথায় !
মন প্রাণ ভরা, আমার সে গোরা,
গাঢ় ক'রে বাঁধি তাপিত হিয়ায় !
যেন, ছেড়ে এ মন্দিরে, ছিঁড়ে প্রেম-ডোরে,
প্রভু মোর ফিরে যেতে না পায় !

শ্রীশারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ।

প্রাণ-কথা।

ভালবাসা।

এ পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করার যদি কোন সাধন-সামগ্রী থাকে, ত ভালবাসা। ভালবাসার মূল আত্মজ্ঞান। যাহাকে আপনার মত দেখি ও আপনার মত ভাবি, তাহাকেই ভালবাসি। যেমন, আপনাকে ভালবাসা স্বতঃসিদ্ধ, তাহার জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় না, সেইরূপ যাহাকে আপনার মত দেখি, তাহাকে ভালবাসিতে মানসিক বলের প্রয়োজন হয় না। এইজন্যই ধর্ম্মমাত্রের অনুশীলনের চরম লক্ষ্য সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান। জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্ত্ত হইতেই আমাদের এই আত্মজ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ হয়। ভূমিষ্ঠ হইয়াই চতুর্দ্দিকে যাহাদিগকে দেখিতে পাই, সকলকেই আপনার বলিয়া মনে করি। যেদিকে নয়ন ফিরাই, সকলই নয়নানন্দবর্দ্ধন বলিয়া অনুভব হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের স্মৃতি কাহারও উদয় হয় না সত্য, কিন্তু সদ্যপ্রসূত শিশুর মুখচ্ছবি দেখিলে স্পষ্ট অনুভব হয় যে, আত্ম-পরজ্ঞানের কালিমাময় রেখা তখনও তাহার মুখমণ্ডলে উদিত হয় নাই। সে সকলের দিকেই সস্নেহে সমদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, প্রত্যেক সুন্দর বস্তুতে তাহার চিত্ত আনন্দে

উৎফুল্ল হয়, এবং সেই আনন্দে সে শয্যায় শুইয়া হস্তপদাদি সঞ্চালন করিতে থাকে। তাহার আনন্দের বিরাম নাই; কেবল ক্ষুধার সময় সে কাঁদে—যে নিকটে থাকে, তাহার দিকেই তাকাইয়া সে কাঁদে। সে নির্ব্বাক্ ক্রন্দনের অর্থ—আহার-ভিক্ষা। শিশু অব্যক্ত ভাষায় বলে—"আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমায় খাইতে দেও।" তাহার ক্রন্দনের সময় জননী আসিয়া স্তনপান করান বলিয়াই, জননীকে সে দুগ্ধ-দাত্রী বলিয়া চিনিতে আরম্ভ করে। জননীর প্রকৃত অর্থ সে তখন বুঝে না—ভেদবুদ্ধি তখন তাহার জন্মে নাই। যিনি আহার-যোজনা করেন, এবং যাঁহারা তাহাকে সর্ব্বদা আদর করেন, সে তাঁহাদিগকেই কেবল আপনার বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করে। যতই বয়স বাড়িতে থাকে, ততই দেখিতে পায় যে, কতকগুলি লোক তাহাকে ভালবাসে, এবং কতকগুলি তাহাকে তত ভালবাসে না। তখন তাহার মন তাহাদিগের উপর উদাসীন হয়; এবং যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহাদিগের উপর প্রীতি প্রবল হয়।

অন্য বাটীর বালক বালিকাগণের সহিত খেলিতে গিয়া সেখানে বিভিন্ন ব্যবহার পাইয়া মায়ের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া বলে,—"মা, আমি আর ও বাড়িতে যাব না। কারণ, হরির মা একটা সন্দেশ ভাঙ্গিয়া হরিকে ও তাহার ছোট ভগিনী নীলাকে দিল—আমায় কিছু দিল না। কেন মা! ওরা কি আমাদের পর?" মা উত্তর করিলেন,—"বাছা রাম! ওরা আমাদের পর বই কি? জ্ঞাতি—শত্রু; সুতরাং তোমার প্রতি ওরূপ ব্যবহার করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বাছা! তুমি আর ওদের বাড়িতে যেও না!" বালকের কোমল প্রাণে এই মাতৃবাক্য শেলসম বিদ্ধ হইল। কারণ, সে হরিকে প্রাণের সহিত ভালবাসে; হরিও তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। আজ সেই প্রাণের হরি তাহার পর! এই কথায় রাম বজ্রাহতবৎ হইল। তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। জীবনের সেই প্রথম দিন সে জানিল যে, তাহার ক্রীড়া-সহচর প্রাণ-সহচর হরি তাহার পর! যদি পর হইল ত পরের সঙ্গে মিত্রতা কেন? রাম সঙ্কল্প করিল—আর হরির বাটীতে যাইবে না, আর হরির সহিত কথা কহিবে না। পর দিন হরি রামের বাটীতে আসিয়া রামকে ডাকিল—"ভাই রাম! তুমি আজ প্রাতে উঠিয়াই অন্য দিনের মত আমাদিগের বাটীতে যাও নাই কেন ভাই? তোমার কি কোনও অসুখ করিয়াছে?" রামের ম্লান মুখচ্ছবি দেখিয়া হরির সরল মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, বুঝি রামের কোনও অসুখ হইয়াছে। রাম নির্ব্বাক্—প্রাণের কথা কণ্ঠে আসিয়াছে, কিন্তু রসনা তাহা নির্গত করিতে অনিচ্ছুক। রাম চিত্রার্পিতের ন্যায় হরির মুখ-পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আজ জীবনের প্রথম দিনে সে আত্মগোপন করা আবশ্যক মনে করিল। বলিল—"ভাই হরি! সত্যই আমার একটু অসুখ করিয়াছে; তাই তোমাদের বাটীতে যাইতে পারি নাই।" হরি সরল ভাবেতে তাহা বিশ্বাস করিল। সুতরাং সে আর প্রশ্ন করিল না—রামের ললাটে ও গাত্রে হাত দিয়া দেখিল যে, গাত্র গরম হইয়াছে কি না। কিন্তু গা ভাল আছে দেখিয়া, তাহার মন হর্ষোৎফুল্ল হইল। ভাবিল—কোনও বিশেষ পীড়া নহে। সুতরাং শীঘ্রই সারিবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু রামের মা অন্যদিনের মত তাহাকে আর আদর করিল না দেখিয়া, তাহার প্রাণ আকুল হইল। সে ব্যথিত চিত্তে গৃহে ফিরিয়া জননীকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিল। হরির জননী তাহাকে উপদেশ দিলেন যে,—"তুই আর রামে

দের বাটীতে যাস্‌না! ওরা পর বই ত নয়—তোকে আদর করবে কেন?' এই বাক্যে হরির হৃদয়-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া গেল। সে রামের বাড়ি আর যাইতে পারিবে না—এই চিন্তা তাহার কোমল প্রাণে অসহনীয় হইল। কিন্তু অনাদৃত হওয়া অপেক্ষা রামের বাটীতে না যাওয়াই ভাল—ইহাও সিদ্ধান্ত করিল। এইরূপে বালক-হৃদয়ের পরস্পরের বাটীতে যাওয়া রুদ্ধ হইল। কিন্তু বালক সঙ্গী বিনা থাকিতে পারিবে কেন? তাহারা পরস্পরে আবার নূতন সঙ্গী কাড়িল। কিন্তু কিছু দিনের পর আত্মপর-জ্ঞানের বিষময় ফল—সেই সেই স্থলেও ফলিল। সুতরাং সেই সেই স্থলেও বিচ্ছেদ ঘটিল।

এইরূপে বাল্যকাল হইতে আমাদের অন্তরে আত্মপর-জ্ঞানের বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়। আপনার জনক-জননী, ভ্রাতা-ভগিনী, কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীগণকে আপনার বলিয়া বোধ হয়—এবং অপরকে পর বলিয়া বোধ হইতে থাকে। এই বিষময় ভেদবুদ্ধি অব্যক্ত হইতে ক্রমে ব্যক্ততম অবস্থায় পরিণত হয়। শিশুর হৃদয় দেবভাবে পরিপূর্ণ—সে আত্মপর জানে না—সকলকেই সে আপনার দেখে। যে তাহাকে আদর করিয়া কোলে করিতে চায়, সে তাহারই কোলে উঠে। সে কেবল আদর বা আনাদর—এই মাত্র চিনিতে শিখিয়াছে। বালকের কোমল প্রাণে—স্বচ্ছ-নির্ম্মল হৃদয় গগনে আত্মপর-জ্ঞানের উষামাত্র দেখা দিয়া থাকে। যৌবনে সেই রবির কিরণ কিঞ্চিৎ প্রচণ্ডতা ধারণ করে। প্রৌঢ়াবস্থায় সে কেবল অসহ্য হইয়া উঠে। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রৌঢ়াবস্থায় লোক আত্ম-পরিবার ভিন্ন আর সকলকেই পর ভাবিয়া উপেক্ষা করে। তাই, এই বয়সেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অত্যন্ত স্বার্থপর হয়। তখন আপনার স্ত্রীপুত্রাদি বা স্বামীপুত্রাদি ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। সমস্ত মমতা তখন গৃহপ্রাঙ্গণের অভ্যন্তরবর্ত্তী হয়।

কোন রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে অন্য কোন রাজকর্ম্মচারীর আত্মীয়তা জন্মে। উক্ত রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে সেই আত্মীয়তা—নিবন্ধন লিখিয়াছিলেন— "Yours affectionately—আপনার স্নেহের।" কিন্তু তিনি তাহাতে বিরক্ত হইয়া লেখককে বলেন—'আপনি Affectionately কথা মিথ্যা প্রয়োগ করিয়াছেন—আপনি আমাকে ভালবাসিতে পারেন না এবং আমিও আপনাকে ভালবাসিতে পারি না। Affectionately কথা যদি এখানে প্রয়োগ করি, তবে পিতা ভ্রাতা ও পুত্রাদিকে কি লিখিব?" আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এই কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আমি বলিলাম,—'ভালবাসা কি গৃহের বাহিরে যাইতে পারে না! আমিও এখন বন্ধু জানি—যাঁহাদের মধ্যে পূর্ণ অদ্বৈত ভাব।" তিনি বলিলেন,—"হাঁ, জীবনে একজন বন্ধু হইতে পারে, এবং তাঁহার সহিত অদ্বৈত ভাবও ঘটিতে পারে; কিন্তু সে এক জনের অধিকের সঙ্গে নহে।" আমি তাঁহার সহিত আর উত্তর-প্রত্যুত্তর করিলাম না। কারণ, যাহার হৃদয় অনন্ত-প্রসারী হয় নাই—যিনি আনন্দময়ী মাতা ও সচ্চিদানন্দ পিতাকে চিনিতে পারেন নাই—তাঁহার স্নেহ কখন নির্ম্মুক্ত হইতে পারে না।

ক্রমে যত বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়, মৃত্যুর দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, সংসারের আশা-ভরসা যখন একে একে সকলই নির্ম্মূল হইতে থাকে, এবং কর্ম্মক্ষয় তার ত্রাসের সহিত সংসারের লোকে তাহার প্রতি যত বীতশ্রদ্ধ হইতে থাকে, ততই তাহার মন আনন্দময়ী মাতা ও সচ্চিদানন্দ পিতার

নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। যে সকল বিষয়-কীট মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত কেবল বিষয়-কার্য্যে রত থাকে, বলিত গাত্র ও পলিত কেশ হইয়াও নিরন্তর 'আমার' 'আমার' করিয়া মরে, আমি সেই পুণ্যশ্লোকদিগের কথা বলিতেছি না। যাহা ঘটে, তাহাই বলিতেছি। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে সাধারণতঃ সংসার-বন্ধন একটু শিথিলিত হয়। সেই সময় পাষণ্ডেরও মন একটু পরলোক-চিন্তাপরায়ণ হয়। সেই সঙ্গে আত্মপর-জ্ঞানও কিঞ্চিৎ শিথিলিত হয়। যদি আমরা সকলেই এক পিতামাতার সন্তান হইতাম,—তবে সমস্ত জগদ্বাসী এক পরিবার না হইবে কেন? আমরা সকলেই যখন তাঁহাদের সন্তান, তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে স্নেহ থাকিবে না কেন? কেন আমরা পরস্পরকে ভাই ভগিনীর মত ভাবিতে পারিব না? এরূপ ভাবা—স্বাভাবিক না আত্ম-পরিবার-বহির্ভূত সকলকেই পর ভাবা স্বাভাবিক? মানুষ যতই ভগবদ্ভক্ত হইবে, ততই তাহার চিত্তবৃত্তির প্রসার বাড়িতে থাকিবে। ইহা অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য। যেদিন আমাদের তত্ত্বজ্ঞান-চক্ষু উন্মেষিত হয়, সেইদিন হইতেই আমাদের হৃদয় পারিবারিক গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বব্যাপী হইতে চেষ্টা করে। এই গণ্ডীর ভিতর থাকা অধ্যাত্ম বলিয়াই সন্ন্যাসী পরমহংস প্রভৃতিকে দেখা যায়। তাঁহারা সর্ব্বভূতে সর্ব্বজীবে সমদর্শী। সকল পরিবারই তাঁহাদের পরিবার। তাঁহারা যেখানে যান, সেইখানেই আত্মজ্ঞান করেন। কাহাকেও পর বলিয়া মনে করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত। ব্রহ্মাণ্ডপতির ও জগদ্ধাত্রীর সন্তান হইয়া, তাঁহারা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইতে ইচ্ছুক নহেন। অনন্ত জগৎ তাঁহাদের বাসগৃহ, অনন্ত আকাশ তাঁহাদের গৃহ-চন্দ্রাতপ এবং অনন্ত জীব তাঁহাদের ভ্রাতাভগিনী—তাঁহাদের অনন্ত প্রেমের আধার।

গৃহের বাহিরে গিয়া এই 'বিশ্ব-প্রেমের সাধনা' সহজসাধ্য বলিয়া অধিকাংশ মহাত্মা সংসারত্যাগী হন। কিন্তু সংসারের ভিতরে থাকিয়া ইহার সাধনা অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই, যাঁহারা তাহাতে সমর্থ হন—তাঁহাদিগকে জ্ঞানিগণ 'বীর' উপাধি দিয়া থাকেন। জনকাদি গৃহে থাকিয়াও এই কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা বীর-সন্ন্যাসী বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। 'বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ান্তু যেষাং ন চেতাং সিত এ বীরাঃ।' বিকারের কারণ সত্ত্বেও যে মনীষিগণের চিত্ত বিকৃত হয় না, তাঁহাদিগকেই 'বীর' বলি। সুতরাং ধীর ও বীর একই ভাবব্যঞ্জক। সেই ধীর ও বীর সন্ন্যাসীগণের চরণে আমার কোটী কোটী নমস্কার। কলিতে ইহাদিগেরই সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন অধিক।

শিব ও কৃষ্ণ সংসারী সন্ন্যাসীগণের আদর্শ। জনকাদি তাঁহাদের অনুকরণকারী শিষ্যমধ্যে পরিগণিত।

আর্য্যধর্ম্ম সাংসারিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বজীবনের ও বিশ্ব প্রেমের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছে। উপনয়নের সময় আর্য্য-বালক মাত্রকেই সন্ন্যাসী করিয়া দিয়া আবার গৃহে ফিরাইয়া আনে। উপনয়নের অনুষ্ঠানের মধ্যে এই অভিনব ক্রিয়া হইয়া থাকে। সন্ন্যাস-ক্ষেত্র হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আবার সংসার-মধ্যে প্রবিষ্ট করাণর অর্থ এই যে, 'যথারণ্য তথাগৃহম্'। 'তোমার মন যদি সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে তোমার পক্ষে অরণ্যও যাহা, গৃহও তাহা। গৃহে থাকিয়াও তুমি পবিত্র সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবে। সুতরাং সন্ন্যাস যখন হইতে, ফিরিয়াই গৃহেই সন্ন্যাস কর।' আর্য্য-গুরুর এই উপদেশের মর্ম্ম যদি

নবোপনীত বালক বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে প্রত্যেকেই জনক হইতে পারিত।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারি আশ্রমেই আর্য্য-ঋষিগণ সন্ন্যাসের অনুষ্ঠান রাখিয়াছেন—তবে মাত্রা কম-বেশী মাত্র। ব্রহ্মচর্য্যে উপনীত বালককে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি বা ত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুগৃহে গিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে হইবে। তথায় থাকিয়া ঊর্দ্ধরেতা ও যমশীল হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। তথায় বংশরক্ষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য কিছুকাল থাকিয়া, পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে তাঁহাকে বনে গমন করিতে হইবে। কারণ, শাস্ত্রের শাসন আছে—'বনং পঞ্চাশতো ব্রজেৎ'। তখন শাস্ত্রের সে শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে অল্প লোকেই পারিতেন। তখন লোকে সাধারণতঃ শতবর্ষজীবী ছিলেন। সুতরাং জীবনের অর্দ্ধেক কাল প্রত্যেক আর্য্য বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু-আশ্রমে অতিবাহিত করিতেন। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই তিন আশ্রমে লোকের প্রায় অশীতিবর্ষ কাটিয়া যাইত। এই তিন আশ্রমেরই ভিত্তি আংশিক বা পূর্ণ সন্ন্যাস। সুতরাং আর্য্যমাত্রই তখন প্রধানতঃ সন্ন্যাস-প্রধান ছিলেন। কাজেকাজেই অধিকাংশ লোকেই তখন বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন। এইজন্যই আর্য্যভূমিতে, আতিথ্যের ও দানশীলতার এত আদর ছিল। 'সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ'—অতিথি সর্ব্বদেবতার সারভূত। নিজের প্রাণ বা তদপেক্ষা প্রিয়তর জায়া বা পুত্রের প্রাণ অতিথির চরণে বলি দিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত ছিলেন না। দাতাকর্ণ—হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি তাহার নিদর্শন।

এখন আর্য্যভূমি পশ্চাত্য-সভ্যতার স্বার্থপরতায় পরার্থপরতা বলি দিয়াছেন। তাই তাহার ভালবাসা এখন সীমাবদ্ধ। তাই আর্য্যগণ এখন পারিবারিক জীবনের গণ্ডী লঙ্ঘনে এত আপত্তি করিয়া থাকেন। তাহার ফল ভারত এখন দীন, পরপদদলিত এবং রোগ-শোক-অকালমৃত্যু ও দুর্ভিক্ষাদিতে জীর্ণশীর্ণ ও মলিন।

মা ব্রহ্মময়ী! মা আনন্দময়ী! কবে আবার তুই আমাদের উপর প্রসন্ন হইবি! কবে আমাদের উপর কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতকে আবার আনন্দধামে পরিণত করিবি! মা! আর কেন? আয় মা! আর যন্ত্রণা সহ হয় না! আয়—দয়া করে আমাদিগকে উদ্ধার কর্। তোর চরণে ধরি, আয়!—আবার বিশ্বপ্রেমে ভারত আলোকিত কর্?

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম-এ।

আত্ম-তত্ত্ব।

শিষ্য।—মহাশয়, আপনার দৃষ্টান্তটী কেমন কেমন বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনি প্রজার সহিত আত্মার, রাজার সহিত পরাশক্তির ও রাজ্যের সহিত মূল প্রকৃতির তুলনা করিলেন। প্রজাসমষ্টি রাজার অধীন; কিন্তু আত্মা কি তাঁহার শক্তির অধীন? বরং শক্তি ও প্রকৃতি উভয়ই আত্মার অধীন; কিন্তু আপনার দৃষ্টান্তটী ঠিক ইহার বিপরীত।

গুরু।—দৃষ্টান্তটী দার্ষ্টান্তিক বিষয়ের বিসদৃশ নহে। তবে স্রষ্টার সহিত সৃষ্টপদার্থের ঠিক তুলনা হইতে পারে না। সত্যের সহিত পার্থিব মিথ্যা পদার্থের যদি তুলনা করিতে হয়, তবে উপরোক্ত তুলনাটীর সহিত তুলনীয় বিষয়ের অনেক সৌসাদৃশ্য হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে রাজা একটী উপাধি মাত্র। রাজা বা রাজউপাধি প্রজাসমষ্টির শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। রাজ্যের সুনিয়ম, সুশাসন ও শান্তিস্থাপন প্রয়োজন। যদি পৃথিবীস্থ মানবমাত্রেই আত্মজয়ী, সমদর্শী ও বিবেকী হয়, তবে তাহারা প্রত্যেকেই স্বয়ং ব্যবস্থাপক ও শান্তিস্থাপক। তাহাদের সুনিয়ম, সুশাসন ও শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজশক্তির প্রয়োজনাভাব হয়। সমাজের সুখস্বাচ্ছন্দের নিমিত্ত প্রজাসমষ্টির কার্য্যের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজার প্রয়োজন। এই প্রতিনিধি শব্দটী বিশ্লেষ করিয়া উহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে, রাজা কেবল রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত প্রজাসমষ্টির নৈতিক কার্য্যকারী শক্তিমাত্র প্রতিপন্ন হয়, প্রজাই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী ও রাজ্যের জীবন বা আত্মস্বরূপ। রাজ্যের রাজনিয়ম, রাজনীতি অক্ষুণ্ণভাবে যথাযথ সংরক্ষণ, রাজকার্য্যের পরিদর্শন. তাহার গুণদোষ বিচার, রাজ্যের সুনিয়ম সংস্থাপন, ঐ সুনিয়মের নিমিত্ত বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন, রাজাপ্রজার কর্ত্তব্য পালন ও সর্ব্বসামঞ্জস্য সংরক্ষণ ইত্যাদি নৈতিক হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত প্রজাবর্গের মহাসভার প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ঐ মহাসভাই রাজা ও রাজ্যের মহাপ্রাণ। শক্তি এবং প্রকৃতি যেমন ঈশ্বরের আশ্রিত, সেইরূপ রাজা ও রাজ্য মহাসভার আশ্রিত। সর্ব্বশক্তির নিয়ামক ঈশ্বর যেরূপ মায়োপাধিবিশিষ্ট. সেইরূপ রাজশক্তির নিয়ামক মহাসভাও উপাধিবিশিষ্ট। ফলিতার্থ—মহাসভা, রাজা ও প্রজাসমষ্টির নৈতিক ক্ষমতার নামান্তর মাত্র। রাজ্যের সৃষ্টিস্থিতির মৌলিক উপাদানই প্রজা। যে রাজ্যের জীবনস্বরূপ প্রজাগণ অশিক্ষিত ও বর্ব্বর, যে রাজ্যের প্রজাসমূহের রাজকার্য্য-বা রাজনীতি জ্ঞান নাই এবং তাহা পর্য্যালোচনার, পরিদর্শনের ও তাহার হিতাহিত বিবেচনার ক্ষমতাও নাই, সে রাজ্যের রাজশক্তি প্রায় স্বেচ্ছাচারী হয়—প্রজাগণকে স্বেচ্ছাচারী রাজনিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। মুসলমান-রাজ্য ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যে রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ রাজনীতি বা রাজাপ্রজার অধিকার, কর্ত্তব্য কার্য্য ও তাহাদের পরস্পর শক্তি ও ক্ষমতা-সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে, সে রাজ্য অজ্ঞানান্ধকারে আবরিত। আধ্যাত্মিক রাজ্যেরও প্রজারূপ জীবাত্মা যতদিন অন্ধ, স্বেচ্ছাচারী প্রাকৃতিক শক্তি বা স্বভাবের সম্পূর্ণ অধীন থাকে ও তাহাদের

আত্ম-হিতাহিত জ্ঞান কিছুমাত্র না থাকে, ততদিন জীব অজ্ঞানান্ধকারে আবরিত থাকে। রাজ-অনুগ্রহে প্রজাগণ শিক্ষিত হইলে রাজনীতির ও রাজাপ্রজার কর্ত্তব্য, হিতাহিত-জ্ঞানের আভাস তাহাদের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয় ও তদ্দ্বারা রাজকার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ন্যায়ান্যায় প্রভৃতি রাজনীতির সমালোচন হইতে থাকে। যতই সমালোচনা দ্বারা রাজনীতির দোষগুণ আবিষ্কৃত হয়, ততই অন্ধ স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির মধ্যে সুনিয়ম সংস্থাপিত হইতে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতেও চিৎশক্তির অনুকূলতা-হেতু কামিকতত্ত্ব পরিষ্কৃত ও সুব্যবস্থিত হইলে, হিতাহিত কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আভাস মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়। তদ্দ্বারা জীবের অন্ধ স্বভাবশক্তির মধ্যে চিন্তা ও যুক্তি-শক্তির মূল বুদ্ধিবিকাশ হয়। ঐ মন ও বুদ্ধিতে স্বভাবের কার্য্যাকার্য্য ন্যায়ান্যায় ও সদসদ্ জ্ঞানের আভাস যতই প্রতিফলিত হইতে থাকে, অন্ধ স্বেচ্ছাচারী প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে অর্থাৎ অবিদ্যা-রাজ্যে ততই বিবেকের বিকাশ হয় ও স্বভাব বিবেকের অনুকূল হইতে থাকে। কিন্তু যত কাল প্রাকৃতিক শক্তি ঐ স্বাধীন ক্ষমতার নিয়মাধীন না হয় ততদিন, ঐ প্রাকৃতিক বা স্বভাবশক্তি নিয়ম-পরতন্ত্র হইলেও, জীবাত্মা প্রাকৃতিক শক্তির নিয়মের অধীন থাকে। উহাকে বৈদান্তিকগণ অদৃষ্ট বা প্রাক্তন কহেন। অবিদ্যারাজ্যস্থ পুরোক্ত জ্ঞানাভাসই বেদোক্তে পরোক্ষ জ্ঞান। আধ্যাত্ম-রাজ্যে প্রাকৃতিক রাজশক্তির উপর জ্ঞানময় (আত্মরূপ প্রজাশক্তির কৃত ব্যবস্থা ও নিয়ম প্রবর্ত্তন ও সংস্থাপিত হয় তখন জীবাত্মা-রূপ প্রজার প্রকৃত অধিকার প্রাপ্তিরূপ আত্ম-বোধ বা অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হয় ও জীবাত্মা বিদ্যারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তদনন্তর উভয় ক্ষমতা ও শক্তি এক হইয়া গেলে মানবাত্মা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। এমন বিবেচনা করিয়া দেখ, অবিদ্যারাজ্যস্থ প্রজা বিদ্যারাজ্যভুক্ত হইলে, কার্য্যক্ষেত্রে জ্ঞানের একমাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা মূল রাজ্যের রাজশক্তি (রাজা ও প্রজা সমষ্টি লইয়া যে সাম্রাজ্য, তাহার) ন্যূনাতিরেক কিছুই হয়না। রাজ্যস্থ অণু বা ঔপাদানিক অংশরূপ প্রজা এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে নীত হয় মাত্র। রাজা, প্রজা ও রাজ্য লইয়া যে একটী মৌলিক ভাব, উপরোক্ত ক্রিয়ার দ্বারা তাহার যেমন হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই হয় না, সেইরূপ পার্থিব জীবের যুক্তি দ্বারা পরব্রহ্মের বা মূলতত্ত্বের কিছুই হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

শিষ্য।—আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন, সত্য জ্ঞানই ব্রহ্ম। আবার ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত জ্ঞান ও অজ্ঞান দুইটী ভাব আছে; ঐ অজ্ঞানকে জ্ঞানে পরিণত করাই সৃষ্টির মহদুদ্দেশ্য। যদি প্রাকৃতিক তত্ত্বে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানালোকের বিকাশ হয়, এবং ঐ তত্ত্ব স্বয়ং জ্ঞানময় হইয়া ব্রহ্মে সংযোজিত হয়, তবে অবশ্যই জ্ঞানাংশে সত্য-জ্ঞানময় ব্রহ্মের অসম্পুষ্ট হইবে, অর্থাৎ তাঁহার যে অঙ্গ অজ্ঞানে আবরিত ছিল, সেই আবরণের পরিবর্ত্তে সেই অঙ্গে জ্ঞানের বিকাশ হইল। তাহা হইলে জ্ঞানাংশে ব্রহ্মের বৃদ্ধিত স্বীকার করিব না কেন?

গুরু।—তোমাকে একটা তত্ত্ব বুঝান অতি কঠিন হইতেছে। প্রথমতঃ সারসত্য ব্রহ্মের সহিত এই অসার জাগতিক পদার্থের তুলনা সর্ব্বাংশে ঠিক হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জগতে এরূপ ভাষা নাই, যাহাদ্বারা তাঁহার প্রকৃত ভাব ব্যক্ত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ মনের এরূপ শক্তি নাই যে, মন সেই ব্রহ্মাতীতস্বরের মূল তত্ত্ব অনুভব করিতে পারে, বিশেষতঃ আমি যৎকিঞ্চিৎ যাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহাও

ভাষা ও দৃষ্টান্তের বস্তুর অভাবে তোমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দিতে পরিতেছি না। যাহাহউক তুমি সোজা কথাটা বুঝ। জ্ঞান, শক্তি ও প্রকৃতি সমুদয়ই পরব্রহ্মের অন্তর্গত, সত্য, মূলতত্ত্ব এক অদ্বিতীয়। জ্ঞান, শক্তি ও অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি এই ত্রিবিধভাব, সেই অদ্বিতীয় মূল তত্ত্বের অস্তিত্ব বিকাশ ও অবিকাশ। জ্ঞান যৎকর্ত্তৃক অসিকাশিত হয়, তাহাই অজ্ঞানতা। আদিতে মূলপ্রকৃতি অব্যক্ত ছিল। যাহা অজ্ঞানাবস্থায় বা নিদ্রিতাবস্থায় থাকে, তাহার নিকট সত্যজ্ঞানও অব্যক্ত থাকে। অতএব, সেই অব্যক্তের বা নিদ্রিতের অন্তরের অন্তর-রূপ সত্যপদার্থ অব্যক্তেরও অব্যক্ত। তোমার ব্যক্তদেহ-অভ্যন্তরে প্রাণ, মন ও বুদ্ধি আছে; তদভ্যন্তরে সগুণ আত্মা (সত্ত্ব, রজ, তম গুণ), তাহার অভ্যন্তরে কূটস্থ চৈতন্য আছেন। তোমার দেহ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির উপাদানরূপ প্রকৃতি যখন অব্যক্ত অবস্থায় থাকেন, তখন সগুণ আত্মাও অব্যক্ত হন, কেবল সেই সত্য মূলতত্ত্ব ঐ অব্যক্তাভ্যন্তরে থাকেন। অব্যক্ত অর্থে অপ্রকাশ, সেই অপ্রকাশের আত্মা যাহা, তাহাও অপ্রকাশ। এইজন্য তিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। তিনি অব্যক্তের অব্যক্ত, তাঁহার গুণও অব্যক্ত, ও তিনি নিষ্ক্রিয়। তবে ইহা দ্বারা এই সাব্যস্ত হইল যে, আদিতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটী মূলতত্ত্ব অপ্রকাশ ছিল। এখন প্রশ্ন হইতেছে, ব্রহ্ম যদি সত্য স্বপ্রকাশ, তবে কি তিনি নিজের নিকট অপ্রকাশ হইলেন? তিনি স্বয়ংই স্বপ্রকাশ, তাঁহার আবার অপ্রকাশ কি? তবেই হইল যে, তিনি স্বয়ং স্বপ্রকাশ বটে, কিন্তু তাঁহার শক্তি ও প্রকৃতির বিকাশ অভাবে কে তাঁহার প্রকাশ অনুভব করিবে? কাজেই তিনি অবিকাশ বলিয়া পরিগণিত। এস্থানে প্রশ্ন হইতেছে যে, তাঁহার শক্তি ও প্রকৃতি তাঁহা হইতে কি পৃথক?

জগতের আদিতে একই মূলতত্ত্ব; তবে আবার শক্তি ও প্রকৃতি কি? এইখানেই গোলযোগ। পার্থিব এমন কোন ভাষা বা ভাব নাই, যাহা দ্বারা এই তত্ত্বটী পরিষ্কাররূপ ব্যাখ্যাত হইতে পারে। তবেই এখন সৃষ্ট পদার্থের স্বভাবের অনুমান ভিন্ন আর উপায় নাই। কিন্তু সৃষ্ট পদার্থ অনাদি নহে; সৃষ্ট পদার্থেরও আদিই সেই অনাদি পরব্রহ্ম। যখন সেই সৃষ্ট পদার্থে বিশেষতঃ সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে মানবে তাঁহার আভাস আছে, এবং মানব-বুদ্ধিই তাঁহার অনুসন্ধান করে, তখন মানবের স্বভাব-অনুসারে তাহার স্রষ্টার স্বভাব অনুমান করিতে হইবে। মানবে জড় ও চেতন এবং জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয় স্বভাব আছে। মানবের দৈহিক উপাদানই পঞ্চভূত বা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানানুসারে 'এলিমেণ্ট', অর্থাৎ মানবের দেহ উক্ত পঞ্চভূত বা 'এলিমেণ্ট' দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ ভূত বা 'এলিমেণ্ট' জড় পদার্থ; মানবের চর্ম্ম মাংস রক্ত মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র মস্তিষ্ক স্নায়ু শিরা ধমনি এবং শরীর-অভ্যন্তরস্থ সমস্ত যন্ত্র বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে, পঞ্চভূত বা ঐ উপাদান সংমিশ্রিত এক জাতীয় জীবাত্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও জ্ঞানবুদ্ধির কোন লক্ষণ অনুভূত হয় না, অথচ মানব জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন চেতনশক্তিবিশিষ্ট জীব। ঐ জ্ঞান ও শক্তি উপরোক্ত পঞ্চভূত বা 'এলিমেণ্টে'র সহিত এরূপভাবে সংমিশ্রিত যে, তাহা বিশ্লেষ করা যায় না। প্রোপ্রিয়ার্টিসের দ্বারা বিশ্লেষ করিলে, ঐ ভূত বা 'এলিমেণ্ট' মাত্র থাকে; চেতন-শক্তির ও জ্ঞানের অবিকাশ হয়। ঈশ্বরে সত্য-জ্ঞান ও পরাশক্তির সহিত প্রকৃতি ঐরূপ সংমিশ্রিত। অতএব তিনি সগুণ ও ক্রিয়াশীল ও সেই ক্রিয়াই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। জ্ঞান ও শক্তি হইতে প্রকৃতিকে বিশ্লেষ করিলে, জ্ঞান ও শক্তির অবিকাশ হয়। জগতে জ্ঞান ও শক্তির অবিকাশ

হইলে,জগতের উপাদান-কারণ-রূপিণী মূল প্রকৃতিও অবিকার্শিত হইয়ন্সস্নেহেতু তৎকালে তাঁহার ক্রিয়া-অবিকার উভয় সমান। অনুভূতি না থাকিলে অনুভবযোগ্য বস্তুরও অস্তিত্ব থাকে না; তখন জ্ঞান, শক্তি ও প্রকৃতি সেই আদি মহা-কারণে লীন হয়। এখন এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে যে, সত্য জ্ঞান স্বপ্রকাশ, তাঁহার অনুভবই তিনি ; তবে অনুভবের জন্য শক্তি ও প্রকৃতির বিকাশের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য আবার মনুষ্য-স্বভাবের সহিত তুলনা করিতে হইবে। আমার জড়দেহের সহিত জ্ঞান ও শক্তি একাকারভাবে সংমিশ্রিত, জ্ঞানের ধ্বংস নাই, তবে নিদ্রাকালে জ্ঞানের অবিকাশ হয় কেন? আমি নিদ্রাকালে স্বীয় জ্ঞান অনুভব করিতে পারি না কেন? প্রশ্ন, আমি কে? উত্তর, যে অনুভব করে। জ্ঞান স্বপ্রকাশ সত্য পদার্থ, তাহা সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে থাকে; সেই স্বপ্রকাশ জ্ঞানের যে স্বয়ং অনুভব, তাহা নিদ্রা-কালে আমার অনুভবের অতীত। তবে আমার অনুভব সেই স্বপ্রকাশ জ্ঞান নহে; তাহা হইলে সেই অনুভবকারী আমিও সত্য স্বপ্রকাশ জ্ঞান নহি। নিদ্রাকালেও চেতন-শক্তির ক্রিয়া আছে (যথা নিশ্বাস-প্রশ্বাস এবং সমস্ত যান্ত্রিক ক্রিয়া) এবং প্রাকৃতিক উপাদান আছে। কিন্তু জ্ঞানকে শক্তি ও প্রকৃতি হইতে বিশ্লেষ করিলে, শক্তি ও প্রকৃতির আমিত্ব থাকে না; অর্থাৎ শক্তিও আমি নই, ও প্রকৃতিও আমি নই। পক্ষান্তরে আমার জ্ঞানানুভূতির বৃদ্ধি ও হ্রাসের সহিত সত্য স্বপ্র-কাশ জ্ঞান বা মূলতত্ত্বের কিছুই হ্রাসবৃদ্ধি নাই। এখন, আমি কে স্থির হইলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি আমি স্থির হইবে। প্রকৃতপক্ষে মুক্তি দ্বারা আমি বা আমার অজ্ঞান-সংমিশ্রিত সীমাবদ্ধ জ্ঞানানুভূতি-সমষ্টি আমিত্বের অসীম জ্ঞানানু-ভূতিতে পরিণতি ভিন্ন মূল আমিত্বেরও লোপ হয় না। সত্য স্বপ্রকাশ জ্ঞানের উপরিভাগে যে অজ্ঞানাবরণ ছিল, সেই অজ্ঞানাবরণ পরিক্ষয় ও নির্ম্মল হইলে, শক্তিরূপ দর্পণে সত্য স্বপ্রকাশ জ্ঞানের আভাসরূপ আমিত্বের বিকাশ হয়। তদ্-ভিন্ন সত্য স্বপ্রকাশ জ্ঞান বা মূলতত্ত্বের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। একটী প্রদীপের আলো সহজ নির্ম্মল দর্পণে প্রতিভাসিত হউক বা আদৌ দর্পণে প্রতিভাসিত না হউক, মূল প্রদীপের হ্রাসবৃদ্ধি অসম্ভব। এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত মত আমার আমিত্ব-জ্ঞান অথবা ব্রহ্মাণ্ডের আমিত্ব-জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি? ইহার একতর আমিত্ব-জ্ঞানতত্ত্ব স্থিরীকৃত হইলে অন্যতর আমিত্ব-জ্ঞানতত্ত্ব স্থিরীকৃত হইবে, এবং উভয়ের মধ্যে বিশেষত্ব বুঝিতে পারিবে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তোমাতে জ্ঞান, চিচ্ছক্তি ও অচেতন উপাদান-কারণ-রূপিণী প্রকৃতি এই ত্রিবিধ তত্ত্ব আছে। চেতন-শক্তি হইতে অচে-তন প্রকৃতির বিকাশ এবং প্রাকৃতিক উপাদানে চিচ্ছক্তির বিকাশ হয়। এইরূপে উভয়ের সংমি-শ্রণে ও সংঘর্ষণে প্রাকৃতিক তত্ত্ব পরিষ্কৃত হইলে, আমিত্ব-জ্ঞানের আভাস ঐ প্রাকৃতিক দর্পণে প্রতিফলিত হয়। তদ্দ্বারা অহং-তত্ত্বের বিকাশ হয়। ঐ অহংবৃত্তিই আমিত্ববোধ। ঐ আমিত্ব-বোধ যে বাহ্য বিষয়ে প্রতিফলিত হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা মন। ঐ আত্মাভাসে ভাসিত আমার বুদ্ধি ও মনের ক্ষমতাই আমার আমিত্ব। ঐ আত্মাভাসই অনু-ভবকারী শক্তি। অনুভবকারী শক্তির বিকাশ হইলে, আমার জ্ঞান, শক্তি ও প্রকৃতি তিনেরই বিকাশ হয়; কিন্তু ঐ জ্ঞান, শক্তি ও প্রকৃতিকে বিশ্লেষ ও পৃথক করিলে, আমার আমিত্ব থাকে না—আমিত্বের অবিকাশ হয়। আমার অ-ত্বের বিকাশ হউক না হউক, তদ্দ্বারা মূলতত্ত্বের কিছুই হ্রাসবৃদ্ধি হয় না; মূলতত্ত্ব সমভাবই

থাকে। এই তো গেলো—আমার আমিত্ব। এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডের আমিত্ব-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহা-শক্তিরূপ দর্পণস্থ সত্যজ্ঞানাভাসই ব্রহ্মাণ্ডের আমিত্বের মহানুভব। ঐ দর্পণের উপাদানই প্রকৃতি, স্বচ্ছতাই চিৎশক্তি; উভয় সম্মিলিত মহাশক্তি-রূপ দর্পণস্থ সত্যজ্ঞানাভাস দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃজন, পালন ও সংহারশক্তিরূপ মহদ্ জ্ঞানানুভবের বিকাশ হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি জ্ঞানানুভবই ব্রহ্মাণ্ডের আমিত্ব বা ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। ক্ষুদ্র আমির বিকাশ হইলে আমাতে যেমন জ্ঞান, শক্তি ও প্রাকৃতিক তত্ত্বের বিকাশ হয়, সেইরূপ ঐ ব্রহ্মাণ্ডের মহা-আমির বিকাশ হইলে সেই মহৎ আমির মধ্যে পরম-জ্ঞান পরাশক্তি ও মূলপ্রকৃতির বিকাশ হয়। জ্ঞান এক অখণ্ড, কিন্তু প্রকৃতি অসংখ্য; ঐ অসংখ্য প্রাকৃতিক তত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ডের মহামিত্বের অংশই সঞ্চয় মানবাত্মা। যেমন সত্যজ্ঞানের আভাস দ্বারা মহাশক্তি-রাজ্যে ব্রহ্মাণ্ডের কারণরূপ মহদ্ভীমর মহামানস-শক্তির বিকাশ হয়, সেই-মত ঐ কারণিক বীজরূপ আত্মাভাস দ্বারা মানব-মস্তিষ্কে বুদ্ধি ও মনের বিকাশ হয়। ঐ বুদ্ধি ও মন কোটী কোটী জন্মের পর মহাবুদ্ধি ও মহামানস-শক্তিতে পরিণত হইলে, তাহাতে সত্যজ্ঞানের আভাস প্রতিফলিত হয় ও অবিদ্যা-রাজ্যস্থ আমিত্ব-জ্ঞানানুভব বিদ্যা-রাজ্যস্থ মহাসিত্ব-জ্ঞানানুভবে পরিণত হয়। প্রকৃত পক্ষে মহাশক্তি-অন্তর্গতে প্রতিফলিত সত্যজ্ঞানের আভাস দ্বারা মহদ্ জ্ঞানানুভবের বিকাশ হয়, আর সত্যজ্ঞানের আভাসের আভাস (পরোক্ষা-ভাস) দ্বারা প্রাকৃতিক মস্তিষ্কে আমাদের জ্ঞানানুভবের বিকাশ হয়। ঐ প্রাকৃতিক তত্ত্বস্থ জ্ঞান-অনুভবই আমি, আর মহাশক্তিস্থ সমষ্টি জ্ঞানানুভবই সেই মহৎ আমি। আমার ঐ প্রাকৃতিক সারতত্ত্ব মহাশক্তিতে পরিণত হইলে, আমিও মহা-আমিত্বে পরিণত হই; অর্থাৎ প্রজা, প্রজাপতি-স্বরূপে পরিণতস্থয়। প্রজা-পতি অর্থে—সূত্রাত্মা। মনে কর, ঐ সূত্রাত্মা যেন এক অখণ্ড অনন্ত সূত্রস্বরূপ। ঐ অখণ্ড সূত্রের এক এক অংশরূপ সূক্ষ্ম সূত্রখণ্ডে যেন এক একটী পুষ্প গ্রথিত হয়। ঐ পুষ্প শুষ্ক হইয়া সূত্রচ্যুত হইলে,তাহার সূক্ষ্ম আঁটাল অংশ সূত্রের সহিত সংসর্গিত হওয়ায়, তাহার সারভূত গন্ধ ঐ সূত্রে সংলগ্ন থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প গ্রথিত হইয়া, তাহাদের সারভূত গন্ধ সূত্রস্থ হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে একজা-তীয় গন্ধ অন্যজাতীয় গন্ধে সংমিশ্রিত হইয়া যায় ও পরস্পর আকর্ষণ-হেতু পরস্পরের পৃথক পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। ঐ সূত্রের সহিত ভিন্ন ভিন্ন আঁটাল পদার্থ মিশিয়া যাওয়ায়, তাহার সংঘর্ষণে শুষ্ক সূত্রাংশ মার্জ্জিত ও সুদৃঢ় সূত্রে পরিণত হয়। ইহা তোমরা অবগত আছ যে, কার্পাসের অংশু হইতে যজ্ঞোপবীতের সূত্র প্রস্তুত হয় ও তাহা পাক এবং আঁটাল পদার্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ও পরিমার্জ্জিত হওয়ায় ঐ সূত্র শক্ত (দুশ্ছেদ্য) এবং যজ্ঞোপবীতের উপযোগী হয়। প্রকৃতপক্ষে সূত্রের সহিত পুষ্প যেরূপ পৃথক বস্তু, সূত্রাত্মার সহিত প্রাকৃতিক তত্ত্ব বা ভূত সেরূপ পৃথক বস্তু নহে। এ সূত্রে পুষ্পগ্রন্থনের পরিবর্ত্তে ঐ সূত্ররূপ বৃন্তে পুষ্প অঙ্কুরিত প্রস্ফু-টিত ও শুষ্ক হইয়া সূত্রচ্যুত হওয়া বলিলে, প্রকৃত বিষয়ের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য হয় বটে; কিন্তু দৃষ্টান্তটী অস্বাভাবিক হয়। এইজন্য সূত্রে পুষ্প অঙ্কুরিত ও প্রস্ফুটিতের পরিবর্ত্তে গ্রথিত শব্দ প্রয়োগ হইল। ফলিতার্থ—অবিনশ্বর আত্মার সহিত নশ্বর কোন পদার্থেরই ঠিক তুলনা হইতে পারে না। ঐ সূত্রও দৃশ্য পদার্থ নহে; উহা ব্রহ্মাণ্ডের অদৃশ্য সূত্রাত্মা। বরং উহাকে আধ্যাত্মিক তেজস্বরূপ বলা যাইতে পারে। যেমন

জগতের সমস্ত পদার্থ-মধ্যে তেজ বা উষ্ণতা আছে—এমন কি শৈত্য বরফের মধ্যেও তেজের অস্তিত্ব আছে, সেইরূপ সমস্ত ভূতে সূত্রাত্মা আছেন; কিন্তু এ পদার্থে আলো বা উষ্ণতার বিকাশ নাই, তাহাকে যেমন আমরা তেজোময় বা জ্যোতির্ময় বলি না, সেইরূপ যে জীবে ঐশী ষড়ৈশ্বর্য্য এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, তাহাকে আমরা মহাত্মা বা মুক্তাত্মা বলি না। মুক্তাত্মাগণই স্বয়ং তেজ ও জ্যোতির্ময় সূত্রাত্মা বা প্রজাপতি-স্বরূপ। এখন মনে কর, তেজ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া মেঘরূপে জলবর্ষণ করিল, জল জমিয়া বরফ হইল, পুনর্ব্বার বরফ জলে পরিণত হইল, ঐ জল সৌর-তেজ কর্ত্তৃক বাষ্পময় হইয়া পুনঃ মেঘে পরিণত হইল, ঐ মেঘে মেঘে ঘর্ষণে তাড়িতের বিকাশ এবং তাড়িতে তেজ এবং জ্যোতির বিকাশ হইল। এস্থলে ভাবিয়া দেখ দেখি, পার্থিব মূল পদার্থ-রূপ জীব তেজ-রূপ সূত্রাত্মায় পরিণত হইল কি না? যেমন, উভয় জাতীয় (পজেটিভ নেগেটিভ্) তাড়িত পরস্পর আকর্ষণ-হেতু বজ্র নিনাদের সহিত উভয় মিলিত হইয়া, আকাশে নিউট্রালাইজড্ হইয়া যায়; সেই রূপজ্ঞান ও শক্তির বিষম সংঘর্ষণ-হেতু উভয় মিলিত হইয়া পরব্রহ্মে লুক্কায়িত থাকে। তোমাকে অন্য আর একপ্রকার সরলভাবে বুঝাইতেছি। মনে কর, যেমন নদ, নদী, খাল, পয়প্রণালী, পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতি স্থিত সমস্ত জলের মূল উপাদান বাষ্প, সেইরূপ অনন্ত প্রাকৃতিক তত্ত্বের উপাদান—তামসিক মায়া বাষ্পপ্রকৃতি। যেমন তেজ বাষ্পীয়তা হইতে বাষ্প জলাকারে, শিশিরাকারে ও বরফাকারে, ইত্যাদিতে পরিণত হয়, সেইরূপ পরশক্তি হইতে প্রকৃতি বিকাশিত ও অসংখ্য প্রাকৃতিক তত্ত্বে পরিণত হয়। যেমন তেজের মধ্যে আলো আছে, সেইরূপ পরাশক্তির মধ্যে সত্য জ্ঞান আছে। যেমন আলোর বিকাশ না হইলে বাষ্প ও জলের বিকাশ অসম্ভব, সেইরূপ জ্ঞান বা চৈতন্যের বিকাশ না হইলে মূলপ্রকৃতি বা প্রাকৃতিক তত্ত্বের বিকাশ অসম্ভব। যেমন আলো, তেজ এবং বাষ্পীয় অনু আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ জ্ঞান, শক্তি ও প্রকৃতি পরব্রহ্মে অবস্থিত। যেমন আলোর, তেজের ও পরমাণুর অবিকাশ হইলে আকাশেরও অবিকাশ অর্থাৎ আকাশ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হয়, কিন্তু আকাশ আকাশই থাকে অর্থাৎ আকাশে আলো তেজ ও বাষ্পীয় অনু লুক্কায়িত থাকে, আকাশ মহদ্ধকারে আচ্ছন্ন হয়; সেইরূপ জ্ঞান, শক্তি ও প্রকৃতি অবিকাশিত হইলে পরব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হন, তাঁহাতে তিনি হইয়া থাকেন। অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি ও প্রকৃতি তাঁহাতে লুক্কায়িত থাকে; তিনি অব্যক্তে আবারিত বা অব্যক্তের অব্যক্ত থাকেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, সূর্য্য স্বয়ং তেজোময় পদার্থ নহে, উহা এক জাতীয় সূক্ষ্ম বাষ্পীয় মণ্ডল (ফোকস—focus) স্বরূপ। যেমন ঐ বাষ্পীয় মণ্ডলে (ফোকসে) আকাশস্থ জ্যোতি ও তেজ সঙ্কুচিত হইয়া তাহার যে জ্যোতি ও তেজোময় বিশ্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই আমাদের সূর্য্য; সেইরূপ প্রকৃতির মণ্ডল মধ্যে জ্ঞান ও শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া তাহার যে মহত্ত্বীনয় মহামনুভবের বিকাশ হয়, তাহাই আমাদের সগুণ ঈশ্বর বা প্রজাপতি। সূর্য্যের তেজ ও আলো যেরূপ সৌরজগৎব্যাপী প্রজাপতি সেইরূপ ত্রিলোকও চতুর্দ্দশ মন্বন্তর (কল্পান্ত) ব্যাপী। যেমন আকাশে সূর্য্যের ন্যায় কোটী কোটী নক্ষত্র আছে, সেইরূপ পরব্রহ্মে কোটী কোটী প্রজাপতি আছে। যেমন কোটী কোটী নক্ষত্র-সমষ্টিই মহাসূর্য্য-স্বরূপ, সেইরূপ সমগ্র

প্রজাপতিই মহাবিষ্ণু বা সমষ্টি ঈশ্বরস্বরূপ। বাষ্পের বিকার মেঘ, মেঘের বিকার জল, জলের বিকার কর্দ্দম, কর্দ্দমের স্থূল অবস্থা কঠিন মৃত্তিকা; কিন্তু কঠিন মৃত্তিকা কর্দ্দম ও কর্দ্দমময় ঘন জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের বিকাশ হয় না এবং সূর্য্যের তাপে জল বা জলীয়াংশ ব্যতীত কর্দ্দমাদি বাষ্পে পরিণত হয় না। যেমন নির্ম্মল জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের বিকাশ হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতে আত্মাভাস বিকাশিত হয়। এখন মনে কর, জল সূর্য্যতাপে বাষ্পে পরিণত হইল, ঐ বাষ্প ও তেজ রূপান্তরিত হইয়া যেন একটী ধূমকেতুতে পরিণত হইল। ঐ ধূমকেতু পূর্ব্বোল্লিখিত মত সূর্য্যে সম্মিলিতই হউক বা কালক্রমে স্বয়ং একটী নক্ষত্রেই পরিণত হউক, তদ্দ্বারা যেমন আকাশের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, আকাশে যে মূলতত্ত্ব তাহা চিরকালই সমান আছে অর্থাৎ আকাশস্থ তেজ ও আলোর মৌলিক তত্ত্ব চিরকালই এক ও অদ্বিতীয়—তাহা অবিকাশই থাকুক বা কোটী কোটী সূর্য্য ও নক্ষত্ররূপে বিকাশিত হউক, মূলের হ্রাসবৃদ্ধি নাই; সেইমত পরব্রহ্মরূপ মহাকাশস্থ সত্যজ্ঞানরূপ মূলতত্ত্বের হ্রাসবৃদ্ধি বা কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না। আমাতে যেমন জ্ঞান, শক্তি ও প্রকৃতি ত্রিবিধতত্ত্ব আছে, ব্রহ্মাণ্ডেও আমিতেও ঐ সমষ্টি ত্রিবিধ তত্ত্ব আছে, আমার যেমন চেতন-শক্তি হইতে প্রকৃতির বিকাশ হয় এবং প্রকৃতির জড় উপাদানে অর্থাৎ দেহমধ্যে চেতনশক্তির বিকাশ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের পরাশক্তি হইতে মূল প্রকৃতির বিকাশ হয় এবং প্রকৃতিতে পরাশক্তির বিকাশ হয়। মূল প্রকৃতি চেতনবৎ হইলে, শক্তি ও প্রকৃতি এক হইয়া যায়। যখন জ্ঞান, শক্তি ও প্রকৃতি ত্রিবিধ মৌলিক তত্ত্ব পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, তখন সত্যজ্ঞানাভাস দ্বারা প্রকৃতি-রূপ দর্পণের অণ্বংশে বা রজ অংশে স্বচ্ছত্ব-হেতু মহদ্জ্ঞান-শক্তির বিকাশ হইলে, পরব্রহ্মের হ্রাসবৃদ্ধি হইবে কেন? ঐ মহাশক্তিরূপ দর্পণ পরব্রহ্মের মায়া; ঐ মায়া তিনি আকর্ষণ করিয়া লইলে, তাঁহাতে তিনিই থাকেন। দর্পণে তাহার বিকাশ না হওয়ায় ও দর্পণ অবিকাশ হওয়ায়, মহা-আমিরূপ মহানুভবও অবিকাশ হন—মূল সত্য পরব্রহ্ম সমভাবে থাকেন—তাঁহার স্বরূপ অবস্থার বিকাশ-অবিকাশ সমান।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চড়ক।

আমি পরাণের সনে থাকিব আজিকে
চড়ক পাক!
বাজারে ঢাক!
বসন্তের বায়ু বহে অনিবার,
মুখে মৃদুহাসি শ্যাম রূপধার,
মধুর রঙ্গে ভবতরঙ্গে
বাজিছে শাঁক!

বাহির হইয়াছি রঙ্গে মাতিয়া,
থাকিতে পাক!
বাজারে ঢাক!
ওগো কুসুমে কুসুমে, মাতাল ভ্রমর
করিছে কেলি,
সকলে মেলি!

বৃক্ষে বৃক্ষে নব কিশলয়
কাঁপে থরথরি, মোহিয়া হৃদয়
চারু প্রকৃতির, রুক্ষ টুটিয়া
এখনি, বাক!
আকাশে পাতালে কৌলাকুলি করি,
শান্তি থাক!
বাজারে ঢাক!!

আজি ঘুম ভেঙ্গে আহা পরাণ আমার,
বসিয়া আছে,
কূলের কাছে,
থেকে থেকে থেকে, উঠিছে নাচিয়া,
ধরিছে নবীন কোরকে চুমিয়া;
বন্ধন হতে মুক্তি পাইয়া,
হৃদয়ে নাচে,
প্রেমের উল্লাসে, পরাণ আমার,
পিরীতি যাচে,
ফুলের কাছে!

হায় এতকাল আমি বলিনি তাহারে,
কাতর স্বরে,
শুমর ভরে;
সে কথা বলিলে, পাছে দুখ পায়,
অভিমান ভরে ঘরে ফিরে যায়!

(তাই) ছিঁড়িয়া ফেলিনি, লাজ-আবরণ,
বুকের পরে;
আজিকে সরমে, ঠেলিয়াছি পায়,
প্রেমের তরে,
যতন ভরে!

কত মনে মনে তারে করেছি চুম্বন,
পূর্ণিমা রাতে,
স্নেহের সাথে!
শত মুরলির, কাকলি করিয়া,
সেধেছি তাহারে প্রেয়সী বলিয়া,
কোকিল-কণ্ঠে করিয়াছি গান,
বসন্ত-রাতে!
যা কিছু মধুর, দিয়াছিনু তার
দুখানি হাতে,
স্নেহেরি সাথে!

শেষে শুনিলাম কাণে, ভাসি পরাণে,
বলিছে দশে,
রসিয়া রসে,
পাষাণীর বুকে দোলাও না হায়,
ফিরে এস সখা, বলি বার বার;
দেখ দুটি আঁখি, মেলিয়া তোমার—
নব সরসে
ফুটে আছে কত, কমল সুন্দর,
মধু দিবসে,
রসিয়া রসে!

তবে স্বভাব মধুর বঁধুরে আমার,
হারাই বুঝি,
পাই না খুঁজি!
আকাশের তারা, নিবে নিবে আসে
তেমন করিয়া শশী নাহি হাসে,
বুকের মাঝারে শুষ্ক কুসুম
কেবল পুঁজি!
নিরাশ-সাগর মাঝারে পশিয়া
এত যে যুঝি,
পাই না খুঁজি!

তাই ভেবেছি আজিকে, পরাণের সাথে,
যাইব পাক,
বাজারে ঢাক!
আয়রে মরণ, বিকট দশন!
তোর সনে আজ করিবরে রণ;
আয় কাছে আয়, অট্ট হাসিয়া
জীবন যাক!

প্রাণেরে ধরেছি যতন করিয়ে,
দে তবে পাক!
বাজারে ঢাক!
দে পাক দে পাক,
আরো দেরে পাক!

তোরা নিরাশা-সাগরে তুফান তোল;
প্রিয়তম আমার গেয়েছি আজিকে,
ভরেছে কোল;
পাষাণীর আজ, ভেঙ্গে গেছে ঘুম,
প্রণয় রোল,
হৃদয়ের মাঝে, উঠেছে আমার,
কি কল্লোল!
শোণিত-কম্পনে, ভীম প্রভঞ্জনে,
কি হিল্লোল!
কুন্তল আবৃত, সুধাংশু বয়নে,
আহা কি মাধুরী, বলিব কেমনে?

রিণি-রিণি-রিণি নূপুর স্বনে
তুলেছে রোল।
আয় রে নিরাশার পরাণ বঁধুর,
মধুর সরম, করে দেরে দূর!
ওই সরমের ওঠনটুকু
দূরে চলে যাক!
দে পাক দে পাক!

প্রিয়াতে আমাতে করি মুখোমুখি
কত সুখ-ভরে রইয়াছি সুখী;
বুকের নিকটে পাষাণী আমার
বসিয়া থাক!
এখনও পিপাসা মেটেনি প্রাণের!
দে পাক দে পাক!
বাজারে ঢাক!

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

জাতীয়ত্ব।

[যাদবচন্দ্র—শিক্ষা-বিকৃত-মস্তিষ্ক গ্রাজুয়েট; রাধানাথ—স্বতন্ত্র্যবলম্বী শিক্ষিত যুবা।]

যাদব। তোমার কি হে মাস গেলে তিন চারশ টাকা উপায় কচ্ছো, কিছু করেও নিয়েছ, তুমি বলবে না কেন; আবার তার উপর গবর্ণমেণ্টকে চাবিতালা সপ্লাই কর্দ্দার কনট্রাক্ট পাবার ভরসা বোধ হয় আছে, তাই এখন ইংরেজ ভক্ত হয়ে পড়েছ।

রাধা। আর রাগ করো না ভাই; তবে, সে হিসেবে কি তুমি কিছু উপায় কত্তে না পেরে আর গবর্ণমেণ্টের কাছে কোন প্রত্যাশা না থাকায় সাহেবের উপর চটে দেশহিতৈষী হয়ে পড়েছ?

যাদব। শুধু আমি কেন, অনেকেই চটেছে; আমাদের দেশ আমরা বসে থাকব কর্ম্ম পাবনা খেতে পাবনা আর কোথা থেকে ইংরেজ উড়ে এসে জুড়ে বসে এখানকার মোটা মোটা চাকরীগুলি দখল করে আমাদের দেশের টাকা-গুলি ঘরে নে যাবেন।

রাধা। কই জনার্দ্দন সার বেলেঘাটার

গদিতে, কি নোনাগঙ্গার বড়বাজারের কুঠীতে একজন ইংরেজকেও তো চাকরী করতে দেখতে পাইনে। ইংরেজের চাকরী ইংরেজ কচ্ছে এটা কি বড় আশ্চর্য্যের কথা। দেশীয় দখল করেছেন ইংরেজ, রাজকার্য্যও এক রকম ব্যবসা, তার পর রেলওয়ে বল, জাহাজের কাজ বল, বড় বড় সওদাগরী আপীস ইত্যাদি যা কিছু বল, যে গুলি বেশী চাকরীর যায়গা, সবই ইংরেজের, তা সেগুলিতে ওরা যদি একেবারে ওদের জাতভাইকে বঞ্চিত করে, তাহলে কি ধর্ম্মে সইবে? ওই আমি যে কারবারটুক করেছি, এতে আগে আমি আপনার যতগুলি স্বজাত পেয়েছি তাদের কর্ম্ম দিয়েছি, তার পর আর যা কিছু দুএকটী বাকী তা বাঙ্গালিকেই দিয়েছি; এদের বদলে ইংরেজ ফরাসি ওলিকে যাক, আমি যদি খোটা কি উড়ে মিস্ত্রী সব রাখতুম তাহলে কি লোকে আমায় ভাল বলতো?

যাদব। তাহলে আমাদের উপায় কি হয়? দেশের লোক অন্নের জন্য কোথায় যাবে?

রাধা। আপীসের চাকরী বই যদি অন্নের অন্য উপায় না থাকে তাহলে লাটসাহেবি থেকে বস্তাবন্দিগিরি, পর্য্যন্ত সমস্ত চাকরী গুলি দেশের লোককে দিলেও সবার সঙ্কুলান হয় না। উপস্থিত নেকারের সংখ্যা তো কম নয়, তার পর সাল সাল বাড়িছে কত তা দেখবার জন্য বেশী দূর গিয়ে কাজ নেই, একবার এই কল্কাতার স্কুল কটা ঘুরে এলেই বুঝতে পার্ব্বে। তবু ইংরেজের সব কাজ হাতে নেবার জন্য বাঙ্গালী উপযুক্ত হয়েছে কি না, সে তর্কই আমি এখানে তুলছিনে। আরও বলি, ভাতভাইকে পুষছে বলে ইংরেজকে দুষছ, কিন্তু তা পুষিয়ে কত লক্ষ দেশী লোককে পুষছে বল দেখি, এত চাকরীস্থল আমাদের দেশে আনে কোন রাজার আমলে ছিল? কত কেরাণীগিরি চাকরী ইংরেজ তৈয়ের করেছে বল দেখি? তা সবাই যদিও দিকে ছুটবে তা কত লোকের যায়গা হবে? সে হিসেবে তোমার আমার যদি পাঁচ পাঁচটী ছেলে হয়; তা হলে গবর্ণমেণ্টকে এক একটী নূতন আপীস খোলবার বন্দোবস্ত কত্তে হয়। রোগের গোড়াটা ধর না ভাই, চাকরীর চেষ্টা যে ক্রমে এপিডেমিক হয়ে দাঁড়িয়েছে!

যাদব। তা সেও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের দোষ; টেক্‌নিক্যাল স্কুল কেন এখনও কচ্ছে না, তা হলে তো দেশের লোকে সব শিল্প-ব্যবসা শিখতে পারে।

রাধা। আচ্ছা ভাই তোমাদের স্বাধীনতার মানেটা কি আমায় বুঝিয়ে দিতে পার? এদিকে তো বল আমরা সব কাজের উপযুক্ত হয়েছি, কিন্তু কোন একটা দরকার পড়লেই অমনি "দে গবর্ণমেণ্ট দে"; লেখাপড়া শিখব, গবর্ণমেণ্ট স্কুল করে দিলে তবে চলবে; পয়সা চাই সংসার চলে না, দাও গবর্ণমেণ্ট তার একটা উপায় করে; রাজনৈতিক, সামাজিক, নাগরিক বা যখন কিছু উন্নতির আবশ্যক হবে সব গবর্ণমেণ্টের দোহাই; ক্রমে বিবাহের খরচের রেট, দম্পতি মিলনের জন্যের বাঁধাবাঁধি, ঠাকুরবাড়ীর পূজার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত ভার গবর্ণমেণ্টের হাতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে; দিন কতক বাদে দেখছি গবর্ণমেণ্টকে বাড়ী বাড়ী রাঁধা ভাত প্রার্থনা পাঠাবার জন্য দরখাস্ত করা হবে; তা হলে স্বাধীনতাটা রক্ষা করা হবে কি রকম? ইংরেজদের বলা হবে কি যে তোমরা আগে পিছে ঢাল তলোয়ার খিঁচতে থাক, আমাদের গায়ে মাছিটী না বসতে পারে, আমরা আহারাদির পর একটু নিজা দিয়ে উঠে তামাক টামাক খেয়ে খানিক বা লেক্‌চার দিলেম খানিক বা রাজ্যশাসনটা করে নিলেম।

যাদব। লোকে প্রিটে প্রিটে ক্রমে কামারে বুদ্ধি আরও মোলায়েম হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা তাই

বা কচ্ছো। কলেজ ডেজ কি ভুলে গেলে—তুমি লেকচার দিতে না?

রাধা। তুম বার কঁকমারি করেছি, তার জন্য তুমি আমার কাণটী ধরে ঘুরালে দুই বারো নামিয়ে দিতে পার, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু ঠাকুরালের মতন ওরুমশাই আর পৃথিবীতে নেই, আপীসের চাপরাসীর দাঁত খিঁচুনিতে আর বালামের বাজার দেখে যে জ্ঞান লাভ হয়েছে, ভলম্ ভলম্ মিল স্পেন্সর পড়ে আর টী গ্রীনমেণ্ট কসে তার আধ কড়াও হয়নি, নিজে তো পাসের চাপরাস বেঁধে এ্যাপ্লিকেসন বগলে সপ্লিকেসন করে করে হায়রাণ হলেম, তারপর একবার ভাবলেম মহম্মদ-আবিজনীর চৌদ্দপুরুষের নাম ডেকে মুখস্থ করেছি, একবার নিজের বংশের ইতিহাসের পাতাটা উল্টেই না কেন; দেখলুম যাকে তুমি হাতুড়ী পেটা বলছিলে, প্রপিতামহ পর্য্যন্ত তার দ্বারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে গেছেন, এই কলকেতাতেই বেশ কাজ কারবার ছিল দেশেও একটু জমী জিরেত চাস আবাদ ছিল, হাতুড়ীর জোরে বাড়ীতে দুর্গোৎসব ষষ্ঠিপূজা সেবা পর্য্যন্ত হতো, স্বজাতের ভিতর একটা বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল কারুর বাড়ী কোন ক্রিয়া কর্ম্ম হলে হাজার নিমন্ত্রিত লোক অপেক্ষা থাকতো, কার সাধ্য অগ্রে কামার (আমার প্রপিতামহ) বসে পংক্তি দোষজন্য কেঁদে চটি জুতো ঠাঙ্গোস ঠাঙ্গোস কত্তে কত্তে উপস্থিত হয় তক্ষণাৎ খেতে বসে।—তারপর ঠাকুরদাদা মহাশয় যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী পড়ে সাহেবের চাকরী করে ডোকলেন, আমাদের বংশে তিনি প্রথম লোক অর্থাৎ তাঁর আমলই চাঁদবদন ঠগীসুর অতিথসেবা এইগুলি বজায় হয়ে গাড়ী ঘোড়া চাকর বাকর কাপড় চোপড়ের ধুম বাড়ে। বাবা উকীলের বাড়ী ঢুকে "ভদ্র" চাল বজায় রাখবার জন্য প্রথমেই নিজের ভদ্রাসনখানি বাঁধা দেবার লেখাপড়ার মুঁহবিদা করেন; কাকারাও সব "ভদ্র" কায়িক গায়ে দিয়ে বাবার ভাত খান; বড়দা মেজদাও কম "ভদ্র" লোক নন, মদ খেয়ে রাত্রে বাড়ী আসেন না; তারপর আমি বংশের প্রথম পাস "ভদ্রতার" মাত্রা কিছু বেশী, একদিন ক্রিকেট রুবের এ্যানিভারসারি স্পোর্টস্‌এর চাঁদা দিতে হবে দশটী টাকার নেহাৎ প্রয়োজন, মার বাক্স ভেঙ্গে তল্লাস করা ভিন্ন ষ্টেট্‌ করওয়ার্ড উপায় আর কিছু নেই, সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ে দেখি যে কলখানা ভারি খাঁরাপ কোন চাবিই লাগে না, উদ্যম ভঙ্গ হই হই এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ি হলো যে কি আমি "কায়ুরের ছেলে" একটা কল খুলিতে পার্ব্বে না? তখনই একটা ছিঁচকে চুমড়ে দামড়ে এক রকম করে নিয়ে ঝড়াক্‌সে বাক্সটা খুলে ফেল্লেম; বড়ই আহ্লাদ হলো যে হাঁ যথার্থ কামারের ছেলে বটে। নিজের বরাতেও জেল নেই ছেলেপুলে ওলোর বরাতেও উপবাস করে মরা নাই, তাই সেই সঙ্গে সঙ্গে এইটে মনে এল, যে ভাল, কামারের ছেলে বলে দাপট করে কল তো ভাঙ্গলেম তা ভাঙ্গাভাঙ্গি না করে এই দাপটে কল গাড়ি না কেন? জেতের বিদ্যা চুরিতে না থাকটে মোজগারে যাটাই না কেন? তার পর তাই থেকে তোমার বাপ মার আশীর্ব্বাদে যা হোক দুমুটো এনে খাচ্ছি, বাড়ীখানি খালাস হয়েছে, আবার, জগদম্বা যদি কৃপা করেন তাহলে আসছে বছর মাকে আনবার ইচ্ছা আছে।

তারপর সেই "ভদ্রআনার" গড়াগড়ির সময় স্বজাতের ভিতর দুদশ জন যারা মুখ টিপে টিপে হাসতো তাদের ছেলেপুলেরাও আমার কারখানা থেকে দুপয়সা ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। এই—আমার ছেড়ে আমার ধরেই ভাই আমার

মায় ভাব এসেছে দেশোদ্ধার ছেড়ে কার্য্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়েছি ; ভদ্রলোক হয়ে সাহেবের ষ্টমেদারি করে নিয়ে তাঁর দরওয়ান চাপরাসীর খিচুনি খেয়ে এসেছি, এখন ছোট লোক হয়ে এইটুকু লাভ হয়েছে যে নিজেও দুপাঁচজন দরোয়ান চাপরাসী রেখেছি, আর সময়ে সময়ে একআধটা সাহেবও আমার কারখানায় চাকরী পাবার জন্য দরখাস্ত করে জানে। দেখে শুনে আর ভুরে আমার তো ভাই বেশ বিশ্বাস হচ্ছে যে আমাদের এই দুর্দ্দশার প্রধান কারণ, যে যার জাত ব্যবসা ছেড়ে দেওয়া।

যাদব। জাত ব্যবসা কি—ব্যবসার আবার জাত কি? যার যা ইচ্ছে সে সেই ব্যবসা করে পারে।

রাধা। পারেনা কেন? হাত আছে পা আছে পারে না কি আমি বলছি, কিন্তু কি জান ভাই বড়ো কিছু লাঙ্গলে ধাতুতে হয়ে পড়েছে; কেদারায় বসে টানাপাখার হাওয়া খেয়ে কলম পেষা বেশ লেফ্‌কা দুরস্ত, বাইরে থেকে খুব জমকাল, মেহনতও কম, সেই জন্য সবাই লাফিয়ে তাই ধরতে চায়, কিন্তু জেতের কড়াকড়ী যদি ঠিক বজায় থাকতো তা হলে আর এটা হতে পারত না। সব ব্যবসার, সব কাজের একটা হিসাবে মত ভাগাভাগি থাকতো।

যাদব। এ কত বড় পক্ষপাত দেখদেখি, যার একপুরুষ ছুতোরগিরি করেছে, তার বংশে বরাবরই সকলকে ছুতোরগিরি করতে হবে? কারুর যদি উন্নতি করতে ইচ্ছা হয় সে পারবে না? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, আমাদের দেশে এখন কায়েত বামুন ছাড়া অন্য জাত থেকে কত বড় বড় লেখা পড়াওয়ালা লোক হয়েছেন, তাঁদের দ্বারা দেশের কত উপকার হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু তাঁরা যদি মূর্খ হয়ে নিজের জাত ব্যবসা করেন, তা হ'লে কি হ'তো?

রাধা। কিন্তু একটী ছুতোর ডাক্তার, একটী লেখা উকীল, একটী নাপিত এডিটারের জায়গায় কর্ত্ত ভরদ্বাজ কশ্যপের বংশধর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটী ওয়ালা হয়েছে বল দেখি? কত আচার-বিনয় বিদ্যাদি গুণ সম্পন্ন কায়স্থের সন্তান এখন কমলালেবুর বরফের কুলী মাথায় করে বেড়াচ্ছে বল দেখি? আর মূর্খ পণ্ডিতের কথা কি বলছো? কেতাব-পড়া—তা অতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মপুস্তক ছাড়া অন্য জ্ঞান-উপার্জ্জন করতে কোন জাতিরই নিষেধ ছিল না, কিন্তু লেখাপড়া করেই যে জাতব্যবসা ছাড়তে হবে তার মানে কি? এই যে যুক্তি যে অধ্যবসায় যে শ্রম ও যে মনোযোগের বলে তুমি সায়েন্সে এম, এ, পাস করেছ সেই যুক্তি সেই অধ্যবসায় সেই মনোযোগ সেই পরিশ্রম যদি তোমার জাতীয় ব্যবসায় কৃষি কর্ম্মে প্রয়োগ কর, তাহলে তুমি তোমার নিজের, পরিবারের, দেশের কত উন্নতি কত উপকার করে পার বল দেখি?

যাদব। তাতো আমি রাজি আছি, জয়েন্ট-ষ্টক প্রিন্‌সিপলে একটা এগ্রিকলচারাল্ কোম্পানী করবার চেষ্টাও আমি করছি, কিন্তু সমস্ত দেশের লোক এখনও তেমন উদ্যত হয়নি, তেমন এনলাইটেণ্ড হয়নি, আমি এনকরেজমেণ্ট পাচ্ছি কৈ?

রাধা। ঐ দেখ ভাই, লিমিটেড কোম্পানী কর্ম্মে ডাইরেক্টার হবে, সেক্রেটারি হবে, ঐ ঘুরে ফিরে সেই কেরাণীগিরি; কাগজ কলমে ক্যাল্‌কুলেসন্ কর্ম্স রিপোর্ট লিখে যতটুকু কৃষি-কর্ম্ম হয় তাতে রাজী, নয় বড় জোর সোলা হ্যাট মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে একবার মাঠ তদারক করে আসবে—কেরাণীগিরি প্লস্ সাহেবি—তা তোমার দোষ কি ১৯২০ বৎসর অভ্যাস করে যা শিক্ষালাভ করেছ তাতো করে যাবেই। লেখাপড়া শিখতে একটু মাথার খাটুনি হয় যটে, কিন্তু শরীরের, একটু আয়েস, একটু বাবুগিরি অভ্যাস হয়ে যায়। এই দেখনা, গবর্ণমেণ্টের বদৌলতে বা অন্যরকমে যে ক'জন বাঙ্গালী বিলাত থেকে চাষ বাস শিখে এসেছেন, তাঁদের, মধ্যে কেউ ডেপুটী, ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি, কেউ স্কুল মাষ্টারি, কেউ বা চাষের রিপোর্ট লেখা চাকরী কচ্ছেন, কিন্তু নিজের একাউণ্টে চাষ আবাদ করবার প্রবৃত্তি কারুরই হয়নি; আর হবেই বা কি রকম করে, একটা বড় ইংরাজী রকম ক্ষেত খামার না হলে তো আর তার হাত দিতে পার্ব্বেন না, (হাস্য) তার মূলধনও নেই), এর কারণ কি? বিলেতে এগ্রিকলচারাল্ কেমিষ্ট্রি, ভেট্‌রিনারি, বুককিপিং, ফারমিং, ষ্টক্‌ব্রীডিং ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিষয় শেখা হয়েছে বটে; কিন্তু লাঙ্গল ধরা, গোরুর লেজ-মলা, রোদ জল খাওয়া, চাষাদের সঙ্গে বসা, ধুলো মাখা এই সব আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি শেখা হয়নি, সেটী শিখতে গেলে বালক কাল থেকে অভ্যাস করতে হয়, ছেলেবেলা থেকে ঐ সব করতে করতে গায়ে ও প্রাণে এমনি সয়ে যায় যে, ক্রমে তাতে ঘৃণারুও উদ্রেক হয় না আর মনে অপমানও বোধ হয় না, বরং ওর ভিতর যে খুঁটিটুকু যে মনটুকু যে গর্ব্বটুকু লুকান আছে সেটার উপর দৃষ্টি পড়ে, তাই চাষা সন্ধ্যাবেলা মাটী মেখে ধানের বোঝা মাথায় করে, গান গাইতে গাইতে বাড়ী যায়; আর তোমার হেডক্লার্ক বাবু চাপকান পরে টুপি মাথায় দিয়ে, একেবারে, দুনিয়ার উপর চটে যমকে নিমন্ত্রণ দিতে দিতে ঘরে ফেরেন।

যাদব। ও সব তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারিনে, মাটীমাখা আবার শিখব কি?

রাধা। এই যেমন কালি মাখা শিখেছ। দেখতে পাওনা মেডিকেল কলেজের পাঁচ বচ্ছর এক পাঁচে ঘনা ছাড়তে শিখে, ঘরে সার্জ্জারি কত্তে বেরুতে হয়। অভ্যাস বড় জিনিষ, অভ্যাসে শুধু শরীর নয় মনও বশ হয়। ছেলেনা এটা ছোট কথা বটে কিন্তু দৃষ্টান্তের জন্য বলি; যে মেথর সহরের ময়লা মাথায় করে বেড়ায় একটা সদ্য মরা ইঁদুর তাকে ফেলে দিতে বল্লে সে ছোঁয়না, তাতে তার জাত যাবে, মান যাবে, সে মুদ্ধফরাসের কাজ। যে কসাই বড় বড় কত কি সব হাসতে হাসতে সচ্ছন্দে কাটে একটা মাছি মারতেও তার কষ্ট হয়। সুখ দুঃখ, ক্লেশ আরাম, সম্ভ্রম অসম্ভ্রম, মান অপমান, এ সকলেরই বোধাবোধ কেবল অভ্যাস ও সংস্কার গুণে। এই জন্য সেকেলে ঋষিরা শ্রমজীবিদের পক্ষে হায়ার-এডুকেশন নিষেধ করে গেছেন; তাঁরা জানতেন, যেমন একালে দেখা যায়, গাউন পরে কনভোকেসনে গিয়ে লাট সাহেবের হাত থেকে ডিগ্রি, এম, ডিগ্রি আনার পর র‍্যাঁদা বাটালি নিয়ে ব্যবুরা বাক্স গড়তে পারে না; তেমনি সেকালে সাধারণ পাতঞ্জল পড়ে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন জয় করে এসেও কেউ তাঁত বুনতে বসতে পার্ব্বে না।

যাদব। কিন্তু তাতেও তোমার (হেরিডিটারি) বংশগত জাতিভেদের গিণ্ডির বজায় থাকছে না। যে ছেলেকে টেক্‌নিক্যাল এডুকেসন্ দেবার ইচ্ছে হবে, তাকে একটু ছেলে বেলা থেকে হাতে হেতেড়ে কাজ শিখতে দিলেই হুলো।

রাধা। কার কাছে শিখতে দেবে? হারাণ ডেপুটীর ছেলে পরমথ কুমোরের কাছে বসে হাঁড়ী গড়তে শিখতে, কি সহজে চাকে, গবর্ণমেণ্ট টেক্‌নিক্যাল স্কুল কচ্ছে না বলে চুট ছোঁ, চুঁই কচ্ছো; কিন্তু তোমার সেই হম্‌বগ্ কমিগুলো কি আগে, পাবলিমেণ্ট ভলেণ্টারি টেক্‌নিক্যাল স্কুলের বন্দোবস্ত করে গেছেন বল দেখি? Each caste was a special

school for a particular industry, এক এক জাত এক একটা স্কুল, এক এক কারিকরের ঘর এক একটা ওয়ার্কশপ। ছুতার জাত কাঠের কাজ শেখবার একটা প্রামেনেন্ট স্কুল, লোহার কাজ শেখবার স্কুল কামার জাত, এদেশে চাষার কাজটা সবার চেয়ে বেশী প্রয়োজন, চাষের কাজের ফিল্ড খুব একসটেন-সিভ, এই জন্য চাষের কাজ শেখবার জন্য একটা নয় চার পাঁচটা স্পেশ্যাল জাত আছে; আর প্রায় সব জাতেরই নিজের কাজ ছাড়া চাষ করবার জন্য যেন একটু exofficio প্রিভিলেজ আছে। সেই ঋষিদের হমবগ বলতে লজ্জা করে না? কি জ্ঞান! কি দূরদৃষ্টি! কত বড় উদ্ভাবনা শক্তি দেখ্‌দেখি, বাপ ছেলেকে কাজ শেখাবে অতবড় ইণ্ট্রোরেষ্টেড শুভ্রদশায় আর কোথায় খুঁজলে পাবে? আর যে বাপ পৃথিবীতে সবার উপর মান্য, তিনি যে কাজ করেন, তাঁর কাছে থেকে সেই কাজের স্নেহমাখা শিক্ষা পেতে সন্তানের সহজেই আমোদ উৎসাহ ও প্রবৃত্তি হবে। বুড়ো বাপুরা তো আর জানত না, যে কালে বাপকে ড্যাম স্কুল বলা বিদ্যাদিগ্‌গজ সব জন্মাবে? বাপকে ছোট লোক বলে নিজে ভদ্রলোক হতে যাবে? তার উপর হেরিডিটী—বাপের গুণ ছেলেতে বর্ত্তায়, বাপের প্রবৃত্তি ছেলেতে জন্মায়, একথা তোমার ইংরেজেও স্বীকার করে। ছেলের instinct inclination এর জন্য একাউণ্ট ফর্ কত্তে হলে বরং আমাদের পূর্ব্বজন্ম জাত নক্ষত্র এগুলো ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু ইংরেজ টিংরেজের হেরিডিটী বা বংশ লক্ষণ ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

যাদব। কিন্তু যাই বল আর যাই কও ভাল রকম এডুকেসন না পেলে কোন বিষয়েরই উন্নতি হয় না।

রাধা। কে বলেছে যে এডুকেসন চাইনা, আর কেইবা তোমায় বল্লে এডুকেসন মানে বই পড়া। এই যানি চরকা তাঁত টাঁতগুলো এদেশে গোড়ায় বেদব্যাস শুকদেবও তৈয়ের করেননি, আর যখন তৈয়েরি হয়েছে, তখন তোমার বিলেত জন্মায়ওনি। যে অনন্ধর কারিকর প্রথম চরকা তৈয়ের করেছিল তার মাথা যে বিলাতি স্পিনারি তৈয়ের করেছিল, তার চেয়ে কমতি ঠাওরাও নাকি? তুমোর তো হাড়ী গড়ে, মাটী গড়েছেন জগদীশ্বর—একটী গোড়া পেলে তার উপর অনেকে ফ্যালাও কত্তে পারে। আর রসো হালফিল্‌ই দেখ, তোমার এখনকার ইন্‌ভেন্‌সনের রাজা তো এডিসন, কলেজ ইউনি-ভারসিটি চুলোয় যাক, তিনি যে স্কুলের বড় বেঞ্চী ডিক্টেসন লিখেছেন তারও এমন কিছু বেশী নজীর নাই। বুক্‌-এডুকেসন্ যে দরকার নাই তা আমি বলছি না। ডিগ্রী-টা অফ্ লেবার যদি এপ্রিসিয়েট করা যায়, শারীরিক পরিশ্রমের সম্মান রেখে মিস্ত্রী কারিকর কৃষককে যদি আমরা আদর করে আমাদের সংসর্গে আসতে দিই তা হলে আমাদের সঙ্গে মেশাবার জন্য তাদের ভিতর অনেকে নিশ্চয়ই অবসর মত লেখা পড়া শেখে। এই যে সব এখানকার বড় বড় সাহেব মাচ্ছিণ্টে দেখতে পাও এদের ভিতর অনেকেই ১৩।১৪ বৎসরের সময় এপ্রেণ্টিস ঢুকছেন, সমস্ত দিন কাউণ্টারে জোতা থেকেও এঁরা বয়সকালে চেম্বার অফ্ দি কমার্সের প্রেসিডেণ্ট হবার সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডিনারে বক্তৃতা দেবার উপযুক্ত হন। তার পর আমাদের দেশে লোক শিক্ষার, যাকে মাস্ এডুকেসন বল, তার আর একটি সহজ উপায় আছে; বার মাসে তের পার্ব্বণ, বার ব্রত, পাঠ কথকতা, যাত্রা আমোদই ইত্যাদি সবই এডুকেটিং, সব থেকেই শিক্ষা পাওয়া যায়; আবার এই বঙ্গদেশে কাশী-

রাম, কৃত্তিবাস যা দুখানি অমূল্য বই লিখে গেছেন তা গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে লোককে শিক্ষিত কচ্ছে;—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

এই দুটী লাইনে ইতর ভদ্র স্ত্রী পুরুষ সক-লকেই শিক্ষার প্রতি যে প্রবৃত্তি দিচ্ছে তা তোমার জর্ম্মাণ পুলিসের ঠাকুর্দ্দাদাও এ জন্মে পাচ্চেনা। কি কথায় বার্ত্তায় কি ধর্ম্মভাবে কি আচার ব্যবহারে, আমাদের দেশের সামান্য সাধারণ লোক যতটুকু উন্নত, এমন আর কোন দেশে নাই। ইতর লোকের অবস্থা হতে দেশের যথার্থ অবস্থা বুঝা যায়; যেমন কিউ গার্ডেন দেখে ইংলণ্ডকে উর্ব্বরা দেশ বলা যায় না, পাম্-গ্রামের পড়ো জমি দেখতে হবে; তেমনি বিলেতের ভদ্র সাহেবদের দেখেই বিলেতকে একেবারে সভ্য ভূমির আদর্শ বল্লে হবে না; ইংলণ্ডের ইতর লোককে দেখলেই বুঝতে পাবে যে বিলেত হাড়ে টক।

যাদব। তবে তুমি এখন কি কত্তে চাও? এক রকম তো সব ভেঙ্গে চুরে গেছে আপা-ততঃ উপায় কি?

রাধা। আলাদীনের প্রদীপ ঘষার মতন তড়ি ঘড়ি কিছু হবার যো নেই। সেই দ্রোণা-চার্য্য প্রথম যে দিন ধর্ম্মের জন্য বেদাধ্যয়ন ছেড়ে স্বার্থের জন্য ধনুতে গুণ যোজন করে-ছিলেন, সেইদিন থেকেই আস্তে আস্তে ভাঙ্গতে সুরু হয়েছে, অনেকদিনে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে; প্রথমে রবিশ সাফ কত্তে হবে, তার পর আস্তে আস্তে অনেকদিনে গড়তে হবে, ভাঙ্গার চেয়ে গড়তে বেশী সময় লাগে তা তো জান, আমা-দের উন্নতি কত্তে হলে তোমরা যাকে পেছন মনে কর সেই পেছুতে হবে; সাহেবি ধরণ সামনে আদর্শ রেখে হিন্দু উন্নতি কত্তে যতই চেষ্টা করবে ততই অধঃপাতে যাবে; হিন্দুর উন্নতির উপায়ে সেই পুরাতন হিন্দুর আদর্শ। আশ্চর্য্য এক এলোমেলি দেখি যে, পাছে সাহে-বরা আমাদের আস্তে নিয়া আমেরিকার এবরি-জিনিদের মত মনে করেন বলে প্রতি কথায় আমরা তাঁদের সামনে গর্ব্ব করি যে আমরা পুরাতন আর্য্য জাতির বংশ; আমাদের ব্যাস ছিল, বাল্মীকি ছিল; ভাস্কর কার্য্যের উদাহরণে ভিড়িয়ারি মন্দির দেখাই, শিল্পের জন্য ঢাকা মসলিন দেখাই, আরও কত কি দেখিয়ে তো আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে সভ্যজাতির প্রিভিলেজ ডিমাণ্ড করি, কিন্তু আপনাদের নিজের কাজের বেলায় সে সমস্তই ইগ্‌নোর করি, শাস্ত্রগুলো আরেবিয়ান নাইটের গল্প মনে করি; সাহেবঃ স্মরণং বিনা গতিরন্যথা ভেবে রসে থাকি।

যাদব। তবে কি আবার সব কেঁচে গণ্ডুষ করে এই লেখা পড়া ভুলে যেথার জাত ব্যবস্থা ধত্তে হবে?

রাধা। যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। কাজ ভাগাভাগি করে নিতেই হবে, শরীর খটিতেই হবে; তবে আজ বা তট চার্য্যি মশায়ের হাতে লাঙ্গল দিয়ে তুমি ঘটা নাড়, আবার তোমার ছেলে কাল জুতো সেলাই কত্তে বস্‌ল, আমার ছেলে অন্নের অভাবে বিহারীলাল কর্ম্মকার নাম বদলে বিহারানন্দ স্বামী হয়ে গেরুয়া পরে ধর্ম্ম-প্রচার কত্তে বেরিয়ে যান; এই রকম পোড়ো ধরা খিচুড়ি চলতেই থাকবে। কিন্তু বংশগত জাতি ভেদের বন্দোবস্ত ভারি পাকা, ভারি কায়েমি, এই জাতি ভেদই সাম্য, সাম্য মানে তোমারও ঘটী আছে আমারও ঘটী আছে নয়, তোমার নাই হয় ঘটী আছে আমার না হয় বাটি আছে। যেমন পরকালে তরবার জন্য তাঁতিকে ব্রাহ্মণের কাছে জোড় হাত করে দাঁড়াতে হবে,

তেমনি ব্রহ্মণকেও ইংরাজের লজ্জা নিবারণের জন্য তাঁতির ঘরমুখ হতেই হবে; প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের সম্মান আছে, জোর আছে, আমি প্রত্যেক জাতিকেই সম্মান করি, তবে কাক কাকের মধ্যেই সুন্দর, তিনি যদি ময়ূরপুচ্ছ পরেন তবে আমি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ রায় তাঁকে একটু ঠোকরাব। কেন তিনি ছুটো রংচঙে পাখার লালচ করেন? ঐ কাল রূপেই তাঁর আদর কত! কত দরকার! এই কলিকেতা সহরেই একদিন কাক না থাকলে মিউনিসিপালিটিকে মাথা চাপড়ে পাগল হতে হয়, পাড়াগাঁয়ে তো কাক আছে বলেই কন্যার ভোজ্য দেশ দিতে হয় না; আর মড়ার তো সংসারে বিশেষ কিছুই প্রয়োজন দেখি না, তার পর আওয়াজের কথা ধোতে গেলে কাল কাক তো তাঁর আছে নাইটেঙ্গেল, পাপিয়ার কলরব না থাকলে সংসারে তাঁকে চায় কে? মানী মনুষ্য কে পোষে? মদারানও যে কুদিন কুকুর ফেলেন সে কদিন তাঁর পানে কেউ ফিরেও দেখে না। এই ভেদাভেদই সাম্য, এই ওপের তারতম্য ভেদাভেদ করেই জগদীশ্বর সৃষ্টির সাম্য রক্ষা করেছেন। এটী বেশ মনে রেখ মেয়েদের গোঁফ বেরুলেই আর গুরুবেরা ঘোমটা দিলেই সাম্য হয় না।

যাদব। তোমার কথায় যে দেশে ঘিয়ে লাঙ্গল ধরতে ইচ্ছে হচ্ছে হে।

রাধিকা। এই বেলা নেশার ঝোঁকেরুকে করে লেগে যাও, জুড়ুতে দিওনা—যাও।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

('একাকার' হইতে)

হায়দারের রাজ্য প্রাপ্তি।

মহীশুরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন। উহার দুর্গের কামান-শ্রেণী হইতে একদিন রাত্রে সহসা গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। হায়দার কারণ অবগত না হইয়া কুন্দিরাওকে ডাকাইয়া পাঠান। তিনি আসিলেন না। পরে হায়দার দেখিলেন, কুন্দিরাও স্বয়ং দুর্গের উপরিভাগ হইতে হায়দারের সৈন্যগণের উপর গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ দিতেছেন। তখন তিনি সমস্ত চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া কুন্দিরাওর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কুন্দিরাও তাঁহাকে সসৈন্যে সপরিবার ত্যাগ করিয়া সেই মুহূর্তে দেশ হইতে প্রস্থান করিতে বলিলেন। অগত্যা হায়দার এতকাল যে অতুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সে সমস্ত ত্যাগ করিয়া এবং নিজ পরিবারবর্গকে পর্য্যন্ত কুন্দিরাওর দয়ার উপর রাখিয়া দেশ হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

হায়দার মহীশুর হইতে তাড়িত হইয়া নানা স্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং কিছু দিন পরে কুন্দিরাওর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। যুদ্ধে হায়দার পুনর্ব্বার পরাস্ত হন। তখন তিনি দীনভাবে নন্দরাজের শরণাপন্ন হন। তাঁহার পত্রপ্রাপ্তে পতিত হইয়া আপনার পূর্ব্ব দোষ স্বীকার পূর্ব্বক মার্জ্জনা-প্রার্থনা করিলেন এবং আপনাকে অনুগত ভৃত্যের ন্যায় পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিতে ব্যগ্রতা অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নন্দরাজ হায়দারের বাহ্য সরলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নন্দরাজও এই সুযোগে আপনার পূর্ব্বগৌরব উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। হায়দার আপনার স্বভাবসিদ্ধ চাতুরি-বলে নন্দরাজকে বশীভূত করিয়া কৌশলে মন্দরাষ্ট্রের নামাঙ্কিত শীল-মোহর হস্তগত করিলেন এবং কুন্দিরায়ের সেনাপতিগণের নামে জালপত্র লিখিয়া সেই শীল-মোহরের দ্বারা নন্দরাজের নাম ইসাইয়া দিলেন। এক জন চতুর ও কার্য্যদক্ষ দূতকে সেই পত্র শত্রু-শিবিরে লইয়া যাইবার ভারার্পণ করিলেন। সেই দূত এরূপভাবে পত্র লইয়া কুন্দীরায়ের শিবিরে গমন করিল যে, সহজেই তাহা কুন্দীরায়ের হস্তগত হইয়া তাঁহার মনে নিজ সেনাপতিগণের উপর অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিল। তিনি সুচতুর হইয়াও হায়দারের কৌশলে প্রতারিত হইয়া রজনী-যোগে শিবির পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে কুন্দিরাওকে দেখিতে না পাইয়া সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ হইল। এতদবস্থায় উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া হায়দার সহজেই জয়ী হইলেন। কুন্দিরাও, পরে হায়দারের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকট আবার এক ঘোরতর যুদ্ধ হইল। হায়দার বৈগতিক দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সন্ধির বিষয় সকল যখন স্থির হইতে লাগিল, সেই সময়ে শত্রুগণকে নিতান্ত নিরুদ্যমভাবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। শত্রুগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। হায়দার বাহিরে জানাইতে লাগিলেন, মহীশুরের সিংহাসনে তাঁহার কোন অভিলাষ নাই, এবং মহীশুরের রাজাকে রীতিমত রাজসম্মান প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে তিনি রাজার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তিনি কুন্দীরাওকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন এবং পূর্ব্বে যে সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলে তিনি মহীশুর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবেন; অথবা রাজাজ্ঞা পাইলে তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিবেন। কিন্তু গোপনে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তিনি রাজসিংহাসন ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। রাজা অগত্যা তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি লইয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণে স্বীকার করিলেন। হায়দার বিশেষ অনিচ্ছার ভাণ করিয়া উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। নন্দরাজের এক লক্ষ টাকা বৃত্তি ধার্য্য হইল। রাজা ও রাজা-পরিবারবর্গ কুন্দিরায়ের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে প্রার্থনা করিলে, হায়দার বলিয়া পাঠাইলেন যে, কুন্দীরায়কে পোষা পাখীর ন্যায় যত্নে রক্ষা করিবেন। তাঁহার কথায় সকলেই অসন্তুষ্ট হইল। কিন্তু তিনি আপনার কথা-মতে কুন্দীরাওকে একখানি খাঁচায় বন্ধ করিয়া পক্ষীর ন্যায় আহার প্রদান করিতে লাগিলেন। নন্দরাজের সাহায্যে শত্রুদমন করিয়া মহীশুর রাজ্যের সিংহাসন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, প্রত্যুপকার স্বরূপ শীঘ্রই তাঁহার বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিয়া ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, বিএ, বি-এল।

একাকার!

"একাকার"—ষষ্ঠ মাসের প্যান্টোমাইম্—বড়দিনের পঞ্চরং—কি না-বড়দিনের আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-তামাসা বা সঙ-রঙ্গ। অর্থাৎ বড়দিনের ছুটীতে বাঙ্গালী বাবুরা থিয়েটার দেখিয়া একটু আমোদ-আহ্লাদ করিবেন, এই উপলক্ষেই "একাকার" লিখিত।

*একাকার—ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু প্রণীত ও ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

সুতরাং সাধারণতঃ থিয়েটারের "প্যান্টোমাইম" বা পঞ্চশর যাঁহাদের কখনও দেখা আছে, তাঁহারা ঐ এক পরিচ্ছেদেই 'একাকারের' পরিচয় পাইয়া থেলেন। বাস্! আর কি চাই?

কিন্তু—শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন—"একাকারের" পরিচয় ঐ পর্য্যন্তেই পর্য্যবসিত হয় নাই। সঙ্-নাচের আমোদ ছাড়া, 'একাকারে' নূতন আরও কিছু আছে।

ধীরে ধীরে, সঙের-রঙের অলক্ষিত-মূর্ত্তিতে, সমাজ ও দেশের মহদুপকার করিতেছেন—এরূপে যিনি "একাকার" আঁকিয়াছেন। হিন্দুর পবিত্র প্রথা জাতিভেদ—জাতিগত কর্ম্মভেদ—যাহার অরক্ষণে দিনদিন আমরা এই দুর্গতির চরম সীমায় নিপতিত হইতেছি, "একাকারের" রঙ্গ-চিত্রে তাহারই দোষগুণ বড় সুন্দররূপে চিত্রিত। "একাকার"—আজকালকার একাকার-সমাজের জীবন্ত নকুসা—নক্সার ভিতর-বাহির 'সেড্-ডেড্স্' সবই সম্পূর্ণ।

"একাকার" উপদেশমূলক, অথচ আকর্ষক—উহা দেখিতে দেখিতে মুখ প্রফুল্ল ও হাস্যময় হয়, অথচ ভাবিতে গেলে অশ্রু অনিবার্য্য হয়। হাস্যামোদের ভিতর অশ্রুর এমন অন্তঃশীলা গতি—কে কোথায় দেখিয়াছ, বল দেখি? আমোদের সঙ্গে এমন অন্তস্তলস্পর্শী শিক্ষা—বল দেখি, কোথায় কবে পাইয়া থাক?

"একাকারে" — একে অন্য হইতে চায়। নিজের যাহা আছে বা যাহা ছিল—তাহা ভাল কি মন্দ—বুঝিবার সামর্থ্য বা চেষ্টা নাই; অথচ, তাহা খোয়াইয়া, পরের যাঁহা আছে—ভাল-মন্দ না বুঝিয়া—তাহা লইতে চেষ্টা পাওয়া;—ইহাকেই বলে—"একাকার"। "একাকারে" বনের ব্যাঙ পাখীর মত উড়িতে চায়; ভাঙ্গুক, মাছের মত জলে সাঁতার দিতে চায়, ইত্যাদি। "একাকারের" সূত্রতত্ত্ব এই—প্রস্তাবনা এইখানে। কিন্তু তাহাদিগকে যখন বুঝান হয়, তাহাদের মধ্যে ব্যাঙকে যখন বলা হয়—"উড়িতে বাসনা বড় বনের শার্দ্দূল, দন্তনখ ঝল্প লম্ফ দেও বিহঙ্গেরে!" তখন তাহারা বুঝিতে পারে—"না, না" বলিয়া নিজের জাতীয় প্রকৃতিতেই সন্তুষ্ট থাকে।

ফলতঃ বড় সত্য কথা — প্রত্যেক জাতির জাতিগত ও প্রকৃতিগত সম্মান অটুট। নিজ-নিজ ব্যবসায়ের মর্য্যাদা কার না আছে? আমি ব্রাহ্মণ, তুমি কুমোর বা কামার; কিন্তু কার্য্য-হিসাবে আমার নিকট যেমন তুমিও বাঁধা, তোমার নিকট তেমনি আমিও বাঁধা; পূজা-পার্ব্বণে আমার দ্বারস্থ না হইলে যেমন তোমার চলিবে না, সেইরূপ কার্য্য-হিসাবে আমাকেও তোমার দ্বারস্থ হইতে হইবে। তবে কেনএ "একাকার"—কেন এ বিশৃঙ্খলা—কেন ব্যাঙের এরূপ পাখী হইতে যাওয়া, বা ভাঙ্গুকের মৎস্যোচিত গুণক্ষমতা-প্রার্থনা?

"একাকারে"—আমাদের সঙ্গে এই "জাতীয়ত্বটুকুই" অতি সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে! "একাকার" দেখিলে, বাস্তবিকই শিক্ষিত 'গ্রাজুয়েট' সুধা যাদবচন্দ্রের মত সকলেরই বলিতে ইচ্ছা হয়—"যাই, আর কাজ নাই, নিজের নিজের জাত ব্যবসাই অবলম্বন করা থাক।"

ফলতঃ "একাকার" এত সুন্দর—অথচ এত উপদেশপূর্ণ, উহা না দেখিলে বা দেখিয়া না বুঝিলে, এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে তাহার সার্থকতা-প্রদর্শন অসম্ভব। নমুনা-স্বরূপ 'জাতীয়ত্ব'-প্রস্তাবে আমরা "একাকারের" একটী চিত্র প্রদান করিলাম। বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের সহিত মর্ম্মস্পর্শী শিক্ষা উহাতে কিরূপ আছে, তাহার বংকিঞ্চিৎ আভাস ঐ প্রস্তাবে পাওয়া যাইবে।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান

অষ্টম বর্ষ। | ২৫শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। | ৩৯ সংখ্যা।

হাসি!

হাসি! তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি বলিয়া তোমার কথা বলিতে ইচ্ছা হয়; তুমি আদর, সোহাগ, আহ্লাদ, অনুরাগ, সরলতা, পবিত্রতার কোলে বসিয়া থাক বলিয়া সকলে তোমার আদর করে। তুমি স্বর্গের আলোক-ছটা, হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস, প্রণয়ের নবমুকুল! তোমাকে ছাড়িয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না; তুমি আছ বলিয়াই সংসারের অনন্ত যন্ত্রণা-রাশির ভিতর মাঝে মাঝে সংসারের স্নিগ্ধ ছায়া পতিত হয়, হতাশের প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, জীবনের মমতাটুকু আরও বাড়িয়া উঠে। তুমি যদি না থাকিতে, তাহা হইলে প্রকৃতি কি এমনি মনের মত করিয়া এ বসুমতী সাজাইতে পারিত? শূন্যময় আকাশ সময়ে সময়ে সৌন্দর্য্যের আধার স্থান হইয়া কবির কাব্যে স্থান পাইত? শশী কি সেই অতুলনীয় সুধাধারিনি তুলনা হইতে পারিত? তুমি না থাকিলে এ পৃথিবী কেবল রাক্ষসের পুরী হইত। তুমি শ্মশানেও পারিজাত ফুটাইয়া দাও, মরুভূমে অমৃত বৃষ্টি কর, সৌন্দর্য্যদীপ উজ্জ্বলতর করিয়া দাও; আর তুমি আহ্লাদ, অনুরাগ, সরলতা, পবিত্রতার পবিত্র কোলে বসিয়া থাক বলিয়া সমভাবে সকলে তোমার আদর করে।

তোমার তো একরূপ নয়; বহুরূপীর মত বহুস্থানে বহুরূপে দেখা দাও। কখন তোমাকে দেখিয়া হর্ষের শীতল প্রবাহে ভাসিয়া যাই, কখন স্তম্ভিত, ভীত হই; কখন আশালতা-মূলে জলসিঞ্চন করি, কখনও হতাশ হইয়া নির্ণিমেষে তোমার পানে চাহিয়া থাকি, কখন ঘৃণায় মরিয়া যাই, তোমার পানে চাহিতে ইচ্ছা হয় না; তুমি মুহূর্ত্তে প্রাণ কাড়িয়া লইতে পার, আবার প্রাণের বন্ধন ছিন্ন করিয়াও দিতে পার। তোমাতে কোমলতাও আছে কাঠিন্যও আছে, মধুতা আছে তীব্রতাও আছে; তুমি কখন শীতল, কখন উষ্ণ, কখন নাতি শীতোষ্ণ! তোমার নামের পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু আধার-

ভেদে ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ কর, ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত হও।

৪৬০০৮

যখন বিম্বাধরার অধর পল্লবে সুধার ধারা ঢালিয়া দিয়া বিধুমুখে মধুর হাসি হইয়া বিরাজ কর, যখন সেই অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের ভিতর তড়িৎশক্তিতে ক্রীড়াপর হইয়া দেখা দাও দাও দাও না, তখন তোমার যে রূপ দেখিতে পাই, সে রূপের তুলনা নাই; তখন তোমাকে একবার দেখিয়া আশা নিবৃত্ত হয় না; মনে হয় তুমি অমর অক্ষয় হইয়া সেই বিম্বাধরে বিরাজ কর, পলে পলে দেখি; তুমি বাহির হইয়া তখনই আবার অধরের অন্তরালে লুক্কায়িত হও বলিয়া, তোমার উপর বড় রাগ হয়। সংসারে শত শত যাতনা, বাহিরে শত ব্যথায় ব্যথিত হইয়া, পৃথিবীর কোলাহলের মাঝে তোমাকে হারাইয়া, যখন বিষন্ন-মনে গৃহে ফিরিয়া যাই, তখন সেই যে একখানি পূর্ণিমার চাঁদের মত সুন্দর মুখ, তুমি সেই মুখমণ্ডলের অধরপ্রান্তে দীপশিখার মত জ্বলিয়া উঠ, কখন অধর ছাড়িয়া নয়নে যাও, আবার নয়ন ছাড়িয়া অধরে আইস, তখন আমি যত সুখী হই, যথার্থ করিয়া বলিতেছি, তৎক্ষণাৎ সমস্ত সৌরজগতের আধিপত্য পাইলেও তত সুখী হই না। তখন শ্রান্তি দূরে যায়, ভ্রান্তি আত্মহারা করে, শান্তি সুখদ-স্পর্শে হৃদয়-ব্যথা অপসারিত করে; তখন তুমি কত কোমল, কত মধুর, কত অমৃতস্রাবী! নয়ন দিয়া প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের স্তরে স্তরে উজ্জ্বল রেখা আঁকিয়া দাও; মধুর অধরে স্থান পাইয়া তোমার মধুরতা ঝরিয়া পড়ে, তাই বলিতেছিলাম স্থানভেদে তোমার গুণভেদ!

শ্রীমতী মান-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন; দুর্জ্জয় মান সহজে ভাঙ্গিবার নয়; অনুরাগের সহচর তুমি, বিরাগের সময় থাকিবে কেন? কিছু ক্ষণের জন্য মানিনীর কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিকুঞ্জকুসুমে প্রফুল্লতারূপে, তমালের পত্রান্তরালে জ্যোৎস্নারূপে, কোকিলা-কণ্ঠে কলধ্বনিরূপে বিরাজ করিতেছ; শ্রীকৃষ্ণ অনেক সাধিয়া পড়িয়া সখীর নিকট কুঞ্জ-প্রবেশের অনুমতি লইয়া বড়সাধে রাধার মাধব রাধার কাছে আসিলেন, দেখিলেন—সকলই রহিয়াছে, বনমালা, কুসুম-কিসলয় শয্যা, সজ্জিত পুষ্প-স্তবক কিছুরই অভাব নাই; অভাবের মধ্যে রাধার অধরে কেবল তুমি নাই। "সো মুখ চান্দ,হাস মধুরাধর, সো দিঠি বঙ্ক নেহারি" মানিনীর মান মেঘে ঢাকা পড়িয়াছে। তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,বংশীধর অধীর হইয়া পড়িলেন; অনেক সাধিলেন মান ভাঙ্গিল না, অধরের হাসি ফুটিল না, শেষে পায়ে ধরিয়া বলিলেন

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমির মতি ঘোরং
স্ফুরদধর সীধবে তব বদন চন্দ্রমা
রুচয়তে লোচন চকোরং।"

আর তুমি থাকিতে পারিলে না, অভিমানিনীর অধর-যুগলে ফুটিয়া উঠিলে; মান ভাঙ্গিয়া গেল, প্রেম-বৈচিত্র বাড়িয়া উঠিল, রসরাজ হারানিধি ফিরিয়া পাইলেন। এক মূহুর্ত্ত তুমি ছিলে না বলিয়া একটা যেন মহাপ্রলয় আরম্ভ হইয়াছিল, তুমি যেমন আসিলে অমনি সব থামিয়া গেল, মধুরে মলয় বহিতে লাগিল। সেইজন্য বলি তুমি শ্মশানেও পারিজাত ফুটাইয়া দাও, মরুভূমে অমৃত বৃষ্টি কর, সৌন্দর্য্যদীপ উজ্জ্বলতর করিয়া দাও। একা তুমি কিন্তু বহুরূপে লীলা কর।

আবার যখন তুমি বালকের মনোহর মুখমণ্ডলে বিরাজ কর, তখন তোমার সেই অকপট ভাবটুকু দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া যাই, প্রাণে আনন্দ ধরে না; উদ্দেশ্য নাই, লক্ষ্য নাই, আপনার সোহাগে আপনি গলিয়া পড়;

ছল চাতুরী কিছুই যেন জান না; শিশুর অধরে সুকুমার শিশুর মত বিরাজ কর; ধন্য সেই স্রষ্টা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিরহিনী ঘুমাইয়া আছে, সমস্ত দিন ব্যথিত অন্তরে প্রণয়ীর আশাপথ চাহিয়া চাহিয়া হতাশ হইয়া নিদ্রার কোমল কোলে আশ্রয় লাভ করিয়াছে, স্বপ্নে দেখিতেছে যেন কত দিনের পর প্রাণের প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছে; যে মুখখানি অহর্নিশ দেখিতে বাসনা, সেই মুখখানি পলকশূন্য নয়নে চাহিয়া আছে, প্রণয়ী সপ্রেমে প্রণয়িণীকে কত দিনের বিরহ কথা বলিতেছে; বিয়োগ-বিধুরার আহ্লাদ রাখিবার স্থান হইতেছে না; তুমি উল্লাসের প্রিয় সখা—অমনি নিদ্রিত সুন্দরীর অধরযুগলে স্ফুরিত হইলে, স্বপ্নাবেশে অধরযুগল ঈষৎ বিভিন্ন করিলে; যে দেখিল, সে ইহজীবনে আর সে চিত্রটী বিস্মৃত হইতে পারিল না; সেইজন্য বলি তুমি বহুরূপী!!

যাহা সুন্দর, যাহা মনোহর, যাহা কোমল তেমন কিছু পাইলে তুমি ছাড়িতে চাও না। তুমি দিবানিশি পুষ্প-পাশে বিরাজ কর কেন? আর কিছু নয়—কুসুমে কান্তি আছে, সৌরভ আছে, দলে দলে কোমলতা আছে, কেবল সেইজন্য। তেমন সুখের আসন পাইয়া সহজে কি কেহ ছাড়িতে চায়? তুমি ফুলে ফুলে বিরাজ কর, সমীর সোহাগে চুম্বন কর, অলি ঝুরিয়া মরে, মালিনী মালা গাঁথিয়া ঘরে ঘরে সাজাইয়া রাখে; একটী ফুল শুকায়, তুমি আর একটীতে যাও, শত শত ফুল শুকাইয়া যায় কিন্তু তোমার ফুলের অভাব নাই। সৌন্দর্য্য ভালবাস বলিয়াই তো ফুলের পাশ ছাড়িতে চাও না! অর্দ্ধস্ফুট ফুল অর্দ্ধ হাসিত বদনে যখন হৃদয়দ্বার অর্দ্ধোন্মোচিত করে, তখন মনে হয় তোমার তেমনি রূপের একখানি প্রতিমা গড়িয়া, অতি নির্জ্জনে তুলিয়া রাখি; যখন কোন বিষাদ ভারে মন বিষন্ন হয়, তখন তোমাকে বাহির করিয়া এক একবার দেখি, আর সকল দুঃখরাশি অপসারিয়া যাই; কেন না—তখন তুমি সরল অথচ কুটিল, উভয় ভাবের মিশ্রণে এক মধুর ভাব ব্যক্ত করিতে থাক।

তুমি অত্যন্ত ক্রীড়াপর, তাই সকল সময় দেখিতে পাই; জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র তোমার অব্যাহত গতি; ধরায় কুসুমে কুসুমে, মানবের অধরে, প্রাতঃ সূর্য্যকিরণে আরও কত কত স্থানে বিরাজ কর, আকাশে তারার হার চাঁদের কিরণ লইয়া খেলা কর, ভূগর্ভে খনির মণি সাগরের মুক্তাপাশে থাক। যখন তোমাকে সুন্দর স্থানে দেখি, তখন তোমাকেও পরম সুন্দর দেখি, তখন তোমার মোহন মূর্ত্তিটী পুনঃপুনঃ দেখিতে সাধ হয়। যখন তুমি ধীরে ধীরে নম্রতা মাখিয়া বাহির হও, অস্থির হইলেও উদার ভাবে দেখা দাও, চঞ্চল হইলেও ভালবাসা মাখিয়া আইস, তখন মনে হয় তুমি একতিল নয়নের আড় হইও না। আবার যখন অতি চঞ্চল বিশ্বত্রাসিনী সৌদামিনীর মুখমণ্ডলে বিভাসিত হও, তখন তোমার পানে চাহিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়। প্রাতঃ-সূর্য্যকরে শিশির বিন্দু সুরঞ্জিত হয়, কিন্তু মধ্যাহ্ন রবির হাস্য সে সহিতে পারে না, শুকাইয়া যায়; কারণ তোমার মৃদুতাটুকু মর্ম্মস্পর্শী, স্নিগ্ধ, হৃদয়ানন্দদায়ী!!

তোমার স্বাভাবিকত্বই সুন্দর; সাধ্বী পতিব্রতাও রমণী, বারাঙ্গনাও রমণী; তুমি তো উভয়েরই কাছে থাক, কিন্তু যখন বারবণিতার কাছে থাক, তখন তোমার তেমন মাধুরী দেখিতে পাই না কেন? আর কিছু নয়, সাধ্বী প্রাণের আনন্দ চাপিতে না পারিয়া হাসে

তাহার কাছে নগ্নতা মূহূর্ত্তে মায়িয়া বাহির হও, যাঁর গরিমা মন ভুলাইতে হাসে, তাহার কাছে অস্থিরতা এবং অপবিত্রতা মাখিয়া বাহির হও। সাধ্বীর কাছে তুমি স্বাভাবিক, আর বারাঙ্গনার কাছে কৃত্রিম!—আবার দেখ তুমি এত মিষ্ট, কিন্তু যে কাষ্ঠ হাসি হাসে, তাহার হাসি তেমন মিষ্ট নয়। তাহাতেই বলি তোমার স্বাভাবিকতাই সুন্দর! তোমার অস্বাভাবিক ভাব দেখিলে প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়,—যখন জগজ্জননী সতী জগৎকে পতিব্রতার ধর্ম্ম শিখাইবার জন্য শিবনিন্দা শুনিয়া দক্ষ-যজ্ঞে প্রাণাহুতি দিলেন, মাতৃস্নেহ-পালিত নন্দী মাকে জন্মের মত বিদায় দিয়া, শূন্য বৃষভ রথ লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কৈলাসে ফিরিয়া আসিল,—কাঁদিতে কাঁদিতে পার্ব্বতীর কাছে এই ভীষণ শোক সমাচার প্রদান করিল, এই বজ্র পতন মাত্রে—

"ক্রুদ্ধ সুদংষ্ট্রৌষ্ঠ পুট সুদুর্জ্জটী
জটা তড়িদ্বহ্নি সটোগ্র রোচিষঃ
উৎকৃত্য রুদ্রঃ সহসোত্থিত হসন্
গম্ভীর নাদঃ বিসসর্জ্জ ত্বাং ভূতিঃ।"

তখন তুমি কি ভয়ানক! কি ভীষণ রোমহর্ষণকারী! অসহনীয় শোকে হৃদয়কে আলোড়িত করিয়াছে, অসহ্য সন্তাপে অশ্রু প্রস্রবণ শুকাইয়া গিয়াছে, সৃষ্টি বিধ্বংসকারী রোষানল ধুকধুক করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে!! তখন রোদন চিত্তের পরিবর্ত্তে রুদ্রদেবের বিস্ফারিত অধরে মহেন্দ্র রূপী হুঙ্কার হাস্য!!! ধরণী মূর্চ্ছিতঃ কম্পিত হইতে লুণ্ঠিল, আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল, অকালে মহাপ্রলয়ের সূচনা হইল। তুমি শোক সন্তাপ দেখিলে পলাইয়া যাও, দুঃখের সময় লুকাইয়া থাক, অশ্রুজলে তুবিয়া মর, তাই মহাদেবীর সে রাগী রোদন সময় তোমার বিকাশ দেখিয়া ত্রিভুবন বাসী ভয়ে চকিত হইয়া পড়িল।

আবার দেখ, রোগী রুগ্ন শয্যায় শায়িত, অজ্ঞান, অভিভূত। শিওরে পতিগত প্রাণা ভার্য্যা শিশুসন্তান ক্রোড়ে লইয়া স্বামীর মুখ-পানে চাহিয়া রহিয়াছে, আর প্রতি মুহূর্ত্তে সেই দুঃখহারিণীকে অন্তরে অন্তরে ডাকিয়া আশালতার মূলে জলসিঞ্চন করিতেছে; সহসা তুমি মেঘাচ্ছন্ন দিনের রৌদ্রবৎ—রোগীর মুখমণ্ডলে একবার ফুটিয়া উঠিয়া আবার বিলীন হইয়া গেলে; যে মুখের হাসি দেখিলে দুঃখিনীর সকল দুঃখ যন্ত্রণা দূরে যাইত, তখনও তো সাধ্বী সেই স্বামীর মুখেরই হাসি দেখিল! তথাপি তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, জীবন-বন্ধন যেন শিথিল হইয়া পড়িল, যে "আশালতার মূলে জলসিঞ্চন করিতেছিল তাহা যেন ছিঁড়িয়া গেল। সরলা যাহাকে হাসিতে দেখিলে হাসিত, রুগ্ন শয্যায় তাহাকে হাসিতে দেখিয়া শূন্য হৃদয়ে নীরবে নয়ন দুটী মুছিল কেন? সে দারুণ রোগ-যন্ত্রণার সময় তোমার উদয় অস্বাভাবিক, কেবল সেইজন্য। নিশান্তে সূর্য্যোদয় দেখিলে কে না চকিত হয়?

বলিয়াছি তো তুমি নানা সাজে পর, কিন্তু কখন সাজ তোমার সুন্দর নয়; যখন ঘৃণাচ্ছলে, ব্যঙ্গচ্ছলে বাহির হও, তখন যেন তোমার তত সৌন্দর্য্য থাকে না; তখন কোমলতার পরিবর্ত্তে কাঠিন্য ধারণ কর, মধুরতা ছাড়িয়া তীব্র আঘাত হও; শত্রু-দমন সময়ে রণরঙ্গিণী চামুণ্ডা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে যে অট্টঅট্ট হাস্য করিয়াছিলে জগজন স্থিরভাবে সে হাস্যের দিকে চাহিতে পারিয়াছিল, উহাদের হাসির প্রতি কয়জন লক্ষ্য করে? তুমি বালকের কাছে বালক, তরুণের কাছে তরুণ, বৃদ্ধের কাছে বৃদ্ধ। যেখানে যেমন

সেখানে তেমন না থাকিলে তোমার কুৎসীত রূপ বাহির হইয়া পড়ে।

আবার ইহাও বলি সময়ে সময়ে অস্বাভাবিকতার ভিতরও তোমার মোহন বেশ দেখিতে পাই। অনুরাগিণী রাধিকা যমুনা জলে গিয়া কেলী কদম্ব মূলে মনচোরা শ্যামরায়কে দেখিতে পাইয়াছেন। বয়ঃসন্ধি সময়, ভয়ে ভয়ে চকিত-নেত্রে চারি ধারে চাহিয়া চাহিয়া ব্রজধর শ্যামরূপ দেখিতেছেন। প্রণয়ের মর্ম্ম অন্তর সখীর কাছেও তাহা প্রকাশ নাই; সখী কিন্তু দূর হইতে অনুরাগিণীর এরূপ দর্শন ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছে, নিকটে আসিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল "রাধে! সত্য করিয়া বল, ফাঁদে পড়িয়াছ না কি? নিমিষেতে কি দেখিতেছিলে?" আর লুকাইবার উপায় নাই, হাতে হাতে চোর ধরা পড়িয়াছে, অপ্রতিভ হইয়া দুইবার 'কিছু নয় কিছু নয়' বলিয়া লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সখী ছাড়িবে কেন? হাতে হাতে ধরিয়াছে পীড়াপীড়ী করিতে লাগিল, তখন অনন্ত উপায় হইয়া 'কাঁদন-মাখা হাসি দেয় পারি!' মরি মরি তখন তুমি কি সুন্দর!! মুখে হাস্যনয়ন জল ছল ছল! নয়ন দুটী রক্তবর্ণ করিতেছে বটে, কিন্তু ঝরিয়াছে সে দুফাইতে পারিতেছে না; অধরে তুমি ঈষৎ ফুটিয়া বসিয়া দিতেছ, 'কথা সত্য বটে!' আর ভ্রূযুগল নয়ন দুটী বলিতেছে "না মিথ্যা!" তখন কি অপার্থিব সৌন্দর্য্যের সমাবেশ! আকাশে একদিকে মেঘ, একদিকে চন্দ্র-কর সম্পাত!! তখন তোমাকে দেখিলে মনে হয় তোমার বালাই লইয়া মরি।

তুমি শিশুর আসো সরলতা, পুষ্পাধরে প্রফুল্লতা, রমণীর অধরে কমনীয়তা, দেবী প্রতিমার মুখমণ্ডলে পবিত্রতা রূপে বাস কর। আবার যখন সমাধিস্থ যোগী যোগাসন পাতিয়া অন্তর্দৃষ্টি নিমগ্ন-নেত্রে মহাযোগসাধনে ব্যাপৃত থাকেন, বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত থাকে, কানন মৃগ রোমন্থন করিতে করিতে সেই যোগী দেহে গাত্র কণ্ডুয়ন সুখ অনুভব করে, তিনি ধ্যানানন্দে বিভোর হইয়া মহুয়াকে লোক সকলে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন, তুমি স্থির অকম্পিত ভাবে তাঁহার বদনে ঈষৎ প্রকাশিত থাক, তখন তোমাকে দেখিলে ভক্তি রস উচ্ছলিত হইয়া পড়ে, গললগ্নী বাসে প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়, বাহেন্দ্রিয় তাঁহার অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে বিরত থাকে, একলী তুমি তাঁহার পরমায়ু মিলনানন্দ বহির্জগতে প্রচার কর। ধন্য তোমার চতুরতা, আর যিনি তোমাকে এ চতুরতা শিখাইয়াছেন তাঁহাকে শত ধন্যবাদ!!

তুমি ইচ্ছা রূপী, বহুরূপী, সুন্দর মনোহর! কিন্তু দুঃখ এই, ব্যথার ব্যথী নও। সুখের সময় তুমি প্রিয় সখার মত সঙ্গে সঙ্গে থাক, দুঃখের সময় আর দেখা দাওনা; যারা চির প্রমুখ, যখন দুঃখের বার্ত্তা জানে না, তুমি তাহাদিগের কাছে থাকিতেই ভালবাস; দিবাকর অস্তমিত হইলে নলিনীর মুখ-পঙ্কজে আর তো দেখা দাও না? বসন্ত-সখা কোকিলের মত আইস, আবার বসন্ত ফুরাইলে যে দেশে বসন্ত আছে সেই দেশে উড়িয়া যাও; রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, বিরহ সন্তাপ তোমার ভাল লাগে না, কিন্তু মনুষ্য ঐ সকল লইয়াই অনুক্ষণ ব্যতিব্যস্ত। সেই জন্য অধিকাংশ সময় তোমার অভাব অনুভব করি। হে হাস্য! পৃথিবীর মানুষ আমি বিনয় করিয়া বলি, যদি ইচ্ছা করিলে থাকিতে পার, তাহা হইলে কথা রাখিও, একতিল কাছছাড়া হইও না, ব্যথার ব্যথী হইও। কাঁদিতে কাঁদিতে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি, যেন হাসিতে হাসিতে যাইতে পারি। তুমি যাঁহার করুণাকটাক্ষের স্নিগ্ধ ছায়া, প্রতিক্ষণ তোমাকে সঙ্গে লইয়া

তাঁহার কার্য্য যাহাতে করিয়া জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিতে পারি, আর জন্মে জন্মে অভয় হৃদয়ে তোমায় যেন পাই।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শোক।

এ কি মা! এ কি বার্ত্তা? তুমি এ সংসারে আমায় পাঠাইয়া যাহাদের সঙ্গে রক্ত সম্বন্ধে—যোন সম্বন্ধে—হৃদয় সম্বন্ধেও শেষতঃ সামান্যতঃ নে যে যাঁহাদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে—সম্বন্ধ করিয়াছ, একে একে সকলকে সরাইয়া লইতেছ কেন? মা! আমার দুঃখের এই অমূল্য উপাদান সামগ্রীগুলিকে হাতে দিয়া কাড়িয়া লইতেছ কেন? জননী জঠর হইতে তুমিষ্ট হইবার সময় এই তরল নয়নদ্বয় যাঁহাদিগকে দেখিয়াছিলে, তাঁহাদিগের অধিকাংশকে তুমি কেন হরণ করিয়া লইলে? যে পুরুষহীনা স্নেহময়ী মাতৃস্বসা মাতৃগর্ভ হইতে তুমিষ্ট হইবামাত্র আমায় ক্রোড়ে লইয়া যতদিন জীবিত ছিলেন, জননীর ন্যায় আমায় লালনপালন করিয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায়? যে সাবিত্রী সদৃশী মাতামহী একমাত্র কন্যার প্রথম পুত্র দেখিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায়? যে পিতামহ পিতামহী ও জ্যেষ্ঠতাতগণ আমার জন্মে আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন কোথায়? যে পিসীমা আমায় উপনয়ন পর্য্যন্ত আমায় পুত্র নির্ব্বিশেষে লালনপালন করিয়াছিলেন, তিনি কোথায়? আমার স্বর্গি তুল্য যে পিতা স্নেহবারিতে আমায় নিরন্তর ভুরাইয়া রাখিতেন, তিনি এখন কোথায়? যে মধ্যম ভ্রাতা আমি রাত্রিতে গেলে আপনারা না খাইয়া সংসারের যাবতীয় সুখাদ্য আমায় খাওয়াইত, যাহার মৃত্যু সংবাদে আমি বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূপতিত সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম, সেই প্রাণের ভাই আমার এখন কোথায়? মূর্ত্তিমতি সরলতা আনন্দময়ী বালিকা ভগিনী এখন কোথায়? সাবিত্রী সদৃশী প্রেমপ্রতিমা পত্নীদ্বয় এখন কোথায়? মা কালিকে! তুমি তোমার করাল ও বিশাল কুক্ষির অভ্যন্তরে একে একে আমার প্রাণের এই সকল উপাদান পুরিয়াছ! ইহাতেও কি মা তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় নাই? যাঁহাদের উল্লেখ করিলাম—তদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রাণের সামগ্রী ভক্ষণ করিয়াছ তথাপি কি মা তোমার নিবৃত্তি নাই? এই দেখ মা! বক্ষ চিরিয়া তোমায় দেখাইতেছি—বক্ষের শোণিত তুমি প্রায় শোষণ করিয়াছ। রক্তস্থলীতে যে একটুমাত্র রক্ত এখনও রাখিয়া দিয়াছ, তাহা কেবল বাঁচিয়া থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিবার জন্য! সে তোমার কৃপা নহে—দারুণ দণ্ড।

এত কষ্ট দিয়াও কি মা তোমার দয়া হইল না? কখনও যায়া মাই তুমি বজ্র কঠিন বিদ্যাসাগরকে গ্রাস করিয়া আমাদিগকে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়াছ। সে দিন আমার দেব কুলচূড়ামণি স্পর্শমণি সদৃশ পরেশনাথকে হরণ করিয়া প্রাণের মর্ম্মস্থানে গভীর ক্ষত করিয়াছ! তাহার কিছু দিন পরেই সাহিত্য সংসারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবি কুলচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্রকে কুক্ষিগত করিয়া গভীর শোকোচ্ছ্বাসে হৃদয় প্লাবিত করিলে! আবার সে শোকের নবীনতা যাইতে না যাইতেই জ্যেষ্ঠ তুল্য নবীনচন্দ্রকে তোমার করাল দংষ্ট্রার সংপেষণে চূর্ণীকৃত করিয়া একটী পরিবারকে অনন্ত দুঃখ সাগরে ভাসাইলে ও আমার হৃদয়ে নিদারুণ শেলাঘাত করিলে! মা করাল-বদনে! তোমার এই মূর্ত্তি দেখিয়া আমার প্রাণ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! মা মুণ্ডমালিনী! তোমার করাল অসিতে এই সমস্ত প্রাণ-পুত্তলিগণের দেহ ছিন্ন করিয়া কবলিত করিয়াছ, মুণ্ডগুলির মালা বাঁধিয়া গলদেশে বিলম্বিত করিয়াছ। মা! এ ভীষণ দৃশ্য আর দেখিতে পারিতেছি না! তোমার অট্টহাস্য—রুধির বিগলিত লোলজিহ্বা ও অধরোষ্ঠ দেখিয়া আমার হৃদয়-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাইতেছে! মা! তোমার এই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি সংহার কর! যে করুণ নয়ন রঞ্জনের মুণ্ডমালা গলায় ঝুলাইয়াছ—তাঁহাদিগকে উদ্ধার কর! মা! তুমি যাঁহাদিকে স্বহস্তে নিজ অসিতে সংহার করিয়াছ, তাঁহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি নাই—জানিয়াও প্রাণের ব্যাকুলতার প্রাবল্যে প্রার্থনা করিতেছি! মা! তুমি তাঁহাদিগকে বিদেশ মুক্তি দেও! মা! অসুরনাশিনী! পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অসুর বিনাশের জন্যই এই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে—কিন্তু কলিতে তুমি অসুরগণের পূজায় বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিরীহ ও দুঃখ ভারিত সন্তানগণের উপর তোমার অসি চালনা করিতেছ! বাল বৃদ্ধ যুবা—বালা বৃদ্ধা যুবতী সকলকে বিচার না করিয়া করাল গ্রাসে কবলিত করিতেছ! কেন মা!! আমাদের কি অপরাধ হইয়াছে বলিয়া দেও মা! মা বরাভয়দায়ী! তোমার দীন ভারত সন্তানগণের নিকট হইতে তুমি কি অনুমানা পাইয়াছ যে, তাহাদিগকে সমূলে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছ? মা চরণে ধরি, কৃপা করিয়া তোর মনের কথা বল—তোর রাগের কারণ উল্লেখ কর! তুই রাগিলে তোর দৃষ্টিতে যে লয় হইবে মা! কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখন নয়। আমরা যদি কুপুত্রই হয়া থাকি, তুইত সুমাতা কখন নয়! তবে এ ভয়ঙ্করী ও প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরিয়াছিস্ কেন? মা! সন্তান হইয়া তোর মুখের দিকে তাকাইতে ভয় হয় কেন? সন্তানের মুণ্ডমালা লইয়া তোর এ তাণ্ডব কেন? তুই কি উন্মাদিনী হইলি মা! তোর সোণার ভারতকে তুই ছারখার করিতে বসিলি কেন? তোর এ বেগ কিনি ধারণ করিতে সক্ষম, সেই শিবময় শিবকে তুই এবার কোথায় ফেলিয়া এলি? সে প্রেমময় ভক্তবৎসল না দেখিয়া আমাদের প্রাণ যে আকুল হইয়াছে মা! সে প্রেমে ঢুলু ঢুলু নয়ন দুটী দেখিলে যে সংসারের সমস্ত শোক তাপ ভুলিয়া যাওয়া যায়। উন্মাদিনী! তুই তাঁকে কোথায় ফেলিয়া এলি? রাবণ গৃহে তিনি যেমন বাঁধা ছিলেন, এবার কি তিনি সেইরূপ প্রেতাসুরগণের গৃহে বাঁধা পড়িলেন? হায় কি হইল! কি দুর্দ্দিনে ভারতকে ঘিরিল! পিতা ত্যাগ করিলেন—মাতা উন্মাদিনী হইয়া আপন সন্তানের শোণিত পানে বিহ্বল হইলেন! চতুর্দ্দিকে শোকের গভীর মেঘ উদিত হইল! পুত্র-বিয়োগ বিধুরা জননীর, পতিহীনা রমণীর, পিতৃহীনা বালক বালিকার এবং বন্ধুহীন নরনারীর ক্রন্দনে ভারতগগন বিদীর্ণ হইল! দিবসে সূর্য্য অস্তমিত—রজনীতে নক্ষত্রমালা ও চন্দ্র অন্তর্হিত! হিম

রাত্রি তিমিরে আবৃত। এ কি প্রলয়কাল উপস্থিত! না প্রলয়ের অনেক বিলম্ব! তবে কি আমায়ের পূজা বন্ধ হওয়ায় মা উমাদিগী হইয়াছেন! পিতার পূজা বন্ধ হওয়ায় তিনি পুত্র-গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন! আর রক্ষা নাই! এস ভারতবাসী ভাই ভগিনীগণ আমরা সকলে মিলিয়া এবার জগন্মাতার ও জগৎ পিতার বিরাট পূজার আয়োজন করি! এস আমরা রামচন্দ্রের ন্যায় অকালে ভগবতী মহামায়ার উদ্বোধন করি। আমরা ত্রিশ কোটী ভারত সন্তান প্রত্যেকে দুইটী করিয়া নয়নের নিলোৎপল তাহার চরণে অঞ্জলী দিই। এই করাল কালী-মূর্ত্তি সেই পূজায় দশভুজা মূর্ত্তিতে পরিণত হইবে তখন মা! দশভুজে বর ও অভয় প্রদান করিয়া ভারতকে পুণর্জ্জীবিত করিবেন—পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। মা প্রসন্ন হইলে পিতাও প্রসন্ন হইবেন। তিনি আর আমাদিগকে ফেলিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি আসিলে ত্রিশকোটী ভারতবাসী ঐক্যতানে শঙ্কর স্তোত্রে তাঁহাকে উদ্বোধিত করিব। আর বিলম্ব করিও না। এস সকলে মিলিয়া সেই বিরাট পূজার আয়োজন করি। সেই পূজার আয়োজনে ব্যাপৃত থাকিলে, শোক রাক্ষস আর আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারিবে না! আইস আর বিলম্ব করিও না।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম-এ।

আত্মতত্ত্ব।

শিষ্য।—ব্রহ্মই সত্যজ্ঞান, জ্ঞানের স্বভাব চেতন অবশ্যই তাঁহাতে চিচ্ছক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু অচেতনা প্রকৃতি তাঁহার স্বভাব হইবে কি প্রকারে? চেতনের স্বভাব অচেতন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব?

গুরু।—তুমি চেতন জীব তোমাতে অচেতন স্বভাব কোথা হইতে আসিল? তোমার সপ্তধাতু, দৈহিক উপাদান সমস্তই—পঞ্চভূতোৎপন্ন ও জড় স্বভাব অথচ তুমি চেতন জীব, বিশেষতঃ তোমার নখ চুল ও দন্ত প্রভৃতিতে চৈতন্যের সংস্রব নাই, অতএব চেতন হইতে অচেতন পদার্থ উৎপন্ন অসম্ভব নহে।

শিষ্য।—যদি চেতন হইতে অচেতন উৎপত্তি কল্পনা করিতে পারেন, তবে অচেতন-প্রধানা প্রকৃতি হইতে চেতন আত্মার উৎপত্তি কল্পনাও করা যাইতে পারে—এইলে অপ্রত্যক্ষবাদ অর্থাৎ অদৃশ্য চেতনা হইতে দৃশ্য ভৌতিক প্রকৃতির কল্পনা অপেক্ষা প্রত্যক্ষবাদ অর্থাৎ দৃশ্য ভৌতিক উপাদান সংযোগে চেতনাত্মার উৎপত্তি কল্পনা অপেক্ষাকৃত সহজ; যদি চেতন হইতে অচেতন উৎপন্ন হইতে পারে, তবে অচেতন প্রাকৃতিক তত্ত্ব হইতে চেতনাত্মার উৎপত্তি অসম্ভব হইবে কেন?

গুরু।—তোমার এই তর্ক নূতন নহে এই তর্ক চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, এই তর্ক মীমাংসার নিমিত্ত বেদান্ত দর্শনের উত্তর মীমাংসা বা শারীরক মীমাংসা দর্শন মহামুনি বাদরায়ণ ব্যাস প্রণীত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের উত্তর মীমাংসা বিশ্বরহস্যের পরিপূর্ণ মীমাংসা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বেদান্ত দর্শনে উহার মীমাংসা বিশদভাবে আছে বটে, কিন্তু ঐ মীমাংসা অত্যধিক তর্কবিতর্কপূর্ণ ও বিস্তৃত যে, সাধারণ বুদ্ধিতে উহার সারসংগ্রহ করিয়া উঠা কঠিন; আপনি সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় উহার মীমাংসা করিয়া দিউন।

গুরু।—প্রথমতঃ ঈক্ষতের্ণা শব্দস্য সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের ঈক্ষণ-পূর্ব্বক অর্থাৎ আলোচনা পূর্ব্বক সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব অবিহিত হইয়াছে, অচেতন-প্রধানা প্রকৃতি ঈক্ষণ (আলোচনা) করিতে পারে না, সুতরাং তাহার সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব। এই বিষয়ের মীমাংসাও আমার এই মীমাংসাতত্ত্বের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশদরূপে আছে; তাহার স্থূল মর্ম্ম পুনরুদ্ধৃত করিতেছি, যখন সৃষ্টির ক্রিয়ার সর্ব্ব-সামঞ্জস্য (অর্থাৎ যেখানে যেরূপ হওয়া উচিত) চিন্তা ও বিবেক-মূলক কার্য্য, জগতের প্রত্যেক কার্য্যেই চিন্তা ও বিবেক-প্রসূত, প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে যেন যুক্তি ও বিবেক মাখান আছে। অচেতন প্রকৃতি বা স্বভাব শক্তির চিন্তা ও বিবেকমূলক সর্ব্ব-সামঞ্জস্যের প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, অচেতন হইতে চেতনাত্মার বিকাশ হইলে ঐ চেতনাত্মা পুনর্ব্বার অচেতন প্রকৃতিতে লীন হওয়াই সম্ভব, তাহা হইলে আত্মার অস্তিত্ব ও ব্যক্তি নিহিত্বের (Identity) অভাব হয় ও তৎসহ পরলোক, জন্মান্তর, কর্ম্মসূত্রে ও কর্ম্মফলরূপ প্রাক্তন অসিদ্ধ হয়; জন্মান্তর ও কর্ম্মফলজনিত প্রাক্তন স্বীকার না করিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কারণ নির্ণয় হয় না অর্থাৎ জন্মান্তর স্বীকার না করিলে উহার মন্তোষজনক উত্তর হয় না।

শিষ্য।—আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন, প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্রী, ভগবদ্গীতায় ঐরূপ বর্ণিত আছে,

যথা কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি-রুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ গীতা ১৩ অঃ ২০

বঙ্গার্থ—কার্য্য এবং কারণ ইহাদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হন আর পুরুষ সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্বে হেতু বলিয়া কথিত হন। অবশ্য আপনি ইতিপূর্ব্বে ঐ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বরের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, প্রকৃতি পুরুষ উভয় লইয়াই ঈশ্বর, সুতরাং ঈশ্বরের সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব অসঙ্গত হয় না। কিন্তু এ স্থানে পুরুষ অর্থে আত্মা ও প্রকৃতি অর্থে স্বভাব, অতএব স্বভাব সমস্ত কার্য্যের কর্ত্রী ও কারণ। আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া সুখ দুঃখ ও প্রকৃতির গুণ ভোগ করেন, সুতরাং এখানে প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব প্রমাণিত হইতেছে! তবে প্রকৃতির সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব নাই বলেন কেন?

গুরু।—

ঈশ্বরৈশ্বর্য্য জীবভোগ্য জগদ্ব্যাপ্যং সমন্বিত
পিতৃভুক্তা ভর্ত্তৃ ভোগ্যা যথা যোনিরথেশ তাং।

বঙ্গার্থ—যেমন কন্যা, পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বামীর ভোগ্য হয়, সেইরূপ ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া জীবের ভোগ্য হয়। পরাশরী-রৈত্রেয়কে ১৩ শ্লোক।

এস্থলে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত-প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব ও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব একই কথা। অচেতন প্রকৃতির

কার্য্য হইলেও ঐ তর্কের মীমাংসা আছে। ঐ সকল সূত্রের ভাষ্যকার শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে ঐ তর্ক নিরসরূপে মীমাংসা করিয়াছেন; ঐ সূত্রের ভাষ্য পাঠ করিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য।—বেদান্ত দর্শনে উহার মীমাংসা বিশদভাবে আছে বটে, কিন্তু ঐ মীমাংসা অত্যধিক তর্কবিতর্কপূর্ণ ও বিস্তৃত যে, সাধারণ বুদ্ধিতে উহার সারসংগ্রহ করিয়া উঠা কঠিন; আপনি সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় উহার মীমাংসা করিয়া দিউন।

গুরু।—প্রথমতঃ ঈক্ষতের্ণা শব্দস্য সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের ঈক্ষণ-পূর্ব্বক অর্থাৎ আলোচনা পূর্ব্বক সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব অবিহিত হইয়াছে, অচেতন-প্রধানা প্রকৃতি ঈক্ষণ (আলোচনা) করিতে পারে না, সুতরাং তাহার সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব। এই বিষয়ের মীমাংসাও আমার এই মীমাংসাতত্ত্বের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশদরূপে আছে; তাহার স্থূল মর্ম্ম পুনরুদ্ধৃত করিতেছি, যখন সৃষ্টির ক্রিয়ার সর্ব্ব-সামঞ্জস্য (অর্থাৎ যেখানে যেরূপ হওয়া উচিত) চিন্তা ও বিবেক-মূলক কার্য্য, জগতের প্রত্যেক কার্য্যেই চিন্তা ও বিবেক-প্রসূত, প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে যেন যুক্তি ও বিবেক মাখান আছে। অচেতন প্রকৃতি বা স্বভাব শক্তির চিন্তা ও বিবেকমূলক সর্ব্ব-সামঞ্জস্যের প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, অচেতন হইতে চেতনাত্মার বিকাশ হইলে ঐ চেতনাত্মা পুনর্ব্বার অচেতন প্রকৃতিতে লীন হওয়াই সম্ভব, তাহা হইলে আত্মার অস্তিত্ব ও ব্যক্তি নিহিত্বের (Identity) অভাব হয় ও তৎসহ পরলোক, জন্মান্তর, কর্ম্মসূত্রে ও কর্ম্মফলরূপ প্রাক্তন অসিদ্ধ হয়; জন্মান্তর ও কর্ম্মফলজনিত প্রাক্তন স্বীকার না করিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কারণ নির্ণয় হয় না অর্থাৎ জন্মান্তর স্বীকার না করিলে উহার মন্তোষজনক উত্তর হয় না।

শিষ্য।—আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন, প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্রী, ভগবদ্গীতায় ঐরূপ বর্ণিত আছে,

যথা কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি-রুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ গীতা ১৩ অঃ ২০

বঙ্গার্থ—কার্য্য এবং কারণ ইহাদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হন আর পুরুষ সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্বে হেতু বলিয়া কথিত হন। অবশ্য আপনি ইতিপূর্ব্বে ঐ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বরের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, প্রকৃতি পুরুষ উভয় লইয়াই ঈশ্বর, সুতরাং ঈশ্বরের সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব অসঙ্গত হয় না। কিন্তু এ স্থানে পুরুষ অর্থে আত্মা ও প্রকৃতি অর্থে স্বভাব, অতএব স্বভাব সমস্ত কার্য্যের কর্ত্রী ও কারণ। আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া সুখ দুঃখ ও প্রকৃতির গুণ ভোগ করেন, সুতরাং এখানে প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব প্রমাণিত হইতেছে! তবে প্রকৃতির সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব নাই বলেন কেন?

গুরু।—

ঈশ্বরৈশ্বর্য্য জীবভোগ্য জগদ্ব্যাপ্যং সমন্বিত
পিতৃভুক্তা ভর্ত্তৃ ভোগ্যা যথা যোনিরথেশ তাং।

বঙ্গার্থ—যেমন কন্যা, পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বামীর ভোগ্য হয়, সেইরূপ ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া জীবের ভোগ্য হয়। পরাশরী-রৈত্রেয়কে ১৩ শ্লোক।

এস্থলে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত-প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব ও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব একই কথা। অচেতন প্রকৃতির

কর্তৃত্ব নাই, ঈশ্বরের পরাশক্তি হইতে অধির অধিষ্ঠ, বায়ুর 'বায়ুত্ব,' জীবের জীবত্ব, মানবের মানুষত্ব। তোমার যেমন মানস-রাজ্যে 'বুদ্ধি ও মনের কর্তৃত্ব ও দেহ-রাজ্যে বায়ু, পিত্ত (তেজ) প্রভৃতি পঞ্চভূতের কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু পরা-প্রকৃতি বা চিচ্ছক্তি বিনা দেহ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত কাহারই কার্য্যকারী শক্তি বা কর্তৃত্ব থাকে না, সেইরূপ শক্তিরাজ্যে ঈশ্বরের পরাশক্তি ব্যতীত প্রকৃতি অচেতন ও অব্যক্ত। অতএব ভগবদ্গীতায় প্রকৃতির যে কার্য্য কারণ ও কর্তৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরের প্রকৃতির ঐ স্থলে পরা ও অপরা প্রকৃতি এক, এইজন্য ইচ্ছা, দৃষ্টি, চেতনা সমস্তই প্রকৃতি বলা হইয়াছে। ঈশ্বরকে পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে পৃথক [করিলে, তিনিই সত্যজ্ঞান (ব্রহ্ম) তাঁহার ভোগ অভোগ কিছুই নাই; যেহেতু তিনি শক্তি ও প্রকৃতির আশ্রিত নহেন, শক্তি ও প্রকৃতি তাঁহার আশ্রিত। যখন তিনি শক্তি সংযুক্ত তখন কর্ত্তা। যখন তিনি স্বরূপ তখন কর্ত্তা বা ভোক্তা কিছুই নহেন, সত্য (জ্ঞানানন্দরূপ) সাক্ষী। আর প্রকৃতির আশ্রিত (অবিদ্যাবরিত) চিদাভাসই জীব পরাশক্তি হইতে অচেতন প্রকৃতিতে শক্তি ও গুণের বিকাশ হয় এবং প্রকৃতিই অপরাশক্তি-রূপে কর্তৃত্ব ও কার্য্য করেন; তদাশ্রিত চিদাভাসই অনুভবকারীরূপে প্রকৃতির গুণ ও কার্য্য-ফল ভোগ করেন। ঐ প্রকৃতি দর্পণে, স্বরূপ-জ্ঞানের আভাস প্রতিফলিত হইলে ঐ দর্পণে স্বাধীন বিবেক ও চিন্তাশক্তির বিকাশ হয় বটে, কিন্তু যতদিন ঐ জ্ঞানাভাসরূপ অনুভবকারী আত্মা প্রকৃতির আশ্রিত (অপরাশক্তির কর্তৃত্বাধীন) থাকেন, ততদিন তাঁহার প্রকৃতির গুণ ও কার্য্যফল (সুখদুঃখ) ভোগ করিতে হয়। ক্রমে ঐ স্বাধীন বিবেক ও চিন্তাশক্তি কর্তৃক অপরা প্রকৃতি জীত হইলে ঐ স্বাধীন-বিবেক ও চিন্তাশক্তি দৈবী প্রকৃতিতে পরিণত হয় এবং মানব ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হয়। তখন ঈশ্বর ও আত্মা এক হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত-দৃষ্টান্তানুরূপ যেমন রাজ্যের কর্তৃত্ব শক্তিই রাজশক্তি, সেইরূপ প্রাকৃতিক শক্তির মূলই পরাশক্তি। প্রজা রাজ্যের আত্মা স্বরূপ হইলেও যেমন রাজতন্ত্র রাজ্যের প্রজাগণের স্বেচ্ছাচারী রাজাজ্ঞা ও রাজ নিয়ম পালন ও শিরোধার্য্য করিতে হয়, রাজকৃত আইন ন্যায়মূলক ও প্রজার হিতকর না হইলেও তাহার সুফল ও কুফল ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতির গুণও কার্য্যফল জীবাত্মার ভোগ করিতে হয় এবং তদ্ধেতু জন্ম জন্মান্তর পরিভ্রমণ করিতে হয়। কিন্তু স্বাধীন রাজ্যের প্রজাগণের মহা সভাই স্বয়ং রাজক্ষমতা; যদিও রাজা ও রাজ্য ঐ মহা সভার নিয়মাধীন; তথাচ স্বকৃত আইন বা নিয়মকে রাজ্যের আইন বলিয়া বলে। যেরূপ প্রজা-সমষ্টির মহাসভার সহিত রাজাই কর্ত্তা; প্রজাগণই ভোক্তা, সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তি বা সমষ্টি ঈশ্বরই কর্ত্তা, ব্যষ্টি জীবগণ ভোক্তা। এখন বুঝিলে "ঈশকার্য্য জীবভোগ্য অথবা কার্য্য কারণ কর্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরুচ্যতে—পুরুষ সুখ-দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি?

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নূতন-বৌ।

(কাহিনী)

প্রথম-স্তবক।

আজ আর কুঞ্জর মা'র অবসর নাই, নূতন বৌ'এর ন-বসত। একটী মাত্র ছেলে কুঞ্জ; হয় না হয় না করিয়া বিবাহ হইয়াছে; এখনও বৎসর ফিরে নাই, মেয়েটী সেয়ানা আর পাড়া-প্রতিবেশী দশ জনের দ্বারা কুঞ্জর অনুরোধে এড়াইতে পারেন নাই বলিয়া বৌ আনিতে পাঠাইয়াছেন, কুঞ্জ স্বয়ং শ্রীমতীকে আনিতে গিয়াছে। প্রাতঃকালে তারে খবর আসিয়াছে, আজ বেলা দশটা দশ মিনিটের সময় কুঞ্জ বউ লইয়া ঘরে ফিরিবে। কত সাধের বৌ ঘরে আসিবে, ঘর আলো হইবে; বল দেখি মা একটী ছেলের মা! আজ আর কেমন করিয়া কুঞ্জর মা'র অবসর থাকিবে?

উপন্যাস হ'ক, আর কাহিনীই হ'ক, প্রথমে পরিচয়টা একটু ভাল করিয়া খুলিয়া না দিলে তোমরা হয়ত ভাবিবে লোকটা বদ্-রসিক লিখ্‌তে জানে না; পাড়ায় পাড়ায় কত কুঞ্জ আছে কত কুঞ্জর মা আছে, এ কোন্ কুঞ্জর কথা? আজ যে যে কুঞ্জর খঞ্জনংনয়নার শুভ দ্বিরাগমন, সেই হয়ত ভাবরে এ বুঝি আমারই কথা লিখ্‌ছে। এত সন্দেহে কাজ কি, জান তো কবির কলম আট্‌কায় না; তুমি গঙ্গার জলপ্রবাহ রোধিতে পারিবে কিন্তু উপন্যাস লেখকের কলম আট্‌কাইতে পারিবে না, মন দিয়া বলি, তোমরা মন দিয়া শুন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দের ১০ই মে তারিখে সূর্য্য-গ্রহণ দিনে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় কামদৈবপুর নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে শ্রীমান কুঞ্জবিহারী জন্মগ্রহণ করেন; পিতার নাম ফড়িঙ্‌চন্দ্র ঘোষ; মাতার নাম আনন্দময়ী। ঘোষজী এখনও বর্ত্তমান; তিনি বড় একজন জমীদারের তরফের কর্ম্মচারী; মাসিক বেতন কত জানি না, কিন্তু বার্ষিক আয় বিলক্ষণ। পল্লীর আশে পাশে দশখান গ্রাম তাঁহার করতলে; গ্রামের মণ্ডল, গোমস্থা ও প্রজা মজুরান্ সাক্ষাতে অসাক্ষাতে প্রায়ই বলাবলি করিয়া থাকে যে, ঘোষ বাবুজীর উপর কমলার দয়া আছে। ঘোষজী বাল্যকালে দুই বৎসর পাঠশালে লিখিয়াছিলেন, তাহার পর দুই বৎসর গ্রামের পাঁচু আমীনের খস্‌ড়া চিঠা নকল করিয়া হাতের লেখা পাকান, তাহার পর এক বৎসর জমীদারী সেরেস্তায় সেয়াখতি কার্য্য শিক্ষা করিয়া, জমীদারের চাকুরি করিতে যতটুকু বিদ্যা চাই, তাহার উপরও কিছু চড়া চড়া রকমের শিক্ষা করেন; তিনি কাউলের পরিবর্ত্তে 'চার্ল্য' লিখিতেন, সরস্বতীর জায়গায় 'শড়েস্বতি' লিখিতেন, আর তাঁহার ব্যবহারিক ভাষার ভিতর "যদ্যপি কি না স্যার্" এই অদ্ভুত অব্যয়ের বহুল প্রয়োগ থাকিত; তাহাতেই গ্রামের জমীদারের ঘরে তাঁহার বড় পসার পড়িয়া যায়; এক বৎসরের মধ্যেই তিনি হাজীরানবিশী, আমিনী, মুহুরীগিরি এ সকল অতিক্রম করিয়া হাজার টাকার মহালে তহশীলদার হন। তাহার পর এক-

বারেই লাট কামদেবপুরের উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারী। সেই পদ হওয়ার পর হইতে তিনি একটু উঁচু ধরণের চাল চলন শিখিতে আরম্ভ করেন; তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—অল্প দিনের মধ্যেই তাহাতে দক্ষতা লাভ করিয়া ফেলেন। সেই সময় একজন পাদ্রী সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়; পাদ্রী সাহেবের নিকট সর্ব্বদা 'পিরুন' ব্যবহার করিতে ও খবরের কাগজ পড়িতে উপদেশ প্রাপ্ত হন। তদবধি দুইখানি বাঙ্গলা সুবাদপত্রের একজন গ্রাহক বুদ্ধি হয় এবং একজন দর্জ্জি নিযুক্ত তাঁহার ভবন-সন্মুখস্থ কদম্বমূলে বসিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। তাঁহার বাহিরের ঘরে প্রায়ই দশ পাঁচ জন বাজে লোক বসিয়া থাকিত, তিনি তাহাদিগকে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনগুলি পাঠ করিয়া শুনাইতেন; ভিতরের দিকু খুলিতেন না, বলিতেন ভিতরে কেবল ছাই ভস্ম! কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, তিনি একবার ভিতরের দিক খুলিয়াছিলেন, সেই বারই কামদেবপুরের ছটাকে ছিদাম জানিতে পায় "জর্ম্মান মুলুকের রাজরাণীর কপালে দুইটী শিং আছে।

একটু বয়স হইলে ঘোষজীর বিবাহ হয়, সেটা তাঁহাদের বংশের দোষ কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি বলেন, তাঁহাদের সপ্তম পুরুষ হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, তথাপি পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলিত। যে যাহাই বলুক, তিনি সেই অধিক বয়সেই গুণবতী ভার্য্যা লাভ করিয়াছিলেন; আনন্দময়ী যথার্থই আনন্দময়ী; সর্ব্বদাই সহাস্যবদন, গৃহকার্য্যে নিপুণা, স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি। আগে ঘোষজীর সংকার্য্যে বড় একটা মতি ছিল না, আনন্দময়ীর আগমনের পর হইতে তাহাতেও তাঁহার মতি হয়; সেইজন্য তাঁহার খরচপত্রের কিছু বাহুল্য হইয়া পড়ে, ঘোষজী তাঁহার আত্মীয় বন্ধুর কাছে প্রায়ই বলিতেন, তিনি আর একটি সায়সাও আঁচাইতে পারেন না।

বৈশাখ মাসে ঘোষজীর শুভ বিবাহ, তাহার পর বৎসরেই শ্রীমান্ কুঞ্জবিহারীর জন্মলাভ। কুঞ্জবিহারীর জন্মদিন হইতে সপ্তাহ কাল কামদেবপুরে বড় ঘটা হইয়াছিল, ঘোষজী পুত্ররত্ন লাভ করিয়া অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। সমস্ত গ্রামের চুলি সন্তুষ্ট মনে বিদায় হইয়াছিল, গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেরই বাড়ী তেল হরিদ্রা এবং সন্দেশ বিলান হইয়াছিল, সদর দরজার সম্মুখে বাঁশের উচ্চ মঞ্চের উপর অষ্টপ্রহর নহবৎ বাজিয়াছিল। তা ছাড়া নপতানীর নত্ পুরুষ্ঠাকুরাণীর পাটা যেড়ে এবং ভাট দৈবকের বিদায়েও বড় ঘোস্নাম পড়িয়াছিল। মাহাতের প্রজারা বলে প্রায় পাঁচ শত টাকা ব্যয়; ঘোষজী কিন্তু দেড় হাজার টাকা ব্যয়ের সিহাবে প্রজার উপর চাঁদার হার ফেলিয়াছিলেন। সেই জন্মোৎসব ব্যাপারের শেষ দিনে বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। অকস্মাৎ সামান্য একটু মেঘ-সঞ্চারে সেই নহবৎ মঞ্চের উপর বজ্রপাত হইয়া একটা মানাইওয়ালা মারা পড়ে। সেইজন্য ঘোষজী পুত্রের ভবিষ্যৎ অশুভ আশঙ্কা করিয়া কিছু দুঃখ হইয়াছিলেন।

দিনে দিনে কুঞ্জবিহারী শশি-কলার মত বাড়িতে লাগিল, ষষ্ঠ মাসে শিশুর অন্নাশন ও ওনামকরণ ব্যাপার সমাধা হইয়া গেল; আনন্দময়ী খেকারা মা মুচিনী, কুঞ্জর মা হইলেন। বালকের ডাক নাম হইল কুঞ্জবিহারী আর মেষরাশি বলিয়া রাশি নাম হইল অবোধ চন্দ্র! ঘোষজী সঙ্কল্প করিলেন, কুঞ্জ ফেলিয়া অগ্রে পুত্রের একখানি জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করাইয়া লইবেন; কোষ্ঠীর ফল দেখিয়া ঘোষজীর আনন্দ আর ধরে না; পুত্রের মহিমাইহলের তাঁর বর্ণ হবে, অগাধ বিদ্যা হবে, স্ত্রীরত্ন লাভ হবে, রাজগৃহে বাস হবে; একটা পাপগ্রহের দোষে কেবল রাজটীকা হবে না।

দেখিতে দেখিতে দশজনের সুখ দুঃখ লইয়া পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল, ঘোষজী শুভদিন দিনক্ষণে হাতেখড়ি দিয়া পাঠ হেতু পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন; দুই বৎসর কেবল যাওয়া আসাতেই কাটিয়া গেল, তৃতীয় বর্ষে ঘোষজী গণিয়া জমা খরচের খাতায় একশখান খড়ি, আর সতের খান বর্ণ পরিচয়ের খরচ লিখিলেন, ছেলের বর্ণ পরিচয় হইল না, তাহার পর কুঞ্জবিহারীও আর বড় একটা পাঠশালায় যায় না। ঘোষজীকে কেহ পুত্রের লেখা পড়ার কথা বলিলে, তিনি বলিতেন "ভাব কেন, সিংহের বচ্চা সিংহই হবে।"

মায়ের সোহাগ, বাপের সোহাগ, কুঞ্জবিহারী আলালের ঘরে দুলাল; যখন পূর্ণ ষোড়শ বৎসর প্রাপ্ত হইল, তখন তাহার বোধোদয় পাঠ সমাপ্ত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে যাওয়া রূপ একটা বৃহৎ ব্যাপারের ইচ্ছা করিল; এ ইচ্ছার কথা ঘোষজীও মত দিলেন, কারণ, তাঁহার একমাত্র সন্তানটা, অধিক বিদ্যা হইলে পাছে না টিকে; বিশেষ তিনি একজন বড় কুসংস্কারাপন্ন মনুষ্য। একদিন পুত্রের বোধোদয় পাঠ মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিলেন, কুঞ্জবিহারী পাঠ করিতেছিল "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ" সেই দিনই তিনি পুত্রের লেখা পড়া শিক্ষার উপর যাড়ে যাড়ে চটিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার যাহার সহিত দেখা হইত, তাহাকেই বলিতেন "আজকালকার লেখা পড়া শিখে বড় মন্দ, ছেলে পিলে কুস্তান হইয়া যায়, খুঁটে দেখ হয়। একটা কাঁচা ছেলে সে কিনা বলে ঈশ্বর নিরাকার!!

কুঞ্জবিহারীর বিদ্যালয় ত্যাগের কয়েক মাস পর হইতে ঘোষজীর বাক্স হইতে টাকা পয়সা হারাইতে লাগিল; চাকর বাকরের উপর সন্দেহ হওয়ায় সাত সপ্তাহ মধ্যে সতের চাকর বাঁধাল বরতরফ হইল, উপরন্তু কমিল না। শেষে প্রকাশ হইল, কুঞ্জবিহারীরই গোপনীয় ব্যয়ের জন্য এই সকল দ্রব্য নানাস্থানে হইয়াছে। ঘোষজী নীরবে থাকিলেন, ভাবিলেন—যশোদার আদরের গোপাল বৃন্দাবনে ননী চুরী করিতেন, আমারও ত আদরের গোপাল না করবে কেন?

প্রথম বৎসর কুঞ্জর এই প্রকার অভিনয়, দ্বিতীয় বর্ষে সুখের যাত্রার দল করিয়া গোপনে মোহন গুঁড়ীর দোকানে যাতায়াত, তৃতীয় বর্ষে ঝুমুর-ওয়ালীর দলে ভর্ত্তি, চতুর্থ বর্ষে পিতৃ মাতৃ পীড়ন, পঞ্চম বর্ষে দোসর সঙ্গে লইয়া নিরুদ্দেশ। ঘোষজী কাঁদিয়া আকুল, গৃহিণীও কাঁদিয়া আকুল। নানা স্থানে অন্বেষণ হইল সন্ধান হইল না। গোটা তিন বৎসর পরে কুঞ্জবিহারী রাখালবেশে আপনিই আসিয়া স্বীকার হইল; আনন্দময়ী আপনার ননীচোরা ফিরিয়া পাইয়া পুত্রের বিবাহ জন্য জেদ ধরিলেন, ঘোষজী ষষ্ঠবর্ষকে নিমন্ত্রণ দিলেন।

কত লোক আসে যায়, কুলের ওনের কথা শুনিয়া কেহই আর আসল কাজে অগ্রসর হয় না। ষোড়শ বৎসর কুঞ্জবিহারী নিরুদ্দেশ ছিল, সেই কয় বৎসরের ভিতর সে তিন বার কলিকাতা দেখিয়াছে, কথিকাতায় গিয়া সে থিয়েটার শুনিয়াছে, গড়ের মাঠ দেখিয়াছে, সাহেবের গায়ে ঠেস্ দিয়া ট্রামগাড়ীর পাশে বসিয়াছে, ঘটনাক্রমে পুলিশ-থানায় গিয়া এক ইন্সপেক্টার সাহেবের সঙ্গে কথা বলিয়াছে, আর তাহাকে পায় কে? সে এখন সাড়ে ষোল আনা সভ্য, সতের আনা বাবু। তাহার ন আনা সাত আনা সিতি, পরিধান গান-পেড়ে ধুতি, হাতে

ফিন্‌ফিনে টিক্, মুখে 'সিস্' আঙুলে আংটি, আর রসনার অন্তর্গুঢ়ে কি এক ভাষায় অবিরাম 'হিস্ হিস্' শব্দ! এখন সব পাড়া গাঁ তাহার ভাল লাগে না, পাড়াগেঁয়ে চাল চলন পছন্দ হয় না; কথায় কথায় অনেককেই বলে, তোমরা পাড়াগেঁয়ে অসভ্য, জান কি? ঘোষজা পুত্রের নিকট সর্ব্বদাই তুচ্ছ, জননী জড়সড়, কুঞ্জবিহারী এখন যথার্থই যেন মনুষ্যেতর।

ঘোষজীর তিন বৎসরের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল, কুঞ্জবিহারীর বিবাহ হইল না। তাহার দৌরাত্ম্য আরও বাড়িয়া উঠিল। সুপুত্র হ'ক আর কুপুত্র হ'ক মায়ের মন বুঝে-নী, আনন্দময়ী প্রতিদিনই স্বামীকে অনুযোগ করেন, ঘোষজী বলেন "তুমি কেন আর জ্বালাতন কর, দেখছো তো অকাল কুষ্মাণ্ডের কারখানাটা, ওর বিয়ে দিয়ে আবার কি একটা গলগ্রহ করবো।" গৃহিণী বলেন "তুমি বুঝতে পারছো না, উট্‌তি বয়েস বিয়ে থাওয়া না দিলে কি ঘর সংসারে মন বসে? আর একলা আমি কত খেটে খেটে মরবো; বৌমাটী হ'লে পর আমার একটা দোসর হবে।"

ঘোষজী প্রত্যুত্তরে বলেন "আমি কি আর চেষ্টার ত্রুটী করছি, কেউ যে মেয়ে দিতে রাজী হয় না, পাকীটাকে দিনকতক একটু স্থির হ'য়ে থাকতে বলছি, তা থাকে কৈ? আচ্ছা দেখি আর একবার চেষ্টা ক'রে।"

এইবার ঘোষজী প্রাণপণে লাগিলেন, দশের মাতব্বর পঁচিশ বার করিতে লাগিলেন; নূতন যাজনাঅ আইন পাশ হওয়ার পর তাঁহার আর বড় একটা উপরি পাওনা নাই, একটু অধিক ব্যয়ের আশঙ্কা হইলেই পরের কাছে হাত পাতিতে হয়। কিন্তু বাহিরের লোকে তাহা কিছু জানে না; বাহিরে তাঁহার সাবেক সম্ভ্রম অটুট রহিয়াছে।

পাকা ঘটকের ঘটকালি, দ্বিতীয় উদ্যমে সম্বন্ধ জুটিল ভাল, উকীলের মেয়ে, বাঙ্গালার তিনটে পাশ, খাঁটি সোনার রঙ্গ, ঘটকের মুখে শোনা, পঞ্চমুখী ভের ছাড়িয়া চোদ্দয় পা দিয়াছে; কিন্তু লোকে বলে, বয়স যোলোর কম নয়, নাম শ্রীমতী প্রমদা। বাঙ্গালীর ঘরে ভাল পাত্র জুটে না বলিয়া উকীল বাবু এতদিন প্রমদার বিবাহ দেন নাই। প্রমদারও বিবাহে বড় মত ছিল না; সে বলিত, বিবাহ আবার একটা কি! কিন্তু সমাজের মধ্যে থাকিয়া বিবাহ না দিলে, জাতি রক্ষা হয় না। সেইজন্য একবার সাত পাকটা ঘুরাইয়া রাখা ভাল। নবীন যুবক পাত্র চাই বলিয়া উকীল বাবুর ঘোষনা পড়িয়া গেল, ঘটক জুটিয়া গেল, পাত্র স্থির হইল নব নটবর কুঞ্জবিহারী। উকীল 'বাবুর অবসর কম, মুতরাং দেখা শুনা আর বড় একটা হইল না; ২৮শে ভাদ্র শনিবার শ্রীমতী প্রমদার সহিত কুঞ্জবিহারীর সাত পাক ঘুরিয়া গেল, ঘোষজী প্রায় হাজার টাকা ব্যয় করিয়া দারুণ পুত্রদায় হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

কুঞ্জ যেবার কলিকাতা গিয়াছিল, সেবার বড়ি-আঁটা, এলো-চুল, বই-হাতে করা কতকগুলি মেয়েকে গাড়ীতে চড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিল। সেই অবধি তাহার যেমনি মেয়ে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইত, বিবাহের পর শ্রীমতী প্রমদার ললিত কান্তিতে যেমনি হাব ভাবের ছায়া দেখিয়া তাহার আহ্লাদ রাখিবার স্থান হয় না। বিবাহ যখন আসে, তখন পথের মাঝে বর-কন্যার হাত ছাড়াছাড়ি তাস ছিঁড়াছিড়ি, অনেক রসের ছড়াছড়ি হইয়া গেল, যাহারা সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা কাণাকাণি করিয়া বলিলেন, এইবার ঘোষজীর তিনকুল উদ্ধার হবে।"

বিবাহ ব্যাপার তিন মাস হইল সম্পন্ন হইয়াছে। কুঞ্জর মা'র আর ঘর চলে না, তাই বৌ আনিতে গিয়াছে, তারে খবর মাণিক যোড় এ'ল ব'লে, সেইজন্য আজ আর কুঞ্জর মা'র অবসর নাই।

শ্রীশ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অভেদ-জ্ঞান।

আজকাল দেশে 'থিওজফি' (Theosophy) লইয়া, বড়ই আন্দোলন-আলোচনা চলিয়াছে। কিন্তু 'থিওজফি' কি? 'থিওজফি' কি অভেদ-জ্ঞান?

"থিওজফিকেল সোসাইটির" আলোচনা করিলেই, অভিমত আপনা-আপনিই অভিব্যক্ত হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাউক, উক্ত 'সোসাইটি' ও তাহার অভিমত কি?

উদ্দেশ্যের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই, সোসাইটির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য—সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—আর্য্য ও প্রাচ্য সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানাদির অনুশীলন ও আলোচনা এবং তদ্দ্বারা মনুষ্য সমাজের উপকারিতা; এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য;—ভাবের অজ্ঞাত নিয়মাবলীর এবং মনুষ্যের গুপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তির অনুসন্ধান ও আবিষ্ক্রিয়া।

ফলতঃ ইহার প্রথম উদ্দেশ্যটীকেই মুখ্য বলিয়া মনে করিতে পারি; কারণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্যটীর মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্যটীই নিহিত রহিয়াছে। অতএব, 'সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব' এই 'সোসাইটীর' একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিলে, বোধ হয় অন্যায় বলা হয় না।

আজকাল সাধারণতঃ ভ্রাতৃভাব বলিলে সে ভাবের অভাবই বুঝি। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" এখনকার বুলি। এখন ভায়ে ভায়ে একান্নে থাকাও, সাধারণের চক্ষে যেন নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে—যাহা স্বাভাবিক ও অবশ্য-কর্ত্তব্য, তাহা অতিশয় গৌরবের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। রাম লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভাব যে জাতির আদর্শ, সে জাতির আজ কি কারণে এতদূর অবনতি, হইল যে, তাহাদের পক্ষে ভ্রাতৃভাব এখন অভিধান-গত অর্থহীন শব্দ মাত্র, তাহা নির্ণয় করিতে আমাদের বোধ হয় অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। ভারতে মুসলমান-রাজত্ব ভ্রাতৃবিচ্ছেদে কলঙ্কিত। মুসলমানের আগমন কাল হইতে শিখিয়াছি যে, মৃত্যুর পরেও বিচ্ছেদ-প্রবৃত্তি মৃত ভ্রাতাদ্বয়ের হৃদয়ে বলবতী থাকে—পাছে কবর মধ্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাদ জন্মে বলিয়া আজও মুসলমানেরা এক স্থানে দুই ভাইকে গোর দেয় না। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা-অনুকরণে সেই বিচ্ছেদ, এতদূর প্রবল করিতেছে যে, ভ্রাতৃভাবের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। গৃহে যাহাদের ভ্রাতৃভাবের অভাব, তাহাদের মুখে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব ধৃষ্টতা মাত্র। সে যাহা হউক, আপাততঃ দেখিতে হইবে, আমাদের এই হীনাবস্থা হইতে

সার্ব্বজনীন প্রেমের ক্রমিক বিকাশ হইবার সম্ভাবনা।

ভ্রাতৃভাব বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ আপন গৃহের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে—দেখিতে হইবে সেখানে ভাই আছে কি না। ভ্রাতৃশূন্য গৃহই ভ্রাতৃভাবের মর্ম্ম কি বুঝিবে। আপন গৃহে ভায়ের অভাব ঘুচাইতে পারিলে, ভায়ের মত স্নেহচক্ষে আত্মীয়বর্গকে অনুগত লোকসমূহকে দেখিতে শিখিলে, ভ্রাতৃভাব বুঝিতে পারিবে। তখন সেই ভাবের ক্রম-বিস্তৃতিতে স্বজাতি ও স্বদেশ অনুপ্রতি করিয়া লইবে। অবশেষে, তাহাতেই সমস্ত জগতে অনুপ্রাণিত করিবে।

পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীই সাধারণতঃ এক এক অংশে অন্ধ। এসিয়ার পূর্ব্বভাগে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, পশ্চিমে মুসলমানধর্ম্ম, ভারতে হিন্দুধর্ম্ম, য়ুরোপ ও আমেরিকায় খৃষ্টধর্ম্ম, আফ্রিকায় ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে অন্যান্য ধর্ম্মের ধ্বংস করিয়া আপন শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর। এই ধর্ম্ম-সংঘর্ষণে দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তি পায় ও তাহা মানবের পক্ষে ভ্রাতৃভাবের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠে। এই বিষম দূরীকরণের একটী প্রকৃষ্ট উপায় আছে, তাহা এই "সোসাইটীর" দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ আর্য্য ও অন্যান্য প্রাচ্য সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানাদির আলোচনা দ্বারা উদ্ধার। মনুষ্য জগতের উপকারিতা। পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহ আপন বিজ্ঞানদর্শনাদিচর্চ্চার ভূরি গ্রহণে সমর্থ, কিন্তু প্রাচ্য দেশ—যাহা কিছু তাহার আপন ছিল, তাহা হারাইয়া বসিয়া আছে, কিম্বা তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছে; সুতরাং যেওগুলির আলোচনা তাহার গর্ব্বে আশাতীত হুরূহ। "থিয়সফিক্যাল সোসাইটী" সেওগুলির অনুশীলন দ্বারা তন্মধ্যস্থ প্রচ্ছন্ন রত্ন-গুলি বাহির করিয়া আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এইরূপ আলোচনা ও অনুসন্ধানে পাশ্চাত্য সাহিত্যদর্শন বিজ্ঞানাদির বিশেষ সাহায্য হইবে এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভাষা, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, জ্ঞান সমস্তই আলোচিত হইবে, এবং এইরূপ আলোচনা যিনি যতই করিবেন, তিনি ততই প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যগুলি ততই স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। দেখিতে পাইবেন—সকল ধর্ম্মেই বলিয়াছে,—"সত্য কথা কহিবে, পরনিন্দা করিবে না, পরদ্রব্য লইবে না, পরস্ত্রী মাতৃস্থানীয়া, জীবে দয়া করিবে, মিতাচারিতা রক্ষা করিবে, সংযম শিক্ষা করিবে, বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান করিবে।" দেখিতে পাইবেন—প্রধান প্রধান সত্যগুলি কোন এক ধর্ম্মের নিজস্ব নহে। বিভিন্ন পরিচ্ছদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রত্যেক ধর্ম্মেরই ঐরূপ উপদেশ। এই একতা যখনই উপলব্ধি হইবে, তখনই অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব দূরে যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের পথ উন্মুক্ত হইবে। এ বিষয়ে আবার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বড় কম সহায়তা করিতেছে না। মুদ্রাযন্ত্র যাবতীয় গ্রন্থ-শাস্ত্র সহজে প্রত্যেকেরই করতলগত করিয়া তুলিতেছে—বাষ্পীয় যান পৃথিবীর এক প্রান্তের অধিবাসীর সহিত অন্য প্রান্তের অধিবাসীর মিলন সুলভ করিয়া তুলিয়াছে, বৈদ্যুতিক-মেখলা গাঢ় আলিঙ্গনে পৃথিবীকে বদ্ধ করিয়াছে। যে দিকে চাহিবে সে দিকেই দেখিতে পাইবে তোমার জন্য বিজ্ঞান সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের বিপুল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে।

অনেকে মনে করেন, হিন্দুজিগের প্রধান সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের প্রধান অন্তরায়। তাঁহারা বলেন, এই জাতিভেদ থাকার হিন্দুসমাজে আহার ব্যবহার পরস্পরের মধ্যে প্রচলিত নাই এবং সেই কারণে এ সমাজে ভ্রাতৃভাব সাধনা এক প্রকার অসম্ভব। আমরাও স্বীকার করি, অসম্ভব — যদি তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল আহার ব্যবহার, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের উদ্দেশ্য তাহা নহে। বিশ্বাসী হিন্দু সন্তানের নিকট (মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত) জীবনের শেষ নাই। জন্মের পর জন্ম আসিয়া কর্ম্মের ধাক্কা দিয়া জীবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে—তাহাকে অনন্তের পরে যাইতে হইবে! কর্ম্মের ধাক্কা সহিয়া ঠিক থাকা বড় কঠিন। কঠিন বলিয়াই সাধনা কঠিন; সিদ্ধিলাভ আরও দুরূহ। কর্ম্ম করিতে করিতে আসক্তি ত্যাগ হইবে; তবে কর্ম্মের ধাক্কায় তোমায় বিপর্য্যস্ত করিতে পারিবে না। আহার ব্যবহারে কর্ম্মের বন্ধন কশিয়া যাইবে বই খসিয়া যাইবে না। হিন্দুদের মধ্যে বুঝি সেইজন্যই আহার ব্যবহারে এত বাঁধাবাঁধি। এই বাঁধাবাঁধি না থাকিলেই জগতে কেবল আহার ও ব্যবহার, উদর ও স্বার্থ। নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া পার্শ্বস্থ জনেক বন্ধু প্রশ্ন করিলেন—"আহার-ব্যবহারে কি তবে ভ্রাতৃভাব হয় না?" হইবে না কেন?—হয়, কিন্তু তাহা নিম্ন-ভূমের, ভ্রাতৃভাব স্থানীয় নহে; যতক্ষণ আহার-ব্যবহার, ততক্ষণই ভ্রাতৃভাব। এ কথার সার্থকতা জন্য প্রমাণের অভাব নাই।

বন্ধু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার উর্দ্ধ ভূমের ভ্রাতৃভাব জিনিষটা কি বল দেখি?" এবার উত্তর দেওয়া সহজ নহে; তবে এই প্রসঙ্গে এই 'সোসাইটীর' তৃতীয় উদ্দেশ্যের অবতারণা করিলে উত্তর পাওয়া যাইবে বলিয়া তাহার অবতারণা করিলাম। উর্দ্ধেশক্তি, স্বভাবের অজ্ঞাত নিয়মাবলী ও মনুষ্যের আধ্যাত্মিক শক্তির অনুসন্ধান ও আবিষ্ক্রিয়া। স্বভাব অক্ষয় ভাণ্ডার, আমাদিগকেও যাইতে হইবে—অনন্তের পর পারে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, সে শক্তি আমাদের কৈ? চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলি স্বভাব আমাদিগকে দিয়াছে এবং চির-কালই দিবে; কিন্তু কৈ, তাহাতে ত মন পরি-তৃপ্ত হয় না! যত পাই তত চাই—বাসনার বিরাম নাই, কষ্টেরও অবধি নাই। মনুষ্য জগতের শ্রেষ্ঠ জীব; কিন্তু 'যত রাজ্যের' দুঃখের ভার বহিতেছে মানুষে। মানুষের কষ্ট দিন দিন বাড়িতেছে কেন? কেহ বলিবেন—পৃথিবীর জন-সংখ্যার পরিমাণ এত অধিক হইয়াছে যে, পৃথিবী আর তাহাদের জন্য সুখস্বচ্ছন্দতা যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছে না কাজেই কষ্টের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এ যুক্তির অলীকতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। মানিয়া লইলাম, পৃথিবীর জনসংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। কেহ কি বলিতে পারেন, পৃথিবীর সম্পত্তি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি হয় নাই? সম্পত্তি অর্থে এখানে ভূমি, শ্রমও ধন বুঝিতে হইবে। যেমন দিন দিন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার ধনাগমও সুলভ হইয়া উঠিতেছে। কত সহস্র সহস্র যোজন পতিত ভূমি এক্ষণে তাহার উৎপন্ন দ্রব্য মনুষ্যের সেবায় নিয়োজিত করিতেছে। একদিকে জনসংখ্যার সমষ্টি করুন ও অন্যদিকে সম্পত্তির সমষ্টি করুন, পরে অনুপাত করিয়া দেখুন—দেখিতে পাই-বেন, জগতে কোন অভাবই এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তিষ্ঠিতে পারিবে না। তবে অভাব কোথা হইতে আইসে? সম্পত্তি বিভাগের সামঞ্জস্য নাই বলিয়া। যে ধনী, সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধি-কারী; আবার যে দরিদ্র, তাহার কপর্দ্দকেরও সংস্থান নাই; যাহার অভাবিস্তর আছে, তাহারও যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু যাইবে কোথায়?

যাইবে,যাহাদের আছে তাহাদের নিকট। সুতরাং মধ্যবিত্ত লোকসংখ্যা প্রায়ই কমিয়া আসিতেছে। ইহা কল্পনা নহে—গত লোকগণনায় (Census Report) দেখিলেই ইহার সত্যাসত্য প্রমাণ হইবে। মনুষ্যের কষ্টের লাঘব করিবার জন্য সাধারণের দৃষ্টি সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদিগের উপর গিয়া পড়িতেছে। সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাও সম্পত্তিই সুখের আকর ভাবিয়া, অযথোচিত অর্থ-সঞ্চয়ে ব্যস্ত—সঞ্চয় করিয়াও তাহাদের সুখ নাই—সর্ব্বদা কিসে রক্ষা পাইবে, তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত, ভীত। এদিকে প্রাণ খুলিয়া কাহাকেও দান করিতেও কুণ্ঠিত। অতএব, সম্পত্তি বিভাগের সামঞ্জস্য হইলে অনেক দুঃখের নিবৃত্তির সম্ভাবনা বলিয়া এক্ষণে অনুমান হয়। বলের দ্বারা এই সামঞ্জস্য করিবার উদ্যমে 'সোসালিষ্ট' 'নিহিলিষ্ট' প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না; বরং অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতেছে, ফলে দেশে অরাজকতা প্রশ্রয় পাইতেছে। বলে যদি সম্পত্তি সামঞ্জস্য না হইল, তবে আর কিরূপে মনুষ্যের দুঃখ নিবারণ হইবে? ইহার উত্তর একটু স্থিরভাবে বুঝিতে হইবে যে—সুখই বা কি, আর দুঃখই বা কি, আর তাহা ভোগ করেই বা কে? এইখানেই পার্থিব শক্তির বিরাম। কিন্তু এই আত্মার অন্য এক শক্তির স্ফুরণের স্থান। কেহ কেহ অনুভব করেন, সেই শক্তিই মনুষ্যের ওই আধ্যাত্মিক শক্তি। এ শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপনার সহিত শুভাবের কতদূর সূক্ষ্ম সম্বন্ধ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। তখন মানুষ বুঝিতে পারে—স্বার্থবুদ্ধিসমাশ্রিত এই বিশ্ব-জগৎ উহা আমি-ভিন্ন আর কিছুই নহে, সুখ-দুঃখ কিছুই নহে, কেবল মাত্র মনের বিকার। তখন সম্পত্তি অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তখন মন হয়—আমি কোন সম্পত্তিরই অধিকারী নহি; উহা আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে—সাধারণের জন্য। আইস, সমস্ত জগৎ! তোমরা নিজ নিজ প্রয়োজন মত এই সম্পত্তি লইয়া যাও, তোমাদের অভাব দূর হউক। তোমাদের অভাব দূর হইলেই আমার অভাব দূর হইল, এই ভাব মনে উদয় হয়। তখন আমিই সর্ব্বত্র, আমাতেই সর্ব্ব। ইহাই উক্ত-তুমির ভ্রাতৃভাব। অভাব, সনাতন, অনন্তের পারে যাইবার একটী সুন্দর পথ। এই পথ অনুসরণ করিয়া চলিলে আনন্দের স্রোতে জগতের সমস্ত দুঃখ ভাসিয়া যাইবে। আর বোধ হয় সেইজন্যই, এই 'সোসাইটীর' পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। উদ্দেশ্য তিনটী, লক্ষ্য একটী, একে—তিন, তিনে—এক।

শ্রীদেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম-এ।

আত্মহত্যা-ভূত!

ওমরাও খাঁর বাড়ী কামাসকাট কাম্। তুমি হয়ত বলিবে হইতেই পারে না, ওমরাও খাঁ মুসলমান, কসিয়াতে যাইবে কি প্রকারে? কেন এটা কি বড় অসম্ভব কথা! এখানকার বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারদের বিলাতে 'লঙ্গ' থাকিতে পারে, পূজার ছুটিতে তাঁহারা 'হোমে' যাইতে পারেন, আর ওমরাও খাঁ কামাসকাট কাম থাকিতে পারে না? তবে এই বলিতে পার,

মানায় না, ভাল শুনায় না,—তা নয়, আপোষে মিটাইয়া বলিলাম পারিস্য দেশে। ওমরাও খাঁর বাড়ী পারস্য দেশে। কিন্তু জানিয়া রাখিও, ওমরাও খাঁকে কামাসকাট কাম পাঠাইতে বড় ইচ্ছা ছিল।

ওমরাও খাঁ নবাব-পুত্র। পিতা মাতা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, ওমরাও খাঁ অভিভাবক-শূন্য। তাঁহার বয়স ২০ বৎসর। বিষয়কার্য্য দেখেন না বা দেখিতে জানেন না। ইয়ার লইয়া দিবারাত্র আমোদ করিয়া বেড়ান। তাঁহার ইয়ার যথাক্রমে কালু সেখ, করিম, রহিম, আমদ, নেউল ও আলি প্রভৃতি। ইহারাই ওমরাও খাঁর পারিষদ। তিনি ইহাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন ভাবিয়া বাছিয়া লইয়াছেন। ইহারাও ওমরাও খাঁর মনোরঞ্জন করিতে একান্ত যত্নবান।

একদিন বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া ওমরাও খাঁ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। দেখিলেন, সুলেমান বিবি অশ্বারোহণে সেই পথে যাইতেছেন। বিবি রূপবতী বলিয়া দেশবিখ্যাত, কিন্তু তিনি আজও অবিবাহিতা।

সুলেমানের পিতার সংসামান্য ভূসম্পত্তি থাকিলেও বড় ঘরের ছেলে বলিয়া প্রথিতনামা। কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিলেও কাহাকে জানাইতে পারেন না। সুলেমানের বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া সমান ঘরে অর্থাভাবে ওমরাও মহলে কন্যাদানে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সুলেমানের বিবাহের ফুল ফুটি ফুটি করিয়া আজও সম্যক্ ফুটে নাই। কোথাও সুবিধা হয় নাই, কাজেই সুলেমান অদ্যাপি অনূঢ়া। মধ্যবিত্ত লোকের ঘরে দিলে এত দিনে চাই কি সুলেমান এক সংসারের গৃহিণী হইতে পারিত, কিন্তু তাহার পিতা খোদার্জ্জি তাহা হইতে বিরত ছিলেন।

ওমরাও খাঁ পূর্ব্বে সুলেমানকে দুই একবার দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু এবারের দেখা স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে যখন দেখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে দাগ বসে নাই,—এবারে দাগ বসিয়াছে। অধীর প্রত্যেক পদক্ষেপে; তাহার পৃষ্ঠ-শোভিনীর ঈষদ্দোলায়মান, ঈষদ্ভোন্নত পয়োধর যুগলের সম্মুখে ও পশ্চাতে ঈষৎ সঞ্চালন দেখিয়া ওমরাও খাঁ ভাবিলেন, ঘোটকটার যদি কিছুমাত্র রস-বোধ থাকিত ত এরূপ আরোহিণীকে সমস্ত দিবারাত্র পিঠে করিয়া রাখিত। আরোহিণী নামিলে হয়ত চার পা তুলিয়া লাফাইত। ওমরাও খাঁ ভাবিতেছেন—ওই যে সুবঙ্কিম ভ্রূ-যুগলের নিম্নদেশে ওই যে পদ্মপলাশ লোচনযুগল ভাসিতেছে, উহার প্রেম-পরিপূর্ণ কটাক্ষ যাহার উপর পড়িয়াছে সংসারে সেই ধন্য। না জানি সুন্দরীর স্বর কত মধু-মাখান। ব্রহ্মাণ্ডের বিনিময়ে, এমন কি আমার এই প্রাণের বন্ধুগণের বিনিময়েও যদি উহাকে গজীরূপে পাই ত আর কিছু চাহি না।

এদিকে সুলেমান বিবি ওমরাও খাঁর দৃষ্টি-পথের বাহির হইয়া গেল। সে দিন আর ওমরাও খাঁর ভ্রমণ হইল না। বিধাদিত অন্তঃকরণে গৃহে ফিরিলেন। বন্ধুরা সহসা তাঁহার এই ভাবান্তর দেখিয়া মর্ম্মাহত হইল। কিন্তু কেহই ভরসা করিয়া হঠাৎ এ ভাবান্তরের কারণ জানিতে পারিতেছিল না। ওমরাও খাঁ আপনিই সকল বন্ধুবর্গের উদ্দেশে বলিলেন "ভাই সকল! আজ আমার নবজীবন। পথে সুলেমান বিবিকে দেখিয়া তাহারই পায়ে এ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। সে আমার মন চুরি করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি সুলেমান বিবিকে পাই, তবে এই প্রাণ রাখিব নচেৎ আমার এই পর্য্যন্ত শেষ।"

বন্ধুরা প্রমাদ গণিল। কিন্তু কি করিবে—

তাহারা জানিত, ওমরাও খাঁ যখন যে বস্তু চাহিবেন, তখন সেই বস্তু আনিয়া দিতে পারিলে তিনি বড় খুসী হন, আমার অতিরিক্ত বকশিস্ করেন। তাই কালু সেখ খোদাবক্সের কাছে চলিল।

বৃদ্ধ খোদাবক্স কালুকে সমাদর করিয়া বসাইয়া তাহার দৌত্যের কারণ জানিলেন। খোদাবক্সের অবস্থা হীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কতকগুলি দেনাপত্র হইয়াছিল। কালু সেখকে বলিলেন "দেখুন আপনার নবাব যাহা চাহিয়াছেন, আমি এখনি তাহা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমার কন্যার বিনিময়ে আপনার নবাব বাহাদুরের নিকট হইতে আমি কিছু প্রত্যাশা করি।"

কালু বলিল "বিলক্ষণ, সে ত আপনার প্রাপ্য। আপনি চাহিলে ত পাইবেনই, না চাহিলেও পাইতেন।"

এইরূপ নানা কথার পর খোঁদাবক্স ওমরাও খাঁকে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ জানাইলেন। কালু পত্র লইয়া ওমরাও খাঁর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিল। ওমরাও খাঁ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কালুকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিলেন।

পর দিন ওমরাও খাঁ সবান্ধবে খোদাবক্সের গৃহে নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিলেন। সুলেমান তাঁহার পিতার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া তিনি দুঃখিত হন নাই বরং সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার যৌবন-নদী এ সময়ে কানায় কানায়। প্রণয়-পিপাসা-রূপ বাত্যা-সন্তাড়িত হইয়া তাঁহার আসঙ্গ-লিপ্সা-রূপ তরঙ্গ হৃদয়-নদীতে উদ্বেগও হইয়া আঘাত করিবার কূল খুঁজিয়া পায় না। সে তরঙ্গ জলে উঠে, জলেই মিলায়। সুলেমান পিতাকে জানাইলেন "যখন এক ব্যক্তি বাচিয়া আসিতেছে, তখন প্রত্যাক্ষান করা উচিত বিবেচনা হয় না।"

ওমরাও খাঁকে খোদাবক্স যথেষ্ট সমাদর আহ্বান করিলেন। রীতিমত নবাবী ভোজের আয়োজন হইল। সুলেমান বিবির সহিত ওমরাও খাঁর সাক্ষাৎ ঘটিল। ওমরাও খাঁ অতি যত্নে সুলেমানের হস্ত ধরিয়া বলিলেন "তুমি আমার সকল হৃদয় অধিকার করিয়া আছ, কথায় জানাইব কি! যেদিন তোমায় দেখিয়াছি সেই দিনই আমি বিকাইয়াছি, আরক আনবে কি! বড় আশায় আসিয়াছি, বিমুখ করিবে কি?"

সুলেনাম ব্রীড়া সঙ্কুচিত অধরে, চোখে মুখে আনন্দের প্রবল ফুটিয়া বাহির হইতে চায়, টিপিয়া চাপিয়া, ছুটা বা ঢোক গিলিয়া, সে বেগ নিবারণ করিয়া বলিলেন "বাবা বোধ হয় ডাকিতেছেন, আমি আসি।"

যাই হোক্ বিবাহ হইল। ওমরাও খাঁ সুলেমান বিবিকে ঘরে আনিলেন। দিন যায়, কালু সেখ প্রভৃতি পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যহই আসে, গল্প করে, সুলেমান বিবির তা ভাল লাগে না। একদিন ওমরাও খাঁকে সুলেমান বিবি বলিলেন "প্রিয়তম! একটা কথা আছে।"

ও। কি কথা?

সু। তোমার ওই অকাল কুষাণ ইয়ারগুলির সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে।

ওমরাও খাঁ চটিলেন। যদিও সুলেমানকে তিনি প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন, তত্রাচ কালু সেখ প্রভৃতিকেও তিনি ভাল বাসেন। এ দুই ভালবাসা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুলেমানকে যদি ওমরাও খাঁর মাথার মণি বল ত কালু সেখ প্রভৃতিকে তাঁহার বুকের পঞ্জর বলিলেও বলা যায়।

ও। এ তোমার অন্যায় আবদার, উহারা তোমার কি করিতেছে?

সু। করুক্ বা নাই করুক্, উহাদের আমি দেখিতে পারি না, তোমাকে উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতেই হইবে।

ওমরাও খাঁ রাগত হইয়া বলিলেন 'না, তা পারিব না।"

এতদূর অবজ্ঞার উত্তর সুলেমান ওমরাও খাঁর নিকট প্রত্যাশা করেন নাই। শুনিয়া তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, মাথা ঘুরিল। অভিমানিনী অপমানে ঘৃণায় হতচেতন হইয়া পড়িলেন। ওমরাও খাঁ প্রমাদ গণিলেন।

বিগতপ্রস্থ ওমরাও খাঁ ব্যস্ততা সহকারে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাহির বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, কালু সেখ প্রভৃতি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের দেখিয়া ওমরাও খাঁ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। অতি কটুভাষায় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোরা এখনি এখান হতে দূর হ, যদি সহজে না যাস্ ত চাবুকে তাড়াব।" তাহারা ত অবাক্। যে ওমরাও খাঁ তাহাদিগকে কখন ভাল বই মন্দ বলে নাই, হঠাৎ এই অভদ্রোচিত ব্যবহারে তাহারা ভাবিল—নিশ্চয়ই সুলেমান ওমরাও খাঁর কানে মন্ত্র দিয়াছে।

বন্ধুরা চলিয়া গেল, সুলেমানও চেতনা প্রাপ্ত হইল। ওমরাও খাঁ বলিলেন—"প্রিয়তমে! তোমারই কথা শুনিয়াছি, তাহাদিগকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি।" শুনিয়া সুলেমান বিবি আহ্লাদে ডগমগ, ভাবে গদ্গদ হইলেন।

দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়—ওমরাও খাঁ স্ত্রী পরিচর্য্যায়ই ব্যস্ত। বিবাহের দেড় বৎসর পরে সুলেমান বিবি ওমরাও খাঁকে একটী কন্যারত্ন দান করিলেন। খোদাবক্স আসিয়া, ওমরাও খাঁ আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার কন্যার কুলমান হেতু এক আনন্দ ভোজ দিলেন। তাহাতে ব্যয় হইল বিস্তর। আবার বৎসরের পরে সুলেমান আর একটি কন্যা প্রসব করিলেন। এবারও পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ ভোজাদি হইল। এইরূপে ছয় সাত বৎসরের ভিতর ওমরাও খাঁর পাঁচ কন্যা হইল, এবং প্রত্যেকেরই জন্মদিনে একটি করিয়া আনন্দ ভোজ হইয়াছিল। ওমরাও খাঁর ইচ্ছা না থাকিলেও খোদাবক্সের পীড়নে তাঁহাকে এই ব্যয়ভার সহ্য করিতে হইয়াছে।

এদিকে ওমরাও খাঁর কোষাগার অথশূন্য। আর দেড় বৎসর পরে আবার সুলেমান বিবি এক কন্যা প্রসব করিলেন। খোদাবক্স আসিল, জমাতীথর আনন্দ ভোজের জন্য ওমরাও খাঁকে বিস্তর পীড়াপীড়ি করিলেন। ওমরাও খাঁ জানাইলেন, তাঁহার আর কোষে অর্থ নাই। কন্যার জন্মদিনে আনন্দ ভোজ হইবে না শুনিয়া সুলেমান বিবি মৃতপ্রায় হইলেন। দেখিয়া ওমরাও খাঁ ক্রোধে ও ক্ষোভে অন্ধ হইলেন। এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া যায়, ওমরাও খাঁর অবস্থা দিন দিন আরও শোচনীয় হইতে লাগিল। তিনি ঋণগ্রস্ত হইলেন। তাহার উপর খোদাবক্স যখন তখন আসিয়া সুলেমানের নিকট হইতে যখন যাহা পাইতেন লইয়া যাইতেন। ওমরাও খাঁ জানিয়াও কিছু বলিতে পারিতেন না। কারণ সুলেমান বিবি এখন তাঁহার উপর পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন।

একদিন ওমরাও খাঁ নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিলেন "পূর্ব্বে কি ছিলাম, আর এখন কি হইয়াছি। বিবাহের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলাম। তখন যাহা ইচ্ছা হইয়াছে করিয়াছি। আর

এখন সম্পূর্ণ পরের আয়ত্তাধীন। কোন উপায়ে যে আর পূর্ব্বের অবস্থা ফিরাইয়া পাইব, তাহার উপায় নাই। স্ত্রীকে পথে বসাইতে পারিব না; কন্যাগণকেও হতাশ করিতে পারিব না। তবে উপায়—" ওমরাও খাঁ আরও চিন্তান্বিত হইলেন। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলিলেন। সেই নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁহার হৃদয়ের একটা গুরুভার নামিয়া গেল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা কতক প্রফুল্ল হইলেন। মনে মনে বলিলেন—"আমার আত্মহত্যা করাই উচিত।"

রাত্রি অধিক হইলে, পরিবারবর্গ সকলে নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিতে থাকিলে, ওমরাও খাঁ উঠিলেন। একখানা তোঁতা ছুরিকে বালি দিয়া একবার সানাইয়া লইলেন। একটী কক্ষের ভিতর একটী প্রদীপ জ্বালিয়া এক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন। ইচ্ছা পূর্ব্বে যেরূপে দিন কাটাইতেন, এখন তাহার কতক সুখ অনুভব করিবেন। এক বোতল সরাব আনিয়াছিলেন, গ্লাসে ঢালিয়া একটু খাইলেন। সঙ্গেতে তামাকুট প্রস্তুত করিলেন। একটু একটু করিয়া মদ্যপান করেন, আর ঘন ঘন তাম্রকূট সেবন করেন। অল্পক্ষণের ভিতর নেশা হইল। সে সময়ে একবার ভাবিলেন "বাঃ কেমন আমোদ হইতেছে, কিন্তু এ আমোদ ত থাকিবে না। এ আমোদে ছুটতে দিব না।" নেশা থাকিতে থাকিতে, এই রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে এই ছুরিকার দ্বারায় কার্য্য শেষ করিব।"

হঠাৎ তাঁহার বোধ হইল, যেন তিনি একা নন, সম্মুখে কে এক ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছে। স্তিমিত প্রদীপালোকে ওমরাও খাঁ দেখিলেন, আগন্তুক যেন কেবল চর্ম্মাবশিষ্ট পুরুষ, চক্ষু কোটরগত ও রক্তবর্ণ। কতকগুলা কাল চুল জটা বাঁধিয়া মাথার চারিদিকে অযথা পড়িয়া আছে। সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ওমরাও খাঁর ভয় জন্মিল। ওমরাও খাঁ জিজ্ঞাসিলেন—"তুমি কে?"

আগন্তুক গম্ভীরস্বরে বলিল "আর কতক্ষণ?"

ওমরাও খাঁ বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "কিসের কতক্ষণ? তুমি কি উপায়ে এখানে আসিলে?"

আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া বলিল "কেন দ্বার দিয়া।"

ওমরাও খাঁ জানিতেন তিনি দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়াছিলেন। অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "কে তুমি?"

আ। মানুষ।

ও। আকার দেখিয়া ত বিশ্বাস হয় না।

আ। না হয় অবিশ্বাস কর।

ও। তাহা ত করিয়াছি।

ওমরাও খাঁর এতাধিক নির্ভিকতা দর্শনে আগন্তুক সন্তুষ্ট হইল, বলিল "হাঁ তুমি যাহা ভাবিয়াছ, আমি তাহাই। আমি মানুষ নহি।"

ও। তবে তুমি কি?

আ। আমি এক উপদেবতা।

ও। তোমাকে তাহার মতন ত দেখাইতেছে না।

আ। আমি আত্মহত্যা-ভূত!

বলিয়া ভূতটি ওমরাও খাঁর আরও নিকটে আসিল। আসিয়া সেই চক্ষুচকে ছুরির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া ওমরাও খাঁকে বলিল 'কেমন এখন প্রস্তুত হইয়াছ ত?"

ও। সম্পূর্ণ নহে। এখনও কলিকায় অর্দ্ধেক তামাক রহিয়াছে। বোতলে পরিষ্যাপ্ত সরাব রহিয়াছে।

ভূ। তবে শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া লও।

ও। তুমি যে বড় জবরদস্ত দেখিতে পাই! অত তাড়াতাড়ি কেন?

ভূ। হাঁ আমি বড়ই ক্ষিপ্রহস্ত। তাহার কারণ এই ভূমণ্ডল আমাকেই দেখিতে হয়। এখন আমায় ভারতবর্ষ হইয়া চীনে যাইতে হইবে, এবং তাহার পর এই রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে কত দেশ যে পর্য্যটন করিতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ও। ও কথা এখন থাক। মদটা আস্টা খেয়ে থাক?

ভূ। না।

ও। ছিটা ফোঁটাও চলে না? একটু খাও না হে!

ভূ। না আমি কখন খাই না; ও দ্রব্য খাইলে স্ফূর্ত্তি উত্তেজিত করে।

ও। আচ্ছা তুমি যে বলিতেছ, তুমি আত্মহত্যা-ভূত। তুমি নিজেই কি লোক মারিয়া থাক?

ভূ। না, আমি সহস্তে মারি না বটে; কিন্তু আত্মহত্যাকারীর মন খারাপ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকি এবং তাহাকে নানা উপায়ে উত্তেজিত করি।

ও। তবে বোধ হয় তুমি দেখ, হত্যাকারী গলায় ছুরিখানা ভাল করিয়া বসায় কি না, আফিঙ্গটা তেলে গুলিয়া খায় কি না?

ভূ। হাঁ তাহাই। কিন্তু তোমার আর দেরি কি? শীঘ্র শীঘ্র ঐখানা তুলিয়া লও। ভাল সান দিয়াছ ত? তুলিয়া চোখ কান বুজিয়া যত জোর আছে, একেবারে টুঁটিটা ওঁার করে দাও। কর কর, যা বলিলাম তাই কর। আমার বড় তাড়া, আর এক যুবক আমায় ডাকিতেছে। তার অধিক টাকা হইয়াছে, সে বড়ই ভীত, সে আমায় এখনি খুঁজিতেছে।

ও। কি বলিলে অধিক টাকা হইয়াছে বলিয়া সেই মূর্খ আত্মহত্যা করিবে। হাঃ হাঃ এ বড় রহস্য!

বলিয়া ওমরাও খাঁ একবার গাল ভরিয়া হাসিলেন। এমন হাসি তিনি অনেক দিন হাসেন নাই। ভূতটী যেন ইহাতে বড়ই চটিল। বলিল—"অমন করিয়া আর হাসিও না। উহাতে আমার বড় ব্যথা লাগে। যত পার দীর্ঘনিশ্বাস ফেল, ভাবনায় মাথা নোয়াইয়া ফেল। তাহাতে আমি বড়ই সুখী হইব।"

ওমরাও খাঁ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ভূতটি তাহাতে লাফাইয়া উঠিল। উঠিয়া সেই ছুরিখানা ওমরাও খাঁর হাতে দিল। ওমরাও খাঁ ছুরিখানার মাথার দিকটায় হাত দিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—"এ মন্দ নহে। একজনের অধিক টাকা জমিয়াছে বলিয়া সে আত্মহত্যা করিবে?"

ভূ। আঃ যার কিছু নাই বা অল্পই আছে সে ত অক্লেশে করিতে পারে।

ও। তা ত নিশ্চয়ই। আর এতদূর অগ্রসর হয়ে পশ্চাৎপদ হওয়াও যুক্তিযুক্ত নয়।

ভূ। ফিরিবে কোথায়, কোষাগার যে শূন্য।

ও। হয়ত ভবিষ্যতে আবার পূর্ণ হইতে পারে।

ভূ। প্যান্‌পেনে ষ্যান্‌ষেনে অমিতব্যয়ী স্ত্রী?

ও। ইচ্ছা করিলে তাহাকেও শাস্ত করা যায়।

ভূ। ১০।১৫ টা কন্যা?

ও। একটিকে ভাল পাত্রে দিতে পারিলে অবস্থা ফিরাইতে পারি।

ভূতটি যেন বড়ই চটিল। বলিল "তামাসা পরিত্যাগ কর।"

ও। সে অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়াছি। ভু। ওনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কারণ তোমামার উপর আমি বড়ই চটা। এস শীঘ্র শীঘ্র এ পাপ-পরিপূর্ণ পৃথিবী পরিত্যাগ কর।

ওমরাও খাঁ ছুরি হস্তে ধরিয়া বলিলেন "হাঁ এখনি এ শোক-তাপ দুঃখ-দারিদ্রপূর্ণ সংসার পরিত্যাগ করিব।" কিন্তু তোমার সহিত যথায় যাইব, ভাবিতেছি, তথায় যে কত সুখে থাকিব, তাহা তোমার মুক্তি দেখিয়া অনুভব করিতেছি। তুমি আমায় বুঝাইতে পার যে, তোমার এত কদর্য্য মূর্ত্তি কেন? এবং ইহার পর আমারও যে তোমার ন্যায় চেহারার চটক দাঁড়াইবে না, কে বলিতে পারে?

আত্মহত্যা-ভূত এবার সাংঘাতিক চটিল। বলিল,—"আমার কথা শোন বলিতেছি।"

ওমরাও খাঁ চীৎকার করিয়া বলিলেন,—সরে দাঁড়াও! আমি এখন সকল বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তোমার কথা শুনিব কেন? আগে দেখি আমার কথা কেহ শোনে কি না। আমি সুলেমানকে বলিব আমার মতাবলম্বী হইয়া চলিতে, খোদাবক্সকে বাড়ীতে অন্ন না প্রবেশ করিতে দিতে; যদি সে না শোনে, তখন এই ছুরি তাহার বুকে বসাইব। তাকে মারিয়া আমার সুখের পথ উন্মুক্ত করিব। আমি মরিব কেন?"

শুনিয়া আত্মহত্যা-ভূত দুই এক পদ করিয়া পশ্চাতে হটিল। রাগে, ক্ষোভে, দিশেহারা হইয়া ওমরাও খাঁর উদ্দেশে সহস্র গালি বর্ষণ করিয়া অন্তর্হিত হইল।

প্রভাত হইল, সুলেমান নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন, ওমরাও খাঁ শয্যায় নাই। দাস দাসীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই তাঁহার উদ্দেশ বলিতে পারিল না। সকলে বিশেষ ভাবিত হইল। ওমরাও খাঁ অবসর বুঝিয়া গৃহের বাহির হইলেন। গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা সুলেমানকে বলিলেন। শুনিয়া সুলেমান বিবি সিহরিলেন।

ওমরাও খাঁ বলিলেন—"এখন বল কি করিতে চাও। আমার বশবর্ত্তী হইয়া যে কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকা যায়, এক রকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, না যেরূপ করিয়া আসিতেছ ঐরূপে কাটাইবে?

সু। যা বলিবে তাহাই করিব।

ভিতরের গোল মিটিল। ওমরাও খাঁ ও সুলেমান বিবি সুখে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী

সমাপ্ত।

কলিকাতা লিটল্ ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধানী

অষ্টম বর্ষ। ৩রা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। ৪০ সংখ্যা।

মন, ইন্দ্রিয় ও আত্মা।

মন ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ। কেহ ইহাকে সত্ত্ব বলিয়া থাকেন, কেহ ইহাকে চেতঃ বলিয়া কহেন, আবার কেহ কেহ ইহাকে আত্মার প্রযত্নাধীন সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তাবিষয়ক চেষ্টা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কেহ বা এই মনকে ইন্দ্রিয় ব্যাপারের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পুরুষ কখন সুখেতে, কখন দুঃখেতে কখন বা অন্যান্য মানসিক ব্যাপারে মগ্ন থাকেন; আবার সেই পুরুষ কখন নীলবর্ণ দেখিতেছেন, কখনবা রক্তবর্ণ দেখিতেছেন, কখন বা অন্যান্য বিবিধ প্রকার অবয়ব অবলোকন করিতেছেন। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারাও অনেক সময়ে অনেক প্রকার ইন্দ্রিয়-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, আবার কখন বা সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া সাধু ভাবাবলম্বন, দেবগুরুতে ভক্তি, ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কখনও রজোগুণের বিবিধ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। আবার কখনও বা সেই পুরুষ তমোগুণাবলম্বন করিয়া ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি করিয়া থাকেন। পুরুষের এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিলে তাঁহার অনেক মন আছে বলিয়া সহসা বোধ হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, তাহার চিত্ত একই, কারণ এককালে দুইটী কার্য্য হয় না। যদি এককালে দুই কিম্বা ততোধিক কার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহা হইলে দুই কিম্বা ততোধিক মন আছে, ইহা সঙ্গত হইলেও হইতে পারিত। যখন তাহা হয় না অর্থাৎ একটি কার্য্যের অধিক এককালে হয় না, তখন কার্য্যকর্ত্তা পুরুষের মন যে এক, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মন ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা এবং সেই মন যখন এক বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল, তখন এককালে এক ইন্দ্রিয়ই কার্য্য করিতে পারে, দুই কিম্বা ততোধিক ইন্দ্রিয় কার্য্য করিতে পারে না। পুরুষের যখন যে গুণের আধিক্য থাকে, তখন তাহার মন তদ্‌গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া আখ্যাত হয়। কেন না তদ্‌গুণ-

সম্ভব কার্য্য সেই সময়ে পুনঃপুনঃ [illegible] দ্বারা সম্পাদিত হয়। [illegible] হইলে মহর্ষি বা সত্বগুণাবলম্বী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। মন ইন্দ্রিয় সকলের নিয়ন্তা, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ সেই মনের অনুগত হইয়া আপন আপন কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

ইহা নিঃসংশয় জানিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় পাঁচ এবং সেই ইন্দ্রিয়ের দ্রব্যও পাঁচ, তাহাদের অধিষ্ঠানও পাঁচ, বিষয়ও পাঁচ এবং বুদ্ধিও পাঁচ। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসন এবং স্পর্শন এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথ্বী এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় দ্রব্য। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ার্থ। দর্শনবুদ্ধি, শ্রবণবুদ্ধি, ঘ্রাণবুদ্ধি, রসনবুদ্ধি এবং স্পর্শনবুদ্ধি এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও আত্মা একত্রীভূত হইলে এই বুদ্ধির উৎপত্তি হয়। ক্ষিত্যপতেজ মরুৎব্যোমের মধ্যে যে যে ইন্দ্রিয় নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই সেই ইন্দ্রিয় সেই সেই দ্রব্যের প্রতি অনুধাবন করে। এইরূপ অনুধাবন ইন্দ্রিয় স্বভাবের হিতকর। ইন্দ্রিয়ার্থের (রূপ,রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। অতিযোগ, অযোগ এবং মিথ্যাযোগ হইলে, ইন্দ্রিয় ও মন বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া বুদ্ধিকে নাশ করে। মনের অর্থ চিন্তা; সেই মন এবং বুদ্ধির স্বীয় অর্থ সম্বন্ধে সমান, অতিহীন এবং মিথ্যাযোগ, আত্ম প্রকৃতি বিকৃতির কারণ স্বরূপ।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এবং চেতনা এই সমবেত ছয়টী ধাতু পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। ইহাদের মধ্যে ষষ্ঠ ধাতু এক চেতনারই পুরুষ সংজ্ঞা হয়। মন, চক্ষু প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় আকাশাদি পঞ্চ স্থূল ভূত এবং আট প্রকার প্রকৃতি (মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্র) এই চতুর্ব্বিংশতি ধাতুভেদে পুরুষের অবান্তর চতুর্ব্বিংশতি ভেদ হইয়া থাকে।

জ্ঞান হওয়া ও না হওয়া এই উভয়ই মনের লক্ষণ। কারণ আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং অর্থ এই সমুদায়ের সংযোগ হইলেও যখন মনের সংযোগ হইলে জ্ঞান জন্মে না, আর তাহার পর আত্মা, ইন্দ্রিয়, অর্থ এবং মন এই সমুদয়ের সংযোগ হইলে জ্ঞান জন্মে। ইহা দ্বারা নিশ্চয় জানা যায় যে, জ্ঞানের অভাব এবং ভাবই মনের লক্ষণ। মনের অণুত্ব এবং একত্ব এই দুইটী গুণ। যাহা কিছু চিন্তার বিষয়, বিচারের বিষয়, তর্কের বিষয়, ধ্যানের বিষয় এবং সংকল্পের বিষয়, সেই সমস্ত বিষয়ই মনের গ্রাহ্য বলিয়া অভিহিত হয়। ইন্দ্রিয় ও নিজের চালনা, বিচার এবং তর্ক এই কয়েকটী মনের কর্ম্ম। এই সমুদয় হইতে বুদ্ধির বৃত্তি হইয়া থাকে। মনের সহিত যুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থ গৃহীত হয়। তাহার পর গুণ বা দোষ অনুসারে মনের দ্বারা বিশেষণ ও বিশেষ্য ভাবে কল্পিত হইলে বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি জন্মে। অনন্তর সেই বুদ্ধি, বৃত্তি দ্বারা বুদ্ধিপূর্ব্বক কোন কথা বলিতে বা কোন কার্য্য করিতে অনুষ্ঠান করে। শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসগ্রহণ এবং গন্ধগ্রহণ এই পাঁচটী কর্ম্মের দ্বারা পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয় অনুমিত হয়। শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সহিত আকাশ, ত্বগেন্দ্রিয়ের সহিত আকাশ ও বায়ু, দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত আকাশ, বায়ু ও অগ্নি, রসনেন্দ্রিয়ের সহিত আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি ও পৃথিবী; এইরূপে শ্রবণাদি এক একটী ইন্দ্রিয় ক্রমশঃ আকাশাদি পঞ্চভূতের এক একটী অধিক ভূতের সহিত যুক্ত আছে। এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে বুদ্ধির বৃত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ এবং জিহ্বা এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহাদের মধ্যে হস্তের দ্বারা গ্রহণ ও ধারণ, পদদ্বারা গমনাগমন, পায়ু দ্বারা মলত্যাগ, উপস্থ দ্বারা মূত্র ও শুক্রত্যাগ এবং জিহ্বা দ্বারা বাক্য নিষ্পত্তি হয়। বাক্য দুই প্রকার। সত্য ও অনৃত। ইহার মধ্যে সত্য জ্যোতিঃস্বরূপ এবং অনৃত বাক্য তমঃস্বরূপ। জন্তুর যে ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া যে বুদ্ধি জন্মে, সেই সেই ইন্দ্রিয় অনুসারে বুদ্ধির নাম নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। আর মনের দ্বারা যে বুদ্ধি জন্মে, মনের দ্বারাই সেই বুদ্ধির নাম নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের আশ্রয় করিয়া যে বুদ্ধি হয়, তাহার নাম শ্রবণজ্ঞান। এইরূপ দর্শনাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বুদ্ধি জন্মে, সেই সেই বুদ্ধি সেই সেই দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের নামানুসারে নির্দ্দিষ্ট থাকে। কার্য্য, ইন্দ্রিয় এবং অর্থের অনেক প্রকার ভেদ আছে বলিয়া বুদ্ধিরও অনেক প্রকার ভেদ হয়। আত্মা, ইন্দ্রিয়,মন এবং অর্থ ইহাদের এক একটীর সন্নিকর্ষে এক একটী বুদ্ধি জন্মে। যেমন বীণা ও নখের সংযোগে একটী শব্দই নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, তেমন বুদ্ধি, আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও অর্থের সংযোগ বহুপ্রকার হয়। অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের সহিত মন ও মনের সহিত আত্মা এইরূপে পূর্ব্বটী পরবর্ত্তীর সহিত পরস্পর সংযুক্ত হয়।

এই চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক রাশিই পুরুষ বলিয়া অভিহিত হয়। রজঃ ও তমোদ্বারা এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব যুক্ত হইলে সংযোগরূপ পুরুষের উদ্ভব হয়। এই সংযোগ-রূপ পুরুষ অনন্ত। সত্ববুদ্ধি দ্বারা রজঃ ও তমোগুণ নিরাকৃত হইলে ঐ সংযোগ নির্ব্বাহ হয়। এই পুরুষেতেই কর্ম্মফল, জ্ঞান, মোহ, দুঃখ, জীবিত এবং মৃত্যু প্রতিষ্ঠিত আছে। যিনি তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক পুরুষের সমুদয় অবগত হন, তিনি জানিতে পারেন যে, কিরূপে প্রলয় ও কিরূপেই বা সৃষ্টি হয়।

কোন কোন ঋষিরা বলিয়া থাকেন, এক নিত্য আদি পুরুষ আছেন, তাহা হইতে পরম্পরাক্রমে যে সমুদয় পুরুষের উৎপত্তি হইতেছে, তাহারা তৎসদৃশ। অথচ তাহা হইতে পৃথক্ নহে। মনুষ্য হইতে মনুষ্য ইত্যাদিরূপে অন্যান্য ভাব হইতে অন্যান্য ভাবের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। তাহাদের সমষ্টির কোন ঈশ্বর নাই। তাঁহারা প্রত্যেক আদি চৈতন্য পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ সমষ্টির নাম সত্য। সেই আদি পুরুষ কর্ত্তাও নহে, ভোক্তাও নহে। এইরূপে যাঁহারা আত্মার নিষেধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে একজনের কর্ম্মফল তৎসদৃশ অপরে ভোগ করে। কিন্তু ইহা অসম্ভব। কারণ যে কর্ত্তা সেই ভোক্তা, কেবল কারণ সমূহের পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেখা যায়, কর্ত্তা করণাদির সহিত যুক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্মের কারণ হইয়া থাকে। কর্ত্তা যে কর্ম্ম করে, তাহা নষ্ট হইয়া ফলরূপে তৎক্ষণাৎ কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হয়। অন্যকে প্রাপ্ত হওয়ার অবকাশ পায় না। নীতিবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যখন ক্রিয়ার উপভোগে সেই নিত্য একমাত্র পুরুষই কারণ, তখন সেই পুরুষই কর্ত্তা, অন্য কর্ত্তা নহে। সেই পুরুষ অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকায় অহঙ্কার, কর্ম্মফল, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জন্মান্তর এবং জাতিস্মরণ ইত্যাদি হইয়া থাকে।

যেমন পুরুষ (পরমাত্মা) অনাদি, সেই হেতু ইহার প্রভব (উৎপত্তির কারণ) নাই; কিন্তু রাশিসংজ্ঞক পুরুষ মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। আত্মাই জ্ঞাতা, করণ-সংযোগে তাহারই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। করণ সমূহের কোন প্রকার দোষ থাকিলে জ্ঞান জন্মে না। যেমন মলযুক্ত জলে যত্নপূর্ব্বক দর্শন করিলেও বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া

যায় না। তেমনই চিত্ত ও কামনা প্রভৃতি দোষে দূষিত থাকিলে কখনই যথার্থ তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। মন, বুদ্ধি, বুদ্ধীন্দ্রিয় (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও উপস্থ) এই সমুদয়ের সাধারণ নাম করণ। কর্ত্তার সহিত এই সমস্ত করণের সংযোগেই কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির সংযোগ হইতে সুখ দুঃখের সংবেদন জন্মিয়া থাকে। এই ভূতাত্মা একাকী কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না এবং একাকী কোন কর্ম্মের ফলভোগ করে না। সংযোগ হইতেই সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, যেহেতু সংযোগ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হয় না। ভাব (পদার্থ) এক নয়, আর কোন ভাবই অহেতুক নহে। পরন্তু সমস্ত ভাবই শীঘ্রগ, এই নিমিত্ত কখনই স্বভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যেহেতু শীঘ্রগত্ব স্বভাব অন্যের সংযোগ ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারে না। অনাদি পুরুষ নিত্য, আর যাহা কারণ হইতে উৎপন্ন হয় তাহা অনিত্য। সৎ অথচ কারণহীন পদার্থই নিত্য, আর হেতুবিশিষ্ট হইলেই অনিত্য। সেই সৎ পদার্থ কোন ভাবের দ্বারা গৃহীত হয় না। যেহেতু সেই পদার্থ-নিত্য বলিয়া কোন ভাব হইতে গৃহীত হয় না। সেই নিমিত্ত তাহা অব্যক্ত এবং অচিন্তনীয় এবং ইহার বিপরীত হইলে ব্যক্ত বলিয়া জানিবে। আত্মা —অব্যক্ত, ক্ষেত্রজ্ঞ, শাশ্বত, বিভু এবং অব্যয়। তদ্ভিন্ন অন্য যাহা কিছু সমুদয়ই ব্যক্ত। ঐন্দ্রিয়িক এবং অতীন্দ্রিয় ভেদে ব্যক্ত দুই প্রকার। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহার নাম ইন্দ্রিয়ক ব্যক্ত। আর তদ্ভিন্ন যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, অথচ কোন লিঙ্গ দ্বারা গৃহীত হয়, তাহার নাম অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত।

প্রকৃতি—আকাশাদি (পঞ্চ ভূতমাত্র) বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি এবং অহঙ্কার এই আটটী ভূত সমুদয়ের প্রকৃতি অর্থাৎ কারণ বলিয়া অভিহিত হয়। বিকার—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষুরাদি) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্‌পানি প্রভৃতি), মন এবং পৃথিব্যাদি পঞ্চ স্থূল ভূত এই ষোলটী বিকার বলিয়া অভিহিত হয়। অব্যক্ত ব্যতিরেকে সমস্ত ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইল। ঋষিগণ অব্যক্তকেই এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন।

অব্যক্তই মূলপ্রকৃতি বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্র, মন এবং ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতেই সর্ব্বাস্থির সমুদয় হয়। পুরুষ প্রলয়ের সময় ইষ্ট পদার্থের সহিত বিযুক্ত হয়, তদনন্তর ঐ পুরুষ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হয়। এইরূপে রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা সত্বগুণের অভিভব হইলে চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে অর্থাৎ ইহার পুনঃপুনঃ জন্ম ও মরণ হইতে থাকে। যাহাদিগের শীতোষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বে অত্যন্ত আশক্তি এবং যাহারা অত্যন্ত অভিমানী, তাহাদেরই উদয় ও প্রলয় অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বে তাদৃশ আশক্ত নহেন অথচ অভিমান শূন্য, তাঁহাদের জন্ম মৃত্যু এই দুয়ের কিছুই নাই অর্থাৎ তাঁহারা মুক্তলাভ করিয়া থাকেন।

প্রাণ (বহির্বায়ু গ্রহণ) অপান (অন্তর্বায়ু পরিত্যাগ) নিমেষাদি, আয়ু, মনের গতি (চিন্তা, সঙ্কল্পাদি) মনের এক ইন্দ্রিয় হইতে অপর ইন্দ্রিয়ে সঞ্চরণ, মনের প্রেরণ, মনের ধারণ, স্বপ্নাবস্থায় দেশান্তরে গমনাগমন, মরণ, দক্ষিণ নেত্রদ্বারা দৃষ্ট বস্তুর বামচক্ষুর দ্বারা এবং বামচক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা জ্ঞান এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি স্মৃতি ও অহঙ্কার এই সমস্ত চিহ্নের দ্বারা পরমাত্মার অনুভব হয়। আত্মা শরীর ত্যাগ করিলে শরীর শূন্য ও অচেতন হইয়া পঞ্চভূত মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

মন অচেতন এবং ক্রিয়াবিশিষ্ট। পরমাত্মা এই মনের চৈতন্য জন্মাইয়া দেয়। বিভু পরমাত্মা মনের সহিত যুক্ত হইলেই তাহার ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, অতএব আত্মাই চেতনাবান্ এবং সেই হেতু আত্মাই কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হয়। মন ক্রিয়াবিশিষ্ট হইলেও অচেতন এবং জন্য কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হয় না। সমস্ত প্রাণীই আপনাপন আত্মার দ্বারা আপনাপন আত্মাকে প্রাণের সহিত সর্ব্বপ্রকার যোনিতে প্রেরণ করিয়া থাকে, অন্য অন্যের প্রেরক হইতে পারে না। চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন হইলে পরমাত্মা ভিন্ন্যাদি ব্যবহিত বস্তু অবলোকন করিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই আত্মাকে বিভু বলা যায়। কর্ম্মানুসারেই আত্মা মনের অনুবর্ত্তী হইয়া এক যোনিতে অবস্থান পূর্ব্বক সমস্ত যোনিতে গমনাগমন করিয়া থাকে।

এই বিশ্বমধ্যে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদয়ই কারণ বিশিষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মা। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার একটীতেও সুখের প্রত্যাশা মাত্রই করা যায় না। কারণ এই সমুদয় আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কেননা আত্মাকে কেহই নির্ম্মাণ করে নাই এবং করিতেও পারে না। এই আত্মাই প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া সর্ব্ব পদার্থের কারণ ভূত ভূতাত্মারূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানিব্যক্তি যে পর্য্যন্ত না বিজ্ঞান পূর্ব্বক ইহা নহে, ইহা আমার নহে, এইরূপ সত্যবুদ্ধির উপার্জ্জন করিতে সমর্থ না হইবেন, তৎকাল পর্য্যন্ত এই সংসারচক্রে ঘুরিতে থাকিবেন। আর যাঁহার তাদৃশ সত্যবুদ্ধির উৎপত্তি হয়, তিনি সমস্ত অতিক্রম করিয়া আর এই সংসারচক্রে প্রত্যাগমন করেন না।

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের স্বাস্থ্যহানির কারণ কি?

কতিপয় দিবস গত হইল, মেডিক্যাল কংগ্রেসে ও ছোট লাটের ভবনে এ দেশের লোকের স্বাস্থ্য অবনতির ও অকাল মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে বহুতর প্রকার আলোচনা ও আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। এ দেশের স্বাস্থ্যহানির ও অকাল মৃত্যুর সংখ্যা দিনদিন যেরূপ ক্রমান্বয়ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, সত্বর ইহার প্রতিকার না হইলে এদেশ একেবারে উৎসন্ন হইয়া যাইবে। আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ হিতে বিপরীত হইয়া পড়িতেছে, যাঁহারা রক্ষক তাঁহারাই ভক্ষক হইয়া দাড়াইয়াছেন, সুতরাং মূল কারণ নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে কেহই যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন না। এই যে বড় বড় ডাক্তার মহোদয়গণ সেদিন এ দেশের স্বাস্থ্য অবনতির কারণ সম্বন্ধে কতপ্রকার আন্দোলন করিলেন, কিন্তু কেহই মূল কারণ নির্ণয় করিতে যত্নবান হন নাই। ফলতঃ যাঁহাদের রাজ নিয়মে এ দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে—যাঁহাদের ধর্ম্ম

ও নীতি প্রচারে এ দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, —ইহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এদেশের স্বাস্থ্য অবনতি হইতেছে, তাঁহারাই যখন এ দেশের স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন তখন প্রকৃত উন্নতির আশা কি? যাহা হউক এ দেশের স্বাস্থ্য অবনতির প্রকৃত কারণ কি, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিব। সুদেশহিতৈষী মহাত্মাগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিবেন ও শীঘ্র প্রতিকার উদ্দেশ্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

এ দেশের স্বাস্থ্য অবনতির সর্ব্বপ্রধান কারণগুলি এই, যথা—(১) ধর্ম্মহীনতা, (২) দরিদ্রতা, (৩) প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি ঘৃণা, (৪) বিলাসিতা, (৫) বাল্যকাল হইতে কঠোর মানসিক পরিশ্রম, (৬) বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী, (৭) অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবন, (৮) ডাক্তারী তেজস্কর ঔষধ সেবন, (৯) শারীরিক শ্রমের অভাব, (১০) রেলওয়ে প্রভৃতি।

(১) ধর্ম্মহীনতা। ভারতের প্রাচীন মহর্ষিগণ এ দেশের লোকের শরীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে বহুবিধ উৎকৃষ্ট নিয়ম শাস্ত্রাদিতে বিধিবদ্ধ ও সমাজ দৃঢ়ভাবে প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। শরীর, মন এবং আত্মার উন্নতিকেই তাঁহারা প্রকৃত উন্নতি অথবা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। মনের, মস্তিষ্ক শরীরের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ; মন বিকৃত হইলে শরীর কিছুতেই সুস্থ থাকিতে পারে না, সুতরাং কেবল শরীরের উন্নতির যত্ন করিলে, শরীর কিছুতেই সুস্থ থাকিতে পারেনা। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশবাসীরা আমাদিগের একমাত্র শরীরের উন্নতির জন্য কিরূপ পরিশ্রমে চেষ্টা করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহাও আমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ হইতেছে অর্থাৎ বিলাত প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের অধিকাংশ শারীরিক উন্নতির নিয়মাদি আমাদের দেশে বিধিবদ্ধ করায় আমাদের শারীরিক উন্নতিও হইতে পারিতেছে না। এইরূপে আমরা বিরুদ্ধ শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া ও মানসিক উন্নতির জন্য যত্ন ও চেষ্টা না করিয়া দিনদিন ধ্বংসের যাইতেছি। অথচ আমাদের চক্ষের উপর দেখিতেছি যে, প্রাচীন মহর্ষিদের নিয়মাদি প্রতিপালন করিয়া আমাদের দেশের লোক বলিষ্ঠ, নিরোগী, দীর্ঘজীবী, ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বত্রই পরিচিত হইতেছেন। আর আমরা মহর্ষিদের সেই সমস্ত অমূল্য উপদেশ "কুসংস্কার" প্রভৃতি বলিয়া যতই ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিতেছি, ততই দিনদিন অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইতেছি। ফলতঃ আজকাল আমরা আমাদের বর্ত্তমান দুরাবস্থার বিষয় যতই চিন্তা করি, ধর্ম্মহীনতাই একমাত্র কারণ দেখিতে পাইয়া থাকি। ধর্ম্মভাব হীন হওয়ায় এদেশে ব্যভিচার, মদ্যপান, সহবাসে অনিয়ম ও অতিরিক্ত সহবাস, কুলটা সহবাস, উপদংশ পীড়া প্রভৃতি দুর্নীতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ ভিন্ন মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অভাবে বহুতর লোকের হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির ক্রিয়াও প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। ধর্ম্মভাব শিথিল হওয়াতেই এ দেশের লোকের কিরূপ ভাবে স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, দৃষ্টান্তস্থলে আজ একটিমাত্র প্রকৃত দুরবস্থার কথা এস্থলে উল্লেখ করিব। এই যে বিশুদ্ধ জলের অভাব বশতঃ নানা উৎকট পীড়াগ্রস্ত দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, ইহার প্রকৃত কারণ কি? একমাত্র ধর্ম্মহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ; অতি প্রাচীন কালের কথা বলিতেছি না, শাস্ত্র পুরাণাদি দোহাই দিতেছি না, কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও আমাদের পিতা পিতামহগণ ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে পুষ্করিণী, দীর্ঘি প্রভৃতি জলাশয় খনন করিয়া ভগবানের নামে উৎসর্গ করিতেন, সর্ব্বসাধারণে সেই বিশুদ্ধ জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন ও নানা রোগের হস্ত হইতে মুক্ত থাকিতেন। এ ভিন্ন ভগবানের নামে জলাশয় উৎসর্গ করায় কেহই জলকে কোন প্রকার দূষিত করিতে সাহসী হইতেন না। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে যে সকল জল পুষ্করিণী, দীঘি প্রভৃতিজলাশয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই আমাদের পিতা পিতামহগণ ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যে খনন করাইয়াছিলেন। আজকাল আমরা উন্নত ধার্ম্মিক, উচ্চশিক্ষিত, বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত, অপর লাট সাহেব দেখের, জজ, মেজিষ্ট্রেট, সম্পাদক, লেখক এরূপ কতকগুলি হইয়াছি, কিন্তু পিতা পিতামহ প্রভৃতি মহাত্মারা ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে যে সকল জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছিলেন, সে সকল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার পর্য্যন্ত করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ধর্ম্মহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ নয় কি? প্রাচীন মহাত্মাদের ন্যায় যদ্যপি আমাদের উন্নত ধর্ম্মভাব থাকিত, তবে কি আজ সমস্ত বাঙ্গালায় বিশুদ্ধ জলের এইরূপ অভাব হইতে পারিত।

বিশুদ্ধ জলের অভাবে অর্থাৎ দূষিত জল-পানে ওলাউঠা, জ্বর, আমাশয়, উদারাময় প্রভৃতি পীড়া উৎপন্ন হয়। এই দেশে এই শ্রেণীস্থ পীড়াতেই বহুতর সংখ্যক লোক প্রতি বৎসর অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে।

(২) দরিদ্রতা। রাজনৈতিক নানাবিধ কারণে ও এ দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের জাতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য কোনু প্রকার যত্ন ও চেষ্টা না থাকায় এ দেশ দিনদিন অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। যে দেশের বহুতর সংখ্যক লোক দুইবেলা পেট পুরিয়া অন্ন ভাত আহার করিতে পায় না, সে দেশের স্বাস্থ্য উন্নত থাকার আশা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। দুঃখীর স্বাস্থ্যরক্ষা ভালরূপে হয় না, নানাবিধ চিন্তায় ক্রমে আয়ু ও দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আর যখন হইতেই দরিদ্রতার সহিত মিত্রতা করিলে, দেহ কদাচও পূর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং অকালেই বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় অথবা সামান্য কারণেই শুষ্কতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়। পূর্ব্বে এ দেশের লোকের খাওয়া পরার ভাবনা ছিল না। এখন নানা কারণে সকলেরই "অন্ন চিন্তায়" দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় ও কি উপায়ে পরিবার প্রতিপালন করিবে, এই চিন্তায় সর্ব্বদা অস্থির হইয়া থাকিতে হইতেছে। নৈরাশ্য, দরিদ্রতা ও মানসিক উদ্বেগে আয়ু নাশ, স্বাস্থ্য নষ্ট ও দেহ অকালে পতন হয় ইহা স্থির সত্য। ফলতঃ এ দেশের দরিদ্রতা দূরীভূত না হইলে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়াও অসম্ভব। সুদেশহিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই দেশের দরিদ্রতা নিবারণের জন্য বিশেষরূপে যত্ন ও চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেবল সভা সমিতি করিয়া অল্প অর্থ বৃথা লুটাইলে দেশের কোনই উপকার হইবে না। যাহাতে জাতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হয়, এজন্য প্রত্যেক মহাত্মা ব্যক্তিরই সাধ্যানুসারে যত্ন ও চেষ্টা করা উচিত। দেশের দরিদ্রতা দূরীভূত হইলে স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইবে। এ দেশের লোক নিজেদের স্বাস্থ্য উন্নতি সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ নহেন, অর্থাভাব বশতঃই অনেকে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারিতেছেন না। অতএব দেশের ধন বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বাগ্রে যত্ন করা উচিত। যাহারা এ দেশের স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য চেষ্টা ও যত্ন করিতেন, তাঁহারা এ দেশের লোকের দরিদ্রতা দূরীভূত করিতে বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেন না কেন? এই

অফুরন্ত দয়ার মহিমা অমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

(৩) প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি ঘৃণা। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এ দেশবাসীগণের স্বাস্থ্যহীনতার ও অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রাচীন ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

(৪) বিলাসিতা। আধুনিক সভ্যতার এক প্রধান অঙ্গ বিলাসিতা। আমরা যতই পশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেছি, ততই আমাদের স্বাস্থ্যহীন হইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ছুকে পতিত হইয়া আমরা নিত্য নূতন নূতন বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতেছি ও কৃত্রিম সুখের ইচ্ছা আমাদের ক্রমেই প্রবল হইতেছে, বাসনা কিছুতেই মিটিতেছে না; এবং এই বাসনা মিটাইবার জন্য দিনদিন আমরা দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি। ফলতঃ বিলাসিতার নানা কারণে দেশে অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা কত বিষয়ে যে, আমাদের দেশের বালক, যুবা, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদের বিলাসিতা বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আধুনিক সভ্যতার কত মহিমা আছে, আমরা কয়টাই বা জানি, আর যাহা সামান্য জানি, তাহাই বা লিখিবার স্থান কোথায়! বিলাতী এক একটা দ্রব্যের গুণাগুণ ও আমাদের শারীরিক প্রকৃতি যদি সমভাবরূপে তিতা করিয়া দেখা যায় তবে দেখান যাইতে পারে যে, বিলাতী প্রত্যেক দ্রব্য আমাদের স্বাস্থ্যের ন্যূনাধিক পরিমাণে অনিষ্ট করিতেছে। বিলাতী পরিচ্ছদ, টাইট কোট, কলারের প্রভৃতি; বিলাতী লেবেণ্ডার, ওয়াডিকলম; পাউডার প্রভৃতি; বিলাতী নানারূপ খাদ্য প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ করিতেছে। এই যে আলোর জন্য আমরা ক্লেরোসিন তৈল ব্যবহার করিতেছি, ইহার ধূমে স্বাস্থ্যের যে কত অনিষ্ট হয়, তাহা বর্ণনাতীত। এ ভিন্ন বিলাতী সভ্যতার অনুরোধে এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করিয়া বহুতর অর্থ অনর্থক নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। বিলাত প্রভৃতি দেশের লোকেরা আমাদের অর্থ লুঠিয়া বড় মানুষ হইতেছেন, আর আমরা বিলাতী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্যহীন ও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি। দেশের এই শোচনীয় অবস্থার বিষয় একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেই, বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা সহজে বুঝা যায়। এ দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদিগের দোষেই দেশের এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাঁরা যদি দেশীয় দ্রব্যাদির প্রতি ঘৃণা না করিতেন,—জাতীয় শিল্প বাণিজ্যের জন্য প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিতেন এবং বিদেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করাকে সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া মনে না করিতেন, তবে এ দেশের অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকেরা কখনই এত বাহুল্যভাবে বিদেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে পারিতেন না। একে বণিকজাতিরা প্রতিনিয়ত তাঁহাদের দেশের দ্রব্যাদি এদেশে ব্যবহার জন্য সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাতে এদেশীয় উচ্চশ্রেণীর ও শিক্ষিত লোকেরা তাঁহার প্রশ্রয় দেওয়ায় এ দেশের নানা প্রকারে দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে।

(৫) বাল্যকাল হইতে কঠোর মানসিক শ্রম। আমাদের দেশে পূর্ব্বে টোলে ও পাঠশালায় ছাত্রগণ যথেষ্ট শ্রমের সহিত বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেন। প্রাচীন মহর্ষিগণ বালক ও যুবকগণের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিদ্যাশিক্ষার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। প্রাচীন কালের ছাত্রগণ সেই সমস্ত

নিয়মে জাতীয় বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়া স্বাস্থ্যও উন্নত রাখিতে সক্ষম হইতেন। আজকাল ইংরাজী বিদ্যালয়ে বালকগণের দেহ ও মন চিরকালের জন্য নিস্তেজ হইতেছে। পূর্ব্বে ছাত্রগণ জাতীয় ভাষা অধ্যয়ন করিতেন। জাতীয় ভাষা বাল্যকাল হইতে অভ্যাস করিতে তত কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইত না। আজকাল অতি শৈশবকাল হইতেই ছাত্রগণ বিজাতীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। বিদ্যালয়ের কঠোর পরিশ্রম, বিজাতীয় ভাষা অভ্যাস, খাদ্যের অপূর্ণতা ইত্যাদি কারণে শরীর অতি সহজেই ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে। যে বয়সে দেহের গঠন ও বর্দ্ধনপূর্ণ হইবার প্রয়োজন, যে বয়সে পূর্ণ আহার গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন, যে সময় বয়স অনুরূপ পরিমিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন, যে বয়সে দেহ গঠনের পূর্ণতা জন্য উপযুক্ত নিদ্রার প্রয়োজন; সেই বয়সে বালক ও যুবকগণ বাটী ছাড়িয়া বৃহৎ কোন নগরের একটী হোটেলে অথবা বাসাতে বাস করিতে আরম্ভ করে; কোনরূপ অসার, অপূর্ণ আহারে দিন কাটাইতে থাকে; আহার গ্রহণ করিয়া, পরিপাকের জন্য বিশ্রাম নাই, নিদ্রা নাই, শরীরের চালনা নাই, মানসিক উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা নাই, অথচ তাহার উপর অতি কঠোর বিজাতীয় ভাষা এক মনে এক ধ্যানে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ১৬ অথবা নিতান্ত অল্প বয়সে এণ্ট্রেন্স পাস করিতে হইবে, নতুবা উন্নতি নাই, এইরূপ নানা কারণে অল্পবয়স অতি অল্প বয়স হইতেই কঠোর মানসিক শ্রম করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। মাসিক পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, ষাণ্মাসিক পরীক্ষা, তৎপরে এণ্ট্রেন্স, এল্-এ, বি-এ, এম্-এ, বি-এল, পরীক্ষার ত্রাস, উৎসাহ, নিরুৎসাহ, দুশ্চিন্তা, অপমান, বিষাদ, রাত্রি জাগরণ, অপূর্ণ আহার ইত্যাদি নানা কারণে অল্পবয়স্ক বালকগণের শরীরে ও মনে বিশাল শিরঃ জন্মাইয়া, মন ও শরীরকে চিরকালের জন্য নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। পূর্ব্বকালে এ দেশে এ সকল ব্যাধিসাধক পরীক্ষার নিয়ম ছিল না। ছাত্র সদ্বিদ্যাশালী হইলে, গুরু উপযুক্ত উপাধি প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া ছাত্রকে বিদায় দিতেন। ষোড়শ বৎসর যে ব্যক্তি টোলে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইতেন, তিনি প্রাপ্ত বিদ্বান ও বিজ্ঞ হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু যিনি ১৬ বৎসর কাল বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথানুযায়ী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন, তিনি রুগ্ন, উৎসাহশূন্য ও ধর্ম্মনীতি বিহীন কেমন এক বিকৃত শরীর ও মন লইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইহাদের হৃদয়ে সাহস নাই, শরীরে বল নাই, চক্ষে জ্যোতি নাই, কেমন এক বিকৃত ভাব। এ ভিন্ন, ইহাদের ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়েও কোন দৃঢ় ভিত্তি দেখা যায় না। ভারতের প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই সমস্ত নানা কারণেই কম্পিটিটিভ্ সিস্টেম্ (Competetive system) প্রথা প্রচলন করেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে ম্যালেরিয়া, ডাক্তারী ঔষধ, সুরাপান ইত্যাদি কারণে এদেশবাসীগণের যে স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীতেও ক্রমশঃ আমাদিগকে সেইরূপ স্বাস্থ্যবিহীন করিতেছে। ভয়, উৎসাহ, নিরুৎসাহ ইত্যাদি কারণে মানসিক বৃত্তিগুলি উত্তেজিত ও অবসাদ হইয়া থাকে এবং এই সমস্ত কারণে বালক ও যুবকগণের স্বাস্থ্য দিনদিন ক্রমতরূপে হানি হইতেছে।

এ ভিন্ন আজকালকার পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা

এত বেশী ও দুরূহ যে অল্পবয়স্ক বালকগণ রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াও উঠিতে পারে না। এই পাঠ্য নির্ব্বাচনের দোষেও আমাদের অল্পমতি সুকুমার বালকগণের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। ফলতঃ আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া অধীর হইয়া পড়িতেছে। এ হতভাগ্য দেশের উপায় কি হইবে? যাঁহারা রক্ষক তাঁহারাই ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, আমরা কাহার নিকট দেশের এই ভীষণ দুর্দ্দশার কথা জানাইব? আশা ছিল দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদিগের সমীপে দেশের এই সমস্ত দুর্দ্দশার কথা জানাইয়া মনের ব্যথা নিবারণ করি, কিন্তু বিধাতার চক্রে এ দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা বিকৃত শিক্ষা ও সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া কেবল ফাঁকা বিষয় লইয়া দিবারাত্র অস্থির হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের "কর্ণবিবরে এই সকল কথা স্থানও পায় না!!

(৬) বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর বহুতর দোষ। অদ্য আমরা এ স্থলে "কিণ্ডারশিক্ষার সময়" সম্বন্ধে ২।৪টি কথা মাত্র বলিব। পূর্ব্বে প্রাতঃকালে ২।৩ ঘণ্টা এবং বৈকালে ২।৩ ঘণ্টা ও রাত্রি৯।১০টা পর্য্যন্ত ছাত্রগণ বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন, মধ্যাহ্নকাল আহার ও বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এদেশ উষ্ণপ্রধান বিধায় মধ্যাহ্নকাল কঠোর মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম অত্যন্ত কষ্টকর ও স্বাস্থ্যহানিকর। এ সময়ে বিশ্রাম ও সহজ কার্য্য ভিন্ন কঠোর কার্য্য স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। মধ্যাহ্নকালের পূর্ব্বে ১০ দণ্ডের সময় আহার করা এ দেশের নিয়ম ও স্বাস্থ্যকর; এ সময়ের আহারই আমাদের প্রধান আহার। রাত্রিতে লঘু আহার করা এ দেশের প্রচলিত প্রথা। বিলাতে (হিমপ্রধান দেশে) প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল অত্যন্ত কষ্টকর; শীতে লোক প্রায় জড়সড় হইয়া থাকে, এ সময় পরিশ্রম করা কি গৃহের বাহির হওয়া অত্যন্ত ক্লেশকর। মধ্যাহ্নকাল হিমপ্রধান দেশে কার্য্যোপযোগী সময়। সে দেশের লোকেরা প্রাতঃকালে লঘু আহার "ব্রেকফাষ্ট" করিয়া, বিদ্যার্থীগণ বিদ্যালয়ে ও কার্য্যার্থীগণ কার্য্যালয়ে গমন করে; সায়ংকালের পূর্ব্বে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করতঃ "ডিনার" অর্থাৎ প্রধান আহার করিয়া থাকে। এ দেশের বালক ও যুবকগণের যে সময় (মধ্যাহ্নকালে) পাকাশয় মধ্যে আহার্য্য পরিপাক হইতে থাকে, সেই সময় অঙ্কশাস্ত্রের পর্য্যালোচনায়, ভূগোল বৃত্তান্তের তত্ত্বাবধারণে, বিজাতীয় সাহিত্য শাস্ত্রের বিবৃতি করণে বা অন্যবিধ কঠোর মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকে। মন ও শরীর উপযুক্ত বিশ্রাম না পাওয়ায় আহারীয় পদার্থ উপযুক্তরূপে পরিপাক হয় না। এইরূপে পাকাশয়ের ক্লান্তি জন্মে। প্রতিদিন এই ক্লান্তির জন্য ক্রমে অগ্নিমান্দ্য হয় ও আহার কমিয়া যায়। ক্রমে অজীর্ণের জন্য বালকের শারীরিক শক্তির হ্রাস হয় এবং ক্রমে মাথাঘোরা, দৃষ্টিহীনতা ও বুদ্ধিহীনতা ইত্যাদি নানা পীড়া উপস্থিত হয়। বালক ও যুবকগণ বিদ্যালয়ে যতই উন্নত হইতে থাকে, ততই ক্রমে স্বাস্থ্যহানি উপস্থিত হইয়া পড়ে। এই ভাবে এ দেশের ছাত্রগণের শরীর ও মন দিনদিন নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ফলতঃ আর্দ্ধকালকার শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সবল সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী লোক নাই বলিলেও হয়। দেশের এই শোচনীয় অবস্থার কথা কেহ যে বড় চিন্তা করেন এমত বোধ হয় না। কারণ ইহার প্রতিকার উদ্দেশ্যে কাহাকেও কোন প্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিতে দেখিতে পাই না।

এই সমস্ত নানা কারণে এ দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদিগের যেরূপ গুরুতর ভাবে স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, শীঘ্র ইহার প্রতিকার না হইলে ৪।৫ পুরুষ পরে এ জাতির অস্তিত্ব থাকিবে কি না, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। এ দেশের বড় বড় ডাক্তার ও শিক্ষিত মহোদয়েরা বড় বড় কথাই ভাবেন, কিন্তু এদিকে যে ভিতরে ভিতরে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা কিন্তু কেহই তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন না।

(৭) অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবন। পাশ্চাত্য সভ্যতা যতই খরতর বেগে অগ্রসর হইতেছে, ততই এ দেশের লোক-লজ্জা, সমাজ-বন্ধন ও প্রাচীন রীতিনীতি ইত্যাদির মাথা খাইতেছে। অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে এ দেশের যে কি মহান্ অনিষ্ট হইতেছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা অসাধ্য! যে দেশে কালাকাল, পাত্রাপাত্র, সময় অসময় বিবেচনা না করিয়া লোক ঋণ, স্থায়ী নরকবৎ ইন্দ্রিয় সেবনের জন্য অনুক্ষণ লালায়িত, সে দেশের লোক মহা জরাগ্রস্ত বা একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত না হইয়া, কেবল দেহেই জীবিত আছে, ইহাই করুণাময় ঈশ্বরের অশেষ দয়া বলিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ "পুত্রের জন্য ভার্য্যার প্রয়োজন" মনে করিতেন, পুর্ব্বে "বংশরক্ষা হইলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু হায়! আজকাল আমরা "অজ্ঞতার মোহে মুগ্ধ হইয়া অনুক্ষণ পাশব সুখভোগকেই বিবাহের প্রয়োজন করিয়া তুলিয়াছি। এ দেশের যুবকগণ নানা কুৎসিৎ কুসংসর্গে পতিত হইয়া যে সকল উপায়ে অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবন করিয়া থাকে, তাহা কেহ কেহ "সুরুচির" বিরুদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করেন, কিন্তু এদিকে যুবকগণের অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে সর্ব্বনাশ হইতেছে। এই অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে এ দেশের যুবকগণের যে কত প্রকার উৎকট ও দুরারোগ্য পীড়া উৎপন্ন হইতেছে তাহার নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য।

(৮) ডাক্তারী ঔষধ সেবন। বিলাতী তেজস্কর ঔষধ বাহুল্যরূপে আমরা ব্যবহার করায় আমাদের স্বাস্থ্য গুরুতর ভাবে নষ্ট হইতেছে। আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসী ও আমাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে শীতপ্রধান দেশবাসীদের হইতে ভিন্ন। শীতপ্রধান দেশবাসীর লোকের শরীরের পক্ষে উপকারী ও পরীক্ষিত ঔষধ আমাদের কখনই স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময় শিশুদের জন্মের দিন হইতেই সেই সকল তেজস্কর ও সুরাঘটিত ঔষধ অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করায়, আমাদের শিশু, বালক ও যুবকগণের স্বাস্থ্য দিনদিন গুরুতর ভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অনেক সময় সামান্য সামান্য পীড়ায় অতিরিক্ত ঔষধ সেবনেও বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। যে সকল পীড়ায় সামান্য গাছগাছড়া ব্যবহার, কি একটু নিয়ম পালন করিলেই আরাম হইতে পারে, আমরা আজকাল সেই সকল পীড়াতে অনেক সময়ে বিলাতী ঔষধ বাহুল্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। এইরূপে ডাক্তারী তেজস্কর ঔষধে আমাদের স্বাস্থ্য দিনদিন গুরুতর ভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এ সম্বন্ধে বহুতর তত্ত্ব ইতিপূর্ব্বে অনুসন্ধান পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। বর্ত্তমান মেডিকেল কংগ্রেসে ডাক্তার মহোদয়গণ যে সকল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও আন্দোলন করিয়াছেন, তাহাতে ডাক্তারী চিকিৎসা-প্রণালী, ডাক্তারী স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ডাক্তারী তেজস্কর ঔষধ যাহাতে আরও বাহুল্য ভাবে এ দেশে প্রচলন হয়, তাহারই উপায় করা হইতেছে

অথবা হইবে। এ'স্থিত বিলাতী নানাপ্রকার ঔষধ এদেশে বিক্রয় করিয়া যাহাতে বিদেশবাসীগণ আরও ধনবান হইতে পারেন ও বিলাতী রমণীগণের নৃত্য সংস্থান হয়, ইহাই উক্ত সভার নিগূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়া আমরা মনে করি। যদি এ দেশের স্বাস্থ্য উন্নতিই সভার উদ্দেশ্য হইত, তবে তাঁহারা এ দেশের প্রাচীন স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অবশ্য আলোচনা ও আন্দোলন করিতেন ও এ দেশীয় ঔষধ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। এ সম্বন্ধে বহুতর কথা আমাদের স্বতন্ত্র প্রস্তাবে সবিস্তার বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(৯) শারীরিক শ্রমের অভাব। অতি শৈশবকাল হইতেই এ দেশের বালকগণ একমাত্র বিজাতীয় ভাষায় কৃতবিদ্য হওয়ার জন্য, সর্ব্বদা মানসিক চিন্তা করিয়া থাকে, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম মাত্রেই করে না অথবা শারীরিক পরিশ্রম করার যথেষ্ট সময় ও সুবিধা প্রাপ্ত হয় না। শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া পড়ে। শরীরে বল না থাকিলে উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি ইত্যাদি কিছুই থাকে না, এবং শরীর ক্রমশঃ রুগ্ন ও নানা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অকালে নিধন প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান সময় এ দেশের রাজপুরুষগণ ও শিক্ষিত মহোদয়গণ এ দেশের বালকগণের ব্যায়ামের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যুবকগণের শারীরিক বল উন্নতির জন্য যত্ন ও চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু দরিদ্রতা বশতঃ এ দেশের যুবক ও বালকগণের যে অতি গুরুতর ভাবে স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, এ সম্বন্ধে বড় কেহই কোন কথা বলেন না বা ইহার প্রতিকার জন্য কেহই কোন চেষ্টা করেন না, ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। ফলতঃ সর্ব্বাগ্রে এ দেশের দরিদ্রতা যাহাতে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা ও যত্ন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য; নতুবা সমস্ত নিয়ম ও ব্যবস্থাই বৃথা হইবে।

(১০) রেলওয়ে। রেলওয়ের রাস্তা প্রভৃতিতে জল আবদ্ধ হওয়ায়, নিম্ন ভূমিতে জল বসিয়া যাওয়ায়, সেই স্থান হইতে এক প্রকার বাষ্প উত্থিত হয়। সেই দূষিত বাষ্প, মানব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর ইত্যাদি নানা পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। রেলওয়ের রাস্তায় জল আবদ্ধ হওয়ায় যে মেলেরিয়া বিষ উৎপন্ন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বহুতর তত্ত্ব এ দেশের মনীষী ব্যক্তিগণ আলোচনা ও আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এ স্থলে এ সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্মানুষ্ঠান কুসংস্কার নহে।

পাশ্চাত্য বিদ্যাবিশারদ এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা সাধারণের ধর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রকেই কুসংস্কার বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গীয় জাতিগত পার্থক্যাদিও তাঁহারা কুসংস্কার বা কুনীতির পরিচায়ক বলিয়া অথবা বাগাড়ম্বর করিয়া থাকেন।

রোগ—বিকৃতিভাবাপন্ন যাঁহাদের নয়ন, তাঁহারা একরূপ পদার্থকে অন্যরূপে দেখিতে পান্ ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম। অজ্ঞানতা রোগে জ্ঞাননেত্র যাহাদের সম্যক্ আক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে সুসংস্কারকে কুসংস্কাররূপে এবং সুনীতিকে কুনীতিরূপে অবলোকন করা, বিস্ময়ের বিষয় কি? ধর্ম্ম যে এক অতীব উপাদেয় জিনিষ ইহা অধিকাংশ লোকেই স্বীকার করিয়া থাকেন।" যদি তাহা না হইবে তবে বহু শ্রমলভ্য প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়তর ধনরাশি, ধর্ম্মার্জনার্থ কেহ অকাতরে ত্যাগ বা দান করিত কি না? সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল।

ধর্ম্ম যদি পরমোপাদেয় পদার্থ না হইবে, তবে শীত-গ্রীষ্মের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, আর্য্যঋষিগণ ধর্ম্মার্জনার্থে গহন কাননে আশ্রয় লইতেন কি না? সে বিষয়েও বিশিষ্টরূপই সন্দেহ থাকিত।

আহার নিদ্রা প্রভৃতি বৈষয়িক ভোগ-বিলাস সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয়ার্থ কেহ কঠোর নিয়ম-তৎপর হইত কি না? তাহাও সহজ বোধগম্য।

ধর্ম্ম যদি চরমে পরম সুখকর পদার্থ না হইবে, তবে আর সকল দেশে, সর্ব্ব সম্প্রদায়ে আবহমান কাল যাবৎ (বিভিন্ন প্রকারে) ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথা প্রচলিত থাকিত না এবং স্বধর্ম্মে আঘাত লাগিলে, সম্প্রদায়-শুদ্ধ সকল লোক ক্ষেপিয়া উঠিত না।

অন্ততঃ এক বা দুই সম্প্রদায়েই যদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে হয়ত তাহাদিগকে কুসংস্কারী বলিতে হইলে বলা যাইতে পারিত। যখন যাবতীয় জনমানবকেই এক একরূপে ধর্ম্মাশ্রিত দেখিতে পাই, আরণ্যক বর্ব্বর জাতিগণ মধ্যেও যখন ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইতে দেখিতে পাই; উন্নত মানব হইতে নীচ মানব পর্য্যন্ত প্রায় সকলেরই যখন ধর্ম্মের নিকটে মস্তকাবনত করিতে দেখা যায়, তখন আর ধর্ম্মানুষ্ঠানকে কুসংস্কার বলিয়া কিরূপে স্বীকার করিব?

অধিকাংশ লোকের যাহা সম্মত, তাহা কুনীতি হইলেও সুনীতির মধ্যে পরিগণিত এবং কুসংস্কার হইলেও সুসংস্কার মধ্যে গণ্য, এ কথা সভ্য জগতের অনুমোদিত। আমি ঐ কথা দ্বারাই যে "ধর্ম্মানুষ্ঠান-কুসংস্কার নহে" ইহা প্রতিপাদন করিতেছি তাহা নহে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের যে সকল নিয়ম পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহা দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে যে "ধর্ম্মানুষ্ঠান কুসংস্কার নহে।

পূর্ব্বোক্ত কুসংস্কারবাদীদের মতে, আর্য্যজাতিই নাকি, অধিকতর কুসংস্কারী বলিয়া পরিগণিত, আর্য্যধর্ম্মই নাকি অধিকতর কুসংস্কার বিশিষ্ট?

তাই এ প্রবন্ধে আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দুটী একটী কথা বলিয়া ঐরূপ অযথা বাদের অযাথার্থতা প্রদর্শন করাইতে যত্ন করিব।

পক্ষপাত-শূন্য—সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে, আর্য্যধর্ম্মের-মধ্যে কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই যেন কি এক অলৌকিক মাধান রহিয়াছে বলিয়া উপলব্ধি হয়। আর্য্যগণ জাতিভেদ স্বীকার করিতেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে কুসংস্কারী বলা যায় না; যেহেতু পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীব জন্তুগণ মধ্যেই জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাই। ভূচর, খেচর, জলচর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে দিকেই দৃষ্টি করি, সেই দিকেই যখন আচার ব্যবহার, আহার বিহারে স্ব স্ব জাতিগত প্রার্থক্য দেখা যায়, তখন মনুষ্যগণ মধ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকাটা বিচিত্র বিষয় বলিয়া যেন বোধ হয় না। তবে পশু পক্ষী অপেক্ষাও যাহারা জঘন্য, তাহাদের পক্ষে জাতিভেদ হয়ত ভাল বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে পারে।

যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বদর্শী মহাত্মা, তাঁহাদের নিকট জাতিভেদ প্রথা কদাচও নিন্দনীয় নহে। অভিনিবেশের সহিত আর্য্যজাতির আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে, কুসংস্কারের পরমাণুমাত্রও কোন স্থলে পরিলক্ষিত হয় না। উপাসনার সময় আর্য্যগণ ক্ষৌম বস্ত্রাদি পরিধান ও নামাবলী, উত্তরীয় বসন, রুদ্রাক্ষ, বিভূতি প্রভৃতি ধারণের যে সকল নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনটীও কুসংস্কারমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

কোথাও বেড়াইতে যাইতে হইলে বা কোন সমাজ বিশেষে গমন করিতে হইলে অথবা কাছারি প্রভৃতি রাজকীয় কার্য্য-ভবনে গমন করিতে হইলে, যদি এক একরূপ বিভিন্ন প্রকার পোষাক পরিচ্ছেদের প্রয়োজন হইল, তবে উপাসনার সময় পবিত্র ক্ষৌম বসন, নামাবলী প্রভৃতি গ্রহণে, পোষাক পরিবর্ত্তন জন্য আর্য্যগণকে দোষী বা কুসংস্কারী বলা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

স্থান, আসন, বসন প্রভৃতির সহিত মনের গতির অনেক নৈকট্য সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়; বিচারপতিগণ যখন রাজকীয় বসন ভূষণে বিভূষিত হইয়া উচ্চাসনে উপবিষ্ট হন, তখন তাঁহাদের মানসিক ভাব যেরূপ হইয়া থাকে, সাম্যভাবে গৃহে অবস্থিতির সময় সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না, যোদ্ধাগণ রণসাজে সজ্জিত হইয়া করে খরশাণিত অসিশস্ত্র ধারণ করিয়া কটিবদ্ধ আঁটিয়া, যে সময় সমর-প্রাঙ্গনে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে, সে সময় তাঁহাদের মনের গতি যেরূপ হয়, অন্য সময় কি সেইরূপ থাকে? তাহা কখনও নহে।

তাই আর্য্যগণ স্থানাসন বসনাদিভেদে মানসিক গতির প্রার্থক্যানুভব করিতে পারিয়া, ঈশ্বরোপাসনার সময়ও তদুপযোগী মানসিক ভাবোদ্দীপক স্থানাসনাদির ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া, জগতের পরম মঙ্গল সংসাধন করিয়া গিয়াছেন।

কোট পাণ্টুলান ছাড়িয়া, ক্ষণকালের জন্য তসর, গরদ, নামাবলী ধারণ করিলে, সহজেই মানসিক গতির পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এই কারণে, আর্য্যধর্ম্মকে যাহারা কুসংস্কারমূলক বলিয়া থাকে, তাহাদের কথা আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না।

আর্য্যজাতির ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত শারীরিক স্বাস্থ্যেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে; ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকগণও তাহা অম্লান-বদনে স্বীকার করিতেছেন।

রুদ্রাক্ষ-মালা ধারণ করিলে পক্ষাঘাত প্রভৃতি উৎকট রোগের আশঙ্কা থাকে না এবং তুলসীগাছের ম্যালেরিয়াদি নিবারক মহান্ গুণ সকল ইংলণ্ড হইতে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ঘোষণা করিতেছেন এবং যত্নের সহিত তুলসী কানন স্ব স্ব গৃহ-প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন।

প্রতিপদ প্রভৃতি পঞ্চদশ তিথিতে আর্য্যগণ যে পঞ্চদশ দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন, তাহাও নব্য রাসায়নিকগণ কর্ত্তৃক ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে।

তিথি নক্ষত্রাদির সহিত শারীরিক ও রাসায়নিক যোগ চিরপ্রসিদ্ধ, নিষিদ্ধ তিথিতে নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শারীরিক বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। ঐরূপ ব্যভিচারেই সম্প্রতি জ্বরারোগ্য রোগ সকল সংক্রমিত হইতেছে এবং অকাল মৃত্যু প্রভৃতি হইতেছে বলিয়া অনেক প্রাচীন জ্ঞানবানগণ বলিতেছেন; যে দেশে যে জাতির যেরূপ আচার ব্যবহার আবহমানকাল যাবৎ প্রচলিত, তাহার ব্যত্যয়ে ঐরূপ অন্যায়, দৌর্কল্য প্রভৃতি সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বা অসঙ্গত বলিয়া যেন বোধ হয় না।

অজ্ঞানতাই সকল অনর্থের মূল; অজ্ঞানতা প্রণোদিত হইয়াই মূর্খ মানবগণ ধর্ম্মানুষ্ঠান, প্রথাকে কুসংস্কারমূলক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। যাঁহারা প্রজ্ঞাবান তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সদসৎবিচারে সক্ষম। রামের শ্যামের কথায় ধর্ম্মানুষ্ঠান কুসংস্কারমূলক হইতে পারে না। যতদিন অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে, ততদিন পর্য্যন্তই মানবগণ সদসৎবিচারে বিমুখ থাকে, তাহা অপনোদিত হইলেই সকল ভ্রম অপসারিত হয়।

ধনরত্ন, রাজ্য, সাম্রাজ্য কিছুইত কাহারও সঙ্গে যাইতে দেখা যায় না, স্ত্রীপুত্র বন্ধু-বান্ধবাদি সকলই ত দু'দিনের সঙ্গী, যেদিন নয়ন মুদিয়া ধরায় মহাশয়ন করিবে, সেদিন হইতে আর কাহারও সহিত কোন সংস্রব থাকিবে না। মনু বলিতেছেন,—

"মৃতশরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমংক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥"

মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া (অথবা অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া) বান্ধবগণ বিমুখ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, ধর্ম্মই তোমার (দেহীর) অনুসরণ করিবে, এরূপ আত্ম-সহায় আর কি কেউ আছে? আহা! এ হেন চির-সম্বলকে কুসংস্কার বলা কি সহজ অজ্ঞানতার কার্য্য? ভ্রান্ত মানব মনু তো দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না, নশ্বর সুখের তরে সতত লালায়িত, অর্থমদে পরমার্থ জ্ঞানশূন্য, এই অভিমান-মত্ততা, অহঙ্কার একদিন অবশ্যই অপসারিত হইবে এবং পরিতাপানলে অবশ্যই পুড়িয়া মরিতে হইবে।

ধর্ম্মবিহীন, মানবে আর পশুতে পার্থক্য কিছু নাই। আহার নিদ্রা ভয়াদি পশুরও যেরূপ, মানবেরও সেইরূপ; পশু অপেক্ষা মানবের বিশেষ গুণই ধর্ম্ম।

প্রকৃত মনুষ্যত্বই ধর্ম্মানুষ্ঠান। যে মানব কখনও রসগোল্লার রস আস্বাদন করে নাই, সে কিরূপে তাহার রস তারতম্য করিবে? ধর্ম্ম-রসানভিজ্ঞগণও সেইরূপই ভাল মন্দের তারতম্য করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং "কু"কে "সু" এবং "সু"কে "কু" বলিয়া থাকে।

সমুদ্রের জলপানে যেরূপ লবণের অস্তিত্ব বুঝা যায় সেইরূপ ভাল করিয়া ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেও তন্নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ভালরূপে বুঝা যাইতে পারে। বিশেষরূপ চর্চ্চা না করিয়া অধিক অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন না করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের উপাদেয়ত্ব অনুপাদেয়ত্ব কখনই অনুভূত হইতে পারে না।

কেবল আর্য্যধর্ম্ম কেন, অধিকারী ভেদে কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মও কুসংস্কারমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

মই, বাঁস, দড়ি প্রভৃতি নানাবিধ উপায় দ্বারা যেমন অট্টালিকার ছাদে উঠা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের নিকটে পঁহুছিবারও নানাবিধ

উপায় আছে। বিভিন্নরূপ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই সেই উপায়, প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই সেই সেই সম্প্রদায়কে স্বস্ব পথ দেখাইতেছে। নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পথাবলম্বীগণ অবশ্যই ঈশ্বর সমীপে অগ্রসর হইতে পারে সন্দেহ নাই। একই জল যেমন বারি, পানী, ওয়াটার প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত হয়, সেরূপ একই ঈশ্বর দেশ, জাতি, সম্প্রদায় ভেদে হরি, ব্রহ্ম, আল্লা, জিহোবা প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়েন। বিভিন্নতা স্বীকার করিলেও, একটী দীপ হইতে শত শত দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করিলে যেমন সকল দীপই সমশক্তিশালী হইয়া থাকে, সেরূপ হরি, দুর্গা, কালী, ব্রহ্ম, আল্লা প্রভৃতি অধিকারী বিশেষের পক্ষে সমমঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকেন। তবে এইমাত্র প্রভেদ বলা যায় যে, শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণাদি কাচপাত্রে আবৃত প্রদীপবৎ এক একটী ধর্ম্মালোক এক একরূপ স্বঙ্গে ধর্ম্ম আলোকিত করিতেছে।

যাহার পক্ষে যেরূপ বর্ণের আলো হিতজনক (ঈশ্বর সুবিধিকারক) তাহার পক্ষে তৎতৎ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ তাহাই নির্দ্দিষ্টরূপে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট যাহা, তাহাই সকল-সম্প্রদায়ের সর্ব্বথা হিতজনক।

স্থিরপ্রচলিত বংশানুগত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কাহারও অন্য ধর্ম্মাবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। স্বয়ং ভগবানের উপদেশ—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"॥

অন্ধ, অজ্ঞলোককে পথ প্রদর্শন করাইতে পারে না, যাঁহারা পথপ্রদর্শক তাঁহারা চক্ষুষ্মান, নয়ন বান—লোকের কথা মান্য না করিয়া যদি অন্ধগণ বিচরণ করে তবে কূপাদিতে পতন ত তাহাদের স্বতই সম্ভবপর। সেইরূপ তত্ত্বদর্শী মহাত্মাদের অনাদিষ্ট উপদেশ উপেক্ষাকারীদের অধঃপতন ত অবশ্যম্ভাবী। অন্ধকূপের সন্নিহিত হইতেছে দেখিলে, স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়া সকলেই যাইতে নিষেধ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবানও বিপথগামী— অজ্ঞানান্ধ মানবদের হিতার্থে ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছেন। যিনি সেই পরমার্থযুক্ত উপদেশানুসারে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিবেন, তাহার যে পরম মঙ্গল সংসাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? একটী প্রাচীন প্রসঙ্গ মনে হইল, কোন এক কাঠুরীয়া কাষ্ঠাহরণার্থ এক অরণ্যে গিয়াছিল, দৈবাৎ এক সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, সাধু মহাত্মা তাহাকে অগ্রসর হইতে বলিল, তদনুসারে অগ্রসর হইয়া সেই কাঠুরীয়া কতকগুলি চন্দনকাষ্ঠ পাইল,পরে মনে মনে চিন্তা করিল যে, সাধু ত আমাকে চন্দনকাষ্ঠের কথা বলেন নাই, বলিয়াছিলেন অগ্রসর হইতে,আরও অগ্রসর হওয়া উচিত মনে করিয়া, যখন আরও খানিক দূরে পঁহুছিল, তখন এক তাম্রখনি প্রাপ্ত হইল, ক্রমে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব রত্নরাজি পাইতে লাগিল।

রৌপ্য, স্বর্ণ, হিরক, মণি-মাণিক্য বহুতর ধন পরিপ্রাপ্ত হইয়া সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরবৎ অতুল-ঐশ্বর্য্যে পরমসুখে কাঠুরীয়ার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে থাকিল।

সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যে যিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিবেন, পরিণামে যে তিনি অতুল ধনে ধনী হইবেন,সে কথায় কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ইদানীন্তন ধর্ম্মিকগণ মধ্যেও ক্রমশঃ উন্নতি ও সর্ব্ববিষয়ে নির্ম্মল শান্তি সম্যক্ দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত নির্ম্মলানন্দ অনুভব করা যায় না; রোগ, শোক, পরিতাপ প্রভৃতির প্রতিরোধক একমাত্র ধর্ম্ম, সুতরাং ধর্ম্মানুষ্ঠান কোন সম্প্রদায়েরই কুসংস্কার-মূলক নহে।

শ্রীরোহিণীকান্ত বিদ্যাভূষণ।

নিশীথে।

(১)

নীরব কানন মাঠ নিশীথ বেলা।
নীরব সে পাপিয়ার মধুর স্বরা।
রজত জোছনা রাশি,
সোহাগেতে হাসি হাসি,
পড়িয়ে ধরার গায় করিছে খেলা।
নীরব কানন মাঠ নিশীথ বেলা॥

(২)

কাঁপিছে পাদপরাজি ধীর সমীরে।
দোছুল ব্রততীকুল দুলিছে ধীরে।
বিকচ কুসুমদল,
বিতরিছে পরিমল,
হেলে দুলে-নেচে নেচে পবন-ভরে।
নাচিছে প্রকৃতি রাণী ধীর সমীরে॥

(৩)

হেন কালে দূরমাঠে মধুর স্বনে।
কে যেন ধরিল গান আপন মনে।
অসীম দিগন্ত ভরি,
বিথারিল সে লহরী,
মোহিল পরাণ মন পশি মরমে।
কে যেন গাহিতেছিল মধুর স্বনে॥

(৪)

পরাণ পাগল করা অমিয় তানে।
কে যেন ছায়ার মত উদে পরাণে।
নিথর হৃদয়পটে,
কি স্মিরিতি জেগে উঠে,
দেখেছিনু যারা বুঝি কোন্ স্বপনে।
(কবে কোন্ কালে কিছু নাহিক মনে॥)

(৫)

সুধু মনে হয় কবে দূর অতীতে।
এইমত একদিন চাঁদনী রাতে।
এই গান এই সুরে,
এমনি এমনি করে,
কে যেন কে গেয়েছিল বাঁশীর সাথে!
কবে যেন একদিন চাঁদনী রাতে॥

(৬)

শুনিতে লাগিনু গান বিভল প্রাণে।
ভুলিয়ে জগৎ কথা ভুলি আপনে।
গীতস্বর ক্রমে হায়,
নীরব হইয়ে যায়,
তবু যেন মনে হয় জাগে শ্রবণে।
আজিও সে স্বর যেন বাজিছে প্রাণে॥

শ্রীমনোজমোহন বসু, বি-এ।

আত্মতত্ত্ব।

শিষ্য।—এইবার আপনার উপরোক্ত মীমাংসার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছি; এক্ষণে জন্মান্তর ও পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল স্বীকার না করিলে, কোন্ বিষয় অসামঞ্জস্য হয় ও কোন্ কোন্ বিষয়ের কারণ নির্ণয় হয় না, তাহাই বিশদরূপে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু।—১। পশু ও মানব উভয়ই প্রকৃতির সন্তান; পশুদিগের দৈহিক উন্নতি আছে, মানসিক উন্নতি নাই; মানবের কর্ম্মফল যদি আত্মায় সঞ্চিত না হইত, তবে মানবেরও পশুর ন্যায় মানসিক উন্নতি হইত না। পশুতে আত্মার স্বরূপের আভাসের বিকাশ নাই, মানবে তাহার আভাস আছে। ঐ আভাস দ্বারা প্রকৃতি মাতার গর্ভ হইতে বুদ্ধির স্বাধীন ক্রিয়া প্রসূত হয় ও তজ্জনিত কর্ম্মফল হইতে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা প্রকৃতির ক্রোড়ে বিকাশিত হইয়া তাহাদের সারসংগ্রহরূপ গুরুত্বাত্ম আত্মাভাসের সহিত লোকান্তরে নীত ও আত্মিক বীজে (অর্থাৎ কারণাত্মায়) সঞ্চিত হয় এবং পুনরাত্মাভাসের সহিত ঐ সারসংগ্রহ ইহলোকে পুনরাগত হইয়া সংসারে পরিণত এবং অনুশীলন দ্বারা তাহার বিকাশ ও নব নব কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। পশুতে আত্মার স্বরূপ আভাস না থাকায় স্বাধীন ক্রিয়ার বিকাশ ও কর্ম্মফল আত্মায় সঞ্চিত হয় না; পশুর কর্ম্মফল সাধারণতঃ প্রাকৃতিক উপাদানে সঞ্চিত হইয়া দৈহিক ও অঙ্গ কামিক ক্রিয়ার উন্নতি হয়, কিন্তু শত অনুশীলনেও বুদ্ধি, বিবেক ও পরজ্ঞানাত্মী বৃত্তির বিকাশ হয় না। অন্তর্জগতে বুদ্ধির ও বিবেকের ক্রিয়া না থাকিলে মানবে উহা কোথা হইতে আইসে? মন, বুদ্ধির বীজ না থাকিলে কেবল অনুশীলন দ্বারা তাহার বিকাশ হইতে পারে না; অতএব সাংখ্যের অচেতনা প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবোৎপত্তি অসম্ভব।

শিষ্য।—আমি এইস্থানে একটু বাধা দিতে বাধ্য হইলাম; যদি অচেতনা প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবোৎপত্তি অসম্ভব হয়, তবে অচেতনা প্রকৃতি হইতে চেতনবিশিষ্ট পশু পক্ষী আদির উৎপত্তি হইবে কি প্রকারে?

গুরু।—কে বলিল অচেতনা প্রকৃতি হইতে পশ্বাদির উৎপত্তি হয়? চিৎশক্তি যোগে প্রকৃতির চেতনা হয়, সেই চেতন প্রকৃতি হইতে পশ্বাদির উৎপত্তি হয়। তবে চেতন স্বভাবের কর্ম্মফল ঐ চেতন প্রাকৃতিক উপাদানে সংমিশ্রিত হইয়া জীবের ক্রমোন্নতি হইতে থাকে; কিন্তু আত্মার স্বরূপ আভাস ব্যতীত বিবেক ও বুদ্ধির বিকাশ এবং তজ্জনিত কর্ম্মফল আত্মায় সঞ্চিত হয় না, অর্থাৎ আত্মাভাস রূপ বিবেক ও চিন্তা যোগ ব্যতীত কর্ম্মসহায়া পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, পশুদিগের কর্ম্ম প্রাকৃতিক উপাদানেই লীন হয়। প্রকৃতপক্ষে চেতন প্রকৃতি ব্যতীত অচেতন প্রকৃতির পিপীলিকা হইতে মনিব পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীবোৎপাদনের ক্ষমতা অসম্ভব ও অযৌক্তিক। চিদাভাস দ্বারা প্রকৃতির যেরূপ বিকাশ হইবে, ইহজগতে সেইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হইবে। ইহারই নাম স্বভাবের উন্নতি অবনতি; তন্নিম্ন মানবের উন্নতি অবনতির কার্য্য-প্রণালী কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ যেহেতু

মানবে আত্মাভাস বিকাশিত হওয়ায় ঐ আভাস (বিবেক ও চিন্তা) যোগে কর্ম্ম, আত্মায় সঞ্চিত হইয়া পরিপাকান্তে তাহার সারাংশ পুনঃ আত্মাভাসের সহিত ইহলোকে নীত হয় এবং বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মিক বীজে পরিণত হয়। এই জন্যই বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল ও অভিজ্ঞতার সংস্কার হইতে বুদ্ধি, জ্ঞানাঙ্গী ও কার্য্যকারী বৃত্তির বিকাশ হওয়ায় মানবেই ক্রমোন্নতির নিয়ম (Progressive law) আছে। কর্ম্ম হইতেই মানবের পূর্ব্বজন্মের সহিত পরজন্মের সম্বন্ধ ও ব্যক্তিনিষ্ঠত্ব (Identity) সংরক্ষিত হয়। আত্মা এক, কেবল কর্ম্ম হইতেই মানবের স্বাতন্ত্র্য; এই কর্ম্মই যে মানবের মানসক্ষেত্রের বীজস্বরূপ এবং উহাই যে পুনর্জ্জন্মের হেতুভূত, তাহা নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে যথা।—

২। পিতার সহিত পুত্রের ভ্রাতার দৈহিকাকারের অধিকাংশ সাদৃশ্য থাকে, এমন কি উভয় ভ্রাতার মধ্যে কে রামু কে শ্যাম চেনা যায় না। কিন্তু উভয়ের মনের কার্য্যকারী ও জ্ঞানাঙ্গী বৃত্তি, বুদ্ধি এবং বিবেক উহাদের মধ্যে এতাদৃশ বিসদৃশ হয় যে, উহারা এক বংশের লোক বলিয়া অনুভূত হয় না। উভয় সহোদর তুল্যভাবে লালিত পালিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া কেহ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, কেহ নির্ব্বোধ, কেহ সচ্চরিত্র, কেহ অসচ্চরিত্র, কেহ শান্ত, ধীর, সৌম্য, কেহ দুর্ব্বৃত্ত, চঞ্চল, উদ্ধত, কেহ ভীরু, কেহ সাহসী হয়। এমন কি উভয় যমজ পুত্র একই ব্যক্তির তত্ত্বাধীনে ও এক শিক্ষকের শিক্ষাধীনে থাকিয়াও ঐ প্রকার ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়। পূর্ব্বজন্মের অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মফল জনিত সংস্কার ব্যতীত উহার অন্য কোন সন্তোষজনক হেতু আছে কি?

৩। এক পিতামাতার দুইটী বালক সমান বুদ্ধিমান ও সমান ভাবে শিক্ষার সুযোগ সত্ত্বে একের অক্ষশাস্ত্রে, অন্যের সাহিত্যে; এক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান [illegible] ইতিহাসে অধিক প্রবৃত্তি হয় ও যাহার যে দিকে অধিক প্রবৃত্তি, সে অল্প শিক্ষায় সেই বিষয়ে অধিক পারদর্শী হয়। কেহ বাল্যকাল হইতেই গীত-বাদ্যে, কেহ সাহিত্যে, কেহ দর্শনে, কেহ বিজ্ঞানকর্ম্মে অধিক পারদর্শী হয়; যেন মস্তিষ্কায় প্রোথিত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গুপ্ত সঞ্চিত রত্নের আবরণী মস্তিষ্কা কিঞ্চিৎ অপসারিত হইয়া ঐ রত্নের উজ্জ্বলতার বিকাশ হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট কর্ম্মিক বীজ অনুর্ব্বরা-ভূমিতে প্রোথিত হইলেও কিঞ্চিৎ জলসেচনে অঙ্কুরিত ও শীঘ্র বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া সুফলপ্রসব করে; কিন্তু বীজ অপকৃষ্ট হইলেও উৎকৃষ্ট ভূমিতে ও সার প্রদানে ও জল সেচন দ্বারাও শীঘ্র বৃক্ষাকারে পরিণত হয় না বা উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করে না।

৪। সমাশিক্ষিত সম-ব্যবসায়ী ও সমপদস্থ দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন অল্প দিনে সেই ব্যবসায় পারদর্শী হয়, অন্যে বহুকালেও পারদর্শী হয় না। কিন্তু ব্যবসান্তরে প্রবেশ করিবামাত্র অল্প দিনেই সেই ব্যবসান্তরে পারদর্শী হয়। ঐরূপ সমশিক্ষিত ও সমপদস্থ একজন কার্য্যে পারদর্শী, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, উদ্যমী, অধ্যবসায়ী, মেধাবী কিন্তু চিন্তার পর আলোচনীয় বিষয়ের অস্থলে প্রবেশক্ষম, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অভাব

* তাহা বলিয়া মরুভূমিতে উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিতে হইবে, পাছে ঐরূপ মনে করিও না। বীজ-মাত্রেরই উৎকৃষ্ট সুর-বোধ থাকিলেও ভিন্নতার বীজের কখন উৎকৃষ্ট সুর বাহির হইতে পারে না; তদ্রূপ মোর ও মলিন বা নীচাশয় মস্তিষ্কে আত্মিক জ্যোতির বিকাশ হয় না।

দেখা যায়। অন্য বহু অনুশীলনেও প্রথমোক্ত গুণগুলি কিন্তু বিনা অনুশীলনেও স্বভাবতঃ সুরসিক ও প্রত্যুৎপন্ন হয়।

৫। সামান্য মধ্যবিত্ত পিতা হইতে বহু-পুত্রের মধ্যে একজন মহাত্মার আবির্ভাব হয়, কিন্তু ঐ মহাত্মার বংশে আর তদ্রূপ মহাত্মার আবির্ভাব দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইষ্ট, প্রভৃতির ন্যায় আর কয়জন মহাত্মা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তদ্ভিন্ন সাহিত্যে কালিদাস, সেক্সপিয়ার; দর্শনে কপিল, গৌতম, কনাদ, বেন, মিন ও কমটী; প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানে নিউটন, ক্রম ও ডলটিয়ার প্রভৃতির ন্যায় তাঁহাদের উত্তরন ও অধস্তন বহু পুরুষের মধ্যে আর কেহ জন্মিয়াছে? দেশের অবস্থাও প্রকৃতির অনুকূলতা কি তাহাদের জন্মের সহিত উদিত হইয়া তাহাদেরই মৃত্যুর সহিত অস্তমিত হইল? ইতিহাস তা তাহা বলে না তাহা হইলেও তাহাদের ঠিক সমসাময়িক উন্নত পিতা-মাতার ঔরস ও গর্ভে—তাহাদের ন্যায় আর কয়েকটী রত্ন জন্মিয়াছিল? তাহাদের পিতা কি পূর্ব্বপুরুষ কেহ সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান-বিদ্ ছিল, তাহার কি কোন প্রমাণ আছে? বরং ইতিহাসে তাহার বিরুদ্ধ আছে। উত্তরাধিকারিক পুরুষানুক্রমিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম (Hereditary, reversioneny or natural laws) উপরোক্ত কয়েকটী প্রশ্নের—কি সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানোক্ত উপরোক্ত নিয়মগুলি এইস্থানে প্রযোজ্য নহে, অব জন্মান্তর কর্ম্মফল ব্যতীত ইহার সন্তোষজনক উত্তর কি?

৬। যে প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ঐ উৎপন্ন মানবের ন্যায় অন্যায় বিচার আছে; কিন্তু সেই প্রকৃতি কি অচেতন ও অন্ধ, সেই প্রকৃতির অন্তঃরাজ্যে কি ন্যায় অন্যায় বিচার নাই? একটী বালক কোন দুষ্কার্য্য করে নাই, কিন্তু সে পীড়ার অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় কেন? সে কোন্ ন্যায় বিচারে দোষী ও দণ্ডনীয়? তদ্ভিন্ন অন্যান্য হেতু ইতিপূর্ব্বে মানবের জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফলানুযায়ী ভোগ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন এবং অদৃষ্ট ও পুরুষাকার সম্বন্ধীয় প্রশ্ন মীমাংসা কালে তোমাকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি; পুনরোক্তি অনাবশ্যক, ফলিতার্থ জন্মান্তর ও তাহার কর্ম্মফল সম্বন্ধে ন্যায় ও যুক্তিমূলক শত শত প্রমাণ আছে, চিন্তা করিয়া দেখিলে নিজে নিজেই বুঝিতে পারিবে। জন্মান্তর স্বীকার করিলে চেতনাত্মা ও ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইবে। তোমার আমার যেরূপ জ্ঞান ও চেতন অচেতন প্রকৃতি আছে, সেই সমষ্টি তুমি আমি রূপ ঈশ্বরেরও অনন্ত জ্ঞান ও চেতন অচেতন প্রকৃতি আছে। যেমন মৃত্যুন্তে লোকান্তরে স্বভাবের সার বীজ আত্মায় অব্যক্ত থাকে; পরে সংস্কার রূপে আত্মাভাসের সহিত ইহলোকে আগত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়, সেইরূপ অনন্ত নিদ্রাকালে অনন্ত প্রকৃতির সার বীজও পরব্রহ্মে অব্যক্ত থাকে; পরে অনন্ত ব্রহ্মাভাসের সহিত অনন্তক্ষেত্রে ক্রমে বিকশিত হয়।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গীতাবলী।

১। একতালা।

মনে করি সদা হরিপদে মন বিকাইব।
প্রেম-হিম-নীরে ডুবি ভবতাপ নিবারিব॥
শান্তি সুখময়ী সুধা, নিবারিবে ভবক্ষুধা,
তৃষা-তৃষা দূরে যাবে, কবে আশা পুরাইব।

২। তাল আড়া।

আশা হবে কি পূরণ।
হরিপদে মম মতি রবে অনুক্ষণ॥
নিয়ত শ্রীহরি-গুণ, শ্রুতি করিবে শ্রবণ,
নয়ন হেরিবে হরি-তনু সাধুজন॥
বাসনা শ্রীহরিনাম, গান করি অবিশ্রাম,
পরম আনন্দ-রসে হইবে মগন॥
করদ্বয় নিরন্তর, হবে হরিসেবাপর,
চরণ করিবে হরিতীর্থ-পর্য্যটন॥
মস্তক লইবে হরিপদের শরণ।

৩। তাল আড়া।

পতি কি হবে আমার।
ভজন পূজন নাথ জানি না তোমার॥
পতিতপাবন তুমি, অধম পতিত আমি,
নিজ গুণে গুণনিধি কর হে উদ্ধার॥
বড় সাধ হয় মনে, তব ভজন-পূজনে,
তাপিত পরাণ নাথ জুড়াই এবার॥
কিন্তু কাম ক্রোধ আদি রিপুগণ হয় বাদী,
পূরে না মনের সাধ, বিষাদ অপার॥

৪। তাল একতালা, বাউলের সুর।

মিছে কেন কর বিষয়-ভাবনা।
কতই দেখিছ এ ছার সংসারে,
কারুই পূরে না মনোবাসনা॥
বিষয় ছাড়াবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
কখনই শান্তি পাবে না॥
পতিতপাবন হরি, ভজ মন ত্বরা করি,
পাবে শান্তি সুখ ধাম,
জপ হরিনাম,
রবে না ভবের যাতনা যাতনা॥

শ্রীগোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদবারিধি।

কন্যা-বিক্রয়।

জগতে সমস্ত পদার্থই শিশু, যৌবন, জরা,—ভাবের অধিন। শৈশবে ক্রমোন্নতি; যৌবনে পূর্ণ-বিকাশ; বার্দ্ধক্যে ব্যাধি-জীর্ণতাই নশ্বর জগতের অখণ্ড নিয়ম। অন্যান্য সময়ের ব্যাধি চিকিৎসার অধিন বটে, কিন্তু বার্দ্ধক্যের ব্যাধি দুরারোগ্য। হিন্দুধর্ম্মের সেই বার্দ্ধক্য দশা

উপস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে যতগুলি ধর্ম্ম আছে, হিন্দুধর্ম্মের নিকট সে সমস্তই হীনপৌষ্য শিশু। অন্যান্য ধর্ম্মের জাত কর্ম্মের পূর্ব্বেই হিন্দুধর্ম্ম বার্দ্ধক্য দশায় পদার্পণ করিয়াছে; সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম একণে বৃদ্ধতম। বৃদ্ধের জরাজীর্ণ দেহ যেমন ব্যাধির প্রমোদ ভবন; হিন্দুধর্ম্মের বিশাল দেহও তদ্রূপ নানারূপ দুরারোগ্য ব্যাধির বিশাল ভূমি। রোগ-সঙ্কর অটলে চিকিৎসকগণ "বলবতঃ চিকিৎসকেন" এই উপদেশের অনুসরণ করেন, কিন্তু বহুসংখ্যক রোগ এক সময়ে বলবান হইলেই বিপদের কথা। হিন্দুধর্ম্মের বৃদ্ধদেহ আজ নানারূপ উৎকট পীড়ায় জর্জ্জরিত। এক একটি প্রবল ব্যাধির প্রতাপে এক একটি প্রধান অঙ্গের অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত ক্ষয় হইতেছে। সুতরাং চিকিৎসকগণ "কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়" হইয়া একবার এদিক্ একবার ওদিক্ দৌড়াইতেছে। কিন্তু কোনই ফল হইতেছে না। হিন্দু সমাজের অতিবৃদ্ধ অসাড় দেহে কোন ঔষধই কার্য্যকরী হইতেছে না; অথচ তাই বলিয়া নীরব থাকা উচিত নহে। শুশ্রূষানাস্তি চিকিৎসাই চিকিৎসকগণের অভিপ্রেত।

হিন্দু সমাজের ব্যাধিসমূহ মধ্যে "অত্যধিক পাত্র-মূল্য" একটি প্রধান ব্যাধি, এবং তন্নিবারণের জন্য আজকাল কিছুই আলোচনাও হইতেছে। কিন্তু পাত্র-মূল্য রোগে যেমন সমাজের একটি প্রধান অঙ্গ জর্জ্জরিত, তেমনি আবার কন্যা-বিক্রয় রোগেও সমাজের অপর একটি প্রধান অঙ্গ ততোধিক ক্লিষ্ট। বরং পাত্র-মূল্যের ভীষণ প্রতাপে কন্যাপক্ষ সর্ব্বস্বান্ত হইলেও বরপক্ষের তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু কন্যা বিক্রয় দ্বারা বরপক্ষ সর্ব্বস্বান্ত এবং উভয় পক্ষই ধর্ম্মচ্যুত হইতেছে, অথচ দেখিয়া শুনিয়া কন্যাকে অরূপে বিসর্জ্জন করা হইতেছে। তাই বলি, পাত্র-মূল্য সম্বন্ধে আজকাল যেমন একটু আলোচনা হইতেছে, তেমনি কন্যা-বিক্রয় সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা হওয়া উচিত। যদিও এ ক্ষীণ কণ্ঠের অসার ক্রন্দনে সমাজের 'নির্জ্জীব নিষ্পন্দ দেহে চৈতন্য সঞ্চার অসম্ভব বটে, তথাপি চেষ্টায় বিরত হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমরা কন্যা-পণ সম্বন্ধে ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে একবার দৈনিক বঙ্গবাসী এবং চারুবার্ত্তা প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। আবার পাত্র-পণের আলোচনা দেখিয়া কন্যা-বিক্রয়ের দোষ দেখাইতে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম।

কন্যা-বিক্রয় যে হিন্দুশাস্ত্রে কতদূর দোষাহৃত এবং কিরূপ মহাপাতকই, তাহা নিম্নলিখিত বচন দ্বারাই অনুভব করা যাইতে পারে,—যথা,—

"শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি সুতাংশ্চ, লোভমোহিতাঃ
আত্মবিক্রয়িনঃ পাপা পাপা কিল্বিষ কারিণঃ।
পততি নরকে ঘোরে ষষ্টি চাসপ্তমং কুলম্॥

লোভ পরবশ হইয়া যে সমস্ত ব্যক্তি শুল্ক গ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান করে, সেই আত্ম-বিক্রয়ী মহাপাতকীগণ স্বয়ং ঘোর নরকে নিমগ্ন হয়, এবং সপ্তম কুল পর্য্যন্তও বিনষ্ট করে।

এ বিষয়ে মনুর মতও নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

"ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াৎ শুল্কমণপি
গৃহ্ণন্ শুল্কং হি লোভেন ব্যাজবোরোহপত্য-
বিক্রয়ী॥"

জ্ঞানী কন্যাদাতা অতি সামান্য শুল্কও গ্রহণ করিবে না। যেহেতু লোভবশতঃ শুল্ক গ্রহণ দ্বারা মনুষ্যে অপত্য বিক্রয়ী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

হিন্দুধর্ম্মের নেতা পরিব্রাজকগণের কথা দূরে থাকুক; মনু শুদ্রাদিকেও শুল্ক গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যথা,—

"আদদীত ন শুদ্রোপি শুল্কং দুহিতরং দদৎ"

অর্থাৎ কন্যা-সম্প্রদান কালে শুদ্রও শুল্ক গ্রহণ করিবে না।

কন্যা-বিক্রয় যে কতদূর পাপাবহ, তথা নিম্নলিখিত বচন দ্বারা আরও বিশদরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

"যঃ পুমান্ শুল্কমাদাতি স যাতি নরকং নরঃ,
অতএব হি শুল্কং চ জামাতৃর্নাদদাচনঃ॥"
(রঘুনন্দন সংগ্রহ)

যে ব্যক্তি শুল্ক গ্রহণ করে, সে নরকগামী হয়, অতএব জামাতার নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করিবে না। (অপিচ)—

কন্যা মূত্র পুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পাতকী
কৃমিভি র্দংশিতৈঃ কাকৈর্যাবদিন্দ্রা চতুর্দ্দশঃ॥"

যে মহাপাপী কন্যা-বিক্রয় করে; সেই নরাধম কন্যার মল মূত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতি (কল্পান্ত কাল) পর্য্যন্ত কৃমি ও কাক কর্ত্তৃক দংশিত হয়।

এই ঘোরতর মহাপাতক দ্বারা যে কেবল সেই পাপকারীই নরকস্থ হয়, তাহা নহে। তদ্দ্বারা সনাতন-হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত বিবাহের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। প্রবল ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থের জন্য স্ত্রী পুরুষের সাময়িক যুক্তিমাত্রকে আর্য্যমহর্ষিগণ "বিবাহ" বলেন নাই। অথবা তাঁহারা ধর্ম্মপত্নিকে কেবল বিলাস সামগ্রী বা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। ভার্য্যা হিন্দুর সহধর্ম্মিণী অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপা এবং সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের প্রধান সহায়। কিন্তু মূল্য দ্বারা ক্রয় করিয়া দার-পরিগ্রহ করিলে হিন্দুর সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। শুল্ক-পরিণীতা রমণী যে পত্নী-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারে না, এবং দৈব পৈত্র্য কোনরূপ ধর্ম্ম কার্য্যের অধিকারিণী নহে; তাহাই নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

'ক্রীতা দ্রব্যেণ যা নারী ন সাপত্ন্যাভিধীয়তে,
ন সা দৈবে ন সা পৈত্র্যে দাসীং তাং
কবয়োবিদুঃ॥"

যে নারী মূল্য দ্বারা ক্রীতা হয়, সে স্ত্রী কখনই পত্নী-পদবাচ্যা হইতে পারে না, পণ্ডিতগণ তাহাকে দাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এবং ঐরূপ ক্রীতা পত্নী দৈব পৈত্র্য কোনরূপ ধর্ম্ম-কার্য্যের অধিকারিণী নহে। (অপিচ দক্ষক মীমাংসায়াং)

"ক্রিয়া কৃতাচ যা নারী ন সাপাত্ন্যাভিধীয়তে।"

হিন্দুর বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল ভার্য্যাতেই পরিসমাপ্তি লাভ করে নাই।

"পুত্রার্থ ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনং।"

পুত্রের জন্য দার-পরিগ্রহণ এবং পিতৃ-স্বর্গার্থ (পারলৌকিক) পিণ্ডদানাদি কার্য্যের জন্যই পুত্রের প্রয়োজন। কিন্তু এইরূপ ক্রীতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র দ্বারা সে উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না। যথা,—

"বিক্রীতায়াস্তু কন্যায়াঃ যঃ পুত্রো জায়তে ভ্রুবং,
সচ চণ্ডাল বিড্জস্ত সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ॥"

ক্রীতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে চণ্ডাল ভ্রুবং সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত বলিয়া জানিবে।

এক্ষণে দেখা উচিত, এরূপ বিবাহ দ্বারা হিন্দুর প্রকৃত বিবাহের উদ্দেশ্য সাধিত হয় কি না? যে বিবাহে পিতৃপুরুষ নিরয়গামী হয়, যে বিবাহে পরিণীতা পত্নী ধর্ম্মপত্নী বলিয়া অভিহিতা হইতে পারে না, যে বিবাহে স্বীয় ঔরসজাত পুত্র (বিজাতীয় রাজার আইনানুসারে ধনাধিকারী হইলেও) হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী পিণ্ড-

নিকারী হইতে পারে, না সে বিবাহে কেবল পশুত্ব ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা ভিন্ন আর কি ফল আছে? ক্রীতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণ ব্রাহ্মণ-ঔরষে জন্মগ্রহণ করিয়াও কেবল গর্ভদোষে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পবিত্র কুলকে কলুষিত করে।

কন্যা-বিক্রয় রূপ মহাপাতক দ্বারা যে কেবল কন্যা-বিক্রেতা বা তাহার পিতৃপুরুষ নরকস্থ হয় এবং তাহার বংশজাত সকলে পাণ্ডিত্য লাভ করে, তাহা নহে। যে দেশে ঐ মহা-পাতকের অনুষ্ঠান হয়, তদ্দেশবাসীদিগকেও ঐ পাপের অনুমোদক বলিয়া পাপী ও পতিত হইতে হয়। যথা,—

"তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তি শুক্রবিক্রয়ী।"

যে দেশে শুক্র-বিক্রয়ী বাস করে, সে দেশ-কেও পতিত বলিয়া মনে করিবে। এ স্থলে দেশ শব্দের লক্ষণা দ্বারা দেশবাসীকেই বুঝায়। (অপিচ) বৃহন্নারদীয় পুরাণে যথা,—

"তোষনার্থ বিনা কন্যা ধনলোভেন বিক্রীতা,
তেনৈনো ভক্ততে নিত্যং তদ্দেশং পাপ-
ভাজনং।"

কেবল তুষ্টার্থ ভিন্ন যে ব্যক্তি ধনলোভে কন্যা-বিক্রয় করে, সে প্রতিনিয়ত পাপভোগ করে এবং তদ্দেশও পাপভাজন হয়।

চণ্ডালাদি নীচজাতি এবং জাতিপাতকী প্রভৃতির সহিত ভোজন, উপবেশন ও স্পর্শ-নাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্রাহ্মণাদিগকে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়, কিন্তু কন্যা-বিক্রয় এতই গুরুতর মহাপাতক যে, কন্যা-বিক্রেতাকে দর্শনমাত্রও পাপ জন্মিয়া থাকে। যথা—ক্রিয়া যোগসারে,—

"কন্যা বিক্রয়িনো নাস্তি নরকান্নিষ্কৃতিঃ পুনঃ,
পশ্যেদ জ্ঞানতো বাপি কুর্য্যাদ্ ভাস্কর-
দর্শনম্।"

কন্যা বিক্রয়ীদিগকে অনন্তকাল নরকভোগ করিতে হয়, কদাচিৎকালেও তাহারা নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। অজ্ঞানতা-বশতঃ তাহাদিগকে দেখিলেও প্রায়শ্চিত্তার্থ সূর্য্যদর্শন করিবে।

এই ত গেল ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিপ্রায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্মের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে, আর্য্যজাতি বিজাতীয় রাজার আইন-পাশে বদ্ধ হইয়া, যেরূপ বিপরীতভাব ও সংস্কারকদিগের কূট মীমাংসায় যেরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কেবল ধর্ম্মের দোহাই দিলে যে অদিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইবে, সে ভরসা অতি কম। সেই জন্য কন্যা-বিক্রয় দ্বারা সমাজের যে সমস্ত প্রত্যক্ষ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহাই প্রদর্শন করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম। (ক্রমশঃ)।

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, [illegible] কলিকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান।

অষ্টম বর্ষ। | ১০ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। | ৪১ সংখ্যা।

শঙ্কর-চরিত।

শঙ্করের সন্ন্যাস।

শঙ্কর অষ্টম বর্ষ বয়স উত্তীর্ণ না হইতেই সংসারের দুঃখেদ্য মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া বন-প্রস্থান করিলেন। তাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ-বৈরাগ্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নশ্বর জগতে যে কিছু ভোগ্য, সমস্তই তিনি তৃণ অপেক্ষা তুচ্ছ বিবেচনা করিয়াছিলেন। আমিষে তিনি সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণ ছিলেন বলিয়া,দার-পরিগ্রহাদি গৃহস্থ ধর্ম্মে একান্ত বিরক্ত। সন্ন্যাস ধর্ম্মকেই ধর্ম্মের সার জীবনের সখা, প্রাণের প্রাণ ও প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয় বিবেচনা করিয়াছিলেন। আজ তিনি প্রফুল্লচিত্তে সংসার-নাশের ব্রত গ্রহণ করিলেন। কেহই তাঁহাকে ঐ অধ্য-বসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না। তিনি অনায়াসে অনাথা জননী ও সুহৃদ্-গোষ্ঠীকে জন্মের মত বিদায় দিয়া, তীর্থরাজ প্রয়াগাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিষয়াসক্ত-চেতা মানব শঙ্করকে এজন্য নির্ম্মম বলিতে পারেন; কিন্তু বৈরাগ্যের পবিত্র আলয় বিষয়াসক্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়। আসক্তিতে স্নেহ-মমতা; বিরক্তিতে স্নেহ-পাশ স্খলিত হইয়া পড়ে। বৈরাগ্য-সম্পন্ন সুধীর, নিষ্ঠুর নহে; অনুরাগের গতি বিষয় ছাড়িয়া ভগবদভিমুখ হইলেই মানবের শমস্ত সাধনা নিঃশেষ হয়, তখন ঋষ্ বিষয়ে আসক্তি থাকিবে কেন? ইহাই যদি নিষ্ঠুরতা হয়,তবে সহৃদয়তা কাহাকে বলিব? বিষয়াসক্ত হইয়া আত্মনাশই বরং প্রকৃত নিষ্ঠুরতা। বৈরাগ্য যাহার সহজ, সে ভূমিষ্ঠ হইয়া বিষয়-বিষপানে উদর পূরণ করে না, ভারতের ইতিহাসে এইরূপ অনেক উজ্জ্বল মুনির বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সনক, সনন্দ, কপিল, নারদ, নর, নারায়ণ, শুক, শঙ্কর প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। ইহাঁদের প্রত্যেকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও ত্যাগ-ধর্ম্মের বিমল আদর্শ। ইহাঁদের মধ্যে শঙ্কর, কলি-কলুষসমাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনেও মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম, বৈরাগ্যের সুপাত্র, স্বজাতি-প্রেমের সুরসং-

গাত্রক, দেশের উন্নতিরক ও রক্ষক। অমারী, যোধক শাক্যসিংহের বৈরাগ্য ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে না। শাক্যসিংহ অনেক ঐশ্বর্য্যভোগ করিয়াছিলেন, সংসার-কৃপে অনেক দিন নিমগ্ন ছিলেন, পুত্রমুখ না দেখিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারেন নাই। কৃষ্ণচৈতন্যের বৈরাগ্য তদ্রূপ প্রবাধিক প্রিয়তমা লক্ষ্মীর চির-বিরহ, যদি প্রস্তুতির হইবার পূর্ব্বে প্রস্তুত হওয়া দূরে থাকুক, প্রস্তুতির পূর্ণ অবধেও অন্তর বিদ্যুৎ ছিল।

শঙ্করের প্রস্থান সময়ে পরিধানে গৈরিক-রঞ্জিত কৌপিন বসন, বামহস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড। এই বেশ দেখিয়া তৎকালীন দর্শকবৃন্দের ভ্রম হইয়াছিল যে, যেন ব্রহ্মণ্য-দেব পদব্রজে ব্রহ্মলোকে যাইতেছেন। তিনি যে যাত্রাসময়ে ব্রহ্মধ্যান করিয়া সমাহিত হইয়াছিলেন, পদচালনা কালেও তাহা তাঁহার অনুগত ছিল, কিছু মাত্রও অন্যথা হয় নাই। এই অদ্ভুত বাল-সন্ন্যাসী গমনকালে বন, নদী, নগর, শৈল, জনপদ ও শ্বাপদ জন্তু সকল দেখিয়াও দেখিলেন না। ভাবিলেন, ঐন্দ্রজালিক লোক যেমন ইন্দ্রজাল দেখাইয়া থাকে, দ্বৈতরহিত পরব্রহ্ম স্বয়ং যোগে আমাকে সেইরূপ ইন্দ্রজাল দেখাইতেছেন। বাহ্যদৃশ্যে ভ্রূক্ষেপ নাই, উদ্ভাবনে গমন করিতে লাগিলেন। স্বাপনিকের ভদীয় মনোমোহন রূপলাবণ্য সন্দর্শনে ও সাধুসাহিত্য বশতঃ সংজাত হিংসাবৃত্তি পরিহার করিয়া আশ্চর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। পথিক প্রগণ দূর হইতেই পথ-প্রদান করিতে লাগিল। পরম-পথজ্ঞ শঙ্কর-দেব, কাহাকেও গন্তব্য পথের বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়াও ক্রমে তিনি রেবা-নীর-সম্পৃক্ত বাত-বিকম্পিত গোবিন্দনাথ স্বামীর গুহাকাননাগ্রভাগ দেখিতে পাইলেন। কতিপয় দিনেতে আজ এই পবিত্র পরম রমণীয় কাননে আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন। ভগবান মরীচিমালী স্বীয় রাজত্বের অবসান জানিয়া, রশ্মিজাল উপসংহার করিতে লাগিলেন। এদিকে নারদী-সেবনে আরণ্যক হইতে লাগিলেন। বিহঙ্গকুল সায়ংসময়সূচক ধ্বনি করিতে করিতে স্ব স্ব নীড়াভিমুখে গমন করিতে লাগিল। শঙ্কর বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। কাননস্থ যতিগণ তেজস্বী বালযতি সন্দর্শন করিয়া, একান্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিল। ইহারা অনেকেই গোবিন্দনাথের দর্শনাকাঙ্ক্ষী ও উপদেশ-প্রার্থী।

গোবিন্দনাথ একজন তৎকালের মহাযোগী ও যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। আর্য্যজন তাঁহাকে যোগীন্দ্র আখ্যায় অভিহিত করিতেন। আনন্দগিরি ও মাধবাচার্য্য বলেন, গোবিন্দনাথ স্বামী একজন জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানগুরু এবং গৌড়পাদ নামক মুনির শিষ্য। গৌড়পাদ, ব্যাস-সুত শুকদেব স্বামীর শিষ্য, ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত। ইনি অদ্বৈত মতের তাপস, সিদ্ধযোগী ও মহাপুরুষ; ইহাঁর জ্ঞান-বলের ও যোগ-বলের ইয়ত্তা ছিল না। তজ্জন্য তাৎকালিক লোকে তাঁহাকে ভগবান অনন্তদেবের অবতার ও প্রাঞ্জলির রূপান্তর বলিয়া বিশ্বাস করিত। অনেক যোগী এই পবিত্র পুণ্যাশ্রমে থাকিয়া যোগ শিক্ষা করিতেন, কেহবা শিক্ষানবীভাবে তপস্যা করিতেন। আশ্রমের মধ্যপ্রদেশে একটী মনোরম সরোবর ছিল। যোগীন্দ্র গোবিন্দনাথ সমাধি অবলম্বন করিয়া, সায়ং ও প্রাতের অধিকাংশ সময় ঐ অগাধ জলে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ও তাঁহার শারীরদেহে গোবিন্দনাথ স্বামীর এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

"নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিং তৎপুত্র-

-রাসং শুকং গৌড়পাদং মহান্তং গোবিন্দং যোগীন্দ্রং সনাথং শিষ্যকঞ্চ॥"

আদিদেব নারায়ণ, ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর ও ব্যাস। ব্যাস পুত্র শুক, শুকের শিষ্য গৌড়পাদ, গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দনাথ। অন্যত্র লিখিত আছে যে, সত্যযুগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র বেদাচার্য্য ছিলেন। ত্রেতাযুগে বশিষ্ঠ, শক্তি ও পরাশর। দ্বাপরযুগে ব্যাস ও শুক। কলিযুগে গৌড়পাদ, গোবিন্দ ও শঙ্কর। মাধবাচার্য্যও ঠিক এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।

"ব্যাসঃ পরাশরসুতঃ কিলসত্যবত্যাং
তস্যাত্মজঃ শুকমুনিঃ প্রথিতাত্মভাবঃ।
তচ্ছিষ্যতামপরতঃ কিল গৌড়পাদো
গোবিন্দনাথমুনিরত্র চ শিষ্যভূতঃ॥"

ব্যাস-পুত্র শুক, তৎশিষ্য গৌড়পাদ এবং গৌড়পাদের শিষ্য মুনি গোবিন্দনাথ। এ স্থলে অনেকের মনে এই বিচিকিৎসা উপস্থিত যে, ব্যাস-সুত শুক হইতে শঙ্করাচার্য্য চতুর্থ পুরুষ স্থানীয় সম্ভবপর হয় না। অনেক অন্তরে থাকাই উচিত বোধ হয়। তবে আচার্য্যের অদৃশ্যিকে শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ার প্রথা প্রচলিত থাকিলে, উহা সঙ্গত হইতে পারে। কারণ, কলির আরম্ভের প্রাক্কালে শুক স্বামীর আবির্ভাব, কলির বহুকাল অতীত হইলে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব। এত দীর্ঘকালে শুকের শিষ্য গৌড়পাদ, গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দনাথ এবং তাঁহার শিষ্য শঙ্করস্বামী ঠিক বোধ হয় না; দীর্ঘজীবন হইলেও ঐরূপ সমাবেশের সঙ্গতি থাকে না। যোগিজীবন, নিরুদ্ধপ্রাণ, মহাসার-জীবন, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেলেও বিনষ্ট হয় না; বিশেষতঃ যোগীজন ছন্দমৃত্যু। আমরা যোগমাহাত্ম্যে অনভিজ্ঞ বলিয়াই এরূপ বিচিকিৎসায় পড়িতেছি।

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া উঠি। যদি বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস ও শুকদেব পর্য্যন্ত পরম্পরায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির উপক্রম হইতে পারে, তবে গোবিন্দনাথ শুকের অনুশিষ্য হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যদি তাহাতেও অবিশ্বাস থাকে, ধারাবাহি বংশধরগণের স্থিতিকাল আমাদিগের তুল্য নয় বলিয়া অবিশ্বাস জন্মে; তবে পাশ্চাত্য-গবেষণা গবেষণ বিচরণ করিয়া শঙ্কা বাড়াইয়া লউন, তৃপ্তি হইবে। আর যাঁহারা দেশীয় প্রত্নতত্ত্বে আস্থাবান, তাঁহারা এই কাল-সমীরণে বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও ইহা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, শঙ্করাচার্য্য গুরুপরম্পরা ক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা তাৎপর্য্য হৃদ্গত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, স্ববুদ্ধি-বলে স্বীয় মত প্রচার করেন নাই।

আমাদের মহামহনীয় শঙ্কর আজ গৌড়পাদ-শিষ্য গোবিন্দনাথের কাননাশ্রমে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মলোক সমাগমের সুখ অনুভব করিলেন। রেবা-সঙ্গিক শীতল বায়ুসঙ্গ সঞ্চারণে প্রবাহিত হইয়া শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তীব্রতরুর স্নিগ্ধ ছায়ায় মৃতদেহ ব্যক্তিরও অন্তর শীতল হয়, সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়। যতিবর শঙ্কর কিয়ৎকাল বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগ করিয়া সেই সুরম্য কাননে গোবিন্দ গুরুর দর্শনাভিলাষী হইলেন। অনন্তর তত্রস্থ শিষ্যদিগের নির্দ্দেশানুসারে, সাধারণের দুর্দ্দর্শ তমীয় গুহা-মন্দিরের সন্নিহিত হইলেন। বালকের সন্ন্যাস ও ঔদ্ধত্য বিলোকনে প্রাবতীর যতিগণ বিস্মিত হইলেন। সিদ্ধি যাহার উদ্দেশ্য, সে সাধনায় দীর্ঘসূত্রী হয় না। শঙ্কর নিশা সময়েও গুরু-দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইলেন। মন্দির-সমীপস্থ হইয়া শঙ্কর শিখিলেন, গুহার মুখচ্ছিদ্রটী বিতস্তি পরিমিত। মহাযতি গোবিন্দনাথ সেই বিতস্তি পরিমিত দ্বার দ্বারা প্রবেশ ও বহির্গমন করিয়া থাকেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার মনোমধ্যে আন্দো-

নাথের প্রসাদে অবগত হইলেন। জ্ঞান, আলোচনা ও যোগশিক্ষা করিতে করিতে দেহানে তাঁহার শ্রীমন্তক্ত অতিবাহিত হইল। ক্রমে বর্ষাকাল আসিল; কাদম্বিনী যৌবন-গর্ব্বে গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে অবিরল ধারা-সম্পাতে ধরা হইল; চপলা, অশনির পথ-প্রদর্শিকা হইয়া সময়ে সময়ে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। নদীপিকুল কাদম্বিনী-সমাগমে অতি পুলকিত হইয়া নবীনর্ত্তনে প্রেম বিকাশ করিতে সতত প্রয়াসী; এ সময় অনেক কার্য্যেরই বাধা বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। গোবিন্দনাথের আশ্রম-পাদ বিধৌতকারিণী নর্ম্মদা তরঙ্গিণী ক্রমশঃ স্থূল কলেবরা হইয়া উঠিল, জলস্রোত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। শঙ্কর-রচিতাথ্যায়ক সন্ন্যাসিগণ বলিয়া থাকেন, শঙ্কর এইস্থানে থাকিয়া একদিন গুরুকে অদ্ভুত যোগবল দেখাইয়াছিলেন।

মুনিবর গোবিন্দ একদিন সমাধি-সুখভোগে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় নর্ম্মদা নদী প্রবল-বেগে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; অনন্ত জল-শব্দে দশদিক্ বিকম্পিত। বারিরাশি তীরস্থ তরুশ্রেণী ও ব্রাহ্মণ-দিগের কুটির মগ্ন ও ভগ্ন করিয়া প্রবাহিত হইল। সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় নর্ম্মদার জল-গর্জ্জন, কূল-ভঙ্গের ভীষণ শব্দ, তরঙ্গাঘাতের কঠোর ধ্বনি, ভয়ার্ত্ত জনগণের কোলাহল, এই সমুদয় মিলিত হইয়া যেন এক অভূতপূর্ব্ব মহাপ্রলয় উপস্থিত করিল। পরমকারুণিক শঙ্কর এই সমস্ত উৎপাত দেখিয়া শান্তির জন্য ব্যাকুল হইলেন। গুরু গোবিন্দনাথ সমাধিস্থ, এই সমস্ত উৎপাতে পাছে গুরুর সমাধি-ভঙ্গ হয়, এই কারণেও যোগবলে উহার শান্তি করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। এক সময়ে বালধিল্য-গণ দেহ-রোধে জলবেগ রুদ্ধ করিয়া গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। আজ গুরুর নিদেশ না থাকিলেও আশঙ্কায় শঙ্কর যোগ-বিভব বিস্তার করিলেন। তৎমুহূর্ত্তেই একটী কুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মুখ প্রবাহ অভিমুখে স্থাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত উচ্ছলিত জল কুম্ভমধ্যে গিয়া বিলয় প্রাপ্ত হইল। মহামুনি অগস্ত্য এক সময়ে গণ্ডুষে সমুদ্র গ্রাস করিয়াছিলেন, জহ্নু ভাগীরথীকে উদরসাৎ করিয়াছিলেন; শঙ্কর নর্ম্মদা স্রোত কুম্ভে সংযমিত করিলেন। যোগের অসাধ্য কিছুই নাই, যোগবলে অঘটন ঘটন যায়; আমরা যোগপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অতি দূরে অবস্থান করিতেছি বলিয়া, যোগ-মাহাত্ম্য বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং যোগক্ষেম বহনেও অনুপযুক্ত। যাহা হউক, কিছুকাল পরে গোবিন্দ-গুরুর সমাধি-ভঙ্গ হইল। সমাধি-ভঙ্গের পর তিনি শিষ্যমুখে সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। শঙ্কর যোগসিদ্ধ হইয়াছেন, ইহা জানিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। এইরূপে বর্ষাকাল যাইতে লাগিল; শঙ্করের এখন এই আশ্রমে বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল না, কেবল গুরুর নিদেশে জগৎপ্রসিদ্ধ প্রসন্ন-গম্ভীর ভাষ্যের উপাদান লিপিবদ্ধ করিয়া গুরুকে শ্রবণ করাইলেন; গুরুও পরম-তুষ্ট হইয়া গুরুপরম্পরাগত তাৎপর্য্যার্থপ্রকটিত হইয়াছে ইহাই প্রকাশ করিলেন। উপযুক্ত অধিকারী দ্বারা এই প্রচারার্থ শঙ্করকে অনুরোধ করিলেন। এই কার্য্যে বর্ষা অপগত হইল, শরতের সমস্ত লক্ষণ প্রকটিত হইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল মেঘশূন্য ও নির্ম্মল হইয়া আসিল। সরোবরে কলিনী-কুলবধূ সৌরভ-সম্ভারে দিগন্ত আমোদিত করিয়া হাসিতে লাগিল। প্রকৃতির এই নবীন বেশে ভারতাকাশে নির্ম্মল শঙ্কর-চন্দ্র সমুদিত হইতে লাগিলেন। শরতের আবির্ভাব দেখিয়া

লন করিয়া শঙ্কর যারপর নাই বিস্মিত হইলেন; তাঁহার কৌতূহল-শিখা উজ্জীপ্ত হইয়া উঠিল। গুরু গোবিন্দনাথ তখন সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেছিলেন। দর্শন ব্যগ্র শঙ্কর তাঁহার দর্শন-কামনায় সমাধি-ভঙ্গকারক স্তুতি-আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ হইলে, তিনি অন্যত্র হইতে সুধা-বিনিন্দিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? যতিরাজ শঙ্কর যথারীতি অভিবাদনান্তর গোবিন্দনাথকে আত্মবোধপূর্ণ বচনে প্রতিবচন প্রদান করিলেন। ভাগ্যবান ব্যতীত মহাপুরুষ সন্দর্শন ঘটে না, বাক্যালাপ বহু ভাগ্যের বিষয় ও সুকৃতি-সাপেক্ষ, অদ্যাপি ইহার উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য নহে। গোবিন্দনাথও শঙ্করের প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন শিব-সমাগমে ভাগ বিবর পরিত্যাগ করিয়া পুলক প্রকাশ করিবে ইহা আর বিচিত্র কি? গোবিন্দনাথ যে ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য এতদিন গুহায় হইয়া গুহাস্থিত পুরাণ পুরুষের অধ্যয়ন করিতেছিলেন, আজ তাহার উপক্রম, বৌদ্ধ-পাশ-বিনাশ যজ্ঞের ব্যাণ এবং তমসাচ্ছন্ন ভারতের পূর্ব্বাশায় অরুণোদয়। গুরু গোবিন্দনাথ মধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন। শঙ্কর! তুমি সামান্য ব্যক্তি নও, সাক্ষাৎ শিবাবতার; আমি ইহা সমাধি-যোগবলে জানিতে পারিয়াছি এবং তোমারই প্রতীক্ষায় আমি এই গুহায় হইয়া অপেক্ষা করিতেছি; অচিরে দেশের উদ্ধার না হইলে মেদিনী পাপভারাক্রান্ত হইয়া অধোগত হইবে। এই বলিতে বলিতে মহামুনি গোবিন্দনাথ স্বামী গুহার দ্বারদেশে পাদদ্বয় প্রসারণ করিলেন, শঙ্করও গুরুচরণে যথোচিত ভক্তিসহকারে নমস্কারাদি দ্বারা পূজা শ্রমে করিলেন। বলনাদি দ্বারা গুরুর্যাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, গুরুচর্য্যায় গুরু তৃপ্তিলাভও মুখ্যোদ্দেশ্য নহে; কেবল লোকশিক্ষার্থ এইরূপ চেষ্টা বিস্তার। কারণ যিনি সিদ্ধ, তাঁহার গুরুকরণ-সেবা অধস্তনদিগের ব্যবহার পরিজ্ঞান নিমিত্ত। গুরু গোবিন্দনাথও তখন অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া বিত্তৃষ্ণামাত্র দ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন এবং বলিলেন, শঙ্কর! শিষ্যের করণীয় সদাচার তুমি যথাবিধি প্রতিপালন করিয়াছ; এক্ষণে বল আমাকে কি করিতে হইবে।

অনন্তর যতিরাজ শঙ্কর গুরু-সকাশ হইতে যথাশাস্ত্র উপনিষদ-প্রসিদ্ধ, উপনিষদ্বেদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহাকে যথাবিধি সম্মানিত করিলেন। যদিও তিনি নিজ সহজাত প্রজ্ঞা-দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন, তথাপি শাস্ত্রমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতে অনেচ্ছুক হইয়া, পুনর্ব্বার সেই বিজ্ঞাত আত্মতত্ত্ব বিদিত হইবার কামনা করিলেন। ব্রহ্মবিজ্ঞানার্থ গুরু-সমীপে গমন করিবে এবং গুরু সহায় হইলেই সেই সহায়বান্ অধিকারী ব্রহ্মকে জানিতে পারিবে। এই বেদশাসিন-প্রবর্ত্তিত সদ্বিধি শঙ্করকে গুরুকরণ ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল।

যোগীপ্রবর গোবিন্দনাথ শঙ্করের অকপট শিষ্টতায় পরিতুষ্ট হইয়া, ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয়ের শিরঃস্বরূপ উপনিষদ্ (বেদান্ত) হইতে প্রথমতঃ "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঋগ্বেদের), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (যজুর্ব্বেদের), "তত্ত্বমসি" (সামবেদের) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", (অথর্ব্ববেদের)। এই ব্রহ্মবোধক মহাবাক্য চতুষ্টয় উপদেশ করিলেন। অনন্তর ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্ত দর্শন, উত্তর মীমাংসা, শারীরিক সূত্র ভিন্ন ভিন্ন অভিধান) তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা শুনাইলেন, ব্যাসকৃত শাস্ত্রের গূঢ়ভাব, ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈত তাৎপর্য্যই প্রকৃত তাৎপর্য্য; তাহার উপায় স্বরূপ তদ্বিধ পূর্ব্ব ব্যাখ্যা প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় গুরু গোবিন্দ

মহামতি গুরু গোবিন্দনাথ প্রিয়তম শিষ্য শঙ্করকে একদিন আহ্বান করিয়া বলিলেন, শঙ্কর! যতিদিগের নিয়ম এই যে, তাহারা বর্ষা চারিমাস কোন এক আশ্রম অবলম্বন করিয়া শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা অন্তর্হিত করেন; তৎপরে তাহারা পদধূলি দ্বারা জগৎকে পবিত্র করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছ, এক্ষণে তুমিও জগৎকে পবিত্র করিয়া জগতীস্থ যাবতীয় লোকের জন্ম-মরণযুক্ত সংসাররূপ দাবানলের শেষ হইয়া সমুদিত হও, পরমপুরুষের প্রকৃত পন্থা বিস্তার জন্য পূর্ব্যধাম কাশীক্ষেত্রে গমন কর। বিশেষতঃ বৌদ্ধপাপে কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়াছে, উহার নিরসন জন্য তপস্যা প্রভৃতি প্রার্থনানুসারে তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ, এখনই তাহার আরম্ভ হওয়া উচিত। তীব্রবুদ্ধি বৌদ্ধগণ তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীধামে থাকিয়া ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিচার প্রয়োগ করিয়াছে, তুমিও ঐ অংশে অবস্থানপূর্ব্বক এখনও বেদ বিস্তার ও যতিধর্ম্মের বিমল জ্যোতি প্রকাশ করিয়া, বৌদ্ধপাপ নির্মূল করিয়া দেও, কাশী বৌদ্ধ নির্ম্মল হউক; তখন কাশীধাম এইরূপ ছিল না। কাশী এখন জনপূর্ণ নগরী, কিন্তু শঙ্করের সময় এ স্থান অরণ্যপ্রায় ছিল। কাশীতে এখন বেশ্যা, চোর, বিধর্ম্মী প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মান্বিত লোক বাস করিয়া তীর্থবাস ব্যর্থ দেখে নানাবিধ কুকর্ম্ম করিয়া থাকে, কাশীরও কৃতপাপ বজ্রলেপ হইবে বলিয়া আর ভয় করে না। শঙ্করের সময় তদ্রূপ ছিল না, তখন বৌদ্ধপাপ ব্যতীত আর কোন দোষের আবির্ভাব ছিল না। শত শত সাধু সচ্চরিত্র যাজ্ঞিক গৃহস্থও কর্ম্ম ত্যাগী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। শ্রমণগণ মধ্যে মধ্যে ভ্রম জন্মাইত। কাশীক্ষেত্রে এখন পশুক্ষেপের স্থান নাই, কিন্তু শঙ্করের সময়ে এই স্থানে অনেক বজ্ঞীয় যূপ তাপসগণের আশ্রম, কদম্বকানন ও নিগ্রোধ বৃক্ষের শ্রেণী বিরাজিত ছিল। এখনকার মত বাঙ্গালী-টোলা ছিল না; কাশীর যে অংশে এখন বিশ্বেশ্বর ও কেদারেশ্বরের মন্দির বিরাজিত, সেই অংশও তখন অরণ্যপ্রায় ও তীর্থস্থান মাত্র ছিল। অনেকে অনুমান করেন, যে অংশে এখন সারনাথ নামক বন্যস্থান ও ইতর লোকের বাসভূমি দৃষ্ট হয়, শঙ্করের সময় ঐ অংশেই নগর ছিল। গুরু গোবিন্দনাথের নির্দ্দেশে তিনি কাশীক্ষেত্রে গমনাভিলাষী হইলেন। গুরুদেব বলিলেন, ব্রহ্মতত্ত্বের অনালোচিত স্বরূপ সম্বন্ধে আমি তোমাকে অনেক কথাই বলিয়াছি, সম্প্রতি তুমি অন্য একটী পূর্ব্ব কথা শ্রবণ কর।

ইতিপূর্ব্বে এক সময়ে হিমগিরি পর্ব্বতের সানুদেশে, মহাত্মগণের এক মহান্ সমাগম হইয়াছিল। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাতপা অত্রিমুনি সেই সভার নেতা ছিলেন। সে সভায় পরাশরনন্দন ব্যাসদেব বেদমূলক বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি পরমগুরু পূজ্যপাদ ঋষিপ্রবরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবান্! আপনি বেদতরুর শাখা-বিভাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণের নিরতিশয় হিত বিধান করিয়াছেন। পুরাণ রচনা করিয়া আপামর সাধারণের পরম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। মূলসূত্ররূপে যোগ-শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন এবং মুমুক্ষুদিগের জন্য ব্রহ্মসূত্র প্রচার করিয়াছেন। লোক সকল ব্যাকুল হইয়া ভবদীয় বেদান্ত-সূত্রের বিবিধ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছে বটে, কিন্তু অভিরূপ! আপনার সেই সঙ্কেতোন্মেষ সূত্রের অন্য ব্যাখ্যাও, হইতে পারে এবং কেহ কেহ উহার বিপরীত ব্যাখ্যা করিতেও প্রয়াস পাইয়াছেন। সেইজন্য আপনার নিকট নিবেদন এই যে, আপনি নিজে উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বিভাসক একটী ভাষ্য প্রস্তুত করুন; উহাতে বিপরীতবাদ নিরস্ত হইবে এবং কুমতি-ভাস্ত লোক আর উদ্গমিষ্যতি হইবে না। মহামুনি বেদব্যাস আমার ঐরূপ প্রার্থনা শুনিয়া সভামধ্যে বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা বলিলে, পূর্ব্বে শিব-সভায় দেবগণও আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। বৎস গোবিন্দনাথ! সম্প্রতি আমার কথায় বিশ্বাস কর। একটী কুসমদল নদীজল সংযমিত করিতে সক্ষম এরূপ মংসদৃশ এক সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ তোমার শিষ্য হইবেন। তোমার সেই শিষ্য দুষ্ট মত সকল নিরাকৃত করিয়া সনাতন ব্রহ্মসূত্রের উৎকৃষ্ট ভাষ্য প্রস্তুত করিবেন। যথার্থ তাৎপর্য্য সম্বলিত ঐ ভাষ্য দ্বারা তোমার ও তোমার শিষ্যের যশশ্চন্দ্র নির্ম্মল ও দিগ্‌দ্বয়াপী হইবে; এবং ঐ শিষ্য বেদ ও ব্রাহ্মণের উদ্ধার করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তনা করিবেন; আর পারমহংস পন্থতির অন্তরায় নির্মূল করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। শঙ্কর! ব্যাসদেব আমাদিগকে এইরূপ বলিয়া, পার্ব্বতী পর মহাদেবের কৈলাস-ভবনে প্রস্থান করিলেন। হেমমহাভাগ! আমি দিব্যজ্ঞানবলে জানিতে পারিয়াছি, তুমি সেই উত্তম পুরুষ। বয়সে বালক, জ্ঞানে অতি বৃদ্ধ। এই আশ্রমস্থ যাবতীয় যতিগণ এখনও অবিপক্ক-কষায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই; ইহারা সকলেই তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সফল মনোরথ হইবে। আমার প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে, তুমি ইহাদিগকে গ্রহণ কর। এই বলিয়া যাবতীয় যতি-শিষ্যদিগকে শঙ্করের হাতে সমর্পণ করিলেন। আর বলিলেন, এই আশ্রমস্থ গুহা-মন্দিরে অসংখ্য গ্রন্থরাশি রহিয়াছে, তুমি তাহার উত্তরাধিকারী, তাহাও গ্রহণ কর। এই শিষ্য-পরিবৃত হইয়া অবশ্য মূলচ্ছেদন কর, জগৎ উদ্ধার লাভ করুক। তুমি, এই

নিমমপ্রার্থী জগতের উদ্ধারার্থ প্রসাদগুণোপেত উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করিবার জন্য যত্নপর হও, ভাষ্য প্রচার কর এবং ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করিতে করিতে পুণ্য-পবিত্রশোভিত রমণীয়তম কাশী নগরে গমন কর। গমনমাত্রেই তথায় দেবাদিদেবের সুদর্শন লাভ করিবে, তিনি তোমার প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ বিতরণ করিবেন।

কাশীধাম ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান তীর্থ ও জ্ঞানক্ষেত্র। কাশীর পরাজয় হইলেই ভারতের পরাজয়, এইজন্য বৌদ্ধ-পাপ হইতে আজ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণিত বিধর্ম্মীদিগের প্রয়াস কাশী জয় অথবা বিলয় সাধন। সেইজন্যই বিশ্বনাথের মন্দিরের অদূরে বিভিন্ন ভজনালয়। বৌদ্ধগ্রস্ত কাশীর উদ্ধার বিশেষ কর্ত্তব্য বোধে শঙ্করগুরু শঙ্করকে কাশীতে প্রেরণ করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। শঙ্করানন্দের গুরুক্ষেত্র পরিত্যাগের পর তদীয় গুরু গোবিন্দনাথ যোগে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া অমর হইয়াছিলেন।

শঙ্কর শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া ভারত উদ্ধারার্থ বিনির্গত হইলেন এবং উপযুক্ত শিষ্যদিগকে অদ্বয় ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিতে লাগিলেন। যে জনপদে উপস্থিত হইতেন, গ্রামবাসিগণ তদীয় কমনীয় দেবমূর্ত্তি, সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং মধুর উপদেশামৃত-পানে কৃতার্থ হইতেন। অনেকে বিরুদ্ধ তর্ক করিয়াও অবশেষে সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনরুদ্ভাসিত হইতে লাগিল। পঞ্চযজ্ঞ ও পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রচার হইতে লাগিল। বেদের জয়, ধর্ম্মের জয় বিঘোষিত হইতে লাগিল। অনেক ব্রহ্মবন্ধু ব্রাহ্মণ হইতে লাগিলেন। এখন আমরা শঙ্কর-দিগ্বিজয় ও অবশিষ্ট ঘটনাবলী বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রী।

আত্মতত্ত্ব।

মীমাংসা।—যদি পূর্ব্ব জন্মের স্বভাব অভিজ্ঞতার ক্রমে বিকাশ হয়, তবে পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি উদ্দীপিত হয় না কেন?

গুরু।—এই প্রশ্নের মীমাংসার পূর্ব্বে আর একটী গুরুতর বিষয় বুঝিতে হইবে; পূর্ব্ব-বর্ণিত মত কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রকৃতির এই তিনটী অবস্থা বা ভূর্ভুবস্ব এই ত্রিলোক অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ আছে, আমাদের দেহ, দৈহিক যন্ত্র, মস্তিষ্ক, স্নায়ু প্রভৃতি পার্থিব স্থূল জগতের পঞ্চভূতের বিকার, ভক্ষিত দ্রব্য হইতে শুক্রশোণিত প্রস্তুত হয়, ঐ শুক্রশোণিত হইতে দেহ ও দৈহিক যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হয়। ঐ দেহ, দৈহিক যন্ত্র, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু প্রভৃতির সহিত স্থূল জগতের সম্বন্ধ, উভয়ই প্রকৃতির স্থূলাবয়ব। ঐ দেহ মস্তিষ্কাদি অভ্যন্তরে জ্ঞান বিকাশিনী ও প্রবৃত্তি উদ্দীপনী শক্তি বা গুণের (সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণের) যে ক্রিয়া আছে, তাহার সহিত অন্তরীক্ষ ক্রিয়াশক্তি ও জৈবোপাদানের সম্বন্ধ। ঐ স্থূল সূক্ষ্ম জগতের ও তাহাদের শক্তি ও গুণের সারসংগ্রহ রূপ মহাশক্তির সহিত স্বর্লোকস্থ আত্মার সম্বন্ধ। অন্নোৎপন্ন বীর্য্য ও রেতঃসংযোগ কালে পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব রজঃগুণ স্ফুরিত ও আত্মাভাসের সহিত পূর্ব্বসংস্কার বীজ আকর্ষিত হয়। গর্ভস্থ বীর্য্যাভ্যন্তরে রজঃগুণের (কামিক প্রবৃত্তি উদ্দীপনী শক্তি) স্ফুরণ হইতে দেহ, মস্তকাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও দৈহিক যন্ত্রের অঙ্কুর নির্ম্মিত এবং তৎসহ জৈবীক্রিয়া (পঞ্চপ্রাণ) স্ফুরণ হয় ও ঐ জৈবীক্রিয়া দ্বারা দেহ পুষ্ট হইতে থাকে। সত্ত্বগুণের (জ্ঞান বিকাশিনী-শক্তি) স্ফুরণ হইতে মস্তিষ্ক স্নায়ু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অঙ্কুর নির্ম্মিত ও তৎসহ মন ও বুদ্ধির বীজের স্ফুরণ হয়। ঐ স্ফুরণ হইতে মস্তিষ্ক স্নায়ু ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিকাশ হইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি ও মনের জ্ঞানাঙ্গী বৃত্তি মস্তিষ্কে বিকাশ এবং মস্তিষ্কে উহার ক্রিয়া হয়। মস্তিষ্কে বিকাশ ও ক্রিয়া মাত্রেই বহির্ম্মুখী হইয়া নিম্নস্থ স্নায়বিক চক্রে (Nerve centre) আভ্যন্তরিক ক্রিয়া হইতে থাকে। তদ্দ্বারা কার্য্যকারী বৃত্তি বিশেষ উত্তেজিত হইয়া প্রত্যুৎপাদক স্নায়ুর (Mater Nerve) গতি উৎপাদন করায় তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয় অনুভূতির বিকাশ ও বাহ্য জগতের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া বাহ্য বিষয়াভাসের সহিত আনুভৌতিক স্নায়ুর যোগে পুনঃ মস্তিষ্কে নীত ও তথায় প্রতিক্রিয়া হয়। পুনর্ব্বার বহির্ম্মুখী হইয়া বাহ্য জগতে প্রবেশ করে। স্মৃতিশক্তি মনের পঞ্চজ্ঞানাঙ্গী বৃত্তির অন্তর্গত। ঐ পঞ্চাঙ্গী বৃত্তি মস্তিষ্কে বিকশিত হইয়া মস্তিষ্কেই বিলীন হয় এবং স্থূল জগতের সহিত উহার সংস্রব থাকে। বাহ্য বিষয়ের অভিজ্ঞতা ঐ মস্তিষ্কে সঞ্চিত ও জ্ঞানাঙ্গী এবং কার্য্যকারী বৃত্তির সাহায্যে মস্তিষ্কে স্নায়বিক ক্রিয়ার সহিত বিকশিত হয়। পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি মস্তিষ্ক ও বিশেষ বিশেষ স্নায়ুর সহিত ওতপ্রোত ভাবে সংমিশ্রিত আছে। বুদ্ধি ও মন বাহ্যজগৎ হইতে অন্তরাভিমুখী হইয়া সূক্ষ্মজগতে প্রবিষ্ট মাত্রেই ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞানাঙ্গী বৃত্তি নিদ্রিত হইয়া পড়ে। তখন মনের কার্য্যকারী বৃত্তিগুলি পূর্ব্ব-বর্ণিত মত বাহ্য-স্মৃতির আভাসমাত্র ধারণ করিয়া, স্বপ্ন-জগতে অকস্মাৎ প্রবৃত্তির হস্তের ক্রীড়নক মাত্র হয়; তরুনশ্বর মন ও বুদ্ধি যতই অন্তর্জ্জগতে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, ততই মনের কার্য্যকারী বৃত্তিগুলিও নিদ্রিত হইয়া পড়ে। কেবল দেহাভ্যন্তরে জৈবিক্রিয়া চলিতে থাকে, ইহাই সুষুপ্তি অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে অন্তর্জ্জগতে আনুভৌতিক স্নায়ুর (Sensilive nererc) গতি না হওয়ায় জ্ঞানানুভূতির বিকাশ হয় না। প্রত্যুৎপাদক স্নায়ুকর্ত্তৃক আনুভৌতিক স্নায়ুর ক্রিয়ার বিকাশ মাত্রেই পূর্ব্বোক্ত মত বাহ্যজগতে জ্ঞানানুভূতির বিকাশ হয়। আন্তরিক অবিকশিত জ্ঞানের (আত্মার) আভাস বাহ্যজগতে বিকশিত হইয়া বাহ্যজগতের অভিজ্ঞতার সার পঞ্চমাত্র সঞ্চয় করিয়া অন্তর্জ্জগতে লইয়া যায়। ইহ জগতের বুদ্ধি ও মনোবৃত্তি, দৈহিক ও মস্তিষ্কস্থ সূক্ষ্ম উপাদানের সহিত অন্তরীক্ষস্থ সমবায়ী সূক্ষ্মোপাদানে মিলিত হইয়া যায়। এইরূপে পার্থিব স্থূল-শরীর পৃথিবীতে, সূক্ষ্মোপাদান অন্তরীক্ষে বিলীন হয়। পুনর্ব্বার ঐ সঞ্চিত গন্ধতন্মাত্র বীজ নূতন রূপে নূতন হইয়া আইসে, অর্থাৎ নূতন ঔপাদানিক গুণের সহিত নবভাবে বিকশিত হয়; কেবল বীজে পূর্ব্ব জন্মের বুদ্ধি ও মনের সাধারণ ক্ষমতা মাত্র অর্থাৎ স্মৃতি, মেধা, ধৃতি প্রভৃতির ক্ষমতা শক্তিভাবে লুক্কায়িত থাকে; নূতন ক্ষেত্রে নূতন উপাদানের সহিত নূতন ভাবে বিকশিত হয়। অনুভূতি ও স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞানাঙ্গী বৃত্তির ক্রিয়া যখন মস্তিষ্কের সহিত উৎপত্তি ও মস্তিষ্কেই বিলীন হয়, তখন নূতন মস্তিষ্কস্থ উপাদানে পূর্ব্ব মস্তিষ্কলাভ বাহ্য জ্ঞানানুভূতি ও স্মৃতি প্রভৃতি কি প্রকারে বিকশিত হইবে? তবে তাহার সার সংগ্রহরূপ ক্ষমতা, যাহা শক্তিরূপে বীজস্থ থাকে, নূতন উপাদানের সহিত সেই শক্তি ও ক্ষমতা সংযুক্ত হইয়া, তদ্দ্বারা নূতন অনুভূতি ও স্মৃতি প্রভৃতি বৃত্তি বিকশিত হয়। কিন্তু সেই অনুভূতি ও স্মৃতি বিকশিত হইতে পারে না। মনে কর, বীজ হইতে একটী চারা অঙ্কুরিত ও ক্রমে তাহার নব-পল্লব উৎপন্ন হয়। প্রতি শীতকালে তাহার সমস্ত পত্রগুলি ঝরিয়া পড়ে; বসন্তে পুনর্ব্বার নব-পত্র উদ্গম হয়, আবার পত্র ঝরিয়া নব-পল্লব উৎপন্ন হয়। এইরূপ শাখা প্রশাখায় ঐ চারা প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফল প্রসব করে; এই স্থলে বীজ আত্মা, উহার উদ্গমই সৃষ্টি, পত্রাদিই পার্থিব মানব। ঐ পত্র পতিত হইয়া তৎস্থানে নব-পল্লব উৎপন্নের নিমিত্ত যে উদ্গম সঞ্চিত হয়, সেই উদ্গমই পার্থিব কর্ম্মফল ও অভিজ্ঞতার বীজ স্বরূপ; শাখা প্রশাখা জন্ম জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা; কাণ্ড একাণ্ড মস্তিষ্কশক্তি ফলই নির্ম্মল জ্ঞান। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, যে পত্রগুলি ঝরিয়া পড়িয়া যায়, সেই পত্রগুলি কি পুনরুদ্ভবিত হয়? কখনই নহে, কিন্তু ঐ পত্র ঝরিয়া গেলে ঐ পত্রের রসমূলে যে উদ্গম সঞ্চিত হয়, তদ্দ্বারাই নব-পল্লব ও তদাশ্রিত নব-পত্রোদ্গম হয়। অতএব ঐ পতিত পত্রগুলি মস্তিষ্কস্থ পূর্ব্ব স্মৃতি ও নব-পত্ররূপ নূতন মস্তিষ্কস্থ নূতন স্মৃতি এক নহে। কিন্তু পূর্ব্ব-পত্রস্থ প্রসবের উদ্গম হইতে নব-পল্লব সতেজে বিকশিত ও পত্রগুলি পূর্ব্ব-পত্রের স্বভাবাক্রান্ত হয়, তাহাতেই ভগবদ্গীতাকার বলিয়াছেন।

"তত্রতং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্দ্দেহিকং।
যততেচ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥"

বঙ্গার্থ—তিনি সেই পূর্ব্ব-জন্মের দেহলাভ বুদ্ধি লাভ করিয়া মোক্ষ বিষয়ে অধিকতর যত্ন করিয়া থাকেন।

শিষ্য।—মহাশয় পুরাতন পত্র ঝরিয়া গেলে নব-পত্ররূপ নূতন মানবে যদি পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির উদয় না হয়, তবে গীতায় কৃষ্ণোক্ত—

"বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি নত্বং বেত্থ পরন্তপ।"

বঙ্গার্থ—হে পরন্তপ, আমার এবং তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে সকল জন্মের বৃত্তান্ত জানি। তুমি অবিদ্যাবৃত বলিয়া জান না এই কবিতার তাৎপর্য্য কি? আপনিও পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, মহাত্মাগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাজ্বল্যমান থাকে, ইহার অর্থ কি?

গুরু।—পত্র এবং ফল একত্ব স্বভাবাক্রান্ত নহে; পত্র ঝরিয়া গেলে তাহা মৃত্তিকাসাৎ হয়। অবশ্যই ঐ পত্র মৃত্তিকাসাৎ হইয়া তাহার বিকারে অন্য বস্তু উৎপাদিত হইতে পারে; কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে সেই পত্র অঙ্কুরিত হয় না বা তাহাতে নব-পত্র উদ্ভূত হয় না; কিন্তু ফল ভূমিসাৎ হইলে ঐ ফলই সাক্ষাৎভাবে অঙ্কুরিত ও তাহা নব-বৃক্ষে পরিণত হয়। অতএব মূলে উদ্যম এক হইলেও পুরাতন পত্র হইতে নূতন পত্র পৃথক; কিন্তু ফলরূপ বীজ হইতে চারা পৃথক নহে। এস্থলে অর্জ্জুনের মনোবৃত্তি পত্র স্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণের মন সাক্ষাৎ জ্ঞানময় ফল স্বরূপ। ফলিতার্থ তোমার আমার বুদ্ধি ও মন বিক্ষিপ্ত ও খণ্ড খণ্ড। অখণ্ড স্থির মন ও বুদ্ধি ব্যতীত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর বহির্ম্মুখী ক্রিয়া হইতে অপসৃত হইয়া অভ্যন্তরস্থ শক্তিরাজ্যে জাগরিত থাকিতে পারে না। ঐ অখণ্ড মহামন ও বুদ্ধি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর বহির্ম্মুখী ক্রিয়া (বাহ্যজগত) হইতে অপসৃত হইয়া যখন অভ্যন্তরস্থ শক্তিরাজ্যে জাগরিত থাকিতে সক্ষম হয়, তখন ষড়ৈশ্বর্য্য (অণিমা লঘিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য) সম্পন্ন হয় এবং অন্তর্ম্মুখী ক্রিয়া দ্বারা শক্তিরাজ্য অতিক্রম করিয়া জ্ঞানরাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে; অর্থাৎ অন্তরীক্ষস্থ শক্তি ও ক্রিয়া আয়ত্তাধীন করিয়া কারণ-জগতে প্রবেশ ও স্ব-শরীরে স্বর্গলাভ করিতে পারে। সেস্থলে দেহ মস্তিষ্কাদি পরিধেয় বস্ত্র-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। অখণ্ড বুদ্ধি ও মন ও তাহার অনুভূতি স্মৃতি ধৃতি প্রভৃতি জ্ঞানাত্মী বৃত্তি সকল কেবল পার্থিব মস্তিষ্কে জাগরিত থাকে না। মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ শক্তি ও জ্ঞানরাজ্যে জাগরিত থাকে। যখন ঐ অখণ্ড বুদ্ধি ও মন পত্ররূপ মস্তিষ্কস্থ মনোবৃত্তি অতিক্রম করিয়া অন্তরস্থ জ্ঞানরূপ ফল সংযুক্ত হয়, তখন পত্র ঝরিয়া পড়ার পত্রের সহিত ভূমিসাৎ হয় না, ফলের সহিত আবশ্যক মত ভূমিসাৎ হইয়া স্বয়ংই অঙ্কুরিত হয়। যথা—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।"

প্রকৃতপক্ষে দেহোৎপন্ন বুদ্ধি, আত্মাও দেহের মধ্যবর্ত্তি। সাধারণতঃ ঐ বুদ্ধি ও মন দেহরাজ্যে বিচরণ করে ও দেহের সহিত বিলুপ্ত হয়। উহারা সারসংগ্রহ মাত্র আত্মার সূক্ষ্ম স্তরের ন্যায় সঞ্চিত হয়; কিন্তু যখন দেহ অভ্যন্তরে থাকিয়া দেহরাজ্য অতিক্রম করিয়া শক্তি ও জ্ঞানরাজ্যে বিচরণে সক্ষম হয়, তখন আর দেহের সহিত উহার মৌলিক সম্ভব থাকে না। দেহ ধ্বংশ হইলে দেহের সহিত উহার ধ্বংশ হয় না। আত্মিক (জ্ঞান) রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে, আত্মায় 'কর্ম্মফল' রূপ সঞ্চিত স্তরের পরিবর্ত্তে আত্মভাবাক্রান্ত ও মহদ্ভাবের মহামানস শক্তিতে পরিণত হয় এবং স্বয়ং ঈশ্বর রূপ ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের অঙ্গীভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মাই নারায়ণ, নর-অয়ণ=নারায়ণ বলিলে উহার অর্থ বিশদ ও স্পষ্টকৃত হইবে; অর্থাৎ নর হইয়াছে আধার যাহার, এস্থলেও উপাধীগত পার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে। যেহেতু নারায়ণ পরম আত্মা নহেন, নর অর্থাৎ মনুষ্যের আত্মা। তাঁহার আভাস মানবেই বিকাশ হয়। ঐ আত্মাভাসময়ী বুদ্ধি ও বিবেক আত্মায় মিলিত হইলে মহাদাত্মায় পরিণত হয়। পার্থিব নর নারায়ণের অঙ্গীভূত হইয়া মহাবিষ্ণুত্ব পদ প্রাপ্ত হন।

শিষ্য।—আপনার উপরোক্ত মীমাংসা দ্বারা যোগের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিলাম। সুষুপ্তি এবং সমাধীর মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ; কিন্তু ফলগত অতি বিসদৃশ। সুষুপ্তি ও সমাধী উভয় অবস্থায়ই মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া বাহ্যজগত হইতে অন্তর্হৃত হয়; কিন্তু প্রথমোক্ত অবস্থায় অবিকাশিত হয় ও শেষোক্ত অবস্থায় অন্তর্জ্ঞানের সহিত অন্তর্জগতে সম্যক প্রস্ফুটিত ও বিকাশিত হয়, ইহারই নাম অপরোক্ষ জ্ঞান। যোগের সময় চক্ষু মুদ্রিত না করিয়া নাশাগ্র দৃষ্টি বা ভ্রূ-মধ্যে দৃষ্টি সঙ্কোচন পূর্ব্বক ধ্যান বা আধ্যাত্মিক চিন্তার তাৎপর্য্য এইবার বিশদরূপে বুঝিয়াছি। আমরা নিতান্ত অন্ধ, এজন্য পরমাত্মিক তত্ত্ব ভুলিয়া অকিঞ্চিৎকর বিষয়-সুখের চাকচিক্যে মোহিত হইয়া পড়িয়াছি। হায়! সেই পরম-জ্ঞানী আর্য্যঋষিগণ কোথায়! আর তাঁহাদের বংশধর নরকের কীটরূপ আমরাই বা কোথায়! হা ধিক অর্থ, হা ধিক পাশ্চাত্য সভ্যতা, হা ধিক প্রভুত্ব, ধন, মান, সম্পদ; হার ধিক ধিক!! আমাদিগকে শত ধিক!! আর নয় এই পর্য্যন্ত আপনি প্রজ্ঞা ও বিবেকরূপে বিকাশিত হইয়া যে মহামন্ত্র প্রদান করিলেন, এই মন্ত্র সিদ্ধির নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমি মূঢ়, আপনি দূরে অবস্থান করিলে কামরূপী শত্রু আমাকে পুনারাক্রমণ করিবে। আপনি ব্যতীত তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার শক্তি কাহারও নাই। আপনিই প্রকৃত গুরু, আসুন আপনাকে সম্মুখে রাখিয়া আমি যাঁহার সন্ধান, যাঁহার আভাসে আমিত্বের বিকাশ, সেই বিশ্ব আমিরূপ বিশ্বপিতাকে নমস্কার করি—

তমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্তমস্য বিশ্বস্যপরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ ১২অ ৩৮।৩৯।৪০

বায়ুর্যমোহগ্নি বরুণঃ শশাঙ্ক
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমোহস্তু সহস্র কৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোহস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব
অনন্ত বীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্ব্বঃ॥

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কন্যা-বিক্রয়।

পশু জাতির এত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, তাহারাও আত্ম-সন্তানের উপকারের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুকে আমরা যত কেন হিংস্র, যত কেন নিকৃষ্ট মনে করি না, কিন্তু তাহারাও কখন আত্ম-সন্তানের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করে না। আর জ্ঞানাভিমানী জীব-

শ্রেষ্ঠ মানব দয়া, ধর্ম্ম, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি সমস্ত মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, লোক-নিন্দার মস্তকে পদাঘাত করিয়া, অনায়াসে হৃদয়ে স্বীয় ঔরস-জাতী দুহিতার মাংস-বিক্রয় দ্বারা ধনবৃদ্ধি ও সুখের আয়োজন করিতেছে। এই পশু-বিগর্হিত নিকৃষ্ট ব্যবহার, রাক্ষসাপেক্ষা নৃশংসাচরণ দ্বারা অবলা জাতির উপর যে কি কঠোর অত্যাচার করা হইতেছে, সমাজের যে কত দূর অনিষ্ট-সাধন করা হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয়ে বিষম ক্লেশ উপস্থিত হয়। নৃশংস পিতার অর্থ-পিপাসায় যে কতশত রাজযোগ্য কুসুম-কোমলা স্বর্গ-প্রতিমা ধনহীন, কুরূপ, মূর্খ, কুকর্ম্মান্বিত বৃদ্ধের হস্তে পতিত হইয়া আজীবন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এই অর্থ-লালসার মোহকরী ছায়ে যে কত শত অন্যূন কন্যা জরাজীর্ণ-বৃদ্ধ পতির হস্তে পতিত হইয়া অকালে বৈধব্যের চিরসঙ্গিনী হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে স্থলে অর্থ-পিপাসার নিকট দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানুষিক সংপ্রবৃত্তিগুলি পদদলিত; যে স্থলে সামান্য পণ্যের ন্যায় বাজার-দরে আত্ম-মাংস বিক্রয়; সে স্থলে আর সৎপাত্রের আশা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যে স্থলে কন্যা-বিক্রয়; সেই স্থলেই অপাত্রে কন্যা অর্পণ। বাজার-দরে উচ্চমূল্যে দ্রব্য বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা কি পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া থাকে? যাহার অধিক অর্থ; ভাল দ্রব্য তাহারই করায়ত্ত। বিক্রেতা মূল্যের উচ্চ পরিমাণ ভিন্ন কখনও ক্রেতার দোষ গুণ বিবেচনা করে না। সুতরাং যে স্থলে কন্যা-বিক্রয়, সেই স্থলেই নির্দ্ধন, কুরূপ, মূর্খ বা রুগ্ন পতি; সেই স্থলেই বাল-বৈধব্য, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, আত্মহত্যা, জাতি-ত্যাগ; সেই স্থলেই বর্ণসঙ্কর, বংশ-লোপ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে।

কেবল শুধু বাজার-দরে বিক্রয় নহে। বাজার-দরেরও একটা সাময়িক সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু কন্যা-পণের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। ক্রেতার সর্ব্বস্বান্ত না হইলে পর্য্যন্ত মূল্য বৃদ্ধির সীমা হয় না। বালিকার ৪র্থ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইতে না হইতেই ডাক বৃদ্ধি আরম্ভ হয় এবং ক্রেতার ভদ্রাসনবাটী বন্ধক না হওয়া পর্য্যন্ত, কন্যার ভাবী অন্নবস্ত্রের আশা বিলুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমেই মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কন্যাকর্ত্তা অনেক সময় অর্থের মায়ায় অন্ধ হইয়া "অন্যপূর্ব্বা" দোষের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করে না। কি লজ্জা!! কি পরিতাপ!! এমন কি, অনেক সময় বাগ্দান অথবা অধিবাসের পরেও কন্যা ফিরাইয়া লইয়া (অধিক অর্থের জন্য) অন্য-পাত্রস্থা করিয়া থাকে। অনেক স্থলে বরকে অর্থনাশ, মনস্তাপ প্রভৃতি সহ করিয়া শিশুপালের ন্যায় ভগ্ন-হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন সমাজে কন্যা-মূল্য এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, অনেকে আজীবন আপ্রাণ যত্ন করিয়াও মূল্যের পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই, তাহাদিগকে চির-কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। চির-কৌমার্য্য ব্রতের ফল মুক্তি। কিন্তু এরূপ চির-কৌমার্য্যের ফলে ভাবী বংশের আশা পর্য্যন্ত মুকুলিত করে।

যে স্থলে বিক্রয় প্রথা, সেই স্থলেই অকাল-বিবাহ। সামান্য বেতনের চাকুরি করিয়া বা সামান্য জোত ব্রহ্মোত্তরের আয়ের দ্বারা ১৫০৲ ২০০৲ হাজার টাকা সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং ঐ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতেই বরের বয়ঃক্রম প্রায়

৫।৬৫ বৎসর অতীত হয়। ৪০।৪৫ বৎসর বয়সে ৮।৯ বৎসরের বালিকার পাণিগ্রহণ করিলে, সে বিবাহের পরিণাম অকাল-বৈধব্য ভিন্ন আর কি হইবে? যাহা কিছু অবশিষ্ট আয়ু থাকে; তাহাও ঋণের চিন্তা ও পরিবার প্রতিপালনের চিন্তাতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কাজে কাজেই অনেকে বিবাহ করিয়াও বংশরক্ষা করিতে পারে না। ভাগ্যফলে এ সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও যাহাদিগের সন্তান হয়, সে সন্তান দ্বারাও কোনরূপ উন্নতির আশা নাই। অসময়ের সন্তান অধিকাংশ স্থলেই শৈশবাবস্থাতে পিতৃহীন হয়; সুতরাং অর্থাভাবে তাহারা যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারে না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে পাচক-বৃত্তি বা দাসত্ব অবলম্বন করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে কন্যা-মূল্য যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে ইহার কোন প্রতিকার না হইলে, অল্পকাল পরেই এই শ্রেণীর লোকের অস্তিত্ব লোপ হইবে। এ বিষয় কেহ অনুসন্ধান করিলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন যে, বর্ত্তমান সময়েই এই সমাজের এক তৃতীয়াংশ কেবল অর্থাভাবে অবিবাহিত রহিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক অসভ্যদেশেও মনুষ্য-বিক্রয় প্রথা নাই। কিন্তু সুসভ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সুশাসিত রাজ্যে ভদ্রসমাজে প্রকারান্তরে মনুষ্য-বিক্রয় প্রথা অবাধে প্রচলিত দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এস্থলে আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, আইনের দ্বারা এ বিক্রয়-প্রথা রহিত হউক; কিন্তু সমাজের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে রাজার তীব্রদৃষ্টি ভিন্ন এ কুপ্রথা নিবারণের আশা কম।

কিন্তু হিন্দু সমাজের ঐ ঘোর দুর্দ্দিনে, ঘনঘটাচ্ছন্ন তিমিরময়ী-রজনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া সময় সময় বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইতে দেখিলে, আবার হৃদয়ে ক্ষীণ-আশার সঞ্চার হয়। আবার কোন কোন হৃদয়বান্ হিন্দুর কিছু কিছু যত্ন দেখিয়া, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভরসা জন্মে। তাই আবার সাহস করিয়া এ প্রস্তাবের অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হিন্দু সমাজের নিকট আমাদিগের করজোড়ে প্রার্থনা, তাঁহারা এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত সমাজের প্রতি, অবৈধ অত্যাচার-পীড়িতা কুলকামিনীদিগের প্রতি দয়া করিয়া ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য কুল-রক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্নে অক্ষয় পুণ্য ও অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করুন। নচেৎ দিন্দিন এই পতিত সমাজের সংস্রবে সুব্রাহ্মণগণও পাতিত্য লাভ করিবেন। সুতরাং ক্রিয়াবান্, আচারবান্ সুব্রাহ্মণের অভাবে হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপ, যাগ যজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ প্রভৃতি সমস্তই লোপ হইয়া যাইবে। এবং কালক্রমে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্বের স্মৃতি পর্য্যন্তও পাতিত্যের গাঢ় অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইবে।

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

শেষ।

(১)

কেঁদেছি অনেক দিন
কাঁদিব না আর।
বৃথা আর কেন মায়া,
মোহের কুহক ছায়া,
আঁধার জলদ গায়
বিজলীর হার॥

কেন মধুময় সুরে,
সুদূর দিগন্ত-পুরে,
"আয় আয়" বাজে পুনঃ
আশার ঝঙ্কার।

(২)

সুধু কাঁদা সার হল,
সুধু বুক ভেঙ্গে গেল,
নীরবে ছিঁড়িল সুধু
মরমের তার।

শূন্য তপ্ত মরুমাঝে,
মরীচি ছলনে মজে,
তৃষায় শুড়িল সুধু
অন্তর আমার॥

(৩)

মানস-মন্দির খুলে,
হৃদিপদ্ম বেদি তলে,
এক ধ্যানে গড়ে ছিনু
দেবী প্রতিমায়।

এ মোর পরাণ লয়ে,
আঁখিজল মিশাইয়ে,
উৎসর্গ করিয়াছিনু
সে কোমল পায়॥

(৪)

সারাটা জীবন ভরে,
কোটি বজ বুকে ধরে,
তন্ময়ে সাধিয়ে ছিনু
সে হৃদয় দেবী।

একাগ্র আপনা হারা,
অধীর পাগল পারা,
পুজেছি যতনে সেই
প্রেমময়ী ছবি॥

(৫)

নাহি সে প্রতিমা আর,
নাহিক সে ছায়া তার,
সে যে গো চলিয়ে গেছে
হৃদি শূন্য করে॥

একটি অস্ফুট ভাষে,
একটি দীঘল শ্বাসে,
প্রতিমার বিসর্জ্জন
জনমের তরে।

(৬)

তবে আর কেন মায়া,
আঁধার কুহক ছায়া,
আঁধার জলদ গায়
বিজলীর হার।
সুধু কাঁদা সার হ'ল,
সুধু বুক ভেঙ্গে গেল,
নীরবে ছিঁড়েছে সুধু
মরমের তার॥
কেঁদেছি অনেক দিন
কাঁদিব না আর।

শ্রীসনোন্মোহন বসু বি, এ।

বনদেবী

(উপাখ্যান)

প্রথম অধ্যায়।

পিতৃ-মাতৃহীনা।

পবিত্র প্রভাসক্ষেত্রে সরস্বতী তীরে যেদিন বিপুল যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল, সেই শোকে দুঃখময় ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে—হলধর চাষক জাতির উৎপত্তি বীজ অঙ্কুরিত হয়। কথিত আছে—ইন্দ্রিয়-সংযমী মহাযোগী বলরাম বনদেবী নাম্নী একটী রমণীকে অন্তরে অন্তরে ভাল বাসিতেন। সেই সুন্দরী বনদেবীর সুন্দর হৃদয় অনন্ত গুণে পরিপূর্ণ ছিল; সে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জানিত; তাই সে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে প্রীতি করিত। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বলরামে তাহার অধিকতর প্রীতি ছিল, সেই ভক্তি প্রীতির গুণে বলদেব বনদেবীকে সতত স্নেহের চক্ষুতে দেখিতেন।

বনদেবী চিরকুমারী শৈশব হইতেই সন্ন্যাসিনী ব্রতে দীক্ষিতা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাহার বালিকা-সুলভ হৃদয়েই বিবেক জন্মিয়াছিল। এ পার্থিব জগতের পার্থিব সুখ যে ক্ষণস্থায়ী, তাহা সে বুঝিয়াছিল; সেইজন্য সে ভ্রান্তি মোহ-পূর্ণ সংসারের কোলাহলে মিশিতে বড় ভাল বাসিত না। যখন নিজ গৃহে পিতৃমাতৃ সন্নিধানে থাকিত, তখন সহর্ষে একান্ত-চিত্তে দেব-সেবার আনুষ্ঠানিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিত। গৃহের কার্য্য শেষ হইলে, ক্ষুদ্র বালিকা যোগ-নিরত-বলদেবেরসম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মধুর কণ্ঠ-বিনির্গতউপদেশ রাশি শ্রবণ করিয়া তৃষিত জীবনে পরিতৃপ্তি লাভ করিত।

এতাদৃশ বিশুদ্ধ সুখ উপভোগে তাহার শৈশব-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। যখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল, তখন তাহার অপরিমেয় সৌন্দর্য্য-রশ্মি দিগ্‌দিগন্তে প্রতিভাত হইল। নব-প্রস্ফুটিত ক্ষুদ্র যূথিকার সুমধুর সৌরভ রাশি চারিদিক আমোদিত করিতে লাগিল। তাহার দেবী-সুলভ গুণগ্রামের কথা শ্রবণ করিয়া অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক তাহার পাণি-গ্রহণে অভিলাষী হইলেন। নানাস্থান হইতে তাঁহার পিতার নিকট শত শত অনুরোধ-পত্র আসিতে লাগিল। পিতাও যথোপযুক্ত সময় বুঝিয়া, তাহার বিবাহ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন।

বনদেবীও শুনিল, তাহার বিবাহ হইবে।

সে মনে মনে একবার ব্রিজরূপের হাসি হাসিল; কারণ সে জানিত—যিনি জগন্নাথ, তিনিই প্রকৃত স্বামী। এ জগৎ সংসার তাঁহারই, এজীবনসর্ব্বস্ব তাঁহার। পার্থিব জগতের স্বামী কেবল ক্রীড়ার উপকরণ মাত্র, পার্থিব বিবাহ দুঃখের নিদান—মায়ার দৃঢ় বন্ধন মাত্র। যদ্যপি ঈশ্বরে নিবেদন করিয়াছি, তাহা আর কাহাকেও দিতে পারিব না—যে জীবন ঈশ্বর-সেবায় নিয়োজিত করিয়াছি, সে জীবনে মনুষ্য-সেবা করিতে পারিব না—নারায়ণ ছাড়িয়া কোন্ নরের উপভোগ্য হইব? সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, বিবাহ করিব না—চিরকুমারী থাকিব।

ভগবান্ যাহার সহায়, কে তাহার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে? সে যে প্রতিজ্ঞা করিল, তাহাই স্থির থাকিল। তাহার বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার অব্যবহিত পরেই নিয়তির অনিবার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অকস্মাৎ একদিনেই তাহার পিতা মাতা উভয়েই একসঙ্গে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। অর্দ্ধস্ফুটযৌবনা বনদেবী পিতৃমাতৃ বিয়োগে নিতান্ত কাতরা হইয়া পড়িল। যদ্যপি বিবিধ ধর্ম্মময় উপদেশে তাহার ধর্ম্মজীবন গঠিত হইয়াছিল, যদিও দৈববলে তাহার কোমল হৃদয়ে আত্ম-সংযমন শক্তি অনিয়াছিল, তথাপি এ নিদারুণ শোক সে সহ্য করিতে পারিল না। তাহার ধৈর্য্যস্তম্ভ শোকসিন্ধুর প্রবল উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া গেল, সে সপ্তদিন অবিরাম অশ্রুমোচন করিয়া অবশেষে নিদারুণ-সন্তপ্তা, ভূমিতলে ত শয্যায় শয়ন করিল।

বলদেব প্রতিদিন বনদেবীকে দেখিতে পাইতেন। এখন উপর্য্যুপরি সপ্তদিন দেখিতে না পাইয়া, বনদেবীর জন্য চিন্তিত হইলেন; চিন্তিত হৃদয়ে যোগাসনে বসিয়া ধ্যান-মগ্ন হইলেন। মহাযোগী যোগবলে জানিতে পারিলেন—পিতৃ-মাতৃহীনা বনদেবী এখন মহাশোকে শয্যা-শায়িনী। আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সেইদিনই নিশাকালে ছদ্মবেশে অনুসন্ধান করিয়া, বনদেবীর পিতৃ-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাটী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহ সমস্ত অন্ধকার—কাহারও সাড়া শব্দ নাই; ডাকিলেন "বনদেবী"! কাহারও উত্তর পাইলেন না, তাঁহার অন্তর যেন ব্যথিত হইল। কি করিবেন, ভগ্ন-হৃদয়ে সেখান হইতে অপসৃত হইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। সহসা একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে কাহার দীর্ঘনিশ্বাস ধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। মনে মনে দৃঢ় প্রতীতি হইল, ইহা নিশ্চয়ই কোন শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস! দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন; আবার ডাকিলেন "বনদেবী"! এবার সে অমৃতবর্ষী কণ্ঠস্বর শোকসন্তপ্তা বনদেবীর মর্ম্মতলে প্রবেশ করিল; হৃদয়ে কত যেন আনন্দধারা প্রবাহিত হইল, শয্যত্যাগ উঠিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু শোকে, অনাহারে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল—উঠিতে পারিল না; ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল কে গো।

সে স্বর বলদেব চিনিতে পারিলেন; আর বিলম্ব করিলেন না, মুহূর্ত্ত মধ্যে আলোক প্রজ্বালনের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একটী দীপ প্রজ্বালিত করিলেন। সে দীপালোকে গৃহটী প্রভাসিত হইলে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিলেন—ধূলি-শয্যায় বনদেবীর স্বর্ণকান্তি বিলুণ্ঠিত, ফুয়েজীবর নয়নদুটী গাঢ় রক্তবর্ণে রঞ্জিত, অবিরল অশ্রুজলে সিক্ত মুখপ্রভা ম্লান—নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি আলুলায়িত ও ধূলি-ধূসরিত, শরীর শীর্ণ, লাবণ্য পরিশূন্য, অর্দ্ধমৃতবৎ!!

বলদেব নীরবে অশ্রু মোচন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সম্বরণ

করিয়া, ধীরে ধীরে বনদেবীর পার্শ্বে গিয়া বসিলেন, স্নেহময় মৃদুস্বরে ডাকিলেন "বনদেবি!"

বনদেবী চক্ষু মেলিয়া চাহিল, দেখিল সম্মুখে তাহার জীবনের আরাধ্য দেবতা নররূপী অনন্তদেব। তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, আহ্লাদ রাখিবার যেন স্থান হইল না। হর্ষে দুঃখে নয়ন দুটী প্লাবিত করিয়া প্রবলবেগে অশ্রু নির্ঝর বহিল; কিন্তু কথা কহিতে পারিল না; সকাতরে বলদেবের মুখপানে চাহিতে লাগিল, সে দৃষ্টি করুণ অথচ মর্ম্মভেদী।

বলদেব বনদেবীর অন্তরের কথা বুঝিলেন, ধীরে ধীরে হস্ত দুখানি ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন, সস্নেহে বলিলেন "বনদেবি! এ দশা কেন?"

বনদেবী এবার প্রভাতের বিহঙ্গিনীর মত উচ্চৈস্বরে কাঁদিল, গদ্গদ-কণ্ঠে বলিল "প্রভো! যিনি অন্তর্যামী, তাঁহাকে আর কি বলিব; যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী, তাঁহারই ইচ্ছায় আমার এ দশা!"

"যদি তাহাই জান, তবে শয্যাশায়িনী হইয়াছ কেন?"

"কি করিব দেব! অভাগিনী আমি, আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না।"

"ছি ছি!! সে কথা মুখে আনিও না, ধৈর্য্যই মহত্ত্ব; ধৈর্য্যই বল, ধৈর্য্যই একমাত্র সহায়। ধৈর্য্যই যদি হারাইবে, তবে এতকাল যথা উপদেশ শুনিয়াছ কেন? যে এ সংসারে স্বরং জানিয়া অসম্ভাপ্তির বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতে উপেক্ষা করিল, তাহার কি আজ অনিবার্য্য বিরহ-শোক প্রকাশ করা শোভা পায়? আচ্ছা, তোমাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি তুমি কাহার?"

"প্রভো! আজ আবার এ নূতন পরীক্ষা কেন? আপনি যাহা শিখাইয়াছেন, তাহাই শিখিয়াছি;—আমি সেই ইচ্ছাময় ভগবানের।"

"ভাল! তুমি তাঁহার, এ সৃষ্টিসমূহও তাঁহার?"

"তাহাও তাঁহার।"

"ভাল! এ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য্য কাহার ইচ্ছায় সংসাধিত?"

"তাহাও তাঁহার।"

"মানুষ ইচ্ছা করিলে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে পারে?"

"না।—"

"তোমার পিতা মাতা কাহার ইচ্ছায় এ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন?"

"সেই ভগবানের ইচ্ছায়।"

"আচ্ছা! তুমি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে রাখিতে পারিতে?"

"না।"

"আরও একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, ভগবান যাহা করেন, তাহা মঙ্গল কি অমঙ্গলের জন্য?"

"তিনি মঙ্গলময়, যাহা করেন তাহাই মঙ্গলের জন্য।"

"তবে তুমি মাতৃপিতৃ-বিরহে শোক-সাগরে ভাসিতেছ কেন? তাঁহাদের কাল পূর্ণ হইয়াছে, ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা সাধিত হইয়াছে, যথা সময়ে তাঁহারা পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন; তোমার সহস্র ক্রন্দনেও ফিরিবেন না। কেহ কখন ফিরে নাই, এখন মনে কর ভগবানের ইচ্ছায় তোমার এ বিরহ ঘটিয়াছে; অদৃশ্য তিনি তোমার কোন শুভ সাধনোদ্দেশেই এ বিরহ ঘটাইয়াছেন। শোক পরিত্যাগ কর, ধৈর্য্যের বন্ধন দৃঢ় কর, বিবেকালোক প্রজ্বালিত কর; এখন তুমি শোকাচ্ছন্ন হইয়া চারিদিক অন্ধ-

কার বিধিচ্ছেদ, বিবেকের জ্যোতিতে সে অন্ধকার বিদূরিত হইবে, তখন সম্মুখে দিগন্তব্যাপী কর্ত্তব্যের পথ দেখিতে পাইবে।"

বনদেবী যেন অমৃত পান করিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন বৈকুণ্ঠপ্রদেশে বিষ্ণু-পদতলে বসিয়া ব্রহ্মসংগীত শুনিতেছে; তাহার দুর্ব্বল শরীরে ধীরে ধীরে বল সঞ্চার হইতে লাগিল, ভগ্ন-হৃদয় ধীরে ধীরে উত্তেজিত হইতে লাগিল, তাহার শোক-দুঃখ উষার অন্ধকারের মত ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল। বলরাম তখনও বলিতেছেন "লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া বহু কষ্টে মানবদেহ পাইয়াছ—এ দেহের কর্ত্তব্য ভুলিও না; মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মুক্তির শত কণ্টকিত করিও না। তুমি আমি সকলই মিথ্যা, এ সংসার স্বপ্নময়, সকলই ধ্বংস হইবে, থাকিবে মাত্র সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম পদার্থ। যাহাতে সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মে মিলিত হইতে পার, তাহার চেষ্টা কর; সুখ-দুঃখ মিথ্যা, হর্ষ-বিষাদ মিথ্যা, মায়া-মমতা মিথ্যা; সত্য কেবল সেই পরম পরাৎপর ভগবান! ভগবানকে ভুলিও না, মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না। বনদেবি! তুমি এখনও বালিকা—সকল কথা বুঝিতে পারিবে না; কিন্তু স্মরণ রাখিও, তোমার সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল তুমিই ভোগ করিবে।"

বলভদ্র নীরব হইলেন, বনদেবী তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "প্রভো! আমি মহাপাপের পাপিনী বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই; এখন বলুন কি করিব, কিসে আমার মুক্তি হইবে।"

"বলদেবের মুখকান্তি প্রশান্ত, করুণা-পরিপূর্ণ; বলিলেন "বনদেবি! সেজন্য ভাবিও না; যতদূর পারি সে পথ আমি তোমায় দেখাইব। এখন উঠ, গাত্র-ধূলি মার্জ্জনা কর, কিছু আহার করিয়া অন্তরাত্মাকে পরিতৃপ্ত কর, জানিও স্বেচ্ছায় শরীর ক্ষয় ও মহা পাপ।"

বলদেব কথা বলিতে বলিতে বনদেবীর অঙ্গ-ধূলি ঝাড়িতে লাগিলেন, বনদেবী পূর্ব্বে পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল, সেই পাদপদ্মে আজ বিনি-মূলে বিক্রীতা হইল।

বলদেব আবার বলিলেন 'বনদেবী, যদিও তুমি উচ্চ-চরিত্রা, তথাপি একাকিনী এ গৃহে তুমি কেমন করিয়া বাস করিবে? আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিব; সেখানে থাকিয়া যাহাতে তুমি মনে শান্তি পাও, তাহা আমি অন্বেষণ করিয়া দিব।"

বনদেবী স্বীকৃতা হইল।

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে, বলভদ্র ধর্ম্মগত-প্রাণা বনদেবীর হস্ত ধরিয়া রাজপথে বাহির হইলেন।

পরদিন দ্বারাবতীর সকলে শুনিল যে, অরুণনন্দিনী বনদেবী বলভদ্রের অনুগ্রহে রাজান্তঃপুরবাসিনী হইয়া লক্ষ্মী-স্বরূপিণী রুক্মিণী, সত্যভামা রেবতী প্রভৃতি রাজ্ঞীগণের অনুগ্রহপাত্রী হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নবীনা যোগিনী।

ধরিত্রী-বক্ষে সাক্ষাৎ গোলকধাম সদৃশ দ্বারকার রাজ-অন্তঃপুরে থাকিয়া, বনদেবীর ধর্ম্মময় জীবনের দুই বৎসর অতীত হইল; কিন্তু সে রাজ-অন্তঃপুর বাস বনদেবীর পক্ষে সুখকর বোধ হইল না। বাল্যকাল হইতে বনদেবী সংসারের কোলাহল ভালবাসে না,—তাহার সতত ইচ্ছা, সে নিভৃতে থাকে; নিভৃতে বসিয়া সংসার-সর্ব্বস্ব ভুলিয়া সে হরিপদ ধ্যান করে। কিন্তু রাজ-অন্তঃপুরে থাকিয়া তাহার

নির্জ্জন বাসের, নিভৃত চিন্তার ব্যাঘাত হইতে লাগিল; রাজ্ঞীগণ সতত তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার গীতধ্বনি-নিন্দিত বচনরাশি শুনিতে সাধ করেন, মুহূর্ত্তের জন্য নয়নের অন্তরাল করেন না। বনদেবী দেবীগণের এতাদৃশী অনুগ্রহপাত্রী হইয়া, আপনাকে সৌভাগ্যশালিনী মনে করিত বটে; কিন্তু বিরলে বসিয়া হরিপদ চিন্তার সাধ ত্যাগ করিতে পারিত না। তাই দুই বর্ষ এমনি ভাবে কঠোর-সঙ্গে কাল কাটাইয়া নিভৃত নিবাসের ইচ্ছা করিল। একদিন নির্জ্জনে বলদেবকে স্বীয় হৃদয়ের কথা জানাইল; তিনি পরম প্রীত হইয়া তখনই অনুমতি দিলেন। কারণ তিনি বনদেবীর হৃদয় পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছিলেন, এ অগ্নি-পরীক্ষিতা স্বর্ণ কলুষিত হইবার নহে।

সেই দ্বাপরের কান্তিময়ী দ্বারাবতী বিশাল বারিধির প্রশান্ত বক্ষে শোভা পাইত; সুনীল সিন্ধু অনন্ত জলরাশি বক্ষে ধরিয়া অঙ্কচন্দ্রাকারে দ্বারকাকে বেষ্টন করিয়াছিল। বনদেবী প্রতিদিন সেই সমুদ্র পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত, কোন দিন বা গভীর নিশীথে রাজ-অন্তঃপুর হইতে একাকিনী বাহির হইয়া, সেই সমুদ্র-তীরে যাইত। সমস্ত রাত্রি সেই সিন্ধুকূলে থাকিত, আবার প্রত্যূষে অন্তঃপুরের কেহ না জাগিতে জাগিতে পুরমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিত।

এখন বনদেবী সেই সমুদ্র-তীর ভ্রমণে স্বাধীনতা পাইয়া, সন্ন্যাসিনী-বেশে রাজ-অন্তঃপুর হইতে বাহির হইল। দ্বারাবতীর অদূরস্থিত সিন্ধুস্তট-দেশবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র কানন তাহার বিশ্রাম-স্থান নির্দ্দেশ করিল; স্বহস্তে শুষ্ক পত্র কুড়াইয়া একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিল। সেই পর্ণ-কুটীরে বনদেবীর ক্ষুদ্র হৃদয়ের পবিত্র চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সমস্ত দিবারাত্রি সেই কুটীরে অতিবাহিত করিত, বেলের ঔষধ একবার ভিক্ষার জন্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিত। যখন পরিপূর্ণ যৌবনশালিনী বনদেবী, স্থৈরিক-বসন পরিয়া সর্ব্বাঙ্গে বিল্ব-নামাঙ্কিত করিয়া রুদ্রাক্ষ-হারে কণ্ঠকে বিশোভিত করিয়া, আলুলায়িত কুন্তলে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগর মধ্যে প্রবেশ করিত; তখন নগরবাসী সেই জ্যোতির্ম্ময়ী সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিত; ভক্তিময় চিত্তে সকলেই নানাবিধ সামগ্রী আনিয়া বনদেবীকে ভিক্ষা দিতে যাইত; কিন্তু সংসার-ত্যাগিনী ভিখারিণী সে সমস্ত কিছুই গ্রহণ করিত না; সকলকে বিনয়-নম্র বচনে সন্তুষ্ট করিয়া মুষ্টি-ভিক্ষা মাত্র গ্রহণ করিত। বাস্তবিক বনদেবী সে সময়ে সংসারের সকল বস্তুতেই নীতস্পৃহাময়ী হইয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বনদেবীর চরিত্রোৎকর্ষ-সাধন দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

ভিখারিণী বনদেবীর আর একটী দৃঢ় ব্রত ছিল; সে প্রতিদিন সায়ংকালে সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া, বলদেবের সমীপে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিত। যেদিন যাহা জানিতে ইচ্ছা হইত, সেদিন তাহাই জিজ্ঞাসা করিত। মহাজ্ঞানীর অন্তঃস্থ হইতে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, জ্ঞানি না কাহার অনুগ্রহে বনদেবীও সেই সকল প্রশ্ন করিতে সক্ষমা হইয়াছিল। বলদেব প্রসন্ন-মনে তাহাকে সেই সকল গূঢ় বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতেন। যখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইত, তখন বনদেবী বলভদ্র-পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া স্বীয় কুটীর উদ্দেশে গমন করিত।

এইরূপে মৃদু-প্রবাহিণী নির্ঝরিণীর মত তাহার জীবনের তিন বৎসর অতীত হইল।

চতুর্থ বর্ষের প্রারম্ভে একদিন প্রভাত সময়ে বনদেবী আপন-কুটীর-সম্মুখে বসিয়া, স্বকীয় জীবনের অতীত ঘটনাগুলি এক একটী করিয়া স্মৃতিপথারূঢ় করিতেছিলেন, মাঝে মাঝে প্রভাতকালীন প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করিয়া অন্তরে অন্তরে বিমুগ্ধ হইতেছিল, এমন সময় একটী বন-বিহারিণী কুরঙ্গী একটী সুকুমার শাবক সঙ্গে তাহার সম্মুখদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রীড়াশীল কুরঙ্গ-শাবকটী স্বীয় জননীর সম্মুখে কতু রঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল; কখন কিছুদূর উল্লম্ফনে দৌড়িয়া যায় আবার ছুটিয়া আসিয়া জননীর মুখচুম্বন করে। শাবকটী ছুটিয়া যখন এরূপ দূরবর্ত্তী হয়, কুরঙ্গিনী তখনই চকিত-নেত্রে শশব্যস্তে তাহার অনুসরণ করে এবং শাবকটীকে নিকটে লইয়া তাহার গাত্রলেহন করে।

সেই শাবকগত-প্রাণা বন-হরিণীর অপরিমেয় স্নেহ এবং শাবকটীর অলক্ষিত স্বভাব-সুন্দর ভাব দেখিয়া বনদেবীর মন আজ স্নেহ-রসে বিগলিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, সংসারে মানুষ অপেক্ষা বনের হরিণী বুঝি বড় সুখী। আমি যদি হরিণী হইতাম, তাহা হইলে আমারও ত অমনি শাবক হইত। ঐ কুরঙ্গীর মত আমার হৃদয়ও ত স্নেহমমতা পূর্ণ হইত, অমনি করিয়া শাবক সঙ্গে লইয়া বনে বনে ফিরিতাম, নির্জ্জন—কানন-শোভিনী বন-লতার নব নব ফল ভোজন করিতাম, প্রস্রবণের স্বচ্ছ বারি পান করিতাম; কেন আমি তাহা হই নাই! যে আমাকে মানবী করিয়াছে, সে বুঝি বড় নির্দ্দয় !!

আবার ভাবিল, যখন আরাধ্য দেবতা বলদেবের মুখে শুনিয়াছি, লক্ষ লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়া শেষে বহুকষ্টে এই মানবী দেহ পাইয়াছি, তবে একদিন ত অমনি কুরঙ্গিনী ছিলাম; সেই জীবনই যদি নিষ্কলঙ্ক সুখে পরিপূর্ণ হইত, তাহা হইলে আর মনুষ্য জীবনে কি কাজ ছিল? তাহা নহে; তবে হরিণীর হৃদয়েও কোন গূঢ় প্রদেশে কোন দারুণ যাতনা নিহিত আছে। তবে হরিণী হইয়া কি করিব? দুঃখ ত ঘুচিবে না; কিন্তু মানবী হইয়াও ত কিছু করিতে পারিলাম না, যাহা অন্বেষণ করি তাহা ত কৈ পাই না। যদি আজ গৃহিণী হইয়া গৃহধর্ম্মে থাকিতাম, তাহা হইলে ত আমার জীবন শুষ্ক মরুভূমির মত হইত না; স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি, অনুরাগ সকলেরই আধার পাইতাম। কেন গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়া কি ঈশ্বর-চিন্তা হয় না? পতি পুত্র সে সকল কাহার? সকলই ত তাঁহারই; তবে কেন বিবাহ করিলাম না, কেন গৃহস্থালী পাতাইলাম না, কেন সন্ন্যাসিনী সাজিলাম? সন্ন্যাসিনী সাজিয়াও ত সংসার ছাড়িতে পারি নাই, সংসারের সকলই ত রহিয়াছে; ক্ষুধা রহিয়াছে, তৃষ্ণা রহিয়াছে, বাসনা রহিয়াছে, তবে ত্যাগ করিলাম কি? কেবল স্নেহ-মমতা! ছি ছি!! কেন সন্ন্যাসিনী সাজিলাম, যে আমাকে সন্ন্যাসিনী সাজাইয়াছে, সে বুঝি বড় নির্দ্দয়!!

এমনি ভাবে শত শত চিন্তা উচ্ছ্বসিত জলধির প্রবল তরঙ্গের ন্যায় তাহার হৃদয়ে উঠিতে পড়িতে লাগিল; হরিণী ইতিপূর্ব্বেই তাহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছিল, কিন্তু বনদেবী তাহা দেখিতে পায় নাই। এখন চিন্তা সমাধি-ভঙ্গের পর দেখিল, বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর; ভিক্ষার সময় উপস্থিত। সেদিন বনদেবী ভিক্ষা করিতে যাইতে আর ইচ্ছা হইল না। কারণ সেদিন সহস্র চেষ্টাতেও হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিল না; বহু চিন্তাতেও স্থির করিতে পারিল না, সন্ন্যাসিনী ভাল না গৃহিণী ভাল! বুঝিতে পারিল না, কোন্ পথটী সরল ও সুখজনক। তথাপি কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া ভিক্ষা পাত্র হস্তে কুটীর হইতে বহির্গতা হইল।

বনদেবী প্রতিদিনই নগরে যায়, প্রতিদিনই ভিক্ষা করে, কত শত ঘটনা-স্রোত তাহার নয়ন সম্মুখে প্রবাহিত হয়, সে একমুহূর্ত্তের জন্যও তাহা চাহিয়া দেখে না, কিন্তু আজ নগরে প্রবেশ করিয়াই একটী অচিন্ত্য ঘটনার মধ্যবর্ত্তিনী হইল। দেখিল, রাজপথে একটী সুকুমার শিশু পথের ধূলা মাখিয়া ক্রীড়া করিতেছে; কখন ধূলা ছড়াইতেছে, কখন বা সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিতেছে; কখন অযুত-মাখা আধ আধ অস্পষ্ট বাক্যে আপনার অস্ফুট হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছে; সেই শিশুটীকে অথবা তাহার মত শত শত শিশুকে বনদেবী কতদিন কতবার দেখিয়াছে, হয়ত ভ্রূক্ষেপও করে নাই, কিন্তু আজ সুকুমার শিশুটীকে দেখিয়াই তাহার মন যেন আকৃষ্ট হইল; ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তিনী হইল, নিকটে যাইবামাত্র শিশুটী একবার তাহার মুখপানে চাহিয়া আধ আধ বোলে মা! মা! বলিয়া তাহার কোলে আসিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। বনদেবী আপনা ভুলিল, কর্ত্তব্য ভুলিল, তাহার নিষ্কম্প স্নেহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইল, মনে মনে বলিল "হে বিপদ ভঞ্জন! হে মধুসূদন! হে ইচ্ছাময়! তুমি এ অভাগিনীকে কেন এমন পবিত্র সুখে বঞ্চিতা করিয়াছ!"

বনদেবী ভিক্ষাপাত্র হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, সে তাহা অনুভব করিতে পারিল না, শশব্যস্তে সেই প্রকৃতির প্রিয়রত্ন সেই শিশুটীকে অঙ্কে তুলিয়া লইল; সেই স্থবর্ত্তীর প্রশস্ত রাজপথে অগণ্য জনস্রোত মধ্যে, ধীরা গম্ভীরা সন্ন্যাসিনী সুখে কোলে করিয়া দাঁড়াইল; নয়ন তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। যাহারা তখন বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে বনদেবীর সেই মহিমাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াছিল; তাহারা দেখিতে পাইয়াছিল, তাহার মুন্মেলীবর নয়ন দুটী দিয়া অজস্রধারা বহিতেছে।

বলিয়াছি ত দ্বারাবতীর আবাল বৃদ্ধ-বনিতা বনদেবীকে ভক্তি করিত। যে রমণী সেই শিশুর জননী, সে শুনিতে পাইল যে, সন্ন্যাসিনী তাহার সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়াছে, পুত্রের অপরাধ হইবে ভাবিয়া সেই অন্তঃপুরবাসিনী রমণী শশব্যস্তে দৌড়িয়া রাজপথে আসিল এবং বনদেবীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া করযোড়ে বলিল "মা! কেন তুমি আমার সন্তানের অকল্যাণ করিতেছ; তুমি দেবী, তোমার কি আমার পুত্র কোলে করা সাজে?"

বনদেবী তখনও কাঁদিতেছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "না মা! আমি মহাপাপের পাপিনী, তোমার পুত্রের কোন অকল্যাণ হইবে না।" কিন্তু সে রমণী বনদেবীর সে বাক্যে কর্ণপাত করিল না; বারম্বার আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়া স্বীয় সন্তানকে তাহার অঙ্ক হইতে গ্রহণ করিল। বনদেবীর সেদিন আর ভিক্ষা করা হইল না; ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা বিসর্জ্জন দিয়া, মাতার রক্ষিত শিশুর চরণে পড়িয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে আপন কুটীরে ফিরিয়া আসিল। কোথায় বা স্নান, কোথায় বা আহ্নিক, কোথায় বা উপাসনা!!! সকলই ভুলিল, কেবল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আমি কেন সন্ন্যাসিনী হইলাম!!"

সমীরণ বনদেবীর এ দুঃখ-কাহিনী বলদেবের কর্ণকুহরে বহন করিল; অন্তর্যামী বলরাম জানিলেন—সন্ন্যাসিনী আজ সংসারে ফিরিতে সাধ করিয়াছে; তাঁহার অধরপ্রান্তে মৃদু হাস্য প্রকটিত হইল।

সেই কুলে বসিয়া, সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া, বনদেবী আপনার কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল; তাহার প্রতিদিনের অতিথি-

গুলি আসিয়া আজ ফিরিয়া যাইতে লাগিল। হিংসিনী আসিয়া অনেকক্ষণ অদৃষ্টস্থিত তরুশাখায় বসিয়া থাকিল; যে বনদেবী প্রতিদিন কত যত্নে আহার দেয়, সে আজ ফিরিয়াও চাহিল না; কি করিবে, ক্ষুণ্ণ মনে বিহঙ্গিনী বনান্তরে উড়িয়া গেল। হরিণনয়নী কুরঙ্গী প্রতিদিনের সময় বুঝিয়া, তেমনি সোহাগ প্রদর্শন করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যে সন্ন্যাসিনী প্রতিদিন কত যত্ন কত আদর করে, সে আজ মুহূর্ত্তের জন্যও দৃষ্টিপাত করিল না; একবার নিকটে আসিয়া বনদেবীর মস্তক আঘ্রাণ করিল, তাহাতেও বনদেবী কিছু বলিল না; অবশেষে হরিণী বনদেবীর গাত্রলেহন করিতে লাগিল; তথাপি বনদেবী একটী মাত্র আদরের কথা বলিল না; হরিণী আজ দিন ভাল নহে ভাবিয়া ধনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

সমস্ত দিন গেল; বনদেবী জীবনের ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। সন্ধ্যার সময় যথারীতি বলদেব সমীপে গমন করিল; সে মনে করিয়াছিল, বলদেবকে এ সকল কথা কিছু বলিবে না, যেমন করিয়া পারে আত্মভাব গোপন করিয়া রাখিবে। অন্তর্যামী বলদেব সকলই জানিয়াছিলেন তথাপি বনদেবী যখন সম্মুখবর্ত্তিনী হইল, তখন কিছুই যেন জানেন না এমনি ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি বনদেবী, আজ তোমায় এমন বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?"

বনদেবী আত্ম-গোপন করিতে মিথ্যা কথা বলিল; বলিল "কৈ প্রভো বিমর্ষ হই নাই।"

বলরাম বুঝিলেন বনদেবী আমার কাছে মনের ভাব প্রকাশ করিতে লজ্জা করিতেছে, তথাপি বলিলেন "তুমি মুখে বলিতেছ বিমর্ষ হই নাই, কিন্তু তোমার আকর্ণিক নয়ন স্ফীত গণ্ডস্থল, ম্লান মুখকান্তি দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি সমস্ত দিন কোন নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ।"

বনদেবী শিহরিল, বিমর্ষভাব লুকাইবার জন্য একটু কৃত্রিম হাসি হাসিল; সে তখনও বুঝিতে পারে নাই যে, বলদেব তাহার সমস্ত অন্তরের কথা বুঝিয়াছেন। বলিল "দেব! যে ভিখারিণী—সন্ন্যাসিনী, তাহার আর যন্ত্রণা কি? যেমন রাখিয়াছেন তেমনি আছি।"

"না বনদেবী" বলরাম গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন "না বনদেবী, আর তুমি সন্ন্যাসিনী নও, আর তুমি সংসার-বিরাগিণী নও, তুমি আজ অনন্ত কমলামন্দী শিখরের বিহঙ্গিনী!!"

বনদেবী ভীতা হইল, করযোড়ে বলিল "কেন প্রভো! কিসে শিখরের বিহঙ্গিনী হইলাম?"

বলরাম বলিতে লাগিলেন "বনদেবী, আত্মগোপন করিও না, আত্ম-গোপন মহাপাপ! তুমি যাহা লুকাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছ, তাহা আমি সকলই জানিয়াছি; আমি তোমাকে স্নেহের চক্ষুতে দেখি; তুমি যে কান্দনা করিয়াছ তাহা আমি পূর্ণ করিব। আর আজ সমস্ত দিন তুমি যে চিন্তা করিয়া তাহার কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পার নাই, তাহারও প্রকৃত তত্ত্ব তোমায় দেখাইব।

তখন বনদেবী ভাবিতে লাগিল আমি বড় কুকর্ম্ম করিয়াছি, আর আত্ম-গোপন করিয়া কি করিব? ধীরে ধীরে রুদ্ধ হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটিত করিল, সমস্ত দিন মধ্যে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, আদ্যোপান্ত প্রভু সমীপে নিবেদন করিল; আর ক্ষুদ্র বালিকার মত অবিরল বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিল।

বলরাম সস্নেহে বলিলেন "বনদেবী" কাঁদিও না, তোমার অন্তর আমার নিকট অপরিচিত নহে। আজ তোমাকে অদৃষ্টের অনঙ্কিত চিত্র-পট দেখাইব। যাহা তোমাকে দেখাইব, তাহা এ জন-কোলাহলের মধ্যে সাধিত হইবার নহে। চল, তরঙ্গ-প্রতিহত সমুদ্র-তীরে যাই; সে স্থান গম্ভীর অথচ শান্তি রসাস্পদ, সেই স্থানে মনোযোগের মহা সুবিধা হইবে।"

এই বলিয়া বলদেব গাত্রোত্থান করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন; বনদেবী বাক্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইল!!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মতামত।

রঙ্গভূমি-সম্বন্ধে।

মিনার্ভা থিয়েটারে "সভ্যতার পাণ্ডা"।—গত বড়দিনের সময় হইতে উক্ত মিনার্ভা থিয়েটারে "সভ্যতার পাণ্ডা" নামক এক খানি প্যান্টোমাইম্ অভিনীত হইতেছে। "সভ্যতার পাণ্ডা" এমন মনোহর ও উপদেশপূর্ণ যে, সামান্য দুই এক কথায় উহার প্রশংসা করিয়া মনের সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হয় না; বিস্তৃত প্রবন্ধে প্রত্যেক চরিত্রের বিশ্লেষণ ব্যতীত, সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে, উহার সম্বন্ধে যেন অন্যায়াচার করা হয়। আর তজ্জন্যই আমরা এতদিন "সভ্যতার পাণ্ডা" সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই; ইচ্ছা ছিল যে, প্রবন্ধান্তরে সে বিষয় কিছু বলিব। কিন্তু তাহা পত্রিকার স্থান ও সময়-সাপেক্ষ; অথচ ঐ বিষয় একেবারে উল্লেখ পর্য্যন্ত না করিলেও অন্যায় হয়। এ কারণ, অদ্য আমরা উক্ত অভিনয়ের উল্লেখ মাত্র করিতেছি; আশা করি, সময়ান্তরে উহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। প্রাচীন নাট্যকারের গভীর দূরদৃষ্টির পরিচায়ক "প্যান্টোমাইমের" রঙ্গ-তামাসায়, সমাজের যে বহুল ছিদ্রের প্রতি তীব্র কটাক্ষের উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহা প্রকৃতই সমাজের উপকারক। ফলতঃ "সভ্যতার পাণ্ডা" প্রত্যেকেরই দেখিবার জিনিস; দেখিয়া, শিখিবার অনেক উপাদেয় আছে।

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে; "রজনী"।—স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" আজ নবভাবে অভিনব বেশভূষায় রঙ্গভূমে অভিনীত। "রজনীর" এরূপ দৃশ্য-মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। বঙ্গ রঙ্গভূমি "রজনীর" অভিনয়ে যথেষ্ট ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন—বুঝা গেল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মধ্যে অনেকেই প্রশংসার যোগ্য। 'রজনী' বরাবর আপনার স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। রঙ্গভূমির অন্যতম অধ্যক্ষ বাবু অজ-

বিহারী বসু মহাশয়, সরকার মহাশয়ের অংশ অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন; তাঁহার গাম্ভীর্য্য-বিশ্রিত হাস্য-রসের অভিনয়ে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ রজনী 'বঙ্গ রঙ্গভূমির' প্রশংসার জিনিস হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নাটোরের মকর্দ্দমা।—গত ১৯এ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার কলিকাতার হাইকোর্ট হইতে নাটোরের মকর্দ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে। মাননীয় জজ জষ্টিস্ নরিস্ এবং বিভারলি বাহাদুর এই মকর্দ্দমার বিচার করিয়াছেন। বিচারে তাঁহাদের অভিমত এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে,—"এসেসারগণ যদিও ঐ মকর্দ্দমাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা মকর্দ্দমা বলিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা নহে; অথচ সেসন জজ বাহাদুরও, রাজা বাহাদুরকে ঐ মকর্দ্দমায় জড়িত রাখিয়া যেরূপ ভাবে ঐ মকর্দ্দমা বিচার করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত হইতে পারে না।" এইরূপে, উহারা কতকগুলি যুক্তি দেখাইয়া ঘটনাটী সত্য স্বীকার করিলেও রাজা বাহাদুরের তাহাতে কোন দোষ নাই এরূপ রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ অপর আসামী মথুরানাথ পালকে ঐ ঘটনার মূল অপরাধী বোধ করিয়া তাহার দণ্ড অব্যাহত রাখিয়াছেন, এবং রাজা বাহাদুরকে বে কসুর খালাস দিয়াছেন।

ঘটনা যে অনেকটা এইরূপই দাঁড়াইবে তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়াছিলাম। রাজা বাহাদুর যে এ ঘটনায় নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইবেন তাহা পূর্ব্বেই বুঝা গিয়াছিল, অথচ অকারণ তাঁহার এই অর্থব্যয় ও মনস্তাপ! জানি না ইহার জন্য কে দায়ী হইবেন?

***

চীন-জাপানের যুদ্ধ।—চীন-জাপানের গোলযোগ এখনও মিটে নাই। আবার সন্ধির চেষ্টা হইতেছে।

***

প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন।—এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার অনেক প্রশ্ন বড়ই অন্যায় রকমের দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী অনুবাদের বাঙ্গালাটী বড়ই দুরূহ্য হইয়াছে। ওরূপ বাঙ্গালা প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলঙ্কের কথা বলিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষগণের এতদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান

অষ্টম বর্ষ। ১৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। ৪২ সংখ্যা।

হাট-পত্তন।

হাট-পত্তনের নাম করিলেই বঙ্গ সাহিত্যসেবকের মনে পুণ্যপাপ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের রচিত হাট-পত্তনের কথা উদয় হইবে। ঐ প্রবন্ধটী শ্রীচৈতন্য লীলার একটী সুন্দর রূপক। সমগ্র বৈষ্ণব-শাস্ত্রের রস নিঙড়াইয়া যেন ঐ হাটপত্তনের পত্তন হইয়াছে। অনেকে ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বড়ই প্রশংসা করেন, এবং তাঁহারা বলেন যে, ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সমগ্র চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের সারসংগ্রহ আছে। চতুর্দ্দশ শকাব্দে রাজসাহী জিলার অন্তর্গত ও বোয়ালিয়ার ৬।৭ ক্রোশ উত্তরে স্থিত খেতুরী নামক গ্রামে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের ঔরসে নারায়ণী দাসীর উদরে ঠাকুর নরোত্তম দাসের জন্ম হয়। ১৫০৪ শকাব্দে তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীশ্যামানন্দ পুরীর সমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে তিনি প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা, প্রার্থনা প্রভৃতি অনেকগুলি সদ্‌গ্রন্থের রচনা করেন; এবং হাট-পত্তন প্রবন্ধও এই সময়েই রচিত হয়। এই হাট-পত্তন প্রবন্ধের অনেক অনুকরণ হইয়াছে; তাহার একটী বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই হরিরলুটের গানে শুনিতে পাই যথা—

"হরিরলুট পড়েছে যে আনন্দের আর সীমা নাই।
চাঁদ বদনে হরিবোল ভাই॥
হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হৈলা শ্রীমুকুন্দ,
মুনিগিরি দিলা অদ্বৈতেরে।
হরিদাস খাজাঞ্চী হৈয়া লুট বিলাইল সবারে।
রূপ-সনাতন চুভাই আসি, প্রেমের বাজারে বসি,
আনন্দেতে বিকি কিনি করে।
অরা রাঙ দন্তা ফেলে সোণা দিতেছে ওজন করে॥

প্রেম বাতাসা ভক্তি চিনি,রক্তির মণ্ডাপ্রেমের ফেণি,
দুই হা[illegible] বাজারে।
যত অন্ধ আতুর পঙ্গু কাঙ্গাল খেতেছে
মুট পেট ভরে॥”

যে মহাত্মাই এই সামান্য গানের রচয়িতা হউন না কেন, তিনি কবিত্বশক্তি-বিহীন নহেন।

আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর পরম ভাগবত ও সুকবি ৺নন্দকুমার ভদ্র মহাশয়ের একটী সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় ছিল। আমিও সেই দলে ছিলাম। উক্ত দাদা-মহাশয়ের ও আমার রচিত সংকীর্ত্তনই আমাদিগের দলে প্রায় গীত হইত। আমরা অন্যের রচিত পদ প্রায় গাইতাম না। গাইবার প্রয়োজনও ছিল না ; কেন না, যে দলের সহিত আমাদিগের পাল্লা হইত, তাহারা কোন নূতন ভাবের গান গাইতে পারিত না। কারণ,দাদা-মহাশয়ের রচিত সকল ভাবের সঙ্গীতই ছিল। ঠাকুর নরোত্তমের হাট-পত্তন পাঠ করিয়া দাদা-মহাশয়কে ঐ ভাবের একটী গান রচন করিতে বলি। তিনি আমাকে একটী সুর গাইতে বলেন, কয়েক মিনিট সুরটী গুন্‌গুন করিয়া গাইবার পর, তিনি হাট পত্তনের একটী পদ বলিতে লাগিলেন, আমি লিখিয়া লইলাম। সে আজ প্রায় ৩০ বৎসরের কথা, পদটী আমার সম্যক্ স্মরণ নাই ; যতটুকু স্মরণ আছে, পাঠক মহাশয়দিগকে উপহার দিতেছি। দেখিবেন, এটী ঠাকুরমহাশয়ের কি উপযুক্ত অনুকরণ:—

“ভাল, নিতাই হাট বসাল জীব তরাইতে।
(জীব তরাইতে রে, কলির জীব তরাইতে)
সে হাটের মূল মহাজন আপ্‌নি নিত্যানন্দ।
সঙ্গে মুচ্ছুদ্দি হইল তার মুরারী মুকুন্দ॥
হাটে বেসে গৌরীদাস আছে দাঁড়ি ধরে।
যার যত ইচ্ছা প্রেমধন, দিচ্ছে ওজন করে॥
সংকীর্ত্তন মদ বিকায় দোকানে দোকানে।
তাহা প্রেমরমণী নরহরি বিলায় জনে জনে॥
কলসে কলসে সে মদ হরিদাস কিনিল।
সে আপনি খেয়ে মাতাল হয়ে জগৎ মাতাইল॥

অথবা, আমরা ইহাকে অনুকরণই বা কেন বলি? যাঁহারা সাধক, ভক্ত, ভাবুক ও কবি, তাঁহাদের সকলের মনেই কোন না কোন সময় একবিধ ভাবের উদয় হইতে পারে। ভিন্ন দেশবাসী, ভিন্ন সময়বাসী ভাবুকের হৃদয়ে কালের স্তূপীকৃত বালুকারাশি ভেদ করিয়া একভাব ফল্গু-নদীর স্রোতের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রবাহিত হওয়া বিচিত্র ব্যাপার নহে। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় উদাহরণ আমাদের প্রচারিত মহাজন-পদাবলী-সংগ্রহে দিয়াছিলাম। আবার বিগত বর্ষে জন্মভূমি পত্রিকায় শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় “লোকালোকী” শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার বহু উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। কবি রায় শেখর, বা শশীশেখর রায়, গোবিন্দ দাসের পরবর্ত্তী কালে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত পরাণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং বান্ধবের জনৈক লেখক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ-সম্ভূত ; এবং খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামীর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। এই রায় শেখর একজন উচ্চ দরের কবি, ইঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কিম্বা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা বিষয়ক পদাবলী বিলক্ষণ কবিত্ব-পূর্ণ। তৎসমস্তের উদ্ধরণ বা সমালোচন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা ইঁহার রচিত একটী হাট-পত্তন নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; পাঠক ইহা পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই মোহিত হইবেন। ঠাকুর মহাশয়ের ও ইঁহার প্রবন্ধের বিষয় এক বটে, কিন্তু উভয় হাট-পত্তনের ভাব-বৈচিত্র্য

অনেক। পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন,অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজনাভাব:—

“হাটের পত্তন, শ্রীশচীনন্দন,
করল পাইয়া সুখ।
হাটের ঠাকুর, নিতাই সুন্দর,
খণ্ডিল জীবের দুখ॥

দেখ হাট মনোহর রঙ্গ।
নরহরি দাস, হাটের বিশ্বাস,
শ্রীনিবাস তার সঙ্গ॥ ধ্রু॥
আর অবধূত, ঠাকুর অদ্বৈত,
মজুরি হাটের মাঝ।
হরিদাস আদি, ফিরে হাট সাধি,
রামানন্দ সত্যরাজ॥
করতাল যত, বাদ্য বাজে কত,
মৃদঙ্গ কাঁহাল ঢোল।
হাট কলরব, নৃত্য গীত সব,
ঘন ঘন হরিবোল॥
প্রেমের পসার, লৈয়া গদাধর,
সঙ্গেতে পসারিগণ।
রায় রামানন্দ, মুরারী মুকুন্দ,
বাসুদেব সুলোচন॥
সনাতন রূপ, পণ্ডিত স্বরূপ;
দামোদর যাঁর নাম।
বসু রামানন্দ, সেন শিবানন্দ,
বক্রেশ্বর গুণধাম॥
পণ্ডিত শঙ্কর, আর কাশীশ্বর,
মুকুন্দ মাধব দাস।
রঘুনাথ আদি, গুণের অবধি,
পূরল মনের আশ॥
কত নাম নিব, পসারি এ সব,
লইয়া সদাই কাছে।
পসার ভরণ, পুলক রোদন,
মহাভাব আদি আছে॥
হাটের হাটুয়া, ভকত নাটুয়া,
পসারি মহিমা জানি।
দৈন্য দান দিয়া, সে প্রেম আনিয়া,
সদা করে বিকি কিনি॥
হাটের কোটাল, ঠাকুর গোপাল,
দান ঘাটী গোপীনাথ।
হাটের পালন, শ্রীরঘুনন্দন,
করেন সুন্দর দাস॥
দিবারাতি নাই, বাজার সদাই,
যে যায় সে প্রেম পায়।
প্রেমের পসার, করল বিথার,
শচীর দুলাল রায়॥
ভাঙ্গিল আকাল, মাতিল কাঙ্গাল,
খাইয়া ভরল পেট।
দেখিয়া শমন, করয়ে ভাবন,
বদন করিয়া হেট॥
জরা মৃত্যু নাই, আনন্দ সদাই,
শোক ভয় নাহি হয়।
আশা ঝুলি করি, শেখর ভিখারী,
বাজারে মাগিয়া খায়॥”

শেখর রায় যথার্থই বলিয়াছেন যে, হাটের ব্যাপার দেখিয়া শমন মস্তক অবনত করিয়া ভাবেন। যে জন হরিনামামৃত পান করে, তার জরা, মৃত্যু, শোক কিছুই থাকে না। তারে দেখিয়া শমন-দূত দূর হইতে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করে।

উপরি-উদ্ধৃত পদে যে সকল মহাত্মার নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের কয়েকজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা, যথা—নরহরি সরকার, হরিদাস, রায় রামানন্দ, মুরারী গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ, সুলোচন দাস, শিবানন্দ সেন। ইঁহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ সময়ান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ ইঁহাদিগের ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অপর যে সকল পারিষদ ও অন্তরঙ্গদিগের নামোল্লেখ আছে, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত

পরিচয় দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

নরহরি দাস—ইনি বৈষ্ণব-জগতে সরকার ঠাকুর বলিয়া সাধারণতঃ পরিচিত। ইহার নিবাস ছিল শ্রীখণ্ডে। ১৪০০ শকে ইহার জন্ম। ইনি ভক্তিস্নিগ্ধা-পটল ও ভক্তামৃত অষ্টক নামক গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা, এবং সর্ব্বদা মহাপ্রভুর অঙ্গে চামর ব্যজন করিতেন।

শ্রীনিবাস — ইহার প্রচলিত নাম শ্রীবাস পণ্ডিত। ইহার শ্রীরাম,শ্রীপতি ও শ্রীনিধি নামে অপর তিন সহোদর ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই এইচারি ভ্রাতা ভক্তি-পথাবলম্বী হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ ও উৎকল-যাত্রার পর ইনি নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুমারহট্ট বা হালিসহর যাইয়া বাস করেন। এই শ্রীবাস-প্রাঙ্গনেই মহাপ্রভুর কীর্ত্তনানন্দ হইত; এবং শ্রীশচীদেবীর অন্যতমা মালিনী দেবী এই শ্রীবাস পণ্ডিতেরই ধর্ম্মপত্নী ছিলেন।

হরিদাস—দুইজন;—যবন বা ব্রহ্ম হরিদাস ও দ্বিজ হরিদাস। যশোহর জিলার অন্তর্গত বনগ্রাম উপরিভাগের নিকট পূর্ব্বে বুঢ়ণ গ্রাম ছিল। এই গ্রামবাসী সুমতি-নামা বিপ্রের ঔরসে ও গৌরীদেবীর গর্ভে যবন হরিদাসের জন্ম। পিতার মৃত্যু ও মাতার পতি-সহগমনে শিশু হরিদাস এক যবন-দম্পতি কর্ত্তৃক প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে যবন হরি-দাস বলে। দ্বিজ হরিদাস নবদ্বীপ-বাসী, মহাপ্রভুর পার্ষদ কীর্ত্তনিয়া ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। অত্যন্ত দোষে মহাপ্রভু ইহাকে চির-বর্জ্জন করেন।

রায় রামানন্দ—উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্ম্মচারী ভবানন্দ রায়ের পাঁচ পুত্র-মধ্যে রায় রামানন্দ অন্যতম। ইনি নর্ম্মসখ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মহাপ্রভুর দক্ষিণাপথ ভ্রমণ সময়ে উভয়ের মিলন হয়; তৎপরে রায় রামানন্দ বিষয়কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীগৌর-চরণ-শরণ লয়েন। মহাপ্রভু ইহাকে অভিন্নাত্ম মনে করিতেন। ইনি যেমন প্রগাঢ় পণ্ডিত, তেমনি উচ্চ শ্রেণীর সাধক ছিলেন।

সত্যরাজ ও বসু রামানন্দ — কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ বসুবংশে ভগীরথ বসুর জন্ম। তাঁহার ঔরসে শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামক বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্য-প্রণেতা মালাধর বসু বা গুণরাজ খানের জন্ম; ঐ গুণরাজ খানের দ্বিতীয় পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ বসু বা সত্যরাজ খান। বসু রামানন্দ এই সত্যরাজ খানের পুত্রদ্বয় ইনিও একজন পদকর্ত্তা।

গদাধর পণ্ডিত—১৪০৮ শকাব্দে বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে চট্টগ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্রীমাধব মিশ্রের ঔরসে ও রত্নাবতী দেবীর গর্ভে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের জন্ম। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইনি ঢাকা জিলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ উপবিভাগের নিকট-বর্ত্তী প্রসিদ্ধ বেলেটি গ্রামে বাস করেন। ত্রয়োদশ বর্ষে মাতুলালয় নবদ্বীপে আগমন করেন। ইনি অকৃতদার ও অকুমার-বৈরাগী। ইনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মন্ত্র-শিষ্য, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ছাত্র ও শ্রীগৌরাঙ্গের ও মুরারী গুপ্তের সতীর্থ। সপ্তচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে পণ্ডিতের তিরোভাব হয়।

গদাধর দাস—ইহাঁর নিবাস ছিল এড়িয়াদহ। ইনি চব্বিশ ঘণ্টা গোপী ভাবে মগ্ন থাকিতেন। ইনি স্ব-গ্রামস্থ কাজীগণকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করান। কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন,—

"কাজীগণের মুখে যে বোলাইল্য হরি হরি।"

মুরারী গুপ্ত—ইনি জাতিতে বৈদ্য, নবদ্বীপ বাসী, মহাপ্রভুর বাল্য সুহৃদ ও সতীর্থ ছিলেন।

চিরদিন মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহার বাল্য-লীলার এক স্মৃতি-লিপি রাখেন। যাহা "মুরারী গুপ্তের করচা" নামে খ্যাত। ইহা অবলম্বন পূর্ব্বক লোচন দাস চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর আদি-লীলা বর্ণন করেন।

মুকুন্দ দাস—নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতা; শ্রীরঘুনন্দনের পিতা ও শ্রীখণ্ডবাসী। ইনি গৌড়-বাদশাহের রাজবৈদ্য ছিলেন।

মুকুন্দ দত্ত—বৈদ্যবংশাবতংশ ও নবদ্বীপ-বাসী। ইনিও মহাপ্রভুর শৈশব-সখা ও সতীর্থ। যতদিন গৃহে ছিলেন, ততদিন বিচার বিতণ্ডাতে ইহাঁর অত্যন্ত স্পৃহা ছিল। মহাপ্রভুকে নৃত্য করাইতে হইলে, মুকুন্দ দত্ত কীর্ত্তনারম্ভ করিতেন। কেহ বলেন, ইহাঁর জন্মস্থান শ্রীহট্ট, কেহ বলেন চট্টগ্রাম।

বাসুদেব দত্ত — চট্টগ্রামবাসী ও মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইহাঁর সহিত মিলনে পরিতুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু কহিয়া-ছিলেন;—

"যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে॥"

বাসুদেব ঘোষ—ইনি মাতুলালয় শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত বুঢ়ণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা কুমারহট্ট আসিয়া বসবাস করেন। ইহাঁর মাধবানন্দ ও গোবিন্দানন্দ ঘোষ নামে আরও দুই সহোদর ছিলেন; এবং পরে আসিয়া নবদ্বীপে বাস করেন। তিন ভ্রাতাই বিখ্যাত পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় যেমন বিদ্যাপতি, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-বর্ণনে তেমনি বাসুদেব ঘোষ।

লুলোচন—লোচন বা ত্রিলোচন দাস বিখ্যাত পদকর্ত্তা ও চৈতন্যমঙ্গলের রচয়িতা। ইহাঁর নিবাস ছিল শ্রীখণ্ডে।

সনাতন-রূপ—"বট গোস্বামী" প্রবন্ধে দুই ভ্রাতার বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

শঙ্কর পণ্ডিত ও স্বরূপ দামোদর—ইহাঁর পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য, নিবাস নবদ্বীপ। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর ইনি কাশী যাইয়া সন্ন্যাসী হয়েন; এবং দণ্ডীদিগের নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহা পণ্ডিত হয়েন। ইনি নীলাচলে সর্ব্বদা মহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের ন্যায় মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত আর ছিল না। শঙ্কর পণ্ডিত ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। উভয় ভ্রাতার উপর মহাপ্রভুর কেমন স্নেহ ছিল, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই পয়ারে দেখা যায়:—

"সহোদর প্রীতি আমার তোমার উপরে।
শুদ্ধ কেবল প্রেম শঙ্কর উপরে॥"

শিবানন্দ সেন—ইনি বৈদ্যকুলজাত, কুলীন-গ্রামবাসী, ও মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে স্বয়ং সমস্ত ব্যয় দিয়া বঙ্গবাসী যাত্রিদিগকে নীলাচলে লইয়া যাইতেন। পরমানন্দ সেন বা কবিকর্ণপুর ইহাঁর পুত্র।

বক্রেশ্বর—ইহাঁর জন্মস্থান সেটেরি। নব-দ্বীপ হইতে নীলাচলে যাইয়া, ইনি মহাপ্রভুর নিকটে অবস্থিতি করিয়া, তদীয় সেবা করেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে যথা:—

"বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য।
এক ভাবে চব্বিশ প্রহর যার নৃত্য॥
আপনি মহাপ্রভু গান যাঁর নৃত্যকালে।"

কাশীশ্বর—ইনি পূর্ব্বে শ্রীঈশ্বরপুরীর ভৃত্য ছিলেন; তদীয় অপ্রকটের পর মহাপ্রভুর

নিকট ভৃত্যভাবে থাকেন। ইনি অত্যন্ত বলবান ছিলেন। মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন, কাশীশ্বর অগ্রে যাইয়া লোক ঠেলিয়া পথ করিয়া দিতেন।

মাধব দাস।—কুলিয়া গ্রামবাসী। বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া মহাপ্রভু ইহার গৃহে বাস করিয়াছিলেন। ওখরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় কাব্য, ইনি পড়াইয়া "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" নাম দিয়া প্রকাশ করেন।

গোপাল ঠাকুর—অথবা চাঁপাল গোপাল। এ ব্যক্তি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ; কুলিয়া গ্রামবাসী হিরণ্য দাসের গৃহে আশ্রিত ছিল। হরিদাসকে অপমান করাতে ইহার কুষ্ঠ রোগ হয়। মহাপ্রভু যখন কুলিয়া গ্রামে মাধব দাসের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন গোপাল কুষ্ঠরোগমুক্ত ও শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত হয়েন।

গোপীনাথ—এই নামে দুই ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ১। গোপীনাথ সিংহ, শ্রীগৌরাঙ্গের জনৈক প্রিয়দাস। ২। গোপীনাথাচার্য্য, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি।

রঘুনন্দন—খণ্ডবাসী মুকুন্দ দাসের পুত্র ও অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য। ইহার বিশেষ বিবরণ "শিশু-ভক্ত যুগল" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

মুশ্বর দাস—ইহার সম্বন্ধে চৈতন্য-চরিতামৃত বলেন:—

"প্রেমরস স্বরূপ সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ প্রধান॥"

মদীয় ভ্রাতার রচিত হাট-পত্তনে যে গৌরীদাস পণ্ডিতের উল্লেখ আছে, তাঁহারও সংক্ষেপ পরিচয় দিতেছি। রঘুনাথ দাসের বিবরণ 'ষট্‌গোস্বামী' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

গৌরীদাস মুখটী-বংশজাত বরুণ বাচস্পতির বংশধর। ইহাঁর পিতার নাম কংসারী মিশ্র, মাতার নাম কমলাদেবী। ইহাঁর নিবাস অম্বিকা-কালনায়। ইহাঁরা ছয় ভ্রাতা ছিলেন। (১) দামোদর পণ্ডিত (২) জগন্নাথ পণ্ডিত (৩) সূর্য্যদাস পণ্ডিত (৪) গৌরীদাস পণ্ডিত (৫) কৃষ্ণদাস পণ্ডিত (৬) নৃসিংহ চৈতন্য পণ্ডিত। গৌরীদাসের ভার্য্যার নাম বিমলা দেবী। বড় বলরাম ও রঘুনাথ নামে ইহাঁর দুই পুত্র জন্মে। মহেশ পণ্ডিত ও ঠাকুর গোবিন্দ নামে রঘুনাথের দুই পুত্র জন্মে। গৌরীদাসের বংশাবলী অদ্যাপি অম্বিকায় আছেন।

শ্রীজগবন্ধু ভদ্র।

গৃহস্থাশ্রম।

সুকঠিন গার্হস্থ ব্যাপার
সুশৃঙ্খলে কে পারে চালা'তে?
রাজ্য শাসনের রীতি নীতি
সূক্ষ্মভাবে রয়েছে ইহাতে।

এ আশ্রম-মুখ চেয়ে আছে
সংসারের বিবিধ আশ্রম।
দায়ীত্ব ইহার গুরুতর
কয় জন বহিতে সক্ষম?

পাপ পুণ্য দুইটী পাদপ
শাখা প্রশাখায় বিজড়িত;
ব্যাপিয়া রয়েছে এ আশ্রম
নানা ফল ফুলে সুশোভিত।

পুণ্য বৃক্ষে পত্র পুষ্প ফল
সমস্তই স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল,
স্বরগের জ্যোতি তাহে পশি
ক'রে আছে আশ্রম উজ্জ্বল।

পাপ পাদপের অস্বচ্ছতা
প্রতিহত করে সে আলোক;
মায়ার ছায়ার অন্ধকারে
পরিপূর্ণ করেছে এ লোক।

বাসনার রসে পুষ্টি পেয়ে
পাপ বৃক্ষে ফলে প্রতিদিন,
হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কুফল
তাহে দেশ করেছে শ্রীহীন।

এ আশ্রমে পরিণাম দুই
আত্মহত্যা কিম্বা আত্মোন্নতি;
বুঝি হায় আত্মহত্যা পথে
এখন এ সংসারের গতি!

রজ্জু, বিষ, অকিঞ্চিৎকর
আত্মহত্যা ঘটাতে দারুণ;
অবাধ্যতা—কুভাব—কলহে
আত্মহত্যা ঘটে শতগুণ।

এ আশ্রমে জন সমাগমে
বিজনতা পাই না খুঁজিয়া;
প্রতিজনে তিল তিল করি
একাকীত্ব ফেলেছে পুঁছিয়া।

নীরবতা দুর্ল্লভ হেথায়।
সহিষ্ণুতা হয় না ধারণা।
সুকঠিন তাই এ আশ্রমে
আত্মোন্নতি ব্রতের সাধনা।

নিত্যে মতি ধায় না কখন।
সততই অনিত্যে বিব্রত।
আনন্দে অনিত্যে নিত্য ভ্রমে
মজিয়া রয়েছে অবিরত।

শোক দুঃখ আঘাতে ক্ষণিক
হয় মাত্র চেতনা স্ফুরণ ;
পূর্ব্বাবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয়
"চকমকি" প্রস্তর যেমন।

মূল অস্ত্র, প্রধান উৎসব—
—বিবাহ—এ গৃহস্থাশ্রমের ;
যে নামে জাগিয়া উঠে হৃদে
অদ্ভুত আবেগ উল্লাসের।

দু'টী ভিন্ন জীব পরস্পরে
আপনার দেহ, প্রাণ, মন
মিশে এক করিয়া ফেলিতে
—হিবিধান বিবাহ-বন্ধন।

ক্বচিৎ শুভদ এ মিলন,
কষ্টকর প্রায় সর্ব্বদাই ;
দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগী জন
বলে ইহা "দিল্লীর মিঠাই"।

বিবাহ মিলনে কিন্তু এই
আশ্রমের ভিত্তি সুগ্রথিত ;
তাহে কোন ব্যতিক্রম হ'লে
এ আশ্রম হয় নিপতিত।

বুঝিতে বৃহৎ বস্তু, নরে
ক্ষুদ্রে তায় করে পরিণত,
সঙ্কুচিত ক'রে ক্রমে লয়
নিজ নিজ ধারণার মত।

আচার, ব্যবস্থা, ব্যবহার,
ভিন্ন ভিন্ন তাই এ আশ্রমে,
জাতিভেদ মতভেদ নানা
জনে জনে একেক প্রকার।

ক্ষুদ্রে যে পার্থক্য দেখা যায়,—
—ইষ্ট-সংঘর্ষণ অতিশয়,
বৃহত্ত্ব বন্ধনে একতায়
সব একাকার ক'রে লয়।

ক্ষুদ্র বৃহতের তার-তম্যে
কার পক্ষে ঘৃণার ব্যাপার ;
কার পক্ষে পুনঃ এ আশ্রম
অভিহিত "সুখের সংসার"।

শ্রীদেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম এ,

বনদেবী।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্বপ্নে।

তখন রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড হইয়াছে, সুনীল স্বচ্ছ আকাশে স্বচ্ছ শশী উচ্চ হাসি হাসিতেছে, ঝলকে ঝলকে জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছে ; আশে পাশে দুই একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র মিটি-মিটি করিতেছে। বলদেব বনদেবীকে সঙ্গে করিয়া অনতিবিলম্বেই সমুদ্র-কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই সৈকত-প্রান্তরের এক পার্শ্বে তাঁহারা উপবেশন করিলেন।

উপবেশন করিয়াই বনদেবী করযোড়ে বলিল, "প্রভো! আজ্ঞা করুন্ এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

"ব্যস্ত হইও না, যাহা যাহা করিতে হইবে, সকলই বলিয়া দিতেছি ; তুমি এই সৈকত-শয্যায় শয়ন করিয়া নয়ন মুদিত কর। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তোমায় না ডাকিব, ততক্ষণ সর্ব্বথা চক্ষু মেলিও না। সাবধান! নয়ন উন্মীলিত করিলেই মহা বিপদে পড়িবে।"

বনদেবীর কৌতূহল-শিখা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল, আজ্ঞা পাইবামাত্র তাহাই করিল, সিকতাময় শয্যায় শয়ন করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকিল। বলদেব ধীরে ধীরে তাহার ললাটদেশে আপনার হস্তের একটী অঙ্গুলি স্পর্শ করাইলেন। জানি না, কি অদ্ভুত শক্তিতে অঙ্গুলি-স্পর্শমাত্রেই বনদেবী হতচেতনা হইয়া পড়িল। বলদেব যখন দেখিলেন, বনদেবী সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনা হইয়াছে, তখন অদূর হইতে কিছু শিক্ত মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং সযত্নে একটী মৃন্ময় শিশু-মূর্ত্তি গড়িতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথম প্রহর—দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল, বনদেবীর সুষুপ্তি ক্রমেই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল ; সেই গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল।

দেখিল, "যেন সে একাকিনী একটী বহু-জনাকীর্ণ নগরের মধ্যে পথহারা হইয়া রাজ-পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; সে দেশে সকলই যেন নূতন, সকলই যেন তাহার কাছে অপরিচিত ; কোথায় যাইবে, কিছুই যেন স্থির করিতে পারিতেছে না। শত শত মনুষ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেছে, সকলকেই সবিনয়ে পথ দেখাইয়া দিতে কহিতেছে ; কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না। যে তাহার কথা শুনিতেছে, সেই হো হো হাস্য করিয়া বলিতেছে,—"আমিই পথ জানি না তা তোমাকে পথ দেখাইব কি।"

স্বপ্নে বনদেবী বড় বিপদে পড়িল ; তাহার অন্তরে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল, তথাপি কি করিবে, সেই অপরিচিত নগরের বিস্তীর্ণ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে একটী বৃহৎ বাটীর সম্মুখীন হইল। সেই বাটীর দ্বারদেশে একজন দিব্যকান্তি পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ; তাঁহার স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, শিরে

জ্যোতির্ময়-মুকুট, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, পরিধানে কৌষিক বস্ত্র; তাঁহার অধর যুগলের ঈষদ্ভাস মধ্যে মূর্ত্তিমতী করুণা যেন প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার শান্ত দৃষ্টি সর্ব্বত্র যেন করুণা বর্ষণ করিতেছে।

বিপন্না বনদেবী তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া হৃদয়ে যেন বল পাইল; যেন কত দিনের পরিচিত বলিয়া মনে হইল; সাহসে বলিল, "দেবি! তরঙ্গিণী রমণী আমি, পথহারা হইয়াছি, আমি কোন্ পথে যাইব দেখাইয়া দিউন।"

সেই মহাপুরুষের হৃদয়ে ঈষৎ উচ্ছলতার হইল, প্রশান্ত স্বরে বলিলেন, "বৎসে! তুমি যে বিপদে পড়িয়াছ, তাহা আমি তোমাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার গন্তব্য স্থানের পথও আমি চিনি; আইস, আমি তোমাকে সে পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া সেই মহাপুরুষ অগ্রবর্ত্তী হইলেন, বনদেবী পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা দুইজনে নগরের প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেই দিব্যপুরুষ হস্তোত্তোলন করিয়া বনদেবীকে দেখাইতে লাগিলেন—"দেখ বৎসে! সম্মুখে যে ঐ বালুকা-কঙ্করময় কণ্টকাকীর্ণ অপ্রশস্ত পথ দেখিতে পাইতেছ, ঐ পথ ধরিয়া তোমাকে যাইতে হইবে; তোমার গন্তব্য স্থান এখান হইতে বহু দূর। কিন্তু দীর্ঘ সময় তোমাকে ঐ পথ অতিক্রম করিতে হইবে, পথিমধ্যে শত শত বিপত্তির মধ্যে পড়িবে, কিন্তু ভয় নাই; সে সকল বিঘ্ন বিপত্তিতে তোমার কিছু মাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না। তুমি সাহস এবং সহিষ্ণুতাকে আশ্রয় করিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া যাইবে, এইরূপে কিছুকাল পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই তুমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে। কিন্তু সাবধান! এই পথের পার্শ্বে ঐ যে বিস্তীর্ণ, রম্য লতাদি পরিশোভিত, কুসুমালঙ্কৃত, লোকপ্রবাহশূন্য পথ দেখিতে পাইতেছ—কদাপি যেন ও পথে যাইতে ইচ্ছা করিও না। আপাততঃ দেখিয়া ঐ পথ সুখের ও সহজগম্য বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু উহার সীমান্তদেশ বড় ভয়ঙ্কর; সেখানে উপস্থিত হইলে আর উদ্ধার হইতে পারিবে না। পথিমধ্যে তোমার অনেক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, অনেক লোক হয় ত অনেক প্রলোভন দেখাইবে, কিন্তু সে প্রলোভন-বাক্যে তুমি কর্ণপাত করিও না। আপন মনেই এই পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসারিণী হইবে।"

বনদেবী স্বীকৃতা হইল, পদধূলি গ্রহণ করিল; মহাপুরুষ পথ দেখাইয়া আবার নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, সেই স্বপ্নময় দেশের উজ্জ্বল গগনে যেন এক নূতন চাঁদ উদিত হইয়াছে। বনদেবী সবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে সেই অপ্রশস্ত পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। মহাপুরুষ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সে তাহাই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল; সত্যই পথ বড় দুর্গম, চারি ধারে নিবিড় বন, তাহার মধ্যে শত শত হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছে। বনদেবীকে দেখিবামাত্রই মুখব্যাদান করিয়া যেন আক্রমণ করিতে আসিতে লাগিল। বনদেবী মহাপুরুষের বাক্য ভুলিল না, সে সাহস সহিষ্ণুতাকে আশ্রয় করিয়া সৈরিকে লক্ষ্য করিল না; দেখিতে দেখিতে হিংস্র জন্তু সকল কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। পথের মধ্যে বৃহৎ এক নদী, তাহার ভীষণ তরঙ্গ সকল যেন আকাশ স্পর্শ করিতে ধাবিত হইতেছে। সেই নদীর কূলে বসিয়া শত শত জলযাত্রী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে; নদীর যেন অপর কূল নাই, সীমা নাই, আপন অহঙ্কারেই সীমান্ত প্রদেশাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। বনদেবী বড় বিষম বিপদে পড়িল; কেমন করিয়া সে বিপুল প্রবাহময়ী তরঙ্গিণী উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। নিজে সন্তরণে অক্ষমা, আবার তরণীর দৃষ্টি পথম হয়, তত দূরের মধ্যে একখানিও তরণী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; কি করিবে, অনন্ত উপায় হইয়া সেই নদীর তীরদেশে উপবেশন করিল। দেখিতে দেখিতে দুই একজন করিয়া অনেকগুলি পান্থ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার মধ্যে দুই একজন বহুদিনের পরিচিত লোকেরও বনদেবী দেখিতে পাইল। সকলেই সবিস্ময়ে বনদেবীর মুখপানে চাহিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল,—"বাছা! এ কোন্ বয়সে একাকিনী তুমি এ পথে কেন আসিয়াছ? এ বড় দুর্গম পথ, এ পথ ধরিয়া তুমি কেমন করিয়া যাইবে? এই দেখ আমরা এই পথে আসিয়া কত কষ্টই ভোগ করিতেছি। এই নদীর অপর তীরে আমাদের লক্ষ্যস্থান। কিন্তু কেমন করিয়া এ নদী উত্তীর্ণ হইব, তাহার কিছুই স্থিরতা করিতে পারিতেছি না। আমরাই যখন অগম্য হইয়াছি, তখন তুমি কেমন করিয়া এ নদী পার হইবে? আরও তো অনেক পথ আছে, সেই পথ ধরিয়া যাও না কেন? ঐ দেখ পার্শ্বে আলোকময় সুবিস্তৃত সুন্দর পথ, চল সকলে মিলিয়া ঐ পথ ধরিয়া যাই।"

বনদেবী কাহাকেও কোন উত্তর করিল না, মনে মনে সেই মহাপুরুষের মূর্ত্তি ও উপদেশ চিন্তা করিতে লাগিল; অনেকক্ষণ ভাবিয়া স্থির করিল, মহাপুরুষের বাক্য লঙ্ঘন করিব না, কাহারও প্রলোভনে ভুলিব না, আমি এই পথ ধরিয়াই যাইব। এই নদী কি পার হইতে পারিব না? সত্যই কি এ নদীর পার নাই? পার যদি না থাকিবে, তবে লোকে এ পথে আসিবে কেন? নিশ্চয়ই কূল আছে, নিশ্চয়ই এই নদীর পার আছে; আমিও পার হইব, না পারি ডুবিয়া মরিব।" বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে নদীগর্ভে অবতরণ করিতে লাগিল, যতই অবতরণ করে, ততই যেন নদীর প্রবাহ মন্দীভূত হয়, ভীষণ তরঙ্গগুলিও ততই যেন অদৃশ্য হয়। বনদেবী সাহস পাইল, তীরভূমি অতিক্রম করিয়া জলে নামিল; দেখিল, নদী সম্পূর্ণ শান্তপ্রবাহিণী; কিন্তু অগণ্য হিংস্র জলজন্তু অদূরে ভাসমান রহিয়াছে; তাহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যেন তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বনদেবী তাহাতেও ভয় করিল না, দ্বিগুণ সাহসে ভর করিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। কিন্তু হরি! হরি! কোথা হইতে এ কুমার-কান্তি শিশু? বনদেবীর অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে, আধ আধ বোলে "না! ও পথে যাস্ না, ডুবিয়া মরিবি" বলিয়া পদে পদে আকুল করিতেছে? বনদেবী ফিরিয়া চাহিল, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা হারাইল, আর যাওয়া হইল না। সঙ্গেতে সেই কুমার-শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিল, সঙ্গেতে বসিয়া বিশ্রাম ও পথে যাইব না ত কোন্ পথে যাইব? শিশু শুদ্ধ শুদ্ধ চম্পক-কলি সদৃশ অঙ্গুলি তুলিয়া সেই পার্শ্বস্থ আলোকমালা-মণ্ডিত পথ দেখাইল, যে পথে মহাপুরুষ যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই পথ দেখাইল। বনদেবী ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা হারাইয়াছিল, এখন আশ্রয়হারা হইল, মহাপুরুষ-উপদেশ সকলই ভুলিল, আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সেই শিশুকে কোলে লইয়া সেই পথ উদ্দেশে ধাবিতা হইল। অন্যান্য যাত্রীগণ, বনদেবীর সেই ভাব দেখিয়া সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে বনদেবী সেই পথে আসিয়া পড়িল; দেখিল,প্রকৃতই সে পথ হুগ্ধ,পুষ্পসজ্জিত এবং কুসুমাকীর্ণ; তাহার মনে বড় হর্ষোদয় হইল। একবার ভাবিতে লাগিল, সেই মহাপুরুষ বুঝি কেশ দিবার জন্যই ঐ পথ দেখাইয়াছিলেন। যাহা হউক, বনদেবী এখন সেই কুসুমাবৃত পথ পাইয়া সেই শিশুক্রোড়ে দ্বিগুণ-বেগে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল; কিছুদূর বর্দ্ধিত তেজে দ্বিগুণ উৎসাহেই গমন করিল; কিন্তু যতই দূরবর্ত্তিনী হইতে লাগিল, ততই শরীর যেন শ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল; শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; ক্রমে বনদেবীর পা যেন আর চলে না। স্বরে এমনিভাবে বনদেবী কত পথ যে অতিক্রম করিতেছে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পথ যেন ফুরায় না, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন পথ দেখিতে পাইতে লাগিল। চলিতে চলিতে সে কুসুমাবৃত পথ অতিক্রম করিয়া এক কদর্য্য কণ্টক ও কঙ্করময় পথে আসিয়া পড়িল। প্রথমে প্রবেশকালে পথিমধ্যে যে আলোক দেখিয়াছিল, এখন আর সে আলোক দেখিতে পাইতেছে না; সন্ধ্যার ছায়ার মত অন্ধকার সে-পথকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। বনদেবী সে অন্ধকারে পথের কণ্টক,কঙ্কর ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছে না; শত শত কণ্টক পদে বিদ্ধ হইতে লাগিল। শরীরও শ্রান্তিতে পূর্ণ, শরীর হইতে অনর্গল ঘর্ম্ম জল বহির্গত হইতেছে; আবার ক্রোড়স্থ শিশুটী তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া "মা বড় ক্ষুধা" বলিয়া কাঁদিতেছে। বনদেবী তখন বিষম বিপদে পড়িল; কতদূরে যে তাহার লক্ষ্যস্থান, তাহাও জানে না, সম্মুখে কেবল অন্ধকার, ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, তখন মনে মনে স্থির করিল ফিরিয়া যাই; আর এ পথে যাইব না; কেন মহাপুরুষের বাক্য লঙ্ঘন করিলাম। পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, পথ, অন্ধকার স্তূপে স্তূপে সজ্জিত। তখন দেখিল আর উপায় নাই, কি করিবে, বীরপদে অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল।

বনদেবী স্বর-রাজ্যে যখন এইরূপ বিপদে পতিতা, তখন পৃথিবীতে রাত্রি প্রায় সার্দ্ধ তৃতীয় প্রহর অতীত হইল; বনদেবের সেই মৃন্ময় পুত্তলিকা গঠনও সমাপ্ত হইল। তখন সেই মৃন্ময় পুত্তলিকাটীকে সম্মুখদেশে স্থাপিত করিয়া, সমুদ্র হইতে এক গণ্ডুষ জল আনিয়া মন্ত্রপূত করিতে লাগিলেন; যখা সময়ে সে জল পূত মন্ত্রাভিষিক্ত হইলে, তিনি অস্ফুট কণ্ঠে এই কয়টী কথা উচ্চারণ করিলেন, "ভক্তে ভগবানে যুক্ত হইলে ভক্তেরই জয় হয়, তাই আজ ভক্তিগত-প্রাণা বনদেবী জয়লাভ করিল। সে বাল্যাবধি যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল, কামনাময়ী হইয়া আজ তাহার সামান্য ফল-লাভ করিল; সে স্বর্গ চাহিল না, মুক্তি চাহিল না, সে সংসারের বিষাক্ত সুখ চায়; তাই তোমাকেই এই মন্ত্রপূত জলের দ্বারা সজীব করি-লাম। প্রচ্ছন্নভাবে আমার শক্তি তোমাতে সঞ্চারিত থাকিবে; তোমা হইতে পৃথিবীতে একটী শান্তস্বভাব জাতির সৃষ্টি হইবে; পৃথি-বীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য, ধরা শস্যশালিনী করিবার জন্য, তোমাকে জীবন দিয়া বনদেবীর করে অর্পণ করিলাম। তুমি সংসারে গিয়া কর্ত্তব্য ভুলিও না।" এই বলিতে বলিতে সেই মন্ত্র-পূত জল-গণ্ডূষ মৃন্ময় পুত্তলিকার মস্তকে প্রক্ষিপ্ত করিলেন; সেই সময়ে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিদ্যুতালোকের ন্যায় বনদেবের ললাটদেশ হইতে নির্গত হইয়া শিশুর শরীরে প্রবেশ করিল। তখন সেই পুত্তলিকা সদ্য-প্রস্ফুটিত কিংশুক সদৃশ বিদ্যুৎকান্তি প্রাপ্ত হইল, সবজাত

শিশুর মূর্ত্তিতে জীবন সঞ্চার হইল। বনদেব সেই শিশুটীকে হস্তে ধরিয়া সংজ্ঞাহীনা বন-দেবীর ক্রোড়দেশে স্থাপন করিলেন। আশ্চর্য্য দৈবশক্তি প্রভাবে শিশুটী বনদেবীর ক্রোড়স্থ হইবামাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িল। বনদেব আর বিলম্ব করিলেন না; তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এ দিকে সপ্তমযী বনদেবী ক্লান্তদেহে সেই পথ অতিক্রম করিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহার সর্ব্বদেহ রাত্রি যেন গাঢ় হইয়া আসিল; আর অন্ধকারে কিছুই লক্ষিত হইতেছে না; বনদেবী আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; ক্রোড়স্থ শিশুটী কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়াছে। বনদেবী তখন অনন্য উপায় হইয়া, সেই কণ্টকাকীর্ণ পথের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। জনপ্রাণী নাই, চারি দিকে হিংস্র জন্তুর কলরব, বনদেবী ভয়ে মৃত-প্রায়; এমন সময় দেখিল, একটা ভীষণা-মূর্ত্তি রাক্ষসী দ্রুত পদবিক্ষেপে তাহার সম্মুখদেশে আসিতেছে। তাহার বিকট গর্জ্জন, লোহিত-মান জিহ্বা,করাল দন্তশ্রেণী। বনদেবী ভাবিল, সে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে গ্রাস করিবে, এখন পলায়ন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া, ক্রোড়স্থ শিশুটীকে দৃঢ় করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল,অঞ্চল দিয়া কটিদেশ একটু দৃঢ় করিয়া বাঁধিল এবং পলাইবার জন্য যেই সবেগে গাত্রোত্থান করিবে, অমনি তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিল, রজনী প্রায় প্রভাত হইয়াছে, সম্মুখে প্রশান্ত জলধি মৃদুমধুর গর্জ্জন করিতেছে; সে সেই সিকতা-নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে, আর বক্ষঃস্থলে একটী ক্ষুদ্রজীবন্ত শিশু বিরাজ করিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, শশব্যস্তে সৈকত-শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। দেখিল, যে শিশু স্বপ্নের নদী হইতে ফিরাইয়া অন্য পথ দেখাইয়াছে, স্বপ্নে যে শিশুর জন্য ব্যাকুলা হইয়াছিল, রাক্ষসী-গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য, যে শিশুকে বৃহদ্রূপে বক্ষদেশে আঁটিয়া ধরিয়াছিল, এটীও সেই শিশু; বনদেবী বিস্ময়-সাগরে নিমগ্না হইল।

শ্রীশ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্মশ্রু-ধারণ।

শ্মশ্রু-ধারণ (দাড়ী রাখা) কর্ত্তব্য কি না? এবং কর্ত্তব্য হইলে কোন্ জাতির পক্ষে বা কোন্ শ্রেণীর পক্ষে কর্ত্তব্য, অদ্য সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে অনেকেই শ্মশ্রু-ধারণ করেন, কিন্তু তাহা কোন নিয়মের অধীন নহে। যাহার ইচ্ছা হয়, সেই দাড়ী রাখে; আবার মুণ্ডন ইচ্ছা হইলে তাহা ত্যাগ করে; কেবল ভাঁল মুসলমানগণই ধর্ম্মানুরোধে নিয়ত শ্মশ্রু-ধারণ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ দাড়ী রাখেন,নানা শ্রেণীর হিন্দু বাবুগণও দাড়ী রাখেন, সাধু মহাত্মা-গণ দাড়ী রাখেন এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মধ্যেও

কেহ কেহ দাড়ী রাখিয়া থাকেন। কিন্তু আবার, ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই শ্মশ্রু-ধারণকে ঘোর কুকার্য্য বলিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতির মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ পরিলক্ষিত হয় না। যাহার ইচ্ছা হয় দাড়ী রাখে, যাহার ভাল বোধ না হয়, সে রাখে না; সে দাড়ী রাখা না রাখা সখের উপর নির্ভর। জামা, চাদর, ছড়ী, জুতা প্রভৃতির মধ্যে দাড়ীও একটী সজ্জা বিশেষ। ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রেণী ভিন্ন দাড়ী রাখা সম্বন্ধে আর কাহারও কোন আপত্তি নাই। সুতরাং এক্ষণে কেবল ব্রাহ্মণপণ্ডিত লইয়াই বিচার।

অধিকাংশ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ দাড়ী রাখাকে মহা কুকার্য্য বলিয়া বোধ করেন। সন্ধ্যা, পূজা না কর, তাহাতে তত আপত্তি নাই, বা কোন মাদক সেবন কর, তাহাতেও তত নিন্দা নাই, নীচ স্ত্রী-সংসর্গ, অভক্ষ্য ভক্ষণ অথবা পাতিত্যজনক কার্য্য কর, তাহারও প্রায়শ্চিত্ত আছে; কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মিয়া দাড়ী রাখিলে সমাজে তাহার স্থান নাই, সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তও নাই। অথচ অন্য এক শ্রেণীর প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে শ্মশ্রু-ধারণ করিতেও দেখা যায়। অতএব শ্মশ্রু-ধারণ কুকার্য্য কি সৎকার্য্য, তাহাই নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

শ্মশ্রু-ধারণ পাপজনক না ব্রাহ্মণজাতির ব্যবহার-বিরুদ্ধ, না তদ্দ্বারা শারীরিকও মানসিক কোন অপকার সাধিত হয়, কিম্বা প্রাকৃতিক নিয়মের কোন অন্যথাচরণ করা হয়, ইহাই বিচার্য্য।

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের যে ক্ষুদ্র অংশ আমাদিগের জ্ঞানগোচর হইয়াছে, বা উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিতগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যে পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্মশ্রু-ধারণ পাপজনক বলিয়া বাচনিক কোন প্রমাণ পাই নাই। তবে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সাগর সদৃশ অপার, সুতরাং একথা দৃঢ় করিয়া কখনই বলিতে পারিব না যে, কোন শাস্ত্রে এরূপ প্রমাণ নাই। যদি কোন মহাত্মা ইহার বিরুদ্ধ প্রমাণ জ্ঞাত থাকেন, তবে তাঁহা প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। এ পর্য্যন্ত যখন শ্মশ্রু ধারণ পাপজনক বলিয়া কোন প্রমাণ পাই নাই; তখন তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দোষণীয় বলিয়া মনে করিতে পারি না। বরং শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিলে, শ্মশ্রু-ধারণ ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়াই অনুমিত হয়। যদিও "ব্রাহ্মণগণ শ্মশ্রু-ধারণ করিবে" এরূপ কোন অনুজ্ঞাবাচক "শ্রুতি" নাই, তথাপি প্রকারান্তরে শ্মশ্রু কেশাদি ধারণ সম্বন্ধে অনুকূলক মত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত শুদ্ধিতত্ত্বের অশৌচসঙ্কর প্রকরণে লিখিত আছে, "কেশ শ্মশ্রু ধারণাতাম্ অগ্র্যাভবতি সন্ততিঃ" ইতি দানধর্ম্মে। কেশ ধারণ করিলে সন্তান বলবান হয়, যদিও এটি অনুজ্ঞা-বিধি নহে, তথাপি ইহাকে ঔপকারিক বিধি অবশ্যই বলিতে হইবে। ঐ স্থলে বচনান্তর দ্বারা পিতৃমাতৃ বিয়োগ এবং তীর্থযাত্রাদি ব্যতিরিক্ত স্থলে শ্মশ্রু কেশাদি বপন অকর্ত্তব্য বলিয়াও প্রমাণিত হইয়াছে। যথা,—

প্রয়াগে তীর্থযাত্রায়াং পিতৃমাতৃ বিয়োগতঃ,
কচানাং বাপনং কার্য্যং বৃথা ন বিকচো ভবেৎ"

প্রয়াগে তীর্থযাত্রা কালে ও পিতৃমাতৃ বিয়োগে কেশাদি ত্যাগ করিবে, তদ্ভিন্ন সময়ে বৃথা কেশাদি ত্যাগ করিবে না। কচ শব্দে সামান্যতঃ কেশ বুঝাইলেও এ স্থলে [illegible] যুক্ত কেশ শ্মশ্রু ইত্যাদি লোম মাত্রকেই বুঝাইয়াছে যথা,—

"অতএবাদি পুরাণে যত্ত্বাজ্যমুক্তং"

অর্থাৎ আদিপুরাণে যাহা আগের উপযুক্ত বলিয়া উক্ত আছে; কেহ কেহ ইহা কাম্যপর বলেন। অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব যে বঙ্গদেশের একমাত্র প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং কেবল এই শাস্ত্রমূলেই যে বঙ্গীয় হিন্দুজাতির জাতকর্ম্ম হইতে সপিণ্ডকরণ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইতেছে, ইহা একবাক্যে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সেই অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে যাহা প্রকারান্তরে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কখনই পাপজনক নহে।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ব্রাহ্মণের পক্ষে কর্ত্তব্য। অথচ মলমাস-তত্ত্বে চাতুর্ম্মাস্য প্রকরণে শ্মশ্রু-নখাদি ধারণের বিশেষ বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা,—"ধারণামথ লোমাঞ্চ গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে।" বৎসরে দ্বাদশ মাস, তন্মধ্যে চারি মাসকাল শ্মশ্রু-ধারণের ব্যবস্থা রহিল। অবশিষ্ট অষ্টম মাস মধ্যে "ন জন্মমাসে নচ চৈত্র পৌষে বিবাহযাত্রা নচ ক্ষৌরকর্ম্মঃ" জন্মমাস, চৈত্র মাস ও পৌষ মাসে বিবাহযাত্রা ও ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে না। যদিও কেহ কেহ এই ক্ষৌর শব্দের অর্থান্তর করেন, তথাপি ইহার সরলার্থ সাধারণ ক্ষৌরকর্ম্মকেই বুঝাইয়া থাকে এবং অনেক স্থলে ইহার সরলার্থই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বিধি ও নিষেধে সপ্তম মাস প্রাপ্ত হওয়া গেল। এক্ষণে অবশিষ্ট পঞ্চম মাস। এই পঞ্চম মাস মধ্যেও পর্ব্বাহাদিতে ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ। প্রতিমাসে নিষিদ্ধ দিনও অনেক, যথা—"ষষ্ঠ্যষ্টমী পঞ্চদশী উভয় পক্ষে চতুর্দ্দশী, অত্র সন্নিহিতং পাপং তৈলে মাংসে ভগে ক্ষুরে" উভয় পক্ষীয় ষষ্ঠী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা অমাবস্যাতে ক্ষৌরাদি করিলে পাপ হইবে। অতএব পাঁচ মাসের মধ্যে প্রায় তিন মাস মাত্র অবশিষ্ট রহিল। অতঃপর শ্রাদ্ধাদি বাসরেও ক্ষৌর বর্জ্জন বিধেয়। এক্ষণে যে বর্ষ মধ্যে কিঞ্চিদধিক দুইমাস কাল অবশিষ্ট থাকিতেছে, তন্মধ্যেও আবার রাজমার্ত্তণ্ডে যথা—

উত্তরাত্রিতয়ং যাম্য রোহিণী রৌদ্র সর্পপিতৃভেষু—চাশ্বিভে শ্মশ্রুকর্ম্ম সকলং বিবর্জ্জয়েৎ"

অপিচ—

"মানং ক্ষৌরে হন্তি গুরুঃ শুক্রং শুক্রোধনং রবিঃ। আয়ুরশ্বয়কং হন্তি সর্ব্বহন্তিশনৈশ্চরঃ। ক্ষৌরিকার্য্যে শনি, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্রবার এবং উত্তরফল্গুনী প্রভৃতি নক্ষত্রে সাধারণতঃ নিষিদ্ধ।" এক্ষণে দেখ অবশিষ্ট কি রহিল? এই নিষিদ্ধ কালের ইতর দিনে ক্ষৌরী হওয়া যাইতে পারে। ইহা দ্বারা কি শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় বিশদরূপে বুঝা যাইতেছে না যে "শ্মশ্রু নখাদি ধারণ করাই কর্ত্তব্য"? তবে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে নিষিদ্ধ দিন ব্যতিরেকে ক্ষৌরী হইতে পারে। এইত গেল শাস্ত্রের কথা; এক্ষণে যুক্তি দ্বারা ইহার ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে কতদূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, তাহাই দেখা যাউক।

শাস্ত্রে আছে, শ্মশ্রু কেশাদি ধারণ করিলে সন্তান বলবান হয়। শাস্ত্র কখনই যুক্তিহীন নহে। যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে দেখিতে পাইবে, পিতার শুক্রের গাঢ়তাই সন্তান বলিষ্ঠ হওয়ার প্রধান কারণ। শুক্রের তারল্য দূর না হইলে কখনই অপত্যোৎপাদিকা শক্তি জন্মে না। এবং সেই জন্য পূর্ণ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে অথবা যৌবনাবস্থাতেও ব্যাধি-বিকৃত শুক্র-তারল্যে (রতিশক্তি বিদ্যমান থাকিলেও) সন্তানোৎপাদিকা শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সময়ে পুরুষের পূর্ণ যৌবন উপস্থিত হয়, সেই সময় তাহার শুক্রের

পাতিত্য জন্মে এবং সেই সময়েই তাহার শুক্রদান হয়। সুতরাং পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, শুক্রের সহিত শুক্রের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে কি না? মাতার অংশ হইতে সন্তানের রক্তমাংসাদি এবং পিতার শুক্রাংশ হইতে অস্থি, মজ্জা, নখ, লোমাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং শুক্র কেশাদির সহিত শুক্রের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তন্মধ্যে আবার সবকাল জাত বলিয়া শুক্রের সহিত শুক্রের আরও নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং বারম্বার শুক্রত্যাগ করিলে যে শুক্রের অপকার ঘটিবে, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, এবং সেই অভিপ্রায়েই যে শাস্ত্রকারগণ শুক্র-ধারণ করিলে সন্তান বলবান হইবার কথা বলিয়াছেন, তাহাও নিঃসন্দেহ।

শারীরিক বিধানানুসারে দেহস্থ প্রত্যেক পদার্থ পরিশোষণের জন্য প্রতিনিয়ত রসরক্তাদি উপাদানের প্রয়োজন। শুক্র নখাদি ধারণ করিলে তাহা বৃদ্ধির শেষ সীমায় উপনীত হইয়া সমতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং শুক্র নখাদি পরিশোষণের জন্য তখন শরীরস্থ কোন উপাদানের প্রয়োজন হয় না। আর প্রতি সপ্তাহে শুক্র ইত্যাদি মুণ্ডন করিলে তাহা বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রতিনিয়ত শরীরস্থ উপাদান ব্যয়িত হইয়া থাকে। অতএব সেই অযথা ব্যয়ের গতি প্রতিরুদ্ধ হইলে, ঐ উপাদান যে দেহযন্ত্রের অন্য স্থান পরিপূর্ত করিবে, তাহা একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত; ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, শুক্র-ধারণ বিজ্ঞান-সম্মত।

চিকিৎসা-ব্যবসায়ীগণ বলিয়া থাকেন, শীঘ্র শীঘ্র শুক্র নখাদি বপন করিলে চক্ষুর তেজোহ্রাস হয়। এবং শুক্র-ধারণ করিলে তদ্দ্বারা ধমনী প্রভৃতি স্নায়ু হিমের আক্রমণ হইতে অনেক পরিমাণে পরিরক্ষিত হয়। ইহাও অযৌক্তিক নহে।

অনেক সময় অনেক দুরারোগ্য অচিকিৎস্য ব্যাধির জন্য কেহ কেহ দেবতার উদ্দেশ্যে শুক্র নখাদি ধারণ করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা অনেককে ফললাভ করিতেও দেখা যায়। যদিও তৎপ্রতি দৈবানুগ্রহই প্রধান কারণ বটে; তথাপি আংশিক রূপে শুক্র-ধারণাদিও তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ শুক্র-ধারণাদির পরিবর্ত্তে অন্য নিয়মের ব্যবস্থা থাকিত।

একণে দেখা উচিত, শুক্র-ধারণ ব্রাহ্মণ জাতির ব্যবহার-বিরুদ্ধ কি না? সম্প্রতি দাড়ী রাখা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের পক্ষে ব্যবহার-বিরুদ্ধ বটে; কিন্তু পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ (মুণ্ডনসি) গণের পক্ষে তাহা ব্যবহার-বিরুদ্ধ ছিল না। বরং শুক্র-ধারণ তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুরাপাদিতে ব্যাস, নারদ প্রভৃতি মহর্ষি বা ব্রাহ্মণগণের রূপ-বর্ণনাতে—"শুক্র-বিরাজিত মুখমণ্ডল" ইত্যাদি বাক্যবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়, এবং লোক-পরম্পরা প্রসিদ্ধ চিত্র-পটাদিতেও মুনি ঋষির চিত্রে সুদীর্ঘ শুক্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। অথচ তাঁহাদিগের আকৃতি মনোমধ্যে উদিত হওয়া মাত্রেই যেন আশ্চর্য্য-বিস্ফারিত শ্বেত শুক্রজাল মানস-নয়নের প্রত্যক্ষ হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ শুক্র-ধারণকে নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং পূর্ব্বকালে তাহা ব্রাহ্মণ জাতির ব্যবহার-বিরুদ্ধ ছিল না। তবে বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সেই প্রাচীন-আর্য্যঋষি কশ্যপাদির বংশধর হইয়া, শুক্র-ধারণকে এত কুকার্য্য বলিয়া মনে করেন কেন? আমাদিগের বোধ হয়, মুসলমান রাজত্ব কালে শুক্রধারী যবনদিগের অত্যাচারে অথবা তাহাদিগের সহিত আকৃতিগত পার্থক্যের জন্য ব্রাহ্মণগণ শুক্র-ত্যাগ করেন; এবং তদবধি ইহা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের ব্যবহারিক পদ্ধতিরূপে পরিণত হইয়া আসিয়াছে।

ঈশ্বরাভিপ্রেত নৈসর্গিক-নিয়মানুসারে নর-নারীর যে আকৃতি-ভেদ, তন্মধ্যেও শুক্র-ধারণ একটী প্রধান চিহ্ন। সুতরাং তাহা সপ্তাহে সপ্তাহে পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না; বরং তদ্দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথাচরণ করাই হইয়া থাকে। যদিও কেশ শুক্র উভয়ের ত্যাগেই শারীরিক অপকার ঘটে, তন্মধ্যে আবার শুক্র-ত্যাগই অধিক অপকারজনক। শরীরস্থ প্রধান (শুক্র নামক) রসের সহিত শুক্রের সম্বন্ধই অধিক। নারীদেহে ঐ রসের অভাবপ্রযুক্ত স্ত্রী-জাতির শুক্রাগম হয় না; এবং পুরুষাকৃতি নপুংসকের (জন্ম-ক্লীব) গণের শুক্রাগম হইতে দেখা যায় না।

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াই বোধ হয়, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, প্রসন্ন তর্করত্ন, প্রসন্ন দিব্যরত্ন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি মহাত্মাগণ অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে শুক্র-ধারণ করিয়াছেন; এবং সেই দৃষ্টান্ত অন্যান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, মধ্যেও অনেকে শুক্র-ধারণ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমার শেষ বক্তব্য এই, যদি শুক্র-ধারণ ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে পাপাবহ বা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ না হয়, তবে তাহা অবিরোধে প্রচলিত হওয়াই উচিত।

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

ঈশ্বর নিত্য জাগ্রত।

কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ পর্য্যন্ত, সৃষ্টির সহিত তাঁহার এখন আর কোনও সংস্রবই নাই।

এ অতি ভয়ানক কথা! যদি সৃষ্টির সহিত এখন ঈশ্বরের সম্বন্ধমাত্র না থাকিত, তাহা হইলে, এই জগৎ কি প্রকারে এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিলে পারিত? সৃষ্ট বস্তু-নিকরে তিলার্দ্ধকাল মাত্রও আপনি থাকিতে পারে?

একথা যাঁহার সৃষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, জগৎ এক জন অনন্তজ্ঞান, অনন্তমঙ্গল, অনন্তশক্তি পুরুষের ইচ্ছাতে অভাব হইতে সদ্ভাবে উপস্থিত হইয়াছে, তিনি উক্তরূপ কথা সমস্বরে বলিতে পারেন না। ঈশ্বরের সেই সৃষ্টিকারিণী ইচ্ছাই জগতের প্রাণ ও একমাত্র অবলম্বন। সেই অনন্তজ্ঞান-অনন্তমঙ্গলত্ব-অনন্তশক্তি বিশিষ্টা ইচ্ছা অনাগত বর্ত্তমান না থাকিলে, এই সকল কেমন করিয়া এখনও পর্য্যন্ত থাকিতে ও চলিতে পারে? প্রাণত্যাগ হইলে কি কেহ কখন থাকিতে পারে? যখন সেই ইচ্ছাই জগতের প্রাণ, তখন সেই প্রাণ এ পর্য্যন্ত না থাকিলেও জগৎ এ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, এ কথা, নিতান্ত জড়পিণ্ড না হইলে, আর কেহই মুখে আনিতে পারে না। এই জগৎ উৎপন্ন হইয়া অমনি তমুহূর্ত্তেই আবার বিলুপ্ত হইয়া যাইত,

খাটতা জন্মে এবং সেই সময়েই তাহার শ্মশ্রু-জাল হয়। সুতরাং পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, শ্মশ্রুর সহিত শুক্রের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে কি না? মাতার অংশ হইতে সন্তানের রক্তমাংসাদি এবং পিতার শুক্রাংশ হইতে অস্থি, মজ্জা, নখ, লোমাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং শ্মশ্রু কেশাদির সহিত শুক্রের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তন্মধ্যে আবার সম্বন্ধ জ্ঞাত বলিয়া শ্মশ্রুর সহিত শুক্রের আরও নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং বারম্বার শ্মশ্রুত্যাগ করিলে যে শুক্রের অপকার ঘটিবে, ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই, এবং সেই অভিপ্রায়েই যে শাস্ত্রকারগণ শ্মশ্রু-ধারণ করিলে সন্তান বলবান হইবার কথা বলিয়াছেন, তাহাও নিঃসন্দেহ।

শারীরিক বিধানানুসারে দেহস্থ প্রত্যেক পদার্থ পরিশোষণের জন্য প্রতিনিয়ত রসরক্তাদি উপাদানের প্রয়োজন। শ্মশ্রু নখাদি ধারণ করিলে তাহা বৃদ্ধির শেষ সীমায় উপনীত হইয়া সমতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং শ্মশ্রু নখাদি পরিশোষণের জন্য তখন শরীরস্থ কোন উপাদানের প্রয়োজন হয় না। আর প্রতি সপ্তাহে শ্মশ্রু ইত্যাদি বপন করিলে তাহা বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রতিনিয়ত শরীরস্থ উপাদান ব্যয়িত হইয়া থাকে। অতএব সেই অযথা ব্যয়ের গতি প্রতিরুদ্ধ হইলে, ঐ উপাদান যে দেহযন্ত্রের অন্য স্থান পরিপুষ্ট করিবে, তাহা একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত; ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, শ্মশ্রু-ধারণ বিজ্ঞান-সম্মত।

চর্চ্চিৎসা-ব্যবসায়ীগণ বলিয়া থাকেন, শীঘ্র শীঘ্র শুক্র নখাদি বপন করিলে চক্ষুর তেজোহ্রাস হয়। এবং শ্মশ্রু-ধারণ করিলে তদ্দ্বারা বপননী প্রভৃতি স্নায়ু হিংস্র আক্রমণ হইতে অনেক পরিমাণে পরিরক্ষিত হয়। ইহাও অযৌক্তিক নহে।

অনেক সময় অনেক দুরারোগ্য অচিকিৎস্য ব্যাধির জন্য কেহ কেহ দেবতার উদ্দেশ্যে শুক্র নখাদি ধারণ করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা অনেককে ফললাভ করিতেও দেখা যায়। যদিও তৎপ্রতি দৈবানুগ্রহই প্রধান কারণ বটে; তথাপি আংশিক রূপে শ্মশ্রু-ধারণাদিও তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ শ্মশ্রু-ধারণাদির পরিবর্ত্তে অন্য নিয়মের ব্যবস্থা থাকিত।

এক্ষণে দেখা উচিত, শ্মশ্রু-ধারণ ব্রাহ্মণ জাতির ব্যবহার-বিরুদ্ধ কি না? সম্প্রতি দাড়ী রাখা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের পক্ষে ব্যবহার-বিরুদ্ধ বটে; কিন্তু পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ (মুণ্ডনঋষি) গণের পক্ষে তাহা ব্যবহার-বিরুদ্ধ ছিল না। বরং শ্মশ্রু-ধারণ তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট ছিল। পুরাণাদিতে ব্যাস, নারদ প্রভৃতি মহর্ষি বা ব্রাহ্মণগণের রূপ-বর্ণনাতে—"শ্মশ্রু-বিরাজিত মুখমণ্ডল" ইত্যাদি বাক্যবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়, এবং লোক-পরম্পরা প্রসিদ্ধ চিত্র-পটাদিতেও মুনি ঋষির চিত্রে দীর্ঘ শ্মশ্রু অঙ্কিত হইয়া থাকে। অথচ তাঁহাদিগের আকৃতি মনোমধ্যে উদিত হওয়া মাত্রেই যেন অবশ্যম্ভাবিরূপে শ্বেত শ্মশ্রুজাল মানস-নয়নের প্রত্যক্ষ হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ শ্মশ্রু-ধারণকে নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং পূর্ব্বকালে তাহা ব্রাহ্মণ জাতির ব্যবহার-বিরুদ্ধ ছিল না। তবে বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সেই প্রাচীন-আর্য্যঋষি কন্যপাদির বংশধর হইয়া, শ্মশ্রু-ধারণরূপ এত কুকার্য্য বলিয়া মনে করেন কেন? আমাদিগের বোধ হয়, মুসলমান রাজত্ব কালে শ্মশ্রুধারী যবনদিগের অত্যাচারে অথবা তাহাদিগের সহিত আকৃতিগত পার্থক্যের জন্য ব্রাহ্মণগণ শ্মশ্রু-ত্যাগ করেন; এবং তদবধি ইহা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের ব্যবহারিক পদ্ধতিরূপে পরিণত হইয়া আসিয়াছে।

ঈশ্বরাভিপ্রেত নৈসর্গিক নিয়মানুসারে নর-নারীর যে আকৃতি-ভেদ, তদধ্যেও শ্মশ্রু-ধারণ একটী প্রধান চিহ্ন। সুতরাং তাহা সপ্তাহে সপ্তাহে পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না; বরং তদ্দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথাচরণ করাই হইয়া থাকে। যদিও কেশ শ্মশ্রু উভয়ের ত্যাগেই শারীরিক অপকার ঘটে, তন্মধ্যে আবার শ্মশ্রু-ত্যাগই অধিক অপকারজনক। শরীরস্থ প্রধান (শুক্র নামক) রসের সহিত শ্মশ্রুর সম্বন্ধই অধিক। নারীদেহে ঐ রসের অভাবপ্রযুক্ত স্ত্রী-জাতির শ্মশ্রুজন্ম হয় না; এবং শুক্রাকৃতি নপুংসক-(জন্ম-ক্লীব) গণের শ্মশ্রুজন্ম হইতে দেখা যায় না।

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াই বোধ হয়, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, প্রসন্ন তর্করত্ন, প্রসন্ন বিদ্যারত্ন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি মহাত্মাগণ আশ্য-কর্ত্তব্য বোধে শ্মশ্রু-ধারণ করিয়াছেন; এবং সেই দৃষ্টান্তে অন্যান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মধ্যেও অনেকে শ্মশ্রু-ধারণ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমার শেষ বক্তব্য এই, যদি শ্মশ্রু-ধারণ ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে পাপাবহ বা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ না হয়, তবে তাহা অবিরোধে প্রচলিত হওয়াই উচিত।

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

ঈশ্বর নিত্য জাগ্রত।

কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ পর্য্যন্ত, সৃষ্টির সহিত তাঁহার এখন আর কোনও সংস্রবই নাই।

এ অতি ভয়ানক কথা। যদি সৃষ্টির সহিত এখন ঈশ্বরের সম্বন্ধমাত্র না থাকিত, তাহা হইলে, এই জগৎ কি প্রকারে এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিলে পারিত? সৃষ্ট বস্তু-কিরূপে তিলার্দ্ধকাল মাত্রও আপনি থাকিতে পারে?

একথা যাঁহার স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, জগৎ এক জন অনন্তজ্ঞান, অনন্তমঙ্গল, অনন্তশক্তি পুরুষের ইচ্ছাতে অভাব হইতে সদ্ভাবে উপস্থিত হইয়াছে, তিনি উক্তরূপ কথা কখনই বলিতে পারেন না। ঈশ্বরের সেই সৃষ্টিকারিণী ইচ্ছাই জগতের প্রাণ ও একমাত্র অবলম্বন। সেই অনন্তজ্ঞান-অনন্তমঙ্গলত্ব-অনন্তশক্তি বিশিষ্টা ইচ্ছা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান না থাকিলে, এই সকল কেমন করিয়া এখনও পর্য্যন্ত থাকিতে ও চলিতে পারে? প্রাণত্যাগ হইলে কি কেহ কখন থাকিতে পারে? যখন সেই ইচ্ছাই জগতের প্রাণ, তখন সেই প্রাণ এ পর্য্যন্ত না থাকিলেও জগৎ এ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, এ কথা, নিতান্ত জড়পিণ্ড না হইলে, আর কেহই মুখে আনিতে পারে না। এই জগৎ উৎপন্ন হইয়া অমনি তমূহূর্ত্তেই আবার বিলুপ্ত হইয়া যাইত,

যদি 'এই সকল থাকুক' এই ইচ্ছার-সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের তদ্রূপ ইচ্ছা না থাকিত যে, 'এই সকল থাকুক ও চলুক।' 'এই সকল থাকুক ও চলুক' এই ইচ্ছার বিরতি হইলে, তন্মিমেষেই এই সকল চলিয়া যায়, কিছুই থাকে না।

যদি জগতের সহিত ঈশ্বরের এখন আর কোন সংস্রবই না থাকিত, তাহা হইলেও, তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণরূপ বিরাম হইয়া থাকাতে, এই জগৎ বর্ত্তমান থাকিতে পারিত না; সেহেতু, ইহা পদার্থসমূহের সংগ্রহ ও সংযোজন পূর্ব্বক রচনা নহে *। এই জগৎ যখন বর্ত্তমান রহিয়াছে ও চলিতেছে, তখন ঈশ্বর এই নিখিল সংসারের তাবৎ কার্য্যই স্বীয় ইচ্ছাতে সম্পন্ন করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছালোত সেই অনাদিকাল হইতে প্রতিনিয়তই বহমান রহিয়াছে। যদি বল, তিনি অনন্তকালের জন্য যে সকল নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, এই জগৎ সেই সকল নিয়মানুসারেই চলিতেছে, ঈশ্বরকে এখন আর কিছু করিতে হয় না। ইহার উত্তর সেই পূর্ব্ব প্রকারই হইতেছে। 'এই সৃষ্টি এই এই নিয়মে অনন্তকাল চলিতে থাকুক' ঈশ্বর একবার মাত্র এইরূপ ইচ্ছা করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে, জগতের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণরূপ ঔদাসীন্য থাকে, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টিমাত্রই থাকে না। জগতের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি না থাকিলে জগৎ কি প্রকার থাকে, এবং তাঁহার নিয়ম সমস্তই বা কিরূপে থাকিতে পারে? তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টিই জগৎ-সৃষ্টি; তাঁহার জ্ঞানেতে যাহা না থাকে, সত্তাতেও তাহা প্রাপ্তিতে পারে না।

প্রকারান্তরে দেখ। যাহার যে স্বভাব, তাহা তাহাকে ছাড়িয়া থাকে না; এবং সেও আপন স্বভাব হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। তোমার স্বভাব কি তোমা হইতে বিযুক্ত হইয়া আছে? অথবা তুমি কি তোমার স্বভাব হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকিতে পার? ঈশ্বরও সেইরূপ তাঁহার স্বভাব হইতে বিযুক্ত নহেন, অথবা তাঁহার স্বভাবও তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভূত নহে। পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ মঙ্গলভাব, স্বাভাবিক পূর্ণ শক্তি, স্বেচ্ছাকারিতা, এই সকল ঈশ্বরের। এ সকল তাঁহাকে নিমেষমাত্রও পরিত্যাগ করিয়া নাই। এ সকল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিলে তিনি আর কি থাকেন? তখন তিনি জড় হইতেও জড় হইয়া রহেন। 'ঈশ্বর' এই শব্দ উচ্চারণ করিলে, আমাদের মনে কি আইসে? একটী শূন্য পদার্থ, না একখান প্রস্তরখণ্ড? ঈশ্বর বলিলেই, অনন্তজ্ঞান, অনন্তশক্তিমান এক মহান্ পুরুষের ভাব মনে উদয় হয় না? 'ঈশ্বর আছেন' এই কথা বলিলেই বা মনে হইলেই, তিনি আপন স্বভাবেই বর্ত্তমান আছেন এইরূপ মনে হইয়া থাকে। তাঁহার স্বভাব কি? না জ্ঞান ক্রিয়া ইচ্ছাক্রিয়া। তাঁহার স্বভাব-বিবর্জ্জিত হইয়া তিনি নাই। যাবৎ তিনি বর্ত্তমান আছেন, তাবৎই তাঁহার সেই স্বভাবের কার্য্য চলিতেছে। অনাদি কাল হইতে তিনি বিদ্যমান, সেই অনাদিকাল হইতেই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াও বহমানী; এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত তিনি বর্ত্তমান থাকিবেন, সেই অনন্তকাল পর্য্যন্তই তাঁহার ঐ ক্রিয়াও বহমান থাকিবেক। তাঁহার ঐ স্বাভাবিকী জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়া কি? না এই বিশ্বব্যাপাররূপ অনন্তলীলা। তিনি এই লইয়াই আছেন, ও এই লইয়াই থাকিবেন;—অনবরতই তাঁহার এই কার্য্য। তাঁহার সেই সকল-সঙ্কলিত প্রতিনিমেষ-বর্ত্তমান জ্ঞানবল-ইচ্ছা-সহযোগে তিনি গড়িতেছেন, ভাঙ্গিতেছেন, আবার গড়িতেছেন; রূপান্তরিত, ভাবান্তরিত ও স্থানান্তরিত করিতেছেন। তাঁহার স্বভাব ও কার্য্যই যদি এই হইল, তবে কিরূপে তিনি ইহা হইতে বিযুক্ত থাকিতে পারেন, এবং ইহাই বা কিরূপে তাঁহা ভিন্ন থাকিতে পারে? 'ঈশ্বর আছেন' বলিলে, যেমন তাঁহার স্বভাবের কার্য্য এই জগৎও আছে বুঝায়, সেইরূপ জগৎ আছে ও চলিতেছে বলিলেও ঈশ্বর কর্ত্তৃক ইহা প্রতি-নিমেষেই পরিচালিত হইতেছে, ইহাও বুঝায়। অতএব "সৃষ্টির সহিত তাঁহার এখন আর কোন সম্পর্ক নাই" একথা কি প্রকারে আসিতে পারে? একথা নিতান্ত অমূলক, অসার ও অশ্রদ্ধেয়।

শ্রী :—

* একটী সামান্য রচনার সময়ে সমুদয় স্বয়ং রচয়িতা বা তৎসদৃশ কোন শিল্পকুশল ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংঘটিত না হইলে, তাহা ও কালক্রমে এক নিয়মে এক ভাবে বহুদিন থাকিতে পারে না।

গৌড় বা লক্ষণাবতী।

'ইতিপূর্ব্বে অনুসন্ধানে' "গৌড় বা লক্ষণাবতী" ইত্যভিধেয় কয়েকটী ইতিবৃত্ত-মূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বাবু শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের বহুদিনের সঙ্কলিত বিষয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা শ্রীশ বাবুকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করি। প্রবন্ধ-লেখক আমাদের বিশেষ পরিচিত এবং বন্ধু; গৌড়ের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁহার সহিত ইতিপূর্ব্বে আমাদের অনেক কথা হইয়াছে। আমরা দীর্ঘকাল অনুসন্ধান আলোচনা করিয়া সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই, শ্রীশ বাবু অল্প দিনের চেষ্টা ও যত্নে তদ্বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়া, অনেকাংশে সফলকাম হইয়াছেন দেখিয়া অধিক আহ্লাদিত হইয়াছি। তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহার বর্ণিত বিষয় যথাসম্ভব ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্য হইত; সাধারণ পাঠকবর্গও যাঁহারা গৌড়ের বৃত্তান্ত কিছুই জানেন না, অথবা কাল্পনিক গল্প পরম্পরা মাত্র শ্রবণ করিয়া গৌড় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও) গৌড়ের প্রকৃত ইতিহাস পাঠ করিয়া পরমানন্দিত হইতেন, এবং বর্ত্তমান লেখককেও শ্রীশ বাবুর ভ্রম প্রদর্শন জন্য লেখনী ধারণ করিতে হইত না। গৌড় বা লক্ষণাবতীর অতীত এবং বর্ত্তমানাবস্থা যথাযথরূপে বর্ণিত হইলে বঙ্গদেশের একখানি উৎকৃষ্ট খণ্ডেতিহাস হয়। ইংরেজী-বাদ নিবাসী স্বর্গীয় সৈয়দ এলাহীবক্স মিঞা দীর্ঘকাল যাবৎ গৌড়ের ইতিহাস-সংগ্রহ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কলিত ইতিহাস পারস্য ভাষায় লিপিবদ্ধ হইতেছিল; তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলেও পারস্য ভাষানভিজ্ঞ অধিকাংশ বঙ্গবাসীর পাঠোপযোগী হইত না। শ্রীশ বাবুর লিখিত গৌড়ের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ হইলেও তাহা গৌড়-নগরী

প্রবেশের দ্বিতীয় দরজার ন্যায় বাঙ্গালী লেখক এবং পাঠকগণের প্রথম প্রবেশের দ্বার স্বরূপ অভিনবীয় হইবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা শ্রীশ বাবুর বিদ্যানুমতিতে সেই দ্বারে প্রবেশ করিয়া "গৌড় বা লক্ষণাবতী"-প্রবন্ধে যে যে বিষয় লেখকের অনবধানতা প্রযুক্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্কলন করিতে প্রয়াস পাইব, এবং প্রবন্ধ লেখক স্থানে স্থানে যে সকল গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাও বন্ধুভাবে প্রদর্শন করিব। আমাদের এ সঙ্কলন ও সংশোধন যদি অবিসম্বাদিত রূপে সম্পাদিত হয়, ভরসা করি শ্রীশ বাবু তাহা বন্ধুর উপহার মনে করিয়া, প্রীতি-পুলক চিত্তে গ্রহণ করিবেন, প্রত্যাহার করিবেন না।

শ্রীশ বাবু প্রথমেই প্রাচীন গৌড়-নগরীর চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করিতে গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। "দক্ষিণ সীমায় সঙ্কীর্ণ-প্রবাহিণী ভাগীরথী" নহে,—দক্ষিণে দক্ষিণ-গড়ের পরিখা, ঐ পরিখা এখন জহরপুরের দাঁড়ানামে খ্যাত। বর্ত্তমান কান্সাট নামক গণ্ডগ্রামের উত্তরেই এই পরিখা। উক্ত পরিখা বা জহরপুরের দাঁড়া বর্ত্তমান কালের সঙ্কীর্ণ প্রবাহিণী ভাগীরথী হইতেও গভীরা; গ্রীষ্মকালেও তাহাতে তিন চারি হস্ত জল থাকে। এই দাঁড়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। তদুপরিস্থিত দক্ষিণ-গড় এখনও বিদ্যমান আছে। শ্রীশ বাবু গৌড়-নগরীর দক্ষিণ সীমা স্বচক্ষে দর্শন না করায় এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি যে "সঙ্কীর্ণ-প্রবাহিণী ভাগীরথীর" উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এখন গৌড়-নগরীর পশ্চিম সীমা। এই ভাগীরথীর প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া, প্রাচীন গৌড-নগরীর সীমা নির্দ্দেশ করা, শ্রীশ বাবুর ন্যায় চতুর সুলেখকের সমাধীন হয় নাই। উক্ত বিষয়ের ইতিহাসোল্লেখ-যোগ্য উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে।

যে স্থান দিয়া এখন "সঙ্কীর্ণ-প্রবাহিণী ভাগীরথী" ৯মাস কাল রুদ্ধস্রোতা থাকিয়া বর্ষার ৩ মাস মাত্র প্রবাহিতা হইতেছেন, গৌড়-স্কন্ধীর সম্যক উন্নতির সময় এই স্থানেই 'বড়গঙ্গা' প্রবাহিতা ছিলেন; তখন তাঁহার নাম 'বড়গঙ্গা' ছিল না। ভাগীরথী-খাত প্রবাহিতা গঙ্গাকে ভাগীরথীই বলিত। কালে গঙ্গাদেবী গৌড়ের ভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান দর্শনে ক্রমশঃ উদীচ্যমান্য রাজমহল নগরীর নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন। গৌড়-নগরীর পশ্চিম-পড়ের নিম্নদেশে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী অর্থাৎ প্রবল তরঙ্গিনীর পরিত্যক্ত একটী 'সোঁতা'* মাত্র রহিয়া গেল; তাহারই নাম 'ভাগীরথী' হইয়াছে। এই ভাগীরথী রাজমহলের সন্নিহিতা 'বড়গঙ্গা' হইতে (এখন বর্ষাকালে) প্রবাহিতা হইয়া গৌড়ের নিকটস্থ মহদীপুর বা মেহেদীপুর নামক গণ্ডগ্রামের নিকটে 'পাগলা গঙ্গার' সহিত মিলিত হইয়াছে। বেগবতী বড়গঙ্গার প্রবল প্রবাহ রাজমহলের দিকে সরিয়া গেলে, ভাগীরথীর ন্যায় প্রাক্তন "পাগলা-গঙ্গার" উৎপত্তি হইয়াছে। এই পাগলা-গঙ্গাও রাজমহলের সন্নিহিতা বড়গঙ্গা হইতে প্রবাহিতা হইয়া, প্রাচীন তর্ত্তিপুর বা ছাপঘাটির ত্রি-মোহানায় বড়গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছিল। বড়গঙ্গা এখন বর্ত্তমান 'তর্ত্তিপুর' হইতেও প্রায় ৪ক্রোশ পশ্চিমে সরিয়া

*'সোঁতা' শব্দ স্রোতার অপভ্রংশ।

* এই তর্ত্তিপুরের অপর পারেই ছাপঘাটির মোহানা ছিল। তাহাও এখন বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যে গঙ্গা "ভাগীরথী" নাম ধারণ করিয়া কলিকাতাভিমুখে ছুটিতেছে, তাহার মোহানা এখন "ফরেক্কা" নামক একটী সুন্দর বন্দরের নিকটে হইয়াছে। তাহাও বোধ হয় দীর্ঘকাল থাকিবে না। ভাগীরথীর গতি ক্রমশঃ যেরূপ সঙ্কীর্ণ এবং অস্থিরা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে

গিয়াছে। সুতরাং পাগলা-গঙ্গার দক্ষিণ মোহানা এখন বর্ত্তমান তর্ত্তিপুরেরও ৪।৫ ক্রোশ দক্ষিণে নারায়ণপুরের সমুখে হইয়াছে। আবার এই পাগলা-গঙ্গা হইতে "তুলসী গঙ্গা" নাম্নী আর একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বিনির্গতা হইয়া, মাহুতাপুরের নিকটে ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এখন গণনা করিয়া দেখিলে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, গৌড় বা মালদহ জেলায় গঙ্গা একটি বা দুটী নহে, চারিটী। বার মাস প্রবাহিতা প্রবল শাখাকেই সাধারণে "বড়গঙ্গা" বলে, অন্য তিনটীর নাম—যথাক্রমে 'পাগলা-গঙ্গা' 'তুলসী-গঙ্গা' 'ভাগীরথী'। ৩৫৩৬ বৎসর পূর্ব্বে এই পাগলা-গঙ্গাও বড়গঙ্গার ন্যায় বেগশালিনী ছিল। ইহার গতি এমনই পরিবর্ত্তনশীল ছিল যে, এক বর্ষাকালে নিত্য নবভাবে প্রবাহিত হইত। তজ্জন্যই সাধারণে ইহার 'পাগলা-গঙ্গা' আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। বোধ হয় এই কারণেই পাগলা-গঙ্গার উভয় তীরে এক মহদীপুর ব্যতীত আর একটীও গণ্ডগ্রাম বা বন্দর নাই; কেবলই বালুকাময় তীর-ভূমিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী বা টোলা† দৃষ্ট হয়। পরিবর্ত্তনশীল কালের নিয়মানুসারে পাগলা-গঙ্গার আর পাগলা প্রকৃতি নাই, এখন গৌড়-নগরীর ন্যায় ছদ্দশাগ্রস্ত হইয়া সাম্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। রাজমহল আর গৌড়-নগরী ন্যূনাধিক বার ক্রোশ ব্যবধান। এই বিস্তীর্ণ স্থান লইয়া গঙ্গাদেবী যে কত প্রকার খেলাই খেলিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আমরা সামান্য কয়েকটী বিবরণ মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। গৌড়-নগরের উত্তর প্রবাহিতা কালিন্দী নদীও রাজমহলের পরপারস্থিত মুখুরাপুর নীলকুঠীর অনতিদূরে বড়গঙ্গা হইতে নির্গতা হইয়া, পুরাতন মালদহ বা সর্ব্বরী নামক উপনগরী কিঞ্চিৎ পশ্চিমোত্তরে মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে, কালিন্দীও বর্ষার ৩ মাস মাত্র নাব্যা থাকে, আর ৯ মাস কেবল বালুকা-নিম্নত নির্ম্মলিরীর গতির দ্বারায় স্বীয় অস্তিত্বের পরিচয় দেয়।

মালদহের মধ্যে কেবল বড়গঙ্গা এবং মহানন্দাই প্রকৃত নদী ও নদ। আর আর গুলি উপনদী। মহানন্দার নাব্যাবস্থা এখনও তিরোহিত হয় নাই। রামপুর বোয়ালীয়া হইতে একখানি বাষ্পীয়-পোত বারমাস তথায় গমনাগমন করে; কিন্তু গ্রীষ্মকালে ছোট ষ্টীমার ভিন্ন বড় ষ্টীমার চলিতে পারে না।

এখন পাঠকবর্গ বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন, শ্রীশ বাবু গৌড়-নগরীর যে চতুঃসীমা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। প্রকৃত চতুঃসীমা এই:—উত্তরে কালিন্দী নদী, পূর্ব্বে মহানন্দা নদ, পশ্চিমে রুদ্ধ-স্রোতঃ ভাগীরথী এবং পাগলা-গঙ্গা,

† পাঁকাকে মালদহবাসীরা 'টোলা' বলে। টোলায় প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ মণ্ডল বিশেষের নামানুসারে টোলার নামকরণ হয়। কলিকাতার গলিগুলির নামকরণের সহিত এই টোলার নামকরণের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে।

দক্ষিণে 'জহরপুরের খাঁড়া' নামক দক্ষিণ-গড়ের পরিখা। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থান দীর্ঘ প্রস্থে ১২ ক্রোশ। এতবড় নগর বাঙ্গালায় আর একটীও ছিল না, লক্ষ্মণাবতী নাই ও ইহা কি গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর কম গৌরবের কথা?

তাহার পর প্রাচীন গৌড়-নগরীর চারিদ্বারে-স্থিতা চারিটী দেবী-মূর্ত্তির কথা।—শ্রীশ বাবু এ বিষয়ের কিছুই অনুসন্ধান করেন নাই। কেবল কাল্পনিক গল্প-প্রণেতা পদ্মগ্রামের মণ্ডল বিশেষের অট্টহাসি-মিশ্রিত আশ্চর্য্য আখ্যান শ্রবণ করিয়াই, তিনি দেবীমূর্ত্তি-চতুষ্টয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বার বাসিনী, শেখর বাসিনী, সম্বল বাসিনী, গৌড়েশ্বরী—এই চারি দেবী-মূর্ত্তির নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়-নগরীর কোন্ দ্বারে-কোন্ দেবীমূর্ত্তি অবস্থিত, তাহা তিনি লিখেন নাই। ইহাতেই তাঁহার লেখা যে অনুসন্ধান-বিবর্জ্জিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বোধ হয় 'দ্বার বাসিনী' এই নাম শ্রবণ করিয়াই শ্রীশ বাবু চারিদ্বারে চারিটী দেবী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উপাখ্যানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন; এবং হিন্দু পাঠকগণও তাহাতে কথাটী বিশ্বাস করে, তদুপযোগী একটী আখ্যানেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীশ বাবু যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিতেন,—'শেখর-বাসিনী' মূর্ত্তি গৌড়ে ছিল না, এখনও নাই। উক্ত দেবী-মূর্ত্তি বড়গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রাতক 'ফরোকার' মোহানার নিকটস্থ নিমতলা নীল-কুঠীর অনতিদূরে রাজমহলের পাহাড়-শ্রেণীর উপত্যকায় বিরাজমানা।

'দ্বার বাসিনী' মূর্ত্তিও সাহেবগঞ্জে নহে, তথা হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এই দ্বার বাসিনী এবং শেখর বাসিনীর অবস্থান দৃষ্টে আদি ভাগীরথী গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনের ইতিহাস বুঝিবার বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। সাধারণে বলে, "দ্বারবাসিনী আর শেখর-বাসিনী"* গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরে (সমসূত্রভাবে) বিরাজ করিয়া প্রমাণ করিতেছেন যে, গৌড়ের পূর্ণ উন্নতির সময় গঙ্গার পরিসর মাত্র ৩ ক্রোশ ছিল। কালে গঙ্গার বেগ হ্রাস হওয়ায় তাঁহার পরিসরও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে; এবং ভাগীরথী, পাগলা-গঙ্গা এই দুইটী 'ছাইড় সোঁতার' পরিত্যক্ত স্রোতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই কিম্বদন্তীর অযৌক্তিক অংশটুকু আদি গঙ্গার পরিসর বার ক্রোশ থাকা) বাদ দিলে, আমরা গঙ্গার পরিবর্ত্তনের যে ইতিহাস লিপি বদ্ধ করিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইবে।

'সম্বলবাসিনী' মূর্ত্তি কোথায়, তাহার কোন সংবাদ আমরা অবগত নহি। শ্রীশ বাবুর লেখার ভঙ্গি দেখিয়া বোধ হয়, ঐ মূর্ত্তি গৌড়ের পূর্ব্ব-দ্বারে আছে। আমরা কিন্তু গৌড়ের অবস্থাভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিবিশেষকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সম্বলবাসিনী মূর্ত্তি গৌড়ে নাই। এ বিষয় শ্রীশ বাবু আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

শেখরবাসিনী, সম্বলবাসিনী সম্বন্ধে শ্রীশ বাবু যেরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, গৌড়েশ্বরীর অবস্থান বিষয় বিশদরূপে লিখিতেও তিনি তদপেক্ষা গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন। গৌড়েশ্বরী মূর্ত্তি 'দখল দরজার' নিকটে থাকা, তাঁহাকে কে বলিল? এটীও তিনি 'সব জান্তা' গল্প-প্রণেতার মুখেই শুনিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। নতুবা তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ ভ্রম করিয়াছেন, এবং সাধারণের পাঠ্য ও আলোচ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি এইরূপ প্রমাণ-বিহীন কথা লিখিয়াছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে

* শেখর বাসিনী বিন্ধ্যবাসিনীর নামান্তর নহে। বিন্ধ্যবাসিনী মূর্ত্তি বেহারাঞ্চলে বিন্ধ্যগিরিতে আছে।

প্রস্তুত নহি। যেরূপ ভ্রম চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখান যায়, সেইরূপ ভ্রম শ্রীশ বাবুর প্রবন্ধে না থাকিলে, আমারও অন্ধকারাবৃত গৌড়ের ইতিহাসের ভ্রম-প্রদর্শন করিতে লেখনী ধারণ করিতাম না।

প্রাচীন কালসাট গ্রামের উত্তরে পরিখা-বেষ্টিত দক্ষিণ-গড়ের নিকটে গৌড়েশ্বরীর মূর্ত্তি ছিল। খৃষ্টীয় ১৮৪০।৪১ সাল হইতে ১৮৪৭।৪৮ সালের মধ্যে যখন গৌড়-নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ বড়গঙ্গা ও পাগলা-গঙ্গা কর্ত্তৃক ভগ্ন হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়েই গৌড়েশ্বরী-মূর্ত্তি গঙ্গার অতল-গর্ভে লীন হয়। কেহ উপযুক্ত রক্ষক বা ভক্ত না থাকায়, বা দেবী-মূর্ত্তি গঙ্গা-গর্ভে লীন হইবে, অন্ধ-বিশ্বাসী মালদহবাসী হিন্দুর মনে এরূপ আশঙ্কা না হওয়ায়, কেহই সে মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করে নাই, অথবা স্থানান্তরিত করিতে সাহসী হয় নাই। কোন এক কবি প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে ছুঁবিভাবে লিখিয়াছিলেন:—

"গড়ের অনতিদূরে মহাবৃক্ষ তলে,
মূর্ত্তিমতী গৌড়েশ্বরী ছিলেন কালীকা,
হইয়া মোক্ষদা দেবী সর্ব্বার্থসাধিকা,
গৌড়ের দুর্গতি দেখি আপন নয়নে,
অভিমানে বিল ঝাঁপ জাহ্নবী জীবনে!"

এখন আর মূর্ত্তিমতী গৌড়েশ্বরী গৌড়ে নাই। বর্ত্তমান দক্ষিণ-গড়ের অনতিদূরে একটী বৃক্ষমূলে দেবীর স্থান বা 'থান' * সংস্থাপিত

* প্রতিমূর্ত্তি-বিহীন যে স্থানে কোন দেব-দেবীর পূজা হয়, তাহাকেই মালদহ বাসীগণ 'থান' বলে। 'থান' শব্দ স্থানের অপভ্রংশ মাত্র। এই সকল স্থান বা 'থান' অনেক স্থানে বৃক্ষ-মূলে দৃষ্ট হয়। মালদহে বা গৌড়ে এইরূপ 'থান' বহুসংখ্যক আছে। বৃক্ষ বা তন্নিম্নস্থ বেদীকায় সিন্দুর-মণ্ডিত দেখিলেই বুঝা যায়,—এটী কোন দেবস্থান বা থান।

হইয়াছে। সকলে এই স্থানেই ভক্তিপূর্ব্বক পূজা দেয়। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের খরিদা জমিদারী সেরসাহাবাদ পরগণার সদর কাছারী কালনাট্যের শুভ পুণ্যাহের সময় সর্ব্বাগ্রে গৌড়েশ্বরীর ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে। দক্ষিণ গড় বা গৌড়েশ্বরীর 'থান' হইতে 'দখল দরজা' চারি ক্রোশ ব্যবধান। ইহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিবেন, শ্রীশ বাবু কিরূপ ভ্রমপূর্ণ বিবরণ লিখিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে,—১৮৪০।৪১ সাল হইতে ১৮৭৭।৭৮ সালের মধ্যে যে গঙ্গা গৌড়ের পশ্চিম-দক্ষিণাংশ উদরসাৎ করিয়াছিল, এটী কি আনুমানিক কথা, না ইহার কোন উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে? আমরা ক্রমে এ বিষয়ের যথাসম্ভব উত্তর প্রদান করিতেছি।—উমরপুর এবং মহদীপুরের পূর্ব্বেই পশ্চিম-গড়ের কতকাংশ দৃষ্ট হয়, তাহার দক্ষিণে অর্থাৎ গড়মহলীর দক্ষিণে আর গড়ের কোন চিহ্ন নাই। গড়মহলী বা উমরপুরের নিকটস্থ গড়ের সমসূত্রে বরাবর দক্ষিণ দিকে আসিলে, শ্যামপুর-বাজিতপুর নামক পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। গড়-মহলীর সমসূত্রে বাজিতপুর পল্লী হইতে দক্ষিণ-গড় প্রায় এক মাইল হইবে। এই এক মাইল স্থান মধ্যে বর্ত্তমান পাগলা-গঙ্গা, এবং তাহার উচ্চয় তীরস্থ গঙ্গাভরট (পয়স্থ) ভূমি। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, গৌড়-নগরী দীর্ঘ প্রস্থে সমান। তাহা হইলে বর্ত্তমান দক্ষিণ-গড় হইতে, পশ্চিমাভিমুখে প্রায় এক মাইল পরিমাণ স্থান গৌড়-নগরীর অন্তর্ভুক্ত না হইলে, দক্ষিণ-গড়ের দীর্ঘত্ব উত্তর ও পশ্চিমের সমান হয় না। বিশেষতঃ গড়মহলী হইতে বর্ত্তমান দক্ষিণ-গড় পর্য্যন্ত যে পশ্চিম-গড় তীর্য্যকভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও অসম্ভব। গড়মহলীর দক্ষিণে যখন আর পশ্চিম-গড় বর্ত্তমান নাই, তখন তাহা

গঙ্গা-গর্ভে লীন হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব। তবেই দেখা যাইতেছে, দক্ষিণ-পড় হইতে পশ্চিমে প্রায় এক মাইল, এবং বড়মহলী হইতে শ্যামপুর-বাজিতপুর পর্য্যন্ত সাড়ে-তিন ক্রোশ ভূমি গঙ্গা-গর্ভস্থ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ সময় এই ভূমি গঙ্গা-গর্ভস্থ হইয়াছে, এখন আমরা তদ্বিষয়ক প্রমাণ প্রদর্শন করিব। খৃষ্টীয় ১৮৫৭।৫৮ সালে ভাগলপুর এবং মালদহ জেলার রেভিনিউ সর্ভে জরিপ হয়। ১৮৫৮।৫৯ সালের অভিমত মালদহের ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাপে (মান-চিত্রে) আমরা দেখিতে পাই, বর্ত্তমান গৌড়-নগরীর মধ্যস্থিত ধোপ্‌ড়া নামক পল্লীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া, বিস্তৃত-কলেবরা বড়গঙ্গা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। এবং মহদীপুর, উমরপুর, গড়মহলী প্রভৃতি গ্রামগুলির কত-কাংশ উদরসাৎ করিয়া, নীলকুঠী-চাঁদনীর নিকট দিয়া প্রবল-স্রোতা পাগলা-গঙ্গাও এই ধোপ্‌ড়ার নিকটে আসিয়া বড়গঙ্গায় মিলিতা হইয়াছে। পূর্ব্বে পাড়ে ধোপ্‌ড়া, পশ্চিম পাড়ে ক্ষুদ্র তেলকুপী তখন বড় গঙ্গা পাগলা-গঙ্গার সঙ্গম-স্থান ছিল। ইহার পূর্ব্বে বা পরে বড়গঙ্গা আর কখনও এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হয় নাই।

যখন বড়গঙ্গা পশ্চিম-পার ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বে পারে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন পশ্চিম-পারে একটী ক্ষুদ্র-স্রোতা বা (সোঁতা) মাত্র ছিল। ৩৪।৩৫ বৎসর অতীত হইল, বড়গঙ্গা পুনরায় সেই ক্ষুদ্র-স্রোতা বা সোঁতা পথ বহিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্ব-পারের পরিত্যক্ত ধারা আবার পাগলা-গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়া ক্রমে বদ্ধ-স্রোতায় পরিণত হইয়াছে।

এক্ষণে গৌড়ের ধ্বংশস্থানে (গঙ্গা সিকস্তির পয়স্ত ভূমিতে) ললডুবরী, সাহারাজপুর, করলা-দিয়াড়া, শ্যামপুর-বাজিতপুর নামক কয়েকখানি ক্ষুদ্র মুসলমান পল্লী সংস্থাপিত হইয়াছে; এবং তাহার মধ্য ও নিকট দিয়া বদ্ধ-স্রোতা পাগলা-গঙ্গা অদৃষ্টনেমীর অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তন যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, আমরা বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ সেই সকল প্রাচীন বিজ্ঞ লোকের মুখে ভাগিরথী পুখানুপুঙ্খরূপে শ্রবণ করিয়াছি। গৌড়ের যে অংশ গঙ্গা সিকস্ত হইয়া পুনঃপ্রস্থ হইয়াছে ঐ অংশ সেরসাহাবাদ পরগণার অন্তর্ভুক্ত। উক্ত পরগণার পুরাতন এবং বর্ত্তমান মালিক-গণের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিবিধ কাগজ দৃষ্টে আমরা উপরিউক্ত বিষয়ের স্থির-সিদ্ধান্ত করিতে সাহসী হইয়াছি। শ্রীশ বাবুর সেরূপ কোন সুবিধা হয় নাই, বোধ হয় তিনি এতদূর সন্ধান করা আবশ্যকও বোধ করেন নাই, তজ্জন্যই অন্ধকারে ঢিল্ ছোড়ার ন্যায় তাড়াতাড়ি লেখনী চালনা করিয়াছেন।

বিষয়টী গুরুতর এবং বহু-বিস্তৃত। এক প্রবন্ধে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিলে, অনুসন্ধানে স্থান সংকুলান হইবে না। আমরা এই বিষয়ে অধিক আলোচনার চেষ্টা করিব।

শ্রীচন্দ্রমোহন সেন।

অনুসন্ধানী
কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
অষ্টম বর্ষ। ২৪এ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৭১। ৪৩শ সংখ্যা।

প্রণতি।

হে ওম্! হে অনন্ত! হে ভর্গ! হে বরেণ্য! হে সত্য! হে সনাতন! হে পূর্ণ! হে পর! হে নিত্য! হে নিরঞ্জন! হে ঈশ! হে ব্রহ্ম! তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার।

হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বময়! হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে সর্ব্বসান্নিধ্যভূত! তুমি জলস্থলমরুদ্ব্যোম সর্ব্বত্র, ওতপ্রোতভাবে, অন্তরে ও বাহিরে, সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে, ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে বিরাজ করিতেছ। হে বিভো! তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার।

হে আদি! হে অনাদি! হে নিত্যসত্তি! হে কালরূপ! হে সর্ব্বকালবিদ্যমান! তুমি আদিতে ও অন্তে, সৃষ্টিতে ও প্রলয়ে, ভূতে ও ভবিষ্যতে, জন্মে ও মরণে, বিচ্ছেদে ও মিলনে, সর্ব্বকালে বিরাজমান। যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বমাত্র ছিল না; যখন জলে ও স্থলে, পর্ব্বতে ও সুগরে, আঁধারে ও আলোকে, সর্ব্বত্র অভেদ-একাকার ভাব; তখন কেবল তুমিই — তোমার সেই মহামহিমাময় তোমাতেই—বিরাজমান ছিলে! হে প্রভো! তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার।

হে জন্ম! হে বিলয়! হে জনক! হে সংহারক! হে জন্মমৃত্যুকারিণ্, হে সংযোগবিয়োগিধান! তুমিই পিতা, তুমিই সংহর্ত্তা; তুমিই জননী, তুমিই সংহারিণী; তুমিই উৎপত্তি, তুমিই বিলয়; তুমিই সংযোগ, তুমিই বিয়োগ; তুমিই প্রাণ, তুমিই প্রাণাক্ষকারী তুমিই জীবন, তুমিই জীবনাপহারী; তুমিই জন্ম, তুমিই মৃত্যু; তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই মহেশ্বর; এ সংসার তোমাতেই উদ্ভূত হইয়াছে, আবার তোমাতেই বিলীন হইতে চলিয়াছে। হে ঈশ! তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার।

হে শান্তি! হে শান্তিময়! হে দয়িত! হে দয়াময়! হে দীনতারণ! হে পতিতপাবন! হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু! হে নরকান্তকারী নারায়ণ! তুমি রোগে ও শোকে, সুখে ও দুঃখে, বিপদে ও সম্পদে, সংসারে ও অরণ্যে, জরা ও যন্ত্রণায়, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়—কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি প্রবল, কি দুর্ব্বল, কি সিংহ, কি শৃগাল—সর্ব্বলোকে, সর্ব্বকালে, সম-নির্ব্বিশেষে, তোমার সেই অপার অনন্ত করুণাসাগরের সুশীতল অমৃতবারি পান করিতে দাও। হে মঙ্গলময়! হে শান্তি-নিলয়! তুমি এ অধম অকৃতিসন্তানের মঙ্গল-বিধান কর, তোমার চরণে কোটীকোটী নমস্কার।

নিলয়।

(১)

প্রমথিনীর প্রশান্ত-ক্রোড়ে তরঙ্গের তাণ্ডব-নৃত্য!—কে মনে করিয়াছিল, সে উদ্ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস আবার একদা শান্তি-সলিলে পরিণত হইবে? অম্বিরাম্বুসদের গম্ভীর বজ্র-নির্ঘোষে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইতেছিল; তখন কে মনে করিতে পারিয়াছিল, আবার সেই আকাশে সুবিমল শশধরের মৃদুহাসি প্রস্ফুটিত হইবে? শ্মশান-মৈকতে প্রাণ-পরিজনের চিতাভস্ম মাখিয়া, কে ভাবিয়াছিল—আবার এই সংসার-প্রলোভনায় বিভ্রান্ত হইতে হইবে? চির-বিড়ম্বিত হতাশ-হৃদয়ের সমাপ-বহ্নি, কে মনে করিয়াছিল—এমন দ্রবীভূত অশ্রু-নির্ঝরে নির্ব্বাপিত হইবে?

জীবন-পথে শত অন্তরায়! কোথাও তীক্ষ্ণ-ধার-কণ্টকের বিস্তৃত-স্তূপ; কোথাও অভ্রভেদী-পর্ব্বতমালার বিশাল প্রাচীর; কোথাও অনন্ত-প্রসারিত মহাসমুদ্রের বিভীষিকাময় তরঙ্গোচ্ছ্বাস; কোথাও দুর্দ্দিগন্ত-প্রসারী, অনল-উদ্গারী মরুভূমির দুরধিগম্য প্রান্তর; কোথাও আবার বনাভ্যন্তরীণ সিংহ-শার্দ্দূলের বিকট হুঙ্কার! জীবন-পথে শত অন্তরায়! আমি কোন্ পথে যাই?

আবার অন্যদিকে শত প্রলোভন! চঞ্চল নয়ন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য-সুধা অঙ্গেঙ্গে আস্বাদিতে! শ্রুতি, বীণা-বিনিন্দিত প্রণয়-মধুর প্রিয়সম্ভাষণ-লাভে আকুলিত! নাসিকা, মনোমদ সুরভি-সুখভোগে আগ্রহ-মানসে উদ্গ্রীব! জিহ্বা, সুমিষ্ট-সুরভি সুরাসাস্বাদনে অগ্রসর! ত্বক, প্রিয়স্পর্শ-লাভে সদা আকুঞ্চিত প্রসারিত! জীবন-পথে শত প্রলোভন! আমি কোন্ পথে যাই?

কত দেখিলাম!—জননী-জঠর পার হইয়া সূতিকা-গৃহে প্রবেশের পর হইতে এ জীবনে, কত দেখিলাম! দেখিতে দেখিতে প্রস্ফুটিত-নয়ন আবার মুদিত হইতে চলিল; কিন্তু আজিও ত দেখার অবসান হইল না!—এ জীবনে আমার দর্শন-পিপাসা মিটিল না ত! আমি নিরুপম নিকুঞ্জকাননের 'শত-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছি; আমি প্রকৃতির বিনোদবল্লরী দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি; আমি কামিনীর কমনীয় বদন-সুধাকরের অনিন্দ্য-কান্তি দেখিতে দেখিতে বিমানবিহারী চাতকের ন্যায় আত্মহারা হইয়াছি; সুমুদ্রের সুধাধবলিত সৌধরাজি, দরিদ্রের শতছিদ্র পর্ণকুটীর, প্রশয়োন্মাদের সম্বরণ-তিত প্রমোদকানন— আমি কত কত দেখিয়াছি; আবার হিমগিরি-গহ্বরে যোগমগ্ন যোগীর তুষারাচ্ছন্ন শ্বেতপ্রস্তরমূর্ত্তি—হৃদয়দর্পণে সে মূর্ত্তিও সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু কেন? —কেহ বলিতে পার কি?—আমার দর্শন-পিপাসা তবু মিটিল না কেন? আমার শ্রুতি—এ জীবনে তাহাতে কত সুস্বর-সুধা ঢালিয়াছি; মৃদঙ্গ-মন্দিরার মনোমদ মোহন ধ্বনি, বীণা-বেণু-সারঙ্গ-সপ্তস্বরার সমবেত সুস্বরলহরী—তবুকে তবুকে স্তূপে স্তূপে কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিয়াছি; আবার কলকণ্ঠ কোকিলবধূর কুহরণ-কাকলী, কিম্বা বিহগ-বীণা-বিনিন্দিত বামাকণ্ঠের সুধা-স্বরতরঙ্গ—আমার শ্রুতি সে সকল সুধাই অনুভব করিয়াছে। তবু কেন?—কেহ বুঝাইয়া দিতে পার কি?—আমার শ্রবণ-পিপাসা মিটিল না কেন? আসন্ন-শয্যাশায়ী অশীতিপর বৃদ্ধ—জীবন-নাট্যের যবনিকা-প্রান্তে অন্তর্জ্জলীর পুতক্রোড়ে শায়িত—তাহারও মনে কেন আশার অতৃপ্ত উচ্ছ্বাস উছলিয়া উঠে?

কিন্তু, কোথায় সেই কাল-তরঙ্গের অনন্ত-প্রসারী করাল গ্রাস, আর কোথায় এই বিশ্ব-ব্যাপী-ক্রোড়ে ক্ষুদ্র প্রাণীবুদ্বুদ! কোথায় সেই গগনা-গতি-বিনিন্দ্য অনন্তস্থায়ী কাল-গতি, আর কোথায় এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের নিমেষ-সীমান্ত বর্ষকণিকা! কোথায় সেই বহুযোজন-বিস্তৃত সাহারা-মরুভূমির বালুকাস্তূপ, আর কোথায় এই অতি-ক্ষুদ্র বালু-কণাভ্যন্তরীণ মানবের আশা-তৃষ্ণা! একদিকে দিগন্তবিস্তৃত অভ্রস্পর্শী নগররাজের বিপুল ছায়া, অন্যদিকে সূচীভেদ্য সামান্য ছিদ্র। একদিকে উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবতের বিরি-গহ্বর উৎপাটন, অন্যদিকে দুর্নিরীক্ষ্য কীটাণুর ক্ষুদ্র আস্ফালন!

প্রবলের নিকট দুর্ব্বল পরাভূত! প্রবল-মহাবলের নিকট অবনত! আবার মহাবল, অনন্তবলের কুক্ষিগত! সেই ক্ষণজন্মা মহা-পুরুষ—বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ন—যাঁহার বীর্য্যদর্পে সসাগরা পৃথিবী কম্পান্বিত হইত, সামান্য চোরের ন্যায়—নরহন্তা বন্দীর মত, সমুদ্র-বেষ্টিত 'সেণ্টহেলেনায়' নিভৃত-নির্জ্জনে তাঁহার মৃত্যুর কথা—স্মরণ করিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়! আবার গ্রীসের অভ্যুত্থান-সময়ে বীর্য্যবান্ লিওনিদ্‌সকে দেখিয়া, গ্রীসের অভাবনীয় অধঃ-পতনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে, কার না অশ্রু অনিবার্য্য হয়! আবার আর্য্যগৌরবের লীলা-নিকেতন— বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, গার্গ্য, পুলস্ত প্রভৃতি ঋষি-মহর্ষির আশ্রম-স্থান —কুরুক্ষেত্রের ক্ষত্রিয়-বীর্য্য অবলোকন করিয়া, কে মনে করিতে পারে যে—সেই জয়গান-বিঘোষিত ভূরত, এই শৃগাল-গৃধিণীর লীলাস্থল শ্মশানে পরিণত! এইরূপ, অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে—একের উপর অন্যের আধিপত্য—প্রবলের উপর মহাবলের আতিশয্য —মহাবল অনন্তবলের অধিগত।

কিন্তু কি সে অনন্তবল? সে বল কি—যে বলের আতিশয্যে প্রবল-দুর্ব্বল সকল বলের পরাগতি! বীরদর্প নতশির, পদ-সম্পদ অকিঞ্চিৎকর, কোলাহল-কল্লোলের সাম্যভাব —কি সে অমূল্য সামগ্রী—প্রতিযোগিতায় যাহার এত সামর্থ্য প্রদর্শিত!

সৃষ্টির আদিকালে—চরাচর-স্থাবরজঙ্গমাত্মক ধরয়িত্রীর জন্মসময়ে, একবার মনে কর দেখি, এই বিশ্বের কোন্ মূর্ত্তি ছিল? তখন অন্তরীক্ষে ও ধরণী-পৃষ্ঠে, অনলে ও অনিলে, বারিধে ও মেঘে, সাগরে ও কন্দরে, গোলকে ও ভূলোকে —সর্ব্বত্র আভঙ্গ, মূলত একত্র রক্ষণও একাকার! তখন হিমাচল কি ভারতনুদর, সিন্ধুনদ কি ইন্দ্রপ্রস্থ, শিবজীর কি সেতেরের—এ জগতে কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তখন মনুষ্য ছিল না, তখন পশুপক্ষী ছিল না, তখন প্রাসাদ-কুটীর ছিল না, তখন আনন্দ-উদ্বেগ ছিল না, তখন বল-বীর্য্য বা ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব ছিল না। ছিল—ছিল কেবল—মনঃকল্পিত কালরূপী এক অনন্ত জ্ঞানন্ত্য; আর ছিল—সেই অনন্তের মধ্যে সুভীর অতিগভীর নীরবতা। তাহাই জনক, তাহাই জননী; তাহাই প্রকৃতি, তাহাই পুরুষ; তাহাই, এই ভূতধাত্রী ধরয়িত্রীর প্রসবিত্রী, তাহাই, এই সংসার-সমাজের আদিভূত।

দেখ, এখনও জগতে তদাধিক্য! কত কাল গত হইল এই পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে, কত যুগযুগান্তের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ইহার উপর

দিয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু দেখ—এখনও সে দুঃখের পূর্ণপ্রতাপ—এখনও তাহাদের প্রবল আধিপত্য। দেখ—নীরবতা—চারিদিক নীরবতাময় — জগৎ এখনও সেই নীরবতাক্রোড়ে নিদ্রিত। তোমার এ ক্ষুদ্র পৃথিবীর কোলাহল—সে অনন্ত নীরবতা ভঙ্গ করিবে, সাধ্য কি? সে অনন্ত নীরবতার তুলনায়, এ কোলাহল—মহাসাগরে বারিবিন্দু — তাও যেন নয়! শিশু, সহস্র বলশালী হইলেও, জননজননীর নিকট শিশু বই আর কিছুই নয়! কিন্তু সে তুলনায়, পৃথিবী এখন ভক্ত-শোনিত! ভক্ত-শোনিতের সাধ্য কি, জননীর প্রতিযোগী হয়? কাজেই নীরবতায় জগৎ পরিপূর্ণ—পৃথিবী অনন্ত নীরবতাময়। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডও সেই অনন্ততার দিকে প্রধাবিত।

বৃন্তস্খলিত ফল আপনিই অধঃগামী; ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত ইষ্টক, কোন্ অলক্ষ্য আকর্ষণে নিম্ন ভিমুখীন্। সে বল তুলনায় অতিসামান্য—যাহা ইষ্টকের ঊর্দ্ধোত্থান সঁচিত করে; সে বৃত্তধারণ অতি ক্ষণস্থায়ী—যাহা ফলের শূন্যব্যস্থান অবধারণ করে। মহাসতি নিষ্টুনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের আলোচনায়, এই যুক্তিটি সুন্দর প্রতিপাদিত। ক্ষুদ্র বৃহতের দিকে আকর্ষিত—বড় মহান্ সুন্দর সত্য!

ভাব দেখি—কেমন ধীর-নীরবে সে আকর্ষণক্রিয়া পরিসূচিত! নয়নের গোচরীভূত নহে—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করাও সম্ভবাতীত; কিন্তু, কেমন স্থাবর-জঙ্গম কীটপতঙ্গ জড়-অজড় সর্ব্বত্র তাহা প্রতিফলিত! কে আকর্ষক, কে আকর্ষণ করে, দেখিবার উপায় নাই, বুঝিবার সামর্থ্য নাই, অথচ কেমন নীরবে!

কেমন নীরবে!—কে যেন নীরবতার দিকে সদা আকর্ষণ করে! দৃষ্টির অন্তরালে, ধীরে—অতি ধীরে, কে যেন আপনার অলক্ষ্য বিশাল বাহু বিস্তার করিয়া, নীরবতার ক্রোড়ে টানিয়া লইতে চায়। তাই দেখি—তরঙ্গিণীর উদ্ভাস্য-উচ্ছ্বাস শান্তিসলিলে পরিণত! তাই দেখি—জীবন্তিড়া সলিল-পৃষ্ঠে বুদ্বুদের নৃত্যমাত্র! কাল—কালসাগরে—নীরব—নীরবতার দিকে বিশ্ব বিলীন হইতে চলিয়াছে। নিলয় — নিলয়ন জগতের প্রকৃতি-জাত।

শ্রীশশধর কাব্যতীর্থ।

'উমিচাঁদের দলিল জাল!'

একদিকে বাঙ্গালার সিংহাসন হইতে ধীরে ধীরে সিরাজের পদস্খলন হইতেছে; অন্যদিকে ক্লাইবের কুটীল চক্র, অলক্ষিতে, বাঙ্গালায় ব্রিটীশ-প্রাধান্য-স্থাপনে চেষ্টা পাইতেছে। এই সময় উমিচাঁদ নামক একজন শিখ-বণিকের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের পরিচয় হয়। সেই হইতেই উমিচাঁদ, উমিচাঁদ নামে অভিহিত।

উমিচাঁদ তখন একজন বিখ্যাত ধনশালী বণিক। বাঙ্গালা ও বিহারের প্রায় সকল স্থানেই তাঁহার বাণিজ্য-ব্যবসায় বিস্তৃত। অধিকাংশ পণ্যদ্রব্যের সরবরাহে ইংরাজ-বণিকগণ তখন তাঁহার মুখাপেক্ষী। কলিকাতায় ও মুর্শিদাবাদে উমিচাঁদের বৃহৎ অট্টালিকা-ভবন; তাঁহার দাসদাসীতে পরিপূর্ণ; বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী সৈন্য, তাঁহার প্রহরী-কার্য্যে নিয়োজিত।

উমিচাঁদ তখন রাজারাজড়া অপেক্ষাও কোন অংশে ন্যূন নহেন; উমিচাঁদ ক্রোড়পতি।

যখন নবাব আলীবর্দ্দি বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন হইতেই নবাব-সংসারে উমিচাঁদের প্রতিপত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। নবাবের উক্ত-কর্ম্মচারীমাত্রেই তাঁহার নিকট উপকৃত ও তাঁহার অনুগত ছিলেন, এদিকে ব্যবসায়-সূত্রে ইংরাজদিগের সহিতও উমিচাঁদের সম্বন্ধ। সুতরাং উমিচাঁদের দ্বারা নবাব-সরকার হইতে ইংরাজেরা অনেকাংশে সুবিধা-সুযোগ উপভোগ করিতে লাগিলেন। নবাবের সহিত কোনরূপ বিবাদ বাধিলে, উমিচাঁদ, মধ্যস্থ থাকিয়া, তাহা মিটাইয়া দিতেন; সঙ্গে সঙ্গে, বণিক ইংরাজ, বাণিজ্যের সহিত রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সূক্ষ্ম সূত্র প্রাপ্ত হইতেন।

আলীবর্দ্দির মৃত্যুর পর * একদিকে সিরাজ বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিলেন, অন্য দিকে ঢাকার নবাব নওয়াজিস মহম্মদের বিধবা পত্নী স্বীয় পোষ্যপুত্রের† জন্য সিংহাসনের দাবী করিলেন। ঢাকা হইতে নবাব-দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের পুত্র কুমার কৃষ্ণদাস, বহু ধনরত্ন হইয়া, কলিকাতায় ইংরাজদিগের আশ্রয়-প্রার্থী হইলেন। উমিচাঁদ, ইংরাজের পক্ষ হইয়া, ইংরাজের অনুরোধ-রক্ষা ও সহায়তার জন্য, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেন। এই ঘটনায় নবাবের নিকট ইংরাজের নির্দ্দোষ-প্রমাণের চেষ্টা এবং উমিচাঁদের স্বীয় স্কন্ধে সে দোষভার-বহনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

তৎপরে, নবাব, ধনরত্নসহ কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইবার জন্য, কলিকাতায় 'ইংরাজ-সমীপে একজন দূত * প্রেরণ করেন। উমিচাঁদ, দূতের সম্বর্দ্ধনা করিয়া, তাঁহার প্রতি সুব্যবহারের জন্য, ইংরাজদিগকে পরামর্শ দেন। কিন্তু ইংরেজেরা তখন সন্দিগ্ধচিত্ত—টাকার, নবাবের পোষ্যপুত্র বুঝি সিংহাসনের অধিকার লাভ করেন! † এই উপলক্ষে, দূতকে যৎপরোনাস্তি অপমানের সহিত বিদায় দেওয়া হয়। ইংরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী উমিচাঁদের সুপরামর্শ গৃহীত হয় না।

দূতের প্রতি দুর্ব্যবহারে, নবাবের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল; নবাব, কলিকাতা-আক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে দূতের সম্বর্দ্ধনা করায়, উমিচাঁদের প্রতি ইংরাজের দারুণ সন্দেহ জন্মিল। উমিচাঁদই এই অনর্থের মূল মনে করিয়া, ইংরাজেরা উমিচাঁদকে জব্দ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। উমিচাঁদ, কৌশলে ইংরাজ-দুর্গে বন্দীভাবে রহিলেন। * *

* ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল নবাব আলীবর্দ্দির মৃত্যু হয়।

† এই পোষ্যপুত্রের নাম মুরাদউদ্দৌলা। মুরাদ, সিরাজউদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

* এই দূত নবাবের চর-বিভাগের অধ্যক্ষ রামরায় সিংহের জ্ঞাতা।

† কারণ, তৎপক্ষে রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের বনিকট যুদ্ধার্থ অবস্থান করিতেছিলেন।

* * এই সূত্রে উমিচাঁদকে, কৌশলে বন্দী করা হয়। ইংরাজ-সৈন্য তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করে। তাঁহার শ্যালক বাঙ্গীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন; তিনি অন্তঃপুরে লুক্কায়িত হন। অবশেষে, ইংরাজেরা বাড়ী লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইলে, উমিচাঁদের বাটীরক্ষক তিন শত সৈন্য ইংরাজদিগকে বাধা দিয়া পরাস্ত হয়। এই সময় অন্তঃপুরে এক লোমহর্ষণ ঘটনার অভিনয় হইয়াছিল। প্রভুপরিবার পাছে ইংরাজ হস্তে অপমানিত হন—এই আশঙ্কায়, উমিচাঁদের একজন সর্দ্দার, অন্তঃপুরে অগ্নি প্রদান করে, এবং ১৩টি পুরমহিলার প্রাণবধ করিয়া এ লোমহর্ষণ ব্যাপারের পরিসমাপ্তি করে। এই উপলক্ষে উমিচাঁদের ধনাগার ও বাটী লুণ্ঠন করিয়া, ইংরাজেরা প্রচুর মুদ্রা ও বহুল মণিমাণিক্যাদি অপহরণ করেন।

অপরদিকে, নবাব-সৈন্য কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদুর্গ আক্রমণ করিল। ইংরাজ বিপদ গণিলেন। তখনীয় শাসনকর্ত্তা রাজা মাণিকচাঁদ নবাবের একদল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। উমিচাঁদের সহিত তাঁহার বহুদিনের বন্ধুত্ব। সুতরাং এই সুযোগে, ইংরাজ, যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া ইংরাজের প্রাণ-পরিজন বাঁচাইবার জন্য, উমিচাঁদকে দিয়া মাণিকচাঁদের নামে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। নবাবের দেওয়ান রায় দুর্ল্লভের নামেও আর একখানি অনুরোধ-পত্র ঐরূপভাবে লিখিয়া লওয়া হইল। বন্দী উমিচাঁদ, সরল বিশ্বাসে ইংরাজের এই মহদুপকার করিলেন।

উমিচাঁদের অনুরোধে, ইংরাজদিগের মুক্তি-ঘোষণা করিয়া, নবাবসৈন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিল। কিন্তু, মধ্য হইতে, কলিকাতা-আক্রমণের সময়, উমিচাঁদের বাটী নবাব-সৈন্য কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া গেল। * উমিচাঁদ ইংরাজ-দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন; সুতরাং তখন ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। পরে যখন জানিতে পারিয়াছিলেন, তখন আবার, ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রথম লুণ্ঠনের সন্দেহ না করিয়াই, সন্তুষ্টতঃ, নবাব-সৈন্যের উপরই সমস্ত অনর্থের আরোপ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, এই সময়, নিঃস্ব ইংরাজদিগের অর্থাভাবজনিত দারুণ দুরবস্থা দর্শন করিয়া, নিজের অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল—তাহার অধিকাংশই ইংরাজদিগকে প্রদান করিয়া, তাঁহাদের দুঃখমোচন করেন।

ইহার পর, মন্ত্র নামক নবাবের একজন পারিষদের সহায়তায়, উমিচাঁদ, নবাবের প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠেন; এবং নবাব কর্ত্তৃক ইংরাজ-পক্ষের আর কোন অনিষ্ট না হয়, তৎপ্রতি সর্ব্বদা যত্নবান থাকেন। আরও, তিনি মধ্যস্থ হইয়া, এই সময় ইংরাজদের সহিত নবাবকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন।* অধিক কি, নবাবের একপ সন্তোষবিধান করিতে সমর্থ হন যে, নবাব, ইংরাজদিগকে 'খিলাৎ' পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইংরাজদিগের প্রতি নবাবের এইরূপ বিশ্বাস-স্থাপনের জন্য, উমিচাঁদ নবাব-সমক্ষে ব্রাহ্মণস্পর্শে প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন যে,—'ইংরাজেরা কখনই সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিবেন না—তাঁহাদের সত্যবাদিতা অটল, ইত্যাদি।'

কিন্তু ইংরাজে-নবাবে বিবাদ অনিবার্য্য হইল। নবাবকে স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া, ক্রমশঃ বলবৃদ্ধি হইলে, ইংরাজেরা সন্ধিসূত্র অমান্য করিলেন। বিবাদ বাধিয়া উঠিল।

উমিচাঁদ, এখনও ইংরাজদিগের সমান সহায়তা করিতে লাগিলেন। ইংরাজ, নবাব-সংসারের সমস্ত গূঢ় সন্ধান উমিচাঁদের নিকট পাইতে লাগিলেন। * প্রধান সেনাপতি মিরজাফর নবাবের আচরণে বিরক্ত—সে সংবাদ ক্লাইবের নিকট পৌঁছিল; লক্তি নামক অপর একজন সেনাপতি ইংরাজদের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন; ভিতরে ভিতরে নবাবকে রাজ্যভ্রষ্ট করার আরও কত ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। ওয়াট্‌সন্ সাহেব সিরাজের পরিবর্ত্তে মিরজাফরকেই নবাব করিয়া দিবেন বলিয়া, আশা দিলেন; এদিকে আবার লক্তি ও উমিচাঁদকে জানান হইল—উমিচাঁদের অভিপ্রায় মত লক্তিকেই নবাব-পদে স্থাপিত করা হইবে।

উমিচাঁদের প্রাণ আশার লহরে নৃত্য করিতে লাগিল। তাঁহার আয়ত্তাধীন লক্তি নবাব হইলে, তাঁহার আর কিসের ভাবনা? তিনি, মনে মনে কালনিমির লঙ্কাভাগ করিয়া, ইংরাজদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন—'নবাবের কোষাগার হইতে লুণ্ঠিত মণিমাণিক্যের চতুর্থাংশ এবং নগদ শতকরা ৫ টাকা হিসাবে তাঁহাকে দিতে হইবে।' এই সঙ্গে, তিনি, ইংরাজদিগকে একটু ভয়-প্রদর্শনও করিলেন—'যদি এই সর্ত্তে তাঁহারা অসম্মত হন, তবে নবাবের নিকট সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া দিবেন।'

এ পর্য্যন্ত উমিচাঁদ ইংরাজদিগকে অকপটে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু ইংরাজগণ, কার্য্যোদ্ধার করিয়া লওয়া ব্যতীত, তাঁহার উপর আদৌ বিশ্বাস-স্থাপন করেন নাই। এক্ষণে, তাঁহারা পূর্ণরূপে উমিচাঁদকে অবিশ্বাস করিলেন। অতঃপর, উমিচাঁদ যাহাতে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসেন—তাহার ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। ক্লাইবের চক্রান্ত-অনুসারে, ওয়াটসন, উমিচাঁদকে জানাইলেন—"স্বীকার আপনার ভাবনা নাই। নূতন বন্দোবস্তে আপনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন। কিন্তু আসুন, অগ্রে প্রাণ বাঁচাইবার উপায় করা যাউক। এখন কলিকাতায় প্রস্থান না করিলে নবাবের রোষানলে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা।" উমিচাঁদ, অকপটে তাহাই বুঝিলেন; উল্লাসে, উদ্বেগে, নবাবের নিকট আপনার প্রাপ্য প্রায় ৮৷৷০ লক্ষ টাকা * উপেক্ষা করিয়া, তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

এইবার ক্লাইবের কূট ষড়যন্ত্র! উমিচাঁদকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য, ক্লাইব, তাঁহার সহিত এক চুক্তিপত্রের চাতুরী খেলিলেন। বন্দোবস্ত হইল, উমিচাঁদকে ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইবে; অথচ, ক্লাইবের মনে মনে রহিল—তাঁহাকে ফাঁকি দিতে হইবে। তজ্জন্য, দুইখানি দলিল প্রস্তুত করা হইল। মিরজাফরের সহিত তাঁহাদের যে সর্ত্ত, একখানিতে তাহাই রহিল; এবং অপরখানিতে উমিচাঁদের উপর প্রতারণার জাল বিস্তার করা হইল। আসল দলিলখানি হইল—সাদা কাগজে; নকল—লাল রঙ্গীণে। রঙ্গীণ দলিলে ওয়াটসনের নাম জাল-সহি করাইয়া, ক্লাইব, তাহা উমিচাঁদকে প্রদান করিলেন। উমিচাঁদ, কিন্তু তখনও বিশ্বাসের অটল চূড়ায় অবস্থিত। ওয়াটসন্ ও ক্লাইবের সহি দেখিয়া, তিনি সন্ধিপত্র গ্রহণ করিলেন, এবং বিহিতবিধানে ইংরাজের হিতানুষ্ঠানে নিয়োজিত হইলেন।

যথাসময়ে পলাশী-প্রাঙ্গণে সিরাজের ভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেন; ইংরাজের সৌভাগ্য-আকাশে ধ্রুবতারা উদিত হইল। এইবার উমিচাঁদ মনে করিলেন, আবার তাঁহার ভাগ্যগগণে সুপ্রভাত হইল! তিনি রাজ-রাজেশ্বরের অবস্থা হইতে পথের ভিখারী হইয়া-

* এ লুণ্ঠনে প্রায় ৪লক্ষ মুদ্রা ও বহুমূল্য মণিমুক্তাদি উমিচাঁদের বাটী হইতে অপহৃত হয়।

* ১৮৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী এই সান্ধিপত্র প্রস্তুত হয়। উমিচাঁদ ও রণাজং রায় ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

† ইংরাজেরা সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া, চন্দননগর অধিকার করিতে অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া, নবাব, আবার তাঁহাদিগের বিপক্ষে সৈন্য পাঠাইলে, উমিচাঁদ, এইরূপে নবাব-সৈন্যগণকে ফিরাইয়া লন। কিন্তু ইংরাজেরা উমিচাঁদের সে সম্মান রক্ষা করেন নাই; তাঁহারা চন্দননগর আক্রমণ করিয়াছিলেন।

* ইহার ৪ লক্ষ টাকা—যাহা নবাব-সৈন্যেরা উমিচাঁদের বাটী হইতে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিল, এবং বক্তি ৪৷৷০ লক্ষ টাকা—যাহা বর্দ্ধমানের রাজাকে তিনি ধার দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইংরাজের নিকট অধিক পাইবার লোভ সম্বরণ করিয়া আর দুইচারি দিন সেখানে থাকিতে পারিলেই, ঐ টাকা তাঁহার পাওয়ার সম্ভব ছিল।

ছিলেন, এখন আবার তাঁহার সেই পদস্পন্দ পুনঃপ্রপ্ত হইবেন—অন্তরে আনন্দ ধরে না। তিনি আহ্লাদে গদগদ হইয়া, সন্ধি-পত্রহস্তে, ইংরাজের দ্বারস্থ হইলেন। মনে আনন্দ ধরে না—আশা অনন্ত!

কিন্তু একি? বিনামেঘে বজ্রপাত! ক্রুর-মতি ক্লাইবের ষড়যন্ত্র-প্রণোদিত চতুর ক্যুফিটন্ বলিয়া উঠিলেন,—"উমিচাঁদের দলিল জাল!"

উমিচাঁদ নিস্পন্দ—নীরব! জড়পিণ্ডবৎ সংজ্ঞা-হীন ভূতলে নিপতিত হইলেন। আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না; তাঁহার ভৃত্যগণ তাঁহাকে শূন্যে শূন্যে উত্তোলন করিয়া বাড়ী লইয়া গেল।

উমিচাঁদের সে মোহ আর ভাঙ্গিল না; হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি ভেদ করিয়া যে শেল বিদ্ধ হইল, তাহা আর অপসৃত হইল না। বিষাদে, ক্ষোভে, শোকে, নিরাশে, উমিচাঁদ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। প্রতি পলে পদস্খলন, নয়নে অশ্রু-স্পন্দন, হৃদয়ে গাঢ়শ্বাস, স্বরে ইংরাজের বিভী-ষিকাময়ী মূর্ত্তি, বদনে—"উমিচাঁদের দলিল জাল!"

বৃদ্ধ উমিচাঁদ এইরূপেই জীবলীলা শেষ করিলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দেরএই ডিসেম্বর উমিচাঁদের মৃত্যু হয়।

শ্রীমোহিতগোপাল লাহিড়ী।

বিপ্লব।

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যূষে একটী বালিকা দীঘির ধারে ফুল তুলিতেছিল।

বালিকা পূরমা সুন্দরী। বয়স ১৩।১৪ বৎ-সর হইবে—যৌবনের প্রারম্ভকাল। চঞ্চল নয়ন, আলুলায়িত কেশগুলি, পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করিয়া, হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

বালিকা আপন মনে ফুল তুলিতেছে; এমন সময়, তাহার জজ্ঞাতসারে, একটী যুবক পশ্চাৎ হইতে তাহার চক্ষুদ্বয় চাপিয়া ধরিল।

"কিরণ! আর কেন ভাই?—চিনেছি!"

"চিন্‌তে তো পারলে না, মৃণাল!" যুবক, হাসিতে হাসিতে তাহার চোখ ছাড়িয়া দিল।

মৃণালবালা ব্যস্তসমস্ত হইয়া মস্তকে কাপড় দিল। মৃদুস্বরে লজ্জাবনত মুখে বলিল, —"আপনি সরে যান।"

"কেন?"

"কেউ দেখতে পাবে।"

"পেলেই বা?"

"তবে আমি যাই।"

মৃণাল, দুই এক পদ অগ্রসর হইবার চেষ্টা পাইল। যুবক অমনি হাত ধরিয়া ফেলিলেন; বলিলেন,—"মৃণাল! আমি দস্যু কি চোর নই। চিরকাল একত্রে ব'সে গল্প করেছি, রূপ কথা শুনেছি; আকাশের তারা গুণেছি, জলে সাঁতার দিয়েছি, গাছ থেকে ফুল পেড়ে খেলা করেছি; আর আজ তুমি আমায় দেখে পালাচ্ছ কেন? লোকে দেখবে? দেখে, দেখুক; তাতেই বা কি? তবে বুঝি তুমি আমায় ভাল বাস্‌না?"

মৃণাল ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"আমি কি তাই বল্‌ছি?"

"তবে যেতে বল্‌ছ কেন?"

"লোকে দেখ্‌লে লজ্জা পাবে!"

"কেন লজ্জা পাবে, মৃণাল?"

"কেন লজ্জা পাব? আচ্ছা, আপনি তবে আর আমাদের বাড়ী যান না কেন? ছেলে-বেলার মত ফুলের মালা গেঁথে, হাতে করে এনে, আমার গলায় পড়িয়ে দিতে পারেন না কেন?"

"কেন যাইনে—কেন পারিনে, তাকি তুমি জান না? যেদিন থেকে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, সেইদিন থেকেই আমি যাই-নে! অথচ, তোমায় না-দেখেও থাকতে পারিনে, তাই তোমায় দেখ্‌বার জন্য, প্রত্যহ এই দীঘির ধারে আসি।"

"আমিও কি আপনাকে না দেখে থাকতে পারি? না দুই একবার দেখে তৃপ্তি হয়! তবে যে পালাতে চাই, কেবল লজ্জায়। আচ্ছা, ও কথাটা কি সত্যি?"

"কোন্ কথাটা?"

"ওই যে বল্‌লেম?"

"কি বল্‌লেম?"

"আপনার সঙ্গে আমার বের সম্বন্ধ হচ্ছে!"

"আমার মা ও তোমার মা দু'জনেই সম্মত হয়েছেন। দাদাকে টাকায় পত্র লেখা হয়েছে। তাঁর অনুমতি এলেই বিয়ের আশীর্ব্বাদ হ'বে।"

"যদি তাঁর অমত হয়?"

"তা হ'লে হবে না!"

"তা হলেই—"

"তা হলে কি?"

"তা হলে—"

"তা হলে কি, বল?"

"জন্মের মত গিয়েছি।"

বালিকার চক্ষু অশ্রুভারাবনত হইল। যুবক হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"না মৃণাল, যদিই দাদা—দাদা কেন, সমস্ত জগৎ একদিকে হইলেও, তোমার সহিত আমার বিবাহ রহিত হ'বে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—প্রাণ পরি-ত্যাগ করিব, তথাপি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

এই সময় মৃণালবালার সই কিরণমালা দীঘির ধারে ফুল তুলিতে আসিতেছিল। বৃক্ষের পার্শ্ব দিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া, মৃণাল বলিল, —"আপনি সরে যান! ঐ দেখুন, সই আস্‌ছে।"

"যাই, কিন্তু আবার যেন দেখা পাই।"

যুবক প্রস্থান করিলেন।

"বেস, বেসজই, হচ্ছে ভাল!" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে কিরণমালা আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃণালবালা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, —"মরণ আর কি!"

কিরণমালা, ফুল হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—

"কবরী বাঁধিয়া দিব, মনো মত সাজাইব,
বনফুল খুঁজে দেব তায়।"

মৃণালবালা কহিল,—"আঃ মরণ!—আমার কি হয়েছে?"

কিরণমালা কহিল,—

"মৃণাল-বলয় দিব, ফুলসাজে সাজাইব,
মনচোরা পড়িবে লো ধরা।"

মৃণাল জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন ক'রে?"

কিরণমালা কহিল,—

"মূলমন্ত্র শিখাইব, প্রেম-ডোরে বাঁধি দিব,
আর না পলায়ে কভু যায়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ত্রিগুণা সুন্দরীর বাড়ীটী ইষ্টকনির্ম্মিত।

সারি সারি তিনটি দুতারি। ঘরগুলি সেকেলে ধরণের; নীচু নীচু, জানালার দলে গবাক্ষ। অপর তিনদিকে ইষ্টকপ্রাচীর। বহির্বাটীতে একটি নয়নিবার ঘর। বাটীর মধ্যে প্রশস্ত উঠান। উঠান বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বাটীর ভিতর একটি তুলসী গাছ, একটি দাড়িম্ব গাছ। দাড়িম্ব গাছে একটি ডালিম হইয়াছে। ত্রিগুণা, সেগুলিকে পোকার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, এমন গোমস লেপিয়াছেন যে, দেখিলে বোধ হয়—গোমস ফলিয়াছে। তিন-চারিটা কলাগাছও ছিল। একটি কলাগাছে এক কাঁদি কলা ফলিয়াছে। ত্রিগুণা কাঁদিটা বাঁদরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, ছালা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছেন।

এই বাড়ীটী পল্লীস্থ ভদ্রমহিলাগণের বৈঠকখানা ছিল। আহারের পর দলে দলে স্ত্রীলোক-আসিয়া উপস্থিত হইত। কেহ তাস খেলিত-কেহ পাকা-চুল তুলাইত, কেহ ক্লাসের কোথায় কি হইয়াছে সংবাদ দিত। কেহ পাড়ার নিন্দা, বাটীর নিন্দা, পুত্র ও পুত্রবধূর নিন্দা করিত। কেহ কাটনা কাটিত, কেহ পৈতা পাকাইত, কেহ সিকে বুনিত; কেহ গেঁটেকড়ির আয়না, পাখা ও আলনা বৈয়ারি করিত। এদিকে মৃণাল-বালার সমবয়স্কারা আসিয়া, কেহ তাস, কেহ বিস্তি, কেহ গোলাম-চোর, কেহ দশ-পঁচিশ, কেহ বা ঘুঁটি খেলিত। ছোট ছোট মেয়েগুলা, মাতার সহিত বেড়াইতে আসিয়া, ইঁদুরে ঘর তৈয়ার করিয়া, ছোট ছোট ভাঁড়ে, ঘুটী ভাত, পাথর-কুচি পাতার মাছ রাঁধিয়া, কচুপাতে পরিবেশন করিত। কেহ কেহ পুতুলকে নেকড়ার কাপড় পরাইয়া বর-কনে করিয়া বিবাহ দিত।

অদ্যও এই প্রকার হইতেছিল। অদ্য আমার একজন রামায়ণ পড়িতেছিলেন, এবং চার জনে একমনে তাহা শুনিতেছিলেন। সন্ধ্যে মধ্যে "কৈকেয়ী মাগী কি দুষ্টু মা" বলিয়া তাহার চরিত্র-সমালোচনা করিতেছিলেন।

ক্রমে মৃণালের বিয়ের কথা উঠিল। মিত্র-বাড়ীর মেজবউ কহিলেন,—"হাঁ ঠাকুরঝি, মৃণালের বিয়ে কি রায়েদের বাড়ীতেই হ'লে?"

ত্রিগুণা কহিলেন,—"গাঁয়ে ঘরে, আর ছেলেটি বড় ভাল, ঐখানেই বিয়ে দেব।"

বোসেদের বড়গিন্নি কহিলেন,—"ঐ খানেই বিয়ে দেও; খাণ্ডুড়ী ও ননদ মন্দ নয়; দু'পয়সা আছেও; মেয়ে সুখে থাকবে।"

মল্লিকবাড়ীর নিস্তারিণী কহিলেন,—"তা ঐ খানেই বিয়ে দেও। তবে দোষের মধ্যে —বড্ড বেলায় খায়, আর জা-মাগী বড় দুষ্টু।"

সেনের বাড়ীর উমাকালী কহিলেন,—"তবে কিনা—ওদের বাড়ীর বড় সংসার; বউরা ভাতে তরকারি খেতে পায় না। তা বোন, তাতে আর কি আসে-যায়? দেও—ঐ খানেই বিয়ে দেও।"

চাটুয্যেদের শিবসুন্দরী কহিলেন,—"এক রকম ভাল—সংসারের কোন কাজকর্ম্ম করতে হবে না। তবে কিনা—পান সাজতে সাজতে হাতের নখ খয়ে যাবে।"

সেনপাড়ার ঠাকরুণদিদি তখন মৃণাল-বালার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মৃণাল, বর মনে ধরে তো? খেলা-ঘরের বর সত্যিকের হতে চল্‌লো—মনে ধরেছে তো!"

মৃণালবালা লজ্জায় ঘাড়ে মাথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঢাকার বুড়ীগঙ্গা-তীরস্থ একটি সুদৃশ্য দ্বিতল গৃহে বসিয়া, এক ব্যক্তি চক্ষে চসমা দিয়া কাগজ পত্র দেখিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে

আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৪৯।৫০ বৎসর হইবে। সম্মুখে যথেষ্ট স্থান দখল করিয়া, স্থূলকায় তৎপত্নী বসিয়া আছেন; এবং পূজার সময় ভ্রাতা ও মাতার কি কাপড় দিবেন, বন্দোবস্ত করিতেছেন। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া একখানি পত্র দিয়া যাইল। উপরোক্ত ব্যক্তি পত্রপাঠে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন;—"সংসম্বন্ধ বটে!"

"কি?"

"ত্রিগুণা মাসীর কন্যার সহিত হরগোবিন্দ তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া, আতাঠাকুরাণী আমার মতের জন্য পত্র লিখিয়াছেন।"

পাঠক! ইনি কে, বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন। ইহাঁর নাম রামগোবিন্দ রায়। ইনি ঢাকার নবাব নওয়াগিস্ মহম্মদের ডেপুটী রাজবল্লভের দেওয়ান। ধরাসনে বসিয়া আছেন—ইহাঁর পত্নী উমাসুন্দরী। আমরা উমসুন্দরীকে অতঃপর বড়বৌ বলিয়া উল্লেখ করিব। উমাসুন্দরীতে সুন্দরীর নামগন্ধ নাই। তিনি যেমন স্থূলকায়, তেমনি অঙ্গের গঠন; কেবল রঙটী বেস ফর্সা। কথাগুলি অতিশয় কর্কশ; তাঁহার মুখের দোষে চাকর-বাকর একর্মীসের বেশী তিক্তিতে পারে না।

বড়বৌ জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার মত কি?"

"আমার মত সম্পূর্ণ। কারণ, একে মেয়েটি পরমসুন্দরী, তাহাতে ঘর ভাল।"

"তার পর?"

"তার পর কি?"

"বিয়ে দিলেই পাঁচটী কাক্তা-কাক্তা হবে; তাদের পুষ্‌বে কে? তোমার বাপের পয়সা ছিল, সুখী ঠাকুরঝিকে কুলীনে দিয়েছিলেন; তাদের দশা হবে কি?"

"এখনও হরগোবিন্দর অংশে যে বিঘে আছে, বাবু-য়ানা করে চালাতে পার্‌বে।"

"তোমার তবেননিতান্ত মত—বিয়ে দেওয়া? কিন্তু ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার ভাই গণেশের বিয়ে দেবো—অনেকদিন পর্য্যন্ত মনে মনে ইচ্ছে ছিল।"

"তা আর হয় না। আর গণেশের এখন বিয়ে দিয়েও কাজ নেই। সে খাওয়াবে কি?"

"বটে! ওযে আমার ভাই! আর তোমার ভাই খাওয়াতে পার্‌বে?"

"হরগোবিন্দ ও গণেশে বিস্তর তফাৎ। হরগোবিন্দ কিছু করে না বলে; নচেৎ, ও যেরূপ লেখাপড়া জানে, চেষ্টা করলে, ভাল কাজকর্ম্ম হ'তে পারে। গণেশের হাতের লেখা পড়া যায় না, আর লিখতে গেলে হাত কাঁপে।"

"আমার ভায়ের সব দোষ, আর তোমার ভায়ের সবই গুণ! নাড়ীর টান কি না?"

"আমি যা বল্‌ছি, সব সত্য। পূজোর সময় বাড়ী গিয়ে, হরকে এখানে এনে নবাব-সরকারে একটী চাকরি ক'রে দেব।"

"রাখ্‌বে কোথায়?"

"কেন, বাসায়?"

"বাসায় যদি সে থাকে, আমি এখান থেকে চলে যাবো।"

"তা যেও!"

"এই তো কথা!"

বলিয়া উমাসুন্দরী গাত্রোত্থান করিলেন; এবং দেওয়ানজীর নিকট একখানা পেন-কাটা ছুরী পড়িয়া ছিল—হস্তে লইয়া, "তবে জন্মের মত যাই" বলিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাইলেন।

দেওয়ানজী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; "আরে কি কর—ওগো দাঁড়াও—বাত শোন।" বলিয়া অর্দ্ধ-উলঙ্গ-বেশে, কাছা-কোঁচ খুঁজিতে খুঁজিতে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

শ্রীহুর্গাচরণ রায়,

'দেবগণের মর্ত্তে আগমন' প্রবেতা।

কবি-কুটীর।

সুপ্তোত্থিতা।

(১)

আহা কি মধুর সাজে সেজেছ স্বপন-রাণী!
উজলি ভবনময় শোভিছে বদনখানি।
হেন বেশ সুকুমার, কভু কি দেখেছি আর!
হেন সুধাময় ছবি পড়ে কি নয়ন-কোনে?
শরত-কৌমুদী কভু খেলে কি বিজলি-সনে!

(২)

বল না ত্রিদিব দেবী, এতক্ষণ কোথা ছিলে!
চন্দ্রালোক-তট হ'তে এখনি কি নেমে এলে!
মরত-সাগর-মাঝে, ভীষণ তামস রাজে,
নিরখি তরঙ্গমালা, পরাণ আকুল কিরে?
অধরে কালিমা তাই, ভাসিছ বিষাদ-নীরে?

(৩)

অথবা স্বরগে ছিলে—কোন স্বপনের দেশে,
অমর-ললনা সনে খেলেছ মোহিনী বেশে।
কোমল চরণ দুটী, কান্তর হয়েছে ছুটি,
বিরাম লভিয়া তাই, সুরতরঙ্গিণী তীরে—
প্রভাতে কি মনোরমে, এসেছ বিহগী-স্বরে?

(৪)

ক্ষীরোদ-সাগরে বুঝি জনম তোমার বলী!
নবনীত দেহ আহা, জিনিয়া কুসুমমালা!
প্রবল ঝটিকা-ভরে, উথলি জলধি কিরে,
ফেলিয়া দিয়াছে এই রতন ভূমির পরে!
বিন্দু বিন্দু সুধাধারা তাই কি নিয়ত ঝরে?

(৫)

বিষাদ-বিকল-চিতে কেন লো রয়েছ বসি,
অধর মলিন যেন প্রভাতের পূর্ণশশী!
কেন আলুথালু বেশে, কবরী পড়েছে খসি,
কুঞ্চিত কুন্তলরাজি লুটাইছে শিরোদেশে—
কালিম-সাগরে যেন তরঙ্গ খেলিছে হেসে!

(৬)

অলক-ভুজঙ্গশিশু বলনা কি কুতূহলে,
হেলিয়া দুলিয়া অই চুমিছে কপোলদলে!
কৃষ্ণতার দুনয়ন, কেন লোহিত বরণ?
সচঞ্চল দিঠি তাহে চমকিছে বারে বারে—
কোকনদ-কলি যেন স্পন্দিত ভ্রমরভরে।

(৭)

চম্পকবরণযুত সুকোমল বাহুলতা,
এলায়ে পড়েছে যেন মৃণাল সমীরালিতা।
মধুর গম্ভীর ভাষ, মুচুকে মুচুকে হাস,
আবেশে অলস আঁখি, বলনারে কি কুতূকে—
উরস-মুকুল দুটী ম্লানমুখী কিবা দুখে।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার, বি-এ।

ছবি।

(ইংরাজী হইতে।)

সুনীল কুন্তলগুচ্ছ কণ্ঠদেশ প্রবাহিয়া
এলায়ে পড়েছে তার বক্ষের উপর।
সুন্দর সে কণ্ঠদেশ, বাহুপাশে জড়াইয়া
ঐ বক্ষে লীন হওয়া কত সুখকর!

শিশির-কণিকা-সিক্ত-গোলাপ-অধর তার
সুন্দর আননখানি আনন্দ-আকর।
স্বর্গের আভাযুত তার গণ্ড-দেশ দু'টী
অরুণরঞ্জিম রাগে শোভে অতি মনোহর॥

শ্রীদেবকিশোর মুখোপাধ্যায়, এম-এ।

বাসনা।

দারুণ বাসনানলে
দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
হৃদয়ের অন্তস্তলে
তারি শুধু যাতনা;

জীবনের স্তরে স্তরে
তাহারি কালিমা প'ড়ে,
মলিন বিষাদ-ছায়া
করিয়াছে রচনা।

শৈশব-সুষমা যত
একে একে সব গত,
রয়েছে মরুভূ মত
পরাণের বেদনা;

নিরাশা-বালুকা তায়
চারিদিকে দেখা যায়,
তবু কেন হায় হায়
এ দারুণ কামনা!

সে দেবতা স্বরগের
আমি কীট নরকের,
তবু আশা করি তারে
কবিবায়ে ধারণ;

সামান্য প্রণয়-বাঁধে
তবু চাই সেই চাঁদে
বাঁধিয়া রাখিতে হৃদে,
এ কেমন বাসনা!

তাহারি চরণতলে
এ জীবন দিয়া ঢেলে,
করিব একাকী বসি
সেই রূপ-সাধনা;

মধুমাখা সেই নাম
হৃদে জপি অবিরাম,
পুরিবে সকল কাম
ধন্য হবে রসনা!

ফুরাইলে লীলাখেলা,
তাহারি চরণ-ধূলা
আমার এ শিরোপরে
করি নিব স্থাপনা;

দেখিতে দেখিতে তায়
যেন প্রাণ বাহিরায়,
আর কি চাহিতে পারি—
এই এক বাসনা।

শ্রীললিতমোহন সেন।

বনদেবী।

(উপাখ্যান।)

চতুর্থ অধ্যায়।

বংশবিস্তার।

বেলা প্রহরেকের সময় বনদেবীর সেই ক্ষুদ্র কুটীর জনস্রোতে পরিপূর্ণ হইল। হারাবতীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সম্রাসিনীর সেই নবজাত শিশু সন্দর্শন করিতে আসিতেছে; বলদেবও আসিয়াছেন। বনদেবী সেই সন্তানটীকে বলদেবের পদমূলে রাখিয়া অবিরল অশ্রুমোচন করিতেছে, আর সকাতরে বলিতেছে,—"প্রভো! আমার এ বিপত্তি কেন হইল?"

বলদেব প্রবোধ দিতেছেন, বলিতেছেন,—"বনদেবী! এখন আর কাঁদিয়া কি করিবে? যাহা কামনা করিয়াছিলে, তাহাই পাইয়াছ। যাহাই হউক এখন আর উপায়ান্তর নাই; সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, এখন ইহার পালন-লালন কর। এই শিশু হইতে পৃথিবীতে একটী জাতি-স্রোত প্রবাহিত হইবে, এই শিশু হইতে আমার হলায়ুধের সম্মান রক্ষিত হইবে।"

বনদেবী সেইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দেব! সকল কথা আমায় প্রকাশ করিয়া বলুন; কেমন করিয়া এ সন্তান হইতে নূতন জাতি সৃষ্টি হইবে? কেমন করিয়া আপনার হলের সম্মান রক্ষা হইবে?"

বলদেব গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"সে চিন্তা তোমায় করিতে হইবে না, এ সন্তান নিশ্চয়ই কোন দৈব-তেজ প্রসূত। ইহার নাম দেবদত্ত রাখিও। হস্তিনার অনতিদূরবর্ত্তী, সংগ্রামপুর-গ্রামে, শূদ্রবংশীয় বৈজয়ন্ত নামক সামন্তের ঊর্ব্বী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে; ঈশ্বর-ইচ্ছায় তাহার সহিত এই দেবদত্তের উদ্বাহ-ক্রিয়া সমাহিত হইবে। তাহার গর্ভস্থ সন্তানগণ হিংসাদ্বেষপরিশূন্য হইয়া, হলধারণ-পূর্ব্বক কেবল কৃষিকার্য্যে জীবন নিয়োজিত করিবে। এমনি করিয়া সেই বংশপরম্পরা কৃষিকার্য্যই প্রধান জীবিকা বলিয়া অবলম্বন করিবে এবং সেই বংশ আমার নামানুসারে "হলধর চাষক" জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।

বনদেবী কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইল, যোড়হস্তে বলিল,—"তাহা ত বুঝিলাম; কিন্তু এই অভাগিনীর উপায় কি হইবে?"

বলদেব প্রসন্নবদনে বলিলেন,—"সেজন্যও চিন্তা নাই, তোমার সদুপায় আমার চিন্তার বিষয় থাকিল। এখন, এ কুটীর-বাস ত্যাগ কর। রাজপুরীর প্রান্তদেশে তোমার বাগযুক্ত প্রদত্ত হইয়াছে; দাস দাসী অর্থ যাহা কিছু প্রয়োজন, সকলই প্রাপ্ত হইবে। সেইখানে থাকিয়া, ধর্ম্মপথে মন রাখিয়া, এই শিশুর লালনপালন-রূপ রতব্রতে নিযুক্ত থাকিবে।"

বনদেবী উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, তাহাই স্বীকার করিল; এবং সেইদিনই সেই শিশু-তীর্থ কুটীর-বাস ত্যাগ করিয়া, পুনরায় সংসারে প্রবিষ্টা হইল।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে পবিত্র প্রভাস-ক্ষেত্রে নিদারুণ গৃহবিচ্ছেদে বিপুল যদুবংশ ধ্বংস হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ছলিবলীলা শেষ করিয়া স্বধামে গমন করেন। যদুকুল নির্ম্মূল হইলে, মহাবীর অর্জ্জুন দ্বারাবতী হইতে যখন যদুরমণীগণকে হস্তিনায় লইয়া যান, সেইদিন বনদেবীরও জীবলীলা অবসান হয়। সে মৃত্যুকালে দেবদত্তকে অর্জ্জুনের হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিল। অর্জ্জুনও সুলক্ষণযুক্ত বালকের দিব্যকান্তি দেখিয়া সুপ্রীতঃকরণে তাহার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন যখন হস্তিনায় প্রত্যাগমন করেন, তখন দেবদত্তকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। হস্তিনায় আসিয়া দেবদত্ত নিজগুণে সকলকে বশ করিয়াছিল, সকলেই তাহার সৌজন্য ও নম্রতা-দর্শনে প্রীত হইয়াছিলেন। বিশেষ, কুমার পরীক্ষিত ও বজ্র, সহোদরবৎ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

কালে যখন দেবদত্ত পূর্ণ বিংশতি-বর্ষ-বয়স্ক হইল, তখন ঘটনাচক্রে তাহার বিবাহপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, এবং সরলাত্মা নরপতি পরীক্ষিতের উৎসাহে শীঘ্রই তাহা সমাহিত হইবার সুযোগ হইয়া উঠে। যেদিন দেবদত্তের উত্তর হয়, সেইদিন বলদেব বলিয়াছিলেন যে, হস্তিনার নিকটবর্ত্তী সংগ্রামপুরস্থ বৈজয়ন্ত নামক শূদ্র সামন্তের কন্যা ঊর্ব্বীর সহিত এই দেবদত্তের উদ্বাহক্রিয়া সমাহিত হইবে। কার্য্যেও তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। সেই সামন্ত বৈজয়ন্ত প্রায় অধিকাংশ সময় হস্তিনার রাজসভায় উপস্থিত থাকিত এবং প্রতিদিনই দেবদত্তকে দেখিতে পাইত। দেবদত্ত যে পুরবাসীর স্নেহ, নৃপতির অনুগ্রহ ও বংশলতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাও সে জানিতে পারিয়াছিল। সে অধিকন্তু নিজেও তাহার গুণরাশির পক্ষপাতী হইয়াছিল। সে স্বোড়শবর্ষীয়া কন্যা ঊর্ব্বীর বিবাহের জন্য পাত্রের অন্বেষণ করিতেছিল। এক্ষণে দেবদত্তকে দেখিয়া অবধি তাহাকেই যে কন্যা-দান করে, এই কল্পনাটী হৃদয়মধ্যে বদ্ধমূল করিয়াছিল। সে গোপনে গোপনে তাহার আদিবৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়াছিল; একদিন

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিল। পরীক্ষিতও দেবদত্তের জন্য উপযুক্তা পাত্রী অনুসন্ধান করিতেছিলেন; এক্ষণে বৈজয়ন্তের মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং তাহাকে আশ্বাস দিয়া স্বীয় অমাত্যগণকে এ বিষয় জ্ঞাপিত করিলেন। অমাত্যগণ সকলেই একবাক্যে এ শুভবিষয় অনুমোদন করিলেন।

যথাসময়ে সামন্তপ্রধান বৈজয়ন্তকে এ শুভসংবাদ প্রদান করা হইল। বৈজয়ন্ত এ শুভ সংবাদে যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়া সমারোহে উদ্বাহ-ক্রিয়া সমাহিত করিবার জন্য নানা উদ্যোগ করিতে লাগিল। শুভদিন নির্দ্দিষ্ট হইল। সেই শুভদিনে সামন্তরাজ প্রিয়তমা ঊর্ব্বীকে দেবদত্ত হস্তে অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও সুখী বোধ করিল। এই শুভোদ্বাহ-সংঘটনে হস্তিনাবাসী প্রায় সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেবদত্ত ও ঊর্ব্বী ইহারাও পরস্পর আপনাদিগকে সুখী বোধ করিয়াছিল।

এই পরিণয়-ক্রিয়ার কিছু দিন পর হইতেই দেবদত্তকে আর হস্তিনায় থাকিতে হয় নাই। কারণ, বৈজয়ন্তের সেই একটী মাত্র তনয়া ভিন্ন আর কোন সন্তানসন্ততি ছিল না; কিন্তু তাহার ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না; নিজে ও তখন বৃদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে জামাতাকে জইয়া গিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্যের ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করে—এইরূপ মনন করিয়া, দেবদত্ত ও তাহার অভিভাবক পাণ্ডবনাথকে জানাইল। দেবদত্ত সম্মত হইল এবং মহারাজ পরীক্ষিত একপটে গাঁহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। দেবদত্ত হস্তিনা ত্যাগ করিয়া সংগ্রামপুরে গমনপূর্ব্বক শ্বীয় শ্বশুরের কার্য্যভার গ্রহণ করিল এবং দিব্য

রূপলাবণ্যশালিনী, পূর্ণযৌবনা ঊর্ব্বীর মধুময় সহবাসে কালক্ষেপ করিতে লাগিল।

কালে সেই সামন্তকন্যার গর্ভে ক্রমান্বয়ে দুইটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। জ্যেষ্ঠের নাম যশোধবল ও কনিষ্ঠের নাম বিকর্ত্তন। ইহারা দুই সহোদরেও মহারাজা পরীক্ষিতের বিশেষ অনুগ্রহপাত্র হইয়াছিল; এবং পরে রাজার অধীনস্থ সামন্তপদে নিযুক্ত থাকিয়া সসম্মানে আপন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল। কিন্তু কৃষিকার্য্যকে কেহই তাহারা হেয় বা অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করে নাই।

জ্যেষ্ঠ যশোধবলের তিন পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে; পুত্রগণের নাম যথাক্রমে সারস্বত, দিব্যাঙ্গ ও বৃহদ্ধ। কন্যাদ্বয়ের নাম উমা ও পুষ্প রক্ষিত হইয়াছিল। কনিষ্ঠও এক পুত্র ও এক কন্যা লাভ করিয়াছিল; তাহাদের নাম যথাক্রমে ভাস্কর ও যমুনা।

এইরূপে চাষকজাতির বংশস্রোত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বনদেবীর পুণ্যে, বলভদ্রের অনুগ্রহে, দেবদত্তরূপ যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এখন তাহা হইতে কাণ্ডপ্রকাণ্ড বিশিষ্ট এক বৃহৎ তরুর উদ্ভব হইল। কালে এই জাতি বহুদেশ-ব্যাপী হইয়াছে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চেনা-চুল।

শ্মশ্রু-ধারণ।

আজকাল যেদিকে তাকাই, সেইদিকেই দেখি—কেবল দাড়ি। পূর্ব্বে কেবল মুসলমানের মুখে আর ছাগের মুখে দাড়ি দেখিতাম, ইতরং দাঁড়ির উপর বড় চটা ছিলাম; কিন্তু অধুনা বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি সকলেই মুখে দাড়ি দেখিয়া এই বুড়া-বয়সে দাড়ি রাখিতে বড়ই সাধ হয়। এবং দাড়ি রাখা যে যুক্তিসঙ্গত, ইহা প্রমাণ জন্য কয়েকটী যুক্তিও সংগ্রহ করি। কিন্তু আরও যুক্তি মিলে কি না, এই আশায় আমার সংগৃহীত যুক্তিগুলি এতদিন আধারের গোচরীভূত করি নাই। অদ্য ১২ই ফাল্গুনের 'অনুসন্ধানে' পূজ্যপাদ ঠাকুর মহাশয়ের 'শ্মশ্রু-ধারণ' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরমোপকৃত হইয়াছি। উঁহাতে কৈ শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ আছে, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নাই; কারণ, আমি শাস্ত্রবিষয়ে গণ্ডমূর্খ। তবে ঠাকুর মহাশয় যে যুক্তি কয়েকটী দিয়াছেন, তাহা বড়ই যুক্তিপূর্ণ; সুতরাং তৎপোষকতায় দুই-চারিটী কথা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

একটী যুক্তি এই যে, শ্মশ্রুধারণে শুক্লের গাঢ়তা ও আধিক্য রক্ষা পায়। এ কথাটা খুবই ঠিক। ঠিক কিনা, প্রমাণ লউন। প্রথমতঃ মুনি-ঋষিদিগের শ্মশ্রু ছিল বলিয়া, আকাশমার্গে অনায়াস গমনাগমন পর্য্যন্ত করিতে দেখিলেই, তাঁহাদের সন্তানোৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধি পাইত, এবং অদ্ভুত সন্তান পয়দাও করিতেন। দৃষ্টান্ত —ঋষ্যশৃঙ্গ, শকুন্তলা প্রভৃতি। ঋষিভায়াদের শ্মশ্রুর প্রভাবে শুক্লের এমনই অমোঘ সন্তানোৎপাদিকা শক্তি ছিল যে, দ্রোণ, কুন্ত প্রভৃতিতে সে বস্তু রক্ষিত হইলেও, তাহাতেও সন্তান জন্মিত। নজির—মহাভারতের আদিপর্ব্ব।

দ্বিতীয়তঃ, লণ্ড ভায়াদের বদনে শ্মশ্রু আছে বলিয়া, তাঁহাদিগের ঘরে মা-ষষ্ঠীর বরে পালে পালে ছেলে আর মেয়ে—ঠিক যেন রক্তবীজের ঝাড়। মগধের রাজা ও শ্রীকৃষ্ণ শ্মশ্রুধারণ করিতেন কি না, ঠাকুর মহাশয়ের অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। আমার ত বিশ্বাস হয়, তাঁহাদের খুব ঘন ও দীর্ঘ শ্মশ্রু ছিল; নতুবা, একজনের ষষ্ঠী-সহস্র, আর একজনের ষট্‌পঞ্চাশৎ কোটী সন্তান হইল কিসের জোরে?

তৃতীয়তঃ, অজবদন শ্মশ্রুশোভিত। তাই বলিয়া অজবংশের এত অধিরবৃদ্ধি। তবে আপনারা বলিবেন যে,—'নারীদেহে শুক্ররস' নাই, অথচ ছাগীর বদনে দাড়ি কেন? সুতরাং শ্মশ্রু ও শুক্র, 'শকারজাত' হইলেও, উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু তাহা নহে—আপনাদেরই ভ্রম। ছাগীর মুখে যে শ্মশ্রু দেখেন, হয় উহা শ্মশ্রু নহে—দীর্ঘ-রোম; না হয়, উহা নিপাতনে-সিদ্ধ শ্মশ্রু!

চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদিগের মুখে শুনিয়া, ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, শ্মশ্রু-ধারণ করিলে, চক্ষুর তেজ শীঘ্র নষ্ট হয় না। ইহা যখন চিকিৎসক মহাশয় ও ঠাকুর মহাশয় উল্লেখেরই যুক্তি ও সূক্তি, তখন কিছুতেই অন্যথা হইতে পারে না। ধৃতরাষ্ট্র ও দীর্ঘতমা ঋষি, সশ্মশ্রু জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়াই, জন্মিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা চোখের মাথা খাইয়াছিলেন। আবার ওদিকে দেখ, আধুনিক শ্মশ্রুধারী শ্মশ্রুত-বিদ্যদলে কি চক্ষের তেজ! তাঁহারা মানেই করুন, বা আহারই করুন, বা ভ্রমণই করুন, যখনই তাঁহাদিগের চক্ষুর প্রতি চক্ষু অর্পণ করিবেন, তখনই দেখিবেন—নাসিকার উভয় পার্শ্বে দুইটী গোলাকার চক্ষু, কাচের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে! অন্য সময় না দেখিলেও, যখন তাঁহারা নিদ্রা যান, তখন যাইয়া দেখিবেন, সেই বিস্ফারিত নেত্রদ্বয়ে 'লেজেরাস্' বা "শ্রীমানীর" না আর কি, যেন লেখার মত আছে।

ঠাকুর মহাশয় যে বলিয়াছেন—"শ্মশ্রুধারণ করিলে" হিমের আক্রমণ হইতে অনেক রক্ষা পাওয়া যায়; তাহাও আপনাদিগকে অকাট্য বলিয়া মানিতে হইবে। কারণ, তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—"ইহাও অযৌক্তিক নহে।" তিনি প্রস্তাবের সুলাস্তরে বলিয়াছেন, এদেশে মুসলমান-রাজত্ব আরম্ভ হইলেই মুসলমানদিগের সহিত পার্থক্যরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শ্মশ্রুধারণ পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন। নদীয়াতে রঘুনাথ শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রঘুনন্দন, গদাধর প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া, সেদিনকার ব্রজনাথ পর্য্যন্ত সকলেই শ্মশ্রুহীন ছিলেন। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, হিম লাগিয়া ইহাঁরা সকলেই অল্পবয়সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থে যে ইহাঁর বিপরীত লিখে, তাহা নহে। আর একটী প্রমাণ, গৌরাঙ্গের চেলাগণ—শ্মশ্রু কেন কেশ পর্য্যন্ত মুণ্ডন করেন; নিত্যানন্দের চেলা বাঁউলগণ—দীর্ঘকেশ ও দীর্ঘশ্মশ্রু ধারণ করেন। সুতরাং অবশ্যই আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, প্রশ্নোক্ত ব্যক্তিগণ, হিম লাগিয়া অল্পবয়সেই মরিয়া যায়। যদি ইহার বিপরীত দেখিতে পান, তবে সে দেখা, দেখাই নহে। আরও বিশ্বাস করিবেন, এখন দাড়ির বাড়াবাড়ি হওয়াতে, এদেশে বাতশ্লেষ্মা-বিকার (নিউমোনিয়া) আদৌ হয় না।

এই পর্য্যন্ত গেল, ঠাকুর মহাশয়ের টীকা। সংপ্রতি আপনারা আমার খাঁয় মস্তিষ্কসম্ভূত দুই-একটি যুক্তিও শুনুন, এবং তাহার সারবত্তার বিচার করুন।

কেশশ্মশ্রু বপন না করা একান্ত উচিত। কারণ,

১মতঃ। ইহাতে নরসুন্দর ভায়াকে অপকরস্থা প্রদর্শন করা যায়।

২য়তঃ। ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য যে সপ্তাহে সপ্তাহে মাথাগুস্থি একটী পয়সা ব্যয় হয়, তাহা আর হয় না। নখ, কলম-ক্কাটা ছুরিতে বা দশনাগ্রে ছেদন করিলেই হইল।

৩য়তঃ। সাধু কলিয়া দণ্ডবৎ বা মুসলমান বলিয়া সেলাম পাওয়া যায়।

৪র্থতঃ। ব্রাহ্মণগণের দোকানের পাঁউরুটী খারাপ; মুসলমানের দোকানের রুটী ক্রয়-পক্ষে শ্মশ্রু কেমন সহায়!

৫মতঃ। মুসলমান-গৃহস্থের দুগ্ধ খাঁটি বলিয়া অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়; সুতরাং গোয়ালারা শ্মশ্রুপ্রভাবে সাদা জল অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে।

৬ষ্ঠতঃ। যাত্রা বা থিয়েটারে সং সাজিতে কষ্ট হয় না; মাঝে মাঝে একটু পাঁউডার বা খড়ি ঘষিলেই হইল।

৭মতঃ। মৃত্যু হইলে হিন্দু-মুসলমান দুই জাতিকেই শ্মশান-বন্ধুকে পাওয়া যায়।

৮মতঃ। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন পরিচয়-দিবার বেস্ সুযোগ হয়। যথা, শাক্তের নিকট যোগী, বৈষ্ণবের নিকট বৈরাগী, শৈবের নিকট যাবা বৈদ্যনাথ বা তারকেশ্বরের চেলা, আলকাটী দলে থিয়োসফিষ্ট, সাধারণী দলে ব্রাহ্ম, মুসলমান-সমাজে মোল্লা, খৃষ্টান-সমাজে খৃষ্টান।

আরও ঢের যুক্তি আছে। কিন্তু অদ্য এই পর্য্যন্ত। যদি ঠাকুর মহাশয়ের শ্মশ্রুধারণে একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, অথচ প্রচুর যুক্তির অভাবে তাহা পারিতেছেন না—এমন হয়, তবে আমাকে লিখিলেই বিনা-ডাকখরচায় দুই-চারি মণ যুক্তি পাঠাইয়া দিব।

প্রস্তাব-উপসংহারের পূর্ব্বে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। আমি বালকের ও স্ত্রীলোকের শ্মশ্রুধারণের কথা প্রবন্ধের গোড়ায় বলিয়াছি। তাহার টীকা-টিপপ্পনী করিয়া না দিলে হয় ত পাঠকগণ আমাকে বেল্লিক মনে করিবেন। অতএব, কৈফিয়তের ব্যাখ্যা শুনুন।

১মতঃ। বালক-পক্ষে বালকেরা পাঁঠা ধরিতে, তাহা লইয়া খেলা করিতে, তাহা চরাইতে বড় ভালবাসে। অধুনা বাপ-খুড়ার মুখে শ্মশ্রু হওয়াতে, তাঁহাদিগকে উহার স্থানীয় মনে করিয়া, অনেক সময় তাঁহাদিগের শ্মশ্রু ধারণ করিয়া দেখে।

২য়তঃ। স্ত্রীলোকের পক্ষে। স্বামীর বদনে শ্মশ্রু থাকাতে, পরস্পরের—প্রদানে কষ্ট হয় বলিয়া, রমণীগণ, ঐ স্বামীর বা উপস্বামীর শ্মশ্রু সযত্নে হস্তে ধারণ করেন। বারবনিতারা পূর্ব্বে রুষ্ট হইলে প্রণয়ীর কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক পাদুকা-প্রহার করিত, এখন শ্মশ্রু-ধারণ দ্বারাই সে কার্য্য সম্পাদিত হয়।

অতএব, বালক বা স্ত্রীলোকের শ্মশ্রুধারণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা ব্যাকরণবিরুদ্ধ কথা নহে।

চেনাচুর-ওয়ালা—শ্রীবিশ্বসখা সাঁ।

'বিষস্য বিষমৌষধম্।'

মৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য রাখা সকলেরই উচিত; লেখক-সম্প্রদায়ের পক্ষে আরও উচিত—কেন-না, তাঁহারা অশিক্ষিত সমাজের শিক্ষক। কিন্তু সত্যপথে অনেক বিঘ্ন। গোঁড়ামি ও বিদ্বেষ উভয়ই সত্যপথের অপরিহার্য্য কণ্টক। মাননীয় শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের লিখিত ও 'অনুসন্ধানে' প্রকাশিত "কল্পবৃক্ষ ও হোমিওপ্যাথি" শীর্ষক প্রবন্ধটী লক্ষ্য করিয়াই প্রাগুক্ত প্রাচীন সত্যের পুনরুক্তি করা হইল।

প্রস্তাবে প্রতিপাদিত কবিরাজ মহাশয়ের কথা আর কি বলিব! এইরূপ গোঁড়ামি কেবল তাঁহার একার নহে, উহাঁদের সম্প্রদায়ের অনেকেই এইরূপ রোগে ধরিয়াছে। 'চিকিৎসা সম্মিলনী' চিকিৎসা-সম্বন্ধে একখানি বিখ্যাত পত্রিকা। উহার মধ্যেও এইরূপ অসত্যের ছড়াছড়ি বিস্তর রহিয়াছে। কবিরত্ন-কবিরাজ শীতলচন্দ্র "আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যা" লইয়া বিস্তর আগড়ম-বাগাড়ম্ব করিয়া রাখিয়াছেন। যে বিষয় ধরিয়া জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার প্রাচীন বন্ধু যশোদা বাবুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, ১২৯৭ সনের "চিকিৎসা সম্মিলনীর" বোধ হয় ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় নামক পাবনা জেলার অন্তর্গত কোন এক পল্লীগ্রামের জনৈক কবিরাজ "হোমিওপ্যাথি যে আয়ুর্ব্বেদের নকল" এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে গিয়াই ধানভানিতে শিবের গীত গাহিয়া তাণ্ডবে নৃত্য করিতে করিতে নিজের অগাধ পাণ্ডিত্যের বড়ই পরিচয় দিয়াছিলেন। আমাদের তাহাতে বড় হাসি পাইয়াছিল।

এক্ষেত্রে শুধু কবিরাজ-সম্প্রদায়ের ব্যক্তি-বিশেষই যে দোষী, তাহা নহে; এলোপাথ ও হোমিওপাথগণের মধ্যেও স্বমতাভিমানী অনেক গোঁড়া জ্ঞানহেন্দ্র তাঁহারা ধন্বন্তরিকে সরস্বতীর ন্যায় জ্ঞান করেন।

জগদ্বন্ধু বাবু যদিও হোমিওপ্যাথির কথঞ্চিৎ অবগত আছেন বলিয়া নিজে পরিচয় দিয়াছেন এবং নিজেকে হানিমানের শিষ্যানুশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিয়াছেন; তথাপি তাদৃশ প্রবীণ ব্যক্তি যে কোন সম্প্রদায়ের দিকে ঝুঁকিয়া এহেন প্রতিবাদ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করার আমার কোনও কারণ নাই। তবে কিনা, একটু ধীরভাবে প্রবন্ধটী লিখিলেই হইত।

তিনি লিখিয়াছেন—'আয়ুর্ব্বেদ-সম্বন্ধে তিনি মূর্খ, বিশেষতঃ তিনি যে ক্ষুদ্রস্থানে আছেন সেখানে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি সহজে পাওয়া যায় না।' যদি তাহাই হয়, তবে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সংগ্রহ এবং তাহা হইতে আরও কতকটা জ্ঞান সংগ্রহ করার কালটুকু প্রতীক্ষা করিয়া প্রতিবাদটি প্রকাশ করিলে কি ভাল হইত না? এত ব্যস্ততাই বা কি?

বড় গোল বাধিয়াছে—"ঋষয়োঽহি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্"—এই শ্লোকার্দ্ধ লইয়া শ্লোকাংশ অবিকল এই আয়ুর্ব্বেদে আছে, কবিরাজ মহাশয় তাহার কোনও প্রমাণ দেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিপক্ষে প্রমাণ অনেক আছে। শ্লোকাংশ কালিদাসের রচিত বলিয়াই অন্যান্য পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি। 'শূদ্রকারতিলকে' নাকি শ্লোকটী এইভাবে লিখিত আছে, যথা,—

"দৃষ্টং দেহি পুনর্বলে কমলায়ত-লোচনে,
ঋষয়োঽহি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্।"

যাবৎ ইহার বিরুদ্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ না

কেশশ্মশ্রু বপন না করা একান্ত উচিত। কারণ,

১মতঃ। ইহাতে নরসুন্দর ভায়াকে অর্থকৃচ্ছ্রতা প্রদর্শন করা যায়।

২য়তঃ। ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য যে সপ্তাহে সপ্তাহে আধাগুন্তি একটী পয়সা ব্যয় হয়, তাহা আর হয় না। নখ, কলম-কাটা ছুরিতে বা দশনাগ্রে ছেদন করিলেই হইল।

৩য়তঃ। সাধু কলিয়া দণ্ডবৎ বা মুসলমান বলিয়া সেলাম পাওয়া যায়।

৪র্থতঃ। ব্রাহ্মণগণের দোকানের পাঁউরুটী খারাপ; মুসলমানের দোকানের রুটী ক্রয়-পক্ষে শ্মশ্রু কেমন সহায়!

৫মতঃ। মুসলমান-গৃহস্থের দুগ্ধ খাঁটি বলিয়া অধিক মূল্যে বিক্রিত হয়; সুতরাং গোয়ালারা শ্মশ্রুপ্রভাবে সাদা জল অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে।

৬ষ্ঠতঃ। যাত্রা বা থিয়েটারে সং সাজিতে কষ্ট হয় না; মাঝে মাঝে একটু পাঁউডার বা খড়ি ঘষিলেই হইল।

৭মতঃ। মৃত্যু হইলে হিন্দু-মুসলমান দুই জাতিকেই শ্মশান-বন্ধুরূপে পাওয়া যায়।

৮মতঃ। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন পরিচয়-দিবার সুযোগ হয়। যথা, শাক্তের নিকট যোগী, বৈষ্ণবের নিকট বৈরাগী, শৈবের নিকট মাবা বৈদ্যনাথ বা তারকেশ্বরের চেলা, আল্‌কটী দলে খিয়াসফিষ্ট, সাধারণী দলে ব্রাহ্ম, মুসলমান-সমাজে মোল্লা, খৃষ্টান-সমাজে খৃষ্টান।

আরও ঢের যুক্তি আছে। কিন্তু অদ্য এই পর্য্যন্ত। যদি ঠাকুর মহাশয়ের শ্মশ্রুধারণে একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, অথচ প্রচুর যুক্তির অভাবে তাহা পারিতেছেন না—এমন হয়, তবে আমাকে লিখিলেই বিনা ডাকখরচায় দুই চারি মণ যুক্তি পাঠাইয়া দিব।

প্রস্তাব উপসংহারের পূর্ব্বে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। আমি বালকের ও স্ত্রীলোকের শ্মশ্রুধারণের কথা প্রবন্ধের গোড়ায় বলিয়াছি। তাহার টীকা-টিপ্পণী করিয়া না দিলে হয় ত পাঠকগণ আমাকে বেল্লিক মনে করিবেন। অতএব, কৈফিয়তের ব্যাখ্যা শুনুন।

১মতঃ। বালক-পক্ষে। বালকেরা পাঁঠা ধরিতে, তাহা লইয়া খেলা করিতে, তাহা চরাইতে বড় ভালবাসে। অধুনা বাপ-খুড়ার মুখে শ্মশ্রু হওয়াতে, তাঁহাদিগকে উহার স্থানীয় মনে করিয়া, অনেক সময় তাঁহাদিগের শ্মশ্রু ধারণ করিয়া দেখে।

২য়তঃ। স্ত্রীলোকের পক্ষে। স্বামীর বদনে শ্মশ্রু থাকাতে, পরস্পরের—প্রদানে কষ্ট হয় বলিয়া, রমণীগণ, ঐ স্বামীর বা উপস্বামীর শ্মশ্রু সযত্নে হস্তে ধারণ করেন। বারবনিতারা পূর্ব্বে কষ্ট হইলে প্রণয়ীর কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক পাদুকা-প্রহার করিত, এখন শ্মশ্রু-ধারণ দ্বারাই সে কার্য্য সম্পাদিত হয়।

অতএব, বালক বা স্ত্রীলোকের শ্মশ্রুধারণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা ব্যাকরণবিরুদ্ধ কথা নহে।

চেনাচুর-ওয়ালা—শ্রীবিশ্বম্ভর সাধু।

'বিষস্য বিষমৌষধম্।'

মৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য রাখা সকলেরই উচিত; লেখক-সম্প্রদায়ের পক্ষে আরও উচিত—কেননা, তাঁহারা অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজের শিক্ষক। কিন্তু সত্যপথে অনেক বিঘ্ন। গোঁড়ামি ও বিদ্বেষ উভয়ই সত্যপথের অপরিহার্য্য কণ্টক। মাননীয় শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের লিখিত ও 'অনুসন্ধানে' প্রকাশিত "কল্পবৃক্ষ ও হোমিওপ্যাথি" নামক প্রবন্ধটী লক্ষ্য করিয়াই প্রাগুক্ত প্রাচীন সত্যের পুনরুক্তি করা হইল।

প্রস্তাবে প্রতিপাদিত কবিরাজ মহাশয়ের কথা আর কি বলিব! এইরূপ গোঁড়ামি কেবল তাঁহার একার নহে, উহাঁদের সম্প্রদায়ের অনেকেই এইরূপ রোগে ধরিয়াছে। 'চিকিৎসা সম্মিলনী' চিকিৎসা-সম্বন্ধে একখানি বিখ্যাত পত্রিকা। উহার মধ্যেও এইরূপ অসত্যের ছড়াছড়ি বিস্তর রহিয়াছে। কবিরত্ন-কবিরাজ শীতলচন্দ্র "আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যা" লইয়া বিস্তর আস্ফালন-বাগাড়ম্বর করিয়া রাখিয়াছেন। যে বিষয় ধরিয়া জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার প্রাচীন বন্ধু যশোদা বাবুকে আক্রমণ করিয়াছেন, ১২৯৭ সনের "চিকিৎসা সম্মিলনীর" বোধ হয় ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় নামক পাবনা জেলার অন্তর্গত কোন এক পল্লীগ্রামের জনৈক কবিরাজ "হোমিওপ্যাথি যে আয়ুর্ব্বেদের নকল" এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে গিয়াই ধানভানিতে শিবের গীত গাহিয়া তাণ্ডবে নৃত্য করিতে করিতে নিজের অগাধ পাণ্ডিত্যের বড়ই পরিচয় দিয়াছিলেন। আমাদের তাহাতে বড় হাসি পাইয়াছিল।

এক্ষেত্রে সুধু কবিরাজ-সম্প্রদায়ের ব্যক্তি-বিশেষই যে দোষী, অহা নহে; এলোপাথ ও হোমিওপাথগণের মধ্যেও ঘুমতাড়িমানী অনেক গোঁড়া জ্লাছেন—যাঁহারা ধরাধামকে সরষেখানির ন্যায় জ্ঞান করেন।

জগদ্বন্ধু বাবু যদিও হোমিওপ্যাথির কথঞ্চিৎ অবগত আছেন বলিয়া নিজে পরিচয় দিয়াছেন এবং নিজেকে হানিমানের শিষ্যানুশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিয়াছেন; তথাপি তাদৃশ প্রবীণ ব্যক্তি যে কোন সম্প্রদায়ের দিকে ঝুঁকিয়া এহেন প্রতিবাদ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করার আমার কোনও কারণ নাই। তবে কিনা, একটু ধীরভাবে প্রবন্ধটী লিখিলেই হইত।

তিনি লিখিয়াছেন—'আয়ুর্ব্বেদ-সম্বন্ধে তিনি মূর্খ, বিশেষতঃ তিনি যে মুদ্দস্থানে আছেন সেখানে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি সহজে পাওয়া যায় না।' যদি তাহাই হয়, তবে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সংগ্রহ এবং তাহা হইতে আরও কতকটা জ্ঞান সংগ্রহ করার কালটুকু প্রতীক্ষা করিয়া প্রতিবাদটি প্রকাশ করিলে কি ভাল হইত না? এত ব্যস্ততাই বা কি?

বড় গোল বাধিয়াছে—"শ্রুয়তেহি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্"—এই শ্লোকার্দ্ধ লইয়া শ্লোকাংশ অবিকল এই আয়ুর্ব্বেদে আছে, কবিরাজ মুশাইয় তাহার কোনও প্রমাণ দেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিপক্ষে প্রমাণ অনেক আছে। শ্লোকাংশ কালিদাসের রচিত বলিয়াই অন্যান্য প্রত্নতত্ত্বগণের মুখে শুনিয়াছি। 'শূদ্রারতিলকে' নাকি শ্লোকটী এই ভাবে লিখিত আছে, যথা,—

"দৃষ্টং দেহি পুনর্বলে কমলায়ত-লোচনে,
শ্রুয়তেহি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্।"

যাবৎ ইহার বিরুদ্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ না

হইতেছে, তাবৎ এই শ্লোকটী যে আয়ুর্ব্বেদোক্ত নহে, তাহা এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে।

শ্লোকাংশ আয়ুর্ব্বেদোক্ত হউক অথবা "শৃঙ্গারতিলকেরই" হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতেছে না। মূল কথা এই যে, এই আলোক পাইয়াই হানিমান হোমিওপ্যাথির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন কিনা? কবিরাজ মহাশয়ের গোঁড়ামি খণ্ডন করিতে গিয়া জগদ্বন্ধু বাবু লিখিতেছেন,—"জর্ম্মাণ দেশে সংস্কৃতের বহুপ্রচার-সত্ত্বেও হানিমানের ন্যায় মহা বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি 'শৃঙ্গারতিলক' পাঠ করিয়া তাহার শ্লোকাংশকে মূল সূত্র ধরিয়া এক সার্ব্বভৌমিক সত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করাও হাস্যকর।"

আমি কিন্তু এরূপ অনুমান করা হাস্যকর মনে করিতে পারি না। হানিমান্ 'শৃঙ্গার তিলক' পাঠ করিয়া এই সত্য লাভ করিয়াছেন কিনা, তৎসম্বন্ধে আমি আদৌ কিছু বলিতেছি না। কিন্তু গ্রন্থবিশেষের কোন ছত্রবিশেষ-পাঠে অথবা অতি সামান্য কোন কথায় অথবা অতি সামান্য সামান্য ঘটনা-দর্শনে জগতে যে অনেক সময়ে অতি গভীর সত্য প্রচারিত হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সত্যানুসন্ধিৎসু চিন্তাশীল মণিষা-সম্পন্ন মহাত্মাগণের প্রাণে সত্যের অনল গোপনে প্রধূমিত হইতে থাকে; যেমন-তেমন একটী কথার আলোক-বর্ত্তিকা-লাভে অথবা যেমন-তেমন একটী ঘটনা প্রত্যক্ষে অমনি তাঁহাদের প্রাণস্থিত সত্যের গুপ্ত অনল সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। আতা-পতন-সন্দর্শনে নিউটন্-কর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার, অনরত্তন-কালে বাষ্প-বেগ সন্দর্শনে বাষ্পের অচিন্তনীয় মহাশক্তির ধারণা, দোহুল্যমান দীপের পরিদোলন-দর্শনে ঘটিকা-যন্ত্রের সৃষ্টি, মৎস্য-বিক্রয়কারিণীর মুখে "বেলা নাই" শব্দ-শ্রবণে লালা বাবুর গৃহত্যাগ—এইরূপ সামান্য সামান্য ঘটনায়—ম্লান্য সামান্য কথায়, সত্যানুসন্ধিৎসু মহাত্মাগণের প্রাণে কত বার যে সত্যের আলোক জ্বালাইয়া দিয়াছে, ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। ক্ষুদ্রই হউক আর যেমনই হউক, মহাত্মাগণ কিছুই তাচ্ছিল্যের চক্ষে দর্শন করেন না।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন॥"

এই অমূল্য উপদেশ কেবল মহাত্মাগণের জীবনেই আচরিত হইতে দেখা যায়। "নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যামমেধ্যাদপি কাঞ্চনং"—মহাত্মাগণই এই উপদেশ-অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। হানিমানের ন্যায় সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি যে 'শৃঙ্গারতিলক' পাঠ করিবেন এবং তাহা হইতে এই সত্য গ্রহণ করিবেন, ইহা অসম্ভব এবং উপহাসের কথা নহে। তবে তিনি এই শ্লোকাংশ পাঠ করিয়াই যে হোমিওপ্যাথির সূত্র অবগত হইয়াছিলেন, ইহা বলা বড়ই গোঁড়ামি, বড়ই ধৃষ্টতা!

হানিমান 'শৃঙ্গারতিলক' বা তাহার অনুবাদ অথবা এই শোকাংশ বা তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু "শ্রূয়তে হি পুরালোকে বিষমা বিষমৌষধম্"—এই কথাটীর অনুবাদ যে অনেক কাল হইতে ইয়োরোপ ও এমেরিকায় প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে।

১৮৭৩ সনের ১১ সেপ্টেম্বর লিমিংটন্ নগরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের কংগ্রেসের বিদ্যমত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার উইলিয়ম সাপু, এম, ডি, এফ্, আর্, এস্, মে বক্তৃতা করেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; "বিষস্য বিষমৌষধম্" বচনাংশের সহিত হোমিওপ্যাথির কোন সংস্রব আছে কি না, এতদ্দ্বারা তাহাও কতকটা বুঝা যাইবে।

ডাক্তার সার্প বলিতেছেন,—

"What are remedies? Poisons are remedies. It has been heard of the old time in the world, that poison is antidote to poison. This is as the proposition was expressed three or four thousand years ago. In modern times, and in the language of Shakespeare, it is expressed in the words 'In poison there is physic.' This is startling. How contrary to anticipation, to *apriori* reasoning; that that which does harm in health should do good in sickness. The human mind would never have discovered this by ages spent in cogitation and reasoning. It is a fact, not contrary to reason, but beyond its reach. Arsenic and Aconite, Mercury and Bella-donna, Copper and Veratram are among the most deadly poisons we are acquainted with, and are they not also among the best remedies we possess?

The abuse of a thing is most a good argument against its use; moreover, that which is true in general must be true in its particulars."

কলিকাতার খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও তদীয় "চিকিৎসা-প্রকরণ" নামক গ্রন্থের ১৯ ও ২১ পৃষ্ঠায় "বিষস্য বিষমৌষধম্" শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়া বচনাংশকে হোমিওপ্যাথির যুক্তির সামিল করিয়াছেন। সাধারণতঃ হোমিওপ্যাথির সহিত এই শ্লোকাংশের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা এতদ্দ্বারা বিলক্ষণরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। বিজ্ঞান-আলোচনার শীর্ষস্থলে, সুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের কংগ্রেস-সভায়, বিজ্ঞানজ্ঞানসম্পন্ন সুবক্তা সম্মানিত সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সার্প, সভাপতির স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, যে 'বিষস্য বিষমৌষধম্' শ্লোকাংশকে হোমিওপ্যাথির সহিত সম্বন্ধসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিলেন, জগদ্বন্ধু বাবু তাহা খণ্ডন করিতে পারেন কি?

এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা এ পর্য্যন্ত জগদ্বন্ধু বাবুর দুইটী কথার উত্তর দেওয়া হইল;—

একটী কথা এই যে, কালিদাসের 'শৃঙ্গার-তিলকেও' যদি কোন সত্য থাকে, হানিমানের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিও তাহা পাঠ করিয়া সত্য-লাভ করিতে পারেন—ইহা উপহাসের বিষয় নহে। অপরটী এই যে, 'বিষস্য বিষমৌষধম্' শ্লোকাংশের সহিত হোমিওপ্যাথির সম্বন্ধ আছে।

শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তী

মতামত।

পুস্তক।

প্রবাসীর অস্ফুট স্মৃতি।—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ প্রণীত। মূল্য ৸০ বার আনা।

এই একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পাঁচকড়ি বাবু চাকরী-উপলক্ষে আসাম-প্রদেশে অবস্থিত, এবং সেই সূত্রেই পুস্তকখানি লিখিত। উহা পড়িলে, আসাম-প্রদেশের অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। পুস্তকখানি সরস-মধুর ভাষায় লিখিত—সম্পূর্ণ চিত্তাকর্ষক, অথচ বহুল নূতন বিবরণ সম্বলিত। পুস্তকে আসামের কয়েকখানি চিত্রও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের আমরা বহুল প্রচার-কামনা করি।

সাধন-সঙ্গীত।—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র কবিরত্ন প্রণীত। ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকার দুই-একটি হরিসভার কীর্ত্তন প্রভৃতি উপলক্ষে যে গীতগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহাই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। তেমন কবিত্ব পূর্ণ না হইলেও, গীতগুলি ভগবদ্ভাবোদ্দীপক।

A Catalogue of the English books in the Bagbazar Reading Library.—'বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর' এই পুস্তকের তালিকাখানি দেখিয়া, আমরা বড়ই সুখী হইলাম। দেখিয়া বুঝা গেল, কলিকাতার অপর কোন 'প্রাইভেট লাইব্রেরীতে' এরূপ সংগ্রহ আছে কিনা সন্দেহ। ফলতঃ আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, অন্যান্য পল্লীর পাঠাগার-সমূহ অপেক্ষা 'বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী' সমধিক উন্নত। এই লাইব্রেরীর উদ্যোক্তাগণকে এজন্য ধন্যবাদ দিই।

সাময়িক পত্র।

(অব্যবহিত-পূর্ব্ব-প্রাপ্ত।)

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।—ত্রৈমাসিক। মাঘের তৃতীয় সংখ্যা।—শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

প্রবন্ধ আছে—আটটি। প্রথম দুইটী প্রবন্ধে ইংরাজী বৈজ্ঞানিক পরিভাষাসমূহের কিরূপ বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা উচিত, তাহারই আলোচনা চলিয়াছে। ইহাতে চিন্তাশীলতার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয় প্রবন্ধ—মকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র। ১৫ পৃষ্ঠা-ব্যাপী প্রবন্ধে, উক্ত তির আড়ম্বর যত বেশী, কাজের কথা বড় অল্প। কথার মধ্যে আছে—"গুণাকর, কবিকঙ্কণের কবিত্ব পত্রে পত্রে নকল করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র কুৎসিৎ সমসাময়িক কুৎসিৎ রসিকতা বর্ণনা করিয়াছেন।" তৃতীয় প্রবন্ধ—বাঙ্গালা রচনা। প্রবন্ধের মত—'এও বটে, সেও বটে!' একজনে বলা হইতেছে—নির্দ্ধনী, নির্দ্দোষী ইত্যাদি যাঁহারা লেখেন, তাঁহারা অসংযত, অসাবধান। কিন্তু পরক্ষণেই বলা হইতেছে—যে সকল চলিয়া আসিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন না করাই ভাল।' সেই চলা-না-চলার সমস্যা! কি চলিয়াছে বা কি চলিবে, এবং তাহা কে মানিতেছেন বা মানিবেন, আগে তাহারই ঠিক করা উচিত। নহিলে, 'গোলে হরিবোলের' মত—"আমার ভুল, ভুল নহে; অপরের ভুলই ভুল"—একথা নিজস্ব হইতে পারে, কিন্তু পরিষদের কথা হওয়া উচিত নহে। সাময়িক প্রসঙ্গ—৪র্থ প্রবন্ধ; জ্ঞাতব্য, কিন্তু অল্প। ৬ষ্ঠ—মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা, ৭ম—ছেলে ভুলানো ছড়া, ৮ম—পরিষদের কার্য্যবিবরণ। উপসংহারে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। "সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা"—একে ত্রৈমাসিক, তাহাতে সমগ্র লেখকমণ্ডলী-সমলঙ্কৃত সাহিত্য-পরিষদ-সমিতির মুখপত্রস্বরূপ পত্রিকার 'অনুসন্ধানের' পৃষ্ঠার মত বড় একটি পৃষ্ঠা রবীন্দ্র বাবুর এই ৮ ছত্র পরিমিত—

'রাণু কেন কেঁদেছে।
ভিজে কাঠে রেঁধেছে॥
কাল যাব আমি গঞ্জের হাট।
কিনে আনবো শুকনো কাঠ॥
তোমার কান্না কেন শুনি।
তোমার শিকেয় তোলা ননি।
তুমি খাওনা সারা দিনই॥"

ছড়াটী মাত্র দিয়া পূরণ করা বড়ই নিন্দার কথা। আমরা পরিষদের হিতকামী। সুতরাং ভরসা করি, আমাদের কথাগুলিকে প্রতিপক্ষভাবে গ্রহণ না করিয়া, পরিষদ, সুহৃদ্‌বাক্যজ্ঞানে তৎপ্রতিবিধানে যত্নপর হইবেন।

নব্যভারত।—মাসিক পত্র ও সমালোচন।—শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্পাদিত। মাঘ ও ফাল্গুন মাসের।

প্রবন্ধ—১১টী। 'ভীষ্ম'প্রবন্ধ—দুইটী। গ্রন্থকারকে গালি দিবার জন্য, এবং আর্য্যানার্য্যের একত্ব-প্রমাণের চেষ্টায়। কথাটী 'ভাল করিয়া' বুঝাইয়াছেন—"দুর্য্যোধন (যেন) শত শত ভারতপ্রবাসী-প্রমুখ সুরেন্দ্রনাথ, ভীষ্ম ছিউম!" কালে কতই দেখিব? মগধের পুরাতত্ত্ব—সংগ্রহ প্রচুর, কিন্তু অধিকাংশই 'রয়েল এসিয়াটীর সোসাইটীর জর্ণাল' হইতে। 'গরিব ব্যাঙ'—উপযোগী, কিন্তু আকাশ-কুসুম! 'সামাজিক পবিত্রতা'—চাপল্যপূর্ণ; 'শ্রীকৃষ্ণযাত্রা'—সম্প্রদায়-বিশেষের ব্যবসায়-সাহায্য। 'ফুলের বিবাহ'—ফুলরাজ্যের কথা। পত্রাবলীর পত্রকবিতা, মন্দ নহে—কিন্তু চর্ব্বিতচরণ। ভগবদ্গীতা—পদ্য দুর্ব্বোধ, তাই ব্যাখ্যাই সব। আর কয়েকটী বাদ-প্রতিবাদ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম। ফলতঃ এবারের 'নব্যভারত' তত ভাল নহে। না হউক, কিন্তু সকলের প্রধান। সম্পাদক নিজে পণ্ডিত, অথচ তাঁহার পত্রিকাখানি সুপরিচালিত—বড়ই অধ্যবসায়ের কথা।

সাহিত্য।—মাসিক পত্র ও সমালোচন। ফাল্গুন মাসের। শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

'সাহিত্য' পত্রখানি মুখ্যে কিঞ্চিৎ আশা-প্রদ হইয়াছিল। উপস্থিত সংখ্যায় তাহাতে নিরাশ হইলাম। সাহিত্যের আর যেন সে শ্রীই নাই! সুন্দর মলাট, পুরুপুরু কাগজ—দেখিতে বেস ছিল। সম্ভবতঃ গ্রাহক মহাশয়দিগের দোষেই সাহিত্যের সে শ্রী বাঙ্গালাইতে হইয়াছে। দেশের এ দুর্দ্দশায়, বড়ই দুঃখিত হইতে হয়।

সাহিত্যে ৯টি প্রবন্ধ আছে। 'বরস্তী'—কি না জ্যোতিঃ! বটব্যাল মহাশয়, ৪ পৃষ্ঠায় ইহাই বলিয়াছেন। 'বেশের [বর্ণ-বৈচিত্র্য]—জ্ঞাতব্য, কিন্তু অনাবিষ্কৃত। 'মীর কাশেম' ও দেবী সিংহের অত্যাচার', দুইটীই একজাতীয়, বিস্তৃত, কিন্তু তেমন নূতনত্ব কৈ? প্রতিশোধ—ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস। সমালোচন—পূর্ব্বে 'সাধনা'-'নব্যভারতেরই' থাকিত, আজকাল, পাঁচজনের নিন্দার দায়ে, আরও দুই এক খানার 'না-করিলে নয়-গোছের' করা হইতেছে।

'সাহিত্য'—আমাদের বড়ই আদরের জিনিস। সাহিত্যের সামান্য অবনতিতে আমাদের বড়ই কষ্ট হয়। আমরা প্রার্থনা করি—সাহিত্য আবার সর্ব্ববিষয়ে উন্নত হউক।

কল্পতরু—'বঙ্গতরু-জিজ্ঞাসু সভার' মহাসুভূতি-ক্রমে প্রকাশিত। মাসিক পত্র। ফাল্গুন মাসের।

তত্ত্বসভা, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, সপ্ততত্ত্ব, তত্ত্ব বার্ত্তা—পত্রখানির সমস্তই তত্ত্বময়। বাঙ্গালা মাসিক কাগজের—"B. K. Mozumder, Editor. D.N.Gosvami. It.Editor" ইহাও সুতরাং তত্ত্বমূলক!

"শ্রীমান্ স্টি, কিট্‌লির মাতার পীড়ার বৃদ্ধি, যুবকসমিতির অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতি, Executive Notice, শ্রীমতী অন্নবাসস্তীর (?) বক্তৃতার বিজ্ঞাপন"—দেড়

পৃষ্ঠা-পরিমিত এই ওলিই পত্রিকার 'তত্ত্ববার্ত্তা।'

অত 'তত্ত্ব' বোধিগম্য হইবে কিনা—চিন্তায়, পত্রখানির ভিতরেই প্রবেশ করা হইল না।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চীন-জাপান।—যুদ্ধ পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। উভয়েই এখনও সন্ধির চেষ্টা পাইতেছেন। জাপান, যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য, ঋণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

রুসিয়া।—নূতন জার প্রজার প্রতি বড়ই সদয়-ভাব দেখাইতেছেন। কিন্তু প্রজারা অধিকাংশ কেহ কেহ তাঁহাকে মানিতে প্রস্তুত নহে। মর্ম্মে একদল যুবক বিদ্রোহী হয়; এবং একমাত্র ক্ষমা প্রার্থনায় তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া, সম্রাট সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

পরের সংবাদ, নূতন জার বড়ই পীড়িত।

ট্রেণে দুর্ঘটনা।—গত শনিবার জঙ্গলপুরের মেলট্রেণে বড়ই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কতকগুলি দুইলোকের—সম্ভবতঃ সস্যার বড়ঘরে রেলগাড়ী অউটরেল' হয়; দু'ইভার, গার্ড এবং আরও অনেক কর্ম্মচারী মারা পড়িয়াছে, আরোহিগণের কত মরিয়াছে, তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া করিন। আহতগণ জরুরদুস্তের ইসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। দস্যুদিগের সন্ধান চলিতেছে; কিন্তু এখনও বিশেষ ফলফলে নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন—রেলওয়ে-কর্ম্মচারীরের যোগ-সাজে এই কার্য্য হইয়াছে।

তারকেশ্বরের মকর্দ্দমা।—গত শুক্রবার তারকেশ্বরের উইলের 'মকর্দ্দমার রায় বাহির হইয়াছে। মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয়ের ও'কেনলি বাহাদুর, হুগলি-কোর্টের রায় বহাল উইলখানি প্রকৃত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতঃপর মহান্ত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গিরি মহাশয়ই তারকেশ্বরের স্বাধীন মোহান্ত হইলেন। কেশবচন্দ্র গিরিকে খরচের দায়ী হইতে হইয়াছে। তাহা হউক, মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে—আনন্দের বিষয়। এক্ষণে, আমরা প্রার্থনা করি, নবপ্রতিষ্ঠিত মহান্ত মহাবরজ ন্যায় ও ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিয়া, আপনার সৎকীর্ত্তির পরিচয় দিবেন। তাঁহার নিকট হিন্দুসমাজ সমূহ আশা করিয়া থাকেন।

রঙ্গভূমির যে-বন্দোবস্ত।—এসম্বন্ধে আমাদের কোন বিশস্ত ব্যক্তির পত্রখানি এইখানেই প্রকটিত হইল। তরসা করি, এতদ্বারা তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িবে।

"অনুসন্ধানের সম্পাদক মহাশয়—বড় দুঃখেই থিয়েটারের 'সিজন কাড'গুলি জলতে দিয়াছিলেন আজকাল সম্পাদকদিগেরও যেমন মানাপমান বোধ অল্প, থিয়েটারের অধ্যক্ষ-সম্প্রদায়েরও তত্তোধিক বাঁধুনি-বন্দোবস্ত! বলিহারি যাই! বড় দুঃখেই কথাটা বলিতে হইল। সেদিন কোন একটা থিয়েটারে—অবশ্য নাম করিয়া তাঁহাদের পসার মাটী করিতে চাহি না—দেখিলাম, একজন প্রকৃত সম্পাদক বসিবার আসন পাইতেছেন না, আর একজন সম্পাদকের প্রাতনিধি-স্বরূপ করিমন্দী প্রেস-মেম্বর সম্মুখের আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। থিয়েটারের কর্ত্তারের এখবা কেহ জানাইলেনও; কিন্তু "আচ্ছা দেখি ভবি বলিয়া অনবসর-বশতঃই হউক—কি কি-সমস্ত থাকায় বলিতে পারি না, সে সম্বন্ধে আর কিছু উচ্চবাচ্য হইল না। অপমান-বোধে কেহ কেহ উঠিয়া গেলেন; না বুঝিতে পারিয়া অনুরে বসিয়া রহিলেন। গতিক দেখিয়া—আর সেদিনের আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খের বর্ণিয়া, খুসীর আস্কি আর সেখানে প্রবেশ করিলাম না। অন্যত্র বিয়া সে দিন থিয়েটার দেখি।"

এই বলিয়া প্রতিনিধি মহাশয়, থিয়েটারের অন্যো-বস্ত-সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—"রঙ্গ-কর্ত্তাদের উচিত যে—সম্পাদক স্বয়ং বা সম্পাদকীয় বিভাগের পরিচিত লোক ভিন্ন অপরকে প্রবেশ করিতে না দেওয়া, এবং (২) যদি দেওয়া হয়, তবে সম্পাদকের সম্মানার্হ আসন হইতে তাহা ভিন্ন করা।"

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অষ্টম বর্ষ। ১লা চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। ৪৪শ সংখ্যা।

একটী রূপক।

পদকর্ত্তা চৈতন্যদাস অতি আশ্চর্য্যরূপে গোবর্দ্ধন-লীলার রূপকচ্ছলে, মহাপ্রভু চৈতন্য-দেবের পাতকী-উদ্ধার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন। সংক্ষেপে রূপকটীর বিষয় এই:—মহাপ্রভু জীবগণকে বলিলেন, "আর ইন্দ্রাদি দেবতা-দিগের অর্চ্চনা করিতে হইবে না। নাম শ্রবণাদি নবধা অঙ্গে; ও শান্তদাস্যাদি পঞ্চফলে; সাত্ত্বিক ভাবাদি উপকরণে; স্বীয় ইন্দ্রিয়গ্রামকে বলী প্রদান করিয়া, শুদ্ধ ভক্তিরূপ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূজা কর, তাহাতে প্রেমমণি-রূপ ইষ্ট ফললাভ হইবে।" জীবগণ;—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্॥"

এই নববিধ ভক্তি অঙ্গে; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর পঞ্চফলে; ও, স্তম্ভ, প্রলয়, রোমাঞ্চ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, বেপথু, অশ্রু ও বৈবস্থ এই অষ্টবিধ উপকরণে; ভক্তিরূপ গোব-র্দ্ধনের অর্চ্চনা আরম্ভ করিলে, কলি-রূপ দুর্ব-পতি, কুমতীরূপা ইন্দ্রাণীসহ অধর্ম্মরূপ ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক কাম-মেঘ বর্ষণ, ক্রোধ-বজ্র নিক্ষেপণ, লোভমোহ-রূপ শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। মদমাৎসর্য্যরূপ প্রবল ঝড় উঠিল; তাহাতে লোকের, ধৈর্য্য ধর্ম্ম উড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিল। জীবের দুর্গতি দেখিয়া ভগবান চৈতন্যদেব স্বয়ং ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়া, ভক্তি-গোবর্দ্ধন ধারণ পুরঃসর জীবগণকে রক্ষা করিলেন। জীব সেই ভক্তি-শৈলের আশ্রয় লাভ করিয়া নিরাপদ হইল। কলি-ইন্দ্র পরা-ভূত ও লজ্জিত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিল যে, "যে জন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-এই গান করিবে, তাহার উপর আমার অধিকার থাকিবে না।" মহাপ্রভুও কলির উপর সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে "ধন্য কলি" উপাধি প্রদান করিলেন। নামগ্রহণ-রূপ সহজ সাধন কেবল এই কলিকালের জন্যই:—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

জীব যদি একবার দিনান্তে বলনা ভরিয়া :—

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই ষোড়শাক্ষরাত্মক মধুর নাম গ্রহণ করে, তবে তাহাকে কলি স্পর্শ করিতেও পারে না। সুতরাং কলিকাল যথার্থই "ধন্য"—কলির জীবও ধন্য। মহাপ্রভুর ভক্ত-ভাব ধারণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্ত না হইলে জীবকে ভক্তির সাধন শিক্ষা দেওয়া যায় না এই জন্যই কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন :—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখান"

সম্প্রতি আমরা শ্রীচৈতন্যদাসের সেই রূপ-কাত্মক পদটী উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা পাঠ করিয়া, পাঠকগণ নিশ্চয়ই মোহিত হইবেন। পদকর্ত্তা চৈতন্যদাসের বৃত্তান্ত আগামী কোন সপ্তাহে লিখিব।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
পুন গিরি ধরণ, পুরব লীলাক্রম,
নবদ্বীপে করিল প্রকাশ॥ ধ্রু॥
শুদ্ধ ভক্তি-পোষণ, পূজা কর জগজন,
ঐই বিধি দিলা কলি মাঝে।
শ্রবণাদি নব অঙ্গ, করতরুময় অঙ্গ,
পঞ্চরস ফলে তাহা সাজে॥
পুলক অঙ্কুর শোভা, অশ্রুজল মনোলোভা,
মন্দবায়ু বেপথু সুন্দর।
নিজেন্দ্রিয় উপচারে, সুখ সেই গিরিবরে,
প্রেম-মণি পাবে ইষ্টবর॥
দেখিয়া লোকের গতি, কলি-যুগ-সুরপ্রতি,
কোপে তনু কম্পিত হইল।
অধরস ঐরাবতে, ক্রমতি ইন্দ্রাণী সাতে,
সসৈন্যেতে সাজিয়া আইল॥
কাম-মেঘ বরিষণে, ক্রোধ-বজ্র নিক্ষেপণে,
লোকের হইল বড় ডর।
লোভ মোহ শিলাঘাতে, মাৎসর্য্যাদি খরবাতে,
ধৈর্য্য-ধর্ম্ম উড়ে নিরন্তর॥
জানিয়া জীবের দায়, শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়,
উপায় চিন্তিল মনে মনে।
ভক্তভাব সাক্ষাৎকার, নিজে করি অঙ্গীকার,
ভক্তি-গিরি করিলা ধারণে॥
তাহার আশ্রয়ে লোক, পাশরিল দুঃখশোক,
কলি-ভয় খণ্ডিল সকলে।
তবে কলি দেবরাজ, পেয়ে পরাভব লাজ,
স্তুতি করে চরণ কমলে॥
অপরাধ ক্ষমাইয়া, কহে কিছু দীন হৈয়া,
যত জীব প্রভুর আশ্রয়।
যেন তব গুণ গায়, তাহে মোর নাহি দায়,
এই সত্য করিনু নিশ্চয়॥
প্রভু তাহে দয়া কৈল, "ধন্য কলি" নাম থুইল,
অদ্যাপিও ঘোষয়ে সংসারে।
চৈতন্য দাসেতে বলে, গোকর্ণন লীলাছলে,
যুগে যুগে জীবেরে উদ্ধারে॥

শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

হলধর চাষক।

চাষক-জাতির কোন স্থায়ী ইতিহাস না থাকাতে, তাহাদের বংশ-বিস্তারেরও ক্রমিক বিবরণ জানিবার উপায় নাই। তবে বর্ত্তমান চাষক-জাতির মধ্যস্থ দুইএকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রমুখাৎ উপন্যাসবৎ যে ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, দেব-দত্তের* পৌত্রগণের পর উহাদের মধ্যে এমন কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই, যাহা উল্লেখ-যোগ্য। ইহা নিশ্চয়ই অনুমেয় যে, কালে যখন তাহাদের বংশ সুবিস্তীর্ণ হইয়াছিল, তখন তাহারা হস্তিনা-ভূমি ত্যাগ করিয়া আপন আপন অভীষ্ট স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, সময়ের অনন্যভাব্য পরি-বর্ত্তনে যুগান্তর হইয়া যখন কলিযুগ পরিবর্ত্তিত হইল, তাহার বহুশত বৎসর পরে, ঐ জাতীয় একজন বিশেষ খ্যাতনামা হইয়াছিল; তাহার নাম ভদ্রমুখ। সেই সময়ে বহুসংখ্যক চাষক-জ্যোতি হস্তিনা হইতে মালব-গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া আপন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া-ছিল। ঐ ভদ্রমুখ উক্ত চাষকগণের প্রধান ছিল। তাহারা সকলেই কৃষিকার্য্য করিত। তবে মধ্যে মধ্যে দুই একজন পশুপালন কার্য্যেও ব্রতী হইয়াছিল। সেই ভদ্রমুখ তত্রত্য অধি-পতির অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল। যখন তথাকার হিন্দুরাজা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন, তখন ভদ্রমুখ কৃষিলব্ধ শস্যের দ্বারা স্বীয় রাজার বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিল। এবং "সম্বল" এই অর্থবোধক উপাধিও লাভ করিয়াছিল। যে উপাধি সে সময়ে বিশেষ সম্মানসূচক ছিল। কালে সেই সম্মানসূচক উপাধি ঐ জাতির অন্তর্গত সকলেই আপন আপন নামে সংযো-জিত করিত। বাঙ্গালা ও বেহারের নিবাসী হইয়া, এক্ষণে ইহারা অধিকাংশই "দাস" এই উপাধি ধারণ করিয়াছে।

ভদ্রমুখের বংশীয় দাদুনাথ যখন মালবে বাস করিতেছিল, তখন বাঙ্গলা ও বেহারের মধ্যে মগধ ও লক্ষণাবতী নগরী বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। সেই দাদুনাথ একবার কোন কার্য্যোপলক্ষে মগধে আগমন করে এবং সেই সময়ে লক্ষণাবতী নগরও দেখিয়া যায়। সে তথাকার শস্য-শ্যামলা ভূখণ্ড, নবনব পল্লব-সমাকীর্ণ তরুরাজী ও দিগন্তপ্রবাহিণী সুবিস্তৃতা তটিনীর তটভূমি দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া-ছিল। এবং সেই সকল স্থান কৃষিকার্য্যের যে সবিশেষ উপযোগী, তাহাও সে উপলব্ধি করিয়াছিল; এবং মগধ হইতে আসিয়া সেই তটবর্ত্তী ভূভাগে উপনিবেশ সংস্থাপন করিলে তাহাদের কৃষিকার্য্যের যে সমধিক উন্নতি হইবে, তাহাও সে চিন্তা করিয়াছিল।

তাহার সেই ইচ্ছাই এদেশীয় চাষক-জাতির জননী। দাদুনাথ দেশে গিয়া আপন জাতীয়গণের সমক্ষে মগধ ও লক্ষণাবতীর ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করে। তত্রত্য উর্ব্বরা ভূমিখণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করে ও মগধের সীমান্ত-প্রবাহিণী গঙ্গার তটদেশে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপনের প্রস্তাবনা করে। যদিও সে

*দেবদত্তের বিবরণ "বনদেবী" শীর্ষক কিম্বদন্তীমূলক উপাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে।

সময়ে তাহারা সকলে আসিয়া মগধে উপনিবেশ সংস্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ফলতঃ সেই সময় হইতেই বাঙ্গালা ও বেহার প্রদেশ কৃষিকার্য্যের যে উপযুক্ত স্থান, তাহা তাহারা পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল।

যে সময়ে সেনবংশীয় সুবিখ্যাত রাজা বল্লাল-সেন আদিশূরের আনীত প্রগ্ ব্রাহ্মণের সন্তান-সন্ততিগণের ও তাঁহাদের ভৃত্যগণের সন্তান-সন্ততিগণের সমাজ-বন্ধন করেন, প্রবাদ আছে, তদ্দিতর জাতিরও সমাজবন্ধন সেই সময়ে সংঘটিত হয়। তাহার প্রায় তিন চারি শতাব্দী পরে, হলধর চাষক-জাতীয় মহীপতি নামক একব্যক্তি ব্যবসায়-উপলক্ষে লক্ষণাবতী নগরে আগমন করে, এবং সেই ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ পাইয়া সেই নগরেই আপন বাসস্থান নির্দ্দেশ করে। যখন বখ্‌তিয়ার খিলিজি বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা, তখন মহীপতির উত্তরাধিকারি-গণ গৌড়মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল।

তাহাদের উন্নতি দেখিয়া, ক্রমে ক্রমে স্বদেশ হইতে অনেক চাষক-জাতি আসিয়া বাস করে। এবং কৃষিকার্য্যের দ্বারা প্রচুর অর্থলাভ করে ও তাহাদের দ্বারাই বঙ্গীয় চাষক-জাতির বংশ-বিস্তার হইতে থাকে।

যখন তাহারা স্থায়ীরূপে বাঙ্গালার নিবাসী হইল, তখন তাহাদের কৌলিক ক্রিয়াদি সমাধানের জন্য যাজক-ব্রাহ্মণের আবশ্যক হইল। ইহাদের প্রদেশে আগমনের পূর্ব্বে যে বঙ্গীয় সমাজবন্ধন হইয়া গিয়াছিল, তাহা উক্ত হইয়াছে। কাজেই ইহাঁরা আসিয়া বঙ্গীয় কোন সমাজের মধ্যস্থ হইতে পারে নাই। তখন নবপ্রথিত সমাজের দৃঢ়বন্ধন। সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই নবাগত নিদেশী চাষক-জাতির সহিত মিলিত করিতে কাহারও সাধ্য হয় নাই; এবং ইহারাও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ ভিন্ন, অপরাপর জাতির আচার-ব্যবহার কখনই দৃষ্ট দেখিয়া, তাহাদের সহিত সম্মিলন করিতে কখনই অভিপ্রায় প্রকাশ করে নাই। বঙ্গীয় শূদ্রসকল ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিত, ইহারাও অগত্যা ঘৃণা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইত। উত্তরকালে সেই ঘৃণাই উভয় সমাজের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব সংস্থাপন করে।

তাহাদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন পুত্র-কন্যাগণের পরিণয়াদি সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল, তখনই তাহারা যাজক ব্রাহ্মণের জন্য লালায়িত হইয়াছিল। স্বদেশ হইতে স্বীয় পুরোহিত-ব্রাহ্মণকে এদেশে আনিবার জন্য চেষ্টাও করিয়াছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ স্বদেশের মমতা-প্রযুক্ত এদেশে আসিতে স্বীকৃত হয়েন নাই। হলধর জাতি তখন অনন্য উপায় হইয়া এদেশীয় ব্রাহ্মণগণকেই স্বীয় যাজন-কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করিল; কিন্তু এদেশীয় ব্রাহ্মণ-গণও সমাজের অনুরোধে কেহই তাহা করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই। সে সময়ে যে সকল বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ শূদ্রযাজক ছিলেন, তাঁহারা যে সকল জাতির যাজকতা করিতেন—তাহাদের আচার-ব্যবহার যেরূপ ছিল, চাষক-জাতির আচার-ব্যবহার তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না; তাহাদের যাজকতা করিলে তাঁহাদের যে কোনরূপ ক্ষতি নাই ও তাহাদের যাজনকার্য্যের দ্বারা প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে—তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তথাপি সেন-রাজার গঠিত সমাজবন্ধন ছিন্ন করা তাঁহাদের ক্ষমতাতীত হেতু, ইচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহারা তাহাদের যাজকতা কার্য্য করিতে বিমুখ হয়েন।

সেই সময়ে গৌড়ের সন্নিহিত পাণ্ডুয়া নামক স্থানে শ্যামনাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বনিবাস মেদিনীপুর

জেলায় ছিল। নবাব-সরকারে চাকুরী উপলক্ষে গৌড়ে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সময়ের কথা উল্লিখিত হইতেছে, সে সময়ে তিনি কোন কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন না, তখন ধর্ম্মার্জ্জনই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল, এবং তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কোন সমাজের পক্ষপাতী ছিলেন না; সাম্যনীতি প্রচারই তাঁহার জীবনের মহান্ ব্রত ছিল। তিনি চাষক-জাতিকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া করুণাযুক্ত হন, এবং বঙ্গীয় সমাজ-বন্ধন ছেদ করিয়া তাহাদের যাজন-কার্য্যে ব্রতী হয়েন। তাঁহার এই কার্য্যে দেশমধ্যে এক মহান্ আন্দোলন পড়িয়া যায় এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বিজাতীয় ক্রোধ-পরবশ হইয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন।

ইহার কিছু দিন পরেই মহাত্মা চৈতন্যদেব স্বীয় উদারনৈতিক ধর্ম্ম প্রচারো-দ্দেশে গৌড়ে আগমন করেন। সেই সময়ে বঙ্গসংখ্যক চাষক চৈতন্য-প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই তাহাদের মধ্যে যে পঞ্চমাংস ভোজন-প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক হ্রাস হইয়া আইসে।

সায়নাচার্য্য সমাজচ্যুত হইলেও নিঃসহায় হয়েন নাই। তাঁহার অখণ্ডনীয় তর্কে প্রবাজিত হইয়া, একে একে অনেক ব্রাহ্মণ চাষক-জাতির পৌরোহিত্য-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এইরূপে ক্রমে তাঁহাদেরও দলপুষ্টি হইতে লাগিল।

কালের তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতে যখন গৌড়নগর ধ্বংস হয়, যখন প্রবল সংক্রামক ব্যাধি গৌড়ের অগণ্য নরনারীর জীবনলীলা শেষ করিয়া দেয়; তখন গৌড়বাসী বহু মনুষ্য, আপন আপন জীবন লইয়া, কেহ গঙ্গা পার হইয়া রাঢ়ভূমিতে, কেহ বা মহানন্দার পূর্ব্ব-তীরবর্ত্তী বরেন্দ্র-ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে, কেহ বা দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। সেই সংক্রামক ব্যাধিতে গৌড় জনশূন্য হয়। বর্ষাগমনে পৌড়ার উপ-দ্রব প্রশমিত হইলে, যাহারা নিকটবর্ত্তী রাঢ় ও বরেন্দ্র-ভূমিতে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা পূর্ব্ব-মমতা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া আবার একে একে গৌড়ে আগমন করিতে লাগিল। হলধর চাষক-জাতিরাও পলায়ন করিয়াছিল। তাহার মধ্যে যাহারা স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিল, তাহারা আর ফিরিয়া আসিল না। যাহারা রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা আবার একে একে আসিয়া গৌড়ে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। যাহারা বরেন্দ্র-ভূমিতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা মাত্র দ্বাদশ ঘর; সেই দ্বাদশ ঘর ফিরিয়া আসিল। রাঢ়ভূমিতেই অধিকাংশ চাষক-জাতি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; তাহারাও বহুসংখ্যক একত্রিত হইয়া, পুনরায় গৌড়ে উপস্থিত হইল। সেই অবধি, বরেন্দ্র-প্রদেশাগত দ্বাদশ ঘর বারেন্দ্র-চাষক "বারঘরিয়া" ও রাঢ়-প্রদেশাগত রাঢ়ী "দেশ পাড়িয়া" (অর্থাৎ দেশ ব্যাপী) এই আখ্যায় অভিহিত হইতে লাগিল। মূল কথা, সেই অবধি ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই ইহাদের মধ্যে এক ভুমুল গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। সে বিবাদের মূল কারণ, পরস্পরের আচার ব্যবহার-গত বৈষম্য। যাহারা রাঢ়-ভূমিতে গমন করিয়া-ছিল, তাহাদের আচার ব্যবহার কিছু দুষ্ট হইয়াছিল; সেই আচার ব্যবহার সংশোধন করিবার জন্য বারেন্দ্র চাষকজাতি তাহাদিগকে অনুরোধ করে, কিন্তু এস সংখ্যার আধিক্য প্রযুক্ত তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। ক্রমে

সেই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া এমন বৈরভাব উপস্থিত যে, দুই শ্রেণী যেন দুইটী পৃথক্ সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়ায়, কেবল স্বীয় সামাজিক বিষয়েই ইহাদের ঐ প্রকার বৈরভাব লক্ষিত হইত; নতুবা অন্যান্য সকল বিষয়ে ইহাদের সম্পূর্ণ একতা ছিল।

এক্ষণে এই দুই শ্রেণী বহুসংখ্যক চাষক-জাতি ভ্রাতৃবৎ গৌড় বেষ্টন করিয়া বাস করিতেছে। ইহাদের অধিকাংশই অসভ্য ও অশিক্ষিত। তবে মধ্যে মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকও প্রবেশ করিয়াছে। ইহারা সকলেই প্রায় কৃষিজীবি। কেহ কেহ 'পলুপোষা' ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে এবং দুই একজন বিদ্যাশিক্ষা করিয়া চাকরী-বৃত্তিও অবলম্বন করিয়াছে। বারেন্দ্র চাষক-জাতির আচার ব্যবহার মন্দ নহে। ইহারা সকলেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী; স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মালা-ধারণ ও তিলক সেবা করিয়া থাকে। রাঢ়ীয় চাষকগণের আচার ব্যবহার এখনও সম্পূর্ণ সংস্কৃত হয় নাই।

কত সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই দেবদত্তের বংশীয় হলধর চাষক জাতি পৃথিবী-বক্ষে থাকিয়া হলায়ুধের সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছে। যে সময়ে ইহারা বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিল, সে সময় যদি বঙ্গীয় সমাজ-বন্ধন কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ইহারাও কোন জল-স্পৃশ্য জাতির মধ্যগত হইতে পারিত এবং ইহাদের পুরোহিত-ব্রাহ্মণগণও স্বীয় সমাজ হইতে বিচ্যুত হইতে পারিতেন না।

এদেশীয় শূদ্রগণ ইহাদিগকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া অভিহিত করে; ইহারা তাহা স্বীকার করে না, এবং বল্লালসেনের সমাজ-বন্ধনে বদ্ধ হইতেও চাহে না। তাহা না চাহিলে কি হইবে? স্বীয় সমাজের লোক-বিরলতা প্রযুক্ত দেশীয় সমাজের নিকট ইহাদিগকে অনুক্ষণ মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হইতেছে।

ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাই যে, দিল্লি প্রভৃতি প্রদেশে তাহাদের স্বজাতীয় অনেক লোকের বাস আছে। তাহারা স্বদেশে ঘৃণ্য ও জলাশশীয় নহে। তাহারা এদেশীয় চাষক-জাতিকে ঘৃণার চক্ষুতে দৃষ্টি করে। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে একজন পশ্চিম-দেশীয় সম্ভ্রান্ত চাষক জলপথে ভ্রমণ করিতে করিতে গৌড়ের সন্নিকটে আসিয়া একজন এ দেশীয় চাষকের সহিত আলাপ করে। এবং কথাবার্ত্তায় এতদ্দেশীয়দিগের পলুপোষা প্রভৃতি ব্যবসায় জ্ঞাত হইয়া "সব চামার হো গিয়া" এই কয়টী মাত্র কথা উচ্চারণ করে; এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

শ্রীশশিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সাবিত্রী।

প্রকৃতি-প্রশান্ত-ফুল্ল সপ্তচ্ছদ তলে,
পৌর্ণমাসী-যামিনীর শান্তিময় কোলে;
হীরক-সন্নিভ-আভা,
প্রদীপ্ত-সুন্দর প্রভা,
তারা-দল বিভাসিত নীলাভ গগণে;
কি দেখ কামিনী রঙ্গ নিথর নয়নে?

বাসন্তী-পবনে দোলে মল্লিকা-বল্লরী,
ফুল্ল-ফুলে কচি হাসি লতিকা সুন্দরী;
কাঁচা মুখে কচি হাসি,
প্রকৃতি হৃদয়ে পশি,
করিতেছে শোভাময় না হেরি নয়নে—
কি দেখ গো সতীশ্বরি! নীবিড় কাননে?

আকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্র স্থির অবিচল,
হৃদয়-বসন অর্দ্ধ উন্মুক্ত কেবল;
স্বনে বহে দীর্ঘশ্বাস,
জীবনে ছাড়িয়া আশ,
কর-পুটে হৃদে ঘাত মার কি কারণ?
কি কারণে পাগলিনী হয়েছ এমন?

নীলোৎপল বিনিন্দিত নেত্র নিরমল,
গণ্ডদেশ বিপ্লাবিয়ে বহে অশ্রু-জল;
ধূলি বিজড়িত কায়,
বাত্যা আন্দোলিত প্রায়,
এলান চিকুর-পাশ অপৃষ্ঠে লম্বিত;
কেন ধরা-দেহ করে নিয়ত চুম্বিত?

সুঠাম সুগোল কান্তি সূক্ষ্মি মুরতি,
নিতম্ব নিবিড় দীপ্ত আজানু গুম্ফতি;
শ্যামল তৃণের দলে,
ক্ষণে উঠে ক্ষণে চলে,
কণ্টক আঘাতে হায় বিক্ষিপ্ত শোণিত,
কেন বল শ্যাম-তৃণ হয়েছে রঞ্জিত?

চন্দ্র-কর-স্নাত-ফুল্ল বিনোদ দর্শন,
স্বর্গীয় সুন্দর জ্যোতি বিমল আনন;
চারু সুরলতাময়,
মুখানিতে এত সয়,
কালিমা কেন দেখি নিষ্প্রভ নয়ন!
নহে কেন পূর্ব্বমত সুন্দর তেমন?

নেত্র নীলোৎপল-স্থিত দুইটি খঞ্জন,
জড় সড় পক্ষ কেন স্তম্ভিত এমন?
নাহি সাড়া শব্দ লেশ,
কেন এত হীন বেশ?
স্বর্ণ-অঙ্গ আভরণে নাহিক ভূষিত;
স্বর্গের প্রতিমা খানি মরতে পতিত!

প্রভাত শরত-শশী হীনাভ যেমন,
কে তোমার অঙ্কদেশে করেছে শয়ন?
নিবিড় ঘুমের ঘোরে,
বাহ্যজ্ঞান একেবারে,
করিয়াছে পরিহার নির্ভয় হৃদয়ে,
কাননে হিংস্রক ফিরে শীকার চাহিয়ে।

সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর নিশি ঘুরব গগণে,
নিঝুম প্রকৃতি আছে গভীর বদনে।
কাঁপে না পল্লব পাতি,
নিবিল তাহার ভাতি,
ভয় নাই রে উন্মত্ত কিছু মাত্র তোর?—
হিংস্রক জীবের কাছে খাটেনা-ক জোর।

তাই বলি উঠ ত্বরা উঠরে ঘুমন্ত,
নতুবা এখনি হবে ও জীবন অন্ত;

জগতের আলোক রাশি,
শিরেতে তব বসি,
দেখিতে কাহারো নাহি হবে কিছু কষ্ট,
এখনি হইবে তুমি উপাধান ভ্রষ্ট।

সজীব প্রতিমা খানি কর প্রসারণে,
খেদায় মশকবৃন্দে ধীর সঞ্চালনে;
যদি চল সমীরণে,
নড়ে কেশ শিরস্থানে,
অমনি কামিনী বৃত্ত কর প্রসারণে,
যথা স্থানে রাখে তায় বিষর বদনে।
মৃণ্ময়ী প্রদীপ্ত প্রভা ভাস্কর সমান,
আরক্ত লোচনে কেবা পুরুষ প্রধান,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড খণ্ড,
সমকক্ষে শোভে দণ্ড,
গ্রাসিতে চাঁদেরে রাহু এত লালায়িত;
কুলীশ কোলেতে ফুল হতেছে শায়িত।

বুঝেছি বুঝেছি দেবি, ঐ চিত্র তোমার,
মৃত পতি কোলে করি, কাঁদ অনিবার;
জলন্ত মূরতি ধরি,
শমন সম্মুখে করি,
কর জোড়ে পতি প্রাণ চাহি বারেবার;
নিষ্ঠুর শমন মন হ'লনা কাতর।

এ জগতে নারীকুলে তোমার মতন,
পতিগতা প্রাণা নারী আছে কোন জন?
মরি কেহ পুনরায়
ফিরে কিরে এ ধরায়?
তুমি গো করিলে দেবি, লজ্জন এবার
প্রকৃতি-নিয়ম চির যা'ছিল ধাতার।

পাশ্চাত্য জগতে যদি তোমার মতন,
বিকীর্ণ করয়ে কেহ সতীত্ব কিরণ;
তা হ'লে বৈধব্য জ্বালা,
সবে না কো কোন বালা,
চিরকাল পতি-সহ প্রেম আলাপনে,
সংসার সুখের ঘরে রবে দুই জনে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

'বিষস্য বিষমৌষধম্'।

আবার জগদ্বন্ধু বাবু বলিয়াছেন,—"আপাততঃ তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করিয়া লই—ঐ বচনটী কালিদাস আয়ুর্ব্বেদ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি।"

লেখার ভাবে বুঝা যায় যে, আয়ুর্ব্বেদে 'বিষস্য বিষমৌষধম্' (ক) ভাবাত্মক কোন কথাই নাই। উদ্ধৃত কথাটী বুঝি কেবল কবিরই কল্পনা মাত্র। বাস্তবিক তাহা নহে, জগদ্বন্ধু বাবু যদি মাধব কবের নিদানস্থিত প্রথম সাতটী শ্লোক ও বিজয় রক্ষিতের টীকা সহ পাঠ করিতেন, তবে তাঁহাকে 'তর্কের খাতিরের' পরিবর্ত্তে 'সত্যের খ্যাতিরেই' ঐ বচনাংশের আয়ুর্ব্বেদ-মূলকত্ব স্বীকার করিতে হইত। "হেতুব্যাধি বিপর্য্যস্তা বিপর্য্যস্তার্থ কারিণাং।"(খ) এই শ্লোকের মধ্যে হোমিওপ্যাথির আদি

(ক) "তদেব যুক্তি যুক্তস্থ প্রাণীদায়ি রসায়নম্।"
ভাব প্রকাশে।
"বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্ত রসায়ণং।"
চরক সংহিতায়।

(খ) জগদ্বন্ধু বাবু এই শ্লোকটী অসঙ্কোচে বলেন কেন? এটী যে বৃদ্ধ বাগভট হইতে সংগৃহীত।

সূত্র আছে বলিয়া যশোদা বাবু বলিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের পূর্ব্বেও অন্যান্য কবিরাজ মহাশয়গণ এই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহা অনেকে বলে, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা ভাল। জগদ্বন্ধু বাবু সেটুকু বিবেচনা করার অবসর পান নাই। তিনি এই শ্লোকের অর্থ বুঝিবার জন্য কোন সংস্কৃতজ্ঞ ভাল কবিরাজের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন না। মাধব করের নিদান যে তাঁহার নিকটেই ছিল, তাহা তিনি আমাদিগকে প্রবন্ধের আভাসেই জানাইয়াছেন—আলস্য-দোষে (?) তাহাও খুলিলেন না। কবে তিনি 'প্রকৃতি' নাম্নী কোন একখানা পত্রিকায় একটী ভ্রম ব্যাখ্যা পড়িয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দ্বারাই কবিরাজের কথাটী একেবারে উড়াইয়া দিলেন। জগদ্বন্ধু বাবুর এ কাজটী ভাল হয় নাই। একবার নিজের রক্ষিতের টীকাটী তাঁহার দেখা উচিত ছিল। আমাদের প্রয়োজনীয় অংশে টীকাকার সংক্ষেপতঃ কিছু বলেন কি না, দেখা যাউক। টীকাকার লিখিতেছেন,—"এতন্নোরেব ব্যস্তসমস্তয়ো বিপর্য্যস্তার্থকারিণঃ (অর্থাৎ) নিদানে সমানধর্ম্মিণোঽপি প্রভাবাৎ রোগপ্রশমনকারিণঃ ইত্যাদি।" আবার অন্যত্রঃ—"হেতু সমানধর্ম্মকত্বেঽপি রোগপ্রশমনকৃত্বমিতি।" ইহাতে কি Similia Similibus Curantur কথাটী বুঝা গেল না? ইহাতে হানিম্যানের 'হোমিওপ্যাথি বা Homœopathy in individual অভিপ্রায়রূপে না হউক, হোমিওপ্যাথির মূল সূত্রটী কি ধরা পড়িল না?

নিদানের এই সূত্রটীর এই ব্যাখ্যা, হোমিওপ্যাথিদিগকে জব্দ করার জন্য, অবশ্যই কোন আধুনিক বৃদ্ধের প্রকল্পিত নহে। হোমিওপ্যাথি প্রচারের বহুপূর্ব্বে এদেশে এই ব্যাখ্যা চলিয়া আসিতেছে। ইহা অদ্যকল্যকার নূতন গড়া জিনিস নহে। 'হেতুব্যাধির সমানধর্ম্মী দ্রব্য দ্বারা কোন কোন রোগের চিকিৎসার বিধি-ব্যবস্থা প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যথা,—

"ভবেৎ কদাচিৎ ক্লাম্যেঽপি বিরুদ্ধাভি মতাক্রিয়া
অন্তর্গতং পিত্তধাতুং স্বেদসেকোপনাহনৈঃ
নয়ন্তো বহুিরুক্লেশং তত্রৈবাশু শময়ন্তি হি॥"

৩০ অধ্যায়, চিকিৎসিত স্থান, চরক।

অর্থাৎ—পিত্তঘটিত রোগেই শীতল ক্রিয়া করা সাধারণতঃ প্রশস্ত; কিন্তু এমন অনেক স্থল আছে, শীতক্রিয়া না করিয়া বরং তদ্বৎ স্থলে উষ্ণক্রিয়া দ্বারাই ব্যাধির শান্তি হয়। পিত্তঘটিত ক্লৈব্য-রোগে বাহ্য উষ্ণ প্রলেপাদি দ্বারা তাহার তাপ নির্গত হইয়া উষ্ণতার শান্তি হইয়া থাকে। কিন্তু সেই স্থলে শীতবীর্য্য সেক বা প্রলেপাদি বাহ্যপ্রয়োগ করিলে, ঐ উষ্মা শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রোগের আরও বৃদ্ধি করিতে পারে। বস্তুতঃ এরূপ উষ্ণ প্রয়োগে অন্তর্গত শ্লেষ্মারই ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা। অতএব, সেইস্থলে উষ্ণক্রিয়া দ্বারাই পিত্তের নিবারণ করা উচিত।

আবার অন্যত্র,—

"মিথ্যাতিহীন পীতেন যো ব্যাধিরুপজায়তে,
সমপীতেন তেনৈব সমাদ্যোন্মোপশম্যতি।"

১২ অধ্যায়, চিকিৎসিত স্থান, চরক।

অর্থাৎ—মদ্য অযথারূপে কিম্বা হীন কিম্বা অতিরিক্তমাত্রায় সেবিত হইলে যে সকল ব্যাধি জন্মে, নিয়মিতরূপ মদ্যপানের দ্বারায় সেই সমুদায় ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে।*

* "Tobacco, which causes giddiness, nausea etc, has been found to relieve these affection. Colchicum cures dropsy, because it diminiches the secretion of wine. Jalap creates gripes; therefore it allays the gripes which are so frequent in young children. Senna occasions colic; therefore it cures the

ইহাতেও 'বিষস্য বিষমৌষধম্' বাক্যের একটু আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু উক্ত আভাসের উপর নির্ভর করিয়া বিচার করা যুক্তিযুক্ত নহে। এমন দেখা যাউক, আয়ুর্ব্বেদে আরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না? মাধবকরের নিদানের সেই সপ্তম শ্লোকের টীকাতেই দেখা যাইতেছে যে, ঠিক সেইরূপ একটী শ্লোক আছে —যাহা না জানায় জগদ্বন্ধু বাবুকে তর্কের খাতিরে কবিরাজ মহাশয়ের কথাটী কোনরূপে ধরিয়া লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। সেটি এই;—'যদ্ভতং চরকৈঃ—বিষং বিষঘ্নমুক্তং যদ্বৎ প্রভাব প্রভাবিতং।" সম্ভবতঃ এইখানেই বুঝি, কালিদাসের পুরাকালের কথাটীর প্রথম অবতারণা।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নিদানের সপ্তম শ্লোকে এবং তাহার ব্যাখ্যাতেই হোমিওপ্যাথির সূত্রটী বীজাকারে অবস্থিতি করিতেছিল।

মাত্রার ন্যূনাধিক্য-নিবন্ধন যে ঔষধের গুণের ঠিক বৈপরীত্য ঘটে, আয়ুর্ব্বেদে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। যথা,—

"শ্লেষ্মঃ পিত্তে বনোলেপশ্চন্দনস্যাপি দাঁহকৃৎ,
ত্বগ্‌গতজ্বোঘ্নণো "রোধাৎশীতকৃচ্ছান্বধা গুরোঃ।
মুদ্গৌষ্ণ মক্ষিকাবিষ্ঠা মক্ষিকৈবতু বাময়েৎ,
অন্যেষু ভিন্ন দ্রব্যেষু চৈব তেষেক বিক্রিয়া।"

৩০ অধ্যায়, চিকিৎসিত স্থান, চরক।

অর্থাৎ, চন্দন-লেপ-শীতল বলিয়া সকলেরই জানা আছে; কিন্তু লেপ অধিক ঘন হইলে ত্বগ্‌গত উষ্মা রোধ করে বলিয়া দাহই জন্মায়। কিন্তু অঘন লেপ দাহ নিবারণ করে। মক্ষিকা বমনকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু তাহার বিষ্ঠা বমননাশক, ইত্যাদি।

আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ বচন-প্রমাণ আছে এবং এইরূপ বচন-প্রমাণের সহিত হোমিওপ্যাথির বিশেষ সংসর্গ আছে। ইহা প্রমাণিত সত্য— অস্বীকার করাই বরং গোঁড়ামি। জগদ্বন্ধু বাবু বড় অধীরভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহাই আমার দুঃখ; কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের ধৃষ্টতাও কম নহে। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ হেতু-ব্যাধির সমানধর্ম্মী উপশমের বিষয় "কিঞ্চিৎ জ্ঞাত ছিলেন, উল্লিখিত শ্লোক কয়েকটী দ্বারা কেবল তাহারই প্রমাণ হয়। কিন্তু তাঁহারা যে এই সত্যকে হানিমানের ন্যায় বিশিষ্ট অবয়বে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করিয়া জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ আছে কি? তেমনতর চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের ক্ষুদ্রাপি পাওয়া যায় কি?

"হেতু সমানধর্ম্মকত্বেঽপি রোগ-প্রশমকত্বং"—এই সত্যটি হানিমানের হৃদয়ে যেরূপ বিরাট ভাবে, উজ্জ্বলভাবে, সুতরাং পরিষ্কারভাবে, প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন্ দেশের কোন চিকিৎসকের হৃদয়ে যে তেমনভরভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণাভাব। হানিমান যে কোন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ অথবা তাহার কোনরূপ অনুবাদ পাঠ করিয়াই এই সত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় সূত্রের সহিত হোমিওপ্যাথির সম্বন্ধ আছে, তাহা সত্য; কিন্তু হানিমানের হোমিওপ্যাথি কার্য্যজগতে একটী অভিনব পদার্থ। আয়ুর্ব্বীক্ষণিক পারমেটে

disease. Ipeca, is effectual in dysentry and asthma, because it possesses the power of exciting hemoraehage as asthma. Arsenic in one dose produces inflamation of the stomack and bowels and in another it surgs both. Veretrum in one dose produces cholera and in another dose cures it etc—"Vide Hahneman's "organond er rationellen" Heil kunde."

জোয়ার সহিত সর্ব্বাবয়ব-পরিপূর্ণ সুষ্ঠাম মনুষ্য-মূর্ত্তির যে সম্বন্ধ, আয়ুর্ব্বেদীয় সূত্রের সহিত হানিমানের হোমিওপ্যাথির সম্বন্ধ কতকটা সেইরূপ।

হানিমান আয়ুর্ব্বেদের ঐ বীজাকার সংক্ষিপ্ত সূত্রের আলোক পাইয়াও যদি হোমিও-প্যাথি প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার গৌরব অতুল্য, তাহা হইলেও "হোমিও প্যাথি আয়ুর্ব্বেদ হইতে অধিকল উদ্ভূত" একথা বলা বড়ই ক্ষেপামী। মনে কর, ইষ্টকালয়-নির্ম্মাণ-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন স্থপতি, দৈবাৎ কোন বালককে খেলা করিতে করিতে ইষ্টক গঠন করিতে দেখিয়াছিলেন। সেই ইষ্টক-দর্শনে তাঁহার মনে নির্ম্মাণকারিণী শক্তি (Constructive genius) একরূপ পরিচালিত হইতে লাগিল যে, অবশেষে তাঁহার সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ইষ্টকালয়-নির্ম্মাণ-কৌশল উদ্ভাবিত হইয়া গেল। সময়ে তিনি একখানা অতিসুন্দর ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিলেন। এখন কি, এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত যে, এই ইষ্টকালয়খানা বালকের ক্রীড়া-কালের গঠিত ইষ্টকের অবিকল নকল? কোথায় বা ইষ্টক-খণ্ড, আর কোথায় বা এই বিচিত্র প্রাসাদ! দৃশ্যে বল, প্রয়োজনীয়তায় বল, শিল্প-কৌশলে বল, যাহাই বল, একটীর সহিত অপরটী সর্ব্বতোভাবে অতুল্য। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের সংক্ষিপ্ত সূত্রের সহিত হোমিওপ্যাথির যেটুকু সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধটুকু ব্যতীত বেশী কোন কথা আর বলিবার নাই এবং সে সম্বন্ধটুকু অস্বীকার করিবারও যো নাই। এইটুকুই সত্য রেখা—ইহার বাহিরে উভয় দিকেই গোঁড়ামী।

শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।

বিপ্লব।

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেওয়ানজী-বাড়ী পূজার বড় ধুম।

বাড়ীটী বৃহৎ—চারি মহল। প্রথম মহলে পূজার বাড়ী; দ্বিতীয় মহলে ঠাকুর-বাড়ী, তথায় সুবর্ণময়ী জগদ্ধাত্রী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। তদুপরে অন্দর-মহল। অন্দর-মহলের পর রান্নাবাড়ী। বাড়ীর চারিদিকে 'গড়'। পাচঘুয়ারে একটী পুষ্করিণী; তাহাকে "শিড়কির পুকুর" কহে; এখানে বাড়ীর মেয়েরা স্নান করে, বাসন মাজে ও কাপড় কাচে।

পূজা-উপলক্ষে বাড়ী মেরামত হইতেছে; চুন ফিরাইয়া বাড়ী শাদা ধপ্‌ধপে করা হইতেছে; ডোমেরা আট চালা বাঁধিতেছে। অনেক ছাগ-মেষ অগ্রেই সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহারা "ব্যা" "ব্যা" শব্দে পূজা-বাড়ী জানাই য়া দিতেছে। প্রতিমায় রঙ্ দেওয়া হইতেছে, ছেলেগুলো আহারনিদ্রা ফেলিয়া হা করিয়া দেখিতেছে। বাড়ীতে ভিয়ান বসিয়াছে; অপ্যাপ্ততঃ মুড়ী, মুড়কী ও পকান্নের ভিয়ান হইতেছে। অগ্রে মুড়ী-মুড়কী প্রভৃতিরই দরকার—কারণ বাদ্যকর প্রভৃতিকে সন্দেশ-মিঠাই যোগান

কঠিন, দুই-চারিটা দিলে তাহাদের মনও উঠিবে না এবং পেটও ভরিবে না। বাড়ীতে বোধন বসিয়াছে, চণ্ডীপাঠ হইতেছে ও ঘন ঘন নহবৎ বাজিতেছে। ঈশ্বর কুটুম্ব জুটিয়াছে; কুটুম্ব অপেক্ষা কুটুম্বিনীর ভাগই অধিক। তাহাদের কাহারও ছেলে কাঁদিতেছে; কাহারও কন্যাকে অন্য ছেলে প্রহার করায়, চীৎকার-শব্দে রোদন করিতেছে। কেহ খাবার জন্য, কেহ বস্ত্রের জন্য, মাতার নিকট আব্দার লইয়াছে। "ও মেজ বৌ, এদিকে আয়!" "ও শ্যামা, জল দিয়ে যা।" "ও বামী, তোর কি মাচ-কোটা এখনও হলো না?"—ইত্যাদি শব্দ চতুর্দ্দিকে হইতেছে। দেওয়ানজীর মাতা, পুত্রের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, নারায়ণের তুলসী দিতেছেন; স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে।

বেলা প্রায় আড়াই প্রহরের সময়, ভাগীরথী-তীর জনতায় পরিপূর্ণ হইল। দেওয়ানজী মহাসমারোহে বাড়ী আসিতেছেন। তাঁহার পতাকা-যুক্ত তরী-সকল দূরে দেখা দিয়াছে; নৌকার সিপাহীগণ ঘন ঘন বন্দুক ছুড়িতেছে।

ক্রমে তরী-সকল ঘাটে আসিয়া থামিল। পুরুষেরা হরিধ্বনি ও স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি দিয়া উঠিল। দেওয়ানজী তরী হইতে তীরে নামিলে, গ্রামস্থ দশবল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বাড়ী-অভিমুখে চলিল। রাস্তার মধ্যে যেখানে যেখানে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি দিতে লাগিল, দেওয়ানজী গোণা-পাঁথা নহে—সিকি-দোয়ানী ছড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে বাড়ী পৌঁছিয়া, চতুর্ভুজ স্বর্ণপ্রতিমাকে প্রণাম করিয়া, অন্দর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বড়-বৌও শিবিকারোহণে চলিলেন। তাঁহাকে কাঁদে করিয়া, বেহারারা, "মাগী বড় ভারি" "মাগী বড় ভারি" বলিতে বলিতে, ছুটিতে লাগিল। গ্রামের ছোট ছোট বিস্তর মেয়ে পাল্কীর সঙ্গে বৌ দেখিতে ছুটিল। তাঁহাকে সম্ভাষণ করিবার জন্য বিস্তর পাড়ার মেয়েরা জুটিয়াছিল। তিনি যেমন পাল্কী হইতে নামিলেন, অমনি তাহারা ছুটিয়া গিয়া, হাত ধরিয়া উপরে লইয়া চলিল। "উঃ! বড় গরম! বড় গরম!"—বলিতে বলিতে, বড়-বৌ উপরে চলিলেন।

মাতাকে প্রথাম করিয়া, দেওয়ানজী দালানে বসিলেন। তখন ভগী, ভাগে, ভাগী প্রভৃতিরা আসিয়া প্রণাম করিয়া, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। হরগোবিন্দ রায়, দাদা আসিতেছেন বলিয়া, খিড়্‌কীর পুকুরে মাছ ধরাইতেছিলেন। এক্ষণে, দাদা বাড়ী আসিয়াছেন শুনিয়া, আহ্লাদে ছুটিয়া আসিয়া, অগ্রজকে প্রণাম করিলেন।

দেওয়ানজী, মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, এটী কে?"

"ওযে হর! চিন্‌তে পারছ না?"

দেওয়ানজী, কেবল "হুঁ" বলিলেন; ভ্রাতার সহিত কোন কথা না কহিয়া, অপরের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

আহারের সময় আবার, রামগোবিন্দ, হরগোবিন্দকে দেখাইয়া কহিলেন,—"মা, এটী কে?"

এখন হরগোবিন্দের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল; অভিমানে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; এমন কি, চক্ষে দুই-এক বিন্দু জলও আসিল। তিনি, চক্ষেরজল চক্ষে শুষ্ক করিয়া, কহিলেন,—"দাদা! আপনি আমাকে চিন্‌তে পারলেন না?" এই বলিয়া, হরগোবিন্দ আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাতের গ্রাস মুখে উঠিল না; ভ্রূকুঞ্চিরাবনত বদনে তিনি বাহিরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

"ওরে যাস্‌নে! আমার মাথা খাস্‌—ফের!

ওরে—শোন! তোর কিসেয় দুঃখ—ফের!"—বলিয়া, পশ্চাৎ পশ্চাৎ মাতাঠাকুরাণীও ছুটিলেন। দাদী সুখদাও, "হেই ছোড়্‌দা, তোমার পায়ে পড়ি, ফের"—বলিতে বলিতে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিন্তু আর তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ইতিপূর্ব্বে জমিদার রামগোবিন্দ রায় ও তৎপত্নীকে হরগোবিন্দের বিবাহ-সূত্রে যুদ্ধ বাধে। ঐ যুদ্ধে বড়-বৌ পেন-কাটা ছুরির সাহায্যে জয়লাভ করেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর সন্ধি হয়—"হরগোবিন্দকে বাড়ী হইতে তাড়াইতে হইবে। তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য, দেওয়ানজী বাড়ী গিয়া প্রথমে কথা কহিবেন না; তাহাতে যদি না যায়, অন্য উপায় দেখা যাইবে। আরও, হরগোবিন্দের সহিত মৃণালবালার যে সম্বন্ধ হইতেছে, তাহা চাহিয়া গণেশের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিতে হইবে।" এক্ষণে, হরগোবিন্দ প্রথমটীতেই দৃষ্টত্যাগ করিয়া যাইলেন; সুতরাং আর দ্বিতীয় উপায় দেখিবার আবশ্যক হইল না। কেবল বাকী রহিল—গণেশের সহিত মৃণালের বিবাহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পদ্মগ্রামে কেহ হঠাৎ বড়-মানুষ হইলে, দরিদ্র ব্যক্তিরা যেমন কিছু পাইবার প্রত্যাশায় কর্ত্তার নিকট আসিয়া বসিয়া থাকে, তোষামোদ করে, মনভুলান কথা কয়; তেমনি দরিদ্রা রমণীরাও গিন্নীর নিকট আসিয়া তদ্রূপ করিয়া থাকে। দেওয়ানজী-বাড়ীতেও এই সম্প্রদায়ের বিস্তর স্ত্রীলোক আসিয়া বড়-বৌয়ের শুভাগমন-জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি পাল্কী হইতে নামিবামাত্র, তাঁহার হাত ধরিয়া উপরে লইয়া যাইল, এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কেহ—"উঃ! বড় ঘর্ম্মিছো" বলিয়া, বাতাস দিতে লাগিল। বড়-বৌ কহিলেন,—"বড্ডো মাথা ধরেছে।" কেহ কহিল,—"মাথা-ধরার আর অপরাধ কি! নৌকোয় আসার কি কম কষ্ট!" কেহ কহিল,—"সময়ে আহার-নিদ্রা নেই; মাথা ধরবেই তো!" একজন,—"আমি মিছরি ভিজিয়ে এনে দিই!"—বলিয়া, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। বড়বৌ কহিলেন,—"উঃ! উঃ! বড় মাথা ধরেছে; বামা! গোলাপজল দে তো!" বামা চাকরাণী তৎশ্রবণে এক বোতল গোলাপজল আনিয়া দিলে, একমাগী থপ্‌থপ্ করিয়া তাঁহার মস্তকে দিতে লাগিল।

এই সময় সুখদা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বড়-বৌ তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"এ মেয়েটী কাঁদে কেন? এটী ওপাড়ার পুঁটে তেলির মেয়ে না?"

সুখদাও কহিল,—"ওগো, তোমরা বল্‌তে পার, আমাদের বড়-বৌ কোথায় গেলেন! তোমরা এ কানা নাগীকে ঘিরে বসে কি করছো?"

বড়-বৌ কহিলেন,—"কে ও, সুখ ঠাকুরঝি? রাগ করিসনে ভাই, প্রথমে আমি চিন্‌তে পারিনি।"

সুখদা কহিল,—"চিন্‌তে পারবে কেন? চাকার জলে বড় চোক খারাপ করে! ওদিকে বড়দা ছোট্‌দাদাকে চিন্‌তে পারলেন না, এদিকে আবার তুমি আমাকে চিন্‌তে পারছ না!"

"না, না—সত্যি বলছি, রাগ করিস্‌-নে, আগে আমি তোকে চিন্‌তে পারি-নি! তুই আগেকার চেয়ে বড্ডো রোগা, আর ময়লা হইছিস্।"

"তা, আমি কে, জিজ্ঞাসা করলেই হতো।

পুঁটে তেলির মেয়ে বলা কি ভাল হ'য়েছে? তা হ'লে পুঁটে তেলি তোমার কে হলো?"

একজন কহিল,—"অমন ভুল সকলেরই হয়।" একজন কহিল,—"মুনিদেরও মতিভ্রম হয়েছিল।"

সুখদা কহিল,—"খোষামোদ করার ঘটা দেখ! মর মাগীরে!" এই বলিয়া, সুখদা ক্রতপদে প্রস্থান করিল, এবং নিজের ঘরে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। বড়-বৌয়ের কাছে দরবার করা মিথ্যা জানিয়া, সে বিষয়ের আর আরজী দাখিল করিল না।

সুখদা চলিয়া যাইলে, স্ত্রীলোকেরা কহিল,—"বড়-বৌ, ভাই, বস, আমরা চল্‌লাম। এত অপমান জন্মে হই-নি। ভালবাসা আছে বলেই এসেছিলাম; আমরা কি খোষামোদ করতে এসেছি?"

বড়-বৌ কহিলেন,—"তোমরা বস। কর্ত্তাকে ব'লে ওকে মজা দেখাব। ওর কথায় কি রাগ করতে আছে?"

তখন একজন কহিল,—"তা সত্যি। ও তো ঘর-জামাইয়ের মাগ!" একজন কহিল,—"যার ধনে উনি ধনী, তাঁরই বৌকে এত অপমান! এতই কি বুকের পাটা? কালে আরও কত দেখ্‌বো! ধন্য কলিকাল!"

এদিকে সুখদা ও তাহার মাতা, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, কেবল কাঁদিতেছেন। দেখিয়া, জামাই বাবু (সুখদার স্বামী) মিথ্যা করিয়া কহিলেন,—"হরগোবিন্দ বাবুকে নৌকা করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া আসিলাম।" তাঁহার কথায় আপাততঃ ইহারা শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু কহিলেন,—"ঝক্‌ঝাওটার দিন—নৌকোয়—সৌকোয়—ভয় নেই তো?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হরগোবিন্দ রায় প্রস্থান করিলে, গ্রামে হলস্থূল পড়িয়া গেল। ঘাটে, মাঠে, হাটে, বাজারে ঐ কথার আন্দোলন! পাঠশালে, টোলে, অন্দরমহলে ঐ কথার আন্দোলন! যেখানে সেখানে ঐ কথার আন্দোলন।

ত্রিওণাসুন্দরীর বাড়ীতেও অপরাহ্নে একটী, দুইটী, পাঁচটী করিয়া, বিস্তর স্ত্রীলোকের আসা-দানী হইল; এবং পুনরায় ঐ কথার আন্দোলন আরম্ভ হইল। দেওয়ানজীর নিন্দা করিয়া একটী রমণী কহিলেন,—"পয়সা হুয়েছে বলে, অমন হেনস্থা করতে নেই। মার পেটের ভাই তো বটে?" অপর রমণী কহিল,—"ওলো, মিন্সের দোষ নেই; মাগীর পরামর্শেই ওরূপ হয়েছে। দেওরকে বিষয়ের ভাগ দিতে হবে বলে, মাগী লাগিয়ে লাগিয়ে অমন করেছে।" আর একজন কহিল,—"মারই বা কেমন প্রাণ! ছেলে ভাত ফেলে উঠে গেল; হাত দুখানা ধরতে নেই?"

এইরূপ আন্দোলন হইতে হইতে, হরগোবিন্দ কোথায় যাইলেন— তাহারই মীমাংসা আরম্ভ হইল। একজন কহিলেন,—"পেঁচোর মা জল আনতে গিয়ে দেখে এসেছে—জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরেছেন।" আহা! একি কম আপসোস্‌ গা! এতে আর প্রাণ রাখ্‌তে ইচ্ছে করে?" আর এক রমণী কহিলেন,—"সেই মরা বলাগড়ে ভেসে উঠেছে; থানায় রেখেছে; কত লোক দেখ্‌তে যাচ্ছে।" আর একজন কহিলেন,—"সে দেহ হরগোবিন্দের নয়, বড়-ঠাকুর দেখে এসেছেন।" আর এক রমণী কহিলেন,—"হেঁশোর মা বল্‌লে—শান্তিপুরের কাছে খেয়ায় পার হ'বার সময়, তিনি ডুবে মরেছেন।"

মৃণালবালা জনতার একপার্শ্বে বসিয়া এই সকল শুনিতেছিল। ত্রিওণাসুন্দরী কন্যার মুখপ্রতি চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"দু আর হরগোবিন্দ, দুই আমার সমান; দুটীকেই আমি সমান ভালবাসিতাম।"

এক রমণী কহিলেন,—"ঈশ্বরের শুভগ্রহ দিদি, তাই মৃণালের সঙ্গে বিয়ে হয়-নি। বিয়ে হ'লে আজ কি সর্ব্বনাশের কথা ভাব দেখি!" অপর কহিল,—"আহা! একাদশীর যন্ত্রণা কি কম যন্ত্রণা গা! দশমীর দিন ৩।৪ ঘণ্টা বসে বসে কুঁচ্‌কি-কাঠা বোঝাই নিই। রাত্রে পেট ভার হ'লে বলে, এক-পেট ছানা খাই। তবু একাদশীর দিন ফিদেয় চোকে-কাণে কিছুই দেখ্‌তে পাইনে। ত্রিওণা মাসীর বড় পুণ্যি, তাই ওখানে বিয়ে হয়-নি।" আর এক জন কহিল,—"দেখ্‌বোন, মানুষের আয়ু কখন আছে কখন নেই, কে বল্‌তে পারে? কালও হরগোবিন্দ দীঘির ধারে তালপাতা কাটিয়েছেন; আজ কোথায় চলে গেলেন!" আর একজন কহিলেন,—"কাল কি গা! আজও খিড়কির পুকুরে, দাদা আস্‌ছেন বলে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মাছ ধরিয়েছেন। আহা! ভাজা মাছ হাঁড়িতেই রইল—খেতে হল না!" অপর একজন কহিল,—"আচ্ছা, তাঁর শ্রাদ্ধটুকুও না করে তো, শ্রাদ্ধ হবে না! ওরা যে ব্যবহার কর্‌লে, তাতে যে শ্রাদ্ধি হয়—এমনও বোধ হয় না! আহা! এত বড় লোকটা ভূত হবে গা!"

স্ত্রীলোকেরা চলিয়া যাইলে, মৃণালবালা গৃহে আসিয়া শয়ন করিল, এবং অন্ধকারে কাঁদিতে লাগিল। ঐ দিন অসুখের ছল করিয়া, সে আর আহারাদি করিল না। ত্রিওণা আসিয়া কন্যার নিকট শয়ন করিলেন। হঠাৎ তাঁহার হাত মৃণালের চক্ষে লাগায়, কহিলেন,—"তোর চোকে জল কেন লা?"

মৃণাল কহিল,—"চোক-টুকাতে জল-ভার হয়েছে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দেওয়ানজী, কেবল ভ্রাতৃস্নেহ-প্রযুক্ত ভ্রাতার সহিত ওরূপ ব্যবহার করিয়া, শেষে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সুখদার ক্রন্দনে তাঁহার বক্ষে যেন শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি চতুর্দ্দিকে ভ্রাতার অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন।

মাতা কহিলেন,—"আপাততঃ সন্ধান কর—হরগোবিন্দকে, মহাশয় 'যক্ষ' দেয়নি তো? ও ত প্রায়ই দুই-একটা 'যক্ষ' দেয়!"

"যক্ষ কি, মা?"

"মহাস্তের বিস্তর টাকা। ওদের বিয়ে করতে নেই; মলে প্রধান চেলা বিষয় পায়। তাই মহান্ত ফিরে জন্মে পাবার জন্য, টাকাগুলো একটা গর্ত্তে পুঁতে, একটা জীবন্ত ছেলে কি মেয়েকে কতকগুলো খাবার দিয়ে, গর্ত্তের মধ্যে বসিয়ে রেখে, গর্ত্তের উপরে দরমা দিয়ে মাটী চাপা দেয়। ঐ ছেলে কি মেয়ে সেই টাকা আগ্‌লে বসে থাকে। তারপর ঐ মহান্ত ফিরে জন্মে বড় হ'লে, 'যক্ষ' ওর টাকা ওকে দিয়ে চলে যায়।"

দেওয়ানজী হাস্য করিয়া কহিলেন,—"মা, তোমাকে একথা বল্‌লে কে?"

"বল্‌বে আর কে? হর মাঝে মাঝে 'যক্ষ' ভেঙ্গে বিস্তর ছেলেমেয়েকে বাঁচিয়ে দিয়েছে; 'যক্ষ' থেকে কত টাকা তুলে এনেছে। আমি 'যকের' টাকা বাড়ী আনতে বারণ করতাম; শুনি কি শুনতেন? আগোনে গা-শুদ্ধ ছেলে পুটিয়ে, আমোদ করে খেতো।"

"এ কখনও সম্ভব হয়?"

সুখদা কহিল,—"হাঁ, বড়দা, হাঁ। ছোড়দা

আমাকেও ঐ টাকার ভাগ দিতেন। আমি পাড়ার মেয়েগুলোকে ডেকে এনে খাওয়াতাম।"

মাতা কহিলেন,—"হরগোবিন্দের অত কড়াকড়িতেও মহান্ত ক্ষান্ত হত না। সুখদা তোর মনে আছে?—সেই একবার একটী অতিথির মেয়েকে মহান্ত 'যক্ষ' দেয়, আর সেই শোকে লোকটা সন্ন্যাসী হয়ে যায়।"

"আছে! সে সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষ।"

"আরও একটী ছেলে পাওয়া যায়-নি—মনে আছে?"

"হাঁ মা! হরনাথ মুখুয্যের নয়? দেখ বড়দা, শনি আর মঙ্গলবার 'যক্ষ' দেবার দিন; ঐ দুই দিন ছেড়ি-দা কেবল মহান্তের বাগানের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতেন।"

দেওয়ানজী কহিলেন,—"মহান্তের অনেক লোক, ও একা; যদি ওকে মেরে ফেল্‌তো?"

"ছোড়্‌দাও, মাইনে দিয়ে নিমে নিকিড়ি, ও রেয়ে চাড়ালকে রেখেছিলেন।"

"মাইনে পেত কোথায়?"

"ঐ যে যক্ষের টাকা। আমরা খেয়ে, ওদের মাইনে দিয়ে, আরও বাঁচ্‌তো।"

এই বলিতে বলিতে, হঠাৎ মনে পড়ায়, সুখদা বলিল,—"বড়দা তোমার ব্যাগে একখানি বেস্ ঢাকাই কাপড় ছিল—নিইছি।"

"ওরে, না—না, ও সুখ, ওখানা ফেরত দে ওখানা সে নিজের টাকা দিয়ে গণেশের জন্যে কিনেছে।"

"ওঁর নিজের টাকা ত, তোমার টাকা নিয়ে?

আমি দেব না—যা করতে পার্‌বেন, কয়েন দেন!" এই বলিয়া, সুখদা ছুটিয়া পলাইল।

এই সময়, মহান্ত ব্যতীত অনেক ভদ্রলোক, দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসায়, মাতা উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

সকলেই আসিয়া হরগোবিন্দের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ক্রমে কথায় কথায় মহান্তের কথা উঠায়, দেওয়ানজী কহিলেন,—"মহান্ত নাকি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে একলা পেলে 'যক' দেয়?"

একজন কহিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ, উহার দৌরাত্ম্যে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে বাটীর বাহির করা ভার হইয়াছে। তাহা ভিন্ন, বেটা লম্পটেরও এক শেষ। ঠাকুর-বাড়ীতে দুই-তিনটে ও প্রতি তালুকে এক-একটা উহার রাখিত বেশ্যা আছে।"

"বোধ হয় অপর দোষও আছে। মদ-ভাংও চলে?"

"দিনরাত্রি।" মহান্তের অধীনে বিস্তর ডাকাইতও আছে। ঐ সকল ডাকাইত রজনীতে নৌকায় বোম্বেটে করে। কোন নৌকা গ্রামের ঘাটে রজনীতে লাগাইলে, নৌকারোহীকে সপরিবারে পাহাড় চাপা দিয়া জলমগ্ন করিয়া হত্যা করে।"

"পুজাটা আগে চুকে যাক। তার পর ভগুলী গিয়ে, ফৌজদারের সঙ্গে স্বয়ং দেখা করে, যাতে ওর সর্ব্বনাশ হয়—করবো।"

শ্রীদুর্গাচরণ রায়,
'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' প্রণেতা।

নৈদাঘ নিশীথ স্বপ্ন।

(পঙ্কু ও বিপিনের প্রবেশ।)

পঙ্কু।—ভীরু! কেন নহ অগ্রসর?

বিপিন।—সাহস যদ্যপি এত, রহ সঙ্গে ধীর।
ভালমতে জানি আমি প্রকৃতি তোমার;—
নহ ক্ষম—সম্মুখে দাঁড়াতে ক্ষণকাল;
ইতস্ততঃ পলায়ন ভরসা কেবল।
কৈ—কোথায় এখন তুমি?

পঙ্কু।—এই আমি—এস এইদিকে।

বিপিন।—বুঝিয়াছি—উপহাস করিতেছ তুমি!
সমুচিত ফললাভ করিবে ইহার—
দিবসে যদ্যপি পাই দেখিতে তোমায়।
যাও এবে! শ্রান্তিভারে এ তনুবল্লরী—
শান্তি-আশে নতপ্রায় নীহার-শয়নে।
পুরব-গগণে উষা উকি দিবে যবে,
তোমার প্রভাব আমি দেখিব তখন।

[শয়ন ও নিদ্রা।

(মানদার প্রবেশ।)

মানদা।—ক্ষান্তিময়ী মন্থরগামিনী বিভাবরী!
চঞ্চলচরণে ত্বরা করহ প্রয়াণ।
দেব দিবাকর! পূর্ব্বাশার দ্বার খুলি'
দেখাও শান্তির বিভা—দিবা-সমাগমে
ফিরে যাহে যেতে পারি বৈজয়ন্তপুরী।
—তাজিয়া সংসর্গ হেন ঘৃণার আকর।
এস নিদ্রে! বিরামদায়িনী শান্তিময়ী!
শান্তিক্রোড়ে ভুলাইয়া রাখ তনয়ারে।
বিষাদ-বিকল সদা নির্ঝর-নয়ান।
মুদিত করহ তারে বিস্মৃতি-আঁধারে।

[শয়ন ও নিদ্রা।

পঙ্কু।—
একটি দুটি তিনটি, কোথায় গেল আঁটি,
ঘোড়ায় ঘোড়ায় চাটি মিলে যাবে।
বিরসমুখে ঐ আসে, ছিঁ ছিঁ ছি মদনা হাসে
আহা! ছুঁড়িদের পাগল বানাবে!

(প্রমদার প্রবেশ।)

প্রমদা।—এত ক্লান্তি, এত দুঃখ না ভুঞ্জিনু কভু।
নীহার-নিষিক্ত দেহ, কণ্টকে ব্যথিত;
না পারি চলিতে আর, গমনে অক্ষম;
পরিক্লান্ত পদদ্বয়—না চলে ইচ্ছায়।
এখানে বিরাম লভি—প্রভাত-আশায়,
দ্বন্দ্বক্ষেত্রে রক্ষিবেন বিনোদে ঈশ্বর।

[শয়ন ও নিদ্রা।

পঙ্কু।—তুমি ধীরে, অকাতরে, অঘোরেঘুমাও।
চোখে চোখে রস মেখে, বিভ্রম ঘুচাও।

[বিনোদের চক্ষে রস-প্রদান।

যখন জাগিবে, আনন্দ পাইবে,
সম্মুখে হেরিয়ে গৃহিণী-রতন।
চলিত কথায়, সবারে জানায়,
নাহি হয় পর আপনার জন।
কারো ক্ষতি হল্যো না,
কারো কষ্ট বৈলো না;
যে যারে ভালবাসে,
সে গেল তার পাশে,
আমি এবে করি পলায়ন॥

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীমোহিতগোপাল লাহিড়ী।

'নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন'—মহাকবি সেক্সপীয়রের "এ মিডসমার্স নাইট ড্রিমের" (A Midsummer-night's Dream) অনুবাদ। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় ইহার আরম্ভ করেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার অবসর-হেতু, অথচ গ্রাহক মহাশয়দিগের আগ্রহাতিশয্য-নিবন্ধন এবং 'অনুসন্ধানের' অষ্টম বর্ষের মধ্যেই উহার পরিসমাপ্তির আবশ্যক-বোধে, উহার শেষাংশ, অপরের দ্বারা লিখিত হইল।

ভূদেব।

ভূদেব—আজীবন শিক্ষক।

ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য স্কুল-ইনেস্পেক্টর গ্যারেট-সাহেব এতদ্দেশীয় কোন শিক্ষিত যুবককে বলিয়াছিলেন,—"I see, you alllook upon Bhoodeb as your Guru—how is it?" 'আমি দেখিতে পাই, তোমরা সকলেই ভূদেবকে গুরু জ্ঞান করিয়া থাক—কেন?' তদুত্তরে সেই শিক্ষিত যুবক বলিয়াছিলেন,—"Because we cannot help,—কারণ তদ্ভিন্ন আমাদের অন্য উপায় নাই।" ভূদেব বাবুর সম্বন্ধে গ্যারেট-সাহেব এই সকল কথা শুনিয়া, বিশেষ চেষ্টা করিয়া "পুষ্পাঞ্জলি" প্রভৃতি ভূদেব বাবুর কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহার সারবত্তা স্বীকার করিয়াছিলেন।

ভূদেব বাবু আজীবন শিক্ষক। তিনি যখন স্কুলে পড়িতেন, তখন অন্যান্য ছাত্রের পড়া বলিয়া দিতেন। তিনি বিদ্যালয় হইতে তাৎকালিক সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি—৪০ টাকা সিনিয়ার স্কলার্সিপ লাভ করিয়া বাহির হইয়া, চন্দননগর, শিয়াখালা, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে স্কুল বসাইয়া শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে কনিষ্ঠা ভগীর বিবাহের সময় অর্থের অনাটন-বশতঃ ঋণগ্রস্ত হইয়া ১৮৪৯ অব্দে ঢাকরী স্বীকার করেন। সে চাকরীও কিন্তু কলিকাতা মাদ্রাসার দ্বিতীয় শিক্ষকতা। তথায় তাঁহার শিক্ষকতা-গুণে কি ছাত্র, কি কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।

ভূদেব—উপরওয়ালার সম্মানরক্ষক।

উপরওয়ালার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, ভূদেব, তাহার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। তৎকালে ক্রীষ্টার সাহেব মাদ্রাসার হেড্ মাষ্টার ছিলেন; তিনি অন্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বিদ্যালয়ের কাজ বড়-একটা দেখিতেন না। মাদ্রাসার তাৎকালিক পরিদর্শক কর্ণেল রাইলি এ বিষয় জানিতে পারিয়া একদিন ভূদেব বাবুকে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন। ভূদেব তদুত্তরে দুইটী কথা বলেন। প্রথম, তিনি দ্বিতীয় শিক্ষক; দ্বিতীয়, এ বিষয়ে তাঁহার উপরওয়ালা ক্রীষ্টার-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে সেই ভীষণ দুর্দ্ধ কর্ণেল ভূদেব বাবুকে নানাপ্রকার ভয়প্রদর্শন করেন। কিন্তু অটল ভূদেব কোন কথা না বলিয়া নীরব থাকেন। ইহাতে কর্ণেল, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ-সূচক কয়েটী কথা বলিয়া, যাহাতে সত্বরে তাঁহার পদোন্নতি হয় সেই ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে ভূদেব বাবু দেড় শত টাকা বেতনে হাবড়া-স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েন। তথায় তাঁহার শিক্ষকতা-গুণে সফলেই সন্তুষ্ট হয়; এবং পরে প্রতিদ্বন্দ্বী-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি তিনশত টাকা বেতনে-নব প্রতিষ্ঠিত হুগলী-নর্ম্মাল-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়েন। তৎপরে ১৮৬২ অব্দে বিদ্যালয়ের সহকারী পরিদর্শক হইয়া ক্রমে বিভাগীয় স্কুল-পরিদর্শক হইয়াছিলেন। এইরূপে শিক্ষক হইতে শিক্ষকের শিক্ষক পরিদর্শকরূপে চাকরী করিয়া ১৮৮৩ অব্দে পেন্সন গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বেতন ১৫০০ টাকা ছিল।

ভূদেব—আজীবন ছাত্র।

ভূদেব বাবুর জীবনে আর দুইটী জিনিষ দেখা যায়। প্রথম, ভাল ছাত্র না হইলে ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না। দ্বিতীয়, নিজে উপর-ওয়ালার মান রাখিতে না শিখিলে নিজে উপর-ওয়ালা হইতে পারে না। এই শেষোক্ত কথাটী আমরা তাঁহার মাদ্রাসার চাকরীতেই দেখিয়াছি। প্রথমটী সম্বন্ধে বলি, ভূদেবের ন্যায় সুছাত্র অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যেমন আজীবন শিক্ষক, তেমনি আজীবন ছাত্রও ছিলেন। বিদ্যালয়ের পড়ায় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে জুনিয়র স্কলার্সিপ পাস এবং সিনিয়ার স্কলার্সিপে উচ্চবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্কুল হইতে বাহির হইয়া তিনি একে একে কয়েকটী লাইব্রেরী পাঠ করিয়া শেষ করেন। পাছে পাঠের ব্যাঘাত হয় বলিয়া, তিনি অনেক সময়ে কম আহার করিতেন। এমন কি, স্কলার্সিপ পরীক্ষা দিবার সময় তিনি পূর্ব্বাহ্নে চৌদ্দ গ্রাস ভাত গণিয়া খাইতেন এবং রাত্রিতে সাবুদানা সেবন করিতেন। সমস্ত রাত্রি পাঠ তাঁহার পক্ষে অভ্যস্ত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি যেরূপ অল্প নিদ্রা যাইতেন, তাহাতে, তিনি নিদ্রাকে জয় করিয়াছিলেন বলিতে পারা যায়। তিনি চাকরীর অবস্থায় যে সকল রিপোর্ট লেখেন, তাহার মধ্যে উত্তর পশ্চিম-প্রদেশের পাঠশালা-শিক্ষার এবং বারম্বার শিক্ষা-কমিসনের রিপোর্ট সমধিক প্রসংসনীয়। প্রথম মোক্তেখানি তাঁহার নামেই প্রকাশিত হয় এবং সেজন্য বিলাতে ষ্টেট-সেক্রেটারীও তাঁহাকে সাধুবাদ করেন। পেন্সন লওয়ার অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার শেষোক্ত রিপোর্ট লিখিবার সময় তাঁহাকে যেরূপ পড়াশুনায় পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি, তাহা জীবিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তৎপরে পেন্সন লইয়া ৺কাশীধামে গিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করেন।

ভূদেব—গ্রন্থকার।

ভূদেব একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা-লেখক। তিনি পুঁথিগত বিদ্যা ভালবাসিতেন না। তিনি অতি সামান্য পুস্তক, কথা বা দ্রব্য হইতে যে সকল জ্ঞান লাভ করিতেন, তাহাও তাঁহার জ্ঞানাগ্নিতে পরিপাক করিয়া প্রকাশ করিতেন। তিনি 'সামাজিক প্রবন্ধে' যে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে—এবং তদনুসারে তাঁহার দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার ও তাহাদ্বারা বঙ্গায় রাখিবার জন্য কষ্টে-উপার্জ্জিত ধনের এক লক্ষ ষাটি হাজার টাকা দান মনে করিলে—তাঁহাকে অতিমানুষ জ্ঞান হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার যে তাঁহাকে জ্ঞানাবতার বলিয়া থাকেন, তাহা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। তিনি স্বধর্ম্ম-রক্ষা, স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগই মনুষ্যত্ব বলিয়া মনে করিতেন। বৃথা অনুচিকীর্ষা-বৃত্তির অথবা উশৃঙ্খলতার প্রশ্রয়-দান, তিনি কখন অনুমোদন করিতেন না। তিনি বৃথা গালিগালাজের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু সত্য কথা মিষ্ট করিয়া বলিতেন। তাঁহার সম্পাদিত শিক্ষাদর্পণ, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ।

তাঁহার "প্রবন্ধ পুষ্পকে" দেবদেবী প্রভৃতির ধ্যানগম্য মূর্ত্তি যেরূপ লিখিত হইয়াছে —যেরূপে সেগুলি মানবের নিত্য-দর্শনীয় হয়—যেরূপে ভাস্কর্য্যের বিশ্বরূপ জ্ঞানীমাত্রেরই দর্শনীয় হয়—সেরূপে তুমি-আমি ভেদজ্ঞান প্রকৃত পক্ষে তিরোহিত হয়—যেরূপে স্তরে স্তরে অন্তরে অন্তরে জীবে দয়া প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, তাহাতে তাঁহাকে প্রকৃত ঋষি ভিন্ন

আর কিছুই বলা যায় না। লোকে কথায় বলে—"দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্ম্ম জানা যায় না।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে অন্তর্ধান কালে ব্রজ-গোপীগণ তাঁহার মর্ম্ম জানে নাই—গৃহে অবস্থানকালে নদীয়াবাসী শ্রীচৈতন্যের মর্ম্ম বুঝে নাই। ভূদেবের প্রবন্ধাদি সম্বন্ধেও তাই। তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন,—"পুষ্পাঞ্জলি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়—তখন প্রায় সকলেই বলিয়াছিলেন যে, ওরূপ জটিল পুস্তক কে পড়িবে? কিন্তু এই বিশ বৎসর হইল 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রকাশ হইয়াছে; ইতিমধ্যে উহার প্রায় বার আনা ভাগ পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐরূপে কালে 'সামাজিক প্রবন্ধাদিও' লোকে পড়িবে।" বাস্তবিক তাই। ইতিমধ্যে দেখা যাইতেছে, মহামতি ইলিয়ট সাহেব 'সামাজিক প্রবন্ধের' প্রশংসা করায় অনেকের হস্তে ঐ পুস্তক যাইতেছে। কিন্তু ও পুস্তক পাঠ করিতে যে মনোযোগ আবশ্যক, নব্যাধ্যাপাঠী তরলচিত্ত অনেকেই সেরূপ মনোযোগ ব্যয় করিতে এখনও প্রস্তুত নহেন। যখন জ্ঞানের জন্য—অন্তরে আনন্দের জন্য লেখাপড়ার আদর হইবে, তখন এই পুস্তকের আদর হইবে। তাই বলি, ভূদেব বাবুর কথা যতই আন্দোলন করা যাইবে, ততই ঘষিত চন্দনের ন্যায় সৌরভ পাওয়া যাইবে।

ভূদেব—অকপট ধার্ম্মিক।

ভগবান চৈতন্যদেব বলিয়া গিয়াছেন,—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন পূজনীয়ঃ সদা হরিঃ।'

আমাদের বোধ হয়, ভূদেব বাবু চৈতন্য দেবের ঐ কথাটী কার্য্যে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি সামান্য বা গোঁড়াদিগের ন্যায় কেবল মুখের জোঠামী না করিয়া কার্য্যতঃ বাবুগিরির প্রতিবন্ধক এবং চিত্তামণিরূপ সুচিন্তার পোষকতা করিয়াগিয়াছেন। তিনি এই মহাবাক্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দিনকতক হৈ হৈ করিয়া টাকা করেন নাই—আজীবন কন্যা করিয়াছেন। দানের টাকা তাঁহার পিতার ও মাতার নামে উৎসর্গ করিয়া এবং সমস্ত সমাজের ধর্ম্মোন্নতির দিকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করায়, একাধারে সতর্কিক জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অদ্বৈত-সূদশ ২।১ জন ব্যক্তি ব্যতীত বড়ভুজের প্রকৃত মূর্ত্তি জনসাধারণ দেখে নাই। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার কোন আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন,—"তুমি চৈতন্যসভায় যোগ দাও বলিয়া তোমায় লইয়া আমোদ করি বটে, কিন্তু উহাতে আমি সন্তুষ্ট আছি। তবে প্রকৃত চৈতন্যমূর্ত্তি দর্শন করিও—গোঁড়ামি করিও না।"

ভূদেব—অলৌকিক দাতা!

তাঁহার বিষয় লিখিতে গেলে অনেক কথা মনে আসে; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা নবাখ্যান বা উপন্যাস লিখিতে চাহি না। অথবা আমরা তাঁহার বিষয় পূর্ব্বে কোন সংবাদ রাখি নাই, আর আজ তিনি সমাজের উপকারার্থে দেড় লক্ষ টাকা দিয়াছেন বলিয়া অদ্ভুত কাহিনীতে জীবনী সাজাইতে চাহি না। তিনি কার্য্যগতিকে চুঁচুড়ায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন; নতুবা তাঁহার জন্মস্থান কলিকাতায় হরিতকির বাগানে। তথায় তাঁহার পৈতৃক ভবন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি মনে করিলে তথায় আসিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিতেন; কিন্তু কলিকাতার ভজুকে মাতিয়া বেড়ান অপেক্ষা সহর হইতে অনন্ত দূরে বাস করিতে ভালবাসিতেন। তিনি ১২৩২ সালের ২রা ফাল্গুন উক্তস্থানে জন্মগ্রহণ

করেন, এবং ১৩০১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ চুঁচুড়ায় দেহলীলা সম্বরণ। এই প্রায় ৭০বৎসর কাল তিনি শিক্ষক হইয়া নিজে ক্রমোন্নতিতে ৫০ টাকা হইতে ১৪০০ টাকা বেতনে সরকারী কার্য্য করিয়াছেন। ছাত্র হইয়া, কাপ্তেন রিচার্ডসন হইতে ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত, স্বদেশানুরাগী হইয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনে নিয়োজিত ছিলেন এবং দুহার অব্যবহিত পূর্ব্বে দেড়লক্ষ টাকা দান করিয়া বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় অনেককে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন। নিজের কর্ত্তব্যপালনই স্বদেশের হিতসাধন, স্বধর্ম্মরক্ষাই স্বদেশের মতসাধন, ইত্যাদি তিনি যেন স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি বাবুগিরিতে মাতিতেন না, তাই তিনি, সামান্য শিক্ষক হইয়াও, সন্তানগণের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান রাখিয়া সচ্ছন্দে দেড়লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানের কথা উল্লেখ করিয়া কেহ তাঁহাকে কিছু বলিলে তিনি বলিতেন,—আমি নূতন কিছুই করি নাই—কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি মাত্র। নিজের এবং পরিজনের ভরণ-পোষণ, পড়ায় চিকিৎসাদি এবং শিক্ষাদানাদিতে যে ব্যয় আবশ্যক, তাহা করিয়াও দেখা গেল যে, সন্তানদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ ছাড়াও কিছু অর্থ থাকে। সেই উদ্বৃত্ত অর্থ কিরূপে ব্যয় করা উচিত, তাহাই সন্তানদিগকে দেখাইয়াছি মাত্র, বাবুগিরি প্রবৃত্তি বন্ধ করা এবং সদ্ব্যয়ের দিকে লক্ষ রাখিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাই করিয়াছি।"

ভূদেব—প্রকৃতই ভূদেব।

ব্রাহ্মণই হিন্দুসমাজের গুরু—শুধু হিন্দুসমাজের কেন, বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় মহাপুরুষগণের মতেও—ব্রাহ্মণই জগতের গুরু। তাই কি ভূদেব বাবুর পরমজ্ঞানী পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার নাম 'ভূদেব' রাখিয়াছিলেন? 'ভূদেব' অর্থে 'ব্রাহ্মণ'। শুনিয়াছি, তর্কভূষণ মহাশয় জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন; তাই কি তিনি সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন জানিয়া "ভূদেব" নাম রাখিয়াছিলেন? জানি না। তবে ভূদেব নামেও, ভূদেব—কাজেও ভূদেব।

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মতামত।

পুস্তক।

কিরণসিংহ।—উপন্যাস।—শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ৸৹ পাঁচ সিকা।

'কিরণসিংহ'—সুবৃহৎ উপন্যাস—ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়া-অবলম্বনে রচিত। শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের এখানি ৬ষ্ঠ উপন্যাস। তাঁহার অপর কয়েকখানি উপন্যাস-সম্বন্ধে আমরা যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখানি তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট—এখানি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পরিণত-মস্তিষ্কের পরিচায়ক। পুস্তকখানির ভাষা সরল, অথচ মনোহারী; বর্ণনা সুরম্য, অথচ

প্রাকৃতিক; চরিত্রচিত্রন উপযোগী, অথচ পরিস্ফুট। ফলতঃ 'বিরণসিংহ'—আজকালকার বাজে নভেল-নাটক-প্লাবিত দেশে—সমাদরের সামগ্রী। তাঁহার কিরণসিংহ-পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। আর সেইজন্য ই এই পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করিবার বাসনা আছে—আর সেইজন্যই আমরা অদ্য আর এই পুস্তকের অধিক আলোচনা কিছুই করিলাম না। উপসংহারে আমরা এই পুস্তকের সমুহ প্রচার কামনা করি; এবং গ্রন্থকার মহাশয়—একজন ধনশালী জমীদার হইয়াও, এরূপে সাহিত্যের সেবায় জীবন নিয়োজিত করায়—তাঁহাকে অত্যধিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ফলতঃ দেশের অপরাপর ধনী-সন্তানগণের নিকট রোহিণী বাবুর এ অকপট সাহিত্য-চর্চ্চা আদর্শ-স্থানীয় হওয়া উচিত।

সাময়িক পত্র।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান ও সমালোচন।—মাসিক পত্র। মাঘ মাসের। কার্য্যাধ্যক্ষ—কবিরাজ শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন।

১৩টী প্রবন্ধ। তন্মধ্যে ৪টী কবিতা—একটী অসম্পূর্ণ, এবং ৮টী অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ—প্রায়ই চিকিৎসা-সহ, একটী বাদ-প্রতিবাদ, একটী সমালোচনা, একটী উচ্ছ্বাস, একটী General Hints.

পত্রিকাখানির ছাপা ও কাগজ সুন্দর। দাম সুলভ। প্রবন্ধও অনেকগুলি ভাল। কিন্তু ছঁএক পেজ. প্রবন্ধ আর তন্মিয়ে "ক্রমশঃ"—বড়ই বিরক্তিজনক। রয়েল বেঙ্গলে "রজনী" প্রবন্ধটী সুন্দর ও সাময়িক, রাসমণি ও সে-কালের বড়লোক—জাতব্য। General Hints ও প্রমেহ চিকিৎসা—একদলের মধ্যে।

সজ্জনতোষিণী।—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পাদক। চৈত্র মাসের।

তপন মিশ্র—একজন গৌরাঙ্গ-ভক্তের বিবরণ। নবদ্বীপশতক—একঘেয়ে পদ্য। পাঠকবর্গের প্রতি সম্পাদকের নিবেদন—শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরস্থাপনার সাহায্য-প্রার্থনার বিজ্ঞাপন। ইত্যাদিই এই পত্রের প্রবন্ধ। অথচ একজন সুশিক্ষিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই পত্রের সম্পাদক। সুখের বিষয়, পত্রিকাখানি নিয়মিত বাহির হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আলোচনা।

হিন্দুর অধঃপতন ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? বিলাতের একজন ধর্ম্ম-এনিবেশণ্ট নাম—কলিকাতায় আসিয়া, হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন। আর, পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া, সেই বক্তৃতা-উপদেশ শুনিয়া আমাদিগকে হিন্দুয়ানী শিখিতে হইতেছে। হা ধিক আমাদের!

এ কথায় কেহ যেন মনে না করেন যে, 'এনিবেশেণ্টের' উপদেশ আমরা মন্দ বলিতেছি বা তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মের কপট-ভক্ত বলিতেছি। হইতে পারেন তিনি—হিন্দুর প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী, হইতে পারেন তিনি—শাপভ্রষ্টা দেবী; কিন্তু

জমীদের ক্ষোভ এই যে, হিন্দুর এমন দিনও আসিল—বিধর্ম্মী বিজাতীয়া মেমের উপদেশ-মাখাসে হিন্দুকে হিন্দুত্ব শিখিতে হইল!

কিন্তু সে ক্ষোভে আর ফল কি? এখন বরং তাঁহার কথাই সকলের কানে আঙ্গুল দিয়া প্রবেশ করান উচিত—যদি হিন্দুহিতৈষিণী এই ভক্তিমতী মহিলার উপদেশ-বচনেও কাহারও ঘুমোর-নিদ্রা ভাঙ্গে? এনিবেশেণ্ট একদিন ভক্তিপ্লুতদয়বরে বলিয়াছিলেন,—'হায়! আমার বড় দুঃখ!—জানি না কোন্ পাপে, হিন্দুর গৃহে স্থান না পাইয়া, আমি ম্লেচ্ছের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম!" একজন বিদেশীয়া বিধর্ম্মী মেমের মুখে এই কথা, আর হিন্দু—স্মরণ কর দেখি—তোমার কি আচরণ?

... ...

গত বৃহস্পতিবার, উক্ত মহিলা 'জাতিভেদ' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। কি অভাবনীয় অপূর্ব্ব দৃশ্য—যখন মনে হয়, বিধর্ম্মী ইংরাজ-মহিলা তাঁহার অমৃতময়ী সুন্দর ভাষায় হিন্দুকে 'জাতিভেদ' শিক্ষা দিতেছেন! যাহা হউক, তাঁহার সে বক্তৃতার মর্ম্ম এই:—

মনে কর—যেন চারিটি যন্ত্রের সাহায্যে মনুষ্য শরীর পরিরক্ষিত। চক্ষুর দ্বারা দর্শন, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, উদরের দ্বারা পরিপাক-ক্রিয়া এবং ফুস্‌ফুস্ দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস-ত্যাগ—মনুষ্য শরীর এইরূপ যন্ত্রচতুষ্টয়ে পরিচালিত। এক এক যন্ত্রের এক এক কার্য্য। এখন, ইহার কোন এক যন্ত্রের উপর যদি দুইটী বা তিনটী কার্য্যের ভার দেওয়া হয়?—যদি চক্ষুকে বলা হয়—দেখ এবং শোন—তুমি দুইই কর, কর্ণকে বলা হয়—তোমায় হজম করিতে হইবে—নিশ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতে হইবে—সব কাজই করা চাই; ভাব দেখি, তবে শরীর-মন্দিরে কি বিরাট সংঘটন হয়? ঠিক তদ্রূপ—হিন্দুর জাতিভেদ! কেমন প্রকৃতি-অনুযায়ী সমাজ-শরীরের এক-একটী জাতি-যন্ত্রকে কেমন সুন্দর একএকটী কার্য্যে নিয়োজিত রাখা হইয়াছে! কেমনসুন্দর বিধি—শূদ্র, সেভূমির উর্ব্বরতা-সম্পাদনে—কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে; বৈশ্য—সে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে; ক্ষত্রিয়—রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে; ব্রাহ্মণ—সেই জ্ঞানগৌরবসম্পন্নশ্রেষ্ঠ জাতি—ধর্ম্মোপদেশ-দানে ও সর্ব্বজাতির মঙ্গল-কামনায়, নিয়োজিত থাকিবে। আর এখন, তাহারই ব্যভিচার ঘটায়, সমাজের এত হীন অবস্থা! জাতিগত কর্ম্মভাগ না থাকায়, সমাজ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে।

... ...

ইহার পর, এনিবেশেণ্ট, ইংলাণ্ডের "ফিউডাল সিস্‌টেম" প্রথার সহিত এদেশীয় জাতিভেদ প্রথার একত্ব প্রতিপাদন করিয়া দেখান যে, ইংলণ্ডেও এই জাতিভেদ-প্রথা বর্ত্তমান ছিল—এবং সেই সুন্দর প্রথার গুণে ইংরাজের ক্রমোন্নতি। আরও, সেই যে পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত জাতিগত কর্ম্মভেদ—যাহা সমাজের শিরায় শিরায় সংবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে; উহার ব্যত্যয়ে, নদীর বিপরীত-গতির চেষ্টার ন্যায়, সমাজের অনিষ্ট বৈ ইষ্ট নাই। বরং সে ভাব বিদ্যমান রাখিলে, এক এক জাতির এক একটী কার্য্যে সৌষ্ঠবের সহিতই সমাহিত হইতে পারিত। কৃষকের পুত্র—পিতৃ-প্রদর্শিত কৃষিকার্য্যে যেরূপ পারগতা দেখাইতে পারে, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনে তাহার ততোধিক দুর্ব্বলতা!। ইহা স্বভাবজ! সে গতি প্রতিরোধের চেষ্টাই বিড়ম্বনা ও বিশৃঙ্খলার পরিপোষক।

... ...

উপসংহারে এনিবেশেণ্ট বলেন,—"ব্রাহ্মণের উন্নতি ভিন্ন হিন্দুসমাজের উন্নতি কিছুতেই নাই। এখনও হাজারের মধ্যে অন্ততঃ তেমন এক শত ব্রাহ্মণও আছেন—এখনও সমাজ তাঁহাদিগকে

আপনাদের মস্তকরূপে স্বীকার করিয়া লউন—আবার—আবার হিন্দু সেই হিন্দু হইবে—হিন্দুর পূর্ব্বগৌরব পুনরাগমন করিবে। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার ভিন্ন; হিন্দুর আর গতি নাই—আর উপায় নাই।”

বিবিধ।

পুলিশ আইন।—দেশের লোকের এত আপত্তির পরও, সম্মতি আইনের ন্যায়, জোর করিয়া গবর্ণমেণ্ট পুলিশ-আইন পাশ করিয়াছেন।

চীন-জাপান।—এ সপ্তাহে চীনের আরও দুর্দ্দশার সংবাদ পাওয়া যায়।(১) ইতিপূর্ব্বে ওয়ে-হে-ওয়ে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়, চীনের কয়েকজন প্রধান সেনানায়ক আত্মহত্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।(২) গত ৯ই মার্চ্চ জাপানীরা 'থিংচংয়ে' আক্রমণ করে; ৩ঘণ্টা ভয়ানক যুদ্ধের পর, চীনেদের প্রায় ২০০০ হাজার এবং জাপানীদের ৯৬জন সৈন্য মারা যায়; চীনেরা পলায়ন করে। (৩) 'দেনিশ-হোদাই' হইতে চীনেরা তাড়িত হইয়াছে; তাহাদের ১৪০০ হাজার সৈন্য-মারা গিয়াছে।(৪) চীনেরা এখন জাপানীদের সবরূপ সর্ত্তে স্বীকৃত হইয়া সন্ধিস্থাপন জন্য ব্যস্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর রেলওয়ে।—বড় আনন্দের সংবাদ, বাঙ্গালীর চেষ্টায়, যৌথকারবারে, একটী রেলওয়ে লাইন খোলা হইল। গত ৭ই নবেম্বর ১২।০ মাইল খোলা হইয়াছিল; এক্ষণে, গত ৮ই মার্চ্চ, তারকেশ্বর হইতে মগরা পর্য্যন্ত ৩২।০ মাইলই খোলা হইয়াছে। 'হোপ'-সম্পাদক বাবু অমৃতলাল রায় এই রেল-পথের প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী। তাঁহাকে শত ধন্যবাদ।

সংবাদপত্রের মুখবন্ধ।—পঞ্জাব পেট্রিয়ট' পত্রে, অন্যান্য সংবাদপত্রের ন্যায়, গবর্ণমেণ্টের অন্যায় আচরণের বিষয় না লেখা হয়—এইজন্য ঐ পত্রের ৬২ খানি গবর্ণমেণ্ট লইবেন এবং ঐ পত্রে গবর্ণমেণ্টের কমিশরিয়েটের বিজ্ঞাপনগুলি প্রদত্ত হইবে—এইরূপ আশ্বাস দেওয়া হইতেছিল। এই কথা এখন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

জগন্নাথ-পথে রেল।—গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন, বেঙ্গল-নাগপুর-রেলওয়ে, কটক, পুরী ও মেদিনীপুর হইয়া কলিকাতায় মিলিত হইবে। হিন্দু যাত্রীর সুসংবাদ।

গ্রন্থকারের আয়।—'পরিষদে' প্রকাশ—বিলাতের শত শত গ্রন্থকার গ্রন্থ লিখিয়া বৎসরে ১৮ হাজার টাকা লাভ করেন। তথাকার অন্ততঃ ৩০ জনের বার্ষিক আয় ২৮হাজার, ৬১জনের ৫৮ হাজার, ২জনের ৭৮ হাজার। বাঙ্গালীর বিদ্যাসাগর প্রথম, তন্নিম্নে বঙ্কিম বাবু। কিন্তু তাঁহার আয় বার্ষিক হদ্দ ৫ হাজার টাকা।

স্বাস্থ্য-সংবাদ।—কলিকাতায় বসন্ত-ওলাউঠার বড়ই প্রকোপ। গত পূর্ব্বসপ্তাহে বসন্তে ১২৩ জন লোক মারা পড়িয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এরূপ মৃত্যু আর হয় নাই।

মনুষ্যের কীটাণু।—পত্রান্তরে প্রকাশ, কোন বৈজ্ঞানিক গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কীটাণুর আধিক্যে মনুষ্যের বলবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তাঁহার গণনামতে ইংরাজের শরীরে কীটাণু-সংখ্যা, .৩৩৪২০৫, ফরাসীর, .৫১৩০৫৮, জার্ম্মানির, .৬১৫৮৭১, রুষিয়ার .১৩৩৪৬৮ ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক মহাশয় বোধ হয় বাঙ্গালীর শরীরের কীটাণু এখনও গণনা করিবার সুবিধা পান নাই!

পৃষ্ঠপোষণ।—দেশের বিদ্যোৎসাহী নৃপতিবর্গের নাম করিতে হইলে, রঙ্গপুর-কাকিনিয়ার রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয় অন্যতম। প্রবল বিদ্যানুরাগ, নিরত বিদ্যানুশীলন—তাঁহাকে উচ্চপদবীতে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছে। পাঠালয়, বিদ্যালয়, সংবাদ পত্র—এ সকলই তাঁহার নিজের আছে। এরূপ সচ্চরিত্র, প্রতিষ্ঠাবান ও অমায়িক ব্যক্তিকে এক্ষণে আমাদের অন্যতর পৃষ্ঠপোষকরূপে প্রাপ্ত হইয়া আমরা পরম আনন্দিত হইলাম।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান

অষ্টম বর্ষ। } ৮ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। { ৪৫শ সংখ্যা।

পাপ ও পুণ্য।

পাপ ও পুণ্য—এ বিভেদজ্ঞান কোথা হইতে আসিল? বাস্তবিক ইহা কি, ও ইহার উৎপত্তির মূল কোথায়?

স্বতঃই কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব, কেহ ইহারও সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। যদি বল, মানুষ ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা; তাহা হইলে এ পাপপুণ্য কৃত্রিম (Artificial); এবং ইহাতে কতদূর যায়-আসে, তাহা পরে দেখা যাইতেছে। কিন্তু, যদি বল, ঈশ্বরই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা—পাপ পুণ্য তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন ও কোন্‌টী হইতে পাপ ও কোন্‌টী হইতে পুণ্য হইবে, তাহার বিচারের জন্য বিবেকশক্তি দিয়াছেন। যদি এইরূপই হয়, তবে এ পাপপুণ্যের সৃষ্টি করিয়া ও আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেকশক্তি দিয়া, এ ভবঘোরে আবর্ত্তন করানর কি প্রয়োজন? আমরা ত তাঁহার পক্ষে কীটানুকীট—আমাদের লইয়া এ বৃহৎ ব্যাপার কেন? পাপনীতি দিয়া অসৎ কার্য্যের অনুসরণ করানই বা কেন ও নরক ভোগই বা কেন? তবে এ সৃষ্টির কোন্ প্রয়োজন?

এ প্রশ্নের মীমাংসা করা বড়ই দুরূহ এবং তাহা এখানকার আলোচ্য বিষয় নহে। আবার দেখিতে পাই যে, পাপপুণ্য জাতি ও সম্প্রদায়-ভেদে ভিন্ন প্রকার—যাহা একজাতি ও সম্প্রদায়ে পাপ বলিয়া পরিগণিত, তাহাই আবার অন্য জাতি ও সম্প্রদায়ে পুণ্য বলিয়া কর্ত্তব্য। ইহারও মীমাংসা এস্থলে কর্ত্তব্য নহে। এখানে কেবল নাস্তিকতা ও আস্তিকতার মতে পাপপুণ্য কি, তাহাই বিবেচ্য।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, আস্তিকেরা ইহার কি উত্তর দেন। তাঁহারা বলেন যে, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে ঈশ্বরের অংশমাত্র লাগিয়াছে—এই বিশ্ব তাঁহার অন্তর্গত; তাঁহার পরিমাণ নাই, এই বিশ্বের পরিমাণ ও অবধি আছে। এই বিশ্বের জীব তাঁহা হইতেই উৎপন্ন ও তাঁহারই অনুকরণ করিতে সতত চেষ্টা করিতেছে—তাঁহার সম্পূর্ণতাকে প্রাপ্ত হইতে অবিরত তাঁহা-

রই দিকে ধাবিত হইতেছে; কিন্তু সে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে [illegible]

এখন কথা হইতেছে যে, তিনি যদি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়া থাকেন এবং সৎ ও অসৎ কাজ কোন্‌টা, তাহাও বিচারশক্তি দিয়া থাকেন, তবেই আমরা পাপ ও পুণ্যের জন্য দায়ী—কারণ, সৎ কাজ করিলেই পুণ্য ও অসৎ কাজ করিলেই পাপ হয়। পাপ ও পুণ্য, অসৎ ও সৎএর এই সম্বন্ধ।

কিন্তু এই সৎ ও অসৎ কাজের সৃষ্টি হইল কোথা হইতে?

কেহ বলেন যে, ঈশ্বরই একটী কাজকে সৎ ও অপরটীকে অসৎ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের মনে এরূপ বিশ্বাস হয় না—কেন না, তাহা হইলে ঈশ্বরকে যথেচ্ছাচারী করা হয়। তিনি একবার যে কাজকে সৎ করিয়াছেন, পুনরায় ইচ্ছা করিলে তাহাকেই অসৎ করিতে পারেন,—এরূপ সাধারণের বিশ্বাস নহে।

অতএব, কোন কাজ স্বতঃই সৎ বা অসৎ।

এমন স্থীকৃত হইল যে কোন কাজ স্বতঃই সৎ বা অসৎ, আমাদের সৎ অসৎ বিচার করিবার শক্তি আছে ও সৎ কাজকে আশ্রয় ও অসৎ কাজকে ত্যাগ করার স্বাধীন ইচ্ছাও আছে। অতএব, আমরা পাপ ও পুণ্যের জন্য দায়ী। কিন্তু কিসে বা কেন আমরা এই দায়িত্ব পূরণ করিতে বাধ্য?

আস্তিক বলেন, আমাদের আত্মা অবিনশ্বর ও পুনর্জন্ম আছে। ইহজন্মে আমরা যে কাজ করি, পরজন্মে তাহার বিচার হইবে; ও কর্ম্মফল-অনুসারে ঈশ্বর কাহাকেও নরকে কাহাকেও বা স্বর্গে প্রেরণ করিবেন। অতএব, এই দণ্ডভয়ে আমরা সৎকাজ করি ও অসৎ-কাজ পরিত্যাগ করি।

এখন দেখা যাউক, নাস্তিক হইতে কি উত্তর পাওয়া যায়? কিন্তু নাস্তিকের পাপ-পুণ্য, অসৎ সৎ আস্তিকের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁহার মতে ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই, এই বিশ্বের উৎপত্তি ঘটনাক্রমে হইয়াছে আবার ঘটনাক্রমে লয় হইতে পারে। তিনি কোন বস্তুরই কারণ দেখিতে পান না। আস্তিকের বিবেকশক্তি তাঁহার নাই, মন তাঁহার মতে অনুভূতির সমষ্টি-মাত্র।

তাঁহার মতে পাপপুণ্য মনুষ্যজাতির সমাজ হইতে উৎপন্ন। তিনি বলেন, সমাজ বা শৃঙ্খলাবদ্ধ গবর্ণমেণ্টের উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছে, প্রথমতঃ সকল মনুষ্যই অন্যের উপার্জ্জিত দ্রব্য ভোগ করিতে চাহিত ও তজ্জন্য কলহ ও যুদ্ধাদি হইত। যখন দেখিল, ইহাতে শান্তি নাই, তখন যাহাতে শান্তিতে বাস করিতে পারে, তজ্জন্য কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া একজনকে সমাজপতি নির্ব্বাচিত করিল এবং যে এই লিপিবদ্ধ নিয়মের অন্যথা করিবে, তাহাকেই তিনি ঐ লিপি-অনুযায়ী দণ্ড দিবেন, এই শক্তি প্রদান করিল।

সমাজের এই নিয়মভঙ্গ করাই অসৎকাজ—সুতরাং পাপকাজ; এবং এই নিয়মে চলাই সৎ-কাজ—সুতরাং পুণ্য কাজ।

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, সমাজ-নিয়ম ভঙ্গ করায় মহৎ অনিষ্ট আছে—যেমন কোন অঙ্গে বেদনা হইলে বা আঘাত লাগিলে সমস্ত শরীর অসুস্থ হয়, সমাজেরও কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে সেইরূপ অনিষ্ট হয়।

এখন দেখা আবশ্যক যে, সমাজের নিয়মানুসারে আমরা কখন্ চলিতে বাধ্য ও কখন্ইহার অন্যথা করিলে অব্যাহতি পাইতে পারি। সমাজ আমাদের বহিস্থ কাজ দেখিয়া পুরস্কার ও দণ্ডবিধান করেন; অন্তরস্থ বা মনের মধ্যে যে

সকল ইচ্ছার উৎপত্তি হয়, তাহার কোনই কিছু করিতে পারেন না। অতএব, যখন আমরা দেখি যে, অমুক কাজ করিলে সমাজকে ফাঁকি দিতে পারিব, তখনই ফাঁকি দিলাম। মনে অসৎ ইচ্ছা হইলে সমাজ আমার কিছু করিতে পারে না, সুতরাং অনায়াসেই পাপ-ইচ্ছা করিতে পারি। কিম্বা সুযোগ হইলে বা সমাজকে ফাঁকি দিতে পারিলে কেন পাপ কাজ করিব না?

এ বিষয় নাস্তিক বলেন, যখন সমাজ-নিয়ম ভঙ্গ হইল না, তখন তাহা পাপ কাজই নয়।

কিন্তু যেই তুমি পাপ-ইচ্ছা করিলে, অমনি ঈশ্বর-প্রদত্ত আস্তিকের বিবেকশক্তি তোমাকে তীব্রশূলবৎ বিদ্ধ করিবে, তুমি তৎক্ষণাৎ সেই পাপ-ইচ্ছা বা কাজ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবে; এ ছাড়া, পরজন্মের দণ্ডভয়েও অসৎ কাজ ত্যাগ করিবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত।

কবিকঙ্কণ ও চণ্ডীকাব্য।

ইতিপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, কবির স্বহস্তলিখিত পুস্তকখানি দেখিলে, আজিকালিকার মুদ্রিত কি বটতলার পুস্তক, কি বাবু অক্ষয়চরণ সরকারের প্রকাশিত পুস্তক, উভয়বিধ মুদ্রিত পুস্তককেই বিভিন্ন ব্যক্তির লিখিত বলিয়া ভ্রম জন্মে। দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত যে পুস্তকখানি এ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরদিগের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সমুদয় অংশ নাই। যাহা আছে, তাহা সমস্ত গ্রন্থের এক-তৃতীয়াংশও নহে। ঐ গ্রন্থখানি এখন পবিত্র-জ্ঞানে কবিকঙ্কণের প্রোক্ত সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তির সহিত পূজিত হইয়া থাকে। আমরা আর একখানি হস্তলিখিত পুস্তক পাইয়াছি; তাহার সহিত কবির স্বহস্তলিখিত পুস্তকখানির পাঠ মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রথমোক্ত পবিত্র পুস্তকে "চণ্ডীকাব্যের" যতদূর আছে, তাহাও সহিত উহার সর্ব্বাংশে মিল আছে। সুতরাং এই গ্রন্থখানির মৌলিকতা-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সমুদায় 'চণ্ডীকাব্যের' পাঠান্তর প্রদর্শন-কালে আমরা এই গ্রন্থখানিকে মূল-স্বরূপ গণ্য করিব। এস্থলে আমরা একটী অত্যাবশ্যক কথা বলিয়া রাখি যে, এই পুস্তকখানির শেষে "শকে রস রসবেদ" ইত্যাদি গ্রন্থ-রচনার সময়-সূচক কবিতাটী নাই; কিন্তু ইহার শেষাংশে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" শীর্ষক প্রবন্ধটী দৃষ্টিগোচর হয়। পশ্চাৎ তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। এক্ষণে 'চণ্ডীকাব্য' এবং প্রচলিত কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া কবির জীবনী এবং এতদ্দেশের তাৎকালিক সামাজিক অবস্থা-সম্বন্ধে যতদূর অবগত হইতে পারা যায়, তাহা পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য, তদানীন্তন বর্দ্ধমান-চাকলার অন্তর্গত (অধুনাতন জেলা বর্দ্ধমানের অধীন রায়না থানার দক্ষিণ-প্রান্তবর্ত্তী) 'দামুন্যা' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আজিকালি দামুন্যা গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার শেষ। দামুন্যার দক্ষিণ-দিকবর্ত্তী

"তালা"-গ্রাম হুগলী-জেলার জাহানাবাদ থানার অধীন। দামুন্যা উৎকালে একটী গণ্ড-গ্রামের মধ্যে গণ্য ছিল। পূর্ব্বকালে যে গ্রামে ধনী, শ্রোত্রিয়, রাজা, নদী ও বৈদ্য থাকিতেন, সেই গ্রামই শ্রেষ্ঠ হইত।* তাঁহাদিগের অভাবে গ্রাম বাসোপযোগী বলিয়া গণ্য হইত না। দামুন্যায় 'রত্নাদু'-নামে নদী ছিল, হরিনন্দী বৃষদত্ত প্রভৃতি ধনী ছিল, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, বৈদ্য ছিলেন; রাজা কিছু সকল গ্রামে থাকা সম্ভব নয়, তবে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী অনেক লোক ছিল। সুতরাং দামুন্যা যে একটী ভাল গ্রাম ছিল, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। এই গ্রামে কবির পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিতেন। তাঁহাদিগের সাত পুরুষের নাম যদিও মুদ্রিত পুস্তকে নাই, কিন্তু তাঁহার স্বহস্তলিখিত পুস্তক হইতে আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি।†

বঙ্গদেশে বালকের বাল্যকাল যেরূপ ধূলা-খেলায় কাটিয়া যায়, মুকুন্দরামেরও তাহাই ঘটিয়াছিল; অন্যান্য বালকের ন্যায়, তিনিও সকালে-সন্ধ্যায় বৃদ্ধা মাতামহী-পিতামহী প্রভৃতি আত্মীয়াগণের নিকট ভূত-প্রেতের গল্প, বিমাতার ষড়যন্ত্রে রাজা কর্ত্তৃক রাজপুত্রের শিরশ্ছেদের আজ্ঞাকাহিনী, বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীর কথা শুনিয়া, বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত সাহস-সংস্কারে অভ্যাস-লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর, যথারীতি গ্রাম্য-গুরুর নিকট বঙ্গীয় বর্ণমালা ও যৎকিঞ্চিৎ গণিত শিক্ষা করিয়া, সংস্কৃত ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। তৎকালে এতদঞ্চলে ভাঙ্গামোড়া ও খানাকুল-কৃষ্ণনগর সংস্কৃত স্মার্ত্ত ও স্মৃতি-শাস্ত্রের আলোচনার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। এই দুইটী স্থানে বহুল অধ্যাপক, দুরাগত বিদ্যার্থীদিগকে অন্নদান দ্বারা ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায় ও কাব্যাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। মুকুন্দরাম, এতদুভয় স্থলেই ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া কৃতবিদ্য হইলে, আপন গ্রামে চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

মুকুন্দরাম স্বভাব-কবি ছিলেন। কবিত্ব তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি ছিল। অভাবে পড়িয়া অথবা সখের বশবর্ত্তী হইয়া, যেমন আজি-কালিকার অধিকাংশ কবি কষ্টকল্পনা দ্বারা কবিত্বের উদ্বোধন-প্রয়াসী, মুকুন্দরাম সেরূপ কবি ছিলেন না। তাঁহার কবিত্ব বাল্যকাল হইতেই স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। সেইজন্য তিনি চণ্ডীকাব্যের প্রথমেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—

"গঙ্গাসম সুনির্ম্মল, তোমার চরণ-জল,
পান কৈনু শিশুকাল হৈতে।
সেই ত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে,
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে।"

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি অল্প বয়স হইতেই কবিতা রচনা করিতেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার শৈশব-রচিত "শিব-সংকীর্ত্তন" নাম্নী কবিতাটী কোথাও দেখিতে পাই না।

কবিকার্য্য তাঁহার পুরুষানুক্রমিক জীবিকা। তিনি কেন, সেকালে পল্লীগ্রামস্থ গৃহস্থমাত্রেরই কৃষি প্রধান উপজীব্য ছিল। যে গৃহস্থের চাস না থাকিত, তাহারই দরিদ্রতা সূচিত হইত। যাহার গৃহে ধান্যধনের সংস্থান না থাকিত, সে নগণ্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। কবিত্ব কৃষিপ্রিয়তা ও সেকালের কৃষিপ্রাধান্য নিম্নোক্ত কবিতা পাঠেই উপলব্ধি হইবে।

"ধন্য অঘ্রাণের মাস, ধন্য অগ্রহায়ণ মাস।
বিফল জনম তার নাহি যার চাস॥"

* ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্তু গরুম।
পঞ্চ যত্র ন বাসন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥

† 'অনুসন্ধান', ৩য় পৃষ্ঠা, ১২৯১ সালের ২৭এ মাঘ।

বাস্তবিক সেকালে কৃষিকার্য্যের এতই আদর ছিল। মধ্যে, পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে যদিও দুই এক জন ইংরেজ-সেবক 'চাকুরে বাবুর' নিকট কৃষি 'চাসার ব্যবসায়' বলিয়া উপেক্ষিত হইত; কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে তণ্ডুলের দুর্ম্মূল্যতাপ্রযুক্ত এখন আবার তাঁহা-দিগকেই কৃষিকার্য্যে অধিকতর অভিনিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

কবি যৌবনে চাসের ধানে সংসার পরি-পোষণ করিতেন, অকাতরে ছাত্রগণকে অন্নদান করিতেন, সকালে-সন্ধ্যায় ছাত্রগণকে লইয়া শাস্ত্রালোচনায় সময়ক্ষেপ এবং অঞ্চলী-অপ্রবাসী হইয়া অতুল সুখানুভব করিতেন। ইহাই সেকালের বাঙ্গালীর বাঞ্ছনীয় জীবন। এই নিরাপদ ও নিরুপদ্রবে কালক্ষেপ করিতে পারি-লেই, বাঙ্গালী আপন জীবনের সার্থকতা জ্ঞান করিতেন।

তবে মুসলমান-রাজত্বে ধনপ্রাণ লইয়া লোককে সময় সময় সশঙ্ক থাকিতে হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের অধীনস্থ কর্ম্মচারি-গণই রাজধানীর দূরস্থ স্থানে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। শাসনকর্ত্তা শান্ত সুধীর হইলেও, তাঁহাদিগের উৎপাতে নানা বিভীষিকা উৎপাদন করিত। পাঠান-রাজত্বে বঙ্গদেশ সুখশান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, মোগল-রাজত্বে দেশের নানা স্থানে নানা প্রকার অত্যাচারের সূত্রপাত হয়। জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ বঙ্গদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলে, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণও তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া বঙ্গবাসীকে একপ্রকার ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, আমাদিগের শান্তিপ্রিয় রাজ-সংপ্রব-বিহীন কবি পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া "আপ-নাকে নিরুপায় জ্ঞান করেন," এবং তাহার প্রতিকারের কোন পথ না পাইয়া, অগত্যা প্রবাস-প্রস্থানে কৃতসংকল্প হন। পলায়নকালে তিনি যে যে নদনদী পার হইয়া, যে যে গ্রাম দিয়া, যেরূপে যেস্থানে অবস্থান-পূর্ব্বক, মেদিনী-পুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোণার নিকটবর্ত্তী "আড়রা-ব্রাহ্মণভূমির" রাজা রঘুনাথের আশ্রয় লাভ করেন, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে সেই সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

ব্রাহ্মণভূমির রাজার নিকট মুকুন্দরাম বিলক্ষণ সম্মান-লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির সহিত তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞানেরও পরিচয় পাইয়া, রাজা রঘু-নাথ তাঁহাকে "কবিকঙ্কণ" উপাধি প্রদান করেন, এবং তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। এইরূপ রাজ-সম্মানে সম্মানিত হইয়া, এবং সুসময়যাত্রা-লাভের সুবিধা পাইয়া, কবিকঙ্কণ কিয়দ্দিন ব্রাহ্মণ-ভূমিতে অবস্থিতি করেন বটে; কিন্তু তিনি কিছুতেই জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা ভুলিতে পারিলেন না; এদিকে জন্মভূমিস্থ বন্ধুগণও তাঁহাকে দেশে আনিবার জন্য অনুরোধ করিতে ছিলেন। দামুন্যায় বহুদিনের বাস্তু, পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়, সেখানকার সম্পত্তি, পৈতৃক দেবকীর্ত্তি, বাল্যবন্ধুগণের আত্মীয়তা, ক্রমেই তাঁহার মনে জাগরূক হইতে লাগিল। কালধর্ম্মে তিনি মুসলমানের অত্যাচার বিষুক্ত হইতে লাগিলেন, ক্রমে জন্মভূমি-পুনর্দর্শনের জন্য তাঁহার ইচ্ছা বড়ই বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি দামুন্যা-দর্শনে আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিলে, রাজা তাঁহাকে বিদায় দিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু প্রার্থনার পর প্রার্থনায় এবং মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভূমিতে আসিয়া অবস্থিতি করিবার স্বীকার করিলে, তিনি প্রত্যাগমনের অনুমতি পাইলেন। তিনি সপরিবারে দেশে আসিলেন; কিন্তু যত-দিন জীবিত ছিলেন, মধ্যে মধ্যে প্রতিশ্রুতি

পালনের জন্য ব্রাহ্মণভূমিতে যাতায়াত করিতেন।

এই সময় দেশের মান্যগণ্য লোকে, তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় পাইয়া, নিষ্কণ্টকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সংস্থান জন্য, তদানীন্তন সমুদায় ডিহিদারকে অনুরোধ করিলেন। দামুন্যার অনতিদূরবর্ত্তী কোটসিমুল-গ্রামে তৎকালে বাংবারা খাঁর পুত্র ডিহিদারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; তিনি, কবিকঙ্কণের বাসোপযোগী ১৬ বিঘা ভূমি, তদুপযুক্ত ধান-জমি এবং তৎসহ দুইটী পরগণার সভাপণ্ডিতের অধিকার দান করিয়া, তাঁহার পূর্ব্বক্ষতির পূরণ করিয়া দেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার শেষ-জীবন সুখে-সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবার উপায়-বিধান হইয়াছিল; তিনি বার্দ্ধক্যে প্রিয়ভূমি দামুন্যায় অবস্থিতি করিতে পাইয়া, পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সন-তারিখ কেহই বলিতে পারেন না; তবে এই পর্য্যন্ত জানিতে পারা গিয়াছে যে, অশীতি বর্ষাধিককাল জীবিত থাকিয়া পরলোক-ধাম আশ্রয় করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উহা পলাশী-যুদ্ধের একশত বিশ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল।

তিনি যে বঙ্গভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন কবিকঙ্কণকে কেহ ভুলিতে পারিবেন না। বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি যে কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা, ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত, প্রবল প্লাবন, ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাতাদি যাবতীয় অত্যাপাত উপেক্ষা করিয়া, চিরদিন অচল-অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে। অশিক্ষিত গায়ক-সম্প্রদায় ও অর্দ্ধশিক্ষিত লিপিকরদিগের হস্তে তাঁহার কাব্যের যতই অঙ্গবিকৃতি ও অসৌষ্ঠব সংঘটিত হউক, তাঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্যরাশির সহস্রাংশের একাংশও বিলুপ্ত হইবে না। প্রায় তিনশত বৎসর-মধ্যে শিপিকর-রূপ রাহুগ্রাসেও যখন তাঁহার প্রতিভা লোপ পায় নাই, তখন আর ভয় নাই।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

বিপ্লব।

(উপন্যাস।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মৃণালবালার চক্ষে নিদ্রা নাই। সমস্ত রাত্রি কেবল হরগৌরিন্দের অমঙ্গল-আশঙ্কা করিয়াছেন; এবং যখনই নিদ্রা আসিয়াছে, ভিভীষিকাময়ী স্বপ্ন আসিয়া তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। অতি প্রত্যূষে তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া ঘাটে যাইবার ছলে দীঘির ধারে যাইয়া হরগৌরিন্দকে খুঁজিয়া আসিয়াছেন। যেখানে তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থানটীর প্রতি অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছেন; এবং শেষে হতাশ্বাস হইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, শয্যায় শয়ন করিয়াছেন।

এই সময় কিরণমালা, অপর কয়েকটী বয়স্যার সহিত আসিয়া, মৃণালের শিয়রে দাঁড়াইলেন;

এবং কহিলেন,—"ওলো ওঠ, ফুল তুল্‌তে যাবি-নে?"

"না।"

"তোর কোন অসুখ হয়েছে নাকি?"

"না।"

"তবে যাবি-নে কেন? শিবপুজো কর্‌বি-নে? এরপর গেলে কি ফুল পাবি? কালী ভট্‌চায্ সব তুলে নিয়ে যাবে যে!"

এই সময় ত্রিগুণাসুন্দরী গৃহে আসায়, কিরণমালা কহিল,—"মাসী-মা, স'য়ের কি কোন অসুখ হয়েছে? ওকে যা বল্‌ছি, 'না' বল্‌ছে কেন?"

ত্রিগুণা কহিলেন,—"ওর অসুখ হয়েছে! চোখে জল-ভার হওয়ায়, টস্‌টস্ করে জল পড়্‌ছে; চোখ-দুটা রাঙা হ'য়েছে। আর পেটের অসুখ করেছে। তোমরা চারটি চারটি ভাগ দিয়ে নেও; আজ আর ও ফুল তুল্‌তে যাবে না।"

বাসিকাগণ চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরে, দেওয়ানজী মহাশয় নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। ত্রিগুণা, তাঁহাকে যত্ন করিয়া বসাইয়া, 'হরগৌরিন্দের কোন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কিনা' জিজ্ঞাসা করিলেন। দেওয়ানজী, কহিলেন,—"এক প্রকার পাওয়া গিয়াছে; সে কলিকাতায় গিয়াছে।"

ত্রিগুণাকে গ্রামের লোকে যেমন আপনার ন্যায় ভাবিত, ত্রিগুণারও তেম্‌নি একটী মহৎগুণ ছিল—পরোপকার করা। কাহারও পুত্র-বিয়োগে বাটীর সকলে শোকাভিভূত হইলে, ত্রিগুণা সকলের মুখে জল দিতেন, সান্ত্বনা করিতেন; তৎপরে স্বয়ং রন্ধনাদি করিয়া তাহাদিগকে আহার করাইয়া, তবে বাটী আসিতেন। কোন বাড়ীর গৃহদেবতা লোকাভাবে সেবা পাইতেছেন না দেখিলে, স্বয়ং যাইয়া পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি দিয়া পূজা দিয়া আসিতেন। আজ, দেওয়ানজীর সেই সাহসে কহিলেন,—"মাসী-মা, আমি বড় বিপদে পড়েছি।"

"কি বাবা!"

"হরগোবিন্দ বাড়ী থেকে যাওয়া পর্য্যন্ত, মা বিছানা হইতে উঠিতেছেন না। এক্ষণে আপনাকে পূজার কয়েক দিন ওবাড়ীতে থাকিয়া পূজার আয়োজন করিয়া দিতে হইবে।"

"আমার যা'বার কোন বাধা নেই; কিন্তু কাল থেকে মৃণালের বড় অসুখ হ'য়েছে।"

"তাতে ভয় কি? মৃণাল উপরের ঘরে সুখে-দার কাছে শুয়ে থাক্‌বে।"

"আচ্ছা, দেখি; পারি ত একটু পরেই যাইব।"

এই বলিয়া, দেওয়ানজীকে বিদায় দিয়ে, এবং মৃণালবালার নিকট যাইয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ মৃণাল, তুই যাবি?"

"না।"

"তবে আমার যাওয়া হ'ল না। তোকে একলা রেখে যাব কেমন্ করে?" মৃণালবালা কহিল,—"যাওনা! সইটই আছে; আমার জন্যে ভাব্‌না কি?' মনে মনে ভাবিল,—"মাকে পাঠাইতে পারিলে, তালপুকুরের পাড়-গুলো ভাল করিয়া খুঁজিব।"

ত্রিগুণাসুন্দরী চলিয়া যাইবার কিছু পরে, তারামণি আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং মৃণালকে কহিল,—"তুই এখনও শুয়ে যে! তোর মা কোথায়?"

মৃণাল, তারামণিকে দেখিয়া শশব্যস্তে উঠিল এবং তারার হস্ত ধরিয়া বসাইল। তৎপরে ক্রোড়ে টেনে দিয়া কহিল,—"তারা দিদি, আমার বড় অসুখ হয়েছে।"

তারামণি জাতিতে কায়স্থ। গ্রামের সকলে তাহাকে 'তারাপিসি' বলিয়া ডাকিত।

ত্রিপুরাসুন্দরীও 'পিশি' বলিয়া ডাকিতেন; সুতরাং মৃণালবালা ঠানদিদির স্থলে 'দিদি' বলিয়া ডাকিল। হরগোবিন্দও তাঁহাকে ঠানদিদির স্থলে 'দিদি' বলিয়া ডাকিতেন।

তারামণি বিধবা ও প্রাচীনা। তাহার ব্যবসা ছিল—গ্রামস্থ লোকের নিজ নিজ পুত্রকন্যাকে সন্দেশ প্রভৃতি পাঠাইয়া তত্ত্ব লইবার সময় তারামণি বহন করিয়া লইয়া যাইত। তারা দশবাড়ীর তত্ত্ব একত্র হইলে,গহণার নৌকায় উঠিয়া ত্রিবেণী, হুগলী, হালিসহর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে বিলি করিতে করিতে, কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইত। তারাকে এই সূত্রে নবদম্পতিদিগের বিস্তর গোপনীয় পত্র বহন করিতে হইত। তাহাতে তাহার যথেষ্ট দুই পয়সা উপরিলাভ ছিল, এবং যুবক-যুবতীদিগের নিকট প্রভুত্বও ছিল। তারা উপার্জ্জিত অর্থে অনেক সংকার্য্য করিত। শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিয়াছে। বাড়ীতে মাস কথকথা দিয়াছে। এমন ব্রত নাই, যাহা তারামণি করে নাই। সম্প্রতি বনমালী মুখুয্যেকে ভিক্ষাপুত্র লইয়াছে। তারামণি ইহা ব্যতীত বিবাহের ঘটকালী করিত; তাহাতেও তাহার দু'পয়সা আয় ছিল। মৃণাল কহিল,—"তারা দিদি, আমার বড় অসুখ হয়েছে।"

তারামণি, কিরণবালার নিকট, হরগোবিন্দ ও মৃণালে যে অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছে শুনিয়াছিল। সুতরাং কহিল,—"আহা! মরে যাই। আমি কল্‌কাতা যাচ্ছি; তোর জন্যে বেনেপুঁভুল আন্‌বো।"

"সে বয়েস গিয়েছে।"

"তবে কি আন্‌বো?"

"আমার রোগের ওষুধ!"

"তোর কি রোগ হয়েছে?"

"মন খারাপ।"

"কার জন্যে?"

"মন জানে।"

"আমি তবে যাই।" এই বলিয়া, তারামণি গাত্রোত্থান করিল। মৃণালবালা "হে তারা-দিদি, আর একটু বস।"—বলিয়া বসাইয়া কহিলেন,—"দেওয়ানজীর ভায়ের কোন সংবাদ পেয়েছ?"

"তার জন্যে তোমার মাথা ব্যথা কেন?"

"তাঁর মা-বোন বড্ড কাঁদ্‌ছেন, তাই বল্‌ছি।"

"কল্‌কাতায় যাচ্ছি, সন্ধান নেব। তাকে কিছু বল্‌তে হবে কি?"

"আমার জন্যে আবার তাঁকে কি বল্‌বে?"

"তবু?"

"কিছু না।"

"একখানা পত্র দেবে?"

"আমি কেন তাঁকে পত্র দেব? আচ্ছা, তারা দিদি, তার তো কোন অমঙ্গল হয় নি?"

"তাঁর অমঙ্গল হবে কেন? তুমি একখানি পত্র লিখে দেও।"

"দিই—না—"

"তবে থাক, আমি চল্লাম।"

এই বলিয়া, তারামণি দ্বারের নিকট পর্য্যন্ত যাইলে, মৃণালবালা সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া কহিল,—"তারা দিদি, কেউ টের পাবে না ত?"

"কেউ না, আমি পেটকোচলে ক'রে নিয়ে যাব।"

"তবে আয়,একখানা চিঠিই লিখে দিইগে!" —এই বলিয়া, মৃণাল তারামণিকে ফিরাইয়া আনিল, এবং কাগজ-কলম লইয়া লিখিতে বসিল। কয়েক ছত্র লিখিয়া, পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল।

"ছিঁড়্‌লি কেন?"

"লাইনগুলো বেঁকে গেল।" বলিয়া,

আবার একখানা আরম্ভ করিয়া, আবার ছিঁড়িল।

"আবার ছিঁড়্‌লি কেন?"

"এক ধের্‌ড়া কালী পড়্‌লো।"

"তুই ব'সে ব'সে ঐ কর্; আমি চল্লাম।"—এই বলিয়া, তারামণি গাত্রোত্থান করিল।

"হে তারা দিদি, বার বার এইবার! তোর পায়ে পড়ি, ব'স্।" এই বলিয়া, মৃণাল আবার লিখিতে আরম্ভ করিল। এবার আর তারামণির ভয়ে ছিঁড়িল না। বলিল,—"তারা দিদি, এখানি ফেলে দিয়ে আর একখানা ভাল ক'রে লিখে দেব?"

"ওখানায় কি হয়েছে?"

"বড্ডো বানান-ভুল হয়েছে।"

"সে আবার কি?"

"বানান ভুল!"

"যা ভুল হয়েছে, আর দু'এক ছত্র লিখে দে-না! পত্রখানা ছিঁড়বি কেন?"

মৃণালবালা অগত্যা পত্রে "ইতি" দিয়া শেষ করিয়া, তারামণিকে দিল। তারামণি, পত্রখানি লইয়া পরিধেয়-বস্ত্রের খুঁটে বাঁধিয়া নাভিকুণ্ডের নিকট গুঁজিয়া প্রস্থান করিল।

মৃণালবালা সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া, অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

মহান্ত বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। যে সমস্ত লোক দেওয়ানজীর নিকট মহান্তের নিন্দা করিয়াছিল, তাহারাই আবার মহান্তের নিকট আসিয়া দেওয়ানজীর নিন্দা আরম্ভ করিল। প্রত্যেক পল্লীগ্রামে এরূপ লোকের অসদ্ভাব নাই। দেওয়ানজীর নিকট তাঁহার মনোমত কথা বলিয়া বার্ষিক লইয়াছে; পূজার কয়েকদিন আহারাদিরও বেস বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে। অদ্য আবার মহান্তের নিকট আসিয়া, প্রাত্যহিক জলখাবার গোবিন্দজীর ভোগের লুচির বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছে।"

একজন কহিল,—"গ্রামস্থ সকলেই দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। আপনি না যাওয়ায়, তিনি অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন।"

মহান্ত কহিলেন,—"আমার কি অসুখ-বিসুখ হইতে নাই? তিনিই বা কোন বাবাকে প্রণাম করিতে আসিলেন? আমি গরীব ব্রাহ্মণ, তিনি ধনী, এজন্য আমাকে অপমান করিতে পারেন; কিন্তু বাবা ত কোন অপরাধ করেন নাই!"

"তা সত্য; কিন্তু তিনি আপনার উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন; বলেন—ফৌজদারকে লিখিয়া আপনাকে পদচ্যুত করিবেন।"

"ফৌজদার ওঁয়ার হাত ধরা কি না! আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে!"

অপর একব্যক্তি কহিল—"ও সব কথা ছেড়ে দেন। ওর মত পাপিষ্ঠ জগতে নেই; নচেৎ, সহোদর ভাইকে বাড়ী থেকে তাড়াবে কেন?"

মহান্ত কহিলেন,— "সে কাজটা কিন্তু মন্দ করে-নি। তাতে আমি নিন্দে করতে পারি নে। আমার অমন ভাই থাকলে, জুতো মেরে তাড়াতাম!"

"কেন?"

"আরে—সে পাষণ্ড ভয়ানক লোক! দুঃখের কথা বল্‌বো কি; প্রত্যহ দুটী বেলা কতকগুলো লোক এসে আমার বাগান খুঁড়্‌তো। জিজ্ঞাসা কর্‌লে, বল্‌তো—'যক্ষ দিয়েছে কি না, দেখছি!' আরে মলো যা!—আমার বাগান,আমার টাকা,

আমি যা খুসী তা করি, তোর সে খোঁজে দরকার কি?"

"লোকে বলছে—মরে গেছে।"

"সে ছেলে মরবার নয়—দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। আমি দেওয়ান-ফেওয়ান কারুকে ভয় করি-নে; আমার ভয় কেবল—সেই ছোঁড়া-টাকে। ছোঁড়া যেন অসুর-অবতার! একশ' লেঠেল ওর সাম্নে দিয়ে দেখেছি, ওর কিছুই করতে পারে-নি। বেটা বোধ হয় বিষ খেয়েও মরে না। ভীম! ভীম!"

"দেওয়ানজী—আপনাকে লম্পট, মাতাল কত কি বল্‌লেন। আবার বল্‌লেন—হুগলির ফৌজদার তাঁহার মনিব নবাবের কেহ হয়। নবাবের কাছ থেকে ফৌজদারের নামে অনুরোধ-পত্র আনিয়ে, অপ্‌নাকে গদিচ্যুত করবেন।"

মহান্ত কিয়ৎকাল বিমর্ষ থাকিয়া কহিলেন, —"তা হ'তে আমার যদি কোন অনিষ্ট হয়—তো 'ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়'—আমিত নাগা-সন্ন্যাসী, আর আমার বংশ-নাশেরও ভয় নেই; কিন্তু আগে তাঁরি সপরিবারকে কুচিয়ে নির্ব্বংশ ক'রে, তার পর না হয় নবাবের শূলে উঠ্‌বো।"

দশম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গার ধারে ডুমুরদা নামক একটী গ্রাম আছে। গ্রামটী বেস্ বৃহৎ, অনেক ভদ্রলোকের বাস। গঙ্গার ধারেই ডুমুরদার বাজার। বাজারে বিস্তর দোকান-পাট আছে।

একটী দোকানে, বেলা ৩।৪টার সময়, এক-জন যুবা আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবার কাঁধে গামছা; হাতে একখানা ২।৩ হাঁত লম্বা নিরেট বাঁশের লাঠি, তাহা আবার আছোলা! বাম-হস্তে আর একখানা কি একটা গামছায় জড়ান। ট্যাঁকে আন্দাজ দশ-বার আনা পয়সা। যুবা দোকান-ঘরে আসিয়া, দোকানের বেড়ায় বাঁশী-গাছটা ঠেশ দিয়া রাখিলেন; এবং তজা-পোষের উপর হাতের পোঁট্‌লাটা ধপ্ করিয়া ফেলিয়া, উপবেশন করিলেন। ঐ পোঁট্‌লার শব্দটা দোকানীর কাণে যাওয়ায়, দোকানী সেই দিকে চাহিল; এবং ট্যাঁকের পয়সার প্রতি ঘন ঘন চাহিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, "আজ শুভক্ষণে রাত্রি পোহাইয়াছে। শেষ বেলায় এক কাতলা পড়িল। আজ বেস্-কিছু বকরা পাওয়ার সম্ভাবনা।"

আগন্তুক হরগোবিন্দ রায়। হরগোবিন্দ কহিলেন,—"মুদি ভাই, এখানে আহারাদি হইতে পারে? সমস্ত দিন অনাহারে আছি।"

মুদি কহিল,—"গ্রামের ভিতর যান। তথায় অনেকেরই বাড়ীতে অতিথ-সেবা হইয়া থাকে। রজনীতে শয়নের স্থান পর্য্যন্ত পাবেন।"

হরগোবিন্দ কহিলেন,—'বেস্ বেস্। আমি ঐ প্রকার স্থানই চাই। কিন্তু আমি তাই বিদেশী, গ্রামের কিছুই চিনি-নে যে!"

"চলুন; আমি আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া, অগ্রে অগ্রে মুদিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাঁশ-হাতে হরগোবিন্দ চলিলেন। যাইবার সময় গামছায় বাঁধা পোঁট্‌লাটাও হস্তে করিয়া লইলেন। পোঁট্‌লায় বাঁধা ছিল—একটী শালগ্রাম শিলা। এই শিলা ইঁহাকে একজন সন্ন্যাসী দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন,—"ঠাকুরটী সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিবে। ইনি সঙ্গে থাকলে, তোমার কোন বিপদ হবে না। যদি হয়, উদ্ধার পাইবে।" হরগোবিন্দ যখন বাড়ী হইতে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন, ঠাকুরটী ফেলিয়া আসেন নাই।

মুদি, হরগোবিন্দকে অতিথিশালা দেখাইয়া দিয়া, প্রস্থান করিল। অতিথিশালার লোকেরা

ঁহাকে পাইয়া বেস্ সমাদর করিলেন; এবং হারাণকে সঙ্গে দিয়া রন্ধনশালায় পাঠাইলেন।

হরগোবিন্দ বাটীর মধ্যে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে অত্যন্ত ভীত হইলেন। দেখিলেন, বিস্তর লাঠি, শোটা, তীর, সড়্‌কী এবং ২০।২৫টী বন্দুকও রহিয়াছে।

হারাণ কহিল,—"তুই এখানে কেন?"

"এরা কারা?"

"এরা!"

"তুমি কে?"

"হারাণ!"

"তোমার বাড়ী কোথায়?"

"না জানে!"

"তোমরা কি জাতি?"

"না জানে।"

"তোমার বাপের নাম কি?"

"না জানে।"

'আমাকে বাঁচাতে পার?"

"ভাত দেবে না।"

"আমি ভাত দেব, আমাকে বাঁচাতে পার?'

"না পারে।"

হরগোবিন্দ বুঝিলেন,—"ইহার মধ্যে কিছু রহস্য আছে—এ বালক প্রকৃত ডাকাত নহে। মনে মনে স্থির করিলেন,—"যদি পলাইতে পারি, ইহাকেও সঙ্গে করিয়া লইতে হইবে। আপাততঃ চারটি আহারের উদ্যোগ করি। শরীরে বল করিয়া লওয়া আবশ্যক।"

হরগোবিন্দ আহারাদি করিতে লাগিলেন। ওদিকে বাহির-বাটীতে কথোপকথন আরম্ভ হইল। একজন কহিল,—"বৈটা যেন 'অসুর-অবতার!" আর একজন কহিল,—"আমরা অনেক লোক আছি; সপ্তরথীতে ঘিরে বেটাকে 'অভিমন্যু-বধ' করবো।" তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, —"একটাকে মার্‌তে আমাদেরও অন্ততঃ দু'একটাও তো যা'বে। তার চেয়ে, ঘুমুলে, গলাটা কেটে ফেলা যা'বে।"

অর্দ্ধরাত্রে হরগোবিন্দ অস্ত্রাগার হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটী 'রাইফেল বন্দুক' পাইলেন; সেটী নারায়ণের সহিত একত্রে বাঁধিয়া, দ্বিতীয় গামছা দিয়া ঠোঁমরে বেস্ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। তৎপরে বহির্বাটীতে যাইলেন; মনে কোন ভয় হইয়াছে বা ইহারা যে ডাকাত তাহা টের পাইয়াছেন—কিছুই প্রকাশ করিলেন না; দস্যুদিগের সহিত বসিয়া নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন।

রজনীতে ডাকাতেরা হরগোবিন্দকে জল খাইতে উপরোধ করিল। কিন্তু তিনি 'ক্ষুধা নাই' বলিয়া অস্বীকার করিলেন। তাহারা বারম্বার অনুরোধ করিয়া একবাটী দুগ্ধ খাওয়াইল। দুগ্ধে আফিং মিশ্রিত ছিল, কিছু পরে তাঁহার নেশা হইল, নেশায় অসার হইয়া পড়িলেন, সেই সময় তাঁহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া একটী অন্ধকার ঘরে অবরুদ্ধ করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভাগীরথী-তীরে মহান্তের আবাস-ভবনের নিকট গোবিন্দজীর একটী বাঁধা ঘাট আছে। ঐ ঘাটকে 'গোবিন্দজীর ঘাট' কহে। ঐ ঘাটে গ্রামস্থ প্রায় অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষ স্নান করিত। অদ্য মহাষ্টমী, তাহাতে অপরাপর দিন অপেক্ষা বেশী লোক স্নান করিতেছিল। প্রাচীনা স্ত্রী-লোকেরা চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। কুলবধূরা ঘোমটা দিয়া এবং গলদেশে অঞ্চলের বেড় দিয়া পূজা করিতেছিলেন। বালক-বালিকারা পূজার ফুল কুড়াইতেছিল; জলে সাঁতার দিতেছিল। অপর দিকে পুরুষেরা

বসিয়া পূজা করিতেছিলেন। গঙ্গায় আশ্বিন মাসে জল কানায় কানায় উঠিয়াছে। জল রক্তবর্ণ; কলকল শব্দে মড়ার অর্দ্ধ-দগ্ধ কাষ্ঠ, কয়লা, বৃক্ষের শিকড় এবং নানাপ্রকার লতা পাতা লইয়া স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। ঢেউগুলো ঝড়াস্ ধড়াস্ শব্দে তীরে লাগিতেছে; স্ত্রীলোকদিগের মৃত্তিকার শিবকে উৎসর্গ করিয়া ফেলিয়া পুষ্পাদি লইয়া পলাইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দিতেছে। দেওয়ানজীও স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি, ঘোলা জলে বস্ত্র ময়লা হইবে বলিয়া, একখানি গেরুয়া-বসন পরিধান করিয়া ছিলেন।

এই সময় একখানি প্রকাণ্ড পানসী দূরে দেখা যাইল। ওগুলে মাঝিরা ওণ ঘাড়ে করিয়া ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। দেওয়ানজী তাহাদিগকে বারংবার ওণ ওটাইতে বলায়, তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। অধিকন্তু, তাঁহার উপর দিয়া ওণ টানিয়া চলিল। তখন দেওয়ানজী 'ওণ' কাটিয়া মাঝিদিগকে প্রহার করিতে হুকুম দিলেন। হুকুমমাত্র, নৌকার 'ওণ' কাটিয়া দিয়া, ঘাটের ছেলে-বুড়ো আদি করিয়া প্রায় সকলে, মাঝিদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। 'ওণ' কাটিবামাত্র পানসীখান ১০।১২ হাত হটিয়া গিয়া 'বোঁ' 'বোঁ' শব্দে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু হালের মাঝি শক্ত থাকায়, নৌকাখানি রক্ষা পাইল।

নৌকাখানি ফৌজের নৌকা। ইহাতে ৩০। ৪০ জন সিপাহী ছিল এবং একজন সাহেবও ছিলেন। পানসী কাশীমবাজার কুঠী হইতে কলিকাতায় যাইতেছিল। পানসী রক্ষা পাইলে, সাহেব তরী তীরে লাগাইতে কহিলেন; এবং কয়েকজন সিপাহীকে হুকুম দিলেন,—"সব কোই কো পাকড়-লে-আও।"

যখন সিপাহিগণ পানসী হইতে তীরে নামে, দেওয়ানজী দেখিয়া ভয় পাইল; এবং কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়াছে' দেখিয়া, ঘাটে যত লোক ছিল, সকলকে পলাইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। আপনিও, মহান্তের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অপর দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। মেয়ে-পুরুষ-বালক-বালিকা যে যেখানে পারিল, পলায়ন করিল। পলাইবার সময়, অনেকে জলের ঘড়া, পুষ্প-পাত্র ও শুষ্ক কাপড় ফেলিয়া পলাইল। সিপাহিগণ ঘাটে আসিয়া কহিল,—"মাঝি, কে তেঁদের গুণ কাটিল এবং প্রহার করিতে হুকুম দিল?"

মাঝিরা কহিল,—"একব্যক্তি গেরুয়া-বসন-পরা।"

"সে কোথায় যাইল?"

মাঝিরা কহিল,—"সে এই বাড়ীর মধ্যে পালিয়েছে।" এই বলিয়া, তাহারা মহান্তের বাড়ী দেখাইয়া দিল। এই সময়, মহান্ত বিস্তর লোক কেন ঘাট হইতে পলাইয়া যাইতেছিল—তাহার কারণ জানিবার জন্য, বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। মাঝিরা তাঁহাকেই দেখাইয়া কহিল,—"ঐ ব্যক্তি।"

তখন, সিপাহিগণ ক্রোধে অধীর হইয়া, সবলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অনেক ঝাড় লণ্ঠন ভাঙ্গিল, বিস্তর দ্রব্যাদিও নষ্ট করিয়া অবশেষে মহান্তকে প্রহার করিতে করিতে কহিল, —"হারাম-জাঁদা, হুয়ারকি বাচ্ছা! এ কা'র নৌকো জানিস্-নে!" এই বলিয়া, মহান্তকে বন্ধন করিয়া, তাহারা নৌকাভিমুখে লইয়া চলিল।

যাইবার সময় তাহারা দেখিতে পাইল—একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক, সামনে একখানি চেঙারীর উপর কতকগুলো হাঁড়ি, হাঁড়ির মুখ ময়দা দিয়া আঁটা—মহান্তের দুর্দ্দশা দেখিতেছে।

একজন সিপাহী কহিল,—"তুই কে?"

"আমি তারামণি?

"চল্।"

"কোথায় যাব?"

"কলিকাতায়।"

"চল, আমিও কলিকাতায় যা'বার জন্য গহণার নৌকার অপেক্ষা করিতেছি।"

"তোকে সাক্ষ্য দিতে হইবে।"

"সাক্ষ্য কাক্ষ্য কোথায় পাব? ছ'আনা ক'রে পয়সা দিস্, তাই নিয়ে নামিয়ে দিতে হ'বে।"

"এখন চল।"

"আমার বোঝাটা মাথায় তুলে দেও।"

সিপাহী, বোঝাটা মাথায় তুলিয়া দিলে, তারামণিও, মহান্তের সঙ্গে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া, ইংরাজের নৌকায় উঠিল।

শ্রীদুর্গাচরণ রায়

নৈদাঘ-নিশীথ স্বপ্ন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বনাংশে বিনোদ, বিপিন, মানদা ও প্রমদা নিদ্রিত।

ত্রিতারা ও ভূতোর প্রবেশ; সঙ্গে বেলফুল, বকুলফুল, বকুলফুল ও বেগুনফুল প্রভৃতি পরীগণ; তৎপশ্চাতে অলক্ষ্যে অনঙ্গ।

ত্রিতারা।—এস নাথ, ব'স এই কুসুম-আসনে,
চুমিব বয়ান চারু—বড় সাধ মনে।
সাজাইয়া সুগন্ধি-গোলাপে কেশদাম,
হেরিব নয়ন ভরি, মুরতি সুঠাম।

ভূতো।—বেলফুল, একাথায়—কই?

বেলফুল।—হুজুর হাজির এই!

ভূতো।—এস, তোমায় মাথায় গুঁজে রাখি!

কৈ, বকফুল মশাই!—আপনি কোথায়?

বকফুল।—আজ্ঞে এই যে হাজির!

ভূতো।—আচ্ছা, তুমি যাও—তৈরি থাক-গে; বিশ্বকর্ম্মা পুজোর দিন কচুপাতে করে তুলে আনবো—হাজির থেকো। কৈ, বকুলফুল মশায়—আপনি গেলেন কোথায়?

বকুলফুল।—দাসী আজ্ঞাধীনা সদা!
কি আদেশ, পালিব এখনি।

ভূতো।—অত সঙ্কোচে আর কাজ কি!
এস তোমায়, মাথায় তুলে রাখি!

ত্রিতারা।—
প্রাণনাথ, শুনিবে কি—সুগীত মধুর!

ভূতো।—গাওনায় আমি খুব বাহাদুর!
দলের মধ্যে সেরা একটির!

বাজনাও আমি যেমন বুঝি, তেমন আর কেউ নয়! কি বল ভাই!—বাজনার মধ্যে যদি বল তো ঢাক!—কি মধুর ঠাওা বাদ্যি ভাই! আমি বড় ভালবাসি ঢাকের বাদ্যি!—ভাল নয় কি ভাই?

ত্রিতারা।—
কিবা দ্রব্য থাইতে বাসনা প্রিয়তম!

ভূতো।—
রাঙা রাঙা ভাত, শুট্‌কী মাছের ঝোল,
পুঁই-ডাঁটার চর্‌চরি!
আহা-হা! আমরি!

ত্রিঅরা।—দধি দুগ্ধ ঘীর সর নবনী মাখন।
কিবা অভিমত নাথ, করি আয়োজন।

ভূতো।—গুড় আর মুড়ি, একটা পাকাকলা!
আহা! যেন সঙ্গীতক করছে এ নোলা!
পায়তো করগে যোগাড় গপাগপ খাবো!
ঘুম আসছে আমার এখন আমি ঘুমবো।
একটুখানি সরিৎ যাও, মিনতি তোমায়।
মানা ক'রে দিও সবে, যেন না জাগায়।

ত্রিতারা।—
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে কর শ্রান্তি দূর;
এ কর-পল্লবে দাসী করিবে ব্যজন।

পরীগণ! যাও এবে নিজ নিজ স্থানে।

[পরীদের প্রস্থান।

অনুরাগে ফুল্লময়ী মাধবীবল্লরী,
ভুজপাশে তমালে বেড়িয়া রহে সদা;
ফুল্লফুলে শোভাময়ী কতই লতিকা—
পাদপের উর্ধ্ব কণ্টক দেহ'পরে—
স্থিরে রহে হীরক অঙ্গুরী সম ছাঁদে;
প্রাণনাথ পাশে দাসী রহিবে তেমতি।

[উভয়ের নিদ্রা।

(পঞ্চুর প্রবেশ।)

অনঙ্গ।—(অগ্রসর হইয়া)
এস পঞ্চু, দেখেছ কি অদ্ভুত কৌতুক?
ক্ষোভ হয়, দেখে হেন বিহ্বল প্রণয়!
বনান্তে যেদিন যবে দেখা মোর সনে;
বাধিল উভয়ে দ্বন্দ্ব; তিরস্কার কত
করিলাম তায়—ঘৃণিত পশুর পিছে
প্রেম-অন্বেষণ-হেতু! আশ্চর্য্য পতন!—
কি কৌতুক!—সুবাসিত ফুলের মুকুটে
সাজাইয়া দেয় রাণী রাসভের শির!
নিশির শিশির শোভে গোলাপ-মুকুলে,
সুচিকন মুক্তাবিম্ব প্রায়; এবে হায়,
নয়ন-পল্লবে বসি' ভ্রূশ্রুরূপে যেন,
বিলাপিছে আপনার অসম্মান হেরি!
ইচ্ছামত তিরস্কার করিলাম কত;
শীতলায় শাস্তি-ভিক্ষা মাগিল তখন।
চাহিলাম বালকে আবার; বিনা-বাক্যে
করিল অর্পণ—নিজ সহচরী সহ।
পাঠাইলা পরীরাজ্যে নিকুঞ্জে আমার;
করগত অবজ্ঞি সে কুমার; যাই এবে
দৃষ্টির বিভ্রম তা'র করি গিয়ে দূর।
নিদ্রামগ্ন বৈজয়ন্তবাসী সূত্রধর;
দেও পঞ্চু খুলে দেও মুখোস তাহার;
নিদ্রাভঙ্গে—জাগরণে, সবাকার সনে—
ফিরে যাহে যেতে পারে বৈজয়ন্তপুরে।
অমূলক স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছু যেন,
মনে কেহ নাহি ক'রে রাত্রির ঘটনা।
যাই আমি, রাণীর বিভ্রম করি দূর।

[চক্ষে ফুলের রস দিতে দিতে।

'যেমন ছিলে, তেমনি হও,
যেমন দেখ্‌তে, তেমনি চাও,
মদন-শরে, ফুলের রসে,
পাও সে বল, উঠ হেসে।'

প্রাণের ত্রিতারা! উঠ পরীরাণী!

ত্রিতারা।—
নাথ! নাথ! একি দেখি অদ্ভুত দর্শন!
গর্দ্দভের প্রেমে মুগ্ধ ছিনু এতক্ষণ!

অনঙ্গ।—
ভালবাসা তায় প্রতি পড়েছে তোমার।

ত্রিতারা।—
কেমনে ঘটিল হেন অদ্ভুত ব্যাপার!
কি ঘৃণা! লজ্জার কথা! হা ধিক আমার!

অনঙ্গ।—
বৃথা অনুতাপে আর কিবা প্রয়োজন?
পঞ্চু, এখন মুখোসটা ওর মাথা থেকে
সরিয়ে ফেল। প্রিয়ে ত্রিতারা! তুমি গান
গাও।

[ত্রিতারার গান।]

মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধপ্রাণ। এস প্রিয়ে,
ভ্রমি ধীরে নিদ্রালুদিগের দিকে গিয়ে।
কপোত-কাপোতী সম আমরা দু'জন—
বদ্ধ পুনঃ হইলাম নব অনুরাগে।
প্রমোদিনী নিশিথিনী কালি সুরধুরে—
পরিণয়-উৎসবে প্রমত্ত হ'বে সবে;
সুরেশ্বর মিলিবেন হেমলতা সনে—
আনন্দ-লহরী চির-বিজলী খেলিবে।
সে আনন্দ দ্বিগুণিত করিবারে প্রিয়ে,
নৃত্যগীতে সুরেশ্বরে তুষিব আমরা।

পঞ্চু।—পরীরাজ! আজি কি আনন্দ অনুপম!
প্রভাতী-কাকুলী-গীতি গায় মনোরম।
অনঙ্গ।—হের প্রিয়ে, নীরবে নিশীথ চলি যায়;
আমরাও ধরি এস, পলাক্ষ তাহার।
চঞ্চল চরণে চাঁদ চলে কক্ষপথে,
পশ্চাতে তাহারে ফেলে চল গৃহে যাই।

ত্রিতারা।—এস নাথ, যাই তবে আপন আলয়ে।
যাত্রাকালে ব'লো মোরে রাত্রির ঘটনা;
কি হেতু নরের সহ, ভূমির উপরে,
নিদ্রিত ছিলাম আমি, আপনা ভুলিয়া!

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীমোহিতগোপাল লাহিড়ী।*

বিষস্য বিষমৌষধম্।

এক্ষণে আবার জগদ্বন্ধু বাবুর বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া আরও দুই চারিটি কথা সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের যে স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া "বিষস্য বিষমৌষধম্ রচনাংশের সহিত হোমিওপ্যাথির সম্পর্কহীনতা" দেখাইতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া, লিখিতে লিখিতে প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন; সেই অংশটুকুতে "অনধিকার চর্চ্চা (তাঁহার কথাতেই, আমিও বলি) করিতে গিয়া" তিনি নিজেও "অনধিকার-চর্চ্চা-মূলক কথা লইয়া বাড়াবাড়ি করিয়া কেন যে ভ্রমের ছড়াছড়ি করিলেন" আমিও "তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

* বহু ভগ্নভার মস্তকে লওয়া হইয়াছে—যখন "নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্নের" পরিসমাপ্তির ভার গ্রহণ করিয়াছি, একে মহাকবি সেক্সপীয়রের প্রণীত নাটকের (A midsummer night's Dream) বিদেশীয়-ভাবমূলক গভীরতাপূর্ণ ভাষার অনুবাদ, তাহাতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের চিন্তাশীল মস্তিষ্কের অনুসরণ—বড় অসম্ভাবনীয় কঠিন কার্য্য। বিদেশের ভাব-পদ্ধতি,—এদেশীয়ে সমীকরণ, একে তো "ভাঁহাই ছুরাসাধ্য; তাহার উপর আমার কবিবরের আরত্তের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া—তাঁহার মনোভাব পুর হইতে ধারণা করিয়া লওয়া—আরও শক্ত কথা। সুতরাং এই কঠিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া আমি যে হাস্যাস্পদ হইব, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে সে বিষয়ে এই আমার একমাত্র ভরসা—এই দায়িত্বের উত্তর "সুধিয়া, সসম্ভ্রমমাত্রেই আমার এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে পারিবেন আর, সেই সাহসেই এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি—নতুবা দুঃসাহসিকতার অপবাদ যে অন্ত, তাহা জানি।

—লেখক।

ভ্রম ঘটিয়াছে—নানা প্রকারে। প্রথমতঃ ভাষায়, দ্বিতীয়তঃ অসাবধানতায়, তৃতীয়তঃ অনুসন্ধান-হীনতায়, চতুর্থতঃ বুঝিবার ত্রুটিতে। নিম্নে একে একে দেখান যাইতেছে।

প্রথমতঃ—ভাষার ভ্রম এই যে, "উদ্ভেদিক" এবং "ঔদ্ভিজ্জাত"—ইহা ব্যাকরণ-গত ভুল। এরূপ ভুল 'কম্পোজের' দোষেও হইতে পারে, অনবধানতায়ও ঘটিতে পারে; এটি বক্তব্য নয়। কিন্তু জগবন্ধু বাবু লিখিতেছেন,—"চক্রদত্ত-মতে এই সকল বিষের প্রতিষেধক (Antidote) যে সকল আছে ইত্যাদি।" জগবন্ধু বাবু "প্রতিষেধক" শব্দটীর ইংরেজী প্রতিশব্দ "Antidote" লিখিয়াছেন; এখানে পরিভাষা-গত ভুল হইয়াছে। বিষ বা কোন দ্রব্যের ক্রিয়া যাহা জীব-শরীরে প্রকাশ পায়, তাহার বিনাশ-সাধন (Neutdralization) নিমিত্ত যাহা ব্যবহৃত হয়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাহার নামই 'Antidote'। যথা,—

"Agents which alter the nature of poisons and either render them completely inert or greatly diminish their activity are denominated antidotes."

Vol. I. Percira's Materia Medica

কিন্তু "প্রতিষেধক" তাহা নহে। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কোন রোগ চিকিৎসার জন্য যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার শীর্ষস্থানে রোগের নাম দিয়া "প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ" এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা :—বৃদ্ধ বাগ্‌ভটে :—"নাসারোগ-প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ"; "জ্বরোরোগ-প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ"; "মুখরোগ-প্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ", ইত্যাদি। চরক-সংহিতার ঐরূপ স্থলে "চিকিৎসিতং" এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইংরেজী চিকিৎসা-গ্রন্থে ঐরূপ স্থলে "antidote" শব্দ ব্যবহার করা হয় না; "treatment"শব্দ লিখিত হয়। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, "প্রতিষেধ" শব্দের প্রতিশব্দ "Antidote" নহে, বরং "treatment" হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ।—অসাবধানতা এই যে, চক্রদত্ত হইতে বিষচিকিৎসার ঔষধাবলীর তালিকা করিয়া জগবন্ধু বাবু আমাদিগকে দেখাইতেছেন যে, চক্রদত্তে বিষের ঔষধ ৫৭টী মাত্র আছে। এইখানে তাঁহার ছুটী ভ্রম। তিনি যে তালিকা করিয়াছেন, তন্মধ্যেই দেখা যায় যে, ঔষধাবলীর সংখ্যা ৫৭ না হইয়া ৬৩ হওয়া উচিত। কারণ, পঞ্চলবণ একটী দ্রব্য নহে; ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটী দ্রব্য—প্রত্যেকটিই ভিন্নগুণবিশিষ্ট। ত্রিকটু ও তিনটী পদার্থ। যাউক, এ ভ্রমও যৎসামান্য মনে করিতে পারি। কিন্তু যে অধ্যায় হইতে তিনি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই অধ্যায়ের মধ্যেই বিষ-চিকিৎসার প্রায় আরও চল্লিশটী ঔষধ তাঁহার তালিকায় উদ্ধৃত করা হয় নাই; কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। কেবল চক্রদত্তকৃত সংগ্রহেই যে বিষ-চিকিৎসার কত ঔষধ আছে, উহা দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইত। চক্রদত্তের বিষ-চিকিৎসার শেষভাগে "ঘৃতসঞ্জীবনোগদে" নামক যে ঔষধটী আছে, তন্মধ্যে অনেক ঔষধ অতি প্রয়োজনীয়; তাহা উদ্ধৃত না করায়, অসতর্কতা-নিবন্ধন তালিকাটীতে গুরুতর ভ্রম ঘটিয়াছে।

তৃতীয়তঃ।—অনুসন্ধানের অভাব জন্য যে ভ্রম ঘটিয়াছে, জগবন্ধু বাবু নিজেই যখন এরূপ বুঝিয়াছেন, তখন সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল ছিল। কিন্তু বিষয়টী আবশ্যকীয়; সুতরাং সে সম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন হইতেছে।

এই প্রবন্ধে জগবন্ধু বাবু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমসংকুল—এই সমালোচ্য অংশ; সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার ধৃষ্টতা প্রকাশও এইখানেই হইয়াছে।

একমাত্র "চক্রদত্তের" বিষ-চিকিৎসার ঔষধাবলীর একটী নিতান্ত অসম্পূর্ণ তালিকা গ্রহণ করিয়া এবং আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য গ্রন্থের কোন মর্ম্ম না বুঝিয়াই, জগবন্ধু বাবু 'বিষস্য বিষমৌষধম্' কথাটী একবারেই আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত নহে বলিয়া, দন্তের সহিত সর্ব্বজন-সমাদৃত একখানি পত্রিকায় এরূপ একটী কথাকে অনায়াসে জনসমাজে প্রচার করিতে সাহসী হইলেন—বড়ই আশ্চর্য্য। চরক যে স্পষ্টতই বলিতেছেন,—

"জঙ্গমস্যাদধোভাগমূর্দ্ধ্বভাগমুদাহৃতম্।
তস্মাজ্জঙ্গমং বিষং মৌলং হন্তি মৌলংচ জঙ্গমম্॥"

চিকিৎসিত স্থানম্ চরকে।

ইহা বৈজ্ঞানিক কি না, জানি না; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে আছে। ইহাতে স্পষ্টতঃই কি দেখা যাইতেছে না যে—জঙ্গম বিষ উদ্ভিজ্জ মৌল বিষকে হনন (Neutralize) করে এবং উদ্ভিজ্জ মৌল বিষ জঙ্গম বিষের বিনাশ সাধন করে! ইহা হইতে আরও স্পষ্টতর কথার আবশ্যক আছে কি? আয়ুর্ব্বেদে তাহাও আছে; যথা,—

"বিষং বিষস্যমুক্তং যত্তৎ প্রভাব প্রভাবিতং।

বোধ হয়, এতৎ সম্বন্ধে ইহাই প্রচুর প্রমাণ।

তার পর, জগবন্ধু বাবু লিখিতেছেন, কালিদাসের 'বিষস্য বিষমৌষধং' কথার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। কিন্তু "বিষস্য বিষমৌষধম্" কথাটি যে খুব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত, তাহা ১৮৭২ সালের "Repost of British Association for the advancement of Science" নামক পুস্তকে অন্তর্নিবিষ্ট "Thos. R. Fraser, M. D." লিখিত "Report on the antagonism- betwcen the action of the active substances" নাম ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেই জগবন্ধু বাবুর এই ভ্রমাত্মিকা ধারণা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইবে।

এখন বিষ-চিকিৎসা-সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা লিখিলেই, প্রস্তাব উপসংহার করা যাইতে পারে।

বিষ যখন জাঙ্গম-দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন বিবিধ উপায়েই তাহার চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। 'বেলাডনা' একটী বিষ, 'ওপিয়ামও' একটী বিষ; অথবা উভয়েই উভয়ের 'Antidote' বা বিষঘ্ন। তাই বলিয়া 'ওপিয়াম' দ্বারা বিষাক্ত হইলে সেই বিষের ক্রিয়া বিলোপ-সাধন করিতে যে পরিমাণে 'বেলাডনার' আবশ্যক, তাহা কখনই ব্যবহৃত হয় না; তজ্জন্য অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু দৈহিক-যন্ত্রনিচয় তদবস্থায় যে পরিমাণে 'বেলাডনার' বেগ সহ্য করিতে পারে, যুক্তি পূর্ব্বক সেস্থলে সেইটুকুই প্রয়োজ্য। তজ্জন্যই আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে,—

"বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নং।"

বুঝিবার ত্রুটিতে জগবন্ধু বাবু যে ভ্রম করিয়াছেন, তাহাও এখন বুঝা যাইবে। 'বিষস্য বিষমৌষধম্' কথাটী যে একবারে যুক্তিহীন নয় (হোমিওপ্যাথির সহিত কোন সম্বন্ধের কথা এখানে বলা হইতেছে না), জগবন্ধু বাবু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিতেন।

আয়ুর্ব্বেদে যে সমস্ত বিষ-চিকিৎসা আছে, তাহার অনেক স্থলেই যে বিষের ঔষধ বিষ, তাহা বিষ-চিকিৎসা-প্রণালী দেখিলেই প্রতীয়মান হয়। শুদ্ধ বিষের দ্বারাই যে বিষের চিকিৎসা করিতে হইবে, ইহা আয়ুর্ব্বেদের অভিপ্রায় নহে। পীত বিষ অর্থাৎ আমাশয়ে প্রবিষ্ট বিষের চিকিৎসায় বমিকারক ঔষধের ব্যবস্থা চক্রপাণি দত্ত ও করিয়া রাখিয়াছেন। যথা,—

"পীতো বিষস্যাং বমনক্রিয়ায়ে,
প্রদেহ সেকাদি সুশীতলঞ্চ।

চরকও বমনের ব্যবস্থাই দিতেছেন,—

"আদাবামাশয়গে বমনং স্বগ্রেহে স্বেকাদি।"

ইনিই সর্পকীট ও গরবিষ শান্তির জন্য লিখিতেছেন,—

"নাগদন্তী ত্রিবৃদ্দন্তী প্রকৃপীরঃ ফলৈঃ
সাধিতং মাহিষং সর্পিঃ সগোমূত্রাঢ়কংহিতং।"

ইহাতে ঘৃত ও গোমূত্র ভিন্ন যে কয়েকটী দ্রব্য আছে, উহারা ভেদ ও বমনকারক।

পরবিষ শান্তির জন্য বাগ্‌ভটও বমনের ব্যবস্থাই করিয়াছেন। যথা,—

"গরার্ত্তো বান্তবান্ ভুক্ত্বা তৎপথ্যং পান-
ভোজনম্।"

সর্পবিষ চিকিৎসায় বাগ্‌ভট অনেক প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া, একস্থানে ঐ বমনবিধিই প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

"বমনৈর্বিষহৃদভিশ্চ নৈবং ব্যাপ্নোতি তৎবপুঃ।"

কফাধিক্য-বিষেও বমনকারক ঔষধের ব্যবস্থা,—

"যষ্ট্যাহব মদনা ক্ষৌদ্র জালিনী সিন্ধুবারিকা,
কফে শ্রেষ্ঠাম্বুনা পীত্বা বিষয়াশু সমুদ্বমেৎ।"

কুকুর-বিষে বমনকারক ঔষধের ব্যবস্থা।

"কোষাতক্যাঃ শুকাখ্যায়াঃ ফলংজীমূতকস্যচ,
মদনস্য চ সক্ষৌদ্রা দধ্না পীত্বা বিষং বমেৎ।"

শার্ঙ্গধরের মতেও বিষে বমির ব্যবস্থা

"বিষদোষে স্তন্যরোগে মন্দেহগ্নৌশ্লীপদে-
হৃদ্রুদে।"

ফলতঃ আয়ুর্ব্বেদ হইতে এইরূপ বহুতর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, বিষ-চিকিৎসায় বমিকারক ঔষধের ভূয়ো ভূয়ো ব্যবস্থা রহিয়াছে।

'এলোপ্যাথি' মতেও বিষ-চিকিৎসা প্রণালীটী কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ। সুবিখ্যাত মেটেরিয়া মেডিকাকার "Jonathon Pereera, M. D. F. R. S" তদীয় মেটেরিয়া মেডিকার প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন;—

"The most important is the removal of the poison from the part to which it has been applied. From the stomach it is removed by the stomach pump, by the use of emetics, by promoting vomiting, by diluents and demulcents.

(As for the emetics) more effective emetics are one or two scruples of sulphate of zinc or 5 to 15 grains of sulphate of copper."

(2) "In poisoning by caustic or acrid substances, considerable relief is generally obtained by the use of diluents, oily, muclagenous and other demulcent liquids and fine impalhable powders. These substanuees lessen the injurious action of poisons by diluting and enveloping them by sheathing the mucous surface of the stomach and intestines and by obstructing absorption. Hence I have termed them meckanical antidotes."*

এলোপ্যাথিক বিষ-চিকিৎসায় যে বমনের বিধি আছে, জগবন্ধু বাবুও তাহা জ্ঞাত আছেন। আয়ুর্ব্বেদে বিষ-চিকিৎসার অধিকাংশ স্থলেই যে বমনের বিধি আছে, তাহা উদ্ধৃত বচনগুলিতেই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। বমনকারক ঔষধগুলি যে প্রায়শঃই বিষাক্ত, জগদ্বন্ধু বাবু যখন চিকিৎসা-শাস্ত্র কিছু কিছু দেখিয়াছেন, অবশ্যই তাহা বুঝিতে পারেন। বিষ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধাবলীর মধ্যে উদ্ভিজ্জ ও খনিজ বিষ অনেক আছে। যথা,—

নাগদন্তী, কবরী, কর্কোটক, করঞ্জ, সূহী, ইন্দ্রবারুণী, শ্বেতকরবীর মূল, তাম্রচূর্ণ, রসাঞ্জন (Antimony)। যে মদন ফল বমিকারকরূপে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার অপর নাম বিষফল। এই সমুদয় পদার্থের একটু মাত্রাধিক্য হইলেই ভেদ ও বমি হইয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ করে; অথচ, ইহারা এবং এতাদৃশ বহুবিধ ঔষধ বিষ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থাৎ বিষ-চিকিৎসায় বিষও ব্যবহৃত হইয়াছে। বিষের ঔষধ যে বিষ, তাহা এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল কি না, জগদ্বন্ধু বাবু এখন একবার বেশ ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

উপসংহার করার পূর্ব্বে দুটী কথা বলিয়া রাখার আবশ্যক।—

১ম। ঔষধ শব্দ দ্বারা যে কেবল (Chemical antidote) বুঝিতে হইবে (যেরূপ জগদ্বন্ধু বাবু বুঝিয়াছেন), তাহা নহে। চরক বলেন,—

'ভেষজ নাম তদ্ যদুপকরণীয়োপ কল্পাতে-
ভিষজোঃ
ধাতু সাম্যাভি নিবৃত্তৌ প্রযতমানস্য
বিশেষতশ্চোপায়ান্তেভ্যঃ।"
বিষানস্থানং, চরক-সিংহিতা।

অর্থাৎ,—চিকিৎসক ধাতুসাম্যের জন্য প্রবৃত্ত হইলে যে যে বস্তু উপকরণরূপে কল্পিত হয়, তাহার নাম ঔষধ।

২য়তঃ। "বিষের ঔষধ বিষ" এই কথায় বিষের ঔষধ বিষ ভিন্ন যে আর কিছুই নহে, এমন অর্থই বা জগদ্বন্ধু বাবু কেন করেন? 'ফলের দ্বারা ক্ষুধা নিবারিত হয়' এই কথায় এমন অর্থ কি হইতে পারে যে, ফল ভিন্ন অন্য কিছুতেই ক্ষুধা নিবারিত হইতে পারে না? এইরূপ বাক্যে এমন বাধকত্ব কি আছে যে, একের গুণ প্রকাশ করিতে অন্যের গুণ-সম্বন্ধে বাধা পড়ে?

যাহা হউক, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিবিধ বিষ-প্রতিকারে অন্যান্য ঔষধ ব্যবহারের ন্যায় বিষাক্ত ঔষধের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। শ্বেত কবরী, আর্সেনিক, রসাঞ্জন (Antimony) প্রভৃতি তো আছেই; অধিকাংশ স্থলেই বমনকারক ঔষধের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বমনকারক ঔষধ বিষাক্ত। বিশেষতঃ,—

"১। সমপীতেন তেনৈব সমদ্যোনোপশম্যতি।"
"২। তস্মাদ্দংষ্ট্রি বিষং মৌলং হন্তি
মৌল চ দ্রংষ্ট্রিজং।"
"৩। বিষং বিষঘ্নমুক্তং যত্তং প্রভাবপ্রভাবিতং।"

ইত্যাদি বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইল 'বিষস্য বিষমৌষধম্' শ্লোকাংশ নিশ্চয়ই আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত। তদ্ব্যতীত, ডাক্তার সার্পের বক্তৃতা হইতে যেটুকু উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ন্যায় সুবিখ্যাত ও সুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের গ্রন্থের ১৯ ও ২১ পৃষ্ঠায় "বিষস্য বিষমৌষধম্" বাক্যের সহিত হোমিওপ্যাথির যে সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, আলোচ্য শ্লোকাংশের সহিত হোমিওপ্যাথির সম্বন্ধ আছে।

উপসংহারে একটী কথা বলা আবশ্যক। জগদ্বন্ধু বাবু একজন অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি, সাহিত্য-সংসারে উচ্চ-পদবীতে অধিষ্ঠিত। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির কোন কথায়, লোকের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার সামান্য ত্রুটিও উপেক্ষা করা অনুচিত। করিলে, অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সুতরাং প্রতিবাদছলে কোন রূঢ় কথা বলা হইয়া থাকিলে, উদ্দেশ্যের উপযোগিতা বুঝিয়া, তিনি মার্জ্জনা করিবেন—ভরসা করি।

শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।

---

* সম্ভবতঃ এই কারণেই আয়ুর্ব্বেদের স্থানে স্থানে বিষ-চিকিৎসায় ঘৃতাদি ব্যবহারেরও বিধি আছে। বৃদ্ধ বাগ্‌ভট বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বেষু সর্ব্বাবস্থেষু বিষেষু ন ঘৃতোপমম্,
বিদ্যতে ভেষজং কিঞ্চিদ্বিশেষাৎ প্রবলেঽনিলে॥"

ঘৃত বিষ না হইলেও Meachanical Antidote হইয়া কার্য্য করে।

কবি-কুটীর।

অভিযোগ।

তোর কাছে এত সুধা
এত শান্তি আছে—
না বুঝিয়া গিয়াছিনু
মানুষের কাছে!

'ওমা' মাগিতে 'ও মা' যাচিতে,
'সুধা দেও দেও' বলি সাধিতে,
'মন দেও দেও' বলি কাঁদিতে।

তারা বড়ই কাঙাল, কোথায় পাবে!
তারা প্রেম যে কি ধন, নাহিক ভাবে!

কেমন ক'রে আমায় তবে,
দেবে প্রেমের ভাগ!
নাহিক তাদের ব্যথা-বোধ—
নাহিক অনুরাগ!

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

রসিকা।

(ধানশ্রী)।

সখি! রসিক নিরখি গৌরিতি কিয়ব,
শ্যাম সে রসিকরাজ।
রস-কৃষ্ণাবনে বসতি কিয়ব অনদেশে নাহি কায়॥
রসের বসনে দেহ আবিরব চলব রসের বাট।
রসের বুজারে রসের সওদা কিয়ব রসের হাট॥
গৌরিতি-রসের রসানে উজলি ভূষণ পিন্ধব গায়।
রসের সরসে সিনান কিয়ব রসের সরোজ খায়॥
রসের বাতাসে নিঃশ্বাস তেজব
নাহিব রসের খাটে।
রসের কালিন্দে আলিস রাখব
ভতব রসের খাটে॥
রসের বাগানে কুসুম তুলব ভরিয়া রসের ডালা।
রসেভরা ফুলে বঁধুর লাগিয়া গাঁথব মোহনমালা॥
রসের তিলক অলকা তিলকা
রসকলি দিব নাকে।
রসের কাজলে উজলব আঁখি
রসের পরাগ মুখে॥
রসের মন্দিরে বিরাজ কিয়ব রঁসের আগর ধারে।
বিরস বদন দেখিলে সখির খেদাইয়া দিব দূরে॥
রসের অঞ্জন রসের মঞ্জন রসের তাম্বুল মুখে।
রসিক রঞ্জনে পরম যতনে হার কিয়ব বুকে॥
রসিক নিরখি নাগর কিয়ব গাহিব রসের গাথা।
রসিক মিলিলে বিরলে বৈঠই কহব রসের কথা॥
রসিক ভ্রমর যে ফুলে বিরাজে
সে ফুলে গাঁথব মালা।
রসিক দেখিলে পরম আদরে
সাজাব তাহার গলা॥
রসিক পাইলে চরণ পাকড়ি শুনব রসের কথা।
রসিক নাগর যে দেশে যায়ব পশাইয়া যাব তথা॥
রসের বাজারে রসিক বিরাজে
রসের হিল্লোল তায়।
রসিক পাইলে তাহারে কহিলে
মরমের দুঃখ যায়॥
রসিক সুজন সহিত মিলন মণি-কাঞ্চনের যোগ।
রসিকের সহ রসিকা-মিলনে মাহেন্দ্র-লগুন-ভোগ॥
রসিক-মলয় রসিকা যমুনা রসের হিল্লোলু তায়।
রসরাজ ভণে রসের কদম্ব তলায় রসিক রায়॥

শ্রীরসিকলাল দত্ত।

শ্রীমতীর ঝগড়া।

জ্বালাতন!—জ্বালাতন!—জ্বালাতন! লোকের কাছে আর মুখ দেখান যায় না! বল দেখি তোমরা সবাই—এখন হ'তে শেষ কলির বিংশ-শতাব্দী—এতদিন যা' সয়েছি সয়েছি—এ কালেও কি আর ওসব স'য়া যায়? বলি, মেয়েমানুষ-আমাদের নিয়েই তো তোমাদের মান!—কেমন গা?—কি বল পুরুষ-শায়রা!—কথাটা স্বীকার কর কি না? কিন্তু, সেই আমাদের প্রতিই এতটা অপমান! কথায় কথায় অপমান!

বলি, আরও কি খুলে বল্‌তে হবে? বলি—এই আপনাদের—এই তোমাদের—এই তোমাদের জাতভাইদের—এই কবিদের—হতচ্ছাড়া হাড়হাবাতে পোড়ারমুখো 'অধরদের'—জ্বালায় জ্বালাতন হলাম যে! কেন?—এত বিদ্রূপ—এত হেনেস্থা কেন? কেন?—হয়েছে কি?—আমরা কি সত্যি-সত্যিই "থপ্ থপ্" করে পা ফেলি?—সত্যিই-কি আমাদের পায়ে জল-ভার গোদ হয়েছে? দেখ দেখি আল্‌পিটো "একবার! অমরা হলেম কি না—"গজেন্দ্র-গামিনী!" অর্থাৎ, গজ কিনা 'হস্তী'—হাতী! আর, আমাদের পা-দুখানী হলো কিনা—হাতীর পায়ের মত—বড় বড় গাছের গুঁড়ির মত—গেঁজ-বেড়োনো গোদের মত! আর আমরা চলি কিনা—আস্তে, আস্তে, আস্তে—থপ্, থপ্, থপ্! আ-মর্! মিন্সেরা, একেবারে চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস্ নাকি?

আহা! আমাদের কেমন সরু সরু গোল-গাল পা-দুখানি! বিশেষ, আজকালকের ওতো কথাই নেই! এত ক'রে চেপে চেপে সরু সরু জুতোগুলো পায়ে দিয়ে, যাকে 'লেডিজ সু' বলে গো—লেডিজ 'সু'—কেমন নিটেলেটি গোলগালটি দাঁড় করান গিয়েছে! তারেই কি না বলে—হাতীর পায়ের মত থপ্ থপ্ পা? সেকালে বল্‌লেও বরং খাটতো কতকটা—কারণ, তখনকার কতকগুলো অসভ্য 'বার্ব্বারাস্' মাগীরা—'নেকেড্' পায়ে থাকতো! কিন্তু এখন আর তা নেই গো—তা নেই! এখন খট্—খট্—খট্!

আমাদের পা হাতীর পা! বল্‌তে একটু লজ্জা করে না? বলি, তা হলে কি আর এই পায়ের তলায় এত গড়াগড়ি যেতে? দ্বাপরের শেষে সেই কেষ্ট-ঠাকুরটি থেকে, আর ৩৫-তিনটী পর্য্যন্ত বল দেখি দিকি ক'রে, এই পায়েই দিনের মধ্যে ধর ক'বার ক'রে? তবু—তবু—সুবিধে পেলে, এতবিদ্রূপ!—এত অপমান! পোড়ারমুখো কবিরা—হতচ্ছাড়া 'অধরা'!—আর কি উপমার যায়গা পাওনি? তাই পায়ে ধ'রে অপমান করা?

শুধুই কি তাই? শুধু কি ঐ বুলেই খালাস? আরও ব'লে কি না—আমরা তাদের গায়ে-পড়া—তাদের না জড়িয়ে, ধরলে আমাদের আশ্রয় নেই—আমরা "তমালে জড়িতা লতা!" কেন? —মরতে লতা হ'তে যাঁব কেন? আ-মর্ পোড়ার-মুখোরা! আমরা লতা, না তোরা লতা? তোরাই আমাদের জড়িয়ে থাকিস্, না আমরা? আমরা আশ্রয় না থাকলে, তোরা দাঁড়াতিস্ কোথায় বল্ দেখি! আসিসে সাহেবদের তাড়া খেয়ে

এসে কার কোলে মাথা রেখে জিরতে পারতিস্? আমাদের 'অঞ্চল' না ধরলে, কোম্ কাজটা তোরা করতে পারিস—বল দেখি! তবু আমরা হ'লাম লতা, তোদের জড়িয়ে ধরে তবে দাঁড়াতে পারি। সেকালে বল্লেও বা খাটতে পারতো কতকটা! কিন্তু এখন সব 'সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রীর' রাজ্য,—এখন সব 'সেল্ফ্ মেড'—এখন আর ও রুজ্‌রকী খাটে না! এখন স্ত্রী-পুরুষ স্বস্ব-প্রধান! কিন্তু পাকে-চক্রে তবু এই অপমান করা!

ভাল, দেশে কি লোক নেই একজনও? শুনতে তো পাই, দিনদিন রক্তবীজের বংশের মত দেশে শত শত নারীহিতৈষী নরবরের জন্ম হচ্ছে; কিন্তু, অবলাদের প্রতি পুরুষজাতির এই অপমান—এর প্রতিকার কেউ করতে পারে না? আর পোড়া-কোম্পানীও নিত্যি-নতুন কত আইন কর্‌ছে; তারাও কি এর একটা কোন বিহিত করতে পারে না? আইনে সত্যি কথা বল্‌বার যো নেই—চোরকে চোর বল্‌লে চোর-মশায়ের মানহানি করার অপরাধে ৫০০ ধারায় জেলে যেতে হয়; আর এই মিথ্যে গ্লানিগুলো—বিশেষ এই অবলা সরলা মহিলা কুলবালার উপর—এর কি একটা প্রতিকার হয় না?

শ্রীমতী অবলাবালা।

মতামত।

পুস্তক।

অষ্টাদশ-বিদ্যা।—পণ্ডিত গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ-বারিধি প্রণীত। ১ম ও ২য় খণ্ড।

গভীর গবেষণা-পূর্ব এই একখানি পুস্তক "অষ্টাদশ-বিদ্যা"। পুস্তকখানি এতই আবশ্যকীয়-না পড়িলে শাস্ত্র-সম্বন্ধে মোটামুটি একটা "আক্কেল" জন্মাইতে পারে। হিন্দুর কয়খানি ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহাদের কি কি বিভাগ, সে বিভাগের এক-একখানিতে আবার কি কি জিনিস আছে, 'অষ্টাদশ-বিদ্যা' পাঠে সেই সকল তত্ত্ব সম্যক অবগত হওয়া যায়। এক কথায়, ইহা যেন—শাস্ত্রসমূহের একখানি" সংক্ষিপ্তসার বা অষ্টাদশবিদ্যার প্রথম সূত্র। শাস্ত্রানুসন্ধিৎসুগণ, শাস্ত্রানুশীলনের সূচনায় এ পুস্তকের সাহায্যে সমূহ উপকার পাইতে পারিবেন। অধিকন্তু, শাস্ত্রপাঠ শেষ করিয়া, ইহাকে স্মারক-শাস্ত্র-রূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিদ্যা-বিনোদ মহাশয় যে অশেষ শ্রম ও শাস্ত্র-চর্চ্চা করিয়া অষ্টাদশ-বিদ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এ পুস্তক সকলেরই আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই।

স্বাস্থ্য-সোপান।—প্রথম ভাগ।—ঋষি-প্রণীত বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থোক্ত স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ। শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

নিদ্রা, আহার, ব্যায়াম, পানীয় প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, এই পুস্তকে সরল ভাষায় তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে। হিন্দুভাব-প্রণোদিত এরূপ শ্রেণীর পুস্তকের প্রচারে আমরা সন্তুষ্ট আছি। অমৃত বাবুর এ সাধু উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ দিই।

পিণ্ডদান পদ্ধতি।—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত এবং গয়া 'সুগত-যাত্রি-নিবাসের' অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

গয়ায় গিয়া কি নিয়মে পিতৃকার্য্যাদি সম্পাদন করিতে হয় এবং গয়ার মাহাত্ম্য ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রভৃতি এই পুস্তকে আছে। প্রসন্নকুমার বাবু গয়ায় যাত্রি-নিবাস খুলিয়া, যাত্রিদের সুবিধা করিয়া, অনেকের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র পুস্তকেও তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনের অনেকটা সহায়তা করিবে। তাঁহার উদ্দেশ্য ও উদ্যমে প্রশংসা করি।

সাময়িক পত্র।

জন্মভূমি।—৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা। ফাল্গুন মাসের। বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন প্রেস শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

জন্মভূমির একটী প্রধান গুণ দেখিলাম, ইহাতে কতকগুলি নূতন লেখক-সৃষ্টির চেষ্টা হইতেছে। এই সংখ্যায় একটীও "সুপ্রসিদ্ধ" লেখকের নাম নাই, অথচ পত্রিকাখানি অনুল্লেখ-যোগ্য হয় নাই।

১০টী বিষয় আছে। ৩টী পদ্য, ২টী গল্প, একটী উচ্চাঙ্গ, একটী সমালোচনা, একটী 'উত্তর-কাশী' একটী ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। 'রণজিৎ সিংহের দরবার'—জ্ঞাতব্য, চিত্তাকর্ষক। 'উপন্যাস নহে'—কিন্তু কৌতুকপ্রদ। 'মেসার ফর মেসার'—সেক্সপীয়ারের নাটকের গল্প। 'প্রেম'—মন্দ নহে। 'পুরাণ কথা'—সুতরাং নূতনত্বহীন! 'সুখ ও শান্তি'—তুচ্ছপ্রায়! 'সমালোচনা'—"মুক্তকণ্ঠে" করা হইয়াছে!

জ্যোৎস্না-হারী।—মাসিক পত্র ও সমালোচনা।—চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত।

মাঘ মাসের প্রথম সংখ্যা। সূচনায় লিখিত হইয়াছে,—"সূর্য্যালোক-সমুদ্ভাসিত দিবাভাগে জ্যোৎস্নার প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু অন্ধকার রজনীতে যখন সূর্য্যালোক থাকে না, তখন যে জ্যোৎস্নার বিশেষ সমাদর, হইয়া থাকে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।" এ কথা অবশ্য আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই, এবং অন্ধকারেও 'জ্যোৎস্না' টিকিতে পারে না। প্রবন্ধের মধ্যে "বৈজ্ঞানিক স্থিতিত্ব" উল্লেখযোগ্য।

আভা।—মাসিক পত্র।—শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

"আভা"—প্রথম সংখ্যা। সূচনা প্রায় একরূপ। ছোট ছোট অনেকগুলি বিষয় আছে। কিন্তু তেমন ভাল নহে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-হরণ।—রিউটরের তারের সংবাদ, মাদ্রাজ লিবরাল ফ্রিডম, দেশীয় সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা-হরণের চেষ্টা করিতেছেন।

... ...

ডেপুটীর বিরুদ্ধে।—তমলুক হইতেছে, ঘুষ লওয়ার অপরাধে, ঢাকার ডেপুটী ফৌজদারি সাহেবের বিচার জন্য, গভর্ণমেণ্ট, ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর হুকুম দিয়াছেন।

... ...

সৈন্য-ভয়ে দেশত্যাগ।—ত্রিহুতে রাষ্ট্র,—একদল গোরা-সৈন্য সেইদিক দিয়া যুদ্ধযাত্রা করিবে ও তাহাতে অধিবাসীদের মহল ক্ষতির সম্ভাবনা। তমা গেল, এই ভয়ে, বহুলোক ত্রিহুতবাসী গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে।

... ...

ডেপুটীর ব্যবহার।—নারায়ণগঞ্জের ডেপুটী সুকাস, একজন আসামীকে মেয়াদ দেন। কিন্তু রায়ের নকল লইতে গিয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার তখনও রায় লেখাই হয় নাই। অথচ, তৎপূর্ব্বেই আসামী জেলে প্রেরিত।

... ...

ডাইভোর্সে আপত্তি।—'মেরিড' সাহেব স্ত্রীর অসচ্চরিত্রের জন্য যে স্ত্রী-ত্যাগের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আদালত তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন। কারণ, আদালত প্রমাণের দাস; তিনি সত্য বলিলেও, তাহাকে প্রমাণ চাই; তাঁহার স্ত্রী যে কুচরিত্রা, তাহা তিনি "হাতে-নাতে" প্রমাণ করিতে পারেন নাই! সুতরাং মকর্দ্দমা 'ডিস্‌মিস্' হইয়াছে। এই সূত্রে আদালতের বোধ হয় বলিয়া দিলে ভাল হইত—প্রমাণটা কি কি রকম আবশ্যক

চীন-জাপান।—গত পূর্ব্ব রবিবার চীনের প্রধান মন্ত্রি-সভায় একটী অধিবেশন হয়। তাহাতে বহু আলোচনার পর, সন্ধিস্থাপনাই ধার্য্য হইয়াছে। চীনের মন্ত্রি-সভার প্রধান সভাপতি কং এই উপলক্ষে গত বুধবার প্রকাশ করিয়াছেন—"চীন হইতে জাপানে সন্ধির জন্য দূত প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের ক্ষতিপূরণেও স্বীকৃত হওয়া যাইবে; ইহাতেও তাহারা অন্যরূপ ব্যবহার করিলে, যুদ্ধই চালান যাইবে।" জাপানের প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট ইটো এবং বৈদেশিক মন্ত্রী ভাইকাউণ্ট মুৎসুই—দুই জনে 'সামিনোসেফি' অভিমুখে রওনা হইতেছেন; এদিকে চীনের প্রেরিত প্রতিনিধিগণও ১৯এ মার্চ্চের মধ্যে ঐস্থানে পৌঁছিবার সম্ভাবনা। সেখানেই উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিয়া সন্ধি করিবেন।

... ...

চিত্রলে যুদ্ধসম্ভাবনা।—উত্তর-পশ্চিমে কাবুলের সীমানার চিত্রল রাজ্য। তথাকার অধিপতি উমরা খাঁ ইংরাজের বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে জানান হইয়াছে—১লা এপ্রিলের পূর্ব্বে তিনি যেন চিত্রল পরিত্যাগ করেন, নতুবা তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইবে। এদিকে, জেনারেল সাত্ত বর্ত্তাই লোর অঞ্চলে পেশয়ারে ইংরাজ-সৈন্য সজ্জিত হইতেছে। উমরা খাঁ যে বিনা রক্তপাতে রাজ্য-ত্যাগ করিবেন, এরূপ ভরসা হয় না।

... ...

মহারাজার ক্ষমতা-লোপ।—তাঁহার সংবাদ-দাতা পুত্রের "মহারাজের সমস্ত ক্ষমতা লোপ করা হইবে; ইংরাজ-রাজ কর্ত্তৃক গঠিত মন্ত্রি সভায় এখন হইতে ভরত-পুর শাসিত হইবে, মহারাজা নামে মাত্র থাকিবেন। কারণ, যুবরাজের মৃত্যুর পর, সর্দ্দারগণের—সুতরাং মহারাজের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া অধিবাসিগণ গভর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছে।"—তদনুরূপ চলিতেছে।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

অনুসন্ধান

অষ্টম বর্ষ। | ১৫ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। | ৪৬শ সংখ্যা

শ্রীগৌরাঙ্গের নামাবলী।

মিশ্রনন্দন—জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। শচী-সুত—ঐরূপ।

নবদ্বীপচন্দ্র—জগতের পাপান্ধকার নাশ করিয়াছেন বলিয়া চন্দ্র; এই সেই চন্দ্র নবদ্বীপ-রূপ আকাশে উদিত।

নদীয়াবিহারী—নবদ্বীপে লীলাকারী।

শ্রীগৌরাঙ্গ—শরীর গৌর বলিয়া।

গৌরসুন্দর—গৌরবর্ণ ও সুন্দর বলিয়া শ্রীবয়স এই নাম রাখিয়াছিলেন।

নিমাই—নিম তিক্ত, সুতরাং নিমাই নাম রাখিলে ডাকিনীগণ বালকের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না অনুমান করিয়া শ্রীমতী সীতা ঠাকুরাণী এই নাম রাখেন। কেহ কেহ বলেন নিম্ব-তরুমূলে জন্ম হওয়াতে, শিশুর নিমাই নাম হয়। যথা,—

"যখনে জন্মিলা নিমাই নিম্বতরু-তলে।
হৈয়া কেন নামরিলা আমি-না লইতাম কোলে॥"
প্রাচীন পদ।

বিশ্বম্ভর—এদেশে চিরকাল বিশ্বাস যে,পিতা ও পুত্রের নামে অন্তরগত বা অর্থগত মিল থাকা প্রয়োজন। "জগৎ" শব্দের অর্থ বিশ্ব; এইজন্য জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিশ্ব-রূপ, কনিষ্ঠের নাম বিশ্বম্ভর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—মহাপ্রভু, সন্ন্যাস-গ্রহণের পর এই নাম ধারণ করেন। বেদানুসারে "কৃষ্ণ" শব্দের অর্থ "পরব্রহ্ম"; এবং 'চৈতন্য" শব্দের অর্থ "চিৎস্বরূপ" বা "পরমাত্মা"। সুতরাং "কৃষ্ণ-চৈতন্য" নামের অর্থ "চিৎস্বরূপী" বা "পরমাত্মা-রূপী", "পরব্রহ্ম"। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তেরা বলেন, তিনি যে কেবল নামে, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য", তাহা নহে, তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার। এ কথার অনেক প্রমাণও তাঁহারা প্রদর্শন করেন। কিন্তু সমুদায় আলোচনার এ স্থল নহে। তবে এস্থলে আমরা পুজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বা-মীর একটী পদ্য উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ অজস্রবার অবতারের যে যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, 'ভগবদ্গীতার' সেই শ্লোকোক্ত কারণ-গুলির সহিত, এই ক্ষুদ্র পদের কারণগুলি

মিলাইয়া লইলে, পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। পদটী এই,—

"অরে রে নিন্দুক ভাই, তোর কিরে বুদ্ধি নাই,
বৃথাই ধরিলা হুটী আঁখি।
সব অবতার সার, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার,
তুমি তাহে রৈয়াছ উপেখি॥
সুরাপান অত্যাচার, ভ্রূণহত্যা ব্যভিচার,
তন্ত্র-ধর্ম্মে ভরাত্ব পুরিল।
যক্ষ রক্ষ বিষহরি, নানা উপহার করি,
জীব সবে পূজিতে লাগিল॥
দেখিয়া জীবের দৈন্য, প্রভু মোর শ্রীচৈতন্য,
নবদ্বীপে প্রকট হইলা।
তারকব্রহ্ম হরিনাম, যাচি সবে করি দান,
অধমের সে শ্লাঘি ঘুচাইলা।
জগাই মাধাই আদি, দুষ্কৃতের নিরবধি,
হরিনামে করিলা উদ্ধার।
ব্রাহ্মণে যবনে মিলি, করাইলা কোলাকুলি
পর তেকে দেখ একবার।
ম্লাস্তিকে করিলা ভক্ত, খঞ্জে কৈলা গতিশক্ত,
অন্ধেরে করিলা চক্ষু দান।
কহে দীন কৃষ্ণদাস, নহিলে ইথে বিশ্বাস,
তোর আর নাহি পরিত্রাণ॥"

শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

উপাসনা-তত্ত্ব।

নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ দেব দেবীর উপাসনার মাহাত্ম্য বা প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। অথচ উপাসনা ব্যতীত মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না—উহা অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়।

উপাসনা কাহাকে বলে—তাহা না বুঝিলে, উপাসনার বাস্তবিক প্রয়োজন আছে কি না—তাহা অবধারিত হইতে পারে না। এজন্য, সর্ব্বাগ্রে উপাসনার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা আবশ্যক। যে ব্যক্তি ঐকান্তিক ভক্তিপরবশ হইয়া একাগ্রতার সহিত কোন বিষয়ের আরাধনা করে, তাহাকে সেই বিষয়ের উপাসক বলা যায়। হিন্দু-শাস্ত্রমতে উপাসনা দুই প্রকার; নির্গুণ ও সগুণ উপাসনা। প্রকৃত পক্ষে, নির্গুণ উপাসনা উপাসনা-পদবাচ্য নহে; উহাকে অব্যক্ত-সাধন বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাস বলা যায়। সগুণোপাসনা, প্রকৃত গুণের উপাসনা। মৌলিক গুণ তিনটী—সত্ত্ব, রজ ও তম। সত্ত্বগুণ অর্থে জ্ঞানানন্দ-বিকাশিনী শক্তি, রজঃগুণ অর্থে প্রবৃত্তি ও ক্রিয়োদ্দীপনী শক্তি। তমঃগুণার্থে আবরণী শক্তি। অতএব, জ্ঞানের উপাসনার নাম সাত্ত্বিক উপাসনা। ঐ সাত্ত্বিক উপাসনা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত ও বৈষয়িক তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত। কিন্তু, উহা ভিন্ন ভিন্ন স্তরাভর্গত হইলেও, উভয়ই অভ্যন্তরীণ সাত্ত্বিক উপাসনা। ঐ সাত্ত্বিক উপাসনা দ্বারাই কপিল, পাতঞ্জল, ব্যাস, গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, বরাহ মিহির প্রভৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ প্রভৃতির উন্নতি ও স্বস্ব তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। অভ্যন্তরীণ রাজসিক উপাসকের দৃষ্টান্তস্বরূপ পার্থিব উন্নতিশীল রাজা, রাজমন্ত্রী

ও যোদ্ধাগণ; যথা, রঘু, অর্জ্জুন, নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট ও প্রিন্স বিস্মার্ক। অভ্যন্তরীণ তামসিক উপাসকের দৃষ্টান্ত—দুর্য্যোধন, আশুতুষ্টদেবকে দেওয়া যাইতে পারে।* ফলতঃ এক এক বিষয়ের অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত, যত্ন, চেষ্টা, চিন্তা ও একাগ্রতা দ্বারা এক এক শক্তি বা বৃত্তির যে সকাম উপাসনা করা হয়, ইহাই প্রকৃত অভ্যন্তরীণ সকাম উপাসনা। আমাদের পৌরাণিক দেব সকাম উপাসকের উচ্চ দৃষ্টান্ত-স্থল। সকাম উপাসনার মূল—এক পক্ষে ভক্তি, প্রীতি, বিশ্বাস; অন্যপক্ষে ইচ্ছা, যত্ন, অধ্যবসায় উদ্যোগ ও চেষ্টা। উপরি-উক্ত উপাসনাই মানসোপাসনা বা স্বভাব-শক্তির অনুশীলনরূপ প্রাকৃতিক উপাসনা।

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য-পদার্থ-শক্তি হইতে জগতের অসাধারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায়, ঐ সকল শক্তির বাহ্য আরাধনা করিতে মানবের স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। তদ্দ্বারা মনের একাগ্রতার বৃদ্ধি ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বাহ্য আরাধনারও দূরবর্ত্তী ফল—শক্তিবৃদ্ধি ও অভীষ্ট-সাধন। কিন্তু শক্তি বাস্তবিক কোন দৃশ্য পদার্থ নহে। ঐ শক্তির গুণানুরূপ কল্পিত মূর্ত্তি ব্যতীত উহার বাহ্য উপাসনা হইতে পারে না। বিশেষতঃ, সাধারণ লোকের ভক্তি আকর্ষণের নিমিত্ত ঐ সকল শক্তির গুণানুরূপ সাকার দেব-দেবীর মূর্ত্তি কল্পনা ও সেই সকল সাকার দেব-দেবীর পূজা অত্যাবশ্যক। মানবের প্রীতি, ভক্তি, বিশ্বাস, আসক্তি ও কামনা, হইতেই একাগ্রতা, জন্মে;† তদ্দ্বারা অধ্যবসায়, যত্ন ও চেষ্টা হইতে অভীষ্ট-ফল লাভ হয়। বাহ্য চাকচিক্য ব্যতীত সাধারণ লোকের প্রথমতঃ ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মিতে পারে না, এবং মন আকর্ষিত বা মনের একাগ্রতা হইতে পারে না। পুরাণাদি দূরে থাকুক, মূল ভগবদ্গীতায়ও সাকার উপাসনার ভূয়সী প্রশংসা আছে। কিন্তু গীতাকার কেবল সাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তির নিমিত্তই উহার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। ঐ ভগবদ্গীতার দেবোপাসনা সকাম ও নিষ্কাম যোগের ব্যাখ্যা পরে করিব। ফলে, পৌরাণিক দেব-দেবীর উপাসনার মধ্যেও প্রাকৃতিক সত্য অন্তর্নিহিত আছে; উহা মূলক পৌত্তলিকতা (Idolatory) নহে। তবে কালক্রমে উহা দ্বারা নানারূপ মূলক বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া উহা মলিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু ঐ মলিনত্বের মধ্য দিয়াও সত্যের প্রকৃত জ্যোতিঃ পাওয়া যায়।

যেরূপ মানসোপাসনা বা অভ্যন্তরীণ স্বভাব-শক্তির অনুশীলন-রূপ প্রাকৃতিক উপাসনার মধ্যে দুইটী স্তর আছে, সেইরূপ আবার দেব-দেবীর উপাসনারও বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ দুইটী স্তর আছে। প্রথমতঃ, বাহ্য চাকচিক্য-দ্বারা মানবের মন আকর্ষিত হয়। মানব সততই সাংসারিক শোক, দুঃখ, ক্লেশ ও যন্ত্রণার অধীন। মানব সর্ব্বদাই শোকে সন্তপ্ত; দুঃখ ও ক্লেশ-ভোগে ম্লান ও ক্লান্ত হইয়া, তাহার উপশমের জন্য দিক্‌হারা পথিকের ন্যায় অক্ততসাচ্ছন্ন কণ্টকাকীর্ণ পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। আবার বাসনা-তৃষ্ণায় তৃষ্ণাতুর ও ক্লেদক্লান্ত মরুভূমিস্থ পথিকের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া, জগাযে-যণের জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া বেড়াইতেছে কিন্তু জগতের সম্পূর্ণ অভাব। এ অবস্থায়, মনুষ্য যদি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তও সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়া

* প্রকৃতপক্ষে রঘু, অর্জ্জুন প্রভৃতি কেবল রজ-গুণের উপাসক নহেন; রজ ও সত্ত্বগুণের উপাসক তবে রজ মুখ্য, সত্ত্ব গৌণ। সেইরূপ, দুর্য্যোধন ঐকান্তিক তম মুখ্য, রজ গৌণ।

† একাগ্রতা যে যোগের প্রধান অঙ্গ, তাহা 'যোগ-তত্ত্ব' বর্ণন-কালে ব্যাখ্যাত হইবে।

ও পরিষ্কার বুঝিতে প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার ক্রিয়োৎপরিমাণ ভূমারি উপশম হয় ও নিদারুণ পশ্চাত্তাপ দূর হয়। দেব-দেবী পূজার বাহ্য চাক্‌চিক্য ও নির্ম্মল আনন্দ-প্রমোদ দ্বারা মন অত্যন্ত আকর্ষিত হয়; পুষ্প, চন্দন, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ এবং স্নান, বস্ত্রাদি ও মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি দ্বারা মন পবিত্র ও ভক্তিভাবাপন্ন হয়; এবং নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতদিগের আদর, আহ্বান, ভোজন ও দান প্রভৃতি সংক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা মন প্রফুল্লিত হয়। ইহাদ্বারা মানব কিছুক্ষণের জন্য সংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়। ঐ সকল অনুষ্ঠানের দূরবর্ত্তী ফল সাধনের নৈতিক উন্নতি। এই পর্য্যন্তই দেবোপাসনার বাহ্যস্তর।

ভিন্ন, অভ্যন্তরস্থ আর একটী স্তর আছে; ঐ অভ্যন্তরস্থ স্তরের মধ্যে গূঢ় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং তন্মধ্যে ভয়ঙ্কর সত্য অন্তর্নিহিত আছে। উক্ত স্তরে প্রবেশ করিয়া উহার গূঢ় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক রহস্য ভেদ করা—আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে; এমন কি, আমার তাহা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে কি না, সন্দেহ। তবে অন্তর্নিহিত সত্যের যে জ্যোতি বাহির হয়, তাহা অবশ্যই সত্য। ঐ তত্ত্ব সাধ্যানুরূপ বুঝাইতে হইলে, দুই-একটী দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। অনেকে অবগত আছেন, শূলবেদনা-গ্রস্ত বা অন্যান্য অচিকিৎস্য গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিগণ,অনন্যোপায় হইয়া একাগ্রচিত্তে তারকনাথ বা বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে "হত্যা দিয়া" স্বরূপেযে উপযুক্ত ঔষধ বা রোগ প্রতিকারের উপায় প্রাপ্ত হয়েন। এমন কি, স্বপ্নেও কেহ কেহ ঐরূপ শুভঔষধাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উপরি-উক্ত বিবরণগুলি কল্পিত নহে; উহার সত্যতা-সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে ও আমরা নিজজ্ঞানেও কিছু কিছু অবগত আছি। মনুষ্যের অধ্যবসায়, যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা যে অভীষ্ট ফল লাভ হয়, ঐ অধ্যবসায় ও যত্ন-চেষ্টায় মূল—একাগ্রতা, ভক্তি ও বিশ্বাস। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের মধ্যে যে সকল ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, চিরাভ্যস্ত বিধায়, তাহাতে আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি না; কিন্তু যদি ঐ অভ্যস্ত সামান্য প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিন্তা করি, তবে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যেক ব্যাপারই বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

কোন ব্যক্তি আমাদিগকে কঠোর কথা বলিলে আমরা ক্রোধান্বিত ও মিষ্ট কথা বলিলে সন্তুষ্ট হই কেন? ইহার প্রকৃত গূঢ় কারণ কি কেহ নির্ণয় করিয়াছেন? ঐ বাক্য একটী শব্দ মাত্র; ঐ শব্দ—আকাশীয় পরমাণুর কম্পন হইতে যে একটী প্রবাহ (Vibratory motion) উৎপন্ন হয়, তাহা বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া আমাদের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়-দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। তথায় কোন অব্যক্ত শক্তি-প্রভাবে একটী উদ্বোধ্য-শক্তির বিকাশ হইয়া, আমাদের সূক্ষ্মমনের কোন বৃত্তির সহিত ঐ শব্দের গুণের সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য হওয়ায়, একটী অব্যক্ত শক্তিউত্তেজনা হয়; এবং পরে তাহা বাহ্যে প্রকাশ হয়। উহাই আমাদের সন্তোষ বা ক্রোধ। সুতরাং আমাদের সমস্ত ব্যাপার বাহ্য

* পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিক ও আনন্দের মূলমিশ্র সাত্ত্বিক উপাসনা যে স্বয়ম্ভর্ত্তর, ইহাও সেই এক স্তর স্তর্ত্ত। তবে অধ্যাত্ম-জ্ঞানোন্মাদকগণ এই স্বপ্ন স্তরে শ্রীবিষ্ণু হইয়া তাহার নির্ম্মল জ্যোতিতে বিমল আনন্দ ভোগ করেন; কিন্তু সাধারণ জনবর্গ অপেক্ষা বিশেষে এই স্তর হইতে সেই জ্যোতির আভাস প্রাপ্ত হইলেও, তাহার প্রকৃতমর্ম্মোদ্ঘাটনে কৃতকৃত্য হইতে সমর্থ হন না—এইমাত্র প্রভেদ।

ও অভ্যন্তরীণ এক-একটী শক্তির বিকাশ বা বিকার মাত্র।

ক্লেশ—মনের একটী বৃত্তি বা অবস্থা। তাহারও স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ কারণ। বলা বাহুল্য, সূক্ষ্ম এবং স্থূল ভূতের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। যেমন, শব্দ ও বাহ্য বিষয় বা ক্রিয়ার সূক্ষ্ম শক্তির সহিত মনোবৃত্তির সংঘর্ষণে একটী শক্তির উত্তেজনা হইয়া, মনের, শোক, দুঃখ, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি এক-একপ্রকার অনুভূতি জন্মাইয়া, মানবের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়; সেইরূপ, শরীরস্থ স্থূল ভূতের অভাব ও অসামঞ্জস্য-হেতু তাহার বিকৃত অবস্থা হওয়ায়, ঐ বিকৃত অবস্থা-দ্বারা মানবজীবনের একটী প্রতিকূল-শক্তির উদ্রেক হইয়া, ঐ প্রতিকূল-শক্তির সহিত সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির সংঘর্ষণে একপ্রকার ভয়ঙ্কর ক্লেশের উৎপত্তি হয়। যখন প্রতিকূল শক্তি দ্বারা মন-বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ-সহ জীবাত্মা ঘোর আক্রান্ত হয়েন, তখন অসহ্য যন্ত্রণায় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের পরস্পর বিরোধ হয়। ইহারই নাম মৃত্যু। কিন্তু ঐ স্থূল দেহের সহিত সূক্ষ্ম দেহের যাহাতে বিচ্ছেদ না হয়,তজ্জন্য ঐ প্রতিকূল শক্তির সহিত অনুকূল শক্তির ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় অভ্যন্তরীণ অনুকূল শক্তি, বাহ্য জগতের স্বজাতীয় স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন শক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলে,অর্থাৎ গ্রহাদি সুপ্রসন্ন হইলে) ঐ অনুকূল শক্তির ক্রিয়া-স্রোত ভয়ঙ্করবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন, রোগমুক্তির আসক্তি ও বাসনা উপস্থিত হয়; এবং তন্নিমিত্ত দেববিশেষে দৃঢ় ভক্তি, একাগ্রতা, তন্ময়-চিন্তা, ধারণা ও ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা জীবাত্মার একপ্রকার, অনুকূল জ্ঞানশক্তির উদয় হয়; তদ্দ্বারা স্বপ্নাদেশে ঔষধ বা অন্য প্রতিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং অনুকূল সূক্ষ্ম শক্তিরই জয় হয়। পরে, ঐ প্রাপ্ত ঔষধাদির সহিত ভক্তি ও একাগ্রতা প্রভৃতির সংমিশ্রণে যে লৌকিক শক্তির আবির্ভাব হয়, তদ্দ্বারা শরীরস্থ স্থূল ভূতের অভাব ও অসামঞ্জস্য দূর হইয়া সাম্যাবস্থা রক্ষা ও পীড়া আরোগ্য হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতের সংমিশ্রণ ও বিমিশ্রণের ব্যাপার যে নিয়মের অধীন,সূক্ষ্মভূতের শরীরের মধ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল সংমিশ্রণ ব্যাপারও সেই একই নিয়মের অধীন। অতএব, ভক্তি, বিশ্বাস, একাগ্রতা ও তন্ময়-চিন্তা প্রভৃতি অনুকূল-শক্তি দ্বারা মানবের ঈপ্সিত ফললাভ হয়। ভগবদ্গীতাকারও ঐ মতের সম্পূর্ণ পোষণ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহদেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥"

৪র্থ অধ্যায়, ১১শ ও ১২শ শ্লোক।

"যোযো যাংযাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়া র্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥"

৭ম অধ্যায়, ২১শ ও ২২শ শ্লোক।

বঙ্গানুবাদ।—হে পার্থ! মানবগণ যে ভাবেই আমাকে (ঈশ্বরকে) উপাসনা করে, আমি (ঈশ্বর) তাহাদিগকে সেই 'ভাবেই' অনুগ্রহ করিয়া থাকি। * কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যগণ নানা-প্রকারের পূজা করিলেও তাহারা একমাত্র আমারই (ঈশ্বরেরই) অনুসরণ করিয়া থাকে ১১। ইহলোকে কর্ম্মজন্য ফল শীঘ্র পাওয়া যায় বলিয়া সকাম পুরুষ-বর্গ ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ১২। সেই সকাম ভক্ত পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে দেব মূর্ত্তিতে অর্চ্চনা করিয়া থাকে, আমি (ঈশ্বর) তাহার পূর্ব্ব-সংকল্পিত-রূপ কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি। ২২ যে যে সকল

ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া যে যে দেবমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমিই দৈশ্বরই অন্তর্যামিরূপে সেই সেই ব্যক্তির ভক্তি তত্তন্মূর্ত্তিতে দৃঢ় করিয়া দিই ২১।

কবিতা কয়েকটীর যে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল, তাহা উহার উপসংহার মাত্র। ঐ কবিতা-কয়েকটীর অভ্যন্তরীণ গূঢ় তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যে কোন ব্যক্তি একাগ্র ও তন্ময় হইয়া যে কোন বিষয়ের কামনা করে, সেই কামনা হইতে তাহার অনুকূল শক্তি উদ্ভূত হইয়া কামনা সকল সফল হয়। মনুষ্য যে শক্তির উপাসনা করে অর্থাৎ যে যে বিষয়ের সাধনা করে, তৎপ্রতি ক্রমেই তাহার আসক্তি ও প্রীতি জন্মিতে থাকে। তখন, তদ্‌বিষয়ে একাগ্রচিত্ত ও তন্ময় হওয়ায়, একপক্ষে অধ্যবসায়, যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা, পক্ষান্তরে কামনা,ভক্তি, প্রীতি, বিশ্বাস প্রভৃতির তীব্রবেগ, একাগ্রতা ও তন্ময়ত্ব হইতে উৎপন্ন আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম অনুকূল শক্তি-প্রভাবে, সফল-মনোরথ হয়। ঐ আসক্তি, প্রীতি, ভক্তি, বিশ্বাস একটী সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক চৌম্বক আকর্ষণী-শক্তিজাত। ঐ আকর্ষণী বা অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তি আত্মার একএকটী অবস্থা বা শক্তিবিশেষ; উহা সেই মৌলিক অনন্ত শক্তিরই উন্মেষ বা বিকার মাত্র। সুতরাং যে, যে শক্তির উপাসনা করুক না কেন,তাহাতেই অনন্তশক্তির উপাসনা করা হয় ও সেই অনন্ত শক্তি হইতেই অবস্থাভেদে ভক্তি, প্রীতি, অধ্যবসায় প্রভৃতি অনুকূল শক্তি বা তাহার বিপরীত প্রতিকূল শক্তি উৎপন্ন হয়।

অতএব, দেখা গেল, দেবারাধনা দ্বারা ভক্তি ও একাগ্রতা প্রভৃতি জন্মে; তদ্দ্বারা মানবের কামনা সিদ্ধ হয়; এবং ইহাই দেবারাধনার দ্বিতীয় স্তর।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্ব্বাণ।

আমি দেখিতে এসেছি, দেখে যাই বঁধু
বয়নখানি।
পুড়ে থাক হয়ে, প্রেম গেছে জ্বলে,
তুমি ত তাহার শ্মশান জানি।

প্রেতের সোহাগ, মুখের আদরে,
কাজ নাহি আর।
খিলখিল করি, পিশাচীর হাসি,
হাস বারবার।

অতুল রূপের মাঝারে তোমার,
হেন হলাহল!
প্রাণের রুধির, পান ক'রে প্রাণ,
হাসে খলখল।

বুক-ফাটা এই, বুকের উছাস—
নয়নের জল;
শুধু তাহে বল, কেমনে নিবাবে—
দারুণ অনল?

যত পার হাস, উপেক্ষার হাসি,
আদরে কি আর কাজ;
মরম মাঝারে করিয়াছ পান,
তবু আসিয়াছি আজ!

ওগো তবু আসিয়াছি, ও অনল মাঝে,
পুড়িয়া হইতে ছার!
আশায় করেছ নিরাশার মত,
প্রাণে তবু মোহ-ভার!

ওই হাসি-পান, একদিন করে,
হ'য়েছি আপনহারা।
আজিও তেমনি, চাঁদের মাধুরী,
তেমনি মধুর রাত!

বসন্তেরি প্রাণ মলয়-সমীর
পুলকে বহিয়া যায়!
সে দিনের মত পিউ পিউ করি
পাপিয়া সঙ্গীত গায়!

অধরে অমিয়, কপোলে কপোল,
কি-যেন-কি বুকে রয়ে;
জীবন-সঙ্গীত, সেদিন শুনেছি,
সুখেতে বিবশ হয়ে।

শতছিন্ন প্রাণ, মরণের তান,
আজি শুনিতেছে দূরে।
হাস লো প্রেয়সি, পিশাচি রাক্ষসি,
গাও মৃদু মধু সুরে।

তবে এস এস, এসে কাছে বস,
আর হাসিয়া ভুলাবে কারে?
এই অবিনাশী, মোহটুকু আছে,
দাসা দিয়ে যাও তারে।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

বিপ্লব।

(উপন্যাস।)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি নিস্তব্ধ। জ্যোৎস্নালোকে পল্লীগ্রামের বনজঙ্গলগুলি সুন্দর দেখা যাইতেছে। জঙ্গলের মধ্য হইতে ঝিঁ ঝিঁ পোকারা একঘেয়ে শব্দ করিতেছে। একটী একটী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় জ্যোৎস্না-পোকারা একই সময়ে জ্বলিয়া উঠায়, অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে—যেন গাছে হীরার ফুল ফুটিয়াছে। রাস্তাঘাটে জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। বিরশ, ডুমুরদা ডাকাইত-প্রধান স্থান বলিয়া, কি রাত, কি দিন, কেহ সহজে সেদিকে আসিত না। গ্রামের মধ্যে মোড়লদের বাড়ী; ডাকাইতেরা তথায় বসিয়া গীতবাদ্য আমোদ-প্রমোদ করিত। অদ্যও সেইরূপ চলিতেছিল। এমন সময় সংবাদ আসিল, —"একখানা প্রকাণ্ড 'ভাউলে' আসিতেছে। তাহাতে একজন জমীদার আছেন। জমীদারের সঙ্গে বিস্তর টাকা আছে। ভাউলেখানি মারিতে পারিলে, ঐ সমস্ত টাকা পাওয়া যাইতে পারে।" তৎশ্রবণে ডাকাইতের দল লাফাইয়া উঠিল; দলে দলে ছুটিল। যাইবার সময়, হারাণী নামক একটী বালিকাকে বলিয়া গেল,—"অতিথ মুসুল তার গলায় ছুরি বসিইয়া দিবি। ফিরে এসে যদি দেখি সে বেঁচে

আছে, তোদের টুকরো টুকরো করে ফেলবো।"

কয়েক ঘণ্টা পরে, হরগোবিন্দের নেশা ছুটিল। তিনি দেখিলেন—একটী গৃহে শয়ন করিয়া আছেন। গৃহমধ্যে মিটামিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রথমে তাঁহার স্মরণ হইল; কোথায় আছেন—ভাবিয়া লইতে একটু সময় লাগিল। পরিশেষে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে গিয়া দেখেন—হস্ত-পদ বান্ধা আছে। তখন সকল কথা মনে পড়িল—চক্ষে জল আসিল। ভাবিলেন,—"হায়! ডাকাইতেরা আমাকে কৌশলে বন্ধন করিয়াছে! আমাকে পাঁঠা-পাঁঠীর ন্যায় বধ করিবে! চোরের ঘরে চোরের ন্যায় প্রাণ দিতে হইবে!" একবার সজোরে বন্ধন ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেন। মনে মনে মাতা ভ্রাতা ও জন্মভূমির নিকট বিদায় লইলেন; এবং "মৃণাল, আমার প্রাণের মৃণাল" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মৃণালের রূপ গুণ যতই তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল, ততই নয়ন-জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মনে মনে কহিলেন, —"আহা! কত আশা, কত ভরসা, কত সাধ মনে ছিল; আজি বিধাতা সকল সাধে বাদ সাধিল! আমার আন্তরিক দুঃখ এই—প্রাণের মৃণালকে প্রাণত্যাগের সময় একটীবার চক্ষের দেখা দেখিতে পাইলাম না! আমার দুঃখ—যমালয়ে যাইয়াও যন্ত্রণা প্রদান করিবে। আহা! আমি কুচ্ছ বিষয়ে অভিমান করিয়া কেন বাড়ী হইতে আসিলাম? না হয় দাদার সংসারে না থাকিতাম, কেন আমি কৃষ্ণপুর বাড়ী পরিত্যাগ করিলাম। আমি যদি বাটী হইতে বহির্গত না হইতাম, হায়, এমন অপমৃত্যুতে মরিতে হইত না!"

তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া রোদন করিতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার যেন বোধ হইল—একখানি কোমল হস্ত তাঁহার চক্ষের জল ও কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতেছে। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন—একটী পরমা-সুন্দরী বালিকা শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে। বালিকার পরিধানে ছিন্ন বসন, সর্ব্বাঙ্গে ময়লা, মস্তকের সুদীর্ঘ কুন্তলে তৈল-অভাবে জট, হস্তে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র। হরিগোবিন্দ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কি দেবী, না মানবী? আপনি কি আমার উদ্ধারের জন্য কারাগারে আসিয়াছেন! আপনি কে?"

"আমি হারাণী।"

"হারাণী কে?"

"আমি।"

"তা ত বুঝেছি। বাড়ী কোথায়?"

"জানি-নে।"

"বাপের নাম কি?"

"জানি-নে।"

"এরা কারা?"

"ডাকাত! তোকে কাটবে! আমাকে কাটতে পাঠিয়েছে।"

"আমাকে কি তুমি কাটবে?"

"না, তুই পালা; বাঁধন কেটে দিই, পালা।"

"আমি পালালে তোমার কি হবে?"

"আমায় মারবে, আমায় কাটবে, তুই পালা।"

"তোমায় মারবে—তোমায় কাটবে! তার চেয়ে কেন আমার সঙ্গে চল না?"

"ভাত দেবে না।"

"আমি ভাত দেব। তুমি শীগ্‌গীর আমার হাতের বাঁধনটা কেটে দেও, আমি ভাত দেব।"

হারাণী, তৎশ্রবণে, একহস্তের বন্ধন কাটিয়া দিল; হরগোবিন্দ, অস্ত্রখানি চাহিয়া লইয়া, অপরাপর বন্ধনগুলি স্বয়ং ছাটিয়া লইলেন। পরে, হারাণীর হস্তধারণ করিয়া বাহিরে

আসিয়া, তাহাকে একস্থানে অপেক্ষা করিতে বলিলেন; এবং আপনি একটী আলো হস্তে করিয়া, দস্যুদিগের গৃহ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে দেখেন, বিস্তর নূতন কাপড়ের চোগা, চাপকান ও টুপী প্রভৃতি রহিয়াছে। তখন তিনি তাহা হইতে নিজের সাজ-সজ্জার উপযোগী বস্ত্রাদি, একটী টুপী ও এক-জোড়া বিনামা বাছিয়া পরিধান করিলেন; এবং একখানি অত্যুৎকৃষ্ট 'কিরিচ' স্কন্ধে ঝুলাইলেন। তৎপরে, প্রত্যাগমন করিয়া, হারাণীর হাত ধরিয়া শুভযাত্রা করিবার জন্য দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে, হারাণ ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"ও বাবু, বাবু, আমিও।"

হরগোবিন্দ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"তুমিও যাবে? আচ্ছা। কিন্তু পেছু ডাকলে?" এই বলিয়া, প্রত্যাগমন করিয়া, আর তিনটী বন্দুক সংগ্রহ করিয়া ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইলেন, এবং হারাণ ও হারাণীর স্কন্ধে তাহার একটী দিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দ্বার বাহিরদিক হইতে বন্ধ। সুতরাং সজোরে পদাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। হরগোবিন্দের ঘনঘন পদাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, চৌকাট প্রভৃতি সহ দরজাটী গভীর শব্দে পড়িয়া গেল। তখন, তিনজনে মুক্ত-পথে বাহির হইয়া, গঙ্গার ধারে ধারে কসাড়-বনের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রামস্থ মেয়ে-ছেলেরা বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দেওয়ানজী-বাড়ী পূজা দেখিতে যাইতেছে। ত্রিগুণা-সুন্দরীও পূজার আয়োজনাদি করিয়া দিতে যাইবেন—তাহারও উদ্যোগ করিতেছেন। মৃণালবালার কোন আমোদ-আহ্লাদ নাই; সকলই হরগোবিন্দের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে। তিনি অহোরাত্র কেবল হরগোবিন্দের চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। যদি কেহ হরগোবিন্দের সুসমাচার—তাঁহার বাড়ী আসার সংবাদ দেয়, কাণ খাড়া করিয়া, তাহার প্রত্যেক কথা শ্রবণ করিতেছেন। কখন কখন হরগোবিন্দের হস্তলিখিত কাগজপত্র লইয়া অশ্রুকেও বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতেছেন।

একসঙ্গে পূজাবাড়ী যাইবার জন্য, পাড়ার স্ত্রীলোকেরাও, দুই-চারিজন এ সময় ত্রিগুণার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শনি পাগলী আগে হইতেই আসিয়া বসিয়া ছিল। কথায় কথায়, গোঁসাইবাড়ীর বড়-বৌ ত্রিগুণাসুন্দরীকে কহিলেন,—"ঠাকুরঝি! শুনেছিস্—তারামণিকে নবাবের লোকেরা ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। আর তার সঙ্গে যত সন্দেশের হাঁড়ি ছিল, সরা খুলে, সব খেয়ে ফেলেছে!" মোক্ষদা কহিলেন,—"বটে! ঐ জন্যেই মেনকার মা কাঁদছিল বটে! বল্লে—বাছার মুখের জিনিসগুলি বাছা আমার মুখে দিতে পেলে না!" ত্রিগুণাসুন্দরী কহিলেন,—"আহা! তারা বুড়ো মানুষ! তাদের অপরাধ কি?" লক্ষ্মীমণি কহিলেন,—"অপরাধ খুব! তারা চোরাই মাল কিনে মহাস্তকে বেচ্‌তো; মহাস্ত আবার তাই গলিয়ে পোদ্দারের দোকানে বেচ্‌তো; এখন নব্যবের চৌয়ের এক ছড়া চিক্ ধরা পড়েছে!" মাঝ হইতে শনি পাগলী বলিয়া উঠিল,—"দূর—চিক কেন? কাণবালা ঠমোকদা কহিল,—"বাড়ীতে ওঁরা বলাবলি কর্‌ছিলেন, মহাস্ত আর তারামণিকে মুখোমুখী ক'রে দাঁড় করিয়ে, ডাল-কুত্তো দিয়ে খাওয়াবে।" শনি পাগলি বলিয়া উঠিল,—"ডাল-কুত্তো কেন?—তালের বাসের গর্ত্তে ছেড়ে দেবে।" লক্ষ্মীমণি কহিলেন,—"মাগো! মাগীর পেটে এত বিদ্যেও ছিল! আমরা বরাবর ভেবেছি আস্—বৃন্দাবন যাওয়া,

রথ-দোল করা, এই টাকা পাঁচ কোথায় ?"

এদিকে পুঁটিকাটারা বাদ্য-বাজনা ওঠায়, স্ত্রীলোকেরা সকলেই প্রস্থানোদ্যত হইলেন। এই সময়, কিরণমালাও নবসাজে সাজিয়া উপস্থিত। হরসুন্দরী কিরণকে দেখিয়া কহিলেন,—"কিরণ! মৃণাল যদি যেতে চায়—তো ওকে নিয়ে যাস্ এখন—আমি একটু সকাল সকাল যাই।" কিরণ সম্মত হইলে, ত্রিগুণা-সুন্দরী প্রস্থান করিলেন।

কিরণ, গৃহমধ্যে যাইয়া দেখে, মৃণাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিয়া আছে। "সই—ও সই! তুই জেগে, না ঘুমিয়ে?—ওমা, তোর চোকে জল যে—তুই কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদছিস্?' অতঃপর, হাত ধরিয়া, "ওঠ" বলিয়া টানিতে লাগিল।

মৃণাল বিরক্তির সহিত উত্তর দিলেন,—"আ! করিস্ কি? আমার অসুখ!"

"তোর অসুখ কি আর সাধ্যিনো?"

"সারবে মলে।"

'ওঠ, ওষুধ এনেছি।"

মৃণাল, তৎশ্রবণে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কই" কি ওষুধ, বল?"

"ওষুধ কি বলে—খায়।"

"আমি খাবার ওষুধ চাইনে।"

"শুনছি—হরগোবিন্দ বাবুকে জামাই বাবু ফিরিয়ে এনেছেন।"

"মাইরি!"

"না ভাই মিথ্যে বলবো না, ফিরিয়ে আনেন-নি; তবে তাঁর কলকাতায় ইংরেজদের কুটীতে চাকরী হয়েছে—দেখে এসেছেন। চল না, দেওয়ানজী-বাড়ী ঠাকুর দেখ্‌তে গিয়ে জেনে আসি।"

মৃণাল মনে মনে ভাবিয়া ভাবিলেন—"কল-কাতায় যদি চাকরী হয়ে থাকে, তারা যাচ্ছেন, ঠিক খবর এনে দিত। কিন্তু আমার কপালেই সে বিপদে পড়লো। আমার এমনি কপাল, যে ডালটা ধরি, সেইটেই ভেঙে পড়ে।"

এই সময় এক সন্ন্যাসী, "মা কোথায় গো" বলিয়া, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং দুইটী বালিকা ব্যতীত আর কেহই নাই দেখিয়া, প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। মৃণাল, তদ্দর্শনে কিরণকে কহিলেন,—"সই ওঁকে আসতে বল। কোন্ ছলে কোন্ দেবতা আসেন, বলা যায় না।"

কিরণ, তৎশ্রবণে সন্ন্যাসীকে ডাকিল। সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলে, মৃণাল, কুশাসন পাতিয়া দিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী "চিরসুখী হও" বলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং পরক্ষণেই মৃণালবালার মুখ-প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"মা, তোকে এমন উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল দেখ্‌ছি কেন? তোর কি কোন অসুখ হয়েছে? দেখি—হাতখানা দেখি?'

মৃণাল হস্ত-প্রসারণ করিলে, সন্ন্যাসী, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হস্ত পরিত্যাগ করিলেন।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুর, কি দেখ্‌লেন?'

"উপস্থিত বড় কষ্ট যাচ্ছে। অপরও কষ্ট আছে। এমন কি—"

বলিতে বলিতে, সন্ন্যাসী আর বলিলেন না।

কিরণ সভয়ে কহিল,—"ঠাকুর! উপায়?"

সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, —"উপায়? আচ্ছা, যা হয়, আমি করবো। যখন সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে, আমাকে স্মরণ-কর্‌বে।"

"আপনাকে কোথায় পাব?"

"এই গ্রামের প্রান্তভাগে মাঠে যে প্রকাণ্ড বটগাছ আছে, যাহাকে পঞ্চাননতলা কহে,

সেখানে আমার দেখা পাবি। আমি যে কথা বলিলাম, কাহাকেও প্রকাশ করিস্ নে।"

সন্ন্যাসী, আরবিলম্ব না করিয়া, তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন। মৃণালবালা ও কিরণমালা সবিস্ময়ে উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে ডাকাতেরা বাঁশবেড়ের খালের মুখে আসিয়া ভাউলেখানার নাগাল ধরিল। ভাগীরথী তীরে বহুদূর-বিস্তৃত কসাড় ও নলবন; তাহার পর, কিছুদূর বিস্তৃত দূর্ব্ব করিতেছে—বালির চড়া। ডাকাইতেরা সেইখানে আসিয়া দেখে, ভাউলে স্রোতমুখে নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছে। রজনী জ্যোৎস্না-আলোকে আলোকিত। মাজিরা নিদ্রা যাইতেছে; একজনমাত্র হাল ধরিয়া আছে।

ডাকাইতেরা ভাউলেখানিতে কি আছে, জানিত না। তাহারা, সমান নৌকা বোধে, মাজিকে গুলি করিল; কিন্তু সে গুলি ফস্‌কাইয়া যাইল। এদিকে, বন্দুকের শব্দে, নৌকার ভিতরস্থ ইংরাজ-সৈন্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাঁহারা দস্যু-ভয়ে সর্ব্বদা বন্দুকে গুলি-বারুদ দিয়া ঠিক করিয়া রাখিত। এক্ষণে, দস্যুদিগকে লক্ষ্য করিয়া, একেবারে ৫।৭টী আওয়াজ করিল। তাহাতে দস্যুদের দুই-তিনজন হত হইল; বক্রী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল!

তাহারা পলাইতে পলাইতে দেখে—অতিথি, হারাণ ও হারাণীকে সঙ্গে লইয়া, পলাইতেছে। তখন "গ্রেপ্তার কর" "গ্রেপ্তার কর" বলিয়া সেইদিকে ছুটিয়া যাইলে, হরগোবিন্দ ক্রমাগত দুই-তিনবার বন্দুক চালাইলেন, এবং তাহাতেও ২।১ জন হত হইলে, বক্রী অপরদিকে পলাইতে লাগিল।

এই সময় ইংরাজ-সৈন্যগণ নৌকা লাগাইয়া তীরে নামিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অধিনায়ক একজন সাহেবও নামিয়াছিলেন। তাঁহারা, ডাকাতদিগের অনুসন্ধানে যাইয়া দেখেন—একটী বাঙ্গালী দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন যুবার সাঁহত একটী বালক ও একটী বালিকা আছে। তাঁহারা কেন এমন ভয়ানক সময়ে এমন স্থানে আছেন—জানিতে সাহেবের অত্যন্ত আগ্রহ হইল। তিনি নিকটে যাইয়া সবিশেষ অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং আদর করিয়া তাঁহাদিগকে আনিয়া আপনাদের নৌকাতে উঠাইলেন। নৌকা পুনরায় অনুকূল স্রোতে কলিকাতা-অভিমুখে ছুটিতে লাগিল।

—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ানজীবাড়ীতে ক্রমে দলে দলে নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। এদিকে, গায়ের গহনা-অনুসারে, আদর-অভ্যর্থনারও ইতর-বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। সুখদা নিতান্ত মনোকষ্টে ছিল, তথাপি, সাদরে সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল।

বড়বৌ প্রায় নীচেয় নামেন না। উপরে বসিয়াই, মাতা ও ভ্রাতার সহিত গল্প করেন। অদ্যও সেইরূপ করিতেছিলেন। ভ্রাতা গণেশ, বসিয়া পত্র লিখিতেছিল।

মাতা কহিলেন,—"প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে অঘ্রাণ মাসে যদি গণেশের বে হয়, বড় ঘরখানা হাইতে হবে—রান্না ঘরটায়ও খুঁচি দিতে হ'তে।"

বড়বৌ, যেন কিকিৎ অন্যমনে, উত্তর দিলেন—"হুঁ!" কারণ, গণেশের পত্র লেখা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া, মনে মনে

ভাবিতেছিলেন—"মিন্সে যেমন বলে—গণেশ লিখতে জানেনা, হাত কাঁপে; এই সময় এলে, এক্ষুণি দেখাই তারে—কৈ, কেমন হাত কাঁপে গণেশের!"

ইতিমধ্যে গণেশ বলিয়া উঠিল,—"দিদি এক হাঁড়ি সন্দেশ না লিখে একহাঁড়ি বাতাসা লিখি।"

"এসে করে' আমি সন্দেশ পাঠাচ্ছি, আর তুই বাতাসা লিখ্‌বি।" বলিয়া, বড়-বৌ বকিয়া উঠিলেন।

গণেশ সন্দেশ বানান জানিত না; সুতরাং কহিল,—এ-এ-এও মিষ্টি, ও-ও-ও-ও মিষ্টি।"

কিন্তু বড়-বৌ কিছুতেই শুনিলেন না; কহিলেন,—"না, তুই সন্দেশ লেখ।" তখন অগত্যা "সনেশ" বলিয়া, গণেশ পত্রখানি ইতি করিল।

মাতা কহিলেন,—"আচ্ছা, দু-একখানা ত চাই!"

"আমি সব দেব, সেজন্যে ভাবনা নেই।"

গণেশ কহিল,—"অ-অ-অ-অত ভাবুচ্ছিস্ কেন? দি-দি-দি-দিদি বো-বো-বো-বৌকে সব দেবে। আর আমারও কি ম-স-স-সত্য তত্তোদিন চাকরী হবে না।"

"ওরে হতভাগা ছেলে! অঘাণ মাসে কিম্বা, তোর তখন চাকরী হবে কেমন করে?" এই বলিয়া, মাতা আপনা-আপুনি এই বলিতে লাগিলেন,—কি যে করি! আবার কতগুলো উনোন পত্তে হবে, কাঠ তৈয়ের করতে হবে।"

গণেশ কহিল,—"মা তু-তু-তু-তুই ভাবিসনে, —বাড়ীর পাশে যে জি-জি-জিজিউলি গাছ গুলো আছে, কে-কে-কে-কেটে কাঠ করে দেব।"

বড়-বৌ কহিলেন,—"ওরে জিউলি-কাঠের ঢেঁকি, জিউলি কাঠ কি কখিন কালে শুকোয়!"

মাতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ওরা স্বীকার হবে তো?"

বড়-বৌ কহিলেন,—"হাত ধুয়ে বসে আছে। মা, তোমার ছেলে যে কত বড় লোকের শালা, তা তো জাননা? তোমার জামাই, যে চাকার নবাবের দেওয়ান নৈখানে ওঁর বড় মান, প্রত্যহ টট্‌কা ইলিস্ না হ'লে ভাত খেতে পারেন না।"

"তোরা মা সুখে থাক্; তাতেই আমার সুখ।"

গণেশ কহিল,—"দিদি, ডি-ডি-ডি ডিমোলা ইলিস্?"

এই সময় মৃণালবালা, কিরণবালা ও আরও দুই একটী বালিকা আসিয়া দেওয়ান-বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সুধদা, "এস দিদি" "এস দিদি" বলিয়া, ছুটিয়া গিয়া হাত ধরিল; এবং মাতার সহিত দেখা করাইয়া দিল। মৃণালকে দেখিয়া মাতার হরগোবিন্দকে মনে পড়িল; তিনি মৃণালকে কোলে বসাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শেষে, মৃণালের হস্তে পাঁচটী টাকা দিয়া, বড়-বৌকে দেখাইয়া আনিতে কহিলেন।

সুখদা তখন, মৃণালের হস্ত ধরিয়া অপরাপর বালিকাগণ সহ উপরে যাইয়া কহিল,—"বৌ দেখ, এইটীর সঙ্গে ছোট দাদার বিয়ে!" এই বলিয়া বালিকাগণসহ মৃণালকে বসাইয়া, রাখিয়া সুখদা প্রস্থান করিল।

সুখদা প্রস্থান করিলে, বড়-বৌ মাতার গা টিপিয়া দেখাইলেন,—"এই মেয়েটি!"

মাতা কহিলেন,—"দিব্য মেয়েটি!"

বড়-বৌ কহিলেন,—"গণেশ! দেখ দেখি, এই মেয়েটীকে তোর পছন্দ হয়?"

"আ-আ-আ—আমি একবার নি-নি-নি নীচেয় যাই।" এই বলিয়া, গণেশ, পলা-

ইবার চেষ্টা পাইল। কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন।

বড়-বৌ বকিয়া উঠিলেন,—"থা—আরও গুড় খা! আ! কতভাগা ছোঁড়া!" এই বলিয়াই, বড়-বৌ, কথাটা চাপা দিয়া লইলেন,—"তা বয়েস হ'লেই ওটুকু সেরে যাবে।"

মাতাও তাহাতে সায় দিলেন,—"তা যাবে বৈ কি?—যাবে বৈ কি!"

এই সময় বড় বৌ বাক্স হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া মৃণালের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন,—"সন্দেশ কিনে খেও।" "মৃণাল টাকা দুইটী লইয়া বড়-বৌয়ের মাতার হাতে দিয়া, প্রণাম করিলেন।

"বেঁচে থাক; কত দেবে; এখন ছেলে-মানুষ—টাকা দিয়ে প্রণাম কেন?—এই বলিয়া, টাকা দুইটী আচলে বাঁধিলেন।

একটী বালিকা কহিল,—"বেস ছেলেটী; তবে রঙটী একটু ময়লা।"

মাতা কহিলেন,—"আহা বাছা আমার রোগে রোগে কাসা হ'তে পেলে না!"

এমন সময় ঘোষ পাড়ায় মেজো-পিশি বলিয়া উঠিলেন,—"তা না হক, কেষ্ট রাধিকের মিলন হ'বে। পেটে গুণ থাকলে, রং ময়লায় আসে যায় কি?"

কিরণমালাও গণেশের লিখিত চিঠিখানির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, অমনি উত্তর দিল,—"তা তো বটেই! তবে যদি কলমের খোঁচায় কাগজ-খানা না ছিঁড়ে তো?"

গণেশ তাড়াতাড়ি বলিতে গেল,—"ম-ম-ম-মল ক-ক-ক-কলম দি-দি-দি-দিলে কি করবো?"

সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের ভিতর হাসির একটা গর্‌রা উঠিয়া গেল। এদিকে, সুখদা আসিয়া সকলকে নীচেয় লইয়া গেল। যা'বার সময়, কিরণমালা বলিতে বলিতে গেল,—"বাবা! কি সর্দ্দনেশে তোতলা!"

মাতা কহিলেন,—"আমার কপালের দোষ!"

গণেশ জিজ্ঞাসিল,—"কি মা?"

মাতা কহিলেন,—"সাত-তাড়াতাড়ি কথা কইলি কেন—হতভাগা ছোঁড়া? ওরা তোকে তোত্‌লা জেনে গেল! বিয়ে হওয়া এখন সাত-হাত জলে পড়্‌লো।"

গণেশ দুঃখিতভাবে কহিল,—"মা ত-ত-ত তবে কি হবে মা?"

বড়-বৌ হাসিয়া কহিলেন,—"ভয় কি? বিয়ে হবে।"

শ্রীদুর্গাচরণ রায়।

বাঙ্গালা অভিধান।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় কুড়ি বুড়ি ব্যাকরণ, এবং অন্ততঃ সাড়ে বার গণ্ডা অভিধান আছে। কিন্তু তথাপি বাঙ্গালা-ভাষা-শিক্ষার্থীর শিক্ষা সুচারুরূপে হয় না; শিক্ষার পিপাসা মিটে না; সুতরাং অনেকেই বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে বড়ই নারাজ। কারণ, এতগুলা ব্যাকরণের মধ্যে, ডাক্তার বেল্লের ইংরাজী ব্যাকরণের মত একখানিও নাই; এবং এতগুলা অভিধানের মধ্যে

ওয়েবেষ্টরের 'অভিধানের মত একখানিও কোষ নাই। ব্যাকরণের বিষয়ে আলোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; এবং সম্যক্‌রূপ আদ্যোপান্ত আলোচনা আমার মত লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। মাননীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ পারদর্শী, এবং 'অনুসন্ধান' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় তিনি এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনাও করিয়াছেন। সুতরাং এতৎ আলোচনা পর্য্যাপ্ত নহে, তথাপি, ভরসা করি, বিদ্যানিধি মহাশয় সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালা ভাষার প্রকোষ্ঠার না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। যিনি দানসাগরের অধিকারী, তাঁহার পক্ষে তিল-কাঞ্চন কি শোভা পায়? ইংরাজীতে নানা ভাবের অভিধান আছে। কোন অভিধানে কেবল প্রতিশব্দ আছে; কোন অভিধানে শব্দ-সকলের নানার্থ আছে; কোন অভিধানে প্রতি-শব্দের পরস্পর তুলনায় বিচার আছে; কোন অভিধানে শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-মাত্র আছে; ইত্যাদি, ইত্যাদি। সুতরাং পাঠকের জানিতে কৌতূহল জন্মে; তাঁহা শিখিতে উৎসাহ হয়। বাঙ্গালা ভাষায় কি তদ্বিধ অভিধান সংগৃহীত হইতে পারে না? অবশ্যই পারে। আমরা এই প্রস্তাবে একপ্রকার শব্দের আলোচনা করিব। অর্থাৎ ভাষাতে সংখ্যাবাচক কতক-গুলি শব্দ আছে, যাহা সচরাচর আলাপ বা লিখনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অথচ অনেকেই তাহাদিগের অর্থ জানেন না। আমরা ক্ষুদ্র একটী 'পেরাগ্রাফ' রচনা করিয়া, এই শ্রেণীস্থ শব্দের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছি। যথা,—

"চতুর্বর্ণান্তর্গত ব্যক্তিগণের সাধারণ নাম হিন্দু। হিন্দুর জীবন চতুরাশ্রমে বিভক্ত; তন্মধ্যে দ্বিতীয় আশ্রমটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জন্ম-মাত্র জীবগণকে যে ত্রিবিধ ঋণে আবদ্ধ হইতে হয়; তন্মধ্যে গ্রন্থমাত্রমে ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষি-ঋণ-মাত্র পরিশোধ হয়, অপর দুইটী ঋণ গৃহস্থাশ্রমেই শোধ করিতে হয়? গৃহীকে ষড়-রিপু বশীভূত ও চতুর্দ্দশেন্দ্রিয় পরাজয়-পূর্ব্বক ধর্ম্মপথেথাকিয়া চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে হইবে। দশ ব্যসন ও দ্বাদশ মদ্যাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। গৃহে পঞ্চবটী স্থাপন, পঞ্চাগ্নিপ্রজ্বালন, ও পঞ্চশস্য সঞ্চয় করিতে হইবে।" ইত্যাদি।

পাঠক দেখিবেন, এই ক্ষুদ্র রচনাটিতে দ্বাদশটী সংখ্যাবাচক শব্দ আছে। কিন্তু দুই চারিটী ভিন্ন অনেকেই অপর শব্দগুলির অর্থ জানেন না। আমরা ক্রমশঃ এই শ্রেণীস্থ শব্দ-সকলের ব্যাখ্যা পাঠকগণকে উপহারস্বরূপ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই শব্দগুলি "অ"কারাদি ক্রমে লিখিত হইবে। অদ্য আমরা "অ" ও "এ" স্বরাদ্য শব্দগুলি মাত্র প্রদান করিলাম।

অঃ (কোপজ) দোষ—দুষ্টতা, দৌরাত্ম্য, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, প্রতারণা, কটূক্তি ও নিষ্ঠুরতা-চরণ।

অষ্টশক্তি—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা ও চর্চ্চিকা।

অষ্টবিবাহ—ব্রাহ্ম, আর্ষ্য, প্রাজাপত্য, দৈব, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও পৈশাচ।

অষ্টসার—পলাশবীজ, অপামার্গ, তেঁতুল, অর্ক, তিল, নাল, যব, সর্জ্জিকা।

অষ্টবসু—আপ, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যূষ, ও প্রভাব।

অষ্টবর্গ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী ও ক্ষীর কাকোলী।

অষ্টমূর্ত্তি—সর্ব্ব (ক্ষিতির), ভব (জলের), রুদ্র (অগ্নির), উগ্র (বায়ুর), ভীম (আকাশের), পশুপতি (যজমানের), মহাদেব (চন্দ্রের), ঈশান (সূর্য্যের)। তন্ত্রসার মতে এই আটটী। কিন্তু স্কন্দপুরাণের মতে—পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি—এই আটটী।

অষ্টমূত্র—ছাগী, মেষী, গবী, মহিষী, খোটকী, হস্তিনী, গর্দ্দভী ও উষ্ট্রীর মূত্র।

অষ্টমঙ্গল (মাঙ্গল্য দ্রব্য)—ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, সুবর্ণ, ঘৃত, সূর্য্য, জল ও রাজা।

অষ্টভৈরব—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধো-ন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ও সংহার।

অষ্টনায়িকা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও কৌমারী।

অষ্টনাগ—অনন্ত, বাসুকী, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ।

অষ্টধাতু বা লোহক—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা, কান্তি লৌহ, রঙ্গ, লৌহ ও ইস্পাত।

অষ্ট দিগ্‌গজ—ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক।

অষ্টদিক্‌পাল—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, মরুৎ, কুবের ও ঈশান।

অষ্টক—পৈশুন্য, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, বাগদণ্ডজ, পারুষ্য ও ক্রোধজ।

অষ্টক্ষীর—ছাগী, মেষী, গবী, মানুষী, হস্তিনী, খোটকী, উষ্ট্রী, ও মহিষী দুগ্ধ।

অষ্টসিদ্ধি বা ঐশ্বর্য্য—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামবসায়িতা।

অষ্টাঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। "ইতি অষ্টবিধ যোগ। প্রণাম করিতে যে অষ্টাঙ্গ লাগে, তাহা:—জানু, পাদ, হস্ত, উরস্, বুদ্ধি, শিরঃ, বাক্য ও চক্ষু। শরীরের অষ্ট অবয়ব যথা:—দুইহস্ত, হৃদয়, কপাল, দুইচক্ষু, কণ্ঠ ও মেরুদণ্ড। মতান্তরে, দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু, মন ও বাক্য।

অষ্ট স্থান (চিকিৎসা সম্বন্ধে)—ত্বক্, শরীর স্থান, ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধি।

অষ্টাদশ পুরাণ—ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বরাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড় ও ব্রহ্মাণ্ড।

অষ্টাদশ উপপুরাণ—আদি, নৃসিংহ, বায়ু, শিবধর্ম্ম, দুর্ব্বাসা, নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশন, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, পদ্ম, দেব, পরাশর, মরীচি ও ভাস্কর।

অষ্টাদশ পর্ব্ব (মহাভারতের)—আদি, সভা বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, নারী, অনুশাসন, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমিক, মুষল, মহাপ্রস্থান, স্বর্গারোহণ।

একাদশ করণ—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি, শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কিস্তঘ্ন

একাদশ অধিকপা—দুঃখ, অর্চ্চি, ক্ষমা, জ্বালিনী, জ্বালিনী, বিষ্ণুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্য ও কব্য।

একাদশ রুদ্র—অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ, ঈশ্বর ও কপর্দ্দী এই একাদশ তনুও বলে।

একান্ন পীঠ—হিঙ্গলা বা হিমালয়, সর্কর, তারা, করতোয়াতট, শ্রীপর্ব্বত, সুগন্ধা, বজ্রনাথ, গোদাধরী, গণ্ডকী, অনল, পঞ্চসাগর, জ্বালামুখী, কাশ্মীর, শ্রীহট্ট, ভৈরব পর্ব্বত, প্রভাস, প্রভাস-খণ্ড, জলস্থান, প্রয়াগ, মানসরোবর, চট্টগ্রাম, মিথিলা, রত্নাবলী, মণিবন্ধ, মণিবেদ, উজানি, রণখণ্ড, বেহুলা, বক্রেশ্বর, জালন্ধর, রামগিরি, বৈরবত, বৈদ্যনাথ, উৎকল, হরিদ্বার, কৌঙ্ক, কাঞ্চী, কালমাধব, নর্ম্মদা, কামরূপ, মলব, স্রোতা, জয়ন্তী, নেপাল, ত্রিবোড়া, ত্রিপুরা, ক্ষীরগ্রাম, কালীঘাট, বিভাস, কুরুক্ষেত্র, বিন্ধ্যশেখর।

শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

মানব-কলঙ্ক।

(৪)

গর্ভাধান।

গর্ভাধান অতীব গুরুতর কার্য্য। যাহারা নিকৃষ্ট পাশবী প্রবৃত্তির তৃপ্তিবিধান নিমিত্ত কালাকাল বিচার না করিয়া পরস্পরের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যথা তথা ও যখন তখন সঙ্গত হয়, তাহাদিগের পক্ষে ইহা গুরুতর কার্য্য নহে; কারণ, তাহাদের স্বভাব নিতান্ত দূষিত; কিন্তু যাঁহারা স্ববংশের স্বজাতির ও স্বদেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রকৃতির একটী পবিত্রকার্য্য সম্পাদন করিতেছে মনে করিয়া স্ত্রীপুরুষে পরস্পর সঙ্গত হয়েন, তাঁহাদেরই পক্ষে গর্ভাধান অতীব গুরুতর কার্য্য। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, গর্ভাধান-সময়ে স্ত্রীপুরুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যেরূপ থাকিবে, গর্ভ-উৎপন্ন শিশুর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ঠিক সেইরূপই হইবে। এই মহাবাক্যের সত্যতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। এইজন্য হিন্দুশাস্ত্রকারগণ, শুভদিনে উপযুক্ত সুস্থশরীরে ও উৎফুল্লচিত্তে গর্ভাধান করিতে বিধান দিয়াছেন। কিন্তু সেই মঙ্গলময় বিধান কয়টী লোক গ্রাহ্য করেন? কয়জন ব্যক্তি পুত্রোৎপাদনের অভিপ্রায়ে পবিত্রহৃদয়ে পত্নীতে উপাগত হয়েন? ভাবিয়া দেখিতে গেলে কিছুতেই ঘৃণা ও জুগুপ্সা সম্বরণ করা যায় না! সমগ্র মানবসমাজ কি পতিত? মানুষী প্রবৃত্তি কি পাশবী হইয়া পড়িয়াছে? পশুরাও যে, অনেক বিষয়ে মানুষ অপেক্ষা ভাল; পশুগণ যথাকালে ঋতুতে সঙ্গত হইয়া থাকে; কিন্তু মানুষের কালাকাল নাই, পাত্রাপাত্র বিচার নাই; তাহাদের উদ্দেশ্য দূষিত, অভিপ্রায় বিগর্হিত, আচরণ নিতান্ত কলঙ্কিত। এই যে প্রতি বৎসর অসংখ্য শিশু কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, অগণ্য ভ্রূণ গর্ভেই নষ্ট হইতেছে, কতশত নবনারী অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতেছে, ইহার কারণ কি? আর যে দেশে প্রবর্ত্তে প্রায় প্রতিগৃহেই ধার্ম্মিক ও সুবুদ্ধিমান পুত্র জন্মিত, ভীম ও প্রতাপসিংহের ন্যায় বীর পুত্রগণ উদ্ভূত হইত, সে দেশে এখন হীনমেধ, ক্ষীণবুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞানহীন, দুর্ব্বল এবং পুরুষনামের অযোগ্য পুত্রগণ উৎপন্ন হইতেছে কেন? সকলই, কি তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ম্মফল? পিতামাতার কি দোষ নাই? পিতামাতা যদি বুঝিয়া যথাকালে সুস্থশরীরে সুস্থচিত্তে পরস্পরে সঙ্গত হয়, পুত্রোৎপাদনই যদি তাহাদের পবিত্র অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে এরূপ অসংখ্য রোগ-শোকে লোকে জর্জ্জরিত হইত না। অতএব, গর্ভাধান-কালে স্ত্রী-পুরুষের শরীর সুস্থ এবং মন উৎফুল্ল ও পবিত্র থাকিলে এবং গর্ভাধানকে গুরুতর কার্য্য বলিয়া স্মরণ রাখিলে গর্ভে সবল ও সুবুদ্ধি শিশু উৎপাদিত হইতে পারে।

ভ্রূণের ক্রমসঞ্চরণ কালকে জননীর গর্ভকাল বা গর্ভাবস্থা বলে। এই অবস্থা গর্ভিণীর পক্ষে অতীব কষ্টকরময়। এই সময়ে তাঁহার শরীরে নানা প্রকার অবস্থান্তর হইতে থাকে। এই সময়ে তাঁহার গুরুতর দায়িত্ব; তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে। কারণ, তাঁহার শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলের উপর গর্ভস্থ ভ্রূণের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করে। তাঁহার শরীর অসুস্থ হইলে ভ্রূণের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করে। তাঁহার শরীর অসুস্থ—এমন কি বিপন্ন হইতে পারে; তাঁহার শোণিত দূষিত হইলে ভ্রূণের শোণিত দূষিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার শোণিত বিশুদ্ধ এবং শরীর নিরাময় থাকিলে শিশুর শরীর বিশুদ্ধভাবে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। মাতার জীবনীশক্তি পর্য্যাপ্ত থাকিলে শিশু যেন জীবনীপূর্ণ বিশাল প্রস্রবণ হইতে আপনার শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে। কলতঃ যখন গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গলের উপর পিতামাতার—এমন কি সুবিশাল মানব-সমাজের সুখ ও উন্নতি নির্ভর করিতেছে, তখন এই সঙ্কটময় কালে গর্ভিণীকে অতি সতর্কভাবে রক্ষা করা উচিত। প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীকগণ গর্ভিণীকে যেরূপ যত্নসহকারে সতর্কভাবে রক্ষা করিতেন, পৃথিবীর অন্য কোন জাতিকে সেরূপে রক্ষা করিতে দেখা যায় না। হিন্দুরা বলেন, গর্ভিণীকে সর্ব্বদা আমোদে রাখিতে হইবে; তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ সুনীতি ও সৎকথা শুনাইবে; ফলতঃ তাঁহার মন যাহাতে সুস্থ ও আনন্দিত থাকে এবং চিত্তের সমৃক্তি সকল স্ফূর্ত্তি পায়, তাহাতে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাহাতে ভীতি, শোক ও দুঃখের উদ্রেক হইতে পারে, যাহাতে মনোমধ্যে কলুষিত ভাববিকাশ পাইতে পারে, এরূপ কথা বা ভাবভঙ্গী করিতে নাই। এই বিষয়ে প্রাচীন গ্রীকজাতিরও বিশেষ লক্ষ্য ছিল; যাহাতে গর্ভিণীর শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের উন্নতি হয়, তাঁহারা তাহা করিতেন;—এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা গর্ভিণীকে সুমধুর সঙ্গীত শুনাইতেন, সুন্দর সুন্দর আলেখ্য দেখাইতেন, এবং সুদৃশ্য শিল্পদ্রব্যজাত ও কারুকার্য্য নয়নসমক্ষে স্থাপন করিতেন।

চিকিৎসাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, যে, গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন অবস্থায় থাকে, —সহজেই তাহাদের দুঃখ, অভিমান ও রোষের উদয় হয়; একবার এই সকল বৃত্তির উদয় হইলে, অনেক সময় তাহারা দমন করিতে পারে না। ইহার পরিণাম অতীব ভয়ানক। ইহাতে গর্ভস্থ ভ্রূণ ও জননী উভয়েরই বিষম বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এইজন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখিতে হইবে এবং মধুর আলাপনে চিত্তের মালিন্য দূর করিতে হইবে।

গর্ভাধান-কালে দম্পতীকে যেরূপ সাবধানে থাকিতে হয়, গর্ভাবস্থায় তাহা অপেক্ষা অধিক সাবধানে থাকা উচিত। এরূপ করিতে হইলে গর্ভাবস্থায় সংসর্গ বন্ধ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে করুণাময়ী প্রকৃতি সতীর যে কি উদ্দেশ্য, ইতর প্রাণীর ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। কোন্ কোন্ সময়ে পুরুষের সহিত সঙ্গত হইতে হইবে, পশুগণ সহজবুদ্ধিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারে; এই জন্য গর্ভাবস্থায় তাহারা কিছুতেই পুরুষকে কাছে আসিতে দেয় না। এইরূপ কার্য্যের অভিপ্রায় যে অতীব মঙ্গলকর, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পশুগণ যে কার্য্য দূষণীয় ও অনিষ্টকর বলিয়া পরিহার করে, আত্মাভিমানে স্ফীত মানবগণ জগতের মধ্যে আপনাকে শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াও অম্লানবদনে অসঙ্কোচে সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীসংসর্গ যে একান্ত দূষণীয় ও পরিহার্য্য, তাহা কেহ একবার ভাবিয়া দেখে না। জন্য ইন্দ্রিয়-পিপাসার শান্তিবিধান করিতে যাইয়া তাহারা গর্ভিণীর ও আপনার সর্ব্বনাশ করে এবং ভাবী সন্তানের সুখ ও উন্নতি-পথে স্বহস্তে কণ্টক রোপণ করিয়া থাকে। সমগ্র জীবজগৎ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ—দেখিতে পাইবে যে, একমাত্র মানব ভিন্ন

অন্য কোন প্রাণীই গর্ভিণীর উপর এইরূপ পাশব ব্যবহার করে না! ইহাতে মানবের মানবত্ব কোথায়?—মানব যে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট! আজি যে ক্লমসংখ্য সন্তানকে যুগী মূর্চ্ছা প্রভৃতি বিবিধ স্নায়বিক রোগে, নিপীড়িত দেখা যায়, লক্ষ লক্ষ পুত্রকন্যা যে মূর্খ, ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত হইতেছে—তন্মধ্যে কেহ বিকলাঙ্গ, কেহ বা বিকৃতবুদ্ধি—ইহার অবশ্য কিছু ইহার কারণ আর কিছুই নহে, মানবের উৎকট মদ্যোগ-পিপাসা। এই জঘন্য কার্য্য দ্বারা কেবল যে, ভাবী সন্তানের অমঙ্গল হয়, এমত নহে; গর্ভিণীও অশেষ কষ্টে নিপীড়িত হয়েন—কখন গর্ভস্রাব, জরায়ুর প্রদাহ বা তাহাতে ক্ষত, কখন বা অন্যান্য নানাবিধ সাঘাতিক পীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মানবমাত্রেরই গর্ভাবস্থায় স্ত্রীসংসর্গ হইতে বিরত হওয়া উচিত।

গর্ভাবস্থা গর্ভিণীর পক্ষে বড়ই বিষম কাল; স্বাস্থ্যরক্ষার সামান্য ত্রুটি বা অনিয়মে অথবা অল্প অত্যাচারেই গর্ভিণীর এবং সেই সঙ্গে গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে; সেই জন্য এই সময়ে গর্ভিণীর স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; ইহাতে যে কেবল গর্ভিণীর মঙ্গল সাধিত হইবে এমত নহে, গর্ভস্থ শিশুরও স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শিশু যতদিন গর্ভমধ্যে থাকে, ততদিন মাতার শোণিত দ্বারাই তাহার পোষণ-কার্য্য সাধিত হয়; সেই শোণিত মাতার শরীর হইতে সন্তানের শরীরে বাহিত হইয়া তাহার জীবন রক্ষা করে; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মাতার শোণিতই শিশুর জীবনী-শক্তির একমাত্র প্রস্রবণ। এই প্রস্রবণ দূষিত হইলে শিশুর স্বাস্থ্য নষ্ট—এমন কি জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং তাহার ক্রমস্ফুরণে কোন প্রকার বাধা ঘটিবে না। গর্ভিণীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, পথ্য, পরিশ্রম, বিশ্রাম, নিদ্রা প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গর্ভিণীর পথ্য যত সুপাচ্য অথচ পুষ্টিকর হয়, ততই মঙ্গল। আমিষ অপেক্ষা সুপক্ক ও সদ্য ফলমূলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে; আমাদের দেশে সচরাচর যে সকল কন্দমূল-ফলাদি ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে আলু, কপি, মেথন, মটরশুটি ও বিট এবং রম্ভা, কমলা-নেবু, তরমুজ, আতা, পেয়ারা, আম, জাম, আনারস ব্যবহার করা যাইতে পারে। মৎস্য অল্প পরিমাণে আহার করিবার বাধা নাই; যদি কেহ মাংস না খাইলে থাকিতে পারেন না, তাহা হইলে তাহা অতি অল্পপরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য। মাংসাহারে গর্ভিণীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইবারই সম্ভাবনা, এইজন্য ইহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলেই মঙ্গল। গর্ভাবস্থায় অনেক স্ত্রীলোকের অধিক অম্ল সেবনেরুচি বৃদ্ধি পায়; ইহা সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য; তবে যদি কেহ অম্ল ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহাকে অল্পপরিমাণে পাকা তেঁতুল বা কুল দেওয়া যাইতে পারে। আহার যত পরিমিত হয়, ততই ভাল। পানীয় দ্রব্যের মধ্যে বিশুদ্ধ জল ও দুগ্ধ সেবনীয়। সকল প্রকার উত্তেজক পেয় হইতে নিবৃত্ত থাকা উচিত;—এমন কি, যদি কাঁহারও চা সেবন করা অভ্যাস থাকে, এই সময়ে তাহাও পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

লঘু ও পরিমিত আহার স্বাস্থ্যরক্ষার যেরূপ সহায়তা করে, লঘু ও পরিমিত পরিশ্রম হইতে সেইরূপ সাহায্য পাওয়া যায়। আদৌ কোন পরিশ্রম না করিয়া ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যেমন অস্বাস্থ্যকর, সেইরূপ আবার অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলে স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে। এইজন্য অল্প অল্প পরিশ্রম—যাহাতে শ্রান্তি বা ক্লান্তি না হয়—করা সর্ব্বথা বিধেয়। ইহাতে শোণিত-সঞ্চালন-কার্য্য সম্যক্‌রূপে সাধিত হয় এবং গর্ভিণী ও গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে, হস্তদ্বয়ের অপেক্ষা চরণদ্বয়ের পরিমিত চালনা করা ভাল। পল্লীগ্রামে কুলকামিনীগণ শৌচাদি ব্যাপারের নিমিত্ত মাঠে ঘাটে যাইতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের আবশ্যকমত ব্যায়াম এবং সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা হয়। সহরে অবরোধ-প্রথা অতীব কঠোর; এখানে তাঁহারা গৃহের বহির্ভাগে আসিতে পারেন না; এইজন্য পল্লীবাসিনীগণের ন্যায় বিস্তৃত ময়দানের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পান না। এরূপ অবস্থায় স্ব স্ব বাসভবনের চতুঃসীমার মধ্যে যতটুকু বিশুদ্ধ বায়ু পান, সাধ্যমত সেবন করা এবং যতটুকু পাদচারণ করিতে পারেন, ততটুকু করা একান্ত উচিত।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

নৈদাঘ-নিশীথ স্বপ্ন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্যের শেষাংশ।

(সুরেশ্বর, হেমলতা, অজয় এবং অনুচরবর্গের প্রবেশ।)

সুরেশ্বর।—

ধীরে ধীরে অবসিত চারি বিভাবরী।
মধুর কাকলী-স্বনে আবাহন-গীতি
সুপ্রভাতে বলাইছে রঙ্গসিংহাসনে।
আজি সে সুখের দিন!—আনন্দলহরী
খেলে প্রাণে—অফুল বিজলী-সমান!
এ মধুযামিনী আজি!—সুনীল অম্বর
ভাসিবে হাসিবে স্রোতে—শুভ্র-নিরমল,
শরতের রজত-প্রতিমা নিশামণি—
প্রতিচ্ছবি ধরিবেন—স্বচ্ছ হৃদাকাশে;
বিবাহ-বিলাসে হ'ব বিভোর দু'জনে।
এস প্রিয়ে! দেখি গিয়ে—কিবা নবসাজে
সাজিয়াছে বৈজয়ন্ত পুরী মনোরম—
উঠিয়াছে কি মধুর সঙ্গীত-লহরী,
পবন-হিল্লোল-সনে দূর নভোস্থলে।

হেমলতা।—

যেন আথ! সে উল্লাসে বিশ্ব মাতোয়ারা!
আনন্দে নিঝর ঝিল নাচে; পিকবধূ
নিভৃত নিকুঞ্জ কিবা মাতায় সঙ্গীতে!
হাসে ধরা মনোহরা—শোভে বনস্পতি
নবীনা বল্লরী সহ—সে নব-বয়সে!
যেদিকে নিরখি প্রাণ!—উল্লাস-অলস
মরমে হেরি—কি মধু সুরে আছা মরি!

সুরেশ্বর।—(হঠাৎ মানদা প্রভৃতিকে দেখিয়া)
দেখ—দেখ!—একারা এখানে? নিতম্বিনী
সুচারুহাসিনী বামা!—অপ্সরী, কি পরী?

অজয়।—

নরনাথ! নহে এরা—অপ্সরী কি পরী!
প্রমদাসুলভা এই—তনয়া আমার!
কুতঘ্ন বিনোদ এই; ওই সে বিপিন!
মানদা—নন্দের কন্যা, ওই সুরূপতি!

বিন্ময় মানিনু এবে! অদ্ভুত দর্শন!—
নিদ্রাগত চারিজনে রহে এক ঠাঁই?

সুরেশ্বর।—
এসেছে নিশ্চিত এরা—রাখিতে সম্মান—
আমাদের, বিবাহ-উৎসব আজি শুনি'।
নিদ্রাভঙ্গে—জাগরণে, দেখিবে এখনি,
সে আনন্দে একান্তে করিবে যোগদান।
ভাল কথা মনে হ'লো! আজি না অজয়!
প্রমদা উত্তর দিবে—কারে ভালবাসে?

অজয়।—
সত্য প্রভু। আজি তার উত্তরের দিন।

সুরেশ্বর।—
যাও তবে! আদেশ করহ অনুচরে—
ভেরীনাদে জাগাইতে সুপ্ত-সবাকারে।

[ভৃত্যের ভেরী-বাদন। বিপিন, বিনোদ, মানদা এবং প্রমদার সচমকে জাগরণ।

সুমঙ্গল করুন বিধাতা! সমাগত—
এবে সে শুভদা ঋতুরাজ! আশা মোর—
কপোত-কপোতী সম রহ অনুরাগে।

বিনোদ।—
ক্ষম দাসে, নরনাথ!

সুরেশ্বর।—
ভাঁড়াও তোমরা সবে সম্মুখে আমার!
জানিতাম—পরস্পরে ছিল বৈরীভাব;
মধুর মিলন হেন—অপূর্ব্ব ঘটন!
এত দ্বেষ—এত ঘৃণা, কোথা গেল এবে?
চির-নিমিলিত বুঝি সুপ্তি-আঁধারে!

বিনোদ।—
নাহি জান—কি উত্তর দিব নরনাথ!
নিদ্রিত কি জাগরিত—বিভ্রম এমন!
সর্ব্বসাক্ষী দেবগণ—জানেন তাঁহারা;
না জানি নিশ্চিত কিছু—কেমি বা এখানে!
গভীর আঁধারে ঘেরা সূক্ষ্ম স্মৃতিপাশে—
যতটুকু ক্ষীণদৃষ্টি পারে প্রবেশিতে,
সত্য ততটুকু দেব!—এইমাত্র জানি—
অমরার কঠোর বিধান হ'তে দূরে—
প্রমদার প্রেম-আশে আসিনু পরী'য়ে।

অজয়।—
ধর্ম্মরাজ! পাইলেন—প্রচুর প্রমাণ।
চোরের উচিত শাস্তি করুন বিধানে
কি বঞ্চনা—প্রতারণা—দেখছ বিপিন!
পিতা আমি—কন্যা নহে মম আজ্ঞাধীনে?
প্রমদা তোমার পত্নী—আমার আদেশে!
দোঁহার অজ্ঞাতে তারে হরিল অনা'সে।

বিপিন।—
নরনাথ! যেইদিন নিভৃত নিশীথে—
বনপথে পলায়ন করিল দু'জনে;
সে বারতা মানদাসুন্দরী আনি দিলা।
সচকিতে ছুটিনু পশ্চাতে; মানদাও—
ধরিল বিহ্বল-প্রাণে পদাঙ্ক আমার।
এবে নাথ! জানি না কি দেব-প্রভা-গুণে—
দেবশক্তি সংঘাত নাহিক তাহে কিছু—
এত প্রেম ভালবাসা প্রমদার প্রতি—
গলিল নীহার-সম!—কোথা ভেসে গেল!
এখন—এখন শুধু তার—অস্ফুটিত
বিলাপিছে—শৈশবের ক্রীড়নক সম।
হৃদয়ের অধীশ্বরী মানদাসুন্দরী—
নয়নের আনন্দ-দায়িনী সে আমার—
এতদিন অজ্ঞানে ভুলিয়া ছিনু তারে।
বিকার-বিভ্রান্ত রোগী অথবা যেমন—
অমৃতে অমৃতজ্ঞানে করে পরিহার।
এবে সে বিভ্রম দূর!—নীরস রসনা
তৃপ্ত পুনঃ সরস মধুর সুধাপানে।
আমি তার, সে আমার, তারে চাই শুধু—
মানদাসুন্দরী মম জীবনসাঙ্গনী।

সুরেশ্বর।—
শুভক্ষণে মিলিয়াছ প্রেমিকযুগল।

ফিরুপে ঘটিল হেন, শুনিব সকল।
বৃথা অভিযোগ আর তোমার অজয়!
বিধিমতে হউক—প্রেমের চিরজয়।
মহেশ-মন্দিরে আজি, উৎসবের ক্ষণে,
চিরবন্ধ হ'বে সবে প্রণয়-বন্ধনে।
ধীরে ধীরে দিনমণি নভে সমুদিত;
সূক্ষ্ম হ'তে খরতাপ ক্রমে প্রস্ফুটিত।
এস সবে! আর না—বিলম্বে কাজ নাই।
পরিণয়-উৎসবে মাতিগে চল যাই।
হেমলতে!—হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী!
এস প্রিয়ে!—জীবনের চির-সহচরী!

[সুরেশ্বর, হেমলতা, অজয় এবং অনুচরবর্গের প্রস্থান।

বিপিন।—
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর—স্মৃতি লয়প্রায়!
সুদূর অচল যেন মেঘে পরিণত।

প্রমদা।—
এ নয়ন—নূতন-সৃজিত মনে লয়!
সে ধাঁধা এখন যেন হইয়াছে লয়।

মানদা।—
বিনোদে লভিনু আজি! কি আনন্দ মনে!
পুনঃপ্রাপ্ত হারানিধি যেন শুভক্ষণে।

বিপিন।—
নিশ্চিত বলিতে পার, কেহ—আমরা কি
আছি জাগরিত? কিম্বা দেখি, ঘুমঘোরে—
অদ্ভুত স্বপন? মনে কি পড়ে না ক্ষণতরে—
আছিলেন সুরপতি হেথা? আদেশিলা—
আমাসবে, হইবারে অনুগামী তাঁর?

প্রমদা।—
সত্য বটে! পিতাও ছিলেন তাঁর সনে।

মানদা।—
সুরেশ্বরী হেমলতা!—তাও প'ড়ে মনে!

বিনোদ।—
আদেশিলা—মন্দিরে যাইতে তাঁর সনে।

বিপিন।—
তবে তো নিদ্রিত নই?—আছি জাগরণে!
চল যাই দ্রুতপদে—পশ্চাতে তাঁদের;
যেতে যেতে মীমাংসা হইবে স্বপনের।

[সকলের প্রস্থান।

ভূতো।—(জাগিয়া)
আমার পালা প'লে, আমায় ডাকিস্-রে—ডাকিস্! এই দেখ—ইন্দ্রজিতের 'পার্ট' আমার ঠিক মনে আছে—"প্রাণের ইন্দ্রজিৎ—সুন্দরীর মাথা!" ওরে ও কানাই! ওরে ও ছিরে কামার! ওরে ও তিনে কাঁশারী! ওরে বেটা পেঁচো! তোরা সব গেলি কোথা রে? ওরে—আমায় খানিক্ষণ ভূতে নিয়ে গিইছিলো রে—এখন আবার ঘুম-পাড়িয়ে রেখে গিয়েছে রে! কি স্বপন রে বাবা!—এমন তো কখনও দেখিনি দাদা! খুলে বল্‌লে, লোকে বল্‌বে—গাধা! কোথায় নিয়ে গিইছিলো রে—কেউ বল্‌তে পারে না—কেউ জানে না! কি হইছিলাম—কি কইছিলাম—কিছু বলা যায় না—কিছু শোনা যায় না! ওরে সত্যি বল্‌ছি রে—সত্যি! কানে তা দেখ্‌তে পা'য়া যায় না, চোক্কে তা' শুনতে পাবিনে, জিবে তা হজম হবে না, হাতে তার আস্বাদ পাওয়া যাবে না! ওরে অদ্ভুত রে—অদ্ভুত! দেখা হ'লে, ক্লাণাইয়েকে বলবো—এর একটা ছঁড়া বাঁধ্‌তে; আর সে ছড়ার নাম হ'বে—"ভূতোর কেচ্ছা!" কি ভূতোনন্দী কারখানা বাবা! খুব মজা হ'বে তা'হলে—আমার পালার শেষে 'পের্‌মিশন' নেই"মরে যাবে, তখন একবার ঐ কেচ্ছাটা সব্বাইকে গেয়ে শোনাবো। খুব মজা হবে! বাহবা!—খুব মজা হবে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৈজয়ন্ত নগর—কানাইয়ের বাড়ী।

কানাই।—ওরে ভূতোরে বাড়ী কেউ একবার যা রে—যা! সে এলো কি না, দেখ!

পেঁচো।—তাকে আর পাওয়া যাবে না—আর পাওয়া যাবে না। তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে—ভূতে!

ছিরে।—সে না এলে যে সব মাটী! বিক্রম কর্‌বে কে রে?

কানাই।—ইন্দ্রজিৎ সঙ্গে বার লোক তার মত এদেশে আর কেউ নেই রে—কেউ নেই।

ছিরে।—সে যেন হবহু ইন্দ্রজিৎ ছিল—হবহু ইন্দ্রজিৎ!

কানাই।—ঠিক্ রে ঠিক্!—সে যেন ইন্দ্রজিতের সাঙ্গোৎ প্রেত-আত্মা ছিল রে!

ছিরে।—'প্রেমের হাঁদা' কি রে? সে যেন ইন্দ্রজিতের ভূতটী হয়ে জন্মেছিলো!

(রামার প্রবেশ।)

রামু।—সুরেশ্বর এইবার দেব-মন্দির থেকে আস্‌ছেন। তাঁর সঙ্গে আরও দু-তিনটী সম্ভ্রান্ত প্রজাপুরুষ আছেন। এই সময় আমাদের 'প্লে' আরম্ভ করতে পার্‌লে, সে দশ টাকা পোষাতে পার্‌বো!

ছিরে।—কোথায় গেলি ভূতো—বাবা রে!

ভোর চার আনা রেজ ছিল—তাও মারা গেল; বেশীর ভাগ—রাজা আবার আমাদের এখনি খুলে ঝুলোবে রে—বাবা!

(ভূতোর প্রবেশ।)

ভূতো।—এরা সব পাগল হ'ল নাকি?

কানাই।—ভূতো—ভূতো! এইছিস বাবা—এইছিস্? বাঁচালি বাছা—বাঁচালি আজ।

ভূতো।—বড় মজার কথা—বড় মজার কথা! কিন্তু বল্‌বো না—বল্‌বো না! অদ্‌ভুত—অদ্‌ভুত।

কাণাই।—কি ভূতো?—কি—কি? কোথায় গিইছিলি?

ভূতো।—সে কথা বলছি-নে—একটুও না! এখন চল, রাজার খাওয়া-দাওয়া হ'য়েছে, থিয়েটার আরম্ভ করা যাক্‌গে! নে—সব দাড়িটাড়িগুলো প'রে নে; নে—নিজের 'পার্টটা' এক-একবার দেখে নে; নে—আরও নে—গরম দুধ আর মরিচের গুঁড়ো খেয়ে গলাটা সানিয়ে নে! গলা সাফ্‌লো না হ'লে, 'প্লেতে' সুর বেরোবে কি ক'রে? চল—চল! কিন্তু সে কথা আমি আর কাউকে বল্‌ছিনে—বড় মজা—বড় আশ্চর্য্য!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীমেহিতগোপাল লাহিড়ী।

শ্রীমতীর ঝগড়া।

গত সপ্তাহের "অনুসন্ধান"-পত্রে "শ্রীমতীর ঝগড়া" প্রবন্ধে শ্রীমতী কবিদিগের বিপক্ষে এক মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন এবং অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রতিকার আমাদিগের সাধ্যের অতীত; কারণ, আমরা কবি নহি এবং কবির কলম চালিয়া ধরিবার ক্ষমতাও আমাদিগের নাই, তবে শ্রীমতীর পক্ষ হইতে দুইটা উচিত কথা বলিতে পারি—তাহাতে কবিভায়া রাগ করেন, নাচার! কবির সে কালের পুরাণ বস্তাপচা ভাঁব (old-fashioned ideas) একালে স্থান পাইতে পারে না—সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত কল্পনা-জগতে একটা মহা বিপর্য্যয় হওয়া

নিতান্ত আবশ্যক। সে কালে যে সকল মাসগ্রী সৌন্দর্য্য-মধ্যে পরিগণিত হইত, এখন তাহার অনেককেই অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছে; আবার যাহার কোনও পুরুষে সৌন্দর্য্যশ্রেণীতে উঠিতে পারে নাই, তাহা এক্ষণে সৌন্দর্য্য-সার হইয়া দাঁড়াইতেছে—কাহারও সন্ধ্যা, কাহারও ভোর! দুনিয়ার নিয়মই যখন এই, তখন কি আর প্রাচীন উপমা খাটে? দীর্ঘ জুটাজুটধারী ব্যাস, বাল্মীকি মরিয়া মাটী হইয়াছেন; কালিদাস, ভবভূতিও শূন্যে বিলীন হইয়াছেন; কিন্তু প্রাচীন উপমা আজিও চলিতেছে—একালের কবিগণ সেই সাবেক বনিয়াদি চাল আজিও ছাড়িতেছেন না। ইহা কি সামান্য অত্যাচার—সামান্য অপমান! অত্যাচারের মাত্রাটা এই আইন-আচ্ছন্ন দেশে স্ত্রীজাতির উপরেই বেশী; অপমানও তাঁহাদিগেরই পূর্ণমাত্রায়। যাঁহারা মানিনী, মান যাঁহাদিগের স্বথায় কথায়, মানের দায়ে ওজরও খোদ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগের পায়ে লুণ্ঠিত, তাঁহাদিগের এত অপমান—বাস্তবিকই অসহ্য—কবির বিরুদ্ধে সকলেরই সম্মর্জ্জনী ধারণ করা উচিত। এমন কি, অস্ত্র-আইনে না বাধিলে আমরা আঁইশ-বটীর ব্যবস্থা করিতেও কুণ্ঠিত নহি!

শ্রীমতীর ঝগড়ার প্রথম দফা—স্ত্রীজাতিকে "গজেন্দ্রগামিনী" বলিয়া বিদ্রূপ করা। এখনকার সুমতি কুমতি যুবতীগণকে "গজেন্দ্রগামিনী" বলা, আর চুলের গোছা ধরিয়া দু'-বা মারা—একই কথা! বরং মারটা লঘু—কেন-না, তাহা শরীরের উপর অত্যাচার; আর "গজেন্দ্রগামিনী" বলিয়া গালি দেওয়া—মনের উপর অত্যাচার—মানিনীর মানহানি করা! এখন, মানের যত আদর, প্রাণের তত নয়—থাক্ প্রাণ থাক্ মান! "গজেন্দ্রগামিনী" রমণী এখন কি আর কেহ দেখিতে পান? যদি কেহ থাকে, তবে সে সেই পাড়া-গেঁয়ে প্রেতিনী—অসভ্য, অভব্য, অনন্যা! তাঁহাদিগের কথা পাড়িয়া আমরা অসভ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। সভ্য ভব্য নব্য গজগামিনী কামিনী এখন আর নাই; তথাপি তাঁহাকে "গজেন্দ্রগামিনী" বলা কবির বেজায় বে-আদবী, উৎকট ধৃষ্টতা! রমণীগণ গজেন্দ্রগামিনী কিসে? হস্তীর সঙ্গে তুলনা কিসে চলে? পায়ে—না গমনে? পায়ে যে নয় তাহা পুরুষ-মাত্রেই অবগত আছেন; কারণ, তাঁহারা প্রহ্লাদ নহেন যে, চব্বিশ ঘণ্টা সেই পদতলে পেষিত হইয়াও বাঁচিয়া আছেন। "দেহি পদপল্লবমুদারম্"। বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পা-দুখানি করকমলে ধারণ করিয়া দুর্ব্বহ মানভঞ্জন করিয়াছিলেন, মহাদেব যে চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া রণরঙ্গিণীর রণ ভঙ্গ করিয়াছিলেন, আর আমরা যাহা মস্তকে ধারণ করিয়া সংসার-সাগরে সাঁতার দিতেছি; তাহা হস্তী-পদতুল্য হইলে, আমরা কখনই বাঁচিতাম না। তবে আমরা বাঁচিয়া আছি কি না—যদি কাহারও এমন সন্দেহ হয়, তাহা হইলে সে কর্ত্তা স্বতন্ত্র। হইতে পারে—সে কালে রমণী-পদ হস্তীপদতুল্য ছিল, আকারে না হউক—গুরুত্বে। কিন্তু এখন যে সে গুরুত্ব নাই, তাহা আমরা একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলিতে পারি। এখন রমণীর পদ পালকবৎ লঘু; এমন কি, সংসারে তাঁহার দুইটার একটার পদ আছে কি না, সন্দেহ। তবে কি রমণী গমনে হস্তীতুল্য? আমরা বিনা 'ইউক্লিডের' সাহায্যে প্রমাণ করিতে পারি যে, গমনেও তিনি হস্তীতুল্য নহেন। হস্তীর গমন—ধীর, মৃদু, সতর্কতা-পূর্ণ। এখনকার স্ত্রীলোকের গতি কি তেমন কেহ দেখিতে পান?—অবলা সরলা রমণীর দিন গিয়াছে—এখন প্রবলা চপলার চাল চলিতেছে। এখন আর দেড়কাঠা ভূমি রমণীর পৃথিবী নহে—এখন তিনি জগতের

চারিধেও চতুষ্পদে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন! সুতরাং সাবেকগতিতে চলিলে ফি আর চলে? একমকীয় রমণী ঘোড়ার পিঠে, গাড়ীতে, ষ্টীমারে, রেলে, বেলুনে পর্য্যন্ত বিহারিণী; সুতরাং কেমন করিয়া গজগামিনী? এখন কি আর ঘরে তাঁহার পা স্থির হয়?—এখানে ওখানে সেখানে সদাই তিনি বিহার করিয়া বেড়াইতেছেন; সুতরাং তিনি চঞ্চলা চপলা। আজ তিনি এক সংসারে, কল্য হয় ত দ্বিতীয় সংসারে, পরশ্ব হয় ত তৃতীয় সংসারে, তৎপর দিবস হয় ত তিনি একেবারে সংসার ছাড়া। যাঁহার এমন গতি-মতি, তাঁহাকে গজ-গামিনী বলা কবিদিগের কতদূর কসুর, তাহার কি আর সীমা আছে?

শ্রীমতীর দ্বিতীয় আপত্তি—রমণী-জাতিকে "জড়িতা" লতা বলা। আপনারা বলুন দেখি, এ কথা কি সত্য? বলুন দেখি, সংসারে কে কাহাকে জড়ায়? আমরা ত জানি, পুরুষই রমণীকে জড়ায়। কন্যা বয়সে বাড়ী বিবাহ করিতে যায়, কি বর কন্যার বাড়ীতে যায়? যদি রমণী লতা হইবে, তাহা হইলে সে অচল অটল থাকিবে কেন?—আর পুরুষ বা অগ্রসর হইয়া তাহাতে জড়াইতে যাইবে কেন? আমার বিবেচনায়—রমণী তমাল, আর পুরুষ লতা। সত্য করিয়া বলুন দেখি, এখন আপনি (he) 'হি', না তিনি (he) 'হি'? ব্যাকরণের ব্যতিক্রমে আপনি (he) 'হি' বটে; কিন্তু বস্তুতঃ আপনি (she) 'শি', আর আপনার গৃহিণী, যিনি সেকালে (she) 'শি' ছিলেন, তিনি এক্ষণে (he) 'হি' হইয়াছেন। রমণীই এখন বল-বুদ্ধি-ভরসা; সুতরাং তাঁহাকে না জড়াইলে, পুরুষের সকল দিক ফরসা। রমণী কি পুরুষকে জড়াইতে আসে? একবারও আমরা তাহা বলিতে পারি না। বলুন দেখি, পাছে আপনার "ললিত লবঙ্গ লতা" তমালত্যাগিনী হইয়া শিমুলগ্রাহিণী হন সেই ভয়ে, আপনি নিয়ত তাঁহাকে জড়াইয়া ধরেন কিনা? ভয়ে হউক, ভক্তিতে হউক, পুরুষ মহাশয়কেই এখন রমণী-লতাকে জড়াইয়া থাকিতে হইয়াছে। যে জড়ায়, সে ত তমাল নয়—সেই লতা; সুতরাং পুরুষই এক্ষণে লতা, আর রমণী তমাল। সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রীর দোহাই দিয়া পুরুষ যে রমণীর সমান অর্থাৎ তমাল হইবেন, তাঁহারও উপায় নাই; কারণ, রমণীর তমালত্ব পূর্ব্বেই সপ্রমাণিত হইয়াছে। সাম্যের প্রকৃত অর্থ বৈষম্য, স্বাধীনতার অর্থ অধীনতা, মৈত্রীর অর্থ বিরোধ—আমরা প্রলাপ বকিতেছি না, একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবেন।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চীন-জাপানের যুদ্ধ।—সন্ধির জন্য ব্যস্ততাপ্রকাশ করিতেছেন। সন্ধির সম্ভাবনায় জাপানের যুদ্ধতরীর প্রতি অধিক অগ্রসর না হইবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। চীনগভর্ণমেণ্ট জাপানের ক্ষতিপূরণ-জন্য ঋণ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

... ...

চিত্রলের যুদ্ধ।—চিত্রলে উমারা খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া কাশ্মীরের মহারাজার সমস্ত সৈন্য ইংরাজের সহায়তা করিতেছে। উমারা খাঁও যুদ্ধে উদ্যোগী হইতেছে।

... ...

অনিবার্য্য হইয়াছে। কাশ্মীরের মহারাজার সমস্ত সৈন্য

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনুসন্ধান।

অষ্টম বর্ষ। ২২এ ও ২৯এ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩০১। ৪৭, ৪৮ সংখ্যা।

ভগবদ্গীতোক্ত

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ধ্যানযোগ।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, যোগের মধ্যে কর্ম্মযোগই প্রধান। ঐ কর্ম্ম যোগ কাহাকে বলে—তাহা না বুঝিলে, উহার প্রধানত্ব কখনই ধারণা হইতে পারে না। কেহ কেহ মনে করেন যে, কেবল সন্ধ্যা পূজা হোম প্রভৃতির নামই কর্ম্মযোগ। ইহা তাঁহাদের ভ্রম-সংস্কার। অর্জ্জুন জ্ঞাতিবধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাকে শত শত যুক্তি দ্বারা যুদ্ধই তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য এবং উহাই কর্ম্মযোগ প্রতিপাদন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন—শিক্ষিত পাঠক অনেকেই তাহা অবগত আছেন। তবে কেবল পূজা হোম প্রভৃতিকে কর্ম্মযোগ বলিব কেন? প্রকৃত পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনই কর্ম্মযোগ। এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে কি, ইহা অবধারণ অতীব কঠিন; উহা অবধারণ করিতে হইলে, মানব-প্রকৃতি ও মানবের চরম উদ্দেশ্য কি, অগ্রে স্থির করিতে হইবে। উহাও অধিক চিন্তা করিয়া আমাদের স্থির করিবার আবশ্যক হইবে না; হিন্দুশাস্ত্রে উহা স্থিরীকৃত আছে। মানব-প্রকৃতির সর্ব্বপ্রধান তত্ত্বই—অমরত্ব—আমিত্ব; ঐ আমিত্ব হইতেই মানবের সংসারি-বন্ধন; সাদা কথায় বলিতে হইলে, উহাই মানবের সুখ। প্রকৃত পক্ষে ঐ আমিত্বের মধ্যে প্রধানতঃ চারিটী তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে, যথা, আসক্তি, বাসনা, প্রীতি ও প্রেম। উহাই মানবের স্বভাব বা প্রকৃতি। বেদান্ত-দর্শনে, ঋষিত আছে যে, মানবের চরম উদ্দেশ্য—ব্রহ্মে মিলন। ব্রহ্ম আমাদের ন্যায় অজ্ঞানীয় নিকট প্রত্যক্ষ বস্তু নহে; তবে বেদান্ত বলেন যে, সমস্তই ব্রহ্মময় বা ব্রহ্মই জগন্ময়। যদি তাহাই হয়, তবে জগতস্থ জীবজন্তু প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থের আত্মার সহিত নিজের আত্মাকে মিশাইতে পারিলে ব্রহ্মে মিলন হয়। ইহারই নাম বিরাট-

প্রেম। স্ত্রীপুত্রের প্রতি ভালবাসা, আসক্তি ও বাসনা-মূলক হইলেও, তাহাতেও প্রীতি ও প্রেম আছেন ঐ প্রীতি ও প্রেম, স্বার্থ ও পরার্থ-মূলক। যে প্রেমে নিজের স্বার্থ আছে, তাহা বাসনা-মূলক; এবং যে প্রেম স্বার্থ-শূন্য পরার্থ-প্রেম, তাহাই সহানুভূতিমূলক। ঐ সহানুভূতিমূলক প্রেমও যে একেবারে বাসনাশূন্য, তাহা নহে; উহাতেও উৎকৃষ্ট বা দৈবী বাসনা রহিয়াছে, যেহেতু এ পরার্থ-প্রেমেও আত্মপ্রীতি আছে। আত্ম-প্রীতি ব্যতীত পরার্থ-প্রেম হইতে পারে না। কিন্তু পরার্থ-প্রেমে আত্মপ্রীতি বড়ই কাঁটুন; যেহেতু, আমিত্বের উপর ভালবাসাই মানবের স্বভাব-সিদ্ধ। তবেই হইল, আমিত্বকে বিরাটত্বের অন্তর্ভূত করা বা পরার্থমূলক বিশ্বপ্রেম, একই কথা। আমার শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদির সীমার মধ্যেই—অন্ততঃ স্বীয় পরিবারের মধ্যেই, আমার আমিত্বের অবস্থান। কিন্তু পারিবারিক প্রেম নিজের স্বার্থমূলক হইলেও, ঐ আত্মীয়-পরিবারের উপর প্রেম হইতে পরার্থ-প্রেম শিক্ষা হইতে পারে। এইজন্য পরিবারের গণ্ডীর বাহিরে—সমাজস্থ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, তদনন্তর স্বজাতির প্রতি—ক্রমেই প্রেমের যতই বিস্তার হয়, ততই পরার্থ-প্রেমে আত্মপ্রীতির বিকাশ হইতে থাকে। কিন্তু পারিবারিক প্রেমের ন্যায় স্বজাতীয় প্রেমও স্বার্থমিশ্রিত। স্বার্থ এবং পরার্থ দুইটী পরস্পর বিরোধী হইলেও, পারিবারিক বন্ধন ও সমাজ-বন্ধনের মধ্যে পরস্পরের সামঞ্জস্য আছে। মানবের আত্ম-দেহ—ইন্দ্রিয়ের উপর স্নেহ অধিক; সেই স্নেহের সাহায্য-প্রাপ্তি হইতেই অন্যের উপর ভালবাসা বা কৃতজ্ঞতা অলক্ষ্যে ক্রমে; তাহা হইতেই ক্রমে পরার্থ-প্রেম শিক্ষা হয়। শৈশবাবস্থায় মাতা পিতা আত্মীয়বর্গ আমাদিগকে লালন-পালন করেন ও ভালবাসেন বলিয়া, আমরাও তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে শিক্ষা করি; সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি পরস্পরের সাহায্য করে, এইজন্য পরস্পরের উপর অলক্ষ্যে সহানুভূতির উৎপত্তি হয়। ফল কথা, আমার আমিত্বের সহচর অসক্তি ও বাসনা এবং বিরাট আমিত্বের সহচর বিশ্বপ্রেম। ইহা পরস্পর বিরোধী নহে। তবে যেখানে উভয়ের সামঞ্জস্য আছে, সেই স্থল বিরোধী নহে। এক্ষণে, বিশ্বপ্রেমের সহিত আমার দেহ-ইন্দ্রিয়জনিত প্রেমের সামঞ্জস্য আছে কি? অবশ্য বিশ্বপ্রেমের সহিত ক্ষুদ্র আমিত্ব-প্রেমের সামঞ্জস্য না থাকিলেও, ক্ষুদ্র আমিত্ব-প্রেমের সহিত বা স্বার্থের সহিত পরার্থের যে সামঞ্জস্য উপরে কথিত হইয়াছে, তাহাই বিশ্ব-প্রেমের নিম্নতর সোপান। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, মানবে আসক্তি, বাসনা, প্রীতি ও প্রেম আছে; ঐ আসক্তি, বাসনা, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত; এবং প্রীতি-প্রেম, মনুষ্যত্ব হইতে বিরাট পুরুষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার মধ্য-কেন্দ্র অহংত্ব বা আমিত্ব। আসক্তি ও বাসনা একদিকে মনুষ্যত্বকে বা আমার আমিত্বকে প্রলোভনের মধ্যে ফেলিয়া আমার মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিয়া পশুত্বে পরিণত করিতে পারে, অন্যদিকে প্রীতি ও প্রেমের সহিত যোগে মনুষ্যত্বকে ক্রমেই উন্নত করিতে পারে। তদনন্তর ঐ আসক্তি ও বাসনা, প্রীতি ও প্রেমের অধীভূত হইলে, ঐ প্রেম যখন বিরাট প্রেমের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন আসক্তি ও বাসনা স্বীয় অস্তিত্ব হারাইয়া প্রেমের সহিত মিশিয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে একদিকে নিরুদ্ধ বাসনামূলক স্বার্থ, অন্যদিকে প্রীতি ও প্রেম-মূলক সহানুভূতি—উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রামই মানব-জীবন। মানবজাতির সহানুভূতির ফল—নৈতিক উন্নতি, বাসনার ফল—স্বীয় স্বার্থ।

অতএব, সংসার-বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া, উভয়ের সামঞ্জস্যে আত্মপরিবারের ও সমাজের উন্নতি-সাধনই মানবের ক্রমোন্নতির উপায়; প্রকৃত পক্ষে উহাই মানব-ধর্ম্ম-বিরোধী নহে। ঐ সমাজোন্নতির নিমিত্ত সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থিক উন্নতির প্রবৃত্তিও স্বভাবসিদ্ধ। অবশ্যই মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই দৈহিক ও মানসিক মুখাপেক্ষণ; সমাজের সুখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধির সহিত নিজেরও সুখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যদিও ঐ সুখ আসক্তি বা বাসনা-মূলক, কিন্তু নিজের ন্যায় সমাজের সুখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধি নিষ্কাম বাসনামূলক নহে, প্রীতিমূলক। প্রীতিও একজাতীয় আসক্তি বটে, কিন্তু সমাজের সুখ-সমৃদ্ধির উপর একমাত্র লক্ষ্য হইলে, নিজস্বার্থ, সমাজ-স্বার্থের অন্তর্গত এবং নিজের হিত ও সুখসমৃদ্ধি, সামাজিক হিত ও সুখসমৃদ্ধির অন্তর্ভূত হইয়া যায়। তখন আসক্তির পরিবর্ত্তে উহাকে সহানুভূতি বলা যাইতে পারে। যদিও ঐ উন্নতি লৌকিক উন্নতি বটে, কিন্তু উহা দ্বারা অদৃশ্যভাবে আধ্যাত্মিক বল বর্দ্ধিত হয়। ইহারই নাম কর্ম্মযোগের প্রথমাভ্যাস, সদাচার ইহাকে 'নীতি' বলে। মানব একেবারে মানসীয় বৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে না; অহংকেন্দ্রাভিমুখী গতি বা আসক্তি মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ঐ আসক্তি বা বন্ধন-মিশ্রিত ক্রমিক পরার্থ-প্রেম বা সহানুভূতি দ্বারা নৈতিক বল বৃদ্ধি হয়। উহাই আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান।

সমগ্র মানবজাতি ভিন্ন ভিন্ন সমাজভুক্ত। কিন্তু যদি এক সমাজস্থ ব্যক্তিগণের অন্য সমাজস্থ ব্যক্তির হিতের উপর লক্ষ্য না থাকে ও কেবল স্বীয় সমাজের সুখসমৃদ্ধির উপর একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে ঐ উন্নতি নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়া উহার স্রোত মন্দীভূত হয় ও ক্রমে অলক্ষ্যে বিপরীত কেন্দ্রাভিমুখী হইতে থাকে। ঐ স্থান—আধ্যাত্মিক উন্নতি অবনতির একটি বিন্দু বা সীমা-স্বরূপ। যদিও উহা আধ্যাত্মিক উন্নতির একটী সোপানে বটে; কিন্তু ঐ স্থানে স্বজাতীয় স্বার্থ নামক একটী ভয়ঙ্কর রাক্ষস উহার প্রহরী। ঐ রাক্ষসকে পরাজয় ব্যতীত ঐ সোপান অতিক্রম কঠিনতর মানবের স্বীয় সমাজেরস্থায় ভিন্ন সমাজস্থ লোকের সুখসমৃদ্ধির এবং ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন রাজ্যের হিত ও তাহাদের উন্নতির উপর সমদৃষ্টি এবং উভয় সমাজের বা উভয় জাতির সামঞ্জস্য বড়ই কঠিন। উহার মধ্যে বহু বিঘ্ন-বিপত্তি আছে; তদ্ব্যতীত, প্রত্যেক সমাজের নৈতিক বল বর্দ্ধিত হইলে, পরস্পরের সহানুভূতি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, পৃথিবীতে কার্য্যতঃ প্রায় তাহা ঘটে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান যুগের মানবের স্বার্থ ও স্বীয় বাসনা-সম্ভূত বেগই অত্যধিক। মানবের অবশ্যই নৈতিক শক্তি আছে, তাহাও আসক্তি ও স্বার্থমূলক। নৈতিক বল হইতে দৃঢ়রূপে সমাজ-বন্ধন হইলে, তাহাই একটী কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া, ঐ সমাজ-কেন্দ্রাভিমুখী গতি পুনঃ প্রবল হইয়া উঠে। এইজন্যই প্রত্যেকের নৈতিক শিক্ষা, নৈতিক শক্তিবর্দ্ধন, তাহার অনুশীলন ও পরিচালন আবশ্যক। ঐ শিক্ষা-প্রণালী ও তাহার অনুশীলন-পদ্ধতি আমার কৃত দার্শনিক-সীমাংসা প্রথম ভাগ "শিক্ষার স্ব" নামক পুস্তকে বিস্তৃতরূপে সমালোচিত হইয়াছে; এস্থলে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। প্রকৃত পক্ষে বিনা পক্ষপাতে ও বিনা তাঁরতম্যে সমস্ত মানব-জগতের প্রতি সমদৃষ্টি ও জগতের উন্নতি-সাধনই কর্ম্মযোগ; কর্ম্মযোগব্যতীত কেবল জ্ঞান ও ধ্যান-

* প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম্ম কেবল সমগ্র মানব-জগতের উন্নত সমদৃষ্টি শিক্ষা দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই; সমস্ত জীবজন্তু—এমন কি জড়পদার্থের উপর সমদৃষ্টি ও প্রেম-শিক্ষাই হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের

যেরূপ মানসবৃত্তি-বৃদ্ধি সম্যক অনুশীলিত হয় না ও নৈতিক উন্নতিও অল্প সাধিত হয়। সুতরাং জ্ঞানযোগ বা চিন্তা বা ধ্যান দ্বারা মানবীয় স্বাভাবিক স্রোত রুদ্ধ করিয়া একাকী আধ্যাত্মিক উন্নতি করা বড়ই কঠিন। হঠযোগ ও ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি কঠিন সাধন দ্বারা ইহা সাধিত হয় বটে, কিন্তু অষ্টাঙ্গযোগ ব্যতীত হঠযোগসাধন বা ষট্‌চক্রভেদ অসম্ভব। ঐ অষ্টাঙ্গযোগের যম ও নিয়ম, মানবের সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন ও সামঞ্জস্য এবং নৈতিক উন্নতি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ঐ সংযম বা নিয়ম পালন করিতে হইলে, কর্ম্মযোগ যে আবশ্যক, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তবে জ্ঞান বা ধ্যানযোগ মুখ্য, কর্ম্ম উহার গৌণ। অতএব, কর্ম্মযোগ ব্যতীত কেবল জ্ঞান ও ধ্যানযোগের দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন করা অতীব ক্লেশকর। এই জ্ঞানযোগার্থে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতি-সাধন, ক্রমিক জড়তত্ত্ব হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বনির্ণয় ইত্যাদি। উহা কর্ম্মযোগাপেক্ষা কঠিন। বহু অধ্যয়ন, গুরূপদেশ, আত্মসংযম, অভ্যাস, বৈরাগ্য, সহিষ্ণুতা, ঐধ্যবসায়, ধারণা, একাগ্রতা প্রভৃতি বহুতর গুণের আবশ্যক। প্রধানতঃ, ধারণা-শক্তি ব্যতীত মানবের জ্ঞানোপার্জ্জন কখনই সম্ভব হইতে পারে না। বিষয় সংগ্রহ, স্মৃতি, উদ্ভাবন, অনুমান, তুলনা, নির্ব্বাচন, উপমান, বিষয়ের চিন্তার অবিচ্ছিন্ন গতি (একাগ্রতা) প্রভৃতি সমস্তই ধারণা-সম্ভূত। আভ্যন্তরীণ মানবীয় শক্তি বর্দ্ধন ব্যতীত ধারণাশক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে না। ইহা পরীক্ষিত ও সর্ব্ববাদিসম্মত যে, মানবীয় দৌর্ব্বল্য-হেতুই মানবের ধারণা, স্মৃতি ও চিন্তাশক্তির হ্রাস হয়। আবার, বস্তুমাত্রেরই আভ্যন্তরীণ বলসঞ্চয় ব্যতীত বাহ্য বলপ্রকাশ দ্বারা ক্রমে তাহার উদ্যম নষ্ট হয়। সুতরাং আত্মীয় শক্তির অন্তর্মুখী গতিই ধারণা-শক্তি-বৃদ্ধির মূল; কিন্তু বাসনা ইহার সম্পূর্ণ অন্তরায়। আসক্তিই যখন মানব-ধর্ম্ম, তখন আসক্তি ও পরপ্রেম বা সহানুভূতির পরস্পর সামঞ্জস্য ব্যতীত আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করা বড় কঠিন। মানব কর্ম্মযোগ দ্বারা উভয় বৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি ও আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারে; কিন্তু কর্ম্মযোগ ব্যতীত কেবল জ্ঞান ও ধ্যানযোগ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আত্মোন্নতি করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। ঐ অবস্থায় কঠোর অভ্যাস ও বৈরাগ্য ব্যতীত মানবের পূর্ব্বোক্ত-মত বন্ধন শিথিল ও আত্মোন্নতি সম্ভব হইতে পারে না। আবার, জ্ঞান, ধ্যান বা কর্ম্মযোগ ব্যতীত কেবল অভ্যাস-যোগ আরও কঠিন ও অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জ্ঞান উপার্জ্জন দ্বারাও মানের একপ্রকার ঐধ্যানভূতি হইতে থাকে ও তৎপ্রতি ক্রমেই প্রীতি জন্মিতে থাকে; ক্রমে যতই জ্ঞানালোচনার দিকে মন প্রধাবিত হয়, ততই বাহ্য সুখের উপর বিরক্তি জন্মে ও কঠোর অভ্যাসও ক্রমে বদ্ধমূল হয়। কিন্তু জ্ঞানযোগ হইতে ধ্যানযোগ দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজে আত্মসুখের উপর বৈরাগ্য জন্মে; অভ্যাসও বদ্ধমূল হয়; কারণ, কঠোর অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সহিত ধ্যানযোগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ; উহার সহিত জ্ঞানযোগের সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী। এইজন্য গীতাকার অভ্যাস হইতে জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ হইতে ধ্যানযোগ, ধ্যানযোগ হইতে কর্ম্মফল-ত্যাগ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—

"শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং॥"

গীতা, ১২ অধ্যায়, ১২ শ্লোক।

বঙ্গানুবাদ।—অভ্যাস যোগাপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যান ও ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ; এই ত্যাগানন্তরই মুক্তিরূপ শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

এই কর্ম্মফল-ত্যাগ সাধারণ কর্ম্মযোগ নহে। কর্ম্মযোগী সিদ্ধানন্তর স্থিতপ্রজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞানী ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম-সমর্পণ করিয়া ফলত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল জগতের হিতার্থেও লোকশিক্ষার্থে কর্ম্ম করিয়া নিরবচ্ছিন্ন যে শান্তি উপভোগ করেন, এইস্থলে সেই কর্ম্মফল ত্যাগ যে বুঝাইতেছে, তাহা উপরোক্ত কবিতার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী কবিতা দ্বারা প্রমাণিত হইবে। যথা;—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যাস্যমৎপরঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাং॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবেসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্ম পরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান॥"

গীতা, ১২ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ হইতে ১২শ শ্লোক।

এই কয়েকটী কবিতার স্থূল তাৎপর্য্য—ঈশ্বরে মন ও বুদ্ধি স্থির করিয়া অনন্য যোগ দ্বারা ঈশ্বরোপাসনাই প্রশস্ত। তাহাতে অশক্ত হইলে, অভ্যাস-যোগদ্বারা ঈশ্বর-প্রাপ্তির চেষ্টা কর্ত্তব্য। অভ্যাস-যোগে অশক্ত ব্যক্তি, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কার্য্য করিলেই যথেষ্ট। ঐরূপ ঈশ্বরোদ্দেশে কার্য্য করিতে যে না পারে, সে সংযতচিত্তে কার্য্যের ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া যদৃচ্ছা কার্য্য করিতে পারে। ইহা দ্বারা ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ ও ঈশ্বরে মনোবুদ্ধি স্থির করিয়া অনন্য-যোগ দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং নিতান্ত অশক্তপক্ষে কেবল সংযতচিত্তে কার্য্যের ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য করা বিধেয়, বলা হইয়াছে। এক্ষণে, প্রথমোক্ত ঈশ্বরে কর্ম্ম-সমর্পণপূর্ব্বক সগুণেশ্বর উপাসনার সহিত শেষোক্ত মত সংযতচিত্তে সর্ব্বকার্য্যের ফলত্যাগ করিয়া যদৃচ্ছা কর্ত্তব্য কার্য্য করার পার্থক্য নির্ণয় হইলে, তৎপরবর্ত্তী দ্বাদশ শ্লোকোল্লিখিত "ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং" কবিতার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী "যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি" প্রভৃতি কবিতা কয়েকটীর মধ্যে কোন বিরোধ থাকিবে না। প্রথমতঃ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ; তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ; এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মনুষ্য কর্ম্মযোগ-সাধন ব্যতীত কখনই যোগী বা জ্ঞানী হইতে পারে না। প্রথমতঃ ক্রিয়াদ্বারাই চিত্তসংযম ও চিত্ত যাহাতে দৃঢ় হয় তাহা করিতে হইবে। ঐ চিত্তসংযমের উপায় এই;—প্রথমতঃ আমি যে অবস্থার লোক তাহাতে আমার যে কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহাই করিতে হইবে। নিজের স্বার্থ বা কর্ম্মফলের উপর লক্ষ্য করিয়া সুখ, দুঃখ, হিংসা, ক্রোধ, অনুরাগ ও বিদ্বেষ ইত্যাদির বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটি করা উচিত নহে। কেবল কর্ত্তব্যবোধে কার্য্য করাই কর্ম্মযোগের প্রথম সোপান। সগুণ ঈশ্বরের প্রকৃত অর্থবোধ ও ঈশ্বরের সহিত আত্মসম্বন্ধ উপলব্ধি ব্যতীত

ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ করিলে। অতএব পূর্ব্বোক্ত মত প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধির ও কর্ত্তব্যপ্রিয়তা, তদনন্তর তাহা অনাসক্তিদ্বারা ঈশ্বরের (জগতের হিতার্থে) কর্ম্মকরণ; ঐরূপ ঈশ্বরের কার্য্য করিতে করিতে আপনার সহিত ঈশ্বরের (জগতের) অভিন্নজ্ঞান হইলে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কর্ম্ম-সমর্পণ হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য অধিকদূর যাইতে হইবে না; অর্জ্জুনকে যুদ্ধের উপদেশস্থলে নিম্নোক্ত কবিতা-কয়েকটীর দ্বারা যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, উহাই কর্ম্মযোগের প্রথম সোপান (কর্ত্তব্য কর্ম্ম), কিম্বা শেষোক্তমত কর্ম্মফল-ত্যাগের.. অভ্যাস। অর্জ্জুন একজন ক্ষত্রিয় রাজপুরুষ; রাজ্যরক্ষার্থ ও আততায়ী হইতে প্রজাবর্গের ত্রাণ ও মঙ্গলার্থ যুদ্ধ—তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সন্ন্যাস তাঁহার প্রকৃতির বিপরীত ও অবিধেয়। অর্জ্জুন স্বীয় প্রকৃতি-অনুযায়ী তাঁহার অবস্থানুরূপ কার্য্য করিতে অবশ্যই বাধ্য। সুতরাং লাভালাভ-ফলাফলের উপর দৃষ্টি না করিয়া, কেবল কর্ত্তব্য-বোধে স্বীয় প্রকৃতি-অনুরূপ কার্য্য করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥
নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বং কর্ম্মজ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥"

গীতা, ৩য় অধ্যায়; ৪র্থ হইতে ৯ম শ্লোক।

সর্ব্বশেষে ৯ম শ্লোকে যজ্ঞার্থে বিষ্ণু (ঈশ্বর) প্রীত্যর্থে অর্থাৎ লোকহিতার্থে কর্ম্ম বুঝাইতেছে। *

কর্ম্মযোগ সিদ্ধানন্তর ঈশ্বরের সহিত আপনার অভিজ্ঞান হইলে, ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাস অবলম্বন করুন বা সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ ও কর্ম্মফল-ত্যাগপূর্ব্বক লোকহিতার্থে কর্ম্ম করুন। উভয়ের মধ্যে ফল-গত পার্থক্য নাই। যথা,—

"নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্মসমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥"

গীতা, ৩য় অধ্যায়, ১৮ হইতে ২২ শ্লোক।

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥"

গীতা, ৪র্থ অধ্যায়, ১৯—২২ ও ৩৭।৩৮ শ্লোক।

* ৯ম শ্লোকে শঙ্করাচার্য্যের টীকা দেখুন।

ঐরূপ জ্ঞানী মহাত্মাকে গীতাকার স্থিত-প্রজ্ঞ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঐ স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোক হইতে ৭২ শ্লোকে বর্ণিত আছে। বাহুল্যভয়ে ঐ শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইল না। উহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, ইন্দ্রিয় এবং মন যাহার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছে — কূর্ম্ম যেমন স্বীয় শরীর ইচ্ছামত বাহির ও সঙ্কোচ করিয়া লইতে পারে, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয় ও মনকে ইচ্ছামত বিকাশ ও নিরোধ করিতে পারেন অর্থাৎ যাঁহার অহং বা আমি-রূপ স্রোত বিরাট রূপ সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী বা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি গুণাতীত; তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম বা কর্ম্মত্যাগ উভয়ই সমান; এইজন্যই গীতাকার সাংখ্য ও কর্ম্মযোগের মধ্যে পার্থক্য নাই, প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা,—

"সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলং।
যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥"

গীতা, ৫ম অধ্যায়, ৪,৫ ও ৬ষ্ঠ শ্লোক।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা "সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগ; ততঃ কুরু যতাত্মবান্" ও "ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগ-স্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং" অর্থাৎ "কর্ম্ম ফলত্যাগ-পূর্ব্বক সংযতচিত্তে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন"—এবং "জ্ঞান হইতে ধ্যান, ধ্যান হইতে কর্ম্ম ফলত্যাগ; শ্রেষ্ঠ—ঐ ত্যাগ হইতে অবিচ্ছিন্ন শান্তিলাভ"—এই দুইটী শ্লোকোল্লিখিত ফলত্যাগের মধ্যে ওরূপ পার্থক্য আছে। এ দুইটী স্থলের কর্ম্ম-ফলত্যাগের পার্থক্য-সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের উপমাটি অতীব মনোরম ও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যথা; সমুদ্রপানকারী অগস্ত্যঋষি ব্রাহ্মণ এবং বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণগণও ব্রাহ্মণ; ঐ উভয় ব্রাহ্মণের মধ্যে যে পার্থক্য, ঐ উচ্চয় কবিতার উল্লিখিত কর্ম্ম ফলত্যাগের মধ্যে সেইরূপ পার্থক্য; শাঙ্করভাষ্যে ঐ দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকের টীকা দৃষ্টি করুন।

প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাসীই নির্গুণোপাসক, আর কর্ম্মযোগীই সগুণোপাসক *। উভয়েরই চরমফল মুক্তি। কিন্তু সগুণোপাসনা হইতে নির্গুণোপাসনা ক্লেশসাধ্য হইলেও, নির্গুণ পরব্রহ্মধামপ্রাপ্তিই চরম সীমা। পরব্রহ্ম ধামই ঈশ্বরের চরম ধাম। অতএব, পরব্রহ্মধাম প্রাপ্তিকে ঈশ্বরত্ব-প্রাপ্তি বা পূর্ণজ্ঞানানন্দ-লাভ বলিতে হইবে। যথা,—

"ক্ষেত্রজ্ঞমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥"

গীতা, ১২ অধ্যায়, ৩, ৪ শ্লোক।

তাৎপর্য্য।—যিনি অক্ষর-অব্যক্ত উপাসনা করেন, যাঁহার চিন্তা সর্ব্বগামী, যিনি ইন্দ্রিয়-সংযমী ও সর্ব্বত্র সমজ্ঞানী, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন; আর, যিনি, ভক্তিপূর্ব্বক সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি যোগীশ্রেষ্ঠ, এবং ঈশ্বর তাঁহাকে সংসার-সাগর হইতে পার করেন; যেহেতু, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না অর্থাৎ অজ্ঞানতা দূরীভূত ও নির্ম্মল জ্ঞানলাভ হয়।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ভক্ত বা যোগীর পরিণামে নির্ম্মল পূর্ণ জ্ঞানানন্দ লাভই

* নির্গুণ ও সগুণোপাসকের পার্থক্য পরে প্রদর্শিত হইবে।

উদ্দেশ্য। অতএব সংখ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী স্বয়ং নির্ম্মল জ্ঞানালোকপূর্ব্বক সেই চরম জ্ঞানানন্দময় হইয়া পরব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হন। অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানীর সহিত পার্থক্য নাই ; এস্থলে ধ্যাতা ধ্যেয় একণ আর তত্ত্ব বা যোগীর বা ভক্তিমূলে জ্ঞানের উদয় হইলে সেই নির্ম্মল জ্ঞানের সাহায্যে মুক্তি বা ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়। এস্থলে ধ্যাতা ধ্যেয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। যথা,—

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।"

এস্থলে "অহং সমুদ্ধর্ত্তাই ঈশ্বর স্বয়ং নির্ম্মল জ্ঞান), এবং 'তেষাং'—সাধকস্বরূপ ; অতএব সাধক ও সমুদ্ধর্ত্তা পৃথক। ইহাদ্বারা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। ফলতঃ যে পথই অবলম্বিত হউক, নির্ম্মল জ্ঞানানন্দ লাভই চরমোদ্দেশ্য। শ্রুতব্যতীত, নিম্নোক্ত কবিতা কয়েকটি দ্বারাও জ্ঞানের প্রতিপন্ন হইয়াছে। যথা,—

"শ্রেয়ান দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"

গীতা, ৪র্থ অধ্যায়, ৩৩ ও ৩৭ শ্লোক।

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব্বএবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিং॥"

গীতা, সপ্তম অধ্যায়; ১৭ ও ১৮ শ্লোক।

তবে সগুণোপাসনা বা কর্ম্মযোগসিদ্ধি ব্যতীত নির্গুণোপাসনা বা কর্ম্মসন্ন্যাস ক্লেশসাধ্য ; কিন্তু নির্ম্মল জ্ঞানাধিকারীর পক্ষে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। ঐ নির্ম্মল জ্ঞানাধিকারীকেই জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী কহে। ইহাদ্বারা সাংখ্য বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। কিন্তু কর্ম্মযোগ সিদ্ধি ব্যতীত কেবল জ্ঞানযোগ বা ধ্যানযোগ দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানের বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসের অধিকার হয় না, অর্থাৎ যোগারূঢ় ব্যক্তিরই সমজ্ঞান হয়। যথা ;—

"আরুরুক্ষ মুনির্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।
যদাহি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্প সন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥"

এই জ্ঞানযোগ জ্ঞানাভ্যাসের চেষ্টা মাত্র! অতএব এই অধ্যায়ে যে স্থানে জ্ঞানযোগের উল্লেখ আছে বা হইবে, সেস্থানে প্রকৃত জ্ঞানাভ্যাসের চেষ্টা ভিন্ন নির্ম্মল জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাস (সাংখ্য) বুঝিতে হইবে না। ইতিপূর্ব্বে ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ বা সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগের সহিত সাধারণতঃ ফলত্যাগপূর্ব্বক যদৃচ্ছা কর্ত্তব্য কর্ম্মের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে ; জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাস ও জ্ঞানযোগের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য প্রদর্শিত হইল। প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত জ্ঞানযোগার্থে মনন প্রভৃতি জ্ঞানানুশীলন বুঝায়, শেষোক্ত সাংখ্যযোগ বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসার্থে জ্ঞানসমাধি বুঝিতে হইবে। ইহা আর একটু বিশদভাবে বলিতে হইলে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রথমোক্ত শ্রবণ, মনন অর্থে তত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন বা গুরূপদেশ, শ্রবং চিন্তা দ্বারা আত্মার তত্ত্বনির্ণয়ের চেষ্টা। ঐ শ্রবণ ও মননকে বৈষয়িক্তিকরণ পরোক্ষ জ্ঞানলাভের উপায়ীভূত কহেন ; তাঁর জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসকে সমাধি বা অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের হেতু কহেন। কিন্তু কর্ম্মযোগ দ্বারা মনোবৃত্তি শাসিত ও চিত্ত শুদ্ধি না হইলে কেবল অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা অতীব কঠিন। এইজন্যই গীতায় কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

জ্ঞানযোগব্যাসী, জ্ঞানোপার্জ্জন বা প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয় জন্য আত্মোৎসর্গ করিলে এবং দর্শন (লৌকিক ও আধ্যাত্মিক), বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ শিক্ষা ও তাহা পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার প্রবৃত্তি বা চিন্তা-স্রোত তন্মুখীন হইলে, যদিও বাহ্যসুখের প্রতি ক্রমেই আস্থাশূন্য হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আপনাকে হঠাৎ বন্ধনমুক্ত করিতে পারেন না ; কারণ, আসক্তিই মানবীয় বন্ধন। তাহার দুইটী স্রোত; আত্মসুখ ও পরসুখানুভূতি এবং সহানুভূতি। ঐ সহানুভূতি-বৃত্তি কেবল জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা সম্যকরূপে স্ফূরিত হয় না, কর্ম্মযোগ বা কর্ম্মানুশীলন দ্বারা স্ফূরিত হয়। যখন ঐ সহানুভূতি হইতে নৈতিক উন্নতি বর্দ্ধিত ও নীচ বাসনার বেগ মন্দীভূত হয়, তখন সহানুভূতি বা পরপ্রেম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কারণ হয়। ঐ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ধ্যান-যোগকেই সাংখ্যযোগ বলে, অর্থাৎ আত্মাকার বুদ্ধিযোগের নাম সাংখ্যযোগ। ঐ আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ-সাধনের নামই অব্যক্ত সাধন। ঐ অব্যক্ত সাধন যে অতীব ক্লেশসাধ্য, তাহা ভগবদ্গীতাকার স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ;—

"সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয় সকারাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥
সংন্যাসস্তু মহাঁবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥"

গীতা, পঞ্চম অধ্যায়, ২ ও ৬ শ্লোক।

বঙ্গানুবাদ।—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির হেতুস্বরূপ। তন্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করা নিতান্ত দুঃখজনক। কর্ম্মযোগিগণ সিদ্ধ হইয়া শীঘ্রই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

গীতা, ১২শ অধ্যায়, ৫ শ্লোক।

বঙ্গানুবাদ।—নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। কেন-না, নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ করা দেহাভিমানীর পক্ষে নিতান্ত ক্লেশসাধ্য।

তবে কর্ম্মযোগ সিদ্ধানন্তর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ধ্যানযোগ অতীব সহজ ও স্বাভাবিক ; উহা অব্যক্ত সাধন বা নির্গুণোপাসনা হইলেও, যোগারূঢ় বা স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষে কঠিন নহে। উহা যোগারূঢ় ব্যক্তির মহাচৈতন্যাভিমুখী গতি—তত্ত্ববিদ্‌গণের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তত্ত্বের সপ্তম তত্ত্বে সম্মিলনের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি।* এইস্থানে "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী" কবিতাটী একবার স্মরণ করুন। কর্ম্ম সন্ন্যাস অব্যক্ত সাধন ও কর্ম্মযোগ ব্যক্ত সাধন।* ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? এই তাৎপর্য্য অথবা ভগবদ্গীতার সর্ব্বাঙ্গীন সরল ও সূক্ষ্ম মীমাংসা বা তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা অদ্যাপি, কোন ভাষ্যায় হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, অব্যক্ত সাধন বুঝাইবার পূর্ব্বে, ব্যক্ত সাধন বা সগুণ ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা আবশ্যক। আমরা ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকায় "উপাসনা-তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে উপাসনীয় আভাস্তরীণ ও বাহ্য যে দুইটী স্তর আছে তাহার পরিচয় ব্যাখ্যা করিয়াছি। বাহ্য উপাসনা, আভ্যন্তরীণ উপাসনার ক্রমিক মাত্র। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বলিলে, অবশ্যই তাঁহার গুণের উপাসনা বুঝিতে হইবে। সগুণ ঈশ্বর সর্ব্বগুণসম্পন্ন; তাঁহার গুণের অনুকরণই তাঁহার পূজা বা উপাসনা। কিন্তু অনুকরণ করিতে হইলে,

* কর্ম্মসন্ন্যাসই যে অব্যক্ত সাধন ও কর্ম্মযোগই যে ব্যক্ত সাধন, ভগবদ্গীতার কোন টীকাকার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নাই। তবে এই শ্লোকের মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকায় কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

ব্যক্তিবিশেষের গুণের অনুকরণ আবশ্যক; এইজন্য মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ঈশ্বরের অনুরূপমূর্ত্তি একজনকে আদর্শ রাখিয়া তাঁহার গুণের অনুকরণই প্রকৃত উপাসনা। ঈশ্বরের স্বরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা পূর্ণ-ব্রহ্মের অবতার বলিয়া থাকি। ঐরূপ অবতারও কাল্পনিক নহে। তাহা আমরা পরে দর্শাইব। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্মের অবতার, তাঁহার গুণের উপাসনা করাই তাঁহার উপাসনা। দুঃখের বিষয়, উপাসনা বা পূজা প্রভৃতি এক্ষণে বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। আমরা নিত্য যে সন্ধ্যা, আহ্নিক ও গায়ত্রী জপ করি, ঐ সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর প্রকৃত তাৎপর্য্য ঐ সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর মধ্যেই আছে। গায়ত্রীর অর্থ ও ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে 'তাড়িৎ শক্তি' নামক প্রবন্ধে করিয়াছি; গায়ত্রী জপার্থে—গায়ত্রী আবৃত্তি করা নহে, সেই মহাচৈতন্যের চিচ্ছক্তি ধ্যান করা। সেই ধ্যান হইতেই মানুষের দৈবী বুদ্ধির উদয় হয়। ধারণা ভিন্ন কখনই ধ্যান হয় না এবং কোন বস্তু আয়ত্তাধীন না হইলে, তাঁহার প্রকৃত ধারণা হয় না; অতএব, চিচ্ছক্তি আয়ত্তাধীন করাই গায়ত্রী জপের উদ্দেশ্য গায়ত্রী কেবল আবৃত্তি করা উদ্দেশ্য নহে। সন্ধ্যার মধ্যে কয়েকটী স্থান লক্ষ্য করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, আধ্যাত্মিক অগ্নি বা শক্তি আয়ত্তাধীন করাই সন্ধ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু কেবল জ্ঞানোপার্জ্জন ও চিন্তা বা ধ্যান দ্বারা প্রকৃত গুণের অনুকরণ করা হয় না; ক্রিয়া-দ্বারাই প্রকৃত গুণের অনুকরণ হয়। মহাচৈতন্য বা পরব্রহ্ম এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহে। প্রকৃতির গুণানুসারেই মানবের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব। সেই পৃথক অস্তিত্বের বিলোপ ও একত্বে পরিণতির চেষ্টা প্রকৃত ঈশ্বরের উপাসনা। যথা,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র, সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।"

গীতা, ৬অধ্যায়, ২৯ ও ৩২—শ্লোক।

উপরোক্ত কবিতা-কয়েকটী কার্য্যে-খাটাইতে হইলে, সহানুভূতি, একতা-বন্ধন ও পরস্পর পরস্পরের হিত-চেষ্টা আবশ্যক। উহাই কর্ম্ম-যোগের প্রথম সোপান। তদ্দ্বারা আত্মোন্নতি ও মানবজাতির উন্নতি সাধন করা হয়। মানব-জাতির ক্রমোন্নতি সাধিত ও পরিশেষে মানবাত্মা পরমাত্মার সম্মিলিত হওয়াই, মানবের চরমো-ন্নতি ও ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। অত এব, কর্ম্মযোগ দ্বারা মানবীয় শক্তি পরমাত্মা-ভিমুখী ও মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কার্য্যও তাঁহার সেবা করা হয়। কার্য্য দ্বারা উহা সাধন করার নামই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বা কর্ম্মযোগ। অবশ্যই লৌকিক কর্ম্ম ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি দ্বারা আপনাকে দৈবী শক্তিসম্পন্ন করা যায় এবং তদ্দ্বারাও আত্মা-ভিমুখী গতি হইতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা কেবল নিজের ভিন্ন সাধারণ মানবসমাজের অতি অল্পই উন্নতি সাধিত হয়, এবং নিজের উন্নতিও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। স্বভাবের সামঞ্জস্য শারী-রিক শক্তি ও মনোবৃত্তির অনুশীলন দ্বারা নৈতিক ও বিবেকানুমোদিত ক্রিয়ামূলক উন্নতি যত সহজ, স্বভাবের বিপরীত কঠোর অভ্যাস, বৈরাগ্য ও চিন্তামূলক উন্নতি তত সহজ নহে। নৈতিক ও সামাজিক মাঙ্গলিক, ন্যায় ও সদ-সৎ বিবেকানুমোদিত, শান্তিপ্রদ, কর্ত্তব্য কর্ম্মই

কর্ম্মযোগ; উহা নিশ্চয়ই গগুণোপাসনা বা ব্যক্ত সাধন; উহা দ্বারা অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হইতে পারে। আর, অধ্যয়নও উপদেশ-লব্ধ, উদ্ভাবনী শক্তিও কল্পনা-প্রসূত, অনুমান-উপমানও চিন্তামূলক, এবং অভ্যাস-বৈরাগ্য ও একাগ্রতা-জনিত ধারণা-লব্ধ, জ্ঞান নিশ্চয়ই পরোক্ষ জ্ঞান, তাহার সন্দেহ নাই। তবে পরোক্ষ-জ্ঞান লাভ হইলে, কঠোর অভ্যাস ও একাগ্র-তার সহিত অবিচ্ছিন্ন চিন্তা দ্বারা বস্তুতত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে। ঐরূপ স্থলে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞান বা ধ্যানযোগ দ্বারা বস্তু সকল পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইলে, তাহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে যখন-কোন সন্দেহ হইতে পারে না, তখন তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না বলিয়া পরোক্ষ জ্ঞান বলিব কেন? এ কথা সত্য, যাহা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয়, তৎসম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান বলা যায় না; কিন্তু মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য—বস্তুবিশেষের তত্ত্বনির্ণয় নহে, তত্ত্বনির্ণয়ান্তে, তাহা কার্য্যে খাটাইয়া মানবসমাজের উপকার, জগতের উন্নতিসাধন এবং আত্মতত্ত্বনির্ণয় দ্বারা মহত্ত্বপ্রাপ্তি ও চরমে মুক্তিলাভই মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু উহা ধ্যান ও জ্ঞানযোগের মুখ্য ফল নহে, গৌণ ফল; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগের সাক্ষাৎ ফলই মহত্ত্ব-লাভ। ঐ কর্ম্মযোগের প্রত্যেক ক্রিয়াই মহত্ত্বসূচক ও তাহার মুখ্য ফলই আত্মোন্নতি ও জগতের উন্নতিসাধন।* মনে করুন, যেন কোন সভ্যদেশে সভ্যতার ভূমির অনুর্ব্বরতা ও তদুদ্ভিন্ন অনাবৃষ্টি-হেতু এবং বহির্বাণিজ্য-অভাবে শস্যাদি না থাকায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি যেন একজন জগতের হিতৈষী কর্ম্মযোগী; ইতিপূর্ব্বে আপনি যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা সেই জাতির মধ্যে একতা সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেই সভ্যদেশের অব্যব-হিত নিকটবর্ত্তী একটী অসভ্যদেশ উৎপীড়িকা-শক্তিবিশিষ্ট; তজ্জন্য অধিবাসিগণ অসভ্য হৈতু, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি না থাকায় এবং শস্য উৎপাদনের উৎকৃষ্ট পন্থা ও তাহার সদ্ব্যব-হার না জানায়, দস্যুতায় ও অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন; তাহারা পরস্পর কলহ, চৌর্য্য, দস্যুতা, নরহত্যা ও পরস্বাপহরণ ভিন্ন কিছু জানে না। আপনি স্বীয় স্বার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক বহু অধ্য-বসায়, যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা, উভয়দেশের মধ্যে মৈত্রীভাব-স্থাপন, সভ্যদেশবাসীর সাহায্যে তদ্দেশে জ্ঞান ও ধনের বিস্তার এবং তদ্দেশীয়ের সাহায্যে সভ্যদেশের দুর্ভিক্ষ-নিবারণ এবং উভয় দেশের স্বাস্থ্য, মঙ্গল-সাধন, পরস্পরের ধনজ্ঞান ও ধর্ম্মের অভাব-মোচন, ভ্রাতৃভাব-সংস্থাপন, এবং প্রেম ও জ্ঞানালোক বিস্তার দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপন করিলেন। এই সকল কার্য্যে আপ-নার কতদূর মহত্ত্বলাভ ও আত্মোন্নতি হইল, তাহা আর বিশদরূপে বর্ণনার আবশ্যক নাই। ইহা নিশ্চয়ই গুণের উপাসনা বা ব্যক্ত সাধন।* যে ব্যক্তি সমাজে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করাইয়া দিতে পারে, সে মহৎ। যিনি দেশীয় স্বাধীন দেশ বা স্বাধীন সমাজকে একীকরণ করিয়া পরস্পরের

* কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, গীতার কর্ম্মযোগের সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আর্থিক এবং বৈষয়িক উন্নতির সম্বন্ধ কি? আমরা বলি যে, কর্ম্মযোগের সহিত বর্ত্তমান কালোপযোগী বৈষয়িক উন্নতির যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। ঈশ্বর-দত্ত মানব-বৃত্তির অনুশীলন ও সামঞ্জস্য ব্যতীত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-শক্তি উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব; প্রকৃতির পন্থানুসরণপূর্ব্বক, মানব নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যা-ত্মিক শক্তিসম্পন্ন হইলে, শারীরিক সুখের প্রয়োজনা-ভাব হইবে, এবং প্রকৃতির উন্নতিবশতঃ তৎকৃতোপ-যোগী প্রকৃতি-বন্ধু যাহা আধ্যাত্মিক সুখ ও আত্মো-ন্নতির প্রয়োজন হইবে, ইহাই ভগবদ্গীতার সারো-পদেশ। রাজর্ষি জনক ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল।

ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দিতে পারেন, তিনি মহত্তর।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান ও ধ্যানযোগ আছে। মানব বাল্যকালে রীতিমত শিক্ষিত না হইলে কখনই কর্ম্মযোগের অধিকারী হইতে পারে না। কর্ম্মযোগ অবশ্যই কতক পরিমাণে জ্ঞান ও ধ্যানযোগের সাপেক্ষ; কিন্তু ঐ ধ্যান ও জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হইলে, মানব দেবত্বে পরিণত হয়। ঐ দেবত্ব প্রাপ্ত হইলে, ইহলোকেই মানবীয় বুদ্ধি যেরূপ আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে মিশিত হইয়া যায়, পরলোকেও সেইরূপ মানবাত্মা দৈবী আত্মায় পরিণত হয়।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিকঙ্কণ ও চণ্ডীকাব্য।

উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা, কবিকঙ্কণের সময়ে —প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, বঙ্গদেশের সামাজিক আচার-ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা "চণ্ডীকাব্য" হইতে প্রদর্শন করিব। কবি সে কালের সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, উচ্চ, মধ্যম, এবং অধম ত্রিবিধ জাতির আচার-ব্যবহার সুন্দররূপ বর্ণনা করিবার সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। পার্ব্বতীর রূপ, অন্নপূর্ণার লীলা ও বিবাহাদি বর্ণনায় উচ্চজাতীয়ের, ধনপতি ও শ্রীমন্তের জন্মাদিতে মধ্যম-জাতীয়ের এবং কালকেতুর জন্ম ও বিবাহাদি উপলক্ষে নীচজাতীয়ের রীতিনীতি ও কুলধর্ম্মাদির সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

"পর্ব্বত-রাজার ছিল যত কুলাচার।
ওদন-প্রাশন আদি করিল তাহার॥
করিল শ্রবণবেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর বেশ গৌরীর দিবসে দিবসে॥"

পর্ব্বত-রাজ কন্যার জন্মোপলক্ষে যাহা কিছু কুলাচার ছিল, করিলেন—যথাকালে অন্নাশন, এবং পঞ্চমবর্ষে কর্ণবেধ সম্পাদন করিলেন। তাহার পরই বিবাহ—কন্যার যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, উপযুক্ত পাত্রে কন্যা-সম্প্রদান জন্য পিতার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কন্যা মনে মনে মহেশ্বরকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে পতিলাভ করিবার জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইহা পৌরাণিক কথা, গ্রন্থকারের তাহা পরিবর্ত্তন করিবার সাধ্য নহে। আলঙ্কারিকের মত সেকালের গ্রন্থকারেরা পৌরাণিক মতের প্রতিকূলে স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিলে তাঁহাদিগের গ্রন্থ সাধারণে আদৃত হইত না। এজন্য পৌরাণিক প্রথামত তিনি উচ্চজাতীয়ের মধ্যে স্বয়ম্বর-প্রথা প্রকারান্তরে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বিবাহপদ্ধতি উচ্চজাতীয়ের মধ্যে যেরূপে আচরিত হইয়া থাকে, তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই; যথারীতি গাত্রহরিদ্রা, অধিবাসাদি কার্য্য যথানিয়মেই অনুষ্ঠিত হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

"দেখিয়া শুভক্ষণ, আইলা দ্বিজগণ,
করিল স্বস্তিক-বাচন।
আরোপি হেমপটে, যুগল করপুটে,
মঙ্গলেশে করিল আবাহন॥
পার্ব্বতী রূপবতী, হরিদ্রাসুত ধুতি,
পরিয়া বসিলা আসনে।
যতেক নিপ্র-মুণি, করে বেদ-ধ্বনি,
গৌরীর গন্ধাধিবাসনে॥
মহৌষধ শিলা, দূর্ব্বা পুষ্পমালা,
ধান্য ঘৃত ফল দধি।
স্বস্তিক সিন্দুর, কজ্জল কর্পূর,
শঙ্খ দিলা যথাবিধি॥
বান্ধিল করে সূত্র, প্রশস্ত দীপপাত্র,
মস্তকে করিল বন্ধনা।
স্বর্ণসীঁথি শিরে, অঙ্গুরী দিয়া করে,
করিলা আশীষ-যোজনা॥
রজত-দর্পণ, তাম্র গোরোচন,
সিদ্ধান্ন চামর পবন।
মোদক দিয়া লাজ, পূজিল চেদীরাজ
কন্যার গন্ধাধিবাসন॥
নৈবেদ্য দিয়া ভূরি, মাতৃকা পূজা করি,
দিলেন বসুধারা দান।
বসুর পূজা করি, বসিলা হিমগিরি,
তবে নান্দীমুখের বিধান॥"

সকলই শাস্ত্রসঙ্গত; যাহার পর, যে কাজ নির্দ্দিষ্ট আছে, পর পর তাহারই বর্ণনা অতি চমৎকার। তাহার পর কন্যাদান-কালে—

"আইলা ত্রিপুরারি, হেমস্ত হাতে ধরি,
বসাইল কনক-আসনে।
বসনু অঙ্গুরী, মাল্য দিলা গিরি,
করিল শিবের বরণে॥
কাথে কুম্ভ করি, মেনকা-সুন্দরী,
জল সয়ে ঘরে ঘরে।
আইও সহ মিলি, করে হুলাহুলি,
তণ্ডুল মঙ্গল করে॥"

কবি পুরাঙ্গনাগণের ব্যবহারগুলিরও যথাবিধি উল্লেখ করিয়া, আপন বর্ণনার বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি করেন নাই। মেনকার পুঁটি-বর্ণনাদি করিলে, কবিকে অনুষ্টচর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ-দোষে দূষিত হইবে বলিয়া, তিনি পার্ব্বতীর জন্ম-বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহা স্বভাবোচিতই হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে, নরলোকে রম্ভাবতীর গর্ভবর্ণনা ও খুল্লনার জাতকর্ম্মাদির বিষয় পাঠ করুন,—

"প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
দ্বিতীয় মাসের বেলা লোকে কানাকানি॥
তৃতীয় মাসের বেলা ভূতলে শয়ন।
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
পাঁচ মাসে কাঁজি করঞ্জায় যায় মন।
ছ'মাসের বেলা তারা না রোচে ওদন॥
সপ্ত মাসে বন্ধুজনা দিল তারে সাধ।
নয় মাসে প্রসব-বেদনা অবসাদ॥
সাধুর কিঙ্করী ডাকি আনিল পাচতি।
শুভক্ষণে হৈল তার কন্যা রূপবতী॥
চালের ফুড়িয়া খড় আলিল আঁতুড়ি।
গোমুত দুয়ারে আনি পূজে ষষ্ঠী বুড়ি॥
হলুহুলি দিয়া কৈল নাভির ছেদন।
তিন দিনে কৈল রামা সুপথ্য পাচন॥
ষষ্ঠী পূজা জাগরণ হয় ছ'দিবসে।
অষ্টকলাই কৈল তার অষ্টম দিবসে॥
নতা করিল নয় দিনে মন্দের হরিষে।
একুইশা কৈল তার একুশ দিবসে॥
খুল্লনা খুইল নাম পূর্ণ হইল মাস।
মাস দুই তিনে দেয় উলটিয়া পাশ॥
সাত মাসে রম্ভা তারে করায় ভোজন।
আদিত হইল রম্ভা দেখিয়া দর্শন॥
করিল শ্রবণ বেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর বেশ বামা দিবসে দিবসে॥"

সেকালে বাল্য-বিবাহ ভদ্রাভদ্র সকলেরই মধ্যে প্রচলিত ছিল। খুল্লনার বিবাহ-সম্বন্ধের পূর্ব্বে ঘটক ব্রাহ্মণের উক্তি,—

"শুনহ অবোধ লক্ষপতি।
দ্বাদশ বৎসরের সুতা, তোর ঘরে অবিবাহিতা,
কেমনে আছহ সুস্থমতি॥

সপ্তম বৎসরে কন্যা, বিভা দিলে হয় ধন্যা,
অষ্ট পুত্র কুলের পাবন।

নবম বৎসর যদি, বর আনি যথাবিধি,
তনয়া করয়ে সম্প্রদান।
তার পুত্র দিলে জন্ম, সুরপুরে পায় স্থল,
পিতৃলোকে পায় বহু মান॥
কেহ না বুঝায় তোমা, গত হৈল দশমমা,
তথাচ না কৈলা কন্যাদান।
প্রবেশিলে একাদশে, মদন-হুদয়ে বৈসে,
নবরস হয় একস্থান।
না করিলে কর্ম্মভাল, এগার বৎসর গেল,
অপযশ করিলে মুরখ।
দ্বাদশ বৎসর ধরণী, হয় কন্যা রজঃস্বলা,
পুরুষেরে নাহি করে ভয়॥"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, সপ্তম ও নবম বর্ষ কন্যার বিবাহ-দানের প্রশস্ত সময় বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল। এ প্রথা আজিও বঙ্গদেশে চলিয়া আসিতেছে।

এখন দেখা যাউক, নীচ-জাতীয়দিগের মধ্যে কিরূপ প্রথা ছিল। কালকেতুর মাতা নিদয়ার গর্ভলক্ষণাদি ও কালকেতুর জাতকর্ম্মাদি-সম্বন্ধে কবি অতি সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন; এবং উক্ত সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে যে বয়সে বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহা নিম্নোক্ত কবিতা-পাঠে অবগত হওয়া যায়।

"প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানী।
দ্বিতীয় মাসেতে করে লোকে কানাকানি॥
তৃতীয় মাসের বেলা তুলিল শয়ন।
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
পাঁচ মাসে নিদয়ার না রোচে ওদন।
ছয় মাসে হৈল তার অলস চরণ॥
সাত মাসে নব বাটী দিলা ধর্ম্মহেতু।
গণকে জিজ্ঞাসে পুত্র জনমের হেতু॥
আট মাসে নিদয়ার বাড়ি যায় পেট।
চলিবারে না পারয়ে, চাহিতে নারে হেঁট॥
নয় মাসে নিদয়ার সাধ-দেয় ব্যাধ।
নিদয়া স্বামীকে কহে ভাবিয়া বিষাদ॥"

গর্ভ-লক্ষণাদি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, সুতরাং তাহাতে ভদ্রাভদ্র উচ্চনীচাদি জাতি-বৈষম্য-হেতু বিশেষত্ব অসম্ভব; সুতরাং কবিরও বর্ণনা-বৈষম্য নাই। তবে সাধভক্ষণাদি ব্যাপারে উভয় জাতীয়ের মধ্যে ভক্ষ্য দ্রব্যের বিভিন্নতা-হেতু এতদুভয়ের রচনা-বৈষম্যও ঘটিয়াছে। যথা—খুল্লনার সাধভক্ষণ,—

"শাক তুলিবারে ছুয়া ফিরে শাড়ি বাড়ি।
দোছটী কুরিয়া পরে বার হাত সাড়ি॥
নট্যা রাঙ্গা তোলে শাক পালঙ্ক নালিতা।
তিক্ত ফলতার শাক ফলতা পলতা॥
সাঁজতা বনতা বনপুঁই ভদ্রপলা।
হিজলী কলমী শাক জাঙ্গি ডাঁড়িপলা॥
নটিয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে।
মজরী উলুফা ধন্যা ফীরপাই বেতে॥
বাড়ী বাড়ী ফিরে ছুয়া দিয়া বাহুনাড়া।
ডগী ডগী তোলে যত সরিষার আড়া॥
রন্ধন করিতে হৈল লহনার ত্বরা।
ঘণ্টে পুরিয়া এড়ে মাটিয়া পাঁথরা॥
ঘৃতে জবজব কৈল নলিতার শাক।
কটু তেলে বেথুয়া করিল দুঢ়পাক॥
খণ্ডে মুগের সুপ উভারে ডাবরে।
আঁছাদিল থালা-থালি তাহার উপরে॥
কটুতৈলে ভাজে মুসা চিতলের কোল।
রোহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোল॥
বদরী শকুল মীন রসাল মসুরী।
পুনর্ণ্ণবি ভাজে রামা সরল সফরী॥
কর্কটকুষ্মাণ্ড তোলে রামা বিদুড়ীর বড়া।
কচি কচি পোঁইশাকত ভাজিল কুমুড়া॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন।

অভয়া-চরণে গণে শ্রীকবিকঙ্কণ॥"

এদিকে ব্যাধ-সীমন্তিনীর সাধের ঘটা দেখুন,—

"গর্ভের দেখিয়া ভর, মনে মোর লাগে ডর,
ক্ষুধা তৃষা নাহি দিন দশ।
আপনার মত পাই, তবে গ্রাস দুই খাই,
পোড়া আছে জামীরের রস॥
নিধানি করিয়া থুই, তাহাতে মাহিষ দই,
কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি।
যদি পাই মিঠা ঘোল, পাকা চালিতার ঝোল,
প্রাণ পাই পাইলে আমসী॥
আমার সাধের সীমা, হেলঞ্চা কলমী গিমা,
বোয়ালি আনিয়া কর পাক।
ঘন কাটি খরজালে, সাঁতলিবে কটু তৈলে,
দিবে তায় পলতার শাক॥
পুঁইডগা মুখী কচু, ফুলবড়ি তাহে কিছু,
তাতে দিবে মরিচের ঝাল।
হরিদ্রা-রঞ্জিত কাঞ্জি, উদর পুরিয়া ভুঞ্জি,
প্রাণ পাই পাইল্লে পাকাল॥
লুণ কিছু দিয়া বাড়া, নকুল গোধিকা পোড়া,
হংসডিম্বে তোল কিছু বড়া।
কিছু ভাত থাই খড়া, চিঙ্গড়ির তোল বড়া,
সঁজারু করহ শিকপোড়া॥
সদাই ন্যাকার উঠে, দিনে দিনে বল টুটে,
বদনে সদাই উঠে জল।
মূলা বার্ত্তাকু শিম, তায় দিয়া ব্যঞ্জ নিম,
আর দিও উড়ুম্বর ফল॥"

নীচ-জাতীয়দিগের জাতকর্ম্মাদি নিম্নোক্ত বিবরণে অবগত হওয়া যায়। যথা,—

"ডাল কাটি আলে শিখী সূতিকা-ভবনে।
সঘনে হুলুই পড়ে নাড়িকা ছেদনে॥
গোমুণ্ড পাতিল যষ্ঠী দ্বার দক্ষিণ-ভাগে।
পূজা করি ধর্ম্মকেতু তবে বর মাগে॥
তিন দিনে দিল তারে সুপথ্য পাচন।
ছয় দিনে ষাটুয়ারা করে জাগরণ॥
বষ্ঠী দিনে অষ্টকলাই করে কর্ম্মকেতু॥
নয় দিনে নখপ্রতে করেন শুদ্ধ হেতু॥
অপরূপ বাসবসুত-দিবসে দিবসে।
ষষ্ঠী পূজা একুইশা কৈলা একমাসে॥

* * * *

চারি পাঁচ মাস গেল ছয়ে পরবেশ।
ভোজন করাইল বলি দিয়া ছাগ-মেষ॥
গণক আনিয়া নাম থুইলা কালকেতু।
গণকেরে দিলা দান পরমায়ু হেতু॥

* * * *

পঞ্চম বরুষে কৈল শ্রবণ-বেধন।
বিক্রম বর্ণিয়া গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥"

সেকালে নীচ-জাতীয়দিগের পুত্রকন্যার মধ্যেও যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা নিম্নোক্ত কবিতা-পাঠেও অবগত হইতে পারা যায়। যথা,—

"হীরা নিদয়ারে বলে, কি হয়েছে পুত্রকোলে,
তার পাছে বলয়ে নিদয়া।
অই জীয়া থাকুক সই, হোক্ বহু পরমাই,
বর দেও ঝাট হোক্ বিয়া॥"

উপরোক্ত কবিতা-পাঠে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সেকালে গর্ভবতী স্ত্রীলোককে সপ্তম মাসে নববস্ত্র দিবার পদ্ধতি ছিল। একবলে পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত এবং নবম মাসে সাধ দিবার প্রথা আছে; সপ্তম মাসে উক্তবিধ কোন অনুষ্ঠানই করা হয় না।

উচ্চ ও নীচ উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধে যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। অধিবাসাদি-কার্য্যে সামান্য মাত্র বিভিন্নতা ছিল। যথা,—ব্যাধপুত্র কালকেতুর বিবাহ—

"পরিয়া হরিদ্রা বাসে, কটাক্ষ করিয়া আইসে,
যত ছিল পরিহাসী জনে।

সুবেশা কুমারী নারী, সঙ্গে করি সখি চারি,
বসিলা পিতার সন্নিধানে।
ব্রাহ্মণ বসিয়া পীঠে, বেদমন্ত্র পড়ি মঠে,
গণেশ করিল আবাহনে।
পূজে পঞ্চ উপচারে, ভাবি সর্ব্ব দেবতারে,
শুভক্ষণে গন্ধাধিবাসন ॥
মহীগন্ধ ধান্যশীলা, শত দূর্ব্বা পুষ্পমালা,
দধি ঘৃত স্বস্তিক সিন্দূর।
শঙ্খ কজ্জল সোনা, তাম্র রৌপ্য গোরচনা,
চামর দর্পণ বর্ণপুর ॥
দ্বিজে সুতা বান্ধে হাতে, বাজিল মুড়লা মাথে,
আইয়ে দেয় জয় চারিভিতু।
ষোড়শ মাতৃকা পূজা, ঘৃত তালি চেদিরাজা,
একে একে কৈল পুরহিত ॥

* * *

ছায়া-মণ্ডপতলে বসাল কুঞ্জর-ছালে,
বন্ধুজন মিলি কুতূহলে।
স্বস্তিবাক্য দ্বিজবরে, বরণ করিলা বীরে,
বীর ধরি ফাটক কুণ্ডলে ॥
বিরল করিয়া স্নান, জামাতার কৈল মান,
প্রেমবতী ব্যাধের অবলা।
শিরে দিয়া দূর্ব্বা ধান, দিছিয়া রেখলিল পান,
গলে গাঁথি দিল পুষ্পমালা ॥
চারিদিকে গীত নাটে, ফুল্লরা চড়িলা পাটে,
কুঞ্জরের ছাল মাঝে পরে।
চৌদিকে ব্যাধের নারী, উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি,
ছায়ানী হইল কন্যা বরে ॥
বাপের পুণ্যের হেতু, আনন্দে সঞ্জয় কেতু,
হাতে কুশ করে কন্যা দান।
যৌতুক ধনুক খান, দিল শর তিন বাণ,
দিয়া জামাতার কৈল মান ॥
ডেমছা রাজ্যে গড়ি, দিলে বান্ধে গুঁঠিছড়া,
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম, লাজাহুতি কৈল হোম,
দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি ॥

কবি-বর্ণিত মধ্য-জাতীয়ের মধ্যে অধিবাস-প্রথা এইরূপ,—

"খুল্লনার গন্ধ অধিবাস।
মিলি পুরনিতম্বিনী, উলু দেয় জয়ধ্বনি,
রম্ভাবতী হৃদয় উল্লাস ॥
লিখন করিয়া পাতি, আনি সব বন্ধু জাতি,
দেশে দেশে পাঠায় বার্ত্তন।
লক্ষপতির বামে, দেশে দেশে বেণে আসে,
বোঝা ভার লয়ে আয়োজন ॥
কোমল পল্লব-শিখা, উপরে রসাল শাখা,
পুক্তি নব পাতিল আশান।
উপরে ফুলের ঝারা, পাতিল লগ্নের সরা,
দ্বিজগণে করে বেদগান ॥
পটহ মৃদঙ্গ শানি, দাড়ে কাংসত বেণী,
শঙ্খ বাজে দোগণ্ডী বিস্তর।
খমকঁ টমক ভেরী, জগঝম্প বাজে তূরী,
অঙ্গভঙ্গে নাচয় নর্ত্তকী ॥
দিনপতি গণপতি, পূজিলেন প্রজাপতি,
অধিবাস প্রতিগ্রহণে।
পুতিয়া মন্থন-যষ্টি, সভাজন কৈল ষষ্ঠী,
পূজা কৈল মুকুন্দনন্দনে ॥
দ্বিজগণে বেদগান, মহীগন্ধ শিলাধান
দূর্ব্বা পুষ্প ঘৃত ফল দধি।
রজত-দর্পণ হেম, স্বস্তিক সিন্দুর হেম,
কজ্জল গোরচনা বিধি ॥
সিদ্ধার্থ চামর শঙ্খ, ভুবনে উপমা রঙ্ক,
পূর্ণপাত্র প্রদীপভূষিত।
করি তার শব্দ, ব্রাহ্মণে পড়রে বেদ,
সূত্রবান্ধে জনাই পণ্ডিত ॥
পূজিল প্রতিমা রুচি, গৌরী পদ্মা সেধা শচী,
সাবিত্রী বিজয়া জয়া তথা।
স্বাহা স্বধা দেবাসনা, শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা,
পূজিলেন অনেক দেবতা ॥

ঘৃত দিয়া সাতঁ তোলা, কাঁধে দিল বহুধারা,
কৈল নান্দিমুখের বিধান।
জল সাক্ষি-রম্ভাবতী, সুরসা হইয়া সতি,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

উভয় শ্রেণীর অধিবাস-প্রথা দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে,উচ্চজাতীয়ের আড়ম্বর ব্যতীত প্রকৃত কার্য্য-সম্বন্ধে অনুমানের বিভিন্নতা বড়ই অল্প। হস্তে সূতা-বন্ধন,মহীগন্ধ ধান্যশীলা প্রভৃতির আয়োজন, ষোড়শ মাতৃকার পূজা, বসুধারা দান ইত্যাদি কার্য্যে কোন পার্থক্য নাই। বিবাহ-ব্যাপারেরও কোন বৈষম্য লক্ষিত হয় না। পূর্ব্বে ব্যাধ-কন্যার বিবাহ-বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে গন্ধবণিক জাতীয় কন্যাদান-প্রথাতে অতিরিক্ত কিছুই দেখা যায় না। কন্যা-দান কালে ব্রাহ্মণের বেদগান, যৌতুকদান, হোম, অনল প্রণাম ও অরুন্ধতি-দর্শনাদি একই প্রকার অনুষ্ঠান।

"সাধু করে কন্যাদান, দ্বিজগণে বেদগান,
গায় নাচে রঙ্গে বিদ্যাধরী।
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি, পটহ দুন্দুভি বেণী,
আনন্দিত সাধু লক্ষেশ্বরী ॥
পাটে চড়ি রূপবতী, প্রদক্ষিণ করে পতি,
শেষে মুখে দুজনে ছায়ানী।
দিলেন সাধুর গলে, আপনার কণ্ঠমালৈ,
বন্ধুগণ করে জয়ধ্বনি ॥
অভয়ার প্রতিফলে, সহ কুশে গঙ্গাজলে,
সদাগর করে কন্যাদান।
বসন কাঞ্চন হার, আদি নানা অলঙ্কার,
দিয়া জামাতার কৈল মান ॥
বাজয়ে মঙ্গল পড়া, দ্বিজে বান্ধে গাঁটছড়া,
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম, লাজাহুতি কৈল হোম,
দোঁহে করে অনলে প্রণতি ॥
উভে প্রবেশিয়া ঘরে, ক্ষীরখণ্ড ভোগ করে,
কুসুম-শয়নে গেল রাতি।
করিয়া চণ্ডীকা-ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
মুকুন্দ রচিল ছন্দযুক্ত ॥

নীচ ব্যাধ ও মধ্যজাতীয় গন্ধবণিকের বিবাহ-ব্যবস্থা একই প্রকার ছিল, এরূপ বর্ণনা নিতান্ত অসঙ্গত। কেন-না, আজি পর্য্যন্ত অন্ত্যজ-জাতীয়দিগের বিবাহাদি সংস্কার-পদ্ধতির সহিত অন্যান্য জাতীয়ের পদ্ধতির সমতা কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় না। ব্যাধ—চণ্ডাল। কিন্তু আজি-কালি চণ্ডালগণ মৃগয়া-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রমজীবির কার্য্য করিয়া থাকে। এরূপ হইতে পারে যে,মেকালে চণ্ডালগণ পশুপক্ষী বধ করিয়া তাহাদিগের মাংস-বিক্রয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত, অথবা পশুপক্ষীঘাতী ব্যাধনামে অন্য পৃথক জাতি ছিল। পুরাণেতিহাসে যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে অধুনাতন চণ্ডাল-গণই পূর্ব্বে ব্যাধ নামে খ্যাত ছিল, অথবা চণ্ডাল ব্যাধ কিরাত ও শবর—তাহাদিগের এই চতুর্বিধ ভিন্ন আখ্যা ছিল। কালক্রমে তাহারা নিষ্ঠুর প্রাণীবধ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রম দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে। সে যাহা হউক,তাহারা যে অন্ত্যজ মধ্যে পরিগণিত, সে পক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে,তাহাদিগের বিবাহাদি সংস্কার কখনই গন্ধবণিক জাতির সহিত একই নিয়মে সম্পাদিত হইবার প্রথা সেকালের হিন্দু-সমাজে প্রচলিত থাকিতে পারে না। তবে কথা এই যে, কালকেতু শাপভ্রষ্ট পুরুষ। ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর হরকোপে শাপগ্রস্ত হইয়া ভূতলে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাব্যোক্ত নায়কেরা প্রায়ই দেবতু-সম্পন্ন; অথবা ঈশ্বরানু-গৃহীত, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে আদর্শ-চরিত্র হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে, অল-ঙ্কার-শাস্ত্রের লক্ষণানুসারে নায়কের চরিত্র-বর্ণ-নার ত্রুটি থাকিয়া যায়। কবিকঙ্কণ, সংস্কৃত

কাব্যনাটকাদিতে যেরূপ দেবপ্রতিম নায়ক-নায়িকার চরিত্রশ্রবণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই আদর্শে কালুকেতুকে তিনি ইন্দ্রের শাপভ্রষ্ট খুল্লনা নীলাম্বর শ্রুলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দেবাদর্শে যে নায়কের চরিত্র গঠিত, তাঁহাকে উচ্চজাতীয় কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারী বলিয়া বর্ণনা না করিলে, কাব্যাংশে ত্রুটি জন্মিবার আশঙ্কায়, কবি ঈশ্বর বিদ্যাহারি সংস্কার উচ্চজাতীয় আদর্শে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ব্যাধকর্ম্ম পশুজাতীয় বলিয়া, কবি, কালকেতুর নিজমুখে তাহা ব্যক্ত করাইয়া এবং দেবী চণ্ডীকর্ত্তৃক তাহাকে উচ্চজাতীয়ের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ-সম্পাদনে অনুগৃহীত প্রতিপাদন করিবার জন্য, নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। যথা,—

"চণ্ডিকা বলেন কালু ব্যাধের নন্দন।
নগরের মাঝে দেহ আমার ভবন॥
পূজিও মঙ্গলবারে করাইও জাত।
গুজরাট নগরেতে তুমি হবে নাথ॥
এমন শুনিয়া কালু চণ্ডীর বচন।
কৃতাঞ্জলি হয়ে কিছু করে নিবেদন॥
নীচকুলে মম জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশে জল লোকে বলে রাড়॥
পুরোধা আমার কেবা হইবে ব্রাহ্মণ।
নীচ কি উত্তম হয় পেলে বহুধন॥
চণ্ডিকা বলেন শুন ব্যাধের নন্দন।
তোমার কুটীরে মোর হৈল দরশন॥
পবিত্র হইলা পুত্র মম দরশনে।
আইস আজ্ঞা কালকেতু সন্ন দিব কানে॥
তব পুরোহিত পাবে মম দরশন।
লইবে তোমার দান উত্তম ব্রাহ্মণ॥

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

বিপ্লব।

উপন্যাস।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা।

ক্রমে চন্দ্রদেব তারাদলকে সঙ্গে লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এখনও সূর্য্যদেব আসিয়া দেখা দেন নাই; সুতরাং একটু একটু ঘোর ঘোর আছে। পুরোহিত-ব্রাহ্মণেরা—সকাল-সকাল পূজা করিতে হইবে বলিয়া, এবং প্রাচীনারা—নৈবিদ্য করিতে হইবে ও পূজার ভোগ রাঁধিতে হইবে বলিয়া, সেই ঘোর ঘোর থাকিতেই গঙ্গাস্নানে আসিয়াছেন। তাঁরারা তীর-স্কন্ধে পূজাবাড়ীর জন্য জল তুলিতে আসিল। ভাগীরথীর উভয় তীরস্থ গ্রামসমূহ হইতে পূজা-বাড়ীর বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ডিঙ্গি নৌকার মাঝিরা 'বেড় জালে' ইলিস মাছ ধরিতে আরম্ভ করিল। সাহেবদের বজরাও কুল কুল শব্দে কলিকাতা-অভিমুখে চলিল। অন্যান্য নৌকা, যাহা রজনীতে মোঙ্গর করিয়া ছিল, "বদর" "বদর" শব্দে ছাড়িয়া দিল।

এই সময় দারাণ ও হারাণীর নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায়, ভাউলের জানালার নিকট বসিয়া, তাহারা গঙ্গার তীরস্থ সুন্দর সুন্দর গ্রামগুলি দেখিতে

ছিল; এবং সবিস্ময়ে "ঐ—ঐ" করিয়া উভয়ে উভয়কে দেখাইতেছিল। ডুমুরদার ডাকাইতের বুবাড়ী ভিন্ন, উহারা আর কিছুই তো জীবনে দেখে নাই!

এই সময় হরগোবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায়, তিনি ভাউলের চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছিলেন। মহান্তকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট যাইয়া প্রণাম করিলেন ও কহিলেন,—"একি! মহান্ত খুড়ো—আপনার এ দশা যে?"

মহান্ত হরগোবিন্দকে দেখিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন;—কোন কথা কহিলেন না। মনে মনে স্থির করিলেন, "এই বেটাই সাহেব-দিগকে লাগাইয়া আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে।" অতএব, "উৎসন্ন যাও" বলিয়া, মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। হরগোবিন্দ ভাবিলেন,—"ঠাকুর কি কারণে সাহেবদের নিকট অপমানিত হইয়াছেন; আমাকে বলিতে লজ্জা বোধ হওয়ায়, কথা কহিতেছেন না। যাহা হউক, বিশেষ জানিয়া, যে প্রকারে পারি, ইহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছি।"

এই সময় তারামণি, হরগোবিন্দকে দেখিয়া, চীৎকার-শব্দে কহিল,—"ও হর, হর, তুমি যাচ্ছ কোথায়? আছ কেমন?"

হরগোবিন্দ শ্রবণে নিকটে যাইয়া কহিল, —"কে ও—তারা দিদি! তুমি সাহেবের নৌকায় কেন?"

"কল্‌কাতায় যাচ্ছি যে!"

এই সময়, একখান ষ্টীমার যাইতেছে দেখিয়া, হারাণী ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"বাবু, ঐ—ঐ!" হরগোবিন্দ কহিলেন,—"তুমি বসে বসে দেখ্‌-গে!"

মহান্ত ও তারামণি একদৃষ্টে হারাণীর প্রতি চাহিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল,—"এটীকে আবার পেলে কোথায়?"

হরগোবিন্দ কহিলেন,—"তারা দিদি, দেশের খবর কি?"

"খবর বড় মন্দ। তোমার মা আর বোন অন্নজল ত্যাগ ক'রে কেবল কাঁদছেন।"

"তুমি বাড়ী গিয়ে বলো—আমার জন্যে ভাবনা নেই; আমি ভাল আছি। দেশের খবর বল?"

"মহান্ত ঠাকুরের বাড়ী-ঘর লুঠ ক'রে ওঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!"

"কেন?"

"যে 'যখ' দিতেন!"

"আর কি খবর, বলঁ?"

"সব ভাল।"

"চাটুর্য্যেবাড়ীর?"

"সব ভাল।"

"মল্লিকবাড়ীর?"

"সব ভাল।"

"আর ওদের বাড়ীর?"

"কাদের বাড়ীর?"

"ঐ যে যদুদের বাড়ীর?"

"হাঁ! হাঁ! যদুর বোন সরমর হয়েছে।"

"কেন?—কেন?—কি হয়েছে? মৃণাল-বালা মরমর! তার কি কোন ব্যায়রাম হয়েছে নাকি?"

"কি হয়েছে, ঠিক হচ্ছে না; তবে খায় না দায় না—কেবলই বিছানায় পড়ে থাকে। কথা কয় না, চুল বাঁধে না—কেবলই কাঁদে। নড়ে না, চড়ে না—কেবলই ভাবে। রোগ নয়, শোক নয়—শরীর রোগা হচ্ছে। দুঃখ নেই, কষ্ট নেই—বর্ণ যেন কালী হয়ে গিয়েছে।"

হরগোবিন্দ মনে মনে ভাবিলেন,—"এ কি রোগ! আচ্ছা, তারা দিদি, চিকিৎসা করান হচ্ছে তো?"

"রোগই স্থির হচ্ছে না, তার চিকিৎসা কি

করে হবে ? লোকে বলছে—ভূতে পেয়েছে ! কেন-না, হর হর শব্দ করে।"

হরগোবিন্দ মনে মনে কহিলেন,—"ঐকি রোগ, কিছু তো বুঝতে পাচ্ছিনে ?—হর হর শব্দ করে ! তবে কি আমি চলে আসায় ওরপ হয়েছে ? আমায় কি তবে মৃণাল ভালবাসে ?"

এই সময় তারামণি কহিল,—"ও হর, তোমার নামে একখানা চিঠি আছে।" এই বলিয়া, নাভিভূগুের ভিতর হইতে পরিধেয় বস্ত্রের একটা কোণ টানিয়া দুই তিনটী গিরা খুলিয়া, শতভাঁজবিশিষ্ট একখানি পত্র হরগোবিন্দের হস্তে প্রদান করিল। হরগোবিন্দ আগ্রহের সহিত দেখেন—মৃণালের পত্র। পত্রে না-জানি কি লেখা আছে ভাবিয়া, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। পাঠ করিতে যান, চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখেন এবং নয়ন-জলে চক্ষের দৃষ্টি রোধ করে। যাহাহউক, কোনরূপে পড়িয়া বুঝিলেন যে,—তিনি দেশত্যাগ করিয়া আসায় ও দেশের লোকে তাঁহার মৃত্যু রটনা করায়, মৃণাল মনোকষ্টে উদ্বিগ্ন ও মৃতপ্রায় হইয়াছেন।

এই সময় সাহেব আসিয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, 'সেকেণ্ড' করিলেন ; এবং মহাশয়কে দেখাইয়া কহিলেন,—"ঐ ষ্টুপিড্ বড় বড্‌মাস্ আছে। ওঁহামার নৌকার ডোরি কাটিয়া ডিঙ্গা ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করায়, উহাকে ধরিয়া আনিয়াছে।"

হরগোবিন্দ হিন্দিতে সাহেবের সহিত কথা কহিতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে ঐ স্ত্রীলোকটীকে আনা হইয়াছে কেন ?"

"ও কোন ডুযি নহে, সান্ধ্য উহার লইটে হইবে।"

"যে ব্যক্তি ওন কাটিয়া দিয়াছে বলিতেছেন, ও বোধ হয় ইংরাজের নৌকা জানিত না ; জানিলে, কখনই অমন কাজে সাহস করিত না। ইংরাজের ক্ষমতা কে না জানে ? স্বয়ং নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ ইংরাজের ভয়ে শশঙ্কিত। তিনি প্রায়ই বলিয়া থাকেন—ইংরাজকে আমি বড় ভয় করি। আমার রাজ্যে মহারাষ্ট্রীয়েরা ডাঙ্গায় আগুন জ্বালিয়াছে ; তাহার উপর ইংরাজের সহিত যদি বিবাদ করি, তাহারা জলে আগুন জ্বালাইয়া আমার রাজ্য ছারখার করিবে। একথা তিনি প্রায়ই বলেন। সে হিসাবে মহাশয় তো তৃণবিশেষ ; ও কি আপনাদের অনিষ্ট করিতে পারে ?"

আলিবর্দ্দি খাঁর ভয়ের কথা শুনিয়া, সাহেব কিছু সন্তুষ্ট হইলেন ; বলিলেন,—"আলীবর্ডী বড় বেমার আছে। বোড় হয় বেশী দিন বাঁচিবে না ; উহার লেড়্‌কা সিরাজ-উদ্দৌলা নবাব হ'বে। রাস্‌কেল কিণ্ড রাজ্য রাখিতে পারিবে না। ও বড় দুষ্ট আছে।" এই বলিয়া, সহাস্যমুখে, সাহেব মহাশয়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—"টুমি আমার 'ওণ' না কাটিয়াছে, টবে কে কাটিয়াছে ?"

মহাশয় করযোড়ে উত্তর করিলেন,—"আমি কেমন করে জানবো হুজুর ?"

সাহেব তারামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"টুমি কি জানে ?" তারামণি, থতমত খাইয়া 'যক-যক' বলিয়া মহাশয়ের 'যক' দেওয়ার বিষয় কি বলিতে যাইতেছিল, তেমন সময় হরগোবিন্দ বাধা দিয়া বলিলেন,—"না হুজুর ! ও কিছুই জানে না। মহাশয় দোষী নহে।"

সাহেব কহিলেন,—"আপনি যডি বিবেচনা করেন—ও কেঁকটি ডোষি নহে, টবে ছাড়িয়া ডিতে পারেন।"

মহাশয় নিষ্কৃতি লাভ করিয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু মনে মনে কহিতে লাগিলেন, সাহেব অত্যন্ত দয়ালু বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন, নচেৎ হরাবেটা তো আমাকে ধরাইয়া দিয়া ফাঁসাইবার

চেষ্টায় ছিল। আমার বিপক্ষে আবার হিন্দি করিয়া সাহেবকে কত কথাই বলিল।

"জাতি ছোটলোক বেটা। যে ব্রহ্মহত্যা করতে পারে, তার মত পাপী আর জগতে নেই। ওর ছায়া মাড়ালেও পাপ হয়। আচ্ছা, আসিও এর প্রতিফল লইব। আমার দ্বারায় যদি উহার সর্ব্বনাশ না হয়, আমার ব্রাহ্মণ-ঔরসে জন্ম নয়।"

তারামণিকেও সাহেব নামিতে বলিলে, তারা কহিল,—"আমি এখানে নামিব না, কলিকাতায় যাইয়া নামিব।"

ভাউলে যথাসময়ে কলিকাতায় পৌঁছিল। সাহেব নিজের ঠিকানা হরগোবিন্দকে দিয়া, অপরাহ্নে দেখা করিতে বলিয়া, প্রস্থান করিলেন। হরগোবিন্দও, হারাণ, হারাণী ও তারামণির সহিত, নগর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাসা স্থির করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মহাশয় কহিলেন,—"আসতে আজ্ঞা হউক।"

রামগোবিন্দ প্রণাম ও আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"বসতে আজ্ঞে হউক।"

ইতিপূর্ব্বে যখন গ্রামস্থ কতিপয় লোক মহাশয়কে কহে—দেওয়ানজী বলিয়াছেন—'পুজোর পর ওগলির ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাশয়কে গদিচ্যুত করিবেন' ; তখন মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—'যদি দেওয়ানজী কর্ত্তৃক আমার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে আমি দেওয়ানজীকে সপরিবারে একগাড়ে দিয়া, না হয় নবাবের শূলে যাইব।' এই কথা ক্রমেও জননীর কর্ণে উঠায়, তিনি পুত্রকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন—'আর না মহাশয়ের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ করেন।' সুতরাং দেওয়ানজীও মাতৃ-আজ্ঞায় সম্মত হইয়া, অদ্য বিজয়া দশমীর দিন মহাশয়ের সহিত কোলাকুলি করিয়া সন্ত্রম-স্থাপন করিতে আসিয়াছেন।

এই সময় গ্রামস্থ অনেক লোক মহাশয়কে প্রণাম করিতে ও সিদ্ধি খাইতে আসিল। মহাশয়ের ভবনে প্রত্যহই সিদ্ধি চলিত ; তবে অদ্য বিশেষ সমারোহ।

দেওয়ানজী মহাশয়কে কহিলেন,—"সাহেবেরা কি অমনিই আপনাকে ছাড়িয়া দিল ?"

মহাশয় কহিলেন,—"না-দেবে কেন ? আমি তো কোন দোষ করি নাই। আপনার ভ্রাতা—হরগোবিন্দ ঐ নৌকায় ছিলেন, তিনিই সাহেবদিগকে বলিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া যান ; এবং যাহাতে আমার দণ্ড হয়, তজ্জন্য সাহেবকে আমার বিপক্ষে অনেক কথা বলেন। বাঙ্গালায় বলিলে আমি বুঝিতে পারিব বলিয়া, হিন্দিতে কথোপকথন হইতে লাগিল। কিন্তু সাহেবেরা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া, আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম—নবাব-সরকারে ইংরাজের নামে অভিযোগের নালিশ করিব। কিন্তু দেখিলাম—উহাদের কোন দোষ নাই ; হরগোবিন্দই এই ঘটনা সৃষ্টাইয়াছে।"

দেওয়ানজী কহিলেন,—"হরগোবিন্দ যখন সাহেবদের সহিত আলাপ করিয়াছে, তখন উহার ভুল হইবে। কারণ, শীঘ্রই দেখিবেন—সাহেবরাই আমাদের দেশের রাজা হইবে। রাজা অত্যাচারী হইলে, রাজ্য রক্ষা হয় না। বর্ত্তমান নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলা—যিনি ভবিষ্যতে নবাব হইবেন—ভয়ানক অত্যাচারী, মূর্খ, নাতিল ও ইতিয়াসক্ত।"

মহাশয় কহিলেন,—"আচ্ছা, আপনাদিগের ঢাকার নবাব আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পর নবাব না হন কেন ?"

দেওয়ানজী কহিলেন,—"আলিবর্দ্দি সিরাজ-উদ্দৌলাকে দণ্ডিকরূপ গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং ঐ দুরাত্মাই নবাব হইবে।"

এই সময় যদুনাথ আসিয়া মহান্ত-ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। যদুনাথ—মৃণালের জ্যেষ্ঠ।

মহান্ত কহিলেন,—"এস, যদু ভায়া এস। ডেকেছিলাম, বলি—কাজকর্ম্ম এখন কোথায় করা হচ্ছে।"

যদু কহিলেন,—"কাজকর্ম্ম কোন স্থানে হয় নাই। পূজার পর একদ্বারে হইবার আশ আছে।"

মহান্ত কহিলেন,—"তুমি কেন আমার এখানে কাজ কর না? আমি প্রাচীন, বিষয়াদি দেখিয়া উঠিতে পারি না; তুমি যদি সমস্ত বিষয়ের ও দেবসেবার তত্ত্বাবধান-ভার লও, তাহা হইলে প্রাচীন বয়সে অনেক বিশ্রাম পাই এবং ভগবানেরও নাম লইতে পারি।"

দেওয়ানজী কহিলেন,—"যদু ভায়ার ঠাকুর-বাড়ীতেই কর্ম্ম করা উচিত। ইহাতে বাড়ী ঘর দুই দেখা হইবে। আমার মতে তুমি এই-খানেই স্বীকার হও।"

যদু কহিলেন,—"আমি সম্পূর্ণ স্বীকার হই-লাম। কেবল মাতা-ঠাকুরাণীকে একবার বলিয়া আগামী কল্য এ বিষয়ের উত্তর দেব।"

এই সময় গণেশ আসিয়াও সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। মহান্ত গণেশের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"এটী!"

দেওয়ানজী কহিলেন,—"আমার সম্বন্ধী।"

মহান্ত কহিলেন,—"আরে এস—এস। বেস ছেলেটী! বা! দিব্য ছেলেটী। এটী কি করে?"

দেওয়ানজী কহিলেন,—"বিষয়-কর্ম্ম কিছুই করে না। ভাব্‌ছি—বাটীর বিষয়াদির ভার উহার উপর দেব। আর, এখানে একজন অবিভাবক না রাখিলেও তো চলে না!"

"অবশ্য—অবশ্য!" যাহা হউক, তাঁহাকে দেখে, বড় সন্তুষ্ট হইলাম। বাবুজী, তোমার নাম কি?"

গণেশ কহিলেন,—"গ—গ—গ—গণেশ।"

একজন করিল,—"ছেলেটী একটু তোত্‌লা।

মহান্ত কহিলেন,—"তোত্‌লায় কিছু এসে যায় না. পেটে বিদ্যে থাকিলেই হইল।"

অপর একজন কহিলেন,—"তবে উহার স্ত্রীটীও ঐ রকম তোতলা হ'লে, বড় মজা হয়। ঝগ্‌ড়া-টগ্‌ড়া হ'লে, তা হলে দেখ্‌তে বড় মজা হবে। দুইজনেই তো-তো-তো—বড় মজাদার! আমাদের বিশু বাবুদের—"

এই বলিয়া, তিনি তাঁহাদের গ্রামের বিশ্ব-নাথ বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর গল্প ফাঁদিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; এমন সময়,দেওয়ানজীর দ্বারবান আসিয়া একখানি পত্র প্রদান করিল। দেওয়া-নজী, পত্রখানি উন্মুক্ত করিয়া পাঠ করিলেন,—

"ভ্রাত! নবাবের অত্যন্ত উৎকট পীড়া। বোধ হয়, এ যাত্রা রক্ষা নাই। তুমি পত্রপাঠ চাকায় আসিবে। ইতি।

শ্রীরাজবল্লভ রায়।"

"আমি চল্‌লেম"বলিয়া,বিমর্ষভাবে দেওয়া-নজী গাত্রোত্থান করিলে, মহান্ত জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"সব ভাল ত?" দেওয়ানজী কহি-লেন,—"বড় ভাল নয়, আমার মুনিব নবাবের অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে। আমাকে অদ্যই ঢাকায় রওনা হইতে হইবে।"

দেওয়ানজী চলিয়া যাইলে, অপরাপর সক-লেও স্ব স্ব বাটী চলিয়া যাইল। তখন মহান্ত আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"ঢাকার নবাব এবার নিশ্চয় মরিবেন। মরিলেন কি, হয় তো গঙ্গাযাত্রা করেছে; মর—কবর-যাত্রা করেছে।

নবাব গেলেই, দেওয়ানজী যে রামগোবিন্দ, সেই রামগোবিন্দ হইলেন। অত তেজ, অত দর্প ভাল নয়। আবার এদিকে কেমন কল পেতেছি —যদুকে কর্ম্ম দিয়ে নিজের বশে আন্‌বো। এনে, হরগোবিন্দের সহিত মেয়েটার সম্বন্ধ ভাঙ্গাবো। ছোঁড়া ও ছুঁড়িটের, যেরূপ ভাব হয়েছে, এমন ভাব কোথাও দেখি-নি। এর মধ্যে তারামণিকে দিয়ে পত্র লেখালেখি হচ্ছে। আর নৌকায় তারাতে আর হরগোবিন্দতে যেরূপ কথোপকথন হইল, আমি তো শুনে অবাক্ হয়েছি। এমন ভালবাসা কখন দেখি-নি—কোথাও শুনি-নি। যদি যদুকে হাত করে সম্বন্ধটা ভাঙ্গতে পারি, আমার চিরশত্রু হর-গোবিন্দ নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়ে একদিকে চলে যাবে—আমার কণ্টক নিষ্কণ্টক হবে। তবে, যে মেয়েটাকে হরগোবিন্দের সহিত নৌকায় দেখিলাম, সেটীকে পাইবার কি? আহা! পরমাসুন্দরী!"

এই সময় শনি পাগলী আসিয়া কহিল,—"বড় ক্ষিদে পেয়েছে; গোবিনজীর প্রসাদ কিছু দিতে বল না?' কি ভাব্‌ছো? কার বুঝি সর্ব্বনাশ কর্‌বে! ওগুলো কি ভাল?" এই বলিয়া, শনি প্রস্থান করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রিগুণার বাড়ীতে আজ মহা আনন্দ। সত্য-নারায়ণের কথা হইবে, কাঁচা-পাকা সিন্নির উদ্যোগ হইতেছে। মহান্তের বাড়ীতে যদু-নাথের কর্ম্ম হওয়ায়, এই সিন্নি দেওয়া হই-তেছে। গোবিন্দজীর অতুল ঐশ্বর্য্য, মুহান্ত বৃদ্ধ হওয়ায় বিষয় দেখিতে পারেন না, এ কারণ যদুনাথ ঠাকুর-বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছেন। সেই আনন্দে ত্রিগুণা আজ সত্যনারায়ণের সিন্নি দিতেছেন। বিস্তর স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

স্ত্রীলোকেরা 'উপরি' শব্দের অর্থ জানে না; এজন্য ত্রিগুণাকে, কহিতেছে—"মাসী মা, বহুর মাইনে কম বলে দুঃখিত হ'য়ো না। মেজো ঠাকুর বল্লেন—'ও কাজে বেশ উপরি আছে।"

ত্রিগুণা কহিলেন,—"হাঁ মা, সকলেই ঐ কথা বল্‌ছে বটে।"

ত্রিগুণার বাড়ীতে আজি এত আনন্দ, কিন্তু মৃণালবালা বড় নিরানন্দ। দাদার চাকরীর আনন্দ তাঁহার মনে স্থান পাইতেছে না; হর-গোবিন্দের দ্বিচ্ছেদানল তাঁহার সকল আনন্দকে দগ্ধ করিয়াছে। চক্ষু সকলই দেখিতেছে, কিন্তু দেখা মাত্র। কান সকলই শুনিতেছে, কিন্তু মন দিয়া শুনিতেছে না। মন তাঁহার মনে নাই, হরগোবিন্দের নিকট গিয়াছে। মৃণাল-বালা মনে মনে কহিলেন, — "আরে ছি! ছি! মাগী একটা খারাপ কথা বলিয়া দুইটী টাকা আমার হাতে দিলে, আমি সে টাকা লইব কেন? তৎক্ষণাৎ তাঁর মাকে দিয়া প্রণাম করিলাম। সুখ-ঠাকুরঝি ("জিহ্বা কাটিয়া—কে যেন শুনিয়াছে ভাবিয়া অপ্রতিভ হইয়া) সুখদার মা চারিটী টাকা দিলেন, যত্ন ক'রে কাপড়ে বাঁধ্‌লাম। মাগী কিনা বলে—তার ভায়ের সঙ্গে"; শুনে যেন মাথায় আগুন জলে উঠ্‌লো। সুখদা বল্‌লে—"ছোট দাদার সঙ্গে"; শুনে তবে সে আগুন নিব্‌লো। আচ্ছা, যদি সত্যি সত্যি তাহার ভায়ের সঙ্গে—মরণ আর কি!—দীঘিটা তো কাছে আছে? গঙ্গা তো বেশী দূর নয়! যা কপালে আছে, পরে হবে; এখন আর ভাব্‌তে পারিনে। কিন্তু এরূপ কষ্টে ও দুর্ভাবনায়, আমার আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না মরণটা হলে বাঁচি।"

এই সময়, কিরণমালা আসিয়া কহিলেন,—

"সই, কি কর্‌ছো? কথা কচ্ছ না যে?—তুমি দেখ্‌ছি হর হর ক'রে মেপে যাবে!"

মৃণালবালা, কিরণমালার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন,—"সই, তুই বেস্ সুখে আছিস্। আমার মত দুঃখিনী জগতে নেই।"

"কেন? আমি কি সুখে আছি?"

"সে সুখে আছ, তুমি কাহাকেও মন দেওনি, বেস্ সুখে আছ?"

"তুমি কেন দিলে?"

"আমি কি দিলাম? অবশ্য মন যে আপনা হইতেই দিল! আমি ভাবছি—তিনি যদি না ফিরে আসেন, আর পাঁচজনে মুটে বড়-বৌয়ের ভায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটায়, তাহা হইলে কি করিব?"

"কি করিবে?"

"প্রাণ তো আর পাঁচজনকে দেওয়া যায় না! কাজেই ত্যাগ কর্‌বো।"

"সম্বন্ধ ঘটায়, তুমি ঘটাতে দেবে কেন?"

"তোর মত বোকা দেখিনি। আমার হাত কি? আমি পরাধীনা বালিকা!"

"তোমার মা ও দাদা ও-পোড়া বাঁদরের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না, আমরাও বারণ কর্‌বো।"

এই সময় হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া, ব্যস্তসমস্ত হইয়া, মৃণালবালা কহিলেন,—তারামণি কথা শুনছি নয়? একবার দেখে আয়না ভাই!"

কিরণমালা তারামণির সন্ধানে ঘরের বাহির হইল। কিন্তু ইহার অনতিবিলম্বে মেয়ে-মহলে তারামণি লইয়া হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল।

"তুই অনেকদিন বাঁচ্‌বি—এই তোর নাম হচ্ছিল—" বলিয়া গোঁসাই বাড়ীর বড়-গিন্নি চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ছোট-গিন্নি কহিলেন,—"তারা ঠাকুরঝি, কল্‌কাতায় গিছিলি, অনেক সাহেব দেখ্‌লি—নয়? আচ্ছা, সাহেবেরা নাকি গরু খায়; তাদের মেয়েরা নাকি ঘোমটা দেয় না, ঘোড়ায় চড়ে?" মৃণালের বাড়ীর মোক্ষদা কহিল, —"আচ্ছা তারা দিদি, সাহেবেরা নাকি খেয়ে, আঁচায় না, হেগে ছোঁচায় না?"

তারামণি বিরক্ত হইয়া কহিল,—"আমাকে তো সাহেবেরা সে সকল কথা কিছু ভেঙ্গে বলে-নি। কেমন ক'রে জান্‌বো আমি তা?"

"তা সত্যি—তা সত্যি" বলিয়া, সে বিষয়ে সকলে নিশ্চিন্ত হইলে, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী কহিলেন, —"ছোট-বৌয়ের বড্ড অরুচি, তারাদিদি যদি পাঁচ রকম আচার আন্‌তিস্!" শিবসুন্দরী কহিলেন,—"কলিকাতায় খুব সমুদ্রের কাঁকড়া আর ভেটকি মাছ—তাই যদি কিছু আন্‌তিস্!" বিন্দুবাসিনী কহিলেন,—'দু'চারটে কমলা নেবু আর দু'একটা কপি আন্‌তিস্!"

তারামণি কহিল,—"তোমরা না ব'লে দিলে আমি কি ক'রে আন্‌বো? আমি তো আর হাত গুণ্‌তে জানি নে?"

তখন সকলে মহান্তের কথা তুলিল। এক-জন কহিল,—"হাঁ তারাদিদি, সাহেবেরা নাকি মহান্তকে বেত মেরে ছেড়ে দিয়েছে!" আর এক-জন কহিল,—"না লো—না, বেত মার্‌বে কেন? শুনেছি কল্‌কে পুড়িয়ে ছাপ দিয়ে দিয়েছে।" এইরূপ নানা কথা চলিতে লাগিল। তারামণি ইতস্ততঃ একবার মৃণালবালার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, "তুই কেমন আছিস্" বলিয়া, একখানি পত্র দিয়া, চলিয়া আসিল। পত্র পাইয়া মৃণালবালার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। কতক আহ্লাদে, কতক বা সংবাদ কি আছে তাহা জানিবার জন্য, মনে অভিনব ভাবের উদয় হইল। সে ভাব ভুক্তভোগী ব্যতীত কে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে?

এখন মৃণাল মহা বিপদে পড়িলেন। পত্র পাইলেন, কিন্তু পড়েন কিরূপে? অথচ না পড়িয়াও থাকিতে পারিতেছেন না। বাটীতে বিস্তর লোকের আমদানী, পড়িতে যাইলে কেহ কেহ দেখিতে পাইবে। আবার, একবার পাঠ করিয়া কিছু তৃপ্তি হইবে না; বিশ্বার পঁচিশ-বার পড়িতে হইবে; কিন্তু পড়েন কিরূপে? আবার ভাবিলেন,—"পড়া না হয় একটু বাদেই হবে; কিন্তু এখন রাখি কোথায়? বালিসের তলায়? —হারিয়ে যাবে, কি কেউ দেখ্‌তে পাবে। কাপড়ের খুঁটে? —তাতেও লোকে দেখ্‌তে পেতে পারে।" শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন,—"পত্রখানা মাথায় রাখাই উচিত।" অতএব, খোঁপায় গুঁজিয়া রাখিলেন। কিন্তু, বেস করিয়া মাথায় কাপড় দিয়াও, ভাবিতে লাগিলেন—"কে হয় তো দেখ্‌তে পাবে?"

দুই একটী স্ত্রীলোক হাসিতে হাসিতে গৃহ-মধ্যে কি লইতে আসিল। মৃণাল ভাবিলেন,— "এরা জানিতে পারিয়াছে।" মাতা আসিয়া কহি-লেন,—"এক্‌লা বসে কি কর্‌ছিস্?" মৃণাল ভাবিলেন—"মা জানিতে পারিয়াছেন।" দাদা আসিয়া কহিলেন,—"মৃণাল, কি হচ্ছে?" মৃণাল ভাবিলেন—"দাদা জানিতে পারিয়াছে।"

ক্রমে সন্ধ্যা হয় হয় দেখিয়া, প্রতিবাসিনীরা চলিয়া যাইল; তখন সত্যনারায়ণ-পূজার হাঙ্গামা আসিল, আরো দুই-একজন করিয়া লোক জুটিতে লাগিল। মৃণালবালা কত-ক্ষণে পত্রখানি পাঠ করিবেন, ভাবিতে লাগি-লেন। ক্রমে স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকায় বাড়ী পরিপূর্ণ হইল। এই সময়, পুরোহিত বিষ্ণু শর্ম্মা মহাশয় তিন দিকে কাচ ও একদিকে কাগজ-মোড়া লণ্ঠন হাতে, যষ্টির উপর ভর দিয়া, কুঁজার ন্যায় আসিয়া বদখা দিলেন। মৃণাল-বালা, সেই সুযোগে ছুটিয়া গিয়া কিরণমালা-দের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"সই, সই, প্রদীপ জ্বাল, পত্র পেয়েছি!"

শ্রীদুর্গাচরণ রায়।

শ্রীচৈতন্যদাস।

শ্রীচৈতন্যদাস ভণিতযুক্ত যে একটী রূপক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই চৈতন্যদাসের বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিবৃত হইতেছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য-পাঠে আমরা চারিজন চৈতন্য-দাসের পরিচয় পাইয়াছি। (১) কুলীনগ্রাম-বাসী শ্রীশিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র। এই মহা-প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে আর কোন কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। (২) চাকন্দী-নিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বা চৈতন্যদাস। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের পিতা। (৩) পাটুলী-গ্রাম-নিবাসী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও সাধক বংশীবদন দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র। (৪) বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর। প্রথম তিনজন কোন পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন কি না, আমরা জানিতে পারি নাই। সুতরাং আমরা রাজা বীর হাম্বীরকেই প্রকাশিত রূপক ও অপরাপর পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য। যাহাহউক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চৈতন্যদাস-সম্বন্ধেও আমরা সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

প্রথমতঃ।—গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, ওরফে চৈতন্যদাস। বর্দ্ধমান জেলার কণ্টক (কাটোয়া) নগরের পূর্ব্ব ও কি ক্রোশ ব্যবধানে চাকদী-গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বাস করিতেন। ইনি অতীব সুশীল ও পরম কৃষ্ণভক্ত রাঢ়ী-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে ঘটনা উপলক্ষে গঙ্গাধরের নাম চৈতন্যদাস-রূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা অতি বিস্ময়কর। গঙ্গাধর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মের প্রায় বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের প্রারম্ভে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব কণ্টক নগরে মধু শীলের দ্বারা মস্তক মুণ্ডন করাইয়া, ডোর-কৌপীন ধারণ-পূর্ব্বক, শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্যত্ব স্বীকার-পূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তখন গঙ্গাধরের বয়ঃক্রম ৪৫ কি ৪৬ বৎসর ছিল। এবং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-সময়ে গঙ্গাধর কণ্টক নগরে কার্য্যানুরোধে উপস্থিত ছিলেন। সোণার নিমাইচাঁদকে নবীন বয়সে ভিখারী হইতে দেখিয়া, গঙ্গাধর শোকে একান্ত অধীর হইয়াছিলেন;" এবং দিবানিশি কেবল "হা চৈতন্য", "হা চৈতন্য" বলিয়া রোদন করিতেন। গঙ্গাধর নিতান্ত ভালমানুষ ছিলেন বলিয়া, গ্রামস্থ সমস্ত লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। অকস্মাৎ গঙ্গাধরের প্রেম-বিকার-দর্শনে সকলে নানাপ্রকার যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়া অচিরকালমধ্যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। এই সময় হইতে সকলে তাঁহাকে চৈতন্যদাস বলিয়া ডাকিতে লাগিল। গঙ্গাধর, যাজিগ্রাম-নিবাসী শ্রীবলরাম শর্ম্মার দুহিতা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া, শ্বশুরালয়েই বাস করেন। অধিক বয়ঃক্রমে বিবাহ সম্পন্ন হওয়াতে, গঙ্গাধরের সন্তানাদি জন্মে না। প্রতি বৎসর দ্বিজদম্পতি পুরুষোত্তমে যাইয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া আসিতেন। কতিপয় বর্ষান্তর মহাপ্রভুর বরে লক্ষ্মীপ্রিয়া গর্ভ ধারণ করেন; সেই গর্ভে মহাপ্রভুর প্রেমাবতার-স্বরূপ শ্রীনিবাসাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়তঃ।—বংশীবদন দাসের পুত্র চৈতন্যদাস। 'বংশীশিক্ষা' প্রণেতা পুরুষোত্তম মিশ্র বা প্রেমদাসের মতে, এই চৈতন্যদাস পরম উদার, পণ্ডিতাগ্রগণ্য ও মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। অনুমান ১৪৪০ শকাব্দে চৈতন্যদাসের জন্ম। ইঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্য-লীলা জাগরূক ছিল। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী ইহার নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন;—

"সর্ব্বত্র বিদিত, সর্ব্বমতে যোগ যেহোঁ।
গৌরপ্রিয় বংশীদাসের পুত্র তেহোঁ॥"

তৃতীয়তঃ।—বনবিষ্ণুপুরাধিপতি বীর হাম্বীর। ১৪৪৪ কি ১৪৪৫ শকে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় দস্যুদল দ্বারা ধনসঞ্চয় করিতেন। কেবল যে বনবিষ্ণুপুরের রাজারাই দস্যুতা-দোষে দোষী ছিলেন, এরূপ নহে। তদানীন্তন জমিদারদিগের অন্যূন বার আনা দস্যুদলপতি ছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, "বাঙ্গালার প্রাচীন ভূম্যধিকারীদিগের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে চৌদ্দ আনা দস্যু ও দুই আনা উৎকোচগ্রাহী ছিল।" ইহা বড় অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয় না। সমস্ত বাঙ্গালার ন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষের দশাও ঐরূপ ছিল। সে যাহা হউক, ১৫০৭ শকে ঠাকুর নরোত্তম দাস, শ্রীশ্যামানন্দপুরী ও শ্রীপ্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্য, মহাপ্রভুর নিকট মহাসমারোহে শ্রীবৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে প্রচারের জন্য বহুল বৈষ্ণব-গ্রন্থ লইয়া স্বদেশ-যাত্রা করেন। ইহাঁরা আসিতে আসিতে যখন বনবিষ্ণুপুরের অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,

তখন বীর হাম্বীরের নিয়োজিত দস্যুগণ বহুমূল্য সামগ্রী-ভরে গ্রন্থরত্ন হরণ করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল। কথিত আছে, সেই সকল স্পর্শন ও দর্শনে রাজার মন বিশুদ্ধ হইল। তিনি বীর দ্বারপণ্ডিত শ্রীশ্যামাচার্য্যের হস্তে গ্রন্থরত্ন সমর্পণপূর্ব্বক, তাহাদিগের রীতি-মত অর্চ্চনা করিতে আদেশ করিলেন। বাবা আউল মনোহর দাস সেই গ্রন্থরত্ন-ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী নিযুক্ত হইলেন। আচার্য্যরত্ন, ঠাকুর মহাশয় ও পুরী মহাশয় দেশবিদেশে অপহৃত গ্রন্থনিচয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সন্ধান পাইয়া শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হাম্বীরের রাজধানীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য প্রভুর নিরুপম রূপমাধুর্য্য দর্শনে ও শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের অভূতপূর্ব্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা-শ্রবণে দস্যুরাজ বীর হাম্বীরের হৃদয় প্রেমে বিগলিত হইল; তিনি যার-পর-নাই দীনভাবে, ও আত্তিসহকারে আচার্য্যরত্নের নিকট সত্ত্ব গ্রহণ করিলেন; তাঁহার গুরুদত্ত নাম হইল "চৈতন্যদাস"। ইনি উভয় নামেই অনেক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

"শ্রীচৈতন্যদাস নামে যে গীত বর্ণিল।
বিস্তারের ভয়ে তাহা নাহি জানাইল॥"

'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা শ্রীঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী —ইহাই বলিয়া, বীর হাম্বীরের আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যলীলা-বিষয়ক গুটি-তিনেক পদ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। যথা,—

ভূপালী।

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব উঠিল।
পূর্ব্ব চরিত্র বুঝি মনেতে পড়িল॥
গৌরীদাস মুখ হেরি উল্লসিত হিয়া।
আমিহ ছাঁদন-দুরি বলে ডারু দিয়াঁ॥
আজি শুভ দিন, চল গোঠেতে যাইব।
আজি হইতে গো-দোহন আরম্ভ করিব॥
ধবলী শাঙলি কোথা শ্রীদাম সুদাম।
দোহনের ভাণ্ড মোর হাতে দেহ রাম॥
ভাবাবেশে বেয়াকুল শচীর নন্দন।
নিত্যানন্দ আসি কোলে করে সেই ক্ষণ॥
চৈতন্যদাসীয়া বলে ছাঁদনের ডুরি।
হারাইলা গৌরীদাস গোপী কৈলা চুরি॥

সুহিনী।

কি বলিব শিতারে এ দুখ সহায়।
গোরা মুখ হেরি কেন পরাণ না যায়॥
মলিন বদনে বসি আঁখিযুগ ঝরে।
আকাশ গঙ্গার ধারা সুমেরু শিখরে॥
ক্ষণে মুখ শির নমে ক্ষণে উঠি ধায়।
অতি দুরবল ভূমে গড়ি মুরছায়॥
নাসায় নাহিক শ্বাস দেখি সব কাঁদে।
চৈতন্যদাসের হিয়া স্থির নহুহি বাঁধে॥

সুহাই।

মোহে বিহি বিপরীত ভেল।
অভিমানে মোহে উপেখিপহুঁ গেল॥
কি করব কি হব কহ না উপায়।
কেমনে পাইব সই মোর গোরা রায়॥
কি করিতে কিনা জানি হৈল।
পরাণ পুতলি গোরা কোরে ছাড়ি গেল॥
কে জানে এমন হইবে।
আঁচলে বাঁধিহ ধন সাগরে পড়িবে॥
চৈতন্যদাসের এই হৈল।
পাঁইয়া গৌরাঙ্গচাঁদ না ভজি ত্যজিল॥

শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

নূতন-বৌ।

(কাহিনী)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কুঞ্জবিহারীর মত ওখানকার সঙ্গে তেমন পাশ-করা কার্কনবরণীর বিবাহরূপ বৈধ চুক্তিটা যে চট্ করিয়া হইয়া গেল, কথাটা শুনিয়া লোকের মনে একটা খট্‌কা বাধিতে পারে। যিনি হাওয়ার উপর কথার বাঁধুনি পাতিয়া রজতখণ্ডের সঞ্চার করেন, তিনি না দেখিয়া না শুনিয়া এমন গ্রাজুয়েটের ছিড়াছিড়ির বাজারে এমন একটা অকূল-কুমাণ্ডর হাতে কন্যাদান করিবেন শুনিয়া, হয় ত তুমি ভাবিবে কাহিনীটার আগা-গোড়াই মাজান! চমকাইও না, সাফাই আছে; কুঞ্জেরমা নূতন-বৌয়ের আশা-পথ চাহিয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকুন, আমি ততক্ষণ শ্রীমতীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতের প্রথম অধ্যায় ব্যাখ্যা করি; ঘট্‌কীটা যখন ধরিয়াছে, তখন ভাঙ্গিয়া যাওয়া ভাল।

যে সুরের নব নটবর সুন্দর রসময়ী বিদ্যার স্বরে সিঁদ্ দিয়াছিল, সেই সহরের নামে যে জেলা, তাহার মাঝখানে বৃন্দাবনের গোকুলের মত প্রাণ-আকুল-করা একখানি গ্রাম; নাম বলিয়া দিব না, সীমা-সহরদ্দ বলিয়া দিব; পার ত চিনিয়া লও। কোনখানেতে চড়িও না, পদব্রজে চলিতে আরম্ভ কর, বরাবর চলিয়া যাও, যেখানে গিয়া দেখিবে—তরুণ বাবুর বাঁধা-ঘাট, সেইখানে গিয়া একদম নিঃশ্বাস ফেল; দেখিবে—সরসীর সরসস্পার্শে সেই গ্রামখানি; গ্রামের কমলকুঞ্জে ঝাঁকে ঝাঁকে কমল ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কমলিনীর অন্তরঙ্গ স্বামী সূর্য্যমামা কাঁদিতে কাঁদিতে অস্ত যাইতেছে, কুঞ্জবনে কাল ভ্রমর ফুলের মধু লুটিতেছে। গ্রামের আম্রশাখায় কোকিলের একজাই কুহরণ, বাগানের ভিতর ওমরিয়া ওমরিয়া মলয়ের ফুকরণ, পরশনে শরীর শিহরণ—দেখিবে, আর মোহিত হইবে। সেই গ্রামে প্রমদার পিতার পিতা অর্থাৎ পিতামহ শ্রীমদ্ভাগুঘুঘুর বাস! আসল নাম বাস্তুঘুঘু নয়; মনিবের লাটের টাকা হজম করিয়া মহাজনী কারবার ফাঁদিয়া সুদের সুদে তস্য সুদে অনেক গরীবের ভিটে-ঘুঘু করিয়াছিলেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে বাস্তুঘুঘু বলিত; দেশের মধ্যে তাঁহার আসল নাম অপেক্ষা নকল নামটাই অধিক জাহির ছিল, ফলেই জুল বাধে। তিন চারি বৎসরের মধ্যে তিনি প্রায় তিন চারি হাজার টাকার জমীদারীও করিয়া ফেলেন। তাঁহারই একমাত্র পুত্র, উকীল বাবু রায়ে অনঙ্গমোহন। বাস্তুঘুঘু মহাশয় পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ে বড় যত্নবান ছিলেন; পুত্রকে কিছুদিন গ্রামে বাঙ্গালা পড়াইয়া সাহেবী চাল-চলন ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন।

বৈষব হইতেই অনঙ্গমোহন বড় বুদ্ধিমান। কলিকাতায় পাঠারম্ভের কয়েক বৎসর পরেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষা-সাগর পার হইলেন; কয়েক বৎসর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে রঙ্গ একটা মেশামিশি ছিল না, মনোযোগ সহকারে লেখা-পড়াই করিতেন। উচ্চ অঙ্গ পনার প্রথম সোপানে পা দিয়াই প্রাণটা যেন আই-ঢাই করিতে লাগিল, একটু আধটু আমোদ-প্রমোদ নহিলে প্রাণের ভিতরটা যেন ফাঁকফাঁক বোধ হইতে লাগিল; তখন আর যাও কোথা? তরুণ যুবক ধরিবার জন্য আশে পাশে রঙ্গ-বেরঙ্গের যে সকল ফাঁদ পাতা আছে, আমাদের ছোকরা বাবু অনঙ্গমোহন সেইফাঁদে পড়িয়া গেলেন; নব্য হিন্দুর দলে ভর্ত্তি হইয়া, নব্য বাবুয়ানীর রসের বুলি কপ্‌চাইতে লাগিলেন।

এইবার তুমি পাড়াগাঁয়ের মানুষ হও ত, হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিবে, বলিবে—লোকটার সকল আঁজগুবি! হিন্দু চিরদিনই হিন্দু, তার আর নব্য-প্রাচীন কি? কথাটা না বুঝিয়া গোল-যোগ কর বলিয়াই ত, তোমরা বাবুদের কাছে গালি খাও? টাকাটা রহিয়াছে, চাহিয়া দেখনা কেন? নব্যহিন্দু—অর্থাৎ বাহিরে যখন থাকিবে, তখন দশবজুতে জুটিয়া মদ খাও, বারাঙ্গনায় প্রেম কর, সন্ধ্যাবেলায় মুখে-চোখে চাদর জড়াইয়া চাচার দোকানে গতিবিধি কর, আপত্তি নাই! ষ্টীমারের গুপ্তগৃহে বসিয়া প্রফীর পম্পুট চর্ব্বণ কর, রেলওয়ে কোম্পানির সুসজ্জিত হোটেলে আতিথ্য-গ্রহণ কর, পেঁজ্‌সাহেবের বাড়ী যদি নিমন্ত্রণ হয় তো নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাও, কেহ যদি কিছু বলে তাহা হইলে 'আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি' বলিয়া মহা তর্কযুদ্ধও আরম্ভ করিয়া দাও। সমাজে যাইবে, কিন্তু চক্ষু মুদিবে না; জুতা পায়ে দিয়া দেবমন্দিরে উঠিবে, কিন্তু ওলাউঠার সময় গ্রামের নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দলে যোগ দিবে; ব্রাহ্মণ হইলে পৈতা-গাছটার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, কিন্তু জামাইষষ্ঠীর সময় শাশুড়ীর দেওয়া সুতা-গাছটী সযত্নে গলায় বাঁধিবে। রামায়ণ একটা আষাঢ়ে গল্প, মহাভারত ব্যাসের পাঁচালীপুরী, ভগবদ্গীতা প্রক্ষিপ্ত, আর্য্যগণ মেকালের চাষা ছিল, ভারতবর্ষ আগে সমুদ্রের চরা ছিল, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কিন্তু সব এক—এমনি এমনি বাঁধিগদ্ মুখস্থ করিয়া রাখিবে, সময় বুঝিবে আর আওড়াইবে। অধিক লিখিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়। ইহাতেই যদি বুঝিয়া থাক, ত বুঝিয়াছ; নতুবা, আমি তো না-চার।

অনঙ্গমোহন নব্যদলে মিশিয়া থিয়েটার শুনিতে যান, শেষ-রাত্রিতে বাসায় আসিয়া রঙ্গভূমির রঙ্গিণীদের প্লাউডার-ঘষা মুখ স্বপ্ন দেখেন, কোন দিন বা বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া চৌরাস্তার বারান্দার কাছে মন-টুকু হারাইয়া আইসেন, অবসর-মত সমাজে গিয়া চস্‌মা কিসিবাক্স প্রতিজ্ঞা করিয়া আইসেন।

দিনের পর দিন গেল, এক লাটসাহেবের পর আর এক লাটসাহেবের রাজ্য আসিল, অনঙ্গ-মোহনের ঈষৎ গোঁফের রেখা ঘুচিয়া কোমল কপোলে দাড়ী গজাইল; একদিন এক রসিক ইয়ার জিদ ধরিলেন—"আজ তোমাকে পারবঙ্গ চাচার দোকানে কারী আর কট্‌লেট্ খাইতে হইবে।" সত্য কথা বলিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলিতে হয়, অনঙ্গমোহন এই সুকার্য্যটা একাল পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেদিন বন্ধুর অনুরোধ এড়াইবার জন্য বলিলেন,—"ভাই! আমার প্রেজুডিস্ নাই; তবে কিনা, পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বড় খারাপ লাগে। আর ঐ দাড়ীওয়ালার হাতে খেতেও রুচি হয় না। বিশেষ হিন্দুর ছেলে—"

বন্ধু যেন অবাক হইয়া বলিলেন,—"হিন্দুর ছেলে? হিন্দুর ছেলে ভিন্ন আর হোটেলে খায় কে? আজ তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে কত টিকিওয়ালা ভট্‌রাজ ধরাইয়া দিব।"

অনেক অনুরোধ ও উপরোধের পর, অনঙ্গ-মোহন সসঙ্কোচে হইয়া বাহির হইলেন। পথের মধ্যে তাঁহার গাটা যেন বমিবমি করিতে লাগিল। সহরের মাঝখানে একটী হোটেলে

উভয়ে প্রবেশ করিলেন। অনঙ্গমোহন দেখিলেন, সেখানে ঐজন পাচক আর পরিচারক ভিন্ন মুসলমানের নামগন্ধ নাই, এক একটী প্রকোষ্ঠে হিন্দুয়ানীতে ভরা, বন্ধুর কথায় অযথার্থ নয়—দুই, চারি জন টিকিওয়ালা হাড়িভার মেম্বরও তাহার ভিতর বসিয়া রোজমুন করিতেছেন। তখন তাঁহার চৈতন্য হইল, ভাবিলেন—এখনও তিনি সম্পূর্ণ সভ্য হইতে পারেন নাই। আর ফিরিতে হইল না, সেইদিনই তাঁহার প্রেতাত্মা পবিত্র হইল—উপাদেয় খাদ্যের আস্বাদে তাঁহার রসনাগ্রে নৃত্য করিতে লাগিল, রোজ লিকার আর বিয়ারের ঈষৎ আমেজে তাঁহার নয়ন-যুগল ঢুলুঢুলু করিতে লাগিল, সেই দিন হইতে তিনি কঠিন প্রতিজ্ঞা করিলেন—রাত্রিতে অন্ন আহার করিবেন না।

একাল পর্য্যন্ত অনঙ্গমোহনের বিবাহ হয় নাই; পাত্রের বাজার বড় তেজ; তাহার উপর তিনি সুশিক্ষিত এবং ধনীর পুত্র; বাস্তুঘুঘু দাঁও মারিবার মতলব আঁটিতেছিলেন; দেঁড় হাজার টাকা পর্য্যন্ত ডাক হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি স্বায় পাতেন নাই; তিনি কোট ধরিয়াছিলেন—ছেলে বি-এ পাশ না হলে শ্রীবিষ্ণু করবো না।

অনঙ্গমোহনের বাবুর দিদার দৌড় যত বাড়িতে লাগিল, ততই সমাজের সঙ্গে মেশামিশি যে যাহে সি একটু বেশী রকমের হইতে লাগিল। নামদারা অনেক বন্ধুর সহিত আলাপ-পরিচয় হইল; বেশী দিন সমাজে যাতায়াত হওয়ায় মাঝে মাঝে অনেক পারিবারিক উপাসনায়ও যোগ দিতে আগিলেন; ভাতা-মহলে অচিরাৎ তাঁহার পসার জমিয়া গেল; ভগিনীরাই বা ছাড়িবেন কেন?—তাঁহারাও মাঝে মাঝে অনঙ্গকে লইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন।

যে বৎসর তিনি বি-এ পাশ করিলেন, সেই বৎসর কুমারী কমলমুখীর কমলমুখে কালশিরা দেখা গেল। জানিনা গোপনীয় কি একটা রোগে তাঁহার দেহলতা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, ভিতরে ভিতরে বড়-একটা কানাকানি রকমের গুজব চলিতে লাগিল; ইহার কয়েকদিন পরেই প্রচার হইল—অনঙ্গ বাবু ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিবেন। কুকথা যত শীঘ্র রটে, সুকথা তেমন নয়। অনঙ্গের পিতা সে সংবাদ শুনিতে পাইলেন, পুত্রের মন ফিরাইবার জন্য ব্যস্ত-ভাবে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না; তখন অনঙ্গমোহন সমাজের পাণ্ডার নিকট হলফ পাঠ করিয়া ফেলিয়াছেন এবং নূতন বিবাহ-আইনের ধারা মতে সেই গুপ্ত-ব্যাধিবিশীর্ণা কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তুঘুঘু অনঙ্গ-মোহনকে ত্যজ্যপুত্র করিয়া দেশে ফিরিলেন। বিবাহের কয়েক মাস পরেই শুভক্ষণে জন্মি-লেন—শ্রীমতী প্রমদা। বিবাহের পর অনঙ্গ একটী নূতন স্কুলে মাষ্টারী করিতে লাগিলেন, আর ব্যবহার বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর পরে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শামুলধারী শ্যামরায় সাজিলেন, এবং শ্রীমতীকে লইয়া সেই নূতন সহরে ওকালতী করিতে আসিলেন।

দিন যায়, ক্ষণ যায় না। যমের কপালে আগুন, অনঙ্গের অকপট স্বাধীন-প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানির পানে সে চাহিল না, ওকালতী আরম্ভের কয়েক মাস পরেই তাঁহার প্রেমময়ী গৃহিণী বা প্রমদার মা গলদ্-জ্বলা-রোগে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। নবীন যুবকের নবীন হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, অনঙ্গ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিলেন। কেহ শুনিতে পাইল, কেহ পাইল না। কয়েক দিন পরে পিতাকে পত্র লিখিলেন,—"হিন্দুশাস্ত্রে যদি কিছু

ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করিবেন, আবার হিন্দু হইবেন।"

অনঙ্গের পিতা ব্যবস্থা-জন্য স্বয়ং নবদ্বীপে গেলেন। পণ্ডিতেরা কেহ বলিলেন—"প্রায়শ্চিত্ত নাই।" কেহ বলিলেন—"পাপ থাকিলেই প্রায়শ্চিত্ত আছে।" যাহা হউক, কয়েকদিন চেষ্টার পরে বড় বড় নাম-সই-করা লম্বা-চওড়া একখানা ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করিলেন, এবং পুত্রকে বাটী আসিতে পত্র লিখিলেন। সমাজে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কিন্তু সে ফাকা আওয়াজে কিছুই হইল না; স্মৃতির ব্যবস্থাপত্র কক্ষে করিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত 'মাভৈঃ! মাভৈঃ!' শব্দে কাশীর নসোরা শ্রাদ্ধ করিলেন। অনঙ্গমোহন, বাটী আসিয়া কয়েক কাহন কড়ি উৎসর্গ করিয়া, যেমন সোণার চাঁদ ছিলেন তেমনি সোণার চাঁদ হইলেন; বাস্তুঘুঘুর নগদ দুই হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গেল।

প্রায়শ্চিত্তের পাঁচ সাত দিন পরে অনঙ্গ-মোহন পুনরায় হিন্দু-মতে বিবাহ করিলেন, এবং বিবাহান্তে ব্যবসায়-স্থানে চলিয়া গেলেন; মাতৃহীনা প্রমদা জনকের কাছে কাছে থাকিয়া পিতৃস্নেহে পরিপালিতা হইতে লাগিল। "অঙ্গারং শতধৌতেন মলিনত্বং ন জায়তে।" অনঙ্গ-মোহন হিন্দু হইলেন বটে, কিন্তু চাল-চলন সাবেক ধরণেরই থাকিয়া গেল; যেওয়া হিন্দু-শাস্ত্রকারগণের বেয়াদবি আর স্বার্থপরতামূলক, সেগুলা তিনি বার্গাড়ার দিয়া চলিতে লাগিলেন। পঞ্চমবর্ষীয়া মাতৃহীনা প্রমদার উপর তাঁহার জীবনের সমস্ত অপত্যস্নেহ-টুকু গড়াইয়া পড়িল, প্রমদা গোলাপ-কলিকার মত উকীল বাবুর বামাম্বর আলো করিতে লাগিল। যে সহরে তাঁহার ওকালতী-ব্যবসায়, সেখানকার লোকে জানে—প্রমদা তাঁহার হিন্দুমতের বিবাহিতা স্ত্রীর] গর্ভ-জাতা বালিকা। কথাটা প্রকাশ হইবারও বড় একটা হেতু ছিল না; কারণ, তাঁহার ব্যবসায়-স্থান জন্মস্থান হইতে বহুদূরে। দেশেও যাতায়াত ততটা নাই, কাজেই সে রহস্যটা চাপা থাকিয়া যায়ও দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী যেবার প্রাণপতির পাশে আগমন করেন, সেইবার কি একটা কথায় কথায় একটু গোল হইবার মত হইয়াছিল; বাহিরে বাহিরে একটু চোখ টেপা-টেপিও হইয়াছিল, কিন্তু ব্যাপারটা অধিক দূর গড়ায় নাই।

অনঙ্গমোহন স্নেহময়ী কন্যাকে বিদুষী করিবার জন্য ছেলেবেলা হইতেই বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন; মৈখোনকার বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে অনঙ্গবাবুর গোপনে একটু মনান্তর হইয়া বাক্যালাপ বন্ধ হয় বলিয়া, তিনি প্রমদাকে বালক-বিদ্যালয়েই পাঠাইতেন। বিবিধ শ্রেণীর বালক-সঙ্গে প্রমদা সাত বৎসর বিদ্যা অভ্যাস করিয়া প্রথমে নিম্ন-প্রাথমিক তাহার পর উচ্চ-প্রাথমিক, তাহার পর মধ্য-বাঙ্গলা-ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। আমরা শুনিয়াছি, প্রমদা মৌখিক পরীক্ষায় প্রত্যেক বার পূর্ণ-নম্বর প্রাপ্ত হইয়াছিল, শেষ-পরীক্ষায় তাহার সঙ্গী একটী ছাত্র বলে—পরীক্ষা-গৃহের রক্ষক তিনদিন প্রমদার পৃষ্ঠের কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

প্রমদা যেবার ছাত্রবৃত্তি পাশ করিল, তখন তাহার সেই পোড়া যৌবনের সঙ্গে মাঝামাঝি রকমের সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে। এইজন্য, অনঙ্গ বাবু নবীন নটবরের সঙ্গে নবীনা বালিকাকে ইংরেজী শিখিতে পাঠাইতে পারিলেন না। যীশু-প্রেমে উন্মাদিনী একটী দেশী প্রৌঢ়া পাদ-রিণী বাসায় আসিয়া প্রমদাকে পবিত্র প্রেম শিক্ষা দিতে লাগিল; বালিকা-জীবন ধীরে ধীরে অন্ধকার হইতে আলোকের দিকে অগ্রসর

হইতে লাগিল। প্রেমের যৌবন-প্রাপ্তির পর হইতে অনঙ্গ বাবুর বুকের স্তম্ভিতটা থাকিয়া থাকিয়া দুরুদুরু করিয়া উঠিত; কারণ, কলিতে স্বয়ম্বর নাই, হিন্দুমতে রাখিতে হইলে হাতে সুতা বাঁধিয়া সাতপাকটা ঘুরাইতেই হইবে, কিন্তু সর্ব্বদা ভয়—বিধাতার প্রসঙ্গ-ক্রমে পাছে সকল রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অনঙ্গবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী, বলা বাহুল্য যে, নবীনা; তিনি গোঁড়া হিন্দুর মেয়ে। কিন্তু স্বামীপার্শ্বে আসিয়া নুনী যেমন ঘোলা জলে মিশিয়া ঘোলা হইয়া যায়, তিনিও তেমনি হইয়াছেন। আজকাল দেশে কি একটা বদ হাওয়া পড়িয়াছে, নবীন ধরণের চালচলনে অধিকাংশ লোকেরই রুচি—তা তিনি পুরুষই হউন, আর রাসরসময়ী পোপাঙ্গনার সজাতি রমণীই হউন। নবীনা গৃহিণী প্রথম প্রথম দিনকতক আসিয়া নাক তুলিয়া বেঙ্কাইয়া ছিলেন, প্রমদাকে স্পর্শ করিতেও যেন ঘৃণা বোধ করিতেন; কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই, এখন তরুণীস্বয় তরল সর্ব্বাঙ্গে মধু! নবীনা জননী তরুণী হইলেও গৃহিণী, আর প্রমদা সহবাস-সম্মতির আইনের ভিতর যে বয়স ধরা আছে তাহার তিন বৎসর ওধারে দাঁড়াইয়াও রসময়ী বালিকা!

প্রমদা পাশ করিয়া পিয়ানো বাজায়, কটির বসন কাঁচলী-কষণ শিখা করে, গোপনে প্রেম-সঙ্গীতের বাছা বাছা গানগুলি মুখস্থ করে। সে একবার বড়দিনে পিতার সঙ্গে কলিকাতায় গিয়া থিয়েটারে "চোরের উপর বাটপাড়ীর" অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছিল, সেইবার সে একটী গান শিখা করে। সেই গানটী সে প্রায়ই গাহিত। গানটী এই—"প্রাণ কি চায়রে কে জানে, পোড়া মন টিকেনা এখানে" ইত্যাদি।

অকস্মাৎ বাস্তঘুঘুর একখানি চিঠি অনঙ্গ মোহনের হাতে আসিয়া পড়িল। তাহাতে লেখা—"তুমি যদি শীঘ্র প্রমদাকে বিদায় না কর, তাহা হইলে আমি বিষয়-সম্পত্তির অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যাইব, তোমার জন্য সমাজের কাছে কত মুখ লুকাইয়া থাকিব?" ইত্যাদি। পত্রখানি পাঠ করিয়া উকীল বাবু কিছু বিষণ্ণ হইলেন; হিন্দুমতের প্রণয়িনীকে শুনাইলেন; তিনি বলিলেন—"যখন পর্শার কম, তখন উচিত বটে।"

দেশের ভিতর আসল মেকী চালাইতে হইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা, সাবেক মতে চালাইতেও আর সাহস নাই, সেইজন্য তিনি প্রমদাকে বাহিরে বাহিরে সমাজের ভিতর চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আজকাল কার বাজারে না হয় কি? ঘটক টাকার পুঁটুলি বাঁধিল, বলিল—"বাবু, ভয় কি? সোণা-মণির মেয়ে বিষ্ণুঠাকুরের ঘরে চলিয়েছি, আপনারা ত সোণার চাঁদ! তবে বাজার-তেজ; বিশেষ, এদেশে খাঁটি কায়েতের নামগন্ধ নাই—সব বেটারাই নকল দক্ষিণ-রাঢ়ী—ভুলো-ভাট্‌কা এক-আধটা এখানে-ওখানে পড়ে আছে। খাঁটি কায়েতের ছেলে দেব, কিন্তু পাশ-করা দিতে পার্‌বো না।"

রহস্য-প্রকাশ-ভয়ে এবং সমাজে সরলভাবে চলিষ্ণু হইবার বাসনায়, অনঙ্গ বাবু তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। ঘটকের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল; কায়স্থ-পুত্র কুঞ্জবিহারীর সহিত প্রমদার বিবাহ হইয়া গেল, সমাজের এ গা-ঢালা সময়ে কেহই তাহাতে উচ্চবাচ্য করিল না। বিবাহের তিন মাস পরেই "ন-বসতের ধুম! তাতেই কুঞ্জর মা'র অবসর নাই।

পাঠক মহাশয়! পরিচয়ে পরিচয়ে আপনি হাড়ে-হাড়ে চটিয়াছেন। রাগ করিবেন না—এইবার আসল গল্প আরম্ভ।

শ্রীশশিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—সুরেশ্বরের প্রাসাদ।

(সুরেশ্বর, হেমলতা, ফুলেশ্বর, অমাত্যগণ এবং অনুচরগণের প্রবেশ।)

হেমলতা।—

প্রাণেশ্বর! বিঘ্নয় জাগিল বড় মনে—
অদ্ভুত বচন কহে প্রেমিকনিচয়।

সুরেশ্বর।—

অসম্ভব! অলীক কাহিনী অনুমানি;
প্রত্যয় না করি কভু উপকথা হেন।
বিকার-বিকল-বুদ্ধি উন্মাদ-প্রেমিক,
নিমগন কল্পনা-হিল্লোলে অনুখন;
কত গড়ে, কত ভাঙ্গে—কল্পনা-কৌশলে,
জ্ঞানের অতীত তাহা—নাহি হয় ধারণা।
প্রেমিক, পাগল, কবি—তিনই সমান;
বিজড়িত কল্পনা-সূত্রেতে সমস্ত্রাদে।
প্রেতমূর্ত্তি—উন্মাদ-নিরতে অগণিত—
অনন্ত নরকে যার স্থান-অকুলান।
প্রেমিক—বিকৃত-মনা, নেহ্যারে সদাই—
প্রেতপাশে অনুপম অপ্সরী-সুষমা।
সুমোহন কল্পনা-বিলোল অঙ্গিঠারে—
দেখ কবি—অনিমিষে ত্রিদিব-ত্রিলোক;
অজানিত অদেশের কতই কাহিনী,
অন্তরে গাঁথিয়া রাখে কল্পনার হারে;
শূন্যগর্ভ বায়ুবিম্ব—অদৃশ্য, অস্থায়ী—
অভাবিত রূপগুণে সাজায়ে যতনে,
বিশ্ববাসে প্রতিষ্ঠিত করে ধ্রুব-সম।
যে উলাসে উছলিত হৃদি-সরনিধি,
নেহ্যারে অনায়সে তার উৎস নিরমল।
গম্ভীর নিশীথে যথা গাঢ় অন্ধকারে—
শুভ্রপুঞ্জে, ক্রমক্রমে, ভ্রমের সঞ্চার।

হেমলতা।—

কিন্তু নাথ! শুনিলে সে রাত্রির কাহিনী,
মনে হ'লে—সিন্ধিলাভ অপরূপ হেন;
কল্পনা-স্বজিত চিত্র না হয় ধারণা,
সত্যের অনন্ত জ্যোতিঃ স্বতঃ-প্রস্ফুটিত!
সংঘটন—যেরূপ হউক নরনাথ!
বড়ই চমৎকারপ্রদ, নায়িক সংশয়।

সুরেশ্বর।—

হের প্রিয়ে! আসে ওই প্রেমিকনিচয়,
আনন্দ-উল্লাস-পূর্ণ সহাস-বদন।

(বিপিন, বিনোদ, প্রমদা ও মানদার প্রবেশ।)

এস—এস, আনন্দনন্দন প্রিয়জন!
নবপ্রেমে অনুরাগে বন্ধ হ'য়ে এস,
সে সুখ-লহরে চির রহ নিমগন।

বিপিন।—

তদধিক আনন্দ-হিল্লোল নরনাথ!
রাজপুরে প্রাসাদে হউক প্রবাহিত!

সুরেশ্বর।—

এস সবে, দেখি এবে—আছে কিবা
রঙ্গরঙ্গ-নৃত্যগীত বাদ্য-আয়োজন?
প্রহরেক ব্যবধান সান্ধ্যভোজ পরে—
তবে সে নিদ্রার কাল; এ দীর্ঘ সময়,
কৌতুকে কাটাতে কিবা হয়েছে উদ্যোগ?

ফুলেশ্বর।—

কি রঙ্গের—নাটকের, হয়েছে ব্যবস্থা—
সময়ের সুচীভেদ্য দূর করিবারে?
ডাক দেখি ফুলেশ্বরে—জানি সবিশেষ।

ফুলেশ্বর—
সর্ব্বজয়ী প্রবল প্রতাপ সুরপতি!
আজ্ঞাধীন দাস তব—আছে উপস্থিত।

সুরেশ্বর।—
সন্ধ্যার তামসী ছায়া অপসারি দূরে,
কিবা রঙ্গে, কি কৌতুকে, মাতাইবে প্রাণ?
অলস-মন্থর-পদে চলে কালগতি,
উল্লাস-আবেশে কিবা, কাটাইবে তারে?

ফুলেশ্বর।—
নরনাথ! এই তার আছে বিবরণ।
প্রথমে কি হবে তাহা করুন মনন
[একখানি কাগজ প্রদান।]

সুরেশ্বর।—
[পাঠ] "দুর্য্যোধন-উরুভঙ্গ—ভীমের বিক্রম!
যবনিকা অন্তরালে গীত মনোহর।"
না চাহি শুনিতে উহা; ভীমের কাহিনী—
সবিস্তারে বলেছি সেদিন প্রেয়সীরে।
[পাঠ] "সূর্পনখা-নাসাচ্ছেদ—লঙ্কার সমর;
মারীচের মায়ামৃগ—জানকী-হরণ।"
পুরাতন—চর্ব্বিতচর্ব্বণ অভিনয়;
শুনিয়াছি—অসুর-সমরে জয়ী যবে।
[পাঠ] "একাকার"—সমাজ-বিপ্লব—নাট্যরঙ্গ।
শিক্ষাপ্রদ সরস মধুর মনোহর।"
রঙ্গপূর্ণ ব্যঙ্গনাট্য—তীব্র মর্ম্মভেদী।
বিবাহ-উৎসবে তাহা নহে উপযোগী।
[পাঠ] "শোকাবহ হাস্যাত্মক ইন্দ্রজিত-বধ।
অভিনব—দীর্ঘসূত্রী ক্ষুদ্র-নটন্যাস।"
শোকাবহ—অথচ হইবে হাস্যাত্মক!
দীর্ঘসূত্রী—কিরূপে হইতে পারে ক্ষুদ্র?
অদ্ভুত কাহিনী! যেন—উষ্ণ হিমশীলা!
পারে কি ঘটিতে হেন—সংযোগ বিষম!

ফুলেশ্বর।—
ক্ষুদ্র অতি—সংশয় নাহিক তাহে কিছু;
সংক্ষিপ্ত এ হেন কভু—না হয় স্মরণ।
দীর্ঘসূত্রী—তবে যে কহিনু নরনাথ!
অশিক্ষিত অভিনেতা—সে দোষ তাদের।
অভিনয়ে অনিপুণ—উচ্চারণ ক'রে
মিমসিন; বিনিময়ে বাড়ায় সময়।
প্রমীলার চিতাশয্যা—ইন্দ্রজিত-বধ;
মর্ম্মভেদী ঘটনা, নিশ্চিত শোকাবহ।
কিন্তু নাথ! দেখিয়া সে প্রথম দিনের
অভিনয়; সত্য বটে, তিতিল নয়ন—
অশ্রুনীরে; তবে সে শোকের অশ্রু নহে—
ক্ষোভ এই, হাসিতে হাসিতে নাড়ি ছিঁড়ে।

সুরেশ্বর।—
কেবা তোরা—অভিনয়ে নিপুণ এমন!
কোথায় বসতি করে—কিবা পরিচয়?

ফুলেশ্বর।—
বৈজয়ন্তবাসী, মূর্খ শ্রমজীবি তারা;
অজ্ঞান-আঁধারে পূর্ণ অন্তর তাদের;
না জানি শবদ-ভাষা, অস্ফুটন্ত স্মৃতি;
এবে এই পণ্ডশ্রম করিল কেবল—
সুরনাথে তুষিবারে বিবাহ উৎসবে।

সুরেশ্বর।—
ভাল ভাল!—দেখিব তাদের অভিনয়।

ফুলেশ্বর।—
আপনার যোগ্য তাহা, নহে নরনাথ!
দেখিয়াছি ভালমতে—বৃথা শ্রম সার॥
আরো বৃথা মনে হ'ত—যদি না জাগিত
মনে উদ্দেশ্য তাদের—পরিশ্রম দৃঢ়,
অসহ দারুণ যত্ন, তুষিতে সুরেশে।

সুরেশ্বর।—
সেই অভিনয় আজি দেখিতে মনন।
নহে, তা নিন্দার যোগ্য, অনুষ্ঠান যার—
কর্ত্তব্য পালন সদা, সরল অন্তরে।
যাও ফুলেশ্বর—ত্বরা, আনহ তাদের।
আসন-গ্রহণে তুষ্ট করুন সকলে।

[ফুলেশ্বরের প্রস্থান।

হেমলতা।—
হেন মতে, সরল নিরীহ জনে নাথ!
কষ্ট দেওয়া অকারণ, নাহি লাগে ভাল।

সুরেশ্বর।—
মধুরভাষিণী প্রিয়ে! কোমল পরাণে—
দিব না দারুণ ব্যথা—সে কঠিন দৃশ্যে।

হেমলতা।—
তবে কেন প্রাণনাথ! কহে ফুলেশ্বর—
না জানে তাহারা কিছু—অজ্ঞ অভিনয়ে?

সুরেশ্বর।—
প্রাণেশ্বরী! অজ্ঞতার বাড়াব আদর।
অজ্ঞতার অকারণে দিব ধন্যবাদ।
প্রমাদে প্রসন্নভাব করিব প্রকাশ।
গুণের না হোক যত, দেখাব আদর—
কর্ত্তব্য-পালন-হেতু—ক্ষুদ্র-সাধ্য-জ্ঞানে।
অভিনয় যেরূপ হউক বিধুমুখী!
আমি তা করিব মনে—সক্ষম জ্ঞাপক।
কম্পিত চরণ, কিম্বা বিষম বচন;
ছেদাছেদ ভেদাভেদ বুঝিতে অক্ষম;
বিকল কণ্ঠের স্বর, ভয়েতে বিহ্বল;
বলিতে বলিতে কথা সহসা নীরব;—
এইরূপ যাহা কিছু উপজিবে ত্রুটি,
সকলি করিব জ্ঞান—সম্মানসূচক।
সংক্ষেপে কহিনু প্রাণ, মনঃ-অভিলাষ;
দিব না সরল প্রাণে বেদনা নিশ্চিত।

(ফুলেশ্বরের প্রবেশ।)

ফুলেশ্বর।—
অনুমতি আপনার—যাচে নরনাথ।
প্রস্তাবনা-পাঠ-হেতু অভিনেতৃগণ।

সুরেশ্বর।—
ভাল কথা! আসিতে বলহ প্রস্তাবকে।

[বাদ্যধ্বনি।

(কানাইর প্রবেশ।)

প্রস্তাবনা-পাঠ।—
আপনাদের বিরক্ত করা বা কষ্ট দেওয়া আমাদের ইচ্ছা। নহে কেবল সদিচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে। এসেছি—আপনাদের পরিতাপ প্রদান করিতেও। নহে—কেবল সম্মান দেখাইবার জন্য। আমরা আসিয়াছি!

সুরেশ্বর।—লোকটার হ্রস্বদীর্ঘ ছেদ-বিচ্ছেদ কোনই জ্ঞান নেই।

বিপিন।—আওড়াতে হয়, বাস, আউড়ে গেল—না আছে তাঁর, না আছে মুণ্ডু! কমা, ছেদ, কিছুরই বোধ নেই। এই জন্যেই পণ্ডিতগণ বলে থাকেন—অনেক বাজে কথা ক'য়ার চেয়ে একটা সাচ্চা কথাই ভাল!

হেমলতা।—বাস্তবিকই; বালকেও এর চেয়ে ভাল ক'রে বল্‌তে পারে। কেবল যেন হা'র ভেতর থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে গেল—না আছে তার মানে, না আছে কিছু!

সুরেশ্বর।—সুতোয় যেন জড়াপট্‌কা বেধে গিয়েছে; সবই আছে, কিন্তু এলেঁ খেলো—খেই-হারা। ফাক—এর পর কি?

(ইন্দ্রজিৎ, প্রমীলা প্রভৃতি দল-বলের প্রবেশ। প্রস্তাবনা-পাঠের ন্যায় হাস্যজনক অভিনয়। রাত্রি অধিক হওয়ায়, সকলের প্রস্থান।)

(প্রকৃত প্রবেশ।)

নিশীথিনী নীরবতাময়; দূর বনান্তরে
কেশরীর গভীর গর্জ্জন—অফুটন্ত
প্রতিধ্বনি প্রবেশে নগরে; ঊর্দ্ধমুখ
শার্দ্দূলের চীৎকারে কেবল—নিশামণি
হাসে নীল নভে; উল্লাস বিকট-স্বরে
পেচকের কর্কশ কঠোর কণ্ঠ গায়—
দিবসের সুচীভেদে দেখায়ে ভ্রূকুটি—

কালের করাল ছায়া !—শ্মশানের
সুদূর প্রান্তরে—অট্টহাসে হাসে যেন—
প্রেতমূর্ত্তি বিশ্বগ্রাসের—লকলক জিহ্বা।
নীলিম মুকুটে ফিরা শোভাময়ী চারু,
নিশারাণী—একচ্ছত্রী সমুদয়ের প্রায়।
অনুচর আমরা তাঁহার—হরষিত
অপার হরষে ; যাই এবে, রাজ-কার্য্যে ;
সমুদিবে অরুণ-পতাকা অগপরে,
জানাইবে—বিরাম সময় সমাগত ;—
গমনের পথ তাঁর করি পরিষ্কার।

(দলবল-সহ অনঙ্গ এবং ত্রিতারার প্রবেশ।)

অনঙ্গ।—

পরিক্লান্ত নিশামণি—অলস মন্থর
পদে করিছে প্রয়াণ—গৃহ-অভিমুখে।
জ্বলিতেছে মিটিমিটি ক্ষীণ দীপালোক—
মুমূর্ষু-অন্তিম রোগী সম—সুরপুরে।
সময়ের ক্রতগতি—চলিছে ত্বরিত
আগে আসে ; বিলম্বে বিফল হ'তে পারে
অন্তরের একান্ত পিয়াস—সুরেশ্বরে
শুভদিনে একাকে হেরিতে নৃত্যগীতে।
চল-চল প্রাণেশ্বরী, নৃত্যগীতে চারু,
আনন্দ-প্রবাহ পুনঃ করি প্রবাহিত।

ত্রিতারা—

প্রাননাথ ! চির অনুগামী দাসী তব ;
যেবা আজ্ঞা, করিব পালন-প্রাণপণে।
চলুন ত্বরায় তবে, তুষিতে সুরেশে—
সুন্দর নৃত্যগীতে-আলোইতে পুরী।

অনঙ্গ।—

অরুণের তরুণ কিরণ—পুবাকাশে
প্রতিচ্ছায়া প্রস্ফুটিত হইল তাহার ;
দম্পতি-ত্রিতয়ে নব—আশীর্ব্বাদ শুভ
করিব প্রভাতে বোধে ; করিব জ্ঞাপন—
অন্তরের অভিলাষ—সুখে যেন চির
প্রেমের লহরে ধৃত রহে নিমগন।

রোগে শোকে সন্তাপে বিচ্ছেদে যেন কভু
কষ্ট নাহি পায় কোন দম্পতি-নিচয়।
জন্মিবে যা' তাঁহাদের বংশের দুলাল
ভবিষ্যতে, শ্রীমান সুন্দর যেন হয়।
মৃণাল সমান বাহু, কমল বদন,
গণ্ডদেশ আভাময় গোলাপ রঙ্গিনে ;
বীর্য্যবান, কীর্ত্তিমান, অতুল-বিক্রম,
বিনীত, বিদ্বান, সর্ব্বগুণান্বিত—
এরূপ সুপুত্র যেন জন্মে তাঁহাদের।
প্রাসাদের চারিভিতে যেন সমভাবে,
শান্তির হিল্লোল চির রহে বহমান।
প্রিয়া-সনে, সুরেশ্বর—সরসের পতি,
অনন্ত আনন্দে যেন রহেন মগন।
পরীগণ ! চল সবে—মিলিগে প্রভাতে,
সুরেশ্বরে আশীর্ব্বাদ করিতে এমতে।

[সকলের প্রস্থান

পঙ্কু।—

ভ্রান্তিভাবে অঘটন ঘটিল তেমন ;
সংশোধন বহুকষ্টে হইয়াছে তার।
দোষী আমি—অপরাধ সম্পূর্ণ স্বীকার ;
ছায়া জ্ঞানে কায়াহীনে করিবেন ক্ষমা।
ভাবিবেন—ছিলেন যখন তন্দ্রাঘোরে,
দেখেছেন এ সকল স্বপ্ন বিভীষিকা।
স্বপ্নময় অমূলক অলীক কাহিনী,
মতান্তরে করিবেন বিধিমতে দূর।
ক্ষমাভিক্ষা মাগি আমি সুজন সমীপে,
কেহ যেন আর মোরে না দেন গঞ্জনা।
ঘটনা—বিধির-সৃষ্টি, কি করিব আমি ?
কৌতুকে হয়েছি শুধু নিমিত্তের ভাগী।
ঘটনার ক্রূরগতি করিয়া স্মরণ,
ক্ষমা করিবেন মোরে—শেষ নিবেদন।

[প্রস্থান।

শ্রীমোহিতগোপাল লাহিড়ী।

সম্পূর্ণ।

'নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্নের' অনুবাদ সম্বন্ধে

দুই একটী কথা।

বিজ্ঞাপিত সময়েই "নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্নের" পরিসমাপ্তি হইল। বিষয়টী যেরূপ গুরুতর এবং তাহাতে কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা যেরূপ সুদূর-পরাহত, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

পূর্ব্বেই সে কথা বলিয়াছি যে, মহাকবি সেক্সপীয়ারের নাটক 'মিড্ সমার্স নাইট ডিস্ড্রীম' (A Mid-Summers Night's Dream) বিদেশীয় ভাবমূলক কঠিন ভাষার অনুবাদ ও এ দেশীয়ে তাহার সমীকরণ, কষ্টকল্পনা মাত্র ; বিশেষতঃ, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহোদয়ের অমানুষী প্রতিভার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যাওয়া—তাঁহার এক-প্রকাশের অনুবাদের সহিত মিল রাখিয়া পুস্তকের পরিসমাপ্তি করা—বড়ই দুঃসাহসের কার্য্য। যাহা হউক, চাপল্যবশতঃ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার আর উপায় নাই ; অগত্যা কোনরূপে শেষ করিয়া দিতে হইল।

সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ এবং স্বয়ং কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহোদয়, যদিও আমার এ অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমায় উৎসাহ দিয়াছেন ; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি—সে কেবল তাঁহাদের সহৃদয়তার পরিচয় মাত্র, আমার অনুবাদের নহে। নহিলে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ত্রুটি কতরূপে হইয়াছে ! প্রথমতঃ, বিদেশের পৌরাণিক ঘটনার সহিত এ দেশের পৌরাণিক ঘটনার সামঞ্জস্য কোথায় ? সুতরাং তাহার সকল স্থলেই আন্দাজের উপর বলিতে হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশের আচার-ব্যবহার, পরণ-পরিচ্ছদ-খাওয়াই বা মিলিবে কিরূপে ? সুতরাং তদ্বিষয়েও বহু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন আবশ্যক হইয়াছে ! এইরূপ বিবিধ কারণে, দুই এক স্থলে একেবারে পরিত্যাগ করিতেও হইয়াছে। দুই এক স্থলে সংযোজনেরও আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং ত্রুটি যে নানা-রূপে ঘটিতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য।

তবে মনের প্রবোধ এই, কবিবর নবীনচন্দ্র বসু—নিজেও পূর্ব্বাপর ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে পথে গিয়া তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি মাত্র—নূতন কিছুই করি নাই—এই যা' ভরসা। আর সহৃদয় গ্রাহক মহোদগণও বোধ হয়, এই সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিবেচনা করিয়াই আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে কেহকেহ আমাকে সেক্সপীয়ারের অন্যান্য দুই একখানি নাটকের (Hamlet, Romeoeond Jliet প্রভৃতির) এইরূপে অনুবাদ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অত্যধিক সহৃদয়তার পরিচায়ক। সে বিষয়ে অদ্য যদিও নিশ্চিত কিছু বলিতে পারিতেছি না ; কিন্তু ভরসা করি, যদি আমার ঐরূপ মর্ম্মানুবাদ কোন-রূপে চলিতে পারে, আগামী বর্ষের 'অনুসন্ধানে' সেরূপ কোন চেষ্টা করা যাইবে—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঐরূপ একখানি নাটকের অবতারণা করা হইবে।

নিবেদক

শ্রীমোহিতগোপাল লাহিড়ী।

মতামত।

পুস্তক।—

প্রহ্লাদ।—উপন্যাস-ছলে ধর্ম্ম-প্রচার।—ভূতপূর্ব্ব 'আর্য্যদর্শন'-সম্পাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত যোগেশনাথ বিদ্যাভূষণ, এম, এ বিরচিত। মূল্য ।৵ চারি আনা।

মহামতি প্রহ্লাদের ভক্তিময় অপূর্ব্ব জীবন-চরিত—এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উপন্যাস-আকারে বিবৃত হইয়াছে। 'উপন্যাসের ন্যায় সরল মধুর ভাষায়, পরপর তদনুরূপ ঘটনা-সমাবেশে, এবং প্রহ্লাদ-জীবনের সেই প্রগাঢ় ভক্তি-তত্ত্বের মর্ম্মানুসরণে, পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় সরস্বতীর প্রিয়পুত্র, বঙ্গ-সাহিত্য সংসারের কীর্ত্তিমান পুরুষ; তাঁহার এ অভিনব উপায়ে—উপন্যাস-ছলে ধর্ম্মপ্রচারে বাস্তবিকই অনেকের মহদুপকার হইবে। আজিকালিকার স্ত্রীলোক ও যুবক—অনেকের নিকটই প্রহ্লাদ-চরিত্র আকাশ-কুসুমবৎ অজানিত; এ পুস্তকে তাহাদের অশেষ উপকার সাধিত হইবে, নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

জ্বর-চিকিৎসা।—প্রথম ভাগ—দ্বিতীয়-সংস্করণ।—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মৈত্র, এম-বি প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মৈত্র, এম-বি মহাশয়, আজকাল কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক। তাঁহার যশঃ-সুনাম সর্ব্বত্র; তিনি সুপণ্ডিত, সুবিদ্বান ও সুচিকিৎসক। এই 'জ্বর-চিকিৎসা' তাঁহার সেই বহু দর্শিতার পরিচায়ক।

পুস্তকের ভূমিকায় যে লিখিত হইয়াছে,—"এবার এই পুস্তকখানি প্রথম বারের অপেক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত; প্রকৃতপক্ষে ইহা এ দেশীয় জ্বরচিকিৎসার পুস্তক হইয়াছে, কোন ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ নহে। অনেকগুলি লক্ষণ এ দেশে দৃষ্ট হয়, তাহা ঔষধ-বিবরণ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম চিকিৎসকগণের ঔষধ নির্ণয় সম্বন্ধে যে গোল হয়, আমি তাহার ভুক্তভোগী; যেখানে ঐ প্রকার গোল হইতে পারে, সেগুলি আমি বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।" পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগ-সহকারে দেখিলে, প্রকৃতই এ কথার সার্থকতা প্রতিপালিত হয়।

সে বিষয়ে, একটী বিষয় বলিলেই বোধ হয়, অনেকে বুঝিতে পারিবেন। এই ধরুন—'একোনাইট' ও 'বেলেডোনা'—দুটী ঔষধই প্রায় সম-গুণজ্ঞাপক। সুতরাং ব্যবস্থার সময় বড়ই গোল বাধে। এই পুস্তকে, সেইরূপ বিবিধ শ্রেণীর সংশয় দূর করিবার জন্য, পাশাপাশি দুইটী ঔষধের লক্ষণ ও প্রভেদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ফলতঃ 'জ্বর-চিকিৎসা' যে বহু-পাঠ ও বহুদর্শিতার ফল, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি; ৪৫—৯নং কলেজ ষ্ট্রীটে মৈত্র এণ্ড কোম্পানীর দোকানে পাওয়া যায়।

নূতন পঞ্জিকা—১৩০২সাল।

কবিরাজ নিশিকান্ত সেন কবিভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক ৩নং কুমারটুলিস্থিত তদীয় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় হইতে বিনামূল্যে বিতরিত।

এত বড় একখানি 'ফুল পঞ্জিকা' এ পর্য্যন্ত আর কেহ যে বিনামূল্যে দিতে পারিয়াছেন, আমাদের তাহা স্মরণ হয় না—সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ নিশিকান্ত সেন মহোদয় এমনই বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। পঞ্জিকাখানি পাঠাইবার ডাকমাশুলই ঠিক ৵০ এক আনা লাগে। যে কেহ বিনামূল্যে এইরূপ একখানি পঞ্জিকা পাইবার ইচ্ছা করেন, সত্বর পঞ্জিকা পাঠাইবার ডাকমাশুল এক আনা উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে, পঞ্জিকা পাইতে পারিবেন।